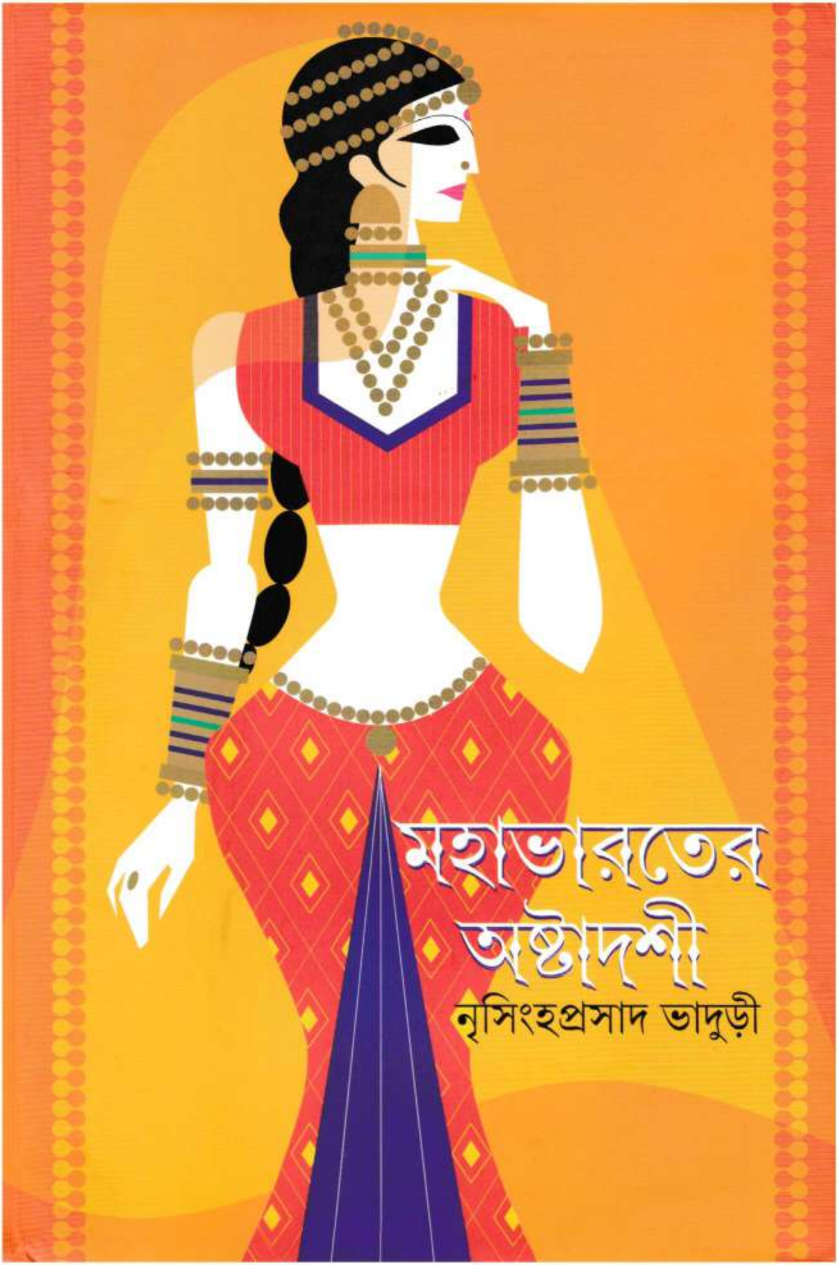
মহাভারতের
অষ্টাদশী
নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

মহাভারতের প্রধান
নারীচরিত্রগুলি নিয়ে
এই বই। প্রত্যেকটি
চরিত্রের বিশ্লেষণ
মহাভারতের গভীর
বিচিত্র দর্শনে এই
গ্রন্থের পাঠককে
সমৃদ্ধ করবে।

9 789350 402801

মহাভারতের প্রধান নারীচরিত্রগুলি নিয়ে এই বই। দেবাভিসম্পাতে স্বর্গ থেকে পতন হল উর্বশীর, তিনি মর্ত্যের রাজা পুরূরবাকে বরণ করলেন। মহাভারত মহাকাব্যের সূচনা হল।
শুধুমাত্র হস্তিনাপুরের রাজনীতি নয়। মহাভারতের বিশাল চালচিত্রে রয়েছে মুনি-ঋষি এবং তাঁদের পত্নীকুলের কথা। বহু বিচিত্র রাজা-মহারাজার কাহিনি। পুরুষের বীরগাথার পাশাপাশি আছে নারীকুলের প্রেম, ত্যাগ, ক্রোধ ও প্রতিহিংসার বিবরণ। আছে যন্ত্রণার ইতিকথা। ঘটনা যতই স্বয়ংসম্পূর্ণ হোক, কোনও না কোনও সূত্রে কাল তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছে কুরু-ভরতবংশের সংশ্লিষ্ট কোথাও। কেউ খানিক দূরের, কেউ কাছের। কিন্তু গুরুত্বের বিচারে সকলেই উল্লেখ্য। দেবযানী আর শর্মিষ্ঠা, মাধবী বা লোপামুদ্রা, অম্বিকা, অম্বালিকা, কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা, কুন্তী-দ্রৌপদী-গান্ধারী-মাদ্রী প্রমুখ প্রত্যেকটি চরিত্রের বিশ্লেষণ মহাভারতের গভীর বিচিত্র দর্শনে এই গ্রন্থের পাঠককে সমৃদ্ধ করবে।

৫০০.০০

ISBN 978-93-5040-280-1

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর জন্ম ২৩ নভেম্বর, ১৯৫০ অধুনা বাংলাদেশের পাবনায়। কৈশোর থেকে কলকাতায়। মেধাবী ছাত্র, সারা জীবনই স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনা। অনার্স পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে পেয়েছেন গঙ্গামণি পদক এবং জাতীয় মেধাবৃত্তি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত সাহিত্যে এম-এ। স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য এবং সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের কাছে একান্তে পাঠ নেওয়ার সুযোগ পান। নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবনের সূচনা। ১৯৮১ থেকে কলকাতার গুরুদাস কলেজে।

১৯৮৭ সালে প্রখ্যাত অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে ডক্টরেট উপাধি পান। বিষয়— কৃষ্ণ-সংক্রান্ত নাটক। দেশি-বিদেশি নানা পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত। আনন্দবাজার, দেশ ও বর্তমান পত্রিকার নিয়মিত লেখক। প্রিয় বিষয়— বৈষ্ণবদর্শন এবং সাহিত্য। বৌদ্ধদর্শন এবং সাহিত্যও মুগ্ধ করে বিশেষভাবে। বাল্যকাল কেটেছে ধর্মীয় সংকীর্ণতার গণ্ডিতে, পরবর্তী জীবনে সংস্কৃত সাহিত্যই উন্মোচিত করেছে মুক্তচিন্তার পথ।

প্রচ্ছদ সুদীপ্ত দত্ত

মহাভারতের অষ্টাদশী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাভারতের অষ্টাদশী

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

আ ন ন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০১৩
পঞ্চম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৬

© নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-93-5040-280-1

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড
সিপি৪ সেক্টর ৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা ৭০০ ০৯১
থেকে মুদ্রিত।

MAHABHARATER ASTADASHI
[Essay]
by
Nrisinghaprasad Bhaduri

Published by Ananda Publishers Private Limited
45 Beniatola Lane, Calcutta 700009

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি এখন ত্বরিতগতি ছন্দ থেকে মন্দাক্রান্তায় পরিণত
সেই উত্তর-মেঘের সুষমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের প্রকাশিত

এই লেখকের অন্যান্য বই

কৃষ্ণা কুন্তী এবং কৌন্তেয়
দেবতার মানবায়ন শাস্ত্রে সাহিত্যে কৌতুকে
বাল্মীকির রাম ও রামায়ণ
মহাভারতের ছয় প্রবীণ
মহাভারতের প্রতিনায়ক
মহাভারতের ভারত যুদ্ধ এবং কৃষ্ণ
শুকসপ্ততি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরম্ভে

মহাভারতের অষ্টাদশী। অষ্টাদশী কথাটা একটা সংজ্ঞা। আমি বিয়াল্লিশ বছরের ঈষৎ-মেদিনী দেখেছি কত, তাঁদের মনের ভিতর এখনও কেমন অষ্টাদশী খেলা করে। কত ষাট-বাষট্টির মহিলা দেখেছি—সতত রোমন্থনী—সংস্কৃতের কবিতমা শিলা ভট্টারিকা কি এঁদেরই কথা স্মরণ করেছিলেন সহস্রবার উচ্চারিত এই শ্লোকে—সেই আমার যৌবন সন্ধিতে আমার কুমারীত্ব-হরণ-করা এই বর, সে তো সেই আছে, সেই চৈত্রের রাতগুলি তাও একই রকম আছে, এখনও উন্মীলিত মালতীর বুক স্পর্শ করে ঘুরে আসে প্রৌঢ়পুষ্প কদমফুলের হাওয়া, এমনকী আমিও তো সেই আমিই আছি, বদলাইনি একটুও, কিন্তু তবুও...তবুও বারবার মনে পড়ে সেই রেবা নদীর তীর, সেই বেতসীলতার কুঞ্জগৃহগুলি, যেখানে বারবার চুরি করে গিয়ে মিলিত হয়েছি তাঁর সঙ্গে—সা চৈবাস্মি তথাপি চৌর্য-সুরতব্যাপার-লীলাবিধৌ/রেবা-রোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে।

এই হল বিয়াল্লিশ-বাষট্টির দেহপুটে অষ্টাদশীর মন। আর পুরুষ মানুষের কথা নাই বা বললাম। প্রাচীনা এক রমণীই দুঃখ করে বলেছিলেন—এটা ঠিকও নয় এবং এটা মানায়ও না যে, পুরুষগুলোর শরীরে জরা ধরে যাবে, তবু তাদের লাম্পট্যের বিকার যায় না—যদিহ জরাস্বপি মান্মথাঃ বিকারাঃ। কথাটা সম্পূর্ণ মেনে নিয়েছিলেন বিদগ্ধ ভোজরাজ। তিনি এই কথার উত্তরে বলেছিলেন—তা হলে কি মেয়েরা ঠিক এইরকম নাকি যে, যৌবনবতীর মৃদু-কঠিন স্তন দুটি বয়সের ভারে একটু নমিত হতেই তাঁদের জীবনটাও শেষ হয়ে যায়, নাকি শেষ হয়ে যায় রতি-বিলাস-কলা—স্তনপতনাবধি যৌবনং বা রতং বা? ভোজরাজের প্রত্যুত্তরটা হয়তো একটু তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে বিদগ্ধা রমণীর মুখের ওপর জবাব দিতে গিয়ে এবং আমরা এটা বেশ জানি যে, শাস্ত্র এবং কাব্যে অশেষ রমণীকুলকে যতই কলঙ্কিনী করা হোক, যতই না তাঁদের অখিল পুরুষের ধৈর্য-ধ্বংসী যন্ত্রে পরিণত করা হোক, আমরা বেশ জানি—তার জন্য দায়ী পুরুষেরাই এবং দায়ী তাঁদের বিধিসৃষ্ট শরীরগ্রন্থিগুলি, আর হৃদয়গ্রন্থিও বটে।

পরস্পরের ওপর দোষারোপ বাদ দিয়েও বলা যায়—দুই পক্ষেই অন্তঃশায়ী মনের বয়স খুব বাড়ে না। বাড়লে জীর্ণ-পক্ক শরীরের সঙ্গে মানায় না বলে মনকে খানিক বুড়িয়ে নিতে হয় বটে, কিন্তু গভীর সঙ্গোপনে অষ্টাদশী মন তখনও কাজ করে, কাজ করে পৌরুষেয় আঠেরোর কৌতূহল—সেই ইনারশিয়া, যা চলতে থাকে এবং যার উৎসমূল সেই আঠেরো—অথবা the cobweb of premarital acquaintanceship—জর্জ ইলিয়টের শব্দ। আমরা কিন্তু অষ্টাদশীর মন নিয়ে বিচার করতে বসিনি এখানে, শুধু বলতে চেয়েছি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাভারতে বহুল নারী-চরিত্রের মধ্যে রাজকুলের রজোগুণ-সমন্বিত রমণীরা যেমন আছেন, তেমনই আছেন ঋষিপত্নীরা, আছেন দার্শনিক মহিলা, এবং আছেন গণিকা-বেশ্যারাও। সবচেয়ে বড় কথা, ভারতবর্ষের চিরন্তন ঐতিহ্যে হাজারো যাঁরা ভাগ্যবতী পরম সতী আছেন, তাঁরাও তো বিরাজ করছেন মহাভারতে। সাবিত্রী আছেন, দময়ন্তী আছেন—সতীত্বের জন্যই তাঁরা অসাধ্য সাধন করেছেন। এই দু'জনের মধ্যে সাবিত্রী তো মৃত্যুর দেবতা যমরাজকে পর্যন্ত অভিভূত করে ফেলেছেন আপন নিষ্ঠায়। মহাভারত-পুরাণ, আমাদের ধর্মশাস্ত্র, শ্রৌতশাস্ত্র সর্বত্র যে-কথাটা পাওয়া যাবে, সেটা হল পুরুষের জন্য শত রকমের ধর্ম-নিয়ম, সংস্কার, তপস্যার বিধান আছে আত্মশুদ্ধির জন্য, ঐহিক-পারত্রিক উন্নতির জন্য। কিন্তু স্ত্রীলোকের কাছে সংস্কার একটাই, সেটা বিবাহ এবং তাঁর সমস্ত তপস্যাটাই স্বামীর সন্তুষ্টি লাভের মধ্যে নিহিত। এই মানসিকতার চরম পর্যায়ে কিন্তু সেই বিখ্যাত পৌরাণিক কাহিনী তৈরি হয়েছে—যেখানে এক কুষ্ঠরোগী চলচ্ছক্তিহীন স্বামীকে বেশ্যাবাড়ি পৌঁছে দেবার মধ্যে সতীত্বের সিদ্ধি চিহ্নিত হয়েছে প্রাচীন পুরাণেই। সাবিত্রী এখানে সতীত্বের প্রভাবে মৃত্যুলোক থেকে ফিরিয়ে আনছেন স্বামীকে এবং একভাবে তিনি যেন এখানে কঠোপনিষদের নচিকেতার কাছাকাছি পৌঁছে যান।

আর দময়ন্তীকে দেখলাম— সে এক অদ্ভুত দুরন্ত প্রেম, যা এক বিরাট 'স্ট্রাগল'-এর মধ্য দিয়ে আসছে—নল-রাজা দৈব-দুর্বিপাকে জুয়া খেলে সব হারাচ্ছেন, কলি প্রবেশ করছে তাঁর শরীরে, শেষ পর্যন্ত সর্বরিক্ত এক হীন মানুষে পরিণত হচ্ছেন তিনি। দময়ন্তী যেখানে নির্মল প্রেমের প্রতীক, প্রেমের জন্য লৌকিক জগতের যন্ত্রণা এবং অলৌকিক জগতের পরীক্ষা—সব সামলাচ্ছেন। অবশেষে মিলন এসেছে পতিনিষ্ঠার অনিবার্য পরিণতিতে। এটাও কিন্তু সতী ধর্মেরই একপ্রকার 'রোমান্টিক ট্রান্সফরমেশন'। অথচ আমরা এই সংকলনের মধ্যে সাবিত্রী-সত্যবানের মৃত্যুঞ্জয়ী সতীভাবনা অথবা নল-দময়ন্তীর পরিণাম-রমণীয় প্রেম নিয়ে পুনর্বিচার করিনি। মহাভারত গ্রন্থখানা যেহেতু এক বিরাট বিচিত্র সভ্যতা এবং এক চলমান জীবনের প্রাচীন প্রতিরূপ, আমরা তাই নিখিল-রমণীকুলের বিচিত্র মানসলোকে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছি। কেননা চলমান রমণী-জীবন শুধু সতীত্ব-নির্ভর এককেন্দ্রিক অনুভূতি নয়। সেখানে ব্যাকরণ মতে পঞ্চস্বামীর প্রতি সম-ব্যবহারের দায় এবং দাবি থাকলেও দ্রৌপদী বেশি ভালবাসেন অর্জুনকে। কিংবা কন্যাবস্থায় পুরুষ-সমাগমের মতো অষ্টাদশী ভ্রান্তি ঘটলেও পরবর্তী বিবাহিত জীবনের মুখোমুখি হওয়াটা কেমনতর দুঃসাহসিক অভিযান হয়ে দাঁড়ায়—সেটাও মহাভারতীয় সত্য উদঘাটনের একটা বড় প্রসঙ্গ হয়ে ওঠে কুন্তী কিংবা সত্যবতীর জীবনে।

মহাভারতের রমণী-মানস নিয়ে যদি গভীরভাবে চিন্তা করা যায়, তা হলে দেখা যাবে—সেখানে একটা বড় দুশ্চিন্তা আছে মেয়েদের স্বভাব-চরিত্র নিয়ে। এটা অবশ্যই সেই চরিত্র—যার অবশেষ পরিণতি হল সেই সব নিন্দামুখর প্রবাদ— নারী নরকের দ্বার, কিংবা বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ। মেয়েদের সম্বন্ধে এইসব প্রচার যে, মেয়েরাই দুর্দম কামনায় পুরুষকে প্রলুব্ধ করে, তারাই সবচেয়ে বেশি কামুক এবং সুযোগ পেলে কোনও পুরুষকেই তারা ছাড়ে না—পুমান্ ইত্যেব ভুঞ্জতে—এই সব প্রচার কিন্তু ভারতীয় নীতি-উপদেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়গা নয় শুধু, কিংবা নয় শাস্ত্রীয় সতর্কবাণী, এমনকী এটা একটা সামাজিক সিদ্ধান্তও শুধু নয়, এটা একটা সামগ্রিক বিশ্বাস যে, মেয়েরাই যত সর্বনাশ তৈরি করে। তার মধ্যে মহাভারতে যখন এক ঋষি এক স্বর্গবেশ্যা অপ্সরাকে জিজ্ঞাসা করেন—তোমার কাছে আমি মেয়েদের স্বভাবের কথা শুনতে চাই, তখন উত্তরটা ভীষণ 'ইনট্রিগিং' হয়ে যায়। অপ্সরা বলে—আমি একটা মেয়ে হয়ে মেয়েদের নিন্দে করতে পারব না—প্রত্যুবাচ ন শক্ষ্যামি স্ত্রী সতী নিন্দিতুং স্ত্রিয়ঃ। তার পর অপ্সরা রমণী আস্তে আস্তে বলতে থাকে মেয়েদের স্বভাব-চরিত্রের কথা। তাতে মেয়েদের মনের গভীরতা এমনভাবেই স্ফুট হয়ে ওঠে যেন মেয়েরা সবাই পুরুষ দেখলেই হামলে পড়ছে—বেঁটে-খাটো, মোটা-কালো, মূক-বধির কোনও পুরুষেই যেন আপত্তি নেই—স্ত্রীণামগম্যো লোকেঽস্মিন্ নাস্তি কশ্চিন্মহামুনে।

আমরা স্বচ্ছ দৃষ্টিতে বুঝতে পারি যে, এই কথাগুলির মধ্যে একটা একপেশে বাড়াবাড়ি আছে এবং কথাগুলি মেয়েদের মুখেও সাজিয়ে-গুছিয়ে চাপানো হয়েছে। ফলত একটি মেয়েই এখানে ত্রস্ত-ভীত নীতিবাগীশ বৃদ্ধের মতো বলে ওঠে—যৌনতার সমস্ত দোষের মূলে আছে মেয়েরা এবং তা সবাই জানে—স্ত্রিয়ো হি মূলং দোষাণাং তথা ত্বমপি বেত্থ চ। আমরা অবশ্য মনে রাখব যে, এই কথাগুলি যে বলছে সে একজন অপ্সরা, যার মধ্যে পৌরুষের গণ্যতা থাকে না, গম্যতাও নয় এবং বিপ্রতীপ ভাবনায় এটাও বুঝতে দেরি হয় না যে, পুরুষমাত্রেই যেভাবে সার্বিক কামনায় মথিত হয়, সেই মানসিক তথা যৌন মন্থনই প্রতিফলিত-ভাবে নারীর মধ্যে দেখে পুরুষ। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, নারী-শরীরের গঠন, তার স্তন-জঘন-নিতম্বের ব্যঞ্জন স্বভাবতই অথবা 'ইনস্টিংক্টিভলি' পুরুষকে আকর্ষণ করে এবং সে আকর্ষণ দুর্দমনীয় বলেই কামুকতায় আচ্ছন্ন পুরুষ সমস্ত দোষটাই চাপিয়ে দেয় মেয়েদের ওপর যেন তারা আকর্ষণ করছে বলেই পুরুষ আকৃষ্ট হচ্ছে, তা নইলে তারা শমদমের সাধনে এতটাই সিদ্ধ যে অশেষ রমণীকুল যদি চলাফেরা করে আকর্ষণ না করত তা হলে পুরুষেরা সব সময় উদাসীন চক্ষুতে উর্ধ্বরেতা হয়ে বসে থাকত।

মহাভারত মেয়েদের খুব বাস্তব দৃষ্টিতে দেখে এবং সমাজের বাস্তবটাও সে সঠিকভাবে জানে। ফলে সীতার মতো অমানুষী সতী-চরিত্র সাবিত্রী কিংবা দময়ন্তীর মাধ্যমে আরও নাটকীয়ভাবে সেখানে আসে। কিন্তু সতীত্বের মতো এমন সৎ উপদেশ বস্তু থাকতেও মহাভারত জানে যে সংসারের বাস্তব এমনই অথবা কন্যা-জীবনের কৌতূহল এবং আকর্ষণও এমন হতে পারে যে, বয়ঃসন্ধিতে বিধিসম্মত বিবাহের পূর্বেই তার গর্ভাধান ঘটে গেল। মহাভারতে সত্যবতীর জীবনে এই ঘটনা ঘটেছে, একই ঘটনা ঘটেছে কুন্তীর জীবনেও। সত্যবতী তাঁর জীবনের এই রহস্য প্রকট করে দিয়েছেন, কিন্তু সত্য লুক্কায়িত ছিল কুন্তীর জীবনে। যে সমাজ কানীন পুত্রকে মেনে নিত, সেইখানে দাঁড়িয়েও কুন্তী যে তাঁর এই সঞ্চিত রহস্য উন্মোচন করলেন না, এটাও তো একটা জটিল জীবন-যাপনা, যা অনেকানেক বাস্তবের কাছাকাছি আসে। মহাভারত এই বাস্তবকে মর্যাদা দেয়, এই বাস্তবকে সে মহাকাব্যিক পরিণতি দেয়—কুন্তীকে দেখতে হয় তাঁর কানীন পুত্র তাঁরই বিধিসম্মত পুত্রের প্রতিযোদ্ধা।

নারী-জীবনে সতীত্বের নিষ্ঠা বৈধতাকে তুঙ্গভূমিতে প্রতিষ্ঠা করে বটে, কিন্তু ঔপপত্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকর্ষণও পৃথিবীতে কম নয়, যেমন কম নয় পুরুষের দিক থেকে পরকীয়া প্রেমের আকর্ষণ। কিন্তু স্ত্রীলোকের দিক থেকে ঔপপত্য কিংবা পুরুষের দিক থেকে পরকীয়ার কোনও সুস্থির পরিণতি নেই, তা নেহাৎই এক চরম আস্বাদন মাত্র। ব্যবহারিক জীবনে পরকীয়া কিংবা ঔপপত্যের ব্যাপারে কোনও শাস্ত্রীয় অনুমোদন থাকতে পারে না। ফলে মহাভারত সেখানে প্রায় নিশ্চুপ আর ধর্মশাস্ত্রের ভাবনাতেও প্রথাসিদ্ধ বৈবাহিক প্রেমের বাইরে নারী-পুরুষকে উৎসাহিত করাটা কোনও মহাকাব্যিক উদ্দেশ্য হতে পারে না। কিন্তু মহাভারতের সমসাময়িক সমাজ এবং তার পূর্বকল্পে জীবনচিত্রটাই এমন ছিল, যেখানে কন্যা অবস্থায় যাচিত এবং অযাচিত পুরুষ-সঙ্গমে স্ত্রীলোককে নিগ্রহের জায়গায় নিয়ে যায়নি। এমনকী বৈবাহিক জীবনেও ধর্ষণ এবং অতিক্রমের ঘটনায় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা বা ভয়ংকর শাস্তি দেওয়া শাস্ত্রীয় অনুমোদনেই নিষিদ্ধ হয়েছে মহাভারতে। মহাভারতে সত্যবতী, কুন্তী এবং দ্রৌপদীর জীবনে বারবার যে প্রশ্ন উঠেছে—প্রথম সঙ্গমের পরেও তাঁদের কন্যাভাব সুস্থির থাকছে কিনা—এই কুটিল প্রশ্নে দেবতার বরদান বস্তুটাকে একটা অতিপ্রাকৃতিক স্যাংশন হিসেবে না মানলেও চলে। মাসান্তিক অথবা সন্তান জন্মের পর রজঃচক্রের আবর্তনেই স্ত্রী-শুদ্ধির ঘটনাটা এত উদার এবং মহান ভাবে বুঝেছে মহাভারত যে সেটাকে দেবতার বরদানের মতোই গ্রহণ করা যায়। এমনকী তা পরবর্তীতে কঠিন-হৃদয় ধর্মশাস্ত্রকার অথবা স্মার্তেরও বিধান-নিদান বটে।

নারী-স্বাধীনতার উচ্চারণের মধ্যে আজকাল এক ধরনের অসহিষ্ণুতা দেখি। অনেক মহিলাকেই দেখি তাঁরা আকণ্ঠ ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন পুরুষের ওপর। মহাভারতের চরিত্র-ভাবনায় বোঝা যাবে যে জীবন বড় বিচিত্র রসময়তায় বয়ে চলে, সেখানে পুরুষের পৌরুষেয় যন্ত্রণা-অত্যাচার এবং সর্বগ্রাসী অধিকার-বোধ কখনও এককোটিক চরম সত্য হতে পারে না। পুরুষের প্রতি সার্বিক সন্দেহ এবং শঙ্কা এক ধরনের রমণীয় অসহনীয়তা তৈরি করছে এবং তা আজকাল আমাদের সমসাময়িক যুবক-যুবতীর মধ্যে এমন এক মানসিকতার ইন্ধন দিয়েছে যে, তারা অনেক সময় সঠিক বয়সে বিয়েই করতে চাইছে না। বিশেষত মেয়েরা। মহাভারত এখানে যেন এক বিকল্প হিসেবে কাজ করে। এখানে প্রেম, ভালবাসা, যৌনতা, এবং নারী-পুরুষের এককোটিক উদগ্রতাও এমন এক মহাকাব্যিক সহনীয়তার মধ্য দিয়ে পরিস্রুত হয়, যাতে অনেক কিছুই শিক্ষণীয় হয়ে ওঠে, এমনকী পালনীয়ও বটে।

এই গ্রন্থে মহাভারতের সেই সব রমণীর চরিত্র এবং মানস নিয়ে আমরা ভেবেছি, যাঁদের বিশেষত্ব আছে—এবং সেটা মহাকাব্যিক বিশেষ। কুন্তী এবং দ্রৌপদীকে নিয়ে আমায় নতুন করে তপস্যায় বসতে হয়েছিল, কেননা এঁদের কথা আমি আগে লিখেছি। কিন্তু এতদিনে আমার বয়স বেড়েছে এবং তার সঙ্গে ছাত্র হিসেবে বিদ্যালাভের পরিসরও কিছু বেড়েছে। বিশেষত পণ্ডিত-সজ্জনদের সতত চলমান সারস্বত চর্চার নিরিখে মহাভারতের স্ত্রী-চরিত্র নিয়ে যেহেতু নতুন করে ভাবার প্রয়োজন ছিল, তাই কুন্তী-দ্রৌপদীর মতো শাশুড়ি-বউকে নিয়ে আরও ভাবতে হয়েছে আমাকে। অন্যান্য স্ত্রী-চরিত্রগুলিও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আগে বেরিয়েছে, কিন্তু গ্রন্থনার প্রয়োজনে সেগুলিরও পরিবর্ধন-পরিমার্জন ঘটেছে।

পরিশেষে জানাই, অনেক বিপরীত পরিস্থিতি এবং বাধার মধ্য দিয়ে যে কোনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখককে কাজ করতে হয় এবং একজন লেখক, যাকে মাঝে-মাঝেই পাঠকের কাছে শব্দমূর্তিতে পৌঁছোতে হয় তার পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা হল অন্য এবং অন্যতর বিষয় নির্মাণ। সেখানে কোনও বিষয়কেই অপ্রাধান্যে কম সমাদরে দেখলে চলে না। এর ফলে পূর্ব প্রতিজ্ঞা বিষয়-বিশ্লেষণ বিলম্বিত হতে থাকে। এই গ্রন্থের ক্ষেত্রেও আমার এই বিড়ম্বনা ঘটেছে। তবে এই প্রকাশনা সম্পূর্ণ করার জন্য আমার পুত্র অনির্বাণের নিরন্তর চেতাবনি ছিল, সেটা সময়ে আমার চৈতন্য সম্পাদন করেছে। অনেক কাটাকুটি, অনেক ইতস্তত গোলাকার পরিচ্ছেদ সঠিকভাবে সংস্থাপন করে আমার কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন আমার সহকারী শিষ্যা তাপসী মুখার্জী। সংসারের আর অন্য মানুষগুলি ছাড়াও প্রকাশনা-ক্ষেত্রে আমার বড় সহায় আনন্দ-প্রকাশনার সদস্যবৃন্দ। সর্বশেষে আমার প্রাণারাম সেই কিশোর আর বিনোদিনী রাইকিশোরী, যাঁরা চিরকাল লীলায়িত শব্দ-সরস্বতীতে; সেই লীলায়ন ছাড়া কেম্‌নে এই মহাকাব্যিক অষ্টাদশীর হৃদয় বোঝাতে পারতাম—লীলা কাচন বর্ততাং মনসি মে রাধামনোমোহিনী।

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচি

উর্বশী ১

শকুন্তলা ২৬

দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা ৪৪

সত্যবতী ৯৯

অম্বা-শিখণ্ডিনী ১৩৬

গান্ধারী ১৬৪

কুন্তী ২৪৮

মাদ্রী ৩৫০

হিড়িম্বা ৩৭১

দ্রৌপদী ৪০৬

উলূপী এবং চিত্রাঙ্গদা ৫৬৪

সুভদ্রা ৬০১

রুক্মিণী ৬৩৩

সত্যভামা ৬৫৫

সুদেষ্ণা ৭০৭

লোপামুদ্রা ৭২৫

মাধবী ৭৪৭

উত্তরা ৭৮০

নির্দেশিকা ৮২৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উর্বশী

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট। স্থান— বেঙ্গল থিয়েটার, ৯, বিডন স্ট্রিট, কলিকাতা। মাইকেল মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক মঞ্চস্থ হল। এই দিনটির বিশেষত্ব ছিল এই কারণে যে, স্ত্রী চরিত্র রূপায়ণে এই প্রথম বারাঙ্গনাদের মধ্যে থেকে অভিনেত্রী গ্রহণ করা হল। থিয়েটার কর্তৃপক্ষ চারজন বারাঙ্গনাকে অভিনয়ের কাজে লাগিয়েছিল, যাঁদের নাম শ্যামা, গোলাপ, এলোকেশী এবং জগত্তারিণী। গোলাপ যদিও পরবর্তীকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় নায়িকা, কিন্তু 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে দেবযানীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এলোকেশী এবং দেবিকার ভূমিকায় জগত্তারিণী।

তৎকালীন বেঙ্গল থিয়েটারের পরিচালকগোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন মহামতি বিদ্যাসাগর। তিনি এই ধরনের অভিনেত্রী গ্রহণের অত্যন্ত বিরোধী থাকায় বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। অভিনয়ের সাবলীলতা এবং নীতিবোধের দ্বৈরথে বিদ্যাসাগরের মতো অতি আধুনিকতম মানুষটিও সেদিন নীতিবোধের কোঠায় পা রেখেছেন। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব প্রথম/দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে পাঁচশো বছর আগে পর্যন্ত অভিনয়ের স্বাভাবিকতার দিকেই মন দিয়েছি আমরা অর্থাৎ তখনও স্ত্রী চরিত্রের অভিনয়ে স্ত্রীরাই প্রাধান্য পেতেন এবং তাঁরা যে অনেকেই অভিজাতবংশীয়া ছিলেন না, তার প্রমাণও ভূরিভূরি আছে।

পুরাতন নাচ-গানের কথা যখন তুললামই তখন নৃত্যাভিনয়ের প্রথম গুরু ভরত মুনির কথা না বলে পারা যাবে না। তা ছাড়া ভরতের নাট্যশাস্ত্র যেহেতু অনেকের মতেই খ্রিস্টপূর্ব শতাব্দীতে রচিত, তাই ইতিহাস-পুরাণের চেয়ে তার গুরুত্ব কিছু কম নয়। তা ছাড়া ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্রে যেভাবে অভিনেত্রীদের সৃষ্টি-কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, সেটা বুঝলে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীদের পুরাতন পরম্পরাটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে।

একটা নাটকের মধ্যে যা যা থাকা দরকার, অর্থাৎ বাচিক চমৎকার, ভাবের ব্যঞ্জনা, আঙ্গিক কৌশল— এই সবকিছুর প্রয়োজন দেখিয়ে নাট্যশাস্ত্রের প্রথম পাঠ তৈরি করলেন ভরত মুনি। তারপর সুরগুরু ব্রহ্মাকে নাট্যশাস্ত্রের 'রাফ ড্রাফট' দেখানোর পর ব্রহ্মা তাঁকে বললেন, তুমি কাব্যনাটকের এতসব ভাবনা ভাবলে, আঙ্গিক, বাচিক এবং সাত্ত্বিক অভিনয়ের নানা নিয়মকানুনের কথাও তুমি বলেছ। তো এইসঙ্গে অভিনয়ের কৈশিকী বৃত্তিটাও তুমি বুঝিয়ে দাও— কৈশিকীমপি যোজয়— এবং তার জন্য আর যা যা তোমার দরকার সেগুলোও বলো।

সমস্ত দেব-মনুষ্যের সম্পর্কে ঠাকুরদাদার মতো ব্রহ্মা তো দুটো কথা উপদেশ দিয়েই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালাস। কিন্তু নাটক নামানোর ঝামেলা যে কী, তা ভরত মুনির মতো একজন সফল পরিচালকের অজানা নেই। কৈশিকী বৃত্তি হল নৃত্যনাটকের সেই অংশ, যা বাচিক, আঙ্গিক বা সাত্ত্বিক অভিনয়ের সম্পূর্ণতা এনে দেয়। অভিনয়ের ভাব-ব্যঞ্জনা এবং সৌন্দর্য্য এই কৈশিকী বৃত্তির যোজনাতেই সম্পন্ন হয়। তুলনা দিয়ে বলতে গেলে— এ হল চাঁদের জ্যোৎস্নার মতো, সুন্দরী রমণীর লাবণ্যের মতো। বাচিক সংলাপ, নিরলস অঙ্গ-সঞ্চালন এবং রস-ভাবের উপযুক্ত প্রকাশ-ক্ষমতা এগুলি নৃত্য কিংবা নাটকের যত বড় অঙ্গই হোক, তার সঙ্গে শিল্পীজনোচিত প্রয়োগলালিত্য এবং বৈচিত্র্যই কিন্তু নৃত্য কিংবা নাটকের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে। কৈশিকী বৃত্তির কাজ এটাই— প্রাণ সঞ্চার করা। বিশেষত শৃঙ্গার রসের অভিনয়ে নায়ক-নায়িকার অভিনয় কৌশলে এই কৈশিকী বৃত্তির মিশ্রণই দ্রষ্টা-শ্রোতার হৃদয় আপ্লুত করে তোলে।

ভরত মুনি এতকাল তাঁর নাটক চালিয়ে এসেছেন পুরুষ অভিনেতাদের দিয়েই। কিন্তু শৃঙ্গার-রসের নৃত্যনাটকে সুন্দরী স্ত্রীলোক ছাড়া যে কৈশিকী বৃত্তির প্রয়োগ সম্ভব নয়— এ তিনি ভালই জানতেন। ফলে ব্রহ্মার কথা শুনে তিনি একটু রেগেই গেলেন। তাঁর বক্তব্য— আপনি তো বলেই খালাস— কৈশিকীটাও লাগাও। তা কৈশিকীর অভিনয়ের লোকজন দিন আমাকে। শুধু পুরুষমানুষ দিয়ে অভিনয়ের মধ্যে এই রসভাবসম্পন্ন শৃঙ্গার আমদানি করা সম্ভবই নয়, এর জন্য রমণী চাই, রমণী— অশক্যা পুরুষৈঃ সা তু প্রযোক্তুং স্ত্রীজনাদৃতে।

ব্রহ্মা আর দেরি করেননি। ভরত মুনির নাটকের তপস্যা সিদ্ধ করার জন্য ব্রহ্মা তাঁর মন থেকে সৃষ্টি করলেন অপ্সরাদের। শৃঙ্গার রসের ভাব-ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলে অপ্সরারা ভরত মুনির কৈশিকী বৃত্তির প্রয়োগ ঘটালেন নৃত্যে-নাটকে।

লক্ষণীয়, অপ্সরারা সৌন্দর্য্য এবং রমণীয়তার দিক থেকে প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসসম্ভবা হলেও চারিত্রিক দিক দিয়ে তাঁদের ব্যবহার তৎকালীন সামাজিকতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। আরও স্পষ্ট করে বললে বলা যায়, বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস যদি বেশ্যাদের অভিনয়ে প্রথম সমৃদ্ধ হয়ে থাকে, তবে সংস্কৃতের নাট্যশালাও পুষ্ট হয়েছিল স্বর্গবেশ্যা অপ্সরাদের অভিনয়ে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে গুপ্তযুগের তথা ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ কোষকার অমর সিংহের লেখা 'অমরকোষ' খুলুন। দেখবেন অপ্সরাদের পরিচয় দিয়ে তিনি বলেছেন, মেয়েদের মধ্যে উর্বশী, মেনকা, রম্ভার মতো অপ্সরারা হলেন স্বর্গবেশ্যা— স্বর্বেশ্যা উর্বশীমুখাঃ।

অপ্সরাদের নাম করতে গিয়ে নবরত্নসভার এই মাননীয় সদস্যটি যে নামগুলি করেছেন, তাঁরা হলেন— উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী, তিলোত্তমা, সুকেশী এবং মঞ্জুঘোষা ইত্যাদি। নাট্যশাস্ত্রে দেখবেন যাঁদের নায়িকা পেয়ে ভরত মুনি কৃতকৃতার্থ বোধ করলেন, তাঁরাও কিন্তু এই সুকেশী, মঞ্জুকেশী, সুলোচনারা। ভরত মুনির সুবিধার্থে ব্রহ্মা একসঙ্গে অন্তত বাইশ-তেইশজন অপ্সরাকে ভরত মুনির হাতে সঁপে দিয়েছেন।

কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার হল, ভরত মুনি কিন্তু নাটকীয় ভাব-ব্যঞ্জনা বিস্তারের জন্য উর্বশী-মেনকা-রম্ভাদের মতো ভুবন-বিখ্যাত সুর-সুন্দরীদের পেলেন না। ভরত মুনি তাঁদের নাম জানতেন না, এমন নয়। তবে নাট্যসৃষ্টির মধ্যে লোকজীবনের উপাদানই যেহেতু বেশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং যেহেতু উর্বশী-মেনকা-রম্ভাদের মধ্যে স্বর্গলোকের অভিসন্ধি মেশানো আছে, তাই খানিকটা বাস্তব-চেতনার নির্দেশেই মঞ্জুঘোষাশী, সুকেশী, সুলোচনাদের মতো প্রায় অশ্রুত অপ্সরাদের নিয়োগ করা হল নাট্যকর্মে।

আমরা অপ্সরাদের উৎপত্তি-বিকাশ নিয়ে এখানে বেশি আলোচনা করব না। কিন্তু এটা মানতে হবে যে, প্রসিদ্ধ পুরু-ভরতবংশের যিনি আদি জননী, সেই উর্বশীকেও কিন্তু আমরা ভারতবর্ষের তাবৎ নাট্য-নাটকের আধারশক্তি অথবা বীজ হিসেবেই পাই। যে-সব পণ্ডিতেরা ভারতীয় নাটকের মূল অনুসন্ধান করেন, তাঁরা সকলেই এই একটি ব্যাপারে একমত যে, ভারতীয় সংস্কৃত নাটকের বীজ আছে সুপ্রাচীন ঋগ্‌বেদের মধ্যেই। ঋগ্‌বেদের মন্ত্রগুচ্ছের অন্তরে প্রধান যে সূক্তগুলিতে (অনেকগুলি মন্ত্রের সংকলন) দেশি-বিদেশি গবেষকরা নাটকের মূল খুঁজে পেয়েছেন, সেগুলিকে বলা হয় সংবাদ-সূক্ত। সংবাদ মানে কথোপকথন। সংবাদ মানে একরূপতা, সাদৃশ্য, যেমন কবি আর সহৃদয় পাঠকের হৃদয়-সংবাদ। কথোপকথনের মধ্যে এই হৃদয়-সংবাদ নাও থাকতে পারে, কিন্তু সংবাদ শব্দের প্রধান অর্থ কথোপকথনই; যেমন ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির সংবাদ, অর্জুন-কৃষ্ণ সংবাদ— রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্। ঋগ্‌বেদের মধ্যে প্রধান সংবাদ-সূক্ত দুটি হল— যম-যমী-সংবাদ এবং পুরূরবা-উর্বশী-সংবাদ।

আমরা শুধু বলতে চাই— বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় যে নবরত্নের সমাহার ঘটেছিল, তার অন্যতম রত্ন, কোষকার অমর সিংহ যদি উর্বশীকে স্বর্গবেশ্যাদের প্রধান পরিচিত মুখ বলে থাকেন, স্বর্বেশ্যা উর্বশীমুখাঃ— তবে অন্যতর কালিদাস উর্বশীকে বিখ্যাত করে দিয়েছেন পুরু-ভরতবংশের আদি-জননী হিসেবেই। সবচেয়ে বড় কথা, সুরসুন্দরী অপ্সরাদের সতত অস্থির যে যৌনতার কথা মহাভারত-পুরাণে বিখ্যাত হয়ে আছে, যেখানে উর্বশীর মধ্যে আমরা সম্পূর্ণা এক প্রেমিকার হৃদয় দেখেছি সুপ্রাচীন ঋগ্‌বেদের মধ্যেই, দেখেছি সুরসুন্দরীর জননী হয়ে ওঠার পরিণতি। স্বয়ং কালিদাসও এই বৈদিক মন্ত্রণা ভুলতে পারেননি বলেই উর্বশীকে নামিয়ে এনেছেন একান্ত মানবিক সত্তার মধ্যে যেখানে পূর্বরাগ, প্রেম, শৃঙ্গার, বিরহ শেষ পর্যন্ত পাণ্ডব-কৌরব-বংশের আদি-প্রসূতিকে জননীর স্নেহ-পরিণতির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে।

২

আমাদের ইতিহাস-পুরাণে অপ্সরাদের সম্বন্ধে যা বলা আছে, তাতে প্রথম যেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, অপ্সরাদের মতো এমন সুন্দরী আর পৃথিবীতে নেই। আর এমন ভীষণ রকমের সুন্দরী হলে এমনিতেই আপন সৌন্দর্য-সচেতনতা এবং অনন্ত পুরুষের লোভদৃষ্টিতে নিজেকে প্রথাগত নৈতিকতায় প্রতিষ্ঠা করাটা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। এমনিতে একটা কথাই আছে যে, রাজার ঘরে অতিরিক্ত বেশি সময় থাকলে বামুনের চরিত্র নষ্ট হয়, আর অতিরিক্ত রূপ থাকলে নষ্ট হয় স্ত্রী— স্ত্রী বিনশ্যতি রূপেণ ব্রাহ্মণো রাজসেবয়া। কিন্তু এই লোকমুখরতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি নাও মানি, তবুও বলতে হবে যে, স্বর্গসুন্দরী অপ্সরাদের পৌরাণিক উদ্ভবের মধ্যেই নষ্ট হওয়ার মন্ত্র লুকানো আছে, কিন্তু তার মধ্যে নিজে নষ্ট হওয়ার চেয়েও অন্য পুরুষকে নষ্ট করার মন্ত্রণা আরও বেশি। অবশেষে এর চেয়েও কুটিল যুক্তিতে আমার মনে হয়— পুরুষ মানুষ স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে নিজে নষ্ট হওয়ার জন্যই এমন একটা পৌরাণিকী ব্যবস্থা সামাজিকভাবে রেখে দিয়েছে যাতে শেষ জায়গায় এসে বলা যাবে— আমি শান্ত, দান্ত মুনি-ঋষি মানুষ। সমস্ত সংযম করপুটে রাখা আমলকীর মতো আমার হাতের মুঠোয়, কিন্তু কী করব— ওই অপ্সরা মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী-পুঞ্জিকস্থলা— ওদেরই ছলা-কলায় আমার এই দশা হল।

আসলে শুধুই সৌন্দর্য্য নয়, তার সঙ্গে বৈদগ্ধ্যও আছে। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস ঘাঁটলে একথা প্রমাণিতই হয়ে যাবে যে, সৌন্দর্য্যের সঙ্গে শাস্ত্রীয় কলা এবং বিদ্যা-বৈদগ্ধ্যের প্রধান আধার ছিলেন গণিকারাই। আর এ-প্রসঙ্গে আমরা বিস্তারিত তথ্য এই প্রবন্ধে জানাব না। তবে এটা অবশ্যই বলব যে, অতিশয়ী সৌন্দর্য্যের সঙ্গে যদি বিদগ্ধতার অতিশয় যুক্ত হয় তবে সেই রমণী চিরকালই বেশির ভাগ পুরুষের অনায়ত্তা ছিলেন বলেই গণিকার সম্বোধন লাভ করতেন। এক নিপুণ কবি বলেছিলেন, ওরে মেনকা-রম্ভাদের সঙ্গে কীভাবে সম্ভোগ উপভোগ করতে হয়, সে জানেন সুরপতি ইন্দ্র। তোদের মতো দাসী-চাকরানিদের পিছনে-ঘোরা লোকেরা রম্ভা-মেনকাকে বুঝবে কী করে— জম্ভারিরেব জানাতি রম্ভাসংযোগবিভ্রমম্। হয়তো এই শ্লোকের মধ্যে যৌনতার আভাসটুকুই বেশি, কিন্তু অপ্সরা মানেই যে যৌনতা নয়, সেটা জানিয়ে রাখাই ভাল। তবে অন্য সাধারণ গার্হস্থ্য রমণীকুলের সঙ্গে অপ্সরাদের পার্থক্য এইখানেই যে, যৌনতা এখানে, শরীর-বিলীন কোনও নিশ্চেষ্ট বৃত্তি হিসেবে থাকে না, এখানে 'ফ্লার্ট' করার একটা ব্যাপার আছে। আজকের দিনে অবশ্য 'ফ্লার্ট' করার ঘটনা অনেক বেশি সার্বত্রিক এবং তার কারণ হিসেবে সুব্যবস্থিত তর্কযুক্তিও হাজির করেন যুক্তিবাদীরা। সিডনির 'মর্নিং হেরাল্ড' কাগজে পল শিহান বলে একজন লিখলেন যে, অল্পবয়সি মেয়ে এবং অবশ্যই তরুণীরাও মাঝে মাঝে বড় অশালীন হয়ে ওঠে; যে-সব জামা-কাপড় তারা পরে, তাতে পুরুষকে 'প্রোভোক' করার সমস্ত উপকরণই মজুদ থাকে, এরা অনেক সময়েই বিপজ্জনক যৌন মিলনকে প্রশ্রয় দিয়ে ফেলে এবং কোনও-না কোনও সময়ে অন্তঃসত্ত্বাও হয়ে পড়ে। শিহান মন্তব্য করেছেন, এমনটি যারা করেছে বা করে তারাই স্বাভাবিক, আমরাই অস্বাভাবিক। জামা-কাপড়ের বিভিন্ন যত নমুনা আছে— যাতে শরীর স্ফুটাস্ফুট ব্যঞ্জনায় যৌন মহিমায় প্রকট হয়ে ওঠে, সে-সবই নাকি সতেরো থেকে তেইশের মধ্যে অতিস্বাভাবিক, কেননা এই সময়ে তারা রমণীজনোচিত উর্বরতার তুঙ্গে থাকে। ফলত এই অবস্থায় যে-মেয়েরা নিজেদের বিজ্ঞাপিত করে অথবা 'ফ্লার্ট' করে, সেখানে তাদের অন্তর্গত যৌন তীব্রতাই কাজ করে এবং সেটা জুডো-খ্রিস্টান নৈতিকতা মেনে কাজ করে না, এবং সেটাই স্বাভাবিক।

আমরা এই দৃষ্টিকোণ থেকে তরুণী মেয়েদের কথা ভাবি না, বরঞ্চ এইভাবে যারা চলে তাদের আমরা মোটেই ভাল চোখে দেখি না এবং সকুৎসায় আরও এগিয়ে আমরা অন্যতর আখ্যা দিয়ে থাকি— যে- আখ্যা সামাজিক বৃত্তের বাইরে। কিন্তু মনে রাখা দরকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে, স্বর্গসুন্দরী উর্বশী কিন্তু এই বৃত্তের মধ্যেই আছেন, আছেন তাঁর সমপ্রাণা মেনকা-রম্ভা-তিলোত্তমারাও। মহাভারত-পুরাণে এই অপ্সরাদের যে-প্রয়োজনে ব্যবহৃত, ব্যবহৃত এবং ব্যবহৃত হতে দেখেছি, তা হল প্রধানত মুনি-ঋষি-তপস্বীদের ধ্যান ভঙ্গ করা। স্বর্গের অতিলৌকিক শক্তিমান দেবতারা মর্ত্য মানুষের তপস্যা-শক্তিকে ভয় পেতেন। তাঁরা ভাবতেন তপস্যার কৃচ্ছ্রসাধন করে তাঁরা শেষ পর্যন্ত দেবেন্দ্রর ইন্দ্রত্ব কেড়ে নিয়ে স্বর্গের রাজা হয়ে বসবেন। দার্শনিক দৃষ্টিতে স্বর্গের ইন্দ্রপদ স্থায়ী কোনও নিত্যপদ নয়, অতএব কারও তপস্যা দেখলেই তাঁরা ভয় পেতেন এবং পাঠিয়ে দিতেন স্বর্গসুন্দরী অপ্সরাদের কাউকে, যাঁরা শারীরিক বিভঙ্গে তপস্বীজনের মনে বিভ্রম ঘটাতেন। এতে মুনি-ঋষিদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটত, তাঁদের তপশ্চর্যা ব্যর্থ হয়ে যেত। আমাদের কবি দেবতাদের এই অন্যসমাধি-ভীরুতা বুঝে স্বয়ং উর্বশী সম্বন্ধেই লিখেছিলেন— মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল/ তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল।

পল শিহান কিন্তু এতাদৃশী রমণীদের কথা বলেননি। তিনি সতেরো থেকে তেইশের সাধারণ মেয়েদের কথা বলেছেন অথবা বলেছেন অধিকবয়সা তরুণীদের কথা, শারীরিক উর্বরতা যাঁদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় এবং সেই কারণে তারা শরীরের চটুলতা না করে পারে না। আর অপ্সরারা কী রকম? না, তাঁরা দেবকার্য-সাধনের জন্য নিজেদের 'এক্সপোজ়' করেন 'ফ্লার্ট' করেন। কিন্তু তাতে অপ্সরাদের কী হয়? ঋষি-মুনিদের ধ্যানভঙ্গ করে দেবতারা না হয় নিজের সিদ্ধি গুছিয়ে নিলেন। কিন্তু তাতে অপ্সরারা কী পাচ্ছেন? আপন সৌন্দর্যে অন্যান্য ঋষিদেরও ধ্যানভঙ্গ করতে পারছেন, শুধু এই সাফল্যের গর্ব! আমরা বলব— বরং এটাই মেনে নেওয়া ভাল যে, রূপ-গুণের গৌরবে যে-সব সুন্দরী রমণীরা খানিক উর্বরতার আকর্ষকী তাড়না অনুভব করতেন, 'ফ্লার্ট' কিংবা 'এক্সপোজ়' করার ব্যাপারে সামাজিক সতীত্বে যাঁরা তেমন বিশ্বাস করতেন না, তাঁরাই আমাদের স্বর্গসুন্দরী অপ্সরা। প্রসঙ্গত পুরুষদের কথাটাও বলে নেওয়া ভাল। সামাজিক সৌজন্যে এবং পারিবারিক মহিমা প্রকটিত করার জন্য যত লক্ষ্মীমতী এবং মহা-মহিম মর্যাদাময়ী রমণীই পুরুষ-মানুষরা পছন্দ করুন না কেন, উপভোগ-শয্যাতে সেই লক্ষ্মীমতীর কাছেই কিন্তু পুরুষেরা বেশ্যার ব্যবহার আশা করেন। তা নইলে এমন সংস্কৃত নীতিশ্লোক তৈরি হত না যে, এমন বউটি সত্যিই খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে খাওয়া-দাওয়া করাবে মায়ের মতো, বাড়ির কাজ করবে দাসীর মতো, আর রেতের বেলায় বিছানায় হয়ে উঠবে বেশ্যার মতো— কার্যে দাসী রতৌ বেশ্যা ভোজনে জননীসমা।

ভাবছেন, বড় অশ্লীল আর বাড়াবাড়ি কথা বলে ফেলছি আমি। পুরুষ-মানুষেরা আদপেই এমনটা এমন করে চান না, আর লক্ষ্মীমতী রমণীরাও আদপে এই আচরণ করতে পারেন না। আর যাঁরা করেন তাঁরা বেশ্যাই। বস্তুত ঠিক এইরকম একটা ভাবনা থেকেই স্বর্গসুন্দরী অপ্সরারা স্বর্গবেশ্যা বলে কথিত হয়েছেন অমরকোষে। অথচ এটাই সবচেয়ে বড় সত্য নবরত্নের রত্নতম অমর সিংহও বাস্তব বোঝেননি। যে-রমণীর অনন্ত সৌন্দর্যের মধ্যে খানিক বৈদগ্ধ্য আছে, প্রগলভতার সঙ্গে 'ফ্লার্ট' করারও ক্ষমতা আছে, তাকে মর্যাদাময়ী, কুলবধূ বলেনি কেউ। সংস্কৃতের এক সাহসী কবি 'বৈদগ্ধ্য-বিদগ্ধতা'র শব্দটিকে ধরে সশ্লেষে

বলেছিলেন— প্রদীপের সলতে আগুনে দগ্ধ হলে যেমন কালো-মলিন হয়ে ওঠে, তেমনই কুলবধূও যদি বিদগ্ধা রমণী হন, তবে সে বিদগ্ধতা তাঁর সামাজিক মলিনতা সৃষ্টি করে অর্থাৎ বিদগ্ধতায় তিনিও কালো হয়ে যান সলতের মতো। বহিরঙ্গে তার আগুন রূপটা কিন্তু ছিল, ঠিক যেমন থাকে দীপশলাকার। ঠিক এর পরেই কবির দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির উচ্ছ্বাস— যেটা আসলে গণিকাদের দোষ বলে মনে হয়, সেটাই তাদের ভূষণ, ঠিক যেমন শশিকলার কলঙ্ক— দোষা অপি ভূষায়ৈ গণিকায়াঃ শশিকলায়াশ্চ। এবার বলুন, এই কথার সঙ্গে ডি. এইচ. লরেন্স-এর কথাটার কতটুকু ফারাক— what is pornography to one man is the laughter of genius to another.

মহাভারতের উদার-বিশদ প্রেক্ষিতে যদি অপ্সরা-সুন্দরীদের বিচার করা হয়, তা হলে দেখব এই স্বর্গসুন্দরীরাই, যাঁরা প্রথাগত বৈবাহিক সীমানার নিতান্ত বাইরের মানুষ, তাঁরাই কিন্তু মহাভারতের শতেক অভ্যুদয়ের জননী। স্বর্গবেশ্যা বলে কথিত হলেও তাঁরাই কিন্তু বাৎসল্যের সন্ধান দিয়েছেন অনেক শুষ্করুক্ষ মুনি-ঋষিকে, অনেক সন্তানকামী রাজাকে, এমনকী স্বয়ং মহাভারতের কবি দ্বৈপায়ন ব্যাসকেও। হয়তো অপ্সরাদের এই জননীত্বও প্রথাসিদ্ধ তথা স্নেহস্নিগ্ধ জননীত্ব নয়, তবে এই নিরিখেই এটা সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পুরুষ তার রতিমুক্তির জন্য নীতি-সম্মত বৈবাহিক স্ত্রীর মধ্যেও যেমন খানিক গণিকাভাব আকাঙ্ক্ষা করে, গণিকারাও তেমনই অন্যতর কারণে, অন্যতর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃতা হওয়া সত্ত্বেও জননীর গৌরবটুকুও অনুভব করতে চান অনেক সময়েই, হয়তো বিনা কারণে, হয়তো বিনা কোনও অধিকার ভোগ করে। ডি. এইচ. লরেন্স লিখেছিলেন— If a woman hasn't got a tiny streak of harlot in her, she's a dry stick as a rule. And probably most harlots had somewhere a streak of womanly generosity... plenty of harlots gave themselves, when they felt like it, for nothing.

অপ্সরাদের সম্বন্ধে এই কথা সঠিক খাটে বলেই মহাভারতের এক জায়গায়— যেখানে দৈনন্দিন কী করলে মানুষের ভাল হয়, এইরকম একটা প্রশ্ন করছেন যুধিষ্ঠির সেখানে দেবতা, ঋষি, রাজা, তীর্থ, নদীর বহুতর পুণ্য-নামের সঙ্গে অন্তত নয় জন অপ্সরাকে সকালে উঠেই স্মরণ করতে বলেছেন মহামতি ভীষ্ম। এখানে তাঁদের বিশেষণ দেবকন্যা এবং মহাভাগ্যবতী— দেবকন্যা মহাভাগা দিব্যাশ্চাপ্সরাং গণাঃ। এই যে প্রাতঃস্মরণীয়া নয় জন অপ্সরা, তাঁদের মধ্যে প্রথম নামটি হল উর্বশীর। উর্বশীই বোধহয় স্বর্গসুন্দরী অপ্সরাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি 'ডিগনিফায়েড'— যিনি বারংবার দেবকার্য-সাধনের জন্য মুনি-ঋষিদের ধ্যান ভাঙানোর কাজে ব্যবহৃত হননি, অন্তত মেনকা, ঘৃতাচী, রম্ভার মতো তো হননইনি। উর্বশীর জন্ম কিংবা উৎপত্তিটাও একটু যেন অন্য রকম।

রামায়ণ-মহাভারত এবং পুরাণগুলিতে এটা সাধারণভাবেই দেখা যাবে যে, পৃথিবী এবং স্বর্গের যত উত্তমোত্তম বস্তু আছে, তা সবই প্রায় সমুদ্রমন্থনের ফল। পুরাণগুলিতে অবশ্য সৃষ্টিবিষয়িণী বর্ণনায় ব্রহ্মার মানসপুত্র কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা মুনির গর্ভে অপ্সরাদের জন্ম হয় বলে বলা হয়েছে— মুনির্মুনীনাঞ্চ গণং গণমপ্সরসাং তথা। কিন্তু পুরাণে যখন গণ অথবা একটা গোষ্ঠী হিসেবে অপ্সরাদের উৎপত্তি ঘোষণা করা হচ্ছে, তখন সেই বিশাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গণের মধ্যে উর্বশী-মেনকাদের নাম করা হয়নি প্রায়ই; যদি বা হয়েও থাকে তা হলে জাতি-নামে একবার অপ্সরাদের গণের কথা বলেই উর্বশী-মেনকাদের কথা পৃথক এবং বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মহাভারতে আবার পৃথক প্রসঙ্গেই শ্রেষ্ঠ অপ্সরাদের নাম করে বলা হল— উর্বশী, পূর্বচিত্তি, সহজন্যা, মেনকা, বিশ্বাচী আর ঘৃতাচী— এই ছয়জন হলেন অপ্সরাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং এই ছয়জনকে নিয়েই একটা গণ তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু অপ্সরাদের এই শ্রেষ্ঠ গণের মধ্যে পৃথকভাবে ঘৃতাচী, বিশ্বাচীদের জন্মকথা কখনওই বলা হয় না, কিন্তু পুরাণে উর্বশীর জন্ম নিয়ে একটি পৃথক উপাখ্যানই আছে।

পুরাকালে ভগবান শ্রীহরির অংশসম্ভূত নর-নারায়ণ নামে দুই যুগলঋষি ছিলেন। তাঁরা বহুতর কৃচ্ছ্রসাধন করে বহু বছর ধরে তপস্যা চালিয়ে যাওয়ায় স্বর্গের দেবতাদের মনেও ভয় দেখা দিল। দেবরাজ ইন্দ্র তো ভীষণই চিন্তিত হলেন যে, এবারে তাঁর দেবরাজের স্বর্গ-সিংহাসনটাই চলে যাবে। এত সব ভেবে ইন্দ্র বহুভাবে সেই যুগল-মুনির সমাধি ভঙ্গ করার চেষ্টা করলেন। শেষ পর্যন্ত কোনও উপায়ই কাজে লাগল না দেখে তিনি অপ্সরা-সুন্দরীদের ডেকে পাঠালেন নর-নারায়ণকে কামাতুর করে দেবার উদ্দেশে। এই মুহূর্তে একবারের তরে হলেও স্বর্গসুন্দরী অপ্সরাদেরও কিন্তু 'বারাঙ্গনা' বলেছেন পৌরাণিক— বারাঙ্গনাগণোঽয়ং তে সহায়ার্থং ময়েরিতঃ। তারপরেই ইন্দ্র কিন্তু সোচ্ছ্বাসে তিলোত্তমা-রম্ভার নাম করে বলেছেন— এঁরা একাই আমার এই গুরুতর কাজটা করে দিতে পারে— একা তিলোত্তমা রম্ভা কার্যং সাধয়িতুং ক্ষমা।

নর-নারায়ণ যুগল-ঋষির তপস্যার স্থানটি প্রাকৃতিকভাবেই ছিল অতি মনোরম গন্ধমাদন পর্বত। সেখানে ভালবাসার দেবতা তিলোত্তমা-রম্ভার মতো কাম-সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হলেন মুনি-যুগলের ধ্যান ভাঙাতে। অকালে বসন্তের ফুল ফুটল সেখানে, কোকিল-কুলের আলাপ শুরু হল বকুল গাছে— বভূবুঃ কোকিলালাপা বৃক্ষাগ্রেষু মনোহরাঃ। রম্ভা- তিলোত্তমা মনোহরণ শরীর-বিভঙ্গে নাচতে আরম্ভ করলেন দুই মুনির সামনে, সঙ্গে চলল তন্ত্রী-লয়-সমন্বিত গান। অপ্সরাদের মধুর নৃত্য-গীত শুনে মুনিদের ধ্যান ভাঙল এবং সাময়িক বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে একে অপরকে জিজ্ঞাসা করলেন— কী হয়েছে বলো তো? আজ কি হঠাৎ কালধর্মের বিপর্যয় ঘটে গেল— কালধর্ম-বিপর্য্যাসঃ কথমদ্য দুরাসদঃ। এমন তো হবার কথা ছিল না। সমস্ত প্রাণীদের কেমন কামাতুর বলে মনে হচ্ছে। বসন্তলক্ষ্মীর এই আগমনও তো স্বাভাবিক নয়। সুরসুন্দরীরা এত সুন্দর সব গান করছে। আমার তো মনে হচ্ছে— এর মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্রের কোনও চক্রান্ত আছে, তিনি আমাদের ধ্যানভঙ্গ করার জন্যই এত সব আয়োজন করেছেন। এরই মধ্যে নৃত্যপরা অপ্সরা-সুন্দরীদের ওপর নজর পড়ল দুই ঋষির। দেখলেন— এক-দু'জন নয়, রম্ভা-তিলোত্তমা, মেনকা-ঘৃতাচী থেকে আরম্ভ করে কাঞ্চনমালিনী-বিদ্যুন্মালারাও আছেন। রম্ভা-তিলোত্তমাদের যত মনোমোহিনী শক্তিই থাক, তাঁরা কিন্তু মুনি-যুগলকে দেখে ভয়ও পাচ্ছেন একটু-একটু। কিন্তু দেবকার্য-সিদ্ধির জন্য তাঁরা পুনরায় নৃত্য আরম্ভ করলেন মুনিদের সামনে। অপ্সরারা মুনিদের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে যথোচিত সম্মান পুরঃসর নৃত্য আরম্ভ করলেও তাঁদের নৃত্যের বিষয় ছিল কামোদ্দীপক।

মুনিরা নিজেদের পরিশীলন অনুসারেই বুঝে গেলেন সব কিছু। বুঝে গেলেন— এখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপ্সরাদের দোষ নেই কিছু। তাঁদের মনোহরণ ভঙ্গি দেখে এতটুকুও অভিভূত না হয়ে নারায়ণ ঋষি তাঁদের বললেন, হ্যাঁগো! তোমরা তো সব এখানে স্বর্গ থেকে আমার অতিথি হয়ে এসেছ। তো বসো সব এখানে। আমি যথাসাধ্য আতিথ্য করব তোমাদের। অপ্সরাদের সঙ্গে এত ভাল করে কথা বললেও যুগল ঋষির অন্যতম নারায়ণের মনে একটু রাগ-অভিমানও হল এবং সেটা হয়তো দেবরাজ ইন্দ্রের ওপরেই। তিনি মনে মনে ভাবলেন— বেশ তো তিলোত্তমা-রম্ভাদের পাঠিয়েছেন দেবরাজ। কিন্তু এ আর এমন কী! সৌন্দর্য্য বস্তুটার কি অন্ত আছে কোনও! আমি এদের চেয়েও শতগুণ সুন্দরী অপ্সরা সৃষ্টি করতে পারি নতুন করে— বরাক্যঃ কা ইমাঃ সর্বাঃ সৃজাম্যদ্য নবাঃ কিল। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঋষি নারায়ণ নিজের উরুতে চপেটাঘাত করলেন একবার। অমনই তাঁর উরু থেকে সৃষ্টি হল এক সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণীর। নারায়ণের উরু থেকে জন্মালেন বলেই তাঁর নাম হল— উর্বশী— নারায়ণোরুসম্ভূতা হ্যর্বশীতি ততঃ শুভা। উর্বশীর রূপ দেখে স্বর্গসুন্দরী অপ্সরাদের মনে চমৎকার তৈরি হল। তাঁরা লজ্জায় নারায়ণ ঋষির কাছে মাথা নত করলেন। নারায়ণ ঋষি বললেন— তোমাদের ওপর আমার কোনও ক্ষোভ নেই। আমি আমার এই উরু-সম্ভবা উর্বশীকে দেবরাজ ইন্দ্রের সন্তোষের জন্য উপহার হিসেবে পাঠাচ্ছি। এই পরমাসুন্দরী তোমাদের সঙ্গেই যাক দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে— উপায়নমিয়ং বালা গচ্ছত্বদ্য মনোহরা।

রম্ভা-তিলোত্তমারা এবার উর্বশীকে নিয়ে স্বর্গরাজ্যে ফিরলেন এবং ঋষিদের উপঢৌকন উর্বশীকে নিবেদন করলেন ইন্দ্রের কাছে। ইন্দ্র অবাক হলেন যুগল-ঋষির তপস্যার শক্তি দেখে, যে শক্তিতে উর্বশীর মতো এমন সুন্দরী রমণীর সৃষ্টি হতে পেরেছে— যেনোর্বশ্যাঃ স্বতপসা তাদৃগ্‌রূপাঃ প্রকল্পিতাঃ। আসলে নারায়ণ ঋষি তাঁর তপোবল ক্ষয় করে সৃষ্টি করেছিলেন অসামান্যা উর্বশীর— তরসোৎপাদয়ামাস নারীং সর্বাঙ্গসুন্দরীম্— আর স্বর্গ থেকে যে-অপ্সরারা ভোলাতে এসেছিলেন ঋষিকে, তাঁদের পরিচর্যার জন্য তিনি আরও অনেক সমতুল্য অপ্সরাদের সৃষ্টি করেন। তারপর যখন উর্বশীকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হল, তখন এঁরাও উর্বশীর অনুগামিনী হয়ে স্বর্গরাজ্যে চলে গেলেন। এই সম্পূর্ণ কাহিনি থেকে উপাখ্যানের আবরণটুকু ছেড়ে দিলে এইটুকু আমাদের মনে আসে যে, উর্বশী সমস্ত মনুষ্য-কুলের তপস্যার ফল এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্যে স্বর্গের অলৌকিকতার চেয়েও নর এবং নারায়ণের মানুষী ভাবনাটাই বড় হয়ে ওঠে। সবচেয়ে বড় কথা, সকলের সঙ্গে গদের ঢালে উর্বশীর সৃষ্টি হয়নি, তাঁর সৃষ্টি হয়েছে পৃথকভাবে এবং যে মহাকবি লিখেছিলেন— মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল/ তোমার কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল— তিনি কিন্তু এই নর-নারায়ণী কাহিনির নির্যাসটুকু বুঝেছিলেন। স্বর্গের অপ্সরা-লোকে উর্বশী কিন্তু অনেক পরে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন। নৃত্যপরা স্বর্গসুন্দরীদের মধ্যে তিনি হয়ে উঠলেন প্রথমা। তাঁকে ছাড়া ইন্দ্র-সভায় নৃত্য-গীতের আসর আর মানায় না; অবশেষে তিনি উপস্থিত না থাকলে স্বর্গলোকে সুরকুলের আমোদ স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু উর্বশীর এই স্বর্গ-সম্বন্ধ এত গাঢ় হয়ে ওঠা সত্ত্বেও মর্ত্যলোকের সঙ্গে তাঁর যেন কোথায় এক অদৃশ্য টান আছে। তাঁকে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে ফিরে আসতে হয় মাটির টানে।

উর্বশীর কথাটা যেভাবে এখানে বলে ফেলেছি, তাতে তাঁর পূর্ব ইতিহাস কিছু জানানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরকার। স্বর্গসুন্দরীদের প্রথমা উর্বশী যে নিজের নামে বহুকাল আগেই নৃত্যগীতের নিজস্ব একটা ঘরানা অথবা সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলেন, তা এই পূর্বের ইতিহাস থেকেই বোঝা যাবে।

বৃহদ্-দেবতা বলে একখানা অতিপ্রাচীন বৈদিক গ্রন্থ আছে, শৌনক ঋষির লেখা। বেদের দেবতা এবং বিভিন্ন ঋকমন্ত্রের প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা থাকায় গ্রন্থটির খুব কদর আছে বৈদিকদের মধ্যে। এই গ্রন্থের এক জায়গায় দেখা যাচ্ছে, মিত্রাবরুণ নামে এক যমজ দেবতা আদিত্য যজ্ঞ দেখতে এসেছেন। সেকালে এমনি যমজ বা যুগল দেবতা ছিলেন। আপনারা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নাম শুনে থাকবেন, মিত্রাবরুণও ওইরকম যুগল দেবতা। আবার ওই যুগলদেবতাই পুরাণে-ইতিহাসে মুনি বলে পরিচিত হয়েছেন। ব্যাকরণের ভাষায় এঁরা হলেন দেবর্ষি, যিনি দেবতা, তিনিই ঋষি। তা যাই হোক, দেবতা হন আর মুনিই হন, মিত্রাবরুণ এসেছেন স্বর্গের আদিত্য যজ্ঞে যোগ দিতে। এদিকে উর্বশী... আহা কে যে এই নামখানি দিয়েছিলেন, তাঁর পায়ে নমস্কার— উর্বশী হলেন ইন্দ্রসভার সর্বসেরা নর্তকী। কিন্তু নর্তকী তো আরও অনেকে আছেন, উর্বশী যে সবার সেরা, তার কারণ অন্য। যেমন তাঁর রূপ, তেমনই তাঁর বিদগ্ধতা। উর্বশীর ক্ষমতা— তিনি আপন দূরত্ব সম্পূর্ণ বজায় রেখে পুরুষমানুষের মনের উপর তাঁর রূপলাবণ্য এবং বৈদগ্ধ্যের ছায়া ফেলতে পারেন।

এই আদিত্য যজ্ঞেও উর্বশী কিছু করেননি। নৃত্যের ভঙ্গিমায় সূক্ষ্ম বস্ত্রের স্ফুটাস্ফুট ব্যঞ্জনায় কোনও দেহতত্ত্ব প্রকাশ করেননি। বাক-বৈদগ্ধ্যে যুগল-ঋষি মিত্রাবরুণ দেবের মনও মুগ্ধ করেননি। ইনি এসেছিলেন আদিত্য যজ্ঞের নেমন্তন্ন খেতে। আর মিত্রাবরুণ এসেছিলেন আদিত্য যজ্ঞের ক্রিয়াকলাপ দেখতে। কিন্তু মুশকিল হল— উর্বশীর চলনেই নাচন, বলনেই গান। যজ্ঞভূমিতে অপরূপা উর্বশীকে দেখে মিত্রাবরুণ আর ঋক মন্ত্রের উদাত্ত-অনুদাত্ত ধ্বনি শুনতে পেলেন না, শুনতে পেলেন না উদ্‌গাতার সামগীত, দেখতে পেলেন না অধ্বর্যুর ঘৃতহোম। তাঁদের সমস্ত ইন্দ্রিয় চক্ষুতে কেন্দ্রীভূত হল এবং সে চক্ষুর আহার্য ছিল একটিই— একা উর্বশী। ক্রমে ক্রমে মুগ্ধতা কামনায় রূপান্তরিত হল, মিত্রাবরুণের তেজ স্খলিত হল— তয়োস্তু পতিতং বীর্যম্।

উর্বশীর কোনও দোষ ছিল না। অবশ্য তাঁর সবচেয়ে বড় দোষ— তিনি তিন ভুবনের সেরা সুন্দরী। মিত্রাবরুণ নিজেদের উন্মাদ কামনার কথা ভাবলেন না, শুধু শরীরের মধ্যে কেন এই অধঃপাত ঘটল, কেন জনসমক্ষে এমন লজ্জিত হলাম, এই দোষেই উর্বশীকে শাপ দিলেন— শাপ দিলেন— স্বর্গে আর তোমার থাকা হবে না, সুন্দরী। তোমাকে যেতে হবে মর্ত্যলোকে, মর্ত্যজনের দুঃখ-কষ্ট, ভালবাসা বুঝতে। দেবর্ষি-যুগলের অভিশাপ লাভ করে উর্বশীর যে খুব কষ্ট হল, তা আমরা মনে করি না। স্বর্গের নন্দনকানন, পারিজাত ফুলের সৌগন্ধ্য আর ইন্দ্রসভার বিলাস ছেড়ে যেতে হবে, এইটুকুই যা মনে দুঃখ, নইলে পৃথিবীও তাঁর কাছে খুব খারাপ জায়গা নয়। কারণ মর্ত্যভূমির সর্বশ্রেষ্ঠ রাজার ঠিকানা জানা আছে উর্বশীর। তিনি পুরূরবা।

পুরূরবা রাজত্ব করতেন এখনকার ইলাহাবাদের কাছে 'প্রতিষ্ঠান' বলে একটা জায়গায়। প্রসিদ্ধ পাণ্ডব-কৌরব বংশের তিনি বহুপূর্ব-পুরুষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

আমার এক আত্মীয়া, আধুনিকা, সুবেশা, সুগঠনা তরুণী। তিনি বাড়ির খাবার একদমই খেতে ভালবাসেন না। বেগুন এবং মুলোকে তিনি বর্বর-রুচির খাদ্য মনে করেন, লাউ-ডগা সহযোগে ডাল-ছড়ানো তরকারি তাঁর কাছে শ্রাদ্ধকালের পিণ্ডের মতো, আর মাছ ব্যাপারটা ঝোলে হলেই সেটা বাম-দক্ষিণাঙ্গুলির রমণীয় কম্পাক্ষেপণে ভীষণ 'মেসি'। তবে এই তরুণী দোকানে দোকানে 'ফিশ-ফ্রাই' খেতে ভালবাসেন। ভালবাসেন 'চাউ মিঙ'। আমি তাকে একদিন বললাম, তুমি দোকানে যে 'ফ্রিশ-ফ্রাই' খাও, সেই মাছগুলো দেখেছ কখনও? আত্মীয়া বলল, দেখার কী আছে? অমন যার স্বাদ, সে মাছও নিশ্চয়ই খুব ভাল হবে। আমি বললাম, নিশ্চয়ই। তবে কিনা, তুমি এত চার দিকে ঘোরাফেরা করো, কত ব্যাপারে 'ফিল্ড ওয়র্ক' করো, তিন কোয়াটার পেন্টু পরো, তোমাকে আমি ফিশ-ফ্রাইয়ের সুন্দর মাছগুলি দেখাব। কালই চলো, তবে সকাল সকাল উঠো।

পরের দিন সকালে উঠে তাকে গাড়ি করে একটা নাম করা বাজারে নিয়ে গেলাম। বাজারের খানিক আগেই গাড়ি রেখে হাঁটতে লাগলাম মাছের বাজারের উদ্দেশে, এ-তরুণী জীবনে বাজারেই যায়নি, মাছ দেখবে কোথায়! আর এমনই কপাল! যেতে যেতেই একটি রিকশা চোখে পড়ল— রিকশার পা-দানির ওপর গোটা আটেক 'বম্‌বে-ভেটকি', যা আমাদের দিশি ভেটকির ধারে কাছেও নয়— না আকারে, না প্রকারে। রিকশার পাদানিতে মাছগুলির লেজ একদিকে ঝুলছে, অপর দিকে মুড়োগুলি প্রায় রাস্তায় ঝুঁকে পড়েছে— এতটাই বড়। মাছগুলির রং পাশুটে, সবুজপ্রায়, মাঝে মাঝে হলদেটে ছোপ, দেহ ভাল রাখার জন্য প্রচুর নুন-হলুদ দেবার ফল আর কী! আমার সুশোভনা আত্মীয়াকে মাছগুলো দেখিয়ে বললাম, এই মাছগুলো চিনিস? সে 'ওয়্যাঃ ওয়্যাঃ' করে প্রায় বমি তুলে বলল, এগুলো কেউ খায়? আমি বললাম, খায় বইকী, তবে তোর মতো এমন ভদ্রলোকেরা খায় না। ধীরে চলমান রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এগুলো কি ভাই 'বম্‌বে ভেটকি'? সে নির্দয়ভাবে উত্তর দিল— বম্‌বে ভেটকি আবার কী? বলুন 'বম্‌বে ভোলা'। আমি বললাম, এগুলো কী তা হলে ভোলা মাছ? সে বলল, মুখখানা কি ভেটকে আছে, বাবু? যে জিজ্ঞেস করছেন? সব ভোলা, সেটাকেই আপনারা বম্‌বে ভেটকি দেখছেন, এখন পাঙাশ মাছেরও ফেরাই হচ্ছে, দোকানে খাবার সময় সব 'পিউর' ভেটকি।

সব কথা আমার ভাগনি শুনতে পায়নি, মাছের রূপ দেখে সে খানিকটা দূরেই দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললাম— চল এবার। কীভাবে ফিশ-ফ্রাইয়ের 'ফিলে' তৈরি হচ্ছে, দেখবি চল। মাছ কাটার জায়গায় পৌঁছোতেই সে উলটে চলতে আরম্ভ করল। দুর্গন্ধের কথা ছেড়েই দিলাম। এক ঝলক সে যা দেখেছে, সবই সেই রিকশায় দেখা মাছ এবং তার 'ফিলে' তৈরি করে সেই মাছের লিঙ্গদেহটি ফেলে রাখা রয়েছে টাল দিয়ে। তরুণী নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বেরিয়ে গেল, আমার সঙ্গে ফিরল না এবং আমি কতগুলি পরিচ্ছন্ন 'ফিলে' নিয়ে বাড়ি ফিরে বোনকে বললুম— মেয়েটা খাবে। একটু ফ্রাই করার ব্যবস্থা কর। আমার ভাগনি রেগে কেঁদে অশ্রুৎপাতী চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি জীবনে আর ফিশ-ফ্রাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাব না। আমি বললাম— যাঃ এরকম করতে নেই। এ তো অনেক ভাল জিনিস, দোকানে যা খাস সে কহিবার নহে সখি।

আমি এই গপ্পোটাই ফেঁদেছিলাম কৌরব-পাণ্ডব বংশের প্রথমাকে বোঝানোর জন্য। বলেছিলাম— এই যে আপনারা বলেন না আমি হচ্ছি লাহিড়ী বাড়ির ছেলে, আমাদের বংশে এসব... ইত্যাদি ইত্যাদি— এরকম লাহিড়ীবংশ, বসুপরিবার, রায়পরিবার, সান্যালবংশ আমি অনেক দেখেছি, কার যে কোথায় কী লুকিয়ে আছে, কে যে কোথায় বাঁধা পড়েছিলেন, তারপর কত যুগ আগে কী ঘটে গেছে, আমরা কিন্তু কিছুই জানি না। আর বৃদ্ধ চানক্য শোলোক বেঁধে বলেছিলেন, আর চানক্য বলছি কেন— খোদ গরুড় পুরাণে আছে— এমন কোনও বংশ পৃথিবীতে নেই যার মধ্যে দোষ নেই। এই পৃথিবীতে মেয়েরা আছে এবং কোন মেয়ে যে কার মাথায় কোথায় গিয়ে পড়বে, তা কেউ জানে না, নদীর মতো কুল-ভাসানো গতি তাদের— নারীনাঞ্চ নদীনাঞ্চ স্বচ্ছন্দা ললিতা গতিঃ— অতএব বংশ নিয়ে বড় বড় কথা বোলো না, মনে রেখো কিন্তু এই পৃথিবীতে মেয়েরা জন্মেছে— ন কুলং নির্মলস্তত্র স্ত্রীজনো যত্র জায়তে।

পৌরাণিক কথক-ঠাকুর মেয়েদের ওপর খুব শ্রদ্ধাবশত এ কথা বলেছেন, তা নিশ্চয়ই নয়। হয়তো-বা সম-সামাজিক পৌরুষেয়তায় তালি দেবার জন্য— যেন অন্য হাতটি নেই এমনভাবেই কথা বলেন তাঁরা। কিন্তু আমরা তো জানি— তাঁদের গান্ধর্ব, রাক্ষস, পৈশাচ ইত্যাদি প্রায়-বিধিসম্মত বৈবাহিকতার মধ্যেই তো অন্য কুলের মেয়েদের বিধিসম্মত সংক্রমণ ঘটে যায়। সেখানে পরবর্তীকালে লাহিড়ী-মুখার্জি-বসুদের সমস্ত মহাবংশের প্রতি আমার প্রণাম রইল। মৎস্যগন্ধা সত্যবতী ধীবর রাজার মেয়ে— তাঁকে মহাকাব্যিক মাহাত্ম্য দেবার জন্য কোথায় সেই মগধরাজা উপরিচর বসুর শুক্রসংক্রান্তি কল্পনা করা হয়েছে মৎস্য-গর্ভে। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর বীজ এল দ্বৈপায়ন ঋষি থেকে, আর পাণ্ডবরা তো সব দেবতার ছেলে। স্বয়ং দুর্যোধন ক্ষত্রিয় রাজাদের জন্মরহস্যের কথা তুলে জ্ঞাতিভাই পাণ্ডবদের দুষেছিলেন সেই অস্ত্রপরীক্ষার সময়ে, যখন অধিরথসূতপুত্র রাধাগর্ভজাত কর্ণকে ভীমসেন যা নয় তাই বলছিলেন। তখন দুর্যোধন সাক্ষেপে বলেছিলেন, ওরে আর কথা বাড়াস না। তোদের নিজেদের জন্ম কোথায় কীভাবে হয়েছে, তা কিন্তু আমার ভালরকম জানা আছে— ভবতাঞ্চ যথা জন্ম তদপ্যাগমিতং ময়া। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা— এত তর্ক কীসের? বলছি তো, পৃথিবীতে মহা-মহাবীরদের জন্মের উৎস খুঁজতে যাসনে, চেষ্টা করিসনে নদীর উৎস খোঁজার— শূরাণাঞ্চ নদীনাঞ্চ দুর্বিদা প্রভবা কিল। দুর্যোধনের কথাটা তো প্রায় গরুড় পুরাণের মতো হয়ে গেল। দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য— এঁদেরও ছাড়লেন না দুর্যোধন, তাঁদের জন্ম ঋষিদের ঔরসে হয়েছিল বটে, কিন্তু স্বর্গবেশ্যা অপ্সরারাই যে তাঁদের জন্মের নিমিত্ত হয়ে আছেন, সে-কথা তির্যকভাবে উল্লেখ করতে ভোলেননি দুর্যোধন। আমাদের ধারণা, মহাভারতের বড় বড় অনেক মানুষের জন্ম-মাহাত্ম্যে প্রথাগত বৈবাহিক সংকেত না থাকায়— এইরকম একটা মৌখিক শ্লোকও তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যার মর্ম হল— ঋষিদের আর নদীদের আর প্রসিদ্ধ ভরত বংশের মূল খুঁজতে যেয়ো না বাপু— নদীনাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ ভারতস্য কুলস্য চ। মূলান্বেষো ন কর্তব্যঃ... ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই ভণিতা থেকে পরিষ্কার যে, এই কথাগুলির একটা ভাল দিকও আছে। অন্তত মহাভারতের কালে মহাভারতের 'কোর স্টোরি-লাইন'-এর মধ্যে জাতি-বর্ণের ব্রাহ্মণ্য-বিদ্বেষ তৈরি হয়নি এবং এই দৃষ্টি থেকেই আমাদের ভরত-কুরু-কৌরব-পাণ্ডবদের প্রথমাকে খুঁজতে হবে। কিন্তু মুশকিল কী জানেন, মহাভারতের কালের এই কৌলীন্যহীন তথা প্রথাবিরুদ্ধ উদারতা সকলের সহ্য হয়নি এবং প্রসিদ্ধ ভরত-কুরুবংশের মধ্যে এই জন্ম বিষয়ক উদারতা মহাভারতের প্রমাণে সিদ্ধ হলেও ভরতবংশ সম্বন্ধে এই বিসংবাদী কথাগুলিকে অন্য অর্থ দিয়ে শব্দের অভিধা শক্তিকে আবরণ করতে চেয়েছেন অনেকে। আমরা যে একটু আগেই মৌখিকতার ধারায় ভেসে-আসা শ্লোকে নদী, ঋষি আর ভরতবংশের মূল নিয়ে জল্পনা বন্ধ করতে বলেছিলাম, এই শ্লোকের অপর একটি পাঠ গরুড় পুরাণের মধ্যে পাওয়া যায়। সেখানে একটিমাত্র শব্দই শুধু অন্যরকম। এখানে বলা হয়েছে— নদী-সকলের মূল উদ্ভব কোথা থেকে হয়েছে জানার চেষ্টা কোরো না। চেষ্টা কোরো না অগ্নিহোত্রী ঋষিদের মূল অন্বেষণ করতে অথবা ভরত-বংশের মূল অন্বেষণ করতে— নদীনাম্ অগ্নিহোত্রাণাং ভারতস্য কুলস্য চ।

এখানে পঞ্চানন তর্করত্নমশাই অনুবাদ করেছেন— নদী, অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, ভারত ও কুল ইহাদের মূল অনুসন্ধান করিবে না, যেহেতু মূল অন্বেষণ করিলে দোষ হইতে পারে। আমরা শুধু বলব— 'অগ্নিহোত্র যজ্ঞে'র মূল 'ভারতে'র মূল— এই অনুবাদে অর্থটা কি বোকা বোকা অর্থহীন হয়ে গেল না? তবে তর্করত্নের মতো বিশালবুদ্ধি ব্যক্তি এই অনুবাদ নিজে করেননি, জনৈক কৃষ্ণদাস শাস্ত্রীর অনুবাদ তিনি প্রকাশনা-সম্পাদনা করেছেন বলেই শাস্ত্রীমশায়ের বেখেয়াল অনুবাদ তিনি খেয়ালই করেননি। খেয়াল করলে বুঝতেন— গরুড় পুরাণের এই অধ্যায়ে অনেক শ্লোকই লোকমুখে প্রচলিত ছিল এবং এগুলি নীতিশ্লোক হিসেবেই চিরকাল চিহ্নিত হয়েছে। অনেক শ্লোকের ঈষৎ-পরিবর্তিত পাঠ আমাদের নীতিশাস্ত্রগুলির মধ্যেও পাওয়া যাবে, আর নৈতিক এই শ্লোকগুলি যেহেতু লোকস্তর থেকে উঠে আসে, তাই এগুলির মধ্যে সামাজিক সমালোচনা, রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি ধিক্কার এবং জাতি-বর্ণের চতুর ব্যবস্থার প্রতি বিষোদগারও উঠে আসে। আমরা তাই কৃষ্ণদাস শাস্ত্রীর মতো সংকুচিত অনুবাদ গ্রহণ করব না। বরঞ্চ মহাভারত নিজের মধ্যেই নিজ-সমাজসৃষ্টির যে উদারতা দেখিয়েছে সেটাই মেনে নেব। আমরা মূলান্বেষণও করব আমাদের মহাভারতীয় সত্তায় এবং শ্রদ্ধায়।

আপনারা অবহিত আছেন নিশ্চয় যে, পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী চন্দ্রবংশের সূচনাতেই একটা গণ্ডগোল হয়েছিল। ভগবান ব্রহ্মা চন্দ্রকে সৃষ্টি করে তাঁকে অশেষ গ্রহ-নক্ষত্রের এবং সমস্ত ওষধিকুলের আধিপত্য দিলেন। তিনিও রাজসূয় যজ্ঞ-টজ্ঞ করে নিজেকে উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠা করায় মনে মনে একটু অহংকারীও হয়ে পড়লেন। ঠিক এইরকম অবস্থায় তিনি দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে হরণ করে নিজ ভবনে নিয়ে এলেন। ভগবান ব্রহ্মা এবং দেবর্ষিরা অনেকে অনুরোধ করলেও তিনি তারাকে ছাড়লেন না। এতে শেষপর্যন্ত একটা বিশাল যুদ্ধই বেধে গেল এবং প্রৌঢ় দেবতাদের সহায়তায় তারাকে ফেরানো হল বৃহস্পতির কাছে, কিন্তু তখন তারা গর্ভবতী। বৃহস্পতি তারার এই অবস্থা দেখে তাঁকে 'অ্যাবর্শনে'র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথ বাতলে দিলেন। তারা গর্ভত্যাগ করার পর দেখা গেল বাচ্চাটি অসম্ভব সুন্দর— চন্দ্র তো সেই বাচ্চার দিকে সাভিলাষে তাকালেনই, এমনকী বৃহস্পতিও তাঁকে বেশ পছন্দ করে ফেললেন। এবারে প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করল— বালকটি কার? দেবতারাও বার বার জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু তারা একেবারে নিরুত্তরা। মায়ের এই নিরুত্তর স্বভাব দেখে ছেলে পর্যন্ত রেগে উঠছে। অবশেষে সেই ব্রহ্মার অনুরোধে তারা স্বীকার করলেন— ছেলেটি চন্দ্রের। ব্রহ্মা সানন্দে শৈশব-প্রাজ্ঞ ছেলের নামকরণ করলেন বুধ। এক্ষেত্রে আমাদের ছোট্ট একটু টিপ্পনী এই যে, আপনারা দেখছেন তো নামগুলি— বৃহস্পতি, চন্দ্র, তারা, বুধ— এগুলি সবই তো আমাদের গ্রহ-নক্ষত্রের নাম। হয়তো-বা জন্মমূলে খানিক অলৌকিকতা এবং দেবমাহাত্ম্য খ্যাপন করে চন্দ্রবংশকে একটা মর্যাদার আসন দেওয়াটা এখানে জরুরি ছিল, একই সঙ্গে তারাহরণ, গর্ভপাত ইত্যাদির মাধ্যমে একটা মনুষ্যোচিত ব্যবহারও এখানে অনুসৃত হল। চন্দ্রের পরে বুধের জীবন-সঙ্গিনীর মধ্যে তো রীতিমতো আধুনিক বিতর্কের ছায়া পড়েছে। বিষ্ণু পুরাণ জানিয়েছে— মনুর স্ত্রী ইচ্ছা করেছিলেন তাঁর একটি মেয়ে হোক। তাতে যাজ্ঞিকের যজ্ঞপ্রভাবে তাঁর একটি মেয়ে হল। মেয়েটির নাম ইলা। এই ইলা মৈত্রাবরুণের প্রভাবে মনুর পুত্র হয়ে উঠলেন এবং তাঁর একটি পুরুষ-নামও হল, তাঁর নাম সুদ্যুম্ন। এই লিঙ্গপরিবর্তনের ঘটনাটাকে trans-sexualism বলব কিনা জানি না, তবে মহাভারত সেইকালে এমন একটা জীবনোদাহরণ দিয়েছে, এটাই ভীষণ আধুনিক লাগে। পুরাণ বলেছে— সুদ্যুম্ন মনুপুত্রের ওপর আবার নাকি দেবতার অভিশাপ নেমে এল, তিনি আবারও ইলা হলেন। এমন কন্যা অবস্থায় ইলা যখন চন্দ্রপুত্র বুধের আশ্রমের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছেন, তখনই পারস্পরিক আকর্ষণে তাঁদের মিলন হল এবং ইলার গর্ভে বুধের পুত্র হল— তাঁর নাম পুরূরবা। ইলা নাকি আবারও পুরুষ হয়েছিলেন এবং আগে মেয়ে ছিলেন বলে রাজ্য পাননি। তাঁকে প্রতিষ্ঠান বলে একটা জায়গা দেওয়া হয়েছিল এবং ইলা-সুদ্যুম্ন পুত্র পুরূরবাকেই সেই রাজ্য দান করেন। পুরূরবা কিন্তু বুধের পুত্র হওয়া সত্ত্বেও প্রধানত ইলার ছেলে ঐল পুরূরবা হিসেবেই বেশি বিখ্যাত ছিলেন; হয়তো মা ইলার জীবনে trans-sexualism-এর ব্যাপারটা বেশি প্রথিত হওয়ায় পিতার নামের চেয়েও পুরূরবা ইলার নামেই বেশি বিখ্যাত হয়েছিলেন।

পুরূরবা যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনই তেজস্বী। তৎকালীন দিনের ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে রাজা হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠান নগরকে যথেষ্ট পরিমাণ উন্নত করেছিলেন এবং সেটা এতটাই যে হস্তিনাপুরী প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত এই বংশের বড় বড় রাজা যযাতি, পুরু, দুষ্যন্ত, ভরত সকলেই এই প্রতিষ্ঠানে রাজত্ব করে গেছেন। প্রতিষ্ঠান নগরের অবস্থিতি ছিল এলাহাবাদের উলটো দিকে ঝুসি নামে একটা জায়গায়। গঙ্গার ধার-বরাবর এই জায়গাটাকে এখনও প্রতিষ্ঠানপুর বলেন অনেকে। পুরূরবা এখানেই রাজত্ব করতেন। চন্দ্রবংশে পুরূরবাই বোধহয় সেই প্রধান মৌল পুরুষ, যাঁর সময় থেকে ঈষৎ অলৌকিক যে পিতৃ-পরিচয়— আকাশের চাঁদ, বুধ গ্রহ এবং ইলার মতো দ্বৈত-যৌনতার বিষয় থেকে সরে গিয়ে প্রথম একটা পার্থিব মানুষকে দেখতে পাচ্ছি। এই বংশে পরবর্তী কালে বহুবিখ্যাত রাজারা অনেকেই জন্মেছেন— একেবারে নহুষ-যযাতি থেকে আরম্ভ করে দুষ্যন্ত-ভরত-কুরু এবং

সর্বশেষে কৃষ্ণ-পাণ্ডব-কৌরব— সকলের বংশমূল পুরূরবা এবং তাঁরা হয়তো পুরূরবার চেয়েও হাজার গুণ বেশি বিখ্যাত। কিন্তু তাই বলে পুরূরবার বিখ্যাতি কিছু কমে না। তিনিই বোধহয় সেই প্রথম পার্থিব পুরুষ যাঁর জন্য পার্থিব প্রেমকল্প প্রথম বুঝতে পেরেছি আমরা। তিনিই বোধহয় প্রথম সেই পুরুষ, যাঁর কামনায় স্বর্গসুন্দরী উর্বশী স্বর্গ ছেড়ে নেমে আসেন ভুঁয়ে এবং তিনিই বোধহয় প্রথম সেই পার্থিব পুরুষ, যাঁর জন্য আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলা 'নাটকে'র উৎপত্তি ঘটেছে। কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকের নায়ক বিক্রম আদিপুরুষ পুরূরবার ছায়ামাত্র। পুরূরবা এমনই এক পুরুষ যে, পুরুষমানুষ হওয়া সত্ত্বেও পৌরাণিকেরা তাঁর সুরূপের কথা না বলে পারেননি— সগুণশ্চ সুরূপশ্চ প্রজারঞ্জনতৎপরঃ।

মনের মধ্যে তাঁর রাজোচিত উৎসাহ-উদ্যমের কোনও অভাব ছিল না, ফলে শত্রুরাজ্যের কাছে তিনি ছিলেন কৃতান্তের মতো। অন্যদিকে তাঁর আদেশ-নির্দেশের মধ্যে এমনই এক ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠত যে, মাথা নুইয়ে তাঁর আদেশ-নির্দেশ পালন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকত না— সদৈবোৎসাহশক্তিশ্চ প্রভুশক্তিস্তথোত্তমা। মর্ত্যলোকে এই গুণী রাজাকে উর্বশী আগে থেকেই চিনতেন। পুরাণগুলিতে যেমন আছে, তাতে দেখছি— মিত্রাবরুণের শাপ (দেবীভাগবত পুরাণে কিন্তু প্রজাপতি ব্রহ্মার দ্বারা শাপগ্রস্ত হয়েছেন উর্বশী— ব্রহ্মশাপাভিতপ্তা সা) লাভ করেই উর্বশী স্বর্গ ছেড়ে নেমে আসলেন ভুঁয়ে আর স্বামী হিসাবে বরণ করে নিলেন পুরূরবাকে। উর্বশী নাকি তাঁর নাম-ধাম আর গুণ-গান শুনেই মুগ্ধ হয়েছিলেন— শ্রুত্বোর্বশী বশীভূতা। কিন্তু বিভিন্ন পুরাণের অন্য জায়গাগুলো ঘাঁটলে বোঝা যাবে— উর্বশী পুরূরবাকে পূর্বে দেখে থাকবেন।

সেকালে মর্ত্যভূমিতে যাঁরা বড় বড় রাজা হতেন তাঁরা তাঁদের জ্ঞান, বলবত্তা এবং ঐশ্বর্যের মহিমায় শুধু যে দেবরাজের সঙ্গে তুলনীয় হতেন— তাই নয়, অপিচ স্বর্গে তাঁরা নিয়মিত যাতায়াত করতেন। মাঝে মাঝে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গেও মর্ত্যরাজাদের এমন বন্ধুত্ব জমে উঠত যে, স্বর্গের ইন্দ্র তাঁদের খাতির করে নিজের অর্ধাসন ছেড়ে দিতেন তাঁদের আপ্যায়ন করার জন্য। পুরূরবাও ছিলেন এই ধরনের এক রাজা। মৎস্যপুরাণ লিখেছে— কীর্তি চামরগ্রাহিণী দাসীর মতো তাঁর অঙ্গসংবাহিকা হয়েছিলেন। ভগবান বিষ্ণু এতই প্রসন্ন ছিলেন পুরূরবার উপর যে, সেই সু-দৃষ্টির ফলে দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁর অর্ধাসন ত্যাগ করতেন মর্ত্য রাজার সম্মানে। এই পুরূরবা যখন সসাগরা পৃথিবীর রাজা, সেই সময় ইন্দ্রের প্রতিপক্ষ দানব রাজা কেশী তাঁর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন সর্বত্র। পুরূরবা বহুবার কেশীকে পরাজিত করেছেন এবং আরও একবার কেশী দানবের সঙ্গে তাঁর সংঘাত হল। কিন্তু এইবার সংঘর্ষের কারণ ছিলেন উর্বশী।

রাজা পুরূরবা একদিন বেড়াতে বেরিয়েছেন তাঁর দক্ষিণ-আকাশবাহী রথে চড়ে। হঠাৎ তিনি দেখলেন— দানবেন্দ্র কেশী স্বর্গের সেরা নর্তকী উর্বশী এবং চিত্রলেখা নামে দুই অপ্সরাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন— কেশিনা দানবেন্দ্রেণ চিত্রলেখাম্ অথোর্বশীম্।

পুরূরবা চিত্রলেখাকে না চিনলেও উর্বশীকে নিশ্চয়ই চিনতেন। স্বর্গসুন্দরী উর্বশীর এই বিপদে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিলেন কেশীকে। কেশী যে উর্বশীকে তুলে নিয়ে আসছিলেন স্বর্গ থেকে, সে কিন্তু ইন্দ্রকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েই— শক্রোঽপি সমরে যেন চৈবং বিনির্জিতঃ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু পুরূরবাকে কেশী ভয় পান। পুরূরবা সঙ্গে সঙ্গে বায়ব্যাস্ত্রে কেশী দানবের পথ রুদ্ধ করে উর্বশীকে তুলে নিলেন নিজের রথে। আহা! বেচারা চিত্রলেখা। পৌরাণিক তাঁর কথা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করলেন না। পুরূরবা শুধু উর্বশীকে নিজের রথে তুলে নিয়ে তাঁকে পৌঁছে দিলেন দেবরাজের আস্তানায়। কৃতজ্ঞতার কারণে সমস্ত দেবতাদের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গেল— মিত্রত্বমগমদ্ দৈবৈর্দদাবেন্দ্রায় চোর্বশীম্।

তাই বলছিলাম, অন্তত উর্বশীকে পুরূরবা চিনতেন এবং অবশ্যই উর্বশীও পুরূরবাকে। এবারে আরও একটা ঘটনা বলি। পুরূরবা যেভাবে ইন্দ্রজয়ী কেশীকে পরাস্ত করে উর্বশীকে উদ্ধার করেছিলেন, তাতে তাঁরও একটা 'হিরো-ওয়ারশিপ' তৈরি হয়েছিল রাজার উপর।

উর্বশীকে ফিরে পাওয়ার ফলে স্বর্গে একেবারে উৎসবের আবহাওয়া চলে এল। নৃত্যগুরু ভরত মুনিকে তলব করে ইন্দ্র বললেন নাটক দেখানোর ব্যবস্থা করতে। ভরত মুনি বললেন, কোনও ব্যাপারই নয়। আমাদের 'লক্ষ্মী-স্বয়ংবর' নাটক একেবারে তৈরিই আছে, আর তাতে 'হিরোইন' হলেন স্বয়ং উর্বশী।

নাটক আরম্ভ হল। ভরত মুনি মেনকা উর্বশী এবং রম্ভাকে নাচার ইঙ্গিত করলেন— মেনকাম উর্বশীং রম্ভাং নৃত্যতেতি তদাদিশৎ। উর্বশী অভিনয় করছিলেন স্বয়ং লক্ষ্মীর ভূমিকায়। তিনিই প্রধানা নায়িকা। কিন্তু পুরূরবাকে দেখা ইস্তক তাঁর এমনই মনের অবস্থা যে, তিনি শুধুই মুখে পুরূরবার নাম নিয়ে গান করেন। কিন্তু মনের মধ্যে যাই থাক, অভিনয়ের সময় তো আর পুরূরবার কথা বললে চলবে না, 'লক্ষ্মী-স্বয়ংবর' নাটকে তাঁর লক্ষ্মীর পার্ট বলার কথা। উর্বশী নাচতে নাচতে শুধুই পুরূরবার দিকে তাকান, মনেও তিনি পুরূরবার কথা ভাবেন এবং এক সময় লক্ষ্মীর পার্টটাই ভুলে যান— বিস্মৃতাভিনয়ং সর্বং যৎ পুরা ভরতোদিতম্। ভরত মুনির রাগ হয়ে গেল ভীষণ। তিনি অভিশাপ দিলেন— তোকে মর্ত্যভূমিতে লতা হয়ে জন্মাতে হবে আর ওই পুরূরবা হবে একটা পিশাচ।

আমরা দু-দুটো শাপের কথা শুনলাম। একটা মিত্রাবরুণ, যুগল-ঋষির শাপ, দ্বিতীয়টা ভরত মুনির শাপ। প্রথম শাপের কথা আছে দেবীভাগবতপুরাণে, দ্বিতীয় শাপের কথা পেলাম মৎসপুরাণে। এবারে এই দুই শাপের শেষে আমাদের উপজীব্য হল শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ। শুকদেব জানাচ্ছেন— মিত্রাবরুণের শাপের কথা উর্বশীর মনে ছিল। কিন্তু 'মর্ত্যলোকে যাও' বললেই তো আর হল না। উর্বশীর মতো এক অসামান্যা রূপসি মর্ত্যলোকে বাস করবেন। তা তিনি তো আর যার তার ঘরে গিয়ে বেঁটে-খাটো-মোটা-কালো একটা লোককে নিজের প্রেম উপহার দিতে পারেন না। তিনি বিদগ্ধা রসিকা বটে, মর্ত্যভূমিতে নেমে এলেও তিনি এমনই একজনকে স্বামীত্বে বরণ করতে চাইবেন, যাঁকে তাঁর ভাল লাগবে। উর্বশী তাই ভাবছিলেন। হয়তো এই ভাবার সময়টুকু মিত্রাবরুণ দিয়েছিলেন।

ভাগবত পুরাণ বলছে— নারদ মুনিও নাকি ইন্দ্রসভায় বারবার তাঁর বীণার ঝংকারে পুরূরবার সম্বন্ধেই গান গাইছিলেন। গান শুনে উর্বশীর প্রাণ-মন আকুল হয়ে গেল। ভাবলেন— এই তো সেই মানুষ, যে তাঁর প্রেমের মর্ম বুঝবে। আর শুধু প্রেমই তো নয়, এ হল লক্ষ্মী-স্বয়ংবর নাটকের সবচেয়ে দামি তারকার প্রেম। এ প্রেম বিনা পয়সায় হয় না। উর্বশী যে পুরূরবাকেই নিজের প্রেমের যোগ্য বলে ভাবলেন— তার কারণ আগেই

জানিয়ে দিয়েছে অন্যান্য পুরাণগুলি। পুরূরবার শুধু প্রেম নয়, আর কী আছে? উর্বশী শুনেছেন— সে রাজার রূপ-গুণ-চরিত্র যেমন, তেমনই আছে আধুনিকের উদারতা। তাঁর অতুল ঐশ্বর্য এবং ক্ষমতার কথাও উর্বশী শুনেছেন— তস্য রূপ-গুণৌদার্য-শীল-দ্রবিণ-বিক্রমান্। এসব খবর পেয়েই উর্বশী এসেছেন পুরূরবার কাছে।

এ পুরাণ, সে পুরাণ যাই বলুক, পুরূরবার ব্যাপারে উর্বশীর কিন্তু ভালবাসাও ছিল। বেদের মন্ত্রগুলি পড়লে আমার অন্তত সেইরকমই লাগে এবং বেদের সেই প্রেমের সুরটুকু একমাত্র ধরে রেখেছে বিষ্ণু পুরাণ। এই পুরাণে বলা আছে— পুরূরবাকে দেখামাত্রই স্বর্গসুন্দরীর অভিমান-মঞ্চ থেকে নেমে এসে, স্বর্গসুখের সমস্ত অভিলাষ ত্যাগ করে— অপহায় মানম্ অশেষম্ অপাস্য স্বর্গসুখাভিলাষম্— উর্বশী একেবারে তন্মনা হয়ে রাজার কাছে উপস্থিত হলেন। স্বর্গসুন্দরী আজ মাটির ধুলোয় নেমে এসে পুরূরবার কাছে কী চাইছেন? রাজা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। বললেন, সুন্দরী আমার! দাঁড়িয়ে কেন? বোসো। কী করতে পারি তোমার জন্য— আস্যতাং করবাম কিম্? উর্বশী কাছে এলেন। তারপর ইনি দেখলেন ওঁকে আর উনি দেখলেন এঁকে। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে গেলেন। দু'জনেই চাইলেন দু'জনকে।

রাজা বললেন— সুভ্রু! আমি তোমাকে চাই। তুমি খুশি হয়ে আমাকে ভালবাসবে এই আমি চাই। আমাদের ভালবাসা হোক চিরকালের— রতির্নৌ শাশ্বতীঃ সমাঃ। মর্ত্যভূমিতে নেমে স্বর্গের অপ্সরাও রাজার কথা শুনে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন— লজ্জাবখণ্ডিতমুখী। উর্বশী বললেন— সুন্দর আমার। তোমাকে দেখার পরেও তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে না, তোমাকে মন দেবে না, এমন মেয়ে আছে নাকি তিন ভুবনে— কস্যাস্তয়ি ন মজ্জেত মনো দৃষ্টিশ্চ সুন্দর। হৃদয়ের সমস্ত উচ্ছ্বাস দিয়ে পুরূরবার কাছে আত্মনিবেদন করার পরেও উর্বশী কিন্তু নিজেকে সম্পূর্ণ উজাড় করে দিতে পারলেন না। বললেন— রাজা, তোমাকে দেখা অবধি আমার মন জ্বলছে রিরংসায়। কিন্তু তবু আমার একটা শর্ত আছে, রাজন্।

সুরলোকের শ্রেষ্ঠতমা রূপসির রিরংসার কথা জেনেও পৃথিবীতে এমন কোনও পুরুষমানুষ আছে যে তাঁর শর্তে রাজি না হবে? পুরূরবা বললেন, বলো তোমার শর্ত। উর্বশী দুটি মেষ শাবকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, মহারাজ, এই দুটিকে আমি পুত্রস্নেহে লালন করেছি। এই দুটি আমার শয্যার দুই পাশে বাঁধা থাকবে, এদের সরানো চলবে না। উর্বশী এবার বললেন, আমি তোমাকে মৈথুনের সময় ছাড়া অন্য কোনও সময় নগ্ন দেখতে চাই না, রাজা। এবং আমাকে অন্য কিছু খাবার জন্য অনুরোধ করবে না তুমি, আমি শুধুই ঘি খেয়ে থাকব— ঘৃতং মে বীর ভক্ষ্যং স্যান্নেক্ষে ত্বান্যত্র মৈথুনাৎ।

পুরূরবা রাজি হলেন উর্বশীর শর্তে। তারপর উর্বশীর রমণ-সুখে তাঁর দিনরাত কোথা দিয়ে যেতে লাগল তা টেরও পেলেন না রাজা। উর্বশীকে নিয়ে কখনও তিনি চৈত্ররথের বনে, কামনার মোক্ষধাম অলকাপুরীতে বেড়াচ্ছেন, কখনও-বা মানসসরোবরে কমল-কলির মধ্যে জলক্রীড়া করছেন, কখনও বা স্বর্গসুন্দরীর সঙ্গে বিজন রহস্যালাপ চলছে বহুক্ষণ ধরে। রাজার ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে উর্বশীও তাঁকে ভালবাসা দিলেন অনেক, এমনকী আর কখনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বর্গে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছাও তাঁর হত না— প্রতিদিন-প্রবর্ধমানানুরাগা অমরলোকবাসেঽপি ন স্পৃহাং চকার।

এদিকে কতকাল উর্বশী স্বর্গে নেই— দেবতা, গন্ধর্ব এমনকী অপ্সরাদেরও আর ভাল লাগে না। দেবরাজ ইন্দ্রের বৈজয়ন্ত প্রাসাদে নাচের আসর আর সেভাবে জমেই না। দিনের পর দিন উর্বশীহীন রঙ্গমঞ্চ দেখে ইন্দ্রের মনে রীতিমতো কষ্টের সঞ্চার হল। একদিন তো নর্তক গন্ধর্বদের ডেকে তিনি মনের ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন— আমার আর ভাল লাগে না, উর্বশী নেই এমন সভা মানায় নাকি— উর্বশীরহিতং মহ্যমাস্থানং নাতিশোভতে। ইন্দ্রের মনোভাব বুঝে স্বর্গের সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্বেরা ঠিক করল— যে করেই হোক উর্বশীকে ফিরিয়ে আনতে হবে ধরাধাম থেকে।

কিন্তু সোজা পথে তো আর এ কাজ করা যাবে না। পুরূরবা প্রকৃষ্ট গব্য-ঘৃতের সরবরাহ ঠিক রেখেছেন, অতএব উর্বশীর খাবার কোনও কষ্টই নেই। শয্যার পার্শ্ববর্তী মেষদুটি এখন রাজারও স্নেহধন্য, আর রুচিশীল মর্ত্যরাজার বিনা কারণে উলঙ্গ হওয়ারও কোনও প্রশ্ন আসে না। উর্বশী স্বর্গের কথা ভুলে গিয়েছেন, বরঞ্চ মর্ত্যের প্রেমে এখন তিনি গভীরভাবে লালায়িত। এতসব দেখে গন্ধর্ব বিভাবসু আরও সব গন্ধর্বদের নিয়ে উর্বশীকে রাজার হৃদয় থেকে সরিয়ে আনার চক্রান্ত করলেন। একদিন গভীর রাতে, অন্ধকার যখন প্রায় গ্রাস করে ফেলছে প্রতিষ্ঠানপুরের রাজপ্রাসাদ, সেইসময় গন্ধর্ব বিভাবসু অন্য গন্ধর্বদের সঙ্গে এসে সবার অলক্ষিতে রাজার অন্তঃপুরে ঢুকলেন।

রাজা তখন বিবস্ত্র অবস্থায় উর্বশীর সঙ্গে শুয়ে আছেন। গন্ধর্বরা উর্বশীর শয্যার পাশ থেকে একটি মেষশাবক তুলে নিয়ে চলে গেল। মেষের ডাক শুনে মাঝরাতেই উর্বশীর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি বলে উঠলেন— আমি নিশ্চয়ই অনাথ, নইলে আমার ছেলের মতো মেষশাবকটিকে হরণ করবে কে? হায় হায় কী করি, কার কাছেই বা যাই!

পুরূরবা সব শুনলেন, কিন্তু উর্বশী তাঁকে নগ্ন অবস্থায় দেখে ফেলবেন— এই ভয়ে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন না— নগ্নং মাং দেবী দ্রক্ষ্যতীতি ন যযৌ। রাজাকে নির্বিকার দেখে গন্ধর্বরা এবার দ্বিতীয় মেষটিকেও হরণ করল। উর্বশী আবার ডুকরে কেঁদে উঠলেন— এক রত্তি ক্ষমতা নেই, অথচ দেখায় যেন ওঁর কত ক্ষমতা। আসলে একটা নপুংসক স্বামীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে আমার— কুনাথেন নপুংসসা বীরমানিনা। নইলে আমার ছেলে নিয়ে যাচ্ছে চোরে, আর উনি! পুরুষমানুষ বাইরে গেলে মেয়েছেলে যেমন দরজা বন্ধ করে দিনের বেলা ঘুমোয়, সেইরকম ঘুমোচ্ছেন— যঃ শেতে নিশি সন্ত্রস্তো যথা নারী দিবা পুমান্।

পুরূরবা আর থাকতে পারলেন না। সেই বিবস্ত্র অবস্থাতেই বিছানা ছেড়ে উঠে খড়্গ হাতে নিয়ে বেরোলেন উর্বশীর মেষশাবক ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু যেই না তিনি বেরোতে যাবেন, এই সময় গন্ধর্বরা বিদ্যুতের স্ফুরণ ঘটাল আকাশে। চকিত ক্ষণপ্রভায় উর্বশী দেখলেন— রাজা উলঙ্গ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজবাড়ি থেকে চলে গেলেন অন্যত্র— তৎপ্রভয়া চোর্বশী রাজানম্ অপগতাম্বরং দৃষ্ট্বা অপবৃত্তসময়া তৎক্ষণাদেব অপক্রান্তা। রাজা তো এই মারি কি সেই মারি করে বেরিয়েছিলেন, এদিকে গন্ধর্বরা কাজ হয়ে গিয়েছে দেখে মেষশাবক ফেলে রেখে পালাল। রাজা পরম পুলকে মেষদুটি কোলে করে বাড়ি ফিরে দেখলেন— উর্বশী

নেই। উর্বশীর প্রেমে আকুল পুরূরবা সেই নগ্ন অবস্থাতেই উন্মত্তের মতো বেরিয়ে পড়লেন উর্বশীকে খুঁজতে— তাঞ্চ অপশ্যন্ অপগতাম্বর এব উন্মত্তরূপো বভ্রাম। এখানে-সেখানে পরিচিত-অপরিচিত নানা জায়গায় খুঁজে পুরূরবা উপস্থিত হলেন কুরুক্ষেত্রে। দেখলেন এক কমল-সরোবরে অন্যান্য অনেক অপ্সরাদের সঙ্গে জলক্রীড়ায় মত্ত উর্বশী।

এই যেটুকু বললাম এ হল ঋগ্‌বেদে বলা পুরূরবা-উর্বশী সংলাপ-সূক্তের অগ্রভাগ— যা বেদে নেই, অথচ নানা পুরাণে বর্ণিত আছে। এইবার আমরা খোদ ঋগ্‌বেদের সংলাপ-সূক্তে দেখব— উর্বশী বোধহয় রাজাকে দেখেই নানা বিভঙ্গে চলে যেতে চাইছিলেন, আর অমনি পুরূরবার বারণ শুরু হল বৈদিক ভাষায়— হয়ে জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে— প্রিয়া আমার। জায়া আমার। এত নিষ্ঠুর তোমার মন! দাঁড়াও, এত তাড়াতাড়ি চলে যেয়ো না। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। মনের কথা এখনই যদি পরিষ্কার করে না বলি, তা হলে অনেক অসুবিধা হবে পরে। উর্বশী নির্বিকারচিত্তে বলে উঠলেন— তোমার সঙ্গে কথা বলে আমার কী হবে— কিমেতা বাচা কৃণবা তবাহং— আমি প্রথম উষার আলোর মতো মুছে গিয়েছি তোমার জীবন থেকে। হাওয়াকে যেমন ধরে রাখা যায় না আলিঙ্গনের মুদ্রায়, না বাহুতে, তেমনই তুমিও আমাকে ধরে রাখতে পারবে না। তুমি ঘরে ফিরে যাও— পুরূরবঃ পুনরস্তং পরেহি।

পুরাবিদ পণ্ডিতেরা আধুনিক দৃষ্টিতে বলেন— পুরূরবা হলেন সূর্যের প্রতীক, তিনি সৌর নায়ক। আর উর্বশী হলেন উষা, 'উর্বশী' শব্দের একটা অর্থও তাই। সূর্যের উদয় হলে শুধু যে অন্ধকার দূরে যায় তাই নয়, রক্তিম বসনে সাজা সুন্দরী উষাও আর থাকে না। আলোয় আলোয় জ্বলে ওঠা নগ্ন সূর্যকে উর্বশী উষা ছেড়ে চলে যায়, আর সেই নগ্ন-তেজের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে তার সারাদিনের হাহাকার। অল্পক্ষণের মিলনে সে শুধু বলে— না, এত তাড়াতাড়ি যেয়ো না, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে কত।

সূর্য-উষার এই রূপক-সংলাপের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেও বৈদিক ঋষির প্রেমের ভাবনাটা ব্যর্থ হয় না কিছু। উর্বশীর কথা শুনে পুরূরবা বললেন— তুমি নেই, তাই আমার তূণীর থেকে বাণ বেরোয়নি একটাও, যুদ্ধে গিয়ে ধরে আনতে পারিনি শত্রুর গোধন। রাজকার্য বীরশূন্য, শোভাহীন, সৈন্যেরা সিংহনাদ করা ছেড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ উর্বশী ছাড়া পুরূরবার সমস্ত দৈনন্দিন কাজ আটকে গিয়েছে। এখনও তিনি সরোমাঞ্চে স্মরণ করেন— কীভাবে উর্বশী শ্বশুরের ঘরে খাবার পৌঁছে দিয়েই পুরূরবার ঘরে আসতেন রমণ-সুখ অনুভব করার জন্য। উর্বশীও বলেন— রাজা আমার। প্রতিদিন তিনবার তুমি আমায় আলিঙ্গন করতে— ত্রিঃ স্ম মাহ্নঃ শ্নথয়ো বৈতসেন। কোনও সপত্নীর সঙ্গে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না, তুমি শুধু আমাকেই সুখী করতে। তুমি আমার রাজা, তুমি আমায় সমস্ত সুখ দিয়েছ।

কিন্তু এত সুখ পেয়েও উর্বশী রাজাকে চিরতরে ছেড়ে এসেছেন। এখন তাঁর বক্তব্য— তুমি ফিরে যাও এখান থেকে, আমাকে আর তুমি পাবে না— পরে হি অস্তং নহি মূরমাপঃ।

উর্বশীর কথা শুনে পুরূরবার হৃদয় ভেঙে গেল। নৈরাশ্যের যন্ত্রণায় তিনি শেষ ঋক মন্ত্র উচ্চারণ করলেন এবং সে মন্ত্রই বোধহয় সমস্ত বিরহ-পদাবলীর প্রথম সংজ্ঞা। পুরূরবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন— তুমি যখন আর ফিরে আসবে না, তবে পতন হোক তোমার প্রণয়ীর। সে যেন আর কোনওদিন দাঁড়ানোর শক্তি না খুঁজে পায়— সুদেবো অদ্য প্রপতেদনাবৃৎ। পরাবতং পরমাং গন্তবা উ। সে যেন কালরাত্রির কোলে ঘুমিয়ে পড়ে, ক্ষুধার্ত নেকড়েরা যেন খেয়ে নেয় তাকে। উর্বশী এতকালের সহবাস-চেতনায় সান্ত্বনা দিলেন রাজাকে। বললেন— পুরূরবা! অমন করে বোলো না তুমি। এমন করে মরণ চেয়ো না। তুমি কি জানো না— মেয়েদের হৃদয়টাই নেকড়ের হৃদয়ের মতো, মেয়েদের ভালবাসা স্থায়ী হয় না— ন বৈ স্ত্রৈণাণি সখ্যানি সন্তি। সালাবৃকাণাং হৃদয়ান্যেতা।

আমি সত্যিই ভাবতে পারি না যে, খ্রিস্টজন্মের দুই আড়াই বছর আগে আমরা এইরকম অসামান্য কবিতা লিখেছি। পৃথিবীর অন্যাংশের মানুষ যখন কাঁচা মাংস খাচ্ছে, তখন আমরা মিলন-বিরহের জীবন-নাটকের কথা লিপিবদ্ধ করছি এই নাটকীয় ভাবনায়।

বিষয়বস্তু হিসেবে আরও লক্ষণীয় হল— একজন স্বর্গসুন্দরী অপ্সরার এই মানসিক সংশ্লেষ। একজন মর্ত্য মানুষের জন্য তাঁর হৃদয় এতটাই ভগ্ন হয় যে, তিনি নিজেও আড়াল খোঁজেন সমগ্র স্ত্রীজাতির প্রণয়স্বভাবের অন্তরালে। 'ফ্রেইলটি! দাই নেম ইজ উওম্যান'— এ কথা তো সেদিন লিখলেন শেক্সপীয়র এবং তাও তিনি সেটা পুরুষের মুখে বসিয়ে দিয়ে স্ত্রীজাতির উদ্দেশে পৌরুষেয় আক্রোশ প্রচার করে দিলেন সাধারণী ব্যঞ্জনায়। কিন্তু যে-রমণী নিজের মুখে নিজের ক্রূরতা প্রকট করে তোলে প্রণয়ীর কাছে, প্রেমিকা হিসেবে সে কিন্তু নিজের অসহায়তার জায়গাটাই শুধু প্রমাণসহ করে তোলে না, একই সঙ্গে সে স্বর্গসুন্দরীর অভিমান-মঞ্চ থেকে মাটির ধূলিতে নেমে আসে; প্রণয়ী পুরূরবার সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করতে না পারার যন্ত্রণাটা তাঁকে বিরহিণীর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করে।

উর্বশী ফেরেননি। স্বর্গের আগ্রাসনে ফেরার উপায় ছিল না তাঁর। পুরূরবা কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়েছিলেন। এই বুক ভাসানো বিরহ দিয়েই রচিত হয়েছে কবি কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকের অন্তরভাগ। পুরাণে বর্ণিত ভরত মুনির যে অভিশাপে লতা হয়ে থাকবেন উর্বশী তাও কালিদাস কাজে লাগিয়েছেন কবিজনোচিত সমব্যথা নিয়ে। আমাদের পুরাণকারের হৃদয় অবশ্য বড়ই দয়াপ্রবণ। তাঁরা পুরূরবাকে একেবারে নিরাশ করেননি। রাজা যখন পদ্ম সরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে উর্বশীকে বারবার ফিরে আসার অনুরোধ জানাচ্ছেন, তখন উর্বশী বললেন— কেন এমন অবিবেচক পাগলের মতো করছ। আমার গর্ভে তোমারই ছেলে আছে। তুমি ঠিক এক বছর পরে আবার এইখানে ফিরে এসো। তখন তোমার ছেলেকে তোমারই কোলে দেব, আর সম্পূর্ণ এক রাত্রি ধরে তোমার সঙ্গে মিলন-সঙ্গম উপভোগ করব আমি— সংবৎসরান্তে হি ভবানেকরাত্রং ময়েশ্বরঃ রংস্যতি।

পুরূরবা বড় খুশি হয়ে রাজধানীতে ফিরলেন— তবু তো এক রাত্রির জন্য তিনি পাবেন উর্বশীকে। পুরূরবা ফিরে চলে গেলে কমলসরোবরের যত স্নান-সহচরী অপ্সরারা ঘিরে ধরল উর্বশীকে। উর্বশী বললেন, ইনিই আমার সেই পুরুষ-রত্ন পুরূরবা, যাঁর ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে এতকাল তাঁরই সহবাসে দিন কেটেছে আমার। অপ্সরারা বলল— কী সুন্দর! কী সুন্দর! ইচ্ছা হয় ভাই, আমরাও এমন পুরুষের সঙ্গে রসে-রমণে সারা জীবন কাটিয়ে দিই— অনেন সহাস্মকমপি সর্বকালমভিরন্তুং স্পৃহা ভবেদিতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরূরবা কিন্তু এমনটি চান না। উর্বশী ছাড়া দ্বিতীয় কোনও সত্তা তাঁর হৃদয় অধিকার করে না। এক বছর পরে তিনি আবার এসেছেন উর্বশীর সংকেতিত স্থানে। একটি দুর্লভ রাত্রি উর্বশীর সহবাসে ক্ষণিকের মধ্যে কেটে গেল। অবশ্য রাজা তাঁর প্রথম পুত্র 'আয়ু'-কে লাভ করলেন এরমধ্যে এবং দ্বিতীয় পুত্রের গর্ভাধান করে এলেন। উর্বশীর সঙ্গে মাত্র পাঁচ রাত্রির আঙ্গিক মিলনের অধিকারে পুরূরবা আরও পাঁচটি পুত্রের জনক হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, পাঁচ বছরে পাঁচটি রাত্রি মাত্র ভিক্ষা পেয়েও পুরূরবা উর্বশীকে স্মরণ করেছেন আরও গভীরভাবে। এই স্মরণের অনন্যতার মধ্যেই উর্বশী বুঝেছেন পুরূরবা তাঁকে ছাড়া জানেন না। পুরূরবাকে তিনি বলেছেন— আমাকে তুমি এত ভালবাস, তাই আমার সগন্ধতায় গন্ধর্বরা তোমার উপর খুশি হয়েছেন। তুমি বর চাও তাঁদের কাছে। রাজা বর চাইলেন এবং তাঁদেরই করুণায় হোম করে তিনি একাত্ম হলেন উর্বশীর সঙ্গে উর্বশীলোকে।

বেদ-পুরাণের এই কাহিনির শেষে এসে সেই ডি. এইচ. লরেন্স-এর কথাটা বড় সার্থক মনে হয় আমার— And most harlots had somewhere a streak of womanly generosity...plenty of harlots gave themselves, when they felt like it, for nothing. স্বর্গের নন্দনকানন ছেড়ে আসাটা কোনও অভিশাপই ছিল না উর্বশীর কাছে, এমন কোনও স্ফীত-বোধও কাজ করে না তাঁর মনে যে, তাঁর নৃত্য-গীত, তাঁর বৈদগ্ধ্য একমাত্র দেবরাজ ভোগ্য কোনও পণ্য বস্তু। বরঞ্চ সুরলোকের প্রয়োজন সাধক যান্ত্রিক আগ্রাসন তাঁকে বিপ্রতীপভাবে এক অযান্ত্রিক মর্ত্যপ্রেমের সন্ধান দিয়েছে, যেখানে এক স্বর্গবেশ্যা সুরসুন্দরী জননী হবার আস্বাদন চেয়েছেন মর্ত্য মানুষের কাছে। উর্বশীর সূত্র ধরেই বলি— এটা বোধহয় ভারতীয় সভ্যতার একটা 'ট্রেইট'-ই বটে যে, আমরা মহাভারত-রামায়ণ বা পুরাণগুলিতে যত মেনকা-রম্ভা, ঘৃতাচী-বিশ্বাচীদের নাম শুনেছি, তাঁরা বহুল সময়েই মুনি-ঋষিদের ধ্যানভঙ্গ করার জন্য নিয়োজিত হলেও তাঁরা কিন্তু অনেক সময়েই সেই সব শুষ্ক-রুক্ষ মুনি-ঋষিদের সন্তান ধারিকা জননী। এমনকী অনেক অভ্যুদয়শালী তপঃপরাক্রান্ত ঋষি-মুনিও আছেন, যাঁদের জননী আসলে স্বর্গসুন্দরী এই স্বর্গবেশ্যা অপ্সরারা।

অশেষ যৌবনোন্মাদনার অন্তরালে অপ্সরাদের এই জননীত্বের পরিসরটুকু কিন্তু কম নয় ভারতীয় সংস্কৃতিতে এবং ভেবে দেখা দরকার যে, অনেক ক্ষেত্রেই এই স্বর্গবেশ্যারা পুত্র-কন্যার প্রতি তেমন মায়া-মোহ প্রকটভাবে দেখাননি, কখনও বা সন্তানদের পরিত্যাগও করেছেন, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা সন্তান ধারণ করার ক্ষেত্রে অস্বীকৃত হননি, এবং উৎকট ঋষি-মুনিদের সন্তান আপন গর্ভে ধারণ করার কারণে বিরাগও প্রদর্শন করেননি কখনও। তাতে এটা বুঝি যে, আপন স্বর্গীয় যৌবন নিয়ে তাঁরা যতই আকুল থাকুন, অপ্সরাকুলের অনেকেই কিন্তু বহুতর বিরাট মহাপুরুষের জননী। এই মহাপুরুষ-কুলে বশিষ্ঠ কিংবা অগস্ত্যের মতো ঋষিরা যেমন আছেন, তেমনই আছেন দ্রোণাচার্য-কৃপাচার্যের মতো নমস্য ব্যক্তিরা। আবার ঘৃতাচী-মেনকাদের মতো অপ্সরারা না থাকলে আমরা রুরুর স্ত্রী প্রমদ্বরাকেও পেতাম না আর ভারতখ্যাত ভরতের জননী শকুন্তলাকেও পেতাম না দুষ্যন্তের স্ত্রী বলে। আরও শতেক বিখ্যাত অপ্সরা-প্রসূতির বিবরণ না দিয়ে বরঞ্চ এটা বলাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাল যে, মাতৃত্ব কিন্তু ভারতীয় স্বর্গসুন্দরীদের অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য এবং এখানে উর্বশী এমনই একটা নাম, যিনি ভবিষ্যদ্‌বিখ্যাত পুরু-ভরত-কুরুবংশের আদিজননী। তিনি তাঁর পুত্র আয়ুকে সযত্নে গর্ভে ধারণ করে ফিরিয়ে দিয়ে গেছেন প্রেমিক রাজার তত্ত্বাবধানে। আর উর্বশীর এই বংশ-মাতৃত্বের মহিমাটুকু ভুলতে পারা যায় না বলেই আমরা পাণ্ডব অর্জুনকে দেখেছি— তিনি স্বর্গসুন্দরীর যৌন আকর্ষণের মধ্যেও আগে স্মরণ করেছেন তাঁর জননীত্বের কথা। কথাটা অবশ্য একটু বুঝিয়ে বলতে হবে।

আসলে এটা একটা জটিল প্রশ্নও বটে এবং সে প্রশ্ন ভারতবর্ষের সুরসুন্দরীদের সম্বন্ধে যেমন প্রযোজ্য, তেমনই প্রযোজ্য ঋষি-মুনিদের ক্ষেত্রেও। লক্ষণীয়, আমরা ঋষি বশিষ্ঠকে দশরথ-রামচন্দ্রের কুলপুরোহিত হিসেবে যেমন পেয়েছি, তেমনই তাঁদের অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহ দিলীপেরও কুলপুরোহিত হিসেবে বশিষ্ঠকেই দেখেছি। যে-নারদকে আমরা সত্য-ত্রেতাযুগে বীণা বাজিয়ে হরিনাম করতে শুনেছি, তাঁকেই দেখেছি দ্বাপর-কলির সন্ধিতে— কতবার, কত ঘটনায়, তার ঠিক নেই। আবার অপ্সরাদের ক্ষেত্রে দেখুন, মেনকা-ঘৃতাচী— যাঁদের আমরা কুরু-ভরতবংশের প্রথম-যুগীয় রাজত্বকালে ঋষিদের মন ভোলাতে দেখেছি, তাঁরাই তাদের অধস্তন-কালে অন্য অর্বাচীন ঋষি-মুনির ধ্যান ভাঙাচ্ছেন। আমরা শুধু বলব— এই নামগুলিকে একটা ব্যক্তিনাম হিসেবে না দেখাই ভাল, আসলে এঁরা এক-একটা 'ইনস্টিটিউশন', এবং প্রথম-বিখ্যাত ব্যক্তিনামেই তাঁদের সম্প্রদায় গড়ে উঠত। তাঁদের তপস্যা কিংবা সৌন্দর্যের পরম্পরাটা এমনই, যাতে পরবর্তী শিষ্য-প্রশিষ্যের ওপর মূল ঋষির নাম অধিরূঢ় হত, অথবা অপরূপা কোনও সুন্দরীর ওপরে অধিরূঢ় প্রতীকটি হত উর্বশী-মেনকা-রম্ভার। এবারে আমরা পাণ্ডব অর্জুনের কথায় আসি।

কত কষ্টের তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে অর্জুন স্বর্গে পৌঁছেছেন ইন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে। কচি-কাঁচা ছেলে স্বর্গে গিয়েছে তার জন্মদাতা বাবার সঙ্গে দেখা করতে। সুন্দরী স্ত্রীলোকের ব্যাপারে এমনিতে অর্জুনের কিছু দুর্বলতা আছে; সে আমরা উলূপী, চিত্রাঙ্গদাকে দিয়েই বেশ বুঝেছি। কিন্তু পাড়ার মেয়ে এক কথা, আর স্বর্গের মতো বিদেশ-বিভুঁই, সে বড় ভয়ানক কথা। আমাদের বন্ধু-বান্ধব দু-একজনা— অরুণ-বরুণ এই শ্যাম বঙ্গদেশে শ্যামলা-কমলাদের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়েছিল, তাদের কয়েকজনকে দেখলাম মেমসাহেবদের দেশে গিয়ে, একেবারে থম মেরে গেল। ছেলেমেয়ের নির্বিচার 'ডেটিং-ফেটিং' দেখে তারা কোথায় সুযোগ নেবে, না একেবারে অতিরিক্ত সচেতন হয়ে গর্তে ঢুকে পড়ল। আমাদের অর্জুনেরও ওইরকম থম-মারা অবস্থা হল স্বর্গসুন্দরীদের দেখে। বাবা ইন্দ্র ছেলেকে দেখে অর্ধাসন ত্যাগ করে সানন্দে তাঁকে বসতে দিলেন বটে, কিন্তু বাবার বৈজয়ন্ত প্রাসাদের সভায় অর্জুন যা দেখলেন, তাতে তিনি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। অর্জুন দেখলেন উর্বশী-মেনকারা সব নাচ জুড়েছেন দেবসভায় এবং তাঁদের নাচের ঠমক-গমক দেখলে একেবারে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হবে। অর্জুনের মনোভাব বুঝে মহাভারতের কবি নাচনিদের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন— এঁরা হলেন সব বরাঙ্গনা। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করা মহাপুরুষরা পর্যন্ত এঁদের দেখলে পরে পাগল হয়ে যান। আর এখানে তাঁদের অঙ্গভঙ্গি কেমন? বিশাল নিতম্বে

তরঙ্গ তুলে— মহাকটিতটশ্রোণ্যঃ কম্পমানৈঃ পয়োধরৈঃ— পয়োধরের ঈষৎ-চকিত কম্পনে মাতাল করে দিয়ে ইন্দ্রসভার অপ্সরারা হাবে-ভাবে, কটাক্ষে মানুষের বুদ্ধিটাই মোহিত করে দিচ্ছে সম্পূর্ণ।

অর্জুন সব দেখলেন বটে, তবে দেখেশুনে একটু গুটিয়ে থাকলেন। একে বাবার সামনে, তার মধ্যে অপ্সরাদের ওই দুঃসাহসিক শিথিল ব্যবহার, অর্জুন নিজেকে খুব সংযত করে রাখলেন। তবে জায়গাটা স্বর্গ বলে কথা, এবং ইন্দ্র-বাবার মতো অতি-প্রগতিশীল মানুষ আর হয় না। ইন্দ্রসভায় উর্বশী-মেনকার নাচগান যখন চলছিল, তখন অর্জুন একবার সবিস্ময়ে খানিকক্ষণ তাকিয়েছিলেন উর্বশীর দিকে। ছেলের চাপা-চাউনি ইন্দ্র খেয়াল করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গন্ধর্ব চিত্রসেনকে বলে দিয়েছেন— ছেলেটাকে উর্বশীর দিকে চেয়ে থাকতে দেখলাম। মনে মনে তাকে পছন্দই নাকি, কে জানে? যা হোক, তুমি উর্বশীকে বলো, যেন সে একবার অর্জুনের ঘরে যায়— সোপতিষ্ঠতু ফাল্গুনম্।

চিত্রসেন অবসর বুঝে উর্বশীর কাছে গিয়ে অর্জুনের সম্বন্ধে বলতে আরম্ভ করলেন। মর্ত্যলোকে অর্জুনের সমান বীর যে আর নেই, তাঁর মতো উদার চরিত্র, তাঁর মতো সৎ, বুদ্ধিমান এবং রূপবান মানুষ যে আর দ্বিতীয় হয় না— এমন সব নানা সুখ্যাতি করে চিত্রসেন আসল কথা পাড়লেন। বললেন— তুমি তো অর্জুনকে দেখলেও। তোমার পরিচিত মানুষ। তা এমন মানুষ স্বর্গে এলেন, তো তিনি স্বর্গের আসল মজাটা না পেয়েই চলে যাবেন, তা তো হয় না। তিনি স্বর্গে আসার ফল লাভ করে যান একটু— স স্বর্গফলমাপ্নুয়াৎ।

চিত্রসেনের কথা শুনে উর্বশী বেশ তৈলোদ্রিক্ত হলেন। মুচকি হেসে তিনি বললেন— অর্জুনের যত গুণের কথা তোমার কাছে শুনলাম, তাতে কোন মেয়ে তাকে না চাইবে বলো? একে তো দেবরাজ বলেছেন, তাতে আবার তুমি যেমন তাঁর গুণপনা বলছ— সেসব শুনেই তো অর্জুনের উপর আমার কামনার উদ্রেক হচ্ছে— তস্য চাহং গুণৌঘেন ফাল্গুনে জাতমন্মথা। উর্বশী চিত্রসেনকে কথা দিয়ে দিলেন— তুমি ভেব না। আমি ঠিক সময়মতো চলে যাব তাঁর কাছে।

গন্ধর্ব চিত্রসেনকে বিদায় দিয়ে উর্বশী ভাল করে স্নান করলেন। অর্জুনকে তিনি ইন্দ্রসভায় দেখেছেন। তাঁর কথা ভাবলেই এখন তাঁর মন কামনায় পীড়িত হচ্ছে— মন্মথেন প্রপীড়িতা। উর্বশী খুব সাজলেন। গলায় সাতনরি হার পরে, গায়ে সুগন্ধ মেখে মনে মনে তিনি এতটাই অর্জুনের কাছে চলে গেলেন যে, তাঁর মনে হল যেন অর্জুন উর্বশীর মহার্ঘ শয্যাতেই এসে পড়েছেন এবং তিনি যেন রমণে প্রবৃত্ত হয়েছেন অর্জুনের সঙ্গে— মনোরথেন সংপ্রাপ্তং রময়ত্যেব হি ফাল্গুনম্।

উর্বশী অর্জুনের ঘরের দিকে চললেন। আকাশে চাঁদের আলো এবং রজনির অন্ধকার— দুই-ই গাঢ় হল। বেণিতে টাটকা ফুলের মালা গুঁজে, স্তনের উপর কুঙ্কুম-চন্দনের অলকা-তিলকা এঁকে, সূক্ষ্মবস্ত্রের স্ফুটাস্ফুট ব্যঞ্জনায় জঘন দেশে ঢেউ তুলে উর্বশী চললেন— সূক্ষ্মবস্ত্রধরং রেজে জঘনং নিরবদ্যবৎ। যাওয়ার সময় কামোদ্রেকের জন্য একটু মদ্যও পান করে নিলেন উর্বশী— সীধুপানেন চাল্পেন। জনহীন স্বর্গপথে চাঁদের জ্যোৎস্নাকে সাথি করে, মিহি সুরে গান করতে করতে উর্বশী যখন চলতে আরম্ভ করলেন, তখন তাঁর সূক্ষ্মবস্ত্রের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তরালেও পীন পয়োধরের উল্লম্ফনটুকু দৃশ্যত রোধ করা গেল না।— গচ্ছন্ত্যা হাররুচিরৌ স্তনৌ তস্যা ববল্গতুঃ।

উর্বশী এসে পড়েছেন অর্জুনের বাড়িতে। দারোয়ান খবর দিল স্বর্গসুন্দরী উর্বশী আপনার সেবায় উপস্থিত। অর্জুন কিন্তু এতটা ভাবেননি। এগিয়ে এসে স্বাগতভাষণ করে ঘরে নিয়ে যাবেন কী, তার আগে উর্বশীর সাজগোজ দেখে অর্জুন চক্ষু মুদে রইলেন। তারপর তাঁর উচ্ছ্বাসে জল ঢেলে দিয়ে বললেন— মা! আপনি অপ্সরাদের মধ্যে প্রধান, আপনাকে প্রণাম। বলুন, কী আদেশ? স্বর্গসুন্দরীর সমস্ত সম্মান ধুলোয় মিশে গেল যেন। অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হল উর্বশীর।

বললেন— কী যা-তা বলছ? ওই যে ইন্দ্রসভায় নাচবার সময় আমার দিকেই ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে ছিলে তুমি— অনিমিষং পার্থ মামেকাং তত্র দৃষ্টবান্— এমনকী তোমার বাবা ইন্দ্র পর্যন্ত সেই বেহায়া চাউনি দেখে গন্ধর্ব চিত্রসেনকে দিয়ে আমায় খবর পাঠালেন যে, তোমার কাছে যেতে হবে আমায়— সেসব কী তা হলে মিথ্যা?

একটা প্রশ্ন এখানে উঠবেই। আপনারা বলতেই পারেন— কোথায় সেই পুরূরবা, অর্জুনের কতকাল আগের পুরুষ, আর কোথায় অর্জুন? এ উর্বশী কি সেই উর্বশী? পুরাতনেরা বলবেন— স্বর্গের অপ্সরা বলে কথা। তাঁদের বয়স বাড়ে না, তাঁরা চিরযৌবনা। আমি তা বলি না। ইতিহাস পুরাণ পড়ে আমি যা বুঝেছি, তাতে স্বর্গ নামের জায়গাটা পৃথিবীর বাইরের কোনও জায়গা নয়। আর ইন্দ্র যে একটা উপাধি মাত্র, দেবতা-মনুষ্য-রাক্ষস যে কেউ যে ক্ষমতা অথবা মহাপুণ্যের ফলে ইন্দ্রত্ব পেতে পারেন, সে উদাহরণও আছে ভূরিভূরি। এই কথাগুলো বলে আমি যেটা বোঝাতে চাই, সেটা হল উর্বশীও একটা উপাধি। স্বর্গের শ্রেষ্ঠতমা সুন্দরী অপ্সরা যিনি, তাঁরই নাম উর্বশী। এক উর্বশী বিদায় নিয়ে চলে যান, তারপর আরও এক সুন্দরী-প্রধানা নির্বাচিত হন উর্বশীর সিংহাসনে। এইরকমটি না হলে স্বর্গের দেবতারাও যেখানে দার্শনিক দৃষ্টিতে জরা-মরণ বর্জিত নন, সেখানে উর্বশী শুধু অপ্সরা বলেই চিরযৌবনা থাকবেন সে কথা ঠিক নয়।

বস্তুত উর্বশী-মেনকারা এক সময় আপন আপন ব্যক্তি নামেই বিরাজ করতেন, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁদের সৌন্দর্য্য বৈদগ্ধ্যের কারণে এই নামগুলো উপাধি বা একটি বিশেষ পদের মর্যাদা লাভ করে। পুরাণে ইতিহাসে অপ্সরারা কেউ একা নন। তাঁদের দল এবং উপদলও ছিল। উর্বশীর সঙ্গে তাঁর দলের অপ্সরারা থাকেন, মেনকার সঙ্গে তাঁর দলের মেয়েরা অথবা রম্ভার সঙ্গে তাঁর দলের সুন্দরীরা। এইরকম এক-একটি অপ্সরা দলের সুন্দরীমুখ্যার উপাধি হত উর্বশী, মেনকা অথবা রম্ভা। কাজেই অর্জুন যে উর্বশীর দিকে চেয়েছিলেন, ইনি কোনওভাবেই পুরূরবার কণ্ঠলগ্না উর্বশী নন। কিন্তু এইরকমই কোনও এক উর্বশী তাঁর বহু পূর্বপুরুষের বক্ষলগ্না হয়ে বিশাল পুরু-বংশের জননী হয়েছিলেন— এই মর্যাদাই হয়তো অর্জুনকে কেমন যেন লজ্জিত করে তুলল।

অতএব উর্বশী যখন সানুরাগে যাচিকার অনুনয়ে বললেন— না অর্জুন, তোমার পিতা কিংবা চিত্রসেনের কথাতেই শুধু নয়, আমিই তোমাকে চেয়েছি। তুমি আমারও আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ, আমি নিজেই তোমার কাছে এসেছি— মমাপ্যেষ মনোরথঃ— তখনও কিন্তু অর্জুন

কানে আঙুল দিলেন। বললেন— আপনি যা বললেন, আমার সে কথা না শুনলেই ভাল হত— দুঃশ্রুতং মেঽস্তু সুভগে। সম্মানের প্রশ্নে আপনি আমার কাছে জননী কুন্তীর মতো, অথবা ইন্দ্রপত্নী শচীর মতো। আমি যে আপনার দিকে তাকিয়ে ছিলাম তার কারণ আমার বিস্ময়। ভাবছিলাম, এই উর্বশী আমাদের পুরুবংশের জননী! উর্বশী এই মাতৃ সম্বোধনে মোটেই সুখী হলেন না। বললেন— দেখো, আমরা হলাম গিয়ে অপ্সরা। আমাদের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই যে, আমরা কুলবধূদের মতো একটি স্বামী নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেব— অনাবৃতাশ্চ সর্বা স্মঃ— আমরা সবার কাছেই মুক্ত। তোমার ওই পুরুবংশের কত পুরুষ, এমনকী তাঁদের পুত্র-প্রপৌত্ররা পর্যন্ত— যাঁরাই আপন পুণ্যবলে এই স্বর্গলোকে এসেছেন, তাঁরাই আমাদের সঙ্গে রমণসুখ অনুভব করে গেছেন, কেউ বাদ যাননি— তপসা রময়ন্ত্যস্মান্ ন চ তেষাং ব্যতিক্রমঃ। আর এতসব তুমি যদি নাও বোঝো, তা হলে শেষ কথাটা বলি শোনো— তোমাকে দেখার পর থেকে কামনায় শরীর জ্বলছে আমার, আমি তোমাকে চাইছি, অতএব তুমিও আমাকে চাইবে, এটাই কথা— এমন করে চাইলে তুমি কিছুতেই ধর্মত আমাকে ছেড়ে যেতে পারো না— তৎ প্রসীদ ন মামার্তাং ন বিসর্জয়িতুমর্হসি।

অর্জুন বললেন— এবার আমার অন্তরের সত্য কথাটাও শুনুন। আমি এই স্বর্গের দেব-দেবীদের শপথ নিয়ে আবারও বলছি— আমার কাছে আমার মা কুন্তী-মাদ্রী যেমন সম্মানিত, যেমন সম্মানিত ইন্দ্রপত্নী শচীদেবী, আপনিও আমার কাছে তেমনই মায়ের মতো, এমনকী তার চেয়েও বেশি, কেননা আপনি আমার এই বংশেরই আদি জননী— তথা চ বংশজননী ত্বং হি মেঽদ্য গরীয়সী। আপনার সৌন্দর্যের কোনও তুলনা নেই, আপনি বরবর্ণিনী, কিন্তু তবুও আপনি চলে যান এখান থেকে, আমি মাথা নুইয়ে চরণে পড়ছি আপনার। আমি আমার এই দৃষ্টি পালটাতে পারব না। আপনি সত্যিই আমার পূজনীয়া মায়ের মতো, আমি আশা করব— আপনিও আমাকে পুত্রের মতো রক্ষা করবেন— ত্বং হি মে মাতৃবৎ পূজ্যা রক্ষ্যোঽহং মাতৃবত্ ত্বয়া।

কামার্তা এবং স্বয়মাগতা রমণীর সকাম নিবেদনের মধ্যে এমন সম্পর্কশুদ্ধির গঙ্গাজল ঢেলে দিলে তার রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক। স্বর্গের অধুনাতনী সুন্দরীতমারও রাগ হল। উর্বশী বললেন— তোমার পিতা চেয়েছিলেন— আমি তোমার কাছে আসি, তাই তোমার ঘরে এসেছিলাম আমি; আর আমিও তোমাকে দেখে মুগ্ধা কামিনী হয়েছিলাম। কিন্তু তুমি এমনটা দেখেও যেভাবে অনভিনন্দনে মুখ ফিরিয়ে নিলে— যস্মান্মাং নাভিনন্দেথাঃ স্বয়ঞ্চ গৃহমাগতাম্— তাই আমিও তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি— তুমি মেয়েদের মধ্যে বাস করবে নপুংসকের মতো, কেউ তোমাকে আর পুরুষ বলবে না— অপুমানিতি বিখ্যাতঃ ষণ্ডবদ্ বিচরিষ্যসি।

খুব রাগ হল উর্বশীর। উষ্ণ নিঃশ্বাসে, ক্রোধ-স্ফুরিত অধরে তিনি বেরিয়ে গেলেন অর্জুনের ঘর থেকে। অভিশাপ শুনে ধনুর্ধর মহাবীর অর্জুনেরও ভাল লাগল না— রাত্রে ভাল করে ঘুমও এল না তাঁর। পরের দিন সকাল হতেই গন্ধর্ব-বন্ধু চিত্রসেনের সঙ্গে দেখা করে আদ্যোপান্ত বললেন সব কিছু। সব শুনে গন্ধর্ব চিত্রসেন বললেন— শাপে বর হয়েছে তোমার। গন্ধর্ব চিত্রসেন প্রথমে অর্জুনের প্রশংসা করে বললেন— ধন্যি তোমার মা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যিনি এমন সুপুত্রের জননী। স্বর্গসুন্দরী উর্বশী এসেছিলেন তোমার কাছে, অথচ তুমি ধৈর্য দেখিয়েছ ঋষিদের মতো। আর উর্বশী যে শাপ দিয়েছেন, তাতে তোমার ভালই হবে। তোমাদের বনবাসের কাল শেষ হলে তোমাদের অজ্ঞাতবাসে যেতে হবে, তখনই তুমি তোমার ওই অভিশাপটা ক্ষইয়ে দেবে। তুমি নপুংসকের ভাবে থাকবে, আর নাচ-গান করে দিন কাটিয়ে দেবে মেয়েদের মধ্যে— তেন নর্তনবেশেন অপুংস্ত্বেন তথৈব চ। অতএব চিন্তা কোরো না, উর্বশীর এই অভিশাপ তোমার কাছে আসবে সময়মতো— অর্থকৃত্তাত সাধকশ্চ ভবিষ্যতি।

সুরসুন্দরী উর্বশীর জীবন-চিত্র বর্ণনায় তাঁর রূপ-বৈদগ্ধ্যের যে বিশাল চমৎকার মহাভারত-পুরাণে ফুটে উঠেছে, সেটা একটা চরম বৈশিষ্ট্য বটে, কিন্তু অপ্সরা-সুন্দরীদের এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের চেয়েও উর্বশী বোধহয় এইখানেই একান্তভাবে পৃথক যে, বৈদিক ঋকমন্ত্র থেকে মহাভারত-পুরাণ পর্যন্ত তাঁর সম্ভোগ-বিরহের সুর চিরন্তনী এক প্রেমিকা-সত্তার বিস্তার ঘটায় এবং অবশেষে বিশ্রান্তি লাভ করে জননীত্বের পরিসরে। সে পরিসর এমনই উদার-বিশদ এবং মহান যে, বহু অতীত বৎসরের পরেও মহাবীর অর্জুন তাঁর মাথা নত করেছেন শুধু এক নাম-প্রতীকের কাছে। তিনি বলেছিলেন— সেই নৃত্যসভার আসরে আপনার দিকে উৎফুল্ল নয়নে তাকিয়ে দেখেছি আর ভেবেছি— এই তো সেই পরম্পরাবাহিতা উর্বশী, যিনি এই প্রসিদ্ধ পৌরব-বংশের আদিজননী, আপনি আমার মাতৃসমা গুরু, যেমন আমার জননী কুন্তী, যেমন ইন্দ্রাণী শচী আমার মা, তেমনই আপনিও; অথবা তার চেয়েও অনেক বেশি— উর্বশী আমাদের বংশ-বিবর্ধিনী আদিজননী—

গুরোর্গুরুতরা মে ত্বং মম বংশবিবর্ধিনী।
ইয়ং পৌরববংশস্য জননী বিদিতেতি হ ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শকুন্তলা

কালিদাস যে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকখানি লিখেছেন, তার বিষয়বস্তু যদি দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেমকাহিনি না হয়ে অন্য কিছু হত, তা হলেও অসুবিধে ছিল না, কেননা যে শিল্পবোধে মেঘদূতের মতো অসাধারণ কাব্যের জন্ম হয়েছে, যে শিল্পবোধে রঘুবংশ মহাকাব্যের জন্ম হয়েছে, সেই শিল্পবোধের ছোঁয়ায় যে কোনও বিষয়ের কাব্য-নাটক— উগ্রং প্রসাদি গহনং বিকৃতঞ্চ বস্তু— রসসিক্ত হয়ে উঠতে পারত। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কাহিনি আকরিক অবস্থায় কালিদাস যেমনটি পেয়েছিলেন, তাকে অবিকৃত রেখে একখানা নাটক তৈরি হলে কী আর এমন অসাধারণ হত। সবচেয়ে বড় কথা, নাটকের মুখ্য চরিত্রগুলির মানসিক গঠন যদি সেই আকরিক অবস্থার মতোই হত, তা হলে সারা অভিজ্ঞান শকুন্তলম জুড়ে আমরা নায়ক নায়িকার তুমুল ঝগড়াঝাটি ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেতাম না।

আপনারা হয়তো জানেন রবীন্দ্রনাথ যে 'শ্যামা' নামে নৃত্যনাটিকাটি লিখেছেন, সেই নৃত্যনাটিকার শ্যামা নায়িকা কিন্তু আদতে এক খুনি মহিলা, যে গণিকাও বটে, আপন সুখ ও সুবিধার জন্য তারই ঘরে আসা পুরুষকে খুন করতে তার বাধে না। অথচ রবীন্দ্রনাথ তাকে কীই না বানিয়েছেন। নাটিকার শেষে আত্মসমর্পিতা শ্যামার জন্য আমাদের মায়া হয়। একইভাবে কালিদাসও তাঁর শকুন্তলাকে তার মৌল আকরিক অবস্থা থেকে একেবারে যথার্থ নায়িকাটি করে তুলেছেন। মণিকার যেমন অঙ্গার কলুষিত প্রস্তর খণ্ডটিকে অতি যত্নে আলোক-বিচ্ছুরণক্ষম উজ্জ্বল হীরক খণ্ডে পরিণত করেন, কালিদাসও তেমনি পুরাণ-ইতিহাসের আকর থেকে গ্রাম্যতা-দোষ-দুষ্ট শকুন্তলাকে তুলে এনে বৈদগ্ধ্যে, ব্যঞ্জনায়, রসে, ভাবে উদ্ভাসিত করে তাঁকে একেবারে নাটক রচনার প্রোজ্জ্বল কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বস্তুত, দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার কাহিনিটি এতই প্রাচীন যে, প্রায় সবগুলি মুখ্য পুরাণেই তাঁদের প্রণয়কাহিনি পাওয়া যাবে। পাওয়া যাবে তাঁদের আপতিত দুর্ভাগ্যের পর পুনর্মিলন কাহিনিও। কালিদাস অবশ্য পঞ্চলক্ষণ পুরাণের রাজবংশ বর্ণনার সংক্ষিপ্তসার থেকে তাঁর নাটকের কাহিনি সংগ্রহ করেননি। নাটক রচনায় তাঁর প্রধান উপজীব্য ছিল মহাভারতের অন্তর্গত শকুন্তলা-দুষ্মন্তের কাহিনি। কিন্তু পুরাণগুলির আলাপ এবং ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে, দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কাহিনি মহাভারতের থেকেও প্রাচীন। বিশেষত দুষ্মন্ত যে শকুন্তলাকে বিয়ে করার পর এক সময় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলেন, এই ঘটনা প্রসঙ্গে পুরাণগুলিই এমন দু-একটি প্রাচীন শ্লোক উল্লেখ করেছে যে, সেই শ্লোক বা শ্লোকগুলি সমস্ত পুরাণগুলিতেই এক রকম। পুরাণকারেরা বলেছেন যে, এই শ্লোকগুলি নাকি দেবতারা গান করেন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবৈঃ শ্লোকো গীয়তে। লক্ষণীয় বিষয় হল, পুরাণগুলির মধ্যে যখনই এমন উল্লেখ থাকে অর্থাৎ যেমন 'দেবতারা এই শ্লোকটি গান করেন' অথবা 'এখানে গাথা আছে', তখনই বুঝতে হবে যে, ওগুলি হল— 'allusions to matters that are handed down from very ancient times, long before the original Purana was compiled. (F. E. Pargiter.)

রাজবংশের পরম্পরার মধ্যে যেখানে একের পর এক রাজনাম কীর্তন করা হচ্ছে, সেখানে যেই দুষ্মন্তের পুত্র ভরতের নাম এল, সঙ্গে সঙ্গে পুরাণকারেরা বলে উঠবেন, ভূ-ভারতের নাম ভরত কেন হল, সে সম্বন্ধে দৈববাণী শোনা যায়। দুষ্মন্ত যখন শকুন্তলার সঙ্গে আপন বিবাহের কথা অস্বীকার করেন তখনই নাকি আকাশ থেকে এই দৈববাণী শোনা গিয়েছিল। দেবতারা দুষ্মন্তের উদ্দেশে বলেছিলেন, মাতৃগর্ভ, সে তো চর্মপাত্রের আধারমাত্র, পুত্রের উপর পিতারই অধিকার! পুত্র যার ঔরসজাত, সে তার স্বরূপ। দুষ্মন্ত! তুমি পুত্রের ভরণ করো, শকুন্তলাকে শুধু শুধু অপমান কোরো না— ভরস্ব পুত্রং দুষ্মন্ত মাবসংস্থাঃ শকুন্তলাম্। দেবতারা আরও বললেন, হে নরদেব! ঔরসজাত পুত্র পিতাকে যমগৃহ থেকে উদ্ধার করে। তুমিই এই পুত্রের কারণ, তুমিই শকুন্তলার গর্ভাধান করেছ। শকুন্তলা ঠিক বলেছে— তঞ্চাসা ধাতা গর্ভস্য সত্যমাহ শকুন্তলা।

মাত্র এই দুটি শ্লোক থেকেই শকুন্তলা-দুষ্মন্তের কাহিনির পূর্বাপর বৃত্তান্ত এক ঝলকে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এই শ্লোকদুটি প্রমাণ করে যে, শকুন্তলা-দুষ্মন্তের কাহিনি রীতিমতো লোকস্তরে প্রচলিত ছিল। দুষ্মন্তের দ্বারা বিবাহিতা শকুন্তলার প্রত্যাখানের ঘটনা এই শ্লোকদুটিতে যেমন পরিষ্কার, তেমনি পরিষ্কার যে, রাজা দুষ্মন্ত কোনও কারণে তাঁর আপন শিশুপুত্রকে অস্বীকার করছেন এবং অন্যেরা তাঁকে এ ব্যাপারে সাবধান হতে বলছে। একেবারে লোকস্তরে প্রচলিত এই শ্লোকদুটিকে পুরাণে কথকঠাকুর সূত-মাগধেরা প্রত্যেকটি মুখ্য পুরাণের মধ্যে সন্নিবেশ করেছেন আনুপূর্বিক ঘটনা কিছুটি না বলে। মৎস্যপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, হরিবংশ প্রত্যেকটি জায়গায় এই শ্লোকদুটি অবিকৃত এবং প্রসঙ্গও সেই এক, ভরতের নাম ভরত কেন হল? দেবতারা আকাশ থেকে বলেছিলেন— 'ভরস্ব পুত্রং দুষ্মন্ত'— এই 'ভরস্ব'-ক্রিয়াপদের প্রথম দুটি বর্ণ 'ভর' এবং দুষ্মন্তের শেষ বর্ণ 'ত', এই তিনটি বর্ণ নিয়েই ভরত।

আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি এই শ্লোকদুটিই দুষ্মন্ত শকুন্তলার কাহিনি এবং তাঁদের পুত্র নামের বীজরূপ। স্বয়ং মহাভারতকারও এই শ্লোকদুটিই মাথায় রেখেছিলেন, কেননা, তিনিও এই শ্লোকদুটি উদ্ধার করতে বাধ্য হয়েছেন। তবে তাঁর বিশেষত্ব হল তিনি এই শ্লোকদুটির সমস্ত ইঙ্গিতগুলি কাজে লাগিয়ে, পূর্বাপর বৃত্তান্ত সাজিয়ে গুছিয়ে নিখুঁত গৃহিণীপনায় পাঠকের কাছে একেবারে উপাখ্যানের আকারে উপস্থাপিত করেছেন এবং তা থেকে সবচেয়ে উপকৃত হয়েছেন কবি কালিদাস।

তবে হ্যাঁ, মহাভারতের কাছে কালিদাস যত ঋণীই হোন, মহাভারতের কাহিনির সঙ্গে কালিদাসের নাট্যকল্পনার আকাশ পাতাল তফাত আছে। নাটকের নায়ক-নায়িকার স্বভাব এবং কথাবার্তার ভঙ্গিও মহাভারতের জগৎ থেকে একেবারে আলাদা। উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে কানন ঘেরা বাড়িতে বসে কালিদাস যে কথা, যে ভাব, যে স্ত্রী-আচার কল্পনাও করতে

পারেন না, মহাভারতের কবি কিন্তু তা অনায়াসে পারেন কারণ ব্যাসের হৃদয় যে সর্বাশ্লেষী। সেখানে সবাই স্ব-স্বরূপে দাঁড়িয়ে আছে। লজ্জাহীন আবরণহীন।

কালিদাস নাটকীয় মুহূর্তে ধনুকবাণ হাতে, রথে-চড়া দুষ্মন্তের প্রবেশ সূচনা করে নাটক আরম্ভ করলেন, আর মৃগয়া বিহারী দুষ্মন্ত একা একা হরিণের পিছন পিছন ছুটতে ছুটতে কণ্বমুনির আশ্রমের সীমানায় এসে পড়লেন। কিন্তু মজা হল, এই বনপথে রথ নিয়ে ছোটার জন্য মহাভারতের কবিকে জমি তৈরি করতে হয়েছে প্রায় দুই অধ্যায় ধরে। মহাভারতের দুষ্মন্ত যেভাবে হাজারও সেনাবাহিনী নিয়ে মৃগয়ার তোড়জোড় করেছেন, তার একটা উদ্যোগপর্ব আছে এবং তাকে বাদ দিলে চলে না। কালিদাস তো দুষ্মন্তকে একাকী শকুন্তলার কাছে পাঠানোর জন্য নাটকের প্রথম থেকেই একটি হরিণকে একেবারে প্রাণভয়ে ভীত করে ছুটিয়ে দিয়েছেন। ফলত দুষ্মন্তও সৈন্যসামন্ত ছেড়ে একা হরিণের পিছু পিছু ধাওয়া করার সুযোগ পেয়েছেন এবং এর শেষ পদক্ষেপ ছিল আশ্রমের মধ্যে নিভৃত রহস্যালাপে মেতে ওঠা শকুন্তলার দেখা পাওয়া।

কিন্তু যে মহাকবি ভারতবর্ষের বিশাল রঙ্গমঞ্চে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটিয়েছেন, তাঁর ভাবটা সবসময়ই এক বিশাল একান্নবর্তী পরিবারের ঠাকুরদাদার মতো। শূন্যতা, নির্জনতা, দুঁহুঁ-দোঁহা, কানাকানি, চোখ-চাওয়া এ সব তাঁর পোষায় না। তাঁর ভাবটা, ওরে কে আছিস? রাজা বেরোচ্ছেন, পাত্র-মিত্র সব কোথায় গেল! এমনি ধারা এক হাঁক-ডাকের ব্যাপার। ফলে মহাভারতের দুষ্মন্ত যখন মৃগয়ায় বেরোচ্ছেন, তখন অস্ত্র, যোদ্ধা, হস্তী, অশ্ব, পদাতিক, রথী, শঙ্খনাদ এবং সৈন্যদের 'লেফট-রাইট' করার কিলকিলা শব্দ যেন রাজপুরী মুখর করে তুলল। কী না, রাজা মৃগয়ায় বেরোচ্ছেন। 'আশ্রম-ললামভূতা' শকুন্তলার সঙ্গে মহারাজের দেখা হবে। এই প্রস্তুতিতে মহাভারতের কবির কোনও দায় নেই। তাঁর কাছে বড় কথা হল মহারাজ মৃগয়ায় বেরোচ্ছেন। দুষ্মন্তকে মৃগয়া-বিদায় দেওয়ার জন্য পুরনারীরা সব বাড়ির ছাদে ভিড় করেছিল। মহারাজকে দেখে তাদের মনে হয়েছিল বজ্র হাতে পুরন্দর যেন— পশ্যন্তঃ স্ত্রীগণাস্তত্র বজ্রপাণিং স্ম মেনিরে। সত্যি বলতে কী, এই যে দুষ্মন্তকে দেখে দেবরাজ ইন্দ্রের কথা মনে আসছিল, ঠিক এইখানেই মিথলজিস্টরা টিপ্পনী কেটে বলবেন— ইন্দ্র মানেই তিনি দেবতা হিসেবে বড় কাম-কেলি-প্রবণ; এমনকী পরনারী ধর্ষণ অথবা পরবধূবিলাসের মতো ঘটনা তাঁর 'এপিথেট'-এর মধ্যে পড়ে বলে 'অহল্যাজার' নামে একটি সামান্য বহুব্রীহি সমাসও অন্যপদার্থ-প্রাধান্যে ইন্দ্রকে বুঝিয়ে দেয়। মহাভারতের কবি সোজাসুজি রাজার চরিত্র বর্ণনা করবেন না, কিন্তু মেয়েরা তাঁকে দেখে ইন্দ্র বলে ভাবছে মানেই, এই বহুবল্লভ দুষ্মন্ত রাজা তাঁদের কাছে কম আকর্ষণীয় নন। রাজাকে ছাদের ওপর থেকে দেখতে পেয়েই সপ্রেমে তারা কানাকানি করছিল মহারাজের বীরত্বের কথা— ইতি বাচো ব্রুবন্ত্যস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রেম্না নরাধিপম্। রাজদর্শনের সন্তোষে তাদের সপ্রেম ফুল ছোড়াছুড়ি রাজার মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে গড়িয়ে পড়ছিল মাটিতে।

প্রশস্ত রাজপথের মধ্যে দুষ্মন্তকে দেখার জন্য পুরনারীদের এই মনমথ ভাব আর আকুতিকেই মহাভারতের কবি কাজে লাগিয়েছেন। দেখিয়েছেন— দুষ্মন্ত কত কাম্য, রমণীর কাছে কতখানি কাম্য বরপুরুষ তিনি। এরপরেই আরম্ভ হল মৃগয়ার দৃশ্য। তাতে কত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে বাঘ, সিংহ, হাতি ঘোড়া মারা পড়ল তার ইয়ত্তা নেই। দুষ্মন্ত যেন সারা বনকে একেবারে ঘাঁটিয়ে তুললেন— লোড্যমানং মহারণ্যম্। বনচরদের খাওয়াদাওয়া জুটল প্রচুর। সুচতুর কালিদাস মৃগয়ার এই সমস্ত পরিবেশটুকু দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমে লোভী বিদূষকের মুখে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু কালিদাসের পরিশীলিত ধীরোদাত্ত নায়কের ক্ষুধা-তৃষ্ণার বালাই নেই। মহাভারতে রাজা দুষ্মন্ত এক বনে শিকার শেষ করে আর এক বনে যাচ্ছেন, কিন্তু বেলা যত বাড়ছে, রাজার ক্ষুধা পিপাসাও তত বাড়ছে। দু'এক জায়গায় রাজা শিকার ধরতে গিয়ে বিফলও হলেন। অবশ্য যে বনে রাজা কণ্বমুনির আশ্রম দেখতে পাবেন, যে আশ্রমে তিনি শকুন্তলাকে দেখতে পাবেন, সেখানে প্রবেশের পূর্বেই কিন্তু আবহাওয়া পালটে গেল। মহাকাব্যের 'ফর্মুলা' মেনে সে বনে শীতল ছায়া, শীতল হাওয়া পাওয়া গেল। ফুলের বাহারে সে বন দৃষ্টিরম্য, সুরভিতে ম ম করছে। যাঁরা ভট্টি কাব্যের শরদবর্ণনায়— এমন কোনও জলাধার ছিল না যেখানে পদ্ম ফোটেনি, এমন পদ্মই ছিল না, যাতে ভ্রমর বসেনি, এমন কোনও ভ্রমর ছিল না যে নাকি গুনগুন করছিল না— এমনই ধারাবর্ণনায় মুগ্ধ হন, তাঁরা জানবেন ভট্টি মহাশয় তাঁর রসদ পেয়েছেন মহাভারতে। এইমাত্র যেখানে দুষ্মন্ত এসে পৌঁছলেন, সে বনে এমন কোনও গাছই ছিল না, যাতে ফুল ফোটেনি— না পুষ্পঃ পাদপঃ কশ্চিৎ। এমন ফুল ফলও ছিল না, যেখানে অনুপস্থিত মধুকরের গুনগুন— ষটপদৈর্নাপ্যপাকীর্ণঃ ন তস্মিন্ বৈ কাননেঽভবৎ।

দেখুন, মহাকাব্যের নায়কের সঙ্গে মহাকাব্যের নায়িকার দেখা হবে, অথচ তার সমারোহভার কিছুই থাকবে না, তা তো হয় না। কাজেই মনোহর প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যরাশি অনুভব করতে করতে রাজা পৌঁছলেন মালিনীর তীর ঘেঁষা শান্ত আশ্রমপদে। রাজার পাত্রমিত্রের ধনুকের টঙ্কার সব থেমে গেল, শোনা গেল বিরামবিহীন ওঙ্কার। কালিদাসের অপূর্ব নাটকীয়তায় কোনও হরিণ এখানে প্রাণভয়ে ছুটতে ছুটতে পেছনে তাড়া করা রাজাকে আশ্রমে প্রবেশ করায়নি। আপন গতিপথেই রাজা আশ্রমে প্রবেশ করেছেন। কালিদাস তো নিজের নায়কটিকে তিন যুবতী রমণীর সামনে একা ফেলে দেওয়ার জন্য তাকে পরম আশ্রম ভক্ত করে তুলেছেন। সেই নগর-নায়ক জানে যে, অতি বিনীত বেশে তপোবনে প্রবেশ করতে হয়। এমনকী তার জন্য রাজার ধরাচূড়া, অস্ত্রশস্ত্র সব যেমন ত্যাগ করতে হয়, তেমনই শেষ সাথী সারথিটিকেও ত্যাগ করে আশ্রমের পথে প্রবেশ করতে হয়। কিন্তু মহাভারতের দুষ্মন্ত অত কৃপণ নন। তাঁর অমাত্য, পারিষদবর্গ এমনকী পুরোহিতটি পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আছেন। মালিনী নদীর তীরভূমিতে কণ্বের আশ্রম, সে যেন ছবিতে আঁকা। বিমোহিত রাজা সবাইকে নিয়ে প্রবেশ করলেন শান্ত আশ্রমপদে। শুধু তাঁর চতুরঙ্গ বাহিনী বাঁধা রইল বনদ্বারে। ব্যস, এইটুকুতেই তাঁর বিনয় ভাব শেষ হয়েছে। মহাভারতের তপোবনে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই যে কণ্বমুনির আশ্রম দেখা যাবে, তা মোটেই নয়। কালিদাসের বৈখানস তপস্বী মানুষটির মতো কেউ বিত্রস্ত হরিণটিকে বাঁচিয়েই রাজাকে বিশ্বস্তভাবে পাঠিয়ে দেয়নি শকুন্তলার কাছে। এখানে কণ্বমুনির আশ্রমের অনেক আগেই কেবল শোনা যাচ্ছে ঋগ্বেদের দেবতাহ্বান-ধ্বনি, সামবেদের গান, যজুর্বেদীদের যজ্ঞক্রিয়া— অগ্নয়ে স্বাহা, ইন্দ্রায় বৌষট্, অথর্ববেদীদের শান্তি মন্ত্র, অভিচারিক মন্ত্র, সামবেদী মুনিঋষিদের 'শব্দছন্দোনিরুক্তি'তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমস্ত বন একেবারে মুখরিত। রাজা দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে পৌঁছলেন। এইবার এতক্ষণে তিনি অমাত্য পারিষদবর্গকেও ছেড়ে দিলেন ঋষির সঙ্গে দেখা করার জন্য। এ কথা তো অবশ্যই ঠিক যে, শকুন্তলার সঙ্গে প্রেম করতে হলে তাঁকে একা ছেড়ে দিতেই হবে দুষ্মন্তের হাতে। তবে কালিদাস এ কাজ যত তাড়াতাড়ি আরম্ভ করেছিলেন, মহাভারতের কবি তা করেননি।

সবাইকে ছেড়ে আশ্রমে ঢুকে মহাভারতের দুষ্মন্ত কণ্বকে দেখতে পেলেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি কালিদাসের দুষ্মন্তের মতো দুষ্টুমি করেননি। লতাজালে অন্তরিত হয়ে তিন যুবতী কন্যার বিশ্রম্ভালাপ শুনতে শুনতে তাড়িয়ে তাড়িয়ে শকুন্তলার রূপ উপভোগ করা— কালিদাসের দেওয়া এই সুযোগ ব্যাসের দুষ্মন্তের হয়নি। ব্যাপারটা এখানে অনেক সরল এবং সহজ। কণ্বমুনির আশ্রমে ঢুকে কাউকে না দেখে দুষ্মন্ত একেবারে বন মাতিয়ে তুললেন। হেঁকে বললেন, কে কোথায় আছ গো, সাড়া দাও। তার গলা শুনে শান্ত আশ্রমপদ যেন সচকিত হয়ে উঠল— উবাচ ক ইহেত্যুচ্চৈর্বনং সন্নাদয়ন্নিব।

কণ্বমুনির অনুপস্থিতি পূরণ করতে পর্ণকুটির থেকে বেরিয়ে এল লক্ষ্মীর মতো সুন্দরী এক মেয়ে— কন্যা শ্রীরিব রূপিণী। তাপসীর বেশ তাঁর পরিধানে। শক্তিধর রাজার চেহারা এবং ঐশ্বর্যের যে ছায়া পড়েছিল সেটি তার মনে দ্রুত এক প্রতিক্রিয়া তৈরি করল। কিন্তু ব্যাসের শকুন্তলা তো আর কালিদাসের শকুন্তলার মতো সারা প্রথম অঙ্ক জুড়ে কথা-না-কওয়া শৃঙ্গার-লজ্জায়-নাটানো সব্রীড়া যুবতীটি নন। বিশেষত উত্তম নাট্যকারের বদান্যতায় পাওয়া দুটি সপ্রতিভ সখীও তাঁর নেই। আকাশে উড়িয়ে দেওয়া দুষ্মন্তের শূন্য শব্দ শুনেই ব্যাসের শকুন্তলা সহজভাবে বেরিয়ে এসে দুষ্মন্তকে বসার আসন দিলেন, পা ধোয়ার জল দিলেন, তারপর জড়তাহীন গলায় স্বাগত কুশল প্রশ্ন— হে বন্ধু আছ তো ভাল— প্রপচ্ছানাময়ং রাজন্ কুশলঞ্চ নরাধিপম্। সহজ বেশে, মধুর হেসে— ঠিক হেসে নয়, যেন হাসছেন এমনিভাবে— স্ময়মানেব— শকুন্তলা প্রশ্ন করলেন, তা রাজার কাজটা কী, বলুন কী আমাদের করতে হবে?

কালিদাসের দুষ্মন্ত আগেই জানেন যে, শকুন্তলার পিতা কণ্ব আশ্রমে নেই। আগেই তপস্বীদের কাছে খবর পেয়ে গিয়েছেন যে, শকুন্তলার প্রতিকূল ভাগ্য প্রশমনের জন্য মহর্ষি কণ্ব সোমতীর্থে গিয়েছেন। কালিদাস তাঁর নায়ক নায়িকাকে শূন্য আশ্রমপদে মিলিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন অনেকক্ষণ। পিতা কণ্বকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন অনেক দূরে— সোমতীর্থে। কিন্তু যুবতী নায়িকার প্রতি ব্যাসের এই প্রশ্রয় নেই। তাঁর কণ্বমুনিও আশ্রম ছেড়ে বড় বেশি নড়াচড়া করেন না। সেই অনুপস্থিতির মুহূর্তে শুধু তিনি ফল কুড়োতে গিয়েছিলেন— ফলান্যাহর্তুম্ আশ্রমাৎ। ব্যাসের শকুন্তলাকে তাই অবস্থা বুঝে অনেক বেশি স্মার্ট হতে হয়েছে। তিনি বলেছেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, এই তিনি এলেন বলে— মুহূর্তং সম্প্রতিক্ষস্ব দ্রষ্টাস্যেনমুপাগতম্।

ব্যাসের শকুন্তলার কোনও সখী নেই, পিতা কণ্ব দূরে যান না। অতএব চমৎকার অরণ্য পরিবেশে ক্ষ্যাপা হাওয়ার মধ্যে বরারোহা আগুনপানা সুন্দরীর কাছে রাজাকে প্রণয় নিবেদন করতে হয়েছে তাড়াতাড়ি। অবশ্য তার আরও কারণ ছিল এবং প্রথম কারণ বোধহয় তাপসী শকুন্তলার সপ্রতিভতা। যে মুহূর্তে রাজা শকুন্তলাকে কণ্ব মুনির কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেই মুহূর্তে শকুন্তলার দুটি গুণ তাঁকে স্পর্শ করেছে রীতিমতো। কী মধুর কথা বলে এই মেয়ে—কন্যাং মধুর ভাষিণীম্। আর কথা যেমন বলে, দেখতেও তেমনি একেবারে নিখুঁত— 'অনবদ্যাঙ্গী'। শকুন্তলার রূপ একেবারে ফেটে পড়ছিল, নিরন্তর ব্রহ্মচর্যে কঠোর দমনে সে রূপে মৃদুতা আনার চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোনও লাভ হয়নি। আসলে সংযমের স্বভাবই বোধ হয় এই। আজকের দিনেও রমণী রূপের আদর্শ বলে চিহ্নিত হন যাঁরা, যাঁদের শরীরে যৌনতার অভিজ্ঞান খোদিতবৎ বলে মনে হয়— নিশ্চিত জানবেন— তাঁদের তপস্যা এবং সংযমের অন্ত নেই। খাদ্যের কৃচ্ছ্রতা থেকে দৈহিক কৃচ্ছ্রতা এতটাই তাঁদের পালন করতে হয় যে, সেই শম-দমের অভিব্যক্তি স্ফুট হয়ে ওঠে স্তন-জঘণে, কটি-নিতম্বে। আশ্রমবাসিনী শকুন্তলা হয়তো লোকচক্ষুতে দর্শনীয় হয়ে ওঠার জন্য সচেতনভাবে কোনও কৃচ্ছ্রসাধনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাননি। কিন্তু আশ্রমবাসিনীর জীবনে ব্রত-উপবাস, পরিশ্রম এবং কৃচ্ছ্রসাধন এতটাই স্বাভাবিক যে, সেই স্বাভাবিক কৃচ্ছ্রতাতেই শকুন্তলার রূপ এবং যৌবন রাজার কাছে মোহময় হয়ে উঠেছিল— বিভ্রাজমানা বপুসা তপসা চ দমেন চ। কালিদাস যে শকুন্তলার বল্কলোদ্ভেদী যৌবন নিয়ে প্রিয়সখী প্রিয়ংবদার মুখে চটুলতার প্রকাশ করেছেন তার মূল উপাদান বোধহয় এখানেই। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে যৌবন দমিত হলেও শকুন্তলার অপার রূপরাশি দেখে যথেষ্ট আলোড়িত হয়েছেন দুষ্মন্ত। কিন্তু রাজাকে একবার লৌকিকতার খাতিরে জানতে হল শকুন্তলাকে। কার মেয়ে? কেনই বা এই নির্জন বনে তাঁর বাস? অবশ্য এ প্রশ্নের সঙ্গে রাজা প্রাসঙ্গিক কথাটি স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়ে দিয়েছেন— তোমাকে দেখেই ভুলেছি আমি, আমার মন বাঁধা পড়েছে তোমার কাছে— দর্শনাদেব হি শুভে ত্বয়া মেহপহৃতং মনঃ।

আগেই বলেছি ব্যাসের শকুন্তলা সখীসহায়হীন বলেই বেশি 'স্মার্ট' অতএব একটুও লজ্জা না করে সোজাসুজি আপন পিতামাতা বিশ্বামিত্র-মেনকার বিলাস রহস্য, কেলি-কলা বৃত্তান্ত রাজাকে সবিস্তারে জানিয়েছেন। কালিদাসের বিদগ্ধা সখী প্রিয়ম্বদা এই প্রসঙ্গ একটু তুলেই অর্ধোক্তে লজ্জায় মাথা নিচু করেছিলেন, অভিজাত বৃত্তি রাজাও সসঙ্কোচে বলেছিলেন, থাক থাক। সব বুঝেছি, আর বলতে হবে না। মালিনীর তীরে শিশু শকুন্তলার জন্মের পর শকুন্ত পক্ষীরা যে তাঁকে রক্ষা করেছিল, সে প্রসঙ্গ কালিদাস তোলেননি। কিংবা সবিস্তারে তোলেননি সেইসব কথাও, যেখানে মেনকার বিলোভনে ধরা পড়েছেন কবি বিশ্বামিত্র। কালিদাস কলমের এক আঁচড়ে শুধু প্রিয়ম্বদার মুখে মেনকার 'উন্মাদয়িতৃ' রূপের কথা তুলতেই ব্যঞ্জনা-বৃদ্ধ রাজা তাঁকে থামিয়ে দিয়েছেন। আর শকুন্তলা! তিনি তখন কাছে পিঠে কোথাও নেই। কিন্তু ব্যাসের শকুন্তলার কোনও জড়তা নেই। বসন্তের হাওয়ায় এলোমেলো চুলে, উতলা আঁচলে মেনকা কেমন করে ভুলিয়েছিলেন বিশ্বামিত্রকে সে কথা বলতে ব্যাসের নায়িকার একটুও বাধে না। শকুন্তলা বললেন, শুনুন তা হলে আমি কেমন করে মহর্ষি কণ্বের মেয়ে হয়ে গেলাম।

শকুন্তলা বলে চললেন, তপস্যায় বসে ছিলেন বিশ্বামিত্র। তাঁর তীব্র তপস্যায় ভয় পেলেন ইন্দ্র। এই বুঝি তাঁর ইন্দ্রত্ব চলে যায়, গোটাতে হয় স্বর্গের রাজপাট। ইন্দ্র ভয় পেয়ে ধরলেন

স্বর্গবেশ্যা মেনকাকে। বললেন, অপ্সরাদের মধ্যে তোমার সমান আর কে আছে! তা তুমি বাপু তোমার রূপ যৌবন দিয়ে, মধুর ব্যবহার, স্মিত হাসি আর কথা দিয়ে বিশ্বামিত্রকে ভোলাও। মেনকা বললেন সে কি সোজা কথা! ওই কোপন স্বভাব মুনি, যাকে কি না তুমি পর্যন্ত ভয় পাচ্ছ, তার মুখোমুখি হব আমি! না বাপু, সে হবে না। ওই মুনির কাছে যাওয়া, আর আগুনে হাত দেওয়া একই ব্যাপার। তুমি আমাকে রক্ষা করার ভার নাও, আমি যাচ্ছি। হ্যাঁ, এক যদি এলোমেলো হাওয়া আর ভালবাসার দেবতা পুরুষমানুষের মন-মথন-করা মন্মথ আমার সহায় হয়, তবেই তাঁকে একবার ভোলানোর চেষ্টা করতে পারি। বলা বাহুল্য, দেবরাজ রাজি হলেন এবং সদাগতি সমীরণকে পাঠিয়ে দিলেন মেনকার সঙ্গে আর রইলেন কামদেব, বিশ্বামিত্রের মনে বাসনা তৈরি করবেন তিনি। কালিদাসের কুমারসম্ভবে অকাল বসন্তের সূত্র কি এইখানে?

ব্যাসের শকুন্তলা এখানেও থামেননি। তিনি বলতে থাকলেন, কেমন করে মেনকা বিশ্বামিত্রের সামনে খেলা করতে লাগলেন, নাচতে লাগলেন। এমন সময় বন থেকে উদোম হাওয়া এল আর মেনকার পরিধেয় বসনখানি উড়ে গেল। চাঁদনি রঙের বসনখানি আঁকড়ে ধরতে গিয়েই যেন মেনকা প্রায় শুয়ে পড়লেন মাটিতে। কিন্তু সেই অবস্থাতেও মেনকার মুখের হাসিটি গেল না। লোক দেখানো লজ্জার আভাসটুকুও সজীব রাখলেন মুখে— বিশ্বামিত্র তাঁকে দেখলেন একেবারে অনাবৃতা— দদর্শ বিবৃতাং তদা। মেনকার রূপে গুণে বিশ্বামিত্রের মন চঞ্চল হয়ে উঠল, তার ফল এই যে, মুনিও তাঁকে সরস আমন্ত্রণ জানালেন, মেনকাও সানন্দে রাজি হলেন। জন্মালেন শকুন্তলা। ব্যাসের শকুন্তলা পিতামাতার কেলি-কলার সংবাদ দিতে এতটাই নিঃসঙ্কোচ যে, তিনি জানালেন, মেনকার সঙ্গে অনেক কাল রঙ্গ রসে কাটানোর পরেও মহর্ষির মনে হয়েছিল যেন এক দিন কাটল।

আসলে এসব গল্প শকুন্তলা তাঁর পালকপিতা কণ্বের কাছে শুনেছেন। কণ্বই তাঁকে বলেছেন কেমন করে মালিনীর তীরে পাখিরা শকুন্তলাকে ঘিরে ছিল— শকুন্তৈঃ পরিবারিতাম্, কেমন করে পথে যেতে যেতে নির্জন বনের মাঝখানে নিষ্পাপ শিশুটিকে তিনি দেখতে পান। ব্যাসের শকুন্তলা মহর্ষি কণ্বের বদান্যতার কথা সগৌরবে ঘোষণা করে বললেন, তিনিই আমার নাম দিয়েছেন শকুন্তলা, আমি তাঁকেই পিতা বলে জানি— কণ্বং হি পিতরং মন্যে।

কিন্তু শকুন্তলা কণ্বকে পিতা মনে করলে কী হবে, রাজা দুষ্মন্ত যে বিশ্বামিত্রকেই শকুন্তলার পিতা হিসেবে চান। এতক্ষণ তিনি একটি মেয়ের মুখে স্বর্গবেশ্যা মেনকা এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কেলি-কলার উত্তেজক গল্প শুনছিলেন, কিন্তু তাঁর মন পড়ে ছিল শকুন্তলার কাছে। দৃষ্টি তো বটেই। দেখামাত্রই অজ্ঞাতকুলশীলা এক রমণীর রূপে মোহিত হয়েও যিনি তাঁকে প্রশ্ন করছেন— নিতম্বিনী কন্যে! তুমি কার মেয়ে— সেখানে তাঁর এই প্রশ্নের মধ্যে শুধু সরল পরিচয়-জিজ্ঞাসা-মাত্র আকারিত হয় না, বোঝা যায়, এতক্ষণ তিনি শুধু তাঁর জাত বিচার করে যাচ্ছিলেন। অর্থাৎ এঁকে বিয়ে করা যাবে কি যাবে না শুধু এই চিন্তা ছিল রাজার। বিশেষত দুষ্মন্ত তাঁর পূর্বপুরুষ যযাতি রাজার ব্রাহ্মণী বিবাহের ফল মাথায় রেখে থাকবেন। তাই রাজা সন্দেহ মুক্ত হলেন যে, শকুন্তলা মূলত ক্ষত্রিয় রাজার মেয়ে। বিশ্বামিত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তপস্যা করে যতই ঋষি হন না কেন, তাঁর জন্মসূত্রই রাজার কাছে বড় হয়ে উঠল। যেই না রাজা জাতবিচারে নিজের দিকে সায় পেলেন, অমনি তিনি বায়না ধরলেন, তুমি আমার বউ হও— সর্বং রাজ্যং ভবাদ্যাস্তু ভার্যা মে ভব শোভনে।

সত্যি কথা বলতে কী, দুষ্মন্তের দিক থেকে শকুন্তলার জাত বিচারের চিন্তাটি বড়ই হাস্যকর। দুষ্মন্ত নিজে পৌরব, তার মানে জন্ম হয়েছিল মহারাজ যযাতির ঔরসে দানবনন্দিনী শর্মিষ্ঠার ধারায়। তার ওপরে তিনি তাঁর নিজের বাড়িতে মানুষ হননি। মানুষ হয়েছিলেন যযাতির অন্য বংশ তুর্বসুদের ধারায়। মহাভারতের মতে তুর্বসুবংশের রাজারা হলেন সব যবন— তুর্বসো যবনাঃ স্মৃতাঃ। এই তুর্বসু বংশের মরুত্ত রাজার ঘরেই দুষ্মন্ত মানুষ হয়েছিলেন বলে পুরাণকারেরা বলেছেন। এ হেন দুষ্মন্ত যখন কণ্ব মুনির পালিতা কন্যার জাত বিচার করেন তখন হাস্যকর লাগে বই কী! স্বয়ং ব্যাস এ বিচার পরিষ্কার করেই দেখিয়েছেন, কিন্তু কালিদাসের মতো কবিও দুষ্মন্তের এই জাত বিচারের কথাটা দেখাতে ভোলেননি।

যাই হোক, শকুন্তলার রূপে মজা রাজা যখন তাঁর জাতি বর্ণেও সন্তুষ্ট হলেন, তখন আর তাঁর মনের বাধ মানে না, কেবলই বিয়ের জন্য তাড়না আরম্ভ করলেন। ব্যাসের শকুন্তলা দেখলেন, এ তো উঠল বাই তো কটক যাই। বাস্তবিক সারা জীবন বামুন মুনির ঘরে থেকে শকুন্তলা ব্রাহ্ম বিবাহের কায়দা কানুন ছাড়া আর কিছুই জানেন না। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য কি প্রাজাপত্য বিবাহ অত তড়িঘড়ি হয় না, সময় লাগে। কিন্তু রাজা শকুন্তলাকে বোঝালেন, দেখ বাপু! যত রকম বিয়ে আছে তার মধ্যে ভালবাসার বিয়েই সবচেয়ে ভাল— বিবাহানাং হি রম্ভোরুব্য গান্ধর্বঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।

AMARBOI.COM

কালিদাসের শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের কথা কখনওই এত খোলাখুলি পর্যায়ে পৌঁছায়নি। সারা প্রথম অঙ্ক জুড়ে সেখানে শকুন্তলার কথাটি নেই। লজ্জায় আনন্দে তাঁর বাক্য সরে না। দুষ্মন্তের যা কথা সবই সখীদের সঙ্গে। আর তৃতীয় অঙ্কের মিলন পর্বে যাও বা শকুন্তলার মুখ ফুটল, তাও লজ্জায়, আশঙ্কায় প্রকাশের পথ পায় না। কিন্তু ব্যাসের শকুন্তলা ভালরকম কথা বলা না জানলেও, সে ভীরু নয়। রাজার খোলাখুলি প্রস্তাব শুনে তিনি ভাবলেন, পাগল রাজা বলে কী? গান্ধর্ব বিবাহ আবার কী? দুষ্মন্ত তখন আট কিসিমের বিয়ের নিয়মকানুন শুনিয়ে বললেন, গান্ধর্ব বিবাহ বুঝলে না? এই যেমন, আমি তোমায় মন দিলুম, তুমিও আমায় মন দিলে। আমি তোমায় চাই, তুমিও আমায় চাও— সা ত্বং মম সকামস্য সকামা বরবর্ণিনী— এই হল গান্ধর্ব বিবাহ। তাই করব। শকুন্তলা দেখলেন মহা বিপদ। এই পাগল এবং একাধারে পাগল করা রাজাকে আটকানো তো একেবারেই দায়। ভবিষ্যতের কিছুই না বুঝে যখন রাজাকে এখনই মন দিতে হবে, তখন ভবিষ্যতের একটা ব্যাপার অন্তত গুছিয়ে রাখা ভাল। রাজার অত্যাগ্রহ বুঝে শকুন্তলা বললেন, আপনি যখন এত করে বলছেন, তা হলে গান্ধর্ব বিবাহই বুঝি বা ধর্ম হবে। সে হোক, আপনি যদি একান্তই আমাতে আসক্ত হন, তবে একটা শর্ত আছে, সেটা আগে শুনুন— শৃণু মে সময়ং প্রভো। আমার শর্ত হল আমার গর্ভে আপনার যে ছেলে হবে তাকে যুবরাজ করতে হবে। ভবিষ্যতে সেই হবে রাজা। এতে

যদি আপনি রাজি থাকেন— যদ্যেতদেবং দুষ্মন্ত অস্তু মে সঙ্গম স্তয়া— তবেই আমি মিলিত হতে পারি আপনার সঙ্গে।

সোজাসুজি কথা। ফেলো কড়ি মাখো তেল। দুষ্মন্ত নির্বিচারে রাজি হলেন শকুন্তলার শর্তে। মিলিত হলেন দু'জনে— দুষ্মন্ত শকুন্তলা। দু'দিন বাদেই চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে শকুন্তলাকে রাজধানীতে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজা চলে গেলেন। কালিদাসের বৈদগ্ধ্যে লজ্জাবতী শকুন্তলার তরফ থেকে এ সব শর্ত আরোপের কথা আগে মনে আসেনি। সে ভীরু আশ্রম বালিকা, রাজাকে সে নিজের অজ্ঞাতেই মন দিয়েছে, অকারণের আনন্দে। এখানে মিলন নিঃশর্ত, আবেগে মধুর। রাজা যাওয়ার সময় শুধু তাঁকে নিজের নাম লেখা একটি আংটি দিয়ে গিয়েছেন। কালিদাসের শকুন্তলা প্রতিদিন সেটি দেখেন আর একটি করে পুজোর পুষ্পে রাজার দিন গোনেন। কালিদাসের শকুন্তলার যত ভাবনা সখীদের। প্রিয় সখীর বিয়ে হয়েছে, এখন তাঁর বিবাহ বৃত্তান্ত শুনে পিতা কণ্ব কী বলেন, খুশি হন, না অখুশি হন। এইসব ভাবনাই তিনকন্যার নিস্তরঙ্গ আশ্রম জীবনে ঢেউ তোলে।

মহাভারতে কিন্তু চিত্রটা অন্যরকম। সেখানে ক্ষণিকের মিলন ছেড়ে দুষ্মন্ত পালিয়ে যান নগরে এবং পালিয়ে যান এই ভেবে যে, মুনি তপঃপ্রভাবে সব জেনে দুষ্মন্তকে কী করবেন কে জানে— ভগবাং স্তপসা যুক্তঃ শ্রুত্বা কিং নু করিষ্যতি? আমি দুষ্মন্তের এই ভাব দেখে বলতে চাই— কালিদাসের দুষ্মন্ত দুষ্টু, কিন্তু মহাভারতের দুষ্মন্ত একেবারে দুষ্ট, দুষ্ট চরিত্র। মৃগয়াবিহারী দুষ্মন্ত তপস্বিনী বালিকাকে মৃগয়া করে বাড়ি পালিয়েছেন। তাঁর দুষ্টুমির এই শেষ নয়। এখানে শকুন্তলাকে স্মরণচিহ্ন হিসেবে আংটি-ফাংটি কিছুই দেননি। রাজধানীতে ফিরে শতেক রমণীবিলাসে শকুন্তলার কথা স্রেফ ভুলে গিয়েছেন তিনি এবং আমরা জানি, ইচ্ছে করেই ভুলে গিয়েছেন। কালিদাসের চতুর্থ অঙ্কে সেই আংটি পাওয়ার শুরু থেকেই শকুন্তলার মনে বিরহের সুর বেজে উঠেছে। তাঁর মধ্যে দুর্বাসার শাপ এসে দুষ্টু দুষ্মন্তের চরিত্র অনেক সাধু করে তুলেছে, তাঁকে সুনাগরিক হওয়ারও সুযোগ করে দিয়েছে। কবি হিসেবে এ দোষ পুরুষতান্ত্রিকতার কি না জানি না, তবে কালিদাসের আবিষ্কার দুর্বাসার শাপে মধুকরবৃত্তি রাজার দোষ তো অনেক ঢাকা পড়ে গিয়েছে। অর্থাৎ রাজা যে শকুন্তলাকে ভুলে গিয়েছেন, তার উপর রাজার কোনও হাত নেই, সবই দুর্বাসার শাপের দোষ, তাঁর কোনও দোষ নেই। তবু কালিদাসের এই চতুর্থ অঙ্ক থেকে একেবারে ষষ্ঠ অঙ্ক কবিপ্রতিভার চরম বিচ্ছুরণ। দুষ্মন্তের চারিত্রিক দোষ যেমন এতে চাপা পড়েছে, তেমনই দুর্বাসার শাপের ফলে শকুন্তলার দিক থেকে প্রতি মুহূর্তে নাটকীয় টেনশন তৈরি হয়েছে।

এ ব্যাপারে কিন্তু মহাভারতের কবি যতখানি বিদগ্ধ, তার থেকে অনেক বেশি সরল হৃদয়ের ঋষি। ঠিক এই কারণেই শকুন্তলা-দুষ্মন্তের অনুরাগ যেমন ক্রমিক পর্যায়ে উন্নীত, ব্যাসে তা নয়। ব্যাসে এই দেখা এই পরিচয়-জিজ্ঞাসা এবং পরিচয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব, অপিচ মিলনও। আবার কালিদাসে যেমন চতুর্থ অঙ্ক থেকেই শকুন্তলার মানসিক প্রতীক্ষা আরম্ভ হয়, মহাভারতে তা নয়। মহাভারতের কবি সরল হৃদয় বলে শকুন্তলার বিদায়ের আয়োজনে করুণ রসের কোনও আবেদন রাখেননি। অন্যদিকে গর্ভবতী অবস্থায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে কালিদাসের পাঠক-দর্শক যেমন সমবেদনায় আকুল হয়ে ওঠেন, মহাভারতের কবির এ সব ঝামেলা নেই এবং ঠিক সেই কারণেই কালিদাসের সপ্তম অঙ্কের ঘটনা ব্যাসকে সন্নিবেশ করতে হয়েছে দুষ্মন্ত বন থেকে চলে যাওয়ার পরপরই।

মহাভারতের দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েও আর যে কণ্বাশ্রমে ফিরে এলেন না কিংবা লোকও পাঠালেন না, তা কণ্ব মুনির ভয়ে। কিন্তু কণ্ব মুনি লোক ভাল, মহাভারতেও ভাল, কালিদাসেও ভাল। কালিদাসে কিন্তু দৈববাণীর ফলে কণ্ব মুনি সব বৃত্তান্ত জেনেছেন। কালিদাসের শকুন্তলা, যে নাকি পরবাসী নায়কের কাছে আপন পিতামাতা বিশ্বামিত্র-মেনকার বিলাসরহস্য নিজমুখে জানিয়েছেন, তাঁর পক্ষে পিতার কাছেও নিজমুখে আগন্তুক নায়কের সঙ্গে সহবাসের কথা জানাতেও দ্বিধাবোধ করার কথা নয়। কিন্তু না, ব্যাসের কণ্ব দৈববাণী না শুনলেও তপোবনে সব জানতে পেরেছেন এবং জানার পর কালিদাসের কণ্বের মতোই তিনি খুশি। আনন্দে উদ্বেল হয়ে শকুন্তলাকে চক্রবর্তী পুত্রের জননী হবার আশীর্বাদ জানিয়েছেন কণ্ব মুনি তদুপরি বরও দিতে চেয়েছেন খুশি হয়ে। কিন্তু এই মুহূর্তে শকুন্তলা কিন্তু বাস্তবতার বুদ্ধিতে ততটা পীড়িত নন। পূর্বে যেমন তিনি শর্তসাপেক্ষ মিলনের কথা রাজাকে বলেছিলেন তেমনি এখনও সেইরকম কিছু বর চাইতে পারতেন পিতা কণ্বের কাছে। অন্তত এই মুহূর্তে শকুন্তলা পিতার কাছে লুকোতে পারলেন না যে, আগন্তুক রাজাকে তিনি ভালবেসে ফেলেছেন। এখন তিনি রাজার হিতবুদ্ধিতে ধর্মিষ্ঠতা এবং রাজ্যে চিরপ্রতিষ্ঠার আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন মহর্ষি কণ্বের কাছে।

হয়তো রাজার চরিত্রে ধর্মিষ্ঠতা থাকলে আগামী দিনে শকুন্তলার বাস্তব সুবিধা হবে, তাই অমন আশীর্বাদ চাওয়া। কিন্তু সত্যি বলতে কী, রাজা নিজে যে একেবারেই ধর্মিষ্ঠ নন— সেটা আমরা জানি তবুও কণ্ব মুনি বললেন, আমার কথা মনে না রেখে তুমি পুরুষমানুষের সঙ্গে নির্জনে যা সব করেছ, তা ধর্মের দিক থেকে কিছু অন্যায় নয়। সকাম পুরুষ আর সকামা রমণী, দুয়ের গান্ধর্ব মিলনে ক্ষত্রিয়ের কোনও বাধাই নেই। তা ছাড়া রাজা দুষ্মন্ত ধর্মাত্মা বটে, মহাত্মাও বটে।

শকুন্তলা বললেন, 'পিতা, তুমি তাঁকে আশীর্বাদ করো।'

কণ্ব বললেন, 'তুমি যখন তাঁকে ভালবেসে ফেলেছ, তখন তাঁর প্রতি আমার অপ্রসন্নতার কারণ নেই কোনও— প্রসন্ন এব তস্যাহং ত্বৎকৃতে বরবর্ণিনি।'

এ তো ঠিক বাস্তব-বোধী পিতার কথা। কন্যার অভীপ্সিত মিলনে বাধা দিলেন না কণ্ব, সব মেনে নিলেন। দুষ্মন্তের ঔরসজাত শকুন্তলার পুত্র মহর্ষি কণ্বের আশ্রমেই জন্মাল। কালিদাসের পুত্র জন্ম এত শীঘ্র নয়, কারণ অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকে সর্বস্বসার চতুর্থ অঙ্কে রসসৃষ্টি বাকি। শকুন্তলা বনস্থলী থেকে বিদায় নেবেন। তাঁর আসন্ন বিরহে আকুল বৃক্ষলতা পশুপক্ষী থেকে আরম্ভ করে সম্পূর্ণ বনস্থলীর আকুলতা। পিতা কণ্বের সগদ্গদ উপদেশ, সখীদের চোখের জল, এইসব কিছু কালিদাসের কবিত্বের মূর্ছনায় এমন এক রসভূমিতে পৌঁছেছে যে সাময়িকভাবে রাজা দুষ্মন্তের কথা আমাদের মনেই থাকে না। আবার যখন আমরা শকুন্তলাকে নিয়ে রাজসভায় উপস্থিত হই, তখন অসহায় শকুন্তলাকে দেখে আমরা

বিমূঢ় বোধ করি, অন্যদিকে শাপগ্রস্ত দুষ্মন্তকে দেখেও আমাদের মায়া লাগে। কেননা তিনি যেন পাগলের মতো হয়ে গিয়েছেন; শকুন্তলাকে বলা কথা তাঁর একটুও মনে নেই, মনে নেই কণ্বাশ্রমের সামান্যতম স্মৃতি। মনের যন্ত্রণা আরও বাড়ে যখন দেখি শকুন্তলা কাপড়ের খুঁটে রাজার দেওয়া আংটি খুঁজে পাচ্ছেন না। পাঠক দর্শককে কালিদাস একেবারে শকুন্তলার একান্ত পক্ষপাতী করে তোলেন যখন গর্ভবতী শকুন্তলা রাজার দ্বারা তিরস্কৃত এবং আপন আশ্রম বন্ধুদের দ্বারা অপমানিত হয়ে সভাস্থল ত্যাগ করেন— একেবারে একা গর্ভবতী।

মহাভারতের শকুন্তলার ধাত কিন্তু এমন নয়। তিনি নিজের ভার নিজেই বইতে জানেন। কণ্ব মুনির কাছে তিনি রাজার ধর্মিষ্ঠতার আশীর্বাদ ভিক্ষা করছেন, কিন্তু রাজা ধর্মিষ্ঠ না হলে কী করতে হবে তা তিনি জানেন। তার ওপরে তাঁর ছেলে হয়ে গিয়েছে। তাঁর দুর্দান্ত ক্রীড়া প্রকৃতি, যা কালিদাস ব্যাসের আদলেই একেবারে সপ্তম অঙ্কে বর্ণনা করেছেন, সেই ক্রীড়া প্রকৃতি দেখেই বনবাসীরা তাঁর নাম রাখল সর্বদমন। সবাইকে এ ছেলে দমিয়ে রাখে তাই সর্বদমন— অস্তু অয়ং সর্বদমনঃ সর্বং হি দময়ত্যসৌ।

সর্বদমনের কৌমার কাল উপস্থিত হল। কণ্ব মুনি ভাবলেন, এ বার ছেলের যুবরাজ পদবী ধারণ করার সময় হয়েছে। তার এবার বাবার কাছে যাওয়া উচিত। শকুন্তলাকে ডেকে কণ্ব বললেন, দেখ মা। বিয়ে হওয়া মেয়েদের বহুকাল ধরে বাপের বাড়িতে থাকাটা ভাল দেখায় না— নারীণাং চিরবাসো হি বান্ধবেষু ন রোচতে। তুমি এ বার ছেলে নিয়ে মহারাজের কাছে যাও। কণ্ব মুনি তাঁর একপাল শিষ্যের সঙ্গে সপুত্র শকুন্তলাকে পাঠিয়ে দিলেন রাজা দুষ্মন্তের কাছে। শিষ্যেরা রাজধানীতে শকুন্তলাকে পৌঁছে দিয়েই ফিরে চলে এলেন আশ্রমে। কালিদাসে কিন্তু শার্ঙ্গরব, শারদ্বত এবং আর্যা গৌতমী শকুন্তলার সঙ্গে ছিলেন অনেকক্ষণ। কিন্তু ব্যাসের শকুন্তলা নিজের ভার নিজে বইতে জানেন। অতএব তিনি একাই ছেলেকে নিয়ে রাজার কাছে এসে যথাবিধি সম্মান জানিয়ে বললেন, এই নাও তোমার ছেলে, আমার গর্ভে তোমার কেমন দেবশিশুর মতো পুত্র হয়েছে দেখো। এবার একে তোমার পূর্ব শর্ত মতো যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করো। মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে আমার সঙ্গে মিলনের পূর্বেই তুমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে সে কথা এখন স্মরণ করার সময় এসেছে।

আগেই বলেছি ব্যাসের দুষ্মন্ত দুষ্ট, একেবারে দুষ্টচরিত্র। শকুন্তলার ব্যাপারে সব কথাই তাঁর মনে ছিল, কিন্তু মনে থাকা সত্ত্বেও— তস্যা রাজা স্মরন্নপি— রাজা বললেন, 'দুষ্ট তাপসি! এ সব কী বলছ, কিছুই তো আমি মনে করতে পারছি না। ধর্ম বল অর্থ বল কাম বল কোনও ব্যাপারেই তো তোমার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছি না। কাজেই তুমি এখানে থাকবে, না চলে যাবে কিংবা কী করবে, না করবে, তাতে আমার কী! তোমার যা ইচ্ছে তাই কর— গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা কামং যথা পোছসি তৎ কুরু। বস্তুত, কালিদাসের শকুন্তলাকে প্রথমেই রাজার মুখোমুখি হতে হয়নি। শার্ঙ্গরব, শারদ্বত, দু'জনে প্রাথমিক কথাবার্তা আরম্ভ করার ফলে নানা উক্তি প্রত্যুক্তির মাধ্যমে রাজার ইচ্ছে-অনিচ্ছে এবং শকুন্তলার সম্বন্ধে রাজার ধারণা ক্রমেই পরিষ্কার হতে থাকে। এতে শকুন্তলার পক্ষে অনেক সুবিধে হয়। কালিদাসে সমস্ত গণ্ডগোল বাধে যখন শকুন্তলা বুঝতে পারেন তিনি রাজদত্ত অভিজ্ঞান আংটিটি হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু ব্যাসের শকুন্তলার বিপদ আরম্ভ হয়েছে আরও আগে, অনেক আগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একেবারে প্রথম প্রস্তাবেই সোজাসুজি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাসের শকুন্তলা বলে ফেলেছেন রাজা জেগে ঘুমোচ্ছেন। সব জানা সত্ত্বেও, সব মনে পড়ে গেলেও রাজা তাঁর পূর্বকৃত অপরাধ, অবশ্য যদি এটাকে কেউ অপরাধ বলে, সেই অপরাধ জনসমক্ষে স্বীকার করতে চাইছেন না। এখানে তাই শকুন্তলা প্রথম থেকেই ফুঁসে উঠেছেন। রাগে তাঁর চোখ লাল হয়ে গিয়েছে— অমর্ষতাম্রাক্ষী, ঠোঁটদুটি স্ফুরমাণ— স্ফুরমাণৌষ্ঠ, কটাক্ষে তিনি যেন রাজাকে দগ্ধ করে ফেলতে চাইছিলেন। মহর্ষি কণ্বের শান্ত আশ্রমে বেড়ে ওঠা প্রত্যেকটি মানুষের যে শিক্ষা থাকে, সেই শিক্ষায় শকুন্তলা তাঁর অবিশুদ্ধ ভাবটি চাপা দিতে চাইছিলেন বটে। কিন্তু তাঁর কটাক্ষ দাহন ছিল অপ্রতিরোধ্য এবং রাগে দুঃখে শেষপর্যন্ত তিনি প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করলেন। কণ্বাশ্রমের শিক্ষায় তাঁর প্রথম দিকের কথাবার্তায় যথেষ্ট ভদ্রতা ছিল, কিন্তু রাজার অভদ্রতায় শকুন্তলাও শেষে অভদ্র হয়ে উঠলেন এবং তা এতটাই যে ভাবা যায় না।

শকুন্তলা বললেন, মহারাজ! তুমি সব জেনে শুনে এসব কী বলছ? ইতর লোকের মতো একেবারে দ্বিধাহীনভাবে সমস্ত ঘটনা যে তুমি অস্বীকার করছ, তাতে কি তোমার হৃদয়কে ফাঁকি দিতে পারবে? কোনটা সত্যি আর কোনটা সত্যি নয় তোমার মন যে সব জানে। এ ভাবে তোমার অন্তরপুরুষকে ছোট কোরো না। নির্জনে একটা পাপ কাজ করে তুমি যে ভাবছ কেউ বুঝি জানতে পারল না, সেটা ভেব না। তোমার কীর্তিকলাপ সব জানেন তোমার অন্তরপুরুষ, সব জানেন তোমার দেবতারা।

শকুন্তলা এরপরে প্রায় দার্শনিকের ভঙ্গিতে হৃদিস্থিত অন্তরপুরুষ সম্বন্ধে রাজাকে উপদেশ দিলেন। শেষে বললেন, পতিব্রতা নারী স্বয়ংই তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছেন— তাঁকে অপমান করা তোমার শোভা পায় না। যে মেয়েকে সসম্মানে তোমার ঘরে তোলা উচিত তাঁকে তুমি যদি উন্মুক্ত সভায় অসভ্য লোকের মতো কলঙ্কিত করো সেটা কি ভাল হয়! শকুন্তলা অধৈর্য হয়ে উঠলেন। বললেন, আমি কি অরণ্যে রোদন করছি দুষ্মন্ত? তুমি আমার কোনও কথা শুনতে পাচ্ছ না? আমি এত কথা বলা সত্ত্বেও যদি আমার কথা অনুসারে তুমি একটুও না চলো তা হলে অন্যায় অনীতিতে তোমার মাথাটা যে চৌচির হয়ে ফেটে যাবে— দুষ্মন্ত শতধা মূর্ধা ততস্তে দা স্ফুটিষ্যাত।

শকুন্তলা এরপর পুরুষমানুষের জীবনে পুত্রের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে থাকলেন। পতিব্রতা নারীর কত মূল্য এবং পুত্র কীভাবে পিতৃ-পিতামহকুলকে পুংনাম নরক থেকে উদ্ধার করে, তার সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করলেন। তারপর আসলেন নিজের কথায়। বললেন, ছেলের মাকে মায়ের মতো সম্মান করতে হয়, মায়ের মতো দেখতে হয়— মাতৃবৎ পুত্রমাতরম্। আর সেই মায়ের পেটে যে ছেলে জন্মায় সে যেন পিতার পক্ষে আয়নায় নিজের মুখ দেখা। পিতার দায়িত্ব সম্বন্ধে শকুন্তলা এ বার উদাহরণ টানলেন। দেখ, প্রাণীজগতে পিঁপড়েগুলো পর্যন্ত নিজের ডিম নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তারা ডিমের ক্ষতি করে না, সেখানে তুমি ধর্মজ্ঞ হয়ে নিজের পুত্রের ভরণপোষণ করবে না এ কেমন কথা। তা ছাড়া পুত্র স্পর্শের আনন্দ তুমি জান না রাজা। ভাল জামাকাপড় পরা, কী স্ত্রীলোকের স্পর্শসুখ, কী শীতল জলে গা জুড়ানো এইসব কিছুর থেকেও শিশু পুত্রের স্পর্শসুখ অনেক

অনেক বেশি রাজন্য। তোমার পুত্র আজ তোমার সামনেই উপস্থিত। আমার জীবন এবং আমার ছেলে দুইই তোমার। কাজেই শত শরৎ বেঁচে থাকো তুমি, শতায়ু হোক আমার ছেলে। তোমার শরীর থেকে আরও একটি পুরুষের শরীর তৈরি হয়েছে। শকুন্তলার সৎ-সরোবরের শান্ত জলে আজ তুমি নিজের ছায়া নিজেকেই দেখো।

এই রকম আত্মনিবেদনের পরেও শকুন্তলা দেখলেন রাজা টলছেন না কিংবা তাঁর ভাবগতিক একটুও বদলাল না। এত কথার পরও রাজা ভাবলেশহীন অপরিবর্তিত। মুখের অবস্থা দেখে শকুন্তলা ভাবলেন, সত্যি সত্যি ভুলে গেল নাকি লোকটা! কণ্বমুনির আশ্রমের কথা, শকুন্তলার কথা সবই কি ভুলে গেলেন দুষ্মন্ত! যদি পুরনো কথাই মনে পড়ে, শকুন্তলা তাই বললেন, সেই যে সেই হরিণের পেছনে ধাওয়া করতে করতে মৃগয়াক্লান্ত হয়ে তুমি পিতা কণ্বের আশ্রমে এসে পৌঁছলে। আমাকে দেখতে পেলে, দেখতে পেলে কুমারী শকুন্তলাকে। তুমি জিজ্ঞেস করলে আমার কথা। আমি তোমাকে শোনালাম কেমন করে অপ্সরা সুন্দরী মেনকা ঋষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে আমার জন্ম দিলেন। তারপর সেই অসতী স্বর্গসুন্দরী আমাকে যে ত্যাগ করে গেলেন, একেবারে পরের ঘরের সন্তানের মতো ত্যাগ করে গেলেন, সে কথাও তোমাকে বলেছি। হায়! বাল্যকালে পিতামাতা আমাকে অসহায় অবস্থায় ত্যাগ করে চলে গেলেন আর এখন যৌবনে তুমি আমায় ত্যাগ করছ। পূর্বজন্মে কী এমন পাপ করেছি, যার ফল পাচ্ছি আমি। তুমি আমায় ত্যাগ করেছ— সেও না হয় আমি সইব, আমি না হয় আবার সেই আশ্রমেই ফিরে যাব, কিন্তু তোমার এই ছেলেকে তুমি কোনও মতেই অস্বীকার করতে পারো না।

শকুন্তলা ভাবলেন, আপন জননীর অন্যায় ব্যবহারের কথা বলে অন্তত স্বামীর অনুকম্পা আকর্ষণ করা যাবে। এক জায়গায় অবিচার হয়েছে বলে স্বামীর কাছে বিচার পাবেন না— শকুন্তলা এটা ভাবতেই পারেন না। কিন্তু রাজা যে জেগে ঘুমোচ্ছেন। তিনি শকুন্তলার কথার সূত্র ধরে আরও সুযোগ পেয়ে গেলেন। শকুন্তলার থেকে আরও এক কাঠি এগিয়ে গিয়ে দুষ্মন্ত বললেন, তোমার পেটে জন্মানো এইসব ছেলেফেলের কথা আমি বুঝি না শকুন্তলা। মেয়েরা ভীষণ মিথ্যে কথা বলে— অসত্যবচনা নার্য্যঃ— অতএব কে তোমায় বিশ্বাস করবে? তার মধ্যে তুমিই তো তোমার জন্মকথা শোনালে। যার মা হল স্বর্গবেশ্যা মেনকা এবং যে নাকি দেবতার নিঃশেষ নির্মাল্যের মতো তোমাকে ফেলে দিয়ে গিয়েছে হিমালয়ের কোলে তার কথায় আবার বিশ্বাস? তোমার পিতা হলেন বিশ্বামিত্র, যে নাকি আগে ছিল রাজা, পরে ব্রাহ্মণত্বে লুব্ধ হয়ে ঋষি হয়েছেন। তাও কিনা তপস্যার মধ্যে আবার অপ্সরাকে দেখে মুগ্ধ হলেন। যাঁর এইরকম কালচার সেই বিশ্বামিত্রের মেয়ে হলে তুমি। যদি বলো মেনকা অপ্সরাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আর পিতা বিশ্বামিত্রও মহর্ষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তা হলে তাঁদের মেয়ে হয়েও তুমি এ রকম বেশ্যার মতো পুরুষ মজানো ভাষা শিখেছ কোত্থেকে— কস্মাৎ ত্বং পুংশ্চলীব প্রভাষসে। এ সব কথা বলতে তোমার লজ্জা করছে না একটুকুও, বিশেষ করে আমার সামনে? দুষ্টা তপস্বিনী কোথাকার, বেরোও এখান থেকে— দুষ্ট তাপসি গম্যতাম্।

দুষ্মন্ত এতক্ষণ শকুন্তলাকে গালাগালি দিচ্ছিলেন, কিন্তু ছেলের ব্যাপারে দুর্বলতা প্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেলে যদি আবার সভ্যজনেরা অন্যরকম সন্দেহ করে তাই তিনি এ বার ছেলেকে জড়িয়ে নিয়ে শকুন্তলাকে যা-তা বলতে আরম্ভ করলেন। ছেলের দায়িত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করে দুষ্মন্ত বললেন, কোথায় তোমার ঋষিশ্রেষ্ঠ পিতা, আর কোথায় তোমার মা, আর কোথায় বেচারা তুমি সাধুর বেশে দাঁড়িয়ে আছ। আর এই ছেলের কথা বলছ? তোমার ছেলে তো বেশ বড়সড় বাপু, দেখলে মনে হয় গায়ে বেশ জোরও আছে। এত অল্পসময়ের মধ্যে হয় এই চেহারা! কোত্থেকে একটা শালখুঁটির মতো দশাসই ছেলে নিয়ে এসে বলছ কিনা এ বালক তোমার ছেলে। যেমন খারাপ তোমার জন্ম, তেমনি বেশ্যার মতো তোমার কথাবার্তা, মেনকাও তেমনি শুধু নিজের কাম চরিতার্থ করার জন্যই তোমার জন্ম দিয়েছে। তুমি যাই বলো বাপু, যা ঘটেছে বলে তুমি বলছ তা সবই ঘটেছে তোমার চোখের বাইরে, অতএব তুমি এখন এখান থেকে মানে মানে কেটে পড়— নাহং ত্বাম্ অভিজানামি যথেষ্টং গম্যতাং ত্বয়া।

মহাভারতের শকুন্তলা কালিদাসের মতো অত বিদগ্ধা, পরিশীলিতবুদ্ধি নন যে, রাজাকে শুধু— অনার্য! নিজের মতো করে, নিজের অনুমান মতো আমাকে দেখছ— শুধু এইটুকু বলেই ছেড়ে দেবেন। মহাভারতের শকুন্তলা রাজার উলটো পালটা কথা শুনে এবার সত্যি ক্ষেপে উঠলেন। ঝংকার দিয়ে তিনি বললেন, রাজা! পরের খুঁত এইটুকু ছোট্ট হলেও খুঁজে বার করতে খুব ভাল লাগে, তাই না? আর নিজের খুঁতটা যে একটা বেল ফলের মতো এত বড় তার বেলা? আমার মা মেনকা দেবতাদের মধ্যেই ঘোরাফেরা করেন, আর দেবতারাও আমার মা'র পেছনে ঘুরে বেড়ায়— ত্রিদশাশ্চানু মেনকাম্। অতএব তাঁর গর্ভে আমার জন্ম, তোর জন্মের থেকে অনেক ভাল— মমেব উদ্রিচ্যতে জন্ম দুষ্মন্তত্তব জন্মনঃ।

আগে ভাবতাম শকুন্তলা হঠাৎ এই কথাটা বললেন কেন? আমাদের আধুনিক চোখে স্বর্গবেশ্যার গর্ভে শকুন্তলার জন্মের কথাটাই বরং খারাপ লাগতেই পারে, যেমন রাজার নাগরিক বৃত্তিতে তাই লেগেছিল। উলটো দিক দিয়ে রাজা দুষ্মন্তের জন্ম কী এমন দেখলেন শকুন্তলা যে, এমন কথাটা তাঁর রাগের মুখে বেরোল। অবশ্য রাগের মুখে অনেক সময় সত্য কথাটা বেরোয়, তাই আমরাও ব্যাপারটা একটু অনুসন্ধান করেছি।

আপনাদের নিশ্চয়ই সেই যযাতি রাজার কথা মনে আছে। সেই যযাতি যিনি ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানীর উপরোধে তাকে বিয়ে করতে বাধ্য হলেন অথচ শেষ পর্যন্ত পড়লেন দানবনন্দিনী শর্মিষ্ঠার প্রেমে। এই প্রেমের ফলে তাঁর ওপরে নেমে এল শুক্রাচার্যের দেওয়া জরার অভিশাপ। শেষে যযাতির অনেক অনুরোধে বিধান পাওয়া গেল যে, যযাতির পাঁচ পুত্রের মধ্যে কেউ যদি পিতার জরা গ্রহণ করেন, তবে রাজা আপাতত মুক্ত হবেন। পাঁচ পুত্রের মধ্যে যিনি জরা নেবেন, যযাতির রাজ্য পাবেন তিনি-ই। দেবযানীর তিন পুত্র এই জরা নিতে অস্বীকার করলেন। শর্মিষ্ঠার প্রথম পুত্রও তাই, কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র পুরু সানন্দে জরা গ্রহণ করলেন এবং তিনিই রাজা হলেন যযাতির রাজ্যে। সেই থেকে বিখ্যাত পুরু কিংবা পৌরব বংশ চালু হল। দুষ্মন্ত সেই বংশেরই ছেলে বলে পরিচিত। দেবযানীর গর্ভে যযাতির প্রথম দুই ছেলে হলেন যদু এবং তুর্বসু। এঁরা দু'জনেই পিতার অভিশাপ কুড়িয়েছিলেন। যদুর কথা আমাদের প্রয়োজন নেই আপাতত, কিন্তু দ্বিতীয় পুত্র তুর্বসু যযাতির জরা নিতে অস্বীকার

করলে, যযাতি বলেন, তুই রাজা হবি সেই দেশে, যেখানে সাধারণ প্রজাদের নিয়ম কানুন, সভ্য আচারের বালাই থাকবে না। যে দেশে যৌন সম্বন্ধে কোনও বিচার থাকবে না, যে যা পারে তাই করবে, এইরকম একটা ম্লেচ্ছ দেশ, যা নাকি সভ্য সমাজের বাইরে, সেইখানে রাজা হবি তুই।

পরবর্তীকালে মহাভারত বলেছে এই তুর্বসু থেকেই যবন কিংবা ম্লেচ্ছদের সৃষ্টি— যদোস্তু যাদবা জাতা স্তুর্বসোর্যবনা স্মৃতাঃ। আমরা তুর্বসুর কথা এত করে বলছি এইজন্য যে, শকুন্তলার নায়ক দুষ্মন্ত মানুষ হয়েছিলেন এই তুর্বসুদের ঘরে। যযাতির মূল ভূখণ্ডে দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী পুরু মহারাজ রাজত্ব করে গেলেও তাঁর বংশধরেরা সে রাজ্য চালাতে পারছিলেন না। পণ্ডিতেরা মনে করেন ইক্ষ্বাকু-বংশীয় মান্ধাতা এবং যদুবংশীয় শশবিন্দু, যাঁরা দু'জনে ছিলেন জামাই শ্বশুর, এঁরা দু'জনেই এমনভাবে পৌরবদের রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন যে, মহারাজ দুষ্মন্ত পর্যন্ত অন্তত দশ-এগারো পুরুষের মধ্যে কোনও রাজার নাম প্রায় উল্লেখই করা যায় না। দুষ্মন্ত জন্মানোর সময় তুর্বসু বংশে রাজত্ব করছিলেন মরুত্ত নামে এক নামী রাজা। তাঁর পুত্রসন্তান ছিল না, ছিল শুধু এক মেয়ে সম্মতা। সে মেয়েকেও তিনি দান করেন, তাঁর পুরোহিত সংবর্তের কাছে। হরিবংশ পুরাণ বলেছে, এই সম্মতাই দুষ্মন্তকে পুত্র হিসেবে লাভ করেন। এখন সম্মতা সংবর্ত ঋষির ঔরসেই দুষ্মন্তকে লাভ করেন, নাকি অন্য কোনও উপায়ে সে কথা পুরাণগুলিতে অস্পষ্ট। কিন্তু দুষ্মন্তের খ্যাতি ছিল পুরুবংশীয় বলেই। এমনও হতে পারে যে, ক্ষীণবীর্য পুরুদের কোনও অখ্যাত পুরুষের হাতে সম্মতাকে দান করেন সংবর্ত এবং তাই হয়তো দুষ্মন্ত পৌরব। কিন্তু মরুত্ত যেহেতু নামী রাজা ছিলেন এবং অপুত্রক, তাই দুষ্মন্তকে তিনি পুত্র নির্বিশেষে পালন করেন। ফল হল এই যে, যযাতিপুত্র তুর্বসুর বংশধারাই লুপ্ত হয়ে গেল এবং তুর্বসুর বংশ মিশে গেল পৌরব বংশে। কারণ ততদিনে দুষ্মন্ত রাজা হিসেবে বিরাট নাম কিনে ফেলেছেন— পৌরবং তুর্বসোর্বংশঃ প্রবিবেশ নৃপোত্তম।

আমাদের কথা হল যে দুষ্মন্তের জন্মকথা পুরাণে এত রহস্যাবৃত হয়ে আমাদের কাছে নেমে এসেছে, সেই দুষ্মন্তের এক জায়গায় জন্ম, এক জায়গায় মানুষ হওয়া, তাও আবার যৌন বিষয়ে আচার-শিথিল যবনদের রাজ্যে— এ সব কিছুই সাধারণের মধ্যে রস আলোচনার বিষয় হয়েছিল নিশ্চয়ই। এ সব রহস্যকথা সাধারণে ছড়িয়ে যাওয়ায়, কণ্বাশ্রমের নায়িকার পক্ষে দুষ্মন্তের জন্ম সংবাদ জোগাড় করা কিছুই কঠিন হয়নি। আমরা মনে করি, শকুন্তলা যে বললেন, তোর জন্মের থেকে আমার জন্ম অনেক ভাল তা এই উক্ত কাহিনির কথা মনে রেখেই। ভাবটা এই যার নিজের জন্মের ঘটনাই পরিষ্কার নয়, সে আবার অন্যের জন্ম নিয়ে কেচ্ছা করে কী করে— ছুঁচ বলে চালুনিকে। অতএব এ বার শকুন্তলার সুযোগ, তিনি কোমরে কাপড় জড়িয়ে বলতে আরম্ভ করলেন, তোর জন্মের থেকে আমার জন্ম ঢের ঢের ভাল। তুই ঘুরিস ফিরিস এই পৃথিবীতে আর আমি ঘুরি অন্তরীক্ষে। পাহাড়ে আর সরষেতে যে তফাত, আমার সঙ্গে তোরও সেই তফাত। কুৎসিত লোকে যতক্ষণ আয়নায় মুখ না দেখে, ততক্ষণ সে নিজেকে অন্যের থেকে রূপবান মনে করে। তোর অবস্থাও তাই। আয়নায় নিজের মুখ দেখলে পরে নিজের সঙ্গে অন্যের তফাতটা বুঝবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ কিন্তু সেই জন্মের খোঁচাই চলছে। শকুন্তলা বললেন, যে আসলে ভদ্রলোক সে কোনও কিছুই খারাপ দেখে না, তোর মতো 'বিহেঠক' নিন্দুকেরা শুধু খারাপই দেখে, খারাপই বলে। ভদ্রলোকেরা দুটো কটু কথা বলে ফেললে পরে অনুশোচনা করে, আর তোর মতো দুর্জন যারা, তারা অন্যকে কটু কথা বলেই সুখ পায়। তোর মতো যারা সত্য ঘটনাকে অস্বীকার করে, তারা তো সাপের মতো। বিশেষ করে যে পুরুষমানুষ নিজের মতো দেখতে ছেলেটাকে পর্যন্ত স্বীকার করল না, ভগবান তার ভাল করবেন না— তস্য দেবাঃ শ্রিয়ং ঘ্নন্তি— এই আমি বলে দিলাম।

মূর্খ, শুয়োর, সাপ আরও বহুতর গালাগালি দিয়ে মহাভারতের শকুন্তলা এবারে ধাতে ফিরলেন। আবারও তিনি ধর্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়ে পুত্রজন্মের সহস্র উপকারিতা স্মরণ করিয়ে দিলেন রাজাকে। কালিদাসের শকুন্তলাকে দু-পাঁচ কথা বলার পরেই লজ্জায়, দুঃখে, অভিমানে সভাগৃহ ত্যাগ করতে হয়েছিল। কিন্তু মহাভারতের শকুন্তলা নরমে গরমে শতকথা বলেও যখন দেখলেন রাজা খুব একটা ঘাড় পাতছেন না, তখন তিনিই রাজাকে ত্যাগ করেছেন। দুষ্মন্তের ত্যাগের সাধ্য কী? শকুন্তলা বললেন এত কথার পরেও মিথ্যাচারেই যখন তোমার আসক্তি, তখন আমি নিজেই যাচ্ছি, তোমার মতো লোকের সঙ্গে আর এক মুহূর্তও নয়— আত্মনা হন্ত গচ্ছামি ত্বাদৃশে নাস্তি সঙ্গতম্। আর আমার ছেলের কথা! সে তোমার তোয়াক্কা করে না, কপালে থাকলে সে নিজেই এই হিমালয়ের মুকুট পরা, সাগরের আঁচলা দেওয়া পৃথিবী নায়িকাকে ভোগ করবে। দরকার নেই তোমার রাজ্যে।

ঠিক এই কথাটি বলেই মহাভারতের শকুন্তলা ফিরে চললেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দৈববাণী হল, যে দৈববাণীর কথা আমরা আগে বলেছি। দৈববাণী বলল, ভরস্ব পুত্রং দুষ্মন্ত মাবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্— পুত্রকে তুমি ভরণ করো দুষ্মন্ত, শকুন্তলাকে অপমান কোরো না। শকুন্তলা ঠিক সত্য কথাটি বলেছে, তুমিই এই পুত্রের জন্মদাতা— ত্বঞ্চাস্য ধাতা গর্ভস্য সত্যমাহ শকুন্তলা। এই দৈববাণী ভারতবর্ষের সমস্ত মুখ্য পুরাণগুলিতে আছে, যেখানেই আছে ভরতের জন্মপ্রসঙ্গ। মহাভারতের প্রধান তাৎপর্য, প্রসিদ্ধ ভরত বংশের মূল ভরতের ভরণ কীভাবে সম্ভব হয়েছিল পিতা দুষ্মন্তের দ্বারা, সেইটাই। যে ভরত থেকে 'ভারত' নামের সৃষ্টি, যে ভরত থেকে ভারতবর্ষের সমস্ত কীর্তি— ভরতাদ্ ভারতী কীর্তিঃ ভারতী যত্র সন্ততিঃ— সেই ভরত কীভাবে পিতার দ্বারা বিপ্রলব্ধ হয়েও আবার নিজের জায়গা খুঁজে পেলেন পিতার ঘরে, এইখানেই মহাভারতের কবির তাৎপর্য, অন্য কিছু নয়। কিন্তু কালিদাসের তাৎপর্য কামনার শান্তিতে, প্রেমের পরিণতিতে। পুত্রজন্মের আনন্দ সেখানে অনেক পরে এবং সে আনন্দ সেখানে শৃঙ্গার রসের মহত্তর তাৎপর্যে বিশ্রান্তি লাভ করে। অভিজ্ঞানশকুন্তলমের চতুর্থ অঙ্ক থেকে সপ্তম পর্যন্ত কালিদাসের বৈদগ্ধ্যে, কবিচেতনায়, ভাবে, রসে, ব্যঞ্জনায় নতুনতর মাত্রা লাভ করেছে, কিন্তু যে আকর থেকে তিনি তাঁর উপাদান সংগ্রহ করেছেন, সেখানেও তাঁর ঋণ কম নয়।

ওপরে যে দুষ্মন্ত শকুন্তলার তুমুল ঝগড়াঝাঁটি দেখলাম, সেখানেও শুধু পুত্র প্রসঙ্গ ছাড়া শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান এবং তাঁকে অবিশ্বাসের রসটি কালিদাসেও ঠিক আছে, যদিও কালিদাসের প্রত্যাখ্যান, অবিশ্বাস এবং শকুন্তলার দিক থেকে নিজেকে স্থাপন

করার প্রসঙ্গটি অতি-বৈদগ্ধ্যে পরিশীলিত হওয়ার ফলেই পাঠক-দর্শক শকুন্তলার প্রতি মায়াগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অথচ দুষ্মন্তকেও তাঁরা সে রকম করে দূষতে পারেন না, কারণ দুর্বাসার শাপের কারণটি পাঠক এবং দর্শকের জানা আছে। মহাভারতের দুষ্মন্ত দৈববাণী শোনার পর সর্বসমক্ষে স্বীকার করেছেন, আমি যে সব জেনেও এই পুত্রের পিতৃত্ব অস্বীকার করেছি, তার কারণ, শুধুমাত্র তোমার কথায় যদি এই অজানা অচেনা ছেলেটিকে আমি পুত্র বলে স্বীকার করে নিতাম, তা হলে লোকে আমাকে সন্দেহ করত। কাজেই সর্বসমক্ষে সন্তানের শুদ্ধির জন্যই আমি এই অপব্যবহার করেছি। শকুন্তলার কাছেও তিনি ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। বলেছেন, তোমার সঙ্গে আমার মিলন হয়েছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে। আমি যদি শুধু তোমার কথায় তোমাকে মেনে নিতাম এবং ছেলেকে সিংহাসনে বসিয়ে দিতাম, তা হলে পাঁচজনে বলত তুমি ছলাকলায় ভুলিয়ে আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলে এবং এখন ছেলেটাকে চাপিয়ে দিলে রাজার সিংহাসনে। কাজেই লোকের চোখে তোমার এবং আমাদের দু'জনের সন্তানের শুদ্ধি প্রমাণ করার জন্যই আমি এতসব অপব্যবহার করেছি।

মহাভারতের দুষ্মন্তের কথা শুনে মনে হয় যেন দৈববাণী নেমে আসা কিংবা প্রজা সাধারণের বিচার সম্বন্ধে দুষ্মন্তের খানিকটা চিন্তা মহাভারতের দুষ্মন্তকে শেষ পর্যন্ত কিছুটা মহানই করে তোলে। বিশেষত, দৈববাণীর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করে তাঁকে কোলে নেন। ব্রাহ্মণেরা মন্ত্র পড়তে থাকেন, বন্দিরা বন্দনা করতে থাকে, রাজা দুষ্মন্ত সঙ্গে সঙ্গে পুত্র ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। রাজ্যাভিষেক সম্পূর্ণ হওয়ার পর রাজা দুষ্মন্ত নিজেকে নিয়োগ করেন মহিষী শকুন্তলার তোষণে। ভাল খাবার-দাবার, নতুন নতুন শাড়ি-কাপড় আর গয়নাগাঁটি, এই ছিল রাজার কাছে শকুন্তলাকে তোষামোদ করার প্রধান উপায়।

কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলে পুত্র-পিতার মিলন-প্রসঙ্গ একেবারে শেষ অঙ্কে, যদিও পুত্রের থেকে শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের পুনর্মিলনই এখানে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, পুনর্মিলন সম্ভব হয়েছে রাজা দুষ্মন্তের অনুতাপ-দহন সম্পূর্ণ হওয়ার পরে, যদিও এই অনুতাপের রাস্তা পরিষ্কার হয়েছে ধীবরের কাছে রাজার নামাঙ্কিত আংটিটি ফিরে পাওয়ার ফলে। কালিদাসে নাটকের চতুর্থ অঙ্ক থেকে ষষ্ঠ অঙ্ক পর্যন্ত যত ঘটনা ঘটেছে, তার নিয়ন্ত্রণ কিন্তু মূলত সেই অভিজ্ঞান আভরণটির, যেটি দুষ্মন্ত শকুন্তলার হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন রাজধানীযাত্রার প্রাক্কালে। তারপর থেকে শকুন্তলা-দুষ্মন্তের পারস্পরিক সম্পর্ক যে খারাপ হয়েছে, তা ওই আংটির কারণেই। বস্তুত কালিদাসের নাটকের চতুর্থ অঙ্ক থেকে ষষ্ঠ অঙ্ক পর্যন্ত ওই আংটিটি হল আসল নায়ক, যে নাটকটি ঋষি দুর্বাসার ক্রোধের ধাতুতে গড়া। যা থেকে নেমে আসে নিয়তি, 'নেমেসিস'। দুর্বাসার শাপের ব্যাপারটা একেবারেই কালিদাসের নব নব উন্মেষশালিনী প্রজ্ঞার ব্যাপার। নর-নারীর যুগল সম্পর্কের মধ্যে শুধুমাত্র কামনার অন্যায় থাকে, সেখানেই কালিদাসের মতো চিরন্তন কবির হাতে নেমেসিস নেমে আসে দুর্বাসার শাপের আকারে। তবে আংটির ব্যাপারটা কালিদাস কোথাও ইঙ্গিত পেয়ে থাকলেও থাকতে পারেন। পদ্মপুরাণের স্বর্গ খণ্ডে এই আংটির কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাওয়া যায়। সেখানে স্বামীর ঘরে যাওয়ার রাস্তায় শকুন্তলা নাকি আংটিটি প্রিয়ম্বদার হাতে দেন এবং প্রিয়ম্বদা সেটি আঁচলে রাখতে গেলে আংটিটি জলে পড়ে যায়— প্রিয়ম্বদা তু তদ্‌গৃহ্য বসনাঞ্চলমধ্যতঃ। যাবন্ন্যস্তবতী তাবদপতৎ সলিলে দ্বিজ।

প্রিয়ম্বদা ভয়ে এ ঘটনা প্রকাশ করেননি এবং শকুন্তলাও সখীপ্রেমে এ ঘটনার জের টানেননি। কিন্তু মনে রাখতে হবে পদ্মপুরাণের অনেক অংশই এত বিপুল পরিমাণে প্রক্ষিপ্ত যে কালিদাস তাঁর আংটির বৃত্তান্ত এখান থেকে ধার করেছেন তা মনে হয় না। বরঞ্চ বৌদ্ধ গ্রন্থের একাংশ কট্‌ঠহরি জাতকে বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্ত দুষ্মন্তের মতো একইভাবে এক রমণীকে দেখে মোহিত হন এবং নামাঙ্কিত একটি আংটি সেই স্ত্রীকে দিয়ে বলেন, তোমার মেয়ে হলে এই আংটি দিয়ে তার ভরণ-পোষণ করবে, আর ছেলে হলে এই আংটি নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে। এদিকে স্বয়ং বোধিসত্ত্ব সেই রমণীর ছেলে হয়ে জন্মালেন। পরবর্তী সময়ে বোধিসত্ত্বকে সঙ্গে নিয়ে সেই রমণী যখন রাজার কাছে গেলেন, তখন ব্রহ্মদত্ত লোকলজ্জায় তাঁর পূর্ববিবাহের কথা অস্বীকার করলেন। রমণী এ বার রাজার দেওয়া আংটিটি দেখান। রাজা তাও অস্বীকার করে বললেন যে, ও আংটি তাঁর দেওয়াই নয়। এর পরে খানিকটা অলৌকিকতার মাধ্যমে বোধিসত্ত্বের শুদ্ধত্ব এবং রাজার পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল।

ঘটনা যাই হোক, আংটির ব্যাপারটি এই জাতকের গল্প থেকে কালিদাসের মাথায় ঢুকে থাকতে পারে। কিন্তু ওই আংটির সঙ্গে দুর্বাসার শাপ, আংটি জলে পড়ে যাওয়া, তাকে মাছের পেটে ঢোকানো এবং পরিশেষে মাছের পেট কেটে আবার সেই আংটি বার করা এ সব কিছুই এতই অভিনব এবং এতই নাটকীয়তার সুরে বাঁধা যে, এগুলি কালিদাসের প্রতিভা-প্রসূত নয় তা ভাবাই যায় না। তবে, এই কট্‌ঠহরি জাতক, পদ্মপুরাণ এবং অন্য পুরাণগুলির মধ্যে কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলের উপাদান যতই লুকিয়ে থাকুক না কেন কালিদাস যে মহাভারতের কবির কাছেই সবচেয়ে বেশি ঋণী, সে কথা বোধকরি জলের মতো পরিষ্কার। যে সমস্ত ঘটনা প্রধান এবং যে পরিমণ্ডলে শকুন্তলার কাহিনি জমে উঠতে পারে তা কালিদাসের বিলক্ষণ জানা বলেই মহাভারতের মূলস্রোত থেকে তিনি সরে যাননি। তবে এ কথা তো ঠিকই যে যিনি মহাভারতের মতো মহাকাব্যের কবি তাঁর লক্ষ্য অনেক বড়। এই যে বিরাট ভারতযুদ্ধ, কিংবা এই বিরাট ভরত বংশ যে-বংশের এক-একজন বিরাট পুরুষ এক একটি স্মরণীয় কাজ করে রেখেছেন এবং সবচেয়ে বড় কথা যে ভরতের নামে আজকেও আমরা দেশকে চিহ্নিত করি, একতাসূত্রে আবদ্ধ হই, সেই ভরতের প্রথম জীবন এবং তাঁর জনক-জননীর ইতিহাস কেমন ছিল— এটাই মহাকাব্যের কবির কাছে অনেক জরুরি। কিন্তু এই বিরাটের মাঝখানে থেকে মধুকরবৃত্তিতে উপাদান সংগ্রহ করে কালিদাস আমাদের যা দিয়েছেন, তা হল মধুর রসের পরিসর, বিদগ্ধজনের আকুল হৃদয়ের পরিসর, প্রেমিক প্রেমিকার অন্তরে নানা রঙের টান-পড়া ছবি। কালিদাসের নাটকে ভরত শুধুই নায়ক-নায়িকার বিশুদ্ধির প্রতীক, কুমারসম্ভবমাত্র, আর সবই নায়ক-নায়িকা কেন্দ্রিক। আর মহাভারতে ভরতই সব, বাকিটা তাঁর জনক-জননীর পরিচয়।

দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা

সময় যে পালটায়, পালটেছে, সেটা সবচেয়ে ভাল বুঝতে পারে আমাদের মতো সদ্য বুড়োরা। আমাদের এমন ক্ষমতা নেই যে, ডিকেন্সের দুই শহরের অসামান্য তুলনা করার কৌশল এখানে রপ্ত করব এবং সেই কৌশলে দুই কালের অসাধারণ একটা তুলনা টানব। বস্তুত ব্যাপারটা অত বৃহৎ কিছুও নয়। তবে কিনা বারবার মনে হয়, পুরুষ-রমণীর হৃদয় প্রকাশ করার প্রকারের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য এসেছে এবং তাতে করে এমন ভাবারও কোনও কারণ নেই আমার যে, এখন যা হচ্ছে, যা বড় খারাপ, বড় বেলেল্লাপনা চলছে সর্বত্র। এটা যদি খারাপ আর বেলেল্লাপনাই হত, তা হলে আমার পিতাঠাকুরের তুলনায় আমার যুবককালের সমস্ত ঘটনাপ্রবাহই বেলেল্লাপনা। তবে হ্যাঁ, এখন অনেক কিছুই দেখি, যা অনেক সময়ে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে ঈর্ষাকাতর করে তোলে, যদিও বৃদ্ধত্বের শিংটুকুও ভাঙা চলে না, আর এখনকার ছেলেমেয়েরাও কেউ গোবৎস নয়; তারা সব বোঝে।

আমার খটকা লাগল সেইদিন এবং ঠিক সেইদিনই আমি বুঝলাম যে, আমার বৃদ্ধত্বের বয়ঃসন্ধি ঘটেছে, যেদিন কলেজ স্কোয়ারে পথ অতিক্রম করার সময় শুনলাম— একটি ছেলে সামান্য একটু অনুযোগের সুরে মেয়েটিকে বলছে— তুই কিন্তু এখনও আমাকে 'আই লাভ ইউ' বলিসনি। মেয়েটি ঈষল্লাস্যে মধুর হেসে বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে, এই তো বলছি— আই লাভ ইউ। অত রাগ দেখাচ্ছিস কেন? সত্যি বলতে কী— সেই ধ্বনি পবনে বহিল। চলমান পথের মধ্যে দুই অজ্ঞাত-পরিচয় তরুণ-তরুণীর এই কথোপকথন আমাকে দুটি বিষয় বুঝিয়ে দিল, অবশ্য এখানে একটি অন্যটির ফলশ্রুতি। প্রথমত, অনুমানযোগ্য কারণেই বুঝলাম— এই দুই তরুণ-তরুণীর মধ্যে পরিচয়- মেলামেশা হয়ে গেছে, কিন্তু যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতার মধ্যেও মেয়েটি 'আই লাভ ইউ' না বলায়, তরুণ ছেলেটি এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। দ্বিতীয় বিষয়টা একেবারেই অন্য। সেটা আমাদের সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে প্রায় ইংরেজি না-জানা একটি প্রজন্মের ভাষা-ব্যবহারের দিক। এই পোস্ট-কলোনিয়াল ভাবনারাশির অনন্ত প্রক্রিয়ায় আমাদের কালচারের মধ্যে ঔপনিবেশিকতা এমনভাবেই ঢুকে আছে যে, তার ফলশ্রুতি এই দাঁড়াল, অর্থাৎ ইংরেজি ভাষায় 'আই লাভ ইউ' না বললে প্রেমশঙ্কা নিবৃত্ত হচ্ছে না।

আমার বক্তব্য হল— ছেলেমেয়েরা বহুকালই কলেজ স্কোয়ারে ঘুরেছে, প্রেম-নিবেদনের ইতিহাসও বহুপথে শ্রুত, কীর্তিত এবং লিখিত হয়েছে, কিন্তু দুটি বস্তু এখন খুব চোখে পড়ে। প্রথমটা প্রাথমিক প্রেমসিদ্ধির চিহ্ন হিসেবে 'আই লাভ ইউ' নামক মহাবাক্যের প্রয়োগ। দ্বিতীয়টা, সামাজিক ঐতিহাসিকের মননের বিষয় এবং সেটা হল— মেয়েদের দিক থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগ বাড়িয়ে প্রেম নিবেদনের প্রবণতা। দেখছি, মেয়েরাও আজকাল যথেষ্ট প্রেম নিবেদন করছে, ফ্লার্ট করছে ছেলেদের সঙ্গে এবং হাবে-ভাবে, লাস্যে-ভাষ্যে নিজেদের অগ্রগতির অবস্থানও বুঝিয়ে দিচ্ছে। আবারও বলি— এতে আমি খারাপ কিছু দেখছি না। বৃদ্ধরা পূর্বে একে কালের গতি বলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছেন বটে কিন্তু আমাদের কালেও আক্ষরিক অর্থে এটাকে কালের গতি বা পরিবর্তন হিসেবেই ধরে নেওয়া হত, অন্তত আমাদের বাপ-পিতামহরা তাই বলে স্বস্তি পেতেন। এর কারণ হিসেবে ফেমিনিজম, প্রগতিশীলতা, বিশ্বায়ন, এবং মেয়েদের মানসিক জড়তা-ভঙ্গ যাই থাক, এখানেই আমার বুকে কিছু সুখের মতো ব্যথা বাজে। এবং তা বাজুক, কেননা আমি বুড়ো হচ্ছি বলে তো আর দুনিয়ার অগ্রগতি রুখে থাকবে না। অপিচ সাজে-কাজে, কথায় এবং বার্তায় মেয়েরা আরও প্রগলভা থেকে প্রগলভতরা যদি হয়ে ওঠেন, তা হলে বুড়োদের নান্দনিক বোধ এবং নাতনি-স্নেহ আরও জাগ্রত হোক, এই প্রার্থনা করি।

কালের কথাটা তবু থেকেই যায়। আমি আধুনিক কালের যুবকদের প্রতি যেমন ঈর্ষাবোধ করি, তেমনই আমার পিতৃকুল এবং বয়স্ক দাদাদের জন্য দুঃখও পাই। তাঁদের কালে নাকি উচ্চশিক্ষায় যে সব মেয়েরা আসত, তাঁরা মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে এসে ক্লাসে ঢুকতেন এবং ক্লাস করার পর তাঁদের সঙ্গেই বেরিয়ে যেতেন। পুরুষ সহপাঠীদের সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় ছিলই না, মেলামেশা তো দূরের কথা। এ বাবদে আমাদের বয়সকাল অনেক ভাল ছিল। কথাবার্তা, হাসিঠাট্টাও পারস্পরিক চলত যথেষ্ট, কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে রাবীন্দ্রিক প্রভাব যেন একটু বেশিই ছিল। অর্থাৎ কথা যত না ছিল, ভাব এবং ভাবালুতা ছিল তার চেয়ে বেশি। বিশেষত, এমন উদাহরণ খুব কমই ছিল, যেখানে মেয়েরা পুরুষের কাছে এগিয়ে এসেছে প্রেম নিবেদন করার জন্য। অন্যদিকে পুরুষের কাছে বিদগ্ধা তরুণীরা প্রায় সময়েই অবোধ্য থাকতে ভালবাসতেন। কথাবার্তা তথা ভাব-ভঙ্গির মধ্যে সাহিত্যের ধ্বনিতত্ত্ব বেশি মিশে থাকায় পুরুষের মনন-শক্তির ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হত। কোনও কথা বললে মনে হত— কেন বলল, না বললে মনে হত— কেনই বা বলল না— এই অসহনীয় স্বগত যুক্তিতর্কের মধ্যে 'নিমেষে আঁচল ছুঁয়ে যায় যদি চলে/ তবু সব কথা যাবে সে আমায় বলে'— এইসব বিচিত্র ভাব-সন্নিবেশ অনেক সময়েই আমাকে অতি বৈষ্ণব ভাবাপন্ন তৃণাদপি সুনীচ এবং তরুর মতো সহিষ্ণু করে তুলেছে। পাছে আমার ভাবমূর্তি ব্যাহত হয়, এই দুশ্চিন্তায় দুর্গত জীবন কাটাতে কাটাতেই আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি, তবু ভাবতে বাধ্য হই— কথাবার্তা আর ধ্বনি-ব্যঞ্জনার সঙ্গে নিজেকে প্রকাশ বা প্রকট করে তোলার একটা সুবিধেও আছে।

হতে পারে, এখানে 'রোম্যান্টিসিজম' একটা খুব বড় যুক্তি এবং মেয়েদের দিক থেকে প্রগলভ হয়ে ওঠা, নিজেকে কথায়-মনে প্রকট-প্রকাশ করে ফেলাটা 'রোম্যান্টিসিজম'-এর চরম জায়গায় একটা বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু এটাও তো ঠিক যে, জীবন তো এরকম নয়। এখানে নিজের সঙ্গে নিজের ছায়াযুদ্ধ চলে প্রতিনিয়ত। এখানে আমাদের পৌরুষেয়তা, আমাদের সামাজিক আচার, আমাদের অহংকার এমনভাবেই মেয়েদের দেখতে, বলতে এবং শুনতে শিখিয়েছে যে, তাঁদের কায়, মন এবং বাক্য— কোথাও কোনও আচরণভঙ্গ

হলেই তাদের মেয়েত্ব নিয়ে বিচিত্র প্রশ্ন উঠে যায়। কিন্তু জীবন এবং জগৎ তো এটাই দাবি করে যে, এমন মেয়েও থাকবে এবং ছিল এবং আছে— যারা নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছে, প্রেম, ভালবাসা, এমনকী যৌনতার কথাও নিজের মুখে বলবে, বলত এবং বলে। যৌনতার কথা পর্যন্ত নাই গেলাম, কিন্তু একজন সুন্দরী রমণী তার হৃদয় উন্মোচিত করছে পুরুষের কাছে, প্রেম নিবেদন করছে নিজের ভাব-ব্যঞ্জনায়, অথবা নিজের মুখে— এটা অংশত সত্য হলেও সমাজের এই একান্ত বাস্তবটা বোঝানোর জন্য মহাভারতের আদিপর্বে একবার প্রবেশ করতেই হবে।

আদিপর্বের বিভিন্ন ঘটনাবলির মধ্যে আমরা যাব না। কিন্তু এখানে দেবযানীর কথাটা আমরা সাড়ম্বরে বলতে চাই। এই কারণে যে, তৎকালীন সমাজে তিনিই বোধহয় অন্যতমা রমণী যিনি ব্রাহ্মণকন্যা হওয়া সত্ত্বেও ভবিষ্যতে ক্ষত্রিয় রাজার কণ্ঠলগ্না হয়েছিলেন স্বেচ্ছায় স্ব-স্বাধীনতায়। আর দ্বিতীয় হল সেই দুর্লভ সামাজিক গুণ, যেখানে একটি মেয়ে নিজের মুখে তার পুরুষাভিলাষের কথা জানিয়েছে অভিমত পুরুষের জন্য। না, আমরা এটা মোটেই বলছি না যে, পুরুষই একমাত্র প্রেম, ভালবাসা, কামনার অভিলাষ জানায়। আমরা জানি, তা মেয়েরাও জানায়। তবে এই জানানো প্রায়শই শব্দমন্ত্রে হয় না, বেশির ভাগই তা রমণীর ভাবতন্ত্র, শব্দ সেখানে স্ফুটাস্ফুট ব্যক্ততায় ভাবকে তীব্রতর করে। তবে মহাভারতে দেবযানীর আখ্যানে সেই অসাধারণ বৈশিষ্ট্যটুকু আছে, যেখানে অতিসংরক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য কোনও বাধা হয়ে উঠতে পারেনি এবং দেবযানী তাঁর নিজের জীবন নিজেই গঠন করছেন, নিজের পছন্দ যে পুরুষ তাকে নিজের পছন্দের কথা বলতেও তিনি দ্বিধা করছেন না, এমনকী নিজের মুখে নিজের আর্ত প্রেম জানাতেও তাঁর কোনও দ্বিধা নেই।

সমাজ এবং জীবনের সাংস্কারিক পদ্ধতির মধ্যে থাকতে থাকতে আমরাও যেন এইরকমই ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছি যেন সুন্দরী মেয়েরা কখনওই নিজের মুখে পুরুষের কাছে প্রেম নিবেদন করে না অথবা জানায় না কোনও পুরুষের জন্য স্বাভিলাষ। আমাদের দেশে এটা তো একটা বৈশিষ্ট্যই বটে, কেননা মনু যাজ্ঞবল্ক্যের নিয়ম-নীতি মাথায় নিয়ে আমাদের পিতামাতারা বড় হয়েছেন, সেখানে বিবাহ-পূর্বকালে কোনও পুরুষের প্রতি অনুরাগই মেয়েদের পক্ষে বেশ অনভিপ্রেত ছিল, তার মধ্যে আবার নিজের মুখে প্রেম-যাচনা— মেয়েদের মুখে এটা যেন মানায়ই না। তবে সবিনয়ে জানাই, এটি এককভাবে ভারতবর্ষের কোনও বৈশিষ্ট্য নয়, ইংরেজ অথবা ইউরোপীয় সংস্কৃতিতেও— হ্যাঁ, ওদের চুম্বনালিঙ্গনের প্রক্রিয়া যতই খোলামেলা বা উদার হোক, ইউরোপীয় সংস্কৃতিতেও আগ বাড়িয়ে মেয়েরা প্রেম নিবেদন করলে তাকে খানিক 'ককেটিশ' বলে চিহ্নিত করাটা সাধারণ রেওয়াজের মধ্যেই ছিল। এমনকী গবেষক পণ্ডিতেরা রেনোয়া-রাফায়েল-এর ছবির বিচার করার সময় পর্যন্ত মেয়েদের চোখের দিকে লক্ষ্য রেখে বলেছেন— স্বানুকুল করার জন্য ছেলেদের চোখ যদি মেয়েদের মুখের দিকে আবদ্ধ থাকে, তবে মেয়েদের চোখ কিন্তু এদিকে, ওদিকে অথবা দিগন্তে প্রসারিত, নেহাৎ চোখের মণির মতো শব্দ-শ্রবণে কানের কোনও লক্ষ্য চিত্রিত করা যায় না, তা নইলে মেয়েদের কানগুলিকেও অন্য কোনও দিগন্তে বিলীন হতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা যেত চিত্রকরের হাতে। হয়তো বা অশেষ রমণীকুলের সামাজিক ভাবন্যাসের মধ্যেই এর রহস্য আছে এবং ডারউইনের মতো সামাজিক পিতা তো বলেই দিয়েছিলেন যে, মেয়েরা নাকি 'Less eager than the male... she is coy, and may often be endeavouring to escape from the male.'

এই যে রমণীকুলের 'coyness' লজ্জাবতী ভাব, রমণীর মন জয় করার জন্য পুরুষের যে সার্বক্ষণিক চেষ্টা এবং অপচেষ্টা এবং সেখানে ডারউইনের choice theory, অর্থাৎ রমণী বেছে নেবে তাকেই যার সেই দুরূহ সৌভাগ্য আছে, এখানে তার জায়গাটা অনেক শক্তপোক্ত বলে বলেন সামাজিকেরা। কিন্তু রমণীর লজ্জাবতী ভাবটাই সমস্ত নারীসমাজের সামান্য ধর্ম এবং সেটাই হওয়া উচিত— এই সিদ্ধান্ত সব পণ্ডিত-গবেষকেরা মানেন না। তাদের মতে ছলবলে বা চুলবুলে 'ককেটিশ' রমণীদেরও যথেষ্ট আবেদন আছে এবং সমাজে এবং সাহিত্যেও তাঁরা সংখ্যায় কম নন। কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন— মেয়েদের ককেটিশ ভাবটা প্রায়ই স্বাভাবিক নয়, যদি বা কখনও এই স্বভাব দেখাও যায়, তা হলে বুঝতে হবে, সেই মেয়ের মধ্যে একটা 'ইনসিকিওরিটি' কাজ করছে এবং সেটা হয়তো তার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা সুস্থিতির জন্যই।

আমরা বলব— এই সমস্ত কল্পগুলি পটভূমিতে রেখেই মহাভারতের দেবযানীর চরিত্র-ভাবনা করা উচিত। দেবযানীর প্রথম জীবনের সবচেয়ে বড় ভাগটি জুড়ে আছেন তাঁর পিতা শুক্রাচার্য, সামাজিক জীবনে তিনি কিন্তু একটা চলমান 'এস্টাব্লিশমেন্টে'র বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছেন। অর্থাৎ তিনি দেবতাদের তথাকথিত শুভশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অসুর-দৈত্য-দানবের আচার্য হয়ে আছেন, তিনি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ এবং বিরাট রাজনীতিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও তিনি দৈত্য-দানবদের গুরু। তার মানে জীবনের প্রথম ভাগেই দেবযানী কিন্তু 'মেইনস্ট্রিম' ব্রাহ্মণ্য শক্তির বিরুদ্ধে একটা 'কাউন্টার-হেজিমনি'র অঙ্গ হয়ে আছেন। এই মুহূর্তে দৈত্যদের সর্বময় রাজা বৃষপর্বার আচার্য-স্থানে আছেন শুক্রাচার্য। শুক্রাচার্য দানবদের রাজ্যেই বাস করেন এবং দেবযানীও তাঁর কাছেই থাকেন। শুক্রাচার্যের স্ত্রী কিংবা দেবযানীর মায়ের নামটুকু আমরা পুরাণের বংশবর্ণনার অংশ থেকে জানতে পারি কিন্তু দেবযানীর নিত্য-নৈমিত্তিক-প্রাত্যহিক কোনও ঘটনার মধ্যে আমরা তাঁর মায়ের সাহচর্য একবারও উল্লিখিত হতে দেখিনি। একটি পুরাণ স্পষ্টতই জানিয়েছে যে, মাতৃ-সাহচর্যহীনা দেবযানীর প্রতি পিতা শুক্রাচার্যের স্নেহ ছিল একেবারেই লাগামছাড়া।

এতগুলি কল্প-বিকল্পের মধ্যে দেবযানী মানুষ হচ্ছেন বলেই তাঁর জীবনে প্রথম পুরুষের পদ-সঞ্চার রীতিমতো এক মনস্তত্ত্বের বিষয় হয়ে ওঠে। দেবযানীর কাহিনি আরম্ভ হয়েছে এক দৈব অভিসন্ধি নিয়ে। ধন-সম্পত্তি আর ঐশ্বর্যের অধিকারকে কেন্দ্র করে দেবতা এবং অসুরদের সংঘাত চলছিল নিরন্তর— সুরাণামসুরাণাঞ্চ সমজায়ত বৈ মিথঃ। এই অবস্থায় দেবতারা বৃহস্পতিকে গুরু হিসেবে বরণ করে নিলেন, আর অসুর-দানবেরা গুরুকরণ করলেন শুক্রাচার্যকে। দেখা গেল, তখন যেসব সংঘর্ষ চলল, সে সব জায়গায় দেবতারা দৈত্য-দানবদের যখনই মেরে ফেলছেন, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য তাঁর সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ করে সেইসব অসুর-দানবদের বাঁচিয়ে তুলছেন। কিন্তু এই বিদ্যা বৃহস্পতির জানা না থাকায়

তিনি যুদ্ধহত দেবতাদের আর বাঁচাতে পারছেন না— ন হি বেদ স তাং বিদ্যাং যৎ কাব্যো বেত্তি বীর্যবান্।

আসলে শুক্রাচার্যের মধ্যে নানান উদ্ভাবনী শক্তি ছিল এবং সেটা এতই বেশি চমৎকৃতি তৈরি করত যে তিনি একসময় 'কবি' নামে পরিচিত হন, এমনকী কাব্য নামেও। খোদ ভগবদ্‌গীতার বিভূতিযোগে ভগবান বলেছেন— কবিদের মধ্যে আমি উশনা শুক্রাচার্য— কবীনামুশনাঃ কবিঃ। এখানে পণ্ডিত টীকাকারেরা অবশ্য শাস্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকেই কবি বলে চিহ্নিত করেছেন এবং আমরা মনে করি, রাজনীতির মতো কঠিন শাস্ত্র-দর্শনে শুক্রাচার্যের নব-নবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা ছিল বলেই তিনি কবি বা কাব্য নামে চিহ্নিত হয়েছেন। ভৃগুপুত্র কবির ছেলে কাব্য উশনা— এই বংশলতা তাঁর বুদ্ধি-প্রকর্ষে উড়ে গেছে। তিনি নিজেই কবি নামে চিহ্নিত।

সে যাই হোক, শুক্রাচার্য যা পারছেন, বৃহস্পতি তা পারছেন না বুঝেই দেবতারা শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতির ছেলে কচের শরণাপন্ন হলেন। তাঁরা বললেন— আমরা তোমার সাহায্য চাই, ব্রাহ্মণ! অমিততেজস্বী শুক্রাচার্যের কাছে যে সঞ্জীবনী বিদ্যা আছে, সেই বিদ্যা তোমাকে আহরণ করে নিয়ে আসতে হবে আমাদের কাছে— শুক্রে তামহর ক্ষিপ্রং ভাগভাঙ্ নো ভবিষ্যসি। কীভাবে এই বিদ্যা শুক্রাচার্যের কাছ থেকে নিয়ে আসতে হবে— এবার তার উপায় কচকে বলতে আরম্ভ করলেন দেবতারা। তাঁরা বললেন— শুক্রাচার্য এখন দানবরাজ বৃষপর্বার আচার্য হিসেবে তাঁরই রাজধানীতে তাঁর কাছেই থাকেন। তিনি শুধু দানবদেরই রক্ষা করেন, দানব ছাড়া অন্য কাউকে তিনি রক্ষা করেন না। এই অবস্থায় তোমাকে গিয়ে শুক্রাচার্যকে তুষ্ট করতে হবে এবং তার মেয়েকেও তুষ্ট করতে হবে; আর সত্যি বলতে কী, এ কাজটা তুমিই শুধু পারো— ত্বমারাধয়িতুং শক্তো নান্যঃ কশ্চন বিদ্যতে।

এখানে কচের দিক থেকে তো প্রশ্ন উঠবেই যে, তোমরা শুক্রাচার্যকে তুষ্ট করতে বলছ, বিদ্যালাভের জন্য সেই সদগুরুর সেবা করব সেটা ঠিক আছে, কিন্তু তাঁর মেয়েটাকেও তুষ্ট করতে হবে, এ কেমন কথা! দেবতারা কচকে বললেন— তুমি 'পূর্ববয়াঃ' অর্থাৎ তোমার বয়স কম, সেটা একটা সুবিধে, এই বয়সে বিদ্যা লাভ করার পরিশ্রম করে তুমি যেমন শুক্রাচার্যকে খুশি করার চেষ্টা করবে, তেমনই তার মেয়েটাকেও তুষ্ট করার চেষ্টা করবে। কেননা, তাঁর আদরের মেয়ে দেবযানী তুষ্ট হলেই তুমি কাব্য উশনার কাছ থেকে নিশ্চিতভাবে বিদ্যা লাভ করতে পারবে— দেবযান্যাং হি তুষ্টায়াং বিদ্যাং তাং প্রাপ্স্যসি ধ্রুবম্। এইরকম একটা প্রস্তাব কচের পক্ষে বোঝা অসম্ভব নয়। কিন্তু একটা যুবতী মেয়েকে তুষ্ট করে তার বাপের কাছে পৌঁছনো এবং তাঁর কাছ থেকে বিদ্যে আদায় করার প্রক্রিয়ার মধ্যে যে সব উপাদান আছে, তাতে কচের দিক থেকে অন্যত্র বাহিত হওয়ার সম্ভাবনা পুরোপুরি থেকে যায় বলেই দেবতারা যেন একটু সতর্ক হয়ে কচকে বলেছিলেন— তুমি দেবযানীকে তুষ্ট করবে তোমার চরিত্র দিয়ে। তোমার অনুকূলতা দিয়ে, তোমার মধুরতা দিয়ে, তোমার আচরণ দিয়ে এবং তোমার সংযম দিয়ে— শীলদাক্ষিণ্য-মাধুর্যৈরাচারেণ দমেন চ।

তার মানে, প্রথম থেকেই এটা ঠিক হয়ে রইল যে, দেবযানীকে ভোলাতে হবে অনুকূল ব্যবহারে এবং পৌরুষের মধুরতায়, কিন্তু তাই বলে শেষ জায়গায় সংযমের বাঁধ ভাঙলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলবে না। তার মানে, এটা তেমনই এক সুষ্ঠু পরিকল্পনা যেখানে ঠিক করেই নেওয়া হল যে, দেবযানীকে এক চরম বঞ্চনার শিকার হতেই হবে, এক যৌবনবান পুরুষ তাঁকে ভোলাবে, কিন্তু নিজে ভুলবে না।

দেবতাদের শুভেচ্ছা নিয়ে কচ উপস্থিত হলেন শুক্রাচার্যের আশ্রমে। সেখানে সবিনয় প্রণিপাতে কচ শুক্রাচার্যকে বললেন— আমি কচ— অঙ্গিরা ঋষির পৌত্র, বৃহস্পতির ছেলে। আমি আপনার শিষ্য হতে চাই। আমি কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করব এবং যতদিন শিক্ষা সম্পূর্ণ না হয়, ততদিন গুরুগৃহে থাকব— ব্রহ্মচর্য্যং চরিষ্যামি... শিষ্যং গৃহ্লীতু মাং ভবান্। দানবগুরু শুক্রাচার্য সানন্দে কচকে শিষ্যত্বে বরণ করে নিলেন এবং স্বাগত জানালেন তাঁর প্রচেষ্টাকে— কচ সুস্বাগতং তেঽস্তু প্রতিগৃহ্নামি তে বচঃ। বস্তুত শুক্রাচার্য খুশিই হয়েছেন, তাঁর শত্রুপক্ষের শিক্ষক-আচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্রটি তাঁর কাছে শিক্ষা নিতে এসেছে, এতে তাঁর গর্বই হল। সেকালে অবশ্য এই ব্যবহারটা ছিল; শত্রু বলেই তাঁর পুত্র-আত্মীয়-পরিজনদের সঠিক শিক্ষা দেব না— এই সংকীর্ণতা গুরু-আচার্যদের ছিল না। আমরা পরবর্তী কালে দ্রোণাচার্যকে দেখব দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে শিক্ষা দিচ্ছেন— ভবিষ্যতে এই ধৃষ্টদ্যুম্ন কিন্তু দ্রোণাচার্যের গলা কাটবেন। অতএব শিক্ষাদানের ব্যাপারে শুক্রাচার্যও সেই উদার দার্শনিকতায় বিশ্বাস করেন। শুক্রাচার্য কচকে বললেন— এখানে তুমি স্বাগত। আর আমি মনে করি— এতে তোমার পিতা বৃহস্পতিকেও আমার সম্মান জানানো হচ্ছে, তোমাকে প্রত্যাখ্যান করলে তাঁকে অসম্মান করা হবে, তাই তুমি আজ থেকে আমার শিষ্য হলে, তোমার পিতা সম্মানিত হন— অর্চয়িষ্যেঽহমর্চ্যং ত্বাম্ অর্চিতোঽস্তু বৃহস্পতিঃ।

শিষ্যত্ব গ্রহণের সময় কচ কিন্তু একবারও মুখ ফুটে বললেন না যে, তিনি সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখতে এসেছেন শুক্রাচার্যের কাছে। শুক্র কচকে শিষ্যত্বে বরণ করতেই কচ ব্রহ্মচর্যের ব্রত গ্রহণ করলেন উশনা শুক্রাচার্যের উপযুক্ত শিষ্য হয়ে ওঠার জন্য, অন্যদিকে তিনি গুরুকন্যা দেবযানীর তুষ্টি বিধানের জন্যও নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন, এই খবর প্রাথমিকভাবে দিয়েছে মহাভারত— আরাধয়ন্নুপাধ্যায়ং দেবযানীঞ্চ ভারত। এই তোষণের চেষ্টা বর্ণনা করতে গিয়ে মহাভারত কতগুলি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করেছে। বলেছে— গুরু এবং গুরুকন্যা দু'জনকেই প্রীত করার চেষ্টা করছিলেন এই কচ— যিনি যৌবন নামক বস্তুটির নজরে এসেছেন, গোচর হয়েছেন কেবল— যুবা যৌবনগোচরে এবং দেবযানীকে তিনি তোষণ করার ভাবনা করছেন কখনও তাঁকে গান শুনিয়ে, কখনও নাচ দেখিয়ে আবার কখনও সুরলোকের সিদ্ধ বাদ্য-বাজনা বাজিয়ে— গায়ন্ নৃত্যন্ বাদয়ংশ্চ দেবযানীমতোষয়ৎ।

একজন যুবক পুরুষের দিক থেকে নয়, এমনকী এক যৌবনবতী রমণীর দিক থেকেও নয়, কিন্তু একজন তৃতীয় জনের দিক থেকে যদি দেখেন, তবে কচের এই প্রয়াস আপনার কাছে blatant লাগবে। আমার মনে আছে, আমি যখন বি. এ. ক্লাসে পড়ি, তখন একদিন একটা ক্লাস অফ হয়েছে এমন একটা ক্লাসরুমে চার-পাঁচজন মেয়ের সামনে দীপক সরকারকে টেবিল বাজিয়ে গান শোনাতে দেখেছিলাম। দীপক খুব ভালই গান করত এবং আমি জানতাম দীপক একটি বিশেষ মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতেও চাইত। সেদিনের ওই

চার-পাঁচটি মেয়ের মধ্যে তার ঈপ্সিতা রমণীটিও ছিল। আমি হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়ে অপ্রস্তুত হয়ে বসে পড়লাম একটা বেঞ্চিতে এবং দীপকের গান শেষ হতেই সে অন্য মেয়েদের অনুরোধ করতে লাগল গান শোনানোর জন্য। সে শর্ত দিল তারা কেউ গাইলেই সে তার দ্বিতীয় গান শোনাবে। অন্যেরা তেমন গান জানত না, অন্তত দীপকের মতো জানত না। তারা অবশেষে সেই মেয়েটিকেই পীড়াপীড়ি করতে লাগল, যাকে দীপক ঈষৎ পছন্দ করে ফেলেছিল। অনেক না-না, আমি ও-রকম পারি না, অন্যদিন হবে— ইত্যাদি বাহানার পরে সেও গাইল— আবার এসেছে আষাঢ়...।

এখানে দুটো জিনিস বলার আছে— দীপকের ব্যবহারিক প্রয়াসটা কিন্তু blatant ছিল না, সে তো একটি অপরিচিতা রমণীকে স্বানুকূল করতে চাইছিল প্রেমের জন্য। কচও সেই অনুকূলতা চাইছিলেন বটে, কিন্তু তা প্রেমের জন্য তো মোটেই নয়, নিছক তোষণের জন্য, তোষণ করে কার্যসিদ্ধির জন্য। এইজন্য এটাকে blunt বলছি, তা আরও বলছি এই কারণে যে, কচ সেটা জানেন। কচ জানেন— তিনি blatantly এটা করছেন কিন্তু দেবযানী সেটা জানেন না এবং একেবারেই সেটা বুঝতে পারছেন না। অসুর-দানবদের মধ্যে থাকতে থাকতে হঠাৎ এই সুরলোকের যুবক এসে উপস্থিত হল তাঁর পিতার কাছে। পড়াশুনো ব্রত-নিয়মের পাট চুকিয়েই সে দেবযানীর কাছে আসে, সে গান শোনায়, বাদ্যি বাজায় এবং নাচ দেখায়।

সামাজিক অভ্যস্ততার একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া সব সময়েই কাজ করে, সবার ভিতরেই করে। দিন-রাত অসুর-দানবের ক্রূর সংস্কৃতির মধ্যে যখন স্বর্গসমীরণের মতো কচ এসে দেবযানীর তোষণ করছেন নৃত্য-গীত-বাদ্যে, তখন এক যুবতী-হৃদয় সেগুলিকে নিছক তোষণ বলে বুঝতে পারে না। সে ভাবে, এত আয়োজন, পুরুষের এত প্রয়াস তো শুধু তারই হৃদয়-সংবাদের জন্য, সম্মতির জন্য। বারবার স্তুত-মুগ্ধ-যাচিত হতে হতে রমণীর হৃদয়েও এক অনুকূল প্রতিক্রিয়া আসে। আর কীই না করছেন কচ দেবযানীর মন পাবার জন্য— কখনও ফুল্ল বকুল ফুল কুড়িয়ে আনা, কখনও বন্য ফল, আর দেবযানী যখন যা বলছেন, সেই আজ্ঞা পালনে সদা-তৎপর বৃহস্পতি-পুত্র কচ— পুষ্পৈঃ ফলৈঃ প্রেষনৈশ্চ তোষয়ামাস ভারত। আরও দুটি শব্দ আছে মহাভারতের কবির। কচের সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন— যুবা যৌবন-গোচরে— অর্থাৎ এমন এক যুবা পুরুষ, যার ওপরে যৌবনের নজর পড়েছে কেবল। আর যে দেবযানীকে এই যৌবনগন্ধী তরুণ নানা উপচারে তুষ্ট করার চেষ্টা করছে, সেই মেয়েটিও সদ্য যৌবনে পা দিয়েছে— স শীলয়ন্ দেবযানীং কন্যাং সম্প্রতি-যৌবনাম্।

সদ্য যৌবনে উপনীত কন্যা শব্দটার মধ্যেও একটা কামনার অভিসন্ধি আছে, তার হৃদয়টুকু কমলকলির মতো স্ফুটনোন্মুখ হয়েই আছে, ফলত কচের দিক থেকে দেবযানীর জন্য যে আনুকূল্যময় তোষণ, ভজন, রঞ্জন চলছিল, তা একসময়ে দেবযানীর মনকে ভাসিয়ে দিল সমান অনুভূতিতে। পিতার শিক্ষাকালে নিয়মব্রতে কচের যে পরিশ্রম হত, যে পরিশ্রম হত দেবযানীর জন্য পুষ্প-ফলের অন্বেষণে, দেবযানী এখন যেন আর সেটা সইতে পারছেন না। আগে কচ দেবযানীর মন-ভোলানো গান গাইতেন, এখন দেবযানী কচকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিনোদিত করার জন্য গান গাইতে থাকেন আর যেটা করেন তার মধ্যে রমণীর ললনাসুলভ বিভঙ্গ আছে, অর্থাৎ তিনি এবার কচের মন ভোলাতে চাইছেন। তা নইলে মহাভারতের কবি এমন সাংঘাতিক একটা ক্রিয়াপদ ঘটমান বর্তমানে প্রয়োগ করতেন না— গায়ন্তী চ ললন্তী চ রহঃ পর্য্যচরত্তদা। সংস্কৃতে 'লল্' ক্রিয়ার অর্থ হল কামনা করা, ভীষণভাবে চাওয়া এবং কচের প্রতি এই কামনার প্রকাশ দেবযানীর দিক থেকে ঘটছে গোপনে, যেখানে অন্য লোক নেই— রহঃ পর্য্যচরত্তদা।

এত কথার সারমর্মে বুঝতে পারি— কচ দেবযানীর মন ভোলাতে চাইছেন শারীরিক পরিশ্রমে এবং নান্দনিক পরিচর্যায় কিন্তু তিনি নিজে ভুলছেন না। অথচ এতদিনে দেবযানীও পরিচর্যা পেতে পেতে কচের পরিচর্যার পরিশ্রম লাঘব করার চেষ্টা করছেন এবং নিজেও তাঁকে চাইতে আরম্ভ করেছেন মনে মনে, অর্থাৎ তিনি ভুলেছেন। মহাভারতের ঠিক এই জায়গায় গৌড়ীয় সংস্করণে একটি শ্লোক আছে, যা সব সংস্করণে নেই। এখানে দেখা যাচ্ছে— দেবযানীও তখন কচকে পাবার আশায়— ললন্তী— নির্জন স্থানে তাঁকে গান শোনাচ্ছেন অথবা নৃত্যগীতের পরিচর্যা দিচ্ছেন, সেখানে মহাভারত মন্তব্য করছে— যে-পুরুষ মেয়েদের কাছে ভাল গান গায়, পরিষ্কার বেশবাস করে, ভাল ভাল গিফট্ দেয়, সুন্দর কথা বলে এবং নিজেও যে বেশ ভাল দেখতে, তেমন পুরুষকে মেয়েরা নিশ্চয়ই চায়— গায়ন্তঞ্চৈব শুক্লঞ্চ দাতারং প্রিয়বাদিনম্। নার্য্যো নরং কাময়ন্তে। কচ খুব ঝকঝকে জামাকাপড় এবং অলংকার পরতেন কিনা, সে খবর মহাভারত দেয়নি, কিন্তু তিনি যে গান ভাল গাইতেন, ভাল কথা বলতে পারতেন এবং বিনা বাক্যে দেবযানীর অভীষ্ট পূরণ করার চেষ্টা করতেন, তার প্রমাণ তো আমরা পেয়েইছি। বাড়ির কাজের লোক যেভাবে আজ্ঞা পালন করে, তেমনভাবে আজ্ঞা পালন করলে— মহাভারত বলেছে 'প্রেষণৈঃ'— কোন রমণী সেই পুরুষের ওপর খুশি না হয়ে পারে! অতএব দেবযানীও এবার চাইতে আরম্ভ করলেন কচকে— গায়ন্তী চ ললন্তী চ।

মহাকাব্য জানিয়েছে এইভাবে নাকি পাঁচশো বছর কেটে গেল, যদিও মহাকাব্যের অতিশয়ী বর্ণনা বাদ দিয়ে এটুকু বলাই যায় যে, সময়টা অন্তত পাঁচ বছর হবেই। তবে এত বছরের এই ব্রহ্মচর্যের সাধন তার অনেকটাই অতিবাহিত হয়েছে দেবযানীর পরিচর্যায়, কেননা শুক্রাচার্যের নির্দিষ্ট মতে যদি এই ব্রহ্মচর্য পালিত হত, তা হলে কি আর একজন ব্রহ্মচারীর পক্ষে মিষ্টি মিষ্টি গান গেয়ে রমণীর মন ভোলানোর কাজটা সঠিক হত! কেননা গান গাওয়া, কিংবা সুদৃশ্য বেশ বাস ধারণ করা অথবা নির্জন স্থানে রমণীর সম্ভাষণ— এ সব তো ব্রহ্মচর্যের শাস্ত্র একেবারেই ওলটপালট করে দেয়। তবে হ্যাঁ, দেবযানীর পরিচর্যা করে কচ যে সুফল পেয়েছিলেন, হয়তো শুক্রাচার্যের অকুণ্ঠ সেবায় সেই ফল পেতে আরও দেরি হত। তার প্রমাণ মিলবে শিগগিরই।

শুক্রাচার্য এবং দেবযানী কেউই কিন্তু এখনও পর্যন্ত বোঝেননি যে, শুক্রগৃহে কচের আসার আসল কারণটা কী? কিন্তু দানব-অসুরেরা কচের অভীষ্টটুকু বুঝে গেল খুব তাড়াতাড়ি। বিশেষত দেবযানীর সন্তোষণে কচের বাড়াবাড়িটাই বোধহয় এই অভিলাষটুকু আরও ধরিয়ে দিল। দেবতার গুরু বৃহস্পতির ওপর দানবদের হাজার ক্রোধ আছে এবং

শুক্রাচার্যের সঞ্জীবনী বিদ্যাও যাতে সুরলোকে পাচার না হয়ে যায় এই ভাবনায় দানবেরা কচকে মেরে ফেলল— জঘ্নুর্বৃহস্পতের্দ্বেষাদ্ বিদ্যারক্ষার্থমেব চ। শুক্রাচার্য কিংবা দেবযানীকে কচের গোপন ইচ্ছেটা জানাবার সাহস ছিল না দানবদের। অতএব একদিন যখন শুক্রাচার্যের হোমধেনুটিকে চরাতে নিয়ে গেছেন বনের কাছে, তখন দানবরা কচকে মেরে তাঁর শরীর খণ্ড খণ্ড করে কেটে কুকুর দিয়ে খাইয়ে দিল।

এদিকে দিনান্তের সূর্য অস্ত গেল, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার আগেই আপন অভ্যস্তপদে শুক্রাচার্যের হোমধেনু এবং অন্যান্য গোরুগুলি ফিরে এল তাদের রক্ষক ছাড়াই— ততো গাবো নিবৃত্তাস্তা অগোপাঃ স্বং নিবেশনম্। গোরুগুলি সব ফিরে এল, অথচ কচ ফিরে এলেন না, এটা দেবযানীকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। পিতা শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে দেবযানী বললেন— পিতা! তোমার সায়ংকালীন হোম শেষ হয়ে গেল। সূর্যদেব অস্তাচলে চলে গেছেন, আমাদের গোরুগুলি সব ফিরে এসেছে রক্ষক ছাড়াই। পিতা! কোথাও কিন্তু কচকে দেখছি না— অগোপাশ্চাগতা গাবঃ কচস্তাত ন দৃশ্যতে। এতকাল এই দানবপল্লিতে আছেন দেবযানী, দানবদেরও তিনি হাড়ে হাড়ে চেনেন। কিছু একটা ঘটেছে এইরকম সন্দেহ এবং অনুমানে দেবযানী শুক্রাচার্যকে বললেন— আমি নিশ্চিত, কচকে কোথাও কেউ মেরে ফেলেছে, অথবা সে নিজেই মরে পড়ে আছে কোথাও। নইলে সে এখনও ফিরে আসছে না কেন? আমার একটা সার-সত্য কথা শোনো বাবা। আমি কিন্তু কচকে ছাড়া বাঁচব না— তং বিনা ন চ জীবেয়মিতি সত্যং ব্রবীমি তে।

এই প্রথম এবং সেটা অসম্ভব প্রত্যয়ী ভাষায় স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হল দেবযানীর প্রেম। বৃহস্পতির পুত্র কচকে তিনি কামনা করেন জীবনের সঙ্গী হিসেবে পাবার জন্য এবং সে কথা স্পষ্টভাবে তিনি ব্যক্ত করছেন পিতার কাছে— তাঁকে ছাড়া আমি বাঁচব না— তং বিনা ন চ জীবেয়ম্ ইতি সত্যং ব্রবীমি তে। আমরা এইসব কঠিন তর্কে এখন যাব না যে, এটা প্রেম নাকি মোহ, নাকি এইভাবে প্রেমের কথা সোচ্চারে জানানো যায় নাকি পিতার কাছে। আমরা শুধু এইটুকু বলব— মহাকাব্যের কালে তখনও প্রেম-ভালবাসার রবীন্দ্রীভবন বা রবীন্দ্রীকরণও ঘটেনি, প্রেমের ব্যাপারে নান্দনিক ব্যঞ্জনাও তখন সর্বত্র তত প্রকট নয়। ফলত পুরুষের মতো অনেক রমণীর মুখেও এই স্পষ্ট প্রেমোদ্গার খুব তাড়াতাড়ি শোনা যেত— যেমনটি দেবযানীর ক্ষেত্রে ঘটেছে।

পিতা শুক্রাচার্য তাঁর আদরের মেয়েটিকে চেনেন, অতএব দেবযানীর স্পষ্টোক্তিমাত্রেই তিনি বলেছেন— একটুও চিন্তা করিসনে মা! এই আমি সঞ্জীবনী মন্ত্রে ডাকছি কচকে। সে এখনই চলে আসবে। শুক্রাচার্য তাঁর সিদ্ধ সঞ্জীবন মন্ত্র উচ্চারণ করে কচকে ডাকলেন এবং কচ সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার প্রভাবে পূর্বোক্ত কুকুরগুলির পেট চিরে একাকার শরীরে বেরিয়ে এলেন শুক্র এবং দেবযানীর সামনে। তার মুখবর্ণ সজীব, মন প্রফুল্ল এবং হয়তো বা মনে-মনে ভাবছেন— এই সেই সঞ্জীবনী বিদ্যার স্পর্শ, যা তাঁকে আয়ত্ত করতে হবে।

কচ ফিরে আসার পর প্রথম প্রশ্ন করলেন দেবযানী, এবং অনুমান করি পিতা শুক্রাচার্য ততক্ষণে চলে গেছেন তাঁর অভিমানিনী কন্যার প্রথম শব্দ-উচ্চারণের জন্য। দেবযানী সরল প্রশ্ন করলেন— তুমি কেন এত দেরি করে এলে? কী হয়েছিল তোমার—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কস্মাচ্চিরায়িতোঽসীতি। কচ এবার ভার্গবী দেবযানীকে আদ্যন্ত জানিয়ে বললেন— কল্যাণী! আমি প্রত্যেক দিনের মতো আজও গুরুর হোমের জন্য সমিধ, কুশ, তোমার জন্য ফুল, রাঁধার জন্য শুকনো কাঠ— এসব সংগ্রহ করে আসছিলাম। এতক্ষণে ঘোরাঘুরি করে একটু পরিশ্রান্ত লাগছিল, তাই একবারটি বসেছিলাম বটবৃক্ষের ছায়ায়। এমনকী আমার সঙ্গে-যাওয়া গোরুগুলোও আমায় দেখে ইতস্তত এসে দাঁড়িয়ে ছিল সেই বটগাছের তলায়— গাবশ্চ সহিতাঃ সর্বা বৃক্ষচ্ছায়ামুপাশ্রিতাঃ। এবার হঠাৎই আমি দেখলাম— কতগুলি অসুর-দানব আমার কাছে এসে জুটল কোথা থেকে। তারা আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে আমি বললাম— আমি দেবগুরু বৃহস্পতির ছেলে, আমার নাম কচ— বৃহস্পতি-সুতশ্চাহং কচ ইত্যভিশ্রুতঃ। তারপর কী জানি কী হল জানি না, আমার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে দানবরা আমাকে ধরে মেরে, খণ্ড খণ্ড করে ছেঁচে খাইয়ে দিল কুকুরদের। তারপর তো এই গুরু আমায় আহ্বান করলেন তাঁর সিদ্ধ সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়ে, আমি কোনও মতে জীবন পেয়ে ফিরে এসেছি তোমার কাছে— ত্বৎসমীপম্ ইহায়াতঃ কথঞ্চিৎ প্রাপ্তজীবিতঃ।

কোনও রকমে জীবন ফিরে পেয়েছি, এই অনুভূতিটাই কচের কাছে বেশি মূল্যবান ছিল, নাকি বড় ছিল এই মনোহারী বিরহোত্তর সংযোজন— কোনওরকমে জীবন পেয়েই তোমার কাছে ফিরে এসেছি— ত্বৎসমীপমিহায়াতঃ কথঞ্চিৎ প্রাপ্তজীবিতঃ— এই কূট তর্ক ওঠেনি মহাভারতের শব্দপংক্তিতে। এই দুই মানব-মানবীর জীবন আবারও চলতে লাগল সেই পরিচিত ছন্দে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যেও সেই গান কিন্তু তখনও ছিল। আবারও একবার কচকে খুন করার চক্রান্ত হল। দেবযানী কচকে ফুল আনতে পাঠিয়ে ছিলেন বনে, দানবরা কচকে দেখে আবারও তাঁকে মারল। দেবযানী আবারও জানালেন পিতা শুক্রাচার্যকে, কচ আবারও বাঁচলেন শুক্রাচার্যের সঞ্জীবনী সাধনায়। কিন্তু তৃতীয় বার এই হত্যার মধ্যে কিছু বুদ্ধি-কৌশল মিশিয়ে দিল দানবরা। বার বার কচ বেঁচে ফিরে আসছেন— এটা দানবদের মোটেই সহ্য হচ্ছিল না।

তৃতীয় বারে দানবরা কচকে মেরে তাঁর শরীরটা পুড়িয়ে ফেলল। এবার সেই ভস্মীভূত শরীরের দগ্ধচূর্ণ শুক্রাচার্যের পানীয় সুরার সঙ্গে মিশিয়ে সেই সুরা তাঁকে পান করতে দিল। শুক্রাচার্য নির্দ্বিধায় সুরার সঙ্গে মিশ্রিত কচের দেহভস্ম পান করলেন— অপিবৎ সুরয়া সার্ধং কচভস্ম ভৃগূদ্বহঃ। সেকালের দিনে ব্রাহ্মণের পক্ষে সুরাপান একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। সুরাপান করলে সেই পাতকী ব্রাহ্মণ সমাজের চোখে একেবারে হেয়, ঘৃণ্য হয়ে যেতেন। কিন্তু অসুর-দানবদের নিশ্চিন্ত কৌশল দেখে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, শুক্রাচার্যের সুরাপানের অভ্যাস ছিল। বিশেষত তিনি তেজস্বী মানুষ, নানান উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী এবং থাকেন অসুর-দানবের রজোগুণী পরিবেশে। তাঁর এই সুরাপানের অভ্যাস হয়েছিল এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব এতটাই যে তাঁর জবাবদিহির প্রয়োজন ছিল না কারও কাছে। দানবেরা শুক্রাচার্যের পানীয় সুরায় কচের শরীরভস্ম মিশিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে রইল যে, শুক্রাচার্য কচকে নিজেই শেষ মৃত্যুর পথ দেখাবেন।

শুক্রাচার্য সুরাপান করলেন দানবদের পরিকল্পনামতো এবং সেদিনও সূর্য অস্ত গেল, সন্ধ্যার ঘনায়মান রক্ত-কৃষ্ণ অবচ্ছায়ায় গোরুগুলি ফিরে এল গোচারণক্ষেত্র থেকে অথচ

সেগুলির রক্ষক কচ সঙ্গে এলেন না— স সায়ন্তন-বেলায়াম্‌ অগোপা গাঃ সমাগতাঃ। কচের দেরি দেখে দেবযানীর মন আশঙ্কায় ভরে উঠল। তিনি আবারও পিতা শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে বললেন— পিতা! আমার কথা সব সময় শুনে চলে কচ। আজ আমি তাঁকে শুধু ফুল আনতে বলেছিলাম। কিন্তু তাতে তো এত দেরি হবার কথা নয়। আমার আবারও সন্দেহ হচ্ছে, হয় তাকে নিশ্চিত খুন করেছে, আর তা নইলে সে মারা গেছে। সে যা কিছুই হোক, পিতা! কচ যদি ফিরে না আসে, তা হলে আমি কিন্তু বাঁচব না— তং বিনা ন চ জীবেয়মিতি সত্যং ব্রবীমি তে।

শুক্রাচার্য ভাবলেন— আর বেশি কী হবে, অসুররা বোকার মতো আবারও কচকে মেরে ফেলেছে, আমি আবারও সঞ্জীবনী প্রয়োগ করব, কচ ফিরে আসবে আবার। শুক্রাচার্য সঞ্জীবনী মন্ত্রে আহ্বান করতে লাগলেন কচকে, কিন্তু অন্যান্য বারের মতো কচ কিন্তু ফিরে এলেন না। শুক্রাচার্য ভাবলেন কচ বোধহয় নিজে নিজেই কালপ্রাপ্ত হয়ে মারা গেছেন। তিনি দেবযানীকে বোঝানোর চেষ্টা করে বললেন— বৃহস্পতির পুত্র কচ বোধহয় মারাই গেছে। আমি তো বার বার সঞ্জীবনী বিদ্যায় তার জীবন বাঁচিয়েছি, কিন্তু অসুরেরা তাকে মেরে ফেলছে, এ অবস্থায় আর কী করতে পারি বলো— বিদ্যয়া জীবিতোঽপ্যেবং হন্যতে করবাম কিম্‌।

পিতা শুক্রাচার্যের কথা শুনে দেবযানীর মন শোকে ভারাক্রান্ত হল, চোখ দিয়ে জল পড়ল ঝর ঝর করে। শুক্রাচার্য অসহায়ভাবে বললেন— দেবযানী তুমি এইভাবে শোক কোরো না, এমন করে কেঁদো না তুমি, তুমি অসুরগুরু শুক্রাচার্যের মেয়ে এবং এই দার্শনিক বোধ তোমার থাকাই উচিত যে, মরণ তো একদিন আসবেই মানুষের, অতএব কেঁদো না তুমি— মৈবং শুচো মা রুদো দেবযানি/ ন ত্বাদৃশী মর্ত্যমনুপ্রশোচতে। শুক্রাচার্য এবার দেবযানীকে একটু মর্যাদা দিয়ে বললেন— তা ছাড়া তোমার ক্ষমতা কি কম? স্বর্গের দেবতারা, মর্ত্যের ব্রাহ্মণেরা, অসুরেরা তো বটেই, সবাই তোমাকে কত সম্মান করে। সেখানে তুমি এই একটা সাধারণ মানুষের জন্য এত কাঁদলে শোভা পায় না। আর তুমি তো এটাও বুঝতে পারছ যে, এই ব্রাহ্মণকে বাঁচিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে, যতবার তাকে বাঁচিয়ে তুলছি, তুমি দেখছ তো অসুররা তাকে মেরে ফেলছে। আমি আর কী করতে পারি— অশক্যোঽসৌ রক্ষয়িতুং দ্বিজাতিঃ/ সঞ্জীবিতো বধ্যতে চৈব ভূয়ঃ।

পিতার কথায় এবং এই মানসিক বিপন্নতার সময়ে পিতার এই দার্শনিকতায় দেবযানী বেশ বিরক্ত হলেন। কচ তাঁর যৌবনস্নিগ্ধ হৃদয় এতটাই অধিকার করেছেন যে, তিনি শুধু তাঁর সম্মান নিয়ে চিন্তিত নন, কচের আত্মসম্বন্ধে তিনি বুঝি এখন তাঁর শ্বশুরকুলের সম্বন্ধেও ভাবতে আরম্ভ করেছেন। দেবযানী বললেন— ঋষিবৃদ্ধ অঙ্গিরা কচের পিতামহ এবং মহাতপস্বী বৃহস্পতি এই কচের পিতা। সে একজন ঋষির পৌত্র এবং একজন ঋষির পুত্র— এই রকম একটা মান্য মানুষের জন্য আমি শোক করব না, আমি কাঁদব না তার জন্য— কথং ন শোচেয়মহং ন রুদ্যাম্‌। মুহূর্তের এই মর্যাদার জগৎ বিগলিত হয়ে মিশে গেল দেবযানীর ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে।

দেবযানী বললেন— কচ এখানে ব্রহ্মচারীর ব্রত ধারণ করে তপস্যা করেছে, সব সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে দেখে মনে হয়েছে যেন আমার সমস্ত ইচ্ছা পালনের জন্য সে পায়ের আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এমন কোনও কাজও বোধহয় নেই যা সে জানে না— যদোত্থিতঃ কর্মসু চৈব দক্ষঃ। আর আমার নিজের কথা বলি, একান্ত নিজের মনের কথা, পিতা আমার! কচ যে কী ভীষণ সুন্দর যতটা সুন্দর ততটাই বিদ্বান। কচকে আমি ভালবাসি, পিতা! কচ যদি ফিরে না আসে, তবে আমিও তার মৃত্যুপথের যাত্রী হব— কচস্য মার্গং প্রতিপৎস্যে ন মোক্ষ্যে/ প্রিয়ো হি মে তাত কচোঽভিরূপঃ।

সেকালের দিনে, সেই মহাকাব্যের কালেও একটি যুবতী রমণী তার পিতার সামনে তার ভালবাসার লোকের সম্বন্ধে বলছে— কচ যে ভীষণ সুন্দর পিতা! তাকে আমি ভালবাসি— প্রিয়ো হি মে তাত কচোঽভিরূপঃ— অভীষ্ট পুরুষের জন্য একটি রমণীর মুখে প্রিয়ত্বের এই স্পষ্টোক্তি আর বেশি শুনেছি বলে মনে হয় না। হ্যাঁ, মহাভারতে আরও দু-চারজন রমণীর মুখে কামনা, এমনকী ঈষদীষৎ যৌনতার কথাও শুনেছি, কিন্তু কামনার সঙ্গে প্রিয়ত্বের এই বিমিশ্রণ— কচ যে ভীষণ ভীষণ সুন্দর, পিতা! তাকে আমি ভালবাসি— প্রিয়ো হি মে তাত কচোঽভিরূপঃ— দেবযানীর মুখে এই আত্মসমর্পণের কথা পিতা শুক্রাচার্যকে যেন এই মুহূর্তে আরও অসহায় করে তোলে।

ক্রোধের সঙ্গে ক্ষোভ মিশিয়ে শুক্রাচার্য বললেন— অসুর-দানবেরা নিশ্চয়ই আমার ওপর বিদ্বেষ পোষণ করে, নইলে এমনটা হবে কেন যে, তারা বারবার আমার এই নিরপরাধ শিষ্যটাকে মেরে ফেলছে। আমার প্রতি এই প্রতিকূল আচরণ ওদের ধ্বংস করে ছাড়বে আমি জানি। কিন্তু অসুর-দানবের ধ্বংসে দেবযানীর কিছু যায় আসে না, তিনি পিতাকে আবারও বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন কচকে বাঁচানোর জন্য। শুক্রাচার্য পুনরায় সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রয়োগ করলেন এবং সেই বিদ্যার প্রভাবে কচের প্রথমে সংজ্ঞালাভ ঘটল, কিন্তু গুরুর উদরের মধ্যে আছেন বলেই বেশ ভয় পেলেন, কেননা গুরু তাঁকে আহ্বান করছেন বিদ্যা প্রয়োগ করে, এই অবস্থায় শুধুমাত্র সূক্ষ্ম চৈতন্যময় লিঙ্গদেহ থেকে শরীর ধারণ করলেই তো গুরু মারা পড়বেন, সেখানে উদরের বাইরে গেলে তো গুরুকে চিরতরের জন্য শেষ করে দেওয়া। অতএব কচ অতীব সংকোচে ধীরে ধীরে গুরুকে জানালেন— গুরুদেব! আপনি আমার কাছে ভগবানের মতো। আমি কচ, আপনার প্রসন্নতা ভিক্ষা করে বলছি— লোকে যেভাবে পুত্রকে সমাদর করে আপনি আমাকে সেইভাবেই ভাবুন— যথা বহুমতঃ পুত্রস্তথা মন্যতু মাং ভবান্।

ঠিক এই জায়গাটায় প্রসিদ্ধ টীকাকারেরা অনেকেই শব্দের মানে বলে সংস্কৃত শব্দের প্রতিশব্দ উচ্চারণ করে গেলেন, কিন্তু কচ কেন হঠাৎ— আমাকে আপনার পুত্রের মতো ভাবুন— এই কথাটা বললেন, তার গূঢ়ার্থ কেউ বললেন না। আসলে পূর্বশ্লোকে বলা হয়েছে— কচ শুক্রাচার্যের জঠরের মধ্যেই সংজ্ঞা লাভ করে গুরু শুক্রাচার্যের উদ্দেশে বললেন— বিদ্যাবলাল্লব্ধমতির্মহাত্মা/ শনৈর্বাক্যং জঠরে ব্যাজহার। এখানে দুটি অর্থ আছে। প্রথমত একটি শিশু যেহেতু মাতৃজঠরেই বৃদ্ধি লাভ করে, সেই জঠরেই সংজ্ঞা লাভ করে এবং সে পুত্র নামে চিহ্নিত হয়, কচ সেই অর্থে শুক্রাচার্যের উদর-জঠরে আছেন বলেই তিনি পুত্রের সংজ্ঞা লাভ করতে পারেন। এতদিন বিদ্যার জন্য সাধনা করার পর কচ সেই

পুত্রের নৈকট্য আশা করছেন গুরুর কাছ থেকে। দ্বিতীয় অর্থটা আমাদের বিদ্যালাভের পরম্পরার কথা। উপনয়নকালে গায়ত্রী দীক্ষার সময় গুরু-আচার্য যে মন্ত্র দেন শিষ্যের কানে, সেই মুহূর্তেই গুরু তাঁকে আপন বিদ্যাগর্ভে স্থান দেন; বলা হয়— অন্তত তিন রাত্রি গুরু তাঁর শিষ্যকে গর্ভে ধারণ করেন। আমরা বিশ্বাস করি— কচের অভীষ্ট বিদ্যালাভের সময় এসেছে, অতএব যে ভাবেই হয়ে থাকুক গুরু শুক্রাচার্য কচকে আপন জঠরে ধারণ করে আছেন বিদ্যাদানের প্রাক্ মুহূর্তে।

আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে ফিরে আসি। কচের কথা শুনে শুক্রাচার্য আশ্চর্য হয়ে বললেন— সবই বুঝলাম, কচ! বুঝলাম তুমি আমার জঠরে আছ, কিন্তু কোন পথে তুমি আমার জঠরে গিয়ে প্রবেশ করলে, কেমন করেই বা তুমি আমার উদরে বাস করছ— তমব্রবীৎ কেন পথেনোপনীত/ ত্বং চোদরে তিষ্ঠসি ব্রূহি বিপ্র— বলো তুমি এই রহস্য, আমি আজই অসুরদের ধ্বংস করে দেবতাদের পক্ষে যাব। কচ বললেন— গুরুদেব! আপনার কৃপায় আমার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়নি, অতএব সব ঘটনাই আমি স্মরণ করতে পারছি— তব প্রসাদান্ন জহাতি মাং স্মৃতিঃ/ স্মরামি সর্বং যচ্চ যথা চ বৃত্তম্— আর আমার এতদিনের তপস্যার ফলটুকুও নষ্ট হয়ে যায়নি, ফলে এই স্বল্পপরিসর জঠরের মধ্যে থাকার কষ্টও আমার অসহ্য হয়ে ওঠেনি। কচ এবার আনুপূর্বিক সব বললেন— কীভাবে অসুরেরা তাঁকে মেরে, পুড়িয়ে তাঁর ভস্মচূর্ণ পানীয় সুরার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে— সব এক এক করে বললেন শুক্রাচার্যকে।

এমনটা ভাবতেই পারেন যে, আমরা দেবযানীর চরিত্র-ভাবনার প্রতিজ্ঞাত হয়েছি, আমরা কেন এই কচ-শুক্রাচার্য-সংবাদ বসে বসে শুনতে যাব। উত্তরে জানাই— কচের জীবনের জন্য দেবযানীই কিন্তু শেষবারের মতো প্রার্থনা করেছিলেন পিতার কাছে এবং এখনও যে সংলাপ চলছে, তার সঙ্গেও দেবযানীর বর্তমান ভীষণভাবে জড়িত। কচের মুখে তাঁর জঠরবাসের কাহিনি শুনে শুক্রাচার্য এবার ঘুরে তাকালেন দেবযানীর দিকে। বললেন— বলো দেবযানী! কীভাবে আমি তোমার প্রিয় কার্যটুকু করতে পারি— কিং তে প্রিয়ং করবাণ্যদ্য বৎসে। দ্যাখো, কচ বেঁচে ফিরতে পারে, কিন্তু তাতে আমি মারা যাব, কেননা আমার জঠর ভেদ করেই তাকে বেরোতে হবে, তা না হলে কচের দেখা পাবে না তুমি— দৃশ্যেৎ কচো মদ্গতো দেবযানি।

সত্যি বলতে কী, শুক্রাচার্যের মতো পিতার সন্ধান সেকালের শাস্ত্র-কাব্যে পাওয়া যাবে না। মাতৃহারা এই কন্যাটিকে হয়তো তিনি অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়েছেন, কিন্তু এমন করে একটি মেয়ের জন্যই বা ক'জন পিতা ভাবেন। তাঁর মেয়ে একেবারে শত্রুপক্ষের আচার্য-পুত্রকে ভালবেসে ফেলেছে, তাঁকে বাঁচানোর জন্য আজকে তিনি নিজের জীবনটাও বিসর্জন দিতে পারেন। দেবযানীকে বলেছেন— আমি মরলেই তবে কচ বাঁচবে, আর কোনও উপায় নেই— বধেন মে জীবিতং স্যাৎ কচস্য। দেবযানী অসাধারণ উত্তর দিয়েছেন এই কথার, কেননা মরণের সমস্যা না হলেও অনেক গৃহস্থ-ঘরের মেয়েরই এই সমস্যা হয়, হয়তো বা সেটা 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি'র সমস্যা, অথবা প্রিয়তম মাতাপিতার প্রিয়ত্বের সঙ্গে অভীষ্ট প্রিয়তম পুরুষের বৈকল্পিক প্রিয়ত্বের সমস্যা। এসব ক্ষেত্রে মেয়েরা যেটা বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটা দেবযানীও বলেছেন, কিন্তু এসব ক্ষেত্রে পিতামাতারা অনেক ক্ষেত্রেই যা করেন না, শুক্রাচার্য সেটা করেছেন।

দেবযানী বললেন— পিতা! তোমার মৃত্যু এবং কচের মৃত্যু— এই দুই মৃত্যুর যে কোনও একটিই আমার হৃদয়কে আগুনের মতো পুড়িয়ে মারবে— দ্বৌ মাং শোকাবগ্নিকল্পৌ দহেতাম্। কেননা, আজকে কচ যদি মারা যায়, তবে আমার জীবনে সুখ-শান্তি বলে কিছু থাকবে না, আর তুমি যদি আজ মারা যাও, তা হলে আমি বাঁচব কী করে আর— কচস্য নাশে মম মর্ম নাস্তি/ তবোপঘাতে জীবিতুং নাস্মি শক্তা। শুক্রাচার্য দেবযানীর অন্তর অনুধাবন করলেন, কন্যার অন্তর বুঝে তিনি যে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিলেন, এক কথায়, তা অনবদ্য। এটা যদি গল্প হিসেবেও নিই, তা হলেও এমন উপন্যাসোপম গল্প লেখা হয়েছে কিনা সন্দেহ। আর যদি এটা খানিক অলৌকিক সিদ্ধির নিরিখেও দেখি, তা হলে শুক্রাচার্যকে সেই কালের বুদ্ধিমত্তম আচার্য হিসেবে স্বীকার করে নিতে হবে, কেননা আগামী দিনের জীবন্ত বাস্তব বুঝে নিয়ে আগামী প্রজন্মের অনুকূলে যাওয়াই শুধু নয়, সম্পূর্ণ অনহংবাদিতায় এমনতর এক বুদ্ধির উদ্ভাবন তিনি করেছেন যাতে শিষ্যের জীবন তাঁর কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে এবং সেটা নিজের থেকেও অধিক।

আপন জঠরে লব্ধসংজ্ঞ কচের উদ্দেশে শুক্রাচার্য বললেন— ওহে বৃহস্পতির পুত্র কচ! তুমি তপস্যায় সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করেছ, যেহেতু দেবযানীকে তুমি সন্তুষ্ট করতে পেরেছ বলে দেবযানীও আজ তোমাকে সেইভাবেই পছন্দ করে ফেলেছে— সংসিদ্ধরূপোঽসি বৃহস্পতেঃ সুত/ যত্ত্বাং ভক্তং ভজতে দেবযানী। আমার একান্ত-লব্ধ এই সঞ্জীবনী বিদ্যা তুমি লাভ করো, তুমি যদি নিতান্তই ইন্দ্ররূপী কচ না হয়ে শুধুই বৃহস্পতির পুত্র কচ হও, তা হলে গ্রহণ করো এই বিদ্যা। অবশ্য এত কথাই বা বলছি কেন, ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারও পক্ষে আমার পেট থেকে বেরিয়ে আসাও সম্ভব নয়, তুমি গ্রহণ করো এই বিদ্যা— বিদ্যামিমাং প্রাপ্নুহি জীবনীং ত্বং/ ন চেদিন্দ্রঃ কচরূপী ত্বমদ্য।

এই শ্লোকটা একটু না আলোচনা করলে শুক্রাচার্যের মানসলোকও স্পষ্ট হয় না, স্পষ্ট হয় না দেবযানী এবং কচের ভাবনাও। আমরা যারা প্রথম থেকে ভাবছিলাম— শুক্রাচার্য বিপক্ষ দেবতাদের অভিসন্ধি এতটুকুও বুঝতে পারেননি, এবং তিনি তাদের ছলনায় অভিভূত, তারা ভুল ভাবছিলাম। ওই একটি মাত্র শব্দ— ওহে বৃহস্পতির ছেলে— এই সম্বোধনের মধ্যে যেমন শুক্রাচার্যের উদার হৃদয়ের আভাসটুকু স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তেমনই— তুমি যদি ইন্দ্ররূপী কচ না হও— এই শব্দগুলিই স্পষ্ট বলে দেয় শুক্রাচার্য ইন্দ্রের ছলনাটুকু জানেন এবং ইন্দ্র নন বলেই, শুধু কচ হওয়ার জন্যই আজ তিনি বিদ্যা লাভ করতে পারছেন। কেননা কচের তপস্যা, সাধনা এতটাই যে, গুরুর সঙ্গে সঙ্গে গুরুর মেয়ে দেবযানীর মতো প্রায় অসন্তোষ্যা রমণীকেও তিনি পরম নমনীয়তায় এতটাই বশ করে ফেলেছেন যে, সে তাকে চাইতে আরম্ভ করেছে। দ্বিতীয়ত, শিষ্যের পক্ষে ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠার এই তো সেই বিরলতম মুহূর্ত যেখানে গুরু তাঁকে অঙ্গীকার আত্মসাৎ করে নিজের সিদ্ধিগর্ভে স্থাপন করেন এবং আপন তেজ আধান করেন শিষ্যের মধ্যে। শুক্রাচার্য আজ সম্পূর্ণ অঙ্গীকৃত শিষ্যের মধ্যে বিদ্যার আধান করছেন। পরিস্থিতি যে রকম তৈরি হয়েছে, তাতে তাঁর নিজের

মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। শুক্রাচার্য তাই আপন গর্ভস্থ কচের বেঁচে ওঠার মধ্যে গর্ভমুক্ত শিষ্যের পুত্রসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করে বলছেন— তোমাকে যেমন করে আমি বাঁচিয়ে তুলছি, এই দেহ থেকে বেরিয়ে গর্ভমুক্ত হওয়ার পর তুমিও তেমনই আমার পুত্র হয়ে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়ো— পুত্রো ভূত্বা ভাবয় ভাবিতো মাম্/ অস্মদ্দেহাদুপনিষ্ক্রম্য তাত। দেখো, যেন ধর্মের দিকে তোমার দৃষ্টি থাকে। মনে রেখো, তুমি কিন্তু আমারই প্রদত্ত বিদ্যার বলে বিদ্বান হবে, এই অবস্থায় তোমার যেন সেই ধর্মবতী ভাবনা থাকে যে, আমাকেও তুমি বাঁচিয়ে রাখবে।

এই মুহূর্তে শুক্রাচার্যের কথা শুনে মনে হবে যেন তিনি নিজের জীবন নিয়ে ভাবছেন। আমরা তা মনে করি না। বরঞ্চ প্রাচীন শিক্ষার এই গৌরব ছিল যে, বিদ্যাবংশ টিকিয়ে রাখতে হবে। আমাদের কী হয়, আমরা যাঁদের কাছ থেকে বিদ্যা লাভ করেছি, তাঁদের ভুলে যাই। গুরু কিন্তু শিষ্যের মধ্যে বেঁচে থাকতে চান, ঠিক যেমন মাতাপিতা পুত্রকন্যার মধ্যে। বিদ্যা লাভ করার পর অধীত বিদ্যা শ্রদ্ধাঞ্জলির মতো ফিরিয়ে দিতে হয় গুরুকেই। আজ শুক্রাচার্যের কাছে সেই সংকট এসেছে যে, তাঁরই উদ্ভাবিত বিদ্যা তাঁর বিপক্ষীয় শক্তির কাছে চলে যেতে বসেছে, সেই বিদ্যার মূলস্থান যাতে নষ্ট না হয়, শুক্রাচার্য সেটা সাবধান করছেন কচকে।

গুরু শুক্রাচার্যের কাছ থেকে সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করে কচ তাঁর উদর ভেদ করে বাইরে বেরোলেন হিম-তুষারের আবরণহীন চাঁদের মতো সুন্দর হয়ে— ভিত্ত্বা কুক্ষিং নির্বিচক্রাম বিপ্রঃ/ শুক্লাত্যয়ে পৌর্ণমাস্যামিবেন্দুঃ। কচ সঞ্জীবিত হয়েই দেখলেন— তার গুরু শুক্রাচার্য মৃত পড়ে আছেন, অধ্যাত্ম জ্ঞান আর ব্রহ্মভাবনা যেন ছিন্নমূর্তি হয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে সেখানে। কচ সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জীবনী বিদ্যায় অভিমন্ত্রিত করলেন গুরুর শরীর এবং শুক্রাচার্য পুনরায় পূর্বরূপে দাঁড়ালেন কচের সামনে। অভীষ্ট পুরুষ এবং পরম প্রিয় পিতা— দু'জনেই জীবিত হয়ে উঠলে দেবযানীর কী প্রতিক্রিয়া হল, এই মুহূর্তে মহাভারতের কবি তা লেখেননি। তাঁর কাছে এখন অনেক বড় হয়ে উঠেছে— গুরু-শিষ্যের সেই বিদ্যা-পরম্পরা, যেখানে নিতান্ত শত্রুপক্ষের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কচের মুখ দিয়ে কী নির্মল শ্রদ্ধা ধ্বনিত হচ্ছে শুক্রাচার্যের জন্য। যাঁরা ভাবছিলেন, যেমনটা অসুররাও ভাবছিল হয়তো যে, কচ একবার গুরুর উদর ভেদ করে বেরিয়ে আর কেন গুরুকে বাঁচাবেন, তাঁরা দেখলেন— সঞ্জীবিত গুরু শুক্রাচার্যের সামনে দাঁড়িয়ে কচ বললেন— আপনার মতো মানুষ, যিনি আমার মতো বিদ্যাশূন্য ব্যক্তির কানে অমৃতের তুল্য বিদ্যার উচ্চারণ করেছেন— যঃ শ্রোত্রয়োরমৃতং সন্নিষিঞ্চেদ্। বিদ্যাম্ অবিদ্যস্য যথা ত্বমার্য্যঃ— সেই আপনাকে আমি আমার পিতা এবং মাতা বলে মনে করি। বিদ্যা দান করে আপনি যে উপকার করেছেন, আমি তাঁর কোনও অপকার করতে পারি না। কারণ আমি জানি যে, গুরুর কাছে বিদ্যা শিখে তার আদর যে করে না, ইহলোকে-পরলোকে কোথাও তাঁর ঠাঁই নেই।

শুক্রাচার্য পরম প্রীত হলেন কচের ভাবনায়। প্রথমত তাঁর রাগ হল নিজেরই ওপর— কেন তিনি সুরাপান করেছিলেন, যাতে জ্ঞানী মানুষেরও জ্ঞান নষ্ট হয়। শুক্র প্রথমত ব্রাহ্মণের সুরাপান সর্বৈব নিষিদ্ধ করলেন, আর দানব-অসুরদের ডেকে বললেন— তোমরা ভীষণ রকমের বোকা। কচ এখন সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করেছেন, অতএব তিনি আমারই মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভাবশালী হয়ে উঠেছেন। তোমরা তাঁর কোনও ক্ষতি করার চেষ্টা কোরো না। কেননা তিনি এখনও কিছুদিন থাকবেন আমার কাছে। কচ পূর্বে গুরুর কাছে এসে বলেছিলেন— আমি হাজার বছরের ব্রত ধারণ করছি আপনার কাছে শিক্ষা লাভের জন্য। সেই মতো তিনি বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করা সত্ত্বেও আরও বেশ কিছুদিন থেকে গেলেন গুরুর আশ্রমে। গুরুর কাছে বিদ্যা এবং বিনয়— দুই শিক্ষাই সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পর এবার গুরুর কাছ থেকে বিদায় নেবার পালা এল। শুক্রাচার্য কিন্তু সানন্দ মনে কচকে স্বর্গলোকে ফিরে যাবার অনুমতি দিলেন। কচ এবং তাঁর মেয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছিল, সেটা তাদের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার ভেবে নিয়েই একবারও কিন্তু সেই বিষয়ে কথা বললেন না। গুরু শুক্রাচার্যের অনুমতি লাভ করে কচ দেবলোকে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন— অনুজ্ঞাতঃ কচঃ গন্তুমিয়েষ ত্রিদশালয়ম্।

এই সম্পূর্ণ ঘটনা এবং তার প্রতিবেদনের মধ্যে এটা এতক্ষণ নিশ্চয়ই একটা লক্ষ করার মতো বিষয় ছিল যে, কচ কিন্তু অনেক নেচে-কুঁদে, গান গেয়েও দেবযানীর ব্যাপারে মানসিকভাবে খুব একটা 'ইনভলবড' হননি, কেননা তিনি ঠিক করেই নিয়েছেন যে, সঞ্জীবনী মন্ত্র লাভের জন্য তাঁকে এই নান্দনিক কাজগুলি করতে হবে। আরও খেয়াল করার মতো মুহূর্তটি হল— বিদ্যালাভের পর তাঁর গুরুর সামনে তাঁর হৃদয়ের উদার বিস্ফোরণ— আমার মতো বিদ্যাহীন শিষ্যের কানে আপনি অমৃতের মতো বিদ্যা সিঞ্চন করেছেন— যঃ শ্রোত্রয়োরমৃতং সন্নিষিঞ্চেদ্/ বিদ্যামবিদ্যস্য যথা ত্বমার্যঃ। আপনি আমাকে নতুন জন্ম দিয়েছেন পিতামাতার মতো, আপনাকেই আমি আমার পিতা এবং মাতা মনে করি একাধারে— তং মন্যেঽহং পিতরং মাতরঞ্চ। বিদ্যা-দীক্ষার পর এই যে কচের 'বিশদীভূত মনোমুকুর', এখানে শুধু নবলব্ধ পরম জ্ঞানের ছায়া পড়ে, এখানে কোনও রমণীর মুখের ছায়া নেই।

ঠিক এইখানে দানবগুরু শুক্রাচার্যের ভাবটুকুও দেখার মতো। যে-তিনি দেবযানীর প্রতি কচের ভক্তিনম্রতা এবং প্রিয়তোষণে খুশি ছিলেন, বারবার দেবযানীর অনুরোধেই যে-তিনি কচের প্রাণ বাঁচিয়েছেন এবং শেষ বার নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁকে বাঁচানোর সময় যে-শুক্রাচার্য কারণ দেখিয়েছেন এই বলে যে, 'কী আর করব, দেবযানীর ভক্ত তুমি এবং তোমাকে যেহেতু দেবযানীও ভজনা করে— যত্বাং ভক্তং ভজতে দেবযানী— তাই তুমি লাভ করো এই সঞ্জীবনী বিদ্যা— সেই তিনি শুক্রাচার্য আজ কিন্তু একবারও কচকে বিদায়-অনুমতি দেবার সময় বললেন না দেবযানীর সঙ্গে দেখা করে যেতে, অথবা তাঁর হৃদয়-ঘটিত সূক্ষ্ম-মধুর ব্যাপারটুকুর ওপর সঠিক যত্ন নিতে। হয়তো বা এই দুই যুবক-যুবতীর প্রেম-ব্যবহারে তিনি নিশ্চিন্তও ছিলেন খানিকটা, ভেবেছিলেন হয়তো যে, এ-ব্যাপারে দেবযানী নিজেই যথেষ্ট, তাঁকে আর আগ বাড়িয়ে বাড়তি কিছু করতে হবে না। ফলত গুরুর কাছে বিদ্যা লাভ করে কচ যেরকম কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়েছিলেন, স্বয়ং শুক্রাচার্যও কিন্তু উপযুক্ত শিষ্যকে বিদ্যা দান করে পরম আহ্লাদিত হয়েছেন। দানবদের কাছে তিনি এমন কথাও বলেছিলেন গৌরবে যে, আজ কচ কিন্তু বিদ্যা লাভ করে আমার মতোই প্রভাবসম্পন্ন— সঞ্জীবনীং প্রাপ্য বিদ্যাং মহাত্মা/ তুল্যপ্রভাবো ব্রাহ্মণো ব্রহ্মভূতঃ। হয়তো

শিষ্যগৌরবে এতটা গৌরবান্বিত হয়েই তিনি যেন কচ-দেবযানীর স্বতঃসিদ্ধ ঘনিষ্ঠতায় আর পৃথক নির্দেশ দেওয়া সমীচীন মনে করেননি। মহাভারতে কচ এই সুবিধে এবং সুযোগ দুটোই পেয়ে রইলেন। তিনি গুরুর অনুমতি লাভ করে সুরলোকে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিলেন।

আমরা কিন্তু এখন সেই নান্দনিক মুহূর্তে উপনীত, যেখানে সুরগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচের মানসে বাংলার কবিগুরুর হৃদয়-স্পর্শ লেগেছে। কচ এসেছেন দেবযানীর কাছে বিদায় প্রার্থনা জানাতে— "দেহো আজ্ঞা, দেবযানী, দেবলোকে দাস/ করিবে প্রয়াণ। আজি গুরুগৃহবাস/ সমাপ্ত আমার।" মহাভারতে আমরা কচের এই শেষ সৌজন্যটুকু দেখতে পাই না। শুক্রাচার্যের কাছে শেষ বিদায় নিয়ে নিয়ে তিনি সুরলোকে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, অথচ একবারের তরেও এই আশ্রমের বীতকাল সহবাস-পরিচয়গুলি অথবা এতকাল যাঁকে নৃত্য-গীত-বাদ্যে পরিতুষ্ট করার চেষ্টা করেছেন, এবং যাঁর অনুরাগে তিনি বেঁচে আছেন, তাঁর কথা বা অন্য কোনও কিছু তিনি মনে আনছেন না। বস্তুত মহাভারত কচকে সেই পৌরুষেয়তা বা 'মেল হায়ারারকি'র আকরিক স্তরে রেখেই কচের বিবরণ দিচ্ছে, যেখানে কচ দেবকার্য সিদ্ধ করতে এসেছেন। সেই প্রয়োজন মিটেছে, বিদ্যা লাভ হয়েছে এবং বিদ্যার গৌরবে তিনি ফিরে যাচ্ছেন। দেবযানীর কাছে তিনি একবারও আসেননি এবং এই আকরিক স্তরে মহাভারতে তিনি যেভাবে বর্ণিত, তাতে দেবযানী বলে যে তাঁর জীবনে এতকাল কেউ ছিল, এটা তিনি মনেও আনতে চাননি অথবা মনে রাখতেই চাননি।

যে বিদ্যার গৌরব নিয়ে কচ মহাভারতে উপস্থিত, রবীন্দ্রনাথ সেটার উল্লেখ করছেন গৌণতর স্নিগ্ধতায় এবং তাও সরাসরি দেবযানীর সামনে এবং তাঁকে খানিকটা মহিমান্বিত করেই যেন— আশীর্বাদ করো মোরে/ যে বিদ্যা শিখিনু তাহা চিরদিন ধরে/ অন্তরে জাজ্বল্য থাকে উজ্জ্বল রতন...। এখানে দেবযানী কাঙ্ক্ষিত আশীর্বাদটুকু করলেন না বটে, কিন্তু বেশ একটু গুরুকন্যার ভঙ্গিমাতেই— তা বেশ, তা বেশ, "মনোরথ পুরিয়াছে,/ পেয়েছ দুর্লভ বিদ্যা..." ইত্যাদি শুভেচ্ছার পরেই স্বপ্রসঙ্গে এসেছেন— আর-কিছু নাহি কি কামনা,/ ভেবে দেখো মনে মনে। কচ বলেছিলেন— আর কিছু নাহি।

বস্তুত মহাভারতে যা আছে, সেটাকে আকরিক স্তর থেকে নান্দনিক স্তরে নিয়ে যাবার জন্য কচকেই প্রথমে দেবযানীর কাছে নিয়ে আসার এই যে মুখবন্ধ, এটাই কচ-দেবযানী সংবাদের গহন পারস্পরিকতা তথা নান্দনিক বিদায়ের সুর বেঁধে দিয়েছে রবীন্দ্রনাথে। কিন্তু মহাভারত এ রকম নয়, মহাভারতে শত শত মানুষের মহাকাব্যিক চরিত্রোন্মেষ ঘটে কঠোর বাস্তবতায়। এক-একটা চরিত্রকে সে সমাজের জটিল মানসলোক থেকে তুলে আনে এবং দেখিয়ে দেয়, এমন মানুষ কিন্তু আছে দুনিয়ায় এবং সে এইভাবেই চলে; শুধু তাই নয়; এইরকম মানুষ একটা দেখছ মানে কিন্তু আরও হাজারটা এইরকম আছে। আর সত্যি বলতে কী, আমি আমার এই জীবনেই এ রকম বহু সহাধ্যায়ী এবং অন্য যুবক-যুবতী দেখেছি— যেখানে ছেলেটি একটি মেয়েকে ভুলিয়ে তার পিতার কাছে পৌঁছেছে, মাস্টারমশাই পিতার কাছে বিশেষ পাঠ নিয়েছে। মাস্টারমশাইয়ের মেয়ের সঙ্গে প্রেমের রঙ্গ করেছে এবং অবশেষে মেয়েটিকে মহাকালের হাতে ছেড়ে দিয়ে সে নিজের 'কেরিয়ার'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুঙ্গে নিয়ে গেছে। একেবারে বিদ্যালাভের জায়গা না হলেও অন্য কিছু ক্ষেত্রে উলটোটাও দেখেছি। অর্থাৎ সেখানে মেয়েটি পৌঁছেছে ছেলে বন্ধুর বাবার কাছে এবং অভীষ্টসিদ্ধির পর পূর্বের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব অস্বীকার করে 'আর কিছু নাহি' পর্যন্ত যেতেই দেয়নি। অতএব সমাজে এইরকম ঘটনা ঘটে, তবে সেই ঘটার মধ্যে প্রত্যেকটি ঘটনাই স্বতো বিশেষ এবং পাত্র-পাত্রীর মানস-ভেদে সেসব সত্য ঘটনা উপন্যাসোপম হয়ে ওঠে।

মহাভারত এই উপন্যাস তৈরি করে না, বরঞ্চ সে জীবনের আঞ্চলিক সত্যকে সামগ্রিক সত্যে রূপান্তরিত করে জানায়— কচ এলেনই না দেবযানীর কাছে, অতএব একটি যুবতী মেয়ে হয়েও সে মেয়ে যা সচরাচর করে না, করতে চায় না, তেমনটি করেই প্রথম এবং শেষ চেষ্টায় দেবযানী নিজেই উপস্থিত হলেন কচের কাছে। কথা বললেন তৎকালীন দিনের সামাজিকতা বজায় রেখেই। বললেন— তুমি মহর্ষি অঙ্গিরার পৌত্র! তোমার চরিত্র, বিদ্যা, তপস্যা এবং ইন্দ্রিয়সংযম— সবটাই তোমাকে অলংকৃত করেছে— ভ্রাজসে বিদ্যয়া চৈব তপসা চ দমেন চ। শেষোক্ত শব্দটি 'দম' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম— এই শব্দটা দেবযানীর মুখে ভীষণ রকমে 'আয়রনিক্যাল' লাগে। দেবযানী কি সামান্য হলেও একটু অসংযম চেয়েছিলেন কচের দিক থেকে, যে অসংযম অন্তত মানসিক হলেও একান্তভাবেই এবং অত্যন্ত রমণীয়ভাবেই ভীষণ প্রয়োজন রমণীর মন পাবার জন্য। আমরা বুঝতে পারি, কচ যা করেছেন— সেই নৃত্য-গীত-বাদ্য অথবা ফুল কুড়িয়ে আনা— তার মধ্যে ছিল না তাঁর অযান্ত্রিক মনটুকু, অথচ তিনি যা করেছেন, তা দেবযানীর ভুল বোঝার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আর ঠিক সেইজন্যই দেবলোকে যিযাসু কচের কাছে গিয়ে দেবযানী প্রায় নির্লজ্জের মতো বলে ফেললেন— আমার পিতা শুক্রাচার্য তোমার পিতামহের শিষ্য, সেই পিতামহ আমার পিতার কাছে যেমন মাননীয়, তেমনই তোমার পিতা বৃহস্পতিও আমার কাছে তেমনই মাননীয়।

এই মাননীয়তা এবং কুলাচারের পারিবারিক সমতা প্রতিষ্ঠা করেই দেবযানী বললেন— তুমি যখন আমার পিতার কাছে শিক্ষালাভ করার সময় ব্রত-নিয়ম-শৃঙ্খলা পালনে ব্যাপৃত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়তে, তখন আমি অনেক ভক্তি নিয়ে তোমার সেবা, পরিচর্যা করেছি। আজকে তোমার বিদ্যালাভ সম্পূর্ণ হয়েছে, এখান থেকে তুমি চলে যাবার কথাও হয়তো ভাবছ, কিন্তু এতদিনে আমি কিন্তু তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠেছি, এমন অনুরক্ত জনের প্রতি তোমারও তো একইভাবে অনুরক্ত হওয়া উচিত— স সমাবৃতবিদ্যো মাং ভক্তাং ভজিতুমর্হসি। মহাভারতে এই যুক্তিটা বিভিন্ন অনুরাগের কাহিনির মধ্যে বারবার এসেছে, বিশেষত সেইসব জায়গায়— যেখানে পুরুষ কিংবা নারী প্রথমে আন্তরিক প্রেমভাব প্রদর্শন করে তারপর প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করছে। আর এই যুক্তিটাও সাংঘাতিক— আমি যেহেতু তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি, অতএব তোমারও আমাকে ভালবাসা উচিত— ভক্তাং ভজিতুমর্হসি। বস্তুত 'তোমারও আমাকে ভালবাসা উচিত' এই শব্দটা বেশ ঔচিত্যার্থে ব্যবহার করা এই কারণে যে, ওই প্রস্তাবিত ব্যক্তির ভালবাসাও আগে বেশ প্রকটই ছিল, কিন্তু এখন হঠাৎই সেটা স্তব্ধ হয়ে প্রায় অস্বীকারের জায়গায় পৌঁছোলে এই অকাট্য যুক্তিটা আসে মহাভারতে— আমি ভালবেসেছি, অতএব তোমারও ভালবাসা উচিত আমাকে— ভক্তাং ভজিতুমর্হসি।

দেবযানীর কথার যুক্তি আছে এখানে। সত্যিই তো কচ যেভাবে দেবযানীর অনুরঞ্জন-মনোরঞ্জন করেছেন, সেগুলি এক সম্পন্নযৌবনা রমণীর কাছে কোন বার্তা পৌঁছে দেয়? কী করেই বা দেবযানীর রমণীহৃদয় এটা বুঝবে যে, এত সব গান, নাচ, ফুল কুড়িয়ে আনা— এইসব কিছু তাঁকে যান্ত্রিকভাবে তোষণ করার জন্য, আর কিছু নেই তার মধ্যে? দেবযানী হয়তো এটাও বুঝেছেন যে, কচ যেভাবে বিনাবাক্যে বিদায় নেবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাতে প্রেম-ভালবাসার আন্তর যুক্তি দিয়ে লাভ নেই, তার চেয়ে অন্তত নিজের অনুরাগ স্থির রাখার জন্য বৈবাহিক প্রস্তাব দেওয়াই ভাল। তিনি বললেন— আমাদের যেমন সম্পর্ক তাতে আর দেরী না করে যথাবিধানে মন্ত্র উচ্চারণ করে আমাকে বিয়ে করো তুমি— গৃহাণ পাণিং বিধিবন্মম মন্ত্রপুরস্কৃতম্।

আমরা শুধু বলতে চাই— কতটা নাচার হলে, কতটা অসহায়তা থাকলে এক 'সম্প্রাপ্তযৌবনা' রমণী নিজের মুখে বিয়ের প্রস্তাব দেয় পুরুষের কাছে। এবং কী আশ্চর্য, কচ সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছেন এই যুক্তিতে যে, দেবযানী তাঁর গুরুপুত্রী, অতএব গুরু হিসেবে শুক্রাচার্য কচের কাছে যতখানি মান্য এবং পূজনীয়, দেবযানীও ঠিক ততখানিই মান্যা এবং পূজনীয়া। কচ বললেন— অতএব এইসব অন্যায় কথা তুমি আমাকে বোলো না— দেবযানী তথৈব ত্বং নৈবং মাং বক্তুমর্হসি। যদি শাস্ত্রের কথা বলেন, যদি তৎকালীন আচার, নিয়ম এবং বিধির কথা বলেন, তা হলে কচের যুক্তি কিন্তু মিথ্যে নয়, ঠিক আছে। পুরাণ এবং ধর্মশাস্ত্র একাধিকবার বলেছে যে, গুরুপত্নী, গুরুপুত্র এবং গুরুকন্যারা গুরুবৎ মান্য এবং পূজনীয়। হ্যাঁ, এই ব্যাপারে কচ একেবারেই ঠিক আছেন, ধর্মশাস্ত্র এবং পুরাণগুলি এ-কথা বারবার জানিয়েছে যে, গুরুগৃহে ব্রত-নিয়ম পালন করে যে শিষ্য বিদ্যাভ্যাস করছেন, তিনি গুরুর বিবাহিত স্ত্রীর পর্যন্ত কাছাকাছি যাবেন না, সেখানে অবিবাহিতা গুরুকন্যা তো সাত মাইল দূরে থাকার কথা। শাস্ত্র বলেছে— গুরুর স্ত্রী যদি যুবতী হন, তবে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে পর্যন্ত প্রণাম করবে না, বরঞ্চ অভিবাদনের প্রয়োজনে তাঁর পায়ের কাছে সন্নিহিত ভূমিতে হস্তস্পর্শ করে প্রণাম করতে পারো।

এতই যেখানে কড়াকড়ি সেখানে শাস্ত্রের বৃদ্ধাচার একটা মানা হল যে, গুরুর কন্যা দেবযানী গুরুর মতোই মান্যা, অতএব বিয়েটিয়ে চলবে না। কিন্তু গুরুর আশ্রমে ব্রহ্মচর্য পালন করার সময় কচ কোন নিয়মটা মেনেছেন? ব্রহ্মচারীর একান্ত পরিহর্তব্য নৃত্য-গীত তিনি তো করেইছেন দেবযানীর সঙ্গে। আর মহাভারতের কথকঠাকুর যে মোক্ষম খবরটি আমাদের দিয়েছে অর্থাৎ দেবযানী যখন বনভূমির কোনও নির্জন অন্তরালে নিজে গান শুনিয়েছেন কচকে, তাঁকে মনে মনে কামনা করেছেন— গায়ন্তী চ ললন্তী চ রহঃ পর্য্যচরত্তথা— তখন কি কচ 'ওঁ বিষ্ণু' বলে কানে হাত দিয়ে থাকতেন, নাকি তিনি দেবযানীর মানসিক জল্পনা এতটুকুও বুঝতেন না। কই কচ তো নিজেকেও নিবারিত করেননি, একবারও বারণ করেননি দেবযানীকেও যে, এই পারস্পরিক প্রশ্রয় ভাল নয়, বন্ধ হোক এইসব সানুরাগ আচরণ? খুব স্বাভাবিকভাবেই কচের আচরণ আজ দেবযানীর কাছে অস্বাভাবিক লাগছে এবং যে মুহূর্তে কচ গুরুকন্যার পূজনীয়ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন, দেবযানী সেই মুহূর্তেই তাঁদের পারস্পরিক প্রশ্রয়ের স্মৃতি-তর্পণের কথাই শুনিয়েছেন, এবং মহাভারতে সেটা এতটাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্তর্পণে এবং মর্যাদায় করেছেন দেবযানী যে, কচের প্রতিক্রিয়াগুলি উচ্চারিতও হয়নি। দেবযানী শুধু নিজের কথা বলেছেন।

দেবযানী বলেছেন— অসুর-দানবেরা যখন বারবার তোমাকে মারবার চেষ্টা করছে, তখন এক-একবার তোমার অনুপস্থিতিতে আমি বুঝেছি যে, আমি ভালবেসে ফেলেছি তোমাকে— তোমার মনে পড়ে না সেসব কথা— তদা প্রভৃতি যা প্রীতিস্তাং ত্বমদ্য স্মরস্ব মে। দেবযানী কিন্তু একবারও সবিনয়ে বললেন না যে, তাঁর জন্যই কচ আজ বেঁচে আছেন, তাঁর জন্যই আজ এই সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করা সম্ভব হয়েছে কচের পক্ষে। না, দেবযানী কচের কৃতজ্ঞতাবোধে কণ্ডুয়ন করছেন না, তিনি নিজের কথা বলছেন শুধু। বলেছেন— তোমার জন্য আমার যে সৌহার্দ জন্মেছিল, এতদিনের পরিচয়ে আমার যে অনুরাগ সৃষ্টি হয়েছে তোমার জন্য, সেখানে কিন্তু আমি সম্পূর্ণ স্থির হয়ে আছি— সৌহার্দে চানুরাগে চ বেত্থ মে ভক্তিমুত্তমাম্। ঠিক এই অবস্থায় তুমি আমাকে এইভাবে ছেড়ে চলে যেতে পারো না; তা ছাড়া এমন নয় যে, আমি কোনও দোষও করেছি এর মধ্যে, তা হলে কোন যুক্তিতে তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে শুনি— ন মামর্হসি ধর্মজ্ঞ ত্যক্তুং ভক্তামনাগসম্।

এই পরিচ্ছেদে ওই যে একবার এতকালের সৌহার্দ এবং অনুরাগ স্মরণ করতে বলেছেন দেবযানী, সেই সূত্র ধরেই রবীন্দ্রনাথ কী অসাধারণ এক বিদায়-স্মরণিকা তৈরি করেছেন। রবীন্দ্রনাথে দেবযানীর স্মারণ-প্রক্রিয়ার মধ্যে যে 'সুন্দরী অরণ্যভূমি' অথবা 'সেই বটতল, যেথা তুমি প্রতি দিবসেই গোধন চরাতে এসে পড়িতে ঘুমায়ে', কিংবা সেই 'হোমধেনু'— এইসব কিছু মহাভারতে কাহিনির বিবর্তনের মধ্যেই আছে, রবীন্দ্রনাথ সেগুলিকে পরে নিয়ে এসেছেন কচকে সুখস্মৃতি মনে করিয়ে দেবার জন্য। অবশ্য মহাভারতে কলস্বনা বেণুমতীর কথা নেই এবং বিদায় অভিশাপের পরবর্তী অংশ একান্তভাবেই রাবীন্দ্রিক সৃষ্টি। কিন্তু এটাও তো ঠিক যে, মহাভারতে যে সৌহার্দ এবং অনুরাগের কথা দেবযানী বলেছেন রবীন্দ্রনাথ সেটাকে এক কাব্যিক নান্দনিকতায় মোহময় করে তুলেছেন আরও। কিন্তু আকরিক স্তরে দেবযানীর এই সৌহার্দ এবং অনুরাগের কথা মহাভারতে কচের কাছে একেবারেই আমল পায় না। এখানে কচ প্রতিযুক্তিতে বলেন— যে কাজটা আমার করাই উচিত নয়, তুমি সেই কাজটা আমাকে দিয়ে করিয়ে নিতে চাইছ— অনিযোজ্যে নিযোক্তুং মাং দেবযানি ন চার্হসি।

কচের যুক্তি হল— শুক্রাচার্যের জঠরটিকে যদি দেবযানীরও জন্মজঠর হিসেবে কল্পনা করা যায়, তা হলে দেবযানীর জন্ম যেখান থেকে হয়েছে; কচেরও জন্ম হয়েছে সেখান থেকেই, কেননা কচও শুক্রাচার্যের উদরে বাস করেছেন। এই যুক্তিতে কচ বললেন— তুমি আমার ভগিনী হও, দেবযানী! তুমি আর কোনও সম্পর্কের কথা বোলো না— ভগিনী ধর্মতো মে ত্বং মৈবং বোচঃ সুমধ্যমে। আমি তোমাদের ঘরে অনেক সুখে থেকেছি, কোনও দিক থেকে কোনও অসুবিধে হয়নি আমার। কিন্তু এবার আমায় যেতে হবে, তুমি আমার যাত্রা-মঙ্গলের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করো— সুখমস্ম্যুষিতো ভদ্রে... শিবম্ আশংস মে পথি।

যিনি নিজেকে প্রেমিকা বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করছেন তাঁর সঙ্গে তথাকথিত প্রেমিক যদি হঠাৎ তুঙ্গ মুহূর্তে বোন পাতিয়ে ফেলে, তা হলে প্রেমিকার মনের যে অবস্থা হয়,

দেবযানীরও তাই হল। তা ছাড়া মহাভারতের কচও এমন সহৃদয় নন যে, কোমল সুরে অন্তত অপারগ ব্যক্তির মতো বলবেন যে, 'আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয়, সখী' অথবা একবারের তরেও— 'হা অভিমানিনী নারী সত্য শুনে কী হইবে সুখ'— এমন সব কথা সান্ত্বনার তরেও বলবেন না মহাভারতের কচ। ইনি শুধু কর্তব্য বোঝেন, স্বকার্যসাধনের কথা বোঝেন এবং বোঝেন অনাসক্ত নিষ্কাম কর্ম। এমনকী এই প্রায়-বিবাদের মুহূর্তেও দেবযানীর সৌন্দর্য্যের বহুমানন অথবা তাঁর প্রত্যঙ্গস্তুতির অভ্যাসটুকু এখনও মুছে যায়নি, নইলে যাঁকে ধর্মত ভগিনী বলে সান্ত্বনা দিচ্ছেন তাঁকে 'প্রসীদ সুভ্রূ' বলে ডাকার দরকার কী, 'সুমধ্যমা' বলে তাঁর মধ্যদেশের ক্ষীণতার অনুমানে অন্য কোনও পীনতার দিকে দৃষ্টি দেবারই বা দরকার কী, আর শেষ কালে শুক্রাচার্যের উদরবাসের প্রসঙ্গে ভগিনীত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে যেভাবে 'বিশালাক্ষী, চাঁদ-চুয়ানো মুখ' বলে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করছেন কচ, তাতে আমাদের বৃদ্ধ সিদ্ধান্তবাগীশ হরিদাস পর্যন্ত বলেছেন— এই দুটো সম্বোধন করে কচ অন্তত বুঝিয়ে দিলেন যে, দেবযানীর অতিশয়ী সৌন্দর্যের ব্যাপারে তাঁর সন্দেহ নেই কোনও এবং তাঁকে একবার দেখলে পরে কোনও শরীরের দোষ কারও চোখে পড়ার কথা নয়— এতৎ-সম্বোধন-দ্বয়েন দেবযান্যা সৌন্দর্যাতিশয়-সূচনেন দৃষ্টদোষাভাবঃ সূচিতঃ।

তার মানে, সব দিক থেকে বৈবাহিক যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই না, বোন— এই তো মহাভারতীয় কচের মনোভাব। প্রসিদ্ধ সেই জার্মান দার্শনিক বলেছিলেন যে, হ্যাঁ বাপু! একজন নারী একজন পুরুষের বন্ধু তো হতেই পারে, তবে সেই বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য খানিক physical antipathy-র সাহায্য প্রয়োজন। মহাভারতের কচ তো সেটাও খুব ভালভাবে পেরেছেন বলে মনে হয় না। দেবযানীর সযৌক্তিক কথা তাঁর কাছে এতটুকুও যৌক্তিক নয়, তিনি এখন বিদ্যা নিয়ে পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচেন। দেবযানী সহ্য করতে পারলেন না এই অযৌক্তিক প্রত্যাখ্যান। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন— কচ! আমি মেয়ে হয়ে তোমার কাছে বৈবাহিক সম্বন্ধ যাচনা করেছি এবং সেটা ধর্মের জন্যও বটে, কামের জন্যও বটে। যেহেতু এই যাচনা প্রত্যাখ্যান করলে, অতএব এতদিন ধরে যে বিদ্যা তুমি শিখলে, তাতে তোমার সিদ্ধি আসবে না কোনওভাবেই— যদি মাং ধর্মকামার্থে প্রত্যাখ্যাস্যসি যাচিতঃ— তুমি এই বিদ্যা প্রয়োগ করতে পারবে না ইচ্ছেমতো।

কচ সঙ্গে সঙ্গে বললেন— আমার অধীত বিদ্যা সফল না হলে কোনও ক্ষতি নেই আমার। আমি তা অন্যত্র ফলাব। আমি এই বিদ্যা যাদের শেখাব তারাই আমার বিদ্যার সুফল ফলাবে। তবে আমিও তোমায় বলছি, দেবযানী! তুমি আমার গুরুর মেয়ে বলেই তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছি, তা ছাড়া গুরু শুক্রাচার্যও এ-ব্যাপারে কোনও নির্দেশ দেননি আমাকে। আমি তো তোমাকে ধর্ম-কথা, চিরাচরিত নিয়মের কথা বললাম। কিন্তু ধর্ম নয়, কামনার বশেই তুমি আমাকে অভিশাপ দিলে; অতএব আমিও ছাড়ব না। আমিও তোমাকে জানিয়ে রাখলাম— তুমি যেভাবে চাইছ, সেইভাবে তোমার ইচ্ছে পূরণ হবে না— তস্মাদ্‌ভবত্যা যঃ কামো ন তথা স ভবিষ্যতি। তুমি যেমনটি চেয়েছিলে যে, কোনও ঋষিপুত্র একদিন এসে তোমায় বরণ করে নিয়ে যাবে, আমি অভিশাপ দিচ্ছি— তেমনটি হবে না। কোনও ঋষিপুত্র তোমার পাণিগ্রহণ করবে না— ঋষিপুত্রো ন তে কশ্চিজ্জাতু পাণিং গ্রহিষ্যতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবযানী কোনও দিন অন্তরের অন্তঃস্থলেও এমনটা ভেবেছিলেন বলে আমাদের মনে হয় না। কোনও ঋষিপুত্র তাঁকে দোলায় চড়িয়ে বিয়ে করে নিয়ে যাবেন এমন সারস্বতী আকাঙ্ক্ষা দেবযানীর মনে ছিল বলে আমাদের মনে হয় না। দেবযানী আসলে সত্যিই প্রেমে পড়েছিলেন এবং সেইজন্যই এই প্রত্যাখ্যানের কথাও তিনি পিতাকে বলেননি। তবে বললে কী হত— অন্তত দেবযানীর ব্যাপারে আমরা পিতা শুক্রাচার্যের যে চিরন্তনী মানসিকতা দেখেছি, তাতে দেবযানী একবার এই বৈবাহিক আগ্রহ জানালে কচের ফিরে যাবার উপায় থাকত না বলেই আমরা মনে করি। আর শুক্রাচার্য নিজে তাঁর প্রিয় শিষ্যটিকে খুব ভাল চিনেছিলেন বলেই তাঁর প্রতি দেবযানীর অনন্ত দুর্বলতা জেনেও কচের বিদ্যাগ্রাহিতার বিষয়েই তিনি মনোনিবেশ করেছেন, দেবযানীর ব্যাপারে তিনি কচকে কিছু বলতে চাননি। আর মহাভারতের কচ দেবযানীকে যেভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং যেভাবে তাঁকে অভিশাপ দিয়েছেন, তার প্রতিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের প্রেম-দার্শনিকতা— তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও— এই দার্শনিকতায় কচের শেষ কথা— আমি বর দিনু দেবী, তুমি সুখী হবে। ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে— এই পুরুষ-মানস একান্তভাবেই রবীন্দ্রনাথের মৌলিক সৃষ্টি। মহাভারত কিন্তু লোকচরিত্র শেখায়, মহাকাব্যিক দৃষ্টিতে সে সমাজের বাস্তব উদ্ঘাটিত করে, আখ্যাত করে। শুধু বিদ্যা, শুধু 'কেরিয়ার', শুধু আত্মোন্নতির জন্য অনেক পুরুষ যে এইরকম প্রত্যাখ্যান করে এবং সেখানে যে বিদ্যা, 'কেরিয়ার' বা আত্মোন্নতিই রমণীর মনের চেয়েও অধিক সত্য হয়ে উঠতে পারে পুরুষের কাছে, এই জাগতিক সত্যটাই মহাকাব্য অনন্ত-ঘটনারাশির মধ্যে একটা উদাহরণ হিসেবে সপ্রমাণ হয়ে ওঠে। মহাকাব্য জানিয়ে রাখে যে, এমনটাও কিন্তু হয়— ঠিক যেমন লিখেছিলেন উইলিয়ম থ্যাকারে— Love is a mighty thing, dear Bob, but it is not the life of a man. There are a thousand other things for him to think of besides the red lips of Lucy, or the bright eyes of Eliza. There is business, there is friendship, there is society, there are taxes, there is ambition, and a manly desire to excercise the talents which are given to us by Heaven, and reap the prize of our desert.

রমণীর মন যে সহস্র বর্ষের সাধনার ধন, সেটা থ্যাকারে সাহেবের এই চরিত্রটি বোঝেন না, তেমনই বোঝেন না কচও— দেবলোকে তাঁর অনেক কাজ পড়ে আছে, অতএব মহাভারতের কচ দেবযানীকে অব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ে হবার অভিশাপ দিয়ে ফিরে গেলেন দেবতাদের কাছে।

প্রথম প্রেমে যেভাবে প্রত্যাখ্যাতা হলেন দেবযানী, তাতে তাঁর হৃদয়ের গভীরে একটা প্রতিক্রিয়া হবারই কথা। কচকে সত্যিই ভালবেসেছিলেন দেবযানী; তবে কচের সঙ্গে বিয়ে হলে তাঁর পরবর্তী জীবন কেমন হত, সে কথা অনুমান করতে একটু ভয় বাসি মনে। এক তো হতে পারত— দেবাসুরের দ্বন্দ্ব মিটে যেত চিরকালের তরে, কিন্তু তাতে রাজনৈতিক নেতাদের মহা-সমস্যা হত— ইন্ডিয়া-পাকিস্তান মিলে গেলে যে সমস্যা, এটাও তাই। কিন্তু এই মজাক ছেড়ে দিলেও কচের ব্যক্তিগত জীবন দেবযানীকে নিয়ে কেমন হত, সেটা বোধহয় কচ বুঝেইছিলেন। কচ যখন গুরুগৃহে এসেছিলেন, তখন দেবযানীর ভাবটা যদি

খেয়াল করে থাকেন, তবে দেখবেন, তিনি কিন্তু তেমন কোনও অস্থিরতার পরিচয় দেননি, যাতে ভাবা যায়— দেবলোক থেকে দেবগুরু বৃহস্পতির ছেলে পড়তে এসেছে তাঁর বাবার কাছে এবং তিনি এক লহমায় গলে গিয়ে প্রেম নিবেদন করে বসলেন তাঁর কাছে। বরঞ্চ তিনি বহুকাল অবিচল ছিলেন একান্ত ভাবেই গুরুপুত্রীর অভিমান-মঞ্চে বসে। কচ তাঁকে গান শোনাচ্ছেন, নাচ দেখাচ্ছেন, এবং তিনি বুঝতে পারছেন যে, তার মনোহরণের চেষ্টা চলছে; অবশেষে তিনি বিগলিত হচ্ছেন, অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন এবং এক সময় কচের জন্য তিনি 'কনসার্নড'।

কিন্তু কচের সঙ্গে যদি শেষ পর্যন্ত তাঁর বিবাহ হত, তা হলে দিনের পর দিন পৌরুষেয় অভ্যস্ততায় সপ্রেম দিনগুলি কেটে গেলে দেবযানী কিন্তু অবশ্যই সেই গুরুপুত্রীর মর্যাদা-প্রকোষ্ঠে ফিরে আসতেন, কেননা এই মর্যাদাই তাঁর অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। একটু খোলসা করে এই অনুমানের শক্তিটুকু জানাই। আমি খুব ছোটবেলা থেকে আমার পিতার ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে অনেক সাধু-মহান্তের সংস্পর্শে এসেছি এবং সেই সূত্রে অনেক সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থ গুরুও আমি দেখেছি। এই সূত্রে যে-ক'জন গৃহস্থ গুরুর সঙ্গ আমি পেয়েছি, তাঁদের অনেকেই নিজস্ব ক্ষেত্রে বড় সাধক। কিন্তু তাঁদের স্ত্রী-পুত্রদের মধ্যে প্রধানত স্ত্রী এবং কন্যারা অনেক সময় গুরুর চাইতেও বেশি গুরুগিরি করতেন। শিষ্যরা যেহেতু তাঁদের গুরুর মতোই শ্রদ্ধাভক্তি করত, তার সুযোগ তাঁরা বেশ একটু গ্রহণ করতেন স্বপ্রয়োজনেই এবং ব্যাপারটা আধ্যাত্মিকতার চেয়েও নিতান্ত বৈষয়িক হয়ে উঠত অনেক সময়েই। এমন একটা ঘটনাও আমি কাছ থেকে দেখেছিলাম, যেখানে গুরুপুত্রী প্রেমে পড়লেন শিষ্যপুত্রের। শিষ্যপুত্রের বিদ্যা-বয়স এবং ভবিষ্যৎসম্ভাবনার উজ্জ্বলতা দেখে গুরুমা বিশেষ আগ্রহী হলেন এই বিবাহে। কিন্তু বাদ সাধলেন স্বয়ং শিষ্য, যার পুত্র 'গায়ন্তী' তথা 'ললন্তী' গুরুপুত্রীর প্রাগবৈবাহিক অভিব্যক্তিতে প্রায় বিগলিত হবার পথে এসে দাঁড়িয়েছেন। শিষ্য তথা পিতার যুক্তি ছিল— আমি গুরুর সঙ্গে তাঁর প্রীতিকামনায় তাঁর পরিবারের সবার যত সেবা করেছি, তাতে ভবিষ্যতেও তাঁর পরিবারের থেকে নানান অকারণ আদেশ আমার ওপর নেমে আসার সম্ভাবনা আছে, যা আমাকে গুরুবৎ মান্যতায় পালন করতে হবে, কিন্তু তাতে আমার পরিবারের ক্ষতি হবে। বিশেষত গুরুপুত্রীকেও আমি গুরুর মতোই মানি এবং তাঁর সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে হলেও তাঁর আদেশ আমাকে যথাবৎ মান্য করতে হবে, সেটা ভবিষ্যতের পরিস্থিতিতে অসহনীয়ও হয়ে উঠতে পারে।

এই বিবাহ বন্ধ হয়েছিল এবং পিতারূপী শিষ্যটিকে তার জন্য অনেক ভর্ৎসনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল। সে যা হোক, আমি এই বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করতাম না, যদি না দেবযানীর বিবাহিত ভবিষ্যতে এই ঘটনার অনুমানযোগ্য প্রতিরূপ না দেখতাম। কচ চলে যাবার পর দেবযানীর জীবনে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল এবং সেই শূন্যতার কারণে তাঁর মনে যে কষ্ট তৈরি হয়েছিল তার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল দু'ভাবে। প্রথমত প্রতি পদেই তিনি গুরুকন্যার গুরুত্ব অধিকভাবে প্রকট করে তুলছিলেন, দ্বিতীয়ত দেবযানীর মনের মধ্যে এক ধরনের বিপন্নতা তৈরি হয়েছিল যাতে তাঁর মনে হচ্ছিল তাঁকে পছন্দ করার অনেক লোক আছে এবং অবিলম্বেই তাদের একজনের সঙ্গে বিবাহিত হয়ে ওঠাটা খুব জরুরি। এটা অবশ্যই ঠিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে, অসামান্যা সুন্দরী এবং বংশমর্যাদায় অত্যন্ত বড় হওয়া সত্ত্বেও যে রমণী এক অভাবিত কারণে প্রত্যাখ্যাত হন অভীষ্ট পুরুষের কাছেই, তবে তাঁর মনে এইরকম একটা 'ফ্রাস্ট্রেশন' আসতেই পারে এবং তাতে সাময়িকভাবে যার-তার ওপর ক্রোধী হয়ে ওঠাটাও যেমন স্বাভাবিক, তেমনই নিজের রূপ-গুণ যাচাই করে নেবার জন্য পুরুষানুসন্ধানের ব্যাপারটাও খুব স্বাভাবিক। দেবযানীর জীবনে সেই দ্বিতীয় পর্যায় এবার আরম্ভ হল।

২

পূর্ব-ঘটনা যাই ঘটে থাকুক, দানবরাজ বৃষপর্বার রাজ্যে শুক্রাচার্যের গুরুত্ব যেমন কমল না, তেমনই কমল না দেবযানীর গুরুত্ব। 'আইডেনটিটি'-র এই জায়গাটা যথেষ্ট স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল থাকায় দেবযানী যে অনেক দিন গালে হাত দিয়ে কচের জন্য শোক করলেন, তা নয়। খুব তাড়াতাড়িই তিনি নিজেকে সংবৃত করলেন নিজের মধ্যে, কিন্তু অন্তরের হতাশা তো শুধুমাত্র শোকাচ্ছন্নতার মাধ্যমেই প্রকাশ হয় না, অন্যজনের কাছে সেটা কখনও কখনও ক্রোধ, ঈর্ষা, অসূয়া অথবা অনভিনন্দনের মতো অদ্ভুত বিরুদ্ধ বৃত্তির মাধ্যমেও প্রকট হয়ে ওঠে, অনুভবী মানুষ মাত্রেই সেটা বুঝতে পারে। তবে খুব দার্শনিক মনস্তাত্ত্বিকতার মধ্যে না গিয়ে দেবযানীর অদ্যতন সময়টা বিচার করলে দেখা যাবে— তিনি মাঝে মাঝেই ঝগড়া করে ফেলছেন। একগুঁয়েমি ব্যাপারটা তাঁর স্বভাবের মধ্যেই ছিল, সেটা আমরা কচের আশ্রমে অবস্থানকালীন সময়েও দেখেছি, হয়তো সেই একগুঁয়েমি না থাকলে কচ বেঁচে ফিরতেন না ত্রিদশালয়ে, কিন্তু সেই একগুঁয়েমির প্রকাশটা প্রায়শই অভিমানের রূপ ধরত এবং সেটা প্রধানত শুক্রাচার্যের কাছেই। কিন্তু এখন দেবযানী ঝগড়া করে ফেলছেন।

পুরুষ আর পুরুষে যদি ঝগড়া হয়, তবে তা মন্দ লাগে না; তার তীব্রতা অনেক সময়েই দ্বন্দ্বযুদ্ধের সৃষ্টি করে। এবং তার পরিণতি সময়ে সময়ে ভয়ানক। পুরুষ আর রমণীর যে ঝগড়া, তা দাম্পত্য জীবনের অন্যতম অঙ্গ, ঝগড়ায় অংশগ্রাহী স্ত্রী-পুরুষের কাছে যে ঝগড়া, বিষবৎ ত্যাজ্য মনে হলেও, তা পাড়াপড়শির শ্রবণানন্দ বর্ধন করে। কিন্তু সব বাদ দিয়ে যদি মেয়েতে মেয়েতে ঝগড়ার কথায় আসি, তবে দেখবেন সেটা কোনও মতেই সহনীয় নয়। সে ঝগড়া শুনতেও ভাল লাগে না, রুচিকরও নয় এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার ফল সুদূরপ্রসারী। ঠিক এই রকমই একটা মারাত্মক ঝগড়া হয়েছিল অসুরগুরু শুক্রাচার্যের মেয়ে দেবযানীর সঙ্গে অসুরদের রাজা বৃষপর্বার মেয়ে শর্মিষ্ঠার।

মহাভারতে যে জায়গায় দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠার ঝগড়ার কথা এসেছে, সেখানে দেবলোকের একটা অভিসন্ধি দেখা গেছে। অর্থাৎ বৃহস্পতির ছেলে কচ যখন মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিখে স্বর্গে এসে দেবতাদের সে বিদ্যা শেখালেন, তখন দেবতারা স্বর্গলোকের অধীশ্বর ইন্দ্রকে জানালেন যে, এবার সময় হয়েছে অসুররাজ বৃষপর্বার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার। ইন্দ্র অবশ্য সরাসরি যুদ্ধে না গিয়ে পরোক্ষভাবে অসুরদের শক্তি আরও খানিকটা ক্ষীণ করে দেবার জন্য নতুন এক চাল চাললেন। অসুররাজ্যে মায়াবৃত অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে ইন্দ্র

দেখতে পেলেন— অসুরগুরু শুক্রাচার্যের মেয়ে দেবযানী এবং অসুররাজ বৃষপর্বার মেয়ে শর্মিষ্ঠা তাঁদের সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে নদীর জলে ক্রীড়া করতে নেমেছেন। স্নানরতা সমস্ত রমণীর পরনের কাপড়গুলি নির্দিষ্ট এক-একটা স্থানে পরিত্যক্ত অবস্থায় জমা করা ছিল নদীর কিনারে আরণ্যক বৃক্ষের তলায় তলায়।

কথিত আছে, ইন্দ্র নাকি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায় প্রচণ্ড দমকা হাওয়া সৃষ্টি করে মেয়েদের কাপড়গুলি সব এলোমেলো করে দিলেন। ফলে একজনের পরনের কাপড় পড়ে রইল অন্য জায়গায়। মেয়েদের স্নান এবং জলক্রীড়া শেষ হতেই তারা ত্বরিতগতিতে জল থেকে উঠে নিজের মনে করেই এক-একখানি কাপড় পরে নিল। অসুররাজ বৃষপর্বার মেয়ে শর্মিষ্ঠা রাজার ঘরের মেয়ে বলে কথা। রাজকন্যা বলেই খানিকটা অবাধে চলা তাঁর অভ্যাস এবং অনেক ব্যাপারেই তাঁর রাজকন্যা-সুলভ ঔদাসীন্যও আছে। তিনি যখন সলজ্জে জল থেকে উঠে লজ্জানিবারণী বস্ত্রখানি পরলেন, তখন একবারও খেয়াল করলেন না যে, দেবযানীর কাপড়টি ভুলক্রমে পরে বসে আছেন— ব্যতিমিশ্রমজানন্তী দুহিতা বৃষপর্বণঃ।

কিন্তু দেবযানী ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্যের মেয়ে। বামুন ঘরের মেয়ে বলেই হোক, অথবা গুরুর মেয়ে বলেই হোক তাঁর কিছু নিজস্বতা আছে এবং গুমোরও আছে, হয়তো বা কিছু শুচিবাইও আছে। শর্মিষ্ঠার গায়ে নিজের কাপড়খানি দেখেই দেবযানীর মাথায় যেন একেবারে খুন চেপে গেল। আসলে গুরুপুত্র এবং গুরুকন্যাদের মানসিকতা এমনটাই হয় অনেক সময়। তাঁরা দরকারে সমবয়সি শিষ্যপুত্র বা শিষ্যকন্যাদের সঙ্গে খেলা করেন, কিন্তু একটু ইতরবিশেষ হলেই তাঁদের সম্মানে লেগে যায় এবং তখনই অন্তরে জেগে ওঠে গুরুর শাসন। তদবস্থ শর্মিষ্ঠাকে দেখেই দেবযানী বললেন— হ্যাঁ-হে, অসুরের ঝি! এ তোর কেমনধারা ব্যবহার? তুই আমার শিষ্যা হয়ে আমারই কাপড় পরে বসে আছিস। তোর ভাল হবে না মোটে— কস্মাদ্‌ গৃহ্লাসি মে বস্ত্রং শিষ্যা ভূত্বা মমাসুরি?

অন্য সময়ে হলে অথবা একান্তে হলে শর্মিষ্ঠা হয়তো তবু খানিকটা মেনে নিতেন দেবযানীর দাপট। কিন্তু এতগুলি সমবয়সি সখী-বান্ধবীর সামনে দেবযানী তাঁকে যখন শুধু অসুরঘরের মেয়ে বলেই অভদ্র আচরণের দায়ে গালি দিলেন শর্মিষ্ঠা তখন আর সইতে পারলেন না। একে রাজরক্ত, তাতে অন্যায়টাও তাঁর ইচ্ছাকৃত নয়, গভীর তো নয়ই। বিশেষত অসুরঘরের আদপকায়দা নিয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত করায় দেবযানীকে অসুরঘরের মর্যাদা ভাল মতন বুঝিয়ে দেবার জন্য শর্মিষ্ঠা বললেন— দেখ, আমার বাবা বসে থাকুন, অথবা শুয়েই থাকুন, তোর বাবা স্তুতি পাঠক খোসামুদে মানুষের মতো নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার বাবার স্তুতি করেন— স্তৌতি বন্দীব চাভীক্ষ্ণং নীচৈঃ স্থিত্বা বিনীতবৎ।

শুধু এইটুকু বলেই ছেড়ে দিলেন না শর্মিষ্ঠা। সামান্য পরিধেয় বস্ত্রকে কেন্দ্র করে তাঁকে যে অপমান সইতে হয়েছে, সে অপমানটা দেবযানী তাঁর একান্ত আপন শক্তি, ক্ষমতা বা গৌরবের জোরে করেননি, করেছেন পিতা শুক্রাচার্যের গৌরবে। পিতার ক্ষমতা তিনি ব্যবহার করেছেন নিজেকে জাহির করার জন্য। শর্মিষ্ঠা এই গৌরব সহ্য করতে পারেননি। অতএব দেবযানী এক কথা বললে তিনি চার কথা শুনিয়ে তাঁর নিজের পিতার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করে বলেছেন— তুই হলি এমন একজন মানুষের মেয়ে যে স্তুতি করে, যে যাচনা করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং যে আমার বাবার দেওয়া দান গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করে— যাচত স্বং হি দুহিতা স্তুবতঃ প্রতিগৃহ্নতঃ। আর আমি কার মেয়ে জানিস? যাঁকে লোকে স্তব করে, যিনি কারও কাছে কিছু যাচনা করেন না এবং যিনি দান করেন। দেবযানী শর্মিষ্ঠাকে শাসিয়েছিলেন যে, তাঁর কাপড় পরার ফল ভাল হবে না, তার উত্তরে শর্মিষ্ঠা বলেছিলেন— তোকে আমি গ্রাহ্যও করি না? তুই রাগ দেখিয়ে আমার যতই অপকার করার চেষ্টা করিস না কেন, তুই নিজে-নিজেই কপাল কুটে বসে থাক অথবা তুই যতই মাটিতে আছাড় খেয়ে শোক করতে থাক, তুই আমার কিছুই করতে পারবি না। কারণ আমি রাজকন্যা এবং আমি সশস্ত্রা, তোকে আমি গণ্যই করি না। তুই যত ইচ্ছে রাগতে থাক— আদুষ্বস্ব বিদুষ্বস্ব দ্রুহ্য কুপ্যস্ব যাচকি।

সুযোগ পেয়ে শর্মিষ্ঠা ব্রাহ্মণ্য এবং রাজন্যের পারস্পরিক ভেদরেখাটিও একটু বুঝিয়ে দিলেন দেবযানীকে। বস্তুত সেকালের দিনে ব্রাহ্মণ্য এবং রাজন্যের পরস্পর নির্ভরতা যতটা ছিল, পরস্পর-নির্ভর বলেই এই দুয়ের একে অপরকে সাবজ্ঞে অতিক্রম করার প্রবৃত্তিটাও মাঝে-মাঝেই কাজ করত। শর্মিষ্ঠার কথায় স্পষ্ট এই ভাব ফুটে উঠছে যে, যাজ্ঞিক, পুরোহিত এবং আচার্যপ্রমাণ ঋষিদেরও অনেক সময়েই আর্থিক সাচ্ছন্দ তথা ব্যক্তি-গৌরব প্রকাশের জন্য রাজার ওপরেই নির্ভর করতে হত। আর রাজারা নির্ভর করতেন ব্রাহ্মণের বুদ্ধির ওপর, বিদ্যার ওপর, যাতে অনন্ত ভোগ-সুখ এবং উচ্চাকাঙক্ষার মধ্যেও তাঁরা রাজত্ব চালিয়ে নিয়ে যেতেন। ফলত একটা অমূর্ত ভাবনায় যেভাবে বিদ্যা-বুদ্ধি এবং অর্থ-সম্পদের মধ্যে একটা চিরন্তন বিরোধ আছে, ঠিক সেই বিরোধ অন্তরবাহী হয়ে কাজ করে ব্রাহ্মণ্য এবং রাজন্যের বিরোধেও। আর এই বিরোধে অর্থ, সম্পদ এবং অর্থজনিত শক্তি বিদ্যাবলের মাহাত্ম্যকে অনেক সময়েই বিমানিত করে, ঠিক যেমন বাস্তব জীবনেও আমরা বিধ্বস্ত হয়ে অনেক সময়েই স্বীকার করি— বিদ্যা, বুদ্ধি যা বলো, আসলে টাকাই সব। সম্পন্ন পরিবারে, রাজা-রাজড়ার পুত্র-কন্যার মধ্যে এই ভাব আরও বেশি প্রকটভাবে দেখা দেয় এবং এখানে আচার্য এবং ঋষি পিতার গৌরবে দেবযানীও যেহেতু সামান্য কারণে অনর্থক বেশি গুরুগিরি করে ফেলেছেন, অতএব শর্মিষ্ঠাও পিতার রাজশক্তির গৌরবে এমন কথা বলতে পারছেন দেবযানীকে যে, তুই দরিদ্র এবং তোর হাতে অস্ত্র নেই আর আমি রাজকন্যা এবং আমার হাতে অস্ত্রও আছে, অতএব তোর এত মেজাজ কীসের রে ভিখারি কোথাকার— অনায়ুধা সায়ুধায়া রিক্তা ক্ষুভ্যসি ভিক্ষুকি— আমার মধ্যে তুই এবার এমন একজনকে দেখতে পাবি যে উলটে মারতেও জানে।

এইরকম একটা উত্তাল ক্রোধের মুখে দেবযানী যথাসাধ্য যুক্তি দিয়ে নিজের প্রাধান্য বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন শর্মিষ্ঠাকে এবং হয়তো সেটাকে একটা উত্তম প্রয়াস বলে মেনে নেওয়াও যায়, কিন্তু একই সঙ্গে তিনি যখন শর্মিষ্ঠার গায়ে জড়ানো নিজের কাপড়খানি টানাটানি করে খুলেও নিতে চাইলেন, তখন তাঁকে যেন ব্রাহ্মণগুরু শুক্রাচার্যের মেয়ে বলে মনে হয় না। শর্মিষ্ঠাও এই ব্যবহার ভাল মনে নেননি এবং তিনি এতই ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে, দেবযানীকে একটি মজা কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়ে নির্দ্বিধায় বাড়ি ফিরে এলেন। এমনকী কাউকে বললেনও না যে, দেবযানীর কী অবস্থা হল। অসুর ঘরের মেয়ে

বটে, হৃদয়টাও তাঁর অনেক কঠিন। অতএব দেবযানীকে কুয়োয় ফেলে দিতেও তিনি সংকোচ বোধ করেননি, ফিরেও তাকাননি একবারও— অনবেক্ষ্য যযৌ বেশ্ম— এবং যেন কুয়োর মধ্যে দেবযানী মরে পড়ে থাকলেই ভাল, এইরকম একটা কঠিন হৃদয়ের ভাবনা নিয়েই শর্মিষ্ঠা ঘরে ফিরে এসেছিলেন— হতেয়মিতি বিজ্ঞায় শর্মিষ্ঠা পাপনিশ্চয়া— একবার পিছন ফিরেও দেখলেন না তাঁর দিকে এবং তাতে আরও বোঝা যায় যে, রাগটা তাঁর অনেক দিনের। হয়তো বা এই রাগ জন্ম নিয়েছে বহুকালিক ব্যবহারে, শুক্রাচার্য দানবকুলের গুরু হওয়ার দরুন দেবযানীও দানবরাজার মহিলা-মহলে গুরুর মর্যাদায় এবং পৃথক মান্যতায় চলতেন বলেই হয়তো এত রাগ শর্মিষ্ঠার। ফলে দেবযানীর দিকে তিনি একবার ফিরেও তাকালেন না— অনবেক্ষ্য যযৌ বেশ্ম ক্রোধবেগপরায়ণা।

শর্মিষ্ঠার ইচ্ছামতো দেবযানী অবশ্য মারা যাননি। জীবন তবু কেটে যায় গল্পকাহিনির সত্যের চেয়েও আরও বিচিত্র সত্য নিয়ে। বিপন্ন হলেও তাকে সাহায্য করার লোক আসে বাইরে থেকে, পড়ে গেলে তাকে ধরে তুলবার মানুষ আসে আনমনে একাকী।

দেবযানী যেখানে মজা-কুয়োর মধ্যে পড়েছিলেন, সেখানে দৈবক্রমে এসে পৌঁছলেন পৌরব-বংশের রাজা নাহুষ যযাতি। মৃগয়ার পরিশ্রমে পিপাসার্ত হয়ে যযাতি ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে ওই কুয়োর মধ্যে জল আছে ভেবে জল খেতে এসেছিলেন— শ্রান্তযুগ্যঃ শ্রান্তহয়ো মৃগলিপ্সুঃ পিপাসিতঃ।

হঠাৎ তিনি দেখলেন— কুয়োর মধ্যে আগুনপানা সুন্দরী এক রমণী দাঁড়িয়ে আছেন— কন্যামগ্নিশিখামিব। দেবযানী কাঁদছিলেন কিনা, সে খবর দেননি মহাভারতের কবি, কারণ আগুন থেকে জলবিন্দু ক্ষরিত হয় না, অগ্নিশিখা-সমান দেবযানীও হয়তো কাঁদছিলেন না। কিন্তু কুয়োয় পড়ে যাবার পর থেকে কাল অনেকটাই অতিক্রান্ত হওয়ায় তাঁকে একটু চিন্তাকুল এবং উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল নিশ্চয়ই।

যযাতি তাঁকে দেখেই বুঝেছিলেন যে, দেবযানী বড় ঘরের মেয়ে। প্রথম দেখায় দেবযানীর রূপে তিনি এতটাই মুগ্ধ বোধ করেন যে, তাঁর সাধারণ কুশল-জিজ্ঞাসার মধ্যেও কেমন শরীর শরীর গন্ধ চলে আসে। কুয়োর মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলেও দেবযানীর উদ্দেশে তিনি বলে ফেলেন— কেমন কাঁচা সোনার মতো তোমার গায়ের রং, হাতের আঙুলে রক্ত ফেটে পড়ছে যেন, কানে সোনার দুলগুলিও তো একেবারে ঝক-ঝক করছে— কা ত্বং তাম্রনখী শ্যামা সুমৃষ্টমণিকুন্তলা। যযাতি বললেন— কে গো তুমি মেয়ে? এমন সুন্দর চেহারা তোমার, অথচ এমন বিপন্ন আতুর দেখাচ্ছে কেন তোমাকে? সবচেয়ে আশ্চর্য এই তৃণ-লতাচ্ছন্ন কুয়োর মধ্যেই বা তুমি এসে পড়লে কী করে? তুমি কার মেয়ে বলো তো— দুহিতা চৈব কস্য ত্বং বদ সত্যং সুমধ্যমে?

কূপের মধ্যে প্রতিকূল অবস্থাতে দাঁড়িয়ে থেকেও দেবযানী তাঁর মর্যাদা সম্বন্ধে যেমন সচেতন, তেমনই সচেতন তাঁর চেহারার জন্য। পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি সাহংকারে বললেন— যাঁর সঞ্জীবনী বিদ্যাবলে দৈত্যেরা মরে গেলেও বেঁচে ওঠে আমি সেই শুক্রাচার্যের মেয়ে। তিনি নিশ্চয়ই এখনও জানেন না যে, আমি এই কুয়োর মধ্যে পড়ে রয়েছি। আর আপনি যে আমার রক্তিম অঙ্গুলিগুলির প্রশংসা করছিলেন— এই আমার সেই দখিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতখানি— এষ মে দক্ষিণো রাজন্ পাণিস্তাম্রনখাঙ্গুলিঃ। আপনি আমাকে এই হাত ধরেই কুয়ো থেকে তুলুন। আমি আশা করি— আপনি শান্ত, বলবান, মনস্বী এবং সদ্বংশজাত, আর ঠিক সেইজন্যই আমার মতো মানুষকে এখান থেকে হাত ধরে তোলার উপযুক্ত লোকও আপনিই— সমুদ্ধর গৃহীত্বা মাং কুলীন স্ত্বং, হি মে মতঃ।

পুরুষ মানুষের সামনে বিপন্ন অবস্থাতেও নিজের 'ফেমিনিটি' বজায় রাখা এবং দেবযানীর দম্ভটুকু আন্দাজ করতে পারলেন? যযাতির শঙ্কাকুল প্রশ্নে তিনি একবারও জানাননি যে স্ত্রীজনোচিত ঝগড়ার ফলে তাঁর এই কূপগতি হয়েছে। উলটে বলেছেন— সঞ্জীবনী বিদ্যার জনক এখনও জানতে পারেননি বলেই এখনও তিনি কুয়োর মধ্যে পড়ে আছেন। নইলে এমনটি হত না। দ্বিতীয়ত যযাতি একবার মাত্র পুরুষোচিত উচ্ছ্বাসে তাঁর রক্তিম অঙ্গুলিগুলির প্রশংসা করেছিলেন বলে, তিনি সেই রক্তিম অঙ্গুলিগুলির কথাই ঘোষণা করে সেই হাতটিই বাড়িয়ে দিয়েছিলেন যযাতির দিকে— এষ মে দক্ষিণো রাজন্ পাণিস্তাম্রনখাঙ্গুলিঃ। সবচেয়ে বড় কথা, বিপন্ন অবস্থায় তাঁকে কুয়ো থেকে তোলার জন্য তিনি রাজার কাছে কোনও কাকুতি-মিনতি করছেন না। বরঞ্চ তাঁকে হাত ধরে তোলার ব্যাপারে যে কৌলীন্য এবং আভিজাত্যের প্রয়োজন হয়, সেইটি রাজার আছে বলে তাঁকে কুয়ো থেকে তুলে রাজাই যেন ধন্য হবেন— এমন একটা ভাব করলেন দেবযানী।

যাই হোক, যযাতি বুঝলেন— দেবযানী বামুন ঘরের মেয়ে। অতএব তাঁর এগিয়ে-দেওয়া ডান হাতটি ধরে দেবযানীকে কুয়ো থেকে তুললেন যযাতি। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, এই উদ্ধার কার্যের পর এই ব্রাহ্মণকন্যার সঙ্গে আর একটি কথাও বলেননি যযাতি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘরে ফিরে এসেছেন রাজা। এই যে চলে যাবার তাড়াহুড়ো, এ কি শুধুই বামুন-ঘরের মেয়ে বলে, নাকি দেবযানীর চরিত্রের মধ্যেই সেই দর্পোদ্রিক্ত বীজ ছিল, যাতে রাজা যযাতির মতো অভিজাত ব্যক্তিও রমণীর সাহচর্যমোহ ত্যাগ করে পালাতে চান, যেমন পালাতে চেয়েছিলেন ব্রাহ্মণ বৃহস্পতির পুত্র কচ এককালে।

যযাতি চলে যেতেই দেবযানী দেখলেন যে, তাঁর গৃহদাসী ঘূর্ণিকা অনেকক্ষণ তাঁকে না দেখতে পেয়ে তাঁর অন্বেষণে বেরিয়েছে। দেবযানী দাসীর কাছে শর্মিষ্ঠার ইতিবৃত্তান্ত সব জানিয়ে তাকে পিতা শুক্রাচার্যের কাছে পাঠালেন। দাসীকে বলে দিলেন— যতক্ষণ না পিতা এই ঘটনার বিহিত করছেন, ততক্ষণ তিনি অসুররাজ বৃষপর্বার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করবেন না। ঘূর্ণিকা দেবযানীর কথামতো শুক্রাচার্যকে আদ্যন্ত ঘটনা সব জানালেন। বিশেষত জানালেন যে, অসুররাজপুত্রী শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছনা করেছে।

এই অদ্ভুত মান-অপমানের চক্রান্তে দেবযানী মানসিকভাবে কতটা গ্রস্ত হতে পারেন, সেটা শুক্রাচার্য খুব ভালভাবে জানেন বলেই তিনি খুব তাড়াতাড়ি মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে বেরোলেন। কিন্তু মনে মনে শুক্রাচার্য এই ঘটনাটাও খুব ভাল জানেন যে, দেবযানীরও কোনও দোষ আছে। কেননা, দেবযানীর যা চরিত্র তাতে সে কিছুই করেনি, কিছুই বলেনি, অথচ একজন তাকে অযথা কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়ে গেল— এমনটি হতে পারে না। তা ছাড়া শুক্রাচার্য বহু অভিজ্ঞ পুরুষ, দেবাসুরের রাজনীতি নিয়ে তাঁর জীবন কাটে, কাজেই নির্মম সত্যটুকু তিনি অনুভব করতে পারেন সহজেই। তবু শৈশবে মাতৃহারা এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটিকে তিনি অসম্ভব স্নেহ করেন, মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্রয়ও দেন। প্রধানত সেই স্নেহের বশেই দেবযানীর সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র তিনি জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। কিন্তু একই সঙ্গে সত্য উচ্চারণ করতেও তাঁর দ্বিধা হল না। খুব রয়েসয়ে শুক্রাচার্য বললেন— খুব দার্শনিক কায়দায় বললেন— দেখো মা! লোকে নিজের দোষ গুণ অনুসারেই দুঃখ এবং সুখ ভোগ করে। আমার মনে হয়— এই ঘটনায় তোমার নিজেরও কোনও অন্যায় ছিল এবং হয়তো সেই অন্যায়েরই ফল ভোগ করছ তুমি— মন্যে দুশ্চরিতং তেঽস্তি যস্যেয়ং নিষ্কৃতিঃ কৃতা।

এ অবস্থায় যেমনটি হয়। নালিশ করার সময় যেমন অন্যায়কারী ব্যক্তি নিজের অন্যায় চেপে রেখে পরকৃত্য দোষের চূড়ান্ত কথাগুলি বলে এবং যার কাছে নালিশ করছি, তাকেই কীভাবে অপমান করা হয়েছে, সেই কথাগুলি বলে যেমন সালিশী-মানা ব্যক্তিকে পক্ষপাতী করার চেষ্টা করা হয়, ঠিক তেমন করেই দেবযানী শুক্রাচার্যকে বললেন— আমার অন্যায়ই হোক, আর তার প্রায়শ্চিত্তই ভোগ করি, কিন্তু অসুর-মেয়ে শর্মিষ্ঠা কী বলেছে, একবার মন দিয়ে শোনো। শর্মিষ্ঠা বলেছে— তুমি নাকি দৈত্যদের স্তাবক— কথাটা কি ঠিক— সত্যং কিলৈতৎ সা প্রাহ দৈত্যনামসি গায়নঃ? শর্মিষ্ঠা চোখ লাল করে, সগর্বে সাহংকারে আমাকে বলেছে— যে লোক সব সময় স্তব করে, প্রার্থনা করে এবং দান গ্রহণ করে— আমি নাকি তারই মেয়ে। আর লোকে যাঁর স্তব করে এবং যিনি দান করেন, কিন্তু দান গ্রহণ করেন না, শর্মিষ্ঠা নাকি তাঁর মেয়ে। দেবযানী এবার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে বললেন— শোনো বাবা। আমি যদি সত্যি করে এক স্তাবক এবং প্রতিগ্রহজীবীর মেয়ে হই, তবে আমি যথাসাধ্য অনুনয়-বিনয় করে শর্মিষ্ঠাকে তুষ্ট করব, এ কথা আমি বলেই দিয়েছি— প্রসাদয়িষ্যে শর্মিষ্ঠামিত্যুক্তা তু সখী ময়া। দেবযানী এর পরেও ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন— শুধু এই জঘন্য কথাতেই শেষ হয়নি। এর পরেও আমাকে জোর করে ধরে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছে শর্মিষ্ঠা।

শুক্রাচার্য দেবযানীকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করলেন। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন— মা! কখনই তুমি এক স্তাবক-যাচকের মেয়ে নও। বরঞ্চ সকলেই যার স্তুতি করে, তুমি তারই মেয়ে— অস্তোতুঃ স্তূয়মানস্য দুহিতা দেবযান্যসি। একথা তিন ভুবনের সবাই জানে। আমার অলৌকিক ঐশ্বর্য সঞ্জীবন মন্ত্রের ক্ষমতা দৈত্যরাজ বৃষপর্বাও জানেন, স্বর্গেশ্বর ইন্দ্রও জানেন এবং পৃথিবীপতি নাহুষ যযাতিও জানেন। তবে কী জান— নিজের ক্ষমতার কথা নিজের মুখে বলতে নেই। তাতে ভদ্রলোকের লজ্জা হয়— কত্থনং স্বগুণানাঞ্চ কৃত্বা তপ্যতি সজ্জনঃ। কিন্তু তুমি তো আমার ক্ষমতার কথা ভালই জান, দেবযানী। তাই নিজের মুখে আর সে-সব কথা বলছি না— ততো বক্তুমশক্তোঽস্মি ত্বং মে জানাসি যদ্‌বলম্। তা ছাড়া, যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন ওঠো, ঘরে যাবে চলো। যে তোমার সঙ্গে অসদাচরণ করেছে, তাকে ক্ষমা করে দাও। ক্ষমা করাটাই সাধু-সজ্জনের ধর্ম।

শুক্রাচার্য অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলেন দেবযানীকে। রাগ হলে সেই রাগ দমন করার সুফল কত, ক্রোধহীন ব্যক্তির মর্যাদা কত এবং ক্ষমা করলে কতটা ধর্ম হয়— এসব শাস্ত্রীয় কথা শাস্ত্রীয় অভিসন্ধিতেই দেবযানীকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন শুক্রাচার্য। পরিশেষে বললেন— বাচ্চারা এরকম ঝগড়া করেই থাকে, বুদ্ধি হয়নি বলেই এবং ঝগড়া করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালমন্দ বোঝে না বলেই বাচ্চারা এমন করে ঝগড়া করে। কিন্তু তাই বলে আমি বুড়ো মানুষ হয়ে এসব সাধারণ ঝগড়ার কথা মনে রাখব? তাই কি হয়? প্রাজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি কখনও বালক-বালিকার অনুকরণ করতে পারে— ন তৎ প্রাজ্ঞোঽনুকুর্বীত ন বিদুস্তে বলাবলম্।

দেবযানী আরও কঠিন এবং শক্ত হলেন মুখে এবং মনে। বললেন— বাবা! ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব আমি জানি। ক্রোধ এবং ক্ষমার দোষ-গুণও আমার অজানা নয়। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে— কাদের সঙ্গে থাকা যায় এবং কাদের সঙ্গে থাকা যায় না। যারা শিষ্য হয়ে শিষ্যের মতো ব্যবহার করে না, গুরু অথবা গুরুবৎ কিচ্ছু জানে না, অথচ মুখে বলবে 'আমি আপনার শিষ্য'— এমন মিশ্রবৃত্তি শিষ্যের সঙ্গে আমার অন্তত থাকতে ভাল লাগে না— তস্মাৎ সংকীর্ণবৃত্তেষু বাসো মম ন রোচতে।

দেবযানী আরও একটা অকাট্য যুক্তি দিয়ে ঘটনার গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করলেন। বললেন— যে মানুষ সহবাসী বা প্রতিবেশী জনের বৃত্তি, ব্যবসায় অথবা তার বংশ নিয়ে কটু মন্তব্য করে— পুমাংসো যে হি নিন্দন্তি বৃত্তেনাভিজনেন বা— কোনও বুদ্ধিমান মানুষ, যে নিজের ভাল চায়, সে কখনও এই কটুকাটব্যের মধ্যে থাকবে না। এমন একটা শাস্ত্রীয় যুক্তি দেবযানীর মুখে শুনতে আশ্চর্য লাগে এই কারণে যে, তিনি নিজেই সেই সংকট প্রথম তৈরি করেন। সেই যখন স্নান করার সময় সকলের পরিধেয় বস্ত্র এলোমেলো হয়ে গেল, শর্মিষ্ঠা দেবযানীর কাপড় পরে ফেলেছিলেন ভ্রমবশত, তখন দেবযানীই কিন্তু শর্মিষ্ঠাকে অসুর ঘরের মেয়ে বলে প্রথম গালাগালিটা আরম্ভ করেছিলেন। নিজের বংশ নিয়ে এই অমর্যাদার কারণেই শর্মিষ্ঠার ক্রোধ উদ্রিক্ত হয়। যাই হোক, কাদের সঙ্গে থাকা যায় কাদের সঙ্গে যায় না— এ বিষয়ে দেবযানী অনেক দৃষ্টান্ত দেবার পর পিতার ক্রোধাগ্নি উদ্দীপিত করার জন্য তাঁরই উদ্দেশে বললেন— গরিব বলেই যারা লাভের আশায় বড়লোক শত্রুর মোসাহেবি করে, সেই সেবাবৃত্তির চেয়ে কষ্টকর আর কিছু আছে কিনা আমার জানা নেই। এমন নীচ মানুষের সংসর্গে পদে পদে যদি সম্মানী ব্যক্তিকে এইভাবে অপমানিত হতে হয়, তবে তার চেয়ে মরণও ঢের ভাল। দেবযানী শেষ দুঃখ জানিয়ে পিতাকে বললেন— ছুরি, কাটারি অথবা শরের আঘাতে যদি শরীরের কিছু অংশ কেটেও বেরিয়ে যায়, তবু সেখানে আবার মাংস গজায়, কিন্তু তীক্ষ্ণ এবং কটু কথায় মানুষের মনের মধ্যে যে ক্ষত তৈরি হয় সে ক্ষত কোনও দিন সারে না। বাক্যের ক্ষত রয়েই যায়— বাচা দুরুক্তং বীভৎসং ন সংরোহতে বাক্ক্ষতম্।

দেবযানীর এই কথাটা রীতিমতো রাজনীতির ইতিকর্তব্যের মধ্যে এসে পড়েছে। মহামান্য মনু মহারাজ তাঁর সংহিতা গ্রন্থে কোন কোন দোষ থেকে রাজাদের বিরত থাকা উচিত সেই প্রসঙ্গে বলবার সময় ক্রোধজ ব্যসনের মধ্যে বাক্‌পারুষ্য এবং দণ্ড-পারুষ্যের একটা তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন— রাজদণ্ড প্রয়োগ করে দণ্ডযোগ্য মানুষের হাত-পা, নাক-কান কেটে দিয়ে শাস্তি দেওয়াই যায়। কিন্তু তাতে সমস্যা এই যে, সেই ক্ষতির আর কোনও প্রতিবিধান করা যায় না। কাটা হাত-পা আর জোড়া দেওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে বাক্য-পারুষ্যের কথা এসেছে। অর্থাৎ খারাপ কথা বলা, মনে আঘাত দিয়ে কথা বলার প্রসঙ্গ

এসেছে। মনু বলেছেন— এটাও রাজা বা রাজনীতির পক্ষে একটা বড় দোষ। কেননা কুকথা এবং অপ্রিয় বাক্যের কুফল এমনই যে, হাজার চেষ্টা করলেও পরে আর সেই ক্ষত সেরে ওঠে না। মনুর টীকাকারেরা এইজায়গাটা যখন বিচার করছেন, তখন তাঁরা মহাভারত থেকে দেবযানীর এই কথাটুকু উদ্ধার করেছেন। কুল্লূকভট্ট তাঁর টীকায় লিখেছেন— অপ্রিয় বাক্যের ফল এতটাই মর্মে আঘাত করতে পারে যে, তার আর কোনও চিকিৎসা নেই। যেমনটি বলা হয়েছে— [মহাভারতে দেবযানীর উক্তিতে]— ন সংরোহতে বাক্‌ক্ষতম্।

একটি মানুষ— যার সঙ্গে অন্য জনের আত্মসম্বন্ধ আছে, যার প্রতি স্নেহ আছে, ব্যাকুল ভালবাসা আছে— সে যদি সেই স্নিগ্ধ-ব্যাকুল মানুষটির কাছে যৎসামান্য যুক্তি এবং বেশির ভাগটাই অভিমান নিয়ে কিছু বোঝাতে থাকে, তবে এক সময় সে সেইভাবেই বুঝবে, যেমনটি তাকে বোঝানো হচ্ছে। শৈশবে মাতৃহারা দেবযানীর প্রতি শুক্রাচার্যের স্নেহ ছিল অন্তহীন। দেবযানীকে তিনি অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছেন এবং প্রথম প্রথম তাঁকে বলেওছেন নিজের দোষ সম্বন্ধে সচেতন হতে। কিন্তু কন্যার অপার অভিমান এবং তাঁর আপন স্নেহের মিশ্রক্রিয়া যখন চূড়ান্ত আকার ধারণ করল, তখন অসুরগুরুর লোকোত্তরা বুদ্ধিও আর কাজ করল না। মহাভারতের কবি টিপ্পনী করতে বাধ্য হয়েছেন যে, শুক্রাচার্য আর কোনও পূর্বাপর বিবেচনা না করেই সিংহাসনে সমাসীন অসুররাজ বৃষপর্বার সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন— বৃষপর্বাণমাসীনম্ ইত্যুবাচ অবিচারয়ন্। ব্যক্তিগতভাবে শুক্রাচার্য যে বৃষপর্বার ওপরে খুব ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তা নয়। অভিমান ক্ষুব্ধা দেবযানী যেহেতু শর্মিষ্ঠার শাস্তি চান এবং অসুরদের গুরুমর্যাদায় অবস্থিত শুক্রাচার্য যেহেতু এই ব্যাপারে সরাসরি শর্মিষ্ঠার সঙ্গে কথা বলতে পারেন না, অন্তত সেটা যেহেতু তাঁকে মানায় না, সেইজন্য তিনি সোজা বৃষপর্বার কাছে গিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তাঁর কথা থেকে এটা বোঝাও গেল যে, তাঁর আসল রাগটা বৃষপর্বার ওপরে নয়, রাগটা প্রধানত শর্মিষ্ঠার ওপরেই, যার জন্য এই উটকো এক মেয়েলি ঝগড়ার মধ্যে তাঁকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। শুক্রাচার্য একেবারে আকস্মিকভাবে বৃষপর্বাকে বললেন— তুমি গোরু দেখেছ, মহারাজ। গোরু গর্ভস্থ হয়েই কিন্তু সদ্য-সদ্যই প্রসব করে না। পাপও সেই রকম বারে বারে করতে করতে এক সময় পাপকর্মকারী মানুষের মূলোচ্ছেদ করে বসে। একটা জিনিস জেনো। আজকে যখন মুখরোচক গুরুপাক জিনিস খাচ্ছ, তখন মুখে ভাল লাগছে বটে, কিন্তু পেটে গিয়ে সে খাবার কুফল জন্মাবে। পাপও তেমনই। এখন না বুঝে পাপ করছ বটে, কিন্তু এর ফল গিয়ে বর্তাবে তোমার ছেলের ওপর, তোমার নাতির ওপর— ফলত্যেব ধ্রুবং পাপং গুরুভুক্তমিবোদরে।

শুক্রাচার্য সোজাসুজি শর্মিষ্ঠার কথায় যেতে পারছেন না, তাই আগে অন্য কথা বলে বৃষপর্বার দোষ দেখিয়ে বললেন— আমারই ঘরে থাকা অবস্থায় তুমি ধার্মিক এবং গুরুনিষ্ঠ আমার শিষ্য ব্রাহ্মণ কচকে হত্যা করার ব্যবস্থা করেছিলে। আর এখন তোমার মেয়ে শর্মিষ্ঠা আমার ভালমানুষ মেয়েটাকে প্রথমে যা নয় তাই বলেছে। তারপর আবার তাকে প্রতারণা করে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছে— বিপ্রকৃতা চ সংরম্ভাৎ কূপে ক্ষিপ্তা মনস্বিনী।

শুক্রাচার্য বৃষপর্বাকে যাই কটু কথা বলুন, কিন্তু বলতে তাঁর খারাপ লাগছে। এতকাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই মানুষটার সুখে-দুঃখে আছেন, তাঁর ভাল-মন্দ চিন্তা করছেন, তাঁকে উপদেশ-পরামর্শ দিচ্ছেন এবং বৃষপর্বাও পরম মান্যতায় তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। তাই এই মানুষটাকে খারাপ কথা বলতে তাঁর মনে লাগছে। তাই সঙ্গে সঙ্গে বললেন— দেবযানী আর তোমার রাজ্যে থাকবে না, আর সে যদি না থাকে, তবে তাকে ছেড়ে আমার পক্ষেও এখানে থাকা সম্ভব নয়। তাই আজ থেকে আমি সবান্ধবে তোমাকে ত্যাগ করলাম। একের ওপর রাগ অন্যের ওপর মেটাচ্ছেন বলে শুক্রাচার্য কথঞ্চিৎ সান্ত্বনাও উচ্চারণ করলেন পরিশেষে। বললেন— আমার জন্য তুমি কষ্ট পেয়ো না, অথবা আমার ওপর রাগও কোরো না যেন। আসলে আমার উপায় নেই, দেবযানী না থাকলে আমি এখানে থাকতে পারি না। তার যেদিকে গতি হবে, আমারও গতি সেইদিকে, তার কাছে যা প্রিয় আমার কাছেও তাই প্রিয়— অস্যা গতির্গতির্মহ্যং প্রিয়মস্যাঃ প্রিয়ং মম।

যতটুকু কথা শুক্রাচার্য বলেছেন, তাতে এটা বোঝানো গেছে যে, তাঁকে নয়, তুষ্ট করতে হবে দেবযানীকে। অসুররাজ বৃষপর্বা পূর্বভূত ঘটনার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানতেন না। শুক্রাচার্যের আকস্মিক আক্ষেপে তিনি হতচকিত হয়ে বললেন— এ কী কথা বললেন, ব্রাহ্মণ। আমি যদি কচকে হত্যা করিয়ে থাকি অথবা আমি যদি শর্মিষ্ঠাকে দিয়ে দেবযানীকে কোনও কটু কথা বলিয়ে থাকি, তবে আমার যেন অসদ্‌গতি হয়। খুব সত্যি কথা, যে দুটি অভিযোগ শুক্রাচার্য করেছেন, তার কোনওটারই প্রকৃত দায় বৃষপর্বার নয়। কচকে যে বার বার মেরে ফেলার চেষ্টা হয়েছে, সে চেষ্টা করেছে অসুররা এবং তা তারা নিজেদের সিদ্ধান্তেই করেছে। এতে বৃষপর্বা সরাসরি দায়ী না হলেও, অসুরদের রাজা হিসেবে একটা নৈতিক দায় শুধু থেকে যায় এবং শুক্রাচার্য হয়তো নিরুপায় হয়ে তারই ইঙ্গিত করছেন। একইভাবে কন্যা শর্মিষ্ঠাকেও বৃষপর্বা শিখিয়ে দেননি যাতে সে দেবযানীকে অপমান করে। কিন্তু সেখানেও তাঁকে পিতা হবার দায় বইতে হচ্ছে।

শুক্রাচার্যের আকস্মিক ক্রোধে বৃষপর্বা তাই হতভম্ব হয়ে বললেন— আপনি যদি এইভাবে এখনই চলে যান, গুরুদেব, তা হলে আমাদের সবাইকে তো সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে হবে! শুক্র বললেন— সে তোমরা যাই করো, সমুদ্রেই ডুবে মরো, আর অন্য দেশেই চলে যাও, আমি আমার মেয়েকে ছাড়া থাকতে পারব না। তবে হ্যাঁ আমি তোমার ভাল চাই সবসময়। তোমরা যদি নিতান্তই আমার উপস্থিতি চাও, তবে আমার মেয়ে দেবযানীকে তুষ্ট করো— প্রসাদ্যতাং দেবযানী জীবিতং যত্র মে স্থিতম্। বৃষপর্বা একটু ইতস্তত করলেন, একটু যেন লজ্জা হল তাঁর। আপন কন্যার সমবয়সি একটি মেয়ের কাছে নিজের কোনও দোষ না থাকতেও ক্ষমা চাইতে হবে। এ কেমন বিড়ম্বনা। বৃষপর্বা ইনিয়ে বিনিয়ে বললেন— অসুরদের যত সম্পত্তি আছে— হাতি, ঘোড়া, রথ— সবই তো প্রভু আপনার। তা হলে...। শুক্রাচার্য বৃষপর্বার কথা কেড়ে নিয়ে বললেন— অসুরদের যত সম্পত্তি আছে, তার সবকিছুরই প্রভু যদি আমিই হই, তবে আমি বলছি— তোমরা দেবযানীকে সন্তুষ্ট করো— দেবযানী প্রসাদ্যতাম্।

পুত্র-কন্যার জন্য পিতা-মাতাকে কখনও কখনও এইরকম অস্বস্তিকর পরিবেশে পড়তে হয়। শুক্রাচার্যের কথাগুলি শুনলেই বোঝা যায় যে, তিনি খুব যুক্তি-তর্কের মধ্যে যেতে

চাইছেন না; কেননা যুক্তিতর্কের মধ্যে গেলে তাঁকে অসুররাজ বৃষপর্বার যুক্তি-তর্কও কিছু মেনে নিতে হত এবং তাতে এমন হতেই পারত যে, দেবযানীর সব কথা মেনে নেওয়া সম্ভব হত না, এমনকী যুক্তি-তর্ক খাটিয়ে দেবযানী-শর্মিষ্ঠার ঝামেলা মিটেও যেতে পারত অপরাধ স্বীকারের মাধ্যমে, ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে। কিন্তু এসব মাধ্যম দেবযানী পছন্দ করছেন না, তিনি বিবাদ মেটাতে চাইছেন না, তিনি শর্মিষ্ঠাকে চরম শাস্তি দিতে চাইছেন এবং শুক্রাচার্য তাঁর এই আদরিণী মেয়ের আবদার না মেনে পারছেন না, কেননা তিনি সেইভাবেই অনর্থক আদরে তাঁকে মানুষ করেছেন। কিন্তু বৃষপর্বার ওপরে অর্থ-মানের কারণেই যে স্নেহ-ভালবাসা শুক্রাচার্যের তৈরি হয়েছে, সেটা যাতে নষ্ট না হয় এবং যাতে ব্যাপারটা দেবযানী-শর্মিষ্ঠার স্তরেই আবদ্ধ থাকে, সেইজন্যই শুক্রাচার্য বারবার বলতে লাগলেন— আমাকে নয়, তুমি দেবযানীকে তুষ্ট-প্রসন্ন করো— দেবযানী প্রসাদ্যতাম্।

বৃষপর্বা বুঝলেন— আর কোনও উপায় নেই। অগত্যা বৃষপর্বা দেবযানীর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাওয়াটাই শ্রেয় মনে করলেন। কেননা দেবযানী চলে গেলে তাঁর কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না বটে, কিন্তু শুক্রাচার্য তাঁর রাজ্য ছেড়ে চলে গেলে সমূহ বিপদ। বৃষপর্বা যাতে খুব অস্বস্তিতে না পড়েন, সেজন্য শুক্রাচার্য আগেভাগেই এসে তাঁকে বুঝিয়ে বললেন— দেখো মা! বৃষপর্বা যথেষ্ট অনুতপ্ত এবং সে বার বার এ কথা বলেছে যে, তার ধন-সম্পত্তি, রাজ্য— এ সব কিছুরই মালিক আমি। দেবযানী পিতার কথায় একটুও আমল দিলেন না এবং অস্বস্তিটুকুও বুঝলেন না। তাঁর শুধু মনে শর্মিষ্ঠার কথা। সে দেবযানীকে স্তাবক এবং যাচকের কন্যা বলেছে, দেবযানী পিতার অস্বস্তি, রাজার অসম্মান— এসব কিছু বোঝেন না। নিজের 'ইগো' ছাড়া তাঁর অন্তরে আর কোনও দয়া, মায়া, স্নেহ-মমতা নেই। পিতাকে তিনি একই রকম রাগ দেখিয়ে বললেন— আমি বিশ্বাস করি না তোমার কথা। তুমি যদি সত্যিই অসুররাজ বৃষপর্বার রাজ্য-সম্পত্তির মালিক হও, তবে সে নিজে এসে ওই কথা বলুক আমার সামনে— নাভিজানামি তত্তেহহং রাজা তু বদতু স্বয়ম্।

শুক্রাচার্য আর কথা বাড়ালেন না। বৃষপর্বা এর মধ্যে এসে পায়ে পড়লেন দেবযানীর— পপাত ভুবি পাদয়োঃ। বৃষপর্বা বললেন— দেবযানী! তুমি যা চাইবে, তা যদি একান্ত দুর্লভও হয়, যদি তা একান্ত অসাধ্যও হয় আমার, তবু আমি তোমাকে তা দেব। দেবযানী সময় বুঝে চরম আঘাত করলেন। বললেন— তা হলে তোমার মেয়ে শর্মিষ্ঠা তার এক হাজার সখীর সঙ্গে আমার দাসী হবে আজ থেকে। আর বিয়ের পর পিতা আমায় যে পাত্রে দান করবেন, সেই বাড়িতে শর্মিষ্ঠাও তার হাজার সখীর সঙ্গে আমার পিছন পিছন যাবে— অনু মাং তত্র গচ্ছেৎ সা যত্র দাস্যতি মে পিতা।

শর্মিষ্ঠা রাজার ঘরের মেয়ে, কাজেই রাজমহলে তাঁর পিতার সঙ্গে শুক্রাচার্যের যে কথা-কাটাকাটি চলছে এবং শেষ পর্যন্ত বৃষপর্বা কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, এ খবর তাঁর কাছে আগেই চলে গেছে। সম্ভবত সেই জন্যই শর্মিষ্ঠাকে যে ছোটবেলা থেকে লালন করেছে, সেই ধাত্রীমাতা বৃষপর্বার কাছে কাছেই ছিল। সামনে তাকে দেখেই বৃষপর্বা আদেশ দিলেন— যাও ধাত্রী! শর্মিষ্ঠাকে গিয়ে বলো, দেবযানী যেমনটা চাইছে, সে যেন তাই এসে করে। ধাত্রী তাড়াতাড়ি করে শর্মিষ্ঠার কাছে গিয়ে বলল— ওঠো গো মেয়ে। এখন তোমার বাবা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা আত্মীয়স্বজনের প্রয়োজনে তোমায় কাজ করতে হবে। দেবযানী এমন করে তার পিতা শুক্রাচার্যকে বুঝিয়েছে যে, এখনই তিনি রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছেন প্রায়— ত্যজতি ব্রাহ্মণঃ শিষ্যান্ দেবযান্যা প্রচোদিতঃ। যা অবস্থা, তাতে দেবযানী এখন যা বলবে, তাই তোমাকে করতে হবে, মেয়ে!

শর্মিষ্ঠা রাজার ঘরের মেয়ে, রাজশাসন এবং রাজার ধর্ম জন্ম থেকে ক্রিয়া করে রাজবাড়ির পুত্র-কন্যাদের মধ্যে। নিজের আত্মসম্মানের চেয়ে রাজ্যের প্রয়োজনটাকে অনেক বড় করে দেখতে শেখাটা খুব সহজ নয়। শর্মিষ্ঠা সেটা শিখেছেন ভালভাবেই।

আজ যখন তিনি দেখলেন— তাঁরই অপরাধে তাঁর পিতা এবং তাঁর আত্মীয় পরিজন অসুরেরা সকলে বিপন্ন হয়ে পড়েছেন, তখন তিনি নিজের সমস্ত গরিমা বিসর্জন দিয়ে ধাত্রীকে বললেন— দেবযানী যা চাইবে, আমি তাই করব— যং সা কাময়তে কামং করবাণ্যহমদ্য তম্। আমার দোষে দেবযানী এবং শুক্রাচার্য আমাদের রাজ্য ছেড়ে চলে যাবেন, এমনটি নিশ্চয়ই আমি করব না।

শর্মিষ্ঠা শেষবারের মতো রাজমর্যাদায় উঠে বসলেন শিবিকায়। সঙ্গে এক হাজার পরিচারিণী দাসী। শর্মিষ্ঠা দেবযানীর সামনে পালকি থেকে নেমে পিতার ইচ্ছামতো দেবযানীকে বললেন— দেবযানী! এই এক হাজার দাসীর সঙ্গে আমিও তোমার পরিচারিকা দাসী হলাম— অহং দাসী-সহস্রেণ দাসী তে পরিচারিকা। তোমার পিতা যেখানে তোমাকে কন্যাদান করবেন, এই হাজার দাসীর সঙ্গে আমিও সেখানে তোমার পিছন পিছন যাব। দেবযানী এবার শর্মিষ্ঠার কথা উলটে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন— তুমি না বলেছিলে— আমি স্তাবক, যাচক এবং প্রতিগ্রহজীবীর মেয়ে, আর তুমি হলে সদাসংস্তুত দানী বাবার মেয়ে, তা হলে কোন লজ্জায় তুমি আমার দাসী হবে শুনি— স্তুয়মানস্য দুহিতা কথং দাসী ভবিষ্যসি? শর্মিষ্ঠা এই ঝগড়ার কথার মধ্যেই গেলেন না। বললেন— আমার বিপন্ন আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বন্ধু পিতা যাতে বিপন্মুক্ত হন, সেজন্য যে কোনও রকম কাজ আমি করতে রাজি— যেন কেনচিদার্তানাং জ্ঞাতীনাং সুখমাবহেৎ। আর ঠিক সেইজন্যই দাসীর মতোই অনুগমন করতে আমার কোনও বাধা নেই।

শর্মিষ্ঠার প্রতিবচন দেবযানী কতটা বুঝলেন জানি না, তবে শর্মিষ্ঠার এই কথাগুলির মধ্যেও যে রাজোচিত প্রত্যয় ছিল, সেকথা দেবযানীর পক্ষে সত্যিই বোঝা সম্ভব হয়নি। দেবযানী বুঝলেন না— যে প্রত্যয় নিয়ে শর্মিষ্ঠা তাঁকে অপমান করে কুয়োয় ফেলে দিয়েছিলেন, আজ সেই প্রত্যয়েই রাজকন্যার শিবিকা থেকে নেমে দেবযানীর দাসী হলেন শর্মিষ্ঠা। দেবযানী বসে থাকলেন পিতৃ-গৌরবের অভিমানমঞ্চে। তাঁর নিজের কোনও ক্ষমতা নেই, অথচ যে পিতার ক্ষমতার ভিত্তিতে তাঁর এত গৌরব এত আড়ম্বর, সেই পিতা যখন তাঁকে ক্রোধ এবং ক্ষমার তত্ত্ব বুঝিয়েছিলেন, তখনও তিনি বোঝেননি, আবার যখন পিতা এসে বৃষপর্বার কাতর আবেদনটুকু জানিয়েছিলেন, তখন পিতাকেই তিনি বলেছিলেন আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করি না। অন্যদিকে শর্মিষ্ঠার ব্যক্তিত্ব দেখুন। তিনি পূর্বে দেবযানীকে অপমান করে ভয়ও পাননি, নিজেদের ঝগড়ার কথা পিতাকেও জানানোর প্রয়োজন বোধ করেননি। কিন্তু রাজকন্যা বলে পিতার গৌরবে সেদিন দেবযানীর সঙ্গে ঝগড়া করলেও,

আজ যখন তিনি দেবযানীর দাসী হলেন, তখন পিতার রাজোচিত গৌরব অতিক্রম করে আপন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হলেন, প্রতিষ্ঠিত হলেন নিজের প্রত্যয়ে।

দেবযানী শর্মিষ্ঠার এই একান্ত আপন গৌরব এবং তাঁর ব্যক্তিগত মর্যাদা কিছুই বুঝলেন না। পিতার ব্রাহ্মণ্য এবং গুরুগৌরবের ওপর ভরসা করে প্রথমে যেমন তিনি ঝগড়া আরম্ভ করেছিলেন, আজও সেই পিতৃগৌরবের মঞ্চে বসে শর্মিষ্ঠার দাসীত্ব-ভাবনাতেই তিনি পরম তুষ্ট বোধ করলেন। পিতাকে তিনি বললেন— এখন আমি সন্তুষ্ট হয়েছি পিতা, এবার আমি বৃষপর্বার রাজধানীতে প্রবেশ করতে পারি— প্রবিশ্যামি পুরং তাত তুষ্টাস্মি দ্বিজসত্তম।

পিতা অসুররাজ বৃষপর্বার স্বার্থে, পিতার রাজ্যের স্বার্থে এবং আত্মীয় পরিজন অসুরদের স্বার্থে রাজকন্যা শর্মিষ্ঠা দেবযানীর অনুবৃত্তি করতে আরম্ভ করলেন দাসীর মতো। অনুবৃত্তির নমুনা হিসেবে কালিদাস রঘুবংশে লিখেছিলেন— দাঁড়িয়ে পড়লে দাঁড়ানো, চললে চলা, এমনকী তিনি জল খেলে জল খাওয়া— এই রকমভাবে অনুগমন করা যায় ছায়ার মতো। শর্মিষ্ঠাও প্রায় সেইভাবেই অনুগমন করছেন দেবযানীর। সেদিন কী খেয়াল হল, দেবযানী আপন কৌতুকে সেই বনভূমিতে এসে উপস্থিত হলেন, যেখানে শর্মিষ্ঠা তাঁকে ফেলে দিয়েছিলেন কুয়োয় এবং যেখানে মহারাজ যযাতি তাঁর হাত ধরে উদ্ধার করেছিলেন কুয়ো থেকে। হয়তো দেবযানী বোঝাতে চেয়েছিলেন শর্মিষ্ঠাকে— একবার বুঝে দ্যাখ, যে জায়গায় তুই আমাকে কুয়োয় ফেলে মারতে চেয়েছিলি, সেই বনভূমির মধ্যেই আজ তোকে আমার পিছন পিছন ঘুরতে হচ্ছে দাসীর মতো। অবশ্য এ ছাড়াও অন্য একটি কৌতুককর রোমাঞ্চও তাঁর মন জুড়ে থাকতে পারে। ভেবে থাকতে পারেন— যে মানুষটি তাঁকে একবার হাত ধরে কুয়ো থেকে তুলে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন, সেই মানুষটির সঙ্গে আবার যদি একবার দেখা হয়। এই বনভূমির মাঝখানে, উতল হাওয়ায়।

ঘটনাটা একেবারেই কাকতালীয় বলতে হবে। নইলে একই জায়গায় মহারাজ যযাতি আবারও এসে পৌঁছলেন কী করে? দেবযানী সেদিন প্রচুর সাজসজ্জা করেছিলেন। পুরাতন কষ্টস্পর্শী জায়গার স্মৃতি সুসময়ে বড়ই সুখ দেয়। দেবযানীও আজ চরম মানসিক সরসতার মধ্যে আছেন। এক হাজার দাসী নিয়ে শর্মিষ্ঠা তাঁর পিছনে ঘুর-ঘুর করছে। কেউ খেলা করছে, কেউ বন্য ফল ছিঁড়ছে, কেউ খাচ্ছে, কেউ চিবোচ্ছে, আবার কেউ বা বন্য মধুপুষ্পের নিষ্যন্দজাত মদিরা পান করছে— ক্রীড়ন্ত্যোভিরতাঃ সর্বাঃ পিবন্ত্যো মধুমাধবীম্। দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠাও এই বনভব ক্রীড়ারস থেকে সরিয়ে রাখেননি নিজেদের। দেবযানীর 'মুড' আজকে খুব ভাল। আজকে শর্মিষ্ঠার সাজগোজেও তাঁর আপত্তি হয়নি এবং আজকে তাঁর সঙ্গে একত্রে বসে— একাসনে নয় কিন্তু— বন্য পুষ্পাসব পান করতেও তাঁর দ্বিধা হচ্ছে না— যতক্ষণ অন্তরের শিরা-উপশিরা ভরি নাহি উঠে।

এমন সময়ে কী কাকতালীয় ঘটনা, মহারাজ যযাতি মৃগয়ার শ্রমে ক্লান্ত হয়ে জলপানের আশায় ঘুরতে ঘুরতে ঠিক সেইখানেই এসে উপস্থিত হলেন, যেখানে বসে আছেন শর্মিষ্ঠা এবং দেবযানী— তমেব দেশং সম্প্রাপ্তো জলার্থী শ্রমকর্ষিতঃ। নির্জন বনভূমির মধ্যে হঠাৎ এই ব্যাকুল বিভ্রমে মেতে-ওঠা রমণীসমাজ দেখে মর্ত্যভূমির রাজা যযাতি একটু হতচকিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন— একটি রত্নখচিত উৎকৃষ্ট আসনের ওপর দেবযানী বসে আছেন। আর তার থেকে একটু নিচু আসনে বসে আছে আরও একটি মেয়ে— সমস্ত মেয়ের মধ্যে তাকেই দেখতে সবচেয়ে ভাল— রূপেনাপ্রতিমাং তাসাং স্ত্রীণাং মধ্যে বরাঙ্গনাম্। সেও একটি সোনার আসনে বসে আছে বটে, কিন্তু তার আসন নিচুতে এবং সে উপরিস্থার পা টিপে দিচ্ছে, তবু মুখে তার ভুবন ভোলানো হাসিটুকু লেগেই আছে— দদর্শ পাদৌ বিপ্রায়াঃ সংবহন্তীমনিন্দিতাম্।

আসলে শর্মিষ্ঠা মানুষটাই অমনই। যখন তিনি দেবযানীকে সকারণে অপমান করেছিলেন, তখনও তিনি কারও তোয়াক্কা না করেই নিজের অনুভব সিদ্ধিতে কাজ করেছেন। আজ যখন তাঁকে দাসীবৃত্তি করতে হচ্ছে এবং আজ যখন তিনি বুঝতে পারছেন যে, দেবযানী সচেতনভাবেই এই পুরাতন বনভূমিতে নিয়ে এসেছেন তার পুরাতন ক্ষতে ক্ষারক্ষেপণের জন্য, তখনও সেই অপমানকর অভিসন্ধিটুকুও শর্মিষ্ঠা গ্রহণ করেছেন একেবারে 'স্পোর্টিং স্পিরিটে'। আজকে তিনি দেবযানীর পাও দাবাচ্ছেন আবার হাসছেনও— নিষণ্ণাং চারুহাসিনীম্।

এতক্ষণ যেসব সখী-দাসীরা হাসছিল, খেলছিল, নাচছিল আর বাদ্যি বাজাচ্ছিল, যযাতিকে দেখেই তারা সব থেমে গেল। লজ্জায় নামিয়ে নিল সব মুখ। এমন হঠাৎ নিস্তব্ধতার মধ্যে আগন্তুককে প্রশ্ন করতেই হয়। অতএব যযাতি প্রশ্ন করলেন— দু' হাজার মেয়ে আপনাদের দুটি মেয়েকে ঘিরে রয়েছে। কে আপনারা? আপনাদের নাম কী, পরিচয় কী? এখানে কে উত্তর দেবেন, দেবযানী থাকতে। তিনি তাঁর উচ্চাসনের মর্যাদা বুঝিয়ে দিয়ে বললেন— আমি দেবযানী। অসুরদের গুরু শুক্রাচার্য, আমি তাঁর মেয়ে। আর এই যে দেখছেন আমার পা টিপে দিচ্ছে— ও অসুররাজ বৃষপর্বার মেয়ে— আমার সখীও বটে দাসীও বটে। শর্মিষ্ঠার ব্যাপারে যতখানি তাচ্ছিল্য করা যায় ঠিক ততখানিই করলেন দেবযানী। যদি বা সখিত্ব এবং দাসিত্বের মধ্যে সখিত্বের অংশটুকু বেশি করে ধরেন আগন্তুক, তাই শর্মিষ্ঠার পরিচয় আরও একটু নামিয়ে দিয়ে বললেন— আমার সখীও বটে, দাসীও বটে, তবে যেখানে যেখানে আমি যাব, সেখানে সেখানেই ও আমার পিছন পিছন যাবে— ইয়ঞ্চ মে সখী দাসী যত্রাহং তত্র গামিনী।

আসলে দেবযানী বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর নিজের চেয়ে শর্মিষ্ঠা রাজার চোখে পড়েছে বেশি। তা ছাড়া, মহাভারতের কবি যদিও স্পষ্ট করে বলেননি বটে, কিন্তু আমাদের মনে হয়— যযাতিকে দেবযানী দেখেই চিনতে পেরেছিলেন। কেননা পুরুষ চিনতে দেবযানীর ভুল হয় না। দেবযানীর উত্তরে রাজা একটুও খুশি হলেন না। যে মেয়েটিকে তাঁর পছন্দ, তাঁকে দাসী বলে অপমান করা হচ্ছে শুধু ব্রাহ্মণত্বের অভিমানে, দেবযানীর এই সাহংকার প্রত্যুক্তি মেনে নিতে পারলেন না যযাতি। তিনি বলে উঠলেন— এ আবার কেমন কথা। আমার তো ভারী আশ্চর্য লাগছে শুনে যে, অসুররাজ বৃষপর্বার এই পরমা সুন্দরী মেয়েটি কিনা তোমার দাসী। এ কেমন কথা হল— কথং নু তে সখী দাসী কন্যেয়ং বরবর্ণিনী।

যযাতি এবার শর্মিষ্ঠার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। বললেন— স্ত্রীলোকের এমন সুন্দর চেহারা এই পৃথিবীতে আমি দ্বিতীয়বার দেখিনি— নৈবংরূপা ময়া নারী দৃষ্টপূর্বা মহীতলে।

ইনি দেবীও নন, গন্ধর্বীও নন, যক্ষীও নন, কিন্নরীও নন, অথচ মানুষের এমন সুন্দর চেহারা হয়! কেমন লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো টানা-টানা চোখ, এঁর ভাব-সাব-লক্ষণ দেখেও তো একবারও মনে হয় না যে, ইনি কারও দাসী হতে পারেন। অথচ তুমি বলছ— ইনি তোমার দাসী। হবেও বা। তবে এমন মানুষ দাসীত্ব করলে বুঝতে হবে হয় ভাগ্যের পরিহাস, নয়তো ইনি স্বেচ্ছায় তপস্যা করে তোমার দাসী হয়েছেন, নইলে এমন চেহারার মানুষ দাসী হয় নাকি— অন্যথৈবানবদ্যাঙ্গী কথং দাসী ভবিষ্যতি?

দেবযানীর ধৈর্য লুপ্ত হচ্ছিল। প্রশংসা পাওয়া তাঁর স্বভাব, প্রশংসা না করলে জোর করে, ঝগড়া করে, অভিশাপ দিয়েও প্রশংসা আদায় করা তাঁর স্বভাব। মহারাজ যযাতি তাঁকে চরম আঘাত দিলেন আরও একটি কথা বলে। এক প্রগলভা আত্মসর্বস্ব রমণীর পাশে নতমুখে নিম্নাসনে বসে-থাকা এক অনুপমা রমণীকে পাদসম্বাহন করতে দেখে রাজা যযাতি একেবারেই সহ্য করতে পারেননি। বিশেষত অসুররাজার মেয়ের মধ্যে তাঁর নিজগৃহের রাজত্বগন্ধ আছে। আর সেইরকমই এক রাজবাড়ির মেয়ে কিনা দাসীবৃত্তি করতে বাধ্য হচ্ছে। শর্মিষ্ঠা সম্বন্ধে দেবযানীর সাহংকার উক্তিতে রাজা তাই একটুও সুখী হতে পারেননি এবং দেবযানীকে সরাসরি প্রত্যাঘাত করে বলে ফেললেন— দেখো। তুমি সুন্দরী বটে, কিন্তু এই মেয়েটির সৌন্দর্যের কাছে তোমার সৌন্দর্য কিছুই নয়— অস্যা রূপেণ তে রূপং ন কিঞ্চিৎ সদৃশং ভবেৎ। কিন্তু কী আর করা যাবে, সবই কপাল। নিশ্চয়ই এঁর পূর্বজন্মের পাপ ছিল, নইলে এমন দশা হবে কেন?

অন্য কোনও সময় এমন মুখের ওপর কথা শুনলে দেবযানী কী করতে পারতেন, আন্দাজ করা যায়। আবার পিতা শুক্রাচার্যকে ধরে গুরুতর অভিশাপ দেওয়াতেন নিশ্চয়। কিন্তু এখন সে সময় নয়। রাজা শর্মিষ্ঠাকে পছন্দ করলে কী হবে, দেবযানী যে রাজাকেই পছন্দ করে ফেলেছেন। অতএব তাঁর যখন পছন্দ হয়েছে, যেভাবে হোক এই পুরুষমানুষটিকে আত্মসাৎ করবেনই। তাই রাজার মুখে নিজের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে অমন অপমানকর উক্তি শুনেও তিনি তা সম্পূর্ণ হজম করে নিলেন। শর্মিষ্ঠা কেমন করে তাঁর দাসী হলেন, সেই বিশ্লেষণের মধ্যেও গেলেন না, কেননা তাতে তাঁর নিজের দোষ রাজার কাছে প্রকট হয়ে উঠতে পারে। অতএব রাজার সমস্ত কৌতূহলে জল ঢেলে দিয়ে দেবযানী বললেন— সকলেই বিধির বিধান অনুসারে চলতে বাধ্য হন, রাজা। কাজেই এও বিধির বিধান, এ বিষয়ে বেশি কথা বলে আর লাভ আছে কিছু— মা বিচিত্রাঃ কথাঃ কৃথাঃ। তার চেয়ে আপনার কথা বলুন— আপনার এই রাজবেশ, অথচ বৈদিক ভাষা, আচার-বিচারের সঙ্গেও বেশ পরিচয় আছে মনে হচ্ছে। তা আপনার নাম কী, কোন দেশেরই বা রাজা আপনি?

যযাতি নিজের পরিচয় দিলেন। নামও বললেন। এরপর দেবযানী একবার রাজাকে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেছেন শুধু এবং রাজা যেন কেমন বুঝতে পারছিলেন— এ মেয়ের গতিক ভাল না। তিনি আর কাল বিলম্ব না করে যাবার অনুমতি চাইলেন দেবযানীর কাছে। বললেন— অনেক তো হল, অনেক প্রশ্ন করলেন, এবার অনুমতি করুন— বহুধাপ্যনুযুক্তোঽস্মি তদনুজ্ঞাতুমর্হসি। আর যাবেন কোথায় রাজা! দেবযানী সঙ্গে সঙ্গে বললেন— এই দু'হাজার দাসী এবং শর্মিষ্ঠাকে নিয়ে আমরা সবাই আপনার অধীন হলাম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজা। আপনি আমার চিরকালের সখা হোন এবং আমার স্বামীও হোন— ত্বদধীনাস্মি ভদ্রং তে সখা ভর্তা চ মে ভব।

স্বামীর সঙ্গে যে সখ্য সম্বন্ধ— স্ত্রীলোকের মর্যাদার দৃষ্টিতে সে বড় উচ্চমার্গের কথা। কিন্তু দেবযানী যে এ কথা বলেছেন, তার মধ্যে অন্য ধরনের এক সচেতনতা আছে। এ যদি শুধুই এক মনোমুগ্ধকর প্রেমের বশে আত্মনিবেদন হত, তা হলে এই সখ্যসম্বন্ধের অন্য মাত্রা তৈরি হত, সে মাত্রায় যুক্ত হত কবির প্রেরণা— চিরজনমের সখা হে— অথবা— পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার। কিন্তু আমরা দেবযানীকে চিনি। তিনি মুখে যতই রাজার অধীনতা স্বীকার করুন, সে আত্মনিবেদন একেবারেই মৌখিকতা, মৌখিক বিলাসিতা। আত্মনিবেদন করার সময়েও তিনি মনে রাখেন যে, গুরু শুক্রাচার্যের মেয়ে তিনি। ভর্তার সঙ্গে চিরসম্বন্ধের মধ্যেও বন্ধু যেমন বন্ধুর সঙ্গে সমানে সমানে মেশে দেবযানী সেই সমতাটুকু জিইয়ে রাখতে চাইলেন আপন গুরুগৌরবের সচেতনতায়।

রাজা যযাতি যেমন অবাক হলেন, তেমনই ফাঁপরে পড়লেন। একটি যৌবনবতী রমণী হঠাৎ প্রেম নিবেদন করলে, তার মুখের ওপর প্রত্যাখ্যান-শব্দও উচ্চারণ করা যায় না, আবার এ-কথাও তাকে বলা যায় না যে, দেখো বাপু। তোমার রূপ-গুণ, আচার-ব্যবহারও আমার পছন্দ হয়নি। অতএব ওসব বিয়ে-টিয়ে সম্ভব নয়। রাজা উলটো পথ ধরলেন। ব্রাহ্মণ গুরু শুক্রাচার্যের মেয়েকে পরম গৌরব দিয়ে বললেন— দেখো দেবযানী। তোমার ভাল হোক, কিন্তু আমি তোমায় বিয়ে করতে পারছি না— বিদ্ধ্যৌশনসি ভদ্রং তে ন ত্বামর্হোঽস্মি ভাবিনি। আমি ক্ষত্রিয় রাজা, আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন না। বর্ণশ্রেষ্ঠ বলে চিহ্নিত ব্রাহ্মণ-কন্যার সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের বিয়ে পণ্ডিতরাও অনুমোদন করবেন না।

দেবযানী মহারাজ যযাতির কথা পড়তে দিলেন না। প্রথম যৌবনে তিনি বৃহস্পতি-পুত্র কচকে নিজের প্রেমজালে আবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন; পারেননি। আসলে দেবযানী প্রেমে পড়েননি, পিতার গৌরবে নিজের অহমিকার জালেই তিনি তাঁকে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন; পারেননি। তাই তিনি এবারে আর সুযোগ হারাতে চান না। কচ তাঁকে অভিশাপ দিয়ে রেখেছেন— কোনও ঋষি বা ঋষিপুত্রের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে না। যযাতি রাজা এবং রাজপুত্র। ব্রাহ্মণ না হোন, অন্তত ব্রাহ্মণের পরের বর্ণ তো বটে, এঁকে তিনি ছেড়ে দিতে পারেন না। এইরকম একটা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি থেকেই দেবযানী যযাতির কথার উত্তর দিয়ে বললেন— তাতে কী আছে, মহারাজ! ব্রাহ্মণের সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের, ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণের সম্বন্ধ তো চিরকালের— সংসৃষ্টং ব্রহ্মণা ক্ষত্রং ক্ষত্রেণ ব্রহ্ম সংহিতম্। আর আপনি আমার কাছে ঋষিও বটে ঋষিপুত্রও বটে।

মহারাজ যযাতির কোন পূর্বপুরুষ ঋষি ছিলেন, অথবা কোন সুবাদে তিনি ঋষি হতে পারেন, তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু প্রণয়-বাচনিক ব্যবহারে রাখালও তো রমণীর মৌখিক সরসতায় রাজপুত্র হয়ে ওঠে অথবা পুরুষের কল্পভাষায় কত সাধারণীও তো স্বর্গসুন্দরী। অতএব সেই ভাষায় দেবযানী যখন যযাতিকে বলেন— প্রিয় আমার! তুমিই আমার কাছে ঋষি, তুমিই আমার ঋষিপুত্র, তুমি বিয়ে করে নিয়ে যাও আমাকে— ঋষিশ্চ

ঋষিপুত্রশ্চ নাহুষাঙ্গ বহস্ব মাম্— তখন এটা ভাবার কোনও কারণ নেই যে, মহাভারতের টীকাকারদের ব্যাখ্যানুযায়ী এখানে ঋষি বলতে ঋষি-প্রতিম রাজর্ষি বুঝতে হবে, অথবা বহু পূর্বপুরুষের ঋষিত্ব প্রমাণ করে যযাতির ব্যাপারে দেবযানীর বচন প্রমাণ করতে হবে। আমরা মহাকাব্যের সমন্বয়িনী বুদ্ধিতে দেবযানীকে যতটুকু চিনেছি, তাতে তাঁর এই প্রিয় সম্বোধনের মধ্যে তাঁর পূর্ব-প্রণয়ী বার্হস্পত্য কচের প্রতি অধিক্ষেপ ছাড়া আর কিচ্ছু ছিল না। কচ বিরক্ত হয়ে দেবযানীকে অভিশাপ দিয়েছিলেন— কোনও ঋষিপুত্র তোমার স্বামী হবে না কোনও দিন— ঋষিপুত্রো ন তে কশ্চিজ্জাতু পাণিং গ্রহীষ্যতি। আজ যযাতিকে যখন দেবযানী প্রায় বৈবাহিক শৃঙ্খলের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেছেন, অথচ যযাতি এখনও ব্রাহ্মণ-কন্যার সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের বৈবাহিক নিষেধের শাস্ত্রযুক্তি শোনাচ্ছেন, তখন প্রিয়-সম্বোধনে দেবযানীর সাফ কথা— ওসব আমি জানি না যাও, তুমিই আমার ঋষি, তুমিই আমার ঋষিপুত্র— কচের অভিশাপ যেন এই প্রিয় সম্বোধনে এক মুহূর্তে উড়িয়ে দিলেন দেবযানী।

ঋষি-ঋষিপুত্রের এই দ্বন্দ্বটা তবু ঘুচে যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের প্রতিলোম-বিবাহের শাস্ত্রীয় যুক্তিটা দেবযানী যেভাবে লঘু করে দিলেন, সেখানে সমাজের প্রখর বাস্তবতাই সবচেয়ে বড় যুক্তি হয়ে ওঠে। কেননা শাস্ত্রযুক্তি যতই প্রাতিলোম্য নিষেধ করুক, যতই বলুক বর্ণসংকরের ফলে শাস্ত্রীয় নরকের যন্ত্রণার কথা, কিন্তু পুরুষ-রমণীর প্রেম-ভালবাসার চিরন্তন জগৎ তো এমনই যেখানে বর্ণসংকরের যুক্তি খাটে না। ফলে অগস্ত্যের মতো ঋষির সঙ্গে রাজকুমারী লোপামুদ্রার যেমন বিয়ে হয়, বশিষ্ঠের সঙ্গে শূদ্রাণী অক্ষমালার যেমন আনুলোম্যে বিবাহ হয়, তেমনই প্রতিলোম বিবাহেরও অন্ত নেই ভারতবর্ষে, কিন্তু শাস্ত্রকারেরা এই বিষয়ের সামাজিক বিরুদ্ধতা স্মরণ করেই এই প্রণয়-বিবাহের কথা উদাহরণ হিসেবেও বলেন না, বলতে চান না। দেবযানী সেই বাস্তবতার যুক্তিতে প্রণয়-বিবাহের যুক্তিটুকুই শুধু বুঝিয়েছেন, তা আমরা মনে করি না। বস্তুত ব্রাহ্মণ্যের সঙ্গে ক্ষত্রিয়তার মাখামাখি এবং ক্ষত্রিয় ভাবনার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যের মাখামাখি— শব্দগুলো দেখুন— সংসৃষ্টং ব্রহ্মণা ক্ষত্রং ক্ষত্রেণ ব্রহ্ম সংহিতম্— এই মাখামাখির মধ্যে সমাজের একটা সমসাময়িকতা আছে।

পণ্ডিতেরা জানিয়েছেন— বৈদিক কাল থেকে মহাভারতের কাল পর্যন্ত সময়ে ব্রাহ্মণ্য এবং ক্ষাত্রশক্তির পারস্পরিক নির্ভরতাতেই রাজনীতি, সমাজনীতি এমনকী অর্থনীতিও তৈরি হয়েছিল। ব্রাহ্মণেরা আইন তৈরি করতেন সেই আইন প্রয়োগ করতেন ক্ষত্রিয়েরা। এই পারস্পরিকতার মধ্যে নিজেদের স্বার্থরক্ষার ভাবনাও তাঁরা যথেষ্ট করতেন বলেই সমাজের অধমাংশ এবং স্ত্রীলোকেরাও অনেক সময় পীড়িত হতেন বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। আবার ব্রাহ্মণ্য এবং ক্ষাত্র-শক্তির পারস্পরিক স্বার্থ-প্রতিপূরণের মধ্যে ঐহিক লাভ অনেক সময় বাস্তবসঙ্গত কারণেই বড় হয়ে উঠত বলে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষও হত মাঝে মাঝে। পণ্ডিতেরা এই বিষয়ে বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের বিবাদের উদাহরণ দেন, উদাহরণ দেন নিমি রাজার এবং আরও অনেকের, যেখানে ব্রাহ্মণ্য এবং ক্ষাত্র শক্তি একে অপরের বিপক্ষে গেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের বিশাল পরম্পরাবাহী বর্ণাশ্রমের ইতিহাসে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধ দৃষ্টত যাই থাকুক এবং পণ্ডিতেরা গবেষকের আত্মপ্রমাণমুখর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবনায় যতই এই বিরোধ প্রমাণ করুন, ইতিহাসের সত্য এই যে, ভারতবর্ষে রাজনৈতিক শক্তি পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় দুই পক্ষেরই অবদান ছিল এবং এই দুই পক্ষই পরস্পরকে সবচেয়ে বেশি সমঝে চলত। ফলে ঝগড়া-বিবাদের জায়গা ছিল কমই এবং সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিবাহের শাস্ত্রীয় অনুমোদন না থাকলেও উচ্চবর্ণ হিসেবে এই দুয়ের পরস্পরাপেক্ষা এতটাই বেশি ছিল যে বিবাহের ব্যাপারে প্রাতিলোম্যও খুব ভয়ংকরী বাধা হয়ে ওঠেনি কখনও। এই দিক থেকে দেবযানীর আশ্বাস বচন বা বিবাহের যুক্তি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের পারস্পরিক শক্তিকেন্দ্রিক সহাবস্থান সবচেয়ে নিষ্ঠুর সত্য হিসেবে প্রকট করে তোলে। রাজনৈতিক এবং সামাজিক শক্তি-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই দুই উচ্চবর্ণের পারস্পরিক সহায়তা বৈশ্য-শূদ্র এবং স্ত্রীলোকের সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা পারিবারিক উৎপীড়ন তৈরি করত কিনা, তার বিস্তৃত আলোচনার পরিসর এটা নয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সামাজিক মাখামাখির কথাটা দেবযানী যেভাবে, যে ভাষায় বলেছেন ঠিক সেইভাবে সেই একই ভাষায় মহাভারতের অন্যত্রও উল্লিখিত হয়েছে। যুদ্ধপূর্ব সময়ে পরস্পরের রাজনৈতিক শক্তি এবং অবস্থান বুঝে নেবার জন্য। ইতঃপূর্বে অসুররাজ বৃষপর্বা এবং ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্যের মধ্যে যে বিবাদ তৈরি হয়েছিল, তা যেভাবে মিটিয়ে ফেলা হল, সেটা থেকেই ব্রাহ্মণ্য এবং ক্ষাত্রশক্তির পারস্পরিক আনুকূল্যবিধানের চিত্রটা খুব পরিষ্কার হয়ে যায়। দেবযানী সেই পারস্পরিক আনুকূল্যের ভাবনাটা খুব সরলভাবে আপন বৈবাহিক যোজনায় প্রয়োগ করছেন এই মুহূর্তে।

যে বিবাহ যযাতি করতে চাইছেন না জীবন-যাপনের সুস্থিরতার জন্য, সেখানে দেবযানীর এই স্নিগ্ধ সমাধানে যযাতি খুব পুলকিত বোধ করলেন না। বরঞ্চ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের প্রতিলোম বিবাহের ফলে যে সামাজিক এবং পারিবারিক সংকট তৈরি হয়, তার একটা যথার্থ সামাজিক কারণ তিনি নির্ণয় করেছেন। যযাতি বলেছেন— হ্যাঁ, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে একটা আন্তরিক সম্বন্ধ আছে বটে, তবে শাস্ত্রীয় যুক্তিতে সে-সম্বন্ধ তো সব বর্ণের মধ্যেই থাকার কথা, কেননা শ্রুতিবাক্য অনুসারেই তো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র— এই চতুর্বর্ণই সেই বিরাট সহস্রশীর্ষা পুরুষের মুখ, বাহু, উরু, চরণ থেকে সৃষ্ট হয়েছে— একদেহোদ্ভবা বর্ণাশ্চত্বারোঽপি বরাঙ্গনে— কিন্তু সমস্যাটা আসলে অন্য জায়গায়। সমস্যাটা শুচিতার বোধ নিয়ে, সমস্যাটা বর্ণভেদে প্রত্যেক বর্ণের আচার-বিচারের বোধ নিয়ে, সমস্যাটা প্রত্যেক বর্ণের পরম্পরা-বাহিত স্বধর্মবোধ নিয়ে— এখানে প্রত্যেকটি বর্ণই একের থেকে অন্যে এমন বেশি মাত্রায় পৃথক এবং ব্রাহ্মণেরা সেখানে এমনই উচ্চস্থানে বিচরণ করেন যে, সমস্যাগুলি ভয়ংকর আকার নেয়— পৃথগ্‌ধর্মাঃ পৃথক্‌শৌচাস্তেষাস্তু ব্রাহ্মণো বরঃ।

যযাতি তাঁর আপন বিবাহ-সংকটের মুহূর্তে যে সামাজিক সত্য উচ্চারণ করেছেন, তার চেয়ে বড় সত্য বোধহয় আর কিছু হতে পারে না। ভারতবর্ষের সমাজে আধুনিকতার সংক্রমণ এবং সেই সূত্রে বিবাহের সময় বর্ণধর্মের যত অতিক্রম ঘটেছে, তাতে প্রত্যেকটি অতিক্রমী বিবাহের মধ্যে কী ধরনের অশান্তি হত বা এখনও তা হয়, সেটা যাঁরা জীবন দিয়ে বুঝেছেন, তারাই জানেন যে, 'অজাতে' 'কুজাতে' বিয়ে করার কী ফল হয়! এক্ষেত্রে পূর্বস্বীকৃত অনুলোম বিবাহ, যেখানে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যরা শাস্ত্রীয় বিধিতেই নিজের থেকে

নিম্নবর্ণে বিবাহ করতে পারতেন, সেখানে এই ধরনের বিবাহে প্রেম-ভালবাসা-প্রণয়ই সব সময় কারণ হয়ে উঠত এবং এখনও তাই হয়। কিন্তু এই ধরনের প্রণয়জাত বিয়েতেও পিতা-মাতারা তাঁদের ব্রাহ্মণ্যের মৌখিকতা ত্যাগ করতে পারেন না, যদিও বাস্তব জীবনে তাঁরা সন্ধ্যা-বন্দনাদি সামান্য শৌচাচারও পালন করেন না। প্রাথমিক আপত্তি সত্ত্বেও যদি জোর করে যুবক-যুবতীর প্রণয় শেষ পর্যন্ত বিবাহে রূপান্তরিত হয় এবং মাতা-পিতা যদিবা পুত্র-বাৎসল্যে মেনেও নেন ছেলেকে, তা হলেও কিছু দিন পর থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত উচ্চতার কথা ভেসে আসতে থাকে নিম্নবর্ণীয়া যুবতীর উদ্দেশে— সে-কথা ছেলের মা-বাবাও বলে ফেলেন কখনও, কখনও বা আত্মীয়-স্বজনেরাও বলেন, কেননা তাঁরা বলার জন্যই আছেন— কথায় বলে— বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি।

সামান্য একটু অনুক্রম দিয়ে এইরকম একটা বিবাহ-ঘটনার বাস্তব-চিত্র উদ্ধার করে জানাই যে, এক্ষেত্রে এক ব্রাহ্মণ বালক একটি শূদ্র মেয়ে বিয়ে করে এনেছিল এবং তাদের বউভাতের দিন আত্মীয়-স্বজনেরা এমন বিচিত্র কৌতূহলে সদলবলে উপস্থিত হলেন যেন চিড়িয়াখানায় শিম্পাঞ্জি দেখতে এসেছেন। কৌতূহল শান্ত হবার পর 'টোটালি এমব্যারাসড' ছেলের মা-বাবাকে তাঁরা সান্ত্বনাও দিয়ে গেলেন— কী আর করবে বলো। ছেলের পছন্দ, তাকে তো আর ফেলে দেওয়া যায় না। আত্মীয়-স্বজনেরা সকলে এসেছিলেন, সকলেই প্রচুর প্রীতিভোজ উদরসাৎ করলেন, তারপর প্রচুর ঢেকুর তুলতে তুলতে প্রচুর সমালোচনা করতে করতে ছেলের পিতামাতাকে প্রচুর দূষতে দূষতে নিজেদের ব্যাপারে পাকা অবস্থান নিয়ে বললেন— আমাদের ছেলেরা যদি এমন করে তবে ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতাম। অমুকদা আর অমুকদি একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে।

এরপর আস্তে আস্তে সামাজিক পারিবারিক মেলামেশা চলতে থাকবে আর পদে পদে জাতিবর্ণগত দূষণ চলতে থাকবে। বউ যদি ভুলেও কোনও দিন বলে যে, বাপের বাড়িতে আমি কচুর লতি খেয়েছি, তা হলে শাশুড়ি বলবেন—আমাদের দেশে দেখতুম ওগুলো ছোটলোকেরা খেত। নিচু জাতের বউ যদি শিক্ষিতের বিজ্ঞানময়তায় কথা বলে, তা হলে অল্পবিদ্যার দূষণ তৈরি হবে অবধারিত। তার মধ্যে বউ যদি সুন্দরী হয় এবং তার যদি বিদ্যাবুদ্ধির সামান্যতম গুমরও থাকে, তবে শুনতে হবে— ছিল ভাগাড়ে, পড়েছে জোয়ারে, তাই সহ্য হচ্ছে না। এই যে পৃথক আচার, পৃথক আহার, পৃথক ভাবনা যা প্রত্যেক গৃহেই অন্যরকম, সেটাই দূষণের আধার হয়ে ওঠে তখনই, যখন জাতি-বর্ণের উচ্চাবচ বিপরিণাম ঘটে। অথচ সমান-বর্ণতা থাকলে ওই কচুর লতির কথাটাই আজকাল আই. টি. সি. সোনার বাংলার স্পেশাল থালিতে পড়লে উচ্ছ্বসিত হতে দেখেছি কত জনকে। যযাতি এই সমস্ত ব্যাপারগুলিকেই একত্রে ধরে 'পৃথগ্‌ধর্মাঃ পৃথক্‌শৌচাঃ' বলে চিহ্নিত করেছেন।

বস্তুত যযাতির এই বাস্তববোধ আরও বেশি সপ্রমাণ হয়ে ওঠে প্রতিলোম বিবাহের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ একটি উচ্চবর্ণের রমণীর সঙ্গে যদি একটি নিম্নবর্ণের ছেলের বিয়ে হয়। এসব ক্ষেত্রে দেখেছি— প্রথম দিকে অতি দজ্জাল শাশুড়িও একটু থতমত অবস্থায় থাকেন। আর দু-চার জন বউকে দেখেছি— দু-চার মাস যেতেই তাঁরা বহুল শুদ্ধাচারের কথা বলেন— তোমাদের বাড়িতে এইরকম হয়, আমার ঠাকুমা থাকলে দেখতে। বামুন ঘরের বিধবা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কত শুদ্ধাচারে থাকেন তিনি। এখানেও আচার, ব্যবহার, আহার নিয়েও অধিক্ষেপ-বাক্য উচ্চারিত হয়। বস্তুত অনুলোমই বলুন আর প্রতিলোম বিবাহই বলুন, বর্ণসংকর মাত্রেই বিবাহের চেয়েও বিবাহোত্তর জীবনের সমস্যা অনেক বেশি এবং সে সমস্যা সবসময়েই ব্রাহ্মণ্য আচার, ব্যবহার এবং জীবন-যাপনের সামাজিক উচ্চতার মাপকাঠিতেই বিচারিত। কথাটা খুব ভাল ধরেছিলেন সামাজিক-ঐতিহাসিক ম্যাক্স হ্বেবার। The Brahmin and Castes নামক একটি রচনায় তিনি বলেছেন— ভারতবর্ষে জাতিবর্ণের বিভাগ মানেই বিভিন্ন সামাজিক অবস্থিতি এবং এই অবস্থানের নিম্নতা, মধ্যতা অথবা উচ্চতা ঠিক হয় ব্রাহ্মণদের তুলনায় অথবা ব্রাহ্মণরা যে ধর্মীয় সমুদাচার পালন করেন তার তুলনায় একটি বিশেষ বর্ণ কতটা দূরে বা কাছে আছেন সেটা থেকে। মহারাজ যযাতি বলেছিলেন— আমরা একের সঙ্গে অপরে মাখামাখি করি বটে, কিন্তু আমাদের চলমান জীবনের পদ্ধতি, আমাদের আচার-আচরণ এবং শুচিতার বোধ অন্যরকম, অথচ ব্রাহ্মণ সেখানে সবার ওপরে— পৃথগ্‌ধর্মাঃ পৃথক্‌শৌচাস্তেষান্তু ব্রাহ্মণো বরঃ। আর এ-বাবদে ম্যাক্স হ্বেবার লিখলেন— Caste, that is, the ritual rights and duties it gives and imposes and the position of the Brahmins, is the fundamental institution of Hinduism.

মহারাজ যযাতি যেভাবে পাকা সমাজ-ঐতিহাসিকদের মতো ক্ষত্রিয় বর্ণের আচার-ব্যবহারের পৃথগ্‌ভাব নির্ণয় করে দেবযানীর প্রণয়গ্রহ থেকে বেরোতে চাইলেন, দেবযানী নিজের আসন্ন প্রয়োজনেই তা হতে দিলেন না। তিনি একটি কুমারী মেয়ের গায়ে পুরুষ-স্পর্শের প্রসঙ্গ তুলে বিবাহের অনিবার্যতা সপ্রমাণ করে তুললেন।

দেবযানী বললেন— ব্রাহ্মণের ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম— এসব কথা থাক। হাতের ধর্মটুকু আপনি স্মরণ করুন, মহারাজা। আপনি যে আমায় হাতে ধরে কুয়ো থেকে তুলেছিলেন। তা এমন কোনও পুরুষমানুষ আছেন— আমায় দেখাতে পারবেন— যে একটি মেয়ের পাণিগ্রহণ করে তাকে বিবাহের অধিকার প্রত্যাখ্যান করেছে? আপনি একবার আমার পাণিগ্রহণ করেছেন, আমি ভদ্রঘরের মেয়ে— সেই হাতে আমি আর কোনও পুরুষকে স্পর্শ করতেও পারব না— কথং নু মে মনস্বিন্যাঃ পাণিমন্যঃ পুমান্ স্পৃশেৎ।

যযাতি মহা-ফাঁপরে পড়লেন। ব্রাহ্মণ্য যে ভয়ংকর বস্তু এবং ব্রাহ্মণ্যকে যে তিনি যথেষ্টই ভয় পান— একথা বারবার জানিয়ে যযাতি বললেন— তোমার পিতা যদি তোমাকে আমার হাতে না দেন, তা হলে আমার পক্ষে সম্ভব হবে না তোমায় বিয়ে করা— অতোঽদত্তাঞ্চ চ পিত্রা ত্বাং ভদ্রে ন বিবহাম্যহম্। যযাতি ভেবেছিলেন— দেবযানীর হয়তো স্বভাব আছে পুরুষ দেখলে অভিভূত হওয়া। কিন্তু ব্রাহ্মণ পিতা শুক্রাচার্যের কাছে এই বিবাহের প্রস্তাব গেলেই তিনি সাহংকারে নস্যাৎ করে দেবেন দেবযানীকে এবং ব্রাহ্মণ থেকে হীনবর্ণ বলেই রাজার সঙ্গে দেবযানীর এই বিয়ে তিনি অনুমোদন করবেন না।

ভুল বুঝেছিলেন রাজা। দেবযানীর প্রতি তাঁর পিতার অন্ধ স্নেহের কথা তিনি জানতেন না। কতবার দেবযানীর জন্য তাঁর আপন অলৌকিক ব্রাহ্মণ্য ব্যবহার করতে হয়েছে, তাও তিনি জানতেন না। রাজার কথা শুনেই দেবযানী সোল্লাসে বলে উঠলেন— ও এই কথা। তা হলে পিতাই আমাকে তুলে দেবেন আপনার হাতে। আর আমাকে আপনি 'অদত্তা' বলছেন

কেন? আমি তো নিজেকে দিয়েই বসে আছি আপনার কাছে,কাজেই আপনি দত্তাকেই গ্রহণ করছেন, অদত্তাকে নয়। কথা বলেই দেবযানী পরিচারিকার দিকে তাকিয়ে বললেন— যা তো ঘূর্ণিকা, তুই আমার ব্রহ্মার সমান পিতাকে ডেকে নিয়ে আয় এখানে। একথাও তাঁকে বলবি যে, আপনার মেয়ে নাহুষ যযাতিকে নিজেই স্বামী হিসেবে পছন্দ করেছে— স্বয়ম্বরে বৃতং শীঘ্রং নিবেদয় চ নাহুষম্।

শুক্রাচার্যের কাছে সব খবর গেল। তিনি সব কাজ ছেড়ে তাড়াতাড়ি এসে উপস্থিত সেই বনভূমির মধ্যে। যযাতি যথোচিত মর্যাদায় তাঁর পদবন্দনা করলে দেবযানী বললেন— এই যযাতিই আমাকে হাতে ধরে কুয়োর ভিতর থেকে তুলেছিলেন। আপনাকে প্রণাম— আপনি এঁর হাতেই আমাকে তুলে দিন। আমি আর অন্য কাউকে স্বামী হিসেবে মানতে পারব না— নমস্তে দেহি মামস্মৈ লোকে নান্যং পতিং বৃণে। যযাতির সামনেই তাঁর মেয়ে যেসব যুক্তিতে নিজের প্রণয় বা আত্মসমর্পণ সযৌক্তিক করে তোলার চেষ্টা করছেন, তাতে একটু বিব্রতই বোধ করলেন শুক্রাচার্য। তিনি অসাধারণ সুন্দর একটি কথাও বললেন। বললেন— দেখো মা! ধর্ম, নিয়ম, আচার— এগুলো এক জিনিস, আর তোমার পছন্দ, প্রিয়ত্ব, প্রণয়— এগুলো আর এক জিনিস। আর ঠিক সেইজন্যই আমাকে না বলেই তুমি তোমার স্বামী ঠিক করেছ। এটা প্রণয়ের পরিসর, আমার কী বলার আছে। তা ছাড়া বৃহস্পতির ছেলে কচ যে অভিশাপ তোমাকে দিয়েছিল, তাতে কোনও ঋষি বা ঋষিপুত্রকে তুমি স্বামী হিসেবে পাবে না। অতএব যাঁকে তুমি স্বামী হিসেবে বরণ করেছ, আমার সম্পূর্ণ সম্মতিক্রমে তিনিই গ্রহণ করুন তোমাকে— গৃহাণেমাং ময়া দত্তাং মহিষীং নহুষাত্মজ।

চিন্তাটা যে এমন উলটো হয়ে যাবে, সেটা মোটেই ভাবেননি যযাতি। তিনি যে সুযোগ খুঁজছিলেন দেবযানীর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য সে সুযোগ তিনি পেলেন না। শুক্রাচার্যকেও তিনি মিনমিন করে বললেন— এইভাবে বিবাহ হলে বর্ণসংকরের দোষ স্পর্শ করবে না তো আমাকে? এ ব্যাপারে আপনিই আমাকে সঠিক পরামর্শ দেবেন। শুক্রাচার্য নিজের দৈব তেজের ভরসা দিয়ে যযাতিকে বললেন— এই পাপ থেকে আমি তোমাকে মুক্ত করে দেব, মহারাজ— অস্মিন্ বিবাহে মা গ্লাসীরহং পাপং নুদামি তে— তুমি বর্ণসংকরের ভয়ে বিষণ্ণ হয়ো না, মহারাজ! সুন্দরী দেবযানীকে বিয়ে করে তুমি অনন্ত আনন্দ লাভ করো।

এখানে তো সেই গভীর প্রশ্নটা সত্যিই উঠবে। মানুষ তো বলবেই— বাঃ, এ তো বেশ মজা, ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্যের নিজের যেই প্রয়োজন হল, তখনই তিনি নিজেদেরই করা নিয়মের দফারফা করে দিলেন। তিনি নিজে বেশ বুঝেছেন যে, তাঁর এই বদমেজাজি অহংকারী মেয়েটির বিয়ে দেওয়া খুব মুশকিল হবে, অতএব সে যখন নিজের বিয়ের ব্যবস্থা নিজেই কোনও মতে করে ফেলেছে, অতএব এই মুহূর্তে আর বর্ণসংকরের দোষটোশ নেই। আর যদি সে দোষ হয়ও, তা হলে আপন আর্য প্রভাবে তিনি তাঁর জামাই রাজাকে সমস্ত অধর্ম থেকে মুক্ত করে দেবেন— অধর্মাত্ত্বাং বিমুঞ্চামি শৃণু ত্বং বরমীপ্সিতম্। যুক্তিবাদীরা এখানে প্রশ্ন তুলবেনই যে, তা হলে বর্ণসংকরের ফলে নরকে গতি হবে— এমন কঠিন কথা যে প্রচার করা হয়েছে, সেগুলি কোনও আন্তরিক শাস্ত্রযুক্তি নয়, ব্রাহ্মণ্যের নিজস্ব প্রকোষ্ঠ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং উচ্চতা বজায় রাখার জন্যই তা হলে এইসব প্রচার। তা না হলে এই প্রাতিষ্ঠানিক সত্য কোনও কাদামাটির পুতুল নাকি যে, অন্য জনের ভাব-ভালবাসায় চরম শাস্তি ঘোষণার জন্য এই নিয়ম ব্যবহার করা হবে, আর নিজেদের প্রয়োজন হলে বলব— আমার মেয়েটাকে বিয়ে করে তুমি আনন্দ্ রহো বেটা, তোমার সব দোষ আমি ঘুচিয়ে দেব— অহং পাপং নুদামি তে।

আমরা বলব— বর্ণসংকর তা হলে প্রথমত সেই শাস্ত্রীয় চেষ্টা, যাতে উচ্চবর্ণের শুক্র-শোণিতের পরম্পরা দূষিত না হয়। যদি বা প্রণয় প্রেমের কাতরতায় বর্ণসংকর ঘটেও, তা উচ্চ-উচ্চতর বর্ণের অনুকূলে নিষ্পত্তি হবে, কেননা মনু-মহারাজ সামাজিক আইনের সেই পরিনিষ্পত্তি ঘটিয়েছেন যেখানে অনুলোম বিবাহ ঘটতে পারে এবং প্রত্যেকটি উচ্চতর বর্ণ স্ববর্ণের পরেই নিম্ন-নিম্নতর বর্ণের রমণীকে কামনা হলেই বিবাহ করতে পারেন, কিন্তু প্রতিলোম বিবাহ চলবে না, তাতে উচ্চতর বর্ণের মর্যাদা লঙ্ঘিত হবে, ব্রাহ্মণ্য লঙ্ঘিত হবে। কিন্তু এইসব কিছুর ওপরে এই মুহূর্তে প্রতিলোম বিবাহের ক্ষেত্রেও আপন সুবিধার্থে স্বয়ং শুক্রাচার্যের মুখে যে ব্রাহ্মণ্য স্বচ্ছন্দাচার দেখলাম, তার একটা ধর্মশাস্ত্রীয় তথা স্মার্ত তাৎপর্য আছে, কেননা স্মৃতিশাস্ত্রের বহুস্থলে আচার প্রমাণের জন্য মহাভারতীয় বচন উদ্ধৃত হয়েছে। লক্ষণীয়, প্রতিলোম বিবাহ স্মৃতিশাস্ত্র একেবারেই মানবে না বলে শুক্রাচার্যের এই মহাবাক্য ভুলেও কোথাও উচ্চারিত হয়নি, কিন্তু কথাপ্রসঙ্গেও যদি এই প্রসঙ্গ ওঠে সেই ভয়ে মহাভারতীয় টীকাকারদের অন্যতম এক আধুনিক টীকাকার এই মন্তব্য করেছেন যে, শুক্রাচার্য তাঁর শাস্ত্রবুদ্ধিতে এটাকে আর প্রতিলোম বিবাহ বলে মনে করেননি। তিনি নাকি ভেবেছেন যে, বার্হস্পত্য কচ যে মুহূর্তে দেবযানীকে অভিশাপ দিয়ে বলেছেন— কোনও ঋষি বা ঋষিপুত্র তোমার স্বামী হবেন না— সেই মুহূর্তেই দেবযানী ব্রাহ্মণত্ব থেকে পতিত হয়ে ক্ষত্রিয়ের পর্যায়ভুক্ত হয়েছেন। রাজা যযাতি এই ঘটনা জানতেন না বলেই তাঁর দিক থেকে যথোচিতভাবেই বর্ণসংকরের শঙ্কা করেছেন, আর শুক্রাচার্য সেটা জানেন বলেই অতি সহজে বলেছেন— এতে তোমার কোনও পাপ হবে না, আর পাপ হলেও সেটা থেকে আমি তোমাকে বাঁচাব। নিজের এবং দেবযানীর বর্ণস্থিতি সম্বন্ধে তাঁর এই মনোভাব ছিল বলেই নাকি তিনি রাজার সামনেই দেবযানীকে বলেছিলেন— তুমি যখন নিজেই এই বিবাহ মনস্থ করেছ, তখন আমার আর কিছু বলার নেই। তা ছাড়া কচও যেহেতু তোমাকে অভিশাপ দিয়েছে, তখন অন্যরকম আর কিছু হবারও সম্ভাবনা নেই— কচশাপাত্ত্বয়া পূর্বং নান্যদ্ভবিতুমর্হতি।

আমরা বেশ বুঝি— শুক্রাচার্যের মানস এইভাবে ভাবনা করাটাও এক ধরনের ব্রাহ্মণ্য সংযোজন। আসলে প্রেম-প্রণয়-ভালবাসার ক্ষেত্রটা মনুষ্যজীবনে এতটাই ব্যক্তিগত বৃত্তি এবং প্রবৃত্তির ওপর নির্ভর করে যে, বিধিনিষেধ আরোপ করে কখনওই শেষ রক্ষা করা যায় না। বিশেষত সেই সমাজেও বর্ণসংকর প্রচুর পরিমাণে ঘটত বলেই উচ্চ-নীচ বর্ণের বিবাহে বর্ণসংকর নিষেধ করা হয়েছে এত। আমরা বরঞ্চ বলব— প্রয়োজন যখন আসে, জীবনের যন্ত্রণামুখর পর্যায়গুলিতে যখন অনিবার্যতার ধর্ম পালন করতে হয়, তখন স্মৃতিশাস্ত্রের বিধিবিধান সব উপদেশের মৌখিকতায় পর্যবসিত হয়। আমাদের মনে হয়— শুক্রাচার্যের

বক্তব্যও সেই মর্মেই। ক্ষুরধার বুদ্ধিমান এই মানুষটিকে সারা জীবন এমনই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে যাতে ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্যের মূলধারা থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন। অসুর-দানবদের গুরু হয়ে তাঁকে সম্পূর্ণ আয়ুষ্কাল কাটিয়ে দিতে হয়েছে এবং সেটা অবশ্যই চির-আচরিত ব্রাহ্মণ্যের এক বিপরীত কোটিতে বসে। নইলে তিনিই বোধহয় একমাত্র ব্যক্তি যাঁর কথাবার্তা, সমাজ-ভাবনা, নীতিবোধ এবং ব্যক্তিজীবনের সংকটমোচনে তাঁর প্রখর বাস্তবতা-বোধ তাঁকে অন্যরকম এক গৌরব দান করেছে এবং সে গৌরবও এতটাই যে মূলধারার ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র তাঁর প্রতি চরম সম্মান জানাতে বাধ্য হয়। হয়তো জীবনের ক্ষেত্রে এতটা বৈপরীত্যের মধ্যে চলতে হয়েছে বলেই তিনি বোধহয় বোঝাতে পেরেছেন যে, ব্রাহ্মণ্যের অভিমান দিয়ে জীবন চালানো যায় না, প্রণয়-প্রেম-ভালবাসা যদি ব্রাহ্মণ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তা হলে সেখানে সামাজিক প্রতিকূলতা তৈরি হতে থাকে ব্রাহ্মণ্যের বিরুদ্ধেই। শুক্রাচার্য নিজের চোখে দেখলেন— দেবযানী ব্রাহ্মণ্যের স্ফীতিবোধে প্রিয়সখী শর্মিষ্ঠাকে দাসীতে পরিণত করেছিলেন একদিন, কিন্তু আজ নিজের প্রয়োজনে, নিজের প্রণয়সিদ্ধির প্রয়োজনে সেই ব্রাহ্মণ্য তাঁকে জলাঞ্জলি দিতে হল। শুক্রাচার্য তাই জীবনবোধের সমাধান দিয়েছেন— ওসব পাপ-টাপ কিছুই হবে না বাপু! যদি হয় তো আমি বুঝে নেব— অহং পাপং নুদামি তে। মানে, এইসব বর্ণসংকর, নরক ইত্যাদি কথায় অনেক চক্র আছে, ও সব তোমার বোঝার দরকার নেই, ওসব আমি বুঝে নেবো। তুমি বিয়ে করে বাড়ি যাও।

শুক্রাচার্য বুঝতে পারছিলেন— দেবযানীকে বিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে মুশকিল হবে। মেয়ের যে রকম স্বভাব, যেরকম স্বাধীন চিন্তাধারা, সেখানে সুপাত্র পাবার বাস্তব অসুবিধে যে ঘটবেই, সেটা তিনি ভাল করেই অনুভব করছিলেন। অতএব এই মর্ত্য রাজা যযাতিকে যখন তাঁর মেয়ে নিজেই পছন্দ করেছে, সেখানে তাঁকে যথাসম্ভব অভয় দিয়ে বিবাহে প্রবৃত্ত করাটাই তিনি সঠিক মনে করলেন। শুক্রাচার্যের বাস্তব বুদ্ধি সাংঘাতিক। তিনি বুঝেছিলেন যে, রাজার সঙ্গে বিবাহের পরেও দেবযানী শর্মিষ্ঠাকে অবশ্যই নিয়ে যাবেন তাঁর পৃষ্ঠলগ্না দাসীর মতো। কিন্তু শর্মিষ্ঠার রূপ যে একসময় রাজাকে অভিভূত করবে— এ ব্যাপারে অভিমানাচ্ছন্ন দেবযানী সচেতন না হলেও শুক্রাচার্য যথেষ্ট সচেতন। ঠিক সেইজন্য দেবযানীকে যযাতির হাতে তুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই শুক্রাচার্য বললেন— বৃষপর্বার এই কুমারী মেয়ে শর্মিষ্ঠাও তোমার সঙ্গে যাবে, মহারাজ। তাঁকে তুমি সসম্মানে পালন কোরো এবং কখনও যেন তাঁকে আপন সুখশয্যায় আহ্বান কোরো না— সম্পূজ্যা সততং রাজন্ ন চৈনাং শয়নে হ্বয়েঃ।

শুক্রাচার্যের কথা মান্য করে যযাতি অসুরগুরুকে সসম্মানে প্রদক্ষিণ করলেন এবং শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে বিবাহ করলেন দেবযানীকে। শুক্রাচার্য প্রচুর যৌতুক দিলেন রাজাকে। রাজাও দেবযানীকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দিলেন আপন রাজধানীর দিকে। দেবযানীর পিছন পিছন চললেন তাঁর নিজের এক হাজার দাসী এবং তাঁর পৃষ্ঠগামিনী হলেন শর্মিষ্ঠা আরও এক হাজার দাসী নিয়ে— দ্বিসহস্রেণ কন্যানাং তথা শর্মিষ্ঠয়া সহ।

শর্মিষ্ঠাকে দাসিত্বে নিয়োগ করা থেকে আরম্ভ করে স্বামী হিসেবে একজনকে বিবাহ করা পর্যন্ত যা কিছুই ঘটেছে, তার মধ্যে দেবযানীর আত্মাভিমান ছাড়া আর কিছু নেই। পিতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুক্রাচার্যের অলৌকিক তপঃপ্রভাব তিনি অপব্যবহার করেছেন আত্মাভিমান চরিতার্থ করার জন্যই। একটি রাজাকে তিনি বিবাহ করলেন, সেখানেও তাঁর প্রেম-ভালবাসা ইত্যাদি সুকুমার অনুভব যতটুকু কাজ করেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করেছে খেয়াল, ইচ্ছে, আত্মতর্পণ। নিজের ইচ্ছে, নিজের 'ইগো' তৃপ্ত হলেই যাঁরা খুশি হন, বন্ধু, স্বামী এবং পরিজন সকলেই এক সময় অত্যন্ত যান্ত্রিকভাবে তাঁদের প্রিয়সাধনের যন্ত্র হয়ে ওঠেন, উলটো দিক থেকে তাঁদের ভালবাসা পাওয়াটা এইসব রমণীদের ভাগ্যে জোটে না। তবে দেবযানীর মতো রমণীরা এটাকেই ভাগ্য বলে মনে করেন, স্বামী থেকে আরম্ভ করে সকলকেই তিনি নিয়ন্ত্রণ-শাসন করতে পারছেন, এই আত্মতর্পণের মধ্যেই তাঁদের ভালবাসা। কিন্তু এই আত্মতৃপ্তির গৌরব এবং সম্পূর্ণ আত্মসচেতনতা নিয়ে কখনও কাউকে সম্পূর্ণভাবে ভালবাসা যায় না।

৩

যেদিন নিজের কোনও দোষ ছাড়াই স্নানান্তে দেবযানীর পরিধেয় বস্ত্রখানি নিজের গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিলেন, সেদিন রাজকন্যার ভোলা স্বভাবে একবারও শর্মিষ্ঠা বুঝতে পারেননি যে সেই পরিধেয় বস্ত্রখণ্ড এমন বিপত্তি ঘটাবে তাঁর সমস্ত জীবনে। যার সঙ্গে দেবযানী এতক্ষণ সখীর মতো খেলায় মত্ত ছিলেন, সেই দেবযানী যে হঠাৎ এমন করে সব সখিত্ব গৌণ করে গুরুঠাকুর হয়ে উঠবেন খেলার মাঝখানে, রাজার ঝিয়ারি শর্মিষ্ঠা তা বুঝবেন কেমন করে! ব্রাহ্মণ-গুরু শুক্রাচার্য অসুররাজ বৃষপর্বার গুরু হয়ে এসেছেন, দেবাসুরদ্বন্দ্বে তিনি অসুরদের প্রভূত উপকার সাধন করেছেন— এ-কথা শর্মিষ্ঠা জানেন। কিন্তু পিতার প্রভুত্বের সুযোগ নিয়ে তাঁর মেয়েটিও যে পরবর্তী প্রজন্মের অকারণ-প্রভু হয়ে উঠেছেন, এটা শর্মিষ্ঠা বুঝতেই পারেননি। রাজগুরু শুক্রাচার্য তাঁর সঞ্জীবনী বিদ্যার প্রভাবে রণক্ষেত্রে মৃতপ্রায় অসুরদের বাঁচিয়ে তোলেন— এ কৃতজ্ঞতায় অসুররাজ বৃষপর্বা শুক্রাচার্যের পালন-পোষণের ভার নিয়েছেন, শুক্রাচার্যের পরিবার-পরিজনও সেই সূত্রে লাভ করেন গুরুজনোচিত মর্যাদা।

কিন্তু শর্মিষ্ঠা দেবযানীর সমবয়সি খেলার সাথী। খেলতে খেলতে কি গুরুর মর্যাদা মনে রাখা যায়! তা ছাড়া তাঁর কাছে তাঁর পিতার গৌরবই বা কম কীসে? তিনি বৃত্তি দিয়ে, অন্নপান দিয়ে, মর্যাদা দিয়ে শুক্রাচার্যকে পালন করছেন— এ তো চোখে দেখা যায়। কিন্তু চোখে দেখা গেলেও রাজবৃত্তির চেয়ে বিদ্যার মূল্য বেশি এ-কথা বালিকার পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি। ফলত দেবযানী গুরুগিরি ফলাতেই শর্মিষ্ঠাও তাঁর পিতার গৌরবের কথা বলেছেন। সেকালের দিনে বিদ্যা রাজবৃত্তির অনুসারী হত না, যেমনটি এখন। ফলে শর্মিষ্ঠাকেই মাথা নোয়াতে হল বৃহত্তর স্বার্থে— পিতার স্বার্থে, অসুরদের স্বার্থে। কিন্তু বিদ্যার কাছে মাথা নোয়ানো এক জিনিস, আর পিতার বিদ্যার বলে বলীয়সী এক অপদেবীর খেয়াল এক জিনিস। অতএব দেবযানীর দাসী হতে হল তাঁকে। দেবযানী যখন বললেন— দেখ্ এবার!

যাচক-স্তাবকের কন্যা বলে অপমান করেছিলি আমাকে— দেখ্ কেমন লাগে! শর্মিষ্ঠা দ্বিতীয়বার এই ঝগড়ার মধ্যে যাননি। তিনি অম্লানবদনে রাজকন্যার মতোই বলেছিলেন— যাতে আমার পরিবার-পরিজন-জ্ঞাতিবর্গের উপকার হবে, তার স্বার্থে এই দাসীবৃত্তি করব আমি— যেন কেনচিদ্যার্তানাং জ্ঞাতীনাং সুখমাবহেৎ।

শর্মিষ্ঠা দেবযানীর দাসী হলেন বিনা দ্বিধায়। তাঁর খাওয়া-নাওয়া, ওঠা-বসা সর্বত্র অনুগামিনী হলেন দাসীর মতো। এরই মধ্যে মহারাজ যযাতি যখন এসে তাঁকে উচ্চাসনে বসা দেবযানীর পা টিপতে দেখলেন, সেদিনও তিনি রাজকন্যার সত্তায় সচেতন হয়ে একবারও হাত সরিয়ে নেননি দেবযানীর পা থেকে। দেবযানী কোনও বিস্তারের মধ্যে না গিয়ে তাঁর দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে তাঁর দাসীত্বের পরিচয় দিলেন, তবু কোনও ভাবান্তর হল না শর্মিষ্ঠার। তিনি তবু হাসছিলেন— নিষণ্ণাং চারুহাসিনীম্। কিন্তু রাজা যযাতি যখন দেবযানীর সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ না করে শর্মিষ্ঠার সম্বন্ধেই কৌতূহল দেখাতে আরম্ভ করলেন, তখন কেমন লেগেছিল যৌবনবতী শর্মিষ্ঠার? তিনি নিজের পরিচয় দিতে পারেননি। কেমন করে কত সামান্য ঘটনা থেকে এই দাসীবৃত্তি তাঁর কপালে জুটল— সে ঘটনার বিন্দুবিসর্গও তিনি জানাতে পারেননি রাজাকে।

রাজা যযাতি দেবযানীকে মোটেই বিয়ে করতে চাননি, তিনি পেতে চেয়েছিলেন শর্মিষ্ঠাকেই। দেবযানীর সামনেই তিনি সোচ্চারে শর্মিষ্ঠার অনিন্দ্যসুন্দর রূপের প্রশংসা করে বলেছিলেন— এমন সুন্দরী কোনও রমণী আমি এই পৃথিবীতে দেখিনি কখনও— নৈবংরূপা ময়া নারী দৃষ্টপূর্বা মহীতলে। শুধু তাই নয়, উচ্চাসনে বসে দেবযানী যখন শর্মিষ্ঠাকে দিয়ে পা টেপাচ্ছিলেন রাজাকে দেখিয়ে দেখিয়ে, তখন রাজা তাঁর মুখের ওপর বলেছিলেন— তোমার সৌন্দর্যের চাইতে এই মেয়েটির সৌন্দর্য অনেক বেশি— অস্যা রূপেণ তে রূপং ন কিঞ্চিৎ সদৃশং ভবেৎ।

দেবযানীর পদ-সম্বাহন করতে করতে এ সব কথা কেমন লেগেছিল শর্মিষ্ঠার? তাঁর তো একটা কথা বলারও উপায় ছিল না। আগন্তুক রাজার মুখে নিজের রূপের প্রশংসা শুনে তাঁকে অধোমুখে থাকতে হয়ছে, থাকতে হয়েছে নির্বিকার। দেবযানীকে অতিক্রম করে জীবনের প্রথম রোমাঞ্চিত রাজপুরুষের প্রশংসার উত্তর দেওয়া দূরে থাক, উচ্চাভিমানিনী দেবযানীর সামনে তার হৃদয়ের মুগ্ধতাটুকুও দেখানোর উপায় ছিল না। অথচ সেই মানুষটিকে দেবযানীর পৃষ্ঠলগ্না হয়ে যেতে হবে দেবযানীর রোমাঞ্চ দেখার জন্য— সাক্ষীর মতো, দ্রষ্টার মতো।

শুক্রাচার্য আবার তাঁর সামনেই রাজাকে বলে দিলেন— এই বার্ষপর্বণী শর্মিষ্ঠাকে আপনি সম্মানের চোখে দেখবেন এবং কখনও তাঁকে আহ্বান করবেন না শয্যায়। শর্মিষ্ঠার কাছে কেমন লেগেছিল এই আগাম সতর্ক সাবধানবাণী?

যযাতির বুঝতে কিছু বাকি ছিল না। কিন্তু এই সম্পূর্ণ বিবাহপর্বের মধ্যে এক অজানা ভয়, অযথা সম্মান এবং এক খণ্ডিত হৃদয় নিয়েই তিনি দেবযানীকে নিয়ে প্রবেশ করলেন রাজধানীর অন্তঃপুরে। শর্মিষ্ঠাকে কোথায় রাখা যায় সে-ব্যাপারে রাজা নিজে সিদ্ধান্ত নিলেন না। অন্তঃপুরের আশপাশে এখানে-ওখানে জায়গা দেখে একটি জায়গা ঠিক হল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদিও ঘরবাড়ি সেখানে কিছুই ছিল না। দেবযানীর অনুমতি নিয়ে নতুন ঘর-বাড়ি তৈরি করে সেখানে শর্মিষ্ঠার থাকার ব্যবস্থা করলেন রাজা— দেবযান্যাশ্চানুমতে... গৃহং কৃত্বা ন্যবেশয়ৎ। এক হাজার নিজস্ব দাসী-বাহিনীর সঙ্গে শর্মিষ্ঠার পৃথক আবাস, পৃথক অন্নপানের ব্যবস্থা হল— যদিও এই পৃথক অশন-আসন-বাসনের মধ্যে রাজার অন্তর্গত হৃদয়ের বিশেষ সমাদরের চিহ্নও কিছু ছিল— যা হয়তো অতি সচেতনভাবে অচেতনের মতো সুব্যবস্থিত হয়েছিল— বাসোভিরন্নপানৈশ্চ সংবিভজ্য সুসৎকৃতাম্।

অতি-সুব্যক্তভাবে দেবযানীর দাসী বলে অন্তঃপুরচারিণীর উপযুক্ত একটি মহাল শর্মিষ্ঠার ভাগ্যে জোটেনি বটে, কিন্তু এমনিতে শর্মিষ্ঠার থাকবার জায়গাটা ভারী সুন্দর। শর্মিষ্ঠার বাড়ির আগেই আছে একটি অশোক ফুলের বন। সংস্কৃত সাহিত্যে অশোক ফুলের তাৎপর্য আছে প্রেমের প্রতীক হিসেবে। সেই অশোক ফুলের বনের প্রান্তেই শর্মিষ্ঠার বাড়ি। সচরাচর এ-দিকটায় রাজার পা পড়ে না। কিন্তু অন্তঃপুরের প্রাচীরের অন্তরাল ছেড়ে এই অশোক কুঞ্জের প্রান্তিক গৃহটিতে আসতে কার না মন চায়? বিশেষত অশোক ফুলের মতোই রাঙা-রাঙা একখানি মুখ সেখানে উদাসী চোখে চেয়ে আছে কার পদধ্বনির অপেক্ষায়।

দেবযানীর সাহচর্যে রাজাকে সুখী থাকতেই হবে, অন্তত সুখী দেখাতেই হবে। অতএব সেই সুখেই দেবযানী গর্ভবতী হলেন। শর্মিষ্ঠা বোধহয় দেবযানীর চেয়ে বয়সে একটু ছোট। দেবযানী গর্ভবতী হয়েছেন এবং নির্বিঘ্নে তাঁর পুত্র হয়েছে, এই সংবাদ শর্মিষ্ঠা জানেন। সময় এল, যখন শর্মিষ্ঠাও পুষ্পবতী হলেন। মনে মনে তাঁর বড় কষ্ট হল। ভাবলেন— এই দাসীবৃত্তির জীবনে তাঁর আর স্বামীর ঘর করা হল না। স্বামীই নেই, তায় স্বামীর ঘর। তাঁর জীবন এবং যৌবন সম্পূর্ণ বৃথা হয়ে গেল— ন চ মেহস্তি পতির্বৃতঃ। ওদিকে দেবযানীর ছেলে হয়ে গেছে বলে শর্মিষ্ঠার মনে মনে একটা ঈর্ষাও এসেছে। বারবার তাঁর মনে হচ্ছে— দেবযানীর দাসীবৃত্তি করেন বলে জীবনের সমস্ত ধর্মগুলিও বিসর্জন দিতে হবে নাকি! এটা-ওটা নানান চিন্তা করে শর্মিষ্ঠা কিছুতেই মনঃস্থির করতে পারলেন না। কী করবেন, কী উপায়ে তিনি ইচ্ছাপূরণ করবেন— অনেক ভেবেও তার কোনও কূল পেলেন না শর্মিষ্ঠা— কিং প্রাপ্তং কিং নু কর্তব্যং কিং বা কৃত্বা কৃতং ভবেৎ।

যযাতির সম্বন্ধে শর্মিষ্ঠার একটা ধারণা আছে। তিনি জানেন— রাজা তাঁকে সবিশেষ পছন্দ করেন। একবার তিনি ভাবলেন— দেবযানী যেমন নিজেই তাঁকে স্বামী হিসেবে বেছে নিয়েছে, সেখানে তিনিও তো একইভাবে যযাতিকে স্বামী হিসেবে বরণ করতে পারেন— যথা তয়া বৃতো ভর্তা অথৈবাহং বৃণোমি তম্। শর্মিষ্ঠার এই ভাবনার পিছনে সেকালের দিনের সামাজিক কারণও একটা আছে। সেকালের দিনের রাজার ঘরে যিনি বা যাঁরা স্ত্রীর দাসী হয়ে আসতেন, তাঁরা অনেক সময়েই রাজার ভোগ্যা হতেন এবং সেই অর্থে স্বামীর। বিচিত্রবীর্যের দাসীর গর্ভে বিদুর জন্মালেও তাঁকে বৈচিত্রবীর্য বলতে যেমন অসুবিধে ছিল না, সেইরকম গান্ধারীর দাসীগর্ভজাত পুত্র যুযুৎসুও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র বলেই পরিচিত ছিলেন। কাজেই শর্মিষ্ঠার ভাবনাটা এখানে অমূলক নয়। তিনি তাঁকে স্বামীত্বে বরণ করতেই পারেন এবং সেক্ষেত্রে একটি সন্তান লাভের ইচ্ছাও তিনি জানাতে পারেন তাঁকে। শর্মিষ্ঠার ধারণা

ছিল— পুত্রকামনায় রাজার সঙ্গে মিলিত হতে চাইলে তিনি সে মিলন না করতে পারবেন না কোনওভাবে— রাজ্ঞা পুত্রফলং দেয়মিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।

কিন্তু রাজাকে স্বামী হিসেবে চাইলেই তো আর হল না, তাঁকে পেতে হবে প্রত্যক্ষভাবে এবং তাও নির্জনে। কেননা তাঁর এই ইচ্ছার কথা যদি কোনওভাবে দেবযানী জানতে পারেন, তবে তাঁরও যেমন নিস্তার থাকবে না, তেমনই নিস্তার থাকবে না রাজারও। কাজেই বারবার তিনি তাঁর প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে ভাবতে লাগলেন— যদি কোনওভাবে, কোনও কারণে মহারাজ যযাতির সঙ্গে একবার তাঁর দেখা হত নিভৃতে— দেবযানীর শকুন-চক্ষুর আওতার বাইরে— অপীদানীং স ধর্মাত্মা ইয়াম্মে দর্শনং রহঃ।

কী আশ্চর্য! শর্মিষ্ঠার বিপুল ইচ্ছাশক্তির বশেই হোক অথবা ভগবানের ইচ্ছায়— মহারাজ যযাতি অশোক বনের প্রান্তপথে পা বাড়ালেন। মহাভারতের কবি মন্তব্য করেছেন— 'যদৃচ্ছয়া' অর্থাৎ কোনও নির্দিষ্ট ইচ্ছা ছাড়া ঘুরতে ঘুরতে যযাতি এসে পৌঁছলেন সেই অশোক বনের প্রান্তসীমায়— যেখানে শর্মিষ্ঠাকে চকোরি-চক্ষুতে অপেক্ষা করতে দেখলেন তিনি। টীকাকার নীলকণ্ঠ আবার 'যদৃচ্ছয়া' শব্দের অর্থ করেছেন— ঈশ্বরেচ্ছাবশত। কিন্তু আমরা যারা এই মর্ত্যভূমির মানুষ, তারা বেশ বুঝি— অকারণে অনিচ্ছায় ঘুরতে ঘুরতেও নয় আবার ভগবানের ইচ্ছেতেও নয়, রাজা স্বেচ্ছায় দেবযানীর রাহু-প্রেমের কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ সচেতনভাবেই অশোকবনের নিভৃত পথে পা বাড়িয়েছিলেন, হয়তো তাঁর চলাফেরার এই লোক দেখানো ভাবটুকু ছিল যে, তিনি চলেছেন পথভোলা পথিকের মতো। অশোকবনের শেষে, যেখানে আর একটু গেলেই শর্মিষ্ঠার গৃহপ্রাঙ্গণ শুরু হবে, রাজা দেখলেন, সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন শর্মিষ্ঠা একাকিনী, যেন অপেক্ষায় আকুল— অশোকবনিকাভ্যাসে শর্মিষ্ঠাং প্রাপ তিষ্ঠতীম্।

স্বপ্নেও ভাবেননি শর্মিষ্ঠা— রাজার সঙ্গে অমন নির্জনে, প্রস্ফুটিত অশোকপুষ্পের লালিমা-মাখানো প্রান্তরে তাঁর দেখা হবে— এমন কথা স্বপ্নেও ভাবেননি শর্মিষ্ঠা। কিন্তু সময় তো বেশি নেই— কোথায় কীভাবে দেবযানীর সদাজাগ্রত চক্ষু তাঁকে তাড়া করে বেড়াবে, কে জানে। অতএব শর্মিষ্ঠা প্রথম সুযোগেই কথা আরম্ভ করলেন হেসে। বললেন— আপনার ঘরের সংরক্ষণশীল ঐতিহ্য এমনই যে পুরুষমানুষরা সহজেই মেয়েদের মুখ দেখতে পায় না— তব বা নাহুষ গৃহে কঃ স্ত্রিয়ং দ্রষ্টুমর্হতি। শর্মিষ্ঠা বোধহয় বলতে চাইলেন যে, এতদিন কোনও পুরুষমানুষ তাঁর চরিত্র লঙ্ঘন করেনি অতএব তাঁর কুমারীত্বের মানটুকু এখনও অটুট। এতকাল এই অশোকবনের আড়ালে আছেন শর্মিষ্ঠা, কেউ তাঁর খোঁজ করে না। শর্মিষ্ঠা তাঁর অভিমানটুকু জানালেন— মহারাজ! আমার রূপ ছিল, আভিজাত্য ছিল এবং আমার চরিত্রের কথাও আপনি জানেন— রূপাভিজনশীলৈ র্হি ত্বং রাজন্ বেত্থ মাং সদা। কিন্তু এমন একটা অবস্থাতেও আমার কি এই অধিকার নেই, যাতে একবারও আপনার সঙ্গে মিলন হতে পারে আমার।

শর্মিষ্ঠা 'মিলন' কথাটা বলেননি। তিনি রাজার কাছে ঋতুরক্ষার আবেদন জানিয়েছিলেন। সেকালের দিনের নিয়মে স্ত্রীলোকের ঋতু বৃথা যাওয়াটা পাপ বলে গণ্য হত এবং ঋতুকালে পুরুষের কাছে মিলন প্রার্থনা করলে তা প্রত্যাখ্যান করাটাও অন্যায়ের মধ্যে গণ্য হত। শর্মিষ্ঠা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই সামাজিক নিয়মেরই সুযোগ নিলেন বটে, কিন্তু আমাদের ধারণা— ঋতুরক্ষার কথাটা একেবারেই প্রথামাফিক কথা, শর্মিষ্ঠা রাজাকে চেয়েছিলেন নিজের ভালবাসার কারণেই। সবচেয়ে বড় কথা— শর্মিষ্ঠা তাঁর নিজের প্রতি রাজার আন্তরিক আসক্তিটুকু জানতেন, আর ঠিক সেইজন্যই নিভৃত অশোককুঞ্জের ধারে আজ তিনি আত্মসমর্পণ করেছেন।

শর্মিষ্ঠার কথা শুনে যযাতি মনে মনে অবশ্যই আপ্লুত বোধ করেছেন। কিন্তু দেবযানীর ভয়, শুক্রাচার্যের আক্রোশের ভয় সেই মুহূর্তেই তাঁকে এমনভাবে আক্রান্ত করল যে, তিনি সোজাসুজি এক কথায় শর্মিষ্ঠার প্রস্তাবে রাজি হতে পারলেন না। তিনি বললেন— শর্মিষ্ঠা! তোমার স্বভাবও আমি জানি, বংশ-পরিচয়ও জানি। তোমার চেহারার মধ্যে এমন এক বিন্দু স্থানও নেই, যেটাকে খারাপ বলা যেতে পারে, এমনই তোমার রূপ— রূপঞ্চ তে ন পশ্যামি সূচ্যগ্রমপি নিন্দিতম্। কিন্তু দেবযানীকে বিয়ে করার সময় শুক্রাচার্য যেভাবে সাবধান করে দিয়েছিলেন আমাকে, তাতে কীভাবে তোমাকে একই শয্যায় আহ্বান করি। শর্মিষ্ঠা নিজের প্রয়োজনেই যযাতির ভয়-বিহ্বল সতর্কতা একেবারে লঘু করে দিয়ে বললেন— ওসব কথা কি মনে রাখতে আছে, মহারাজ! নীতিশাস্ত্র কি বলে জানেন? নীতিশাস্ত্র বলে— পরিহাসের সময়ে, মেয়েদের মন ভোলানোর সময়ে, বিয়ের সময়ে, প্রাণ যাবার সময়ে, আর সর্বস্ব চলে যাবার সময়— মানুষ যদি মিথ্যে কথা বলে, তবে পাপ হয় না একটুও— ন নর্মযুক্তং বচনং হিনস্তি/ ন স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহকালে।

যযাতি এ-কথায় দ্রবীভূত হলেন না। বললেন— দেখো, আমি রাজা বলে কথা। সত্য এবং ধর্মাধর্মের ক্ষেত্রে সমস্ত প্রজারা রাজাকেই দৃষ্টান্ত হিসেবে মানে, তারা যেখানে রাজার কথাটাকেই প্রমাণ হিসেবে ধরে, সেখানে বিপন্ন অবস্থাতেও আমার মিথ্যাচরণ করা উচিত নয়। শর্মিষ্ঠা এব্যর শেষ যুক্তি উপন্যস্ত করলেন তৎকালীন সমাজের বৈধতা অনুসরণ করে। বললেন— নিজের স্বামী এবং সখী-দাসীর স্বামী একই কথা হল, মহারাজ! এখানে একজনের সঙ্গে বিয়ে হওয়া মানে আর-একজনের সঙ্গেও বিয়ে হয়ে গেছে ধরে নিতে হবে। কাজেই যে মুহূর্তে দেবযানী আপনাকে স্বামীত্বে বরণ করেছে, সেই মুহূর্ত থেকে আপনিও আমার স্বামী হয়ে গেছেন— সমং বিবাহমিত্যাহুঃ সখ্যা মেহসি বৃতঃ পতিঃ।

শর্মিষ্ঠার কথায়, শর্মিষ্ঠার সপ্রয়াস অনুধাবনে এবং অবশ্যই তাঁর রূপের আচ্ছন্নতায় রাজার মনও এবার আচ্ছন্ন হতে আরম্ভ করল। তিনি নিজের যুক্তিতে বললেন— আমার স্বপক্ষে একটাই যুক্তি আছে। আমার একটা ব্রত হল— যাচক ব্যক্তি যে যা আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে তাই দেব। এদিকে তুমি আমার কাছে আমার মিলন যাচনা করছ— কী যে আমি করি— ত্বঞ্চ যাচসি মাং কামং ব্রূহি কিং করবানি তে? রাজার ভাবটা এই— শারীরিক মিলন-কামনাও কি কোনওভাবে যাচনীয় পদার্থের মধ্যে পড়ে। যদি তা পড়ে, তবে এই যাচনা মানা যেতে পারে। তবে মজা হল— যে যাচনা করছে, রাজা তাঁর কাছেই নিজযুক্তির অনুমোদন চাইছেন। শর্মিষ্ঠা সঙ্গে সঙ্গে বললেন— আমাকে অধর্ম থেকে রক্ষা করুন, মহারাজ। আপনার করুণায় আমি যদি পুত্রবতী হই, তবেই আমার ধর্ম রক্ষা হবে।

যযাতির মাধ্যম ছাড়া শর্মিষ্ঠার যেহেতু পুত্রলাভের আর কোনও উপায় ছিল না, অতএব শর্মিষ্ঠা তাঁর অসহায়তা জ্ঞাপন করলেন একেবারে মনুর মত উদ্ধার করে। তিনি বললেন—

দাস, স্ত্রী এবং পুত্র— এঁদের তো কোনও স্বাধীনতা নেই, মহারাজ! নিজের নিজের অর্জিত ধনেও এঁদের অধিকার নেই। আর আমার অবস্থা ভাবুন, মহারাজ! আমি দেবযানীর দাসী, আর সেই দেবযানী আবার আপনার অধীন। তা হলে দেবযানীর পরম্পরায় আমারও ইচ্ছাপূরণ করাটা আপনার কাজ— সা চাহঞ্চ ত্বয়া রাজন্ ভজনীয়াং ভজস্ব মাম্।

নিজেকে ধরে রাখা আর সম্ভব হল না রাজার পক্ষে। তিনি শর্মিষ্ঠার সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর অভীষ্ট পুরণ করলেন এবং শর্মিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর পৌর্বাহ্নিক দুর্বলতা থাকায় নিজেও পরম প্রীতি লাভ করলেন। যথাসময়ে শর্মিষ্ঠার পুত্র হল এবং সেই সুখবর দেবযানীর কানেও গেল যথাসময়ে। প্রথমে একটু খারাপই লাগল দেবযানীর। পরে একটু সামলে উঠে সোজা শর্মিষ্ঠার কাছে গিয়ে তাঁকে সোজাসুজি 'চার্জ' করে বললেন— এমনই তোর ইন্দ্রিয়ের তাড়না। এমন অধীর হয়ে এমন একটা পাপ করে বসলি। শর্মিষ্ঠা ঠান্ডা মাথায় বললেন— কিছুই পাপ করিনি। আমার গৃহে এক ঋষি এসেছিলেন অতিথির মতো, আমার ঋতুকাল উপস্থিত হওয়ায় আমি ধর্মসঙ্গতভাবেই তাঁর কাছে মিলন প্রার্থনা করেছি এবং সেই কারণেই পুত্রলাভ করেছি আমি।

সেদিনকার কথা মনে আছে শর্মিষ্ঠার, যেদিন নাহুষ যযাতিকে 'ঋষি' এবং 'ঋষিপুত্র' বলে সম্বোধন করেছিলেন দেবযানী। আজ যযাতির ওপর সেই আরোপিত ঋষিত্বের উল্লেখ করেই সমস্ত মিথ্যাচার থেকে অব্যাহতি পেতে চাইলেন শর্মিষ্ঠা। দেবযানী খুব একটা বিশ্বাস করলেন না শর্মিষ্ঠার কথা। সামান্য সন্দেহের সুরেই বললেন— ঋষি-ব্রাহ্মণ বলে কথা। তা তাঁর নাম কী? গোত্র কী? তাঁর বংশ-পরিচয়ই বা কী? শর্মিষ্ঠা লঘু সুরে একেবারে উড়িয়ে দিলেন দেবযানীকে। বললেন— সে সব কী ছাই আমার মনে ছিল নাকি তখন? অমন একজন ঋষি, তপস্যার তেজে যেন দীপ্ত হয়ে উঠেছে তাঁর সর্ব অঙ্গ। অমন দীপ্র তীব্র ব্যক্তিত্বের সামনে ওই সময় কারও শক্তি থাকে জাত-গোত্র শুধোবার— তং দৃষ্টা মম সংপ্রষ্টুং শক্তির্নাসীচ্ছুচিস্মিতে। শর্মিষ্ঠার হাবে-ভাবে কথায় বিশ্বাস উৎপাদিত হল দেবযানীর। বললেন— যদি এমনটাই হয়ে থাকে, তবে আমার আর রাগ করার কিছু নেই। বর্ণশ্রেষ্ঠ এক ব্রাহ্মণের কাছ থেকে যদি তোর পুত্রলাভ হয়ে থাকে, তা হলে ভালই হয়েছে।

দেবযানী চলে গেলেন শর্মিষ্ঠাকে বিশ্বাস করে। এর মধ্যে দেবযানীর আরও একটি পুত্র হল। প্রথম পুত্রের নাম যদু, দ্বিতীয় পুত্রের নাম তুর্বসু। ওদিকে অশোকবনের উতল হাওয়ায় যযাতির অভিসার-কৌতুককুটুকুও বাদ পড়ল না। ভয় যদি একবার ভেঙে যায়, বিশেষত এই ধরনের সতত বার্য্যমান চৌর্যমিলনের ক্ষেত্রে ভয় যদি একবার ভেঙে যায়, তবে এমন ভোগের আস্বাদ মধুরতর হয়। শর্মিষ্ঠা যযাতির ঔরসে তিনটি পুত্র লাভ করলেন— দ্রুহ্যু, অনু এবং পুরু।

ভালই চলছিল যযাতির সংসার— একদিকে অন্তঃপুর-চারিণী দেবযানী, অন্যদিকে অশোককুঞ্জের অন্তর্লীন মধুর অভিসার শর্মিষ্ঠার সঙ্গে। কিন্তু মনুষ্য জীবনে এত সুখ কি সয়? একদিন দেবযানী রাজার সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়েছেন এমনিই, অকারণে। ঘুরতে ঘুরতে কখন যে সেই অশোককুঞ্জের সীমানা এসে গেছে, রাজা তা বুঝলেও, বারণ করলে দেবযানী সচেতন হবেন, সেই ভয়েই হয়তো তিনি কিছু বলেননি। কিন্তু অঘটন যা ঘটার ঘটেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেল। দেবযানী দেখলেন— কয়েকটি বালক অশোকবনের উন্মুক্ত প্রান্তরে খেলা করছে। ছেলেগুলি ভারী সুন্দর— যেমন ফুটফুটে তাদের চেহারা, তেমনই মনকাড়া স্বভাব— একেবারে দেবশিশুর মতো। রাজগৃহের বাইরে এমন রাজপুত্রোপম চেহারা দেখে দেবযানী রাজাকেই জিজ্ঞাসা করলেন— এমন সুন্দর ছেলেগুলো কোন বাড়িতে জন্মেছে? দেখতেও তো অনেকটা তোমারই মতো? দেবযানী রাজার উত্তরের অপেক্ষা না করে ছেলেগুলিকেই সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন— তোমাদের নাম কী বাছারা? তোমাদের বাবার নাম কী?

কপাল মন্দ মহারাজ যযাতির। রাজা এবং দেবযানী যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁদের অদূরেই ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছেন শর্মিষ্ঠা। দেবশিশুর মতো ছেলেগুলি দেবযানীর কথার উত্তরে মহারাজ যযাতি এবং শর্মিষ্ঠার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে পর্যায়ক্রমে দেখিয়ে দিল— ইনিই আমাদের পিতা, ইনি আমাদের মা। যযাতির মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। ছেলেগুলি পিতা যযাতির নাম উল্লেখ করেই সাদরে তাঁকে জড়িয়ে ধরতে গেল। কিন্তু দেবযানী সামনে আছেন বলে রাজা তাঁর আপন পুত্রদেরও জড়িয়ে ধরে বুকে তুলে নিতে পারলেন না। অন্য সময়ে যযাতির আদরে অভ্যস্ত বালকেরা পিতার এই আবেগগন্ধহীন কাষ্ঠশুষ্ক ব্যবহার দেখে কাঁদতে কাঁদতে অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা শর্মিষ্ঠার কাছে চলে গেল— রুদন্তস্তেহথ শর্মিষ্ঠামভ্যয়ুর্বালকাস্ততঃ।

অসুররাজার কন্যা শর্মিষ্ঠা দেবযানীর দাসীত্ব স্বীকার করলে কী হবে— রাজার উদাসীন ব্যবহারের কারণ তিনি অনুমান করতে পারেন। কিন্তু তিনিও রাজার ঘরের মেয়ে। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধি কোনওভাবেই দেবযানীর চেয়ে কম নয়। নিজের গর্ভে গূঢ়োৎপন্ন শিশুদের কোনও পিতৃপরিচয় থাকবে না— এটা তিনি শেষ পর্যন্ত মেনে নেওয়ার লোক নন। এখন যখন দৈবক্রমে সেই পিতৃপরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে, তখন তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব নিয়েই প্রস্তুত হলেন দেবযানীর মৌখিক ঝটিকাবৃষ্টির জন্য। দেবযানী বললেন— তোর স্বভাবটা এখনও অসুরের মতোই রয়ে গেছে; আমারই বাড়িতে আমার দাসীর মতো থেকে আমার বিরুদ্ধে যেতে তোর ভয় করল না— তমেবাসুরধর্মং ত্বমাস্থিতা ন বিভেষি মে?

দেবযানী আবারও তাঁকে অসুরের ধর্ম নিয়ে গঞ্জনা দিলেন বলেই শর্মিষ্ঠা আসুরিকভাবেই চোয়াল শক্ত করে জবাব দিলেন— তোমাকে আমি একটুও ভয় পাই না। আমি তো অন্যায় কিছু করিনি। তুমি কি ভেবেছিলে— তোমার দাসী হয়েছি বলে সারা জীবন স্বামী-পুত্রহীনভাবে জীবন কাটিয়ে দেব? আমার জীবনের ধর্ম, আমার নারীর স্বভাব কিছু থাকবে না? কাজেই এখানে অধর্মটা কী হল? আমি যাঁকে ঋষি বলেছিলাম, তিনি তো ঋষিই বটে। আর তা ছাড়া যেদিন থেকে তুমি রাজাকে পতিত্বে বরণ করেছ, সেদিন থেকে তোমার দাসীর ওপরও তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার এসেই যায়— এ তো জানা কথা। কাজেই তোমার স্বামী ন্যায়সঙ্গতভাবে আমারও স্বামী বটে— সখীভর্তা হি ধর্মেন ভর্তা ভবতি শোভনে— অতএব আমার ভুলটা কোথায়?

শর্মিষ্ঠার এই ব্যক্তিত্বময় যৌক্তিকতার জবাব দেবযানীর কাছে নেই। অতএব তাঁর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল মহারাজ যযাতির ওপর এবং রাগ হলে দেবযানীর সামনে একটাই রাস্তা খোলা থাকে— সেটা তাঁর বাপের বাড়ি। দেবযানী বললেন— আমার অপ্রিয় কাজ করেছ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি। আমি এক মুহূর্তও আর এখানে থাকব না। দেবযানী বাপের বড়ি চললেন— বিবর্ণ, মলিন মুখে ক্রোধ আর অশ্রুধারা নিয়ে শুক্রাচার্যের কাছে চললেন দেবযানী। আর তাঁর পিছন পিছন চললেন মহারাজ যযাতি— উদ্বিগ্ন, চিন্তিত এবং ক্রোধোদ্দীপ্তা স্ত্রীর ক্রোধশান্তির চেষ্টা করতে করতে। দেবযানী ফিরলেন না— ন্যবর্ত্তত ন চৈব স্ম ক্রোধসংরক্তলোচনা। পিতার কাছে উপস্থিত হয়ে দেবযানী ব্রাহ্মণ্যের উচ্চতা মনে রেখেই বললেন— অধর্ম এখন ধর্মের মাথায় চড়ে বসেছে, নীচের মানুষ চড়ে বসেছে ওপরের মানুষের মাথায়— অধর্মেন জিতো ধর্মঃ প্রবৃত্তমধরোত্তরম্।

আমি দেখেছি— এখনও যাঁদের অসবর্ণ বিয়ে হয় এমনকী ভালবেসেও যদি তা হয়, এবং তাতে স্ত্রী যদি হন বামুনঘরের এবং স্বামী তথাকথিত নিম্নবর্ণের, তা হলে কোথায় যেন কোনও দুর্গতি ভাগ্যচক্রের মধ্যে অন্তর্ভেদ সৃষ্টি করতে থাকে। কোনও সাধারণ অন্যায়, সাধারণ ঝগড়া অথবা সাধারণ দাম্পত্য কলহের মধ্যেই স্ত্রীর মুখ দিয়ে তখন বেরিয়ে পড়ে জাতিবর্ণের অকারণ কৌলীন্যের কথা, উচ্চ-নীচ ভেদাভিমানের কথা। অথচ মহারাজ যযাতি খুব বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে দেবযানীকে বহু আগেই— সেই যখন তিনি বিয়ের জন্য যযাতিকে পীড়াপীড়ি করছিলেন— তখন কিন্তু তিনি বলেছিলেন— এমন বিয়ের জন্য জোর কোরো না। ক্ষত্রিয় আর ব্রাহ্মণের মধ্যে যতই আন্তরিক মিল থাকুক, কিন্তু এদের দুয়ের আচার-আচরণ আলাদা, শুচিতার বোধ আলাদা, ধর্মের বোধও আলাদা— পৃথগ্‌ধর্মাঃ পৃথক্‌শৌচাস্তেষাং তু ব্রাহ্মণো বরঃ।

আজকাল যত অসবর্ণ বিবাহ হয়, তাতে আপত্তির কিছু দেখতে পাই না আমি। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী কারও মধ্যে যদি উচ্চতর কৌলীন্যের বোধ অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করতে থাকে, তা হলেই সেখানে কথায়, কাজে, ব্যবহারের মধ্যে দাম্পত্য-সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে, জটিলতা তাতে আরও বাড়ে। দেবযানী পিতা শুক্রাচার্যের কাছে অধমোত্তমের বিপরীত আচরণের কথা উল্লেখ করেই শর্মিষ্ঠার গর্ভে মহারাজ যযাতির তিনটি পুত্রজন্মের কাহিনি বিবৃত করলেন এবং সবচেয়ে আশ্চর্য— দেবযানী তাঁর আপন গর্ভে পুত্রসংখ্যার হীনতা দেখিয়ে নিজেকে দুর্ভাগা এবং শর্মিষ্ঠার প্রতি যযাতির অধিকতর আকর্ষণ প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন। মেয়ের কথায় শুক্রাচার্য দ্বিতীয়বার কোনও চিন্তা করলেন না। মুহূর্তের মধ্যে তিনি দেবযানীর পৃষ্ঠাবনত যযাতির উদ্দেশে অভিশাপ উচ্চারণ করলেন— অচিরকাল মধ্যেই বৃদ্ধসুলভ জরায় আক্রান্ত হবে তুমি। অর্থাৎ শুক্রাচার্য এক অভিশাপের জোরে যযাতির ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিটুকুই লোপ করে দিলেন।

যযাতির এই অকালবৃদ্ধত্ব এবং জরালাভের অবস্থাটুকু লৌকিকভাবে ব্যাখ্যা করা কঠিন, তবে খুব সম্ভব, ইন্দ্রিয়সুখ লাভের সমস্ত অধিকার তিনি হারিয়েছিলেন শুক্রাচার্যের চাপে এবং হয়তো তিনি হারিয়েছিলেন রাজত্বের অধিকারও। শুক্রাচার্যের অভিশাপ শুনে রাজা যযাতি এবার মোক্ষম অস্ত্রটি ব্যবহার করলেন শাপমুক্তির জন্য। তিনি বলেছিলেন— আপনার কন্যা দেবযানীর সঙ্গে মিলন-সুখ এখনও আমার অতৃপ্তই রয়ে গেছে— অতৃপ্তো যৌবনস্যাহং দেবযান্যাং ভৃগুদ্বহ। অতএব এই অকাল বার্ধক্য থেকে মুক্তি দিন আমাকে। দেবযানীর প্রসঙ্গে শুক্রাচার্যের সম্বিৎ ফিরল। বিশেষত কোন অবস্থায় এবং অবস্থার চাপে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহারাজ যযাতি শর্মিষ্ঠার সংসর্গ করতে বাধ্য হয়েছেন— সেই যুক্তিও তিনি অনুধাবন করলেন খানিকটা। সবচেয়ে বড় কথা, অভিশাপ দিয়েই শুক্রাচার্য বুঝেছেন যে, এতে তাঁর মেয়ে দেবযানীরই ক্ষতি হচ্ছে বেশি। অতএব রাজার অনুনয় মেনে তিনি তাঁকে অন্যের দেহে জরা-সংক্রমণের অধিকার দিলেন। অর্থাৎ অন্য কেউ তাঁর জরা গ্রহণ করলে যযাতি তাঁর যৌবনও ফিরে পাবেন, রাজত্বও ফিরে পাবেন।

শুক্রাচার্যের এই সহৃদয়তার সুযোগ নিয়ে যযাতি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁর অনুমতি নিয়ে নিলেন। সেটা হল— জরা গ্রহণের জন্য তিনি পুত্রদেরই অনুরোধ করবেন এবং যে জরা গ্রহণে সম্মত হবে, তাঁকেই তিনি ভবিষ্যতে রাজ্যভার দিয়ে যাবেন। শুক্রাচার্য স্বীকার করে নিলেন এই অনুরোধ এবং বললেন— যে পুত্র তোমার জরা গ্রহণ করবে, সেই রাজা হবে হস্তিনাপুরে— বয়ো দাস্যতি তে পুত্রো যঃ স রাজা ভবিষ্যতি।

এরপরে অনেক ঘটনা ঘটে গেল। পালা চলল অভিমান এবং দুরুক্তির। যযাতি তাঁর প্রত্যেক পুত্রকে এক এক করে অনুরোধ জানালেন তাঁর বার্ধক্য গ্রহণ করার জন্য এবং পরিবর্তে তাঁর যৌবন ফিরিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু দেবযানীর গর্ভজাত কোনও পুত্রই তাঁর জরা গ্রহণ করলেন না। নিজের যৌবনোচিত সম্ভোগ-সুখ তাঁরা পিতার জন্য জলাঞ্জলি দিতে রাজি হলেন না। শর্মিষ্ঠার প্রথম দুই পুত্রও যযাতির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন, কিন্তু কনিষ্ঠ পুরু প্রথম অনুরোধেই সানন্দে পিতার কথা মেনে নিলেন এবং তাঁর বয়স, বার্ধক্য, জরা সবটাই গ্রহণ করলেন নিজের শরীরে। যযাতি তাঁর হৃত যৌবন ফিরে পেলেন।

মহাভারতের কবি এই মুহূর্তে একবারও শর্মিষ্ঠার কথা স্মরণ করেননি। যে দেবযানীকে যযাতি বিধিসম্মতভাবে বিবাহ করে তাঁর আজ্ঞানুবর্তী হয়েছিলেন প্রতি কর্মে, তাঁর পুত্ররা কেউ যখন পিতার দুঃখ বুঝলেন না, তাতে দেবযানীর কী প্রতিক্রিয়া হল, আমরা অনুমান করতে পারি। কিন্তু অসুর রাজকন্যা শর্মিষ্ঠা দেবযানীর দাসী হয়ে বাস করছিলেন রাজবাড়ির প্রত্যন্ত সীমায়, জীবন যাপন করছিলেন অত্যন্ত অবহেলিতভাবে, তাঁরই পুত্র যখন পিতার মনোরথ সম্পূর্ণ করল, সেদিন তাঁর দাসীত্বের কষ্ট, প্রিয় মিলনের অপূর্ণতা এবং গূঢ়মিলনজাত পুত্রের অমর্যাদা— সব যেন ধুয়েমুছে গেল। মহাভারতের কবি শর্মিষ্ঠার সগর্ব হৃৎস্পন্দন একবারের তরেও উল্লেখ করেননি বটে, কিন্তু যেদিন তাঁরই কনিষ্ঠ পুরু পিতৃদত্ত সিংহাসনে রাজা হয়ে বসলেন, সেদিন দেবযানীর উচ্ছিষ্ট দাসীত্বপঙ্ক থেকে আপন মর্যাদায় উঠে এলেন শর্মিষ্ঠা। দাসী থেকে তিনি রাজমাতায় পরিণত হলেন।

কথা উঠেছিল, চেষ্টাও হয়েছিল। সমাজের প্রতিনিধি ব্রাহ্মণেরা প্রশ্ন তুলেছিলেন— কেন দেবযানীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র শুক্রাচার্যের দৌহিত্রকে বঞ্চিত করে শর্মিষ্ঠার গর্ভজাত কনিষ্ঠ পুরুকে রাজা করা হচ্ছে— জ্যেষ্ঠং যদুমতিক্রম্য রাজ্যং পুরোঃ প্রযচ্ছসি? রাজা যযাতি সেদিন শুক্রাচার্যের অনুমোদনটুকুই ব্যবহার করেছিলেন জনপদবাসী দেবযানীর ব্রাহ্মণ প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে। তাঁরা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন— শুক্রাচার্যের অনুমোদনের পর আর কিছু বলার নেই তাঁদের— বরদানেন শুক্রস্য ন শক্যং বক্তুমুত্তরম্। যে দেবযানী সারা জীবন শুক্রাচার্যের শাসন জারি করে আপন স্বামীকে পর্যুদস্ত করে রেখেছিলেন, তাঁকে সেই শাসনই গলাধঃকরণ করতে হল— এমনই দেবযানীর কপাল। অন্যদিকে যৌবনের

অভিসন্ধিতে পিতার জন্য আপন যৌবন ত্যাগ করে শর্মিষ্ঠার গর্ভজাত পুরু এমনই এক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করলেন, যাতে শর্মিষ্ঠা শুধু পুত্রগর্বেই গর্বিত হলেন না, তিনি দাসীর পর্যায় থেকে উত্তরিত হলেন রাজমাতার পদবিতে। তাঁর পুত্রই প্রতিষ্ঠিত হলেন প্রতিষ্ঠানপুরের রাজ সিংহাসনে। চিরকাল অন্তরালে-থাকা শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে হারিয়ে দিলেন শেষ খেলায়— তাঁরই পুত্রের বংশধারায় জন্মালেন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম প্রজানুরঞ্জক রাজা— দুষ্মন্ত, ভরত, কুরু প্রমুখ। শর্মিষ্ঠা বেঁচে থাকলেন আপন মর্যাদায়, আপন শোণিতধারায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যবতী

সময়ের হিসেবে এখন থেকে প্রায় পাঁচ কিংবা ছয় হাজার বছর আগেকার কথা। বার্হদ্রথ জরাসন্ধ তখন কেবলই মগধ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। পূর্ব ভারতে কৌরব-বংশধারার শেষ বীজ তখন কেবলই উপ্ত হয়েছে মাত্র। হস্তিনাপুরের যুবরাজ শান্তনুর সঙ্গে নদীনায়িকা গঙ্গার চঞ্চল এবং অসফল মিলন কেবলই শেষ হয়েছে।

আনুমানিক ঠিক এই সময়ে আধুনিক মিরাটের পশ্চিম দিকে যেখানে যমুনা নদী বয়ে যাচ্ছে, সেই যমুনার তির ঘেঁষে একটি নৌকো দাঁড়িয়েছিল। নৌকোটি আকারে খুব বড় নয়, চার-পাঁচ আরোহী তাতে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারে, আর আজ থেকে পাঁচ-ছ'হাজার বছর আগে আরোহীর সংখ্যা বেশি হবারও কথা নয়। নৌকোটি খুব বড় নয় বলেই হাওয়ায় সে নৌকো যাতে ভেসে চলে না যায়, তার জন্য একগাছি শুষ্ক-লতার রজ্জু নৌকোর প্রান্তভাগে আটকানো লৌহ বলয়ের সঙ্গে বেঁধে রজ্জুর অন্য প্রান্ত তীরভূমিতে একটি খুঁটির সঙ্গে বাঁধা আছে।

নৌকোটি জলের ওপর ভাসছিল। নীল যমুনার কৃষ্ণবর্ণ জলতরঙ্গগুলি ছলাৎ ছলাৎ করে তিরভূমির ওপরে ঈষদুচ্চকিত শব্দে আছড়ে পড়ছিল। নৌকোর তলদেশেও সেই তরঙ্গমালার অভিঘাত টের পাওয়া যাচ্ছিল, যদিও তা শব্দে নয়, নৌকোর ঈষদীষৎ দুলুনিতে। নৌকোর হালের পিছনে, নৌকোর উপরি-প্রান্তভাগে এক উদ্ভিন্নযৌবনা রমণীকে আমরা বসে থাকতে দেখছি। যমুনার মতোই ঘননীল তার দৃষ্টিটুকু সুদূর অরণ্যবাহী পথের দিকে প্রসারিত। সে অপেক্ষা করছে বোঝা যায়, কারও জন্য সে নির্জন জলপ্রান্তে অপেক্ষা করছে, কিন্তু এ অপেক্ষা যে কোনও প্রাণপ্রিয় প্রণয়ীর মিলনাপেক্ষা নয়, সেটা তার চোখ মুখ দেখেই বোঝা যায়। এ অপেক্ষা নিছকই এক অপেক্ষা, নিতান্তই প্রয়োজনে।

রমণী অতিশয় সুন্দরী। কিন্তু যে অর্থে সেই সেকালে এবং একালে রমণীর সৌন্দর্য্য বিচার করা হয়, সেই অর্থে কেউ তাঁকে সুন্দরী বলবেন না। কারণ এই রমণীর শরীরে গৌরবর্ণের আভাসমাত্রও নেই। রমণী ঘন কৃষ্ণবর্ণা, এবং লোকে তাকে আদর করে কালী বলে ডাকে। কিন্তু মানুষের সাধারণ সৌন্দর্য্য-ভাবনার মধ্যে থেকে যদি গৌরীয় দুর্বলতাটুকু ছেঁটে ফেলা যায়, তবে এই কৃষ্ণবর্ণা রমণীর দিকে একবার চক্ষুমাত্র নিবেশ করলে মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি এমনই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারে যে, সে স্বীকার করে বসবে— সৌন্দর্য্য-ভাবনায় গৌরবর্ণের পূর্বাবেশ একেবারেই মূল্যহীন।

এখনও সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসেনি। সবেমাত্র গোধূলির আলো ছড়িয়ে পড়েছে নীল যমুনা জলের ওপর, সবুজ বনভূমির ওপর, বনমধ্যবর্তী সর্পিল পথের ওপর এবং অবশ্যই

পূর্বোক্ত রমণীর চিক্কণ-কৃষ্ণ শরীরের ওপর। আসন্ন সন্ধ্যারাগে উদ্ভাসিত দিগন্তের মধ্যে নৌকার প্রান্তদেশে নিষণ্ণা কৃষ্ণবর্ণা এই রমণী চিত্রার্পিত মূর্তির মতো একা বসেছিল। তার ঘন কৃষ্ণ কেশরাশি মাথার ওপরে চূড়া করে বাঁধা। আতাম্র ওষ্ঠাধারে মুক্তাঝরানো হাসি। রমণীর উত্তমাঙ্গের বস্ত্র পৃষ্ঠলম্বী সূত্রগ্রন্থিতে দৃঢ়নিবদ্ধ এবং অধমাঙ্গের বস্ত্র কিছু খাটো। নৌকার ত্রিকোণ প্রান্তদেশে বসে রমণী তার পা দুটি নিবদ্ধ অবস্থায় নিম্নস্থিত কাষ্ঠস্তরের ওপর ছড়িয়ে রাখার ফলে তার কদলীস্তম্ভ-সদৃশ্য চরণ-দুটি উরু পর্যন্ত প্রায় অনাবৃত। এই অনাবরণ প্রকট লাবণ্য পৌরুষেয় দৃষ্টিতে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার যান্ত্রিকতা বলে মনে হলেও এই রমণীর কাছে এটি স্বভাবসিদ্ধ এবং অতি সহজ।

কিন্তু ওই রমণীর পক্ষে এই অনাবরণ ব্যবহার যতই সহজ, সরল আর স্বাভাবিক হোক, সাধারণ মানুষ তা সহ্য করতে পারবে কেন! এমনকী কোনও জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধ মহাপুরুষ হলেও নীলোর্মিচঞ্চল যমুনার জলে একটি নৌকোর ওপর অমন স্বভাবসুন্দর প্রত্যঙ্গমোহিনী রমণীমূর্তি দেখতে পেলে, তিনি স্থির থাকতে পারবেন না। অন্তত একবারের জন্যও তাঁর মনে হবে— সমস্ত জীবনের ত্যাগ বৈরাগ্যের সাধন, অথবা সেই চিরাভ্যস্ত ইন্দ্রিয়নিরোধ তাঁর উচিত হয়েছে তো? অন্তত একবারের তরেও মনে হবে— এই রমণীর অধিকার পেলে বেশ হত— অতীবরূপসম্পন্নাং সিদ্ধানামপি কাঙ্ক্ষিতাম্।

রমণী যে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছিল তার অবসান ঘটল আকস্মিকভাবে। জটাজুটধারী এক মুনিকে নদীতীরবর্তী সর্পিল পথ বেয়ে নৌকোর দিকেই আসতে দেখা গেল। সন্ধ্যা হয়ে আসবে এখনই, তাঁকে পরপারে পৌঁছোতে হবে। মহর্ষি বোধহয় তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছেন। হয়তো যমুনা পার হয়ে মথুরা-শূরসেন অঞ্চলে কোনও দেবক্ষেত্রে যাবেন, হয়তো বা যাবেন মৎস্য দেশের কোনও তীর্থে।

এই অঞ্চলে যমুনা কিঞ্চিৎ শীর্ণতোয়া। ফলে নদী-পারাপারের জন্য এইখানেই লোকে আসে। তাতে লোকেরও সময় লাগে কম, নৌবাহকেরও পরিশ্রম হয় কম। মহর্ষি অন্য সময়েও নদী পার হবার জন্য তাঁর পরিচিত এই খেয়াঘাটে এসেছেন, কিন্তু সবসময়ে একটি পুরুষকেই দেখেছেন নৌকো পার করে দিতে। কিন্তু আজকের দিনে সব কিছুই কেমন অন্যরকম ঘটছে। খেয়াঘাটে আসতেও তাঁর দেরি হয়ে গেছে, আর এদিকে সূর্যের শেষ অস্তরাগ যমুনার জলে লুটোপুটি খেয়ে সেই নৌকার প্রান্তদেশে বসা নিকষ-কৃষ্ণ রমণী-শরীরের মধ্যে নতুন মায়া তৈরি করেছে। মুগ্ধ হলেন মুনিবর। উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে আরও এক চিক্কণ প্রকৃতি-শরীর তাঁর নিরুদ্ধ প্রকৃতিকে বিক্ষুব্ধ করে তুলল। তিনি মনে মনে এই উদ্ভিন্নযৌবনা রমণীর আসঙ্গলিপ্সা করলেন— দৃষ্ট্বৈব চ তাং ধীমাংশ্চকমে চারুহাসিনীম্।

তবে মনে মনে কামনায় পীড়িত হলেও সেই মানসিক বিকার সাময়িকভাবে দমিত করে রাখার অভ্যাস তাঁর জানা ছিল। অতএব প্রাথমিক সম্মোহনের সেই উত্তাল ভাবটুকু প্রশমিত করে মুনিবর জিজ্ঞাসা করলেন— তা, হ্যাঁগো মেয়ে! এখানে যে চিরকাল নৌকো পারাপার করে, আমাদের সে-ই পরিচিত নাইয়াটি কোথায়— ক্ব কর্ণধারো নৌর্যেন নীয়তে ব্রূহি ভামিনি? রমণী বলল, তিনি আমার পিতা। আমার পিতার কোনও পুত্র সন্তান নেই, থাকলে সেই এই কর্ম করতে পারত। অথচ পিতার যা বয়স হয়েছে তাতে এখন নৌকো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারাপার করতে তাঁর কষ্ট হয়। সেইজন্য এই নৌকো নিয়ে আমিই খেয়া পারাপার করি— নৌর্ময়া বাহ্যতে দ্বিজ! মহর্ষি বললেন, সে তো খুব ভাল কথা। তা হলে আর দেরি নয়। এতক্ষণ অনেক আরোহীকে ওপারে নিয়ে গেছ তুমি। এখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, হয়তো আমিই তোমার নৌকোয় শেষ যাত্রী। নৌকো নিয়ে চল তাড়াতাড়ি— অহং শেষো ভবিষ্যামি নীয়তামচিরণে বৈ। নীল যমুনার জলে নৌকো ছেড়ে দিল মধুরহাসিনী রমণী। নৌকোর ওপর তার দিনশেষের আরোহী জটাচীরধারী এক মুনিবর।

এই নৌকোর আরোহী যদি একজন সাধারণ মানুষ হতেন, তা হলে সেটা কোনও আখ্যায়িকা হত না। ঘটনা হল— দিনশেষের এই খেয়া-নৌকোয় যিনি পরপারে চলেছেন, তিনি মহামুনি পরাশর। কিন্তু এত বড় ঋষি হওয়া সত্ত্বেও এই খেয়া-পারাপারের নাইয়াটির প্রতি তিনি সংযতেন্দ্রিয় রুক্ষ-শুষ্ক মুনির মতো ব্যবহার করেননি। ব্যবহার করেছেন একেবারে সাধারণ মানুষের মতো, আর ঠিক সেই কারণেই ঘটনাটা আখ্যায়িকা হয়ে উঠেছে।

সূর্যবংশের বিখ্যাত পুরোহিত হলেন মহর্ষি বশিষ্ঠ। পরাশর এই বশিষ্ঠের নাতি। বিশ্বামিত্র মুনির সঙ্গে বশিষ্ঠের যে দীর্ঘদিন বিবাদ-বিসংবাদ চলেছিল, তাতে বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠপুত্র শক্তি মারা গিয়েছিলেন। মারা গিয়েছিলেন মানে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। পুরাণ-ইতিহাসের বক্তব্য অনুযায়ী সূর্যবংশের রাজা কল্মাষপাদের পুরোহিত-পদবী লাভের জন্য বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠ দু'জনেরই কিছু প্রতিযোগিতা হয়েছিল। এই অবস্থায় বশিষ্ঠের পুত্র শক্তির সঙ্গেও কল্মাষপাদের বিবাদ বেধে যায় ওই পূর্বোক্ত পদেরই অধিকার নিয়ে। রাজা শক্তিকে চরম অপমান করেন। শক্তিও ক্রুদ্ধ হয়ে কল্মাষপাদকে অভিশাপ দেন।

আমাদের লৌকিক ইতিহাস অনুসারে— এই হল ক্ষত্রিয় রাজার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য বিবাদের ঘটনা যার সূত্রপাত হয়েছিল ভার্গব ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজাদের বিবাদকে কেন্দ্র করে। ঘটনা এতদূর যায় যে, রাজা কল্মাষপাদ বিশ্বামিত্রের সহযোগিতায় বশিষ্ঠ-পুত্র শক্তিকে মেরে ফেলেন। পরে অবশ্য শক্তির পিতা বশিষ্ঠের সঙ্গে রাজা কল্মাষপাদের সুসম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং রাজা নিজের ভুল বুঝতে পারেন কিন্তু ততদিনে দুর্ঘটনা যা ঘটার ঘটেই গেছে। উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যুতে বশিষ্ঠ অন্তরে দগ্ধ হলেও যথাসম্ভব সংযতচিত্তে আপন যজ্ঞ-তপঃ-স্বাধ্যায় চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এমনই সময় একদিন সেই অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

শক্তি যখন মারা যান তখন তাঁর ঔরসজাত পুত্র গর্ভস্থ ছিলেন। শক্তির স্ত্রীর নাম অদৃশ্যন্তী। শক্তির মৃত্যুতে তাঁর পিতা বশিষ্ঠ উন্মত্তপ্রায় অবস্থায় নিজের ঘর ছেড়ে চলে যান। একসময় তিনি আত্মহত্যারও চেষ্টা করেন যদিও তাঁর এই চেষ্টা সফল হয় না। দুঃখ-প্রশমনের জন্য তিনি নানা দেশ নানা তীর্থে ঘুরে বেড়াতে থাকেন— স গত্বা বিবিধান্ শৈলান্ দেশান্ বহুবিধাংস্তথা। অনেক নদী-পাহাড়, অনেক অরণ্য, গ্রাম-শহর ঘুরে শ্রান্ত-ক্লান্ত সংযত বশিষ্ঠ ঘরে ফেরার পথ ধরলেন। একটু যেন আগ্রহও দেখা গেল তাঁর মনে চির-পুরাতন সেই আশ্রমে ফিরে আসার জন্য।

অধিকাংশ পথ যখন অতিক্রান্ত, আশ্রম যখন আর খুব দূরে নয়, তখন বশিষ্ঠ বুঝতে পারলেন যে, একটি রমণী তাঁর পিছন পিছন আসছে। বশিষ্ঠ দেখলেন— রমণী বিধবা এবং নিরাভরণা, তার মুখখানি করুণ লাবণ্যে ভরা। বশিষ্ঠ কোনও কথা বললেন না, যেমন

চলছিলেন, চলতে লাগলেন। আনমনে চলতে চলতে হঠাৎই তাঁর কানে ভেসে এল বেদ উচ্চারণের উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিতের ধ্বনি। মহর্ষি অবাক বিস্ময়ে পিছনে ফিরে তাকাতেই বিধবা রমণীর করুণ মুখখানি তাঁর চোখে পড়ল। বশিষ্ঠ শুধোলেন, কে তুমি রমণী? কেনই বা তুমি আমার পিছন পিছন আসছ? বিধবা রমণী বললেন, পিতা! আমি আপনার পুত্রবধূ অদৃশ্যন্তী। বশিষ্ঠ বললেন, তা হলে কার মুখে ওই অপূর্ব বেদধ্বনি উচ্চারিত হতে শুনলাম। এই স্বর, এই ধ্বনি যে আমার খুব চেনা। আমার মৃত পুত্র শক্তির মুখে এই বেদোচ্চারণ যে আমি বার বার শুনেছি— পুরা সাঙ্গস্য বেদস্য শক্তেরিব ময়া শ্রুতঃ।

অদৃশ্যন্তী সলজ্জে বললেন, পিতা! আমার গর্ভে একটি পুত্র আছে। আপনার পুত্র শক্তির ঔরসেই এই পুত্রের উৎপত্তি। এখন তার বারো বৎসর বয়স। সে গর্ভস্থ অবস্থাতেই বেদ উচ্চারণ করছে। গর্ভস্থ পুত্রের বারো বছর বয়স— মূল সংস্কৃত এবং তার সিদ্ধান্তবাগীশ কৃত অনুবাদ বিশ্বাস্য না অবিশ্বাস্য, তা অন্য কথা, কিন্তু আমাদের যা ধারণা, তা হল— বশিষ্ঠ পুত্রশোকে পাগল হয়ে বহুকাল আশ্রমের বাইরে ছিলেন। হয়তো তিনি যখন ফিরে এসেছেন, তখন শক্তিপুত্রের বারো বছর বয়স হয়ে গেছে। পিতৃগৃহের পুরাতন আশ্রমে গর্ভগৃহে যিনি বড় হচ্ছিলেন বশিষ্ঠ তাঁকে চেনেনই না। মায়ের কাছে মায়ের অঞ্চলছায়ায় এবং মায়েরই অনুশাসনে এতকাল ধরে বড় হয়েছেন বলেই হয়তো এই গর্ভবাসের কল্পনা— যে কল্পনা পৌরাণিকদের লোকোত্তর ভাবনায় আক্ষরিক গর্ভবাসের রূপকে বিধৃত। মূল পুরাণের কথকতা থেকেও যেন আমাদের এই গবেষণাই প্রমাণ হয়। সেখানে বলা আছে— আমার গর্ভ থেকেই এই পুত্রের জন্ম। আপনার পুত্র শক্তির ঔরসে জাত এই বালক। ছোটবেলা থেকে বেদাভ্যাস করতে করতে এই ছেলের এখন বারো বছর বয়স হল— সমা দ্বাদশ তস্যেহ বেদান্ অভ্যস্যতো মুনে।

অদৃশ্যন্তীর মুখে এমন অভাবনীয় সংবাদ শুনে পরম আহ্লাদিত হলেন বশিষ্ঠ। শক্তি বেঁচে নেই বটে, কিন্তু তাঁর পুত্র তো আছে। সেই সূত্রে বশিষ্ঠের সন্তান-পরম্পরা তো অক্ষত অবিচ্ছিন্ন রইল— অস্তি সন্তানমিত্যুক্তা— বশিষ্ঠ পুত্রবধূর সঙ্গে ঘরে ফিরে চললেন। বশিষ্ঠ ভাবলেন শক্তির পুত্র, সে তো শক্তিরই অন্য এক রূপ, অন্য এক জীবন— পরাসুঃ। পর মানে অন্য। অসু মানে প্রাণ, জীবন। অর্থাৎ অন্য (পর) এক প্রাণের (অসু) মধ্যে শক্তি উজ্জীবিত আছেন বলেই শক্তির পুত্রের নাম 'পরাশর'। মূলে এই নামটি হয়তো ছিল পরাসুর (পরাসু + র)। আছে অর্থে 'র' প্রত্যয় হয়, যেমন— মধুর। তেমনই পরাসুর। তা থেকেই ডাকে ডাকে পরাসর এবং অবশেষে 'পরাশর'।

পিতামহ বশিষ্ঠের সঙ্গে শিশু পরাশর যখন বেশ পরিচিত হয়ে উঠলেন, তখন চিরাচরিত সমাজব্যবস্থার অভ্যাসে পরাশর পিতামহ বশিষ্ঠকে বাবা-বাবা বলে ডাকতে আরম্ভ করলেন। স্নেহময় বশিষ্ঠও নাতির এই সম্বোধনে বাধা দিতেন না। ভাবতেন— আহা! পিতা নেই, অন্যদের দেখে কাউকে পিতা বলে ডাকতে কোন বালকের না ইচ্ছে করে! পুত্রের এই ব্যবহারে মাতা অদৃশ্যন্তী বড় অস্বস্তিতে পড়তেন, কিছুটা লজ্জিতও হতেন বুঝি। একদিন ওই একইরকম ভাবে পরাশর তাঁর পিতামহ বশিষ্ঠকে বাবা-বাবা বলে ডাকছিলেন, এই অবস্থায় জননী অদৃশ্যন্তী পুত্রকে বললেন— বাছা! তুমি তোমার ঠাকুরদাদাকে বাবা-বাবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে ডাক কেন? এমন কোরো না, করতে হয় না— মা তাত। তাত তাতেতি ব্রহ্মেনং পিতর পিতুঃ। তোমার পিতা বেঁচে নেই। বনের ভিতর এক রাক্ষস তোমার পিতাকে ভক্ষণ করেছে।

একটি রাক্ষসই তাঁর পিতার মৃত্যুর কারণ জেনে পরাশর ক্রোধে অধীর হয়ে উঠলেন। সবংশে রাক্ষসকুল নিধনের জন্য তিনি আরম্ভ করলেন রাক্ষসমেধ যজ্ঞ। দলে দলে রাক্ষস পরাশরের যজ্ঞের আগুনে দগ্ধ হতে লাগল। পুরাতন ভুয়োদর্শী ঋষিরা— অত্রি, পুলহ এমনকী রাক্ষসদের জন্ম-মূল পুলস্ত্য ঋষিও পরাশরের ক্রোধ শান্ত করার জন্য যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। তাঁরা সকলেই নিরীহ এবং নিরপরাধ রাক্ষসদের বধ না করার জন্য অনুরোধ করলেন পরাশরকে। ঋষিদের যুক্তি-তর্কের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে পরাশর তাঁর উদ্দীপিত ক্রোধও সম্বরণ করলেন। তৎক্ষণাৎ যজ্ঞ বন্ধ করলেন পরাশর— তদা সমাপয়ামাস সত্রং শক্ত্যো মহামুনিঃ।

দীপ্যমান এই ক্রোধ-সম্বরণের এই ঘটনা থেকে বুঝতে পারি— পরাশর সাধারণ কোনও ব্যক্তিত্ব নন। শাস্ত্র বলে— কাম এবং ক্রোধের জন্ম হয়েছে একই উৎস থেকে। উভয়েই রজোগুণের আত্মজ— কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। নিজের উদ্গত ক্রোধ যিনি প্রশমন করতে পারেন, রক্তস্ফীত ধমনীকে যিনি এক মুহূর্তে সাধারণ রক্তচাপে পরিণত করতে পারেন, সেই পরাশরকে আমরা যমুনার তীরে আগত দেখেছি। সেই পরাশরকে আমরা এক খেয়াতরীতে উঠতে দেখেছি, যেখানে পুরাতন নাইয়ার অনুপস্থিতিতে তিনি একটু আগেই পরিচিত হয়েছেন তার মেয়ের সঙ্গে। মুনি তার যৌবনোদ্ভেদ নিরীক্ষণ করে পুলকিত; তার কালো রূপের মধ্যে তিনি আলোর সন্ধান পেয়েছেন।

ইতিহাস-পুরাণের আরও যে-সব নর-নারীর চরিত্র আছে, তাতে এইরকম মদির পরিস্থিতিতে তাদের এতটুকুও সুস্থির দেখিনি। দর্শনমাত্রেই কামভাব সেইসব নর-নারীকে প্রায়ই মথিত করেছে। আলোচ্য মহামুনি পরাশরও যে ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে নৌকার ওপর সমাধিলগ্ন হয়েছেন তাও নয়। তবে তাঁর পিছু পরিশীলিত ভাবনা আছে। আছে কবির মতো একটি হৃদয়। প্রথম সম্বোধনেই তিনি এই সন্ধ্যার রক্তিমা-মাখানো কৃষ্ণা রমণীর হাতে উপহার দিয়েছেন কবির হৃদয়, বলেছেন— আমি তোমার দিনশেষের খেয়ার শেষ যাত্রী হব, বাসবী! নিয়ে চল আমাকে— অহং শেষো ভবিষ্যামি নীয়তামচিরেণ বৈ। বাসবী! মুনির মুখে এই অশ্রুতপূর্ব সম্বোধন শুনে রমণীর জল-বাওয়া বৈঠাখানি চকিতের জন্য থেমে গেল কিনা, সে খবর আমরা পাইনি। কিন্তু আশ্চর্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আর তার আগ্রহটুকুও লুকিয়ে রাখল না। অর্থাৎ 'বাসবী' নামের রহস্যটুকু সে জানে, কিন্তু অন্য কেউই যে রহস্য প্রায় জানে না, তা মুনি জানলেন কী করে? এবং সেই জানাটুকুও কী এমন কবির হৃদয়ের সঙ্গে মিশিয়ে এমন করেই বলতে হয়! রমণী তার দিনশেষের যাত্রীকে তুলে নিল নৌকোয়। নৌকো বাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণা রমণীর শারীরিক বিভঙ্গ দিনশেষের যাত্রী মহামুনি পরাশরের চোখ এড়িয়ে গেল না। চিত্তদুয়ার মুক্ত করে নির্নিমেষে তিনি তাকিয়ে রইলেন সোনার আঁচলখসা সন্ধ্যাসমা রমণীর দিকে।

কৃষ্ণা রমণী মহামুনি পরাশরের এই আকর্ষণ নারীজনোচিত সচেতনতায় বুঝে নিল এক

লহমায়। মুনি তাকে বাসবী বলে সম্বোধন করেছেন। এই সম্বোধনের অর্থ সে জানে। কিন্তু মুনি কেন তাকে এই নামে ডাকলেন, সে-সম্বন্ধে তার মনে অদ্ভুত এক অনুসন্ধিৎসা রয়েই গেল। নিজেকে খানিকটা সপ্রতিভ দেখানোর জন্য 'বাসবী' নামের রহস্যটি সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে রমণী বলল— লোকে আমাকে মৎস্যগন্ধা বলে ডাকে, আমি অত্রস্থ ধীবরদের প্রধান দাশ রাজার কন্যা। বাস্তবে আমার পিতামাতার সংবাদ সর্বাংশে আমি জানি না এবং তার জন্য দুঃখও আমার কম নেই।

সত্যি কথা বলতে কি, 'বাসবী' নামটি শোনা মাত্রেই রমণীর মনে যে রহস্য তৈরি হয়েছিল, তার বাচনভঙ্গির মধ্যেও কিন্তু তার নাম-রহস্য সম্বন্ধে একটা জিজ্ঞাসা জেগেই রইল। পরাশর উত্তর দিলেন সঙ্গে সঙ্গে এবং বোঝাতে চাইলেন যে, রমণীর বাসবী নামের রহস্যটি তিনি জানেন। অবশ্য নৌকার ওপর সন্ধ্যার এই অনুকূল লগ্নে রমণীকে তিনি তার নাম-রহস্য শোনাননি, কারণ তা শোনালে রমণীর লজ্জা বোধ হত।

২

পরাশর যা আভাসে বলেছেন এবং মহাভারতে যে আভাসটুকু সবিস্তারে ধরা আছে, তাতে এই রমণীকে ধীবর-রাজা দাশের ঔরসজাত কন্যা বলে মনে হয় না। তিনি দাশরাজার ঘরে পালিত হয়েছেন মাত্র। মহাভারতের উপাখ্যান অনুযায়ী চেদি দেশের রাজা চৈদ্য উপরিচর বসু তাঁর স্ত্রী গিরিকার সঙ্গে মিলিত হওয়ার আশায় অপেক্ষা করছিলেন। অন্যদিকে গিরিকাও ঋতুস্নান শেষ করে অপেক্ষা করছিলেন ওই একই প্রিয় মিলনের আকাঙ্ক্ষায়। ঠিক এই অবস্থায়, পিতৃপুরুষের আদেশে পিতৃযজ্ঞের কারণেই চেদিরাজকে মৃগবধের উদ্দেশে মৃগয়া করতে চলে যেতে হয় আকস্মিকভাবে। পৌরাণিক নিয়মে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে বন্য পশুপাখির মাংসে পিতৃপুরুষের তর্পণ সেকালে প্রথাগত ছিল। অতএব পিতৃপুরুষের ওই আদেশ অমান্য করতে না পেরেই উপরিচর বসু মৃগয়ায় গেলেন।

মৃগয়ায় রাজার মন বসল না মোটেই। অপেক্ষমাণা সুন্দরী গিরিকার কথা তাঁর বারবার মনে পড়ল। যান্ত্রিকভাবে রাজা মৃগয়া করছিলেন বটে, কিন্তু অযান্ত্রিক মনে নিরন্তর জেগে রইল সেই মধুর মুখখানি— চকার মৃগয়াং কামী গিরিকামেব সংস্মরন্। রতিলিপ্সু রাজার মন সংযমের বাধ মানল না। তাঁর তেজোবিন্দু উৎসারিত হল এবং রাজা তা ধারণ করলেন পত্রপুটে। তার পরের ঘটনা প্রায় সবারই জানা। অপেক্ষমাণা ঋতুস্নাতা স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়া হল না, ঈপ্সিত পুত্রলাভও বিঘ্নিত হয়ে গেল তার ফলে। কিন্তু পুত্রজন্ম বিফল হোক— এটা যেহেতু রাজা চাইছিলেন না, অতএব পত্রপুটে ধরা সেই তেজোবিন্দু রাজা গিরিকার কাছে পাঠিয়ে দিলেন একটি বাজপাখির পায়ে বেঁধে। রাজার কপাল, গিরিকার কাছে সেই তেজোবিন্দু পৌঁছোল না, পথের মধ্যে আরেকটি বাজপাখির আক্রমণে সেই বিন্দু পতিত হল যমুনায়।

যমুনা নদীতে তখন শাপগ্রস্তা অপ্সরা অদ্রিকা মৎসী হয়ে বিচরণ করছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপরিচর বসুর তেজ সেই মৎসী ভক্ষণ করে গর্ভবতী হল। এদিকে এক সময়ে ধীবরেরা জাল ফেলতে এল যমুনা নদীতে এবং দৈবের দোষে সেই গর্ভবতী মৎসী ধরা পড়ল ধীবরদের জালে। ধীবরেরা সেই মৎসীকে কাটতে গেলেই তার গর্ভ থেকে বেরিয়ে এল একটি স্ত্রী এবং একটি পুংশিশু। এই আশ্চর্য ঘটনা ধীবরেরা নিবেদন করল দেশের রাজা উপরিচর বসুর কাছে। সব দেখে শুনে উপরিচর বসু পুরুষ শিশুটিকে গ্রহণ করেন। মহাভারতের মতে চৈদ্য উপরিচরের এই শিশুপুত্রই ভবিষ্যতে 'মৎস্য' নামে এক ধার্মিক রাজা বলে পরিচিত হয়েছিলেন— স মৎস্যো নাম রাজাসীদ্ ধার্মিকঃ সত্যসঙ্গরঃ। শিশুকন্যাটিকে রাজা ধীবরদের হাতেই দিয়ে দেন এবং তা কন্যাসন্তান বলেই হয়তো। রাজা ধীবরদের বলে দেন যেন শিশুকন্যাটিকে তারাই মানুষ করে। মৎস্যঘাতীদের আশ্রয়ে থাকার ফলে এই মেয়েটি মৎস্যগন্ধা নামে পরিচিত হয়— সা কন্যা দুহিতা তস্যা মৎস্যা মৎস্যসগন্ধিনী। মৎস্যগন্ধার অপর নাম সত্যবতী এবং তাঁর গায়ের রং কালো বলে তাঁর ডাক নাম হয়ে গেল কালী।

এই উপাখ্যানের অলৌকিকত্ব এবং সরসতার খোলস থেকে প্রকৃত সত্য উদ্ধার করা খুব কঠিন, এমনকী প্রায় অসম্ভবই বটে। উপরিচর বসুর বংশ-পরম্পরার বিচার করলে দেখা যাবে যে, তিনি কোনও মতেই মৎস্যগন্ধা সত্যবতীর পিতার সমবয়সি হতে পারেন না। সত্যবতী, ব্যাসদেব, শান্তনু এবং ভীষ্মের সঙ্গে উপরিচর বসুর সমসাময়িকতা ঐতিহাসিকভাবে বিচার করলেও সত্যবতী কখনও উপরিচরের পালিতা কন্যাও হতে পারেন না। কেননা উপরিচর বসু অনেক আগের কালের মানুষ। ভারতবর্ষে যখন আর্যায়ণ আরম্ভ হয়েছে, নতুন নতুন দেশ যখন আর্যগোষ্ঠীর হস্তগত হচ্ছে, সেই প্রথম কল্পে চেদি দেশের প্রতিষ্ঠার সময়ে আমরা উপরিচর বসুকে জড়িত দেখেছি। কালের প্রমাণে শান্তনু-ভীষ্ম অথবা সত্যবতী-ব্যাসের অনেক পূর্বেই উপরিচর বসুর সময় পেরিয়ে গেছে। সত্যবতীর কালের সঙ্গে চৈদ্য উপরিচরের কাল কোনওভাবেই মেলে না। অতএব কোনওভাবেই সত্যবতী তাঁর কন্যা নন।

তা হলে মহাভারতের কবি যে উপাখ্যান রচনা করলেন তার সবটাই কি মিছে, নাকি অর্থহীন মৌখিকতা? আমরা বলি— এ আসলে পৌরাণিক কথক-ঠাকুরদের কথকতা। ভবিষ্যতে যে রমণীর গর্ভে বিশালবুদ্ধি ব্যাস জন্মাবেন, সেই রমণীকে এক অব্যন্তর অশ্রুতকীর্তি রাজার নামের সঙ্গে জড়িত করে রাখাটা কথকঠাকুরদের ভাল লাগেনি। কাজেই মহান উপরিচর বসুর উপাখ্যান এসে গেছে কথকতার মুখে। কিন্তু তাই বলে উপরিচরের সঙ্গে সত্যবতীর এক ফোঁটাও সম্পর্ক নেই, সেটাও ঠিক নয়। কথকতার ধূপের ধোঁয়া থেকে সেটা বার করাটাই ঐতিহাসিকের কাজ।

মনে রাখতে হবে, মহামুনি পরাশর সত্যবতীকে সম্বোধন করেছেন 'বাসবী' বলে। আরও মনে রাখতে হবে, আমরা ইতিপূর্বে মহাভারতের মধ্যেই দেখেছি— উপরিচর বসুর সবগুলি পুত্রকে একসঙ্গে 'বাসব' বলে ডাকা হত এবং তাঁদের প্রত্যেকের নামেই পৃথক পৃথক বংশধারা তৈরি হয়েছিল— বাসবাঃ পঞ্চ রাজানঃ পৃথগ্‌বংশাশ্চ শাশ্বতাঃ। আমাদের অনুমান— মৎস্যগন্ধা সত্যবতী উপরিচর বসুর পুত্র কোনও বাসব রাজার বংশে জন্মেছেন। হয়তো সেই কারণেই পরাশর তাঁকে ডেকেছেন 'বাসবী' বলে।

আরও একটা অনুমানের কথা বলি। মহাভারতের নানান রাজবংশের ঐতিহাসিকতা বিচারে সবচেয়ে বড় সহায়ক গ্রন্থ হল পুরাণগুলি, যেগুলির মধ্যে বংশ, প্রতিবংশ, মন্বন্তরের ইতিহাস আছে। মহাভারত থেকে জানা যায়— উপরিচর বসুর পঞ্চম পুত্র 'মাবেল্ল' হয়তো মৎস্যদেশের রাজা ছিলেন কেননা মৎস্যদেশ উপরিচরের অধিকারভুক্ত ছিল এবং উপরিচরের পুত্রের নামও ছিল মৎস্য, তাঁর নামেই হয়তো মৎস্য দেশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল— স মৎস্যো নাম রাজাসীদ্ ধার্মিকঃ সত্যসঙ্গরঃ। অন্যদিকে বায়ু পুরাণের মতো প্রাচীন পুরাণে দেখা যাচ্ছে— উপরিচর বসুর পুত্রসংখ্যা পাঁচ নয়। তাঁর পুত্রসংখ্যা সাত এবং তাঁর সপ্তম পুত্রের নামই মৎস্য। অথবা তাঁর নাম মৎস্যকাল— মাথৈল্লশ্চ (মাবেল্লশ্চ) ললিত্থশ্চ মৎস্যকালশ্চ সপ্তমঃ। সংস্কৃত শব্দে যাঁকে ললিত্থ বলা হয়েছে, পণ্ডিতেরা তাঁকে রাজপুত্র লাঠোর বা রাঠোরদের পূর্বপুরুষ বলে মনে করেন। এখানে সবচেয়ে বড় কথা হল যে, তখনকার মৎস্যদেশ হল এখনকার রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর-ভরতপুর-আলোয়ার অঞ্চল। অর্থাৎ ললিত্থ এবং মৎস্য— এঁরা দু'জনেই রাজপুতানা বা মৎস্যদেশের অধিবাসী ছিলেন এবং এঁদের মূল পরিচয়— এঁরা সব 'বাসব' রাজা।

মহাভারতের উপাখ্যানে সত্যবতীর জননীকে যেভাবে এক মৎসীর রূপ দেওয়া হয়েছে এবং সত্যবতীর আপন ভ্রাতার নামেই যেহেতু মৎস্যদেশের প্রতিষ্ঠা, অপিচ এই মৎস্যও যেহেতু একজন 'বাসব' রাজা, তাই আমরা অনুমান করি সত্যবতী মৎস্যদেশীয় কোনও রমণী ছিলেন। অথবা তত্রস্থ মৎস্যরাজার সঙ্গে তাঁর কোনও আত্মীয়তার সম্বন্ধ ছিল বলেই হয়তো সত্যবতীকে 'মৎস্যা মৎস্যসগন্ধিনী' বলা হয়েছে মহাভারতে। সংস্কৃতে 'সগন্ধ' শব্দের অর্থ আত্মীয় অথবা নিজের জাত। গান্ধার দেশের মেয়ে যদি গান্ধারী হতে পারেন, মদ্র দেশের মেয়ের নাম যদি মাদ্রী হয়, পঞ্চাল দেশের জাতিকা যদি পাঞ্চালী হন, তা হলে মৎস্য দেশের মেয়েই বা মৎসী বা মৎস্যগন্ধা হবেন না কেন? অবশ্য এমন হতেই পারে যে, সত্যবতীর জন্মের মধ্যে গৌরব ছিল না তত। আমরা উপরিচর বসুর পট্টমহিষী গিরিকার জন্মের মধ্যেও কোনও গৌরব দেখিনি। মহাভারতে যমুনা নদীর অন্তরচারিণী যে মৎসীকে আমরা উপরিচর বসুর তেজোবিন্দু ভক্ষণ করতে দেখেছি— আমাদের ধারণা— তিনি বসুরাজের অধিকৃত মৎস্যদেশের কোনও রমণী। হয়তো সেই মৎস্যদেশীয় কোনও রমণীর বংশধারাতেই সত্যবতীর জন্ম, যাঁর জন্মদাতা স্বয়ং কোনও 'বাসব' বা বসুবংশীয় কোনও রাজা। রাজপুরুষের সঙ্গে অনামিকা মৎস্যদেশীয়ার মিলনের মধ্যে কোনও গৌরব ছিল না বলেই হয়তো, এবং তা সহসা ঘটেছিল বলেই হয়তো মৎসীকর্তৃক তেজোবিন্দু-ভক্ষণের ঘটনাটি রূপকাকারে বিবৃত হয়েছে।

এ-ব্যাপারে সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই যে, সেই মৎস্যদেশীয় রমণীর কুলশীল আর্যজনের সম্মত ছিল না এবং এতেও কোনও সন্দেহ নেই যে, সত্যবতী মানুষ হয়েছেন ধীবরপল্লিতে। সঙ্গে কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে, ধীবর শব্দটি মহাভারতে এসেইছে শুধু 'মৎস্য' শব্দের সূত্র ধরে। আমাদের ধারণায় মৎস্যগন্ধার জন্মদাতা বীজী পিতা আসলে মৎস্যদেশের রাজা এবং সত্যবতী মৎস্যরাজের পুত্রী বলেই হয়তো তাঁর গায়ে আঁশটে গন্ধের কল্পনা। আবার এটাও ঠিক যে, সত্যবতীর মা আর্যজনবিগর্হিতা রমণী ছিলেন বলেই হয়তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই মৎস্যরাজ অন্তঃসত্ত্বা জননীকে ঘরে নিয়ে আসেননি। তিনি বিসর্জিত হয়েছিলেন। অতএব অন্যত্র হয়তো কোনও ধীবরপল্লিতে বিসর্জিতা হবার ফলেই ধীবরদের ঘরোয়া সংস্কার আরোপিত হয়েছিল সত্যবতীর ওপর। তাঁর নামও সেই কারণেই মৎস্যগন্ধা।

পিতার অনুপস্থিতিতে সত্যবতী নৌকো বাইতে এসেছেন যমুনায়। তাঁর দিনশেষের যাত্রী পরাশর মোহময়ী নাইয়ার সমস্ত জীবনকাহিনি জানেন। জানেন তার অবমানিত জীবন-কথা এবং অবশ্যই তার জন্মকথাও, নইলে 'বাসবী' বলে তাঁকে ডাকলেন কী করে? খেয়া-পারাপারের তরুণী নাইয়া মহামুনি পরাশরের কথায় আপ্লুতা বোধ করেছেন। আপ্লুতা হয়েছেন তাঁর মর্যাদা-বোধে। মহামুনি হওয়া সত্ত্বেও পরাশর তাঁকে কোনও তাচ্ছিল্য করেননি এবং সুন্দরী রমণী বলে প্রথমেই ব্যাঘ্রঝম্পনের রীতিও অনুসরণ করেননি। রমণী তাঁর ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের বোধে এটা বুঝতে পেরেছেন যে, পরাশর তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, কিন্তু তাঁর কথাবার্তা এবং সর্বোপরি তাঁর মর্যাদাবোধে সত্যবতী তাঁর কারুণ্যের স্পর্শ পেলেন অন্তরে। তিনি বললেন, আমি ধীবররাজার মেয়ে বলেই পরিচিত। আমার জন্মের ব্যাপারে আমার অনেক দুঃখশোক আছে। এর মধ্যেও আপনি আমাকে চিনলেন কী করে, আমার দুঃখই বা বুঝলেন কী করে— জন্মশোকাভিতপ্তায়াঃ কথং জ্ঞাস্যসি কথ্যতাম্? সত্যি কথাটা বলেই ফেলেছেন সত্যবতী। আমাদের বোঝা উচিত, সত্যবতী যদি উপরিচর বসুর মেয়েই হবেন অথবা কোনও 'বাসব' রাজার মেয়ে বলেই যদি তিনি স্বীকৃত হতেন, তা হলে তাঁর জন্ম নিয়ে কোনও শোক থাকবার কথা নয়। নিজেকে তিনি 'জন্মশোকাভিতপ্তা' বলেই পরিষ্কার জানিয়েছেন। এই কষ্টের ফলেই 'বাসব' রাজার পিতৃত্ব ঘুচিয়ে ফেলে তিনি পরাশরকে জানান— আমি দাশ রাজার মেয়ে। লোকে আমাকে মৎস্যগন্ধা বলে ডাকে। বস্তুত তিনি মৎস্যরাজেরই মেয়ে কিন্তু মায়ের অগৌরবে মৎস্যরাজ তাঁকে ঘরে না রাখলেও তাঁর সঙ্গে সত্যবতীর জন্ম সম্বন্ধে আত্মীয়তা আছে বলেই লোকে তাঁকে মৎস্যগন্ধা বলে ডাকে।

মহামুনি পরাশর সব খবর রাখেন এবং জানেন— মৎস্যগন্ধা আসলে বসুবংশেরই মেয়ে, তাঁকে ডেকেছেনও 'বাসবী' বলে। কিন্তু সেই 'বাসবী' সাভিমানে জানিয়েছেন যে তিনি মানুষ হয়েছেন কোনও অপাংক্তেয় মানুষের কাছে যাঁর নাম দাশ। তাঁর পালনের গৌরবেই আপাতত সত্যবতী গর্বিতা, 'বাসবী' হিসেবে সেই গর্ব তিনি বোধ করেন না।

পরাশর কোনও অসভ্যতা করেননি যৌবনবতী সত্যবতীর সঙ্গে, কোনও অসভ্য ভণিতার মধ্যেও যাননি, পৌরাণিক পুরুষেরা স্ত্রীলোক দেখলেই যেমনটি করতেন। মৎস্যগন্ধার অপার রূপরাশি বর্ণনা অথবা স্তন-জঘনের সকাম বর্ণনা করে অন্যান্য পুরাণ-পুরুষের মতো সত্যবতীকে তিনি বিব্রতও করেননি। কোনও ভণিতা না করে পরাশর বলেছেন— বাসবী! আমি একটি পুত্র চাই তোমার কাছে এবং সেইজন্যই তোমার সঙ্গে মিলন প্রার্থনা করি।

সেকালের দিনের নিরিখে পরাশরের এই প্রার্থনার একটা তাৎপর্য আছে। কামনা কীভাবে ধর্মে পরিণতি লাভ করে— এটা তারই উদাহরণ। সেকালের দিনে পিতৃঋণ শোধ করার জন্য পুত্র-কামনা করতেন প্রাচীনেরা। রমণীর সঙ্গে শারীরিক মিলনের মধ্যে যে বাধ-ভাঙা কামনার অভিসন্ধি আছে প্রাচীনেরা সেই কামনাকে শৃঙ্খলিত করবার চেষ্টা করতেন পুত্রার্থে মিলনের সকারণতায়। অর্থাৎ শারীরিক মিলন যেন বল্গাহীন অসংখ্যাত

ইন্দ্রিয়-চর্বণে পরিণত না হয়, পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষায় মিলন ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির ক্ষেত্র থেকে মানুষকে সরিয়ে আনে ধর্মের বৃহত্তর ক্ষেত্রে। পরাশর ঠিক তাই করেছেন। যিনি ভবিষ্যতে বিশালবুদ্ধি ব্যাসের পিতা হবেন, তিনি ইন্দ্রিয়-পরবশ হয়ে কাজ করছেন না, তিনি পুত্রের প্রয়োজনে সেকালের ধর্মের আনুগত্যে একবার মিলন সম্পন্ন করতে চান যান্ত্রিকভাবে।

মুনিবর পরাশরের ইচ্ছা এবং আশয় ধরে ফেলতে সত্যবতীর অসুবিধে হয়নি, এমনকী তাঁর ওই পুত্রলাভের যান্ত্রিকতার কথাটাও সত্যবতী মেনে নিতে খুব অসুবিধে বোধ করছেন না। কিন্তু নারীসুলভ সাধারণ লজ্জা তাঁকে কুণ্ঠিত করে তুলেছে। তিনি বললেন, দেখুন মুনিবর! পরপারে কিছু ঋষি-মুনিদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে— পশ্য ভগবন্ পরপারে স্থিতান্ ঋষীণ্।। হয়তো এই ঋষি-মুনিরা আগেই খেয়া পার হয়ে যমুনার ওপারে গেছেন। হয়তো বা পরাশরের জন্যই তাঁরা অপেক্ষা করছেন এবং তাকিয়েও আছেন ওই খেয়া-নৌকার দিকে। সত্যবতী ভারী লজ্জাবোধ করলেন। বললেন মুনিরা সব তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে। এই অবস্থায় কীভাবে আমাদের মিলন সম্ভব— আবয়োর্দৃষ্টয়োরেভিঃ কথং নু স্যাৎ সমাগমঃ।

পরাশর তপস্বী, যোগী। তিনি বিভূতিমান মহাসত্ত্ব পুরুষ। নারী-পুরুষের শারীরিক মিলনের মধ্যে বাহ্যত যে আবরণ দরকার সেই আবরণ তিনি সৃষ্টি করলেন যোগবলে। চারিদিক ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন হল। আমাদের ধারণা, গোধূলির শেষ লগ্নে অন্ধকারের যে ছায়া নামছিল প্রেমনত নয়নের দীর্ঘচ্ছায়াময় পল্লবের মতো সেই ছায়াই মুনিসৃষ্ট অলৌকিক ‘নীহারিকা’র রূপকে বর্ণিত হয়েছে। সন্ধ্যার প্রায়াচ্ছন্ন অন্ধকারের মধ্যে এবার সত্যবতী অনুভব করলেন যে, মুনি যা বলছেন, তা মৌখিকতা মাত্র নয়। মুনি শারীরিক মিলনে আগ্রহী এবং সে মিলন আসন্নপ্রায়। প্রখর বাস্তব সত্যবতীকে হঠাৎই পরিণত করে তুলল এক মুহূর্তে। আরও বড় কথা— তিনি জানেন যে, সমাজের অসম্মত অবিধির মিলনে যে পুত্রের জন্ম হবে, তার দায়িত্ব যদিও বা পরাশরই গ্রহণ করেন— কারণ পরাশর পুত্রলাভের জন্যই মিলন কামনা করেছেন— কিন্তু সেই মিলনের মধ্যে যে সামাজিক অসম্মতি আছে তার জন্য সমাজ তাঁকে কী মর্যাদা দেবে?

সত্যবতী ভয় পেলেন। নিজের জন্মের কারণেই যিনি কষ্ট পান, তিনি তো এই প্রস্তাবে ভয় পাবেনই। তাঁর বাস্তবতার বোধও তাই অন্যের চেয়ে প্রখর। সত্যবতী বললেন, মুনিবর! আমি যে কুমারী। আপনার প্রস্তাবিত মিলন ঘটলে আমার পিতা কী বলবেন? আমার কুমারীত্ব দূষিত হলে আমি ঘরেই বা ফিরব কী করে, ঘরে থাকবই বা কী করে— গৃহং গন্তুমৃষে চাহং ধীমন্ ন স্থাতুমুৎসহে।

তখনকার সমাজের যে রীতি ছিল, তাতে পরাশর জানতেন যে, তিনি যদি মৎস্যগন্ধা সত্যবতীর কুমারীত্ব হরণ করেন এবং তাঁর গর্ভজাত পুত্রের পিতৃত্ব অস্বীকার না করেন তা হলে সত্যবতীর কোনও অসুবিধে হবে না এবং সমাজেও তা খুব দূষণীয় বলে গণ্য হবে না। তবু তিনি সত্যবতীর ভয়টা বোঝেন, ‘জন্মশোকাভিতপ্তা’ এক রমণীর ভবিষ্যতের দায়ও তিনি বোঝেন, পরাশর অতএব সামান্য আশীর্বাদের ভঙ্গি মিশিয়েই বললেন, তুমি আমার প্রিয় কার্য সম্পাদন করো। তুমি আবারও তোমার অভীষ্ট কুমারীত্ব ফিরে পাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার সন্তোষ ঘটেছে অতএব যে বর চাও তাই পাবে। মৎস্যগন্ধা বললেন, আমার গায়ের মৎস্যগন্ধ দূর হোক, সুন্দর সৌগন্ধে প্রসন্ন হোক আমার শরীর।

আমরা পূর্বেও এই মৎস্যগন্ধের কথা বিশ্বাস করিনি, এখনও করি না। বস্তুত যে জন্মদাতা মৎস্যরাজ তাঁর জন্ম দিয়েও তাঁর পিতৃত্ব অস্বীকার করে তাঁকে বিসর্জন দিয়েছেন ধীবরপল্লিতে, পিতৃপরিচয়হীন সেই রমণী মৎস্যরাজের সগন্ধতা অথবা আত্মীয়তা অস্বীকার করলেন প্রথম সুযোগে। পরাশরের আশীর্বাদে মৎস্যগন্ধার রমণীশরীরে পদ্মের সৌগন্ধ এসে তিনি 'যোজনগন্ধা' বা 'গন্ধবতী'তে পরিণত হলেন কিনা জানি না, তবে এই মুহূর্ত থেকেই যে তাঁর নাম সত্যবতী হল, সে কথা আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

সত্যবতীর সঙ্গে পরাশরের অভীষ্ট মিলন সম্পূর্ণ হল এবং অলৌকিকভাবে তিনি সদ্যই গর্ভবতী হলেন এবং সদ্যোগর্ভ মোচন করলেন অলৌকিকভাবেই। মহভারতের কবি বেদব্যাস জন্মালেন। সদ্যোগর্ভ এবং সদ্যপ্রসবের কথাটা যে লৌকিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না, তা আমরা মনে করি না, কিন্তু মহাভারতের কবি যে অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী তাতে তাঁর জন্মের এই অলৌকিকতাটুকু আমরা জিইয়ে রাখতে চাই। বলতে চাই— জয় হোক মহামতি ব্যাসের— জয়তি পরাশরসূনুঃ সত্যবতীহৃদয়নন্দনো ব্যাসঃ।

ব্যাস জন্মালেন বটে, কিন্তু থাকলেন না সদ্যপ্রসবা মায়ের সঙ্গে। জন্মলগ্নেই তিনি শিশু নন, কৈশোরগন্ধী প্রায় যুবক। পিতা পরাশর তাঁকে নিয়ে যাচ্ছেন স্বাধ্যায়-অধ্যয়নের জন্য, তপস্যার জন্য। পরাশর যে শুধুমাত্র পুত্রলাভের ধর্মলাভ করার জন্যই কুমারী মৎস্যগন্ধার সাহচর্য প্রার্থনা করেছিলেন, তা এই ঘটনা থেকে আরও বেশি বোঝা যায়। কামচরিতার্থতার কারণ থাকলে পরাশর থেকে যেতেন যৌবনবতী সত্যবতীর সঙ্গে— ঘর বাঁধনের মায়া-পরবশ হয়ে। কিন্তু না, পুত্রলাভের সঙ্গে সঙ্গেই সেই সদ্যোজাত মহাপুরুষলক্ষণ পুত্রকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন পিতৃত্বের দায় সম্পূর্ণ পালন করে পিতৃঋণ শোধ করার জন্য।

অন্যদিকে ব্যাসকে দেখুন। সদ্যোগর্ভ থেকে যাঁর জন্ম তাঁর মাতৃদায় কতটুকু! গর্ভধারণের কষ্ট নেই, সন্তান-লালনের কষ্ট নেই, সত্যবতীও তাই পুত্রের কাছে বেশি কিছু আশা করেন না। তবু পিতার সঙ্গে একেবারে চলে যাবার আগে জননী সত্যবতীকে তিনি বলে গেলেন যে, তপস্যার জন্য তিনি চলে যাচ্ছেন বটে— কিন্তু প্রয়োজনে স্মরণ করলেই তিনি চলে আসবেন মায়ের কাছে— স্মৃতোঽহং দর্শয়িষ্যামি কৃত্যেষ্বিতি চ সোঽব্রবীৎ।

সদ্যোজননীর মনে সদ্য-ত্যক্ত কৈশোরগন্ধী বালকের এই ভরসার কথাটুকু কতখানি ক্রিয়া করল জানি না, তবে কথাটা তাঁর মনে দাগ কেটে রইল।

ত্যাগ এবং বৈরাগ্যের বিভূতিময় পরাশরের সংস্পর্শে এসে তথাকথিত কৈবর্তপল্লির রমণী মৎস্যগন্ধা গন্ধবতী সত্যবতীতে পরিণত হলেন। তিনি যেখানে উপস্থিত থাকতেন, সেখান থেকে দূর-দূরান্তে তাঁর অঙ্গের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ত, আমোদিত হত দিগ্‌দিগন্ত। এই জন্যই তাঁর নাম গন্ধবতী। তাঁর নাম যোজনগন্ধা। আমরা অবশ্য এই পুষ্পামোদের অর্থ বিশদ কোনও অর্থেই বুঝি। নইলে লৌকিকভাবে এই পুষ্পামোদী গাত্রগন্ধের কোনও তাৎপর্যই হয় না। আমরা বুঝি— ধীবরপল্লীতে মানুষ হওয়া রমণী মহামুনি পরাশরের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পূর্বতন পালকপিতার জাতি-সংস্কার কাটিয়ে উঠে বাহ্মণ্য-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কার লাভ করেছিলেন। তাঁর সুনামের সৌগন্ধ, তাঁর রূপের সৌগন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল বলেই সত্যবতী গন্ধবতী, সত্যবতী যোজনগন্ধা। পরাশরের সঙ্গে সংস্পর্শের পর সত্যবতী নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করলেন। নিজের সম্বন্ধে তাঁর মর্যাদাবোধ নিজের কাছেই অনেক বেড়ে গেল।

এই ঘটনার পর অনেক কাল কেটে গেছে। সত্যবতী আরও রূপবতী আরও যৌবনবতী হয়েছেন। এই সময়ে আরও এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল তাঁর জীবনে। হস্তিনাপুরের রাজা, প্রসিদ্ধ ভরত-কুরুবংশের জাতক মহারাজ শান্তনু মৃগয়ায় এসেছেন। যমুনার তীরবাহী পথ ধরে শান্তনু অনেক দূর চলে এসেছেন। মৃগয়াযোগ্য পশুপাখী সব সময়েই মৃগয়াকারী পুরুষের সামনে এসে উপস্থিত হয় না। এখানে ওখানে তাকে খুঁজতে হয়। 'মৃগ্' ধাতুর মানেই তো অন্বেষণ করা। শান্তনুও সেই অন্বেষণেই ছিলেন। কিন্তু অন্বেষণ করতে করতে যে মৃগমদের সৌরভ তাঁর নাসাপুট পূর্ণ করল, তা কোনও পশুপাখির নয়, সে সৌরভ বসন্তের হাওয়ায় ভেসে আসা যৌবনের সৌরভ। আসলে সুগন্ধ এবং সৌরভ এখানে রূপকমাত্র। এ রূপক প্রলোভনের; এ রূপক আকর্ষণের প্রতীক। গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে স্বর্গসুন্দরীর মতো এক রমণীকে দেখতে পেলেন মহারাজ শান্তনু। তিনি সত্যবতী। তিনি আবারও সেই যমুনার ওপর ডিঙি-নৌকোয় বসেছিলেন সবিভঙ্গে। এমন অসাধারণ রূপের আবেদন নাসিকার কাছে অবশ্যই নয়, সে আবেদন দৃষ্টির কাছে। বেশ বুঝি, সত্যবতীর নাম শুধু গন্ধবতী অথবা যোজনগন্ধা বলেই এখানে নাসিকা এবং গন্ধের অবতারণা।

এমন একটি সুন্দরী রমণীকে এমন অদ্ভুত পরিস্থিতিতে বসে থাকতে দেখে শান্তনু একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসাও করলেন তাঁকে— কে তুমি? কার মেয়ে? এই জনশূন্য স্থানে কীই বা বা তুমি করতে চাইছ— কস্য ত্বমসি কা বাঽসি কিঞ্চ ভীরু চিকীর্ষসি? সত্যবতী নিজের পালক পিতার ঋণ অস্বীকার করলেন না। জানালেন— আমি দাশ রাজার কন্যা। তিনি না থাকলে আমাকে এই নৌকো পারাপার করতে হয়।

৩

যমুনার কালো জলে কৃষ্ণবর্ণা সত্যবতীর কথা শুনে এবং অবশ্যই তাঁর সর্বাঙ্গে সৌন্দর্য্য-লাবণ্য দেখে আবারও মুগ্ধ হলেন শান্তনু। গঙ্গাকে শান্তনু গৃহবধূ করে আনতে পারেননি, হয়তো সে উপায়ও তাঁর ছিল না। তা ছাড়া গঙ্গার সঙ্গে সম্ভোগ-মিলনের মধ্যে যে কঠিন শর্ত ছিল, তাতে দেবব্রতর মতো একটি পুত্র লাভ করেই তাঁকে শান্ত থাকতে হয়েছে মাত্র, গঙ্গাকে রাজধানীতে নিয়ে যাবার মতো স্বাধিকার তিনি নিজেও বোধ করেননি, উপরন্তু গঙ্গার মধ্যে সুগৃহিণী সুলভ সত্তাও হয়তো ছিল না। কিন্তু সুচিরকাল স্ত্রী-সঙ্গহীন এক রাজা হিসেবে শান্তনুর দিন কেটেছে শুধু রাজকার্য নিয়ে আর অনাবিল পুত্রস্নেহে। বসন্তের উদাসী হাওয়ায় অথবা শরতের শেফালি-প্রভাতে অথবা বর্ষার ঘন-দেয়া বরিষণের মধ্যে রাজা শান্তনুর যে কত কিছু সংগোপনে বলার থাকে, অথচ বলা হয় না, কত কিছুই যে শোনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে, অথচ শোনা হয় না। এই অদ্ভুত নিঃসঙ্গতা এড়াতেই যমুনা-পুলিনে এসেছিলেন শান্তনু। আর সেই মুহূর্তে কী অদ্ভুত যোগাযোগ— বিধাতার আদিসৃষ্টির মতো শান্তনু দাশেয়ী গন্ধবতীকে দেখতে পেলেন যমুনার তরঙ্গচঞ্চল জলের মধ্যে।

দেখামাত্রই তাঁর প্রেমে পড়লেন শান্তনু। একে ঠিক প্রেম বলা উচিত কিনা সে বিষয়ে আমাদের আধুনিক সচেতনতা কাজ করে, কিন্তু গন্ধবতী দাশেয়ীর শরীরের মধ্যে আগুন ছিল, সেদিকে তাকালে দৃষ্টিরমণ আপনিই হয়ে যায়। অতএব তাঁকে দেখা মাত্রই কামনায় মোহিত হলেন শান্তনু। দেবরূপিণী কন্যার দিকে তাকিয়ে রাজা বললেন, তুমি শুধু আমারই থাকবে, কন্যা! এরকম আহ্বান হয়তো জীবনে বহুবার শুনেছেন সত্যবতী। অতএব নিজের মর্যাদা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি বললেন, আমার সেই অধিকার নেই, যাতে আমি নিজেই নিজেকে তুলে দিতে পারি তোমার হাতে। তুমি আমার পিতার সঙ্গে কথা বলো। শান্তনু সঙ্গে সঙ্গে কৈবর্তপল্লিতে দাশরাজার কাছে উপস্থিত হলেন এবং নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনু। তোমার কন্যাকে আমি বিবাহ করতে চাই— স গত্বা পিতরং তস্যা বরয়ামাস তাং তদা।

কৈবর্তপল্লির দাশ রাজা যথেষ্ট বুদ্ধিমান মানুষ এবং তিনি নিজের স্বজাতীয়দের যথেষ্ট আস্থাভাজনও বটে। মৎস্যরাজের কন্যাকে তিনি অন্নপান দিয়ে মানুষই শুধু করেননি, এই মেয়েকে তিনি নিজের মেয়ের মতোই ভালবাসেন এবং তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও তিনি ভয়ংকর সচেতন। এবং তিনি অবশ্যই সচেতন নিজের সম্বন্ধেও। একজন রাজার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল, আর তিনি ধন্য হয়ে যাবেন, এমন হীনমন্যতায় তিনি ভোগেন না। তাঁর বিষয়বুদ্ধিও অন্য অনেকের থেকেই প্রখর। হস্তিনাপুরের রাজার এমন অভাবনীয় আগমন এবং তার চেয়েও অভাবনীয় প্রস্তাব শুনে তিনি এটা ভালই বুঝে গেছেন, হস্তিনাপুরের রাজা যখন তাঁর মেয়ের অঞ্চল ধরে এত দূর কৈবর্তপল্লিতে এসে উপস্থিত হয়েছেন, তখন তাঁর কাছ থেকে মেয়ের ভবিষ্যতের সমাদর সম্বন্ধে কথা আদায় করে নিতে হবে। কারণ রাজবংশের মেয়ে বলেই সত্যবতীকে তিনি যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়ে মানুষ করেছেন এবং সেই মেয়ে যে হস্তিনাপুরের শুদ্ধান্তবাসিনী হয়ে শুধু অন্যতমা এক রাজভোগ্যা রমণী হয়ে থাকবেন— এটা কৈবর্তপল্লির মণ্ডলমশায় দাশরাজা মেনে নেবেন না। তিনি কথা চান হস্তিনাপুরের রাজার কাছে।

দাশরাজা চিবুক শক্ত করে রাজাকে বললেন, মেয়ে যখন হয়েছে, তখন তাকে তো পাত্রস্থ করতেই হবে, মহারাজ! সে আর এমন বেশি কথা কী— জাতমাত্রৈব মে দেয়া বরায় বরবর্ণিনী। তবে কিনা এ বিষয়ে আমার একটু কথা আছে। অভিলাষ সামান্যই, তবু, মহারাজ, আমার কথাগুলো শুনতে হবে আপনাকে। অর্থাৎ আপনি যদি সত্যিই এই কন্যাকে আপনার ধর্মপত্নী হিসেবে গ্রহণ করতে চান, তবে আপনাকে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে, মহারাজ! সেই প্রতিজ্ঞাটি করলে আমি আপনার হাতে মেয়েকে তুলে দেব। সত্যি কথা বলতে কী, আপনার মতো এমন উপযুক্ত সৎপাত্র আর কোথায় পাব, মহারাজ— ন হি মে ত্বৎসমো কশ্চিদ্ বরো জাতু ভবিষ্যতি।

শান্তনু বুঝলেন যে, রূপমুগ্ধ হয়ে তিনি কৈবর্তপল্লির মণ্ডলমশায়ের কাছে এসে খুব ভাল

কাজ করেননি। তিনি খানিকটা বেকায়দায় পড়ে গেছেন। হস্তিনাপুরের মতো একটি রাজ্যের শাসক হবার ফলে শান্তনুর কূটনীতির বোধ কিছু কম নয়। তিনি সহজেই বুঝে গেলেন যে, কুটিল কৈবর্তরাজের মনে এমন কোনও কথা আছে, যা সহজে পূরণ করার মতো নয়। তিনি বললেন, আগে তোমার অভিলাষটা শুনি, দাশরাজ! তবেই না সেটা পূরণ করার চেষ্টা করব। যদি সেটা মানার মতো হয়, তবেই তো মানব। একটা অসম্ভব বস্তুকে তো আর সম্ভব করে ফেলা যাবে না।

দাশরাজা নিজের অন্তর ব্যক্ত করে বললেন, আমার এই কন্যার গর্ভে যে পুত্রটি হবে, তাকেই আপনি দিয়ে যাবেন আপনার সিংহাসনের উত্তরাধিকার। আপনার জীবদ্দশাতেই সেই পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে হবে, যাতে অন্য কোনও সমস্থানীয় ব্যক্তি ওই সিংহাসনের উত্তরাধিকার দাবি না করতে পারে— নান্যঃ কশ্চন পার্থিবঃ।

নীল যমুনার জলে যে রমণীর নীলকান্তি রূপ দেখে মোহিত হয়েছিলেন শান্তনু, সেই মোহন মুখ ছাপিয়ে শান্তনুর হৃদয়ের মধ্যে এক কৈশোরগন্ধী যুবকের বৎসল মুখ ভেসে উঠল। সে মুখ গঙ্গাপুত্র দেবব্রতের মুখ। হস্তিনাপুরে তাঁর পিতা শান্তনু ছাড়া আর কোনও আপনজন নেই তাঁর। রাজ্যের প্রত্যেকটি প্রজার জন্য কুমার দেবব্রত আন্তরিকতা বোধ করেন এবং এমন সর্বাতিশয়ী গুণের জন্যই তিনি বহু পূর্বেই যুবরাজ-পদে বৃত হয়েছেন। সেই নবযৌবনোৎসুক দেবব্রতকে যৌবরাজ্য থেকে সরিয়ে দিয়ে এই স্বার্থান্বেষী কৈবর্তমুখ্যের অন্যায় আবদার মেনে নিতে পারলেন না শান্তনু।

কৈবর্তরাজ হস্তিনাপুরের রাজাকে ভালভাবেই চিনতেন। শান্তনুর পূর্বপ্রণয়িনী গঙ্গা এবং তাঁর পুত্র দেবব্রতর কথা তিনি জানতেন না, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। অন্যদিকে দাশরাজ সবচেয়ে যেটা বেশি জানতেন, সেটা হল মহারাজ শান্তনুর কামুক-স্বভাবের কথা। দাশরাজা তাঁর নিজের অভিজ্ঞতাবশে এটা বুঝেছেন যে, শান্তনু একবার যখন তাঁর মেয়েকে দেখে মোহিত হয়েছেন, তখন তাঁকে দিয়ে কিছু অন্যায় সত্যও করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। কুমার দেবব্রতর জন্য আপাতত শান্তনুর চক্ষুলজ্জা কাজ করল বটে, কিন্তু শান্তনু যে বড়শি-বিদ্ধ মৎস্যের মতো রাজধানীতে ফিরলেন, সে কথা দাশরাজও বুঝলেন এবং অবশ্যই বুঝলেন মহারাজ শান্তনু।

সত্যি কথা, যুবক পুত্র দেবব্রতর কারণে শান্তনু সাময়িকভাবে দাশরাজার আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন বটে, কিন্তু তাঁর হৃদয় থেকে সত্যবতীর আবেদন এতটুকুও নষ্ট হল না। মনে মনে সত্যবতীর কথা ভাবতে ভাবতেই তিনি হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন— স চিন্তয়ন্নেব তু তাং... কামোপহতচেতনঃ। বিধাতার আদিসৃষ্টির জন্য সেই আদিকামনাটুকুও তাঁর মন জুড়ে রইল। হস্তিনাপুরের রাজকার্য, প্রজাকল্যাণ, মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা— কিছু আর শান্তনুর ভাল লাগে না। সারা দিন বসে বসে তিনি শুধু সত্যবতীর কথাই ভাবেন।

এইরকমই এক ধ্যানমগ্ন দিনে— শান্তনুং ধ্যানমাস্থিতম্— কুমার দেবব্রত এসে উপস্থিত হলেন পিতার কাছে। সামান্য অনুযোগের সুরেই বললেন— সর্বত্রই তো আপনার মঙ্গল দেখতে পাচ্ছি, পিতা! সামন্ত রাজারা সকলেই পরাভূত, কোথাও কোনও ত্রাস অথবা বিহ্বলতার কারণ ঘটেনি আমাদের। তা হলে আপনার মুখে এই ক্লিষ্টতার আভাস দেখি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন? ধ্যানী-যোগীর মতো সদা-সর্বদা আপনাকে অন্য চিন্তায় ব্যাপৃত দেখতে পাচ্ছি। আপনি রাজকার্য দেখছেন না, আমার সঙ্গেও বাক্যালাপ করছেন না, এমনকী আস্তাবল থেকে ঘোড়া টেনে নিয়ে আপনি যে বাইরে বাইরে ছুটে বেড়াতে ভালবাসেন, তাও তো আপনি ছেড়ে দিয়েছেন। ছেড়ে দিয়েছেন পূর্বের সমস্ত অভ্যাস। আর শরীরটাও তো আপনার খুব খারাপ হয়ে গেছে— একেবারে বিবর্ণ, কৃশ, পাণ্ডুর— ন চাশ্বেন বিনির্যাসি বিবর্ণো হরিণঃ কৃশঃ।

শান্তনু এসব কথার কোনও উত্তর দিলেন না। দেবেনই বা কী করে? সত্যবতীর রূপে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন— একথা তো আর কুমার দেবব্রতকে বলা চলে না। এদিকে গাঙ্গেয় দেবব্রতও বড় ঋজু-সরল মানুষ। পিতার মানসিক পরিবর্তনের কথা তাঁকে জানতেই হবে। অতএব একটু অধৈর্য হয়েই বললেন— আপনার ব্যাধিটা কী, জানতে পারি আমি? যদি ব্যাধির নিদান জানা যায়, তবে তার প্রতিকারও সম্ভব— ব্যাধিমিচ্ছামি তে জ্ঞাতুং প্রতিকুর্য্যাং হি তত্র বৈ।

শান্তনু তাঁর অন্তর ব্যথার কথা স্পষ্ট করে বলতেন পারলেন না। যুবক বয়স্ক পুত্র, যাঁর নিজেরই বিবাহের সময় আসন্ন তাঁকে এসব কথা বলা যায়ই বা কী করে? কিন্তু মনে যদি প্রৌঢ়বয়সেও কারও স্ত্রীসঙ্গলিপ্সা প্রবল হয়, সে স্পষ্ট করে না বললেও আড়েঠাড়ে বলে। শান্তনুও তাই করলেন। তিনি কুমার দেবব্রতর খুব প্রশংসা করলেন বটে, কিন্তু সেই প্রশংসাবাণী এবং অনাবিল পুত্রবাৎসল্য অতিক্রম করে আরও এক বিপন্নতা এমনভাবেই তাঁর অন্তর থেকে বেরিয়ে এল, যাতে বেশ বোঝা যায় যে, তিনি যা বলছেন, তার অন্যতর অর্থ আছে। পুত্রের অনুযোগ, তিনি ধ্যানী-যোগীর মতো বসে আছেন— সেই অনুযোগ তিনি স্বীকার করে নিয়েই বললেন— তবে কী জানো, বাবা! আমাদের এই বিখ্যাত বিশাল বংশে তুমিই একমাত্র সন্তান। তার মধ্যে তোমার পুরুষকার এবং অস্ত্রক্ষমতা প্রদর্শনের তীব্রতা এমনই এক মাত্রা লাভ করেছে যে, মাঝে মাঝে আমার ভয় হয়। মানুষের জীবন বড়ই চঞ্চল, কখন কী হয় কিছুই বলা যায় না, তাই বলছিলাম তোমার জীবনে যদি কোনও বিপদ ঘটে, তবে এই পরম্পরাগত বিশাল বংশটাই লুপ্ত হয়ে যাবে। এক ছেলের বাবা হওয়াটা বড়ই কষ্টকর বটে। শান্তনু এবার অসাধারণ উপায়ে নিজের আত্মগত বাসনাটি প্রকট করলেন। বললেন, তুমি আমার একশো ছেলের বাড়া এক ছেলে। আমি আর সন্তান বৃদ্ধির জন্য অনর্থক বিয়ে-টিয়ে করে গোলমাল পাকাতে চাই না— ন চাপ্যহং বৃথা ভুয়ো দারান্ কর্তুমিহোৎসহে।

এ যেন অতিরিক্ত মদ্য-মাংসপ্রিয় এক অতিথি আমন্ত্রণকারী ব্যক্তিকে বলছে, না, না, ওসব ব্যবস্থা আর করবেন না। ওই শাক-শুক্তোই খুব ভাল। কিন্তু এই ভালমানুষির সঙ্গে শান্তনু যখন বলেন, পিতার কাছে একটি মাত্র পুত্রও যা, নিঃসন্তান হওয়াও তাই— তখনই তাঁর আসল ইচ্ছেটা বোঝা যায়। দেবব্রতকে তিনি শতপুত্রর অধিক গৌরব দান করেও যখন মন্তব্য করেন, যজ্ঞের কথা বলো, আর বেদের কথাই বলো, এই সমস্ত কিছুই পুত্রপ্রাপ্তির সৌভাগ্য থেকে কম— তখন বোঝা যায় দেবব্রত ছাড়াও অন্য আরও কোনও পুত্রের মাহাত্ম্য তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠছে। দেবব্রতকে শান্তনু বলেছিলেন, তুমি সব সময় যুদ্ধবিগ্রহ

করে বেড়াচ্ছ— তঞ্চ শূরঃ সদামর্ষী শস্ত্রনিত্যশ্চ ভারত— এই যুদ্ধবিগ্রহের ফলে তোমার যদি ভালমন্দ কোনও ঘটনা ঘটে যায়, তুমি যদি কোনওভাবে নিহত হও— নিধনং বিদ্যতে ক্বচিৎ— তা হলে এই বিশাল বংশের কী গতি হবে?

শান্তনুর কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়— দেবব্রত ছাড়াও তিনি অন্য পুত্রের আকাঙ্ক্ষা করছেন এবং পুত্রের কথা বলাটাই যেহেতু ধর্মসম্মত, যেহেতু শাস্ত্রে বলে— পুত্রের প্রয়োজনেই বিবাহ— অতএব বিবাহের মতো একটি গৌণ কর্ম তাঁর অনীপ্সিত নয় এবং যেন পুত্রোৎপত্তির মতো কোনও মুখ্য কর্মের সাধন হিসেবেই এই বিবাহের প্রয়োজন। পুত্র দেবব্রত সব বুঝলেন। মহাভারতের কবি মন্তব্য করেছেন— সব বুঝেই বুদ্ধিমান দেবব্রত পিতার কাছে বিদায় নিয়ে কুরুসভার এক বৃদ্ধ মন্ত্রীর কাছে এলেন— দেবব্রতো মহাবুদ্ধিঃ পথ্যাযাবনুচিন্তয়ন্। দেবব্রত তাঁকে পিতার মনোদুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করলে সেই মন্ত্রী কোনও ঢাক্‌ঢাক্ গুড়গুড় না করে স্পষ্ট বললেন, দাশ রাজার কন্যা সত্যবতীর জন্য শান্তনুর মন খারাপ হয়েছে। তিনি তাঁকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন।

মন্ত্রীর কথা শুনে দেবব্রত সঙ্গে সঙ্গে কুরুসভার অভিজ্ঞ বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়দের নিয়ে উপস্থিত হলেন সেই কৈবর্তপল্লিতে। পিতার বিবাহের জন্য দেবব্রত সত্যবতীকে যাচনা করলেন দাশরাজার কাছে। দাশরাজা বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি আকস্মিকভাবে কোনও উল্টো কথা বলে বসলেন না। কুমার দেবব্রতকে সাদর সম্ভাবষণে তুষ্ট করে আগে তাঁকে নিয়ে গিয়ে বসালেন নিজের সভায়। বললেন, কুমার! আপনি মহারাজ শান্তনুর পুত্র। যাঁরা অস্ত্রবিদ্ বলে বিখ্যাত, তাঁদের মধ্যে আপনি হলেন গিয়ে শ্রেষ্ঠ। পিতার উপযুক্ত অবলম্বন। আপনাকে আর কীই বা আমি বলব। সত্যি কথা বলতে কী— মহারাজ শান্তনুর মতো এক বিরাট পুরুষের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধের সুযোগ পেয়েও যদি সেটা গ্রহণ করা না যায়, তবে আমি কেন স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্রঠাকুরও অনুতপ্ত হবেন মনে মনে।

দাশরাজা লুব্ধ শান্তনুর সঙ্গে যেভাবে কথা বলেছিলেন, যেভাবে নিজের শর্তটি তাঁকে শুনিয়েই চুপ করে গিয়েছিলেন, এখানে কুমার দেবব্রতর সঙ্গে সেভাবে কথা বললেন না। দেবব্রত যুদ্ধবাজ মানুষ, সত্যে তাঁর চিরপ্রতিষ্ঠা, অতএব দাশরাজা ধীরভাবে তাঁর কথাগুলি সযৌক্তিক করে তুললেন। দাশরাজা বললেন, এ মেয়ে আমার নয়, কুমার! কন্যাটি রাজা উপরিচরের— যে উপরিচর কৌলীন্যের গুণে আপনাদেরই সবার সমকক্ষ। তিনি কতবার আমাকে বলেছেন যে, এই মেয়ের উপযুক্ত স্বামী হতে পারেন একমাত্র মহারাজ শান্তনু— তেন মে বহুশস্তাত পিতাতে পরিকীর্তিতঃ। অর্হঃ সত্যবতীং বোঢুম্...।

কোথায় মহারাজ উপরিচর, আর কোথায় শান্তনু। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সময়ের একটা মস্ত ফারাক ঘটে যায়। তবে ওই যে বলেছিলাম— মৎস্যদেশে উপরিচর বসু যে পুত্রটিকে বসিয়ে দিয়েছিলেন, সেই পুত্রের পরম্পরায় জাত কোনও মৎস্যরাজের কন্যা হবেন সত্যবতী। দাশরাজা কৈবর্তপল্লিতে তাঁকে মানুষ করেছেন বটে, তবে বাসব রাজাদের কৌলীন্য তিনি ভুলে যাননি। আর কী অদ্ভুতভাবে সত্যবতীর উপাদেয়তা এবং দুর্লভতা উপস্থাপন করছেন তিনি।

দাশরাজা বললেন, এই তো সেদিন দেবর্ষি অসিত এসেছিলেন আমার থানে। অসিত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবল— এঁরা সব দেবর্ষি। তা দেবর্ষি অসিত বললেন— সত্যবতীকে তাঁর চাই। আমি সোজা 'না' বলে দিলাম— অসিতো হ্যপি দেবর্ষিঃ প্রত্যাখ্যাতঃ পুরা ময়া। রাজকন্যে বলে কথা, তাকে কি আর শুষ্করুক্ষ মুনির হাতে তুলে দিতে পারি?

দাশরাজা এবার প্রকৃত প্রস্তাব করছেন। বললেন, তবে কিনা কুমার! আমি মেয়ের বাবা বলে কথা। আমার তো কিছু বলার থাকতেই পারে। আমি শুধু চাই— আমার মেয়ের ঘরে যে নাতি জন্মাবে, তার কোনও বলবান শত্রু না থাকে। আমি তো জানি রাজকুমার— তোমার মতো এক মহাবীর যদি অসুর-গন্ধর্বদেরও শত্রু হয়ে দাঁড়ায় তবে সেই অসুর-গন্ধর্বরাও রক্ষা পাবে না, তাঁদের কাউকে আর সুখে বেঁচে থাকতে হবে না— ন স জাতু-সুখং জীবেৎ ত্বয়ি ক্রুদ্ধে পরন্তপে। তা এখানে আমার এই মেয়ের গর্ভে তোমার পিতার যে পুত্রটি জন্মাবে এবং ভগবান না করুন, কখনও যদি তাঁর সঙ্গে তোমার শত্রুতা হয়, তবে তার আর বাঁচার আশা থাকবে? শান্তনুর সঙ্গে আমার মেয়ের বৈবাহিক সম্বন্ধে আমি এইটুকুই মাত্র দোষ দেখতে পাচ্ছি। আমার আর কোনও অসুবিধেই নেই। সত্যবতীকে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া বা না দেওয়া— এর মধ্যে এইটুকুই যা খটকা— এতাবান্— অত্র দোষো হি... দানাদানে পরন্তপ।

৪

কুমার দেবব্রত কৈবর্ত রাজার আশয় স্পষ্ট অনুধাবন করলেন। সমস্ত ক্ষত্রিয়বৃদ্ধর সামনে তিনি সোদাত্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন— তুমি তোমার মনের সত্য গোপন করোনি, দাশরাজ! আমিও তাই সত্যের প্রতিজ্ঞা করছি। উপস্থিত ক্ষত্রিয়রা সবাই শুনে রাখুন— এমন প্রতিজ্ঞা আগে কেউ করেননি, পরেও কেউ করবেন না— নৈব জাতো ন চাজাত ঈদৃশং বক্তুমুৎসহেৎ। দেবব্রত এবার দাশরাজের কথার সূত্র ধরে বললেন, তুমি যেমনটি বললে, আমি তাই করব। আমি কথা দিচ্ছি— এই সত্যবতীর গর্ভে যে পুত্র জন্মাবে, সেই আমাদের রাজা হবে— যোঽস্যাং জনিষ্যতে পুত্রঃ স নো রাজা ভবিষ্যতি।

আগেই বলেছিলাম, কৈবর্তরাজ পাটোয়ারি বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। তিনি বুঝলেন— সত্যবতীর ছেলের রাজা হবার পথ নিষ্কণ্টক। কিন্তু রাজত্ব, রাজসুখ এমনই এক বস্তু যা পেলে বংশ-পরম্পরায় মানুষের ভোগ করতে ইচ্ছা করে। উল্কার মতো এসে যে সুখ ধূমকেতুর মতো চলে যায়, সে সুখ রাজতন্ত্রের রাজা বা গণতন্ত্রের নেতা— কেউ চান না। দাশরাজা তাই চিরস্থায়ী রাজসুখের স্বপ্ন দেখে দেবব্রতকে বললেন, আপনি যা বলেছেন, তা শুধু আপনারই উপযুক্ত। তবে কিনা আমি মেয়ের বাবা বলে কথা। মেয়ের বাবাদের স্বভাবই এমন আর সেই স্বভাবের বশেই আরও একটা কথা আমায় বলতে ইচ্ছে— কৌমারিকাণাং শীলেন বক্ষ্যাম্যহমরিন্দম।

কৈবর্তরাজ বলেন, আপনার প্রতিজ্ঞা যে কখনও মিথ্যা হবে না, সে কথা আমি বেশ জানি। আমি জানি, আপনার পিতার পরে আমার সত্যবতীর ছেলেই রাজা হবে। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুমার! আপনার যে পুত্র হবে তাঁর সম্বন্ধে আমার সন্দেহটা তো থেকেই যাচ্ছে— তবাপত্যং ভবেদ্ যত্তু তত্র নঃ সংশয়ো মহান্। দেবব্রত দাশরাজার অভিপ্রায় বুঝে সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়দের শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, শুনুন মহাশয়েরা, আমার পিতার জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করছি— আমি পূর্বেই রাজ্যের অধিকার ত্যাগ করেছি, আপনারা শুনেছেন। এখন আমি বলছি— আমি বিবাহও করব না এ জীবনে, আজ থেকে আমি ব্রহ্মচর্য পালন করব— অদ্য প্রভৃতি মে দাশ ব্রহ্মচর্যং ভবিষ্যতি। চিরজীবন অপুত্রক অবস্থায় থাকলেও এই ব্রহ্মচর্যই আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে।

সেকালের দিনে মানুষের বিশ্বাস ছিল— অপুত্রকের স্বর্গলাভ হয় না। কিন্তু ব্রহ্মচারীর জীবনে যে নিয়ম-ব্রত এবং তপস্যার সংযম আছে, সেই সংযমই তাকে স্বর্গের পথে নিয়ে যায়। দেবব্রতের প্রতিজ্ঞার পরে ব্রহ্মচর্যের সংযম তাই স্বেচ্ছাকৃত হলেও অকারণে নয়।

দেবব্রতর কঠিন প্রতিজ্ঞা শুনে অন্য কার মনে কী প্রতিক্রিয়া হল, মহাভারতের কবি সে খবর দেননি, কিন্তু দাশ রাজার হৃদয় আপন স্বার্থসিদ্ধিতে প্রোৎফুল্ল হয়ে উঠল।। সানন্দে তিনি ঘোষণা করলেন, মেয়ে দেব না মানে? তোমার পিতার নির্বাচিত বধূকে এই এখুনি তোমার সঙ্গেই পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি।

পিতার মনোনীত হস্তিনাপুরের রাজবধূ সত্যবতীর সামনে এসে দাঁড়ালেন দেবব্রত। তাঁকে আপন জননীর সম্মান দিয়ে ভীষ্ম বললেন, এসো মা! রথে ওঠো। আমরা এবার নিজের ঘরে ফিরব— অধিরোহ রথং মাতঃ গচ্ছাবঃ স্বগৃহানিতি।

বয়সের দিক দিয়ে দেখতে গেলে দেবব্রত হয়তো সত্যবতীর সমবয়সি হবেন প্রায়। হয়তো বা সত্যবতী একটু বড়। দেবব্রত যখন শান্তনুর ঔরসে গঙ্গাগর্ভে জন্মেছেন, হয়তো তাঁর সমসাময়িককালেই পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জন্মেছেন মহাভারতের কবি। কিন্তু বিবাহের বয়স যেহেতু রমণীর ক্ষেত্রে সবসময়েই কম হয় অপিচ পরাশর যেহেতু সত্যবতীর প্রথম যৌবনটুকুই লঙ্ঘন করেছিলেন, তাতে অনুমান করি— সত্যবতী দেবব্রতর চেয়ে খুব বেশি বড় হবেন না বয়সে।

যাই হোক, দেবব্রত যেদিন জননীর সম্বোধনে সত্যবতীকে নিজের রথে তুলে নিয়ে হস্তিনাপুরের পথে পা বাড়ালেন, সেদিন থেকেই এই অল্পবয়স্কা জননীর সঙ্গে তাঁর ভাব হয়ে গিয়েছিল। হস্তিনাপুরের রাজসংকটে এই প্রায় সমবয়স্ক দুই মাতাপুত্রের পরম বন্ধুত্ব বার বার পরে আমাদের স্মরণ করতে হবে। কিন্তু তার আগে জানতে হবে— দেবব্রত অল্পবয়স্কা জননীকে রথে চাপিয়ে— রথমারোপ্য ভাবিনীম্— উপস্থিত হলেন হস্তিনাপুরের রাজধানীতে, পিতার প্রকোষ্ঠে। শান্তনুকে তিনি জানালেন— কীভাবে দাশরাজাকে রাজি করাতে হয়েছে এই বৈবাহিক সম্পর্ক সুসম্পন্ন করার জন্য।

এই মুহূর্তে শান্তনুর মুখে পুত্র দেবব্রতর স্বার্থ-সম্বন্ধীয় কোনও দুশ্চিন্তার বলিরেখা আপতিত হয়নি। একবারও উচ্চারিত হয়নি— পুত্র! তোমাকে আমি যুবরাজ পদবীতে অভিষিক্ত করেছিলাম, এখনও তুমি তাই থাকলে। একবারও শান্তনু বলেননি— দেবব্রত! তোমার মতো পুত্র থাকতে, অন্য পুত্রে প্রয়োজন নেই আমার। পরম নৈঃশব্দ্যের মধ্যে দেবব্রতর যৌব-রাজ্যের সুখ সংক্রান্ত হল শান্তনুর ভাবী পুত্রের জন্য। যৌবনবতী সত্যবতীকে লাভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে শান্তনুর হৃদয়ে যে রোমাঞ্চ তৈরি হয়েছিল, সেই আকস্মিক হৃদয়াহ্লাদ মহাভারতের কবি সলজ্জে বর্ণনা করেননি, কারণ আপন জননী সত্যবতীর সম্পর্ক চেতনার মধ্যে রাখলে শান্তনুও মহাভারতের কবির পিতা। তাঁর পক্ষে শান্তনুর হৃদয় ব্যাখ্যা করা সাজে না। যা সাজে তিনি তাই করেছেন। শান্তনুর মুখ দিয়ে পরমেপ্সিত স্ত্রী-লাভের কৃতজ্ঞতা বেরিয়ে এসেছে পুত্র দেবব্রতর জন্য। তিনি বর দিলেন— বৎস! তুমি যত কাল বেঁচে থাকতে চাও, ততকালই বেঁচে থাকবে। মৃত্যু তোমার ইচ্ছাধীন, ইচ্ছামৃত্যু হবে তুমি— ন তে মৃত্যুঃ প্রভবিতা যাবজ্জীবিতুমিচ্ছসি।

আমরা শুধু ভাবি— শান্তনু যখন এক পুত্রের জীবন নিয়ে পূর্বে এত শঙ্কিত হচ্ছিলেন, তখনই এই মহান বরদান সম্পন্ন করলে পারতেন। কিন্তু তাতে মহাভারতের কবির পক্ষে লোক চরিত্রের বৈচিত্র্য দেখানো সম্ভব হত না। পুত্রকে সারা জীবন বাঁচিয়ে রাখা বা মৃত্যুকে তাঁর ইচ্ছাধীন করে রাখার মধ্যে পিতার সব থেকে বেশি বাৎসল্য প্রকাশ পায়, জানি। হয়তো পুত্রকে এক বৃহৎ জীবন দান করে তাঁর নিজকৃত বঞ্চনার প্রতিদান দিয়েছেন শান্তনু। কিন্তু মহাভারতের কবির দৃষ্টিতে— এই ঘটনা বঞ্চনার অক্ষরে লিখিত হয়নি, হয়তো তাঁর কাছে এ ঘটনা তত রূঢ়ও নয়। পরবর্তী সময়ে মহাভারতের বিশাল ঘটনা-সন্নিবেশের মধ্যে দেবব্রতকে যেভাবে উপস্থাপিত করা হবে, তাতে দেখা যাবে, পিতার বাৎসল্যে এই মহান পুরুষটি বঞ্চিত হলেও, অতিদীর্ঘ জীবনের অধিকারী হওয়ার সুবাদে তিনি এক বিশাল যুগের দ্রষ্টা বলে পরিগণিত হবেন।

হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে সত্যবতীর প্রবেশ নিয়ে যে নাটকের সৃষ্টি হয়েছিল, তার মধ্যে স্বয়ং সত্যবতীর ভূমিকা কতটুকু ছিল, তা নির্ধারণ করা খুবই শক্ত। যা দেখেছি, তাতে দাশরাজাই পিতা হিসেবে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন এবং প্রিয় পালিতকন্যাটির ভবিষ্যৎ-সুরক্ষার জন্য হস্তিনাপুরে বিখ্যাত ভরতবংশের উত্তরাধিকারও তিনি নির্ণয় করে দিয়েছেন। আমাদের জিজ্ঞাসা হয়— এতে সত্যবতীর কোনও পরোক্ষ ভূমিকা ছিল কিনা? এটা ঘটনা যে, মহারাজা শান্তনু যেমন সত্যবতীর প্রেমে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, সত্যবতী তা হননি। যদি হতেন, তা হলে দাশরাজা শান্তনুকে যে শর্ত দিয়েছিলেন এবং সেই শর্ত শুনে শান্তনু যখন বিমূঢ় হয়ে রাজধানীতে নিবাত-নিস্পন্দ দীপশিখার মতো বসেছিলেন, তখন আমরা সত্যবতীকে এমন নির্বিকার দেখতাম না। শান্তনু তাঁর কাছে একান্তে প্রেম নিবেদন করেছিলেন। সেই প্রেমের মধ্যে যদি এতটুকু পারস্পরিকতা থাকত, তা হলে দাশ-রাজার শর্তে বিহ্বল শান্তনুর অবস্থা ভেবে একবারের তরেও সত্যবতী পিতা দাশরাজকে বলতেন— দেখুন, এতটা বোধহয় ঠিক হল না। কিন্তু না, কিছুই তিনি বলেননি পিতাকে। কুমার দেবব্রত বৈবাহিক ঘটনার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে দাশরাজের বাড়িতে এসে সশব্দ অভিভাষণে দাশরাজার অপমানজনক শর্ত যখন মেনে নিলেন, তখনও সত্যবতীকে আমরা কোনও কথা বলতে শুনিনি।

এক হতে পারে— অথবা হতেই পারে যে, পিতাকে অতিক্রম করা সত্যবতীর সাধ্য ছিল না এবং সে কথা প্রথমেই তিনি শান্তনুকেও জানিয়েছিলেন। আবার এও হতে পারে— দাশরাজা যে শর্ত আরোপ করেছিলেন, তাতে তাঁর মৌন-সম্মতি ছিল। এমনকী প্রায় তাঁরই

সমবয়সি কুমার দেবব্রত যে তাঁরই কারণে পিতার রাজ্যের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভাবনা রুদ্ধ করে দিয়ে ভীষ্মপ্রতিজ্ঞ হলেন, তাতেও তাঁর রমণী-হৃদয় এতটুকু বিগলিত হয়নি। অথবা এসব কিছু নয়, সত্যবতী ঘটনা-প্রবাহে গা ভাসিয়ে বসেছিলেন; পিতা তাঁর ভবিষ্যতের আখের বুঝে নিয়ে যেভাবে তাঁর বিবাহ দিয়েছেন তিনিও লক্ষ্মী মেয়ের মতো সব মেনে নিয়ে কুরুবাড়ির রাজমহিষী হয়ে বসেছেন।

উপরি উক্ত কল্পগুলির মধ্যে কোনটা সত্যবতীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, বিনা প্রমাণে তা বলা উচিত হবে না। কিন্তু একথা আমার বারবার মনে হয়— সত্যবতী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মহিলা এবং তাঁর ব্যক্তিত্বও হস্তিনাপুরের পট্টমহিষী হবার সর্বথা উপযুক্ত। বিবাহের পর অবশ্য খুব বেশি সময় অতিবাহিত হল না। দুটি সন্তানের জন্মের পর, অন্তত কনিষ্ঠটি বড় না হতেই শান্তনু মারা গেলেন। মহামতি ভীষ্ম সত্যবতীর নির্দেশ মস্তকে ধারণ করে জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্রাঙ্গদকে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে স্থাপন করলেন— স্থাপয়ামাস বৈ রাজ্যে সত্যবত্যা মতে স্থিতঃ।

এই একবারই বোধহয়; স্বামী শান্তনুর অবর্তমানে এই প্রথম এবং একবারই সত্যবতী ভীষ্মের ওপর কোনও নির্ভরতা না রেখে কাজ করেছিলেন। সত্যবতীর গর্ভজাত প্রথম পুত্র চিত্রাঙ্গদ ভীষ্মের ছত্রছায়ায় মানুষ হননি এবং হয়তো সত্যবতী তার প্রয়োজনও বোধ করেননি। কিন্তু রাজা হবার পর চিত্রাঙ্গদ প্রসিদ্ধ ভরতবংশের গৌরবমতো চলেননি। একবারের তরেও একথা তো শুনিইনি যে, কোথাও কোনওভাবে সত্যবতীর জ্যেষ্ঠপুত্র চিত্রাঙ্গদ ভীষ্মের প্রভাব মেনে চলেছেন। বরঞ্চ মহাভারত যা বলেছে, তাতে চিত্রাঙ্গদ অত্যন্ত বলদর্পী এবং অহংকারী রাজা ছিলেন। প্রতিবেশী রাজাদের তিনি আপন ভুজবলে পর্যুদস্ত করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু অনুপযুক্ত রাজার অবিনয় তাঁকে এতটাই গ্রাস করেছিল যে, মানুষকে তিনি মানুষ বলে মনে করতেন না, নিজের সমান তো কাউকেই নয়— মনুষ্যং ন হি মেনে স কঞ্চিৎ সদৃশমাত্মনঃ। এর ফল হয়েছে খুব সরল। একদিন এক গন্ধর্ব-গুন্ডার হাতে তাঁর প্রাণটাই চলে গেল।

চিত্রাঙ্গদের প্রেতকার্য সম্পন্ন হবার পর ভীষ্ম কিশোর বিচিত্রবীর্যকে সিংহাসনে বসালেন এবং এই অপ্রাপ্তযৌবন বালকটিও ভীষ্মের কথামতোই চলতে আরম্ভ করল— বিচিত্রবীর্যঃ স তদা ভীষ্মস্য বচনে স্থিতঃ। এই ঘটনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, কী তাড়াতাড়ি বিচক্ষণা সত্যবতী তাঁর নিজের ভুল শুধরে নিয়েছেন। চিত্রাঙ্গদ রাজা হবার পর সত্যবতী একবারের তরেও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এই উপদেশ দেননি যে— দেখ বাছা! মহামতি ভীষ্ম এই কুরুরাষ্ট্রের সবচেয়ে অভিজ্ঞ পুরুষ, সমস্ত রাজনীতির গূঢ় তত্ত্বগুলি তাঁর জানা। অতএব তুমি তাঁর পরামর্শ অনুসারে রাজ্য চালাও।

এই উপদেশ সত্যবতী দেননি, কারণ, হয়তো একবারের তরেও তাঁর মনে হয়েছিল যে, ভীষ্মের পরামর্শ ছাড়াই তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রটি এমন সুন্দর রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন যে, প্রজারা ধন্য ধন্য করবে। কিন্তু এই ঘটনা ঘটেনি এবং চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পর সত্যবতী অতি সত্বর তাঁর ভুল শুধরে নিয়েছেন এবং কিশোর কুমার বিচিত্রবীর্যকে সোজাসুজি ভীষ্মের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে প্রাজ্ঞ ভীষ্মকে দেখুন। তিনি যেহেতু সত্যবতীর পিতার কাছে কুরুরাষ্ট্রের নায়কত্ব বিসর্জন দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, অতএব তিনিও কখনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের মত খাটাননি এবং কুমার বিচিত্রবীর্যকেও স্বমতে চলতে বাধ্য করেননি। সত্যবতীর অপ্রাপ্তযৌবন পুত্রটিকে ভীষ্ম যে পরামর্শই দিয়ে থাকুন— তা রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, যাই হোক না কেন, তিনি কোনওদিন সত্যবতীকে ভুলেও অতিক্রম করেননি। অর্থাৎ রাষ্ট্রপরিচালনার সমস্ত ব্যাপারে ভীষ্ম যেসব পরামর্শ দিয়ে বিচিত্রবীর্যকে সাহায্য করতেন, তা তিনি রাজমহিষী এবং রাজমাতা সত্যবতীর মত নিয়েই করতেন। মহাভারতে বলা হয়েছে— বিচিত্রবীর্যের হয়ে ভীষ্ম যে কুরুরাজ্য পালন করতেন, তা সত্যবতীর মত অনুসারেই করতেন— পালয়ামাস তদ্‌রাজ্যং সত্যবত্যা মতে স্থিতঃ।

ভীষ্মের তত্ত্বাবধানে কুমার বিচিত্রবীর্যের রাজ্যশাসন চলতে লাগল এবং ভীষ্ম হাল ধরে ছিলেন বলেই তা ভালই চলতে লাগল। বিচিত্রবীর্য বড় হলেন এবং তাঁর বিবাহযোগ্য বয়সও হল। ভীষ্ম যখন ভাবছেন যে, এবার বিচিত্রবীর্যের বিয়ে দেওয়া দরকার, তখনই কাশীরাজের তিন মেয়ে অম্বা, অম্বিকা এবং অম্বালিকার কথা তাঁর কানে এল। স্বয়ম্বরসভায় কাশীরাজের তিন মেয়ের পাণিপ্রার্থী হিসেবে স্বয়ং বিচিত্রবীর্যকে তিনি পাঠানোর কথা একবারও ভাবলেন না। হয়তো কুরুবংশের রাজাদের পর পর মৃত্যু তাঁর মনে যে ভীতি সৃষ্টি করেছিল, সেটাই এই সিদ্ধান্তের কারণ। স্বয়ম্বরসভা থেকে তিনটি মেয়েকে জোর করে তুলে আনতে গেলে অন্যান্য পাণিপ্রার্থী রাজাদের সঙ্গে যে যুদ্ধ হবে, সেই যুদ্ধের অবিশ্বাস্য পরিণতি নবীন যুবক বিচিত্রবীর্যের ওপরে চাপাতে চাননি ভীষ্ম। এব্যাপারে নিশ্চয়ই জননী সত্যবতীর সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল এবং পুত্রস্নেহে তিনিও ভীষ্মের এই পরিকল্পনা মেনে নিয়েছিলেন। কেননা, এটা খুব স্বাভাবিক ছিল না সেকালে যে, কনিষ্ঠ ভাইয়ের বিয়ের জন্য প্রায় পিতৃপ্রতিম এক প্রৌঢ় অথবা বৃদ্ধ কন্যার পাণিপ্রার্থী হয়ে যাচ্ছেন— এই ব্যাপারটা সত্যবতীও সমর্থন করেছেন পুত্রের প্রতি মায়ায়। অতএব সত্যবতীর মত নিয়ে ভীষ্ম একা একটিমাত্র যুদ্ধরথ সহায় করে কাশীরাজ্যে গেলেন তিন কন্যার সন্ধানে।

এত তোড়জোড় করে যে বিবাহের ব্যবস্থা করলেন ভীষ্ম, তার পরিণতি যে ভাল হয়নি, সে তো সকলেরই জানা। কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বার ব্যাপারটা তো ভীষ্মের জীবনে সব অর্থেই গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল, অন্যদিকে বিয়ের পর মাত্র সাত বৎসর বেঁচে থেকে অপুত্রক অবস্থাতেই লোকান্তরিত হয়েছেন তরুণ বিচিত্রবীর্য। ঠিক এই সময়টা থেকে সত্যবতীকে আমরা যে শুধু নতুনভাবেই চিনতে পারি, তাই নয়, সত্যবতী যে কত বড় বিচক্ষণা দীর্ঘদর্শিনী রাজমহিষী হতে পারেন, তা এই সময় থেকে বোঝা যায়। এখন তাঁর স্বামী বেঁচে নেই, সম্পত্তির দায়ভাক্ পাওয়া পুত্রেরাও বেঁচে নেই, শুধু তিনি নিজে বেঁচে আছেন। এখন তো তিনি স্বচ্ছন্দে ভাবতে পারতেন— আর কীসের দায় এই হস্তিনাপুরের রাজতন্ত্র নিয়ে। তাঁর স্বামী-পুত্রের স্বার্থ নেই; চুলোয় যাক সব। ভীষ্ম আছেন হাল ধরবার মানুষ, অতএব যতদিন বেঁচে আছেন, রাজমহিষীর মর্যাদায় অন্ন-বস্ত্র-ঐশ্বর্য এবং আলস্যের চর্চাতেই তাঁর জীবন কেটে যাবে।

কিন্তু এমনটি তিনি ভাবেননি। প্রসিদ্ধ ভরতবংশের রাজবধূ হয়ে এসে স্বামী হারাবার পর থেকেই তিনি দেবব্রত ভীষ্মকে বড় নিপুণভাবে লক্ষ করেছেন। লক্ষ করেছেন তাঁর নিঃস্বার্থ রাজসেবী চরিত্র এবং হয়তো এই মানুষটির সঙ্গে মিশে-মিশেই, অথবা তাঁর পরামর্শ

শুনে চলতে-চলতেই তিনিও বুঝি একদিন হস্তিনাপুরের সিংহাসনের উত্তরাধিকার এবং প্রজাকল্যাণের সম্বন্ধে দায়িত্ব অনুভব করতে আরম্ভ করলেন। অন্যদিকে ভীষ্মের ব্যাপারে তাঁর কিছু অন্তর্যন্ত্রণাও কাজ করেছে। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, প্রধানত তাঁর কারণেই তাঁর স্বামীর এই প্রথমজন্মা পুত্রটি রাজ্যের অধিকার পাননি এবং তাঁরই কারণে ভীষ্মকে একদিন বিবাহ না করে নিজের উত্তরাধিকার স্তব্ধ করে দিতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভীষ্মের মতো এইরকম বিরাট পুরুষের বংশ-সম্ভাবনা এবং রাজ্যের উত্তরাধিকার— দুইই স্তব্ধ করে দিয়ে স্বার্থপরের মতো আপন গর্ভে যাঁদের তিনি জন্ম দিলেন— তাঁরা কি জাতের মানুষ হলেন! প্রখ্যাত ভরত-কুরুদের উত্তরাধিকারী হয়ে তাঁদের একজন হলেন বলদর্পী, যিনি এক গন্ধর্বের সঙ্গে যুদ্ধোন্মত্ত হয়ে নিজের প্রাণ দিলেন বেঘোরে। আর অন্যজন বিচিত্রবীর্য! তিনি হলেন কামুক। অনিয়মিত কামসেবার কারণে তিনি রাজরোগে মৃত্যু বরণ করলেন শেষ পর্যন্ত।

৫

ঠিক এইসময় থেকেই সত্যবতী অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করেছেন। বুঝেছেন— এত দিন যা করেছেন, ঠিক করেননি। যা করেছেন, তাতে ধর্ম নষ্ট হয়েছে, ভীষ্মের কাছে তাঁর মুখ দেখানোর উপায় নেই। অন্যদিকে কুরু-ভরতের বিখ্যাত বংশ এখন অবলুপ্তির পথে এবং তাঁর আপন পিতৃবংশেও যেহেতু তিনি ছাড়া আর কেউ নেই, অতএব সে বংশেও দাশরাজার দুহিতৃ-পুত্র কেউ রইল না বংশে বাতি দেবার জন্য— ধর্মঞ্চ পতিবংশঞ্চ মাতৃবংশঞ্চ ভাবিনী। এই আত্মগ্লানিই তাঁকে কিন্তু এসময় উদার বিস্তীর্ণ এক পৃথিবীতে অবতীর্ণ করে দিল। তিনি বুঝলেন যে, হস্তিনাপুরের রাজনীতিকে তিনিই আপন স্বার্থে ক্লিন্ন করে দিয়েছেন, অতএব এটা তাঁরই দায়িত্ব যাতে কুরু-ভরতের বংশধারা হস্তিনাপুরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শান্তনব ভীষ্মই হলেন একমাত্র ব্যক্তি, যাঁর কাছে তাঁর দায় আছে।

সত্যবতী খুব সরলভাবেই প্রস্তাব দিলেন ভীষ্মকে, যদিও এত সরলভাবে তাঁর ভাবা উচিত ছিল না, অন্তত সত্যবতীর মতো বুদ্ধিদৃপ্তা রমণীর পক্ষে তো আরও উচিত ছিল না। প্রস্তাবটা এতটাই সরল যে, অনেকের মনে হতে পারে যে, এরমধ্যে রীতিমতো একটা ভান আছে, কেননা সত্যবতী খুব ভালভাবে জানতেন যে, ভীষ্মের মতো কঠিনপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁর প্রস্তাবে কখনও রাজি হবেন না। আর ঠিক সেইজন্যই এটাকে ভান বলে মনে হয়। আমি তবু এটাকে ভান বলে মনে করি না। কেননা এ ছাড়া সত্যবতীর কীই বা উপায় ছিল? তাঁর আপন স্বার্থবুদ্ধি যতটুকুই থাকুক, তা বোধহয় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র চিত্রাঙ্গদ মারা যাবার পরেই চলে গেছে। বিচিত্রবীর্য রাজা হবার পর থেকেই তিনি ভীষ্মের ওপর পরম নির্ভরশীল হয়ে ছিলেন এবং কুত্রাপি তিনি ভীষ্মকে অতিক্রমও করেননি। তারপর যখন বিচিত্রবীর্যও মারা গেলেন, তখন তিনি বুঝেছেন যে, ভবিতব্য তথা কর্মফল এমনই এক অভাবিত কল্প, যা আপন ছন্দে চলে। বিবাহের পূর্বে শত শর্ত আরোপ করে স্বামীকে দিয়ে যা তিনি করাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেয়েছিলেন, আজ ভবিতব্য তা হতে দেয়নি। অতএব আপন নিক্ষিপ্ত থুৎকার নিজেই গলাধঃকরণ করে সত্যবতী নিজের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করছেন ভীষ্মের কাছে নতি স্বীকার করে।

সত্যবতী বললেন, স্বর্গত মহারাজ শান্তনুর পিণ্ড, যশ এবং বংশ আজ তোমারই ওপর নির্ভর করছে, ভীষ্ম— ত্বয়ি পিণ্ডশ্চ কীর্তিশ্চ সন্তানশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ। সত্যবতী যা বলবেন, তার ভনিতা করছেন ভীষ্মের কাছে। বললেন, দেখ, পুণ্যকর্ম করলে স্বর্গলাভ যেমন নিশ্চিত, সত্য পরায়ণ হলে আয়ু যেমন নিশ্চিত তেমনই ধর্মও তোমার মধ্যে নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছে— ত্বয়ি ধর্মস্তথা ধ্রুবঃ। ধর্ম, ধর্মের স্থিতি, কৌলিক আচার— সবই তুমি জান এবং বিপন্ন অবস্থায় তোমার জ্ঞান বৃহস্পতি এবং শুক্রাচার্যের মতো। তোমার ওপর আমার অত্যন্ত ভরসা আছে বলেই একটা বিশেষ কাজে তোমায় নিযুক্ত করব— তস্মাৎ সুভৃশমাশ্বস্য ত্বয়ি ধর্মভৃতাং বর। সত্যবতী এবার আসল কথাটা পেড়ে বললেন, দেখ, আমার ছেলে বিচিত্রবীর্য, সে তো তোমারই ভাই বটে; তা সে তো, বাবা অকালে চলে গেল। এখন তাঁর যে দুই মহিষী, তাদের রূপ-যৌবন সব আছে, কিন্তু স্বামীটি তাদের চলে গেল। তাদের কোলে একটি ছেলেও হল না। তাই আমি বলছিলাম বাছা, তুমি এই দুই কুলবধূর গর্ভে পুত্রের জন্ম দিয়ে এই বিখ্যাত বংশধারা রক্ষা কর— তয়োরুৎপাদয়াপত্যং সন্তানায় কুলস্য নঃ। এই নিয়োগকর্মে যে অনুমতি প্রয়োজন হয়, সে অনুমতি আমি দিচ্ছি তোমাকে এ বাড়ির গুরুজন হিসেবে। আর এই প্রস্তাবে তুমি যদি একান্তই রাজি না হও, তা হলে তুমি নিজেই রাজ্যে অভিষিক্ত হও, ধর্মানুসারে বিবাহ কর এবং কোনও ভাবেই যেন পিতা-পিতামহদের কুল মজিয়ে দিয়ো না— দারাংশ্চ কুরু ধর্মেণ মা নিমজ্জীঃ পিতামহান্।

সত্যবতী ভীষ্মের কাছে যে অন্যায় করেছিলেন, সে নিজের স্বার্থেই হোক অথবা পিতার চাপে, সেই অন্যায় তিনি স্খালন করার চেষ্টা করলেন যথাসাধ্য যথামতি। ভীষ্ম অবশ্যই তাঁর কথা মানতে পারলেন না। তবে অবশ্যই তিনি সত্যবতীর দুশ্চিন্তাটুকু শিরোধার্য করে নিলেন। তাই বলে তাঁর পূর্বের স্কার যতটুকু ছিল, সেটুকু থেকে তিনি মুক্তি দিলেন না সত্যবতীকে। মহাকাব্যের প্রৌঢ় নায়ক বলে কথা। তিনি বিপৎ-ত্রাণ করবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তাই বলে যিনি আত্মদোষে কুরুবংশের সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিটিকে রাজ্যের উত্তরাধিকার তথা বংশকর্তার ভূমিকা থেকে বঞ্চিত করেছিলেন, তাঁর প্রতি একটুও সত্য উচ্চারণ করে বিব্রত না করাটা মহাকাব্যের তরিকা নয়। ভীষ্ম বললেন— তুমি তো বেশ ভালই জান যে, কেন আমি সন্তান উৎপাদনে পুনরায় ব্রতী হতে পারি না। তোমার বিবাহের শর্ত নিয়েও যে সব ঘটনা ঘটেছিল, তাও তুমি ভালই জান— জানাসি চ যথা বৃত্তং শুল্কহেতোস্তদন্তরে। কাজেই আমি আমার প্রতিজ্ঞা থেকে চ্যুত হতে পারি না, কোনও অবস্থাতেই না— ন ত্বহং সত্যমুৎস্রষ্টুং ব্যবসেয়ং কথঞ্চন।

ভীষ্ম অবশ্য সত্যবতীর দুশ্চিন্তাটুকু 'শেয়ার' করছেন। সত্যবতী আত্মসমর্পণ করে বলেছিলেন— আমাদের এই বিপদ, এই কুরুকুল এখন উৎসন্ন হয়ে যেতে বসেছে। হ্যাঁ, আমি জানি, তোমার প্রতিজ্ঞার কথাও জানি এবং আমারই জন্য যে প্রতিজ্ঞা উচ্চারিত হয়েছিল, তাও জানি— জানামি চৈব সত্যং তন্ মমার্থে যচ্চ ভাষিতম্। কিন্তু অন্তত

আপদ্ধর্মের কথাও তো মনে রাখবে। অন্তত সেই দিকে তাকিয়ে আমাদের এই বিখ্যাত ভরতবংশের কুলতন্তুগুলি যাতে রক্ষা পায়, যাতে ধর্ম রক্ষা পায় এবং যাতে আমাদের আত্মীয়-স্বজন সকলে খুশি হয়, তুমি সেই ব্যবস্থা কর, ভীষ্ম— সুহৃদশ্চ প্রহৃষ্যেরংস্তথা কুরু পরন্তপ। মহামতি ভীষ্ম এই পারিবারিক বিপন্নতার মধ্যে অবশ্যই চুপ করে থাকলেন না। কিন্তু সত্যবতী যে ভীষ্মকে পুত্রোৎপাদনে নিযুক্ত করে আপদ্ধর্ম পালন করতে বলেছেন, তার উত্তরে ভীষ্ম বললেন— তুমি যেমন আমাকে ধর্মের কথা শোনালে, তেমনই আমিও তোমাকে ধর্মের কথাই শোনাচ্ছি, মহারানি! তুমিও ধর্মের দিকে তাকাও, এইভাবে আমাদের সবার সর্বনাশ কোরো না— রাজ্ঞি ধর্মানবেক্ষস্ব মা নঃ সর্বান্ ব্যনীনশঃ। তবে হ্যাঁ, মহারাজ শান্তনুর সন্তান যাতে এই পৃথিবীতে অক্ষয় হয়ে থাকে, সে চিন্তা তোমার মতো আমিও করছি। নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বক্ষেত্রে যা হয়, তুমি তাই কর, তাই আমাদের সনাতন নিয়ম— তত্তে ধর্মং প্রবক্ষ্যামি ক্ষাত্রং রাজ্ঞি সনাতনম্। তুমি আপদ্ধর্মকুশল প্রাজ্ঞ পুরোহিতদের সঙ্গে আলোচনা করে সমুচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। আর এত কিছু যদি না করতে চাও, তবে একজন গুণবান ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করে বিচিত্রবীর্যের পত্নীদের গর্ভে পুত্র-জন্মের ব্যবস্থা কর। তার জন্য যদি রাজকোষ থেকে অর্থদক্ষিণা দিতে হয় সেই গুণবান ব্রাহ্মণকে, তাতেও আপত্তির কিছু দেখি না— ব্রাহ্মণো গুণবান্ কশ্চিদ্ ধনেনোপনিমন্ত্র্যতাম্।

ভীষ্মের কথা থেকে বোঝা যায় যে, সেকালের দিনের নিয়োগকর্মে গুণবান ব্যক্তিকে নিয়ে বংশধারা রক্ষা করার জন্য কখনও অর্থব্যয়ও করতে হত। আরও পরিষ্কার করে বলা যায় যে, সমাজশ্রেষ্ঠ সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ আপন অন্তর্গত তেজ অন্যত্র আধান করার জন্য অর্থমূল্য নিতেন কখনও, আবার কখনও নিতেনও না— এমন উদাহরণও ভূরি ভূরি আছে। হতে পারে— ব্রাহ্মণ মুনি-ঋষিদের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, অতএব তাঁরা আপন অমোঘ শক্তির ঋণমূল্য নিতেন। আবার এও হতে পারে— সত্যবতীর কথায় ভীষ্ম রীতিমতো বিপন্ন বোধ করছেন এবং এই পরম দায় থেকে বাঁচার জন্য এবং নিজেকে সত্যভ্রষ্টতা থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি যেন তেন প্রকারেণ অর্থের বিনিময়েও দায়মুক্ত হতে চাইছেন আপাতত।

পরম বুদ্ধিমতী সত্যবতী বুঝলেন যে, ভীষ্মকে জোর করে কোনও লাভ নেই। যিনি তাঁর যৌবন-সন্ধিতে কঠিন প্রতিজ্ঞা করে ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে ব্রহ্মচারীর ব্রত গ্রহণ করেছেন, হেলায় রাজ্য বিসর্জন দিয়েছেন, তিনি এই বয়সে এসে যে আর ব্রতভঙ্গ করবেন না— সেটা খুব ভাল করেই জানেন সত্যবতী। আবার ভীষ্মের কথামত একজন গুণবান ব্রাহ্মণকে যে নিমন্ত্রণ করে আনবেন— এ ভাবনায় তিনি সায় দিতে পারলেন না, অথচ মানসিকভাবে এইখানেই তাঁর সায় আছে— যা তিনি হঠাৎই ব্যক্ত করতে পারলেন না। আসলে ভীষ্ম যে গুণবান ব্রাহ্মণের কথা বলছেন, তার চেয়েও গুণবত্তর ঋষিকল্প ব্রাহ্মণ তাঁর নিজেরই সম্বন্ধে জন্ম নিয়েছে। কিন্তু সে কথা তেমন হঠাৎ করে বলা যায় না। অথচ ভীষ্মকে আর সেকথা না বললেই নয়। কারণ মহারাজ শান্তনুর স্ত্রী-সম্বন্ধে তিনি এখন কুরুবংশের রাজমাতা বটে, কিন্তু শান্তনুর পুত্র-সম্বন্ধে তথা আপন ত্যাগ এবং ব্যক্তিত্বের মর্যাদায় ভীষ্ম এখনও এই কুরুবংশের অভিভাবক।

ভীষ্মকে বলবার সময় সত্যবতীর মতো অসাধারণ ব্যক্তিত্বময়ী রমণীও বেশ অপ্রতিভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোধ করলেন। আসলে কথাটাই এমন যে, এই অপ্রতিভ ভাব কোনও অস্বাভাবিকও নয়। কথা বলতে গিয়ে সত্যবতী সবিশেষ লজ্জা পেলেন, কথার অন্তরে তাঁর বাক্য স্খলিত হল মাঝে মাঝে— ততঃ সত্যবতী ভীষ্মং বাচা সংসজ্জমানয়া। কিন্তু নিজের জীবনের গভীর গোপন কথাগুলি যেহেতু বলতেই হচ্ছে, অতএব একটা অপ্রতিভ হাসি তাঁর মুখে লেগেই রইল। সত্যবতী বললেন, তোমার প্রতিজ্ঞার বিষয়ে যা তুমি বললে সব সত্য। তবে তোমার ওপরে আমার অগাধ বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসেই এই বংশের কুলতন্তু রক্ষার জন্য তোমাকে একটা কথা এখন না বললেই নয়। কারণ তুমিই যেমন এই মহান কুলে ধর্মের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ, তেমনই তুমিই সত্যের স্বরূপ, সবচেয়ে বড় কথা, তুমিই এই বংশের প্রধান অবলম্বন— ত্বমেব নঃ কুলে ধর্মস্ত্বং সত্যং ত্বং পরা গতিঃ। তোমাকে সব কথা খুলে বলছি, তা শুনে তোমার যা মনে হয় তাই কর।

সত্যবতী নিজের কন্যা-জীবনের কাহিনি বলতে আরম্ভ করলেন সলজ্জে। বলতে আরম্ভ করলেন সেই আকুল সন্ধ্যার কথা, যখন দাশরাজার অনুপস্থিতিতে তরী বাইবার সময় আকস্মিক এসে পড়েছিলেন মহর্ষি পরাশর। কীভাবে আপন তেজপ্রভাবে মহর্ষি তাঁকে বশীভূত করেছিলেন এবং কীভাবে তপস্যার প্রভাবে নিজের চারিদিকে কুয়াশা ঘনিয়ে নিয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গত হয়েছিলেন পরাশর— সব খুলে বললেন সত্যবতী। মৎস্যগন্ধা থেকে তাঁর পদ্মগন্ধায় রূপান্তরিত হওয়ার সামান্য ঘটনাটুকুও যেমন বাদ দিলেন না সত্যবতী, তেমনই শেষে জানালেন সেই বিরাট অভ্যুদয়ের কথা— দ্বৈপায়ন ব্যাসের জন্ম-কথা। দ্বৈপায়ন ব্যাস যে তাঁরই কন্যাগর্ভের সন্তান, সে কথা বলতে বলতে গৌরবে সত্যবতীর বুক ভরে উঠল। তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, আমার সেই কন্যাবস্থার পুত্রটি এখন বিখ্যাত ঋষি হয়েছে। চারটি বেদ বিভাগ করে আমার সেই দ্বীপজন্মা দ্বৈপায়ন এখন ব্যাস নামে খ্যাত হয়েছে— লোকে ব্যাসত্বমাপেদে... তপসা ভগবান্ ঋষিঃ। মহর্ষি পরাশরের তপস্যায় ব্যাস আমার সদ্যোগর্ভ থেকে মুক্ত হয়েই পিতার সঙ্গে তপস্যা করতে চলে গিয়েছিল— সদ্যোৎপন্নঃ স তু মহান্ সহ পিত্রা ততো গতঃ।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের জন্ম-কথা জানিয়ে সত্যবতী এবার প্রকৃত প্রস্তাবে ফিরে এলেন। ভীষ্ম গুণবান এক ব্রাহ্মণকে নিয়োগ করার কথা বলেছিলেন পুত্রোৎপত্তির জন্য। সেই সূত্র ধরেই ব্যাসের নানান গুণপনার কথা বললেন সত্যবতী, তার পরেই বললেন— এই বংশের গুরুজন হিসেবে তুমি এবং আমি যদি সেই দ্বৈপায়ন ব্যাসকে এই বংশের পুত্রোৎপাদনে নিয়োগ করি, তা হলে অবশ্যই বিচিত্রবীর্যের পত্নীদের গর্ভে আমরা অভীষ্ট পুত্র লাভ করব— ভ্রাতুঃ ক্ষেত্রেষু কল্যাণমপত্যং জনয়িষ্যতি। ভীষ্ম যদি এমন প্রশ্ন করেন যে, তাঁকে ডাকলেই তিনি আসবেন কেন? যিনি জন্মমুহূর্তটি অতিবাহিত করেই তপস্যায় নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁকে ডাকলেই তিনি রাজবংশের পুত্রোৎপাদনে স্বীকৃত হবেন কেন? এই প্রশ্নের আশঙ্কা করেই যেন সত্যবতী আগে থেকেই বলে উঠলেন— আমার সেই ছেলে তপস্যায় যাবার আগে আমায় বলে গিয়েছিল— মা! কোনও কর্তব্য-কর্মে আমার প্রয়োজন হলে আমাকে নির্দ্বিধায় স্মরণ করো, আমি চলে আসব তোমার কাছে। এবারে তুমি বল, ভীষ্ম! তুমি যদি অনুমতি দাও তবে আমি সেই তপস্বী ঋষি পুত্রকে স্মরণ করতে পারি— তং স্মরিষ্যে

মহাবাহো যদি ভীষ্ম ত্বমিচ্ছমি— এবং তোমার অনুমতি পেলে সে এই পুত্রোৎপত্তি-কর্মে আপত্তি করবে বলে মনে হয় না।

প্রাথমিকভাবে ভীষ্ম একটু হতচকিতই হয়ে গেলেন। নিজের সত্যচ্যুত ভয়ে যিনি একটি গুণবান ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করার যুক্তি দেখিয়ে দায়মুক্ত হতে চেয়েছিলেন সেই তিনি এমন আকস্মিকভাবে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের নাম শুনবেন এবং তাও শুনবেন সত্যবতীর মুখেই একেবারে তাঁর একান্ত পুত্রসম্বন্ধে— এটা ভীষ্ম ভাবতেই পারেননি। ব্যাসের নাম তখন বিখ্যাত হয়ে গেছে। বেদবিভাগকারী দ্বৈপায়ন ব্যাসের নাম শোনা মাত্রই ভীষ্মের মাথা নত হল শ্রদ্ধায়, হাত দুটি অঞ্জলিবদ্ধ হল বেদব্যাসের নাম-মাহাত্ম্যে— মহর্ষেঃ কীর্তনে তস্য ভীষ্মঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ। তিনি সত্যবতীকে বললেন— যে কোনও কাজের আরম্ভেই সেই কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধর্ম-অর্থ-কামের ফলটুকু আগে বুঝে নেওয়া দরকার। তুমি ব্যাসের কথা উচ্চারণ করে এই বংশের হিত, মঙ্গল এবং ন্যায়ের কথাই বলেছ। তুমি যা বলেছ, তা আমার অত্যন্ত পছন্দের কথা, আমার অত্যন্ত অভিপ্রেত কথা— উক্তং ভবত্যা যচ্ছ্রেয়স্তন্মহ্যং রোচতে ভৃশম্।

কোনও কোনও অবোধজনে এমন বলে থাকেন যে, বিধবা সত্যবতী আপন রমণীজনোচিত মোহিনী মায়ায় ভীষ্মকে বিপর্যস্ত করে অসাধারণ কৌশলে আপন কানীন পুত্রের ধারা ভরতবংশের কুলতন্তুর মধ্যে প্রতিস্থাপিত করেছেন। আমাদের বক্তব্য— এমন অশ্রদ্ধেয় সংবাদ অন্তত ব্যাসলিখিত মূল মহাভারতে নেই। এ হল এখনকার দিনের ছেঁদো ঔপন্যাসিকের কল্পনাবিলাস। বস্তুত মহাকাব্যের পরিসরে এসব রমণীয় কৌশল চলে না। এখানে যা কিছু হয়, খুব সোজসুজি হয়। নিজের সন্তানদের ব্যাপারে সত্যবতীর মনে যদি প্রাথমিকভাবে কিছু স্বার্থ কাজ করেও থাকে, তবু বিচিত্রবীর্যের সময় থেকেই সে স্বার্থের ছিটেফোঁটাও কিছু ছিল না। তখন থেকেই ভীষ্ম সব কিছুই দেখা-শোনা করেছেন, এমনকী তাঁর বিয়েও দিয়েছেন তিনিই। আর বিচিত্রবীর্য মারা যাবার পর থেকে সত্যবতী সব ব্যাপারেই নির্ভর করেছেন ভীষ্মের ওপর। বিশেষত উপরি উক্ত নিয়োগ কর্মের ব্যাপারে সত্যবতী তো ভীষ্মকেই প্রথম অনুরোধ করেছিলেন। যদি বলেন— ওসব ঢঙের কথা, সত্যবতী জানতেন; ভীষ্ম রাজি হবে না। সেইজন্যই তিনি বেশি বেশি করে অনুরোধ করেছেন ভীষ্মকে।

আমরা আবারও বলব, এই ধরনের বিচ্ছিরি তঞ্চকতাও মহাকাব্যে চলে না। সত্যবতী কোনওদিন কোনও কিছু ভীষ্মকে লুকোননি, কোনওদিন কোনও ঢঙও করেননি ভীষ্মের সঙ্গে। নিয়োগ-কর্মের ক্ষেত্রেও নিজের কানীন পুত্রের কথা প্রস্তাব করার সময় সত্যবতী সর্বান্তঃকরণে ভীষ্মের ওপরেই নির্ভর করেছেন। আর একথা তো সত্যিই যে, হাজারো গুণবান ব্রাহ্মণের চেয়ে দ্বৈপায়ন বেদব্যাস অনেক বড় এক সহৃদয় ঋষি এবং যেহেতু তিনি সত্যবতীরই আত্মজ পুত্র, অতএব তাঁকে অনুমোদন দেওয়াটা তো ভীষ্মের পক্ষে অতি-স্বাভাবিক। এমন অনুকূল সম্বন্ধের মধ্যে সত্যবতীর মায়া-বিস্তারের কোনও প্রয়োজন ছিল না এবং তাঁর যুক্তিটাও ভীষ্মের কাছে পরম অভিপ্রেত ছিল। ভীষ্ম যখন সাগ্রহে সত্যবতীর প্রস্তাব স্বীকার করে নিলেন, সত্যবতী তখন নিশ্চিন্তে স্মরণ করলেন দ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে— কৃষ্ণদ্বৈপায়নং কালী চিন্তয়ামাস বৈ মুনিম্।

বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর থেকে ভীষ্মের সঙ্গে সত্যবতীর যে কথোপকথন হল, এই পর্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যবতীর হৃদয়টুকুও একটু বিচার করে দেখলে হয়। মহাকাব্যের বীর্য-শরীরের বিরাট পরিসরে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হৃদয়-ভাঙা দুঃখগুলি আপাত দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না, আবার পড়েও। সত্যবতী যত ব্যক্তিত্বময়ীই হোন, যতই হোন তিনি শক্তিমতী রাজমাতা, আপন প্রেমে অধীর স্বামী হারানোর পর তিনি যখন পর্যায় ক্রমে দুটি পুত্রই হারালেন, তখন কি রাজরানি হৃদয়ও উদ্বেলিত হয়ে ওঠেনি! পুত্র হারানোর ব্যথা— সে তো বাঙালির মনেও যেমন, রাজমাতার হৃদয়েও তেমনই। কাজেই আমাদের ধারণা, রানিদের গর্ভে প্রখ্যাত ভরতবংশের পুত্রধারা বাহিত করার জন্য যতখানি, তার থেকে অনেক বেশি করে এই কথাটা বলব যে সত্যবতীর হৃদয় তখন পুত্রমুখ দেখার জন্য আকুল হয়ে ছিল। তাঁর এই প্রথমজ পুত্রের কথা আর তো কেউ জানে না, শুধু তিনিই নিজে জানেন। কানীন পুত্রের কোনও সংবাদ না দিয়ে এত দিন তিনি শান্তনুর ঘর করেছেন, রাজবাড়িতে দুটি পুত্র তাঁর জন্মেছিল। কিন্তু আজ যখন রাজবাড়ির স্বামী-পুত্র সব তিনি হারিয়েছেন, তখন তাঁর মনে সেই হাহাকার সৃষ্টি হল, যা এক মৃতবৎসা জননীর মনে হয়। অথচ এখনও তাঁর প্রথমজ পুত্রটি বেঁচে আছে— এই পুত্রের সঙ্গে যদি জননী-হৃদয়ের বাৎসল্য-যোগটুকু রাখতে হয়, তবে আর তাঁর কথা পরিষ্কার করে না বললে উপায় ছিল না। ঠিক এই কারণেই ভীষ্ম যখন ভরতবংশের সন্তানসৃষ্টির জন্য বাইরে থেকে ব্রাহ্মণ আনার প্রস্তাব দিয়েছেন, ঠিক তখনই সত্যবতী তাঁর প্রথমজন্মা পুত্রটির সংবাদ দিয়েছেন আন্তরিকভাবে। এতে একদিকে যেমন ভরতবংশের ধারা রক্ষিত হওয়ার কথা তেমনই সত্যবতীর পুত্রহারা শূন্য হৃদয়টিও শান্ত হবার কথা।

মহাকাব্যের অলৌকিক শব্দৈশ্বর্য বজায় রেখেই মহাভারত বলেছে— জননী সত্যবতীর স্মরণ-অনুধ্যান যখন তপস্বী পুত্র ব্যাসের হৃদয়ে পৌঁছল, তখন তিনি শিষ্যদের বেদ পড়াচ্ছিলেন। ব্যাস নাকি জননীর স্মরণমাত্রেই তাঁর অজ্ঞাতসারে এসে উপস্থিত হলেন সত্যবতীর সামনে— প্রাদুর্বভূবাবিদিতঃ ক্ষণেন কুরুনন্দন। আমাদের লৌকিক বুদ্ধি বলে যে, সত্যবতী হয়তো ব্যাসকে স্মরণ করে তাঁকে আনবার জন্য দূত পাঠিয়েছিলেন বদরিকাশ্রমে এবং দূত যখন তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিল, তখন ব্যাস হয়তো বেদ শিক্ষা দিচ্ছিলেন শিষ্যদের। জননীর আহ্বান শোনামাত্র ব্যাস আর এক মুহূর্তও দেরি করেননি। তিনি কথা দিয়েছিলেন জননীকে যে, স্মরণমাত্রেই তিনি উপস্থিত হবেন মায়ের কাছে। অতএব কালবিলম্ব না করে তিনি যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থাতেই তিনি উপস্থিত হলেন সত্যবতীর কাছে। তাঁর অজ্ঞাতসারে তাঁকে চমকিত করেই তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন সত্যবতীর হৃদয়ছেঁড়া প্রথমজ পুত্র দ্বৈপায়ন ব্যাস।

৬

পুত্র দ্বৈপায়নকে দেখে একেবারে আকুল হয়ে উঠলেন সত্যবতী। 'কোথায় আসন, কেমন আছিস, কতকাল দেখিনি'— ইত্যাদি নানা কুশল-প্রশ্ন সমাপনের সঙ্গে সত্যবতী প্রগাঢ় স্নেহালিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন পুত্রকে। সেই কতকাল আগে তাঁর সেই প্রথমজ পুত্রটি— যে

তাঁকে প্রথম মা বলে ডেকেছিল— সেই পুত্রটিকে দেখে সত্যবতীর জননী-হৃদয় একেবারে আকুলি-বিকুলি করে উঠল। কবেই সে পুত্র তাঁকে ছেড়ে— বলা উচিত তাঁকে কন্যা-কলঙ্কের লজ্জা থেকে বাঁচিয়ে পিতার সঙ্গে চলে গিয়েছিল তপস্যা করতে। আজ সে মৃতবৎসা জননীর ক্রোড়ে ফিরে এসেছে। পুত্রের ত্বক-স্পর্শে সত্যবতীর এতাবৎ-স্তব্ধ স্তনদুগ্ধও যেন উদ্গলিত হল— পরিষ্বজ্য চ বাহুভ্যাং প্রস্রবৈরভিষিচ্য চ। তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল আনন্দে।

দ্বৈপায়ন ব্যাসকে এমন ছোট্ট শিশুটির মতো আদর-আপ্যায়ন করলেও তপস্যার শক্তিতে যিনি দুঃখ-সুখ, স্নেহ-মায়া সব জয় করেছেন, সেই ব্যাস কিন্তু জননীর শতধার স্নেহে একেবারে আপ্লুত হয়ে গেলেন না। প্রাজ্ঞ নিষ্কাম তপস্বীর মতো ব্যাস তাঁর কমণ্ডলু থেকে সর্বতীর্থের পুণ্যসলিল ছিটিয়ে দিলেন স্নেহকাতরা জননীর মাথায়। তারপর প্রকৃত কার্যে ফিরে এলেন সঙ্গে সঙ্গে। বললেন, আপনি যা চাইছেন, আমি তাই করতে এসেছি। অতএব বলুন, কী প্রিয়কার্য করতে হবে আপনার— শাধি মাং ধর্মতত্ত্বজ্ঞে করবাণি প্রিয়ং তব। সত্যবতী পুত্রমুখ দর্শনে যতই আপ্লুত হয়ে থাকুন, তিনিও কার্যাকার্য ভুলে যাননি। তিনি রাজবংশের প্রথা অনুসারে রাজপুরোহিতকে ডেকে পাঠালেন যথাবিধানে তপস্বী মুনিকে বরণ করে নেবার জন্য। রাজপুরোহিত প্রথা অনুসারে দ্বৈপায়ন ব্যাসকে অভ্যর্থনা জানানোর পর তিনিও বিধি অনুসারেই মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক অভ্যর্থনা গ্রহণ করলেন।

বেদব্যাস সুখাসনে উপবিষ্ট হলে সত্যবতী গভীর দৃষ্টিতে পুত্রের অন্তরের দিকে চেয়ে তাঁকে অসাধারণ একটি সম্বোধন করতে বললেন, কবি আমার! অর্থাৎ তুমি সবটাই বোঝ, যেমন একজন প্রকৃষ্ট কবি বোঝেন— ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান। সত্যবতী বললেন, দেখ বাছা! পুত্রেরা পিতা এবং মাতা— দু'জনেরই সহায় হয়ে জন্মায়। ফলত পিতা যেমন পুত্রের গুরুজন, তেমনই মাতাও পুত্রের কাছে একইরকম গুরুজন। সত্যবতী এবার ব্যাসের সঙ্গে হস্তিনাপুরের রাজবাড়ির একটা আত্মীয়-সম্বন্ধ দেখানোর চেষ্টা করলেন এবং তা করলেন এইজন্যই যাতে ব্যাস এটা বোঝেন যে, এই রাজবাড়ির সংকটে তাঁরও কিছু দায়িত্ব আছে।

সত্যবতী বললেন, মহর্ষি পরাশর, তোমার পিতা শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারেই আমার গর্ভে তোমাকে সৃষ্টি করেছিলেন। সেই দৃষ্টিতে দেখতে গেলে তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র— বিধানবিহিতঃ স ত্বং যথা মে প্রথমঃ সুতঃ। আবার আমার বৈবাহিক সূত্রে বিচিত্রবীর্য আমার কনিষ্ঠ পুত্র। এবারে একটা জিনিস বোঝ— একই পিতা বলে ভীষ্ম যেমন বিচিত্রবীর্যের ভাই, তেমনই একই মাতার সন্তান বলে তুমিও বিচিত্রবীর্যের ভাই— যথা বৈ পিতৃতো ভীষ্মস্তথা ত্বমপি মাতৃতঃ। এখন সমস্যা হয়েছে— এই বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভীষ্ম বিবাহও করবেন না, পুত্রও উৎপাদন করবেন না। এ ব্যাপারে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ফলত এখানে এই হস্তিনাপুরের প্রজাদের দিকে তাকিয়ে আমি তোমার কাছে একটা প্রস্তাব করছি।

প্রস্তাব করার আগে সত্যবতী বোঝাতে চাইলেন যে, তিনি কোনও স্বার্থচিন্তায় কথা বলছেন না। তিনি যা বলছেন, তার পিছনে হস্তিনাপুরের রাজ্যের স্বার্থই প্রধান— অনুক্রোশাচ্চ ভূতানাং সর্বেষাং রক্ষণায় চ— তার সঙ্গে জুড়ে আছে মৃত বিচিত্রবীর্যের উত্তরাধিকারের মঙ্গল এবং সর্বোপরি আছে মহামতি ভীষ্মের সমর্থন। সত্যবতী এবার প্রকৃত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রস্তাবে এসে বললেন, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের দুটি স্ত্রী আছে, দু'জনেই যথেষ্ট রূপবতী এবং যৌবনবতী, কিন্তু তাদের কোলে কোনও পুত্র নেই। তারা দু'জনেই ধর্মানুসারে পুত্র কামনা করে। তাই বলছিলাম— বাছা! তুমি যদি তোমার এই দুই ভ্রাতৃবধূর গর্ভে পুত্র উৎপাদন কর তা হলে এই বংশের এবং এই রাজ্যের সমূহ মঙ্গল— তয়োরুৎপাদয়াপত্যং সমর্থো হ্যসি পুত্রক।

ব্যাস সত্যবতীর কথা ধৈর্য ধরে শুনলেন এবং তাঁর ভূয়োদর্শিতার প্রশংসা করে বললেন, মা! তুমি তো ধর্মের সমস্ত তত্ত্বই জানো। ইহজন্মের পক্ষে যা মঙ্গল এবং পরজন্মের পক্ষেও যা মঙ্গল, তা সবই তুমি জান। কাজেই তোমার আদেশে ধর্মোদ্দেশে যেটুকু এই রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য করা দরকার, তা অবশ্যই করব আমি— তস্মাদহং ত্বন্নিয়োগাদ্ধর্মং উদ্দিশ্য কারণম্। আমি বিচিত্রবীর্যের বংশধারা রক্ষা করার জন্য দুই রানির গর্ভে নিশ্চয়ই পুত্র উৎপাদন করব। কিন্তু তার জন্য আমারও একটা কথা মানতে হবে। তোমার দুই মহারানি পুত্রবধূ এক বৎসর ধরে যথানিয়মে ব্রত পালন করে শুদ্ধ হোন, তবেই আমার সঙ্গে মিলন সম্ভব হবে। নইলে ব্রতাচরণহীন ত্যাগ-বৈরাগ্যহীন কোনও রমণীর সঙ্গে আমার দৈহিক সংশ্লেষ সম্ভব হতে পারে না— ন হি মামব্রতোপেতা উপেয়াৎ কাচিদঙ্গনা।

সত্যবতী প্রমাদ গণলেন— আরও এক বৎসর! এমনিতেই রাজাহীন অবস্থায় অনেক কাল পড়ে আছে হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসন। তবু ভীষ্ম কোনও মতে সামলাচ্ছেন রাজ্যভার। কিন্তু আর কত কাল! এই রাষ্ট্রের রাজমহিষী হিসেবে সত্যবতী সবিশেষ উপলব্ধি করেছেন যে, রাজা না হলে আর চলবে না। পুত্র ব্যাসকে তিনি বললেন, এক বছর অপেক্ষা করা যাবে না, বাছা! রানিরা যাতে এখনই গর্ভলাভ করতে পারেন, তুমি সেই ভাবনাই ভাব বাছা— সদ্যো যথা প্রপদ্যোতে দেব্যৌ গর্ভং তথা কুরু। তুমি তো জানো যে, এই অপরাজক রাজ্য রক্ষা করার ক্ষমতা আর আমাদের নেই। অতএব তুমি আর দেরি কোরো না। তুমি এসেছ যখন এইবারেই তুমি আমার সংকল্প সিদ্ধ করো। তুমি রানিদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করো, ভীষ্ম সেই সন্তানদের বড় করে তুলবেন— তস্মাদ্ গর্ভং সমাধৎস্ব ভীষ্মঃ সংবর্ধয়িষ্যতি।

ব্যাস মায়ের কথায় রাজি হলেন বটে, কিন্তু পুরো রাজি হলেন না। বললেন, এমন অকালে ব্রতহীন অবস্থায় যদি আমাকে এখনই তোমাদের রানিদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করতে হয়, তবে আমার বিকৃত রূপ সহ্য করতে হবে রানিদের। বহুকাল তপশ্চরণ করে আমার শরীরে যে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়েছে, সেই দুর্গন্ধ সহ্য করতে হবে তোমার রানিদের। আমার এই বিকৃত রূপ, এই বিকৃত বেশও তাঁদের সহ্য করতে হবে। আমি মনে করি, অন্তত এইটাই তাঁদের ব্রত হোক— বিরূপতাং মে সহতাং তয়োরেতৎ পরং ব্রতম্। আসলে ব্যাস এই শর্তগুলি কেন দিচ্ছেন, আমরা তা জানি। নিয়োগ প্রথায় একটি স্ত্রী পুরুষের মিলনে কোনও পক্ষেরই যাতে শারীরিক, মানসিক কোনও আসক্তি না জন্মায়, যেন সন্তান লাভের মতো প্রয়োজনীয় কর্মটি একটি যান্ত্রিকতার মধ্য দিয়েই শেষ হয়— এই উদ্দেশ্যেই ব্যাসের ওই শর্ত, যুক্তি, ভাবনা।

ব্যাস রাজি হবার পর সত্যবতীর দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। বিচিত্রবীর্যের দুই বধূ পুত্রলাভের ব্যাপারে যথেষ্টই উন্মুখ ছিলেন, হস্তিনাপুরের রাজপরিবারের পক্ষ থেকে একটি

নিয়োগের ঘটনাও যে ঘটবে— এটাও বুঝি তাঁরা জানতেন। অর্থাৎ তাঁদের মানসিক প্রস্তুতি একটা ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এত তাড়াতাড়ি এটা ঘটবে এবং সেই নিয়োগের নায়ক হবেন একজন ঋষি, তাও কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের মতো এক ঋষি, এটা বুঝি তাঁদের ধারণার বাইরে ছিল। সত্যবতী অন্তঃপুরের একান্তে মিলিত হলেন বধূদের সঙ্গে এবং সবিনয়ে নিজের ভাগ্যকে দোষ দিয়ে তাঁদের বললেন, দেখ, আমারই কপালে এই প্রখ্যাত ভরত বংশ উচ্ছিন্ন হয়ে যেতে বসেছে— ভরতানাং সমুচ্ছেদো ব্যক্তং মদ্ভাগ্যসংক্ষয়াৎ। এখন ধর্মের দিকে তাকিয়েই তোমাদের একটা কথা বলছি শোনো। সত্যবতী নিজের দুর্ভাগ্যের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তার মধ্যে তাঁর দুই পুত্রের ইঙ্গিত যেমন ছিল, তেমনই তাঁরই কারণে ভীষ্মও যে রাজা হতে পারেননি— এই স্বীকারোক্তিটুকুও ছিল। হয়তো সেই কারণেই দুই বধূর কাছে নিয়োগের পরিকল্পনা নিয়ে যখন কথা বললেন সত্যবতী, তখন তিনি নিজের কথা না বলে ভীষ্মকেই প্রাধান্য দিয়ে বললেন, আমাকে এবং নিজের পিতৃকুলের সবাইকে দুঃখী দেখে মহামতি ভীষ্ম আমাকে নিয়োগপ্রথা অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এখন এ-ব্যাপারে তোমরাই তো প্রধান সহায় আমাদের। নিজেদের গর্ভে দেবতুল্য পুত্র উৎপাদন করে এই ভরত বংশের ছিন্ন তন্তুর সন্ধিবন্ধন করতে তোমরাই পার— নষ্টঞ্চ ভরতং বংশং পুনরেব সমুদ্ধর।

সত্যবতী প্রখর বুদ্ধিমতী। প্রথমেই তিনি বললেন না— কে বধূদের সাময়িক নায়ক হবেন। শুধু নিয়োগ-মিলনের জন্য বধূদের সম্মতি বুঝেই তিনি ব্রাহ্মণ-ভোজন, দান-ধ্যান শুরু করে দিলেন। গুরু-ব্রাহ্মণ-অতিথিসেবা শেষ হলে সত্যবতী ঋতুস্নাতা পুত্রবধূ অম্বিকার ঘরে গিয়ে বললেন, তোমার একটি দেবর আছে। সে তোমার সঙ্গে মিলনের উদ্দেশে রজনীর দ্বিপ্রহরে তোমার ঘরে আসবে। তুমি তার জন্য প্রতীক্ষা করে থেকো— অপ্রমত্তা প্রতীক্ষ্যৈনং নিশীথে হ্যাগমিষ্যতি। সত্যবতী পুত্রলাভেচ্ছু বধূর কাছে একবারও বিকৃত-রূপ, বিকৃত-বেশ ঋষি ব্যাসের কথা বললেন না। সত্যবতীর এই অনুচ্চারণ আরও বোঝা যায় বধূ অম্বিকার ব্যবহার থেকে। তিনি যখন গভীর নিশীথে শাশুড়ি সত্যবতীর কথা শুনে দেবরের আগমন-প্রতীক্ষা করছেন, তখন তিনি যাঁদের কথা প্রত্যাশিতভাবে ভাবনা করছিলেন, তাঁরা কিন্তু ভীষ্ম ইত্যাদি কুরুমুখ্যরা, যাঁরা তাঁর দেবর বলে চিহ্নিত— সাংচিন্তয়ত্তদা ভীষ্মমন্যাংশ্চ কুরুপুত্রঙ্গবান্।

ক্ষত্রিয় রাজকুলবধূর স্বপ্নেও ব্যাসের মতো ঋষির কোনও পদসঞ্চার ছিল না। বিশেষত তাঁর বিকৃত রূপ, বিকৃত বেশ রাজরানির মনে এমনই এক 'রিপালশন' তৈরি করেছিল যে ব্যাসের মিলন-মুহূর্তে তিনি ভয়ে, ঘৃণায় চক্ষু মুদে ফেলেছিলেন। এই নৈশমিলনের পর সত্যবতীর সোৎকণ্ঠ প্রশ্ন শুনে ব্যাস তাঁকে আশ্বস্ত করতে পারেননি। এক অঙ্গে বিকল এক অন্ধ পুত্রের জন্ম-সম্ভাবনার ভবিষ্যদ্বাণী করে ব্যাস সত্যবতীকে আরও ব্যগ্র করে তুলেছিলেন। কিন্তু এই বিপন্ন মুহূর্তেও সত্যবতী কত বিচক্ষণা, তাঁর রাজনৈতিক বুদ্ধিও কত প্রখর। অবশ্য যিনি যৌবনলগ্নে ভীষ্মের মতো বিরাট ব্যক্তিত্বের উত্তরাধিকার-সম্ভাবনা স্তব্ধ করে দিয়ে শান্তনুর রাজমহিষী হয়েছিলেন এবং যিনি দুই পুত্রের মৃত্যুর পরেও হস্তিনাপুরের কল্যাণকামিতায় ভীষ্মের সঙ্গে যুগ্মভাবে রাজ্যশাসনের হাল ধরে বসেছিলেন, তাঁর এই বিচক্ষণতা স্বাভাবিক। প্রখ্যাত ভরতবংশের ধারায় একটি অন্ধপুত্র জন্মালে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে সমকালীন আইনপ্রণেতাদের অনুশাসনে রাজা হবার অধিকার পাবে না, মনুপ্রণীত এই রাজনৈতিক আইনের খবর সত্যবতী জানতেন। ফলে ব্যাসের কথা শোনামাত্রই তিনি আকুলভাবে বললেন, হে তপোধন পুত্র আমার! একজন অন্ধ কখনও কুরুবংশের রাজা হতে পারে না— নান্ধঃ কুরূণাং নৃপতিরনুরূপস্তপোধন। আমি চাই— যে নাকি এই ভরত-কুরুবংশের রক্ষা বিধান করবে, যে বাড়াতে পারে পিতৃবংশের উত্তরাধিকার, তুমি সেইরকম একটি পুত্র দাও আমার দ্বিতীয়া পুত্রবধূর গর্ভে। ব্যাস মাতৃবাক্যে স্বীকৃত হলেন।

দ্বিতীয়া বধূ অম্বালিকা ব্যাসকে দেখে চক্ষু মুদলেন না বটে, কিন্তু তাঁরও শরীরে কিঞ্চিৎ বিকার হল, যার ফলে পাণ্ডুবর্ণ পাণ্ডুর জন্মের সম্ভাবনা ঘটল। সত্যবতী তবুও যেন শান্তি পাচ্ছিলেন না। নিজের গর্ভস্থ দুই সন্তানের অপমৃত্যু-হেতু সত্যবতী এতটাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন যে, তিনি ব্যাসের কাছে তৃতীয় একটি পুত্রের জন্য আবারও আবদার করলেন। ব্যাস জননীর কথা ফেলেননি। তিনি রাজি হয়েছেন জননীর সেবাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হয়ে। কিন্তু জ্যেষ্ঠ কুলবধূ অম্বিকা ব্যাসের প্রতি ঘৃণায় নিজে উপগত না হয়ে দাসীকে পাঠিয়ে দিলেন ব্যাসের কাছে। ব্যাস তাঁর জননীর কাছে বড় রানির এই ছলনা না জানিয়ে পারেননি— প্রলম্ভমাত্মনশ্চৈব শূদ্রায়াং পুত্রজন্ম চ। সত্যবতীও এই ছলনার নিরিখে ব্যাসের কাছে আর কোনও উপরোধ করেননি, অন্যদিকে বড় রানি অম্বিকার মানসিকতাও তিনি অস্বীকার করেননি। তিনি তাঁকে কোনও তিরস্কার করেননি, কেননা তিনি বুঝেছেন— রাজকুলবধূ অম্বিকার পক্ষে ব্যাসকে সহ্য করা সত্যিই কঠিন ছিল।

ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুর— এই তিন কুমার জন্মালেন এবং কুরুরাষ্ট্র চলতে লাগল নিজের গতিতে। তখনও এ রাষ্ট্রের হাল ধরে ছিলেন ভীষ্মই যদিও যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ভীষ্ম সবসময় অনুমতি নিতেন জননী সত্যবতীর। তিন কুমারকে বিদ্বান অথবা অস্ত্রশিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে ভীষ্ম যা করার করেছেন, কেননা তিনি তা করতেনই এবং সত্যবতীও সে কথা জানতেন। কিন্তু কুমারদের জীবনেও যে সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, সেখানে যে ভীষ্ম সত্যবতীর অনুমতি নিতেন, তার কারণ এই নয় শুধু, তিনি রাজমাতা, অতএব তাঁকে সব জানানো দরকার। বরঞ্চ কারণ এই যে, সত্যবতীর বুদ্ধির ওপর ভীষ্মের অসম্ভব আস্থা ছিল। গান্ধারী এবং কুন্তীর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর বিবাহের প্রসঙ্গ যখন এল, তখন মহামতি বিদুরের সঙ্গে ভীষ্ম আলোচনায় বসেছিলেন। সেই আলোচনায় ভীষ্ম মুক্তকণ্ঠে সত্যবতীর প্রশংসা করে বিদুরের কাছে বলেছিলেন— আমাদের এই বিখ্যাত কুরুবংশ একেবারে উচ্ছিন্ন হয়ে যেতে বসেছিল; সেই অবস্থায় আমি, সত্যবতী এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস মিলে এই ভরতবংশের কুলতন্তু পুনরায় স্থাপন করেছি— ময়া চ সত্যবত্যা চ কৃষ্ণেন চ মহাত্মনা।

বস্তুত সত্যবতীর বুদ্ধির ওপর এই যে বিশ্বাস— এই বিশ্বাসই বলে দেয় সত্যবতীর বিচক্ষণতা কতখানি ছিল। তিনি সেই যুবতী অবস্থায় হস্তিনাপুরে প্রবেশ করেছিলেন মহারাজ শান্তনুর পাটরানি হয়ে। শান্তনুর নিজস্ব পৌরুষ কতটা ছিল, সেটা তাঁর বিবাহের সময়ই বোঝা গেছে। আপন কামাভিলাষ পূরণের জন্য তিনি ভীষ্মকে যেভাবে বঞ্চিত করেছিলেন, ঠিক সেই বিপর্যস্ত পৌরুষের নিরিখে শান্তনুর এই যুবতী বধূটি যা ইচ্ছে

তাই করতে পারতেন। হস্তিনাপুরের শাসন চলতে পারত অন্তঃপুরের পরিচালনায়। কিন্তু লক্ষণীয়, সত্যবতী কোনও অন্যায় আচরণ করেননি। কোমলপ্রাণ শান্তনুর চেয়ে তিনি বেশি নির্ভর করেছেন ভীষ্মের ওপর। এই নির্ভরতার সুফল পেয়েছে হস্তিনাপুরের রাজশাসন— হস্তিনাপুরের দুই রাজা মারা গেলেও যে শাসন বিঘ্নিত হয়নি। শেষে যখন পাণ্ডুর ওপর রাজ্যের ভার পড়ল এবং সত্যবতী বুঝলেন হস্তিনাপুর তার স্থায়ী রাজা পেয়ে গেছে, তখন থেকে সত্যবতীকে আমরা অনেক উদাসীন এবং নির্বিঘ্ন দেখছি। রাজ্যশাসন বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তিনি আর মাথা ঘামান না এখন। এমনকী ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডুদের জন্য যে বৈবাহিক সম্বন্ধ দেখা হল, সেখানেও ভীষ্মকেই আমরা প্রধান ভূমিকায় দেখছি। এখানে সত্যবতীর কোনও বক্তব্য শোনা যায় না। পাণ্ডু রাজা হবার পর রাজমাতা সত্যবতী এবং ভীষ্ম দু'জনকে দেখলেই মনে হয় যেন তাঁরা হস্তিনাপুরের বৃত্তিভোগী রাজপুরুষ। পাণ্ডু রাজ্য জয় করে বহুতর ধনরত্ন নিয়ে এলে তিনি সত্যবতী, ভীষ্ম, এবং দুই রাজমাতা অম্বিকা এবং অম্বালিকাকে উপহার দিয়ে তুষ্ট করেন— ততঃ সত্যবতীং ভীষ্মং কৌশল্যাঞ্চ যশস্বিনীম্।

বস্তুত সত্যবতী এখন আর রাজমাতা নন, তিনি এখন রাজপিতামহী। হস্তিনাপুরে অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মনে রাজা না হওয়ার যে যন্ত্রণা ছিল, সে যন্ত্রণা জটিল আকার ধারণ করল ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু উভয়েরই পুত্র জন্মাবার পর। ধৃতরাষ্ট্রের অন্তর্দ্বন্দ্বে সত্যবতীকে আমরা একটাও কথা বলতে দেখিনি, অথচ পূর্বে সমস্ত ব্যাপারেই তাঁর নির্দিষ্ট অভিমত দেখতে পেয়েছি। সত্যবতী এখন অনেকটাই নির্বিঘ্ন। কোনও ব্যাপারেই তিনি কোনও কথা বলেন না। এমনকী ধৃতরাষ্ট্রকে কার্যনির্বাহী রাজা হিসেবে হস্তিনাপুরে রেখে অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে পাণ্ডু যে দুই স্ত্রীকে নিয়ে বনগমন করলেন এবং তারপর যে আর একেবারেই ফিরে আসলেন না— এ বিষয়ে হস্তিনাপুরের রাজমহল তোলপাড় হয়ে গেলেও আমরা একবারের তরেও সত্যবতীর কোনও কথা শুনিনি— না ক্ষোভের কথা, না হতাশার কথা, না বিরাগের কথাও।

শেষ পর্যন্ত পাণ্ডু তো মারা গেলেন। তাঁর মৃতদেহও এসে পৌঁছল হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে। উপনীত ঋষিরা পাণ্ডুর মৃত্যু এবং তাঁর পুত্রদের সম্বন্ধে যথাবক্তব্য বলে চলে গেলেন। সমস্ত নগরবাসী তখন শোকে আকুল। পাণ্ডু এবং মাদ্রীর মৃতদেহ যখন চিতার আগুনে দগ্ধ হয়ে গেল, তখন পাণ্ডুর প্রৌঢ়া জননীকেও আমরা পুত্রশোকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখলাম— হা হা পুত্রেতি কৌশল্যা পপাত সহসা ভুবি। কিন্তু ওই অসম্ভব বিপন্ন সময়েও আমরা সত্যবতীকে শ্মশানভূমিতে উপস্থিত দেখিনি। হয়তো পাণ্ডুর এই মৃত্যুতে সত্যবতী যথেষ্টই বিচলিত হয়েছিলেন এবং হস্তিনাপুরের রাজনীতি তিনি যতখানি বুঝতেন, তাতে এটা তিনি নিশ্চয়ই অনুভব করেছিলেন যে, হস্তিনাপুরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল থেকে আরও জটিলতর হবে।

সত্যবতীর যা চরিত্র, যেভাবে মহারাজ শান্তনুর সময় থেকে এখন পর্যন্ত তিনি হস্তিনাপুরের রাজনীতি দেখেছেন, তাতে ভয়ংকর জটিল সময়ে— বিশেষত যখন পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির এবং ধার্তরাষ্ট্র দুর্যোধনের রাজ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠবে, তখনও কি বৃদ্ধা সত্যবতী চুপ করে থাকতে পারবেন— এ ব্যাপারে আমাদের যেন সন্দেহ আছে, তেমনই আরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন দূরদর্শী মনস্বী এই সন্দেহ করেছিলেন— তিনি পাণ্ডু-ধৃতরাষ্ট্রের জনক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। পাণ্ডু এবং মাদ্রীর শ্রাদ্ধক্রিয়া যখন শেষ হয়ে গেল, সত্যবতী যখন শোকে-দুঃখে মুহ্যমান হয়ে আছেন অন্তঃপুরে, তখন ব্যাস এসে উপস্থিত হলেন তাঁর কাছে— সম্মূঢ়াং দুঃখশোকার্তাং ব্যাসো মাতরমব্রবীৎ।

৭

ব্যাস তাঁর জননীকে ঠিক চেনেন। তিনি বুঝেছেন যে, একসময় তাঁর জননী হস্তিনাপুরের রাজবধূ হয়ে রাজৈশ্বর্যের পিছনে ছুটেছিলেন, এতদিনে হয়তো সেই বিষয়ৈষণায় নিবৃত্তি হয়েছে। ব্যাস জানেন নিশ্চয় যে তাঁর জননীর মধ্যে এই বিষয়-ঐশ্বর্য ভোগের ইচ্ছা অন্তর্গত ছিল। নইলে যেদিন সেই মহর্ষি পরাশরের সঙ্গে তিনি সঙ্গত হয়েছিলেন, সেদিন সদ্যোগর্ভে ব্যাসের মতো অসাধারণ পুত্র লাভ করার পরেও কিন্তু তিনি একবারও বলেননি যে, দরকার নেই আমার ভোগ সুখে, দরকার নেই আমার সাধারণ সংসার সুখে; যে মহামুনি আমার বহির্মুখতা সত্ত্বেও আমাকে প্রায় আক্রান্ত করে আর্য সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, আমি তাঁরই সঙ্গে চলে যাই। অথবা বলেননি— যে সন্তানের আমি জননী হয়েছি, সেই সন্তানের লালন-বাৎসল্যে জীবন কাটাব। অর্থাৎ পরম ঋষির স্বচ্ছন্দ তেজঃসঞ্চারও তাঁকে বৈরাগ্যের পথে প্রণোদিত করেনি। তিনি পরাশরের কাছে অক্ষত কুমারীত্ব চেয়েছেন, তা পেয়েওছেন এবং ঋষির শুভকামনা তিনি ঐশ্বর্য ভোগৈষণায় রূপান্তরিত করেছেন।

কিন্তু সেসব ভোগলাভ করে কী পেলেন সত্যবতী! স্বামী শান্তনু গতায়ু, অকালে মৃত্যুবরণ করল দুই পুত্র। কোনও মতে হস্তিনাপুরের রাজবংশধারা প্রবাহিনী রইল তাঁর বৈরাগী তপস্বী পুত্রের করুণায়। এখন হস্তিনাপুরের রাজসংসারে এত যে জটিলতা বেড়েছে, ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর পুত্র দুর্যোধন ক্রমেই যে দুর্বিনীত হয়ে উঠছেন। পাণ্ডু যে মারা গেলেন, তবু সত্যবতী এই সংসার চক্রের অন্দর মহলে বসে আছেন দুঃখ-শোকে মূর্ছিত হয়ে। তপস্বী পুত্রের কাছে তিনি হস্তিনাপুরের রাজপুত্র ভিক্ষা চেয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই পুত্রকে তিনি একবারও বলেন না যে— পুত্র আমার। আর ভাল লাগে না, এবারে আমি সংসারমুক্তি চাই।

যিনি বলছেন না, অথচ যাঁর অন্তরে একদিন পরমর্ষি পরাশরের আর্যতেজ সঞ্চারিত হয়েছিল, তাঁর তো সৌভাগ্য কিছু আছেই। শাস্ত্র বলেছে— সন্ত তপস্ব-জনেরা অনেক সময় কষ্টকর দুরুক্তি উচ্চারণ করেই সংসার বাসনা মুক্ত করেন— সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গম্ উক্তিভিঃ। ব্যাস তাই করলেন এবার। পাণ্ডুর শ্রাদ্ধক্রিয়া শেষ হলে তিনি মায়ের কাছে গিয়ে আকস্মিকভাবে বললেন— মা! তোমার সুখের দিন শেষ হয়ে গেছে মা। দিন যত আসছে, সেসব ভয়ংকর দিন, মা! তুমি সহ্য করতে পারবে না— অতিক্রান্তসুখা কালাঃ পুর্যুপস্থিতদারুণাঃ। সামনের দিন যত এগিয়ে আসবে, তাতে পাপের ওপর পাপ নেমে আসবে এই পৃথিবীতে। তোমার পৃথিবী যৌবন হারিয়ে ফেলেছে মা, এবার তুমি আমার সঙ্গে চলো— শ্বঃ শ্বঃ পাপিষ্ঠদিবসাঃ পৃথিবী গত যৌবনা।

'পৃথিবী গতযৌবনা'— পৃথিবী তার যৌবন হারিয়েছে— এই কথাটার একটা গভীর তাৎপর্য আছে। সত্যিই কি পৃথিবী যৌবন হারায়, নাকি আমরা হারাই। আমি আমার অল্প বয়সে খুব অবাক হয়ে ভাবতাম— বুড়োরা খুব ক্লিশে হয়ে যাওয়া একটা কথা বলে। বার বার বলে— আর আমাদের কালে যা ছিল, যেমন ভাল মানুষ ছিল, তেমনই ভাল ছিল সময়। এখন সব নষ্ট হয়ে গেছে, একেবারে ঘোর কলি। আমার কালে আমি ভাবতুম— বুড়োরা এইরকম বলে বটে, কিন্তু আমি যখন বুড়ো হব, তখন কক্ষনও এইরকম কথা বলব না। আমি কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলব। এখন যখন আমি বুড়ো হচ্ছি, কালের সঙ্গে যথেষ্ট তাল মিলিয়েও চলার চেষ্টা করছি, তবুও কোন অজান্তে মুখ দিয়ে এখন সেই কথা বেরোয়— আমাদের কালে যা ছিল... ইত্যাদি।

কথাটা এখন বুঝতে পারি— ব্যাসের এই অসাধারণ উচ্চারণ থেকে। আসলে পৃথিবী কখনওই যৌবন হারায় না। যারা এখন যুবক-যুবতী তাদের কাছে পৃথিবী এখন ঠিক যৌবনবতী। কিন্তু আমার যৌবন হারিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার পৃথিবীও যৌবন হারাতে থাকে। আমার জোশ-জৌলুশ-ভাস্বরতার অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার পৃথিবীর দীপ্তি-কান্তিও ম্লান হতে থাকে ধীরে। সন্তানের সঙ্গে পিতামাতার বয়সের যে পার্থক্যটুকু থাকে— কালের এই মহান অন্তরটুকুই একজনের কাছে পৃথিবীর বিবর্ণতা, জড়তা বয়ে নিয়ে আসে, অথচ অন্যতরের কাছে উন্মুক্ত করে বক্ষোজ তারুণ্যের কঞ্চুলিকা। জড়, বিবর্ণ, অতিক্রান্তসুখ প্রৌঢ় বৃদ্ধ তখনও ভাবতে থাকে— কাহার...

ব্যাসের মতো কালদর্শী কবি বৃদ্ধা জননীকে এইভাবেই তাঁর নিজের বৃদ্ধত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন— তোমার পৃথিবীর যৌবন চলে গেছে মা! এখন দিনে দিনে ছলনা-কপটতা বাড়বে, যত দোষ আকুল করবে এই পৃথিবীকে। লুপ্ত হবে ধর্ম এবং যত সদাচার, একেবারে ঘোর সময় ঘনিয়ে আসবে অচিরেই— লুপ্তধর্মক্রিয়াচারো ঘোরঃ কালো ভবিষ্যতি। আসলে এ হল সেই ক্লিশে কথা— যা মহাকাব্যের নায়ক এই ভাবে ভবিষ্যদ্‌বাণীর উচ্চারণ করেন। সেই ক্লিশে কথাটা— আর বাপু! আমাদের সময়ে যা ছিল! এখনকার মানুষগুলোকে দেখো— যত ঠগ্‌-বদমাশ-জোচ্চোর, সব একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে— মূল্যবোধ, নীতি, নিয়ম— ব্যাসের ভাষায় যেটা— বহু মায়াসমাকীর্ণো নানাদোষসমাকুলঃ। আসলে ঠগ্‌ বদমাশ-জোচ্চোর তখনও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু আমার যৌবনের সৌন্দর্য্যে আমারই সুন্দরী পৃথিবীকে যে চোখে আমি দেখতুম, মহাকাল সেই দৃষ্টিটাকেই হরণ করে বলে এখনকার পৃথিবীতে আমি ছলনা, বঞ্চনা আর দোষের সমাহার দেখতে পাই। বৃদ্ধ তার যৌবনের দেখা পৃথিবীর সঙ্গে পুত্র-পৌত্রের দেখা তরুণী পৃথিবীকে মেলাতে পারে না।

ব্যাস এবার প্রকৃত প্রস্তাবে ফিরে এসেছেন। কুরুরাজবংশে এক ভয়ংকর জটিলতা তিনি অনুমান করছেন। তিনি লক্ষ করেছেন যে, গান্ধারীর মতো ধৈর্যশালিনী রমণীও কুন্তীর ওপর ঈর্ষায় আপন গর্ভে আঘাত করে যুধিষ্ঠিরের আগে নিজ পুত্রের জন্ম দিতে চেয়েছেন। তিনি লক্ষ করেছেন— পাণ্ডু বনগমন করে বিশেষ কোনও অভিমানে আর বাড়ি ফেরেননি এবং অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মন থেকে রাষ্ট্রশাসনের লোভ কখনও অন্তরিত হয় না। বিশেষত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন যে সময় এল— পাণ্ডু নেই, তাঁর পুত্রেরা ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রিত হল, মহামতি ভীষ্ম কিছু অবগুণ্ঠিত— ব্যাস আর্যদৃষ্টিতে বুঝতে পারছেন— রাজবাড়িতে জটিলতা বাড়বে এবং ধৃতরাষ্ট্র পুত্রমোহবশে এমন কাজ করতে পারেন, যা সত্যবতী তাঁর প্রাচীন মূল্যবোধে সহ্য করতে পারবেন না। ব্যাস তাই বেশ কঠিনভাবে বললেন— তোমারই সংবর্ধিত কুরুবংশের এই মানুষগুলির অন্যায় আচরণে এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, মা। আমি এখনও বলছি— তুমি আমার সঙ্গে চলো, আমার তপোবনে থাকবে তুমি। সেখানে যোগধর্ম আচরণ করে জীবনের শেষ সময়টুকু কাটিয়ে দেবে— গচ্ছ ত্বং যোগমাস্থায় যুক্তা বস তপোবনে। তুমি যত বেশি সময় এখানে থাকবে, ততই এই কুলের ক্ষয় দেখতে পাবে দিনে দিনে।

ব্যাস বলতে চাইলেন— ক্ষয় তো তুমি কম দেখোনি। স্বামী শান্তনু মারা গেছেন, তোমার গর্ভস্থ দুই পুত্র মারা গেছে, এখন পাণ্ডুও মারা গেলেন। তিনটে জেনারেশনের মৃত্যু দেখাই শুধু নয়, ব্যাস বলতে চাইলেন— অন্যায় তো তখন থেকেই আরম্ভ হয়েছে। কামাচারী শান্তনু নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবব্রত ভীষ্মকে রাজ্য দেননি, তোমার গর্ভস্থ দুই পুত্র ক্রোধ এবং কামবশেই অকালে মারা গেছে। আর অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র যেদিন থেকে পাণ্ডু রাজা হয়েছেন, সেদিন থেকেই ঈর্ষালু। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে— আপন যৌবনশক্তির তাড়নায় সত্যবতী তাঁর পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া এই অন্যায়গুলিকে দেখতে পাননি। ব্যাস সর্বনিরপেক্ষ মহাকবি, তিনি সব দেখতে পান, কিন্তু কবিজনোচিত শৈলীর তন্ময়তায় এবং জননীর মর্যাদাবোধে শেষ কথাটা বলেন— তুমি আর এই কুরুবাড়িতে বসে বসে আপন কুলের ভয়ংকর এই ক্ষয় দেখতে যেয়ো না— মা দ্রাক্ষীস্ত্বং কুলস্যাস্য ঘোরং সংক্ষয়মাত্মনঃ। তুমি চলো আমার সঙ্গে আমারই তপচ্ছায়ায় ব্যস করবে আমারই তপোবনে।

জননী সত্যবতী অতি বিচক্ষণা। তিনি ঋষিপুত্রের এই শব্দাঘাত উপেক্ষা করেননি। তিনি বুঝেছেন— যে পরমর্ষি তাঁর প্রথম যৌবনোদ্ভেদে আর্য তেজ নিহিত করেছিলেন তাঁর গর্ভে, সেই পরম অভ্যুদয় তিনি আপন মোহে হেলা করে এসেছেন। আজ সেই পুত্র তাঁকে তাঁর পরমর্ষি স্বামীর বৈরাগ্য-সাধনপথে নিযুক্ত করতে এসেছে, এই তাঁর সঠিক পথ। হঠাৎই তাঁর মনে হল— দুই পুত্রবধূর কথা। তাঁরাই বা কী পেলেন! স্বামী অকালে কামাচারে গতায়ু হলেন, অবশেষে নিয়োগের মাধ্যমে তাঁরা যে পুত্র লাভ করলেন, তাও এই ব্যাসের কাছ থেকেই। সেভাবে দেখতে গেলে ব্যাসই তো তাঁদের আসল স্বামী, তাঁদের গর্ভস্থ সন্তানের জনক। কী যে মনে হল সত্যবতীর! ব্যাস তাঁকে আকস্মিকভাবে বনগমনের প্রস্তাব দিয়েছেন, তিনিও ততোধিক আকস্মিকতায় সেই প্রস্তাব স্বীকার করেছেন— তথেতি সমনুজ্ঞায়। তারপরেই তেমনই আকস্মিকভাবে তিনি দুই পুত্রবধূর সামনে এসে, প্রধানত অম্বিকাকে উদ্দেশ করে বললেন— অম্বিকা! শুনছি নাকি তোমারই ছেলের ঘরের নাতি দুর্যোধনের অন্যায় কর্মে এই গোটা ভরতবংশটাই ধ্বংস হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে এই প্রজা, পরিজন, মন্ত্রী, অমাত্য সব— সানুবন্ধা বিনঙ্ক্ষ্যন্তি পৌরাশ্চৈবেতি নঃ শ্রুতম্।

অম্বিকা যথেষ্টই বুঝতে পেরেছেন যে, ব্যাসের কাছে কথা শুনেই সত্যবতীর এই প্রতিক্রিয়া। সম্ভবত ধৃতরাষ্ট্র যে প্রশ্রয় এবং যে পক্ষপাতে দুর্যোধনকে মানুষ করে তুলেছিলেন, তাতে অম্বিকাও নিশ্চয়ই খুশি ছিলেন না। সত্যবতী দুর্যোধনের সূত্রে ধৃতরাষ্ট্রের

দিকেই তাঁর অভিযোগের অঙ্গুলিসংকেত করেছেন। অন্যদিকে পাণ্ডু মারা যাওয়ায় বিধবা অম্বালিকার জন্যও সত্যবতীর বড় মায়া হচ্ছিল। অম্বিকা ও অম্বালিকা— এই দুই রাজবধূই সত্যবতীর বিপরীত চরিত্র। সেই যে মহামতি ভীষ্ম এঁদের কাশীর রাজসভা থেকে তুলে এনে বিচিত্রবীর্যের বধূ হিসেবে হস্তিনাপুরে স্থাপন করেছিলেন, এই স্থাপনা ছাড়া আর কোনও ক্রিয়াকর্ম, ব্যক্তিগত ব্যবহার কিছুই জানা যায় না এঁদের সম্বন্ধে। কুরুবাড়ির রাজনীতিতেও এঁরা কখনও মাথা গলাননি সত্যবতীর মতো। সত্যবতী বুঝলেন— তিনি আজ হস্তিনাপুর ছেড়ে চলে গেলে এই দুই রাজমাতা বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বেন, বিশেষত পাণ্ডুজননী অম্বালিকা, যাঁর রাজপদে অভিষিক্ত পুত্রটি মারা গেছে। সত্যবতী তাই অম্বিকাকে ভবিষ্যতের অন্যায় অনীতির কথা বলেই তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাঁরই ভগিনীর দুর্দশার কথা। বলেছেন— একবার তাকাও পুত্রশোকে ম্লান দীন এই অম্বালিকার দিকে। তুমি যদি চাও, তবে এমন হতে পারে যে, অম্বালিকাকে নিয়ে তুমিও আমার সঙ্গে চলো সেই শান্তির নিবাসে, তপোবনে, যেখানে পুত্র ব্যাস আমাকে নিয়ে যেতে চাইছেন— বনমাদায় ভদ্রং তে গচ্ছাম যদি মন্যসে।

অম্বিকা-অম্বালিকা সত্যবতীর দূরদৃষ্টির ওপর সম্পূর্ণ আস্থাশীল। তাঁরা দ্বিরুক্তি না করে এক কাপড়ে বেরিয়ে এলেন সত্যবতীর সঙ্গে। ব্যাস যে তাঁর জননীকে এবং একভাবে তাঁর তেজোধারিণী দুই স্ত্রীকেও এইভাবে প্রবজ্যার পথে নিয়ে গেলেন, এ সম্বন্ধে তিনি কবি হিসেবে খুব অল্প কথাই লিখেছেন। যে ঘন ঘটমান কাহিনির মধ্যে দিয়ে, যে আড়ম্বরপূর্ণ তাৎপর্যের মধ্যে দিয়ে সত্যবতী অথবা অম্বা-অম্বালিকারও আগমন ঘটেছিল হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে, সেই ঘনঘটা, আড়ম্বর অনুপস্থিত রইল সত্যবতীর প্রব্রজ্যায়। রাজপুরীতে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের চোখ দিয়ে এক কোঁটাও জল গড়িয়ে পড়ল না তাঁর মা-ঠাকুমা চলে যাচ্ছেন বলে। কুরুবাড়ির অন্তঃপুরে একটুও কান্নার কলরোল উঠল না সত্যবতীর বনগমনের সিদ্ধান্তে। যে সত্যবতী এই রাজবাড়িতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সব জায়গায় ব্যাপ্ত হয়ে জুড়ে বসেছিলেন, তাঁর বনগমনের সংবাদে এতটুকু বিপর্যয়, এতটুকু প্রতিক্রিয়া হল না তাঁর পরিপার্শ্বের আবহ-মণ্ডলে।

আসলে মহাভারতের প্রকৃত সুর এই শান্ত রস। বিশেষত এ হল মহাভারতের কবির জীবনাবহের ক্ষেত্র, তাঁরই মা, তাঁরই নির্মোহ তেজ-ঋদ্ধা দুই রমণী। ব্যাস সব সময় বলেন— সাংসারিক জগতের কর্মগুলি তো করেই যেতে হবে, কিন্তু এক সময়ে সব ত্যাগ করে মনে মনে মুক্তও হতে হবে। সত্যবতী এবং অম্বিকা-অম্বালিকাকে প্রব্রজ্যার পথে অনুগত করে ব্যাস তাঁর জননীকে ঋষি পরাশরের সিদ্ধ জীবনের পথে নিয়ে এলেন— সংসার জীবনের চক্রান্ত থেকে তাঁকে নিয়ে এলেন শান্ত আশ্রম পদে। সঙ্গে নিয়ে এলেন দুই রিক্তা রমণীকে যাঁরা বিচিত্রবীর্যকে নামে মাত্র স্বামী হিসেবে পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে যাঁরা সন্তান লাভ করেছিলেন, ব্যাস তাঁদেরও নিয়ে এলেন বৈরাগ্যের নির্বিঘ্ন জগতে একান্ত সহধর্মচারিণী করে।

সত্যবতী তাঁর দুইপুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে বিদায়বেলায় একবার মাত্রা দেখা করেছিলেন পুত্রপ্রতিম ভীষ্মের সঙ্গে— তথেত্যুক্তা সাম্বিকয়া ভীষ্মমামন্ত্র্য সুব্রতা। তাঁর অনুমতি লাভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে দেরি হয়নি। তারপর কোনও শোরগোল না করে সত্যবতী অম্বিকা-অম্বালিকাকে নিয়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ব্যাস নির্দিষ্ট তপোবনে এসে পৌঁছেছেন— বনং যযৌ সত্যবতী স্নুষাভ্যাং সহ ভারত। এমন হতেই পারত যেন এই তো সত্যবতীর দ্বিতীয় সংসার। হতেই পারে এখানে ঋষি পরাশর ছিলেন তাঁর প্রথম স্বামী; এখানে ব্যাস আছেন, যাঁকে একভাবে অম্বিকা-অম্বালিকার স্বামী বলে মনে করা যেতে পারে। অতএব সত্যবতী এক সংসার ছেড়ে যেন আর এক সংসারে যাত্রা করলেন— যেখানে তাঁর স্বামী, পুত্র, পুত্রবধূ সব আছে; ভরা সংসার।

কিন্তু না, ঋষি ব্যাস সত্যবতীকে এক মোহ থেকে আর এক মোহের মধ্যে প্রবেশ করাননি। সত্যবতী এবং তাঁর পুত্রবধূরা ব্যাসের বদরিকাশ্রমে এসে পুনরাবাস লাভ করেছিলেন, এমন কোনও সূচনা মহাভারতে নেই। সম্ভবত এমন কোনও বনস্থলীতে তাঁদের বসতি নির্দেশ করেছিলেন ব্যাস, যেখানে নিরুপায় হয়েই যোগাভ্যাসে মন দিতে হবে। তাঁরা তাই করেছিলেন। বৈরাগ্য-কৃচ্ছ্রসাধনে নিজেদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ করে তপস্যার মাধ্যমে পরম ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁরা একাত্মতা সাধন করলেন গভীর মনঃসংযোগে। এইভাবেই একসময় তাঁদের মৃত্যুও হল— দেহং ত্যক্ত্বা মহারাজ গতিমিষ্টাং যযুস্তদা। হস্তিনাপুরের রাজবাড়ির কেন্দ্রস্থানে স্থিত সত্যবতী, মহারাজ শান্তনুর কামনার ধন সত্যবতী শেষ বয়সে সকলের অজান্তেই একদিন যেন হারিয়ে গেলেন এই চিরযৌবনা পৃথিবী থেকে।

AMARBOI.COM

অম্বা-শিখণ্ডিনী

মহারাজ শান্তনুর পুত্র বিচিত্রবীর্য যখন রাজা হয়েছেন, তখন তাঁর বয়স খুব কম। কুরু-ভরতবংশের রাজবাড়িতে যে ভয়ংকর 'অ্যাকসিডেন্ট' ঘটে গেল, তার ফলেই বিচিত্রবীর্য রাজা হলেন।

সত্যি কথা বলতে কি, শান্তনুর প্রথম পুত্র গাঙ্গেয় ভীষ্মই শান্তনুর অধিকৃত কৌরব-ভূখণ্ড অতি যত্নে রক্ষা করে চলেছিলেন। কিন্তু শান্তনুর প্রিয়া পত্নী সত্যবতীর বিবাহের সময়ে ভীষ্ম যেহেতু রাজা না হওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন, তাই শান্তনুর মৃত্যুর পর সত্যবতীর গর্ভজাত তাঁর প্রথম পুত্র চিত্রাঙ্গদ রাজা হলেন। চিত্রাঙ্গদ ভীষ্মের কথা যে খুব মেনে চলতেন, তা নয়। স্বভাবের দিক থেকেও তিনি ছিলেন কথঞ্চিৎ অহংকারী। এই অহংকার এবং স্বাধিকার-প্রমত্ততার জন্য একদিন তাঁকে বেঘোরে প্রাণ দিতে হল।

চিত্রাঙ্গদ মারা গেলে রাজা হলেন কুমার বিচিত্রবীর্য। চিত্রাঙ্গদের উদাহরণে কুরুবংশের রাজবধূ সত্যবতী বুঝেছিলেন যে, রাজ্য-শাসনের বিচিত্র ক্ষেত্রে ভীষ্মের পরামর্শ ছাড়া যেমন চলা উচিত হবে না, তেমনই সাংসারিক ক্ষেত্রেও ভীষ্মের কর্তৃত্ব মেনে চলা ঠিক হবে। ভীষ্ম সত্যবতীকে কখনও অতিক্রম করেননি এবং সত্যবতীও পুত্রের হিতের জন্য ভীষ্মের ওপরেই নির্ভর করাটা যুক্তিযুক্ত মনে করতেন। ফলে কুমার বিচিত্রবীর্য যখন রাজা হলেন, তখন হস্তিনাপুরের শাসন এবং কৌরব সংসারের ভালমন্দ সবটাই দেখছিলেন গাঙ্গেয় ভীষ্ম— হতে চিত্রাঙ্গদে ভীষ্মে বালে ভ্রাতরি কৌরব।/ পালয়ামাস তদ্রাজ্যং সত্যবত্যা মতে স্থিতঃ ॥

কুমার বিচিত্রবীর্য যখন যৌবনে পদার্পণ করলেন, ভীষ্ম তখন ছোট ভাইটির বিবাহের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মহারাজ শান্তনু বেঁচে নেই, অতএব এই পিতৃহীন ভাইটির সুরক্ষার ভার নিয়ে ভীষ্ম তাঁর গায়ে রাজনৈতিক জটিলতার আঁচটিও লাগতে দেননি; কিন্তু সেই ছোট ভাইটি এখন সম্পূর্ণ যুবক; অন্য দিকে কুরুবংশের সন্তান-সন্ততি আর কেউ নেই। এই অবস্থায় ছোট ভাইটির বিয়ে দিয়ে তাঁকে সংসারী করলে কুরুবংশের বৃদ্ধি ঘটবে— এই শুভৈষণায় ভীষ্ম ঠিক করলেন, বিচিত্রবীর্যের বিয়ে দিতে হবে— ভীষ্মে বিচিত্রবীর্যস্য বিবাহায়াকরোন্মতিম্।

জননী সত্যবতীর সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়ে গেল। তিনি ভীষ্মের গৌরবে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সঙ্গে সহমত হলেন। এইবার মেয়ে দেখার পালা। সে কালের দিনে কোনও রাজার ঘরে সুন্দরী এবং গুণবতী কন্যা থাকলে তাদের মধ্যে কেই বা বিবাহযোগ্যা অথবা কার বিয়ের কথা হচ্ছে— এ সব খবর 'চরৈবেতি'-স্বভাব মুনি ঋষিদের কাছে পাওয়া যেত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথবা সেইসব খবর দিতেন ব্রাহ্মণেরা যাঁরা ভিনরাজ্যে যজন-যাজন করতে যেতেন। হয়তো তাঁদেরই কারও কাছে ভীষ্ম কিছু খবর পেলেন। আরও একটি জব্বর খবর পেলেন। সেটি একটি স্বয়ম্বর-সভার খবর। স্বয়ম্বরের খবর রাজারাই জানাতেন। কন্যার পিতা বিভিন্ন রাজ্যের রাজাদের কাছে আমন্ত্রণ পত্র পাঠাতেন স্বয়ম্বরের দিনক্ষণ ঠিক করে।

হস্তিনাপুরের কৌরব রাজ্যেও সেই আমন্ত্রণপত্র এসে পৌঁছল। কাশী রাজ্যের রাজা খবর পাঠাচ্ছেন— তাঁর তিনটি কন্যা স্বয়ম্বর-সভায় দাঁড়িয়ে তাঁদের মনোমতো বর পছন্দ করবেন। কন্যা তিনটি অসাধারণ সুন্দরী— কন্যা স্তিস্রোঽপ্সরোপমাঃ। ভীষ্ম যেহেতু হস্তিনাপুরের প্রশাসনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন এবং হস্তিনাপুরের যুবক রাজা বিচিত্রবীর্যের ওপরেই যেহেতু তাঁর প্রাধান্য সর্বজনস্বীকৃত, কাজেই কাশীরাজের স্বয়ম্বর-সভার নিমন্ত্রণপত্র তাঁর কাছেই এসে পৌঁছল। ভীষ্ম ঠিক করলেন, কুমার বিচিত্রবীর্যকে তিনি কোনও ঝামেলায় জড়াবেন না। স্বয়ংবর-সভা অনেক সময়েই ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়, কুরুবংশের এই একমাত্র সন্তান-বীজ বিচিত্রবীর্যের গায়ে কোনও যুদ্ধের আঁচ লাগুক— এটা বোধহয় তিনি পছন্দ করলেন না। ছোট ভাইটির ওপর তাঁর অপত্যস্নেহ এমনই যে, তিনি ঠিক করলেন— নিজেই ওই স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হয়ে ভাইয়ের জন্য তিন কন্যাকে নিয়ে আসবেন হস্তিনাপুরে।

জননী সত্যবতীর সঙ্গেও তিনি তাঁর কার্যক্রম নিয়ে কথা বললেন। মহামতি ভীষ্মের গুরুত্ব এবং কুরু বংশের সবেধন-নীলমণির কথা ভেবে সত্যবতীও ভীষ্মের প্রয়াস সমর্থন করলেন। সত্যবতীর অনুমতি নিয়ে ভীষ্ম একা একটিমাত্র রথে চড়ে রওনা দিলেন বারাণসী নগরীর দিকে— জগামানুমতে মাতুঃ পুরীং বারাণসীং প্রতি।

যাঁরা ভারতবর্ষের পুরাতন ইতিহাস নিয়ে চিন্তা করেন, তাঁরা সাক্ষ্য দিয়ে বলবেন— সে কালের ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে কাশী ছিল অন্যতম সম্পন্ন রাষ্ট্র। বৌদ্ধ জাতক থেকে জানা যায় যে, শুধু রাজকীয় মাহাত্ম্যেই নয়, আয়তনেও তখনকার কাশী ছিল মিথিলা, এমনকী ইন্দ্রপ্রস্থের চেয়েও বড়। আমরা যখনকার কথা বলছি, তখন যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ তৈরি হয়নি; ফলত প্রমাণের জন্য আমরা যদি শতপথ ব্রাহ্মণের মতো প্রাচীন গ্রন্থের ওপর নির্ভর করি তবে দেখব, ধৃতরাষ্ট্র বলে কাশীর এক পূর্বতন রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ মানে সারা পৃথিবী-জয়ের পরিকল্পনা। কিন্তু কাশীরাজ ধৃতরাষ্ট্র এই বিরাট যজ্ঞের পরিকল্পনা করেও পরাজিত হলেন শতানীক সাত্রাজিতের কাছে। এই পরাজয়ে কাশীর রাজাদের আত্মাভিমান ভীষণভাবে আহত হয়েছিল। শতপথ ব্রাহ্মণ যখন লেখা হচ্ছে, তখনও কাশীওয়ালাদের প্রতিজ্ঞা শুনতে পাচ্ছি। তাঁরা নাকি অপমান সহ্য করতে না পেরে তাঁদের যজ্ঞাগ্নি নিবিয়ে দিয়েছিলেন, যতদিন না তাঁদের রাজকীয় মর্যাদা পুনরুদ্ধার হয়।

শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে ভাল করে টের না পেলেও বৌদ্ধ জাতকে কিন্তু কাশী রাজ্যের জয়-জয়কার। আশেপাশের সব রাজ্য কাশীর রাজাকে সব সময় ভয় করে চলেন। কেননা বার বার তাঁরা কাশীর রাজার কাছে পরাজিত হয়েছেন। মহাভারতে কাশীর রাজা প্রতর্দন, যাদব বীতহব্য (বীতিহোত্র) এবং হৈহয়দের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছেন, সে প্রমাণ আছে। আশ্চর্য

ব্যাপার হল— জাতকে যে সব নামকরা কাশীরাজের নাম পাওয়া যায়, তাঁদের কয়েক জন ব্রাহ্মণ্য পুরাণেও সমান আদলে উল্লিখিত। বিশ্বকসেন, উদকসেন এবং ভল্লাট— এইরকম কয়েক জন রাজা মৎস্য-বায়ু পুরাণের মতো প্রাচীন পুরাণে যেমন জায়গা পেয়েছেন, তেমনই জায়গা পেয়েছেন বৌদ্ধ জাতকে।

আর আছেন কাশীর রাজা ব্রহ্মদত্ত। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস জানেন, অথচ ব্রহ্মদত্তের নাম জানবেন না— এ হতেই পারে না। তিনি এক 'মিথিক্যাল ফিগার'। মহাবগ্গ বলেছেন—

ভূতপুব্বং ভিক্ষবে বারাণসিয়ং ব্রহ্মদত্তো নাম কাশীরাজা
অহোসি অড্ঢো মহদ্ধনো মহাভোগো মহদ্বলো
মহাবাহনো মহাবিজিতো পরিপুণ্ণ-কোস-কোঠ্‌ঠা গারো।

কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের কত যে উপাখ্যান আছে, তা বলে শেষ করা যাবে না। বস্তুত কাশীর রাজাদের সম্মান এবং কাশীরাজ্যের সমৃদ্ধি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, কাশীর পার্শ্ববর্তী সমস্ত রাজ্যই কাশীর অধিকার কামনা করত সব সময়, তবে সে কামনা পূর্ণ হত না, কারণ কাশী রাজ্যের যোদ্ধারা ছিলেন যুদ্ধে অদম্য। ঐতিহাসিক লিখেছেন— Benares in this respect resembled ancient Babylon and mediaeval Rome, being the coveted prize of its more warlike but less civilised neighbours. এমন একটা রাষ্ট্রের রাজকন্যাকে ঘরের বউ করে নিয়ে আসার মধ্যে যে মর্যাদা আছে, সেটা হস্তিনাপুরের অধিকর্তা মহামতি ভীষ্ম বুঝেছিলেন। যোদ্ধা হিসেবে তাঁর নিজের মর্যাদা তখন কম নয়, অতএব একাকী একরথে তিনি রওনা দিলেন কাশীর দিকে— রথেনৈকেন শত্রুজিৎ। উদ্দেশ্য— কাশীরাজের তিন সুন্দরী কন্যাকে ছোটভাই বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া।

ভীষ্ম যখন কাশী-রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন দেখলেন— রাজারা সব আগেই এসে গেছেন। স্বয়ম্বর-সভা আরম্ভ হচ্ছে প্রায়। রাজারা সব নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট। এমনকী পতিংবরা তিন কন্যাও বরমাল্য হাতে করে দাঁড়িয়ে আছেন প্রতীক্ষায়। ভীষ্ম রাজাদের একবার দেখে নিলেন। দেখে নিলেন কাশীরাজের তিন সুন্দরী কন্যাকেও— দদর্শ কন্যা স্তাশ্চৈব ভীষ্মঃ শান্তনুনন্দনঃ। মনে মনে ভাবলেন বুঝি— বেশ মানাবে, ভাই বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে এই তিন কন্যার জোড় বেশ মানাবে। ভীষ্ম আশ্বস্ত হয়ে বসলেন কন্যাপ্রার্থী রাজাদের জন্য নির্দিষ্ট একটি আসনে।

স্বয়ম্বর সভায় রাজাদের নাম ডাকা শুরু হল। ইনি শ্রাবস্তীর রাজা, ইনি বৈশালীর। ইনি কেকয় দেশের রাজা, ইনি শাল্বপুরের... ইত্যাদি। রাজারা উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছেন। কেউ শেষবারের মতো মাথার মুকুটটি ঠিক করে নিচ্ছেন, কেউ গলার হারমধ্যস্থিত বৈদূর্য-মণিটি সোজা করে স্থাপন করছেন, কেউ বা সোদ্বেগ মুখের আকার নিগুহন করে সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করছেন তাড়াতাড়ি। এক এক করে রাজাদের নাম পড়া হচ্ছে, আর কন্যারা সেই কীর্তিত রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে পরখ করার চেষ্টা করছেন। এরই মধ্যে যৌবনবতী কন্যাদের নজর গিয়ে পড়ল মহামতি ভীষ্মের ওপর।

পলিত কেশ, বলিরেখায় কথঞ্চিৎ দীর্ণ মুখ-মণ্ডল। ভীষ্ম বসেছিলেন নিরুত্তাপে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরুদ্বেগে। তাঁর একমাত্র ভাবনা, এই বিশাল রাজ-সমাজের বাহু-দণ্ড এড়িয়ে তাঁকে হরণ করে নিয়ে যেতে হবে এই তিন কন্যাকে।

কিন্তু হঠাৎ এ কী কাণ্ড ঘটল? তিন কন্যা ভীষ্মের দিকে এক বার তাকিয়েই যেন ভির্মি খেলেন। ভাবলেন বুঝি— এই বসন্তের ফুলবনে এক বৃদ্ধ হস্তীর প্রবেশ ঘটল কী করে? সত্যি কথা বলতে কি, ভীষ্মকে যখন তাঁরা দেখলেন, তখন যে তিনি খুব বুড়ো হয়ে গেছেন, তা তো নয়। তবে অন্যান্য রাজাদের তুলনায় তাঁর কেশে পাক ধরেছে বেশি, কিছু বলিরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ভালে, কপোলে। যৌবনবান রাজাদের মধ্যে বিপ্রতীপ একাকিত্ব নিয়ে বসে থাকা এক বৃদ্ধপ্রায় নিশ্চেষ্ট ব্যক্তিকে দেখে কাশীরাজের মেয়েরা যেন ভীষণ ভয় পেলেন। কন্যাকামী রাজাদের অধোগতি এবং মানসিক বিকার দেখে তাঁরা স্বয়ম্বর সভা ছেড়ে পালিয়ে গেলেন— অপক্রামন্ত তাঃ সর্বা বৃদ্ধ ইত্যেব চিন্তয়া।

ভীষ্মের দিকে কাশীরাজ-কন্যাদের কৌতূহলী দৃষ্টি এবং তাঁদের পালিয়ে যাওয়া দেখে সমবেত রাজারাজড়ারা ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁরা এতক্ষণ উত্তেজনার আগুন পোয়াচ্ছিলেন। কার গলায় মালা এসে পড়ে— এই সরস-কুতূহলে এতক্ষণ তাঁরা মুগ্ধ মূক হয়ে বসেছিলেন। কিন্তু মেয়েরা চলে যেতে তাঁদের মনে হল যেন লব্ধপ্রায় আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটিই হাতছাড়া হয়ে গেছে এবং অঘটনের জন্য তাঁরা ভীষ্মকেই সম্পূর্ণ দায়ী মনে করলেন।

উত্তেজনায় মুখর হয়ে সমবেত রাজারা এ বার গালাগালি দিতে লাগলেন ভীষ্মকে। তাঁদের মুখ ছুটল সমস্ত ভদ্রতা এবং মর্যাদা অতিক্রম করে। কেউ বললেন— ব্যাটার ভণ্ডামি দেখ। লোকে নাকি একে ধর্মপরায়ণ এক মহাত্মা মানুষ বলে জানে। ব্যাটা বুড়ো হয়েছে, মাথার সবগুলো চুল পাকা, আর কপালটা তো কুঁকড়ে কাকের পা হয়ে গেছে— বৃদ্ধো পরমধর্মাত্মা বলি-পলিত-ধারণঃ। অথচ এই বুড়ো-হাবড়া কী রকম বেহায়া দেখ, এই বয়সে আবার বিয়ে করার শখ চেগিয়েছে— কিংকারণম্ ইহায়াতো নির্লজ্জো ভরতর্ষভঃ।

অন্য এক জন বললেন— ব্যাটা না জোর গলায় প্রতিজ্ঞা করেছিল জীবনে বিয়ে করব না, অমুক করব না, তমুক করব না, ব্রহ্মচারী হয়ে থাকব। তো এ সব কোথাকার ন্যাকামি? লোকে এখন কী বলবে, আর ওই বা লোকের সামনে কী বলবে— মিথ্যাপ্রতিজ্ঞো লোকেষু কিং বদিষ্যতি ভারত। এখন লোক হাসিয়ে বিয়ে করতে এসেছে, ব্যাটা নাকি বেম্মচারী! ভণ্ড কোথাকার— বৃথৈব প্রথিতো ভুবি।

রাজাদের একাংশ এইভাবে ভীষ্মকে গালাগালি দিতে লাগলেন, অন্যাংশ হো হো করে হাসতে লাগলেন— ইত্যেবং প্রব্রুবন্তস্তে হসন্তি স্ম নৃপাধমাঃ। প্রসিদ্ধ ভরতবংশের জাতক হয়ে, ধনুর্বেদে পরশুরামের শিষ্য হয়ে এই অপমান ভীষ্মের পক্ষে হজম করা সহজ নয়। তাঁর ক্রোধ চরমে উঠল— ক্ষত্রিয়াণাং বচঃ শ্রুত্বা ভীষ্মশ্চুক্রোধ ভারত।

অবশ্য এইরকম একটা গণ্ডগোল, ঝুট-ঝামেলার ব্যাপার তিনি বোধহয় চেয়েওছিলেন। মনে রাখতে হবে, ভীষ্ম ভাইয়ের জন্য কন্যাবরণ করতে এসেছেন, সেখানে এমনটি নিশ্চয়ই তিনি চাননি যে, কন্যারা তাঁকেই মালা দিয়ে বরণ করুক। তিনি আগেই বুঝে এসেছিলেন যে, এই বাবদে যুদ্ধ তথা অশান্তি কিছু হবেই এবং তার সুযোগই তিনি নেবেন।

কন্যাদের রাজসভার অন্তরালে চলে যাওয়া এবং রাজাদের গালাগালি— কোনওটাই তিনি গ্রাহ্য করলেন না। স্বয়ম্বর সভার সিংহাসন ছেড়ে তিনি সাহংকারে হেঁটে গেলেন সভার অন্তরালে, যেখানে তিন কন্যা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করছিল। তিনজনের হাত ধরে বাইরে অপেক্ষমাণ নিজের রথে আগে তাঁদের উঠিয়ে নিলেন ভীষ্ম। অবস্থা দেখে অন্যান্য রাজারাও স্বয়ম্বর-সভা ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। তাঁরা হতচকিত, বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধ।

যুদ্ধের প্রথম নিয়ম হল যাতে যুদ্ধ না বাধে। সেইজন্য ভীষ্ম প্রথমে একটু শাস্ত্র-জ্ঞান দিলেন উপস্থিত রাজাদের। বললেন, উপযুক্ত গুণবান পাত্রকে ঘরে ডেকে এনে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার রীতির কথা পণ্ডিতরা অনেক বারই বলেছেন। তবে বিয়ের রীতি তো এক রকম নয়। কেউ মেয়েকে গয়নাগাঁটি দিয়ে বরকে টাকাপয়সার যৌতুক দিয়েও বিয়ে দেন, একেবারে না পারলে দুটি গোরু দান করেও বিয়ে দেন— প্রযচ্ছন্ত্যপরে কন্যাং মিথুনেন গবামপি। আবার বরপক্ষেও এমন মানুষ আছেন, যাঁরা বিয়ের জন্য কন্যাপণ দেন আবার কেউ বা জোর করে বিয়ে করেন মেয়েকে। পাত্র-পাত্রী নিজেরা পছন্দ করেও বিয়ে করে কত সময়। কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁরা রাজারাজড়া আছেন, তাঁরা স্বয়ম্বরে এসে বিবাহ সম্পন্ন করাটাই বেশি পছন্দ করেন— স্বয়ম্বরং তু রাজন্যাঃ প্রশংসন্ত্যুপযান্তি চ। আবার এই স্বয়ম্বর-সভাতেই যদি জোর করে মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে যাবার মতো ঘটনা কিছু ঘটে, তবে বীর ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সেটাই বোধহয় বেশি ভাল।

ভীষ্ম শাস্ত্রজ্ঞান বিতরণ করার পর আরও কিছু ভাল ভাল কথা বলতে পারতেন। কিন্তু তিনি তার ধারে-কাছে গেলেন না। অর্থাৎ যুদ্ধ প্রশমন করা নয়, তিনি যুদ্ধ বাধাতেই চাইছেন। নিজের শক্তি এবং ক্ষাত্রতেজের ওপর তাঁর অসীম বিশ্বাস ছিল। অতএব সমবেত ক্রুদ্ধ রাজাদের শুনিয়ে শুনিয়ে তিনি সোজা বলে বসলেন, তা এই যে ভাই রাজারা সব! এই তো আমি তোমাদের সামনেই এই মেয়ে তিনটিকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছি— তা ইমাঃ পৃথিবীপালা জিহীর্ষামি বলাদিতঃ। তোমাদের ক্ষমতা থাকে তো যুদ্ধ কর। হয় জিতবে, নয় হারবে— বিজয়ায়েতরায় বা। আমার দিক থেকে শুধু এইটুকুই জানাই, আমি যুদ্ধ করব বলে ঠিক করেই এসেছি। অতএব আমি প্রস্তুত।— স্থিতোঽহংপৃথিবীপালা যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়।

ভীষ্ম উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করলেন না। তিন কন্যাকে সাবহেলে রথে চাপিয়ে তিনি রথ চালিয়ে দিলেন অসামান্য দ্রুততায়। এক বার শুধু পিছন দিকে তাকিয়ে বললেন— বিদায়— আমন্ত্র্য স তান্ প্রায়াচ্ছীঘ্রং কন্যাঃ প্রগৃহ্য তাঃ।

ভীষ্মের কথা শুনে সমবেত রাজারা রাগে অপমানে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগলেন, এক হাত দিয়ে আরেক হাতে চড়-চাপড় মারতে আরম্ভ করলেন— যেন সে সব আঘাত ভীষ্মের ওপরেই গিয়ে পড়ছে। যুদ্ধামোদী রাজারা তখন কন্যালাভের আশায় এবং বিশেষত ভীষ্মকে শাস্তি দেবার জন্য স্বয়ম্বরসভার উপযুক্ত গয়নাগাঁটি ছেড়ে যুদ্ধের উপযুক্ত বর্ম পরার জন্য ব্যস্ত হলেন। ভূষণ-অলংকার তাড়াতাড়ি ছুড়ে ফেলেই লোহার বর্ম পরে নিতে হবে। সে এক তুমুল কাণ্ড বেধে গেল— সম্ভ্রমো সুমহানভূৎ।

বর্ম-কবচ পরে ঢাল-তরোয়াল উঁচিয়ে রাজারা ঘোড়ায় চড়ে ভীষ্মের পশ্চাদ্ধাবন করলেন— প্রযান্তমথ কৌরব্যমনুসস্রুরুদায়ুধাঃ। যুদ্ধ আরম্ভ হল। ভীষ্ম একদিকে একা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যপক্ষে কন্যালিপ্সু রাজারা। ভীষণ যুদ্ধ। শর-তোমর-পরশুর বৃষ্টি। মহাভারতের কবি এই যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন, আমরা তার মধ্যে যাচ্ছি না। শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত হব যে, এতগুলি রাজার বিরুদ্ধে ভীষ্মের আত্মরক্ষার নৈপুণ্য এবং একযোগে পরপক্ষচ্ছেদনের ক্ষমতা দেখে তাঁর শত্রুরাও তাঁকে প্রশংসা করেছিলেন— রক্ষণঞ্চাত্মনঃ সংখ্যে শত্রবোঽপ্যভ্যপূজয়ন্।

সমবেত রাজারা ভীষ্মের কাছে হেরে গেলেন। ভীষ্ম শান্তমনে তিন কন্যাকে রথে চাপিয়ে হস্তিনাপুরের দিকে রথ চালিয়ে দিলেন। তিন কন্যা এতক্ষণ ভীষ্মের রথেরই পুচ্ছভাগে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা আগে ভেবেছিল যে, সমবেত স্বয়ম্বরকামী রাজাদের কাছে এই বৃদ্ধপ্রায় মানুষটি ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবেন। কিন্তু তা হল না। এঁদের মধ্যে মধ্যমা এবং কনিষ্ঠা কন্যাটির কোনও ভাববিকার ছিল না। এই বৃদ্ধপ্রায় লোকটির সঙ্গে যেতে হচ্ছে এবং হয়তো তাঁকে বিয়েও করতে হবে— এই ভাবনায় তারা কিছু অস্বস্থ বিমনা হয়েই ছিল। কিন্তু এই তিন কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠাটি ভীষ্মের বল-বিক্রম দেখে একটু অবাকই হয়েছিল বোধহয়। মুখে তার কোনও বাকস্ফূর্তি হয়নি, মহাভারতের কবিও এ বাবদে স্বকণ্ঠে কিছু বলেননি। কিন্তু বিধাতার কপাল-লিখন যেমন শুধু ফললেই তবে বোঝা যায়, সেই ললাট-লিখনের মতো সুপ্ত নিগূঢ় কিছু লিখনের আঁচড় হয়তো পড়ে গেল এই জ্যেষ্ঠা কন্যাটির অবচেতন হৃদয়ে। না, এ বাবদে এখনই কোনও মন্তব্য করা যাবে না, কারণ আমরা এখনও কোনও কিছুই জানি না, এমনকী হৃদয়ের অস্পষ্ট লিখনের কথাও জানি না।

AMARBOI.COM

২

এখনকার রাজস্থানে আলোয়ার বলে যে জায়গাটা আছে, প্রাচীনকালে তার নাম এবং ভৌগোলিক পরিচিতি অন্য রকম ছিল। আমাদের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার রিপোর্ট খুঁটিয়ে দেখলে জানা যাবে, প্রাচীনকালে শাল্বপুর বলে যে জায়গাটি ছিল, সেটাই এখনকার আলোয়ার অঞ্চল। শাল্বপুরে শাল্ব রাজারা শাল্বায়ন গোষ্ঠীর মানুষেরা থাকতেন বলেই পণ্ডিতজনের বিশ্বাস। শাল্বপুর কী করে আলোয়ারে পরিণত হল, তা নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিক পরম্পরাটা পরিষ্কারভাবেই দেখানো যায়। পণ্ডিতেরা বলেন 'শাল্বপুর' কথাটা লোকমুখে সহজীকৃত হয়ে 'শালওয়ার' হয়ে যায়। তারপর 'শালওয়ার' পরিণত হয় 'হালওয়ারে'।

তালব্য 'শ' কী করে 'হ'-এ পরিণত হয়, তা বুঝতে হলে আমার মাস্টারমশাইয়ের ব্যঙ্গোক্তিটি মনে রাখতে হয়। তিনি বলেছিলেন— দেখো বাপু! পূর্ববঙ্গনিবাসী ব্যক্তির কাছে কখনও আশীর্বাদ ভিক্ষা কোরো না। কেননা তাঁরা 'শতায়ু হও' বলতে গিয়ে বলবেন 'হতায়ু হও'— 'শতায়ুরিতি বক্তব্যে হতায়ুরিতি কথ্যতে'। মাস্টারমশাই এবং আমি দু'জনেই পূর্ববঙ্গের মানুষ বলেই আমরা খুব সহজে বুঝতে পারি 'শালওয়ার' কী করে 'হালওয়ার' হয়। আর 'হালওয়ার' থেকে 'আলওয়ার' শব্দটা শুধু উচ্চারণের দৃঢ়তা এবং কোমলতা থেকেই নিষ্পন্ন হবে।

যাই হোক 'আলওয়ার' জায়গাটার পূর্বরূপ শাল্বপুর যখন বিশিষ্ট নগর হিসেবে পরিচিত

ছিল, তখন তার একটা স্বাতন্ত্র্যও ছিল। পরবর্তী কালে শাল্বদেশ মৎস্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু আমরা যখনকার কথা বলছি, তখন শাল্বপুর ছিল মৎস্যদেশের পাশেই। মহাভারতে বারংবার শাল্বদের নাম উচ্চারিত হয়েছে মৎস্যদেশের সঙ্গে, যুগ্মভাবে আবার কখনও বা আলাদা করে— 'শাল্বা মৎস্যাস্তথা', অথবা 'শাল্বমৎস্যাস্তথা'। কোনও কোনও পণ্ডিত অবশ্য বলেন— শাল্বরা থাকতেন আরাবল্লী পাহাড়ের পশ্চিমে কোনও জায়গায়, আবার কেউ বা বলেন— শাল্বদের বসতি ছিল যমুনা-তীরবর্তী অঞ্চলে। আবার কেউ বা বলেন— শাল্বপুর ছিল গুজরাটের উত্তর-পূর্ব কোনও স্থান। শাল্বদেশের রাজাকে কখনও কখনও সৌভপতি বলেও উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাতে বোঝায় সৌভ ছিল শাল্বের প্রতিশব্দ মাত্র।

আমরা যে রাজার কথা বলছি, তিনি তখনকার দিনের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা। নিজের দেশের নামে তাঁকে শাল্ব-রাজা বলেই ডাকা হয়েছে অর্থাৎ তিনি এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন যে তাঁকে দেশের নামে ডাকতেও বাধা হয়নি কারও। এই শাল্বপতি কোনও সময়ে কাশীরাজ্যে এসেছিলেন। হয়তো এই আগমনের পিছনে সৌভপতির উদ্দেশ্য ছিল নিছক ভ্রমণ অথবা রাজনৈতিক কারণ। কাশীরাজ্যের মতো বিখ্যাত রাষ্ট্রকে মিত্রগোষ্ঠীর সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করাটাও কাশীরাজ্যে শাল্বরাজার আগমনের হেতু বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

লক্ষণীয় ব্যাপার হল, এই রাষ্ট্রনৈতিক বন্ধু-ভাবনার প্রক্রিয়া চলার সময়েই কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সৌভপতি শাল্বের। হয়তো এই পরিচয় গাঢ় থেকে গাঢ়তর হল কাশীরাজ্যের দিগন্তলীন তমাল-বিপিনে, হয়তো বা গঙ্গার তীরভূমির স্নিগ্ধ ছায়াময় বেতসী-তরুর তলায় কোনও কুঞ্জবনে অথবা হয়তো রাজার উদ্যান-বাটিকায় যেখানে কাশীরাজের সঙ্গে একান্তে কথা বলবার সময় ক্রীড়াচ্ছলে অথবা স্বেচ্ছাকৃতভাবে অম্বার যাতায়াতে। মহাভারতের কবি শাল্বরাজের সঙ্গে অম্বার প্রথম মিলনের কথা ঘটা করে উচ্চারণ করেননি। তবে তাঁর উদার শ্লোকরাশি থেকে বোঝা যায়— অম্বা শাল্বরাজের রূপে গুণে বশীভূত হয়ে পড়েছিলেন।

অম্বার মনের কথা শাল্বরাজের জানতে দেরি হয়নি। তিনি কাশীরাজের কাছে অম্বাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন। কাশীরাজ সৌভপতির হৃদয় এবং মর্যাদা বুঝে তাঁকে তৎক্ষণাৎ কন্যা সম্প্রদান করলেন না বটে, কিন্তু প্রত্যাখ্যানও করলেন না। আসলে তাঁর মনোবাসনা কিছু অন্য রকম ছিল। সেকালের দিনের এক বিখ্যাত দেশের মর্যাদাময় রাজপুরুষ হওয়ার দরুন কাশীরাজ এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে নিজের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে শাল্বরাজের হাতে তুলে দিতে চাননি। তা ছাড়া আরও দুটি কন্যা রয়েছে। তারাও বিবাহযোগ্যা। কাশীরাজ ভাবলেন, একটি স্বয়ম্বর-সভা ডেকে যদি বিভিন্ন রাজ্যের রাজা-রাজড়া এবং রাজপুত্রদের নিমন্ত্রণ জানানো যায়, তা হলে বিবাহের আড়ম্বরও সম্ভব হবে এবং কাশীরাজের মর্যাদারও উপযুক্ত হবে সেটা। শাল্বরাজার বা তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার মনোবাসনাও তাতে অপূর্ণ থাকবে না। স্বয়ম্বর-সভার মধ্যেই অম্বা তাঁর পরম ঈপ্সিত শাল্বরাজের গলায় মালা দেবেন, কারও সেখানে কিছু বলার থাকবে না। কাশীরাজের অন্য কন্যারাও এই স্বয়ম্বরে তাঁদের নিজের সুযোগ পাবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা জানি, সেকালের দিনের স্বয়ম্বর-সভা অনেক সময় এইভাবে প্রহসনে পরিণত হত। পিতামাতারা পূর্বেই একটি বিবাহ-সম্বন্ধ ঠিক করে রাখতেন এবং স্বয়ম্বর-কালে কন্যা অনেক সময়েই সেই পিতামাতার ইচ্ছাপূরণ করতেন।

এখানেও সেই ঘটনা ঘটতে চলেছে। কিন্তু সবকিছুই গণ্ডগোল হয়ে গেল ভীষ্মের আগমনে। কুমার বিচিত্রবীর্য, যাঁর বিবাহের কারণে ভীষ্ম এখানে এসেছেন সেই বিচিত্রবীর্য নিজে এলে হয়তো এত ঘটনা এখানে ঘটত না। হয়তো অম্বাকে বাদ দিয়েই অন্য দুটি রমণীর পাণিপ্রার্থী হতেন তিনি। যাই হোক, বাস্তবে যা ঘটল তা হল, ভীষ্ম তিন কন্যাকে বিনা বাক্যব্যয়ে রথে তুললেন এবং প্রাথমিক যুদ্ধে সমবেত রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি জিতেও গেলেন। অন্যান্য রাজারা যখন যুদ্ধ করছিলেন, তখন তাঁদের মধ্যে শাল্বরাজাও ছিলেন। নিজের মনের গূঢ় অভিসন্ধি গোপন করে তিনি যেমন স্বয়ম্বর-সভায় অন্য রাজাদের সঙ্গে মিশে একক বসেছিলেন, যুদ্ধের সময়েও তেমনই অন্য রাজাদের সঙ্গে একত্র যুদ্ধ করছিলেন তিনি।

কিন্তু ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধে সমবেত রাজারা যখন যুদ্ধ ছেড়ে ভীষ্মেরই প্রশংসা করতে লাগলেন। তখন শাল্বরাজের পক্ষে আর নিজেকে গোপন রাখা সম্ভব হল না। তিনি আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হলেন। তিনি একাকী পশ্চাদ্ধাবন করলেন ভীষ্মের— অভ্যগচ্ছদ্ অমেয়াত্মা ভীষ্মং শান্তনবং রণে। হঠাৎ শাল্বরাজ একা কেন ভীষ্মের পিছু নিলেন, তার কারণ হিসেবে একটা অসাধারণ উপমা ব্যবহার করেছেন মহাভারতের কবি এবং এই উপমাটি পশু-সম্বন্ধীয়। কবি বলেছেন— একটি সাধারণ হস্তী যখন একটি কামোন্মত্তা হস্তিনীর পিছন পিছন যেতে থাকে কামনাপূর্তির আশায় তখন সেই স্ত্রীকামী হস্তীকে যেমন যূথপতি হস্তী এসে দাঁত দিয়ে আঘাত করে পিছন দিক থেকে, ঠিক তেমনই শাল্বরাজও ভীষ্মের পশ্চাদ্ধাবন করলেন— বারণং জঘনে ভিন্দন্ দন্তাভ্যামপরো যথা। বাসিতামনুসম্প্রাপ্তো যূথপো বলিনাং বরঃ।

শাল্বরাজার একটাই ভুল হয়েছিল তিনি ভীষ্মকেই কন্যাপ্রার্থী ভেবেছিলেন এবং সেইজন্যই নিদারুণ ক্রোধে ভীষ্মকে আক্রমণ করলেন এবং আক্রমণের সময় অসংখ্য বাক্যবাণে তাঁকে আগেই আকুলিত করে তুললেন। বেশিক্ষণ সহ্য হল না। নির্ধুম অগ্নির মতো— ক্রোধাদ্ বিধুমোঽগ্নিরিব জ্বলন্— ক্রোধের সর্বব্যাপ্ত শিখা ছড়িয়ে দিয়ে পলিতপ্রায় ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত করে ভীষ্ম তাঁর রথ ঘোরালেন শাল্বরাজের দিকে। একবার যুদ্ধজয়ী ভীষ্মকে পুনরায় যুদ্ধভূমিতে ফিরতে দেখে সমবেত রাজারা যুদ্ধ দেখার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন— প্রেক্ষকাঃ সমবর্তন্ত ভীষ্ম-শাল্ব-সমাগমে।

ছুটন্ত রথ এক দিক থেকে আরেক দিকে ঘুরিয়ে আনতে সময় লাগে। সেই রথকে যুদ্ধের উপযোগী সমতল ক্ষেত্রে স্থাপন করতে আরও একটু সময় লাগে সারথির। কিন্তু শাল্ব এই সময়টুকু দেননি, রথ ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বাণবর্ষণ শুরু করেছেন। পূর্বজয়ী ভীষ্মকে এইভাবে হঠাৎ কাবু হয়ে পড়তে দেখে পার্শ্ববর্তী প্রেক্ষক রাজারা সব হাততালি দিয়ে উঠলেন, শাল্বরাজাকেও যথোচিত প্রশংসা করতে আরম্ভ করলেন। এতে ভীষ্মের রাগ আরও বেড়ে গেল। তিনি একবার শুধু মুখে বললেন— দাঁড়া ব্যাটা। দেখাচ্ছি মজা— তিষ্ঠ তিষ্ঠেত্যভাষত।

ভীষ্ম সারথিকে বললেন— ঠিক যেখানে শাল্বরাজ দাঁড়িয়ে আছেন, সেইখানে আমার রথটি স্থাপন করো। বন্দুকের যেমন 'রেঞ্জ' থাকে তেমনই বাণেরও একটা 'রেঞ্জ' আছে। হয়তো সেই সুবিধার জন্যই কাছে যাওয়া। মহাভারতের কবি আবারও একটি বন্য উপমা দিলেন। বললেন, একটি সন্তপ্তা গাভীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য দুটি বৃষ যেমন গর্জন করতে থাকে, তেমনই শাল্ব এবং ভীষ্ম যুদ্ধোন্মাদী হয়ে গর্জন করতে লাগলেন পতিম্বরা কন্যা তিনটিকে মাঝখানে রেখে— তৌ বৃষাবিব নর্দন্তৌ বলিনৌ বাসিতান্তরে। আমরা জানি, ভীষ্ম কন্যাকামী নন, অতএব তাঁকে এই মুহূর্তে বৃষ বলা যায় না, কিন্তু রমণীকে হরণ করার নিরিখে শাল্বরাজের কাছে তিনি বৃষ ছাড়া আর কী?

যাই হোক ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হল। ভীষ্ম একদিকে শাল্বের বাণ প্রতিহত করতে লাগলেন, অন্য দিকে একে একে তাঁর অশ্বগুলি, তাঁর সারথি এবং শেষ পর্যন্ত রথটিও খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন। শাল্বরাজ সহায়-সাধনহীন অবস্থায় ভীষ্মের বাণাঘাতে শুধু জীবন নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বিস্তীর্ণ যুদ্ধভূমিতে। ভীষ্ম তাঁকে মারলেন না, বিবাহের সভায় এসে অনর্থক এই হত্যা তাঁর স্বভাবের মধ্যে আসে না। কামুক পুরুষের কাম-বাসনা বাণের আঘাতে তৃপ্ত করে দিতেই তাঁর কৌতুক হল যেন। শাল্বকে তিনি জীবন্ত অবস্থায় ছেড়ে দিলেন— জিত্বা বিসর্জয়ামাস জীবন্তং নৃপসত্তমঃ।

প্রার্থিতা রমণীর সামনে পরাজয়ের এই অপমান শাল্বরাজের ক্ষত্রিয়-হৃদয়ে কতটা আঘাত করেছিল, তা পরে বোঝা যাবে। আপাতত তিনি লজ্জায় অপমানে মাথা নিচু করে নিজের রাজ্য শাল্বপুরে প্রবেশ করলেন এবং নিস্তব্ধভাবে রাজ্য চালাতে লাগলেন। অন্য দিকে ভীষ্ম তাঁর শত্রুবিজয় অব্যাহত রেখে যুদ্ধজয়ের কেতন উড়িয়ে রওনা দিলেন হস্তিনাপুরের দিকে। আপন রথস্থ তিন কন্যার জ্যেষ্ঠাটি এই যুদ্ধজয়ের পর তাঁর কপোল-লম্বিত চঞ্চল কুন্তলগুচ্ছ সরিয়ে একবারের তরেও এই পলিতপ্রায় বৃদ্ধ যুবকটির দিকে লোচন আয়ত করেছিলেন কি না, ভীষ্ম তা খেয়াল করলেন না। তিনি এটাও খেয়াল করলেন না যে, শাল্বরাজা পরাজিত হবার ফলে তিন কন্যার একজনের মুখে কোনও দুঃখের ছায়া ঘনিয়ে এল কি না।

সমস্ত রাজাকে হারিয়ে দিয়ে কাশীরাজের তিন কন্যাকে হরণ করে আনার মধ্যেই ভীষ্মের সার্থকতা। সেই সার্থকতার গর্ব নিয়েই তিনি রথ হাঁকিয়ে দিলেন হস্তিনাপুরের দিকে। রাস্তায় কত নদী-পাহাড় পড়ল। কত বন, কত বিচিত্র বৃক্ষের শোভা দেখতে দেখতে ভীষ্ম বাড়ি ফিরলেন। পুত্রবধূর শুচিতায় ভগিনীর সহজতায় অথবা কন্যার বাৎসল্য পদে পদে বিজ্ঞাপন করে তিন কন্যাকে হস্তিনাপুরে নিয়ে এলেন ভীষ্ম— স্নুষা ইব স ধর্মাত্মা ভগিনীরিব চানুজাঃ। যথা দুহিতরশ্চৈব পরিগৃহ্য যৌ কুরূন্। এত কষ্ট করে, রাজাদের কাছে এত অপমান সহ্য করেও ভীষ্ম এই কন্যাহরণের মতো কাজটি করতে গেলেন কেন? না, এতে তাঁর ছোটভাই বিচিত্রবীর্য খুশি হবেন— ভ্রাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।

কন্যা তিনটিকে নিয়ে ভীষ্ম তাঁদের প্রথমে গচ্ছিত করলেন জননী সত্যবতীর কাছে এবং তাঁর সঙ্গেই প্রথম আলোচনা করলেন, কবে কীভাবে কত আড়ম্বরে বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে হৃতকন্যাদের বিবাহ দেওয়া যায়— সত্যবত্যা সহ মিথঃ কৃত্বা নিশ্চয়মাত্মবান্।

জননী সত্যবতী এই বিবাহ-আয়োজনের ভার সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিলেন ভীষ্মের ওপর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভীষ্ম এবার ঋত্বিক এবং বৈতানিক ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। বিবাহের দিন-ক্ষণ, শুভ মুহূর্ত, লগ্ন এবং মঙ্গল-উৎসবের আড়ম্বর সবকিছু নিয়েই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আলোচনা চলছে ভীষ্মের। যে সভায় ভীষ্ম বসে আছেন, সেখানে ব্রাহ্মণদের সংখ্যাই বেশি, হয়তো মন্ত্রী অমাত্য দু'-একজন আছেন, আর আছেন ভীষ্ম।

এই আলোচনা-সভা চলার সময় অতি অদ্ভুত এক ব্যাঘাত ঘটল, যা ইতিপূর্বে হস্তিনাপুরে কখনও ঘটেনি। সভা চলছে, এই অবস্থাতেই কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যাটি সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁর মনে স্ত্রীজনোচিত কোনও সংকোচ নেই। নেই কন্যাজনোচিত লজ্জা। ভীষ্মকে তিনি কিছু বলতে চান। ভীষ্ম তাঁর দিকে উন্মুখ এবং অবহিত হতেই কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা স্মীয়াধরে ভুবনভোলানো হাসি ছড়িয়ে বললেন— মহাশয়! ধর্ম কী বস্তু আপনি জানেন, কারণ আপনি ধর্মজ্ঞ। আমি আপনাকে কিছু নিবেদন করতে চাই। সেটা জেনে যা আপনার ধর্ম বলে মনে হয়, তাই আপনি করবেন— এতদ্ বিজ্ঞায় ধর্মজ্ঞ ধর্মতত্ত্বং সমাচর।

কথার আগেই ভীষ্মকে ধর্মজ্ঞের সম্বোধনে সম্বোধন করে ধর্মানুসারে কাজ করার অনুরোধ জানানোর মধ্যে অম্বার কিছু উদ্দেশ্য আছে এবং ধর্মানুসারে বিচার করলে তিনি যে তাঁর অনুকূলেই রায় পাবেন— এটাও তাঁর বিশ্বাস আছে। যাই হোক, অম্বা বললেন, এই যে স্বয়ম্বর হয়ে গেল, তার আগে, অনেক আগেই আমি মনে মনে সৌভপতি শাম্বরাজকে স্বামী হিসেবে বরণ করেছিলাম— ময়া সৌভপতিঃ পূর্বং মনসা হি বৃতঃ পতিঃ। আর শাম্বরাজও আমাকে তাঁর পত্নীর স্থান দেবেন বলে স্বয়ম্বরের পূর্বেই আমাকে বেছে নিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা আমার পিতারও জানা ছিল। কাশীরাজ আমাদের এই মনের মিলন বৈবাহিক সম্বন্ধে পরিণত করতে চেয়েছিলেন— তেন চাস্মি বৃতা পূর্বমেষ কামশ্চ মে পিতুঃ।

নিজেদের পূর্বরাগের কথা জানিয়ে কাশীরাজনন্দিনী এবার তাঁর আসল ইচ্ছেটা জানালেন ভীষ্মের প্রতি তিরস্কারের অঙ্গুলি-সংকেত করে। বললেন— এই স্বয়ম্বর সভাতে আমি শাম্বরাজের গলাতেই আমার বরণমালা পরিয়ে দিতাম— ময়া বরয়িতব্যোঽভূৎ শাম্বস্তস্মিন্ স্বয়ম্বরে।

অম্বা আর একটি কথাও বলেননি। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর পূর্বপরিকল্পিত কার্য-পদ্ধতির মধ্যে অনর্থ ডেকে এনেছেন ভীষ্ম। স্বয়ম্বর-সভা থেকে তিন কন্যাকে হরণ করে নিয়ে এসে তিনি এক প্রেমিকযুগলের আশা-আকাঙ্ক্ষায় জল ঢেলে দিয়েছেন।

অম্বা একা ভীষ্মের সামনেই তাঁর গোপন প্রণয় ব্যক্ত করেননি। সভায় মন্ত্রী ব্রাহ্মণরা বসে ছিলেন। কাজেই একান্তে হলে ভীষ্ম সে প্রার্থনা উড়িয়ে দিতে পারতেন। আমরা জানি তিনি এই প্রার্থনা উড়িয়ে দিতেন না— তবু একান্তে হলে তিনি যদিও বা অন্যরকম কিছু করতেও পারতেন, কিন্তু এই সমবেত ন্যায়বিৎ ব্রাহ্মণদের সামনে তা করা সম্ভব নয়। অম্বার কথা শুনে ভীষ্ম যতটা বিব্রত হলেন, তার থেকে বেশি চিন্তাকুল হলেন। এই মেয়েকে নিয়ে এখন কী করা যায়, কোন কাজ অপহৃতা কাশীরাজনন্দিনীর উপযুক্ত হবে— চিন্তামভিগমদ্ বীরো যুক্তাং তস্যৈব কর্মণঃ।

কাশীরাজনন্দিনী নিজের যুক্তি দিয়ে আরও একটা কথা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ভীষ্মকে। বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, সমস্ত রাজাকে হারিয়ে বীরের দর্পে ভীষ্ম তাঁর শরীরটা হস্তিনাপুরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে আসতে পেরেছেন বটে, কিন্তু তাঁর মন-প্রাণ রয়ে গেছে শাল্বপুরে ব্যথিত শাল্বরাজার কাছে। অম্বা বলেছিলেন, জোর করে আপনি আমাকে এখানে এনেছেন বটে, কিন্তু আপনি তো আর জোর করে আপনার ভাইকে ভালবাসাতে পারবেন না। আপনি প্রসিদ্ধ কুরুবংশের জাতক হয়ে কী করে এক অন্যপূর্বা নারীকে নিজের ঘরে রাখবেন— বাসয়েথা গৃহে ভীষ্ম কৌরবঃ সন্ বিশেষতঃ। ভীষ্ম জানেন— রাজকীয় মর্যাদা বা ক্ষাত্রধর্মের তেজ দেখিয়ে একটি রমণীকে হরণ করা যায় বটে কিন্তু তার মন পাওয়া যায় না, কিংবা তার মনের পূর্বাস্বাদিত লালিত কেন্দ্রগুলিকেও নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায় না। ভীষ্ম এটা জানেন।

কিন্তু রমণীর মন! সে কি সত্যিই বোঝেন ভীষ্ম। কোনও রমণীর সঙ্গে তাঁর পূর্বরাগ হয়নি। কাউকে তিনি ভালবাসেননি এমনকী কাউকে ভালবাসবেন না, কাউকে বিবাহ করবেন না বলে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন। এই অবস্থায় অম্বার বক্তব্য তাঁর পক্ষে বোঝা মুশকিলই বটে। কিন্তু অবিবাহিত পুরুষ অথবা যে পুরুষ কখনও স্ত্রী-হৃদয়ের ভাবনা একটুও ভাবেনি, সে স্ত্রীলোকের ব্যাপারে উচ্চকিত থাকে বেশি। পিতার বিবাহের সময় ভীষ্ম পূর্বাপর কোনও বিবেচনা না করে প্রায় সমবয়সি এক রমণীকে জননীতে পরিণত করেছিলেন।

কাজেই অম্বা যখন বলেছিলেন— আমার জন্য শাল্বরাজ এখনও নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছেন— স মাং প্রতীক্ষতে ব্যক্তম্— আপনি আপনার বুদ্ধি দিয়ে বিচার করুন, আপনার মন দিয়ে বিচার করুন— এতদ্‌বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য মনসা ভরতর্ষভ— তখন কিন্তু এই উচ্চকিত বৃদ্ধ আর দেরি করেননি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে জননী সত্যবতীর কাছে সমস্ত ঘটনা নিবেদন করেছেন। রাজকীয় মর্যাদার ব্যাপারও এখানে আছে। তিন কন্যাকে হরণ করে আনা হল, আর বিবাহের সময় পাওয়া গেল দুই কন্যা। তা তো হতে পারে না। অতএব মন্ত্রী, পুরোহিত, ঋত্বিক সবাইকে জানিয়ে ভীষ্ম কাশীরাজনন্দিনীকে অনুমতি দিলেন শাল্বরাজের কাছে ফিরে যাবার জন্য— সমনুজ্ঞাসিতং কন্যামম্বাং জ্যেষ্ঠাং নরাধিপ।

ভীষ্মের বিষয়বুদ্ধি কিছু কম নেই। এক কন্যা রমণী হস্তিনাপুর থেকে শাল্বপুরে যাবেন, তাঁর স্ত্রীজনোচিত সমস্যা আছে, পথের ভয় আছে এবং তাঁর মর্যাদা-রক্ষার ব্যাপারও আছে। অতএব অম্বা যেদিন শাল্বপুরের পথে পা বাড়ালেন, সেদিন তাঁর সঙ্গে দেওয়া হল একটি ধাত্রী রমণীকে আর দেওয়া হল কতকগুলি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে। তাঁরা সমস্ত পথ ধরে অম্বার সুরক্ষার ব্যবস্থা করবেন— বৃদ্ধৈর্দ্বিজাতিভির্গুপ্তা ধাত্র্যা চানুগতা তদা। অম্বা হস্তিনাপুর ছেড়ে চলে গেলেন শাল্বপুরের দিকে। কত পথ, কত নদ-নদী পেরিয়ে মনে মনে শাল্বরাজের কথা ভাবতে ভাবতে অম্বা পথ চলতে থাকলেন। ভাবলেন, কতই না আশ্চর্য হবেন শাল্বরাজ। যে কাশীরাজ কন্যাকে বিবাহের জন্য হরণ করা হয়েছিল সেই প্রিয়তমা সমস্ত বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে নিজে এসে উপস্থিত হয়েছেন তাঁর কাছে— শাল্বরাজ কত খুশি হবেন তাঁকে দেখে! রাজ্য জয় করাও তো কিছুই নয় এই অদ্ভুত ঘটনার কাছে।

অম্বা শাল্বকে বললেন, আমি সব কিছু ছেড়ে, সমস্ত বাধা অতিক্রম করে তোমার কাছে ফিরে এসেছি, তুমি আমাকে গ্রহণ করো— আগতাহং মহাবাহো ত্বামুদ্দিশ্য মহামতে। একই পংক্তিতে 'মহাবাহু' এবং 'মহামতি'— এই সম্বোধন দুটি খেয়াল করার মতো। ক'দিন আগেই ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধে শাল্বরাজ প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন। অম্বা বোঝাতে চাইলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতে কী! যুদ্ধে ওরকম হয়ই। তুমি আমার কাছে মহাবাহু সেই বীরপুরুষটিই আছ। আর 'মহামতি'! যে রমণীকে বিবাহের জন্য হরণ করা হয়েছিল, তাঁকে সেই ঘর থেকে ফিরে আসতে হয়েছে প্রেমের তাড়নায়। প্রিয়তম নায়ক যদি ভুল বোঝেন, তাই শাল্বরাজের সুস্থিরা বুদ্ধির কাছে নিবেদন আছে এই দীনা রমণীর। তাই এমন সম্বোধন— মহামতি!

কিন্তু এই বিপন্ন মুহূর্তেও অম্বার মধুর সম্বোধনে শাল্বরাজের হৃদয় বিগলিত হল না। তিনি সামান্য ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়ে অম্বাকে বললেন, কেন! তোমার জায়গার অভাব কোথায়? তুমি সেই ভীষ্মের কাছে ফিরে যাও। অন্য একজন বিয়ের সাধ করে তোমাকে টেনে নিয়ে গেল, আর সেই মেয়েকে আমি ভার্যার মর্যাদা দেব, তা কী করে হয়? তুমি ভীষ্মের কাছে ফিরে যাও— গচ্ছ ভদ্রে পুনস্তত্র সকাশং ভীষ্মকস্য বৈ।

শাল্বরাজ মনে করেছিলেন, ভীষ্মই তাঁর প্রিয়তমা রমণীকে বিয়ে করার ইচ্ছেয় তাঁকে হরণ করেছেন। অম্বা শাল্বর ভুল ভেঙে দেবার চেষ্টা করলেন। বললেন, আমার বয়স বেশি নয়, রাজা! সবকিছু আমি বুঝি না, কিন্তু আমি তো তোমার কাছে আত্মনিবেদন করেছি, আমি তোমার ভক্ত। লোকে কি একান্ত বশম্বদ জনকে পরিত্যাগ করে? তা ছাড়া ভীষ্মের কথা বলছ? আমি কিন্তু তাঁর অনুমতি নিয়েই এখানে এসেছি। আরও একটা কথা। তিনি কিন্তু নিজে বিয়ে করার জন্য আমাদের হরণ করেননি। ভাই বিচিত্রবীর্যের জন্য তিনি এই কাজ করেছেন এবং আমার আর দুই বোনের সঙ্গে তাঁর বিয়েও হয়ে গেছে। আমি শুধু ভীষ্মকে আমার অভিসন্ধি জানিয়ে এখানে আসার অনুমতি লাভ করেছি— অনুজ্ঞাতা চ তেনৈব ততোহং ভৃশমাগতা।

অম্বা যেভাবে ভীষ্মের কথা বলেছেন, তাতে এই মুহূর্তে ভীষ্মের প্রতি তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে। কিন্তু শাল্বরাজ তাঁর বুদ্ধিতেই অম্বার বিচার করেছেন। তিনি বলেছেন, ভীষ্ম যখন সমস্ত রাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে তোমাকে রথে তুললেন তখন তো বেশ খুশি-খুশিই দেখাচ্ছিল তোমাকে— ত্বং হি ভীষ্মেণ নির্জিতা নীতা প্রীতিমতী তদা। অন্য লোক যাকে এইভাবে নিয়ে গেছে, সেই অন্য লোকের হাত ধরা রমণীকে আমার মতো রাজারা বিয়ে করে না— কথমস্মদ্‌বিধো রাজা পরপূর্বাং প্রবেশয়েৎ।

অম্বা বললেন, খুশি-খুশি। আমাকে তুমি খুশি-খুশি দেখেছ? আমাকে জোর করে তুলে নিয়ে গেলেন ভীষ্ম, আর আমাকে তুমি খুশি-খুশি দেখলে— নাস্মি প্রীতিমতী নীতা ভীষ্মেণামিত্রকর্ষণ। আমাকে নিয়ে যাবার সময় কতই না কাঁদছিলাম আমি। কিন্তু তাতে কী? ভীষ্ম সমস্ত রাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে আমাকে নিয়ে গেছেন— বলান্নীতাস্মি রুদতী বিদ্রাব্য পৃথিবীপতিন্। আমার কীই বা করার ছিল?

আসলে শাল্বরাজের রাগ কোথায় আমরা জানি। প্রিয়তমার সামনে তিনি ভীষ্মের হাতে মার খেয়েছেন। রথ, অশ্ব, সারথি খুইয়ে তাঁকে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে হয়েছিল। সে অপমান তিনি ভোলেননি বলেই বারবার তিনি বলেছেন, যিনি এত যুদ্ধ করে রাজাদের হারিয়ে দিয়েছিলেন— পরামৃষ্য মহাযুদ্ধে নির্জিত্য পৃথিবীপতিন্— তুমি তাঁর কাছেই যাও। তাঁর অভিমান হল— যুদ্ধে হেরে যাবার মুহূর্তে তিনি তাঁর প্রিয়তমার মুখে খুশি-খুশি ভাব দেখেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অম্বা এ কথা অস্বীকার করেছেন বটে, তবে এমনও হতে পারে যে, সেই মুহূর্তে নিজের প্রীত ভাব সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন না। প্রৌঢ়-বৃদ্ধ ভীষ্ম যখন সমস্ত রাজকুলকে যুদ্ধে হারিয়ে দিলেন একা এবং তারপরেও যুবক বীর শাল্বরাজকেও যখন তিনি নাকানি-চোবানি খাইয়ে দিলেন, হয়তো সেই মুহূর্তে অম্বার অযান্ত্রিক মনের মধ্যে বিস্ময়ের আলো লেগেছিল! হয়তো সেই মুহূর্তে ভীষ্মের শক্তির প্রতি এক বিস্মিত নারী-হৃদয় শ্রদ্ধা জানিয়েছিল সমর্থনের হাসি হেসে। সেই স্মিতহাস্যের মধ্যে যতটুকু আবেগ প্রকাশিত হয়েছিল, তা আকস্মিক এবং অকিঞ্চিৎকর হলেও সেই ক্ষণটুকু তো মিথ্যে নয়।

আমরা অনুমানে জানি এই আকস্মিক খুশিভাবের সম্বন্ধে অম্বা সচেতন ছিলেন না। কিন্তু শাল্বরাজ তো সচেতন ছিলেন। তা ছাড়া শাল্বরাজের এমন যুক্তি থাকতেই পারে যে, যখন অম্বাকে রথে ওঠানো হল, যখন তিনি পথ চলতে লাগলেন ভীষ্মের সঙ্গে একই রথে, তখন তিনি কেন শাল্বরাজের প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা ব্যক্ত করলেন না? এমনকী রাজাদের যখন যুদ্ধে হারিয়ে দেওয়া হল, এমনকী শাল্বরাজও যখন হেরে গেলেন, তখনও তিনি কেন চেঁচিয়ে উঠলেন না আকাশ বাতাস আকুল করে? কেন এক সমর্পিতপ্রাণা প্রেমিকা ভীষ্মের সামনে আনত হয়ে বলে উঠল না— ধূলি-লুণ্ঠিত এই যুদ্ধ-ধ্বস্ত যুবকই আমার প্রাণেশ্বর।

বললে, আমরা জানি, অম্বা যদি সত্যিই মুখ ফুটে একথা একবারের তরেও বলতেন, যেমনটি এখন তিনি বলে এসেছেন, তা হলে ভীষ্ম অবশ্যই তাঁকে ছেড়ে দিতেন। কিন্তু তা হয়নি। অম্বা কিছুই বলেননি। কিন্তু শাল্বরাজের দিক থেকে বস্তুটা কীরকম হয়! তিনি অম্বাকে সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করলেন। অম্বা ভাবলেন, শাল্বরাজকে যদি ভাল করে সব কিছু বোঝানো যায়, তবে তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। অম্বা বললেন, আমি ভীষ্মের কাছে বিদায় নিয়েই এসেছি। তিনি তোমার কাছে আসার জন্য অনুমতি দিয়েছেন আমাকে। তা ছাড়া তুমি যে বার বার আমাকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে বলছ, তিনি তো আমাকে চান না— ন স ভীষ্মো মহাবাহুর্মামিচ্ছতি বিশাম্পতে।

অম্বা এবার সকরুণ সুরে বললেন, আমি তো তোমাকে ছাড়া আর কাউকে মনে মনেও ভাবিনি। আমি কখনও কারও নই, আমি তোমার— ন চান্যপূর্বা রাজেন্দ্র ত্বামহং সমুপস্থিতা। মনে রেখো, আমি একজন কুমারী কন্যা। আমি স্বয়ং তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছি, তোমার প্রসন্নতা ভিক্ষা করেছি— ত্বৎপ্রসাদাভিকাঙ্ক্ষিণীম্। অম্বা এইভাবে আত্মসমর্পণ করলেও শাল্বরাজের হৃদয় একটুও বিগলিত হল না। সাপ যেমন তার পুরনো খোলস ছেড়ে ফেলে, তেমন করেই শাল্ব ত্যাগ করলেন অম্বাকে— অত্যজদ্ ভরতশ্রেষ্ঠ জীর্ণাং ত্বচমিবোরগঃ। অম্বা অনেক কাঁদলেন, অনেক অনুনয় করলেন, অনেক কথা বললেন। শেষে বোধহয় তাঁর একটু রাগই হল। বললেন, তুমি আজকে আমায় ছেড়ে দিচ্ছ বলে এটা ভেব না যে, আমার কোনও গতি হবে না। পৃথিবীতে ভদ্রলোক এখনও কিছু আছেন, যাঁদের কাছে আমি আশ্রয় পাব— তত্র মে গতয়ঃ সন্তু সন্তঃ সত্যং যথা ধ্রুবম্। অম্বার কথা শুনে শাল্ব তাঁকে অবহেলে শেষ কথা শুনিয়ে দিলেও অম্বাকে প্রত্যাখ্যান করার মূল কারণটিও তিনি লুকোলেন না। বললেন ঠিক আছে, ঠিক আছে তুমি যাও। তবে মনে রেখো— আমি যে আজকে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করলাম, সে শুধু ভীষ্মের ভয়ে। ভীষ্ম তোমাকে তুলে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছেন, সেই তোমাকে আমি যদি গ্রহণ করি, তবে তাঁর ক্রোধকেই আমন্ত্রণ জানানো হবে— বিভেমি ভীষ্মাৎ সুশ্রোণি ত্বঞ্চ ভীষ্ম-পরিগ্রহঃ।

৩

শাল্বরাজের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অম্বা বেরিয়ে পড়লেন বটে, কিন্তু তাঁর শেষ কথাটি শুনে অম্বার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল ভীষ্মের ওপর। শাল্ব-নগরের বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে তিনি নিজের করুণ অবস্থা সম্বন্ধে ভাবনা শুরু করলেন। তিনি এটা পরিষ্কার বুঝলেন, হস্তিনাপুরে ফিরে যাবার কোনও মানে নেই। তাঁর অন্য দুই বোনের বিয়ে এতদিনে হয়ে গেছে, অথবা হবে। কিন্তু সকলের সামনে তিনি যেভাবে শাল্বরাজের প্রতি প্রেম নিবেদন করেছেন, তাতে হস্তিনাপুরে আবার ফিরে যাবার কোনও মুখ নেই তাঁর— ন চ শক্যং পুনর্গন্তুং ময়া বারণসাহ্বয়ম্।

অনেকে ভাবেন— অম্বা শাল্বরাজার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আবার ভীষ্মের কাছে যান এবং ভীষ্ম তখন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। এই প্রত্যাখ্যানের পর তাঁর ভীষ্মের ওপর রাগ হয়। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। অম্বা রাস্তায় বেরিয়েই সিদ্ধান্ত নেন, ভীষ্মের কাছেও ফিরে যাবেন না, নিজের বাড়িতেও ফিরে যাবেন না। সমস্ত ঘটনার জন্য, এমনকী স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করার জন্য নিজের পিতার ওপরেও তাঁর রাগ হয়। নিজেকেও তিনি কম ধিক্কার দেননি। ভীষ্মের সঙ্গে শাল্বের যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গেই কেন তিনি এক ছুটে শাল্বরাজার কাছে পালিয়ে আসেননি। এইসব পশ্চাত্তাপ নিরন্তর তাঁকে দগ্ধ করতে লাগল— প্রবৃত্তে দারুণে যুদ্ধে শাল্বার্থং নাগতা পুরা। কিন্তু সব কিছুর ওপরেও তাঁর মনে হল— ভীষ্ম যদি রাজসভা থেকে জোর করে তাঁকে তুলে নিয়ে না যেতেন, তা হলে কখনই এই দুর্ভাগ্য তাঁর হয় না। অতএব তাঁর জীবনের সমস্ত কষ্টের মূল হলেন সেই ভীষ্ম— অনয়স্যা তু মুখং ভীষ্মঃ শান্তনবো মম। অতএব যেভাবে হোক ভীষ্মের ওপরে শোধ নিতে হবে— সা ভীষ্মে প্রতিকর্তব্যঃ... দুঃখহেতু স মে মতঃ।

শোধ তো নিতে হবে, কিন্তু কেমন করে? অম্বা জানেন, ভীষ্মকে যুদ্ধে জেতা প্রায় অসম্ভব। এমন কোনও যোদ্ধা নেই যে প্রবল পরাক্রমী ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিশ্চিত পরাজয়ের গ্লানি উপভোগ করতে চাইবে। অতএব তপস্যা বা ব্রাহ্মণ ঋষি-মুনির সাহায্যে ভীষ্মকে পর্যুদস্ত করা যায় কি না সেই ভাবনায় তিনি শাল্বপুরের বাইরে এসেই নিজের গন্তব্যস্থল নিশ্চিত করে ফেললেন।

শাল্বপুরের সীমা শেষ হতেই একটি আশ্রম আছে। ত্যাগব্রতী মুনি-ঋষিরা সেখানে বাস করেন। এই আশ্রমের প্রধান পুরুষ হলেন মহর্ষি শৈখাবত্য। তখন সন্ধ্যা নামছে। অম্বা আস্তে আস্তে মহর্ষি শৈখাবত্যর আশ্রমে প্রবেশ করলেন ধীরপদে। অসাধারণ এক সুন্দরী যুবতী হঠাৎ তপোবনের আঙিনায় এসে উপস্থিত হল দেখে তপস্বী মুনি-ঋষিরা ভারী অবাক হলেন। তাঁরা একে একে ঘিরে ধরলেন অম্বাকে। জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ গো। তুমি কাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়ে, তুমি থাকো কোথায়, এই আশ্রমে এলে কেন? অম্বা সাশ্রুকণ্ঠে সব জানালেন— স্বয়ম্বর-সভা থেকে শাল্বরাজের শেষ প্রত্যাখ্যান পর্যন্ত। দুঃখের কাহিনি শোনাতে শোনাতেই রাত ভোর হয়ে গেল— ততস্ত্বামবসদ্রাত্রিং তাপসৈঃ পরিবারিতা।

অম্বার মুখে তাঁর দুঃখের কাহিনি শুনে তপোবৃদ্ধ মহর্ষি শৈখাবত্য বললেন, তোমার এই বিপন্ন অবস্থায় আমরা তপস্বীরা কীই বা করতে পারি, মা— এবং গতে তু কিং ভদ্রে শক্যং কর্তুং তপস্বিভিঃ? আমরা এই আশ্রমে যজ্ঞ-হোম-তপস্যা নিয়ে থাকি। সেখানে তোমার কী সুবিধে করে দিতে পারি আমরা? অম্বা তখনও কাঁদছেন, তখনও তাঁর নিঃশ্বাস দীর্ঘায়িত। মনে তাঁর যাই থাকুক, মুখে বললেন— না না, আমাকে নিয়ে বিব্রত হবেন না আপনারা। আমিও সন্ন্যাসিনী হয়ে এই আশ্রমে বসেই তপস্যা করব। পূর্বজন্মে যত পাপ করেছি, তপস্যা করে তার মূল্য চোকানোর চেষ্টা করব। আপনারা সব মুনি-ঋষি, দেবতার মতো আপনাদের স্বভাব। আমাকে আপনারা বিরত করবেন না। আমি আর আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরে যেতে চাই না— নোৎসহে তং পুনর্গন্তুং স্বজনং প্রতি তাপসাঃ।

মহর্ষি শৈখাবত্যের পর অন্য তপস্বীরাও অম্বাকে অনেক বোঝালেন। কেউ বললেন, এঁকে পিতার আশ্রয়েই ফেরত পাঠানো উচিত। কেউ বললেন, শাল্বরাজার কাছেই বা আরেকবার গেলে কেমন হয়? অনেক তর্ক-যুক্তির অবতারণা এবং তার নিরসন করে শেষ পর্যন্ত তপস্বীরা বোঝালেন— পিতার ওখানেই তোমার ফিরে যাওয়া উচিত, কারণ পিতার মতো আশ্রয় মেয়েদের আর কিছু হতে পারে না— ন চ তেহন্যা গতির্ন্যায্যা ভবেদ্‌ভদ্রে পিতা যথা। সবকিছুর ওপরে তপস্বীরা অবশ্য অম্বার অলোকসামান্য রূপ দেখে তাঁকে আশ্রমে রাখতে একটু দ্বিধান্বিতও হয়েছেন। বার বার বলেওছেন— তোমার এই রূপ, এই বয়স, এই অরক্ষিত আশ্রমে অনেক ভয়ও আছে তোমার— ভদ্রে দোষা হি বিদ্যন্তে বহবো বরবর্ণিনি। তার মধ্যে এই আশ্রমে রাজারা রাজপুত্রেরা মাঝে মাঝেই আসেন। তাঁরা তোমাকে দেখলেই প্রার্থনা জানাবেন বিবাহের জন্য। সে এক ভীষণ সমস্যা হবে।

অম্বা কোনও যুক্তি কোনও বাধা মানলেন না। বললেন, আমি আপনাদের সুরক্ষাতেই এই তপোবনে তপস্যা করব— তপস্তপ্তুম্ অভীপ্সামি তাপসৈঃ পরিরক্ষিতা। মুনিরা আর কী করেন, তাঁরা আশ্রয় দিলেন অম্বাকে। ভালই চলছিল অম্বার। গাছের ফুল কুড়িয়ে, গাছে জল দিয়ে, তপস্বীদের পুজোপহার সাজিয়ে ভালই চলছিল অম্বার। এরই মধ্যে মহর্ষি শৈখাবত্যের আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন রাজর্ষি হোত্রবাহন। তিনি রাজাও বটে, ঋষিও বটে। এঁর সঙ্গে অম্বার একটা আত্মীয়তার সম্বন্ধও আছে। রাজর্ষি হোত্রবাহন অম্বার মায়ের বাবা অর্থাৎ তিনি কাশীরাজের শ্বশুর এবং তিনি অম্বার মাতামহ।

অম্বা আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা নিবেদন করলেন রাজর্ষি হোত্রবাহনের কাছে। অম্বার ওপর তাঁর মায়া হল এবং যাঁদের কাছ থেকে অম্বা কষ্ট পেয়েছেন, তাঁদের ওপর তাঁর খুব রাগ হল। নাতনিকে নিজের কোলে বসিয়ে তিনি অভয় দিলেন, একটা বিহিত নিশ্চয় করব আমি। তোর মনে যে দুঃখ আছে, সে দুঃখ আমি দূর করব।

রাজর্ষি হোত্রবাহন অম্বাকে পরামর্শ দিয়ে বললেন, তুই জামদগ্ন্য পরশুরামের কাছে যা, মা। তিনি তোর সব দুঃখ দূর করে দেবেন। অম্বা বললেন, কোথায় থাকেন তিনি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর কেনই বা তিনি আমার কথা শুনে আমার কথায় কাজ করবেন। হোত্রবাহন বললেন, পরশুরাম আমার পরম বন্ধু। তিনি থাকেন মহেন্দ্র পর্বতে। যেমন তাঁর তপস্যার তেজ, তেমনই তাঁর ক্ষমতা অস্ত্রশক্তি। তুই সেখানে গিয়ে তাঁর পায়ে ধরে নিজের কথা বলবি এবং আমার নাম করবি। আমার কথা শুনলে, তিনি নিশ্চয় তোর ইচ্ছা পূরণ করবেন। তিনি যে আমার সখা— ময়ি সংকীর্তিতে রামঃ সর্বং তত্তে করিষ্যতি।

অম্বার ভাগ্য তখন ভালই চলছিল। অম্বার সঙ্গে যখন তাঁর মাতামহ হোত্রবাহনের কথোপকথন চলছে, সেই সময়েই সেখানে উপস্থিত হলেন মহাত্মা পরশুরামের একান্ত অনুচর, অকৃতব্রণ। ঋষিরা সকলে আসন ছেড়ে উঠে অভিবাদন জানালেন অকৃতব্রণকে। পারস্পরিক কুশল জিজ্ঞাসা শেষ হলে রাজর্ষি হোত্রবাহন পরশুরামের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি কোথায় আছেন, কেমন আছেন ইত্যাদি। অকৃতব্রণ বললেন, মহাত্মা পরশুরাম সব সময় আপনার কথা বলেন— ভবন্তমেব সততং রামঃ কীর্তয়তি প্রভো। বার বার কথাপ্রসঙ্গে তিনি আপনার বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করেন। বস্তুত আপনাকে দেখার জন্য কালই তিনি এখানে এসে উপস্থিত হবেন।

সেকালের দিনে এমন হত। মুনি-ঋষিরা এক জায়গায় বসে থাকতেন না। বিভিন্ন তীর্থে তীর্থে তাঁরা 'চরৈবেতি'র নেশায় ঘুরে বেড়াতেন, বিভিন্ন রাজার রাজকীয় ক্রিয়াকর্মে উপস্থিত থাকতেন। উপস্থিত থাকতেন বিভিন্ন জায়গায় আয়োজিত যজ্ঞভূমিতে। এইভাবে ভ্রমণ করার ফলে একের সঙ্গে অন্যের দেখা হয়ে যেত, একের কাছে অন্যের খবরও পাওয়া যেত এইভাবে। রাজর্ষি হোত্রবাহন যে শৈখাবত্যের আশ্রমে এসেছেন— এ খবর পরশুরামের কাছে আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। এখন তিনি যাতে সেখান থেকে চলে না যান সেইজন্যই অগ্রদূত হিসেবে অকৃতব্রণের আগমন।

যাই হোক, কথার মাঝখানে অকৃতব্রণ অম্বাকে দেখে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। হোত্রবাহন বললেন, এটি আমার নাতনি— দৌহিত্রীয়ং মম বিভো কাশীরাজসুতা প্রিয়া। হোত্রবাহন অকৃতব্রণের কাছে অম্বার জীবনকাহিনি বলে তাঁর দুঃখের কথা জানালেন। সঙ্গে এটাও জানাতে ভুললেন না যে, তাঁর নাতনিটি ভীষ্মকেই তাঁর সমস্ত কষ্টের মূল বলে মনে করছে— অস্য দুঃখস্য চোৎপত্তিং ভীষ্মমেবেহ মন্যতে। অম্বা হোত্রবাহনের এই কথার পরম্পরায় তাঁকে সোচ্চারে সমর্থন করলেন না বটে, কিন্তু ভাবে ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন— তিনি ভীষ্মের শাস্তি চান। মুখে শুধু বললেন, আমার বাড়িতে ফেরার কোনও উপায় নেই। আমি মহাত্মা পরশুরামের কাছে গিয়ে সব জানাব। তিনি যা করতে বলবেন, তাই করব— তন্মে কার্য্যতমং কার্য্যমিতি মে ভগবন্মতিঃ।

পরশুরামের অনুচর অকৃতব্রণ তাঁর গুরু আসবার আগেই অম্বার ব্যাপারে তাঁদের ইতিকর্তব্য বুঝে নিতে চাইলেন। কারণ রাজর্ষি হোত্রবাহনের নাতনি যখন, তখন কিছু একটা করতেই হবে। পরশুরামও তা করবেন। কিন্তু অম্বা ঠিক কী চান, সেটা আগে বুঝে নেওয়া দরকার। অকৃতব্রণ বললেন, দেখ বৎসে। যদি সৌভপতি শাল্বের ব্যাপারে এখনও তোমার দুর্বলতা থাকে, যদি তুমি মনে কর তোমার হয়ে তাঁকে বুঝিয়ে বলা দরকার, তবে মহাত্মা পরশুরাম তাই করবেন— নিযোক্ষ্যতি মহাত্মা স রামস্তদ্ধিতকাম্যয়া। আবার তুমি

যদি মনে কর— ভীষ্মকে যুদ্ধে হারিয়ে তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া দরকার, তবে পরশুরাম তাই করবেন।

ঠিক এই মুহূর্তে, অর্থাৎ যখন অম্বা বুঝলেন ভীষ্মকে শাস্তি দেওয়া যাবে, ঠিক এই মুহূর্তে ভীষ্মের প্রতি যেন তাঁর সামান্য করুণা দেখা দিল। এটাকে ঠিক দুর্বলতা বলা যাবে কি না জানি না, কিন্তু অম্বা সত্য কথা বলতে বাধ্য হলেন। অম্বা বললেন, ভীষ্ম আমাকে স্বয়ম্বর-সভা থেকে হরণ করেছিলেন বটে, তবে আমি যে শাল্বরাজকে মনে মনে ভালবাসি তা তিনি জানতেন না— নাভিজানতি মে ভীষ্মো ব্রহ্মন্ শাল্বগতং মনঃ। আমি আপনাকে সবই জানালাম। শাল্বের কথাও আপনাকে বলেছি। ভীষ্মের কথাও আপনাকে বলেছি। বলেছি আমার দুঃখের কথাও। এখন সব জেনে, সব বুঝে কী করা উচিত, তা আপনিই বলুন— বিধানং তত্র ভগবন্ কর্তুমর্হসি যুক্তিতঃ।

অকৃতব্রণ অনেক চিন্তা করে বললেন, সবই বুঝলাম। কিন্তু একটা কথা বার বারই মনে হচ্ছে— যদি তোমাকে ভীষ্ম হরণ না করতেন, তা হলে শাল্বরাজ আজকে তোমাকে মাথায় করে রাখতেন। কিন্তু যেহেতু তিনি তোমায় রাজসভা থেকে হরণ করেছিলেন, তাই তো আজ তোমার সম্বন্ধে শাল্বরাজের মনে এত সংশয়, এত অভিমান। ভীষ্মের পৌরুষ, অহংকার এবং তোমার হরণ-প্রক্রিয়া— এই সবকিছুর নিরিখে আমার তো মনে হয় ভীষ্মের ওপরেই তোমার প্রতিশোধ-স্পৃহা জন্মানো উচিত— তস্মাৎ প্রতিক্রিয়া যুক্তা ভীষ্মে কারয়িতুং তব।

যে অম্বা একটু আগে ভীষ্মের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যাপারে সংশয়াপন্ন ছিলেন, অকৃতব্রণের যুক্তিতর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত পালটে গেল এবং দৃঢ়ও হল। অম্বা বললেন— আমার মনেও এমনই ছিল। কেবলই আমার মনে হয় আমি ভীষ্মকে যুদ্ধ করে মেরে ফেলি— ঘাতয়েয়ং যদি রণে ভীষ্মমিত্যেব নিত্যদা।

অকৃতব্রণ এবং অম্বা ভীষ্মের ব্যাপারে মনঃস্থির করতে সারা দিন লাগিয়ে দিলেন। তার মধ্যে বিকেলের দিকেই পরশুরাম জামদগ্ন্য উপস্থিত হলেন শৈখাবত্যের আশ্রমে। রাজর্ষি হোত্রবাহনের সঙ্গে তাঁর কুশল এবং ভাব বিনিময় হল। দু'জনেই সুস্থিত হয়ে বসলে হোত্রবাহন নাতনির দুঃখের কথা সব সবিস্তারে জানালেন। অনুনয় করে বললেন, ওর কাছে সব শুনে তুমি বলে দাও কী করা উচিত। অম্বা প্রথমেই পরশুরামের কাছে অনেক কাঁদলেন— রুদোদ সা শোকবতী বাষ্প-ব্যাকুল-লোচনা। পরশুরামের হৃদয় বিগলিত হল। বললেন, তুমি যেমন আমার বন্ধুর নাতনি, তেমনই আমারও তাই। বল তোমার কী দুঃখ, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। তুমি যা বল তাই করব— করিষ্যে বচনং তব।

অম্বা আনুপূর্বিক সব ঘটনা পরশুরামের কাছে নিবেদন করলেন। পরশুরাম বললেন, তুমি চিন্তা কোরো না। আমি ভীষ্মের কাছে দূত পাঠাব। তিনি নিশ্চয় আমার কথা শুনবেন। আর যদি না শোনেন, তবে তো যুদ্ধের পথ খোলাই রইল। আমি তাঁর সব ধ্বংস করে দেব। পরশুরাম বিকল্প ব্যবস্থাও দিলেন। বললেন, আর যদি মনে কর, শাল্বরাজকে রাজি করাতে হবে, তবে আমি তাও করতে পারি— যোজয়াম্যত্র কর্মণি।

অম্বা বললেন, ভীষ্ম যখন আমাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তখন শাল্বরাজের কাছে তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি নিজেই গিয়েছিলাম। তাঁকে অকথা-কুকথাও অনেক বলেছি— অবোচং দুর্বচং বচঃ। কিন্তু তিনি আমার চরিত্র নিয়েই আশঙ্কিত। এ অবস্থায় আমি মনে করি, ভীষ্মই আমার সমস্ত বিপদের মূল। আপনি তাঁকে শেষ করে দিন জন্মের মতো,তাঁর জন্যই আমার যত কষ্ট— ভীষ্মং জহি মহাবাহো যৎকৃতে দুঃখমীদৃশম্।

পরশুরাম এবার একটু গাঁইগুঁই করে বললেন, আমার তো অস্ত্র ধারণ করাই বারণ। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অথবা তাঁদের অভীষ্ট কোনও কারণ ছাড়া আমি অস্ত্র ধারণ করব না। আর তা ছাড়া তুমি এত ভাবছ কেন? ভীষ্মই হোন আর শাল্বই হোন, তাঁরা দু'জনেই আমার কথা শুনবেন। কথাতেই কাজ হয়ে যাবে, যুদ্ধের দরকার কী? অম্বা বললেন, আমি ও সব জানি না। আপনি প্রতিজ্ঞা করেছেন— আপনি আমার কথা শুনবেন, অতএব আপনি যুদ্ধে তাঁকে বধ করুন— প্রতিশ্রুতং যদপি তৎ সত্যং কর্তুমর্হসি।

পরশুরাম রাজি হচ্ছেন না দেখে স্বয়ং অকৃতব্রণ অম্বার সাহায্যে এগিয়ে এলেন। বললেন, রাজকুমারী আপনার শরণাগতা। আপনি তাঁকে যা কথা দিয়েছেন, তা পালন করা আপনার ধর্ম। তা ছাড়া ব্রাহ্মণদের কারণে ক্ষত্রিয়-নিধনের প্রতিশ্রুতিও এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। ভীষ্ম ক্ষত্রিয়, তাঁকে বধ করে আপনি এই বালিকার কাছে আপনার সত্য রক্ষা করুন— তেন যুধ্যস্ব সংগ্রামে সমেত্য কুরুনন্দন।

পণ্ডিতেরা বলেন— পরশুরামের সঙ্গে ক্ষত্রিয়দের যে কয়েক বার যুদ্ধ হয়েছে, তার মূলে আছে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের পারস্পরিক গুরুত্ব নির্ণয়ের ইতিহাস। আমরা সেই ইতিহাসে যাচ্ছি না, তবে আপাতত বলতে পারি আজকের এই ইতিহাস এক রমণীর তৈরি। আজকের দিনের প্রগতিবাদীরা, যারা সেকালের দিনে নারী-স্বাধীনতার বিষয়ে বারংবার সন্দেহ প্রকাশ করেন, তাঁদের জানাই— অম্বা হলেন সেই রমণী যিনি স্বয়ং ভীষ্মের কাছে, নিজের প্রণয়-অভিলাষ ব্যক্ত করে সসম্মানে হস্তিনাপুর থেকে শাল্বপুর যেতে পেরেছিলেন এবং সেখানে তাঁর প্রণয় ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি প্রতিশোধ-স্পৃহায় এমন এক জন পুরুষকে কাজে লাগাচ্ছেন, যিনি তাঁর পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে বসেছেন এক রমণীর কাছে। ভীষ্মের ওপরে এই রমণীর অস্পষ্ট দুর্বলতা নিয়ে যাঁরা কাব্য করতে ভালবাসেন, তাঁদের হতোদ্যম না করেও বলতে পারি— অম্বা জ্বলেপুড়ে মরছেন নিজের অভিমানে; তার প্রণয় ব্যর্থ হওয়ায় তিনি এমন এক জনকে প্রতিশোধের পাত্র হিসেবে নির্ণয় করেছেন, যিনি তাঁর রসজ্ঞ নন একটুও। এই প্রতিশোধ-স্পৃহা জন্মেছে শুধুই তাঁর নারীত্বের ব্যর্থতায়, এবং সে ব্যর্থতার জন্য ভীষ্ম দায়ী নন।

যাই হোক, পরশুরাম অম্বার কথায় রাজি হলেন ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। অম্বাকে নিয়েই তিনি চললেন হস্তিনাপুরে। সেখানে তখন মহা আনন্দ চলছে। ভাই বিচিত্রবীর্যের বিয়ে হয়ে গেছে। রাজ্যপাটে কোনও সমস্যা নেই। ভীষ্মের ছত্রচ্ছায়া এবং বিচিত্রবীর্যের শাসনে সবকিছুই চলছে অতি চমৎকার। এরই মধ্যে পরশুরাম নীলাকাশে বজ্রের মতো উপস্থিত হলেন হস্তিনাপুরে। ভীষ্ম তাঁর রাজবাড়ির পুরোহিত-মন্ত্রিবর্গ নিয়ে দেখা করলেন পরশুরামের সঙ্গে— ঋত্বিগভি-দেবকল্পৈশ্চ তথৈব চ পুরোহিতৈঃ। পরশুরাম ভীষ্মকে বললেন, এ কী ব্যবহার তোমার? এই মেয়েটিকে এক বার ধরে নিয়ে গেছ, একবার ছেড়ে

দিয়েছ— অকামেন ত্বয়া নীতা পুনশ্চৈব বিসর্জিতা। তোমার তো বিয়ে করার ইচ্ছেও ছিল না। এখন দেখ তো এর কী অবস্থা। আচার ধর্ম সবই এর নাশ হয়ে গেছে। শাল্বরাজ এর চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এবং শুধু তুমি একে তুলে এনেছিলে বলেই তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন এই রমণীকে। সে যাই হোক, মেয়েটার করুণ অবস্থা তো দেখছ, এখন আমার কথা শুনে তুমি একে গ্রহণ কর— তস্মাদিমাং মন্নিয়োগাৎ প্রতিগৃহ্নীস্ব ভারত।

মনে রাখা দরকার, পরশুরাম কিন্তু ভীষ্মের অস্ত্রগুরু। তিনি অতি অল্প বয়সে পরশুরামের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করতে গিয়েছিলেন এবং কৃতবিদ্য হয়ে ফিরেও এসেছিলেন। পরশুরামের অমন কথা শুনে ভীষ্ম একটু হতচকিত হলেও নিজের যুক্তি সাজাতে ভুল করলেন না। বললেন, আমি তো এখন আর এই রমণীকে ভাইয়ের হাতে তুলে দিতে পারি না। ইনি যে মুহূর্তে বলেছেন— আমি শাল্বরাজের প্রণয়িণী, সেই মুহূর্তেই আমি তাঁকে ছেড়ে দিয়েছি। এখন তো আর এঁকে আমি ফিরিয়ে নিতে পারি না। আমারও ধর্ম আছে। ভয় পেয়ে, রাগ করে, লোভে কিংবা কামনায়, আমি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ত্যাগ করতে পারি না।

পরশুরাম হঠাৎই খুব রেগে গেলেন। আসলে এটাই ছিল তাঁর 'স্ট্র্যাটেজি'— ভাল কথায় কাজ না হলেই রাগ দেখাতেন। পরশুরাম বললেন, তুমি যদি কথা না শোন, তা হলে কিন্তু যুদ্ধে তোমাকে হত্যা করব আমি। ভীষ্ম অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলেন, গুরুর পায়ে মাথা ঠুকলেন, অনেক অনুনয় বিনয় করলেন। পরশুরাম ভাবলেন, ভীষ্ম ভয় পেয়েছেন। অতএব তিনি তাঁর পূর্বের অনুরোধ পুনরাবৃত্তি করে বললেন, আমার ভাল লাগবে জেনেই তুমি মেয়েটাকে ফিরিয়ে নাও, নিজের কুলরক্ষা কর— গৃহাণেমাং মহাবাহো রক্ষস্ব কুলমাত্মনঃ।

সত্যি কথা বলতে কি, পরশুরাম যে ধারায় কথা বলছেন, ভীষ্ম ইচ্ছে করেই সে ধারাটি বুঝতে চাইছিলেন না। বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে এই রমণীর আর বিয়ের প্রশ্ন ওঠে না। শাল্বের সঙ্গেও তাঁর প্রণয় ব্যর্থ হয়ে গেছে। এখন পরশুরাম বোঝাতে চাইছেন— সব জায়গা থেকেই যখন রমণীর মাথায় ব্যর্থতা নেমে এসেছে এবং এই ব্যর্থতা এবং কুলনাশের জন্য ভীষ্মই দায়ী, তখন ভীষ্মকেই তার দায় নিতে হবে। পরশুরাম স্পষ্টাস্পষ্টি বিবাহের কথা বলছেন না, কিন্তু বার বার বলছেন— এঁকে তুমি গ্রহণ কর, কুলরক্ষা কর। এ রকমটি না হলে তোমার কিন্তু ভাল হবে না।

কুল রক্ষার মানেই তো বিয়ে করা। ভীষ্ম কি তা বোঝেন না? খুব বোঝেন, কিন্তু তিনি এই কথার ধারে কাছে গেলেন না। ভীষ্ম এ বার একটু শক্ত হলেন। বললেন, এমনটি হতে পারে না। আপনি শুধু শুধু এই বিষয়ে পরিশ্রম করবেন না। যে রমণী— একজনকে ভালবাসি বলে আমার ঘর ছেড়ে চলে গেল, সে রমণীকে সব জেনেশুনে কে তার নিজের ঘরে স্থান দেবে— বাসয়েৎ কো গৃহে জানন্ স্ত্রীণাং দোষো মহাত্যয়ঃ। আপনি যদি তবু আমার কথা না শোনেন তবে আমাকে যুদ্ধই করতে হবে। কারণ আপনি আমার গুরু হওয়া সত্ত্বেও গুরুর মতো ব্যবহার করছেন না আমার সঙ্গে। অতএব আমি যুদ্ধই করব— গুরুবৃত্তিং ন জানীষে তস্মাৎ যোৎস্যামি বৈ ত্বয়া।

সেকালের দিনে যুদ্ধ বাধবার বা বাধাবার একটা অনুক্রম ছিল। যুদ্ধ লাগবার আগে পরস্পর পরস্পরকে গালাগালি দিয়ে গা গরম করে নিতেন। ভীষ্ম এবং পরশুরামও সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রক্রিয়া আরম্ভ করলেন। আমরা সেই সম্পূর্ণ আক্ষেপ-প্রতিক্ষেপের মধ্যে যাব না। তবে যেটুকু না বললে নয়, তা হল, আপনি কুরুক্ষেত্রের মুক্তভূমিতে আসুন। সেখানেই আমাদের যুদ্ধ হবে। ওই কুরুক্ষেত্রেই আমি পিতার শ্রাদ্ধ করে শুচিতা লাভ করেছিলাম, অতএব ওখানেই আপনাকে হত্যা করে পুনরায় শৌচলাভ করব আমি। মনে রাখবেন, এতদিন ধরে আপনি যে বড় ক্ষত্রিয়হন্তা বলে নাম কিনেছেন, তার কারণ আপনি ক্ষত্রিয় কাকে বলে দেখেননি এবং ভীষ্মও তখন জন্মায়নি— ন তদা জাতবান ভীষ্মঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি মদ্বিধঃ।

পরশুরাম উলটে বললেন, এটা তুমি ভালই বলেছ, যুদ্ধটা কুরুক্ষেত্রেই হোক। তার কারণ পাশ দিয়েই তো গঙ্গা বয়ে যাচ্ছেন, তিনি তোমার মা। আমি যখন শত-সহস্র শরক্ষেপে তোমাকে হত্যা করব, তখন অন্তত স্নেহময়ী জননী জাহ্নবী তোমাকে শেষ দেখাটা দেখতে পারবেন। অবশ্য যখন তিনি তোমায় দেখবেন, তখন তোমার দেহটি শেয়াল-শকুনে খাচ্ছে। তাঁর কিছু দুঃখ হবে, কী আর করা যাবে— জাহ্নবী পশ্যতাং ভীষ্ম গৃধ্র-কঙ্ক-বলাশনম্।

ভীষ্ম আর পরশুরামে বাগ্‌যুদ্ধ কিছুক্ষণ চলার পর দু'জনেই আসল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। সে এক ভীষণ যুদ্ধ, তেমন যুদ্ধ কোনও দিন কেউ দেখেনি। মহাভারতের পাঁচ-ছয় অধ্যায় জুড়ে এই মহদ্‌যুদ্ধের বর্ণনা রয়েছে, এবং তাতেও এই দুই মহান যোদ্ধার যুদ্ধ অমীমাংসিত থেকে গেছে। পরশুরাম এবং ভীষ্ম যখন উভয়েই যুদ্ধে উন্মত্ত হয়ে উঠছেন, তখন দেবতা, ঋষি এবং শুভার্থী মানুষেরা একযোগে এসে মিনতি করলেন যুদ্ধ থামাবার জন্য। অনেক চেষ্টার পর যুদ্ধ থামল এবং পরশুরাম সকলের সামনে ভীষ্মের গৌরবের কথা বলতে লাগলেন। ভীষ্মও সবার সামনে গুরু পরশুরামের চরণবন্দনা করলেন— ততোঽহং রামমাসাদ্য ববন্দে ভৃশবিক্ষতঃ।

পরশুরাম ভীষ্মকে বললেন— আমি পৃথিবীতে ঢের ঢের বীর দেখেছি। কিন্তু তোমার মতো এমন বীর আর দ্বিতীয় নেই— ত্বৎসমো নাস্তি লোকেঽস্মিন্ ক্ষত্রিয়ঃ পৃথিবীচরঃ। পরশুরাম অম্বার কাছেও নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে বললেন, আমি আমার চেষ্টা কিছু কম করিনি, দুনিয়ার লোক দেখেছে— প্রত্যক্ষ মেতল্লোকানাম্— আমি আমার প্রাণপণ চেষ্টা করেছি, কিন্তু ভীষ্মকে আমি যুদ্ধে হারাতে পারিনি। জানিস মা। আমার এইটুকুই ক্ষমতা, এইটুকুই আমার শক্তি। তুই এখন যেখানে ইচ্ছে যেতে পারিস, মা। আমি আর কী-ই বা করতে পারি। তবে আমার ধারণা, তুই ভীষ্মের কাছেই বরং আশ্রয় যাচনা করতে পারিস, এ ছাড়া আর তো কোনও উপায়ও আমি দেখছি না— ভীষ্মদেব প্রপদ্যস্ব ন তেঽন্যা বিদ্যতে গতিঃ।

পরশুরাম সলজ্জে চুপ করলেন এবং অম্বা তাঁর লজ্জা ভাঙিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি যা বললেন তা অত্যন্ত সত্যি। ভীষ্মকে যুদ্ধে বধ করার মতো শক্তি এই জগতে নেই। আপনি আমার জন্য যথেষ্ট করেছেন। ভীষ্ম যথেষ্ট শক্তিমান, যথেষ্ট ক্ষমতাশালী, এটা আমি বুঝেছি, কিন্তু তাই বলে আমার পক্ষে ভীষ্মের কাছে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়— ন চাহমেনং যাস্যামি পুনর্ভীষ্মং কথঞ্চন। বরং আমি সেইখানে যাব, যেখানে গেলে ভীষ্মকে আমি যুদ্ধে হত্যা করতে পারব।

অম্বাকে পরশুরাম অনেক বার এই কথাটা বলেছেন, তুমি ভীষ্মের কাছে ফিরে যাও।

কথাটার মানে কী? অম্বা ভাবলেন— ভীষ্ম তো তাঁকে বিয়ে করবেন না, ভাই বিচিত্রবীর্যের সঙ্গেও তাঁর বিয়ে দেবেন না। তাঁর নিজের দিক থেকেই ভীষ্মের ওপর যে কোনও দুর্বলতা আছে, তাও তো নয়। যে দুর্বলতাটুকুও তাঁর আছে, সেটা ভীষ্মের যুদ্ধ ক্ষমতার প্রতি। কিন্তু এই দুর্বলতা আপাতদৃষ্টে কোনও মধুর রসে পরিণতি লাভ করে না, কারণ ভীষ্মের কথা মনে হলেই তাঁর বোধ হয়— ওই লোকটা তাঁর জীবনের সর্বনাশ করে দিয়েছেন। তাঁর কেবলই রাগ হয়, কেবলই প্রতিহিংসা বৃত্তি জেগে ওঠে। কিন্তু ভীষ্মের ওপরেই তাঁর এই ক্রোধ কেন? এই বৃদ্ধপ্রায় ব্যক্তিটির জন্য এতটুকুও যদি তাঁর সরসতা না থেকে থাকে, তা হলে বিপ্রতীপভাবে এতটা সবিকারী হয়ে ওঠা যায় কি?

ওদিকে ভীষ্মের দিক থেকে ব্যাপারটা দেখি। তিনি ক্রমশই অবাক হচ্ছেন। এমন একটি রমণী তিনি ভূমণ্ডলে দেখেননি। তাকে রাজসভা থেকে তুলে আনলেন, রাস্তায় এত শত যুদ্ধ হল, রমণী কিছুই বলল না। বিবাহের মুহূর্তে নিজের অন্যাভিলাষিতা ব্যক্ত করে সগর্বে চলে গেল। তারপর প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর থেকেই এই রমণী দিন রাত যেন তাঁকে শত্রুভাবে ভজনা করে যাচ্ছে। ভীষ্মের কাছে যাচনা করা নয়, সামান্য একটু বললেই তিনি এই রমণীর সারা জীবনের পরমাশ্রয় রচনা করে দিতে পারতেন। হয়তো বিবাহ করতেন না তিনি, কিন্তু হস্তিনাপুরের রাজসুখ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করতেন না নিশ্চয়ই। কিন্তু না, এ রমণী তাঁর কাছে কোনও ভিক্ষা চায় না। আজকে পরশুরামের মতো গুরুকে দিয়েও যখন তাঁর ভীষ্ম-হত্যাব্রত সম্পূর্ণ হল না, তখনও তিনি অসীম ক্রোধে প্রতিজ্ঞা করে গেলেন— আমি বরং সেইখানে যাব, যেখানে গেলে ভীষ্মকে আমি যুদ্ধভূমিতে শুইয়ে দিতে পারি— সমরে পাতয়িষ্যামি স্বয়মেব ভৃগুদ্বহ।

AMARBOI.COM

৪

মনে রাখতে হবে, আমরা এখন অম্বার এই যে কাহিনি শুনছি তা পূর্বস্মৃতি হিসেবে শুনছি মহাভারতের উদ্যোগপর্বে, ভীষ্মের মুখে। ফলত অম্বার জীবনের বিচিত্র গতির সঙ্গে সঙ্গে ভীষ্মের প্রতিক্রিয়াও আমরা শুনতে পাব। অম্বা ভীষ্মকে বধ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে বনে চলে গেলেন তপস্যা করতে— তাপস্যে ধৃতসংকল্পা সা মে চিন্তয়তী বধম্। ভীষ্ম বাড়িতে এসে জননী সত্যবতীকে সমস্ত ঘটনা নিবেদন করেই ক্ষান্ত হলেন না, তাঁর ভীষণ চিন্তা রয়ে গেল অম্বার জন্য। এটা যে তাঁর অবচেতনের কোনও সরসতা, তা আমাদের মনে হয় না; তবে যে মানুষকে পৃথিবীর কোনও শক্তি যুদ্ধে হারাতে পারে না, সেই মানুষটিকে বধ করার জন্য একজন রমণী তপস্যা আরম্ভ করলেন, এতে ভীষ্মের বিস্ময়ের অন্ত রইল না। ঘনিষ্ঠজনের কাছে তিনি বলেও ফেললেন, পৃথিবীতে এমন কোনও ক্ষত্রিয় বীর নেই, যে আমার সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মবিৎ অথবা তপস্যারত ব্যক্তির যে অলৌকিক শক্তি জন্মায়, তার সঙ্গে এঁটে ওঠে কার সাধ্য— ঋতে ব্রহ্মবিদস্তাভ তপসা সংশিতব্রতাৎ।

ভীষ্ম ভয় পাননি নিশ্চয়ই। কিন্তু যখন এই অলোকসুন্দরী রমণী বনে চলে গেলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন তিনি বেশ কিছু দক্ষ গুপ্তচর নিয়োগ করলেন রমণীর উপর কড়া নজর রাখবার জন্য— পুরুষাংশ্চাদিশং প্রাজ্ঞান্ কন্যাবৃত্তান্তকর্মণি। ভীষ্মের মতো মহাবীর এক রমণীর গতিপ্রকৃতির ওপর সদাসর্বদা জাগ্রত চর-চক্ষু নিক্ষেপ করে রেখেছেন— এটা কি শুধুই ভয়ে? ব্রহ্মতেজী বা তপস্বী জাতীয় মানুষেরা তা ভাবতেও বা পারেন, কিন্তু রসশাস্ত্রকারেরা, যাঁরা জীবনের রস এবং রসাভাস নিয়ে ভাবনা করেন তাঁরাও কি এই একই কথা বলবেন? অম্বার এই তপশ্চর্যার উদ্দেশ্য এবং তাঁর চেষ্টার কথা ভীষ্ম নারদ এবং ব্যাসের কাছে নিবেদন করেছিলেন। তাঁরা ভীষ্মের মন কী বুঝেছিলেন জানি না, তাঁরা বলেছিলেন— কী আর করা যাবে? অম্বাকে নিয়ে তুমি দুঃখ কোরো না ভীষ্ম। দৈবকে কখনও পুরুষকার দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যায় না, অতএব তাঁকে নিয়ে আর দুঃখ কোরো না— ন বিষাদস্ত্বয়া কার্য্যো ভীষ্ম কাশীসুতাং প্রতি। এই দুঃখ কি শুধুই তিনি অম্বার হাতে মারা যেতে পারেন, এই ভয়ে? রসশাস্ত্রকারেরা কী বলবেন? যাই হোক, গুপ্তচরদের মুখে ভীষ্ম যে খবর পেয়েছেন, তা তিনি নিজেই জানিয়েছেন। জানিয়েছেন তাঁর দুঃখকষ্ট এবং সংকল্পের কথা।

অম্বা কঠোর তপস্যা করছিলেন। যমুনার তীরে একটি আশ্রম বানিয়ে তিনি ভীষ্মবধের প্রতিজ্ঞায় তপস্যামগ্ন হলেন। খাওয়া নেই দাওয়া নেই, স্নান নেই, কাপড় বদলানো নেই, তিনি তপস্যা করে যাচ্ছেন— নিরাহারা কৃশা রুক্ষা জটিলা মলপঙ্কিনী। অম্বার আত্মীয়স্বজনরা যথাসাধ্য তাঁকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছেন, অম্বা শোনেননি। কঠোর তপস্যার শেষে তিনি তীর্থে তীর্থে ঘুরেও বেড়ালেন অনেক। তীর্থবাসী তপস্বীরাও তাঁর এই কষ্টের জীবন দেখে মায়া করেছেন। তাঁরা বলেছেন, ত্যাগ করো তোমার এই কষ্টব্রত। লোকালয়ে ফিরে যাও। অম্বা বলেছেন, আমি পরজন্মে স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠে যাওয়ার জন্য এই তপস্যা করছি না— ন লোকার্থং তপোধনাঃ। ভীষ্মকে যুদ্ধে হত্যা করে তবেই আমার শান্তি। তাঁর জন্যই এই কষ্টের মধ্যে আমি নিক্ষিপ্ত হয়েছি। মেয়ে হয়ে জন্মেও আমি কোনও স্বামীসুখ পেলাম না। আমার অবস্থা হয়েছে একটি ক্লীবের মতো— নৈব স্ত্রী ন পুমানিহ। জেনে রাখবেন— আমি ভীষ্মকে না মেরে ছাড়ব না। স্ত্রীলোকের হাব-ভাব স্বভাব আর আমার ভাল লাগে না, আমি পুরুষ হতে চাই— স্ত্রীভাবে পরিনির্বিণ্ণা পুংস্ত্বার্থে কৃতনিশ্চয়া।

মহাভারতের বিশাল বিচিত্র কাহিনির অন্তরে অম্বা যেভাবে একদিন শিখণ্ডী হয়ে যাবেন, তার মধ্যে তাঁর তপস্যা, মহাদেবের কাছ থেকে বরলাভ এবং যক্ষ স্থূণাকর্ণের উপাখ্যান এসে এক অদ্ভুত জটিলতা এবং অলৌকিকতা তৈরি করবে। কিন্তু অম্বা থেকে শিখণ্ডীতে রূপান্তরের মধ্যে যে কথ্যগুলি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বলে আমাদের মনে হয়, তা হল—উপরিউক্ত দুঃখের কথাগুলি, যা অম্বা তপস্বীদের জানিয়েছেন। অম্বা বলেছেন, আমি যেন স্ত্রীও নই পুরুষও নই— নৈব স্ত্রী ন পুমানিহ। ভীষ্মের কারণে অম্বার এই দুঃখোচ্ছ্বাসই আমাদের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এক তথ্য।

মনে রাখতে হবে, অম্বা কিন্তু এখনও শিখণ্ডীতে পরিণত হননি। অম্বা শুধু নিজের করুণ অবস্থা বর্ণনা করেছেন মাত্র। তিনি বলেছেন, ভীষ্মই আমাকে সমস্ত বঞ্চনা করেছেন, তাঁর জন্যই আজকে আমি সমস্ত স্বামীসুখ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। ভীষ্ম একদিন তাঁকে রাজসভা থেকে হরণ করে এনেছিলেন বলেই তাঁর জীবনে এক বিরাট বিড়ম্বনা নেমে এসেছে, তিনি

যেন আর স্ত্রীও নন, পুরুষও নন। স্ত্রী নন এই কারণে যে, স্বামীর ঘর, গার্হস্থ্যজীবন তাঁর কপালে জুটল না। আবার পুরুষও নন এই কারণে যে, একজন পুরুষ যেমন তাঁর বলে, শক্তিতে, স্বাধিকারে নিজের প্রাপ্য বস্তু অধিকার করে এবং অধিকার করতে না পারলে ধ্বংস করে, অম্বা তা করতে পারছেন না বলেই তিনি যেন পুরুষও নন। অম্বার নপুংসকত্ব এইখানেই— নৈব স্ত্রী ন পুমানিহ।

স্বামী-সংসার যে রাজকুমারীর কাছে অপ্রাপ্য রয়ে গেল, রাজার ঘরে জন্মেছেন বলেই সেই রাজকুমারী জানেন যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের অধিকারটুকু পেলেই তাঁর আর দুঃখ থাকবে না। অন্তত পুরুষ হলে আজকে এত লোক তাঁকে করুণা করত না অন্তত। অম্বা ধারণা করেছেন, শুধুমাত্র পুরুষ মানুষ হওয়ার সুবিধে পেয়েই ভীষ্ম তাঁকে চরম অপমান করেছেন এবং এইজন্যই নারী-জন্মে তাঁর ঘেন্না ধরে গেছে। এখন তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একটি সার্থক পুরুষ হতে চান— স্ত্রীভাবে পরিনির্বিণ্ণা পুংস্ত্বার্থে কৃতনিশ্চয়া।

মহাভারতের বর্ণনায় এরপর যা দেখব, তা হল, অম্বা ভগবান মহাদেবের কাছ থেকে বরলাভ করছেন। মহাদেব তাঁকে পুরুষ হওয়ার বর দিয়েছেন, কিন্তু কীভাবে কোন জন্মে, কেমন করে এই পুরুষত্ব তাঁর জীবনে নেমে আসবে, সে কথা এখানে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। অন্য দিকে, ঠিক এখন থেকেই লক্ষ রাখতে হবে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের দিকে। কারণ তিনিও ওই একই মহাদেবের কাছে পুত্রলাভের বর পেয়েছেন। দ্রুপদকে যিনি অপমান করে তাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলেন, সেই দ্রোণাচার্যকে অস্ত্রগুরু হিসেবে রাজ্যে আশ্রয় দিয়েছিলেন প্রধানত ভীষ্ম। কৌরব-পাণ্ডবদের শিক্ষাশেষে দ্রোণাচার্য তাঁর প্রিয় শিষ্য অর্জুনের মাধ্যমে দ্রুপদকে জয় করেন এবং তাঁর রাজ্য কেড়ে নেন। অতএব দ্রোণাচার্যের সঙ্গে তাঁর আশ্রয়দাতা ভীষ্মও দ্রুপদের পরম শত্রুতে পরিণত হয়েছেন। অতএব ভীষ্মের ওপর প্রতিশোধ-স্পৃহায় দ্রুপদ মহাদেবের কাছে বর চেয়েছিলেন— ভগবন্ পুত্রমিচ্ছামি ভীষ্মং প্রতিচিকীর্ষয়া।

আমরা জানি, অম্বার পুরুষত্বের পরিণতির উৎস হল মহাদেবের এই দুটি বর। কিন্তু বরলাভের অলৌকিকতার মধ্যে না গেলে অম্বা থেকে শিখণ্ডীর পরিণতি কিন্তু যথেষ্ট লোকগ্রাহ্যভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় এবং সে ব্যাখ্যা বেরিয়ে আসবে ওই বরদানের তথ্য থেকেই। লক্ষ করে দেখুন, মহাদেব দ্রুপদকে বর দিয়েছিলেন— তোমার প্রথমে একটি কন্যা হবে এবং সে-ই ভবিষ্যতে পুরুষত্ব লাভ করবে— কন্যা ভূত্বা পুমান্ ভাবী— অর্থাৎ একেবারে আক্ষরিক অর্থে এই শ্লোকের মানে হল— মেয়ে হয়েই সে পুরুষ হবে।

এবারে দেখুন, দ্রুপদপত্নী যখন সন্তান লাভ করলেন, তখন তিনি পরম রূপবতী এক কন্যাই লাভ করেছেন— কন্যাং পরমরূপাঞ্চ প্রাজায়ত নরাধিপ। কিন্তু কী আশ্চর্য, এতদিন সন্তানহীন অবস্থায় থেকেও আজ যে রমণী সুন্দরী একটি কন্যা লাভ করলেন, তিনি কিন্তু তাঁকে কন্যা বলে প্রচার করলেন না। মহাভারতের কবি লিখেছেন— দ্রুপদের বুদ্ধিমতী মহিষীটি তাঁর প্রথমজন্মা কন্যাটিকে পুত্র বলে সর্বত্র প্রচার করলেন— দ্রুপদস্য মনস্বিনী/ খ্যাপয়ামাস... পুত্রো হ্যেষ মমেতি বৈ। অন্যদিকে দ্রুপদও তাঁর কন্যাটির স্বরূপ-লক্ষণ চেপে গিয়ে সেকালের সামাজিক বিধান অনুসারে একটি পুত্রের উপযুক্ত স্মার্ত প্রক্রিয়াগুলি যথাযথভাবে সম্পন্ন করলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক এইখানেই আমাদের একটি বিশেষ ধারণার কথা বলে নিতে হবে। আপনাদের খেয়াল আছে কি— মহর্ষি শৈখাবত্যের আশ্রমে হঠাৎ যে আপনারা রাজর্ষি হোত্রবাহনকে আসতে দেখলেন, তিনি সৃঞ্জয় বংশের অধস্তন পুরুষ। রাজর্ষি হোত্রবাহন কাশীরাজের শ্বশুর এবং অম্বা তাঁর মেয়ের ঘরের নাতনি। তিনিই প্রথম অম্বাকে তাঁর দুঃখ দূর করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। অন্য দিকে নিজের প্রভাবেই তিনি তৎকালীন দিনের ক্ষত্রিয়হন্তা বীর পরশুরামের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেন অম্বার। হয়তো তাতে কিছু হয়নি। কিন্তু রাজর্ষি হোত্রবাহন অম্বাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। যখন অম্বার সঙ্গে হোত্রবাহনের প্রথম দেখা হয়, তখন তিনি অম্বাকে আশ্রয় দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন— ময়ি বর্তস্ব পুত্রিকে।

এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল— বেদে, ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে এবং মহাভারতের সর্বত্র মহারাজ সৃঞ্জয় পাঞ্চালদের পূর্বপুরুষ বলে পরিচিত। শুধু তাই নয়, সৃঞ্জয় মহারাজ এমনই এক বিখ্যাত পুরুষ ছিলেন যে পাঞ্চাল শব্দের পরিবর্তেও সৃঞ্জয় শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে মহাভারতে। দ্রুপদ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকেও সৃঞ্জয়দের অন্যতম বলেই গণ্য করা হয়েছে। মহাভারতে যেখানে সৃঞ্জয় শব্দটি পাঞ্চালদের পরিবর্ত শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ওনি, সেখানেও সৃঞ্জয়দের নাম উচ্চারিত হয়েছে পাঞ্চালদের সঙ্গে— পাঞ্চালাঃ সৃঞ্জয়ৈঃ সহ। বস্তুত মহারাজ সৃঞ্জয়ের নামেই গোটা পাঞ্চাল-রাজবংশ কখনও কখনও নামাঙ্কিত হয়েছে। রাজর্ষি হোত্রবাহন সৃঞ্জয় বংশের লোক বলেই, অপিচ সৃঞ্জয়রা পাঞ্চালদের সঙ্গে একাত্মক বলেই আমাদের ধারণা হয়— রাজর্ষি সৃঞ্জয় হোত্রবাহন শেষ পর্যন্ত অম্বাকে সমর্পণ করেন পাঞ্চাল দ্রুপদের হাতে। শুধু অপুত্রক বলেই নয়, ভীষ্মের ওপর প্রতিশোধস্পৃহাটা যেহেতু অম্বা এবং দ্রুপদের সাধারণ ধর্ম, তাই অম্বাকে দ্রুপদের ঘরেই নিয়ে আসা হয়।

অম্বার পুরুষত্বলাভের তপশ্চর্যায় আমরা অবিশ্বাস করি না। কিন্তু এই তপস্যা ধর্মবাসনায় প্রণোদিত কি না, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। মহাভারতের কবি যে 'কবিতা-কল্পনা-লতা' লতিয়ে দিয়েছেন অম্বার জীবন উপাখ্যানের সঙ্গে, তাতে স্পষ্টতই আমাদের ধারণা প্রমাণ করা কঠিন হবে। কিন্তু এও তো ঠিক অম্বা নিজমুখেই বলেছেন, আমি ভবিষ্যতের কোনও পারলৌকিক আশায় এই তপস্যা করছি না, করছি ভীষ্মবধের প্রতিজ্ঞায়। আমরা বিশেষভাবে মনে করি, অম্বা অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করছিলেন। একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে এই বিদ্যাশিক্ষার যন্ত্রণা প্রায় দুঃসহ বলেই শেষ পর্যন্ত সবার কাছে তাঁকে বারণ শুনতে হয়েছে। হয়তো এই বিদ্যাশিক্ষার যন্ত্রণায় এবং বনে বনে তীর্থে তীর্থে ঘুরে ঘুরে তাঁর শরীরের রমণীয়তাও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং হয়তো সেইজন্যই অস্ত্রচর্চার প্রশিক্ষণের মধ্যেই তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল— আমি স্ত্রীও নই পুরুষও নই।

অন্য দিকে আরও একটা কথা এখানে বিচার করতে হবে। সেটা হল, মহাদেবের বরের প্রতি যদি দ্রুপদরাজার এতই শ্রদ্ধা থাকে তা হলে তাঁর সদ্য-প্রাপ্ত কন্যাটি নিয়ে এত ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় কেন? দ্রুপদ-মহিষীরই বা অত বুদ্ধিমত্তা ফলিয়ে কন্যাটিকে পুত্র বলে প্রচার করার কী দরকার ছিল, কারণ তিনিও তো জানতেন মহাদেবের বরে প্রথমে তাঁর কন্যাই হবে।

মহাভারতের কবি যতই কবিত্ব করুন, তিনি সময়মতো আমাদের হাতে তথ্য দিয়ে দেন, যাতে আমরা সত্য সিদ্ধান্ত রচনা করতে পারি। তিনি শব্দের চাতুর্যে অঙ্গুলিসংকেত করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মহাদেবের বর থাকা সত্ত্বেও দ্রুপদের রাজবাড়িতে এই চাপাচাপি— রক্ষণগৈঞ্চব মন্ত্রস্যা— স্বাভাবিক নয় যেন। পাঞ্চাল নগরের প্রত্যেকটি লোকের কাছে দ্রুপদ তাঁর কন্যার স্বরূপ লুকিয়ে রেখে প্রচার করলেন যে, তাঁর পুত্রই হয়েছে— ছাদয়ামাস তাং কন্যাং পুমানিতি চ সোঽব্রবীৎ। অন্য দিকে ভীষ্মের কথাটাও ধরুন; তিনি প্রতিনিয়ত গুপ্তচরের মাধ্যমে অম্বার খোঁজখবর রাখছিলেন নিজেরই প্রয়োজনে, নিজেরই তাড়নায়। সেই তিনি যখন জীবনের শেষ কল্পের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে অম্বার কাহিনি বিবৃত করছেন, তখন তিনি যেন কেমন হতভম্ব হয়ে বলছেন, আমি কিন্তু গুপ্তচরের সংবাদ, নারদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য এবং অম্বার তপস্যার নিরিখে এই কথাই জানতাম যে, দ্রুপদের বাড়ির মেয়েটি একটি সম্পূর্ণ মেয়েই বটে— অহমেকস্তু চারেণ বচনান্নারদস্য চ। জ্ঞাতবান্...।

অম্বার জীবন-পরিণতিতে আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, মহারাজ দ্রুপদ তাঁর মেয়েটির লোকশিক্ষা এবং শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করে শেষমেষ তাঁকে ধনুর্বিদ্যা শিখবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দ্রোণাচার্যের কাছে। অম্বা, দ্রুপদের সম্প্রচারে যাঁর নাম এখন শিখণ্ডী, তিনি দ্রোণাচার্যের কাছেই অস্ত্রশিক্ষা লাভ করেছেন— ইষ্বস্ত্রে চৈব রাজেন্দ্র দ্রোণশিষ্যো বভূব হ। সেকালের দিনে এমনটিই হত। পিতার সঙ্গে শত্রুতা আছে বলে তার পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করব, এমন রীতি গুরুদের ধর্মে সইত না।

মনে রাখা দরকার, মহাভারতের উপাখ্যানে এখনও কিন্তু সেই অলৌকিকতা আসেনি, যাতে বলা যাবে, অম্বা কন্যাত্ব থেকে পুরুষত্ব লাভ করেছেন। দ্রুপদ-দম্পতি এখনও তাঁদের মেয়েটিকে ছেলে বলে চালাতে পারছেন এবং দ্রোণাচার্যও নিজের অজ্ঞাতসারে একটি ছেলে-সাজা মেয়েকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন।

একটি মেয়েকে ছেলে সাজিয়ে প্রচার এবং ব্যবহার করার চরম বিড়ম্বনা নেমে এল তখনই, যখন দ্রুপদ শিখণ্ডীর বিবাহ দিতে চাইলেন। পাঞ্চাল দেশের রাজা বলে কথা, দ্রুপদের পাত্রী পেতে অসুবিধে হল না। দশার্ণ দেশের রাজা হিরণ্যবর্মা তাঁর মেয়েকে বিয়ে দিতে রাজি হলেন শিখণ্ডীর সঙ্গে। কিন্তু বিয়ে যখন হয়ে গেল, তখন দশার্ণ-রাজার মেয়ে শিখণ্ডীকে স্ত্রীচিহ্নধারিণী শিখণ্ডিনী বলেই চিনলেন— হিরণ্যবর্মণঃ কন্যা জ্ঞাত্বা তাঃ তং শিখণ্ডিনীম্। মহাভারতের কবিও এখানে শিখণ্ডীকে শিখণ্ডিনী বলেছেন। দেখুন, এখনও এই যুবক-বয়স, থুড়ি যুবতী-বয়স পর্যন্তও কিন্তু শিখণ্ডী মেয়েই আছেন। অবশ্য বয়সটা যুবতীর শেষ সীমাতেই ধরে নেওয়া ভাল, কারণ আমাদের মতে তিনি অম্বা। এই যে দশার্ণ-রাজকন্যার সঙ্গে শিখণ্ডীর তথাকথিত বিবাহ হল, এই বিবাহের পর্ব থেকেই অম্বা-শিখণ্ডীর জীবনে যত গোলমাল শুরু হল, মহাভারতের কবিও তাঁর উপাখ্যান জমাতে আরম্ভ করলেন এই সময় থেকেই।

দশার্ণরাজ হিরণ্যবর্মা দ্রুপদের বিরুদ্ধে তঞ্চকতার অভিযোগ এনে তাঁর রাজ্য জয় করবেন বলে ঠিক করলেন। বিপন্ন দ্রুপদ এই আক্রান্ত হওয়ার মুখে কারও ওপরেই রাগ করতে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেরে নিজের স্ত্রীর ওপরেই খানিকটা হম্বিতম্বি করলেন— এই তো, আগেই বলেছিলাম, এমন লুকোছাপা কোরো না, এখন হল? ইত্যাদি। দ্রুপদ এবং দ্রুপদপত্নীর এই বিড়ম্বনা দেখে শিখণ্ডিনী নিজেই তাঁর বাবামায়ের মুখরক্ষার ভার নিলেন। তিনি গৃহত্যাগ করে চলে গেলেন বনে। বলতে বাধা নেই, তথাকথিত শিখণ্ডিনীর এই ব্যবহারও তাঁর অন্তরশায়িনী অম্বার চরিত্রের সঙ্গে মেলে।

মহাভারতের কাহিনিতে যা দেখি, তাতে এক নিবিড় বনের মধ্যে যক্ষ স্থূণাকর্ণের সঙ্গে শিখণ্ডিনীর দেখা হয়। চিন্তায় দুঃখে শুষ্ক শরীর, ক্ষতহৃদয়া শিখণ্ডিনীকে দেখে যক্ষ স্থূণাকর্ণের মায়া হল। স্থূণাকর্ণের কিছু দৈবী ক্ষমতা আছে। সে বলল, আমি তোমাকে কিছুকালের জন্য আমার পুংচিহ্ন দান করব এবং তোমার স্ত্রীচিহ্ন ধারণ করব আমি। কিছুকাল এইভাবে চলুক। তারপর সময় হলে তুমি এবং আমি আবার লিঙ্গ-বিনিময় করে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাব। অতএব কিছুকালের জন্য তুমি আমার পুংচিহ্ন ধার পেতে পার— কিঞ্চিৎ কালান্তরং দাস্যে পুংলিঙ্গং স্বমিদং তব।

বেদ থেকে আরম্ভ করে মহাভারতের কাল পর্যন্ত আমরা কোনও লিঙ্গ-প্রতিস্থাপনের ঘটনা জানি না। শুধুমাত্র শিখণ্ডিনী-স্থূণাকর্ণের উদাহরণে লিঙ্গ-প্রতিস্থাপনের পরিণত শল্যবিদ্যার পদ্ধতি সেকালের দিনের নিরিখে স্বীকার করে নেওয়া কঠিন। এ ছাড়াও অম্বা এবং দ্রুপদের প্রতি মহাদেবের বর, শিখণ্ডিনীর স্বীকৃত কন্যাত্ব, দশার্ণ রাজার মেয়ের সঙ্গে শিখণ্ডিনীর বিবাহ এবং শেষ পর্যন্ত স্থূণাকর্ণের সঙ্গে লিঙ্গ বিনিময়ের ঘটনা— এইসব কিছুর মধ্যেই যে অলৌকিকতাটুকু আছে, সেটা বাদ দিয়েও কিন্তু শিখণ্ডীর জীবন ব্যাখ্যা করতে আমাদের অসুবিধে হয় না এবং সে ব্যাখ্যায় মহাভারতের কবিতথ্যই আমাদের সহায় হয়েছে।

বস্তুত অম্বা যে মহাদেবের বরলাভের পূর্বেই বলেছিলেন, আমি যেন কেমন হয়ে গেছি। আমি যেন স্ত্রীও নই পুরুষও নই— এই ভাবটুকুর মধ্যেই শিখণ্ডীর নপুংসকত্ব লুকিয়ে আছে। আসলে অম্বার পুরুষত্ব-লাভের পর্যবসান পুংলিঙ্গ-লাভে নয়, পুরুষের যোগ্য বিদ্যালাভে, পুরুষের যোগ্য ক্ষমতালাভে। অম্বা যে এতকাল তপস্যা করেছেন, সে তপস্যাও পুরুষসুলভ অস্ত্রশিক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আগে বলেছি, সৃঞ্জয় রাজর্ষি হোত্রবাহন অম্বাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, তোর কোনও চিন্তা নেই, মা! আমি তোর সমস্ত দুঃখ দূর করব, তুই মা, আমার কাছেই থাকবি— দুঃখং ছিন্দাম্যহং তে বৈ ময়ি বর্তস্ব পুত্রিকে। হোত্রবাহন অম্বাকে নিজের হাতে না রেখে স্বগোত্রীয় আত্মীয় অপুত্রক দ্রুপদের হাতেই তুলে দিয়েছিলেন। কারণ এঁদের দু'জনেরই সাধারণ শত্রু হলেন ভীষ্ম। অম্বাকে রীতিমতো বয়স্থা অবস্থায় পেয়েছিলেন বলে এবং আপন তপস্যার গুণে অম্বা অস্ত্রবিদ্যা লাভ করেছিলেন বলেই দ্রুপদ তাঁকে পুরুষ বলে প্রচার করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

মহাভারত জানিয়েছে— তপস্যার সিদ্ধিতে অম্বা যখন মহাদেবের কাছে বরলাভ করলেন, তখন তিনি অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। এর পরেই তিনি দ্রুপদের মেয়ে হয়ে জন্মান। আমাদের দৃষ্টিতে এই আত্মাহুতি অম্বার স্ত্রী-স্বভাবের অন্ত সূচনা করে। তিনি নিজেই

বলেছেন, স্ত্রীভাবে তাঁর ঘেন্না ধরে গেছে, তিনি পুরুষত্ব চান। এই আত্মাহুতির রূপক তাঁর জীবনে স্ত্রী-স্বভাবের সমাধিমাত্র। এর পরেই— 'পুরুষের বিদ্যা করেছিনু শিক্ষা'। মহাদেবের কাছ থেকে বরলাভ করার পর, অথবা বলা উচিত পুরুষের বিদ্যাশিক্ষার পর থেকেই অম্বা পুরুষসুলভ আচরণ শুরু করেন এবং সেই হোত্রবাহনের চেষ্টায় অপুত্রক দ্রুপদের ঘরে পুরুষের মতোই মানুষ হতে থাকেন। ভীষ্মও তাঁর বিশ্বস্ত গুপ্তচরদের কাছে খবর পেয়েছেন যে, শিখণ্ডী আসলে একটি রমণী। ধৃষ্টদ্যুম্ন তথা কৌরব-পাণ্ডবদের সঙ্গে শিখণ্ডী যখন দ্রোণের কাছে অস্ত্রশিক্ষা লাভ করেন, তখনও তিনি স্ত্রী, অন্তত ভীষ্ম তাই বলেছেন— শিখণ্ডিনং মহারাজ পুত্রং স্ত্রীপূর্বিনং তথা।

পরবর্তী সময়ে দেখব, শিখণ্ডী এতটাই অস্ত্রশিক্ষা লাভ করেছেন যে মহামতি ভীষ্মের মতো যোদ্ধাও তাঁকে 'রথমুখ্য' অর্থাৎ মহাবীর যোদ্ধাদের অন্যতম বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু যত বড় যোদ্ধাই তিনি হোন না কেন শিখণ্ডী যে আদতে স্ত্রীলোক অথবা তিনি অম্বাই, সে কথাও ভীষ্মের অজানা ছিল না। দ্রুপদ তাঁর কন্যাটিকে যেভাবে মানুষ করেছিলেন, তার মধ্যে রীতিমতো এক কুটিল বুদ্ধি কাজ করেছে। তাঁর কন্যাটি যেহেতু ভীষ্মবধের প্রতিজ্ঞা নিয়েই অস্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করেছেন, এবং যেহেতু সে রমণী তাঁর আপন স্ত্রীত্বকেই ঘৃণা করছেন, সেই রমণীকে তিনি পুরুষ-প্রচারে মানুষ করেছেন এই কারণেই যে, অস্ত্রশিক্ষায় শিক্ষিত শিখণ্ডী পুরুষের যে সুবিধাটুকু ভোগ করছে করুক, উপরন্তু ভীষ্মবধের সময় স্ত্রীত্বের সুবিধেটুকু সে যেমন পাবে, তেমনই দ্রুপদও।

স্ত্রীলোক হওয়া সত্ত্বেও শিখণ্ডী যে পুরুষ সেজে থাকতেন, সে কথা ভীষ্মের মন্তব্য থেকেই আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। উদ্যোগ পর্বে অম্বা-শিখণ্ডীর জীবন-পরিণতির কথা বলতে বলতে ভীষ্ম বলেছেন, এই হল আমার চিরকালের নীতি— আমি কোনওদিন তার ওপরে অস্ত্র নিক্ষেপ করি না যে একজন স্ত্রী। কোনও পুরুষ যে আগে স্ত্রী ছিল, তার ওপরেও আমি অস্ত্রক্ষেপ করি না। যে পুরুষকে একজন স্ত্রীর নামে ডাকা হয়, তাকেও আমি কোনও বাণাঘাত করি না। আর যে পুরুষের মতো সাজে অথচ স্বরূপত যে স্ত্রীলোক, তার গায়েও আমি শরনিক্ষেপ করি না— স্ত্রিয়াং স্ত্রীপূর্বকে চৈব স্ত্রীনাম্নি স্ত্রীস্বরূপিণী।

ভীষ্মের এই চতুর্বিকল্পক স্ত্রীত্বের সব ক'টিই কিন্তু অম্বা-শিখণ্ডীর দিকে অঙ্গুলিসংকেত করে। ভীষ্ম জানেন, অম্বা আদতে কাশীরাজের কন্যা— জ্যেষ্ঠা কাশীপতেঃ কন্যা। যিনি দ্রুপদের ঘরে শিখণ্ডী নামে পরিচিত হয়েছেন, তিনি পূর্বে এক রমণী ছিলেন— দ্রুপদস্য কুলে জাতা শিখণ্ডী ভরতর্ষভ। এই পংক্তিতে শিখণ্ডী পুরুষ হলেও তাঁর জন্মের ব্যাপারে স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে— কুলে জাতা। এই গেল দ্বিতীয় বিকল্প। তৃতীয় বিকল্প— কোনও স্ত্রী-নাম। শিখণ্ডীর আসল নাম অম্বা কিন্তু দ্রুপদের ঘরে আসার পরে তাঁর নাম পালটে গেলেও তাঁকে শিখণ্ডিনীও বলা হয়েছে অনেক বার। চতুর্থ বিকল্প হল— স্ত্রীস্বরূপিণী। অর্থাৎ যে স্বরূপত স্ত্রী কিন্তু পুরুষের মতো সাজে বা পুরুষের মতো ব্যবহার করে। ভীষ্ম দ্রুপদের ঘরে জন্মানো ছেলেটিকে স্ত্রী বলেই জানতেন, এখন তিনি হয়তো পুরুষের ব্যবহারে অস্ত্রধারণ করেন কিন্তু স্বরূপত তাঁকে অম্বা বলেই জানেন ভীষ্ম।

শিখণ্ডী যদি পুরুষের বিদ্যা শিখে পুরুষের মতো ব্যবহার না করতেন, তা হলে ভীষ্ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর চতুর্বিধ বিকল্পের দুটি মাত্র বলতেন— স্ত্রী এবং নপুংসকই তাঁর অস্ত্র-স্তম্ভনের কারণ ঘটাত শুধু। কিন্তু শিখণ্ডীই যেহেতু পূর্বের অম্বা ভীষ্মকে তাই আরও দুটি বিকল্প জুড়তে হয়েছে— স্ত্রীনাম এবং স্ত্রীস্বরূপ। অন্য সময়ে দেখব, ভীষ্ম অনেক সময়েই শিখণ্ডীকে নপুংসক বলে উল্লেখ না করে শুধু স্ত্রীলোক বলেই উল্লেখ করেছেন। শিখণ্ডীর নপুংসকত্ব তাই লিঙ্গকেন্দ্রিক নয়, এই নপুংসকত্ব হল স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও পুরুষ-স্বভাবের মিশ্রচারিতায়। ভীষ্ম এই মিশ্রচারিতাকেই ঘৃণা করেন।

অর্জুন যে দিন অম্বা-শিখণ্ডীকে রথের পুরোভাগে রেখে পিছন থেকে বাণ বর্ষণ করেছিলেন ভীষ্মের ওপর, সে দিন শিখণ্ডীর অস্ত্রবিদ্যার পরিচয় আমরা কিছু পাইনি, সে বিদ্যার প্রয়োজনও সে দিন হয়নি। ভীষ্ম তাঁকে দেখেই ধনুঃশর নামিয়ে রেখেছিলেন। সামনে মূর্তিমতী সেই পুরুষবিধা রমণী, যাঁকে একদিন হাত ধরে রথে চড়িয়েছিলেন, যাঁকে হরণ করে নিয়ে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছিলেন একরথে— কাশী থেকে হস্তিনাপুর। পথে কত নদ-নদী পাহাড় পড়েছে, পড়েছে কত বন-অরণ্যানী। তখন এক বারের তরেও যাঁর দিকে তাকাবার অবসর পাননি ভীষ্ম, যাঁর জন্য রাজসভা থেকে আরম্ভ করে পথ চলাকালীন যুদ্ধ করতে করতে ফিরেছিলেন তিনি, আজ এই অন্তিম বয়সে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকিয়েই পরম বীর তাঁর সমস্ত অস্ত্রভার মুক্ত করলেন। সে দিন যাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছিলেন, আজ তাঁরই জীবনের সমস্ত কষ্টের জন্য তিনি যেন প্রায়শ্চিত্ত করলেন কোনও বাধা না দিয়ে, কোনও জোর না খাটিয়ে। অম্বা-শিখণ্ডিনীর দিকে এক বার তাকিয়ে সেই যে তিনি নির্বিরোধে নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন রথের উপর, সেই তাঁর পূর্বকৃত্য হতে পারত। কেননা, সে দিন অম্বাকে প্রীতিমতী হয়ে ভীষ্মের সঙ্গে যেতে দেখেছিলেন শাল্বরাজ। সে দিন সেই প্রীতি-প্রণয়ে মন দিতে পারেননি বলেই আজ যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ভীষ্মকে শেষ শুভদৃষ্টি দিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হল অম্বার কাছে, শিখণ্ডীর কাছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গান্ধারী

এই একটা অলংকার কাব্য-রচনায় ব্যবহৃত হয়, যেখানে দক্ষতম প্রযোক্তা বোধহয় কালিদাস। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি— এ-সব অলংকার প্রয়োগ করা কালিদাসের কাছে বামহস্তের কৌশল। কিন্তু যৌবনবতী পার্বতীর স্মিতহাস্যের তুলনা দেওয়ার সময় কালিদাস বুঝিয়ে দিলেন— দেখো পাঠক! চাঁদের জ্যোৎস্না-মাখানো হাসি, কি মুক্তোর দ্যুতি-মাখা দাঁতের কথা অনেক হয়েছে, আমার স্টকে এমন কোনও উপমান নেই, যার সঙ্গে পার্বতীর স্মিতহাস্যের তুলনা করতে পারি।

তবে হ্যাঁ, যা দেখোনি, যা শোনোনি, এমন অসম্ভব বস্তুর সম্বন্ধ যদি কল্পনা করার ক্ষমতা তোমার থাকে, তবে সেই অমন্দ স্মিতহাসির মাধুর্য খানিকটা আন্দাজ করতে পারবে। কালিদাস এবার বললেন— বড় বড় গাছে— অশ্বত্থ-গাছে, নিমগাছে যখন নতুন কচি পাতা বেরোয়, তখন তার মধ্যে একরকম গভীর তাম্রাভ রক্তিমতা থাকে। সেই তাম্রাভ রক্তিমার মধ্যে যদি দুই ছড়া তরলজ্যোতি মুক্তো বসিয়ে দেওয়া যায়, তবেই পার্বতীর স্মিতহাসির সঙ্গে তার তুলনা হতে পারে— নবপ্রবালোপহিতং যদি স্যাৎ/ মুক্তাফলং বা স্ফুটবিদ্রুমস্থম্।

রসশাস্ত্রে এই অলংকারের নাম নিদর্শনা। নতুন কচি রক্তিম বৃক্ষপত্রের মধ্যে মুক্তোর ছড়া বসিয়ে দিয়ে পরস্পর সম্পর্কহীন দুটি বস্তুর অসম্ভব সম্পর্ক ঘটিয়ে দিয়ে পার্বতীর স্মিতমুখের তুলনা সম্ভব করে তোলাটাই এখানে অলংকার তৈরি করেছে। কবির ভাবটা এই, এমন যদি হত, তবেই সেই মধুরস্মিতের একটা উপমা দেওয়া যায়, নচেৎ নয়— ততোঽনুকুর্যাৎ বিশদস্য তস্যাস্তাম্রৌষ্ঠপর্যস্তরুচঃ স্মিতেন।

আমরা যে গান্ধারীর চরিত্র আলোচনা করতে গিয়ে এমন এক কালিদাসী উপমার গল্প ফেঁদে বসেছি, তার কারণ গান্ধারীকেও কোনও একটা বিশেষ 'ভাল'-র ছাঁচে ফেলা যায় না। এমন বলা যায় না যে, তিনি সীতা-সাবিত্রীর মতো সতী, কেননা তিনি তাঁদের চেয়েও বেশি সতী, অথচ অন্যার্থে তিনি তাঁদের মতো সতী নন‌ও, কেননা মাঝে-মাঝেই তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে ভীষণ রকমের প্রতিবাদিনী, যা তথাকথিত সতীত্বের মুখে ঝাঁটা মারে। সার্থক এক জননী হিসেবেও তাঁর স্নেহের অন্ত নেই, অথচ এই স্নেহের ধারা এমনই বিচিত্র যে, তাঁর নিজের ছেলেরাই তাঁর স্নেহের বিষয়ে সংশয়িত, অথচ অন্যের ছেলেরা সেই স্নেহে আপ্লুত। আরও অদ্ভুত হল— তিনি নিজের ছেলেদেরও ক্ষমা করেন না, আবার অপরের ছেলের পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও, তাঁদেরও তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন না। সেইজন্যই আমরা ওই কালিদাসী উপমার কথা বলেছি। অর্থাৎ এক কথায় গান্ধারীকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশ করা খুব কঠিন, যদি তাঁকে প্রকাশ করতেই হয়, তবে পরস্পর-সম্বন্ধহীন বস্তুর মধ্যেও সম্বন্ধ ঘটাতে হবে।

ব্যাস, মহাভারতের কবি, চেষ্টা করেছিলেন এক কথায় গান্ধারী-চরিত্রের 'ফোকাল পয়েন্ট'টি খুঁজে বার করার। তিনি বলেছিলেন— আমি এই প্রসিদ্ধ কুরুবংশের বিস্তার বর্ণনা করবার সময় গান্ধারীর ধর্মশীলতার কথাও বলব— বিস্তরং কুরুবংশস্য গান্ধার্য্যা ধর্মশীলতাম্। কিন্তু আমি বেশ জানি— আজকের দিনে যুগহ্রাস-জর্জরিত অল্পশ্রুত পাঠক শুধুমাত্র 'ধর্মশীলতা' শব্দটুকু তেমন গভীর অর্থবোধে বুঝতে পারবেন না। কেননা 'ধর্ম' বলতে মহাভারতের যুগে যে গভীর ব্যাপ্ত সমাজবোধ এবং ন্যায়ের ভাবনা ভাবা হত, সেই ব্যাপ্তি আমাদের আধুনিক ধর্মচেতনায় নেই। পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধারণ করার মধ্যে যে বৈশদ্য এবং ব্যাপ্তি আছে, সেই ধারণই মহাভারতীয় ধর্মের প্রধান তাৎপর্য এবং প্রথম অর্থ। যদি আকাশ-সদৃশ উদারতায় সেই ধর্ম অনুধাবন করতে পারেন, তবে ব্যাস-কথিত ওই 'ধর্মশীলতা'ই গান্ধারীর উপযুক্ত বিশ্লেষণ হতে পারে। কিন্তু আধুনিক মহাভারত-পাঠকের হৃদয় যেহেতু নিরন্তর মহাভারতচর্চায় তেমন বিশদীভূত নয়, তাই প্রারম্ভেই উপমার অঙ্গুলি-সংকেতে গান্ধারী চরিত্রের মুখ্য উপাদানটুকু গৌণভাবে নির্দেশ করতে হচ্ছে। অর্থাৎ আমরা সোজাসুজি বলতে পারছি না যে হ্যাঁ, গান্ধারীর চরিত্র এইরকম। জায়া-জননীর অভিধেয় একান্ত-নির্দিষ্ট স্বার্থ-সম্ভব গুণগুলির মধ্যে যদি সার্বভৌতিক মঙ্গলের চেতনা অনুস্যূত হয়, তবেই প্রবাল-পত্রোপহিত মুক্তাফলের মতো গান্ধারীর চরিত্রও উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু আমার ভাষার দীনতা, আমার একান্ত পার্থিব নির্মাণশৈলী শেষ পর্যন্ত ব্যাসকথিত গান্ধারী-চরিত্রের মহাকাব্যিক উত্তরণ ঘটাতে পারবে কিনা— আমার ভয় আছে, সংশয় আছে।

এখনকার দিনের ছিন্নতন্তু পরিবারগুলিতেও যদি কোনও বৃদ্ধ থাকেন, তবে তিনি স্মরণ করতে পারবেন— গাঁয়ে-গঞ্জে জ্ঞাতি-শরিক, বড় তরফ, ছোট তরফ এবং অবশ্যই কর্তামা, বড়মা, মেজমা, রাঙামা— ইত্যাদি বিচিত্র তন্তুসমৃদ্ধ পরিবারগুলিতে এমন মহীয়সী মহিলা থাকতেন সেকালে, যাঁরা অমুকের ছেলে নাড়ু ভালবাসে বলে বিনা কারণে নাড়ু বানাতেন, যাঁরা নিজের ছেলে পরীক্ষায় ফেল করলে পরের বছরের জন্য আশ্বাস দিতেন এবং সেজ-বউ বা রাঙা-বউয়ের ছেলে পরীক্ষায় 'ফার্স্ট' হলে ভবিষ্যতে তার আয়েই বৃদ্ধ-জীবন কাটাবেন বলে সার্থক সান্ত্বনা পেতেন। কোনও কোনও সময় নিজের ছেলের অপদার্থতার জন্য কষ্ট পেতেন না, এমন নয়, অথবা জ্ঞাতি-শরিকদের প্রত্যক্ষ দূষতেন না, এমনও নয়, তবে সেই স্বার্থভাবনা পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মতো এতটাই ক্ষণস্থায়ী যে, পরক্ষণে অন্যতর গৃহপুত্রদের সমৃদ্ধিতে তা একেবারেই চাপা পড়ে যেত। শুধু কুরুপাণ্ডবের জ্ঞাতিবিরোধের নিরিখে গান্ধারী যে এই ধরনের অনুগুণসম্পন্ন মহীয়সী মহিলা, তা কিন্তু নয়। তা নয় এইজন্য যে, গান্ধারীর পিছনে এক বিশাল মহাকাব্যিক 'ফ্রেম' আছে, আছে বিশাল এক রাজবংশের ঋদ্ধ পটভূমি। সেখানে কারণে-অকারণে ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস খুব একটা ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে না সামান্য মান-অপমান, সুখ-দুঃখ-ভাবনা। অথচ আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে জন্মালেই মহাকাব্যের প্রচ্ছায়াহীন বিরাট গৃহস্থালীর মধ্যে আমাদের যে কোনও

বড়-মা, মেজ-মা বা রাঙা-মাকে আমরা গান্ধারীর বিবর্তিত রূপে দেখতে পেতাম। তার মানে এখানেও মেলানো গেল না। কিন্তু যদি মহাকাব্যিক পটচিত্রের মধ্যে অথবা বলা উচিত সুপ্রসিদ্ধ ভরতবংশের ততোধিক সুপ্রসিদ্ধা কুলজননীর চালচিত্রের মধ্যে যদি পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের স্বার্থসন্ধিহীন বড়-মাকে পুরে দিতে পারতাম, তবেই 'নবপ্রবালোপহিত' মুক্তাফলের মতো গান্ধারীর কথঞ্চিৎ উপমা করা যেত, নচেৎ নয়।

মহাভারতের প্রত্যেকটি বড় চরিত্র বর্ণনার সময়, তাদের একটা পূর্বরূপ কল্পনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে— অমুকের অংশে অমুকের জন্ম হয়েছে— যেমন কলহস্বরূপ কলির অংশে দুর্যোধনের জন্ম, অথবা ধর্ম বিদুর-রূপে জন্মেছিলেন, অথবা সিদ্ধি দেবীর অংশে কুন্তীর জন্ম। লক্ষণীয়, মহাভারতীয় বিরাট পুরুষদের অংশাবতার বর্ণনায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেবতা এবং উপদেব বসুগণ, গন্ধর্বদের উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনই গান্ধারী-কুন্তীর পূর্বজন্মের প্রকৃতি বর্ণনায় একটা 'অ্যাবস্ট্রাকশন' আছে। পুজো করার সময় দেখবেন— এখনও একবার উচ্চারণ করতে হয় 'এতে গন্ধ-পুষ্পে ষোড়শমাতৃকাভ্যো নমঃ।' তার মানে ষোলোজন চিরন্তনী মাতৃকামূর্তি আছেন।

এঁদের মূর্তিকল্প একটু 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' বটে, কিন্তু এঁরা প্রত্যেকেই মনুষ্যজীবনে মাতৃকল্প স্ত্রীলোকের এক-একটি চিরন্তনী মূর্তি প্রকাশিত করে। এই যে দেখুন, পাণ্ডবজননী কুন্তীকে যে সিদ্ধি-দেবীর অংশ বলা হয়েছে, তাঁর জীবনে সেটা সম্পূর্ণ প্রতিফলিত। কুন্তী তাঁর জন্মলগ্ন থেকে, কুন্তিভোজের কাছে দত্তক দেওয়া থেকে বিবাহিত জীবনে পুত্রদের ওপর অত্যাচার— সব কিছু মিলিয়ে চরম যন্ত্রণার জীবনযাপন করেছেন। অবশেষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধজয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্মস্বরূপ যুধিষ্ঠির সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হতেই তিনি তাঁর সারা জীবন অস্ত্রহীন যুদ্ধের সিদ্ধি লাভ করেছেন। কুন্তী তাই সিদ্ধিস্বরূপিণী। পার্থিব জীবনের 'আলটিমেট গেইন' 'চরম প্রাপ্তি' অথবা 'অ্যাবস্ট্রাক্টলি' যদি বলি 'সাকসেস'— তবে সেটাই কুন্তীর 'আলটিমেট' চেহারা। এই দৃষ্টিতে দেখলে গান্ধারীকে যে মাতৃকা-মূর্তির অবতার হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে, তার চেয়ে সঠিক বোধহয় আর কিছু হতে পারে না। গান্ধারী পূর্বস্বরূপে ছিলেন 'মতি' অর্থাৎ মননের প্রতিমূর্তি। 'মনন' কথাটা কি কখনও গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন— 'মন্' থেকে ধাতু থেকে প্রত্যয়নিষ্পন্ন এই শব্দের মধ্যে মনের সংবেদনশীলতার সঙ্গে সর্বকল্যাণময়ী বুদ্ধিও একত্তর হয়ে গেছে। এই মনন-শব্দেরই স্ত্রীলিঙ্গ-রূপ মতি, তিনিই গান্ধারী।

গান্ধারী যে দেশে জন্মেছিলেন, সেই দেশের তেমন সুখ্যাতি সে-কালেও ছিল না এবং সেই দেশ থেকে আসা শকুনির চরিত্র এমনভাবেই আমরা মহাভারতে পেয়েছি, যাতে গান্ধার দেশের ওপর আমাদের বিলক্ষণ অভক্তি হয়। কিন্তু ওই যে প্রাচীন ব্যবহারজীবীরা বলেছেন— কোনও মানুষকে দেশ তুলে গালাগালি দিয়ো না, এমন গালাগালি দণ্ডযোগ্য অপরাধ। কথাটা এইজন্যই নিশ্চয় বলা হয়েছে যে, একটি দেশের সব মানুষই একরকম হন না। কেউ বা ব্যক্তিগত চরিত্রেই মন্দ, আবার কেউ বা ভাল। প্রাচীনদের এমন সদর্থক আইন থাকা সত্ত্বেও এ-কথা বোধহয় সত্যি যে, বিশেষ দেশ, দেশের জলবায়ু, ডেমোগ্রাফি, নদ-নদী, অরণ্য, একটি বিশেষ দেশের মানুষের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য তৈরি করে। এ-কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পণ্ডিত গবেষকরাও স্বীকার করেন। মহাভারতের মধ্যেই মদ্র দেশ, বাহীক দেশ, কাশ্মীর দেশ, কেকয় দেশ অথবা মথুরার বিশেষ বৈশিষ্ট্য কীর্তিত হয়েছে এবং শকুনি যেহেতু এই দেশের মানুষ, অতএব তাঁর কথা বলতে গিয়েই গান্ধার দেশের বৈশিষ্ট্যের কথাও বার-বার এসেছে মহাভারতে।

ভারতীয় সভ্যতার প্রথম লগ্ন থেকে যদি বিচার করি, তবে বলতেই হবে যে, আর্যায়ণের প্রথম কল্পে আর্যদের পুণ্য বসতি ঘটেছিল এই গান্ধার দেশে। খোদ ঋগ্বেদে, এই দেশের নাম উল্লিখিত হয়েছে এবং তা উল্লিখিত হয়েছে এক রমণীর মুখে— তিনিই সেই মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি। তার মানে সেই প্রাচীন সময়েও এখানকার মেয়েদের মধ্যে এতটাই লেখা-পড়ার চল ছিল যাতে এক রমণীর মুখে ঋক্-মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে। এই শিক্ষা এবং বিদ্যাবত্তার উত্তরাধিকারই হয়তো গান্ধারী লাভ করেছিলেন। ভৌগোলিক দিক থেকে গান্ধার দেশটি এখনকার পাকিস্তানের পেশাওয়ার, রওয়ালপিণ্ডি এবং লাহোরের খানিকটা অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছিল বলে সাধারণ ধারণা। কিন্তু পারস্য দেশের শিলালিপি থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, এখনকার আফগানিস্তানের কাবুল অঞ্চলও তখন গান্ধারের সীমার মধ্যে ছিল। গবেষক পণ্ডিতদের ধারণা— গান্ধার-রাজ্যটা সেকালে আধুনিক আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চল থেকে আরম্ভ করে একেবারে উত্তর-পশ্চিম পঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সেদিন যে আফগানিস্তানের কান্দাহারে ভারতীয় বিমান-অপহরণের ঘটনা ঘটল, সেই 'কান্দাহার'ও অতীত গান্ধারের শব্দ-অপভ্রংশের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে।

সে যাই হোক, বৈদিক যুগে এবং তৎপরবর্তীকালেও বেশ কিছুদিন, এমনকী ভগবান বুদ্ধের সময়েও গান্ধার রীতিমতো সমৃদ্ধ দেশ ছিল এবং সমৃদ্ধির কারণে যুদ্ধ-বিগ্রহও অনেক হয়েছে এ-দেশে, ফলে রাজ্যের সীমা কখনও বেড়েছে কখনও কমেছে। মহাভারতে গান্ধার দেশকে যেমনটি চেনা যায়, তাতে বৈদিক যুগের সেই সমৃদ্ধি গান্ধার থেকে তখন অনেকটাই অন্তর্হিত। আমাদের ধারণা আর্যায়ণের পরবর্তী পর্যায়ে সিন্ধু পেরিয়ে অনেকটা চলে আসার পর আর্য-পুরুষেরা যখন সরস্বতী-দৃষদ্বতীর প্রথম বসতির মায়াও কাটিয়ে উঠেছেন, তখন গান্ধার দেশে আর্য সংস্কৃতির অবক্ষয় ঘটে গেছে অনেকটা। মহাভারতের গান্ধার দেশের নাম উচ্চারিত হচ্ছে যবন, খশ, কাম্বোজ ইত্যাদি তথাকথিত অধম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে। স্বয়ং কর্ণ বহুকাল গান্ধার-রাজপুত্র শকুনির সহচর হওয়া সত্ত্বেও গান্ধার-দেশের আচার-ব্যবহার যে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যের অনুগামী নয়— সে কথা সোচ্চারে বলেছেন এবং যথেষ্ট নিন্দাসূচকভাবেই তা বলেছেন। অথচ গান্ধারী এই সমস্ত দেশ-নিন্দা এবং জন-নিন্দার ঊর্ধ্বে পৃথক এবং অন্যতর এক শান্ত জগতের প্রতিনিধি। কোনও দেশ, সেই দেশের মানুষ অথবা দেশ-জাতি-বর্ণের কোনও বিশেষ লক্ষণ দিয়ে গান্ধারীর চরিত্র একটা বিশেষ ছাঁচে বেঁধে ফেলা যায় না। তিনি নিজেই একটা বিশেষ, একটা অননুকরণীয় ব্যতিক্রম।

গান্ধারীর নিজের কোনও নাম নেই, দেশের নামেই তাঁর নাম। এতে মনে হয়— গান্ধারীর পিতা সুবল বিশাল কোনও পিতৃপরম্পরায় রাজ্য পাননি। তিনি নিজের ক্ষমতায় এবং গুণে রাজ্য পেয়েছিলেন বলেই আপন রাজ্যগৌরবে কন্যার নাম রেখেছিলেন গান্ধারী। আশ্চর্য ব্যাপার হল— মহাভারতের অন্যতমা প্রবীণা নায়িকার শৈশব কিংবা যৌবন-

সন্ধির কোনও সংবাদ মহাভারতের কবি দেননি। আমরা প্রথম তাঁর ব্যক্তিপরচয় পাচ্ছি কুরুকুলের পিতামহ ভীষ্মের মুখে, তাও কোন প্রসঙ্গে? না, মহামতি ভীষ্ম তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই বিচিত্রবীর্যের পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ দেবেন। অতএব ভীষ্ম এমন একটি কন্যা খুঁজছেন যে বিখ্যাত ভরত-কুরু বংশের বৃদ্ধি ঘটাবে। আসলে ভীষ্ম এবং তাঁর বিমাতা সত্যবতী— দু'জনেই কুরুবংশের সন্তান নিয়ে যথেষ্ট চিন্তান্বিত ছিলেন। ভীষ্ম তাঁর ভীষণ প্রতিজ্ঞার কারণে রাজাও হননি বিবাহও করেননি, স্বয়ং সত্যবতী নিজের দোষ প্রায় স্বীকার করেও ভীষ্মকে নিয়োগ-প্রথায় বিচিত্রবীর্যের দুই স্ত্রীর গর্ভাধানে স্বীকৃত করাতে পারেননি। অবশেষে ব্যাসের কৃপায় ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরের জন্ম। মহারাজ শান্তনুর পর থেকেই কুরুবংশের সিংহাসনে রাজার স্থিতিকাল সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ততর হচ্ছে। ভীষ্ম তাই ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডুর জন্য এমন মেয়েদেরই কুরুবাড়িতে বউ করে নিয়ে আসতে চান, যাঁরা সন্তান-ধারণের অত্যন্ত উপযুক্ত।

কিন্তু সন্তান লাভ করা এমনই এক অকল্পনীয় তত্ত্ব যা আগে থেকে পরীক্ষা করা যায় না। শারীরিক-মানসিক কিছু লক্ষণ থেকে সাধারণ একটা বিচার হয় বটে, কিন্তু পুরোটা হয় না। ভীষ্ম দিগ্-দিগন্তরে ব্রাহ্মণ-সজ্জনদের পাঠিয়েছিলেন— সুলক্ষণা কন্যার সংবাদ সংগ্রহ করতে। তাঁদেরই একজন এসে ভীষ্মকে সংবাদ দিয়ে বললেন— আছে মহাবীর। তেমন একটি কন্যাই আছে গান্ধার রাজ্যে। তিনি মহারাজ সুবলের কন্যা গান্ধারী। সে ভগবান শিবের কাছে এই বর পেয়েছে যে, সে নাকি শত পুত্রের জননী হবে— গান্ধারী কিল পুত্রাণাং শতং লেভে বরং শুভা। ব্রাহ্মণের মুখের কথা শুনেই বসে থাকলেন না ভীষ্ম। এর-তার কাছে খবর নিয়ে তিনি বুঝলেন— বামুন ঠিকই বলেছে— ইতি শুশ্রাব তত্ত্বেন ভীষ্মঃ কুরুপিতামহঃ।

সর্বক্ষেত্রে কন্যার পিতাই সম্বন্ধ নিয়ে আসেন পুত্রের পিতার বাড়িতে। এ ক্ষেত্রে উলটো হল। ভীষ্মই ভ্রাতুষ্পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ-সম্বন্ধ দিয়ে লোক পাঠালেন গান্ধাররাজ সুবলের কাছে— ততো গান্ধাররাজস্য প্রেষয়ামাস ভারত। দূত এসে পূর্বাপর সবই জানাল। এবং অবশ্যই ভীষ্মের এই নির্দেশ ছিল যেন দূত আনুপূর্বিক জানায় স্বয়ং বিবাহপাত্র ধৃতরাষ্ট্র সম্বন্ধেও— কারণ ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ। অসামান্য সুন্দরী কন্যার জন্য হস্তিনাপুর থেকে বিবাহ সম্বন্ধে এসেছে— এই সংবাদে গান্ধাররাজ সুবল যতখানি পুলকিত হয়েছিলেন, ঠিক ততটাই হয়েছিলেন আশাহত। সর্বানবদ্যা আত্মজা গান্ধারীকে শেষ পর্যন্ত এক অন্ধ পাত্রের হাতে তুলে দেবেন? পাত্র পাওয়া গেছে বলেই এমন একটা অন্যায় কাজ করবেন তিনি? মনে মনে তিনি ছটফট করতে থাকলেন— অচক্ষুরিতি তত্রাসীৎ সুবলস্য বিচারণা।

বিয়ের ব্যাপারে গরিব ঘরে একরকম যন্ত্রণা, বড় মানুষের ঘরে আর একরকম এবং সেটা একালেও যেমন, প্রাচীন কালেও তেমনই। কিন্তু একটা ব্যাপারে গরিব-বড়লোকের সমস্যাটা একই, সেটা হল— একটা জায়গাতে কন্যার পিতাকে আপোশ করতেই হয় এবং সুবল-রাজা সেই বড়লোকের আপোশটাই করলেন শেষ পর্যন্ত। গান্ধার রাজ্যের রাজা সেকালের দিনে, অন্তত মহাভারতের কালে এমন কিছু নাম-করা রাজ্য ছিল না, অতএব সেই রাজ্যের রাজার কাছে যদি হস্তিনাপুরের মতো বিখ্যাত রাজবংশের প্রধান পুরুষ ভীষ্ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য কন্যা যাচনা করে লোক পাঠান, তা হলে অন্তরে এক ধরনের স্ফীতিবোধ অবশ্যই কাজ করে। সুবলের মতো ক্ষুদ্র রাজাকে তখন মনের উদ্গত আবেগ চেপে রেখে বুদ্ধি দিয়ে বিচার আরম্ভ করতে হয়। ভাবী জামাতার অন্ধত্বের কথা মাথায় রেখেও আবারও তাঁকে তর্কযুক্তি জুগিয়ে নিয়ে ভাবতে হল— বিখ্যাত ভরত-কুরুবংশের উজ্জ্বল গৌরবের কথা, ভাবতে হল— হস্তিনাপুর রাজ্যের সমৃদ্ধ রাজশক্তির কথা।

বলা উচিত— মহামতি ভীষ্মের অসম্ভব শক্তি এবং ক্ষমতার ব্যাপারটাও এখানে কাজ করছিল। তিনি পূর্বে বৈমাত্রেয় ভাই বিচিত্রবীর্যের বিবাহের জন্য কাশীরাজ্যে সমাগত বিরুদ্ধ রাজাদের চোখের ওপর দিয়ে অম্বা-অম্বিকা-অম্বালিকাকে তুলে নিয়ে এসেছিলেন। অতএব সেই ভীষ্মের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করাটা ক্ষুদ্র গান্ধার রাজ্যের পক্ষে ভয়ংকর ছিল। কিন্তু আমরা জানি— এই ভীতি ছিল অমূলক। কেননা বিচিত্রবীর্যের জন্য কাশীরাজ্য থেকে তিন কন্যা আনতে গিয়ে অম্বার পূর্ব প্রণয়বদ্ধতার কারণে ভীষ্ম যে বিড়ম্বনায় পড়েছিলেন, তাতে ভ্রাতুষ্পুত্রদের জন্য আবারও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা ভীষ্মের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। কাজেই ভীষ্মের ভয় ব্যাপারটা এখানে নিতান্তই অমূলক ছিল। অন্যদিকে ভীষ্মও এগিয়েছেন খুব সন্তর্পণে, ধাপে-ধাপে। তিনি কন্যা যাচনা করে লোক পাঠিয়েছেন এবং পাত্র ধৃতরাষ্ট্রের জন্মান্ধতাও গোপন করেননি। গান্ধাররাজ সুবল যে শেষমেশ এ বিয়েতে রাজি হলেন, তার কারণ একটাই— বড়ঘরের 'স্টেটাস', ভরত-কুরুবংশের খ্যাতি, কীর্তি এবং পরম্পরার কথা ভেবে— কুলং খ্যাতিঞ্চ বৃত্তঞ্চ বুদ্ধ্যা তু প্রসমীক্ষ্য চ।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কথাটা এখানে আসবেই। যে মেয়েটি তার যৌবন-সন্ধি বয়সে স্বপ্নের পুরুষের কাছে সমস্ত দেবার বাসনা নিয়ে বসে ছিল, তাকে একবার পিতা জিজ্ঞাসাও করলেন না, একবারও বললেন না যে, 'তোমার ভবিষ্যৎ স্বামী অন্ধ, তোমার আপত্তি আছে কিনা।' জিজ্ঞাসা করলেন না এবং পিতা সুবল সামান্য দ্বিধা করেই জামাইয়ের কুল-শীল-জাতি-মান দেখেই ঠিক করলেন যে, তিনি অন্ধের হাতেই মেয়ে দেবেন। তিনি তৃপ্ত হলেন কুটুম্বের সম্বন্ধের গৌরবে, কিন্তু গান্ধারী, যুবতী, সদ্যোদ্ভিন্নযৌবনা, গান্ধারীর মন ভরে উঠল অভিমানে। অন্তত আমার তো অভিমানই মনে হয়। অন্যেরা বলেন— পাতিব্রত্য, এমনকী মহাভারতের কবিও সমকালীন সমাজের ধর্মদর্শিতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বলেছেন— যে, ভবিষ্যৎ-স্বামীর অন্ধ জীবনের যন্ত্রণার কথা স্মরণ করে পতিব্রতা গান্ধারী সমব্যথায় একখানি পট্টবস্ত্র অনেকগুলি ফেরতা দিয়ে বেঁধে নিলেন নিজের চোখ— ততঃ সা পট্টমাদায় কৃত্বা বহুগুণং তদা। ববন্ধ নেত্রে স্বে রাজন্...।

আমি কোথাও মহাভারতের কবির শব্দশরীর অতিক্রম করিনি, এখানে যে করছি তা নয়। তবে কিনা মহাকবির শব্দার্থমাহাত্ম্য প্রয়োগ-পরম্পরার মধ্যে কবির আপন মনের কথা এমনভাবেই নিহিত থাকে যা বিশ্লেষণ করলে কবির হৃদয়টি ঠিক ধরা পড়ে। কবি লিখেছেন— মহারাজ সুবল তাঁর ভাবী জামাতার কুল-খ্যাতির কথা শুনে মেয়েকে মৌখিকভাবে দিয়েই দিলেন ধৃতরাষ্ট্রের হাতে। সব হয়ে-যাওয়া ঘটনার খবর এবার গান্ধারীর কানে এল। তিনি শুনলেন যে, তার ভাবী স্বামী অন্ধ— গান্ধারী ত্বথ শুশ্রাব ধৃতরাষ্ট্রমচক্ষুষম্— অথচ এই অন্ধ মানুষটির হাতেই তাঁর পিতামাতা তাঁকে তুলে দিতে চাইছেন। এখানে যে বিবাহ-কৌতুকিনী

রমণীর হৃদয় উপেক্ষিত হয়ে গেছে, মেয়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছার চেয়ে বরের খ্যাতি-কুল-মান যে এখানে বড় হয়ে গেছে, এটা এক লহমায় বুঝতে পারলেন। মহাকবি লিখেছেন— গান্ধারী যখন দেখলেন যে, এমন অন্ধ স্বামীর হাতেও তাঁর বাবা-মা তাঁকে দিতে চাইছেন— আত্মানং দিৎসিতামস্মৈ পিত্রা মাত্রা চ ভারত— সেই মুহূর্তেই তিনি পট্টবস্ত্রের আবরণে বেঁধে নিলেন নিজের চোখ দুটি। মহাকবি শেষ বিশেষণ দিলেন— পতিব্রতপরায়ণা। রক্ষণশীল সমাজকে বুঝিয়ে দিলেন— শেষ কথাটা তাঁর চলমান সমাজে সমাজপতিদের সাংস্কারিক চোখে বিশেষণের ধুলো। গান্ধারীর বিদীর্ণ হৃদয় মহাকবি প্রকাশ করে দিয়েছেন বাক্যবন্ধে কর্মবাচ্যের ব্যবহারে। অর্থাৎ গান্ধারী এখানে স্বতন্ত্র নন। তাঁর স্বকীয় স্বাধীন আত্মার দাতা তিনি নন, কর্তা তিনি নন, সেটা বিসর্জন দেবার জন্য দুটি অনুক্ত কর্তা আছে— তাঁর বাবা এবং মা— যাঁরা এমনিতে অনুক্ত কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হলেও ঠুঁটো জগন্নাথের মতো গান্ধারী এখানে কর্মবাচ্যের কর্তা হয়ে আছেন— আত্মানং দিৎসিতামস্মৈ পিত্রা মাত্রা চ ভারত। আর ঠিক তখনই যেখানে তাঁর কর্তৃত্ব আছে, ঠিক সেই জায়গা থেকে কন্যাজন্মের সমস্ত অভিমান একত্র করে পুরু ফেরতা দিয়ে বেঁধে ফেললেন নিজের চোখ— যাতে বাবা-মাকেও আর দেখতে না হয়, স্বামীকেও আর দেখতে না হয়। কন্যার স্বাভিমান কবির শব্দমন্ত্রের পরম্পরায় অবশেষে অভিষিক্ত হল সামাজিক বিশেষণের সম্মানে— পতিব্রতপরায়ণা। ববন্ধ নেত্রে স্বে রাজন্ পতিব্রতপরায়ণা— তিনি চোখ বেঁধে ফেললেন।

ব্যাস কারণও দেখিয়েছেন— কেন এমন করলেন গান্ধারী। আমি জানি, অভিমান যদি চরম আকার ধারণ করে এবং তাতে যদি কাউকে কিছু করা না যায়, তখন মানুষ আত্মপীড়ন করে। ব্যাস লিখেছেন— চক্ষুষ্মতী রমণী যদি তার স্বামীকে অন্ধ দেখে, তা হলে পদে পদে যেমন অনভিনন্দন তাকে আক্রান্ত করে, তেমনই মনে জাগে অসূয়া— আমার আছে, ওর নেই। এই অসূয়া যাতে তৈরি না হয়, আপন ইন্দ্রিয়ের শক্তি যাতে তাঁকে একান্তে স্বামীর চেয়ে অহংকারী না করে তোলে, এই সমব্যথাও যেমন তাঁকে স্বারোপিত অন্ধত্বের দিকে নিয়ে গেল, তেমনই তৃপ্ত হল তাঁর হৃদিস্থিত অভিমান— যা আত্মনিপীড়নের পথ ধরেই শান্ত পরিণতি লাভ করল পতিপরায়ণতার ব্যাখ্যায়— পিতামাতা যখন এইভাবেই আমাকে অন্ধের হাতে সঁপে দিলেন, তখন আমিও দেখব না এই পৃথিবী, আমি তাঁকে অতিক্রম করব না— গান্ধারী মনকে বেঁধে নিলেন পরম নির্ধারিতের কাছে আত্মনিবেদন করে— নাভ্যসূয়াং পতিমহমিত্যেবং কৃতনিশ্চয়া।

বিয়ে করার নানান রীতি এই সেদিনও কত প্রচলিত ছিল। বরপক্ষে, কন্যাপক্ষে একাধিক বিভিন্ন রীতি। এই তো শুনেছি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির একাংশে এমন নিয়ম ছিল যে, মেয়েকে বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে এসে তারপর যথাবিহিত নিয়মে বিয়ে করতেন ঠাকুরবাড়ির বর-পুরুষেরা। এটা কোনও বাবুয়ানি, নাকি পুরুষতান্ত্রিকতা, এসব তর্কে না গিয়েও বলতে পারি যে, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভবই ছিল না বিবাহ করার জন্য এতদূর পথ যাওয়া; সেই হস্তিনাপুরের দিল্লি অঞ্চল থেকে গান্ধার-কান্দাহারের পার্বত্য-বন্ধুর পথ বেয়ে একজন অন্ধ মানুষ বিবাহ করতে যাবেন— এটা বোধহয় কনে-পক্ষের প্রধান পুরুষ সুবলও ক্ষমা করে দিয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতএব গান্ধারীকেই হস্তিনাপুর নিয়ে যাবার প্রশ্ন উঠল। ভার পড়ল রাজপুত্র শকুনির ওপর। বিবাহের বধূ হিসেবে গান্ধারী যাচ্ছেন, তাঁকে বধূপূর্ব বৈবাহিক সজ্জায় অনেক অলংকারে, বেশে-বাসে সাজিয়ে দিল গান্ধারের রাজবাড়ি। নবীন বয়সের সালংকারা বোনটিকে নিয়ে শকুনি কৌরবদের রাজধানী হস্তিনাপুরে রওনা দিলেন— স্বসারং বয়সা লক্ষ্ম্যা যুক্তামাদায় কৌরবান্। এত দূর পথ যেতে দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারীর কেমন লেগেছিল, মহাভারতের কবি তার এতটুকু বর্ণনাও দেননি। চোখে চার-ফেরতা কাপড় বাঁধা, সঙ্গে পরিচারিকা, রাজবাড়ির কিছু অনুচর, আর ভাই শকুনি। এমন চোখ বাঁধা অবস্থায় স্বামী-গৃহের কল্পনাটুকুই তাঁর প্রধান সহায়, কেননা কিছুই তিনি চোখে দেখবেন না, এমনকী স্বামী ধৃতরাষ্ট্রকেও না। এতটাও তো গান্ধারীর পক্ষে ভাবা সম্ভব ছিল না যে, আজ যে তাঁর ভাই শকুনি তাঁকে বধূবেশে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সম্প্রদান করার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন, সেই শকুনিই একদিন তাঁর সমস্ত সাধু-কল্পনার ধ্বংসবীজ হয়ে উঠবেন।

গান্ধারী হস্তিনাপুরে এসে পৌঁছালে কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম বিয়ের দিন-ক্ষণ ঠিক করলেন। মহাভারতে সেই নির্দিষ্ট দিনের আড়ম্বরের কোনও বর্ণনা নেই, নেই কোনও বৈবাহিক কর্মসূচি। তবু জানি, বরবধূর শুভদৃষ্টি যখন হলই না, তখন প্রয়োজনীয় আঙ্গিক হিসেবে সপ্তপদীগমন বা অশ্বারোহণের ঘটনাটুকু অবশ্যই ছিল, নইলে শুধু ধৃতরাষ্ট্রের সাত পাকে বাঁধা গান্ধারী এমন অশ্মময় ধৈর্য নিয়ে থাকলেন কী করে। সালংকারা গান্ধারীকে ধৃতরাষ্ট্রের হাতে দিয়ে গান্ধার রাজ্যে তখনকার মতো ফিরে গেলেন গান্ধারীর ভাই শকুনি। এই বিবাহে গান্ধার রাজ্যের পক্ষ থেকে উপহার-উপঢৌকনের ব্যবস্থা ছিল ভালই, অন্যদিকে মহামতি ভীষ্মও শকুনিকে যথাযোগ্য সম্মান-অভ্যর্থনায় তুষ্ট করেছিলেন। বিবাহের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটাই চলেছিল ভীষ্মের তত্ত্বাবধানে এবং তাঁর সৎকার-সংবর্ধনার শেষে শকুনি ফিরে গেছেন গান্ধারে— পুনরায়াৎ স্বনগরং ভীষ্মেণ প্রতিপূজিতঃ।

বিবাহের পরে গান্ধারী কেমন ছিলেন হস্তিনাপুরে, তার একটা ছোট্ট ছবি এঁকেছেন ব্যাস, মহাভারতের কবি। ছবিটার মধ্যে বেশিটাই প্রথামাফিক সাধ্বীতার বর্ণনা, কিন্তু তবু সেখানে একটা কথা আছে, যেখানে তাঁর কঠিন আত্মনিগ্রহের প্রাথমিক আবেশটুকু বোঝা যায়। এই কথাগুলি অবশ্য মহাকাব্যিক গড্ডলিকার মধ্যেই পড়ে— যেমন, গান্ধারী তাঁর চারিত্রিক গুণ এবং সদাচারে সমস্ত কুরুকুলের তুষ্টি বিধান করেছিলেন। কুরুবংশের প্রধান পুরুষেরা— অন্তত যাঁরা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট জন বটে— তাঁরা সকলেই গান্ধারীর আচার-ব্যবহারে কোনও ত্রুটি দেখতে পাননি। দোষ-দর্শনের কোনওই কি সম্ভাবনা ছিল, তা হয়তো নয়, কিন্তু যে জায়গায় একটা সংশয়িত ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে, মহাভারতের কবি সেখানে সংশয়টা স্পষ্ট করে না বলে গান্ধারীর বৃত্তিটুকু উদ্ধার করেছেন।

ব্যাস কথাটা লিখেছেন এইরকম— গান্ধারী কোনও পুরুষের নামও কোনওভাবে উচ্চারণ করতেন না— বাচাপি পুরুষান্ অন্যান্ সুব্রতা নান্বকীর্তয়ৎ। গান্ধারীর পতিপরায়ণতা দেখাতে গিয়ে এই শ্লোকটির অনুবাদ পণ্ডিতমশাইদের হাতে হয়ে উঠেছে ভয়ংকর। ওঁরা বলতে চান— বাড়ির সম্মানিত শ্রদ্ধেয় গুরুজনদের প্রতি গান্ধারী এতটাই বাধ্য আচরণ করতেন, যাতে তাঁরা কথা বললে তাঁদের মুখের ওপর তিনি প্রত্যুত্তর পর্যন্ত দিতেন না।

এমনকী প্রাচীন টীকাকার নীলকণ্ঠ পর্যন্ত এই কথা বলে গান্ধারীর ব্যক্তিত্বকে একটা মধ্যযুগীয় তাৎপর্যে পরিবেশন করতে চেয়েছেন। নীলকণ্ঠ বলেছেন— অন্য কোনও পুরুষের কথায় তিনি প্রত্যুত্তর পর্যন্ত দিতেন না— নান্বকীর্তয়ৎ; ন প্রত্যুত্তরং দত্তবতী।

নীলকণ্ঠ টীকাকারের দোষ দিই না, তিনি যে সময়ে জন্মেছিলেন, তাঁর ওপরে সেই কালের ছায়া পড়েছে। নীলকণ্ঠ তো মধ্যযুগেরই মানুষ। তাঁর সময়ে তিনি যেমন দেখেছেন, সমাজ তখন অনেকটাই নিজের মধ্যে গুটিয়ে গেছে, স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা অনেকটাই ক্ষুণ্ণ। হয়তো বা পুরুষের কথার ওপর কোনও উত্তর না দেওয়াটাই তখন স্ত্রী-ব্যবহারের চরম আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিক সেই কারণেই মহাভারতীয় শ্লোকটির অর্থনির্ণয় করার সময় লিখলেন— নান্বকীর্তয়ৎ, ন প্রত্যুত্তরং দত্তবতী।

এই কথা অবশ্য মহাকাব্যের উদার পরিবেশে মানায় না; কথাটা নিতান্তই মধ্যযুগীয়। বরঞ্চ এখানে মহাভারতের কবি যা বলতে চাইছেন, সেটা একটু অন্যভাবেও ভাবা যেতে পারে। কুরুবাড়ির প্রধান এবং প্রধানত ভীষ্ম চরম দায়িত্ব নিয়ে এই বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু তবু এই আশঙ্কা তাঁর মনে থাকার কথা যে, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী হয়ে গান্ধারীর মনের গহনে একটা দুঃখ থাকতেই পারে। মনে হতেই পারে— কাশী, কাঞ্চী অথবা অবন্তীর মতো কোনও ছোট রাজ্যের রাজপুত্রও তাঁর মনের মানুষ হতে পারতেন। এক অন্ধের সঙ্গে এই অন্ধ জীবন কাটানোর থেকে অন্য যে কোনও পুরুষই তাঁর বিবাহের পাত্র হতে পারতেন। ঠিক এই আশঙ্কার উত্তরেই মহাভারতের কবির নিরপেক্ষ মন্তব্য— সুব্রতা গান্ধারী অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী হয়েও অন্য কোনও পুরুষের কথা একবারও ভাবেননি, মনে-মনেও উচ্চারণ করেননি, তাঁদের নাম— বাচাপি পুরুষান্ অন্যান্ সুব্রতা নান্বকীর্তয়ৎ। এখানে 'অনুকীর্তন' মানে ধৃতরাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোনও পুরুষের নাম আকাঙ্ক্ষিত হিসেবে উচ্চারণ করা— গান্ধারী তা করেননি। এমনকী তা মনে মনে ভাবেনওনি। আমার ধারণা, এই অর্থই এখানে আকাঙ্ক্ষিত, প্রত্যুত্তর দেবার অর্থ এখানে আসে না।

২

আসলে মানুষের জীবনে কতকগুলি ঘটনা নিয়তির মতো নেমে আসে। স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্ব সেইভাবেই গান্ধারীর ওপরে নেমে এসেছিল বলেই তিনি সেটাকে শেষ পর্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করেছিলেন। এর পিছনে পাতিব্রত্য যতখানি কারণ, তার চেয়ে অনেক বড় কারণ গান্ধারীর মানসিক শক্তি, যা তাঁকে চিরতরে ধৈর্যশালিনী করে রেখেছে। তবু এই অসম্ভব ধৈর্যের মধ্যেও তিনি তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস এবং নীতিতে স্থির থাকতে পারেননি এবং তার কারণও তিনি নিজে নন, সেখানেও তাঁর স্বামী আছেন। এ-কথা স্পষ্ট করে সোচ্চারে কোথাও বলেননি মহাভারতের কবি। কিন্তু তাঁর বর্ণনার ক্রম থেকে বোঝা যায় যে, স্বামীর প্রতি গান্ধারীর আনুগত্যের সুযোগ নিয়েই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাঁর নিজের মানসিক বিকারগুলি খানিকটা অন্তত অনুপ্রবিষ্ট করতে পেরেছিলেন গান্ধারীর মধ্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেয়াল করে দেখুন, কৌরব-পাণ্ডবদের অধস্তন পুরুষ যখন বৈশম্পায়নের মুখে মহাভারতের আখ্যান শুনছেন, তখন তিনি সরলভাবেই এই তির্যক প্রশ্নটি তুলেছিলেন। বলেছিলেন— আচ্ছা! গান্ধারীর শত পুত্র হল কীভাবে? আর তার সঙ্গে এটাও বলুন যে, গান্ধারী তো চিরকাল স্বামীর অনুকূলেই চলছিলেন, কিন্তু সেই ধর্মচারিণী অনুরূপা স্ত্রীর প্রতি ধৃতরাষ্ট্র কেমন ব্যবহার করেছিলেন? ভাবটা এই— আপনি গান্ধারীর পতিপরায়ণতার কথা বলেছেন বটে। বলেছেন যে, তিনি কুরুকুলের গুরুজনদের অতিক্রম করেননি কখনও। কিন্তু এমন অনুকূলা স্ত্রীর প্রতি পুরুষ হিসেবে ধৃতরাষ্ট্রের কী মানসিকতা ছিল— কথঞ্চ সদৃশীং ভার্যাং ধৃতরাষ্ট্রোঽভ্যবর্তত?

এই প্রশ্নের উত্তরে কথকঠাকুর বৈশম্পায়ন প্রথমে জানিয়েছেন যে, কীভাবে গান্ধারী শত পুত্র লাভের বর পেলেন? বস্তুত এই বরলাভের ঘটনার মধ্যে বর পাওয়া এবং বরলাভের 'কনফার্মেশন' আছে। আমরা গান্ধারীর বিবাহের আগেই দেখতে পেয়েছি যে, মহামতি ভীষ্ম পর্যটক ব্রাহ্মণদের মুখে গান্ধারীর বরপ্রাপ্তি সম্বন্ধে খবর পাচ্ছেন। ব্রাহ্মণরা জানিয়েছিলেন যে, গান্ধারী ভগবান শিবের আরাধনা করে শতপুত্রের জননী হবার বর লাভ করেছেন— আরাধ্য বরদং দেবং ভগনেত্রহরং হরম্। এই বরপ্রাপ্তির নিরিখেই মহামতি ভীষ্ম গান্ধারীর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ স্থির করেছিলেন, কেননা পূর্বে বারবার কুরুকুলের উত্তরাধিকারের সংকট দেখে তিনি পুত্রবধূদের বহুপুত্রতার ভাবনাটুকু মাথায় রেখেছিলেন। এখন জনমেজয়ের প্রশ্নের পর আবারও গান্ধারীর বরলাভের প্রসঙ্গ উঠছে দেখতে পাচ্ছি।

বৈশম্পায়ন জানাচ্ছেন— মহর্ষি দ্বৈপায়ন ব্যাস, যিনি এক অর্থে গান্ধারীর শ্বশুরপ্রতিমও বটে, তিনি নাকি একদিন শ্রান্ত-ক্লান্ত অবস্থায় উপস্থিত হয়েছিলেন গান্ধারীর ভবনে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তাঁর শরীর অবসন্ন হয়ে গেছে। শ্বশুরপ্রতিম ঋষির অবস্থা দেখে গান্ধারী প্রাণমন দিয়ে যথোচিত সৎকারে ব্যাসকে পরিতুষ্ট করেন। তৃপ্ত ব্যাস তখন গান্ধারীকে বর চাইতে বললে গান্ধারী আবারও শত পুত্র লাভের বর চান— তোষয়ামাস গান্ধারী ব্যাসস্তস্যৈ বরং দদৌ। বস্তুত দ্বিতীয়বার এই বর যাচনা করে গান্ধারী তাঁর প্রথম বারের যাচনাটিকেই নিঃসংশয় করে তুলেছেন।

এ কথা বলতে পারি না যে, গান্ধারী তাঁর স্বামীকে ভালবাসতেন না। অন্তত তখনও পর্যন্ত ভাল না বাসার মতো বিশিষ্ট কোনও কারণ ঘটেনি। বিশেষত এই যে ব্যাসের কাছে সন্তান যাচনার সময় বহু পুত্র লাভের ইচ্ছা জানালেন গান্ধারী, সেখানেও কিন্তু তিনি প্রিয় স্বামীর অনুরূপ এবং সদৃশ পুত্রলাভের বাসনা জানিয়েছেন— সা বব্রে সদৃশং ভর্তুঃ পুত্রাণাং শতমাত্মনঃ। একজন অনুকূলা স্ত্রী হিসেবে স্বামীর প্রতি এই নিষ্ঠা প্রদর্শন করলেও ধৃতরাষ্ট্রের অন্তরস্থিত ইচ্ছা, অভিমান এবং আকাঙ্ক্ষাগুলি কিন্তু গান্ধারীর মধ্যে কিছুটা সংক্রমিত হয়েছিল, অন্তত সাময়িকভাবে সংক্রমিত হয়েছিল।

কেন এ কথা বলছি, তার কারণ হল— ভবিষ্যতে ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে যে অন্যায় লোভ এবং রাজ্যাকাঙ্ক্ষা দেখতে পাবেন গান্ধারী এবং যে অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা তিনি ভবিষ্যতে খুব একটা সহ্য করতে পারেননি, সেই লোভ তো সেই দিন থেকেই ধৃতরাষ্ট্রের অন্তরশায়ী

হয়েছিল, যেদিন তিনি জ্যেষ্ঠ হয়েও অন্ধত্বের কারণে রাজ্যের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

আমাদের বিশ্বাস করার এমন কোনও কারণও ঘটেনি যে, সাধারণ দাম্পত্য জীবনে যেমনটি সাধারণভাবে ঘটে, অর্থাৎ যেমন নববধূর মনের মধ্যে বিবাহিত পুরুষ তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ-বেদনার সংক্রান্তি ঘটায়, সেখানে ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী সেখানে ব্যতিক্রম। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস— ধৃতরাষ্ট্র যখন অজস্রবার ভবিষ্যতেও গান্ধারীর কাছে তাঁর এইভাবে রাজ্য হারানোর পরিতাপ জানিয়েছেন, তখন বিবাহিতা পত্নীর কাছে তিনি প্রথম থেকেই এই দুঃখ জানাননি এটা আমরা বিশ্বাস করি না।

বরঞ্চ কার্যক্ষেত্রে যে-সমস্ত ঘটনা ঘটল, তাতে এই অনুমান আরও দৃঢ় হয়। দেখুন, ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু প্রায় সম-সময়েই বিবাহ করেন। বিবাহের পরেও পাণ্ডু বেশ কিছুদিন পররাজ্য জয় করে স্বরাজ্যের ভৌগোলিক বিস্তারে মন দিয়েছিলেন। পাণ্ডু রাষ্ট্রজিত সম্পদ এবং অর্থ ধৃতরাষ্ট্রের হাতেও প্রচুর তুলে দিয়েছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রকেও দেখছি— তিনি যজ্ঞ-টজ্ঞ করছেন, কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও রাজা না হবার দুঃখ তাঁর মন থেকে দূরীভূত হয়েছিল কিনা সে-খবর মহাভারতের কবি স্বকণ্ঠে উচ্চারণ না করলেও পাণ্ডু যে তাঁর দুই সহধর্মচারিণী স্ত্রীকে নিয়ে বনবাসী হলেন হঠাৎ, বিনা কোনও প্ররোচনায়, বিনা কোনও ঘটনায়— এটা খুব স্বাভাবিক লাগে না। মহাভারতে স্পষ্ট কথা কিছু নেই বলেই আরও অনুমান হয়— এখানে মনে-মনে, অন্তরে-অন্তরে কিছু কঠিন টিপ্পনী ছিল যাতে পাণ্ডু আকস্মিকভাবে কাউকে কিছু না জানিয়ে স্ত্রীদের নিয়ে বনবাসী হয়েছেন। বনের মধ্যে বিভিন্ন আশ্রয়ে থাকার সময় রাজোচিত স্বচ্ছন্দতার জন্য ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর কাছে অর্থ পাঠিয়েছেন নানা লোকের মাধ্যমে এবং সেটাও পাঠিয়েছেন খুব 'মেটিকুলাসলি'— উপজহ্রুর্বনান্তেষু... নরা নিত্যম্ অতন্দ্রিতাঃ।

কিন্তু এইসব সচেতন ক্রিয়া-কর্ম সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্র কোনওদিন পাণ্ডুকে ফিরিয়ে আনার জন্য একটি লোকও পাঠালেন না, কিংবা বিদুরের মাধ্যমে পাঠালেন না এমন কোনও সংবাদ, যাতে পাণ্ডু জ্যেষ্ঠের আহ্বানে ফিরে আসেন। গান্ধারীর প্রসঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের এই ব্যবহারটুকু এইজন্য জানাচ্ছি যে, গান্ধারীও কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এ বিষয়ে কোনও প্রস্তাব করেননি, এমনকী তাঁর তরফ থেকে শোনা যাচ্ছে না কোনও উচ্চবাচ্যও। তাতেই অনুমান করি যে, তখনও পর্যন্ত ধৃতরাষ্ট্র তাঁর অক্ষমতা এবং তাঁর ঈর্ষা-অসূয়ার যুক্তিগুলি সাময়িকভাবে গান্ধারীর অন্তর্নিহিত করতে পেরেছিলেন। এ-বিষয়ে আরও একটা প্রায় নিশ্চিত প্রমাণ আছে।

গান্ধারী ব্যাসের কাছে শত পুত্রের জননী হবার বর লাভ করেছেন এবং গর্ভও ধারণ করেছেন, কিন্তু এক বৎসর চলে যাবার পরেও তাঁর গর্ভমুক্তির কোনও সম্ভাবনা দেখা গেল না, কোনও সন্তানও জন্মাল না। ওদিকে কুন্তী গান্ধারীর পরে গর্ভধারণ করেও তাঁর প্রথম সন্তান প্রসব করলেন পাণ্ডুর অরণ্য আবাসে। এই যে তাঁর পরে গর্ভধারণ করেও কুন্তীর পুত্রলাভের ঘটনা ঘটে গেল এবং তিনি গর্ভ নিয়েই বসে আছেন, এতে কিন্তু গান্ধারী মোটেই স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। তাঁর মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল— অপ্রজা ধারয়ামাস ততস্তাং দুঃখমাবিশৎ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গান্ধারীর মনে, ধৈর্যশীলা গান্ধারীর মনে এই দুঃখ কেন— তার একটা চর্চা কিন্তু অবশ্যই আসে। যে গান্ধারীকে আমরা ভবিষ্যতে সদা-সর্বদা ঈর্ষাসূয়ার ক্লিন্ন চক্র থেকে মুক্ত দেখব, সেই গান্ধারীর মনে এ ঈর্ষা-অসূয়া আপনিই সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে হয় না। আমরা তাঁর স্বামী ধৃতরাষ্ট্রকেই এ ঈর্ষার পিছনে কারণ বলে মনে করি। ধৃতরাষ্ট্র নিশ্চয়ই গান্ধারীকে এইভাবে বোঝাতে পেরেছিলেন যে— আমি জ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও অন্ধত্বের কারণে রাজা হতে পারিনি বটে, কিন্তু আমার পুত্র যদি পরবর্তী বংশে জ্যেষ্ঠ হয়ে জন্মায়, তবে পাণ্ডুর পরেই অন্তত তার রাজ্যাধিকার আসবে। উত্তরাধিকার এবং রাজ্যাধিকারের এই কালনীতি ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত সত্তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল, নইলে এ বিষয়ে কতটা তিনি মানসাঙ্ক করতেন তার প্রমাণ মিলবে যুধিষ্ঠির-দুর্যোধনের ক্রম-জন্মের পরেই। দুর্যোধন জন্মাতেই তিনি কুরুকুলের প্রধান পুরুষদের সভায় ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করেছিলেন— আচ্ছা! যুধিষ্ঠির তো বংশের বড় ছেলে, অতএব এখন তো সেই রাজা হবে— সেটা বুঝলাম, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের পরে তো আমার ছেলে দুর্যোধনই রাজা হবে তো, না কি... — অয়ং ত্বনন্তরং তস্মাদ্ অপি রাজা ভবিষ্যতি।

মাত্র এক বছরের ছোট-বড় দুই ভাইয়ের জন্মমাত্রেই এই হিসেব অবশ্যই জ্যেষ্ঠের মৃত্যু অথবা অপসারণের ভাবনা জাগিয়ে তোলে এবং ভবিষ্যতে সেই চেষ্টাই চলেছে বার বার। ধৃতরাষ্ট্রের এই অন্তর্ভাবনা উল্লেখ করে আমরা বোঝাতে চাইছি যে, যাঁর মনের মধ্যে অন্তহীন এইরকম আলোড়ন চলছিল, তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে শুধুই আকাশ-বাতাস, পুষ্প, নদীর রোমাঞ্চ-বর্ণনা করতেন, তা মনে হয় না। বরঞ্চ বলা উচিত, তিনি তাঁর এই অস্থিরতা গান্ধারীর মধ্যেও সাময়িকভাবে সংক্রামিত করতে পেরেছিলেন। নইলে কুন্তীর পুত্র জন্মাতেই গান্ধারীর মতো ধৈর্যশীলা রমণী এমন ঈর্ষাকাতর দুঃখিত হয়ে পড়বেন কেন! কেনই বা দেবর-দেবরপত্নীর এই পুত্রজন্মের সংবাদ তাঁর মতো মনস্বিনীর কাছে দুঃসংবাদ হয়ে উঠেছিল।

যদিবা তিনি শুধু দুঃখিত বা ক্ষুব্ধ হয়েই থাকতেন, তাও এক রকম হত। কুন্তীর পুত্রজন্মের কথা শুনে গান্ধারী এমন একটা কাণ্ড করে বসলেন, যা পরবর্তী কালে আমাদের পরিচিত গান্ধারী-চরিত্রের সঙ্গে মেলে না এবং তাতে এই ধারণা আরও দৃঢ় হয় যে, সেই ঘটনার পিছনেও স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের সবিকার মানসিকতার সংক্রমণ ছিল। গান্ধারী কী করলেন? কুন্তীর পুত্রলাভের সংবাদ শুনে গান্ধারী বিহ্বল হয়ে গেলেন। ভাবলেন— এতকাল ধরে আমি গর্ভধারণ করে রইলাম, অথচ পুত্র হল না। মাঝখান দিয়ে কুরুবংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মে গেল কুন্তীর গর্ভে— উদরস্যাত্মনঃ স্থৈর্যমুপলভ্যান্বচিন্তয়ৎ। নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় আত্মপীড়নের পথ বেছে নিলেন তিনি। একদিন, কাউকে কিছু না বলে— ধৃতরাষ্ট্রকেও তিনি একটা কথা জিজ্ঞাসা করলেন না, ঈর্ষায় তাড়িতা গান্ধারী নিজের গর্ভপাত করার চেষ্টা করলেন, নিজেরই গর্ভে আঘাত করে— সোদরং ঘাতয়ামাস গান্ধারী দুঃখমূর্ছিতা।

গান্ধারীর বিরাট এবং স্নিগ্ধ-ধীর জীবনে এ যেন কেমন এক হিংসার প্রশ্রয়। আত্মঘাতী হবার জন্য যে দীর্ঘ অভিমান প্রয়োজন হয়, আত্মহত্যার জন্য যে অন্তহীন ক্রোধের প্ররোচনা থাকে, অথবা আত্মপীড়নের জন্য যে নিরন্তর দুঃখ-ভাবনা লাগে— তার সবক'টিই কেমন

বিপরীতভাবে এসে আশ্রয় করেছিল মনস্বিনী গান্ধারীর মধ্যে। এতটাই তা বিপরীত যে, সেই অভিমান, ক্রোধ এবং দুঃখ গান্ধারীর স্বরূপের সঙ্গে মেলে না। বস্তুত এ ক্ষেত্রে যদি তাঁর হৃদয়ের ওপর অভিমানী ধৃতরাষ্ট্রের বাক্-ইন্দ্রিয়— মনোবুদ্ধির নিরন্তর ছায়াপাত না ঘটে থাকে, তা হলে আত্মহত্যার চেয়েও কঠিন এই গর্ভনাশের ভাবনা গান্ধারীর মন অধিকার করত না। বৈদ্য-চিকিৎসকেরা কেন জানি না আজও বলেন যে, গর্ভাবস্থায় সুচিন্তা এবং সুমঙ্গলী ভাবনায় দিন কাটালে সুসন্তানের জন্ম হয়। জানি না শরীরের সঙ্গে মন তৈরি হবার ব্যাপারেও এমন বৈজ্ঞানিক কোনও পরামর্শ আছে কিনা যাতে সুভাবনা, সুচিন্তায় সন্তানেরও ভাবগঠন হয়।

ধরে নেওয়া যাক, এ সব কথার কোনও মানে নেই, কিন্তু এই ঈর্ষা, ক্রোধ, অসূয়া মনস্বিনী গান্ধারীর অন্তশ্চেতনায় অবশ্যই কাজ করেছিল এবং তা স্বামী ধৃতরাষ্ট্রেরই নিরন্তর উত্তরাধিকার চর্চার ফল, যাতে তিনি কুন্তীর সন্তানজন্মে নিজেকে আর সফল মনে করেননি; অতএব গর্ভে আঘাত করে নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধিতে অক্ষম সন্তানকে আর জন্ম দিতে চাননি। এবং হয়তো বা এও সেই অভিমান, যেখানে উত্তরাধিকারের ব্যাপারে স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের নিরন্তর প্ররোচনা সহ্য করতে না পেরে তিনি গর্ভনাশে উদ্যত হয়েছেন। অথচ মহাভারতের কবি তথ্য দিলেন যে ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাতেই তিনি তাঁর গর্ভনাশের চেষ্টা করেন। কথাটা ঠিকই, কেননা যাঁর এত প্ররোচনা, সেই স্বামীর ইচ্ছাপূরণ করতে পারেননি বলেই অভিমানিনী গান্ধারী তাঁর অজ্ঞাতেই গর্ভনাশের চেষ্টা করেছেন।

অঘটন তবু ঘটেই গেল। এমন বলার উপায় রইল না যে সন্তান হয়ইনি, তাই উত্তরাধিকার এল না রাজ্যে। গর্ভে আঘাতের ফলেই হোক অথবা অসময়ে গর্ভপাতের কারণেই হোক, গান্ধারী স্থূল মাংসপেশীর মতো একটি বস্তু প্রসব করলেন— ততো জজ্ঞে মাংসপেশী লোহাষ্ঠীলেব সংহতা। 'অষ্ঠীলা' শব্দের অর্থ মাংসপিণ্ড। 'লোহাষ্ঠীলা'— মানে লোহার মতো শক্ত একটা গোলাকার মাংসপিণ্ডের আকারে কিছু। এরকম অদ্ভুত একটা বস্তু দেখে গান্ধারী সেটাকে কোনও অস্পৃশ্য ভূমিতে ফেলে দেবার কথাই ভাবছিলেন। এরই মধ্যে খবর গেল দ্বৈপায়ন ব্যাসের কাছে— তিনি গান্ধারীকে শতপুত্রের জননী হবার বর দিয়েছিলেন। আর ব্যাসের মতো পরমর্ষি যাকে আশীর্বাদ করেছেন, সে আশীর্বাদ বৃথা যাচ্ছে, সেটা যেমন সাধারণ মানুষের কাছেও সহনীয় নয়, তেমনই ভগবান ব্যাসেরও কিছু দায় থেকে যায় গান্ধারীর কাছে, কেননা তিনি বর দিয়েছেন। অতএব লোকেও তাঁকে তাড়াতাড়ি খবর দিল এবং তিনিও তাড়াতাড়ি এলেন গান্ধারীর ভবনে। মহাভারতের কথকঠাকুর লিখেছেন— ব্যাস ধ্যানে জানতে পেরেছেন গান্ধারীর অবস্থা— অথ দ্বৈপায়নো জ্ঞাত্বা... দদর্শ জপতাং বরঃ। যোগী পুরুষের এই ধ্যানগম্য প্রত্যয় এখনকার মানুষের ধারণাগম্য নয়। তবে ধ্যানযোগীর কাছে এই জেনে ফেলার ঘটনা তেমন অসম্ভব কিছু নয়। আর এই বিশ্বাস না থাকলে বুঝুন— তাঁর কাছে খবর পৌঁছেছে যেভাবে হোক এবং তিনি এসেছেন তাঁর সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য।

ব্যাস এসে দেখলেন সেই 'লোহাষ্ঠীলা' গোলাকার মাংসপিণ্ড। দেখেই বললেন— মহারাজ সুবলের মেয়ে তুমি। এ তুমি কী করার কথা ভাবছিলে— কিমিদং তে চিকীর্ষিতম্?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গান্ধারী পরমর্ষি শ্বশুর দ্বৈপায়ন ব্যাসের কাছে একটি কথাও গোপন করলেন না। মহাভারতের নিরপেক্ষ কথক-ঠাকুর মন্তব্য করেছেন— গান্ধারী যেমনটি ভেবে এই কাজ করেছিলেন, সেই সমস্ত কথা তিনি সত্যভাবে উপস্থিত করলেন পরমর্ষি শ্বশুরের কাছে— স চাস্মনো মতং সত্যং শশংস পরমর্ষয়ে। গান্ধারী বললেন— আমি শুনলাম কুন্তীর পুত্র হয়েছে। প্রথমজাত সূর্যের মতো সে পুত্র। আর সেই পুত্রই তো এই বিখ্যাত বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবে জন্মাল— জ্যেষ্ঠং কুন্তীসুত জাতং শ্রুত্বা রবিসমপ্রভম্। আমি আর তাই স্থির থাকতে পারিনি। দুঃখে-অভিমানে আমি গর্ভপাতের চেষ্টা করেছি উদরে আঘাত করে।

গান্ধারীর এই সত্য এবং স্বাভিমান উক্তি থেকে আরও বোঝা যায় যে, তাঁর ইচ্ছার মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছা সংক্রমিত হয়েছিল। বর প্রার্থনার ক্ষেত্রে তিনি শত পুত্রের জননী হবার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন— এখানে তাঁর সরলতা ছিল, কিন্তু সেই সন্তান কুলজ্যেষ্ঠ হোক অথবা কুরুরাজ্যে তার প্রথম উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা হোক সেই জ্যেষ্ঠত্বের সুবাদে— এমন প্রার্থনা পূর্বেও তাঁর মনে ছিল না, পরেও এই জটিলতা সৃষ্টি হবার কথা নয়। এই জটিলতা স্বামী ধৃতরাষ্ট্রই তাঁর মনে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। আর ঠিক সেই কারণেই কুন্তীর জ্যেষ্ঠ প্রথম পুত্রজন্ম স্বামী ধৃতরাষ্ট্রকে ভীষণভাবে আহত করবে বলেই তাঁর অজ্ঞাতেই এই স্বাভিমান গর্ভনাশের চেষ্টা। ভগবান ব্যাসের উদ্যত প্রশ্নের মুখেও গান্ধারী তাঁকে বলেছেন— আপনি বর দিয়েছিলেন, আমি শতপুত্রের জননী হব। কিন্তু কী পেলাম আমি! শতপুত্রের বদলে এই লৌহকঠিন মাংসময় অণ্ড— ইয়ঞ্চ মে মাংসপেশী জাতা পুত্রশতায় বৈ।

গান্ধারীর মনের ক্ষতে ক্ষার নিক্ষেপ করেননি ব্যাস। তিনি গান্ধারীকে শতপুত্রের বরদান করেছেন বটে, কিন্তু সেই পুত্রই কুলজ্যেষ্ঠ পুত্র হবে, এমন বর তো তিনি দেননি, এবং তেমন বর তো চানওনি গান্ধারী। তবু তিনি গান্ধারীর কাছে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন না। কেননা বর নিয়ে এখন ঝগড়ার সময় নয়। বিশেষত, তাঁরই ক্ষেত্রজ পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের অভিলাষ এবং ক্ষোভ তিনি জানেন। অতএব এই প্রসঙ্গে না গিয়ে বরঞ্চ সেই শতপুত্রের বরদান-বিষয় সত্য করার জন্যই তিনি বললেন— আমি যে সত্য উচ্চারণ করেছি, তা তো মিথ্যা হবার নয়, সৌবলেয়ী! আমি তো স্বেচ্ছালাপের সময়েও কখনও মিথ্যে কথা বলিনি বাছা। অতএব আমার এ কথাও মিথ্যে হবে না— বিতথং নোক্তপূর্বং মে স্বৈরেষ্পপি কুতোঽন্যথা। জ্যেষ্ঠপুত্রের বিচারণা ত্যাগ করে ব্যাস মাংসময় বস্তুপিণ্ডটির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করার জন্য গান্ধারীকে নির্দেশ দিলেন— তুমি এক শত কলসি নিয়ে এসো ঘি ভর্তি করে। এই ঘৃতপূর্ণ কুম্ভগুলি রাখতে হবে সুরক্ষিত স্থানে এবং অত্যন্ত শীতল জল দিয়ে এই মাংসপিণ্ডটিকে সিক্ত করতে হবে প্রথমে— শীতাভিরদ্ভিরষ্ঠীলাম্ ইমাঞ্চ পরিসেচয়।

শীতল জলে ঠান্ডা 'টেমপারেচারে' রাখতেই সেই 'অষ্ঠীলা' মাংসময় পিণ্ডটি বহু ভাগে ভাগ হয়ে গেল এবং সংখ্যায় তার পরিমাণ দাঁড়াল একশো একটি। পৃথক পৃথক ঘৃতপূর্ণ কুম্ভে স্থাপন করার সময় এক-একটি ভ্রূণের চেহারা ছিল অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ অর্থাৎ প্রায় এক আঙুল— অঙ্গুষ্ঠপর্বমাত্রাণাং গর্ভাণাং পৃথগেব তু। এই অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ ভ্রূণতুল্য মাংসপিণ্ডগুলি যথাকালে ঘৃতকুম্ভের মধ্যেই বৃদ্ধিলাভ করতে লাগল। গান্ধারী কুম্ভগুলিকে সুরক্ষিত স্থানে রেখে যথোচিত সতর্কতায় রক্ষা করতে লাগলেন। ব্যাস বললেন— এক

বছর পরে এই কলসিগুলির মুখ খুলবে। গান্ধারী যে আর বেদব্যাসের কথা অমান্য করবেন না, সেটা বোঝা যেতেই ব্যাস চলে গেলেন হিমালয়ে তপস্যা করার জন্য।

সম্পূর্ণ এই ঘটনার মধ্যে অনেকটাই অলৌকিকতার আভাস রয়েছে বটে, কিন্তু ঘৃত সেকালের দিনে সমস্ত ওষধি-রসায়নের প্রতীক এবং কুম্ভ শব্দের অর্থ যতই কলসি হোক, এটি অন্য শত রমণীর গর্ভে গান্ধারীর গর্ভ সংস্থাপন কিনা— এমন একটা বৈজ্ঞানিক কল্প-কল্পনার অবসর এখানে থেকেই যায়। একবার তো ভাবতেই হবে যে, মহাকাব্যে অন্তত তিনজন বিখ্যাত মানুষকে আমরা জানি যাঁদের বিশেষণ কুম্ভজন্মা অথবা কুম্ভযোনি। বিখ্যাত অগস্ত্য ঋষি এবং বশিষ্ঠ মুনির জন্ম হয়েছে কুম্ভের মধ্যে বা কলসিতে। পাণ্ডবদের অস্ত্রগুরুও কুম্ভজন্মা দ্রোণাচার্য নামে চিহ্নিত। এসব শুনে আপনাদের কী মনে হয়— এঁরা সব কলসির মধ্যে জন্মেছিলেন? নাকি বাস্তবসম্মতভাবে মনে হয় যে, এঁদের পিতাদের বীজ অন্য কোনও নারীর গর্ভে সংস্থাপিত বা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। সংস্কৃতে কুম্ভদাসী নামে একটি কুখ্যাত শব্দ আছে, যার অর্থ— বেশ্যাপতির দাসী বা কুট্টনী। এঁদের গর্ভে পুত্র হত বলেই এই দাসীদের কুম্ভশব্দে লক্ষিত করা হয়েছে। আমরা এ-কথা মানছি যে, সেই মহাভারতের যুগে গর্ভ-প্রতিস্থাপন-পদ্ধতি হয়তো বৈজ্ঞানিকভাবে জানা ছিল না, কিন্তু মনে রাখতে হবে দা ভিঞ্চি বিমান আবিষ্কার না করলেও আপন কল্পনাতে বিমানের যে ছবি এঁকেছিলেন, তা আধুনিক বিমানের কল্পবৈজ্ঞানিক প্রতিকল্প বটে। কিংবা এইচ. জি. ওয়েলস-এর চাঁদের মানুষটিও কম রোমহর্ষক নয় বৈজ্ঞানিক হিসেবে। সেখানে দা ভিঞ্চি কিংবা ওয়েলস-এর তুলনায় ক্রান্তদর্শী ব্যাস কি খুব ফ্যালনা মানুষ! আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই— শুক্রবীজ অন্যত্র প্রতিস্থাপন করার জন্য অতিশীতলতার সঙ্গে আয়ুষ্কারী ঘৃতস্বরূপ রসায়নের কথা কল্পনা করাটাই তো এক বিশাল বৈজ্ঞানিক চেতনার উদাহরণ। আধুনিক কালের নল-জন্মা শিশু অথবা অন্য মাতার গর্ভে প্রতিস্থাপিত বীজের সন্তান— এই কঠিন বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির নিরিখে কুম্ভজন্মা শিশুদের কল্পনাটাই তো ঋষি-কবির প্রজ্ঞা বিজ্ঞাপিত করে। যাই হোক, গান্ধারীর গর্ভসংস্থ বীজ শত কুম্ভে সংস্থাপিত হল এবং এক বৎসর পূর্ণ হলে গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে প্রথম পুত্র লাভ করলেন— যাঁর নাম হল দুর্যোধন। এই পুত্রজন্মের পরেই ব্যাস এসে কিন্তু ভীষ্ম-বিদুরের মতো কুরুকুলের প্রধানদের জানিয়ে গেলেন যে, জন্মের ক্রম অনুযায়ী কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরই কিন্তু কুলজ্যেষ্ঠ এবং তিনিই রাজা হবার উপযুক্ত— জন্মতস্তু প্রমাণেন জ্যেষ্ঠো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।

গান্ধারীর প্রথম পুত্র দুর্যোধন যেদিন জন্মালেন, যখন তিনি শৈশবের প্রথম নির্ধারিত কান্নাটুকু কাঁদলেন, সেই ক্রন্দনের আওয়াজ নাকি ছিল গাধার ডাকের মতো। মহাকাব্যের অতিশয়িনী বর্ণনায় তাঁর কান্নার ডাক শুনে নাকি অন্য গাধারাও ডেকে উঠেছিল, ডেকে উঠেছিল শেয়াল, শকুন, কাক— যারা দুর্নিমিত্ত, দুর্লক্ষণের বাহন— তং খরাঃ প্রত্যভাষন্ত গৃধ্র-গোমায়ু-বায়সাঃ। এই যে সব দুর্লক্ষণের ভাবনা, এসব হয়তো মহাকাব্য-রচনায় প্রয়োজনীয় অঙ্গ। ভবিষ্যতে যে মানুষ অন্যায়-অধর্মের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠবেন, তাঁর কর্মজীবন দেখেই মহাকাব্যের কবিরা তাঁর জন্মের সময়েই দুর্নিমিত্ত বর্ণনা করেন। ধরে নিলাম— দুর্যোধন তাঁর শৈশবের স্বাভাবিক ক্রন্দন-শব্দেই তাঁর জননীকে আপ্লুত করেছিলেন, হয়তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাধা, শকুন, শেয়াল কিছুই ডেকে ওঠেনি দুর্যোধনের শব্দে-প্রতিশব্দে। কিন্তু এর থেকেও বড় দুর্নিমিত্ত ছিল— যখন পুত্রজন্মের সংবাদ লাভ করেই হস্তিনাপুরের কার্যনির্বাহী রাজা ধৃতরাষ্ট্র সভা ডেকে ভীষ্ম-বিদুরের মতো প্রধান পুরুষদের জিজ্ঞাসা করলেন— যুধিষ্ঠির কুন্তীপুত্র এই বংশের সবার বড় এবং সেই এ-রাজ্যের রাজা হবে, তা জানি। কিন্তু তারপরে আমার ছেলে দুর্যোধন রাজা হবে তো? আপনারা সঠিকভাবে আমাকে এই তথ্যটা দিন তো, বলুন তো ঠিক কী হবে— এতৎ প্রব্রুত মে তথ্যং যদত্র ভবিতা ধ্রুবম্।

প্রায় সমবয়সি— মাত্র এক বছরের ছোট রাজপুত্রের সম্বন্ধে কার্যনির্বাহী রাজার এই ভয়ংকর প্রশ্ন জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের প্রাণের অনিশ্চয়তা তৈরি করে। বিশেষত রাজযন্ত্র যাঁর হাতে রয়েছে, তিনি যদি পুত্রের রাজ্যাধিকার সম্বন্ধে এই নিশ্চয়তা দাবি করেন, তবে অন্যতর বয়োজ্যেষ্ঠের প্রাণের অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে এবং ভবিষ্যতে বারবার বিচিত্র আঘাত এসেছেও যুধিষ্ঠিরের প্রাণহানির জন্য। শেয়াল-শকুনের প্রতিশব্দের চেয়েও এই দুর্নিমিত্ত হস্তিনাপুরের রাজসভা আরও অনেক ভয়ংকর ছিল, যার জন্য মহাকাব্যের রীতিতে ধৃতরাষ্ট্রের বক্তব্য শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আবারও নিতান্ত প্রতীকীভাবে অমঙ্গলসূচক মাংসভোজী প্রাণী আর শেয়াল-শকুনের ডাক শোনা গেল— ক্রব্যাদাঃ প্রাণদন্ ঘোরাঃ শিবাশ্চাশিবশংসিনঃ।

সভায় সমবেত ব্রাহ্মণেরা এবং উচিতবক্তা বিদুর এই শেয়াল-শকুনের অমঙ্গল শব্দের কথাটাই তুললেন, কারণ কার্যনির্বাহী রাজার মুখের ওপর তাঁকে বলা যায় না যে, আপনার এই প্রশ্নটাই সবচেয়ে বড় ভয়ের সংকেত দিচ্ছে। অতএব মহাকাব্যের অমঙ্গল কল্পগুলিকে উপলক্ষ করেই সমবেত ব্রাহ্মণেরা এবং বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন— তোমার পুত্রজন্মের সঙ্গে সঙ্গেই যখন এতসব দুর্লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তখন তোমার এই ছেলেটি বংশনাশের কারণ হয়ে উঠবে। আমাদের মতে এ-ছেলেকে এখনই ত্যাগ করা ভাল, কারণ এঁকে রাখলে শুধু অনর্থেরই সম্ভাবনা থেকে যাবে— তস্য শান্তিঃ পরিত্যাগে গুপ্তাবপনয়ো মহান্।

স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের ওপর ব্রাহ্মণদের এই নির্দেশ, তার পূর্বে পুত্রজন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সভায় সকলকে ডেকে পাঠানো, এই সমস্ত কিছুর পিছনে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা গান্ধারীর দিকে একবার দৃষ্টি দিন। ব্যাস এসে জানিয়ে গিয়েছিলেন— জন্মের প্রমাণে যুধিষ্ঠিরই সবার বড়। এ ঘটনা জেনেও গান্ধারী কিন্তু স্বামী ধৃতরাষ্ট্রকে একবারের তরেও বাধা দেননি সভা ডেকে ওই বিচিত্র প্রশ্ন করার জন্য। মহাকাব্যিক রীতি অনুযায়ী কোনও ইষ্ট পুরুষের জন্ম হলে রাজপুরুষ সেখানে আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণদের অর্থদানে ব্যস্ত থাকেন। ধৃতরাষ্ট্র তার মধ্যে গেলেন না। গান্ধারী তাঁকে অবশ্যই কোনও প্ররোচনা দেননি, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের মন সম্পূর্ণ পড়ে নিয়েও তাঁকে তিনি সভাস্থলে যেতে বাধাও দিলেন না একটুও। মাঝখান দিয়ে ব্রাহ্মণরা যে আগাম উপদেশ দিলেন পুত্রত্যাগের বিষয়ে— এ-কথা নিশ্চয়ই তাঁর কানে এসেছে। কেমন লেগেছিল গান্ধারীর? তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া মহাভারতের কবি বর্ণনা করেননি। হয়তো পুত্রজন্মের পরেই জননীর যে বাৎসল্য একটি শিশুকে সর্বগত দৃষ্টিতে ঘিরে থাকে; সেই বাৎসল্যেই গান্ধারী সুরক্ষিত রেখেছিলেন দুর্যোধনকে।

মহাভারত বলেছে— সভাস্থিত ব্রাহ্মণেরা এবং প্রধানত বিদুরই ধৃতরাষ্ট্রকে পুত্রত্যাগের বিষয়ে কঠিন পরামর্শ দেন। কিন্তু পরবর্তীকালে দুর্যোধনের স্বভাব-ক্লিষ্টা গান্ধারী যখন

কুরুবংশ-ধ্বংসের লক্ষণ দেখে দুর্যোধনের সম্বন্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন, তখন তিনি বিদুরের কথাই প্রধানত উল্লেখ করছেন। অতএব ব্রাহ্মণরা নন, ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ বিদুরের কথা শুনে নিজের প্রথমজাত স্নেহাধার পুত্র সম্বন্ধে কেমন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল গান্ধারী-জননীর মনে? মহাভারতের কবি কোনও উল্লেখ করেননি এই মানসিক বিক্রিয়ার। এমন তো হতেই পারে না যে, কোনও বিক্রিয়া হয়নি। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন— একশো জনের এক কম নিরানব্বুইটি পুত্র থাকুক আপনার। কিন্তু যদি এই বংশের পরম্পরায় এতটুকু শান্তি চান, তবে এই একটি পুত্র আপনি ত্যাগ করুন, আপনার নিরানব্বুইটি পুত্র থাকুক— শতমেকোনম্ অপ্যস্তু পুত্রাণাং তে মহীপতে। বিদুর মহাজন-প্রবাদ উল্লেখ করে বলেছিলেন— সমগ্র কুল রক্ষার জন্য বংশের একজনকে ত্যাগ করাটা অনেক ভাল। সমগ্র একটা গ্রাম বাঁচাতে হলে একটা বংশ ত্যাগ করাও ভাল। আবার দেশ-রক্ষার মতো জাতীয় বিপর্যয়ে একটা গ্রাম ত্যাগ করাটাও কিছু নয়। আর এমন যদি হয়— আমি নিজেই না বাঁচি, তখন নিজের বাঁচার জন্য সমগ্র পৃথিবীকেও ত্যাগ করা যায়। কেননা নিজের প্রাণের চেয়ে বড় কিছু নেই, নিজেরই মতো আরও একটি প্রাণ সৃষ্টির ক্ষমতা আমাদের নেই।

বিদুর অথবা ব্রাহ্মণদের এই কথা শুনে— স তথা বিদুরেণোক্ত স্তৈশ্চ সর্বৈর্দ্বিজোত্তমৈঃ— ধৃতরাষ্ট্র নিশ্চয়ই কষ্টে কানে আঙুল দিতে চেয়েছেন। পুত্রস্নেহে অন্ধ রাজা দুর্যোধনকে ত্যাগ করার কথা ভাবতেও পারেননি। মহাভারতের কবি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন ধৃতরাষ্ট্রের কথা, কিন্তু গান্ধারীর সম্বন্ধে কোনও স্পষ্টোক্তি এখানে নেই। কেন নেই? মহাভারত বলেছে— প্রথমজাত পুত্রস্নেহে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রত্যাগ করতে পারেননি— ন চকার তথা রাজা পুত্রস্নেহসমন্বিতঃ। কিন্তু কথাটা তো গান্ধারীর সম্বন্ধেও খাটে। যে গান্ধারী ভবিষ্যতে সহস্রবার পুত্রের দুষ্কর্ম-বিষয়ে সচেতন করে দিয়েছেন, এমনকী পুত্রত্যাগের কথাও বলেছেন অনেক বার, কিন্তু এই সময়ে, এই প্রথমজাত শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনিও কিন্তু পুত্রত্যাগের কথা একবারও বলেননি। নাকি এখানেও সেই অভিমান কাজ করছে— যে অভিমানে তিনি নিজের চোখে কাপড় বেঁধে নিজেও অন্ধ হয়েছিলেন, সেই অভিমানেই আজ তিনি উদাসীন। স্বামীর মতো তিনিও পুত্রত্যাগের কথা ভাবলেন না। বস্তুত, এই যে সময় এবং অবস্থা চলছে, তাতে এক সুগভীর পুত্রস্নেহ তাঁর মধ্যেও কাজ করছে। এখনও তিনি ভাবতেও পারেন না— এই পুত্র ভবিষ্যতে কী ভয়ংকর রূপ ধারণ করবে। আর ভাবতে পারেন না বলেই বহির্জগতের শত কটূক্তি এবং আপন স্বামীর দুরভীষ্টা উচ্চাশাকে প্রশ্রয় দিয়েও প্রথমজন্মা শিশুর প্রতি স্নেহের আপ্লুতিতে তিনি দুর্যোধনকে ক্রোড়ে চেপে ধরেছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারীর ভালবাসা, অথবা খুব নিষ্ঠাও এটা নয়। বরঞ্চ এটাকে কোনও অনির্দিষ্ট অভিমানই আমরা বলতে পারি। বলতে পারি— সে অভিমান আপাতত এক উদাসীনতারও জন্ম দিয়েছে। এই যে মহাভারতের কবি উল্লেখ করলেন— ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হলে কী হবে, গান্ধারীর জন্য তিনি তো ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে বসে থাকেননি। গান্ধারী যখন গর্ভধারণ করেছিলেন, তাঁর উদর গর্ভভারে স্ফীত থেকে স্ফীততর হচ্ছিল, তখনও ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রীলোক প্রয়োজন হয়েছিল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য। এক বৈশ্যা রমণী গান্ধারীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গর্ভবৃদ্ধিকালে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সহায়তা করেছেন। সেই পরিচারিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের যে সন্তান, সেই যুযুৎসু কিন্তু দুর্যোধনের চেয়েই শুধু বয়সে ছোট, আর সবার বড়। মহাভারতের কবি একবারের তরেও লেখেননি— এই বৈশ্যা পরিচারিকার সঙ্গে স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের শারীরিক সংশ্লেষ গান্ধারীকে এতটুকুও বিচলিত করেছিল। লেখেননি কবি। কিন্তু গান্ধারীর মনে কি এ-ঘটনার সামান্যও ছায়াপাত ঘটেনি? জানি না।

পুত্রজন্মের পর থেকে বহুকাল পর্যন্ত একটি শব্দও তাঁর মুখ থেকে শুনিনি। তাতে এটা বেশ মনে হয় যে, সেই বিবাহকালীন সময় থেকে পুত্রজন্মের কাল পর্যন্ত স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যলাভ সংক্রান্ত যে মানসিক বিকারগুলি গান্ধারী অধিগ্রহণ করেছিলেন, পুত্রজন্মের পর থেকেই সেই সব বিকারের বাস্তবচিত্র নেমে এল তাঁর সামনে। তা ছাড়া বংশের প্রথম এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রলাভের ব্যাপারে কুন্তীর ওপরে যে ঈর্ষা ধৃতরাষ্ট্রের মাধ্যমে তাঁর মধ্যে তৈরি হয়েছিল, সে-ঈর্ষা কি গান্ধারী খুব তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন? অন্তত হস্তিনাপুরের রাজকীয় জীবনে পরপর যে ঘটনাগুলি ঘটেছে, তাতে কিছুতেই এ-কথা মনে হয় না যে, তাঁর মন থেকে সবকিছু মুছে গিয়েছিল।

অথচ এমনিতে বেশ সুখেই থাকার কথা ছিল তাঁর। প্রথম কিছু দিন, বড় জোর এক-দুই বৎসর এই ঈর্ষা-অসূয়া টিকে থাকার কথা। বিশেষত সন্তান-জন্মের সময়, সে জ্যেষ্ঠ হবে, নাকি কারও চেয়ে এক বছরের ছোট, সেটা যে একেবারেই দৈবের ঘটনা, এটা নিয়ে কোনও সহৃদয় রমণী কতদিন দুঃখ পুষে রাখেন! অথবা সেই দুঃখে অন্যের ওপর ক্রোধ করে থাকেন। অতএব বেশ সুখেই থাকার কথা ছিল গান্ধারীর। স্বামীর সঙ্গে একাত্মতায় তিনি তো নিজেই নিজের চোখ বেঁধে অন্ধ হয়ে ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর সমস্ত আশাই তো পূরণ হবার কথা। তিনি শত পুত্রের জননী হতে চেয়েছিলেন, মহর্ষি ব্যাসের করুণায় তিনি তা হয়েছেন স্বচ্ছন্দে। এমনকী ব্যাসের কর্মকাণ্ডে যখন এক-একটি ঘৃতপূর্ণ কুম্ভে সন্তান বীজের প্রতিস্থাপন চলছে তখনই গান্ধারীর মনে হয়, শত পুত্রের সঙ্গে তাঁর যদি একটি মেয়ে থাকত, তা হলে বেশ হত, তাঁর সে ইচ্ছেও তো পূরণ হয়েছে, এমনকী ইচ্ছামাত্রেই তা পূরণ হয়েছে।

অতিবিশ্বস্তা এক ধাত্রীর মাধ্যমে জীবন-রসায়ন ঘৃতের মধ্যে, শীতল জলের মধ্যে একটি একটি করে পুত্রভাগ সংস্থাপন করছেন ব্যাস— শীতাভিরদ্ভিরাসিচ্য ভাগং ভাগমকল্পয়ৎ— ঠিক তখনই গান্ধারীর মনে হল— আমার যদি একটা মেয়ে থাকত— দুহিতুঃ স্নেহসংযোগমনুধ্যায় বরাঙ্গনা! বস্তুত শ্বশুর ব্যাসের ক্রিয়াকারিতায় তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস তৈরি হয়েছিল। তিনি বুঝেই গিয়েছিলেন— যে মানসিকতায় এই ঋষি শ্বশুর তাঁকে শতপুত্রের জননী হবার বর দিয়েছিলেন এবং যে কার্যকারিতায় আজ তিনি কুম্ভে-কুম্ভে পুত্র-বীজ সংস্থাপন করছেন তাতে তিনি শত-পুত্রের জননী হবেনই— ভবিষ্যতি ন সন্দেহো ন ব্রবীত্যযথা মুনিঃ। কিন্তু এই একশোটা ছেলের ওপরে যদি একটি মেয়ে থাকত তাঁর, তবে বুঝি তাঁর হৃদয় পূর্ণ হয়ে যেত। কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধারীর জননী-হৃদয় অদ্ভুত সুন্দর এক সংসার-কল্প ভেসে উঠল। তিনি ভাবতে লাগলেন— আহা আমার যদি একটি মেয়ে থাকত, তা হলে কী আনন্দই না হত— মমেয়ং পরমা তুষ্টির্দুহিতা মে ভবেৎ যদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইখানেই গান্ধারীকে অন্য সমস্ত মহাকাব্যিক রমণীদের মধ্যে প্রতিবিশিষ্ট মনে হয়। কুন্তী এবং মাদ্রী— সন্তানলাভের উপায় যাঁদের হস্তামলকবৎ সহজ ছিল, তাঁরা কিন্তু কেউই একটি কন্যা সন্তান চাননি। মহাকাব্যের যুগে উচ্চকোটি, উচ্চবর্ণ অথবা ঐশ্বর্যশালী মানুষের মধ্যে কন্যা সন্তান কামনা করাটা খুব অস্বাভাবিক ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে কন্যা-সন্তানের জন্ম হবার পর অনেক বাড়িতেই মহাকাব্যিক উল্লাস দেখেছি— পুষ্পবৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে দান-ধ্যানও কম দেখিনি, তবু সেই মহাকাব্যের যুগেও কন্যা-সন্তানের জন্ম নিয়ে জনক-জননীর দুশ্চিন্তার প্রসার ছিল। তবে দুশ্চিন্তা যা ছিল, তা মেয়ে মানুষ করতে হবে বলে নয়, সে-দুশ্চিন্তার অনেকটাই জুড়ে ছিল মেয়ের বিয়ে নিয়ে। সেই বিয়েতেও কন্যা-পণ কত হবে, তা নিয়ে কোনও মহাকাব্যিক দুশ্চিন্তা ছিল না, বরঞ্চ অনেক বেশি দুশ্চিন্তা ছিল শ্বশুরবাড়িতে মেয়ের সুখ নিয়ে। সবার ওপরে ছিল— মেয়েকে দিয়ে দিতে হবে অন্যের হাতে। তবু কন্যা-জন্মের সমস্ত অনিশ্চয়তা জেনেও গান্ধারী একটি মেয়ে চান। মনে মনে কল্পনা করেন— একশো ভাইয়ের পরে সর্বকনিষ্ঠা একটি মেয়ে— পিতামাতাই শুধু নয়, একশো ভাইয়ের সবার ছোট বোনটি কত প্রিয় হবে সকলের— একা শতাধিকা কন্যা ভবিষ্যতি কনীয়সী।

সেকালের পিতারা পরলোকে পিণ্ড লাভ করার জন্য পুত্র কামনা করতেন, তেমনই পুত্র না হলে অন্তত মেয়ের ঘরের নাতি যদি মাতামহ-পিতামহের পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম করে, তাতেও তাঁরা তৃপ্তি লাভ করতেন। এমনকী পুত্র হলেও কন্যার ঘরের পারলৌকিক ক্রিয়াও মৃত প্রেতপুরুষের কাম্য তৃপ্তি বহন করত বলেই স্মার্ত-বিধায়কদের বিশ্বাস ছিল। একটি মেয়ের জন্য গান্ধারীর আকাঙ্ক্ষাটা শুধু পারলৌকিক জীবনের প্রত্যাশা-সূত্রে বাধা ছিল না। বরঞ্চ তিনি অনেক বেশি আপ্লুত ছিলেন— ভবিষ্যতে আপন দুহিতার বিবাহ-সজ্জিত তরুণারুণ মুখমণ্ডলের স্বপ্ন নিয়ে। হয়তো বা এখানেও তাঁর নিজের জীবনের বঞ্চিত ছায়াটুকু ভেসে উঠেছে। যেদিন অন্ধ স্বামীর কথা শুনে তিনি নিজের চোখ বেঁধে ফেলেছিলেন, সেদিন থেকেই বিবাহ-লগ্নের সাজসজ্জা-অলংকরণ সব মিথ্যা হয়ে গিয়েছিল তাঁর কাছে। গান্ধারী ভাবছিলেন— তাঁর একটি মেয়ে যদি হত, তবে মহা আড়ম্বরে তিনি তাঁর বিয়ে দিতেন। ঘরে নতুন জামাই আসত, লজ্জাবস্ত্রের আড়ালে মেয়ের আপ্লুত মুখের ছবি দেখে তিনি আপন কন্যাজন্মের সার্থকতা অনুভব করতেন— অধিকা কিল নারীণাং প্রীতির্জামাতৃজা ভবেৎ। নিজের ঘরে একশো ছেলে, মেয়ের ঘরের নাতি— সব মিলিয়ে তাঁর রাজবাড়িটি গার্হস্থ্যের সমস্ত পরিপূর্ণতা নিয়ে ভরে উঠবে— কৃতকৃত্যা ভবেয়ং বৈ পুত্র-দৌহিত্র-সংবৃতা।

একটি মেয়ের জন্য গান্ধারীর এই আকুতি গান্ধারীকেই নতুন করে চিনতে শেখায় আমাদের। মহাভারতের কিছু কিছু সংস্করণে গান্ধারীর এই কন্যাকাঙ্ক্ষার সূত্র-শ্লোকগুলি ধরা হয়নি। সেখানে ব্যাস আসছেন, ঘৃতপূর্ণ কুম্ভগুলি ভাগ করে রাখছেন এবং অবশেষে গান্ধারীকে তিনি জানাচ্ছেন— তোমার শতাধিক একটি কন্যাও হল। কিন্তু গান্ধারীর নিজের জীবনের নিরিখে একটি মেয়ের জন্য তাঁর মানসিক আকাঙ্ক্ষা থাকবারই কথা। অন্ধ স্বামীকে বিবাহ করার জন্য যিনি চোখ বেঁধে শ্বশুরবাড়িতে এসে বিবাহিত হয়েছিলেন, তিনি যে একটি মেয়ে চাইবেন, একটি জামাই চাইবেন অথবা জামাই বরণ করার মাতৃসুখের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে দিয়ে কন্যাজন্মের সার্থকতা চাইবেন, এটাই আমাদের কাছে স্বাভাবিক লাগে। বিশেষত মহাভারতের কবি অসাধারণ মানসিক জটিলতা বোঝেন বলেই মহাভারতের বঙ্গবাসী সংস্করণে গান্ধারীর ভাবনা-লোকের পাঠগুলি আমার কাছে সঠিক লাগে। গান্ধারী ভাবলেন— আমি যদি কোনও তপস্যা করে থাকি, যদি উপযুক্ত পাত্রে দান-ধ্যান করে থাকি, যদি আহুতি দিয়ে থাকি ইচ্ছাপূরক দেবতার উদ্দেশে এবং যদি গুরুজনদের সেবা করে থাকি কায়মনোবাক্যে, তা হলে যেন শতাধিক একটি মেয়ে হয় আমার— গুরবস্তোষিতা বাপি তথাস্তু দুহিতা মম।

মহর্ষি ব্যাস তখনও প্রতিকুম্ভে ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর সন্তান-বীজ সংস্থাপন করছিলেন। গান্ধারীর কন্যা-কল্পনার সুখস্মৃতি তখনও মেলায়নি, ঠিক সেই সময়েই দ্বৈপায়ন ব্যাস সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন— যা বলেছিলাম এতটুকুও মিথ্যে হয়নি কিন্তু তোমার একশো ছেলে তো হবেই, কিন্তু সেই সঙ্গে একটি কন্যারও সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি যেন। নইলে এক-এক করে একশোটি অংশ গুণে নেবার পরেও একটি অংশ বেশি হচ্ছে। তাতেই মনে হচ্ছে, একটি কন্যাও তুমি লাভ করবে, যেমনটি তুমি মনে মনে চেয়েছ— এষা তে সুভগা কন্যা ভবিষ্যতি যথেপ্সিতা। এই কথা বলে ব্যাস আরও একটি ঘৃত-রসায়ন-সংযুক্ত কুম্ভপাত্রে সেই শতাধিক কন্যাভাগ সংস্থাপন করলেন।

আমি জানি, আমার কাছে অবধারিত এই প্রশ্ন আসবে যে ব্যাসের কথার মূল্য কি এতটাই যে, তিনি একবার মুখ ফসকে বললেন— তোর একশো ছেলে হবে আর অমনই গান্ধারীর একশো ছেলে হল। আবার গান্ধারী একটি মেয়ে চাইলেন মনে মনে, অমনই তাঁর একটা মেয়েও হয়ে গেল। উত্তরে জানাই— এই প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। তবে প্রথম কল্পে বলা যায় যে, এটা অনেকটাই বিশ্বাসের ওপর। সেকালে এমন ঋষি-মুনি সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন যাঁরা সিদ্ধবাক, তাঁদের শব্দোচ্চারণ বৃথা হত না অর্থাৎ তাঁরা যা বলতেন, তাই হত। বিশেষত দ্বৈপায়ন ব্যাস, যাঁকে অনেক সময়েই ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়েছে এবং কোনও কোনও মতে, তিনি ভগবানের অবতার বলেই চিহ্নিত, সেই ব্যাসের কথা কখনও মিথ্যা হতে পারে না। কেননা ভগবত্তার একটা বড় লক্ষণই হল— তিনি 'না'-কে 'হ্যাঁ' করতে পারেন, 'হ্যাঁ'কে 'না' করার শক্তিও তাঁর আছে এবং যেমনটা ঘটছে সেটাকে অন্যরকম করার শক্তিও তাঁর মধ্যেই আছে— কর্তুম্ অকর্তুম্ অন্যথা কর্তুং সমর্থঃ। মহাভারতের কবি ব্যাস যখন গান্ধারীর পুত্রোৎপত্তির বিষয়ে অংশগ্রহণ করছেন, সেখানে তাঁর নিজের মুখেই বারবার শোনা যাচ্ছে— আমি আপন স্বচ্ছন্দতায় অথবা কোনও স্বৈরতান্ত্রিকতাতেও বৃথা বাক্য উচ্চারণ করিনি, সেখানে সুস্থ মানসিকতায় তোমাকে যে বর দিয়েছি, তা ঘটবেই— বিতথং নোক্তপূর্বং মে স্বৈরেষ্পপি কুতোঽন্যথা।

আমি জানি— আজকের এই উপভোগ-জর্জর সামাজিক পরিবেশে আমার এই প্রথম তর্কযুক্তি একেবারেই বোকা-বোকা শোনাবে। সবচেয়ে বড় কথা— জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য, তপস্যা এবং পরহিতব্রতের মাধ্যমে যাঁদের অন্তর নিষিক্ত হয়েছে, তেমন অভ্যুদয়-সম্পন্ন সিদ্ধ মহাপুরুষ এখন প্রায় আমাদের মধ্যে নেই, যদি থাকেন তা হলেও লোকচক্ষুর অন্তরালে আছেন। কিন্তু তেমন মানুষের কথা আমরা শুনেছি, মানুষই যে আপন আন্তর শক্তিতে

ভগবত্তার লক্ষণে চিহ্নিত হন, তেমন দৃষ্টান্তও কী ভারতবর্ষে কম আছে। চৈতন্যদেব অথবা রামকৃষ্ণ তো চাক্ষুষ-পরম্পরায় চরম কোনও অতীত মানুষ নন। কাজেই যদি বিশ্বাস থাকে, তা হলে মানতেই হবে যে, পরম অভ্যুদয়-সম্পন্ন মানুষ যে বাক্য উচ্চারণ করেন, তা মিথ্যা হয় না; এমনকী স্বয়ং বিধাতা পুরুষও বোধহয় তাঁর চিরন্তনী ললাট-লেখনিটি ফেলে দিয়ে বিভূতিমান মহাপুরুষের বাক্য সার্থক করার জন্য নিজের আত্ম-অহংকার বিসর্জন দেন। উত্তর-রামচরিতের কবি ভবভূতি একটি ঘটনায় দেখিয়েছেন যে, রঘুবংশীয়দের কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ স্বয়ং রামচন্দ্রকে তাঁর ভবিষ্যৎ পুত্রলাভের সম্ভাবনা জানাচ্ছেন। ঠিক এইখানে অসাধারণ শব্দবিন্যাসে ভবভূতি স্বয়ং রামচন্দ্রের জবানিতে আদি-ঋষিদের সম্বন্ধে বলছেন— যাঁরা লৌকিক এবং সাধারণ সাধুমাত্র তাঁদের কথাবার্তা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ঘটে-যাওয়া ঘটনার অনুসরণ করে— লৌকিকানাং হি সাধূনাম্ অর্থং বাগনুবর্ততে। কিন্তু যাঁরা আদিকালের ঋষি— বশিষ্ঠ তো বিখ্যাত সপ্তর্ষিমণ্ডলেরই একজন— সেই আদ্য ঋষিরা যদি ধ্যানাবস্থিত তদ্‌গত মনে কোনও শব্দ উচ্চারণ করেন, তবে ভবিষ্যতে ঘটিতব্য বিষয় বিধিলিপি অতিক্রম করে আদ্য ঋষির বাক্যকেই অনুসরণ করে— ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি।

আবারও বলছি— এই ধরনের বিশ্বাসই কিন্তু দ্বৈপায়ন ব্যাসের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বিভূতিময়ী সত্তার সার্থকতা প্রতিপাদন করে এবং গান্ধারীর পুত্রলাভের ঘটনাটাও সেখানে লৌকিক যুক্তি অতিক্রম করে ভগবান ব্যাসের বাক্যমহিমায় সত্য হয়ে ওঠে। অন্যদিকে স্বয়ং গান্ধারীর মানস-সিদ্ধির দিকেও তাকিয়ে দেখুন। তাঁর মতো তপস্বিনী রমণীর একটি কন্যা লাভের ইচ্ছামাত্রেই সিদ্ধিদাতার মনেও সেই ইচ্ছার সংক্রমণ ঘটছে। ব্যাস বলছেন— একটি মেয়েও তোমার হবে, কেননা তুমি যে সেইরকম ইচ্ছা করেছ— এষা তে সুভগা কন্যা ভবিষ্যতি যথেপ্সিতা। আর যাঁরা আমার মতো বিশ্বাসীর যুক্তি মানবেন না, জ্ঞান-বিজ্ঞান-বস্তুতাত্ত্বিকতায় আস্থিত যাঁরা এই আদ্য ঋষির সার্থক শব্দ-সন্ধান মেনে নেবেন না, তাঁদের উদ্দেশে আমাদের যুক্তিকল্পও খুব সাধারণ। অর্থাৎ পুত্র লাভের ক্ষেত্রে গান্ধারীর প্রাথমিক কিছু সমস্যা হয়েছিল বটে, কিন্তু ঠিক সময়মতো উপযুক্ত বৈদ্যের হস্তক্ষেপ ঘটে যাওয়ায়— (সেই বৈদ্য ব্যাসও হতে পারেন—) গান্ধারী অনেকগুলি পুত্রের সঙ্গে একটি কন্যারও জননী হন। অর্থাৎ ঘটনা ঘটে গিয়েছিল এবং সেই ঘটনার জটিলতাকে মহাকাব্যিক অভিসন্ধিতে পূর্ণ করে দ্বৈপায়ন ব্যাসের মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় কল্পে আমার তেমন অভিরুচি নেই। যে মহর্ষি আপন ধর্মাত্মতায় মহাভারতের মতো অসাধারণ মহাকাব্য রচনা করতে পারেন, যিনি তাঁর দৃষ্ট চরিত্রগুলির জীবনের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছিলেন, তিনি তাঁর আপন ঐশী শক্তিতে স্নেহভাজনের বিপদ উত্তরণ করে তাঁর সুখবাসনা পূরণ করতে পারেন, এটাই আমার বিশ্বাস।

যেভাবেই হোক, ব্যাসের কর্মনিয়ন্ত্রণে গান্ধারীর পুত্র হল। অনেকগুলিই পুত্র হল এবং একটি কন্যাও তাঁর আপন স্ত্রী-সাধনার ইচ্ছাপূরণের বার্তা নিয়ে আহিত হয়ে রইল শীতল জলে ঘৃতসিক্ত কুম্ভের মধ্যে। যথাসময়ে, ঠিক যেমনটি দ্বৈপায়ন ব্যাস বলেছিলেন— কৃত্রিমভাবে প্রতিস্থাপিত গর্ভ পরিণত হতে যতটুকু সময় লাগে, সেই নির্দিষ্ট সময়— কালেনৈতাবতা পুনঃ— পেরিয়ে গেলেই কুম্ভাধারগুলির আবরণ মুক্ত করতে হবে— উদ্‌ঘাটনীয়ানি-এতানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুণ্ডানীতি স সৌবলীম্। ঠিক সেইভাবেই গান্ধারী শত পুত্রের জননী হলেন। সঙ্গে লাভ করলেন একটি কন্যাও।

একটি নয়, দুটি নয়— একশোটা ছেলে। আমরা জানি, সমালোচনা-মুখর মনে সন্দেহ একটা আসবেই। এমনকী সে-সন্দেহ নিতান্তই স্বাভাবিক বলে মহাভারতের শ্রোতা জনমেজয় সোৎসাহে বক্তা বৈশম্পায়নকে প্রশ্ন করছেন— আপনি জ্যেষ্ঠ এবং অনুজ্যেষ্ঠের ক্রমিকতায় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের নাম বলুন। বৈশম্পায়ন বলতে আরম্ভ করেছেন একে একে শত নাম। আশ্চর্য হই— মহাভারতের অনেক ক্ষেত্রেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পরবর্তী উত্তরণ বাদ পড়ে গেছে, অনেক আখ্যান-উপাখ্যানের একান্ত ঈপ্সিত শেষাংশ উপেক্ষিত রয়ে গেছে অন্য ঘটনার তাড়নায়, অথচ বৈশম্পায়ন একটি পূর্ণ অধ্যায় জুড়ে ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর শত পুত্রের নাম বলছেন। এতে সন্দেহ আরও বাড়ে। বেশ বুঝতে পারি— পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইয়ের প্রতিপক্ষতায় ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের সংখ্যাগত বাহুল্যের যে একটা বিশাল জোর আছে, সেটা দেখানোটাই হয়তো খুব বড় হয়ে উঠেছে মহাভারতের কবির কাছে। কিন্তু মহাকাব্যিক আচরণ তো ভেদ করি প্রতিনিয়ত, তাতে বাস্তবতার অভিসন্ধি মেশালে এইরকমই মনে হয় যে, আমরা তো রেগে গেলেই বলি— একশোবার বলব, হাজার বার বলব, অথবা বলি— একশো রকমের ঝামেলা; এইসব নির্বচন-প্রবচনে যেমন সংখ্যাগত দিকটি বহুত্ব বা অনেকত্ব নির্দেশ করে, মহাকাব্যের রাজ্যেও তেমনই— দশরথ রাজার হাজার বছর বয়স, যযাতির হাজার বছরের জরা, কৃষ্ণের ষোলো হাজার স্ত্রী— এইসব সংখ্যা বহুত্ব নির্দেশ করে। এই কারণেই মহাভারতের এক অধ্যায় জুড়ে দুর্যোধন, দুঃশাসনের ক্রমে শত পুত্রের একশোটি নাম করা হয়েছে বটে, কিন্তু দুর্যোধন-দুঃশাসন এবং আরও কয়েকজন ছাড়া তাঁদের কোনও গুরুত্বই ছিল না এবং এই গুরুত্বহীনতাই প্রমাণ করে যে গান্ধারীর অনেকগুলি পুত্র ছিল হয়তো, কিন্তু সেই সংখ্যা একশো হয়তো নয়। বরঞ্চ আশ্চর্য লাগে এই ভেবে যে, গান্ধারী একটি কন্যা সন্তানের জন্য এবং তাঁর বৈবাহিক আড়ম্বর নিয়ে যত স্বপ্ন দেখেছিলেন, দ্বৈপায়ন ব্যাস সে বিষয়ে প্রায় নীরব রয়ে গেলেন। গান্ধারীর শতপুত্রের নামকীর্তন করে শেষে এক পংক্তিতে দ্বৈপায়ন ব্যাস গান্ধারীর স্বপ্নশায়িনী কন্যা দুঃশলার জন্ম, নামকরণ এবং বিবাহ একসঙ্গে সেরে দিলেন। আজকের দিনে সদা দোষদর্শী মানুষ যেন আবার না ভাবেন যে, গান্ধারী প্রতিপক্ষের জননী বলেই অথবা দুঃশলা মেয়ে বলেই এই অবহেলা। আমরা বলে থাকি, এই ধরনের মহাকাব্যিক উপেক্ষা কিছু আশ্চর্য নয়, মহাভারতে মহানায়িকা দ্রৌপদীর পুত্রগুলির জীবন সম্বন্ধেও ব্যাস একই রকম নীরব। অতএব প্রকৃত প্রস্তাবে ফিরে আসি।

৩

জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধনের জন্মলগ্নেই ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে যে রাজসিক তাড়না তৈরি হয়েছিল— অর্থাৎ তাঁর ছেলে রাজা হবে কিনা, অন্তত যুধিষ্ঠিরের পরেও সে-সম্ভাবনা আছে কিনা, এই বিষয়ে জননী গান্ধারী যে খুব বিচলিত ছিলেন, তা মনে হয় না। ধৃতরাষ্ট্রের অন্তর্গত হৃদয়ে

রাজ্যলাভের জন্য যে উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ছিল, যা গান্ধারীর মধ্যে সংক্রমিত হবার ফলেই তিনি কুন্তীর ওপর ঈর্ষায় আপন গর্ভে আঘাত করেছিলেন, এ কথা সম্পূর্ণ নিশ্চিত। আবার পুত্রজন্মের পর ধৃতরাষ্ট্র যে ভাবে তাঁর ছেলের রাজা হবার সম্ভাবনা নিয়ে সভা ডাকলেন, সেখানেও গান্ধারীর দিক থেকে কোনও শব্দ আমরা শুনিনি। ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি বিরতও করেননি কোনও তর্কে জড়িয়ে না পড়তে। এমনকী বিদুর ইত্যাদি সভাসদেরা ধৃতরাষ্ট্রের মতিগতি বুঝে তাঁকে যেভাবে পুত্র বিসর্জন দেবার কথা বলেছিলেন, তাতে ধৃতরাষ্ট্র যেমন একেবারেই রাজি হননি— ন চকার তথা রাজা পুত্রস্নেহসমন্বিতঃ— তেমনই গান্ধারীও মৌন-সম্মতিতে ধৃতরাষ্ট্রের পাশেই সেদিন দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে দুর্যোধনকে ত্যাগ করা সম্ভব হয়নি। প্রথমজন্মা পুত্রের ওপর যে স্নেহাকর্ষণ জন্মলগ্নেই সৃষ্ট হয়, কোনও সহৃদয় জননী সেই স্নেহকে উপেক্ষা করে পুত্রকে বিসর্জন দিতে পারেন না। এমনকী গান্ধারীও পারেন না।

গান্ধারী-চরিত্রের এই অন্ধকার দিকটি— আমরা সত্যি একে কোনও অন্ধকার দিক বলব কিনা এবং বলাটাও কোনও ধৃষ্টতা হবে কিনা, সেটাও আমাদের ভেবে দেখতে হবে— তবে আমরা এটাকে এখন থেকেই অন্ধকার দিক বলতে চাই। সবচেয়ে বড় কথা, মহাকাব্যের এই বিশাল চরিত্রটি বুঝতে গেলে প্রথমত পূর্ব-নির্মাণ-নিপুণ দ্বিতীয় সেই মহাকবি, যিনি গণিকা শ্যামাকে নায়িকাতে পরিণত করেছেন অথবা কর্ণ-কুন্তী সংবাদে যিনি কর্ণকে অন্য এক উত্তরণে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেই মহাকবির লেখা গান্ধারীর আবেদন মাথায় না রেখে যদি মহাকাব্যের গান্ধারীকে একবার ভাল করে বিচার করেন, তা হলে দেখবেন— জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে মহাভারতের কবি যেমন মাঝে মাঝেই পুত্রস্নেহে অন্ধ বলে বর্ণনা করেছেন, তেমনই একবারের তরেও মহাকবি সে কথা উচ্চারণ না করলেও গান্ধারীর মধ্যেও সেই স্নেহান্ধতা আছে। হয়তো এই স্নেহান্ধকার ধৃতরাষ্ট্রের মতো সহজাত বা অন্তর্জাত নয়, হয়তো ধৃতরাষ্ট্রের কাছ থেকে তা সহবাস-পরিচয়-বশে আহৃত বলেই গান্ধারীর চোখের উপর আহার্য্য আবরণটির মতোই তা নিতান্তই বাইরের আবরণ। তবুও সে বাহ্য আবরণ যেমন অতি তীব্রভাবে না হলেও কৃত্রিমভাবে আলোর অভাব ঘটায়ই বটে, সেইভাবেই দুর্যোধনের ব্যাপারে গান্ধারীরও স্নেহান্ধতা কম ছিল না।

বিশেষত কতকগুলি ঘটনা আমাদের চোখে পড়ে, বিশেষত সেই দিনটার কথা— যেদিন মৃত স্বামীর শবদেহ এবং মাদ্রীর সুসংবৃত শব নিয়ে জননী কুন্তী ঋষিদের সহায়তায় হিমালয়ের অরণ্য আবাস ছেড়ে হস্তিনাপুরে এসে পৌঁছালেন। সঙ্গে পাঁচটি ছেলে, আভরণহীন, বদন মলিন। আর তাঁদের সকলকে বিস্ময়-কুতুকে দেখার জন্য হস্তিনার রাজবাড়ি থেকে গান্ধারীর একশো ছেলে বসনে ভূষণে অলংকৃত হয়ে বেরিয়ে এসেছিল দুর্যোধনকে সামনে নিয়ে— ভূষিতা ভূষণৈশ্চিত্রৈঃ... দুর্যোধন-পুরোগমাঃ। সেদিন সেখানে একইভাবে বেরিয়ে এসেছিলেন গান্ধারী, রাজবাড়ির অন্তঃপুরবাসিনী রাজরমণীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে— রাজদারৈঃ পরিবৃতা গান্ধারী চাপি নির্যযৌ। কিন্তু আশ্চর্য লাগে, ওই যে স্বামী পাণ্ডু আর সপত্নী মাদ্রীর শবদেহ পাশে নিয়ে বিধবা রাজরানি কুন্তী পঞ্চপুত্রের হাত ধরে দাঁড়িয়েছিলেন, আর অন্যদিকে তাঁর সহযাত্রী, সহায়ক ঋষিরা সমস্ত ঘটনা ভীষ্ম-ধৃতরাষ্ট্র-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদুরের কাছে নিবেদন করছিলেন কতক্ষণ ধরে, এই পুরো সময়টা জুড়ে কুন্তী দাঁড়িয়ে রইলেন পূর্ব পরিচিত রাজবাড়ির প্রাঙ্গণে, কিন্তু একবারের তরেও কৌরব-বাড়ির যুবতী বৃদ্ধা কুলবধূদের একজনকেও দেখলাম না যে, কেউ তাঁরা কুন্তীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন সমদুঃখের মর্মজ্ঞতায়।

উন্মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে ঋষিরা পাণ্ডুর মৃত্যু-পূর্ব ঘটনা, তাঁর পুত্রজন্মের কথা এবং কুন্তীর বিপন্ন অবস্থার বিবরণ দিচ্ছিলেন, আমরা রাজবাড়ির অন্দরমহল থেকে কতকগুলি উৎসুক নারীমূর্তি দেখেছি, দেখেছি বৃদ্ধা সত্যবতীকে, দেখেছি কৌশল্যা অম্বালিকাকে— মৃত পাণ্ডুর জননী— সা চ সত্যবতী দেবী কৌশল্যা চ যশস্বিনী। কিন্তু এই বৃদ্ধা-প্রৌঢ়া রমণীরাও কেউ কুন্তীর দিকে এগিয়ে গেলেন না। হয়তো পাণ্ডুর স্থলাভিষিক্ত ধৃতরাষ্ট্রের প্রভাব এমনই ছিল, অথবা এটা ধৃতরাষ্ট্র-চালিত রাজবাড়ির শাসন, নাকি প্রোটোকল যাতে অন্দরমহলের বৃদ্ধা-প্রৌঢ়ারাও শোকসন্তপ্তা বিধবার পাশে এসে দাঁড়াতে পারেননি। আমাদের জিজ্ঞাসা, গান্ধারীও কি এই দলে পড়েন? আমরা তো ভবিষ্যতে অনেকবার ধৃতরাষ্ট্রকে অতিক্রম করতে দেখব তাঁকে, কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে যখন কুন্তীর স্বামী মৃত এবং কয়েক বৎসর আগেই যিনি রাজরানির ভোগ্য সুখ ত্যাগ করে স্বামীর অনুবর্তী হয়েছিলেন, সেই কুন্তীর বৈধব্য-মুহূর্তে গান্ধারীই বোধহয় সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন, যিনি তাঁর মর্যাদাটুকু অন্তত ফিরিয়ে দিতে পারতেন, কারণ গান্ধারী এবং কুন্তী— বধূ হিসেবে দু'জনের মর্যাদাই কুরুবাড়িতে সমান।

রাজরমণীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে গান্ধারী কুন্তীকে সপুত্রক দেখতে এলেন বটে, কিন্তু গান্ধারী তাঁকে একান্ত আপন করে বরণ করে নিলেন না রাজবাড়ির অন্দর-মহলে। ধৃতরাষ্ট্র ধূমধাম করে পাণ্ডু এবং মাদ্রীর শবদাহের আদেশ দিলেন, আদেশ দিলেন শ্রাদ্ধ-তর্পণের। পাণ্ডুর শব চিতায় উঠল, জননী অম্বালিকা পুত্রশোকে মূর্ছা গেলেন, কুন্তীর আর্তনাদে, হা-হুতাশে সকলের চোখে জল এল, কুরুবাড়ির অন্যান্যদের কাঁদতে দেখা গেল কুন্তীর সমদুঃখভাবে, কিন্তু কোথাও এখানে আমরা গান্ধারীর নাম উচ্চারিত হতে দেখলাম না। মনে রাখা দরকার, মহাকাব্যের বিশালবুদ্ধি কবি সব সময় স্পষ্টভাবে কথা বলেন না। বহুতর মহাকাব্যিক চরিত্রের গতি-বৈশিষ্ট্য তাঁকে সামলাতে হয়, অতএব অনেক কথা তিনি উহ্য রেখে বলে দেন, অনেক কথা বলেও বলেন না। যে গান্ধারী ভবিষ্যতে পুত্রের বিরুদ্ধে, স্বামীর বিরুদ্ধে স্পষ্ট উচ্চারণ করবেন, তিনি যে এখনও সেই ঔদার্যের পরিসরে আসেননি, সেটা স্পষ্ট করে বলতে তাঁর কবিজনোচিত ব্যথা কাজ করে। অতএব গান্ধারীর অনুপস্থিতি মাত্র প্রকাশ করে পাণ্ডুর শ্রাদ্ধ-শান্তির পর তিনি নিজেই কুরুবাড়ির প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং জননী সত্যবতীকে বলেছেন— দিন দিন বড় খারাপ সময় আসছে মা, তুমি আমার সঙ্গে বনবাসে বাণপ্রস্থী হও। এই অস্পষ্ট উচ্চারণ জননী সত্যবতী প্রকট করে দিয়েছেন ধৃতরাষ্ট্রের জননী অম্বিকার কাছে। বলেছেন— তোমার নাতির অন্যায়ে সমস্ত কুরুকুল ধ্বংস হয়ে যাবে— অম্বিকে তব পৌত্রস্য দুর্নয়াৎ কিল ভারতাঃ।

ওই একটা শব্দই যথেষ্ট— অম্বিকা! তোমার নাতি, অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্রের ছেলে। এটা কোনও আর্ষ ভবিষ্যদ্‌বাণী নয়, কোনও দৈববাণীও নয়। আমাদের ধারণা— ততদিনেই

কুমার দুর্যোধন যথেষ্টই বেয়াড়া হয়ে গিয়েছিলেন— বেয়াড়া এইকারণে যে, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যলিপ্সা তাঁর মধ্যে ততদিনে সংক্রমিত হয়েছিল ভালমতো এবং জননী গান্ধারীও কিন্তু এখনও উদাসীন ভূমিকায় আছেন। পুত্রকে সংযত করার ভূমিকা, যা তিনি বারবার গ্রহণ করবেন ভবিষ্যতে, বারবার যিনি চরম নিস্পৃহতায় তীক্ষ্ণ শব্দ উচ্চারণ করবেন দুর্যোধনের অন্যায় লক্ষ করে, তিনি কিন্তু এখনও পর্যন্ত দুর্যোধনকে একবারের তরেও কোনও কটু কথা বলেননি। এমনকী তাঁর নিজের আচরণও আমাদের বিভ্রান্ত করে। কুন্তী এলেন পঞ্চপুত্রের হাত ধরে, রাজরানির প্রাপ্য সম্মান দূরে থাক, বিধবা রানির সামনে কুমার দুর্যোধনের সালংকার উপস্থিতি, রাজরমণীদের দ্বারা পরিবৃতা গান্ধারীর সকৌতুক আগমন, অথচ তারপরে কিছু নেই, কুন্তী কোনও মতে রাজবাড়ির কোনও অকীর্তিত স্থানে আশ্রয় পেয়েছেন এবং সত্যবতী, অম্বিকা, অম্বালিকা ব্যাসের সঙ্গে বানপ্রস্থী হবার পরেই আমরা ভীমকে বিষ খাওয়াতে দেখছি দুর্যোধনের অধিনায়কতায়।

লক্ষণীয় ঘটনা হল, দুর্যোধন যে এত স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছেন, সেখানে ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর কোনও বিবেকের ভূমিকা নেই। অপিচ পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে এক ভাই ভীম যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন— এ কথা একজন স্ত্রী হিসেবে কুন্তী কিন্তু তাঁর বড় দিদি গান্ধারীকে জানাতে পারছেন না। তিনি বিদুরকে তাঁর বাড়ি থেকে ডাকিয়ে আনছেন নিজের অবসন্ন গৃহের মধ্যে এবং তখনই তাঁর কাছে এটা বড় স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে গেছে যে, দুর্যোধন বেশ নিষ্ঠুর এবং তিনি রাজ্যলুব্ধ হয়েই তাঁর অতি বলবান পুত্রটিকে মেরে ফেলতে চাইছেন ভবিষ্যৎ প্রতিযোগী ভেবে। অথচ ধৃতরাষ্ট্রকে তো নয়ই— কুন্তী গান্ধারীকেও তাঁর আকস্মিক বিপন্নতার কথা জানাতে পারছেন না, জানাতে পারছেন না যে, তোমার ছেলেটি কিন্তু ভাল নয়, তুমি তাকে শাসন করো। বোঝা যায়, গান্ধারী পুত্রকে এতটুকুও শাসন করেননি অথবা শাসন করবার ইচ্ছেও তাঁর ছিল না, অথবা ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্রয়-পুষ্ট পুত্রকে তাঁরই সংক্রমিত উদগ্র রাজ্যলালসা থেকে নিবারণ করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। নাকি শেষ কথাটা সেই কাল-চালিত পুরুষশাসিত সমাজের চিরন্তনী অভিসন্ধি যাতে ধৃতরাষ্ট্রকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি গান্ধারীর পক্ষে। কিন্তু তাতে শেষ কথার পরে সেই শেষ প্রশ্নটাও উঠে পড়ে— তা হলে পরে তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে অতিক্রম করলেন কী করে বার-বার। তাতেই সন্দেহ হয়— দুর্যোধনের দুর্বিনীত হয়ে ওঠার পিছনে গান্ধারীর সচেতন ঔদাসীন্য কাজ করেছে হয়তো। অন্তত দুর্যোধনের প্রথম জীবনে বড় হয়ে ওঠার পিছনে ধৃতরাষ্ট্রের ঈর্ষা-অসূয়া যেভাবে সংক্রমিত হয়েছিল, সেখানে গান্ধারী নিজেকে 'কনট্রোল এলিমেন্ট' হিসেবে এতটুকুও কাজে লাগাতে পারেননি, অথবা নিজের মধ্যেও সেই ঈর্ষা-অসূয়া অবচেতনে ক্রিয়া করছিল বলে তা কাজে লাগাননি।

এ কথা নিশ্চয়ই একবার ভেবে দেখা উচিত যে, তাঁর ভাই শকুনি ধৃতরাষ্ট্রের রাজশাসনের মধ্যে আগন্তুক রাজপুত্রের মতো ছিলেন না। তাঁর নিজের রাজ্য গান্ধার কিংবা কান্দাহারের শাসনভার কার হাতে সঁপে দিয়ে শকুনি কোন আশায় ধৃতরাষ্ট্রের রাজধানীতে চিরতরে থেকে গেলেন? গান্ধারীর সামান্যতম প্রশ্রয় না পেলে কেমন করেই বা দেখছি যে, শকুনি কী সুন্দরভাবে নিজের শৃঙ্গ দুটি ভেঙে হস্তিনাপুরের অল্পবয়সিদের বাছুর-দলে প্রবেশ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছেন এবং কুমার দুর্যোধন প্রথম যে সুচিন্তিত প্রয়াস গ্রহণ করলেন পাণ্ডবদের জতুগৃহে পুড়িয়ে মারার জন্য, সেখানে পরিকল্পনা-পর্বে মহাভারতের বিখ্যাত দুষ্ট-চতুষ্টয়ের মধ্যে সৌবলেয় শকুনি প্রথমেই স্বমহিমায় বিরাজ করছেন— তত সুবল পুত্রস্তু রাজা দুর্যোধনশ্চ হ। ধরে নেওয়া যেতে পারে— রাজসভায় যে কর্মকাণ্ড চলছে, ধৃতরাষ্ট্র কণিক নামে এক স্বার্থ-বিধায়ক অমাত্যের সঙ্গে পাণ্ডবদের বিষয়ে দুর্মন্ত্রণা করছেন, সে-সব গান্ধারী কিছুই জানতেন না। কিন্তু তাঁর ভাই শকুনি যে রাজসভার বাইরে তাঁরই পুত্রের সঙ্গে দিন-রাত ওঠা-বসা করছেন, দিন-রাত তাঁকে বুদ্ধি দিচ্ছেন, এটাও কি গান্ধারী বুঝতেন না? এটা ভাবার তো কোনও কারণ নেই যে, ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় এসেই শকুনি বুদ্ধিমান হয়ে উঠলেন এবং তাঁর বুদ্ধির চরিত্র গান্ধারে থাকাকালীন গান্ধারীর জানা ছিল না। আমাদের মনে হয়, গান্ধারী সময়কালে সচেতন হননি এবং এক ধরনের ইচ্ছাকৃত উদাসীনতাও কাজ করেছে তাঁর মনে। লক্ষণীয়, হস্তিনাপুরে যখন জতুগৃহদাহে পাণ্ডবদের মিথ্যা-মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছাল, তখন ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের জন্য পুরবাসীদের সঙ্গে একত্রে অনেক মায়াকান্না কেঁদেছেন। পাণ্ডব-জননী কুন্তীর জন্য পুরবাসীদের শোকও এখানে চাপা থাকেনি— কুন্তীমাতার্শ্চ শোচন্ত উদকং চক্রিরে জনাঃ। প্রজাদের দুঃখ, এত শোক, এত কান্না, এমনকী কুন্তীসহ পাণ্ডবদের শ্রাদ্ধও হয়ে গেল, অথচ মহাভারতের কবি অসামান্য কবিত্ব-কৌশলে একবারের তরেও গান্ধারীর সম্বন্ধে একটি বাক্যও উচ্চারণ করলেন না। বারণাবতে যাবার আগে পাণ্ডবেরা কুন্তী সহ হস্তিনাপুরের কুরুবৃদ্ধদের সঙ্গে গান্ধারীরও চরণবন্দনা করেছিলেন। সকলের সঙ্গে হয়তো বা গান্ধারীরও পুণ্যাশীর্বাদশব্দ উচ্চারিত হয়েছিল পাণ্ডবদের উদ্দেশে— প্রসন্নমনসঃ সর্বে পুণ্যা বাচো বিমুঞ্চত। কিন্তু কুন্তীর সঙ্গে পাণ্ডবদের মৃত্যুর খবর হস্তিনাপুরে আসার পর গান্ধারীর উল্লেখ পর্যন্ত করলেন না মহাভারতের কবি, তাতে বুঝি— গান্ধারীর কোনও অবচেতন চরিত্র তিনি সস্নেহে এড়িয়ে গেছেন। স্পষ্ট করে তা বলা যায় না, অথবা বললে পরে গান্ধারীর চিরখ্যাত ধৈর্যশীলতায় তা আঘাত করতে পারে, এইজন্যই কি গান্ধারীর কথা একবারও উল্লেখ করছেন না ব্যাস? আচ্ছা! গান্ধারীর দিক থেকে এই নৈঃশব্দ্য, এই উদাসীনতা আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করব? 'বিব্লিক্যাল সেন্সে'— resist not evil! কিন্তু মহাভারত তো এমন ধর্মে বিশ্বাস করে না, সে কথায় কথায় চেতাবনি দেয়। পরবর্তীকালে পুত্র দুর্যোধনের উদ্দেশে বারংবার যে-সব তিরস্কার উচ্চারিত হয়েছে, তা তো বিষবৃক্ষ স্বয়ং সংবর্ধিত করার পর তার শাখা-ছেদনের অপপ্রয়াস বলে মনে হয় আমাদের। মহাভারতের সেই বিখ্যাত উপাখ্যানে দেখেছি— অন্যায় চোখে দেখেও যদি চুপ করে থাকা যায়, তবে রাজদণ্ড নেমে আসে তার ওপরে। তা হলে গান্ধারীর এই নিঃশব্দ উদাসীনতার সবচেয়ে বড় ফল যে, পরে হাজার শব্দ উচ্চারণ করেও উদ্ধত পুত্রকে তিনি মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারেননি।

অন্যায় দেখেও চুপ করে থাকলে নিজেও সেই পাপের সঙ্গে কীভাবে জড়িয়ে যেতে হয়, তার একটি বিশিষ্ট উপাখ্যান আছে মহামতি বিদুরের পূর্বজন্মকাহিনিতে। মাণ্ডব্য ঋষি আপন আশ্রমের বৃক্ষমূলে বসে যোগ তপস্যা আচরণ করছিলেন মৌন ব্রত ধারণ করে। হঠাৎই সেই আশ্রমে দস্যুরা উপস্থিত হল লুটপাটের মাল সঙ্গে নিয়ে। তাদের পিছনে রাজপুরুষেরা

ধাওয়া করে আসছিল। রাজরক্ষীরা অনেক পিছনে থাকায় দস্যুরা মাণ্ডব্য মুনির অরণ্য আশ্রমের গোপন জায়গায় লুঠের মাল লুকিয়ে রেখে নিজেরাও লতাবৃক্ষের অন্তরালে লীন হয়ে থাকল। রক্ষীপুরুষেরা দস্যুদের খুঁজতে-খুঁজতে মাণ্ডব্য মুনির আশ্রমেই এসে উপস্থিত হল। তপস্বী মুনিকে তারা জিজ্ঞাসা করল— কোন পথে গেছে দস্যুরা? আমরা ওদের ধরতে চাই। মৌনব্রতী মুনি ভালমন্দ, ঠিক-বেঠিক কিচ্ছু বললেন না— ন কিঞ্চিৎ বচনং রাজন্ অব্রবীৎ সাধ্বসাধু বা। কোনও উত্তর না পেয়ে রাজপুরুষেরা আপন অনুসন্ধানের বুদ্ধিতে আশ্রম তোলপাড় করে খুঁজল এবং বমাল-সমেত চোরদের ধরে ফেলল। চোর ধরার পরে এবার তাদের সন্দেহ সৃষ্টি হল মৌনধারী ঋষির ওপর। চোরদের সঙ্গে তারা মাণ্ডব্য মুনিকেও বেঁধে নিয়ে গেল রাজার কাছে।

লক্ষণীয়, ব্রাহ্মণ-ঋষি হওয়া সত্ত্বেও রাজা কিন্তু তাঁকে ছাড়লেন না। চোরদের সঙ্গে একইভাবে মুনিকেও শূলে চড়িয়ে হত্যা করার আদেশ দিলেন রাজা। রাজপুরুষেরা নির্দিষ্ট স্থানে চোরদের সঙ্গে মাণ্ডব্য মুনিকেও শূলে চড়িয়ে দিল। অদ্ভুত যেটা ঘটল সেটা হল— চোরেরা মারা গেল, কিন্তু তপঃপ্রভাবে মাণ্ডব্য মুনি বেঁচে রইলেন এবং তিনি সেই অবস্থাতেও তপশ্চরণ করতে লাগলেন। লোক মারফত খবর এল রাজার কাছে, রাজা নিজের ভুল এইটুকু বুঝতে পারলেন যে, এঁকে দস্যু-চোরদের সঙ্গে একই দায়ে দায়ী করা উচিত হয়নি। যাই হোক, অন্যদিকে মুশকিল হল যে শূল দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছিল, সেটাকে বার করা তো সম্ভব নয়, অতএব রক্ষীরা অর্ধেক শূল কেটে মাণ্ডব্যমুনিকে শূলাসন থেকে নামান। কিন্তু অর্ধেক শূল তাঁর দেহের ভূষণ হয়েই রইল। যেখানেই তিনি যেতেন, লোকে তাঁকে এই অবশিষ্ট শূলের কাহিনি জিজ্ঞাসা করত এবং তাঁকে পূর্বকাহিনি শোনাতে হত।

বারংবার একই প্রশ্নে জর্জরিত মুনির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ধর্মের দেখা হয় এবং শূল-ব্যথার উৎসও জানা যায়, কিন্তু সেটা আমাদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক। এই উপাখ্যানে আমাদের কাছে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা, সেটা হল— অন্যায় দেখেও যদি চুপ করে বসে থাকা যায় তবে বাহ্যিক রাজদণ্ড বাইরে থেকে এড়ানো গেলেও চুপ করে থাকার দণ্ডটুকু অর্ধেক শূলের প্রতীকে নিজের মধ্যেই প্রবিষ্ট হয়ে থাকে। গান্ধারী কিন্তু সেই সচেতন উদাসীনতার দায় এড়াতে পারবেন না সারাজীবন ধরে। যখন তিনি মুখ খুলবেন, তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। তখন সেই অর্ধেক শূল প্রতীকীভাবে তাঁর অন্যায়ের স্মরণটুকু ঘটিয়েই দেয়। মহাভারতে একেবারে অন্য প্রসঙ্গে উল্লিখিত এই কাহিনি আমরা উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, মহাভারতের মহাকাব্যিক পরিমণ্ডলে ধর্ম ব্যাপারটা এত বিশদ এবং গভীর যে, তা বুঝতে গেলে মহাভারতের কবির সূক্ষ্মতম টিপ্পনীগুলিও খেয়াল করতে হয়। দিনের পর দিন অন্যায় হতে দেখেও যিনি চুপ করে থাকলেন, সেই গান্ধারী ভবিষ্যতে বারবার ধর্মের কথা বলবেন এবং তা বলবেন বলেই সরাসরি তাঁকে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্মক করে দেখতে পারেননি মহাভারতের কবি, এমনকী বহুকাল চুপ করে থাকার জন্য সরাসরি তাঁকে অন্যায়কারী বলে চিহ্নিতও করতে চাননি।

আমরা অবাক হয়ে যাই— বারণাবতের জতুগৃহে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হল, দ্রৌপদীর সঙ্গে বিবাহের পর পাণ্ডবদের রাজ্যভাগ হয়ে গেল, ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞে পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য দেখে পুত্র দুর্যোধন মুখ শুকিয়ে বাড়ি ফিরলেন, শকুনির সঙ্গে দুর্যোধনের নিরন্তর পরিকল্পনা চলল— এমনকী ধৃতরাষ্ট্রও তা টের পেয়ে গেলেন, অথচ গান্ধারী কিছুই জানলেন না এবং বুঝলেনও না। এও কি সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য! আমরা অবাক হয়ে যাই— পাশা খেলার জন্য পাণ্ডবদের ডাকা হয়েছে, পাণ্ডবরা দ্রৌপদী সহ ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে প্রবেশ করে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা না করে, আগে গান্ধারীর সঙ্গে দেখা করেছেন— দদর্শ তত্র গান্ধারীং দেবী পতিমন্যুব্রতাম্। গান্ধারী তখন পুত্রবধূদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বসেছিলেন, তাঁকে দেখাচ্ছিল তারামণ্ডলের মধ্যস্থিত রোহিণী নক্ষত্রের মতো। যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবেরা দ্রৌপদী সহ গান্ধারীকে অভিবাদন জানালে গান্ধারীকে আমরা কুশল জিজ্ঞাসা করতে দেখছি মাত্র, অভিবাদ্য স গান্ধারীং তয়া চ প্রতিনন্দিতঃ।

মনে মনে জিজ্ঞাসা হয়— পাণ্ডব-কুলবধূ দ্রৌপদীকে দেখে কতটুকু পুলকিত হয়েছিলেন দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারী। 'দীর্ঘদর্শিনী'— চোখে পট্টি বাঁধা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে এই বিশেষণে ভূষিত করেছেন স্বয়ং ব্যাস। অথচ এইখানে দ্রৌপদী এতকাল পরে কৌরব-গৃহে এলেন, ইন্দ্রপ্রস্থের রাজরানি এলেন শাশুড়ি-প্রতিমা কৌরব রাজমাতার কাছে, ব্যাস পৃথকভাবে কোনও প্রত্যভিনন্দনের কথা স্পষ্ট করে বললেন না। পরের দিন সেই বিখ্যাত পাশা খেলা যখন চলছিল, যুধিষ্ঠির একটার পর একটা বাজি হারছিলেন, চারদিকে এত হইচই, দুঃশাসন-কর্ণ-দুর্যোধনদের উল্লাস, বিকর্ণ-বিদুরদের প্রতিবাদ— এই বিরল ঘটনার একটি শব্দও কি পৌঁছায়নি গান্ধারীর কানে! আমরা জানি— অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাঁর হৃদয়বিকার চেপে রাখতে পারেননি, শকুনির প্রত্যেকটা চালের পরেই তাঁর পাগলপারা প্রশ্ন ছিল— কিং জিতং কিং জিতমিতি— শকুনি জিতেছে কি? জিতেছে?

আমরা জানি— গান্ধারী এমন নন। কিন্তু রাজসভার মধ্যে যে উদ্বেল চক্রান্ত চলছিল, তার উচ্ছ্বাস-ধ্বনি শুধু রাজ-অন্তঃপুরের পূর্বদ্বারেই স্তব্ধ হয়ে গেল! হ্যাঁ জানি, সেকালে রাজসভা-সংলগ্ন হত না রাজ-অন্তঃপুর। কিন্তু কতদূরে ছিল এই অন্তঃপুর যেখানে রাজসভার উদীর্ণ বিকারগুলি কোনওভাবেই পৌঁছচ্ছে না। যখন দুর্যোধনের আদেশ হল— যাও প্রাতিকামী, কৌরবদের দাসী কৃষ্ণা দ্রৌপদীকে সভায় নিয়ে এসো— কৃষ্ণাং দাসীং সভাং নয়— তখন তো প্রতিকামী এই গেলেন দ্রৌপদীর কাছে, আর এই এলেন তাঁর ক্রোধোদ্দীপ্ত বার্তা নিয়ে। তখন কিন্তু একবারও মনে হয় না— রাজসভা থেকে অন্তঃপুর খুব দূরে ছিল। তারপরেই দুঃশাসন গেলেন দ্রৌপদীর কাছে। তাঁর অসভ্য শব্দ-রাশি, ধর্ষকসুলভ নির্লজ্জ উচ্চারণ— তুই এক কাপড়েই থাক অথবা বিবস্ত্রই থাক, তোকে টেনে নিয়ে যাব রাজসভার মধ্যে, অথবা দ্রৌপদীর সোচ্চার ব্যক্তিগত প্রতিরোধের মধ্যেই তাঁকে টেনে-হিঁচড়ে চুল ধরে রাজসভায় নিয়ে আসা— এগুলো কেউ কি দেখেনি, কেউ কি শোনেনি— রাজ-অন্তঃপুর থেকে রাজসভার পথের অন্তরে। মহাভারতের কালের মেয়েরা কেউ পর্দানশীন ছিলেন না এবং পুরুষেরা অশালীন আচরণ করলে সেটা বীরদর্পেই করত। অতএব দ্রৌপদীর চুল ধরে নিয়ে যাবার দৃশ্য কারও চোখে পড়েনি, সদা মুখর দাস-দাসী, পরিচারক-কঞ্চুকী-প্রতিহারিণীরা সব রাজ-চর্চা-পরিবাদ বাদ দিয়ে অন্তর্মুখ হবার চেষ্টা করছিল এবং রাজসভার

সমুদ্যত কার্যকলাপ কেউ জানে না, শোনেনি, কারও কানেও আসছে না— এমন ভাবা আমাদের পক্ষে দুরূহ।

না হয় এটাও ধরে নিলাম— দ্রৌপদী রজস্বলা ছিলেন বলে রাজগৃহের মুখ্যস্থানে তিনি ছিলেন না, তাঁকে হয়তো রাখা হয়েছিল পৃথক নির্দিষ্ট কোনও প্রকোষ্ঠে, যেখানে সাময়িকভাবে ঋতুকালীন অস্বস্তি কাটিয়ে ওঠেন রাজগৃহের রমণীরা। কিন্তু সেটাই বা অন্তঃপুরের অন্তর্গৃহ ছাড়া কত দূরে হতে পারে? আর রাজবাড়িতে অন্তঃপুরের সুরক্ষায় যারা নিযুক্ত থাকত, তাদের কেউ এই পৃথক-নির্দিষ্ট গৃহের ওপর নজর রাখত না, এটা তো অসম্ভব। সবচেয়ে বড় কথা, যে প্রকোষ্ঠে একজন থাকলে অন্যতরা রমণীও সে প্রকোষ্ঠ পরিহার করে চলেন, সেখানে একবার পুরুষ প্রাতিকামী এসে প্রবেশ করলেন, অন্যবার দুঃশাসন এসে চিৎকার করতে করতে দ্রৌপদীর চুল ধরে নিয়ে যাচ্ছেন— এই সংবাদ গান্ধারীর কাছে পৌঁছায়নি— এটা আমরা মেনে নিতে পারছি না। মহাভারতের কবি এইসব তুচ্ছ কথা বলতে ভুলে গেলেন নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যান্য জব্বর খবর দিয়ে ব্যস্ত রেখেছেন আমাদের। গান্ধারীর চুপ করে থাকাটা এই সময় তাঁকে মানায় না বলেই, বিশেষ করে তার পরবর্তী সময়ের চরিত্রের সঙ্গে মানায় না বলেই ব্যাস নিপুণভাবে রাজসভার বিচিত্র ঘটনায় মনোনিবেশ করেছেন। বস্তুত মহাকাব্যের কবির এই শিল্পীজনোচিত বেদনাবোধ এবং বিচারবোধ তাঁর প্রত্যেক সৃষ্ট চরিত্রের ওপরেই থাকে। ভবিষ্যতে গান্ধারীর মুখে আমরা এমন সব কথা শুনব, যেখানে আজ পর্যন্ত যত তাঁর বিমিশ্র মূক ব্যবহার আস্তে আস্তে লীন হয়ে যাবে ধর্মের মাহাত্ম্যঘোষে।

বস্তুত দুর্যোধন-দুঃশাসন-কর্ণরা দ্রৌপদীকে উন্মুক্ত রাজসভার মধ্যে যে চরম অপমান করলেন, সেটাকে আধুনিক নারীবোধের দৃষ্টিতে যেমন চরম নিন্দনীয় মনে হয়, তেমনই এই ঘটনাই কিন্তু সেই মহাকাব্যিক মুহূর্ত যেখানে হস্তিনার রাজবাড়ির অমার্জনীয় পৌরুষেয়তার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ ভেসে এসেছিল মেয়েদের তরফ থেকে। এবং আমাদের ধারণা, এই আকস্মিক প্রতিবাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গান্ধারী।

মুশকিল হল, দুর্ঘটনা যা ঘটার তখন ঘটে গেছে, বিষবৃক্ষ যতখানি সিঞ্চিত হলে পুষ্ট হয়ে যায়, গান্ধারীর নীরবতায় ততদিনে ধৃতরাষ্ট্রের ঘরে বিষবৃক্ষের ডালপালা ছড়িয়ে গেছে। শকুনি-কর্ণরা ততদিনে দুর্যোধন-রূপ বিষদ্রুমের শক্তপোক্ত শাখায় পরিণত হয়েছেন। যে শকুনির সম্বন্ধে পাণ্ডব-কনিষ্ঠ সহদেব পর্যন্ত সধিক্কারে বলেছিলেন— তোর সঙ্গে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের দেখা না হলে কৌরব-ভাইদের সঙ্গে আমাদের কোনওদিন শত্রুতা হত না— ধৃতরাষ্ট্রস্য সম্বন্ধো যদি ন স্যাৎ ত্বয়া সহ— সেই শকুনির চরিত্র সম্পূর্ণ জানা সত্ত্বেও গান্ধারী তাঁকেও তাঁর দুশ্চেষ্টাগুলি থেকে নিবারণ করেননি, স্বামী ধৃতরাষ্ট্রকেও না। পাণ্ডবদের সঙ্গে কৌরবদের দ্যূতক্রিয়া-পর্বেও গান্ধারীর কোনও বিকার দেখিনি আমরা। আমরা এই সন্দেহ প্রকাশ করেছি আগেই আর সেই কারণেই দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধরে তাঁকে রাজসভায় নিয়ে যাওয়া এবং রাজসভায় তাঁর বস্ত্রাকর্ষণ থেকে দুর্যোধনের ঊরু-প্রদর্শন পর্যন্ত বিশাল বিক্রিয়াগুলি ঘটে গেল গান্ধারীর অর্ধচেতনার মধ্যেই। প্রতিবাদ যখন ভেসে এল তখন বড় দেরি হয়ে গেছে; তবু সেটা প্রতিবাদ এবং গান্ধারীর বিপরীত অবস্থানের সেই আরম্ভ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিন্দু। ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয় থেকে সংক্রমিত হওয়া ঈর্ষা-অসূয়া, যা এতদিন গান্ধারীর অবচেতন ধূমাচ্ছন্ন করে রেখেছিল, এই মুহূর্তটাই ছিল তার অপসারণ-বিন্দু।

অথচ আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে যেন ব্যাপারটা খুব জানান দিয়ে আরম্ভ হয়নি। মানে, প্রতিবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখি, তা হলে তার আগে দ্রৌপদীর অপমান-কাণ্ডটাই বিপ্রতীপভাবে অনেক বেশি ভাস্বর, প্রতিবাদের জায়গাটা একেবারেই নড়বড়ে। কিন্তু মহাভারতের কল্প-বিশ্লেষণ করলে দেখবেন, এই ঘটনার পর ভীম দুঃশাসনের রক্ত পানের প্রতিজ্ঞা করেছেন। দ্রৌপদীর সযৌক্তিক প্রশ্নে ভীষ্ম কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি এবং দুর্যোধন তখনও জঘন্য ইঙ্গিতে দ্রৌপদীকে চরম অপমান করে যাচ্ছেন। অপমান করার তাড়নায় দুর্যোধন যখন নিজের উরুপ্রদর্শন করে ফেলেছেন, সেই মুহূর্তেই ভীমের তীব্র প্রতিজ্ঞা ভেসে এসেছে কুরুসভায়। ক্রোধে তাঁর সমস্ত রোমকূপ দিয়ে যেন আগুন ঝরে পড়ছিল। হঠাৎই প্রাকৃতিক দুর্লক্ষণে মুখর হয়ে উঠল ধৃতরাষ্ট্রের সভাগৃহ এবং গৃহ। তাঁর হোমগৃহে অশিব শিবাশব্দ শোনা গেল, সেই শব্দের পরেই গর্দভ-শকুনের চিৎকার।

দুর্নিমিত্তের সমস্ত চিহ্নিত শব্দ শুনতে পেলেন বিদুর, গান্ধারী, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ— তং বৈ শব্দং বিদুরস্তত্ত্বদর্শী/ শুশ্রাব ঘোরং সুবলাত্মজা চ। আপনারা জানেন— চরম অন্যায়ের পর এই প্রাকৃতিক দুর্লক্ষণ সূচিত হয়, এর একটা পুরাকাল্পিক অভিসন্ধি আছে। ধৃতরাষ্ট্রের হোমগৃহে কোনও শৃগাল সত্যিই ডেকে উঠেছিল কিনা, অথবা গর্দভ-শকুনের অকস্মাৎ শব্দ সত্যিই বিদুর-গান্ধারীর কর্ণে প্রবেশ করেছিল কিনা, সে তর্কে আমরা এতটুকুও প্রবেশ করব না। তবে দ্রৌপদীর নারীসত্তার যে চরম অবমাননা ঘটল তাতে সবচেয়ে যাঁরা আঘাত পেলেন, তাঁদের মধ্যে বিদুর-ভীষ্ম, কৃপ-দ্রোণের সঙ্গে যে নামটি এখন এই মুহূর্তে নতুন করে যুক্ত হল, তিনি হলেন সুবলাত্মজা গান্ধারী। ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ দুর্যোধনের বিরুদ্ধে কিছু করতে না পারলেও তাঁর ব্যবহারে ব্যথিত ছিলেন সব সময়। আর বিদুর তো ছিলেন সর্বদাই দুর্যোধনের বিরুদ্ধে সোচ্চার। কিন্তু গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী গান্ধারী, এখনও পর্যন্ত সোচ্চারভাবে পুত্রের বিরুদ্ধে কোনওদিন তেমন করে কিছু বলেননি। কিন্তু আজ এ তিনি কী দেখলেন?

আমাদের বিশ্বাস— বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ-কৃপের মতো গান্ধারীও রাজসভাতেই উপস্থিত ছিলেন সেদিন। হয়তো চিরন্তন সেই পৌরুষেয়তার ভিড়ে দুর্যোধন-দুঃশাসনের অসভ্যতার সামনে তিনি এগোতেও পারেননি। কিন্তু গান্ধারী যখন অনুভবে দেখলেন— তাঁরই পুত্র তাঁরই গৃহের কুলবধূকে সকলের সামনে উলঙ্গ করে দিতে চাইছে, সেদিন তাঁর অন্তরের নারীসত্তাটুকু জাগ্রত হয়ে উঠল। যাকে জননীর স্নেহে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন এতকাল, সেই হৃদয় থেকে বেরিয়ে এল নারী-সত্তার একাত্মতা। তিনি বুঝলেন— ধৃতরাষ্ট্রের ঘরে আজ গর্দভ-শেয়াল-শকুনেরাই একত্র সমাবিষ্ট হয়ে কুলবধূর ধর্ষণ-সমারোহ সৃষ্টি করেছে। তিনি বিদুরের সঙ্গে একত্রিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসে আর্ত আবেদন জানালেন— ততো গান্ধারী বিদুরশ্চৈব বিদ্বান/ নিবেদয়ামাসতু-রার্তবত্তদা।

মহাভারতে এই সময়ে যে বর্ণনাটুকু আছে, তা খুব বিস্তারিত নয় এবং বিস্তারিত নয় বলেই কে কাকে কী বলছেন এবং তার পরে কী ঘটছে, সেটা যেন খুব ঘুলিয়ে যায়। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন এখানে আছে যে, গান্ধারী এবং বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের কাছে দুর্যোধনের অনিয়মে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গেই ধৃতরাষ্ট্রের মুখ থেকে এই সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে— দুর্যোধন! ছোটলোক কোথাকার। তুই একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিস— হতোঽসি দুর্যোধন মন্দবুদ্ধে— নইলে কুরুশ্রেষ্ঠদের সবার সামনে পাণ্ডবদের ধর্মপত্নী দ্রৌপদীর সঙ্গে আলাপ করছিস— স্ত্রিয়ং সমাভাষসি দুর্বিনীত/ বিশেষতো দ্রৌপদীং ধর্মপত্নীম্। আমরা মনে করি— যে ধৃতরাষ্ট্র এতক্ষণ ধরে দুর্যোধন-কর্ণ-দুঃশাসনের মুখে যত অপশব্দ উচ্চারণ নীরবে সহ্য করে যাচ্ছিলেন এবং একবারও বাধা দেননি, তিনি হঠাৎ গান্ধারী আর বিদুরের মুখে (বিদুর তো একটু আগেই যা-তা বলছিলেন দুর্যোধনের সম্বন্ধে) একবার মাত্র প্রাকৃতিক দুর্লক্ষণের কথা শুনে কথার ভোল পালটে ফেললেন। আমাদের ধারণা, যে-কথাগুলি তিনি দুর্যোধনের উদ্দেশে বলেছেন, তা গান্ধারীর মুখে প্রথম উচ্চারিত হয়েছে। এই কথার মধ্যে যে ঘৃণা আছে; ঘরের বউ দ্রৌপদীর সঙ্গে আলাপ-সম্ভাষণ করছিস— এই শব্দগুলির মধ্যে যে রমণীসুলভ মর্যাদাবোধ আছে, তাতে এই কথা কখনও ধৃতরাষ্ট্রের হতে পারে না। কেননা, ধৃতরাষ্ট্র এতক্ষণ ধরে তাঁর ছেলে এবং ছেলের বন্ধুদের মুখে যে সব অপশব্দ শুনেছিলেন, সেগুলি আর আলাপ-সম্ভাষণের পর্যায়ে ছিল না, সেগুলি ধর্ষক-পুরুষের কামোন্মত্ত উল্লাস এবং বাক্য-রমণে পর্যবসিত হয়েছিল। তবু ধৃতরাষ্ট্র নিশ্চুপে বসেছিলেন। আর এখন তিনি বলছেন কিনা— মেয়েদের সঙ্গে, বউ-ঝি'র সঙ্গে এইভাবে আলাপ-সম্ভাষণ করছিস! বস্তুত শব্দের মর্যাদা রক্ষা করে নিতান্ত স্ত্রীজনোচিতভাবে এ কথা গান্ধারীর মুখ দিয়েই প্রথমত বেরিয়েছে এবং গান্ধারীর ভয়েই ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর কথাগুলি পুনরুচ্চারণ করেছেন মাত্র। ধৃতরাষ্ট্র নিজের ইচ্ছায় দুর্যোধনকে কিচ্ছুটি বলেননি, প্রাকৃতিক দুর্লক্ষণ আমাদের মতে পুরাকল্পের ব্যবহার ছাড়া আর কিছু নয়, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বস্তুত গান্ধারীর নারীসত্তার তদাত্মতায় ভীত হয়েছিলেন সেই মুহূর্তে, শুধু সেই মুহূর্তে।

শুধু সেই মুহূর্তে কেন বলছি, এক মুহূর্তে ভোল পালটে ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে কঠিন তিরস্কার করলেন এবং সেই ভোলেই দ্রৌপদীকে বর দিয়ে পাণ্ডবদের রাজ্যপাট, ধনসম্পত্তি সব ফিরিয়ে দিলেন। এই ঘটনাগুলো যে ধৃতরাষ্ট্র চাপের মাথায় করেছিলেন, অথবা বলা উচিত তাঁর অন্তরঙ্গ স্ত্রীমহলের প্রতিক্রিয়াতেই করেছিলেন, তা বোঝা যায় ধৃতরাষ্ট্রের দুটি বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখে। প্রথম কাজটা হল— পাণ্ডবদের রাজ্যপাট ফিরিয়ে দেবার পরেই তিনি দুর্যোধন-শকুনি-কর্ণদের কথায় উদ্বেলিত হয়ে আবারও পাশা খেলার আহ্বান জানিয়েছেন যুধিষ্ঠিরকে। দ্বিতীয়ত, এই দ্যূতক্রীড়ার পরেই আবারও দুঃশাসন-কর্ণ-দুর্যোধনের মুখ থেকে অবিরাম নষ্ট কুপ্রস্তাব আসে দ্রৌপদীর কাছে। কিন্তু কেউ প্রতিরোধ করেনি, ধৃতরাষ্ট্র সব শুনে চুপ করে থেকেছেন। তবু এর মধ্যে দ্রৌপদীর প্রতি অশালীন আঙ্গিক ইঙ্গিতগুলি বাদ গেছে বলেই হয়তো গান্ধারীর আবেদন প্রয়োজন হয়নি।

আমাদের তৃতীয় যুক্তিটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং সেখানেই গান্ধারীর সত্তা প্রমাণিত হয়। পাণ্ডবরা তখন দ্রৌপদীকে নিয়ে বনবাসে চলে যাচ্ছেন, কুন্তীর চোখের জল বাধ মানছে না, রাজ্যের মানুষ এই অন্যায় বন-প্রয়াণ চোখের সামনে দেখছে— এই অবস্থায় কৌরব শিবিরে দুর্যোধনে-অনুগামীদের যতই উল্লাস শোনা যাক, কৌরব বাড়ির বউ-ঝিয়েরা কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারাক্রান্ত মনে মুখ লুকোচ্ছেন লজ্জায়। কৌরব বাড়ির বউরা সকলেই যে সব কিছু চোখের সামনে দেখেছেন, তা নয়। তাঁরা সবকিছু এর-তার কাছে শুনেছেন। এই শোনাটুকু কেমন শোনায়— আন্দাজ আছে আপনাদের— তোমার স্বামী ভীম-অর্জুনের বউকে টানতে টানতে রাজসভায় নিয়ে এসেছিল। ও মা! ও মা! তোমার স্বামী তার কাপড় খুলে দিয়েছিল। তোমার স্বামী আবার তাকে কাপড় তুলে নিজের উরু দেখাচ্ছিল।

মহাভারতের কবি লিখেছেন— ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূরা আত্মীয়-স্বজনের মুখে শুনলেন কেমন করে তাঁদের স্বামীরা দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধরে রাজসভায় নিয়ে গিয়েছিল— ধার্তরাষ্ট্র-স্ত্রিয়শ্চৈব স্বজনাদ্ উপলভ্য তৎ— কীভাবে তারা দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণ করেছিল এবং কত ইতর ভাষায় তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিল— গমনং পরিকর্ষঞ্চ কৃষ্ণায়া দ্যূতমণ্ডলে। স্বামীদের এই কীর্তি-কলাপ একমাত্র মন্দ-মনের মানুষ ছাড়া আর যে কোনও ভদ্রজনের রুচিসম্মত হতে পারে না, এটা কুরুকুলের বউ-ঝি'রা উপলব্ধি করেছিলেন। বিশেষত কোনও বিবাহিতা স্ত্রী যদি নিরন্তর লোকের কাছে শুনতে থাকেন যে, তাঁর স্বামী স্থির বুদ্ধিতে ঠান্ডা মাথায় একজন মহিলার জামাকাপড় খুলে উলঙ্গ করে দিতে চাইছে, তবে তার এই ধর্ষণ-ভাবনা একজন স্ত্রীর মনে কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে? আমরা এটা জানি— চিরন্তনী পৌরুষেয়তা নারী-মানসের এইসব প্রতিক্রিয় বৃত্তিগুলিকে কোনওদিনই তো তেমনভাবে আমল দেয় না, যেমন আজও এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে বলে তো মনে হয় না।

এই ভাবনার উত্তরে বলতেই হবে যে, একটি মেয়ের এই ধর্ষণ-প্রতিম অপমান ধর্ষকের স্ত্রীকে অবশ্যই আলোড়িত করে এবং তা এখনও করে। মহাভারতের কালে পৌরুষেয়তার যে সুনাম এবং বীরোচিত মাহাত্ম্য বিখ্যাত ছিল, সেই নিরিখে দুর্যোধন-দুঃশাসনদের এই ধর্ষণকামী ব্যবহারগুলি কুরু-স্ত্রীদের মনে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। বিশেষত জননী হিসেবে এবং একজন স্ত্রীলোক হিসেবে গান্ধারীর মতো অনুভবপ্রবণ স্ত্রীতমা মহিলা কী করে পুত্রবধূদের সামনে তাঁর লজ্জা প্রকাশ করবেন। মহাভারতে দেখতে পাচ্ছি— দ্রৌপদীর প্রতি তাঁদের স্বামীদের এই নির্লজ্জ ব্যবহারের কথা শুনে কুরুকুলের বউরা— যাঁদের মধ্যে গান্ধারীও অবশ্যই আছেন— তাঁরা সব কুরু-পুরুষদের গালাগাল দিতে দিতে বহুক্ষণ ধরে ডাক ছেড়ে কেঁদেছিলেন—রুরুদুঃ সস্বনং সর্বা বিনিন্দন্ত্যঃ কুরুস্ত্রিয়ঃ। ডাক ছেড়ে কাঁদা মানে তো সেই— ওগো এ আমার কী হল গো, লোকের কাছে আমি এখন কী করে মুখ দেখাব গো— এই তো সেই চিরন্তনী ভাষা যা ভদ্রলোকে-ছোটলোকে একই রকম।

এমন সলজ্জ সশব্দ রোদনের পরেও উদ্যত পৌরুষেয়তার বিরুদ্ধে যখন কিছু করার ছিল না, কুরুকুলের স্ত্রীরা তখন স্তিমিত-প্রদীপ অর্ধরাত্রি পর্যন্ত গালে হাত দিয়ে মুখ লুকিয়ে ভেবে গেছেন নিশ্চয় যে, এইসব অপদার্থ স্বামীদের বীরপনা তাঁদের আজ কোনও কলঙ্কযাত্রায় শায়িত করেছে— দধ্যুশ্চ সুচিরং কালং করাসক্ত মুখাম্বুজাঃ। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই দুশ্চিন্তিত লজ্জাকুল কুরুকুল-বধূদের মধ্যে গান্ধারীও অন্যতমা নারী, যিনি সমস্ত বউ-ঝিদের নিয়ে দ্রৌপদীর ধর্ষণের বিরুদ্ধে তৎকালেই সোচ্চার হয়েছিলেন। এর প্রমাণ আছে আমাদের কাছে। পাণ্ডবরা বনে চলে গেলে ধৃতরাষ্ট্র-মহারাজকে আমরা সারাক্ষণ উদ্বিগ্ন দেখছি, বারবার পুত্রদের অসহ্য অন্যায় আচরণ এখন তাঁর অন্ধচক্ষুর সামনে ভেসে আসছে,

ভেসে আসছে পুত্রবধূদের আর্ত রোদন-দিগ্ধ কণ্ঠস্বর— ধ্যায়ন্ উদ্বিগ্নহৃদয়ঃ পুত্রাণাম্ অনয়ং তথা— তিনি আর শান্তি পাচ্ছেন না।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ধৃতরাষ্ট্রকে উথালি-পাথালি ভাবতে দেখে সাক্ষী এবং দ্রষ্টার মতো সঞ্জয় বলেই ফেললেন— সমস্ত ঘটনার জন্য আপনিই তো দায়ী মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্র লুকোলেন না, নিজের দায় অস্বীকার করলেন না, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা, সেটা হল মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এখন দুই পক্ষের দুটি অবলা স্ত্রীলোককে দেখে ভয় পাচ্ছেন। সঞ্জয়কে তিনি বলছেন— দুর্যোধন-দুঃশাসন দ্রৌপদীর উদ্দেশে নির্লজ্জ কথাগুলি বলতে থাকলে দ্রৌপদীর চোখ দুটি যেমন ক্রোধরক্ত হয়ে উঠেছিল বলে শুনেছি, সে চোখ বুঝি এই পৃথিবীটাকেও ধ্বংস করে দিতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, দ্রৌপদীকে সভায় টেনে আনার ফলে সমবেত কুরুকুলবধূদের সঙ্গে স্বয়ং গান্ধারী যে ভয়ংকর আক্রোশ প্রকাশ করেছিলেন— ভরতানাং স্ত্রিয়ঃ সর্বা গান্ধার্য্যা সহ সঙ্গতাঃ— সেই ঘটনাতেও আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন বোধ করছি। গান্ধারীর নেতৃত্বে কুরু-ভরতকুলের স্ত্রীদের অমন ভৈরব চিৎকার আমি কোনওদিন শুনিনি— প্রাক্রোশন্ ভৈরবং তত্র দৃষ্ট্বা কৃষ্ণাং সভাগতাম্।

ধৃতরাষ্ট্র এবার বুঝতে পারছেন, তাঁর প্রিয়তমা পত্নী যিনি পাতিব্রত্যের ভাবনায় তাঁরই জন্য কৃত্রিমভাবে অন্ধ হয়ে আছেন, তাঁর ঈর্ষা-অসূয়া যাঁর মধ্যে কৃত্রিমভাবে তাঁরই জন্য সঞ্চারিত হয়েছিল এতকাল ধরে, সেই গান্ধারী এবার তাঁর পাশ থেকে সরে যাচ্ছেন। নইলে দ্রৌপদীকে রাজসভায় কটূক্তি বর্ষণের পর এক সময় ভীষ্ম-দ্রোণ, কৃপ-সোমদত্তরা সভা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু গান্ধারী তাঁর সমভাবিনী কুরুবংশীয়া রমণীদের সঙ্গে একত্রে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে এবং পুত্রদের বিরুদ্ধে ভৈরব শব্দে চিৎকার করছেন— এই ঘটনার সমূহ প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল ধৃতরাষ্ট্রের ওপর, যদিও সেই প্রতিক্রিয়া তিনি নিজেই ধরে রাখতে পারেননি অন্ধস্নেহবশে। গান্ধারীর সোচ্চার প্রতিবাদে মুহূর্তের জন্য ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে তিরস্কার করে পাণ্ডবদের সব ফিরিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু পুত্রের রাজ্যলালসায় নিজের রাজ্যলালসা মেটাতে গিয়ে আবারও তিনি আদেশ দিলেন— ফিরিয়ে আন পাণ্ডবদের। ইন্দ্রপ্রস্থের পথে অনেকটা যদি এগিয়েও গিয়ে থাকে, তবু আবার ফিরিয়ে আন তাদের— তূর্ণং প্রত্যানয়স্বেতান্ কামং ব্যধ্বগতানপি।

পাশাখেলার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের এই পুনরাদেশের সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে গান্ধারীর কানে পৌঁছেছে। আমরা বলেছিলাম— উন্মুক্ত রাজসভায় রমণীমণি দ্রৌপদীর লজ্জাবস্ত্র হরণের ঘটনা এতটাই ধাক্কা দিয়েছিল গান্ধারীকে যে অসহায় দৃষ্টিহীন প্রিয় পতিকে আর তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। বোঝা যায়, ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যলোভ যদিও বা তিনি স্বামীর যুক্তি দিয়েই সহ অনুভূতি দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কুলবধূর প্রতি তাঁর পুত্রদের নগ্ন ব্যবহার এবং সেখানে ধৃতরাষ্ট্রের নিশ্চল বসে থাকাটা গান্ধারীকে এক ধাক্কায় ধৃতরাষ্ট্রের পাশ থেকে সরিয়ে দিল। আরও বুঝতে পারি— গান্ধারীই বোধহয় মহাকাব্যের সেই প্রথমা রমণী যিনি একটি প্রায়ধর্ষিতা রমণীর সমদুঃখিতায় কঠিন প্রতিবাদ রচনা করেছেন নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে, নইলে এতদিন গান্ধারীকে আমরা একটি কথাও বলতে শুনিনি। পুত্রদের অসভ্যতা অন্যায়গুলি এতকাল তিনি দেখে গেছেন, কিন্তু তা যে এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুৎসিত পর্যায়ে পৌঁছেছে, সেটা বোধহয় রাজসভায় দ্রৌপদীর অপমানের পূর্বে তিনি এমন করে বোঝেননি।

এবার তিনি ধৃতরাষ্ট্রের পাশ থেকে সরে গেছেন। আস্থিত হয়েছেন আপন স্বতন্ত্রতায়। অতএব যে মুহূর্তে তিনি শুনলেন— পাণ্ডবদের আবারও পাশাখেলার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, সেই মুহূর্তেই তিনি উপস্থিত হয়েছেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। মহাভারতের কবি লিখেছেন— গান্ধারী দুটি কারণে স্বামীর কাছে গেছেন— প্রথমত পুত্রের প্রতি স্নেহবশত, দ্বিতীয়ত ভয়ে— পুত্রস্নেহাদ্ ধর্মপূর্বং গান্ধারী শোককর্ষিতা। এতদিনে গান্ধারী বুঝেছেন— ধৃতরাষ্ট্রের যে স্নেহ এতাবৎকাল হৃদয়-নিহিত তৃষ্ণা এবং রাজ্যলোভ বাড়িয়ে তুলেছে, এইটাকে স্নেহ বলে না। যে স্নেহ তাঁকে সত্যি মানুষ করে তুলতে পারে, আজ গান্ধারী সেই স্নেহে কথা বলছেন— সেই স্নেহ যার অনুবন্ধে ধর্ম আছে, নিয়মের নিয়ন্ত্রণ আছে— পুত্রস্নেহাদ্ ধর্মপূর্বং— দ্বিতীয়ত সেই বাস্তব— গান্ধারী এবার ভয় পাচ্ছেন। ক্ষত্রিয়গৃহের বধূ হিসেবে ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা তিনি চেনেন। রাজসভায় সকলের সামনে ভীম দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন, দুঃশাসনের রক্তপান করার প্রতিজ্ঞাটাও ভীমেরই, যিনি কখনও অপমান ভুলে যান না। তা ছাড়া দ্রৌপদীর যে অপমান ঘটেছে, তার প্রতিশোধ-স্পৃহা সমস্ত পাণ্ডবদের সব সময় তাড়িত করবে চরম ফলাফলের জন্য। এরই মধ্যে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র আবারও পুত্রের কথায় চালিত হয়ে পাণ্ডবদের পুনরায় পাশাখেলায় আবাহনের চিন্তা করছেন। গান্ধারী তাই এগিয়ে এসেছেন সেই স্বামীর কাছে, যিনি পুত্রের মধ্যে নিজের লোভ সঞ্চারিত করেছেন এবং পুত্রের কারণেই যার বুদ্ধি স্থির থাকে না।

গান্ধারী কোনও ভণিতা না করেই বললেন— দুর্যোধন জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই মহামতি বিদুর এই পুত্রটিকে মেরে ফেলার কথা বলেছিলেন— জাতে দুর্যোধনে ক্ষত্তা মহামতিরভাবত। এই ছেলে জন্মের সময়েই শেয়ালের মতো বিকৃত স্বরে চেঁচিয়ে উঠেছিল, সেই অমঙ্গল কিন্তু এই বংশের ধ্বংস ডেকে আনবে। এই প্রথম গান্ধারী বিদুরের কথা উচ্চারণ করছেন শ্রদ্ধা সহকারে। শৃগালের বিকৃত স্বরের মধ্যে যে দুর্লক্ষণ আছে সেটা দিয়েই যে পুত্রের ভবিষ্যৎ-ক্রিয়া নির্দেশ করা যায় না, সেটা তিনি জানেন। বস্তুত দুর্যোধন জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র যেভাবে রাজ্যলোভে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছিলেন, সেটাই যে বাস্তবিক অমঙ্গল সূচনা করে দিয়েছিল, তার দিকে খেয়াল রেখেই আজ গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন— তুমি নিজের দোষে এই দুঃখসমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়ো না নিজেকে। মূর্খ এবং অশিষ্ট পুত্রেরা তোমাকে যা বলছে তুমি তাই করছ। ওদের কথা এইভাবে নির্বিচারে মেনে নিয়ো না তুমি— মা বালানাম্ অশিষ্টানাম্ অনুসংস্থা মতিং প্রভো।

লক্ষ করে দেখুন, গান্ধারী কিন্তু ছেলেদের দোষ দিচ্ছেন না তেমন করে। ওই একবার মাত্র বিদুরের কথা বলে দুর্যোধনের জন্মমাত্রিক রাজনৈতিক সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন গান্ধারী। কেননা দুর্যোধনের জন্মলগ্নেই জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে অতিক্রম করে দুর্যোধনকেই রাজা করার ভাবনা ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। সেই পুত্রকে মানুষ করার সময়েও নিজের ঈর্ষা-অসূয়াগুলি পূর্ণমাত্রায় সংক্রমিত করে তার লোভ এবং কামনার ইন্ধন তিনিই জুগিয়ে যাচ্ছেন। এত বড় একটা গণ্ডগোলের পর পাণ্ডবরা বাড়ি পৌঁছনোর আগেই মাঝপথ

থেকে তাঁদের তুলে এনে পাশা খেলতে বসানোর পরিকল্পনাটা যদি ধৃতরাষ্ট্র অনুমোদন না করতেন, তা হলে দুর্যোধনের লেশমাত্র ক্ষমতা ছিল না ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে ডেকে আনার। গান্ধারী সরাসরি ধৃতরাষ্ট্রকে দায়ী করে বলেছেন— এই বংশের ধ্বংসলীলায় তুমি কেন এমন কারণ হয়ে উঠছ— মা কুলস্য ক্ষয়ে ঘোরে কারণং ত্বং ভবিষ্যসি। কৌরবরা কৌরবদের জায়গায় আছে, পাণ্ডবরা পাণ্ডবদের জায়গায়, তাঁদের মধ্যে আত্মীয়তার সুস্থ সেতু রচিত হয়ে গেছে রাজ্য ভাগ করে দেবার পর থেকেই। সেই আত্মীয়তার সেতুটুকু তো তুমিই ভেঙে দিচ্ছ। বিশেষত রাজসভায় এই ঘৃণ্য কাণ্ড ঘটে গেল, কেবলই পাণ্ডবরা শান্ত হয়েছে, তুমি আবারও সেই নির্বাপিত অগ্নি জ্বালিয়ে তোলার চেষ্টা করছ— বদ্ধং সেতু কো নু ভিন্দ্যাদ্ ধমেচ্ছান্তঞ্চ পাবকম্।

গান্ধারী ভেবেছিলেন— দ্যূত-সভায় যে-অপমানই হয়ে থাকুক, ধৃতরাষ্ট্র দানে-মানে পাণ্ডবদের যেভাবে তুষ্ট করেছেন, তাতে আপাতত তাঁদের প্রজ্জ্বলিত ক্রোধ শান্ত হয়েছে হয়তো। কিন্তু এই যে আবার অর্ধপথ থেকে তাঁদের ডেকে আনা হচ্ছে পুনরায় পাশাখেলার জন্য, তাতে তো পাণ্ডবদের সমস্ত সংবৃত ক্রোধ পুনরায় আসবে এবং সেই ক্রোধ যে একটি বিখ্যাত বংশ ধ্বংস করে দেবে— সেটা গান্ধারী মনে-প্রাণে বুঝতে পারছেন এখন। গান্ধারী বললেন— পাণ্ডবরা যেভাবেই হোক শান্ত হয়েছে, তুমি একবার ভাবো তো— কোনও সুস্থ মানুষ কি আবার তাদের ক্রোধ জাগিয়ে তুলবে। তুমিও হয়তো আমার মতোই এই কথাটা বেশ বুঝতে পারছ, কিন্তু তবু আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আবার। নিয়ম, আচার, শাস্ত্র— এগুলো দুর্বুদ্ধি, দুষ্ট-জনকে কোনও শিক্ষা দিতে পারে না, তাকে মঙ্গলের দিকেও চালিত করতে পারে না অথবা অমঙ্গল থেকেও তাকে নিবৃত্ত করতে পারে না— শাস্ত্রং ন শাস্তি দুর্বুদ্ধিং শ্রেয়সে চেতরায় চ। আর কোনও বুড়ো মানুষ নিশ্চয়ই বাচ্চা ছেলের যেমন বুদ্ধি, তেমন বুদ্ধি নিয়ে কাজ করে না, যা তুমি করতে চাইছ— ন বৈ বৃদ্ধো বালমতির্ভবেদ্ রাজন্ কথঞ্চন।

এই শেষ কথাটায় গান্ধারী ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন যে বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের বুদ্ধিতেই চলছেন, তাঁর নিজের বুদ্ধিতে নয়। গান্ধারী বোঝেন— তাঁর অন্ধ স্বামীর হৃদয়ে অদ্ভুত এক দ্বৈরথ কাজ করে। কখনও তিনি বেশ ভাল, ছোট ভাই পাণ্ডুর ছেলেদের তিনি আপন পিতৃত্বের বাৎসল্যে অভিষিক্ত করেন, কিন্তু পরক্ষণেই পুত্রের স্বার্থ সেই পিতৃত্বের মহিমা কলুষিত করে দেয়। গান্ধারী বললেন— তোমার ছেলেদের চলার পথে তুমি তাদের প্রকৃত চক্ষু হয়ে ওঠো, এই আমি চাই। আমি চাই তুমি তাদের পথ দেখাও, তা নইলে একদিন বিপক্ষের আঘাতে তারা ধ্বংস করে ফেলবে নিজেদেরই— ত্বন্নেত্রাঃ সন্তু তে পুত্রা মাং ত্বাং দীনাঃ প্রহাসিষুঃ। ছেলের ওপর অন্ধ বাৎসল্যে তুমি দুর্যোধনকে ত্যাগ করোনি, কিন্তু আজকে যে সময় এসেছে, তুমি ত্যাগ করো এই ছেলেকে। আমার কথা রাখো— ত্যাগ করো এই বংশনাশা দুর্যোধনকে— তস্মাদয়ং মদ্বচনাত্ ত্যাজ্যতাং কুলপাংসনঃ। বরঞ্চ আগেই যদি বিদুরের কথায় এই একটি ছেলেকে তুমি ত্যাগ করতে, তা হলে আজকে এই সামগ্রিক ধ্বংসের মুখে এসে পড়তে হত না। তুমি তাকে ছাড়নি, তার ফল আজ পাচ্ছি— তস্য প্রাপ্তং ফলং বিদ্ধি কুলান্তকরণায় হ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গান্ধারী তাঁর স্বামীকে আগেও দেখেছেন, আগেও বোঝবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এতখানি মান-মর্যাদাহীন তিনি ছিলেন না বোধহয়। এই মানুষটাই তো পিতৃহীন পাণ্ডবদের আশ্রয় দিয়েছিল, এই মানুষটাই তো রাজ্যভাগ করে দিয়ে পাণ্ডবদের নিজস্ব সত্তা প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধারীর মনের মধ্যে সেই কুচক্রী রাজার ছায়া পড়ে— এই মানুষটাই জতুগৃহে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনায় শামিল ছিলেন; এই মানুষটাই রাজসভায় বসে বসে যৌবনবতী পুত্রবধূর বস্ত্রহরণের রোমাঞ্চ অনুভব করলেন মানস-চক্ষে অথবা পুত্রদের নয়ন-মাধ্যমে। গান্ধারী কেমন মেলাতে পারেন না সবকিছু। প্রিয় স্বামীর এই মানসিক বিক্রিয়া তাঁকে পীড়িত করছে। তিনি বুঝেছেন— দুর্মদ অশালীন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ধৃতরাষ্ট্র কিছুতেই ছেড়ে থাকতে পারবেন না। শেষবাক্যে তাই বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলেন স্বামীকে— আগে কিন্তু তোমার বুদ্ধি নির্মল ছিল, সেই বুদ্ধির মধ্যে শান্তি, ধর্ম এবং ন্যায়ের অভিসন্ধি ছিল। আজকে যখন তুমি তোমার আপন ভ্রাতুষ্পুত্রদের আবারও পাশাখেলার জন্য ডেকে পাঠাচ্ছ, তখন সেই ন্যায়-ধর্মের বুদ্ধি ফিরে আসুক তোমার মধ্যে— শমেন ধর্মেন নয়েন যুক্তা/ সা তে বুদ্ধিঃ সাহস্তু তে মা প্রমাদীঃ— তুমি এমন করে উদাসীন বসে থেকো না। এটা ভাল করে জেনে রেখো— রাজলক্ষ্মী যদি ক্রূর নৃশংস অন্যায়ী মানুষের হাতে ন্যস্ত হয়, তবে সেই রাজলক্ষ্মী ধ্বংস ডেকে আনবে, আর সে যদি কোমল ভদ্রলোকের হাতে থাকে, তবে সেই বাড়িতেই রাজলক্ষ্মী তার নিজের বয়স বাড়িয়ে প্রৌঢ়া হয়ে ওঠে, নাতি-নাতনি পর্যন্ত তাঁর স্নেহচ্ছায়া প্রসারিত হয়— প্রধ্বংসিনী ক্রূর-সমাহিতা শ্রীঃ/ মৃদুপ্রৌঢ়া গচ্ছতি পুত্র-পৌত্রান্।

গান্ধারীর এই সুচিন্তিত ভাবনার কোনও মূল্য দিলেন না ধৃতরাষ্ট্র। আসলে প্রথম পাশাখেলার পর দুর্যোধনের হাতে আসা সমস্ত ঐশ্বর্য তিনি এমন উদারতায় নিঃশেষে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যে, তার জন্য অন্ধ রাজার মনেও বুঝি কিছু অনুশোচনা ছিল মনে মনে। গান্ধারী এবং কুরুকুলের স্ত্রী-সমাজের আক্রোশে সাময়িকভাবে তাঁর সততা জেগে উঠেছিল বটে, কিন্তু সেটা যে তাঁর খুব স্বাভাবিক উদারতা ছিল না, সেটা বোঝা যায় যখন দুর্যোধনের তাড়নাতে ধৃতরাষ্ট্র দ্বিতীয় বার পাশাখেলার জন্য মাঝপথ থেকেই তুলে আনতে বললেন পাণ্ডবদের। দুর্যোধনের কথায় এত তাড়াতাড়িই তিনি সিদ্ধান্তে স্থির হয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি যেহেতু জানতেনই যে, শ্যালক শকুনি তাঁর অভীষ্ট জয় এনে দেবেন, অতএব এই সময়ে গান্ধারীর দূরদর্শিতার উত্তরে তিনি সমান মানসিক প্রস্তুতিতে একথা বলতে পারেননি যে, তবে তাই হোক। তুমি যখন বলছ, তবে তাই হোক। বরঞ্চ, মনে মনে যিনি একেবারেই হিতৈষিণী স্ত্রীর কথা মানতে পারছেন না, অথচ হিতৈষিণী বলেই তাঁর মুখের ওপরেও সরাসরি নিজের অন্যায় ইচ্ছেটুকুর কথা স্পষ্ট করে বলতে পারেন না, এমন স্বামীরা নিজের বদলে ছেলের ওপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে বলেন— কী আর করবে বলো, কপাল সবই কপাল। ও শেষ হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে এই বংশ। আমি আর কত করব, অনেক বুঝিয়েছি। পারিনি। ও শুনবে না।

ধৃতরাষ্ট্র, একমাত্র ধৃতরাষ্ট্রই পারতেন এই অন্যায় পাশাখেলা ঠেকাতে। কিন্তু পুত্রের উদগ্র লালসার সঙ্গে যেহেতু তাঁর অন্তরশায়ী সুচিরসুপ্ত রাজ্যলোভ একাকার হয়ে গিয়েছিল, তাই

তিনি হিতৈষিণী স্ত্রীর কথা শুনেও শুনলেন না। সব শোনার পর সেই নিজের সুপ্ত অভিলাষ অসম্ভব চতুরতায় ঢেকে দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি কথা শেষ করলেন ধৃতরাষ্ট্র। গান্ধারীর যুক্তিগুলি শুনেও না শোনার ভান করে ধৃতরাষ্ট্র বললেন— দেখো, হাজার চেষ্টা করা সত্ত্বেও এই বংশের ধ্বংস আমি ঠেকাতে পারব না। অতএব তুমি আর কিছু বোলো না, ওদের যা ইচ্ছে তাই করুক, পাণ্ডবরা আবার ফিরে আসুক— যথেচ্ছন্তি তথৈবাস্তু প্রত্যাগচ্ছন্তু পাণ্ডবাঃ। ওরা যেমন চাইছে, সেই রকমই আর একবার না হয় আমার ছেলেরা পাণ্ডবদের সঙ্গে পাশা খেলুক— পুনর্দ্যূতং প্রকুর্বন্তু মামকাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ।

ধৃতরাষ্ট্র যেভাবে কথা বললেন, তাতে বেশ বোঝা যায় যে ছেলেদের ওপর যতই তিনি দোষ চাপিয়ে দিন, তিনি নিজেও ওই একই ভাবনায় শামিল। তিনি নিজেই চান— পাশাখেলা হোক।

ধৃতরাষ্ট্রের কৃত্রিমতা আমরাই বুঝে যাচ্ছি, আর তাঁর স্ত্রী হয়ে গান্ধারী কিছুই বোঝেননি, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। পাণ্ডবরা পাশাখেলায় হেরেছেন এবং বনে চলে যাবার সময় দুর্যোধন এবং তাঁর ভাইয়েরা দ্রৌপদীর উদ্দেশে যত অকথা-কুকথা বলেছেন, তার প্রতিক্রিয়া কুরুকুলের বউদের ওপরে মোটেই ভাল হয়নি। প্রিয় স্বামীদের পরস্ত্রীলোলুপতার ভাষা শুনে একদিকে যেমন তাঁরা লজ্জায় মুখ লুকিয়ে বসেছিলেন হাতের তালুতে— দধ্যুশ্চ সুচিরং কালং করাসক্ত-মুখাম্বুজাঃ—তেমনই অন্যদিকে স্বামীদের ব্যবহারে তাঁরা ক্ষুব্ধ-মানসে কান্নাকাটিও করেছেন অনেক, এমনকী স্বামীদের চরিত্র এবং ব্যবহার নিয়ে নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট নিন্দেমন্দ উচ্চারণ করেছেন।— রুরুদুঃ সস্বনং সর্বা বিনিন্দন্ত্যঃ কুরূন্ ভৃশম। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস— স্পষ্ট করে না বললেও এই কুরুকুলের স্ত্রীলোকের সঙ্গে গান্ধারীও আছেন। বিশেষত, বনে যাবার সময় দুর্যোধন দুঃশাসনেরা যেভাবে পাণ্ডবদের অসহ্য অপমান করেছেন এবং উত্তরে ভীমার্জুন প্রত্যেকেই যেভাবে কৌরব-বংশ ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন, তাতে গান্ধারীর মন সব দিক থেকেই বিপর্যস্ত হবার কথা। গান্ধারী বিপর্যস্তবোধ করেন নিশ্চয়।

৪

তবুও বড় আশ্চর্য লাগে। পাণ্ডবরা বনে চলে গেলেন, প্রিয় পুত্রদের প্রস্থানের সময় জননী কুন্তী উথাল-পাথাল করে কাঁদছেন, বিলাপ করছেন, নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছেন, তবু এই শোকার্ত সময়ে আমরা কিন্তু গান্ধারীকে একবারও তাঁর পাশে এসে দাঁড়াতে দেখছি না। আশ্চর্য লাগে— কুন্তীর আর্তনাদে সমব্যথিত পুরুষ বিদুর তাঁর সৌভ্রাত্রের হস্ত প্রসারণ করে নানা যৌক্তিকতায় কুন্তীকে আশ্বস্ত করে তাঁকে নিজগৃহে প্রবেশ করিয়েছেন, কিন্তু কর্তব্য তো গান্ধারীরই ছিল। তিনি যদি পুত্রদের ব্যবহারে অসন্তুষ্টই হয়ে উঠেছিলেন, তা হলে বড়-জা হিসেবে গান্ধারীর পক্ষেই তো সবচেয়ে স্বাভাবিক ছিল বিপন্না কুন্তীকে সান্ত্বনা-বাক্যে প্রশমিত করা অথবা তাঁকে নিজের ভবনে আশ্রয় দেওয়া, যা বিদুর দিয়েছিলেন। আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে প্রশ্ন জাগে— গান্ধারী পাণ্ডব-ভাই অথবা পাণ্ডববধূর ব্যাপারে যতই করুণাঘন হোন না কেন, কুন্তীকে তিনি সহ্য করতে পারছেন না এখনও পর্যন্ত। এ কি পৌর্বকালিক কারণ, কুন্তী যেহেতু গান্ধারীরও আগে জননী হয়েছেন, যে-কারণে তিনি গর্ভে আঘাত করেছিলেন বিষণ্ণতায় অথবা কুন্তীর পুত্র জ্যেষ্ঠ বলেই আজও জ্ঞাতিশত্রুতার মূল কারণ তিনিই। গান্ধারী কি সেই জন্যই তাঁকে সহ্য করতে পারেন না? এখনও কি পারেন না? নইলে দুর্বুদ্ধি পুত্রকে জন্মলগ্নেই কেন বিসর্জন দেননি বলে দুঃখ পাচ্ছেন, তিনি তো বনবাসী পাণ্ডবদের জননীকে আপন স্নেহচ্ছায়ায় আবৃত করলেন না এখনও।

আসলে গান্ধারীর অন্তরের মধ্যে অদ্ভুত এক দ্বৈরথ কাজ করে। আর এটাও তো সত্যি যে, পুত্রবাৎসল্য এমনই এক বিষম বস্তু যেখানে মায়ের অতি কঠোর তিরস্কার-বাক্য, এমনকী পুত্রের মৃত্যু-কামনাও সেই তিরস্কারের অন্তর্গত বটে, কিন্তু সেই তিরস্কারও বোধহয় খানিকটা মৌখিকতায় চালিত হয়। আমরা নিজেদের জীবনেও তাই দেখি বারবার। পুত্র-কন্যা যখন সঠিক সৎ পথে চলে না, তখন চিরন্তনী মায়ের মুখে বহুবার এই খেদবাক্য শুনেছি— তুই মর, তুই মরলে আমার শান্তি। কিন্তু পুত্র-কন্যা মায়ের অভিশাপে মরে না, বরঞ্চ সে-অভিশাপে তাদের নাকি আয়ু বাড়ে— এমনই জনশ্রুতি। বিষম পরিস্থিতিতে মায়েরা আবারও আশায় বুক বাঁধেন, যদি সন্তানের সুমতি হয়। গান্ধারীর দ্বৈরথটা কোথায়, তিনি পুত্রকে তিরস্কার করছেন, তার জন্য হিতবাক্য উচ্চারণ করছেন, কিন্তু বিপরীতপক্ষে তাঁকে পাণ্ডবদের প্রতি তেমন কোনও সমব্যথায় আচ্ছন্ন হতে দেখছি না। একবারও তাঁর মুখে সেই উদ্বেগ-বচন শুনছি না যে, এই অবস্থায় পাণ্ডবরা কী করবেন অথবা পুত্রহারা জননী কুন্তীর মনের অবস্থাই বা কতটা করুণ হতে পারে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকালে সমস্ত কুরুভার্যাদের নিয়ে যে গান্ধারী সমস্ত সভাস্থল আলোড়িত করে দিয়েছিলেন, তিনি দ্বিতীয়বার দ্যূতক্রীড়ার সময় ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করলেন বটে সানুক্রোশে কিন্তু দ্যূতক্রীড়া বন্ধ করার জন্য তিনি কিন্তু কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করলেন না, এমনকী পুত্রদেরও কিছুটি বললেন না সরাসরি। পাণ্ডবরা বনে চলে গেলেন, পুত্রহারা কুন্তী সাশ্রুকণ্ঠে বিদুরের অতিথি-গৃহে প্রবেশ করলেন অসহায়ের মতো অথচ গান্ধারীকে একবারের তরেও আমরা কুন্তীর কাছে এসে সান্ত্বনা-বাক্য উচ্চারণ করতে দেখলাম না।

এই ঘটনাতে গান্ধারী-চরিত্রের দ্বৈরথ অথবা তাঁর দ্বৈধীভাব খানিকটা অনুমান করা যায়। অর্থাৎ দুষ্ট পুত্রের ওপর তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছেন বটে, এমনকী ধৃতরাষ্ট্রের সততার ব্যাপারেও তাঁর মনে এখন এক গভীর সংশয় তৈরি হচ্ছে, কিন্তু তাই বলে পাণ্ডবজননী কুন্তীর প্রতি তাঁর কোনও করুণাঘন মমত্ব দেখছি না এবং পাণ্ডবদের সহায়তার জন্য দুর্যোধনের বিরুদ্ধেও তিনি কোনও প্রকট প্রতিরোধ-শব্দ উচ্চারণ করছেন না। ধৃতরাষ্ট্র নিজের অভিলাষ পূরণ করবার জন্যই একবার বললেন— এই মহাকুলের ধ্বংস আমি এড়াতে পারব না, বরঞ্চ আবার পাণ্ডবরা আমার ছেলেদের সঙ্গে পাশা খেলুক— এই কথার উত্তরে গান্ধারী একটি কথাও বললেন না। সবই কি তিনি দৈবের ওপর ছেড়ে দিলেন, নাকি দুর্যোধন-দুঃশাসনেরা তাঁকে যতই ক্ষুব্ধ করে থাকুক, একটা জায়গায় তাদের চরম আঘাত হানতে কিন্তু এখনও তাঁর বাধছে, হয়তো তাঁর অন্তরশায়ী স্নেহপ্রবৃত্তিই এই বাধা দিচ্ছে— যে স্নেহ ধৃতরাষ্ট্রের মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ধ নয় বটে, কিন্তু তা কুপুত্রা জননীর বাৎসল্যের ঊর্ধ্বে নয়। এটা অবশ্যই ঠিক, ধৃতরাষ্ট্র প্রথমবার দ্যূতক্রীড়ার পর বিপুল উল্লসিত হয়েও গান্ধারীর আক্রোশে পুত্র-কৃত দ্রৌপদীর অপমান স্মরণে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন, তেমনই দ্বিতীয়বার পাশাখেলার ভাবনাটাও যে গান্ধারীর পছন্দসই হতে পারে না, সেটা আমরা বুঝি; এমনকী ধৃতরাষ্ট্রও সেটা খুব ভাল করে বোঝেন। আমরা বনপর্বে দেখেওছি যে, মহামতি ব্যাস যখন তেরো বছর পর পাণ্ডবদের ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ প্রত্যাগমনের সম্ভাবনার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, তখন ভীষ্ম-দ্রোণ-বিদুরের সঙ্গে তিনি গান্ধারীর কথাও বলছেন। বলছেন যে, পাশা খেলে পাণ্ডবদের বনবাসে পাঠানোর ব্যাপারটা কেউই পছন্দ করেননি, এমনকী গান্ধারীও আমাকে বারণ করেছেন, কিন্তু পুত্রস্নেহের মোহে আমি ব্যাপারটা এড়াতে পারিনি— গান্ধারী নেচ্ছতি দ্যূতং তচ্চ মোহাৎ প্রবর্তিতম্।

বুঝতে পারি— সুবুদ্ধি-প্রণোদিত হলে ধৃতরাষ্ট্রও কার্যত উপলব্ধি করেন যে, তিনি যা করেছেন বা করছেন তাতে গান্ধারীর সায় নেই, কিন্তু গান্ধারীর দিক থেকে যখন ব্যাপারটা ভাবি, তখন বার বার মনে হয়— ধৃতরাষ্ট্র যেমন পুত্রবাৎসল্যে অন্ধ আচরণ করছেন, তেমনই গান্ধারী যতখানি পুত্রের ওপরে স্নেহশীল, তার চেয়েও বোধহয় তাঁর অনেক বেশি স্নেহ-বাৎসল্য আছে স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের ওপর। নইলে পুত্রের ব্যাপারে তিনি কঠিন শব্দ হাজার উচ্চারণ করেছেন বটে, কিন্তু স্বামীর অন্যায় অপকর্মগুলি তিনি তেমন কোনও অপশব্দে প্রতিহত করেন না অথবা চরম বাধা দিয়েও ব্যাহতও করেন না। হয়তো ধৃতরাষ্ট্রের ওপরে এই স্নেহচ্ছায়া, বাৎসল্য, যা শৃঙ্গার-রসের অন্যতম গৌণ অঙ্গ তো বটেই— হয়তো এই স্নেহচ্ছায়া গান্ধারীর মনে তৈরি হয়েছিল বিবাহোত্তর মুহূর্তেই। যেদিন থেকে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের মুখে তাঁর অন্ধত্বের কষ্টগুলি শুনেছেন, অন্ধত্বের জন্য তাঁর রাজা হবার তীক্ষ্ণ বাসনা কীভাবে প্রতিপদে আহত হয়েছে, এটা যে মুহূর্তে তিনি বুঝেছেন, সেই মুহূর্ত থেকেই স্বামী নামক এই বয়স্ক বালকটির ওপর তাঁর অন্যতর এক মায়া কাজ করে। তিনি কিছুতেই ধৃতরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এমন প্রতিরোধ তৈরি করতে পারেন না, যাতে অন্ধ তাঁর এই স্বামীটির উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ভোগাকাঙ্ক্ষা তিনি ঘৃণা করতে পারেন না ক্ষুব্ধ অভিমানে।

গান্ধারীর দিক থেকে ধৃতরাষ্ট্রের ওপর এই স্নেহ-প্রশ্রয় এতটা বিপুল ছিল বলেই হয়তো এখনও পর্যন্ত ধৃতরাষ্ট্রের অন্তর্গত হৃদয়ের বিরুদ্ধে গিয়ে পাণ্ডব-জননী কুন্তী এবং পাণ্ডবদের সঙ্গে তিনি নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারেন না। তা ছাড়া দুর্যোধনও যে শেষ পর্যন্ত এমন দুর্বিনীত প্রশ্রয়ে বিষবৃক্ষে পরিণত হলেন, সেটাও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারীর দুর্বলতায়। গান্ধারী তাঁর অন্ধ স্বামীর লোভ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা তেমন করে কোনও দিনই প্রতিহত করেননি, হয়তো সেই কারণেই এখনও পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে পাণ্ডবদের প্রতিও কোনও মহান স্নেহ প্রদর্শন করেননি তিনি। আর একই কারণে পুত্রবর্জিত অসহায়া কুন্তীকেও তিনি কোনও সুখ-সুবিধা-সান্ত্বনা এতটুকুও দেবার চেষ্টা করেননি। অথচ এটাই হয়তো তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। তা নইলে সারা বনবাস-পর্বের সময় তেরো বছরের মধ্যে একবারও কিন্তু আমরা গান্ধারীকে রাজার অন্তঃপুর ছেড়ে কুন্তীর সঙ্গে কথা বলতে শুনিনি, আসতে দেখিনি বিদুরের ঘরে একবারের তরেও। আর তেরো বৎসরের মধ্যে হস্তিনাপুরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজবাড়িতে কম ঘটনা ঘটেনি, কিন্তু সব মিলিয়ে গান্ধারীর নাম উচ্চারিত হয়েছে একবার, দুইবার কি তিনবার। তাও একবার নিতান্ত অপ্রয়োজনে, সেটা যখন দুর্যোধন ধর্মে মতি রেখে যজ্ঞ করছিলেন, তখন একবার। আর একবার নিতান্তই প্রয়োজনে— যখন দ্রৌপদীকে হরণ করবার কারণে ভীম জয়দ্রথকে ধরতে যাচ্ছেন অর্জুনের সঙ্গে, তখন ভীমের আক্রোশ মাথায় রেখে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন— জয়দ্রথকে যেন তুমি প্রাণে মেরো না ভীম, জননী গান্ধারীর কথা তুমি মনে রেখো। মনে রেখো ভগিনী দুঃশলার কথা— দুঃশলামভিসংস্মৃত্য গান্ধারীঞ্চ যশস্বিনীম্।

যা চলেছে হস্তিনাপুরে, তাতে এই তেরো বছরে দুর্যোধন এতটুকুও সংশোধিত হননি। বরঞ্চ এই সময়ের মধ্যেও গোধন গণনা করার নামে বনবাসী পাণ্ডবদের তিনি উত্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন, দুর্বাসা মুনিকে বনে পাঠিয়ে পাণ্ডবদের হেনস্থা করবার চেষ্টা করেছেন, আর জামাই জয়দ্রথ তো আপনাতে আপনি বিকশিত। আমাদের জিজ্ঞাসা, তা হলে গান্ধারী এতদিন কী করলেন? যে-সব অমূল্য উপদেশ, দুর্যোধনের প্রতি তাঁর তিরস্কার-নিগ্রহ, এমনকী স্বামী ধৃতরাষ্ট্রেরও বিরুদ্ধ-কোটিতে অবস্থান, যা আমরা যুদ্ধের উদ্যোগ পর্ব থেকে আমৃত্যু তাঁর মধ্যে দেখতে পাব, সেগুলি কিন্তু এই তেরো বছরে কিছুই প্রকট হয়ে উঠল না। এতে কিছু প্রশ্ন জাগে মনে।

তবে প্রশ্ন তোলার আগে মনে রাখতে হবে— দ্বৈপায়ন ব্যাস মহাভারতের কবি, তাঁর দৃষ্টিতে গান্ধারী-চরিত্রের 'ফোক্যাল পয়েন্ট' হল তাঁর ধৈর্য; ব্যাস সারা মহাভারত জুড়ে গান্ধারীর ধীরতা প্রদর্শন করতে চেয়েছেন, কিন্তু কেন এই ধীরতা তা স্পষ্ট করে বলেননি কোথাও। আমরা তো সেই পরিসরে প্রশ্ন তুলতেই পারি যে সভাপর্বের শেষে একবার মাত্র গান্ধারীকে আমরা ফুঁসে উঠতে দেখেছি, কিন্তু তারপর তেরো বছর ধরে গান্ধারী কিচ্ছুটি বললেন না দুর্যোধনকে। কেন এই ধীরতা— প্রশ্ন জাগে মনে।

বার বার বলেছি, আবারও একই কথা বলছি বটে, তবে এবার এক নতুন মাত্রা চড়িয়ে বলব। সেই বিবাহের কাল থেকে এই বনপর্ব পর্যন্ত আমরা গান্ধারীকে যতটুকু দেখলাম, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস— কোনও পৌরুষেয়তার চাপে নয়, কিংবা পুত্রের প্রতি স্নেহবশে নয়, গান্ধারী যে এ পর্যন্ত ছেলেকে কিছু বলেননি অথবা একদিনের জন্যও সরাসরি তিরস্কার করেননি, তার সবটাই তাঁর স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ভালবাসায়। ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধতার জন্য গান্ধারীর হৃদয়ে যত মায়া তৈরি হয়েছিল, সেই অন্ধতার কারণে সর্বদিকে সক্ষম সেই মানুষটি রাজ্যলাভ না করায় স্বামীর প্রতি তাঁর সমব্যথা তৈরি হয়েছিল আরও অনেক বেশি। হয়তো এই কারণেই ধৃতরাষ্ট্র যা যা পছন্দ করেননি অথবা যেখানে-যেখানে তাঁর বিরূপতা, ঔদাসীন্য এবং শীতলতা ছিল, ঠিক সেখানে-সেখানেই গান্ধারীও এতদিন উদাসীন, শীতল এবং স্পষ্টতই বিরূপ ব্যবহার করেছেন। গান্ধারীর বিরূপতা, ঔদাসীন্য অথবা শীতলতা স্পষ্ট করে বোঝা যায় না, কেননা তা সোচ্চারভাবে বানান করে পড়া যায় না। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি তাঁর অসীম ভালবাসা এবং প্রেম যদি অন্তঃকরণ দিয়ে উপলব্ধি করেন, তা হলে এতাবৎ পর্যন্ত গান্ধারীর সমস্ত ব্যবহার অর্থবহ হয়ে উঠবে।

আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি— উপযুক্ত ক্ষমতা সহকারে রাজ্যশাসন চালাতে-চালাতে

আকস্মিকভাবে পাণ্ডু যে সস্ত্রীক বনে চলে গেলেন, এর পিছনে ধৃতরাষ্ট্রের অন্তরশায়ী রাজ্যলালসাই সবচেয়ে বড় হেতু ছিল। পাণ্ডু চলে যাবার পর ধৃতরাষ্ট্রই অস্থায়ী রাজা হিসেবে কাজ করেছেন এবং একবারের জন্যও পাণ্ডুকে তিনি ফিরে আসতে বলেননি হস্তিনাপুরে। প্রথম দিকে বিদুরের মারফত তিনি যোগাযোগ রাখতেন, শেষে তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এইসব সময় গান্ধারীকে আমরা কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। অতঃপর বিধবা কুন্তী নিজের পুত্র এবং মাদ্রীর পুত্রদের নিয়ে বাড়ি ফেরার পর ধৃতরাষ্ট্র যে শীতল ব্যবহার করলেন তাঁদের সঙ্গে, গান্ধারী একটি কথাও বললেন না সেখানে। ধর্ম নিয়ে গান্ধারীর মুখে প্রচুর কথা শুনব ভবিষ্যতে, কিন্তু ধর্মের সমস্ত কল্প অনুপস্থিত রইল কুন্তীর প্রতি তাঁর ব্যবহারে। বারণাবতে পাঠিয়ে ধৃতরাষ্ট্র কুন্তীসহ সমস্ত পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন— একথা প্রথমে প্রচারিত হয়নি বটে, কিন্তু দ্রৌপদীর সঙ্গে পাণ্ডবদের বিবাহের পর সব খবর এমনকী দুর্যোধনের পরিকল্পনাও যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সময়েও কিন্তু গান্ধারীর মুখে একটি ধর্ম-শব্দও উচ্চারিত হয়নি। পাশাখেলার সময়েও ধর্মমতি যুধিষ্ঠির গান্ধারীর সঙ্গে দেখা করে গেছেন, এখানে কেমন পাশাখেলা হবে, তার কোনও আগাম খবর গান্ধারী পাননি, অথচ স্বামীকে গান্ধারী চিনতেন, চিনতেন দুর্যোধন এবং শকুনিকেও। সমস্ত ঘটনা থেকে আমার এই বোধই প্রকট হয়ে ওঠে যে, গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে এতই ভালবাসেন যে, স্বামী চাননি বলেই পাণ্ডুজায়া কুন্তীর সঙ্গে তিনি কোনও সুসম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেননি এবং স্বামী চাননি বলেই বনবাসে যাত্রাকালে যুধিষ্ঠির-ভীম ইত্যাদি পাণ্ডব তথা চরম-অপমানিতা পাণ্ডব-বধূ দ্রৌপদীর প্রতিও কোনও সমবেদনা জানাননি গান্ধারী। যাত্রাকালে তিনি সেখানে ছিলেনই না। অথচ কুন্তী বহির্গৃহের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে দিগন্তে নিলীয়মান পুত্রদের দিকে তাকিয়ে হা-হুতাশ করে কাঁদছেন, চরম কষ্ট পাচ্ছেন লাঞ্ছিতা পুত্রবধূর জন্য। কিন্তু গান্ধারী সেখানে ছিলেন না। নিশ্চয়ই ধৃতরাষ্ট্র চাননি, অন্তত তাঁর মনোভাব তাই ছিল এবং সেইজন্যই গান্ধারী সেখানে বেমানান-ভাবে অনুপস্থিত। নিজের মায়ায়, নিজের ভালবাসাতেই গান্ধারী এতদিন ধৃতরাষ্ট্রকে অতিক্রম করতে পারেননি, এখনও পারছেন না। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, তাই তিনি দেখতে পান না, কিন্তু যিনি ধৃতরাষ্ট্রের জন্যই পাঁচ-পুরু কাপড় বেঁধে নিয়েছেন চোখের ওপর, সেই কাপড়ের রন্ধ্রপথে এধার-ওধার দিয়ে ধর্মের সূর্যকিরণ প্রবেশ করলেও গান্ধারী এখনও সত্যদৃষ্টিকে রুদ্ধ করে রেখেছেন স্বামীর জন্যই।

ব্যাপারটা যে গান্ধারীর দিক থেকে বেমানান, তাঁর সামগ্রিক ধর্মবোধ এবং সত্যদৃষ্টির নিরিখে এই ব্যবহার যে তাঁকে মানায় না, সেটা কবির কবি রবীন্দ্রনাথ ঠিক বুঝেছেন। যে কারণে পাণ্ডবদের বনযাত্রার কালে কবি তাঁকে অনুপস্থিত রাখতে পারেননি। কবির মানসলোকে যুধিষ্ঠির স্বভাবসম্মতভাবে গান্ধারীর কাছে এসে বলেছেন—

আশীর্বাদ মাগিবারে এসেছি জননী,
বিদায়ের কালে।

গান্ধারী কত যে আশীর্বাদ করেছেন যুধিষ্ঠিরকে, সেইসব মহাকাব্যিক উদার আশীর্বাদ, যেখানে শত্রুগৃহের রাজমাতা পুত্রের অন্যায় স্বীকার করে নিয়ে শত্রুর ঐশ্বর্য এবং জয় কামনা করেন সেই ভাষায়—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোর পুত্র করিয়াছে যত অপরাধ
খণ্ডন করুক সব মোর আশীর্বাদ,
পুত্রাধিক পুত্রগণ। অন্যায় পীড়ন
গভীর কল্যাণসিন্ধু করুক মন্থন।

বস্তুত ভবিষ্যতে গান্ধারীর যে মহনীয় রূপ দেখতে পাব, যে রূপ মহাভারতের কবির একান্ত দৃষ্টিতে তাঁকে পরম ধৈর্যশীলা এবং ধর্মদৃষ্টি নারী হিসেবে প্রতিপন্ন করেছে শেষ পর্যন্ত, অথবা রবীন্দ্রনাথ যাঁর মুখে পাণ্ডব-ভাইদের উদ্দেশে 'পুত্রাধিক পুত্রগণ'— এমন একটা উদার সম্বোধন নিঃসারিত করেছেন, গান্ধারীর এই রূপ, এই উদার চারিত্রিক আভাস আমরা কিন্তু এখনও এই বনবাস-পর্ব পর্যন্ত পাইনি মহাভারতে। যে দ্রৌপদীর জন্য তিনি প্রথম প্রতিবাদ উচ্চারণ করেছিলেন এবং বংশধ্বংসের ভয়ে তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে দ্বিতীয় পাশাখেলা বন্ধ করার জন্য একান্তে অনুরোধ করেছিলেন, গান্ধারীর সেই রূপ কিন্তু প্রতিফলিত হয়নি তাঁর নিজস্ব ব্যবহারের মধ্যে। পাণ্ডবদের বনবাস-যাত্রাকালে ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনের মুখের ওপর তিনি দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করে মহাকবির জবানিতে বলতে পারেননি—

ভূলুণ্ঠিতা স্বর্ণলতা, হে বৎসে আমার,
হে আমার রাহুগ্রস্ত শশী, একবার
তোলো শির, বাক্য মোর কর অবধান।
যে তোমারে অবমানে তারি অপমান
জগতে রহিবে নিত্য— কলঙ্ক অক্ষয়।
তব অপমানরাশি বিশ্বজগন্ময়
ভাগ করে লইয়াছে সব কুলাঙ্গনা—
কাপুরুষের হস্তে সতীর লাঞ্ছনা।

ঠিক এমনটি হলেই যে গান্ধারীকে মানাত সেটা আমরা বুঝি, কিন্তু মহাভারত তো কাব্য নয়, এখানে মানুষের জটিল মানস-লোক রাজনীতি, ধর্মনীতি এবং জৈবিক সম্পর্কের বিচিত্র বিন্যাসে আরও জটিলতর হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় দ্যূতক্রীড়ার পূর্বে গান্ধারী যেভাবে তাঁর স্বামীর উদ্দেশে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তা যতখানি ধর্মবোধে তাড়িত হয়ে, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রখর বাস্তববোধের তাড়নায়। তিনি বুঝেছিলেন— রাজসভার মধ্যে যেভাবে পাণ্ডব-কুলবধূ দ্রৌপদীর সঙ্গে অশালীন আচরণ করেছে তাঁর পুত্রেরা, যেভাবে কপটতার জালে আবদ্ধ করে ভীম এবং অর্জুনের মতো ব্যক্তিত্বকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছিল, তার ফল হবেই। পরিশেষে তাঁদের সব ফিরিয়ে দেবার মতো একটা বিরাট ঠাট্টা করে পুনরায় দ্যূতক্রীড়ার মাধ্যমে রাজ্য থেকে তাঁদের বনে নির্বাসিত করার যে কী বিষময় ফল হতে পারে, তা গান্ধারী অনুধাবন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বামী সেটা বোঝেননি এবং তিনি বোঝাতেও পারেননি।

দেখতে দেখতে বারো বছর কেটে গেছে, গান্ধারী একটা কথাও কাউকে বলেননি। অজ্ঞাতবাসের কালে তাঁর ছেলেরা বিস্তর খোঁজাখুঁজি করেছে পাণ্ডবদের, কোনও হদিশ মেলেনি। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, তেরো বছর ধরে ধৃতরাষ্ট্র যেমন নির্বিকার থাকলেন, গান্ধারীও কিন্তু ততটাই নির্বিকার। একটা কথাও তিনি বলেননি। তেরো বৎসরের শেষে বিরাট-রাজার ঘরেই পাণ্ডবদের সভা বসল ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করার জন্য। ধৃতরাষ্ট্র নিজে থেকে কিছুই বলছেন না, তিনি খুব ভালই জানেন যে, পাণ্ডবরা বিরাট রাজ্যেই অজ্ঞাতবাসের কাল কাটিয়েছেন— বিরাট রাজার গোধন হরণ করতে গিয়েই সমগ্র কৌরবপক্ষ তা বুঝে এসেছে। আর ধৃতরাষ্ট্র এখন যতই নিশ্চুপে থাকুন, যাঁকে তিনি বয়সের এবং সম্পর্কের গৌরবে পাশা খেলতে বাধ্য করেছিলেন, সেই যুধিষ্ঠির যতই ভোলেভালা নির্বিবাদী মানুষ হোন না কেন, তিনি কিন্তু বনে যাবার সময়েও ঠান্ডা মাথায় ধৃতরাষ্ট্র-সমেত সমস্ত কুরুবৃদ্ধদের বলে গিয়েছিলেন— সকলের কাছে বিদায় চাইছি, ফিরে এসে আবার দেখা হবে— সর্বান্ আমন্ত্র্য গচ্ছামি দ্রষ্টাস্মি পুনরেত্য বঃ। অথচ ধৃতরাষ্ট্র এখন একটি কথাও বলছেন না। চুপ করে বসে আছেন, যেন কোনও কিছুই হয়নি।

উপপ্লব্য-নগরীতে সভা শেষ করার পর সকলের মতামত নিয়ে যুধিষ্ঠিরই শেষ পর্যন্ত দূত পাঠালেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। দূত হিসেবে এলেন দ্রুপদ রাজার পুরোহিত, তাঁর কথাবার্তা কিছু কর্কশ, মনেও খুব রস-কষ নেই। হয়তো জেনে-বুঝেই এমন লোককে পাঠিয়ে ছিলেন পাণ্ডবরা। ব্রাহ্মণ-দূত ধৃতরাষ্ট্র-ভীষ্ম ইত্যাদি সভাসদদের সামনে দাঁড়িয়ে বেশ কড়া করেই পাণ্ডবদের বক্তব্য নিবেদন করলেন। এতে অবশ্য দুর্যোধন-কর্ণদের এতটুকুও হেলদোল হল না, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র অনেক বেশি বুদ্ধিমান লোক, তিনি সকলের সামনেই কর্ণকে বেশ একটু বকাবকি করে বললেন— আমি সঞ্জয়কে দূত করে পাঠাচ্ছি পাণ্ডবদের কাছে। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখ দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে অনেক শান্তির কথা শোনালেন বটে, কিন্তু একবারের তরেও তিনি রাজ্য ফিরিয়ে দেবার কথা বললেন না। ধৃতরাষ্ট্রের এই দ্বিচারিতা যুধিষ্ঠিরের মতো সরল লোকও ধরে ফেলেছেন। ফলে প্রচুর শান্তিকামনা করার পরেও তাঁর শেষ বাক্য ছিল— আমাদের ইন্দ্রপ্রস্থ আমাদের ফিরিয়ে দিন, নয়তো যুদ্ধ হোক।

পাণ্ডবদের তপ্ত মনের সংবাদ বহন করে সঞ্জয় ফিরে এসেছেন হস্তিনাপুরে। কয়েক দিন ধরে যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ এবং অন্যান্য পাণ্ডব ভাইদের সঙ্গে সঞ্জয়ের চাপান-উতোর চলেছে; দূত হিসেবে ধৃতরাষ্ট্রের দ্বিচারিতা যথাসম্ভব গোপনে রেখে বাগজাল বিস্তার করতে হচ্ছিল বলেই তিনি একেবারে ক্লান্ত হয়ে গেছেন। তারপর সারাদিন রথে আসার পরিশ্রম; অতএব সন্ধ্যাবেলায় সঞ্জয় এসে পৌঁছলে ধৃতরাষ্ট্র যতই পাণ্ডব-শিবিরের খবর শোনার জন্য উৎসুক হয়ে থাকুন, সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে খানিকটা তিরস্কার না করে যেতে পারলেন না। আর সম্পূর্ণ সংবাদ তিনি একা ধৃতরাষ্ট্রের সামনে বলতেও চাইলেন না। বললেন— যা বলার কাল সকলের সামনে সভায় বলব— প্রাতঃ শ্রোতারঃ কুরবঃ সভায়াম্/ অজাতশত্রোর্বচনং সমেতাঃ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঞ্জয়ের এই কথায় ধৃতরাষ্ট্রের ছটফটানি আরও বেড়ে গেল। তিনি নিজে তো ভালভাবেই জানেন— এতদিন তিনি কী করেছেন এবং এখনও তিনি রাজ্য ফিরিয়ে দেবার কথা একবারও বলছেন না। অতএব সেই রাত্রে পাণ্ডবদের ভয়ে তাঁর হৃদয় উত্তাল হয়ে উঠল। তিনি বিদুরকে ডাকিয়ে নানান নীতিকথা শুনলেন, অশান্ত হৃদয় শান্ত করার জন্য শুনলেন সনৎ-সুজাতের সংবাদ। সারা রাত ধৃতরাষ্ট্র ঘুমোতে পারলেন না। পরের দিন কুরুসভায় সমবেত কুরুপ্রধানদের সামনে সঞ্জয় যথোচিত কুশলতায় পাণ্ডবদের প্রাথমিক সৌজন্য এবং রাজ্য ফিরিয়ে না দিলে তাঁদের আস্ফালন-হুংকার শব্দ ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করলেন। ধৃতরাষ্ট্রের মনে ভয় তীব্র থেকে তীব্রতর হল। ভীষ্মের মতো মানুষ বারবার রাজ্য ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ জানালেন ধৃতরাষ্ট্রকে। কিন্তু তিনি এতটাই ধুরন্ধর চতুরতার মানুষ যে, সামনাসামনি ভীম-অর্জুনের ভয়ে ত্রস্ত হয়ে উঠলেও দুর্যোধন-কর্ণদের কথায় আবারও মনে-মনে পাণ্ডবদের হারিয়ে দেবার কথাও ভাবছেন।

সভায় কথা-চালাচালি কম হল না, আমরাও সে-বিস্তারে প্রবেশ করব না, কিন্তু এই প্রশ্ন তো উঠবেই যে, গান্ধারীর জীবন-চর্যা করতে গিয়ে আমরা ধৃতরাষ্ট্রের কথা বলছি কেন! উত্তর একটাই— গান্ধারীর সমস্ত জীবনের ওপর তাঁর এই অন্ধ স্বামীর ছায়া এত দীর্ঘাকার যে, এখনও পর্যন্ত তাঁকে সেই ছায়ায় অপাবৃত দেখছি। কিন্তু এই তেরোটা বছর চলে গেল এবং ধৃতরাষ্ট্র একবারও রাজ্য ফিরিয়ে দেবার কথা বলছেন না, অথচ এই অন্ধ-বৃদ্ধ নিরন্তর ত্রস্ত হয়ে আছেন ভীম-অর্জুনের ভয়ে— গান্ধারী কিন্তু এবার বুঝতে পারছেন যে, তাঁর স্বামী ভুল পথে চলছেন এবং যে পুত্রের জন্য তাঁর এত প্রয়াস, সেই পুত্রের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠবে এবার। দ্বিতীয়বার দ্যূতক্রীড়ার পূর্বে গান্ধারী যেভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে, স্বামী তা মেনে না নিলেও সেই প্রতিবাদের ভাষা একেবারে মৌখিকতামাত্র ছিল না। বিশেষত ধৃতরাষ্ট্র যেভাবে কপালের দোষ দিয়ে পুত্র-প্রেরিত স্বাত্মাভিলাষ পূরণ করে নিলেন, গান্ধারী সেটা বেশ বুঝে ফেলেছিলেন। অতএব এই তেরো বছর ধরে তিনি সেই অনিবার্য ধ্বংস দেখার অপেক্ষাতেই বসে আছেন। আর সঞ্জয়ের কথা শুনে একবার পাণ্ডবদের ওপর সহানুভূতি প্রকাশ করেই দুর্যোধন-কর্ণের কথায় আবার যেভাবে ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধজয়ের স্বপ্ন দেখছেন, স্বামীর এই বিভ্রান্তি গান্ধারীর কাছে এখন লোভ এবং তৃষ্ণার জাগ্রত ফল বলেই মনে হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, দুর্যোধনকে যতই তিনি সোচ্চারে তাড়িয়ে দেবার কথা বলুন, সেটা তিনি ধৃতরাষ্ট্রকেই বলছেন, যিনি কিছুতেই পুত্রের সংস্রব ত্যাগ করবেন না এবং সেই সংস্রব গান্ধারীই বা কোন অপত্য স্নেহের সংজ্ঞায় ত্যাগ করবেন। তিনি কিন্তু নিজে দুর্যোধনকে একটা কথাও বলেননি এখনও। অথচ এখন তাঁর সুস্থিত হৃদয়ে এই বোধ জাগ্রত হচ্ছে যে, দুর্যোধনের বিপদ ঘনিয়ে আসছে ধীরে ধীরে; ধৃতরাষ্ট্র যেভাবে দুর্যোধনের দ্বারা চালিত হচ্ছেন এবং ভ্রষ্টবুদ্ধিতে তিনিও যেভাবে চালনা করছেন দুর্যোধনকে, তাতে আর কোনও আশা আছে বলে মনে হচ্ছে না তাঁর।

এ বড় অদ্ভুত জটিলতা— অন্ধ স্বামীর চতুরতা, দ্বিচারিতা জেনেও তাঁর স্বাত্মারোপিত বঞ্চনার বোধ থেকে কীভাবে মুক্ত করতে পারেন গান্ধারী, কতটা মায়া, কতটা করুণা স্ত্রীর দিক থেকে আশা করবেন ধৃতরাষ্ট্র, যিনি এখনও রাজ্যলোভে সম্মোহিত হয়ে পুত্রকে মৃত্যুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথে নিয়ে যাচ্ছেন। গান্ধারীর মনে এখন অদ্ভুত এক ঔদাসীন্য সৃষ্টি হচ্ছে, অনিবার্য ধ্বংসকে আর কোনওভাবে রোধ করতে পারবেন না বুঝেই তিনি নিজের সত্যে এখন সুস্থিত হতে চাইছেন, ধৃতরাষ্ট্রের নিজস্ব সত্যবোধ আস্তে আস্তে মূল্যহীন হয়ে উঠছে তাঁর কাছে। সত্যি বলতে কি, তাঁর অন্তরের এই পরিবর্তন বাইরের মানুষেরাও বুঝতে পারে এখন। ওই যে সঞ্জয়কে নিয়ে সভা বসল, সমবেত কুরুপ্রধানেরা পাণ্ডবদের পক্ষে সওয়াল করলেন কত, ধৃতরাষ্ট্র ভীত হলেন, ত্রস্ত হলেন, তবু দুর্যোধন-কর্ণের কথায় পুনরায় মনে মনে উত্তপ্ত হয়ে যুধিষ্ঠিরের সৈন্যবল গণনা করছেন নিজের ক্ষমতা বুঝে নেবার জন্য। সভা তখন শেষ হয়ে গেছে, সমস্ত সভাসদ কুরুপ্রধানেরা ভীম, অর্জুনের ধ্বংস-শপথ শুনেছেন। কুমার দুর্যোধন সঞ্জয়ের এসব খবর পছন্দ করেননি। তবু সভায় বসে সব শুনতে হয়েছে সকলকেই। আস্তে আস্তে সকলেই চলে গেছেন নিজের নিজের বুদ্ধি-কল্পনায় শান দেবার জন্য।

সঞ্জয় যেহেতু সব দেখে এসেছেন, বিশেষত যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যাঁরা আছেন, তাঁদের সকলের ক্ষমতা যাচাই করার সুযোগটা তিনিই যেহেতু সবচেয়ে ভাল করে পেয়েছেন, অতএব সকলেই সভা ছেড়ে বাড়ি ফিরে যাবার পর ধৃতরাষ্ট্র নির্জনে সঞ্জয়কে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলেন— রহিতে সঞ্জয়ং রাজা পরিপ্রষ্টুং প্রচক্রমে। ধৃতরাষ্ট্র বললেন— তুমি তো সব দেখে এসেছ সঞ্জয়! আর আমরাও সৈন্যসামন্ত যা জোগাড় করেছি তা তুমি ভালমতই জানো। এবার তুমি আমাকে সার সত্য কথাটা বলো তো— গাবল্‌গণে ব্রুহি নঃ সারফল্গু— তুমি পাণ্ডবদের সব ব্যাপারটা দেখে এলে, এখন বলো তো— ওদের শক্তিই বেশি নাকি আমাদের শক্তি বেশি— কিমেষাং জ্যায়ঃ কিম্নু তেষাং গরীয়ঃ।

বহু সাহচর্যের ফলে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে খুব ভাল করে চেনেন। তিনি জানেন যে, এই চতুর অন্ধ বৃদ্ধ সকলের সামনে এক রকম বলেন, আর নির্জনে আর একরকম ভাবেন। এমনকী নির্জনে যা বলেন, পরে তা পরিবর্তনও করেন। অতএব নির্জনে সঞ্জয়ের পেট থেকে কথা বার করে নেবার এই যে পদ্ধতি, সেটা সঞ্জয় মোটে পছন্দ করলেন না। এবং এক মুহূর্তেই একক ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি তাঁর অবিশ্বাসটাও প্রকাশ করে ফেললেন। সঞ্জয় বললেন— আপনাকে একা-একা আমি কিছুই বলব না, মহারাজ! ঈর্ষা-অসূয়া-পরশ্রীকাতরতা পদে পদে আপনাকে ব্যতিব্যস্ত করে— ন ত্বাং ব্রূয়াং রহিতে জাতু কিঞ্চিদ্/ অসূয়া হি ত্বাং প্রবিশেত রাজন্। এর পরেই সেই বিশাল প্রত্যয়ের কথাটা বললেন সঞ্জয়। তিনি বললেন— আমি আপনার একার সামনে কিছুতেই কিছু বলব না। আপনি আপনার পিতা মহামতি ব্যাসদেবকে ডাকুন, ডাকুন আপনার স্ত্রী দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারীকে, তাঁদের সামনে আমি খুলে বলব সব কথা— আনয়স্ব পিতরং মহাব্রতং/ গান্ধারীঞ্চ মহিষীমাজমীঢ়।

এটা মনে রাখা দরকার যে, সঞ্জয় শুধু দূতমাত্র নন, তিনি ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য। সবদিকে সঞ্জয়ের দৃষ্টি প্রসারিত বলেই যেমন তাঁকে দূত করে পাঠানো হয়েছিল, তেমনই রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অন্যায়কে তিনি অন্যায় বলতে ভয় পান না। নিজস্ব অভিজ্ঞতায় সঞ্জয় দেখেছেন যে, ধৃতরাষ্ট্র কারও ভাল কথা শোনেন না, নিজেও বড় অস্থিরমতি, তদুপরি পুত্রস্নেহে অন্ধ। কিন্তু শত অন্ধতা সত্ত্বেও গান্ধারী যখন কৌরব কুলবধূদের সঙ্গে দ্রৌপদীর অপমানের সময় তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ করেছিলেন, তখন সে-কথা তিনি ফেলে দিতে পারেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় দ্যূতক্রীড়ার পূর্বে ধৃতরাষ্ট্র অবশ্য গান্ধারীর অনুরোধ-প্রতিবেদন শোনেননি, কিন্তু সেদিনের পর থেকে গান্ধারীর শান্ত হৃদয়ের প্রতিবাদ তিনি উপলব্ধি করছেন। এই সঞ্জয়কেই তিনি বলেছিলেন যে, গান্ধারী কিছুতেই দ্রৌপদীর অপমানের কথা ভুলতে পারছেন না, তিনি ভীষণ প্রতিবাদ করেছিলেন। হয়তো এই তেরো বছর যে এ-বিষয়ে গান্ধারী একটাও কথা বলেননি ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে, তার কারণও হয়তো এই মৌন প্রতিবাদ। স্বামীকে আর তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। তিনি বুঝতে পারছেন যে তাঁর দুর্মতি পুত্র দুর্যোধন বেড়ে উঠেছে তাঁর স্বামীর কারণেই। সর্বদর্শী সঞ্জয়ও গান্ধারীর এই উপলব্ধির কথা বুঝতে পেরে গেছেন এবং এটাও তিনি বুঝেছেন যে, ধৃতরাষ্ট্র তাঁর মহিষীর এই সত্যদৃষ্টিকেও ভয় পাচ্ছেন। অন্তত তাঁর সামনে যে ধৃতরাষ্ট্রের চতুরালি চলবে না, সে-কথা সঞ্জয় বুঝে গেছেন বলেই ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি বললেন— আপনার পিতা এবং স্ত্রীকে আগে ডেকে আনুন এখানে, তারপর সব খুলে বলব। কেন এই দুইজনকে ডাকছেন সঞ্জয়? লক্ষণীয় মহামতি বেদব্যাস এবং গান্ধারী— এই দু'জনের নাম এখানে এক নিশ্বাসে উচ্চারিত। তার মানে, এঁরা দু'জনেই এক ধরনের কাজ করতে পারেন এবং একই রকম সত্যবোধ তাঁদের আছে। সঞ্জয় বলেছেন— ব্যাস এবং গান্ধারীই আপনার অন্তর্জাত অসূয়া এবং পরশ্রীকাতরতা প্রশমন করতে পারেন, কেননা তাঁরা ধর্ম জানেন এবং এই পরিস্থিতিতে সঠিক কী করা উচিত, তাও তাঁরা জানেন— তৌ তেঽসূয়াং বিনয়েতাং নরেন্দ্র/ ধর্মজ্ঞৌ তৌ নিপুণৌ নিশ্চয়জ্ঞৌ। আমি তাঁদের সাক্ষাতেই শুধু অর্জুন আর কৃষ্ণের বক্তব্য আপনাকে জানাতে পারি।

নাচার এবং ভীত-কৌতূহলী ধৃতরাষ্ট্রের কথায় বিদুর ডেকে আনলেন পিতা ব্যাস এবং গান্ধারীকে। সঞ্জয় কথা আরম্ভ করলেন তাঁদের সামনে। সঞ্জয় আর কোনও বিস্তারে গেলেন না, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন কারও আস্ফালন তিনি আর পুনরুক্তি করলেন না, শুধু কৃষ্ণের কথা বললেন। তাঁর কথার মধ্যে অলৌকিকতার গন্ধ মাখানো ছিল। আসলে কৃষ্ণকে সর্বাধিক চূড়ান্ত স্থানে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই হয়তো এই অলৌকিকতার আশ্রয় নিতে হয়েছে সঞ্জয়কে এবং স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্রও কৃষ্ণের এই অলৌকিক মাহাত্ম্য মেনে নিচ্ছেন। হয়তো কৃষ্ণের যে অসাধারণ বুদ্ধি এবং তার সঙ্গে যে চরম ন্যায়বোধ— এই ব্যাপারটাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রকাশ করার জন্যই সঞ্জয়ের মুখে অলৌকিকতার অবতারণা এবং তাতে ধৃতরাষ্ট্রও সাময়িকভাবে চিন্তান্বিত হয়ে দুর্যোধনকে বললেন— ওরে বাছা! ওই কৃষ্ণের শরণ নে, সঞ্জয় আমাদের একালের বিশ্বাসী লোক, ও যা বলছে শোন, কৃষ্ণকে মেনে নে বাছা— আপ্তো নঃ সঞ্জয়স্তাত শরণম্।

দুর্যোধন তাঁর স্বাভাবিক অহংকারে পিতার কথা উড়িয়ে দিতেই ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর দিকে তাকিয়ে বললেন— তোমার ছেলে একেবারে নীচে নেমে গেছে, গান্ধারী! একেবারে নীচে নেমে গেছে— অর্বাগ্ গান্ধারী পুত্রস্তে গচ্ছত্যেষ সুদুর্মতিঃ। ঈর্ষায়, অহংকারে এতই সে ফুলে উঠেছে যে, বড়দের কথা শোনারই প্রয়োজন বোধ করে না। আমরা জানি— এ সেই চিরকালীন পিতাদের চিরন্তন দোষারোপ। ছেলে খারাপ ব্যবহার করলে বা কথা না শুনলেই পিতা কিংবা মাতা পরস্পরে অপর জনকে বলেন— তোমার ছেলে। তোমার ছেলে এই এই অসভ্যতা করছে। গান্ধারী তাঁর স্বামীর কথার কী উত্তর দেবেন। এতকাল

ধৃতরাষ্ট্র ছেলেকে প্রশ্রয় দিয়ে ছেলের সমস্ত বায়না পূরণ করার চেষ্টা করেছেন। আর আজ তিনি বলছেন— গান্ধারী! তোমার ছেলে এত নীচে নেমেছে। গান্ধারী কী উত্তর দেবেন এ-কথার। তবু স্বামীর প্রতি এখনও সেই মায়া আছে তাঁর, এখনও পর্যন্ত তিনি স্বামীর ওপর ক্রোধটুকু ছেলের ওপরেই প্রকাশ করেন। আজকে গান্ধারীকে সভায় ডেকে আনা হয়েছে মহর্ষি ব্যাসের সঙ্গে। এতদিন যদিও তিনি সোজাসুজি দুর্যোধনের দোষগুলি প্রকটভাবে উচ্চারণ করেননি এবং প্রকটভাবে তিনি কোনওদিন দুর্যোধনকে তিরস্কারও করেননি, কিন্তু আজ শ্বশুর-মহর্ষির সামনে স্বামীর সম্মান রেখেই গান্ধারী দুর্যোধনকে বললেন— এত তোর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, এত তোর লোভ, তুই সমস্ত শাসনের বাইরে চলে গেছিস, বড়দের কথা শোনার এতটুকু প্রয়োজন বোধ করছিস না— ঐশ্বর্যকাম দুষ্টাত্মন্ বৃদ্ধানাং শাসনাতিগ। আজ তুই এতটাই বেড়ে উঠেছিস যে এরপর তোর আকাঙ্ক্ষিত ঐশ্বর্যও পাবি না, জীবনটাও যাবে। তখন জীবন-ধন খুইয়ে, বাবা-মা সব ছেড়ে এমন একটা জায়গায় এসে তুই দাঁড়াবি, যে তাতে শত্রুদেরই ফুর্তি বাড়বে। আমার কথা, তোর বাবার কথা, এখন তোর কিছুই পছন্দ হবে না, এরপর যখন ভীমের হাতে তোর মরণ ঘনিয়ে আসবে, সেদিন এই বুড়ো বাপের কথা তোর মনে পড়বে— নিহতো ভীমসেনেন স্মর্তাসি বচনং পিতুঃ।

লক্ষণীয়, জননী গান্ধারীও এখন উদ্যত-উদ্ধত ভীমসেনের ভয় পাচ্ছেন এবং আমরা মনে করি— তাঁর এই ভয়ও সঞ্চারিত হয়েছে তাঁর স্বামীর হৃদয় থেকে। সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করে আসার পর ধৃতরাষ্ট্রই তাঁর কাছে নিজের দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে বলেছিলেন— রেগে যাওয়া বাঘ দেখলে হরিণ যেমন ভয় পায়, আমিও তেমনি ক্রুদ্ধ-ক্ষুব্ধ ভীমসেনকে ভয় পাই— ভীমসেনাদ্ধি মে ভূয়ো ভয়ং সংজায়তে মহৎ। এই যে ধৃতরাষ্ট্রের মনোজাত ভয়, এই ভয়ই সংক্রমিত হয়েছে গান্ধারীর হৃদয়ে, তিনিও এখন দুর্যোধনকে ভীমের ভয় দেখাচ্ছেন ধৃতরাষ্ট্রের অনুবাদে। তবু বলতে হবে— গান্ধারীর মনের মধ্যে বিরাট একটা পরিবর্তন আসছে। সেই সভাপর্বে দ্রৌপদীর অপমানের পরে এবং দ্বিতীয় দ্যূতক্রীড়ার পরে তিনি যে প্রতিবাদ করেছিলেন, সেদিন থেকেই তিনি বুঝি এটা বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন যে, তিনি আর মনে মনে তাঁর স্বামী-পুত্রের পাশে নেই। হয়তো সেই কারণেই ধৃতরাষ্ট্র যখন শুভবুদ্ধিতে প্রণোদিত হচ্ছেন, তখন তিনি গান্ধারীকে ডেকে পাঠাচ্ছেন রাজসভায়— যেন তিনি পারবেন দুষ্ট পুত্রকে প্রশমিত করতে।

সত্যি কথা বলতে কি, বিপন্ন অবস্থায় গান্ধারীকে এইভাবে ডেকে পাঠানোর ব্যাপারটাও ধৃতরাষ্ট্র-চরিত্রের নিরিখে অভিসন্ধিমূলক মনে হয়। অতি অদ্ভুত তাঁর দ্বিচারিতা— তিনি রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন না, পুত্রের লোভে কণ্ডূয়ন করবেন, অথচ শান্তি চাইছেন মুখে। এই অবস্থায় শেষ চেষ্টা করার জন্য শান্তির প্রস্তাব নিয়ে কুরুসভায় উপস্থিত হয়েছেন কৃষ্ণ। তাঁকে নিয়ে কুরুসভায় দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে প্রচুর খাইয়ে-দাইয়ে, উপহার দিয়ে, স্বপক্ষে নিয়ে আসার কথা ভাবছেন, দুর্যোধন তাঁকে বন্দি করবেন বলে ভাবছেন, ভীষ্ম পিতামহ এঁদের ভাবনা-চিন্তা দেখে গালাগালি দিচ্ছেন, বিদুর সকলের চাতুরী ধরে ফেলে সমালোচনা করছেন এবং এত রকম উত্তেজনার মধ্যে কৃষ্ণ এসেছেন হস্তিনাপুরে। কিন্তু এত ঘটনার মধ্যেও যেটা উজ্জ্বলভাবে চোখে পড়ে, সেটা হল— পাণ্ডবজননী কুন্তী তো বিদুরের গৃহেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে এক বিদুর ছাড়া কারুরই কিন্তু যোগাযোগ নেই এখন পর্যন্ত। ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধনের কথা বাদই দিলাম, কিন্তু যে গান্ধারী এখন সম্পূর্ণ ন্যায়-অন্যায় বুঝতে পারছেন, তিনিও কিন্তু একবারও এই পুত্রবিরহিতা জননীর সঙ্গে কথা বলছেন না। এতকালেও কিন্তু এই অপরিবর্তিত ব্যবহার আমাদের বিভ্রান্ত করে। কৃষ্ণ যখন কুরুসভায় সকলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকার করে কুন্তীর কাছে এসেছিলেন, তখন কুন্তী তাঁকে অনেক কথার মধ্যে তাঁর অসহায় জীবনধারণের দুঃখটুকুও প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন— যে নারী পরের ঘরে থেকে জীবনধারণ করে, তাকে ধিক্কার দিই আমি। জীবিকার জন্য যেখানে পরের দয়ার ওপর নির্ভর করতে হয়, অনুনয় করতে হয় তেমন জীবিকা না থাকাই ভাল— বৃত্তেঃ কার্পণ্যলব্ধায়াঃ অপ্রতিষ্ঠৈব জ্যায়সী। আমরা জানি— বিদুরের সম্মান-ব্যবহারে কুন্তী এতটুকুও অসুখী ছিলেন না, কিন্তু এতকাল তিনি এইখানে পড়ে থাকলেন, অথচ নিজের জা গান্ধারীর কাছে যে মহাকাব্যিক উদারতা কুন্তীর প্রাপ্য ছিল, তা এতটুকুও পাননি বলেই এখনও কুন্তী আশ্রয়দাতা বিদুরের ঘরে অসহায় বোধ করেন। একটা সময়ে গান্ধারী ন্যায় এবং ধর্মের পক্ষে দাঁড়িয়ে পুত্রের প্রতিপক্ষতা করবেন, অথচ আজও তিনি তেমন স্বতন্ত্রা নন, তাঁর সেই উদার মহিমা এখনও তেমন স্বপ্রকাশ নয়। গান্ধারী এখনও ধৃতরাষ্ট্রকে অতিক্রম করতে পারেন না।

কুরুসভায় কৃষ্ণের দুতিয়ালি বিফল হল, কৃষ্ণের তর্কযুক্তি, শান্তিকামনার সারবত্তা মেনে নিয়ে ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র সকলেই দুর্যোধনকে পথে আনবার চেষ্টা করলেন প্রায় একই ধরনের কথা বলে। একমাত্র বিদুর, শুধু বিদুর দুর্যোধনের অবিমৃশ্যকারিতায় ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন— আমি তোমার জন্য এতটুকু দুঃখ পাই না, দুর্যোধন! তোমার যা হবার তা তো হবে। কিন্তু দুঃখ পাই তোমার মা গান্ধারী এবং বৃদ্ধ পিতা ধৃতরাষ্ট্রের জন্য— ইমৌ তু বৃদ্ধৌ শোচামি গান্ধারীং পিতরঞ্চ তাম্। বিদুর মনে করেন— দুর্যোধনের মতো রাজ্যলোভীর হাতে রাজ্যশাসনের ভার দেওয়ায় অপক্ক মানুষের হাতে রাজ্যের সুরক্ষা তুলে দিয়েছেন ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীও সেখানে নিরুচ্চার সাক্ষী। বিদুর বলেছেন— তোমার মতো মানুষ যেখানে রক্ষকের ভূমিকায় আছে, সেখানে তোমার পিতামাতা, মন্ত্রী-অমাত্য, স্বজন-বান্ধব হারিয়ে একদিন ডানাকাটা পাখির মতো ঘুরে বেড়াবেন। বিদুর তাঁর ক্ষোভ চেপে রাখলেন না, গান্ধারী এবং ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশে তিনি শেষ তিরস্কারে বললেন— যে পিতামাতা এইরকম কুলবিধ্বংসী পাপিষ্ঠ ছেলের জন্ম দিয়েও তার প্রশমনের ব্যবস্থা না করেন, তাঁদের একদিন ঘুরে বেড়াতে হবে ভিক্ষুকের সাজে ভিখারির মতো কষ্ট পেতে পেতে— ভিক্ষুকৌ বিচরিষ্যেতে শোচন্তৌ পৃথিবীমিমাম্।

বস্তুত বিদুরই বার বার ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীকে পুত্রত্যাগ করার কথা বলেছেন। বারবার বলেছেন— এই একটা ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করলে তিনি নিরানব্বুইটি ছেলে নিয়ে সুস্থ থাকতে পারবেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র কোনওদিন সে-কথা শোনেননি, গান্ধারীও মাতৃস্নেহে শুধু রাগের সময়েই ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন— বিদুর ঠিক কথাই বলেছেন, এই পুত্রকে তোমার ত্যাগ করাই উচিত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এমন কোনও উদ্যোগ যেমন ধৃতরাষ্ট্র দেখাননি, তেমনি ক্ষোভ প্রকাশের সময় ছাড়া গান্ধারীও তেমন কোনও উদ্যোগ দেখাননি। আর

আজ কী হল, কুরুসভায় শতেক আলোচনা, শান্তির প্রস্তাব নিয়ে দুই পক্ষের চাপান-উতোর, ভীষ্ম-দ্রোণের উপদেশ, দুর্যোধন-কর্ণদের কাছে হিত বোঝানোর চেষ্টা— সব যখন ব্যর্থ হয়ে গেল, তখন কৃষ্ণ কিন্তু শেষ কথা যেটা বললেন, সেটা কিন্তু বিদুরেরই কথার পুনরুক্তি। কৃষ্ণ বললেন— আপনারা সমবেত কুরুপ্রধানেরা কর্তব্য কাজটা কিন্তু করছেন না— সর্বেষাং কুরুবৃদ্ধানাং মহানয়ম্ অতিক্রমঃ। আপনারা একটা মূর্খকে রাজশাসনের মূল কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, অথচ তাঁকে নিয়ন্ত্রণে রাখার এতটুকু চেষ্টাও করেননি। রাজ-ঐশ্বর্য পেলে যাদের মাথা খারাপ হয়ে যায় তেমন মানুষদের নিয়ন্ত্রিত করাটা আপনাদের কর্তব্য ছিল— প্রসহ্য মন্দম্ ঐশ্বর্যে ন নিযচ্ছন্তি যন্নৃপম্। আপনারা আমাদের দিকেই তাকিয়ে দেখুন। মথুরাধিপতি কংস পিতা উগ্রসেনকে বন্দি করে রাজ্য দখল করেছিল। এই অবস্থায় বৃষ্ণি-অন্ধকদের সঙ্ঘমুখ্য কুলপতিরা সকলে তাঁর সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করেন। এই সময়েই কিন্তু নির্বান্ধব কংসকে আমরা মেরে মথুরার সিংহাসন মুক্ত করেছি। এখানেও ঠিক একই কথা বলতে চাই অন্যভাবে— আমি ধৃতরাষ্ট্রকেই বলছি— আপনারা দুর্যোধন-দুঃশাসন এবং কর্ণ-শকুনিকে বন্ধন করে পাণ্ডবদের হাতে দিয়ে দিন। আর যদি এতটা নাও করতে চান, তা হলে শুধুমাত্র দুর্যোধনকে বন্দিশালায় নিক্ষেপ করে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করুন আপনি— রাজন্ দুর্যোধনং বধ্বা ততঃ সংশাম্য পাণ্ডবৈঃ। মনে রাখবেন, যেন আপনার জন্যই ক্ষত্রিয়রা সর্বনাশের মুখে না পড়ে।

এই কথার মধ্যে দুর্যোধনের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রকে দায়টুকুও পরিষ্কার করে দিয়েছেন কৃষ্ণ এবং তাঁর পরামর্শের অন্যতম পাথেয় ছিল বিদুরের নীতিবাক্য— বংশের সবাইকে বাঁচানোর জন্য একজনকে ত্যাগ করাও ভাল, একটা গ্রাম রক্ষার জন্য একটা বংশকেও ত্যাগ করা যায় আর একটা দেশ রক্ষার জন্য গ্রামটাকেও ত্যাগ করতে হয়— ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ। ঠিক একই কথা। বহুকাল আগে বিদুর ওই একই কথা বলেছিলেন। তা যতখানি সদ্যোজন্মা দুর্যোধনের কারণে বলেছিলেন, তার চেয়ে বেশি বলেছিলেন দুর্যোধনের বিষয়ে ধৃতরাষ্ট্রের উন্মত্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখে। আজ কৃষ্ণও একই কথা বললেন এবং দুর্যোধনের কথা ছাড়াও কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে চিহ্নিত করে বলেছেন— দেখবেন মহারাজ! আপনি ক্ষত্রিয়দের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ। আপনার জন্য যেন ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে ধ্বংসের পথে না যায়— ত্বৎকৃতে ন বিনশ্যেয়ুঃ ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ।

কৃষ্ণের এই শেষ সাবধান-বাণীর অর্থ কী ধৃতরাষ্ট্র তা বোঝেন। বাইরে তিনি যতই অন্ধ-সরল প্রকৃতির আবেশ দেখান, ধৃতরাষ্ট্র এবার বুঝতে পারছেন— তাঁর নিজের অবদমিত রাজ্যস্পৃহা এবং সেই কারণেই পুত্রের রাজ্যগৃধ্নুতায় তাঁর অপার প্রশ্রয়— সব এবার ধরা পড়ে গেছে। স্বয়ং যুধিষ্ঠির তাঁকে বিশ্বাস করছেন না, কৃষ্ণ তো করছেনই না। অথচ কৃষ্ণের মতো ভয়ংকর বুদ্ধিমান মানুষ প্রতিকূলে প্রতিপক্ষে থাকলে তাঁর যে ভয়ংকর বিপদ— এই ভয়ও ধৃতরাষ্ট্রকে সাময়িকভাবে চেপে বসল। কিন্তু তাই বলে এই অবস্থায় তিনি যে কৃষ্ণের কথামতো পুত্র দুর্যোধনকে বন্দিশালায় নিক্ষেপ করে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধিবিষয়ক কথা বলবেন— এমন মনোবল আর নেই তাঁর। অতএব শেষ চেষ্টা হিসেবে এবার গান্ধারীর ওপর তাঁর পরম নির্ভরতা— যে গান্ধারী স্বামীর দ্বিচারিতায় ছিন্ন-ভিন্ন, পুত্রের ঐশ্বর্যলোভে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিক্ত, বিরক্ত, লজ্জিত। অথচ স্বামীর প্রতি মায়ায় গান্ধারীর নিজের অন্তর্গত ধর্মবোধ বারবার খণ্ডিত হয়, পীড়িত হয়।

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বললেন— যাও বিদুর! গান্ধারীকে নিয়ে এসো এখানে, তিনি মহাপ্রাজ্ঞা। তাঁকে নিয়ে এসো এইখানে। আমি তাঁর সঙ্গে একত্রে অনুরোধ করব, যদি দুর্বুদ্ধি পুত্রের সুমতি হয় তাতে— আনয়েহ তয়া সার্ধমনুনেষ্যামি দুর্মতিম্। যদিও গান্ধারীর সঙ্গে নিজেকেও এখানে যুক্ত করেছেন ধৃতরাষ্ট্র, কিন্তু নিজের চেয়ে তিনি গান্ধারীর ওপরেই নির্ভর করছেন বেশি। কারণ তাঁর নিজের বলা শাসন যে পুত্রের আত্মবিশ্বাসে কিছুক্ষণ পরেই পরিবর্তিত হয়ে যায়, সে-কথা বুঝি নিজেও বোঝেন ধৃতরাষ্ট্র। কৃষ্ণের বক্তব্যে এখন তিনি এতটাই ভীত যে, এখন তিনি বলছেন— গান্ধারীও যদি পুত্র দুর্যোধনকে শেষ পর্যন্ত সংযত করতে না পারেন, তবে কৃষ্ণ যেমন বলেছেন, তেমনই আমরা করব— যদি সা ন দুরাত্মানং শময়েদ্ দুষ্টচেতসম্। তবে আমার বিশ্বাস আমি যা পারিনি, গান্ধারী তা পারবেন। লুব্ধ, দুর্বুদ্ধি এবং দুর্জনের সহায়তায় সে যতই বেড়ে উঠুক গান্ধারী যদি যুদ্ধশান্তির জন্য তাকে উপদেশ দেন, তবে সেটা সে ফেলতে পারবে না বলেই আমার মনে হয়— অপি লোভাভিভূতস্য পন্থানমুপদর্শয়েৎ। তবে আবার একটু সন্দেহও হয় মনে— দুর্যোধনের কারণে যে বিপদ আমাদের মাথায় এসে চেপে বসেছে, চিরকালের জন্য সেই বিপদ তিনি দূর করতে পারবেন কিনা— অপি নো ব্যসনং ঘোরং দুর্যোধনকৃতং মহৎ।

এখানে পর পর দুটি শ্লোকে 'অপি' শব্দের প্রয়োগ করেছেন মহাভারতের কবি। এই 'অপি' শব্দটা প্রশ্ন-অর্থে ব্যবহার হয়, সম্ভাবনা-অর্থে ব্যবহার হয় আবার সামান্য একটু সন্দেহ-অর্থেও ব্যবহার হয়। তবে কিনা প্রশ্নার্থেই এই ব্যবহার বেশি, আর প্রশ্ন মানেই তার মধ্যে সন্দেহটুকু থেকেই যায়। তার মানে, সিদ্ধান্তবাগীশ এই শব্দের মধ্যে যতই সম্ভাবনার অর্থ অনুবাদ করুন, আমাদের ধারণা, গান্ধারীকে ব্যবহার করাটা শেষ চেষ্টা হিসেবে ধৃতরাষ্ট্র ধরে নিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে এই সন্দেহ যথেষ্টই আছে যে, গান্ধারীও শেষ পর্যন্ত পারবেন কি তাঁর দুর্দম্য পুত্রকে শাসন করতে?

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে মহামতি বিদুর ডেকে আনলেন দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারীকে— পট্টবস্ত্রে চোখ বাঁধা থাকলেও সমস্ত ঘটনা, ঘটনার জের তিনি বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পান— আনয়ামাস গান্ধারীং বিদুরো দীর্ঘদর্শিনীম্। গান্ধারী নিশ্চয়ই খুব ভালভাবে জানেন যে, কুরুসভায় কৃষ্ণ এসেছেন, সেখানে শান্তির বিষয়ে কথা বলা হচ্ছে এবং হয়তো এও জানেন যে, তাঁর দুর্মতি পুত্র সবাইকে অমান্য করে সভা থেকে বেরিয়ে গেছে। গান্ধারী রাজসভায় উপস্থিত হয়েছেন— তখন কেউ নেই সেখানে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ সকলে সভা ছেড়ে চলে গেছেন, চলে গেছেন কৃষ্ণ তাঁর শেষ সাবধান-বাণী শুনিয়ে, আর চলে গেছেন দুর্যোধন-কর্ণেরা সকলে। সভায় একা বসে ধৃতরাষ্ট্র, আর তাঁর বিপদের পরামর্শদাতা বিদুর।

গান্ধারীকে দেখেই ধৃতরাষ্ট্র বললেন— এই যে গান্ধারী! তোমার ছেলের কথা বলছি, সে-বদমাশ সমস্ত শাসনের বাইরে চলে গেছে— এষ গান্ধারি পুত্রস্তে দুরাত্মা শাসনাতিগঃ। এত তার ঐশ্বর্যের লোভ যে সেই লোভে এবার ঐশ্বর্যও হারাবে, জীবনটাও হারাবে। তুমি কি জানো, এখানে একটা সভা চলছিল সেখানে মান্য-গণ্য মানুষেরা সব ছিলেন, ছিলেন

স্বয়ং কৃষ্ণ। তুমি ভালই বোঝ— এই সভার একটা মর্যাদা আছে, শিষ্টতা আছে, এখানে যা ইচ্ছে তাই করা যায় না; অথচ দুর্যোধন অশিষ্টের মতো কারও মর্যাদা না মেনে, কারও কথা না শুনে তার নিজের দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেল, এটা কোন দেশি সভ্যতা— সভায়া নির্গতো মূঢ়ো ব্যতিক্রম্য সুহৃদ্বচঃ।

পুত্রের সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্র বেশ কিছু অপশব্দ প্রয়োগ করলেন বটে, কিন্তু গান্ধারীর সামনে বলবার সময় সেই ধ্রুবপদটি— তোমার ছেলে— এষ গান্ধারি পুত্রস্তে— এই কথাটি বহুদিন শুনছেন গান্ধারী এবং সেটা তাঁর কানে বড় অসহ্য লাগে। সারা জীবন বিপুল প্রশ্রয়ে যিনি ছেলেকে লোভী এবং দুষ্ট তৈরি করলেন, তিনি এখন জননীকে বলছেন— তোমার ছেলে দুষ্ট। গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনেই বললেন— সেই রাজ্যকামুক লোভী ছেলেকে নিয়ে এসো এখানে, তুমি বলছ যখন, নিয়ে এসো— আনয়ানয় সুতং ক্ষিপ্রং রাজ্যকামুকম্-আতুরম্। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা, যে লোকটা অশিষ্ট, অবিনীত এবং ধর্ম তথা অর্থের পুরুষার্থ-প্রয়োজন যে জানে না, সে লোকটার তো রাজ্য পাবার অধিকারই নেই। তবুও দুর্যোধন সর্বতোভাবে বিনা বাধায় সেই রাজ্য লাভ করেছে— রাজ্যম্... আপ্তং তথাপীদম্ অবিনীতেন সর্বথা।

গান্ধারী এতকাল শুনেছেন, কিন্তু এভাবে-ওভাবে নীতি কথা বলেও স্বামী এবং রাজোপাধিযুক্ত ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি ন্যায়ের পথে আনতে পারেননি। অথচ তিনি আজ নীতিকথা বলছেন। বিশেষত, বিনয়-শিক্ষা তো রাজধর্মের মূল কথা। ইন্দ্রিয় দমনের শিক্ষা, নিজেকে সংযত রাখার শিক্ষা, ঐশ্বর্য লাভ করেও উৎফুল্ল না হবার শিক্ষা এবং বিপন্ন হলেও বিষণ্ণ না হবার শিক্ষা— এইসব কিছু বিনয়-শিক্ষার মধ্যে পড়ে এবং তা রাজা হবার প্রাথমিক শর্তের মধ্যে পড়ে। ধৃতরাষ্ট্র পিতা হয়েও নিজেই এই শিক্ষা সম্পূর্ণ পাননি এবং গান্ধারীর পক্ষে তা স্বামীকে বলাও সম্ভব নয় সোচ্চারে। কিন্তু পুত্রের বিনয়-শিক্ষার প্রশ্ন তুলে তিনি যেন ধৃতরাষ্ট্রকেই বলতে চাইলেন— তবু দুর্যোধন রাজা হল কী করে, কার প্রশ্রয়ে— ন হি রাজ্যমশিষ্টেন শক্যং ধর্মার্থলোপিনা।

সত্যিই তো, সেই যেদিন জতুগৃহের অগ্নিমুক্ত পাণ্ডবদের ঊষর খাণ্ডবপ্রস্থে পাঠিয়ে দিয়ে হস্তিনাপুরের পরম্পরাপ্রাপ্ত রাজ্যভার অযোগ্য দুর্যোধনের হাতে সঁপে দিয়েছিলেন ধৃতরাষ্ট্র, সেদিন তো এমন বলেননি— গান্ধারী তোমার ছেলে আজ রাজা হল। অথবা যেদিন শকুনির পাশাখেলার এক-একটি চালের পরে ধৃতরাষ্ট্র উন্মত্তের মতো বারবার জিজ্ঞাসা করছিলেন— জিতেছে কি? শকুনি জিতেছে— সেদিন তো তিনি গান্ধারীকে একবারও বলেননি— তোমার ছেলে পাশা খেলে অধর্ম করছে, দ্রৌপদীকে সভার মাঝখানে টেনে এনে অসভ্যতা করছে। ইত্যাদি কিছুই বলেননি ধৃতরাষ্ট্র। আর আজকে যখন যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছে তাঁর নিজেরই গোঁয়ার্তুমির ফলে, তখন তিনি গান্ধারীকে দুষছেন। আজকে গান্ধারী এসেছেন অন্যায়-দূষণের জবাব দিতে। গান্ধারী প্রথমেই প্রশ্ন তুলেছেন— যাকে তুমি অশিষ্ট, অবিনয়ী, অভদ্র বলছ, সে ছেলে রাজ্য পেল কী করে? এবারে একেবারে সোজাসুজি অধিক্ষেপ— নিন্দা করলে আগে তো তোমাকেই সবচেয়ে বেশি দোষ দিতে হয়, কেননা ছেলের ব্যাপারে এতটাই তোমার মুগ্ধতা যে, কোনওদিন তুমি তার দোষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে পাওনি, অতএব তোমার দোষটাই সবচেয়ে বেশি— ত্বং হ্যেবাত্র ভৃশং গর্হ্যো ধৃতরাষ্ট্র সুতপ্রিয়ঃ।

এতদিন পরে স্বামীকে এক কথায় ছেড়ে দিলেন না গান্ধারী। প্রধানত এই একটি অন্ধ মানুষের ওপর মায়াবশত এতদিন কত অন্যায় তিনি সয়েছেন, আর নয়। গান্ধারী স্বামীকে বললেন— এই ছেলের পাপ-প্রবণতার কথা তুমি সব জানতে। তার সমস্ত অন্যায় কাজে তুমি সবচেয়ে বড় সহায় ছিলে এবং সব জেনেশুনেই তুমি ছেলের বুদ্ধি অনুসারেই চলেছ— যো জানন্ পাপতামস্য তৎপ্রজ্ঞাম্ অনুবর্তসে। গান্ধারী বুঝিয়ে দিলেন যে, এতকাল ছেলের কথামতো কাজ করে আজকে এতদিন পরে তাকে দু-চারটে জ্ঞানমূলক বাণী শোনালেই সে ভাল পথে চলতে আরম্ভ করবে— এই ভাবনাটাই বৃথা। তিনি বললেন— দুর্যোধন আপাদমস্তক লোভী, তার মধ্যে আবার এই রাজ্যের লোভ তার কামনা আরও চতুর্গুণ বাড়িয়ে তুলেছে, আর এই কামনা সামান্য প্রতিহত হবার উপক্রম হলেই তার ক্রোধ বাড়িয়ে তুলছে। এই অবস্থায় যে পৌঁছে গেছে, এবং তুমিই তাকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছ, তাকে এখন জোর করে নিয়ন্ত্রণ করা, সংযত করা প্রায় অসম্ভব— অশক্যোঽয়ং ত্বয়া রাজন্ বিনিবর্তয়িতুং বলাৎ— এবং তোমার পক্ষে তো একেবারেই অসম্ভব। তুমি নিজে জানতে যে, তোমার ছেলে মূর্খ, মূঢ়, সংযমহীন। সে বদলোকের সঙ্গে মেশে এবং তাদের কথাতেই চলে। এমন ছেলের হাতে তুমি যখন রাজ্য তুলে দিয়েছিলে, তারই ফল তুমি ভোগ করছ ধৃতরাষ্ট্র— দুঃসহায়স্য লুব্ধস্য ধৃতরাষ্ট্রোঽশ্নুতে ফলম্।

একেবারে ব্যক্তিগত আলোচনা এবং দোষারোপের মধ্যেও হঠাৎ ঘনিয়ে ওঠা যুদ্ধোদ্যোগের ব্যাপারেও গান্ধারী কিছু রাজনৈতিক কথা বললেন। এতকাল রাজবাড়িতে আছেন, রাজমহিষীও বটে, রাজমাতাও বটে, অতএব রাজনীতি কিছু তিনি বোঝেন না, এমন তো নয়। গান্ধারী বললেন— একান্ত আত্মীয়দের সঙ্গে আমাদের বিভেদ উপস্থিত হয়েছে, অথচ রাজা হয়ে তুমি সেই ভেদ উপেক্ষা করেছ। আর আত্মীয়দের সঙ্গে বিভেদ উপস্থিত হলে, পূর্বে যারা শত্রু ছিল, তারা আমাদের বিভেদ বুঝে আক্রমণ করবে। আমি রাজনীতির দিক থেকে শুধু এইটুকুই বুঝি যে, আত্মীয়দের সঙ্গে যে আমাদের বিভেদ ঘটেছে— তা শুধু তাদের সঙ্গে কথা বলে আলোচনার মাধ্যমেই এই বিভেদ মিটিয়ে নেওয়া যেত। যদি আলোচনা ফলবতী নাও হত, তা হলে অন্তত শত্রুদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করেও তো তাদের সমস্ত পরিকল্পনা বিপর্যস্ত করে দেওয়া যেত। কিন্তু সাম-দান-ভেদ কোনও রাজনৈতিক উপায়ের মধ্যেই তোমরা গেলে না, অথচ রাজনীতির শেষ উপায় যুদ্ধ করবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছ আত্মীয়দের সঙ্গে— নিস্তর্তুমাপদঃ স্বেষু দণ্ডং কস্তত্র পাতয়েৎ।

গান্ধারী বলতে চাইলেন— আত্মীয় ভাইদের সঙ্গে আলোচনার পক্ষে না গিয়ে যুদ্ধ করবার এই প্ররোচনা কি শুধুমাত্র তাঁর ছেলের, না ছেলের বাবা ধৃতরাষ্ট্রের। ধৃতরাষ্ট্র অবশ্য এইসব সযৌক্তিক কথার কোনও প্রত্যুত্তর করেননি। ইতোমধ্যে বিদুর দুর্যোধনের কাছে মায়ের কথা বলে তাঁর প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ জানিয়ে কোনও মতে দুর্যোধনকে গান্ধারীর সামনে উপস্থিত করালেন— মাতুশ্চ বচনাৎ ক্ষত্তা সভাং প্রাবেশয়ৎ পুনঃ। পিতার প্রতি সম্মানেও নয়, বিদুরের প্রতি সম্মানেও নয়, এমনকী মায়ের প্রতিও যে খুব সম্মানবশত

তাও নয়, দুর্যোধন সভায় প্রবেশ করলেন শুধু এই কারণে যে, গান্ধারী কী বলেন— তাই শোনার জন্য— স মাতুর্বচনাকাঙ্ক্ষী প্রবিবেশ পুনঃ সভাম্। সত্যি কথা বলতে কি, গান্ধারী সচরাচর পুত্রের সঙ্গে বেশি কথা বলেন না, তাঁর অন্যায়-কর্মেও তিনি তেমন করে সহায় হননি কোনওদিন, ফলে ছেলের সঙ্গে তাঁর একটা সম্মানসূচক দূরত্ব আছে, এমন একটা ওজনও আছে তাঁর কথার যে, দুর্যোধনের পক্ষেও তা না শুনে উপায় নেই।

তবু একটা রাগ দুর্যোধনের হয়েই ছিল। সভাস্থলে সকলে, এমনকী তাঁর পিতাও যেহেতু তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলেছেন এবং যেহেতু সকলের কাছে শুনতে হয়েছে তাঁর স্বভাবিত আকাঙ্ক্ষার বিপরীত কথা, তাই আবারও যখন তাঁকে মায়ের কথা শোনবার জন্য সভায় ফিরে আসতে হয়, তখন স্বভাবতই তাঁর মুখ-চোখ-শরীরের মধ্যে ক্রোধ এবং অহংকারের পরিস্ফুট অভিব্যক্তি দেখা গেল। তাঁর চোখ লাল হয়ে গেছে এবং সভায় প্রবেশের সময় তিনি ক্রোধে সাপের মতো নিশ্বাস ছাড়তে লাগলেন— অতিতাম্রেক্ষণঃ ক্রোধান্নিশ্বসন্নিব পন্নগঃ। গান্ধারী পুত্রের ভাব বুঝতে পারলেন এবং এও বুঝলেন যে, উৎপথচালিত পুত্রকে আর মিষ্টি কথা বলে লাভ নেই। বৃহত্তর প্রয়োজন শান্তি এবং স্বাভাবিক প্রয়োজন পুত্রের জীবন— দু-দিক থেকে ভাবলেও আজ তাঁকে নিন্দা করাই প্রয়োজন। সুবৃহৎ এবং সুচিন্তিত একটি অনুশাসনের মধ্যে দুর্যোধনের প্রতি তাঁর মাতৃ-সম্বোধনগুলিই একমাত্র স্নেহসূচক শব্দ বলা যেতে পারে। 'পুত্রক', 'তাত' ইত্যাদি শব্দগুলিকে বাংলায় যদি বলে 'বাছা আমার' তবে মাঝে মাঝে দুর্যোধনের প্রতি তার 'মহাপ্রাজ্ঞ' সম্বোধনটির বাংলা করা উচিত— 'তুমি তো বুদ্ধিমান ছেলে, তুমি তো সব বোঝো।' কিন্তু এই শব্দগুলি ছাড়া আর যত কথা আছে, তার মধ্যে দুর্যোধনের প্রতি সমস্ত ব্যক্তিগত অনুরোধগুলিই উচ্চারিত হয়েছে রাজনৈতিক পরামর্শের ভাবনায়। এখন যে সময় এসেছে, তাতে সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানটাই সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক, আর গান্ধারী সেই রাজনীতির কথাই বলছেন, কেননা সুস্থ রাজনীতি তিনি ধৃতরাষ্ট্রের চেয়ে বেশি বোঝেন, অন্তত তার মধ্যে ব্যক্তিগত প্রশ্রয় নেই, মা-বাবার আত্মীয়তা নেই।

গান্ধারী বললেন— বাছা আমার! তোমার এবং তোমার সঙ্গে যারা আছে, তাদের সকলের ভালর জন্যই বলছি বাছা। আমার কথা শোনো, তোমার ভবিষ্যতে ভাল হবে— দুর্যোধন নিবোধেদং বচনং মম পুত্রক। গান্ধারী এতক্ষণ ধৃতরাষ্ট্রকে সোচ্চারে তিরস্কার করেছেন বটে, কিন্তু দুর্যোধনের সামনে তাঁর সম্মান নষ্ট করলেন না, কেননা ধৃতরাষ্ট্র নাচার হয়ে তাঁর শরণ গ্রহণ করেছেন। গান্ধারী বললেন, দুর্যোধন! তোমার পিতা, পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, কৃপ এবং বিদুর যেটা বলছেন, সেটা তুমি শোনো; তাঁদের কথা শোনা মানেই কিন্তু তাঁদের সম্মান রক্ষা করা। রাজ্য ব্যাপারটা এমনই যে, একটি মানুষ ইচ্ছে করলেই রাজ্য পায় না, একজন ইচ্ছে করলে সে রাজ্য রক্ষা করতে পারে না, কিংবা ইচ্ছে করলেই সেটা ভোগ করা যায় না— অবাপ্তুং রক্ষিতুং বাপি ভোক্তুং ভারতসত্তম। গান্ধারী বোঝাতে চাইলেন যে, দুর্যোধন যে আজ রাজা হয়ে বসেছেন, সেখানে তাঁর নিজস্ব কৃতিত্ব কিছু নেই, তাঁর নিজের রাজা হবার ইচ্ছেটাও সেখানে বড় কথা নয়। কেননা অন্তত এই হস্তিনাপুরের অংশে রাজত্বদানের পিছনে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ-কৃপ-বিদুরেরও বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, অথচ দুর্যোধন এখন তাঁদেরই মানছেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার ছেলের রাজা হবার যোগ্যতা এবং যদি বা দুর্যোধন অন্যের পৃষ্ঠপোষণে রাজা হয়েও থাকেন, তবে সেই রাজত্ব টিকিয়ে রাখার প্রশ্নে ছেলেকে সরাসরি আক্রমণ করলেন না গান্ধারী। কারণ বিষয়-লালসায় বিমূঢ় ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত বিকার উপশমন করার উপদেশ শোনালে আরও বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। অথচ গান্ধারী সেই কাম-ক্রোধের তাড়না নিরুদ্ধ করার উপদেশই দেবেন দুর্যোধনকে। তাই সরাসরি না বলে, মানুষের কী হয়, তাই বলছেন গান্ধারী। গান্ধারী বললেন— ইন্দ্রিয়গুলি যার বশে নেই, সে কখনও অনেক দিন ধরে প্রশাসনিক পদে অবস্থিত থাকতে পারে না— ন হি অবশ্যেন্দ্রিয়ো রাজ্যমশ্নীয়াদ্দীর্ঘমন্তরম্। কেননা ইন্দ্রিয়জয়ের ক্ষমতা না থাকলে কামনা এবং ক্রোধ প্রশাসক নেতাকে কর্তব্য ভুলিয়ে অন্য দিকে নিয়ে যায়। কামনা এবং ক্রোধ রাজা হবার পথে সবচেয়ে বড় শত্রু, এই শত্রু-দুটিকে জয় করলেই তবে রাজার রাজ্য সুস্থিত হয়।

এই এতকাল পরে গান্ধারী অর্থশাস্ত্রের প্রাথমিক পাঠ নিচ্ছেন পুত্রকে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রই বলুন অথবা মনুসংহিতাই বলুন, অথবা রাজনীতি বিষয়ক অন্য কোনও প্রাচীন গ্রন্থ, সব জায়গাতে রাজনীতি পাঠের প্রাথমিক অধ্যায়গুলি হল ইন্দ্রিয় জয় এবং বিনয়-শিক্ষা। ইন্দ্রিয়-জয়ের ব্যাপারটা বিনয়-শিক্ষার মধ্যে রাখা যায়, কেননা বিনয় মানেই যে শিক্ষার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গুলি বশে আনা যায়। বিনীত মানেই সুশিক্ষিত। বিনয় শব্দটার মধ্যে আরও বেশ কিছু শিক্ষার ব্যাপার আছে বলেই আমরা ইন্দ্রিয়-জয়ের প্রসঙ্গটা পৃথক উচ্চারণ করলাম। গান্ধারী মনে করেন— ইন্দ্রিয়-জয়ের শিক্ষা না থাকার ফলেই দুর্যোধনের এত রাজ্যলোভ এবং সেই রাজ্যলোভ ব্যাহত হচ্ছে বলেই দুর্যোধনের এত ক্রোধ। কামনা-বাসনার নিয়মই এই, ব্যাহত বা প্রতিরুদ্ধ হলেই তা ক্রোধে পরিণত হয়।

কেন, কেন, দুর্যোধনের রাজ্যলোভ এত বেশি কেন, এই তর্কে না গিয়ে গান্ধারী সাধারণ যুক্তিতে বলেছেন— রাজ্য মানেই তো প্রভুত্ব, power, authority. সকলেই সে প্রভুত্ব চায়, কিন্তু যার নিজের লোভ-তৃষ্ণার ওপরে কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই, সে যদি বা রাজ্য পায়ও কোনও ভাবে সে রাজ্য সে রাখতে পারবে না— রাজ্যং নামেপ্সিতং স্থানং ন শক্যম্ অভিরক্ষিতুম্। প্রাচীন রাজনীতি-শাস্ত্রে ইন্দ্রিয়-জয়, বিনয়-শিক্ষার পরেই অমাত্য নিয়োগের প্রশ্ন উঠেছে সর্বত্র। অমাত্যকে রাজার সহায় এবং পরিচ্ছদ বলা হয়েছে, কেননা রাজা কখনও একা রাজ্য শাসন করতে পারেন না। গান্ধারী এই শুষ্ক রাজনীতির সত্যগুলিকে অদ্ভুত চাতুর্যে পরিবেশন করেছেন দুর্যোধনের কাছে। তিনি বোঝাতে চাইলেন— শত্রু বলে যদি কাউকে মানতেই হয়, তবে পাণ্ডবেরা তোমার প্রথম শত্রু নয়, যাদের দমন করতে চাইছ তুমি। প্রথমে নিজেই নিজের সামনে দাঁড়াও, দেখো তোমার নিজের ভিতরেই শত্রু আছে কিনা, প্রথমে তুমি সেই আন্তর শত্রুকে দমন করো— আত্মানমেব প্রথমং দ্বেষ্যরূপেণ যোজয়েৎ। তারপর দাঁড়াও তোমার মন্ত্রী-অমাত্যদের সামনে। যাঁরা এতকাল তোমার এবং তোমার রাজ্যের হিত চিন্তা করেছেন, তাঁরা হঠাৎই তোমার বিরুদ্ধে কথা বলছেন কেন, সেটা তোমায় বুঝতে হবে এবং তাঁদের জয় করতে হবে নিজের আত্মবুদ্ধি দিয়ে। তারপর তো তৃতীয়ত তোমার বাইরের শত্রু, যাঁরা তোমার মিত্রপক্ষে নেই, তাঁদের জয় করার প্রশ্ন— ততোঽমাত্যান্ অমিত্রাংশ্চ ন মোঘং বিজিগীষতে।

গান্ধারী তাঁর ছেলেকে জানেন। তিনি জানেন যে, কামনা-বাসনা, লোভ, দম্ভ, অহংকার— এই সমস্ত অসদবৃত্তি তাঁর ছেলেকে আপাদমস্তক গ্রাস করেছে এবং এই সেই কারণেই তিনি কারও কথাই শুনছেন না। গান্ধারী বললেন— যে মানুষ ইচ্ছা ক'রে অথবা নিতান্ত ক্রোধের বশে আপন জনের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করে, সে মানুষকে কেউ সহায়তা করে না। আজকে যে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর— কাউকে তুমি সহায় হিসেবে পাচ্ছ না, তার কারণ তোমার এই ইচ্ছাকৃত অন্যায় আচরণ। সাধারণ নৈতিক কথা শেষ করে এবারে গান্ধারী আসল কথায় এলেন। বললেন— পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই, এককাট্টা হয়ে আছে। তারা বুদ্ধিমান এবং বীর, তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজ্য ভোগ করলেই তবে তুমি সবচেয়ে সুখে থাকবে— পাণ্ডবৈঃ পৃথিবীং তাত ভোক্ষ্যসে সহিতঃ সুখী।

সত্যি বলতে কি, কর্ণ-দুঃশাসন-শকুনির প্রতিপক্ষে অর্জুন এবং কৃষ্ণ যে কতটা বেশি শক্তিমান— এ কথা দুর্যোধনকে বোঝাতে পারছেন না গান্ধারী। ভীষ্ম এবং দ্রোণও পারেননি, গান্ধারীও পারছেন না। কিন্তু আজ থেকে পাণ্ডবদের বনবাস-পর্বের আগে ভীষ্ম-দ্রোণ-বিদুরেরা যে অসাধারণ বুদ্ধিতে কৌরব-পাণ্ডবদের রাজ্য ভাগ করে দিয়েছিলেন, গান্ধারী সেই পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে বলছেন দুর্যোধনকে। গান্ধারী বলেছেন— আজকে তুমি যে যুদ্ধের জন্য লালায়িত হচ্ছ, সেই যুদ্ধে কোনও মঙ্গল নেই, ধর্ম নেই, সুখও নেই। তোমার স্বার্থও তাতে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হবে না, আর যুদ্ধে যে জয় হবেই সে-কথাও হলফ করে বলা যায় না। সেইজন্যেই বলছি— যুদ্ধের বুদ্ধিটা তুমি একেবারে মাথা থেকে বার করে দাও— ন চাপি বিজয়ো নিত্যং মা যুদ্ধে চেত আধীথাঃ। যুদ্ধ যাতে না হয় অথচ পাণ্ডব-ভাইদের সঙ্গে তোমার চিরশত্রুতাও যাতে না হয়, সেই ভয়েই ভীষ্ম, তোমার পিতা এবং রাজসভার অন্য মন্ত্রী-অমাত্যেরা পাণ্ডবদের পৈতৃক অংশ দিয়ে তাঁদের রাজ্য আলাদা করে দিয়েছিলেন— দত্তোহংশঃ পাণ্ডুপুত্রাণাং ভেদাদ্ ভীতৈররিন্দম। আর সেই রাজ্যদানের ফল এখনও তুমি বুঝতে পারছ— তারা রাজ্যটাকে নিষ্কণ্টক শত্রুহীন করে বনে গেছে, তুমি তাদের রাজ্যই সম্পূর্ণ ভোগ করছ— যদ্ ভুঙ্‌ক্ষে পৃথিবীং কৃৎস্নাং শূরৈর্নিহতকণ্টকাম্।

অর্থাৎ গান্ধারী একবারের তরেও মেনে নিলেন না যে, পাণ্ডবদের অংশটা এখন দুর্যোধনের হয়ে গেছে। বরঞ্চ বলতে চাইলেন— তোমার নিজের অংশে তুমি যদি নিশ্চিন্তে রাজ্যভোগ করতে চাও, তা হলে পাণ্ডবদের অংশ, অর্ধেক রাজ্য তাদের দিয়ে দাও— যদীচ্ছসী সহামাত্যো ভোক্তুমর্ধং প্রদীয়তাম্। গান্ধারী এবার নিজের অন্তরের ক্ষোভটুকুও সর্বৈব প্রকাশ করে ফেললেন। পাণ্ডবভাইদের ওপর যত অন্যায়-অত্যাচার দুর্যোধন করেছেন, গান্ধারী সেগুলি কোনওদিন মনে মনে মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু স্বামী-পুত্রের সাহংকার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বাধাও দিতে পারেননি। কিন্তু আজ তিনি বুঝতে পারছেন— স্বামী-পুত্রের জীবন এবার বিপন্ন। দুর্যোধনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগুনে সকলে এবার পুড়ে মরবে। এখন আর চুপ করে থাকবেন না গান্ধারী। তিনি এবার সত্য উচ্চারণ করবেন, বলবেন বাস্তবের কথা। গান্ধারী বললেন— তুমি তেরো বচ্ছর ধরে অনেক যাতনা দিয়েছ পাণ্ডবদের। আর নয়— অলমঙ্গ নিকারোহয়ং ত্রয়োদশ সমাঃ কৃতঃ। এই যাতনায় তাদের নিজেদের পৈতৃক রাজ্যাংশ ফিরে পাবার তীব্রতাও যেমন বেড়েছে, তেমনি তোমার অনন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপমানের ফলে তাদের রাগও জমা হয়েছে অনেক। আমি বলব— তুমি তাদের এই উদ্যত ক্রোধ প্রশমন কর— শময়ৈনং মহাপ্রাজ্ঞ কাম-ক্রোধ-সমেধিতম্।

দুর্যোধন সেই যে পিতার আদেশে কোনও মতে গান্ধারীর সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন, ব্যাস। ওইটুকুই। এতক্ষণ গান্ধারী কথা বলছেন, অথচ দুর্যোধন হ্যাঁ-না কিছুই বলছেন না। কোনও কথা যেন তাঁর কানেও ঢুকছে না, অথবা ঢুকলেও সেই কথার প্রতি তাঁর আদৌ শ্রদ্ধা হচ্ছে না। তিনি গোঁয়ারের মতো অবিচলিত দাঁড়িয়ে আছেন। গান্ধারী পুত্রের মানসিকতা বুঝতে পারছেন, অতএব সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পথ ছেড়ে যুদ্ধের বাস্তব ক্ষেত্রে দুর্যোধনের সুবিধে-অসুবিধের কথা বলতে আরম্ভ করলেন। গান্ধারী বললেন— তুমি যাদের ভরসায় তোমার ঈপ্সিত যুদ্ধে জয়লাভ করবে বলে ভাবছ, সেই তুমি, কর্ণ এবং তোমার ভাই দুঃশাসন— এরা কেউই পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারবে না।— ন চৈষ শক্তঃ পার্থানাং যস্ত্বমর্থমভীপ্সসি। আরও একটা জিনিস মনে রেখো— তুমি যে ভাবছ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ— এঁরা সব তোমার পক্ষে সমগ্র শক্তি নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, সেটা ভুল, একেবারেই ভুল— য্যোৎস্যন্তে সর্বশক্ত্যেতি নৈতদদ্যুপপদ্যতে।

গান্ধারী খুব জোরের সঙ্গে বললেন— এঁরা তোমাদেরও স্বভাব জানেন, পাণ্ডবদেরও স্বভাব জানেন, তোমাদের সঙ্গে তাঁদের যে আত্মীয়তার সম্পর্ক, পাণ্ডবদের সঙ্গেও তাঁদের ওই একই সম্পর্ক। স্নেহের ব্যাপারটাও তাঁদের একই রকম। রাজ্যাংশও তোমার এবং পাণ্ডবদের একই রকম— সমং হি রাজ্যং প্রীতিশ্চ স্থানং হি বিদিতাত্মনাম্— কিন্তু তফাত আছে একটাই, ন্যায়, নীতি, ধর্মের দিকে পাণ্ডবদের পাল্লা ভারী। অতএব ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপেরা নিজেদের সর্বাঙ্গীণ ক্ষমতা তোমার জন্য যুদ্ধে উজাড় করে দেবেন না। আর তুমি যে ভাবছ— আমি এঁদের খাওয়াই-পরাই, এঁরা আমার জন্য কেন করবে না, তাতে বলি— খাওয়া-পরার মূল্যটা এঁরা জীবন বিসর্জন দিয়ে চুকিয়ে দেবেন, কিন্তু তাই বলে যুধিষ্ঠিরকে এঁরা কখনও শত্রুভাবে দেখবেন না— রাজপিণ্ড-ভয়াদেতে যদি হাস্যন্তি জীবিতম্। মাঝখান দিয়ে ফলটা কী হবে— যুদ্ধ লাগবে। একদিকে ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-কর্ণেরা যুদ্ধের উত্তেজনায় যুদ্ধ করবেন, অন্যদিকে ভীম-অর্জুন-ধৃষ্টদ্যুম্নেরাও মরিয়া হয়ে লড়াই করবে— মাঝখান দিয়ে দুই পক্ষেরই অসংখ্য নিরীহ সৈন্য এবং মিত্র রাজারা মারা পড়বেন। বিপুল রক্তক্ষয় হবে। তাই বলছিলাম— বাছা তুমি নিজের ক্রোধের মান রাখতে গিয়ে এত রক্তক্ষয় হতে দিয়ো না, তোমার জন্য যেন পৃথিবীটা বীরশূন্য না হয়— এষা হি পৃথিবী কৃৎস্না মা গমস্ত্বৎকৃতে ক্ষয়ম্। তুমি আর লোভ কোরো না বাছা। তুমি শান্ত হও।

হিতৈষিণী জননীর রাজনৈতিক প্রবচন, ব্যক্তিগত অনুরোধ এতটুকুও শুনলেন না দুর্যোধন— তত্তু বাক্যমনাদৃত্য সোহর্থবন্মাতৃভাষিতাম্— তিনি একবারও মায়ের দিকে না তাকিয়ে তাঁকে অগ্রাহ্য করে সভা ছেড়ে চলে গেলেন শকুনির কাছে। ধৃতরাষ্ট্র চেয়েছিলেন— শান্তির প্রস্তাবে নিযুক্ত কৃষ্ণ পাণ্ডবদের কাছে ফেরার আগেই যাতে একটা সমাধান হয়ে যায়; তাঁর শেষ অস্ত্র ছিলেন ধর্মদর্শিনী গান্ধারী। কিন্তু তিনিও নিষ্ফল হলেন এবং নিষ্ফল হবেন— সে-কথা তিনি বোধহয় জানতেনও। যত কথা তিনি দুর্যোধনকে বলেছিলেন এবং তার যতটুকু আমরা লিপিবদ্ধ করলাম, গান্ধারী তার চাইতেও বেশি কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছিলেন হয়তো। তার প্রমাণ আছে কৃষ্ণের কথায়। তিনি হস্তিনাপুর থেকে উপপ্লব্যে ফিরে যুধিষ্ঠিরকে আনুপূর্বিক সব ঘটনা বলেছিলেন। কুরুসভায় শান্তির প্রস্তাবে ধৃতরাষ্ট্র কী বলেছিলেন, ভীষ্ম-দ্রোণ কী বলেছিলেন, কৃপ অথবা স্বয়ং দুর্যোধনই বা কী বলেছিলেন— এই সমস্ত খবর দেবার সময় কৃষ্ণ গান্ধারীর কথাও বলেছেন। কৃষ্ণের জবানি থেকে যা বোঝা যায়। তাতে গান্ধারী বেশ কড়া কথাই বলেছিলেন দুর্যোধনকে। এত কড়া কথা বলার পিছনে শুধু গান্ধারীর ধর্মবোধই নয়, কৃষ্ণ মনে করেন যে, গান্ধারী এখন পুত্রের কারণে সবংশে ধ্বংস হবার ভয় পাচ্ছেন— ধর্মার্থযুক্তং কুলনাশভীতা/ রাজ্ঞাং সমক্ষং সুতমাহ কোপাৎ। কৃষ্ণের কথা থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে— গান্ধারী শুধুমাত্র ধৃতরাষ্ট্র বা বিদুরের সামনেই দুর্যোধনকে তিরস্কার করেননি, তিনি সভায় উপস্থিত সকলের সামনে সকলকে সাক্ষী মেনে নিজের ছেলের দোষ সোচ্চারে বলেছেন। হয়তো এতেই তাঁর হৃদয়ের ভার কিছু লাঘব হয়েছে।

মহাভারত যতটুকু বুঝি— তাতে 'সিকোয়েন্স'টা উলটো সাজানো আছে সেখানে। আমাদের ধারণা— সকলে রাজসভার মধ্যে যখন দুর্যোধনকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, তখন গান্ধারীও ছিলেন সেখানে অন্যতমা বক্তা হিসেবে। পরে দুর্যোধন সভা ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর আবারও ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন গান্ধারীর মাধ্যমে তাঁকে একান্তে বোঝানোর জন্য। সেটাও বিফলে গেছে। কিন্তু বিফলে যতই যাক, কৃষ্ণের জবানিতে গান্ধারীর বক্তব্য এতটাই আন্তরিক যাতে বোঝা যায়— আজ তিনি স্বামী-পুত্রের অন্যায়ের দায় নিয়ে চুপ করে থাকছেন না, বরঞ্চ সবাইকে সাক্ষী মেনে নিজের এতকালের চুপ করে থাকার দায় মোচন করছেন যেন। কৃষ্ণ যেমনটি দেখে এসে বলছেন, তাতে গান্ধারীর উপস্থাপনা রীতিমতো নাটকীয়, তবে সেটা অভিনয় নয়। প্রাণ, ধর্ম এবং চেতনার দায়ে তাঁর সত্য উচ্চারণ।

দুর্যোধনকে গান্ধারী বলেছিলেন— যে সব রাজা, রাজপ্রতিম মানুষেরা বসে আছেন এই সভায়, আর যাঁরা ব্রহ্মর্ষি এবং অন্যান্য সভাসদজনেরা তাঁরা সবাই শুনুন, তাঁদের সামনেই দুর্যোধন, তোমার অন্যায়-অপরাধের কথা বলছি। তুমিই অত্যন্ত পাপী বলেই তোমার নিজস্ব মন্ত্রী-অমাত্যের পাপের কথাও একই সঙ্গে আমায় বলতে হচ্ছে— শৃণ্বন্তু বক্ষ্যামি তবাপরাধং/ পাপস্য সামাত্য-পরিচ্ছদস্য। মনে রেখো দুর্যোধন! এই রাজ্যে রাজা হবার ব্যাপারে আমরা কুল-পরম্পরা মানি, এখানে পিতৃ-পিতামহক্রমে পর-পর রাজা হন— রাজ্যং কুরূণামনুপূর্বভোজ্যং/ ক্রমাগতো নঃ কুলধর্ম এষঃ। তুমি অত্যন্ত নৃশংস এবং অসভ্য বলেই নিজে রাজ্যের অধিকারী না হয়েও নিজের দুর্নীতিতে সমস্ত কুরুরাজ্যটাকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে এসেছ। তুমি রাজা হলেটা কী করে? ধৃতরাষ্ট্রের মতো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এবং বিদুরের মতো দীর্ঘদর্শী ব্যক্তি যেখানে এই কুরুরাজ্যের পরিচালনায় রয়েছেন, সেখানে তাঁদের অতিক্রম করে তুই এখানকার রাজত্ব চাইছিস কী করে— এতাবতিক্রম্য কথং নৃপত্বং/ দুর্যোধন প্রার্থয়সেঽদ্য মোহাৎ।

হয়তো এই কথাটার মধ্যে একটু কৌশলও আছে। গান্ধারী যে তাঁর স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যলোভের কথা জানেন না, তা নয়। বস্তুত তাঁর লোভের কারণেই আজ দুর্যোধন এত পুষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছেন, তাও তিনি ভাল করে বোঝেন। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে ধৃতরাষ্ট্র যখন পুত্রের সদর্প ঘোষণায় ব্যতিব্যস্ত, তখন সাময়িক শব্দপ্রচারে ধৃতরাষ্ট্রকেই অন্তত শ্রেয় বিকল্প হিসেবে অহংকারী পুত্রের সামনে উপস্থিত করতে চাইছেন গান্ধারী। তিনি বোঝাতে চাইছেন— হস্তিনাপুরের রাজপরম্পরা এমনই তাতে দুর্যোধনের রাজ্য পাবার কথাই নয়, তিনি বলেছেন— পিতামহ ভীষ্ম রাজা হননি, কিন্তু যদি হতেন তা হলে ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুর তাঁর অধীন হয়েই রাজ্যপরিচালনায় আনুকূল্য করতেন মাত্র। কিন্তু তিনি রাজা হননি বলেই রাজ্য পেয়েছিলেন পাণ্ডু। নিয়ম অনুসারে পাণ্ডুর মৃত্যুর পর সমগ্র রাজ্যটাই তাঁর ছেলেদের পাবার কথা, এবং পাণ্ডবদের পরে তাঁদেরই পুত্র-পৌত্রেরা— এই রাজ্য পাবে— এটাই সোজা হিসেব— রাজ্য তদেতন্নিখিলং পাণ্ডবানাং/ পৈতামহং পুত্র-পৌত্রানুগামি।

এই মুহূর্তেই আমরা বুঝতে পারি— গান্ধারী তাঁর পুত্রের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রকেও একহাত নিচ্ছেন। কিন্তু তাঁর স্বামীই হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি দুর্যোধনের জন্ম হওয়ামাত্রই রাজসভার অধিবেশন ডেকে সভাসদদের সামনে এই প্রশ্ন তুলেছিলেন। বলেছিলেন— আচ্ছা! বংশের নিয়মে যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা হবেন, এটা ঠিক আছে কিন্তু তাঁর পরে কে রাজা হবেন, দুর্যোধন হবেন কি— অয়ং তু অনন্তরং তস্মাদপি রাজা ভবিষ্যতি? লক্ষণীয়, সবে তাঁর ছেলে হয়েছে, যুধিষ্ঠির তখনও ভাইদের সঙ্গে হস্তিনায় আসেননি, এমনকী পাণ্ডুও তখনও মারা যাননি, সেই অবস্থায় ধৃতরাষ্ট্র যেভাবে পুত্রের রাজা হবার কথা ভাবছেন, তার মধ্যে যুধিষ্ঠিরের মৃত্যু-চিন্তাই বেশি করে ধরা পড়ে। অর্থাৎ যুধিষ্ঠির মারা গেলেই দুর্যোধন রাজা হবেন কি? গান্ধারী জানেন— ধৃতরাষ্ট্রের এই লোভই তাঁর পুত্রের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে বলে যুধিষ্ঠিরের এত যাতনা, তাঁকে আজ বনে-বনে ঘুরতে হচ্ছে শুধু মৃত্যু হয়নি বলে। এমনকী ধৃতরাষ্ট্রের ভাবনা তাঁর পুত্রের মুখেও শব্দরূপ লাভ করেছে। এক সময় দুর্যোধনও ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন— অন্ধতার জন্য তুমি রাজা হতে পারোনি বলে তোমার বংশের ছেলে, নাতি কেউই আর রাজা হবে না, এইরকমই চলবে পরম্পরা।

ধৃতরাষ্ট্র এই দুরাশার ফাঁদে পড়েছিলেন তার কারণ— তাঁর নিজের মধ্যেও রাজ্যলোভ ছিল। গান্ধারী কিন্তু এ-ব্যাপারে নীতি এবং নিয়মের সপক্ষে। তিনি বলতে চান— পরম্পরা যদি পাণ্ডবদের রাজা বানায়, তবে তাই হবে। সেখানে তোমার এত জ্বলে যাবার কারণই নেই। কেননা রাজ্য তোমার পাবারই কথা নয়। গান্ধারী সবার ওপরে মনে রেখেছেন— ভীষ্মের মর্যাদা। তিনি রাজ্য নেননি এবং শতবার সুযোগ আসা সত্ত্বেও রাজ্য গ্রহণ করেননি। তাঁর মর্যাদা তো কুরুরাজ্যে কম নেই। আর সেই মানুষটাও যখন শুধু পাণ্ডবদের রাজ্যাংশমাত্র ফিরিয়ে দিতে বলছেন, তখন সেই মত তো মানতে হবে। মানতে হবে ধৃতরাষ্ট্রের কথাও। তিনি আগে যাই বলে থাকুন, এখন তিনি ন্যায় উচ্চারণ করছেন। সত্যি কথা বলতে কি, গান্ধারী কথা বলার পর ধৃতরাষ্ট্রও দুর্যোধনকে একই কথা বলেছেন, অন্তত কৃষ্ণের জবানিতে আমরা তাই শুনতে পাচ্ছি। যদিও দুর্যোধন কারও কথাই শোনেননি। তিনি সভা ছেড়ে চলে গেছেন এবং পরের দিন সকালবেলাতেই সৈন্য সাজাতে চলে গেছেন।

যুদ্ধের দামামা-তুরী-ভেরী বেজে উঠল চারদিকে, যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। ষোলো-সতেরো দিন তুমুল যুদ্ধ, হাতি-ঘোড়া-রথধ্বনির মধ্যে গান্ধারীর কোনও খবরই পাই না আমরা। শুধু যুদ্ধের খবর পাই, এমনকী ধৃতরাষ্ট্রের খবরও পাই, কিন্তু গান্ধারীর খবর পাই-ই না প্রায়। সেই যখন ভীষ্মের সেনাপতিত্ব চলছে, যুদ্ধের আট-দিনের দিন সাত-আটটি ছেলে মারা গেল ধৃতরাষ্ট্রের। দিব্যদর্শী সঞ্জয়ের তথ্যভাষণে যুদ্ধের বর্ণনাচিত্র যখন এইরকম মর্মস্পর্শী— এই ভীম আপনার অমুক ছেলের মাথাটি নামিয়ে দিল ধড় থেকে— পরাজ্জিতস্য ভীমেন নিপপাত শিরো মহীম্— তখন গান্ধারী কোথায় বসে থাকতেন? অন্তঃপুরে? আমাদের তা মনে হয় না। সঞ্জয়ের মুখে ওই বিচিত্র যুদ্ধবর্ণনা পরম কৌতূহলে গান্ধারীও নিশ্চয়ই শুনেছেন ধৃতরাষ্ট্রের পাশে বসে, কুরুবাড়ির অন্যান্য বউরাও তাঁর পার্শ্ববাসিনী হয়েছিলেন বলেই আমাদের ধারণা। কথাটা প্রমাণ করাও যাবে।

যুদ্ধের আটদিনের মাথায় যে ছেলেগুলি মারা পড়ল, তাতে ধৃতরাষ্ট্রকে ভবিষ্যতের আশঙ্কায় শঙ্কিত হতে দেখেছি। এমনকী দুর্যোধনের নিন্দায় মুখরও হতে দেখেছি। তিনি এমনও বলেছেন— সব বিপদ এই দুর্যোধনের জন্য, আমি এত করে বললাম, ভীষ্ম, বিদুর, এমনকী গান্ধারী পর্যন্ত ওর ভালর জন্য এত করে বলল, কিন্তু বদমাশ! কিছুতেই শুনল না— গান্ধার্য্যা চৈব দুর্মেধাঃ সততং হিতকাম্যয়া। সঞ্জয় এ সব কথা শুনে দুর্যোধনকে নয়, দোষ দিয়েছেন ধৃতরাষ্ট্রকেই— যিনি পাশাখেলায় ইন্ধন যুগিয়েছিলেন। আমাদের বিশ্বাস তখনও গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের পাশেই ছিলেন, কিন্তু তাঁর আত্মশক্তি অনেক বেশি বলেই পুত্রদের মৃত্যুতে মুহ্যমান হননি। কিন্তু সমস্ত ঘটনার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল কর্ণের মৃত্যুর পর।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে দুর্যোধন ভীষ্ম-দ্রোণকে তেমন বিশ্বাস করেননি। তিনি বুঝতেন যে, এরা সর্বশক্তি দিয়ে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না। কিন্তু কর্ণ! কর্ণের ভরসাতেই তো দুর্যোধন যুদ্ধ করতে নেমেছিলেন। কিন্তু আজ কর্ণ যখন মারা গেলেন, তখন দুর্যোধনের মানসিক অবস্থা কী হতে পারে, তার মধ্যে নাই বা গেলাম, কিন্তু কর্ণের মৃত্যুসংবাদ পাবার পর ধৃতরাষ্ট্রকে আমরা অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখছি এবং দেখছি— গান্ধারীও কর্ণের মৃত্যুসংবাদ সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে গেছেন— তথা যা পতিতা দেবী গান্ধারী দীর্ঘদর্শিনী। আমাদের বড় অবাক লাগে এইসব জায়গায়। অন্যান্য পুত্রের মৃত্যুতেও যাঁকে তেমন মুহ্যমান দেখিনি, আজ কর্ণের মৃত্যুতে তিনি এতটাই ভেঙে পড়েছেন যে, তিনি সংজ্ঞাহীন ধৃতরাষ্ট্রের পাশে বসে বিলাপ করে কাঁদছেন— শুশোচ বহুলালাপৈঃ কর্ণস্য নিধনং যুধি। আর ঠিক এইখানেই আশ্চর্য লাগে। তা হলে কি ধৃতরাষ্ট্রের মতো গান্ধারীরও মনের কোণে এমন কোনও দুরাশা ছিল যে কর্ণের ক্ষমতায় দুর্যোধন শেষ পর্যন্ত জিতবেন! আসলে ধৃতরাষ্ট্রের কথা বেশ বোঝা যায়। পাশাখেলার সময় তাঁকে যেমন দেখেছি, তাতে যেভাবে তিনি দুরন্ত কৌতূহলে— শকুনি জিতেছে কি, জিতেছে কি, এইভাবে উল্লসিত হয়েছিলেন, তাতে এই যুদ্ধেও যদি দুর্যোধন আস্তে আস্তে জয়ের দিকে যেতেন, তাতে ধৃতরাষ্ট্রের স্বরূপ পুনরায় উদ্‌ঘাটিত হত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এই ভাবনাতে আমরা গান্ধারীকে কীভাবে বিচার করব? তিনি তো পাশাখেলাও আন্তরিকভাবে চাননি, চাননি এই যুদ্ধও, তবুও একটার পর একটা ছেলে যখন ভীমের হাতে মারা যাচ্ছে, তখন একবারের তরেও তাঁর মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, একবার অন্তত জিতুক দুর্যোধন, তাতে ছেলেরা বেঁচে থাকবে কেউ কেউ। আসলে কর্ণের মৃত্যুর আগে দুঃশাসন এবং অন্যান্য কৌরব ভাইরা অনেকেই ভীমের হাতে মারা গেছেন। কিন্তু আজ যখন কর্ণ মারা গেলেন, তখন বুঝি আর কোনও আশাই রইল না। ধৃতরাষ্ট্র যেমন বুঝলেন যে, তাঁর ছেলে যাঁর ভরসায় এত বড় যুদ্ধকাণ্ড বাধিয়ে দিল, সে মারা যাওয়া মানে জীবনে আর জেতার কোনও আশা নেই এবং সেই সঙ্গে এবার তার ছেলেরও সময় ঘনিয়ে আসছে। এই ভাবনা যেমন তাঁকে নিঃসংজ্ঞ বিচেতন করে দিল, আমাদের ধারণা— এই অনিবার্য যুদ্ধফল গান্ধারীকেও অজ্ঞান করে দিয়েছে। প্রশ্ন উঠবে, তা হলে কী গান্ধারীও মনে মনে ধৃতরাষ্ট্রের মতো পুত্রের জয়াশা পোষণ করতেন, তা নইলে কর্ণের জন্য তিনি এমন হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদবেন কেন? আমরা বলব— এটা ঠিক পুত্রের জন্য জয়ৈষণা নয়, এ হল মৃত্যুর ভাবনা। প্রিয় পুত্র দিনে দিনে তিল তিল করে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে জানলে কোনও জননীর হৃদয়-স্থিতি স্বাভাবিক থাকে?

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের আঠারো দিনের দিন কর্ণ মারা গেছেন, আঠারো দিনের দিন স্বয়ং ভীমের গদাঘাতে দুর্যোধনের উরুদ্বয় ভঙ্গ হল, তাঁর আর মাটি ছেড়ে উঠবার শক্তি নেই, তিনি মৃত্যুর মুখ দেখার জন্য অপেক্ষা করছেন শুয়ে শুয়ে। পাণ্ডবপক্ষে জয়ধ্বনির কোলাহল সামান্য শান্ত হতেই ধর্মমতি যুধিষ্ঠিরের মনে পড়ল গান্ধারীর কথা। তাঁর এই রকম মনে পড়ে, বিপন্ন মুহূর্তেও এমনকী শত্রুও বিপন্ন হলে তাঁর মানসিক অবস্থা কী হতে পারে, সেটা খুব মনে রাখেন যুধিষ্ঠির। সেই বনবাসকালে দ্রৌপদীকে হরণ করার দোষে ভীম যখন গান্ধারীর জামাই জয়দ্রথকে একেবারে শেষ করে দেবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে তাঁকে ধরবার জন্য এগোলেন, তখন যুধিষ্ঠির ভীমকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন— ভগিনী দুঃশলার কথা মনে রেখো, সে যেন বিধবা না হয়, মনে রেখো জননী গান্ধারীর কথা, তিনি যেন তাঁর সাধের জামাইকে না হারান।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের এই মার্মিক ভাবনা চলেনি, কারণ সেটা মহাযুদ্ধ। কিন্তু এই মহাযুদ্ধের শেষে আজ যখন দুর্যোধন মারা গেছেন, যুধিষ্ঠিরের ভীষণভাবে মনে পড়ল জননী গান্ধারীর কথা, মনে মনে একটু ভয়ও হল— গদাযুদ্ধের নিয়ম ভেঙে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করেছেন ভীম। ধর্মদর্শিনী গান্ধারী এই অপরাধ ক্ষমা করবেন না। যুধিষ্ঠির মনে করেন— গান্ধারী এক তপস্বিনী নারী। সারা জীবন এক অপ্রকাশ ধর্মচর্যার মধ্যে দিয়ে তিনি নিজেকে চালিত করেছেন বলেই তিনি যেমন নিজের পুত্রের অন্যায়গুলি মনে মনে মেনে নেননি কখনও, তেমনি আজ অন্যপক্ষ থেকে দুর্যোধনের অন্যায় উরুভঙ্গ যে অধর্ম হল তাও বুঝি তিনি ক্ষমা করবেন না। যুধিষ্ঠির ভাবলেন— গান্ধারী ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর তপস্যার আগুনে এই পৃথিবীটাকেই ধ্বংস করে ফেলবেন হয়তো— ঘোরেণ তপসা যুক্তা ত্রৈলোক্যমপি সা দহেৎ। এমনকী যুধিষ্ঠির এই পরিস্থিতিটা সামাল দেবেন কীভাবে, সেটা ভাবতে গিয়ে নিজে গান্ধারীর মুখোমুখি হতে ভয় পেলেন।

যুধিষ্ঠির ভাবলেন— তিনি ভাইদের নিয়ে গান্ধারীর সামনে উপস্থিত হবার আগেই তাঁর ক্রোধ শান্ত করা দরকার— গান্ধার্য্যাঃ ক্রোধদীপ্তায়াঃ পূর্বং প্রশমনং ভবেৎ। কেননা যেভাবে ভীম দুর্যোধনকে বধ করেছেন, তাতে তীব্র পুত্রশোকের জ্বালায় আপন মানসাগ্নিতে পাণ্ডবদের তিনি ভস্মসাৎও করে দিতে পারেন, অন্তত যুধিষ্ঠিরের তাই বিশ্বাস— মানসেনাগ্নিনা ক্রুদ্ধা ভস্মসান্নঃ করিষ্যতি। যুধিষ্ঠির ভয় পেয়ে কৃষ্ণের শরণ নিলেন। পাণ্ডবদের জন্য যত কষ্ট তাঁকে সইতে হয়েছে, সে সব স্মরণ-কৃতজ্ঞতায় উচ্চারণ করে যুধিষ্ঠির বললেন— তুমিই একমাত্র পারো এই কাজটা করতে, আমরা গেলে হবে না। গান্ধারী তাঁর পুত্র-পৌত্রদের মৃত্যুশোকে এতটাই ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন, যে তাঁর সামনে কেউ গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না— কশ্চ তাং ক্রোধতাম্রাক্ষীং পুত্রব্যসনকর্ষিতাম্। আমি চাই— তুমি আগে সেখানে যাও, তোমার সময়োচিত শব্দমন্ত্রে তুমি তাঁর ক্রোধ-প্রশমনের চেষ্টা কর— গান্ধার্য্যাঃ ক্রোধদীপ্তায়াঃ প্রশমার্থমরিন্দম।

যুধিষ্ঠির গান্ধারীর ভয়ংকর ক্রোধ চোখে দেখতে পারছেন দূর থেকে। আপন ধর্মশক্তির তপস্যায় কতটা তাঁর উত্তরণ ঘটেছিল অথবা সেই তপস্যার অগ্নিবলে কতটা তিনি সকলকে ভস্ম করে দিতে পারেন, সেই অলৌকিক তর্কযুক্তিতে না গিয়ে বলা যায়— যুধিষ্ঠির এই পুত্রশোকাতুরা জননীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছেন। গান্ধারী পাণ্ডবদের অন্যায় যুদ্ধের কথা উচ্চারণ করলে তাঁর মুখের ওপর— আপনার এই ছেলে যখন আমার স্ত্রীকে ঊরুস্থান প্রদর্শন করেছিল— এই কথাটা যুধিষ্ঠির বলতে পারবেন না। কেননা কোনও চরম অপরাধের জন্যই মৃত্যুদণ্ড দেবার অধিকার মানুষের আছে কিনা, যুধিষ্ঠির সে-কথা ভাবেন বলেই এক জননীর ক্রোধ তিনি তাঁর সমদুঃখিতায় দেখতে পারেন। গান্ধারীর ক্রোধকে তিনি এতটাই সম্ভাব্য মনে করছিলেন যে, শুধু কৃষ্ণ নয়, আমার ধারণা— তিনি হয়তো পিতামহ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে উপস্থিত থাকতে বলেছেন গান্ধারীর ক্রোধ-প্রশমনের জন্য। যুধিষ্ঠিরের জবানিতে ব্যাসের কাছে এই অনুরোধ মহাভারতে স্পষ্ট উচ্চারিত হয়নি বটে, কিন্তু কৃষ্ণকে তড়িঘড়ি গান্ধারীর কাছে পাঠানোর সময় যুধিষ্ঠির তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, এই অভাবনীয় পরিস্থিতিতে কৃষ্ণকে সাহায্য করার জন্য পিতামহ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসও সেখানে উপস্থিত থাকবেন— পিতামহশ্চ ভগবান্ কৃষ্ণস্তত্র ভবিষ্যতি।

কেন এই সতর্কতা, কেন এত দুশ্চিন্তা যুধিষ্ঠিরের? কেনই বা গান্ধারীর জন্য এত ভয়, এত আশঙ্কা? যাঁর সঙ্গে একান্ত সম্বন্ধ সেই ধৃতরাষ্ট্রকে এত ভয় পাচ্ছেন না যুধিষ্ঠির, অথচ গান্ধারী, যিনি ধৃতরাষ্ট্রের সম্বন্ধে পরম আত্মীয়া হলেও দূরাগতা বধূ বটে, তাঁকে এত ভয় কেন যুধিষ্ঠিরের? বিশেষত তিনি তো ধর্মদর্শিনী, অন্যায়ের কারণে তিনি পুত্রকে নির্বাসন দিতে চেয়েছিলেন, অথচ সেই পুত্রের মৃত্যুতে তিনি এত ক্রুদ্ধ হবেন কেন? তিনি দুঃখিত, মূর্ছিত, আলুলায়িত হতে পারেন, কিন্তু এত ক্রুদ্ধ হবেন কেন, যাতে মানসাগ্নিতে ভস্মসাৎ করতে পারেন পাণ্ডবদের। বেশ বুঝতে পারি— এখানে একটা রহস্য আছে, যে রহস্য মহাকাব্যের কবি স্পষ্ট করে বলেন না, বলতে চান না, পাছে পরবর্তী প্রজন্ম এক মহান চরিত্রকে ভুলভাবে চিহ্নিত করে।

আসলে যিনি মহাকাব্যের কবি হন, তাঁকে সমাজ-সংসারের এমন এক বিচিত্র বিশাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে গমনাগমন করতে হয়, যাতে করে একটি বিশাল চরিত্রের সাময়িক দোষগুলিকে তিনি অগ্রাহ্য করেন এবং অধিকাংশ গুণের মাহাত্ম্যে তাঁর সময়োচিত স্বভাবজ প্রবৃত্তিগুলিকে কখনওই চিহ্নিত করেন না। অন্যথায় একবার ভাবুন, যে গান্ধারী পুত্রের বিসর্জন-ধ্বনি উচ্চারণ করেছেন, যে গান্ধারী প্রবল ধর্মভাবনায় পুত্রের সমস্ত অন্যায় উচ্চারণ করে তাঁকে শাসন করার চেষ্টা করেছেন এবং যে গান্ধারী পাণ্ডবদের প্রতি সমস্ত অন্যায়ের প্রতিবিধান চেয়েছিলেন, সেই গান্ধারী পুত্রের মৃত্যুতে যতখানি শোকগ্রস্ত হচ্ছেন, তার চেয়ে বেশি ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং সে ক্রোধ এতটাই যে যুধিষ্ঠিরের মতো মানুষও তাতে ভয় পাচ্ছেন— তাতেই বুঝি রহস্যটা খুব গভীরে, যা মহাভারতের কবি গান্ধারীর অসামান্য চরিত্রের নিরিখে বলতে চান না।

যা বলতে চান না, সেটা শুনলে আমাদেরও ভাল লাগবে না, কিন্তু তর্কযুক্তিতে মহাভারতের অনুচ্চার শব্দধ্বনি ঠিক বোঝা যায়। ভাল না লাগলেও তা সত্যি। আসল কথা হল— পুত্রের ব্যাপারে এবং তাঁর স্বভাবের ব্যাপারে যতই অসন্তোষ থাক গান্ধারীর, তবু স্নেহ অতি বিষম বস্তু। ধর্ম, ধর্ম এবং ধর্মের ব্যাপারেই গান্ধারীর যত প্রবণতা, যত মাহাত্ম্য চিহ্নিত হোক, তবু অনুপম যে মাতৃস্নেহ, তাতে কুপুত্রের প্রতি শত ধিক্কার সত্ত্বেও তাঁর মমতার শেষ প্রশ্রয়টুকু থেকেই গেছে দুর্যোধনের প্রতি। স্বামীর অপত্যস্নেহে তিনি বারংবার লজ্জিত হয়েছেন, বারবার সাবধান করেছেন, কিন্তু নিজে একবারও কিন্তু বলেননি— তুমি যা করছ করো, আমি পুত্রের মুখদর্শন করতে চাই না। তার মানে কিন্তু এই দাঁড়ায়— পুত্রের অন্যায়গুলি তিনি মেনে নিতে পারছেন না বটে, কিন্তু সে সর্বথা বঞ্চিত হোক, তার মৃত্যু ঘটুক, এটা তিনি মনে মনে চান না, কোনও জননী বা তা চান, এবং এখানে তিনি সাধারণ কুপুত্রের মাতার চেয়ে অধিক নন কিছু।

যুধিষ্ঠির ভয় পাচ্ছেন— অন্যায় যুদ্ধে দুর্যোধনকে মৃত্যুসীমায় নিয়ে যাবার কারণে গান্ধারী ক্রুদ্ধা হবেন, কিন্তু এই মুহূর্তে পাণ্ডবদের ওপর যত অন্যায় করেছেন দুর্যোধন, বিশেষত পাণ্ডব-কুলবধূর ওপর, সেই সব পুত্রকৃত অপমান স্মরণ করলে গান্ধারীর ক্রুদ্ধ হবার এতটুকু কারণও থাকত না, কেননা সে সব অন্যায়ের কথা গান্ধারী নিজমুখেই বলেছেন এক সময়। ঠিক এই নিরিখে দেখতে গেলে এই মুহূর্তে তাঁর ক্রোধতাম্র আচরণ গান্ধারীর চিরচিহ্নিত ধর্মবোধকে খণ্ডিত করে, সেই ধর্মভাবনা যেন ধর্মধ্বজিতায় পরিণত হয়। তবু তাঁকে আমরা ধর্মধ্বজি বলতে পারি না, কেননা মহাভারতের কবি তাঁর প্রখর বাস্তববোধে তথা কবিজনোচিত বেদনাবোধে এ-কথা বোঝেন যে, মাতৃস্নেহের ধর্ম সদসদ্‌বিবেকের নিষ্কারণ ধর্মবোধকে অতিক্রম করে এবং মানুষ বলেই তা করে হয়তো। আর ঠিক সেই কারণেই তিনি এই কঠিন সময়ে উপস্থিত আছেন গান্ধারীর পাশে, যাতে তাঁর পুত্রবধূ এই ভীষণ ধর্মসংকটে শেষ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হন। এমন যেন না হয় যে, গান্ধারী যে স্বাভাবিক ঈর্ষাবশে তাড়িত হয়ে কুন্তীর পূর্বে পুত্র লাভ করার জন্য আপন গর্ভে আঘাত করেছিলেন, আজকে সেই ঈর্ষা, সেই ক্রোধে তিনি চিরকালের জন্য চিহ্নিত হয়ে না যান।

বস্তুত ধৃতরাষ্ট্রের মতো স্পষ্ট করে না হলেও গান্ধারীও চাইতেন না যে, তাঁর পুত্র সর্বথা রাজ্যভাগ থেকে বঞ্চিত হোক। যদি রাজ্যের ব্যাপারে কোনও ক্ষীণ অভিলাষও তাঁর না

থাকত, তা হলে তিনি গর্ভে আঘাত করে কুন্তীর পূর্বে পুত্র চাইতেন না। আর সমস্ত জীবন ধরে পাণ্ডবরা তাঁর পুত্রের দ্বারা অত্যাচারিত হোক— এটা না চাইলেও দুর্যোধন মহাযুদ্ধে হেরে যান অথবা তাঁর মৃত্যু হোক— এমনটাও তাঁর ঈপ্সিত ছিল না। তেমনটা হলে কর্ণের মৃত্যুর পর তিনি হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসতেন না এবং দুর্যোধনের মৃত্যুর পরেও তিনি এত ক্রোধ-তাড়িত হতেন না। ব্যাস তাঁর পুত্রবধূকে চেনেন বলেই গর্ভে আঘাত করার পরে পরেই তিনি যেমন তাঁর কাছে এসেছিলেন, আজকে তিনি সেই দেরিটুকুও করেননি, আজ তিনি প্রথম থেকেই গান্ধারীর পাশে পাশে আছেন, হয়তো বা যুধিষ্ঠিরের আশঙ্কা জেনেই।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কথায় হস্তিনাপুরে উপস্থিত হয়েছেন ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর সামনে। ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেননি। এবং সেগুলি বলে-বলেই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, অন্যায়ী দুর্যোধনের এমন একটা শাস্তি একেবারে প্রাপ্যই ছিল। গান্ধারীকে সান্ত্বনা দেবার সময় কৃষ্ণের শব্দকৌশল আরও সুচতুর, আরও সূক্ষ্ম। কৃষ্ণ বললেন— এখনকার সময়ে আপনার মতো বিশিষ্টা নারী আর একটিও নেই— ত্বৎসমা নাস্তি লোকেঽস্মিন্নদ্য সীমন্তিনী শুভে। আপনার তো মনেও থাকবে— আমি যখন শান্তির প্রস্তাব নিয়ে কুরুসভায় এসেছিলাম, তখন উভয় পক্ষের লোকেরাই অনেক হিতের কথা, ভাল ভাল কথা বলেছিলেন, কিন্তু আপনার ছেলেরা কেউ সে সব কথা শোনেননি— উক্তবত্যসি কল্যাণি ন চ তে তনয়ৈঃ কৃতম্। তারপর আমার সামনেই সেই ঘটনাটা ঘটল। আপনি আমার সামনেই দুর্যোধনকে যথেষ্ট কড়া কথা বলেছিলেন— দুর্যোধনস্ত্বয়া চোক্তো জয়ার্থী পরুষং বচঃ। আপনি দুর্যোধনকে বলেছিলেন— ওরে মূর্খ। আমার কথা শোন— ধর্ম যেখানে জয়ও সেখানে। দেখুন আজকে আপনার সেই কথাটা ফলেছে। আপনি যদি এই ধর্মের ব্যাপারটাই খেয়াল রাখেন, তা হলে সত্যিই আপনার দুঃখ করার কিছু নেই, আর পাণ্ডবদেরও আপনি প্রতিপক্ষ ভেবে নেবেন না, তাঁদের কোনও ক্ষতি হোক— এই চিন্তাও আপনি মাথায় রাখবেন না— পাণ্ডবানাং বিনাশায় মা তে বুদ্ধিঃ কদাচন। আমি জানি, আপনি আপনার মানসিক শক্তিতে, তপস্যার শক্তিতে এই পৃথিবীকেও দগ্ধ করতে পারেন— চক্ষুষা ক্রোধদীপ্তেন নির্দগ্ধুং তপসা বলাৎ।

কৃষ্ণ বাগ্মী বটে, চতুর বক্তাও বটে। গান্ধারীর কথা দিয়েই গান্ধারীকে স্তব্ধ করে দিলেন কৃষ্ণ। দুর্যোধনের মৃত্যুতে যে ভয়ংকর ক্রোধ তাঁর মধ্যে জমা হয়ে উঠেছিল, কৃষ্ণের মধুর-চতুর উক্তিতে তা প্রকাশ করতে পারলেন না গান্ধারী। শুধু বললেন— আমার মনের ব্যথা আমার বুদ্ধি বিচলিত করে দিয়েছিল— আধিভির্দিহ্যমানায়া মতিঃ সঞ্চালিতা মম— কিন্তু কৃষ্ণ! তোমার কথা শুনে আমার বুদ্ধি এখন অনেকটাই স্থির হয়েছে। আমি জানি— তুমি আছ, পাণ্ডবভাইরা সকলে আছে— এখন তো তোমরাই এই পুত্রহীন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র অবলম্বন— ত্বং গতিঃ সহিতৈর্বীরৈঃ... হতপুত্রস্য কেশব। এই কথাটার মধ্যে গান্ধারীর হতাশা, অসহায়তা যত আছে, তার চেয়ে বেশি আছে সেই ক্রোধ, যা কৃষ্ণের বাক্যচাতুরিতে প্রকাশিত হতে পারল না। যিনি এই এতদিন পুত্র দুর্যোধনের অভিমান-মঞ্চের আশেপাশে থেকে শান্তি না পেলেও আঁচটুকু পুইয়েছেন, যিনি শত পুত্রের বিশ্বস্ততায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে, একদিন তাঁর একটি পুত্রও বেঁচে থাকবে না, সেইসব গভীর বিশ্বাস আজ লুপ্ত হয়ে গেছে, আজ তাঁকে নির্ভর করতে হচ্ছে তাঁদের ওপর যারা তাঁকে পুত্রহীনা বলে মায়া করবেন, করুণা করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে মনস্থও করবেন যে— প্রিয় পুত্রদের অহংকারের প্রতিফল পাচ্ছে আজ বুড়ো-বুড়ি। গান্ধারী এই যাতনা বুঝতে পারছেন, তাই কৃষ্ণের কথা বুঝে নিয়েও মুখখানিতে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদতে লাগলেন কৃষ্ণের সামনে— পুত্রশোকাভিসন্তপ্তা... মুখং প্রচ্ছাদ্য বাসসা।

কৃষ্ণ গান্ধারীকে কোনওমতে সামাল দিয়ে চলে গেলেন তাড়াতাড়ি। কেননা অশ্বত্থামার পাণ্ডববংশ-ধ্বংসের ভাবনা গুপ্তচরদের মুখে খবর হয়ে এসেছিল কৃষ্ণের কাছে। কৃষ্ণ চলে গেলেন এবং সেই রাত্রে পাণ্ডবদের ছেলেরা, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী— সকলেই মারা পড়লেন অশ্বত্থামার হাতে। শেষ সকালে মারা গেলেন স্বয়ং দুর্যোধনও। ধৃতরাষ্ট্রের মাথায় পুত্রশোকের বজ্রপাত নেমে এল। একটা সময় পিতা দ্বৈপায়ন ব্যাসের উপদেশে যখন তিনি শান্ত হলেন, তখন সঞ্জয়কে দিয়ে রথ, শিবিকা ইত্যাদি বাহনের ব্যবস্থা করে বিদুরকে আদেশ দিলেন— তুমি গান্ধারীকে, ভরতবংশীয় সমস্ত বিধবাদের এবং কুন্তীকে শিগগির আমার কাছে নিয়ে এসো। বিদুরের প্রয়োজন হল না অবশ্য। পুত্রশোকে আকুল হলেও গান্ধারী কুরুকুলের বিধবা বধূদের সঙ্গে কুন্তীকেও নিয়ে এলেন— সহ কুন্ত্যা যতো রাজা সহ স্ত্রীভিরুপাদ্রবৎ।

ঘটনাটা তেমন গুরুত্ব দিয়ে বললেন না মহাভারতের কবি, তবে আমরা যারা দূর থেকে মহাভারতের বিচিত্র ঘটনাগুলো লক্ষ করছি, তাদের কিন্তু বেশ চোখে পড়ে যে, অনেককাল পরে এই প্রথম গান্ধারী কুন্তীকে সঙ্গে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এলেন। বড় কঠিন শোকের সময় এখন এবং পাণ্ডব-জননী কুন্তী এখন জয়স্থানে আছেন। মহাকাব্যের কবি এ সব তুচ্ছ ঘটনা খেয়াল করেন না, ফলে এতদিন যাঁর কাছে একবারও যাননি সেই কুন্তীকে সঙ্গে করে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যেতে কেমন লাগছিল গান্ধারীর— সে সব কথা এতটুকুও বলেননি মহাভারতের কবি। তিনি সংবেদনশীল মানুষ, এক-একটা চরিত্রের অধিকাংশ গুণের চিহ্ন আঁকাটাই তাঁর কাজ। তিনি তুচ্ছ কথা মনে রাখেন না। এই তো দেখছি— ধৃতরাষ্ট্র তাঁর বিলাপিনী কুলবধূদের নিয়ে, গান্ধারী-কুন্তী সবাইকে নিয়ে হস্তিনার নগর ছেড়ে বেরলেন যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। পথে দেখা হল— কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা এবং কৃতবর্মার সঙ্গে, যাঁরা পাণ্ডবদের সন্তানবীজ ধ্বংস করে পালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। আশ্চর্য লাগে এই সময়— কুরুকুলের অন্যতম গুরু কৃপাচার্য ধৃতরাষ্ট্রকে যত আবেগময়ী ভাষায় সংবাদ দিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি আবেগ প্রকাশ করে কৃপাচার্য গান্ধারীকে তাঁর পুত্রের মৃত্যুর খবর দিয়ে শাস্ত্রীয় সান্ত্বনা দিলেন। কিন্তু তারপরে যেটা কৃপাচার্য বললেন, সেটা আমাদের কাছে পরম আশ্চর্যের।

কৃপাচার্য বললেন— ভীম অন্যায়ভাবে আপনার ছেলেকে মেরেছে শুনে আমরা রাত্রের অন্ধকারে পাণ্ডব-শিবিরে ঢুকে ধুন্ধুমার কাণ্ড করে এসেছি— আমরা দ্রুপদের ছেলেগুলোকে মেরেছি, দ্রৌপদীর ছেলেগুলোকেও মেরে ফেলেছি— দ্রুপদস্যাত্মজাশ্চৈব দ্রৌপদেয়াশ্চ পাতিতাঃ। আপনার ছেলের শত্রুদের এইভাবে বিনাশ করে এসেছি বলে তারা এখন আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমাদের আর এখানে থাকা চলবে না, আপনি

আমাদের অনুমতি করুন, আমরা যাই— অনুজানীহি নো রাজ্ঞি... সংস্থাতুং নোৎসহামহে। তিন জনে তিন দিকে চলে গেলেন বটে, কিন্তু কৃপাচার্য গান্ধারীকে যে খবরগুলি দিলেন, এই প্রতিহিংসার সংবাদ গান্ধারীর কাছে প্রিয় সংবাদ কিনা, সেটা আমাদের বোঝার উপায় নেই। ভীমের অন্যায় আঘাতে পুত্রের মৃত্যু হয়েছে শুনে যিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তিনি কি নিদ্রিত অবস্থায় দ্রৌপদীর পুত্র-বিনাশনের সংবাদ পেয়ে খুশি হলেন? খুশি হলেন কিনা জানা নেই আমাদের, মহাভারতের কবি মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন এই সময়ে, অথচ এটাও তো অনুমানের বিষয় যে, গান্ধারী খুশি হবেন বলেই কৃপাচার্যের এমনতর সংবাদের অবতারণা। অন্যায় হিংসার উত্তরে অন্যায় এই প্রতিহিংসার কথা শুনে গান্ধারী ভালমন্দ কিছুই বললেন না। এও তো বড় আশ্চর্য। আপন অন্তরস্থিত ধর্মবোধে এই মুহূর্তে খুশি হওয়া সাজে না বলেই হয়তো তিনি খুশি হননি, আবার সেই অন্তরস্থিত পুত্রহত্যার প্রতিশোধবৃত্তিও বাইরে প্রকাশ করাটা একান্ত অশোভন বলে তিনি খুশি দেখালেন না এতটুকু। গান্ধারী নিরুত্তরা কেন এত— আমরা তাঁর প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারি না। নাকি সংবেদনশীল মহাকবি তা বুঝতে দিতে চান না।

কৃষ্ণ একটা অদ্ভুত কথা বলেছিলেন ধৃতরাষ্ট্রকে। ধৃতরাষ্ট্র ঠান্ডা মাথায় ভীমকে পিষে মারতে চেয়েছিলেন, কৃষ্ণের কৌশলে পারেননি। কৃষ্ণ তখন বলেছিলেন— আপনি বুদ্ধিমান মানুষ হওয়া সত্ত্বেও নিজেই অন্যায় করে এখন আবার ক্রোধ করছেন। আপনি আমাদের কারও কথা না শুনে দুর্যোধনের কথায় যুদ্ধে নেমেছেন, আপনি স্বাধীন ছিলেন না, দুর্যোধনের কথায় আপনি ওঠা-বসা করেছেন— রাজংস্তং হ্যবিধেয়াত্মা দুর্যোধন-বশে স্থিতঃ— অথচ এখন ভীমকে মারার কথা ভাবছেন। কথাটা গান্ধারীর সম্বন্ধে খাটে না আবার খাটেও। ধৃতরাষ্ট্র সরল মানুষ, তাঁর ক্রোধ প্রকট, ক্রোধের উপশমও ততোধিক প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু গান্ধারীর সমস্ত আচার-ব্যবহার এতই উদাসীন এবং অনুচ্চারিত যে, তাঁর ক্রোধটুকু তাঁর ধর্মপ্রাণতার আড়াল থেকে পৃথক করা কঠিন হয়ে পড়ে। ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত হয়েই যুধিষ্ঠির-ভীমেরা সব গান্ধারীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন এবং গান্ধারীর মনের অবস্থা তখন এইরকম যে, তিনি যুধিষ্ঠিরকেই অভিশাপ দিতে উদ্যত হলেন।

দ্বৈপায়ন ব্যাস এ-কথা পূর্বেই অনুমান করেছিলেন বোধহয়। আমরা দেখেছি— তিনিই বোধহয় এই পুত্রবধূটিকে সর্বাধিক চেনেন। গঙ্গায় স্নান করে ওঠার পরেই তাঁর মনে হয়েছে— বিপত্তি ঘটতে পারে পাণ্ডবদের। তিনি ত্বরায় এসে গান্ধারীর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন— এটা কিন্তু অভিশাপ দেবার সময় নয়, গান্ধারী। এটা এখন ক্ষমা করার সময়— শাপকালম্ অবাক্ষিপ্য ক্ষমাকালমুদীরয়ন্— অতএব গান্ধারী তুমি পাণ্ডবদের ওপর ক্রোধ কোরো না। এবারে একটা অসাধারণ যুক্তি দিয়েছেন দ্বৈপায়ন ব্যাস, যেখানে যুদ্ধের সময় আঠারো দিন ধরে গান্ধারী কীভাবে মানসিক লড়াই করেছেন পুত্রের সঙ্গেই এবং বলা ভাল, পাণ্ডবপক্ষেই, আর ঠিক এইখানেই ধরা পড়ে, কীভাবে সমস্ত খণ্ডিত ক্ষুদ্র বৃত্তিগুলিকে অতিক্রম করে গান্ধারী এক পরম উত্তরণের পথে যান। বুঝতে পারি, কেন দ্বৈপায়ন ব্যাস তুচ্ছ ঘটনাগুলি স্পষ্ট করে বলেন না— অধর্মের বিরুদ্ধে যখন অন্তর্গত ধর্মের লড়াই চলে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন তুচ্ছ ক্ষুদ্র ঘটনাগুলিকে কবিজনোচিত সংবেদনশীলতায় এড়িয়ে যেতেই হয়, নইলে শেষ পর্যন্ত গান্ধারীকে বোঝা যায় না।

গান্ধারী যখন পুত্রশোকে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারছেন না, তখনই এই ক্রোধের উদ্‌গম, তিনি যুধিষ্ঠিরকে পর্যন্ত অভিশাপ দিতে উদ্যত। ব্যাস বলছেন— পাণ্ডবদের ওপর তুমি ক্রোধ কোরো না গান্ধারী! তোমার কি মনে পড়ে— যুদ্ধের এই আঠারো দিন গেছে, প্রত্যেক দিন যুদ্ধযাত্রার কালে দুর্যোধন তোমার কাছে এসে বলত— আমি যুদ্ধে যাচ্ছি, মা! আশীর্বাদ করো— আমার যেন মঙ্গল হয়— শিবমাশংস মে মাতর্যুধ্যমানস্য শত্রুভিঃ। তুমি কিন্তু তখন একদিনও সেই ব্যক্তিগত উচ্চারণ করোনি, বলোনি— যাও বীর, জয়যাত্রায় যাও, তোমার জয় হোক। প্রতিদিন পুত্রের জয়ৈষণার উত্তরে তুমি বলেছ— যাও পুত্র, যেদিকে ধর্ম আছে, সেই দিকেই জয় হবে— উক্তবত্যসি কল্যাণি যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ। ব্যাস আরও বলেছেন— তুমি তো কোনওদিন মিথ্যা বলোনি, চিরকাল সত্য কথা বলেছ, অতএব পুত্র দুর্যোধনের জয়কামনার উত্তরে তুমি নিশ্চয়ই মনে একরকম, মুখে আর এক রকম কথা বলোনি, তুমি ধর্মেরই জয় চেয়েছ— ন চাপ্যতীতাং গান্ধারি বাচং তে বিতথামহম্।

আমরা অন্যত্র জানিয়েছি— আমাদের মহাকাব্যের কবি এমন এক কবি, যিনি শুধু কবিতা লেখেন না, তিনি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের জীবনে অংশগ্রহণ করেন এবং ধর্মের পথে উত্তরণ ঘটানোর জন্য তাঁদের সংশোধন করেন, সময়ে পাশে এসে দাঁড়ান। আজ যখন অন্যায়কারী পুত্রের শোকে গান্ধারী তাঁর সদ্‌বৃত্তের চিত্তপথ থেকে প্রায় বিচ্যুত হতে যাচ্ছেন, সেখানে তাঁর পরমর্ষি শ্বশুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন পুত্রবধূকে ধর্মবৃত্তের মধ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য। ব্যাস বলেছেন— তুমি আগে যাদের ওপর ক্ষমাশীল ছিলে, এখন সেই ক্ষমা তুমি করছ না কেন— ক্ষমাশীলা পুরা ভূত্বা সাদ্য ন ক্ষমসে কথম্। তুমি ধর্ম এবং পূর্বের কথা স্মরণ করে তোমার পুত্রস্থানীয় পাণ্ডবদের ওপর তোমার উদ্‌গত ক্রোধ পরিত্যাগ করো— কোপং সংযচ্ছ গান্ধারী পাণ্ডবেষু তে।

ব্যাসের কথায় প্রকৃতিস্থ হলেন গান্ধারী। আসলে পুরোপুরি ধৃতরাষ্ট্রের মতো না হলেও তাঁর হৃদয়েও সেই দ্বৈরথ খেলা করে। একদিকে কুপুত্র হওয়া সত্ত্বেও সেই বিষম পুত্রস্নেহ, অন্যদিকে ধর্ম। অন্তর্গত ধর্ম তাঁকে যতই স্থির রাখার চেষ্টা করুক, তবু পুত্রস্নেহ, স্বামীর প্রতি মমতা তাঁকে মাঝে মাঝে এক অচিন্ত্য সংকটের মধ্যে এনে ফেলে। তিনি চেষ্টা করেন, পারেন না এবং অবশেষে সাময়িকভাবে পারেন। গান্ধারী ব্যাসকে বললেন— আমি পাণ্ডবদের ওপরে দোষারোপ করি না, তাদের বিনাশও চাই না। আমি জানি— পাণ্ডবরা কুন্তীর কাছে যে রকম, আমার কাছেও তো সেইরকমই, কাজেই তাদের বাঁচিয়ে রাখাটা আমারও উচিত কাজ— যথৈব কুন্ত্যা কৌন্তেয়া রক্ষিতব্যাস্তথা ময়া।

এই অসামান্য বক্তব্য উচ্চারণ করা সত্ত্বেও গান্ধারী কিন্তু ভীমের অন্যায় গদাঘাতটুকু ভোলেননি। সারা জীবন ধরে পুত্রের অন্যায়গুলি তিনি এই মুহূর্তে ভুলে গেলেন এবং উচ্চারণ করলেন সেই কঠিন প্রতিবাদ। বললেন— ভীম আমার দুর্যোধনকে গদাযুদ্ধে আহ্বান করে কৃষ্ণের সামনেই এমন কাজটা করল— কিন্তু কর্মাকরোদ্ ভীমো বাসুদেবস্য পশ্যতঃ। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের ক্ষমতা সম্বন্ধে গান্ধারীর সমস্ত গর্ববোধ জেগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠল। তিনি বললেন— দুর্যোধন গদাযুদ্ধে ভীমের চাইতে অনেক ভাল, অনেক নিপুণ, এবং ভীম সেটা ভালই জানত। দুর্যোধন যুদ্ধক্ষেত্রে গদা হাতে চারদিক দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল, আর ঠিক সেই অবস্থায় ভীম তার নাভির নীচে গদাঘাত করল। এই ব্যাপারটাই আমার ক্রোধ বাড়িয়ে তুলেছে— অধো নাভ্যাঃ প্রহৃতবান্ তন্মে ক্রোধমবর্ধয়ৎ।

বেশ বোঝা যায় গান্ধারীর অনন্ত ধর্মৈষণার তলদেশে অন্যায়কারী পুত্রের সম্বন্ধে তাঁর জননী-স্নেহ এবং গর্ববোধ কম ছিল না। হয়তো প্রশ্রয়ও ছিল, যেটা প্রকটভাবে ধরা পড়ত না সত্যধর্মের জ্বালায়, তবে তাঁর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের পার্থক্য এই যে, যুক্তি-তর্ক, উহ-প্রত্যূহের দ্বারা তিনি যাবতীয় ক্ষুদ্র ভাবনাগুলিকে দূর করে দিতে পারেন এবং পারেন জননীস্নেহ অতিক্রম করে ধর্মবৃত্তে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। এই তো দেখুন, গান্ধারীর এই ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখে ভীমের মতো মানুষও ভয় পেয়েছেন। তিনি সত্য স্বীকার করে বলেছেন— ধর্মই হোক আর অধর্মই হোক, আমি আত্মরক্ষার জন্য এই অন্যায় করেছি। সবচেয়ে বড় কথা, যুদ্ধনীতির সঠিক নিয়ম মানলে আমি কেন, কেউই আপনার ছেলেকে হারাতে পারত না, আর ঠিক সেইজন্যই আমাকে অধর্ম করতে হয়েছে— ন শক্যঃ কেনচিদ্ধন্তুম্ অতো বিষমম্ আচরম্।

ভীম এবার তর্কে এলেন। বললেন— আর অধর্মের প্রশ্নই যদি তোলেন, তবে বলব— মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে তিনি অন্যায় পাশাখেলায় জিতে তাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলেন। আমাদের সকলের সঙ্গে তিনি অনেক প্রতারণা করেছেন, ফলে আমাকেও অধর্মের আশ্রয় নিতে হয়েছে— নিকৃতাশ্চ সদৈব স্ম ততো বিষমম্ আচরম্। দুর্যোধনের অন্যায়ের কথা বলেই ভীম কিন্তু গান্ধারীর মনে আবারও সেই পুত্রগর্ব উদ্দীপিত করে দিয়ে বললেন— বিপক্ষ সৈন্যদের মধ্যে আপনার ছেলেই ছিলেন একমাত্র অবশিষ্ট। এদিকে তাঁর মতো গদাযুদ্ধে নিপুণ ব্যক্তির সঙ্গে আমি পেরে উঠব কেন? কিন্তু তিনি বেঁচে থাকলেও আমাদের অপহৃত রাজ্য পাবার সম্ভাবনা কিছু ছিল না। অতএব অন্যায়টা করতেই হল। এবারে শেষ কথাটা বলতে আরম্ভ করলেন, বলতে আরম্ভ করলেন গান্ধারীর চরম লজ্জার কথাটা। বললেন— আপনার ছেলে দুর্যোধন পাণ্ডব-কুলবধূকে রজস্বলা অবস্থায় এক কাপড়ে টেনে এনে কী কী কথা বলেছিলেন; সে-সব আপনি কিন্তু জানেন— ভবত্যা বিদিতং সর্বং উক্তবান্ যৎ সুতস্তব। সেদিন যত অপ্রিয় ঘটনা ঘটেছিল সব আমি উল্লেখ করছি না, কিন্তু সমস্ত অপ্রিয় এবং অন্যায়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় অন্যায়— আপনার ছেলে উন্মুক্ত রাজসভায় সকলের সামনে পাণ্ডব-বধূকে উরু থেকে কাপড় সরিয়ে বাম উরু দেখিয়েছিল। আমার মতে সেইদিনই সকলের সামনে তাকে আমরা মেরে ফেলতাম, কারণ সেটাই উচিত কাজ ছিল— তদৈব বধ্য যোঽস্মাকং দুরাচারোঽস্ব তে সুতঃ— কিন্তু ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সত্যবদ্ধ থাকায়, সেটা আমরা পারিনি।

প্রত্যক্ষত দুর্যোধনের অন্যায় কর্মগুলি পরপর সাজিয়ে দিলে গান্ধারী সত্যিই আর সহ্য করতে পারেন না, তখন ভাবেন— এমন ছেলের মরণই ভাল। তবু ভীমের কথার মধ্যে তৃপ্তিকর সারটুকু জননীর মোহে-স্নেহে তিনি আস্বাদন করেন। বলেন— বাছা ভীম! তুমি তো তার প্রশংসাই করছ। তুমি তো বলছ— তুমি ওর সঙ্গে পেরে উঠতে না গদাযুদ্ধে,তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে অন্যায় করতে হয়েছে তার নাভির অধোদেশে আঘাত করে। অতএব এটা তার হত্যা নয়, প্রশংসা বটে, তুমি আমার ছেলের প্রশংসাই করছ— ন ত্বমেষ বধস্ত্বাত যৎ প্রশংসসি মে সুতম্। আর তুমি যে-সব অন্যায়ের কথা বললে, সেগুলো তো সে করেইছে। সেখানে কীই বা আমার বলার আছে। তবে হ্যাঁ, দুর্যোধনকে বধ করার জন্য তোমাকে অন্যায়ের আশ্রয় নিতে হয়েছে সেটা না হয় বুঝলাম, কিন্তু এ-ব্যাপারটায় কী তুমি বলবে ভীম, তুমি একটা মানুষ হয়ে দুঃশাসনের বুক চিরে রক্ত পান করলে— অপিবঃ শোণিতং সংখ্যে দুঃশাসনের বুক চিরে রক্ত পান করলে— অপিবঃ শোণিতং সংখ্যে দুঃশাসন-শরীরজম্। এটা কি কোনও ভদ্রলোকের কাজ, নাকি কোনও ভদ্রলোক এই কাজের প্রশংসা করবে। প্রক্রিয়াটা তো অত্যন্ত নৃশংসও বটে, কাজেই এমন অযৌক্তিক কাজটা তুমি করলে কী করে, ভীম?

ভীম জবাব দিলেন। গান্ধারীর শব্দ-ব্যবহার এবং জিজ্ঞাসার কোমলতা থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর ক্রোধ খানিকটা উপশম হয়েছে, দুর্যোধনের অন্যায় কর্মগুলি তিনি মনে মনে মেনে নিতে পারতেন না বলেই সেগুলি উচ্চারিত হলে, তিনি নিজের দোষটুকু বুঝতে পারেন, আর সেইজন্যই এখন ক্রোধ করছেন না বটে, কিন্তু ভীমের কাছে জবাবদিহি চাইছেন— রাগের মাথায় রক্ত খাব বললেই কি এইভাবে কেউ বুক চিরে রক্ত খায়? এ কেমন রাক্ষুসে অসভ্যতা! ভীম বললেন— ঠিকই তো। অন্য মানুষের রক্তই যেখানে পান করা অসম্ভব, সেখানে আমি নিজের রক্ত পান করি কী করে। ভাই তো আমার নিজেরই রক্ত— যথৈবাত্মা তথা ভ্রাতা বিশেষো নাস্তি কশ্চন। ভগবান জানেন, আমি কখনওই দুঃশাসনের রক্তপান করিনি। তবে হ্যাঁ, একটা প্রতীকী ব্যাপার তো ছিলই। আমার হাত দুটো দুঃশাসনের রক্তে নিষিক্ত ছিল এবং সেই রক্ত আমি ঠোঁটে ছুঁইয়েছিলাম, আমার দাঁত এবং ঠোঁটের ওদিকে যায়নি সে রক্ত, কাজেই এমন ভাববেন না যে, আমি রাক্ষসের মতো দুর্বিষহ কোনও অসভ্যতা করেছি— রুধিরং ন ব্যতিক্রামদ্ দন্তৌষ্ঠাদম্ব মা শুচঃ।

ভীম এবার দুঃশাসনের অন্যায়গুলো বলবার পরেই সেই অনুচ্চার্য কথাটা বলে ফেললেন, কেননা গান্ধারীর ধর্মভাবিত বৃত্তির নিরিখে সেই কথাটা আমরা এতকাল বলতে পারিনি। ভীম বললেন— সেই পাশাখেলার আসরে দুঃশাসন পাণ্ডব-কুলবধূ দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধরে রাজসভায় টেনে এনেছিল। সেদিন আমি তার বুক চিরে রক্তপান করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমি সেই প্রতিজ্ঞা পালন করেছি ক্ষত্রিয়ের ধর্মে— ততস্তৎ কৃতবান্ অহম্। দুর্যোধন-দুঃশাসনকে বধ করার জন্য ভীমের বক্তব্যে কোনও অজুহাত কিংবা সাফাই গাওয়া ছিল না, ভীম সব সত্যগুলি উচ্চারণ করার পর এবার গান্ধারীকেই সবচেয়ে বিপদে ফেলে দিলেন। ভীম বললেন— আমরা আগে কোনওদিন তো কোনও অপকার করিনি আপনাদের, কিন্তু আপনার ছেলেরা চিরটা কাল আমাদের ওপর অন্যায় করে গেছে, করেই গেছে। আপনি তো কোনওদিন বারণ করেননি আপনার ছেলেদের— অনিগৃহ্য পুরা পুত্রান্ অস্মাসু অনপকারিষু— অথচ আজকে আপনি আমাদের দূষছেন— কেন আমি আপনার ছেলেদের হত্যা করেছি। আপনি নিজে তাদের অন্যায় কর্মে বারণ না করে আমাকে এভাবে বারণ করতে পারেন না— ন মামর্হসি কল্যাণি দোষেণ পরিশঙ্কিতুম্।

গান্ধারী এমন একটা প্রশ্নের মুখে পড়বেন ভাবেননি বোধহয়। আমরাও এ কথা স্পষ্ট করে বলতে পারিনি গান্ধারীর ধর্মচরিত্রে কলঙ্ক লাগে যদি! কিন্তু এও তো বড় সত্য কথা, একেবারে উদ্যোগপর্বে যুদ্ধ লাগার আগে দুর্যোধনকে বকাবকি করা ছাড়া কোনওদিন কিন্তু গান্ধারী সোচ্চারে বারণ করেননি দুর্যোধনকে। ভীমের কথায় সেইজন্যই তিনি তেমন আহত হলেন না হয়তো। বরঞ্চ এবার যা বললেন, তা অনেক বেশি কারুণ্য জাগায় মনে। গান্ধারী আর তর্ক করছেন না বটে, কিন্তু তাঁর কথা শুনে বোঝা যায়, তাঁর অন্তরের মধ্যেও সেই অহংকারের বীজ আছে, যে বীজ কবে কীভাবে উপ্ত হয়েছে তা তিনি নিজেও ভাল করে জানেন না। গান্ধারী বললেন— তুমি এই অন্ধ বৃদ্ধের একশোটা ছেলেকেই হত্যা করেছ। তুমি অন্তত একজনকে বাঁচিয়ে রাখতে পারতে, তা হলে আমিও তোমাকেও অন্তত সম্পূর্ণরূপে অপরাধী ভাবতাম না— কস্মান্নাশেষয়ঃ কঞ্চিদ্ যেনাল্পম্ অপরাধিতম্। আমরা বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি, আমাদের রাজ্যও চলে গেছে, একটা ছেলেও যদি বেঁচে থাকত আজ, তা হলে ওই দুই বুড়ো-বুড়ির হাতের লাঠি হয়ে সে থাকতে পারত— অন্তত একটা ছেলেকে তুমি বাঁচিয়ে রাখতে পারতে— নাশেষয়ঃ কথং যষ্টিং... বৃদ্ধয়োর্হৃতরাজ্যয়োঃ।

যে গান্ধারী একসময়ে দুর্যোধনকে বলেছিলেন— এ রাজ্য তোমার পাবারই কথা নয়, পিতৃ-পিতামহক্রমে এ-রাজ্য পাণ্ডবদেরই পাবার কথা, সেই গান্ধারী কিন্তু ভীমকে বলছেন— আমাদের রাজ্য চলে গেছে, আমাদের একটা ছেলেও বেঁচে নেই— বৃদ্ধয়োর্হৃতরাজ্যয়োঃ। অর্থাৎ এবার যে পাণ্ডবদের ওপরেই নির্ভর করে থাকতে হবে— এই নির্ভরতা কিন্তু গান্ধারী ভাল করে মেনে নিতে পারছেন না। তার মানে, দুর্যোধনের আচার-আচরণ অহংকারে যতই তিনি ক্ষুব্ধ থাকুন, সেই পুত্রের ওপর নির্ভরতাও তবু তাঁর আত্মমর্যাদার জায়গা ছিল, এবং এখন সে-মর্যাদা তিনি অনুভব করছেন না। হয়তো সেই কারণেই ভীমের পরেই যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করার মধ্যে একটা তির্যক ভঙ্গি প্রকাশ করে ফেললেন গান্ধারী। ক্রোধটা ভীমের যুক্তিতে চাপা পড়েছিল বটে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের উপস্থিতি টের পাওয়া মাত্রেই গান্ধারী সক্রোধে সেই তির্যক শব্দ উচ্চারণ করলেন— তোমাদের সেই রাজা কোথায়— ক্ব স রাজেতি সক্রোধা পুত্রপৌত্রবধার্দিতা।

একবার গান্ধারী বলেছিলেন— আমরা দুই বৃদ্ধ, যাঁদের রাজ্য হরণ করা হয়েছে— বৃদ্ধয়োর্হৃতরাজ্যয়োঃ— আর এখন যুধিষ্ঠিরকে বলছেন— সেই রাজা কোথায়? কিন্তু এই ভয়ংকর যুদ্ধের পরে যুধিষ্ঠিরের এখনও রাজ্যাভিষেক হয়নি প্রথাগতভাবে, তবু এই সম্বোধন। যুধিষ্ঠির কাঁপতে কাঁপতে এলেন গান্ধারীর কাছে, দাঁড়ালেন হাত জোড় করে— তামভ্যগচ্ছদ্ রাজেন্দ্রো বেপমানঃ কৃতাঞ্জলিঃ। সমস্ত দোষ নিজের কাঁধে নিয়ে যুধিষ্ঠির বললেন— সব দোষ আমার। আমিই আপনার পুত্রহন্তা, আমিই এই সমস্ত মৃত্যুর জন্য দায়ী। আপনি আমাকে অভিশাপ দিন জননী— শাপার্হঃ পৃথিবীনাশে হেতুভূতঃ শপস্ব মাম্। গান্ধারী কোনও কথা বললেন না, কারণ এ-রকম করে সমস্ত দোষ নিজের কাঁধে নিয়ে যে অবনত হয়, তাঁকে অভিশাপ দেওয়া যায় না, কিন্তু তবু ক্রোধ সম্পূর্ণ অপগত না হলে উপায়ান্তরের অভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস দীর্ঘতর থেকেই যায়, গান্ধারীরও তাই হল, তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনও কথা বললেন না, শুধু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করতে লাগলেন অন্তর্গত ক্রোধে— নোবাচ কিঞ্চিদ্ গান্ধারী নিশ্বাসপরমা ভৃশম্।

অসহায় যুধিষ্ঠির জননী গান্ধারীর পুত্রশোকে সমদুঃখিত হয়ে তাঁর দুরন্ত ক্রোধ প্রশমনের জন্য অবনত হলেন তাঁর চরণ স্পর্শ করার জন্য। চরণ স্পর্শ করে উঠে দাঁড়াতেই গান্ধারীর পট্টান্তরিত চোখের কোণ থেকে জ্বলন্ত ক্রোধবহ্নি এসে লাগল যুধিষ্ঠিরের পদাঙ্গুলির অগ্রভাগগুলিতে— অঙ্গুল্যগ্রাণি দদৃশে দেবী পট্টান্তরণে সা। হয়তো অলৌকিকতার তুলিতে লেখা হয়েছে গান্ধারীর এই বহ্নি-নেত্রপাত, হয়তো সেই জননীর নেত্রবহ্নিতে যুধিষ্ঠিরের চরণস্থিত সমস্ত পদাঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগ পুড়ে গেল। যুধিষ্ঠিরের নখগুলি নষ্ট হয়ে গেল— ততঃ স কুনখীভূতো দর্শনীয়নখো নৃপঃ। হয়তো অলৌকিকতা নয়, গান্ধারীর চোখে দেখা এই প্রতীকী নেত্রবহ্নির মাধ্যমে মহাকাব্যের কবি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, গান্ধারী চিরকাল যে ধর্মভাবনায় ভাবিত হয়ে স্বভাবত শুদ্ধ হতে চান, মানুষের স্বভাববৃত্তি সেখানে স্ফুরিত হয় নিতান্ত অসচেতনভাবেও। আপনারা যুধিষ্ঠিরকে দেখেছিলেন— সেই দ্যূতসভায় আপন অপরাজিত ধর্মবৃত্তির মধ্যেও তিনি পাশাখেলায় দ্রৌপদীকে পণ রেখেছিলেন, আজ আরও এক ধর্মাধার জননীর চিরন্তন ধর্মবোধের মধ্যেও জাগ্রত হয়ে ওঠে সেই স্নেহান্ধতার আগুন, যা ধর্মের, ধর্মশরীরের পদাঙ্গুলি পুড়িয়ে দেয়।

যুধিষ্ঠিরের পায়ের অবস্থা দেখেই বোধহয় অর্জুনের মতো মহাবীরও কৃষ্ণের পিছনে এসে দাঁড়ালেন। কৃষ্ণসহ পাণ্ডব-ভাইরা সকলেই গান্ধারীর ক্রোধ প্রশমন করার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং গান্ধারীর ক্রোধ অচিরেই শান্ত হল। পাণ্ডবরা ফিরে পেলেন পুরাতন জননীকে। বিদ্বেষশূন্যা গান্ধারীকে রেখে পাণ্ডবেরা এবার গেলেন জননী কুন্তীর কাছে, পুনশ্চ কুন্তী এবং দ্রৌপদী দু'জনকে নিয়ে পাণ্ডবেরা আবারও উপস্থিত হলেন গান্ধারীর কাছে। কুন্তী এবং দ্রৌপদী উভয়কে অঝোরে কাঁদতে দেখে গান্ধারী বিশেষত দ্রৌপদীকে উদ্দেশ করে বললেন— এমন করে কষ্ট পেয়ো না বাছা! তোমরা আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখো— মৈবং পুত্রীতি দুঃখার্তা পশ্য মামপি দুঃখিতাম্। এই ভয়ংকর যুদ্ধ হয়তো কাল-নিরূপিত, স্বাভাবিক। এখন দ্রৌপদী! তুমিও পুত্রহীন, আমিও তাই, আমাদের কে সান্ত্বনা দেবে? আমি তো আমার ছেলেটাকে বারণ করে রুদ্ধ করতে পারিনি এই যুদ্ধ, তাই আমারই দোষে এত বড় বংশটা ধ্বংস হয়ে গেল— মমৈব হ্যপরাধেন কুলমগ্র্যং বিনাশিতম্।

স্নেহ-মমতা, অহংকার-মম-কার— এগুলি এমনই অন্তর্গত বৃত্তি— সহজ এবং গভীর— যে, অন্তঃশক্তি না থাকলে হাজার বাহ্য চেষ্টাতেও এই বৃত্তিগুলি প্রশমিত হয় না। এটা তো ভাবতেই হবে যে, এক জননীর একশোটি পুত্র গতাসু হয়েছে, তাঁর হৃদয়ের অবস্থা কী হতে পারে! তবু যিনি এক সময় নিজের অন্তঃশক্তিতে নিজের দোষটা আবিষ্কার করতে পারেন, তিনি কিন্তু প্রকৃত তপস্বী, তিনি ধর্মের বিষয়ে প্রামাণ্য ব্যক্তিত্ব। লক্ষ্য করলেন কী, মহারাজা যুধিষ্ঠির সমস্ত দোষ নিজের কাঁধে নিয়ে সমস্ত ক্ষতির জন্য নিজেকেই দায়ী করেছিলেন, এই মুহূর্তে গান্ধারীকেও কিন্তু প্রায় একই বিন্দুতে মিলিত হতে দেখছি। তিনি বলছেন— আমারই দোষে এই কুল ধ্বংস হয়ে গেল। আসলে যুধিষ্ঠিরের চাইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গান্ধারী যে অধম স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন, তার কারণ সেই অধম স্থানে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী। ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি পাতিব্রত্য গান্ধারীর ধর্মৈষণায় অন্যতম অন্তরায় হয়ে উঠেছে বলে আমাদের মনে হয়।

৭

পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হবার পর কুরুকুলের সমস্ত বিধবা স্ত্রী, গান্ধারী এবং অন্যান্যদের নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র একসময় কুরুক্ষেত্রের রণস্থলে এসে পৌঁছালেন। সঙ্গে রইলেন পাণ্ডবরা এবং কৃষ্ণ। কৃষ্ণ গান্ধারীর পাশে পাশে আছেন। আশ্চর্য লাগে— দ্বৈপায়ন ব্যাস অনুমতি করছেন— তোমরা যাও, রণস্থল ঘুরে দেখো। যাচ্ছেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র, যাচ্ছেন দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারী, ব্যাস এঁদের দিব্যদৃষ্টি দিয়েছেন সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাবার জন্য। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, যাঁরা জীবন থাকতে প্রিয়জনদের স্পষ্ট দেখতে পেলেন না, তাঁরা মৃত মুখ স্পষ্ট করে দেখার জন্য যাচ্ছেন। ভারতবর্ষের ধর্মটাও এইরকম— মৃত্যুর পর প্রিয়জনের জন্য কাঁদতে দেয় না বেশি, নানা আচার-অনুষ্ঠান, ব্রত-নিয়ম-উপবাসে তিক্ত করতে করতে বুঝিয়ে দেয়— যার জন্য তুমি শোক করছ, সেই শরীরটা নিতান্তই পাঞ্চভৌতিক জড়। এবার তুমি যাও— রণস্থলে প্রিয়জনের ছিন্ন-ভিন্ন-কর্তিত শরীরগুলি দেখো।

আপনারা বললেন— এ তো বড় নিষ্ঠুর নির্দেশ। মহাকাব্যের সংবেদনশীল কবি কেমন করে এমন নির্দেশ দেন। আমরা বলি— তিনি যত বড় কবি, তত বড় দার্শনিক; দার্শনিক-কবি জানেন যে, মৃত্যুর বাস্তবতা যত মুখোমুখি দেখা যায়, মনের মধ্যে বৈরাগ্য তত তীব্রতর হয়, জীবনের নশ্বরতা তত বুদ্ধিগম্য হয়। ভোগবাদী দেশে এমনটি নয়। মৃত্যুকে তারা কফিনে পুরে মাটিচাপা দেয়, মৃত্যুর করুণ চেহারা তারা চোখে দেখতে চায় না। আমাদের মৃত্যু খাটিয়ায় ওঠে, রজ্জুবদ্ধ হয়, চতুর্দোলায় মাথা ইধার-উধার নড়াচড়া করে অবশেষে আগুনের লেলিহান শিখায় আপাদমস্তক রীতিমতো বোধগম্য হতে হতে দগ্ধ হয়— আমরা দেখি, শেষ পর্যন্ত দেখি। এই দেখার মধ্যে যে যন্ত্রণা, সেটা একদিকে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ায়, অন্যদিকে মনকে জানায়— এই শরীরের কোনও মূল্য নেই, যার মূল্য আছে সে হয়তো 'নতুন আলোয় নতুন অন্ধকারে', অথবা কোনও 'নতুন সিন্ধুপারে' নতুন কোনও 'তুমি' অথবা যাকে খুঁজতে হবে, তাও এই শরীর নয়, সে হল সেই মহান আত্মা, যিনি প্রাণের আরাম, আত্মার শান্তি— আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ।

অতএব ব্যাসের নির্দেশে— ততো ব্যাসাভ্যনুজ্ঞাতো ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ— সকলকে নিয়ে রণক্ষেত্র দেখতে চললেন। সকলের সামনে আছেন কৃষ্ণ যিনি সব সইতে পারেন, সব দেখতে পারেন, সব সওয়াতেও পারেন— বাসুদেবং পুরস্কৃত্য হতবন্ধুঞ্চ পার্থিবম্। রণস্থলের কাছাকাছি হতেই কুরুবাড়ির এবং পঞ্চাল-বাড়ির বউ-মায়েরা ঈষদ্‌স্পষ্ট বিভিন্ন শরীর দেখে একে অপরের শরীরের ওপর গিয়ে পড়লেন, কেউ কেউ অচৈতন্যও হয়ে গেলেন। রণক্ষেত্রের চেহারাটা তো ভয়ংকর, মহাকবি এক শব্দে লিখেছেন— প্রলয়-রুদ্রের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৃত্যস্থানের মতো— রুদ্রাক্রীড়নিভং দৃষ্টা তদা বিশয়ানং স্ত্রিয়ঃ— মৃত্যু ছাড়া, হিংসা ছাড়া আর কোনও চিহ্ন সেখানে নেই। মনুষ্য-বীরদের রক্ত-মাংস-কেশে রণস্থল এক বিচিত্র চেহারা ধারণ করেছে। বীরদের রক্তসিক্ত মস্তকশূন্য দেহ কোথাও, কোথাও বা দেহহীন মস্তক— শরীরৈরশিরস্কৈশ্চ বিদেহৈশ্চ শিরোগণৈঃ— হাতির মাথা, ঘোড়ার মাথার সঙ্গে মানুষের মাথা, বিচিত্র প্রাণহীন দেহ— সব একাকার হয়ে গেছে এই যুদ্ধস্থলে। শেয়াল, কাক, হাড়গিলে, শকুনদের মোচ্ছব লেগেছে সমস্ত জায়গাটা জুড়ে। তারা শবভক্ষণ করছে।

যে-সমস্ত রমণীরা পাঞ্চাল-গৃহ বা কুরুবাড়ির স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাসাদ ছেড়ে কোনওদিন বাইরে বেরোননি তেমন করে, তাঁরা তাঁদের বাপ-ভাই, স্বামী-পুত্রদের এমন বীভৎস রূপ দেখে কেউ চৈতন্যহীন, কেউ অসংলগ্ন-বিলাপিনী, কেউ বা একে অপরের গা জড়িয়ে ধরে আলুলায়িত হলেন— শরীরেষ্বস্খলন্যা ন্যপতংশ্চাপরা ভুবি। গান্ধারী এঁদের সকলের মধ্যে ধীর, তাঁর অনন্ত আত্মশক্তি আছে বলেই নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে তিনি সম্পূর্ণ যুদ্ধস্থল দেখতে পেলেন ব্যাসের প্রভাবে অথবা এই মুহূর্তে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি একান্ত পাতিব্রত্য প্রদর্শনের বালাই ছিল না বলেই তিনি তাঁর নয়নের চিরন্তন আবরণটুকু খুলে ফেলেছিলেন নাকি! গান্ধারী কাছে ডাকলেন কৃষ্ণকে— তিনি আরও এক নৈর্ব্যক্তিক দ্রষ্টা, সাক্ষীর মতো সমস্ত ব্যক্তিকেন্দ্র থেকে সরে এসে ঘটনার চেহারা দেখতে পান।

গান্ধারী বললেন— দেখো কৃষ্ণ! বীরমাতা, বীরপত্নীরা রণস্থলের এদিকে-ওদিকে ছোটাছুটি করছেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অভিমন্যুর মতো বীরেরা এখানে পড়ে আছেন। এখানে-ওখানে মাথার মুকুট, কেয়ূর, অঙ্গদ, বলয় এখন রণভূমির অলংকরণ। পড়ে আছে ইতস্তত ধনুক, বাণ, শক্তি, তোমর, গদা— সমস্ত বীরদের বাহু-নিক্ষিপ্ত অস্ত্র-শস্ত্র। রণস্থলের কী বিচিত্র এই সজ্জা দেখে দেখে আমি তো আমার শোক ধারণ করতে পারছি না কিছুতেই— পশ্যামানা হি দহ্যামি শোকেনাহং জনার্দন। গান্ধারীর মুখে যুদ্ধস্থলের যে করুণ অথচ বীভৎস বিবরণ ভেসে উঠেছে, তা যদি এখানে সম্পূর্ণ বর্ণনা করা যেত, তা হলে মহাভারতের কবির প্রতি ঋণ কিছু কমত। কিন্তু আমার সেই অমানুষী ভাষা কোথায়? বিশেষত, অপূর্ব-নির্মাণের কথা ছেড়েই দিলাম, মহাকবির যে বর্ণনা রয়ে গেছে, তাকে যে পূর্ব-নির্মাণ-নিপুণতায় প্রকট করে তুলব তেমন শক্তিও আমার নেই। তবু যা না বললে নয়, সেইটুকু বলেই আমার অক্ষম ঈর্ষার শান্তি ঘটাব।

গান্ধারী কৃষ্ণকে বলেছেন— যে সব বীরেরা দুগ্ধ-শয্যায় শুয়ে থাকত, তাদের দেহ এখন ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। শেয়াল-শকুনেরা এখন মুখ-ঠোঁট দিয়ে তাঁদের গা থেকে অলংকারগুলি টেনে-সরিয়ে খাবার জায়গা খুঁজে নিচ্ছে। অনেক বীরদের হাতের ধনুক-বাণ-তরবারি মৃত্যুকালেও এমন অবিকল, যেন মনে হচ্ছে এই তাঁরা যুদ্ধে যাবেন— যুদ্ধাভিমানিনঃ প্রীতা জীবন্ত ইব বিভ্রতি। গান্ধারীর সবচেয়ে খারাপ লাগছে কুরুবাড়ির বউদের দেখে। কেউ বিলাপ বন্ধ করে সম্ভাবিত প্রিয়জনের দিকে দৌড়ে যাচ্ছেন, কেউ নিজেই এত বিলাপ করছেন যে, অন্য রমণীর বিলাপশব্দের কোনও অর্থ খুঁজে পাচ্ছেন না। দুর্বিষহ ব্যথায় আকুল হয়ে উঠছে গান্ধারীর মন— তিনি দেখছেন— কতকগুলি রমণী ছিন্ন কর্তিত দেহের সঙ্গে এক একখানি অসংলগ্ন মস্তক জুড়ে আছে দেখে হঠাৎ অসম্ভাবনায়

চেঁচিয়ে উঠে বলছেন— এই মাথাটি তো এই দেহের নয়— শিরঃ কায়েন সন্ধ্যায় প্রেক্ষমাণা বিচেতসঃ— অথচ অভীষ্ট যে মস্তকটি দেহের সঙ্গে জুড়ে দিলে দেহ সম্পূর্ণ হয়, সেটাও তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না। এই অবস্থায় কেউ দেহশূন্য মাথা অথবা মাথা ছাড়া দেহটি দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়ছেন— বিশিরস্কান্ অথো কায়ান্... বিদেহানি শিরাংসি চ।

সমস্ত রণস্থল ছিন্ন মস্তক, ছিন্ন বাহু, অস্ত্র-শস্ত্র, মৃত পশুতে প্রায় অগম্য হয়ে উঠেছে। আঠেরো দিনের যুদ্ধ, আঠেরো দিনের রক্ত, কত শত মনুষ্যদেহ পচে-গলে এমন অবস্থা হয়েছে যে, কিছুই চেনা যাচ্ছে না, রণক্ষেত্রে পা ফেলে এগোনোও যাচ্ছে না ভাল করে— অগম্যকল্পা পৃথিবী মাংসশোণিত-কর্দমা। এমনি করেই যেতে যেতে গান্ধারী এক সময় দুর্যোধনের কাছে এসে পৌঁছালেন। দুর্যোধনকে দেখামাত্রই গান্ধারী তাঁকে জড়িয়ে ধরে 'বাছা আমার', 'ছেলে আমার', 'কোথায় লেগেছে' বলে অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে— হা-হা পুত্রেতি শোকার্তা বিললাপাকুলেন্দ্রিয়া। সম্মুখে-থাকা কৃষ্ণ অনেক কষ্টে তাঁকে তুলে চৈতন্য সম্পাদন করলে গান্ধারী বললেন— জানো কৃষ্ণ! আমার এই ছেলে যুদ্ধের প্রতিটি দিন এসে আমায় বলত— এই ভয়ংকর জ্ঞাতিযুদ্ধে আমার জয় হোক মা, তুমি আশীর্বাদ করো— অস্মিন্ জ্ঞাতিসমুদ্ধর্ষে জয়মম্ব ব্রবীতু মে। আমি প্রতিদিনই বুঝতাম— ওর বিপদ ঘনিয়ে আসছে, তবু সত্যে স্থির হয়ে আমি বলতাম— যে পক্ষে ধর্ম, সেই পক্ষেই জয় হবে। আর বলতাম— যুদ্ধ করার সময় তুমি যেন অসাবধান হোয়ো না বাছা! খুব সতর্ক থেকো— যথা ন যুধ্যমানস্ত্বং ন প্রমুহ্যসি পুত্রক। সেই ছেলে, আজ তার এই অবস্থা। তবু তার জন্য আমি শোক করি না, সে তো চলেই গেছে, কিন্তু তার ওপরে নির্ভর করে যে বেঁচে রইল, সেই ধৃতরাষ্ট্রের জন্যই আমার সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছে— ধৃতরাষ্ট্রন্তু শোচামি কৃপণং হতবান্ধবম্।

এ-কথা বড় সত্য, বড়ই বাস্তব। যে পরপারে চলে গেল, সে ক্ষতি যে পূরণীয় নয়, সে-কথাটা মানুষ যে কোনও মৃত্যুর পরেই বুঝতে পারে। কিন্তু যাঁরা বেঁচে রইলেন, প্রয়াত ব্যক্তির ওপর তাঁদের নির্ভরতা এবং দুর্বলতার নিরিখে তাঁদের জন্যই দুঃখ হয় বেশি। তবু সেই শোকের মধ্যে সামান্য কিছু মৌখিকতা আছে, আছে বেঁচে থেকে দেখার জ্বালা। বস্তুত, প্রিয়জনের মৃত্যুর চাইতে অধিক কিছু নেই। না হলে এরপরেই গান্ধারীর মতো মনস্বিনী মাতা পুত্র দুর্যোধনের সম্বন্ধে পূর্বস্মৃতিতে এত কথা বলতেন না। এই ছেলের জন্যই কুরুকুলের সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে, এ কথা বারবার মুখে বললেও পুত্রের সম্বন্ধে গান্ধারীর গর্ববোধ কম নেই। গান্ধারী বলছেন— কালের কী পরিবর্তন দেখো কৃষ্ণ! যে ছেলে আমার সমস্ত বড় বড় রাজার মাথার ওপর বসে থাকত, সবার আগে তার নাম— যোহয়ং মূর্ধাভিষিক্তানাম্ অগ্রে যাতি পরন্তপঃ— সে আজকে ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। কত সুন্দরী সুন্দরী মেয়েরা দুর্যোধনের দৈনন্দিন সেবায় নিযুক্ত থাকত এতকাল, আজ শেয়াল-শকুনে সেই সেবা করছে, ময়ূর-পুচ্ছের শান্ত ব্যজন আজ শকুনের পাখার হাওয়ায় রূপান্তরিত। একথা মানছি, কৃষ্ণ! মূঢ়-মন্দ দুর্যোধন পিতার কথা, বিদুরের কথা অগ্রাহ্য করে মৃত্যুর মুখ দেখেছে আজ, কিন্তু এও মনে রেখো— এই দুর্যোধন এগারো অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল, এই দুর্যোধনের অধীনেই কিন্তু তেরোটা বচ্ছর ধরে এই পৃথিবীর নিষ্কণ্টক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিকার বর্তমান ছিল— নিঃসপত্না মহী যস্য ত্রয়োদশ সমা স্থিতাঃ। আজ সে মাটিতে ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে বটে, কিন্তু এই দুর্যোধন যখন রাজ্যশাসন করত, তখন আমাদের হাতিশাল, ঘোড়াশাল এবং গোশালা ভরে উঠেছিল প্রাচুর্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, আমি বেশিদিন এই ঐশ্বর্য দেখতে পেলাম না— বার্ষ্ণেয় ন তু তচ্চিরম্। যে রাজ্য আগে দুর্যোধন শাসন করত, সেই রাজ্যেই আজ অন্যের শাসন নেমে এসেছে— তামেবাদ্য মহাবাহো পশ্যাম্যন্যানুশাসনাম্— আজ কোথায় সেই হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে একটাও ঘোড়া নেই। শুধু আমি বেঁচে আছি, কেন যে বেঁচে আছি কে জানে— হীনাং হস্তিগবাশ্বেন কিং নু জীবামি মাধব।

বড় অদ্ভুত লাগে এইসব সময়। বেশ বুঝতে পারি, এইসব সত্য গান্ধারীর অবচেতন থেকে নির্গত হচ্ছে। অথচ এতদিন তাঁকে দেখেছি, বড় চাপা স্বভাব গান্ধারীর। অন্তর্মুখীন ভাল-লাগা এবং মন্দ-লাগা ভাল করে বাক্যে প্রকট হয়ে ওঠে না। আগে কি একবারও বুঝেছি যে, দুর্যোধন পাণ্ডবদের কপটপাশায় বনবাসে পাঠিয়ে তেরোটা বছর ধরে যেভাবে নিরঙ্কুশ রাজ্য-ভোগ করলেন, গান্ধারী সেটা একেবারেই উপভোগ করছেন না। তখন এই অন্যায় রাজ্যপাটে গান্ধারী পরম দুঃখিতা হয়ে থাকলে, আজকের এই ক্ষুব্ধ উচ্চারণ স্বাভাবিকভাবেই সত্য নয়, গান্ধারী বলছেন— আমি সেই ঐশ্বর্য বেশি দিন দেখতে পেলাম না— বার্ষ্ণেয় ন তু তচ্চিরম্। আসলে ধৃতরাষ্ট্র যা প্রকটভাবে পারেন, গান্ধারী সেটা প্রকটভাবে পারেন না, কেননা তাঁর অন্তর্গত ধর্মবোধে সেটা বাধে। জতুগৃহে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার ব্যাপারে ধৃতরাষ্ট্র সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন দুর্যোধনের পাশে, কপট পাশা-খেলানোর ব্যাপারেও তাই। এইসব অন্যায় গান্ধারী কিছুতেই মানতে পারেন না বটে, কিন্তু ছেলে যখন নিরঙ্কুশ রাজা হয়ে বসে, তখন পুত্রের গরিমাটুকু তিনি উপভোগ করেন— সেটা কি জননীর অবুঝ স্নেহ-গরিমা থেকে। আজকে কী অদ্ভুত লাগছে গান্ধারীর মুখে এই কথাটা— তিনি যে পাণ্ডবদের, বিশেষত যুধিষ্ঠিরের ধর্মবোধে আপ্লুত হন, সেই পাণ্ডবরা তো পুত্রপ্রতিম তাঁর কাছে, অথচ দুর্যোধনের অন্যায়াধিকৃত রাজ্য আজ যখন পুত্রপ্রতিম পাণ্ডবদের হাতে যাচ্ছে, তখন গান্ধারী বলছেন— আজ সেই রাজ্যে অন্যের শাসন নেমে আসছে— তামেবাদ্য মহাবাহো পশ্যাম্যন্যানুশাসনাম্। গান্ধারী যে ধর্মবোধে সারা মহাভারত জুড়ে চিহ্নিত হয়েছেন, সেখানে এই কথাগুলি বুঝিয়ে দেয়, তিনিও মানুষ, যে মানুষের মধ্যে ঈর্ষা-অসূয়ার দোলা-চলা এখনও কাজ করে, দুর্যোধনকে তিনি অন্যায়ী জানেন, তবুও সেই অসূয়ার পক্ষপাত কাজ করে। কেমন যেন মনে হয়, তাঁর অন্তর্মুখী স্বভাবের মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল, যাকে সরাসরি প্রশ্রয় বলতে পারি না হয়তো, কিন্তু সেটা তার চিহ্নিত ধর্মস্বরূপকে পরোক্ষে বিদ্ধ করে।

দুর্যোধনের মৃতদেহের সামনেই বসেছিলেন তাঁর স্ত্রী। গান্ধারী তাঁর নাম বলেননি। বলেছেন— লক্ষ্মণের মা— তিনি দুর্যোধনের কোলের কাছে বসে বিলাপ করছেন। পুত্রবধূকে দেখে, তাঁর আকুল অবস্থা দেখে গান্ধারীর শোক চরমে উঠল। আস্তে আস্তে তাঁর নজর পড়ল কুরুকুলের অন্যান্য রমণীদের দিকেও। দেখতে পেলেন কুমার দুঃশাসনকে— তিনি এই বাহু ঊর্ধ্বে প্রসারিত করে রণক্ষেত্রে শুয়ে আছেন। গান্ধারীর মনে পড়ল

দ্যূতসভার কথা— দুঃশাসন কীভাবে দ্রৌপদীকে দাসী বলে অপমান করেছিলেন। তাঁর এও মনে পড়ল— তিনি অনেক বারণ করেছিলেন দুর্যোধনকে। বলেছিলেন— তুমি দুর্বুদ্ধি শকুনির সঙ্গ ত্যাগ করে পাণ্ডবদের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করো। কেউ শোনেনি— দুর্যোধন যা করেছিলেন, দুঃশাসন যা বলেছিলেন, আজ তার ফল পাচ্ছেন দু'জনেই। ভীম তাঁদের শাস্তি দিয়েছেন এইভাবে। দুঃশাসন যেভাবে হাত ছড়িয়ে শুয়ে আছেন রণক্ষেত্রে— বিক্ষিপ্য বিপুলৌ ভুজৌ— তাতেই বুঝি গান্ধারীর মনে হচ্ছে— ভীম যেন তাঁর সমস্ত অঙ্গ থেকে রক্ত চুষে খেয়েছেন— পীতশোণিত-সর্বাঙ্গো ভীমেন যুধি পাতিতঃ।

গান্ধারী কৃষ্ণের পাশে পাশে আরও কয়েকটি ছেলের মৃতমুখ দেখে কষ্ট পেলেন। বিকর্ণ পড়েছিলেন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে। তাঁর স্ত্রী তাঁর পাশে বসে যত-না শোক করতে পারছেন, তার চেয়ে বেশি তাঁকে ব্যস্ত হতে হচ্ছে মৃতমাংস-লোলুপ শকুন তাড়ানোর জন্য— বারয়ত্যনিশং বালা ন চ শক্নোতি মাধব। আর এক পুত্র দুর্মুখ এমনভাবে রণস্থলে শায়িত যে তাঁর মুখখানিও ভাল করে চিনতে পারছেন না গান্ধারী। তাঁর অর্ধেক মুখ শেয়ালে-শকুনে খেয়ে ফেলেছে— অস্যৈতদ্ বদনং কৃষ্ণ শ্বাপদৈরর্ধভক্ষিতম্। একে একে কুমার চিত্রসেন, বিবিংশতি, দুঃসহ— এত সব পুত্রের বীভৎস মৃত্যু দেখে গান্ধারী এবার অভিমন্যুর কাছে এলেন, শুনতে পেলেন তাঁর স্ত্রী উত্তরার করুণ বিলাপ। গান্ধারী আর ধৈর্য রাখতে পারছেন না। দুর্যোধনের অভিন্নহৃদয় বন্ধু কর্ণের ওপরেও তাঁর মায়া কম নয়, হিংস্র পশু-পাখি তাঁর শরীরের অনেকটাই খেয়ে ফেলেছে, তবু সেই অবশিষ্ট শরীরের মধ্যেই মহাবীর কর্ণের যুদ্ধোচ্ছল পূর্ব-চিত্র কল্পনা করলেন গান্ধারী।

গান্ধারী অনেক দেখলেন একে-একে। দ্রোণ, শল্য, শকুনি, ভূরিশ্রবা, দ্রুপদ, বিরাট— শত্রু-মিত্রের সব দেহ একাকার হয়ে গেছে এই রণক্ষেত্রে। গান্ধারীর এই মৃত্যু-বর্ণনার মধ্যে যেমন যেমন তাঁর পুত্র-পৌত্রেরা ছিলেন, তেমনই ছিলেন পাণ্ডব-পক্ষের প্রিয়জনেরাও এবং ছিলেন অন্য দেশীয় রাজারাও। একটা সময়ে দেখছি— গান্ধারী যেন একটু ঈর্ষাই বোধ করছেন পাণ্ডবরা সবাই স্বচ্ছন্দে সুস্থ অবস্থায় বেঁচে আছেন বলে। একে একে প্রত্যেকটি মহার্ঘ্য মৃত্যুর সূক্ষ্ম পরিচয় দেবার পরেই গান্ধারী কৃষ্ণকে বললেন— তুমি এবং তোমাকে নিয়ে সমস্ত পাণ্ডবরাই বোধহয় অবধ্য— অবধ্যা পাণ্ডবাঃ কৃষ্ণ সর্ব এব ত্বয়া সহ— নইলে ভীষ্ম-দ্রোণ, কৃপ-কর্ণ, অশ্বত্থামা-জয়দ্রথ-কৃতবর্মার মতো বীরদের অস্ত্র-হস্তের কবল থেকে যাঁরা বেঁচে ফিরেছেন তাঁরা তো অবধ্য বটেই— যে মুক্তা দ্রোণ-ভীষ্মাভ্যাং কর্ণাৎ বৈকর্তণাৎ কৃপাৎ। অথচ এঁদের দেখো, মহাকালের কী বিশাল বিপরিণাম দেখো— যাঁরা নাকি দেবতাদেরও বধ করতে পারতেন, তাঁরা সব এখানে মরে পড়ে আছেন— ত ইমে নিহতাঃ সর্বে পশ্য কালস্য পর্যয়ম্।

হয়তো এমনই হয় শোকাকুল অবস্থায় অথবা মার খেতে খেতে, দুঃখ পেতে পেতে। এক-একটা মানুষকে এখনও দেখতে পাই— অর্থ আছে, অভিজাত মানুষ অথচ সংসারের বিচিত্র রঙ্গে মার খেতে খেতে বলে ওঠেন— কী কম ছিল আমার ওদের চাইতে, অথচ ওরা এমন সুখে থাকবে কেন! এই দুঃখ, এই কষ্ট যে কখন কীভাবে তৈরি হয়ে যায়, কেউ জানে না— কখনও সে দোষ নিজের মধ্যেই থাকে, কখনও অপরের মধ্যে, কখনও দুয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যেই। এই যে গান্ধারী কষ্ট পাচ্ছেন— এর কারণ তিনি নিজে সৃষ্টি করেননি, কারণ সৃষ্টি করেছে তাঁর ছেলে, ইন্ধন জুগিয়েছেন তাঁর স্বামী এবং তিনি নিজে খানিকটা উদাসীন প্রশ্রয়ে অন্তর্মুখী হয়েছেন। কিন্তু ফল যা হয়েছে, তা এতটাই বিবাদজনক যে, এই মুহূর্তে সেই বিচিত্র সুপ্ত অসূয়া তাঁর মনের মধ্যে কাজ করছে— অথচ এরা সবাই বেঁচে রইল, ধ্বংস হল আমার সব— আত্মীয়, স্বজন, বংশ।

এক সময়ে গান্ধারী এতটাই ক্ষুব্ধ হলেন যে, তাঁর মনে হল— এই তাঁর পাশের মানুষটি, যিনি এতক্ষণ ধরে তাঁর অনন্ত দুঃখের, অনন্ত মৃত্যুর মধ্যে পাশে পাশেই হেঁটে চলেছেন সমস্ত সহানুভূতি নিয়ে, এই কৃষ্ণই সবকিছুর জন্য দায়ী। কৃষ্ণের ওপর সব রাগ গিয়ে পড়ল গান্ধারীর। তিনি বললেন— তোমার শান্তির প্রস্তাব ব্যর্থ হয়ে গেল দেখে তুমি যখন ভাঙা মনে উপপ্লব্যে ফিরে গেলে, আমি সেদিনই বুঝেছিলাম যে, আমার ছেলেরা যতই বলবান হোক তারা মারা গেছে— তদৈব নিহতাঃ কৃষ্ণ মম পুত্রাস্তরস্বিনঃ। কেন জানি না, সেদিনই মহামতি ভীষ্ম এবং বিদুর আমাকে ডেকে বলেছিলেন— দেবী! তোমার এই ছেলেগুলোর ওপর একেবারেই স্নেহ-মায়া রেখো না— তদৈবোক্তাস্মি মা স্নেহং কুরুষ্বাত্মসুতেষ্বিতি।

ভীষ্ম-বিদুরের কথার অর্থ হতে পারে দু-রকম। প্রথমত, যুদ্ধের উদ্যোগকালে দুর্যোধন যেভাবে নিজের শক্তিতে অটল থেকে পাণ্ডবদের এবং কৃষ্ণের আন্তরিক শান্তিপ্রস্তাব উড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে ভীষ্ম-বিদুর বলে থাকবেন— তোমার ছেলেদের ওপর তোমার স্নেহই তাদের কাল হয়েছে, শাসন করো, তীব্র শাসন করো তাদের। আর দ্বিতীয় অর্থ— দুর্যোধনের হঠকারিতায় কৃষ্ণ যে-ভাবে প্রায় অপমানিত হয়ে ফিরে গেলেন, তাতে ভীষ্ম-বিদুর নিশ্চিত বুঝে গেলেন যে, যুদ্ধ হবেই এবং সে-যুদ্ধ হলে এতকাল ধরে অপমানিত হয়ে-থাকা পাণ্ডবরা অবশ্যই প্রতিশোধ নেবেন। অতএব গান্ধারীর প্রতি ভীষ্ম-বিদুরের প্রস্তাব— আর মায়া বাড়িয়ো না। যত মায়া বাড়াবে দুঃখ পাবে। গান্ধারী যেভাবে কথা বলছিলেন, তাতে মনে হয়— দ্বিতীয় অর্থকল্পই প্রাসঙ্গিক, কারণ তিনি নিজেও ভেবেছিলেন— কৃষ্ণের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হওয়া মানেই এবার যুদ্ধ এবং কৃষ্ণের মতো ধুরন্ধর রাজনীতিবিদের সহায়তা মানেই সে পক্ষের জয় অনিবার্য। গান্ধারী তাই কৃষ্ণের কাছেই শেষ খেদোক্তি করে বললেন— যেদিন তুমি চলে গেলে এবং যেদিন ভীষ্ম-বিদুর আমাকে মায়া ছাড়তে বলেছিলেন, সেদিনই আমার ছেলেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে গেছে, তারা মারা গেছে সবাই— অচিরেণৈব পুত্রা মে ভস্মীভূতা জনার্দন।

এতক্ষণ একের পর এক শবদেহ অনুপুঙ্খ দেখা, তাও আবার আপন পুত্রদের শব, পুত্রবধূদের মর্মন্তুদ রোদন, গান্ধারী আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন রণস্থলেই। তবে জ্ঞান ফিরে পেতে তাঁর দেরি হল না। আসলে অবচেতন মনে হয়তো অনেকক্ষণ ধরেই এই পাশের মানুষটির প্রতি রাগ হচ্ছিল। আসলে পাশের মানুষটি যে বড় বিশালবুদ্ধির মানুষ। তিনি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ— চতুর্বর্গকে বড় বিশাল দৃষ্টিতে বোঝেন, আর বোঝেন সাময়িক প্রয়োজন এবং দূরভবিষ্যৎ। গান্ধারী খুব ভালভাবে জানেন যে এই মানুষটি যদি চিরকাল পাণ্ডবদের পাশে থেকে সহায়তা না করতেন, তা

হলে এইভাবে অক্ষত থেকে সকল পাণ্ডবেরা এইভাবে যুদ্ধপথ পেরিয়ে আসতে পারতেন না। অথচ গান্ধারীর সব গেছে— একশো ছেলের একটিও বেঁচে নেই। অতএব চেতনা ফিরতেই তাঁর এতক্ষণের অবদমিত সমস্ত ক্রোধ গিয়ে পড়ল কৃষ্ণের ওপর। পুত্রশোকে তাঁর চিত্ত অধীর, ক্রোধে তাঁর শরীর জ্বলে যাচ্ছে— ততঃ কোপপরীতাঙ্গী পুত্রশোকসমন্বিতা। তাঁর মনে হল— তাঁর নিজের যে ক্ষতি হয়েছে এবং যে ক্ষতি তাঁকে মনশ্চক্ষুতে দেখতে হয়েছে, অনুভব করতে হয়েছে, সেই ক্ষতি অন্তত সেই বিশেষ মানুষটিরই হোক, যিনি আপন পক্ষকে মসৃণভাবে সুস্থিত রাখতে পেরেছেন।

গান্ধারী বললেন— কৃষ্ণ! তুমি কিন্তু পারতে; একমাত্র তুমিই পারতে এই ভীষণ যুদ্ধ বন্ধ করতে। পাণ্ডব-কৌরবরা যখন পরস্পর ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেদের বিনষ্ট করতে উদ্যত হল, তখন তুমি কেমন উদাসীন সাক্ষীর মতো হয়ে গেলে। কেন, কেন এমন করলে তুমি— উপেক্ষিতা বিনশ্যন্ত্ব স্বয়া কস্মাজ্জনার্দন। তুমি তো সমর্থ ছিলে, তোমার ক্ষমতা ছিল, তোমার কথা শোনবার লোক ছিল, বিশাল সৈন্যবল ছিল তোমার— তা তুমি কেন এমন করে উপেক্ষা করলে এই যুদ্ধ। কৃষ্ণের ক্ষমতা সম্বন্ধে গান্ধারী যেটা বলছেন, তার মধ্যে খানিকটা রাজনৈতিক অনুবন্ধ আছে। তার থেকে ব্যক্তি-সম্পর্কগুলি অনেক বেশি সযৌক্তিক হয়ে ওঠে বলে গান্ধারী বললেন— তোমার সঙ্গে কুরুকুল এবং পাণ্ডবকুল— দুই কুলেরই সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়, ফলে তুমি যদি তেমন করে যুদ্ধ বন্ধ করতে চাইতে তা হলে দু'পক্ষই তোমার কথা শুনত— উভয়ত্র সমর্থেন শ্রুতবাক্যেন চৈহ হি। এরপরেও যখন তুমি শুধু কুরুকুল-ধ্বংসের ব্যাপারেই উদাসীন হয়ে রইলে, তখন বুঝি, ইচ্ছে করেই তুমি এটা করেছ— ইচ্ছতোপেক্ষিতো নাশঃ কুরূণাং মধুসূদন।

আমরা জানি— ইচ্ছে করে কৃষ্ণ এ-কাজ করেননি। এটা অবশ্যই ঠিক যে, সেই জতুগৃহদাহ থেকে আরম্ভ করে কপট পাশা এবং বনবাস দুঃখের যে যন্ত্রণা পাণ্ডবদের ওপর দিয়ে গেছে, তাতে একেবারে শেষ কল্পে তাঁর মনে হতেই পারে যে, আর সহ্য করা নয়, এবার চরম আঘাত করা উচিত। কিন্তু সহ্য তো তিনিও কম করেননি। আন্তরিকভাবে শান্তির প্রস্তাব করেও যিনি পাণ্ডবদের জন্য পাঁচখানি গ্রাম পর্যন্ত জোগাড় করতে পারেননি এবং নিজেও যেখানে বন্দি হবার আশঙ্কায় ছিলেন দুর্যোধনের হাতে, সেখানে তাঁর মতো বিশালবুদ্ধি মানুষের দিক থেকে যুদ্ধ এড়িয়ে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। এটা ঠিকই, কৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধ চেয়েইছিলেন। স্পষ্টত নয়, তবে পাণ্ডবদের ওপর অন্যায় বঞ্চনা এবং অপমান আর তিনি সইতে পারছিলেন না। কিন্তু দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারী অন্যায়কারী পুত্রের জননী, অত্যাচারী রাজার গর্ভধারিণী, শত ধর্মবোধ থাকা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি যে, তাঁর পুত্রকৃত অন্যায়-অপমান এবং অসভ্যতা নিয়ন্ত্রণের শেষ বিন্দুটা কোথায়। ইচ্ছা করলেই যে কৃষ্ণ দুর্যোধনের মতো অহংমন্য মানুষকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেন না সেটা গান্ধারী বোঝেন না বলেই, তিনি কৃষ্ণকে বললেন— এর ফল তোমাকে পেতে হবে— ফলং তস্মাদ্ অবাপ্নুহি। তুমি যখন ইচ্ছে করেই বিনাশে প্রবৃত্ত দুই যুযুধান শিবিরকে উপেক্ষা করেছ, তাই আমার অভিশাপ তোমাকে সইতে হবে— আমার যেমন হল, তেমনি তোমার বংশও ধ্বংস হবে। আজ থেকে ছত্রিশ বছর পরে মন্ত্রী, অমাত্য, ভাই-বন্ধু ছেলে সব হারিয়ে তোমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুৎসিত উপায়ে মরতে হবে। তোমার বাড়ির বউরাও আমার বাড়ির বউদের মতো মাটিতে পড়ে কাঁদবে— স্ত্রিয়ঃ পরিপতিষ্যন্তি যথৈব ভরতস্ত্রিয়ঃ।

গান্ধারীর এই অভিশাপটুকু কতটা সত্য, তাতে আমার সন্দেহ আছে। তবে মহাকাব্যের কবি যখন এই অভিশাপ বর্ণনা করেন তখন তাঁর মধ্যে একটা মহাকাব্যিক অভিসন্ধি কাজ করে। একদিকে এই অভিশাপ গান্ধারীর ধর্মবোধের অন্তরাল থেকে তাঁর অবুঝ মনটাকে প্রকট করে তোলে, অপরদিকে তা মহাকাব্যের ঘটনা সমন্বয় করে, কৃষ্ণের মতো বিশালবুদ্ধি মানুষের নিতান্ত মানবিক মহাপ্রয়াণের ঘটনাটাকে এই অভিশাপ সযৌক্তিক করে তোলে। যিনি নিজের অযোগ্য পুত্রকে তেমন করে কোনওদিন বাক্যের শাসনে নিয়ন্ত্রণ করেননি, তাঁর এই অভিশাপ দেওয়ারও যে যোগ্যতা নেই, সে-কথা কৃষ্ণের বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। দ্বিতীয়ত কৃষ্ণের নিজের ঘরে তাঁর ভাই-বন্ধু-আত্মীয়ের মধ্যে যে জ্ঞাতিবিরোধ অনেক দিন ধরে বাসা বাঁধছে, তার ফলেই যে তাঁর নিজের বংশ ধ্বংস হবে এবং তার জন্য গান্ধারীর বাড়তি একটা অভিশাপের প্রয়োজন নেই, সেটা কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আবার কৃষ্ণের এই বিপরীত প্রতিক্রিয়ারও একটা মহাকাব্যিক অভিসন্ধি আছে। গান্ধারীকে কেউ কোনওদিন দোষারোপ করেনি, করার সাহসও নেই কারও। তাঁর সমস্ত আচার-ব্যবহার এবং জীবনযাত্রার মধ্যে ধর্মের, ধর্মবোধের একটা প্রকট আবরণ আছে; সেটা যে নিতান্তই বাহ্য কোনও আবরণ বা তা নিতান্তই লোক-দেখানো অথবা তা একান্তই কোনও তথাকথিত আড়ম্বর, তাও আমরা বলতে পারি না। মহাভারতের কবি দেখাতে চান— গান্ধারীর মতো এমন গভীর ধর্মপ্রাণতার অন্তরালেও পুষ্পে কীটসম তৃষ্ণা জেগে রয়। মহাভারতের বিশাল-হৃদয় কবি দেখাতে চান যে, পুত্রস্নেহ এবং স্বার্থভাবনা এমনই এক বিষম বস্তু, যা সারা জীবন ধরে সেবিত-লালিত ধর্মচিন্তাকে বিদ্ধ করে ওপরে ফুটে ওঠে। মনুষ্য-স্বভাবকে অতিক্রম করে ওঠা গান্ধারীর মতো ধর্মদর্শিনী নারীর পক্ষেও অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

আরও একটা কথা— কৃষ্ণকে অভিশাপ দেবার সময় গান্ধারী বলেছিলেন— আমি যদি পতি-শুশ্রূষা করে সামান্য তপস্যার ফলও পেয়ে থাকি; সেই তপস্যার সিদ্ধিতে তোমাকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি— পতিশুশ্রূষয়া যন্মে তপঃ কিঞ্চিদুপার্জিতম্। 'শুশ্রূষা' মানে সকলেই ভাবেন সেবা, কায়িক এবং মানসিক সেবা। আমরা প্রকৃতি-প্রত্যাগত অর্থে 'শুশ্রূষা' মানে জানি শোনার ইচ্ছে— শ্রু+সন্+অ। আমরা মনে করি, এই আক্ষরিক অর্থটা এখানে বড় জরুরি। হ্যাঁ অবশ্যই দু-একটি চরম মুহূর্তে গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁর অন্ধ পুত্রস্নেহের জন্য তিরস্কার করেছেন, কিন্তু সেই দু'-একবার ছাড়া ধৃতরাষ্ট্র যেমন বলেছেন, যেমন চেয়েছেন, তেমনটিই শুনে গেছেন, গান্ধারী, কোনও জায়গায় তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে সোচ্চারে অতিক্রম করেননি। অতিক্রম যখন করেছেন, তখন বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। ধৃতরাষ্ট্রের মতো স্বামীর প্রতি এই পাতিব্রত্য, এই পাতিব্রত্য ধর্মের অন্তরালে অন্যায়ী পুত্রের প্রতি প্রশ্রয়টাও কিন্তু অনুক্তভাবে নিহিত রইল। আমরা এটাকেই শুশ্রূষা বলি— ধৃতরাষ্ট্র যা বলেন, তাই তিনি শোনেন— এটা বলার চেয়ে ধৃতরাষ্ট্র যা চান, তাই তিনি জীবনভর শুনেছেন। গান্ধারীর অভিশাপের প্রতিক্রিয়ায় কৃষ্ণের নিষ্কপট বাক্য প্রতিক্ষেপ গান্ধারীর অন্তরাল-চরিত্রটাকে হঠাৎ করে বাইরে এনে ফেলে।

কৃষ্ণ বললেন— আমার বংশ যে এইভাবে ধ্বংস হবে, সেটা আমি নিজেই জানি, আমার জ্ঞাতি-বন্ধু যে কাজটা নিজেরাই করবে বলে আমি জানি, সেখানে একটা অভিশাপ দিয়ে আপনি খানিক পিষ্ট পেষণ করেছেন মাত্র— জানেঽহম্ এতদপ্যেবং চীর্ণং চরসি সুব্রতে। যাদব-বৃষ্ণিবংশের ধ্বংস হবে দৈববশেই এবং সেটা ধ্বংস আমিই করব। ওদের পরস্পরের মধ্যে যে বিবাদ বেধেছে, সেটাই তাদের ধ্বংসের পক্ষে যথেষ্ট, সেখানে আপনার অভিশাপটা খুব কিছু কাজে লাগবে না— পরস্পরকৃতং নাশং যতঃ প্রাপ্স্যন্তি যাদবাঃ। তার মানে কৃষ্ণ গান্ধারীর অভিশাপের যৌক্তিকতাটাই সদম্ভে উড়িয়ে দিলেন। এবং এই উড়িয়ে দেবার মধ্যে একটা সাংঘাতিক যুক্তি আছে। কৃষ্ণ বলতে চাইলেন— নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিপদটাই বংশনাশের কারণ এবং সেটা যেমন তাঁর নিজের ব্যাপারে খাটে, তেমনই সেটা গান্ধারীর ব্যাপারেও খাটে।

কৃষ্ণ এবার কোনও ভণিতা, শ্রদ্ধাবেশ না দেখিয়ে বেশ কঠিনভাবেই বললেন— গান্ধাররাজনন্দিনী! এবার শোকতপ্ত ধূলিশয্যা ছেড়ে উঠুন, উঠে পড়ুন। অত শোক করে, অত অভিশাপ দিয়ে কোনও লাভ নেই। আপনার নিজের দোষেই এত শত লোক মরেছে এই যুদ্ধে— তবৈব হ্যপরাধেন বহবো নিধনং গতাঃ। এই যে দুর্যোধন— আপনার গুণধর ছেলে— তার মতো দুরাত্মা দুষ্ট দ্বিতীয় দেখিনি। ঈর্ষা-অসূয়া তাকে গ্রাস করে ফেলেছিল, অহংকার-অভিমানেও ধরাকে সরা জ্ঞান করত, সেই দুর্যোধনের সমস্ত অপকর্মগুলির প্রতি আপনার প্রশংসা আছে বলেই আপনি তাঁকে ভাল বলে মনে করছেন— দুর্যোধনং পুরস্কৃত্য দুষ্কৃতং সাধু মন্যসে। একটা ছেলে, যে ভদ্র-সজ্জনদের সঙ্গে চিরকাল নিষ্ঠুর শত্রুতা করে যাচ্ছে, বৃদ্ধ-সজ্জনের সমস্ত শাসনের বাইরে চলে গেছে যে মানুষটা, সেখানে তো আপনারই দোষ আছে, প্রশ্রয় আছে। সেই নিজের দোষটা পরের ঘাড়ে চাপানোর জন্য আপনি এখন আমাকে দুষছেন, আমাকে অভিশাপ দিচ্ছেন; বেশ কথা বটে— কথম্ আত্মকৃতং দোষং ময্যাধাতুমিহেচ্ছসি।

গান্ধারীকে, চিরকালীন ধর্মদর্শিনী গান্ধারীকে এমন কড়া করে কেউ কথা বলেনি; কৃষ্ণ বলছেন, কারণ এতক্ষণ গান্ধারী নিজের ছেলের দোষগুলো ওপর ওপর বলেছেন বটে, কিন্তু সেই দোষগুলি গভীরভাবে অনুভব না করেই তিনি বারংবার ভীমকে অভিযুক্ত করতে চেয়েছেন, যুধিষ্ঠিরের মতো ধর্মনিত্য মানুষকে অভিশাপ দেবার কথা ভেবেছেন। কৃষ্ণ এতক্ষণ এই মানসিকতা দেখেছেন, সহ্য করেছেন, শেষে নিজেই যখন বিনা কারণে অভিশপ্ত হলেন, তখন কৃষ্ণ দেখলেন— এঁকে সত্য কথা শোনানো দরকার, কঠিন কথা কঠিন ভাবেই তাঁকে বলা দরকার, না হলে তাঁর পুত্রশোকও প্রশমিত হবে না। কৃষ্ণ গান্ধারীর দোষ স্পষ্ট করে বলেই ঝটিতি ফিরে এলেন সেই দার্শনিক যুক্তিতে। বললেন— মৃত মানুষের জন্য শোক করা মানে অপরিহার্য বিনষ্ট অতীত নিয়ে শোক করা এবং সেটা এক কথায় দুঃখের ওপর দুঃখভোগ করা, দুটো অনর্থ একসঙ্গে লাভ করা— দুঃখেন লভ্যতে দুঃখং দ্বাবনর্থৌ প্রপদ্যতে। পরিশেষ সত্যবাচনের পর কৃষ্ণ এই বলেই গান্ধারীকে সান্ত্বনা দিলেন যে, ক্ষত্রিয়া রমণী, বিশেষত আপনার মতো ক্ষত্রিয়া রমণী ছেলে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা যাবে বলেই গর্ভধারণ করে— বধার্থীয়ং তদ্বিধা রাজপুত্রী। গান্ধারী চুপ করে গেছেন। কৃষ্ণের মতো সর্বংসহ মানুষের কাছে কঠিন কথা শুনে গান্ধারী আর একটিও কথা বললেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনন্ত শোকের মধ্যেও হয়তো তিনি অনুভব করলেন— দুর্যোধনের চিরন্তন অন্যায়গুলির পিছনে তিনিও এক পরোক্ষ কারণ বটে।

৮

যুদ্ধশেষে অনেক শোক শান্ত হল না, শান্ত হয় না। এরই মধ্যে যুধিষ্ঠির রাজা হয়েছেন এবং তিনি ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীকে সর্বাধিক মর্যাদায় স্থাপন করেছেন— হয়তো এত মর্যাদা দুর্যোধনও দেননি কোনওদিন। স্বয়ং কুন্তী থেকে আরম্ভ করে দ্রৌপদী, সুভদ্রা সকলে গান্ধারীর নিত্যসেবায় নিযুক্ত হয়েছেন। ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী যুধিষ্ঠির মহারাজকে যা বলতেন, সে কাজ সহজ হোক বা কঠিন হোক, যুধিষ্ঠির তা অবশ্যই পালন করতেন— গুরু বা লঘু বা কার্য্যং গান্ধারী চ তপস্বিনী। পাণ্ডব-ভাইরা প্রত্যেকেই জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের আদেশে গান্ধারী এবং ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সম্মান-ব্যবহার করতেন বটে, কিন্তু ভীম অপ্রকাশ্যভাবে ধৃতরাষ্ট্রের অপ্রিয় কাজ কিছু করতেন এবং যুধিষ্ঠির সেটা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারতেন না। অবশ্য ব্যবহারটা একটু পারস্পরিকও বটে। পাণ্ডবরা যতই ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করুন, দুর্যোধনের মৃত্যুর কথা মনে হলেই তিনি ভীমকেই একমাত্র শত্রু বলে মনে মনে ধারণা করতেন— তদা ভীমং হৃদা রাজন্ অপধ্যাতি স পার্থিবঃ। ভীমও সেই রকম। তিনি মাঝে-মাঝেই নিজের বশে-থাকা ব্যক্তিগত দাস-দাসীদের নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের নানা কাজে বিঘ্ন ঘটাতেন। সবচেয়ে বড় কাজ, যেটা যুধিষ্ঠিরের নজরেই কোনওদিন আসেনি, ভীম মাঝে মাঝেই ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীকে শুনিয়ে শুনিয়ে অন্যদের বলতেন— সংশ্রবে ধৃতরাষ্ট্রস্য গান্ধার্য্যাশ্চাপ্যমর্ষণঃ— আমার এই হাত দুটো দেখেছিস— মুগুর, দুটো মুগুর, এই মুগুর দুটোর মধ্যে ফেলে অন্ধ রাজার সবগুলো ছেলেকেই আমি যমালয়ে পাঠিয়েছি। তোরা এই চন্দন মাখানো হাত দুটোকে পুজো কর, এই হাত দুটো দিয়েই দুর্যোধনকে আমি সপুত্রক শেষ করে দিয়েছি।

এ-সব কথা ধৃতরাষ্ট্র কিংবা গান্ধারী কারওরই ভাল লাগত না, তবু শুনতেন, শুনতে বাধ্য হতেন গান্ধারী— গান্ধারী সর্বধর্মজ্ঞা, তান্যলীকানি শুশ্রুবে। যুধিষ্ঠিরকে তিনি কিছু বলতে পারেননি, এবং ধৃতরাষ্ট্রকেও তিনি বলতে দেননি এবং সদাই যিনি গান্ধারীর সেবাব্রতে রত, সেই কুন্তীকেও কিছু বলতে চাননি গান্ধারী। বছর পনেরো এইভাবে চলার পর ভীমের মর্মন্তুদ কথাগুলি আর সহ্য হচ্ছিল না ধৃতরাষ্ট্রের। তিনি প্রচণ্ড আত্মগ্লানি অনুভব করে বানপ্রস্থে যাবেন বলে ঠিক করলেন। গান্ধারী এখানে দ্বিতীয় সত্তা মাত্র, ধৃতরাষ্ট্র যা করেন, তিনিও তাই করবেন এবং এখানে ধৃতরাষ্ট্রের কথা থেকেই জানতে পারি যে রাজার পরম পৃষ্ঠপোষণা থাকলেও ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী বাড়িতেই যথেষ্ট নিয়ম-ব্রত মেনে চলছিলেন। এবার সেটাকেই প্রথাগত বানপ্রস্থের আশ্রমিক-রূপ দেবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র অনুমতি চাইলেন যুধিষ্ঠিরের।

যুধিষ্ঠির কিছুতেই ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীকে এই বৃদ্ধাবস্থায় বনে পাঠাতে চাইলেন না। যুধিষ্ঠিরের অন্তহীন অনুনয়ের মধ্যে এই কথাটা ভীষণ রকমের ভাল লাগে— তিনি বলেছিলেন— আমি কোনওদিন জননী গান্ধারী এবং আমার গর্ভধারিণী কুন্তীর মধ্যে তফাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিনি— গান্ধারী চৈব কুন্তীচ নির্বিশেষা মতির্মম। গান্ধারীর দিক থেকে এই নির্বিশেষ স্নেহপ্রবৃত্তি কতটা, তা আমাদের পক্ষে বলা মুশকিল, অন্তত এখন এই মুহূর্তে হয়তো তাঁর আর কোনও ক্ষোভ ক্রোধ নেই। শোকও পরিপক্ক হতে হতে একদিন হৃদয়ের মধ্যেই নিথর হয়ে যায়। গান্ধারীর একমাত্র কাজ এখন বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে যথোচিতভাবে অন্তিম গতির দিকে বয়ে নিয়ে চলা। সারা জীবন তিনি এই মানুষটার ইচ্ছা, অনিচ্ছা, এমনকী অন্যায়গুলিও বহন করে এসেছেন। আজ এই বার্ধক্য-চর্যার দিনে গান্ধারী সব সময় স্বামীর পাশে সদা-সর্বদা শারীরিকভাবে উপস্থিত। ব্রত-নিয়মে ঘরের মধ্যেই ধৃতরাষ্ট্র এখন বড় ক্লিষ্ট, কিন্তু সেই নিয়ম-আচার গান্ধারী কিন্তু পালন করছেন একই সঙ্গে, একই তালে। অথচ সেই ক্লিষ্ট শরীর নিয়ে এখন তিনি ধৃতরাষ্ট্রের ছায়াসঙ্গিনী। ধৃতরাষ্ট্র উঠলে তিনি ওঠেন, বসলে বসেন এবং তিনি আহার করলে নিজে আহার করেন। আর সত্যি, ধৃতরাষ্ট্র এখন শারীরিকভাবে এতটাই দুর্বল বোধ করেন মাঝে মাঝে যে, একটু বেশিক্ষণ কথা বললেও তাঁকে এখন গান্ধারীর স্কন্ধাবলম্বন খুঁজতে হয়। যুধিষ্ঠির নিজেও এই নির্ভরতা দেখে একদিন অবাক হয়ে বলেছেন— যে মানুষটার গায়ে হাজার হাতির বল ছিল, যিনি লৌহভীম চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন, সেই মানুষটা এখন অবলা রমণীর অবলম্বন গ্রহণ করেছেন— অবলাম্ আশ্রিতঃ স্ত্রিয়ম্।

আসলে গান্ধারী যে ধৈর্যশীলা ধর্মদর্শিনী বলে পরিচিত হয়েছেন, তা এই কারণেই। আমরা এটাকে পাতিব্রত্য বলতে রাজি নই। অর্থাৎ এ কথা বলতে চাই না যে, ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি অনন্য-মানসিকতার জন্যই তিনি ধর্মদর্শিনী হিসেবে পরিচিতা হয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কী, অন্ধ স্বামীর প্রতি আনুগত্যে গান্ধারী যে বধূ-জীবনের আরম্ভেই কয়েক ফেরতা কাপড় বেঁধে নিয়েছিলেন, সেটা আমাদের কাছে খুব জরুরি। নিজে চক্ষুষ্মতী হওয়া সত্ত্বেও চোখের ওপর ওই কৃত্রিম আবরণখানি যেমন তাঁর জীবনে কৃত্রিম অন্ধত্ব ঘনিয়ে এনেছে, তেমনি নিজের ধর্মবোধ পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও সারা জীবন তাঁকে নিজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে স্বামীর জন্য। তাঁর অধর্ম এবং কুটিলতা গান্ধারীকে বহন করতে হয়েছে চোখে ঠুলি পরে। মহাভারতের কবি বুঝিয়ে দেন— চিরন্তন ধর্মের স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য নেই। স্বামীর অধর্ম নিজের ঘাড়ে বহন করতে করতে আজ তিনি বুড়ো হয়ে গেছেন। আজ তাঁর পুত্র-মিত্র-ভাই-বন্ধু সব চলে গেছে কোথায়, তবু বেঁচে থাকা স্বামীর ধর্ম-যাত্রায় আজ তিনি প্রধান অবলম্বন। ব্রত-নিয়ম-ক্লিষ্ট অনুতপ্ত স্বামীকে আজও তিনি শরীর দিয়ে ধারণ করে চলেছেন— গান্ধারীং শিশ্রিয়ে ধীমান্ সহসৈব গতাসুবৎ।

বনযাত্রার সময় ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত প্রজাদের একত্রিত হবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধ করলে নির্দিষ্টস্থানে কুরুজাঙ্গল দেশের প্রজারা একত্রিত হল যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে। ধৃতরাষ্ট্র সেখানে যুধিষ্ঠিরের অকুণ্ঠ প্রশংসা করার পর দুর্যোধনকে প্রশ্রয় দেবার অন্যায়টুকুও স্বীকার করেছেন। ধৃতরাষ্ট্র সেদিন অসম্ভব সুন্দর ভাষণ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন— পরম্পরাক্রমে আমার পিতা-পিতামহরা যে শাসন চালিয়ে এসেছেন, তাতে আপনাদের প্রতি কোনও অন্যায় আমরা করিনি। এমনকী আমার পুত্র দুর্যোধন যখন এই রাজ্য শাসন করেছে, তখনও সেই দুর্বুদ্ধি মূর্খ আপনাদের কাছে কোনও অপরাধ করেনি। কিন্তু সে আপন অহংকার এবং মূর্খতায় যে বিশাল যুদ্ধ ডেকে এনেছিল, সেখানে আমারও অন্যায় দুর্নীতি কিছু আছে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিমর্দঃ সুমহানাসীদ্ অনয়াৎ স্বকৃতাদথ। সে যুদ্ধে কৌরবরা নিহত হয়েছে, পৃথিবীও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এ-কাজটা আমি ভাল করেছি, কী মন্দ করেছি, অথবা যা কিছুই করে থাকি আপনারা সে-সব মনে রাখবেন না, আমি এই সবার সামনে হাত জোড় করলাম— তদ্বো হৃদি ন কর্তব্যং ময়া বদ্ধোঽয়মঞ্জলিঃ।

সমস্ত ভাষণটার শেষে মর্মস্পর্শী ভাষায় যখন ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত প্রজাপুঞ্জের কাছে বিদায় চাইছেন, তখন নিজের সঙ্গে তিনি তাঁর চিরন্তনী সহধর্মচারিণীর জন্যও বিদায় চেয়েছেন। ধৃতরাষ্ট্র বলেছেন— আপনাদের এই রাজা বৃদ্ধ, পুত্রহীন এবং প্রাচীন রাজাদের বংশধর, অতএব সব ক্ষমা করে আমাকে অনুমতি করুন। আমার সঙ্গে আছেন আমার স্ত্রী গান্ধারী, তিনিও এখন করুণার পাত্রী, তিনিও বৃদ্ধা হয়েছেন, সবগুলি পুত্র হারিয়ে শোকার্তাও বটে, তিনিও আমার মাধ্যমে আপনাদের কাছে বনগমনের অনুমতি চাইছেন— গান্ধারী পুত্রশোকার্তা যুস্মান্ যাচতি বৈ ময়া। আমি জানি— আমার লুব্ধ দুর্মতি পুত্রেরা অনেক স্বেচ্ছাচার করেছে, সেজন্য আমি আমার স্ত্রী গান্ধারীর সঙ্গে একত্রে সকলের কাছে ক্ষমা চাইছি— যাচেঽদ্য বঃ সর্বান্ গান্ধারীসহিতোঽনঘাঃ।

গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে বনগমনে উদ্যত হলে রাজমাতা কুন্তী একেবারে অভাবিত তৎপরতায় গান্ধারীর সঙ্গে সঙ্গে চলতে আরম্ভ করলেন। যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য পাণ্ডব-ভাইদের কল্পনার মধ্যেও ছিল না, অথচ কুন্তী বললেন— গান্ধারী আমার শাশুড়ির মতো ধৃতরাষ্ট্র আমার শ্বশুর-কল্প। আমি বনের মধ্যে আমার এই শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করব— শ্বশ্রূ-শ্বশুরয়োঃ পাদান্ শুশ্রূষন্তী বনে ত্বহম্। কুন্তী কারও কথা শোনেননি, কনিষ্ঠ সহদেবকে তিনি এত ভালবাসতেন, তাঁর দিকেও আর ফিরে তাকাননি। এমনকী ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে গান্ধারীও তাঁকে অনুরোধ করেন— ইত্যুক্তা সৌবলেয়ী তু রাজ্ঞা কুন্তীমুবাচ হ— কিন্তু কুন্তী কারও কথা না শুনে গান্ধারী এবং ধৃতরাষ্ট্রের অনুগমন করেন। সবার আগে কুন্তী পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন বদ্ধনেত্রা গান্ধারীকে, গান্ধারীর হাত কুন্তীর কাঁধে, আর অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের হাত গান্ধারীর কাঁধে— কুন্তী গান্ধারীং বদ্ধনেত্রাং ব্রজন্তীং... রাজা গান্ধার্য্যাঃ স্কন্ধদেশেঽবসজ্য।

এ যেন অদ্ভুত এক ফিরিয়ে দেওয়া, কুন্তীর সঙ্গে কোনওদিন গান্ধারী এই ব্যবহার করতে পারেননি। ছেলেরা বনবাসে যাবার পর কুন্তী বিদুরের ঘরেই ছিলেন, কিন্তু একদিনের তরেও গান্ধারীকে মিলিত হতে দেখিনি কুন্তীর সঙ্গে। হয়তো ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধতায় তাঁকেও অন্ধ হয়ে থাকতে হয়েছে চিরকাল, তাঁর ঈর্ষা-অসূয়ার বস্ত্র-আবরণ চোখে লাগিয়ে কোনওদিন গান্ধারী তাঁর ভগিনী-প্রতিমা কুন্তীর প্রতি স্নেহ-মমতা দেখাতে পারেননি। আজ কুন্তী ধৃতরাষ্ট্রের অনুগমন করে তাঁকেই যেন বুঝিয়ে দিলেন— গান্ধারীকে তিনি অন্ধ পথে চালিত করেছিলেন।

বনের মধ্যে যথোচিতভাবে ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর সেবায় নিযুক্ত হলেন কুন্তী। সঙ্গে আছেন চিরস্নিগ্ধ বিদুর এবং সঞ্জয়। এখন গান্ধারীর যে অবস্থাটা চলছে, তার সবটাই আশ্রমিক অবস্থান। প্রথমে শতযূপের আশ্রম, তারপর বেদব্যাসের আশ্রম, পরিশেষে গভীর নির্জন বনপথে। এরই মধ্যে বিদুর যোগবলে দেহত্যাগ করেছেন এবং যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্যরা বনে এসে দেখা করেছেন ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তীর সঙ্গে। তিনি সবাইকে নিয়ে অন্তত একমাস এখানেই আছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর অরণ্য আশ্রমে এসেছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাস, দ্বৈপায়ন ব্যাস— গান্ধারী-কুন্তীর শ্বশুর। তিনি এসে ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীকে তপস্যা-ব্রত-নিয়ম বৈরাগ্যের উত্তরোত্তর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। ব্যাসের দিক থেকে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল— এত তপস্যা, ব্রত, নিয়ম করছ। তা এতদিনে তোমাদের মন থেকে পুত্র বিনাশের দুঃখ দূর হয়েছে তো— কচ্চিদ্ হৃদি ন তে শোকো রাজন্ পুত্র-বিনাশজঃ?

ব্যাস সেদিন অনেক কথা বলেছেন, অনেক উপদেশ দিয়েছেন এবং একটি ইচ্ছাপূরণের স্বপ্নও দেখিয়েছেন সবাইকে। বলেছেন— কী চাও বল, ধৃতরাষ্ট্র! তোমার অভীষ্ট আজ পূরণ করব তপস্যার বলে। আসল কথাটা কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র বলতে পারলেন না। ইনিয়ে-বিনিয়ে নানা শোক-দুঃখ, যুদ্ধ, ছেলের দোষ, নিজের দোষ, নিরীহ মানুষের ক্ষয় ইত্যাদি বিকীর্ণ বিষয় উচ্চারণ করে সেই ধ্রুবপদে চলে এলেন— আমি এখনও শান্তি পাচ্ছি না। শোকে, দুঃখে, চিন্তায় আমার মনে এখনও সেই অস্থিরতা আছে। ধৃতরাষ্ট্রের এই স্মৃতিকাতর অবস্থা দেখে গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা সকলেরই পূর্বস্নেহ, পূর্বসুখ, আবারও শোকের স্বরূপ জাগ্রত করে দিল মনে মনে। এই অবস্থায় শোকার্ত গান্ধারী সবার সামনে উঠে দাঁড়ালেন। অন্ধ স্বামীকে তিনি সবচেয়ে ভাল চেনেন, তাঁর কথাগুলো বুঝে নিতে হয়, তিনি স্পষ্ট করে মনের ঠিক ইচ্ছেটা বলেন না, ঠিক ইচ্ছেটা অন্যকে ভাল করে বুঝতেও দেন না।

দ্বৈপায়ন ব্যাস সরল মানুষ, এইসব অস্পষ্ট ধূসর শব্দরাশি তিনি কবির ব্যঞ্জনাতে বুঝলেও ধৃতরাষ্ট্রের মুখে এখনও সেই নিরুচ্চার দ্বৈভাষিকতা দেখে অবাক হন। এই অবস্থায় ধৃতরাষ্ট্রের ধর্মচারিণী দ্বৈভাষিক উঠে দাঁড়িয়েছেন তপস্বী যোগীর সামনে। তিনি বলেছেন— অন্য কিছু না। মুনিবর। ইনি পরলোকগত পুত্রদের দেখতে চান এবং আপনি সেটা বুঝতেও পারছেন— লোকান্তরগতান্ পুত্রান্ অয়ং কাঙ্ক্ষতি মানদ। সেই যুদ্ধের পর আজকে ষোলোটা বছর কেটে গেল, মুনিবর! পনেরো বছর পাণ্ডবদের ঘরে কাটিয়েছি, আর এই বনে বনে এক বছর কেটে গেল। কিন্তু ষোলো বছর ধরেই ইনি ছেলেদের জন্যেই শোক করে যাচ্ছেন. কোনও শান্তি আসেনি তাঁর মনে— অস্য রাজ্ঞো হতান্ পুত্রান্ শোচতো ন শমো বিভো। এখনও সারারাত ইনি ঘুমোন না এবং যেভাবে তাঁর রাত্রির নিঃশ্বাস দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়, তাতে বুঝি এখনও তিনি কিছুই ভোলেননি। গান্ধারী বোধহয় বোঝাতে পেরেছেন যে, তাঁর নিজের অন্তত এই অবস্থা নয়। আপন অন্তরস্থিত দার্শনিক বোধে আজ তিনি সমস্ত শোকই কাটিয়ে উঠেছেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র যেমন এখনও রাত্রে ঘুমোতে পারেন না, তেমনটা না হলেও কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা এবং অন্যান্য কৌরব-কুলবধূরা এখনও যে মৃত স্বামী-পুত্রের কথা স্মরণ করে কষ্ট পান, গান্ধারী সে-সব দুঃখ-কথা তপস্বী শ্বশুরকে জানিয়ে সকল বধূদের মনস্তত্ত্বটাও বলেছেন ব্যাসের কাছে। বলেছেন— ওরা যে আমাকে আর ধৃতরাষ্ট্রকে আরও বেশি বেশি করে সেবা করে, আমার সেবার জন্য যে বেশি আড়ম্বর করে, তার কারণ, ওরা পূর্বগত শোক ভুলতে না পেরে ব্যস্ত রাখে নিজেদের— তেনারম্ভেন মহতা মাম্ উপাস্তে মহামুনে।

গান্ধারী সকলের কথা বলেছেন, নিজের কথা বলেননি। প্রধানত সেই স্বামীর কথা ভেবেই গান্ধারী ব্যাসকে বললেন— আপনি তো সব পারেন, ঠাকুর! আপনি তপোবলে সেই মৃত্যুলোক নিয়ে আসতে পারেন আমাদের সামনে, যেখানে এই বৃদ্ধ রাজার পরলোকগত পুত্রদের দেখা যাবে। বেদব্যাস সকলের কথা বাদ দিয়ে গান্ধারীকে বললেন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভদ্রে! তুমি ছেলে, ভাই, বন্ধু, সবাইকে দেখতে পাবে— ভদ্রে দ্রক্ষ্যসি গান্ধারি পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ সখীংস্তথা— অন্যেরাও যাঁরা আছেন এখানে, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং তোমার পুত্রবধূরা— সকলেই তাদের প্রিয়জনদের দেখতে পাবে— রাতের ঘুমে জেগে উঠে সুখস্বপ্ন দেখার মতো— নিশি সুপ্তোত্থিতান্ ইব। ব্যাসের করুণায় সকলে দেখতে পেলেন সবাইকে এবং দেখলেন— সেখানে কোনও শত্রুতা নেই, ভেদ নেই, ঈর্ষা নেই, অসূয়া নেই। গান্ধারী, কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র সকলে পরম তৃপ্তিতে শান্তি পেলেন।

হয়তো এই আরও একবার জীবন্ত দর্শন সকলের পক্ষেই কাম্য ছিল, অশান্ত হৃদয় দমন করার জন্যই হয়তো এই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু স্বপ্ন মিলিয়ে গেলে যেমন আর দুঃখ থাকে না, ঠিক সেইভাবেই গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র একেবারেই শান্ত হয়ে গেছেন এবার। আরও দু-বছর এর পরে কেটেছে। যুধিষ্ঠির সকলকে নিয়ে ফিরে এসেছেন এবং দু-বছর পরে নারদের কাছে খবর পেয়েছেন যে, এই দু-বছর ধরেই গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র এবং কুন্তী কঠোর নিয়ম-ব্রতে দিন কাটিয়েছেন এবং পরিশেষে দাবাগ্নি-জ্বালায় আত্মাহুতি দিতেও তাঁদের আর কোনও কষ্ট হয়নি। মন-বুদ্ধি-চিত্তকে যোগ সমাধিতে নিমগ্ন করে দাবাগ্নিদাহে ভস্মীভূত হয়ে গেলেন গান্ধারী।

সারা জীবন যত অস্থিরতার মধ্যে কেটেছে, স্বামী-পুত্রকে নিয়ে যত বিপরীত পরিস্থিতি তাঁকে দেখতে হয়েছে, সেই তুলনায় গান্ধারীর শেষ জীবন এবং মৃত্যু বড় অনাড়ম্বর। যেদিন রাজবাড়ির বধূ হয়ে এসেছিলেন গান্ধারী, সেদিনও খুব আড়ম্বরের প্রশ্ন ছিল না। কেননা তাঁর স্বামী রাজা ছিলেন না। কিন্তু সুস্থিতভাবে তাঁর স্বামী যদি রাজা হতেনও, তা হলেও বুঝি এত বৈপরীত্যের মধ্যে তাঁকে পড়তে হত না— যদি না অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মনের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার জটিলতা বাসা বাঁধত। তার সঙ্গে পুত্র দুর্যোধন, যিনি ছলে-বলে-কৌশলে পিতার উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরম্পরা বহন করেন আপন রক্তের মধ্যে। আমরা এটাকেই গান্ধারীর পক্ষে বিপরীত পরিস্থিতি বলেছি। আমরা গান্ধারীর জীবনটা অনুপুঙ্খভাবে দেখেছি। তিনি কিন্তু এই উচ্চাকাঙ্ক্ষায় শামিল ছিলেন না— স্বামীর-পুত্রের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে সংক্রমিত হয়নি কোনওদিন, কিন্তু স্বামী-পুত্রের চাপে তাঁকে এমনই এক অবগুণ্ঠনের মধ্যে থাকতে হয়েছে, যাতে মনে হবে যেন তিনিও পরোক্ষে আছেন তাঁর স্বামী-পুত্রের সঙ্গে। কিন্তু থাকাটা যে কতটা না-থাকা সেটা বুঝতে পারা যায় চরম সব মুহূর্তগুলিতে। পুত্র-স্নেহের মধ্যেও তাঁর কত যন্ত্রণা— যুদ্ধের সংশয়িত মুহূর্তেও যার জয়োচ্চারণ ঘোষণা করা যায় না, যার জীবন কামনা করা যায় না, জননীর স্নেহের রাজ্যে এটা কতটা প্রতিকূল, কতটা বিপরীত পরিস্থিতি। এই বৈপরীত্য নিয়েই গান্ধারীর জীবন কেটেছে চিরকাল। একদিকে স্বামী-পুত্রের বিষয়ের প্রতি জর্জরিত লোভ, অন্যদিকে সেই স্বামী-পুত্রের প্রতিই জায়া-জননীর মোহ-স্নেহ, অথচ চরম এক মুহূর্তে হৃদয়ের সমস্ত বৈপরীত্য স্তব্ধ করে দিয়ে বলতে হয়— পুত্র! তুমি সাবধানে থেকে রণক্ষেত্রে নিজেকে রক্ষা করে চলো, তবে মনে রেখো— ধর্ম যেদিকে জয় হবে সেইদিকেই। এইভাবে এই বৈপরীত্যের মধ্যে যিনি ধর্মকে আন্তরিকভাবে ধরে রাখতে পারেন, মহাভারতের কবি তার নাম দিয়েছেন গান্ধারী আর কালিদাস তাকে বলেছেন পার্বতীর হাসি— যে হাসিতে দন্তগুলি স্ফুট হয় না অথচ হাসিটুকু বোঝা যায়, যে হাসিকে নতুন কচি তাম্রাভ পাতার মধ্যে মুক্তো বসিয়ে বুঝতে হয়— তিনি গান্ধারী।

কুন্তী

আমি এই মাটির পৃথিবীতেই এমন মানুষ অনেক দেখেছি, যাঁদের সাধারণ সমাজ-সচল নীতি-নিয়ম-শৃঙ্খলা দিয়ে বিচার করা যায় না। করা যায় না, কারণ, প্রথমত তাঁরা সামাজিক রীতি-নীতির তোয়াক্কা করেনি এমন হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে যে, তাঁদের জীবন এমনভাবেই তৈরি হয়েছিল অথবা ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যেই এমন ধরনের বিপন্নতা মাথায় নিয়ে তাঁদের জীবন আরম্ভ করতে হয়েছে যে, নিয়ম-নীতি না ভেঙে তাঁদের উপায় ছিল না। কিংবা বিপন্নতা সামাল দিতে গিয়ে সামাজিক নিয়মটা যে তাঁরা ভেঙে ফেললেন, এটা তাঁদের বোধের মধ্যেও আসে না। কিন্তু সামাজিক মানুষ যখন এইসব মানুষের বিচার করেন, তখন তাঁরাও যে খুব নির্মম হয়ে ওঠেন, তা কিন্তু নয়। সমস্যা হল, নির্মম না হয়ে ওঠার জন্য যুক্তির প্রয়োজন হয়, এবং আরও যেটা প্রয়োজন হয়, সেটা হল—প্রিয়জনোচিত সংবেদনশীলতা। আমার মনে আছে— আমি আমার বেশি বয়সি দাদা-প্রতিম দু-একজনের কাছে শুনেছি যে, বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ-ষাট দশকে বাংলার এম. এ. ক্লাসে শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ নিয়ে এই ধরনের প্রশ্ন আসত যে, আচ্ছা! অচলাকে কি সতী বলা যায়? অথবা শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মীকে?

পরীক্ষার প্রশ্নে, বিশেষত শরৎচন্দ্রের স্ত্রীচরিত্র নিয়ে যত সমালোচনা হয়েছে, তাতে সংস্কার-স্থিত মানুষেরা যত তিরস্কারই করুন শরৎচন্দ্রকে, বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত লোকের কিন্তু একটা লোকদেখানো দায় থাকে, নিজে সংস্কারবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তার প্রগতিশীল হবার দায় থাকে। ফলে উপরি উক্ত প্রশ্নে প্রশ্নকর্তা তর্কযুক্তির মাধ্যমে সেই উত্তর আশা করতেন, যেখানে অচলা অথবা রাজলক্ষ্মীকে তাদের শতেক সামাজিক অতিক্রম সত্ত্বেও সতী বলে প্রতিপন্ন করা গেছে। উত্তরদায়ী ছাত্র-ছাত্রীরাও বহুতর তর্কযুক্তি সাজিয়ে আবেগ-গম্ভীর কারুণ্যে অচলা বা রাজলক্ষ্মীকে চরম সতী প্রতিপন্ন করে শরৎচন্দ্রের সম্মান রাখার চেষ্টা করতেন এবং তাতেই নম্বর পেতেন। বলা বাহুল্য, সাংস্কারিক সমাজের মধ্যে থেকে যে মানুষ এই ধরনের প্রশ্ন করছেন অথবা যে-সব ছাত্র-ছাত্রীরা প্রায় একইরকম তর্কযুক্তি সাজিয়ে একই মর্মে অচলা বা রাজলক্ষ্মীকে সতী বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করছেন, তার মধ্যে একটা অসম্ভব রকমের কৃত্রিমতা আছে। অর্থাৎ কিনা, সমাজ এটা মানবে না, সামাজিক মানুষ এটাকে স্বীকার করবে না, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের প্রতি সামাজিক প্রবঞ্চনা অথবা পৌরুষেয় প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে একটা যুক্তিসিদ্ধ সরব প্রতিবাদ করার জন্য কৃত্রিমভাবেও প্রগতিশীল হয়ে ওঠাটা নিতান্ত জরুরি হয়ে পড়ে। আসল জায়গায় সমাজের সাংস্কারিক সত্য কিন্তু এই একবিংশ শতাব্দীতেও এটাই যে, স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ সতীত্বের বাইরে যদি কোনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রমণীর অন্যতর কোনও ভাল-মন্দ সম্পর্ক তৈরি হয়, তা হলে চর্চার বিষয় হিসেবে সেই রমণীচরিত্র ভীষণই 'ইন্টারেস্টিং' বটে; কিন্তু তাঁকে যদি সমর্থন করতে হয়, কিংবা তবুও তাঁকে যদি সতী বলতে হয়, তবে শুধুমাত্র তাঁর জীবনযাপনের পূর্ব জটিলতা এবং ততোধিক বিচিত্র সামাজিক প্রবঞ্চনার কারণেই তাঁর চরিত্র সমর্থনীয় হয়ে উঠতে পারে এবং ঠিক এই ধরনের 'প্রিকনডিশনে'ই তাঁর জীবন বহুতর যৌক্তিকতায় সহনীয় হয়ে উঠতে পারে। তা নইলে বাস্তব জীবনে একজন অচলা বা রাজলক্ষ্মীর অবস্থিতি মানুষ যদি একবার টের পায়, তা হলে এই মুখর জগতের সুখ আস্বাদনের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁদের কৃত্রিম সদুত্তর নিয়েও এগিয়ে আসবেন না, আর প্রশ্নকর্তারা সারাজীবন শুধু প্রশ্নই করে যাবেন, তাঁরা উত্তর লেখেন না, শুধুই নম্বর দেন।

তবে কিনা রমণীর চরিত্র নিয়ে কথা! এ-বিষয়ে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকলেই শুধু কথা বলতেই ভালবাসে না, রমণী-চরিত্রের শুদ্ধতা নিয়ে সন্দেহ করাটা একটা সার্বিক মুখরতার বিষয়— ভবভূতি আরও একটু বুদ্ধিদীপ্তভাবে বলেছিলেন— কবির কবিত্ব-শব্দ এবং স্ত্রীলোক— এই দুয়ের সাধুত্ব নিয়ে দুর্জন মানুষেরা সবসময়েই বড় মুখর— যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ। তবে মহাকবি হলেও সুজন বলেই ভবভূতির একটা ভুল থেকে গেছে। স্ত্রীলোকের চরিত্র নিয়ে মুখরতায় শুধুমাত্র দুর্জনেরাই একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করেন না, এ বিষয়ে— আগেই বলেছি— সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সার্বিকভাবে আগ্রহী। এর মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা বলেন সবচেয়ে সতী রমণীরা। আমার জীবনে দু-চারজন সতী-রমণীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার ঘটেছে। অহো ভাগ্য! এঁরা স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষ জানেন না। এই আধুনিক যুগেও তাঁরা সর্বক্ষণ সোচ্চারে সোচ্ছ্বাসে এমনভাবেই স্বামীর কথা জানান দেন, যাতে মনে হয়— অন্য যত বিবাহিতা রমণীরা স্বামীনিষ্ঠতায় ভীষণভাবেই পিছিয়ে আছেন এবং সামান্যতম হলেও অন্যতরা রমণীরা যেন একটু অন্যমনেও রয়েছেন। এই ধরনের কঠিন সতীচ্ছদের অন্তরালে এঁদের স্বামীরা ঠিক কেমন আছেন, সেটা আমার জানা হয়নি ভাল করে, তবে এঁদের একজন স্বামীকে আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল— তিনি বাথরুমে যাবার আগেও স্ত্রীকে মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করেন এবং সেটা আমার শ্রুত হওয়ায় আমার দিকে তাকিয়ে তীব্র স্বরে সেই সতী আমাকে বলেছিলেন— দেখলেন তো আপনার বন্ধুর অবস্থা! এরা নাকি আবার পুরুষ মানুষ। একটি কাজও নিজে করার ক্ষমতা নেই। জনান্তিকে বলে রাখি— উপর্যুক্ত স্বামী পুরুষদের আমি কিন্তু স্ত্রৈণ বলি না, কেননা এটা বেশ বুঝি যে, স্ত্রৈণতার যদি কোনও মুখ্যার্থ থাকে, তবে আপন স্ত্রীর প্রতি যৌনতাও এখানে স্ত্রীর আদেশ-সাপেক্ষ, কেননা সেখানে পারস্পরিকতার কোনও প্রশ্নই নেই।

আমি এত কথা এই তথাকথিত সতীদের নিয়ে বলতাম না, কিন্তু এই ধরনের স্বামী-অন্তঃপ্রাণা সতীদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য যেটা দেখেছি, সেটা হল— যে-কোনও সামান্য কামগন্ধময় যৌন বিষয়ে এঁদের নিরলস আগ্রহ এবং অন্যতরা রমণীকুলের পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রগল্‌ভতা তথা তাঁদের জীবনে পৌরুষেয় সংক্রমণের আশঙ্কা-বিষয়ে সার্বক্ষণিক মুখরতা। পরিশেষে অবশ্যই সেখানে আপন সতীত্বের জয়গান তাঁদের নিজেদের মুখেই নেমে আসে, কিন্তু পরিশেষের আগ পর্যন্ত অন্যান্য হাজার রমণীদের সমস্ত আচরণই যে ত্রুটিপূর্ণ এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের সমস্ত অভিমুখই যে যৌনতার দিকে— এই সুবিশাল তীব্র সমালোচনার মধ্যে তাঁদের নিজেদের মনস্তাত্ত্বিক গহন সব সময়েই উহ্য থাকে। তাঁদের আলোচ্য বিষয় যে অনর্থক তথা নঞর্থকভাবে যৌনতারই আলোচনা— সেটা অপ্রমাণ হয়ে ওঠে শুধুমাত্র তাঁদের পরিশিষ্ট সিদ্ধান্তে— আমরা এরকম নই বাবা। কিন্তু সত্য কথা বলতে আমরা কিছুতেই পিছুপা নই, যেটা বলার, সেটা আমরা বলবই।

সত্য কথাটা যে কী, তা কে জানে! অথবা তাঁদের সতীত্বের এই কাঠিন্য এবং অসতীত্বের বিষয়ে সার্বক্ষণিক চর্চাটা অবদমিত কোনও যৌনবিলাস কিনা সে-কথা ফ্রয়েড সাহেব বলতে পারবেন, তবে আমাদের মহাভারতের কুন্তীকে নিয়ে সতীত্বের একটা চিন্তা-তর্ক যে উঠেছিল, সেটা পরিষ্কার হয়ে যায় বেশ প্রাচীন একটা লোক-কথিত শ্লোক থেকে। কথাটা গবেষকদের মতো পাণ্ডিত্যের চালে না বলে একটু কায়দা করে বলি।

২

সবই কপাল গো দিদি, সবই কপাল। কপাল ভাল থাকলে হাজারো দোষ থাকুক, তবু লোকে সুখ্যাত করবে, আর কপালের জোর না থাকলে তার অবস্থাটা হবে ঠিক আমার মতো।

একাধারে দুঃখ, অভিমান এবং ক্রোধ মেশানো এই কথাগুলো শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন অন্যতর এক মহিলা। জিজ্ঞাসা করলেন— তোর কী এমন কপাল পুড়ল যে সাত সকালেই বকর-বকর আরম্ভ করেছিস?

আজ থেকে বহুকাল আগে, মহাভারতের যুগ যখন চলে গেছে, শাস্ত্র আর আচারের বিষম বাঁধনে সমগ্র নারী সমাজকে যখন বেঁধে ফেলা হচ্ছে, তখন এই কথোপকথন চলছিল বলে আমরা মনে করি। যে ভদ্রমহিলা কপালের কারসাজি নিয়ে খুব চিন্তিত, তিনি— আর কিছুই নয়, হয়তো দু-একজন পুরুষ-পড়শির সঙ্গে একটু আধটু রসিকতা করে ফেলেছেন, তাতেই পাড়ার পাঁচজনে পাঁচরকম গল্প বানিয়ে ফেলল। ভদ্রমহিলার নিন্দে হল যথেষ্ট।

তা এরকম ঘটনা ঘটলে কার না দুঃখ হয়। মনের দুঃখে তথা সময়মতো ব্যথার ব্যথী আরও এক মহিলাকে সামনে পেয়ে তিনি প্রথমেই পুণ্যবতী পাঁচ কন্যের শিকড় ধরে টান দিলেন। পুণ্যবতী পাঁচ কন্যে মানে— সেই পাতকনাশিনী পাঁচ কন্যে, যাঁদের কথা সকালে উঠেই স্মরণ করতে বলেছেন শাস্ত্রকারেরা— অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।

আমাদের এই মহিলাটি অবশ্য রামায়ণ-বিখ্যাতা অহল্যা, তারা এবং মন্দোদরীকে দয়া করে ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর আক্রমণ এবং আক্রোশ প্রধানত দু'জনকে লক্ষ করে— কুন্তী এবং দ্রৌপদী। কাজেই অন্যতরা যখন সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করল— কী এমন হল যে কপালের দোষ দিচ্ছ— তখন তিনি জিহ্বার বাঁধন খুলে মহাভারতের প্রবীণা এবে নবীনা— দুই নায়িকার মুখে ঝামা ঘষে দিলেন। বললেন— কপাল না তো কী? পাঁচ-পাঁচটা পুরুষ মানুষ ওই কুন্তীর সঙ্গে আশনাই করেছে, কামনা করে সঙ্গ দিয়েছে; আর তার ব্যাটার বউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্রৌপদী— তাকেও কামনা করেছে পাঁচ-পাঁচটা পুরুষ—পঞ্চভিঃ কামিতা কুন্তী তদ্‌বধূরথ পঞ্চভিঃ। তবু এঁরা হলেন গিয়ে সতী। তা, একে কপাল বলব না তো কী? পোড়া কপাল আমার! লোকেও এদের সতী বলে। তাই বলছিলাম—কপাল থাকলে কীই বা না হয়—সতীং বদতি লোকোঽয়ং যশঃ পুণ্যৈরবাপ্যতে।

বলতে পারেন—এ আমার ভারী অন্যায়। মহাভারতের এক প্রবীণা নায়িকার চরিত-কথা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথমেই এমনভাবে কথাটা আরম্ভ করলাম যাতে কুন্তীর মর্যাদা লঙ্ঘিত হতে পারে। অন্তত অনেকেই তাই ভাববেন। তবে আমার দিক থেকে সাফাই গাইবার দুটো রাস্তা আছে। এক প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর হয়তো বা উপরিউক্ত সংস্কৃত শ্লোকটি দেখে উৎসাহিত হয়েই কুন্তীর সম্বন্ধে দু-চার কথা বলে মহামতি বঙ্কিমচন্দ্রের গালাগাল খেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর 'কবিরত্নপ্রকরণে' লিখেছিলেন— "কোনও সম্পন্ন ব্যক্তির বাটীতে মহাভারতের কথা হইয়াছিল। কথা সমাপ্ত হইবার কিঞ্চিৎ কাল পরেই বাটীর কর্তা জানিতে পারিলেন, তাঁহার গৃহিণী এবং পুত্রবধূ ব্যভিচারদোষে দূষিতা হইয়াছেন। তিনি, সাতিশয় কুপিত হইয়া তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে, গৃহিণী উত্তর দিলেন, আমি কুন্তী ঠাকুরাণীর, পুত্রবধূ উত্তর দিলেন, আমি দ্রৌপদী ঠাকুরাণীর দৃষ্টান্ত দেখিয়া চলিয়াছি। ...তাঁহারা প্রত্যেকে পঞ্চপুরুষে উপগতা হইয়াছিলেন; আমরা তদতিরিক্ত করি নাই।"

বিদ্যাসাগরের এই উপাখ্যান প্রসঙ্গে বঙ্কিমের বক্তব্য ছিল—"এরূপ উপাখ্যান বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিপিকৌশলেও সরস হয় নাই, অথবা তাঁহার নামের বা বয়সের গুণেও নীতিগর্ভ বা ভদ্রলোকের পাঠ্য বলিয়া গৃহীত হইবে না।"

দুই বিশাল ব্যক্তিত্বের এই তর্কাতর্কির নিরিখে বলতে পারি যে, চিরকালীন গৌরবের তিলক-আঁকা ব্যক্তি সম্বন্ধে অন্যথা ভাবনা অন্য সজ্জনের কটূক্তির কারণ ঘটায়। কুন্তীর সম্বন্ধে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মশাই কিছু অন্যথা লিখলেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া হয়েছে। তবে আমার কথারম্ভে বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তির পূর্ব-আলোচনা থাকায় আমার চপলতা কিছু কমে। আমার দ্বিতীয় সাফাইটা অন্য। সেটা হল—আমরা এমন একটা চরিত্র সম্বন্ধে কথা আরম্ভ করেছি, যিনি কোনও এলেবেলে ছিঁচকে সাহিত্যের নায়িকা নন। দ্রৌপদীকে বাদ দিলে মহাভারতের মতো বিরাট কাব্যের প্রথম ভাগের নায়িকা তো কুন্তীই। যিনি মহাকাব্যের নায়িকা হবেন, সঙ্গতভাবেই তাঁর চরিত্রের বিচিত্র দিক থাকবে এবং সেই চরিত্রের এদিক-সেদিক নিয়ে নানা জনে নানা প্রশ্নও তুলবে। সেসব প্রশ্ন ঠিক কি না এবং ঠিক হলে কতটা ঠিক, বেঠিক হলেই বা কতটা বেঠিক—সেটা কুন্তী-চরিত্রের আলোচনার পরিসরে আমাদের ভাবতেই হবে। ভাবতে হবে—আরও এমন কিছু আছে কিনা যাতে করে কুন্তী-চরিত্রের ধূলিমলিন অংশগুলি ধুয়ে মুছে যেতে পারে। দেখুন, মহাকাব্যের নায়িকারা কেউ আকাশ থেকে পড়া কল্পলোকের বাসিন্দা নয়। দোষে-গুণে তাঁরাও আমাদের মতো মানুষই। তবে কিনা তাঁদের চরিত্রে এমন মনোহরণ কতগুলি 'বিশেষ' আছে, যাতে তাঁরা আমাদের দৈনন্দিনতা অতিক্রম করে মহাকাব্যের রসোত্তীর্ণা নায়িকাটি হয়ে উঠেছেন। কুন্তী সেই হাজারো বিশেষ-থাকা এক নায়িকা। অথচ এমনিভাবে দেখতে গেলে আমাদের দেশে কত শত বিধবা পাবেন, যারা বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি কোথাও সুখে থাকেননি, স্বামীর

সুখ পাননি, ছেলের সুখও পাননি— এখন মরার মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। এমনিতে কুন্তীও সেইরকম। এতই সাধারণ। কুন্তীর নিজের মুখেই কথাটা শুনুন।

কুন্তী এখন জীবনের চরম পর্যায়ে দাঁড়িয়ে। বারো বছর ছেলেরা বনে বনে ঘুরে বেড়িয়েছে, এক বছর তাঁদের কাটাতে হয়েছে লুকিয়ে-চুরিয়ে, নিজেদের গোপন করে। তেরো বছর পর আবার দুর্যোধন তাঁদের রাজ্যপ্রাপ্তির অধিকার অস্বীকার করেছেন। এবার কৃষ্ণ এসেছেন দুর্যোধনের কাছে পাঁচ পাণ্ডবভাইয়ের জন্য পাঁচখানা গ্রাম যদি অন্তত পাওয়া যায়। কৃষ্ণ এসে বিদুরের সঙ্গে পূর্বেই কথা বলেছেন। এখন বিকেলবেলায় সাঁঝের আঁধার যখন ঘনিয়ে আসছে, তখন তিনি উপস্থিত হয়েছেন নিজের পিসি কুন্তীর কাছে—নতমুখ, লজ্জায় ম্লান। এক মুহূর্তে সারাজীবনের সমস্ত ক্ষোভ এক জায়গায় জড়ো করে কুন্তী ছেলেদের কুশল জানতে চাইলেন। ছেলে, ছেলের বউ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর সবার সম্বন্ধে কথা বলে কুন্তী এবার কৃষ্ণের কাছে নিজের গোপন করুণ কথাটা এক নিঃশ্বাসে বললেন। বললেন নিজের ভাইয়ের ছেলে কৃষ্ণের কাছে; তিনি ঘরের লোক এবং ঘরের কথা সব জানেন। কৃষ্ণ নইলে, নিজের গভীর অন্তরের কথাটা মহাকাব্যের প্রবীণা নায়িকার মুখ থেকে এমন করে বেরোত কিনা সন্দেহ!

কুন্তী বললেন—বাপেরবাড়ি বলো আর শ্বশুরবাড়ি বলো—কোনও জায়গাতেই আমার কপালে সুখ লেখা ছিল না। দু' জায়গাতেই আমার জুটেছে লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা—সাহং পিত্রা চ নিকৃতা শ্বশুরৈশ্চ পরন্তপ। এই শ্লোকের মধ্যে কুন্তী জন্মদাতা বাবার কথা বলেছেন, যে বাড়িতে এসে তিনি কুন্তী হলেন, সেই বাড়ির কর্তা তাঁর পালকপিতা মহারাজ কুন্তিভোজের কথা বলেননি। আর বলেছেন শ্বশুরদের কথা—অর্থাৎ শ্বশুর এখানে একজন নয়। অনেকগুলি শ্বশুর বা শ্বশুরস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁর দুঃখের জন্য দায়ী—শ্বশুরৈশ্চ পরন্তপ। যিনি পাণ্ডুর সত্যিকারের বাবা সেই শ্বশুর ব্যাসদেবের সম্বন্ধে কুন্তীর কোনও বক্তব্য নেই। বক্তব্য নেই তাঁর সম্বন্ধেও, যিনি পাণ্ডুর নামে বাবা, সেই বিচিত্রবীর্য শ্বশুর সম্বন্ধেও। কারণ তাঁকে পাণ্ডুই দেখেননি তো কুন্তী! তা হলে যাঁদের ওপরে কুন্তীর অভিমান তাঁদের একজন হয়তো পিতামহ ভীষ্ম, যিনি শ্বশুর না হলেও প্রায় শ্বশুরই, কারণ শ্বশুরের প্রথম সম্বন্ধটা তাঁর সঙ্গেই হতে পারত। আরেকজন হলেন ধৃতরাষ্ট্র, যিনি ভাশুর। ভাশুর কথাটা সংস্কৃতে 'ভ্রাতৃশ্বশুর' শব্দ থেকে আসছে; ধৃতরাষ্ট্র তাই শ্বশুর পর্যায়েরই মানুষ। এই ভ্রাতৃশ্বশুর বা ভাশুরের সম্বন্ধে কুন্তীর ক্ষোভ আছে যথেষ্ট। এবং সে ক্ষোভের কারণও আছে যথেষ্ট।

কিন্তু শ্বশুরবাড়ি তো হাজার হলেও পরের বাড়ি। তাকে আপন করে নিতে হয় চেষ্টায়, সাধনায়। বলতে পারি পাণ্ডুর অকালমৃত্যুতে এবং শ্বশুরের মতো অন্যান্যদের অনাদর, অবহেলায় শ্বশুরবাড়িকে আর আপন করে নেওয়া সেরকমভাবে সম্ভব হয়নি কুন্তীর পক্ষে। কিন্তু এই শ্বশুরকুলের ওপর যত না রাগ আছে কুন্তীর, তার থেকে অনেক বেশি রাগ আছে তাঁর নিজের বাপের বাড়ির ওপর। এ এক অদ্ভুত মনের জগৎ যেখানে কুন্তী একা, নিঃসঙ্গ। তাঁর দুঃখ, তাঁর ক্ষোভ— পিতা-মাতার সহৃদয়তা নিয়ে বোঝবার মতো কেউ ছিল না সংসারে, এখনও নেই। আজ পরিণত বয়সে তিনি এমন একজনের কাছে তাঁর মনের ব্যথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্ত করছেন, যিনি তাঁর বাপের বাড়ির লোক। অথবা এমন একজনের কাছে, যাঁর কুন্তীর সমতুল্য অভিজ্ঞতা খানিকটা আছে।

অভিজ্ঞতা মানে এই নয় যে, দু'জনের বয়স সমান, অতএব একে অপরকে বয়সোচিত জ্ঞান দান করে যাচ্ছেন। এখানে অভিজ্ঞতাটা সমান ঘটনায়, অথবা প্রায় সমান পরিস্থিতিতে। কৃষ্ণকেও কৃষ্ণের বাবা বসুদেব বন্ধু নন্দ গোপের কাছে রেখে এসেছিলেন বৃন্দাবনে। বেশ অনেক বয়স পর্যন্ত কৃষ্ণ নন্দরাজাকেই নিজের বাবা বলে জানতেন। সেই জায়গা থেকে কৃষ্ণ অনেক কষ্টে, অনেক বিপরীত পরিস্থিতির মধ্যেও আপন ক্ষমতায় নিজের পিতা-মাতার কাছে চলে এসেছিলেন।

কিন্তু কুন্তীর ব্যাপারটা আরও করুণ। কথাটা একটু খুলে বলি। একটি নিঃসন্তান দম্পতি যখন পিতৃমাতৃহীন একটি শিশুকে পুত্র হিসেবে পালন করেন, সেই শিশু বড় হয়ে নিজের পরিচয় জানলে, তার একরকম মনের গতি হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত এই শিশুটির চেয়ে তার মনের গতি কিন্তু আরও বিচিত্র হবে, যার বাবা-মা বেঁচে আছেন, অথচ নির্বোধ বয়সে যাকে দত্তক দেওয়া হয়েছিল অন্যের কাছে। পরিস্থিতি কিন্তু আরও জটিল এবং কঠিন মনস্তত্ত্বের পরিসর হয়ে দাঁড়াবে যদি এমন একজনকে দত্তক দেওয়া হয়—যে তার বাবা-মায়ের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। খেলাধূলার বয়স যায়নি, কিন্তু বাবা-মাকে যে শিশু নিজের ভালবাসার মাধুর্যে চিনে গেছে, তাকে যদি অন্যের কাছে দত্তক দেওয়া যায়, তবে তার মনের যে জটিল অবস্থা হয় কুন্তীরও তাই হয়েছে।

কুন্তী কৃষ্ণকে বলেছেন—আমি নিজেকে দোষ দিতে পারি না, এমনকী দোষ দিই না দুর্যোধনকেও। সমস্ত দোষ আমার জন্মদাতা পিতার—পিতরস্ত্বেব গর্হেয়ং নাত্মানং ন সুযোধনম্। আমি যখন বাচ্চাদের খেলনা নিয়ে খেলা করি, তখন আমাকে তোমার ঠাকুরদাদা, অর্থাৎ আমার বাবা তাঁর বন্ধু কুন্তিভোজকে দিয়ে দিলেন।

কুন্তী এইটুকু বলেই থামেননি। আরও ক'টা কথা বলেছেন। আজকের নারী-স্বাধীনতার প্রবক্তাদের মুখে নতুন কী কথা শুনব? তাঁরা বলেন—স্ত্রীলোককে সেকালে গয়নাগাটি, ধনসম্পত্তির মতো ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁদের স্বাধীন সত্তার কথা সচেতনভাবে কেউ ভাবেননি। ভাবতে অবাক লাগে আজ থেকে প্রায় দু' হাজার-আড়াই হাজার বছর আগে কুন্তীর মুখ দিয়ে এ কী কথা বেরুচ্ছে? কুন্তী বলছেন—যাঁদের টাকা-পয়সা আছে, তাঁরা যেমন দেদার টাকা-পয়সা দান-ছত্তর করে নাম কিনতে চান, আমার বাবাও তেমনই আমাকে তাঁর বন্ধুর কাছে দত্তক দিয়ে বেশ নাম কিনলেন। আমাকে দিয়ে দিলেন যেন আমি একটা টাকার থলে—ধনং বৃত্তৈরিবার্পিতা।

বাংলায় যা বলেছি, মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ তাই বলেছেন কুন্তীর কথাটি ব্যাখা করতে গিয়ে। তিনি বলেছেন—দাতা হিসেবে খ্যাতি পাওয়ার জন্য ধনী ব্যক্তি যেমন অক্লেশে ধন দান করেন, আমার বাবাও তেমনই অক্লেশে বন্ধুর কাছে দত্তক দিয়েছিলেন আমাকে—বৃত্তৈর্বদান্যত্বেন খ্যাতৈর্ধনং যথা অক্লেশেন অর্প্যতে, তদ্বৎ যেনাহম্ অর্পিতা।

কুন্তী সেকালের পুরুষ-শাসিত সমাজের এক প্রধান প্রতিভূকে, যদুবংশীয় পিতৃতান্ত্রিকতার প্রতীক নিজের বাবাকে যেভাবে, যে ভাষায় নিন্দা করেছেন, আজ দু' হাজার বছর পরে

আধুনিক নারী প্রগতিবাদীরা এর থেকে বেশি কী বলবেন? কুন্তী বলেছেন—বাবা এবং শ্বশুর—দুই পক্ষই আমাকে বঞ্চনা করেছে, আমার আর বেঁচে থেকে লাভ কী, দুঃখের চূড়ান্ত হয়েছে আমার—অত্যন্ত দুঃখিতা কৃষ্ণ কিং জীবিতফলং মম।

ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়—শ্বশুরবাড়িতে বিশেষত ধৃতরাষ্ট্রের কাছে ক্রমাগত বঞ্চনা পেতে পেতে আজ তাঁর মনের অবস্থা এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, যাতে তাঁর ক্ষোভ সমস্ত কিছু ছাপিয়ে একেবারে তাঁর জন্মদাতা পিতা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। অন্তত এই মুহূর্তে বোঝা যাচ্ছে যে, কুন্তী এমন একজন অতিসংবেদনশীল স্পর্শকাতর মহিলা, যাঁকে বাল্যকালের এই ঘটনাটি এখনও পীড়া দিয়ে চলেছে। তাঁকে যখন কুন্তিভোজের কাছে দত্তক দেওয়া হয়, তখন তাঁর পুতুল-খেলার বয়স হয়ে গিয়েছিল বলেই পিতা বলে চিহ্নিত ব্যক্তিটি সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতাও যথেষ্টই হয়ে গিয়েছিল। যে শিশু বাবা-মাকে বাবা-মা বলেই ভালবেসে ফেলেছে, তাকে যদি হঠাৎ দত্তক দিয়ে দেওয়া হয়, তবে তার যে কিছু নিরাপত্তাবোধের অভাব ঘটে—সে কথা বোধকরি খুব কঠিন মনস্তত্ত্বের তত্ত্বকথা নয়, একেবারে সাধারণ কথা। ছোটবেলায় এই নিরাপত্তাবোধের অভাব কুন্তীর কাছে এতটাই 'শকিং' হয়ে গেছে যে, তাঁর মানসিক গতি-প্রকৃতিও সেইভাবেই গঠিত হয়েছে, জটিলতাও কিছু এসেছে।

পণ্ডিতরা, বিশ্বভুবনের সেরা পণ্ডিতেরা দত্তক-দেওয়া বাচ্চাদের মনোজগৎ নিয়ে যে চিন্তাভাবনা করেছেন, সেটা অনেকটাই প্রদত্ত হওয়া এইসব বাচ্চাদের মনোবিকাশের দিকে নজর করে। এইসব বিদগ্ধ পণ্ডিতেরা জানিয়েছেন যে, একটি বাচ্চা জন্মাবার পর অন্তত ছ'মাসের মধ্যে যদি তাকে দত্তক না দেওয়া হয়, তবে তার পরবর্তী সময়ের দত্তকদের 'late placement' বলেই মানতে হবে। ঠিক এই নিরিখে দেখতে গেলে দেরিতে দেওয়া দত্তক সন্তানদের, বিশেষত যাদের পাঁচ থেকে আট বছরের মধ্য-সময়ে দত্তক দেওয়া হচ্ছে, তাদের মধ্যে বিচিত্র ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় এবং দত্তক নেওয়া পিতা-মাতারা সেই প্রতিক্রিয়া কতটা সামলাতে পারেন? সময়ে সময়ে দত্তক-দেওয়া এইসব বাচ্চাদের মনে যে প্রাথমিক ধাক্কা লাগে, যাকে পণ্ডিতেরা বলেছেন 'primary wounds' তার প্রতিক্রিয়া ছাড়াও তাদের বিচিত্র দুঃখ-শৃঙ্খলও একরাশ প্রতিক্রিয়ার (grief-reactions) মধ্যেই ধরা পড়ে এবং সেগুলি প্রায় সময়েই একইরকম।

David Howe নামে এক বিশিষ্ট গবেষক Patterns of Adoption: nature, nurture and psychosocial development নামে একখানি গবেষণা গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, একটু বেশি বয়সে—মানে ওই পাঁচ থেকে সাত আট বছরে যেসব বাচ্চাদের দত্তক দেওয়া হয়, তাদের মানসিক বিক্রিয়ার মধ্যে প্রথমে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে একটা প্রাথমিক ধাক্কা (initial sense of shock) এবং অবিশ্বাস (disbelief) অর্থাৎ আমাকে কেউ ভালবাসে না, আমার সঙ্গে এইরকম হল—এই ধরনের প্রতিক্রিয়া। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই দত্তকদের গ্রাস করে নিদারুণ কষ্ট এবং অন্তর্দাহজাত করুণ বিলাপ-ভাব। তৃতীয় পর্যায়ে আসে ক্রোধ এবং অনুশোচনা এবং কোনওভাবেই মুক্ত না হওয়ার ফলে হতাশা এবং এক ধরনের নির্দ্বন্দ্ব, নির্বিকল্প ভাবও কাজ করতে থাকে মনের গভীরে। অবশেষে এইসব ভাব আস্তে আস্তে থিতু হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং নিরুপায় বলেই সে সবকিছু মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে, নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে অন্যভাবে প্রস্তুত করার প্রয়াসও আরম্ভ হয় এই সময়েই এবং অবশেষে একটা প্রতিজ্ঞাও তৈরি হয় নিজেকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার।

আমরা জানি, পণ্ডিতেরা এই যে একটা প্যাটার্ন তৈরি করেছেন, স্বতোবিভিন্ন মনুষ্য-হৃদয়, বিশেষত শিশুর হৃদয় সেইভাবে চলে না। কিন্তু কিছুটা অন্যরকম হলেও পণ্ডিতদের দেওয়া পরীক্ষিত সূত্রগুলিও কিন্তু অন্যরকমভাবেই এই ধরনের শিশুর হৃদয়ে অন্তঃক্রিয়া করতে থাকে। কুন্তীর ক্ষেত্রেও সেটা হয়েছে, একটা সময় সবকিছু বুঝে নিয়েই তিনি কুন্তিভোজের বাড়ির সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া করে নিয়েছিলেন।

বস্তুত দত্তক দেওয়ার সূত্রে এই পিত্রন্তরের ঘটনা যদি না ঘটত, তা হলেও কুন্তীর জীবনের ঘটনাগুলি একইরকম ঘটতে পারত কিংবা ঘটতে পারত অন্য কোনও উৎপাত। দত্তক নেওয়া মেয়ে বলেই মহারাজ কুন্তিভোজ কুন্তীর বিয়ে কিছু খারাপ দেননি। তা ছাড়া এ বিয়ের ব্যাপার-স্যাপার কৃষ্ণের পিতামহ আর্যক শূর অথবা কৃষ্ণপিতা বসুদেব কিছুই জানতেন না এমনও মনে হয় না। আর সবচেয়ে বড় কথা, কুন্তী হস্তিনাপুরের অধিপতি পাণ্ডুকে বরণ করেছিলেন স্বয়ম্বরসভায়, স্বেচ্ছায়। পাণ্ডুও ভালই রাজত্ব চালাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি যে মারা যাবেন, তাই বা কে জানত? অথবা কে জানত প্রজ্ঞাচক্ষু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁর সঙ্গে এত অপব্যবহার করবেন?

আসলে অবস্থার গতিকে সবই যখন বিপরীত হয়ে দাঁড়িয়েছে—স্বামী মারা গেছেন, শ্বশুরবাড়িতে নিজের অধিকার নেই, সন্তানেরা বনবাসের কষ্ট ভোগ করলেন এবং এখন সমস্ত শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁরা স্বরাজ্য উদ্ধার করতে পারছেন না—এমন অবস্থার গতিকে কুন্তীর সমস্ত রাগ গিয়ে জমা হয়েছে জন্মদাতা পিতার ওপরেই। অভিমান হচ্ছে—যার পিতা সেই শৈশব অবস্থায় পিতৃস্নেহে বঞ্চিত করে একটি শিশু কন্যাকে অন্যের কাছে দত্তক দিয়েছেন, তার আর জীবনের মূল্য কী—কিং জীবিতফলং মম। অথবা কুন্তী তাঁর পিতার ওপর অভিমানে তাঁর জীবনের ঘটনার শৃঙ্খল অন্যভাবে সাজাতে চান—অর্থাৎ যদি তাঁর পিতা কুন্তিভোজকে দত্তক না দিতেন, তা হলে স্বয়ম্বরসভায় পাণ্ডু আসতেন না, যদি পাণ্ডুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে না হত, তা হলে... ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা জানি—এসব কথা ঠিক নয়। এসব কথা কুন্তী এইভাবেই ভেবেছিলেন কি না তাও মহাভারতের কবি স্বকণ্ঠে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। কিন্তু এটা বুঝতে কোনও অসুবিধা নেই যে, পিতার ওপর তাঁর এই অসম্ভব আক্রোশ এসেছে তাঁর সারাজীবন ভোগান্তির ফলে। বিশেষত পাণ্ডুর জীবনাবসানের পর শ্বশুরকুলে পাঁচটি সন্তান নিয়ে তাঁকে এতই কষ্ট পেতে হয়েছে যে, তাঁর পিতার সম্বন্ধে এই অভিমান তাঁর মনের অবস্থাকে আরও জটিলতর এবং দ্বন্দ্বময় করে তুলেছে বলে আমরা মনে করি। কুন্তী-চরিত্র বিশ্লেষণের সময় তাঁর পিতার সম্বন্ধে এই অভিযোগ আর কোনওভাবে কাজ করেছে কিনা তাও আমরা খেয়াল করার চেষ্টা করব।

মথুরা অঞ্চলে আর্যক শূর যেখানে রাজত্ব করতেন, সে রাজত্ব খুব বড় ছিল না বটে কিন্তু সেখানে গণতান্ত্রিক নিয়ম-কানুন কিছু কিছু চলত। রাজ্যগুলি ছোট ছোট 'রিপাবলিক' বা 'সঙ্ঘে' বিভক্ত ছিল। কারণ যদুবংশের অধস্তন বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধক পুরুষেরা এই সঙ্ঘগুলিকেই নেতৃত্ব দিতেন বলে আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পেয়েছি। যাই হোক আর্যক শূর এইরকমই একটা সঙ্ঘাধিপতি ছিলেন, আর কুন্তিভোজ ছিলেন অন্য একটি সঙ্ঘের অধিপতি। ছোট ছোট রাজা হলেও এঁদের সম্মান কারও কম ছিল না।

বৃষ্ণি, অন্ধক, ভোজ, কুকুর—এইগুলি একই যদুবংশের একেকজন নামী রাজার নাম। অধস্তন পুরুষেরা নিজস্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এই নাম ব্যবহারও করতেন। কুন্তীর পালক পিতা কুন্তিভোজ যেমন ভোজবংশীয়, তেমনি অত্যাচারী কংসও ছিলেন ভোজবংশীয়। কুন্তী হয়তো অভিমান করেই বলেছেন যে, তাঁর পিতা বন্ধুত্বের খাতির রাখতে গিয়ে কুন্তিভোজের কাছে তাঁকে দত্তক দিয়েছিলেন—অদাত্তু কুন্তিভোজায় সখা সখ্যে মহাত্মনে। বাস্তবে কিন্তু আর্যক শূর অর্থাৎ কুন্তীর জন্মদাতা পিতার সঙ্গে কুন্তিভোজের আত্মীয়তার বন্ধন ছিল। অন্তত আমার তাই বিশ্বাস।

রাজা শূরের আপন পিসতুতো ভাই হলেন এই কুন্তিভোজ। খিল হরিবংশ থেকে জানতে পারছি—শূরের প্রথম ছেলে নাকি কৃষ্ণপিতা বসুদেব—বসুদেবো মহাবাহুঃ পূর্বম্ আনকদুন্দুভিঃ। তারপর নাকি তাঁর আরও কয়টি ছেলে এবং একেবারে শেষে পাঁচটি মেয়ে জন্মাল—যাঁদের একজন হলেন কুন্তী। সাধারণত মানুষের ঘরে এমন সুশৃঙ্খলভাবে প্রথমে সবচেয়ে গুণশালী পুত্রটি, তারপর কতগুলি এলেবেলে এবং তারও পরে 'লাইন' দিয়ে কতগুলি মেয়ে—এরকম হয় না বলেই সন্দেহ হয় যে, হরিবংশের লেখক-ঠাকুর কৃষ্ণের পিতা বসুদেবের মাহাত্ম্যে আর্যক শূরের সন্তানদের সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়েছেন। বাস্তব ছিল অন্যরকম।

হরিবংশের প্রমাণে এটা আমরা প্রথমে স্বীকার করে নেব যে, বৃষ্ণি-সঙ্ঘের নেতা-রাজা আর্যক শূর বিয়ে করেছিলেন তাঁদেরই পালটি ঘর ভোজবংশের মেয়েকে। আবার ওই কুন্তিভোজও ছিলেন ভোজদেরই ছেলে। ঠিক এইখানটায় আমাদের মহাভারতের কবিকে স্মরণ করতে হবে। মহাভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ থেকে আমরা জানতে পারি যে, কুন্তিভোজ ছিলেন রাজা শূরের আপন পিসতুতো ভাই। তাঁর ছেলে-পিলে ছিল না—পিতৃস্বস্রীয়ায় স তাম্ অনপত্যায় ভারত—এবং হরিবংশ জানাচ্ছে—তাঁর অনেক বয়সও হয়ে যাচ্ছিল—শূরঃ পূজ্যায় বৃদ্ধায় কুন্তিভোজায় তাং দদৌ।

আর্যক শূরের ভোজদের ব্যাপারে একটু টান বেশি ছিল। নিজের স্ত্রী ভোজ-ঘরের, পিসির বিয়ে হয়েছে ভোজ-বাড়িতে আবার তাঁর প্রিয় পুত্র বসুদেব—ভবিষ্যতে যিনি কৃষ্ণের পিতা হবেন—তিনিও লালিত-পালিত হয়েছেন ভোজদের বাড়িতে। ভোজ-কুলের কলঙ্ক মহারাজ কংস এক সময় বসুদেবকে গালাগালি দিয়ে বলেছিলেন—আমার বাবা তোকে মানুষ করেছে—মম পিত্রা বিবর্ধিতঃ। এই যেখানে অবস্থা সেখানে ভোজবংশীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিঃসন্তান কুন্তিভোজের সঙ্গে আর্যক শূরের যথেষ্ট দহরম-মহরম ছিল বলেই আমাদের অনুমান।

আসলে সাধারণ গেরস্ত-বাড়িতে যা হয় এখানেও তাই হয়েছে। কুন্তিভোজ বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন অথচ এখনও তাঁর ছেলেপিলে কিছুই হল না। হয়তো এই অবস্থায় তিনি শূরকে বলেন—তোমার তো বয়স কম। বাপু হে! আমাকে তোমার একটি সন্তান মানুষ করার সুযোগ দাও। মায়া পরবশ হয়ে আর্যক শূর তাঁকে বলেন—ঠিক আছে, আমার প্রথম যে সন্তানটি হবে, তাকেই দিয়ে দেব তোমার হাতে। হরিবংশ এ ব্যাপারে কিচ্ছুটি জানায়নি, কিন্তু মহাভারত বলেছে—আর্যক শূর রীতিমতো প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন এই কথা—অগ্রামগ্রে প্রতিজ্ঞায়—অর্থাৎ প্রথমে যে জন্মাবে, তাকেই দেব। আর্যক শূরের প্রথম সন্তান হল একটি মেয়ে—পৃথা। নিঃসন্তান কুন্তিভোজের ওপর মায়ায় আর্যক শূর তাঁর প্রথমা কন্যাটিকে তাঁর হাতে তুলে দিলেন—অগ্রজাতেতি তাং কন্যাং শূরোঽনুগ্রহকাঙ্ক্ষয়া। অদদৎ কুন্তিভোজায়... ॥

পরবর্তী সময়ে কুন্তী নিজের মনের জ্বালায় কুন্তিভোজের প্রতি আর্যক শূরের এই অনুকম্পা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন বটে, তবে নিজের স্বামী পাণ্ডু এবং নিজের সপত্নী মাদ্রীর পুত্রকামনার নিরিখে নিঃসন্তান পুরুষ বা রমণীর জ্বালা তাঁর বোঝা উচিত ছিল। সেটাও যে তিনি বোঝেননি, তার কারণ—সন্তান ধারণের উপায় ছিল তাঁর আপন করায়ত্ত। এতই সহজ, প্রায় খেলার মতো। সে কথা আসবে যথাসময়ে।

বোঝা গেল—কৃষ্ণপিতা বসুদেব তাঁর বাবা আর্যক শূরের প্রথম পুত্র হলেও হতে পারেন, কিন্তু প্রথম সন্তান নন। কুন্তীই সবার বড় এবং তাঁকে যেহেতু দত্তক দেওয়া হয়েছে অতএব হরিবংশে বসুদেবই হয়ে গেছেন শূরের প্রথম ছেলে অথবা প্রথম সন্তানও। মহাভারতে কিন্তু কুন্তী 'অগ্রজাতা' এবং সে কথা কুন্তী যথেষ্টই জানতেন বলে মনে হয়। কেননা, স্বয়ং কুন্তিভোজও একথা লুকোননি। মহারাজ আর্যক শূরের প্রথম সন্তানের গৌরব, বসুদেবের মতো বিশাল পুরুষের ভগিনী হওয়ার গৌরব—কোনওটাই কুন্তিভোজ পৃথা (কুন্তী)-র কাছে লুকোননি। হয়তো সেই কারণেই কুন্তীর অভিমানটাও থেকেই গেছে। আর্যক শূরের প্রথম কন্যাটিকে দত্তক নিয়েও রাজা কুন্তিভোজ যে তাঁকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করেননি বা করতে পারেননি, সেই কারণেই জন্মদাতা পিতা সম্বন্ধে কুন্তীর সচেতনতা এবং অভিমান—দুইই থেকে গেছে।

দত্তক কন্যা হিসেবে পৃথা যেদিন মহারাজ কুন্তিভোজের বাড়িতে এলেন, তখন তিনি নেহাতই শিশু। এই রাজ্যে এসে তাঁর খারাপ লাগার মতো কিছু ছিল না। রাজা কুন্তিভোজ পরম আহ্লাদে তাঁর এই নতুন-পাওয়া মেয়েকে মানুষ করছিলেন। কোনও কিছুরই অভাব নেই এবং আস্তে আস্তে শূর-দুহিতা পৃথা কুন্তীতে পরিণত হলেন। কথাটা বললাম এইজন্য যে, কুন্তিভোজের পালন-পোষণে তাঁর নামটাই শুধু পালটে যায়নি, তিনি কুন্তিভোজের বাড়ির আচার-আচারণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেন। মেয়েদের যেহেতু শ্বশুরবাড়িতে স্বামীর ঘর করতে হয়, তাই নিজেকে পালটানোর বীজটা তাদের মধ্যে বুঝি থেকেই যায়। আর কুন্তী যেহেতু শিশুকালেই চলে এসেছেন অন্য এক বাড়িতে তাই পরিবর্তন সইয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিতে তাঁর সময় লাগেনি। শৈশব পেরিয়ে কুন্তীর শরীর থেকে কৈশোরের গন্ধও যখন যাই-যাই করছে, সেই সময়ের মধ্যে ভোজবাড়ির গৃহিণীপনার দায়িত্ব প্রায় সবই তাঁর হাতে এসে গেছে। কুন্তিভোজও তাঁর ওপর অনেকটাই নির্ভর করেন।

নির্ভর করার কারণও আছে। মনু মহারাজ যতই বলুন—মেয়েরা ঘরের কাজ নিয়ে থাকবে, আয়-ব্যয় দেখবে ইত্যাদি,—বুঝলাম, সেসব কথা মেয়েদের খানিকটা ঘরে আটকে রাখার জন্য; কিন্তু মহাভারতের সমাজ মনুর নিয়ম-মতো চলত না। সেখানে মেয়েদের স্বাধীনতা ছিল অনেক বেশি। কিন্তু এত স্বাধীনতা সত্ত্বেও কুন্তী যে অল্প বয়সেই একেবারে ভোজবাড়ির গিন্নিটি হয়ে উঠলেন, সে বুঝি কুন্তিভোজের আস্কারায় আর অত্যধিক স্নেহে। একটা ঘটনা এই সূত্রেই বলে নিই।

কুন্তিভোজের বাড়িতে অতিথি এসেছেন দুর্বাসা মুনি। দুর্বাসা বড় কঠিন স্বভাবের মুনি। প্রখর তাঁর তেজ, বিশাল তাঁর ব্যক্তিত্ব। চেহারাটাও বেশ লম্বা-চওড়া, দর্শনীয়। মুখে দাড়ি, মাথায় জটা। তপস্যার দীপ্তি সর্বাঙ্গে। এহেন দুর্বাসা মুনি কুন্তিভোজের বাড়িতে এসে বললেন—তোমার বাড়িতে কিছুদিন ভিক্ষা গ্রহণ করতে চাই। তুমি বা তোমার বাড়ির লোকজন, আমার সঙ্গে কোনও অপ্রিয় আচরণ কোরো না—ন মে ব্যলীকং কর্ত্তব্যং ত্বয়া বা তব চানুগৈঃ।

দুর্বাসা নিজেকে চিনতেন। তাই কেমনভাবে তিনি থাকবেন কুন্তিভোজের বাড়িতে—তার একটা আভাস আগেভাগেই দিয়ে রাখলেন। ঋষি বললেন—আমি যেমন ইচ্ছে বাড়ি থেকে বেরোব, যেমন ইচ্ছে ফিরে আসব—যথাকামঞ্চ গচ্ছেয়ম্ আগচ্ছেয়ং তথৈব চ—আমার অশন, আসন, শয়ন, বসন—সবকিছুই চলবে আমারই মতে। কেউ যেন আমাকে বাধা দিয়ে অপরাধী না হয়—নাপরাধ্যেত কশ্চন। অর্থাৎ আমাকে যেন কেউ 'ডিসটার্ব' না করে।

কেউ যেন অপরাধ না করে—মুনির এই সাবধান-বাণীর মধ্যে তাঁর স্বেচ্ছাময়তার ইঙ্গিত যত আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি আছে সেই ব্যক্তির উদ্দেশে তাঁর ভবিষ্যৎ ক্ষমাহীনতার ইঙ্গিত—যে তাঁকে বাধা দেবে। কুন্তিভোজকে তিনি বলেই দিয়েছিলেন—আমি এইরকম স্বেচ্ছাচারে থাকব—এতে যদি তোমার অমত না থাকে তবেই এখানে থাকব, নচেৎ নয়—এবং বৎস্যামি তে গেহে যদি তে রোচতেঽনঘ। দুর্বাসা মুনিকে যাঁরা চেনেন, তাঁরা বিলক্ষণ জানেন যে,—যদি তোমার অমত থাকে অথবা তোমার যদি পছন্দ না হয়—এই কথাগুলির কোনও মূল্য নেই। অর্থাৎ দুর্বাসার কথা শুনে কুন্তিভোজ যদি বলতেন—আপনার যেরকম নিয়ম-কানুন শুনছি, তাতে তো একটু অসুবিধেই হবে। মানে আপনি যদি একটু...।

দুর্বাসার কাছে এসব কথার ফল—অভিশাপ। আবার তাঁর কথা মতো চলে যদি অপরাধ ঘটে তারও ফল ওই অভিশাপই। তবু যদি কোনওক্রমে দুর্বাসা তুষ্ট হন এই আশায় অন্যদের মতোই কুন্তিভোজ বললেন—না, না, আপনি এসব কী বলছেন? আপনি যেভাবে থাকতে চাইবেন, সেইভাবেই থাকবেন—এবমস্তু। কুন্তিভোজ কথাটা বললেন বটে, কিন্তু বলেই এই অদ্ভুত সংকটে প্রথম যাঁর কথা স্মরণ করলেন—তিনি তাঁর প্রিয় কন্যা মনস্বিনী কুন্তী। কুন্তিভোজ আগাম দুর্বাসাকে বলে বসলেন—আমার একটি বুদ্ধিমতী কন্যা আছে। নাম পৃথা। যেমন তার স্বভাব-চরিত্র, তেমনই সৎ তার প্রকৃতি, দেখতেও ভারী মিষ্টি—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শীলবৃত্তান্বিতা সাধ্বী নিয়তা চৈব ভাবিনী। কুন্তিভোজ বললেন—আমার এই সর্বগুণময়ী মেয়েটি আপনার দেখাশুনো করবে। আমার ধারণা—সে আপনার অবমাননা না করে তার আপন স্বভাবেই আপনাকে তুষ্ট করতে পারবে। আমার বিশ্বাস—আপনি তুষ্ট হবেন, মুনিবর—তুষ্টিং সমুপযাস্যসি।

হয়তো দুর্বাসা দাঁড়িয়েছিলেন, এবার বসলেন। কুন্তিভোজ মুনির সঙ্গে কথা বলে তাঁকে পা ধোয়ার জল আর বসার আসন দিয়েই মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে এলেন ভিতর-বাড়িতে। কৈশোর-গন্ধী বয়সটাকে বিদায় দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত সরলতা নিজের চোখের মধ্যে পুঞ্জীভূত করে ডাগর-চোখে দাঁড়িয়েছিলেন কুন্তী—পৃথাং পৃথুললোচনাম্। কুন্তিভোজ বললেন—দুর্বাসা মুনি আমার ঘরে উপস্থিত। আমাদের এখানে তিনি কিছুদিন থাকতে চান। আমি তাতে হ্যাঁ বলেছি। তাঁর পূজা-আরাধনা এবং তাঁর থাকা-খাওয়ার ব্যাপারে তুষ্টির চরম আশ্বাস আমি তাঁকে দিয়েছি তোমারই ভরসায়—ত্বয়ি বৎসে পরাশ্বস্য ব্রাহ্মণস্যাভিরাধনম্। এখন আমার কথা যাতে মিথ্যে না হয়, তুমি তার ব্যবস্থা করো বাছা।

কুন্তিভোজ এইটুকু বলেই শেষ করতে পারতেন, কিন্তু দুর্বাসা মুনি যেভাবে তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, তার নিরিখে তিনি আরও ক'টা কথা কুন্তীকে বলার প্রয়োজন বোধ করলেন। সেকালের সমাজে তপস্যা এবং স্বাধ্যায়নিষ্ঠ ব্রাহ্মণের সম্মান ছিল বিশাল, অতএব সেই ব্রাহ্মণের তুষ্টির জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে—এমন একটা ইতিবাচক অনুজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে কুন্তিভোজ কতগুলি মানুষের অপমৃত্যুর কথা বললেন—যাঁরা ব্রাহ্মণের অবমাননা করে ওই ফল লাভ করেছে। কুন্তিভোজ স্বীকার করলেন যে, হ্যাঁ ওই হঠাৎক্রোধী, অভিশাপ-প্রবণ একজন মুনিকে তুষ্ট করার ভার কুন্তীর ওপর তিনিই ন্যস্ত করেছেন—সোঽয়ং বৎসে মহাভাগ আহিতস্ত্বয়ি সাম্প্রতম্।

কুন্তিভোজ জানতেন—ব্রাহ্মণ আর দুর্বাসা মুনিতে তফাত আছে। দুর্বাসার স্বেচ্ছাময় ব্যবহার অপিচ তাঁর সাবধানবাণী সত্ত্বেও কুন্তিভোজ যে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিজের মেয়ে কুন্তীকে তাঁর তুষ্টি-বিধানের জন্য নিয়োগ করলেন—এর মধ্যে কিছু কিছু সচেতনতা কাজ করেছে, স্বার্থও কিছু কিছু। একেবারে আপন ঔরসজাতা কন্যাকে তিনি এভাবে নিয়োগ করতে পারতেন কিনা—তাতেও আমাদের সন্দেহ আছে। আর সেইজন্যেই কুন্তিভোজকে মেয়ের কাছে সাফাই গাইতে হচ্ছে, ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে, এমনকী চাটুকারিতাও করতে হচ্ছে। কুন্তী বোধহয় সে-কথা বুঝতেও পারছেন। তাঁর অশান্তির বীজ এখানেই।

কুন্তিভোজ বললেন—অতিথি ব্রাহ্মণদের সৎকার করার ব্যাপারে তোমার নিষ্ঠার কথা আমি ছোটবেলা থেকেই জানি। আমার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ঘরের ভৃত্যরা—যারাই আছে, সবার প্রতি তোমার প্রীতি-ব্যবহার আমি জানি। তারাও প্রত্যেকে তোমার ব্যবহারে তুষ্ট। লোক-ব্যবহারের এইসব ক্ষেত্রে তুমি সর্বত্র তোমার উপস্থিতি প্রমাণ করেছ অর্থাৎ তুমি সর্বত্র জুড়ে বসে আছ—সর্বম্ আবৃত্য বর্তসে। তবু এখনও তুমি ছোট, এবং তুমি আমার মেয়ে—সেইজন্য ব্রাহ্মণের ক্রোধের ব্যাপারটা মাথায় রেখে আমি তোমায় শুধু খেয়াল রাখতে বলছি।

কুন্তিভোজ এখানেও শেষ করতে পারতেন। কিন্তু তা করলেন না। কিন্তু এইবারে তিনি

যে কথাগুলি বললেন তার মধ্যে দত্তক পাওয়া কন্যার মধ্যে তাঁর আত্মীকরণের মাধুর্য যতখানি প্রকাশ পেয়েছে, তার আড়াল থেকে উঁকি দিয়েছে এক ধরনের সংশয়; সামান্যতম হলেও সে সংশয় কুন্তীর মনে অন্য এক প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে—যা সচেতন মনে বোঝা যায় না। একটু বুঝিয়ে বলি কথাটা, একটা বোকা-বোকা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলি।

ধরুন, একটি গৃহস্থ বাড়িতে পুত্রের কৃতিত্ব এবং অকৃতিত্বের ব্যাপার নিয়ে মা-বাবা নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। ধরুন, ছেলেটি ভাল কোনও কাজ করেছে, তখন মা ছেলেটির বাবাকে বলেন—আমার ছেলে বলে কথা, আমি আগেই তোমাকে বলেছিলাম না, ছেলে আমার... ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ মায়ের গলার শিরা ফুলে উঠল, গর্বে মুখ উজ্জ্বল হল। কিন্তু এই ছেলেটি যদি খারাপ কিছু করে আসে, সেদিন তার গর্ভধারিণী স্বামীকে বলবেন—এই যে, তোমার ছেলে কী করেছে শুনেছ? আগেই আমি সাবধান করেছিলাম, তোমার ছেলেকে তুমি মানুষ করো, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরকম একটা কথোপকথন থেকে—বংশের ধারা যাবে কোথায়, যেমন বাপ তেমনই ছেলে—ইত্যাদি অসংখ্য গার্হস্থ্য এবং দাম্পত্য প্রবাদ আমি বহুত্র শুনেছি। অর্থাৎ এক একটা সময় আসে যখন মা কিংবা বাবা পুত্র-কন্যাকে আপোসে 'disown' করেন। সাধারণ জীবনে দৈনন্দিনতার গড্ডলিকাপ্রবাহে এইসব কথোপকথন বড় বেশি মনস্তাপ ঘটায় না। বাবা-মার মনেও না, পুত্র-কন্যার মনেও না। কিন্তু পুত্র-কন্যার জীবন যদি সরল না হয়, তা যদি বাঁধাধরা গতানুগতিকতার বাইরে হয়, তবে বাবা-মায়ের সাধারণ কথাও অনাত্মীকরণের বীজ বপন করতে পারে পুত্র-কন্যার মনে। আমরা এবার কুন্তিভোজের কথায় ফিরে আসব।

কুন্তিভোজ বললেন—প্রসিদ্ধ বৃষ্ণিদের বংশে তুমি জন্মেছ। মহারাজ শূরের তুমি প্রথম মেয়ে। মহামতি বসুদেবের ভগিনী তুমি। তোমার জন্মদাতা পিতা শূর প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন যে, তাঁর অগ্রজাতা প্রথম কন্যাটিকে আমার হাতেই তুলে দেবেন তিনি। তিনি কথা রেখেছেন, তিনি সানন্দে তাঁর কন্যাটিকে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন—দত্তা প্রীতিমতা মহ্যং পিত্রা বালা পুরা স্বয়ম্—সেইজন্যই আজ তুমি আমার মেয়ে।

বাবা হয়ে সানন্দে নিজের কন্যাকে তুলে দিয়েছেন অন্যের হাতে! যত বন্ধুই হন, তবু সানন্দে? কুন্তীর মনে খট করে বাজল না তো? কুন্তিভোজ বললেন—যেমন প্রসিদ্ধ কুলে তুমি জন্মেছ, তেমনই প্রসিদ্ধ কুলে তুমি বড় হয়েছ। এক সুখ থেকে আরেক সুখ, এক হ্রদ থেকে আরেক হ্রদে এসে পড়েছ—সুখাৎ সুখম্ অনুপ্রাপ্তা হ্রদাৎ হ্রদমিবাগতা। এই উপমাটি একেবারে প্রসিদ্ধ মহাকাব্যের উপমা। মহাভারতে এটি বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে— যখন এক রাজবাড়ির মেয়ের বিয়ে হয়েছে আরেক রাজবাড়িতে। কুন্তিভোজ সেই উপমাটি নিজের অজান্তেই ব্যবহার করে ফেললেন। কিন্তু শৈশবের পরিচিত বাবা-মাকে ছেড়ে অন্য বাড়িতে, অন্য বাবা-মার কাছে মানুষ হওয়ার কী সুখ—তা কুন্তীই শুধু জানেন। অন্যদিকে কুন্তিভোজ জানেন শুধু রাজবাড়ির সাজাত্য।

সে যাই হোক, এক কুল থেকে আরেক কুলে, এক হ্রদ থেকে আরেক হ্রদে এসে কুন্তীর না হয় বড় সুখই হল, কিন্তু কুন্তিভোজ এবার কী বলছেন? বলছেন— জানো তো, মন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং নীচ বংশের মেয়েদের যদি খানিকটা আচার-নিয়মের মধ্যে রাখা যায় তবে তারা চপলতাবশত যা করা উচিত নয়, তাই করে ফেলে—দৌষ্কুলেয়া বিশেষেণ কথঞ্চিৎ প্রগ্রহং গতাঃ। বালভাবাদ্ বিকুর্বন্তি প্রায়শঃ প্রমদাঃ শুভে।

হঠাৎ এই কথাটা কেন? কুন্তিভোজ যা বলেছেন, তার অর্থ যদি একান্তই সরল-সোজা হয় তবে কিছুই বলার নেই। কিন্তু মুশকিল হল, নৈষধের কবি শ্রীহর্ষ লিখেছেন—কাব্য-সাহিত্যে এত যে ব্যঞ্জনার ছড়াছড়ি তার মূল নাকি বিদগ্ধা রমণীদের বাচনভঙ্গী—বিদগ্ধনারীবচনং তদাকরঃ। কাজেই কুন্তিভোজ যতই সোজা-সরলভাবেই কথাটা বলুন না কেন, মহাভারতের অন্যতমা নায়িকা কথাটার মধ্যে একটা ইঙ্গিত খুঁজে পেতে পারেন। ভাবতে পারেন—হঠাৎ করে এই মন্দ বংশের কথাটা এল কেন? নিয়ম আচারের শৃঙ্খলের মধ্যে থেকে চপলতা যদি কিছু ঘটে, তা হলে দোষ হবে বংশের, যে বংশে তিনি জন্মেছেন সেই বংশের দোষ হবে। অর্থাৎ এখন বৃষ্ণিকুলকে যতই ভাল-ভাল বলুন, তেমন তেমন কিছু ঘটলে কুন্তিভোজ অনাত্মীকরণের সুযোগ ছাড়বেন না। অর্থাৎ তিনি 'disown' করবেন।

কুন্তিভোজ দুর্বাসাকে তুষ্ট করার জন্য এক লহমার মধ্যে কুন্তীকে স্মরণ করেছেন বটে, কিন্তু আরও একটা সমস্যা তাঁর ছিল, যে সমস্যার কথা তিনি ঘুরিয়ে বলেছেন কুন্তীকে। বলেছেন—পৃথা! রাজকুলে তোমার জন্ম, দেখতেও তুমি ভারী সুন্দর—পৃথে রাজকুলে জন্ম রূপং চাপি তবাদ্ভুতম্—তুমি যেন সেই বংশের অভিমান, রূপের অভিমান ত্যাগ করে দুর্বাসার সেবা কোরো। তাতে তোমারও মঙ্গল, আমারও। মুনি যদি ক্রুদ্ধ হন তা হলে আমার বংশ ছারখার হয়ে যাবে—কৃৎস্নং দহ্যেত মে কুলম্।

বোঝা যাচ্ছে, কুন্তিভোজ অনেক দায়িত্ব দিয়ে দিলেন কুন্তীকে, একেবারে শুষ্ক দায়িত্ব। তিনি একবারও বললেন না—অন্যথা কিছু ঘটলে—তুমি আমার মেয়ে, আমার সম্মান যাবে। বললেন—পৃথা! অর্থাৎ সেই শূর বংশের নাম—পৃথা! তোমার জন্ম রাজকুলে অর্থাৎ সেই রাজবংশের মেয়ে হয়েও অন্য কিছু ঘটলে আমার বংশ ছারখার হয়ে যাবে।

কুন্তী সব বোঝেন, সমস্ত ইঙ্গিত বোঝেন। কুন্তিভোজ তাঁকে মহারাজ শূরের মেয়ে, বসুদেবের ভগিনী বলে যতখানি চাটুকারিতা করেছেন, আমি বুঝি—এসব কিছুর থেকেও বড়—তিনি কৃষ্ণের পিসি। নৈষধে-বলা সেই বিদগ্ধা রমণীদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্যা। হায়! কুন্তিভোজ যদি তাঁর কথার ইঙ্গিতগুলি বুঝতে পারতেন? অথবা তিনি সবই বুঝেছেন।

কুন্তী প্রিয়তম সম্বোধনে 'বাবা' বলে কথা আরম্ভ করলেন না। কুন্তিভোজের মুখে শূর-নন্দিনী 'পৃথা' সম্বোধনের উত্তরে কুন্তীর ভিতর থেকে জবাব দিলেন পৃথা। বললেন—রাজেন্দ্র! এই সম্বোধনের মধ্যে পিতার অভীপ্সাপূরণে কন্যা স্নেহ-যন্ত্রণা নেই, আছে—রাজার আদেশে রাজকর্মচারীর কর্ম-তৎপরতা, রাজার ইচ্ছায় প্রজার ইতিকর্তব্য পালন। এখন এই বয়সে বুঝতে পারি মহাকাব্যের কবিদের এইসব শব্দ-ব্যঞ্জনা কত গভীর করে বুঝেছিলেন কালিদাস। লোক-রঞ্জক রামের আদেশে লক্ষ্মণ যখন সীতাকে রেখে এলেন বাল্মীকির তপোবনে, তখন সীতাও এই সম্বোধনেই কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন—লক্ষ্মণ! সেই রাজা রামচন্দ্রকে বোলো—বাচ্যস্ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা—এই গর্ভাবস্থায় অনুরক্তা স্ত্রীকে যে তিনি বিসর্জন দিলেন, সে কি তাঁর যশেরই উপযুক্ত হল, না বংশ মর্যাদার উপযুক্ত হল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানেও সেই বংশ-মর্যাদা আর যশোরক্ষার প্রশ্ন এসেছে সদ্য যৌবনবতী কুন্তীর তথাকথিত কন্যাত্বের মূল্যে। কুন্তী তাই কন্যাজনোচিত মমতায় জবাব দিতে পারছেন না। তিনি বললেন—রাজেন্দ্র! আচার-নিয়ম-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে আমি নিশ্চয়ই সৎকার করব। তুমি যেমনটি তাঁকে কথা দিয়েছ রাজা, আমি সেইভাবেই কাজ করব। ব্রাহ্মণ-অতিথি ঘরে এসেছেন, তাঁকে উপযুক্ত মর্যাদায় সৎকার করা আমাদের চিরকালের 'স্বভাব'। এতে যে তোমার ঈপ্সিত প্রিয় কার্য করা হবে অথবা আমার মঙ্গল হবে, সে আমার বাড়তি পাওনা—তব চৈব প্রিয়ং কার্য্যং শ্রেয়শ্চ পরমং মম। এখানে 'স্বভাব' শব্দটি এবং সংস্কৃতে দুটি 'চ'-এর প্রয়োগ লক্ষণীয়।

কুন্তী রাজা কুন্তিভোজকে সম্পূর্ণ অভয় দিয়ে বললেন—অতিথি ঋষি সকাল, বিকেল, মাঝরাতে যখন ইচ্ছে ঘরে ফিরুন, আমার ওপরে তাঁর রাগ করার কোনও কারণ ঘটবে না। তোমার আদেশমতো বামুন-ঠাকুরকে সৎকার করার সুযোগ পাচ্ছি—এতে তো আমারই লাভ, রাজা—লাভো মমৈষ রাজেন্দ্র। 'আদেশ' এবং 'রাজেন্দ্র' শব্দটি পুনশ্চ লক্ষণীয়। পাঠক, মাথায় রাখবেন—এর পরের কথাগুলোও।

কুন্তী বললেন—তুমি নিশ্চিন্তে থাকো, 'রাজা'—বিশ্রদ্ধো ভব রাজেন্দ্র—তোমার বাড়িতে থেকে বামুন-ঠাকুরের কোনও অসন্তোষ ঘটবে না। আমি আমার যথাসাধ্য করব, রাজা! অন্তত আমার জন্য তুমি অতিথি-ব্রাহ্মণের কাছ থেকে যে কোনও ব্যথা পাবে না—সে-কথা আমি হলফ করে বলতে পারি—ন মৎকৃতে ব্যথাং রাজন্ প্রাপ্স্যসি দ্বিজসত্তমাৎ।

কুন্তীর ভাষণ ছিল অনেকটাই। কিন্তু সম্পূর্ণ বক্তব্যের মধ্যে 'রাজন্', 'রাজেন্দ্র', 'নরোত্তম', 'নরেন্দ্র'—এই সম্বোধনগুলি পিতৃসম্বোধনের প্রতিতুলনায় আমার কাছে বড় বেশি লক্ষণীয় মনে হয়েছে। তা ছাড়া শেষ বাক্যে পরম আশ্বস্ত কুন্তিভোজও এই বিদগ্ধা রমণীকে পিতৃত্বের মাধুর্যে অভিষিক্ত করেননি। কুন্তীকে তিনি জড়িয়ে ধরেছেন তাঁর আপন আদেশ সমর্থনের আনন্দে—পরিষ্বজ্য সমর্থ্য চ। বলেছেন—তা হলে এই করতে হবে, ওই করতে হবে ইত্যাদি। সৌজন্যের চূড়ান্ত করে আরও বলেছেন—ভদ্রে! আমার ভালর জন্য, তোমার নিজের ভালর জন্য এবং আমার বংশের ভালর জন্যও এই যেমন কথা হল, তেমনটিই কোরো—এমবেতৎ ত্বয়া ভদ্রে কর্ত্তব্যম্ অবিশঙ্কয়া।

কথা শেষ করে কুন্তিভোজ মেয়েকে নিয়ে উপস্থিত হলেন দুর্বাসার কাছে। বললেন—ঋষিমশাই! এই আমার মেয়ে। ভুল করে যদি বা অজ্ঞানে কোনও অপরাধ করে ফেলে তা হলে মনে রাখবেন না সেটা।

দুর্বাসার জন্য আলাদা ঘর ঠিক হল একটা। রাজার দুলালী পৃথা, নাকি কুন্তী, রাজবাড়ির অভিমান ত্যাগ করে, নিদ্রালস্য ত্যাগ করে সেই বাড়িতেই তাঁর স্নান-আহারের যত্ন-আত্তি করতে লাগলেন। নিজেকে বেঁধে ফেললেন কড়া নিয়মে, অবগুণ্ঠন রইল শুচিতার। মুনিকে নিয়ে জ্বালা কম নয়। এই তিনি বলে গেলেন— আমি সকালে ফিরব, কিন্তু ফিরে এলেন সন্ধ্যাবেলায় বা রাত্রে। হয়তো সারা বেলা কুন্তী তাঁর জন্য খাবার-দাবার সাজিয়ে বসে থাকলেন। মনে রাগ নেই, ক্ষোভ নেই, মুখে নেই অপ্রিয় কোনও শব্দ। এর মধ্যে যেটা বেড়েই চলেছিল, সেটা নিত্যনতুন ব্যঞ্জনের বাহার। দুর্বাসা অবশ্য এতেই ছেড়ে দিতেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়তো তিনি বাড়ি এসে দুর্লভ কোনও উপকরণের নাম করে বললেন— এই খাবারটার ব্যবস্থা করোনি? জোগাড় করো, তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করো—সুদুর্লভমপি হ্যন্নং দীয়তামিতি সোঽব্রবীৎ। তারপর সবিস্ময়ে মুনি লক্ষ করতেন তাঁর বলার আগেই সে খাবার তৈরি আছে—কৃতমেব চ তৎ সর্বম্।

নিজের নাটকে এক চরম মুহূর্তে নাটকীয়তা ঘনিয়ে আনার জন্য মহাকবি কালিদাস দুর্বাসা মুনির ক্রোধের অংশটুকু ব্যবহার করেছেন। নাটকের সখী নায়িকার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন— এই দুর্বাসার ক্রোধ বড় সুলভ, স্বভাবটাও তাঁর বাঁকা—এষ দুর্বাসাঃ সুলভকোপো মহর্ষিঃ। কিন্তু মহাকাব্যের এই অন্যতমা নায়িকার পরিসরে আমরা দেখলাম—কুন্তীর সেবা-পরিচর্যায় দুর্বাসা মুনি পরম সন্তুষ্ট। কুন্তী এই দুর্মর্ষণ অতিথিকে দেবতার শ্রদ্ধাটুকু দিয়েছেন কিন্তু তাঁর পরিচর্যা করেছেন—প্রিয়শিষ্যার মতো, পুত্রের মতো, বোনের মতো— শিষ্যবৎ পুত্রবচ্চৈব স্বসৃবচ্চ সুসংযতা। এই পরিচর্যার মধ্যে খোলা হাওয়ার মতো আরও যে এক সুমধুর অথবা স্বেচ্ছা সম্পর্কের অবকাশ ছিল, সেইখানে কুন্তী ছিলেন স্থির। ব্যাসকে তাই লিখতে হয়েছে—স্বসৃবচ্চ সুসংযতা। জীবনের প্রান্তকালে কুন্তী যখন দেবতাকল্প শ্বশুর ব্যাসদেবের কাছে নিজের সমস্ত স্খলন-পতন-ত্রুটিগুলির স্বীকারোক্তি করছেন, সেদিন আরও একটা অদ্ভুত কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন—সমস্ত শুচিতা আর শুদ্ধতা দিয়ে আমি সেই মহর্ষির সেবা করেছিলাম। আমার দিকে মহর্ষির ওপর রাগ করার মতো বড় বড় অনেক ঘটনা ছিল, কিন্তু আমি রাগ করিনি—কোপস্থানেষ্বপি মহৎস্বকুপ্যন্ন কদাচন।

ভুলে গেলে চলবে না—কুন্তী অসাধারণ রূপবতী ছিলেন। স্বয়ং কুন্তিভোজ তাঁকে তাঁর রূপ সম্বন্ধে সাবধানও করেছেন, আবার দুর্বাসার জন্য সেই রূপ ব্যবহারও করেছেন— হয়তো নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অথবা ইচ্ছে করেই। কিন্তু একভাবে দিনের পর দিন কাছাকাছি থাকতে থাকতে, সেবা-পরিচর্যার দান-আদানের মাঝখানে দুর্বাসার শুষ্ক রুক্ষ ঋষি-হৃদয় যদি কখনও কুন্তীর প্রতি সরস হয়ে থাকে, যদি অকারণের আনন্দে কখনও চপলতা কিছু ঘটে গিয়ে থাকে তাঁর দিক থেকে—তবে আপন শুদ্ধতা আর সংযমের তেজে কুন্তী হয়তো মুনির সেই সরসতা এবং চাপল্য সযত্নে পরিহার করেছেন, নিজেকে স্থাপন করেছেন প্রিয়শিষ্যা, পুত্র অথবা ভগিনীর ব্যবহার-ভূমিতে। হয়তো ঋষির দিক থেকে এটাও একরকমের পরীক্ষা ছিল, অথবা নিরীক্ষা। অবশেষে দুর্বাসা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে বাধ্য হয়েছেন। সন্তুষ্ট হয়েছেন কুন্তীর চরিত্রবলে এবং ব্যবহারেই— তস্যাস্তু শীলবৃত্তেন তুতোষ মুনিসত্তমঃ।

এক বৎসর যখন এই সেবা-পরিচর্যায় কেটে গেল, তখন মুনি খুশি হয়ে বললেন—না, কুন্তীর মধুর পরিচর্যায় সামান্যতম দোষও আমি খুঁজে পাইনি। তুমি বর চাও ভদ্রে, এমন বর, যা মানুষের পক্ষে পাওয়া দুর্লভ। এমন বর, যাতে জগতের সমস্ত সীমন্তিনী বধূদের লজ্জা দেবে তুমি। কুন্তী বললেন—আমি যা করেছি, তা আমার কর্তব্য ছিল। আপনি খুশি হয়েছেন, খুশি হয়েছেন পিতা কুন্তিভোজ, আমার বর চাওয়ার প্রয়োজন কী—ত্বং প্রসন্নঃ পিতা চৈব কৃতং বিপ্র বরৈর্মম। আজ থেকে এক বছর আগে রাজোচিত নির্মমতায় যে আদেশ নেমে এসেছিল কুন্তীর ওপর, তা সম্পূর্ণ নিষ্পন্ন করার পরই কুন্তী বোধহয় কুন্তিভোজকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার পিতা বলে ডাকলেন। এমনও হতে পারে মহর্ষির সামনে তাঁর পিতৃত্বের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে চাননি কুন্তী।

যাই হোক কুন্তীর নিষ্কাম ব্যবহারে দুর্বাসা বোধহয় আরও খুশি হলেন। বললেন—ঠিক আছে। বর না হয় নাই নিলে। আমি তোমাকে একটা মন্ত্র দিচ্ছি, যে মন্ত্রে যে কোনও দেবতাকে আহ্বান করতে পারবে তুমি। শুধু আহ্বানই নয় এই মন্ত্রের মাধ্যমে যে দেবতাকেই তুমি ডাকবে, সেই দেবতাই তোমার বশীভূত হবেন। কামনা ছাড়াই হোক অথবা সকামভাবেই হোক এই মন্ত্রবলে যে কোনও দেবতা বাঁধা পড়বেন তোমার বাঁধনে, তিনি ব্যবহার করবেন তোমার ভৃত্যের মতো—বিবুধো মন্ত্রসংশান্তো ভবেদ্ ভৃত্য ইবানতঃ।

দুর্বাসার বর, বড় অদ্ভুত বর। পৃথিবীতে যৌবনবতী কুমারীর প্রাপ্য ছিল আরও কত কিছু, কিন্তু সব ছেড়ে কেন যে দুর্বাসা এই দেব-সঙ্গমের বর দিলেন কুন্তীকে—তা ভেবে পাই না। একটা কথা অবশ্য মনে হয়, যা একেবারেই ব্যক্তিগত। মনে হয়—কুন্তীর রূপ ছিল অলোকসামান্য। তার ওপরে তিনি এখন সদ্য যৌবনবতী। দিনের পর দিন একান্তে এই রূপের সংস্পর্শ ঋষি দুর্বাসাকে হয়তো বা যুগপৎ বিপন্ন এবং বিস্মিত করে তুলত, হয়তো বা তাঁর মনে জাগিয়ে তুলত কোনও অকারণ বিহ্বলতা, যাতে করে কুন্তীকে তিনি স্পর্শও করতে পারতেন না, আবার ফেলেও দিতে পারতেন না—এরে পরতে গেলে লাগে, এরে ছিঁড়তে গেলে বাজে।

সংবৎসরের শেষ কল্পে দুর্বাসা যখন বিদায় নেবার কথা ভাবছেন, তখনও কুন্তীর সম্বন্ধে সেই বিস্ময়-ব্যাকুল বিপন্নতা তাঁকে কিন্তু মোটেই উদাসীন রাখতে পারেনি। অশব্দ অস্পর্শ এক মানসিক আসঙ্গের প্রত্যুত্তরে দুর্বাসা চেয়েছেন—হয়তো প্রতিহিংসায় নয়, হয়তো অকর্মণ্য দাম্ভিকের অক্ষম ঈর্ষায় দুর্বাসা চেয়েছেন—কুন্তী যেন কোনও মর্ত্য মানুষেরই সম্পূর্ণ প্রাপণীয় না হন। পরে দেখব, তা তিনি হনওনি। এমন একটা ভাব যদি থেকে থাকে যে—আমি পেলাম না, অতএব অন্য কেউ যেন তাঁকে না পায়, তবেই কুন্তীর প্রতি দুর্বাসার এই বর আমার কাছে সযৌক্তিক হয়ে ওঠে। আরও সযৌক্তিক হয়ে ওঠে মহাভারতের কবির ব্যঞ্জনা। এমন ব্যঞ্জনা যে, শুষ্ক হৃদয় ঋষির বর দেওয়ার সময়েও মনে রাখতে হচ্ছে যে,—এমন একজনকে তিনি বর দিচ্ছেন যিনি রূপে অতুলনীয়া—ততস্তাম্ অনবদ্যাঙ্গীং গ্রাহয়ামাস স দ্বিজঃ। দেবলোকের বিভূতি দিয়ে দুর্বাসা কুন্তীকে দেবভোগ্যা করে রাখলেন। কুন্তীর রূপ-মাধুর্য সম্বন্ধে একেবারে নিজস্ব কোনও সচেতনতা না থাকলে এক নবযুবতীর প্রতি দেব-সঙ্গমের এই প্রসঙ্গ উত্থাপন এবং বরদান একজন বিরাগী ঋষির দিক থেকে কতখানি যুক্তিযুক্ত?

একেবারে অন্য প্রসঙ্গ হলেও না বলে পারছি না যে, দুর্বাসা মুনির কাছে সংস্কৃত মহাকাব্যের কবি থেকে নাট্যকার—সবাই যেভাবে ঋণী তাতে অন্যভাবে এই ঋষির আলাদা মর্যাদা পাওয়া উচিত ছিল। পরবর্তীকালে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মাঝখানে শুধুমাত্র দুর্বাসার শাপের আমদানি করে কালিদাস যেমন নাটক জমিয়ে দিলেন, তেমনই মহাকাব্যের কবিও দুর্বাসার বরমাত্র ব্যবহার করে কুন্তীর গর্ভে মহাভারতের ভবিষ্যৎ নায়কের সম্ভাবনা তৈরি করে রাখলেন। ভারী আশ্চর্য লাগে ভাবতে—চরম একটা নাটকীয়তার জন্য—অনুকূল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথবা প্রতিকূলভাবে সেই দুর্বাসাকেই কত না ব্যবহার করেছেন মহাকবিরা। এসব কথা বলব এক সময়ে, মুনি-ঋষিদের নিয়ে আলোচনার পরিসরে।

৪

নবীন যৌবনমতী কুন্তীর কানে দেব-সঙ্গমের রহস্য-মন্ত্র উচ্চারণ করে দুর্বাসা যেই চলে গেলেন, আর অমনই কুন্তীর কুমারী-হৃদয়ে শুরু হল নতুন এক অনুভূতি। তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র কথা কইতে শুরু করল পুরুষ-গ্রহণের স্বাধীনতায়। সামান্যতম সংশয় শুধু মন্ত্রের বলাবল নিয়ে—পাব তো, যাঁকে চাই, তাঁকেই কি পাব? এ কেমন মন্ত্র যাতে ইচ্ছামাত্র বশীভূত করা যায় যেকোনও অভীপ্সিত পুরুষকে! আমি পরীক্ষা করব মন্ত্রের শক্তি, দেখব—যাকে চাই সে আমার ডাক শুনতে পায় কি না? কুমারী হৃদয়ে এই নবসঙ্গমের ভাবনায় তাঁর ঋতুভাব ত্বরান্বিত হল। ঋতুর এই অস্বাভাবিকতা বৈদ্যশাস্ত্রে মোটেই অস্বাভাবিক নয়, কারণ কুন্তী মন্ত্র পরীক্ষার জন্য সবসময় পুরুষের আসঙ্গ ভাবনায় আকুল ছিলেন—এবং সঞ্চিন্তয়ন্তী সা দদর্শর্তুং যদৃচ্ছয়া।

তারপর একদিন। সেদিন অন্তঃপুরের অট্টালিকায় একলা ঘরে পুষ্পের বিছানায় শুয়েছিলেন পুষ্পবতী কুন্তী। ভোরের সূর্য তাঁর কিরণ-করের স্পর্শে নবযুবতীর গালখানিও যেন লাল করে দিল। কী ভাল যে লাগছিল কুন্তীর! পূর্ব দিগন্তে আকাশের বুক চিরে বেরিয়ে আসছে রক্তিম সূর্য—তাঁর সুমধুর নান্দনিক পরাক্রমে মুগ্ধা কুন্তীর, মন এবং দৃষ্টি—দুইই নিবদ্ধ হল সূর্যের দিকে। রাত্রি-দিনের সন্ধিলগ্নের এই দেবতাটিকে এক দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে কুন্তী তাঁর মধ্যে দিব্যদর্শন এক পুরুষের সন্ধান পেলেন। দেখতে পেলেন তাঁর কানে সোনার কুণ্ডল, বুক-পিঠ জুড়ে সোনার বর্ম—আমুক্তকবচং দেবং কুণ্ডলাভ্যাং বিভূষিতম্।

মনে রাখা দরকার—দেবতার রাজ্যে সূর্য এমন এক দেবপুরুষ, যাঁর প্রাধান্য এবং মহিমা অন্য সমস্ত দেবতার চাইতে বেশি। ঋগ্‌বেদে তিনি শুধুই দেবতামাত্র নন, অন্যান্য অনেক দেবতাকেই তাঁর বিভূতি বলে মনে করা হয়। এই তো কিছুদিন আগে দক্ষিণী পণ্ডিত অধ্যাপক সীতারাম শাস্ত্রী সমস্ত ঋঙ্‌মন্ত্রের সূর্যনিষ্ঠ ব্যাখ্যা করতেন। এমনকী পরবর্তীকালে যে সমস্ত দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে—বেদের সঙ্গে যাঁদের সোজাসুজি কোনও যোগ নেই, তাঁদেরও সৌর-কুলীনতা প্রতিষ্ঠা করা গেলে মিথলজিস্টরা তাঁদের বেশি মর্যাদা দেন। বেদের পরবর্তীকালে নারায়ণ-বিষ্ণুর যে এত মহত্ত্ব দেখতে পাই, সেই বিষ্ণু-নারায়ণও কিন্তু আসলে সূর্যই। ধ্যেয়ং সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্তী—তাঁরও কানে সোনার দুল, মাথায় মুকুট।

দেব-তত্ত্বের মূল-স্বরূপ ওই সূর্যকেই কুন্তী তাঁর মন্ত্র-পরীক্ষার প্রথম আধার বলে বেছে নিলেন। হৃদয়ে হাত ঠেকিয়ে আচমন-পুরশ্চরণ করে দুর্বাসা মন্ত্রে কুন্তী আহ্বান জানালেন সূর্যকে। সূর্য নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করলেন। আকাশ থেকে নিজের তাপ-বিতরণের কাজ যেমন চলার তেমনই চলল, কিন্তু অলৌকিকতার সূত্রে তিনি শরীর পরিগ্রহ করে কুন্তীর সামনে এসে দাঁড়ালেন—মুখে হাসি, মাথায় বদ্ধমুকুট, তেজে চারদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কুন্তীর জীবনের প্রথম অভীপ্সিত পুরুষ, তিনি তাঁকে ডেকেছিলেন সানুরাগে—তস্য দেবস্য ভাবিনী।

অতএব এই অনুরাগের প্রত্যুত্তরের মতো সুন্দর ভাষায় সূর্য বললেন—ভদ্রে। প্রথম আলাপে স্ত্রী-লোককে 'ভদ্রা' সম্বোধনটি অনেকটা ফরাসিদের মাদামের মতো। এই সম্বোধনের মধ্যে প্রথম আলাপের দূরত্বটুকু বজায় রেখেই সূর্য বলেন—ভদ্রে! আমি এসেছি তোমার মন্ত্রের শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে। এখন আমি সম্পূর্ণ তোমার বশীভূত—বলো আমি কী করব—কিং করোমি বশো রাজ্ঞি? অনুরাগবতী কুন্তীর বুঝি এইবার আপন কুমারীত্বের কথা স্মরণ হল। কুন্তী বললেন—আপনি যেখান থেকে এসেছেন সেখানেই ফিরে যান। আমি কৌতুকবশে অর্থাৎ এমনি মজা দেখার জন্য আপনাকে ডেকেছি, অতএব আপনি এখন ফিরে যান—কৌতূহলাৎ সমাহূতঃ প্রসীদ ভগবন্নিতি। সংস্কৃতে আছে—প্রসীদ—প্রসন্ন হোন, ফিরে যান; ইংরেজিতে এই 'প্রসীদ' হল—প্লিজ।

যৌবনবতী কুন্তী সানুরাগে দেব-পুরুষকে ডেকেছেন মজা দেখার জন্য—কৌতূহলাৎ সমাহূতঃ,—তিনি জানেন না একক পুরুষকে সানুরাগে ঘরে ডাকলে সে আর প্রসন্ন হয়ে ফিরে যায় না; প্রথম ভদ্র সম্বোধনের পরেই তার নজর পড়ে অনুরাগবতীর শরীরে। উচ্চাবচ প্রেক্ষণের পর যথাসম্ভব ভদ্র সম্বোধনে সে বলে—কৃশকটি সুন্দরী আমার! যাব, নিশ্চয় যাব, কিন্তু আমাকে সাদরে ডেকে এনে নিজের ইচ্ছে বৃথা করে এমন করে পাঠিয়ে দেবে আমাকে—ন তু দেবং সমাহূয় ন্যায্যং প্রেষয়িতুং বৃথা? সূর্য পরিষ্কার বললেন—আমি তোমার ইচ্ছেটুকু জানি। তুমি চাও—সোনার বর্ম-পরা সোনার কুণ্ডল-পরা আমার একটি পুত্র হোক তোমার গর্ভে। কিন্তু তার জন্য যে তোমার শরীরের মূল্যটুকু দিতেই হবে। তুমি নিজেকে আমার কাছে ছেড়ে দাও—স ত্বমাত্মপ্রদানং বৈ কুরুষ্ব গজগামিনি। তুমি যেমন ভেবেছ তেমন পুত্রই হবে তোমার এবং আমিও যাব তোমার সঙ্গে মিলন সম্পূর্ণ করে—অথ গচ্ছাম্যহং ভদ্রে ত্বয়া সঙ্গম্য সুস্মিতে।

সূর্যের প্রণয়-সম্বোধনের মধ্যে এখন রমণীর অলসগামিতা অথবা মধুর হাসিটিও উল্লিখিত হচ্ছে। অবশ্য এই সপ্রণয় ভাষণের মধ্যে পুরুষের ভয় দেখানোও ছিল। কথা না শুনলে অভিশাপ দিয়ে তোমার বাবা আর সেই ব্রাহ্মণ ঋষিটিকে ধ্বংস করব—এর থেকেও বড় দায় চাপানো হয়েছিল কুন্তীর নিজের চরিত্রের ওপরই। সূর্য বলেছিলেন—তুমি যে আমার মতো একজন দেবপুরুষকে ঘরে ডেকে এনেছ—এই অন্যায় কাজ তোমার বাবা জানেন না। কিন্তু তোমার অপরাধে আমি ধ্বংস করব তাঁকে এবং তাঁর পরিজনকে। এবারে সূর্য কুন্তীর স্বভাব নিয়েই বড় গালাগালি দিয়ে ফেললেন। সূর্য বলতে চাইলেন— বোকা হলেন সেই মুনি যিনি তোমাকে এই মন্ত্র দিয়েছেন। পুরুষের সম্বন্ধে যে রমণীর সংযমটুকু নেই, সেই রমণীকে এই মন্ত্র দেওয়াটাই একটা বাতুলতা। তা সেই ব্রাহ্মণকে গুরুতর দণ্ড দেব আমি, যিনি তোমার স্বভাব-চরিত্র না জেনেই এই পুরুষ-আহ্বানের মন্ত্র তোমায় শিখিয়েছেন—শীলবৃত্তমবিজ্ঞায়... যোঽসৌ মন্ত্রমদাত্তব।

সূর্য যে প্রত্যাখ্যাত হয়েই কুন্তীর স্বভাব-চরিত্র নিয়ে গালাগালি দিচ্ছেন, সে-কথা আমরা বেশ বুঝতে পারি। কুন্তীর মন্ত্র-পরীক্ষার মধ্যে কৌতুক ছাড়া অন্য কোনও প্রবৃত্তি ছিল বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মনে করি না। একান্ত মানবোচিতভাবে ব্যাপারটা ভেবে দেখুন—অসাধারণ কোনও লাভের অভিসন্ধি মেশানো এমন কোনও মন্ত্র যদি আমরা পেতাম, তবে আমরাও তা পরীক্ষা করেই দেখতাম। মন্ত্রের শক্তি যে আছে, সে সম্বন্ধে মানুষ ইতিবাচক ধারণা পূর্বাহ্নে পোষণ করে না বলেই মণি-মন্ত্র-মহৌষধি—মানুষ তাড়াতাড়ি পরীক্ষা করতে চায়। তার মধ্যে এই মন্ত্র হল বশীকরণের মন্ত্র: আধুনিক যুবক-যুবতীর হাতে যদি পুরুষ বা রমণী বশ করার এমন সিদ্ধমন্ত্র থাকত, তবে তা অবশ্যই পরীক্ষিত হত কুন্তীর মতোই কৌতুকে—এ-কথা আমি হলফ করে বলতে পারি।

তবে দেবপুরুষ কুন্তীকে যে গালাগালি দিচ্ছিলেন, সে কুন্তীর স্বভাব-চরিত্রের জন্য যতখানি, তার চেয়ে অনেক বেশি নিজের সম্মানের জন্য। সুন্দরী রমণীর কাছে সাদর আমন্ত্রণ লাভ করে কোন পুরুষেরই বা প্রত্যাখ্যাত হতে ভাল লাগে, নিজের বন্ধু-বান্ধব বা সমাজের কাছেই বা তার মুখ থাকে কতটুকু? সূর্যের আসল কথাটা এবার বেরিয়ে এল। তিনি বললেন—তুমি যে আমাকে অনুরাগ দেখিয়ে এখন বঞ্চিত করছ—এসব আকাশ থেকে আমার বন্ধু দেবতারা দেখছেন আর হাসছেন—পুরন্দরমুখা দিবি। ত্বয়া প্রলব্ধং পশ্যন্তি স্ময়ন্ত ইব ভাবিনি। তোমার তো দিব্যদৃষ্টি আছে, একবার তাকিয়ে দেখো আকাশপানে। কুন্তী সূর্যের কথা শুনে আকাশের দিকে চাইলেন। দেখলেন অন্য দেবতাদের।

কুন্তী নিজের বোকামিতে সত্যিই লজ্জা পেলেন। কৌতুক-লিপ্সু কুমারী এক মুহূর্তে যেন বড় হয়ে গেলেন। বললেন—তবু আপনি চলে যান সূর্যদেব। আমার পিতা-মাতা আমাকে এই শরীর দিয়েছেন, মেয়েদের কাছে এই শরীর-রক্ষার মূল্যই যে সবচেয়ে বেশি, কারণ দ্বিতীয় একটি কুমারীর শরীর তো আমি তৈরি করতে পারব না, অতএব আমার এই কুমারী-শরীরটাই আমাকে রক্ষা করতে হবে—স্ত্রীণাং বৃত্তং পূজ্যতে দেহরক্ষা। কুন্তী এবার অনুনয়ের সুরে বললেন—বিশ্বাস করুন, আমি আমার অল্প বয়সের চঞ্চলতায় শুধু কৌতুকের বশে মন্ত্রশক্তি জানার জন্য আপনাকে ডেকেছি। এটা ছেলেমানুষি ভেবেই আপনি ক্ষমা করে দিন।

সূর্য বললেন—বয়স তোমার অল্প বলে আমিও তোমাকে এত সেধে সেধে বলছি। অন্য কেউ কি আমার এত অনুনয় পাওয়ার যোগ্য? তুমি নিজেকে ছেড়ে দাও আমার কাছে, তাতেই তোমার শান্তি হবে—আত্মপ্রদানং কুরু কুন্তি কন্যে শান্তিস্তবৈবং হি ভবেচ্চ ভীরু। সূর্য শুধু একটা কথাই ভাবছেন। ভাবছেন—যে রমণী প্রথম যৌবনের চঞ্চলতায় সাদরে দেবপুরুষকে কাছে ডেকেছে, উপভোগের দ্বারাই তার শান্তি হবে। হয়তো এটাই ঠিক—কুন্তীর প্রথম আহ্বানটুকু মিথ্যে ছিল না, কিন্তু ডাকার পর পুরুষের একান্ত দুরবগ্রহ একমুখী প্রয়াস দেখে এখন তিনি চিন্তিত, ব্যথিত। যে কোনওভাবেই হোক, সূর্য কুন্তীর শরীর-সম্ভোগ ব্যতিরেকে ফিরে যেতে চান না। স্বর্গের দেবতা হওয়া সত্ত্বেও মনুষ্য-রমণীর আহ্বানে তিনি মানুষের শরীরে নেমে এসেছেন ভুঁয়ে। এখন এই সামান্যা মানবী তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবে, এ তিনি সহ্য করতে পারছেন না। কুন্তীর কাছে বারংবার দেবসমাজে তাঁর ভাবী অপমানের কথা তিনি বলেওছেন, কারণ সেটাই তাঁর প্রধান লজ্জা—গমিষ্যাম্যনবদ্যাঙ্গি লোকে সমবহাস্যতাম্।

কুন্তী অনেক চিন্তা করলেন। সূর্য সতেজে তাঁর হাত ধরেই রয়েছেন। তবু মুখখানি নিচু করে তিনি কত কিছুই ভেবে নিলেন। বুঝলেন—তাঁর প্রত্যাখ্যানে নিরপরাধ কুন্তিভোজ এবং স্বয়ং দুর্বাসার বিপদ নেমে আসতে পারে। অন্যদিকে স্বর্গের দেবতা উপযাচক হয়ে তাঁর কাছে প্রসাদ ভিক্ষা করছেন, তাঁর হাতখানিও ধরে আছেন নিজের হাতে—এই বিচিত্র অনুভূতি তাঁর মোহও জন্মাচ্ছে বারে বারে। একদিকে তিনি 'শাপ-পরিত্রস্তা' অন্যদিকে 'মোহেনাভিপরীতাঙ্গী'—এই ভয় এবং মোহের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কুন্তী এবার তাঁর ভয় এবং মোহ দুই-ই প্রকাশ করলেন সূর্যের কাছে।

ভয়াবিষ্টা কুন্তী বললেন—আমার বাবা, মা, ভাই, আত্মীয়-স্বজন কী বলবে আমাকে? তাঁরা এখন বেঁচে আছেন, আর আমি সমাজের নিয়ম ভেঙে নিজেকে হারিয়ে ফেলব? যদি সব নিয়ম ভেঙে এমনি করে হারিয়ে ফেলি নিজেকে—ত্বয়া তু সঙ্গমো দেব যদি স্যাদ্ বিধিবর্জিতঃ—তা হলে আমার বংশের মান-মর্যাদা সব যাবে।

মোহাবিষ্টা কুন্তী বললেন—আর এত কথা শুনেও যদি মনে হয়, আপনি যা বলছেন তাই ধর্ম, তবে আমি আত্মীয়-স্বজনের দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে আপনার ইচ্ছে পূরণ করব—ঋতে প্রদানাদ্ বন্ধুভ্য স্তব কামং করোম্যহম্। কিন্তু আমার একটাই কথা—আমার এই শরীর দিয়েও আমি সতী থাকতে চাই। কুন্তী এই মুহূর্তে সূর্যকে সম্বোধন করলেন 'দুর্ধর্ষ' বলে—আত্মপ্রদানং দুর্ধর্ষ তব কৃত্বা সতী ত্বহম্। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট।

মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন—অধিকাংশ ধর্ষণের ক্ষেত্রে—যেখানে পরস্পরের পরিচিতি আছে—সেখানে রমণীর দিক থেকে প্রাথমিক বাধাদানের ব্যাপার থাকলেও পরবর্তী সময়ে কিছু আত্মসমর্পণের ইচ্ছাও থেকে যায়। কিন্তু কি রমণী, কি পুরুষ, তিন ভুবনের সার কথাটা কুন্তীর মুখ দিয়েই বেরিয়েছে—শরীর দিয়েও আমি সতী থাকতে চাই। প্রথম যৌবনের হাজারও চঞ্চলতার মধ্যেও রমণীর পক্ষে বিধিবহির্ভূত মিলনের এই হাহাকারটুকু বড়ই স্বাভাবিক—আমি আপনাকে শরীর দিয়েও সতী থাকতে চাই—আত্মপ্রদানং দুর্ধর্ষ তব কৃত্বা সতী ত্বহম্।

সূর্য সব বোঝেন। কুন্তীকে সামান্য উন্মুখ দেখা মাত্রই তিনি কথা আরম্ভ করলেন একেবারে কামুক পুরুষের স্বার্থপরতায়। বললেন—বরারোহে। বরারোহা মানে জানেন কি? A good mount for a distinguished personality. সূর্য বললেন—বরারোহে! তোমার বাবা-মা বা অন্য কোনও গুরুজন—কেউ তোমার প্রভু নন অর্থাৎ জীবনের এই বিশেষ মুহূর্তে তাঁদের ইচ্ছামতো চলার কথা নয় তোমার। যাতে তোমার ভাল হবে, সেই কথাই বরং আমার কাছে শোনো। সূর্য এবার পণ্ডিত-জনের পাণ্ডিত্য দেখিয়ে বললেন—'কম্' ধাতুর অর্থ কামনা করা। কন্যা শব্দটাই এসেছে এই ধাতু থেকে, অতএব কন্যাজন মাত্রই সব পুরুষকেই কামনা করতে পারে, সে স্বতন্ত্রা—সর্বান্ কাময়তে যস্মাৎ কমের্ধাতোশ্চ ভাবিনি। তস্মাৎ কন্যেহ সুশ্রোণি স্বতন্ত্রা বরবর্ণিনি।

সূর্য কন্যা-শব্দের মধ্যেই কামনার উৎস প্রমাণ করে দিয়ে কুন্তীর মনের আশঙ্কা দূর করতে চাইলেন। বোঝাতে চাইলেন সূর্যের প্রতি তাঁর অনুরাগবতী হওয়াটাই যথার্থ হয়েছে। কামনার চূড়ান্ত পর্যায়ে কুন্তীর কাছে সূর্যের যুক্তি হল—স্ত্রী এবং পুরুষ পরস্পরকে কামনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবে, এইটাই স্বাভাবিক, এবং অন্যটাই বিকার—স্বভাব এষ লোকানাং বিকারোঽন্য ইত্য স্মৃতঃ। সূর্য জানেন—এত যুক্তি, এত স্বভাব-বোধনের পরেও কুমারী কুন্তীর মনে সামাজিকের সেই ভ্রূকুটি-কুটিল জিজ্ঞাসাটুকু থেকেই যাবে। অতএব প্রথম যৌবনবতী রমণীর রিরংসা এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা কুন্তীকে আশ্বাস দিয়ে সূর্য বললেন—আমাদের মিলনের পর তুমি আবারও তোমার কুমারীত্ব ফিরে পাবে—সা ময়া সহ সঙ্গম্য পুনঃ কন্যা ভবিষ্যসি—আর তোমার ছেলেও হবে অনন্ত খ্যাতির আধার এক মহাবীর।

সূর্যের এই আশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কুন্তী তাঁকে সম্বোধন করেছেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচার ভঙ্গীতে—হে আমার আঁধার-দূর-করা আলো—সর্বতমোনুদ। এই মুহূর্তে কুন্তী জানেন—যে ছেলে জন্ম নেবে সূর্যের ঔরসে, সেই ছেলের সঙ্গে তাঁর থাকা হবে না, তাকে লালন-পালন করার সামাজিক সাহস তাঁর নেই। থাকলে কুমারীত্বের জন্য লালায়িত হতেন না তিনি। কিন্তু 'দুর্ধর্ষ' এই তেজোনায়ক ফিরে যাবেন না অসঙ্গমের অসন্তোষ নিয়ে। অতএব সেই ভবিষ্যৎ সন্তানের জন্মলগ্নেই তাঁর স্বয়ম্ভরতার নিরাপত্তা চান তিনি। কুন্তী বললেন—আপনার ঔরসে আমার যে পুত্র হবে সে যেন আপনার অক্ষয় কবচ এবং কুণ্ডল নিয়েই জন্মায়। সূর্য বললেন—তাই হবে ভদ্রে! এই কবচ এবং কুণ্ডল অমৃতময়। তোমার সেই পুত্র অমৃতময় বর্ম এবং কুণ্ডল নিয়েই জন্মাবে।

কুন্তী বললেন—যদি তাই হয়, যদি আমার পুত্রের কুণ্ডল এবং বর্ম দুটিই অমৃতময় হয় অর্থাৎ জীবনে বেঁচে থাকার নিরাপত্তা যদি তার স্বায়ত্তই থাকে, তবে হোক আপনার ঈপ্সিত সঙ্গম, যেমনটি আপনি বলেছেন আমি তাতেই রাজি—অস্তু মে সঙ্গমো দেব যথোক্তং ভগবংস্ত্বয়া। মনে করি—আমার পুত্র আপনারই মতো শক্তি, রূপ, অধ্যবসায়, তেজ এবং ধর্মের দীপ্তি নিয়ে জন্মাবে।

কুন্তী দেখেছেন—সূর্যের হাত থেকে যখন নিস্তার নেই-ই, সেক্ষেত্রে তাঁর কন্যাসত্তা এবং ভাবী পুত্রের নিরাপত্তা—দুটিই তাঁর একান্ত প্রয়োজন—একটি বাস্তব কারণে, অন্যটি মানবিক। প্রথম যৌবনের কৌতূহলে তিনি বোকার মতো ভুল করে ফেলেছিলেন, তাকে তিনি শুধরে নিয়েছেন মনস্বিনীর মতো অতি দ্রুত, সূর্যের দ্বারা প্রায় আলিঙ্গিত অবস্থায়। ভবিষ্যৎ জীবনের পরিণত মাতৃত্বের ব্যাপ্তি প্রথম যৌবনের মাদকতার মধ্যে আশা করা যায় না বলেই, অন্তত পুত্রের নিরাপত্তার ভাবনাই যে তাঁকে এই মুহূর্তে স্বতন্ত্র নারীর মহিমা দিয়েছে, তাতে সন্দেহ কী? ভবিষ্যতে কর্ণের শত অভিমানের উত্তরে সূর্যের দুরাগ্রহ এবং তাঁর অসহায়তার জবাবদিহি সম্ভব ছিল না বলেই অন্তত এই নিরাপত্তার চিন্তাও আমার কাছে কুন্তীর বাস্তববোধের পরিচয়।

কুমারীত্ব এবং কুমারীপুত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত হতেই কুন্তী তাঁর প্রথম মিলনের কৌতুক যেন আবারও ফিরে পেয়েছেন, অন্তত দেখাচ্ছেন সেইরকম। সূর্যের কথায় সায় দিয়ে তিনি বলেছেন—হোক সেই পরমেপ্সিত মিলন—সঙ্গমিষ্যে ত্বয়া সহ—যেমনটি তুমি চাও। আর প্রার্থিতা রমণীর সোচ্চার আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য একাধিক প্রিয় সম্বোধনে ভরিয়ে তুলেছেন কুন্তীকে—আমার রানি, যৌবন শোভার আধার, বামোরু। সূর্য আলিঙ্গন করলেন কুন্তীকে, হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন কুন্তীর নাভিদেশ। দেবভাব থাকা সত্ত্বেও মানুষের শরীরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূর্যের করস্পর্শের এই ইঙ্গিত পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ফুটিয়ে তুলতে দ্বিধা করেননি। বলেছেন—বসনমোচনায় ইত্যাশয়ঃ।

নবীন যৌবনবতী কুন্তী যেদিন সূর্যকে দেখে সকৌতুকে পুরুষ বশীকরণের মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, সেদিন তিনি ভেবেছিলেন—দেখি তো পুরুষকে কাছে ডাকলে কেমন হয়! দেখি তো পুরুষ ভোলালে কেমন হয়! এই কৌতুক আর কৌতুক রইল না, কঠিন বাস্তব আর সূর্যের 'দুর্ধর্ষতা'য় সে কৌতুক এক মুহূর্তে কুন্তীকে প্রৌঢ়া করে তুলল। আর এখন সেই অভীপ্সিত সঙ্গম-কৌতুকের মুহূর্তে পুরুষের ধর্ষণ-মুখরতায় কুন্তী অচেতন হয়ে গেলেন। মহাভারতের কবি দেবতা পুরুষকে বাঁচানোর জন্য লিখেছেন—কুন্তী সূর্যের তেজে বিহ্বল হলেন, বিছানায় পড়ে গেলেন অচেতনের মতো—পপাত চাথ সা দেবী শয়নে মূঢ়চেতনা—মোহাবিষ্টা, ছিন্ন লতার মতো— ভজ্যমানা লতেব। আমরা জানি—ইচ্ছার বিরুদ্ধে সঙ্গমে প্রবৃত্ত হয়ে কুন্তী সংজ্ঞা হারিয়েছিলেন আর 'দুর্ধর্ষ' সূর্য তাঁর সঙ্গম সম্পন্ন করেছেন কুন্তীর অচেতন অবস্থাতেই, কারণ আমরা দেখেছি, ব্যাসদেবকে অধ্যায় শেষ করতে হয়েছে—একাকী সূর্যের সঙ্গম-সন্তোষের পর কুন্তীর চেতনা ফিরিয়ে দিয়ে—সংজ্ঞাং লেভে ভূয় এবাথ বালা। ব্যাসের শব্দ প্রয়োগও খেয়াল করবেন—'বালিকা আবারও চেতনা ফিরিয়া পাইল'। এই বালা বা বালিকা শব্দের মধ্যেই কুন্তীর অজ্ঞতা, চঞ্চলতা, কৌতুকপ্রিয়তা ইত্যাদি নির্দোষ গুণগুলি নিহিত করে মহাভারতের কবি তাঁকে সমস্ত দোষ থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

amarboi.com

৪

কুন্তী আর সূর্যের প্রথম মিলন কাহিনীটি আমি সবিস্তারে শোনালাম। এর কারণ এই নয় যে কুমারী অবস্থায় সূর্যের সঙ্গে কুন্তীর সঙ্গম-রসের রগরগে বর্ণনা দিয়ে অল্পস্বল্প পাঠকের চিত্ত-বিনোদন করায় আমার বড় মোহ আছে। এই বিস্তারটুকু আমার কাছে এইজন্য প্রয়োজনীয় যে, অনেকেই কুন্তীকে খুব দোষারোপ করে থাকেন। পরবর্তী সময়ে ভাগ্যহত কর্ণের যন্ত্রণা যত বাড়তে থাকে এই দোষারোপও ততই বাড়তে থাকে। এই বর্ণনার মাধ্যমে আমি কুন্তীর নাচার অবস্থাটা বোঝাতে চেয়েছি।

আরও কারণ আছে। সেটা মনস্তত্ত্বের পরিসর। পূর্বে কৃষ্ণের কাছে কুন্তী অনুযোগ করেছিলেন—আমি বাপের বাড়িতেও সুখ পাইনি। শ্বশুরবাড়িতেও নয়—সেই অনুযোগের নিরিখে আমরা লক্ষ করেছি মহারাজ কুন্তিভোজ তাঁকে দত্তক নিলেও সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতে পারেননি। কুন্তীও তাঁর মধ্যে সার্থক পিতাটিকে খুঁজে পাননি। কুন্তীর মানসিক জটিলতা আরও বেড়েছে আর একটা কারণে। আমার ধারণা— ভোজবাড়িতে এসে কুন্তী একটি পালক পিতা পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু মা পাননি। সেই দত্তক নেওয়ার মুহূর্ত থেকে এখনও পর্যন্ত মহারাজ কুন্তিভোজের রানির উল্লেখ কোথাও নেই। কুন্তী যেভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই ভোজগৃহের সর্বময়ী কর্ত্রীটি হয়ে উঠেছিলেন, তাতে এই সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়। প্রথম যৌবনবতী কন্যাকে দুর্বাসার মতো অতিথির সেবায় নিযুক্ত করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়েও কুন্তিভোজ প্রৌঢ়া জননীর মতো কারও সঙ্গে আলোচনা করেননি। এবং আজ এই বিধিবহির্ভূত মিলনের পরেও কুন্তীকে আমরা বিপন্ন হয়ে খুঁজতে দেখিনি জননীর আশ্রয়। ভাবে বুঝি, কুন্তিভোজের স্ত্রী বুঝি পূর্বেই স্বর্গতা হয়েছিলেন।

দশ মাস কেটে গেল, কুন্তীর প্রচ্ছন্ন গর্ভের কথা কেউ টেরই পেল না। যে বাড়িতে জননীর অস্তিত্ব আছে, সে বাড়িতে এই প্রচ্ছন্নতা কি সম্ভব? কুন্তীর গর্ভের আকার শুধু প্রতিপদের চাঁদের আকার থেকে ক্রমে বিবর্ধিত হল। কিন্তু কেউ টেরটি পেল না। কারণ তিনি থাকতেন মেয়েদের থাকবার জায়গায় এবং গর্ভের আকার লুকিয়ে রাখার অভ্যাস তিনি করেছিলেন নিপুণভাবে। অন্তঃপুরের এক ধাত্রীকন্যা ছাড়া—হয়তো গর্ভমুক্তির জন্য তাকেই রেখেছিলেন কুন্তী—সে ছাড়া দ্বিতীয় কেউ টের পেল না কুন্তীর কুমারী-গর্ভের কথা।

যথা সময়ে কুন্তীর পুত্র জন্মাল। গায়ে সোনার বর্ম, কানে সোনার কুণ্ডল, দেখতে ঠিক সূর্যের মতো—যথাস্য পিতরং তথা। প্রথম পুত্র জন্মের আনন্দে উৎসব করা হল না, মঙ্গল-শঙ্খ বাজল না, চিৎকার করে কেউ ঘোষণা করল না—রাজবাড়িতে ছেলে হয়েছে। সমাজে নিজের সম্মান রাখার তাগিদে কুন্তী ধাত্রীকন্যার সঙ্গে পরামর্শ করে একটি বেতের পেটিকার মধ্যে ভাল করে মোম লেপে দিলেন যাতে পেটিকা জলের মধ্যে ভাসলেও তাতে জল না ঢোকে। সেই পেটিকার মধ্যে সুন্দর কাপড় পেতে দিয়ে কুন্তী শুইয়ে দিলেন শিশু পুত্রকে। পেটিকার মুখ ঢেকে সদ্য-জননী কুন্তী চললেন সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ির উপকণ্ঠে অশ্বনদীর দিকে। একদিকে কুমারীত্ব প্রতিষ্ঠার সামাজিক দায়, অন্যদিকে পুত্রস্নেহ—এই দুই বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ায় মাতৃস্নেহই কিন্তু বড় হয়ে উঠল কুন্তীর মনে। মহাভারতের কবি মন্তব্য করেছেন—কুমারী মেয়ে গর্ভধারণ করে পুত্রের জন্য বিলাপ করছে—এটা ঠিক নয় জেনেও কুন্তী তাঁর মাতৃ-হৃদয়ের ক্রন্দন রুদ্ধ করতে পারেননি। ভীষণ ভীষণ কেঁদেছেন তিনি, কেঁদেছেন পুত্রস্নেহে—পুত্রস্নেহেন রাজেন্দ্র করুণং পর্যদেবয়ৎ।

হ্যাঁ, পুত্রকে তিনি ভাসিয়েই দিয়েছেন অশ্বনদীর জলে। সাধারণে বলতেই পারেন—কেন, এতই যদি পুত্রস্নেহ তবে কেন সব অপমান লজ্জা ঠেলে দিয়ে, কেন তিনি ঘোষণা করলেন না—কুমারীর লজ্জার থেকেও পুত্রস্নেহ আমার কাছে বড়। আমি বলব—সমালোচনার প্রান্তে দাঁড়িয়ে বলা যায় অনেক কিছু, কিন্তু কেউ কি কুন্তীর মনস্তত্ত্বের ধার দিয়ে গেছেন? মনে রাখা দরকার—যে রমণী নিজেই নিজের কাছে করুণার পাত্র, তাঁর করুণার পরিমাপ করতে চাইছি আমরা।

আমি আগেই বলেছি—শৈশবে আপন পিতা-মাতার স্নেহরসে বঞ্চিত হয়ে যে রমণী অন্যের ঘরে প্রতিপালিত হল, যাঁকে যে কোনও বিপন্ন মুহূর্তে তাঁর পালক পিতা বলেন—তুমি আর্য শূরের মেয়ে, ভুলে যেয়ো না তুমি মহামতি বসুদেবের বোন—সেই রমণীর কাছে মর্মান্তিক পুত্রস্নেহের থেকেও কুমারীত্ব বড়। যাঁরা দত্তক নেন, তাঁদের মনস্তত্ত্ব কি কখনও বিচার করে দেখেছেন? যে পিতা-মাতা দত্তক নিলেন, সেই ছেলে বা মেয়ে যদি ভবিষ্যতে সুপুত্র বা গুণবতী রমণী হয়, তবে সমস্তটাই সেই পালক পিতা বা মাতার পালনের গুণ, কিন্তু দৈববশে সেই ছেলে বা মেয়ে যদি কুপুত্র বা দুশ্চরিত্রা হয়, তবে সব দোষটাই গিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়বে বীজী পিতার অথবা গর্ভধারিণী মায়ের ওপর। পালক পিতা-মাতার অন্তর্দাহ আড়ালে বলতে চাইবে—অমন বাপ-মায়ের মেয়ে, বংশের দোষ যাবে কোথায়?

বরিষ্ঠ বংশের মেয়ে অন্য বাড়িতে প্রতিপালিত হয়ে কুন্তী পিতা-মাতার নাম ডোবাতে চাননি। তাই কুমারীত্ব এবং কন্যাপুত্রের দ্বৈরথে কুমারীর সুনাম তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে যে পুত্র কঠিন কাব্যময়তায় বলে উঠবে—যে ফিরালো মাতৃস্নেহপাশ/তাহারে দিতেছ মাতঃ, রাজ্যের আশ্বাস—সে পুত্র কি জানে—শৈশবে তার মা কতটুকু মাতৃস্নেহ লাভ করেছে! কঠিন মনস্তত্ত্বের শিকার হয়েই কুন্তী কুন্তিভোজের বাড়িতে এসেছেন, এখন তিনি আরও কঠিনতর মনস্তত্ত্বের শিকার হয়ে যাবেন, যখন সদ্য-জননীর গর্ভ-ছেঁচা পুত্রটিকে ভাসিয়ে দিতে হল অশ্বনদীর জলে।

কতই না কল্পনা ছিল। সে যেন আপনারই মতো দেখতে হয়। আপনার মতো চেহারা, আপনার মতো শক্তি, আপনার মতো তেজ, আর আপনারই মতো সত্ত্বগুণ—ত্বদ্ বীর্যরূপসত্ত্বৌজা ধর্মযুক্তো ভবেৎ স চ—কুন্তী শুধু এই চেয়েছিলেন। কিন্তু আজকে ভাগ্যের তাড়নায় কুমারীত্বের প্রাধান্যে প্রথম-জাত পুত্রকে ভাসিয়ে দিতে হল জলে। জননীর আর্দ্রতায় কুন্তীর বুক ভেঙে কান্না এল। নির্জন নদী তীরে আকাশ-বাতাসের উদ্দেশে জানাতে হল জননীর উদ্বেগ—বাছা আমার! দ্যুলোক-ভূলোকে যত প্রাণী আছে, তারা যেন তোমাকে বাঁচিয়ে রাখে—স্বস্তি তেঽস্ত্ব অন্তরীক্ষেভ্য পার্থিবেভ্যশ্চ পুত্রক। যে জলে তোমায় ঠেলে দিয়েছি, সেই জলচর প্রাণীরা যেন ক্ষতি না করে তোমার। তোমার যাবার পথে মঙ্গল হোক তোমার!

বাছা! জলের রাজা বরুণ তোমায় রক্ষা করুন জলে, আকাশে রক্ষা করুন সর্বত্রগামী বায়ু।

বাছা! যিনি দিব্য-বিধানে আমার কোলে দিয়েছিলেন তোমাকে, তোমার সেই তেজস্বী পিতা তোমায় সর্বত্র রক্ষা করুন—পিতা ত্বাং পাতু সর্বত্র তপনস্তপতাং বরঃ।

সমস্ত দেবতার আশীর্বাদ যাচনা করেও কুন্তী জননীর যন্ত্রণা এড়াতে পারলেন না একটুও। কবচ-কুণ্ডলের সুরক্ষায় কর্ণের যে মৃত্যু হবে না, সেটা তিনি জানতেন। কিন্তু এমন সুন্দর শিশুপুত্রটিকে কোলে চেপে না ধরে, তাকে যে বিসর্জন দিতে হচ্ছে,—এই ব্যথার থেকেও আরও কঠিন এক ঈর্ষাকাতর অনুভূতি তাঁকে পীড়িত করতে লাগল। পুত্র-স্নেহের আরও এক অন্যতর রূপ এই ঈর্ষা। কুন্তী তখনও কাঁদছেন, আর ধরে আছেন তাঁর পরান-পুতলির পেটিকাটি। মুখে বলছেন—বাছা! বিদেশ-বিভুঁয়ে যেখানেই বেঁচে থাকো তুমি, তোমার এই সহজাত বর্ম দেখে তোমায় ঠিক চিনতে পারব আমি। ধন্য তোমার পিতা, যিনি সহস্র কিরণ-চক্ষুতে নদীর মধ্যেও তোমাকে দেখতে পাবেন। বাছা! ধন্য সেই মা যিনি তোমাকে পুত্র-কল্পনায় কোলে তুলে নেবেন, তোমার মুখে দেবেন স্নেহস্রুত স্তন্যপান। এই শিশু বয়সেই এমন তেজস্বী চেহারা, এই দিব্য বর্ম, এই কুণ্ডল, এই পদ্ম-পাতার মতো চোখ, এই চাঁচর কেশ—যে মা তোমাকে পাবেন, তিনি কি কোনওদিন কোনও সুখস্বপ্নেও এমন একটি পুত্রের মুখচ্ছবি কল্পনা করতে পেরেছিলেন? বাছা! তুমি যখন মাটিতে হামাগুড়ি দেবে, ধুলায় ধূসর হবে তোমার শিশু-শরীর, তুমি কথা বলবে কলকল করে, আধো আধো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষায়—অব্যক্ত কল-বাক্যানি বদন্তং রেণুগুণ্ঠিতম্—সেদিন তোমায় আমি দেখতে পাব না, দেখবেন পুণ্যবতী অন্য কোনও মা। বাছা! বাছা! যখন তুমি বড় হবে, বন্য সিংহের তেজ আসবে তোমার শরীরে সেদিনও আমি তোমায় দেখতে পাব না। দেখবেন অন্য কোনও জননী।

কুন্তী অনেক কাঁদলেন। প্রথম জাত পুত্রের ভবিষ্যৎ মুখচ্ছবি যতই স্পষ্ট হতে থাকল তাঁর মনে, তাঁর কষ্টও তত বাড়তে লাগল। মা হওয়ার পর প্রথম সন্তানের বিয়োগ-দুঃখ একজন মাকে যতখানি যন্ত্রণা দিতে পারে, কুন্তী ঠিক সেই যন্ত্রণাই পেলেন। তবু তাঁকে ভাসিয়ে দিতে হল তাঁর শিশুপুত্রটিকে। হাজারও কান্নাকাটির পর রাতও যখন অর্ধেক হয়ে গেল, তখন কঠিন বাস্তব তাঁকে ফিরিয়ে আনল ঘরে। এত রাত হয়ে গেছে, তবু মেয়ে ঘরে নেই—একথা যদি কোনওভাবে পিতা কুন্তিভোজের কানে যায়, তবে বহুতর অনর্থ ঘটতে পারে। কুন্তী ফিরে এলেন কাঁদতে কাঁদতে। মনে রইল পুত্র-শোকার্তা জননীর কামনা—আবার কবে দেখতে পাব আমার প্রথম সন্তানকে—পুত্রদর্শনলালসা। কুন্তী জানেন—কর্ণের মৃত্যু অসম্ভব; কিন্তু ছেলে বেঁচে আছে, অথচ তার জন্য জননীর স্নেহ-কর্তব্যগুলি করা হল না, তাকে কোনওদিন বলা যাবে না—ওরে তুই আমারই ছেলে—এই স্বাধিকারহীনতার গ্লানি কুন্তীকে কেবলই কষ্ট দিতে থাকল।

আসলে আমরা কেউই পুত্রের জন্য পুত্রকে ভালবাসি না, নিজেকে ভালবাসার কারণেই আমরা পুত্রকে ভালবাসি। উপনিষদ তাই বলে—ন বা অরে গার্গি পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।

পুত্রকে জলে ভাসিয়ে দেওয়ার অভিযোগে কুন্তীকে যাঁরা দোষী সাব্যস্ত করতে চান, তাঁদের আমি কয়েকটি কথা হয়তো কষ্টেসৃষ্টে বোঝাতে পেরেছি। এক, শৈশবে পুতুল-খেলার সময় যে বালিকাকে 'সানন্দে' দত্তক দেওয়া হয়েছিল কুন্তিভোজের কাছে, সেই বালিকা পালক-পিতার মধ্যে সাধারণ্যে পরিচিত স্নেহময় পিতাকে খুঁজে পাননি। শৈশবে মায়ের স্নেহ, যা একটি শিশুর মনোভুমি তৈরি করে অনন্ত সরসতায়, সঠিক সাবলীলতায়, সেই স্নেহ কুন্তী জন্মদাতা পিতার গৃহে তো পেলেনই না, কুন্তিভোজের গৃহেও পাননি।

দুই। ভোজগৃহের অন্যতর পরিবেশে বালিকা নিজেকে খাপ খাওয়াতে খাওয়াতে যেদিন যৌবনবতী হয়ে উঠলেন, সেই যৌবনের মধ্যে বিকার এনে দিল দুর্বাসার মন্ত্র। যৌবনের প্রথম শিহরণে কুমারীর দূরত্বে থেকে পুরুষকে একটু দেখা, একটু ছোঁয়া, আধেক পাওয়া, আধেক না-পাওয়ার রহস্য উপভোগ করা তাঁর হল না। তিনি পুরুষ বশীকরণের কাম-মন্ত্র শিখে হঠাৎই দেব-পুরুষকে ডেকে বসলেন সদ্যোযুবতীর কৌতুকে; কিন্তু সেই কৌতুকের শাস্তি হল প্রৌঢ়া রমণীর স্থূলতায়, ভাষায়, সঙ্গমে।

তিন। একটি সন্তান জন্মাল। তাকেও জলে ভাসিয়ে দিতে হল পিতা, পরিবার এবং সমাজের মুখ চেয়ে। জন্মদাতা পিতার সানন্দ দত্তক-দানে তিনি কাঁদতে পারেননি, আজ প্রথম জাত পুত্রকে ভাসিয়ে দিয়েও তিনি সোচ্চারে কাঁদতে পারলেন না, নিজের মনোকষ্ট কোনও প্রিয়জনের কাছে বলতে পারলেন না। শৈশব এবং প্রথম যৌবনের দুই ধরনের অবরুদ্ধ শোক কুন্তীর মনোজগৎ তৈরি করেছিল এমনই এক গভীরতর মিশ্রক্রিয়ায়, যাতে

মহাকাব্যের কবি তাঁকে আরও বহুতর কষ্টের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। কুন্তীকে যদি বুঝতেই হয়, তবে শৈশবে তাঁর পিতা-মাতার স্নেহ বঞ্চনা এবং নবযৌবনের আরম্ভেই তাঁর অনীপ্সিত কৌতুক-সঙ্গমে তথা সন্তান-ত্যাগের নিরুদ্ধ বেদনা—এই তিনের বিচিত্র বিষমান্বয়ের নিরিখেই তাঁকে দেখতে হবে, নচেৎ তাঁর চরিত্র-বিশ্লেষণে ভুল হবে, তাঁর চরিত্রে আসবে অনর্থক আরোপ, যা মহাকাব্যের কবির হৃদয় না বোঝার সামিল।

৬

কুন্তীর রূপগুণের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই রূপগুণের ঔজ্জ্বল্য আরও বেড়ে গিয়েছিল তাঁর ধর্মাচরণ এবং ব্রতপালনের মাধ্যমে—সত্ত্বরূপগুণোপেতা ধর্মারামা মহাব্রতা। ধর্ম এবং ব্রতকে এই যৌবনবতী সুন্দরী কেন আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরেছিলেন, তার কারণ আমরা অনুমান করতে পারি। কন্যাবস্থায় সূর্য-সঙ্গম, পুত্রলাভ এবং পুত্রত্যাগ—এইসব কিছুই তাঁর যুবতী-হৃদয়ে এমন এক অনুশোচনা তৈরি করেছিল, যার প্রলেপ হিসাবে ধর্ম এবং ব্রতচারণের মধ্যেই তিনি আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু এই ধর্ম-ব্রত নতুন এক শুদ্ধতার তেজে কুন্তীর যৌবন এবং রূপ আরও বেশি উজ্জ্বল করে তুলল এবং সেই উজ্জ্বলতা লোক-সমাজে ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না।

তেজস্বিনী যৌবনবতীর মধ্যে লজ্জা এবং মৃদুতার মতো স্ত্রী-সুলভ গুণগুলি কুন্তীকে করে তুলল প্রার্থনীয়তরা। রাজারা অনেকেই আলাদা আলাদা করে প্রস্তাব দিলেন কুন্তীকে বিয়ে করার—ব্যাবৃণ্বন্ পার্থিবা কেচিদ্ অতীব স্ত্রীগুণৈর্যুতাম্। হয়তো কুন্তীও চাইছিলেন বিয়ে করতে। সময় বুঝে মহারাজ কুন্তিভোজ স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করলেন। ওদিকে কুন্তীর রূপ-গুণ এবং ব্রত-কর্মের কথা যেহেতু অনেক জায়গাতেই ছড়িয়ে পড়েছিল তাই কৌরবগৃহেও একটা প্রাথমিক কথাবার্তা তাঁকে নিয়ে হয়ে গেছে। স্বয়ং পিতামহ ভীষ্ম বিদুরের কাছে প্রস্তাব করেছেন—শুনেছি যাদবদের একটি সুন্দরী মেয়ে আছে, কুলে-মানে তারা আমাদের পালটি ঘর—শ্রূয়তে যাদবী কন্যা স্বানুরূপা কুলস্য নঃ।

'যাদবী কন্যা' কথাটা লক্ষ করার মতো। বোঝা যাচ্ছে কুন্তিভোজ যতই দত্তক নিন, কুন্তীর পরিচিতি ছিল যাদবদের মেয়ে হিসেবেই। কুন্তিভোজ যদি ভোজবংশের কেউ হন, তবে তাঁদের মধ্যেও যাদবদের রক্ত আছে এবং সে অর্থে কৃষ্ণের মামা কংসের মধ্যেও যাদবদের রক্ত আছে, কিন্তু তিনিও প্রধানত ভোজ-বাড়ির লোক ছিলেন। কংসকে বলা হত ভোজবংশের কুলাঙ্গার—ভোজানাং কুলপাংসনঃ। কিন্তু বংশে বংশে মামাতো-পিসতুতো সম্পর্ক হলেও যাদব আর ভোজদের জ্ঞাতিশত্রুতা ছিল। বিশেষত যাদব বলে যাঁরা গর্ব করতেন, তাঁদের মর্যাদা কিছু বেশিও ছিল। কৃষ্ণপিতা বসুদেব অথবা কুন্তীর পিতা আর্যক শূর ছিলেন যাদবদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি। কংসের নিজের স্বজন ভোজেরাও তাঁর অত্যাচারে সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং যাদব বসুদেব তথা যাদব কৃষ্ণ সবসময়েই চেষ্টা করেছেন কংসের নিজের স্বজনদের মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে তাঁদের নিজেদের দলে টানতে। হয়তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুন্তিভোজের হাতে নিজের মেয়েকে দত্তক দেওয়ার মধ্যেও যাদবদের এই রাজনীতি কিছু থাকতে পারে।

মহাভারতের সভাপর্বে কৃষ্ণ নিজেই যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন যে, ভোজজাতির বৃদ্ধ-পুরুষদের অনুরোধেই তিনি কংসকে বধ করেছেন। অন্যদিকে হরিবংশে দেখছি—কংস নিজেই বলছেন যে, বৃষ্ণি, অন্ধক, ভোজ—এইসব জাতির শক্তিমান পুরুষেরা কংসের স্বজন হওয়া সত্ত্বেও যাদব কৃষ্ণের পক্ষ নিয়েছেন—শেষাশ্চ মে পরিত্যক্তা যাদবাঃ কৃষ্ণপক্ষিণঃ। আমার ধারণা—কুন্তীকে 'সানন্দে' একটি ভোজবাড়িতে দত্তক দেওয়ার মধ্যে কুন্তীর পিতা আর্যক শূরের কিছু রাজনৈতিক স্বার্থ কাজ করে থাকতে পারে এবং একটি রমণীকে কেন্দ্র করে এই রাজনীতিক স্বার্থ-চেষ্টা কুন্তীর হয়তো একটুও ভাল লাগেনি। লাগেনি বলেই নিজের বংশের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক অধস্তন কৃষ্ণের কাছে কুন্তী নিজের পিতা আর্যক শূর সম্বন্ধে তিক্ত কথা বলেছেন। অন্যদিকে যাদবদের মান-মর্যাদা অন্য জ্ঞাতিদের থেকে বেশি থাকায় কুন্তিভোজের পক্ষে কুন্তীকে দত্তক নিয়েও তাঁকে আত্মীকরণ করা সম্ভব হয়নি। কুন্তী তাই বিয়ের সময়েও 'যাদবী' কন্যাই রয়ে গেছেন এবং 'যাদবী' বলেই হয়তো পিতামহ ভীষ্ম তাঁকে নিজের কুলের উপযুক্তা বধূ হিসেবে কল্পনা করেছেন—শ্রূয়তে যাদবী কন্যা স্বানুরূপা কুলস্য নঃ।

যাক এসব কথা। কুন্তিভোজ স্বয়ম্বর সভা ডাকলেন কুন্তীর বিয়ের জন্য। দেশ-বিদেশ থেকে রাজা-রাজড়ারা এলেন ভোজবাড়িতে। এলেন পাণ্ডুও। হয়তো ভীষ্মের নির্দেশমতো। মহাভারতের কবি লিখেছেন—রাজসভায় মধ্যস্থানে বসা ভরতবংশের রাজা পাণ্ডুকে দেখতে পেলেন বুদ্ধিমতী কুন্তী, মনস্বিনী কুন্তী। পাণ্ডুকে দেখে তিনি মনে মনে আকুল হলেন—হৃদয়েনাকুলাভবৎ। তাঁর শরীরে দেখা দিল কামনার রোমাঞ্চ। তিনি সখীদের সঙ্গে সলজ্জে পাণ্ডুর কাছে উপস্থিত হয়ে বরমাল্য পরিয়ে দিলেন তাঁর গলায়।

মহাকাব্যের নিয়মে এই বিবাহ-সভার বর্ণনাগুলি প্রায়ই 'স্টক্-ডেসক্রিপশন'। অর্থাৎ যাঁর গলায় মালা দেওয়া হচ্ছে, তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং শারীরিক সৌন্দর্যে অন্য রাজাদের অবশ্যই লজ্জা দিচ্ছেন। অপিচ নবীনতম পুরুষকে প্রথমবার চোখে দেখেই স্বয়ম্বর বধূটি তাঁকে পাবার জন্য 'কাম-পরীতাঙ্গী' হয়ে উঠছেন—এই বর্ণনা আমি আরও উদ্ধার করতে পারি।

এখানে খেয়াল করার মতো বিশেষণ আছে একটিই। তা হল বুদ্ধিমতী কুন্তী, মনস্বিনী কুন্তী। আমার ব্যক্তিগত ধারণা—কুন্তীর বিয়ের মধ্যেও কিছু রাজনীতি ছিল। তখনকার দিনের রাজনৈতিক চিত্রে মগধরাজ জরাসন্ধ ছিলেন ধুরন্ধর পুরুষ। মথুরার কংস ছিলেন তাঁর জামাই এবং 'এজেন্ট'। যাদবরা কংসের অত্যাচারে পর্যুদস্ত হয়ে রাজনৈতিক বন্ধু বাড়াবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন একভাবে। এসব কথা আমি অন্যত্র লিখেছি। কুন্তিভোজের কাছে কুন্তীকে দত্তক দিয়ে একদিকে যেমন কংসপক্ষীয় ভোজদের হাত করার চেষ্টা করেছিলেন আর্যক শূর, তেমনই অন্যদিকে ভরতবংশের সঙ্গে একটা বৈবাহিক যোগাযোগ গড়ে তোলাটাও তাঁদের দিক থেকে কাম্য ছিল।

ভরতবংশের কুলপুরুষ মহামতি ভীষ্ম কুন্তিভোজের বাড়িতে থাকা 'যাদবী' কন্যার কথাটা

কোত্থেকে শুনেছিলেন—সেটা মহাভারতে বলা না থাকলেও আমার ধারণা—এ খবর এসেছিল যাদবদের কাছ থেকেই, হয়তো খোদ কৃষ্ণপিতা বসুদেবের কাছ থেকেই। এরপর কুন্তীর বিয়ের জন্য যখন স্বয়ম্বরসভা ডাকা হল, সেখানে কুন্তীর দিক থেকে সবাইকে ফেলে পাণ্ডুকে বরণ করাটা ছিল কন্যাপক্ষের ঈপ্সিত। যাঁকে কুলমর্যাদা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সময় কুন্তিভোজকে বলতে হয়—মনে রেখো তুমি আর্যক শূরের কন্যা, মহামতি বসুদেবের তুমি ভগিনী—বসুদেবস্য ভগিনী... শূরস্য দয়িতা সুতা—তিনি যে বিয়ের সময় শূর অথবা বসুদেবের ইচ্ছাটি বুঝবেন না, তা আমি মনে করি না। এইজন্যই বরমাল্য দেওয়ার সময় ঠিক পাণ্ডুকেই চিনে নেওয়ার মধ্যে কুন্তীর মনস্বিতা বা বুদ্ধিমত্তা দেখতে পেয়েছেন মহাভারতের কবি।

বরপক্ষ এবং কন্যাপক্ষ—দুইয়েরই ঈপ্সিত ব্যক্তিটির গলায় স্বয়ম্বরবধূর মালাটি পড়ায় স্বয়ম্বরসভার অবস্থা হল এখনকার দিনের পূর্ব-নির্ধারিত ব্যক্তির চাকুরি পাওয়ার মতো। বিশেষ এইটুকু যে, তার 'কোয়ালিফিকেশন' যথেষ্ট আছে। ইন্টারভিউতে আসা গাদা গাদা কর্মপ্রার্থী ব্যক্তি যখন বুঝতে পারে লোক ঠিক করাই আছে, তখন তারা যেমন নিষ্প্রভ নিস্তরঙ্গতায় নিজেদের মধ্যে গজগজ করতে করতে ফিরে যায়, তেমনই কুন্তী পাণ্ডুকে বরণ করেছেন দেখেই রাজারা সব যেমন এসেছিলেন, তেমনই হাতি, ঘোড়া, রথের মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন—যথাগতং সমাজগ্মুর্গজৈরশ্বৈ রথৈস্তথা।

কুন্তীর সঙ্গে পাণ্ডুর বিয়ে হল, যেন শচীর সঙ্গে মিলন হল ইন্দ্রের। পাণ্ডু বউ নিয়ে, কুন্তিভোজের বাড়ি থেকে অনেক সম্মান-উপহার নিয়ে মহর্ষি আর ব্রাহ্মণদের জয়ঘোষের মধ্যে রাজধানীতে ফিরলেন। কুন্তীর নিশ্চয়ই মনে হয়েছিল—কন্যাবস্থায় সেই আকালিক দুর্ঘটনার পর এবার তিনি সুখে সংসার করবেন। কিন্তু সুখ তাঁর ভাগ্যে ছিল না। কুন্তী কৃষ্ণের কাছে দুঃখ করে বলেছিলেন—বাপের বাড়িতেও আমি সুখ পাইনি, শ্বশুরবাড়িতেও নয়। শব্দটা ছিল 'নিকৃতা' অর্থাৎ ওখানেও লাঞ্ছনা পেয়েছি, শ্বশুররাও আমাকে লাঞ্ছনা দিয়েছেন। শ্বশুর বা শ্বশুরস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম হলেন ভীষ্ম। কারণ পাণ্ডুর নামমাত্র-বাবা বিচিত্রবীর্য বেঁচে নেই এবং পাণ্ডুর জন্মদাতা ব্যাসদেব কোনওভাবেই কুরুবাড়ির সংসারে প্রবেশ করেননি। কাজেই কুন্তীর শ্বশুরের প্রথম সম্বন্ধটা ভীষ্মের সঙ্গেই।

বিয়ের পর কিছুদিন কাটতেই মহামতি ভীষ্ম পাণ্ডুর আরও একটি বিবাহ দেবার জন্য ব্যস্ত হলেন। মদ্রদেশের মেয়ে শল্যের বোন মাদ্রীর কথা তাঁর জানাই ছিল। তাঁকে বাড়ির বউ করে আনার জন্য তিনি নিজেই সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ছুটলেন সে দেশে। হয়তো পাণ্ডুর এই বিয়েতে বড় বেশি আসক্তি ছিল না। প্রথমা মহিষী কুন্তীর সঙ্গে বিয়ে হবার পর তিনি খুব উচ্চ-বাচ্যও করেননি। কিন্তু ভীষ্ম নিজেই আগ্রহ দেখালেন পাণ্ডুর দ্বিতীয় বিবাহের জন্য।

ভীষ্মের আগ্রহটা কেন, তার কারণ আমরা বুঝি। নিজে তো বিয়ে করেননি। কিন্তু পিতা শান্তনুর দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্য মারা যেতে ভরতবংশের সিংহাসন খালি হয়ে গিয়েছিল। ভীষ্ম নিজে রাজা হবেন না অথচ রাজবংশের ভাবনাটা ছিল তাঁরই। এই অবস্থায় রাজমাতা সত্যবতী এবং তাঁর নিজের মতৈক্যে ব্যাসদেবকে স্মরণ করতে হয়। কুরুকুলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরের জন্মের মাধ্যমে। কুরুকুলে বংশ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরম্পরা রক্ষার একটা সমস্যা ছিল এবং ভীষ্ম সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুদের বিয়ের আগে বিদুরকে তিনি বলেছিলেন—তোমরা তিনজনেই এই প্রসিদ্ধ ভরত-বংশের অঙ্কুর। যে কুল প্রায় লুপ্ত হতে বসেছিল—আমি, সত্যবতী আর ব্যাসদেব মিলে এখন তোমাদের মধ্যেই সেই বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছি—সমবস্থাপিতং ভুয়ো যুস্মাসু কুলতন্তুষু। ভীষ্ম বলেছিলেন—তোমাদের চেষ্টা করা উচিত, যাতে সমুদ্রের মতো এই বংশ বৃদ্ধিলাভ করে—কুলং সাগরবদ্ যথা।

এই নিরিখে—আমার ধারণা, এই নিরিখে ভীষ্ম আগে থেকেই নানা বংশের মেয়ে খোঁজ ভাঁজ করছিলেন এবং সেই খোঁজের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। ভীষ্ম ব্রাহ্মণদের মুখে গান্ধারীর কাহিনী শুনেছিলেন। শুনেছিলেন গান্ধারী মহাদেবকে তুষ্ট করে শতপুত্রের জননী হবার আশীর্বাদ পেয়েছেন। যিনি ভরতবংশের 'সাগরবৎ' বৃদ্ধি চান, তিনি যে গান্ধারীর মতো মেয়েকেই কুলবধূ করে আনবেন তাতে আশ্চর্য কী। মহাভারতের কবি লিখেছেন—গান্ধারীর শত পুত্রের জননী হবার আশীর্বাদ-সংবাদ ভীষ্ম পেলেন ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে—অথ শুশ্রাব বিপ্রেভ্যঃ। কারণ ব্রাহ্মণরাই এদেশ-ওদেশ ঘুরে বেড়াতেন এবং এ রাজ্যের সঙ্গে ও রাজ্যের সংবাদের সূত্র ছিলেন তাঁরাই।

তো, ভীষ্ম ব্রাহ্মণদের কাছে গান্ধারীর খবর পেলেন আর কুন্তীর খবর পেলেন না? বিশেষত দুর্বাসা মুনি কারও উপকার করলে সেই উপকার কাউকে না বলে থাকবেন—এটা তাঁর অভ্যাসের মধ্যে ছিল না। নানা পুরাণকাহিনীতে দুর্বাসার চরিত্র লক্ষ করে চৈতন্য-পার্ষদ রূপ গোস্বামী এই উক্তিটি করেছেন। কাজেই দেব-পুরুষ আহ্বান করে কুন্তীর সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতার কথাও ভীষ্ম জানতেন বলেই মনে হয়। জানতেন যে, তার একটা প্রমাণ দাখিল করতে পারি মহাভারত থেকেই।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম যখন শরশয্যায় শুয়ে আছেন, রাজারা সবাই যখন একে একে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চলে গেছেন, তখন কর্ণ এসে উপস্থিত হলেন ভীষ্মের কাছে—একা, নতশির, অপরাধীর মতো চেহারা। এসেই বললেন—আমি রাধার ছেলে কর্ণ এসেছি—রাধেয়োঽহং কুরুশ্রেষ্ঠ। ভীষ্ম বললেন—এসো, এসো কর্ণ। তুমি যে রাধার ছেলে নও, কুন্তীর ছেলে—সে আমি জানতাম। সূর্যের তেজে কুন্তীর গর্ভে তুমি জন্ম নিয়েছ—এসব কথা আমি নারদের মুখে শুনেছি। শুনেছি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের কাছেও—সূর্যজস্ত্বং মহাবাহো বিদিতো নারদান্ময়া। কৃষ্ণদ্বৈপায়নাচ্চৈব তচ্চ সত্যং ন সংশয়ঃ।

ভীষ্ম যেখানে কুন্তীর কানীন পুত্রটির কথাও জানতেন সেখানে তিনি তাঁর পুত্রলাভের ব্যাপারে দুর্বাসার আশীর্বাদের কথা জানতেন না—এটা ভাবা আমার পক্ষে মুশকিল। কাজেই গান্ধারীর কথা তিনি যেভাবে ব্রাহ্মণদের মুখে শুনেছিলেন, তেমনই কুন্তীর দৈবশক্তির কথাও তিনি জানতে পেরেছিলেন ব্রাহ্মণদের কাছ থেকেই—ইতি শ্রুশাব বিপ্রেভ্যঃ।

কুরুকুলের সন্তান-সমস্যা সমাধানের জন্য তথা এই কুল যাতে সন্তান-সন্ততিতে 'সাগরবৎ' ভরে ওঠে, সেজন্যেও যদি তিনি সুবল-সুতা গান্ধারী এবং যাদবী কুন্তীকে বধূ করে এনে থাকেন, তা হলে ভীষ্মের যুক্তিও সেখানে বোঝা যায়। কিন্তু দ্বিতীয়বার তিনি কেন পাণ্ডুর সঙ্গে মাদ্রীর বিয়ে দেওয়ার জন্য এত তৎপর হয়ে উঠলেন—তার মধ্যে একটা

হেঁয়ালি থেকে যায়। প্রমাণ এখানে দেওয়া যাবে না, তবে প্রায় অখণ্ডনীয় একটা অনুমান এখানে করা যেতে পারে। বস্তুত মহাভারতের পঙ্‌ক্তির মতো শব্দ-প্রমাণ আমাদের হাতে নেই বলেই এমন একটা অনুমান আমাদের করতে হচ্ছে।

পাণ্ডুর পুত্র উৎপাদন করার ক্ষমতা ছিল না বলেই মহাভারতের কবিকে হয়তো কিন্দম মুনির অভিশাপের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কিন্তু সে-কথা বলবার আগেই আমাদের অনুমান-খণ্ডের প্রথম প্রস্তাবটা করে নিই। মহামতি ভীষ্ম কি পাণ্ডুর এই অক্ষমতার কথা জানতেন? তিনি বলেছিলেন—নারদ এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের কাছে তিনি কুন্তীর খবর পেয়েছেন, কিন্তু পাণ্ডুর পুত্রোৎপত্তির অক্ষমতার কথাও তিনি ব্যাসের কাছেই শোনেননি তো?

আমরা একবারের জন্য পেছন ফিরে তাকাব হস্তিনাপুরের রাজবাড়ির সেই ঘরটির মধ্যে যেখানে 'অশেষ-যোগ-সংসিদ্ধ' কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস মায়ের আদেশ মেনে নিয়ে বিচিত্রবীর্যের দুই পত্নীর ক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদন করছিলেন। আপনারা জানেন—রাজবধূর বিদগ্ধ রুচিতে অম্বিকা এবং অম্বালিকা—কেউই ব্যাসের সঙ্গে মিলনের ঘটনাটা পছন্দ করেননি। কিন্তু তাঁরা হলেন নিরুপায়, কারণ সে যুগে এই নিয়োগ প্রথা ছিল সমাজ-সচল। তার মধ্যে রাজমাতা সত্যবতী নিজেই হস্তিনাপুরের অরাজক সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর জন্য দুই বধূকে ব্যাসের সঙ্গে মিলিত হতে উপরোধ করেছিলেন।

সত্যবতীর ইচ্ছায় এই দুই রাজবধূর কোনও সম্মতি ছিল না। কিন্তু তাঁদের জন্য কুরুবংশের লোপ হয়ে যাবে—শুধু এই কারণে তাঁদের কোনও মতে রাজি করাতে পেরেছিলেন সত্যবতী। সত্যবতী বলেছিলেন—কিছুই নয়, তোমাদের ভাশুর আসবেন নিশীথ রাতে, তোমরা দুয়োর খুলে অপেক্ষা কোরো। কিন্তু রাজবধূর বিদগ্ধ-রুচিতে এই নিশীথ-মিলন পরাণ-সখার সঙ্গে অভিসারে পর্যবসিত হয়নি। এ মিলন বস্তুত তাঁদের কাছে ছিল ধর্ষণের মতো।

স্বয়ং ব্যাসও এটা জানতেন। সত্যবতীকেও তিনি বারবার সাবধান করেছেন। বলেছেন—আমার বিকৃত রূপ তাঁদের সহ্য করতে হবে—সে-কথা মনে রেখো—বিরূপতাং মে সহতাং তয়োরেতৎ পরং ব্রতম্। কিন্তু বলে-কয়েও কোনও শরীর মিলনে কি রুচি নির্মাণ করা যায়? শত-শত প্রজ্জ্বলিত দীপের আলোয় ব্যাসকে দেখেই অম্বিকা তিক্ত ঔষধ সেবনের মানসিকতায় সেই যে চোখ বুজেছিলেন, আর চোখ খোলেননি। তাঁর পুত্র শত হস্তীর শক্তি সত্ত্বেও অন্ধ হবে—ব্যাসই সে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এই দুর্ঘটনার ফলে দ্বিতীয়া রানি অম্বালিকার দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল, কারণ অন্ধ ব্যক্তি কুরুবংশের রাজা হতে পারে না, অতএব তাঁর চক্ষু মুদে থাকা চলবে না।

চক্ষু মুদে যে অনীপ্সিত সঙ্গমে বড় রানি কোনওরকমে পাড়ি দিতে চেয়েছিলেন, অম্বালিকাকে সেই সঙ্গম চোখ খুলে দেখতেই হল বলেই তাঁর কাছে এই সঙ্গম সম্পূর্ণ ধর্ষণের বিকারে ধরা দিল। মহর্ষির লালচে কটা দাড়ি, মাথাভর্তি জটা, তপোদীপ্ত চক্ষু এবং গায়ের উৎকট গন্ধ—সব কিছু টান টান চোখে দেখে দ্বিতীয়া রানির শরীর ভয়ে ফ্যাকাসে-হলুদ হয়ে গেল। সত্যবতী পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে ব্যাস বললেন—এই রানির ছেলে পাণ্ডুবর্ণ হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপরের কথা এইটুকুই। কোনও ছেলের গায়ের রং যদি ফ্যাকাসে-হলুদ হয়, তাতে এমন কিছু আসে যায় না। বরঞ্চ এই গাত্রবর্ণে পাণ্ডুকে যে যথেষ্ট সুন্দর লাগত—তার বর্ণনা আমরা মহাভারতে বহু জায়গায় পেয়েছি। কালিদাসের যক্ষবধূর মুখে এই পাণ্ডুতা ছিল বলে আমরা তাঁকে বেশি পছন্দ করেছি। কিন্তু সঙ্গম-লগ্নে রাজরানির এই পাণ্ডুতার আড়ালে আরও কিছু ছিল, যা ব্যাস স্বকণ্ঠে সোচ্চারে বলেননি। বৈদ্যশাস্ত্রের নিয়মমতো রমণীর কাছে পুরুষের সঙ্গম যদি ধর্ষণের বিকারে ধরা দেয়, তবে সেটা এতই 'শকিং' হতে পারে যাতে বিকৃতাঙ্গ সন্তানের জন্ম দিতে পারে। এর ফলেই ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, আর অম্বালিকাকে যেহেতু জোর করে এই ধর্ষণ চোখ মেলে সহ্য করতে হয়েছিল, তাই পাণ্ডু পুত্রোৎপত্তির অক্ষমতা নিয়েই জন্মেছিলেন। নইলে গাত্রবর্ণের পাণ্ডুত্ব এমন কোনও রোগ নয় যে, সত্যবতী পুনরায় ব্যাসকে আরও একটি সন্তানের জন্য উপরোধ করবেন।

সত্যবতী এই ইঙ্গিত বুঝেছিলেন হয়তো, সেই কারণেই আরও একটি পুত্রও তিনি প্রার্থনা করে থাকবেন। কিন্তু কুরুবংশের পরবর্তী বৃদ্ধির জন্য আর বেশি কিছু তাঁর বলার ছিল না, কেননা মহর্ষি রানিদের গর্ভাধান করার সঙ্গে সঙ্গেই বলে দিয়েছিলেন—ধৃতরাষ্ট্র শত পুত্রের পিতা হবেন এবং পাণ্ডুও পাঁচ সন্তানের পিতা হবেন। কেমন করে হবে, কীভাবে হবে—সে-কথা তখন অপ্রাসঙ্গিক ছিল। কিন্তু আমার যা বক্তব্য ছিল—পাণ্ডুর জন্মদাতা পিতা এবং কালজ্ঞ ঋষি হিসাবে ব্যাস হয়তো জানতেন পাণ্ডুর পুত্রোৎপত্তির ক্ষমতা ছিল না। এই অক্ষমতার কথা মহামতি ভীষ্মকে তিনি জানিয়ে থাকবেন। কুরুবংশের এই সন্তানটির ওপর জন্মদাতা হিসেবে ঋষির যে মমতা ছিল, সেই মমতাতেই হয়তো ভীষ্মকে তিনি কুন্তীর খবর দিয়েছিলেন, আর সেই মমতাই মহাভারতের কবির হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়ে তাঁকে কিন্দম মুনির অভিশাপের গল্প লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে। আপন ঔরসজাত প্রিয় পুত্রের প্রজনন-শক্তির অভাব তিনি কিন্দমের অভিশাপের প্রলেপ দিয়ে সকারণ করতে চেয়েছেন।

এখনও প্রশ্ন রইল মাদ্রীর বিবাহ তবে কেন? দেখুন, স্বামীর ব্যক্তিত্ব-বীজ ছাড়াই যে রমণীর পুত্র-উৎপাদনের শক্তি করায়ত্ত—সে যেভাবেই হোক, দৈববলে অথবা নিয়োগপ্রথায়, পুত্রমুখ সে দেখবেই। সে রমণীকে স্বামী অসাধারণী ভাবতেই পারেন, কিন্তু নিজের তীব্র স্বাধিকারবোধ তাতে পদে পদে মার খায়। মাদ্রীকে ভীষ্ম প্রায় উপযাচকের মতো মদ্র-নগরী থেকে নিয়ে এসেছিলেন, তাও আবার কন্যাপণ দিয়ে। নিয়ে এসেছিলেন শুধু পাণ্ডুর স্বামীজনোচিত স্বাধিকার তৃপ্ত করার জন্য নয়, নিয়ে এসেছিলেন হয়তো কুন্তীকে 'ব্যালান্স' করার জন্য। ভাবটা এই—শুধু পুত্র-ধারণের শক্তি থাকলেই হবে না গো মেয়ে, স্বামীর ভালবাসাটাও পাওয়া চাই। অর্থাৎ স্বামীর দৈহিক অক্ষমতায় তোমার নিজের অহংকার যদি বেড়ে যায়, তবে অন্তত স্বামীর প্রণয়ের জন্য তোমার প্রতিযোগিনী রইলেন একজন। হয়তো মাদ্রীকে ভীষ্ম এই কারণেই কুরুবাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। কারণ তিনি বোধহয় পাণ্ডুর অক্ষমতার কথাও জানতেন আবার কুন্তীর দৈবী ক্ষমতার কথাও জানতেন।

মূল প্রস্তাবে ফিরে এসে বলি—বিবাহের কয়দিনের মধ্যে, হয়তো বর-বধূর উন্মত্ত-অন্তরঙ্গতা তখনও ভাল করে আরম্ভই হয়নি—তার মধ্যেই এই যে দ্বিতীয়া আরও একটি রমণীকে সযত্নে জুটিয়ে আনলেন ভীষ্ম, সে রমণী যতখানি পাণ্ডুর বউ হয়ে এলেন, তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেয়ে অনেক বেশি কুন্তীর সতীন হয়ে এলেন। মনে মনে কুন্তী শ্বশুরকে এই ঘটনার জন্য দায়ী করেছেন, দুঃখও পেয়েছেন মনে মনে।

হয়তো দুঃখের কারণ আরও বেশি ছিল এই কারণে যে, পুত্রোৎপত্তিতে অক্ষম জানা সত্ত্বেও পাণ্ডুর সঙ্গে যে তাঁর বিয়ে হল—তার মধ্যে ভীষ্মের অলক্ষ হাত ছিল, কারণ এই যাদবী কন্যাটিকে আগে থেকেই তিনি পাণ্ডুর জন্য মনোনীত করে রেখেছিলেন। লক্ষ করে দেখুন, দু-দুটি নববধূকে বাড়িতে রেখে বিবাহের এক মাসের মধ্যে পাণ্ডু রাজধানী থেকে দিগ্বিজয় করতে বেরিয়েছেন। এই এক মাস কুন্তী এবং মাদ্রীর সঙ্গে তিনি বিহার করেছেন যখন তাঁর ইচ্ছা হয়েছে অথবা যখন মনে হয়েছে বিহারে তাঁর সুখ হবে—যথাকামম্ যথাসুখম্। ভাষাটা খেয়াল করার মতো।

বুঝলাম, এটাও না হয় বুঝলাম। কিন্তু প্রসিদ্ধ ভরতবংশের কোন প্রসিদ্ধ রাজা বিয়ের এক মাসের মধ্যে দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন? ভরতবংশে রাজকার্য বা প্রজার কার্য বোঝার মতো রাজা কম ছিলেন না। সম্বরণ, শান্তনুর মতো প্রেমিক অথবা পাণ্ডুর পিতৃপ্রতিম বিচিত্রবীর্যের মতো ভোগী রাজার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, দুষ্মন্ত, ভরত, কুরু এমনকী পরবর্তীকালে যুধিষ্ঠির-অর্জুনও যে বিয়ের এক মাসের মধ্যে কোথাও নড়েননি! পাণ্ডু কি এতই বড় রাজা? ভোগের ইচ্ছে যে তাঁর কম ছিল না—সে-কথাও পরে জানাব।

আসলে স্ত্রীদের কাছে আপন অক্ষমতা লুকিয়ে রাখার জন্য, অথবা ক্ষমতার ধ্বজাটুকু জিইয়ে রাখার জন্যই পাণ্ডুকে দিগ্বিজয়ে বেরতে হল—বিয়ের পর তিরিশ রাত্তিরের অক্ষম বিহার সেরেই—বিহৃত্য ত্রিদশা নিশাঃ। অন্তঃপুরের অন্তরমহলে পড়ে রইলেন কুন্তী—পাণ্ডুকে বরণ করার সময়ে যাঁর অতুল দৈহিক দীপ্তিতে মনে হয়েছিল যেন সূর্যের দীপ্তিতে ম্লান হয়ে গেছে অন্য রাজাদের মুখমণ্ডল—আদিত্যমিব সর্বেষাং রাজ্ঞাং প্রচ্ছাদ্য বৈ প্রভাঃ। যাকে দেখে কুন্তী তাঁর হৃদয়ের ভাব গোপন রাখতে পারেননি, শরীরে জেগেছিল রোমাঞ্চ, সেই পাণ্ডু তিরিশটি বিহার-নিশি দুই রমণীর মধ্যে তাঁরই ইচ্ছামতো ভাগ করে দিয়ে এখন রাজ্য জয় করতে বেরলেন।

রাজ্য-জয়েও অনেকদিন গেল। কম কথা তো নয়। ফিরে আসার পর দান-ধ্যান, সত্যবতী-ভীষ্ম-ধৃতরাষ্ট্রকে রাশি রাশি ধনরত্ন উপহার, ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা—অনেক কিছু করে পাণ্ডু বললেন—আমি বনে যাব, বনেই কিছুদিন কাটাব। তা রাজা-রাজড়াদের এই ধরনের বিলাস হতেই পারে। রাজমহল আর রাজার সুখবিলাস ছেড়ে পাণ্ডু দুই স্ত্রীকে নিয়ে বনে গেলেন। পাণ্ডু ভেবেছিলেন বুঝি, রাজমহলে যা হচ্ছে না, বনে গিয়ে তাতে সুবিধে হবে। মাঝে মাঝে তাঁকে দুটি হস্তিনীর মধ্যগত ঐরাবতের মতো লাগছিল বটে, কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই দুই রানিকে ছেড়ে পাণ্ডু মৃগয়ায় মত্ত থাকতেন—অরণ্যনিত্যঃ সততং বভূব মৃগয়াপরঃ।

বনে আসা, আবার বনে এসেও মৃগয়ায় ডুবে থাকা—এই সবকিছুর মধ্যেই পাণ্ডুর দুর্বার হৃদয়-যন্ত্রণা ছিল, কিছু আত্ম-বঞ্চনা ছিল, যার চরম মুহূর্তে মহাভারতের কবি কিন্দম মুনির অভিশাপ বর্ণনা করেছেন। পাণ্ডু নাকি মৈথুনরত দুটি হরিণ-হরিণীকে মেরে ফেলবার পরেই দেখতে পেলেন হরিণটি ছিল এক ঋষিকুমার। মনুষ্যবসতির মধ্যে মৈথুন চরিতার্থ করার মধ্যে যে লজ্জা আছে, সেই লজ্জা থেকে বাঁচবার জন্যই ঋষিকুমার হরিণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচ্ছাদন গ্রহণ করেছিলেন। ঋষি পাণ্ডুকে বলেছিলেন—স্ত্রীসম্ভোগের সুখ আপনি জানেন, অথচ সেই অবস্থায় আমাকে মেরে আপনি কী নারকীয় কাজটাই না করলেন! ঋষিকুমার বলেছিলেন—আমি পুত্রের জন্য মৈথুনে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম, আপনি সেই আশা বিফল করে দিলেন—পুরুষার্থফলং কর্তুং তৎ ত্বয়া বিফলীকৃতম্।

পাণ্ডু ঋষিকুমারের সঙ্গে নিজের সপক্ষে মৃগবধের কারণ উপস্থিত করে অনেক তর্ক করলেন বটে, কিন্তু মৈথুনরত অবস্থায় প্রাণিবধ মৃগয়ার বিধিতেও সত্যিই লেখে না। পুরাণ ইতিহাসে এমন গল্পও আছে যাতে দেখা যাচ্ছে—মৈথুন-চর পশু পক্ষীকে রাজপুরুষেরা ছেড়ে দিচ্ছেন। রামায়ণের মতো মহাকাব্যে যেখানে ক্রৌঞ্চ-মিথুনের একতরের মৃত্যুতে কবির শোক শ্লোকে পরিণত হয়েছিল, সেখানে মৈথুনরত প্রাণীকে হত্যা করার মধ্যে পাণ্ডুর যে অন্য কোনও আক্রোশ ছিল আমরা হলফ করে বলতে পারি। বস্তুত স্ত্রী-পুরুষের মিলনের মধ্যে পুত্রলাভের যে সুখ-সম্ভাবনা থেকে যায় সেই সম্ভাবনা তাঁর বারংবার প্রতিহত হচ্ছিল বলেই তিনি তাঁর অন্তরের আক্রোশ মিটিয়েছেন মৈথুনরত একটি মৃগকে হত্যা করে, নইলে মুনি যেমন বলেছেন—সম্ভোগ সুখের মর্মও তিনি জানতেন, শাস্ত্র এবং ধর্মের মর্মকথাও তিনি জানতেন—স্ত্রীভোগানাং বিশেষজ্ঞঃ শাস্ত্রধর্মার্থতত্ত্ববিৎ।

যাই হোক মুনি শাপ দিলেন—মৈথুনে প্রবৃত্ত হলেই পাণ্ডু মারা যাবেন এবং আমাদের কাছেও পাণ্ডুর পুত্রোৎপত্তির অক্ষমতা এই মুহূর্তে থেকেই যতই সকারণ হয়ে উঠুক, আমরা বেশ জানি—মনস্বিনী কুন্তী তাঁর শত দুঃখ সত্ত্বেও তাঁকে এই বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করেননি। কবি লিখেছেন—ঋষির অভিশাপ শুনে পাণ্ডুর মনে এত আঘাত লেগেছিল যে, দুই স্ত্রীকে ছেড়ে তিনি কঠোর ব্রত-নিয়ম আশ্রয় করে তপস্যা করবেন বলেই ঠিক করলেন। আমরা জানি—এও সেই আক্রোশ। বারংবার পুত্র-লাভের সম্ভাবনা ব্যাহত হওয়ায় নিজের ওপরে তাঁর যে আক্রোশ হয়েছিল, সেই আক্রোশই তিনি চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন গৃহস্থধর্মের ওপরে রাগ করে। এই অবস্থায় কুন্তী এবং মাদ্রী—দু'জনেই তাঁকে অন্তত পত্নীত্যাগে বিরত করতে পেরেছিলেন। তাঁরা বরঞ্চ নিজেরাও স্বামীর অনুধর্মের কঠোর নিয়ম-আচার পালন করতে রাজি হয়েছিলেন।

এইভাবেই দিন কাটছিল। দিনরাত যজ্ঞ-হোম, তপঃ-স্বাধ্যায়, ঋষিদের সঙ্গ আর ফলমূল আহার—দুই স্ত্রীর সঙ্গে সহধর্মচারী পাণ্ডুর দিন কাটছিল এইভাবেই। কিন্তু গভীর ক্ষত মিলিয়ে গেলেও যেমন তার দাগ থাকে, তেমনই এই শত ব্রত-নিয়ম-আচারের মধ্যেও পুত্রহীনতার যন্ত্রণা তাঁকে পীড়া দিতে লাগল। প্রাথমিকভাবে পাণ্ডু নিয়োগপ্রথারও পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি স্বয়ং বিচিত্রবীর্যের পুত্র নন, তাঁর স্ত্রীর গর্ভে তিনি ব্যাসের ঔরসে জন্মেছিলেন। নিজের জন্ম-প্রক্রিয়ার এই অকৌলীন্যে হয়তো প্রাথমিকভাবে তিনি নিয়োগের বিরোধী ছিলেন। কারণটা পরিষ্কার। বাবা বিচিত্রবীর্য বেঁচে ছিলেন না, তাঁর অনধিকৃত ক্ষেত্রে কেউ সন্তান দান করলেন—সে এক কথা। আর পাণ্ডু বেঁচে আছেন, অথচ তাঁর চোখের সামনে বা আড়ালে অন্য কেউ তাঁরই প্রিয়া পত্নীতে উপগত হবে—এমন একটা অনধিকারচর্চা তাঁকে হয়তো ঈর্ষাকাতর করে তুলেছিল।

প্রিয়তমা দুই পত্নীর মুখের দিকে চেয়ে কাতর দীর্ঘশ্বাসে তিনি বলেছিলেন—সন্ন্যাসী হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাব আমি। আমার সন্তান উৎপাদন করার শক্তি নেই, কী দরকার আমার ঘর-গেরস্তির—নাহং... স্বধর্মাৎ সততাপেতে চরেয়ং বীর্যবর্জিতঃ। এই অবস্থায় অবশ্যই প্রশ্ন আসে এবং বলা যায়—পাণ্ডু তুমি কোনও ব্রাহ্মণের সাহায্য নিয়ে নিয়োগ-প্রথায় পুত্রলাভ করো। এইরকম আশঙ্কার আগেই পাণ্ডু তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন—কুন্তী-মাদ্রী দু'জনের কাছেই। পাণ্ডু বলেছিলেন—আমি কি কুত্তা নাকি যে, অন্যের কাছে ছেলে দাও, ছেলে দাও করে কাতর চোখে ভিক্ষে করব; যে ব্যাটা এমন করে, সে কুত্তা—উপৈতি বৃত্তিং কামাত্মা স শুনাং বর্ততে পথি।

কিন্তু হায়! যিনি এত বাগাড়ম্বর করেছিলেন, তাঁর চিন্তা-ভাবনা অন্যরকম হয়ে গেল। যজ্ঞ-হোম, তপশ্চরণ অনেক অনেক করেও আবারও সেই কথাই মনে হল—একটি ছেলে থাকলে বেশ হত। আসলে একটা বয়সে বাৎসল্য মানুষকে কাঙাল করে। পাণ্ডুও তাই কাঙাল হলেন। যেমন করে হোক একটি ছেলে চাই।

এ কাজ সহজ নয়, স্ত্রীদের অভিপ্রেত নাও হতে পারে। কিন্তু পাণ্ডু, পুত্রচিন্তায় পাগল পাণ্ডু একদিন নির্জনে ডাকলেন কুন্তীকে। বললেন—তুমি আমার বিপদটা জানো, কুন্তী! আমার প্রজননী শক্তি নেই—নষ্টং মে জননং—এই বিপদে তুমি আমাকে পুত্রলাভের ব্যাপারে সাহায্য করো কুন্তী। পাণ্ডু আরও বললেন—দেখো! এই এত বড় হস্তিনাপুর রাজ্যের কোনও উত্তরাধিকারী রইল না। শাস্ত্রে বলে—অন্তত ছ'রকমের ছেলে বাপের সম্পত্তি পায়—নিজের ঔরসজাত পুত্র, অন্যের অনুগ্রহে নিজের স্ত্রীর গর্ভে জাত ক্ষেত্রজ—এইরকম করে পাণ্ডু কানীন পুত্রের কথাও বললেন। অর্থাৎ কন্যা অবস্থায় কুন্তীর যদি কোনও ছেলে থেকে থাকে তবে তার পিতৃত্ব স্বীকার করে নিতে পাণ্ডুর কোনও দ্বিধা নেই।

কিন্তু কুন্তী! কুন্তী একবারের তরেও স্বীকার করলেন না তাঁর সূর্য-সম্ভব পুত্রটির কথা। স্বীকার করলেন না, কারণ সে পুত্রের জন্মের মধ্যে জননীর ঈপ্সা ছিল না। ছিল কৌতুক। ছিল লজ্জা। ছিল গ্লানি, সবচেয়ে বেশি ছিল অনিচ্ছা। মনের গভীরে যাকে ইচ্ছের মতো লালন করেন জননী, সেই ইচ্ছে কর্ণের জন্মে ছিল না। আর ছিল না বলেই সে পর্ব তিনি ভুলতে চেয়েছিলেন। ধর্ম-ব্রতে নিজেকে শুদ্ধ করে ভালবেসেছিলেন হস্তিনাপুরের রাজাকে। নতুন করে বাঁচতে চেয়েছিলেন। আজ স্বামীর এই বিপন্ন মুহূর্তে—যখন একটি কানীন পুত্রের জন্যও তিনি লালায়িত—তখনও তিনি তাঁর পূর্বের অভিজ্ঞতা বলতে পারেননি। পাণ্ডুকে তিনি ভালবাসতে চেয়েছিলেন, তাঁকে ঠকাতে চাননি। তাই আজ পাণ্ডুর মুখে যখন আস্তে আস্তে সেই প্রস্তাবেরই সূচনা হচ্ছে, তখনও কুন্তী কুণ্ঠিত, লজ্জিত।

পাণ্ডু একটা গল্প বললেন কুন্তীকে। বললেন—কেমন করে এক বীর রমণী স্বামীর আদেশ মতো এক যোগসিদ্ধ ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করে পুত্রলাভ করেছিলেন। গল্প বলার শেষে পাণ্ডুর অনুরোধ—কুন্তী! আমি মত দিচ্ছি। তুমি কোনও বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের ঔরসে পুত্র-লাভের চেষ্টা করো।

কুন্তী পাণ্ডুর ইচ্ছে-অনিচ্ছে জানতেন। প্রজননের শক্তি না থাকায় পাণ্ডুর গ্লানি, তাঁর ঈর্ষা, তাঁর কষ্ট তিনি অনুমান করতে পারেন। সবকিছুর ওপর অন্য পুরুষের নিয়োগে পুত্র-লাভ করার ব্যাপারে পাণ্ডুর পূর্ব মনোভাব—অর্থাৎ সেই আমি কি কুকুর নাকি?—সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনোভাবও কুন্তী জানেন। নিজের জীবনে দুর্নিবার কৌতুক-খেলায় যা ঘটার একবার ঘটে গেছে। নিজের স্বামীর ঔরসজাত পুত্রটি আপন কুক্ষিতে ধারণ করে পূর্বের সমস্ত গ্লানি তিনি ধুয়ে মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে বুঝি আর হল না।

তবু কুন্তী বললেন—মহারাজ! তুমি ধর্মের রীতি-নীতি সব জানো। আমিও তোমার ধর্মপত্নী মাত্র নই, তোমাকে আমি ভালবাসি—ধর্মপত্নীম্ অভিরতাং ত্বয়ি রাজীবলোচন। ধর্ম অনুসারে তুমি আমার গর্ভে বীর পুত্রের জন্ম দেবে। সেই বীর পুত্রের জন্য শুধু তোমার সঙ্গেই মিলন হবে আমার। তুমি ছাড়া অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে আমার শারীরিক মিলন হচ্ছে—সে যে আমি মনে মনেও ভাবতে পারি না—ন হ্যহং মনসাপ্যন্যং গচ্ছেয়ং ত্বদৃতে নরম্। সত্যি কথা বলতে কি—তোমার চেয়ে উৎকৃষ্ট অন্য কোনও পুরুষ আমার কাছে আর কেউ নেই।

পাণ্ডু গল্প বলেছিলেন। তার উত্তরে কুন্তীও এবার গল্প বললেন পাণ্ডুকে। বললেন, পাণ্ডুরই ঊর্ধ্বতন এক বিরাট পুরুষ ব্যুষিতাশ্বের গল্প। ব্যুষিতাশ্ব বহুতর যজ্ঞ এবং ধর্মকার্য করে দেবতাদের তুষ্ট করেছিলেন বটে, তবে নিজের স্ত্রী ভদ্রার প্রতি তাঁর অতিরিক্ত আসক্তি এবং সম্ভোগের ফলে তাঁর শরীর হল ক্ষীণ এবং তিনি অপুত্রক অবস্থাতেই মারা গেলেন। মারা যাবার পর মৃত স্বামীকে জড়িয়ে ধরে অশেষে-বিশেষে বিলাপ করলেন ভদ্রা। সেই বিলাপের সুর—কুন্তী যেমন শুনিয়েছেন—সে সুর কালিদাসের রতি-বিলাপ সংগীতের প্রায় পূর্বকল্প বলা যেতে পারে। যাই হোক বিলাপে অস্থির ব্যুষিতাশ্বের প্রেতাত্মা অন্তরীক্ষ-লোক থেকেই জবাব দিল—তুমি ওঠো, সরে যাও, চতুর্দশী আর অষ্টমী তিথিতে তোমার শয্যায় ফিরে আসব আমি। আমারই সন্তান হবে তোমার গর্ভে—জনয়িষ্যাম্যপত্যানি ত্বয্যহং চারুহাসিনি।

কুন্তী পাণ্ডুকে বললেন—যদি শব-শরীর থেকে তাঁর পুত্র হতে পারে—সা তেন সুষুবে দেবী শবেন ভরতর্ষভ—তা হলে মহারাজ! তোমার তো যোগ-তপস্যার শক্তি কিছু কম নয়, তুমিই আমাকে পুত্র দেবে—শক্তো জনয়িতুং পুত্রান্। পাণ্ডু এসব কথার ধার দিয়েও গেলেন না। নিজের যোগশক্তি বা তপস্যার শক্তিতে খুব যে একটা আস্থা দেখালেন তাও নয়। বরঞ্চ পুরাণে ইতিহাসে কবে কে নিয়োগ-প্রথায় আপন স্ত্রীর গর্ভে অন্যের ঔরসে পুত্র লাভ করেছে, সেইসব উদাহরণ একটা একটা করে কুন্তীকে শোনাতে লাগলেন। পাণ্ডু মানসিকভাবে কুন্তীকে অন্য একটি পুরুষের ক্ষণিক-মিলনের জন্য প্রস্তুত করতে চাইছেন। শেষ কথায় পাণ্ডু বললেন—আমাদের জন্মও যে এই নিয়োগের ফলেই সম্ভব হয়েছে, তাও তো তুমি জানো—অস্মাকমপি তে জন্ম বিদিতং কমলেক্ষণে।

পাণ্ডু নিজের কথা বলে, নানা গল্প-কাহিনী শুনিয়ে কুন্তীকে শেষে অনেক অনেক অনুনয় করে বললেন—আমার কথা তুমি শোনো কুন্তী, আমি নিজেই তোমাকে বলছি। শুধু একটি ছেলে, চিরটাকাল আমি ভেবেছি সেই ছেলের কথা। এইবারে একেবারে সত্যি কথাটা প্রকাশ হয়ে গেল। পাণ্ডুর হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত হল এতকালের তথ্য-বচন—আমার প্রজনন শক্তি নেই বলেই সন্তানের আকর্ষণ আমার চিরকালের বেশি—বিশেষতঃ পুত্রগৃদ্ধী হীনঃ প্রজননাৎ স্বয়ম্। পাণ্ডু অনেক আদর করে কুন্তীকে সম্পূর্ণ স্বমতে প্রতিষ্ঠা

করার জন্য স্বামীর সোহাগের সঙ্গে যেন আচার্যের গম্ভীরতা মিশিয়ে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে বললেন—এই আমি তোমার মাথায় আমার দুই হাত রাখছি, আমি পুত্র চাই কুন্তী, আমাকে পুত্র দাও।

কুন্তীর জীবনে স্বামীর ভালবাসার এই বুঝি চরম মুহূর্ত। পাণ্ডুর আবেগ-মধুর অনুনয়ে কুন্তী বিগলিত হলেন। আস্তে আস্তে শোনাতে আরম্ভ করলেন কুন্তিভোজের বাড়িতে সেই অতিথি-পরিচর্যার কাহিনী। বললেন তাঁর পরম তুষ্টির কথা এবং অবশ্যই বশীকরণ মন্ত্রের কথা। এই বিষণ্ণ গম্ভীর মুহূর্তে, যখন তিনি স্বামী থাকতেও স্বামীর ইচ্ছাতেই অন্য পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হতে চলেছেন, এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে সেই কৌতুক-সঙ্গমের কথা উল্লেখ করা সম্ভব হল না। স্বামী যা চাইছেন ঠিক সেইরকম অর্থাৎ তাঁর অতি-অভিলষিত একটি খবর দেওয়ার সময় তাঁর পক্ষে স্থূলভাবে বলা সম্ভব হল না—মহারাজ! আমার একটি ছেলে আছে। কুন্তী এখানে নিজের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছেন। তিনি দেবতা আহ্বানের মন্ত্র জানেন, সেটা তিনি করবেন। কিন্তু কোন দেবতাকে আহ্বান করবেন, কখন করবেন—এই সমস্ত ভার তিনি পাণ্ডুর ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। স্বামীর সম্মতি, স্বামীর চাওয়া—এই পরম অধীনতার মধ্যেই তিনি যেন পাণ্ডুর পুত্র পেতে চাইছেন, দেবতার আহ্বান তাঁর কাছে যান্ত্রিকতামাত্র।

কুন্তী বললেন—তুমি অনুমতি দাও। দেবতা, ব্রাহ্মণ—যাঁকে তুমি বলবে—যং ত্বং বক্ষ্যসি ধর্মজ্ঞ দেবং ব্রাহ্মণেব চ—তাঁকে আমি ডাকতে পারি। তবে কোন দেবতাকে ডাকব, কখন ডাকব—এই সমস্ত ব্যাপারে আমি তোমার আদেশের অপেক্ষা করব, আমি কিছু জানি না। তোমার ঈপ্সিত কর্মে তোমারই আদেশ নেমে আসুক আমার ওপর—ত্বত্ত আজ্ঞাং প্রতীক্ষন্তীং বিদ্ধ্যস্মিন্ কর্মণীপ্সিতে।

পাণ্ডুর কাছে কুন্তীর এই চরম আত্মনিবেদন এবং শরণাগতি একদিকে যেমন তাঁর প্রথম যৌবনের গ্লানিটুকু ধুয়ে মুছে দেয়, অন্যদিকে তেমনই দেবতা-পুরুষকে নিজে নির্বাচন করার স্বাধিকার ত্যাগ করে সমস্ত ভার পাণ্ডুর ওপর দিয়ে স্বামীর প্রতি একান্ত নিষ্ঠাও তিনি দেখাতে পেরেছেন। নিজের অনীপ্সিত সন্তানটির কথাও যে তিনি বলেননি—তাও পাণ্ডুর প্রতি নিষ্ঠাবশতই। পাণ্ডু যদি দুঃখ পান। স্বামীর সম্মতি বা সাহায্য ছাড়া একাই তিনি উৎকৃষ্ট সন্তানের জননী হতে পারেন—এই স্বাধিকার যদি পাণ্ডুকে আহত করে—তাই কন্যাবস্থায় তাঁর পুত্রজন্মের কথাও উল্লেখ করেননি এবং এখনও তিনি নিজের ইচ্ছায় কাজ করছেন না, করছেন পাণ্ডুর ইচ্ছায়, তাঁরই নির্বাচনে।

কিন্তু পাণ্ডু কী করলেন? কন্যাবস্থায় কুন্তীর কৌতুক-সঙ্গম যেমন হঠাৎই হয়ে গিয়েছিল, তেমনই এখনও কোনও মানসিক প্রস্তুতির সময় দেননি পাণ্ডু। কুন্তীর প্রস্তাবের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি কেবল একবার—আমি ধন্য হলাম, অনুগৃহীত হলাম, তুমি আমার বংশের ধারা রক্ষা করে বাঁচালে আমাকে—কেবল এই একবার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে বসেছেন—আজই, আর দেরি নয়, আজই তুমি আহ্বান করো ধর্মরাজকে।

প্রথম যৌবনে মন্ত্র পরীক্ষার জন্য যে কৌতূহল কুন্তীর মনে জেগেছিল, হয়তো পাণ্ডুও সেই মন্ত্র পরীক্ষার কৌতূহলেই কুন্তীকে বলেছিলেন—দেরি নয়, আজই ডাকো ধর্মরাজকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা হলে আমাদের পুত্রলাভ কোনওভাবেই অধর্মের সঙ্গে যুক্ত হবে না—অধর্মেণ ন নো ধর্মঃ সংযুজ্যেত কথঞ্চন। আসলে ধর্মকে প্রথম আহ্বান জানানোর মধ্যে পাণ্ডুর দুটি যুক্তি থাকতে পারে। প্রথমত এতদিন পাণ্ডু ধর্ম-আচার নিয়েই জীবন কাটাচ্ছিলেন, অতএব তার একটা প্রতিফলন ঘটে থাকবে তাঁর প্রস্তাবে। দ্বিতীয়ত, এইভাবে অন্য পুরুষের দ্বারা, হোক না সে দেবতা, তবুও অন্য একজন পুরুষের দ্বারা নিজের স্ত্রীর গর্ভে পুত্র উৎপাদনের ব্যাপারে তাঁর কিছু লজ্জা থেকে থাকবে। কিন্তু সেই পুত্রের জন্মদাতা যদি হন স্বয়ং ধর্মরাজ, তবে তার মধ্যে অধর্মের লজ্জা কিছু থাকে না। অতএব ধর্মকেই তিনি প্রথমে ডাকতে বললেন কুন্তীকে।

কুন্তী সংযত চিত্তে ধর্মের পূজা করে দুর্বাসার মন্ত্রে ধর্মকে আহ্বান জানালেন মিলনের জন্য। ধর্ম এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কী চাই তোমার কুন্তী। কুন্তী বললেন—পুত্র চাই। পুত্র দিন। তারপর শতশৃঙ্গ পর্বতের বনের ভিতর একান্তে ধর্মের সঙ্গে মিলন হল কুন্তীর—শয্যাং জগ্রাহ সুশ্রোণী সহ ধর্মেণ সুব্রতা।

জ্যৈষ্ঠ মাসের এক পূর্ণিমা তিথিতে কুন্তীর প্রথম ছেলের জন্ম হল। নাম হল যুধিষ্ঠির। প্রথম পাণ্ডব। ধর্মের দান প্রথম পুত্রটি লাভ করেই পাণ্ডুর এবার ক্ষত্রিয় জাতির শৌর্য-বীর্যের কথা স্মরণ হল। কুন্তীকে বললেন—লোকে বলে ক্ষত্রিয় জাতির শক্তি-বলই হল সব। তুমি মহাশক্তিধর একটি পুত্রের কথা চিন্তা করো। পাণ্ডুর ইচ্ছা জেনে কুন্তী নিজেই এবার বায়ুদেবতাকে স্মরণ করলেন। কারণ দেবতার মধ্যে তিনি মহাশক্তিধর। বায়ু এলেন। কুন্তীর দ্বিতীয় পুত্র লাভ হল—ভীমসেন।

যুধিষ্ঠির এবং ভীম জন্মানোর পর পাণ্ডু যেন নতুন করে আবিষ্কার করলেন নিজেকে। শাস্ত্রে শুনেছেন—উপযুক্ত পুত্রের জন্য মাতা-পিতাকে তপস্যা করতে হয়। যুধিষ্ঠির এবং ভীমের জন্মের মধ্যে পাণ্ডুর কৌতূহল ছিল, ফলে পুত্রজন্মের মধ্যে আকস্মিকতার প্রাধান্য ছিল বেশি। কুন্তীর শক্তিতে এখন তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী অতএব জেনে বুঝে রীতিমতো পরিকল্পনা করে একটি অসামান্য পুত্রের পিতা হতে চান তিনি। এমন একটি পুত্র চান যাঁর মধ্যে দেব-মুখ্য ইন্দ্রের তেজ থাকবে। থাকবে দেবরাজের সর্বদমন শক্তি এবং উৎসাহ। এমন একটি বীরপুত্রের জন্য তিনি নিজে তপস্যায় বসলেন আর ঋষি-মুনির পরামর্শে কুন্তীকে নিযুক্ত করলেন সাংবৎসরিক ব্রতে। স্বামী-স্ত্রীর যুগল-তপস্যায় সন্তুষ্ট হলেন দেবরাজ। স্বীকার করলেন—কুন্তীর গর্ভে অলোকসামান্য পুত্রের জন্য দেবেন তিনি। পাণ্ডুর ইচ্ছায় কুন্তী এবার দেবরাজকে স্মরণ করলেন সঙ্গম-শয্যায়। জন্মালেন মহাবীর অর্জুন।

অর্জুনের জন্মের পর বহুতর দৈববাণী হল। তাঁর ভবিষ্যৎ পরাক্রম, চরিত্র এবং যশ বারংবার ঘোষিত হল স্বর্গের দেবতা আর ঋষি-মুনিদের মুখে। কুন্তীর এই পুত্রটি যে কুরুবংশের সমস্ত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করে কুরুকুলের রাজলক্ষ্মীকে শ্রীময়ী করে তুলবে—সে-কথা অর্জুনের জন্মলগ্নেই শোনা গেল বারবার। দেবতা, সিদ্ধ-গন্ধর্ব-চারণেরা, মুনি-ঋষিরা ভিড় করে অর্জুনকে দেখতে লাগলেন। এই অসাধারণ মুহূর্তে মহারাজ পাণ্ডুর কোনও প্রতিক্রিয়া আমরা দেখতে পাই না। যা দেখি তাতে আমাদের শ্রদ্ধা আহত হয়।

নন্দনের সংবাদ বয়ে আনা এই বীর পুত্রটির সম্বন্ধে শতশৃঙ্গবাসী ঋষিমুনিদের বিস্ময়

এবং জয়কার তখনও শেষ হয়নি, তারই মধ্যে পাণ্ডু কুন্তীর কাছে আরও একটি পুত্রের জন্য বায়না ধরলেন। কুন্তী আর থাকতে পারলেন না। প্রজননশক্তিহীন এক অসহায় স্বামীর পুত্রকামনা মেটানোর জন্য তিনি তাঁর ইচ্ছেতে অন্য পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছেন। তাও একবার নয়, তিনবার। এখন স্বামী আবারও বলছেন চতুর্থ এক পরপুরুষের সংসর্গে পুনরায় পুত্রবতী হওয়ার জন্য। কুন্তী আর থাকতে পারলেন না। বললেন—মহারাজ! বংশকর পুত্র না থাকায় আমাদের আপৎকাল উপস্থিত হয়েছিল—এ-কথা ঠিক। সেইরকম আপৎকালে স্বামীর সম্মতিতে দেব-পুরুষের সংসর্গে আমাদের পুত্রলাভ হয়েছে—তাতেও দোষ নেই। কিন্তু বিপৎকালেও তিন তিনবার পরপুরুষের সহবাসে পুত্রোৎপত্তির পর চতুর্থ পুত্রের জন্ম দেওয়া—সাধুদের আচার সম্মত নয়। কুন্তীর বক্তব্য—তোমার যতই অনুমতি থাকুক, এই বিপৎকালেও চতুর্থ পুরুষের সংসর্গে আমার উপাধি জুটবে স্বৈরিণীর, আবার যদি—যা মতিগতি দেখছি তোমার—পঞ্চম পুরুষের সহবাস জোটে আমার কপালে তা হলে লোকে আমায় বেশ্যা বলবে—অতঃ পরং স্বৈরিণী স্যাৎ পঞ্চমে বন্ধকী ভবেৎ।

আমরা যে সাহসিকা রমণীর আক্ষেপের কথা আরম্ভ করেছিলাম, অথবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উল্লিখিত যে গৃহস্থ-পত্নী কুন্তীর উদাহরণে নিজের ব্যভিচার-দোষ সমর্থন করতে চেয়েছিল অথবা নীতি-যুক্তির নিয়মে এখনকার কালেও যাঁরা কুন্তীর মধ্যে অন্য কোনও ইঙ্গিত খুঁজে পান—তাঁদের আমি কুন্তীর ওই শেষ বক্তব্যটুকু স্মরণ করতে বলি। কন্যাবস্থায় কৌতুক-সঙ্গমের আকস্মিকতা ছাড়া সচেতনভাবে কুন্তী অন্য কোনও পুরুষকে সকাম অভ্যর্থনা জানাননি। এমনকী দেবতা-পুরুষদের আহ্বান করার মধ্যেও স্বামীর ইচ্ছে এবং নিজের দিক থেকে পুত্রোৎপত্তির যান্ত্রিকতা থাকায়, তাঁর দিক থেকে কোনও সকাম ভাব আমরা লক্ষ করিনি।

বস্তুত যিনি রসিকতা করে শ্লোক বেঁধে বলেছিলেন—কপালের জোর লোকে কুন্তীকে সতী বলে, তাঁকেও শব্দ-চয়ন নিয়ে ভাবতে হয়েছে। তাঁকে শ্লোক বাঁধতে হয়েছে কর্মবাচ্যে—অর্থাৎ পাঁচটি পুরুষের দ্বারা কুন্তী কামিতা হয়েছিলেন—পঞ্চভিঃ কামিতা কুন্তী। কর্তৃবাচ্যে এই বাক্যের রূপ দাঁড়াবে—সূর্য, পাণ্ডু, ধর্মরাজ, বায়ু এবং ইন্দ্র—এই পাঁচজন কুন্তীকে কামনা করেছিলেন। এই শ্লোকের মধ্যে কুন্তীর সম্বন্ধে সকৌতুক কটু ভাবনা আছে বটে। কিন্তু তবু কামনার ক্ষেত্রে কুন্তীর কর্তৃত্ব নেই। অর্থাৎ রসিকতা করেও তাঁর সম্বন্ধে এ-কথা বলা যাচ্ছে না যে, তিনি স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে আপন রতিসুখ চরিতার্থ করার জন্য কোনও পুরুষকে কোনওদিন কামনা করেছেন। তিনটি পর-পুরুষ সংসর্গ সত্ত্বেও পাণ্ডুর প্রতি নিষ্ঠা এবং অনুরাগটুকু মিলিয়ে নিতে হবে কুন্তীর আপন বক্তব্য অনুযায়ী—আর নয় মহারাজ! তোমার যত ইচ্ছেই হোক শুধু পুরুষান্তরের সংখ্যাই এরপর আমাকে স্বৈরিণী বা বেশ্যা করে তুলবে—অতঃ পরং স্বৈরিণী স্যাৎ পঞ্চমে বন্ধকী ভবেৎ।

কুন্তী এইটুকু বলেই পাণ্ডুকে ছেড়ে দেননি। তাঁকে শাসন করে বলেছেন—ধর্মের নিয়ম-নীতি তুমি যথেষ্টই জানো। কিন্তু জেনেশুনেও যেন কিছুই তোমার খেয়াল নেই এমনিভাবে সমস্ত ধর্ম-নিয়ম অতিক্রম করে আমাকে আবারও পুত্রের জন্য বলছ কেন—অপত্যার্থং সমুৎক্রম্য প্রমাদাদিব ভাষসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলে এও এক বিকার। প্রজনন-শক্তিহীন অবস্থায় পাণ্ডুর এক ধরনের বিকার ছিল। কিন্তু অন্য পুরুষের সংসর্গে নিজের তিনটি পুত্র লাভ করেও পাণ্ডু যে এখনও পুনরায় স্ত্রীকে পুরুষান্তরে নিয়োগ করতে চাইছেন—এর মধ্যে বোধহয় আরও বড় কোনও বিকার আছে। জানি না, মনস্তাত্ত্বিকেরা এ বিষয়ে কী ভাববেন, তবে পাণ্ডুর অবদমিত শৃঙ্গারবৃত্তিই যে তাঁর কুলবধূকে একরকম দুর্গতির দিকে ঠেলে দিয়েছে, সে-কথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

যাই হোক পাণ্ডুকে থামতে হল। পুত্রহীনকে পুত্র দান করে কুন্তী আপাতত চালকের আসনে বসে আছেন। আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলতে হবে। নিজের বিয়ের কয়দিনের মধ্যে পাণ্ডুকে দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে দেখে তিনি নিশ্চয়ই পুলকিত হননি। মাদ্রীর প্রতি স্বামীর দেহজ আকর্ষণ হয়তো বা কিছু বেশিই ছিল, যার জন্য তিনি পীড়িত বোধ করে থাকবেন। কিন্তু মুখে কখনওই কিছু বলেননি। আজ পুত্রলাভের জন্য পাণ্ডুকে কুন্তীরই মুখাপেক্ষী হতে হয়েছে—এতে যদি তাঁর অহংকার কিছু নাও হয়ে থাকে, আত্মতৃপ্তি কিছু ঘটেইছে। চোখের সামনে কুন্তীর এই বাড়-বাড়ন্ত দেখে মাদ্রীও খুশি হননি। যে কোনও কারণেই হোক স্বামী-দেবতাটি তাঁর হাতের মুঠোয়ই ছিল, অতএব মাদ্রী কুন্তীর কাছে কোনও দীনতা দেখাননি। তাঁর অভীষ্টপূরণ করতে চেয়েছেন স্বামীর মাধ্যমেই।

মাদ্রী পাণ্ডুকে একদিন বলেই ফেললেন—মহারাজ! তোমার পুত্র জন্মাবার শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছে—তাতেও আমার দুঃখ হয়নি। কিন্তু আমিও রাজার মেয়ে এবং পুত্র প্রসবের শক্তি আমারও ছিল। মাদ্রী বললেন—দেখো, গান্ধারীর একশোটি ছেলে হয়েছে—তাতেও আমার দুঃখ নেই। কিন্তু মহারাজ, আমি কুন্তীর চাইতে খাটো কীসে? তাঁর ছেলে হল অথচ আমার ছেলে হল না—এ দুঃখ আমি রাখব কোথায়—ইদন্তু মে মহদ্ দুঃখং তুল্যতায়াম্ অপুত্রতা। মাদ্রী নিজের দুঃখ জানিয়ে এবার আসল প্রস্তাব পেশ করলেন পাণ্ডুর কাছে। বললেন—কুন্তী আমার সতীন বটে। তাঁর কাছে আমি হ্যাংলার মতো ছেলে হওয়ার মন্ত্র শিখতে যাব না—সংরম্ভো মে সপত্নীত্বাৎ বক্তুং কুন্তিসুতাং প্রতি। যদি তোমার ইচ্ছে হয়, যদি তোমার ভাল লাগে, তবে কুন্তীকে তুমি বলে রাজি করাও।

ছোট বউ বলে কথা। মাদ্রী যা বললেন, পাণ্ডু তা নিজেই ভেবেছিলেন। স্বামীর গাম্ভীর্য বজায় রেখেও কুন্তীর কাছে কিছু কাকুতি-মিনতি করতেই হল পাণ্ডুকে। কুন্তী রাজি হলেন। ভাবলেন—বেচারা! শেষে এইভাবে বলতে হল! স্বামীর আদরিণী ধনিকে করুণা করার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। বললেন—ঠিক আছে। এইটুকু দয়া আমি তাকে করব—তস্মাদনুগ্রহং তস্যাঃ করোমি কুরুনন্দন। কুন্তী মাদ্রীকে মন্ত্র দিলেন বটে, কিন্তু সাবধান করে বললেন—একবার, শুধু একবারের জন্য যে কোনও দেবতাকে ডাকতে পারো তুমি।

মাদ্রী একবারে যমজ দেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আহ্বান করে কুন্তীর বুদ্ধির ওপর টেক্কা দিলেন। কুন্তীর মনে মনে রাগ হল বটে কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না। এরপর পাণ্ডু আবার মাদ্রীকে মন্ত্র শেখানোর জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন কুন্তীকে। একেই কুন্তী মাদ্রীকে সহ্য করতে পারেন না, তার মধ্যে তার চোরা-বুদ্ধিতে মনে মনে আরও রেগে রয়েছেন কুন্তী। স্বামীর এই দুর্বার পুত্রেচ্ছাও তাঁর আর ভাল লাগছে না। বস্তুত পুত্রের জন্য বারংবার এই প্রয়াসে পাণ্ডুরও কোনও সুপ্ত অভিলাষ থেকে থাকবে। আমার ধারণা—জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র

শত-পুত্রের পিতা হয়েছেন—এই ঈর্ষা হয়তো তাঁর অন্তরের অন্তরে কাজ করে থাকবে। পাণ্ডু জানতেন—কুন্তীকে বলে আর কোনও সুবিধে হবে না, এখন যদি মাদ্রীকে দিয়ে তাঁর অভীষ্ট পূরণ হয়—তাতে ক্ষতি কী?

কুন্তী বুঝে গেছেন তাঁর স্বামীকে। মাদ্রীকেও তাঁর চেনা হয়ে গেছে। অতএব পাণ্ডুকে প্রায় তিরস্কারের ভাষাতেই কথাগুলি বলে গেলেন কুন্তী। মাদ্রীর সম্বন্ধে তাঁর চিরকালীন মনোভাব যা ছিল, বিশেষত স্বামীর ব্যাপারে তাঁর সপত্নীর অভিমানও বড় পরিষ্কার হয়ে গেল তাঁর কথার ভাষাতেই। কুন্তী বললেন—দেখো, মাদ্রীকে একবার একটি দেব-পুরুষকে ডাকবার কথা বলেছিলাম। সেখানে সে এক মওকায় যমজ-দেবতা ডেকে দুটি ছেলে পেয়েছে। এ তো চরম বঞ্চনা, আমাকে তো বোকা বানানো হয়েছে—তেনাস্মি বঞ্চিতা। এরপরেও আমি যদি তাকে আবার মন্ত্র-শিক্ষা দিই, তবে তো সন্তান-সৌভাগ্যে সে আমাকেও টেক্কা দেবে, অন্তত সংখ্যায়। তুমি আর বোলো না, খারাপ মেয়েছেলেদের কেতাকানুনই এইরকম—বিভেম্যস্যা হ্যভিভবাৎ কুস্ত্রীণাং গতিরীদৃশী। আমি বোকা কিনা, তাই বুঝিনি যে, যুগল-পুরুষের আহ্বানে ফলও দুটোই হয়। না, তুমি আর আমাকে অনুরোধ কোরো না, আমি খুব বুঝেছি, এবার আমাকে দয়া করো—তস্মান্নাহং নিযোক্তব্যা ত্বয়ৈষোঽস্তু বরো মম। পাণ্ডু কুন্তীকে আর ঘাঁটাতে সাহস করেননি।

৭

কুন্তী স্বামীকে ভালবাসার চেষ্টা করেছিলেন অনেক। কিন্তু স্বামীসুখ তাঁর কপালে ছিল না। দুর্বাসার কাছে স্বেচ্ছা-বিহারের মন্ত্র শেখা সত্ত্বেও তাঁর মনে ছিল অসাধারণ সংযম এবং তার চেয়েও বেশি ব্যক্তিত্ব। ইচ্ছে করলেই কামুকের স্থূলতায় তাঁকে ভালবাসা যায় না। তাঁকে ভালবাসতে হলে পুরুষের দিক থেকে যে ব্যক্তিত্ব, যে সংযম থাকা দরকার, সেই ব্যক্তিত্ব বা সেই সংযম পাণ্ডুর ছিল না। কুন্তীর অন্তর বুঝতে হলে স্বামী নামক পুরুষটির যে পরিশীলিত চিত্তবৃত্তি বা যে মার্জিত রুচিবোধ থাকা দরকার পাণ্ডুর তা ছিল না। ছিল না বলেই চতুর্থবার তিনি কুন্তীকে দেব-পুরুষ ভজনার কথা বলতে পেরেছিলেন। ছিল না বলেই মাদ্রীর মাধ্যমে তিনি নিজের বিকার চরিতার্থ করার চেষ্টা করেছিলেন। কুন্তী তাঁকে অপমানও করেননি, কিন্তু তাঁর কথা শোনেনওনি। বস্তুত সেখানে তিনি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন যেখানে পাণ্ডু রুচির সীমা অতিক্রম করেছেন অথবা যেখানে রুচি কামুকতার স্থূলচিহ্নে চিহ্নিত হয়েছে।

স্বামীসুখ কুন্তীর কপালে ছিল না। তার কারণ পাণ্ডু নিজেই। আরও এক কারণ তাঁর সতীন মাদ্রী। পুত্র উৎপাদনের শক্তি না থাকলেও পাণ্ডুর কামুকতা ছিল যথেষ্ট। যদি কিন্দম মুনির অভিশাপের গল্পটি বিশ্বাস করতে হয়, তবে বলব—পাণ্ডু যে মৈথুনরত অবস্থায় মৃগ-মুনিকে হত্যা করেছিলেন, তার পিছনে পাণ্ডুর ক্ষত্রিয়ের যুক্তি যাই থাক, আসলে তিনি নিজের কাম-পীড়ন সহ্য করতে পারেননি বলেই মৃগের মৈথুনও সহ্য করতে পারেননি। পরে অভিশাপগ্রস্ত হয়ে তিনি স্ত্রীদের কাছে সানুতাপে নিজের সম্বন্ধেই বলেছেন—ভদ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বংশে জন্মেও সংযমের লাগাম-ছাড়া কামমুগ্ধ লোকেরা নিজের দোষেই এমন বাজে কাজ করে যে তার দুর্গতির সীমা থাকে না—প্রাপ্নুবন্ত্যকৃতাত্মানঃ কামজালবিমোহিতাঃ।

মৃগ-মৈথুনের মধ্যে কোনও ইন্দ্রিয়পীড়ন অনুভব না করলে পাণ্ডু নিজের সম্বন্ধে এই কথাটা বলতেন না। এই মুহূর্তে স্মরণে আনতেন না পিতা বিচিত্রবীর্যের কথা, যিনি অতিরিক্ত স্ত্রীসম্ভোগে শরীরে যক্ষ্মা ধরিয়ে ফেলেছিলেন। পাণ্ডুর অবস্থাও প্রায় একইরকম। তবে তাঁর এই সম্ভোগ-প্রবৃত্তির ইন্ধন হিসেবে কুন্তীকে ব্যবহার করাটা পাণ্ডুর পক্ষে কঠিন ছিল। কারণ সেই সংযম, সেই ব্যক্তিত্ব। কিন্তু মদ্ররাজকন্যা এ বিষয়ে পাণ্ডুর মনোমতো ছিলেন এবং তাঁর অনিয়ত শৃঙ্গার-বৃত্তিতে প্রধান ইন্ধন ছিলেন তিনিই। যথেষ্ট শৃঙ্গারে সাহায্য করার কারণেই স্বামীর প্রণয় ছিল তাঁর বাড়তি পাওনা। বস্তুত কুন্তী এর কোনওটাই পছন্দ করতে পারেননি। স্বামীর প্রণয়ের জন্য অসংযত রুচিহীনতাকে তিনি প্রশ্রয় দিতে পারেননি, নিজেকেও বল্গাহীনভাবে ভোগে ভাসিয়ে দিতে পারেননি।

মৃগ-মুনির অভিশাপের পর পাণ্ডু যে হঠাৎ বড় ধার্মিক হয়ে উঠলেন জপ-যজ্ঞ-হোমে দিন কাটাতে লাগলেন—তাঁর পিছনে তাঁর ধর্মীয় সংযম যত বড় কারণ, শাপের ভয় তার চেয়ে অনেক বড় কারণ। মৃগ মুনির অভিশাপ ছিল—মৈথুনে প্রবৃত্ত হলেই তোমার মরণ ঘটবে।

এই অভিশাপের পর কুন্তী স্বামীর ব্যাপারে আরও কড়া হয়ে গিয়েছিলেন। কোনওভাবেই যাতে তাঁর প্রবৃত্তির রাশ আলগা হয়ে না যায়, সেদিকে তিনি দৃষ্টি রাখতেন সতত। বস্তুত স্বামীর ব্রত-ধর্ম পালনে তিনি বরং খুশিই ছিলেন। সাময়িকভাবে পাণ্ডুও শান্ত হয়ে ছিলেন বটে, তবে পুরুষান্তরের সংসর্গে নিজের স্ত্রীর গর্ভে বারংবার পুত্র-প্রার্থনার মধ্যে তাঁর আপন কাম-বিকারই শান্ত হচ্ছিল। কিন্তু যেই তাঁর পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়েছে, বলা ভাল—কুন্তীর ব্যক্তিত্বে পুরুষান্তরে তাঁর শৃঙ্গার-নিয়োগ যেই বন্ধ হয়ে গেছে, অমনই পাণ্ডুর ধর্ম-কর্ম চুকে গেছে, এমনকী শাপের ভয়, মৃত্যুর ভয়—সব তিনি অতিক্রম করতে পেরেছেন আপন শৃঙ্গার-লালসায়।

অবশ্য সময়টাও ভাল ছিল না। ছেলেরা বড় হচ্ছিল। এদিকে চৈত্র এবং বৈশাখের সন্ধিতে বসন্তের হাওয়ায় পলাশ-চম্পকের মাতন শুরু হয়েছিল শতশৃঙ্গ পর্বতের বনে বনান্তে। এই উতলা হাওয়ায় পাণ্ডুর মনে মাঝে মাঝেই বাসনার শিখা জ্বলে উঠছিল। দূরে তাঁর ধর্ম-বালকরা খেলা করছিল, কুন্তী তাঁদের সঙ্গেই ছিলেন। কিন্তু মাদ্রী রাজাকে একা উতাল-চিত্তে ঘুরতে দেখে তাঁর পিছু নিলেন এবং তাও একাকিনী।

তিনি দুটি বালকের হাত ধরে রাজার সঙ্গে যেতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। মহাভারতের কবি পর্যন্ত তাঁর এই ভঙ্গি নাপছন্দ করে লিখেছেন—মাদ্রী তাঁর পিছন পিছন গেছেন একা—তং মাদ্রী অনুজগামৈকা। তাও যদি বা তিনি সাবগুণ্ঠনে জননীর প্রৌঢ়তায় অনুগমন করতেন স্বামীর। না, তিনি তা করেননি। একটি শাড়ি পরেছেন যেমন সুন্দর তেমনই সূক্ষ্ম। তাও পুরো পরেননি অর্ধেকটাই কোমরে জড়ানো। সূক্ষ্ম শাড়ির অনবগুণ্ঠনে গায়ের অনেক অংশই বড় চোখে পড়ছিল। মাদ্রীকে তরুণীর মতো দেখাচ্ছিল। পাণ্ডু দেখছিলেন, কেবলই দেখছিলেন—সমীক্ষমাণঃ স তু তাং বয়স্থাং তনুবাসসম্।

পাণ্ডুর হৃদয়ে দাবানল ছড়িয়ে পড়ল। তিনি জড়িয়ে ধরলেন মাদ্রীকে। মাদ্রী শুধু স্বামীর

মৃত্যু-ভয়ে তাঁকে খানিক বাধা দিলেন বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম বস্ত্রের পরিধানে আগুন লাগিয়ে দিয়ে নিজেকে রক্ষা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। মৈথুন-লিপ্সায় পাণ্ডুর তখন এমন অবস্থা যে, অত বড় একটা অভিশাপের কথাও তাঁর মনে ছিল না। যদিবা মাদ্রীর কথায় তাঁর মনে হয়েও থাকে তবু—ধুর শাপ—শাপজং ভয়মুৎসৃজ্য—এইরকম একটা ভঙ্গিতে তিনি মৃত্যুর জন্যই যেন কামনার অধীন হলেন—জীবিতান্তায় কৌরব্যো মন্মথস্য বংশগতঃ। সঙ্গম-মুহূর্তেই পাণ্ডু মারা গেলেন। মাদ্রীর উচ্চকিত আর্তনাদ শোনা গেল। পাঁচটি কিশোর-বালককে সঙ্গে নিয়ে কুন্তী ছুটে এলেন পাণ্ডুর কাছে।

মাদ্রী এবং পাণ্ডু এমন অবস্থায় ছিলেন যে সেখানে কিশোর পুত্রদের কাছাকাছি যাওয়াটা বাঞ্ছনীয় ছিল না। কাজেই দূর থেকে কুন্তীকে দেখেই মাদ্রী চেঁচিয়ে বললেন—ছেলে-পিলেদের নিয়ে এখানে যেন এসো না দিদি। তুমি ওদের ওখানেই রেখে, একা এসো—একৈব ত্বমিহাগচ্ছ তিষ্ঠন্ত্বত্রৈব দারকাঃ। কুন্তী এলেন এবং দেখলেন—জীবনে যাঁকে তিনি একান্তই আপনার করে পেতে চেয়েছিলেন, তিনি মারা গেছেন।

কুন্তী আর থাকতে পারলেন না। বললেন—রাজা যথেষ্ট বুঝেশুনেই চলছিলেন। আমি তাঁকে সবসময় এসব ব্যাপার থেকে আটকে রেখেছি—রক্ষ্যমাণো ময়া নিত্যং বনে সততম্ আত্মবান্। সেই লোক তোমাকে হঠাৎ আক্রমণ করার সুযোগ পেলেন কী করে? এই দুর্ঘটনার জন্য কুন্তী মাদ্রীকে দোষারোপ করতে ছাড়লেন না। বললেন—মাদ্রী! তোমারই উচিত ছিল রাজাকে সামলে রাখা। এই নির্জন জায়গায় এসে তুমি রাজাকে প্রলুব্ধ করেছ—সা কথং লোভিতবতী বিজনে ত্বং নরাধিপম্। আমি সবসময় যে রাজাকে অভিশাপের কথা মনে করে বিষণ্ণ থাকতে দেখেছি—এখানে এই নির্জনে সে তোমাকে পেয়েই তো অতিরিক্ত সরস হয়ে উঠল—ত্বাম্ আসাদ্য রহোগতাং... প্রহর্ষঃ সমজায়ত?

মাদ্রীর ওপরে যতই রাগারাগি করুন, তাঁর স্বামীটিও যে সমান দোষে দোষী—এ-কথা কুন্তী মনে মনে অনুভব করছিলেন। নিজের সম্বন্ধে সচেতনতাও তাঁর কম ছিল না। শাস্ত্রের নিয়মে তিনি জানেন যে, প্রথমা স্ত্রী হলেন ধর্মপত্নী। আর মাদ্রী যতই প্রলুব্ধ করুক তাঁর স্বামীকে, তাঁর বিয়ের মধ্যেই কামনার মন্ত্রণা মেশানো আছে। দ্বিতীয় বিবাহটাই যে কামজ। এত কামনা যে স্বামীর মধ্যে দেখেছেন এবং যাঁর মৃত্যুও হল কামনার যন্ত্রণায়—তাঁকে আর যাই হোক শ্রদ্ধা করা যায় না, ভালওবাসা যায় না। মাদ্রীকে গালাগালি করার পরমুহূর্তেই কুন্তী তাই শুষ্ক কর্তব্যের জগতে প্রবেশ করেছেন। বলেছেন—মাদ্রী! আমি জ্যেষ্ঠা কুলবধূ এবং তাঁর ধর্মপত্নী, কাজেই রাজার সহমরণে যেতে আমাকে বাধা দিয়ো না মাদ্রী। তুমি ওঠো। এই ছেলেগুলিকে তুমি পালন করো।

জীবনের এই চরম এবং অন্তিম মুহূর্তে মাদ্রী কুন্তীর কাছে কতগুলি অকপট স্বীকারোক্তি করে বসলেন। সেকালের পারলৌকিক বিশ্বাস অনুযায়ী মাদ্রী বলে চললেন—স্বামীর সঙ্গে আমিই সহমরণে যাব দিদি। এই সামান্য জীবনে সীমিত স্বামীসুখে এবং সীমিত শারীরিক কামোপভোগে আমার তৃপ্তি হয়নি—নহি তৃপ্তাস্মি কামানাম্। আর রাজার কথা ভাবো। আমার প্রতি শারীরিক লালসাতেই তাঁর মৃত্যু হল। এই অবস্থায় আমি মৃত্যুলোকে গিয়েও তাঁর সম্ভোগ-তৃষ্ণা মেটাব না কেন—তমুচ্ছিন্দ্যামস্য কামং কথং ন যমসাদনে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুন্তী আবার এসব কথা বেশিক্ষণ শুনতে পারেন না। রুচিতে বাধে। হয়তো বা মনে হল—এইরকম একটি স্বামীর জন্য সহমরণের মতো এত বড় আত্মবলি কি বড় বেশি ত্যাগ নয়? কিন্তু এখনও তাঁর শোনার বাকি ছিল। দুটি সন্তানের জন্ম দিয়েও মাদ্রী যতখানি মা হতে পেরেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি তিনি নায়িকা। ফলত স্বামীকে চিরকাল সম্ভোগের প্রশ্রয়ে তিনি শুধু কুক্ষিগতই করেননি, সন্তানের স্নেহের থেকেও সম্ভোগ-তৃষ্ণা ছিল তাঁর কাছে বড়। আর কুন্তী যে সেই কন্যা অবস্থাতেই সন্তানকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে মায়ের স্নেহ-যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছেন, সেই স্নেহ ব্যাপ্ত হয়েছিল তাঁর পরিবারের সর্বত্র। এমনকী অভিশপ্ত স্বামীকেও যে তিনি সমস্ত মৈথুন-চেষ্টা থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রাখতেন, সেও বুঝি একরকম পুত্রস্নেহে—মানুষটা বেঁচে থাকুক—আর কীসের প্রয়োজন—রক্ষ্যমাণো ময়া নিত্যম্। কিন্তু স্বামী যে এত ভোগী, তা তিনি তত বোঝেননি।

মাদ্রীর এই অসফল সম্ভোগ-বাঞ্ছা ছাড়াও মাদ্রী এবার যা বললেন, তাতে তো কুন্তীর কোনওভাবেই আর মৃত্যুর পথে নিজেকে ঠেলে দেওয়া চলে না। সেটাও যে এক ধরনের স্বার্থপরতা হবে। শুষ্ক কর্তব্যের জন্য, সম্ভোগ-রসিক স্বামীর অনুগমনের জন্য নিজের সন্তানদের বলি দেওয়া সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। মাদ্রী বলেছিলেন—শুধু অসফল কাম-তৃষ্ণাই নয়, আমি তোমার ছেলেদের সঙ্গে আমার নিজের ছেলেদের এক করে দেখতে পারব না—ন চাপ্যহং বর্তয়ন্তী নির্বিশেষং সুতেষু তে। এই কথা শোনার পর কুন্তী আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করেননি, সহমরণের কথাও আর দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করেননি। নিষ্কম্প দৃষ্টিতে, সুগভীর ব্যক্তিত্বে তিনি সন্তান-পালনের দায়িত্বটাই বেশি বড় মনে করেছেন। স্বামী আর সতীনকে তাঁদের অভিলাষ-পূরণের অবসর দিয়েছেন আপন মূল্যে—ইহজন্মেও-পরজন্মেও।

৮

পাঁচটি অনাথ পিতৃহীন বালক পুত্রের হাত ধরে কুন্তী স্বামীর রাজ্যের রাজধানীতে এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে আছেন ঋষিরা। তাঁরাই এখন একমাত্র আশ্রয় এবং প্রমাণ। এই পাঁচটি ছেলে যে পাণ্ডুরই স্বীকৃত সন্তান, তার জন্য ঋষিদের সাক্ষ্য ছাড়া কুন্তীর দ্বিতীয় গতি নেই। পাণ্ডু এবং মাদ্রীর মৃতদেহ ঋষিরাই হস্তিনাপুরে বয়ে নিয়ে এসেছেন বটে, কিন্তু মৃত স্বামীর রাজ্যপাট অথবা সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেতে হলে 'সাকসেশন সার্টিফিকেট'টা যে আর্যবাক্যেই প্রথম পেশ করতে হবে—এ-কথা কুন্তীর ভালই জানা ছিল।

পুরনো আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আবার কতকাল পরে দেখা হবে—এই অধীরতায় কুন্তী খুব দ্রুত হেঁটেছিলেন। পাঁচ ছেলে, রাজার শব আর ঋষিদের সঙ্গে কুন্তী যখন হস্তিনার দ্বারে এসে পৌঁছলেন তখন সকাল হয়েছে সবে। এর মধ্যেই রটে গেল—কুন্তী এসেছেন, রাজা মারা গেছেন, পাঁচটা ছেলে আছে কুন্তীর সঙ্গে। পুরবাসী জনেরা হুমড়ি খেয়ে পড়ল হস্তিনার রাজসভার কাছে। মনস্বিনী সত্যবতী, রাজমাতা অম্বালিকা, গান্ধারী—সবাই কুন্তীকে নিয়ে

রাজসভায় এলেন। ঋষিরা পাণ্ডুর পুত্র-পরিচয় করিয়ে দিলেন কুরুসভার মান্যগণ্য ব্যক্তিদের কাছে, মন্ত্রীদের কাছে এবং অবশ্যই প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্রের কাছে।

পাঁচটি পিতৃহীন পুত্রের হাত ধরে কুন্তী যখন কুরুসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা দামি কাপড় পরে, সর্বাঙ্গে সোনার অলংকার পরে রাজপুত্রের চালে জ্ঞাতি ভাইদের দেখতে এসেছিল। কুন্তীর কাছে এই দৃশ্য কেমন লেগেছিল? বনবাসী তপস্বীরা কুন্তীর পাঁচটি ছেলের সামগ্রিক পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন—মহারাজ! পাণ্ডু আর মাদ্রীর দুটি শব-শরীর এই এখানে রইল। আর তাঁর প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর পাঁচটি অসাধারণ ছেলে দিয়ে গেলাম আপনারই হেফাজতে। আপনি মায়ের সঙ্গে এই ছেলেদের দেখভাল করুন অনুগ্রহ করে। তাঁর স্বামীই রাজা, ধৃতরাষ্ট্র তাঁরই রাজত্বের কাজ চালাচ্ছিলেন মাত্র। কিন্তু আজকে শুধুমাত্র রাজধানীতে মৃত্যু না হওয়ার কারণে আসল রাজপুত্রদেরই প্রার্থীর ভূমিকায় প্রতিপালনের অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে হচ্ছে!

ধৃতরাষ্ট্র খুব ঘটা করে পাণ্ডুর শ্রাদ্ধ করলেন বটে, কিন্তু কুন্তী বা তাঁর ছেলেদের রাজকীয় মর্যাদা তিনি দেননি। রাজবাড়িতে তাঁদের আশ্রয় জুটেছিল বটে, কিন্তু থাকতে হচ্ছিল বড় দীনভাবে, বড় হীনভাবে। ভীমকে যেদিন বিষ খাইয়ে গঙ্গায় ফেলে দিলেন দুর্যোধন, সেদিন ওই অত বড় ছেলেকে হারানোর ঘটনার পরেও ধৃতরাষ্ট্রকে কিছু বলতে পারেননি কুন্তী। সমস্ত কুরুবাড়ির মান্য-গণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে কুন্তীর একমাত্র বিশ্বাসের ব্যক্তি ছিলেন তাঁর দেওর বিদুর। দুই-একজন অতিপক্ক বুদ্ধিজীবী কুন্তী আর বিদুরের সম্পর্ক নিয়ে কথঞ্চিৎ সরসও হয়ে পড়েন দেখেছি। তবে তাঁদের কথাবার্তার মধ্যে মহাভারতীয় যুক্তি-তর্কের থেকে আত্ম-হৃদয়ের প্রতিফলনই বেশি। এই একই ধরনের প্রতিফলন দেখেছি আরও কতগুলি বুদ্ধিজীবীর নব নব উন্মেষশালিনী প্রজ্ঞার মধ্যেও। তাঁরা আবার কুন্তীর ছেলেগুলিকে ধর্ম-বায়ু বা ইন্দ্রের ঔরসজাত না ভেবে দুর্বাসার ঔরসজাত ভাবেন। আমি বলি—ওরে! সেকালে নিয়োগ প্রথা সমাজ-সচল প্রথা ছিল। পাণ্ডুর ছেলে ছিল না বলে কবি যেখানে ধর্ম, ইন্দ্র বা বায়ুকে কুন্তীর সঙ্গে শোয়াতে লজ্জা পাননি, সেখানে দুর্বাসার সঙ্গে শোয়াতেও কবির লজ্জা হত না—যদি আদতে ঘটনাটা তাই হত।

থাক এসব কথা। ভীমকে বিষ খাওয়ানোর পর কুন্তী একান্তে বিদুরকে ডেকে এনেছেন নিজের ঘরে। সুস্পষ্ট এবং সত্য সন্দেহ প্রকাশ করেছেন রাজ্যলোভী দুর্যোধন সম্পর্কে। কিন্তু কোনওভাবেই নিজের সন্দেহের কথা ধৃতরাষ্ট্রকে জানাতে পারেননি। কারণ তিনি বুঝে গিয়েছিলেন—চক্ষুর অন্ধতার থেকেও ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহান্ধতা বেশি। ভীম যখন নাগলোক থেকে ফিরে এসে দুর্যোধনের চক্রান্তের কথা সমস্ত একে একে জানিয়েছেন, তখনও আমরা কুন্তীকে কোনও কথা বলতে দেখিনি। মহামতি যুধিষ্ঠির এই নিদারুণ ঘটনার প্রচার চাননি। পাছে আরও কোনও ক্ষতি হয়। কুন্তীকে আমরা এইসময় থেকে যুধিষ্ঠিরের মত মেনে নিতে দেখছি, যদিও বুদ্ধিদাতা হিসেবে বিদুরের মতামতই এখানে যুধিষ্ঠিরের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে।

আসলে কুন্তী যা চেয়েছিলেন, মহাভারতের কবি তা স্বকণ্ঠে না বললেও বোঝা যায়, অন্য সমস্ত বিধবা মায়ের মতোই তিনি তাঁর সন্তানদের ক্ষত্রিয়োচিত সুশিক্ষা চেয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেয়েছেন তাদের মৃত পিতার রাজ্যের সামান্য উত্তরাধিকার ছেলেরা পাক। তার জন্য তিনি হঠাৎ করে কিছু করে বসেননি, এতদিন পরে ফিরে এসে হঠাৎ করে ছেলেদের জন্য রাজ্যের উত্তরাধিকার চাননি। তিনি সময় দিয়ে যাচ্ছেন, ছেলেদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হওয়ার অপেক্ষাও করছেন।

ভীষ্মের ইচ্ছায় দ্রোণাচার্যের তত্ত্বাবধানে কৌরব-পাণ্ডবদের একসঙ্গেই অস্ত্রশিক্ষা আরম্ভ হল। আর এই অস্ত্রশিক্ষার সূত্র ধরেই তাঁর কনিষ্ঠপুত্র অর্জুন সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হিসেবে বেরিয়ে এলেন। কুন্তী এই দিনটিরই অপেক্ষায় ছিলেন। যেদিন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সামনে দ্রোণাচার্যের অস্ত্রপরীক্ষার আসর বসল, সেদিন অর্জুনের ধনুকের প্রথম টংকার-শব্দে ধৃতরাষ্ট্র চমকে উঠেছিলেন। বিদুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ভাই! কে এল এই রঙ্গস্থলে? সমুদ্রের গর্জনের মতো এই শব্দ কীসের? বিদুর বললেন—তৃতীয় পাণ্ডব এসেছে রঙ্গস্থলে, তাই এই শব্দ। ধৃতরাষ্ট্র সগৌরবে বললেন, যজ্ঞের সময় শমীবৃক্ষের কাঠ ঘষে ঘষে যেমন আগুন জ্বালাতে হয়, আমাদের কুন্তী হলেন সেই আগুন-জন্মানো শমীকাঠের মতো। কুন্তীর গর্ভজাত এই তিনটি পাণ্ডব-আগুনে আজ আমি নিজেকে সবদিক থেকে সুরক্ষিত মনে করছি—ধন্যোঽস্মি অনুগৃহীতোঽস্মি রক্ষিতোঽস্মি মহামতে।

কুন্তী এই দিনটিরই অপেক্ষা করেছেন। বিধবা মা যেমন করে অপেক্ষা করেন—ছেলে পড়াশুনো করে পাঁচজনের একজন হয়ে মায়ের দুঃখ ঘোচাবে, কুন্তীও তেমনই এতদিন ধরে এই দিনটিরই অপেক্ষা করেছেন। কিন্তু পোড়া-কপালির কপালের মধ্যে বিধাতা এত সুখের মধ্যেও কোথায় এক কোণে দুঃখ লিখে রেখেছিলেন। কুন্তীর কনিষ্ঠ পুত্র অর্জুন যখন নিজের অস্ত্রশিক্ষার গুণে সমস্ত রঙ্গস্থল প্রায় মোহিত করে ফেলেছেন, সেই সময়েই সু-উচ্চ রঙ্গমঞ্চ থেকে কুন্তী দেখতে পেলেন—বিশাল শব্দ করে আরও এক অসাধারণ ধনুর্ধর তাঁর তৃতীয় পুত্রটিকে যেন ব্যঙ্গ করতে করতে ঢুকে পড়ল রঙ্গস্থলে।

কুন্তীর বুক কেঁপে উঠল—সেই চেহারা, সেই মুখ। সেই ভঙ্গি। বুকে সেই বর্ম আঁটা। কানে সেই সোনার দুল—মুখখানি যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে—কুণ্ডল-দ্যোতিতাননঃ। কুন্তী দেখলেন—কত শক্তিমান, আর কত লম্বা হয়ে গেছে তাঁর ছেলে। হেঁটে আসছে যেন মনে হচ্ছে সোনার তালগাছ হেঁটে আসছে, যেন কঠিন এক পাহাড় পা বাড়িয়েছে রঙ্গস্থলের দিকে—প্রাংশুকনকতালাভঃ... পাদচারীব পর্বতঃ। কুন্তীর মনের গভীরে কী প্রতিক্রিয়া হল, মহাভারতের কবি তা লেখেননি। তবে নিরপেক্ষ একটি মন্তব্য করেই যখন কবি রঙ্গস্থলের খুঁটিনাটিতে মন দিয়েছেন, তখন ওই একটি মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় কুন্তীর মনে কী চলছিল। কবি বললেন—সূর্যপুত্র কর্ণ অর্জুনের ভাই হয়েও তাঁকে ভাই বলে বুঝলেন না—ভ্রাতা ভ্রাতরমজ্ঞাতং সাবিত্রঃ পাকশাসনিম্।

যাঁকে অমর জীবনের আশীর্বাদ দিয়ে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, সে যে এইভাবে কোনওদিন ফিরে আসবে, তা কুন্তীর কল্পনাতেও ছিল না। যাঁকে জননীর প্রথম বাৎসল্যে কোলে তুলে নিতে পারেননি, সেই তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তান আজ ফিরে এল তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে, প্রায় যুদ্ধোদ্যত অবস্থায়। প্রকৃতির প্রতিশোধ কি এমনতর হয়! এখন এই মুহূর্তে পাঁচটি প্রায় যুবক ছেলের সামনে এই বিধবা রমণীর পক্ষে তাঁর কন্যা অবস্থার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জননীত্ব স্বীকার করা সম্ভব ছিল না। বলতে পারেন, স্বীকার করলে কীই বা এমন হত? কী হত তা কুন্তীই জানেন। তবে নিজের স্বামীর প্রচণ্ড উপরোধেও যিনি লজ্জা আর রুচির মাথা খেয়ে যে কলঙ্কের কথা স্বীকার করতে পারেননি, আজ বিধবা অবস্থায় বড় বড় ছেলেদের সামনে সে-কথা কি স্বীকার করা সম্ভব ছিল? তা ছাড়া রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে কুন্তীর মনে যে দুশ্চিন্তা ছিল, কর্ণের পুত্রত্ব প্রতিষ্ঠায় সেই উত্তরাধিকারে নতুন কোনও ঝামেলা তৈরি হত কি না সেটাই বা কতটা নিশ্চিত ছিল। কুন্তীকে যে কুরুকুলের কলঙ্কিনী বধূ হিসেবে নতুন বিপত্তির মুখ দেখতে হত না, তারই বা কী স্থিরতা ছিল?

অতএব নিজের মান, মর্যাদা এবং রুচির নিরিখে যাঁর বাৎসল্য-বন্ধন জন্মলগ্নেই তিনি ত্যাগ করেছেন, আজ আর তাঁকে আগ বাড়িয়ে সোহাগ দেখাতে চাননি কুন্তী। বরঞ্চ যে মুহূর্তে তিনি দেখেছেন তাঁর জ্যেষ্ঠ-পুত্র তাঁর কনিষ্ঠটিকে যুদ্ধের আহ্বান জানাচ্ছে, সেই মুহূর্তে মূর্ছাই ছিল তাঁর একমাত্র গতি। তিনি তাই অজ্ঞান হয়ে বেঁচেছেন। কিন্তু অজ্ঞান হয়েও কি বাঁচবার উপায় আছে। মহামতি বিদুর তাঁর অবস্থা দেখে দাসীদের দিয়ে কুন্তীর চোখে-মুখে চন্দন-জলের ছিটে দেওয়ালেন। জ্ঞান ফিরে দেখলেন বড়-ছোট—দুই ছেলেই মারামারি করার জন্য ঠোঁট কামড়াচ্ছে। কুন্তী কষ্টে লজ্জায় কী করবেন ভেবে পেলেন না—পুত্রৌ দৃষ্ট্বা সুসংভ্রান্তা নান্বপদ্যত কিঞ্চন।

বাঁচালেন কৃপাচার্য। কৃপাচার্য কর্ণকে তাঁর বংশ-পরিচয় জিজ্ঞাসা করে সবার সামনে চরম অপমানের মধ্যে ফেলে দিলেন বটে, কিন্তু কুন্তীর কাছে এও বুঝি ছিল বাঁচোয়া। বংশ-পরিচয়ের কথায় কর্ণের পদ্ম-মুখে বর্ষার ছোঁয়া লাগল, তাঁর কান্না পেল—বর্ষাম্বুবিক্লিন্নং পদ্মামাগলিতং যথা—তবু কর্ণের এই অপমানেও শুধুমাত্র দুই ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ হল দেখে কুন্তী স্বস্তি পেলেন। এর পরেও কর্ণকে নিয়ে মুখর ভীমসেন আর দুর্যোধনের মধ্যে বিশাল বাগ্‌যুদ্ধ, অপমান পালটা অপমান চলল বটে, তবু এরই মধ্যে প্রতিপক্ষ দুর্যোধন যখন কর্ণের মাথায় অঙ্গরাজ্যের রাজার মুকুট পরিয়ে দিলেন, সেই সময়ে দুর্যোধনের ওপর কুন্তীর চেয়ে বেশি খুশি বোধহয় কেউ হননি।

বাৎসল্যের শান্তি কুন্তীর ওইটুকুই। চাপা আনন্দে তাঁর বুক ভরে গেল—পুত্রম্ অঙ্গেশ্বরং জ্ঞাত্বা ছন্না প্রীতি-রজায়ত। কেউ বুঝুক আর না বুঝুক কুন্তী বুঝলেন—তাঁর বড় ছেলেই প্রথম রাজ্য পেল এবং সবার কাছে সে হীন হয়ে যায়নি। এও এক আনুষ্ঠানিক তৃপ্তি, যার ব্যাখ্যা দেওয়া সহজ নয়। কুন্তী যেটা বুঝলেন না, সেটা হল—এই যুদ্ধের রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ পুত্র—দু'জনেই জন্মের মতো শত্রু হয়ে গেল। এখন যদিও যুদ্ধ কিছু হল না, তবু দুই সমান মাপের বীর দু'জনের প্রতিস্পর্ধী হয়ে রইলেন—এ-কথাটা কুন্তী বোধহয় মায়ের মন নিয়ে তেমন করে বুঝতে পারলেন না। কিন্তু বুঝতে না পারলেও জননীর প্রথম সন্তান হিসাবে কর্ণ যে বেঁচে আছেন, তিনি যে সুষ্ঠু প্রতিপালন লাভ করে এত বড় ধনুর্ধর পুরুষটি হয়ে উঠেছেন—এই তৃপ্তি তাঁকে জননীর দায় থেকে খানিকটা মুক্ত করল অবশ্যই।

যাই হোক, দ্রোণাচার্যের সামনে এই অস্ত্র-প্রদর্শনীর পর এক বছর কেটে গেছে। কুন্তীর দুটি পুত্র, ভীম এবং অর্জুনের অসামান্য শক্তি এবং অস্ত্রনৈপুণ্যের নিরিখেই—অন্তত আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই মনে হয়—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনাপুরের যুবরাজ করতে বাধ্য হলেন। পাণ্ডবজ্যেষ্ঠের এই যৌবরাজ্য লাভের পর ভীম আর অর্জুনের প্রতাপ আরও বেড়ে গেল। তাঁরা এমনভাবে সব রাজ্য জয় করে ধনরত্ন আনতে আরম্ভ করলেন এবং তাঁদের খ্যাতি এত বেড়ে গেল যে, ধৃতরাষ্ট্রের মন খুব তাড়াতাড়িই বিষিয়ে গেল—দূষিতঃ সহসা ভাবো ধৃতরাষ্ট্রস্য পাণ্ডুষু। তার মধ্যে ইন্ধন যোগালেন রাজ্যলোভী দুর্যোধন। ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি বোঝালেন—যেভাবে হোক, পাণ্ডবদের একেবারে মায়ের সঙ্গে নির্বাসন দিতে হবে—সহ মাত্রা প্রবাসয়।

ধৃতরাষ্ট্রের মনেও ওই একই ইচ্ছে ছিল, তিনি শুধু বলতে পারছিলেন না, এই যা। পাণ্ডবভাইদের সঙ্গে তাদের মাকেও যে বারণাবতের প্রবাসে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন দুর্যোধন, তার কারণ একটাই—কুন্তীর বুদ্ধি এবং ব্যক্তিত্ব। পাণ্ডবরা গিয়ে যদি শুধু কুন্তী রাজবাড়িতে থাকতেন, তা হলে বারণাবতের লাক্ষাগৃহে আগুন লাগানোর 'প্ল্যান' ভেস্তে যেতে পারে—এই দুশ্চিন্তাতেই দুর্যোধন কুন্তীকেও পাণ্ডবদের সঙ্গে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন। তিনি বোঝেননি যে, কুন্তীর বা পাণ্ডবদের ভাল চাওয়ার মতো লোক কুরুবাড়িতে আরও ছিল। মহামতি বিদুরের বুদ্ধিতে কুন্তী এবং পাণ্ডবভাইরা সবাই বারণাবতের আগুন-ঘর থেকে বেঁচে গেলেন।

কুন্তীকে এই সময় ছেলেদের সঙ্গে বনে বনে ঘুরতে হয়েছে বটে, তবে তিনি খারাপ কিছু ছিলেন না। ছেলেরা এখন লায়েক হয়ে উঠেছে। বিশেষত ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, তাঁর স্থিরতা, ব্যক্তিত্ব এবং নীতিবোধ এতই প্রখর যে, তাঁর ওপরে নির্ভর না করে কুন্তীর উপায় ছিল না। যে কোনও বিপন্ন মুহূর্তে যুধিষ্ঠিরের কথা মেনে তিনি চলতেন এবং যুধিষ্ঠিরের কথার মর্যাদা তাঁর কাছে ছিল প্রায় স্বামীর কাছাকাছি। মেজ ছেলে ভীমের ওপরে তাঁর স্নেহটা একটু অন্য ধরনের। তিনি জানেন—এ এক অবোধ, পাগল, একগুঁয়ে ছেলে। ভীমের গায়ের জোর সাংঘাতিক। কাজেই বনের পথে ভীমের কাঁধে চেপে যেতেও তাঁর লজ্জা করে না। সব ছেলের সমান পরিশ্রমের পর, অথবা ভীমের যদি অন্য ছেলেদের চেয়ে বেশি পরিশ্রমও হয়ে যায় তবু যেন তাঁকেই ইঙ্গিত করে কুন্তী একটা কথা হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে পারেন—পাঁচ ছেলের মা হয়ে, আজ এই বনের মধ্যে তেষ্টায় গলা ফেটে যাচ্ছে আমার। মায়ের এসব কথার প্রথম প্রতিক্রিয়া ভীমের মনেই হবে। তিনি জল আনতে যাবেন এবং কুন্তীও তা জানেন।

এই গর্ব তাঁর অর্জুনের বিষয়েও ছিল। তবে অর্জুনের থেকেই কিন্তু কুন্তীর মাতৃস্নেহে প্রশ্রয়ের শিথিলতা এসেছে। হাজার হোক, ছোট ছেলে। মায়ের কনিষ্ঠ পুত্রটি অসাধারণ লেখা-পড়া শিখে অসম্ভব কৃতী পুরুষ হয়ে উঠলে মায়ের মনে যে শ্রদ্ধামিশ্রিত নিরুচ্চার প্রশ্রয় তৈরি হয়, অর্জুনের ব্যাপারে কুন্তীরও সেই প্রশ্রয় ছিল। যদিও এই প্রশ্রয়ের মধ্যে মায়ের দাবিও ছিল অনেক। সে দাবি মুখে সচরাচর প্রকাশ পেত না, কিন্তু সে দাবির চাপ কিছু ছিলই। অর্জুনও তা বুঝতেন। সে-কথা পরে আসবে।

প্রশ্রয় বলতে যেখানে একেবারে বাধা-বন্ধহীন অকৃত্রিম প্রশ্রয় বোঝায়, যার মধ্যে ফিরে পাওয়ার কোনও তাগিদ নেই, যা শুধুই নিম্নগামী স্নেহের মতো, দাদু-দিদিমা বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠাকুরমা-ঠাকুরদার অন্তর-বিলাস—কুন্তীর সেই প্রশ্রয় ছিল নকুল এবং সহদেবের ওপর, বিশেষত সহদেবের ওপর। মাদ্রী যে কুন্তীকে বলেছিলেন—তোমার ছেলেদের সঙ্গে আমার ছেলেদের আমি এক করে দেখতে পারব না—এই কথাটাই কুন্তীকে আরও বিপরীতভাবে স্নেহপ্রবণ করে তুলেছিল নকুল এবং সহদেবের প্রতি। পিতৃ-মাতৃহীন এই বালক দুটিকে কুন্তী নিজের ছেলেদের চেয়ে বেশি স্নেহ করতেন। আবার এদের মধ্যেও কনিষ্ঠ সহদেবের প্রতি তাঁর স্নেহ এমন লাগামছাড়া গোছের ছিল যে, তাঁকে বোধহয় তিনি বুড়ো বয়সে পর্যন্ত খাইয়ে দিতেন অথবা ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। পাণ্ডবরা যখন বনে গিয়েছিলেন, তার আগে কুন্তী সহদেবের সম্বন্ধে দুনিয়ার মাতৃস্নেহ উজাড় করে দিয়ে দ্রৌপদীকে বলেছিলেন—বনের মধ্যে তুমি বাপু আমার সহদেবকে একটু দেখে রেখো—সহদেবশ্চ মে পুত্রঃ সহাবেক্ষ্যো বনে বসন্। দেখো ওর যেন কোনও কষ্ট না হয়। কুন্তীর মানসিকতায় দ্রৌপদীকেও তাঁর এই কনিষ্ঠ স্বামীটির প্রতি বাৎসল্য বিতরণ করতে হয়েছে।

যাই হোক, প্রশ্রয় আর লালনের মাধ্যমে যে ছেলেদের কুন্তী বড় করে তুলেছিলেন, দেওর বিদুরের বুদ্ধিতে সেই পাঁচ ছেলেই তাঁর বেঁচে গেল। এখন তাঁদের সঙ্গেই তিনি বনের পথে চলতে চলতে একসময় ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন। মেজো ছেলে ভীম মায়ের কষ্ট দেখে জল আনতে গেল। আর এরই মধ্যে পথের পরিশ্রমে ঘুম এসে গেল সবার। যে বনের মধ্যে এই ঘুমের আমেজ ঘনিয়ে এল সবার চোখে সেই বন ছিল হিড়িম্ব রাক্ষসের অধিকারে। সে তার বোন হিড়িম্বাকে পাঠিয়ে দিল ঘুমন্ত মানুষগুলিকে মেরে আনতে।

ততক্ষণে ভীমের জল আনা হয়ে গেছে। তিনি মা-ভাইদের পাহারা দিচ্ছিলেন। হিড়িম্বা ভীমকে দেখে তাঁর প্রেমে পড়ে গেল। সে ভীমের কাছে হিড়িম্ব রাক্ষসের নরমাংসভোজনের পরিকল্পনা ফাঁস করে দিয়ে সবাইকে বাঁচাতে চাইল। ভীমের এই করুণা পছন্দ হয়নি। অদূরেই হিড়িম্ব রাক্ষসের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ লাগল এবং এদিকে কুন্তী পাণ্ডবভাইদের সঙ্গে জেগে উঠলেন। হিড়িম্বা মনুষ্যরমণীর ছাঁদে যেমনটি সেজে এসেছিল, তাতে কুন্তীর ভারী পছন্দ হয়ে গেল তাঁকে। সরলা হিড়িম্বা কুন্তীর কাছে তার পছন্দের কথাও গোপন করল না। সে পরিষ্কার জানাল ভীমকে সে বিয়ে করতে চায়।

ওদিকে ভীমের হাতে হিড়িম্ব মারা গেল এবং কুন্তী ছেলেদের প্রস্তাব-মতো পা বাড়ালেন এগিয়ে যাওয়ার জন্য। কারও অনুমোদনের অপেক্ষা না করেই অনাকাঙ্ক্ষিতের মতো হিড়িম্বা কুন্তী এবং তাঁর ছেলেদের পিছন পিছন চলতে লাগল। হিড়িম্বের ওপর তখনও ভীমের রাগ যায়নি। সেই রাগেই বোধহয় তিনি হিড়িম্বাকেও মেরে ফেলতে চাইলেন। অবধারিতভাবে বাধা এল যুধিষ্ঠিরের দিক থেকে। কিন্তু এই মুহূর্তে কুন্তীর কাছে হিড়িম্বার আত্মনিবেদন বুঝি ভোলার নয়।

হিড়িম্বা কুন্তীকে তার স্বভাব-সুলভ সরলতায় জানাল—মা! ভালবাসার কত কষ্ট, সে তুমি অন্তত বোঝো। তোমার ছেলের জন্য আমি এখন সেই কষ্ট পাচ্ছি। তুমি আর তোমার এই ছেলে দু'জনেই যদি আমাকে এখন প্রত্যাখ্যান করো—বীরেণাহং তথানেন ত্বয়া চাপি যশস্বিনি—তা হলে আমি আর প্রাণে বাঁচব না।

হিড়িম্বা এবার আসল লোকটিকে ধরেছে। সে জানে, এই মায়ের কথা ফেলার সাধ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারও মধ্যে নেই। হিড়িম্বা সমস্ত লোকলজ্জা ত্যাগ করে কুন্তীর কাছে অনুনয় করে বলল— তুমি আমাকে দয়া করো মা। তোমার ছেলের সঙ্গে মিলিয়ে দাও আমাকে। আমি এই ক'দিনের জন্য তাঁকে নিয়ে যাব, আর যখনই তুমি বলবে আবার ফিরিয়েও দিয়ে যাব তোমার ছেলেকে, তুমি বিশ্বাস করো।

যুধিষ্ঠির বুঝলেন—মা একেবারে গলে গেছেন। মায়ের মতোই যুধিষ্ঠির ভীমকে ছেড়ে দিয়েছেন হিড়িম্বার সঙ্গে এবং তাঁদের পুত্র-জন্ম পর্যন্ত সময় দিয়েছেন বাইরে থাকার। যথা সময়ে ভীম এবং হিড়িম্বার ছেলে জন্মাল এবং দু'জনেই এলেন কুন্তীর কাছে। কুন্তী এই সময়ে রাক্ষসীর গর্ভজাত এই পুত্রটিকে যে মর্যাদা দিয়েছিলেন, তাতে শাশুড়ি হিসেবে তাঁর ঔদার্য প্রকাশ পেয়েছে অনেক আধুনিকা শাশুড়ির চেয়ে বেশি।

আজকের দিনে, তথাকথিত এই চরম আধুনিতার দিনেও নিজের ছেলের সঙ্গে তথাকথিত নিম্নবর্ণের কোনও মেয়ের বিয়ে হলে শাশুড়িরা আধুনিকতার খাতিরে যথেষ্ট সপ্রতিভ ভাব দেখালেও কখনও বা মনে মনে কষ্ট পান, আবার কখনও বা পুত্রবধূ বা তাঁর বাপের বাড়ির লোকের সামনে সোচ্চারে অথবা নিরুচ্চারে নিজের সম্বন্ধে তুলনামূলকভাবে উচ্ছ্রিত বোধ করেন। কিন্তু সেই মহাভারতের যুগেও কুন্তীর মতো এক মনস্বিনী রাজমাতা নিজের ছেলেকে শুধু রাক্ষসীর সঙ্গে একান্ত বিহারে পাঠিয়েও তৃপ্ত হননি, রাক্ষসীর বিকট চেহারার ছেলের বিলোম মস্তকে হাত বুলিয়ে তিনি অসীম মমতায় বলে উঠেছেন—বাছা! প্রসিদ্ধ কুরুবংশে তোমার জন্ম, আমার কাছে তুমি ভীমের সমানই শুধু নয়, এই পঞ্চপাণ্ডবের তুমি প্রথম পুত্র, সবসময় আমরা যেন তোমার সাহায্য পাই—জ্যেষ্ঠঃ পুত্রোঽসি পঞ্চানাং সাহায্যং কুরু পুত্রক।

এমন অসীম মর্যাদায় একটি রাক্ষসীর পুত্রকে যে মনস্বিনী কুরুবংশের মাহাত্ম্যে আত্মসাৎ করেন, শাশুড়ি হিসেবে সেই মনস্বিনীর ধীরতা এবং বুদ্ধিকে আমাদের লোক-দেখানো আধুনিকতার গৌরবে চিহ্নিত না করাই ভাল। শাশুড়ি হিসেবে কুন্তীর বিচক্ষণতা এবং মমত্ব এর পরেও আমরা দেখতে পাব। কিন্তু এই মমত্ব কোনওভাবেই বাংলাদেশের জল-ভাত আর নদী-নীরের মতো নম্র কোনও মমত্ব নয়। এই মমত্বের মধ্যে জননীর সরসতা যতটুকু, ক্ষত্রিয় জননীর বীরতাও ততটুকুই। বরঞ্চ বীরতাই বেশি। ক্ষত্রিয় জননীর স্নেহের সঙ্গে বীরতা এমনভাবেই মিশে যায় যে এর জন্য আলাদা করে তাঁর ভাবার সময় থাকে না। এই বীরতা আগে তিনি নিজের ছেলের ব্যাপারে প্রমাণ করেছেন, তারপর তা প্রমাণ করেছেন শাশুড়ি হিসেবেও। সে-কথা পরে হবে। আসলে ভীমের অমানুষিক শক্তি এবং লোকোত্তর ক্ষমতার ওপরে কুন্তীর এত বিশ্বাস ছিল যে, এরজন্য তিনি অনেক ঝুঁকি নিতেও পিছপা হতেন না। জতুগৃহের আগুন থেকে বেঁচে উঠে পাণ্ডবরা বনের পথে ঘুরতে ঘুরতে একচক্রা নগরীতে এলেন। সেখানে বামুনের ছদ্মবেশে এক বামুন বাড়িতেই আশ্রয় নিয়ে বাস করতে আরম্ভ করলেন। এখানেই দুরন্ত বক রাক্ষস থাকত। রাক্ষস মানে, সে যে মানুষ ছাড়া অন্য কোনও বৃহত্তর প্রাণী তা আমার মনে হয় না। তবে আর্য-সমাজের বাইরে এরা এমন কোনও প্রজাতি যাদের নরমাংসে অরুচি ছিল না। একচক্রা নগরের রাজা বক রাক্ষসের সুরক্ষা ভোগ করতেন। বদলে বক রাক্ষসের নিয়ম ছিল—নগরের এক একটি বাড়ি থেকে তার খাবার

জোগান দিতে হবে এবং যে ব্যক্তি ওই খাবার-দাবার নিয়ে বক রাক্ষসের অপেক্ষায় বসে থাকবেন, তিনিও বক রাক্ষসের খাদ্য-তালিকায় একটি খাদ্য বলেই গণ্য হবেন। কুন্তীরা একচক্রাতে যে ব্রাহ্মণ বাড়িতে ছিলেন, কোনও একসময় সেই বাড়ির পালা এল বক রাক্ষসের খাবার জোগাড় করার। বামুন বাড়িতে কান্নার রোল উঠল। বাড়ির বদান্য গৃহকর্তা যদি বলেন—আমি খাবার নিয়ে যাব, ব্রাহ্মণী তাতে বাধা দিয়ে বলেন—না আমি। ছেলে বলে—আমি যাব তো মেয়ে বলে—আমি।

বামুনবাড়িতে যখন এই আত্মদানের অহংপুর্বিকা এবং অবশ্যই কান্নাকাটি যুগপৎ চলছে, তখন কুন্তী ভীমকে জানিয়ে সেই বামুনবাড়িতে ঢুকলেন। কুন্তীর মাতৃহৃদয় তথা স্নেহ-মমতা এই ঘটনায় কতটা উদ্বেলিত হয়েছিল—সেটা বোঝানোর জন্য মহাভারতের কবি বেশি কথা খরচ করেননি। কিন্তু এমন একখানি জান্তব উপমা দিয়েছেন ব্যাস, যাতে কুন্তীর স্নিগ্ধ হৃদয়খানি পাঠকের কাছে একেবারে সামগ্রিকভাবে ধরা পড়েছে। কবি লিখেছেন—ঘরের মধ্যে বাছুর বাঁধা থাকলে তার ডাক শুনে গোরু যেমন ধেয়ে গোয়ালের মধ্যে ঢোকে, সেইরকম করে কুন্তী ঢুকলেন সেই বামুনবাড়িতে—বিবেশ ত্বরিতা কুন্তী বদ্ধবৎসেব সৌরভী।

কুন্তী সব শুনলেন। বামুনের সব কথা ধৈর্য ধরে শুনলেন। শুনে বললেন—আমার পাঁচ ছেলে। তাদের একজন যাবে বক রাক্ষসের উপহার নিয়ে। কুন্তী অবশ্যই ভীমের কথা মনে করেই তাঁর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বামুন তো অনেক না-না করলেন, কিন্তু কুন্তী বললেন—আমার ছেলেকে আপনি চেনেন না। সে বড় সাংঘাতিক। অনেক রাক্ষস-ফাক্ষস জীবনে সে মেরেছে। সে রাক্ষসকে মেরে নিজেকেও বাঁচিয়ে ফিরবে। স্বয়ং যুধিষ্ঠির পর্যন্ত কুন্তীর এই পুত্র-বিতরণের উদারতায় খুশি হননি। ভয়ও দেখিয়েছেন অনেক। কিন্তু বীরমাতা তাঁর ছেলেকে চিনতেন। বিশেষত হিড়িম্ব-বধের পর ভীমের উপর তাঁর প্রত্যয় অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এই প্রত্যয়ের সঙ্গে ছিল ক্ষত্রিয়-জননীর উপকারবৃত্তি। সিংহ-জননী যেমন শিশুসিংহকে শিকার ধরার জন্য বেছে বেছে নরম শিকার ধরতে পাঠায় না, শিকারের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে তাকে যেমন ছেড়ে দেয়, কুন্তীও তেমনই ব্রাহ্মণের প্রত্যুপকারবৃত্তির সঙ্গে তাঁর ক্ষত্রিয়-জননীর গর্বটুকু মিশিয়ে দিয়েছেন ভীমকে রাক্ষসের সামনে ফেলে দিয়ে।

একচক্রায় সেই বামুনবাড়িতেই ছিলেন কুন্তী আর পাণ্ডবরা। এরই মধ্যে এক পর্যটক ব্রাহ্মণ এসে পাঞ্চাল-রাজ্যে দ্রুপদের ঘরে ধৃষ্টদ্যুম্ন আর দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত গল্প করে বলে গেলেন। কুন্তীর মনে বোধহয় দীপ্তিময়ী দ্রৌপদী সম্বন্ধে পুত্রবধূর কল্পনা ছিল। কিন্তু মনে মনে থাকলেও সে-কথা একটুও প্রকাশ করলেন না। বরঞ্চ বেশ কাব্যি করে ছেলেদের বললেন—এখানে এই ব্রাহ্মণের ঘরে অনেক কাল থাকলাম আমরা—চিররাত্রোষিতা স্মেহ ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে। এখানকার বন-বাগান—যা দেখবার আছে অনেকবার সেগুলি দেখেছি। বহুকাল এক জায়গায় থাকার ফলে ভিক্ষাও তেমন মিলছে না। তার চেয়ে চলো বরং আমরা পাঞ্চালে যাই—তে বয়ং সাধু পাঞ্চালান্ গচ্ছামো যদি মন্যসে।

বলাবাহুল্য, পাণ্ডবরা জতুগৃহের ঘটনার পর দুর্যোধনের চোখে ধুলো দেবার জন্য ব্রহ্মচারী মানুষের বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। মায়ের কথায় পাঁচ ভাই পাণ্ডবেরা সবাই পাঞ্চালে যাবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোড়জোড় শুরু করে দিলেন। এই উপক্রমের মধ্যেই একচক্রার সেই বামুন বাড়িতে উপস্থিত হলেন ব্যাসদেব। যত বড় নিরপেক্ষ মুনিই তিনি হন না কেন, কুরুবংশের প্রতি এই ঋষির অন্য এক মমতা ছিল। বিশেষত পাণ্ডু ছিলেন তাঁরই ঔরসজাত সন্তান। তিনি মারা গেছেন, তবুও তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেরা আপন জ্যাঠতুতো ভাইদের চক্রান্তে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এই অন্যায় তাঁর সহ্য হয়নি। একচক্রার যে বামুন বাড়িতে কুন্তী আর পাণ্ডবরা ছিলেন, সে বাড়িতে তাঁদের বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন স্বয়ং বেদব্যাস—এবমুক্ত্বা নিবেশ্যৈতান্ ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে। কুন্তীকে আশীর্বাদ করে বলে গিয়েছিলেন—তোমার ছেলেরা ধার্মিক। রাজা হবে তারাই। পুত্রবধূ কুন্তীকে অনেক আশ্বস্ত করে সেদিন তিনি চলে গিয়েছিলেন—কুন্তীমাশ্বাস্য প্রভুঃ—আজ যখন কুন্তী নিজেই আবার পাঞ্চালে যাবার প্রস্তাব করেছেন, তখন সেই বেদব্যাস আবার এসে কুন্তীকে তাঁর সমর্থন জানিয়েছেন এবং পাঞ্চালী দ্রৌপদীর কথাটাও বলেছেন এমন করে যাতে পাঁচ ভাইয়ের এক বউ হবেন দ্রৌপদী।

স্বয়ং পাণ্ডবভাইরাও ব্যাসের মর্ম-কথাটা তেমন করে বোঝেননি যেমন করে বুঝেছিলেন কুন্তী। পাঞ্চালে এসে কুন্তী আর পাণ্ডবভাইরা কুমোরপাড়ার একটি বাড়িতে বাসা বাঁধলেন। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে যাবার দিনও তাঁরা ভিক্ষা করতেই বেরিয়েছিলেন। কিন্তু পথে ব্রাহ্মণদের মুখে স্বয়ম্বরের আয়োজন এবং ঘটা শুনে তাঁরাও গিয়ে উপস্থিত হলেন দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায়। এর পরের ঘটনা সবার জানা। অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীর বরমাল্য লাভ করলেন—অপিচ দ্রৌপদীর পাণিপ্রার্থী অন্যান্য রাজাদের সঙ্গেও তাঁকে এবং ভীমকে অনেক লড়তে হল। অবশ্য তাঁরা জিতেই ফিরলেন।

মহাভারতের জবান অনুযায়ী ভীম ও অর্জুনের সঙ্গে প্রতিপক্ষ রাজাদের লড়াই লাগবার সঙ্গে সঙ্গেই যুধিষ্ঠির, নকুল এবং সহদেব—এই তিনজন স্বয়ম্বর সভার বাইরে চলে এসেছেন, কিন্তু কোনওভাবেই মায়ের কাছে ফিরে আসেননি। ভীম আর অর্জুন নববিবাহিতা বধূটিকে মায়ের কাছে নিয়ে এসে বলেছিলেন—মা, ভিক্ষা এনেছি। কুন্তী উত্তরে বলেছিলেন—যা এনেছ, তা সবাই মিলে ভোগ করো। এই কথার পর দ্রৌপদীকে দেখে কুন্তীর ভুল ভাঙে এবং তিনি যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে মীমাংসা চান, যাতে করে তাঁর কথাও থাকে, আবার পাঞ্চালী দ্রৌপদীও যাতে ধর্ম-সংকটে না পড়েন।

একটা মীমাংসার জন্য এই যে কুন্তী যুধিষ্ঠিরের কাছে ছুটে গেলেন, এইখানে মহাভারতের পাঠক-পণ্ডিতেরা কিছু কিছু অনুমান করেন। তাঁরা বলেন—কুন্তীর কথাটা কোনও হঠোক্তি নয়। কুন্তী বলেছিলেন—যা এনেছ, তা সবাই মিলে ভোগ করো। অনেকের ধারণা—স্বয়ম্বর সভার ফল-নিষ্পত্তি, যা দ্রৌপদীকে লাভ করার ফলে অর্জুনের সপক্ষেই ঘটেছিল—সে ঘটনাটা কুন্তীর জানা ছিল। এবং জানা ছিল বলেই ভাইদের মধ্যে যাতে এই নিয়ে কোনও বিভেদ না হয়, তাই তিনি ইচ্ছে করেই অমন কথাটা বলেছিলেন—যা এনেছ সবাই মিলে ভোগ করো।

মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ এই কথাটা প্রথম এইভাবে বলার চেষ্টা করেন। যুধিষ্ঠিরের কাছে কুন্তী মীমাংসার জন্য গেলেন, আর সিদ্ধান্তবাগীশ লিখলেন—বোঝা যাচ্ছে, যুদ্ধ শেষ হয়েছে শুনেই যুধিষ্ঠির, নকুল আর সহদেব (যাঁরা যুদ্ধের আরম্ভেই বাইরে

এসেছিলেন) চলে আসেন কুম্ভকারগৃহে মায়ের কাছে। অর্থাৎ তাঁরাই বলে দেন—দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন অর্জুন। তারপর যখন ভীম-অর্জুন দ্রৌপদীকে নিয়ে এলেন, তখন কুন্তী জেনে বুঝে অমন একটা হঠোক্তি করলেন—যা এনেছ সবাই মিলে ভোগ করো।

ঠিক এইখানে সিদ্ধান্তবাগীশের এই মত অথবা যে পণ্ডিতেরা এই মত পোষণ করেন তাঁদের সঙ্গে আমার মত-পার্থক্য হবার ভয় করি। কারণ মহাভারতে দেখছি—স্বয়ম্বর সভার জের টেনে যুদ্ধ-বিগ্রহ শেষ হতে হতে বেলা গড়িয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য দিন ছেলেরা যে সারাদিনের ভিক্ষা সেরে কুন্তীর কাছে ফিরে আসত—তারও একটা মোটামুটি সময়-সীমা নির্ধারিত ছিল। কিন্তু কোনওদিনই এমন দেরি হত না যাতে কুন্তী দুশ্চিন্তায় পড়তেন। কিন্তু এখানে দেখছি—তিনি মহা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন—ছেলেরা ফিরছে না, ভিক্ষা নিয়ে আসার সময়টাও পেরিয়ে গেছে—অনাগচ্ছৎসু পুত্রেষু ভৈক্ষ্যকালেঽভিগচ্ছতি। কুন্তী এতটা ভাবছেন যে, ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা হয়তো তাদের চিনে মেরে ফেলেছে। অথবা মায়াবী রাক্ষসেরা ধরে নিয়ে গেছে ছেলেদের।

দেখা যাচ্ছে, ছেলেরা বাড়ি ফেরেনি এবং ছেলেরা বাড়ি না ফিরলে মায়েদের যে দুশ্চিন্তা হয়, তাই কুন্তীর হচ্ছে। তার মানে যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব স্বয়ম্বর সভা থেকে বেরলেও বাড়ি ফেরেননি। সিদ্ধান্তবাগীশ পরে যা লিখেছেন (যা আমরা আগে বলেছি) তার একান্ত স্ববিরোধ এইখানে কুন্তীর দুশ্চিন্তার টীকা রচনা করে বলেছেন—যুধিষ্ঠির, নকুল আর সহদেব বাড়ি ফেরেননি। তাঁরা স্বয়ম্বরের যুদ্ধরঙ্গ থেকে বেরিয়ে গিয়ে কুম্ভকারগৃহে আসবার পথে কোথাও অপেক্ষা করছিলেন। যদি এই যুদ্ধ বিগ্রহ দূরে তাঁদের বাড়ি পর্যন্ত ছড়ায়, যদি মায়ের কোনও বিপদ হয়, তাই রাস্তাতেই তাঁরা গার্ড দিচ্ছিলেন—যুধিষ্ঠির-নকুল-সহদেবাঃ মাতৃরক্ষার্থং রঙ্গান্নিষ্ক্রম্য তৎকুম্ভকারভবনাক্রমণপথে প্রতীক্ষন্তে স্ম ইতি প্রতীয়তে। দেখা যাচ্ছে সিদ্ধান্তবাগীশ আগে একরকম বলেছেন, পরে আরেক রকম বলেছেন।

বস্তুত আমরাও এই অনুমানটাই মানি। হয়তো বাড়তি এইটুকু বলি যে, মায়ের বিপদ হবে—এই ভয়ে নয়, তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন ভীম আর অর্জুনের আশঙ্কাতেই। যুধিষ্ঠির, নকুল-সহদেব—যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারে যত ল্যাঙ্‌প্যাঙাই হন না কেন, তাঁরা পালিয়ে যাবার মতো ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন যদি বাইরে থেকেও কোনও আক্রমণ হানতে হয়। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধনীতিতে পাঁচজন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কেউ যুদ্ধ করে না। ভীম অর্জুন যুদ্ধ করছেন, সেখানে দরকার হলে বাইরে থেকে আক্রমণ শানানোর সুবিধে বেশি। হয়তো সেই কারণেই তাঁরা রাস্তায় অপেক্ষা করছিলেন। এবং ভীম-অর্জুন যুদ্ধ জিতে দ্রৌপদীকে নিয়ে রাস্তায় নামামাত্রই তাঁরা এসেছেন একই সঙ্গে। যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব—কেউই ভীম-অর্জুন ফেরার আগে বাড়ি ফিরেছিলেন—কুন্তীর দুশ্চিন্তার নিরিখে সে-কথা বিশ্বাস হয় না। সিদ্ধান্তবাগীশ একবার রাস্তায় অপেক্ষা করার কথা বলে পরে নিজেকে বাঁচানোর জন্য লিখেছেন—যুদ্ধের শেষ খবর শুনেই তাঁরা বাড়ি ফিরেছেন। আমি বলি—যুদ্ধ শেষ হলে তার প্রতিক্রিয়া হবে ভাইদের সঙ্গে মিলিত হওয়া। প্রায় এক বয়সের ভাইয়েরা আগে নিজেরা একসঙ্গে মিলবে, তারপর হই হই করে মায়ের কাছে যাবে। এইরকম হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবিশ্বাসী পণ্ডিতেরা বলেন—অন্য ভাইরা যদি আগে না ফিরেই থাকেন, তবে ভীম আর অর্জুনকেই শুধু মায়ের কাছে গিয়ে ভিক্ষা এনেছি বলে দাঁড়াতে দেখলাম কেন? আমি বলব লজ্জা, এর কারণ, লজ্জা। যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব যুদ্ধ-টুদ্ধ করেননি, অথচ নতুন বউকে সঙ্গে নিয়ে মায়ের সামনে গিয়ে বেশ দালালি করে একটা কথা বলবেন—এটা তাঁদের ক্ষত্রিয়বুদ্ধিতে লজ্জা দিয়েছে। তা ছাড়া নতুন বউটিই বা কী ভাববে? তিনি স্বয়ম্বরের রঙ্গস্থলে অর্জুনকেও দেখেছেন, ভীমকেও দেখেছেন। অতএব তাঁরা যে কথাটা বলতে পারেন, যুধিষ্ঠির, নকুল বা সহদেবের সে-কথা বলা মানায় না। তাই তাঁরা কিছু বলেননি এবং মায়ের সঙ্গে বউ-পরিচয়ের চরম লগ্নে তাঁরা একটু আড়ালেই থেকেছেন।

কিন্তু যে মুহূর্তে ভুল ভেঙেছে, যে মুহূর্তে তিনি বুঝেছেন—ফস করে নতুন বউয়ের সামনে অমন কথাটা বলা ভুল হয়ে গেছে, অমনই কুন্তী তাঁর বড় ছেলের কাছে দৌড়ে গেছেন। নব-পরিণীতা দ্রৌপদীকেও দেখাতে চেয়েছেন—ক্ষত্রিয় বাড়িতে যুদ্ধ জিতে বউ নিয়ে আসাটা যেমন বড় কিছু কথা নয়, তেমনই যুধিষ্ঠির যুদ্ধ না করলেও তাঁর মতের মূল্য কিছু কম নয়। কারণ ক্ষত্রিয়ের কাছে যুদ্ধবৃত্তি যত বড়, ধর্মবুদ্ধি তার থেকেও বড়। তিনি একটা কথা ভুল করে বলে ফেলেছেন, তার মীমাংসার ভার তিনি দিয়েছেন বড় ছেলে যুধিষ্ঠিরের হাতে। দেখাতে চেয়েছেন—ভীম-অর্জুন যত বড় যুদ্ধবীরই হোক, আমার অন্য ছেলেগুলিও কিছু ফেলনা নয়। সঙ্গে নতুন বউটির সুকুমার মনোবৃত্তির কথাটাও কুন্তী ভুলে যাননি। যুধিষ্ঠিরকে তিনি বলেছেন—এমন একটা মীমাংসা করো, যাতে আমার কথাটাও মিথ্যে হয়ে না যায়, আর কৃষ্ণা পাঞ্চালীরও যেন কোনও বিভ্রান্তি না হয়—ন চ বিভ্রমেচ্চ।

যুধিষ্ঠির সিদ্ধান্ত দেবার আগে অর্জুনকে যাচিয়ে নিয়েছেন। বলেছেন—তুমিই দ্রৌপদীকে জয় করেছ। তুমিই তাঁকে বিবাহ করো। অর্জুন সলজ্জে বলেছেন—না দাদা, আগে তোমার বিয়ে হোক, ভীমের বিয়ে হোক, তারপর তো আমি। মনে রাখবেন কথাটা অর্জুনকে বলা হয়েছে, অর্জুনই তার উত্তর দিয়েছেন। কুন্তীর এখানে কোনও পার্ট নেই। রসজ্ঞ মানুষেরা বলতে পারেন—কুন্তীর এ বড় অবিচার। কই হিড়িম্বা যখন ভীমকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, তখন তো কুন্তী বলেননি—আগে আমার বড় ছেলে যুধিষ্ঠির বিয়ে করবে, তারপর ভীম।

আমি বলি—ভীমের জন্য হিড়িম্বা লজ্জা ত্যাগ করে যেসব কথা বলেছিলেন, সেসব কথা যদি বিদগ্ধা রাজনন্দিনীর মুখ দিয়ে বেরোত, তা হলে যুধিষ্ঠির-কুন্তী নিশ্চয়ই অন্যভাবে ভাবতেন। তা ছাড়া ভীম স্বয়ং তো একবারও বলেননি যে, দাদা! এই রাক্ষসী-সুন্দরীকে আগে তুমি বিয়ে করো, তারপর তো আমার বিয়ের কথা আসবে। ভীম সরল লোক। দেখলেন—হিড়িম্বাও জোরজার করছে, মা-ও বলছেন। তিনি নির্দ্বিধায় হিড়িম্বাকে নিয়ে চলে গেছেন অন্য জায়গায়। কিন্তু অর্জুন যে মহাভারতের নায়ক। যুধিষ্ঠির প্রস্তাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মায়ের বিপাকের কথা ভেবেছেন, দ্রৌপদী সম্বন্ধে ব্যাসদেবের ভবিষ্যৎ-বাণী স্মরণ করেছেন এবং নব-পরিণীতা বধূর সামনে নিজের চারদিকে নায়কোচিত দূরত্বের আড়াল ঘনিয়ে নিয়ে বলেছেন—দাদা, আগে তোমার বিয়ে হোক, তারপর ভীমের বিয়ে হোক, তারপর তো আমি। আমাকে দিয়ে অধর্ম করিয়ো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুন্তী এখানে কী করবেন? এখানে তাঁর কৃত্য কিছু নেই। বিদগ্ধা দ্রৌপদীও কিছু বলেননি। অতএব সমস্ত সিদ্ধান্তটাই চলে গেছে যুধিষ্ঠিরের হাতে। বলতে পারেন—যুধিষ্ঠির যখন—'দ্রৌপদী আমাদের সবারই মহিষী হবেন'—বলে সিদ্ধান্ত দিলেন, সেটাতে কুন্তী আপত্তি করেননি কেন? করেননি, কেননা এতে তাঁর হঠোক্তির দায়টাও চলে গেছে, আর পাঁচজনের এক স্ত্রী হলে ভাইদের মধ্যে ভেদ-বিভেদ হবে না—এই সুন্দর যুক্তিটা তাঁর পরম ঈপ্সিত ছিল। কিন্তু এটা তিনি জেনে বুঝে করেছেন তা মনে হয় না। তা ছাড়া এই বিয়ে নিয়ে পরেও কম লড়তে হয়নি। মহামতি দ্রুপদের সঙ্গে, ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে, সবার সঙ্গে এই মায়ের বচন নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে তর্ক করতে হয়েছে। আর কুন্তী যে জেনে-বুঝে পাঁচ ছেলের সঙ্গে এক রূপসীর বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্যই ফস করে একটা মিথ্যার মতো সত্য কথা বলেছেন, তা মনে করি না। আরও মনে করি না এই কারণে যে, দ্রুপদের সভায় অত বড় ঋষি-শ্বশুর স্বয়ং ব্যাসদেবের কাছে কুন্তী অত্যন্ত বিপন্নভাবে আর্জি জানিয়েছেন—ছেলেপিলেদের কাছে আমার কথাটা একেবারে মিথ্যে হয়ে যাবে বলে আমি বড় ভয় পাচ্ছি, আমি কী করে এই মিথ্যা থেকে মুক্তি পাব বলুন—অনৃতান্মে ভয়ং তীব্রং মুচ্যেহম্ অনৃতাৎ কথম্? আর যাই হোক, বেদব্যাসের সঙ্গে কুন্তী চালাকি করবেন না।

শেষমেষ যুধিষ্ঠিরের সিদ্ধান্তে এবং ব্যাসদেবের অনুমোদনে কুন্তীর হঠাৎ বলা কথাটাই পাঁচ ছেলের একত্রে বিবাহের মঙ্গলে সমাপ্ত হল। বিয়ে হলে স্বামীহারা কুন্তী নববধূ দ্রৌপদীকে স্বামীদের কাছে আদরিণী হবার আশীর্বাদ করলেন প্রথমে। তারপরই প্রবাসিনী রাজমাতা ছেলেদের রাজ-সৌভাগ্যের সম্ভাবনায় কল্যাণী বধূকে বললেন—কুরুদের রাজ্যে তুমি স্বামীর সঙ্গে রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হও। ভাষাটাও ছিল—তুমিই তোমার আপন ধর্ম-সৌভাগ্যে স্বামীকে বসাবে রাজার আসনে—অনু ত্বম্ অভিষিচ্যস্ব নৃপতিং ধর্মবৎসলা। কুন্তীর তৃতীয় আশীর্বাদ ছিল কুরুবংশের গর্ভধারিণী জননীর একাত্মতায়। তিনি বলেছিলেন—আজকে যেমন বিবাহের পট্টবস্ত্র পরিহিত অবস্থায় তোমাকে অভিনন্দিত করছি, তেমনই তোমার ছেলে হবার পর পুত্র-সৌভাগ্যবতী তোমাকে আবারও অভিনন্দিত করব।

এই তিনটি আশীর্বাদের মাধ্যমে কুন্তী একদিকে যেমন নববধূ দ্রৌপদীকে কুলবধূর স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেছেন, তেমনই তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন প্রসিদ্ধ ভরতবংশের পরম্পরার মর্যাদা। দ্রৌপদীর সৌভাগ্যেই হোক অথবা পাণ্ডবদের ধৈর্য এবং বীর্যে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজ্য দিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। রাজমাতা হওয়া সত্ত্বেও যে অপমান এবং বঞ্চনার গ্লানি নিয়ে কুন্তীকে ঘর ছাড়তে হয়েছিল, কুন্তী সেই ঘরে ছেলে এবং ছেলের বউ নিয়ে ফিরে এলেন সগৌরবে। যুধিষ্ঠির রাজ্য পেলেন ইন্দ্রপ্রস্থে। ঘটা করে রাজসূয় যজ্ঞ করলেন। আর কুন্তী! নববধূ দ্রৌপদীর হাতে সমস্ত গৌরবের সম্ভাবনা ছেড়ে দিয়ে নিজে সরে রইলেন রাজমাতার দূরত্বে। ভাবটা এই—স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা মাতা হিসেবে ছেলেদের আমি রাজত্বে প্রতিষ্ঠিত দেখলাম। এইবার তোমরা সুখে থাকো। আমি দায়মুক্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্ত হতে চাইলেই কি আর মুক্ত হওয়া যায়? কুন্তী বলেছিলেন—বাপের বাড়ির লোকের কাছেও আমি সুখ পাইনি, শ্বশুরবাড়ির লোকের কাছেও নয়। স্বামী চলে গেলেন অকালে। ভাশুর আপন পুত্রস্নেহে অন্ধ। বারণাবতের আগুন থেকে বেঁচে মহামতি দ্রুপদের আত্মীয়তার সান্নিধ্যে সগৌরবে হস্তিনায় ফিরলেন বটে, কিন্তু পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজ্যের প্রতিপত্তিও ধৃতরাষ্ট্রের সহ্য হয়নি। মতলববাজ শ্যালক এবং রাজ্যলোভী পুত্র তাঁকে যা বুঝিয়েছে, তিনি হয়তো তাই বুঝেছেন। কুন্তীর ছেলেদের বাড়বাড়ন্ত দুর্যোধনের যেমন সহ্য হয়নি ধৃতরাষ্ট্রেরও নয়। ফল পাশাখেলা, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, পাণ্ডবদের বনবাস।

এইসময় থেকে আমরা অন্য এক কুন্তীকে দেখতে পাব। রাজমাতা হিসেবে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসুখ—তা কতটুকুই বা ভোগ করলেন তিনি? সারাজীবন কষ্ট করে এসে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যসুখ তাঁকে বড় বেশি উৎফুল্ল করতে পারেনি। তিনি ছিলেনও একান্তে। কিন্তু তার মধ্যে এ কী হল? ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা শকুনির ক্রীড়া কুশলতায় প্রথমে তাঁর ছেলেদের সর্বস্ব জিতে নিত, তাও তাঁর সইত। পাশার পণে ছেলেদের বারো বছর বনবাস হত তাও তাঁর সইত। কিন্তু উন্মুক্ত সভাস্থলের মধ্যে শ্বশুর ভাশুর গুরুজনদের সামনে কুলবধূর লজ্জাবস্ত্র খুলে দেবার চেষ্টা করল দুঃশাসন-দুর্যোধনেরা—এ তিনি সইবেন কী করে?

ঠিক এই জায়গায় কুন্তী দ্রৌপদীর সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন। একাত্ম হয়েছেন কুরুকুলের বধূর মর্যাদায়। তাঁর নিশ্চয়ই মনে হয়েছে—পাণ্ডুর স্ত্রী হিসেবে কুরুবাড়িতে যে মর্যাদা তাঁর প্রাপ্য ছিল, সে মর্যাদা তিনি যেমন পাননি, তেমনই তাঁর ছেলের বউও পেল না। তাঁর শ্বশুরকুল তাঁর সঙ্গে যে বঞ্চনা করেছে, সেই বঞ্চনা চলল বধূ-পরম্পরায়। পাশাখেলায় পাণ্ডবরা হেরে গিয়ে যখন বনবাসের জন্য তৈরি হচ্ছেন, তখন কুন্তী তাঁর আবাঙ্মুখ ছেলেদের সঙ্গে কথা বলেননি, কথা বলেছিলেন শুধু পুত্রবধূ দ্রৌপদীর সঙ্গে।

পরিস্থিতিটা বলি। যুধিষ্ঠির দ্রোপদী আর ভাইদের নিয়ে বিদায় চাইলেন সবার কছে। কুন্তীও বুঝি ছেলেদের সঙ্গে বনে যাবার জন্যই প্রস্তুত হয়েছিলেন, কারণ পাণ্ডুর বংশধর পুত্রদের যেখানে ঠাঁই হল না, সেই শত্রুপুরীতে তাঁর স্থান কোথায়? কাজেই তিনিও বনে যাবার জন্যই প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু ধর্মাত্মা বিদুর যিনি ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার অন্যতম মন্ত্রীও বটেন, তিনি পাণ্ডবদের ডেকে বললেন—রাজপুত্রী আর্যা পৃথা বৃদ্ধা হয়েছেন, বেশি কষ্টও তাঁর সইবে না, তিনি আর বনে যাবেন না, তিনি আমারই বাড়িতে থাকবেন আমারই সমাদরে—ইহ বৎস্যতি কল্যাণি সংকৃতা মম বেশ্মনি। কথাটা বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে শোনালেন—অর্থাৎ রাজবাড়ির আনুকূল্য ছাড়াও বিদুরের অধিকারে তিনি বিদুরের ঘরে থাকবেন।

যুধিষ্ঠির নিশ্চিন্ত হয়ে কাকা বিদুরের মত মেনে নিয়েছেন, সম্মত হয়েছেন কুন্তীও। ঠিক এই সময়ে বিদগ্ধা দ্রৌপদী উপস্থিত হয়েছেন মনস্বিনী কুন্তীর কাছে। কুন্তী আর চোখের জল রাখতে পারেননি। সেইকালের শাশুড়ি হয়েও ছেলের বউকে যে কত সম্মান দেওয়া যেতে পারে তার একটা উদাহরণ হতে পারে এই কথোপকথন। সাধারণ শাশুড়িরা সবসময় ছেলের ওপর অধিকার ফলাতে গিয়ে পুত্রবধূর সঙ্গে কোঁদল করেন। পরিবর্তে শাশুড়িরা যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলের বউদের সম্মান সম্বন্ধে সচেতন হন, তা হলে যে ছেলেরা আপনিই অধিকারে আসে সেটা বোধহয় কুন্তীর মতো কেউ জানতেন না। অবশ্য দ্রৌপদীও বিদগ্ধা বটে, শাশুড়িকে তিনি বুঝেছেন ভালমতো।

কুন্তী বলেছেন—বাছা! এই বিরাট বিপদের মুহূর্তে কোনও কষ্ট মনে রেখো না তুমি। মেয়েদের কী করা উচিত তা তুমি জানো এবং স্বামীদের সঙ্গে কীভাবে তোমায় চলতে হবে—তাও তোমায় বলে দিতে হবে না। তোমার পিতৃকুল এবং শ্বশুরকুল—দুই কুলেরই তুমি অলংকার। এই কুরুকুলের ভাগ্যি মানি আমি, যে তারা তোমার ক্রোধের আগুনে ভস্ম হয়ে যায়নি এখনও। তোমার মধ্যে স্বামীদের জন্য ভাবনা যতখানি আছে, তেমনি আছে মায়ের গুণ—বাৎসল্য। শীগগিরই ভাল দিন আসবে তোমার।

এইসব শুভকামনার পরে কুন্তী শুধু তাঁর আদরের সহদেবকে বনের মধ্যে ভাল করে দেখে রাখতে বলেছেন দ্রৌপদীকে, এবং সে-কথা আমি আগে বলেছি। বিদগ্ধা দ্রৌপদী রওনা দিলেন, কুন্তীর কান্না দ্বিগুণতর হল। ছেলেদের জড়িয়ে ধরে অনেক কাঁদলেন তিনি, অনেক ধিক্কার দিলেন নিজেকে। বললেন—চিরকাল ধরে ন্যায়-নীতি আর সমস্ত উদারতার মধ্যেই ছেলেরা আমার মানুষ হয়েছে, কিন্তু কেউ নিশ্চয়ই ভীষণভাবে খারাপ চেয়েছে আমার—কস্যাপধ্যানজঞ্চেদং—যার ফলে দুর্দৈব উপস্থিত হল। অথবা এ আমারই ভাগ্যের দোষ—আমি তোমাদের জন্ম দিয়েছিলাম; নইলে এত গুণের ছেলে হয়েও এইভাবে দুর্ভোগ পোয়াতে হবে কেন তোমাদের?

কুন্তী এবারে স্মরণ করলেন তাঁর সারাজীবনের কষ্টের কথা, তাঁর স্বামীর কথা, সপত্নী মাদ্রীর কথা, যাঁরা পুত্র-জন্মের সুখে-সুখেই স্বর্গত হয়েছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পরেও ছেলেদের নিয়ে তিনি যে আশায় বুক বেঁধেছিলেন, স্বার্থপর ভাশুরের আগ্রাসনে সে আশা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তিনি বলেছেন—আগে যদি জানতাম ছেলেদের সেই বনবাসই জুটবে আবার কপালে, তা হলে পাণ্ডুর মৃত্যুর পর সেই শতশৃঙ্গ থেকে আর হস্তিনায় ফিরে আসতাম না—শতশৃঙ্গান্মৃতে পাণ্ডৌ নাগামিষ্যং গজাহ্বয়ম্। স্বামী-সতীনের মরণ দেখেও জীবনে বুঝি আমার বড় লোভ ছিল, তাই হয়তো এই কষ্ট—জীবিতপ্রিয়তাং মহ্যং ধিঙ্ মাং সংক্লেশভাগিনীম্।

কুন্তীর করুণ বিলাপে সেদিন পাণ্ডবদের বনবাস-দুঃখ আরও গাঢ়তর হয়েছিল। কোনওদিন কুন্তীকে এত আলুলায়িত ভেঙে-পড়া অবস্থায় আমরা দেখিনি। একবার তিনি ছেলেদের আটকে দিয়ে বলেন—ছাড় আমাকে, আমিও বনে যাব তোদের সঙ্গে, একবার নিজের বেঁচে থাকায় ধিক্কার দেন, আরেকবার সহদেবকে চেপে ধরে বলেন—সবাই যাক বাবা, তুই অন্তত আমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য থাক এখানে, তাতে কী এমন অধর্ম হবে—মৎপরিত্রাণজং ধর্মম্ ইহৈব ত্বমবাপ্নুহি। অত বিলাপের পর শেষে আর কুন্তী শ্বশুর-ভাশুরের উদ্দেশে দুটো কথা না বলে পারেননি। বলেছেন—ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ এঁরা নাকি ধর্মের নীতি-নিয়ম সব জানেন, এঁরাই নাকি এই বংশের রক্ষক, তা এঁরা থাকতেও আমার এই দুর্দশা হল কেমন করে—স্থিতেষু কুলনাথেষু কথমাপদুপাগতা?

পাণ্ডবভাইরা ঠোঁট চেপে শরীর শক্ত করে পা বাড়ালেন বনের পথে। মহামতি বিদুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহু কষ্টে দুর্দৈবের যুক্তিতে শান্ত করার চেষ্টা করলেন কুন্তীকে। বিবাহিত পুত্রদের শোকে আকুল এক মাকে তিনি নিজের ঘরে স্থান দিলেন সসম্মানে। শোকে দুঃখে কুন্তী পাথর হয়ে গেলেন। প্রায় তেরো বছর অর্থাৎ যতদিন পাণ্ডবরা বনবাসে আর অজ্ঞাতবাসে দিন কাটিয়েছেন ততদিন মহাভারতের কবি আমাদের কুন্তীর খবর দেননি। হয়তো পুত্রশোকাতুর মাতার দুঃখ কবির মরমী ভাষাতে প্রকাশ করলেও সে বুঝি যথেষ্ট হত না, অথবা সে দুঃখ শুনে শুনে অভিনব-ঘটনা-পিপাসু পাঠকের মনে যদি কুন্তীর দুঃখকষ্টের প্রতি তুচ্ছতা জন্মায়, অতএব মহাভারতের কবি প্রায় তেরো বছর কুন্তীর খবর দেননি আমাদের। বনের মধ্যে পাণ্ডবদের অরণ্য-জীবনের নব নবতর ঘটনা-বিন্যাস করে পাঠকদের তিনি অন্যভাবে আকৃষ্ট এবং নিবিষ্ট রেখেছেন।

এই তেরো বছর যে মহাভারতের কবি কুন্তীকে পাঠক-চক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রাখলেন, তাঁর আরও একটা উদ্দেশ্য আছে। মনে রাখা দরকার, কুন্তী ক্ষত্রিয়-রমণী। প্রিয় পুত্রদের বনবাসের কারণে সাময়িকভাবে তাঁর যত কষ্টই হোক, ক্ষত্রিয়-রমণীর হৃদয় বাংলাদেশের নদী-জল আর দুধ-ভাতে গড়া নয়। ক্ষত্রিয়-রমণীর কাছে পুত্রজন্ম সাময়িক রতি-মুক্তির ফল নয়, পুত্রের মাধ্যমে সে জগতের কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। এই যে তেরো বছর কেটে গেল—আমরা বেশ জানি—ছেলেদের বিবাসনের দিনটি থেকেই কুন্তীর মনের মধ্যে গড়ে উঠেছে প্রতিরোধ। স্বামীর গুরুজন তাঁর শ্বশুর-ভাশুরের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর কম ছিল না, কিন্তু তাবলে তাঁরা যাই করেছেন, তাই ঠিক, এমন ভাবনা নিয়ে তিনি বিদুরের ঘরে বসে বসে চোখের জল ফেলে যাচ্ছেন—এমনটি ভাবার কোনও কারণ নেই। তিনি কুরুবাড়িতে আছেন—নিজের ইচ্ছেয় নয়, বিদুরের ইচ্ছেয়, কিন্তু নিজের স্বাতন্ত্র্যে। সেই বিদুরের বাড়িতেই শোকাহত পাথর-প্রতিমা প্রতিরোধের আগুনে সজীব হয়ে উঠল। শ্বশুরবাড়ির মধ্যে বিদুরের দুর্গে বসেই তিনি অন্যায়কারী ভাশুরের বিরুদ্ধে মন শক্ত করে ফেলেছেন।

নিজের ছেলেদের প্রত্যেকের চরিত্র তিনি জলের মতো পড়তে পারেন। অতএব তেরো বছরের মাথায় পিতৃরাজ্যের উত্তরাধিকারের জন্য আবার যখন সময় আসবে, তখন যাতে ছেলেরা তাঁর মিইয়ে না যায়—তার জন্য প্রত্যেক ছেলের মতো করেই উত্তেজনার ভাষা তৈরি করে রেখেছেন কুন্তী। তাঁর বুকে বিঁধে আছে প্রিয় পুত্রবধূটির অপমানের যন্ত্রণা, যে যন্ত্রণার সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে তিনি একাত্ম অনুভব করেন। পুত্রবধূর মনোকষ্ট এবং অপমান তাঁর কাছে পাণ্ডুর কুলবধূদের পরম্পরায় সাধারণীকৃত। তিনি মনে করেন, পাণ্ডুর ঘরের বউরা—কুন্তীই হোন অথবা দ্রৌপদী—তাঁরা কেউ তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা পাননি। অতএব আর তিনি অপেক্ষা করবেন না।

সময় এল। তেরো বছরের শেষে পাণ্ডব-কৌরবের শান্তি-বিনিময়ের চেষ্টা ব্যর্থ হল। পুরুষোত্তম কৃষ্ণ নিজে এসেছেন কুরুদের বাড়িতে পাণ্ডবদের হক বুঝে নেবার জন্য। শান্তি তিনিও চান, কিন্তু পাণ্ডবদের ভাগ তাঁদের বুঝিয়ে দিতে হবে—এই মনোভাবটা তাঁর ছিল। ফলে কুন্তীর পক্ষে নিজের শাণিত বক্তব্যগুলি পেশ করাটা খুব কষ্টকর হয়নি। তা ছাড়া বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই ভাইপোটির ওপর তাঁর নির্ভরতা ছিল একান্ত। ভাইপোটিও

সেইরকম। কুরুদের সভায় যাবার আগে কৃষ্ণ একবার কুন্তীর সঙ্গে দেখা করেন। তেরো বছর ছেলেদের মুখ না দেখার ফলে কুন্তীর প্রথম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল অনর্গল কুশল প্রশ্নে। তারই সঙ্গে ছেলেদের কর্তব্য সম্বন্ধেও তিনি একইভাবে মুখর। বছরর পর বছর যে অন্যায় তাঁদের সইতে হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কীভাবে প্রতিক্রিয় হয়ে ওঠা উচিত, সে ব্যাপারে এখন তিনি নিজেই উপদেশ দিয়েছেন কৃষ্ণকে। কৃষ্ণ এখানে নিজে বেশি কথা বলেননি। কিন্তু কুরুদের সভায় কৃষ্ণের শান্তি-সফর যখন ব্যর্থ হয়ে গেল, তখন কিন্তু কৃষ্ণ নিজেই জিজ্ঞাসা করেছেন মনস্বিনী কুন্তীকে—তোমার ছেলেদের কী বলব বলে দাও, পিসি! অর্থাৎ এবার উত্তেজনাটা নিজেই চাইছেন।

প্রথমবার যখন কৃষ্ণ এলেন কুন্তীর কাছে, তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে। বিদুরের ঘরে খাওয়া-দাওয়া, আলাপ-আলোচনা সেরে কৃষ্ণ পিসির সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ছেলের বয়সি ভাইপোকে দেখে কুন্তী আর থাকতে পারলেন না। কৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরে অনেক কাঁদলেন কুন্তী। বললেন—পাঁচ ভাই, ছোটবেলা থেকে এক-মত, এক-প্রাণ, অন্যায়ভাবে তাদের পাঠানো হল বনে। বাপ নেই, তাদের আমি কত কষ্ট করে মানুষ করেছি—বালা বিহীনাঃ পিত্রা তে ময়া সততলালিতাঃ। সমস্ত রাজ-সুখ ত্যাগ করে দুঃখিনী মাকে রেখে তারা চলে গেল বনে।

ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যসুখের প্রতিতুলনায় পাণ্ডবভাইরা কত কষ্টে বনে বাস করলেন—কৃষ্ণের সামনে তার একটা চিত্র তুলে ধরলেন কুন্তী। কুন্তী বললেন—হয় শঙ্খ-দুন্দুভির শব্দ, নয়তো হাতি-ঘোড়ার ডাকে ছেলেরা আমার সকালবেলায় জেগে উঠত। ব্রাহ্মণেরা পুণ্যাহ ঘোষণা করতেন, বাঁশিতে ভৈরবীর সুর চড়ানো হত, বাছারা আমার সেই শব্দ শুনে জেগে উঠত। আর এখন বিশাল বিশাল বনের মধ্যে জন্তুর ক্রূর-কর্কশ শব্দে ছেলেরা আমার বোধহয় ঘুমোয়নি এতকাল।

কুন্তী ছেলেদের কথাই বলে চলেছেন—এই যে আমার বড় ছেলে যুধিষ্ঠির। যে নাকি অম্বরীষ-মান্ধাতা অথবা যযাতি-নহুষের মতো বিরাট এক রাজার রাজা হবার উপযুক্ত, সেই যুধিষ্ঠির বনের মধ্যে কেমন ছিল, কৃষ্ণ? আর যার গায়ে হাজার হাতির শক্তি— হিড়িম্ব, বক আর কীচকের মতো লোককে যে শায়েস্তা করেছে, সেই আমার ভীষণ রাগী ছেলে ভীম কেমন করে দিন কাটাল বনে বনে? অর্জুন, আমার অর্জুন। যার ওপর সমস্ত পাণ্ডবভাইরা ভরসা করে থাকে, একেক ক্ষেপে যে একশোটা বাণ ছুঁড়তে পারে, সামনাসামনি যুদ্ধ করে কেউ পারবে না যার সঙ্গে—সেই অর্জুন আমার কেমন আছে কৃষ্ণ? এইভাবে নকুল-সহদেব—পিতৃমাতৃহারা যে ভাই দুটিকে চোখে হারাতেন কুন্তী, জননীর সমস্ত প্রশ্রয়ে যাদের তিনি মানুষ করেছেন, সেই নকুল-সহদেবকে ছাড়া কেমন করে দিন কেটেছে কুন্তীর—তাও তিনি জানালেন কৃষ্ণের কাছে।

সবার শেষে এল কুলবধূ কৃষ্ণার কথা। কুলবধূর সমস্ত মর্যাদা একত্র জড়ো করে শাশুড়ি কুন্তী এবার পুত্রবধূর কথা জিজ্ঞাসা করলেন কৃষ্ণকে। দোষ ধরলে তো কত কিছুই ধরতে পারতেন কুন্তী। পাঁচ ছেলের এক বউ। একে যত্নে করো না, ওকে খেতে দাও না, স্বামীদের সঙ্গে তর্ক করো, পিসতুতো দেওর কৃষ্ণের সঙ্গে অত কীসের বন্ধুত্ব তোমার, অর্জুনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারে তোমার রস বেশি, নকুল-সহদেবকে একটু দেখে রাখতে পারো না, স্বামীদের সঙ্গে একই তালে ঘুরে বেড়াও—এরকম শত দোষ আবিষ্কার করা কিছুই কঠিন ছিল না শাশুড়ি কুন্তীর পক্ষে। কিন্তু কুন্তী তাঁকে দেখেছেন কুরুবাড়ির বধূ-পরম্পরায়। তিনি নিজে কুরুবাড়ির বউ, সেই বউ হিসেবেই তিনি দ্রৌপদীর মর্যাদা রক্ষা করেছেন। বউ হিসেবে কুরুবাড়িতে কষ্ট পেয়েছি, অতএব শাশুড়ি হিসেবে সেটা পুষিয়ে নেব—এই দৃষ্টিতে নয়, দ্রৌপদীর মান-অপমানের কথা কুন্তীর বিলক্ষণ স্মরণে আছে।

তাই সবার কথা শেষ করে কুন্তী এবার আলাদা করে আসছেন দ্রৌপদীর প্রসঙ্গে। বললেন—আমার সবগুলি ছেলের থেকেও অনেক বেশি আমার কাছে আমার পুত্রবধূ দ্রৌপদী—সর্বৈঃ পুত্রৈঃ প্রিয়তরা দ্রৌপদী মে জনার্দন। যেমন তার রূপ, তেমনই তার গুণ। নিজের কচি ছেলেগুলিকে বাড়িতে রেখে সে স্বামীর কষ্টের ভাগ নিতে গেছে বনে। আভিজাত্য, ঐশ্বর্য, কৌলীন্য—কিছুই তো কম ছিল না তার, তবু স্বামীদের জন্যই সে বনে গেছে। দ্রৌপদীর জন্য কুন্তী এবার চিরাচরিত ভারতীয় ধর্মদর্শনেও সন্দেহ প্রকাশ করছেন। ধর্মের কর্তা বক্তা এবং অভিরক্ষিতার মতো এক ব্যক্তির নামই হল কৃষ্ণ। তাঁর কাছেই কুন্তী বলছেন—পুণ্য কর্ম করলেই মানুষ সুখ পায়—এমন নিশ্চয়ই নয় কৃষ্ণ, কারণ তা যদি হত তা হলে আমার দ্রৌপদীর সারাজীবন ধরে অক্ষয় সুখ পাওয়ার কথা।

আসলে কুন্তী এবার যেসব মেজাজি কথাগুলি বলবেন তার অন্তঃসূত্র হলেন দ্রৌপদী। ছেলেদের এই চুপ করে বসে থাকা আর তাঁর ভাল লাগছে না। ধর্ম-ধর্ম করে যুধিষ্ঠিরের শুভবুদ্ধি আর তৃপ্ত করছে না এই ক্ষত্রিয় রমণীর মন। কুন্তী বলছেন—দেখ কৃষ্ণ! যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন অথবা নকুল-সহদেব—কেউ আমার কাছে কৃষ্ণা-পাঞ্চালীর থেকে প্রিয় নয়। অমন একটা মেয়েকে রাজসভার মধ্যে এনে অপমানের চূড়ান্ত করা হল, আর এরা কেউ কিচ্ছুটি করল না—এর থেকে দুঃখের ঘটনা আমার জীবনে কখনও ঘটেনি—ন মে দুখঃতরং কিঞ্চিদ্ ভূতপূর্বং ততোঽধিকম্। রজস্বলা অবস্থায় দ্রৌপদীকে শ্বশুর-ভাশুরের সামনে জোর করে নিয়ে আসা হল, আর ব্রহ্মলগ্ন নির্বিঘ্ন পুরুষের মতো সেটা বসে বসে দেখলেন ধৃতরাষ্ট্র এবং অন্যান্য কৌরবেরা।

কুন্তী এই প্রসঙ্গে বিদুরের অনেক প্রশংসা করলেন কৃষ্ণের কাছে, কেননা তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দ্রৌপদীকে সভাস্থলে নিয়ে আসার নিন্দা করেছিলেন। কুন্তী কিছুই বাদ দিচ্ছেন না, কুরুবাড়ির সমস্ত বঞ্চনা তিনি একটি একটি করে বলতে থাকলেন। তিনি ভাবছিলেন—মানুষটি কৃষ্ণ বলেই তিনি হয়তো শান্তির প্রস্তাব গ্রহণ করাতে সমর্থ হবেন কুরুসভায়। জুটবে আরও এক রাশ বঞ্চনা। বারবার অসহ্য নিপীড়ন আর মাঝে মাঝে দুই-চার মুদ্রা ভিক্ষা দেওয়ার মতো কিছু সান্ত্বনা পেতে পেতে কুন্তী এখন ক্লান্ত। শান্তিকামী কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তিনি তাই ঠাণ্ডা মাথায় নিজের জীবনের বঞ্চনাগুলি একটি একটি উপস্থিত করে তাঁর আসল প্রস্তাবের পথ পরিষ্কার করছেন।

আমরা এখন সেই জায়গায় উপস্থিত, যেখান থেকে আমরা কুন্তীর জীবনের কথা আরম্ভ করেছিলাম। জীবনের যে উপলব্ধি থেকে কুন্তী নিজেকে অবহেলিত এবং বঞ্চিত বলে মনে করেছেন, আমরা এখন সেই মুহূর্তে উপনীত। কঠিন এবং জটিল এক মনস্তত্ত্বের শিকার

হয়ে কুন্তী যখন নিজের ভাইপোকে বলেছিলেন—বাপের বাড়িতেও বঞ্চনা লাভ করেছি, শ্বশুরবাড়িতেও তাই—আমরা এখন সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি।

কুন্তী বলেছিলেন—জীবনে দুঃখ আমি কিছু কম পাইনি, কৃষ্ণ—নানাবিধানাং দুঃখানাম্ অভিজ্ঞাস্মি জনার্দন। ছেলেদের এই অজ্ঞাতবাস এবং তারপরে এখনও যে তাদের রাজ্য দেওয়া হচ্ছে না—সবই সহ্য করা যেত যদি আমি ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকতাম। বাপের বাড়ি শ্বশুরবাড়ি সব জায়গাতেই আমি অবিচার পেয়েছি। তবু আমার এই বিধবার জীবন, ইন্দ্রপ্রস্থের সম্পদ-নাশ এবং কৌরবদের এই শত্রুতা—এও আমাকে তত কষ্ট দেয় না, যতটা দেয় ছেলেদের সঙ্গে আমার থাকতে না-পারাটা—তথা শোকায় দহতি যথা পুত্রৈর্বিনাভবঃ। এই যে আমি প্রায় চোদ্দোটা বছর ধরে আমার অর্জুন, যুধিষ্ঠির, ভীম অথবা নকুল-সহদেব—কাউকে চোখে দেখতে পাচ্ছি না, এর পরেও কি কারও শান্তি থাকতে পারে? আসলে কী জানো কৃষ্ণ, মানুষ মারা গেলে তবেই লোকে তার শ্রাদ্ধ করে, আমার কাছে আমার ছেলেরা কার্যত মৃত, আমিও মৃত তাদের কাছে—অর্থতস্তে মম মৃতাস্তেষাং চাহং জনার্দন।

মহাভারতের কবির ব্যঞ্জনাটা এখানে ধরতে পারলেন কি না জানি না। সংস্কৃতে 'শ্রাদ্ধ' শব্দটি যে ধাতু থেকে আসছে 'শ্রদ্ধা' শব্দটিও সেই ধাতু থেকেই আসছে। পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-তর্পণ মানে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন। সামগ্রিকভাবে এখানে কুন্তীর ভাবটা হল—আমার ছেলেরা আমার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর মতো কিছু করেনি এবং আমিও তাদের মধ্যে শ্রদ্ধা করার মতো কিছু পাইনি। তারা শুধুই আমার কাছে মৃত, আমিও তাদের কাছে তাই; কিন্তু মানুষের মৃত্যু হলে যে শ্রাদ্ধ-তর্পণটুকু করে, অন্তত সেইটুকু তাদের কাছে আশা করা গিয়েছিল। তারা তাও করেনি—জীবনাশং প্রণষ্টানাং শ্রাদ্ধং কুর্বন্তি মানবাঃ।

এখানে কুন্তীর শ্রাদ্ধ-তর্পণ বলতে যেন আবার আক্ষরিক অর্থে শ্রাদ্ধ বুঝবেন না। এখানে শ্রাদ্ধের মধ্যে কুন্তী তাঁর সন্তানদের তরফে কৌরবদের বিরুদ্ধে যথোচিত প্রতিক্রিয়া আশা করছেন। কুন্তী এর পরেই কৃষ্ণের মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরকে জানাচ্ছেন—কৃষ্ণ! সেই রাজা যুধিষ্ঠিরকে বোলো (কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, এককালে তিনি রাজা ছিলেন), সেই ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে বোলো—তুমি যে এত ধর্ম-ধর্ম করো, সেই ধর্মও যে একেবারে ক্ষীণ হয়ে গেল বাছা! ধিক সেই ধর্মপুত্রের জননীকে, যাকে বেঁচে থাকতে হয় পরের ওপর নির্ভর করে—পরাশ্রয়া বাসুদেব যা জীবতি ধিগস্তু তাম্। আর আমার নাম করে সেই ভীম আর অর্জুনকে একবার বোলো। বোলো যে, ক্ষত্রিয়-জননীরা যে সময়ের কথা ভেবে সন্তান প্রসব করে, এখন অন্তত সেই সময়টা এসে গেছে—যদর্থং ক্ষত্রিয়া সূতে তস্য কালোঽয়মাগতঃ। এই সময়ও যদি বয়ে যায়, তবে এরপর মিথ্যাই সত্যের জায়গাটা অধিকার করে নেবে—মিথ্যা চাতিক্রমিষ্যতি।

যে ছেলের যা। ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরকে ধর্মের শাসনে, আর ভীম-অর্জুনকে ক্ষাত্রবীর্যের মহিমায় উদ্বুদ্ধ করে কুন্তী বলেছেন— সময় যদি সেরকম আসে, তবে জীবনটাও খুব বড় কথা নয়। দরকার হলে জীবন দিতে হবে—কালে হি সমনুপ্রাপ্তে ত্যক্তব্যমপি জীবিতম্। আমরা ভাবি চিরাচরিত ক্ষাত্র-নীতি-সিদ্ধির জন্য কোন জননী এমন করে ছেলেদের বলতে পারেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুন্তীর বক্তব্য—ভীম-অর্জুনের মতো বীর, যাঁরা নাকি যুদ্ধকালে দেবতাদেরও অন্ত ঘটাতে পারেন, সেই তাঁরা যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সভাস্থলে উপস্থিত দ্রৌপদীর অপমান দেখলেন—এটা তাঁদের লজ্জা—তয়োশ্চেদ্ অবজ্ঞানং যত্তাং কৃষ্ণাং সভাং গতাম্। দুঃশাসন-দুর্যোধনের সঙ্গে তাঁর প্রথমজাত সন্তান কর্ণও দ্রৌপদীর সঙ্গে জঘন্য ব্যবহারটি করেছিলেন—কুন্তী তা ক্ষমার যোগ্য মনে করেন না। বরঞ্চ তাদের শত অপমান এবং কটূক্তির উত্তরে হঠাৎ-ক্রোধী ভীমসেন যে ক্ষেপে উঠেছিলেন—সেই ক্ষিপ্ততাই অনুমোদন করেন কুন্তী। নিজের ছেলেকে তিনি চেনেন। তাঁর ধারণা—দুর্যোধন ভীমের সঙ্গে যে অপব্যবহার করেছে—তার ফল বুঝবে সে—তস্য দ্রক্ষ্যতি যৎ ফলম্।

এই চরম মুহূর্তে যুধিষ্ঠির এবং অর্জুন যেখানে অসাধারণ ধৈর্য নিয়ে ঘটনার গতির দিকে নজর রাখছেন, সেখানে তাঁর ওই অধীর হঠাৎ-ক্রোধী পুত্রটিই যে প্রধান ভরসা। সে যা করেছে, সে ঠিক করেছে যেন। কৃষ্ণকে কুন্তী বলেছেন—কৌরবদের এই চরম শত্রুতার মুখে আমার ভীম অন্তত চুপটি করে বসে থাকবে না। ভীম সারাজীবন শত্রুতা পুষে রাখে এবং শত্রুর শেষ না করে সে ছাড়বে না। দ্রৌপদীর অপমানে ভীম একান্তভাবে প্রতিক্রিয় হয়েছিলেন বলেই কুন্তীর আবার মনে পড়ল লজ্জারুণা দ্রৌপদীর কথা। কুন্তী বলেছেন—ছেলেরা পাশা খেলায় হেরেছে, দুঃখ নেই আমার, রাজ্য হারিয়েছে তাতেও দুঃখ পাই না, বনবাসে কষ্টে দিন কাটাচ্ছে—তাও আমি গণ্য করি না। কিন্তু রজস্বলা অবস্থায় কুলবধূকে সভার মধ্যে এসে যে অশালীন কথাগুলি শুনতে হল—সে দুঃখের থেকে বড় দুঃখ আমার কাছে কিছু নেই কৃষ্ণ! কিছু নেই—কিন্নু দুঃখতরং ততঃ।

দ্রৌপদীর অপমান আজ কুন্তীর কাছে সমগ্র নারী জাতির একাত্মতায় ধরা দিয়েছে, যে নারী জাতির মধ্যে তিনিও একতমা। বারবার তাঁর মনে পড়ে—অমন অসভ্য পরিস্থিতিতে দ্রৌপদী কাউকে সহায় পায়নি, স্বামীদেরও নয়। আজ কৃষ্ণের শান্তি-প্রস্তাবের প্রাক্কালে দ্রৌপদীর একাত্মতায় কুন্তী তাই নিজের লাঞ্ছনা ব্যক্ত করছেন কৃষ্ণের কাছে। বলেছেন—ছেলেপিলেদের সঙ্গে আমার সহায় একমাত্র তুমি কৃষ্ণ! তুমি আছ, বলরাম আছে, তোমার বীরপুত্র প্রদ্যুম্ন আছে। আর আমি! তোমরা থাকতেও, ভীম-অর্জুনের মতো ছেলে থাকতেও আমাকে এইসব লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হল—সোঽহম্ এবংবিধং দুঃখং সহেয়ং পুরুষোত্তম।

এই 'পুরুষোত্তম' শব্দটির মধ্যে যেন একটা খোঁচা আছে। অর্থাৎ লোকে তোমায় যে 'পুরুষোত্তম' বলে ডাকে, আমার এই সারাজীবনের লাঞ্ছনা গঞ্জনার নিরিখে ওই নামে বুঝি কলঙ্ক লেগেছে। কৃষ্ণ কুন্তীকে আশ্বাস দিলেন কুন্তীর পিতৃকুলের বিশ্বস্ততায়। বললেন—পিসি! তুমি মহারাজ আর্যক শূরের মেয়ে। এক হ্রদ থেকে আরেক হ্রদে এসে আশ্রয় নেওয়ার মতো বিবাহসূত্রে তুমি এসে পড়েছ কৌরবকুলে। তুমি বীরপুত্রদের জননী বলেই এই আশা আমি রাখি যে, তোমার মতো প্রাজ্ঞ রমণীরাই সাধারণ সুখ-দুঃখের ওপর উঠতে পারবে—সুখদুঃখে মহাপ্রাজ্ঞে ত্বাদৃশী সোঢ়মর্হতি। বস্তুত তোমার ছেলেরাও বনবাসের পরিসরে এই সাধারণ সুখ-দুঃখ ক্রোধহর্ষের ওপরে উঠে ধৈর্য অবলম্বন করেছে। বড় মানুষেরা এইরকমই করেন। সাময়িক সুখের থেকে পরিণত কালের অবিচল সুখই তাদের বেশি কাম্য। কৃষ্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন—আমার বিশ্বাস—আর খুব বেশি দেরি নেই। শীগগিরই তোমার ছেলেরা তোমার পুত্রবধূ—সবাই এসে নিজেদের কুশল জানিয়ে অভিবাদন জানাবে তোমাকে।

কৃষ্ণের কথায় কুন্তী সাময়িকভাবে শান্ত হয়ে কৃষ্ণের ওপর আস্থা জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু কুরুসভায় দুর্যোধন যখন কৃষ্ণের শান্তির প্রস্তাব নস্যাৎ করে দিলেন, সেই সময়ে সুখ-দুঃখ অথবা ক্রোধ-হর্ষের ঊর্ধ্বতার দার্শনিক মাহাত্ম্য তাঁর কাছে আর তত সত্য ছিল না। তিনি বুঝেছিলেন ধৈর্যের দিন এবারে শেষ। এখন শাস্তি দেবার সময় এসেছে। হস্তিনাপুর ছাড়বার আগে তিনি আবার এসেছেন মনস্বিনী কুন্তীর কাছে। কুন্তীর উত্তেজনা পাণ্ডবদের মধ্যে সংক্রমিত করার জন্য কৃষ্ণই নিজে বলছেন—বলো পিসি কী বলতে হবে পাণ্ডবদের, তোমার নাম করে যা বলতে হবে এইবার তা বলো—কিং বাচ্যা পাণ্ডবেয়াস্তে ভবত্যা বচনান্ময়া।

কৃষ্ণ এখন শুনতে চাইছেন। কৃষ্ণের মতো অত বড় বীরপুরুষ এবং বাকপটু মানুষ! নিজের ওপর যাঁর অনেক আস্থা ছিল—ভেবেছিলেন—ঠিক পারব, কৌরব-সভায় সবার মধ্যে দুর্যোধনকে ঠিক রাজি করাতে পারব। কিন্তু পারলেন না। দুর্যোধন এবং তাঁর সাকরেদদের ভাব-ভাবনা আগে থেকে জানতেন বলেই কুন্তী কৃষ্ণের মাধ্যমে ছেলেদের যা বলার তা আগেই বলেছেন। এখন কৃষ্ণ নিজেই এসেছেন কুন্তীর কাছে—বিরক্ত, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ। কুন্তীকে বলেছেন—যুক্তি তর্ক দিয়ে অনেক বলেছি। আমি বলেছি, পণ্ডিত ঋষিরা বলেছেন, একটা কথাও যদি শোনে—ন চাসৌ তদ্ গৃহীতবান্। কৃষ্ণ বলেছেন—এখন তুমি বলো, তোমার কথা এখন আমি শুনতে চাই—শুশ্রূষে বচনং তব।

এই যে একটা সময়ের তফাত হল, তাতে কুন্তীও তাঁর বক্তব্য আরও শাণিত করার সুযোগ পেলেন। আগে যে ব্যক্তি শান্তিকামী হয়ে নিতান্ত পাঁচখানি গ্রামের বদলেই শান্তি বজায় রাখতে উদ্যত ছিলেন, সেই লোকের অর্থাৎ আমাদের কৃষ্ণের সমস্ত 'মিশন' এখন ব্যর্থ হয়ে গেছে। কৃষ্ণের এই ব্যর্থতার সুযোগ, কুন্তীর কাছে এক বড় সুযোগ। বস্তুত কৃষ্ণ যে শান্তিকামী হয়ে কৌরব-সভায় পাণ্ডবদের জন্য পাঁচখানি গ্রাম পর্যন্ত প্রার্থনা করেছিলেন—এই প্রার্থনা কুন্তীর মনোমত হয়নি। এখন কৃষ্ণ ব্যর্থ হওয়ার ফলে তিনি সেই কথাগুলি বলতে পারছেন, যা আগে তিনি বলতে পারেননি। কুন্তী বলছেন—তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক বুদ্ধি, মনস্বিতা এবং মাতৃত্বের গ্লানি একত্রিত করে। পাঠক! অবহিত হয়ে শুনুন!

১০

এই মুহূর্তে আমার সহৃদয় পাঠকদের কাছে আমিও যে সকরুণ প্রার্থনা জানাচ্ছি, তার কিছু কারণ আছে। আসলে সাধারণ পাঠক গল্প চান, ঘটনার পর ঘটনার বিন্যাস চান। উপন্যাসের চরিত্র যদি একসঙ্গে বেশি কথা বলে, তার বক্তব্য যদি দীর্ঘায়িত হয়, তবে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। কুন্তীর চরিত্র বিশ্লেষণের পথে আমরা এখন এমন একটা জায়গায় উপস্থিত হয়েছি, যখন পাঠকের ধৈর্যের ওপরেই আমাদের আস্থা রাখতে হবে। আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভরসা একটাই—আমার পাঠক কোনও সাধারণ মামুলি পাঠক নন। মহাভারতের মতো বিশাল এক মহাকাব্যের ততোধিক বিশাল এক নারী চরিত্রের বিশ্লেষণ শোনবার জন্য তিনি পূর্বাহ্ণেই প্রস্তুত। এই প্রস্তুতি থাকার জন্যই পাঠক তাঁর উদারতায় কুন্তীর এই বিপন্ন মুহূর্তে তাঁর পাশে থাকবেন, তাঁর কথা মন দিয়ে শুনবেন বলে আশা করি।

ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজনীতি-শাস্ত্রের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা উত্থান-শক্তি-সম্পন্ন রাজার কথা শুনে থাকবেন। উত্থান-শক্তি বলতে সাধারণত আমরা উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতাই বুঝি, রাজনীতির পরিভাষাতে ব্যাপারটা প্রায় একই বটে, তবে যে রাজা শত্রুর মোকাবিলা করতে সতত উদ্যোগ নেন, শত্রুর দ্বারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়েও যিনি আপন প্রাপ্তির কথা ভুলে যান না, সুযোগ এলেই আবার ঝাঁপিয়ে পড়েন শত্রুর ওপর, প্রাচীন রাজনীতির পরিভাষায় তিনিই উদ্যমী রাজা, উত্থান-শক্তির অধিকারীও তিনিই। তেরোটা বছর ধরে ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির যেভাবে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় কষ্ট ভোগ করে চলেছেন কুন্তী তাতে সুখও পাচ্ছেন না শান্তিও পাচ্ছেন না। পাশাখেলার পণ হিসেবে বনবাসে যাওয়াটা ধর্মের নীতি-নিয়মে যুক্তিসিদ্ধ হতে পারে, কিন্তু রাজ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরের ধীর চেতনা এই ওজস্বিনী ক্ষত্রিয়া রমণীকে পীড়া দিচ্ছে।

কুরু-পাণ্ডবের রাজনীতির মধ্যে কুন্তী হয়তো প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নেই, কিন্তু এই রাজনীতিটা তিনি হাড়ে হাড়ে বোঝেন। আর বোঝেন বলেই রাজনীতির মধ্যে যুধিষ্ঠিরের নিরন্তর ধর্মৈষণা আর তিনি সহ্য করতে পারছেন না। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে তিনি তাই খবর পাঠাচ্ছেন—বাবা! তুমি যেমন ধর্ম-ধর্ম করে যাচ্ছ, সেটাই ধর্ম নয়, তোমার ধর্ম প্রজাপালন, সেই ধর্ম তো নষ্টই হয়ে গেল বাবা—ভূয়াংস্তে হীয়তে ধর্মো মা পুত্রক বৃথা কৃথাঃ। কুন্তীর কাছে যুধিষ্ঠিরের হেয়তা এইখানেই। ছেলেকে তিনি লজ্জা দিয়ে বলেন—তোমার বুদ্ধিটা প্রায় গোঁ-গোঁ করে বই মুখস্থ করা ছাত্রের মতো। যারা বেদের অর্থ কিছুই বোঝে না অথচ দিন-রাত বেদ মুখস্থ করে ভাবে যে খুব ধর্ম হচ্ছে, তোমার বুদ্ধিও সেইরকম। ধর্মকার্যের আনুষ্ঠানিক কিছু তৃপ্তিতেই তুমি এমন বুঁদ হয়ে আছ যে ভাবছ খুব ধর্ম হচ্ছে—অনুবাকহতা বুদ্ধিঃ ধর্মম্ এবৈকমীক্ষতে।

যুধিষ্ঠির পূর্বে রাজা ছিলেন, এখন তিনি রাজ্যহারা, বনবাসী। ব্রাহ্মণোচিত উদার শান্ত ধর্মবুদ্ধির থেকেও তাঁর কাছে এখন রাজ্যোদ্ধারের পরিকল্পনা বড় হওয়া উচিত ছিল। অথচ এই যে কৃষ্ণ কুরুসভায় এলেন শান্তির দূত হয়ে, সেখানে শুধু যুধিষ্ঠির কেন, অর্জুন এমনকী ভীমের মতো লোকের কাছ থেকেও পুরাতন রাজ্যপাটের চেয়ে শান্তির কাম্যতা বেশি দেখা গিয়েছিল। এ জিনিস পঞ্চস্বামিগর্বিতা দ্রৌপদীর যেমন সহ্য হয়নি, পঞ্চপুত্রগর্বিতা এই ক্ষত্রিয়া রমণীরও তা সহ্য হয়নি। যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনা ছিল—সম্পূর্ণ রাজ্যপাট নাই পেলাম, অন্তত পাঁচ গ্রামের পরিবর্তেও যদি যুদ্ধ এড়িয়ে চলেন দুর্যোধন, তবু সেই কলহ-মুক্তিতে বুঝি ধর্ম আছে, শান্তি তো আছেই।

কুন্তীর কাছে অসহ্য এইসব যুক্তি। পূর্বতন রাজাদের উদাহরণে কুন্তী প্রকারান্তরে ধিক্কার দিচ্ছেন যুধিষ্ঠিরকে। বলেছেন—কৃষ্ণ! যেটা ধর্ম, অন্তত যুধিষ্ঠিরের কাছে যেটা ধর্ম হওয়া

উচিত, সেই ধর্ম সে আপন বুদ্ধিতে নির্মাণ করতে পারে না। জন্মলগ্নেই তার ধর্ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন স্বয়ং বিধাতা। ক্ষত্রিয় পুরুষেরা জীবন ধারণ করে বাহুশক্তির ওপর নির্ভর করে। কারণ পরম পুরুষের বাহু থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এই ক্ষত্রিয় জাতি। নৃশংস কাজ করতে হলেও তার চরম অভীপ্সিত কাজ হল প্রজাপালন। তার সেই ধর্ম আজ কোথায়! কুন্তী বলেই চললেন। বললেন—বুড়ো মানুষদের মুখে শুনেছি—কুবের নাকি মুচুকুন্দ রাজাকে খুশি হয়ে এই সমস্ত পৃথিবীর রাজত্ব উপহার দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জানো কৃষ্ণ! মুচুকুন্দ এই দান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—আমি চাই, আমার নিজের শক্তিতে আমি আমার প্রার্থিত রাজ্য অধিকার করে নেব, আপনার দান চাই না আমি—বাহুবীর্যার্জিতং রাজ্যম্ অশ্নীয়ামিতি কাময়ে।

আসলে কুন্তীও আর এই দান চান না। যিনি রাজরানি ছিলেন তাঁর ছেলেরা বনবাসের দীন প্রকোষ্ঠ থেকে পাঁচখানি গ্রাম ভিক্ষা করবেন আর দুর্যোধন সেই দান করবেন—দুর্যোধনের এই মর্যাদার ভূমিকা কুন্তী সহ্য করতে পারছেন না। কুন্তী মনে করেন—ভাল কথা বলে, রাজ্যের অল্পাংশমাত্র গ্রহণের প্রস্তাব করে দুর্যোধনকে কিছুই বোঝানো যাবে না। পাণ্ডবদের দিক থেকে তার ওপরে চরম দণ্ড নেমে না আসলে ধর্মেরই অবমাননা ঘটবে। কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—তুমি যে পূর্বে রাজা হয়েও ঋষিদের মতো পরম ত্যাগের মাহাত্ম্যে নিজেকে বেশ রাজর্ষির কল্পনায় স্থাপন করেছ, তুমি জেনে রাখো এটা রাজর্ষির ব্যবহার নয়—নৈতদ্ রাজর্ষিবৃত্তং হি যত্র ত্বং স্থাতুমিচ্ছসি। তুমি যদি ভেবে থাকো যে, কোনওরকম নৃশংসতা না করে নিষ্কর্মার মতো বসে বসেই প্রজাপালনের ফল পাওয়া যাবে, তা হতে পারে না। স্বর্গ থেকে তোমার বাপ-ঠাকুরদারা তোমার এই বুদ্ধি-ব্যবহার দেখে পুলকিত হয়ে আশীর্বাদ করে যাচ্ছেন—এটা ভেবো না, এমনকী মা হিসেবে আমারও কোনও আশীর্বাদ নেই এ ব্যাপারে—ন হ্যেতাম্ আশিষং পাণ্ডুর্ন চাহং ন পিতামহঃ।

পাঁচ-পাঁচটি বীর পুত্র থাকতেও তিনি নিজে অসহায়ভাবে শত্রুপুরীতে বসে আছেন। ছেলেদের শুভদিনের জন্য আর কতই বা অপেক্ষা করতে পারেন কুন্তী। এর থেকে দুঃখের আর কীই বা আছে যে রাজরানি এবং রাজমাতা হয়েও তাঁকে জ্ঞাতিশত্রুর বাড়িতে বসে পরের দেওয়া ভাতের গ্রাস মুখে দিতে হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য—বাপ-ঠাকুরদার মান আর ডুবিও না যুধিষ্ঠির, তুমি রাজা ছিলে, অতএব রাজার মতো শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়াই তোমার একান্ত ধর্ম—যুধ্যস্ব রাজধর্মেণ মা মজ্জয় পিতামহান্।

কৃষ্ণের মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনন্ত উত্তেজনায় সংবাদ পাঠিয়ে কুন্তী এবার কৃষ্ণকে একটা গল্প বলছেন। বলছেন—এই গল্প শুনে ভালটা কী হওয়া উচিত, করণীয়ই বা কী—সেটা তুমি যুধিষ্ঠিরকে বলতে পারবে। এই গল্পটির মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে। কুন্তীর গল্পে চরিত্র দুটি—মা বিদুলা আর তাঁর ছেলে সঞ্জয়, যে সিন্ধুদেশের রাজার কাছে যুদ্ধে হেরে নিরাশ হয়ে শুয়ে ছিল। এখানে বিদুলা ছেলেকে যা বলেছেন, কুন্তীও ঠিক তাই বলতে চান। বিদুলার গল্পে তাঁর ছেলের যে অবস্থা হয়েছে, কুন্তী মনে করেন—তাঁর ছেলেদেরও সেই একই অবস্থা হয়েছে, বিশেষত যুধিষ্ঠিরের। বস্তুত কড়া কড়া যেসব কথা বিদুলা তাঁর ছেলেকে বলেছেন, সেগুলি বোধহয় মা হিসেবে সোজাসুজি বলা যায় না বলেই কুন্তী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদুলার জবানে বলছেন যুধিষ্ঠিরকে। এখানে বিদুলার সঙ্গে কুন্তীর এক চুলও তফাত নেই, এমনকী কোনও একপদীভাবে কুন্তীকে বিদুলা-কুন্তী বললেও দোষ হয় না। দোষ হয় না বিদুলার ছেলে সঞ্জয়কেও যুধিষ্ঠির ভেবে নিলে।

বিদুলার গল্পের প্রথম প্রস্তাবে কুন্তী বিদুলার ওরফে নিজেরই পরিচয় দিচ্ছেন। কুন্তী বলছেন—জানো কৃষ্ণ! এই বিদুলা ছিলেন রাজচিহ্নে চিহ্নিতা এক ক্ষত্রিয়া রমণী। যেমন বড় বংশ, তেমনই তাঁর নিজের খ্যাতি। অবিনয়ী মোটেই নয়, কিন্তু ব্যক্তিত্বময়ী, রাগী মহিলাও বটে। রাজার সংসদে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা বলার ক্ষমতা ছিল, অন্যদিকে তিনি চরম দীর্ঘদর্শিনী, ভবিষ্যতের করণীয় এবং তার ফল সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন।

সন্দেহ নেই, বিদুলার ব্যক্তিত্ব এবং কর্তৃত্ব খ্যাপন করে কুন্তী জানাতে চাইলেন—বংশ, মর্যাদা এবং দীর্ঘদর্শিতার ব্যাপারে বিদুলার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য নেই কোনও। অতএব বিদুলার কথা, তাঁরই কথা। কুন্তী বলেছেন—জানো কৃষ্ণ! সিন্ধুরাজের কাছে হেরে গিয়ে বিদুলার ছেলে হতাশায় শুয়ে ছিল নিজের মনে। বিদুলা সেই পেটের ছেলেকে কী বলেছিলেন জানো? বলেছিলেন— কোথাকার এক কুপুত্তুর এসে জন্মেছে আমার পেটে। যে ছেলে শত্তুরের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারে সেই ছেলে হলি তুই। আমার মতো মা তার জন্ম দেয়নি, তোর বাপও তোর জন্ম দেয়নি, তুই কোত্থেকে এসে জুটেছিস আমার কপালে—ন ময়া ত্বং ন পিত্রা চ জাতঃ ক্বাভ্যাগতো হ্যসি।

একটু আগে যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে কুন্তী বলেছিলেন, তিনি বাপ-ঠাকুরদার নাম ডোবাচ্ছেন—মা মজ্জয় পিতামহান্। এখন বিদুলার মুখ দিয়ে কুন্তী যা বলছেন তাও যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশেই। অতএব এরপর থেকে আমরা আর 'বিদুলা বললেন'—এমন করে বলব না, বরঞ্চ বিদুলার একাত্মতায় আমরা বলব—বিদুলা-কুন্তী বললেন। যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে বিদুলা-কুন্তীর বক্তব্য—ক্রোধলেশহীন ক্লীব পুরুষকে কেউ গণনার মধ্যে আনে না। এমন করে নিজেকে ছোট কোরো না, এত অল্পে সন্তুষ্ট হয়ো না—মাত্মানং অবমন্যস্ব মৈনমল্পেন বীভরঃ।

কুন্তী এখানে সেই ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যপাটের পরিবর্তে যুধিষ্ঠিরের চাওয়া পাঁচখানি গ্রামের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করছেন। বিদুলারূপী কুন্তী বলছেন—কাপুরুষ ছেলে কোথাকার, দয়া করে একবার গা তোলো, দুর্যোধনের বুদ্ধিতে পরাজিত হয়ে আর নিষ্কর্মার মতো শুয়ে থেকো না, একবার গা তোলো—উত্তিষ্ঠ হে কাপুরুষ মা শেষ্বৈবং পরাজিতঃ। বনবাস থেকেই লোক পাঠিয়ে পাঁচটি মাত্র গ্রাম ভিক্ষে করছ তুমি। আরে মজা নদী যেমন অল্প জলেই ভরে দেওয়া যায়, ইঁদুরের প্রার্থিত অঞ্জলি পূরণ করতে যেমন সামান্যই জিনিস লাগে, তেমনই তোমার মতো সন্তুষ্ট কাপুরুষ অল্পেই সন্তুষ্ট হবে।

পঞ্চ গ্রামের প্রার্থনাতেই কুন্তী বুঝি রেগে গেছেন। ভাবটা এই—বনে বসে বসে শান্তির খবর ছড়াচ্ছ, কেন বাপু তুমি এখনও শকুনের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে পারোনি শত্রুর ওপর! গাব গাছের কাঠ যেমন সহজে জ্বলে ওঠে, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে স্ফুলিঙ্গের কণা, তেমনি করে একবারও যদি মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠতে তুমি? তা তো নয়, শুধু তুষের আগুনের মতো গুমিয়ে গুমিয়ে জ্বলছ আর ধোঁয়া ছাড়ছ। ওই ধোঁয়াটাই যুধিষ্ঠিরের শান্তির বাণী। আরে, সারাজীবন ওমনি করে গুমিয়ে গুমিয়ে ধোঁয়া ছাড়ার থেকে একবার, অন্তত

একবার, মুহূর্তের জন্য জ্বলে ওঠাও অনেক ভাল—মুহূর্তং জ্বলিতং শ্রেয়ো ন তু ধূমায়িতং চিরম্।

ভীমকে বিষ খাওয়ানো হল, তবু যুধিষ্ঠির সবাইকে চুপ করে থাকতে বলেছিলেন, কুন্তীও মেনে নিয়েছেন সে-কথা। কিন্তু বারণাবতে আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা, রাজ্যের অর্ধেক দিয়ে পাশা খেলার পণে সেটা জিতে নেওয়া, কুলবধূকে রাজসভায় বিবস্ত্র করার চেষ্টা, বারো বছরের বনবাস, এক বছরের অজ্ঞাতবাস, তাও এখন আবার শান্তি কামনা—এইভাবে গুমিয়ে গুমিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বেঁচে থাকা—এটা কুন্তীর সহ্যের বাইরে। তাঁর মত হল—তুমি ক্লীব, তোমার রাজ্যপাট সব গেছে, যশ-খ্যাতি সব গেছে, ভোগ-সুখ সব গেছে, এখন শুধু ধর্মের ধ্বজাটা সামনে রেখে বেঁচে থেকে লাভ কী রে ব্যাটা—ধর্মং পুত্রাগতঃ কৃত্বা কিং নিমিত্তং হি জীবসি। হয় তুমি নিজের বীরত্ব দেখাও, নয় মরো—উত্তাবয়স্ব বীর্যং বা তাং বা গচ্ছ ধ্রুবাং গতিম্। আরে সেরকম সেরকম লোক আছে, যারা রণক্ষেত্রে আসন্ন মৃত্যুর সময়ে মাটিতে পড়তে পড়তেও শত্রুর কোমর জড়িয়ে ধরে পড়ে অর্থাৎ সেই অবস্থাতেও তার উদ্যম নষ্ট হয় না। তো সেইরকম একটা পুরুষকার আত্মস্থ করো তুমি, নইলে সেরকম কাজ যদি কিছুই না করতে পারো তবে তো তুমি পুরুষ নও স্ত্রীও নও, তোমার জন্ম হয়েছে শুধু জনসংখ্যা বাড়াবার জন্য—রাশিবর্ধনমাত্রং স নৈব স্ত্রী ন পুনঃ পুমান্।

নিজের পেটের ছেলে যুধিষ্ঠির। এই তেরো বছর ধরে শত্রুর ছিদ্র অন্বেষণ করা তার উচিত ছিল। উচিত ছিল দুর্যোধনের ওপর বিরাগ-গ্রস্ত মন্ত্রী-প্রজাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা। তারপর এই বনবাসের শেষে একেবারে বাঘের মতো দুর্যোধনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া। অথচ যুধিষ্ঠির এসব কিছুই করেননি। কুন্তীর ধৈর্য তাই শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে— হয় মারো, নয় মরো। মায়ের কাছ থেকে এই সমস্ত কঠিন কথার উত্তরে বনবাসক্লিষ্ট যুধিষ্ঠির বিদুলার পুত্রের মতো তো বলতেই পারেন যে, মা! আজ যদি আমরা মরে যাই, তা হলে এই রাজ্য-পাট, ভোগ-সুখ অথবা তোমার নিজের জীবনেরই বা কী মূল্য থাকবে— কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা?

কুন্তী জানেন যুধিষ্ঠিরের মতো নিরুপদ্রব শান্তিকামী ব্যক্তির কাছ থেকে এইরকম একটা মর্মবিদারী মমতা-মাখা প্রতিপ্রশ্ন হতেই পারে। তিনি বলতেই পারেন—বুঝি বা আকরিক লোহা সব এক জায়গায় করে মা তোমার হৃদয়ে গড়ে দিয়েছেন বিধাতা—কৃষ্ণায়সস্যেব চ তে সংহত্য হৃদয়ং কৃতম! নইলে, নিজের ছেলেকে পরের মায়ের মতো এমন করে যুদ্ধে নিয়োগ করো তুমি?

কুন্তী এসব আবেগ-ক্লিন্ন প্রশ্নের উত্তর জানেন। তিনি জানেন যে, হ্যাঁ, যুদ্ধে গিয়ে ছেলেগুলি আমার মারাও যেতে পারে। কিন্তু তবু এইভাবে দিন দিন হীনবল হয়ে অতি অদ্ভুত এক পর্যায়মরণ বরণ করা ক্ষত্রিয় রমণীর পক্ষে যেমন উপযুক্ত নয়, তেমনই উপযুক্ত নয় ক্ষত্রিয় পুত্রদের পক্ষেও। উৎসাহহীন, নির্বীর্য কতগুলি পুত্র আপন কুক্ষিতে ধারণ করার জন্য কুন্তী লজ্জা বোধ করেন। দিনের পর দিন পরের ওপর নির্ভর করার মধ্যে যে দরিদ্রতা আছে, সেই দরিদ্রতা স্বামী-পুত্রের মৃত্যুর চেয়েও তাঁর কাছে কষ্টকর বেশি—পতিপুত্রবধাদেতৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরমং দুঃখমব্রবীৎ। কেন না, সমস্ত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এই পরান্নজীবিতার মধ্যে যে লজ্জা, সেই লজ্জা ক্ষত্রিয়া বীর রমণীর সয় না। বিদুলার মতো কুন্তী বলতেই পারেন—আমি ছিলাম বিরাট বৃষ্ণিবংশের মেয়ে, বিয়ে হয়েছিল কুরুদের রাজবাড়িতে, স্বামী আমাকে সমস্ত সুখে রেখেছিলেন, স্বামীর রাজ্যে আমি ছিলাম সবকিছুর ওপর—ঈশ্বরী সর্বকল্যাণী ভর্ত্রা পরমপূজিতা। কুন্তী বলতে পারেন—দাস-দাসী, ব্রাহ্মণ-ঋত্বিক, আচার্য-পুরোহিত—আমরা ছিলাম এঁদের আশ্রয়। আর আজ! কেউ আমাদের ভরসা করে না, আমিই অন্যের আশ্রয়ে বেঁচে আছি, এর চাইতে আমার মরণও ছিল ভাল—সান্যমাশ্রিত্য জীবন্তী পরিত্যক্ষ্যামি জীবিতম্।

পুত্রস্নেহের থেকে কুন্তীর কাছে আজ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অনেক বড়। কারণ যুদ্ধের জন্যই পুত্রের জন্ম, যুদ্ধ-জয়ের মধ্যেই তার চরম সার্থকতা। যুদ্ধে জয় হোক বা মৃত্যু হোক নিজের, তবু যুদ্ধের মাধ্যমেই ক্ষত্রিয়-পুরুষ হয়ে ওঠে ইন্দ্রের মতো—জয়ন্ বা বধ্যমানো বা প্রাপ্নোতীন্দ্রসলোকতাম্। বিদুলার মতো এক ক্ষত্রিয়-রমণীর জবানে কথা বলতে বলতে কুন্তী দেখছি আর যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য বিস্তার করছেন না। রাজনীতির মূল উপদেশের সঙ্গে যখন বীরত্ব আর উত্তেজনার সংবাদ পাঠাতে হল পুত্রদের কাছে, তখন এই শেষ মুহূর্তে কুন্তী আর যুধিষ্ঠিরের কথা মনে আনলেন না। বিদুলার গল্প শেষ করেই কুন্তী কৃষ্ণকে বলেছেন—আমার কথায় তুমি অর্জুনকে একটা খবর শুধু মনে করিয়ে দেবে কৃষ্ণ। সেই ছোট্টবেলার কথা, অর্জুনের তখন কেবলই জন্ম হয়েছে। আমি ছেলে কোলে নিয়ে মেয়েদের মধ্যে বসেছিলাম। সেই সময়ে আকাশবাণী হয়েছিল—এই ছেলে তোমার সমস্ত শত্রু হত্যা করে পৃথিবী জয় করবে ভবিষ্যতে, এই ছেলের যশ হবে আকাশ-ছোঁয়া—পুত্রস্তে পৃথিবীং জেতা যশশ্চাস্য দিবং স্পৃশেৎ। ভীমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সে নাকি বাপের সম্পত্তি উদ্ধার করবে।

AMARBOI.COM

কুন্তী বললেন—সেই অর্জুনকে জানিয়ো কৃষ্ণ! যে আশায় ক্ষত্রিয় রমণীরা ছেলে ধরে পেটে, সেই সময় এখন এসে গেছে, ভীমকেও জানিয়ো ওই একই কথা—এতদ্ ধনঞ্জয়ো বাচ্যো নিত্যোদ্যুক্তো বৃকোদরঃ। কুন্তী আবারও তুললেন দ্রৌপদীর সেই অপমানের কথা। বললেন—সেই অপমানের থেকে আর কোনও বড় অপমানের কথা তিনি ভাবতে পারেন না এবং অর্জুনও যেন এই দ্রৌপদীর কথাটা খেয়ালে রাখেন—তং বৈ ব্রূহি মহাবাহো দ্রৌপদ্যাঃ পদবীং চর।

পাণ্ডব-সহায় কৃষ্ণ পিসি কুন্তীর সমস্ত উত্তেজনার আগুন পোয়াতে পোয়াতে রওনা দিলেন বিরাটনগরের উদ্দেশে, পাণ্ডবরা সেইখানেই রয়েছেন এখন। কৃষ্ণ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কৌরবসভায় 'রিপোর্ট' চলে এসেছে কুন্তীর বক্তব্য নিয়ে। ভীষ্ম এবং দ্রোণ লাগাম-ছাড়া দুর্যোধনকে শাসন করার চেষ্টা করেছেন মনস্বিনী কুন্তীর চরম যুক্তিগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়ে। তাঁরা বলেছেন—কুন্তীর কথার মধ্যে উগ্রতা থাকতে পারে, কিন্তু সে কথাগুলি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং ধর্মসম্মত—বাক্যমর্থবদত্যুগ্রমুক্তং ধর্ম্যমনুত্তমম্। ভীষ্ম-দ্রোণ দুর্যোধনকে জানালেন যে, মায়ের কথা এবার অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে তাঁর ছেলেরা। কৃষ্ণও সেইভাবে তাদের বোঝাবেন।

এতদিন পাণ্ডবরা যা করেননি, এখন তা করবেনই— এই স্পষ্টতা হঠাৎ করে আসেনি। যে ভাষায়, যে যুক্তিতে কুন্তী আজ পাণ্ডবদের যুদ্ধের জন্য উদ্যোগী হতে বলেছেন, তা একদিনের উত্তেজনা নয়। দিনের পর দিন সহ্য করতে করতে শ্বশুর-কুলের বৃদ্ধ-জনের কাছ থেকে আর যখন কোনও সুবিচারের আশা রইল না, কুন্তী যখন বুঝলেন যে, পাণ্ডবদের জন্য তাঁর ভাশুরের অনুভব মমতাহীন মৌখিকতামাত্র, সেইদিন কুন্তী তাঁর সমস্ত সৌজন্য ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চরম দিনের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। নইলে, এতদিন তিনি এত কঠিনভাবে কোনও কথা উচ্চারণ করেননি। কুন্তীর সমস্ত ধৈর্য অত্যন্ত সযৌক্তিকভাবে অতিক্রান্ত হয়েছে বলেই যুদ্ধের উত্তেজনা ছড়ানোর মধ্যেও এখন ধর্মের সম্মতি এসেছে—উক্তং ধর্ম্ম্যমনুত্তমম্।

১১

কৃষ্ণ যখন কৌরব-সভায় শান্তির দূত হয়ে এলেন, তখন তিনি সভায় যাবার আগে একবার কুন্তীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, আবার সভা ব্যর্থ হবার পরেও একবার দেখা করেছিলেন। প্রথমবার যখন কুন্তীর সঙ্গে কৃষ্ণের দেখা হয়, তখন কুন্তী একবার বলেছিলেন—আমার ভাশুরের ছেলেদের এবং আমার ছেলেদের কোনওদিনই আমি আলাদা চোখে দেখিনি—ন মে বিশেষো জাতু আসীদ্ ধার্তরাষ্ট্রেষু পাণ্ডবৈঃ। এই কথার মধ্যে হয়তো সত্য কিছু নিশ্চয়ই আছে, নইলে দিনের পর দিন বঞ্চনা সহ্য করে কুন্তী এত ধৈর্য ধরলেন কী করে! কিন্তু এই সত্যের চেয়েও আরও গভীর এক বিষণ্ণ সত্য আছে, যার জন্য দুর্যোধনের ব্যাপারে ধৈর্য ধরেছেন কুন্তী। সেই সত্য হয়তো কর্ণ, যাঁকে দুর্যোধন পালনে-পোষণে এবং মন্ত্রণায় এমনই এক পৃথক মর্যাদা দিয়েছেন যা কুন্তীর অপরাধী মনে অন্যতর ধৈর্যের জন্ম দিয়েছে।

দিনের পর দিন অস্থির অহংকারী দুর্যোধনের সঙ্গে পড়ে নিজের একান্ত-জাত সন্তানকে একেবারে অন্যরকম হয়ে যেতে দেখলেন কুন্তী। অস্ত্রশিক্ষার আসরে দুর্যোধন যখন তাঁকে অঙ্গরাজ্য দান করে রাজার পদবীতে স্থাপন করেছিলেন, তখন দুর্যোধনের ওপর কুন্তীর চেয়ে বেশি খুশি বোধহয় কেউ ছিলেন না। কিন্তু কুন্তীর সেই খুশি একটু একটু করে ভেঙে যেতে থাকল। তিনি দেখলেন, দুর্যোধনের সঙ্গে মিশে মিশে, তার সমস্ত অন্যায়ের অংশভাগী হয়ে কেমন করে তাঁর কন্যাগর্ভের পুত্রটি একেবারে বয়ে গেল। কর্ণ যেদিন উন্মুক্ত রাজসভার মধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করার আদেশ দিয়েছিলেন দুঃশাসনকে—সে খবর কি কুন্তীর কানে যায়নি? গিয়েছিল। দুর্যোধনের ওপর খুশি থাকার এই বুঝি শেষ দিন, আপন কুক্ষিজাত পুত্রকে ক্ষমা করার পক্ষেও বোধহয় সেই দিনটি ছিল চরম দিন। কৃষ্ণের কাছে কথা বলতে গিয়ে বারংবার যখন দ্রৌপদীর প্রতি কৌরবদের অন্যায়ের প্রসঙ্গ আসছিল, তখন কর্ণকেও কুন্তী সমানভাবে দায়ী করেছেন—দুঃশাসনশ্চ কর্ণশ্চ পুরুষাণ্যভ্যভাবতাম্। পুত্র বলে তার অন্যায় অনুক্ত রাখেননি কুন্তী।

কিন্তু আজ কী হবে? দুর্যোধন শান্তির প্রস্তাব উড়িয়ে দিলেন এক ফুঁয়ে। যুদ্ধের উদ্যম শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে গেল সশব্দে, সোচ্চারে। বিদুর এসে কুন্তীকে বললেন—তুমি তো জানো, ঝগড়া-ঝাঁটি এড়িয়ে শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারটা আমি কীরকম পছন্দ করি। কিন্তু এত চ্যাঁচাচ্ছি, তবু দুর্যোধন কিছুই শোনে না। ওদিকে ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির, তাঁর ভীমার্জুন, কৃষ্ণ এবং অন্যান্য সহায়-শক্তি থাকা সত্ত্বেও দুর্বলের মতো শান্তি-শান্তি করে যাচ্ছেন—কাঙ্ক্ষতে জ্ঞাতি-সৌহার্দাদ্ বলবান্ দুর্বলো যথা। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, তিনি বুড়ো হয়ে গেলেন, তবু তিনি থামবেন না—বয়োবৃদ্ধো ন শাম্যতি। ছেলের কথায় মত্ত হয়ে অন্যায়ের রাস্তা ধরেছেন তিনি, আর এই জ্ঞাতিভেদ সৃষ্টির কাজে বুদ্ধি জুগিয়ে যাচ্ছে জয়দ্রথ, কর্ণ, দুঃশাসন আর শকুনিরা।

এই যুদ্ধোদ্যোগের মুহূর্তে বিদুর যখন সমস্ত রাজনীতিটার 'পারস্‌পেকটিভ' বুঝিয়ে দিচ্ছেন কুন্তীকে, ঠিক সেই মুহূর্তে আবারও কর্ণের নাম কুন্তীকে বুঝি শেষবারের মতো উচ্চকিত করে তুলল। বিদুর, ধর্মময় বিদুর বলেছিলেন—যদি ধার্মিক সুজনের প্রতি এত অধর্ম করবে, তবে কোন মানুষটা বিষিয়ে না যাবে—কো ন সংজ্জরেৎ? কৃষ্ণের শান্তির কথাতেও যেখানে কাজ হল না, সেখানে কৌরবদের অন্যায়-অধর্মে যে বহু বীরপুরুষই মারা পড়বে, তাতে সন্দেহ কী? এইসব ভেবে ভেবে দিনে রাতে দুশ্চিন্তায় আমার ঘুম হয় না।

বিদুরের যেমন ঘুম হয় না, তেমনই কুন্তীরও ঘুম হয় না। বিদুরের রাজনৈতিক ভাষ্যে কর্ণ যুদ্ধ লাগবার অন্যতম কারণ, আর সে যুদ্ধ যদি লাগে তবে অনেক বীরপুরুষই মারা যাবে—সে ভীমও হতে পারে, অর্জুনও হতে পারে, কর্ণও হতে পারে। এই একটু আগে কৃষ্ণের মাধ্যমে বীর পুত্রদের যিনি যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করেছেন, তিনি ওই ভবিষ্যৎ বীরনাশে এত উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন কেন? হ্যাঁ এই যুদ্ধের দোষ অনেক, কিন্তু যুদ্ধ না করলে সেই চিরকালীন নির্ধনতা, অপমান আর বঞ্চনা। একদিকে নির্ধনতার যন্ত্রণা অন্যদিকে জ্ঞাতিক্ষয়ের মাধ্যমে জয়লাভ—দুইই তাঁর কাছে সমান সমান—অধনস্য মৃতং শ্রেয়ঃ ন হি জ্ঞাতিক্ষয়ো জয়ঃ। কুন্তী এসব বোঝেন, এমনকী পাণ্ডব-কৌরবদের এই জ্ঞাতিযুদ্ধে প্রত্যেক সমরনায়কের রাজনৈতিক অবস্থিতিটাও তিনি ভালভাবেই জানেন।

কুন্তীর মতে এই যুদ্ধে ভয়ের কারণ তিন জন—পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ এবং কর্ণ। তিনজনই দুর্যোধনের জন্য লড়াই করবেন। তবু এর মধ্যে তাঁর সান্ত্বনা এবং স্থির বিশ্বাস যে, আচার্য দ্রোণ প্রিয় শিষ্যদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাইবেন না। আর পিতামহ ভীষ্মই বা কী করে পাণ্ডবদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্নেহমুক্ত হবেন? আর বাকি রইলেন শুধু কর্ণ। হায়! কুন্তী কীভাবে বোঝাবেন নিজেকে। কৌরব পক্ষে এই কর্ণই হলেন একমাত্র ব্যক্তি, কুন্তীর মতে যার ভবিষ্যতের দৃষ্টি নেই কোনও। দুর্যোধনের পাল্লায় পড়ে মোহের বশে কেবলই সে কতগুলি অন্যায় করে যাচ্ছে, পাণ্ডবদের তো সে চোখেই দেখতে পারে না—মোহানুবর্তী সততং পাপো দ্বেষ্টি চ পাণ্ডবান্।

মুশকিল হল, যত অনর্থই ঘটাক এই কর্ণ, তাঁর শক্তি এবং ক্ষমতা সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন ওঠে না। কুন্তী ভাবেন—ওই অসামান্য শক্তি নিয়ে কর্ণ যে শুধু তাঁর অন্য ছেলেগুলির বিপদ ঘটাতেই ব্যস্ত রইল—এই মর্মান্তিক বাস্তব তাঁকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিল—তন্মে দহতি সম্প্রতি। আজ যখন এই মুহূর্তে কৌরব আর পাণ্ডবদের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল,

তখন দুর্ভাবনায় হতাশায় হঠাৎই ঠিক করে বসলেন—যাব আমি। ঠিক যাব। কন্যা-জননীর লজ্জা ত্যাগ করে আমার জ্যেষ্ঠপুত্রের কাছে গিয়ে জানাব যথাযথ সব কথা। জানাব—কেমন করে দুর্বাসার কাছে মন্ত্র পেয়ে কুন্তিভোজের ঘরে বসেই আহ্বান করেছিলাম তার পিতাকে। জানাব—একই সঙ্গে আমার কন্যাত্ব এবং স্ত্রীত্ব—এই পরস্পরবিরোধী আবেগ কীরকম ব্যাকুল করে তুলেছিল আমাকে—স্ত্রীভাবাদ্ বালভাবাচ্চ চিন্তয়ন্তী পুনঃ পুনঃ। একদিকে পিতার মর্যাদা রক্ষা অন্যদিকে কৌতূহল আর অজ্ঞানতার বশে সূর্যের আহ্বান—কুন্তী ঠিক করলেন—এক এক করে সব কর্ণকে জানাব আমি। কন্যাবস্থায় হলেও সে আমার ছেলে, আমার ভাল কথাটা কি সে শুনবে না, ভাইদের ভালটা কি সে বুঝবে না—কস্মান্ন কুর্যাদ্ বচনং পশ্যন্ ভ্রাতৃহিতং তথা। কুন্তী ঠিক করলেন—আজ আমি কর্ণের কাছে গিয়ে সব কথা বলব, তারপর চেষ্টা করব তার মন যাতে পাণ্ডবদের দিকে ফিরে আসে—আশংসে ত্বদ্য কর্ণস্য মনোহহং পাণ্ডবান্ প্রতি।

কুন্তী রওনা দিলেন। তিনি জানেন এই সময়ে কর্ণ গঙ্গার তীরে পূর্বমুখ হয়ে বসে থাকেন। জপ করেন বেদমন্ত্র। দ্বিপ্রহর কাল অতিক্রান্ত বটে, কিন্তু সূর্যের তাপ প্রচণ্ড। রোদে কুন্তীর শরীর যেন পুড়ে যাচ্ছে। সূর্য কি শাস্তির মতো কোনও কিরণ বিকিরণ করছেন আজ! ভাগীরথীর তীরে এসে কুন্তী দেখলেন—পুব দিকে মুখ করে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে তপস্যায় বসে আছেন কর্ণ। তাঁর মুখ দিয়ে উদগীর্ণ হচ্ছে বেদমন্ত্রের নিস্বন—গঙ্গাতীরে পৃথাশ্রৌষীদ্ বেদাধ্যয়ন-নিস্বনম্। পশ্চিম দিক থেকে অলসগমনে আসা তাপার্তা কুন্তীকে কর্ণ দেখতে পাননি। পুত্রের জপ-ধ্যান-বেদমন্ত্র—কিছুর মধ্যেই মায়ের সহজ ভাব নিয়ে নিজেকে ঘোষণা করতে পারলেন না কুন্তী। তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। সূর্যাতপে তপ্ত হয়ে নিজের চারদিকে ঘনিয়ে নিলেন আপন উত্তরীয়ের ছায়া, হয়তো প্রথম স্বামীর কাছে লজ্জায়। দেখে মনে হল পদ্মের মালা যেন শুকিয়ে যাচ্ছে—পদ্মমালেব শুষ্যতী।

কর্ণের জপ-ধ্যান শেষ হতে হতে বেলা গড়িয়ে গেল। পুব দিক থেকে কর্ণ এবার দৃষ্টি সরিয়ে আনবেন পশ্চিম আকাশে। বিদায় দেবেন প্রায় অস্তগ্যামী সূর্যকে। এই দিক বদলের মুহূর্তেই চোখে পড়ে গেলেন কুন্তী। এই নির্জন নদীতীরে হঠাৎ এই প্রৌঢ়া মহিলাকে একলা দেখেই হাত জোড় করে এগিয়ে এলেন কর্ণ। কতবার তিনি এঁকে দেখেছেন দূর থেকে। অভিমানী বীর কর্ণ সৌজন্যে আনম্র হয়ে সস্মিত ভাষে নিজের পরিচয় দিলেন—আমি কর্ণ, 'অধিরথসূতপুত্র রাধাগর্ভজাত'—রাধেয়োহহম্ আধিরথিঃ কর্ণস্ত্বমভিবাদয়ে।

কুন্তীর মুশকিল হল—তিনি জানতেন না যে, কর্ণ সব ব্যাপারটাই জানেন। যে পুত্রের জন্মের বৃত্তান্তে কালিমা থাকে, সে নিজের গবেষণাতেই প্রথমত নিজের পরিচয় জানবার চেষ্টা করে। লোকের কথায় আরওই সে জেনে যায় কে সে, কোথা থেকে এসেছে, বিশেষত এখানে এই খানিক আগেই স্বয়ং কৃষ্ণ কর্ণকে একা রথে উঠিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন অন্যত্র। কৃষ্ণ তাঁকে পরিষ্কার জানিয়েছিলেন—দেখো ভাই, তুমি কুন্তীর ছেলে, অতএব চলে এসো পাণ্ডবের দিকে, ঝামেলা মিটে যাবে, দুর্যোধন ট্যাঁফোঁ করতে পারবে না। কর্ণ রাজি হননি—সে অন্য কথা, কিন্তু ভাইপো কৃষ্ণ যেখানে পিসি কুন্তীর কন্যাগর্ভের কথা জানে, সেখানে কর্ণ সেটা জানতেন না, তা আমরা ঠিক বিশ্বাস করতে পারি না। তা ছাড়া যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগে নাও জেনে থাকেন, তা হলেও অন্তত কুন্তী যখন তাঁর কাছে এসেছেন, তার আগে তো তিনি কৃষ্ণের মুখেই সব শুনে নিয়েছেন।

এই নিরিখে দেখতে গেলে বলতেই হবে যে, কর্ণের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে কুন্তীর যে সলজ্জ সংশয় ছিল, কর্ণের দিক থেকে তা ছিল না। ফলত প্রথম অভিবাদনের মুখেই কর্ণ তাঁর সারা জীবনের কলঙ্ক-অভিমান, একত্রিত করে দাঁত শক্ত করে নিজের পরিচয় দিয়েছেন—আমি 'অধিরথসূতপুত্র রাধাগর্ভজাত'—রাধেয়োহহম্ আধিরথিঃ।

সেকালের অভিবাদনে এইরকমই নিয়ম ছিল। অভিবাদনের সময় নিজের নাম বলতে হত, অপরিচিত হলে কখনও বা পরিচয়ও দিতে হত। অপর পক্ষ সম্মানে বা বয়সে বড় হলে অভিবাদিত ব্যক্তি নাম ধরেই আশীর্বাদ করতেন। কিন্তু কর্ণ, হয়তো ইচ্ছে করেই কুন্তীর মনে জ্বালা ধরানোর জন্য নিজের নাম বলার আগে নিজের পিতৃ-মাতৃ পরিচয় বিন্যাস করে সগর্বে নিজের নাম বলেছেন—আমি অধিরথসূতপুত্র রাধাগর্ভজাত।

'গর্ভ' কথাটা শুনেই কুন্তীর মনে অন্য এক প্রতিক্রিয়া হল। সেই যেদিন পুত্রকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে কুন্তী বলেছিলেন—যিনি তোমায় পালন করবেন সেই ভাগ্যবতী রমণী অন্য কেউ—সেই রমণী আজ শুধু পুত্র পালনের গুণে কর্ণের কাছে গর্ভধারণের অধিকার লাভ করছে। 'আমি রাধেয়'—কথাটা শোনামাত্রই কুন্তীর মুখে তাই তীব্র প্রতিবাদ ঝরে পড়েছে—না না, বাছা তুমি মোটেই রাধার ছেলে নও। তুমি আমার ছেলে, তুমি কুন্তীর ছেলে, সূত অধিরথ মোটেই তোমার পিতা নন—কৌন্তেয় স্ত্বং ন রাধেয়ো ন তবাধিরথঃ পিতা। সারথির ঘরে তোমার জন্ম নয়। আমি যখন বাপের বাড়িতেই ছিলাম তখন কন্যা অবস্থায় আমারই পেটে জন্মেছিলে তুমি। তুমি আমার ছেলে, তুমি পার্থ। স্বয়ং স্বপ্রকাশ সূর্যদেব তোমার বাবা।

মহাভারতের সামান্য সংলাপকে কেন্দ্র করে যে কবি কর্ণের সারা জীবনের অভিমান এবং কুন্তীর সারা জীবনের পুত্রস্নেহ একত্র মন্থন করে 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' রচনা করেছিলেন, তাঁর পক্ষে মনস্তত্ত্বের অপূর্ব প্রসার ঘটিয়ে কর্ণকে সত্য, নিষ্ঠা এবং নীতিপরায়ণতার একান্ত ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করাটা অসম্ভব ছিল না। অসম্ভব ছিল না কর্ণকে বঞ্চনা এবং হতাশার তিলক পরিয়ে তাঁকে মহান করে দিতে। বিংশ শতাব্দীতে বসে মহাকাব্যের এক অন্যতম প্রতিনায়ককে জীবন-যন্ত্রণার চরমে পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁকে মর্যাদার তত্ত্বে বিভূষিত করাটা নিঃসন্দেহে অন্য এক মাত্রা দিয়েছে। তবে মহাকাব্যের কবির এই দায় ছিল না। বিশাল মহাকাব্যের পরিসরে যে মানুষ নিজেই নিজের কাছে করুণার পাত্র, সেই কুন্তীকে দিয়ে তিনি আর কীই বা করাতে পারতেন এই মুহূর্তে? পুত্রের মনোযন্ত্রণার মূল্যে তিনি জননীর মনোযন্ত্রণা লঘু করে দেখেননি। বিংশ শতাব্দীতে কর্ণের মনস্তত্ত্বের জটিল আবর্ত তাঁকে শেষ পর্যন্ত মহান করে তুললেও মহাকাব্যের কবির কাছে সরলতার দায় ছিল বেশি।

কুন্তী বলেছিলেন—আমি কর্ণকে সব খুলে বলব। বলব—আমার নিজের চরিত্রের কথা ছেড়েই দাও, আমার পালক পিতার চরিত্র রক্ষার জন্য আমাকে এই কাজ করতে হয়েছে—দোষং পরিহরন্তী চ পিতুশ্চারিত্ররক্ষিণী। যে রমণী বালিকা অবস্থায় আপন পিতার স্নেহে বঞ্চিত হয়ে পালক পিতার ইচ্ছা অনুসারে মানুষ হয়েছেন, পালক পিতার সুনাম রক্ষার

জন্য যাঁকে নিজের সন্তান ভাসিয়ে দিতে হয়েছে জলে, জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে যাঁকে প্রজনন শক্তি-রহিত একটি পতি বরণ করতে হয়েছে, উপরন্তু শ্বশুরবাড়িতে যাঁর নিজের স্থিতিই অত্যন্ত শঙ্কাজনক, সেই অভাগা রমণী নিজেই নিজের কাছে এত বড় করুণার পাত্র যে, তাঁর পক্ষে আপন কন্যাবস্থার পুত্র নিয়ে জীবনে টিকে থাকা কঠিন ছিল।

আজ সেই কন্যাবস্থার পুত্রের সঙ্গে সংলাপী কুন্তী প্রথমেই ধাক্কা খেলেন। যে গর্ভ ধারণের জন্য এতকালের এত মানসিক চাপ—সেই গর্ভ ধারণের যন্ত্রণাটাই অস্বীকার করছে তাঁর পুত্র। হ্যাঁ, বালিকার প্রগল্‌ভতায় পুত্রের প্রতি সুবিচার তিনি করেননি ঠিকই, কিন্তু তাই বলে ছেলে তার গর্ভধারিণীর ভূমিকাটাই অস্বীকার করবে? জননীর মুখের ওপর ছেলে বলবে—না তুমি জননী নও! নিজের গর্ভধারিণীর ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করার জন্য অপ্রস্তুতের মতো আগে বলতে হয়েছে—না-না তুমি রাধার ছেলে নও, তুমি আমার সবার বড় ছেলে, তুমি রাধেয় নও, তুমি পার্থ!

সব গুলিয়ে গেল। ভেবেছিলেন—গুছিয়ে গুছিয়ে দুর্বাসার কথা বলব, সূর্যদেবের কথা বলব, নিজের সমস্যার কথা বলব—কিছুই সেভাবে বলা হল না কুন্তীর, সব গুলিয়ে গেল। এই অবস্থায় নিজেকে সপ্রতিভ দেখানোর জন্য কুন্তীকে নিজের বিশাল জীবনসমস্যার কথা খুব তাড়াতাড়ি বলে ফেলতে হল। কুন্তী বললেন—আলোকদাতা সূর্যদেব আমারই কুক্ষিতে তোমার জন্ম দিয়েছিলেন। এইরকমই সোনার বর্ম, কানের দুল তোমার জন্ম থেকে। আমার বাবা কুন্তিভোজের অন্দর মহলে তোমার জন্ম দিয়েছিলাম আমি।

কুন্তী খুব তাড়াতাড়ি—কর্ণের দিক থেকে কোনও প্রতিবাদ, কোনও বিরূপতার আগেই বলে ফেললেন—সেই তুমি আমার ছেলে হয়েও নিজের মায়ের পেটের ভাইদের চিনতে পারছ না। উলটে কোন এক অজানা মোহে ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের তুমি সেবা করে যাচ্ছ। এই কি ধর্ম বাছা? যে পৃথিবী, যে ধন-সম্পদ অর্জুন জিতে এনেছিল অসাধু লোকেরা সেসব লুটেপুটে নিল, এখন তুমি বাছা আবার সেসব জুটিয়ে এনে নিজেই সব ভোগ করো। লোকে দেখুক—কর্ণ আর অর্জুন এক জায়গায় জুটলে কী হয়, কেমন মাথা নুয়ে যায় সবার—সন্নমন্তামসাধবঃ। কুন্তী ভবিষ্যতের এক অসম্ভবের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়ে সোৎসাহে বলে উঠলেন—কর্ণ আর অর্জুন এক জায়গায় হলে, ব্যাপারটা দাঁড়াবে ঠিক বলরাম আর কৃষ্ণের মতো। তোমাদের দু'জনের সংহত শক্তি রুখবে, এমন বুকের পাটা কার বাছা? পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তোমার শোভা হবে যেন দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা। তুমি বাপু আর সারথির ছেলে কথাটা মুখেই এনো না—সূতপুত্রেতি মা শব্দঃ পার্থস্ত্বমসি বীর্যবান্—তুমি আমার ছেলে, তুমি পার্থ।

প্রায় প্রগলভ জননীর ভাষণে কর্ণ একটুও টললেন না। 'তুমি কুন্তী অর্জুনজননী'—এত সব কবিতার পরিণত শ্লেষ মহাভারতে নেই। তবে উতোর-চাপান এখানেও কিছু কম ছিল না। কর্ণ কুন্তীকে সম্বোধন করলেন মায়ের ডাকে নয়, বললেন—'ক্ষত্রিয়ে'। কথাটার মধ্যে সাংঘাতিক সত্য আছে, পরে আসব সে-কথায়। কর্ণ বললেন—আমাকে জন্মকালেই বিসর্জন দিয়ে যে অন্যায়টি আপনি করেছেন তাতে আর অন্য কোন শত্রু আপনার চেয়ে আমার বেশি অপকার করবে—ত্বৎকৃতে কিন্নু পাপীয়ঃ শত্রুঃ কুর্যান্ মমাহিতম্। যে অবস্থায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ক্ষত্রিয়ের সংস্কার লাভ করে মেজাজে থাকতে পারতাম, সেই অবস্থায় আপনি মায়ের কাজ এতটুকু করেননি, এখন নিজের স্বার্থে আপনি আমাকে খুব ছেলে-ছেলে করছেন—সা মাং সংবোধয়স্যদ্য কেবলাত্মহিতৈষিণী।

কুন্তী এই গালাগালি হজম করে যাচ্ছেন, একটি কথাও তিনি বলছেন না। আর কথাগুলি তো ঠিকই। কর্ণ বললেন—আজ যদি আমি সব ছেড়ে পাণ্ডবদের পক্ষে যাই, লোকে আমাকে ভিতু বলবে না? কোনওদিন আমার ভাই বলে কেউ ছিল না, আজ যদি এই যুদ্ধকালে হঠাৎ পাণ্ডবদের আমি ভাই বলে আবিষ্কার করি, তবে ক্ষত্রিয়জনেরা আমাকে কী বলবে—অভ্রাতা বিদিতঃ পূর্বং যুদ্ধকালে প্রকাশিতঃ। কর্ণ দুর্যোধনের অনেক গুণ-গান করলেন। কত সম্মান তিনি দিয়েছেন, কত ভোগসুখ—সবই একে একে বললেন। আর বলতেই বা হবে কেন কুন্তী সেসব জানেন, তিনি তাতে সুখীও ছিলেন। পুত্রের প্রতি মাতার কর্তব্য করা হয়নি বলেই, কর্ণের প্রতি দুর্যোধনের প্রশ্রয়-গৌরবে তিনি সুখীই ছিলেন। কিন্তু আজ কী হবে? যুদ্ধ যে লাগবেই, তিনি তা চানও।

ক্ষত্রিয়া রমণীর এই কঠিন হৃদয় কর্ণ জানেন। তিনি বলেছেন—যুধিষ্ঠিরের বাহিনীর মধ্যে অন্য চার ভাইয়ের সঙ্গে আমার যুদ্ধ হবে না, আমার যুদ্ধ শুধু অর্জুনের সঙ্গে। হয় সে মরবে আমার হাতে, নয় আমি তার হাতে। তবে আপনার তাতে ক্ষতি নেই কোনও। আপনি পঞ্চপুত্রের জননী, তাই থাকবেন আপনি, আপনি নিরর্জুনা হলে কর্ণ আপনার থাকবে, আর আপনি অকর্ণা হলে অর্জুন আপনার থাকবে—নিরর্জুনা সকর্ণা বা সার্জুনা বা হতে ময়ি।

কুন্তী শুনলেন, কর্ণের সব কথা শুনলেন, অন্যায়-ধিক্কার সব শুনে জননীর দায়-প্রত্যাখ্যান—তাও শুনলেন। ক্ষত্রিয় পুত্রদের জননী হিসেবে কুন্তী বুঝলেন কর্ণকে তার শেষ বক্তব্য থেকে নড়ানো যাবে না। ভবিষ্যতের পুত্রশোক তাঁর হৃদয় গ্রাস করল। তিনি আস্তে আস্তে কর্ণের কাছে এলেন। কর্তব্যে স্থির অটল, অনড় কর্ণকে তিনি সারাজীবনের প্রৌঢ় বাসনায় আলিঙ্গন করলেন—উবাচ পুত্রমাশ্লিষ্য কর্ণং ধৈর্যাদকম্পনম্। হয়তো আর হবে না। সেই বালিকা বয়সে পুত্রের জন্মলগ্নে জননীর যে স্নেহ প্রথম ক্ষরিত হয়েছিল, নিরুপায়তার কারণে জলে ভাসিয়ে দিতে হয়েছিল বলে যে শিশুপুত্রটিকে তিনি সজোরে কোলে চেপে ধরেছিলেন, আজ এতদিন পরে সেই ছেলেকে আবারও জড়িয়ে ধরলেন কুন্তী। বুঝলেন—জীবনের ধারায় জননীর কর্তব্য-বন্ধন মুক্ত করে একবার পুত্রকে ভাসতে দিলে সে ভেসেই চলে, সারাজীবন আর তাকে ধরা যায় না, ধরতে চাইলেও, না। কুন্তী তাই জড়িয়ে ধরলেন কর্ণকে। আর দেখতে পাই কি না পাই। হয় অর্জুন, নয় কর্ণ—একজন তো যাবেই, যদি কর্ণ যায় তবে সামনা-সামনি একতম পুত্রের সঙ্গে এই শেষ দেখা। কুন্তী কর্ণকে জড়িয়ে ধরলেন দ্বিতীয়বার।

ক্ষত্রিয় পুত্র যেমন তার সত্য থেকে চ্যুত হল না, ক্ষত্রিয়া রমণীও তেমনই তাঁর ভবিষ্যৎ ভাবনা থেকে সরলেন না। কর্ণকে বললেন—কৌরবদের বিনাশ যাতে হয়, তুমি সেই খেয়ালটা রেখো, বাছা। আমি এত করে তোমায় বোঝালাম, কিন্তু কিছুই হল না। কপালে যা আছে হবে—দৈবন্তু বলবত্তরম্। অর্জুন ছাড়া তাঁর অন্য চার ছেলের দুর্বলতা কুন্তী জানেন, অতএব যুদ্ধকালে এই চারজনের যাতে ক্ষতি না হয়, সে-কথা তিনি আবারও মনে

করিয়ে দিলেন কর্ণকে; কেন না, কর্ণও কথা দিয়েছিলেন তিনি অর্জুন ছাড়া আর কারও ক্ষতি করবেন না। মহাভারতের কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ শেষ হল অদ্ভুত সৌজন্য-বিনিময়ের মধ্য দিয়ে। কুন্তী বললেন—মঙ্গল হোক তোমার বাছা, সুস্থ থাকুক তোমার শরীর। উত্তরে কর্ণও বললেন একই কথা। যে আবেগ সারাজীবন ধরে কুন্তী জমা করে রেখেছিলেন কর্ণের জন্য, তা উপযুক্তভাবে মুক্ত হল না পাত্রের কাঠিন্যে। কুন্তী যখন জড়িয়ে ধরলেন কর্ণকে তখন ব্যাস তাঁর বিশেষণ দিয়েছেন 'অকম্পনম্'। হয়তো কর্ণের এই বিশেষণ তাঁর অনড় অকম্প স্বভাবের জন্যই।

১২

একটা কথা করজোড়ে নিবেদন করি। আমি আগে বারংবার বলেছি কুন্তী তাঁর শৈশব থেকেই এক কঠিন মনস্তত্ত্বের শিকার। তার মধ্যে কন্যা অবস্থায় এক শিশুপুত্রকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে এবং উপর্যুপরি স্বামীর কাছে, পুত্রদের কাছে সেই পুত্রের জন্মকথা চেপে গিয়ে কুন্তীর মনের মধ্যে এমন এক জটিল আবর্ত তৈরি হয়েছিল যা তাঁর মনকে কঠিন থেকে কঠিনতর করে তুলেছে। স্ত্রীলোকের জীবন-আরম্ভ যাকে বলে, সেই আরম্ভের পূর্বেও কুন্তীর এই যে বিধিবহির্ভূত পুত্রলাভ, সেই পুত্র তাঁর জীবনের প্রথম ভাগ, মধ্যভাগ এবং শেষ ভাগেও অন্তর্দাহ তৈরি করে গেছে।

আমরা কর্ণকুন্তীর সংলাপে এখনই যে পর্যায়টুকু শেষ করলাম, এটাকে মধ্যভাগের শেষ পর্যায় বলা যায়। বলতে পারেন—কর্ণের কথা স্বামীকে তিনি বলেননি, কিন্তু বশংবদ পুত্রদের তিনি বলতেই পারতেন। আমরা বলি—কুন্তী এটাকে নিজের কলঙ্ক বলে প্রথমেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ফলে স্বামীকে তিনি বলেননি আর স্বামীর মৃত্যুর পরেও এমন কিছু ঘটেনি যাতে করে লজ্জা ত্যাগ করে ছেলেদের সে-কথা বলা যায়। 'এমন কিছু' বলতে আপনারা কুন্তীর দিদিশাশুড়ি সত্যবতীর কথা স্মরণ করতে পারেন। কন্যা অবস্থায় তাঁর পুত্র হলেন স্বয়ং মহামুনি ব্যাস। কিন্তু মৎস্যগন্ধা সত্যবতী শান্তনুকে ব্যাসের কথা কিছুই বলেননি, ছেলেদেরও বলেননি। কিন্তু কুরুবংশ যখন লোপ হয়ে যেতে বসল, তখনই কেবল সত্যবতী পুত্রকল্প ভীষ্মের কাছে ব্যাসের কথা প্রস্তাব করেন কুরুবংশের রক্ষাকল্পে। তাই বলছি, তেমন কিছু হয়নি যে, কুন্তীকে বলতে হবে। বিশেষত এসব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটাই হল চেপে যাওয়া।

বলা যেতে পারে, এখন এই বিশাল ভারত-যুদ্ধের প্রাক্ মুহূর্তে কুন্তী ছেলেদের কাছে কর্ণের কথা বলতে পারতেন; পাণ্ডব-কৌরবদের যুদ্ধটাই তা হলে লাগত না, হত না অজস্র লোকক্ষয়। কারণ পরের ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারব যে, মহামতি যুধিষ্ঠির মায়ের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন—আগে যদি জানতাম কর্ণ আমাদের বড় ভাই, তা হলে লোকক্ষয়ী যুদ্ধ হত না। —আলবত জানি, যুধিষ্ঠির যা চাইতেন কুন্তী তা চাইতেন না। এখানে সেই ক্ষত্রিয়া রমণীর বিচারটুকু মাথায় রাখতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে রাখা দরকার, রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-কুন্তী সংবাদ বাঙালির স্নেহ, মায়া এবং মমতার মৃদুতায় তৈরি। এই চিত্র-কবিতায় কর্ণ যতবার কুন্তীকে মা-মা করে ডেকেছেন, মূল মহাভারতে তা একবারও ডাকেননি। কর্ণ কুন্তীকে চিনতেন বলেই তাঁকে প্রথম সম্বোধন করেছেন—'ক্ষত্রিয়া' বলে। অন্যত্র আরও কৃত্রিমভাবে—'যশস্বিনী' বলে, 'আপনি' বলে। বস্তুত ক্ষত্রিয়া রমণীর হৃদয় বাংলার শ্যাম-শীতল নদী আর অন্নের মৃদুতা দিয়ে গড়া নয়। যতদিন কর্ণ দুর্যোধনের ভোগচ্ছায়ায় সুখী ছিলেন, কুন্তীরও ততদিন কিছু বলার ছিল না, কেন না ছেলের এই সুখ তাঁর অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু যেদিন থেকে তিনি বুঝলেন তাঁরই ছেলের শক্তিকে উপজীব্য করে দুর্যোধনেরা তাঁর অন্য ছেলেদের বঞ্চিত করছে, সেদিন থেকেই তাঁর হৃদয়ে ক্ষোভ দানা বাঁধছে। বিশেষত কুরুসভায় দ্রৌপদীর চরম অপমানের পর কর্ণকে নামত দায়ী করতেও কুন্তীর বাধেনি। ক্ষত্রিয়া রমণী নিজ পুত্রের অন্যায় সহ্য করে না।

শেষ কথাটা হল—শ্বশুরকুলের বৃদ্ধ-জনেরা তাঁর প্রতি সুবিচার করেননি। পাণ্ডু মারা যাবার পর রাজরানির সম্মান তাঁর দূরে থাক, কুরুবাড়িতে তাঁকে থাকতে হয়েছে ভিখারির মতো। উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্রদের প্রাপ্য ভাগও তিনি পাননি। উপরন্তু জুটেছে অপমান। নিজের অপমান, পুত্রবধূর অপমান। এরপরে বিদুলার জবানিতে, পুত্রদের যুদ্ধে উত্তেজিত করেছেন কুন্তী। যে রমণী সারা জীবনের অপমানের শোধ নেওয়ার জন্য প্রিয় পুত্রদের যুদ্ধের মুখে ঠেলে দিতে পারেন, তিনি এখন হঠাৎ কর্ণকে জ্যেষ্ঠ পুত্র বলে ঘোষণা করে যুদ্ধের আগুনে ছাই চাপা দেবেন, এমন মৃদুলা রমণী কুন্তী নন। যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—কর্ণকে বড় ভাই জানলে যুদ্ধ করতাম না। আর কুন্তী বলেছিলেন—বাবা তুমিও পাণ্ডবপক্ষে এসো, কৌরবদের বিনাশ করো, যুদ্ধ করো।

অর্থাৎ যুদ্ধ করতেই হবে, ক্ষত্রিয়া রমণীর এই কাঠিন্যের মধ্যে যথাসম্ভব করুণার মতো যেটা কর্ণের জন্য করা সম্ভব, কুন্তী তাই করেছেন। আসলে তাঁর ঈর্ষা হচ্ছিল—আরে আমারই ছেলে ওটা, তার কাঁধে বন্দুক রেখে তোরা যুদ্ধ করবি? কর্ণ নিজেই কুন্তীকে বলেছেন—আমাকে নৌকোর মতো আশ্রয় করে কৌরবরা এই যুদ্ধসাগর পার হবেন—ময়া প্লবেন সংগ্রামং তিতীর্ষন্তি দুরত্যয়ম্। কুন্তীর ঈর্ষা—তোরা যুদ্ধ করবি, কর না, কিন্তু আমার ছেলেটাকে নৌকো ঠাউরেছিস কেন? তুই বাবা চলে আয় তো এই ধারে, দেখি কার ঘাড়ে ক'টা মাথা, দেখুক চেয়ে চেয়ে কৌরব-ঠাকুরেরা—অদ্য পশ্যন্তু কুরবঃ কর্ণার্জুনসমাগমম্।

ঠিক এই বুদ্ধি নিয়েই কুন্তী গিয়েছিলেন কর্ণের কাছে। অন্তরের এই মুখ্য ধারার তলায় তলায় ছিল সারাজীবনের পাপবোধ, পুত্রের প্রতি মায়ের কর্তব্য পালন করার দায় এবং অন্য মানসিক জটিলতা। কিন্তু যে মুহূর্তে কর্ণ তাঁকে হাঁকিয়ে দিয়েছেন, সেই মুহূর্তেই তিনি পুনরায় কঠিন সেই ক্ষত্রিয়া রমণী। অন্তরের স্নেহধারা বয়ে চলল অন্তরের পথেই। সম্পূর্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল ধরে একবারের তরেও কুন্তীর দিকে নেত্রপাত করেননি মহাভারতের কবি। শুধু যুদ্ধ, যুদ্ধ এবং যুদ্ধ। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য—সব রথী-মহারথীরা যুদ্ধভূমিতে শয্যা গ্রহণ করছেন। কুন্তীর সম্বন্ধে কথাটি নেই কবির মুখে। হয়তো অন্তরালে বসে বসে এই বিভ্রান্ত জননী নক্ষত্রের আলোকে ঘোর যুদ্ধফল পাঠ করছিলেন—একজন তো যাবেই,

হয় কর্ণ, নয় অর্জুন। মহাভারতের কবি যে মুহূর্তে আবারও তাঁর চিত্রপটে কুন্তীর ছবি আঁকলেন, সেই কুন্তীর সঙ্গে যুদ্ধপূর্ব কুন্তীর কোথায় যেন এক গভীর যোগসূত্র আছে।

যুদ্ধের আগে প্রথম পুত্র কর্ণকে ফিরিয়ে নিতে এসেছিলেন কুন্তী। কর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আর যুদ্ধের পরে আবারও যখন আমরা কুন্তীর দেখা পেলাম, তখন কর্ণ মারা গেছেন। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ চলেছিল মাত্র আঠারো দিন। কুন্তী যখন কর্ণের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তখন যুদ্ধের উদ্যোগ চলছে। অর্থাৎ আঠারো দিন নাই হোক, মাত্র কুড়ি-বাইশ দিন আগে যে পুত্রের সঙ্গে দেখা করে শেষবারের মতো জড়িয়ে ধরেছিলেন কুন্তী, এখন সে মারা গেছে। কুন্তীকে আমরা যুদ্ধজয়ী পাণ্ডবপক্ষের পুত্রগর্বিণী রাজমাতার মতো দেখতে পেলাম না। দেখলাম বিজিত কৌরবপক্ষের স্বামীহারা, পুত্রহারা হাজারো রমণীদের সঙ্গে একাকার, বিষণ্ণা, হাহাকারে সমদুঃখিতা।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যতখানি রোমাঞ্চকর ছিল, যুদ্ধোত্তর কুরুক্ষেত্র ছিল ততখানিই করুণ। এমন কেউ ছিল না, যার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব একজনও মারা যায়নি। যুদ্ধ জয় করে পঞ্চপাণ্ডব বেঁচেছিলেন বটে, তবে তাঁরাও পুত্র হারিয়েছেন, আত্মীয়-কুটুম্ব অনেককেই হারিয়েছেন। আরও যা হারিয়েছেন তা তখনও জানতেন না। যুদ্ধশেষের পর যুধিষ্ঠির ভাইদের নিয়ে প্রথম গান্ধারীর কাছে গেছেন, কারণ তাঁর একটি সন্তানও বেঁচে নেই। তা ছাড়া 'দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে'—সেই নিয়মে ভবিষ্যতের রাজা যুধিষ্ঠির আপন কর্তব্য পালন করে তারপর এসেছেন মায়ের কাছে। দ্রৌপদীও রয়েছেন সেখানেই।

ছেলেরা পাঁচ পাণ্ডবভাইরা মায়ের কাছে এলেন—শুধু এইটুকু বলেই মহাভারতের কবি তুষ্ট হলেন না, বললেন—মাতরং বীরমাতরম্—শুধু মায়ের কাছেই নয়, বীরমাতার কাছে। মনে পড়ে কুন্তীর উত্তেজনা—যে সময়ের জন্য ক্ষত্রিয় কামিনীরা সন্তান পেটে ধরে, অর্জুন—সেই সময় এখন এসে গেছে। ব্যাসকে তাই লিখতে হল—সংগ্রামজয়ী বীরপুত্রের জননীর কাছে ফিরে এল তার পুত্রেরা—মাতরং বীরমাতরম্। কতক্ষণ ধরে কুন্তী চেয়ে থাকলেন পুত্রদের মুখের দিকে, কতক্ষণ? নিশ্চয়ই মনে হল—আরও একজন যদি থাকত! প্রিয়পুত্রেরা যুদ্ধ করতে গিয়ে কত কষ্ট পেয়েছে, এই যন্ত্রণা যুদ্ধ জয়ের থেকেও এখন পীড়া দিতে থাকল কুন্তীকে। যুদ্ধজয়ের অন্তিম মুহূর্তে কঠিনা ক্ষত্রিয়া রমণী পরিণত হয়েছেন সাধারণী জননীতে।

আনন্দের পরিবর্তে কুন্তীর চোখ ভরে জল এল। এক ছেলে মারা গেছে—সে দুঃখ কেঁদে জানাবারও উপায় নেই তাঁর। কাপড়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন কুন্তী—বাষ্পমাহারয়দ্দেবী বস্ত্রেণাবৃত্য বৈ মুখম্। প্রিয় পুত্রদের প্রত্যেকের ক্ষতস্থানে বারবার হাত দিয়ে জননীর স্নেহ-প্রলেপ বুলিয়ে দিলেন তিনি। জ্যেষ্ঠ-পুত্রের শোক ভুলতে চাইলেন জীবিতদের গায়ে হাত বুলিয়ে। স্বামীদের দেখে দ্রৌপদীর দুঃখ তীব্রতর হল। কেঁদে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তিনি বললেন—মা! সুভদ্রার ছেলে অভিমন্যু, আপনার অন্য নাতিরা সব কোথায় গেল? কই, আজকে তারা তো কেউ এল না আপনার কাছে। আমার ছেলেরা কেউ বেঁচে রইল না, আর আমি এই রাজ্য দিয়ে কী করব—কিং নু রাজ্যেন বৈ কার্য্যং বিহীনায়াঃ সুতৈর্মম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুন্তী আবারও একাত্ম হলেন দ্রৌপদীর সঙ্গে। দ্রৌপদী তো আর জানেন না যে, তাঁর মতো কুন্তীও আজ পুত্রহারা। সমদুঃখের মর্যাদায় কুন্তী পুত্রবধূকে মাটি থেকে ওঠালেন। তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন মায়ের স্নেহে, সন্তানহারার একাত্মতায়। সবাইকে নিয়ে তিনি চললেন দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারীর কাছে। বুঝলেন—যে জননী তার একশোটি পুত্র হারিয়েছে, তার যন্ত্রণা সকলের কষ্ট লঘু করে দেবে। গান্ধারীর দুঃখে কুন্তী নিজে সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করলেন।

কুরুরমণীদের সবাইকে নিয়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র উপস্থিত হয়েছেন গঙ্গার ঘাটে। আছেন গান্ধারী, আছেন কুন্তী। পাণ্ডবরা এসেছেন জননীর সঙ্গে। কুরুবাড়ির পুত্রবধূরা জলে নেমে তর্পণ করছেন। এমন সময় মনে মনে বিপর্যস্ত কুন্তী চোখের জলে আপ্লুত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছেলেদের উদ্দেশে বললেন—যে মহাবীরকে সকলে সারথির ছেলে বলে ভাবত, সবাই যাকে জানত রাধার ছেলে, সেই কর্ণ তোমাদের সবার বড় ভাই। সৈন্যদলের মধ্যে যাকে দেখতে লাগত সূর্যের মতো, দুর্যোধনের সৈন্যবাহিনীর যে ছিল নেতা, যার মতো বীর এই তিন ভুবনে আর দ্বিতীয়টি নেই—যস্য নাস্তি সমো বীর্যে পৃথিব্যামপি কশ্চন—সেই কর্ণ তোমাদের বড় ভাই। এই বিরাট যুদ্ধে সে অর্জুনের হাতে মারা গেছে, তার জন্য এক অঞ্জলি জল দিয়ে গঙ্গায় তর্পণ করিস তোরা। সে তোদের বড় ভাই, সূর্যের ঔরসে আমারই গর্ভে তাঁর জন্ম হয়েছিল তোদেরও অনেক আগে—স হি বঃ পূর্বজো ভ্রাতা ভাস্করান্ময্যজায়ত।

পাণ্ডবরা হঠাৎ করে প্রায় অসম্ভব এই নতুন খবর শুনে একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন। কর্ণের জন্য তাঁদের দুঃখ ভ্রাতৃসম্বন্ধের নৈকট্যে তীব্রতর এবং আন্তরিক হয়ে উঠল। যে যুধিষ্ঠির যুদ্ধে পর্যন্ত স্থির থাকেন, তিনি রাগে সাপের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে মায়ের কাছে তাঁর প্রথম পুত্রজন্মের সত্যতা সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি শুনতে চাইলেন। মায়ের সঙ্গে যুধিষ্ঠির কখনও এই ব্যবহার করেননি। কিন্তু কুন্তী ওই একবারই যা বলেছেন, তিনি বারবার এক কথা বলেন না। যুধিষ্ঠির মনে আকুল, মুখেও গজর গজর করতে থাকলেন। বারবার বলতে থাকলেন—এ কী আক্কেল তোমার, সব কথা চেপে থাকার জন্য আজ তোমার জন্য আমরা মরলাম—অহো ভবত্যা মন্ত্রস্য গ্রহণেন বয়ং হতাঃ। আগে বললে এই লোকক্ষয়ী যুদ্ধ হত না, কর্ণ পাশে থাকলে এই পৃথিবীতে কী আমাদের অপ্রাপ্য ছিল—এইরকম নানা সম্ভাবিত সৌভাগ্যের কথা বলে ধর্মরাজ দূষতে লাগলেন কুন্তীকে। কুন্তী এ-কথারও জবাব দিলেন না। ভাবটা এই—আমার ছেলে মারা যেতে আমার যে কষ্ট হয়েছে, তার চেয়ে বেশি কষ্ট তোমাদের ভাইদের হতে পারে না বাছা। যুধিষ্ঠির সাময়িক শ্রাদ্ধ-তর্পণ সেরে চলে এলেন বটে। কিন্তু এর কাছে তার কাছে মায়ের এই রহস্য-গোপনের কথা এবং ভ্রাতৃহত্যার শোক বারংবার বলেই চললেন। তবু কুন্তী কিছু বললেন না।

যুধিষ্ঠির কর্ণের নানা খবর পেলেন মহর্ষি নারদের কাছে। গভীর দুঃখে দুঃখিত হয়ে থাকলেন অন্তরে। কুন্তী এবার প্রয়োজন বোধ করলেন যুধিষ্ঠিরকে কিছু বলার। বোঝাতে চাইলেন—তোমার দুঃখের চাইতে আমার দুঃখ কিছু কম নয় বাছা। বললেন—কেঁদো না, মন দিয়ে শোনো আমার কথা—জহি শোকং মহাপ্রাজ্ঞ শৃণু চেদং বচো মম। আমি চেষ্টা করেছিলাম অনেক। তোমরা যে তার ভাই—এ-কথা আমি অনেক করে বলেছিলাম তাকে। আর শুধু আমি কেন, তার জন্মদাতা পিতা সূর্যদেবও তাঁকে আমারই মতো করে

বুঝিয়েছেন। ভগবান সূর্যদেব এবং আমি অনেক যত্নে, অনেক অনুনয় করে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাকে না পেরেছি বোঝাতে, না পেরেছি তোমাদের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দিতে। মেলা তো দূরের কথা, সে আমাদের ব্যাপারে আরও প্রতিকূল হয়ে উঠল। আমিও দেখলাম—যাকে বুঝিয়ে শাম্য করা যাবে না, তাকে উপেক্ষা করাই ভাল। আমি তাই করেছি—প্রতীপকারী যুস্মাকম্ ইতি চোপেক্ষিতো ময়া।

কুন্তীর এই স্বীকারোক্তির পরেও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁকে ছাড়েননি। কেন তিনি আগে বলেননি কর্ণের গোপন জন্ম-কথা—এই কারণে অনেক গালাগাল অনেক শাপ-শাপান্ত যুধিষ্ঠিরের কাছে শুনতে হল কুন্তীকে। যুধিষ্ঠির বুঝলেন না—প্রথম পুত্রের মৃত্যুতে অন্য পুত্রদের যুদ্ধ-জয় কুন্তীর কাছে তিক্ত হয়ে গেছে। তাঁর নিশ্চয়ই মনে পড়ে আপন পুত্রবধূর সেই স্মরণীয় বিলাপের ভাষা—আমার ছেলেরা বেঁচে নেই, এই রাজ্য দিয়ে আমি কী করব—কিং নু রাজ্যেন বৈ কার্যং বিহীনায়াঃ সুতৈর্মম। কুন্তী এখন নির্বিণ্ণ, নিরাসক্ত এক বিশাল বৈরাগ্যের জন্য অপেক্ষমাণ।

দেখা যাচ্ছে—যুদ্ধ কুন্তীও চেয়েছিলেন, দ্রৌপদীও চেয়েছিলেন। যুদ্ধের জন্য উত্তেজনা তৈরি করার ব্যাপারে দ্রৌপদী যতখানি মুখরা ছিলেন, কুন্তীও ঠিক ততটাই। যুদ্ধ লাগলে আত্মীয়, পরিজন, এমনকী প্রিয় পুত্রদেরও কারও না কারও মৃত্যু হতে পারে—এই সত্য তাঁদের জানা ছিল। তবু শাশুড়ি এবং পুত্রবধূ দু'জনেই যুদ্ধ চেয়েছেন অন্যায়কারী কৌরবদের শাস্তির জন্য। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের ধীরে চলার নীতিতে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁকে বলেছিলেন—এত অপমানের পরেও যদি তোমরা চুপ করে বসে থাকো, তবে থাক, যুদ্ধ করবে আমার বাপ-ভাই, যুদ্ধ করবে আমার ছেলেরা, আর তাদের নেতা হবে অভিমন্যু। আর কুন্তী কৌরবদের শাস্তির জন্য ছেলেদের বিদুলার উপাখ্যান শুনিয়েছিলেন, যে উপাখ্যানের বিষয়বস্তু—ক্ষত্রিয়ের ছেলেরা যুদ্ধ অথবা মৃত্যুভয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকে না। তারা হয় মরে, নয়তো প্রতিশোধ নেয়। কুন্তী-বিদুলার প্রসঙ্গ পরে আরও একবার স্মরণ করতে হবে আমাদের।

শাশুড়ি এবং পুত্রবধূ—দু'জনেরই এই উত্তেজনার পর তাঁদের এই পুত্রশোক মহাভারতের পাঠকদের কেমন যেন সংশয়িত করে তোলে, তাঁদের চরিত্র সম্বন্ধে একটা সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেবার পথ যেন রুদ্ধ করে দেয়। বস্তুত এইখানেই ক্ষত্রিয়া রমণী এবং জননীর বিচার। কুন্তীর শ্বশুরকুল, বিশেষত কুরুজ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র তাঁর ভ্রাতৃবধূ এবং পুত্রবধূর ওপর যে অন্যায় চালিয়ে গেছেন, তার প্রতিবিধান করাটা কুন্তী এবং দ্রৌপদীর কাছে অনিবার্য ছিল, কারণ স্ত্রীলোক এবং শ্বশুর-ভাশুরের রক্ষণীয়া হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা যে অপমান সয়েছেন, সে অপমান বোধহয় পাণ্ডবরাও সননি। কাজেই ক্ষত্রিয়া রমণী হিসেবে একজন পুত্রদের, অন্যদের স্বামীদের যুদ্ধের প্ররোচনা দিয়েছেন। সেই প্ররোচনা যেমন সত্য, আবার এখন পুত্রদের মৃত্যুতে এই দু'জনের কষ্টও ততটাই সত্য। জ্ঞাতি-বান্ধব এবং অতি প্রিয়জনের মৃত্যুর পর দ্রৌপদী রাজরানি হয়ে তবু যতটুকু সুখী হয়েছেন, কুন্তীর মনে কিন্তু রাজমাতা হওয়ার সুখ একটুও নেই। কারণ কুন্তীর বয়স হয়েছে, তিনি সংসারে নির্বিণ্ণ হয়ে উঠেছেন।

লক্ষণীয় বিষয় হল—শ্বশুর-ভাশুর ধৃতরাষ্ট্রের ওপর যে কুন্তীর এত রাগ ছিল, পুত্রদের যুদ্ধজয়ের পর সেই কুন্তী ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারীর সেবায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন। তাঁর ছেলেরা নিযুক্ত হল ধৃতরাষ্ট্রের সেবায়। আরেকভাবে বলা যায় কুন্তী ধৃতরাষ্ট্রের সুখকামনাতেই আত্মনিয়োগ করলেন। পাণ্ডবরা, বিশেষত মহারাজ যুধিষ্ঠির যা কিছু করতেন ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়েই করতেন, আর এদিকে কুন্তী ধৃতরাষ্ট্রের আত্ম-প্রতিনিধি গান্ধারীর কাজে এমনভাবে নিজেকে নিয়োগ করলেন, যাতে মনে হবে তিনি যেন পুত্রবধূ, স্বামীর পরিজনদের সেবায় নিমগ্ন।

স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ বাগচী মশাই কুন্তীর এই ব্যবহারের মধ্যে দিয়েই মুখ্যত কুন্তী-চরিত্রের মাহাত্ম্য নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে কুন্তী-চরিত্রের এইটাই 'ফোকাল পয়েন্ট'। কুন্তীর মৃত্যু পর্যন্ত এই ব্যবহারের ব্যাপ্তি। তাঁর মতে কুন্তী স্বামীর ঘর বেশিদিন করতে পারেননি, স্বামী-সেবা যাকে বলে এবং যা নাকি সেকালে স্ত্রীলোকের অন্যতম ধর্ম ছিল, নানা কারণে সেই সেবা-সৌভাগ্যও কুন্তীর কপালে জোটেনি। এখন পুত্রহীন এই বৃদ্ধদম্পতির সেবায় আত্মনিয়োগ করে কুন্তী তাঁর জীবনের সার্থকতা খুঁজে নিয়েছেন। তাঁর সতীত্ব এখানেই, এইখানেই তাঁর সার্থকতা এবং হয়তো বা এই কারণেই পুণ্যবতী প্রাতঃস্মরণীয় পঞ্চকন্যার মধ্যে কুন্তীর নাম—অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।

মহামহোপাধ্যায়ের বক্তব্য আমার মাথায় রেখে সবিনয়ে জানাই কুন্তীর সতীত্ব নিয়ে আমি খুব একটা চিন্তিত নই। এমনকী চিন্তিত নই বৈষ্ণবরা যে কারণে কুন্তী সহ ওইসব রমণীকে সতী-পাতকনাশিনী বলেছেন, তাই নিয়েও। বৈষ্ণবরা বলেন, এই পঞ্চকন্যাই ভগবানকে স্বশরীরে—কেউ রাম-রূপে, কেউ কৃষ্ণ-রূপে দর্শন করেছিলেন বলেই তাঁরা পাতকনাশিনী সতী। বললাম তো যেভাবেই হোক এই মাহাত্ম্য নিয়েও আমি চিন্তিত নই। কথাটা হল—কুন্তী ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন প্রায় পুত্রবধূর অভিমানে—কুন্তিভোজসুতা চৈব গান্ধারীমন্ববর্তত। কেন?

এবার একটা ফালতু কথা বলি। গুণিজনে আমার অপরাধ নেবেন না। ভিড় বাসে একটি সিট খালি হয়েছে। সেই খালি আসনের সামনে দাঁড়ানো ব্যক্তির দাঁড়াবার কায়দা, তাৎক্ষণিক শারীরিক সংস্থান এবং তৎপরতার কারণে আসনটি কারও কাছে প্রাপ্য হয়, এবং অন্য কারও কাছে প্রাপ্য হয় না। কিন্তু আসনটি অপ্রাপ্য হলেও ক্বচিৎ কেউ শারীরিক নিপুণতা, তৎপরতা এবং বলিষ্ঠতায় সেইখানে বসে পড়ে। তখন ঝগড়া লাগে। আসনটি যার প্রাপ্য স্বাভাবিক কারণেই সে অন্যান্য যুক্তিবাদীদের সমর্থনে এবং ন্যায়তই তর্কে জিতে যায়। অন্যায়ী অনধিকারী তখন আসন ছেড়ে উঠতে চায় এবং অধিকারী ব্যক্তি তখন বদান্য হয়ে বলেন—আরে ছি ছি, বসুন, আপনিই বসুন, একবার শুধু বললেই হত, এই তো দু-মিনিটের মামলা, সবাই তো নেমে যাব। অপ্রস্তুত অনধিকারী তখন সেই আসনে বসতে বাধ্য হন, এবং যতক্ষণ বসে থাকেন ততক্ষণ আপন অপ্রাপ্য অধিকারে মানসিকভাবে ছিন্ন-ভিন্ন হতে থাকেন।

এখানেও তাই। পাণ্ডু ছিলেন রাজ্যের নির্বাচিত অধিকারী। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর রাজ্যে বসে পড়েছিলেন। যুদ্ধ হল। যুদ্ধে পাণ্ডুর প্রতিনিধিরা জিতলেন। জিতে বললেন—জ্যাঠামশাই! আপনিই রাজা। আপনি যা বলবেন, আমরা তাই করব—ধৃতরাষ্ট্রং পুরস্কৃত্য পৃথিবীং

পর্যপালয়ন্। ভিড় বাসে সেই অধিকারীর বদান্যতায় অনধিকারী যেমন শারীরিকভাবে উঠতেও পারে না, আবার মানসিকভাবে বসতেও পারে না, ধৃতরাষ্ট্রও সেইভাবেই পনেরো বছরে কাটালেন। আর কুন্তী! যে ধৃতরাষ্ট্রের অন্যায় আচরণে তাঁর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল, তিনি যে এত এখন ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর অনুগতা হয়ে পড়লেন, তার কারণ নৈতিকভাবে তাঁর জয় হয়ে গেছে। বিজয়িনীর নম্রতার মধ্যে কোনও লজ্জা নেই, বরং মাহাত্ম্য আছে। অধিকন্তু একশত পুত্রের মৃত্যুতে যে জনকজননী শোক-ক্লিষ্ট হয়ে আছেন, তাঁদের গৌরবে প্রতিষ্ঠা করে নিজে নত হওয়ার মধ্যেও বিজয়িনীর মাহাত্ম্য আছে। ধৃতরাষ্ট্রের প্রিয়া মহিষীর অসংখ্য সেবা করে, বশংবদ হয়ে কুন্তী যেমন একদিকে তাঁদের মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করেছেন, তেমনই অন্যদিকে ছিল তাঁর স্বাধিকারের বদান্যতা—তুমি আমার অধিকার স্বীকার করেছ, বাস্, ঠিক আছে, তুমিই বসে থাকো রাজার আসনে, আমি নির্বিঘ্ন, আমি সিদ্ধকাম।

এই সিদ্ধকাম অবস্থাতেই কুন্তীর বৈরাগ্য এসেছে। তা ছাড়া পনেরো বছর ধরে এই অন্ধ ভাশুর এবং তাঁর পুত্রহীনা পত্নীর সঙ্গে থেকে থেকে কুন্তীও ভোগসুখে নির্লিপ্ত হয়ে গেছেন। যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে যথাসম্ভবের থেকেও বেশি সম্মান দিয়ে চলতেন। বিলাস, ভোগ-সুখ এবং মর্যাদা কোনওটাই ধৃতরাষ্ট্র কম পাননি যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে। তবে এইসব কিছুর মধ্যে ক্ষুদ্র কণ্টকের মতো একটি মাত্র বস্তুই ধৃতরাষ্ট্রকে বিদ্ধ করত। সবাইকে লুকিয়ে মধ্যম পাণ্ডব ভীম মাঝে মাঝে গঞ্জনা দিতেন ধৃতরাষ্ট্রকে। এ ঘটনা যুধিষ্ঠির, অর্জুন অথবা দ্রৌপদী-কুন্তী কেউই জানতেন না। ধৃতরাষ্ট্রও কাউকে বলেননি।

পনেরো বছর যুধিষ্ঠিরের রাজত্বে সুখবাস করে ধৃতরাষ্ট্র এবার বনে যাবার জন্য তৈরি হলেন। বানপ্রস্থের সময় ধরলে ধৃতরাষ্ট্রের একটু দেরিই হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, তিনি যুধিষ্ঠিরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সস্ত্রীক বানপ্রস্থে যাওয়ার জন্য তৈরি হলেন। ইচ্ছে—বাকি জীবন সাধন, তপস্যায় কাটিয়ে দেওয়া। যেদিন গান্ধারীকে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র রওনা দিলেন বনের উদ্দেশে, সেদিন রাজ্যের যত নর-নারী রাস্তায় ভেঙে পড়ল তাঁদের দেখতে। বৃদ্ধ রাজা বনে যাচ্ছেন, গান্ধারী বনে যাচ্ছেন, পাণ্ডবরা সবাই তাঁদের পেছন পেছন চলেছেন। কুন্তীও চলেছেন চোখ-বাঁধা গান্ধারীর হাত ধরে। হস্তিনাপুরের সিংহদ্বার ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে এসেছেন তাঁরা। পুরবাসীরা ফিরে গেছে অনেক আগেই। এবার যুধিষ্ঠিরও ফিরবেন। আর কত দূরই বা যাবেন তিনি। ধৃতরাষ্ট্রও বারবার বলছেন—এবার ফিরে যাও বাছা, আর কত দূর যাবে তুমি, যাও যাও।

গান্ধারীর হাত-ধরা কুন্তীকেও যুধিষ্ঠির এবার বললেন—আপনি এবার ফিরে যান মা, আমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে আরও খানিকটা এগিয়ে দিই—অহং রাজানমন্বিষ্যে ভবতী বিনিবর্ততাম্। যুধিষ্ঠির বললেন—ঘরের বউরাও সব রয়ে গেছে, আপনি এবার তাদের নিয়ে ফিরে যান। আমি আরও কিছু দূর যাই মহারাজের সঙ্গে। যুধিষ্ঠিরের এই কথার পর গান্ধারীর হাতটি আরও শক্ত করে ধরলেন কুন্তী। চোখে তাঁর জল এল। তবু একেবারে আকস্মিকভাবে, যুধিষ্ঠিরের একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে কুন্তী বললেন—আমার সহদেবকে যেন কখনও বকাঝকা কোরো না বাছা। সে বড় ভাল ছেলে, যেমন আমায় ভালবাসে, তেমনই তোমাকেও। তাকে সবসময় দেখে রেখো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুধিষ্ঠির কিছু বুঝতেও পারেননি। ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীকে পৌঁছতে নয়, কুন্তীও যে তাঁদের সঙ্গে চলেছেন সব ছেড়ে, কিচ্ছুটি না বলে—সে-কথা যুধিষ্ঠির কিছু বুঝতেই পারেননি। কুন্তী এবার বললেন—আর তোমাদের বড় ভাই কর্ণকে সবসময় স্মরণে রেখো বাবা। আমারই দুর্বুদ্ধিতে তাকে একদিন আমি প্রতিপক্ষে থেকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছিলাম। আর দেখো, আমার হৃদয় নিশ্চয়ই লোহা দিয়ে তৈরি। নইলে কর্ণকে না দেখেও এখনও যে সে হৃদয় আমার খান খান হয়ে যায়নি, তাতে বুঝি এ একেবারে লোহা। ব্যাপারগুলো এমনই হয়েছিল, আমার পক্ষে আরও ভাল করে কী-ই বা করা সম্ভব ছিল, বাছা। তবু সব দোষ আমারই, কেন না আমি কর্ণের সব কথা তোমাদের কাছে খুলে বলিনি—মম দোষোঽয়মত্যর্থং খ্যাপিতো যন্ন সূর্যজঃ।

মনে রাখবেন—এই কথাগুলি কুন্তীর সাফাই গাওয়া নয় অথবা বনে যাবার শেষ মুহূর্তের স্বীকারোক্তিও নয় কিছু। কথাগুলি গভীর অর্থবহ। এই কথাগুলির পরে কুন্তী বলেছিলেন—আমার বাকি জীবন আমার শ্বশুর-শাশুড়ি ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর সেবায় কাটিয়ে দিতে চাই—শ্বশ্রূ-শ্বশুরয়োঃ পাদান্ শুশ্রূষন্তী সদা বনে। আগেই বলেছি, মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ বাগচী কুন্তীর এই শ্বশুর-শাশুড়ি শুশ্রূষার মধ্যেই কুন্তীর চরিত্র-মাহাত্ম্য খ্যাপন করতে চেয়েছেন।

মহাজনের এই পদাঙ্কিত পথে আমি যে তেমন করে পা বাড়াতে পারছি না, তার একমাত্র কারণ কর্ণ। আমি আগেই বলেছি যে, শৈশবে আপন পিতৃ-মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত কুন্তীর মধ্যে এমনই এক মানসিক জটিলতা তৈরি হয়েছিল। সে জটিলতা আরও বাড়ে কন্যা অবস্থায় তথাকথিত এক অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়ে। বাবা-মার কাছে একথা বলতে পারেননি, স্বামীর কাছে বলতে পারেননি, ছেলেদের কাছে তো বলতেই পারেননি। এদিকে শ্বশুরকুল তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিচ্ছে না, অথচ প্রধানত যাঁর ভরসায় তাঁর শ্বশুরকুল তাঁরই প্রতিপক্ষভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে, তিনিও তাঁর ছেলে, কর্ণ। তিনি এমনই সত্যসন্ধ যে, তাঁকে বলে কয়েও কিছু করা যায়নি। প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর অন্য ছেলেরা এবং কুন্তী পূর্বাহ্নেই জানতে পারছেন—কর্ণ মারা যাবেন।

যে গভীর জটিলতার সূত্রপাত হয়েছিল যৌবনে, যার বৃদ্ধি ঘটেছিল বিধবার সমস্ত জীবনের অন্তর-গুপ্তিতে, সেই জটিলতা কর্ণের মৃত্যুতেও শান্ত হয়নি, বরং তা বেড়েছে। যে যুধিষ্ঠির জীবনে মায়ের মুখের ওপর গলা উঁচু করে কোনওদিন কথা বলেননি, সেই যুধিষ্ঠির রাগে সাপের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে জননীকে বলেছেন—তোমার স্বভাব-গুপ্তির জন্য আজ আঘাত পেলাম আমি—ভবত্যা গূঢ়মন্ত্রত্বাৎ পীড়িতোঽস্মীত্যুবাচ তাম্। যুধিষ্ঠির জননীকে উদ্দেশ করে সমগ্র নারীজাতিকে শাপ দিয়েছিলেন—মেয়েদের পেটে কোনও কথা থাকবে না—সর্বলোকেষু যোষিতঃ ন গুহ্যং ধারয়িষ্যন্তি।

কুন্তী যুধিষ্ঠিরের কথার উত্তর দেননি, প্রতিবাদ করেননি, আপন মনে বকবকও করেননি। যুধিষ্ঠির কুন্তীকে বুঝি তখনও চেনেননি। আমি হলফ করে বলতে পারি—মেয়েদের পেটে কথা না থাকার অভিশাপ শত কোটি প্রগলভা রমণীর অন্তরে যতই ক্রিয়া করুক, মনস্বিনী কুন্তীর তাতে কিছুই হয়নি। এই যে রাজ্য-পাওয়া বড় ছেলে গলা উঁচু করে কর্ণের ব্যাপার

নিয়ে অত বড় কথাটা বলল, তার প্রতিক্রিয়া কুন্তী মনের মধ্যে চেপেই ছিলেন। যুধিষ্ঠির রাজ্য পাওয়া মাত্রই তিনি রাজমাতার যোগ্য বিলাস ছেড়ে মন দিয়েছিলেন শ্বশুরকল্প ধৃতরাষ্ট্রের সেবায়। যুধিষ্ঠির বুঝতেও পারেননি নিস্তরঙ্গভাবে পুত্রদের দেওয়া ভোগ-সুখ থেকে অবসর নিলেন কুন্তী। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে দিনের পর দিন অন্তরে বৈরাগ্য সাধন করার ফলেই এত সহজে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বনে যাওয়ার ব্যাপারে। জলপান বা ভাত খাওয়ার মতো অতি সহজেই তিনি বলতে পারছেন—আমিও গান্ধারীর সঙ্গেই বনে থাকব বলে ঠিক করেছি।

লক্ষণীয় বিষয় হল—এই সহজ প্রস্থানের পথে তিনি আবারও সেই কর্ণের প্রসঙ্গ তুলছেন যুধিষ্ঠিরের কাছে, এমন একটা প্রসঙ্গ যা নিয়ে পুত্রের কাছে তিনি উচ্চৈঃস্বরে অভিযুক্ত হয়েছিলেন একদা পনেরো বছর আগে। কুন্তী সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেননি, ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে কাশী কিংবা বনে যাননি। কিন্তু পনেরো বছর তিনি যুধিষ্ঠিরের কথা মনে রেখেছেন, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া চেপে রেখেছেন নিপুণভাবে। যাবার আগে শুধু জবাবদিহির মতো করে কথাটা আবারও তুলছেন কুন্তী। বলেছেন—আমার হৃদয়টা লোহার মতো বাবা, নইলে কর্ণের মরণ সয়েও বেঁচে রইলাম কী করে? তবে ঘটনার প্রবাহ ছিল এমনই যে, আমি কী বা করতে পারতাম সেখানে—এবং গতে তু কিং শক্যং ময়া কর্তুম্ অরিন্দম।

কথাটার মধ্যে পনেরো বছরের অন্তর্দাহ আছে, অভিমান আছে, জবাবদিহিও আছে। যুধিষ্ঠিরের কথাটা যে তিনি সেদিন মেনে নিতে পারেননি, তারই উত্তর দিচ্ছেন আজ পনেরো বছর পরে, বানপ্রস্থে যাবার পথে। অথচ বলার মধ্যে সহজ ভাবটা দেখবার মতো—সবই আমার দোষ, বাছা। তুমি ভাইদের নিয়ে তোমার বড় ভাই কর্ণের কথা সবসময় স্মরণে রেখো। তার মৃত্যু উপলক্ষ করে দান-ধ্যান কোরো।

কুন্তীর যাত্রা এবং বক্তব্যের আকস্মিকতায় যুধিষ্ঠির হতচকিত হয়ে গেছেন। তিনি কথাই বলতে পারছেন না—ন চ কিঞ্চিদুবাচ হ। পনেরো বছর আগে বলা কথার জবাবটা যে এইভাবে মায়ের বনবাস-যাত্রার মুখে এমন হঠাৎ করে ফিরে আসবে—এ তিনি ধারণাই করতে পারছেন না। কথা আরম্ভ করার জন্য তাঁকে ভাবতে হল এক মিনিট—মুহূর্তমিব তু ধ্যাত্বা। দুশ্চিন্তায় আকুল হয়ে তিনি উত্তর দিলেন—এ তুমি কী বলছ মা! এ তুমি নিজে নিজে কী ঠিক করেছ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার ওপর রাগ কোরো না তুমি—ন ত্বামভ্যনুজানামি প্রসাদং কর্তুমর্হসি।

মুহূর্তের মধ্যে যুধিষ্ঠির গুছিয়ে নিলেন নিজেকে। বললেন—মা! তুমিই না একসময়ে আমাদের যুদ্ধে উত্তেজিত করেছিলে? বিদুলার গল্প বলে তুমিই যেখানে আমাদের এত উৎসাহ দিয়েছিলে, সেই তুমি কিছুতেই আমাদের ছেড়ে যেতে পারবে না—বিদুলায়া বচোভিস্ত্বং নাস্মান্ সন্ত্যক্তুমর্হসি। কৃষ্ণের কাছে তোমারই বুদ্ধি পেয়ে আমরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, রাজ্যও পেয়েছি তোমারই বুদ্ধিতে। সে বুদ্ধি এখন কোথায় গেল মা? আমাদের এত ক্ষত্রিয়ের ধর্ম উপদেশ দিয়ে এখন তুমি নিজেই তো সেই ধর্মের চ্যুতি ঘটাচ্ছ। আমাদের ছেড়ে, এই রাজ্য ছেড়ে, তোমার পুত্রবধূকে ছেড়ে কোথায় তুমি বনের মধ্যে গিয়ে থাকবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলের কান্না-মাখা কথা শুনে কুন্তীর চোখে জল এল। তবু তিনি চলতে লাগলেন গান্ধারীর সঙ্গে। কুন্তীও কোনও কথার উত্তর দিলেন না দেখে ভীম ভাবলেন—মা বুঝি একটু নরম হয়েছেন। ভীম বললেন—তোমার ছেলেরা যখন রাজ্য পেল, যখন সময় এল একটু ভোগ-বিলাসে থাকার, তখনই তোমার এই অদ্ভুত বুদ্ধি হল কেন, মা—তদিয়ং তে কুতো মতিঃ! আর যদি এই বুদ্ধিই হবে তবে আমাদের দিয়ে যুদ্ধে এত লোকক্ষয় করালে কেন? বনেই যদি যাবে তবে সেই বালক-বয়সে আমাদের শতশৃঙ্গ পর্বতের বন থেকে কেন টেনে এনেছিলে এখানে? বারবার বলছি মা, কথা শোনো, বনে যাবার কল্পনা বাদ দাও, ছেলেদের উপায়-করা রাজলক্ষ্মী ভোগ করো তুমি, ফিরে চলো ঘরে।

কুন্তী ভীমের কথাও শুনলেন, কিন্তু বাড়ি ফিরবার লক্ষণ একটুও দেখা গেল না তাঁর মধ্যে। দ্রৌপদী-সুভদ্রা কত বোঝালেন কুন্তীকে, ছেলেরা সবাই কত করে বললেন ফিরে যেতে, কুন্তী বারবার তাঁদের দিকে ফিরে তাকান—যেন এই শেষ দেখা, আর চলতে থাকেন। সাশ্রুমুখে পুত্রদের দিকে বারবার তাকানোর মধ্যে কুন্তীর স্নেহানুরক্তি অবশ্যই ছিল—সা পুত্রান্ রুদতঃ সর্বান্ মুহুর্মুহুরবেক্ষতী। কিন্তু তাঁর চলার মধ্যে নিশ্চিত সিদ্ধান্তের শক্তি লুকানো ছিল। তিনি তাই থামছিলেন না। বস্তুত ওই শক্তিতে কুন্তী এবার চোখের জল মুছলেন, রুদ্ধ করলেন বাষ্পোত্তিন্ন স্নেহধারার পথ। কুন্তী নিজেকে শক্ত করে দাঁড়ালেন বনপথের মাঝখানে। প্রিয় পুত্রেরা তাঁকে যুক্তির জালে আবদ্ধ করেছে। প্রশ্ন করেছে—কেন তুমি পূর্বে আমাদের যুদ্ধে উৎসাহিত করে এখন বনে পালাচ্ছ। ছেলেদের এই প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাবেন তিনি। কুন্তী দাঁড়ালেন। মুখে তাঁর সেই তেজ, সেই দীপ্তি।

কুন্তী বললেন—প্রশ্নটা তোমাদের মোটেই অন্যায় নয় যুধিষ্ঠির! সত্যিই তো, আমি তোমাদের চেতিয়ে দিয়েছিলাম। সেই সময়ে, যখন শত্রুর ওপর আঘাত হানায় তোমরা ছিলে কম্পমান—কৃতমুদ্ধর্ষণং পূর্বং ময়া বঃ সীদতাং নৃপ। কেন অমনি করছিলাম জান? জ্ঞাতিরা পাশাখেলায় তোমাদের সর্বস্ব হরণ করে নিয়েছে, সুখ বলে যখন কোনও কিছুই অবশিষ্ট ছিল না তোমাদের, তখনই আমি তোমাদের উত্তেজিত করেছি—কৃতমুদ্ধর্ষণং ময়া। আমি তোমাদের উত্তেজিত করেছি এই কারণে, আমার স্বামী পাণ্ডুর ছেলেরা যাতে পৃথিবী থেকে মুছে না যায়, যাতে তাঁর বীর পুত্রদের যশোহানি না হয়।

এই কথাটার মধ্যে ভীমের প্রশ্নের জবাবও আছে। ভীম বলেছিলেন—বনেই যদি যাবে তবে পাণ্ডুর মৃত্যুর পর কেন আমাদের বন থেকে টেনে এনেছিলে এখানে—বনাচ্চাপি কিমানীতা ভবত্যা বালকা বয়ম্? কুন্তী জবাব দিয়েছেন স্বামীর ইতিকর্তব্যর কথা মনে রেখে। বস্তুত পাণ্ডু অকালে মারা যাবার পর কুন্তী যখন বিধবা হলেন তখন অন্য ব্যক্তিত্বময়ী বিধবা রমণীদের মতো তাঁরও একমাত্র ধ্যান ছিল—কেমন করে তাঁর নাবালক ছেলেগুলিকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া যায়। এর জন্য মুনি-ঋষিদের ধরে পাণ্ডুর মৃতদেহ নিয়ে নাবালকদের হাত ধরে তিনি উপস্থিত হয়েছেন শ্বশুরবাড়িতে। ভূতপূর্ব রাজরানির প্রাপ্য সম্মান তিনি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাননি, পেয়েছেন শুধুই আশ্রয়। সেই আশ্রয়ও নিরাপদ ছিল না। ভীমকে বিষ খাওয়ানো, বারণাবতে সবাইকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা—সবকিছু কুন্তী সয়েছেন এবং অপেক্ষা করেছেন সুদিনের। ছেলেরা ততদিনে মহাশক্তিশালী বীরের মর্যাদা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়েছে। রাজনীতিতে সমর্থন এসে গেছে কুন্তীর আসল বাপের বাড়ি বৃষ্ণি যাদবদের কাছ থেকে এবং বিবাহসূত্রে পাঞ্চাল দ্রুপদের কাছ থেকেও।

ধৃতরাষ্ট্র এই বিধবা মহিলার উচ্চাশা চেপে রাখতে পারেননি। চেষ্টা তিনি কম করেননি। কুন্তীকে যদি একটুও ভয় না পেতেন ধৃতরাষ্ট্র, তা হলে অন্তত বারণাবতে কুন্তী সহ পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করতেন না। যাই হোক, পাঞ্চালদের সঙ্গে বৈবাহিক যোগাযোগের পর এবং বারণাবতের ঘটনায় নিজের রাজ্যে নিজেরই মান বাঁচাতে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজ্য দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অবাধ্য ছেলেদের ধৃতরাষ্ট্র রুখতে পারেননি। তাদের প্ররোচনায় পাশাখেলার ছলে পাণ্ডবদের সর্বস্ব নিয়ে বনবাসে পাঠান ধৃতরাষ্ট্র।

কুন্তী এই অন্যায় সইতে পারেননি। বাপের সম্পত্তির ভাগ তারা কিছুই পেল না, উলটে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ছেলেদের পাঠিয়ে দেওয়া হল বনে, কুন্তী এই অন্যায় সইতে পারেননি। স্বামীর অবর্তমানে নিজের কষ্টে প্রতিষ্ঠিত রোজগেরে ছেলেদের দেখে বিধবা মা যে সুখ পান, ঠিক সেই সুখই কুন্তী নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন, যখন যুধিষ্ঠির রাজা হয়েছিলেন ইন্দ্রপ্রস্থে। কিন্তু দুর্যোধন-ভাইদের জ্ঞাতি চক্রান্তে ছেলেদের যে রাজ্যনাশ হয়ে গেল, তখনও কুন্তী হাল ছাড়েননি। তিনি একা বসেছিলেন শ্বশুরবাড়িতে। বিদুরের কথায় যে তিনি শেষ পর্যন্ত ছেলেদের সঙ্গে বনে যাওয়া বন্ধ করে কুরুবাড়িতেই রয়ে গেলেন, তার কারণ বিদুরের মর্যাদারক্ষা যতখানি, তার চেয়েও বেশি তাঁর অধিকারবোধ—আমার শ্বশুরবাড়ি, আমার স্বামীর ঘর, আমার হক আছে থাকার, আমি রইলাম শুধু পাণ্ডুর উত্তরাধিকারিতার অধিকারে। রাজা পাণ্ডুর বংশ এবং উত্তরাধিকার যাতে মুছে না যায় কুরুবাড়ি থেকে—যথা পাণ্ডোর্ন নশ্যেত সন্ততিঃ পুরুষর্ষভাঃ—সেইজন্যই তিনি কুরুবাড়িতে একা জেগে বসেছিলেন এবং সময়কালে ছেলেদের উত্তেজিত করেছেন চরম আঘাত হানার জন্য—ইতি চোদ্ধর্ষণং কৃতম্।

কুন্তী বললেন—তোমাদের শক্তি কিছু কম ছিল না। দেবতাদের মতো তোমাদের পরাক্রম। সেই তোমরা চোখ বড় করে চেয়ে চেয়ে জ্ঞাতিভাইদের সুখ দেখবে আর নিজেরা বনে বসে বসে আঙুল চুষবে—সে আমি সইতে পারিনি বলেই তোমাদের যুদ্ধে উত্তেজিত করেছি—মা পরেষাং সুখপ্রেক্ষাঃ স্থাতব্যং তৎ কৃতং ময়া। যুধিষ্ঠির! মর্যাদায় তুমি দেবরাজ ইন্দ্রের মতো হয়েও তুমি কেন বনে বাস করবে, সেইজন্যই আমার উত্তেজনা। একশো হাতির বল শরীরে নিয়েও ভীম কেন কষ্ট পাবে, সেইজন্যই আমার উত্তেজনা। ইন্দ্রের সমান যুদ্ধবীর হয়েও অর্জুন কেন নিচু হয়ে থাকবে—সেইজন্যই আমার উত্তেজনা। আর তোমরা এত বড় বড় ভাইরা থাকতে নকুল-সহদেব আমার বনের মধ্যে খিদেয় কষ্ট পাবে—এইজন্যই আমার উত্তেজনা।

কুন্তী এবার শেষ প্রশ্ন তুললেন সমগ্র রাজনীতির সারমর্মিতায়। বললেন—এই যে এই মেয়েটা, পাণ্ডবদের সুন্দরী কুলবধূ দ্রৌপদী। একে যখন সভার মধ্যে নিয়ে এসে অপমান করল সবাই, সকলে চুপটি করে বসে থাকল। পঞ্চস্বামীগর্বিতা হয়েও সাহায্যের আশায় যাকে কাঁদতে হল অনাথের মতো, আমার শ্বশুরকুলের বড় মানুষেরা ব্যথিত হয়েও চুপ করে বসে থাকলেন। দুঃশাসন এসে তার চুলের মুঠি ধরল—এখনও ভাবলে আমার মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় আমি অজ্ঞান হয়ে যাব—এরকম অসভ্যতা দেখেই আমি তোমাদের যুদ্ধে উত্তেজিত করেছি, শুনিয়েছি বিদুলার উদ্দীপক সংলাপ।

কুন্তী বলতে চান—পাণ্ডবদের যুদ্ধে উত্তেজিত করার মধ্যে তাঁর নিজের স্বার্থ কমই। ছেলেরা রাজ্য জিতে ভোগ-বিলাস এনে দেবে তাঁর কাছে আর তিনি বিলাস-ব্যসনে মজে থাকবেন, বসে বসে সুখ ভোগ করবেন—এই আশায় তিনি যুদ্ধের উত্তেজনা ছড়াননি ছেলেদের মধ্যে। কুন্তীর বক্তব্য—যুদ্ধের উত্তেজনার বিষয় এবং কারণ তাঁর ছেলেদের মধ্যেই ছিল, অর্থাৎ ঘটনা পরম্পরা যা চলছিল—যে অন্যায় যে অবিচার, তাতে বহু পূর্বে তাঁর ছেলেদেরই উত্তেজিত হওয়া উচিত ছিল। তাদের দিক থেকে অত্যন্ত উচিত এই প্রতিক্রিয়া যখন কুন্তী লক্ষ করলেন না, তখনই তাঁকে কঠিন কথা বলতে হয়েছে, বিদুলার মরণান্তিক কঠিন সংলাপ শোনাতে হয়েছে ছেলেদের। এর মধ্যে জননী হিসেবে তাঁর পাওয়ার কিছু নেই, যা প্রাপ্য তা তাঁর ছেলেদের, ঠিক যেমন যুদ্ধে উত্তেজিত হওয়ার কারণগুলিও ছিল তাদেরই একান্ত।

যুধিষ্ঠির এবং ভীমের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের উত্তরে কুন্তী তাঁর উত্তেজনা চেপে রাখতে পারেননি। যে প্রশ্ন করতে ছেলেদের লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল, সেই প্রশ্ন যখন তারা কঠিনভাবেই করল, তখন উত্তর এসেছে অবধারিত কঠিনভাবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কুন্তী ছেলেদের রেখে বনের পথে পা বাড়িয়েছেন জীবনের মতো। কাজেই অভিযোগের উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে নেমে আসছে প্রশান্তি, বনযাত্রার বৈরাগ্য।

কুন্তী বললেন—তোমাদের যে এত করে যুদ্ধ করতে বলেছিলাম, তার আসল কারণ কী জানো? তোমাদের বাবা ছিলেন রাজা। তোমরা রাজার ছেলে। আমারই গর্ভজাত সন্তানদের হাতে পড়ে সেই মহাত্মা পাণ্ডুর রাজবংশ উচ্ছিন্ন না হয়ে যায়, সেই কারণেই আমি তোমাদের উৎসাহিত করেছি। জেনে রেখো, তোমরা নিজেরাই যদি নিরালম্ব অবস্থায় থাকো, তবে তোমাদের ছেলেরা, তোমাদের নাতিরা কোনওদিনই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না—ন তস্য পুত্রাঃ পৌত্রা বা ক্ষতবংশস্য পার্থিব। কাজেই যা কিছু উৎসাহ-উদ্দীপনা তা তোমাদেরই কারণে, আমার নিজের ভোগসুখের জন্য কিছু নয়। ভাবতে পারেন কি—একটি সমৃদ্ধিশালী, সুপ্রতিষ্ঠিত বংশধারার জন্য কুন্তী কত আধুনিকভাবে লালায়িত!

ভীম বলেছিলেন—তোমার ছেলেরা এখন রাজ্য জিতেছে, সেই রাজসুখ এখন তোমার ভোগ করার কথা—যদা রাজ্যমিদং কুন্তি ভোক্তব্যং পুত্রনির্জিতম্—রাজমাতার প্রাপ্য সুখ যখন তোমার কাছে আমাদেরই পৌঁছনোর কথা, ঠিক তখনই তোমার এই বানপ্রস্থের ইচ্ছে হল? কুন্তী এই প্রশ্ন এবং পুত্র-নির্জিত রাজ্য-সুখের ভোক্তব্যতা নিয়ে যে অসাধারণ উক্তিটি করেছেন তা এই অতি বড় আধুনিক সমাজেও আমি অত্যন্ত সযৌক্তিক মনে করি।

কুন্তীর বক্তব্যের আগে আমি দুটো সামান্য কথা নিবেদন করে নিই। আমার সহৃদয় পাঠককুল আমাকে কুন্তীর বক্তব্যের সারবত্তা বোঝানোর সময় দিন একটু। আজকের দিনের অনেক কৃতী ছেলে বলে—পাশ্চাত্য সমাজ বড় ভাল। ওখানে যার যার, তার তার। ছেলে বড় হল, চাকরি করছে, বউ নিয়ে আলাদা আছে। বাপ-মাও আলাদা আছে। শাশুড়ি-বউতে দিন-রাত কথা কাটাকাটি নেই, ভ্যাজর-ভ্যাজর নেই। ভারী সুন্দর ব্যবস্থা।

এই 'সুন্দর' ব্যবস্থার মধ্যে আমি কিছু নিন্দনীয় দেখি না। ভারতবর্ষেও আজকাল তাই হচ্ছে। একান্নবর্তী পরিবারগুলি একে একে ভেঙে যাচ্ছে। বস্তুত এতেও আমি কিছু নিন্দনীয় দেখছি না। কারণ এমনটি হবেই। কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক পটভূমিকার দিকে তাকালে অনেক কিছু সহজে বোঝা যাবে। আমাদের অব্যবহিত পূর্বকালে যা দেখেছি, তাতে জমি সম্পত্তি এবং বসতবাড়ির একটা বিশাল ভূমিকা ছিল সমাজে। ছেলেরা বাপের সম্পত্তি পেত। বাবা যদি সম্পত্তির অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতেন, তা হলে শাশুড়ি দাপট দেখাতেন, পুত্র-পুত্রবধূ নিগৃহীত বোধ করতেন। জমি-সম্পত্তির যুগ অতীত হয়ে যাবার পর যখন বাপ চাকরি করে, ছেলেও চাকরি করে সেই অবস্থায় শাশুড়ি-বউয়ের ঝগড়ার অনুপাত বোধহয় সবচেয়ে বেশি। এই কাঠামোতে বাপ মারা গেলে মায়ের অবস্থা বড় করুণ। এই অবস্থায় পুত্রবধূ দাপট দেখায়, শাশুড়ি নিগৃহীতা বোধ করেন।

এখন দেখছি সমাজ অতি দ্রুত এই পারিবারিক ঝগড়াঝাটির নিষ্পত্তি ঘটিয়ে ফেলেছে। এখন বাপ চাকরি করতে করতেই ছেলের পড়াশুনো, তার ব্যবহারিক প্রতিষ্ঠার দিকে যেমন নজর রাখেন, তেমনই তাঁর অবর্তমানে তাঁর স্ত্রীর যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তার ব্যবস্থাও করেন। অথবা বাপ যদি বেঁচেও থাকেন, তা হলে অবসরকালীন জীবনে বুড়োবুড়ি পুত্র-পুত্রবধূকে বাদ দিয়েও কীভাবে জীবন কাটাবেন, তার একটা অঙ্ক কষে নেন আগে থেকেই। অর্থাৎ তাঁরা পুত্রের উপার্জিত ধনে ভাগ বসাতে চান না। ভাবটা এই—আমরা বেঁচে থাকি, তোমরাও সুখে থাকো, ঝগড়াঝাটি যেন না হয়, বাছা। আমরা প্রায় পাশ্চাত্য সমাজ-ব্যবস্থার কাছাকাছি চলে আসছি।

এতে ভাল হচ্ছে, কি মন্দ হচ্ছে—তা জানি না, তবে এ ব্যবস্থা আর্থিকভাবে সচ্ছল পরিবারগুলির মধ্যেই চলতে পারে, অন্যত্র নয়। অন্যত্র সেই একই হাল—রোজগেরে ছেলে, পুত্রবধূর দাপট, বাবা-মা নাজেহাল। এর মধ্যে যদি আবার একজন স্বর্গত হন, তখন অন্যজনের অবস্থা হয়ে ওঠে আরও করুণ। তিনি মনে মনে কষ্ট পান, একান্তে বসে কাঁদেন। পুত্রবধূর তবু মায়া হয় না, অথচ এই অসহায় শাশুড়ি নামের ভদ্রমহিলাটি—কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্বশুরই আগে স্বর্গত হন—নিজের ছেলেটিকে রেখে অন্যত্রও চলে যেতে পারেন না। কারণ মায়া-মোহ তো আছেই, সহায়-সম্বলহীনতাও আছে।

ঠিক এইরকম একটা পটভূমিকায় আমি কুন্তীর বক্তব্য পেশ করতে চাই। যদিও এখানে শাশুড়ি-বউয়ের কোনও ব্যাপারই নেই। যা আছে, তার নাম সংসার-চক্র। তবে মনে রাখা দরকার কুন্তীর বক্তব্যের একটা পটভূমিকা আছে। শাস্ত্র, কাব্য এমনকী সাধারণ মানুষের শেষ কথাটির মধ্যেও আমরা বুঝতে পারি যে, ভারতবর্ষ কোনওকালেই ভোগ-বিলাসের প্রশস্তি গায় না, তার প্রশস্তি বৈরাগ্যেই। এখানে অতি ভোগী মানুষেরও একসময় মনে হয়—চাওয়ার আগুনে ইন্ধন জোগালে তার কোনও শেষ নেই, অতএব একটা কোথাও শেষ করতে হবে। এই দর্শন থেকেই ভারতবর্ষে আশ্রম-ব্যবস্থার জন্ম হয়েছিল। এই আশ্রম কিন্তু ঋষির আশ্রম নয়, আশ্রম-ব্যবস্থা।

চতুর্বর্ণের বিষম ব্যবস্থায় শত দোষ থাকতে পারে, তার অনেকটাই আমরা বুঝে নিয়েছি। এমনকী ব্রহ্মচর্য আশ্রমে ছেলেপিলেদের লেখাপড়ার সময়টা কেমন কাটানো উচিত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে সম্বন্ধেও মতবিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু এই সেদিনও কবি-ঋষি শান্তিনিকেতনে ছেলেপিলেদের লেখাপড়ার যে আয়োজন করেছিলেন, তার মধ্যে দোষ থাকলেও আনন্দের ভাগটা অন্যরকম। গার্হস্থ্যে ব্যবস্থা নিয়েও আমার কোনও বক্তব্য নেই। কিন্তু মানুষ কতকাল গৃহস্থ অবস্থায় রতি-সুখ, সন্তান-সুখ ভোগ করবে, তার একটা সীমা ছিল। এই সীমার শেষ থেকেই বানপ্রস্থের আরম্ভ।

সাধারণ মতে সময়-সীমাটা পঞ্চাশ, কথায় বলে পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ। অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত দাম্পত্য এবং বাৎসল্য রস উপভোগ করে বেরিয়ে পড়ো ঘর থেকে। কথাটা বলা সহজ, কিন্তু কাজে খুব কঠিন। কারণ ততদিনে পঞ্চাশোর্ধ্ব বুড়ো-বুড়ির মধ্যে অন্যতর এবং আরও গাঢ়তর এক ঘনিষ্ঠতা জন্মে যায়; দিন যত যায় বাৎসল্যরসও ঘনীভূত হয় ততই। এই অবস্থায় ঘর ছেড়ে বেরনো বড় কঠিন। সেকালেও এটা কঠিন ছিল। স্বয়ং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রই বেরোতে পারেননি এবং পারেননি বলেই নিজের বংশনাশ তাঁকে বড় কাছ থেকে দেখে যেতে হয়েছে। কিন্তু বেরনোর নিয়মটা 'থিওরেটিক্যালি' ছিলই। কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস বড় গৌরব করে রঘুবংশীয় নৃপতিদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, যৌবনকালে তাঁরা বিষয়-সুখ চাইতেন বটে, কিন্তু বুড়ো বয়স হলেই তাঁরা বনে চলে যেতেন—বার্ধকে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্।

দেখুন, কবিরও মমতা ছিল। তিনিও পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যেতে বলেননি; বলেছেন বুড়ো বয়সে—বার্ধকে মুনিবৃত্তীনাম্। এইটাই কথা—ঘর থেকে বেরতে হবে। তা একটু বয়স বেশিই হোক, কিন্তু বেরতে হবে। আসলে পুত্র এবং পুত্রবধূকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত দেখেই বেরনো ভাল, তাতে পরবর্তী প্রজন্মের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে মধুর, মনটা থাকে অসূয়াহীন— ভালয় ভালয় বিদায় দে মা আলোয় আলোয় চলে যাই। তা অনেকে পুত্রকে প্রতিষ্ঠিত দেখা মাত্রই বেরতে পারেন না, কারণ নাতি-নাতনির জন্য নিম্নগামিনী স্নেহধারায় আরও কিছু কাল কাটে। বাস্তববাদী কবি-ঋষিরা তাতেও আপত্তি করেননি। ভাবটা এই—যতদিন সম্মান নিয়ে আছ, ততদিন থাকো, কিন্তু সম্মানের অসম্ভাবনা মাত্রেই বেরিয়ে পড়। দুঃখের বিষয়—আজ আর কেউ বনে যায় না। গেলে, অনেক পারিবারিক অশান্তির নিরসন হয়ে যেত।

আপনারা স্বয়ং ব্যাসদেবের কথাটাই স্মরণ করুণ। তাঁর মা সত্যবতী কুরুবংশের ধারা রক্ষার জন্য অত্যন্ত বিব্রত ছিলেন। মহারাজ শান্তনুর ঔরসে আপন গর্ভজাত পুত্র দুটির মৃত্যু তাঁকে দেখতে হয়েছে। তারপর অতিকষ্টে পূর্বজাত পুত্র ব্যাসকে বুঝিয়ে দুই পুত্রবধূ অম্বিকা এবং অম্বালিকার গর্ভে দুটি নিয়োগজাত সন্তান পেয়েছিলেন। কুরুবংশের দুই অঙ্কুর—ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু। অন্ধত্বের জন্য ধৃতরাষ্ট্র রাজা হতে পারলেন না। রাজা হলেন পাণ্ডু। কিন্তু সিংহাসনস্থ পাণ্ডুর মৃত্যুও সত্যবতী দেখতে বাধ্য হলেন। আর কত?

হস্তিনাপুরে যেদিন পাণ্ডুর শ্রাদ্ধ হয়ে গেল, সেদিন ত্রিকালদর্শী ব্যাস জননী সত্যবতীকে সাবধান করে দিয়ে বললেন—সুখের দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে মা, যে সময় আসছে তোমার পক্ষে তা মোটেই ভাল নয়—অতিক্রান্তসুখাঃ কালাঃ। ব্যাস আরও বললেন—মা! পৃথিবী তার যৌবন হারিয়ে ফেলেছে, সামনের সমস্ত দিনই পাপে আর কষ্টে ভরা—শ্বঃ শ্বঃ পাপিষ্ঠ-দিবসাঃ পৃথিবী গতযৌবনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পৃথিবী গতযৌবনা'—মহাকবির ব্যঞ্জনা যাঁরা বোঝেন না, তাঁদের কী করে বোঝাব—এটা কত বড় কথা। আসলে প্রত্যেক মানুষের জীবনে যতদিন যৌবনকাল, যতদিন কর্মক্ষমতা, এই পৃথিবীও তার কাছে ততদিন যুবতী। কিন্তু মানুষের প্রৌঢ়ত্বের সঙ্গে পৃথিবীও প্রৌঢ়া হয়ে যায়, মানুষের বৃদ্ধত্বে পৃথিবীও বৃদ্ধা। অর্থাৎ ততদিনে সেই পৃথিবী আমার সন্তান বা সন্তানকল্পদের কাছে যুবতী রূপে ধরা দেয়। ওঁরা বলেন, 'জেনারেশন গ্যাপ' আমরা বলি—তুমি যত বুড়ো হবে, তোমার পৃথিবীও তোমার সঙ্গে বুড়ি হবে, তুমি আর মেলাতে পারবে না। তোমার যুবক সন্তানের যুবতী পৃথিবীর সঙ্গে, তোমার বুড়ো বয়সের বুড়ি পৃথিবী মিলবে না। ব্যাস তাই বললেন—পৃথিবী গতযৌবনা। চলো মা এবার বনে গিয়ে মনের সুখে ঈশ্বরচিন্তা করবে।

কুন্তীর মনে আছে এসব কথা। মনে আছে বৃদ্ধা দিদি-শাশুড়ি তাঁর দুই শাশুড়ি অম্বিকা এবং অম্বালিকার হাত ধরে বনে চলে গিয়েছিলেন। যুবতী পৃথিবী রয়ে গেল অন্ধ যুবক ধৃতরাষ্ট্রের হাতে। তারপর কুরুক্ষেত্রবাহিনী গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। কুন্তী তাঁর শ্বশুরের শিক্ষায় নিজেই চলে যাচ্ছেন বনে। যুবতী পৃথিবী রইল তাঁর যুবক পুত্রদের হাতে। তাঁর তো আর কিছু করার নেই। ভীম বলেছিলেন—ছেলেরা তোমার রাজ্য পেয়েছে, সেই রাজ্য তুমি মনের সুখে ভোগ কর। কুন্তী সদর্পে উত্তর দিয়েছেন—রাজসুখ! রাজসুখ আমি অনেক ভোগ করেছি, পুত্র! আমার স্বামীর যখন সুখের দিন ছিল, তখন তাঁর রাজত্বে রাজরানি হয়ে রাজ্যসুখ আমি অনেক ভোগ করেছি—ভুক্তং রাজ্যফলং পুত্র ভর্তুর্মে বিপুলং পুরা। টাকা-পয়সা খরচা করার অজস্র স্বাধীনতা তিনি আমায় দিয়েছিলেন, অনেক অনেক দান করেছি আমি, তিনি কোনওদিন বাধা দেননি। আর আনন্দ! স্বামীর সঙ্গে একত্রে বসে সোমরস পান করেছি—পীতঃ সোমো যথাবিধি। আর কী চাই?

কুন্তীর কথাগুলির মধ্যে যেমন এক বিশাল ব্যক্তিত্ব আছে, তেমন অধিকার-বোধের মর্যাদা। বস্তুত কুন্তীর মতো একজন বিদগ্ধা রমণী যে জীবনবোধের কথা বলেছেন, সে জীবনবোধ যদি আমাদের থাকত তা হলে সংসারের অনেক বিপন্নতা এবং অসহায়তা থেকেই আমরা মুক্তি পেতাম। এ-কথাটা আপনারা মানবেন কিনা জানি না, আমি অন্তত মানি যে, স্বামীর অধিকারে স্ত্রীর যত মর্যাদা, পুত্রের অধিকারে তত নয়। পুত্র যদি অনেক গুণে গুণীও হন, তবুও নয়। বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বলা শৃঙ্গার রস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—'দোঁহার যে সমরস ভরতমুনি জানে।' অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য রসটা হল সমরস, দু'জনেই সে রসের সমান অংশীদার। এই মমতার সূত্রেই স্বামীর জীবিতকালে স্ত্রী যে অধিকার বোধ করেন, স্বেচ্ছায় যা দান-বিতরণ করতে পারেন, স্বামীর অবর্তমানে পুত্রের জমানায় সে অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে না। সমরস নয় বলেই তখন ব্যবহারে সংকোচ আসে। তা ছাড়া ততদিনে পুত্রের জীবনেও যেহেতু অন্যতরা এক সমরসিকার আবির্ভাব হয়, তাই জননীকে পূর্বতন স্মৃতি নিয়েই কাটাতে হয়। আর কুন্তীর মতো ব্যক্তিত্বময়ী রমণী হলে সেই পূর্বতন স্মৃতি নিয়েই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন—তাতে মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে।

সেকালের ক্ষত্রিয়া রাজমহিষীদের মদ্যপানে বাধা ছিল না। এখানে কুন্তী পাণ্ডুর সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একসঙ্গে বসে মদ্যপান করতেন—অথবা সোমকে যদি মদ্য নাই বলেন, তবে একসঙ্গে বসে সোমসুধা পান করতেন—এই কথাটা এখানে খুব বড় কথা নয়। এখানে সোমপানের ব্যঞ্জনাটা হল—তাঁরা একত্রে জীবনের চূড়ান্ত আনন্দও ভাগ করে নিতেন। কুন্তীর আনন্দের ভাণ্ডার সেদিনই পূর্ণ হয়ে গেছে। আজ স্বামীর অবর্তমানে পুত্রনির্ভর আনন্দে কুন্তীর তত ভরসা নেই, বরঞ্চ সংকোচ আছে, কেন না তাঁর কাছে এখন তাঁর পৃথিবী গতযৌবনা। বরঞ্চ ক্ষত্রিয়া বধূ এবং রাজরমণীদের মর্যাদায় বিদুলার কথা বলে তিনি যে স্বামীর অবর্তমানেও পুত্রদের স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন, এইটুকুই ক্ষত্রিয় বিধবার পক্ষে যথেষ্ট। পুত্রদের দেওয়া রাজ্যসুখে আজ আর তাঁর কোনও আকাঙ্ক্ষাই নেই—নাহং রাজ্যফলং পুত্রা কাময়ে পুত্র-নির্জিতম্। রাজ্যসুখ তিনি স্বামীর আমলেই যথেষ্ট ভোগ করেছেন, এখন কোনও অগৌরবের ছোঁয়ায় সেই পূর্বতন গৌরব যাতে কলুষিত না হয়, সেইজন্যই আজ কুন্তীর এই অপ্রত্যাশিত বানপ্রস্থ।

স্বামীর মৃত্যুর পর কতগুলি অসহায় বালককে নিয়ে তিনি হস্তিনায় এসেছিলেন। সেইদিন থেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কুন্তী তাঁর ভাশুরঠাকুর ধৃতরাষ্ট্রের কাছে করুণা পাননি। আজ যখন বৃদ্ধ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র, সহায়সম্বল সব গেছে, তখন কুন্তী অসীম করুণায় হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন শাশুড়ি-কল্প গান্ধারীর অসহায় হাতে। তিনি আজ এই দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে নিয়ে চলেছেন হাত ধরে বনের পথে। স্বামীকে তিনি বেশিদিন ইহলোকে পাননি, তাঁর অবর্তমানে স্বামীর রক্ত-মাংস যাঁর দেহে-কোষে আছে, সেই ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করে তিনি খানিকটা স্বামীসেবার সান্ত্বনা পেতে চান। ছেলেদের বলেছেন দৃঢ় সংকল্পে—ফিরে যাও বাছারা—নিবর্তস্ব কুরুশ্রেষ্ঠ। জীবনের যে ক'টা দিন বাকি আছে, ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারীর মতো শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করে আমি আমার পতিলোকে যাত্রা করতে চাই।

কুন্তী চলে গেলেন। সদর্পে মাথা উঁচু করে চলে গেলেন। যুধিষ্ঠির ভীম—এঁরা যেন একটু লজ্জাই পেলেন—ব্রীড়িতা সন্ন্যবর্তন্ত। ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী অবশ্য কুন্তীকে ফিরে যাওয়ার জন্য অনেক বোঝালেন, কিন্তু কুন্তী ফিরলেন না। ফিরলেন না, কারণ, আমার ধারণা, সেই শ্বশুর ব্যাসদেবের কথা কুন্তীর মনে আছে—পৃথিবী গতযৌবনা। ফিরলেন না, কারণ কুমার যুধিষ্ঠির পুত্রশোকার্তা ক্ষত্রিয়া জননীকে কর্ণের কথা বলে একবার হলেও অতিক্রম করেছে। এই অতিক্রম যে বারবার ঘটবে না তার কী মানে আছে—পৃথিবী গতযৌবনা। তাঁর সময় চলে গেছে। কুন্তী যে দৃঢ়তা নিয়ে পুত্রদের যুদ্ধে উত্তেজিত করেছিলেন, সেই দৃঢ়তা নিয়েই আজ বনে চলে গেলেন।

অগত্যা যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের নিয়ে কৃষ্ণা-পাঞ্চালীকে নিয়ে ফিরে এলেন হস্তিনায়। মা চলে গেছেন, রাজকার্যে তাঁদের মন বসে না। কিছুদিন যাবার পরেই যুধিষ্ঠির লোক-লস্কর সঙ্গে নিয়ে ভাই, বউ আত্মীয় পরিজন সঙ্গে নিয়ে চললেন বনের পথে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। কুন্তীরা তখন সবাই শতযূপ মুনির অরণ্য আশ্রমে থাকেন। পাণ্ডবরা লোকমুখে খবর নিতে নিতে শতযূপের আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। তপস্বী বালকেরা বনের মধ্যে রাজপুরুষ, পাইক-বরকন্দাজ দেখে অবাক হয়ে গেল। যুধিষ্ঠির তপস্বী বালকদের

শুধোলেন—আমরা যে শুনেছিলাম এখানেই আছেন তাঁরা। কাউকেই তো দেখছি না। বালকেরা বলল—এই তো যমুনায় গেছেন জল আনতে, পুজোর জন্য ফুল তুলতে।

পাঁচ ভাই পাণ্ডব সঙ্গে সঙ্গে চললেন যমুনার দিকে। দেখলেন—বৃদ্ধা কুন্তী এবং গান্ধারী কলসী কাঁখে জল নিয়ে ফিরছেন যমুনা থেকে। সঙ্গে সুস্নাত ধৃতরাষ্ট্র। মাদ্রীপুত্র কনিষ্ঠ সহদেব তো শিশুর মতো ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন কুন্তীকে—সহদেবস্তু বেগেন প্রাধাবদ্ যত্র সা পৃথা। আমি আগেই বলেছি—কুন্তী এই সপত্নী পুত্রটিকে কত ভালবাসতেন। সহদেব কুন্তীকে জড়িয়ে ধরে যত কাঁদেন, কুন্তীও ততই কাঁদেন। সাশ্রুকণ্ঠে সানন্দে আর কোনও বীরপুত্রের কথা না বলে গান্ধারীকে তিনি খবর দেন—আমার সহদেব এসেছে, দিদি, সহদেব এসেছে। পাণ্ডবরা একে একে সবাই কুন্তীর কাছে এলেন, তাঁদের কাঁখের কলসী তুলে নিলেন নিজের মাথায়। সবাই ফিরে এলেন শতযূপের আশ্রমে।

মহামতি ব্যাসের আজ অন্যরূপ। নিজেরই পুত্র-প্রপৌত্র, পুত্রবধূরা সব এক জায়গায়। ধৃতরাষ্ট্র-কুন্তী-গান্ধারীকে তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করে বললেন—কী চাও তোমরা বলো। আজ আমি আমার যোগসিদ্ধির ঐশ্বর্য দেখাব। বলো কী চাও? ব্যাস বুঝতে পারছিলেন—ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী এই নির্জন বনে এসে যত তপস্যাই করুন, তাঁদের মনে এখনও কাঁটার মতো ফুটে আছে শত-পুত্রের শোক। ব্যাসের কথা শুনেই ধৃতরাষ্ট্র কেঁদে ফেললেন। গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের মনের কথা কেড়ে নিয়ে দ্রৌপদী, সুভদ্রা, সবার মন বুঝে বললেন—এতই যদি আপনার দয়া, তবে আমার মতো অভাগা রমণীদের, যাদের পুত্র গেছে, স্বামী গেছে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে, তাঁদের স্বামী-পুত্রদের একবার দেখান না দয়া করে।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কুন্তীর মনের মধ্যে বিদ্যুৎশিখার মতো ভেসে এল কর্ণের প্রতিচ্ছবি, চিরকালের লুকিয়ে রাখা সূর্য-সম্ভবা দীপ্তি—কর্ণ, সেও কি লুকিয়ে রাখা যায়? একবার কি কুন্তী অসাড়ে অস্পষ্টভাবে উচ্চারণও করে ফেলেছিলেন কর্ণের নাম? কেন না ব্যাসের বিশেষণ দেখছি—দূরশ্রবণদর্শনঃ—যিনি দূরের কথা শুনতে পান, মনের ছবি দেখতে পান। ব্যাস কুন্তীকে দেখলেন বড় মনমরা। স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করলেন—কুন্তী! বলো তুমি। তোমার মনে কীসের কষ্ট; খুলে বলো আমায়।

এই মুহূর্তে কুন্তীকে আমরা দেখছি আত্মনিবেদনের পরম পরিসরে। কুন্তী বললেন—আপনি আমার সাক্ষাৎ শ্বশুর। দেবতার দেবতা। আমার এই চরম সত্যের স্বীকারোক্তি আমার দেবতাদের দেবতাকে আমি শোনাতে চাই—স মে দেবাতিদেবস্ত্বং শৃণু সত্যাং গিরো মম।

আমার সহৃদয় পাঠককুল। আমি আগেই আপনাদের জানাই—কুন্তী কর্ণের কথা বলবেন! মনে রাখবেন—এখানে তাঁর পুত্র যুধিষ্ঠির বসে আছেন, যে যুধিষ্ঠির মাকে মৃদু অভিশাপ দিয়েছিলেন কর্ণের কারণে। মনে রাখবেন, এখানে তাঁর স্বামীজ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র আছেন, গান্ধারী আছেন, আছেন কুলবধূরা—যাঁরা শাশুড়ির কীর্তি শুনে ছ্যা-ছ্যা করতে পারেন। কুন্তী আজ সবার সামনে, বিশেষত দেবকল্প শ্বশুর ব্যাসের সামনে নিজের চরম স্বীকারোক্তি করছেন। প্রথমজন্মা সূর্যসম্ভব যে পুত্রটি তাঁর সারাজীবনের পুলক-দীপ্তি হয়ে থাকতে পারত, তাকে সারাজীবন লুকিয়ে রাখার যন্ত্রণা তাঁকে পাপের মতো পুড়িয়ে মারে। যে সারা জীবন পাপের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো করে অন্তরে লুকিয়ে ছিল, তাকেই আজকে কুন্তী দেখতে চান এবং দেখাতে চান সবার সামনে, প্রাণ ভরে, প্রথম পুত্রের সম্পূর্ণ মর্যাদায়।

এই ঘটনাটা আমি কুন্তীর জীবনে অসীম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। জীবনের আরম্ভে প্রথম যৌবনের রোমাঞ্চের দিনে যাঁকে দিয়ে কুন্তী প্রথম মাতৃত্বের স্বাদ পেয়েছিলেন, সারাজীবন তাঁকে মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখে আজ তিনি তাঁকে সর্বসমক্ষে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। পাঁচ ভাই পাণ্ডবকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠা করা তাঁর কাছে যতখানি ছিল, এ তার থেকেও বেশি—আপন মাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা, প্রথমজন্মা পুত্রের প্রতিষ্ঠা। কুন্তী যাঁকে দিয়ে জীবন আরম্ভ করেছিলেন আজ শেষের দিনে তাঁকেই দেখতে চাইছেন। পরম প্রিয় স্বামী নয়, পুত্রদাতা দেবতাদের নয়, যাঁকে দিয়ে কুন্তী নিজের গর্ভের মধ্যে দ্বিতীয় সত্তার আনন্দ পেয়েছিলেন প্রথম, কুন্তী তাঁকেই শেষের দিনে দেখতে চাইছেন, দেখতে চাইছেন কর্ণকে। হয়তো এইজন্যই, এই মাতৃত্বের প্রতিষ্ঠার জন্যই কুন্তী পঞ্চ পুণ্যবতী রমণীর মধ্যে একতমা—অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা। এর পরেও কে তাঁকে কুলকঙ্কষা বলে তিরস্কার করবে?

কুন্তী বললেন—আপনি তো জানেন, সেই ঋষি দুর্বাসা কেমন করে ছিলেন আমার ঘরে। কেমন করে আমি তাঁর সেবা করেছি। সেই যুবতী বয়সে তাঁর ওপরে রাগের কারণ অনেক ছিল আমার, কিন্তু আমি ক্রুদ্ধ হইনি। আমি যে তাঁর কাছে বর নিয়েছি, তাও তাঁর শাপের ভয়ে, আমি নিজে কোনও বর চাইনি। তিনি দেবতার আহ্বান আর সঙ্গমের মন্ত্র দিলেন আমার কানে। তখন আমার কী বা বয়স, যৌবনের স্পষ্টাস্পষ্ট রহস্য জানতে গিয়ে আমি সেদিন আহ্বান করে বসলাম দেব দিবাকরকে। আমার মূঢ় হৃদয়ের কৌতূহলী আহ্বান সত্য করে দিয়ে হঠাৎ তিনি এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে। বিশ্বাস করুন—আমি তখন কাঁপছিলাম। কত কেঁদে পায়ে ধরে বলেছিলাম—তুমি চলে যাও এখান থেকে—গম্যতামিতি। কিন্তু গেলেন না, শাপের ভয়, ধ্বংসের ভয় দেখিয়ে নিজের দীপ্ত তেজে আমাকে আকুল করে আমাতে আবিষ্ট হলেন তিনি—ততো মাং তেজসাবিশ্য মোহয়িত্বা চ ভানুমান্। হায়! তারপর সেই গূঢ় জাত প্রথমজন্মা পুত্রকে আমার জলে ভাসিয়ে দিতে হল। সূর্যের প্রসন্নতায় আমি যেমন অনূঢ়া কন্যাটির মতো ছিলাম, তাই হলাম আবার।

তবু, কিন্তু তবু, সেদিন আমার সেই ছেলেটিকে—যাকে আমি আমার ছেলে বলে জেনেও অবহেলা করলাম, ভাসিয়ে দিলাম জলে, তার জন্য আমার শরীর মন সবসময় জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে। আপনি বোঝেনও সে কথা—তন্মাং দহতি বিপ্রর্ষে যথা সুবিদিতং তব। এতক্ষণ সম্পূর্ণ স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করে কুন্তী এবার তাঁর কৃতকর্মের ন্যায়-অন্যায় যাচাই করতে চাইছেন। কুন্তী জানালেন—সব আপনাকে বললাম। আমার পাপ হয়েছে, না হয়নি, আমি তার কিচ্ছু জানি না। আমি শুধু আমার সেই ছেলেকে একবার দেখতে চাই—তং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভগবন্—আপনিই তাকে দেখাতে পারেন।

অসামান্য দীর্ঘদর্শিতার কারণে ব্যাস জানেন যে, কন্যা অবস্থায় পুত্রজন্মের জন্য কুন্তীর চরিত্রে পাপের স্পর্শ লেগেছিল কি না—এই প্রশ্ন কুন্তীকে যেমন সারাজীবন কুরে কুরে খেয়েছে, তেমনি এই প্রশ্ন অন্যদের মনেও আছে। কুন্তীর কথার উত্তরে ব্যাস প্রথমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন—তোমার কোনও দোষ ছিল না কুন্তী—অপরাধশ্চ তে নাস্তি। আর দোষ ছিল না বলেই পুত্রের জন্মের পরেও তুমি দেবতার আশীর্বাদে পূর্বের সেই কন্যাভাব আবারও লাভ করেছ। আসলে কী জান—দেবতারা ওইরকমই। তাঁদের অলৌকিক সিদ্ধি আছে, অতএব ওইভাবেই তাঁরা মনুষ্যশরীরে আবিষ্ট হন। তাঁদের এই অলৌকিক দেহ-সংক্রমণ সত্ত্বেও তুমি যেহেতু অন্য মানুষের মতোই মনুষ্যধর্মেই বর্তমান, সেই হেতু তোমার কোনও দোষ এখানে নেই। ভাবটা এই—যদি দোষ থাকে তবে সেই দেবতার। তবে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাস তাঁর এই ভাব-ব্যঞ্জনা শুদ্ধ করে দিয়ে বলেছেন—আসলে কারওই দোষ নয় কুন্তী—অসামান্য দৈব তেজে বলীয়ান ব্যক্তির দোষ সাধারণের মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না, বড় মানুষের সবই ভাল, সবই শুদ্ধ। আর তোমার কী দোষ, তুমি আগেও যা ছিলে, দেবসঙ্গমের পরেও তাই ছিলে—সেই লজ্জারুণা কন্যাটি—কন্যাভাবং গতা হ্যসি।

প্রশ্নের মীমাংসা হল। মীমাংসা করলেন মহাভারতের হৃদয়-জানা কবি, মীমাংসা করলেন ঋষি-সমাজের মূর্ধণ্য-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত কন্যা-সত্যবতীর জাতক পারাশর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব। ব্যাস উত্তর দিলেন মানে, প্রশ্নের সমাধান সবারই হয়ে গেছে। এইবার মৃতজনদের সামনে নিয়ে আসার জন্য আপন যোগৈশ্বর্য প্রকট করবেন ব্যাস। তিনি ভাগীরথীতে স্নান করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মৃত প্রিয়জনদের আহ্বান করলেন আবাহান মন্ত্রে। ভাগীরথীর তীরে তুমুল কোলাহল শোনা গেল—কর্ণ, দুর্যোধন, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পাঁচ ছেলে, দুঃশাসন, শকুনি, ঘটোৎকচ সবাই সশরীরে দেখা দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা—সকলে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লেন।

লক্ষণীয় বিষয় হল—এই যে মৃত ব্যক্তিরা সব ব্যাসের তপঃসাধনে ভাগীরথী তীরে সশরীরে উপস্থিত হলেন, এঁদের কারও মনে কোনও গ্লানি নেই, ক্রোধ নেই, অসূয়া নেই, ঈর্ষা নেই—নির্বৈরা নিরহংকারা বিগতক্রোধমৎসরাঃ। অত্যন্ত স্বাভাবিক রাজকীয় মর্যাদায় তাঁদের দেখা যাচ্ছে। যেমন তাঁদের বেশ-ভূষা, তেমনই ভাস্বর তাঁদের শরীর-সংস্থান। জীবিত অবস্থায় যে মহাবীরের যেমন বেশ ছিল, যেমন ছিল তাঁদের রথ, বাহন, ঠিক তেমনই রথে চড়ে, ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত্তুর সব উপস্থিত হলেন মায়ের সামনে, পিতার সামনে, প্রিয়তমা পত্নীর সামনে।

এমন করে কুন্তী কর্ণকে কোনওদিন দেখেননি। এমনভাবে, এমন সহানুভূতির মহিমায় কোনওদিন কুন্তী কর্ণকে এমন দেখেননি। পুনর্জীবিত অবস্থায় কর্ণকে কুন্তী দেখলেন অন্য এক মূর্তিতে। ভাগীরথীর তীরে কর্ণকে দেখামাত্রই পাঁচভাই পাণ্ডবরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ধেয়ে গেলেন তাঁর দিকে—সম্প্রহর্ষাৎ সমাজগ্মুঃ। পরস্পরকে স্বাভাবিক ভ্রাতৃস্থানে পেয়ে ভারী খুশি হলেন তাঁরা—ততস্তে প্রীয়মানা বৈ কর্ণেন সহ পাণ্ডবাঃ।

ঠিক এইরকম একটা দৃশ্যই তো কুন্তী সারাটা জীবন ধরে পরম কামনায় দেখতে চেয়েছেন। পাঁচ ভাই নয়, ছয় ভাই যেন এই অনন্ত সৌহার্দ্যে বাধা পড়ে—এই তো কুন্তীর চিরকালের বাসনা। শ্বশুর ব্যাসের করুণায়—চিত্রং পটগতং যথা—এই পরম ঈপ্সিত ছয় ভাইয়ের মিলন দেখে কুন্তীর সব আশা পূরণ হয়ে গেল। টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখেছেন—এই দৃশ্যকে স্বপ্ন বলা যাবে না, কেননা তা হলে বলতে হবে ব্যাস 'ম্যাজিক' দেখাচ্ছেন। মোহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা ভ্রান্তিও বলা যাবে না কারণ ঋষি-চূড়ামণি ব্যাস আপন বিদ্যায় এবং তপস্যার মাহাত্ম্যে এই নিষ্পাপ প্রত্যক্ষ মনুষ্য-রূপ দেখাচ্ছেন। বস্তুত কুন্তী যে ব্যাসের বিদ্যায় পুত্রকে স্বরূপে দেখতে চেয়েছিলেন, তা শুধু এই অসামান্য দৃশ্যটির জন্য। মহাভারতের কবি এ-কথা লেখেননি যে, কর্ণকে দেখামাত্র কুন্তী ছুটে গেছেন তাঁর কাছে। লিখেছেন—ভাইরা সানন্দে ছুটে গেছেন তাঁর কাছে। কুন্তী তো এইটাই দেখতে চেয়েছেন সারা জীবন ধরে। তাঁর কন্যা অবস্থার প্রচ্ছন্নজাত পুত্রটি স্নেহের সরণিতে কোনওমতেই যে বিধিসম্মত পুত্রদের থেকে আলাদা নয়, সেই প্রতিষ্ঠাই তাঁর জীবনের প্রতিষ্ঠা।

বস্তুত এই অসম্ভব এবং অসামান্য এক চিত্রকল্পের পর আমার দিক থেকে কুন্তীর জীবনের আর কোনও ঘটনা জানানোর ইচ্ছে নেই। মহাভারতকে পৌরাণিকেরা 'ইতিহাস' বলেন। কুরু-পাণ্ডব বংশের সার্থক ঐতিহাসিক হিসেবে এরপর ব্যাসকে লিখতে হয়েছে পাণ্ডবদের হস্তিনায় ফিরে যাওয়ার কথা। লিখতে হয়েছে—কেমন করে যাবার সময় পাণ্ডব-কনিষ্ঠ সহদেব কুন্তীকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলেছিলেন—মা! এই অরণ্য আশ্রমে তোমায় ফেলে রেখে কিছুতেই আমি হস্তিনায় ফিরে যাব না। লিখতে হয়েছে—নির্জন বৈরাগ্য সাধনের জন্য কীভাবে কুন্তী সহদেবকে সাশ্রু বিদায় দিয়েছেন। এমনকী লিখতে হয়েছে—প্রজ্জ্বলিত দাবানলে তপোনিষ্ঠ কুন্তীর মৃত্যুর কথাও।

কিন্তু কেন জানি না—ওই ভাগীরথী-তীরে কর্ণকে পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে মিলিত দেখার ঘটনাই আমার কাছে কুন্তীর জীবনের শেষ দৃশ্য বলে মনে হয়। পরেরটুকু মহাকাব্য নয়, ইতিহাস, সমস্ত মহাভারতের মধ্যে প্রায় কোনও অবস্থাতেই কুন্তীকে আমরা নিশ্চিন্ত এবং আনন্দিত দেখিনি। সেই কন্যা অবস্থায় রাজপ্রাসাদের অলিন্দে রক্তিম সূর্যকে দেখে কুন্তীকে আমরা সানন্দ-কুতূহলে যৌবনের আহ্বান জানাতে দেখেছিলাম। আর আজ এই ভাগীরথীতীরে তাঁর প্রথমাজন্মা পুত্রের প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠায় কুন্তীকে আমরা সানন্দমনে তপস্যার পথে পা বাড়াতে দেখলাম। ব্যাসকে তিনি বলেছিলে—পাপ হোক পুণ্য হোক আমি আমার সেই ছেলেকে একবার দেখতে চাই। কিন্তু কর্ণের ওই ভ্রাতৃমিলনের পর কুন্তীকে এখন আমরা অনন্ত বৈরাগ্যময় এক বিশাল বিশ্রামের মধ্যে পরিতৃপ্ত দেখতে পাচ্ছি, যে দুধের ছেলেটিকে কুন্তী জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, সেই জল বাহ্যত অশ্বনদীর হলেও কুন্তীর অন্তরবাহিনী ফল্গু নদীতে কর্ণ চিরকাল ভেসে চলেছেন। আজ ব্যাসের ইচ্ছায় সেই অন্তর-ফল্গুর বালি খুঁড়ে কুন্তী কর্ণকে তুলে আনলেন সবার সামনে। এর পরে আর তাঁর পাবার কিছু নেই। যাঁকে প্রথম দিনে পেয়েছিলেন অসীম কৌতুকে ছলনায়, আজ শেষের দিনে তাঁকেই পেলেন আন্তর প্রতিষ্ঠায়, পরম প্রশান্তিতে। এখন তাঁর কোনও পাপবোধ নেই, জবাবদিহি নেই, শান্ত সুস্থভাবে এখন তিনি ছেলেদের বলতে পারেন—তোমরা প্রকৃতিস্থ হও বাছারা—স্বস্থা ভবত পুত্রকাঃ। তোমরা ফিরে যাও, আমাদের আয়ু আর বেশি নেই—তস্মাৎ পুত্রক গচ্ছ ত্বং শিষ্টমল্পং চ নঃ প্রভো।

তোমরা প্রকৃতিস্থ হও, ফিরে যাও এবার— এ-কথাটা কুন্তীকে বলতে হয়েছে সর্বশেষের মায়া কাটিয়ে। ব্যাসের যোগজ পুণ্যবলে কুন্তী তাঁর মৃত পুত্রকে দেখে খুশি হয়েই ছিলেন, আর কোনও আক্ষেপও ছিল না তাঁর। কিন্তু যুধিষ্ঠির তাঁর ভাই এবং ভার্যাদের নিয়ে তখনও

ধৃতরাষ্ট্রের অরণ্য আবাসে আছেন এবং তাতে প্রত্যেকেরই মায়া বাড়ছে বই কমছে না। দুই পক্ষেই কোনও ভাবান্তর না দেখে বৈরাগ্যবিদ্য ব্যাসই শেষে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, যুধিষ্ঠির তো এবার দেশে ফিরে যেতে চাইছে, রাজ্যপালন তো আর সোজা কথা নয়! ওর যাওয়া দরকার। তুমি বিদায় দাও ওকে। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বিদায় দিয়ে বললেন, তোমার মাধ্যমেই আমি পুত্রলাভের ফল পেয়েছি, তুমি এই অরণ্য-আবাসে এসেও আমাকে অনেক আনন্দ দিয়েছ, তুমি ফিরে যাও এবার। ধৃতরাষ্ট্র এবার মায়ার কথাটা বলেই ফেললেন। বললেন, দেখো বাছা! এখানে আমরা ত্যাগ বৈরাগ্যের ব্রত নিয়ে আছি, তুমি এখানে থাকলে পরে স্নেহ-মায়ায় সেই তপস্যার ক্ষতি হয়। অতএব তুমি ফিরে যাও এবার— ভবন্তঞ্চেহ সম্প্রেক্ষ্য তপো মে পরিহীয়তে।

তাঁর নিজের কথাটা যে কুন্তীর ব্যাপারেও খাটে, সেটা বুঝেই ধৃতরাষ্ট্র বললেন, তোমার দুই মা, গান্ধারী এবং কুন্তী শুকনো পাতা খেয়ে আমারই মতো নিয়ম পালন করে চলেছেন— মাতরৌ তে তথৈবেমে জীর্ণপর্ণাকৃতাশনে— খুব বেশিদিন এঁরা বাঁচবেনও না। তা ছাড়া জীবনে যা পাবার ছিল পেয়েছি, এখন কঠিন তপস্যাই করতে চাই, তুমি ফিরে যাও। ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনে যুধিষ্ঠির বললেন, আমাকে এইভাবে আপনি বিদায় দেবেন না। আমার ভাইরা বরং সবাই ফিরে যাক হস্তিনায়, এখানে আমি আপনার এবং আমার দুই জননীর সেবা করে দিন কাটাতে চাই সংযত হয়ে। এটা বোঝাই যায় যে, ছেলেদের নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী যত যন্ত্রণা পেয়েছেন, এখন তাতে এই বৈরাগ্যের সাধন তাঁদের প্রায়শ্চিত্তের মতো, কিন্তু কুন্তীর এই কঠিন তপশ্চরণ যুধিষ্ঠির মেনে নিতে পারছেন না। আমাদের ধারণা, সেই কারণেই যুধিষ্ঠির একাকিনী মায়ের জন্য তিনজনের সেবাই অঙ্গীকার করতে চাইছেন।

আমাদের তর্কানুমান যে সত্যি, তা যুধিষ্ঠিরের পরবর্তী কথা থেকেই প্রমাণ হয়ে যায়। ধৃতরাষ্ট্রের মতো গান্ধারীও যখন যুধিষ্ঠিরের আবেদন-নিবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন স্নেহশীলা জননী কুন্তীর চোখে কিন্তু জল এসে গেছে, যুধিষ্ঠির গান্ধারীর প্রত্যাখ্যাত অশ্রুজল মুছে নিয়ে রোদনপরা কুন্তীকে নিজের মানসিক অবস্থার কথাটা সবিস্তারেই জানালেন— স্নেহবাষ্পাকুলে নেত্রে প্রমৃজ্য রুদতীং বচঃ। যুধিষ্ঠির বললেন, 'মা! যশস্বিনী গান্ধারী তো আমাকে বিদায় দিয়ে দিলেন, কিন্তু তুমি আমার গর্ভধারিণী মা, তোমার ওপর থেকে মন উঠিয়ে নিলে আমার যে দুঃখ হবে, সেই দুঃক বুকে নিয়ে আমি ফিরে যাই কী করে— ভবত্যাং বদ্ধচিত্তস্তু কথং যাস্যামি দুঃখিতঃ?

সত্যি বলতে কী, জাগতিক জীবনের অনন্ত জটিলতা এবং এক বিরাট যুদ্ধের অবক্ষয় দেখে যুধিষ্ঠিরের মনেও এক ধরনের নির্বেদ উপস্থিত হয়েছে। হস্তিনায় রাজ্যাভিষেকের প্রাক্-মুহূর্তে তাঁর অনীহা আমরা দেখেছি, এখন বোধ করি কুন্তীকে দেখে তিনি আরও অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। কুন্তী তো তাঁর পুত্রদের সদ্যোলব্ধ সমৃদ্ধ রাজৈশ্বর্য ছেড়ে ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর অনুগামিতায় বনবাসী হয়েছেন। অনেক থাকা সত্ত্বেও সেই ধনৈশ্বর্য ত্যাগ করে আসার মধ্যেই ঐশ্বর্য লুকিয়ে আছে— যুধিষ্ঠির এই তত্ত্বটা তাঁর মায়ের উদাহরণেই সবচেয়ে ভাল বোঝেন বলে আজ এই অরণ্য-আবাসের মধ্যে বৈরাগ্যের সাধনই তাঁর কাছে শ্রেয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং শ্রেয় বলে মনে হচ্ছে। তিনি কুন্তীকে বললেন, ধর্মচারিণী মা আমার! আমি তোমার তপস্যায় কোনও বাধা দিতে চাই না, কেননা তপস্যার ওপরে মঙ্গল-লাভের আর কোনও উপায় নেই। কিন্তু এটাও জেনো, আমারও আর আগের মতো রাজ্য-শাসনে নিযুক্ত থাকতে ইচ্ছে করে না—মমাপি ন তথা রাজ্ঞি রাজ্যে বুদ্ধির্যথা পুরা। আমারও তাই তপস্যার দিকেই মন তৈরি হয়েছে।

মহাভারতের পূর্বাংশ থেকে আমরা জানি যে, রাজ্যশাসন এবং প্রজাপালনের ক্ষাত্র-বৃত্তি যুধিষ্ঠিরের কোনও কালেই পছন্দ ছিল না, এমনকী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধোত্তর কালে দ্বিতীয়বার তিনি রাজ্য গ্রহণই করতে চাননি। বিশেষত, আপনজনদের মৃত্যুর অনুতাপ যুধিষ্ঠির এখনও ভুলতেই পারেননি। ফলত তাঁর প্রতিক্রিয়াটা এই বানপ্রস্থের পরিসরে অন্যদের চেয়ে আলাদা। কুন্তীকে তিনি বলেছেন— রাজ্যশাসন করতে আর আমার ভাল লাগে না, মা! এই পৃথিবী শূন্য হয়ে গেছে, আত্মীয়-বন্ধুরা কেউই প্রায় বেঁচে নেই, ফলে মিত্রহীন অবস্থায় আমার শক্তিও তো আর আগের মতো নেই— বান্ধবা নঃ পরিক্ষীণা বলং নো ন যথা পুরা। আমাদের বড় সহায় এবং বৈবাহিক কুটুম্ব ছিলেন পাঞ্চালরা, তাঁরা এখন মানুষের কথায় এবং স্মরণ-কর্মে অবশিষ্ট আছেন মাত্র, শেষমেশ অশ্বত্থামা তাঁদের এমনই সর্বনাশ করেছে যে, তাঁদের বংশধর কাউকে খুঁজে পাই না আমি। তাঁরা শেষ হয়ে গেছেন— পাঞ্চালাঃ সুভৃশং ক্ষীণা কথামাত্রাবশেষিতাঃ। শিশুপালের মৃত্যুর পর চেদিবংশীয়রা এবং অজ্ঞাতবাসের সুবাদে মৎস্যদেশীয়রা আমাদের বন্ধু হয়েছিলেন। এই যুদ্ধে শেষ হয়ে গেছেন তাঁরাও। শুধু বৃষ্ণিবংশীয়রা বেঁচে আছে এবং সেই বংশেও শুধু কৃষ্ণ আছেন বলে এখনও আমি রাজধর্ম পালন করে যাচ্ছি।

যুধিষ্ঠির নিজের নিরানন্দের বার্তা দিয়ে কুন্তীকে বলতে চাইছেন— আমি আর ঘরে ফিরতে চাই না। এরপর ধৃতরাষ্ট্রও কঠিন তপস্যায় নিমগ্ন হবেন, তোমার দেখভালের জন্য একজন পুরুষও অবশিষ্ট থাকবে না। অতএব আমি এখানে থেকে যেতে চাই। যুধিষ্ঠিরের এই বৈরাগ্যযোগে প্রথম যিনি বাধা হয়ে দাঁড়ালেন, তিনি পাণ্ডব-কনিষ্ঠ সহদেব। মাদ্রীর এই ছেলেটির জন্য কুন্তীর স্নেহের অন্ত ছিল না। পাণ্ডবদের বনবাস-যাত্রার সময় নিজের গর্ভজাত কোনও ছেলের জন্য পুত্রবধূ দ্রৌপদীকে তিনি অনুনয় করেননি, কিন্তু সহদেবের জন্য পুত্রবধূর কাছেও অনুরোধ করেছিলেন কুন্তী। বস্তুত তাঁর জন্য কুন্তীর এই মায়ার কথা সহদেবও জানেন, আর সেইজন্যই যুধিষ্ঠিরকে বাধা দিয়ে সহদেব বললেন, আমি থাকব এখানে। পিতৃকল্প ধৃতরাষ্ট্র এবং দুই মায়ের সেবা করে আমি শরীর শুষ্ক করতে চাই এখানে। আমি কুন্তী-মাকে ছেড়ে কোথাও যাব না, দাদা! তুমি হস্তিনায় ফিরে যাও— নোৎসহেহহং পরিত্যক্তুং মাতরং ভরতর্ষভ।

কুন্তী স্নেহের আবেগে জড়িয়ে ধরলেন সহদেবকে। সেই কোন শিশুকালে স্বামী-সহমরণে যাবার আগে মাদ্রী তাঁকে বলে গিয়েছিলেন— আমার এই ছেলে দুটিকে দেখে রেখো। কিন্তু দেখতে দেখতে এই কনিষ্ঠতমটির ওপরে কুন্তীর এতই স্নেহ জন্মেছিল যে, সহদেব কিছু বললে কুন্তীর পক্ষে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা প্রায় অসম্ভব হয়। তবুও কুন্তী দীর্ঘ বনবাসের স্থিতবুদ্ধিতে এবং পরম নিষ্কামতায় সহদেবকে জড়িয়ে ধরে বলেছেন, সহদেব!

এমন করে তুই বলিস না বাছা। আমার কথা শোন, তোমরা সবাই হস্তিনায় ফিরে যাও— গম্যতাং পুত্র মৈবং ত্বং বোচঃ কুরু বচো মম। তোমরা এখানে এসেছিলে খুব ভাল হয়েছে, তোমরা ভাল থাকো সকলে, কিন্তু এটাও তো বুঝবে বাছারা যে, তোমাদের স্নেহমায়ায় যদি আবদ্ধ হয়ে পড়ি, তা হলে আর এই বৈরাগ্যের তপস্যা করব কী করে? তোমরা যে কেউ এখানে থাকলে তোমাদের মায়ায় তপস্যার পথ থেকে ভ্রষ্ট হব আমরা। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের আর আয়ু বেশি নেই, অতএব ফিরে যাও, বাছা! কুন্তী সহদেবকে উদ্দেশ করেই শেষ কথাটা বললেন— তস্মাৎ পুত্রক গচ্ছ ত্বং শিষ্টমল্পঞ্চ নঃ প্রভো।

কুন্তীর কথায় সহদেবেরও আর উপায় থাকল না, যুধিষ্ঠিরেরও আর উপায় থাকল না থেকে যাবার। পাণ্ডবরা গান্ধারী এবং কুন্তীর চরণ ধরে যাবার অনুমতি চাইলেন সাশ্রুকণ্ঠে। ব্যাস লিখেছেন, গোবৎসকে জননীর দুগ্ধপান থেকে নিবারিত করলে সে যেমন গাভী-মায়ের দিকে বারবার চায়, আর চরম অনিচ্ছায় যেতে বাধ্য হয়, পাণ্ডবরা তেমনই কুন্তীর দিকে বারবার তাকাতে তাকাতে হস্তিনায় ফিরে যাবার পথ ধরলেন অনিচ্ছায়— পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষন্তঃ প্রচক্রুস্তে প্রদক্ষিণম্।

হস্তিনায় ফিরে আসার পর দুই বৎসর কেটে গেছে। পাণ্ডবরা কুন্তীর কোনও খবর পাননি। আর তিনি যেভাবে বলেছিলেন, তোমরা কেউ এখানে থাকলে আমাদের তপস্যার বিঘ্ন হয়— উপরোধো ভবেদেবম্ অস্মাকং তপসঃ কৃতে— তাতে যুধিষ্ঠিরদের কারও আর সাহসও হয়নি আবার গিয়ে তাঁর খবর নেবার। বস্তুত পাণ্ডব-ভাইরা সবাই কুন্তীকে চেনেন, তাঁর 'অথরিটি', তাঁর গম্ভীরতা এবং সবার ওপরে তাঁর কথার মূল্য। যে জননী বনবাসী পুত্রদের উদ্দেশে মৃত্যুপণে যুদ্ধের পরামর্শ দিয়েছিলেন, যিনি সুদুস্ত্যজা রাজলক্ষ্মীকে হেলায় ফিরিয়ে দিয়ে পুত্রহীনা গান্ধারী এবং অন্ধ ভাশুরের সেবার জন্য বানপ্রস্থে গেছেন, তাঁর বারণ সত্ত্বেও সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করাটা পাণ্ডবদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। যুধিষ্ঠির তাই সেদিকে পা বাড়াননি, কিন্তু খবরটা পেতে যেন একটু দেরিই হয়ে গেল।

অন্তত দু-বছর পর দেবর্ষি নারদ ঘুরতে ঘুরতে হস্তিনায় এসে পৌঁছোলেন। যুধিষ্ঠির তাঁর কাছে খবর চাইলে নারদ বললেন, আমি এখন ধৃতরাষ্ট্রের তপোবন থেকেই আসছি। যুধিষ্ঠির আকুল হয়ে ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, গান্ধারী এবং কুন্তীর খবর জিজ্ঞাসা করলেন। নারদ বললেন, সে অনেক কথা। তোমরা সেই তপোবন থেকে হস্তিনায় চলে এলে তোমার জ্যাঠা ধৃতরাষ্ট্র কুরুক্ষেত্রের প্রান্ত ছেড়ে গঙ্গাদ্বারে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গান্ধারী, কুন্তী এবং সঞ্জয়। ধৃতরাষ্ট্র যথেষ্ট কৃচ্ছ্রসাধন করে তপস্যা করছিলেন, তাঁর সঙ্গে গান্ধারীও। গান্ধারী যদি বা জলটুকু খাচ্ছিলেন, কুন্তী তাও নয়। তিনি এক মাস ধরে উপোস করে চলেছেন— গান্ধারী তু জলাহারী কুন্তী মাসোপবাসিনী। বনের মধ্যে থাকলেও ধৃতরাষ্ট্র এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতেন না। সমস্যা ছিল, যেখানেই তিনি যেতেন, গান্ধারী অন্ধ স্বামীকে একা ছেড়ে দিতেন না কখনও, আবার এই দুই অন্ধজনকে পথ দেখিয়ে নেবার জন্য কুন্তীকেও যেতে হত তাঁদের সঙ্গে। সূত সঞ্জয় প্রধানত ধৃতরাষ্ট্রকে সাহায্য করতেন উচ্চাবচ পথ চলতে, আর কুন্তী হয়ে উঠতেন গান্ধারীর চক্ষু— গান্ধার্য্যাশ্চ পৃথা চৈব চক্ষুরাসীদনিন্দিতা।

বানপ্রস্থের এই কালে কুন্তীর জীবন অনেকটাই ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর সেবাব্রতে কাটছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি কুন্তী যে ধরনের উপবাসাদি কৃচ্ছ্রতায় কাল কাটাচ্ছিলেন, তাতে খুব স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি শরীর-শোষণের মাধ্যমে নিজের আয়ু ক্ষয় করে দিতে চাইছেন। 'ইউথানাশিয়া', 'মার্সি কিলিং', 'অনার কিলিং' এইসব নিয়ে যাঁরা আজকাল মাথা ঘামান, তাঁদের প্রশ্নে আমি অনেকবারই এই উত্তর দিয়েছি যে, আত্মহত্যা মহাপাপ হলেও আমাদের দেশে কিন্তু ইচ্ছামৃত্যুর কিছু কিছু পরিসর ছিল। পৌরাণিক-স্মার্তরাও অতিবৃদ্ধ জরাগ্রস্ত অবস্থায়, দুরারোগ্য মহাব্যাধির দ্বারা পীড়িত অবস্থায় নিজেদের মৃত্যু ত্বরান্বিত করার বিধান দিয়েছেন কতগুলি বিশিষ্ট উপায়ের মাধ্যমে। তার মধ্যে প্রায়োপবেশন, অগ্নিপ্রবেশ, জলে ডুবে মৃত্যুবরণ, অথবা উঁচু পাহাড় থেকে পড়ে মৃত্যু ঘটানো— এগুলি আছে। এখানে বানপ্রস্থী ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী এবং সঞ্জয়কে যেভাবে উপবাসের মাধ্যমে দিন-দিন কৃশ থেকে কৃশতর হতে দেখছি, তাতে দেখছি তপস্যা-ব্রত-উপবাসের মাধ্যমে নিজেকে শেষ করে ফেলার একটা উপায় তাঁরা গ্রহণ করেই ফেলেছেন। কিন্তু দিন-দিন জীর্ণ হয়ে বেঁচে থাকারও একটা কষ্ট আছে। অবশেষে একটা চরম ইচ্ছা হয়ই জীবনটাকে পূর্ণভাবে শেষ করে দেবার।

দেবর্ষি নারদ জানিয়েছেন যুধিষ্ঠিরকে। সেদিন হঠাৎই হাওয়া উঠেছিল বনের মধ্যে, আর দাবানল যেটা লেগেছিল আগে থেকেই, সেই দাবানল জ্বলে উঠল বনের চারিদিক ব্যাপ্ত করে। বনের হরিণ, বরাহ, সাপ নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে থাকলেও অনেক পশুই মরতে থাকল। এই দাবানল বাড়তে থাকল, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের তথা গান্ধারী-কুন্তীর শারীরিক সমস্যা এতটাই ছিল যে, তাঁদের পক্ষে আর নড়াচড়া করাই সম্ভব হচ্ছিল না। উপবাসে-অনাহারে কুন্তীর শরীর এতটাই কৃশ হয়ে গেছে যে, উদ্যত দাবানল এড়িয়ে তিনি দ্রুত যে কোথাও সরে যাবেন, সেটা সম্ভবই ছিল না এবং সম্ভব ছিল না এই বিপন্ন মুহূর্তে ভ্রাতৃশ্বশুর ধৃতরাষ্ট্র এবং শাশুড়ি-প্রতিমা গান্ধারীকে সরিয়ে নিয়ে অন্যত্র যাবার। নারদ বলেছেন, তাঁরা এতই দুর্বল—অসমর্থোঽপসরণে সুকৃশে মাতরৌ চ তে। ধৃতরাষ্ট্র উপায়ান্তর না দেখে সঞ্জয়কে আপন প্রাণ বাঁচানোর জন্য সরে যেতে বললেন কোথাও, কিন্তু নিজের এবং গান্ধারী-কুন্তীর দায়িত্ব নিয়ে বললেন, আমরা এখানেই থাকছি এবং এই অগ্নিতে দগ্ধ হয়েই আমরা পরম গতি লাভ করব— বয়মত্রাগ্নিনা যুক্তা গমিষ্যামঃ পরাং গতিম্।

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, কুন্তীর কতটা সমর্পণ ছিল ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। পূর্বে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের সম্বন্ধে যথেষ্টই বিরূপ ছিলেন, কিন্তু যে মুহূর্তে এই পুত্রহারা বৃদ্ধ সর্বত্যাগী হয়ে বানপ্রস্থী হয়েছেন, সেই মুহূর্ত থেকেই তিনি এই অন্ধ-বৃদ্ধের অনুগামী শুধু নন, এতটাই তিনি তাঁর অনুগত যে, ধৃতরাষ্ট্র কুন্তীর সম্বন্ধেও নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তার মধ্যে এ তো এমন এক সময়, যখন জীবনেও তাঁরা আসক্তিহীন হয়ে পড়েছেন সর্বাঙ্গীণভাবে। ফলে ধৃতরাষ্ট্র যখন নিজেদের সম্বন্ধে সার্বিক সিদ্ধান্ত জানালেন, তখন সঞ্জয়ের পক্ষে উদ্বেগ প্রকাশ ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। সঞ্জয় বলেছিলেন— মহারাজ! আপনি বোধহয় কোনও মন্ত্রপূত মেধ্য অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করছেন না। কিন্তু কী করবেন ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী। কুন্তীই বা কী করবেন? তাঁদের এমন শারীরিক শক্তিই নেই যাতে তাঁরা দ্রুত অন্যত্র সরে যেতে পারেন। অতএব ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে গান্ধারী এবং কুন্তীও একেবারেই নিরুপায় ছিলেন

পরিস্থিতি মেনে নিতে। আর সঞ্জয় যে মন্ত্রপূতহীন বৃথাগ্নির কথা বলেছিলেন, সেটাকে পরিস্থিতির প্রয়োজনের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে ধৃতরাষ্ট্র বলেছিলেন, জল, অগ্নি, বায়ু অথবা নিজেই নিজের প্রাণ আকর্ষণ করাটাকে তপস্বীরা ভালই বলে থাকেন— জলমগ্নিস্তথা বায়ুরথবাপি বিকর্ষণম্। অতএব ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে সরে যেতে বললেন এবং তিনি নিজে ইষ্টদেবতার প্রতি মনঃসংযোগ করে গান্ধারী এবং কুন্তীকেও বললেন পূর্বমুখ হয়ে তপস্যার আসনে বসতে। ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর মতোই কুন্তীও সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করে এমনভাবেই যোগাসনে বসলেন যে, তাঁকে দেখে মনে হল শুকনো এক নিশ্চল কাঠ পড়ে আছে যেন— সন্নিরুধ্যেন্দ্রিয়গ্রামম্ আসীৎ কাষ্ঠোপমস্তদা।

সেকালে বারবারই এই ধরনের যোগজ মৃত্যুর কথা এসেছে। এসেছে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেবার স্বাধীনতার কথাও। ধৃতরাষ্ট্র যেভাবে নিজেই নিজের প্রাণ আকর্ষণ করার কথায় তপস্বীদের উল্লেখ করেছেন, সেটা প্রাচীন পৌরাণিক এবং স্মার্ত তথ্যের সঙ্গে মেলে। বস্তুত হঠাৎ করে কামনা-ক্রোধের বশীভূত হয়ে আত্মঘাতী হওয়াটা আমাদের দেশ কোনওভাবে মানবে না। তপস্বীর প্রসঙ্গটা সংসার-বিরাগের সঙ্গে ইষ্টদেবতার ওপর মনঃসংযোগের প্রশ্ন আসায় যে 'ডিটাচমেন্ট' তৈরি হয়, তাতে আত্মঘাতে পাপের প্রসঙ্গ থাকে না। এখানে শুধু ধৃতরাষ্ট্র নয়, কুন্তী এবং গান্ধারীর ক্ষেত্রেও সেই একই যোগাভ্যাসের কথাও বলা হল— সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্ত গতি স্তব্ধ করে ইষ্টে মনঃসমাধির মাধ্যমে মরণও অনেক অনায়াস হয়ে ওঠে। উপবাসাদি শরীর-শোষণের প্রক্রিয়ায় আগেই যে শরীর স্তিমিত হয়ে আসছিল, সেটাকে চরম যৌগিক প্রক্রিয়ায় স্তব্ধ করে দেওয়াটাই আমাদের দেশের ইচ্ছামৃত্যুর নিদান। কুন্তী ঠিক তাই করেছেন ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর অনুগামিতায় এবং তাঁর এই মনঃসমাধির মধ্যে দাবাগ্নি তাঁদের সকলের দেহ গ্রাস করেছে, কুন্তী মারা গেছেন গান্ধারীর সঙ্গে একত্রে—গান্ধারী চ মহাভাগা জননী চ পৃথা তব।

নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন, আমি ঘুরতে ঘুরতে ওইদিকেই গিয়েছিলাম এবং আমি তোমার জননী তথা ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর দগ্ধ শরীরগুলি দেখেছি— তয়োশ্চ দেব্যোরুভয়োঃ ... ময়া রাজ্ঞঃ কলেবরম্— আর তপস্বীদের কাছ থেকে শুনেওছি যে, কীভাবে তাঁরা দাবানলে দগ্ধ হয়েছেন। তাঁরা সবাই স্বর্গে গেছেন, মহারাজ! আপনি কষ্ট পাবেন না।

মায়ের মৃত্যুর খবর শুনে যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য পাণ্ডব ভাইরা শোকে-দুঃখে কুন্তীর কথাই স্মরণ করতে লাগলেন। কুন্তীর অসামান্য গুণের কথা তাঁদের মনে উদয় হতে থাকল ক্ষণে ক্ষণে। তাঁদের রোদন-ধ্বনিতে উচ্চকিত হল রাজগৃহের সমস্ত জায়গা— রুরুদু-দুঃখসন্তপ্তা বর্ণয়ন্তঃ পৃথাং তদা। যুধিষ্ঠির অবশ্য নিজের ধৈর্যগুণে কাঁদা বন্ধ করে নারদের কাছে দুঃখ করতে লাগলেন, বিশেষত কুন্তীর জন্য। তিনি বললেন— গান্ধারীর জন্য আমি শোক করি না, তিনি ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে একত্র মরণ বরণ করে পতিব্রতার ধর্ম পালন করেছেন। কিন্তু আমার মা কুন্তীর জন্য আমি শোক সংবরণ করতে পারছি না, তিনি কেন তাঁর পুত্রদের সমৃদ্ধিমান পুত্রৈশ্বর্য ত্যাগ করে বনবাস বেছে নিলেন স্বেচ্ছায়— উৎসৃজ্য সুমহদ্দীপ্তং বনবাসমরোচয়ৎ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুধিষ্ঠির তাঁর আপন আন্তরিকতায় মায়ের এই ব্যবহার মেনে নিতে পারেননি বটে, কিন্তু আমরা কুন্তীকে বুঝতে পারি। লক্ষ করে দেখবেন— পাণ্ডবদের পূর্বজীবনে কুন্তী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে কুন্তী যেদিন পাঁচ পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, সেদিন থেকে রাজগৃহের একান্তে থেকে বিদুরের পরামর্শমতো ছেলেদের চালিত করেছেন, জতুগৃহের আগুনে পুত্রদের সঙ্গে তাঁরও গতি হয়েছিল এবং অবশেষে পঞ্চাল রাজ্যে গিয়ে বসবাসের পরিকল্পনাও ছিল তাঁরই। কিন্তু যেদিন থেকে দ্রৌপদীর সঙ্গে পাঁচ পাণ্ডবের বিয়ে হয়ে গেল, সেদিন থেকেই তাঁকে আমরা অনেক সংবৃত দেখেছি। দ্রৌপদীর সঙ্গে কোনওদিন তাঁর কোনও বিরোধ দেখিনি এবং তিনি নিজের আধিপত্য কিংবা মতামত দ্রৌপদী কিংবা পুত্রদের উপরেও খাটাননি কখনও। অর্থাৎ পুত্রদের বিবাহোত্তরকালে নিজের সমস্ত অহংগ্রাহিতা তিনি দ্রৌপদীর মধ্যে সংক্রমিত করেছেন পুত্রবধূকে উপযুক্ত স্থান ছেড়ে দিয়ে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধোত্তরকালে পুত্রদের রাজৈশ্বর্য লাভের পরে তিনি রাজমাতা হয়ে বসবাস করতেই পারতেন হস্তিনায়। তাতে যে অসম্মানিত হয়ে থাকতেন না, সেটা পাঁচ পাণ্ডব-ভাই এবং দ্রৌপদীর সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্কের নিরিখে জোর দিয়েই বলা যায়। কিন্তু তিনি কোনও অবসর রাখেননি। একে তো প্রথমজন্মা কর্ণের মৃত্যুর জন্য তাঁর হৃদয় আকুল-মথিত ছিল, তাতে এটাই তাঁর ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে বড় গরিমা যে, তিনি সবসময় সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতেন নিজেকে অবগুণ্ঠিত রেখে। দৈবাৎ এমন প্রশ্ন যদি কখনও আসে যে, ঐশ্বর্যপুষ্ট পুত্রেরা অথবা রাজরানি দ্রৌপদী তাঁকে অতিক্রম করছেন কোনও ঘটনায়, তবে সেটা তাঁর পক্ষে মর্মান্তিক হতে পারে বলেই, তাঁর এই সংবরণ। বিশেষত রাজা পাণ্ডুর রাজত্ব-সময়ে তিনি যে রাজরানির গরিমা ভোগ করেছেন, তার সঙ্গে প্রতিতুলনায় যদি রাজমাতার গরিমা লঘু অনুভূত হয়, সেটাও কোনও অবসাদ জাগাতে পারে। অতএব অনেক ভাল পুত্রবধূকে তাঁর নিজস্ব গরিমায় স্থিত হতে দেওয়া। কুন্তী ঠিক তাই করেছেন, পুত্রদের বিবাহোত্তর কাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি পুত্রবধূকেই আপন সম্মানে স্থিত হতে দিয়েছেন পূর্ণ স্বাধিকারে।

কুন্তীর এই অসম্ভব বাস্তব-বোধ যুধিষ্ঠির বোধহয় বুঝেও বুঝতে চাইছেন না মায়ের প্রতি মমতায়। যুধিষ্ঠির বলেছেন— আমার মায়ের এইরকম একটা মরণ হল, অথচ আমি মৃতের মতো বেঁচে আছি, ধিক্ এই রাজ্যকে, ধিক্ আমাদের বলবীর্য আর ক্ষত্রিয়ধর্মকে। আমি শুধু ভাবি— যিনি যুধিষ্ঠিরের জননী, যিনি নাকি ভীম-অর্জুনের মতো বীরের জননী তিনি কিনা অনাথের মতো দগ্ধ হলেন বনে— অনাথবৎ কথং দগ্ধা ইতি মুহ্যামি চিন্তায়ন্। যুধিষ্ঠির আরও দুঃখ পেলেন এই ভেবে যে, কুন্তী-জননী এবং ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীও এমন বৃথা-অগ্নির দাবানলে দগ্ধ হলেন। এমন যদি হত যে, মন্ত্রপূত হোমের আগুনে তিন জনে পরপর আত্মাহুতি দিয়েছেন, তা হলেও হত; কিন্তু কোথায় এক দাবানল প্রজ্বলিত হল, আর সকলে পুড়ে মরলেন সেখানে, এ কেমন মৃত্যু— বৃথাগ্নিনা সমাযোগো যদভূত্ পৃথিবীপতে। কথমেবংবিধো মৃত্যুঃ...?

তৎকালীন দিনের সাংস্কারিক বুদ্ধিতে যুধিষ্ঠির ভাবছেন, মন্ত্রপূতহীন বৃথাগ্নিতে তাঁর মায়ের এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বুঝি অসদ্গতি হল। অপিচ যুধিষ্ঠির সেই ভয়ংকর আগুনের

মধ্যে শিরা-উপশিরায় ব্যাপ্ত মায়ের কৃশ শরীর কল্পনা করে ভাবতে থাকলেন— সেই সময় নিশ্চয়ই মা আমায় ভয়ার্ত কণ্ঠে ডেকেছিলেন— কোথায় বাছা, যুধিষ্ঠির, কোথায় তুই— হা তাত ধর্মরাজেতি মামক্রন্দন্মহাভয়ে— নিশ্চয়ই বলবান ভীমের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলেছিলেন তিনি— আমাকে বাঁচাও, ভীম! আমাকে বাঁচাও। আর ঠিক সেই দীপ্ত দাবানল গ্রাস করে নিল তাঁকে। এই সহদেব যে তাঁর এত প্রিয় ছিল, সেও তো শুনতে পেল না মায়ের ডাক, মাকে সেও বাঁচাতে পারল না। যুধিষ্ঠিরের মর্মস্পর্শী বিলাপ শুনে সমস্ত পাণ্ডবরা পরস্পর জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন— তচ্ছ্রুত্বা রুরুদুঃ সর্বে সমালিঙ্গ্য পরস্পরম্।

যুধিষ্ঠির সহ সমস্ত পাণ্ডবরা মায়ের জন্য এমন বিলাপ করতে আরম্ভ করলে দেবর্ষি নারদ বললেন, মহারাজ! বৃথা-অগ্নি ধৃতরাষ্ট্রকেও গ্রাস করেনি, তোমার জননী কুন্তীকেও নয় এবং গান্ধারীকেও নয়— নাসৌ বৃথাগ্নিনা দগ্ধো যথা তত্র শ্রুতং ময়া— কেননা সঞ্জয় যা ভেবেছিলেন তা বোধহয় ঠিক নয়, আর সেই সময় আতঙ্কিত সঞ্জয় হয়তো সব ব্যাপার খেয়ালও করতে পারেননি। নারদ বলেছেন— আমি সেই গঙ্গাতীরবাসী মুনিদের কাছে শুনেছি যে, ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী-কুন্তীরা নিজের হোমাগ্নিতেই নিজেরা দগ্ধ হয়েছেন। ঘটনাটা এইরকম ঘটেছিল— উপবাসী ধৃতরাষ্ট্র বনে ঢোকবার সময়ে যাজকদের দিয়ে যজ্ঞ করিয়ে সেই যজ্ঞাগ্নি অবশিষ্ট রেখেই বনে প্রবেশ করেছিলেন। যাজকেরা সেই অবশিষ্ট আগুন বনের মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন জায়গা ছেড়ে। সেই যজ্ঞাগ্নিতেই বনের মধ্যে গাছে গাছে আগুন ধরিয়ে দাবানল তৈরি করে দিল— স বিবৃদ্ধস্তদা বহ্নির্বনে তস্মিন্নভূৎ কিল। সেই দাবানলেই মারা গিয়েছেন তোমার মা এবং ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী। অতএব তুমি তাঁদের জন্য কষ্ট পেয়ো না, তারা নিজস্ব যজ্ঞাগ্নির মেধ্য আগুনেই মারা গিয়েছেন। আর তোমার মায়ের কথা বলি, তিনি ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীকে গুরুর মতো সেবা করে যেভাবে শ্বশুরকৃত্য করেছেন তাতে মহতী সিদ্ধি লাভ করেছেন তিনি— গুরুশুশ্রূষয়া চৈব জননী তে জনাধিপ। প্রাপ্তা সুমহতীং সিদ্ধিম্। তোমরা আর দুঃখ পেয়ো না, ভাইদের নিয়ে তোমরা প্রয়াতা জননীর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করো।

পাণ্ডব-ভাইরা অনেক কাঁদলেন মায়ের জন্য, অনেক বিলাপ করলেন ফেলে আসা জননীর সংপৃক্ত জীবন নিয়ে। তারপর নিয়ম মেনে গঙ্গায় জলক্রিয়া, বারো দিন গেলে তেরো দিনের দিন শ্রাদ্ধ-দক্ষিণা শেষ করে পুরবাসীদের পান-ভোজন করালেন। একটা বিরাট যুগ শেষ হয়ে গেল চোখের সামনে। কিন্তু কুন্তীর চরিত্রশংসা শেষ হবার নয়। আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেন— কুন্তীকে আপনি এত বহুমানন করেন কেন? আমি বলে থাকি— মহাভারতীয় নারীচরিত্রের মধ্যে কুন্তীর মতো এত 'অথরিটি' আমি কারও মধ্যে দেখিনি, কারও মধ্যে দেখিনি এত নিষ্কাম অথচ কর্মাসক্তি— 'অ্যাটাচমেন্ট উইথ অল ডিটাচমেন্ট', 'ইমোশন উইথ অল সেল্ফ্লেসনেস্'। এটাও কিন্তু একেবারে ঠিক নয় যে, পাণ্ডুর মৃত্যুর পর কুন্তী শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে নেমে এসে নিজের জন্য এবং ছেলেদের জন্য সব গুছিয়ে নিতে এসেছিলেন এবং রাজ্যের ভাগটা চেয়েছিলেন স্বার্থ-সাধনের আশায়। আমরা বলব— তা হলে সবার আগে কুন্তী পুত্রদের নবলব্ধ সমৃদ্ধ রাজ্যে থেকে যেতেন। বনগমনে উন্মুখ ধৃতরাষ্ট্র পর্যন্ত কুন্তীকে বলেছিলেন—ছেলেরা তো সব সত্যি কথাই বলছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুন্তী কেন এই বিশাল পুত্রৈশ্বর্য ত্যাগ করে বোকার মতো আমার পিছন পিছন বনে যাবে—কানুগচ্ছেদ্ বনং দুর্গং পুত্রানুৎসৃজ্য মূঢ়বৎ।

বস্তুত পুত্রদের জন্য কুন্তীর রাজ্যকামনার মধ্যে তৎকালীন দিনের মহাকাব্যিক তাড়না ছিল এবং সে তাড়নার মধ্যে তৎকালীন দিনের রাজনৈতিক দর্শন আছে। কুন্তী বলেছিলেন, আমার স্বামী পাণ্ডুর বংশ যাতে লোপ না পায় এবং কোনওভাবে তাঁর বীর সন্তানদের যশ যাতে নষ্ট না হয়, সেইজন্যই আমি তোমাদের যুদ্ধ করার উপদেশ দিয়ে উদ্ধার করেছি—জ্ঞাতিভিঃ পরিভূতানাং কৃতমুদ্ধরণং ময়া।

বস্তুত হস্তিনায় পাণ্ডুর বংশ প্রতিষ্ঠিত হোক, এই মহাকাব্যিক রাজনৈতিকতা এতটাই কাজ করেছে কুন্তীর মনে যে, তিনি পাণ্ডুর নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও নিজের কানীন পুত্র কর্ণের কথা বলতে পারেননি স্বামীর কাছে। অথচ এই প্রথমজন্মা পুত্রের কথা সারাজীবন তিনি মনে রেখেছেন কিন্তু মতাদর্শের কারণেই সেখানে তিনি অনাসক্তভাবে পাণ্ডুর ঈপ্সিত পুত্রদের জন্য অবিরাম উদ্যোগ নিয়ে গেছেন। হস্তিনায় আসা অবধি তিনি কোনও রাজকীয় মর্যাদা দাবি করেননি। অপার কৃচ্ছ্রসাধনের পর পুত্রেরা ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য পেলেন বটে, তবে তারপরেই তো বনবাসের কৃচ্ছ্রতা। কুন্তী হস্তিনায় থেকেছেন দীন-হীনভাবে, কিন্তু আত্মজ পুত্রদেরও তিনি যুদ্ধে উৎসাহিত করেছেন বিদুলার ভাষায়, তাঁর নিজের ভোগস্বার্থ অথবা আসক্তি সেখানে কাজ করেনি। পুত্রেরা রাজ্য পাবার পরেই তিনি ধৃতরাষ্ট্রের অনুব্রতী হয়ে রাজ্য ছেড়েছেন রাজকীয় অনাসক্তিতে। আর সারাজীবন প্রথমজন্মা পুত্রটির জন্য যে কষ্ট পেয়ে গেছেন, তা জানিয়ে গেছেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। যাবার আগে কুন্তী বলেছিলেন, তুমি সব সময় যুদ্ধে অপলায়ী কর্ণের কথা মনে রেখো। আমি আমার দুর্বুদ্ধিতে তাকে ত্যাগ করেছিলাম। আমার হৃদয় নিশ্চয়ই লোহার মতো, নইলে আমার নিজের গর্ভজাত সূর্যসমান পুত্রকে ত্যাগ করে আমি বেঁচে আছি কী করে!

কুন্তীর হৃদয়-গহনে এই আন্তরিকতা যেমন কর্ণের জন্য আছে, তেমনি অন্য ছেলেদের জন্যও তাঁর এই আন্তরিকতা আছে। কিন্তু সবার ওপরে আছে সেই রাজকীয় আত্মমর্যাদা যার জন্য সংশয়িত মৃত্যুর কথা জেনেও তিনি পুত্রদের যুদ্ধে উৎসাহিত করেন এবং যার জন্য বনবাসের তপঃসাধনও তাঁর কাছে সর্বতোভদ্র মনে হয়। আসলে যখন তিনি সম্পূর্ণ জিতে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, সেই অবস্থায় ঐশ্বর্যভোগ থেকে সরে গিয়ে লৌকিক মর্যাদার চরম বিন্দুতে পৌঁছেছেন কুন্তী। এই অনাসক্তিতে তিনি মহাভারতের ঋষিতমা রমণী।

মাদ্রী

কাব্যের দৃষ্টিতে যে চরিত্র তেমন তাৎপর্যপূর্ণ নয়, জীবনের বাস্তবতায় সেই চরিত্রই অনেক মূল্যবান হয়ে ওঠে। মহাভারত যেহেতু আমার কাছে কল্পকাহিনি নয় এবং আমার কাছে যেহেতু এটি এক সচল এবং সজীব সমাজের প্রতিফলন, তাই আমার কাছে মহাভারতীয় প্রত্যেকটি চরিত্রে জীবনের তথ্য এবং তত্ত্বটুকুই বড়, কাব্যকল্পনা নয়। মহাভারতকে যাঁরা কবিকল্পিত কাব্য হিসেবে দেখেন, তাঁরা অনেকেই আমাকে বলেছেন— আচ্ছা। এই মাদ্রীর কী প্রয়োজন ছিল পাণ্ডুর জীবনে! পাণ্ডু নিজেও বাঁচলেন না, মাদ্রীকেও প্রায় তিনিই বাঁচতে দিলেন না। বড় সংক্ষিপ্ত মাদ্রীর জীবনও। দুটি ছেলে নকুল-সহদেব— তাঁরাও মহাকাব্যের বিভিন্ন পরিণতির মধ্যে এমন কোনও গভীর স্বাক্ষর রাখেন না, যাতে মাদ্রীকে পুত্র-পরিচয়েও এক বীর-জননী বলে চিহ্নিত করা যায়। তা হলে কেন এই মাদ্রী?

দেখুন, মহাভারত যদি মাত্র মহাকাব্যের কল্প হত, তা হলে বলতাম— যত ক্ষুদ্রই হোক মাদ্রী-চরিত্রের পরিধি এবং তাৎপর্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় ঠিকই, তবু মাদ্রীকে ছাড়া এই মহাকাব্য অসম্পূর্ণ থেকে যেত। এ-চরিত্রের পার্শ্ব-সহায়তা এমনই যে, তিনি ছাড়া মহাকাব্যের মুখ্য চরিত্রগুলিও বিপন্ন হয়ে পড়ে। তিনি না থাকলে পাণ্ডু বেঁচে থাকতেন, পাণ্ডু বেঁচে থাকলে হস্তিনার সিংহাসন নিয়ে রাজনৈতিক খেলাটিও একেবারে অন্যরকম হত। আর কাব্যকল্প ছেড়ে দিয়ে যদি জীবনের পরিসরে নেমে আসি অর্থাৎ যদি সেই সচল মহাকাব্যিক সমাজের এক বাস্তব চরিত্র যদি হয় মাদ্রীর জীবন— অন্তত আমি তাই বিশ্বাস করি, তা হলে বলব— মাদ্রী সেই সমাজটাকেই চিনিয়ে দেন; চিনিয়ে দেন সেই সমাজের কামনা, ক্ষুধা, বাৎসল্য এবং সমর্পণের দিকগুলি।

শুধু মহাভারত কেন, তার দোসর পুরাণগুলির মধ্যেও আমরা কুন্তীর কথা অনেক পাব। পাণ্ডুর প্রথমা পত্নীর বাল্য-জীবন, দত্তক কন্যা হিসেবে কুন্তিভোজ রাজার কাছে তাঁর আগমন, তাঁর কন্যা-গর্ভ, কানীন পুত্র— কত সব বৈচিত্র্য দিয়ে মোড়া তাঁর প্রাক-বিবাহ পর্ব। সেই তুলনায় মাদ্রীর কথা আমরা প্রায় কিছুই জানি না। পাণ্ডু যখন কুন্তীকে স্বয়ংবরে লাভ করে জিতে আনলেন, তখন এইটুকু মাত্র খবর পেয়েছি যে, পাণ্ডু তাঁকে নিয়ে এসে আপন ভবনে প্রবেশ করলেন। বাস্ এইটুকুই, তার পরেই আবার তাঁর পুনর্বিবাহের মাদল-বাদ্য শুনতে পাচ্ছি। মহাকাব্যের মধ্যে যে আড়ম্বর থাকে তাতে বিবাহোত্তর সময়ে প্রথমা বধূটির সঙ্গে হস্তিনার রাজার বৈবাহিক সুখের কিছু বর্ণনা প্রত্যাশিত ছিল। অথচ তা এখানে নেই। কুন্তীর বিবাহের পরেই দেখছি— মহামতি ভীষ্ম পাণ্ডুর দ্বিতীয় বিবাহের জন্য মতি স্থির করেছেন— বিবাহস্যাপরস্য অর্থে চকার মতিমান্ মতিম্। সন্দেহ হয়— ভীষ্ম কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংগোপনে জানতেন যে, পাণ্ডু সন্তান উৎপাদনে অপারগ। অথবা ভীষ্ম না জানলেও পাণ্ডু নিজে কি নিজের কথা জানতেন, যে কারণে প্রথমা বধূ কুন্তীর কাছে নিজের এই অসহায় অক্ষমতা চাপা দেবার জন্যই পাণ্ডু খুব তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় বিবাহের কথা ভেবেছিলেন। এ কথাও ভাবার কোনও কারণ নেই যে, পাণ্ডুর অভিমত-সারস্য ছাড়াই ভীষ্ম নিজে থেকেই তাঁর দ্বিতীয় বিবাহের উদ্যোগ নিয়েছেন।

ভীষ্মের কাছে পূর্বাহ্নেই সংবাদ ছিল যে, মদ্রদেশে একটি রাজকন্যা আছে। মদ্রাধিপতি কন্যার পিতা বোধহয় বেঁচে নেই, কিন্তু তাতে বিবাহের কোনও সমস্যা নেই, কেননা সেই পরমা সুন্দরী কন্যার বিবাহের উপযুক্ত বয়স হয়েছে এবং তাঁর ভাই এই বিবাহের ব্যবস্থা করবেন। ভাল একটা দিন দেখে শান্তনব ভীষ্ম মদ্রদেশে রওনা দিলেন। তাঁর সঙ্গে চললেন বৃদ্ধ কয়েক জন অমাত্য, কয়েক জন ঋষি ব্রাহ্মণ, এবং সৈন্য-সামন্তের একটা সমর্থ বাহিনী— বলেন চতুরঙ্গেণ যযৌ মদ্রপতেঃ পুরম্— অর্থাৎ গজ-বাজী-রথ-পদাতিকের একটা সম্পূর্ণ বাহিনী চলল ভীষ্মের সঙ্গে। তাঁর পূর্বের অভিজ্ঞতা ভাল নয়। কুমার বিচিত্রবীর্যের বিবাহের সময় তাঁকে স্বয়ংবর-ক্ষেত্র থেকেই প্রায় যুদ্ধ আরম্ভ করতে হয়েছিল, তিনি একেবারে একা পড়ে গিয়েছিলেন তখন। সেবারে ভাইয়ের জন্য মেয়ে আনতে গিয়েছিলেন, এবারে ভাইপোর জন্য, বয়সটা একটু বেড়েছে, বেড়েছে অভিজ্ঞতা। তাই মন্ত্রী-পুরোহিত এবং সৈন্য সব সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন ভীষ্ম।

হস্তিনাপুর থেকে মদ্রদেশ খুব কাছেও নয় আবার খুব দূরেও নয়। যাঁরা মদ্রদেশ বলতে আধুনিক 'ম্যাড্রাস' বোঝেন, তাঁরা একেবারে ভ্রান্ত। ভারতীয় সংস্কৃতিতে মদ্রদেশের একটা বড় ভূমিকা আছে এবং মনে রাখতে হবে— বৈদিক ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে মদ্রদেশ এবং মদ্রজাতির উল্লেখ আছে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদ এ-বিষয়ে প্রমাণ দেবে। জায়গাটা এতটাই প্রাচীন বর্ধিষ্ণু অঞ্চল যে, সেই অতি-প্রাচীন যুগেই মদ্রদেশ দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল— একটার নাম উত্তর-মদ্র অন্যটা দক্ষিণ-মদ্র। উত্তর-মদ্রেরা হিমালয়ের ওপার জুড়ে অর্থাৎ কাশ্মীর দেশেরও উত্তর দিকে থাকতেন আর দক্ষিণ-মদ্রেরা আধুনিক পঞ্জাবের পাশে শিয়ালকোট বলে যে জায়গাটা আছে, সেই অঞ্চল জুড়ে বসবাস করতেন। মহামতি ভীষ্ম উত্তর না দক্ষিণ মদ্রে গেলেন— সে-কথা মহাভারতের কবি স্পষ্ট করে বলেননি, তবে মদ্রদেশের অধিবাসীদের বর্ণনা পরেও যা মহাভারতে পেয়েছি, তাতে দক্ষিণ মদ্রকেই বুঝি মদ্রদেশ বলা হয়েছে এবং মহাভারতের কালে এই দেশের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতেও অবক্ষয় ঘটেছে, যে-কারণে মাদ্র জনসাধারণকে 'বাহিক' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সে যাই হোক, পঞ্জাব-কাশ্মীরের মেয়েদের সৌন্দর্যের খ্যাতি যে কতটা, সেটা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না, অতএব মদ্রদেশের সেই অসাধারণ সুন্দরী যাতে হস্তিনাধিপতি পাণ্ডুর পাণিগৃহীতী হন, সেই আশা নিয়েই ভীষ্ম তাঁর মন্ত্রী-অমাত্য, পারিষদ নিয়ে উপস্থিত হলেন মদ্রদেশে। তৎকালীন ভারতবর্ষে ভীষ্মের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তাঁর আগমনের মধ্যে যেহেতু যুদ্ধের আস্ফালন ছিল না, অতএব মদ্ররাজ ভীষ্মের নাম শুনেই— তমাগতমভিশ্রুত্যঃ— বহু দূর এগিয়ে এসে ভীষ্মকে প্রত্যুদগমন করে নিয়ে প্রবেশ করালেন

রাজসভায়— প্রত্যুদ্‌গম্যার্চয়িত্বা চ পুরং প্রাবেশয়ন্নৃপঃ। সেকালের দিনে অতিথি-সুজনকে অভিবাদন-অভ্যর্থনা করার নানান ভাবনা ছিল। একেবারে সামান্যভাবে অভ্যর্থনা জানালেও অতিথিকে পা-ধোয়ার জলটুকু, বসার আসনটুকু দিতেই হত। আবার সামান্য আড়ম্বর যুক্ত হলেই পা-ধোয়ার জল, আসন, ফল-মূলের অর্ঘ্য এবং বিশেষত মধুপর্ক দেবার বিধান ছিল। মধুপর্ক হল দই, দুধ, ঘি, জল, চিনি (মিছরি) এবং এক বিশেষ ধরনের পিঙ্গলবর্ণ মধুর মিশ্রণ। দুধটা অনেক সময় মধুপর্ক থেকে বাদ যায়, তবে এই মধুপর্কের মিশ্রণকে অতিথি-সৎকারে গৃহস্থের সৌভাগ্যদায়ী বলে মনে করা হত। মদ্ররাজ ভীষ্মকে পাদ্য-অর্ঘ্য-আসন-মধুপর্ক দান করে মদ্রদেশে তাঁর আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন— মধুপর্কঞ্চ মদ্রেশঃ পপ্রচ্ছাগমনেঽর্থিতাম্।

আগেই বলেছিলাম— মদ্রাধিপতি বলে এতদিন যিনি ছিলেন, তিনি বোধহয় তখন সদ্যই মারা গেছেন এবং তাঁর পুত্র শল্য তখন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে মদ্রেশ বলতে যেন কিছু দ্বিধা ছিল। কেননা মদ্ররাজ, মদ্রেশ বলে প্রথম পরিচয়-জ্ঞাপনের সময় একবারও যেখানে শল্যের নাম উচ্চারিত হল না, সেখানে ভীষ্ম কিন্তু প্রথম কথা বলছেন শল্যের সঙ্গেই। তাতেই বুঝি, শল্যই এখন রাজা। ভীষ্ম বললেন— তোমার রাজ্যে আমার ভাইপো হস্তিনাধিপতি পাণ্ডুর জন্য মেয়ে দেখতে এসেছি হে— আগতং মাং বিজানীহি কন্যার্থিনমরিন্দম। শুনেছি, তোমার বোনটি নাকি বড় লক্ষ্মীমতী মেয়ে, যেমন তার রূপ তেমনই তার গুণ। আমি তোমার বোনটিকে আমার ভাইপো পাণ্ডুর জন্য বরণ করে নিয়ে যেতে এসেছি। ভীষ্ম আরও একটু আগ্রহ দেখিয়ে শল্যকে বললেন— এই যে বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটছে, তাতে তোমরাও যেমন আমাদের পালটি ঘর, তেমনই আমরাও তোমাদের উপযুক্ত ঘরানার লোক। অতএব সেই সমতার সম্বন্ধ মনে রেখে তুমি আমার এই বৈবাহিক প্রস্তাব সমর্থন করে আমাদের যথাযথ আদর-সৎকার করবে আশা করি— যুক্তরূপো হি সম্বন্ধে ত্বং নো রাজন্ বয়ং তব।

ভীষ্মের এই আকস্মিক বদান্য শব্দচারিতায় মদ্ররাজ শল্য অত্যন্ত খুশি হলেন। হস্তিনার প্রসিদ্ধ ভরতবংশের জাতকের সঙ্গে তাঁর ভগিনীর বিয়ে হবে। শল্য অভিভূত হয়ে বললেন— আপনার বংশে আমার ভগিনীর বিয়ে হবে, আপনি নিজে এসেছেন যাচক হয়ে, এর থেকে শ্রেয়তর কী হতে পারে আমার কাছে— ন হি মেঽন্যো বরস্তত্তো শ্রেয়ানিতি মতির্মম। তবে হ্যাঁ, এই বিয়ের ব্যাপারে আমার কিছু কথা আছে এবং সে কথা বলতে আমার কিছু সংকোচও আছে। আসলে, আমার মহান পূর্ব-পুরুষেরা আমাদের বৈবাহিক সম্বন্ধে একটা নিয়ম চালু করেছেন— পূর্বৈঃ প্রবর্তিতং কিঞ্চিৎ কুলেঽস্মিন্ নৃপসত্তমৈঃ— যে নিয়ম ভাল হোক বা মন্দ হোক, ভদ্র হোক বা ভদ্রেতর, কিন্তু পূর্ব-পুরুষের সেই নিয়মটি আমি অতিক্রম করতে চাই না বা অতিক্রম করাটা পছন্দ করি না— সাধু বা যদি বাঽসাধু তন্নাতিক্রান্তমুৎসহে।

'ভাল হোক বা মন্দ, ভদ্র হোক বা ভদ্রেতর'— এই কথাটার মধ্যেই শল্যের একটা লৌকিক সংশয় আছে। বৈবাহিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষেরই বিভিন্ন প্রদেশে, বিভিন্ন জাতি-বর্ণের মধ্যে ততোধিক বিভিন্ন কৌলিক এবং লৌকিক প্রথা চালু আছে এবং দেখা যাচ্ছে তা প্রাচীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালেও ছিল। আমি এমনও দেখেছি— কন্যাপক্ষের বাড়িতে একরকম কৌলিক নিয়ম এবং বরপক্ষের বাড়িতে আর এক রকমের কুলপ্রথা এবং দুই পক্ষই একে অন্যের কুলপ্রথা নিয়ে হাসাহাসি করছে এবং সে হাসাহাসি ঝগড়াঝাঁটিতে পরিণত হয়েছে— এমনও দেখেছি। আবার এমনটাও হয়— বরপক্ষের পৌরুষেয়তা এবং বর্বরতায় কন্যাপক্ষ নিজেদের কৌলিক নিয়ম ভঙ্গ করতে বাধ্য হয়। এঁরা কেউই বোঝেন না যে, পূর্বপুরুষের কোনও পুরাতন বৃদ্ধ অনেক আদরে এবং মমতায় যে কৌলিক প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন, তার মধ্যে তাঁর কোনও আশা, যন্ত্রণা বা আশীর্বাদ লুকোনো থাকে। সে প্রথা নিয়ে অধস্তনের কোনও পক্ষেরই হাস্য-ব্যঙ্গের অবসর নেই, সে প্রথা পারলে পরে মানো, না পারলে মেনো না, কিন্তু হাসাহাসি কোরো না। শল্য সেই কথাটাই জোর দিয়ে বলেছেন— আমাদের এই কৌলিক নিয়ম আছে— সে আপনার কাছে ভাল লাগুক বা মন্দ লাগুক, আমাকে তা মানতে হবে, আমি তা অতিক্রম করব না— তন্নাতিক্রান্তুমুৎসহে— আপনি না মানলে এ-বিয়ে হবে না।

শল্য বুঝেছিলেন— তাঁদের কৌলিক প্রথা উত্তর ভারতের খাঁটি আর্যকৌলিকতায় কিছু উপহাস সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু ভীষ্ম নিজে যেচে এসেছেন তাঁর ভগিনীকে কুলবধূরূপে বরণ করতে, তাই শল্যের জোরও এখানে বেশি। তাই জোর জাহির করেই শল্য বললেন— আমাদের যে কৌলিক নিয়ম আছে, তা আপনারও জানা, ঠিক সেই জন্যই আমার পক্ষে এটা মুখ দিয়ে বলতে খারাপ লাগছে যে, এ বাবদে আপনাকে কিছু পণ দিতে হবে। শল্য খুব সংকোচ নিয়ে বললেন— কী করব, আমাদের কৌলিক নিয়ম এবং তা কৌলিক বলেই আমাদের কাছে তা প্রমাণ হিসেবে মান্য— কুলধর্মঃ স নো বীর প্রমাণং পরমঞ্চ তৎ। কিন্তু আমাদের কুলধর্ম ততটা সার্বিক নয় বলেই আপনার কাছে তা গ্রাহ্য নাও হতে পারে; আর ঠিক সেই জন্যই আপনাকে তা স্পষ্ট করে বলতে আমার সংকোচ হচ্ছে— তেন ত্বা ন ব্রবীম্যেতদসন্দিগ্ধং বচোহরিহন্।

ভীষ্ম একেবারে পাকা বৈবাহিকের মতো করে বললেন— কুলধর্ম আমাদের কাছে পরম ধর্ম— সে-কথা ভগবান ব্রহ্মাই তো বলে দিয়েছেন কোন কালে। এখানে তোমার কোনও দোষ নেই হে! পূর্বপুরুষেরা একটা নিয়ম করেছেন, সেটা তো তোমায় মানতেই হবে, আর তোমাদের এই নিয়ম আমার জানাই আছে— নাত্র কশ্চন দোষোহস্তি পূর্বৈর্বিধিরয়ং কৃতঃ। মদ্রেশ শল্য তাঁর কথার মাঝখানে সামান্যই একটু হিন্ট দিয়েছিলেন। বলেছিলেন— আপনাকে পণ হিসেবে কিছু দিতে হবে, একথা আপনাকে বলি কী করে— ন চ যুক্তস্তদা বক্তুং ভবান্ দেহীতি সত্তম। কিন্তু ওইটুকুতেই ভীষ্ম বুঝে গিয়েছেন যে, মদ্রদেশের কৌলিক নিয়মে কন্যাপণ চালু আছে। হয়তো এক প্রতিক্রিয় কারণে মদ্রদেশে এই নিয়মের সৃষ্টি হয়েছিল। উত্তর ভারতের আর্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে বিবাহ-প্রথা চালু ছিল, তাতে বরপণের রেওয়াজ অল্প-বিস্তর চালু থাকলেও কন্যাশুল্ক বা কন্যাপণের ব্যবহার চালু ছিল না। কন্যাপণকে তাঁরা কন্যা-বিক্রয়ের তুল্য বলে মনে করতেন এবং আর্যদের স্বীকৃত অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে অতিঘৃণ্য আসুর-বিবাহে এই ধরনের কন্যা-শুল্ক গ্রহণের রেওয়াজ ছিল এবং নামতই প্রমাণিত যে আসুর বিবাহে ভদ্রসুজনের কোনও সম্মতি ছিল না।

অন্যদিকে মহাভারতেই যা প্রমাণিত, সেটা হল— মহাভারতের যুগে মদ্রদেশের সংস্কৃতিতে কিছু অবক্ষয় এসেছে। শল্যের সারথ্যকালে কর্ণ যেভাবে তাঁর দেশজ সংস্কৃতি সম্বন্ধে উদ্গার প্রকাশ করেছেন, তাতে মদ্রদেশীয় 'বাহিক'দের মধ্যে আর্যেতর সংস্কৃতির প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পণ্ডিত গবেষকেরাও মনে করেন যে তৎকালীন ইরান বা ব্যাকট্রিয়া থেকে মদ্রদেশের মূল অধিবাসীরা এসেছিলেন এবং মহাভারতে মদ্রদের মূল-পুরুষ মহাভারতীয় ব্যুষিতাশ্বকেও পণ্ডিতেরা পারস্য সম্রাট দারায়ুসের পিতার নাম-স্বরূপে বিশ্লেষণ করে ভাষাতাত্ত্বিক সাম্য খুঁজে পেয়েছেন। আমরা এতদূর যাচ্ছি না, তবে গবেষণার প্রশ্রয় মেনে চললে মদ্রদেশে সংকরজাতীয় শূদ্রসমান রাজাদের রাজত্ব চলছিল, এইটুকু মেনে নেওয়া যেতে পারে। শল্য যে পূর্বপুরুষকৃত বৈবাহিক নিয়মের কথা বলেছেন, সেটাও ঠিক আর্যবিধিসম্মত না হওয়ায় মদ্রদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতবর্ষীয় আর্যবিধির কৌলিক পার্থক্য মহাভারতের যুগেই স্পষ্ট।

তবে হ্যাঁ, আমাদের মহামতি ভীষ্ম তেমন ভয়ংকর রক্ষণশীল মানুষ নন এবং সেই সংরক্ষণশীলতা মহাভারতের প্রথম কল্পে ছিলও না। বিশেষত তিনি পাণ্ডুর জন্য কন্যারত্ন গ্রহণ করতে এসেছেন, অতএব তিনি কাল-বিলম্ব না করে বহুতর স্বর্ণালংকার, বিচিত্র রত্নরাশি— মণি-মুক্তা-প্রবাল এবং কিছু কাঁচা সোনাও কন্যাশুল্ক হিসেবে শল্যের হাতে দিলেন। দিলেন বেশ কিছু হাতি-ঘোড়া-রথও এবং অবশ্য কন্যার ব্যবহার্য্য বস্ত্রালংকার— বাসাংস্যাভরণানি চ... শাতকুম্ভং কৃতাকৃতম্। শল্য সানন্দে সেগুলি ভীষ্মের হাত থেকে নিয়ে সেইগুলি দিয়েই সাজিয়ে দিলেন ভগিনীকে— দদৌ তাং সমলংকৃত্য স্বসারং কৌরবর্ষভে— এবং সানন্দে তুলে দিলেন শ্বশুরোপম ভীষ্মের অধিকারে। ভীষ্ম মদ্রাধিপতির ভগিনীকে নিয়ে অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে ফিরে এলেন হস্তিনাপুরে— আজগাম পুরং ধীমান্ প্রহৃষ্টো গজসাহ্বয়ম্।

হস্তিনায় ফিরে আসার পর এক শুভ দিন নির্ধারিত হল যেদিন মদ্রদেশিনী রূপবতীর সঙ্গে পাণ্ডুর বিবাহ হয়ে গেল শাস্ত্রবিধি মেনে। জগ্রাহ বিধিবৎ পাণিং মাদ্র্যা পাণ্ডুর্নরাধিপ। মহাভারতে এই বিবাহের কোনও মহাকাব্যিক আড়ম্বর বর্ণিত হয়নি। এমনকী বিবাহকাল পর্যন্ত আমরা এই নববধূর নাম পর্যন্ত জানি না। কত দূর দেশ থেকে আহৃতা এই রূপবতী রমণীর নামের মধ্যে তাঁর দেশ-নামটুকুই বড় হয়ে রইল, তিনি মাদ্রী, মদ্রবতী। কুন্তীর মতো মাদ্রীর জন্যও এক নতুন ভবন তৈরি হল— স্থাপয়ামাস তাং ভার্য্যাং শুভে বেশ্মনি ভাবিনীম্। মহারাজ পাণ্ডু কুন্তী এবং মাদ্রীর সঙ্গে সুখে সংসার করতে লাগলেন। এখনও মাদ্রীর কোনও পৃথক বৈশিষ্ট্য নেই, প্রথমা বধূ কুন্তীর তুলনায় অবশ্যই মাদ্রীর মর্যাদা কিছু ন্যূন বটে, কিন্তু সতীন-কাঁটার সবচেয়ে তীক্ষ্ণ কাঁটাটুকু বিঁধে রইল— কুন্তীর বুকে— পঞ্জাব-কাশ্মীর অঞ্চলের মেয়ে মাদ্রী অতিশয় রূপবতী, অন্তত কুন্তীর চেয়ে বোধহয় অধিক বটেই।

মহাভারতের কবি আপাতত কোনও পার্থক্য করেননি। বলেছেন— দুই স্ত্রীর সঙ্গেই তিনি সুখে বিচরণ করতে লাগলেন। কুন্তী এবং মাদ্রী— দু'জনের সঙ্গেই যখন তাঁর ইচ্ছে, যখন তাঁর ভাল লাগে, তখনই পাণ্ডু বিচরণ করেন— স তাভ্যাং ব্যচরৎ সার্ধং... যথাকামং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যথাসুখম্। কিন্তু মহারাজ পাণ্ডুর পক্ষে এই বিচরণই সার ছিল। কুন্তী বা মাদ্রী কারও কাছেই তিনি সম্পূর্ণ ধরা দিলেন না। হয়তো বা সমস্যা এড়ানোর জন্যই তিনি দিগবিজয় করার জন্য চলে গেলেন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে। দুই যৌবনবতী স্ত্রী অন্তঃপুরেই পড়ে রইলেন পাণ্ডুর অপেক্ষায়। মৃগয়া থেকে ফিরে আসার পর অবশ্য অদ্ভুত সুযোগ এল দুই স্ত্রীর জীবনে। যে কোনও কারণেই হোক— হয়তো সে কারণ প্রধানত হস্তিনাপুরের রাজঘরের ব্যাপার— কিন্তু সে যাই হোক, পাণ্ডু তাঁর দুই স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেলেন বনে। রাজবাড়ির কায়দা-কেতা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, কৃত্রিমতা-আড়ষ্টতা তাঁর যেহেতু পিছনে তাড়া করে না, অতএব কখনও পর্বতের সবুজ উপত্যকায়, আবার কখনও মহাশাল-বৃক্ষের অরণ্য-ছায়ায় পাণ্ডু দুই স্ত্রীকে নিয়ে মহাসুখে দিন কাটাতে লাগলেন। বলেছি তো— মহাভারতের কবি হস্তিনাধিপতির মানসিক সমতার হানি ঘটাননি এখনও। পাণ্ডুর এই উত্তাল বনবিহারের মধ্যেও তাঁর উপমা হল— পাণ্ডুকে দেখাচ্ছিল যে দুই হস্তিনীর মাঝখানে ইন্দ্রের গজরাজ ঐরাবতের মতো— করেণোরিব মধ্যস্থঃ শ্রীমান্ পৌরন্দরো গজঃ।

পাণ্ডুর ব্যক্তিগত সমস্যাটি এখনও মহাভারতের কবি ব্যক্ত করেননি। হয়তো এই সমস্যা প্রধান হয়ে উঠল যখন গান্ধারীর গর্ভধারণের সংবাদ বনবাসী পাণ্ডুর কানে এল। আমরা তো জানি— গান্ধারী পূর্বে গর্ভ ধারণ করলেও তাঁর পুত্রোৎপত্তিতে সময় লেগেছে বেশি। অথচ এদিকে পাণ্ডুর অবস্থা দেখুন, তাঁর সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতাই নেই। মহাভারত ঠিক এই অবস্থায় মৃগরূপধারী কিমিন্দম অথবা কিন্দম মুনির কথা বলেছে। অর্থাৎ সেই ক্রীড়ারত মৃগমিথুনের মিলন-মুহূর্তে এতটুকু বিবেচনা না করে পাণ্ডু একজনকে মারলেন এবং কিমিন্দম মুনির অভিশাপ চলে এল পাণ্ডুর ওপর। অভিশাপ— প্রিয়তমা রমণীর শারীর সংসর্গ ঘটলে তোমারও মৃত্যু ঘটবে— ত্বমপ্যস্যামবস্থায়াং প্রেতলোকং গমিষ্যসি। আমরা এর আগেও অন্যত্র বলেছি— মহাভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে পাণ্ডুকে এক অন্যতর মর্যাদা দিয়েছেন মহাভারতের কবি। তাঁর সন্তান-প্রজননের অক্ষমতাকে মহাকাব্যিক আড়ম্বরে মৃগরূপী মুনির অভিশাপের ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত করেছেন।

মৃগমুনির শাপেই হোক অথবা নিজে উপলব্ধি করেই হোক, দু-দুটি বিবাহিত স্ত্রীর কাছে নিজের প্রজনন ক্ষমতার অসহায়তা জানানো অত সহজ কথা নয়। পাণ্ডু প্রথমে যে ব্যবহারগুলি করেছিলেন সেগুলি তাঁর অসহায়তাই প্রমাণ করে। কুন্তী এবং মাদ্রী— দুই স্ত্রীকেই পাণ্ডু বলেছিলেন যে, তিনি আর সংসার ধর্ম প্রতিপালন করতে চান না, কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে চান। এই অবস্থায় কুন্তী এবং মাদ্রী সমস্বরে করুণভাবে বলেছিলেন— আমরা তোমার ধর্মপত্নী। আমাদের ত্যাগ করে যাবার দরকার কী, তপস্যা করতে হয় আমাদের সঙ্গে নিয়েই তুমি বানপ্রস্থ অবলম্বন করো— আবাভ্যাং ধর্মপত্নীভ্যাং সহ তপ্তং তপো মহৎ। তুমি যদি ইন্দ্রিয় দমন করে বৈরাগ্য-তপস্যায় মন দিতে চাও, তবে আমরাও তাই করব, আমরাও ইন্দ্রিয় দমন করে তোমারই সঙ্গে তপস্যা করব— ত্যক্ত-কামসুখে হ্যাবাং তপ্স্যাবো বিপুলং তপঃ।

কুন্তী এবং মাদ্রী— দুই স্ত্রীরই আন্তরিকতা মেনে নিতে বাধ্য হলেন পাণ্ডু। তিনি দুই স্ত্রীকে নিয়েই কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করে তপশ্চরণ করতে লাগলেন। এতেও তিনি ভালই ছিলেন, দিন একভাবে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু মনের মধ্যে একটা গভীর দুঃখ তাঁর রয়েই গেছে। দু-দুটি সুন্দরী স্ত্রী, অথচ কারও গর্ভে সন্তান দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই। এরই মধ্যে পাণ্ডুর তৎকালীন আবাসস্থল শতশৃঙ্গ পর্বতে সাধনসিদ্ধ মুনিঋষিদের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। পুত্রহীনতার জন্য যত দুঃখ ছিল, সেই দুঃখিত মনোভাব মুনি-ঋষিদের কাছে প্রকট করলে, তাঁরা বললেন,— আমরা দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি— আপনার পুত্র আছে। অতএব আমরা যা দেখছি, তা আপনি ফলে পরিণত করার জন্য যত্ন নিন— তস্মিন্ দৃষ্টে ফলে রাজন্ প্রযত্নং কর্তুমর্হসি।

এই কথাটার মধ্যেই সেই সমাজ-সচল ইঙ্গিত ছিল— অর্থাৎ তুমি যখন প্রজনন-ক্ষম নও, তুমি অন্যভাবে পুত্রলাভের চিন্তা করো, সমাজের মধ্যেই সে উপায় চিহ্নিত এবং স্বীকৃত, শুধু তুমি সেই উপায় গ্রহণ করার ব্যাপারে উদ্যোগী হও। পাণ্ডু সে ইঙ্গিত বুঝলেন। আগেও যে তিনি এই সমাজ-সচল প্রথার কথা জানতেন না, তা নয়। কিন্তু নিজের পৌরুষহীনতা নিজের স্ত্রীর কাছে অসহায়ভাবে বলে, তাঁদেরই আবার অন্যবিধ উপায়ে পুত্রলাভে নিযুক্ত করা— এটা বড় কঠিন ছিল। কিন্তু পাণ্ডু এখন নিরুপায়, এই প্রথম তিনি তাঁর প্রথমা পত্নী কুন্তীকে ডেকে তাঁর অসহায়তার কথা পরিষ্কার জানালেন নির্জনে— সোঽব্রবীদ্ বিজনে কুন্তীং ধর্মপত্নীং যশস্বিনীম্।

'বিজনে' বললেন কুন্তীকে, অর্থাৎ মাদ্রী সেখানে নেই। এতক্ষণ পর্যন্ত মহাভারতের কবি মহাকাব্যিক সৌজন্যে কুন্তী এবং মাদ্রীর সমতা প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। পাণ্ডুর কথার উত্তরে উভয় স্ত্রী সমস্বরে একই শব্দ উচ্চারণ করেছেন— এটা প্রায় অসম্ভব হলেও আমরা মেনে নিয়েছি। মেনে নিয়েছি সেই সব আচরণ, বিচরণ যেখানে কবি লিখেছেন— উভয় স্ত্রীর সঙ্গেই; অথবা নামত, কুন্তী এবং মাদ্রীর সঙ্গে সুখে বিচরণ করতে লাগলেন। আমরা কি আমাদের শঙ্কিল মনে এতটুকু বিচার করব না যে, কুন্তী যেখানে ভালবেসে স্বয়ংবরা হয়ে পাণ্ডুর গলায় বরমাল্য দিয়েছিলেন, সেখানে তিনি দেখলেন— তাঁর বিবাহের বরমাল্য শুষ্ক হতে-না-হতেই পাণ্ডু দ্বিতীয় বিবাহ করলেন মাদ্রীকে। এই অবস্থায় কুন্তীর মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকবে তার আঁচ মাদ্রীর মনেও লাগার কথা। তবে কি মহাকাব্যের বড় ঘরে প্রতিক্রিয়াগুলি কখনই স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, ফলত কুন্তীও যেমন মাদ্রীকে সস্নেহে মেনে নিয়েছিলেন, তেমনই মাদ্রীও থাকতেন কুন্তীর ছত্রছায়ায়।

কুন্তী এবং মাদ্রীর ব্যক্তিগত বেড়ে ওঠা বাল্য-কৈশোর-যৌবনসন্ধির সূত্রগুলি বিচার করলে দেখা যাবে— কুন্তীর জীবনে সংগ্রাম অনেক বেশি, সে তুলনায় পিতৃহীনা মাদ্রী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্নেহচ্ছায়ায় বেড়ে ওঠা অতিলালিতা যুবতী। বাল্যে যখন খেলার বয়সে অথচ রীতিমতো বুঝমান অবস্থায় কুমারী পৃথাকে রাজা কুন্তিভোজের কাছে দত্তক দিলেন আর্যক শূর, সেই সময় থেকে পালক পিতার বাড়ির জটিল জীবনে দুর্বাসার আগমন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূর্যের ঔরসে কানীন পুত্র লাভ, তাকে বিসর্জন দেওয়া এবং অবশেষে পাণ্ডুর সঙ্গে বিবাহ— এইসব কিছু কুন্তীকে যে ব্যক্তিত্ব দিয়েছিল, মাদ্রীর মধ্যে সেই ব্যক্তিত্বের উদ্ভবই ঘটেনি। ফলে পঞ্জাব-কাশ্মীরের জাতিকা যতই রূপবতী হোন, কুন্তীর ওপরে নির্ভর করে তাঁর সদানুগামিনী হয়ে তাঁর স্নেহব্যক্তি ভোগ করা ছাড়া মাদ্রী আর কিছু ভাবেননি। অর্থাৎ সেখানেও তিনি লালিতা ছিলেন।

আজ যখন পাণ্ডুর জীবনে অন্য উপায়ে পুত্রলাভের সমস্যা এল, তখন তাই ব্যক্তিত্বময়ী প্রথমা বধূ কুন্তীরই ডাক পড়ল। পাণ্ডু তাঁর প্রজনন-ক্ষমতার অসহায়তা প্রথম প্রকাশও করলেন কুন্তীর কাছে এবং তাও নির্জনে অর্থাৎ সেখানে মাদ্রী উপস্থিত নেই। অন্য উপায়ে নিয়োগ প্রথায় পুত্র উৎপাদন করার জন্য কুন্তীর কাছেই প্রথম প্রস্তাব করলেন পাণ্ডু। হয়তো নিরুপায় হয়েই, কেননা সেকালের শাস্ত্রীয় নিয়মে প্রথমা বধূই হলেন ধর্মপত্নী। মাদ্রীও সেকালের নিয়মে বিবাহিতা ধর্মপত্নী বটে, কিন্তু জ্যেষ্ঠ বধূ বর্তমানে কনিষ্ঠার শাস্ত্রীয় মূল্য থাকে না, অতএব পাণ্ডুর এই বিশাল সমস্যা-পর্বে মাদ্রীর কোনও ভূমিকা রইল না। আমরা এমন বিশ্বাস অবশ্যই করি না যে, মাদ্রী বড় অনাদরে, অবহেলায় রইলেন, বরঞ্চ বলব— সমস্যা সমাধান করার ব্যক্তিত্ব নিয়ে তিনি জন্মাননি, আর সমস্যা মেটানোর জটিল প্রয়োজনে মাদ্রীকে পাণ্ডু ব্যবহারও করেননি।

প্রজননে-অক্ষম পুরুষের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাও থাকে, পাণ্ডুরও সে সমস্যা ছিল এবং কুন্তী সে ব্যাপারে যতটা অবহিত ছিলেন, বা স্বামীর মন নিয়ে তিনি যতটা ভেবেছেন, মাদ্রী তা ভাবেননি বা ভাবা উচিত কিনা তাও ভাবেননি। পাণ্ডু যখন প্রথম কুন্তীকে নিয়োগপ্রথায় সন্তান উৎপাদন করতে বললেন, সে অবস্থায় কুন্তী পাণ্ডুর মানসিক ক্ষতে বহুতর প্রলেপ দেবার চেষ্টা করেছেন, তাঁর ওপরে চরম নির্ভরতা দেখিয়েছেন, কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও পাণ্ডুকে শেষ সিদ্ধান্ত নিতেই হয়েছে। কুন্তী যখন তাঁর পুত্র-জন্মের স্বাধীন উপায় হিসেবে দুর্বাসার দেবসঙ্গম মন্ত্রের রহস্যটুকু উদ্‌ঘাটিত করলেন, তখন পাণ্ডু সানন্দে কুন্তীকে অনুমতি দিয়েছেন পুত্র লাভের প্রযত্ন গ্রহণ করতে। পাণ্ডু যেমন যেমন বলেছেন, যে দেবতার আহ্বান করতে বলেছেন কুন্তীকে, তিনি সেই সেই দেবতাকে সম্বোধন করেই পুত্রলাভে ব্রতী হয়েছেন। তিন তিনটি পুত্রও সেইভাবে জন্মাল— যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন।

কুন্তীর গর্ভে তিন-তিনটি দেবোপম পুত্রলাভের পর আহ্লাদ, আশীর্বাদ আর শুভকামনায় পাণ্ডু বেশ কিছুদিন আবিষ্ট হয়ে রইলেন। ওদিকে ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর এক শত পুত্র হয়েছে। শুধু মাদ্রী, তিনিই রইলেন পুত্রহীনা। পুত্র উৎপাদনের অক্ষমতা সত্ত্বেও কুন্তীর গর্ভজাত পুত্রেরা যেহেতু তৎকালীন সামাজিক নিয়মে পাণ্ডুর পুত্র বলেই পরিচিত হলেন, অতএব পাণ্ডুর আনন্দও ছিল অকৃত্রিম। এর পরেও তিনি কুন্তীর কাছে আরও একটি পুত্রলাভের জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু নিয়োগের মাধ্যমে কুন্তী আর কোনও সন্তান গর্ভে ধারণ করতে চাননি।

ঠিক এইখানেই মাদ্রীর প্রবেশ। মাদ্রী পাণ্ডুর অন্তর্গত হৃদয়টুকু বোঝেন, তিনি বুঝে নিয়েছেন তাঁর স্বামীর পুত্রাকাঙ্ক্ষা এখনও মেটেনি। কিন্তু এমনও তো নয় যে, মাদ্রী কুন্তীর মতোই দুর্বাসার পুত্র-মন্ত্র লাভ করেছেন অতএব তিনিও তাঁর জ্যেষ্ঠা সপত্নীকে হারিয়ে দিয়ে

গর্বে নেচে বেড়াতে পারেন। অতএব পুত্র লাভ করতে হলে কুন্তীর ওপরেই নির্ভর করতে হবে। কিন্তু কোন সপত্নী, সে যতই ভাল এবং সুশীলা হোক, যার নিজের শরীরে এবং মনে সন্তান ধারণের কোনও অক্ষমতা এবং ব্যাধি নেই, সে কোনও আহ্লাদে অন্যতরা সপত্নীর কাছে নিচু হয়ে পুত্রলাভের মন্ত্র শিখতে চাইবে। অতএব মাদ্রী জ্যেষ্ঠা কুন্তীর কাছে এতটুকুও নত না হয়ে মনে মনে ঠিক করলেন— কাজটা স্বামী পাণ্ডুকে দিয়েই করাতে হবে, কেননা অক্ষমতা তো তাঁরই, দায় তো তাঁরই।

আমরা এমন কথা বলছি না যে, কুন্তীর ওপরে মাদ্রী খুব বিদ্বিষ্টা ছিলেন অথবা কুন্তীকে তিনি সপত্নী হিসেবে খুব দুষ্ট চোখে দেখতেন। আসলে একদিকে তিনি তো জিতেই ছিলেন। কুন্তীকে বিবাহ করার পরেও যখন মাদ্রীকে পাণ্ডু বিবাহ করেছেন, সেই দিনই তিনি একভাবে জিতে আছেন, কিন্তু তাঁর হার হয়েছে মাতৃত্বের পরতন্ত্রতায় এবং সেইখানে এক রমণী কী করে সপত্নীর কাছে মাথা নত করে। মাদ্রী তাই কুন্তীকে কিছু বললেন না, এতটুকুও আনত হলেন না তাঁর কাছে। তিনি উপায় খুঁজলেন নিজের স্ত্রীজনোচিত মর্যাদায়। একদিন যখন কুন্তী কোথাও কাছাকাছি নেই তখন নির্জনে পাণ্ডুর সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলেন মাদ্রী— মদ্ররাজসুতা পাণ্ডুং রহো বচনমব্রবীৎ।

মাদ্রী বললেন— মৃগ-মুনির অভিশাপে তোমার পুত্র উৎপাদনের শক্তি নেই, তাতে আমি তেমন দুঃখ পাইনি। এমনকী আমি রাজকন্যা হওয়া সত্ত্বেও এবং তোমার স্ত্রী হিসেবে গর্ভধারণ করার সমস্ত উপযুক্ততা থাকা সত্ত্বেও আমি যে এমন নিকৃষ্ট অমর্যাদাকর অবস্থায় আছি, তাতেও আমি দুঃখ পাই না। দুঃখ পাই না, কেন না এটা ভাগ্য, এটা নিয়তি। আবার ওদিকে কুরুবাড়ির বড় বউ গান্ধারী শত পুত্রের জননী হয়েছেন, তাতেও আমার দুঃখ নেই। কেননা তিনি ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী, হাজার হলেও বাড়িটাও তো অন্য, অন্য এক গার্হস্থ্য। কিন্তু এটা তো মানতেই হবে যে তোমার স্ত্রীত্বের মর্যাদায় কুন্তী এবং আমি দু'জনেই সমান। সেখানে তার পুত্র আছে অথচ আমার পুত্র নেই— এ দুঃখ আমি সইতে পারছি না— ইদন্তু মে মহদ্দুঃখং তুল্যতায়ামপুত্রতা।

মাদ্রী এই সূত্রটুকু জানাতে ভুললেন না যে কুন্তীর গর্ভে পাণ্ডুর ঔরসে কোনও পুত্র হয়নি, পুত্র হয়েছে অন্য উপায়ে, নিয়োগ-প্রথায়। কিন্তু এই কথাটা সোজাসুজি পাণ্ডুকে বললে তাঁর মনে আঘাত লাগবে বলে মাদ্রী সামান্য এক শব্দী ব্যঞ্জনা ব্যবহার করে বললেন— ভাগ্য, ভাগ্যি মানছি, কুন্তীর গর্ভে তোমার পরিচয়েই আমার স্বামীর পুত্রলাভ হয়েছে— দিষ্ট্যা ত্বিদানীং ভর্তুর্মে কুন্ত্যামপ্যস্তি সন্ততিঃ। এখানে 'দিষ্টা'— ভাগ্যি মানি, 'আমার স্বামীর'— ভর্তুর্মে— এবং অতি নৈর্ব্যক্তিকভাবে— পুত্র আছে— অস্তি সন্ততিঃ— এই কথাগুলি নিজের স্বামীর ওপর মাদ্রীর অধিকার বোধ যেমন স্থাপিত করে, তেমনই এক মুহূর্তের জন্য তাঁর জ্যেষ্ঠা সপত্নীকে যেন অকিঞ্চিৎকর করে তোলে। অর্থাৎ কুন্তী এই পুত্র পেয়েছে অন্য উপায়ে, এখানে তাঁর অন্য কোনও কৃতিত্ব নেই। যদি বা সে কৃতিত্ব থাকেও তবে তা মাদ্রীও দাবি করতে পারেন। মাদ্রী স্বামীকে বললেন— কুন্তীকে বলো— আমাকেও কিছু অনুগ্রহ করতে, তা হলে তোমার প্রতিও সেটা অনুগ্রহ করা হবে— কুর্যাদনুগ্রহো মে স্যাত্তব চাপি হিতং ভবেৎ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ভাল করা মানে তোমারও ভাল করা— তব চাপি হিতং ভবেৎ— এই কথা বলে মাদ্রী বোঝাতে চাইলেন— এ ব্যাপারে পাণ্ডুরই দায় আছে। কেননা নিয়োগ প্রথায় পুত্র লাভের কথা তিনি কুন্তীকেই প্রথম বলেছেন। দৈবাৎ কুন্তী দুর্বাসার দেবসঙ্গম মন্ত্র জানতেন, নইলে শুধুই নিয়োগের প্রশ্ন উঠলে মাদ্রীরই বা অসুবিধে কোথায়। কিন্তু কুন্তীর দেবসঙ্গম মন্ত্র যেহেতু সাধারণ নিয়োগের চেয়েও মহত্তর এবং শুভঙ্কর, অপিচ সেটা পাণ্ডুর পূর্বসম্মত এবং পছন্দসই বটে, তাই কুন্তীর মন্ত্রটাই মাদ্রী গ্রহণ করতে চাইলেন, স্ত্রীত্বের সমান মর্যাদাও। কিন্তু স্ত্রী হলেও মাদ্রী কুন্তীর সপত্নী বটে, অন্য সপত্নীর কাছে তিনি মর্যাদা নষ্ট করবেন কেন। তিনি তাই পাণ্ডুকেই বললেন— আমি সপত্নী হয়ে কীভাবে কুন্তীর কাছে এই অনুরোধ জানাব, আমার এ বিষয়ে সংকোচ আছে— সংস্তম্ভো মে সপত্নীত্বাদ্ বক্তুং কুন্তিসুতাং প্রতি। যদি সত্যি তুমি আমার মন বুঝে থাকো এবং সত্যিই আমার সঙ্গে সহমত হও তবে প্রসন্ন মনে কুন্তীকে তুমিই বলবে, এবং যাতে সে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়, সে ব্যবস্থাও করবে— যদি তু ত্বং প্রসন্নো মে স্বয়মেনাং প্রচোদয়।

পাণ্ডু বললেন— ক'দিন ধরে আমারও মনে এই কথাটা ঘুরছে ফিরছে বটে, কিন্তু তোমায় বলতে পারছি না— মমাপ্যেষ সদা মাদ্রি হৃদ্যর্থঃ পরিবর্ততে— বলতে পারছি না, কারণ তুমি কী ভাববে বা না ভাববে— এ ব্যাপারে আমার দ্বিধা ছিল। মানে কুন্তীর দেওয়া মন্ত্র তুমি নেবে কিনা। এখন তুমি যখন এ বিষয়ে মন করেছ, তা হলে অবশ্যই আমি চেষ্টা করব— প্রযতিষ্যাম্যতঃ— এবং আমি তেমন করে অনুরোধ করলে কুন্তী সেটা ফেলবে না বলেই আমার মনে হয়— মন্যে ধ্রুবং ময়োক্তা সা বচনং প্রতিপৎস্যতে।

সুন্দরী মাদ্রীর সংকোচ-দিগ্ধ উদাসী মনের কথা অনুভব করে তাঁর দুঃখে সমদুঃখী পাণ্ডু কুন্তীর কাছে একদিন বসলেন নির্জনে। বললেন— কল্যাণী! আরও একটি কল্যাণ তোমায় করতে হবে। আমার বংশ বিস্তারের জন্যই শুধু নয়, আমার সন্তোষের জন্য আরও একটু মঙ্গল বিধান করতে হবে তোমাকে— মৎপ্রিয়ার্থং চ কল্যাণি কুরু কল্যাণমুত্তমম্। পাণ্ডু জানেন— কুন্তী অবধারিতভাবে প্রশ্ন করবেন— তোমার বংশবিস্তার তো আমি করেছি এবং তাতেই তোমার সাংস্কারিক পিণ্ডলোপের ভাবনা দূর হয়ে যাবার কথা। শুধু তাই নয়, তোমার সন্তোষের কথা ভেবেই তো পর পর তিন বার আমি অপরিচিত দেবতার সঙ্গে সঙ্গত হয়েছি। পুনরায় চতুর্থ সন্তানের জন্য নিযুক্ত হবার প্রস্তাব তিনি নিজেই প্রত্যাখ্যান করেছেন আগে। তা হলে আবার সেই প্রশ্ন কেন।

পাণ্ডু জানেন, এই প্রশ্ন উঠবে। তাই আগে থেকেই তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, ঠিক বংশপরম্পরা রক্ষা বা তাঁর নিজের সন্তোষ নয়, কিছু কিছু কাজ করতে হয় যশের জন্য সম্মানের জন্য। আমরা আগে যেমন দেখেছি— বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক— তিনি রাস্তার মাঝে পরিচিত জনের সামনে দাঁড়িয়ে ইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণির বয়স্ক শিক্ষকের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছেন, কেননা এককালে তিনি তাঁর কাছে প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছিলেন। এতে কী হয়, প্রণতেরই ব্যবহারিক মর্যাদা বাড়ে। পাণ্ডু ঠিক সেইভাবেই বললেন কুন্তীকে। বললেন— দেখো, যে যজ্ঞ তপস্যা করে ইন্দ্র স্বর্গরাজ্যের আধিপত্য লাভ করলেন, সেই চরম লাভের পরেও কিন্তু ইন্দ্র যজ্ঞ করেছেন এবং তা করেছেন যশের

জন্য। মন্ত্রজ্ঞ ঋষি-ব্রাহ্মণেরা দুষ্কর তপস্যার অনুষ্ঠান করে সিদ্ধিলাভ করায়ত্ত করেও পুনরায় গুরুসেবা করেন যশলাভের জন্য— গুরূনভ্যুপগচ্ছন্তি যশসোঽর্থায় ভাবিনি। পাণ্ডু বোঝাতে চাইছেন— একটা বাড়তি কাজ তোমাকে করতে হবে মাদ্রীর জন্য। বললেন— তুমিই পারো মাদ্রীর কোলে একটি সন্তান দিতে। উত্তম বস্তু তো ভাগ করে নিতে হয়। তোমার পুত্রলাভের মন্ত্র মাদ্রীর সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে তাকেও যদি পুত্রলাভে সাহায্য করো, তবে তার দুঃখসাগরের তরীখানি হবে তুমিই। তুমিই তাকে বাঁচাতে পারো— সা ত্বং মাদ্রীং প্লবেনৈব তারয়ৈনামনিন্দিতে।

পাণ্ডুর আগ্রহাতিশয্য কুন্তী বুঝতে পারলেন, সহানুভূতিতে এটাও অনুভব করলেন যে, মাদ্রী তো সত্যিই বঞ্চিত, তাঁর স্বামীর কারণেই বঞ্চিত এবং সেখানে একজন স্ত্রী হিসেবে মাদ্রীর কোনও দোষই নেই। অতএব কুন্তী পাণ্ডুর প্রস্তাব সমর্থন করলেন অদ্ভুত এক আবরণে। তিনি বললেন— তুমি তো এত কালের আইন মেনেই একটা ন্যায়সঙ্গত কথা বলেছ— ধর্মং বৈ ধর্মশাস্ত্রোক্তং যথা বদসি তত্তথা। ঠিক আছে, এই অনুগ্রহটুকু আমি তাকে করব। পূর্বসংকেতমতো মাদ্রীর সঙ্গে দেখা হল কুন্তীর। কুন্তী তাঁকে দুর্বাসার দেব-সঙ্গমনী মন্ত্র দিয়ে বললেন— মাদ্রী। তুমি একবার, মাত্র একবার কোনও দেবতাকে এই মন্ত্রে আহ্বান করবে— সকৃচ্চিন্তয় দৈবতম্— আর তাতেই তুমি সেই দেবতার অনুরূপ পুত্র লাভ করবে।

'অনুরূপ পুত্র'— তস্মাত্তে ভবিতাপত্যম্ অনুরূপমসংশয়ম্— মাদ্রী অনেক চিন্তা করলেন কুন্তীর এই কথাটা। একবারের তরে সুযোগ পেয়েছেন, তো সে সুযোগটা তিনি কীভাবে ব্যবহার করবেন, এটা অবশ্যই মাদ্রীর ভাবনার বিষয় ছিল এবং এই ভাবনার মধ্যে দিয়েই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও কিছু বোঝা যায়। একবারের জন্য যে সুযোগ আসে, তাকে পূর্ণ সদব্যবহার করার জন্য যে দুটির দিকে তাঁর নজর থাকতে পারত— সে দুটিকে আধুনিক ভাষায় বলা যায় কোয়ালিটি এবং কোয়ানটিটি। তিনি যদি বুদ্ধিমতী হতেন, তিনি অভিজাত গৃহের অতি লালিতা সুন্দরী কন্যাটি না হয়ে যদি কুন্তীর মতো আশৈশব জীবনযুদ্ধ করা অভিজ্ঞা রমণীটি হতেন, তা হলে তিনি এমন এক দেবতার আশীর্বাদ মিলন প্রার্থনা করতেন, যিনি ধর্ম, বায়ু বা ইন্দ্রের চেয়েও অধিক প্রভাবশালী। কিন্তু মাদ্রী তেমন চাননি। আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল— কুন্তীর ক্ষেত্রে দেখেছি, প্রত্যেক পুত্র জন্মের আগে পাণ্ডুর সঙ্গে তাঁর আলোচনা হচ্ছে এবং প্রত্যেকবার পাণ্ডুই নির্দেশ দিচ্ছেন কুন্তীকে— তুমি ধর্মজ্যেষ্ঠ পুত্র কামনা করো, তুমি বলজ্যেষ্ঠ পুত্র কামনা করো অথবা দেবরাজোপম অধিগুণসম্পন্ন পুত্র কামনা করো। কিন্তু মাদ্রী কুন্তীর কাছ থেকে মন্ত্র পেলেন স্বামীর ওপর ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করে কিন্তু তারপরেই তিনি স্বাধীনা। একবারও তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন না— আমার গর্ভে তুমি কেমনতর পুত্র চাও। মন্ত্র লাভ করা মাত্রই তিনি সুযোগ সদ্ব্যবহারে মন দিয়েছেন।

আমি অবাক হই— ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্রের পরে মাদ্রী কেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের তেজ আধান করলেন না আপন গর্ভে। নাকি এঁরা মন্ত্রের এক্তিয়ার ভুক্ত ছিলেন না? তা হলে ইন্দ্র কিংবা বায়ুই বা নয় কেন দ্বিতীয়বার? অসুবিধে তো ছিল না। মাদ্রী তাঁর সুযোগের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সদ্ব্যবহার করলেন গাণিতিক সংজ্ঞায়। তিনি এক সুযোগে দুটি পুত্র চাইলেন। কেননা দেবতাদের মধ্যে যুগল দেবতা আছেন খুব কম, তবু পাণ্ডুকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি প্রখ্যাত মিত্রাবরুণের সন্ধান পেতেন। কিন্তু না, মাদ্রী স্বাধীনভাবে স্মরণ করলেন দৈববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে— ততো মাদ্রী বিচার্যৈবং জগাম মনসাশ্বিনৌ। অশ্বিনীকুমারদ্বয় মাদ্রীর গর্ভে যমজ সন্তানের বীজ আধান করলেন, নির্দিষ্ট সময়ে মাদ্রীর দুটি পুত্র হল। তারা কুন্তীর তিন ছেলের চেয়েও অনেক সুন্দর দেখতে। হয়তো বালক-বয়সের এই সৌন্দর্য্য কুন্তীকেও একটু ঈর্ষান্বিত করেছিল, কেননা তখনও ভীমার্জুনের শৌর্য-বীর্য প্রকটভাবে বোঝা যায়নি, আর শিশুরা তো আপন সৌন্দর্য্যেই মায়ের মন ভোলায় আরও বেশি।

মাদ্রীর দুই পুত্রের নামকরণ করলেন শতশৃঙ্গবাসী ব্রাহ্মণেরা— প্রথম জনের নাম নকুল, দ্বিতীয় সহদেব। পাঁচ পুত্র পেয়ে পাণ্ডু আনন্দে একেবারে ডগমগ হয়ে আছেন— মুদং পরমিকাং লেভে ননন্দ চ নরাধিপ। বালকেরা শতশৃঙ্গবাসী মুনি এবং মুনিপত্নীদেরও মায়া কেড়ে নিয়েছে। বোঝা যায় যে, পাণ্ডুর জীবনে বেশ একটা স্থিতাবস্থা এসেছে। কিন্তু এরই মধ্যে কোথায় কী হল, মহাভারতের কবির কোনও মহাকাব্যিক প্রস্তুতি দেখলাম না— নতুন কোনও প্রসঙ্গে যাবার আগে। হঠাৎই দেখলাম— পাণ্ডু একদিন কুন্তীর কাছে মাদ্রীর পুত্রের জন্য আবারও ওকালতি করছেন— কুন্তীমথ পুনঃ পাণ্ডুর্মাদ্র্যর্থে সমচোদয়ৎ। কেন যেন মনে হয়, পাণ্ডু স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কুন্তীকে এ কথা বলছেন না। কিন্তু মাদ্রীও এতটাই আত্মসচেতন যে, তিনি নিজের মুখে কুন্তীর কাছে যাচনা করে জ্যেষ্ঠা সপত্নীর কাছে ছোট হবেন না। অতএব পাণ্ডু কুন্তীর সহায়তা চাইছেন মাদ্রীর পুত্রের জন্য।

প্রথম যখন মাদ্রীর মনোদুঃখের কথা কুন্তীর কাছে বলেছিলেন পাণ্ডু, তখনও হয়তো কুন্তীর মনে কিছু মায়া তৈরি হয়েছিল কনিষ্ঠা সপত্নীর জন্য। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন— মাদ্রী যুগল-দেবতার আহ্বানে একবারে দু'দুটি পুত্রের জননী হয়েছেন তখন এই বুদ্ধিমত্তা তাঁর কাছে ছল-চাতুরী কপটতার শামিল হয়ে উঠেছে। তিনি বুঝেছেন যে, মাদ্রীর মনে তাঁকে অতিক্রম করার ভাবনা এসেছে। পুনরায় মন্ত্রদানে স্বীকৃত হলে, মাদ্রী হয়তো আবারও যুগল দেবতার আহ্বান জানাবেন। তাতে তাঁর পুত্রসংখ্যা হবে চার অর্থাৎ তিনি কুন্তীকে পুত্রের গুণমানে না হারিয়ে দিতে পারলেও সংখ্যায় হারিয়ে দেবেন। যদি বা কুন্তী তাঁকে এই প্রয়াসে বারণও করেন, তবে মাদ্রী তিন পুত্রের জননী হয়ে কুন্তীর সমান সৌভাগ্যবতী হবেন। কুন্তীকে কোনওভাবে অতিক্রম করা বা তাঁর সমান হতে চাওয়ার একটা বুদ্ধি যে মাদ্রীর মনে কাজ করছে— এটাই কুন্তীর ধারণা ছিল নিশ্চয়ই।

মাদ্রীর ওই চাতুরীটুকু কুন্তী মেনে নিতে পারেননি আগেই, অতএব আবারও যখন পাণ্ডু মাদ্রীর হয়ে কথা বলতে গেলেন, নির্জনে— রহস্যুক্তা সতী তদা— তখন একেবারে জ্বলে উঠলেন কুন্তী। বললেন— আমার সঙ্গে তো সে আগেই প্রবঞ্চনা করেছে। আমি তাকে বলেছিলাম— তুমি একবার মাত্র কোনও দেবতার আহ্বান করে পুত্র লাভ করো। কিন্তু সেই একবারের অঙ্কটা ঠিক রেখে যুগল দেবতার আহ্বান করে সে আমাকে সম্পূর্ণ প্রতারণা করল— উক্তা সকৃদ্ দ্বন্দ্বমেষা লেভে তেনাস্মি বঞ্চিতা। কুন্তী তাঁর সরলতা চেপে রাখেননি। মাদ্রী যে আবারও অশ্বিনীকুমারদ্বয় বা মিত্রাবরুণের মতো দ্বন্দ্ব-দেবতার আহ্বান করে

কুন্তীকে প্রতারিত করবেন— সে কথা চেপে রাখেননি কুন্তী। তিনি বলেছেন— খারাপ মেয়েছেলেরা এই রকমই করে থাকে, মাদ্রী আমাকে এইভাবেই প্রতারিত করবে আবার— বিভেম্যস্যা হ্যভিভবাৎ কুস্ত্রীণাং গতিরীদৃশী।

আসলে মাদ্রী যে তাঁকে এমন চতুর বুদ্ধিতে ঠকিয়ে দেবেন, এ কথা কুন্তী স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। এমনিতে হৃদয়ের গভীরে একটা অসূয়া অবশ্যই কাজ করে সপত্নীর ভাবনায়। কুন্তীকে বিবাহ করার পরেও যেদিন মাদ্রীকে নববধূ হিসেবে বরণ করেছেন পাণ্ডু, সেখানেই তো এই অসূয়ার বীজ উপ্ত হয়ে গেছে। সেকালের সামাজিক ভব্যতায় সপত্নীজনের প্রতি যতটুকু সখীবৃত্তি করা যায় ততটুকু যথাসাধ্য দেখালেও মাদ্রীর প্রতি রাজার কিছু রূপমোহ প্রকট ছিল বলেই মনে হয় এবং এই সামান্য পক্ষপাতও কুন্তীর হৃদয়ে এতটাই ক্ষত সৃষ্টি করেছিল যে, প্রথম সুযোগেই তিনি কনিষ্ঠা সপত্নীকে ধূর্ত এবং খারাপ মেয়েছেলে— কুস্ত্রীণাং গতিরীদৃশী— বলতে দ্বিধা বোধ করেননি। কুন্তী বলেছেন— আমি তো নিতান্তই বোকা। আমি তো একবারও ওর এমন চালাকির কথা মনে মনেও ভাবতে পারিনি যে, যুগল দেবতার আহ্বানে যমজ পুত্র হবে— নাজ্ঞাসিষমহং মূঢ়া দ্বন্দ্বাহ্বানে ফলদ্বয়ম্। অতএব মহারাজ! তুমি আর আমাকে এই বিষয়ে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করবে না আর এই অনুরোধ না করাটাই আমি বরদান বলে মনে করব— তস্মান্নাহং নিযোক্তব্যা ত্বয়ৈষোঽস্তু বরো মম।

কুন্তীর এই কঠিন-শীতল ভাষণ শুনে পাণ্ডু আর মাদ্রীর কথা তোলেননি। পাঁচ পুত্র সহ কুন্তী-মাদ্রী-পাণ্ডুর অরণ্য-জীবন আনন্দেই কাটতে লাগল। এরই মধ্যে সবকিছু উথাল-পাতাল করে দিয়ে বসন্তের সমাগম ঘটল শতশৃঙ্গ পর্বতে পাণ্ডুর অরণ্য আবাসে। চৈত্র এবং বৈশাখের মাঝামাঝি সময়, সমস্ত বন-পর্বতে শিহরণ জেগে উঠেছে। মহাভারতের কবি লিখেছেন— এ হল এক মোহন সময়, সমস্ত প্রাণী এই সময় পাগল হয়ে ওঠে— এই সময়ে পাণ্ডু মাদ্রীর সঙ্গে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন— ভূতসম্মোহনে রাজা সভার্যো ব্যচরণ্ বনে। ওই একটিমাত্র শব্দ 'ভূতসম্মোহন'কাল— ওই একটি শব্দেই কবি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, অন্য প্রাণীর সঙ্গে পাণ্ডুর আর কোনও তফাৎ নেই। তাতে আবার মাদ্রীর মতো রূপবতী এক রমণী তাঁর সঙ্গে।

নায়ক-নায়িকার হৃদ্য-সুপ্ত প্রেম যে মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে আলংকারিকেরা তাকে পরিভাষায় বলেন উদ্দীপন বিভাব, সেই উদ্দীপনের উদাহরণ বসন্ত। কবি লিখেছেন— শতশৃঙ্গ পর্বতের বনে বনে— পলাশ ফুলের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। চম্পক, অশোক, নাগকেশরের গন্ধে ম ম করছে চারদিক। দেবদারু এবং স্থলপদ্মেরও অভাব নেই। ভ্রমর-কোকিলের শব্দ এবং পার্বত্য জলস্থানে বিকচ পদ্মিনীর শোভা— পাণ্ডুর পক্ষে এ এক হন্তারক সময়, তাঁর হৃদয়ে ভালবাসার সঙ্গে আসঙ্গ-লিপ্সা প্রবল হয়ে উঠল— প্রজজ্ঞে হৃদি মন্মথঃ। মাদ্রীকে দেখে তিনি অভিভূত হলেন।

তত্ত্ববিদ ব্যক্তিরা বলে থাকেন— প্রজনন-শক্তি যাদের নেই, তাদের অক্ষমতা বিভিন্ন কারণেই ঘটে থাকতে পারে, এমনকী স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিকভাবে মিলিত হবার শারীরিক উপক্রমেও তার সমস্যা থাকতে পারে, কিন্তু তাতে তার আসঙ্গ-লিপ্সায় ভাটা পড়ে না, কেননা সেটা মনের ব্যাপার। তা ছাড়া অনেক সময় পুরুষের শক্তি-বীজেও অসম্ভাবনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ নিহিত থাকে, সেখানেও তার শারীরিক লিপ্সা ব্যাহত হয় না। এর আগেও যে দু'একটি মন্তব্য আছে মহাভারতে এবং এখন তো জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল যে, প্রজনন-ক্ষমতা না থাকলেও পাণ্ডুর সম্ভোগেচ্ছা লুপ্ত হয়নি। অবশ্য এ ব্যাপারে মাদ্রীকেও আমরা খুব নির্দোষ মনে করি না।

মাদ্রী তো জানতেন যে মিলিত হবার উপক্রমেই সম্ভোগদৃঢ় পাণ্ডুর ওপর কিমিন্দম মুনির মৃত্যুর অভিশাপ নেমে আসবে। এই অভিশাপের মধ্যে অলৌকিকতাই থাকুক অথবা সঙ্গমেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে এ কোনও মরণ ব্যাধিই হোক, মাদ্রী তো জানতেন যে, পাণ্ডু সকাম হলেই তাঁর মৃত্যু অনিবার্য। তবু তিনি তা মনে রাখেননি। হয়তো বেশ রূপবতী ছিলেন বলেই অথবা হৃদয়ের মধ্যে পুষ্পে কীটসম সেই সঙ্গমেচ্ছা লুকিয়ে ছিল বলেই আজ এই বসন্তের উত্তাল প্রকৃতির মধ্যে নিজেকেও তিনি মোহিনী করে তুলেছিলেন। তাঁর বয়স তো চলে যায়নি, মনুষ্য শরীরের স্ত্রীজনোচিত সন্ধিগুলি তো এখনও শিথিল হয়ে যায়নি তাঁর। অতএব আজ কী কথা তাঁর জাগল প্রাণে, তিনি এমন করেই সাজলেন, যাতে তাঁর শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি একেবারে প্রকট হয়ে ওঠে। মহাকাব্যের কবি সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিয়েছেন মাদ্রীর মন-রাঙা পরিধেয় বসনখানির ওপর। সে বসন এতটাই সূক্ষ্ম ছিল যা মাদ্রীর যুবতী-শরীরকে প্রকট করে তুলেছিল স্ফুটাস্ফুট ব্যঞ্জনায়— অন্তত পাণ্ডুর কাছে মাদ্রীর এই রূপই প্রকট হয়ে উঠেছে। একাকী অরণ্যমধ্যে মাদ্রীর পিছন পিছন যেতে যেতে সূক্ষ্মবস্ত্রভেদী মাদ্রীর যুবতী শরীরের দিকে বারবার দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন তিনি— সমীক্ষমাণঃ স তু তাং বয়স্থাং তনুবাসসম।

৩

পাণ্ডু পাগল হয়ে গেলেন। তাঁর শরীরে মনে আগুন জ্বলে উঠল। জেগে উঠল এতদিনের উপবাসী আকাঙ্ক্ষা— যেন গহন বনের গভীরে আগুন লেগেছে— তস্য কামঃ প্রববৃধে গহনেঽগ্নিরিবোত্থিতঃ। স্ত্রীর সঙ্গে বিচরণ করতে করতে অরণ্যপথে বহু দূর চলে এসেছেন পাণ্ডু। এখানে জন-মানব নেই কোনও দিকে। নির্জন স্থান, বাসন্তী প্রকৃতি এবং সামনে সুসূক্ষ্মাম্বরধারিণী মদ্ররাজনন্দিনী এবং তিনি কিনা পাণ্ডুর বিবাহিতা স্ত্রী। পাণ্ডু নিজের শরীর-মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না— ন শশাক নিয়ন্তুং তং কামং কামবলার্দিতঃ। তিনি প্রায় জোর করে মাদ্রীকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন— বলাদ্ রাজা নিজগ্রাহ। 'জোর করে'— এইজন্য যে, মাদ্রী মুহূর্তের মধ্যে বুঝে গেছেন বিপদ ঘনিয়ে আসছে তাঁর চোখের সামনে, তাঁর জ্ঞাতসারে। তিনি হাত দিয়ে, পা দিয়ে, সমস্ত শরীর দিয়ে যথাসম্ভব, যথাশক্তি বাধা দিতে লাগলেন স্বামীকে— বার্য্যমানস্তয়া দেব্যা বিস্ফুরন্ত্যা যথাবলম্— যাতে সেই মধুর আলিঙ্গন পর্যন্তই তাঁর স্বামীর মিলন-সুখ সিদ্ধ হয়, তার চাইতে বেশি নয়।

মাদ্রীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহু-ক্ষেপণ, নির্বল স্ত্রী-শরীরের বাধা এতটুকুও আমল দিলেন না পাণ্ডু। তাঁর মনে থাকল না কিমিন্দম মুনির অভিশাপ; তাঁকে আক্রান্ত করল না মৃত্যুভয়।

প্রায় বলাৎকারে তিনি মাদ্রীর সঙ্গে সঙ্গত হলেন মৃত্যুর সঙ্গে চিরসঙ্গত হবার জন্য— মাদ্রীং মৈথুনধর্মেন সোঽন্বগচ্ছন্ বলাদিব। মহাকাল গ্রাস করল পাণ্ডুর বুদ্ধি, মাদ্রীকে আলিঙ্গন-রত অবস্থাতেই পাণ্ডু ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে— স তয়া সহ সঙ্গম্য... যুযুজে কালধর্মণা। স্বামী পাণ্ডুর গতসত্ত্ব অবস্থা দেখে মাদ্রী বুঝলেন— এক মুহূর্তে সব শেষ হয়ে গেছে। তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল সেই হাহাকার-চিৎকার, সদ্য বিধবার প্রথম বিস্ফোরক ক্রন্দন-ধ্বনি— মুমোচ দুঃখজং শব্দং পুনঃ পুনরতীব চ।

মাদ্রীর আর্ত চিৎকার শুনে কুন্তী ছুটে চললেন বনের অভ্যন্তরে, তাঁর পিছন পিছন তাঁর তিন পুত্র এবং অবশ্যই মাদ্রীর পুত্রেরাও— নকুল এবং সহদেব।

এই আকুল অবস্থাতেও মাদ্রী বুঝলেন— ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না। পাণ্ডু যেভাবে মিলন সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর সঙ্গে, তাতে তাঁর বেশ-বাস বিস্রস্ত, বিধ্বস্ত, অসংবৃত হয়ে গেছে। এই অবস্থায় পুত্রেরা তাঁকে দেখলে যে তিনি পতিমৃত্যুর দুঃখের চেয়েও সমূহ লজ্জায় পতিত হবেন— এটা মাদ্রী অনুভব করলেন। বনের অন্তরাল থেকে কুন্তীকে দূর থেকে দেখতে পেয়েই তিনি বাস্তব-বোধের তাড়নায় বললেন— তুমি এখানে একা এসো দিদি, ছেলেদের তুমি ওইখানেই রেখে এসো— একৈব ত্বমিহাগচ্ছ তিষ্ঠন্ত্বত্রৈব দারকাঃ।

কুন্তী যেন খানিকটা আন্দাজই করে ফেলেছিলেন যে, ভয়ংকর কিছু ঘটেছে। মাদ্রী যে প্রলোভন সৃষ্টিকারী সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করে রাজার সঙ্গে গভীর নির্জন পথে একাকী গেছেন— এটা কুন্তী দেখেননি— এমনটি হতে পারে না। অতএব এখন মাদ্রীর এই চিৎকার এবং ছেলেদের দাঁড় করিয়ে রেখে একা তাঁকে আসতে বলার মধ্যে একটা ভয়ংকর আশঙ্কা তৈরি হয়ে গিয়েছিল কুন্তীর মনে। তিনি মাদ্রীর কথা শুনে পাঁচ পাণ্ডব-ভাইকে দূরে দাঁড় করিয়ে রেখেই একা চলে এলেন মাদ্রীর কাছে এবং মুখে বলতে লাগলেন— শেষ হয়ে গেলাম, আমি শেষ হয়ে গেলাম— হতাহমিতি চাক্রুশ্য সহসৈবাজগাম সা।

কুন্তী দেখলেন— মাদ্রী এবং পাণ্ডু— দু'জনেই শায়িত পড়ে আছেন ভূমিতে। তার মধ্যে পাণ্ডু মৃত এবং সেই মৃত স্বামীর দেহ আগলে ধরে পড়ে আছেন বিস্রস্তবাসা মাদ্রী— দৃষ্টা কুন্তীঞ্চ মাদ্রীঞ্চ শয়ানৌ ধরণীতলে। স্বামীর মৃত্যুতে কুন্তী হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন এবং এই মৃত্যুর জন্য দায়ী করে তিনি তিরস্কার করতে লাগলেন মাদ্রীকে। বললেন— আমার তো আশ্চর্য লাগছে, মাদ্রী! কিমিন্দম মুনির অভিশাপের কথা মাথায় রেখে তিনি নিজে সর্বদাই নিজেকে রক্ষা করে চলতেন এবং আমি তাঁকে রক্ষা করেই চলতাম— রক্ষ্যমাণো ময়া নিত্যং বনে সততম্ আত্মবান্। এ-কথাটার সোজা অর্থ হল— মুনির অভিশাপের কথা মনে রেখেই হোক অথবা অতিরিক্ত উত্তেজনায় নিজের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনে পাণ্ডু নিজে সমসময়ই শারীরিক সংসর্গ এড়িয়ে চলতেন স্ত্রীদের সঙ্গে এবং এমন ভাবনা এলে কুন্তীও তাঁকে এই সংসর্গ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন সব সময়। কুন্তীর তিরস্কার-শাসন মাদ্রীর উদ্দেশ্যে— আমি যখন পেরেছি তো তুই পারিসনি কেন? মুনির শাপের কথা মনে রেখেও রাজা তোকে এইভাবে আক্রমণ করলেন কী করে— কথং ত্বমভ্যতিক্রান্তঃ শাপং জানন্ বনৌকসঃ।

আক্রমণ। আক্রমণই বটে। মাদ্রীও সত্যি নিশ্চয়ই চাননি যে, তাঁর প্রিয় স্বামীর জীবনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্যু ঘনিয়ে আসুক। কিন্তু জ্যেষ্ঠা সপত্নী কুন্তীর মতো এখনও তাঁর মনের মধ্যে স্বামী-স্নেহ আসেনি। অনেকেরই হয় এমন, অনেক স্ত্রীলোকেরই এমন হয় যে, একটু বয়স হলে তাঁর পুত্র-বাৎসল্যের ভাগ স্বামীও কিছু পান। জায়া-বৃত্তির চরম স্থানে জননী-বৃত্তি এইভাবেই ভারতবর্ষে মিশে গেছে। কিন্তু কুন্তীর ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য হলেও মাদ্রীর সম্বন্ধে এটা প্রযোজ্য নয়। তাঁর বয়সও হয়তো কুন্তীর চেয়ে কিছু কম ছিল, এবং সৌন্দর্য্য কিছু বেশি। অন্যদিকে অভিশাপের ফলেই হোক অথবা ব্যাধির ফলেই হোক পাণ্ডুর আকালিক তথা বাধ্যতামূলক ইন্দ্রিয়সংযম মাদ্রীর যৌবন-বাসিত হৃদয়ের মধ্যে অতৃপ্তি জাগিয়ে রেখেছিল।

এই অতৃপ্তি সর্বদা অস্বাভাবিকও নয় এবং হয়তো সেই অতৃপ্তি এবং অপূর্ণতার বিকারটুকুই পথ খুঁজে নিয়েছিল তাঁর বাধাবন্ধহীন প্রলোভক সাজ-সজ্জায়, যেখানে তাঁর যৌবনোদ্ভিন্ন দেহসন্ধিগুলি ব্যাধিগ্রস্ত নিরিন্দ্রিয় পাণ্ডুকেও পাগল করে দিয়েছিল— সমীক্ষমাণঃ স তু তাং বয়স্থাং তনুবাসসম্। তিনি প্রলুব্ধ হয়ে প্রায় আক্রমণ করেছিলেন মাদ্রীকে। মাদ্রী যতই বাধা দেবার চেষ্টা করুন, নিজের যৌবনোচিত অভিসন্ধিগুলি যেহেতু স্বামীর চোখে যাচিয়ে নেবার চেষ্টাই তিনি করেছিলেন, অতএব আক্রান্ত হওয়াটাই তাঁর বিধিলিপি ছিল।

কুন্তীর মধ্যে যৌবনের অতৃপ্তি ছিল না, যে কোনও কারণেই হোক ছিল না। মাদ্রীর জ্বালা তিনি বোঝেননি, অতএব তাঁকে তিরস্কার করে বলেছেন— তোর কি উচিত ছিল না এই অবাধ্য কামসংসর্গ থেকে রাজাকে বাঁচিয়ে রাখার। কেন এই নির্জন বনের মধ্যে একা এসে এমন করে তুই প্রলুব্ধ করলি তাঁকে— সা কথং লোভিতবতী বিজনে ত্বং নরাধিপম্। মুনির অভিশাপের কথা স্মরণ করে সব সময় তিনি বিষণ্ণ থাকতেন, সে-কথা আমি জানি, নিজের দুর্দম বাসনাকে তিনি কখনও জাগ্রত হতে দিতেন না, কিন্তু তোকে নির্জনে দেখে হঠাৎ কেন তাঁর এই আনন্দ আবেগ উথলে উঠল— কথং দীনস্য সততং ত্বামাসাদ্য রহোগতাম্।... প্রহর্ষঃ সমজায়ত।

এই তিরস্কারের পরে কুন্তী যেন একটু ঈর্ষাই করতে লাগলেন মাদ্রীকে। মাদ্রীর সংসর্গ লাভের জন্য পাণ্ডুর উচ্ছ্বসিত পুলকিত মুখখানি তিনি স্বপ্নদৃষ্টিতে দেখতে পেলেন। সত্যিই তো কত কাল তিনি পাণ্ডুর এই আবেগ বিধুর মুখখানি দেখেননি। কিমিন্দম মুনির অভিশাপে স্ত্রী-সংসর্গ এবং পুত্রলাভের প্রত্যক্ষ উপায় যখন থেকে স্তব্ধ হয়ে গেল, সে-দিন থেকেই তিনি বিষণ্ণ বসে থাকেন। আপন স্ত্রীদের অন্য দেব-পুরুষের সংসর্গে নিযুক্ত করে পাণ্ডু ঠিকই পুত্র লাভ করলেন বটে, কিন্তু নিজের অক্ষমতা এবং পৌরুষ প্রকাশের অবসর না থাকায়— পাঁচ-পাঁচ বার অন্যকৃত এই স্ত্রী-সংসর্গ তাঁর মনকে আক্রান্ত করেছিল— যার বহিঃপ্রকাশ ওই বিষণ্ণতা— তং বিচিন্তয়তঃ শাপং দীনস্য— আর পরিশেষে স্বাভাবিক বিকার— মাদ্রীর ওপর এই আসঙ্গ-লুব্ধ আক্রমণ। মৃত্যুর মূল্যেও মাদ্রীকে এমন করে কামনা করেছেন বুঝেই সেই তিরস্কারের মুহূর্তেও কুন্তীর একটু দুঃখ হল, একটু ঈর্ষাও হল। মাদ্রীকে তিনি বললেন— তবু তোর আপন ভাগ্যে ধন্যি বটে তুই, অন্তত আমার চেয়ে তোর ভাগ্য ভাল— ধন্যা ত্বমসি বাহ্লীকি মত্তো ভাগ্যতরা তথা। তবু তো একবারের তরেও রাজার পুলকিত প্রসন্ন মুখখানি তুই দেখেছিস; আমি তো তা দেখিনি কতকাল— দৃষ্টবত্যাসি যদবক্ত্রং প্রহৃষ্টস্য মহীপতেঃ।

তিরস্কৃত হবার পরেও কুন্তীর মুখে এই সামান্য প্রশ্রয়সূচক ধনিয়মানি কথা শুনেই মাদ্রী একটু সাহস পেলেন কথা বলতে। বোঝাতে চাইলেন— তাঁর খুব দোষ ছিল না। বললেন— আমি বার-বার কেঁদে-কেটে অনেক জোর করে বারণ করেছি তাঁকে— বিলপন্ত্যা ময়া দেবি বার্য্যমাণেন চাসকৃৎ— কিন্তু তিনি শুনলেন সে-কথা! কপাল আর দুরদৃষ্ট। রাজা নিজের মনকে সংযত করেননি, হয়তো এই সুচিরনির্দিষ্ট মৃত্যু আজ ঘটবে বলেই তিনি নিজের মনের মধ্যে এই কামভাবকে সংযত করেননি— আত্মা ন বারিতোঽনেন সত্যং দিষ্টং চিকীর্ষুণা।

এ হল সেই চিরকালীন দ্বন্দ্ব— সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব, প্রাচীন-নবীনের দ্বন্দ্ব, সংরক্ষণশীল আর প্রগতিবাদীর দ্বন্দ্ব। কিন্তু যত গালভরা নামই থাক, এত বড় কথা না বললেও বলা যেতে পারে, এ হল চিরকালের কথা, চিরকালীন বিবাদ। কুন্তী বলবেন— তুই এমন করে সেজেছিস কেন যাতে রাজার মন প্রলুব্ধ হয়? আর মাদ্রী বলবেন— আমি তো অনেক বাধা দিয়েছি, কিন্তু পুরুষ কেন তার মন সংযত করতে পারে না। এমন করে কেন সে মৃত্যু ডেকে আনে নিজের!

যাই হোক, কুন্তী আর মাদ্রীর মধ্যে এই বিবাদ বেশিক্ষণ চলেনি। প্রিয় স্বামীর মৃত্যুতে বিহ্বল দুই রমণীই খুব শীঘ্রই আপন ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং কুন্তী প্রস্তাব দিলেন তিনি স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হবেন।

তাঁর যুক্তি ছিল— আমি যেহেতু বড় এবং যেহেতু আমার সঙ্গেই রাজার প্রথম বিয়ে হয়েছে অতএব আমিই তাঁর ধর্মপত্নী। আর ধর্মপত্নীরই অধিকার থাকে সহমরণে গিয়ে ধর্মফল আত্মস্থ করার। তুমি বাছা, এই মৃতদেহ ছেড়ে ওঠো, আমি এখনই অনুমৃতা হব স্বামীর সঙ্গে। তুমি উঠে গিয়ে এই বালকদের পাশে দাঁড়াও এবং মানুষ করো তাদের— উত্তিষ্ঠ ত্বং বিসৃজ্যৈনমিমান্ পালয় দারকান্।

যে সময়ে কুন্তী সহমরণে যাবার কথা বলছেন, এই সময়টাতে সহমরণ প্রথা যে খুব চালু ছিল, তা মনে হয় না। অতীত বৈদিক যুগের উত্তরাধিকারে মহাকাব্যিক সমাজের গঠন তৈরি হয়েছিল, তাতে রামায়ণ এবং মহাভারত কোনওটাতেই সহমরণের কথা বিশেষ একটা নেই। সহমরণ বা অনুমরণের কথা উঠলেই গবেষকেরা মহাভারতে এই স্থানটির কথা উল্লেখ করেন এবং সেই কারণেই জানাতে চাই যে, কুন্তী বা মাদ্রীর এই প্রচেষ্টা একেবারেই প্রথাগত নয়। এটার মধ্যে প্রেমের কিছু তত্ত্ব নিহিত আছে। কুন্তী এবং মাদ্রী দু'জনেই পাণ্ডুকে বড় ভালবাসতেন এবং তা প্রায় রেষারেষি করে ভালবাসা। একেবারে জৈব মিলনের ক্ষেত্রে পাণ্ডুর অক্ষমতা থাকায় অথচ সেই ব্যাপারে পাণ্ডুর অভিলাষ অমলিন থাকায় কুন্তী এবং মাদ্রীর অতৃপ্তি ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই অতৃপ্তি তাঁরা প্রেমের সরসতায় ঢেকে দিতে পেরেছিলেন। একথা মানতে হবে যে, নিজের জীবনের বহুতর জটিল অভিজ্ঞতায় জ্যেষ্ঠা কুন্তী পাণ্ডুর জৈবিক অক্ষমতার ঘটনাটুকু খুব সহজে মেনে নিয়েছিলেন, তাঁর নিজের তাড়নাও তেমন ছিল না। কিন্তু বয়স কম হওয়ার জন্যই হোক বা রূপবত্তার কারণে পাণ্ডুর প্রিয়তরা হওয়ার জন্যই হোক— মাদ্রীর নায়িকা ভাবটুকু কোনও দিনই যায়নি। জৈবিক ভাবনাতেও তাঁর খানিকটা অতৃপ্তি ছিল হয়তো।

লক্ষণীয়, কুন্তী যে অনুমরণের কথা বলছেন, তার মধ্যে স্বামীর প্রতি তাঁর প্রকট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালবাসার সূত্র যতখানি আছে, তার চেয়ে বেশি আছে জ্যেষ্ঠা পত্নীর কর্তব্যবোধ এবং সামাজিক ঔচিত্যের প্রাধান্য। তিনি বলেছিলেন, আমি সহমরণে যেতে চাই, তার কারণ আমি বাড়ির বড় বউ, ধর্মপত্নী এবং জ্যেষ্ঠা পত্নীই প্রথম ধর্মফলের অধিকারী— অহং জ্যেষ্ঠা ধর্মপত্নী জ্যেষ্ঠং ধর্মফলং মম— যেন স্বামীর অনুমরণে পুণ্যধর্ম বলে যদি কিছু থাকে, তবে সে পুণ্য নিয়ম অনুসারে তাঁরই প্রাপ্য। মাদ্রী কিন্তু এমন কথা বলেননি; তিনি স্বামীর জৈবিক চরিত্রটি ধরতে পেরেছেন এবং নিজের জৈবিকতাও প্রকট করে তুলতে তাঁর লজ্জা হয়নি। মাদ্রী বলেছেন— দিদিগো! স্বামী আমার কাছ থেকে চলে গেছেন বলে আমি মনে করি না, অতএব আমিই তাঁকে অনুগমন করতে চাই। আমার অন্তর্বহা কামনা, আসঙ্গলিপ্সা এখনও তৃপ্ত হয়নি। তুমি তাই বাধা দিয়ো না আমাকে— ন হি তৃপ্তাস্মি কামানাং জ্যেষ্ঠে মামনুমন্যতাম্।

ভারতীয় ধর্মদর্শনের জটিল তাত্ত্বিকতা পরিহার করেই একটা বিশ্বাসের কথা আমাদের জানাতে হবে। সেই বিশ্বাসটার পারিভাষিক তথা দার্শনিক নাম বাসনা-সংস্কার। এতবড় কথা এখানে পাঁচ লাইনে বোঝানো যাবে না। কিন্তু এটাই হল বিশ্বাস যে, আমাদের ইহলোকের কামনা-বাসনা-তৃপ্তি-অতৃপ্তি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা— সব কিছু অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে 'মনোবুদ্ধিচিন্তাহংকারাত্মক' সূক্ষ্ম দেহের মধ্যে নিহিত হয়ে মরণের পর প্রেতলোকে এবং পরজন্মেও সঞ্চারিত হয়। এই দর্শনের কথা উপাখ্যানের আকারে সবচেয়ে ভাল বলা আছে জড়-ভরতের কাহিনিতে— ভাগবত পুরাণে। এখানে মাদ্রীও সেই সাংস্কারিক বিশ্বাসেই কথা বলছেন— স্বামীর সঙ্গে শারীরিক সংশ্লেষের সমস্ত অতৃপ্তি আমার শরীরে, হয়তো সেই অতৃপ্তি রয়ে গেছে স্বামী পাণ্ডুর মধ্যেও— যার জন্য নিজের সর্বনাশ জেনেও আমারই সংসর্গ লাভ করতে গিয়ে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হলেন— মাঞ্চাভিগম্য ক্ষীণোঽয়ং কামাদ্ ভরতসত্তমঃ। অতএব আমিই অনুমৃতা হব।

মাদ্রীর কথাগুলি শুনলে ভদ্র-জীবের মনে এমন ভাবনা উদয় হতে পারে যে, এ তো বড় নচ্ছার মহিলা, নিজের শারীরিক কামনার কথা এমন সোচ্চারভাবে বলে যাচ্ছে, এ তো সভ্য সমাজের দৃষ্টিকটুতা, শ্রবণকটুতা— কিছুরই তোয়াক্কা করে না। হ্যাঁ, আপাতদৃষ্টিতে এমনটা হয়তো বলা যেতে পারে, কিন্তু সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে, এটা মহাভারত মহাকাব্য। এখানে উপন্যস্ত কাহিনির মধ্যে নায়ক-নায়িকা, পাত্র-পাত্রী, সকলেই স্পষ্ট কথা বলেন এবং পরবর্তী কালের সভ্যতার নিয়মে অতিরিক্ত সাংস্কৃতিক সংকোচে মনে ভাব অবদমিত রেখে উত্তর জীবনে কোনও ফ্রয়েডীয় তাত্ত্বিক বিকারের শিকার হওয়া পছন্দ করতেন না তাঁরা। এ সবের চাইতে নিজের সাংস্কারিক ধারণায় স্বামীর সঙ্গে শীঘ্র মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই মাদ্রী স্বেচ্ছায় অনুমৃতা হতে চেয়েছেন— একেবারেই স্বেচ্ছায়, সহমরণের কোনও আনুষ্ঠানিক তথা প্রথাগত কারণে নয়।

ঠিক এই মুহূর্তে, অনুমরণের এই অন্তিম মুহূর্তে মাদ্রীর অদ্ভুত স্পষ্ট উচ্চারণগুলি একদিকে যেমন তাঁকে কুন্তী, গান্ধারী— এইসব উদার বৃহৎ মহাকাব্যিক চরিত্রের প্রতি তুলনায় ক্ষুদ্র করে তোলে, অন্যদিকে এই ক্ষুদ্রতাই শত শত সমকালীন পরিবারের সপত্নীবৃত্তিতার বাস্তব প্রতিভূ করে তোলে তাঁকে। মাদ্রী তাঁর স্বামীর সম্পূর্ণ অধিকার চান; স্বামীর মানসিক এবং

শারীরিক ক্ষেত্রটি একান্তভাবেই তিনি নিজের করে পেতে চান, তাঁর জ্যেষ্ঠা অতএব ধর্মপত্নীর অধিকারের গরিমা নিয়ে কুন্তী পাণ্ডুর সহমৃতা হবেন— এই অধিকার মাদ্রীর কাছে নিতান্তই কৃত্রিমতা। আপন শারীরিক আসঙ্গ-লিপ্সার প্রকট উচ্চারণ করে তিনি কুন্তীর ওই কৃত্রিমতা এক মুহূর্তে ভেঙে দিয়েছেন। বুঝিয়ে দিয়েছেন— মরণের স্পষ্ট ইঙ্গিত উপেক্ষা করেও যে স্বামী তাঁরই শারীরিক সঙ্গ কামনা করেছেন, সে স্বামী যেন একান্তভাবে তাঁরই, কুন্তীর নয়। এমনকী এই মৃতদেহটির ওপরেও যেন তাঁরই সর্বাঙ্গীণ অধিকার। কুন্তীকে বলতে হচ্ছে— তুই এই মৃতদেহটি ছেড়ে উঠে আয় এবার— উত্তিষ্ঠ ত্বং বিসৃজ্যৈনম্।

৪

মাদ্রী আরও বেশি রূঢ় এবং বাস্তব হয়ে ওঠেন পুত্রদের কথায়। কুন্তী বলেছিলেন— এই ছেলেপিলেদের ভার তোর ওপরে থাকল বোন। আমি স্বামীর অনুমৃতা হব। মাদ্রী এখানেও সেই ক্ষুদ্রতা প্রকট করে তুলেছেন, কিন্তু ক্ষুদ্রতা এতই বাস্তব এবং স্পষ্ট যে মাদ্রী এখানে সপত্নীবৃত্তির প্রকট মহাকাব্যিক প্রতিবাদ হয়ে ওঠেন। মহাকাব্যিক এইজন্য বলছি যে, মাদ্রী নিজের দীনতা, ক্ষুদ্রতা প্রকাশ করছেন একজন সমকালীন কনিষ্ঠা সপত্নীর প্রতিভূ হিসেবে কিন্তু একই সঙ্গে জ্যেষ্ঠার উদারতাটুকুও তিনি অস্বীকার করেন না। যা তিনি পারেন না, মাদ্রী তার ভানও করেন না। অতএব মাদ্রীপুত্রদের সঙ্গে তিন জন কৌন্তেয়কে সুরক্ষা দিয়ে বড় করার কথা কুন্তীর মুখে প্রস্তাবিত হতেই মাদ্রী নিজের অক্ষমতা জানিয়ে বললেন— আমি পারব না দিদি! আমি পারব না। আমি তোমার ছেলেদের ওপর নিজের ছেলেদের সমান ব্যবহার করতে পারব না, আমার পক্ষপাত আসবেই— ন চাপ্যহং বর্তয়ন্তী নির্বিশেষং সুতেষু তে। আমি জেনেশুনে এই পাপ করতে পারব না। তার চেয়ে এই ভাল, আমার দুটি ছেলেকে তুমি নিজের ছেলের স্নেহ দিয়ে দেখো— তস্মান্মে সুতয়োঃ কুন্তি বর্তিতব্যং স্বপুত্রবৎ।

নিজের ছেলের সমান করে সপত্নী-পুত্রদের দেখা— এটা সহজ কথা নয়, অনেকেই তা পারেন না। কিন্তু সেই সত্যটাকে এমন অকপটে স্বীকার করাটা সহজ নয়, আর ঠিক এইখানেই মাদ্রীকে অন্যতর এক মর্যাদায় দেখতে পাই আমরা। তিনি এতটাই জোর দিয়ে নিজের ক্ষুদ্রতাকে সত্যের মহিমায় প্রকাশ করেন যে কুন্তীর মতো বিশাল ব্যক্তিত্বও কেমন কথা হারিয়ে নিশ্চুপে দাঁড়িয়ে থাকেন।

মাদ্রী শেষ কথা বলেন— আমার সঙ্গে উপগত হবার চেষ্টাতেই রাজা মৃত্যুবরণ করেছেন— মাং হি কাময়মানোঽয়ং রাজা প্রেতবশং গতঃ— অতএব আমার মৃত শরীর তাঁর শরীরের সঙ্গে একত্র আবৃত করে দগ্ধ কোরো। তাতেই আমার প্রিয় আচরণ করা হবে। আর কী বলব, দিদি! তুমি চিরকালই আমার ভাল করে এসেছ, অতএব আমার ছেলে-দুটির ওপরেও তোমার সমান দৃষ্টি থাকবে, এটাই যেন হয়— দারকেষ্বপ্রমত্তা চ ভবেথাশ্চ হিতা মম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই কথোপকথনের পর মহাভারতে যেমনটি লেখা আছে তাতে শব্দগতভাবে মনে হতে পারে যেন মাদ্রী স্বামীর চিতাগ্নিতে আরোহণ করলেন— ইত্যুক্ত্বা তং চিতাগ্নিস্থং ধর্মপত্নী নরর্ষভম্। অর্থাৎ যেন মনে হয়, মাদ্রী জ্বলন্ত চিতায়-শোয়া স্বামীর অনুগমন করলেন। কিন্তু আপাতভাবে শব্দের চেহারা দেখে— বিশেষত 'চিতাগ্নিস্থ' কথাটি দেখে এমন মনে হতে পারে বটে যে, মাদ্রী মধ্যযুগীয় ভাবনামতো সতী হলেন স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দিয়ে। কিন্তু মহাভারতের প্রমাণেই বলা যায় এমনটি ঘটেনি। আসলে 'চিতাগ্নিস্থ' শব্দের সোজাসুজি অর্থ এইরকমই অর্থাৎ পাণ্ডুকে যেন চিতায় তোলা হয়েছে। কিন্তু তা নয়, এখানে 'চিতাগ্নিস্থ' মানে করতে হবে— যাকে চিতায় ওঠাবার অবস্থা তৈরি হয়েছে। এইরকম একটা অর্থান্তর-ভাবনা করতেই হচ্ছে কেননা আমরা জানি যে পাণ্ডুর শবশরীর এখনও দাহ করা হয়নি, অতএব মাদ্রীর চিতাগ্নি প্রবেশের প্রশ্নই ওঠে না। এই অধ্যায়ের পরের অধ্যায়ে দেখছি— শতশৃঙ্গবাসী মুনি-ঋষিরা পাণ্ডু এবং মাদ্রীর মৃতদেহ হস্তিনাপুরে পৌঁছে দিয়েছেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এবং তাঁদের দাহকার্য সম্পন্ন হয়েছে হস্তিনাপুরেই স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে। অতএব মাদ্রী চিতাগ্নিতে প্রবেশ করে সতী হননি মোটেই, তিনি যা করেছেন, সেটাকে যোগের দ্বারা আত্মমরণ ঘটানোর বিষয় বলে ভাবা যেতে পারে। এমনটি সেকালে অভিজাত জনেরা করতেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের ইতর-বিশেষ ঘটিয়ে যোগনিরুদ্ধ অবস্থায় যৌগিক কৌশলে নিজের মৃত্যু ঘটানোর কথা মহাভারতে একাধিক আছে। মাদ্রীও সেই যৌগিক মৃত্যুই বরণ করেছেন চিতাগ্নিযোগ্য পাণ্ডুর অনুমৃতা হয়ে।

পরের অধ্যায়ে মুনি-ঋষিদের ব্যস্ত হতে দেখছি। পাণ্ডু রাষ্ট্র ছেড়ে এসেছিলেন, তাঁকে স্বরাষ্ট্রে পৌঁছে দিতে হবে তাঁর দেহ-সংস্কার রাষ্ট্রের মধ্যেই হতে হবে। অতএব পাণ্ডুর শবদেহ এবং মাদ্রীর শবদেহ নিয়ে মুনিরা হস্তিনাপুরে এসেছেন। সঙ্গে অবশ্যই কুন্তী এবং পঞ্চপাণ্ডব। ঋষিরা ধৃতরাষ্ট্র-ভীষ্ম-বিদুরের সামনে পাণ্ডু-পুত্রদের সবিশেষ পরিচয় দিয়ে তারপর বলেছেন— আজ থেকে সতেরো দিন আগে পাণ্ডু মারা গেছেন এবং তিনি চিতাগ্নিতে স্থান পাবেন জেনেই মাদ্রীও তাঁর সঙ্গে একত্র স্থান পাবার আশায় নিজের প্রাণত্যাগ করেছেন— সা গতা সহ তেনৈব... হিত্বা জীবিতমাত্মনঃ— এবারে আপনারা এঁদের অন্তিম সংস্কার করুন। এরপরে পাণ্ডু এবং মাদ্রীর শব-শরীর দুটি হস্তিনার রাজপরিবারের সামনে রেখে ঋষিরা বলেছেন— এই রইল পাণ্ডু এবং মাদ্রীর দুটি শব দেহ, এই রইল তাঁদের ছেলেপিলেরা সব— ইমে তয়োঃ শরীরে দ্বে সুতাশ্চেমে তয়োর্বরাঃ— এবারে পরবর্তী কর্ম আপনারা করুন।

মাদ্রী রাজপরিবারের জাতিকা, রাজবধূও বটে। অতএব ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু এবং মাদ্রীর শব-সংস্কার কর্মের জন্য যথেষ্ট সমারোহের আদেশ দিলেন বিদুরকে— রাজবদ্ রাজসিংহস্য মাদ্র্যাশ্চৈব বিশেষতঃ। মাদ্রী মৃত রাজার সহধর্মচারিণী বলেই তাঁর রাজমর্যাদা মাথায় রেখেই ধৃতরাষ্ট্র বলেছেন— মাদ্রীর শবদেহ যেন অত্যন্ত আবৃত অবস্থায় চিতাস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়— এতটাই আবৃত, যেন সূর্যের কিরণ সেখানে প্রবেশ না করে, যেন সর্বব্যাপী বায়ুও তার স্পর্শ না পায়— যথা চ বায়ুর্নাদিত্যঃ পশ্যেতাং তাং সুসংবৃতাম্।

মাদ্রীর শব-শরীরের ব্যাপারে এই সংরক্ষণশীলতা ধৃতরাষ্ট্রের গোঁড়ামি, নাকি সেটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজমহিষীর মর্যাদা, সেটা বোঝা বেশ কঠিন। যাই হোক, ধৃতরাষ্ট্র আদেশ দিলেন কুন্তীই তাঁর কনিষ্ঠা সপত্নীর অগ্নিসংস্কার করবেন। হয়তো মাদ্রীপুত্রেরা অত্যন্ত ছোট এবং মাতৃশোকে তাঁদের আকুল অবস্থা বুঝেই ধৃতরাষ্ট্র কুন্তীর ওপর এই মুখাগ্নি সংস্কারের ভার ন্যস্ত করেছেন। এই আদেশ-প্রক্রিয়া থেকে আরও মনে হয় যে, গোঁড়ামি নয়, তখনকার দিনের গৃহবধূ রমণীর মর্যাদা হয়তো এমনই ছিল, যাতে মরণের পরে তাঁকে সুসংবৃত করেই দেহসংস্কার করা হত। ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ এবং মাদ্রীর শেষ ইচ্ছা স্মরণে রেখে নিযুক্ত পুরুষেরা একই শিবিকাতে পাণ্ডু এবং মাদ্রীর শব-দেহ গন্ধ-পুষ্প মাল্যের রাজকীয় আড়ম্বরে সজ্জিত করে নিল। মাদ্রীর সঙ্গে পাণ্ডুর দেহখানিও একত্র আবৃত করে অনেকগুলি অভিজ্ঞ শিবিকাবাহী মানুষ সেই সুসজ্জিত শিবিকা বয়ে নিয়ে গেল গঙ্গার তীরভূমিতে— অবহন্ যানমুখ্যেন সহ মাদ্র্যা সুসংবৃতম্।

মনোরম গঙ্গার তীরে যখন মাদ্রী এবং পাণ্ডুর শিবিকা এসে পৌঁছল, তখন সেই শিবিকা স্পর্শ করে যাঁরা মাটিতে নামালেন, তাঁদের মধ্যে পঞ্চপাণ্ডব ভাইদের সঙ্গে বিদুর এবং ভীষ্মও আছেন— ন্যাসয়ামাসতুরথ তাং শিবিকাং সত্যবাদিনঃ। মৃতদেহ সংকারের পূর্বে যে সব আচার-নিয়ম আছে— কালাগুরু-চন্দনের প্রলেপ দিয়ে মৃতদেহ স্নান করানো, স্নানের পর আবার চন্দনের অনুলেপন— এসব পাণ্ডুকেও যেমন করা হল, মাদ্রীকেও তেমনই করা হল। ঘৃতলিপ্ত অলংকৃত পাণ্ডু এবং মাদ্রীর বস্ত্রাবৃত দেহ এবার তোলা হল চিতায়। চিতার চন্দনকাঠে আগুন দিতেই দুটি শব-শরীর যখন জ্বলে উঠল। পুত্র এবং পুত্রবধূর এমন বীভৎস প্রয়াণ দেখে পাণ্ডুর জননী প্রৌঢ়া অম্বালিকা মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন— ততস্তয়ো শরীরে দ্বে দৃষ্বা মোহবশং গতা।

এই শেষ হয়ে গেল মাদ্রীর জীবন। স্বামীর মৃত্যুর পর যোগবলে নিজের দেহপাত ঘটানোর পর এমন একটাও ঘটনা ঘটেনি অথবা এমন একটিও প্রক্রিয়া ছিল না, যেখানে মাদ্রী এবং পাণ্ডুর পৃথক কোনও সংস্কার ঘটেছে। মাদ্রী তো এই চেয়েছিলেন। কোনওভাবে তিনি প্রিয় স্বামীর কাছ থেকে আলাদা থাকতে চাননি। মরণ তাঁকে এই একত্রস্থিতির নিশ্চিন্ততা দিয়েছে, কিন্তু বেঁচে থাকতে তাঁর ইচ্ছাপূরণ ঘটেনি। জ্যেষ্ঠা সপত্নী কুন্তী পাণ্ডুর কাছে যে বড় অত্যাদর লাভ করেছেন, তা নয়, হয়তো সে তুলনায় মাদ্রীর প্রতিই রাজা বেশি আসক্ত ছিলেন। কিন্তু স্বামীর এই আসক্তি সত্ত্বেও মাদ্রীর মধ্যে একটা রিক্ততা কাজ করত। তাঁর হৃদয়ের মধ্যে যে অনন্ত প্রেম ছিল, যে নিবিড় আসঙ্গলিপ্সা ছিল, জীবন থাকতে সে প্রেম তার পথ খুঁজে পায়নি। কুন্তী তাঁর কনিষ্ঠা সপত্নীকে খুব আদরও করেননি আবার কোনও অপব্যবহারও তাঁর সঙ্গে করেননি। কিন্তু তিনিই বুঝি মাদ্রীর সর্বাঙ্গীণ প্রেমে বাধা দিলেন। প্রেমের ক্ষেত্রে, অথবা প্রেমের অধিকারে এতটুকু ভাগও মাদ্রী সহ্য করতে পারেন না। স্বামীকে তিনি সম্পূর্ণভাবে একান্ত আপন করে চান বলেই তিনি চিরতরে স্বামীর মরণশয্যার সঙ্গী হলেন পরজন্মের আশায়। তাঁর এই মরণোত্তর বিবাহের সাক্ষী হয়ে রইল যুগল-চিতার আগুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিড়িম্বা

এই মহান বিশ্বায়নের যুগে বাঙালির বিয়ে নিয়ে যে কত সমস্যা হচ্ছে, তার কতটুকু খবর আপনারা রাখেন! হ্যাঁ, এটা মানি যে, ভারতবর্ষে বিয়ে এমনই সংবেদনশীল ব্যাপার, যেখানে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সংশ্লেষণ, সংবেদনশীলতা এবং আবেশের চেয়েও বাবা-মামা আত্মীয়স্বজনের আপন হৃদয়-মথিত শাস্ত্রজ্ঞান যে কত মধুর হৃদয় বিমর্দিত করেছে, তা ভাবলে আমার কষ্ট হয়। এই যে সেদিন এক ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের জ্যোতিষীক 'দেব'গণ নিয়ে এমন গর্বিত হয়ে বসে থাকলেন যে, 'রাক্ষস'গণের এক প্রেমিক-রাক্ষস যুদ্ধে ক্ষান্তি দিয়ে মেয়েটির ব্যাপারে অজস্র প্রেম নিবেদন করে বাড়ি ফিরে গেল। আমি যত বোঝানোর চেষ্টা করলাম— বিয়ের ব্যাপারে এটা এত কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়— তোমার মেয়ে দেবগণ বলে এমন কিছু দেবপ্রতিমা নয় যে, সর্বদা সে দেবতার আচরণ করে বেড়াচ্ছে। তার হাতে লক্ষ্মীর ঝাঁপিও নেই, সরস্বতীর বীণাটিও নেই, বরং প্রেমের ক্ষেত্রে তার যে অভয়মুদ্রাটি ছিল, সেটাও এখন গুটিয়ে যাচ্ছে বাবা-মায়ের অল্পশিক্ষিত জ্যোতিষচর্চায়। বলি, এটা কোনও কারণ হল বিয়ে ভাঙার? তোমার নিন্দিত রাক্ষস'গণে'র চেয়ে রাক্ষস তো তথাকথিতভাবে আরও খারাপ, সেই স্বয়ং রাক্ষসের সঙ্গে বিয়ে হলেও প্রেম-ভালবাসার ক্ষেত্রে কোনও ক্ষতি হয় না।

আমার চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুনে পরিধানে তীব্রবাস সেই সুন্দরী মেয়েটি ভিতর-ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দেখলুম— সে একটা গেঞ্জি পরে আছে, যা আমার পাঁচ বছরের নাতনির গায়েই লম্বায় খাটো হবে। যা হোক, সেটাকে কোনও মতে টেনে-টুনে আমার সামনে অর্ধোদর অবস্থায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল— আমিও তো তাই বলি কাকু, এই সব দেবগণ, রাক্ষসগণ এ-সব কী 'হুইমজিক্যাল' জিনিস বলো তো? কোনও মানে আছে এ-সবের? আমি বললাম— মানে হয়তো একটা আছে কিন্তু সেই মানেটা তোর বাবা যেমন বুঝছে, এমন নয়। তোর বাবা যেমন বুঝছে, তাতে মনে হচ্ছে যেন ওই ছেলেটা, ওই ফটিক না কনক কী বললি— যেন সে একটা রাক্ষস আর তুই হলি দেবতা। আমার তো বরং উলটোটাই মনে হল। কথাটা বলতেই তো অনুলেখা সোফার কুশন নিয়ে হেঁই মারি কী সেই মারি করে আমার ওপর চড়াও হল। আমি কোনও মতে সেই আলতো এবং আবদারি আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচালুম, তারপর 'জ্যোতিষ-বচনার্থ' দেবগণ-রাক্ষসগণের তাৎপর্য বোঝালুম, তাতে মেঘ কেটে গেল অনেকটাই, অবশেষে তাদের বিয়েও সুসম্পন্ন হয়েছে। সুখী দম্পতি— এখন তারা মাঝে মাঝে নিজেদের সুখহীনতা নিয়ে যত ঝগড়া করে, তার চেয়ে সুখ নিয়ে ঝগড়া করে বেশি। তাতে 'জ্যোতিষবচনার্থ' আমি

আবার বলেছি— এই দেবাসুরের শাশ্বতিক দ্বন্দ্ব দেবগণ আর রাক্ষসগণের তাৎপর্য বহন করে এবং সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে পৃথিবীর তাবৎ দম্পতিকুলের সকলেই একজন রাক্ষস আর একজন দেবতা।

ঘটনা ঘটেছে আরও একটা। আমেরিকার ওয়াশিংটন অঞ্চলের এক অস্থায়ী ভারতীয় বাপ আমাকে টেলিফোনে হা-হুতাশ করে জানালেন যে, তাঁর ছেলে একটি নিগ্রোজাতীয় রমণীকে অতিশয় ভালবেসে বিয়ে করতে চাইছে, এখন কী কর্তব্য। ঘটনাচক্রে আমি ভদ্রলোককে জানতাম। এই কলকাতাতেই একটি মেয়ের সঙ্গে পূর্বে তাঁর পুত্রের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। খুব সুন্দরী না হলেও মেয়েটি যথেষ্ট ভাল ছিল, কিন্তু বর্ণাশ্রমের মৌখিকতা এবং ঐকান্তিক বংশমর্যাদার কারণে তিনি সে বিয়েতে ঘোরতর অমত করেছিলেন বলেই সেই বিয়েটা হতে পারেনি। তাতে তাঁর ছেলে অতিক্রুদ্ধ হয়ে পড়াশুনোয় মন দিল এবং তারপর আমেরিকা চলে গেল। ভালই চলছিল তার পাঠান্তের চাকরি, এরই মধ্যে বছর চারেক যেতে-না-যেতেই পূর্বকথিত নিগ্রো-সুন্দরী তার হৃদয় অধিকার করল। বাবা-মা সমস্ত কর্ম এবং আলস্য ত্যাগ করে ছেলের ওপর ওই নিগ্রো-হৃদয়ের আক্রমণ রোধ করার জন্য দৌড়ে উড়ে গেলেন আমেরিকায়।

বলা বাহুল্য, তাঁদের অপছন্দ হল এবং ক্রমিক হৃদয়-চাপ প্রশমনের জন্য আমাকে টেলিফোন করলেন ছেলের অনুপস্থিতিতে। বললেন এমনভাবে যেন 'খোকা আমার কিচ্ছু বোঝে না মা', শুধু মেয়েটারই দোষ। তাকে নাকি রাক্ষসীর মতো দেখতে, হাসলে পরে দাঁতের মাড়ি বেরিয়ে পড়ে এবং সে ব্যাঙ এবং গোরু প্রেমানন্দে খায়। অনেক বর্ণনা এবং তার আগ্রাসী ভালবাসার বিচিত্র উদাহরণ শোনার পর আমি ছেলের বাবাকে বললুম— আপনার আর কিছুই করণীয় নেই, আপনি ফিরে আসুন কলকাতায় এবং মাহেন্দ্রক্ষণ দেখে একটি প্রগতিশীল পুরোহিত নিযুক্ত করুন। তারপর উলুধ্বনি এবং শঙ্খনাদ সহযোগে ইতরজনকে মিষ্টান্ন বিতরণ করে ছেলের বিয়ে দিন।

ছেলের বাপ ভদ্রলোক এবার আমার ওপরেই রেগে গেলেন এবং বললেন— আপনাকে আমি কী এইজন্য ফোন করেছিলাম? আমি বললাম— তা হলে কীসের জন্য ফোন করেছিলেন, আপনার দ্বিতীয় বারের অন্যায় প্রলাপে মদত দেব বলে? আপনি তো জানেন— প্রেমের ব্যাপারে আমি ভীষণ রকমের উদার। 'কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে'— এই ঋষিবাক্যে যদি বিশ্বাস থাকে এবং তা থাকতেই হবে, নইলে গত্যন্তর নেই— তা হলে আপনার মতে ওই রাক্ষসীর মতো মেয়েটির সঙ্গে ছেলেটির বিয়ে দিন, সে রাক্ষসীর মতো আপনার ছেলেকে ভালবাসবে। ছেলের বাবা আমার পরিহাসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে আরম্ভ করলে আমি বুঝলাম— ভদ্রলোককে কিঞ্চিৎ শাস্ত্রীয় সান্ত্বনার প্রলেপ দেবার দরকার। কেননা আগের বারেও তিনি সস্ত্রীক যেভাবে ছেলের বিয়ে ভেঙে দিয়েছিলেন, সেখানেও তিনি খানিকটা ব্রাহ্মণ-শূদ্র ইত্যাদি বর্ণ-বাধার সংস্কারে চালিত হয়েছিলেন, আর এখন তো একে বিদেশিনী তাতে নিগ্রো, ফলে ভারতীয় বর্ণবিধির সমস্ত সাম্মানিক বিকল্পগুলিই একেবারে ঘেঁটে গেছে। অতএব এমন একজন বিভ্রান্ত শঙ্কাকুল মানুষকে শান্ত করার জন্য দ্বিতীয় দফায় দূরভাষণ আরম্ভ করলাম খানিক পরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভদ্রলোককে বললাম— দেখুন, ভারতবর্ষ একশো কোটির দেশ। এখানে যদি শুধুই বামুনে-বামুনে আর ক্ষত্রিয়ে-ক্ষত্রিয়ে বিয়ে হত, তা হলে অন্য বর্গের সুন্দরীরা সব এতকাল উপোস করে আছেন নাকি! বিশেষত যে-দেশের নীতিশাস্ত্রকারেরা শ্লোক বেঁধে বলেছে 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি'— ভাল মেয়ে হলে যত খারাপ বর্ণই হোক, তাকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে এসো, সেখানে কি আপনি মনে করেন যে, বামুন-কায়েত-ক্ষত্রিয়রা সব উপোস করে বসে থাকেন বর্ণ-মিশ্রণ, বর্ণ-সংকর তো হতই, এতটা হত বলেই তো খোদ ভগবদ্‌গীতার মধ্যে প্রথমাধ্যায়েই বর্ণ-সংকরের ভয় দেখানো হয়েছে। সমাজে বারবার ব্যাপারটা ঘটত বলেই ভগবদ্‌গীতাও আপনার মতোই বলেছে— মেয়েগুলো সব ভারী দুষ্টু, আর মেয়েরা দুষ্টু হলেই সমাজে বর্ণ-সংকর তৈরি হয়— স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসংকরঃ।

ওই একই কথা হল— গীতা বলেছে দুষ্টু, আর আপনি বলেছেন রাক্ষসী। রাক্ষসী মেয়েটা আপনার ছেলেকে গ্রাস করেছে। তা আমি বলি— ভগবদ্‌গীতার সেই সামাজিক ছেলেগুলো কি সব ধোয়া তুলসীপাতা যে, রাক্ষসীরা সব এসে তুলসীপাতা চিবোচ্ছে, নাকি আপনার ছেলেটি ওই 'স্ফুরিতোত্তরাধরা' নিগ্রো রমণীটির প্রতি কোনও আগ্রাসনী মত্ততায় ধেয়ে যায়নি। জেনে রাখুন মশাই, ভারতবর্ষের সভ্যতায় মহামানবের সমুদ্রমন্থন ঘটেছে। স্বয়ং মনু মহারাজ যিনি সবর্ণ-বিবাহের বিধিবিধান দেবার ব্যাপারে আমাদের পিতামহ-সমান, তিনি পর্যন্ত বুঝেছিলেন যে, যত ধর্ম-কর্ম, যাগ-যজ্ঞ-অগ্নিহোত্র করুক, নিম্নবর্ণের তেমন সুন্দরী গুণবতী মেয়ে দেখলে দেবতারাই নিজেদের 'কন্ট্রোল' করতে পারেন না, তো বামুন-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য। মনু ওইজন্য বলে রেখেছেন— যদি এমন অত্যাসক্তি তৈরি হয়, তা হলে ধর্মরক্ষা করার জন্য প্রথম বিবাহটি সবর্ণেই করো, অর্থাৎ একটা ধর্মবিবাহ আগে সংঘটিত হোক বামুনে-বামুনে, ক্ষত্রিয়ে-ক্ষত্রিয়ে অথবা বৈশ্য-বৈশ্যে। তারপর যদি নিজেকে সংযত করতে না পারো তবে নিজাপেক্ষা নিম্নবর্ণে বিবাহ করতে প্যারো, তবে সেটা হবে কামজ বিবাহ, অর্থাৎ কিনা বুঝে নিতে হবে— সেই বিবাহের মধ্যে কাম আছে, শিথিল ভাষায় 'সেনস্যুয়ালিটি' আছে, 'সেক্সুয়ালিটি' আছে। মনু মহারাজ মার্কা মেরে দিয়েছেন একেবারে।

আমেরিকার ভদ্রলোক এবার আমতা-আমতা করে বললেন— তা হলেই দেখুন— এটা একেবারেই কামজ বিবাহ, আর ওই রাক্কুসে মেয়েটাই এর জন্য দায়ী। বার বার এক কথা শুনে আমার এবার ভারী রাগ হল। আমি বললাম— দেখুন, এইরকম একটা নাম দেবারও শাস্ত্রীয় কারণ আছে এবং সেটা শাস্ত্রীয় পরিশীলন দিয়েই বুঝতে হয়। নইলে নিচু জাতের মেয়ে পছন্দ করাটাই শুধু কামজ ভাবনা, আর আপনারা কি সব 'প্লেটনিক' চালিয়েছেন এতকাল? তা ছাড়া মনু-মহারাজের কড়া শাসনের মধ্যেও তাঁর বাস্তব বুদ্ধিটা খেয়াল করুন। হ্যাঁ, নৈতিকভাবে তিনি অসবর্ণ বিবাহ পছন্দ করেন না, কিন্তু তিনি এটাও বুঝেছিলেন যে, ব্রাহ্মণই হোক আর ক্ষত্রিয়ই হোক, তিনি কোনওভাবেই তাদের কামনার গতি রুদ্ধ করে দিতে পারবেন না। অতএব নৈতিকতার জায়গায় সবর্ণে ধর্মবিবাহের নির্দেশ দিয়ে অসবর্ণ বিবাহগুলিকে কামজ বলে চিহ্নিত করেছেন।

ভদ্রলোককে এবার বোঝালাম যে, মনুর সময়ে এমনকী তার বহু কাল পরেও এই বিংশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শতাব্দীর গোড়ায়ও সমাজে বহুবিবাহ চলত। অতএব ধর্ম এবং কাম দুটোই যথাযথ লাভ করেছেন বহুগামী পুরুষেরা। কিন্তু এখন সরকারি আইনে ধর্ম-কাম যখন একের মধ্যেই লাভ করতে হবে, তাই আর নিজে মনু-মহারাজ হয়ে ওঠার অপচেষ্টা করবেন না। ছেলে যা করছে খুশি মনে মেনে নিন। আর আমার শেষ কথাটা শুনুন— আপনি এত রাক্ষসী-রাক্ষসী করছেন, মহাভারতের যুগে মধ্যম পাণ্ডব ভীম তো খোদ এক রাক্ষসীকেই বিয়ে করেছিলেন, সেখানে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির পর্যন্ত সেই বিয়েতে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিলেন, সেখানে আপনি কোথাকার কোন ধর্মরাজ এসেছেন যে, এই নিগ্রোসুন্দরীকে ছেলের জীবন থেকে মুছে দিতে চাইছেন? মনে রাখবেন— ভারতবর্ষ নীতি-নিয়ম অনেক করেছে, কিন্তু তাই বলে হৃদয় ভাঙার মন্ত্র শেখায়নি কখনও। আমাদের দেশে রাক্ষসীরাও বৈবাহিক প্রক্রিয়ায় অপাঙক্তেয় নয়— তুমিও এস, তুমি এস, তুমিও এস এবং তুমি। আপনি আমার কাছে হিড়িম্বার ভালবাসার কথা শুনুন, আপনার তথাকথিত রাক্ষসী বউমার সঙ্গে মিলবে ভাল।

২

জানেন তো আপনারা সবাই মানালি বলে একটা স্বর্গসুন্দর জায়গা আছে। সেখানে উচ্চচূড় পাহাড়ের মধ্যে শত শত পাহাড়ি গাছের মাঝখানে আছে হিড়িম্বার মন্দির। প্রথমে তো অবাক হয়ে গিয়েছিলাম— এখানে এই হিমাচল প্রদেশের প্রত্যন্ত ভূমিতে হিড়িম্বার অধিষ্ঠান হল কী করে? পরে সেখানকার ফলক দেখে বুঝলাম— আমাদের শক্তিরূপিণী পরমা দেবীর সঙ্গে হিড়িম্বা এখানে এক হয়ে গেছেন এবং দেবী নাকি তত্রস্থ রাজ্যভ্রষ্ট রাজাকে হিড়িম্বার বেশে দেখা দিয়ে তাঁকে স্বপ্নাদেশ দেন। পণ্ডিতজনেরা বলছেন— এই রাজা নাকি বাহাদুরসিং এবং তিনিই নাকি ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা যুদ্ধ জয় করে রাজ্য ফিরে পান। সেই রাজাই প্রতিষ্ঠা করেন হিড়িম্বার মন্দির এবং এখনও সেখানে দেবী হিড়িম্বার নিত্যপূজা অব্যাহত। ভারী ভাল লাগল, এই নির্জন অরণ্য পরিবেশে হিড়িম্বার মন্দির দেখে। মন্দিরের বিগ্রহের কোনও ছিরিছাঁদ নেই। চারদিকে পাথরের দেয়াল আর তারই মাঝখানে যেন গুহাহিত হিড়িম্বা। বেশ মানায়।

আমার কাছে অবশ্য হিড়িম্বার তাৎপর্য অন্যখানে এবং সেই তাৎপর্যেও তাঁকে দেবী বলে সম্বোধন করতেই আমার ভাল লাগে। মহাভারতে পাণ্ডবরা তখন জতুগৃহের আগুন থেকে মুক্তি পেয়ে সুড়ঙ্গ-পথে গঙ্গার ধারে এসে উঠেছিলেন। সেখানে মহামতি বিদুরের বিশ্বস্ত লোক একখানি নৌকা নিয়ে এসেছিল এবং তাতে করেই গঙ্গা পেরিয়ে রাত্রির নক্ষত্র-নির্দেশে দক্ষিণ দিকে চলতে আরম্ভ করলেন— ততো নাবং পরিত্যজ্য প্রযযুর্দক্ষিণাং দিশম্। জতুগৃহের অবস্থান বারণাবতে, এখনকার দিল্লি থেকে সে-জায়গা খুব দূরে ছিল না এবং পাণ্ডবরা যদি গঙ্গা পেরিয়ে দক্ষিণ দিকে গিয়ে থাকেন, তবে সেটা কুলুমানালির পাহাড়ি জায়গা নয় বটে, কিন্তু সে জায়গার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কিছু কম নয়। কারণ পাণ্ডবরা এখানে বিশাল অরণ্যভূমি পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত পঞ্চালে পৌঁছেছিলেন, যেটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনকার বেরিলি-বদায়ুনের কাছাকাছি। এই গভীর অরণ্যভূমির মধ্যেই হিড়িম্বার সঙ্গে দেখা হয়েছিল মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের।

জতুগৃহে আসন্ন মৃত্যুর দুর্ভাবনাকে জীবনে রূপান্তরিত করার জন্য পাণ্ডবদের মানসিক চাপ সহ্য করতে হয়েছিল অনেক, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল রাত্র-জাগরণ, আবার সেই রাত্রের আঁধারে পথ চলা। সব কিছু মিলে জননী কুন্তী আর চার পাণ্ডব ভাই ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় এবং ক্লান্তিতে একেবারে শুয়ে পড়লেন বটগাছের তলায়। কিন্তু এত সব ঝামেলার মধ্যেও যাঁর কোনও 'টেনশন' নেই, রক্তচাপ নেই তিনি হলেন মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন। জতুগৃহের শেষ আগুনটা তিনিই লাগিয়েছেন এবং এই অগম্য পথে তিনি বেশ খানিকটা বয়ে এনেছেন জননীকে এবং ভাইদেরও। জলের আশায়, ক্লান্তিতে সবাই যখন বট গাছের তলায় শুয়ে পড়লেন, তখন ভীম বললেন— খানিকটা দূরে জলচারী সারস-বকদের ডাক শুনতে পাচ্ছি, তোমরা অপেক্ষা কর, আমি জল নিয়ে আসছি। ভীম জল নিয়ে এলেন এবং এসে সবাইকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখে বিড় বিড় করে দুর্যোধনকে বেশ খানিকটা গালাগালি দিলেন। তাতে ক্ষুব্ধ মনও যেমন তাঁর শান্ত হল খানিকটা, তেমনই শ্বাপদসংকুল অরণ্যের মধ্যে নিজে জাগ্রত থেকে সকলকে পাহারা দেওয়ার কাজটাও তাঁর কাছে অনেক সহজ হয়ে গেল।

ঠিক এইরকম এক অবস্থাতেই পঞ্চপাণ্ডব এবং তাঁদের জননীকে দেখতে পায় নরমাংসভোজী রাক্ষস হিড়িম্ব। অনেক দিন পরে এতগুলি মানুষকে স্বয়মাগত ভোজ্য হিসেবে লাভ করে অতি প্রীত হয়ে সে ভগিনী হিড়িম্বাকে বলেছিল— মানুষের গন্ধে আমার জিভে জল আসছে, জিভটা যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে মুখ থেকে— জিঘ্রতঃ প্রস্রুতা স্নেহাজ্জিহ্বা পর্য্যেতি মে মুখাৎ। তুই বাপু যা, মানুষগুলোকে মেরে নিয়ে আয়, আমরা দুই ভাইবোনে মিলে বহুকাল নরমাংস খাইনি।

মহাভারত রামায়ণে রাক্ষস-রাক্ষসীদের বর্ণনা যত ভয়ংকরই হোক, রামায়ণে রাবণ-কুম্ভকর্ণ-বিভীষণকেও যেমন আমি কোনওমতেই অসভ্য বর্বর এবং মনুষ্যেতর কোনও 'স্পিসিস' ভাবি না, তেমনই মহাভারতের হিড়িম্ব, হিড়িম্বা বা বক রাক্ষসের মধ্যে রাক্ষসত্ব কিছুই নেই, যা আছে তা অনেকটাই তাদের অতিমানুষিক ক্ষুধা, লোভ এবং চেহারার বর্ণনা দিয়ে একটা রাক্ষসোচিত ভাব প্রকাশ করা। বস্তুত মহাভারতীয় রাক্ষসদের আমরা মূল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, কখনও বা আর্যেতর গোষ্ঠীভুক্ত এবং প্রধানত শারীরিক শক্তিতে অতিশক্তিমান গুন্ডা-বদমাশ বলে মনে করি। খেয়াল করে দেখবেন, হিড়িম্ব ভগিনীকে আধুনিক একটি 'মাস্তান'-এর মতোই বলেছে— ওরা যেহেতু আমারই এলাকায় শুয়ে আছে অতএব তোর কোনও ভয় নেই। তুই ওদের মেরে নিয়ে আয়— অস্মদ্ বিষয়সুপ্তেভ্যো নৈতেভ্যো ভয়মস্তি তে। হিড়িম্ব এবং হিড়িম্বা নাম দুটির মধ্যে ভাষাগত ভাবে যে সব বর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে অবশ্য তাদের আর্যেতর গোষ্ঠীর মানুষ বলতে খুব একটা অসুবিধে হয় না এবং হয়তো সেইজন্যই মহাকাব্যের পরিসরে তাঁরা রাক্ষস-রাক্ষসী বলে চিহ্নিত হয়েছেন।

সে যাই হোক, হিড়িম্ব রাক্ষসের নির্দেশ পেয়ে তার ভগিনী হিড়িম্বা প্রায় লাফিয়ে লাফিয়েই সুখসুপ্ত পাণ্ডবদের কাছে এল। কিন্তু বলিষ্ঠ দেহ বিশালকায় ভীমসেনকে দেখে

হিড়িম্বার বড় ভাল লাগল। তার মনে হল— এই উজ্জ্বলকান্তি সিংহসদৃশ পুরুষটিই তার স্বামী হবার উপযুক্ত— ভর্তা যুক্তো ভবেন্মম। কী অনাবিল, ছলনাহীন এই সিদ্ধান্ত। বিদগ্ধা আর্য রমণীর সুরুচিসম্পন্ন হাব-ভাব হিড়িম্বা জানে না। নাগরিকার বৃত্তিতে নিষেধের মাধ্যমে 'হ্যাঁ'-বলা কিংবা কোনও কথা না বলে শুধু ভঙ্গিতে অনেক কথা বলার আদত সে শেখেনি, শেখেনি নাগরিক ভ্রূবিলাস। তার যা মনে হয় তাই বলে এবং তা বলতে তার এতটুকু দ্বিধা-লজ্জা নেই।

মধ্যম পাণ্ডবকে যে মুহূর্তে সে দেখেছে, সেই মুহূর্তেই তার হৃদয়ে আবেগ উত্তাল হয়ে উঠেছে। সে মনে মনে ভাবল— আমার ভাই এঁদের মারতে বলেছে, কিন্তু আমি কিছুতেই তা করব না। কেননা ভাইয়ের ভালবাসার চেয়ে স্বামীর ভালবাসা অনেক বেশি উপভোগ্য এবং সে ভালবাসার পরিমাণও অনেক বেশি— পতিস্নেহোঽতি বলবান্ তথা না ভ্রাতৃসৌহৃহদম্। এদের যদি মেরে ফেলি তবে আমার ভাই আর আমার সাময়িক রসনা-তৃপ্তি হবে। কিন্তু এই পুরুষটিকে না মেরে বরঞ্চ যদি তাঁকে স্বামী হিসেবে বরণ করি, তবে কত কতকাল এঁর সঙ্গে আমি সুখে আমোদে কাল কাটাব— অহত্বা তু মোদিষ্যে শাশ্বতীঃ সমাঃ।

এইখানে দুটো কথা আছে— একটা পুরনো কথা, যেটা বললে আধুনিক মহিলারা প্রতিক্রিয় হবেন। আর দ্বিতীয়টা আধুনিক কথা, যেটা শুনলে পুরাতনেরা দুঃখিত হবেন এবং আধুনিক মহিলারা মেনেও না মানার ভান করবেন অথবা শেষ পর্যন্ত দুঃখিতই হবেন। একজন শাস্ত্রীয় রমণীর মুখেই এ-কথা বেরিয়েছিল যে, অবিবাহিত অবস্থায় পিতা-মাতা এবং ভাই-দাদারা একটি মেয়েকে যত আদর দিতে পারে অথবা যত অর্থ-বিত্ত-ঐশ্বর্য দিতে পারে, সেই আদর অথবা সেই ধনৈশ্বর্যদানের একটা সীমা আছে; কিন্তু একজন বিবাহিত স্বামী যে আদর অথবা যে অর্থধন স্ত্রীকে দিতে পারেন, তার কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। আজকের দিনের প্রগতিবাদিনীরা এই আত্যন্তিক স্বামী-গৌরবে বিরক্ত হতে পারেন এবং এটাও সত্যি যে, ভারতবর্ষের সহস্র বিবাহ-জীবনে স্ত্রীরা স্বামীদের কাছ থেকে যত অর্থ-বিত্ত লাভ করেছেন সেটা সীমাহীন নয় অনেক সময়েই, হয়তো বা তার অর্থনৈতিক কারণও থাকতে পারে যথেষ্ট। এমনকী অর্থ-বিত্ত লাভ করলেও তার উপরে স্ত্রীলোকের সঠিক স্বাতন্ত্র্য ছিল কিনা, সেটাও ভাববার মতো বিষয়। তা ছাড়া আদরের ব্যাপারটাও যথেষ্ট সংশয়িত ছিল— এত লোকাপেক্ষা, পিতৃতন্ত্রের অনন্ত দায়বদ্ধতা, সব কিছু মিলিয়ে স্ত্রীর প্রতি আদর-যত্নও অনেক সময় স্বামীদের কাছে আচরণহীন যান্ত্রিকতায় পরিণত হত। অর্থাৎ কিনা আমরা স্বীকার করতে চাই যে, পূর্বোক্ত শাস্ত্রীয় ভাবনার একটা অন্ধকার দিকও আছে, যেখানে পশুপালনের মতো প্রতিপালনের দিকটাই বড় হয়ে ওঠে, অনাবিল উদার আদর অথবা নিঃস্বার্থ সীমাহীন অর্থধারাও এখানে পদে পদে খণ্ডিত।

এই সত্য মেনে নিয়েও বলি— আমি চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেও এমন বহু মেয়েকে নিজেকে চোখে দেখেছি, তারা বাপের বাড়ির পিতৃতন্ত্রে ভাই-দাদাদের আদর-যত্ন পরখ করতে-করতে এমন কথা বার বার বলতেন— বিয়ে হলে আর এই অবস্থা থাকবে না। আমি শুধু বিয়ের অপেক্ষায় আছি। এই আশা এবং এই প্রতীক্ষাটুকু সব সময় সর্বাংশে যে সত্য হয়েছে, তা নয়, অথবা যতটা স্বপ্ন ছিল ততটা হয়তো সত্য হয়নি, কিন্তু সেই বিয়ের দিনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে বৈবাহিক আড়ম্বর তৈরি হয়— শাড়ি-গয়না— উপহার সব মিলিয়ে একটা অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য অবশ্যই তৈরি হয় যা চলতেও থাকে বেশ কিছু দিন। আর স্বামী যদি ভালমানুষ হন, তাঁর আদর এবং ভালবাসা যদি দিন-দিনান্তরে বাড়তেই থাকে তবে অর্থ-বিত্তের আয়-ব্যয়ে স্ত্রীর স্বাধীনতা এসেই যায়। লক্ষণীয়, অতি প্রাচীন কালে মনু-মহাভারতের কালেও অর্থের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসেব রাখার ব্যাপার অনেক সময়েই স্ত্রীর ওপরে বর্তাত এবং সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত সাংসারিক আয়-ব্যয় স্ত্রীরাই সামলাচ্ছেন, এটা হরবকত দেখি। ফলত ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও নিজের হাতে স্বামীর সংসার সামলানোর মধ্যে যে অযান্ত্রিক স্বাধীনতা তৈরি হয়, তাতেও স্ত্রীরা অনেক সময়েই সুখী থাকেন। বিশেষত তার সঙ্গে স্বামীর আদর ভালবাসা যুক্ত থাকলে এ-কথা মনেই হতে পারে যে, স্বামী যতটা দেন এবং যতটা 'স্পেস' ছেড়ে দেন, বাপ-ভাইরা তা দেয় না। হিড়িম্বা সেটাই স্পষ্ট করে বলেছে— স্বামীর ভালবাসা অনেক ভাল, অন্তত ভাইয়ের ভালবাসার চেয়ে অনেক ভাল— পতিস্নেহোঽতি বলবান্ তথা ন ভ্রাতৃসৌহৃদম্। হিড়িম্বা এতদিন শুধু হিড়িম্ব ভাইয়ের খিদমতগারি করেছে, রাক্ষস ভাইয়ের যথেচ্ছ অন্যায় অসভ্যতায় তাকে মদত দিতে হয়েছে। সে এই করুণ অনাদৃত জীবন থেকে এখন বেরিয়ে এসে বৈবাহিক জীবন লাভ করতে চায়।

এবার দ্বিতীয় ভাবনাটা বলি। এটাই তো সার্বিকভাবে দৃষ্ট এবং শ্রুত যে, সুন্দরী মেয়ে দেখলে যুবক পুরুষেরা খানিক উত্তাল হয়ে ওঠে। বিশেষত রমণীর স্তন-জঘন বিস্তারে পুরুষের কামার্ততার দৃষ্টান্তই হাজার হাজার। কিন্তু সাধারণ স্বীকৃতি এইরকমই যে, মেয়েরা এইরকম নয়। সুন্দর মোহন পুরুষ দেখলেই তারা হামলে পড়ে না এবং অনুরাগ দেখায় না প্রকট করে। আর যদি বা কোনও পুরুষের জন্য কোনও মেয়ে তার পছন্দটা প্রকট করে তোলে, তা হলে সমাজ সেটা ভাল চোখে দেখে না এবং এই ধরনের মেয়েদের খারাপ মেয়ে বলে চিহ্নিত করতে কোনও দ্বিধা করে না। কিন্তু পণ্ডিতজনেরা জানাচ্ছেন যে, সুন্দরী মেয়ে দেখলে পরে পুরুষের জৈব আকর্ষণ যেমন স্বাভাবিক, তেমনই বলিষ্ঠ সুন্দর পুরুষ দেখলে মেয়েদের আকর্ষণটাও সেইরকমই স্বাভাবিক, এমনকী সেই আকর্ষণ প্রকট করে তোলাটাও ভীষণ রকমের অস্বাভাবিক ভাবার কোনও কারণ নেই।

পরম নান্দনিক সরসতায় এই কথাটা অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু বৌদ্ধিক চেতনায় তথা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এই সত্যই উন্মোচিত হয়েছে যে, তেমন সুপুরুষের জন্য রমণীর লালসাও প্রায় একইরকম। ডানিয়েল বার্গনার নামে এক ভদ্রলোক নিউইয়র্ক টাইমস-এর একটি সংখ্যায় মেরিডিথ শিভার্‌স্-এর একটা ইন্টারভিউ-এর বিবরণ দিয়েছেন। মেরিডিথ ওনটারিও-তে কুইনজ্ ইউনিভার্সিটির প্রোফেসর এবং তিনি রমণীর মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় অগ্রণী মহিলা বলে চিহ্নিত। ছত্রিশ বছর বয়সি এই মহিলা টরোন্টো ইউনিভার্সিটির মনস্তত্ত্বের গবেষণাগারে বেশ কিছু মহিলা এবং পুরুষকে চেয়ারে বসিয়ে তাদের অনুভূতিপ্রবণ যৌনাঙ্গের সঙ্গে আধুনিককালের অনভূতিগ্রাহক বিদ্যুচ্চালিত যন্ত্রের সংযোগ স্থাপন করে রেখেছিলেন। অতঃপর একটি বিশিষ্ট প্রজাতির শিম্পাঞ্জি-যুগলের নগ্ন মিলন দৃশ্য দেখিয়ে পুরুষ এবং রমণীদের যৌন প্রতিক্রিয়া যান্ত্রিকভাবে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। এ-ছাড়াও দৃশ্যগতভাবে আরও রোমাঞ্চকর কিছু ছিল।

মেরিডিথ বৈদ্যুতিন যন্ত্রানুষঙ্গে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, উদ্দীপনের ক্ষেত্রে সময় বুঝে, মানুষ দেখে, মেয়েদের যৌন প্রতিক্রিয়াও একইরকম। মেরিডিথের পরীক্ষা-প্রক্রিয়াগুলি বিশদভাবে বোঝানো যেত হয়তো, কিন্তু তাতে অতি-আধুনিকা হলেও তাঁদের অস্বস্তি বাড়বে। হয়তো এটাও মানব যে, সুপুরুষ দর্শনে উদ্দীপনা-উত্তেজনা হলেও তার বাচিক প্রকাশ হয়তো অনেকটাই অনেকের ক্ষেত্রে অপ্রকাশ্য থাকে, আর মুখ-চোখের হাব-ভাবের পরিবর্তন ছাড়া দৈহিক বিকার বাইরে পরিস্ফুট হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই, অথচ পুরুষেরা এখানে প্রায় নাচার— মেরিডিথ লিখেছেন।

ঘটনা হল, মধ্যম পাণ্ডবের পৌরুষদৃপ্ত চেহারা, যা সম্পূর্ণ মহাভারত জুড়ে বারবার ঘোষিত— সোনার মতো গায়ের রং, বিশাল লম্বা চেহারা, দীর্ঘ বাহু, পেটানো কাঁধ এবং তার মধ্যে দাড়ি-গোঁফ খুব কম বলে তাঁকে আরও মসৃণ চিকন লাগে। ভীমের চেহারা দেখে হিড়িম্বা রাক্ষসী একেবারে পাগল হয়ে গেল। নিজের কাছে নিজেই সে বলেই ফেলল— সিংহের মতো দৃপ্ত চেহারা, লম্বা, কঠিন পৌরুষেয় অথচ এমন গায়ের রং যেন দ্যুতি বেরোচ্ছে শরীর থেকে— অয়ং শ্যামো মহাবাহুঃ সিংহস্কন্ধো মহাদ্যুতিঃ। এই মানুষটাকেই আমি আমার জীবনসঙ্গী স্বামী হিসেবে চাই। মেরিডিথ শিভারস্ এবং আরও যারা female sexuality-র কথা সোচ্চারে বলেন, তাঁদের কথা সত্য বলেই হিড়িম্বার দিক থেকে এমন অগ্রণী ভূমিকা— রাক্ষসী ভীমকে মনে মনে চাইল আপন কামনা-পূর্তির জন্য— রাক্ষসী কাময়ামাস রূপেণাপ্রতিমং ভুবি— এবং এই চাওয়াটা এতটাই তীব্র যে, তার জন্য হিড়িম্বা তার এতকালের ভাই হিড়িম্ব রাক্ষসকেও ত্যাগ করতে রাজি। এমন একটা পুরুষের সঙ্গে বিয়ে হলে সেটা তার ভাই হিড়িম্বের সাহচর্য থেকে অনেক ভাল বলেই তার ধারণা। এক সাহেব গবেষক অবশ্য এ-বিষয়েও একটা মন্তব্য করেছেন এবং সেটা হিড়িম্বার সম্বন্ধে বেশ খাটে। সাহেব লিখেছেন— Females could benefit from both paternal care and good genes offered by long-term male partners; however, because males displaying indicators of genetic quality are attractive, they are in demand as sex partners, and they shift their efforts towards mating at the expense of providing paternal care.

হিড়িম্বার বাপ নেই, সে ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে থাকে। এতকাল পরে এমন একটা সুপুরুষ দেখে তার যৌন সাহচর্যও সে যেমন কামনা করছে, তেমনই তাকে সারা জীবনের সঙ্গী করে নেবার মধ্যে তার একটা বুদ্ধিও কাজ করছে এবং সেখানে ভাইয়ের যান্ত্রিক তত্ত্বাবধানের থেকে ভীমের মতো এক শালপ্রাংশু পুরুষের আসঙ্গ এবং দাম্পত্য তার কাছে শ্রেয় মনে হচ্ছে— পতিস্নেহোঽতি বলবান্ তথা ন ভ্রাতৃসৌহৃদম্।

আসঙ্গ-লিপ্সা এবং প্রেমের দাম্পত্যে তার যুক্তি এতটাই সরল এবং সোজা যে, হিড়িম্বার বক্তব্য হল— ভাইয়ের সঙ্গে আমার ভাব-ভালবাসার তৃপ্তি তো এইটুকুনি— মুহূর্তমেব তৃপ্তিশ্চ ভবেদ্ ভ্রাতুর্মমৈব চ— বরঞ্চ ভাইয়ের কথায় এদের না মেরে বাঁচিয়ে রাখলে আমার তৃপ্তি হবে ষোলো আনা— কত বছর আমি এই লোকটার সঙ্গে দিন কাটাব, উঃ ভাবতেই কী ভাল লাগে— মোদিষ্যে শাশ্বতীঃ সমাঃ। সত্যি বলতে কী আবারও বলছি— এইরকম মেয়ে আমি অনেক দেখেছি, আত্মীয়-স্বজন এবং বান্ধবী, স্নেহাস্পদদের মধ্যেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকানেক দেখেছি, যাঁরা বিয়ের নামেই খুব খুশি হয়ে ওঠেন। এর একটা অন্তর্নিহিত কারণও আছে। আজকাল বড় ঘরের একছেলে অথবা একমেয়ের সংসারে ছেলেমেয়েরা যেমন সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে অথবা যতটা অনিয়ন্ত্রণে থাকে, সাধারণ ঘরে তা থাকে না। আর আমাদের অল্প বয়সে যা দেখেছি, তাতে নিম্ন-মধ্য-উচ্চ সমস্ত বিত্তভোগীদের মধ্যেই কন্যা-অবস্থায় মেয়েদের ওপর যথেষ্ট এবং কখনও কখনও যথেচ্ছ নিয়ন্ত্রণ খাটানো হত। এমনিতে মেয়েকে সুপাত্রে দেবার কল্পনায় এবং পরিকল্পনায় মেয়েদের গতিবিধির ওপর তো নিয়ন্ত্রণ থাকতই এবং সেটা মেয়ে বলে তার শারীরিক সুরক্ষার মানেই ছিল— যে যে পথে পুরুষের দৃষ্টি এবং সদালাপ বন্ধ করা যায় তার ব্যবস্থা করা। আর অন্যদিকে স্বামীর ঘরে গিয়ে কী করতে হবে না হবে, তার কোনও স্থিরতা নেই বলে বাড়িতে মেয়েকে কাজ শেখানোর অছিলায় তাকে দিয়ে প্রায় দাসী-বৃত্তি করানোটা বাপ-ভাইয়েরও রেওয়াজ হয়ে যেত বা এখনও যায়।

আমি শত শত জায়গায় দেখেছি— এমন একটা বদ্ধ অবস্থা থেকে প্রাথমিক মুক্তির জন্য অনেক মেয়েই বিয়ের কথায় প্রচণ্ড সুখী হয়ে ওঠে— শাড়ি, গয়না এবং একায়নী মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠাটাও সাময়িকভাবে অধিকাংশ মেয়েদের একটা সুখোচ্ছ্বাস তৈরি করে। স্বামীর ঘরে গিয়েও একইরকম দাসীবৃত্তি জোটে কিনা, সেখানেও একইরকম নিয়ন্ত্রণ কিনা— এই তর্ক অনেক ক্ষেত্রে সযৌক্তিক হলেও, আবার অনেক ক্ষেত্রে নয়ও। স্বামীর ঘরে পুত্রকন্যা নিয়ে সংসার করতে করতে অনেকের যে সাংসারিক ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়, সেটাও অনেক বিবাহিত রমণীই পছন্দ করেন। এমনকী স্বামীর রোজগার নিজের হাতে সংসারে ব্যয় করতে করতেও অনেকে এক ধরনের সাংসারিক তৃপ্তি অনুভব করেন এবং কখনও এই শাড়িটা, ওই গয়নাটা অথবা একটি বাড়ি যখন তৈরি হয়— তখন অনেক বাপের বাড়িতে ঈর্ষার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতেও দেখেছি মেয়েদের। বিশেষত একটু বিত্তবান বাড়ির বউ হয়ে গেলে বাপ-ভাইরা তখন সামান্য হলেও যে সাসূয় দৃষ্টিতে ঘরের মেয়েটিকে দেখতে থাকেন, সেটা ভেবে মাঝে মাঝে আমার মায়া হয়।

আজকের প্রগতিশীল নারীবাদী দৃষ্টিতে স্বামীর ঘরে তথাকথিত দাসীবৃত্তি সত্ত্বেও পূর্বাবস্থা থেকে অর্থনৈতিক উন্নতি এবং কখনও সামাজিক উন্নতিকেও কীভাবে দেখা হবে, সেই তর্কের মধ্যে না গিয়েও বলতে পারি— বাপের বাড়ির বাপ-ভাইয়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি লাভ করে স্বামীর বাড়িতে নিজের ঘর পাওয়াটাকে প্রাচীনেরা অনেকেই একটা বড় পাওয়া বলে চিহ্নিত করেছেন। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণটা পাওয়া যাবে রামায়ণের নায়িকা সীতার কথায়। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, সীতার মুখে সেকালের নারীধর্মে পুরুষতান্ত্রিকতাকে মেনে নেওয়া এবং সেটাকেই বড় করে দেখাটা একটা 'ট্রেইট' বটে, কিন্তু তবুও সীতা একটা কথা বলেছিলেন, যেখানে বাপ-ভাই ব্যাপারটার ওপরে একটা হেয়তা তৈরি হয় এবং আংশিকভাবে হলেও সেটা পুরুষতান্ত্রিকতারও বিরুদ্ধে যায়। কিন্তু আমি বলব— তার চেয়েও বেশি বোধহয় আমার পূর্বকথিত প্রস্তাবনা— স্বামীর বাড়িতে বাপ-ভাইয়ের চরম নিয়ন্ত্রণ থেকে বাঁচার আভাস।

সীতা বলেছিলেন— বাপ যা দেয় তার একটা সীমা আছে, ভাই যা দেয় তারও একটা

সীমা আছে, এমনকী নিজের পেটের ছেলে যা দেয় তারও একটা সীমা আছে, কিন্তু স্বামীর ঘরে স্বামী যে সুখ দেয়, তার মধ্যে কোনও সীমা নেই, অমিত নির্বাধ সেই সুখ— অতএব স্বামীকে কে না পছন্দ করবে— অমিতস্য হি দাতারং ভর্তারং কা ন পূজয়েৎ। আমি ঠিক এই দৃষ্টিকোণ থেকে হিড়িম্বার কথা ভাবি। হিড়িম্বা বলেছে— ভাইয়ের সঙ্গে আমার ভাব-ভালবাসার তৃপ্তি অতি সামান্য, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে জীবন কাটানোর তৃপ্তি আমার চিরন্তনী— মোদিষ্যে শাশ্বতীঃ সমাঃ। হিড়িম্বার কথা এবং যুক্তির মধ্যে রামায়ণী সীতার তন্ত্রযুক্তি যেমন আছে, তেমনই বাড়তি যেটা আছে এবং যেটা জীবনেও সীতা মুখে বলতে পারবেন না, সেটা হল আসঙ্গলিপ্সা, ভীমের মতো পুরুষের আসঙ্গলিপ্সা।

মনে মনে আসঙ্গলিপ্সায় ঝুঁকে পড়া এক রমণীর সময় লাগে না নিজে অগ্রণী হতে। মহাভারতের কবি লিখেছেন— ভীমের কাছে যাবার সংকল্প তৈরি হতেই হিড়িম্বা এক সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণ করল এবং অলৌকিক রাক্ষসী মায়ায় সে খুব সেজেগুজে মোহিনী হয়ে উঠল। রাক্ষসী মায়াতে অসুন্দর সুন্দর হতে পারে কিনা, এই অলৌকিকে বিশ্বাস না করেও বলা যায়— পুরুষের চোখে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য সাজগোজ করে সুন্দরী হয়ে ওঠাটা কোনও অ-পূর্ব ঘটনা নয় এবং আমরা বলব— রাক্ষসী মায়ার কাজটা এইখানেই। বিশেষত এখনকার কালে তো এটা সৌন্দর্যের তত্ত্বভাবনার মধ্যে পড়ে— অসুন্দর বলে কোনও তিরস্কার-চিন্তার মধ্যেই আমরা এখন নেই। আমরা বলি— কোনও কিছুই আর অসুন্দর নয়— এটা নির্ভর করে কেমন করে কোন অঙ্গে কোন বিভঙ্গে তুমি শরীরকে 'প্রেজেন্ট' করছ। অসুন্দর বা ঈষৎ সুন্দরকে সুন্দর করে সমক্ষে আনাটাই তো রাক্ষসী মায়া এবং আসঙ্গলিপ্সায় এই মায়া আরও মোহিনী হয়ে ওঠে।

মহাভারতের কবি লিখেছেন— ভীমের কাছে যাবার আগে হিড়িম্বা এক সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণ করেছিল এবং অলৌকিক ক্ষমতায় খুব সেজেগুজে, গয়না পরে, আবার সমস্ত শরীরে-মুখে একটা লজ্জা লজ্জা ভাব ঘনিয়ে এনে সে ভীমের কাছে উপস্থিত হয়েছিল। এ-বিষয়ে আমাদের পূর্বলিখিত ধারণা ছাড়াও এখানে একটি মহাকাবিক্য অভিসন্ধি আছে বলে আমরা মনে করি। বস্তুত আর্যেতর জনগোষ্ঠীভুক্ত একটি রাক্ষসী রমণীর মধ্যে তৎকালীন দিনে অনেক সময়েই এক ধরনের অমার্জিত, অভদ্র, সদাচারহীন স্বতন্ত্রতার আরোপ করা হত। এতকাল একান্তে এই বনের মধ্যে ভাইয়ের খিদমতগারি করতে করতে আভরণহীন, মলমলিন থাকাটাই তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভীমকে দেখার পর সে যখন তাঁর সঙ্গ পাবার জন্য আকুল হল, সে তখন তার অমার্জিত, মলিন রূপ ত্যাগ করে এক আর্যা রমণীর বেশভূষায়-অলংকরণে প্রকট করে তুলল নিজেকে। এমনকী সজ্জিত অঙ্গসৌষ্ঠবের মধ্যে একটু নাগরোচিত সলজ্জভাবও সে ফুটিয়ে তুলল মুখে-চোখে, হাবে-ভাবে— লজ্জমানেব ললনা দিব্যাভরণভূষিতা। মহাভারতের কবি যাকে রাক্ষসীর মানুষী-রূপ বলেছেন, সেটা হয়তো আভরণে, বেশভূষায় এবং আচরণে তার পরিবর্তিত, মার্জিত রূপ।

ভীমের চেহারা দেখে স্বকপোলকল্পনায় প্রেম থেকে একেবারে বিয়ে পর্যন্ত ভেবে নেবার মধ্যে যে রাক্ষসী যুক্তি আছে, তা অত্যন্ত সরল বলেই ঈপ্সিত পুরুষ ভীমের সঙ্গে কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে হিড়িম্বার কোনও লজ্জা-দ্বিধা হল না। সে নানারকম শারীর বিলোভন সৃষ্টি করতে করতে ভীমের কাছে গেল— উপতস্থে মহাবাহুং ভীমসেনং শনৈঃ শনৈঃ। এবারে ঈষৎ হেসে হিড়িম্বা ভীমকে জিজ্ঞাসা করল— কোথা থেকে এই দেশে এসেছ গো তুমি? তোমার পরিচয়ই বা কী? তুমি কে? সব দেবতার মতো চেহারা, এই পুরুষগুলিই বা কারা। আর এই যে সোনার বন্ন স্ত্রীলোকটি, ইনিই বা কে? এই বনের মধ্যে মাটিতে শুয়ে আছেন সব, যেন মনে করছেন— নিজের ঘরেই ঘুমোচ্ছেন। তোমরা কি জানো না— এই বনে ভয়ংকর হিড়িম্ব রাক্ষস বাস করে— বসতি হ্যত্র পাপাত্মা হিড়িম্বো নাম রাক্ষসঃ।

রাক্ষসের সম্বন্ধে জানান দেবার মধ্যে খুব যে একটা ভীতি-প্রদর্শনের ব্যাপার ছিল, তা বোঝা যাচ্ছিল। অপিচ অপরিচিত যুবক পুরুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁকে অনুকূল করার ভাবনাও ছিল হিড়িম্বার মাথায়! সেই কারণেই ভয়ংকরের সংবাদ দিয়েও সেটা যেন 'আমিই ঠিক করে দিতে পারি সব'— সেই ভূমিকায় নেমে এসে রাক্ষস-ভাই হিড়িম্বের সমস্ত পরিকল্পনা ভীমের কাছে ফাঁস করে দিল হিড়িম্বা। হিড়িম্বা বলল— আবার ভাই খুব খারাপ মন নিয়ে একটা কাজ করতে এখানে পাঠিয়েছে আমাকে। সে তোমাদের মেরে তোমাদের মাংস খেতে চায়। কিন্তু না, এটা আমি হতে দেব না। তোমার এই দেবতাপানা চেহারা দেখে আমি আমার ভবিষ্যতের স্বামী হিসেবে আর কাউকে ভাবতে পারছি না। সত্যি বলছি, পারছি না— নান্যং ভর্তারমিচ্ছামি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে।

আমার গৃহকর্ত্রী এক সময় সখেদে আমাকে বলেছিলেন— যে মেয়ে নিজের মুখে সোজা ভাষায় পুরুষের কাছে প্রেম নিবেদন করে, সাহিত্যের বিদগ্ধ জগতে তো বটেই, বাস্তব জগতেও ভাব-ভালবাসার যে প্রকরণ, তাতে মেয়েদের নাকি কোনও মূল্য থাকে না। যে মেয়ে নিজের মুখে কখনও কোনও নির্দিষ্ট পুরুষের প্রতি আপন আসক্তি জ্ঞাপন করে, সে আপনি বিকোয়, তার স্বপ্রকটিত সহজলভ্যতা পুরুষকে বেশি আকর্ষণ করতে পারে না, বেশি দিন তো নয়ই। সাহিত্যের বিদগ্ধ বৃত্তিতে অথবা নাগরিকতার পরিশীলিত বৃত্তিতে কথাটা অসত্য নয় হয়তো, বিশেষত যাঁদের মানসলোকে— 'যারে যায় না দেখা, যায় যে দেখে— ভালবাসে আড়াল থেকে'— এমন জাতীয় স্নিগ্ধ রাবীন্দ্রিকতার অহরহ অনুশীলন চলছে, তাঁদের হয়তো আমার এই জাগতিক বোধটুকু বোঝানো যাবে না, কিন্তু এটাও মানতে হবে যে, পুরুষের পৌরুষেয়তা ভেঙে দেবার পক্ষে এটাও একটা উপচার বটে। বিশেষত ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর রোম্যান্টিক সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে 'ককেটিশ ফিমেল'-এর আবেদন যদি বা নাকচ হয়ে যায়ও, প্রাচীন সাহিত্য বা জীবনে অথবা আধুনিক জীবন ও সাহিত্যে মেয়েদের সেই নমনীয়, কমনীয়, শান্তশীল বিদগ্ধতাই দৃঢ়ভাবে আচরণীয় কিনা, সেটা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে।

এখনকার দিনে ভিক্টোরিয়ান যুগে Flirt's Tragedy নিয়ে বই লেখা হচ্ছে, মানুষের 'শরীর' নিয়ে নতুন দার্শনিক ভাবনা আরম্ভ হয়েছে, তার মধ্যে স্ত্রীলোকের সম্ভোগেচ্ছা লুকিয়ে রাখারও খুব একটা দায় থাকছে না। এই অত্যাধুনিক ভাবনায় আপ্লুত হবার আগেই কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে যে, মহাভারতের কালে অথবা রামায়ণের কালে কিন্তু অনেক মহিলাই নিজের ভোগেচ্ছার কথা নিজেই বলতে পারতেন। তার জন্য কোনও 'পোস্ট-

মডার্নিজমে'রও দরকার হয়নি, অথবা প্রয়োজন হয়নি কোনও উত্তর-ঔপনিবেশিকতার আবেশ। সহজ কথাটা তখন সহজেই বলা যেত এবং এই সহজ ভাবের একটা অন্য মূল্য আছে। কথোপকথনে বক্রোক্তির চমৎকার এখানে থাকে না হয়তো, অথবা থাকে না ধ্বনি-ব্যঞ্জনার মধুর তাৎপর্য, কিন্তু প্রেম ভালবাসার ক্ষেত্রে শারীরিক ভাবনারাশি মূল্যহীন নয় যেহেতু, সেখানে কোনও শরীরী আবেদনই বা এত নিন্দিত হবে কেন। হ্যাঁ, এটা ঠিকই, হিড়িম্বার সপ্রেম বক্তব্যগুলিকে আমরা কোনও উজ্জ্বল উন্নত রসের পর্যায়ভুক্ত করতে পারি না, কিন্তু আত্মনিবেদন যদি সেই রসের অন্যতম উপাদান হয়, তা হলে সেখানেও তো শারীরিক বাসনার ইচ্ছাময় শব্দগুলি অনুচ্চারিত থাকে না। গোপিকাকুল যখন কৃষ্ণকে বলেন— তোমার অধরামৃতপূরকে সিঞ্চন করো আমাদের অধর— সিঞ্চাঙ্গ ন স্বদধরামৃতপূরকেণ— তখন কিন্তু আমরা নিজাঙ্গদানে কৃষ্ণসেবার কথা বলি। অতএব হিড়িম্বার আত্মনিবেদনের কথাও আমাদের বুঝতে হবে। হিড়িম্বা ভীমকে বলেছে— তোমাকে দেখে আমার শরীর-মন কামনায় মুগ্ধ হয়ে গেছে। আমি তোমাকে এত করে চাইছি বলেই আমাকে তোমায় চাইতে হবে— কামোপহত-চিত্তাঙ্গীং ভজমানাং ভজস্ব মাম্।

'আমি তোমাকে চাই অতএব আমাকেও তুমি চাইবে'— এমন রাক্ষুসে যুক্তি ভীম তাঁর সমস্ত ক্ষত্রিয়জীবনে শোনেননি বটে, তবে এই সরল যুক্তি একমাত্র ভীমের পক্ষেই বোঝা সম্ভব, অন্যের পক্ষে নয়। প্রেম-বিবাহের এই ইচ্ছাপূরণের জন্য হিড়িম্বা অনেক কিছু করতে রাজি। ভীম যদি তাঁকে স্বীকার করেন তবে সে উপযুক্ত প্রতিদানও দিতে চায়। সেই স্বীকৃতির অপেক্ষায় হিড়িম্বার সপ্রেম প্রতিদান বাক্যও বড় সহজ।

হিড়িম্বা সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করে বলে— সেই নরখাদক রাক্ষস ভাইয়ের আক্রোশ থেকে আমিই তোমাকে বাঁচাব, তারপর চলে যাব পাহাড়-ঘেরা কোনও নির্জন স্থানে। রাক্ষসের মায়া প্রয়োগ করে ঘুরে বেড়াব আকাশে আকাশে। দেখো, আমার সঙ্গে এমন করে ঘুরে বেড়াতে তোমার খুব ভাল লাগবে— অতুলামাপ্নুহি প্রীতিং তত্র তত্র ময়া সহ। ভীমও বড় সহজ মানুষ। পরবর্তীকালে দ্রৌপদীর প্রেমবৈদগ্ধ্যে বার বার যাকে আপ্লুত এবং ব্যবহৃত হতে দেখব, সেই ভীম আসলে হিড়িম্বার প্রেমেরই যোগ্য ছিলেন পুরোপুরি। ভীম কিন্তু এই মুহূর্তে এক বিরাট কাজে ব্যস্ত। তিনি মা-ভাইদের পাহারা দিচ্ছেন, অতএব কোনও রমণীর কামজ আকর্ষণে সাড়া দেওয়াটা এখন তাঁর পক্ষে মোটেই বীরোচিত নয়। তা ছাড়া ভরতবংশীয় মধ্যম পাণ্ডব এক রাক্ষসের ভয়ে তার রাক্ষসী ভগিনীর আশ্রয়-পোষণে বিপন্মুক্ত হবেন— এটা তাঁর বীরত্ববোধে আঘাত করে। ভীম বললেন— আহা! বেশ বললে বাপু রাক্ষসী! রাক্ষসের খাবার থালায় নিদ্রিত মা-ভাইদের পরিবেশন করে আমি এক কামার্ত পুরুষের মতো তোমার সঙ্গে যাই আর কি— দত্ত্বা রাক্ষসভোজনম্।... কামার্ত ইব মদ্বিধঃ।

হিড়িম্বা বলল— তা হলে যেমনটি তোমার ভাল লাগে, আমি তাই করব। তুমি এঁদের সবাইকে জাগাও। আমি এঁদের সকলকেই বাঁচাব। হিড়িম্বা বুঝেছে—কথাটা স্বার্থপরের মতো হয়ে গেছে। যাঁকে সে স্বামী হিসেবে পেতে চাইছে তাঁর মা-ভাইদেরও যে ভালবাসতে হবে, এটা সে এখন বুঝেছে। কিন্তু এই নিবেদিতপ্রাণা রমণীর কাছে ভীমও বা তাঁর বীরদর্প

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংকুচিত রাখবেন কেন? তিনি বললেন— তোমার সেই বদমাশ ভাইয়ের ভয়ে আমি আমার মা-ভাইদের জাগাতে পারব না। তা ছাড়া ওই রাক্ষস আমার শক্তি সহ্য করতে পারবে না। এই সগর্ব আস্ফালনের সঙ্গে ভীম কিন্তু হিড়িম্বাকে রাক্ষসী জেনেও একবার 'ভদ্রে' একবার 'তন্বঙ্গী' বলে সম্বোধন করেছেন। অর্থাৎ ভীম তাকে পুরোপুরি অস্বীকার করছেন না। কিন্তু এক রমণী তাঁকে বাঁচাতে চেয়েছে বলেই তিনি আপন বীরমানিতায় হিড়িম্বার প্রতি একটু তাচ্ছিল্য দেখিয়েই যেন বললেন— তুমি যাও বা এখানেই থাক, কিন্তু ভাল হয় যদি তোমার নরখাদক ভাইটিকেই এখানে পাঠিয়ে দাও— তং বা প্রেষয় তন্বঙ্গি ভ্রাতরং পুরুষাদকম্।

হিড়িম্বা ভীমের এই উদ্ধত আচরণ গায়ে মাখল না। সে দেখল— তার দেরি হচ্ছে দেখে তার ভাই হিড়িম্ব ধেয়ে আসছে। এতকাল এই রাক্ষসের হিংস্রতা সে দেখেছে। সে ভয় পেয়ে বলল— ওই আসছে আমার ভাই। তোমায় যা বলি একবারটি শোনো। আমি রাক্ষসী, রাক্ষসের বল আমার শরীরে। তুমি আমার এই পিঠের ওপর চড়ে বসো, তোমাকে আমি উড়িয়ে নিয়ে যাব। তোমার ভাই এবং মাকেও আমি একইভাবে নিয়ে যেতে পারি। এসো পিঠে চড়ে বসো— আরুহেমাং মম শ্রোণিং নেষ্যামি ত্বাং বিহায়সা। হিড়িম্বা অবশ্য বর্তমান অনুবাদকের মতো ভদ্রভাবে 'আমার পিঠে চড়ে বসো' বলেনি। বলেছিল— তুমি আমার এই নিতম্বদেশে আরোহণ করো। রাক্ষস কি অত ভদ্রভাষায় কথা বলে? সে পৃষ্ঠদেশ বোঝাতে আপন নিতম্বের উল্লেখ করে। কিন্তু মধ্যম পাণ্ডব হিড়িম্বার আর্তিতে রসিক হয়ে উঠেছেন আপাতত। আর্যেতরা রমণীর কথার মাত্রা আর্য ভাষায় ফিরিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, ওহে বিপুলনিতম্বে (সংস্কৃতে এমন সম্বোধন— পৃথুশ্রোণি, বিপুলশ্রোণি ইত্যাদি খুব চলে)! তোমার ভয় নেই কোনও। আমি থাকতে তোমার ভাই আমাদের কিছুই করতে পারবে না। তোমার সামনেই তাকে আমি কেমন মেরে ফেলি, দেখো— অহমেনং হনিষ্যামি প্রেক্ষন্ত্যাস্তে সুমধ্যমে।

ভীম এটা বুঝেছেন যে, হিড়িম্বা তার ভাইয়ের জীবনের মূল্যেও তাঁকে চায়। হিড়িম্বার মার্জিতা মানুষী চেহারাটাও তাঁর ভালই লাগছে বটে, নইলে বিপুলশ্রোণী, সুমধ্যমা এই সব সম্বোধন আসছে কোথা থেকে? কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি যেমন সরলা এই হিড়িম্বা রাক্ষসী, তেমনই সরল এই মধ্যম পাণ্ডব। তিনি যে হিড়িম্ব রাক্ষসের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিমান এবং তাকে মেরে ফেলতে যে তাঁর কোনও অসুবিধে হবে না, সেটা বোঝানোর জন্য ভীম এবার তাঁর হাতের 'মাসল' দেখাতে আরম্ভ করলেন হিড়িম্বাকে, দেখাতে লাগলেন পায়ের গুলি, বুকের ছাতি, এমনকী উরু সন্ধিও। শেষে বললেন— আমাকে মানুষ বলে খুব খাটো করে দেখো না সুন্দরী— মাবমংস্থাঃ পৃথুশ্রোণি মত্বা মামিহ মানুষম্। হিড়িম্বা বলল— তুমি মানুষ নও, তুমি আমার দেবতা। তোমাকে একটুও ছোট করে দেখছি না আমি— নাবমন্যে নরব্যাঘ্র ত্বামহং দেবরূপিনম্। তবে কিনা, মানুষের ঈশ্বর বড় মানুষ আমার! রাক্ষসের হিংস্রতা আমি দেখেছি, তাই ভয় পাই।

হিড়িম্ব রাক্ষস এবার এসেই গেল। তার আর দেরি সইছে না। কিন্তু সে এসে যা দেখল, তাতে তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। সে দেখল— তার রাক্ষসী বোন মানুষের মতো সেজেছে।

সে চুলের খোঁপায় জড়িয়ে দিয়েছে বনফুলের মালা, মুখখানিকেও ঘষে-মেজে বেশ চাঁদপানা করে তুলেছে। ভুরু, নাক, চোখ, এমনকী সমস্ত রুক্ষ চুলের গোছাটিও সে বিচিত্র ঢঙে সজ্জিত করে তুলেছে। হিড়িম্ব দেখল— হিড়িম্বার গায়ের চামড়া কোন মন্ত্রবলে কোমল হয়ে উঠেছে এবং হাত পায়ের নখ পর্যন্ত সুচারু ভাবে মসৃণ করে তুলেছে সে— সুভ্রূনাসাক্ষি-কেশান্তাং সুকুমার নখত্বকম্। এর ওপর আছে অলঙ্কারের শোভা এবং হিড়িম্ব দেখল যে, তার বোনটি এমন একখানি সুসূক্ষ্ম বাস পরিধান করেছে, যাতে রমণীয় প্রত্যঙ্গ-সৌন্দর্য্য প্রকট হয়ে ওঠে— সুসূক্ষ্মাম্বরধারিণীম্। হিড়িম্ব এবার তাকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করল, সে ভাবল, হিড়িম্বা নিশ্চয়ই পুরুষের মন ভোলানোর জন্যই এমন মোহন সাজে সেজেছে— পুংস্কামাং শঙ্কমানশ্চ চুক্রোধ পুরুষাদকঃ। হিড়িম্ব ক্রোধে ফেটে পড়ল এবং পাণ্ডবদের আগে মেরে তারপর সে তার ভগিনীকে শিক্ষা দেবে বলে ঠিক করল।

হিড়িম্ব রাক্ষসের হম্বিতম্বি শুনে ভীমও এবার যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হলেন এবং হিড়িম্বার আত্মনিবেদনের স্বীকৃতি স্বরূপই তিনি বললেন— যারা ঘুমচ্ছে, তাদের ছেড়ে তুই আমাকে ধর। আর তুই তোর বোনকে কী করবি? আমার সামনে আমি কোনও স্ত্রীহত্যা হতে দেব না। তা ছাড়া ও দোষটাই বা কী করেছে? আমাকে এই বালিকা যেভাবে কামনা করেছে, তাতে বোঝা যায় ও নিজের বশে ছিল না। তুই ওকে এখানে আসতে বলেছিলি, ও এসেছে। এখানে আমার চেহারা দেখে ও মজেছে, তাতে তোর কাছে ওর কী অপরাধ ঘটল? অপরাধ যে করেছে সে হল ওর অন্তরশায়ী মূর্তিহীন অনঙ্গ, তার জন্য তুই একে দায়ী কচ্ছিস কেন— অনঙ্গেন কৃতে দোষে নেমাং গর্হিতুমর্হসি? তবে একে আমার সামনে আমি কিছুতেই তোর হাতে মরে যেতে দেব না। আয় তুই আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। ভীমের কথা থেকে বোঝা যায়— আগে তিনি যতই এই রমণীকে 'যাও বা থাকো'— এমন ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন, সেই ঔদাসীন্য এখন তার নেই। এমনকী তার আসঙ্গলিপ্সায় এখন তিনি নিজেও খানিকটা আকুল বোধ করছেন। অন্তত এই রমণীর আসঙ্গলিপ্সা তাঁর কাছে অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক মনে হচ্ছে না। অর্থাৎ ভীম এখন অনেকটাই অনুকূল হিড়িম্বার ব্যাপারে। অন্তত কিছুতেই তিনি তাঁর হিতৈষিণী প্রিয়ৈষিণীকে মরতে দিতে চান না।

হিড়িম্বের সঙ্গে ভীমের ভয়ংকর যুদ্ধ আরম্ভ হল এবং এই যুদ্ধের পরিণতি আমরা জানি। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালীন পরস্পরের সমাহ্বান-শব্দে পাণ্ডব-ভাইরা যখন কুন্তীর সঙ্গে জেগে উঠে সুন্দরী হিড়িম্বাকে দেখলেন, তখন হিড়িম্বার প্রতিক্রিয়াটুকু লক্ষ করার মতো। কুন্তী হিড়িম্বার রূপ দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন— কে গো তুমি? কার মেয়ে? এই বনের মধ্যে কী করতে এসেছ? তুমি কি বনদেবী না অপ্সরা? হিড়িম্বা সরল মনে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে বলল— এই বিশাল ঘন-নীল যে বন দেখছেন, এখানে হিড়িম্ব রাক্ষসের বাস। আমি তার ভগিনী হিড়িম্বা। আপনাদের সবাইকে মেরে নিয়ে যাবার জন্য আমার ভাই আমাকে এখানে পাঠিয়েছিল। কিন্তু আপনার বলিষ্ঠ সুদর্শন পুত্রটিকে দেখে আমি তাঁকে আমার স্বামী হিসেবে বরণ করেছি— ততো বৃতো ময়া ভর্তা তব পুত্রো মহাবলঃ। এখান থেকে আপনার ছেলেকে আমি সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি। এদিকে আমার দেরি দেখে আমার ভাই হিড়িম্ব এখানে এসে গেছে। আপনাদের ঘুমে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে, সেইজন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার স্বামী অর্থাৎ আপনার পুত্র তাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র ভীষণ যুদ্ধ করছে— স তেন মম কান্তেন তবু পুত্রেণ ধীমতা।

এখানে কান্ত কথাটা লক্ষ করার মতো। কান্ত শব্দটায় যতখানি স্বামী বোঝায়, তার থেকেও বেশি বোঝায় কামিত, কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে। হিড়িম্বা নিজের অধিকার-বচনটুকু মোটেই ছাড়ছে না। ভীমের সম্বন্ধে কুন্তীকে— তোমার ছেলে বলার আগেই সে আমার স্বামী বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করছে। বনবাসিনী রাক্ষসীর মুখে— রাক্ষস, যুদ্ধ এবং সবার ওপরে ভীমের সঙ্গে তার স্বামী সম্বন্ধের কথা শুনে কেমন যেন হতচকিত হয়ে গেলেন কুন্তী। কিন্তু সবার আগে রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধে ভীমের কী হল, সেটা দেখা দরকার বলে সকলেই আগে হুড়মুড়িয়ে যুদ্ধস্থলে এসে উপস্থিত হলেন এবং আমরা জানি— এই যুদ্ধে হিড়িম্বকে বধ করে ভীম শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হন। যুদ্ধজয়ের পর ভীম যখন সকলের প্রশংসা উপভোগ করছেন সেইসময় হিড়িম্বাও কিন্তু দাঁড়িয়েছিল একান্তে। অর্জুন বন ছেড়ে নগরের পথে যাবার দিক নির্দেশ করলেন এবং সকলে চলতেও লাগলেন নির্দিষ্ট পথে। আশ্চর্য হিড়িম্বার সম্বন্ধে কেউ আর কোনও কথাও বলল না। না ভীম, না অন্য পাণ্ডবদের কেউ, না জননী কুন্তী। সেই গভীর নির্জন পথ বেয়ে পাণ্ডবরা যখন চলতে আরম্ভ করলেন, তখন হতভ্রাতৃকা হিড়িম্বা, একটু আগেই যে নাকি ভীমকে স্বামিত্বে বরণ করার গৌরব করছিল, তার দিকে কেউ চেয়েও দেখল না। না ভীম, না অন্য পাণ্ডবরা, না জননী কুন্তী। হিড়িম্বা একেবারে নিজের ইচ্ছায়, আপনাতে আপনি বিকশি পাণ্ডব-ভাই এবং জননী কুন্তীর পিছন পিছন চলতে লাগলেন, একটু দূরত্ব বজায় রেখে।

হিড়িম্বাকে এইভাবে চলতে দেখে হঠাৎই ভীম বললেন— রাক্ষসীরা মোহিনী মায়া বিস্তার করে নানা শত্রুতা করে, অতএব হিড়িম্বের মতো তোরও মরাই উচিত। এই বলে তার দিকে একটু এগোতেই যুধিষ্ঠির তাঁকে স্ত্রী-হত্যায় বাধা দিলেন। মহাভারতের কবি স্বকণ্ঠে যদিও কিছু বলেননি, তবু আমার মনে হয়, ভীমের এই হঠাৎ বলা কথাটার মধ্যে একটা যুক্তি আছে। আচ্ছা, হিড়িম্ববধের পর ভীমের মতো ব্যক্তির পক্ষে কি মা-ভাইদের কাছে প্রকট করে বলা সম্ভব ছিল যে, এই যে মেয়েটি দেখছ, ও রাক্ষসী হলে কী হবে, ও খুব ভাল, ওকে আমি বিয়ে করতে চাই। কোনও ভাবেই কি এই অযৌক্তিক যুক্তি পরম্পরা, অন্য পাণ্ডবদের মনে ভীমের ঐকান্তিক বিবাহেচ্ছা ছাড়া আর কিছু প্রকাশ করত? নাকি তাঁরা এই বিবাহ সহজে মেনে নিতেন?

আমার ধারণা, এখানে ভীম একটু নাটক করলেন। যখন কেউ পেছন পেছন চলতে থাকা হিড়িম্বার দিকে নজর দিল না, সবাই যখন তার ধীর অনুবর্তন সম্পূর্ণ জেনেও তাকে উপেক্ষা করল, তখন এই অতি-নাটকীয়তা ছাড়া কীই বা উপায় ছিল ভীমের। একটু আগেই যিনি তাঁর নিজের সামনে স্ত্রীহত্যা করতে দেবেন না বলে হিড়িম্বকে শাসাচ্ছিলেন, একটু আগে যে রমণীর সামনে তিনি হাতের পেশি আর ঊরুদেশের পরিঘবৎ কাঠিন্য প্রচার করছিলেন, সেই রমণীকে আপন বক্তব্য বলতে দেওয়ার জন্য উপেক্ষমাণ মা-ভাইদের সামনে এই অতিনাটকীয়তা ছাড়া আর কীই বা প্রকাশ করতে পারতেন ভীম।

ঠিক তাই। ভীম একটু একটু এগোতেই এবং যুধিষ্ঠির তাঁকে বাধা দিতেই হিড়িম্বা জননী

কুন্তীর কাছে পরিষ্কার বলে ফেলার সুযোগ পেল। সে কুন্তীকে বলল— একটি মেয়ে যদি কোনও পুরুষকে কামনা করে, ভালবাসে, তবে সেই অন্তর্গতা কামনার কী দুঃখ তা আপনি জানেন— আর্যে জানাসি যদদুঃখংমিহ স্ত্রীণামনঙ্গজম্। যেন মেয়ে হিসেবে কুন্তীই একমাত্র হিড়িম্বার মন বুঝবেন। হিড়িম্বা বলল— আমি এতক্ষণ অনেক দুঃখ সয়েছি, কিন্তু এখন আমার ভাই মারা গেছে এবং আমি আমার স্বজন, স্বধর্ম— সব ছেড়ে আপনার এই ছেলেটিকে আমার স্বামী হিসেবে চেয়েছি। এখন যদি আপনি এবং আপনার এই ছেলে আমায় প্রত্যাখ্যান করেন, তবে আমি আর বাঁচব না— প্রত্যাখ্যাতা ন জীবামি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে। হিড়িম্বা কোনও কিছু লুকোয়নি কারও কাছে। এমনকী তার এই ভালবাসার মধ্যে যে দৈহিক কামজ বাসনার সম্পূর্ণ মুক্তি আছে, সেটা প্রকট করে তুলতেও তাঁর লজ্জা নেই।

হিড়িম্বা এতখানিই ভীমকে ভালবেসে ফেলেছে, যে তার জন্য নিজেকে হেয় করতে তার বাধেনি। পঞ্চপুত্রের জননী হিসেবে কুন্তী ভাবী পুত্রবধূর কোন কথায় খুশি হতে পারেন, সরলা হিড়িম্বা তা সরল ভাবেই জানে। হিড়িম্বা বলল— আমি আপনার ছেলেকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি। সেই মুগ্ধা, অনুগতাকে আপনিই পারেন আপনার ছেলের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে— সংযোজয় সুতেন তে।

এতক্ষণ ধরে এত যে কথা চলছে কই ভীম তো এ-সবের প্রতিবাদ করলেন না। একবারও তো বললেন না— না মা! বিশ্বাস কোরো না এসব কথায়। ও রাক্ষসী, ও মায়া জানে— কই বললেন না তো এসব কথা। তাতেই বুঝি, ভীমের পূর্ব ব্যবহার নাটকীয়তা মাত্র। হিড়িম্বা ভীমের কাছে যেমন আত্মনিবেদন করেছিলেন, ঠিক তেমনই সরলভাবে জননী কুন্তীর কাছে আত্মনিবেদন করে বললেন— আপনি আমার ওপরে বিশ্বাস রাখুন। আমি আপনার ছেলেকে আমার অভীষ্ট জায়গায় নিয়ে যাব, আবার তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব। আপনারা যেই আমার কথা ভাববেন, অমনই আমি এসে দুর্গম স্থানেও আপনাদের বহন করে নিয়ে যাব। যদি তাড়াতাড়ি কোথাও যেতে হয়, তবে আমি আমার পিঠে করে আপনাদের বয়ে নিয়ে যাব— পৃষ্ঠেন বো বহিষ্যামি শীঘ্রং গতিমভীপ্সতঃ। আপনি শুধু আপনার পুত্রের সঙ্গে আমার মিলন ঘটিয়ে দিন।

হিড়িম্বার যা ক্ষমতা, যা সে পারে, নিজের গুণ হিসেবে তাই সে নিবেদন করেছে। একেবারে শেষে এসেছে ধর্মের কথায়। রাক্ষসী হলে কী হবে, তারও স্বানুভূত ধর্মবোধ আছে। সে বলেছে— বিপদের সময় যে পরের ধর্ম রক্ষা করে, সেই তো শ্রেষ্ঠ ধর্মজ্ঞ, আর ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হওয়াটাই ধার্মিকের বিপদ, অতএব যে যে উপায়ে ধর্ম সাধিত হয়, সেই উপায়গুলি নিন্দনীয় নয় কখনও। হিড়িম্বা বলতে চায়— ভীমকে সে রাক্ষসোচিত স্বধর্ম ত্যাগ করে পতিত্বে বরণ করেছে, এখন যদি সে প্রত্যাখ্যাত হয়, তবে স্ত্রীলোকের পালনীয় ধর্ম থেকে সে চ্যুত হবে। আমরা জানি, আজকে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুভবমণ্ডিত ধর্মগুলির কোনও মূল্য নেই। স্বধর্ম, স্ত্রীধর্ম— এগুলির পালনীয়তাও আজকে তাৎপর্য হারিয়েছে। কিন্তু সেদিনকার দৃষ্টিতে দেখলে— এক রমণী অভিমত পুরুষকে কামনা করার পরেও, স্বামিত্বে বরণ করার পরেও, তাকে পাচ্ছে না, এটা তার কাছে ধর্মচ্যুতি বলেই গণ্য হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে উদ্দেশ্যে অথবা যার উদ্দেশ্যে হিড়িম্বা এ-কথা বলেছে তা অবশ্য সিদ্ধ হল। ধর্মচ্যুতির প্রশ্নে ধর্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির এবার জবাব দিয়েছেন। তিনি হিড়িম্বার কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন— তুমি যা বলেছ, তা মেনে নিচ্ছি। তবে হ্যাঁ, ভীমকে যদি তুমি নিয়েই যাও, তবে তোমাকেও একটা কথা দিতে হবে। আমাদের সকাল বেলার স্নান-আহ্নিক, বেশ-ভূষার পর ভীমকে তুমি নিয়ে যাবে, কিন্তু সূর্য ডোববার আগেই তুমি ভীমের সঙ্গে বিহার-ভ্রমণ শেষ করবে। দিনের বেলায় তুমি যেখানে ইচ্ছে যাও, কিন্তু রাতের বেলায় তুমি তাকে ফিরিয়ে দেবে আমাদের কাছে।

কথাটা যুধিষ্ঠির বললেন হিড়িম্বাকে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে উত্তরটা দিলেন ভীমসেন। তার মানে হিড়িম্বার সঙ্গে তাঁর মিলনে আদৌ কোনও অনিচ্ছে ছিল না। তিনি ভাইদের দিকটাও রেখে এবং হিড়িম্বার দিকটাও ভেবে হিড়িম্বাকে বললেন— শোনো রাক্ষসী! (আদরের ডাক বলে কথা!) তোমার সঙ্গে আমি কতক্ষণ থাকব শোনো— আমার সঙ্গে সঙ্গত হওয়ার পর যতদিন না তোমার পুত্র জন্মগ্রহণ করে, ততদিন পূর্বনির্দিষ্ট সময় মতো আমি তোমার সঙ্গে বিহার করব। কিন্তু পুত্র জন্মের পর আর নয়— তাবৎকালং গমিষ্যামি ত্বয়া সহ সুমধ্যমে। সেকালের সমাজের দৃষ্টিতে মধ্যম পাণ্ডবের এই উক্তি খুব অসঙ্গত নয়। কেননা, স্ত্রী-পুরুষের মিলন-মৈথুন যদি বা বিবাহের অন্যতম অঙ্গ হয়ে থাকে, তবু পুত্রলাভই ছিল বিবাহের শেষ মর্ম। ভীম জানেন— পুত্রলাভের মধ্য দিয়েই হিড়িম্বার রাক্ষসী কামনা উপশান্ত হবে এবং সত্যি, হিড়িম্বা সাগ্রহে ভীমের কথা মেনে নিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে হিড়িম্বা পাণ্ডব-ভাইদের মধ্যে প্রথমা পুত্রবধূর পদবিতে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

মহাভারতের কবি এরপরে লিখেছেন— যুধিষ্ঠির এবং ভীমের সমস্ত নির্দেশ মেনে নিয়ে হিড়িম্বা ভীমকে নিয়ে ওপরের দিকে চলে গেলেন— ভীমসেনমুপাদায় সোর্ধ্বমাচক্রমে ততঃ। আমার জিজ্ঞাসা হয়— এই ওপরের দিকের জায়গাটাই এখনকার কুলু-মানালি নয়তো? নইলে হিমাচল প্রদেশের সেই প্রত্যন্ত ভূমিতে হিড়িম্বার অধিষ্ঠান ঘটল কী করে? সেখানে যদি কোনও ভাবে তাঁর উপস্থিতি অনুভূত না হত, তা হলে তত্রস্থ শক্তিরূপিণী দেবীর সঙ্গেই বা কী করে তিনি একাত্মতা লাভ করলেন! মহাভারতের কবি ভীম হিড়িম্বার বিহার স্থানগুলির যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার মধ্যে নদী, বন, সাগর-সৈকতও যেমন আছে, তেমনই আছে হিমালয়ের বনভূমিঘেরা কুঞ্জদেশ, গুহা এবং পার্বত্য সানুদেশ— হিমবদ্‌গিরিকুঞ্জেষু গুহাসু বিবিধাসু চ।... দেবারণ্যেষু পুণ্যেষু তথা পর্বতসানুষু। এই যে দেবারণ্য, এই যে হিমালয়ের গিরিকন্দর এবং পার্বত্যসানুর কথা শুনছি, এগুলি শোনার পরে যদি মানালির উচ্চচূড় দেবভূমিতে হিড়িম্বার মন্দির দেখি, তখন একবারের তরেও অন্তত মনে হবে— হিড়িম্বা বুঝি মধ্যম পাণ্ডবের সঙ্গে এখানে বিহার করতে এসেছিলেন কোনও সময়।

ভীমের সঙ্গে হিড়িম্বার যে মিলন হল, তার মধ্যে না ছিল প্রথাসিদ্ধ বৈবাহিক আচার, না ছিল মন্ত্রোচ্চারণ, না ছিল আত্মীয়পরিজনের স্বীকারগুঞ্জন। আধুনিক মতে একেবারে 'পারফেক্ট লিভ টুগেদার'। অথচ এই রাক্ষসী সুন্দরীই কিন্তু পাণ্ডবদের প্রথমা কুলবধূ এবং তাঁর মতো মহাকাব্যে উপেক্ষিতাই বা আর ক'জন আছেন। যুধিষ্ঠির-ভীমের শর্ত তিনি এতটাই মেনেছিলেন যে, সত্যি পুত্রজন্মের পর আর তাঁকে আমরা দেখতে পাই না। পরবর্তী

কালে হিড়িম্বা বারবার আমাদের স্মরণে এসেছেন তাঁর পুত্র ঘটোৎকচের প্রসঙ্গে। কিন্তু হিড়িম্বাকে আমরা আর একবারও মহাভারতের কোনও পর্যায়ে দেখিনি।

তবে হ্যাঁ, যেটুকু সময় তিনি ভীমের সঙ্গে ছিলেন, সেই সময়টুকু ভীমকে তিনি যে কত জায়গায় নিয়ে গেছেন, তা বলে শেষ করা যাবে না। হিড়িম্বার কথা যেভাবে আরম্ভ হয়েছিল, তাতে দৈহিক কামনা, বিশেষত মেয়েদের যৌনতার ভাষা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ঠিক এই নিরিখে দেখতে গেলে ভীমের সঙ্গে যখন তাঁর মিলন সম্পূর্ণ হল, তখন কিন্তু যৌনতার সর্ববিধ আচরণই তাঁর মিলন-পর্যায়গুলিতে অপেক্ষিত ছিল, অথচ সেইসব চুম্বন-আলিঙ্গন অথবা প্রত্যঙ্গ সংবাহনের একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি মহাকবি। তিনি শুধু সুন্দর সুন্দর রমণীয় ভূমি-নদী-পাহাড়ের উল্লেখ করেছেন, যে-সব জায়গায় গেলে দৈহিক সঙ্গসুখ মানসিক অন্তরঙ্গতায় উত্তীর্ণ হয়। আবার এই মিলনের মধ্যে ভীম এবং হিড়িম্বার পারস্পরিক তথা দেহজ আসক্তিটুকু মহাকবির অসাধারণ বাক্য-ব্যঞ্জনায় ধরা পড়ে, যদিও হিড়িম্বাই সেখানে শারীরিক সুখচেতনার কর্ত্রী হয়ে ওঠেন। মহাকবি লিখেছেন— ভীমকে সুখ দেবার জন্য হিড়িম্বা রূপসী মানবীর রূপ ধারণ করে অলংকার-বিভূষণে সজ্জিত হয়ে থাকত এবং হাবে-ভাবে-বিলাসিতায় তাঁর মনোহরণ করত— বিভ্রতী পরমং রূপং রময়ামাস পাণ্ডবম্।

হিড়িম্বার সঙ্গে ভীমের এই মিলন-মধুরতার ফল ফলল। তাঁদের একটি ছেলে হল। লক্ষণীয়, হিড়িম্বাই মধ্যম পাণ্ডবকে লালসা-তৃপ্তির জন্য প্রধানত চেয়েছিলেন বলে যৌনতার ক্ষেত্রে তাঁর রমণীয় কর্তৃত্ব যেমন তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে, তেমনই পুত্রজন্মের ক্ষেত্রেও মহাভারতের কবি কিন্তু তাঁকেই কর্তৃপদে বসিয়ে বলেছেন— ভীমসেনের কাছ থেকে হিড়িম্বা রাক্ষসী এক বিশাল শক্তিমান পুত্রের জন্ম দিল— প্রজজ্ঞে রাক্ষসী পুত্রং ভীমসেনাম্মহাবলম্। হয়তো বা মহাভারতের কবি আজকের ভাবনায় নিষ্ণাত ছিলেন না— 'উইমেন সেক্সুয়ালিটি', পুত্রলাভের ব্যাপারে স্ত্রীজনের কর্তৃত্ব— এইসব কথা হয়তো তিনি জানতেন না। কিন্তু পৃথিবীতে অকল্পিতভাবেই এমন মৌল উদাহরণ কিছু থেকেই যায় এবং মহাকবির চোখ এড়ায় না বলেই অনন্ত স্ত্রী-হৃদয়বৃত্তির মধ্যেও হিড়িম্বার কর্তৃত্বাভিমানিনী বৃত্তিটি তিনি ভুলে যাননি। শব্দ-প্রয়োগের ক্ষেত্রেও মহাকবির স্বাতন্ত্র্য এখানে লক্ষ করার মতো— রময়ামাস পাণ্ডবম্— তিনি মধ্যম পাণ্ডব ভীমকে সুখিত-রমিত করছেন, তিনি ভীমের মাধ্যমে পুত্র লাভ করেছেন— প্রজজ্ঞে রাক্ষসী পুত্রং— কর্তৃপদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে হিড়িম্বার এই প্রাধান্য নিশ্চয়ই এক আধুনিক সমাপতন— আপনি না মানলেও একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছেন না এই শব্দপ্রমাণ।

যাই হোক, পুত্রজন্মের পর হিড়িম্বার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল। মহাকবি তাঁর মহাকাব্যিক অভিসন্ধিতে লিখেছেন বটে যে, রাক্ষসীরা সদ্যই গর্ভ ধারণ করে এবং সদ্যই গর্ভমুক্ত হয়ে পুত্রকন্যা প্রসব করে, এমনকী তাদের পুত্রকন্যারা বড়ও হয়ে যায় সদ্য-সদ্য। এসব কথা মহাভারতে দেবতাদের প্রসঙ্গেও আছে, ঋষিদের প্রসঙ্গেও আছে, এমনকী স্বয়ং মহাভারতের কবির নিজের সম্বন্ধেও আছে। এমনটা সম্ভব কিনা, সেই তর্কে না গিয়েও বলতে পারি— ভীমের সঙ্গে বিহার আহার শয্যায় কম দিন কাটেনি হিড়িম্বার। অতএব এরই মধ্যে গর্ভধারণ এবং এই এখন গর্ভমুক্তির সময়টুকু লৌকিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু হিড়িম্বার পুত্রটির সদ্য বড় হয়ে যাওয়াটা লৌকিক বিচারে টেকে না বলেই মহাকাব্যিক উদারতার প্রশ্ন এখানে থেকেই যায়। পুত্রজন্মের সঙ্গে সঙ্গে হিড়িম্বার স্বামী-সহবাসের কাল শেষ হয়ে যায়, অথচ সেই পুত্রের সঙ্গে পিতা, পিতৃব্য এবং জননী কুন্তীর দেখা হবে না, সম্ভাষণ হবে না, ভবিষ্যতে কর্ণের একাঘ্নী বাণের আধার এই হিড়িম্বার পুত্র পিতৃব্য অর্জুনের প্রাণ বাঁচিয়ে দেবেন, অথচ তাঁর সঙ্গে কোনও সম্ভাষণই হবে না, তাঁর সঙ্গে দেখাই হবে না, এমনটা মহাকাব্যিক পরিমণ্ডলে সম্ভব নয়। ফলে হিড়িম্বার পুত্র বালক হওয়া সত্ত্বেও যৌবন লাভ করল— বালোঽপি যৌবনং প্রাপ্তঃ— এবং মহাকাব্যের অভিসন্ধি পূর্ণ হল।

পরম ঈপ্সিত স্বামীর কাছ থেকে পুত্র লাভ করে হিড়িম্বার মন গর্বে ভরে গেল। ছেলের চেহারার মধ্যে রাক্ষসের চেহারা যতটুকুই আসুক, ভীমের চেহারাও সে কম পায়নি। তবে তাঁর মাথাটা খানিক ঘটের মতো হয়েছে এবং মাথার চুলগুলো খোঁচা খোঁচা। পুত্রলাভের পরেই হিড়িম্বা স্মরণ করলেন— যুধিষ্ঠির-কুন্তীর কাছে তিনি কথা দিয়েছেন, সে-কথা তাঁকে রাখতে হবে, ভীমকে এবার আপন মায়াজাল থেকে মুক্ত করে দিতে হবে সম্পূর্ণভাবে। কেননা, ভীমের সঙ্গে সহবাসের দিন তাঁর শেষ হয়ে গেছে— সংবাসসময়ো জীর্ণ ইত্যাভাষ্য ততস্তু তান্— শেষ বিদায়ের জন্য হিড়িম্বা আবেগে স্ফুরিতধরা হলেন না। বরঞ্চ অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে ছেলে ঘটোৎকচের হাত ধরে উপস্থিত হলেন জননী কুন্তীর সামনে।

হিড়িম্বা বিদায় চাইলেন কুন্তীর কাছে এবং ঘটোৎকচ কুন্তীর চরণবন্দনা করলেন। ঠিক এইখানে কুন্তীর বক্তব্য আজকের দিনের উপরি-প্রগতিশীল এবং অন্তরে সংস্কারাচ্ছন্ন পুরুষ-রমণীকে লজ্জা দিতে পারে। কুন্তী ঘটোৎকচকে বললেন— বাছা! তুমি কুরুবংশে জন্মেছ, ভীমের মতোই তুমি আমার কাছে সমান স্নেহের— ত্বং কুরূণাং কুলে জাতঃ সাক্ষাৎ ভীমসমো হ্যসি। এই প্রসঙ্গে আমি শুধু আজকের ধনী-মানী জনক-জননীদের একটা সামান্য বার্তা দিতে চাই। বলতে চাই, শিক্ষা-দীক্ষা, ধন-মানের সঙ্গেই প্রগতিশীলতার অবশ্যম্ভাবী যোগ থাকে না। প্রগতির বোধ এমনই এক মুক্ত-সংস্কৃত ব্যক্তিমানসে প্রতিফলিত হয়, যেখানে জীবনবোধের মধ্যে অনহংকৃত এক মমতা আছে অন্যের জন্য, অন্যের জীবনের জন্য। কুন্তী ঘটোৎকচকে কুরুবংশের ছেলে বলে ভাবেন মানে হিড়িম্বা রাক্ষসীকেও তিনি পাণ্ডবদের প্রথমা কুলবধূ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ঘটোৎকচকে তিনি শুধু ভীমের ছেলে বলে একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্মের মধ্যে আবদ্ধ করেননি, কুন্তী ঘটোৎকচকে আশীর্বাদ করে বলেছেন— তুমি পাঁচ পাণ্ডবভাইয়েরই জ্যেষ্ঠ পুত্র— জ্যেষ্ঠঃ পুত্রোঽসি পঞ্চানাং— এটা যে হিড়িম্বার জন্যও কত বড় এক সর্বাঙ্গীণ স্বীকৃতি, সেটা আমি ভারতবর্ষের বিচিত্র-মহান জনজাতিকীর্ণ সমাজের সমন্বয়ের বুদ্ধিতে বোঝাতে চাই।

হিড়িম্বা রাক্ষসী হলেও ভীমের প্রতি ভালবাসায় এবং আনুগত্যে নিজের কথা রেখেছেন এবং আপন গর্ভজাত মানব-রাক্ষস ছেলেটিকেও তিনি তাঁর পিতা-পিতৃব্যের দায়িত্বে রেখে যাননি, হিড়িম্বা ছেলেকে নিজের সঙ্গে নিয়ে গেছেন নিজের দায়িত্বে। পুত্র ঘটোৎকচের হাত ধরে পাঞ্চাল দেশের কাছাকাছি পুরাতন ভ্রাতৃভূমি ছেড়ে চলে গেছেন আরও উত্তর দিকে, হয়তো বা সেই উচ্চচূড় পর্বত-সানু মানালিতে। হিড়িম্বা আর ফিরে আসেননি কখনও, গুরুকার্য করার প্রয়োজনে পাণ্ডবরা ঘটোৎকচকে স্মরণ করেছেন এবং তিনিও প্রাণ

দিয়েছেন পাণ্ডবদের কারণেই, কিন্তু কোনও প্রসঙ্গে কোনও অবস্থায় আমরা হিড়িম্বাকে আর দেখি না। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে আমরা অর্জুন-ভার্যা উলূপী-চিত্রাঙ্গদাকে যথেষ্ট আপ্যায়িত হতে দেখেছি, কিন্তু হিড়িম্বাকে আর দেখিনি। রাক্ষসী হিড়িম্বা তাঁর শিবের মতো স্বামীর কাছে যে কথা দিয়েছিলেন সে কথা তিনি রক্ষা করেছিলেন রাক্ষসীর ভালবাসায়। কামনা ভালবাসায় পরিণত না হলে এমন করে কথা রাখা যায় না, স্বামীর স্বার্থে এমন করে পুত্র বিসর্জনও দেওয়া যায় না। হয়তো সেইজন্যই হিড়িম্বা দেবী হয়ে গেছেন, উলূপী-চিত্রাঙ্গদারা তা হননি।

হিড়িম্বাকে মহাভারতের কবি যে কেন আর কোনও মহাকাব্যিক ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে এনে ফেললেন না, তার কতগুলি সামাজিক কারণ থাকতে পারে এবং সেই কারণগুলি তৎকালীন সমাজের অনন্ত উদারতার মধ্যেও যথেষ্ট যুক্তিসহ হয়ে উঠতে পারে। প্রথমত, হিড়িম্বা-ভীমের প্রণয়-বিবাহের মধ্যে আনুষ্ঠানিকতার সামাজিক নিয়ম ছিল না, ফলে ইন্দ্রপ্রস্থ বা হস্তিনার রাজকীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে হিড়িম্বা ক্ষণিকের জন্যও এসে পড়লে, তার কী প্রতিক্রিয়া হতে পারত, আমরা বলতে পারি না। দ্বিতীয়ত, হিড়িম্বা রাক্ষসী। আর্যায়ণের প্রথম পর্যায়ে আমরা রামায়ণ-মহাকাব্যে যত রাক্ষস দেখেছি, মহাভারতে আমরা সেই সংখ্যায় বা পরিমাণে তত রাক্ষস দেখি না। দৃশ্যতই আর্যায়ণের পরবর্তী পর্যায়ে অবশিষ্ট রাক্ষসী ভাবনার মধ্যে আর্যভাব অনেকটা সম্প্রসারিত হয়ে থাকলেও জাতিগতভাবে তথাকথিত রাক্ষস-রাক্ষসীর প্রতি সামাজিক ব্রাহ্মণ্যের অনভিনন্দন বা ঘৃণা তখনও শেষ হয়ে যায়নি। ফলে অন্যান্য পাণ্ডববধূদের মতো হিড়িম্বা রাজধানীতে এলে কী তার সামাজিক বা লৌকিক প্রতিক্রিয়া হত এবং সেই প্রতিক্রিয়া মহাভারতের অন্যান্য উদার-মধুর চরিত্রগুলির কোনও নীচতা বা অনুদারতা প্রকাশ করে ফেলত কিনা, মহাভারতের কবি সে-ব্যাপারে অতি সতর্ক ছিলেন হয়তো। অতএব তিনি এ-সাহস দেখাননি।

কিন্তু 'মিথ' এমনই এক বস্তু যেখানে সামাজিক সত্যগুলি কালপর্যায়ে সামগ্রিক নির্জ্ঞান থেকে উঠে আসে এবং তা মৌলভাবে অগ্রন্থিত থাকলেও পরবর্তী কবির হাতে তা সত্য হয়ে ওঠে, তাতে আমরা বুঝতে পারি— এমনটা হইলেও হইতে পারিত। বাঙালির কবি কাশীরাম দাস লোভ সম্বরণ করতে পারেননি। যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজসূয় যজ্ঞে অর্জুনের স্ত্রী উলূপী-চিত্রাঙ্গদারা রাজকীয়ভাবে আমন্ত্রিত হয়েই এসেছিলেন মনে হয়। সেই আমন্ত্রিত বধূদের পাশে রেখে কাশীরাম দাস হিড়িম্বাকে টেনে এনেছেন কবিজনোচিত অপূর্বনির্মাণ-নিপুণতায় এবং বুঝিয়ে দিয়েছেন— এমনটা হইলেও হইতে পারিত। কাশীরাম এই সত্য উদ্‌ঘাটনের ভূমিকাটাও করেছেন রাক্ষসী সরলতায়।

হিড়িম্বার ছেলে ঘটোৎকচ তখন হিড়িম্বক বনে রাজত্ব করে। প্রয়াত মাতুল হিড়িম্বের বনটাকেই সে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করার স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছে। সে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের কথা শুনে মায়ের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে যাবার আয়োজন করল। বহুতর রাক্ষস অনুগামী এবং জননী হিড়িম্বাকে নিয়ে সে রাজকীয় ঠাঁটে হাতির পিঠ থেকে নামল ইন্দ্রপ্রস্থের দ্বারে। দ্বারপালেরা যদিও তার রাজকীয় ঠাঁটবাটে মুগ্ধ হয়েছিল, তবু প্রবেশপথে তারা বাধা দিল। কিন্তু ভীমের ছেলে হিড়িম্বার গর্ভজাত— এই পরিচয়মাত্রেই তাঁদের প্রবেশ করানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হল এবং সহদেব নিজে তাঁদের আগমনবার্তা দিলেন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে। যুধিষ্ঠির ঘটোৎকচকে রাজসভায় নিয়ে এসে সহদেবকে বললেন— 'মাতারে পাঠাও তার যথায় পার্ষতী'।

এটাই হবার কথা, পার্ষতী কৃষ্ণা দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী, তিনি পট্টমহিষী, রাজসূয় যজ্ঞ যাঁরা আয়োজন করছেন, তাঁদের প্রধানা মহিষী। রাজকুলের অন্যান্য মহিলাদের 'হোস্ট' করার ভার দ্রৌপদীর ওপরেই। হিড়িম্বাকে সেখানে নিয়ে আসা হল এবং তিনি আসছেন। আমরা মূল মহাভারতে দেখেছি— ভীমকে পছন্দ হতে হিড়িম্বা মায়ারূপ ধরে সুন্দরী হয়েছিলেন, কিন্তু আমরা টিপ্পনী দিয়ে বলেছিলাম— হিড়িম্বা যথেষ্ট সুন্দরীই ছিলেন, তবে হিড়িম্ব-ভাইয়ের ঘরে অনাদরে থাকতে-থাকতে আর তার ফাই-ফরমাস খাটতে খাটতে খানিক রূপভ্রষ্টা ছিলেন। কিন্তু ভীমকে দেখার পর থেকেই তিনি রূপচর্চার মন দিয়েছিলেন। কাশীরাম এ বাবদে অনেক সাহসী। তিনি কোনও মায়ারূপের কথা বলেননি। এমনিতেই— হিড়িম্বারে দেখি চমকিত অন্তঃপুরী। আমরা যদিও বা রাক্ষসী ভেবে হিড়িম্বাকে কিঞ্চিৎ শ্যামা সুশোভনা ভেবেছিলাম, কাশীরামের দৃষ্টিতে তিনি— বিনা মেঘে স্থির যেন তড়িৎ-তরঙ্গ।

বসনে-ভূষণে-আভরণে হিড়িম্বা এখানে এতটাই রূপবতী যে, দ্রৌপদীর অন্তঃপুরচারিণীরা তথা সমাগতা রমণীরা তর্কানুমানে বলছে—

কেহ বলে, হবে বুঝি মদন-মোহিনী।
কেহ বলে, হবে বুঝি নগেন্দ্রনন্দিনী ॥
কেহ বলে, মেঘে ছাড়ি হইয়া মানিনী।
ভূমিতলে আসি দেখা দিল সৌদামিনী ॥

যাই হোক, কাশীরামের দৃষ্টিতে এই অপরূপা হিড়িম্বা প্রথমেই বিধি নিয়মমতে কুন্তীকে গিয়ে প্রণাম করতেই তিনি তাকে আশীর্বাদ করে বসতে বললেন। বস্তুত এই মহিলাকুলের মধ্যে একমাত্র কুন্তীই তাঁকে চেনেন, অন্যেরা তাঁকে চেনেন না, তবে জানেন নিশ্চয়। একই কথা হিড়িম্বার ক্ষেত্রেও সত্য, তিনিও সব খবর রাখেন এবং বোঝেনও সব। কুন্তী তাঁকে সসম্ভাষণে বসতে বললে—

যথায় দ্রৌপদী-ভদ্রা রত্ন সিংহাসনে।
হিড়িম্বা বসিল গিয়া তার মধ্যস্থানে ॥

হিড়িম্বাই যেহেতু ইন্দ্রপ্রস্থের রাজধানীতে প্রথম এসেছেন এবং তিনি কাউকে চেনেনও না অতএব তাঁর কোনও দায় ছিল না দ্রৌপদী কিংবা সুভদ্রাকে সম্ভাষণ করার। কিন্তু প্রধান দায় যাঁর ছিল, সেই দ্রৌপদী হিড়িম্বাকে নিজের পাশে বসতে দেখেই ভীষণ রেগে গেলেন এবং হিড়িম্বাও অতিরিক্ত আত্মসম্মানবোধে দ্রৌপদীর সঙ্গে কোনও কুশল বিনিময়ও করলেন না, কথাও বললেন না কোনও। কাণ্ড দেখে পঞ্চস্বামী-গর্বিতা দ্রৌপদী আর থাকতে পারলেন

না। তিনি হিড়িম্বাকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করলেন সেই ভাষায় ঠিক যেভাবে মধ্যযুগীয় বর্ণাশ্রমগর্বিণী মহিলারা নীচ-জাতীয়া, হীন-জাতীয়া রমণীর এতটুকু সাহংকার উপস্থিতি বা ঘোষণা শুনলে উচ্চকণ্ঠে নির্লজ্জভাবে বলতেন। দ্রৌপদী বললেন— স্বভাব কোনও দিন যায় না রে, স্বভাব কখনও যায় না—

কী আহার, কী বিহার, কোথায় বসতি।
কীরূপ আচার তোর, না জানি প্রকৃতি ৷৷

তথাকথিত হীনজাতীয়া রমণীর প্রতি এই সাধারণ ব্রাহ্মণ্য আক্ষেপ, আমার নিজের ক্যানেই বহুবার শুনেছি ছোটবেলায়। আচার-বিচার নেই, কোথায় থাকিস তার ঠিক নেই— ইত্যাদি সাধারণ তিরস্কারের সঙ্গে দ্রৌপদী হিড়িম্বাকে দুটি ভয়ংকর দোষ দিলেন। প্রথমটা হল— দ্রৌপদী জানেন যে, হিড়িম্বা ভীমের প্রতি নিজে আকৃষ্ট হয়ে নিজে তাঁর ভালবাসার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং সেটা তাঁর ভাই হিড়িম্ব-রাক্ষসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং তার মৃত্যুর মূল্যে। দ্রৌপদী এটাকে কামাতুর স্বভাবের পরিচয় বলে মনে করেন বলে হিড়িম্বাকে বললেন—

ভ্রাতৃবৈরী জনে কেহ না দেখে নয়নে।
কামাতুরা হয়ে তুই ভজিলি সে-জনে ৷৷

দ্বিতীয়ত, দ্রৌপদী এটাও শুনেছেন যে, হিড়িম্বা ভীমকে নিয়ে প্রচুর এদিক-ওদিক ঘুরেছেন এবং পুত্রলাভের পরেও তার এই ঘুরে বেড়ানো স্বভাব যায়নি বলেই তাঁর ঘৃণা আছে হিড়িম্বার প্রতি। এমন একজন রাক্ষসী এসে রাজসভার মধ্যে তাঁরই পাশে বসে থাকবে, এ-কথা ভাবতেই দ্রৌপদীর ক্রুদ্ধ চিৎকার ভেসে আসে—

সতত ভ্রমিস তুই যথা লয় মন।
একে কুপ্রকৃতি তায় নাহিক বারণ ৷৷
অন্বেষিয়া ভ্রমিস ভ্রমরী যেন মধু।
সভামধ্যে বসিলি হইয়া কুলবধূ ৷৷

তিরস্কার যথেচ্ছ হলে সজ্জিত যুক্তির মধ্যেও যে কুযুক্তি এসে যায়, এটা তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। নইলে পাণ্ডবদের কুলবধূ হয়ে দ্রৌপদী কিংবা সুভদ্রা যদি সভায় বসে থাকতে পারেন, তবে হিড়িম্বাই বা সেখানে বসতে পারবেন না কেন! আসলে দ্রৌপদীর রাগ, হিড়িম্বা হীনজাতীয় বলে এবং হীনজাতীয়া বলেই হয়তো তাঁর রাক্ষসীর অভিধা জুটেছে। সবার শেষে দ্রৌপদী একেবারে স্পষ্ট নির্দেশে বললেন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মর্যাদা থাকিতে কেন না যাস উঠিয়া।
আপন সদৃশ স্থানে বস তুমি গিয়া ॥

হিড়িম্বা এই অসহ্য অপমান মেনে নিলেন না এবং এখানে সযত্নে জানানো উচিত যে, রাক্ষসী হিড়িম্বার প্রতি কাশীরাম দাসের অনন্ত মায়া ছিল। ফলে মূল মহাভারতে এসব ঘটনার লেশমাত্র না থাকলেও মহাভারতেরই তথ্যসূত্র দিয়ে হিড়িম্বার মুখে উকিলের যুক্তি জুগিয়ে দিয়েছেন কাশীরাম। হিড়িম্বা দ্রৌপদীকে বলেছেন— তুমি অকারণে অহংকার প্রকট করে যা নয় তা বলার চেষ্টা কোরো না। তুমি নিজের ছিদ্রগুলো আগে দ্যাখো, আগে আয়নায় তোমার নিজের মুখটা দ্যাখো, তারপর আমাকে বলো। আমি না হয় আমার ভাইয়ের শত্রু ভীমকে ভালবেসেছি। তোর ক্ষেত্রে কী হয়েছে সেটা দেখ। তোর বাপ দ্রুপদকে তো অর্জুন যুদ্ধে হারিয়ে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল দ্রোণাচার্যের কাছে। অথচ এত বড় অপমানটা যে করল, তার হাতেই মেয়েকে তুলে দিল তোর বাপ। সেখানে লজ্জা করে না তোর। আর আমি ভীমকে ভালবেসেছি আগে, তারপর আমার ভাই মরেছে যুদ্ধ করে, বীরধর্মে মরেছে সে। কিন্তু তোর বাপ তো নিজের অপমান জেনে বুঝে তোকে তুলে দিয়েছে শত্রুর হাতে, আর তুই নিজেও সেটা মেনে নিয়েছিস—

শত্রুরে যে ভজে তার বলি ক্লীবজন্ম।
সংসারে বিখ্যাত তোর জনকের কর্ম ॥

মুখের মতো এইরকম একটা জবাবের পরে হিড়িম্বা এবার নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করলেন জ্যেষ্ঠার মর্যাদায়। কারণ, দ্রৌপদী মর্যাদার কথা তুলেছেন, অতএব তারও একটা উপযুক্ত জবাব দেওয়া দরকার। হয়তো বা হিড়িম্বা জানতেনও যে, ভীমের ব্যাপারে দ্রৌপদীর কিছু ‘পজেসিভনেস’-ও আছে, কিন্তু সে-সব তো অনেক পরের কথা। হিড়িম্বা বললেন— ওহে শোন! তুই যে আমাকে বেশ একটা সতীন ভেবে কথা বলছিস, ওরকমটা চলবে না। বরঞ্চ তুইই আমার সতীন। তোর বিয়ের অনেক আগে ভীমের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে, এমনকী আমার ছেলে পর্যন্ত হয়ে গেছে তোর বিয়ের আগে—

আমার সপত্নী তুমি আমি না তোমার।
তোর বিবাহের আগে বিবাহ আমার ॥

এইটুকুতে দ্রৌপদীর আক্ষিপ্ত তিরস্কারের সমুচিত উত্তর হয়ে গেলেও হিড়িম্বা তাঁকে এত সহজে ছেড়ে দিলেন না। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজবাড়িতে হিড়িম্বার বধূ-স্থানের মর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দ্রৌপদী। তাঁর পাঁচ-পাঁচটা স্বামী থাকতে পারে, এমনকী তাঁর স্বামীদের অন্য বিবাহিত স্ত্রীরা অন্য দাবি নাও জানাতে পারে, কিন্তু তাঁদের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুললে হিড়িম্বা ছাড়বেন না। তিনি বললেন— আমার শাশুড়ি কুন্তী-মায়ের পাঁচ ছেলে বটে, কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বধূর সংখ্যায় তোমাকে নিয়ে আমরা সবাই ন'জন। তো আর আট জনের কোন্ অধিকার এবং দায় নিয়ে তুমি মাথা ঘামাও? তুমি একা পাটরানি সমস্ত ভোগটা করে যাচ্ছ, আর আমাকে দেখেই তোমার গায়ে জ্বালা ধরেছে। তুমি আমাকে বলছ নাকি আমি স্বতন্ত্র বুদ্ধিতে চলি, এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াই। কিন্তু আমি আমার ছেলের রাজ্যে, ছেলের অধিকারে খাই-পরি, সেখানে স্বতন্ত্রতা, স্বেচ্ছাচারিতা কোথায়? বরঞ্চ স্বতন্ত্রা বললে একমাত্র তোকেই বলতে হয়। পাণ্ডবকুলের সমস্ত ঐশ্বর্য তুই একা স্বতন্তরী খাচ্ছিস, আমরা আট বউ সেই ঐশ্বর্যের অর্ধেকও তো চোখে দেখি না, তা হলে— কি-হেতু নিন্দিস মোরে বলি স্বতন্তরা।

হিড়িম্বা নিজের ছেলের দিকে নির্দেশ করে দ্রৌপদীকে বললেন— দ্যাখ, আমাদের ছেলের দিকে একবার তাকিয়ে দ্যাখ, সমস্ত রাক্ষসদের জয় করে সে রাজকর নিয়ে এসেছে মহারাজের রাজসূয় যজ্ঞে— মোর পুত্রে শোভিতেছে পাণ্ডবের সভা। হিড়িম্বা যে-সব কথা শুনিয়েছেন, সেই সব কথার সোজাসুজি প্রত্যুত্তর দ্রৌপদীর যুক্তিতে আসেনি। কিন্তু যুক্তিতে হেরে গেলে সযৌক্তিক ব্যক্তিও যেমন এলেমেলো কথা বলে গালি দেয়, দ্রৌপদীও ঠিক সেইভাবেই হিড়িম্বাকে শুনিয়ে বললেন— এত ছেলে ছেলে করিস না। কর্ণ বলে একজন আছে জানিস তো, তার ভয়ংকর একাঘ্নী বাণে তোর ছেলের মাথাটা কাটা যাবে। পুত্রের ওপর অভিশাপ শুনে হিড়িম্বাও ছেড়ে কথা বললেন না। বললেন— তবে রে! আমার ছেলেকে তুই এত বড় অভিশাপ দিলি, তা হলে জেনে রাখ্— ছেলেদের জন্য তোরও অনেক কষ্ট আছে কপালে। আমার ছেলে তবু যুদ্ধ করে মরে স্বর্গে যাবে, তোর ছেলেরা বিনা যুদ্ধে বেঘোরে মারা যাবে—

যুদ্ধ করি মোর পুত্র যাবে স্বর্গবাস।
বিনা যুদ্ধে তোর পঞ্চ পুত্র হৈবে নাশ ॥

হিড়িম্বা এতই রেগে গেছেন যে, এবার ইন্দ্রপ্রস্থের সভা ছেড়ে বেরিয়ে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। এই সময়ে দুই বউয়ের কোন্দলে প্রবেশ করলেন কুন্তী এবং দু'জনকেই শান্ত করে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ-সহায়তা করলেন। কাশীরামের এই কাণ্ডটা মূল মহাভারতে নেই, আর কর্ণের কাছে ইন্দ্রদত্ত একাঘ্নী বাণ এসেই পৌঁছয়নি তখনও। কিন্তু নির্মাণ-নিপুণ কবি কাশীরাম যেহেতু হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচের মৃত্যুকারণ জানেন এবং দ্রৌপদীর ছেলেদেরও মৃত্যুর পরিস্থিতি জানেন, অতএব সেই দুটি ঘটনা কলহান্তক ভূমিকায় কাজে লাগিয়ে এমন একটি নতুন গল্প সৃষ্টি করেছেন, যা চিরকালীন ভারতবর্ষীয় সমাজের অন্যায় আভিজাত্য-বোধকেও যেমন আঘাত করে, তেমনই রাক্ষসী হিড়িম্বার প্রতি কাশীরামের কবিজনোচিত বেদনাবোধও এখানে লক্ষ করার মতো বিষয়। হিড়িম্বা কোনও দিন রাজধানীর প্রকাশ্য প্রবাহের মধ্যে ফিরে এলেন না, কিন্তু ফিরে আসলে কী কী জটিল আবর্ত তৈরি হতে পারত, তার একটা কল্পিত ঝলক তৈরি করে দিয়েছেন কাশীরাম।

কাশীরাম দাস যেভাবে হিড়িম্বাকে রাজসূয় যজ্ঞের পটভূমিতে নিয়ে এসেছিলেন, তাতে একটা সামাজিক ব্যবস্থার উন্মোচন ঘটল বটে, কিন্তু এখানে পঞ্চস্বামীগর্বিতা দ্রৌপদীর সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাংসারিক বিবাদ ছাড়া আর কিছু দেখানোর সুযোগ হল না। এই বিরাট রাজসূয়ের অন্তরালে একবারের তরেও তাঁর যেন দেখা হল না মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের সঙ্গে।

মহাকাব্য মহাভারত পড়ে আমার কিন্তু সেই দুঃখটা থেকেই গিয়েছিল, দুঃখ ছিল এই যে, সেই যে ছেলের হাত ধরে রাক্ষসী চলে গেল উত্তরে, আরও উত্তরে, তার সঙ্গে আর একবারও দেখা হল না মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের। তবে আরও পড়তে পড়তে বুঝলাম— আমি একাই শুধু সেই সংবেদনশীল বুদ্ধিমান নই, যে এই নান্দনিক অভাবটুকু অনুভব করেছে, এই অভাবটুকু অনুভব করেছেন কবিকুলের আদিতম নাট্যকার মহামতি ভাস, যিনি খ্রিস্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দীতেই মহাকাব্যের এই আংশিক ট্র্যাজিডি মেনে নিতে পারেননি এবং হিড়িম্বার সঙ্গে ভীমের মিলন ঘটিয়ে দিয়েছেন নির্মল হাস্যরসের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে পরশুরাম রাজশেখর বসু বাংলায় ভাসের নাটকটিকে নিয়ে অসামান্য একটি গল্প লিখেছেন। আমরা সেটি পড়ে নেবার পরামর্শ দিয়েই এই প্রবন্ধ শেষ করতে পারতাম, কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে— মহাকাব্যের হিড়িম্বা-ভীমের প্রণয়-সত্যের ট্র্যাজিডিটুকু ভাস যেভাবে মিলনে উত্তীর্ণ করেছেন, তাতে অন্য এক সত্যের উদ্‌ঘাটন হয়ে গেছে।

ভাসের এই নাটকের নাম 'মধ্যমব্যায়োগ' এবং খ্রিস্টীয় শতাব্দীর আদিকালে এটি একটি একাঙ্ক নাটক, যা কোনও সংস্কৃত নাট্যকার সেইকালে লেখেননি। নাটকটা আরম্ভই হচ্ছে অদ্ভুত এক 'আয়রনি' দিয়ে। মহাভারতের মধ্যম পাণ্ডব ভীমের প্রতি প্রণয়াবেশে যে হিড়িম্বা তাঁর ভাই হিড়িম্ব রাক্ষসের হাত থেকে ভীম এবং অন্যান্য পাণ্ডব-ভাইদের বাঁচাতে চেয়েছিলেন, সেই হিড়িম্ব ছিল নরমাংসলোলুপ এক হিংস্র প্রকৃতির আর্যেতর মানুষ। একবার দেখার পরে ভীমকে তাঁর ভাল লেগে গিয়েছিল বলেই হিড়িম্বা এখানে হিড়িম্ব-ভাইয়ের নরখাদকতার বৃত্তি প্রকট করে তুলেছেন বেশি করে এবং তাঁর স্বচিহ্নিত প্রণয়ী ভীম এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ মা-ভাইকে বাঁচিয়ে দিতে চেয়েছিলেন ঘরের কথা ফাঁস করে দিয়ে। ধরেই নেওয়া যায় যে, আর্যগোষ্ঠীর ক্ষত্রিয় প্রতিভূ ভীমের সঙ্গে হিড়িম্বার সহবাস পরিচয়ের পর তাঁর রাক্ষসী-বৃত্তি কিছু কমবে। বিশেষত নরমাংসলোলুপতার যে জঘন্য অভ্যাস রাক্ষস-রাক্ষসীদের ওপর চিরকাল চাপানো হয়েছে, সেই অভ্যাস আর্যজনের সহবাসে স্তিমিত হবে। কিন্তু ভাসের নাটকে দেখছি— অদ্ভুত এক 'আয়রনি' দিয়েই নাটকের সূত্রপাত ঘটেছে।

ঘটনার স্থান এবং সময় নির্ধারণ করা হয়েছে পাণ্ডবদের অরণ্যবাসের সময়ে। তার মানে অনেক কাল কেটে গেছে— সেই দ্রৌপদীর সঙ্গে পাঁচ পাণ্ডব-ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে, যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হয়ে কিছু কাল কাটিয়েছেন, শকুনির সঙ্গে পাশাখেলা হয়েছে এবং পাণ্ডবরা বনবাসে গেছেন, এমনকী বনবাসেরও কয়েক বছর কেটে গেছে। এইরকম একটা সময়ের প্রক্ষেপে ভাস নাটক আরম্ভ করছেন। দেখা যাচ্ছে প্রথম 'সিনে'ই কুমার ঘটোৎকচ তাঁর বিশাল ভীতিকর শরীর নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং এক ব্রাহ্মণ স্ত্রী-পুত্রসহ তাঁকে দেখে ভীষণ ভয় পাচ্ছেন। প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণ একটু ভয় পেলেও খানিকটা বোধহয় নিশ্চিন্তও ছিলেন যে, রাক্ষসরা আর যাই হোক ব্রাহ্মণ-পরিবারের কাউকে প্রাণে মারবে না। তাঁর তিন ছেলে ঘটোৎকচের চেহারার রাক্ষসোচিত বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে আলোচনা-বিচার করছিলেন— লোকটার চুল লাল, চোখ পিঙ্গলবর্ণ, উঁচু দাঁত, গায়ের রং কালো,

কিন্তু দৃপ্ত, সাহসী এবং উগ্র চেহারা, কিন্তু এই রাক্ষসের গলায় একটা পৈতে আছে। ব্রাহ্মণ পিতা এবং তার তিন ছেলে ভয় পাচ্ছিলেন বটে, কিন্তু সংসারে ঘষ্টে-যাওয়া গিন্নি যেমন অতি ঘনিষ্ঠজনের বৃত্তির উৎকর্ষও বোঝেন না এবং অন্যের ভয়-ত্রাসও কিছু বোঝেন না, সেইরকমভাবেই ব্রাহ্মণী বললেন— কে রে এই লোকটা? তখন থেকে জ্বালিয়ে মারছে।

ততক্ষণে ঘটোৎকচ সামনে এসে গেছেন এবং এই পরিবারের এক-দু'জনের জীবন চলে গেলে যেন খুব কিছু ক্ষতি হয়ে যাবে না, এইরকম একটা ভাব দেখিয়ে ঘটোৎকচ বললেন— ওহে বামুন, দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমায় ভয়ে তোমার স্থিরতা-ধীরতা নষ্ট হয়ে গেছে, তা জানি। পুত্র-পরিবারকে আমার হাত থেকে বাঁচাবে, সেই শক্তিও তোমার নেই। তবে হ্যাঁ, গরুড়ের পাখার বাতাস লেগে তোমার মতো আর্তজনেরও রাগ চেতিয়ে ওঠে জানি, কিন্তু কিছু তো করার নেই, যেয়ো না, যেয়ো না এখান থেকে।

রাক্ষসদের সম্বন্ধে আমাদের যেমন ধারণা— তারা এসেই মেরে-ধরে খেয়ে ফেলবে— ঘটোৎকচ কিন্তু সেরকম ব্যবহার করছেন না, তিনি একটু রেখে-ঢেকে কথা বলছেন, একেবারে হামলে পড়ছেন না। তাঁর কথাবার্তা শুনে ব্রাহ্মণও বলছেন— ভয় পেয়ো না, ব্রাহ্মণী! ভয় পেয়ো না ছেলেরা! এর কথা শুনে মনে হচ্ছে— লোকটার কিছু বোধশক্তি আছে, একটু চিন্তা করে কথা বলছে যেন— সবিমর্শা হি অস্য বাণী। ব্রাহ্মণের কথার খেই ধরে ঘটোৎকচও বলল— আরে কী ঝামেলা! এত কী কথা বলছ— আমি জানি, এই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা পূজ্যতম বটে। কিন্তু কী করি! আমি তো নাচার। আমার মা একটা আদেশ করেছেন আমাকে, তাই সমস্ত দ্বিধা ত্যাগ করে এই অকাজটা আমাকে করতে হবে— অকার্যমেতচ্চ ময়াদ্য কার্য্যং/ মাতুর্নিয়োগাদপনীয় শঙ্কাম্।

খুব নাটকীয়ভাবেই ভাস তাঁর দর্শিতব্য ঘটনা এবং ভাবনার মধ্যে একটা 'আয়রনি' তৈরি করছেন। এই যে ব্রাহ্মণ পরিবার— এঁরা একটা বড় নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছেন। তবে কিনা সেকালের দিনের ব্রাহ্মণের ঘরের নেমন্তন্ন, তাই উৎসবটাও ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের ঘটনা। ব্রাহ্মণ কেশবদাস তাঁর স্ত্রী এবং তিন ছেলেকে নিয়ে ভারতের উত্তর-দেশে উদ্যামক গ্রামে মামার ছেলের উপনয়ন উৎসবে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার সময় বনের পথে সামান্য বিশ্রাম নেবার সময় এই বিপত্তি। লক্ষণীয়, কেশবদাস উত্তরদেশ থেকে ফিরছিলেন এবং মহাভারতের বিবরণে এটাই আছে যে, হিড়িম্বা তাঁর ছেলে ঘটোৎকচকে নিয়ে আরও উত্তরের দিকে চলে গিয়েছিলেন।

'আয়রনি'র জায়গাটা হল এই যে, হিড়িম্বা একটি ব্রত উপবাস করেছিলেন। অতএব পরের দিন পারণ-পর্বের জন্য তিনি ছেলেকে বলেছেন একটি মানুষ ধরে আনতে। সেই নরমাংস খেয়ে তিনি উপবাস ভঙ্গ করবেন। মনে করিয়ে দিতে চাই— এইরকম অন্য একটা দিন, যেদিন তাঁর রাক্ষস-ভাই হিড়িম্বও আপন নরমাংসলোলুপতায় এই হিড়িম্বাকেই পাঠিয়েছিল পাণ্ডব ভাইদের ধরে আনার জন্য। সেদিন হিড়িম্বা কাউকেই ধরতে পারেননি, উলটে মধ্যম পাণ্ডবের আসঙ্গলিপ্সায় তিনি আপন ভাইয়ের নরমাংস-লিপ্সায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আজ সেই হিড়িম্বাই কিন্তু নরমাংসের জন্য ছেলেকে পাঠিয়েছেন বনস্থলীতে। হয়তো নিছক নরমাংস লোলুপতার জন্যই নয়, এর পেছনে হিড়িম্বার ব্রতোপবাসের ধর্মীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ কিছু আছে। কিন্তু সেখানে নিয়মভঙ্গের জন্য নরমাংস লাগবে কেন? বস্তুত হিড়িম্বা নিজেই এই নরমাংসের জন্য ছেলেকে আদেশ দেওয়ায় তাঁর ভাইয়ের বৃত্তি আজ পুনরাবৃত্ত হল এবং ভাস বোধহয় বোঝাতে চাইছেন যে, বৈবাহিক সংসর্গ-সহবাসের মাধ্যমে অনেক কিছু পরিশীলিত হলেও পূর্বেকার বৃত্তি, রুচি এবং স্বভাব আমূল পরিবর্তিত হয়ে যায় না। হিড়িম্বা তাই ভীমের ঔরসজাত পুত্রটিকেই একটি মানুষ ধরে আনার জন্য আদেশ দেন।

ঘটোৎকচ অবশ্য মায়ের আদেশের আভাসটুকু দিয়েছে। ব্রাহ্মণী আর খুব ভরসা রাখতে পারছেন না ঘটোৎকচের কথায়। এখনও তিনি পরিষ্কার করে বলেননি যে, ঠিক কী তিনি চান, তবে সেটা যেহেতু অন্যায় অকাজ বলে তিনি নিজেই চিহ্নিত করেছেন, অতএব বিপদ একটা আছে বলেই মনে করছেন সংসারের ভারবাহক এই পিতা। তিনি বলেও ফেললেন— ব্রাহ্মণী! ওখান থেকে ফেরার সময় জলক্লিন্ন মুনি আমাদের বলেইছিলেন যে, এই বনে রাক্ষসের ভয় আছে, তুমি সাবধানে যেয়ো। এখন দেখছি, সেই বিপদই হল। ব্রাহ্মণী অসহায়ভাবে বললেন— এমন বিপদ দেখেও তুমি এমন চুপচাপ আছ কী করে? বরঞ্চ আমরা সবাই মিলে একটু চেঁচামেচি করে দেখি-না, কেউ যদি বিপদ্-ত্রাণের জন্য এগিয়ে আসে। মায়ের কথা শুনে ব্রাহ্মণের বড় ছেলে বলল— কার আশায় এখানে চ্যাঁচাব মা। দেখছ তো এই অরণ্যের মধ্যে কোথাও কোনও জনমানব নেই। থাকার মধ্যে আছে শুধু পশু আর পাখি। তবে হ্যাঁ, এই শান্ত নির্জন বনস্থলীতে মনস্বী জন এবং মুনি-ঋষিরা থাকতে পছন্দ করবেন বটে।

প্রথম পুত্রের কথা শুনে ব্রাহ্মণের মাথায় বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো একটা ভাবনা খেলে গেল। তিনি বললেন— ব্রাহ্মণী ভয় পেয়ো না। মনস্ব জন, মুনি-ঋষিরা এরকম জায়গায় থাকতে পছন্দ করবেন শুনে আমার ভয়টা কেমন কেটে যাচ্ছে। আমার ধারণা, পাণ্ডব-ভাইরা এখন বনবাসে আছেন এবং তাঁরা কাছাকাছি কোথাও আছেন বলেই আমার মনে হচ্ছে। আর যদি তাঁরা কেউ থাকেন তা হলে এইরকম ভয়ানক দেখতে লোককে তারাই শায়েস্তা করতে পারেন। কেননা, তাঁরা যুদ্ধ ভালবাসেন, শরণাগতকে রক্ষা করেন, দরিদ্র মানুষের প্রতি তাঁদের দয়া-মায়া আছে এবং সবাই জানে তাঁরা কেমন বীর। যে আমাদের এইভাবে ভয় দেখাচ্ছে, তাকে ঠান্ডা করতে ওঁরাই হলেন উপযুক্ত লোক— দণ্ডং যথার্হমিহ ধারয়িতুং সমর্থাঃ।

লক্ষণীয়, ব্রাহ্মণের পরিবারের মধ্যে এত যে ভয়-ত্রাস চলছে, সে-সব দেখেশুনেও ঘটোৎকচ কিন্তু ভয়ংকর কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন না, কিংবা হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ করেও তেড়ে আসছেন না। অন্তত নাট্যকার ভাস তাঁকে এই মুহূর্তে খানিকটা উদাসীন হিসেবে দেখিয়ে রাখছেন এইজন্যই যে, রাক্ষস হলেও তিনি ভীমের পুত্র, মায়ের উপবাসভঙ্গের জন্য খাবার হিসেবে মানুষ ধরে নিয়ে যেতে চাইলেও তাঁর ভদ্রাভদ্র, সমীচীন জ্ঞান আছে। অতএব এখনও তিনি কোনও আক্রমণের ভাব দেখাননি। বরঞ্চ যথোচিত আলোচনার সুযোগ দিচ্ছেন।

ব্রাহ্মণ-পিতার ক্ষীণ আশায় কিন্তু একেবারে ঘোলা জল ঢেলে দিলেন সেই তাঁর প্রথম পুত্রই। সে বলল— তুমি যে পাণ্ডবদের জন্য সকলের জীবনের আশা করছ, আমার কাছে

যা খবর, তাতে এইটুকু বলতে পারি যে, পাণ্ডবরা এখানে নেই। তাঁরা সব মহর্ষি ধৌম্যের আশ্রমে গেছেন শতকুম্ভ নামে এক যজ্ঞ করার জন্য। কথাটা আমি শুনেছি এক ব্রাহ্মণের মুখে যিনি ওই যজ্ঞস্থল থেকে ফিরেছেন। ব্রাহ্মণ পিতা বললেন— তা হলে তো সবই শেষ হয়ে গেল, আর কোনও আশা নেই বাঁচার। ছেলে বলল— না বাবা, সবাই কিন্তু সেই যজ্ঞে যাননি। বনের মধ্যে তাঁদের আশ্রমটি সুরক্ষিত রাখার জন্য মধ্যম পাণ্ডব ভীম এখানে রয়ে গেছেন। ব্রাহ্মণ লাফিয়ে উঠে বললেন— আরে শুধু ভীম যদি এখানে থেকে থাকেন, তা হলে বলতে হবে সব পাণ্ডবরাই এখানে আছেন। আসলে ভীমের শক্তি এবং অস্ত্রক্ষমতার কথা এতটাই লোকবিশ্রুত ছিল যে, তাঁর মতো একজন থাকলে আর কাউকেই প্রয়োজন হয় না। তবে ব্রাহ্মণের ছেলে পিতার উৎফুল্লতায় খুব একটা উৎফুল্ল হল না। কারণ সে জানে যে, এই সময়টাতে তিনি ব্যায়াম এবং শরীরচর্চার জন্য অন্যত্র একটু দূরে থাকেন।

ব্রাহ্মণ পিতা যখন এই আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে ভুগছেন এবং ভাবছেন যে, কিছু করার থাকলেও এই মুহূর্তে তা করা যাচ্ছে না, তখন নিরাশার শেষ জায়গায় এসে ব্রাহ্মণ বললেন— সব আশাই যখন ব্যর্থ হয়ে গেছে, তখন অন্তত অনুনয়-বিনয় করে দেখি একবার। যুবমানস জানে, এতে লাভ হবে না, ব্রাহ্মণের প্রথম ছেলে তাই বলল— কোনও লাভ হবে না, বাবা! পরিশ্রমই সার। ব্রাহ্মণ বললেন— দ্যাখো বাছা! কোনও আশাই যেখানে নেই, সেখানে অনুনয়-প্রার্থনাই একমাত্র উপায়। দেখি না কী হয়! ব্রাহ্মণ এবার ঘটোৎকচের দিকে তাকিয়ে বললেন— এই যে মশাই! আমাদের কি মুক্তি হয় না কোনও ভাবে? ঘটোৎকচ কোনও ক্রোধ প্রকাশ না করে ঠান্ডা মাথায় বললেন— মুক্তি হতে পারে একটা শর্তে। দেখুন, এটা আমার মায়ের ব্যাপার। তিনি আমাকে আদেশ দিয়ে বলেছেন— বাছা! আমার উপবাস ভঙ্গ করার জন্য এই অরণ্য থেকে একটি মানুষ ধরে নিয়ে এসো। সেই কাজ করতে গিয়ে দেখছি তোমরা এখানে রয়েছ। তাই তোমাদেরই ধরেছি। এখন তোমার বাঁচার শর্ত হল, তুমি তোমার একটি ছেলে আমাকে দাও। বদলে তুমি তোমার সতী-সাধ্বী স্ত্রীকে, দুটি ছেলেকে এবং নিজেকে বাঁচাতে পারো। অতএব ভালমন্দ গুণাগুণ বিচার করে তোমার একটি ছেলেকে আমার হাতে দাও— বলাবলং পরিজ্ঞায় পুত্রমেকং বিসর্জয়।

এই বিপন্ন অবস্থাতেও ঘটোৎকচের কথা শুনে ব্রাহ্মণ বেশ রেগে গেলেন। বললেন— ব্যাটা রাক্ষস! বদমাশ কোথাকার! আমি কি বামুন নই, নাকি খারাপ বামুন? আমি এতদিন শাস্ত্র পড়েছি, শাস্ত্রের মর্ম জানি। সেই আমি কিনা একটি সচ্চরিত্র গুণবান ছেলেকে তোর হাতে তুলে দেব! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথায় এতটুকুও রাগ করলেন না ঘটোৎকচ, কিন্তু নিজের জায়গা থেকে এতটুকু সরলেনও না। ঘটোৎকচ বললেন— কে বলেছে আপনি খারাপ বামুন, আপনি খুব ভাল বামুন। কিন্তু তবু বলছি— আপনার একটা ছেলেকে আমি চেয়েছি, যদি তা না দেন, তা হলে আপনি সপরিবারে ধ্বংস হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন। ব্রাহ্মণ আবারও রেগে গেলেন। বললেন— ঠিক আছে, তা হলে শোনো আমার প্রতিজ্ঞা। শোন, আমার এই শরীরের যা কাজ, তা হয়ে গেছে, বার্ধক্যও গ্রাস করেছে আমার শরীর। ছেলেকে বাঁচানোর জন্য শাস্ত্রীয় আচারে মার্জিত এবং সংস্কৃত এই শরীর আমি আহুতি দেব তোর জন্য। তুই চল, আমাকে নিয়ে চল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এই হঠাৎ প্রতিক্রিয়ায় সমস্ত পরিবারটার মধ্যেই একটা আলোড়ন হল। পরিবারের একজনকে বাঁচানোর জন্য আত্মাহুতির ধুম পড়ে গেল। প্রথমেই উচ্চকিত হলেন ব্রাহ্মণী। তিনি বললেন— প্রভু এমন কাজও করবেন না আপনি। পতিব্রতা পত্নীর কাছে স্বামীই তো একমাত্র ধর্ম। আমিও তো আমার এই শরীর-ধারণের পুরস্কার লাভ করেছি, অতএব এই শরীর দিয়ে আমি এই বংশ, পুত্রদের এবং আপনাকে রক্ষা করতে চাই। ব্রাহ্মণীর কথায় ঘটোৎকচ এবার সসম্ভ্রমে জানাল— দেখুন, আমার মায়ের আবার স্ত্রীলোক পছন্দ নয়, অর্থাৎ উপবাস-ভঙ্গের ক্ষেত্রেও শুধু মানুষ হলে তাঁর চলে না, এখানে তাঁর স্ত্রী-পুরুষের বিচার আছে, পুরুষ-মাংসই তাঁর পছন্দ, স্ত্রীলোকের মাংস নয়।

স্ত্রী হিসেবে হিড়িম্বা পুরুষের মাংসই পছন্দ করেন— এখানেও কোনও সামাজিক-দার্শনিক যৌনতার আলোচনা চলে কিনা, সেটা ভাববার বিষয়। কিন্তু আপাতত সে আলোচনায় আমরা যাব না। দেখুন, বাপ-মায়ের এমন একটা আত্মবলিদানের প্রক্রিয়ায় যুবক ছেলেদের মধ্যে এবার আত্মবিসর্জনের নতুন ভাবনা আরম্ভ হল। স্ত্রীলোকে ঘটোৎকচ-জননীর অরুচি দেখে ব্রাহ্মণ পিতা তাঁকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই ঘটোৎকচের সঙ্গে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু ঘটোৎকচ তাঁকেও দূরে হটিয়ে দিলেন, কেননা চর্মসার, মেদহীন এক বৃদ্ধের মাংসও হিড়িম্বার পছন্দ হবে না, সেটা ঘটোৎকচ জানেন। ফলে পড়ে রইলেন তিন ছেলে। তিন জনের মধ্যে প্রথম অনেক বেশি দায়িত্বশীল। সে পিতা-মাতা-ভাইদের বাঁচানোর জন্য আগে যেতে চাইল। গুরুজনদের বাঁচানোর তাগিদে দ্বিতীয় জনও একই কথা বলল। তৃতীয় জনও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা। সকলেই পরিবারের স্বার্থে আগে যেতে চায় আত্মবিসর্জনের জন্য।

তিনজনের বক্তব্য শোনার পর প্রথম পুত্র বলল— শাস্ত্রীয় কারণেই আমার দায়িত্ব অনেক বেশি। পিতা বিপদগ্রস্ত হলে জ্যেষ্ঠ পুত্রই তাঁকে উদ্ধার করে। অতএব আমাকেই যেতে হবে। ঠিক এই অবস্থায় প্রথম পারিবারিক টানাপোড়েন দেখা দিল। পিতা বললেন— এই জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার সবচেয়ে প্রিয়, তাকে আমি ছেড়ে দিতে পারব না। ব্রাহ্মণী বললেন— তোমার কাছে যেমন বড় ছেলে, আমার কাছে তেমনই ছোট ছেলে। তাকেও আমি ছাড়তে পারব না। এবার দুই ভাইয়ের মধ্যম দ্বিতীয় পুত্রটি বাবা-মায়ের এই ভাগাভাগি দেখে একটু যেন মর্মাহত হয়েই ঘটোৎকচকে বলল— পিতা-মাতাই যাকে চান না, তার প্রতি কে প্রসন্ন হবে? ঘটোৎকচ বললেন— আমি তোমার প্রতি প্রীত-প্রসন্ন হয়েছি। তুমি তাড়াতাড়ি চলো আমার সঙ্গে। দ্বিতীয় পুত্রটির মনে প্রথমে একটু অভিমান এসেছিল বটে, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই সে নিজেকে সামলে নিল এবং নিজের ভৌতিক দেহের পরিবর্তে সে যে পরিবারের সকলকে বাঁচাতে পারছে— এই গর্বে সে নিজের অভিমানের জায়গাটা পালটে নিল। তার এই আত্মত্যাগের গৌরব দেখে স্বয়ং ঘটোৎকচ পর্যন্ত তার দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, নাট্যকার ভাস যেভাবে এই তিন পুত্রের উদাহরণ তৈরি করেছেন, যেভাবে প্রথম পুত্রটির প্রতি পিতার এবং কনিষ্ঠ পুত্রটির ওপর মায়ের স্নেহের বাহুল্য দেখিয়েছেন, তার সূত্র আসছে বৈদিক কালের শুনঃশেপের উদাহরণ থেকে। ভাস যেহেতু উত্তর-বৈদিককালের নাট্যকার, অতএব তাঁর নাটকে যাগ-যজ্ঞ, পৌরোহিত্য,

ব্রাহ্মণ্য এবং অন্যান্য বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের প্রাধান্য যেমন আছে, তেমনই কিছু কিছু 'কনভেনশনাল' কাহিনিও তাঁর নাটকে সূত্রাকারে ঢুকে গেছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে দেখা যাবে— হতদরিদ্র এক ব্রাহ্মণ অজীগর্ত অর্থের লোভে তিন পুত্রের মধ্যে একজনকে প্রায় বিক্রি করে দিচ্ছে। সেখানেও স্নেহ-প্রিয়ত্বের কারণে প্রথম পুত্রকে পিতা ছাড়ছেন না, মা ছাড়ছেন না কনিষ্ঠকে, অবশেষে মধ্যম শুনঃশেপকে দু'জনেই ছেড়ে দিচ্ছেন। ভাস সেই বৈদিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন নাটকীয় বৃত্তিতে। ব্রাহ্মণের মধ্যম পুত্রটি ঘটোৎকচের সঙ্গে যাচ্ছে।

ঘটোৎকচ কোনও তাড়া করছেন না। কেননা আসন্ন বিদায়-দৃশ্যে করুণা-বিগলিত পিতার আশীর্বাদ, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের অভিবাদন-আলিঙ্গন— কোনওটাকেই তিনি ক্রূর রাক্ষসোচিত দৃষ্টিতে দেখছেন না। এর পরেই নাটকের গতি পরিবর্তিত হচ্ছে উত্তেজনার দিকে। ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় পুত্রটি ঘটোৎকচের সঙ্গে চলে যাবার কালে নিকটবর্তী জলাশয়ে একবার জল খেয়ে আসতে চাইল। সামনে তার মৃত্যু কীভাবে আসছে, সে বুঝতে পারছে, অতএব ভয় তাকে গ্রাস করছে, সে জল খেতে চাইছে। ঘটোৎকচ অবশ্য তার পালিয়ে যাবার আশঙ্কা করছেন না, কিন্তু একটু নিস্তরঙ্গ ভাব দেখিয়ে বললেন— আমার মায়ের আবার খাবার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, যাহোক তাড়াতাড়ি করো। দ্বিতীয় পুত্র চোখের আড়াল হতেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিলাপ করতে লাগলেন পুত্রের জন্য। তাঁর বিলাপিনী ভাষায় যুক্ত হয়েছে পুত্রস্নেহের আকুলতা, পুত্রের জন্য গৌরব। কিন্তু জল খেয়ে আসতে ব্রাহ্মণ-যুবার দেরি হচ্ছে— জীবন যাবার প্রাক্‌মুহূর্তে কে আর অত সময়ের শৃঙ্খল মেনে চলে!

এদিকে ঘটোৎকচ একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠছেন। একা একাই তিনি সোচ্চারে বলে উঠছেন— ব্রাহ্মণের এই ছেলেটি বড্ড দেরি করে ফেলছে। মায়ের খাবার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। কী যে করি? এবার তিনি ব্রাহ্মণ-পিতাকেই বলে বসলেন— তোমার ছেলেটাকে একবার ডাকো তো। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রেগে বললেন— ব্যাটা! তুই রাক্ষসেরও অধম। রাক্ষসরাও এইভাবে কথা বলে না। তুই কিনা বাপকে বলছিস ছেলেকে মরণের মুখে যাবার জন্য ডাক দিতে। ঘটোৎকচ বললেন— আহা চটছ কেন? ক্ষমা দাও বাপু। আমি রাক্ষস মানুষ, আমার কথাবার্তার ধরনটাই ওইরকম। তা বেশ তো তোমার ছেলের নামটা একটু বলো, আমিই ডেকে নিচ্ছি। ব্রাহ্মণ আবারও রেগে বললেন— এ-কথাটাও আ-মি শু-ন-তে পাচ্ছি না। ঘটোৎকচ বললেন— ঠিক আছে, ঠিক আছে বলতে হবে না তোমাকে। তিনি এবার ব্রাহ্মণের পুত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন— এই যে, বলো তো, তোমার ভাইটার নাম কী? ব্রাহ্মণের প্রথম পুত্র বলল— বেচারা মধ্যম, ওকে আমরা মধ্যম অর্থাৎ মেজ বলেই ডাকি। ঘটোৎকচ বললেন— বাঃ, নামটা বেশ মানিয়েছে তো। তাই আমি ওই নামেই ডাকছি— ওহে মধ্যম, ওরে মেজ! তাড়াতাড়ি এসো, তাড়াতাড়ি এসো এবার।

এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই নাটকের দৃশ্য পরিবর্তন ঘটে গেল এবং নাটকীয়তাও অন্য মোড় নিল। এবারের দৃশ্যে আমরা মধ্যম পাণ্ডব মহাবলী ভীমসেনকে দেখতে পাচ্ছি। তিনি হঠাৎ এই 'মধ্যম' সম্বোধনের বিলম্বিত ডাক শুনে বিচলিত হয়ে নিজে নিজেই বললেন— এ কার কণ্ঠস্বর। এই বনে শত শত পাখি ডাকছে, ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষে পরিপূর্ণ এই বন কারও পক্ষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতিক্রম করাও অত সোজা নয়। এখানে উঁচু গলায় এমন করে কে ডাকছে? গলাটাও অনেকটা অর্জুনের মতো লাগছে, আমার মনে কেমন এক উৎকণ্ঠা হচ্ছে।

একটু দূরে ঘটোৎকচকেও আমরা উৎকণ্ঠিত দেখতে পাচ্ছি। ব্রাহ্মণের পুত্রটি এখনও ফেরেনি। তিনি আবারও জোরে জোরে ডাকতে আরম্ভ করলেন— ওহে মধ্যম! তাড়াতাড়ি এসো। আমার মায়ের খাবার বেলা পেরিয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি করো, ওহে মধ্যম! তাড়াতাড়ি করো। কথাগুলো আবার ভীমের কানে গেল। বারবার এরকম ডাক শুনে তিনি বেশ বিরক্ত হয়ে এগিয়ে আসতে আসতে বললেন— কে রে এটা? এই বনের মধ্যে আমার ব্যায়াম করার দমটাই নষ্ট করে দিচ্ছে। বারবার আমাকে 'মধ্যম' বলে ডাকছে, এটা কে?

এরপর আরও খানিক এগিয়ে আসতেই ঘটোৎকচকে দেখতে পেলেন ভীম। ছেলে এখন এত বড় হয়ে গেছে যে ভীম তাঁকে প্রথম দেখায় চিনতেই পারলেন না, কিন্তু ঘটোৎকচের বলিষ্ঠ চেহারাটা তাঁর বেশ পছন্দ হল। নিজের মনে মনেই তিনি বললেন— সিংহের মতো এর মুখ, সিংহের মতো দাঁত, সুরার মতো উজ্জ্বল দুটি চোখ, পিঙ্গল ভুরু, বাজপাখির মতো নাক, দীর্ঘ বাহু, অথচ গলার স্বর বেশ স্নিগ্ধ এবং গভীর। একে দেখে বোঝা যাচ্ছে— এই বলিষ্ঠ ছেলেটি কোনও বিখ্যাত বীরের ঔরসে রাক্ষসীর গর্ভে জন্মেছে— সুব্যক্তং রাক্ষসীজো বিপুলবলযুতো লোকবীরস্য পুত্রঃ।

পণ্ডিতজনেরাও স্বীকার করবেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এবং অতি গভীর অসবর্ণ অথবা জাতি-কুল-হীন বিপরীত স্ত্রী-পুরুষের মিলনজাত সন্তানদের মধ্যেও দেখেছি যে, চেহারার একটা ছাপ পড়ে। ঘটোৎকচের চেহারায় যেমন ক্ষত্রিয়-বীরের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, তেমনই তাঁর হনু, চোখ, ভুরু এবং চুলের মধ্যে বিজাতীয় ছাপ পড়েছে। হ্যাঁ, তাতে করে এটা বোঝা যায় যে, এই সন্তান সাংস্কারিক জাতি-বর্ণ-সম্ভূত নয়, কিন্তু ভীম যে তাঁকে একেবারে লোকবীর ক্ষত্রিয়ের ঔরসে রাক্ষসীর গর্ভজাত ভেবে নিচ্ছেন, এটা নাট্যকার ভাসের ভাবনা। ঘটোৎকচের প্রতি ভীমের অযথা স্নেহ পূর্বাহ্নেই সূচিত করে দেওয়াটা হয়তো ভাসের উদ্দেশ্য এখানে।

ঘটোৎকচ তখনও দেখেননি ভীমকে, তিনি আরও জোরে চেঁচিয়ে 'মধ্যম' 'মধ্যম' বলে ডাকতে আরম্ভ করলেন। ভীম তাঁর দৃষ্টিপথে এসে গেছেন ততক্ষণ। তিনি ঘটোৎকচের দিকে তাকিয়ে বললেন— আরে চ্যাঁচাচ্ছিস কেন, এই তো আমি এসে গেছি। ঘটোৎকচ দেখল— এটা ব্রাহ্মণের সেই দ্বিতীয় ছেলেটি নয়। কিন্তু ভীমের চেহারাটা দেখে তাঁরও বেশ ভাল লাগল এবং সম্ভ্রমও জাগল। ভীমের চেহারা দেখে ভগবান বিষ্ণু বলে মনে হচ্ছে তাঁর, একই সঙ্গে যে পরমাত্মীয়ও মনে হচ্ছে। পরম আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পারছেন না, অথচ একের প্রতি অপরের স্নেহ এবং অন্যতরের প্রতি অপরের শ্রদ্ধা, এমনকী পরবর্তীকালে তাঁদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি মারামারি— এগুলি এক ধরনের নাটকীয় কৌতূহল তৈরি করে এবং ভাস সেটাকে সযত্নে লালিত করেছেন— কেননা পাঠক তাঁদের পিতা-পুত্র হিসেবে জানে। যাই হোক— ঘটোৎকচ ব্রাহ্মণের পুত্রের বদলে তাঁকেই মেনে নিয়ে বলল— ওহে মধ্যম! তোমাকেই আমি ডাকছি। ভীম সঙ্গে সঙ্গে বললেন— হ্যাঁ, আমিও তো সেইজন্যই এসেছি।

ঘটোৎকচ মধ্যম বলে ডাকছিলেন একজনকে, এলেন আরেকজন। সেজন্য যেন একটু কৌতূহলী হয়েই বললেন— তুমিও কি মধ্যম? আসলে তিন ভাইয়ের মধ্যে দ্বিতীয়কে মধ্যম বা মেজো বলে ডাকাটা যেমন বেশ মজা লেগেছে তাঁর, তেমনই মধ্যম পুত্রটির ওপরে পিতামাতার যে আপেক্ষিক স্নেহহীনতা— যা অধিকাংশ সংসারে সেদিনও এক বৈশিষ্ট্য ছিল— সেই স্নেহহীনতার নিরিখে ভীমও সেইরকম জনক-জননীর অবহেলার পাত্র নাকি— সেটা যাচাই করার জন্যই যেন ঘটোৎকচের এই প্রশ্ন— তুমিও কি মধ্যম। ভীম এবার হেঁয়ালি করে নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করার সুযোগ পেলেন। বললেন— যাঁদের বধ করা সম্ভব নয়, তাঁদেরও আমি মধ্যম। যাঁরা পৃথিবীতে বলদর্পিত শক্তিমান, তাঁদেরও আমি মধ্যম, পৃথিবীতে অন্যান্য রাজারাজড়াদের ঝগড়াঝাঁটিতে আমি মধ্যম, অর্থাৎ নির্বিকার, আবার ভাইদের মধ্যেও আমি মধ্যম। আরও শোনো, পঞ্চভূতের মধ্যেও আমি মধ্যম (ভীম যেহেতু বায়ুর পুত্র), রাজকুলেও আমি মধ্যম, পৃথিবীতে সকলেই আমাকে মধ্যম বলে ডাকে, ভয়ের ব্যাপারেও আমি মধ্যম, অর্থাৎ নির্বিকার, আর মধ্যম আমি সমস্ত কাজে (কেননা তাঁকে দাদা যুধিষ্ঠিরের কথা শুনতে হয়)।

ভীমসেনের মুখে এত প্রত্যয়ের সঙ্গে, এত দর্পের সঙ্গে বারবার এই মধ্যম কথাটা শুনে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মনে আশা জাগল। ভীমকে দেখে ভীমের কথা শুনে তাঁকে যমরাজের দর্পের মতো তাঁর বিপদ-মুক্তির জন্য মধ্যম পাণ্ডব উপস্থিত হয়েছেন বলে মনে হল তাঁর। ইতিমধ্যে সেই ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় পুত্র যে জলপান করার জন্য জলাশয়ে গিয়েছিল, সে নিজের পরলোক চিন্তায় যথাসম্ভব বৈদিক বিধিতে নিজের পারলৌকিক শ্রাদ্ধ করে এল জলাঞ্জলি দিয়ে এবং সে ঘটোৎকচের সামনে ঠিক সেই সময়ে উপস্থিত হল, যখন নিরুপায় বিপন্ন ব্রাহ্মণ ভীমের কাছে জানালেন— আমাদের বাঁচান আপনি, এই ব্রাহ্মণকুলকে সপরিবারে বাঁচান।

বিপদের সময় ব্রাহ্মণ-কুলকে বাঁচানো চিরকালীন ক্ষত্রিয়ধর্ম। এরকম কত করেছেন ভীম। অতএব দ্বিধাহীনভাবে বললেন— কোনও ভয় নেই আপনার। আমি মধ্যম, আপনি বলুন আপনার কীসের ভয়? ব্রাহ্মণ বললেন— আগে মহারাজ যুধিষ্ঠির যেখানে রাজত্ব করতেন সেই কুরুজাঙ্গল-ভূমিতে আমি যূপগ্রামে থাকি। আমার নাম কেশবদাস, মাঠরগোত্রের বামুন। উত্তর দিকে উদ্যামক গ্রামে আমার মামার ছেলের উপনয়নে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফেরার পথে এই বিপত্তি। এই রাক্ষসটা আমাদের সবাইকে মারার তাল করেছে। ভীম বললেন— ও, এই ব্যাপার! আপনাদের যাবার পথে ঝামেলা করছে। আচ্ছা আমি দেখছি।

ভীম প্রথমে একটু বুঝিয়ে বললেন। বললেন— বামুন মানুষ; ওঁকে শান্তিতে ফিরতে দাও। ছেড়ে দাও এঁদের। ঘটোৎকচ গোঁ ধরে থাকলেন। তিনি মোটেই ছাড়বেন না। ভীম একটু অবাকই হলেন, তাঁর সামনে এমন অবাধ্যতা করা সইছে না তাঁর। অথচ ঘটোৎকচ যে খুব খারাপ ব্যবহার করছেন তাও নয়। শুধু তাঁর এক কথা— ছাড়ব না। ভীম ভাবলেন— এটা কার ছেলে রে। এই রাক্ষস-কিশোরের মধ্যে তিনি তাঁর ভাইদের ভাব দেখতে পাচ্ছেন, কৈশোর্যের কারণে একটু স্নেহও হচ্ছে— কুমার অভিমন্যুর কথা তাঁর বার বার মনে হচ্ছে। সন্দেহ এবং কৌতূহল আরও জোরদার হল, যখন ঘটোৎকচ বললেন— আমার বাপ এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেও আমি এদের ছাড়ব না। কেননা এদের একটাকে আমি ধরেছি মায়ের আদেশে— ন মুচ্যতে তথা হ্যেষ গৃহীতো মাতুরাজ্ঞয়া।

ভীম মনে মনে ভাবলেন— ছেলেটার একটা মূল্যবোধ আছে বটে। একটু রাক্ষসোচিত আচরণ করছে, কিন্তু মায়ের আদেশ পালন করার চেষ্টা করছে যে ছেলে, তাকে কী দোষ দেওয়া যায়? কেননা মায়ের চেয়ে বড় দেবতা আর কে আছেন এই পৃথিবীতে? তবে ভীম আর কৌতূহল এড়াতে পারলেন না। বললেন— একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমাকে। ঘটোৎকচ বললেন যা বলার তাড়াতাড়ি বলো। আমার সময় চলে যাচ্ছে। ভীম জিজ্ঞাসা করলেন— তোমার মায়ের নাম কী? ঘটোৎকচ নিঃসংকোচে বললেন— মা হিড়িম্বা রাক্ষসী। আকাশ যেমন পূর্ণচন্দ্রকে স্বামী হিসেবে পেয়েছে, তেমনই ভাগ্যবতী মা আমার পাণ্ডব-কুলের প্রদীপ মহাত্মা ভীমকে স্বামী হিসেবে পেয়েছেন।

ভীম এই কথা শুনে বড় গর্ববোধ করলেন। মনে মনে বললেন— তা হলে এটি হিড়িম্বার ছেলে। তাই এর চেহারা, সাহস এবং শক্তি অনেকটাই এর বাবা-কাকাদের মতোই— রূপং সত্ত্বং বলঞ্চৈব পিতৃভিঃ সদৃশং বহু। কিন্তু প্রজাদের ব্যাপারে এর মনটা নরম নয় কেন, সেটাই আশ্চর্য! এই একটা শ্লোক লিখে ভাস বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, বৈবাহিক ব্যাপারে মহাভারতের উদারতা তাঁরও মজ্জাগত, নইলে ঘটোৎকচের সাহস এবং শক্তির সঙ্গে রূপের কথাটা এভাবে বলতেন না ভাস। কেননা ভীমের পুত্র হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রূপের মধ্যে আর্যেতর রাক্ষসাভাস ছিল। ভাস সেটাকে সম্পূর্ণ মেনে নিয়েই বাবা-কাকাদের সঙ্গে তাঁর তুল্যতা প্রকাশ করেছেন ভীমের মতো পিতার মুখ দিয়ে, দ্বিতীয়ত, ব্রাহ্মণ যুধিষ্ঠিরের পূর্ববসতি কুরুজাঙ্গলের মানুষ, সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে পাণ্ডবদের প্রজা। সেই প্রজার ওপরে ঘটোৎকচের মায়া নেই কেন— এই অনাত্মীয়তাটুকু ভীমকে একটু কষ্ট দিচ্ছে। তিনি ভাবছেন— তাঁর ছেলে হিসেবে জ্যাঠা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যের প্রজাকে সে এইভাবে ধরবে কেন?

ভীম আরও একবার ব্রাহ্মণদের ছেলেটাকে ছেড়ে দিতে বললেন। ঘটোৎকচ রাজি না হলে ভীম ব্রাহ্মণকে বললেন— আপনি ছেলে নিয়ে বাড়ি যান; আমি ক্ষত্রিয়ের বংশে জন্মেছি, ব্রাহ্মণের শরীরের সঙ্গে আমার শরীর বিনিময় করব। ভীম ঘটোৎকচের সঙ্গে চললেন বটে, কিন্তু এতদিন পরে ছেলেকে দেখছেন, তার শক্তি-তেজ তাঁর মতোই কিনা একটু বুঝে নেবার চেষ্টা করলেন। বললেন— দ্যাখো হে ছোকরা! এত দম্ভ, এত সাহস যারা দেখায়, তাদের আমি অত তোয়াক্কা করি না। তোমার ক্ষমতা থাকে তো জোর করে আমাকে নিয়ে যাও। এর উত্তরে ঘটোৎকচ বললেন— আমি কে জানো। ভীম বললেন— জানি, আমার ছেলে বলে জানি। ঘটোৎকচ বললেন— কেমন কথা এটা? আমি আবার তোমার ছেলে হলাম কী করে? ভীম বললেন— আরে চটছ কেন ছোকরা? আমরা ক্ষত্রিয়রা প্রজামাত্রেই পুত্র সম্বোধন করি। ঘটোৎকচ বললেন— তাই নাকি? ভিতু লোকের অস্ত্র ধরেছ তুমি। ভীম বললেন— দ্যাখো হে ছোকরা! ভয় কাকে বলে আমি জানি না। ওটা তোমার কাছে আমি শিখতে চাই। তুমি শিখিয়ে দাও ওটা। ঘটোৎকচ বললেন— ঠিক আছে। আমি শিখিয়ে দিচ্ছি, তুমি অস্ত্রধারণ করো। ভীম সগর্বে উত্তর দিলেন— ধারণ করা হয়ে গেছে। এই যে সোনার থামের মতো দুটো হাত দেখছ আমার, এ-দুটোই আমার অস্ত্র।

ঘটোৎকচ এবার একটু থমকে গিয়ে বললেন— এসব কথা শুধু আমার বাবা ভীমসেনকে মানায়। ভীম আনন্দে গর্বসহকারে বললেন— এই ভীম আবার কে, সে কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, কার্তিক, ইন্দ্র— কার মতো সে। ঘটোৎকচ বললেন— এঁদের সবার মতো। এর উত্তরে ভীম সে-কথা নস্যাৎ করে দিয়ে বললেন— মিথ্যে কথা— অমনই ঘটোৎকচের সঙ্গে মারামারি লেগে গেল ভীমের। গাছ, পাথর, মল্লযুদ্ধ, মায়াযুদ্ধ অনেকরকম যুদ্ধ হল ভীমের সঙ্গে, ঘটোৎকচ পুরোপুরি তাঁকে কাবু করতে না পেরে শেষে বাচ্চা ছেলের মতো বললেন— তুমি কিন্তু আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ যে, এই ব্রাহ্মণ-পুত্রের বদলে তুমি যাবে আমার সঙ্গে। ভীম বললেন— সে কথা আমার বেশ মনে আছে, বেশ তো চলো। অতি অদ্ভুত ব্যাপার দেখে ব্রাহ্মণও তাঁর পুত্র-পরিবার নিয়ে ভীম এবং ঘটোৎকচের পিছন পিছন চলতে লাগলেন।

ঘটোৎকচ ভীমকে নিয়ে মায়ের কাছে এল। দুয়োরের বাইরে ভীমকে দাঁড় করিয়ে রেখে ঘটোৎকচ বলল— দাঁড়াও, তোমার উপস্থিতি মায়ের কাছে জানাই আমি। ঘটোৎকচ এবার মায়ের কাছে সব জানিয়ে বললেন— মা! তোমার উৎকৃষ্ট ভোজনের জন্য বহু দিনের আকাঙ্ক্ষিত একটি মানুষ এনেছি— চিরাভিলষিতো ভবত্যা আহারার্থম্ আনীতো মানুষঃ। ‘চিরাভিলষিতো’ এই শব্দটার মধ্যে নাট্যকার ভাস যেমন স্বামী ভীমের জন্য রাক্ষসী হিড়িম্বার চিরকালীন এক আকাঙ্ক্ষার হৃদয় পুষ্ট করেছেন, তেমনই ‘আহার’ শব্দটা ব্যবহার করেও ভীম যে তাঁর শারীরিক-বৃত্তির প্রশান্তি সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। সেই কবে ভীমকে ছেড়ে এসেছেন হিড়িম্বা, এতদিন উপবাসে থাকার পর একবার তো চিরাভিলষিত এই আহারের প্রয়োজন আছে হিড়িম্বার। অতএব ভীম হিড়িম্বার দৈনন্দিন মাংস-ভাতের আহার নন, বহুকালের অভীষ্ট আহার।

হিড়িম্বা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন— কীরকম মানুষ এনেছ, বাছা! ঘটোৎকচ বললেন— চেহারাতে এ একটা মানুষ বটে, তবে শক্তি-ক্ষমতায় নয়। হিড়িম্বা নানা প্রশ্ন করেছেন এরপর— ব্রাহ্মণ নাকি, বৃদ্ধ নাকি, শিশু নাকি— তার মানে আর্য স্বামীর সহবাস-পরিচয়ে এই ধরনের মানুষ ধরে আনলে তাঁর এখন চলত না। হিড়িম্বা এবার বললেন— তা হলে তো দেখতে হয়। বাইরে এসে এবার ভীমকে দেখতে পেলেন হিড়িম্বা। বিস্ময়ে, আনন্দে এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে ভীমকে দেখতে পেয়ে হিড়িম্বার রমণী-হৃদয় ভালবাসায় পরিপূর্ণ। উপবাস-ভঙ্গের জন্য পারণ বা পূরণ হিসেবে এমন মধুর ভোজ্য বস্তু তিনি আশা করেননি। বাঁধ-ভাঙা আনন্দে ছেলেকে বললেন হিড়িম্বা— এ তুই কাকে ধরে এনেছিস, পাগল! ইনি তো আমার দেবতা রে! ইনি আমারও দেবতা, তোরও দেবতা।

তখনও ভীম হিড়িম্বার দিকে তাকাননি। দুয়ার-বাহিরে ইতস্তত পায়চারী করছেন। ঘটোৎকচ বাইরে দাঁড়ানো ওই মানুষটির ওপর অন্তরে শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠলেও হঠাৎ করে মা তাঁকে দেবতা সম্বোধন করায় একটু অবাকই হল। মায়ের কাছে তাঁর প্রশ্ন; হঠাৎ দেবতা বলে ভাবব কেন লোকটাকে? এবার সমস্ত কৌতূহলের নিরসন করে হিড়িম্বা ভীমের কাছে এসে বললেন— আর্যপুত্র তুমি! জয় হোক তোমার! স্বামীকে আর্যপুত্র বলে সম্বোধন করাটা সেকালের সম্বোধন-রীতি, ঠিক যেমনটি ষাট-সত্তর বছর আগে ছিল একটু অন্যভাবে এই বাংলার মাটিতেও। হিড়িম্বাকে এতদিন পরে দেখে ভীম অপার আনন্দ পেলেন। পাণ্ডবকুলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথমা বধূকে দেবী সম্বোধন করে ভীম বললেন— রাজ্য হারিয়ে কত কাল আমরা এই গহন বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কত কষ্ট পাচ্ছি এই বনের মধ্যে। আজ তুমি অনন্ত করুণায় আমাদের সমস্ত দুঃখ ঘুচিয়ে দিলে।

বস্তুত ভীম বুঝিয়ে দিলেন— এতকাল পরে হিড়িম্বার দেখা পেয়ে তিনি কতটা অভিভূত, কতটা মুগ্ধ। কিন্তু এখন বোধহয় তিনি বুঝতে পারছেন যে, ভীমের সঙ্গে এইভাবে দেখা হওয়ার ভবিতব্যে বুঝি হিড়িম্বার পূর্বপরিকল্পনা ছিল, যে পরিকল্পনার কথা তিনি ছেলে ঘটোৎকচকেও বলেননি। এটা বুঝে নেওয়া ভাল যে, প্রথম-দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দের নাট্যকার হিসেবে ভাস তাঁর নায়ক ভীম এবং নায়িকা হিড়িম্বার মুখে এমন ভাষা ব্যবহার করবেন না, যা তাঁর সময়কালীন পরিশীলনের বিরোধী। ভীমকে দেখার পর ঈপ্সিত মিলনের আনন্দে হিড়িম্বার পক্ষেও যেমন 'আই লাভ ইউ' বলে জড়িয়ে ধরা সম্ভব ছিল না, তেমনই ভীমের পক্ষেও সেটা সমান বিরোধী। ফলত প্রথম দেখায় হিড়িম্বার সবিস্ময় মুখে 'আর্যপুত্র'-সম্বোধন যতটা মানানসই, তার বুঝি বেশি মানানসই ভীমের মুখে তাঁর দেবী সম্বোধন— কা পুনরিয়ম্। অয়ে দেবী হিড়িম্বা— এই সম্বোধন মহাভারতের সেই অঙ্গীকার বজায় রেখেছে, কেননা কুন্তী তাঁকে সপুত্রা হবার পরেই প্রথমা কুলবধূর সম্মান দিয়েছিলেন।

নাটকের শেষ ব্যঞ্জনাটা না বোঝালে অধর্ম হবে। নাটকের ভাষা তো সংক্ষিপ্ত হয় কিন্তু ব্যঞ্জনা হয় পাহাড়-প্রমাণ। অনেক কষ্টের মধ্যে হিড়িম্বার দেখা পাওয়ায় তাঁদের বনবাস-দুঃখ মোচন হয়ে গেছে বলে ভীম নিজেই জানিয়েছেন হিড়িম্বাকে। কিন্তু কীভাবে এই অসম্ভব সম্ভব হল, সেটা ভীম সকৌতূহলে একবার জিজ্ঞাসা করলেন হিড়িম্বাকে। নাট্যকার হিড়িম্বার মুখেও কোনও বেশি কথা বসাননি, কিন্তু হিড়িম্বার হাবে এবং ভাবে বসিয়েছেন রমণীর মধুরতা, বিবাহিতা বধূর চটুলতা। হিড়িম্বা ভীমের গা ঘেঁষে এসে কানে-কানে জানিয়েছেন— আর্যপুত্র! এইভাবে। ভীম সানন্দ মুগ্ধতায় বলেছেন— জাতিতেই তুমি শুধু রাক্ষসী রয়ে গেলে, কিন্তু আচরণে নয়— জাত্যা রাক্ষসী ন সমুদাচারেণ।

ভীম-হিড়িম্বার এই সস্নেহ এবং মুগ্ধ সংলাপের মধ্যেই এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হিড়িম্বা জেনেছিলেন যে, এই বনে পাণ্ডবরা আছেন এবং আজ সম্পূর্ণ আশ্রমের মধ্যে পাণ্ডব-ভাইরা এবং স্বয়ং দ্রৌপদী কেউ যখন বাড়িতে নেই, অথচ ভীম একা, তখনই হিড়িম্বা নিভৃতে ভীমের সঙ্গে একবার চোখের দেখা সম্পূর্ণ করার জন্য ছেলেকে দিয়ে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ঘটিয়েছেন। তিনি জানতেন— ব্রাহ্মণের এই বিপদে ভীম কিছুতেই দূরে থাকবেন না। তিনি আসবেনই তাঁকে বিপদ্মুক্ত করতে। এই অভীষ্টতা ছিল বলেই ভীমকে ধরে আনার পর হিড়িম্বা নিশ্চিন্ত হবার জন্য প্রশ্ন করেছিলেন— যাকে ধরে এনেছ, সে ব্রাহ্মণ নাকি, শিশু নাকি? তারপর যখন পরিকল্পনার সুষ্ঠু সমাধান ঘটেছে, তখনও নিশ্চিন্তে তাঁর আর্যপুত্রের সামনে এসেছেন এবং এই মুহূর্তে ছেলেকে তিনি বলছেন— পাগল ছেলে, পেন্নাম কর বাবাকে, নাটকের শেষে ভীম তাঁর স্ত্রী হিড়িম্বাকে নিয়ে, ঘটোৎকচকে নিয়ে তাঁদের আশ্রমের প্রবেশ-পথ পর্যন্ত অনুগমন করেছেন, তারপর দ্রৌপদীহীন, পাণ্ডবান্তরহীন সেই আশ্রমের মধ্যে ভীম শেষ পর্যন্ত প্রবেশ করে কতিপয় দিন স্থায়ী হয়েছিলেন কিনা, সে খবর নাট্যকার দেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্রৌপদী

ইংরেজি এই শব্দটার কোনও বাংলা অনুবাদ করা যায় না, অথচ এই ঘটনাটাকে 'ইন্‌ট্রিগিং' না বলে অন্য কোনও শব্দে প্রকাশ করা হলে ঘটনার মেজাজটাকেই অস্বীকার করা হয়। ১৯৭০ সালে যখন নিউ ইয়র্কের রাস্তায় সে-দেশের নারীকুল চরমপন্থী তীব্রতায় 'ফ্রিডম ট্র্যাশ ক্যান'-গুলিতে তাঁদের অন্তর্বাস, সাজার জিনিস, সাবান, চোখের কৃত্রিম নিমেষগুলিও ছুড়ে ফেলে দিয়ে পুরুষদের যৌনতার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেন, সেদিন সেই আন্দোলনের ঢেউ কিন্তু ভারতবর্ষেরও এখানে-ওখানে আছড়ে পড়েছিল। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের দেওয়া একটা 'পোস্টার' পড়েছিল— আজ কি নারী সীতা নেহি দ্রৌপদী হ্যায়। এই কথাটাই আমার কাছে খুব 'ইন্‌ট্রিগিং'। পোস্টার সাঁটানোর আগে দিল্লিবাসিনী স্ত্রীস্বাধীনতা-কামিনীরা কি একবারও ভেবে দেখেছিলেন, তাঁরা কী লিখেছেন! অথবা যথেষ্টই ভেবেছিলেন— অন্তত দ্রৌপদী-চরিত্রের একটা দিক তাঁদের কাছে উদ্ভাসিত, যা সভায় সভায় আজকের প্রগতিবাদিনীদের আমি বোঝাতে পারি না। দিল্লিবাসিনীরা নিশ্চয়ই সেই দিকটা নিয়ে বলতে চাননি, যা আমিও বলতে চাই না। অর্থাৎ কিনা সীতা রামচন্দ্রের প্রতি একনিষ্ঠা এক সাধ্বীবধূ, তিনি রাম ছাড়া অন্য কোনও পুরুষের কথা মনে মনেও ভাবতে পারেন না, পাঁচ-পাঁচটা স্বামীর সাহচর্য তো দূরের কথা— যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে। না, প্রগতিবাদিনীরা নিশ্চয়ই এরকম ভাবেননি যে, আমরা সীতার মতো এক স্বামীতে সন্তুষ্ট নই, আমরা দ্রৌপদীর মতো পাঁচটা স্বামী চাই। তাঁদের ভাবনার মধ্যে নিশ্চয়ই দ্রৌপদীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, প্রায় সময়েই তাঁর নির্ভীক আচরণ এবং প্রয়োজনে স্বামীদের বিরুদ্ধে কথা বলার যে নিদারুণ অভ্যাস— এগুলোই কাজ করেছে। তবে হ্যাঁ, এ-কথাও প্রগতিবাদিনীরা ভেবে থাকতে পারেন যে, সীতার মতো এক স্বামীর ভবিতব্যতার মধ্যেই বা থাকব কেন, স্বামী যদি অভিপ্রেত না হন, তাঁর চরিত্রে এবং ব্যবহারে যদি স্ত্রীর প্রতি সম্মানবোধ কাজ না করে, তা হলে নতুন আলোয় নতুন সিন্ধুপারেই বা গমনাগমন করব না কেন! অন্তত দ্রৌপদীকে তো সেদিক থেকে মেনে নেওয়াই যায়।

আমরা এই অহেতুক অথচ সামান্য সংবাদটুকু এইজন্য নিবেদন করলাম যে, আজকের দিনের অনেক সভাসমিতিতে দ্রৌপদীকেও ভয়ংকরভাবে পুরুষশাসনের শিকার হিসেবে চিহ্নিত হতে দেখি। স্বামীসহ অন্য পুরুষদের কারণেই তাঁর জীবনে করুণ পরিণতি নেমে এসেছিল— এই সিদ্ধান্তটা দ্রৌপদীর জীবনে পঞ্চস্বামীর ভবিতব্যতা এবং কৌরবসভায় তাঁর প্রতি চরম অভব্য আচরণের নিরিখেই বলা যায়, এমনটা প্রায়ই আমি শুনে থাকি। আমি তাই উপরি-উক্ত সংবাদের মাধ্যমে এ-কথাটা জানালাম যে, দ্রৌপদীর ওপর এহেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৌরুষেয় অত্যাচারের পরেও দিল্লির প্রগতিবাদিনীরা দ্রৌপদী হবার বাসনা প্রকট করলেন কেন? তা হলে কি দ্রৌপদীর মধ্যে এমন কিছু আছে, যা অনুকরণযোগ্য কাম্য হয়ে উঠতে পারে প্রগতিশীলতার পরিসরেও, অথবা পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে একটি লোকপরম্পরা-প্রাপ্ত কাহিনি নিবেদন করি।

ঘটনাস্থল দুর্যোধনের সাতমহলা বাড়ির অন্দরমহল। এখানে দুর্যোধনের স্ত্রী ভানুমতী আছেন। কোনও কারণে আজ সেখানে পঞ্চস্বামিগর্বিতা দ্রৌপদীর আগমন ঘটেছে। ভানুমতী তাঁকে নেমন্তন্ন করেছিলেন, নাকি দ্রৌপদী সেখানে নিজেই এসেছিলেন, সে খবর আমরা রাখি না। কিন্তু ভানুমতী যেহেতু দুর্যোধনের স্ত্রী এবং দ্রৌপদী যেহেতু পাঁচ ভাইয়ের এক বউ, তাই তাঁদের কথাবার্তা সোজা খাতে বইছিল না। বিশেষত এই দুই রমণীর স্বামীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সহজ ছিল না, তাই এঁদের কথাবার্তার মধ্যেও কুটিল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বিনা কারণেই এসে পড়ছিল। দুর্যোধনের গরবে গরবিনী ভানুমতী শেষ পর্যন্ত চিবিয়ে চিবিয়ে বলেই ফেললেন কথাটা। বললেন— তোমার তো আবার একটা নয়, দুটো নয়, পাঁচ-পাঁচটা স্বামী। এ বিদ্রূপ দ্রৌপদীর গা-সওয়া। কৃষ্ণের পরম-প্রিয়া পত্নী সত্যভামাও মহাভারতের বনপর্বে একই প্রশ্ন করেছিলেন। তবে তাঁর বলার ভঙ্গি ছিল ভাল আর জিজ্ঞাসার সঙ্গে ছিল বিনয়। সত্যভামা বলেছিলেন— পাঁচ-পাঁচটা পাণ্ডব স্বামীকে তুমি কেমন তুষ্ট কর দিদি? ব্রত, স্নান, মন্ত্র, নাকি ওষুধ করেছ দিদি! বল না, কী করলে আমার ওই একটা স্বামীই কৃষ্ণ আমার বশে থাকে! কী বুদ্ধিতেই বা তুমি পাঁচ স্বামীকে সামাল দাও— কেন বৃত্তেন দ্রৌপদী পাণ্ডবান্ অধিতিষ্ঠসি?

হ্যাঁ, সত্যভামার প্রশ্নে আবদার ছিল, জিজ্ঞাসার মধ্যে মিনতি ছিল, দ্রৌপদীও তাই স্বামী হাতে রাখার কেতা-কানুন সত্যভামাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন একেবারে বুড়ি মাসিমার মতো। কিন্তু এই ভানুমতীর বলার ঢঙ তো আলাদা, ভানুমতীর কথার মধ্যে যেন মেয়েমানুষের লাম্পট্যের ইঙ্গিত আছে। দ্রৌপদী ছাড়বেন কেন? বিশেষত তিনি বিদগ্ধা মহিলা, সংসার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দগ্ধাও বটে। সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ দ্রৌপদীর চলে না, মুখ বুঝে সহ্য করার লোকও তিনি নন। সঙ্গে সঙ্গে দ্রৌপদী জবাব দিলেন— আমার শ্বশুরকুলে স্বামীর সংখ্যা চিরকালই একটু বেশি ভানুমতী— পতিবৃদ্ধিঃ কুলে মম।

সরলা ভানুমতী প্রথমে বুঝতেই পারেননি কোপটা কোথায় গিয়ে পড়ল। তারপর যখন দ্রৌপদীর কথাটা বেশ ভেবে দেখলেন, তখন বুঝলেন তাঁর নিজের শ্বশুর, দিদিশাশুড়ি— সবাই জড়িয়ে গেছেন দ্রৌপদীর কথার পাকে। দ্রৌপদীর শাশুড়ি হলেন কুন্তী। পাণ্ডু ছাড়াও আরও পাঁচজন তাঁর অপত্যকারক স্বামী ছিলেন। না হয় ধরেই নিলাম কর্ণ-পিতা সূর্যের কথা দ্রৌপদী জানতেন না। আবার কুন্তীর দুই শাশুড়ি হলেন অম্বিকা আর অম্বালিকা। বিচিত্রবীর্য ছাড়াও এঁদের পুত্রদাতা স্বামী স্বয়ং মহর্ষি ব্যাসদেব। এই সুবাদে ভানুমতীর শ্বশুর ধৃতরাষ্ট্র অথবা তাঁর শাশুড়ি মা অম্বিকাও তো ফেঁসে গেলেন। আবার অম্বিকা-অম্বালিকার শাশুড়ি যে সত্যবতী, তাঁর শান্তনু ছাড়াও তো আরেক স্বামী ছিলেন— পরাশর মুনি। এবার দ্রৌপদীর কথার গুরুত্ব বুঝে আর কথা বাড়াননি দুর্যোধন সোহাগী ভানুমতী।

জনান্তিকে বলে রাখি, ভানুমতী-দ্রৌপদীর এই সংলাপের কথা মহাভারতে নেই। এমনকী দুর্যোধনের স্ত্রীর নাম ভানুমতী কিনা তা নিয়েও সন্দেহ আছে। পণ্ডিতেরা বলেন— বেণীসংহার নাটকের লেখক ভট্টনারায়ণই দুর্যোধন-বধূর নামকরণ করেন ভানুমতী। বস্তুত দুর্যোধনের স্ত্রীর নাম ভানুমতী না মাধবী, তাতে কিছু আসে যায় না। এমনকী ওপরের যে সংলাপটি পণ্ডিত অনন্তকাল ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, সেটিও তাঁর মতে লোকপরম্পরায় প্রচলিত শ্লোকের একাংশ। খুব প্রামাণিক না হলেও এই শ্লোকটিকে আমরা অসীম গুরুত্ব দিই, এবং তা দিই এই কারণে যে, দ্রৌপদীর চরিত্র বুঝতে এমন শ্লোক বুঝি আর দ্বিতীয় নেই।

যাঁরা আর্থ-সামাজিক কুতূহলে সেকালের তাবৎ নারীকুলের প্রতি অন্যায় আর অবিচারের জিগির তোলেন, দ্রৌপদীর চরিত্র তাঁদের কিছু হতাশ করবে। স্বামীদের ভুল বা ভালমানুষির জন্য দ্রৌপদীর জীবনে দুঃখ-কষ্ট এবং উপদ্রব— কোনওটাই কম হয়নি। তবু কিন্তু কোনও সতীলক্ষ্মীর বিপন্নতা দ্রৌপদীর ছিল না। সতীলক্ষ্মীর মতো স্বামীদের সব কথা তিনি মুখ বুজে সহ্যও করেননি। বরঞ্চ আধুনিক অনেক গোবেচারা স্বামীদের মতোই দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীকে মাঝে মাঝেই তাঁর মুখ-ঝামটা খেয়ে গোবেচারা হয়ে যেতে হয়েছে। এবং জনান্তিকে আবারও বলি— দ্রৌপদীর পাঁচ-পাঁচটি স্বামীই দ্রৌপদীকে রীতিমতো ভয় পেয়ে চলতেন। ভয় পেতেন অন্যেরাও। তবে সে-কথা পরে।

দ্রৌপদী কালো মেয়ে। কালো বলেই তাঁর নাম কৃষ্ণা— কৃষ্ণেত্যেবাব্রুবন্ কৃষ্ণাং কৃষ্ণাভূৎ সা হি বর্ণতঃ। মহাভারতীয় রঙ্গভূমিতে যে ক'টি কালো মানুষ মহাভারত মাতিয়ে রেখেছেন তার মধ্যে তিনজনই পুরুষ, আর দু'জন স্ত্রীলোক। এই নতুন কথাটা প্রথম শুনি শ্রদ্ধেয়া গৌরী ধর্মপালের কাছে। প্রথম কালো মহামতি ব্যাসদেব, দ্বিতীয় কালো কৃষ্ণ ঠাকুর, তৃতীয় হলেন অর্জুন। আর মেয়েদের মধ্যে ব্যাস-জননী ধীবরকন্যা সত্যবতী নিকষ কালো। তাঁর নামও ছিল কালী। কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রাকেও কালী বলে ডাকা হত, কিন্তু তার গায়ের রং কালো ছিল না। কাজেই গায়ের রং এবং নামেও মহাভারতের দ্বিতীয়া যে কালো স্ত্রীলোকটি তার নাম দ্রৌপদী। তবে গায়ের রং কালো হলে কী হবে, সেকালে দ্রৌপদীর মতো সুন্দরী সারা ভারতবর্ষ খুঁজলেও মিলত না। অবশ্য দ্রৌপদীর রূপ যে শুধুমাত্র শরীরকেন্দ্রিক ছিল না, তাঁর রূপ যে দেহের সীমা অতিক্রম করেছিল, সে-কথা বোঝা যাবে স্বয়ং ব্যাসের বর্ণনায়। মহাভারতকার দ্রৌপদীর শারীরিক রূপ বর্ণনায় বেশি শব্দ খরচ করেননি। 'সুকেশী সুস্তনী শ্যামা পীনশ্রোণীপয়োধরা'— দ্রৌপদীর এই বর্ণনা মহাকাব্যের সুন্দরীদের তুলনায় অল্পমাত্র। লক্ষণীয় বিষয় হল— নায়িকার রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রে মহাকাব্যকারেরা যেখানে অনুপম শব্দরাশির বন্যা বইয়ে দেন, সেখানে দ্রৌপদীর রূপবর্ণনায় মহাভারতকার যেন একেবারে আধুনিক মানসিকতায় গ্ল্যামারের দিকে মন দিয়েছেন। দ্রৌপদী যে মোটেই বেঁটে ছিলেন না, আবার ঢ্যাঙা লম্বাও ছিলেন না— নাতিহ্রস্বা ন মহতী— সেকেলে কবির কাছে এই বর্ণনা, এই বাস্তব দৃষ্টিটুকু অভাবনীয়। তাও একবার নয়, দু'বার এই কথা ব্যাসকে লিখতে হয়েছে, যদিও অন্যত্র হলে নারীদেহের প্রত্যঙ্গ বর্ণনার ঝড় উঠে যেত তাঁরই হাতে। ব্যাস জানতেন দ্রৌপদীর রূপ তাঁর কুঞ্চিত কেশরাশি কিংবা স্তন-জঘনে নয়, তাঁর রূপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই দৃপ্ত ভঙ্গিতে— বিভ্রাজমানা বপুষা— সেই বিদগ্ধতায়, যার সঙ্গে তুলনা চলে শুধু সমুজ্জ্বল বৈদুর্যমণির— বৈদুর্যমণিসন্নিভা। যেখানেই তিনি থাকেন, সেখানেই আলো ঠিকরে পড়ে, প্রতি কথায়, প্রতি কাজে। আর তাঁর মধ্যে আছে এক দূরত্ব, যে দূরত্ব তাঁর জন্ম লগ্নেই বিধিপ্রদত্ত, কেননা যজ্ঞীয় বেদীর আগুন থেকে তাঁর জন্ম। তাঁর মানে এই নয় যে, একটি যজ্ঞবেদী থেকে কৃষ্ণার জন্ম হয়েছিল। এমনটি হতেই পারে না। তার কারণ দ্রুপদ রাজার আয়োজিত দ্রোণ-হন্তার জন্মযজ্ঞে পুরোহিত যখন আগুনে ঘি দিচ্ছিলেন তখনই তিনি টের পেয়েছিলেন যে ওই যজ্ঞের আগুন থেকে শুধুমাত্র একটি কুমার জন্মাবে না, উপরন্তু একটি কুমারীও জন্মাবে। দ্রুপদ রাজার স্ত্রীকে তিনি বলেছিলেন— রাজ্ঞি পৃষতি মিথুনং ত্বামুপস্থিতম্— তুমি পুত্র এবং কন্যা দুই-ই পাবে রানি। পুরোহিত যাজ যজ্ঞে আহুতি দেওয়া মাত্রই সেই আগুন থেকে জন্মালেন কুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন— উত্তস্থৌ পাবকাৎ তস্মাৎ। এর পরে ধৃষ্টদ্যুম্নের একটু বর্ণনা দিয়েই ব্যাস বললেন— কুমারী চাপি পাঞ্চালী বেদীমধ্যাৎ সমুত্থিতা— সেই বেদী থেকেই কুমারী পাঞ্চালীও উদ্ভূত হলেন। ঠিক এখানে আগুন কথাটা সোজাসুজি নেই বটে তবে যজ্ঞীয় বেদীর মধ্যে আগুন ছাড়া আর কী থাকে? বিশেষ পূর্বাহ্নে যে আগুন থেকে কুমার জন্মেছেন। ব্যাস অবশ্য পরে পরিষ্কার লিখেছেন যে দ্রুপদের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে পুত্র এবং কন্যার মিথুন জন্মাল— তথা তন্মিথুনং যজ্ঞে দ্রুপদস্য মহামখে।

কাজেই যজ্ঞের বেদীমাত্র নয়, বেদীর আগুন থেকেই তাঁর জন্ম। বস্তুত আগুন তো কৃষ্ণার গায়ের রঙে আসবে না, আগুন যে দ্রৌপদীর চরিত্রে। যাঁরা দ্রৌপদীর নিত্যসঙ্গী— পাঁচভাই— তাঁরা এই আগুনে সোনার মতো পুড়ে পুড়ে শুদ্ধ হয়েছেন। আর যাঁরা দূরের, তাঁরা যতবারই এই যাজ্ঞসেনীর আগুনে হাত দিয়েছেন, ততবারই তাঁদের হাত পুড়েছে, কপাল পুড়েছে, গোটা বংশ ছারখার হয়ে গেছে। দ্রৌপদীর আবির্ভাব লগ্নেই তাই দৈববাণী শোনা গেছে— ক্ষত্রিয় কুলের ধ্বংসের জন্যই তাঁর জন্ম, তিনি কৌরবদের ভয়ের নিশান— অস্যা হেতোঃ কৌরবাণাং মহদুৎপদ্যতে ভয়ম্। কি অসামান্যতায়, কী রূপে, কী গুণে— দ্রৌপদীর সঙ্গে আমি তাঁর বৃদ্ধা দিদিশাশুড়ি সত্যবতীর খুব মিল খুঁজে পাই। শুধু গায়ের রং ভাগ করে নিয়ে এঁরা যে একজন কালী আর অন্যজন কৃষ্ণা হয়েছেন তাই নয়, এঁদের দু'জনের মধ্যেই ছিল সেই বিরল ব্যক্তিত্ব, যাতে সত্যবতীর হাতে গড়ে উঠেছিল ওই বিরাট কুরুকুল, আর দ্রৌপদীর ক্ষোভে সেই কুরুকুল ধ্বংস হয়ে গেল। সৃষ্টি আর ধ্বংসের মধ্যে তফাৎ এইটুকুই যে, মহারাজ শান্তনু, পিতামহ ভীষ্ম— এঁরা সত্যবতীর ব্যক্তিত্ব মেনে নিয়েছেন, আর পাণ্ডবেরা দুর্ভাগ্যবশে এবং কৌরবেরা সাহঙ্কারে দ্রৌপদীর ব্যক্তিত্বকে অপমান করেছেন। ফল একপক্ষে বিড়ম্বনা, অন্যপক্ষে ধ্বংস।

ভাবতে একটু অবাক লাগে এইখানে যে, মহাকাব্যের চরমতমা নায়িকার জন্ম হল, অথচ সেই নায়িকা দ্রৌপদীর কোনও ছেলেবেলা নেই, জনক-জননীর বাৎসল্য-ভারাক্রান্ত কোনও শৈশব নেই, ছোট্ট ছোট্ট সঙ্গীদের সঙ্গে কন্দুক-ক্রীড়ারও কোনও ঘটনা মহাভারতের বিরাট পরিসরে এতটুকুও বর্ণিত নয়। জন্ম থেকেই তিনি স্পষ্ট এক কুমারীত্ব বহন করছেন— কুমারী চাপি পাঞ্চালী— যা যৌবনসন্ধির ইষ্ট ভাবটুকুর ইঙ্গিত দিয়ে চলেছে। মহাকাব্য হিসেবে মহাভারত যেখানে কত অবান্তর খুঁটিনাটির কথা বলে, সেখানে নিতান্তই বর্ণনীয়া

প্রধানতমা রমণীটির ক্ষেত্রে মহাকাব্যের কবি যে তাঁর শৈশব-পৌগণ্ড ছাড়িয়ে একেবারে সোজাসুজি যৌবনে উপনীত হলেন, সেখানে একটা ব্যঞ্জনা আছে বলে অবশ্যই মনে হয়। অগ্নিবেদীর মধ্য থেকে যজ্ঞ-সিদ্ধির মতো যে কুমারী জন্মালেন, মহাভারতের কবি তাঁর রূপ-বর্ণনায় চাঁদ-তারার উপমা জোগাড় করে আনেননি, বরঞ্চ খুব গদ্যজাতীয় ভাষায় সোজাসুজি বলেছেন— তিনি বেশ সুশ্রী, তাঁর শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি দর্শনীয়— সুভগা দর্শনীয়াঙ্গী— আজকের দিনে এই শব্দটা 'এক্সকুইজিট ফিগার' বলে অনুবাদ করা যেতেই পারেন তাঁর চোখ দুটি কৃষ্ণবর্ণ এবং সুদীর্ঘ পাপড়ির মতো, তার ওপরে মনোহর ভ্রূ; গায়ের রংও কালো এবং কেশকলাপ কুঞ্চিত, নখগুলি তাম্রাভ এবং উন্নত, আর স্তনযুগল সুগঠিত পীন— দেখলে মনে হয়, কোনও স্বর্গসুন্দরী মানুষের রূপ ধরে নেমে এসেছেন ভুঁয়ে।

এই যে বর্ণনা, এটা অবশ্যই কোনও যৌবনোদ্ধতা রমণীর রূপ, যাঁকে জন্মলগ্নেই শৈশব-পৌগণ্ডহীন এক আবির্ভাব বলে মনে হচ্ছে। লোকে তো বলবেই যে, অলৌকিক যজ্ঞকথায় যদি বিশ্বাস না করো, তা হলে কি দ্রুপদের সেই যাজ্ঞিক পুরোহিতই কোথাও থেকে ধৃষ্টদ্যুম্ন আর দ্রৌপদী— এই দুই ভাইবোনকে নিয়ে এসেছিলেন দ্রুপদের হিংসা মেটানোর জন্য। নইলে, আবির্ভাবেই এই যৌবনোদ্ধতা রমণীর রূপ দেখে জননীর বাৎসল্য প্রকাশেও সংশয় আসে। দ্রুপদের মহিষীকে যাজ্ঞিক যাজ-ঋষির কাছে এসে বলতে হয়— এই মেয়ে যেন আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে আর মা বলে না জানে— ন বৈ মদন্যাং জননীং জানীয়াতামিমাবিতি। আর কেনই বা তাঁকে দেখলেই মনে হয় যে, তিনি ভবিষ্যতে তাঁর বিরুদ্ধ ক্ষত্রিয় রাজাদের জীবনান্ত ডেকে আনবেন, তিনি রমণীকুলের শ্রেষ্ঠা বটে— সর্বযোষিদ্‌বরা কৃষ্ণা নিনীষুঃ ক্ষত্রিয়ান্ ক্ষয়ম্।

তার মানে, মহাভারতের কবি প্রথম কল্পেই দ্রৌপদীকে এমনভাবেই মহাকাব্যের পরিসরে প্রবেশ করাচ্ছেন যাতে তাঁর সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তাঁর তেজ এবং ব্যক্তিত্ব যেন পাঠকের মনে অন্যতর এক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। আরও লক্ষণীয় যে, আবির্ভাব লগ্নেই প্রায় দ্রৌপদীকে স্বয়ংবরের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। তার আগে দ্রৌপদীর সঙ্গে তাঁর পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধু অথবা অন্য কারও সঙ্গে কারও কোনও 'ইনটার-অ্যাকশন' নেই। দ্রুপদের ঘরের বাইরে দ্রৌপদীর প্রথম খবর পাচ্ছি বক রাক্ষস নিহত হবার পর সেই ব্রাহ্মণের বাড়িতেই যেখানে পাণ্ডবরা বসবাস করছিলেন এবং যেখানে অপর এক ব্রাহ্মণ আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এসেছেন। তিনি গল্প করতে-করতে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর প্রস্তুতির খবর শুনিয়েছেন পাণ্ডবদের। এবং এটাই দ্রৌপদী-বিষয়ে প্রথম সংবাদ-সরবরাহ হচ্ছে মহাভারতে।

দ্রৌপদীর যেদিন বিয়ে অথবা স্বয়ম্বর, তার আগে পাণ্ডবেরা বারণাবতে জতুগৃহের আগুন হজম করে প্রচ্ছন্নভাবে এধার-ওধার ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এ-বন সে-বন দেখে, আর কিছুই করার না পেয়ে পাণ্ডবজননী কুন্তী পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। ভিক্ষা-টিক্ষাও ভাল মিলছে না। এরই মধ্যে ব্যাস এসে দ্রৌপদীর জন্মকথা শুনিয়ে গেলেন পাণ্ডবদের। যাবার আগে এও বলে গেলেন, যে সেই রমণীই পাণ্ডবদের বউ হবে। কুন্তী এবং পাণ্ডবদের কাছে এটা দ্রৌপদীর বিষয়ে দ্বিতীয় বারের খবর। কিন্তু কৌরব-জ্ঞাতির প্রতারণা আর বন-বনান্তরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুরে বেড়াবার যন্ত্রণায় পাণ্ডবদের মনে তখন স্ত্রীচিন্তা ঠাঁই পায় না। সমস্ত জগৎকে খরতাপে আক্রমণ না করে সূর্য যেমন সন্ধ্যা-বধূকে ভজনা করে না, তেমনি জগতের কাছে আপন শৌর্য প্রকাশ না করে পাণ্ডবেরাই বা রমণীর চিন্তা করবেন কী করে? তবে একাধারে শৌর্য-বীর্য দেখানোর সুযোগ এবং স্ত্রীরত্ন লাভ— দুইয়েরই মওকা এল দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে, যদিও পাণ্ডবেরা এ-কথা সচেতনভাবে বোঝেননি। তাঁরা পাঞ্চাল রাজ্যের উদ্দেশে রওনা দিলেন ভাল ভিক্ষে পাবার আশায়। কারণ তাঁরা শুনেছিলেন পাঞ্চাল রাজ্যে ভাল ভিক্ষে পাওয়া যায়— সুভিক্ষাশ্চৈব পাঞ্চালাঃ শ্রূয়ন্তে। তা ছাড়া বনে বনে এতকাল বাস করে নগরে ভ্রমণ করার জন্য পাণ্ডবদের নাগরিক-বৃত্তিও কিছুটা উত্তেজিত হয়েছিল বুঝি। কেননা পাঁচ ছেলের মা কুন্তী পর্যন্ত ভেবেছিলেন— নগরে গেলে দারুণ মজা হবে— অপূর্বদর্শনং বীর রমণীয়ং ভবিষ্যতি। পাণ্ডবেরা তাই চললেন। রাস্তায় ব্যাসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বটে, তবে ব্যাসের কথা, দ্রৌপদীর কথা বুঝি বা তাঁদের ভাল করে মনেও ছিল না।

পাঞ্চাল রাজ্যে পৌঁছে ইস্তক দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের খবর পাণ্ডবদের কানে আসছিল। মনে মনে তাঁকে বিয়ে করার মানসিক প্রস্তুতি পাণ্ডবদের কারও ছিল না, কিন্তু তাঁরা যে স্বয়ম্বরের জাঁকজমক দেখতে যাবেন, এটা অবশ্য মনে মনে ছিল। পাণ্ডবেরা পাঞ্চাল রাজ্যে পৌঁছবেন কি, রাস্তাতেই তাঁরা দেখতে পেলেন দলে দলে ব্রাহ্মণ-সজ্জনেরা চলেছেন দ্রুপদের রাজসভায়। পাণ্ডবেরা তখনও বাড়ি-ঘর বাসস্থান ঠিক করেননি কিছু। তখনও প্রচ্ছন্নচারী ব্রাহ্মণের বেশ। যুধিষ্ঠির কিছু শুধোবার আগেই ব্রাহ্মণেরা স্বজাতীয় ভ্রমে পাণ্ডবদের জিজ্ঞাসা করলেন— আপনারা আসছেন কোত্থেকে, যাবেনই বা কোথায়? পুরো পরিচয় পাবার আগেই ব্রাহ্মণেরা বললেন— চল সব দ্রুপদের রাজবাড়িতে, বিরাট উৎসব, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর। আমরা সবাই তো সেখানেই যাচ্ছি। নিষ্কিঞ্চন ব্রাহ্মণেরা দ্রৌপদীর চেহারার একটা লোভনীয় বর্ণনাও দিতে চাইলেন। তাঁরা বললেন— দারুণ দেখতে নাকি দ্রৌপদীকে। 'দর্শনীয়া', 'অনবদ্যাঙ্গী', পদ্মের পাপড়ির মতো চোখ। এক ক্রোশ দূর থেকেও নাকি তাঁর গায়ের মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায় (পাঠক! যোজনগন্ধা পদ্মগন্ধী সত্যবতীর সঙ্গে এখানেও দ্রৌপদীর মিল)। ব্রাহ্মণ বলে কথা, তাঁদের মুখে প্রত্যঙ্গ বর্ণনা কেমন শোনায়; তাই বুঝি অতি সংক্ষেপেও কোনও আড়ম্বরের মধ্যে না গিয়ে, অথচ সব কিছুই বুঝিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণেরা বললেন— দ্রৌপদী তনুমধ্যমা— অর্থাৎ যাঁর কোমরটা বেশ 'স্লিম'। অনবদ্য তার চেহারা, তার ওপরে 'সুকুমারী মনস্বিনী'।

না, ব্রাহ্মণেরা দ্রৌপদীকে পেতে চান না। তাঁরা ধূমধাম দেখবেন, রঙ্গ দেখবেন। উপরি পাওনা রাজার দান— টাকাপয়সা, গোরু, ভোক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ সর্বশঃ। ব্রাহ্মণেরা বললেন— তোমরাও চল আমাদের সঙ্গে, মজা দেখে, দান নিয়ে ফিরে আসবে— এবং কৌতূহলং কৃত্বা দৃষ্ট্বা চ প্রতিগৃহ্য চ। চাই কি, তোমাদের পাঁচ ভাইয়ের এক ভাইকে কৃষ্ণা বরণও করতে পারে, কারণ তোমরা সবাই তো দেখতে বেশ সুন্দর। যুধিষ্ঠির বললেন— নিশ্চয়, নিশ্চয়, এই আমরা এলুম বলে।

এক কুমোরের ঘরে পাণ্ডবদের থাকার ব্যবস্থা হল। ভিক্ষা করে আর ব্রাহ্মণের বেশ ধরে পাণ্ডবেরা তাঁদের ছদ্ম ব্রাহ্মণ্য বজায় রাখছিলেন। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে রাজা-রাজড়ারা এবং

ব্রাহ্মণেরা অনেক আগে থেকেই উপস্থিত হচ্ছিলেন। পাণ্ডবেরাও নিজেদের ব্যবস্থা করে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে উপস্থিত হলেন। সভা একেবারে গমগম করছে। দ্রুপদ মৎস্যচক্ষুর পণ সমবেত সবাইকে জানালেন এবং প্রায় 'অলিম্পিয়ান' কায়দায় স্বয়ম্বর ঘোষণা করলেন— স্বয়ম্বরম্ অঘোষয়ৎ। ঈশান কোণে বসলে নাকি কোনও কাজে পরাজয় হয় না, তাই রাজারা বসলেন সেদিকটায়, মঞ্চের ওপর সারি সারি। উত্তর দিকটায় সাধারণ লোকেরা। আর ঋষি-ব্রাহ্মণেরাও বসলেন তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায়।

বিবাহেচ্ছু রাজারা সব বসে আছেন এমনভাবে, যেন মনে হচ্ছে— এ বলে তুই আমায় দেখ, ও বলে তুই আমায় দেখ— স্পর্ধমানা স্তদান্যোন্যং নিষেদুঃ সর্বপার্থিবাঃ। ক্ষত্রিয় জনতার মধ্যে তখন সাগরতরঙ্গের মতো অবিরাম কোলাহল। প্রত্যেকেই তখন ভাবছেন— কখন সেই দীপ্তিমতী সুন্দরী উদয় হবেন রাজসভায়, কখন কনে দেখব? এরই মধ্যে বাজনা-বাদ্যি আরম্ভ হয়ে গেল। সালঙ্কারা দ্রৌপদী রাঙা কাপড় পরে সভায় উদয় হলেন। হাতে সোনার রঙের বরণমালা। কার গলায় মালা দেব, কে সেই বীরপুরুষ— এই চিন্তায় কিছুটা বা বিবশা— আপ্লুতাঙ্গী সুবসনা সর্বাভরণভূষিতা। ব্রাহ্মণেরা আগুনে আহুতি দিয়ে স্বস্তিবচন করলেন, এক লহমায় বাদ্যবাদন থেমে গেল— কুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন কথা বলছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন— এই ধনুক, ওই মীনচক্ষু লক্ষ্যস্থল, আর এই যে বাণগুলি। আপনাদের কাজ— ছিদ্রপথে ওই মৎস্যচক্ষু ভেদ করা। যিনিই এই কষ্টকর কাজটি করতে পারবেন তাঁরই গলায় মালা দেবেন আমার ভগিনী— দ্রৌপদী। কালিদাসের পার্বতীকে সকামে দেখে শিবের তিনটি চোখ যেমন যুগপৎ তাঁর অধরোষ্ঠে পড়েছিল, এখানে সমবেত রাজমণ্ডলীর আতুর চোখগুলিও তেমনি একসঙ্গে দ্রৌপদীর ওপরে গিয়ে পড়ল। প্রত্যেকেই এই ভাবনায় মশগুল যে, দ্রৌপদীকে আমিই জিতব— সঙ্কল্পজেনাভিপরিপ্লুতাঙ্গাঃ— এবং লক্ষ্যভেদ করার আগেই প্রত্যেকে ভাবতে লাগলেন— দ্রৌপদী আমারই— কৃষ্ণা মমেত্যেব। আশ্চর্য! যে রাজারা অন্য সময় এক জোট, প্রাণের বন্ধু, তাঁরাও এখন অহংমম ভাবনায় সব আসন ছেড়ে উঠে পড়েছেন, একে অন্যকে গালাগালি দিচ্ছেন, যদিও তাঁদের চোখ, মন এবং রসভাব— সবই এক দ্রৌপদীর দিকে— কন্দর্পবাণাভিনিপীড়িতাঙ্গা... কৃষ্ণাগতৈর্নেত্রমনঃস্বভাবৈঃ... দ্বেষং প্রচক্রুঃ সুহৃদোঽপি তত্র।

সেকালের স্বয়ংবর সভার চরিত্রই বোধহয় এটা। ক্ষত্রিয় রাজাদের বহু বিবাহের অসুবিধে ছিল না, অতএব সুন্দরী রাজকন্যাদের স্বয়ংবর-সংবাদ প্রচারিত হলেই তাঁরা অনেকেই স্ত্রীরত্ন লাভের ভাগ্য-পরীক্ষায় নেমে পড়তেন। স্বয়ংবর-সভায় অতি-বড় বন্ধুও কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী। ফলে সাজগোজ থেকে আরম্ভ করে রাজনৈতিক এবং সামরিক উচ্চতা-খ্যাপন বিবাহ-সভাতেও প্রকট হয়ে উঠত। আর সবচেয়ে কৌতুককর ছিল সেই মুহূর্তটি, যখন রাজকন্যা প্রথম সভায় এসে উপস্থিত হতেন বরমাল্য-হাতে, মহাভারতে কবি এর একটা 'ক্রুড' বর্ণনা দিয়েছেন, যা পরবর্তীকালের মহাকবিরা গ্রহণ করেছেন আলংকারিক পরিশীলনে। এখানে যেমন দেখছি— রাজারা দ্রৌপদীকে দেখে কোমল কামুকতায় অস্থির হয়ে উঠছেন— কন্দর্পবাণাভিপরিপ্লুতাঙ্গাঃ— এবং সেই কারণেই বন্ধুস্থানীয় রাজারাও একে অন্যের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করছেন। কালিদাসের রঘুবংশে এই চিত্রটাই অসম্ভব পরিশীলিত ভাবে আছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং তেমনটা হওয়াই খুব স্বাভাবিক। কালিদাসে ইন্দুমতীর স্বয়ংবরে যেইমাত্র তিনি সভাগৃহে প্রবেশ করেছেন, সঙ্গে-সঙ্গেই রাজাদের মধ্যে নানান প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে এবং সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল— বসন-অলংকার-প্রসাধন শেষবারের মতো ঠিক করে নেওয়া। কালিদাস শব্দটি এখানে ব্যবহার করেছেন— শৃঙ্গারচেষ্টা বিবিধা বভূবুঃ। শৃঙ্গার শব্দের অর্থ সাজগোজ করাও যেমন হয়, তেমনই কামুক জনের অপরিশীলিত ইঙ্গিতও হয়। কিন্তু একটি শব্দেই কালিদাস মহাকাব্যিক 'ক্রুডনেস' এবং প্রসাধনী প্রক্রিয়া— দুটিই বুঝিয়ে দিয়েছেন। মহাভারতে দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে এই অপরিশীলন দ্রৌপদীর ব্যক্তিত্ব এবং শারীরিক আবেদন বিপ্রতীপভাবে প্রতীয়মান।

কুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজাদের নাম ঘোষণা আরম্ভ করে দিয়েছেন আগেই— উদ্দেশ্য দ্রৌপদীকে কিঞ্চিৎ পরিচয় করিয়ে দেওয়া। ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন— ইনি দুর্যোধন, ইনি কর্ণ, ইনি জরাসন্ধ, ইনি কৃষ্ণ, ইনি শিশুপাল— আরও কত শত নাম, যার মধ্যে বাংলা দেশের রাজা পর্যন্ত আছেন। বস্তুত বিদর্ভ রাজনন্দিনী রুক্মিণীর পরে আর এমন কোনও স্বয়ম্বরসভা বসেনি, যার সঙ্গে তুলনা চলে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের। সেই সময়ে এই কৃষ্ণা দ্রৌপদীর রূপ-গুণের কথা ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। আমাদের ধারণা— ওই যে বলা হয়েছে দ্রৌপদীর গায়ের মিষ্টি গন্ধ এক ক্রোশ দূর থেকে পাওয়া যেত— একথার আসল তাৎপর্য হল— দূরে দূরান্তরে এই কালো মেয়েটির রূপ-গুণের কথা লোকে জানত। আজ তাই এতগুলি রাজ-ভ্রমর এই কৃষ্ণা পদ্মিনীর মধুলোভে দ্রুপদের রাজসভায় গুনগুন করছে। খেয়াল করতে হবে একই বিবাহ-সভায় বরাত পরীক্ষা করতে মামা-ভাগ্নে— শল্য এবং পাণ্ডবেরা— উভয়েই এসেছেন। বাপ-বেটা— বিরাট এবং তাঁর ছেলে, জরাসন্ধ এবং তাঁর ছেলে— দুয়েই এসেছেন— যার কপালে দ্রৌপদী জোটে তারই লাভ।

আরম্ভ হল ধনুক তোলা। কলিঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র— সব গেল। জরাসন্ধ, শিশুপাল, শল্য— সব গেল। দুর্যোধন, অশ্বত্থামা— সব গেল। মহাভারতকার কেবলই এই মহারাজাদের নাম একটি একটি করে বলেন, আর বলেন— না, ইনিও হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছেন— জানুভ্যাম্ অগমন্‌মহীম। এত রাজার মাঝখানে মাত্র একটি দৃঢ় সংকল্পিত মুখ ধনুকখানি তুলে তাতে বাণ লাগিয়ে লক্ষ্য-ভেদ করে ফেলেছিল আর কী! যাকে দেখে পাণ্ডবেরা পর্যন্ত ধরে নিয়েছিলেন— এই বুঝি লক্ষ্য-বিদ্ধ হল। তিনি কর্ণ, যাঁকে সমবেত সমস্ত রাজমণ্ডলীর সামনে দ্রৌপদী প্রত্যাখ্যান করে বললেন— সুতপুত্রের গলায় মালা দেব না আমি— নাহং বরয়ামি সূতম্। ইতিহাসকে যাঁরা নীচে থেকে দেখেন— History from below— তাঁদের, এই ঘটনাটা মনঃপূত হবে না। হবেই বা কেন— সমাজের পর্যায়ভুক্তিতে কর্ণ সুতপুত্র, কিন্তু স্বয়ম্বর সভায় তার কী? কুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন তো প্রতিজ্ঞাই করেছিলেন— যিনিই লক্ষ্যভেদ করবেন, তিনিই পাবেন আমার ভগিনীকে, মিথ্যে বলছি না বাপু— তস্যাদ্য ভার্যা ভগিনী মমেয়ং কৃষ্ণা ভবিত্রী ন মৃষা বদামি। সমাজের উচ্চবর্ণে না জন্মানোর যন্ত্রণা কর্ণকে সাভিমানে সইতে হল শুধু সূর্যের দিকে একবার তাকিয়ে। কিন্তু মশাই! নারী স্বাধীনতা! সে ব্যাপারে কী বলবেন? সমাজের বিচারে স্ত্রীলোকের অবস্থা তো অতি করুণ ছিল বলে শুনি। কিন্তু বাপভায়ের প্রতিজ্ঞায় তুড়ি মেরে উন্মুক্ত সভার মধ্যে দ্রৌপদী যে নিজের পছন্দ-

অপছন্দ পরিষ্কার জানালেন, তাতে কি এটাই প্রমাণ হয় না যে, সেকালের নারী সমাজের ওপর অত্যাচারের ইতিহাস একেবারে নিরঙ্কুশ বা সর্বাঙ্গীণ হতে পারে না। অত্যাচার ছিল, এবং এখনও আছে। কিন্তু তারই মধ্যে কোথাও বা ছিল মুক্তির বাতাস, কোথাও বা স্ব-অধীনতাও।

দ্রৌপদীর এই প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেয়সী রুক্মিণীর এক ধরনের মিল আছে। রুক্মিণীর বাবা ভীষ্মক এবং ভাই রুক্মী সেকালের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীর বিয়ে প্রায় পাকাই করে ফেলেছিলেন। রুক্মিণী তার শোধ নিয়েছেন একেবারে পালিয়ে গিয়ে, নিজের পছন্দে বিয়ে করে। দ্রৌপদীও বাপ-ভায়ের প্রতিজ্ঞার মর্যাদা রাখেননি এবং আপন স্বাধীনতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এখানে একটা সমস্যা আছে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, দ্রুপদ-ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতিজ্ঞা এবং কর্ণকে প্রত্যাখ্যান— এ-সব কিছুর মধ্যেই একটা রহস্য আছে, যে রহস্য আগে বোঝা প্রয়োজন। একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে, সেকালের স্বয়ম্বর সভায় বীর-বরণের ক্ষেত্রে কন্যার ইচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেলেও সব জায়গায় কন্যার ইচ্ছেই শেষ কথা ছিল না। রাজনীতির চাল ছিল। ছিল সামাজিক মান মর্যাদার প্রশ্নও। যেমন ধরুন রুক্মিণীর স্বয়ম্বরের আগেই যে তাঁর বাপ-ভাই শিশুপালকে রুক্মিণীর বর হিসেবে পছন্দ করেছিলেন— এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, স্বয়ম্বর সভা অনেক সময় প্রহসনে পরিণত হত। অবশ্য রুক্মিণীর বাপ-ভাই যে শিশুপালকে মনস্থ করেছিলেন তার পিছনে রাজনৈতিক কারণ ছিল। কারণ ছিল— শিশুপালের পৃষ্ঠপোষক দুর্ধর্ষ জরাসন্ধকে সন্তুষ্ট রাখার। এ-প্রসঙ্গ অন্যত্র আলোচনা করেছি। এখানে শুধু এইটুকুই প্রয়োজন যে, রাজনৈতিক কারণে পিতা এবং ভ্রাতা অনেক সময়েই তাঁদের মতামত চাপিয়ে দিতেন স্বয়ম্বরা বধূটির ওপর। সৌভাগ্যের কথা, দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে তাঁর বাপ ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর মতামতের মিল ছিল এবং সেই কারণেই— এবং এটা অবশ্যই রাজনৈতিক কারণ— দ্রৌপদীর কর্ণ-প্রত্যাখ্যান আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত মনে হয় না।

একটা জিনিস খেয়াল করুন। মহাভারতকার দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের পূর্বাহ্নেই জানিয়েছেন যে, দ্রুপদ রাজার ভারী ইচ্ছে ছিল যাতে পাণ্ডব অর্জুনের সঙ্গেই তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়— যজ্ঞসেনস্য কামস্তু পাণ্ডবায় কিরীটিনে। কৃষ্ণাং দদ্যামিতি...। ব্যাস লিখেছেন, দ্রুপদ সবসময় মনে মনে এই ইচ্ছা পোষণ করেও বাইরে এ-কথা কখনও প্রকাশ করেননি। কিন্তু আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এ-কথা জানি যে, অন্য কোথাও প্রকাশ না করলেও পিতার মনোগত ইচ্ছা বউ-ছেলে-মেয়ে ঠিকই জানতে পারে। আমাদের দৃঢ় ধারণা— দ্রৌপদী পিতার ইচ্ছে জানতেন। সৌভাগ্যবশত পিতার ইচ্ছের সঙ্গে দ্রৌপদীর ইচ্ছের মিল ছিল, এবং তার কারণও আছে। আমরা যে ঠিক কথা বলছি তার আরও দুটো কারণ আছে। প্রথমত বারণাবতের জতুগৃহে পাণ্ডবদের মৃত্যুর কথা যথেষ্ট চাউর হয়ে গেলেও দ্রুপদ সে-কথা বিশ্বাস করতেন বলে মনে হয় না। বিশ্বাস করতেন না বলেই ব্যাস লিখেছেন যে, পাণ্ডব অর্জুনকে তিনি খুঁজছিলেন— সোন্বেষমাণঃ কৌন্তেয়ং— এবং প্রধানত তাঁর কথা মনে রেখেই তিনি স্বয়ম্বরের জন্য সেইরকম অসামান্য একখানি ধনুক তৈরি করিয়েছিলেন। তৈরি করিয়েছিলেন সেইরকম কৃত্রিম যন্ত্র যা কেউ ভেদ করতে না পারে। দ্রুপদ জানতেন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর মেয়ের স্বয়ম্বরে অংশ গ্রহণ করাটা মর্যাদার ব্যাপার— এবং তাঁর বিশ্বাস ছিল অর্জুন যদি কোথাও থাকেন, তা হলে এই বিরাট স্বয়ম্বর উৎসবে তিনি আসবেনই। দ্বিতীয়ত, খেয়াল করুন ধৃষ্টদ্যুম্নের কথা। পিতার ইচ্ছে তিনি নিশ্চয় জানতেন এবং অর্জুনের সমকক্ষ বীর যে একমাত্র কর্ণ— তাও তিনি জানতেন। ঠিক এই কারণেই তাঁর ভগিনী সম্প্রদানের প্রতিজ্ঞার মধ্যে একটু প্যাঁচ ছিল। ধৃষ্টদ্যুম্ন বলেছিলেন— মিথ্যে বলছি না বাপু, আমার ভগিনী তাঁরই ভার্যা হবেন, যিনি এই লক্ষ্যভেদের মতো মহৎ কর্মটি করবেন। তবে তিনি কেমনটি হবেন? যিনি নাকি— কুলেন রূপেন বলেন যুক্তঃ— অর্থাৎ সেই মানুষটি, যাঁর বংশ-মর্যাদা, রূপ এবং বীরত্ব— সবই আছে। কাজেই যিনিই লক্ষ্যভেদ করবেন তিনিই আমার বোনের স্বামী হবেন— কুমার ধৃষ্টদ্যুম্নের এই প্রতিজ্ঞার মধ্যেও একটু কথার ফাঁক ছিল, এবং দ্রৌপদী যে সুতপুত্রকে মর্যাদার প্রশ্নে প্রত্যাখ্যান করলেন, তাতে আমরা তাই খুব একটা আশ্চর্য বোধ করি না। বিশেষত মহারাজ দ্রুপদ অর্জুনকে খুঁজছিলেন— এই নিরিখে, অপিচ ধৃষ্টদ্যুম্ন লক্ষ্যভেদের ক্ষমতার সঙ্গে লক্ষ্যভেত্তা পুরুষের কুলমর্যাদা এবং রূপও চাইছেন এই নিরিখে— আমরা তো ধারণা করি যে দ্রৌপদী কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য পূর্বাহ্ণেই প্রস্তুত ছিলেন। এমনকী তাঁকে শেখানোও হয়ে থাকতে পারে যে কূটনৈতিক কারণে কর্ণকে স্বয়ম্বর-সভায় নেমন্তন্ন করতে হয়েছে বটে, কিন্তু দ্রৌপদীকে এ ব্যাপারটা সভাতেই সামলাতে হবে। দ্রৌপদী সামলে দিয়েছেন, এবং অর্জুন ছাড়া একমাত্র বীর যিনি এই লক্ষ্যভেদ করতে পারতেন, তিনি অসম্মানে বঞ্চিত হলেন।

যাক, বড় বড় বীরেরা যখন হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়লেন, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন তখন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বসে হাতে সুড়সুড়ি দিচ্ছেন। তিনি আর থাকতে পারলেন না। বসে থাকা সমস্ত ব্রাহ্মণদের মধ্যে থেকে রমণীর বরমাল্যের আশায় হঠাৎ করে উঠে আসতে অর্জুনের সংকোচ হচ্ছিল নিশ্চয়ই। কাজেই তাঁদের কারও বা অস্বস্তি এবং কারও বা বিরক্তি জন্মিয়েই উঠে পড়লেন অর্জুন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে এর এক অদ্ভুত মিশ্রক্রিয়া হল। কিছু উদ্যমী ব্রাহ্মণ একেবারে হই হই করে উঠলেন, তাঁরা তাঁদের পরনের অজিন খুলে রুমালের মতো উড়িয়ে— বিধুন্বস্তোঽজিনানি চ— অর্জুনকে 'চিয়ার আপ' করতে থাকলেন। কিন্তু মধ্যপন্থী ব্রাহ্মণেরা, যাঁরা একটু বে-ভরসা গোছের, তাঁরা বলতে থাকলেন— কর্ণ শল্য রসাতলে গেল, আর এই দুবলা বামুন— প্রাণতো দুর্বলীয়সা— বেটা বলে কিনা ধনুক তুলব। সমস্ত রাজমণ্ডলের সামনে আজ বামুনদের মাথা হেঁট করে দেবে এই বিটলে ছেলেটা— অবহাস্যা ভবিষ্যন্তি ব্রাহ্মণঃ সর্বরাজসু। চিন্তিত ব্রাহ্মণেরা বললেন— ভাল চাও তো চেপে বসে পড় এখানে। অর্জুনে থামলেন না দেখে, তাঁরা অন্যদের বললেন— প্রেমানন্দেই হোক, অহংকার বশেই হোক কিংবা চপলতা বশে— ছেলেটা যে ধনুক বাঁকাতে যাচ্ছে ওকে বারণ করুন, যেন না যায়— বার্যতাং সাধু মা গমৎ।

এই যে কথাগুলি বললেন— এঁরা হলেন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বে-ভরসা দলের, মহাভারতকার যাঁদের বলেছেন— বিমনসঃ। কিন্তু অর্জুন উঠতে যাঁরা বেশ খুশি হলেন— মুদান্বিতাঃ— তাঁরা উদ্যমী হয়ে বললেন— মাথাও হেঁট হবে না, মানও খোয়াবে না। ছেলেটার চেহারা দেখেছ; হাতের গোছা আর কাঁধের গুলিগুলো দেখেছ? তার ওপরে ছেলেটার উৎসাহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখলে বোঝা যায় যে, এর সম্ভাবনা আছে। ক্ষ্যামতা না থাকলে কি আর এমনি এমনি উঠে গেল— ন হি অশক্তঃ স্বয়ং ব্রজেৎ। রোগা হলেও এই ব্রাহ্মণদের খুব মনের জোর আছে। এঁদের ধারণা বামুনের অসাধ্য কিছু নেই, হোক না বামুন ফলাহারী, উপোসী, ব্রতধারী। জল খায় আর হাওয়া খায় বলে— অব্‌ভক্ষা বায়ুভক্ষাশ্চ— তারা কি সব মরে গেছে নাকি, বামুন নিজের তেজেই বামুন।

ব্রাহ্মণবেশী অর্জুনের ঘাড়ে চেপে রোগা বামুনেরা যতক্ষণ মুখ এবং হস্তব্যায়াম করছিলেন, ততক্ষণে অর্জুন ধনুকের কাছে পৌঁছে গেছেন এবং দ্রুপদের যন্ত্র-লক্ষ্যও ভেদ করে দিয়েছেন। আর যায় কোথা, ক্ষত্রিয়দের লজ্জা দিয়ে ব্রাহ্মণেরা তাঁদের উত্তলা উত্তরীয়গুলি আকাশে বিজয়ধ্বজের মতো উড়িয়ে দিলেন। দেবতাদের মুগ্ধ পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে সুকুমারী দ্রৌপদী মধুর এক সমর্থনের হাসি হেসে— উৎস্ময়ন্তী— ব্রাহ্মণবেশীর গলায় সাদা ফুলের বরমাল্যখানি দুলিয়ে দিলেন। তখনও তিনি জানেন না— ইনিই তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন— গাণ্ডীবধন্বা। আমাদের ধারণা, বিবাহলগ্নে এই যে তিনি ব্রাহ্মণবোধে জীবনসঙ্গী বেছে নিলেন, এইখানেই তাঁর ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। সারাজীবনই তাঁর কেটেছে বনবাসিনী ব্রাহ্মণ-বধূর মতো। রাজোচিত সুখভোগ তাঁর কপালে জোটেনি, যাও জুটেছে তাও কণ্টকহীন নয়। বনবাস আর অজ্ঞাতবাসে তাঁর যৌবন শুধু ব্রাহ্মণের আদর্শধূলিতে ধূসর। সাময়িকভাবে ভিক্ষাব্রতী ব্রাহ্মণবেশীরা কুটিরে ফিরে গিয়ে তাঁর বধূ-পরিচয় করিয়েছে ভিক্ষার পরিচয়ে। মহাভারতকার এই পরিচয় লগ্নটি লক্ষ করে বলেছেন— পাণ্ডবেরা যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীকে ভিক্ষা বলে পরিচয় দিলেন— ভিক্ষেতি অথাবেদয়তাম্। পাণ্ডবেরা সারা জীবন এই ভিক্ষার ঝুলি বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছেন, আর যিনি স্বয়ং ভিক্ষা তাঁর সঙ্গে অন্য পাঁচজন ব্যবহারও করেছেন ভিক্ষার মতো।

অথচ দ্রৌপদীর বিবাহলগ্নে ঘটনাগুলি এইরকম ছিল না। এই অসামান্য রমণীর বরমাল্য ভিক্ষার জন্য দূর দুরান্ত থেকে এসেছিলেন সেকালের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত রাজারা। ঠিক সেই অর্থে পাণ্ডবরা তখনও প্রতিষ্ঠিত নন, কারণ তাঁরা তখনও হস্তিনাপুরের সামান্য দাবিদার মাত্র, রাজা নন। তবে যদি সম্ভাবনার কথা ধরা যায়, তা হলে অবশ্যই বলতে হবে যে, ভীমার্জুনের শক্তিমত্তার কথা তখন সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গিয়েছিল এবং এই সম্ভাবনাকে মূলধন করেই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দ্রুপদরাজার রাজনৈতিক বুদ্ধি পরিচালিত হয়েছিল। মনে রাখা দরকার যাঁর সঙ্গেই দ্রুপদ-কন্যা দ্রৌপদীর মেলবন্ধন ঘটবে তাঁর সঙ্গে পাঞ্চাল রাজ্যেরও সুসম্পর্ক হবে— এ তো জানা কথা। রাজনৈতিক অবস্থানে দ্রুপদের অবস্থা তখন ভাল নয়। তাঁর অর্ধেক রাজ্য পাণ্ডব-কৌরবের গুরুদক্ষিণার সময়েই দ্রোণের করগত। দ্রোণ কৌরবসভায় গুরুমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত এবং স্বয়ং পিতামহ ভীষ্ম তাঁকে উচ্চ সম্মানে কুরুকুলের হিতাকাঙ্ক্ষীর আসনে বসিয়ে দিয়েছেন। সেজন্য ভীষ্মের ওপরেও দ্রুপদের ক্ষোভ থাকতে পারে। অন্যদিকে পাণ্ডবেরা যে জ্ঞাতিদের দ্বারা লাঞ্ছিত হচ্ছেন এবং বারণাবতে তাঁদের পুড়িয়ে মারার চেষ্টাও হয়েছিল— এ খবর দ্রুপদ রাখতেন। বস্তুত যে বালকবীর অর্জুন তাঁকে বেঁধে দ্রোণাচার্যের কাছে দাঁড় করিয়েছিল, তার ওপরে দ্রুপদের রাগ ছিল না, রাগ ছিল দ্রোণের ওপরেই। কাজেই দ্রুপদ যে মনে মনে দ্রৌপদীকে অর্জুনের সঙ্গে বিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিতে চেয়েছিলেন, সেও কিন্তু আরেক প্রতিশোধস্পৃহা— যে স্পৃহায় পূর্বে ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম হয়েছে। খেয়াল করে দেখুন কুরুকুলের বর্ম-আঁটা দুই প্রধান পুরুষ মহারথ দ্রোণ এবং ভীষ্ম— এই দু'জনেরই হন্তা কিন্তু দ্রুপদের ঘরেই জন্মেছে— একজন ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং অন্যজন শিখণ্ডী। একজন যদি দ্রোণবধের নিমিত্তমাত্র হয়ে থাকেন, তো ভীষ্মবধের নিমিত্তও শিখণ্ডী। দু'জনকেই নিমিত্ত বলেছি এই কারণে যে, অর্জুন না থাকলে এই দু'জনেরই বলবীর্য এমনকী শিখণ্ডীর ক্লীবত্বও বিফলে যেত। কাজেই দ্রোণাচার্যের আদেশ মাত্রে যে ছেলেটির হাতে দ্রুপদ বাঁধা পড়েছিলেন তাঁর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হলে যে রাজনৈতিক দিক দিয়ে দ্রুপদের সুবিধা ছিল, একথা সবাই বোঝে।

আমাদের ধারণা, পাণ্ডবেরা যে বারণাবতে জতুগৃহদাহ থেকে কোনওক্রমে বেঁচে গেছেন, এ-কথা দ্রুপদ কোনওভাবে শুনেছিলেন, না হলে ধনুক বানাবার আগে তিনি অর্জুনকে খুঁজবেন কেন— সোঽন্বেষয়ানঃ কৌন্তেয়ম্। দ্বিতীয়ত, দ্রৌপদীর বিয়ের পর ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবদের কুমোরশালা থেকে লুকিয়ে সব জেনে এসে দ্রুপদকে বললেন— এঁরা নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়, শুধু তাই নয়, এঁরাই পাণ্ডব। ধৃষ্টদ্যুম্ন এবার বললেন— পাণ্ডবেরা জতুগৃহের আগুন থেকে বেঁচে ফিরেছেন— এইরকম একটা কথা শুনে ঘরে বসে থাকবেন না। আর সত্যিই তো তাই। সেই কবে ব্যাসদেব জানিয়ে যাচ্ছেন দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর হবে, আর পাণ্ডবদের মনে নববধূর নিত্য আসা-যাওয়া ঘটছিল। সেই কবে ধৌম্য পুরোহিতকে তাঁরা বরণ করে নিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডবদের মনে হল এবার ধৌম্যকে সঙ্গে নিয়ে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর দেখতে যাব— মেনিরে সহিতা গন্তুং পাঞ্চাল্যাস্তং স্বয়ম্বরম্। এ যেন বরপক্ষের পুরোহিত ঠিক হয়েছে, আর পাণ্ডবেরা চললেন বধূ বরণ করতে।

দ্রুপদের মনে যেমন ধারণা ছিল যে, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সম্ভাবনা ঘটলে পাণ্ডবেরা আর কিছুতেই আত্মগোপন করে থাকতে পারবেন না, ঠিক এই ধারণাটা ছিল আরেকজন মানুষেরও— তিনি কৃষ্ণ। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর তাঁর কাছে রাজনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সে-কথা আমি অন্যত্র বিস্তারিত লিখেছি। এখানে শুধু এইটুকুই বলব যে, কংসকে হত্যা করার পর কৃষ্ণ এবং তাঁর যাদব-সেনার উপর জরাসন্ধের আক্রোশ অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল, কারণ কংস ছিল জরাসন্ধের জামাই এবং জরাসন্ধ ছিলেন তাঁর কালের অবিসংবাদিত নেতা। হরিবংশে দেখা যাবে, জরাসন্ধের সৈন্যবাহিনীর পুচ্ছভাগে দুর্যোধন ইত্যাদি কৌরবরাও সামিল হয়েছেন— কৃষ্ণের বিরুদ্ধে কোনও সমবেত আক্রমণে জরাসন্ধকে সাহায্য করার জন্য— দুর্যোধনাদয়শ্চৈব ধার্তরাষ্ট্রা মহাবলাঃ। অন্যদিকে উদীয়মান নেতা কৃষ্ণ একটু একটু করে জরাসন্ধের দিকে এগোচ্ছিলেন। কারণ, জরাসন্ধের বিনাশ না হলে যাদব-বৃষ্ণি-কুলের কোনও স্বস্তি ছিল না। কৃষ্ণ কৌরব-পাণ্ডবের জ্ঞাতিভেদের কথা জানতেন, বিশেষত পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক সম্বন্ধসূত্র থাকায় তিনি চাইছিলেন হস্তিনাপুরে পাণ্ডবেরাও একটা শক্তি হয়ে দাঁড়ান। হরিবংশে দেখা যাচ্ছে— বারণাবতে পাণ্ডবদের পুড়ে মরার কথা শুনে কৃষ্ণ ছুটে এসেছিলেন সেখানে। যে কোনও কারণেই হোক, তাঁকে হঠাৎ করে দ্বারকায় ফিরে যেতে হল পাণ্ডবদের শ্রাদ্ধ-তর্পণ করেই, যেন ওইটাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, শ্রাদ্ধকল্পের পরেও তিনি সাত্যকিকে বলে

গেলেন পাণ্ডবদের অস্থি সঞ্চয় করতে— কুল্যার্থে চাপি পাণ্ডূনাং ন্যযোজয়ত সাত্যকিম্। স্পষ্টতই বোঝা যায় যে কৃষ্ণ যে ধরনের মানুষ তাতে যাচাই না করে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেবার লোক তিনি নন। তা ছাড়া পাণ্ডবদের মৃত্যুর কথা তিনি বিশ্বাস করেননি। সাত্যকিকে অস্থি সঞ্চয় করতে বলা মানেই হল— হয় তুমি মৃত পাণ্ডবদের অস্থি সঞ্চয় করে দেখাও, নয়তো জীবিত পাণ্ডবদের পাত্তা লাগাও। মহামতি বিদুর পাণ্ডবদের লাক্ষাগৃহ-মুক্তির খবর শত চেষ্টাতেও চেপে রাখতে পারেননি। কানাঘুষা চলছিলই, এবং মহারাজ দ্রুপদ, কুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন যেমন কানাঘুষাতেই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে পাণ্ডবেরা বেঁচে আছেন, সাত্যকিও নিশ্চয়ই এই কানাঘুষার খবর কৃষ্ণকে জানিয়ে থাকবেন। কৃষ্ণও তাই দ্রুপদের মতোই ধারণা করেছেন যে, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের মতো ঘটনা ঘটলে পাণ্ডবেরা কিছুতেই আত্মগোপন করে থাকবেন না, তাঁদের দেখা যাবেই। কৃষ্ণের অনুমান পুরোটাই ঠিক। পাণ্ডবেরা এসেছিলেন। বিবাহসভা এবং ধনুর্বেধের হই-হট্টগোলের মধ্যেই ছাই-চাপা আগুনের মতো ছদ্মবেশী পাণ্ডবদের কৃষ্ণ ঠিকই চিনেছিলেন— ভস্মাবৃতাঙ্গানিব হব্যবাহান্। চেনাটা তাঁর প্রয়োজনও ছিল। কারণ, পাঞ্চালের সঙ্গে পাণ্ডবদের মেলবন্ধন ঘটলে উভয়েই শক্তিশালী হবেন, এবং তাঁর প্রধান শত্রু জরাসন্ধের বিরুদ্ধে সে-জোট কাজে আসবে।

পাণ্ডবেরা কিন্তু কৃষ্ণ-বলরাম কাউকেই চিনতে পারেননি। কারণ এই নয় যে, ভিড়-ভাট্টা কোলাহল। যখন প্রথম দ্রৌপদী স্বয়ম্বর সভায় এলেন, সবাই তখন একযোগে, একদৃষ্টিতে কৃষ্ণার দিকে তাকিয়েছিল কিন্তু কৃষ্ণ সেই অবস্থাতেই পাণ্ডবদের চিনে ফেলেছিলেন, দাদা বলরামকে চিনিয়েও দিয়েছিলেন। অথচ পাণ্ডবেরা স্বরূপে থাকা কৃষ্ণকেও চিনতে পারেননি। দ্রৌপদীর ভাই ধৃষ্টদ্যুম্ন বিভিন্ন রাজ-নাম কীর্তনের সময় কৃষ্ণ-বলরামের কথা বলেওছিলেন। কিন্তু কে দেখে তাঁদের? কে দেখে রাজাদের? সবাই যেমন তখন দ্রৌপদীকেই দেখছিল, ঠোঁট কামড়াচ্ছিল, পাণ্ডবেরাও তখন প্রায় সেই কাজেই মত্ত ছিলেন। ব্যাসদেবকে তাই লিখতে হয়েছে— দ্রৌপদীকে দেখে পাণ্ডবেরা সবাই একেবারে কামমোহিত হয়ে পড়েছিলেন— তাং দ্রৌপদীং প্রেক্ষ্য তদা স্ম সর্বে/ কন্দর্পবাণাভিহতা বভূবুঃ। এই ফুলশরের আঘাতে মূর্ছিত অবস্থা চলেছে একেবারে পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত।

পাঁচ ভাই রীতিমতো যুদ্ধ জয় করে দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে সেই যখন কুমোরশালায় পৌঁছলেন, সেখানে কি তাঁদের এমন শব্দহীন নিরুচ্চার প্রত্যাগমন ঘটেছে, যাতে কাক-পক্ষী এবং কুন্তী কেউ কিচ্ছু টের পেলেন না। অথচ সেই দিন তো জাগতিক প্রকৃতির মধ্যেই এক ধরনের চাপল্যহীন তুষ্ণীম্ভাব বিরাজ করছিল। ঘন মেঘে মেদুর অম্বর, বৃষ্টি পড়ছে যখন-তখন, দুর্দিনের বিরক্তিতে মানুষজন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে— ততঃ সুপ্তজনপ্রায়ে দুর্দিনে মেঘসংপ্লুতে। দুর্দিনের কবলে যখন অপরাহ্ণে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, তখন কুমোরশালার ভাড়া ঘরে বসে কুন্তী নানা দুশ্চিন্তা করছিলেন— দুর্যোধন বা দুর্যোধনের লোকেরা কি চিনে ফেলল তাঁর ছেলেদের, নাকি মায়াবী রাক্ষসেরা কিছু করল? সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা— ভগবৎ-প্রতিম ব্যাসের কথা কি তা হলে সব মিথ্যে হয়ে গেল— বিপরীতং মতং জাতং ব্যাসস্যাপি মহাত্মনঃ।

আমরা এটা জানি যে, ব্যাস কিন্তু দ্রৌপদীর কথা পূর্বাহ্ণেই কুন্তী এবং পাণ্ডবদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানিয়েছিলেন এবং এটাও বলেছিলেন যে, পাঁচজনের স্ত্রী হবেন দ্রৌপদী। এই অবস্থায় একবারও কুন্তীর মনে দ্রৌপদীর কথা উদয় হয়নি, এটা কি খুব যুক্তিসঙ্গত হবে! অতএব যে মুহূর্তে অর্জুন-ভীম স্বয়ংবর-লব্ধা দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের দরজা থেকেই ঘোষণা করলেন— মা! ভিক্ষা এনেছি— সেই মুহূর্তেই কুটীরের অন্তরাল থেকে কুন্তী বললেন— সবাই মিলে ভিক্ষা ভাগ করে নাও— এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার মধ্যে কুন্তী নবাগতা দ্রৌপদীকেই এই ঘোষণা শোনাতে চেয়েছেন। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, কুন্তী অন্য কোনও প্রতিক্রিয়াশীল শাশুড়ির মতো নন। পুত্রবধূ দ্রৌপদীর সঙ্গে কুন্তীর সম্পর্ক চিরকালই খুব ভাল ছিল এবং পুত্রবধূর সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধাও কিছু কম দেখিনি। কিন্তু বিবাহ-পূর্ব মুহূর্তেও ভাবী পুত্রবধূর চাইতেও ছেলের জন্য জননীর ভাবনা বেশি থাকে এবং পুত্রদের প্রতি কুন্তীর স্নেহ সমান এবং মাদ্রীপুত্র সহদেবের জন্য একটু বেশিই। ঠিক এইরকম একটা মানসিক অবস্থানে কুন্তী কিছু না বুঝে পাঁচ ভাইকে ভিক্ষা ভাগ করে নিতে বলেছেন, এটা আমার কাছে তর্কসহ মনে হয় না। বিশেষত যিনি একটু আগেই ভাবছিলেন যে, ভগবান ব্যাসের কথা কি তা হলে বিপরীত হয়ে গেল— তিনিই তো দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর অবশ্যম্ভাবিতা জানিয়ে পাণ্ডবদের পঞ্চাল-নগরে বাস করার নির্দেশ দিয়েছিলেন— পঞ্চাল-নগরে তস্মান্নিবসধ্বং মহাবলাঃ— যাতে সেই মেয়েটিকে লাভ করতে পারেন পাণ্ডবরা।

এত সব কি ভুলে গিয়েছিলেন কুন্তী! হতেই পারে না। আমরা যদি ব্যাসকথিত দ্রৌপদীর পূর্বজন্ম-কথাটাকে একটা অলৌকিক কাহিনি হিসেবেও ধরি, যদি এমনও বলি যে, ভবিষ্যতে পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিয়ে হয়েছিল বলেই এক রমণীর বহুভর্তৃতার মধ্যে বহুগামিতার দোষ কাটানোর জন্য মহাভারতের কবি পূর্বাহ্নেই দ্রৌপদীর পূর্বজন্ম কথা উচ্চারণ করে রেখে দ্রৌপদীর সঙ্গে পাণ্ডবদের বিয়ের একটা মহাকাব্যিক যৌক্তিকতা তৈরি করে রেখেছিলেন, তা হলে কুন্তীকে আমরা সমস্ত প্রক্রিয়াটির অনুঘটিকা হিসেবে চিহ্নিত করতে চাই। তিনিই তাঁর ছেলেদের কাছে পঞ্চাল-রাজ্যে যাবার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং পঞ্চালে আসা ইস্তক দ্রৌপদী-স্বয়ম্বরের সংবাদ বার বার তাঁর শ্রুতিতে আসাই স্বাভাবিক। ঠিক এই অবস্থায় সমস্ত পাণ্ডবেরা সকলে অপরাহ্নের মেঘদুর্দিন প্রায়ান্ধকারে অন্যান্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বাড়ি ফিরছেন— ব্রাহ্মণৈঃ প্রাবিশত্তত্র জিষ্ণুর্ভার্গববেশ্ম তৎ— এবং কুটিরদ্বারেই ভীম-অর্জুনের সাগ্রহ ঘোষণা— মা! ভিক্ষা এনেছি— আর পরিবেষ্টা ব্রাহ্মণেরা সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন নাকি, তাঁরা তো সেই স্বয়ম্বর-শেষ থেকেই চেঁচাচ্ছিলেন যে, এই স্বয়ম্বর-সভাটা ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যেই শেষ হল, ব্রাহ্মণরাই পাঞ্চালীকে পেয়েছে— বৃত্তো ব্রহ্মোত্তরো রঙ্গঃ পাঞ্চালী ব্রাহ্মণৈর্বৃতা— ঠিক এই অবস্থায় কুন্তী একেবারে নিস্তরঙ্গ মধ্যযুগীয় ঠাকুরমার মতো যা করছিলেন, গভীর নিস্তব্ধতায় তাই করতে-করতেই পান চিবোতে লাগলেন এবং ততোধিক নিস্তরঙ্গতায় ছেলেদের বললেন— ভিক্ষা ভাগ করে নাও— এত বড় বোকার ভুল কুন্তীর মতো বিদগ্ধা রমণী করতে পারেন না। বরঞ্চ বলব— এই ইচ্ছাকৃত সব বুঝেও না বুঝে বলার মধ্যেই তাঁর প্রকৃত ইচ্ছাশক্তি কাজ করছিল। তিনি চাইছিলেন— তাঁর পাঁচ ছেলেই লাভ করুক সুন্দরীশ্রেষ্ঠা দ্রৌপদীকে।

তবে এত সব অন্তর্নিহিত মনের কথা পরিষ্কার করে বলতে চাননি মহাভারতের কবি।

অতএব কাহিনির উপরি-অংশে রসিকতার ভাগই বেশি রইল। মা যে কুটিরের অন্তরাল থেকে বললেন— ভিক্ষাবস্তু ভাগ করে নাও বাছারা, এবং তার পরেই আগুনপানা দ্রৌপদীকে দেখে নববধূর হাত ধরে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে বলেছেন— এখন আমি কী করব? যাতে আমার কথাটাও মিথ্যে না হয়, অথচ ধর্মও সুস্থির থাকে এবং পঞ্চালনন্দিনীর কোনও অধর্ম না হয়, সেইরকম কিছু করো। মায়ের কথা শুনে যুধিষ্ঠির প্রথমেই যে সমাধান দিয়ে দিতে পারতেন, তা কিন্তু দেননি। যে নায়ক অসামান্য দক্ষতায় লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে জিতেছেন, যুধিষ্ঠির প্রথমে সেই অর্জুনকে 'অফার' দিয়ে সবচেয়ে যথার্থ কথাটা বললেন। বললেন— অর্জুন! তুমিই যাজ্ঞসেনী পাঞ্চালীকে লক্ষ্যবেধ করে জিতেছ এবং তোমার পাশেই রাজপুত্রীকে সবচেয়ে বেশি মানাবে— ত্বয়া জিতা ফাল্গুন যাজ্ঞসেনী/ ত্বয়ৈব শোভিষ্যতি রাজপুত্রী। অতএব কোনও দ্বিধা নেই, তুমিই অগ্নিসাক্ষী করে তাঁকে বিধি অনুসারে গ্রহণ করো।

অন্য কোনও পাণ্ডব হলে কী হত বলতে পারব না, কিন্তু অর্জুন এই সময়ে যে ব্যবহার করলেন, তা একমাত্র মহাকাব্যিক বীরকেই মানায়। অসামান্য এক বীরোচিত সৌজন্যবোধ সবসময়েই তাঁর মধ্যে কাজ করে, অতএব সেই বীরোচিত ভদ্রতাতেই অর্জুন নিমেষে যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন— না, মহারাজ! না। তুমি এইভাবে আমাকে অধর্মের পথে ঠেলে দিয়ো না। এ-রকম ব্যবহার তো অশিষ্টজনের মধ্যে দেখা যায়। দুই বড় ভাইয়ের বিয়ে হল না, তার আগেই আমি বিয়ে করে বসব, এটা হয় নাকি? সবার আগে তো তোমার বিয়ে হোক, তারপর ভীমসেন, তারপর তো আমি— ভবান্ নিবেশ্যঃ প্রথমং ততোঽয়ং/ ভীমো মহাবাহুরচিন্ত্যকর্মা। অহং ততঃ...। আর এ-ব্যাপারে তুমি সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা কোরো না। আমরা সবাই এবং এই নবলব্ধা কন্যা— সবাই আমরা তোমার কথা শুনেই চলব।

এ-দেশে এটা অবশ্য একটা চিরকালীন আচারের মধ্যেই পড়ে। কন্যা বয়স্থা হলে সবার আগে তার বিবাহের ব্যবস্থা করতে হত এবং তার পরেই বড় ভাই। এই সমুদাচার এবং সদাচার এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে এক সময়ে স্মৃতিশাস্ত্রকারেরা সমাজ-বিধান দিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন যে, বড় ভাইয়ের বিয়ের আগেই যদি ছোটভাই বিয়ে করে বসে, তবে তার সংজ্ঞা হবে 'পরিবেত্তা' এবং 'পরিবেত্তা'-র চিহ্ন বহন করাটা সমাজের চোখে খুব সহনীয় ছিল না। অর্জুন তাই প্রথমত এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং অন্যদিকে পাণ্ডব-ভাইদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে 'সেন্‌সিটিভ' বলেই মায়ের মন এবং যুধিষ্ঠিরের মনোগত ইচ্ছার কথা তিনি আগেই বুঝেছেন। এ-ব্যাপারে যিনি অপরা, তাঁর মতামত নেওয়াটা আধুনিক দৃষ্টিতে জরুরি ছিল, কিন্তু অর্জুন সবাইকে হারিয়ে যে বীররমণীকে জিতে এনেছেন, তিনি যে অর্জুনের কথা শুনবেন— এ-কথাও অর্জুনের বোঝা হয়ে গেছে। বোঝা হয়ে গেছে— তিনি অর্জুনকে অতিক্রম করবেন না।

অদ্যতনেরা বলেন— ও-সব ভাবের কথা বলবেন না। অর্জুন কিছুই বোঝেননি। শুধু এইটুকু তিনি বুঝেছেন তাঁর বলবান পৌরুষেয় অহংকারে যে, তিনি লক্ষ্যভেদ করে যাঁকে স্বয়ংবরে জিতে নিয়ে এসেছেন, এবং অন্যান্য রাজা-রাজড়াদের যুদ্ধে পরাজিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে যাঁর অধিকার পেয়েছেন, তাঁর ওপরে অর্জুন নিজের অধিকার-কর্তৃত্বেই এ-কথা বলেছেন। বলেছেন— এই কন্যাটিও তোমার কথা শুনবে। আমরা বলব— মহাকাব্যিক সমাজ এবং তার পরিমণ্ডলে এই ঘটনা এত জটিল ছিল না। বিশেষত দ্রৌপদীকে নিয়ে যে অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে— মায়ের কথা, ভাইদের একতা— সব কিছু মিলিয়ে এই পরিস্থিতিতে অর্জুন বলেছিলেন— আমরা সব ভাইয়েরা এবং এই কন্যা সকলেই তোমার কথা মেনে নেব, তুমি তোমার সিদ্ধান্ত বল— বৃকোদরোঽহঞ্চ যমৌ চ রাজন্/ইয়ঞ্চ কন্যা ভবতো নিযোজ্যাঃ।

অর্জুনের এই বীরোচিত ভদ্রতার অব্যবহিত পরমুহূর্তে অন্যান্য পাণ্ডব-ভাইদের প্রতিক্রিয়া ছিল দেখার মতো। যেই তাঁরা বুঝলেন— অর্জুনের কথার মধ্যে ভাইদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং স্নেহ আছে— ভক্তিস্নেহসমন্বিতম্— এবং যখন বুঝলেন যে, অর্জুন স্বয়ংবরে দ্রৌপদীকে এককভাবে জিতে নেবার স্বাধিকার ত্যাগ করে সে-অধিকার ভাইদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চান, সেই মুহূর্তেই সমস্ত পাণ্ডব-ভাইরা দ্রৌপদীর ওপর নিজেদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন— দৃষ্টিং নিবেশয়ামাসুঃ পাঞ্চাল্যাং পাণ্ডুনন্দনাঃ। পুরুষের এই দৃষ্টি কেমন হয়, বিশেষত যে মুহূর্তে এই মানসিক প্রশ্রয় থাকে যে, এই রমণী আমারই হতে পারে, তখন এই দৃষ্টি কেমন হয়, এই দৃষ্টির প্রকৃতি কী এবং রমণী-শরীরের কোথায় কোথায় এই দৃষ্টি পড়ে, তা মেয়েরাই সবচেয়ে বেশি বোঝে এবং অবশ্যই বোঝে 'অন্তঃশাক্তঃ বহিঃ শৈবঃ' সেইসব পুরুষেরা, যারা নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করে না। মহাকবি কালিদাস তাঁর কুমারসম্ভব কাব্যে ব্যঞ্জনার সংক্ষিপ্তিতে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন একবার মনের অজান্তেও পুষ্পশরের মৃদু আঘাতেই পরম যোগী ভগবান শংকরের জ্ঞানাগ্নিদীপ্ত তৃতীয় নয়ন সহ তাঁর সবগুলি চক্ষুই যুবতী উমার বিম্বফলসদৃশ অধরৌষ্ঠের ওপর নিপতিত হয়েছিল— উমামুখে বিম্বফলাধরৌষ্ঠে/ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি।

মহাকাব্যের কবিও তো কম ব্যঞ্জনা-মুখর নন। এমনকী কালিদাসের মতো তিনি রমণী-শরীরের কোনও প্রতীকি অঙ্গসংস্থানও বেছে নেননি পরম কবিত্বময়তায়। কারণ তিনি জানেন— এ হল সেই মুহূর্ত, যখন পুরুষ রমণীর সমস্ত প্রত্যঙ্গসংস্থানে যৌনতার দৃষ্টি-সংক্রমণ ঘটায়। অতএব মহাভারতের কবি সমস্ত সান্দৃষ্টিক বুদ্ধিতে অত্যন্ত সরলভাবে জানিয়েছেন— সব পাণ্ডব ভাইয়েরাই তখন কৃষ্ণা-পাঞ্চালীর ওপর দৃষ্টিপাত করলেন। আর ঠিক এইখানে স্ত্রী-হৃদয়ের প্রতিক্রিয়ায় পাঞ্চালী কৃষ্ণাও কিছু শরম-বিজড়িতা অবগুণ্ঠনবতী নন— তিনিও তাঁদের দেখছিলেন, তাঁদের মোহ দেখছিলেন, তাঁরা কীভাবে তাঁকে দেখছিলেন, তাও দেখছিলেন নিশ্চয়ই— দৃষ্টা তে তত্র পশ্যন্তীং সর্বে কৃষ্ণাং যশস্বিনীম্। অর্থাৎ তিনিও পরিমাপ করছিলেন পঞ্চপাণ্ডব ভাইদের। যে-সব প্রগতিবাদিনীরা আমাকে এক বিদ্বৎসভায় বোঝাতে চেয়েছিলেন— এ এক বিষম অন্যায় হয়ে গিয়েছিল— যুধিষ্ঠির অন্যায়ভাবে পাঁচ-পাঁচটা পুরুষের আপদ চাপিয়ে দিয়েছিলেন নবাগতা স্বয়ংবর বধূটির ওপর— তাঁদের প্রতি পরম করুণায় জানাই— মহাভারতের পরমা এবং চরমা নায়িকাকে ওই একবিংশ শতাব্দীর পরিশীলনে একাকিনীর ধারণ ক্ষমতায় বিচার করবেন না। বিশেষত যে রমণী স্বয়ংবর-সভার নিয়ম অতিক্রম করে সমাগত রাজা-রাজড়াদের সামনে কর্ণকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যাখ্যান করতে পেরে থাকেন, সেই রমণীর যদি পঞ্চস্বামীর ব্যাপারে অনভিপ্রায় থাকত, তা হলে এই মুহূর্তে তিনি প্রতিবাদ করতেন। এবং প্রতিবাদ করলে স্বয়ংবরের ধর্মবোধে যুধিষ্ঠির তা মেনেও নিতেন। কেননা কী হওয়া উচিত, তা তিনি অর্জুনকে প্রথম 'অফার' দিয়েই বুঝিয়ে দিয়েছেন।

অতএব আমরা বলব— কৃষ্ণা পাঞ্চালী এই পরিস্থিতিটা 'এন্‌জয়' করছিলেন এবং আদিম ভাবেই 'এন্‌জয়' করছিলেন। পাঁচ-পাঁচটা বীর পুরুষ তাঁর দিকে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করছেন— এই অবস্থায় প্রতিক্রিয়া তাঁদেরও পরিষ্কার চোখে দেখে নেওয়াটা যেমন তাঁর সাহসের মধ্যে পড়ে, তেমনই তাঁর প্রতিকামিতার আমোদের মধ্যেও পড়ে। মহাকাব্য মহাভারতের প্রধানতমা নায়িকার এই সাহসও আছে এবং তেমনই প্রতিকামিতাও আছে। যদি এখানে একান্তভাবেই পশ্যমানা প্রেক্ষমাণা পাঞ্চালীর নিগূঢ় সম্মতি না থাকত, তা হলে সমস্ত পাণ্ডবরা তাঁকে একই সঙ্গে আপন আপন হৃদয়ে ধারণ করতে পারতেন না— কবি লিখেছেন— দ্রৌপদীকে দেখে তাঁরা একে অপরের মুখ চাওয়াচায়ি করেছেন এবং সকলেই তাঁকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করেছেন— সম্প্রেক্ষ্যান্যোন্যমাসীনা হৃদয়ৈস্তাম্ অধারয়ন্।

আমাদের এখানে প্রথম জিজ্ঞাসা হয়— অর্জুন যখন যুধিষ্ঠিরের প্রথম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে পাঞ্চালী কৃষ্ণাকে স্বাধিকার থেকে মুক্ত করে দিলেন, তারপর সকল পাণ্ডবরাই যে পাঞ্চালীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন— পাঞ্চাল্যাং পাণ্ডুনন্দনাঃ— এই দৃষ্টিপাতের মধ্যে কি অর্জুনও আছেন, আছেন কি যুধিষ্ঠিরও, যিনি নিজে প্রায় বিচারকের আসনে বসে আছেন পরিস্থিতি বিচার করে ঘোষণা করার জন্য। আমরা মনে করি অবশ্যই আছেন, তা নইলে অমন একটা সাধারণ বহুবচন প্রয়োগ করতেন না মহাভারতের কবি— পাঞ্চাল্যাং পাণ্ডুনন্দনাঃ। আর আমি আগে যা বলেছিলাম— পুরুষের এই প্রথম সাগ্রহ দৃষ্টিপাতে দ্রৌপদী নিজেই যথেষ্ট পুলকিত হয়েছেন বলে আমরা মনে করি। দেখুন, মহাকাব্যিক সমাজে পুরুষের বহু-বিবাহ প্রথা চালু ছিল, কিন্তু স্ত্রীলোকের বহু-স্বামিকতার চলন ছিল না এবং তা না থাকার সমাজগত কারণ আছে— তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সন্তানের পরিচয়-স্পষ্টতা নিয়ে। কার ঔরসে কার জন্ম হচ্ছে— এখানে এমনই এক পৌরুষেয় অধিকারের বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল, যার ফলে স্ত্রীলোকের এক স্বামিত্বের ভাবনাটা বাস্তব কারণেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পণ্ডিতরা এ-কথা বার বার স্বীকার করেন যে, বৈবাহিক প্রথার মাধ্যমে স্ত্রীলোকের যৌনতাকে নিজের অধিকারে রাখাটাই এখানে পুরুষ মানুষের 'মোটিভেশন' হিসেবে কাজ করেছে এবং স্ত্রীলোকের এক-পুরুষগামিতার ঘটনাটাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এমনভাবে 'আইডিয়ালাইজ্' করে ফেলা হয়েছে যে, বহুস্বামিকতা এবং বহুপুরুষগামিতাকে মেয়েরাই আত্মিকভাবে প্রত্যাখ্যান করে এবং সেটা শুধু ভারতবর্ষের সতীভাবিত দেশে নয়, সব সমাজেই প্রায় তাই।

স্ত্রীলোকের পক্ষে এক-স্বামিকতার যে 'আইডিয়ালাইজেশন', এটাকেই আমাদের দেশে আমরা সংস্কার বলি, আর ওদের দেশের বিশেষ ভাষায় এটা 'culturally induced social conditioning' বলেন। পণ্ডিতেরা দেখিয়েছেন— নারীপ্রগতিবাদিনীরা যেদিন থেকে তাঁদের শরীর এবং মনের ওপর স্বাধীনতা ঘোষণা করতে আরম্ভ করেছেন, সেদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকেই সমাজ বহির্ভূত বহুগামিতার মধ্যে না গিয়ে 'Serial monogamy' ব্যাপারটা তাঁরা বেশি পছন্দ করছেন। অসীম ব্যক্তিত্বময়ী দ্রৌপদীর ক্ষেত্রেও এই ঘটনা ঘটেছে কিনা, তা আমরা খুব পুস্তকানুসারী উপায়ে বলতে পারি না। কিন্তু লক্ষ করে দেখুন, দ্রৌপদী কিন্তু পঞ্চ পাণ্ডব ভাইয়ের প্রকট কামদৃষ্টিকে প্রত্যাখ্যান করছেন না, ঘৃণার চোখেও দেখছেন না, বরঞ্চ উদার চোখে দাঁড়িয়ে দেখছেন— তাঁরা কী দেখছেন। ব্যাস সাফাই গেয়েছেন পরে, কিন্তু পাঁচ ভাইয়ের অবস্থা বর্ণনা করেছেন— ঈষৎ অনিবার্য কামনার ভাষায়। তিনি বলেছেন— কী আর করা যাবে বলো, পাঞ্চালী কৃষ্ণার চেহারাটাই এমন যে তাঁকে দেখলে কামনার উদ্রেক হবেই, সমস্ত পুরুষের কাছেই তিনি সহনীয়— কাম্যং হি রূপং পাঞ্চাল্যা বিধাত্রা বিহিতং স্বয়ম্— তিনি অন্যা রমণীদের মতো নন, সকলের চাইতে আলাদা এবং সকলেরই মনোহরণ, ফলে পাঁচ পাণ্ডব ভাই যখন দ্রৌপদীর দিকে ভাল করে তাকালেন এবং যখন বুঝলেন— এই মনোহরণ রমণী তাঁরও হতে পারে, তখন তাঁদের সমস্ত ইন্দ্রিয়-দমনের শক্তি যেন শিথিল হয়ে গেল, তাঁদের হৃদয়ে জেগে উঠল প্রবল কামনা— সম্প্রমথ্যেন্দ্রিয়গ্রামং প্রাদুরাসীন্মনোভবঃ।

আমি মহাভারতের কবির কাছে কৃতজ্ঞ এই কারণে যে, তিনি কোনও দ্বিচারিতা করেননি। তেমন তেমন জায়গায় রমণী-শরীরের বহিরঙ্গও যে ভদ্রলোক-ছোটলোক একাকার করে দেয়, মহাকবি সেটা লুকিয়ে রাখেননি। আমি জানি, ভদ্রা সুবুদ্ধিমতী বিষয়াভিজ্ঞা বিদুষীরা এই বৈয়াসিকী ভাষায় বিব্রত হবেন এবং আরও একবার বলবেন— এই হল সেই জায়গা, যেখানে পুরুষমানুষই তার পৌরুষেয় ভাষায় স্ত্রীলোককে 'কমোডিটি' বানিয়ে ফেলছে, সমস্ত মহাভারত জুড়ে দ্রৌপদীর এই 'কমোডিটাইজেশন' অথবা 'কমোডিফিকেশন' চলেছে। আমি শুধু এইখানে আপনাদের দোহাই চাইব, বলব— সমস্ত ব্যাপারটাকে এত জটিল করে তুলবেন না এখনই। বরঞ্চ এটাকে যদি অতিসাধারণ দেহতত্ত্ব, তথা রমণী-শরীর দর্শনে পুরুষের যৌন জাগরণের তাত্ত্বিকতা দিয়ে বিচার করেন, তবে মহাভারতের কাল তথা দ্রৌপদীকে বোঝা অনেক সহজ হবে। আর মনে রাখবেন, পাঁচ ভাই পাণ্ডবের এই প্রতিক্রিয়াটা তিনি কিন্তু দেখছেন এবং বাধা দিচ্ছেন না। আমি বলব— 'এনজয়' করছেন। এবং অবশেষে সব দেখেশুনে যুধিষ্ঠির যখন এই সিদ্ধান্ত দিলেন— আমাদের সকলেরই স্ত্রী হবেন দ্রৌপদী— সর্বেষাং দ্রৌপদী ভার্যা ভবিষ্যতি হি নঃ শুভা— তখনও দ্রৌপদী কিন্তু প্রতিবাদ করেননি। এবং আমি বলব— তিনি 'এন্‌জয়' করছিলেন। এই মুহূর্তটা বেশ করুণও বটে। পাঁচ-পাঁচজন যুদ্ধবীরের চোখ তখন কৃষ্ণা পাঞ্চালীর দিকে। প্রত্যেকে একবার দ্রৌপদীর দিকে তাকান, আরেকবার ভাইদের দিকে। সবার হৃদয়ে তখন সুন্দরী কৃষ্ণা, পঞ্চবীর পাণ্ডবেরা তাঁকে হৃদয়ে ধারণ করেছেন— হৃদয়ৈস্তামধারয়ন্। মনে মনে বোধহয় এঁদের একটু ভয়ও ছিল। যে রমণী উন্মুক্ত রাজসভায় সুতপুত্র কর্ণকে অত্যন্ত কটুভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তিনি যদি এখন বলে বসেন— আমাকে যিনি জিতে এনেছেন, আমি তাকেই চাই, তা হলে কী হবে! পাণ্ডবদের ভাগ্য ভাল, দ্রৌপদী সে-কথা বলেননি। বরঞ্চ পাঁচ ভাইয়ের টেরা চোখের চাউনিতে এবং অর্জুনের বদান্যতায় দ্রৌপদী তখন ক্ষণিক বিব্রত। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন— অর্জুনের উপরোধে এখন যদি জ্যেষ্ঠটির, মানে, ওই

ধর্মমার্কা যুধিষ্ঠিরের গলায় মালা দিতে হয়, তার চেয়ে একদমে পাঁচজনকে সামলানো অনেক ভাল— অন্তত তার মধ্যে তো অর্জুন থাকবেন। সেই অর্জুন, যিনি তাঁর যুবতী হৃদয়ের প্রথম অতিথি, সেই অর্জুন যিনি সবার মধ্যে সবলে জিতে এনেছেন তাঁকে।

যুধিষ্ঠির এতক্ষণ ভাইদের মুগ্ধ চোখগুলি আর মদনাহত চেহারা লক্ষ করে যাচ্ছিলেন। এইবার তাঁর মহর্ষি দ্বৈপায়নের কথা মনে পড়ল। ঋষি না বলেছিলেন— তোমাদের পাঁচজনের স্ত্রী হবেন দ্রৌপদী, এইটাই বিধাতার বিধান— নির্দিষ্টা ভবতাং পত্নী কৃষ্ণা পার্ষত্যনিন্দিতা। কিন্তু কেন এমনটি বলেছিলেন ঋষি— সেকথা পৌরাণিকের দিক থেকে একরকম, যুধিষ্ঠিরের দিক থেকে অন্যরকম। পৌরাণিক দার্শনিকেরা পোড়ো বাড়ির দরজা আর খ্যাপা হাওয়াকে এমনভাবে মেলান যে, পাঠকের মনে হবে খ্যাপা হাওয়ার জন্যেই বুঝি বা বাড়িটার অমন পড় পড় অবস্থা। এর অভিশাপ, তার তপস্যা, অমুকের পূর্ব জন্মের সামান্য ঘটনা— সব পুরাণকারেরা মিলিয়ে দেন, এবং কপাল ভাল থাকলে দার্শনিকের সায়-সম্মতিও জুটে যায় তাতে। দ্রৌপদীর বেলাতেও তা জুটেছে। কেমন করে জুটেছে, তার আগে ব্যাসের অনুভবে দ্রৌপদীর পূর্বজন্মের গল্পটা শোনাই, তারপর দর্শন।

ব্যাস দ্রৌপদীর বিয়ের অনেক আগে পাণ্ডবদের বলেছিলেন যে, পূর্বজন্মে দ্রৌপদী ছিলেন এক ঋষির কন্যা। পরমা রূপবতী; এমনকী এই ঋষিকন্যা সোজা হয়ে দাঁড়ালে তার কোমরের মাঝখানটা যে কোথায় সেঁটে থাকে তা বোঝাই যায় না— বিলগ্নমধ্যা সুশ্রোণী সুভ্রূঃ সর্বগুণান্বিতা। এ হেন সুন্দরী মেয়েরও দুর্ভাগ্য হল স্বকৃত কর্মদোষে, যাতে তার বিয়েই হল না, জুটল না মনোমত বর। সে তখন তপস্যা আরম্ভ করল ভগবান শংকরের। তুষ্ট ভগবান বর দিতে চাইলে কন্যা সর্বগুণে গুণী এক পতি চাইলেন। পাছে ভোলেভালা শিব কন্যার আকাঙ্ক্ষা না বোঝেন, তাই সে বারবার ইচ্ছেটি পরিষ্কার করে জানাল। কিন্তু ঈশ্বর, বিশেষত বরদ ঈশ্বরের কাছে বৃথা কথা চলে না। যা বক্তব্য যা ঈপ্সিত তা একেবারেই স্পষ্ট করে তাঁকে জানাতে হয়। অতএব শিব বললেন— তুমি যেহেতু পাঁচবার স্বামী চেয়ে বর মেগেছ, তাই তোমার বরও হবে পাঁচটা। পূর্বজন্মের ঋষিকন্যা এতদিন বিয়ে না করে থাকার ক্ষোভেই যেন বিনা বাক্যব্যয়ে, বিনা আপত্তিতে পঞ্চস্বামী-সম্ভোগের কথা মেনে নিয়ে বললেন— এবম্ ইচ্ছামি— তাই হোক প্রভু, তোমার দয়ায় তাই হোক— এবমিচ্ছাম্যহং দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ পতিং প্রভো।

এই যে দ্রৌপদীর পূর্বজন্মে পাঁচবার বর চেয়ে পাঁচ স্বামী লাভ করার ঘটনা ঘটল, তাতে এক মহা সমস্যা হয়েছে দার্শনিকদের। অবশ্য তাঁদের আসল সমস্যাটা আরও গভীরতর। তাঁরা বললেন— যজ্ঞাদির বিনিয়োগে এমন কথা তো পাওয়া যায় যে, 'সমিধ যজন করছে', 'তনূনপাত্ যজন করছে'— সমিধো যজতি, তনূনপাত্ যজতি। এক্ষেত্রে 'যজতি' অর্থাৎ যজন করার ব্যাপারটা কি আলাদা আলাদা পাঁচবার বোঝাবে, নাকি একবার? মীমাংসক দার্শনিকেরা কিন্তু বেদের বিনিয়োগমন্ত্রগুলিতে বেশির ভাগ সময়েই আক্ষরিক অর্থে ধরেন এবং সেই নিরিখেই তাঁরা বললেন— যজন করার ব্যাপারটা যখন পাঁচবার উচ্চারণ করা হয়েছে, তখন ওই যজ্ঞের ভাবনা কিংবা যজ্ঞীয় কর্মে ভেদ একটা স্বীকার করতেই হবে। অর্থাৎ একের মধ্যেও একটা বিভিন্নতা আছে। এই প্রসঙ্গে তাঁরা 'পঞ্চেন্দ্রোপাখ্যান' বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি পুরাকাহিনি স্মরণ করেছেন। কাহিনিটি আর কিছুই নয়, সেই তপস্যা করতে করতে বুড়ো হয়ে যাওয়া দ্রৌপদীর কাহিনি। দার্শনিকদের মতে এখানে দেবতা একটাই, এবং তিনি হলেন প্রধান দেবতা ইন্দ্র।

বেদের কাহিনিতে ত্বষ্টার ছেলেকে বধ করার সময় ইন্দ্রের তেজ ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করেছিল, বল প্রবেশ করেছিল বায়ুতে আর তাঁর রূপ প্রবেশ করেছিল দুই অশ্বিনীকুমারের মধ্যে। অর্ধেকটা অবশ্য ইন্দ্রের নিজের মধ্যেই ছিল। অতএব একই ইন্দ্রের ধর্মাংশ কুন্তীর গর্ভে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জন্ম দিলেন। বল স্বরূপ বায়ু-অংশ মহাবলী ভীমের জন্ম দিলেন। অশ্বিনীকুমার-দ্বয় মাদ্রীর গর্ভে জন্ম দিলেন নকুল আর সহদেবকে। এঁরা দু'জনেই ইন্দ্রের রূপ-স্বরূপ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সন্তান বলে অত্যন্ত রূপবান বলে পরিচিত। ইন্দ্র স্বয়ং তাঁর আপন অপ্রতিম অর্ধ দিয়ে কুন্তীর গর্ভে অর্জুনের জন্ম দিলেন। তা হলে এই পাঁচজনই ইন্দ্রের অবয়ব এবং ইন্দ্র থেকেই জন্মলাভ করায় এক এবং অদ্বিতীয় ইন্দ্রই এঁদের মূল জন্মদাতা— পঞ্চাপীন্দ্রাবয়ব-প্রকৃতিত্বাদ্ ইন্দ্রা এবেতি পঞ্চেন্দ্রোপাখ্যানে।

দার্শনিকের এই উদার দৃষ্টিতে অবশ্য দ্রৌপদীর ওপর অসতীত্বের সেই চিরন্তন আরোপ অনেকটাই কমে যায়। এমনকী অর্জুনের লক্ষ্যভেদও অনেক বেশি সযৌক্তিক হয়ে ওঠে এই সুবাদে, কারণ ইন্দ্রের অর্ধাংশই রয়েছে অর্জুনের মধ্যে। কিন্তু দ্রৌপদীর ওপর অসতীত্বের আরোপ যতই কমুক, পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে ভাগ হয়ে ইন্দ্র যদি একাও জন্মে থাকেন, তবু বাস্তবে তাঁর ওই পঞ্চ-অবয়ব-বিশিষ্ট পঞ্চপাণ্ডব ভ্রাতারা কিন্তু কেউই নিজের নিজের অধিকার ছাড়েননি। কাজেই দ্রৌপদীকে বিয়ে করার জন্য যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাব অর্জুন যেই প্রত্যাখ্যান করলেন, যেই অর্জুন বললেন অগ্রজদের অনুক্রম নষ্ট করে এখনই তাঁর বিয়ে করা সাজে না; সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু পাঁচ ভাই পাণ্ডবেরা প্রত্যেকে অনিমিখে দেখছিলেন দ্রৌপদীকে— দৃষ্টিং নিবেশয়ামাসুঃ পাঞ্চাল্যাং পাণ্ডুনন্দনাঃ। প্রত্যেকেই একবার চকিতে তাকিয়ে-থাকা দ্রৌপদীকে দেখেন, আরেকবার অন্যভাইদের দেখেন। হ্যাঁ, দ্বৈপায়ন ঋষির বিধান— পাঁচ জনেরই স্ত্রী হবেন দ্রৌপদী— এই অনুজ্ঞা যুধিষ্ঠিরের মনে পড়ল বটে, কিন্তু ভাইদের ভাবগতিক এবং তাঁদের মুখের চেহারায় তাৎক্ষণিক পরিবর্তনই যুধিষ্ঠিরের কাছে বড় হয়ে দেখা দিল— তেষাম্ আকারভাবজ্ঞঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ। ব্যাসের বচনের থেকেও তাঁর বেশি মনে হল— যদি শেষে সুন্দরী কৃষ্ণার কারণে ভাইতে ভাইতে বিবাদ লাগে! যুধিষ্ঠির ভাইদের মুখগুলি দেখে বুঝলেন— ভাইদের একজনও যদি কৃষ্ণার সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত হন, তা হলে তাঁদের মনে জন্মাবে সেই অন্তর্দাহ, যা তাঁদের পাঁচ ভায়ের একজোট ভেঙে দেবে। অতএব ভাই-ভাই ঝগড়া হওয়ার চেয়ে— মিথো ভেদভয়ান্নৃপঃ— যুধিষ্ঠির মায়ের প্রস্তাবই মেনে নিলেন। ঠিক হল পাঁচজনেরই ঘরণী হবেন দ্রৌপদী। অবশ্য প্রথম বাধাটা এল মহারাজ দ্রুপদের দিক থেকেই।

কথাটা খুব অল্পের ওপর একটা অন্তর্মানসিক সিদ্ধান্তের মধ্যে সেরে ফেলা হল বটে, কিন্তু এটা ভীষণ এবং ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ যে দ্রৌপদীর মতো এক বিদগ্ধা সুন্দরী রমণী যদি শুধুমাত্র অর্জুনের স্ত্রী হতেন, তা হলে অন্যান্য পাণ্ডব-ভাইদের মনে এক ধরনের ঈর্ষা-অসূয়ার জন্ম হওয়াটা খুব স্বাভাবিক ছিল। পাঁচ পাণ্ডব-ভাই তাঁকে পেয়েছেন, এই ঘটনায় কৌরবদের

অনেকের মধ্যেই এই দীর্ঘনিশ্বাস শোনা গেছে যে, ওরাই শুধু দ্রৌপদীকে পেল— তৈর্লব্ধা দ্রৌপদী ভার্যা দ্রুপদশ্চ সুতৈঃ সহ। অতএব এটাও বেশ অনুমানযোগ্য যে, একতাবদ্ধ পাঁচ পাণ্ডবভাই, যাঁরা ভবিষ্যতের রাজনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের শাসনে জীবন অতিবাহিত করছেন, তাঁদের একতাবদ্ধ রাখার জন্য দ্রৌপদীর বিবাহ-বিষয়ক সিদ্ধান্তটি একদিকে যেমন সকলের স্ত্রৈণ ভাবনার তৃপ্তি ঘটাল, তেমনই রাজনীতির দিক থেকেও তাঁদের একতা সুনিশ্চিত করল। পাণ্ডবদের মধ্যে বিবাহ-বিষয়ক সিদ্ধান্ত হয়ে যাবার পর কৃষ্ণ-বলরাম প্রচ্ছন্নভাবে এসে পৌঁছোলেন কুম্ভকার গৃহে। কৃষ্ণ-বলরাম অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে চলে যাবার পর রাতের খাওয়া-শোয়া নিয়ে কিছু চিন্তা করতে হল। যুধিষ্ঠিরকে বাদ দিয়ে চার ভাই ভিক্ষায় বেরোলেন এবং ফিরে এসে সম্পূর্ণ ভিক্ষালব্ধ বস্তু যুধিষ্ঠিরের কাছে জমা করলেন।

মহাভারতের কবি খুব প্রতীকীভাবে— মাত্র এক রাতের সাংসারিক সন্নিবেশ দেখাচ্ছেন। ভিক্ষালব্ধ বস্তু রান্না করলেন কুন্তী, কিন্তু তা পরিবেশন করতে দিলেন দ্রৌপদীকে এবং এখানে শাশুড়ি সুলভ যে অনুজ্ঞাটি ছিল, সেটাও একটা প্রতীকী অনুশাসন— অর্থাৎ, এই সংসারে খাবার-দাবার যা জুটবে, তার অর্ধেক খাবেন ভীম, বাকি অর্ধেক চার ভাই, কুন্তী এবং দ্রৌপদী। শোবার সময়ে একটা ঘরের মধ্যে সাত জন। সহদেব সারা ঘরে কুশ বিছিয়ে দিলেন, তার ওপরে মৃগচর্ম পাতা হল এক এক করে। পাঁচ ভাই পাণ্ডব দক্ষিণ দিকে মাথা করে শুলেন, গুরুজনের মর্যাদায় কুন্তী শুলেন পাণ্ডবদের মাথার দিকটায়, আর তাঁদের পায়ের দিকে শুলেন দ্রৌপদী। এখানে মহাভারতের কবি একটা চুটকি মন্তব্য করেছিলেন— দ্রৌপদী যেন শোয়ার সময় পাণ্ডবদের পা রাখার বালিশ হয়ে রইলেন— অশেত ভূমৌ সহ পাণ্ডুপুত্রৈঃ/ পাদোপধানীব কৃতা কুশেষু।

এই কথায় আমার বিষয়জ্ঞ বন্ধু-বান্ধবীরা বলেছিল— দেখলি তো! দ্রৌপদীও পায়ের বালিশ হয়ে গেলেন, পুরুষ-সমাজ তাদের কোনও অহংকার ছাড়েনি, দ্রৌপদীর মতো এমন বিশাল ব্যক্তিত্বময়ী রমণীকেও পায়ের তলায় পিষতে আরম্ভ করেছে, যেন foot-cushion— আসলে, এর আগে আমি, অন্য জায়গায় যা হয় হোক, মহাভারতের দ্রৌপদীর কিন্তু সে অবস্থা নয়, তিনি কিন্তু উদগ্র পৌরুষেয়তার প্রতিবাদ কিছু করতে পেরেছেন— এর আগে এই জাতীয় কথা কিছু বলে থাকায়— দ্রৌপদী পাঁচ ভাইয়ের পা-রাখার বালিশে পরিণত হলেন— এ-কথাটা যেন আমার আকাঙ্ক্ষিত প্রতিপাদ্যকে খণ্ডিত করে দেয়। বন্ধু-বান্ধবীরা তাই ছাড়ল না, আমাকে এক হাত নিল বটে। আমি বললাম— দেখ ভাই! পরের লাইনটা দেখ। মহাভারতের কবি লিখেছেন— এতে দ্রৌপদী কিছু মনে করেননি, পাঁচ পাণ্ডবদের ওপর কোনও অবজ্ঞার ভাবও নেমে আসেনি তাঁর দিক থেকে— ন চাপি দুঃখং মনসাপি তস্যা/ ন চাবমেনে কুরুপাণ্ডবাংস্তান্।

পণ্ডিতানী বান্ধবীরা বলেছিলেন— এই যে মনে করলেন না— এতে তো আরও বোঝা যায় যে, মনে করার যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু আপন মহদাশয়তার জন্য দ্রৌপদী এ-ব্যাপারকে ধরেননি বা মনে করেননি। এই যুক্তিজালের মধ্যে আমার অন্যতর এক ইতিহাসের পণ্ডিত— তিনি সেই সময়ে ঈষৎ রঙিন অবস্থায় ছিলেন— তিনি বললেন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন বিয়ে করে এনে মানুষটাকে পায়ের তলায় আড়াআড়ি শোয়ানো হয়েছিল। পাঁচ পাণ্ডবরা পা দিয়ে রাতের বেলায় উলটো-পালটা করেছে এই মানুষটার সঙ্গে। কিন্তু শুধু 'কাশ্মীরি তুরঙ্গমী'র মতো পেটা চেহারা বলে ভদ্রমহিলা সয়ে গেছেন এবং নতুন এসেছেন বলেও খানিকটা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। আমি বললাম— দেখ ভাই! ইতিহাসে পণ্ডিত হলেই মহাকাব্যের শব্দশক্তি বোঝা যায় না। খুব সাধারণ কল্পনাতেও একখানা ঘরে যদি এই সাতজনকে রাত্রে শুতে হয় তা হলে কুন্তীও পাঁচ পাণ্ডবদের মাথার ওপরে আড়াআড়িই শুয়েছিলেন। এরপর দ্রৌপদীকে শোয়ালে কোথায় শোয়াতেন তাঁরা। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও গুরুজনদের দিকে পা রেখে শোয়া যেত না। অতএব তাঁকে তো মাথার দিকে রাখতেই হবে। তা হলে দ্রৌপদীকে কোথায় স্থান দেবেন তাঁরা। পাশে শোয়ানোর উপায় নেই, তার কারণ এখন পাণ্ডবদের সঙ্গে তার বিধিসম্মত বিবাহই হয়নি। আর তা ছাড়া কোন পাণ্ডব ভাইয়ের পাশে শোবেন তিনি! অতএব পায়ের কাছে আড়াআড়ি। তাই এখানে সেই কুশশয্যায় দ্রৌপদী পাণ্ডবদের পা-রাখার বালিশের মতো শুয়ে রইলেন— পাদোপধানীব কৃতা কুশেষু। তবে এটা একটা আলংকারিক সমাধান— ভাড়া বাড়ির একটা ঘর, সেখানে মা এবং এখনও বিয়ে হয়নি এমন ভাবী বউকে নিয়ে শোয়া, ফলত পায়ের দিকে শোয়া দ্রৌপদীকে পা-রাখার 'কুশন'-এর তুলনা করে একদিকে কবি যেমন পাণ্ডবদের অসহায় বিকল্পহীনতার ইঙ্গিত দিয়েছেন, অন্যদিকে দ্রৌপদী যে এতে কিছু মনে করলেন না, ভাবী স্বামীদের অবজ্ঞা করলেন না, তাতে দ্রৌপদীর মতো দর্পশালিনী বিদগ্ধা রমণীও যে পাণ্ডবদের মনে মনে পছন্দ করে ফেলেছেন, এবং তাঁদের তিনি শ্রদ্ধাও করতে পারছেন, সেটা প্রমাণ হয়।

আর সেদিন তাঁর শরীরের স্পর্শ করার কোনও নীতিধার্মিক উপায় ছিল না যে, মাঝে মাঝে পায়ের আঙুল দিয়ে ভাবী বধূর সঙ্গে উলটো-পালটা করবেন। আর মহাভারত মহাকাব্যের বীর নায়কেরা কেউ শেয়ালদা স্টেশনের আঙুল-চালানো পাবলিক নন যে, রাতের অন্ধকারে রমণী-শরীরে টিপ দিয়ে দেখবেন— মন্দ নয় তো! বরঞ্চ সমস্যা হয়েছে মহাভারতের বঙ্গানুবাদে মহামতি হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সাংস্কারিক মানসে। সিদ্ধান্তবাগীশ বাংলা করেছেন— "দ্রৌপদী সেইভাবে শয়ন করিলে, পাণ্ডবরা যেন তাঁহাকে পা-বালিশ করিলেন; তাহাতেও দ্রৌপদীর শরীরে বা মনে কোনও দুঃখ হইল না এবং তিনি পাণ্ডবগণকে কোনও অবজ্ঞা করিলেন না।" আমার পূর্বোক্ত রঙিন ঐতিহাসিক বন্ধু এই বাংলাটা পড়েই গুলিয়ে ফেলেছেন, আর সিদ্ধান্তবাগীশকেও আমি কোনও দোষ দিই না। তিনি মহাপণ্ডিত মানুষ বটে, কিন্তু সংস্কৃতভাষাসেবী পণ্ডিতজনের কাছে পূর্বাগত টীকা-টিপ্পনীর একটা পরম্পরাও মানসলোকে কাজ করে সাংস্কারিকভাবে। লক্ষণীয়, মূলশ্লোকে "পাদোপধানীব"— 'পা রাখার বালিশের মতো'— শব্দটা শোনা-মাত্রই নীলকণ্ঠের মতো প্রাচীন এবং প্রামাণ্য টীকাকারও মন্তব্য করে বসলেন— এরকম হওয়ায় সমস্ত পাণ্ডবদের পাদস্পর্শ লাভ করতে করতে— পাদোপধানীব, সর্বেষাং পাদস্পর্শং লভমানা— দ্রৌপদী কুশশয্যায় রাত কাটালেন। অতএব সিদ্ধান্তবাগীশ আর কী করেন! তিনি লিখলেন— 'পাণ্ডবেরা যেন তাঁহাকে পা-বালিশ করিলেন। তাহাতেও দ্রৌপদীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরীরে ও মনে কোনও দুঃখ হইল না'। আমরা শুধু বলব— নীলকণ্ঠ এবং সিদ্ধান্তবাগীশ দু'জনেরই বোঝার ভুল হয়েছে। মূল মহাকাব্যিক শ্লোকে এমন কোনও শব্দ নেই যাতে 'শরীরে'র কথাটা কোনও ভাবে আমদানী করা যায়। আর 'পা-বালিশ' আর 'পা-রাখার বালিশ'-এরও তফাৎ আছে। আরও তফাৎ আছে— পা রাখার বালিশের মতো কথাটায়। শুধু পঞ্চ বীর স্বামীর পায়ের দিকে দ্রৌপদীর শোয়াটাই এখানে প্রধান উল্লেখ্য ব্যাপার ছিল এবং এই আলংকারিক প্রতীকে তাঁর পঞ্চস্বামীর অধীনতা স্বীকার করার ব্যাপারটাও ইঙ্গিতে চলে আসে। কিন্তু বাস্তবে এই পায়ের দিকে শোয়াটা যে দ্রৌপদীর মতো ভয়ংকর ব্যক্তিত্বও মেনে নিলেন, স্বামীদের প্রতি কোনও বিদ্বেষ, কোনও অবজ্ঞা না করে— মহাভারতের কবি এই ইঙ্গিতটুকু দিয়েই সন্তুষ্ট থেকেছেন, তার বেশি কোনও শারীরক ভাষ্য এ-শ্লোকের মধ্যে নেই— যেমনটা টীকাকার নীলকণ্ঠ পুলকিত হয়ে বলতে চাইছেন, অথবা সিদ্ধান্তবাগীশ বঙ্গানুবাদে আরও সশব্দে বললেন— তাঁহার শরীরে বা মনে কোনও দুঃখ হইল না— যেন দ্রৌপদীর শরীরের ওপর পাঁচ পাণ্ডবের দশখানা পা উলটো-পালটা করেছে এবং তিনি তাতে কষ্ট পাননি।

নীলকণ্ঠ এবং সিদ্ধান্তবাগীশের কাছে মহাভারতের ঠিক পরবর্তী প্রাসঙ্গিক শ্লোকটা এই যে, পাণ্ডবরা শোয়ামাত্র সৈন্য-সামন্ত, অস্ত্র, রথ, হস্তী, তরবারি, বাণ— এই সব ক্ষত্রিয় বস্তু নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলেন— অস্ত্রাণি দিব্যানি রথাংশ্চ নাগান্/ খড়্গান্ শরাংশ্চাপি পরশ্বধাংশ্চ। এইসব বিচিত্র শাক্ত কথার মধ্যে ক্ষত্রিয় বীরেরা দ্রৌপদীকে পায়ের আঙুল দিয়ে খোঁচাচ্ছেন— এমন কোনও ঘটনা মহাকাব্যিক অভিসন্ধির সঙ্গে মানায় না। লক্ষণীয়, এর পরেই কুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন পিতা দ্রুপদের দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে সেই কুম্ভকার-গৃহে পৌঁছোলেন এবং বাইরে থেকে সেই সব অস্ত্র সম্বন্ধীয় কথাবার্তাই শুনতে পেলেন এবং এদিক-ওদিক থেকে দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেলেন পাণ্ডবরা কীভাবে শুয়ে আছেন, দ্রৌপদীই বা কীভাবে শুয়ে আছেন! ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবদের সমস্ত বৃত্তান্ত, তাঁদের কথোপকথন এবং দ্রৌপদীর অবস্থান— সবটাই পিতা দ্রুপদকে জানাবেন বলে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

দ্রুপদ সত্যিই বড় উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড় ভয়— কোন ঘরে পড়লেন দ্রৌপদী! ধৃষ্টদ্যুম্ন যেভাবে স্বয়ংবরের শর্ত ঘোষণা করেছিলেন, তাতে যে কেউ মৎস্যচক্ষু ভেদ করতে পারলেই দ্রৌপদীকে পেতে পারতেন। দ্রুপদ অবশ্য খুব ভেবে-চিন্তে মৎস্য-চক্ষুর যন্ত্রনির্মাণ করেছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসও ছিল যে, একমাত্র অর্জুন ছাড়া নীচের দিকে জলচ্ছায়ায় তাকিয়ে ওপর দিকে রাখা মৎস্য-চক্ষু ভেদ করাটা আর কারও কর্ম নয়। তবু তাঁর মনে উদ্বেগটা বড় হয়ে উঠেছে— যেহেতু পাণ্ডবরা স্বরূপে, স্ববেশে ছিলেন না। অতএব ধৃষ্টদ্যুম্ন ফিরে আসতেই, তাঁর অন্তিম জিজ্ঞাসা ছিল— দ্রৌপদী কোনও হীন জায়গায় পড়েনি তো? কোনও বৈশ্য-শূদ্র বা অপর কোনও হীন জাতিতে দ্রৌপদীর সংক্রমণ ঘটলে, সেটা তাঁর মতো ক্ষত্রিয়ের মাথায় বৈশ্য-শূদ্রদের বাঁ পায়ের লাথি বলে ভাবছিলেন তিনি— কচ্চিন্ন বামো মম মূর্ধ্নি পাদঃ/ কৃষ্ণাভিমর্ষেণ কৃতোঽদ্য পুত্র? দ্রুপদের দুশ্চিন্তাটা তখনকার সমাজ-দৃষ্টিতে বোঝাটা খুব অসম্ভব নয়। মহাভারতের বর্ণ-সংকর বিবাহ অনেক হয়েছে, কিন্তু এটাও বোঝা ভাল যে, জাতি-বর্ণ নিয়ে উচ্চতার সচেতন-বোধও সেই সমসাময়িক সমাজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঙ্গ। বিশেষত ক্ষত্রিয়রা রাষ্ট্রশাসনে যুক্ত ছিলেন বলেই অর্থ এবং সম্মানের অধিকারিতায় খানিক অভিমানগ্রস্ত ছিলেন বই কী। এই দ্রুপদ ভাবছেন— যে রাজা আমাকেই রাজকর দিচ্ছে, অথবা কোনও করদ বৈশ্য— তেমন কোনও লোক অথবা কোনও শূদ্র অথবা কোনও বৈশ্য আমার মেয়েটাকে জিতে নিয়ে গেল না তো— কচ্চিন্ন শূদ্রেণ ন হীনজেন/ বৈশ্যেন বা করদেনোপপন্না?

আসলে এই দুশ্চিন্তাটা বেশ বোঝা যায়— শূদ্র, বৈশ্য বা অপর কোনও তথাকথিত হীন জাতির সঙ্গে বিবাহ ব্যাপারটা একটা অর্থনৈতিক পার্থক্য সূচনা করে এবং সেটা এতই বড় এক পার্থক্য যা জীবন, জীবনযাত্রার মান, খাদ্যাভ্যাস এবং দৈনন্দিন চলন-বলনটাকেও এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, জাতি-বর্ণের ছুঁৎমার্গহীন ব্যক্তিকেও আমি এ-বিষয়ে বেশ বিচলিত হতে দেখেছি বহুবার। সেখানে দ্রৌপদীর মতো বিদগ্ধা এক রমণী কার ঘরে গিয়ে উঠছেন, এটা পিতা হিসেবে দ্রুপদের দুশ্চিন্তার বিষয়ই বটে। আর দ্রুপদ যেহেতু অর্জুনের কথা ভেবে-ভেবেই মৎস্য-চক্ষুর যন্ত্রখানি তৈরি করেছিলেন, তাতে তাঁর দুশ্চিন্তা আরও বেড়েছে; তার মধ্যে স্বয়ংবরের মাঝখানে কর্ণ এসে এমন ভেলকি দেখিয়ে গেলেন, তাতে ওই ব্রাহ্মণবেশী মানুষটার পরিচয় নিয়ে আরও ধন্দ তৈরি হয়েছে। ব্রাহ্মণ হলে জাতিগত উচ্চতায় একটা তুষ্টি থাকে বটে, কিন্তু জামাতা ক্ষত্রিয় হলেই তবে দ্রুপদ বেশি খুশি হন এবং তিনি অর্জুন হলেই সবচেয়ে বেশি খুশি। ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিনি বলেই ফেললেন— আমি অর্জুনের সঙ্গে আমার মেয়েটার সংযোগ ঘটাতে পেরেছি কি? নাকি এ-ব্যাপারে আমাকে অনুতাপ করতে হবে— কচ্চিন্ন তপ্যে পরমপ্রতীতঃ/ সংযুজ্য পার্থেন নরর্ষভেণ?

ধৃষ্টদ্যুম্ন যে খুব ভাল করে খবর নিতে পেরেছেন তা নয়, তবে তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ করেছিলেন ভগিনীর। তবুও দূরত্ব কিছু ছিল এবং সময়ও তিনি বেশিই নিয়েছিলেন, নইলে তার মধ্যেই কৃষ্ণ-বলরাম এক ফাঁকে দেখা করে চলে গেলেন কী করে? ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়নি। যাই হোক, বাইরে থেকে দেখে এবং বাড়ির ভিতর উঁকিঝুঁকি দিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন যেটা জানালেন, তার মধ্যে দ্রুপদের জামাতৃ-ভাবনা অনুমান-মাত্রেই পাণ্ডব-নির্ভর হয়ে উঠল বটে, কিন্তু পুরোপুরি সংশয় নিরসন হল না। ধৃষ্টদ্যুম্ন এসে বলেছিলেন— মৃগচর্মধারী যে যুবকটির চোখগুলো বেশ টানা-টানা— যে সেই মৎস্যচক্ষু ভেদ করে বামুনদের প্রশংসা কুড়োল খুব, তা সেই যুবক ছেলেটিকে তো একা একা যুদ্ধও করতে হল স্বয়ংবরে হেরে-যাওয়া হতাশ রাজাদের সঙ্গে, কিন্তু আমার বোনটিকে দেখলাম— সে তার স্বয়ংবর জয়ী যুবক ছেলেটির পরিধান-চর্মবাসের প্রান্তটুকু ঠিক ধরে আছে এবং পদে পদে অনুসরণ করছে তাঁকেই— কৃষ্ণা প্রগৃহ্যাজিনমন্বয়াত্তং/ নাগং যথা নাগবধূঃ প্রহৃষ্টা। ধৃষ্টদ্যুম্ন কিন্তু মহাকাব্যের উপযোগী একটা অসাধারণ উপমা দিয়েছেন এখানে। প্রসিদ্ধি অনুযায়ী হস্তিনীর জন্য পুরুষ হাতিদের মধ্যে অনেক সময়েই মারামারি লাগে, কিন্তু এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে হাতিটি জেতে, হস্তিনী কিন্তু ঠিক তার পিছন পিছন যায়। দ্রৌপদীও ঠিক তাঁর লক্ষভেত্তা পুরুষের অজিন-প্রান্তটি ধরে রেখেছিলেন এত যুদ্ধের পরেও। ধৃষ্টদ্যুম্ন জানালেন— আরও একজন যুবক বীরও কিন্তু একটু আদিম কৌশলে যুদ্ধ করেছিলেন, তিনিও কিন্তু ওই প্রথমোক্ত যুবকেরই সহকারী ছিলেন এবং

এই দুই যুবকের সঙ্গেই দ্রৌপদী গিয়ে পৌঁছেছিল এক কুম্ভকারের বাড়িতে। বাড়িওয়ালার নাম ভার্গব।

ধৃষ্টদ্যুম্ন কিন্তু যা দেখেছেন, তারই আনুপূর্বিক বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেছেন— ওই কুম্ভকার-গৃহে ঘরের মধ্যে এক আগুনপানা চেহারার মহিলাকে বসে থাকতে দেখেছি আমি এবং তাঁকে ঘিরে আরও তিনটে ছেলে— ওই যুদ্ধজয়ী বীরের মতোই তাঁদেরও চেহারা। তারপর ওই বিজয়ী যুবক-দুটি, যাঁদের সঙ্গে দ্রৌপদী গেছেন— তাঁরা ওই মহিলাকে নমস্কার করে দ্রৌপদীকেও বললেন নমস্কার করতে। আমার মনে হল— ওই মহিলাই এই পাঁচ ছেলের মা। স্বয়ংবর সভার সব ঘটনা জানিয়ে একজনকে বাড়িতে রেখে আর চার জন ভিক্ষা করতে গেল। তারপর ভিক্ষা করে ফিরে এলে ওই বয়স্ক মহিলা রান্না করলেন, কিন্তু পরিবেশন করল দ্রৌপদী। সে সবাইকে খাইয়ে পরে নিজে খেল। রাত্রে শোয়ার ব্যবস্থা হল কুশ-শয্যার ওপর মৃগচর্ম বিছিয়ে। কৃষ্ণা শুয়ে রইল ওই মহাবীরদের পায়ের দিকে— সুপ্তাস্তু তে পার্থিব সর্ব এব/ কৃষ্ণা চ তেষাং চরণোপধানী। সব দেখেশুনে ধৃষ্টদ্যুম্ন এবার নিজের মত ব্যক্ত করছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন— ওই পাঁচটা যুবক ছেলে ঘুমোবার আগে যে-সব গল্প করছিল, তার সবটাই যুদ্ধ-বিষয়ক, অর্থাৎ কিনা এঁদের কথাগুলো বামুন-পণ্ডিত বা বৈশ্য-শূদ্রের মতো কথা নয়— ন বৈশ্যশূদ্রৌপয়িকীঃ কথাস্তা/ ন চ দ্বিজানাং কথয়ন্তি বীরাঃ। আমার মনে হচ্ছে— আমাদের আশা পূর্ণ হবে, পিতা! আর এটাও কিন্তু আমরা শুনেছি যে, পাণ্ডবরা জতুগৃহের অগ্নিদাহ থেকে বেঁচে গেছেন। বিশেষত লক্ষ্যভেদ যেভাবে হল এবং যেভাবে তাঁরা রাত্রে শুয়ে শুয়েও যুদ্ধের কথা বলছেন, তাতে নিশ্চয় মনে হচ্ছে এঁরা পাঁচ ভাই পাণ্ডব, কোনও কারণে এঁরা ছদ্মবেশে আছেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন যেভাবে তাঁর দৃষ্ট বিবরণ দিলেন, তাতে এ-কথাটা বারবার মনে হয় যে, জননী কুন্তীর মুখে সেই ভিক্ষা ভাগ করে নেবার নির্দেশটা অনেকটাই যেন অতিরিক্ত কথা বলে মনে হয়। কেননা ধৃষ্টদ্যুম্নের বিবরণে এই নির্দেশের কথা নেই এবং সেটাই স্বাভাবিক, কেননা বিবাহযোগ্যা রমণীটি ঘরে আসামাত্রই তাঁর ভাগাভাগি সম্পূর্ণ হয়ে গেল, এটা মহাকাব্যিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে মানায় না। বিশেষত পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গেই দ্রৌপদীর বৈবাহিক সম্বন্ধের কথাটাও বিবাহ-প্রক্রিয়ার প্রথম পর্বে এসেছে বলে মনে করি। লক্ষ করে দেখুন, এখনও দ্রুপদের কাছে পাণ্ডবদের আকার-নিশ্চয় ঘটেনি, শুধু প্রকার-নিশ্চয় ঘটেছে। অতএব নিশ্চিত হবার জন্যই দ্রুপদ আপন পুরোহিতকে পাঠালেন পাণ্ডবদের নিশ্চিত পরিচয় জানার জন্য। পুরোহিত পাণ্ডবদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেই বিবাহ-প্রসঙ্গে এসে বললেন— লক্ষ্যভেত্তা যুবকটিকে দেখে দ্রুপদ-রাজা বড় আনন্দ পেয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর বড় ইচ্ছে ছিল তাঁর মেয়েটি পাণ্ডু-রাজার পুত্রবধূ হোন। তাঁর মনে সবসময়েই ভাবনা এবং অভিলাষ ছিল যে, আমার এই মেয়েটিকে যেন স্থূল-দীর্ঘবাহু অর্জুন ক্ষত্রিয়-ধর্ম অনুযায়ী বিয়ে করে নিয়ে যান— যদর্জুনো বৈ পৃথুদীর্ঘবাহুর্ধর্মেণ বিন্দেত সুতাং মমৈতাম্।

যুধিষ্ঠির পুরোহিতকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে নিজের বক্তব্য নিবেদন করে বললেন— দ্রুপদ-রাজা ক্ষত্রিয়ের রীতি মেনে স্বয়ংবরের যে পণ রেখেছিলেন, আমাদের বীর যোদ্ধা সেই পণ মেনেই দ্রৌপদীকে জিতেছে। আসলে যুধিষ্ঠিরের মধ্যে সামান্য একটু সংশয় কাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছে। দ্রুপদ রাজা বারবার ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় বিধি— এসব শব্দ উচ্চারণ করছেন, অথচ পাণ্ডবরা সবাই এখন ব্রাহ্মণ-বেশে আছেন, তার মধ্যে তাঁদের আর্থিক অবস্থাও ভাল নয়, স্বয়ংবর-লক্ষ্যও ভেদ করা হয়েছে, অতএব একটু প্রতিবাদের সুরেই বললেন যুধিষ্ঠির। তিনি বললেন— স্বয়ংবর ঘোষণার সময় দ্রুপদ রাজা তো জাতি, কুল, শীল, বংশ কোনওটাই নির্দিষ্ট করে বলেননি। তিনি বলেছিলেন— ধনুকে গুণ চাপাও, লক্ষ্যভেদ করো, নিয়ে যাও আমার মেয়েকে— ন তত্র বর্ণেষু কৃতা বিবক্ষা/ ন চাপি শীলে ন কুলে ন গোত্রে— ফলে, আমাদের মধ্যে সেই বীর, যেভাবে দ্রুপদ বলেছেন, সেইভাবেই দ্রৌপদীকে জয় করেছে, সেখানে তাঁর তো দুঃখ করার কিছু নেই। আর দ্রুপদ রাজার যে অভিলাষ সেটা তো পূর্ণ হবেই, এই রাজকন্যা সব দিক থেকে লক্ষ্যভেত্তা পুরুষটিরও প্রাপ্য, এটাই আমি মনে করি। তা ছাড়া ওই ধনুকে ছিলা পরিয়ে মৎস্যচক্ষুর লক্ষ্য ভেদ করাটা সাধারণ কোনও লোকের কাজ ছিল না; যার বুদ্ধি নেই, অস্ত্রক্ষমতা নেই, বংশগৌরব নেই, এমন লোকের পক্ষে কি ওই লক্ষ্য ভেদ করা সম্ভব— ন চাকৃতাস্ত্রেণ ন হীনজেন/ লক্ষ্যং তথা পাতয়িতুং ন শক্যম্।

অর্থাৎ কিনা যুধিষ্ঠির এখনও নিজেদের পরিচয় পুরোপুরি ভাঙলেন না এবং আরও একটা কথাও পরিষ্কার যে, এখনও পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে এমন ঠিক হয়নি যে, তাঁরা সবাই মিলে দ্রৌপদীকে বিবাহ করবেন, তা নইলে এমন কথা এখানে কথার মধ্যে আসত না যে, লক্ষ্যভেত্তা পুরুষ যিনি জিতেছেন এই রাজকন্যাকে, এই রাজকন্যা তাঁরই প্রাপ্য এটাই আমি মনে করি— সম্প্রাপ্যরূপাং হি নরেন্দ্রকন্যা/ মিমামহং ব্রাহ্মণ সাধু মন্যে। পুরোহিতের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের কথা চলছে— এর মধ্যেই রাজার বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ এসে গেল। দ্রুপদের দূত বলল— এই বিয়ের জন্য বরপক্ষ-কন্যাপক্ষীয় সকলের একটা খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছেন দ্রুপদ-রাজা— জন্যার্থমন্নং দ্রুপদেন রাজ্ঞা/ বিবাহ-হেতোরুপসংস্কৃতঞ্চ। মহাভারতের মধ্যে এই প্রথম আমরা একটা বিয়ের খাওয়া দেখছি, যেখান বর-বউ দুই পক্ষের আত্মীয়স্বজন নিয়ে খাওয়া-দাওয়াটা হবে। সংস্কৃত শব্দটাও খেয়াল করুন— জন্যার্থম্— 'জন্য' মানে বর এবং বউয়ের জ্ঞাতি-বন্ধু-আত্মীয়-স্বজন, এমনকী এর মধ্যে ভৃত্য, চাকর-বাকরেরাও আছে। দ্রৌপদীর বিয়ে ছাড়া এইরকম একটা আন্তরিক নেমতন্ন, যা এখনও চলে, এরকমটা আগে দেখিনি। পাণ্ডবদের সকলের জন্য স্বর্ণপদ্মখচিত রথও এসেছে। পাণ্ডবরা পুরোহিত-ঠাকুরকে আগে পাঠিয়ে দিয়ে সকালের কাজ-কর্ম সেরে দ্রুপদের পাঠানো রথে উঠলেন। কুন্তী আর দ্রৌপদী চললেন একটা রথে— কুন্তী চ কৃষ্ণা চ সহৈকযানে।

দ্রুপদ-রাজা জামাইয়ের বৃত্তি পরীক্ষার জন্য চতুর্বর্ণের ব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্র কিছু সাজিয়ে রেখেছিলেন— পাণ্ডবরা কোনটা তুলে নেন সেটা দেখার জন্য। ফল-মালা, ঢাল-তরোয়াল, বর্ম-বাহন এবং কৃষিকাজের গোরু, দড়ি, কৃষিবীজ। পাণ্ডবরা অবশ্যই ক্ষত্রিয়োচিত জিনিসপত্র তুলে নিয়ে নিজেরাই উৎকৃষ্ট উচ্চাসনে গিয়ে বসলেন। কুন্তী দ্রৌপদীকে নিয়ে প্রবেশ করলেন অন্তঃপুরে। খাওয়া-দাওয়াও প্রচুর হল। এবার দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরের কাছে প্রশ্ন রাখলেন সবিশেষ পরিচয় জানার জন্য। যুধিষ্ঠির এবার আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা জানালেন— সেই বারণাবতে জতুগৃহবাস থেকে কৌরব দুর্যোধনের বঞ্চনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাহিনি এবং শেষ পর্যন্ত পঞ্চালে আসার বিবরণ। দ্রুপদ আনন্দে আত্মহারা হয়ে পাণ্ডবদের সমস্ত রাজনৈতিক এবং সামরিক সাহায্য দেবার প্রতিজ্ঞা করে পাণ্ডবদের সকলের থাকার ব্যবস্থা করলেন এক অট্টালিকায়— যেখানে কুন্তী, দ্রৌপদী এবং পঞ্চপাণ্ডব একত্র থাকার অধিকার পেলেন দ্রুপদের নির্দেশে— তত্র তে ন্যবসন্ রাজন্ যজ্ঞসেনেন পূজিতাঃ। এই জায়গাটা আমার খুব আধুনিক লাগে— দ্রৌপদীর সঙ্গে এখনও বিয়ে হয়নি পাণ্ডবদের। অথচ এই অবস্থায় দ্রুপদ এক পৃথক প্রাসাদের মধ্যে কুন্তী, দ্রৌপদী এবং পাঁচ ভাই পাণ্ডবের থাকার ব্যবস্থা করছেন। দ্রৌপদীর সঙ্গে সম্পূর্ণ পাণ্ডব-পরিবারের একত্র সহবাস-পরিচয় ভাবী বধূকে যে অনেকখানি 'ফ্যামিলিয়ারাইজ্' করে তুলবে, এটা সেইকালে দ্রুপদের মতো এক প্রাচীন পুরুষও বুঝেছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, এই একত্রবাস এক দিনের ছিল না, অন্তত কিছু দিনের, এবং আমাদের বিশেষ ধারণা সব ভাইরা মিলে দ্রৌপদীকে বিবাহ করার সিদ্ধান্তটা এই সময়েই নিশ্চিত হয়েছে। জননী কুন্তী হয়তো পূর্বে এই কথাটা যুধিষ্ঠিরকে বলে থাকবেন, কিন্তু এই সময়ে স্বয়ং দ্রুপদ এবং পাণ্ডবরা সকলেই 'প্রত্যাশ্বস্ত'— পরস্পর পরস্পরের ব্যাপারে আশ্বস্ত, তখনই হয়তো দ্রৌপদীকে ভাল করে চিনে নিয়েই যুধিষ্ঠির এই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তাঁরা সকলে মিলেই দ্রৌপদীকে বিয়ে করবেন। এরপর সেই দিন এল, যেদিন একটা শুভ লগ্ন দেখে দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরকে বললেন— আজ বিবাহের প্রশস্ত দিন, সুতরাং আজই মহাবাহু অর্জুন যথাবিধানে কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ করুন— গৃহ্নাতু বিধিবৎ পাণিম্ অদ্যায়ং কুরুনন্দনঃ।

যুধিষ্ঠির এবার নিজকৃত পূর্বসিদ্ধান্তের পথ পরিষ্কার করার জন্যই একটু অন্য ধরনের কথা-বার্তা বলতে আরম্ভ করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন— বিয়ের কথা যদি বলেন, তবে আমারও তো একটা বিয়ের সম্বন্ধ করতে হয়, আমি তো সবার বড়— মমাপি দারসম্বন্ধঃ কার্যস্তাবদ্ বিশাম্পতে। দ্রুপদ থতমত খেয়ে, তা তো বটেই, তা তো বটেই— এমনি একটা ভাবে যুধিষ্ঠিরের ইঙ্গিত বুঝে বললেন— তা হলে আপনিই কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ করুন, কিংবা আপনাদের মধ্যে অন্য কেউ...। যুধিষ্ঠির বললেন— কৃষ্ণা আমাদের সবারই ঘরণী হবেন। বিশেষত অর্জুন এই মহারত্ন জয় করেছে, আমরা ঠিক করেছি আমরা সবাই এই রত্নের অংশীদার হব— এষ নঃ সময়ো রাজন্ রত্নস্য সহ ভোজনম্। দ্রুপদ আকাশ থেকে পড়লেন। আরক্ত মুখে বললেন— এক পুরুষের অনেক বউ থাকে শুনেছি, কিন্তু এক বউয়ের অনেক স্বামী— অসম্ভব। এ তোমার কেমন বুদ্ধি বাপু? ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বললেন— এরকমটি হলে ছোট ভাইয়ের বউয়ের সঙ্গে বড় ভাই— যবীয়সঃ কথং ভ্রাতুঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা... উঃ আমি আর ভাবতে পারছি না। ঠিক এই সময়ে রাজভবনে উপস্থিত হলেন ব্যাস। তিনি পুরা-কাহিনি শোনালেন। পাণ্ডবদের অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত প্রকট করলেন। জানালেন দ্রৌপদীর পূর্ব-জন্মকথাও। দ্রৌপদী নাকি পূর্বজন্মে ছিলেন এক ঋষির কন্যা— রূপবতী, পতিপ্রার্থিনী। তিনি তপস্যায় শিবকে তুষ্ট করে পাঁচবার একই কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, ঠাকুর আমাকে মনের মতো বর দিন। যেহেতু পাঁচবার, অতএব শিব বললেন তোমার পাঁচটা স্বামী হবে। ব্যাস বললেন— শিবের সেই কথা আজ ফলতে চলেছে। ভগবান শংকর, মহামতি ব্যাস— এঁদের ওপরে আর কথা চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। শুভলগ্নে পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে পাঁচ-সাতে পঁয়ত্রিশ পাকে বাঁধা পড়লেন অনিন্দ্যসুন্দরী দ্রৌপদী।

কুমারিল ভট্ট, যিনি ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম খ্রিস্টাব্দের ধুরন্ধর মীমাংসক পণ্ডিত বলে পরিচিত, তিনি তাঁর তন্ত্রবার্তিকে কতগুলি প্রশ্ন তুলেছেন। ক্ষেত্র বিশেষে মহাত্মা পুরুষদের আপন আত্মতুষ্টিও ধর্মবিষয়ে কোনও প্রমাণ হতে পারে কি না, এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। সেই প্রসঙ্গে অনেকের সঙ্গে পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইয়ের বউ দ্রৌপদীর কথা উঠেছে। পাঁচ ভাইকে পর্যায়ক্রমে সেবা করলে, দ্রৌপদী যে স্বৈরিণী বলে পরিচিত হতে পারেন এ প্রশ্ন তো দ্রৌপদীর বাপ-ভাইও তুলেছিলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বারবার সেখানে বলেছেন— আমরা পাঁচজনে বিয়ে করব, এইটাই ধর্ম— এষ ধর্মো ধ্রুবো রাজন্। ব্যাসের সামনেও যুধিষ্ঠির রীতিমতো আস্থা নিয়ে বলছেন— আমার কথা মিথ্যে হতে পারে না। তাই এখানে অধর্ম থাকতেই পারে না— বর্ততে হি মনো মেঽত্র নৈষোঽধর্ম কথঞ্চন। বোধ করি ধর্মময় যুধিষ্ঠিরের এই আত্মতুষ্টির প্রমাণ দেবার জন্যই কুমারিল তন্ত্রবার্তিকে দ্রৌপদীর কথা তুলেছেন। কিন্তু ঠিক এই কথাটা তোলার সময় আত্মতুষ্টির প্রসঙ্গ গেছে হারিয়ে। কুমারিল সরাসরি প্রশ্ন তুলে বলেছেন— পঞ্চ পাণ্ডবের এক বউ— কথাটা বিরুদ্ধ লাগতে পারে, কিন্তু স্বয়ং দ্বৈপায়ন তো সেকথা পরিষ্কার বুঝিয়েই দিয়েছেন। অর্থাৎ কিনা কুমারিল যুধিষ্ঠিরের আত্মতুষ্টির প্রামাণিকতা বাদ দিয়ে দ্রৌপদীর জন্মের দৈববাদকেই প্রাধান্য দিলেন বেশি। তাঁর মতে যেখানে স্বয়ং দ্বৈপায়ন 'বেদিমধ্যাৎ সমুত্থিতা' দ্রৌপদীর মাহাত্ম্য খ্যাপন করেছেন, তিনি তো আর সাধারণ মানবী নন যে স্বৈরিণীর প্রসঙ্গ আসবে। তিনি স্বয়ং লক্ষ্মীরূপিণী এবং লক্ষ্মী যদি অনেকের দ্বারা ভুক্তা হন, তা হলে দোষও হয় না— সা চ শ্রীঃ শ্রীশ্চ ভুয়োভির্ভুজ্যমানা ন দুষ্যতি।

আমরা আজকের দিনে দুষ্টুমি করে ভট্ট কুমারিলকে বলতে পারতাম— মহাশয়! তা হলে লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতা রাবণের দ্বারা দু'-একবার ভুক্তা হলে কী ক্ষতি হত, কিংবা লক্ষ্মী রুক্মিণী শিশুপালের অঙ্কশায়িনী হলেই বা কী ক্ষতি হত? তার ওপরে লক্ষ্মীর ভাগ স্বয়ং বিষ্ণুর। পাণ্ডবেরা কেউ তো তাঁর তেজে জন্মাননি? যা হোক, আপাত এইসব বিটকেল প্রশ্ন আমরা ভট্ট কুমারিলকে করতে চাই না, কারণ তিনি আমাদের দারুণ একটি খবর দিয়েছেন। কুমারিল মহাভারতের প্রমাণে জানিয়েছেন যে, সুমধ্যমা দ্রৌপদী প্রত্যেক পতিসঙ্গমের পরই আবার কুমারী হয়ে যেতেন— মহানুভবা কিল সা সুমধ্যমা বভূব কন্যৈব গতে গতেঽহনি। পাঠক! আবার আপনি দ্রৌপদীর বৃদ্ধা দিদিশাশুড়ি সত্যবতীর সঙ্গে দ্রৌপদীর মিল খুঁজে পেলেন। এমনকী মিল পেলেন তাঁর শাশুড়ি কুন্তীর সঙ্গেও। মহর্ষি পরাশরের সঙ্গে সঙ্গম হওয়ার পর সত্যবতী আবার তাঁর কুমারীত্ব লাভ করেছিলেন এবং তা পরাশরের বরে। দ্রৌপদীর কাহিনি কিন্তু আরও সাংঘাতিক, তিনি প্রতি সঙ্গমের পরেই কুমারীত্ব ফিরে পেতেন। আগে যে শ্লোকটি উদ্ধার করেছি সেটি কিন্তু ভট্ট কুমারিলের লেখা। তন্ত্রবার্তিকের এই শ্লোকের সূত্র ধরেই মূল মহাভারতীয় শ্লোকটি তন্ত্রবার্তিকের টীকাকার সোমেশ্বর ভট্ট তাঁর ন্যায়সুধায় উদ্ধার করেছেন। এই শ্লোকটি আছে সেইখানেই, যেখানে পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে দ্রৌপদীর বৈদিক রীতিতে প্রথামাফিক বিয়ে হল।

ভগবান শংকর বলেছেন— তুমি পাঁচবার যেহেতু একই কথা বলেছ, অতএব তোমার স্বামী হবে পাঁচটি। কিন্তু যিনি পরজন্মে পঞ্চপতির মনোহারিণী হবেন, তাঁর বিদগ্ধতা, তাঁর বাস্তব-বোধই কী কম হবে! পূর্বজন্মের ঋষিকন্যা দ্রৌপদী বললেন— হোক আমার পাঁচটা বর, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু হলে এই বরও দিতে হবে যে, প্রত্যেক স্বামী-সহবাসের পরই কুমারীত্ব লাভ করব আমি— কৌমারমেব তৎ সর্বং সঙ্গমে সঙ্গমে ভবেৎ। বারংবার এই কুমারীত্বলাভের মধ্যেই দ্রৌপদীর দৈবসত্তার সন্ধান পেয়েছেন দার্শনিক কুমারিল। তাঁর ধারণা, প্রধানত দ্রৌপদীর এই অমনুষ্যসুলভ কুমারীত্বের ভরসাতেই কৃষ্ণ কর্ণকে প্রলোভন দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। সেই যখন উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণের দূতীয়ালি বিফল হল, তখন কৃষ্ণ ভাবলেন অন্তত কুরুপক্ষপাতী কর্ণকে যদি পাণ্ডবপক্ষে টেনে নেওয়া যায়, তা হলেও খানিকটা সাফল্য আসে তাঁর অনুকূলে। কৃষ্ণ কর্ণকে আসল জন্মরহস্য শোনালেন, এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা হিসেবে তাঁর রাজসিংহাসন প্রাপ্তির যোগ্যতাও ঘোষণা করলেন। কিন্তু টোপ হিসেবে কৃষ্ণ যাকে ব্যবহার করলেন, তিনি কিন্তু দ্রৌপদী। কৃষ্ণ বললেন— যুধিষ্ঠির তোমার মাথায় সাদা চামর দোলাবেন, ভীম ছাতা ধরে বসে থাকবেন, আর অনিন্দিতা দ্রৌপদী! ছ'বারের বার যথাকালে দ্রৌপদী উপনীত হবেন তোমার শয্যায়— ষষ্ঠে ত্বাং চ তথা কালে দ্রৌপদ্যুপগমিষ্যতি।

ভট্ট কুমারিল বলেছেন— মানুষের মধ্যে এই ধরনের কুমারীত্ব লাভ মোটেই সম্ভব নয় এবং দ্রৌপদীর এই কুমারীত্বের প্রামাণিকতা আছে বলেই কৃষ্ণ কর্ণকে প্রলোভিত করতে চেয়েছেন— অএতব বাসুদেবেন কর্ণ উক্তঃ... ইতরথা হি কথং প্রমাণভূতঃ সন্ এবং বদেৎ। বস্তুত দ্রৌপদীর এই প্রাত্যহিক কুমারীত্ব নিয়ে ভট্ট মহোদয়দের যতই মাথাব্যথা থাকুক না কেন, আমাদের তেমন মাথাব্যথা নেই, এমনকী খোদ পঞ্চপাণ্ডবেরও কোনও মাথাব্যথা ছিল বলে মনে হয় না। অথচ ভট্ট-শর্মাদের দ্রৌপদীর সতীত্ব বিষয়ে চর্চাটা কিন্তু সামাজিক বিদ্বদ্‌জনের ভীষণ রকমের বিব্রত বোধ করার জায়গা থেকেই এসেছে এবং 'বি-ব্রত' বোধ করেন বলেই এত দার্শনিক সমাধান প্রয়োজন হয় এই বিষয়ে। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের (১৮৮৭-১৯৫৪) মতো বিষণ্ণ কবি, যাঁর অনেক কবিতা আমাদের স্কুল-পাঠ্যেও পড়তে হয়েছে, সেই তিনি স্বয়ং ব্যাস থেকে অন্যান্য পণ্ডিতদের এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখেই কাব্যিক মন্তব্য করেছিলেন—

পাঁজি-পুঁথি লয়ে খুঁজে মুনিগণ
সতীর পঞ্চপতির হেতু,
কল্পনা গাঁথি জন্ম হইতে
জন্মান্তরে বাঁধিল সেতু।

ব্যাস-কথিতা সেই পূর্ব-তপস্বিনীর শিব-তপস্যা এবং পঞ্চস্বামী-লাভের ব্যাপারে শিবের বরদানের ঘটনাটা যে দ্রৌপদীর সতীত্ব-বিপর্যয় সমাধান করার জন্যই পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং দ্রৌপদীর মহাকাব্যিক ব্যক্তিত্বের নিরিখে তিনি নিজে একাই যে তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চস্বামীর দায়িত্ব নিতে পারেন, সেটা বোঝানোর জন্য যতীন্দ্রনাথ খুব লৌকিক যুক্তি দিয়ে বলেছেন—

যে সব কাহিনী জানি বা না জানি,
তেজস্বিনী গো, তোমারে চিনি,
আপন যোগ্য পুরুষ সৃজিতে
জন্ম জন্ম তপস্বিনী।
দেবতারা মিলে গড়িতে পারেনি
তোমার প্রাপ্য তপের নিধি
তাই গো সাধ্বি, পঞ্চ প্রদীপে।
তোমার আরতি করিল বিধি।

এই কবিতার মধ্যে 'সাধ্বী' শব্দটাকে সম্বোধনে বসিয়ে নিয়ে পঞ্চস্বামীর ভোগ-ব্যবহারের যৌনতাকে একেবারে ফুৎকার দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন যতীন্দ্রনাথ। আমরা তাই দ্রৌপদীর সতীত্ব নিয়ে মাথা ঘামাই না, যেমনটি তাঁর স্বামীরাও ঘামাননি। আরও একটা ঘটনা এখানে ভাবার মতো। এত যে পাঁচ স্বামীর কথা হচ্ছে, এখানে দ্রৌপদীর কোনও বক্তব্য নেই। তিনি নিজের সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন, কিন্তু পঞ্চস্বামীর ব্যাপারে তাঁর অনিচ্ছা ব্যক্ত করেননি কোথাও। প্রগতিবাদীরা বলতে পারেন— তাঁকে 'কেয়ার'-ই করা হয়নি, তাঁর মত নেবার কোনও প্রয়োজনই বোধ করা হয়নি। কিন্তু আমরা বলব— দ্রৌপদীর যা চরিত্র আমরা সারা মহাভারত জুড়ে দেখেছি, তাতে জিজ্ঞাসা না করা হলেও অপছন্দের ব্যাপার হলে তিনি বলেই দিতেন। আমাদের ধারণা দ্রৌপদী বেশ 'এনজয়'ই করছিলেন ঘটনার গতি-প্রকৃতি। আর পাণ্ডবরা তো দ্রৌপদীর অসামান্য রূপে মুগ্ধ ছিলেন, সম্পূর্ণ বশীভূত ছিলেন তাঁর গুণে এবং অবশ্যই বিদগ্ধতায় গর্বিত। সেই মুগ্ধতা এবং বশীভবন যে কতখানি, তা সাধারণ মানুষের চোখেও পড়ার কথা এবং সেটা বাইরে থেকে আসা নারদমুনিরও চোখে পড়েছিল। আসছি সে-কথায়।

২

দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের বিবাহ হবার পর বেশ কিছুদিন তাঁরা দ্রুপদের পঞ্চাল-রাজ্যেই ছিলেন। জীবনটা তখন ঘোড়ায় জিন দিয়ে চলত না, আর মহাকাব্যিক সময়টাও মহাকাব্যিক তালে চলে বলে পাণ্ডবরাও কোনও তাড়া বোধ করেননি তক্ষুনি হস্তিনাপুরে ফিরে যাবার। ফলত বিয়ের পর বেশ কিছুদিন বাপের বাড়িতেই থাকার ফলে দ্রৌপদীও হয়তো খানিকটা নিজেকে স্বাধীনভাবে মেলে ধরতে পেরেছেন স্বামীদের কাছে। মহাভারতের কবি অবশ্য এই সময়ে স্বামীদের সঙ্গে দ্রৌপদীকে নিয়ে একটি শব্দও খরচা করেননি, বরঞ্চ শাশুড়ি

কুন্তীর কাছে প্রতিদিন পট্টবস্ত্র পরিধান করে নববধূর নম্রতায় প্রণাম করতে যাচ্ছেন দ্রৌপদী, আর কুন্তী তাঁকে পঞ্চপুত্রের উপযুক্তা স্ত্রী হিসেবে অরুন্ধতী, দময়ন্তী, লক্ষ্মীর সঙ্গে দ্রৌপদীর তুলনা করছেন— এই দৃশ্য চোখে পড়ছে আমাদের। আমরা যেন বুঝতে পারছি— কুন্তী অনেক বেশি নিশ্চিন্ত এখন। সেই কোন কালে পাণ্ডুর মৃত্যুর পর শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে নেমে এসে হস্তিনাপুরে আপন পুত্রদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিয়েছিলেন কুন্তী, যে কারণে ছেলেদের সঙ্গে রাজনৈতিক দুর্ভোগও ভুগেছেন এ-পর্যন্ত, সেই কুন্তীকে এবার যেন একটু আত্ম-সংবরণ করতে দেখছি। নিজের দায়িত্ব তিনি যেন এখন পঞ্চস্বামীগর্বিতা দ্রৌপদীর স্কন্ধে ন্যস্ত করে মুক্ত হচ্ছেন। অনন্ত তাঁর আশীর্বাদের মধ্যে প্রধানতম তাঁর আশীর্বাদ বুঝি এই যে, কুরুজাঙ্গল দেশে যেসব রাজ্য ও নগর আছে, সেখানে তুমি ধর্মানুরক্ত চিত্তে নিজের রাজাকে অভিষিক্ত করো— অনু ত্বম্ অভিষিচ্যস্ব নৃপতিং ধর্মবৎসলা। মহাভারতের টীকাকারেরা সামাজিক দুর্ভাবনা-বশতই এখানে ক্রিয়াপদে অনুজ্ঞা-বচনটা একেবারেই ইচ্ছাকৃতভাবে খেয়াল করলেন না এবং বললেন— 'অভিষিচ্যস্ব' মানে অভিষেক লাভ করো— অভিষেকং প্রাপ্নুহি। কিন্তু এখানে ক্রিয়াপদে অনুজ্ঞায় এই শব্দের প্রকৃত অর্থ— কুরুজাঙ্গল দেশে রাজাকে তুমি অভিষিক্ত করো এবার। দ্রৌপদীর বিদগ্ধতা এবং ব্যক্তিত্বের দৃষ্টিতে কুন্তীর দায়িত্ব-সংক্রমণ মধ্যযুগীয়েরা মেনে নিতে পারেননি বলেই মূল মহাভারতীয় শ্লোকের বিকার তৈরি হয়েছে টীকায়, অনুবাদে।

বস্তুত কুন্তীর এই কথা থেকে দ্রৌপদীর বিবাহ সম্বন্ধে আরও একটা তাৎপর্যও ফুটে ওঠে। এই বিয়ে যেন ঠিক সাধারণ বিবাহ-কৌতুক নয়। প্রথমত যুধিষ্ঠির এবং কুন্তী যে সিদ্ধান্ত নিলেন— পাঁচ ভাইই বিয়ে করবেন দ্রৌপদীকে, সেখানেই একটা রাজনৈতিক দিক আছে। পৈতৃক রাজ্যে এখনও পাণ্ডবদের প্রতিষ্ঠা হয়নি, এর মধ্যে যদি শুধু অর্জুনের সঙ্গে বিয়ের ফলে ভাইতে ভাইতে ঈর্ষাতুর দ্বন্দ্ব তৈরি হয়, তা হলে পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে ভিন্নতার সেই সুযোগ নেবে দুর্যোধন। বুদ্ধিমান যুধিষ্ঠির সেটা অনেক আগে বুঝেছিলেন বলেই যাতে ভাইদের মধ্যে দ্রৌপদীকে নিয়ে কোনও বিভেদ না হয়, তার জন্য সব ভাইরা মিলে দ্রৌপদীকে বিবাহ করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু এ তো গেল পরিবারের ভিতরকার রাজনীতি। এর বাইরেও দ্রৌপদীর সঙ্গে পাণ্ডবদের বিবাহের একটা রাজনৈতিক তাৎপর্য তৈরি হল। পাণ্ডবরা হস্তিনাপুর রাজ্যে থাকার সময় যে সামান্য রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পেয়েছিলেন, সেখানে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার আগেই তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করে বারণাবতের জতুগৃহে পুড়ে মরতে পাঠানো হল মায়ের সঙ্গে। বিদুরের বুদ্ধিতে তাঁরা মরলেন না এবং অবেশেষে পঞ্চাল দেশে দ্রৌপদীর সঙ্গে তাঁদের বিয়েও হল।

বিয়ের সময় থেকে দ্রৌপদীকে লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডবরা কিন্তু দ্রুপদের কাছ থেকে এই পরমাশ্বাসও লাভ করতে থাকলেন যে, হস্তিনাপুরে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য দ্রুপদ তাঁদের সর্বপ্রকার সাহায্য করবেন। আমরা এই সাহায্যের অর্থ বুঝতে পারি; এই মুহূর্তে এটা কোনও সামরিক সাহায্য নয়, বৈবাহিকতার মাধ্যমে পাণ্ডবরা মিত্রলাভ করেছেন, ইংরেজিতে যাকে বলে 'স্ট্রং অ্যালাই', সেই 'অ্যালাই' কিন্তু হস্তিনাপুরের রাজনৈতিক মহলে একটা 'থ্রেট্' হিসেবে কাজ করছে। একই সঙ্গে পাণ্ডবদের উপরি পাওনা হল কৃষ্ণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বিবাহ উপলক্ষ্যে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের অন্যান্য বিশিষ্ট উপহারের সঙ্গে যা পাঠিয়েছেন সেগুলি কিন্তু সামরিক উপহার— শিক্ষিত হস্তী, সুশিক্ষিত মদ্রদেশীয় অশ্ব, রথ, কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা এবং রাশিকৃত মৌলিক স্বর্ণ— বীথীকৃত মমেয়াত্মা প্রাহিণোন্মধুসূদনঃ। এই যে বিশাল রাজনৈতিক এবং সামরিক আয়োজন— এর কেন্দ্রস্থলে কিন্তু দ্রৌপদী। অতএব দ্রৌপদীকে কিন্তু আর সাধারণ এক রাজবধূ হিসেবে বিচার করা যাবে না। এখন থেকেই তাঁকে নিয়ে প্রতিপক্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে উঠতে থাকবে। প্রতিপক্ষ রাজনীতির ধারা যে খাতে বইতে থাকবে, সেখানে দ্রৌপদীও বারবার বিচার্য এবং চিন্তনীয় হয়ে উঠবেন।

পাণ্ডবদের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ-পর্ব সমাপ্ত হতেই গুপ্তচরেরা হস্তিনাপুরে এসে দুর্যোধনকে সব কথা জানাল এবং দুর্যোধন তাতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বোধ করতে লাগলেন এবং তাঁর ভাইরাও, কর্ণ-শকুনিও— অথ দুর্যোধনো রাজা বিমনা ভ্রাতৃভিঃ সহ। গুপ্তচরের খবর বিদুরের কাছেও গেল, কিন্তু তিনি যখন অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে খবরটা জানাতে গেলেন তখন বুঝলেন যে, আসল খবরটা ধৃতরাষ্ট্র তখনও জানেন না। বিদুরের খুশি দেখে তিনি ভেবে বসলেন— দ্রুপদনন্দিনী তাঁর পুত্র দুর্যোধনকেই পতিত্বে বরণ করেছে— মন্যতে স বৃতং পুত্রং জ্যেষ্ঠং দ্রুপদকন্যয়া— এমনকী তিনি বধূমুখ দর্শনানুভবের জন্য দুর্যোধনকে বহুতর অলংকার-নির্মাণের আদেশ দিয়ে বসলেন। বিদুর এবার ধৃতরাষ্ট্রকে প্রকৃত সত্য জানালেন এবং এক মুহূর্তের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু দ্রৌপদীর চাইতেও দ্রৌপদীর সঙ্গে পাণ্ডবদের মিলিত হওয়ার রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে মাথা ঘামালেন বেশি। তিনি বলেও ফেললেন— এমন ঐশ্বর্য-সম্পত্তিহীন অবস্থায় দ্রুপদ রাজাকে পাণ্ডবরা যেভাবে মিত্র হিসেবে লাভ করলেন, তার রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে— কো হি দ্রুপদমাসাদ্য মিত্রং ক্ষত্তঃ সবান্ধবম্।

দুর্যোধন-দুঃশাসন এবং কর্ণ-শকুনিরা ধৃতরাষ্ট্রের সামনেই নানান পরিকল্পনা আরম্ভ করলেন। দ্রুপদ এবং পাণ্ডবদের মধ্যে গুপ্তচর পাঠিয়ে ভেদ সৃষ্টি করার পরিকল্পনার মধ্যে অন্যতম একটা পরিকল্পনা ছিল এইরকম যে, দ্রৌপদীকে পাণ্ডবদের ওপর বিরক্ত করে তোলা হোক। তাতে যুক্তি থাকুক এইরকম— এতগুলো স্বামী নিয়ে তুমি ঘর করবে কী করে? আর পাণ্ডবদেরও প্রত্যেককে বলা হোক— তোমরা পাঁচটা পুরুষ আর ওই একটা বউ, তোমরা পরস্পরের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করছ। এতে কাজ হবে, তারপর দ্রৌপদীকে আমরাই পাব— টীকাকারের ভাষায়— ততশ্চ তাং লপ্স্যামহে ইতি শেষঃ। অথবা এমনও করা যেতে পারে যে, অন্যতরা সুন্দরী রমণীদের দিয়ে পাঁচভাই পাণ্ডবকেই প্রলুব্ধ করা হোক এবং তাতেই কৃষ্ণা দ্রৌপদীকে স্বামীদের থেকে পৃথক করে ফেলা যাবে— একৈকস্তত্র কৌন্তেয়স্ততঃ কৃষ্ণা বিরজ্যতাম্। দুর্যোধন-দুঃশাসন-কর্ণ-শকুনির মধ্যে এই যে এত সব যুক্তি-তর্ক-পরিকল্পনা চলছিল, সেইসব অনেক কূটনৈতিক যুক্তির মধ্যে একটা বড় প্রসঙ্গ হল— দ্রৌপদীকে পাণ্ডবদের ভালবাসার মোহজাল থেকে মুক্ত করে আনা এবং অবশেষে নিজেরা দ্রৌপদীর অধিকার লাভ করা। মহাবীর কর্ণ অবশ্য এই পরিকল্পনায় জল দিয়ে দুর্যোধনকে বলেছিলেন— পাণ্ডবদের কোনও ভাইকে তুমি আর একের বিরুদ্ধে অন্যকে

প্ররোচিত করতে পারবে না। কেননা একটামাত্র বউতে যেখানে পাঁচজনেই আসক্ত, তাদের তুমি পৃথক করবে কী করে? ওদের একতা-বন্ধনের চাবিকাঠিটাই তো ওই একতমা দ্রৌপদী— একস্যাং যে রতাঃ পত্ন্যাং ন ভিদ্যন্তে পরস্পরম্। আর তোমরা যে ভাবছ— অন্য লোক দিয়ে দ্রৌপদীকে পাণ্ডবদের ওপর বিরক্ত করে তুলবে, সেটা অসম্ভব। কেননা দ্রৌপদী পাণ্ডবদের খুব খারাপ অবস্থা জেনেও তাদের সানন্দে বরণ করে নিয়েছে, আর এখন তো দ্রুপদ এবং কৃষ্ণের সহায়তায় তাদের অবস্থা সমৃদ্ধ হয়েছে, এখন দ্রৌপদী তার স্বামীদের থেকে সরে আসবে কেন? অতএব এটা অসম্ভব— ন চাপি কৃষ্ণা শক্যেত তেভ্যো ভেদয়িতুং পরৈঃ।

এরপর কৃষ্ণা দ্রৌপদী সম্বন্ধে কর্ণ একটা সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন, যা আজকের দিনের প্রগতিশীল যৌক্তিকতায় অবশ্যই বিচার্য হওয়া উচিত এবং আমার সহৃদয় পাঠককুল এবং ততোধিক সহৃদয়া পাঠিকা রমণীরা যেন এই আলোচনাকে যুক্তিবাদিতার দৃষ্টিতেই ক্ষমা করেন। পাণ্ডব-ভাইদের ওপর বিরক্তি তৈরি করে দ্রৌপদীকে যে ভাঙিয়ে আনা যাবে না, সে-বিষয়ে কারণটা কর্ণের মতে দ্রৌপদী নিজেই। কর্ণ বলেছেন— দ্যাখো, মেয়েদের যদি একের চেয়ে বেশি অনেকগুলি স্বামী থাকে, তবে সেই বহুভর্তৃকতা মেয়েদের কাছে যথেষ্টই কাম্য অর্থাৎ পছন্দের— ঈপ্সিতশ্চ গুণঃ স্ত্রীণামেকস্যা বহুভর্তৃতা। সেখানে দ্রৌপদী এটাই পেয়েছে, পাঁচ-পাঁচটি উপভোক্তা বা উপভোগক্ষম পুরুষকে যদি কেউ শাস্ত্রসম্মতভাবে স্বামী হিসেবেই পায়, তা হলে দ্রৌপদীর মতো একজন রমণী তাদের ছেড়ে থাকবে কেন? অতএব দ্রৌপদীকে স্বামীদের থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে আসাটা প্রায় অসম্ভব— তঞ্চ প্রাপ্তবতী কৃষ্ণা ন সা ভেদয়িতুং ক্ষমা।

কর্ণের কথাটা যদি তাঁর অভিমান-শ্লেষ থেকে বিশ্লিষ্ট করে একটু তটস্থ হয়ে বিচার করা যায়, তবে আজকের দিনের গবেষণায় এই মন্তব্যের কিছু সত্যতাও খুঁজে পাওয়া যাবে। পণ্ডিতজনেরা এ-বিষয়ে দুটি অসাধারণ শব্দ খুঁজে বার করেছেন— একটি হল exclusivists অর্থাৎ পুরুষ-পরিহারিণী গোত্রের, অন্যটি varietists অর্থাৎ পুরুষ-বৈচিত্র্যবাদিনী। ওঁরা বলছেন— এমনকী মহামতি কিন্‌সের মতও তাই— যে, স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে মানুষ মাত্রেই বৈচিত্র্য পছন্দ করে, একই জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সাবেগে যৌবনজীবন কাটিয়ে যাওয়াটা কোনও রমণীর অন্তর্গত প্রয়োজনের জায়গা নয়, এটা সংস্কৃতিগতভাবে তার ওপর চাপানো একটা সামাজিক শৃঙ্খলা। এমন একটা দায়বদ্ধতা যদি হাজার হাজার বছর ধরে রমণীর মনের মধ্যে অন্তর্জাত কোনও সংস্কার তৈরি না করত, তা হলে মেয়েরাও পুরুষের ব্যাপারে বৈচিত্র্যবাদী হত, যেমনটি পুরুষেরা মেয়েদের ব্যাপারে হয়। স্বয়ং কিন্‌সের মতও তাই। তিনি অনেক পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, মেয়েদের মধ্যে বহুপুরুষগামিতার চিত্রটা যে আপাত দৃষ্টিতে দুর্বল মনে হয়, তার কারণটা কখনওই অন্তঃস্থিত কোনও বৃত্তি নয়, হাজার হাজার বছর ধরে তাকে সামাজিকতার সংস্কারে এইভাবে আবদ্ধ করা হয়েছে বলেই বহুপুরুষগামিতার ক্ষেত্রে মেয়েরা তেমন উন্মুখীন হয়ে উঠতে পারে না সহজে।

আমরা এই নিরিখে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী লাভের ঘটনাটাকে একটা সমাজ-স্বীকৃত সুব্যবস্থা বলেই ধরে নেব। তার মধ্যে দ্রৌপদীর শারীরিক আকর্ষণ সম্বন্ধে যত কথা মহাভারতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে, তাতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে oestradiol level-টা তাঁর মধ্যে উচ্চতর জায়গায় ছিল কিনা বলতে পারব না— কেননা তাতেই নাকি মেয়েদের যৌন আকর্ষণ বেশি হয়— কিন্তু তিনি পঞ্চস্বামী-গ্রহণের উপযুক্ত আধার ছিলেন, সে-কথা বারেবারেই প্রমাণিত হবে। বিশেষত হৃদয়গত আবেগ-মধুরতায় কোনও স্বামীকে কী এবং কতটা দিতে হবে, সেটা দ্রৌপদীর মতো বিদগ্ধা রমণীকে বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন ছিল না। ব্যাপারটা কবির দৃষ্টিতে অদ্ভুত নিপুণতায় দেখিয়েছিলেন কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। উল্লেখ্য, এক কবি যতীন্দ্রনাথ বাগচীর অনুরোধে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত দ্রৌপদী সম্বন্ধে লিখেছেন—

বিবাহ-আসনে বামাঙ্গুষ্ঠ
　　　দিলে তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরে,
তর্জনী তুলি' দিলে বৃকোদরে,
　　　মধ্যমা দিলে পার্থবীরে;
ঈষৎ নামায়ে দিলে অনামিকা,
　　　ধরিল নকুল হৃষ্টমনে,
কনিষ্ঠা তব পরশ করিয়া
　　　সহদেব স্বীয় ভাগ্য গণে!

কবির লেখনীতে আপ্তবাক্যের মতো যে শব্দ উচ্চারিত হয়, তার মধ্যে যে কত গভীর সত্য থাকে, তা বোধহয় তিনি নিজেও অনুধাবন করতে পারেন না। অঙ্গুষ্ঠ বা বুড়ো আঙুল বস্তুটা বৃহত্ত্ব-মহত্ত্বের প্রতীক বটে, তবে বুড়ো আঙুলের মধ্যে একটা সুমহান অনর্থকতাও আছে, যেখানে যুধিষ্ঠির খুব গুরুত্বপূর্ণ ঔপাধিক হওয়া সত্ত্বেও দ্রৌপদীর জীবন এবং হৃদয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণভাবেই অকিঞ্চিৎকর। আবার দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেনই বোধহয় দ্রৌপদীর একমাত্র স্বামী যাঁর মাধ্যমে তিনি আপন অনভীষ্ট নিন্দিত শত্রুদের দমন করতে পেরেছেন, সেখানে তাঁর তর্জনী ধারণ করাটা যথেষ্টই ব্যঞ্জনাময়। আবার অর্জুনরূপী মধ্যমাটা দেখুন। মধ্য শব্দটার মানেই একটু উদাসীন, নিরপেক্ষ ভাবের মানুষ; দ্রৌপদীর জীবনে অর্জুনের ভূমিকার মধ্যে কখনওই খুব আঁকড়ে ধরা নেই, অথচ মধ্যমাঙ্গুলির মতো সবচেয়ে বড়ই তো অর্জুন, দ্রৌপদী তাঁকেই তো জীবনের একমাত্র মাধ্যম করতে চেয়েছিলেন। এত সরল একটা পদ্যে তিনি কুন্তীপুত্র থেকে মাদ্রীপুত্রদের পৃথক করলেন যতীন্দ্রমোহন, আমি ভেবে অবাক হই। নকুল-সহদেবের কথা যেই এল, অমনি 'ঈষৎ নামায়ে দিলে অনামিকা'— অর্থাৎ দ্রৌপদীর মতো বিদগ্ধা রমণীকে ধরবারই ক্ষমতা নেই নকুল-সহদেবের, যদি না তিনি আঙুল ধরার ইঙ্গিতটুকু দেন। তার মধ্যে সহদেবের চেয়েও নকুল দ্রৌপদীর কাছে আরও অনামিক, সেই জন্য তাঁর জন্য অনামিকা। আর সহদেব দ্রৌপদীকে স্ত্রী হিসেবে পেয়ে সত্যিই কতটা ধন্যম্মন্য ছিলেন সময়ে তার পরিচয় দেব।

প্রথমত উল্লেখ্য, ঠিক বিয়ের পর হস্তিনাপুরে প্রবেশ করার আগেই দ্রৌপদীর জন্য রাজ্য-

রাজনীতিতে একটা তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। দুর্যোধনের উলটো-পালটা ভাবনার মধ্যে জল ঢেলে দিয়ে কর্ণ বোঝালেন— ওইসব ছলনায় কোনও কাজ হবে না, একে ভাঙানো, তাকে সরানো, এসব করে কোনও ফল হবে না। বরঞ্চ যতক্ষণে দ্রুপদ রাজা যুদ্ধের উদ্যম শুরু না করেন, যতক্ষণে না কৃষ্ণ তাঁর যাদব-বাহিনী নিয়ে যোগ দেন পাঞ্চাল দ্রুপদের সঙ্গে, তার মধ্যেই পাণ্ডবদের ওপর আক্রমণ করা হোক— রাজ্যার্থং পাণ্ডবেয়ানাং পাঞ্চাল্য-সদনং প্রতি। কিন্তু কর্ণের কথামতো কাজ করা সম্ভব ছিল না, হস্তিনাপুরের অন্তর্গৃহের রাজনীতি— যেখানে ভীষ্ম-দ্রোণ, কৃপ-বিদুরেরা পাণ্ডবদের প্রতি জতুগৃহ-গমনের আদেশটুকুর তাৎপর্য বুঝে গিয়েছেন, তাঁদের কারণেই ধৃতরাষ্ট্রকে দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবদের রাজ্যাধিকার মেনে নিতে হল এবং তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের পৃথক রাজ্যস্থাপনের অনুমতি দিলেন। সেখানে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-বিবাদ যাই থাকুক, গ্রামের লোকেরা বলবেই যে, দ্রৌপদীর মতো বউটার জন্যই পাণ্ডবদের ভাগ্য খুলে গেল।

হস্তিনাপুরের প্রভাবমুক্ত হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী-স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় নারদমুনি এসে পৌঁছোলেন সেখানে। প্রসঙ্গ দ্রৌপদী। পাঁচ ভাই একটি স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন, সেক্ষেত্রে সহবাসের আচারেও তো খানিকটা শৃঙ্খলা থাকতে হবে, কিন্তু সেটা তো আর পাঁচ ভাই 'মিটিং' করে ঠিক করতে পারেন না অথবা সোচ্চারে আলোচনাও করতে পারেন না যে, কীভাবে এক ভাইয়ের ভোগ-সাধনের পর কোন ক্রমে দ্রৌপদীর অধিকার পাবেন। সেই কারণেই মহাকাব্যিক অভিসন্ধিতে নারদ উপস্থিত হলেন ইন্দ্রপ্রস্থে। দ্রৌপদীকে দেখার পরেই তিনি প্রসঙ্গ তুলে বললেন— দ্যাখো বাছারা। তোমাদের পাঁচজনের একটা বউ, প্রত্যেকেরই ধর্মপত্নী দ্রৌপদী কৃষ্ণা— পাঞ্চালী ভবতামেকা ধর্মপত্নী যশস্বিনী। এখন তাঁর অধিকার নিয়ে তোমাদের মধ্যে সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই না লেগে যায়। সুন্দ-উপসুন্দ— দুই ভাইয়ের একটাই রাজ্য, একই গৃহে একই শয্যায় দুই ভাই একই স্ত্রী নিয়ে থাকত— এক রাজ্যাবেকগৃহাবেকশয্যাসনাশনৌ— পরে দুটোতেই লড়াই করে মরল।

যুধিষ্ঠির দুই অসুরের কাহিনি শুনতে চাইলে নারদ তিলোত্তমার কাহিনি শোনালেন। অনিন্দ্যসুন্দরী তিলোত্তমার জন্যই দুই ভাই শেষ পর্যন্ত নিজেরা মারামারি করে মরলেন— এই কাহিনি সবিস্তারে শুনিয়ে নারদ দ্রৌপদীর কথা উপস্থাপন করলেন। বললেন— দ্রৌপদীর জন্য শেষ পর্যন্ত তোমাদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি না লেগে যায়— যথা বো নাত্র ভেদঃ স্যাৎ সর্বেষাং দ্রৌপদীকৃতে। নারদ দ্রৌপদীর প্রসঙ্গে তিলোত্তমার কথা বলায় একদিকে যেমন দ্রৌপদীর চরম শারীরিক আকর্ষণ সূচিত হল, তেমনই অন্যদিকে প্রত্যেক ভাইই যাতে এই অসামান্যা রমণীর ওপর আপন অধিকার খুঁজে পান, সেই সূচনাও হল। পাণ্ডবরা সকলে মিলে নারদের সামনে প্রতিজ্ঞা করলেন— আমাদের এক-একজনের ঘরে দ্রৌপদী থাকবেন এক-এক বছর ধরে— একৈকস্য গৃহে কৃষ্ণা বসেদ্ বর্ষমকল্মষা। সময়টা এক বছর থাকার ফলে পুত্র সম্ভাবনায় পিতৃত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রটাও স্পষ্ট হয়ে উঠবে যেমন, তেমনই যুধিষ্ঠিরাদির পর্যায়ে নকুল-সহদেব পর্যন্ত প্রত্যেকেই এক এক বছরের ছোট বলে ক্রমিক ভোগপর্যায়ও নিশ্চিত হয়ে গেল এবং তাঁরা নিজেরাই ঠিক করলেন যে, এই একবছর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশ্চিন্ত সহবাস-মধুরতার মধ্যে অন্য কেউ যদি উপস্থিত হন, তা হলে তাঁকে ব্রহ্মচারী হয়ে বারো বছর বনে বাস করতে হবে।

একথা ঠিক যে, পঞ্চস্বামীর সুবাদে দ্রৌপদী একমাত্র যুধিষ্ঠির ছাড়া আর সব ভাইয়ের বউদিদি হয়েছেন; আর সহদেবের সঙ্গে মিলন কালে সব ভাইয়েরই তিনি ভাদ্দর বউ। কিন্তু মাঝখানে তিন স্বামী তিন সম্বন্ধেই আছেন দ্রৌপদীর সঙ্গে— কখনও স্বামী, কখনও ভাশুর আবার কখনও বা দেওর। কথাটা মহাভারতের কতগুলি সংস্করণ ধরেছে, কতগুলি ধরেনি। কিন্তু যে সংস্করণে এই বার্তাবহ শ্লোকটা আছে, সেটা ভীষণই চমকদার। সেকালে ভাশুরকে 'ভ্রাতৃশ্বশুর' বলত, বস্তুত এই শব্দটা থেকেই ভাশুর শব্দটা এসেছে। পরবর্তীকালের স্মৃতিশাস্ত্রীয় দায়ভাগ অংশে ভ্রাতৃশ্বশুর শব্দটা ভাশুর অর্থে ব্যবহৃত হলেও মহাভারতের এই সংস্করণ ভ্রাতৃশ্বশুরের পরিবর্তে 'পতিশ্বশুর' শব্দটা ব্যবহার করে বলেছে— ভীম-অর্জুন ইত্যাদির সঙ্গে দ্রৌপদীর স্বামী-সম্বন্ধ ধরলে জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরই একমাত্র সঠিক অর্থে পতিশ্বশুর বা ভাশুর হতে পারেন দ্রৌপদীর। আবার ওপরের চার ভাইয়ের সম্বন্ধ ধরলে একমাত্র সহদেবকেই সঠিক অর্থে দ্রৌপদীর দেবরও বলা যায়— পতিশ্বশুরতা জ্যেষ্ঠে পতিদেবরতানুজে— আর তিনজন কালে কালে স্বামী, ভাশুর, দেওর সবই— ত্রিতয়ং ত্রিতয়ং ত্রিষু।

ত্রিমাত্রিক সম্পর্ক নিয়ে তাঁর মনে কোনও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না। ব্যাস লিখেছেন— স্নিগ্ধ বনস্থলীর মধ্যে যেমন অনেকগুলি হাতি একসঙ্গে থাকে তেমনি পঞ্চস্বামীকে পেয়ে দ্রৌপদী গজদর্পিতা বনস্থলীর মতো অন্যের অধরা হয়েছিলেন। পাণ্ডবরাও তাঁর মধ্যে পেয়েছিলেন বনস্থলীর ছায়া। ব্যাস উপমাটি দিয়েছেন ভারী সুন্দর— নাগৈরিব সরস্বতী। 'সরস্বতী' মানে নীলকণ্ঠ লিখেছেন 'বহু সরোবরযুক্ত বনস্থলী'।

দ্রৌপদী যে এক-এক সময়ে এক-এক বীরস্বামীর স্নান সরোবরে পরিণত হতেন এবং অন্য স্বামীকে দিতেন বনস্থলীর ছায়া— তাতে সন্দেহ কি! ব্যাস তাই লিখেছেন— বভূব কৃষ্ণা সর্বেষাং পার্থানাং বশবর্তিনী— একসঙ্গে তিনি সবারই বশবর্তিনী ছিলেন এবং সেইজন্যই সাধারণভাবে বনস্থলীর উপমা। পাঁচ স্বামীর মধ্যে সবার সঙ্গেই দ্রৌপদীর ব্যবহার একরকম ছিল না। কাউকে একটু বেশি ভালবাসতেন, কাউকে বেশি বিশ্বাস করতেন, কাউকে বা যেন মানিয়ে চলেছেন, আবার কাউকে বাৎসল্যও করেছেন।

বাৎসল্যের কথাটা হয়তো বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু আমাদের ধারণা এই যে নকুল-সহদেব, এই দুই ভ্রাতার প্রতি দ্রৌপদীর বাৎসল্য রসই বেশি, যতখানি না শৃঙ্গার। সারা মহাভারতে যুধিষ্ঠির, ভীম আর অর্জুনের মাহাত্ম্য এত বেশি যে, এই তিন ভ্রাতার চাপে নকুল সহদেবের কথা সংকুচিত হয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে গাছের-ওপর উঠে জলের খোঁজ করা, একে ডাকা, তাকে বলা— এইসব খুচরো কাজের বেলায় নকুল-সহদেবের ডাক পড়ত। দ্রৌপদীর বিয়ের অব্যবহিত পূর্বেও জতুগৃহের আগুন থেকে বেঁচে ফেরবার সময়ে নকুল-সহদেব ভীমের কোলে উঠেছেন। এ হেন নকুল-সহদেবের সঙ্গে তিনটি নাম করা বীর স্বামীর রসজ্ঞা দ্রৌপদী কী ব্যবহার করবেন! বিশেষত কনিষ্ঠ সহদেবের সঙ্গে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপরূপা দ্রৌপদীকে যিনি প্রথম প্রেম নিবেদন করার সুযোগ পেলেন তিনি হলেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। এটি দ্রৌপদীর দুর্ভাগ্য না যুধিষ্ঠিরের সৌভাগ্য— সে আলোচনায় না গিয়েও বলতে পারি, যুধিষ্ঠির, মানে যিনি মহা যুদ্ধকালেও স্থির থাকতে পারেন, তিনি আর কত উতলা হয়ে রমণীর কাছে প্রেম নিবেদন করতে পারেন। বরঞ্চ যিনি তাঁকে লক্ষ্যভেদ করে জিতেছিলেন, যাঁর গলায় তিনি প্রথম বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর সময়-সুযোগ আসার আগেই তাঁকে হারাতে হল। আমি বলি, যে ঘরে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সঙ্গে বসে আছেন, সে ঘরে অস্ত্র রাখা কেন। তুমি ক্ষত্রিয় মানুষ, ক্ষত থেকে ত্রাণ করাই তোমার ধর্ম, আর সেই ধর্ম রক্ষার জন্য যখন তখন অস্ত্রের প্রয়োজন হতেই পারে। যেমন দরকার হলও। গরিব ব্রাহ্মণের গোরু চুরি গেছে, অর্জুনকে এখন তীর-ধনুক নিয়ে চোর তাড়া করতে হবে। এখন উপায়? অস্ত্রাগারে যুধিষ্ঠির এবং দ্রৌপদী। এতকাল আমাদের এই ধারণাই ছিল যে, অস্ত্রাগারে এই নবদম্পতির আস্তানা ছিল। কিন্তু তা মোটেই নয়। মানুষটি তো যুধিষ্ঠির, তিনি দ্রৌপদীকে একান্তে পাওয়ার জন্য খাণ্ডবপ্রস্থে আর এক খণ্ড জমিও খুঁজে পাননি। বাগান, বনস্থলীর কথা ছেড়েই দিলাম। তিনি সেঁদিয়েছেন গিয়ে নির্জন অস্ত্রাগারে। অর্জুনের সে কী দোটানা অবস্থা। তিনি ভাবছেন— দাদা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সঙ্গে আছেন অস্ত্রাগারে, আর একদিকে ব্রাহ্মণ রক্ষা বিধানের দায়ে পাণ্ডবদের সাহায্য চাইছেন। পরিত্রাতার ভূমিকাই অর্জুনের কাছে বড় হল। তিনি অস্ত্রাগারে ঢুকলেন, ব্রাহ্মণের সম্পত্তি উদ্ধার করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বনবাসের অনুমতি চাইলেন অগ্রজের কাছে।

অর্জুনের দিক থেকে এটা খুব বীরোচিত ব্যবহার হল বটে, কিন্তু ঘটনায় যুধিষ্ঠির অত্যন্ত বিব্রত বোধ করলেন। বারবার তিনি বললেন— আমার ঘরে ঢুকে তুমি কোনও অন্যায় কাজ করোনি, আমার অপ্রিয় কাজ তুমি করোনি কিছু। অতএব আমার মনে যদি কোনও অসন্তোষ না থাকে, তবে এমনি এমনি তুমি নিজেকে দোষী ভাবছ কেন। তা ছাড়া এমন যদি হত যে, ছোটভাই তার বউ নিয়ে নিভৃতে বসে আছে, বড় ভাই তার ঘরে ঢুকল, তবু সেটাকে একটা দোষ বলতে পারি, কিন্তু ছোট ভাই বড় দাদার ঘরে ঢুকেছে, তাতে কোনও অন্যায়ই হয় না— গুরোরনুপ্রবেশো হি নোপঘাতো যবীয়সঃ— অতএব অর্জুন! তুমি নিবৃত্ত হও, আমার কথা রাখো, আমাকে কোনও অবজ্ঞা তুমি করোনি। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কাতর উক্তি শুনেও খুব বিগলিত হলেন না। শান্ত কণ্ঠে বললেন— চালাকি করে কোনও ধর্ম আচরণ করা যায় না, একথা তোমার মুখেই বারবার শুনেছি। অতএব আমিও প্রতিজ্ঞাত সত্য থেকে সরে আসতে পারি না, আমাকে যেতেই হবে, তুমি অনুমতি দাও।

মহাভারতে দাম্পত্য-বিপর্যয়ের এই জায়গাটা অদ্ভুত। একটা তুচ্ছ ঘটনা ঘটাতে হবে বলেই ব্রাহ্মণের গোরু হারাল, কিন্তু গোরু খুঁজে আনার জন্য মহাভারতের সবচেয়ে বড় যুদ্ধবীর অর্জুনকেই প্রয়োজন হচ্ছে। এই তুচ্ছতার প্রয়োজন থেকে বুঝতে পারি ঘটনাটা অনেক গভীর এবং পরোক্ষে সেটা দ্রৌপদীর অধিকার লাভের জায়গা। যুধিষ্ঠির যেভাবে বিব্রত হয়ে অর্জুনকে অনুরোধ করেছেন থেকে যাবার জন্য, তাতে কেমন যেন মনে হয়—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি নিজেকে দোষী বোধ করছেন দ্রৌপদীর অনায়াস ভোগ্যতায়। অন্যদিকে যুধিষ্ঠিরের অনুরোধ সত্ত্বেও অর্জুনও যে এত কঠিন এবং নির্মম, সেটাও যেন বিপ্রতীপভাবে এক অপ্রাপ্তির শীতল প্রতিক্রিয়া। আমার শুধু মনে হয়— এই সময়ে দ্রৌপদীর মনের মধ্যে কী হচ্ছিল? মহাভারতের কবি একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি এ বাবদে— দুই স্বামীর কথোপকথনে তিনি আপাতদৃষ্টে অদৃশ্যা হয়ে আছেন। হয়তো বা এই সময়ে মনে পড়ে সেই বিবাহসভার কথা, যেখানে দ্রুপদের কাছে, ব্যাসের কাছে যুধিষ্ঠির বার বার মাতৃবাক্য পালনের কথা বলেছেন। শেষে কিন্তু নিজের অবচেতন মনের কথাও তিনি চেপে রাখতে পারেননি। বলেছেন— পাঁচভাই তাঁকে বিয়ে করুক— এ যেমন জননী কুন্তী বলছেন, এ তেমনি আমারও মনের কথা— এবং চৈব বদত্যম্বা মম চৈতন্মনোগতম্।

এ আমারই ইচ্ছে— মনোগতম্— এই ইচ্ছেটুকুর মধ্যে ব্যক্তিত্ব আছে ঠিকই। কিন্তু সেই মুহূর্তে, যখন নাকি লজ্জানম্রা বধূটির পক্ষে কিছুই বলা সম্ভব ছিল না, যেখানে তাঁর লক্ষ্যভেত্তা পুরুষসিংহ অর্জুন দাদাদের জন্য নিজের হক ছেড়ে দিয়েছেন, সেই কালেও দ্রৌপদী কি তাঁর জ্যেষ্ঠ স্বামীকে ক্ষমা করতে পেরেছেন! আমার তো মনে হয় যুধিষ্ঠিরকে সেই থেকে তিনি মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। মহাভারতকার স্পষ্ট করে এই ব্যাপারে স্বকণ্ঠে কিছু ঘোষণা করেননি, তবে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দ্রৌপদীর ব্যবহার লক্ষ করার মতো। তার ওপরে পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে থাকা অর্জুনকে যদিও বা কোনও পর্যায়ে লাভ করা যেত, তাঁকেও তিনি পরম লগ্নে হারিয়ে বসলেন সেই যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে অস্ত্রাগারে রসালাপ করে। দ্রৌপদী নিজেকেই বা কী করে ক্ষমা করবেন! যুধিষ্ঠিরের কথা তো ছেড়ে দিলাম, যদিও এর ফল ভুগতে হয়েছে যুধিষ্ঠিরকেই, অন্য সময়ে, অন্যভাবে।

অর্জুন ব্রহ্মচারীর ব্রত নিয়ে বারো বছরের জন্য ঘর থেকে বেরোলেন বটে, কিন্তু এই 'হিরোয়িক আইসোলেশন'-এর মধ্যে দ্রৌপদীর প্রতি তাঁর আকর্ষণটাই যে অন্য ধারায় বিপ্রতীপভাবে বয়ে চলল, সে-কথা স্বীকার করাই ভাল। ব্যাপারটা একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। অর্জুনের দিক থেকে একটা পরিকল্পিত ব্যবহার সৃষ্টি করে নিলেই তাঁর নির্লিপ্ততা এবং দ্রৌপদী আকর্ষণের তাৎপর্য পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেমন ধরুন, আমি সেদিনটার কথা ধরছি না, যেদিন লক্ষ্যভেদের পর খুশির হাসিতে উছলে-পড়া দ্রৌপদী বরমাল্যখানি অর্জুনের গলায় দুলিয়ে দিয়েছিলেন। ধরছি না এই জন্যে যে, নববধূর সদ্য-ফোটা একাধার হৃদয়কল্পনার মধ্যে ঠাসাঠাসি করে বসিয়ে দেওয়া হল আরও চারজনকে। বেশ এ-পর্যন্তও না হয় বোঝা গেল, কিন্তু দ্রৌপদীর সঙ্গে প্রথম সহবাসের অধিকার তো অর্জুনকে দেওয়া যেত। না, যুধিষ্ঠিরও এ সুযোগ ছাড়েননি, যদিচ ছাড়লেও আমি নিশ্চিত জানি অর্জুন এ সুযোগ নিতেন না। তারপরেই তো সেই ব্রাহ্মণের গোরু-হারানোর ঘটনা। আচ্ছা, সামান্য একটা গোরুচোর ধরার জন্য, আর গোরু খোঁজার জন্যও কি অর্জুনকে যেতে হবে? ভীম, নকুল, সহদেব— এঁরা কী করছিলেন? যিনি দূর থেকে কতবার দ্রৌপদীর গলা শুনতে পেয়ে বিপদ উদ্ধার করেছেন, সেই তিনি ভীম ব্রাহ্মণের গোরু-হারানো গলা শুনতে পেলেন না? নাকি, কেউই ওই অস্ত্রাগারে ঢুকে দ্রৌপদীর সহবাস খোয়াতে চাননি। তা যাক, না হয় অর্জুনই গোরু-চোর ধরতে গেলেন এবং নারদের নিয়মে তাঁর বনবাস হল। কিন্তু

যুধিষ্ঠির তো ছোট ভাইকে ছাড় দিয়ে বাড়িতেই থাকতে বলেছিলেন, তিনিই তো পাকামি করে থাকলেন না।

ঠিক এইখানটাতেই কথা। ধরে নিই যুধিষ্ঠিরের পীড়াপীড়িতে অর্জুন থেকেই গেলেন। ফলটা কী হত? প্রথমেই এটা পরিষ্কার হয়ে যেত যে, অর্জুন কোনও মূল্যেই সহবাস-সুখ ত্যাগ করতে চান না। দ্বিতীয়ত, ভীম কিংবা নকুল-সহদেব হলেও বুঝি ঘরেই থেকে যেতে পারতেন, কিন্তু এটা যেহেতু সেই অর্জুন, যিনি দ্রৌপদীর বরমাল্য জিতেছিলেন, তাই তিনিই প্রথম নিয়ম ভাঙলে অন্য স্বামীদের মনে, বিশেষত যুধিষ্ঠিরের মনে তো এক ধরনের মিশ্রক্রিয়া হতই। ভীম, নকুল-সহদেবের মনে হত— অর্জুনই যেহেতু লক্ষ্যভেদী এবং দ্রৌপদীর আসল নায়ক, তাই যুধিষ্ঠির তাকে অত করে থাকতে বলছেন। আর যুধিষ্ঠির মনে মনে ভাবতেন— অর্জুন থেকে গেল, বীর ক্ষত্রিয় হওয়া সত্ত্বেও অন্তত দ্রৌপদীর ওপরে নিজের হক এবং প্রাপ্য পাওনা ছেড়ে দিতে চায় না অর্জুন। কাজেই যুধিষ্ঠির যখন বলেছিলেন— তুমি ছোটভাই, বড়দের ঘরে ঢুকেছ, কী হয়েছে— এটা যুধিষ্ঠিরের ভালমানুষি, না পরীক্ষা, সেটা বুঝতে হবে। অন্তত অর্জুন এটাকে পরীক্ষা হিসেবেই নিয়েছিলেন। তাই যে কথা যুধিষ্ঠিরই সাধারণত বলেন, অর্জুন সেই ধর্মেরই দোহাই দিয়ে বললেন— ধর্মের ব্যাপারে চালাকি চলে না, একথা আপনার কাছেই শুনেছি। অতএব সত্যধর্ম থেকে বিচলিত হতে চাই না, দাদা! অর্জুন ধীর নির্লিপ্ততায় বনবাসী হলেন।

না, দ্রৌপদী কাঁদেননি, হৃদয়ের গভীরে পাক খাওয়া আসন্ন বিরহের বেদনা হৃদয়ের মধ্যেই বিলীন হয়ে গেছে। তা ছাড়া সেটা কোনও সময়ও ছিল না কাঁদবার। তিনি জ্যেষ্ঠ স্বামীর সঙ্গসুখ ভোগ করছেন, এই সময়ে তৃতীয় পাণ্ডবের জন্য কাঁদবার মানে হবে একটাই। পক্ষপাত। তিনি শারীরিক সঙ্গ পাবার আগেই অর্জুনকে ভালবেসেছেন। অন্তত নববধূর প্রথম মিলন মুহূর্তেও এই কথাটা তিনি কান্নায় প্রকাশ করতে চাননি। কিন্তু অর্জুন তো চলে গেলেন এবং দ্রৌপদীকে না পাবার নৈরাশ্যেই কিছুটা বা বাউল স্বভাব হয়ে গেল তাঁর। নৈরাশ্যের জবাবে উলুপী, চিত্রাঙ্গদা— একটার পর একটা বিয়েই করে ফেললেন। তারপর বুঝি দ্রৌপদীকে হারানোর দুঃখ কিছুটা বা ঘুচল প্রথমবারের মতো সুভদ্রাকে দেখে। রৈবতক পর্বতের বনভোজন মহোৎসবে সুভদ্রাকে দেখেই তাঁর মনে হল— কৃষ্ণ-বলরামের বোনকে দেখে কেই বা না মোহিত হবে— কমিবৈষা ন মোহয়েৎ। তিনি সুভদ্রার মধ্যে দ্রৌপদীর রূপ এবং বৈদগ্ধ্য, দুয়েরই ছায়া পেলেন, মনে ভাবলেন— এই মহিলা যদি আমার বউ হত— যদি স্যান্‌ মম বার্ষ্ণেয়ী মহিষীয়ম্‌। শেষে কৃষ্ণের মধ্যস্থতায় সুভদ্রা-হরণ করে, অনেক যুদ্ধের প্রস্তুতি শেষে বীরের মতো অর্জুন পেলেন সুভদ্রাকে।

পেলেন তো, কিন্তু এক বছরের একটু বেশি সময় দ্বারকায় থেকে সুভদ্রার উষ্ণ-সঙ্গ ভোগ করতে করতেই যে বনবাসের বারো বচ্ছর কেটে গেল। এবার তো ঘরে ফেরার পালা, খাণ্ডবপ্রস্থে দ্রৌপদীর ঘরে। উলুপী, চিত্রাঙ্গদাকে না হয় দ্রৌপদী নিজের সমমর্যাদায় দেখতেন না, কিন্তু সুভদ্রাকে নিয়ে দ্রৌপদীর মুখোমুখি হওয়া! অর্জুন যে জানেন দ্রৌপদী তাঁকে ভালবাসেন। মাটিতে পড়ে গেলেও স্খলিতপাদ মনুষ্যের অবলম্বন তো সেই ভূমিই, কাজেই যার কাছে অর্জুন অপরাধী, অর্জুন তাকেই আশ্রয় করলেন। খাণ্ডবপ্রস্থে এসে রাজা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রাহ্মণের অভিবাদন সেরেই তিনি ঢুকলেন দ্রৌপদীর ঘরে— দ্রৌপদীম্ অভিজগ্মিবান্। আগেই খবর হয়ে গেছে। বারো বচ্ছর পরে অভিমানে বিধুর দ্রৌপদী প্রথম স্বামি-সম্ভাষণ করলেন কঠিন বক্রোক্তিতে। বললেন— তুমি আবার এখানে কেন? যাও সেইখানে, যেখানে আছে সেই সাত্বত-বৃষ্ণি-কুলের সোহাগী মেয়ে— তত্রৈব গচ্ছ কৌন্তেয় যত্র সা সাত্বতাত্মজা। দ্রৌপদী সুভদ্রার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করলেন না, তাঁর বংশের নামে কথা চালালেন। অর্জুনকে খোঁটা দিয়ে বললেন— তোমার আর দোষ কী? ভারী জিনিস কঠিন বাঁধনে বেঁধে রাখলেও সময়কালে সে বাঁধন খানিকটা আলগা হয়েই যায়— সুবদ্ধস্যাপি ভারস্য পূর্ববন্ধঃ শ্লথায়তে।

ব্যাস লিখেছেন— প্রথমটা দ্রৌপদী যেভাবে বলছিলেন, তাতে তাঁর প্রণয়কোপের ভাগটাই ছিল বেশি— প্রণয়াৎ কুরুনন্দনম্। কিন্তু দ্রৌপদী যে বাঁধনের কথা বললেন, সে বাঁধন তো তাঁর অন্য স্বামীদের। যুধিষ্ঠির, ভীম— এঁদের বাঁধন যত বেড়েছে, অর্জুনের বাঁধন তত আলগা হয়েছে— পরে তার প্রমাণও দেব। কিন্তু এই মুহূর্তে, বারো বছর পরে যে দ্রৌপদী প্রথমে প্রণয়রসে রাগ দেখিয়ে কথা আরম্ভ করেছিলেন সে রাগ তাঁর কোথায় গেল! তিনি তো পরমুহূর্তেই কেঁদে ফেললেন ঝরঝর করে। ব্যাস শব্দটা লিখছেন— বিলপন্তীং, যার মানে বিলাপ করাও হয়, আবার কালীপ্রসন্ন সিংহ মশায়ের মতে 'নানাবিধ পরিহাস করিতে থাকিলে'— তাও হয়। সিংহীমশায় ভেবেছেন, আগে যখন প্রণয় কোপের কথা আছে, তা হলে এ শব্দটা পরিহাসই বোঝাবে। কিন্তু সাতবাহন হাল থেকে সমস্ত রসবেত্তা বোদ্ধারা বলেছেন— বিদগ্ধা মহিলারা রাগ দেখায় কেঁদে, আমি তাই এখানে 'বিলপন্তীং' বলতে কাঁদতে থাকা দ্রৌপদীকেই বুঝি। বিশেষ করে অর্জুন যেহেতু দ্রৌপদীকে নানাভাবে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, বহুভাবে দ্রৌপদীর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন, তাতে বুঝি মানিনী দ্রৌপদী কাঁদছিলেন।

দ্রৌপদী কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন। ধর্মপুত্র থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক পাণ্ডবেরই দ্রৌপদী ছাড়া অন্য স্ত্রী আছেন। তাদের কারও জন্যে দ্রৌপদীর কোনও দুঃখ কোথাও ধরা পড়েনি। কারণ তাদের কাউকে দ্রৌপদী আপনার সমকক্ষ মনে করেননি। কিন্তু অর্জুন তাঁর নির্লিপ্ততার বাহানায় দ্রৌপদীর মতো সপ্রতিভ ব্যক্তিত্বের দিক থেকে পেছন ফিরতে গিয়ে তাঁর সমকক্ষ আরেক ব্যক্তিত্বকে বিবাহ করে এনেছেন। এ অপমান দ্রৌপদী সইবেন কী করে? যার জন্য বারো বছর ধরে হৃদয়ের মধ্যে গোপন আসন সাজিয়ে বসে আছেন, তিনি একেবারে বিয়ে করে ফিরেছেন। দ্রৌপদী লজ্জায় অপমানে কেঁদে ফেললেন। প্রথমবারের মতো তিনি ধরা পড়ে গেলেন— তিনি অর্জুনকে বেশি ভালবাসেন।

সমকক্ষ ব্যক্তিত্বকে দিয়ে সমকক্ষের মোকাবিলা করা মুশকিল, বিশেষত আগুনপানা দ্রৌপদীকে। অর্জুন প্রথমেই সুভদ্রাকে দ্রৌপদীর ঘরে এনে তোলার সাহস পাননি। এখন দ্রৌপদীর ভাব বুঝে, ক্ষমা চেয়ে ফিরে গেলেন সুভদ্রার ঘরে। নববধূর নতুন অনুরাগের মতো লাল কৌশেয় বাসখানি তাড়াতাড়ি খুলে ফেলতে বললেন সুভদ্রাকে, খুলে ফেলতে বললেন ভূষণ-অলংকার। সুভদ্রাকে সাজিয়ে দিলেন দীন-হীন গোয়ালিনীর বেশে— কৃত্বা গোপালিকাবপুঃ। এব্যারে তাকে দ্রৌপদীর ঘরে পাঠিয়ে দিলেন একা। অনুক্রম অনুসারে

সুভদ্রা কুন্তীকে প্রণাম করেই দ্রৌপদীর ঘরে এলেন। তাঁকেও প্রণাম করে সুভদ্রা বললেন— আজ থেকে আমি তোমার দাসী হলাম দিদি— প্রেষ্যাহম্ ইতি চাব্রবীৎ। 'দাসী!' দ্রৌপদীর অভিমান বুঝি কিঞ্চিৎ তৃপ্ত হল। সুভদ্রার কুল মান সব বুঝেও তাঁর আপাত ব্যবহারে, দীন বেশে খুশি হলেন দ্রৌপদী। ভবিষ্যতের ধারণাহীন নতমুখী একা একা বালিকাকে দেখে দ্রৌপদীর বুঝি মায়া হল। উঠে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন সুভদ্রাকে, আশীর্বাদ করলেন— তোমার স্বামী নিঃসপত্ন হোন— নিঃসপত্নোঽস্তু তে পতিঃ। সপত্ন— মানে শত্রু, কাজেই নিঃসপত্ন হোন মানে— স্বামী নিঃশত্রুক হন— এই তো বীরাঙ্গনার আশীর্বাদ। কিন্তু পাঠক! শব্দের মধ্যেও ব্যঞ্জনা আছে। স্ত্রীলিঙ্গে 'সপত্নী' মানে যদি সতীন হয় তা হলে পুংলিঙ্গে সপত্ন মানেও একটা পুরুষ-সতীনের ব্যাপার থেকেই যায়, বিশেষত দ্রৌপদীর যিনি আসল স্বামী অর্জুন, তাঁর সপত্ন পুরুষের জ্বালাতেই বারো বছর পরে অর্জুনকে দেখতে পেলেন তিনি। কাজেই দ্রৌপদীর এই আশীর্বাদের অর্থ এই যে, আমার মতো যেন তোমার অবস্থা না হয়— তোমার স্বামী নিঃসপত্ন হোন।

ভাব দেখে মনে হল বুঝি দ্রৌপদী অর্জুনকে দিয়েই দিলেন সুভদ্রাকে। কিন্তু মন থেকে কি দেওয়া যায়? দেওয়া কি অতই সহজ? বরঞ্চ অর্জুনের প্রতি অক্ষমায় এবং সুভদ্রার প্রতি অতি ক্ষমায় দ্রৌপদীই যেন ধরা পড়ে গেলেন। সুভদ্রার স্বামীকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে নিজেরই মনের মধ্যে সতীন-কাঁটা বিঁধে রইল। অর্জুনের নির্লিপ্ততা দিনে দিনে বাড়িয়ে তুলল দ্রৌপদীর অক্ষমা। ইতিমধ্যে দ্রৌপদী ভীমকে অবলম্বন করতে আরম্ভ করেছেন— ভালবাসার জন্যে যতখানি, অর্জুনের ঈর্ষা জাগানোর জন্যে তার চেয়ে বেশি।

দ্রৌপদীর মতো বিদগ্ধা রমণীর মন বলে কথা— আমরা কীটের খোঁজে কেউটে সাপের গর্তে হাত ঢুকিয়ে ফেলেছি। এবার বরং একটু সাংসারিক কথায় আসি। দ্রৌপদী তাঁর পঞ্চস্বামীর ঔরসে পাঁচটি পুত্র লাভ করলেন— যুধিষ্ঠিরের ছেলে প্রতিবিন্ধ্য, ভীমের ছেলে সুতসোম, অর্জুনের ছেলে শ্রুতকর্মা, নকুলের শতানীক এবং সহদেবের ছেলে শ্রুতসেন। এই ছেলেরা প্রত্যেকে প্রতিবিন্ধ্য থেকে পর পর এক-এক বছরের ছোট— একবর্ষান্তরাস্ত্বেতে— কিন্তু মনে রাখতে হবে এঁদের সবার চাইতে বড় কিন্তু অর্জুনের ঔরসে সুভদ্রার ছেলে অভিমন্যু। মহাভারতের কবি এমন একটা সময়ে দ্রৌপদীর পুত্রজন্মের কথা বললেন যার মধ্যে একটা তাচ্ছিল্য আছে যেন। আসলে, সৌভদ্র অভিমন্যুর জন্মকথা হচ্ছিল সবিস্তারে, সেখানে হঠাৎ করে দ্রৌপদীও তাঁর পঞ্চস্বামীর ঔরসে পাঁচটি পুত্র লাভ করলেন— পাঞ্চাল্যপি তু পঞ্চভ্যঃ পতিভ্য শুভলক্ষণা— এখানে সুভদ্রার পর 'দ্রৌপদীও'— 'পাঞ্চাল্যপি'— কথাটা বলে ফেলেই মহাকবি সেই এক যান্ত্রিকতার আভাস তৈরি করে দিলেন, যেখানে তাঁর গর্ভজাত পুত্রেরা স্বয়ং দ্রৌপদীর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারল না। এই প্রক্রিয়ায় দ্রৌপদীর নিজস্ব বিদগ্ধতার জায়গাটা, অথবা বলা উচিত, তাঁর 'বৈদূর্যমণিসন্নিভ' দীপ্যমান যৌবনের মাহাত্ম্যটাই যেন বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তা নইলে তাঁর গর্ভের পাঁচ-পাঁচটা ছেলে এমন অকিঞ্চিৎকরভাবে উল্লেখ্য হবেন কেন! বস্তুত এই প্রক্রিয়ায় সুভদ্রার চেয়ে সুভদ্রার ছেলে অভিমন্যু যেমন মহাভারতে পাঠকের দৃষ্টিসীমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন, তেমনই দ্রৌপদীর পুত্রেরাও দ্রৌপদীকে 'প্রোক্রিয়েশন' বা 'রিপ্রোডাকশন'-এর ধর্মীয় যান্ত্রিকতাটুকু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েই পাঠকের দৃষ্টির বাইরে চলে যান, উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠেন দ্রৌপদীই— যিনি আর্জুনি অভিমন্যুকে নিজপুত্রদের চেয়েও অনেক সমাদরে দেখেন।

অবশ্য এই জায়গাটায় অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর ভালবাসাটাই আমার কাছে বড় হয়ে ওঠে। হয়তো অর্জুনের প্রিয় পুত্র বলেই দ্রৌপদীও সুভদ্রার এই ছেলেটিকে নিজের ছেলের থেকে কম স্নেহ করতেন না। সুভদ্রা নিজেও তাঁর বড় জা দ্রৌপদীকে কোনও দিনও কোনও ব্যবহারেই অতিক্রম করেননি। এই অনতিক্রমণই হয়তো ওজস্বিনী দ্রৌপদীকে সুভদ্রার ওপর সপত্নীর ঈর্ষা অতিক্রমের যুক্তি জুগিয়েছে। সেই যে বিবাহলগ্নেই সুভদ্রা এসে দ্রৌপদীকে বলেছিলেন— আমি তোমার দাসী, দিদি!— সে-ভাব তাঁর শেষ পর্যন্ত ছিল। শল্য পর্বে দুর্যোধনের মতো শত্রুপক্ষ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা শত-চেষ্টাতেও সুভদ্রা এবং দ্রৌপদীর মধ্যে বিরোধ ঘটাতে সক্ষম হননি। তিনি বলেছেন— কৃষ্ণের বোন সুভদ্রা সমস্ত মান, অহঙ্কার ত্যাগ করে এখনও পর্যন্ত দ্রৌপদীর মতে চলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর সেবা শুশ্রূষা করেন দাসীর মতো—

নিক্ষিপ্য মানং দর্পঞ্চ বাসুদেব-সহোদরা।
কৃষ্ণায়াঃ প্রেষ্যবদ্ ভূত্বা শুশ্রূষাং কুরুতে সদা ॥

৪

যুধিষ্ঠির পৃথক রাজ্যে রাজা হয়েছেন, পট্টমহিষী হিসেবে দ্রৌপদীও রানি হয়েছেন বটে, তবে দ্রৌপদীর দিক থেকে যুধিষ্ঠিরের এই পার্শ্ব-পরিগ্রহ রাজকীয় প্রাতিষ্ঠানিকতার বেশি কিছু নয়। কিন্তু তার জন্য তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের চলা-ফেরা ব্যক্তি-জীবনের সম্পর্কের দ্বারগুলিও রুদ্ধ হয়ে যায় না। খাণ্ডবপ্রস্থ তখনও ইন্দ্রপ্রস্থ হয়নি, অর্জুন ফিরে এসেছেন, সুভদ্রারও অনেক দিন কেটে গেছে, যদিও ভগিনীর বিবাহের সুবাদে কৃষ্ণ এখনও এই খাণ্ডবপ্রস্থেই বাস করছেন। এরই মধ্যে একদিন বেশ গরম পড়েছে, বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে রাজধানীর দুর্গ-দেয়ালের পরিসর। অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন— বড্ড গরম চলছে কৃষ্ণ! চলো যাই যমুনার দিকে— উষ্ণানি কৃষ্ণ বর্তন্তে গচ্ছাব যমুনাং প্রতি। কৃষ্ণ বললেন— আমার মনের কথা বলেছ ভাই! আমারও মনে হচ্ছিল বন্ধু-বান্ধব নিয়ে জলের দিকে যাই একবার। আর দেরি হল না, ধর্মরাজের অনুমতি নিয়ে কৃষ্ণার্জুন চললেন যমুনার দিকে। অর্জুনের সঙ্গে চললেন দ্রৌপদী এবং তাঁর নবপরিণীতা স্ত্রী সুভদ্রা। আর চলল রাজ্যের যত সব নাচিয়ে গাইয়ে মেয়েরা— স্ত্রিয়শ্চ বিপুলশ্রোণ্যশ্চারুপীনপয়োধরা। তারা নিজেদের ক্রীড়া-মত্ততায় যমুনার তটভূমি আলোড়িত করে তুলল এবং সেটা খানিকটা উদ্দীপনও বটে দ্রৌপদী, অর্জুন বা সুভদ্রার সঙ্গে। বিবাহের পর এই প্রথম অর্জুনের সঙ্গে দ্রৌপদীর একান্তে আসা। মহাকাব্যের কবি সংখ্যাতাত্ত্বিকের মতো হিসেব দেননি বটে, তবে প্রথম বৎসরে যুধিষ্ঠিরের অনাপ্লুত সঙ্গ-রঙ্গে দ্রৌপদীর সহবাসের হিসেব যদি ধরি, তবে বারো বছর বনবাসের পর

এই ত্রয়োদশতম বর্ষে দ্রৌপদী বোধহয় অন্য ভাইদের পরকীয়া ছিলেন না। অথবা থাকলেও তিনি এসেছেন ধর্মরাজের অনুমতি নিয়ে। তা ছাড়া সঙ্গে সুভদ্রাও তো এসেছেন। তবু খানিক একান্ত। দ্রৌপদী বড় খুশি হয়েছিলেন সেদিন। সুভদ্রার সঙ্গে একত্রে মদ্য পান করেছেন ক্ষত্রিয়াণীর মতো, নাচিয়ে-গাইয়ে মেয়েদের দিকে বসন-ভূষণের উপহার ছুড়ে দিয়েছেন বিহ্বলতায়— প্রাযচ্ছতাং মহার্হাণি স্ত্রীণাং তে স্ম মদোৎকটে। দ্রৌপদী কি এত সুখ পেয়েছেন এর আগে, এই মুক্তি, অর্জুনের সঙ্গে এই প্রায় একান্ত মুক্তি!

মহাবীর অর্জুনের সময় ব্যস্ত হয়ে উঠল এই উৎসব-মুখর যমুনা তীরেও। খাণ্ডববন দহনের পরিকল্পনা তৈরি হয়ে গেল এইখানেই এবং অতঃপর খাণ্ডব-দহন এবং ময়দানবের পরিকল্পনায় খাণ্ডবপ্রস্থ ইন্দ্রপ্রস্থ হয়ে উঠল। ইন্দ্রপ্রস্থের বহুবিত্তপ্রকাশিনী রাজসভায় নারদমুনি এসে যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ করতে বললেন, এতে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বাড়বে। যুধিষ্ঠির রাজি হলেন এবং প্রধানত কৃষ্ণের বুদ্ধি এবং ভাইদের বাহুবলে এক বিস্তীর্ণ রাজমণ্ডল তাঁর বশীভূত হল। রাজসূয় যজ্ঞের অর্ঘ্যদানের সময় মারা পড়লেন শিশুপাল। যজ্ঞান্তে সকলেই একে একে চলে গেলেন, কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থের সভাসৌকর্য দেখার নাম করে দুর্যোধন এবং শকুনি রয়ে গেলেন পাণ্ডবদের রাজধানীতে। ইন্দ্রপ্রস্থের অতুল শোভা দেখতে দেখতে দুর্যোধনের ঈর্ষা-অসূয়া কতটা উদ্দীপিত হল, সে খবর আমরা জানি। কিন্তু তাঁর অনন্ত ঈর্ষা-কারণ বস্তুর মধ্যে আমরা দ্রৌপদীর ক্ষুদ্র স্থানটিকে ভুলছি না। রাজসভা দেখতে দেখতে যেখানে স্থল-জলের বিভ্রমে বারবার পড়ে যাচ্ছেন দুর্যোধন, সেখানে ভীম নাকি দুর্যোধনের দুর্গতি দেখে বেজায় হেসেছিলেন এবং তাঁর পার্শ্বচর ব্যক্তিরাও হেসেছিল। কিন্তু এখানে একমাত্র ভীমের কথাই আছে, অন্যান্য পাণ্ডবদের কিংবা দ্রৌপদীর হাসাহাসির কোনও ঘটনাই নেই। কিন্তু ব্যাপারটা কেমন অসাধারণভাবে বেড়ে উঠছে দেখুন এবং তার মধ্যে দ্রৌপদী কীভাবে সংক্রমিত হচ্ছেন, সেটাও দেখুন। দুর্যোধন ঈর্ষা-অসূয়ায় মুহ্যমান, সেই মুহূর্তে শকুনি যখন অদ্ভুত কৌশলে অত্যন্ত নঞর্থকভাবে দুর্যোধনকে উদ্দীপিত করছেন, তখন প্রথমেই আসছে দ্রৌপদীর কথা।

শকুনি বললেন— যুধিষ্ঠিরের ওপরে তুমি রাগ কোরো না, ভাগনে! ওদের কপালে ওরা সুখভোগ করছে। তুমি আর কী করবে। তা ছাড়া চেষ্টা তো কম করোনি, সবই তো বিফলে গেছে। ওই যে দ্রৌপদী! তা সেই দ্রৌপদীকে তো ওরাই বউ হিসেবে পেল, সঙ্গে দ্রুপদ রাজা এবং তাঁর ছেলেপিলেদের সহায়তাও জুটে গেল ওদের— তৈর্লব্ধা দ্রৌপদী ভার্যা দ্রুপদশ্চ সুতৈঃ সহ। শকুনির মুখে পাণ্ডবদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি এবং অতুল সম্পত্তি-লাভের প্রসঙ্গটা অপ্রসঙ্গ নয়, কিন্তু ক্ষতে লবণ-ক্ষেপণের মতো দ্রৌপদীর কথাটা ঠিক বেরিয়ে এল শকুনির মুখে। এই অপ্রাসঙ্গিক উদ্দীপনের ফল কী হল— দুর্যোধন যখন পিতা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে তাঁর ঈর্ষা-অনুশোচনার বিবরণ শোনাচ্ছেন, তখন অনেক জ্বালার কথায় কথা বাড়িয়ে দ্রৌপদীর বিরুদ্ধেও ক্রোধ প্রকাশ করলেন দুর্যোধন। বললেন— একবার ভুল করে জলে পড়ে গিয়ে আবার যখন একটা পদ্মদীঘির মতো বস্তু দেখে পরনের কাপড় তুলে ধরেছি, তখন ভীম আমার অবস্থা দেখে হা হা করে হাসল। কিন্তু তারপর যখন স্থল ভেবে জলেই পড়ে গেলাম, তখন দেখলাম— কৃষ্ণ আর অর্জুনও আমাকে দেখে মিষ্টি মিষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসছে এবং হাসছিল ওই দ্রৌপদী, অন্যান্য মেয়েদের নিয়ে দ্রৌপদীও হাসছিল— দ্রৌপদী চ সহ স্ত্রীভির্ব্যথয়ন্তী মনো মম— এতে আমার ভীষণ আঘাত লেগেছে মনে। আমার এই অপমানের প্রতিশোধ নেব আমি।

দেখুন, ঘটনা যা ঘটে, তা থেকে যদি অন্য কারও ওপর নির্ভর নিজের ফায়দা তুলতে হয়, তা হলে বাড়িয়ে বলাটাই দস্তুর। প্রতিশোধ নিতে হলে ধৃতরাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া দুর্যোধনের চলবে না, অতএব অনুশোচনা এবং কষ্ট জানানোর সময়ে অন্য অনেক কথার মধ্যে দ্রৌপদীও কিন্তু একটা ভীষণ রকমের 'আইটেম' হয়ে উঠলেন। শকুনি আগেই বলেছিলেন— যুদ্ধ-টুদ্ধ করে কিছু হবে না, বরঞ্চ কৌশলমার্গে অদক্ষ যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় পর্যুদস্ত করে আমি সমস্ত ধন-সম্পত্তি এবং পাণ্ডবদেরও আমি তোমার অধিকারে নিয়ে আসব। শকুনি দ্রৌপদীর কথা উহ্য রাখলেন এবং দুর্যোধন সমস্ত ঈর্ষা-অসূয়া-অভিমান একত্রিত করে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাশাখেলার অনুমতি বার করে নিলেন। বিদুরের মতো ব্যক্তিত্ব বারণ করলেও ধৃতরাষ্ট্র ছেলের স্বার্থে বললেন— বন্ধুর মতো পাশাখেলা হবে, কোনও চিন্তা নেই।

ধৃতরাষ্ট্রের কথায় খানিকটা বিশ্বাস করেই বিদুর ইন্দ্রপ্রস্থে এসেছিলেন পাশাখেলার নেমন্তন্ন করতে। কিন্তু নিতান্ত ব্যক্তিগত জায়গা থেকে তিনি পাশাখেলার কুফলগুলি যথেষ্টই বর্ণনা করায় যুধিষ্ঠিরের কিছু বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু বোঝেননি যে, তার পিছনে ছিল ওই খেলাটার প্রতি তাঁর অত্যাসক্তি। যুধিষ্ঠির তো কোনওভাবেই জুয়াড়ি নন, জুয়াড়িদের সঙ্গে তিনি মেশেনওনি কোনওকালে, কিন্তু জুয়াড়িদের এই খেলাটার ওপর তাঁর বড় মোহ ছিল। তিনি পাঁচ ভাই এবং দ্রৌপদীকে নিয়ে হস্তিনাপুরে এলেন সাড়ম্বরে। সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম-অভিবাদন জানিয়ে যখন যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবেরা অতিথিভবনে প্রবেশ করছেন, তখন দ্রৌপদীকে দেখে, তাঁর ঋদ্ধি দেখে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূরা কেউ খুশি হলেন না— যাজ্ঞসেন্যাঃ পরামৃদ্ধিং দৃষ্ট্বা প্রজ্বলিতামিব। এখানে 'ঋদ্ধি' শব্দটার অর্থ বেশভূষা এবং প্রচুর অলংকার বলে যাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন বা অনুবাদ করেছেন, তাঁদের উদ্দেশে সবিনয়ে জানাই— ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূদের বেশালংকার কিছু কম থাকার কথা নয়, কিন্তু দ্রৌপদীর চলনে-বলনে-চেহারায় যে ব্যক্তিত্ব ছিল, সেটাকে ঔদ্ধত্য বলে ভুল করাটা স্বাভাবিক বলেই মহাভারতের কবি দ্রৌপদীর ঋদ্ধিকে একটা বিশেষণ দিয়েছেন— 'প্রজ্বলিতামিব'— জ্বলছে যেন। প্রজ্বলিত আগুনপানা এক ধরনের বাড়বাড়ন্ত— ঋদ্ধিং প্রজ্বলিতামিব। অন্তত দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে এই ঋদ্ধি বেশ-ভূষা-অলংকার হতে পারে না। কিছু বিদগ্ধা রমণী এমন থাকেনই, যাঁদের সঙ্গে আগ বাড়িয়ে কথা বলা যায় না, তাঁদের জিজ্ঞাসাই করা যায় না— স্বামী-পুত্তুর নিয়ে ভাল আছ তো গা। এ-হেন রমণীদের দেখলে ও-হেন রমণীরা পিছনে বলেন 'দেমাক'— ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূরা সেই কারণেই একেবারে খুশি হলেন না— নাতিপ্রমনসোঽভবন্।

যুধিষ্ঠির পাশা খেলতে বসলেন শকুনির সঙ্গে এবং এই খেলার বিস্তারিত বিবরণে আমরা যেতে চাই না। শকুনি একেবারে পাকা জুয়াড়ি এবং পাকা পাশাড়ে। খেলার দক্ষতার সঙ্গে খেলার অন্যায় কর্মগুলিও তাঁর ভাল রপ্ত আছে। ফলে যুধিষ্ঠির যখন একটা একটা পণ ধরছেন, তখন খেলার সমাপ্তি ঘটতে সময় লাগছে না। শকুনি বলে বলে দান দিচ্ছেন

এবং শেষে একবার সোচ্ছ্বাসে বলছেন— এই নে, এটাও জিতলাম— জিতমিত্যেব। যুধিষ্ঠিরের পণ বাড়তে লাগল— ছোট থেকে বড়, মহার্ঘ থেকে মহার্ঘতর। আগ্রহ বাড়তে থাকল ধৃতরাষ্ট্রের দিক থেকে। তিনি বড় খুশি হয়ে উঠছেন শকুনির আপন জয়ঘোষণায়। যুধিষ্ঠিরের দুরাগ্রহ এবং মত্ততা বেড়েই চলেছে। এই অবস্থায় মহামতি বিদুর তীক্ষ্ণ ভাষায় এই পাশাখেলার আয়োজনের প্রতিবাদ করলেন। আয়োজক হিসেবে ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধন যেমন তাঁর তিরস্কার থেকে মুক্তি পেলেন না, তেমনটি শকুনিও। কিন্তু পাশাখেলার আসর তখন এমন জমে উঠেছে যে, বিদুরকে যথেষ্ট অপমানজনক ভাষায় থামিয়ে দিলেন। দুর্যোধন যা তা বললেন বিদুরকে এবং ধৃতরাষ্ট্রের সামনেই। অথচ যুধিষ্ঠিরের মত্ততা তখন এমনই যে, তিনি এইসব বাদানুবাদের মধ্যে গেলেন না এবং বিদুর-দুর্যোধনের বাক্য-সংঘাত শেষ হতেই তিনি আবারও খেলা আরম্ভ করলেন।

সেকালের নিয়মে পণ রাখার আগে পণ্য বস্তুর গুণ বর্ণনা করার একটা রীতি ছিল। যুধিষ্ঠিরও সেটা করছিলেন। এই করতে করতে ধনসম্পত্তি রাজ্যপাট সব গেল যুধিষ্ঠিরের। এবার তিনি একে একে ভাইদের পণ রাখতে আরম্ভ করলেন এবং ওই একইভাবে তাঁদের গুণ-বিশেষ বর্ণনা করে। সহদেব থেকে ভীমসেন পর্যন্ত হেরে যাবার পর যুধিষ্ঠির নিজেকেই এবার বাজি রেখে বসলেন, শকুনি একই শঠতায় যুধিষ্ঠিরকে জিতে নিলেন এক লহমায়। সর্বহারা যুধিষ্ঠির যখন আর কিছু ভেবে পাচ্ছেন না, ঠিক তক্ষুনি শকুনি তাঁকে সুকৌশলে বললেন— এ তুমি কেমন একটা ভুল করলে, রাজা! তুমি কিনা নিজেকেই হেরে বসলে? আত্মপরাজয়ের মতো পাপ আর আছে নাকি? তা ছাড়া তোমার নিজের ঘরে অমন ভাল জিনিসটা তুমি এখনও পণই রাখোনি— গ্লহ একঃ অপরাজিতঃ। শকুনি মনে করিয়ে দিলেন— ঘরে আছেন তোমার প্রিয়া পত্নী কৃষ্ণা পাঞ্চালী। তুমি তাকে পণ রেখে নিজেকে অন্তত জিতে নাও— পণস্ব কৃষ্ণাং পাঞ্চালীং তয়াত্মানং পুনর্জয়— এইভাবে মুক্ত করো নিজেকে।

যুধিষ্ঠিরের তখন মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নিয়তি-চালিত মানুষের মতো তিনি দ্রৌপদীর রূপ বর্ণনা আরম্ভ করলেন। বিয়ের আগে থেকে এখন পর্যন্ত দ্রৌপদীকে কেউ এভাবে শরীর-বিশ্লেষণ করে বর্ণনা করেনি— বলা উচিত— করা যায়নি, তাঁর ব্যক্তিত্বের নিরিখেই এমনটা করা যায় না— অথচ যুধিষ্ঠির ভূতাবিষ্টের মতো উন্মুক্ত রাজসভার মধ্যে সকলের সামনে দ্রৌপদীর রূপ বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন— নাতিহ্রস্বা ন মহতী— তিনি বেঁটেখাটো কোনও লোক নন, আবার ঢ্যাঙা লম্বাও নন, ভীষণ রকমের কিছু কালোও নন, আবার তেমন রাঙা-রাঙা গায়ের রংও নয় তাঁর, ঘন কুঞ্চিত কেশরাশি, শরৎকালের পদ্মবাসিনী লক্ষ্মীর মতো তাঁর চেহারা। গায়ে তেমন লোম নেই, পরিপাটি ক্ষীণকটি— যে রকম এক রমণী লাভ করলে যে কোনও পুরুষ তার ধর্ম-অর্থ-কাম সব সিদ্ধ করতে পারবে সেইরকম রমণী এই পাঞ্চালী কৃষ্ণা, আমিও তাঁকেই এবার পণ রাখছি— তয়ৈবংবিধয়া রাজন্ পাঞ্চাল্যাহং সমুধ্যয়া।

যুধিষ্ঠিরের মুখে আপন স্ত্রীর এই বর্ণনা অবধারিতভাবে একধরনের পণ্যতা তৈরি করে, যা এখনকার দিনের প্রগতি-তাত্ত্বিকেরা খুব কড়া করেই ধরবেন, যদিও মহাকাব্যের সামগ্রিকতায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা এখানে 'নারীকে পণ্য করে তোলা হয়েছে' এবং যুধিষ্ঠির এই পৌরুষেতার জন্য দায়ী এক প্রতিভূ পুরুষ— এই তাত্ত্বিকতার ওপর আমরা জোর দিই না। কেননা পাশাখেলার নেশায় যুধিষ্ঠির এখানে তাঁর পুরুষভাইদের এমনকী নিজেকেও পণ্য করেছেন এবং সেই পণ্যতার ক্ষেত্রেও প্রত্যেকটি ভাইয়ের বিশেষ বিশেষ গুণবর্ণনা আছে। বরঞ্চ মহাকাব্যের পরম্পরা বিচারে এখানে পাশাখেলার মতো এক কামজ ব্যসনের নেশায় মানুষ যে প্রিয়তমা স্ত্রীকেও পণ্য করে তোলে— ঋগ্‌বেদের অক্ষসূক্তের সেই দুর্ভাগা পুরুষটিই যে এখানে যুধিষ্ঠিরের আকারে আছেন, সেই বৈদিক পরম্পরাই এখানে পণ্যতার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। বিশেষত যুধিষ্ঠিরের মতো সদাশয় মানুষও যে অক্ষক্রীড়ার নেশায় এমন হিতাহিতজ্ঞানশূন্য মোহচালিত হয়ে পড়েন, যাতে নিজের ভাই এবং স্ত্রীকেও পণ্য করে ফেলতে দ্বিধা করছেন না, মহদাশয়তার এই পতনই কিন্তু এখানে মহাকাব্যের ভিত তৈরি করেছে। এই যে মহদ্‌বিভ্রম এবং মহত্তের বিভ্রম— এটাই মহাকাব্যের সৃষ্টি-নিদান হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলেই মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের এই বিভ্রম বোঝানোর জন্য রামায়ণে সীতার কথায় রামচন্দ্রের সোনার হরিণের পিছনে ধাওয়া করার বিভ্রমটাকে উদাহরণ হিসেবে টানা হয়। যুধিষ্ঠিরকে বোঝানো হয়— মহারাজ! দুঃখ করবেন না, মহদাশয় মানুষেরও ঈদৃশ পরিণতি ঘটে— প্রায়ঃ সমাসন্ন-বিপত্তিকালে ধিয়োঽপি পুংসাং মলিনীভবন্তি।

আমরা তাই দ্রৌপদীকে পণ্য করে তোলার ব্যাপারটা যত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, তার চেয়ে অনেক বেশি চমৎকার মনে করি তাঁর লড়াই করার তেজস্বিতা। যে-মুহূর্তে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখলেন, সেই মুহূর্তে সভাস্থলে ধিক্কারধ্বনি শোনা গেল তাঁর উদ্দেশে, কুরুসভার বৃদ্ধরা এবং সভ্যেরা ধিক ধিক করতে লাগলেন, সমস্ত সভায় আলোড়ন তৈরি হয়ে গেল ওই একটি পণ্যতার বাক্যে। ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপরা ঘামতে লাগলেন, বিদুর দু'হাতে নিজের মাথার চুল ধরে মাথা টিপে চোখ নিচু করে রইলেন। বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র স্নেহান্ধতায় পাগলপ্রায়— বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন— জিতেছে কি? শকুনি জিতেছে এই দানটা? কর্ণ-দুঃশাসন-রা উত্তাল হাসছেন পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের বোকামি দেখে, ভদ্রলোকদের চোখের জল গড়িয়ে পড়ল লজ্জায়— এরই মধ্যে শকুনি ঘোষণা করলেন— এই আমি জিতলাম তোমার দান— জিতমিত্যেব।

এই সমস্ত আলোড়ন, বিক্ষেপ, আক্ষেপের মূল কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু দ্রৌপদী, পাণ্ডবদের কুলবধূ— তাঁকে পাশার দানে, পণ্যতায় কলুষিত করেছেন যুধিষ্ঠির। এবং শুধু তাঁকেই জিতে নেবার অপেক্ষা ছিল এতক্ষণ। ধন-সম্পত্তি নয়, রাজ্যপাট নয়, অন্যান্য শক্তিধর পাণ্ডব ভাইদের দাসে পরিণত করে নিয়েও পাশাখেলার পরিণতি আসেনি। ভূতাবিষ্ট যুধিষ্ঠিরের মনে ছিল না দ্রৌপদীর কথা, তাঁকে মনে করিয়ে দিতে হয়েছে মানেই— দ্রৌপদী সেই চরম পণ যাঁকে না হলে কৌরবপক্ষের প্রাপ্তি সম্পূর্ণ হয় না। কৌরবদের দিক থেকে দ্রৌপদীর অপ্রাপ্যতার অনুমান কতখানি, তা বোঝা যায় তাঁদের পরবর্তী মুহূর্তের প্রতিক্রিয়ায়। যে সর্বজন-শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিটি পাশাখেলার প্রক্রিয়ায় বাধা দিয়েছিলেন, সেই বিদুর যখন স্থাণুর মতো মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, দুর্যোধন সেই বিদুরকে দাসীপুত্র বলে সম্বোধন করে বললেন— এই যে ক্ষত্তা বিদুর! এদিকে এসো এবার, নিয়ে এসো এখানে পাণ্ডবদের

সোহাগী বউটাকে— এহি ক্ষত্তর্দ্রৌপদীমানয়স্ব/ প্রিয়াং ভার্যাং সম্মতাং পাণ্ডবানাম্। সে এখানে এসে আমাদের ঘরদোর ঝাড় দিক, তারপর অন্তঃপুরে আমাদের দাসীদের সঙ্গেই তার থাকার ব্যবস্থা হবে।

মহাভারতীয় প্রাচীনকালে 'দাসী'-শব্দটার মধ্যে কিন্তু অনেক ইঙ্গিত আছে। দুর্যোধন যতই ওপর ওপর বলুন যে, ঘরদোর সাফ-সুতরো করার জন্য দ্রৌপদীকে নিয়ে এসো এখানে, তবুও এটা একেবারেই বহিরঙ্গ আহ্বান। সেকালে দাসীত্বের মধ্যে এক ধরনের পুরুষভোগ্যতার ইঙ্গিত ছিল, দাসী অনেক ক্ষেত্রেই ভোগ্যা, এমনকী পাটরানির পরিবর্ত হিসেবেও সাময়িকভাবে দাসীরা ব্যবহৃত হয়েছেন, এমন উদাহরণ মহাভারতেই অনেক আছে। অতএব দুর্যোধন যে শুধুমাত্র ঘরদোর পরিষ্কার করার জন্য দ্রৌপদীকে ডাকছেন না, সেটা অন্যেরা যেমন দ্রৌপদীকে পণ রাখার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝেছিলেন, তেমনই মহামতি বিদুর সেটা আরও বেশি বুঝতে পারছেন দ্রৌপদী পণজিত হবার পর। আর ঠিক এতটা বুঝেছেন বলেই বিদুর দ্রৌপদীকে আপ্রাণ মুক্ত করার জন্য চেঁচিয়ে বললেন— এটা হতেই পারে না, দুর্যোধন! এটা হতেই পারে না। কৃষ্ণা পাঞ্চালী কখনও এইভাবে দাসী হতে পারেন না— ন হি দাসীত্বমাপন্না কৃষ্ণা ভবিতুমর্হতি। বিদুর এবার সেই আইনের প্রশ্ন তুলে দিলেন, যাতে বিদুর বুঝিয়ে দিতে পারেন যে, দুর্যোধনের কোনও নৈতিক অধিকারই নেই দ্রৌপদীকে সভাস্থলে আনার। তিনি বললেন— যুধিষ্ঠির আগে নিজেকেই পণে হেরে বসেছেন, এই অবস্থায় দ্রৌপদীর স্বামিত্বের অধিকারই তাঁর থাকে না, অতএব তিনি দ্রৌপদীকে পণই রাখতে পারেন না— অনীশেন হি রাজ্ঞৈষা পণে ন্যস্তেতি মে মতিঃ। কিন্তু তবু যদি আইনের ধারে না গিয়ে তুমি দ্রৌপদীকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করো, তা হলে তোমাকে সেই ছাগলের গল্পটা বলতে হয়। সেই যে এক মাছ-ধরা জেলে মাছ ধরার বড়শিতে খানিক ভাতের গুলি দিয়ে টোপ লাগিয়ে রেখেছিল। জেলের অনুপস্থিতিতে হঠাৎই এক ছাগল এসে সেই টোপশুদ্ধ বড়শিটা গিলে নিল। ওদিকে সুতোর টান পড়তেই বড়শি মুখ থেকে বার করতে গিয়ে পিছনের দুই পা দিয়ে লাফাতে লাফাতে নিজের মুখটাই ঠুকতে লাগল মাটিতে। ফলে তার গলা কেটে রক্ত পড়তে লাগল। মনে রেখো দুর্যোধন! এই দ্রৌপদী কিন্তু তোমাদের গলার কাঁটা বড়শি, যার সুতোটা কিন্তু পাণ্ডবদের হাতে, তুমি কিন্তু মরবে দুর্যোধন! ওই ছাগলের মতো— টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখেছেন— এবং বড়শিস্থানীয়াং দ্রৌপদীং স্পৃশন্ ছাগ ইব ত্বমপি নংক্ষ্যতীতি ভাবঃ।

বিদুর আইনি প্রশ্ন তুলে কড়া ভাষায় দুর্যোধনের সমালোচনা করতেই দুর্যোধন এড়িয়ে গেলেন তাঁকে। ঘটনা কিংবা কথাবার্তা অন্যদিকে ঘুরে যাবার আগেই বিদুরের প্রশ্ন এড়িয়ে দুর্যোধন সারথি জাতের একটি লোককে— তার নাম প্রাতিকামী— তাঁকে বললেন দ্রৌপদীকে অন্তঃপুর থেকে ধরে আনতে। দুর্যোধন বললেন— এই বিদুর-ব্যাটা পাণ্ডবদের ভয়ে উলটো-পালটা বকছে। তুমি যাও, নিয়ে এসো দ্রৌপদীকে, তোমার কোনও ভয় নেই।

প্রাতিকামী চলল দুর্যোধনের আদেশ পালন করতে। সিংহের গুহায় ঢোকা কুকুরের মতো প্রাতিকামী পাণ্ডবদের প্রিয়া মহিষীকে বলল— যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় মত্ত, মহারাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্যোধন তোমায় জিতে নিয়েছেন, দ্রৌপদী! তুমি চল এখন ধৃতরাষ্ট্রের ঘরের কাজে নিযুক্ত হবে।— নয়ামি ত্বাং কর্মণে যাজ্ঞসেনি। দ্রৌপদীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। "এ তুমি কী বলছ প্রাতিকামী?"— দ্রৌপদী বললেন। সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ তাঁর চলে না, অতএব তাঁর বক্তব্যে কোনও স্বামী-সোহাগ নেই। সোজা বললেন— রাজার ঘরের কোনও ভদ্র ছেলে বউকে পণ রেখে পাশা খেলে? পাশা খেলায় মজে গিয়ে রাজার যুক্তি বুদ্ধি সব গেছে, নইলে পণ রাখার মতো জিনিস আর কি কিছু ছিল না? প্রাতিকামী বলল— থাকবে না কেন? ধন সম্পত্তি তাঁর আগেই গেছে। তারপর ভাইদের বাজি রেখেছিলেন, তারপর নিজেকে, অবশেষে তোমাকে। দ্রৌপদী বললেন— ওরে সারথির পো, তুই আগে গিয়ে জুয়াড়িকে জিজ্ঞাসা কর যে, সে আগে নিজেকে বাজি রেখে হেরেছে, না, আগে আমাকে বাজি রেখে হেরেছে?

এই বিপন্ন মুহূর্তে এর থেকে ভাল জবাব আর কিছু হতে পারে না। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের অধিকারের প্রশ্ন তুলেছেন। কোন অধিকারে, কার অধীশ্বর ভেবে ধর্মরাজ দ্রৌপদীকে বাজি ধরেছেন— কস্যেশো নঃ পরাজৈষীরিতি ত্বামাহ দ্রৌপদী। প্রাতিকামী যুধিষ্ঠিরকেই দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর দিতে বলেছেন সবার সামনে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের চিরন্তনী স্ত্রীবৃত্তি নিয়ে তিনি মাথা ঘামাচ্ছেন না। স্বামী অন্যায় করলেও তাঁর বিরুদ্ধতা করে কথা বলা যাবে না— অন্তত এটা হচ্ছে না দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে। প্রাতিকামীর মাধ্যমেও দ্রৌপদী কিন্তু এখনও দুর্যোধনের সঙ্গে কথা বলছেন না। বিদুরের কথা তিনি শোনেননি, কিন্তু তিনি বিদুরের মতোই এই মুহূর্তে আত্মরক্ষার জন্য যুধিষ্ঠিরের স্বামিত্বের অধিকার খারিজ করে দিয়ে তাঁর কাছেই প্রশ্ন তুলছেন— তুমি আগে নিজেকে বাজি রেখে হেরেছ, নাকি তোমার হারার পরে আমাকে বাজি রেখেছ— কিন্নু পূর্বং পরাজৈষীরাত্মানম্ অথবা নু মাম্। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর এই প্রশ্ন শুনে প্রাণহীন অচৈতন্য পুরুষের মতো বসেছিলেন, প্রাতিকামী সূতকে ভাল-মন্দ, ঠিক-বেঠিক একটা কথারও উত্তর দিতে পারেননি— বচনং সাধ্বসাধু বা। কিন্তু নিজের প্রয়োজনে দুর্যোধনই প্রাতিকামীকে বললেন— তা এত সব বড় বড় প্রশ্নের উত্তর দ্রৌপদী এই সভায় এসেই করুক না, যদি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গেই তার এত কথা থাকে, তো সে-সব কথা এখানেই হোক, অন্যেরাও শুনুক তাদের কথা— ইহৈব সর্বে শৃণ্বন্তু তস্যাশ্চৈতস্য যদ্বচঃ।

প্রাতিকামীও দুর্যোধনের অন্যায় বুঝে এবং তদুপরি তাঁর অন্যায় আদেশ শুনে মোটেই খুশি হল না। সে ব্যথিতচিত্তে আবারও দ্রৌপদীর কাছে গেল এবং বলল— রাজনন্দিনী! ওরা আপনাকে সভায় গিয়ে যা বলার বলতে বলছে। ওদের সর্বনাশের সময় এসে গেছে, নইলে এমন করে বড় মানুষের সম্মান নষ্ট করে— মন্যে প্রাপ্তঃ সংক্ষয়ঃ কৌরবাণাম্। প্রাতিকামীর মুখে সভা-নিয়ন্ত্রকের আদেশ শুনেও মনস্বিনী দ্রৌপদী প্রাতিকামীর সমব্যথার সুযোগ নিয়ে অসম্ভব সুন্দর একটা উত্তর দিলেন। দ্রৌপদী বললেন— বিধাতার বিধান কে খণ্ডাবে বলো— এবং নূনং ব্যদধাৎ সংবিধাতা! তিনি নিশ্চয়ই এইরকম করেছেন যে, পণ্ডিত এবং মূর্খ দুই ধরনের মানুষই ধর্ম এবং অধর্মকে কোনও না কোনও সময় স্পর্শ করে। ভাবটা এই— যুধিষ্ঠির এবং দুর্যোধন দু'জনেই এখন অধর্মকে স্পর্শ করে আছেন। কিন্তু ধর্মাধর্মের দ্বৈরথে পণ্ডিতরা তো ধর্মকেই বড় বলে মানেন। এখন সেই ধর্মটা যেন কৌরবদের ছেড়ে না

যায়। তুমি তাই আবারও গিয়ে রাজসভার সভ্যদের আমার আগের প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করো। তাঁরা যা বলবেন, তাই আমি করব।

প্রাতিকামী আবারও রাজসভায় গিয়ে দ্রৌপদীর কথা বলল, কিন্তু কাজ কিছু হল না, রাজসভার বিচক্ষণ এবং বৃদ্ধ সভ্যেরাও দুর্যোধনের অন্যায় অভীষ্ট মাথায় রেখেই কথা না বলে মাথা নিচু করে রইলেন— অধোমুখাস্তে ন চ কিঞ্চিদূচু/ র্নিবন্ধং তং ধার্তরাষ্ট্রস্য বুদ্ধা। আসলে দুষ্ট রাজনীতির পরিণতিতে একেশ্বরতার একমুখীন প্রবৃত্তি এই ধরনের বিপত্তি তৈরি করে। দুর্যোধন কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের সোপান বেয়ে এই রাজনীতির মাথায় উঠেছেন, সেখানে ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-বিদুরেরাও অপ্রত্যক্ষে জড়িত, কিন্তু আজ তিনি দুষ্টতার এমন আবর্ত তৈরি করেছেন শুধু নিজেদের লোক নিয়ে— যারা যখন-তখন সম্মানিতের মুখের ওপরেও অপমান-শব্দ উচ্চারণ করতে পারে। বাধা পেলেই তারা অপমান করতে ছাড়ে না বলেই সেখানে দুষ্ট রাজনীতির প্রতিক্রিয়া এইরকমই হয় যে, সকলের বাক্য স্তব্ধ থাকে, তাঁরা অধোবদনে শুধু দেখতে বাধ্য হন। এখানেও তাই হয়েছে। যেহেতু দুর্যোধনের ইচ্ছে, অতএব কুরুকুলের সভাসদরা নিজেদের মান বাঁচাতে অধোমুখে বসে থাকাটাই বেশি সুবিধের মনে করলেন।

ওদিকে যুধিষ্ঠিরের তো মাথাটাই কাজ করছে না। তিনি এটা বুঝে গেছেন যে, দুর্যোধন পাণ্ডব-কুলবধূ দ্রৌপদীকে রাজসভায় এনেই ছাড়বে এবং এখানে আইনি প্যাঁচ দেখিয়ে কোনও লাভ হবে না। তাই সকলের অলক্ষ্যে একজন বিশ্বস্ত দূতের মাধ্যমে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বলে পাঠালেন— তিনি যেন সভায় আসেন— যে অবস্থায় তিনি আছেন, যে কাপড় পরে আছেন, সেই কাপড় পরেই, একবস্ত্রা, অন্য আচ্ছাদনহীন। পরনের কাপড়টি নাভিদেশ থেকে একটু নীচে বেঁধে তিনি যেন শ্বশুর ধৃতরাষ্ট্রের সামনে আসেন কাঁদতে কাঁদতে— একবস্ত্রা ত্বধোনীবী রোদমানা রজস্বলা। যাঁর তখন এমনিতেই ক্রোধে ক্রন্দন করতে ইচ্ছা হচ্ছে, সেই দ্রৌপদীকে কান্নার অভিনয় করতে উপদেশ দিচ্ছেন ধর্মপুত্র! যে সংযম তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছিল, সেই সংযম তো তিনি আগেই হারিয়েছেন, এখন তিনি ভীত-বিহ্বল হয়ে দ্রৌপদীর অসহায়তাকে ব্যবহার করতে বলছেন শ্বশুর-প্রতিম ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। এখনও তিনি সরলভাবে ভাবছেন— অন্তত ধৃতরাষ্ট্র এই অন্যায়ের প্রতিকার করবেন।

কিন্তু অসহায়তাকে ব্যবহার করা, বিশেষত নারীর অসহায়তা, অথবা নারীত্ব ব্যবহার করে স্বকার্য উদ্ধার করা— তাও আবার অন্ধ শ্বশুরের সামনে, যেখানে কথা বলার প্রয়োজন হবে সবচেয়ে বেশি, দ্রৌপদী সেখানে পুত্রবধূর মতো ন্যুব্জ হয়ে ওঠার পাঠ কোনও দিন শেখেননি। যুধিষ্ঠিরের সেই দূত কী ধরনের যৌধিষ্ঠিরী বার্তা দ্রৌপদীকে দিতে পারল জানি না, কিন্তু দুর্যোধনও পুনরায় একই কথা প্রাতিকামীকে বললেন— তুমি এখানে তাকে নিয়ে এসো, প্রাতিকামী! তার সামনেই কৌরবেরা জবাব দেবে— ইহৈবৈতামানয় প্রাতিকামিন্/ প্রত্যক্ষমস্যাঃ কুরবো ব্রুবন্তু। প্রাতিকামী লোকটা দুর্যোধনের আজ্ঞাদাস হলেও সে কিন্তু দ্রৌপদীর ক্রোধ অনুমান করেও একটু ভীত হচ্ছিল— ভীতশ্চ কোপাদ্ দ্রুপদাত্মজায়াঃ— বিশেষত দুর্যোধনের ইচ্ছেটা তাঁর মনঃপূত ছিল না বলেই, সে যেন একটু ঠ্যাটা লোকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতোই সভাসদদের দিকে তাকিয়ে বলল— তা হলে কৃষ্ণা পাঞ্চালীকে আমি কী বলব— সভ্যানুবাচ কৃষ্ণাং কিমহং ব্রবীমি?

মুহূর্তের মধ্যে দুর্যোধন বুঝে ফেললেন— এই লোকটিকে দিয়ে হবে না, আরও নির্মম এবং আরও স্থূল কোনও মানুষ লাগবে যে রমণীর রমণীয়তা, অথবা মনস্বিনীর বিদগ্ধতা বোঝে না। তিনি দুঃশাসনকে আদেশ দিলেন— তুমি নিজে গিয়ে, ধরে নিয়ে এসো যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীকে— স্বয়ং প্রগৃহ্যানয় যাজ্ঞসেনীম্। দুর্যোধনের আদেশে দুঃশাসন গেলেন এবার দ্রৌপদীকে ধরে আনতে। তার চোখ লাল, নিজের ওপরে তার কোনও শাসন নেই— সেই দুঃশাসন গিয়ে খলনায়কের মতো দ্রৌপদীকে বললেন— এস গো, এস এস! তোমায় আমরা জিতে নিয়েছি! লজ্জা কীসের সুন্দরী! একবার দুর্যোধনের দিকে তাকাও— এহ্যেহি পাঞ্চালি জিতাসি কৃষ্ণে/ দুর্যোধনং পশ্য বিমুক্তলজ্জা। এবার পাণ্ডবদের ছেড়ে কৌরবদের আত্মদান কর— কুরূন্ ভজস্বায়ত-পদ্মনেত্রে। দ্রৌপদী রাজবালা, এসব শোনা তাঁর অভ্যাস নেই। বিবর্ণা, হাতে মুখ ঢেকে কেবল পিছু হঠছেন, পিছু হঠতে হঠতে তিনি সেইখানে এসে উপস্থিত হলেন, যেখানে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রীরা ছিলেন— যতঃ স্ত্রিয়স্তা বৃদ্ধস্য রাজ্ঞঃ কুরুপুঙ্গবস্য। টীকাকার কেউ কেউ এই মহাভারতীয় বচন শুনেই বলে উঠেছেন যে, দ্রৌপদী যখন ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রীদের ঘরে এসেছেন সেখানে গান্ধারী ছাড়া ধৃতরাষ্ট্রের অন্য স্ত্রীরা ছিলেন, গান্ধারী সেখানে ছিলেন না। আমরা বলব— গান্ধারীও সেখানে থাকতে পারেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই ছেলেদের কুকর্মের গতি তিনি রোধ করতে পারেননি, বা রোধ করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। তা ছাড়া এত বড় একটা ঘটনা ঘটছে, অথচ তিনি সম্পূর্ণ অনবহিত, এটাও কি সম্ভব! মোট কথা, কুরুস্ত্রীদের মধ্যেও তাঁর আশ্রয় মিলল না। দুঃশাসন এবার তাঁর চুলে হাত দিল। যে চুল একদিন রাজসূয়ের যজ্ঞজলে অভিষিক্ত হয়েছিল, যে চুলের মধ্যে রাজেন্দ্রাণী হবার জল্পনা মেশানো ছিল, দুঃশাসন সেই চুলে হাত দিল। পাঁচ স্বামীর সাহচর্যে নাথবতী হয়েও অনাথের মতো কাঁদতে কাঁদতে দ্রৌপদী বললেন— ছোটলোক, অনার্য! রজস্বলা অবস্থায় এক কাপড়ে বসে আছি আমি। এ অবস্থায় আমাকে তুমি সভার মধ্যে নিয়ে যেতে পার না। মুখে খল হাসি হেসে দুঃশাসন বলল— তুমি রজস্বলাই হও আর এক কাপেড়েই থাক অথবা গায়ের কাপড় গায়ে নাই থাকুক— রজস্বলা বা ভব যাজ্ঞসেনি একাম্বরা বাপ্যথবা বিবস্ত্রা— সভায় তোমাকে যেতেই হবে। তুমি আমাদের কেনা বাঁদী, আমরা যেমন খুশি ব্যবহার করব। আর তুমিও আমাদের নিশ্চিন্ত সুখে যেমন খুশি কামনা করতে পার— দ্যূতে জিতা চাসি কৃতাসি দাসী/ সা কাময়স্মাংশ্চ যথোপজোষম্। দুঃশাসনের টানাটানিতে দ্রৌপদীর কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশরাশি খসে এলিয়ে পড়েছিল, পরিধানের বসন অর্ধ-বিগলিত প্রায়। দ্রৌপদী তবুও চেঁচিয়ে বললেন— যে-সভায় বড় বড় সম্মানিত মানুষ বসে আছেন; বসে আছেন আমার গুরুজনেরা, সেখানে এইভাবে আমি দাঁড়াব কী করে— তেষামগ্রে নোৎসহে স্থাতুমেবম্।

এমন ঘোর এই বিমাননার মধ্যেও দ্রৌপদী কিন্তু এখনও তাঁর স্বামীদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভরসা হারিয়ে ফেলেননি। এমনকী যে যুধিষ্ঠির— যাঁকে সকলেই এই মুহূর্তে ঘৃণ্য অন্যায়ী মনে করছে, তাঁর সম্বন্ধে এখনও তাঁর বহুমানন আছে, তবে এমনও হতে পারে যে, যুধিষ্ঠির

যেহেতু নিজে পণজিত হয়ে তবে তাঁকে বাজি রেখেছিলেন— এই ঘটনাটা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তাঁর মুখে এখনও প্রশংসা ভেসে আসছে যুধিষ্ঠিরের জন্য। দ্রৌপদী বললেন— অসভ্য কোথাকার! অনার্যবৃত্ত! তুই এইভাবে আমাকে প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় সভায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করিস না। মনে রাখিস, দেবতারাও যদি তোর সহায় হয়, তবুও আমার রাজপুত্তুর স্বামীরা তোদের ছেড়ে দেবে না। আর ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের কথা বলি, ধর্মের দিকে তাঁর সতত দৃষ্টি আছে। ধর্মের গতি সূক্ষ্ম বলেই তাঁকে সহজে বোঝা মুশকিল। আমি এখনও মনে করি যে, আমার সেই ধার্মিক স্বামীর গুণগুলি না দেখে, তাঁর সামান্য দোষের কথাটা খুব বড় করে প্রকট করে তোলাটা ঠিক হবে না— বাচাপি ভর্তুঃ পরমাণুমাত্রম্/ ইচ্ছামি দোষং ন গুণান্ বিসৃজ্য।

এ-কথা শুনে অনেক পণ্ডিতজনের মনে হয়েছে যে, যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর সরসতা অন্য পাণ্ডব স্বামীদের চাইতে বেশি। কিন্তু আমাদের মনে হয়— দ্রৌপদী এত সোজা-সরল কথা বলছেন না এখানে। পরবর্তী সময়ে এটা তাঁর যুক্তি হবে যে, যুধিষ্ঠির সত্যিই তো নিজের ইচ্ছেয় পাশা খেলতে আসেননি এবং তাঁর সঙ্গে খেলায় ছলনার আশ্রয়ও নেওয়া হয়েছে, সেখানে যুধিষ্ঠিরের মতো সরলবুদ্ধি মানুষকে দোষ দিলে চলবে কেন? বস্তুত এখানে তাঁর মুখে যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা অনেকটা নিজেকে বাঁচানোর জন্যই। দুঃশাসন ততক্ষণে কৃষ্ণা পাঞ্চালীর চুল ধরে তাঁকে সভায় এনে ফেলেছেন। এই বিকট অভদ্রতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা করে তাঁকে যেন আরও লজ্জায় ফেলে দিলেন। অন্যদিকে দুঃশাসনের অসভ্যতা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি রাজসভার সভ্য এবং বৃদ্ধজনদের উদ্দেশ করে বললেন— আমাকে রজস্বলা অবস্থায় এমন বিপরীত বেশে টেনে আনা হল, অথচ কেউ এখানে একবার এই লোকটার সম্বন্ধে নিন্দা পর্যন্ত করছে না, তা হলে কি এটাই ধরে নেব যে, দুঃশাসন যা করছে, তাতে আপনাদের মত আছে, মশায়রা— ন চাপি কশ্চিৎ কুরুতেত্র কুৎসাং/ ধ্রুবং ত্বদীয়ো মতমভ্যুপেতঃ। আর আমি এই বিখ্যাত ভরতবংশীয় ক্ষত্রিয় পুরুষদের কোন অধঃপতন দেখছি! এই যে পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, মহামতি বিদুর, আর আমাদের রাজা ধৃতরাষ্ট্র— এঁদের শরীরে তো প্রাণ আছে বলে মনে হচ্ছে না। থাকলে, এমন অধর্মের কাজটা তাঁরা বসে বসে দেখছেন কী করে— রাজ্ঞস্তথা হীনমধর্মমুগ্রং, ন লক্ষয়ন্তে কুরুবীরমুখ্যাঃ।

একটা কথা কিন্তু এখানে এই অর্ধপ্রসঙ্গেও জানিয়ে রাখা দরকার। নারীর ওপর পৌরুষেয় অত্যাচার কোনও নতুন কথা নয়, চিরকাল তা চলেছে আজও তা চলছে। কিন্তু ইতিহাসের মধ্যযুগে তো বটেই, এমনকী আজ থেকে একশো বছর আগেও যেভাবে অত্যাচারটা মুখ বুজে সহ্য করতে হত, আমরা বলব— তার চেয়ে অবস্থাটা অনেক বেশি ভাল ছিল মহাকাব্যের যুগে। দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে জঘন্য অন্যায় করেছেন যুধিষ্ঠির, তাঁর স্বামী। অন্যায় করেছেন ঈর্ষাকাতর শত্রুজন— করবেনই, ঈর্ষাকাতর বলেই করেছেন, অপ্রাপ্য সুন্দরী রমণীকে পাবার জন্য করেছেন, শত্রুর স্ত্রী হবার কারণে করেছেন। কিন্তু একটাই এখানে বোঝার কথা— দ্রৌপদী মুখ বুজে সহ্য করছেন না। দুঃশাসনকে যেমন তীব্র ভাষায় তিনি ভর্ৎসনা করেছেন, তেমনই রাজসভায় সমাবিষ্ট মান্য-গণ্য এবং বৃদ্ধ কুলপুরুষদেরও তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি ছেড়ে কথা বলছেন না। আর তাঁর স্বামীরা, ভাগ্যতাড়িত হয়ে এখন যাঁরা কিছুই করতে পারছেন না বা বলতেও পারছেন না, তাঁদের প্রতি তাঁর সক্রোধ সাভিমান রক্ত দৃষ্টিপাতই যথেষ্ট ছিল। দৃষ্টির অগ্নিপাতে তিনি অন্তরে ক্ষুব্ধ স্বামীদের পুড়িয়ে দিচ্ছিলেন যেন— সা পাণ্ডবান্ কোপপরীতদেহান্/ সন্দীপয়ামাস কটাক্ষপাতৈঃ। কিন্তু এই দৃষ্টিপাতে অন্তরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেও কিছু করার উপায় ছিল না বলে— মহাকাব্যের কবি মন্তব্য করেছেন— ধন-সম্পত্তি, রাজ্যপাট, মণি-রত্ন হারিয়ে পাণ্ডবরা যত দুঃখ পেয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশি দুঃখ পেলেন সেই বিপন্ন সময়ে দ্রৌপদীর লজ্জাকুল, ক্রোধ-বক্র দৃষ্টি দেখে— যথা ত্রপাকোপ-সমীরিতেন/ কৃষ্ণা-কটাক্ষেণ বভূব দুঃখম্।

দুঃশাসনের যন্ত্রণায় দ্রৌপদী কাতর হয়ে তাকাচ্ছিলেন স্বামীদের দিকে। এই অবস্থায় দ্রৌপদীকে ধাক্কা মেরে চিৎকৃত হাসির মধ্যে দুঃশাসন বললেন দাসী, আমাদের দাসী— আধূয় বেগেন বিসংজ্ঞকল্পাম্ /উবাচ দাসীতি হসন্ সশব্দম্। কথাটার মধ্যে যে নিকৃষ্ট ইঙ্গিত আছে— যা আমরা আগে বলেছিলাম, তা যেন সমর্থিত হল সম-সময়েই শকুনি আর কর্ণের হাসিতে। বস্তুত দুর্যোধন, কর্ণ আর শকুনি বেশ মজা পাচ্ছিলেন দ্রৌপদীকে দেখে— দুঃশাসন যেভাবে তাঁকে দগ্ধে দগ্ধে অত্যাচার করছিলেন, যেভাবে তাঁর নারীত্বের অবমাননা করছিলেন, এগুলি তাঁদের মর্ষকাম তৃপ্ত করছিল। আমাকে যারা কর্ণ-চরিত্রের মহত্ত্ব এবং মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বারবার স্মরণ করিয়ে দেন, তাঁদের আমি এই জায়গাগুলো একটু স্মরণ করিয়ে দিই। দ্রৌপদীর দুর্গতি তৈরি করে দুঃশাসনের মতো নিরেট যেভাবে হাসছেন, কর্ণও ঠিক সেইভাবেই হাসছেন দ্রৌপদীকে দেখে বা তাঁর প্রতি দাসী-শব্দের উচ্চারণ শুনে— কর্ণস্তু তদ্‌বাক্যমতীব-হৃষ্টঃ/ সম্পূজয়ামাস হসন্ সশব্দম্। হয়তো বা এটা তাঁর পূর্বকালের সেই স্বয়ংবর প্রতিক্রিয়া— দ্রৌপদী তাঁকে সূতপুত্র বলে স্বামিত্বে বরণ করেননি।

দ্রৌপদীর চড়া বক্তব্য শুনেও রাজসভার সকলে নিশ্চুপ হয়ে আছেন— এটা একেবারেই বেমানান হচ্ছে বুঝেই কুরুবৃদ্ধ পিতামহ একটু কথা বলবার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু দুর্যোধন-দুঃশাসনদের 'অ্যাটিটুড' দেখে— এটাও হয়, ওটাও হয়— গোছের একটা উত্তর দিয়ে বললেন— যে জিনিসটার ওপর স্বত্ব নেই, অধিকার নেই, সেটা দিয়ে পণ রাখা যায় না। অন্যদিকে এটাও আবার ঠিক যে, স্ত্রীর ওপর স্বামীর একটা স্বত্ব আছে— অতএব এই দুই দিক বিবেচনা করে আমার খুব বিভ্রান্ত লাগছে। এখানে আইন বা বিচারের সূক্ষ্মতা এতটাই যে যথার্থ উত্তর দেওয়াটা খুব কঠিন। ভীষ্ম কিন্তু ঘটনার গতি-প্রকৃতিটা সঠিক বুঝিয়েই দিয়েছেন, কিন্তু তিনি মনে করেন— কথাটা যুধিষ্ঠিরেরই বলা উচিত। তাঁরই তো বলা উচিত যে, নিজেকে পণ রেখে হেরে যাবার পর দ্রৌপদীর ওপর তাঁর স্বত্ব-স্বামিত্ব থাকে না কিছু এবং তিনি বাজি না ধরলেও শকুনি যে মতলব করে তাঁকে দিয়ে দ্রৌপদীর বাজিটা ধরিয়েছেন— এ-ব্যাপারে তো যুধিষ্ঠিরকেই মুখ খুলতে হবে। ফলে দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা তো সত্যিই কঠিন। অর্থাৎ কিনা যুধিষ্ঠির যদি শকুনির শঠতার কথাটা নিজমুখে না বলেন, তা হলে কী উত্তরই বা দেওয়া যায়— ন ধর্মসৌক্ষ্ম্যাৎ সুভগে বিবেক্তুং/ শক্নোমি তে প্রশ্নমিদং যথাবৎ।

এটা তো চিরকালীন একটা প্রশ্ন যে, স্ত্রীর ওপর স্বামীর স্বত্ব আছে কিনা। এখনকার

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-ভাবনার নিরিখে স্ত্রীলোকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বেড়েছে, বিবাহিত স্বামীর ঘরে থাকলেও তাঁর পৃথক ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি— তাঁর অর্থ, তার শরীর, তার যৌনকর্তৃত্ব— সব কিছুই আইনিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার দিকে এগোচ্ছে। তবে মহাভারতের কালে এমনটা ছিল না— এই কথা বলে মহাভারতীয় সমাজকে অপমান করার চেয়ে যদি ঊনবিংশ/বিংশ শতাব্দীর অর্ধকাল পর্যন্ত সাহেব-সুবোদের প্রগতিশীল আইনের দিকে দেখি তবে সে-আইনেও মহাভারতীয় যুগের চাইতে উন্নতি কিছু দেখতে পাইনি। সেখানে আমি তো দ্রৌপদীর প্রশ্নটাকেই সাংঘাতিক প্রগতিশীল মনে করি। তিনি অন্তত এটা বলেছেন যে, পরাজিত, পণজিত অবস্থায় যুধিষ্ঠিরের স্বত্ব আছে কিনা দ্রৌপদীর ওপর। ভীষ্ম উত্তর দিয়ে আরও বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন স্বত্ব না থাকলে সেটাকে বাজি রাখা যায় না। কিন্তু স্ত্রীর ওপরে স্বামীর স্বত্ব আছে, সেই নিরিখে যুধিষ্ঠিরের কিছু অধিকার আছে।

কিন্তু লক্ষণীয়, যুধিষ্ঠিরকে অনেক খোঁচানো সত্ত্বেও যুধিষ্ঠির কোনও কথারই উত্তর দেননি। তাতে মনে হতে পারে— নিজে পরাজিত হবার পর দ্রৌপদীর ওপর তাঁর স্বত্ব নেই, অথচ বাজি ধরে চরম লজ্জায় পড়ে চুপ করে আছেন, অর্থাৎ কিনা দ্রৌপদী যে প্রশ্ন তুলেছেন, সেটা তিনি অন্যায় বলে মনে করছেন না। অথবা যেভাবে ঘটনা ঘটেছে— শকুনি তাঁকে দিয়ে প্রায় জোর করেই দ্রৌপদীকে বাজি ধরিয়েছেন— সে-কথাও এই সমুদ্যত তর্কমুখর দুর্যোধন-কর্ণদের মুখের ওপর আর বলে লাভ নেই, কারণ তাঁরা নিজেরাই সকলে এখন দাসে পরিণত। কিন্তু সর্বশেষে মনে হয়— তিনি এখন অনুতাপে এতটাই জর্জরিত এবং বিভ্রান্ত যে, ভাগ্যের ওপর সব কিছু ছেড়ে দিয়েছেন নাচার হয়ে, যার জন্য একেবারে অপ্রসঙ্গে গিয়ে অন্তত দ্রৌপদীকে বাঁচানোর জন্য তাঁকে নাটক করে কাঁদতে বলছেন শ্বশুর ধৃতরাষ্ট্রের সামনে।

দ্রৌপদী কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছামতো চলেননি এবং ভীষ্মের কথার উত্তর দিয়ে তিনি বলেছেন— রাজা যুধিষ্ঠির তো নিজে এই পাশা খেলতে আসেননি। কতগুলো ঠগ, অসভ্য, কপট লোক তাঁকে এখানে নিয়ে এসেছে। যুধিষ্ঠির পাশা খেলতে ভালবাসেন, এই পর্যন্ত। কিন্তু পাশাখেলা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাননি কোনও দিন এবং এখানে পাশাখেলায় তার ইচ্ছে তৈরি করা হয়েছে, তা হলে কী করে বলি তিনি নিজের ইচ্ছেতে পাশা খেলতে এসেছেন? আর এই সরল-স্বভাব রাজা যুধিষ্ঠির বিপক্ষের শঠতা কিছু বুঝতে পারেননি, আর যখন বুঝেছেন ততক্ষণে তাঁকে পাশার পণে জয় করা হয়ে গেছে— সম্ভূয় সর্বৈশ্চ জিতোঽপি যস্মাৎ/ পশ্চাদয়ং কৈতবমভ্যুপেতঃ। তা ছাড়া যুধিষ্ঠিরের কথা থাক, কুরুবংশীয়রা এই সভায় যাঁরা আছেন, তাঁদের যেমন নিজেদের ছেলেদের ওপর কর্তৃত্ব আছে, তেমনই পুত্রবধূদের ব্যাপারেও তাঁদের কর্তৃত্ব আছে, তাঁরা আমার কথা পর্যালোচনা করে আমার প্রশ্নটার উত্তর দিন— আমি কি পাশার পণে জিত হয়েছি— তিষ্ঠন্তি চেমে কুরবঃ সভায়াম্/ ঈশাঃ সুতানাঞ্চ তথা স্নুষাণাম্।

দ্রৌপদীর এই কথাটার মধ্যে একটা ইঙ্গিত আছে। দ্রৌপদী বলেছেন— আপনাদের ছেলেদের ব্যাপারে যেমন আপনাদের কর্তৃত্ব আছে তেমনই কর্তৃত্ব আছে পুত্রবধূদের ব্যাপারেও। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যেটা হয়— ছেলের ব্যাপারে মা-বাবা এবং গৃহগত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরুজনেরা যতটা প্রশ্রয়-পরায়ণ হন, পুত্রবধূদের ব্যাপারে সেটা হন না। এখানে দুর্যোধন-দুঃশাসনেরা যা করছেন, যে অসভ্যতা করছেন, সেখানে এতটুকুও প্রতিবাদ না করে প্রশ্রয় দেবার মধ্যেই যদি গুরুজনের কর্তৃত্ব নিহিত থাকে, তা হলে পুত্রবধূরা তাঁদের অত্যাচারের বলি হলে, সেখানেও গুরুজনের কর্তৃত্ব নির্বিশেষ হয়ে ওঠে। বাস্তবে তা উঠেছেও। গুরুজনেরা বসে বসে দ্রৌপদীর অপমান দেখছেন এবং দ্রৌপদী সঠিক প্রশ্ন করেও উত্তর পাচ্ছেন না। তিনি প্রশ্ন করছেন, অসহায়ভাবে কাঁদছেন এবং ততোধিক অসহায়ভাবে স্বামীদের দিকে দৃষ্টিপাত করছেন— অবেক্ষমাণাম্ অসকৃৎ পতীংস্তান্— অথচ দুঃশাসন সকলকে অগ্রাহ্য করে তাঁকে গালাগালি দিয়ে যাচ্ছেন, কাপড় ধরে টানছেন এবং সেই টানাটানিতে দ্রৌপদীর উত্তমাঙ্গের উত্তরীয় বসনখানি খসে খসে পড়ছে— তাং কৃষ্যমাণাঞ্চ রজস্বলাঞ্চ/ স্রস্তোত্তরীয়াম্ অতদর্হমাণাম্— যিনি অপমানের যোগ্য নন কখনও, তাঁকে অপমান করা হচ্ছে, অথচ সম্মানিত লোকেরা রাজসভায় বসে বসে সেই অপমান দেখছেন।

যুধিষ্ঠির দাসখত লিখে বসে থাকলেও ভীমসেনকে আর থামানো গেল না। দুঃশাসনের অসভ্যতা ক্রমে ক্রমে যে স্তরে পৌঁছোচ্ছিল, তাতে ভীমসেন আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি তিরস্কারের কথা সোচ্চারে বলতে আরম্ভ করলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রথমে দুঃসাশনকে কিছুটি বললেন না। বললেন বড় দাদা যুধিষ্ঠিরকে, কেননা আজকে দ্রৌপদী এবং তাঁদের নিজেদের যত দুর্দশা তৈরি হয়েছে, তার মূল কারণ অবশ্যই যুধিষ্ঠির— পাশাখেলায় তাঁর দক্ষতা নেই, অথচ পাশা খেলতে ভালবাসেন। এই অবস্থায় গোঁ চেপে যাবার ফলে যুধিষ্ঠির নিজের ভাইদের তো বটেই এমনকী পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী দ্রৌপদীকেও পণ রেখে বসলেন। দ্রৌপদী তো যুধিষ্ঠির ছাড়াও আর চার পাণ্ডবের স্ত্রী, তো অন্যের স্ত্রীকেই বা যুধিষ্ঠির পণ রাখেন কী করে? কথাটা আকারে-ইঙ্গিতে এবং সুকঠিন তিরস্কারে বলেই ফেললেন মধ্যম পাণ্ডব ভীম।

ভীম বললেন— জুয়াড়ি পাশাড়েদের ঘরে বেশ্যা থাকে বলে জানি। কিন্তু পাশার বাজি ধরার সময় তারা আপন মমতাবশে বেশ্যাদেরও বাজি রাখে না— বেশ্যাদের ওপরেও মায়া থাকে জুড়াড়ির মতো অধম লোকের— ন তাভিরুত দীব্যন্তি দয়া চৈবাস্তি তাস্বপি। অথচ তোমার ধর্মোপনীতা স্ত্রীই শুধু নয়, দ্রৌপদী পাণ্ডবদের কুলবধূ, তাঁকেও বাজি রাখতে তোমার দ্বিধা হল না। তুমি অর্থ-সম্পদ সব হেরেছ, অস্ত্র-শস্ত্র-রথ-বাহন সব গেছে, এমনকী আমাদের রাজ্য, আমরা ভাইদের সব এবং তুমি নিজেকেও হেরে বসে আছ; হ্যাঁ, এর মধ্যে শত্রুদের ছলনাও আছে অনেক, কিন্তু তবু আমি এতে রেগে যাইনি, তখনও আমি মনে রেখেছি, তুমি আমাদের সকলের অধিকারী, প্রভু— ন চ মে তত্র কোপোঽভূৎ সর্বস্যেশো হি নো ভবান্। কিন্তু এটা কী সাংঘাতিক অন্যায় করলে তুমি— তুমি কুলস্ত্রী দ্রৌপদীকে পণ ধরলে শেষ পর্যন্ত। এটা এক অধম জুয়াড়ির থেকেও অধম কাজ যে, দ্রৌপদীর মতো এক রমণীও পণ্য হয়ে উঠলেন তোমার হাতে— ইমং ত্বতিক্রমং মন্যে দ্রৌপদী যত্র পণ্যতে।

ভীমের ভাষা খুব পরিষ্কার, তিরস্কারের অভিমুখও একমুখীন। ভীম বোঝাতে চাইলেন— যদি বাজি রাখার মতো কোনও সম্পত্তিও ভাবো দ্রৌপদীকে, তা হলেও বোঝা দরকার যে তুমি একা তার মালিক নও, যুধিষ্ঠির! ভীম বললেন— এই বেচারা তোমাকে একা বিয়ে

করেনি, সমস্ত পাণ্ডবদের বীর স্বামী হিসেবে সে লাভ করেছে— এষা হ্যনর্হতী বালা পাণ্ডবান্ প্রাপ্য কৌরবৈঃ— তো এতগুলো বীর স্বামী লাভ করার পরেও ক্ষুদ্র-নীচ কৌরবরা তাঁকে অপমান করার সুযোগ পায় কী করে? এই অপমান তাঁকে সইতে হচ্ছে শুধু তোমার জন্য— ত্বৎকৃতে ক্লিশ্যতে ক্ষুদ্রৈর্নৃশংসৈরকৃতাত্মভিঃ। সেইজন্যই— ভীম বললেন— সেইজন্যই আর কারও ওপরে রাগ হচ্ছে না, রাগ হচ্ছে শুধু তোমার ওপরেই। আমি তোমাকে ছাড়ব না। যে হাতে জুয়ো খেলে তুমি দ্রৌপদীকে পাশার পণে বাজি রেখেছ, সেই হাত দুটোই আমি পুড়িয়ে দেব। কথাটা বলেই ভীমসেন কনিষ্ঠ সহদেবকে বললেন— সহদেব আগুন নিয়ে এসো তো, আজ এই যুধিষ্ঠিরের হাত দুটোই পুড়িয়ে দেব— বাহূ তে সম্প্রধক্ষ্যামি সহদেব অগ্নিমানয়।

শত্রুপক্ষের লোকেদের সামনে ভীমের এই ভয়ংকর প্রয়াস তথা নিজেদের ঘরের কোন্দল বাইরে প্রকট না করার জন্য অর্জুন কোনও ক্রমে ভীমকে থামালেন বটে, কিন্তু এই বিপন্ন মুহূর্তেই বুঝি দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামীকে চিনে নেবার সময়। লক্ষণীয়, যুধিষ্ঠির তাঁকে বাজি ধরে থাকলেও যতখানি রাগ তাঁর ওপরে করা উচিত ছিল, তা কিন্তু দ্রৌপদী করেননি। এর একটা কারণ, তাঁর ওপরে বেশি রাগ করলে তাঁর হেরে যাওয়াটাও অনেক বেশি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, যুধিষ্ঠিরকে এতদিনে যতটুকু চিনেছেন দ্রৌপদী, তাতে তাঁর শৌর্য-বীর্য কোনওটা নিয়েই তাঁর গর্ববোধ করার কিছু নেই। উপরন্তু যুধিষ্ঠিরের পরম প্রিয় যে ধর্মবোধ, সেটা নিয়েও তিনি বেশি মাথা ঘামান না। আর আজ তো সেই ধর্মস্থানও— চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়ে গেল। তাঁর জ্যেষ্ঠ স্বামী ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁকে পাশার পণে আবদ্ধ করেছেন। এই সময়ে একবারও কি তাঁর মনে হবে না সেই বিবাহকালের জটিলতা। যে সময়ে এক লজ্জানম্রা স্বয়ংবরবধূকে একবার মাত্র তাঁর বিজেতা পুরুষের কাছে নিবেদন করেই যুধিষ্ঠির তাঁর প্রত্যাখ্যান সানন্দে মেনে নিলেন এবং সকলে মিলে তাকালেন দ্রৌপদীর দিকে— দৃষ্টিং নিবেশয়ামাসুঃ পাঞ্চাল্যাং পাণ্ডুনন্দনাঃ— সেই পাণ্ডু-নন্দনদের মধ্যে যুধিষ্ঠিরও তো একজন। আপন বীরত্ব বা অস্ত্রক্ষমতায় কোনওভাবেই কি তাঁর পক্ষে এই বীর্যশুল্কা রাজনন্দিনীকে পাওয়া সম্ভব ছিল? অথচ কত সহজেই না যুধিষ্ঠির শুধুমাত্র মাতৃ-আদেশ পালন করার সুবাদে পাঁচজনের গড্ডালিকায় দ্রৌপদীকে লাভ করলেন। এত সহজে পেলেন বলেই কি একদিনের পাশাখেলার মত্ততায় তিনি হেরে বসলেন দ্রৌপদীকে। এমন উদাসীন এক স্বামীকে দোষারোপ করেও তিনি তাঁর গুরুত্ব বাড়াতে চান না। তিনি তাঁকে চিনে গেছেন।

কিন্তু নারীত্বের এই প্রলয়-মুহূর্তে সমস্ত প্রতিকূলতা মাথায় নিয়েও যে বৃকোদর স্বামীটি তাঁর জ্যৈষ্ঠভ্রাতার অপকর্মের শাস্তি দিতে চাইছেন, তাঁকেও চিনতে পারছেন বা চিনে নিচ্ছেন দ্রৌপদী। এমনকী চিনে নিচ্ছেন তাঁকেও, যিনি অর্জুন, যিনি এক মুহূর্তে এই কুরুসভার সমস্ত বীরদের সঙ্গে এককভাবে যুদ্ধ করতে পারেন, সেই তিনি ভীমকে শান্ত করছেন যাতে শত্রুদের সামনে তাঁর সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এমন দুর্গতি না হয়। হয়তো এটাই শেষ পর্যন্ত হত, অর্জুন যদি ভীমের সমুদ্যত ক্রোধ শান্ত নাও করতেন, তবে হয়তো দ্রৌপদী নিজেই এ-কাজ করতেন। কেননা প্রায় কামী-স্বভাব শত্রুপক্ষের সামনেও তিনি সেদিন একথা বলছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে,— আমি আমার পরম ধার্মিক স্বামীর গুণগুলি পরিহার করে তাঁর অণুমাত্র দোষও আমি বাক্য দিয়ে উচ্চারণ করতে চাই না— বাচাপি ভর্তুঃ পরমাণুমাত্রম্/ ইচ্ছামি দোষং ন গুণান্ বিসৃজ্য। অতএব সহদেবকে আগুন নিয়ে আসার আদেশ দিলেও দ্রৌপদী তাঁর 'নাতিকৃতপ্রযত্ন' পাশাড়ে স্বামীটির দগ্ধহস্ত দেখে শত্রুকুলের আমোদিনী হয়ে উঠতেন না।

ভীমের উদ্যত ক্রোধ অর্জুন কিছুটা সামাল দিলেন বটে, কিন্তু সভাস্থলে দ্রৌপদীর অসহায়তা চরমে উঠল। দুঃশাসন তাঁকে ধরে টানাটানি করছেন, কৌরবরা তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করছেন এবং উপস্থিত প্রধান বৃদ্ধরা এক্কেবারে চুপ। এই অবস্থায় বরফ ভেঙে কথা বলতে আরম্ভ করলেন বিকর্ণ, দুর্যোধনের ছোট ভাই। এটা হয়তো আশ্চর্যই ছিল, কেননা সমবেত কুরুবৃদ্ধ এবং আচার্যরা যেখানে এক্কেবারে চুপ করে আছেন, সেখানে দুর্যোধনের ঘরের লোক, তাঁর ছোট ভাই কথা বলছেন, এটা একেবারেই বিপরীত কথা। কিন্তু বিকর্ণের দিক থেকে এটা তাঁর সমুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব এবং নীতিবোধের প্রেরণাই বটে এবং এটা তিনি বুঝেছিলেন যে, বিদুর পূর্বাহ্নেই একবার দুর্যোধন-কর্ণের কথায় অপমানিত হয়েছেন, ভীষ্ম-দ্রোণ বুঝতে পারছেন— কথা বললেই তাঁরা অপমানিত হবেন— অতএব একেবারে যুবক সম্প্রদায়ের নীতি-নৈতিকতায় বিকর্ণ কথা বলতে আরম্ভ করলেন। দ্রৌপদীকে ধরে দুঃশাসনের টানাটানি তাঁর কাছে অসহ্য লাগছে। এমন ব্যক্তিত্বময়ী এক রমণীর এই চরম অসহায়তা তিনি মেনে নিতে পারলেন না বলেই কথা বলতে আরম্ভ করলেন তিনি— কৃষ্যমানাঞ্চ পাঞ্চালীং বিকর্ণ ইদমব্রবীৎ।

আসলে বিকর্ণ যা বললেন, সেখানে দ্রৌপদীর বুদ্ধি এবং মনস্বিতাই বড় হয়ে ওঠে। অমন বিপন্ন মুহূর্তে ধর্মরাজ স্বামীর যুক্তি উড়িয়ে দিয়ে তিনি যা বলতে পেরেছিলেন, তার মধ্যে সারবত্তা ছিল বলেই বিকর্ণ তাঁকে সমর্থন না করে পারছেন না। মহাভারতের শব্দপ্রমাণে যা পাওয়া যায়, তাতে এ-কথা বলা যাবে না যে, চিরকাল অন্তরালে থেকে মুখ ফুটে কিছু না বললেও দ্রৌপদীর মতো ব্যক্তিত্বময়ী রমণীর প্রতি এক ধরনের শ্রদ্ধামিশ্রিত দুর্বলতা ছিল না আর কারও। কিন্তু শব্দপ্রমাণ এ-ব্যাপারে না থাকলেও অশব্দে এমন কোনও সম্ভ্রমানুরাগ তো থাকতেই পারে, তা নইলে দুর্যোধনের মতো ভীষণ কঠিন এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে, কর্ণের মতো সাহংকার এক কঠিন ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি দ্রৌপদীকে তিনি সমর্থন করলেন কী করে। শুধুমাত্র মনস্বিনী এক নারীর যৌক্তিকতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিকর্ণ কথা বলছেন, এটার চেয়েও দ্রৌপদীর মতো এক সুন্দরী মনস্বিনীর দুর্বিপাক এবং অসহায়তা সহ্য করতে না পেরেই তিনি কথা বলছেন, এটাই বেশি যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। বিকর্ণের যুক্তি যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত হলেও যথেষ্ট শাণিত। বিকর্ণ বললেন— দ্রৌপদী একটা প্রশ্ন করেছিলেন, আপনারা সেটার উত্তর দিন চাই না দিন, আমি কিন্তু সত্যটা বলবই। দ্রৌপদীর প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দেওয়া আপনাদের উচিত ছিল; দেননি, সেটা অন্যায় হল। ভীষ্ম-ধৃতরাষ্ট্রের মতো বিরাট মানুষও কিছু বললেন না, বিদুরও বসে আছেন চুপ করে, দ্রোণ-কৃপের মুখেও কোনও উত্তর নেই। উপস্থিত রাজা-রাজড়াও তো কিছু বলতে পারেন, তাঁরাও বলুন কিছু।

বিকর্ণের এত উত্তেজনা সত্ত্বেও কেউ কোনও কথা বললেন না। এতে বিকর্ণের আরও রাগ হল। রাগে দুই হাত ঘষতে ঘষতে বিকর্ণ বললেন— মৃগয়া, মদ্যপান, পাশাখেলা আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ত্রীসংসর্গ, এই চারটে রাজাদের কামজ ব্যসন। এগুলিতে আসক্ত হলে মানুষের নীতি-ধর্মের সমস্ত চেতনা লুপ্ত হয়ে যায়। আর এই হতচেতন অবস্থায় মানুষ যে কাজটা করে বা যে কথাটা বলে, সেই কাজগুলিকে অকৃত বা করা হয়নি বলেই ধরে নেন বুদ্ধিমান, ধীমান ব্যক্তিরা। এখানে যে ঘটনা ঘটেছে তাতে মহামতি যুধিষ্ঠিরকে ধূর্ত পাশাড়েরাই খেলায় প্রবৃত্ত করেছে। অবশ্য পাশাখেলায় তাঁর নিজেরও যথেষ্ট আসক্তি আছে। ফলে ঘটনাটা ঘটেই গেছে। কিন্তু তিনি পণটা ধরেছেন পাশাখেলায় প্রমত্ত অবস্থায়— সমাহুতেন কিতবৈরাস্থিতো দ্রৌপদীপণঃ। বিকর্ণ বোঝাচ্ছেন— দ্যূতাসক্ত যুধিষ্ঠির পাশাখেলার ঘোরে যেভাবে যে-অবস্থায় দ্রৌপদীকে পণ রেখেছেন, সেটাকে সত্য বলে না ধরাই ভাল, কেননা মদ কিংবা জুয়ায় মজে-থাকা মানুষের সব কাজটা সত্য নয়, সব কথাও তেমনই সত্য বলে কেউ ধরে না— তথা যুক্তেন ন কৃতাং ক্রিয়াং লোকো ন মন্যতে।

বিকর্ণ এবার সেই প্রশ্ন তুললেন যা ভীম বলেছিলেন এবং দ্রৌপদী বলেছিলেন সূত্রাকারে। বিকর্ণ বললেন— দ্রৌপদী একা যুধিষ্ঠিরের স্ত্রী নন, তাঁর ওপরে স্বত্ব-স্বামিত্ব আছে আর চার পাণ্ডবের—সাধারণী চ সর্বেষাং পাণ্ডবানাম্ অনিন্দিতা। অন্য চার ভাইয়ের স্ত্রীকে তিনি একার ইচ্ছেতে পণ রাখতে পারেন না। সবচেয়ে বড় কথা, যিনি নিজেই নিজেকে আগে পণ রেখে বাজি হেরে বসে আছেন, তিনি অন্যকে পণ রাখবেন কোন এক্তিয়ারে? কিন্তু এই কাজটি তাঁকে করিয়েছেন শকুনি। তিনিই যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে পণ ধরানোর কালে দ্রৌপদীর কথা উল্লেখ করেছেন— ইয়ঞ্চ কীর্তিতা কৃষ্ণা সৌবলেন পণার্থিনা। এই সমস্ত কথা বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে যে, দ্রৌপদীকে পণ ধরে বাজি জিততে যাওয়াটা আইন অনুসারে মোটেই সিদ্ধ নয়।

বিকর্ণের যুক্তি-প্রতিযুক্তিতে রাজসভায় একটা আলোড়ন উঠে গেল বটে। অনেকেই বিকর্ণের প্রশংসা করতে লাগল এবং শকুনিকে নিন্দা করারও যুক্তি খুঁজে পেল। নিজেদের বেগতিক দেখে দুর্যোধনের বন্ধু কর্ণ এবার সভার হাল ধরলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন— এতক্ষণ তাঁদের নিজেদের অনুকূলে যে উত্তাপ তৈরি হয়েছে, তাকে ঝিমিয়ে পড়তে দিলে চলবে না। দ্রৌপদীর ব্যাপারে তাঁর নিজের যে আক্রোশ ছিল, তা মেটাবার উপযুক্ততম সময়ও এটাই। কর্ণ বললেন— কেউ কোনও কথা বলছে না তুমি কেন এত কথা কও। এই দ্রৌপদী তো নিজেই তার প্রশ্নের জবাব চেয়েছে কতবার, এত বড় বড় লোক সব, কেউ তো একটা কথাও বলছে না, সেখানে তোমার মতো একটা বাচ্চা ছেলে— ছোট মুখে বড্ড বড় বড় কথা বলছ— যদ্‌ব্রবীষি সভামধ্যে বালঃ স্থবিরভাষিতম্। কর্ণ কৌশল করে বললেন— তুমি দুর্যোধনের ছোট ভাই অথচ তুমি এত বোকা কেন বুঝি না। যুধিষ্ঠির সর্বস্ব বাজি রেখে পাশা খেলেছেন, দ্রৌপদী তো সেই সর্বস্বের মধ্যেই পড়ে, নাকি! তা ছাড়া যুধিষ্ঠির স্পষ্ট উচ্চারণে দ্রৌপদীর নাম করে বাজি ধরেছে, অন্য পাণ্ডবরাও সেখানে কোনও প্রতিরোধ-শব্দ উচ্চারণ করেনি, তা হলে বলছ কেন বিকর্ণ যে, দ্রৌপদীকে আমরা জিতিনি!

কর্ণের পরবর্তী বক্তব্যটা ভয়ংকর এবং সেটা তিনি আগেও বলেছেন অন্যভাবে। তবে সেবারে প্রসঙ্গ ছিল দ্রৌপদী-স্বয়ংবরের পর পাঁচ স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ভাঙানো যায় কীভাবে, সেই ব্যাপারে। কর্ণ বলেছিলেন— ভাঙানো যাবে না দ্রৌপদীকে, কেননা একটি স্ত্রীলোকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে বহু পুরুষের যৌনতা এমনিই যথেষ্ট আকাঙ্ক্ষিত, আর সেটা যখন ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বিধিসম্মতভাবেই হয়ে গেছে, সেখানে দ্রৌপদীকে ভাঙিয়ে আনা অসম্ভব। কথাটা আজও প্রায় একইভাবে বলেছেন কর্ণ, কিন্তু সেটা আরও বেশি জঘন্য এবং প্রশ্ন ওঠে— এই কথাগুলি কর্ণের মুখ দিয়েই শুধু কেন বেরোয়! এবারে প্রসঙ্গটা— দ্রৌপদী রজস্বলা, এক বস্ত্রে আছেন বলে সভায় আসতে চাইছিলেন না। সেখানে দুঃশাসন আগেই তাঁকে শাসিয়ে বলেছিলেন, তুই এক কাপড়েই থাক, আর বিবস্ত্রাই হ, সভায় তোকে যেতেই হবে। দুঃশাসনের এই কথাকে বিকর্ণের প্রতিপ্রশ্নে সপ্রমাণ করে তুলছেন তিনি। কর্ণ বলেছেন— বৈদিক বিধি-নিয়ম অনুসারে মেয়েদের একটাই স্বামী থাকার কথা, সেখানে দ্রৌপদী যখন এতগুলি পুরুষের বশে আছে, সেটা তো বেশ্যার শামিল— ইয়ন্ত্বনেকবশগা বন্ধকীতি বিনিশ্চিতা। তা, একটা বেশ্যাকে কাপড় পরিয়েই আনি আর বিবস্ত্র অবস্থাতেই সভায় নিয়ে আসি, তাতে কোথায় কী আশ্চর্যের ব্যাপার হল— একাম্বরধরত্বং বাপ্যথবাপি বিবস্ত্রতা!

দ্রৌপদীর সম্বন্ধে কথা বলতে গেলেই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে বহুস্বামিকতার যৌনতা নিয়ে কথা-কটূক্তিটা কর্ণই সবচেয়ে বেশি করেছেন এবং এটা কেন করেছেন, কেন এই বিকার, সেটা একটা প্রশ্ন। এ-প্রশ্নের উত্তর সেই স্বয়ংবর সভায় লুকিয়ে আছে, যেখানে দ্রৌপদী কর্ণকে সূতপুত্র বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তবে শুধু সেই প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ পূর্ণ করার জন্যই কর্ণ এই কথাগুলি বলেছিলেন, তা আমরা মনে করি না। আমাদের মনে হয়— দ্রৌপদীকে স্বয়ংবরে দেখার পর থেকেই তাঁর ওপরে কর্ণের কিছু আকর্ষণ তৈরি হয় এবং অভীপ্সিতা রমণীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হলে, সেই রমণীর অপর-পুরুষভোগ্যতার কথায় স্বকীয় যৌনতার প্রতিফলনও ঘটে প্রতিপূরণও ঘটে। কর্ণের মুখেই তাই দ্রৌপদীর বিষয়ে এত বহুভোগ্যতার বাক্যরমণ তৈরি হয়, যা দুর্যোধন কিংবা দুঃশাসনের মুখে তেমন আসে না। নইলে দেখুন, যৌনতার এই বিপ্রতীপ পরিপুষ্টি ঘটছে বলেই দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ করার আদেশটাও কর্ণের মুখ থেকেই আসছে। দুর্যোধন, দুঃশাসন কেউ নন, কর্ণই দুঃশাসনকে আদেশ দিচ্ছেন— তুমি পাণ্ডবদের এবং দ্রৌপদীর কাপড়গুলো সব খুলে আনো— পাণ্ডবানাঞ্চ বাসাংসি দ্রৌপদ্যাশ্চ সমাহর।

পাণ্ডবদের সঙ্গে দ্রৌপদীরও বস্ত্র হরণ করো— এই আদেশের মধ্যে একটা সমান-সম্বন্ধ তৈরি করা হলেও পাণ্ডবদের বস্ত্র বলতে তাঁদের সম্মান-মাহাত্ম্যসূচক উত্তরীয় বস্ত্রই সংজ্ঞিত হয়, কিন্তু একবস্ত্রা দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে এই বস্ত্রার্থ কতটা ইঙ্গিত বহন করে? কর্ণের মানসিক সংস্কারের মধ্যে এই যে বিকার, সেটা অন্য কোথাও প্রকাশ পায়নি, অথচ তা শুধু দ্রৌপদীর প্রতি বাহিত বলেই আমাদের সন্দেহ হয় যে, কর্ণের কোনও প্রত্যাশা বাধিত হয়েছিল দ্রৌপদীর ব্যাপারে এবং সেখান থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এই প্রতিহিংসাময় আক্রোশ। কর্ণের আদেশ-মাত্রেই পাঁচ ভাই পাণ্ডব তাঁদের উত্তরীয় বসন উন্মুক্ত করে দিলেন এবং বসে পড়লেন নিজের জায়গায়। আর এদিকে দ্রৌপদী, যিনি হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন যুক্তি-প্রতিযুক্তির ভদ্রতা নিয়ে, তাঁর দিকে এবার এগিয়ে গেলেন বশংবদ দুঃশাসন। তিনি জোর করে দ্রৌপদীর কাপড় ধরে টানাটানি আরম্ভ করে দিলেন— ততো দুঃশাসনো রাজন্ দ্রৌপদ্যা বসনং বলাৎ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্রৌপদীর এই বস্ত্রাকর্ষণের ব্যাপার নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বেশ একটু মতানৈক্য আছে এবং এই মতানৈক্য তৈরি হয়েছে মহাভারতের পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে পাঠান্তর থাকায়। যেটা অনেকটাই বহুজন-সম্মত এবং প্রায় পরম্পরাগতভাবে যে পাঠ অনেক জায়গাতেই মেনে নেওয়া হয়েছে, সেটা হল— দুঃশাসন যেই অসভ্যের মতো দ্রৌপদীর কাপড় ধরে টানাটানি আরম্ভ করলেন, তখন দ্রৌপদী আর কোনও উপায় খুঁজে পেলেন না, তিনি আপন বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য প্রার্থনা জানালেন ভগবান কৃষ্ণের কাছে। ভক্তিভরে উচ্চারণ করলেন দ্বারকাবাসী গোবিন্দের নাম এবং ঘনিয়ে-আসা বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য এবং অবশ্যই সমূহ লজ্জা-নিবারণের জন্য দ্রৌপদী কৃষ্ণ ভগবানের শরণ গ্রহণ করলেন। কিন্তু তখনও তিনি লজ্জায় মুখ লুকিয়ে কাঁদছিলেন, অনেক কাঁদছিলেন— প্রারুদদ্ দুঃখিতা রাজন্ মুখমাচ্ছাদ্য ভামিনী। মহাভারতের এই পাঠান্তরে কৃষ্ণ দ্রৌপদীর আর্তিতে সাড়া দিয়েছেন এবং প্রায় অলৌকিকভাবে একের পর এক রঙিন বসন যুক্ত হতে লাগল দ্রৌপদীর বস্ত্রকোটিতে— তদ্রূপম্ অপর বস্ত্রং প্রাদুরাসীদনেকশঃ।

মহাভারতের এই পাঠান্তরে অবশ্যই ভক্তি, ভগবান এবং শরণাগতির জয়কার, এমনকী বিভিন্ন প্রদেশের লৌকিক গান, পালা, ভজনকীর্তন ইত্যাদির মধ্যেও বস্ত্রহরণের কালে দ্রৌপদীর এই লজ্জানিবারণের প্রার্থনা এবং কৃষ্ণের অলৌকিক বস্ত্রদানের কাহিনি পরম্পরাগত-ভাবে স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু মহাভারতের অত্যন্ত প্রাচীন এবং গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপিগুলিতে, বিশেষত কাশ্মীরি এবং নেপালি পাণ্ডুলিপিতে দ্রৌপদীর এই আর্ত কণ্ঠস্বর শোনা যায়নি। উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের পাণ্ডুলিপিতেও শ্লোকের হেরফের আছে— সেটা মেহেন্‌ড্‌লের মতো পণ্ডিত খুব স্পষ্ট করে জানিয়েছেন। এতসব কাণ্ড দেখে পুণে থেকে বেরোনো মহাভারতের বিশুদ্ধ সংস্করণ গোটা ব্যাপারটাকেই বাদ দিয়ে দ্রৌপদীর আর্তি-প্রার্থনা ফুট-নোটে রেখে দিয়েছে, কিন্তু আশ্চর্য কোনও বুদ্ধিতে এমন একটা দুটো শ্লোক এখানে মেনে নেওয়া হয়েছে যেটার অর্থ হল— দুঃশাসন দ্রৌপদীর উত্তমাঙ্গের বসন-প্রান্ত ধরে টানাটানি করতেই নূতন নূতন বস্ত্র সেখানে যুক্ত হতে থাকল পরের পর। পুণার পরিশুদ্ধ সংস্করণে সভাপর্বের সম্পাদক-মশাই অধ্যাপক এড্‌গারটন এই রহস্যের কারণ সমর্থক কোনও শ্লোক এখানে উদ্ধার করেননি এবং একটি পরম উদার মন্তব্য করে বলেছেন— no mention of Krishna or any other superhuman agency... It is apparently implied (though not stated) that cosmic justice automatically, or "magically" if you like, prevented the chaste and noble Draupadi from being stripped in public.

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের বিপর্যয় থেকে রক্ষার সহায় হিসেবে কৃষ্ণকে এই স্থানে নিয়ে আসতে বড়ই কষ্ট হয়েছে পরিশুদ্ধিবাদী পণ্ডিত সজ্জনের, তাতে ধর্মনিরপেক্ষ এক ভাবমূর্তি আমাদের মহাকাব্যকে বেশ একটা বিশ্বায়নী মর্যাদা দেয় এবং তার ওপরে cosmic justice নামক শব্দটাও যেন বেশ একটা মোহঘন আবরণ তৈরি করে। কিন্তু শত চেষ্টাতেও দ্রৌপদীর এই বিপন্ন মুহূর্তে কাপড় আমদানির ব্যাপারটা কোনওভাবেই প্রত্যাখ্যান করা যায়নি। হয়তো এই কারণেই আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে বিখ্যাত হিল্‌টেবাইটেল সাহেব কৃষ্ণের উপস্থিতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা এখনও প্রমাণ করবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। পরিশুদ্ধিবাদীদের বিপক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি হল— দ্রৌপদীর উত্তমাঙ্গের বসন বা 'আপার গারমেন্টে'র কোনও প্রশ্ন আসে না, কেননা তা হলে প্রথম থেকেই 'রজস্বলা একবস্ত্রা' কথাটা মিথ্যে হয়ে যায়। তবে এমন যদি হয় যে, পরিধান-বস্ত্রটি শাড়ির মতো ছিল, তা হলে খানিক সমাধান আসে বটে। কিন্তু বস্ত্রসরবরাহের প্রশ্নটা তবু থেকেই যায়।

আমি নিজে বৈষ্ণব-ঘরের মানুষ, যে কোনও ক্ষেত্রে কৃষ্ণস্ফূর্তি ঘটলেই আমার তৃপ্তি হয় বড় এবং সেটা ভক্তির কারণে নয়, কৃষ্ণের মতো ওইরকম সর্বকূট-সমাধানকারী মানুষের আরও একটি বিচিত্র পদক্ষেপের জন্যই আমার মহামহিম লাগে তাঁকে। ফলে হিল্‌টেবাইটেল যে যুক্তিই দিন আমার ভাল লাগছে। তবে কিনা মহাকাব্যিক নিরপেক্ষতা নিয়ে একথা বলাই চলে যে, 'কস্‌মিক জাস্টিস্‌' তো আসলে আমাদের ধর্ম এবং আমাদের প্রদীপ ভট্টাচার্য এ-বাবদে ভালই বলেছেন যে, বিদুরের জন্মই হয়েছিল ধর্মের প্রতিরূপে এবং কৌরবসভায় দ্রৌপদীর অপমানের বিরুদ্ধে তিনিই ছিলেন প্রথম তীব্র প্রতিবাদী। তাঁকে তখন থামিয়ে দেওয়া হলেও তাঁরই ব্যবস্থাপনায় এবং তাঁরই তীব্রতায় দ্রৌপদী লজ্জা থেকে বেঁচেছিলেন। তবে এ-বিষয়ে স্পষ্ট করে তথ্য-প্রমাণ কিছু দেওয়া যায় না। প্রমাণ যতটুকু পাই মহাভারতের অন্তর্ভাবনায়, সেটা সেই পুরাতন শ্লোক, যেখানে বলা আছে— মহান ধর্ম বস্ত্ররূপ ধারণ করে নানাবিধ বস্ত্র দিয়ে দ্রৌপদীকে আবৃত করলেন— ততস্তু ধর্মোঽন্তরিতো মহাত্মা/ সমাবৃণোদ্‌ বিবিধবস্ত্রপূগৈঃ।

এখানে বস্ত্রান্তরিত ধর্মের কথা শুনেই পণ্ডিতজনেরা ধর্মরূপী বিদুরের কথা টেনে এনেছেন, যাঁর কথা কৃষ্ণও পরবর্তী সময়ে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে বলেছেন যে, সেখানে একমাত্র বিদুরই সেই সময়ে ধর্মার্থ-সংযুক্ত কথাগুলি বলেছিলেন— একঃ ক্ষত্তা ধর্ম্যমর্থং ব্রুবাণঃ— আর তা বলেছিলেন বলেই বিদুর ছাড়া আর কাউকে ত্রাতা বলে মনে হয়নি দ্রৌপদীর— ন্যানং ক্ষত্তুর্নাথমবাপ কিঞ্চিৎ। এমন বিপন্ন সময়ে বিদুরকে না-হয় ত্রাতা বলে ভাবলেন দ্রৌপদী, কিন্তু কীভাবে তিনি এই বিপদ থেকে ত্রাণ করলেন— তার কিন্তু কোনও ইঙ্গিত দেয়নি মহাভারত। বরঞ্চ তার থেকে বিকল্পটা অনেক বেশি যুক্তিপূর্ণ, যদি বলি— দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণের মতো অসভ্য ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সভায় উপস্থিত সমবেত রাজাদের নিন্দামন্দের চিৎকার উঠল এবং রাজারা তাঁদের উত্তরীয় বসন একটার পর একটা ছুড়ে দিতে লাগলেন দ্রৌপদীর দিকে— ততো হলাহলাশব্দস্তত্রাসীদ্‌ ঘোরনিস্বনঃ। এটাই হয়তো এডগারটন সাহেবের cosmic justice বা magic অথবা এটাই সেই বস্ত্রান্তরিত ধর্ম— যে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন বিদুর।

মহাভারত রাজাদের মুখে ওই নিন্দামন্দের ধিক্কারটুকু আগে উল্লেখ করেনি, ধর্ম বস্ত্ররূপ ধারণ করে দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ করার পর সেই অদ্ভুত ব্যাপার দেখার পর নাকি সমবেত রাজাদের টনক নড়েছে এবং তখন তাঁরা দুঃশাসনের নিন্দা এবং দ্রৌপদীর প্রশংসাসূচক চিৎকার আরম্ভ করেছেন— শশংসুর্দ্রৌপদীং তত্র কুৎসন্তো ধৃতরাষ্ট্রজম্‌। আমরা শুধু বলব— সেটাই সবচেয়ে পার্থিব যুক্তি হবে যে, রাজারা এবং সভায় উপস্থিত মনস্বী দর্শকেরা নিজেদের উত্তরীয় বসনগুলি আগে ছুড়ে দিয়েছেন দ্রৌপদীর উদ্দেশে— তাঁর লজ্জা নিবারণের জন্য

এবং পরে নিন্দামন্দের ঝড় তুলেছেন দুঃশাসনের বিরুদ্ধে— এমন একান্ত লৌকিক ভাবেই এই ঘটনা ব্যাখ্যা করা যায় এবং সেটাই উচিত। কৃষ্ণের করুণায় বসন-প্রেরণের কথাও তাতে ব্যাখ্যাত হয়, ব্যাখ্যাত হয় বস্ত্রান্তরিত ধর্মের যুক্তিও।

দুঃশাসনের এই কাপড়-টানাটানির সম্মুখীন ফল যেটা ফলল, সেটা হল— মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের সমস্ত নির্বাক সত্য উপেক্ষা করে উঠে দাঁড়ালেন। ক্রুদ্ধমুখে দুই হাত ঘষতে-ঘষতে বললেন— শুনুন, শুনুন, ক্ষত্রিয় রাজারা সব! এমন কথা আগে কেউ বলেনি, আর বলবেও না পরে। আমি যদি যুদ্ধের সময়ে ভরতবংশের কুলাঙ্গার এই দুর্বুদ্ধি দুঃশাসনের বুক চিরে রক্ত না খাই, তবে আমি আমার বাপ-ঠাকুরদার ছেলে নয়— পিতামহানাং সর্বেষাং নাহং গতিমবাপ্নুয়াম্। ভীমের কথায় রাজসভায় উপস্থিত সকলেই দুঃশাসনকে গালি দিতে লাগল এবং সভায় এত বেশি পরিমাণ কাপড় এসে জমা হল যে, দুঃশাসন ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন— যদা তু বাসসাং রাশিঃ সভামধ্যে সমাচিতঃ। দুঃশাসনের সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রও গালি খেলেন বিস্তর। এই অবস্থায় বিদুর আর চুপ করে থাকলেন না। তিনি সময় বুঝে রাজসভার সমুচিত ইতিকর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিলেন সকলকে। তিনি চাইছিলেন— দ্রৌপদী প্রথমে যে প্রশ্ন করেছিলেন, তার সযৌক্তিক উত্তর যেমন বিকর্ণ দিয়েছেন, তেমনই সভার নিয়ম মেনে সকলে ঠান্ডা মাথায় তার উত্তর দিন— ভবন্তোঽপি হিতং প্রশ্নং বিব্রুবন্তু যথামতি।

বিদুর সাংসদীয় রীতিতে সংকটের সমাধান চাইছেন। অর্থাৎ এই অসভ্যতা নয়, সভায় সভ্যদের 'ডেলিবারেশনস' চলুক, সেখানে আগে মীমাংসা হোক— দ্রৌপদীর প্রশ্নের, তারপর মীমাংসা হোক— দ্রৌপদী কৌরবদের দাসী না অদাসী। বিদুরের কথা শুনে সমবেত রাজারা কিছু বললেন না বটে, কিন্তু সভার উত্তেজনা বুঝে কর্ণ দুঃশাসনকে আদেশ দিলেন দ্রৌপদীকে ঘরে নিয়ে যাবার জন্য— কর্ণো দুঃশাসনং প্রাহ কৃষ্ণাং দাসীং গৃহান্ নয়। অর্থাৎ কর্ণ বোঝাতে চাইলেন— ঠিক আছে, আলোচনাই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু পণজিতা দাসীর ওপর অধিকার তাঁদের ষোলো আনা, এবং সেইজন্যই পণ্যের মতো ব্যবহারও তাঁর সঙ্গে মানায়। কর্ণের কথা শুনে দুঃশাসন তাঁকে অন্দরমহলে নিয়ে যাবার জন্য আবারও বস্ত্রাঞ্চলে টান দিলেন— দুঃশাসনঃ সভামধ্যে বিচকর্ষ তপস্বিনীম্।

'তপস্বিনীম্'— মানে, বেচারা দ্রৌপদী, তাঁকে রক্ষা করার কেউ নেই। এই অবস্থায় দ্রৌপদীর মতো বিদগ্ধা রমণী নিজেকেই নিজে রক্ষা করার দায়িত্ব নিচ্ছেন। কোনও দৈহিক শক্তি দিয়ে নিজেকে রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু বিদগ্ধা রমণীর মুখে শব্দমন্ত্র থাকে, সেখানে শাক্ত তন্ত্রাভ্যাসে প্রথমেই দুঃশাসনকে একটা ধমক কষালেন দ্রৌপদী। বললেন— নরাধম! বুদ্ধি-প্রজ্ঞা তোমার অবশিষ্ট নেই কিছু, আক্ষরিক অর্থেই তুমি দুঃশাসন! কিন্তু এই রাজসভায় এসে আমার তো কিছু কৃত্য ছিল। সে কৃত্য আগেই করা উচিত ছিল আমার। কিন্তু করা হয়নি বলেই তা করতে হবে এখন— পুরস্তাৎ করণীয়ং মে ন কৃতং কার্যমুত্তরম্। আর এটাও তো সত্যিই, এই অসভ্য যেভাবে আমার কাপড় ধরে টানছিল, তাতে কোন ভদ্র আচরণই বা আমার পক্ষে করা সম্ভব ছিল? ওর অসভ্যতায় আমি বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম— বিহ্বলাস্মি কৃতানেন কর্ষতা বলিনা বলাৎ। অদ্ভুত বাক্য-কৌশলে দ্রৌপদী বিদুর-কথিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সভা-সংসদের মর্যাদায় চলে এলেন। বললেন— সভায় উপস্থিত সকলকে আগে আমার অভিবাদন জানানো দরকার। এটা যদি আমি না করি, তা হলে অন্যায় হবে আমার— অপরাধোঽয়ং যদিদং ন কৃতং ময়া। কথা বলতে বলতেই দুঃখে, ক্রোধে, অপমানে দ্রৌপদীর চোখে জল চলে এল। মহাভারতের বক্তা বৈশম্পায়ন জানিয়েছেন— যে অপমানের তিনি যোগ্য নন, সেই অপমান তাঁকে করা হয়েছে উন্মুক্ত রাজসভার মধ্যে— সভায়াম্ অতথোচিতা— এতে উলটো দিকে একটা দোষ-চেতনা তৈরি হয় বলেই দ্রৌপদী সভার মর্যাদা সূচনা করেই বললেন— একমাত্র সেই স্বয়ংবর সভার শাস্ত্রবিহিত দূরত্বে থেকেই অন্যান্য রাজারা আমাকে একবার-মাত্র সামনাসামনি দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন, সেই একবার ছাড়া কেউ কখনও আমাকে দেখেননি, অথচ সেই আমাকে আজ সভায় টেনে আনা হল— সাহমদ্য সভাং গতা। দ্রৌপদী দুঃশাসনকে একেবারে কুলদূষকের জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন এবং পরের বাক্যে কৌরব-সভার সদস্যদের প্রতি ইঙ্গিত করে তাঁদের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিলেন— আমাকে সূর্য এবং বাইরের হাওয়াও কোনও দিন চোখে দেখেনি, আজ তাকে কৌরব কুলপুরুষদের সঙ্গে সবাই দেখছে— সাহমদ্য সভামধ্যে দৃষ্টাস্মি কুরুভিঃ সমম্।

দ্রৌপদী জানেন— সত্যবন্ধ যুধিষ্ঠিরের হাত-পা বাঁধা। কিন্তু তাই বলে তাঁর স্বামিত্বের জায়গায় দাঁড়িয়ে তাঁরা একেবারে মুখে কুলুপ এঁটে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছেন, এটা সাধারণ অবস্থায় হয় না বলেই দ্রৌপদী বলছেন— বারবার এখন মনে হচ্ছে— সত্যিই সময়-কাল পালটে গেছে— মন্যে কালস্য পর্যয়ম্— নইলে পাণ্ডবরা তাঁদের কুলবধূর এই অপমান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন এবং কৌরব-কুলভূষণেরা এই অন্যায় সহ্য করছেন— সময় পালটেছে নিশ্চয়ই, রাজার ধর্মই বা কোথায়— কৌরবরা বলতে পারবেন না যে, তাদের পূর্বপুরুষদের কেউ তাঁদের ঘরের বউকে কোনও দিন সভায় এনে তুলেছেন? দ্রৌপদী আবারও সেই কথাটা বলেছেন— ক্লিশ্যমানাম্ অনর্হতীম্— যে কষ্ট, যে অসম্মান, যে অপমান, যার পাবার কথা নয়, সেই কষ্ট, সেই অসম্মান অথবা সেই অপমান সে সমাজ থেকে পাচ্ছে মানেই সেখানে একটা রাজনৈতিক অপলাপ এবং বৈষম্য আছে। সমাজের যোগ্য মানুষকে যথাযথ মর্যাদা না দিয়ে অমর্যাদার মানুষ, অযোগ্য মানুষকে মর্যাদার স্থানে নিবেশ করাটা রাজনীতির বিষম-সিদ্ধির প্রশ্ন তুলে দেয়। দ্রৌপদী বলেছেন— আমি পাণ্ডবদের বিবাহিত ভার্যা, আমি দ্রুপদ রাজার মেয়ে এবং আমি বাসুদেব কৃষ্ণের সখী— সেই আমি আজ এক সভার মধ্যে এসেছি কী ভাবে— বাসুদেবস্য চ সখী পার্থিবানাং সভামিয়াম্।

বিয়ের পর স্বামীর বাড়ির সুখ্যাতি এবং বাপের বাড়ির মর্যাদার প্রশ্নটা সব কালের সব মেয়েদেরই কথ্য বিষয়। কিন্তু সেই কালের দিনে এক বিরাট প্রথিত পুরুষকে আপন সখা বলে উচ্চারণ করে দ্রৌপদী নিজেকে এমন এক স্পষ্ট এবং নির্মল সম্পর্ক-সেতুর ওপরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, যা একান্তভাবেই মহাকাব্যিক রমণীর কোনও পৃথক প্রকোষ্ঠ নয়, বরং তা একান্তভাবেই দ্রৌপদীর। তিনিই পারেন রাজসভায় দাঁড়িয়ে বলতে— যে, আপনারা তাড়াতাড়ি এই নোটঙ্কি বন্ধ করুন— আমি দ্রুপদের মেয়ে, পাণ্ডব-পঞ্চকের বউ

এবং বাসুদেব কৃষ্ণের সখী— সেই আমি এখানে পাশার চালে পণজিতা হয়ে আপনাদের দাসী হয়েছি, না এখনও অদাসী— তাড়াতাড়ি বলে দিন দয়া করে— আমি সেই অনুসারে আমার তর্ক-প্রত্যুত্তর জানাব, এবং সেই অনুসারে কাজ করব— তথা প্রত্যুক্তমিচ্ছামি তৎ করিষ্যামি কৌরবাঃ।

এই সভায় উত্তর দেবার লোক নেই। অতএব আগেও যেমন ভীষ্ম কথা বলেছিলেন, এবারও তাঁকেই বলতে হচ্ছে। দ্রৌপদীর প্রথম বারের প্রশ্নে এবং প্রত্যুত্তরে ভীষ্ম খানিক হতপ্রভ হয়েছিলেন, কিন্তু এবারে উত্তর দেবার সময় ভীষ্ম এটা খুব আধুনিক দৃষ্টিতেই লক্ষ করেছেন যে, রাজনৈতিক শক্তি যদি প্রবল থেকে প্রবলতর হয়, তবে স্বেচ্ছাচারিতার অবসর তৈরি হয়ে যায় নিজে থেকেই। ভীষ্ম বলেছেন— আমি তো আগেই বলেছি, কল্যাণী! জগতে অতিবিজ্ঞ লোকেরাও ধর্ম এবং নীতি-নৈতিকতার নিয়ম-কানুন, তার সূক্ষ্মতা বোঝেন না। বরঞ্চ এটাই ঠিক যে, জগতে যারা রাজনৈতিকভাবে প্রবল হয়ে ওঠে, তারা যেটাকে নীতি-নিয়ম বা ধর্ম বলে চিহ্নিত করে, সেটাই নীতি, সেটাই নিয়ম এবং লোকেও সেটাকেই ধর্ম বলতে থাকে— বলবাংশ্চ যথা ধর্মং লোকে পশ্যতি পুরুষঃ। ধর্ম-বিচারের শেষ জায়গায় এসে দুর্বল লোক যা বলে, এমনকী সে যদি সত্যিই ন্যায়ের কথাও বলে, তবুও সে প্রবল রাজনৈতিকতার চাপে প্রতিহত হয়ে যায়— স ধর্মো ধর্মবেলায়াং ভবত্যভিহতঃ পরঃ।

এ এক অতিবাস্তব অভিজ্ঞতার কথা এবং এমনই চিরকালীন এই কথা, যা আমরা আজকের গণতন্ত্র কিংবা সমাজতন্ত্রেও টের পাই। গণতন্ত্রে অধিকাংশের ভোটে নির্বাচিত সরকার এবং তদুচিত সরকারি দলের মধ্যেও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু এমনভাবে ন্যস্ত হয় যে, সাধারণ দলকর্মীও ভেক থেকে পশুরাজ হয়ে ওঠেন। আমি একটি বৃহৎ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পড়াবার সময় শিক্ষাব্রতীদের পর্যন্ত এমন দেখেছি যে, সরকারি দলের অন্ধ সমর্থকের সামনে একই দলভুক্ত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলা যায়নি এবং পাড়াতে দেখেছি একটি লোকাল কমিটির সাধারণ মেম্বারের এমন দোর্দণ্ড প্রতাপ যে সার্থক সমালোচনাতেও তাঁর কোপে পড়াটা রাজতান্ত্রিক শোষণের চেয়েও খারাপ বলে মনে হয়েছে। জীবনানন্দের ধারণা-মতো আমরা সকলেই তখন সকলকে আড় চোখে দেখেছি, অথচ সুস্পষ্ট ফল ছিল এই যা ভীষ্ম বলেছেন— রাজনৈতিক প্রতাপবিশিষ্ট ব্যক্তি যেটাকে ন্যায়, নীতি, ধর্ম বলে মনে করবেন, সেটাই ধর্ম, সেটাই নীতি। কৌরবদের কী অবস্থা এখন! দুর্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনি— এঁরা এমন বেপরোয়া কথা বলছেন, বেপরোয়া কাজ করছেন, যেখানে ভীষ্ম, বিদুর, দ্রোণ, কৃপ— কারও তোয়াক্কাই নেই। বিদুর এবং বিকর্ণকে রীতিমতো বেইজ্জত করা হয়েছে এবং ভীষ্মকেও খুব রেখে-ঢেকে, টেনে-টুনে চিন্তা করে উত্তর দিতে হচ্ছে। এখানে পরোক্ষেও তাঁরা পাণ্ডবদের সমর্থন করতে পারছেন না, কিংবা তাঁদের সদ্‌গুণের কথা বলতে পারছেন না। সবচেয়ে বড় কথা, দ্রৌপদীর মতো এক বিদগ্ধা রমণীকে যেভাবে রাজসভায় এনে অসভ্যতা করছেন দুর্যোধন-কর্ণ-দুঃশাসনেরা, যেখানে তাঁর কিংবা তাঁর স্বামীদের দোষ থাকলেও এমনটা করা উচিত হয় না দ্রৌপদীর সঙ্গে— যেটা দ্রৌপদী বলেছেন— তাঁর প্রাপ্য কিংবা যোগ্য নয় মোটেই— মেয়ের সমান পুত্রবধূকে এমন নির্লজ্জ অপমান— ঠিক এই জিনিসটার সমালোচনাও যে করা যাচ্ছে না— ভীষ্ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটাকেই বলছেন— বলবান লোকে যেটা করছে, সেটাই এখন ধর্ম বলতে হবে এবং দুর্বল লোকের কথা সেখানে প্রতিহত হবে এটাই স্বাভাবিক, আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না, দ্রৌপদী! তবে কুরুবংশ যে এই আচরণে ধ্বংসের মুখ দেখবে, সেটুকু আমি বলতে পারি— নূনমন্তঃ কুলস্যাস্য ভবিতা ন চিরাদিব।

নীতিধর্মের গ্লানি যেখানে তুঙ্গে ওঠে, অন্যায়ী লোককে যেখানে বলাও যায় না যে, তুমি অন্যায় করেছ, সেখানে ভীষ্ম যেটা বলছেন— এটাই যথেষ্ট সমালোচনা। কেননা দ্রৌপদী বা তাঁর স্বামীদের সহায়ক কথা বললে দ্রৌপদীর ওপর অত্যাচার আরও বাড়ত হয়তো। সেই কারণেই ভীষ্ম দ্রৌপদী-প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে শুধু বললেন— তুমি যাঁদের কুলবধূ, তাঁরা রাজ্যস্থিতি বজায় রাখার জন্য যেভাবে কামনা এবং ক্রোধ দুটোই সংবরণ করে আছেন, সেই তাঁদের ঘরের বউ হিসেবে তোমার যে চরিত্রের প্রকাশ ঘটেছে, এটাই তোমার উপযুক্ত— উপপন্নঞ্চ পাঞ্চালি তবেদং বৃত্তমীদৃশম্। তুমি এমন অবস্থাতেও ন্যায় কী, ধর্ম কী, এটা যে জানতে চাইছ, সেটাই তো চরম কথা। তুমি দেখো না, দ্রৌপদী! দেখো না— দ্রোণ-কৃপ-বিদুরের মতো ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিদের শরীরে প্রাণ নেই বলে মনে হচ্ছে, তাঁরা এই অন্যায় দেখে শূন্য-শরীরে বসে আছেন। পরিশেষে ভীষ্ম বললেন— আমার কিছু বলার নেই, দ্রৌপদী! বরঞ্চ তোমার এই প্রশ্নের সবচেয়ে বড় সদুত্তর দিতে পারেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং। তুমি পাশার চালে জিত হয়েছ, নাকি জিত হওনি, সেটা তিনিই বলুন— অজিতাং বা জিতাং বাপি— যুধিষ্ঠিরস্তু প্রশ্নেঽস্মিন্ প্রমাণমিতি মে মতিঃ।

আমরা মনে করি, ভীষ্ম শেষ পর্যন্ত সমালোচনাই করেছেন দুর্যোধন-কর্ণ-দুঃশাসনের। কিন্তু শকুনির মদতে বা কৌশলে পড়ে যুধিষ্ঠির পণ তো একটা ধরেইছিলেন, অতএব নিজের হারার পর পণ রাখার ব্যাপারে স্ত্রীর ওপরে তাঁর স্বামিত্বের বিলোপ ঘটে— এ-কথাটা ভীষ্ম পরিষ্কার করে বলে দিলে তো আর এক বিপদ ঘটবে, দ্রৌপদী তো তাতে স্বামীদের অধিকারহীন এক মুক্তা রমণীতে পরিণত হবেন, সেখানে বলবানের আগ্রহ এবং নিগ্রহ আরও বাড়বে। হয়তো বা দ্রৌপদী এই মুক্তি চেয়েই প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু মুক্তা এবং স্বাধীনা এক রমণীকে শুধু বাক্যজালে রক্ষা করার উপায় কুরুবৃদ্ধদের জানা ছিল না। কেননা দেখুন, ভীষ্মের এই ইতিবাচক সমালোচনার পরেও কিন্তু রাজসভার আর কেউ একটি কথাও বললেন না। সমবেত রাজা-রাজড়ারা, কেউ একটি কথাও না; বললেন না দুর্যোধন-কর্ণদের ভয়ে— নোচুর্বচঃ সাধু অথবাপ্যসাধু/ মহীক্ষিতো ধার্তরাষ্ট্রস্য ভীতাঃ। যদি বলতেন, তা হলে হয়তো বা দ্রৌপদীর ওপর অত্যাচার আরও বাড়ত, নয়তো বাড়তি অপমান জুটত তাঁদের কপালে। আর অধম পুরুষের চাটুকারিতার অভ্যাসও তো কম থাকে না। তারা দুর্যোধনের কথার প্রতিবাদ করবেন কী!

সময় এবং সুযোগ বুঝে ভীষ্মের কথাটারই সবচেয়ে উপযোগ ঘটালেন দুর্যোধন। তিনি বললেন— প্রশ্নটা শুধু যুধিষ্ঠিরের ওপরেই থাকে কেন দ্রৌপদী, প্রশ্নটা ভীম-অর্জুন, নকুল, সহদেব সবার ওপরেই থাক, তাঁরাই সব বলুন না। তাঁরা তোমার জন্য যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা প্রমাণ করে একবার বলুন না যে, তিনি তোমার স্বামী নন। এ-কথাটা একবার বলুন না তাঁরা গলা ছেড়ে— অনীশ্বরং বিব্রুবন্তু আর্যমধ্যে/ যুধিষ্ঠিরং তব পাঞ্চালি হেতোঃ— অথবা

যুধিষ্ঠির নিজেই বলুন না যে, তিনি তোমার স্বামী নন, অথবা স্বামী। আর এ-ব্যাপারে সভায় উপস্থিত রাজা-রাজড়ারা কী বলবে? সভার সভ্য রাজারা দুর্যোধনের প্রশংসা করতে লাগল, স্তাবকদের মতো উত্তরীয় কাপড় উড়িয়ে দুর্যোধনকে সমর্থনও করতে লাগল, যদিও কিছু রাজাদের গলায় ভেসে এল আর্তনাদের সুর, হাহাকার। কিন্তু দুর্যোধনের কথায় সবাই এবার তাকিয়ে রইল যুধিষ্ঠিরের দিকে, অন্য চার পাণ্ডবদের দিকেও— তাঁরা কে কী বলেন দ্রৌপদীর প্রশ্ন-মীমাংসায়।

সত্যি বলতে কী, দ্রৌপদী যে প্রশ্নটা করছেন এবং তা মীমাংসা করার জন্য দুর্যোধন-কর্ণরাও যে-প্রশ্ন যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবদের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছেন, আজকের দিনের ভাষায় এটা 'পজেশন'-এর প্রশ্ন, যা থেকে পণ্যতার প্রশ্নও আসে এবং যুধিষ্ঠির ঠিক তাই করেছেন যাকে সরাসরি পণ্যতাই বলা যায়। কিন্তু আমরা বলব— 'পজেসিভনেস' অথবা 'পজেশন', আর পণ্যতা কিন্তু এক নয়। যে কোনও ভালবাসার মধ্যেই 'পজেসিভনেস' থাকে 'আমার' বোধ থাকে, প্রেমের ক্ষেত্রে এবং দাম্পত্যের ক্ষেত্রে এই 'পজেসিভনেস' থাকারই কথা, নইলে ভিড় বাসে যে-লোকটি আমার প্রেমিকার বা আমার স্ত্রীর নিতম্ব স্পর্শ করে উত্যক্ত করছে, তখন কি প্রেমিক পুরুষ অথবা স্বামী নির্বিকার দাঁড়িয়ে ভাববেন— ইনি তো আমার নন, আমি তো এঁর অধিকারী নই। আসলে ভালবাসা, স্নেহ, প্রেম এই সব মানসিক প্রক্রিয়ায় আমার-বোধ বা মম-কার আসবে, মমতা মানেই তো আমার পজেশনের বোধ। কিন্তু পণ্যতা ব্যাপারটা কিছু পৃথক বটে। দাম্পত্য জীবনে মম-কারের বোধে যদি পুরুষের আত্মবোধ বা অহংকার তৈরি হয়, সে যদি এমন ভাবতে থাকে যে, আমাকে ছাড়া আমার স্ত্রীর আর কোনও গতি নেই, তখন এই পুরুষের স্বার্থের তাড়নায় মম-কার পণ্যতায় পরিণত হয়। এখানে যুধিষ্ঠিরের ক্ষণিক ভুলে অন্য নেশায় দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে পণ্যতাই তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ভাইরা থেকে আরম্ভ করে স্বয়ং দ্রৌপদীও বোঝেন— যুধিষ্ঠির এমন মানুষ নন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের এই ক্ষণিক অসচেতনার মাশুল দ্রৌপদীকে যেভাবে চুকোতে হচ্ছে এবং শত্রুপক্ষ এতটাই তার সুযোগ নিচ্ছে যে, দ্রৌপদী তাঁর আইনি প্রশ্নে যুধিষ্ঠিরের স্বামিত্ব বা পজেশন থেকেই মুক্ত হতে চাইছেন ক্ষণিকের জন্য।

আর এই মুহূর্তে যুধিষ্ঠিরের অধিকারে থাকাটা ভীষণ যন্ত্রণার জায়গা তৈরি করে দিচ্ছে বলেই সকল স্তাবকতা স্তব্ধ করে দিয়ে ভীম তাঁর বীরত্বের সূচক বাহু-দুটি দেখিয়ে বললেন— আমাদের পুণ্য, আমাদের তপস্যা এমনকী আমাদের প্রাণেরও অধিকার আমাদের জ্যেষ্ঠ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অধিকারে। তিনি যদি নিজেকে পণজিত বলে মনে করেন তবে আমরাও তাঁর সঙ্গে জিত হয়েছি বলেই বুঝতে হবে। আজকে যুধিষ্ঠিরের গুরু-গৌরবেই আমি আটকে আছি, আর অর্জুনও আমাকে বারণ করেছে, যদি এমনটা না হত— আজকে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আমাকে ছেড়ে দিন একবার তাঁর অধিকার থেকে, আমি শুধু আমার এই দুটো হাত দিয়েই পিষে মেরে ফেলতাম ধৃতরাষ্ট্রের সবগুলো ছেলেকে। এই হাত-দুটোর মাঝে পড়লে দেবরাজ ইন্দ্র এলেও পার পাবে না— নৈতয়োরন্তরং প্রাপ্য মুচ্যেতাপি শতক্রতুঃ। ভীম আপন নিরুদ্ধ ক্রোধে নিজের চন্দনরুষিত হাত-দুটিই শুধু দেখাতে লাগলেন, কিন্তু সত্যবদ্ধ যুধিষ্ঠিরকে তিনি অতিক্রম করতে পারলেন না, ভীষ্ম-দ্রোণ-বিদুরেরাও তাঁকে শান্ত হতে বললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্রৌপদীর আইনি প্রশ্নের কেউ উত্তর দিতে পারলেন না, যুধিষ্ঠির তো নির্বাক হয়েই রইলেন। আশ্চর্যজনকভাবে হঠাৎ পালটা আইন দেখিয়ে জঘন্যভাবে দ্রৌপদীকে উদ্দেশ্য করে কথা বলতে আরম্ভ করলেন কর্ণ। কর্ণ বললেন— ক্রীতদাস, পুত্র এবং স্ত্রী— এই তিন জনেরই আপন-লব্ধ ধনের ওপর কোনও অধিকার নেই। আর এখানে আরও সমস্যা হল— ক্রীতদাসের নিজের স্ত্রীর ওপরেও কোনও স্বত্ব থাকে না, নিজের সম্পত্তির ওপরেও কোনও অধিকার থাকে না। অতএব, এই যে রাজনন্দিনী দ্রৌপদী! তুমি অন্তঃপুরে গিয়ে রাজার পরিবারের সেবা করো। এখন এই ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরাই তোমার মালিক, তোমার পাণ্ডব স্বামীরা নন। আর সবচেয়ে বড় কথা, তুমি এই ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের মধ্যেই কাউকে স্বামী হিসেবে বেছে নাও, এই ক্ষুদ্র, উদ্যমহীন পাণ্ডবদের দিয়ে তোমার কী হবে। তবে হ্যাঁ, এটাও মনে রেখো— ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের মধ্যেই যদি কাউকে বাছ, তা হলে স্বামী হিসেবে তাঁর যৌনতৃপ্তি ঘটানোটাও দাসীদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে— এটা তোমার মনে রাখা উচিত— অবাচ্যা বৈ পতিষু কামবৃত্তির্নিত্যং দাস্যে বিদিতং তত্তবাস্তু।

কর্ণের কথা শুনে ভীমের গা যেন জ্বলে উঠল। যুধিষ্ঠিরের সত্যপাশে বদ্ধ হয়ে তিনি না পারছেন এই লোকগুলিকে পিষে মারতে, আবার শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও না পারছেন অবস্থার প্রতিকার করতে। অতএব ক্রোধনিশ্বাসের সঙ্গে আরক্ত নয়নে ভীম যুধিষ্ঠিরকেই বললেন— আমি কর্ণের ওপরে রেগে যাইনি, দাসধর্মের কথা কর্ণ যা বলছে, তা সত্য বটে। আমি শুধু বলব— তুমি যদি দ্রৌপদীকে নিয়ে খেলাটা না করতে তা হলে আর এই কথাগুলো বলতে পারত না আমাদের শত্রুরা— কিং বিদ্বিষো বৈ মামেবং ব্যাহরেয়ুঃ/ নাদেবীস্ত্বং যদ্যনয়া নরেন্দ্র। ভীমের এই সাভিমান ক্রোধ-ব্যক্তি শুনে দুর্যোধন ভাবলেন— আরে! এই তো সুযোগ! এদের নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া লেগে গেছে, যা আগেও একবার যুধিষ্ঠিরকে পুড়িয়ে মারার উপক্রম করেছিল। দুর্যোধন আবারও একবার বললেন— বলুন, রাজা যুধিষ্ঠির! আপনি বলুন। ভীম-অর্জুন, নকুল-সহদেব— আপনার সব ভাইই তো আপনাকেই মেনে চলে। অতএব আপনি বলুন— দ্রৌপদীকে আমরা জিতেছি, না তিনি পণজিতা নন। এই সামান্য কথাটা শেষ করেই দুর্যোধন আর অপেক্ষা করলেন না। লজ্জা-সম্ভ্রমের সমস্ত বর্ণমালা অতিক্রম করে তিনি তাঁর বাম উরুদেশের ওপর বস্ত্র অপসারিত করলেন এবং হাসতে হাসতে দ্রৌপদীর দিকে তেরছা করে তাকাতে থাকলেন— হসন্ ঐক্ষত পাঞ্চালীম্... অপোহ্য বসনং স্বকম্।

দুর্যোধনের এই ব্যবহারের সাধারণ সরল ব্যাখ্যাও যেমন হয়, তেমনই গভীর এবং সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা হতে পারে তাঁর মনস্তত্ত্বের। আমরা সাধারণভাবে বলতেই পারি— এ তো পুরুষমানুষের সেই লম্পট স্বভাব যে নাকি এক বিবাহিতা মহিলার প্রতি এমন যৌনতার ইঙ্গিতে নিজের যৌনলিপ্সা প্রকট করে। পণ্ডিত মনস্তত্ত্ববিদরা তখনই বলবেন— দুর্যোধনের মধ্যে সেই স্ত্রীবিষয়িনী দুর্বলতাও আছে আর এমনই সেই দুর্বলতা, যেখানে তিনি স্পষ্ট জানেন এই রমণী কোনও দিন তাঁর বশীভূত হয়ে তাঁর অঙ্কারূঢ়া হবেন না। এই অপ্রাপ্যতা এক ধরনের হীনমন্যতা তৈরি করে বলেই তিনি একবার বন্ধু কর্ণের দিকে চক্ষু-কুঞ্চন করেই দ্রৌপদীকে পায়ের কাপড় সরিয়ে বাম উরু দেখাচ্ছেন এবং খ্যাক-খ্যাক করে হাসছেন—

অভ্যুস্ময়িত্বা রাধেয়ং... সব্যমূরুম্ অদর্শয়ৎ। ইংরেজি তর্জমায় পুরুষরা এইরকম 'লিউড্ জেসচার' করলে মেয়েরা দেখে না, তা নয়; দেখতে বাধ্য হয়, তাদের চোখ পড়ে, অসঙ্গতি এবং অভাবনীয়তার চকিত কারণে চোখ পড়েই যায়। এবং কী আশ্চর্য— সিদ্ধান্তবাগীশ দ্রৌপদীর এই চকিত বিস্ময় বা অপস্ময় অনুবাদই করলেন না। মহাভারত বলেছে— দ্রৌপদী দেখছেন এতেও লজ্জা হল না দুর্যোধনের, তিনি তাঁর বাম উরু দেখাতে লাগলেন তাঁকে— দ্রৌপদ্যাঃ প্রেক্ষমানায়াঃ সব্যমূরম্ অদর্শয়ৎ।

এখানে দ্রৌপদীর বিশেষণ হিসেবে যে শব্দ প্রয়োগ হয়েছে এবং বিশেষ্য পদে দ্রৌপদীর ক্ষেত্রেও যে বিভক্তিটি প্রয়োগ করা হয়েছে, সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে তাকে বলে 'অনাদরে ষষ্ঠী'। তার মানে হল— দ্রৌপদী যে তেমন অবস্থায় দুর্যোধনের দিকে পরম অনিচ্ছায় তাকিয়ে ফেললেন একবার এই অনভিপ্রায়কে কোনও পাত্তা না দিয়ে তাকে এতটুকুও 'কেয়ার' না করেই দুর্যোধন তাঁর বাম উরু দেখাতে লাগলেন। এটা দেখে ভীম আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি তাঁর ক্রোধরক্ত চক্ষু দুটি বিস্ফারণ করে রাজসভায় সমাগত রাজাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন— দুর্যোধন! শুনে রাখো তুমি। আমি যদি মহাযুদ্ধে তোমার এই বাম উরুটি গদাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ না করি, তা হলে আমার বাপ-ঠাকুরদার বংশে জন্মাইনি আমি— যদ্যেতমূরুং গদয়া ন ভিন্দ্যাং তে মহাহবে। ভীম আর একটাও কথা বললেন না, শুধু ক্রোধে আগুন হয়ে রইলেন, যা দৃশ্যতই বড় ভয়ংকর ছিল।

হয়তো ভীমের এই আস্ফালনের খুব প্রয়োজন ছিল। যুধিষ্ঠির যে সত্যপাশে আবদ্ধ ছিলেন— পণজিত হবার পরে অথবা শকুনির ফাঁদে পড়ে দ্রৌপদীকে হেরে বসেও তিনি যে অসহায়ের মতো আত্মদূষণে মগ্ন হয়ে বসে ছিলেন— এমন সত্য যে ধর্ম নয়, সেটাই বুঝি একান্ত করে বুঝিয়ে দিতে চাইছেন মহাভারতের কবি। এই শঙ্কা, অর্থাৎ ধর্মের কাজ করছি বলে যা ভাবছি, সেটাই হচ্ছে কি না— সত্যধর্মের এমন একটা সংশয়ী অবস্থান, যেখানে সত্য বা ধর্ম সত্যিই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কি না বোঝা যায় না— এই শঙ্কাটা স্বয়ং ব্যাসই তুলে ধরেছেন মহাভারতের মোক্ষধর্মপর্বে। ব্যাস বলছেন— এমনটা হয় কখনও, এমন অবিচক্ষণ মানুষও আছেন এই পৃথিবীতে যিনি ধর্মভাবে ধর্মের কামনা করেই অধর্মের কাজ করে ফেলছেন— অধর্মং ধর্মকামো হি করোতি হ্যবিচক্ষণঃ। আবার এমনও হয় যে, অধর্মের কাজ করছি ভেবে একজন আসলে ধর্মের কাজই করল— অধর্মকামশ্চ করোতি ধর্মম্। ব্যাস বলছেন— এই দুই ধরনের লোকেরই কোথাও-না-কোথাও এক ধরনের দুর্বলতা আছে— এরা ঠিক কী করছে তা নিজেরাই তেমন বোঝে না— উভেহবলঃ কর্মণী ন প্রজানন্। এখানে ঠিক এটাই ঘটেছে— যুধিষ্ঠির যে এখন কোনও কথা না বলে চুপটি করে বসে ভাবছেন যে, তিনি সত্যপাশে আবদ্ধ আর তাঁর কিছু করার নেই, এটা বস্তুত ধর্মকামুক ব্যক্তির অধর্ম করে ফেলা। তিনি যুক্তি দিয়ে একবারও বলছেন না যে, তিনি নিজেকে হেরে যাবার পর পর দ্রৌপদীকে বাজি রাখতে পারেন না, নীতিগতভাবেই তিনি তখন দ্রৌপদীর স্বামী নন। আবার দেখুন, আমরা যখন ভাবছি যে, যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্যরা সবাই যখন চুপ করে আছেন, অথচ ভীম আস্ফালনে একবার দুঃশাসনের রক্তপান করবেন বলছেন, আর একবার দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করবেন বলছেন— এগুলি সব যুধিষ্ঠিরের সত্য ধর্ম থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেরিয়ে এসে কথা বলা— তা কিন্তু নয়। তিনি ধর্মের কাজ না করতে চেয়েও কিন্তু ধর্মের কাজটাই করছেন। হয়তো ভীম সেটা নিজেও বোঝেননি। কিন্তু এটাই যে ঠিক আচরণ ছিল কুলবধূকে সম্পূর্ণ সুরক্ষা দেবার, সেটা বোঝা যায় আকস্মিক বিদুরের ভাষণে।

বিদুর আর থাকতে পারলেন না। বললেন— ভীষণ ভীষণ ভয়ের ব্যাপারে হয়ে গেল এবং সে-ভয় ভীমের কাছ থেকেই উপস্থিত হবে— সেটা বুঝে নাও ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা সব— পরং ভয়ং পশ্যত ভীমসেনাত্/ তদ্‌বুধ্যধ্বং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ। পাশাখেলার সব নিয়ম তোমরা লঙ্ঘন করেছ। কী অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, আজ একটি স্ত্রীকে রাজসভায় এনে তোমরা বিবাদ আরম্ভ করেছ। এতটুকু মঙ্গলও আর অবশিষ্ট থাকবে না। বিদুর এই ভীতি-প্রদর্শন করেই ক্ষান্ত হননি। দুর্যোধন বারবার সেই আইনি প্রশ্ন তুলছেন বলে তিনি পরিষ্কার জানালেন যে, যুধিষ্ঠির নিজেকে আগে বাজি রেখে হেরেছেন বলেই দ্রৌপদীকে পণ ধরার অধিকার এবং তাঁর স্বামিত্ব দুটোই তিনি হারিয়ে বসেছেন। অতএব শুধু শকুনির কৌশলে পড়ে বিভ্রান্ত হয়ে দুর্যোধনেরা যেন নিজেদের বিপদ ডেকে না আনে— এই কথাটা বেশ কড়া করে বুঝিয়ে দিতেই এটা বোঝা গেল যে, সভার হাওয়া অন্য দিকে ঘুরছে এবং সেটা সম্ভব হয়েছে মধ্যম পাণ্ডব ভীমের সন্ত্রাস-সৃষ্টির ভাষায়। হয়তো এর ফলেই শেষ মুহূর্তে যুধিষ্ঠিরের ভাবশিষ্য অর্জুন বলে ফেললেন— রাজা যুধিষ্ঠির আগে আমাদের সকলেরই অধিকারী প্রভু ছিলেন, কিন্তু নিজেকে হেরে তিনি এখন কোন্ বস্তুর অধিকারী থাকতে পারেন? ঈশস্ত্বয়ং কস্য পরাজিতাত্মা? অর্থাৎ অর্জুন বোঝাতে চাইলেন যে, পাশার পণ্যে দ্রৌপদীকে জিতে যাওয়াটা নেহাৎই শকুনির কৌশল।

এর পরেই ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় সেই চিরন্তন তথা 'মিথিক্যাল' অমঙ্গলের চিহ্নগুলি প্রকট হয়ে উঠল— উচ্চৈস্বরে ডেকে উঠল শেয়াল, গর্দভ, শকুন এবং সেই শব্দ শুনতে পেলেন তাঁরাই, যাঁরা দ্রৌপদীর এই লাঞ্ছনা কিছুতেই সইতে পারছেন না। ধৃতরাষ্ট্রও পুত্রদের মতোই এই লাঞ্ছনায় মৌনভাবে শামিল ছিলেন বলেই অবশেষে বিদুর এবং গান্ধারী একান্তভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা বোঝালেন। আমরা মনে করি— হোমগৃহে শৃগালের ডাক, রাসভ-শকুনের চিৎকার ইত্যাদি অতিজাগতিক শব্দের চেয়েও যুধিষ্ঠিরের প্রতিজ্ঞাত সত্যের বাইরে এসে ভীমের যে ভয়ংকর আস্ফালন— এটাকেই অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বলেছিলেন বিদুর এবং গান্ধারী। তার ফল হয় সঙ্গে সঙ্গে। ধৃতরাষ্ট্র সকলের সামনে দুর্যোধনকে গালমন্দ করে বললেন— অসভ্য ছেলে কোথাকার! তুই শেষ হয়ে গেছিস— হতোঽসি দুর্যোধন মন্দবুদ্ধে। তা নইলে এই কুরুকুলের রাজসভার মধ্যে পাণ্ডবদের ধর্মপত্নী দ্রৌপদীর সঙ্গে কথা চালাচালি করছিস— স্ত্রিয়ং সমাভাষসি দুর্বিনীত/ বিশেষতো দ্রৌপদীং ধর্মপত্নীম্। এক মুহূর্তে সমস্ত সুর পালটে দিয়ে ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে বর দিতে চাইলেন। প্রশংসা করে বললেন— তুমি আমার পুত্রবধূদের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট, তুমি ধর্ম জানো, তুমি সতী বটে, তুমি বর চাও আমার কাছে, যা ইচ্ছে চাও— বরং বৃণীষ্ব পাঞ্চালি!

বর চাইতে গিয়ে এই বুঝি প্রথম তাঁর জ্যেষ্ঠ স্বামীর মুখে কষাঘাত করলেন দ্রৌপদী। যে যুধিষ্ঠির তাঁকে পাশায় পণ রেখে আজকে সকলের সামনে তাঁর চরম অপমানের রাস্তা খুলে দিয়েছেন, দ্রৌপদী প্রথম তাঁকে দাসত্ব থেকে থেকে মুক্তি দেবার বর চাইলেন। তখনও

যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য— তিনি ধর্ম অনুসারেই চলেন সদা সর্বদা, তিনি বড় সুন্দর মানুষ— সর্বধর্মানুগঃ শ্রীমান্— তাঁকে আগে মুক্তি দিন দাসত্ব থেকে। এমন যেন না হয় যে, এই যুধিষ্ঠিরের ঔরসে আমার গর্ভে জাত আমার পুত্র প্রতিবিন্ধ্যকে অন্য ছেলেরা ডেকে বলবে— আরে! এই যে আমার চাকরের পো, আয় এদিকে— এমনটা যেন না হয়। ধৃতরাষ্ট্র মুক্তি দিলেন যুধিষ্ঠিরকে এবং তারপর দ্বিতীয় বর দিতে চাইলে দ্রৌপদী তাঁর অন্য চার স্বামী ভীম-অর্জুন এবং নকুল-সহদেবকেও মুক্ত করলেন দাসত্ব থেকে। ধৃতরাষ্ট্র বিমুগ্ধ স্বরে দ্রৌপদীকে বললেন— আমার ঘরে যত ছেলের বউরা আছে, তাদের সবার চাইতে তুমি ভাল, সব চাইতে ধর্ম-চারী বধূ হলে তুমি— ত্বং হি সর্ববধূনাং মে শ্রেয়সী ধর্মচারিণী।

ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীর যত গুণ বলছেন, এতক্ষণ বুঝি তাঁর এসব খেয়াল ছিল না। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি— তাঁর এই হঠাৎ মন পরিবর্তনের পিছনে ভীমের গদাঘাত-কল্পনা এবং বিদুর-গান্ধারীর সানুবন্ধ নিবেদন যতখানি আছে, তার চাইতে বেশি আছে এতক্ষণ ধরে দ্রৌপদীর এই অনমনীয় আচরণ এবং তারই ফলে শেষ পর্যন্ত সভার গতি ঘুরে যাওয়া। পরবর্তীকালে একসময় ধৃতরাষ্ট্র তাঁর ছেলেদের সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন— যজ্ঞসেন দ্রুপদের ওই মেয়ে দ্রৌপদী কিন্তু শুধুই তেজ— তেজ ছাড়া কিছু নেই ওর মধ্যে— যজ্ঞসেনস্য দুহিতা তেজ এব হি কেবলম্। আমরা বলব— তেজ দেখার এই আরম্ভ, যেদিন দ্রৌপদীকে চরম অপমান করার পর ধৃতরাষ্ট্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বর দান করা আরম্ভ করেছেন। দ্বিতীয় বরে ধনুক-বাণ-গদা সহ চার স্বামীকে মুক্ত করে নিয়েছেন দ্রৌপদী। ধৃতরাষ্ট্র এখন মুগ্ধতার ভাগে তৃতীয় বর দিতে চাইছেন। বলছেন— এ অতি সামান্যই হয়েছে, নন্দিনী! তুমি তৃতীয় বর চাও— তৃতীয়ং বরয়াস্মত্তো নাসি দ্বাভ্যাং সুসৎকৃতা। দ্রৌপদী বীরোচিত বিদগ্ধতায় ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন— লোভ জিনিসটা ধর্মনাশ করে, মহারাজ। আমার আর নেবার ক্ষমতা নেই। আমি তো বামুন নই, মহারাজ! তাঁদের মানায় বর চাওয়া। 'প্রতিগ্রহ' ছাড়া তাঁদের জীবিকা নেই, তাঁরা একশোটা বর চাইতে পারেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়রা এত বর চাইবে কেন? আমার স্বামীরা জুয়োখেলার মতো একটা পাপ কাজ করে দাসত্বে বাঁধা পড়েছিলেন, তাঁরা মুক্তি পেয়েছেন এই যথেষ্ট। এর পরে তাঁদের নিজের ভাল কীসে হবে, তা তাঁরা নিজেরাই বুঝে নেবেন— বেৎস্যন্তি চৈব ভদ্রাণি রাজন্ পুণ্যেন কর্মণা।

দ্রৌপদী যা বলেছেন এবং যেভাবে বলেছেন, তাতে তাঁর মনস্বিতার সঙ্গে ওজস্বিতাও যেমন ধরা পড়ে, তেমনই বড় অকথিতভাবে ধরা পড়ে স্বামীদের ওপর দ্রৌপদীর ভরসা। এত কিছুর পরেও তাঁর ভরসা আছে স্বামীদের ওপর— এই শান্ত বরদ মুহূর্তে নিশ্চয়ই তিনি বোঝেন যে, হঠাৎ এক বিপাক তৈরি হয়ে গিয়েছিল এবং সে বিপাক সত্যিই তাঁর জ্যেষ্ঠ স্বামী তৈরি করেননি, ছলে-বলে-কৌশলে তা তৈরি করেছে ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরাই। বিশেষত এই সম্পূর্ণ দ্যূত-প্রক্রিয়ার মধ্যে মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনকে দ্রৌপদী যেভাবে প্রতিক্রিয় দেখেছেন সমস্ত সীমাবদ্ধতার মধ্যেও, তাতে এই মানুষটির আপাত-কঠিন বহিরঙ্গের মধ্যে তাঁর আদেশ-লুব্ধ এক একান্ত প্রেমিককে আবিষ্কার করেছেন দ্রৌপদী। আর বিপন্ন স্বামীদের জন্য নিজের অবাধ্যতায় এতক্ষণ স্থির থেকেও পরিশেষে যেভাবে তিনি সাধ্য বস্তুটুকু বিনা চেষ্টায় ছিনিয়ে নিয়েছেন, তাতে সবচেয়ে বড় শংসাপত্র দিয়েছেন তাঁর চরম শত্রু— কর্ণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যিনি এতক্ষণ তাঁকে কৌরব-ঘরের দাসী বানাতে চাইছিলেন, যিনি এক বিদগ্ধা রমণীর বসন-মোচনের জন্য উপরোধ তৈরি করে যৌন-চেতন স্বাভিমান পুষ্ট করছিলেন, সেই তিনি এবার বললেন— অনেক সুন্দরী-সুন্দরী স্ত্রীদের কথা শুনেছি বাপু! কিন্তু তাঁদের কেউ যে এমন একটা কাজ করতে পারে, এমন দেখিওনি শুনিওনি— তাসামেতাদৃশং কর্ম ন কস্যাশ্চন শুশ্রুম।

আসলে অতিসুন্দরী রমণীকুলের মধ্যে অনেক সময়েই এক ধরনের লোকপুষ্ট সৌন্দর্য্যের আত্মপ্রসাদ থাকে। তাতে পৃথিবীতে আর কিছু তাঁদের কর্তব্য, করণীয় আছে বলে তাঁরা ভাবেন না, সেখানে বিপন্ন স্বামীকে বিপন্মুক্ত করে বার করে আনার ব্যাপারটা তো তাঁদের সৌন্দর্য্য-সাধনায় কষাঘাত বলে গণ্য হবে। কিন্তু দ্রৌপদীর অসামান্য সৌন্দর্য্য তাঁর শরীর অতিক্রম করে বুদ্ধিতে এসে পৌঁছেছে। কম ক্ষণ তিনি রাজসভায় দাঁড়িয়ে ছিলেন না, একটার পর একটা মানসিক ধর্ষণের প্রক্রিয়া চলছে শত লোকের সামনে। অথচ দ্রৌপদী তাঁর নিজের লড়াইতে সম্পূর্ণ স্থির এবং সেইকালের এক অসামান্যা সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র শারীরিকতার সূত্রেই তাঁকে 'অ্যাড্রেস' করা যাচ্ছে না— এই অবস্থায় কর্ণের মতো বিপ্রতীপ-প্রণয়ী শত্রুকে আশ্চর্য হয়ে বলতেই হয়— পাণ্ডবরা তো সাগরে ডুবে যাচ্ছিল— অবলম্বনহীন। আশ্রয়হীন অপবাদের সমুদ্রে যখন তারা হাবুডুবু খাচ্ছে, সেই সময়ে কোথা থেকে নৌকো নিয়ে এল এই মেয়ে— পাঞ্চালী— বাঁচিয়ে নিয়ে গেল সমস্ত পাণ্ডব ভাইদের— পাঞ্চালী পাণ্ডুপুত্রাণাং নৌরেষা পারগাভবৎ।

কর্ণের এই মোহসুন্দর সাশ্চর্য ভাব কেটে যেতে সময় লাগেনি। পাণ্ডবদের সব কিছু ফেরত দিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে যাবার অনুমতি দিতেই যে-সময়ে তাঁরা ইন্দ্রপ্রস্থের পথ ধরেছেন, সেই মুহূর্তেই আবার দুর্মন্ত্রণার ঘটা চলল ধৃতরাষ্ট্রের ঘরে। দুর্যোধন পিতাকে বুঝিয়ে ছাড়লেন— আবারও পাশা খেলতে হবে। নইলে বিপদ ঘটবে নিজেদের। খানিক অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্র আবারও লোক পাঠালেন পাণ্ডবদের ফিরিয়ে আনতে। আবারও পাশাখেলা হল— সবাই জানেন। আবারও যুধিষ্ঠির হারলেন— সবাই জানেন। বারো বছর বনবাস, আর এক বছর অজ্ঞাতবাসের জন্য প্রস্তুত হলেন পাণ্ডবরা; দ্রৌপদী-সহ। যাবার পথটাও খুব যে মসৃণ ছিল, তা নয়। যেভাবে ইন্দ্রপ্রস্থ যাবার পথ থেকেই সবাইকে ধরে আনা হল এবং যেভাবে ধৃতরাষ্ট্র আপন বৃদ্ধ-সম্বন্ধের গৌরব ব্যবহার করে যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে পাশা খেলালেন, তাতে কেউ যে কোনও কথা বললেন না, এমনকী দ্রৌপদীও নয়, তাতে বোঝা যায়, এই বনবাস নিয়তির মতো নেমে এসেছিল। কিন্তু বনে যাবার পথে যাদের পুনরায় অপমান-বাক্য শুনতে হল, তাঁরাই শুধু প্রতিবাদী ছিলেন এবং প্রতিবাদী ছিলেন বলেই কুমার দুঃশাসনের 'টার্গেট' ছিলেন দ্রৌপদী এবং ভীম।

পাণ্ডবরা মৃগচর্ম পরিধান করে দ্রৌপদীকে নিয়ে বনে যাবার আগে সমস্ত বৃদ্ধজন এবং ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বিদায়-ভাষণ জানাবার আগেই দুঃশাসনের মুখ খুলে গেল। পাশার চালে হেরেছেন বলেই ধর্ম-নিয়মে তাঁরা প্রত্যুত্তর দেবেন না ধরে নিয়েই দুঃশাসন দ্রৌপদীকেই সঠিকভাবে 'টার্গেট' করলেন। বললেন— দ্রুপদ রাজা কাজটা ভাল করেননি মোটেই। কতগুলি নপুংসক স্বামীর হাতে দ্রৌপদীকে ছেড়ে দিয়েছেন। আর দ্রৌপদী তোমায় বলি

শোনো—যে-সব স্বামীরা তোমার ভাল ভাল জামা-কাপড় পরত, সব তো গেছে, তারা সর্বস্বহীন নিরাশ্রয়। এদের দেখে তোমার কতটা পছন্দ হবে, দ্রৌপদী— কা ত্বং প্রীতিং লপ্স্যসে যাজ্ঞসেনি— তার চেয়ে এই ভাল নয় কী, তুমি একটা স্বামী বেছে নাও— পতিং বৃণীষ্বেহ যমন্যমিচ্ছসি। এই যে একটা ভয়ংকর সময় এসে উপস্থিত তোমার স্বামীদের, আমরা চাই না এই সর্বনাশটা তোমাকেও স্পর্শ করুক। এখানে কৌরবদের মধ্যে মহাবীর এবং টাকা-পয়সাওলা লোক অনেক আছে, তুমি একজনকে স্বামী হিসেবে বেছে নাও, ভাল থাকবে, সত্যিই ভাল থাকবে— এষাং বৃণীষ্বৈকতমং পতিত্বে/ ন ত্বাং নয়েৎ কালবিপর্যয়োঽয়ম্।

এটাকেই আধুনিক যৌনবৈজ্ঞানিক ভাষায় 'টারগেটিং' অথবা 'অবজেক্টিফিকেশন' বলে। অর্থাৎ যেহেতু দ্রৌপদীর স্বামী একান্ত বিধিসম্মতভাবেই পাঁচটি, কিন্তু পাঁচটি বলেই তাঁকে যে কোনও সময় যে কোনও অজুহাতে আরও অন্য যে কোনও লোকের শয্যাশঙ্গিনী হতে বলা যায় যেন। তবে এর সোজাসুজি উত্তর দ্রৌপদীর মতো মনস্বিনী রমণীর মুখে মানায় না বলেই, আবার দৃপ্ত পদচারণায় ভীমসেন উলটে ফিরে এসেছেন। দুঃশাসনকে চরম শাসিয়ে তাঁকে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন আবারও। কিন্তু ভীম যেহেতু তখনই কিছু করতে পারছেন না, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যুধিষ্ঠির-জ্যেষ্ঠের কথা রাখার জন্য তখনই যেহেতু গদাঘাতে দুঃশাসন-দুর্যোধনদের শেষ করতে পারছেন না, তাই তাঁর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে ভীমকেও কথা শোনাতে ছাড়লেন না দুঃশাসন। যেহেতু তিনি, একমাত্র তিনিই যেহেতু প্রতিহিংসায় প্রতিজ্ঞা-গ্রহণ করছেন দ্রৌপদীর হয়ে, অতএব তাঁকে দুঃশাসনের মুখে 'গোরু' সম্বোধন শুনতে হল এবং দুর্যোধন হাসিতে ফেটে পড়ে ভীমের প্রতিবাদী হেঁটে চলার অনুকরণ করে দেখাতে লাগলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ভীম কিছুই করতে পারছেন না, শুধু একের পর এক ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা নিয়ে যাচ্ছেন।

এইগুলি দ্রৌপদীর স্ত্রীহৃদয়ে কাজ করেছে, কাজ করেছে স্বামীর সঙ্গে ব্যবহারেও। নকুল, সহদেব, অর্জুন, যুধিষ্ঠির সবাই চুপ, শুধু ভীম একের পর এক প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা নিয়ে যাচ্ছেন। দ্যূতসভার মাঝখানে অসহায় দ্রৌপদী এবার বোধহয় বুঝতে পারলেন যাকে তিনি ভালবাসেন, সে বুঝি তাঁকে ভালবাসে না। কই গাণ্ডীবধন্বার মুখ দিয়ে একটি আওয়াজও তো বেরল না, কিছুই করতে নাই পারুন, অন্তত প্রতিবাদ। স্বামী আত্মসার, নাকি সে আপন স্ত্রীর গৌরবে মহিমান্বিত, তার রক্ষা বিধানে তৎপর, তা বোঝবার এই তো সময়। দ্রৌপদী স্বামীদের চিনে নিলেন। এরপর তিনি যতবারই বিপদে পড়েছেন, তিনি ভীমের কাছেই তা জানিয়েছেন, মহাভারতের উদাত্ত নায়ক অর্জুনকে নয়। উদ্ধত ব্যক্তিত্ব দ্রৌপদীর ভাল লাগে, ধীরোদাত্ত নায়কত্ব নয়। এই দ্যূতসভায় অকর্মণ্য অক্ষম অর্জুনকে তিনি যেমন চিনলেন তেমনি চিনলেন যুধিষ্ঠিরকে— ক্রোধহীন, আপন স্ত্রী-রক্ষায় অপারগ, প্রতিবাদহীন— শুধু ধর্মসার। পতিধর্মের জন্য যদি স্ত্রীধর্ম ত্যাগ করতে হয় তা হলে স্ত্রীলোকের কী রইল, বিশেষত যে নারী নিজেই অত ব্যক্তিত্বহীন নন। আগুন থেকে তাঁর জন্ম, আগুন তাঁর স্বভাবে রয়েছে। সেই আগুনে যিনি চিরকাল সর্বনাশের হাওয়া লাগিয়েছেন, তিনি বায়ুপুত্র ভীম, অন্য কেউ নন। দ্বিতীয়বার পাশা খেলায় হেরে পাণ্ডবদের যখন বনে যাওয়া ঠিক হল, তখন দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বলেছিল— তুমি আবার বনে যাচ্ছ কেন, সুন্দরী! চাল ছাড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন ধানের খোসা, পশুর চামড়া পরা খেলনা যেমনটি, পাণ্ডবরাও ঠিক তেমনি— এদের সেবা করে তুমি কী করবে?

কেউ এসব কথার প্রতিবাদ করেননি। সুকুমারী কৃষ্ণারও আর দুঃশাসনের সঙ্গে কথা বলার প্রবৃত্তি ছিল না। সিংহ যেমন শেয়ালের দিকে ধেয়ে আসে, তেমনি ভীম এবার ধেয়ে এলেন দুঃশাসনের দিকে। আবার সেই প্রতিজ্ঞা— বুক চিরে রক্ত খাব। একেবারে শেষে বুঝি সবাই এবার খেপে উঠলেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব— সবাই। সবাই এবার ভীমের সঙ্গে গলা মিলিয়ে প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা নিলেন। কিন্তু প্রথমে ভীম। কৃষ্ণা আবার তাঁকে চিনলেন।

একটা কথা এখানে বলে রাখাই ভাল। রামায়ণের সীতা এবং মহাভারতের দ্রৌপদী— এই দু'জনেরই একমাত্র মিল হল যে তাঁরা অযোনিসম্ভবা— অর্থাৎ কিনা তাঁদের জন্মে অলৌকিকতার গন্ধ আছে। কিন্তু এই দুই মহাকাব্যের নায়িকা-চরিত্র এত বিপরীত যে ভয় হয়— একের পরিস্থিতিতে আরেকজন পড়লে কী করতেন। কল্পনা করতে মজা পাই— যদি দণ্ডকবনে লক্ষ্মণের গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে এসে দ্রৌপদী ভিক্ষা দিতেন রাবণকে, তবে হয় তাপসবেশী রাবণের দাড়ি-গাছি উপড়ে দিতেন দ্রৌপদী; আর সীতা যদি শ্লথবাসা হতেন উন্মুক্ত রাজসভায় তবে তিনি তক্ষুনি ধরণী দ্বিধা হবার মন্ত্র পড়ে চিরতরে ঢুকে পড়তেন পাতালে; মহাভারত কাব্যখানাই অর্ধসমাপ্ত রয়ে যেত। যদি বলেন রাজসভায় দ্রৌপদীই বা এমন কী করেছেন যে, আমরা তাঁর গুণপনায় মুগ্ধ হচ্ছি। আমি বলব অনেক কিছু করেছেন, যা সর্বংসহা সীতার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সীতাকে যদি রামচন্দ্র বলতেন যে তুমি সভায় এসে শ্বশুরের সামনে কান্নাকাটি কর তা হলে তাই করতেন। তাঁর পক্ষে কি রামচন্দ্রকে 'জুয়াড়ি' সম্বোধন করে এই প্রশ্নটা করা সম্ভব হত যে, পাশাখেলায় আগে নিজেকে বাজি রেখে হেরেছেন, না আগে তাঁকে বাজি রেখেছেন— কিং নু পূর্বং পরাজৈষীরাত্মানাম্ অথবা নু মাম্?

এ তো রীতিমতো 'ল-পয়েন্ট'। সভাসদদের কারও পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। প্রাতিকামী, যে দ্রৌপদীকে নিতে এসেছিল, সেও বুঝতে পেরেছিল প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছেন দুর্যোধনও, যার জন্যে প্রাতিকামী দ্বিতীয়বার বলেছেন— তা হলে আমি রাজকুমারী কৃষ্ণাকে কী বলব— উবাচ কৃষ্ণাং কিমহং ব্রবীমি? দুর্যোধন বলেছেন— প্রাতিকামী ভীমকে ভয় পাচ্ছে। তা মোটেই নয়। সে দ্রৌপদীকেই ভয় পাচ্ছিল— স্ত্রীলোকের কাছে এমন সাংঘাতিক আইনের প্রশ্ন শুনেই সে দ্রৌপদীর ওজন বুঝেছে— ভীতশ্চ কোপাদ্ দ্রুপদাত্মজায়াঃ। দ্রৌপদীর মুখে আইনের প্রশ্ন শুনে সভাসদ কুরুবৃদ্ধেরা যে চুপ করে গেলেন তার কারণ একটাই। বাপের বাড়িতে দ্রৌপদী কিছু কিছু শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাঁর বাবা দ্রুপদ বাড়িতে পণ্ডিত রেখে ছেলে ধৃষ্টদ্যুম্নের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। দ্রৌপদী যে তাঁর কাছ থেকে এবং ভাইয়ের কাছ থেকেও বিদ্যা শিখে নিতেন সে-কথা দ্রৌপদী নিজেই কবুল করেছেন মহাভারতের বনপর্বে। আর আইনের ব্যাপারে দ্রৌপদীর আগ্রহ ছিল বিশেষ রকম। তখনকার দিনে আইনের বই বলতে বৃহস্পতিসংহিতা, শুক্রসংহিতা— এই সবই ছিল। ঘরে রাখা সেই পণ্ডিতের কাছে বৃহস্পতি-নীতির পাঠ নিতেন প্রধানত দ্রুপদ রাজা।

কিন্তু আইনের ব্যাপারে দ্রৌপদীর এত আগ্রহ ছিল যে ওই পাঠ-গ্রহণের সময় তিনি কোনও কাজের অছিলায় চলে আসতেন সেইখানে, যেখানে গুরুজি বৃহস্পতি পড়াচ্ছেন। দ্রৌপদীর আগ্রহ দেখে গুরুজিও তাকে সস্নেহে বৃহস্পতি-নীতির উপদেশ দিতেন এবং বাবার আদরের দুলালী সঙ্গে সঙ্গে বাবার কোলে বসে যেতেন বৃহস্পতির লেখা আইন বোঝবার জন্য— স মাং রাজন্ কর্মবতীম্ আগতামাহ সান্ত্বয়ন্। শুশ্রূষমাণাম্ আসীনাং পিতুরঙ্কে যুধিষ্ঠির।

বনে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন পাণ্ডব ভাইরা। সকলের কাছে অনুমতি নিয়ে পাণ্ডবরা বেরোবার উপক্রম করলে দ্রৌপদী কুন্তীর কাছে বিদায় নিতে এলেন। মহাভারতে দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের বিবাহের পর থেকেই শাশুড়ি হিসেবে কুন্তীকে আমরা অনেকটাই সমাপ্ত-কৃত্যা জননীর ভূমিকায় দেখেছি। হয়তো অতি উপযুক্ত পুত্রবধূর হাতে পুত্রদের হৃদয়-ভার ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন বলেই খানিকটা গুটিয়ে নিয়েছিলেন নিজেকে। তার মধ্যে ইন্দ্রপ্রস্থে পুত্রদের রাজ্যপ্রাপ্তিতে এই নিশ্চিন্ততা আরও বেড়েছিল হয়তো। কিন্তু বিপদ যেভাবে নেমে আসল, তাতে ভীষণ রকমের কষ্ট পেলেও কুন্তী কিন্তু ধৈর্য হারাননি। পুত্রদের তিনি বিদায় দিয়েছেন এবং রামায়ণে রামের বনবাসে জননী কৌশল্যার মতো বিলাপ করতেও দেখিনি। কিন্তু এই বিদায়-বেলায় দ্রৌপদীকে দেখে কুন্তী যেন আর সইতে পারলেন না। অতিকষ্টে দ্রৌপদীর ওপর তাঁর অনন্ত আস্থার কথা জানিয়ে কুন্তী বললেন— তুমি কষ্ট পেয়ো না, বাছা— বৎসে শোকো ন তে কার্য্যঃ প্রাপ্যেদং বসনং মহৎ। স্বামীদের বিষয়ে তোমার কর্তব্য কী, সেটা তোমায় বলে দিতে হবে না আমি জানি। এই কৌরবসভায় যা তোমার সঙ্গে হয়েছে, তাতে এটাই বলতে হবে— কৌরবরা অনেক ভাগ্যবান, এখনও যে তোমার চোখের তীব্র চাউনিতেই তারা ধ্বংস হয়ে যায়নি, তুমি দগ্ধ করোনি বলেই তারা দগ্ধ হয়নি, এটাই তাদের ভাগ্য— সভাগ্যাঃ কুরবশ্চেমে যে ন দগ্ধাস্ত্বয়ানঘে।

পাঁচ স্বামীর সঙ্গে কীভাবে এই কষ্টকর দিন কাটাতে হবে কুন্তী একবারও সে-পথে যাননি। কিন্তু একজন শুধু একজনের জন্য কুন্তী দ্রৌপদীকে যা বলেছেন, তাতে পঞ্চস্বামীর সঙ্গে দ্রৌপদীর ব্যবহারের একটা অদ্ভুত চিত্র ফুটে ওঠে। কুন্তী যুধিষ্ঠির-ভীম কারও কথা বলেননি, কিন্তু সপত্নী মাদ্রীর কনিষ্ঠ ছেলেটিকে তিনি যেহেতু বড় ভালবাসতেন, তাই তাঁর কথাটা না বলে পারলেন না। কুন্তী বললেন— এই বনবাস-কালে আমার কনিষ্ঠ পুত্র সহদেবকে তুমি সবসময় একটু দেখে রেখো— সহদেবশ্চ মে পুত্রঃ সদাবেক্ষ্যো বনে বসন্— দেখো কোনও বিপদে পড়ে আমার এই ছেলেটি যেন অবসাদগ্রস্ত না হয়। কুন্তী বলেছিলেন— তোমার মধ্যে যেমন পাতিব্রত্যের গুণ আছে, তেমনই আমার কথা তুমি যথেষ্ট ভাবো বলেই— মদনুধ্যানবৃংহিতা— আমার মতো মায়ের গুণও তোমার মধ্যে আছে। তুমি দেখো, মা-মরা ছেলে আমার সহদেব, সে যেন আমাকে ছেড়ে মা-হারানোর দুঃখ না পায়— যথেদং ব্যসনং প্রাপ্য নায়ং সীদেন্মহামতিঃ। বস্তুত জননী কুন্তী নিজের ছেলেদের চেয়েও সহদেবকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন বলেই তাঁর 'অনুধ্যানে' দ্রৌপদীর মধ্যেও শৃঙ্গারের চেয়েও সহদেবের প্রতি বাৎসল্যের আধিক্য ছিল হয়তো।

খুব যে এটা অস্বাভাবিক কথা হয়ে গেল, তা নয়। তবে কিনা সম্পূর্ণ শৃঙ্গারাধার এক স্বামীর প্রতি কোনও স্ত্রী বাৎসল্য দেখাতে পারছেন কিনা অবশ্যই নির্ভর করে স্বামী বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ত্রীর নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর। অর্থাৎ কিনা স্বামীর চরিত্রের মধ্যেও যদি বাৎসল্য-লাভের একটা পরমাকাঙ্ক্ষা থাকে এবং স্ত্রীর মধ্যেও তা দেবার ক্ষমতা থাকে, তবে শৃঙ্গার-রসের গৌণতায়, শৃঙ্গার বাৎসল্যে পরিণত হয়। তবে কিনা এটা সর্বাঙ্গীণ সত্য যে, মেয়েরাই যেহেতু মা হন, সন্তানের জন্ম দেন, তাকে লালন করেন, তাই স্নায়বিক কারণেই হোক, অথবা রসতাত্ত্বিক দিক থেকে অখিল-বাৎসল্যের বীজভূমি বলেই হোক একটি মেয়ের মধ্যে শৃঙ্গার-ভাবনার অন্তরালেও এক সজীব বাৎসল্য থাকে যা অনেক সময়েই শৃঙ্গার-রসকে পুষ্ট করে প্রত্যক্ষে পরোক্ষে।

ঠিক এইরকম একটা তাত্ত্বিকতায় এক রমণীর হৃদয়-সরসতা বিচার করলে দ্রৌপদীর সুবিধে ছিল অনেক বেশি। প্রত্যেক রমণী-হৃদয়েই যে বহুতর ভাব-সরসতা নিহিত থাকে, তা একক-স্বামীর আধারেই প্রথমত মিটিয়ে নিতে হয়, পরিশেষে পুত্র-পরিজনের আধারে তা পৃথক আলম্বনও খুঁজে পায়। কিন্তু দ্রৌপদীর স্বামীর সংখ্যা যেহেতু পাঁচ, তাই শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরকে তিনি পঞ্চোপাসনায় পৃথকভাবেই বিতরণ করতে পেরেছেন। কথাটা এমন ছক-কষা পণ্ডিতি গবেষণার মতো করে কোন স্বামীর প্রতি কোন রস কতটা, এই পরিমাপ-সূক্ষ্মতায় গ্রহণ করবেন না, বরঞ্চ এ-ক্ষেত্রে সহদেবের কথাটাই যদি বিশেষভাবে দেখি, তা হলে দেখব— সহদেবের প্রতি কুন্তীর বৎসলতা দ্রৌপদীর মধ্যেও যে সংক্রান্ত হয়েছিল, তার প্রমাণ আছে মহাভারতের বনপর্বে, বিরাট পর্বে এবং অন্যত্রও।

বিরাটের রাজবাড়িতে কীচকের তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে দ্রৌপদী যখন ভীমের কাছে নালিশ জানাতে এসেছিলেন, তখনও এই সহদেবের জন্য মায়ায় তাঁর বাক্য অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। সত্যি কথা বলতে কি, সহদেবের জন্য দ্রৌপদীর মমতা প্রায় কুন্তীর মতোই। বাস্তবে সহদেবের স্বামিত্বের নিরিখে অতিরিক্ত মায়া দেখানো যেহেতু খারাপ দেখায়, দ্রৌপদী তাই সহদেবের ওপর তাঁর অসীম মমত্ব প্রকাশ করেন কুন্তীর জবানিতেই। বিরাটপর্বে ভীমের কাছে তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন— আমার মনে শান্তি নেই একটুও। সহদেবের কথা ভেবে ভেবে রাতে আমার ঘুমই আসে না, তায় শান্তি— ন নিদ্রাম্ অভিগচ্ছামি ভীমসেন কুতো রতিম্। দ্রৌপদী বললেন— বনে আসবার আগে জননী কুন্তী আমার হাত ধরে বলেছিলেন— দ্রৌপদী! রাত-বিরেতে আমার সহদেবকে একটু দেখে রেখো, তুমি নিজ হাতে ওকে খাইয়ে দিয়ো— স্বয়ং পাঞ্চালি ভোজয়েঃ।

এসব কথা থেকে বোঝা যায়, সহদেব হয়তো ঘুমের ঘোরে গায়ের চাদর ফেলে দিতেন, হয়তো তিনি নিজহাতে জুত করে খেতে পারতেন না, অতএব জননী কুন্তীর সমস্ত মাতৃস্নেহ দ্রৌপদীর বধূহৃদয়ে এক মিশ্ররূপ নিয়েছিল। যার জন্য মুখে তিনি সহদেবকে 'বীর' 'শূর'— এইসব জব্বর জব্বর বিশেষণে ভূষিত করলেও মনে মনে ভাবতেন— আহা ওই কচি স্বামীটার কী হবে— দূয়ামি ভরতশ্রেষ্ঠ দৃষ্ট্বা তে ভ্রাতরং প্রিয়ম্। দ্বৈতবনে এসে দ্রৌপদী যখন নির্বিকার যুধিষ্ঠিরকে বেশ পাঁচ-কথা শুনিয়ে দিলেন, তখন ভীম আর অর্জুনের কথা উল্লেখ করে দ্রৌপদী বলেছিলেন— এঁরা এইরকম মহাবীর, তবুও এঁদের বনে থাকতে হচ্ছে। কিন্তু নকুল-সহদেব, বিশেষত সহদেবের কথা যখন উঠল, তখন দ্রৌপদী বললেন— সহদেবকে বনের মধ্যে দেখেও তোমার মায়া লাগছে না, তুমি নিজেকে ক্ষমা করছ কী করে? নকুল-

সহদেব, যারা নাকি জীবনে কষ্টের মুখ দেখেনি, তাদের দুঃখ দেখেও কি তোমার রাগ হচ্ছে না?

ভীম-অর্জুনের বেলায় বীরতা, আর নকুল-সহদেবের বেলায় তাদের দুঃখই দ্রৌপদীর কাছে বড় হয়ে উঠেছে। ভাবে বুঝি, যমজ এই ভাই-দুটির ওপর দ্রৌপদীর রসাপ্লুতি যতখানি ছিল, তার চেয়ে মায়া এবং বাৎসল্যই ছিল বেশি। অন্যদিকে সহদেব কিন্তু দ্রৌপদীকে আপন গিন্নি ভেবে বড়ই গর্বিত বোধ করতেন। ছোট বলে সহদেবের অনেক ছেলেমানুষি ছিল, নিজেকে ছেলেমানুষের মতো একটু প্রাজ্ঞও ভাবতেন তিনি— আত্মনঃ সদৃশং প্রাজ্ঞং নৈষোঽমন্যত কঞ্চন। ঠিক এই কারণেই বুঝি কুরুসভায় পাঞ্চালীর যে অপমান হয়েছিল, তার প্রতিশোধের ভার তিনি একা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণ যখন পাণ্ডবদের হয়ে কুরুসভায় দূতীয়ালি করতে যাচ্ছিলেন, তখন সমস্ত পাণ্ডবেরা, এমনকী ভীম পর্যন্ত বারবার শান্তির কথা বলেছিলেন। এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধ যাতে না হয় তার জন্য সমস্ত পাণ্ডবেরা ছিলেন উদগ্রীব। কিন্তু যখন সহদেবকে বলতে বলা হল, তখন তিনি আচমকা বলে উঠলেন— যুধিষ্ঠির যা বলেছেন তাই সনাতন ধর্ম বটে, কিন্তু কৃষ্ণ! তুমি সেই চেষ্টাই করবে যাতে যুদ্ধ বাধে। এমনকী যদি কৌরব নায়কেরাও পাণ্ডবদের সঙ্গে শান্তি স্থাপনে আগ্রহী হন, তবু কিন্তু যুদ্ধ বাধানোর চেষ্টা করবে। কুরুসভায় পাঞ্চালীকে যে অপমান আমি সইতে দেখেছি, দুর্যোধনকে না মেরে তার শোধ তোলা অসম্ভব। কৃষ্ণ! যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন এঁরা ধার্মিক মানুষ, তাই তাঁরা যুদ্ধশান্তির কথা বলছেন, কিন্তু আমি ধর্মের বাঁধ ভেঙে দিয়ে একাই যুদ্ধ করতে চাই— ধর্মম্ উৎসৃজ্য তেনাহং যোদ্ধুমিচ্ছামি সংযুগে।

যে কনিষ্ঠ ছেলেটি দ্রৌপদীর অপমানে উত্তেজিত, ধর্মের বাঁধ ভেঙে যুদ্ধে একাই প্রাণ দিতে চায়, তার প্রেমরহস্য যতই একতরফা হোক না কেন, দ্রৌপদী তাকে বাৎসল্যে বন্দি করেছিলেন, যে বাৎসল্যকে সে প্রেম বলে ভুল করেছিল। অন্যথায় দ্রৌপদীর প্রেম বড় সহজলভ্য নয়। যে বিশালবপু বৃষস্কন্ধ মানুষটি দ্রৌপদীর জন্য কত শতবার প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেই মধ্যম পাণ্ডব ভীমও যে দ্রৌপদীর প্রেমের স্বাদ সম্পূর্ণ পেয়েছেন তা আমরা মনে করি না। অথচ দ্রৌপদী ভীমের কাছে মাঝে মাঝে এমনভাবে আত্মনিবেদন করেছেন যে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যেন ভীমের মধ্যে তিনি মনের মানুষ খুঁজে পেয়েছেন। আসলে এই মধ্যম পাণ্ডব নিজেই দ্রৌপদীকে এত ভালবাসতেন যে দ্রৌপদীকে মাঝে মাঝেই তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করতে হয়েছে। এত বড় বিশাল মাপের মানুষকে তো আর সহদেবের মতো বাৎসল্যরসে সিঞ্চিত করা যায় না। তবে এই যে আত্মনিবেদন, এ কিন্তু প্রেমের আত্মনিবেদন নয়, এ শুধু বিশ্বাস। চিরমুগ্ধ মধ্যম পাণ্ডবকে তিনি মাঝে মাঝেই কাজে লাগিয়েছেন, এমন কাজ যা অন্যের দ্বারা হবে না। আর দ্রৌপদীর লাবণ্যে, বৈদগ্ধ্যে আত্মহারা ভীম বারবার সেই দুরূহ কর্মগুলি করেছেন প্রিয়ার মন পাবেন বলে।

আপন স্বয়ম্বর লগ্নে দ্রৌপদী নিশ্চয়ই লক্ষ করেছিলেন যে, লক্ষ্যভেত্তা পুরুষটির সঙ্গে আরও একজন শক্তিধর পুরুষ সমস্ত রাজমণ্ডলকে একেবারে নাজেহাল করে তুলেছে। সেই মানুষটি অন্যের মতোই তাঁকে দেখে মুগ্ধহৃদয়ে বরণ করেছিল। অথচ দ্রৌপদী পাঁচভাগ হয়ে গেলেন। কিন্তু এই মুগ্ধতার কথা মনে রেখেই বিদগ্ধা দ্রৌপদী তাঁর এই পরম বিশ্বস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পতিটিকে এমন কোনও কর্মভার দিতেন, যাতে ভীম ভাবতেন— দ্রৌপদীর পক্ষপাত বুঝি তাঁর ওপরেই। এর মধ্যে অর্জুন নামক উদাত্ত পুরুষটির মধ্যে যে ঈর্ষা জাগানোর ব্যাপার আছে, তা ভীম বুঝতেন না। তার ওপরে অর্জুন যখন তপস্যা ইত্যাদি নানা কারণে বাইরে গেছেন, তখন দ্রৌপদী এমন ভাব করতেন যেন ভীমই তাঁর মালঞ্চের একমাত্র মালাকর।

মনে করুন সেই দিনটির কথা। অর্জুন গেছেন দেবলোকে, অস্ত্র সন্ধানে। বহুদিন হয়ে গেল তিনি ফেরেন না। লোমশ মুনির কথায় অন্য পাণ্ডবেরা গন্ধমাদন পর্বতে এলেন যদি অর্জুনের সঙ্গে দেখা হয়। পাহাড়ের চড়াই-উতরাই ভাঙতে গিয়ে পথশ্রান্তা দ্রুপদ রাজার দুলালী কৃষ্ণা হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। তবু টাল রাখতে পারলেন না, একেবারে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। তাঁকে প্রথমে দেখতে পেলেন নকুল। কোনওমতে তাঁকে ধরে ফেলেই নকুল অন্য ভাইদের ডাকতে লাগলেন। দৌড়ে এলেন যুধিষ্ঠির, ভীম, সহদেব। নিজের কোলে দ্রৌপদীর মাথা রেখে ধর্মরাজ খানিকক্ষণ বিলাপ করলেন— সাত-পুরু বিছানায় যার শুয়ে থাকার কথা, আমার জন্যে তার কী অবস্থা— ইত্যাদি ইত্যাদি। বারবার পাণ্ডবেরা ঠান্ডা হাতে তাঁকে স্পর্শ করে, মুখে জলের ছিটে দিয়ে হাওয়া করে— জলমিশ্রেণ বায়ুনা— দ্রৌপদীর জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু জ্ঞান ফিরলেই দেখা গেল ধর্মরাজ তাঁর কোলে-মাথা-রাখা দ্রৌপদীকে অনেকভাবে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন— অর্থাৎ কিনা, এখন কেমন লাগছে, একটু ভাল বোধ করছ কি— পর্যাশ্বাসয়দ্ অপ্যেনাম্। অন্যদিকে নকুল-সহদেব সেই তখন থেকে দ্রৌপদীর রক্ততল পা-দু'খানি টিপেই চলেছেন— তস্যা যমৌ রক্ততলৌ পাদৌ পূজিতলক্ষণৌ... সংববাহতুঃ। হ্যাঁ, অসুখে পড়লে স্ত্রীর পা টিপলে দোষ কী, কিন্তু আমাদের ধারণা, অসুখে না পড়লে, মানে সুখের দিনেও নকুল-সহদেবের ওই একই গতি ছিল। এদিকে মাথা আর পা-দু'খানি তিন পাণ্ডবের মধ্যে ভাগ হয়ে যাওয়ায় ভীমের পক্ষে যেহেতু আর কোনও অঙ্গসংবাহন সম্ভব ছিল না, অতএব হতচকিত হয়ে তিনি দাঁড়িয়েই ছিলেন। ধর্মরাজ মুখ তুলে বললেন— এই বন্ধুর গিরিপথ দ্রৌপদীর পক্ষে আর অতিক্রম করা সম্ভব নয়, ভীম! ভীম বললেন, এ ব্যাপারে আপনি কোনও চিন্তাই করবেন না, সব ভার আমার। আমি বরং আমার পুরনো ছেলে ঘটোৎকচকে স্মরণ করছি। সে হাওয়ার গতিতে সবাইকেই নিয়ে যেতে পারবে। ব্যবস্থা হল, পাণ্ডবেরা অর্জুনকে রাস্তায় ধরে ফেলার আশায় নিসর্গরাজ্য গন্ধমাদনে প্রবেশ করলেন।

হিমালয়ের বিচিত্র মনোরম পরিবেশে পাণ্ডবেরা এবং দ্রৌপদী বিমলানন্দে দিন কাটাচ্ছেন। এমনই এক দিনে না-জানা দিঘির এক সহস্রদল পদ্ম হাওয়ায় উড়ে এসে দ্রৌপদীর পায়ের কাছে মাটিতে পড়ল। সূর্যের কিরণ-মাখা সে পদ্মের যেমন রং, তেমনই তার গন্ধ। দ্রৌপদী বায়না ধরলেন, ভীমের কাছে বায়না ধরলেন— দেখেছ কী সুন্দর পদ্ম, যেমন রং, তেমনই গন্ধ। আমাকে যদি তুমি ভালবেসে থাক— যদি তেহহং প্রিয়া পার্থ— তা হলে এই পদ্ম আরও অনেক, অনেক আমায় এনে দিতে হবে ভীম! আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সেই পদ্ম উপহার দেব— ইদঞ্চ ধর্মরাজায় প্রদাস্যামি পরন্তপ। বুঝুন অবস্থা, মেজস্বামী ভীমসেন কোথায় মাঠ-ঘাট খুঁজে দিব্যগন্ধ পদ্ম নিয়ে আসবেন, আর সেই পদ্মগুলি যাবে জ্যেষ্ঠ স্বামী যুধিষ্ঠিরের ভোগে। অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকার সময় দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের কোলে শুতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেরেছিলেন বলেই নাকি— অক্ষমানীয় ধর্মাত্মা— জানি না, দ্রৌপদী দ্যূতসভার অপমান ভুলে ধর্মরাজকে সৌগন্ধিক উপহার দিতে চাইলেন এবং সে উপহারের ব্যবস্থা করবেন ভীম। শুধু তাই নয় দ্রৌপদীর ইচ্ছে— দু'-পাঁচটা পদ্মফুলের গাছ যদি গোড়াশুদ্ধ উপড়ে আনা যায় তবে সেগুলি কাম্যক বনে পুঁতেও দেওয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য, কাম্যক বন পাণ্ডবদের বনবাস লগ্নে প্রথম অরণ্য, প্রথম প্রথম বনবাসে দ্রৌপদীর বুঝি সে অরণ্য ভারী ভাল লেগেছিল। ভীমের কাছে বায়না ধরে দ্রৌপদী ছুটলেন ধর্মরাজের কাছে। যে একগাছি পদ্ম হাওয়ায় উড়ে এসেছিল, সেটিও তিনি নিবেদন করতে চান ধর্মরাজের হৃদয়ে। এদিকে ভীম প্রিয়ার ইচ্ছে পূরণ করার জন্যে— প্রিয়ায়াঃ প্রিয়কামঃ— চলে গেলেন সেই সহস্রদল পদ্ম জোগাড় করার জন্য।

সে কি সোজা কথা। গিরি-দরী, নদ-নদী পেরিয়ে, হাজারো বনস্থলী তছনছ করে, শেষে পূর্বজন্মের দাদা হনুমানের উপদেশ নিয়ে ভীমসেন গন্ধমাদনের বিশেষ বিশেষ জায়গায় সূর্যবরণ পদ্ম খুঁজে চললেন। তাঁর সদা সজাগ চোখ দুটি ছিল শুধু পর্বতসানুদেশে ফোটা ফুলের রাশির ওপর, আর পাথেয় ছিল দ্রৌপদীর বাক্য। দ্রৌপদী যে বলেছেন— যদি তুমি আমাকে একটুও ভালবাস, ভীম, আমাকে পদ্ম এনে দিতেই হবে। ভীম আরও তাড়াতাড়ি চললেন— দ্রৌপদীবাক্যপাথেয়ো ভীমঃ শীঘ্রতরং যযৌ। শেষে এক হরিণ-চরা বনের ধারে, হাঁস আর চখাচখীর শব্দ-মুখর নদীর মধ্যে ভীম দেখলেন সেই পদ্ম— হাজার, হাজার, যেন পদ্মের মালা সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে নদীর মধ্যে। পদ্মগুলি দেখার পরেই মহাবলী ভীমের যে প্রথম প্রতিক্রিয়া হল, সেটি ভারী সুন্দর করে লিখেছেন ব্যাসদেব। ভীমের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর একান্ত প্রেমের সঙ্গে করুণা মাখিয়ে দিয়েছেন চরিত্রচিত্রী ব্যাসদেব। পদ্মগুলি দেখেই ভীম যেন সব পেয়েছির দেশে পৌঁছে গেলেন— তদ্ দৃষ্ট্বা লব্ধকামঃ সঃ। পুষ্পদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ভীমের মন যেন প্রিয়া দ্রৌপদীর সান্নিধ্য লাভ করল, যে দ্রৌপদী রাজার দুলালী হয়েও বনবাসের কষ্টে মলিন— বনবাসপরিক্লিষ্টাং জগাম মনসা প্রিয়াম্। তাঁরই কষ্টার্জিত ফুল দিয়ে কৃষ্ণা ধর্মরাজের প্রিয় সাধন করবেন, এই কুটিলতা ভীমের মনে ছিল না। কৃষ্ণা মুখ ফুটে ফুল চেয়েছেন— এইটেই তাঁর কাছে বড় কথা ছিল। যার জন্য ফুল পাওয়া মাত্র তিনি লব্ধকাম, দ্রৌপদীর উষ্ণ সান্নিধ্য লাভ করেছেন মনে মনে। ভীম নিজে সরল মানুষ, তাঁর ভালবাসাও সরল। বিশেষত পদ্ম পাওয়া মাত্রেই তাঁর মনে যে কৃষ্ণার মলিন মুখখানি ভেসে উঠেছে তাতে বোঝা যায় নিজে সঙ্গে থাকলেও দ্রৌপদীর বনবাস তিনি কোনওদিন সহ্য করতে পারেননি।

ভীম যে দ্রৌপদীর জন্য পদ্মবনে গেছেন সে-কথা যুধিষ্ঠির জানতেন না। কাজেই ভীমকে বহুক্ষণ না দেখে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে দ্রৌপদীকেই ভীমের কথা জিজ্ঞেস করলেন। তখন কিন্তু এই বিদগ্ধা মহিলা— তোমায় সাজাব যতনে কুসুম-রতনে— ইত্যাদি প্রেমালাপ যুধিষ্ঠিরকে উপহার দেননি। তিনি বললেন— ওই যে অপূর্ব পদ্মফুল, সেইগুলিই অনেকগাছি আমি ভীমকে আনতে বলেছি। আমার প্রিয় সাধনের জন্য— প্রিয়ার্থং মম পাণ্ডবঃ— তিনি বোধহয় গেছেন আরও উত্তরে। ঠিক কথাটাই দ্রৌপদী মুখ ফসকে বলে ফেলেছেন। ভীমকে তিনি কত ভালবাসতেন, সে বিসংবাদে কাজ নেই, তবে তাঁর ভাল লাগবে বলে, শুধুমাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর ভাল লাগবে বলে কত দুঃসাহস যে ভীম দেখিয়েছেন তা বলবার নয়। আর ঠিক এইসব জায়গায় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিপ্রতীপ আচরণও লক্ষ করার মতো। ভীমের সঙ্গে দ্রৌপদীর সম্পর্ক যাই থাকুক, তার সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের সম্পর্কটিও খেয়াল করে যেতে হবে।

সত্যি কথা বলতে কী, যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে দ্রৌপদী ঠিক কী পেলেন, তা বোঝবার আগেই তাঁর বনবাস-পর্ব শুরু হয়ে গেছে। যদি শব্দমন্ত্রে পঞ্চম লাগিয়ে দিই এবং মহাভারতে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা দ্রৌপদীর প্রণয়সূচক বচনাংশ তুলে ধরে প্রমাণ করতে চাই যে, যুধিষ্ঠিরই দ্রৌপদীর আসল প্রাণনাথ, তা হলে আমার মতে সেটা বড় আধ্যাত্মিক বাড়াবাড়ি হবে। প্রথমত এমন অমলিন ব্যক্তিত্ব এবং সতত জাজ্বল্যমান আত্মসচেতনতা নিয়ে এককভাবে কাউকে ভালবাসাই দ্রৌপদীর পক্ষে অসম্ভব ছিল বলে আমরা মনে করি। সেখানে যুধিষ্ঠির কখনও তাঁর ব্যক্তিত্বের জায়গাটায় ভীষণ রকমের অনুকূল হয়ে ওঠেননি। এই বৈবাহিক সময়ে পঞ্চস্বামীর একক বধূ বলেই ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা যুধিষ্ঠিরের পাশে প্রথাসিদ্ধ রানি হওয়ার সুবাদ ছাড়া এমন কোনও ঘটনাই ঘটেনি, যা তাঁকে যুধিষ্ঠিরের প্রতি কোমল করে তোলে। সুরসৌগন্ধিক পুষ্প যুধিষ্ঠিরকে দেবার মধ্যেও ক্ষণিক যুধিষ্ঠিরের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে ওঠাটা দ্রৌপদীর বিকীর্ণ শৃঙ্গার-সরস হৃদয়ের একটি বর্ণাভাসমাত্র। সেটা ভীষণ প্রকটও হয়ে ওঠে, যখন যুধিষ্ঠির ভীমকে না দেখে দ্রৌপদীকে প্রশ্ন করেন— পাঞ্চালী! কোথায় গেছে ভীম? কী করতে গেছে সে— কচ্চিৎ ক্ব ভীমঃ পাঞ্চালি কিঞ্চিৎ কৃত্যং চিকীর্ষতী! এবং দ্রৌপদী নির্মোহ উত্তর দেন— আমার ভাল লাগবে বলে, সে ফুল আনতে গেছে। ঠিক এইখানে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ক্ষণিক সরসতা প্রকট করার চেয়েও ভীম তাঁর কতটা বশংবদ— এটা প্রকট করে তোলাটা দ্রৌপদীর অনেক বড় দায় ছিল। তিনি এমন করেই ভালবাসতে ভালবাসেন।

বনযাত্রার কালে কুন্তীর কাছ থেকে বিদায় নেবার পর দ্রৌপদী তাঁর চরম প্রতিশোধ-স্পৃহা লুকিয়ে রাখেননি। তখনও তিনি রজস্বলা, একখানি বস্ত্রে দেহ আবৃত করে হস্তিনাপুর থেকে বেরোচ্ছেন, কিন্তু চুলগুলি পুরো খোলা এবং চোখে জল। বিদুর এই চেহারার মধ্যে অন্য অর্থ খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর মতে দ্রৌপদী নাকি বোঝাতে চাইছেন— যারা আজ আমার এই অবস্থা করেছে, তাদের বউরাও আজ থেকে চোদ্দো বছর পরে স্বামী-পুত্র-স্বজন হারিয়ে বিধবা-অবস্থায় এইরকমই মুক্তকেশে গঙ্গায় তর্পণ করে বাড়ি ফিরবে। বস্তুত কুরুবাড়ির নিরীহ বউদের প্রতি দ্রৌপদীর কোনও বিরূপতা ছিল বলে আমরা মনে করি না। বরঞ্চ এই ভাবনার মর্ম যতখানি কৌরবদের মৃত্যু-কামনার তাৎপর্য বহন করে, ততখানি তাঁদের বউদের বিধবা দেখার তৃপ্তিতে নয়। একইভাবে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তাঁর বাদ-প্রতিবাদের অংশগুলিকেও যাঁরা প্রণয়াত্মক দাম্পত্য হিসেবে দেখতে চান, অথবা কখনও তাঁকে মেনে নেওয়াটাকে যদি যুধিষ্ঠিরের প্রতি বশংবদতা হিসেবে দেখতে চান, তা হলে এটাই আগেভাগে জানাব যে, মহাকাব্য মহাভারত প্রেম-ভালবাসার ব্যাপারে কোনও জটিল মোহ-স্পন্দন তৈরি করে না। প্রণয়, মোহ, মান এবং ক্রোধের মতো বৃত্তিগুলি এখানে 'সারফেস' থেকেই ধরা পড়ে। দ্রৌপদীকে নিয়ে পাণ্ডবরা বনে এলেন এবং বনপথ পাণ্ডবদের কাছে নতুন বস্তু নয়,

জতুগৃহের আগুন থেকে বেঁচে তাঁদের বনে বনে ঘুরতে হয়েছে। বিবাহের পূর্বকাল পর্যন্ত, কিন্তু দ্রৌপদীর কাছে বনের পথ নতুন বটে। রামায়ণের সীতার মতো স্বামীর প্রিয়তায় তিনি বনকে স্বামী-সংসর্গে স্বর্গ বলে মেনে নিতে পারেননি।

বনে বাস করতে গেলে যেসব উপদ্রব ঘটে, তার প্রথম প্রতীকী উপস্থাপন ঘটেছে কির্মীর রাক্ষসকে দিয়ে। মহাভারতের কবি প্রথমেই বুঝিয়ে দিলেন— এই ধরনের অদ্ভুত সন্ত্রাসের সঙ্গে দ্রৌপদী একেবারে অভ্যস্ত নন। এমনকী এমনটা কল্পনাও করতে পারেন না বলে ভয়ে তিনি চোখ বুঁজে ফেললেন— অদৃষ্টপূর্বসন্ত্রাসান্ ন্যমীলয়ত লোচনে। পাঁচ পাণ্ডব ভাইদের মধ্যে ভয়-বিত্রস্তা দ্রৌপদী— তখনও দুঃশাসনের হাত-লাগানো চুলগুলি খোলা রয়েছে তাঁর— ব্যাস মহাকবি উপমা দিলেন— পাঁচটা পাহাড়ের মধ্যে স্খলিতা নদীর মতো আকুল— পাঁচ ভাইই ত্রস্তা দ্রৌপদীকে একত্রে স্পর্শ করে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন এতটাই মনোযোগ দিয়ে— যেন চক্ষু রূপের সন্ধান পেয়েছে, নাসিকা গন্ধের, মধুর শব্দ শুনেছে কান, জিহ্বা আস্বাদন করছে রস আর ত্বক স্পর্শ করছে আকাঙ্ক্ষিত শরীর— পাঁচ স্বামী পাঁচ ইন্দ্রিয়ের মতো যেন আপন আপন বিষয় খুঁজে পেল— ইন্দ্রিয়াণি প্রসক্তানি বিষয়েষু যথা রতিম্।

দ্রৌপদীর জন্য পাঁচ ভাইয়ের এই ত্রস্ত মনোযোগের মধ্যেই কিন্তু রাক্ষসের অন্বেষণ-ঘোষণা ভেসে আসে— কির্মীর নাকি শুধু ভীমকে খুঁজছে। ভীম স্বভাবসিদ্ধভাবেই বেরিয়ে এলেন রাক্ষসকে শিক্ষা দেবার জন্য। রাক্ষস মারা পড়ল এবং পাণ্ডবরা কাম্যক বন ছেড়ে দ্বৈতবনে এসে একটি কুটীর নির্মাণ করলেন দ্রৌপদীকে নিয়ে বসবাস করার জন্য। দ্বৈতবন-প্রবেশের পর সবচেয়ে বড় ঘটনা বোধহয় এটাই যে, এইখানে প্রথমে দেখা করলেন কৃষ্ণ। তিনি দ্বারকা থেকে আসার সময় দ্রুপদ রাজার ছেলে, মানে, দ্রৌপদীর বাপের বাড়ির লোকদেরও সঙ্গে নিয়ে এলেন দ্বৈতবনে। সেদিন আনন্দে ভরে উঠেছিল পাণ্ডবদের আরণ্য-কুটীর। কৃষ্ণ সেখানে এসে প্রথম অভিবাদনেই বলেছিলেন— সময় এসেছে এবার। এবার যুদ্ধভূমি দুর্যোধন-কর্ণ-দুঃশাসন-শকুনির রক্ত পান করতে চাইছে— দুঃশাসন-চতুর্থানাং ভূমিঃ পাস্যতি শোণিতম্। লক্ষণীয়, এমন চড়া সুরে কথালাপের সুর বেঁধে দিলেও অর্জুন কিন্তু শান্ত কথায় শান্ত করেছিলেন। চুপ করে ছিলেন অন্য পাণ্ডব ভাইরাও। কিন্তু দ্রৌপদী ছাড়েননি।

তা ছাড়া এই বুঝি তাঁর শ্রেষ্ঠ সুযোগ ছিল, আর এমনটা বোধ হয় স্বাভাবিক বটে। আসলে স্বামীর ঘরে শ্বশুরবাড়িতে বসে মেয়ে যদি তার প্রতিবাদের কথা, তার ওপরে অত্যাচারের কথা স্পষ্টভাবে বলতেও পারে, তবু সেখানে তার আহত হৃদয়ের অভিমানটুকু তেমনভাবে স্ফুরিত হয় না, যতটা হয় বাপের বাড়ির লোকের সামনে এবং অবশ্যই সমান-হৃদয় বন্ধুর সামনে। দ্রৌপদী আজ কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলতে আসছেন— বাপের বাড়ির লোকে পরিবৃত হয়ে— ধৃষ্টদ্যুম্ন-মুখৈর্বীরৈর্ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতা। দ্রৌপদী আজ তাঁর পরম সখা, সমান-হৃদয় বন্ধু কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন— তার সমান-হৃদয় কেন? এইজন্য যে, ভাল করে খেয়াল করবেন— আজকে দুর্যোধন-দুঃশাসন-কর্ণ সম্বন্ধে কৃষ্ণের যা মত, দ্রৌপদীর মতও তাই। কৃষ্ণ প্রথমে এসে পাণ্ডবদের সামনে দুরন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন— যারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শঠতা করে ছলনা করে অনিষ্ট করে তাদের সবার আগে মেরে ফেলা উচিত, এটাই সনাতন ধর্ম— নিকৃত্যোপচরন্ বধ্যঃ এষ ধর্মঃ সনাতনঃ। তার মানে, সত্য পালন করে এই বনবাসে আসার ব্যাপারটাকে কৃষ্ণ খুব বড়মানুষি হিসেবে দেখছেন না— ঠিক যেমন একটু পরেই কৃষ্ণ চলে যাবার পর যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদী বলবেন— কৌরবদের ওপর ক্ষমা দেখানোর সময়ই নয় এটা, আমাদের চিরকালের অপকারী দুর্যোধনদের ওপর এখনই ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত।

এই সমান বোধ যেমন কৃষ্ণকে দ্রৌপদীর কাছে এনে দিয়েছে তেমনই আর এক কারণ হল— কৃষ্ণের ওপরে দ্রৌপদীর ভরসা। তিনি তাঁকে এতটাই বিশ্বাস করেন। একটু আগেই অর্জুন কৃষ্ণকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে প্রায় তাঁকে ভগবত্তার প্রকোষ্ঠে ঠেলে দিয়েছেন। দ্রৌপদীও কথা আরম্ভ করেছেন সেই ভগবত্তার সম্বোধনেই, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে নিজের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন— তুমি এত বড় ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও আমার কী হল? আমি নাকি পাঁচ পাণ্ডবের স্ত্রী, মহামহিম কৃষ্ণের সখী নাকি আমি? আর ধৃষ্টদ্যুম্নের মতো যোদ্ধার বোন হওয়া সত্ত্বেও আমাকে দুষ্কৃতীরা রাজসভায় টেনে আনল কী করে— সভাং কৃষ্যেত মাদৃশী? কৃষ্ণের কাছে নিজের তৎকালীন বিপন্ন অবস্থাটা বলার সময়— আমি তখন রজস্বলা অবস্থায় এক কাপড়ে বসে ছিলাম— এ-কথা জানাতে মহাকাব্যের নায়িকার কোনও সংকোচ হয় না। এটা মহাকাব্যিক শব্দের উত্তরণ বটে— এই অতি-আধুনিক কালেও অতি প্রগল্ভা রমণীরাও ভাই-বন্ধুর সামনে আমি তখন রজস্বলা অবস্থায় ছিলাম— এ কথা সোচ্চারে বলতে সংকোচ বোধ করবেন। কিন্তু মহাকাব্যিক কালে ঋতুকালের অব্যবহিত সময়ে ভার্যাগমনের রীতি ছিল বলেই হয়তো অখিল পতিকুলের প্রাতিরাত্রিক জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে দিতে রজস্বলা হবার শব্দ উচ্চারণে দ্বিধা ছিল না রমণীকুলের। আর দ্রৌপদী তো বিপন্নতার চরমে পৌঁছেছিলেন শত্রুদের হাতে, অতএব তাঁর মুখে কোনও শব্দই বেমানান নয়।

কৃষ্ণের কাছে দ্রৌপদী বলছেন— আমি তখন লজ্জায় কাঁপছি, শরীর খারাপ ছিল বলে কোনও মতে এক কাপড়ে রয়েছি তখন, কিন্তু সেই অবস্থায় আমাকে রাজসভায় নিয়ে এল দুঃশাসন। রাজসভার সমস্ত লোক আমাকে দেখে হা হা করে হাসছে— আর তোমরা সব বেঁচে থাকতেও আমাকে ওরা সব বেশ্যার মতো ভোগ করতে চাইল— দাসীভাবেন মাং ভোক্তুম্ ঈষুস্তে মধুসূদন। আর কাদের সামনে ব্যাপারটা ঘটছে? ওই পিতামহ ভীষ্ম, ওই ধৃতরাষ্ট্র— যাঁদের ঘরের বউ আমি, তাঁরা আমার শ্বশুর সব, তাঁদের সামনে তাঁদেরই ঘরের ছেলেরা আমাকে ভোগ করতে চাইছে, অথচ কেউ কিছু বলছে না। দ্রৌপদী এবার স্বামীদের প্রসঙ্গে আসছেন। বললেন— আমি কাউকে দূষছি না, আমার শ্বশুর, দাদা-শ্বশুর কাউকে না— হয়তো বা পুত্রস্নেহে তাঁরা অতি প্রশ্রয়ীও হতে পারেন— কিন্তু আমার স্বামীরা কি করছিলেন? বিধিসম্মতভাবে বিবাহিতা তাঁদের যশস্বিনী ধর্মপত্নীকে লোকে অবাধে উত্যক্ত করে মারছে, আর তাঁরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেটা অবাধে দেখছেন— যৎ ক্লিশ্যমানাং প্রেক্ষন্তে ধর্মপত্নীং যশস্বিনীম্।

বলা বাহুল্য, এই বাক্যে যুধিষ্ঠিরের সত্যবদ্ধতারও নিন্দা করছেন দ্রৌপদী, বলতে

চাইছেন— বিবাহিতা স্ত্রীর এ-হেন বিপন্নতার কালেও যুধিষ্ঠিরের ওই নির্বাক সত্যসন্ধান কোন ধর্ম তৈরি করে? কিন্তু লক্ষণীয়, যুধিষ্ঠিরের নামও উচ্চারণ করলেন না দ্রৌপদী এবং আমরা নিশ্চিত যে, এটা জ্যেষ্ঠ স্বামীর প্রতি সামান্য মর্যাদাবশতও নয়, কারণ সেটা হলে— অমন জঘন্য মুহূর্তেও যাঁরা তাঁর জ্যেষ্ঠ স্বামীকে অতিক্রম করে তাঁর মর্যাদা-রক্ষায় এগিয়ে আসেননি, তাঁদের প্রতি এই ধিক্কার-বাক্য ভেসে আসত না দ্রৌপদীর মুখ থেকে। দ্রৌপদী বলেছেন— ধিক্ এই অর্জুনের গাণ্ডীবকে, ধিক্কার রইল পাণ্ডব মধ্যম ভীমসেনের বাহুবলের প্রতি— ক্ষুদ্র-নীচ লোকেরা আমাকে নির্বাধে অপমান-উৎপীড়ন করে যাচ্ছিল, আর এঁরা সেটা নিশ্চুপে সহ্য করছিলেন— যৌ মা বিপ্রকৃতাং ক্ষুদ্রৈর্মর্ষয়েতাং জনার্দন।

দ্রৌপদী কিন্তু জানেন যে, ভীম প্রতিবাদ করেছিলেন, তিনি যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলার হাতখানিও পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, এমনকী অপেক্ষা করছিলেন একটা চরম আদেশ নেমে আসার, কিন্তু তা আসেনি। যুধিষ্ঠির তো বলেনই নি, কিন্তু যিনি বলেছিলেন, তাঁকে থামিয়ে দিয়েছেন অর্জুন। কিন্তু এই সূত্রে শুধু অর্জুনকে তিরস্কার করাটা একটা একক আক্রমণ হয়ে যাবে বলেই ভীমকে জড়িয়ে নিয়ে দ্রৌপদী ধিক্কার দিয়েছেন আসলে যুধিষ্ঠিরকে এবং একই সঙ্গে এই দুই মহাশক্তিধর স্বামীদেরও, কেননা তাঁরাও যুধিষ্ঠিরকে অতিক্রম করেননি অথবা করতে পারেননি। করতে পারেননি ভীম, আর করেননি অর্জুন। যিনি প্রতিবাদ করতে চেয়েও পারেননি, তাঁর প্রতি দ্রৌপদীর মমতা আছে স্পষ্টতই— আসছি সে-কথায়। তার চেয়েও বড় এক বিপন্ন সমস্যার কথা বলছেন দ্রৌপদী। বলছেন— এটা তো চিরকালের ধর্ম, কৃষ্ণ! ভদ্রলোকের তো এটাই আচার যে, একজন দৈহিক-শক্তিহীন অল্পবল স্বামীও তাঁর বউটাকে সমস্ত অন্যায়-অপমান-বিপন্নতা থেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে— যদ্ভার্য্যাং পরিরক্ষন্তি ভর্তারোঽল্পবলা অপি।

দ্রৌপদীর কথায় আমার মনে পড়ে গেল এক আমোদিনী বিদ্বৎসভার কথা। সেখানে সেমিনারে এক পুরুষ বক্তা বলছিলেন— 'উইমেন-এমপাওয়ারমেন্ট' ব্যাপারটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই এটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন বিবাহিতা মহিলাও কীভাবে জীবন নির্বাহ করবেন, সেখানে তাঁর নিজের স্বাধীনতা থাকা উচিত, কিন্তু আর এক গভীর বিপন্নতা নাকি তাঁকে কুরে কুরে খায়। তিনি বলছিলেন— হ্যাঁ, এটা তো হওয়াই উচিত যে, মেয়েরা নিজের মতো করে বাঁচবে, নিজের মতো করেই জীবন কাটাবে, এমনকী বিয়ে হলেও এই স্বাধীনতা তাঁদের থাকা উচিত, তাঁদের শ্বশুর-বাড়ির জীবন, চাকরি, সন্তান পালন— সব জায়গাতেই স্বাধীনতা থাকা উচিত মেয়েদের, তবে হ্যাঁ, তাঁদের শরীর-সুরক্ষার ব্যাপারেও তাঁদের স্বাধীন ভাবনা থাকা দরকার। রাস্তা-ঘাটে লোক-জন উত্যক্ত করবে, ট্রামে-বাসে কদর্য লোকেরা অস্বস্তি তৈরি করবে, তখনও তাঁদের নিজের ব্যবস্থা নিজেদেরই নিতে হবে। তখন যেন বাপ-ভাই-স্বামীদের ডাক না পড়ে!

সভায় বসে আমি বুঝলাম— বড় অভিমান হয়েছে বেচারার। তার মধ্যে ওই সভায় প্রচুর মহিলা বক্তারা মেয়েদের জীবন, যৌবন, আর্থিক স্বাধীনতা, সব কিছু নিয়েই পুরুষদের এমন বাড়াবাড়ি রকমের আক্রমণ করেছেন, তা যেন পূর্বোক্ত ভদ্রলোক-বক্তার নিজেরই আঁতে ঘা দিয়ে দিয়েছিল। তাঁর ভাবটা ছিল এইরকম— যেন, এই তো এবার থেকে যখন যৌবনবতী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ত্রীকে নিয়ে রাস্তায় যাবেন, তখন যদি কেউ স্ত্রীকে ঠোনা মেরে তুলে নিয়ে যেতে চায়, তখন সেই দুষ্কৃতীকে আর বাধা দেবার প্রশ্ন আসবে না। বউ নিজের জীবন-যৌবন নিজেই সামলাবে, এখানেও তিনি স্বাধীন, তাঁর সুরক্ষার জন্য যেন স্বামীর ডাক না পড়ে।

সভার প্রশ্নোত্তরপর্বে অভিমানী বক্তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে, 'উইমেন-এমপাওয়ারমেন্ট' ব্যাপারটা যতখানি 'বায়োলজিক্যালি-রিলেটেড' ভাবনা, তার চেয়েও অনেক বেশি 'সোশ্যালি অ্যান্ড সোশিয়োলজিক্যালি রিলেটেড' ভাবনা। আপনি বউয়ের জীবন-ধারণের ব্যাপারে, তাঁর স্বমত-প্রকাশের ব্যাপারে, তাঁর চাকরির ব্যাপারে স্বাধীনতা স্বীকার করে নিচ্ছেন মানে এই নয় যে, অন্য একজন আপনার বউকে 'মলেস্ট' করে যাবে, আর আপনি শক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতিবাদ করবেন না, বাধা দেবেন না এবং নিশ্চল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাববেন— যেমন স্বাধীনতা চাইছ, এবার বোঝো, নিজের সুরক্ষার ব্যাপারেও আমার অপেক্ষা থাকা উচিত নয় তোমার। সত্যি বলতে কী, এই প্রতিকূল প্রতিশোধের ইচ্ছা নিয়ে কখনও 'জেন-ইকুয়ালিটি'র সহায় হওয়া যায় না। আমরা বলব— অন্যের অসভ্যতা থেকে স্ত্রীকে অথবা অন্য স্ত্রীলোককেও সুরক্ষা দেওয়াটা যে কোনও পুরুষের ন্যূনতম ইতিকর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তার সঙ্গে স্ত্রীলোকের স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে তার শারীরিক দুর্বলতার জায়গাতে আঘাত করাটা কোনও পৌরুষেয় অহংকার তৃপ্ত করে না। অতি অল্পবল মানুষও তাঁর স্ত্রীকে শুধুমাত্র মমত্ববোধেই বলবত্তরের অন্যায় থেকে রক্ষা করে, এটা 'ইনস্টিংক্টিভ্লি'-ই হওয়ার কথা এবং দ্রৌপদী সেটাই বলছেন যে, দুর্বল লোকেরাও নিজের স্ত্রীকে অপমান-আক্রমণ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে— যদ্ ভার্যাং পরিরক্ষন্তি ভর্তারোঽল্পবলা অপি। তা ছাড়া দ্রৌপদীর যুক্তি আছে আরও। তিনি বলছেন— যে স্বামী তাঁর স্ত্রীর সুরক্ষা দিতে পারেন, তাঁরই সন্তান সুরক্ষিত হয়। তা হলে এ কীরকম ভর্তা আমার! শুনি নাকি— ভর্তাই নিজে ভার্যার উদরে সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তো, এ কীরকম ভর্তা আমার! যিনি নিজের স্ত্রীকে সুরক্ষা দিতে পারেন না, তিনি আবার আমার উদরে সন্তান হয়ে জন্মাবেন কোন সুবাদে— ভর্তা চ ভার্যয়া রক্ষ্যঃ কথং জায়ান্ মমোদরে।

কৃষ্ণের কাছে নিজের স্বামীদের সম্বন্ধে প্রতিবাদ জানানোর সময়ে দ্রৌপদীর শেষ যুক্তিটা ছিল আরও ভয়ংকর। স্ত্রী হিসেবে নয়, আত্মীয় হিসেবে নয়, দ্রৌপদী এক সাধারণ নাগরিক হিসেবে বলেছেন— এঁরা নাকি সব শরণাগত-পালক, শরণাগত মানুষকে নাকি এঁরা পরিত্যাগ করেন না, অথচ আমি তো এঁদের কাছে শরণাগত হয়ে নিজের সুরক্ষা ভিক্ষা করেছিলাম, কই তবু তো আমাকে রক্ষা করেননি এই পাণ্ডবরা— তে মাং শরণমাপন্নাং নান্বপদ্যন্ত পাণ্ডবাঃ!

এটা কিন্তু মানতেই হবে যে, দ্রৌপদী যথেষ্টই ভাল যুক্তি সাজাতে পারেন, সে যুক্তি গভীর এবং অকাট্যও বটে। তার চেয়েও বড় কথা, পাণ্ডবরা হয়তো দ্রৌপদীকে উপযুক্ত সুরক্ষা দিতে পারেননি, কিন্তু সেই কৌরবসভায় সামান্য পাশাখেলার এক কূট অভিসন্ধিতে সম্পূর্ণ রাজ্যটাই নিয়ে নিল ওরা, সবাইকে এক লহমায় দাসে পরিণত করল, আমি রজস্বলা অবস্থায় এক কাপড়ে, আমাকে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে আসল রাজসভায়, অথচ আমার পাঁচ পাঁচটা ছেলে, এদের ঔরসে জন্মেছে— তারাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল এই ঘটনা— আচ্ছা,

তুমি বলো তো কৃষ্ণ! অর্জুনের গাণ্ডীব আছে, ভীমের এত শক্তি আছে, তবু কেন এই দুর্বল ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের জন্য আমার ছেলেরা কেন এই লাঞ্ছনা সহ্য করল— কিমর্থং ধার্তরাষ্ট্রাণাং সহন্তে দুর্বলীয়সাম্— ধিক অর্জুনের গাণ্ডীবকে, ধিক অর্জুন, ধিক্কার আমার ভীমের পুরুষকারে।

সকলকে জড়িয়ে-মড়িয়ে সকল স্বামীদের প্রতি অনন্ত ধিক্কার বর্ষণ করলেও দ্রৌপদীর কিন্তু ভীমসেনের প্রতি এই আস্থা তৈরি হয়েছে যে, এই সেই একমাত্র লোক যিনি আপন মমত্বের তাড়নাতেই তাঁর মর্যাদা রক্ষায় সদা অভিমুখ। ফলে এত ধিক্কারের মধ্যেও যখন তিনি দুর্যোধনদের আশৈশব অত্যাচারের কথাগুলি বলতে আরম্ভ করলেন, তখন ভীমের প্রসঙ্গটাই সর্বাধিক টেনে আনলেন দ্রৌপদী। আর এটাও ঠিক যে, ভীমই যেহেতু কৌরব-অত্যাচারের নিশানা হয়েছেন বারবার, তাতে যেমন অত্যাচারের হিসেব দিতেও সুবিধে হচ্ছে তাঁর, তেমনই ভীমের প্রতিই যেহেতু তাঁর পৃথক এক বিশ্বাস তৈরি হয়েছে, ফলত তাঁর প্রতি অত্যাচার উচ্চারণের মধ্যে স্বামী হিসেবে ভীমের প্রতি নিজের পক্ষপাত এবং প্রিয়তা মিশিয়ে দিতেও তাঁর অসুবিধে হচ্ছে না। দ্রৌপদী বারণাবতের প্রসঙ্গ তুললেন, যেখানে মায়ের সঙ্গে পাণ্ডবদের রাজ্য থেকে বহিষ্কার করেছিলেন দুর্যোধন। তারপর ভীমের খাবারে বিষ মেশানোর কথা, তাঁকে গঙ্গায় অজ্ঞান অবস্থায় ভাসিয়ে দেবার কথা, বারণাবতের জতুগৃহে ভীম কীভাবে আগুন দিয়ে, মা-ভাইদের কীভাবে কোলে করে নিয়ে গিয়েছিলেন বনপথে, সেই সম্পূর্ণ কাহিনিটাও অশ্রুতপূর্বের মতো কৃষ্ণের কাছে বললেন দ্রৌপদী এবং তা সর্বক্ষণই ভীমের বীরত্ব খ্যাপন করে।

ভীমের এই পূর্বজীবন দ্রৌপদী দেখেননি, কিন্তু শুনেছেন, হয়তো বা এই মহাকাব্যিক ত্রাতার ভূমিকায় নেমে-আসা স্বামীটির কথা শুনতে তাঁর ভালও লেগেছে। বিশেষত দ্রৌপদী যখন হিড়িম্ববধ পর্বে ভীমের গরিমা উল্লেখ করছেন, সেখানে তাঁর অগ্রজা সপত্নী হিড়িম্বাকে নিয়েও তাঁর গর্বের অন্ত নেই। ভীমের প্রতি হিড়িম্বার শরীরী আকর্ষণ নিয়ে তাঁর এতটুকু মাথাব্যথা নেই, বরঞ্চ হিড়িম্বা রাক্ষসী যে কত বড় মনের মানুষ, সে-কথা বলার সময়ে দ্রৌপদীর অন্তর আকুলিত হয়েছিল এই ভেবে যে, সেই ভীমপ্রিয়া রাক্ষসী তাঁর পাঁচ স্বামীকেই নরখাদক ভাইয়ের হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল। হিড়িম্বাকে একাধারে মনস্বিনী এবং অসামান্যা সুন্দরী বলতেও দ্রৌপদীর ঈর্ষা হয়নি এতটুকুও। দ্রৌপদীর পূর্ব বিবরণে বক রাক্ষসের কথাও এসেছে এবং সেখানেও ভীমের জয়কার। কিন্তু আনুপূর্বিক বিবরণের শেষে যখন আপন স্বয়ংবরের কথা উঠল, তখন সবার শেষে অর্জুনের অসম্ভব বীরত্বের ভাষ্যটুকুই সবচেয়ে বড় হয়ে উঠল। দ্রৌপদী বলেছেন— তুমি যেমন ভীষ্মক রাজার মেয়ে রুক্মিণীকে জয় করে এনেছিলে, ঠিক সেইভাবেই অর্জুন আমাকে জিতে নিলেন স্বয়ংবরে। কত যুদ্ধ হল সেখানে, কত রাজা-মহারাজা ফিরে গেলেন আহত হয়ে! কিন্তু অন্যেরা কেউ যা পারত না, অর্জুন সেটাই করে দেখাল— এবং সুযুদ্ধে পার্থেন জিতাহং মধুসূদন।

অর্জুনের ব্যাপারে গভীর আপ্লুতি দেখালেন দ্রৌপদী এবং একবারের তরেও যেহেতু উল্লেখ করলেন না যে, তারপর পাঁচ পাণ্ডবের সঙ্গেই তাঁর বিয়ে হল, অতএব দ্রৌপদীর অভিমানও এখানে ভীষণ রকমের বিপ্রতীপভাবে অনুমানযোগ্য হয়ে ওঠে। হয়তো এটাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, স্বয়ংবরে যিনি যুদ্ধ করে তাঁকে জিতে আনলেন, তিনি কোন নৈতিকতায় বাঁধা পড়ে এমন নৈর্ব্যক্তিক মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে থাকলেন কৌরবসভায়? আর এখন! চরম হতাশায় দ্রৌপদী বলছেন— জননী কুন্তীকে ছেড়ে এসে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমাকে নিকৃষ্ট লোকেরা চরম অপমান করছে দেখেও কেমন করে আমার শক্তিমান স্বামীরা উপেক্ষা করছে নির্বীর্য মানুষের মতো— নিহীনৈঃ পরিক্লিশ্যন্তীং সমুপেক্ষন্তি মাং কথম্?

দ্রৌপদীর ক্ষোভ শেষ পর্যন্ত চরম অভিমানে পরিণত হল কৃষ্ণের সামনে। সেই যে সেই স্বয়ংবর-পর্বের পর কৃষ্ণের সঙ্গে দ্রৌপদীর দেখা হয়েছিল, অর্জুনের পরম সখা বলেই হয়তো কৃষ্ণের সঙ্গেও তাঁর গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী-পুরুষের গভীর বন্ধুত্বের মধ্যে বস্তুবাদী পণ্ডিতেরা অনেক সময়েই যৌনতার লুপ্ত-সরস্বতী দেখতে পান অন্তরিত চেতনায়, তবে সংস্কৃত নীতিশাস্ত্রে প্রীতিলক্ষণের মধ্যে যেহেতু গোপন কথা জানানো এবং জেনে নেওয়াটা— গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি— অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য এবং বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে সম-প্রাণতাই বন্ধু হবার সবচেয়ে বড় লক্ষণ— সমপ্রাণঃ সখা মতঃ— তাই দ্রৌপদী এবং কৃষ্ণের সম্পর্কের মধ্যে সমান-হৃদয়তা অথবা সমপ্রাণতার বিষয়টাই বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সমস্ত যৌনতার বিশ্রান্তি ঘটে যায় এমন এক বিশ্বাসে, যেখানে দ্রৌপদী মনে করেন— অন্য কেউ বুঝুক না বুঝুক, কৃষ্ণ ঠিক বোঝেন আমাকে।

এতক্ষণ নিজের যন্ত্রণাগুলি সবিস্তারে বলার শেষ পর্যায়ে যখন অবিচারের জায়গাটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখন চোখে জল আসে অবিরল ধারায়। দ্রৌপদী কান্নায় ভেঙে পড়লেন। মহাভারতের বিদগ্ধ কবি মন্তব্য করলেন— দ্রৌপদীর কথা বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসছিল। মৃদুভাষিণী দ্রৌপদী তাঁর পদ্মকোষতুল্য কোমল হস্তদুটি দিয়ে মুখমণ্ডল আবৃত করে রোদন করতে লাগলেন। উদগত অশ্রুরাশি তাঁর উন্নত পীবর বর্তুল স্তনের ওপর ঝড়ে পড়তে লাগল— স্তনাবাপতিতৌ পীনৌ সুজাতৌ শুভলক্ষণৌ। দ্রৌপদী বলতে লাগলেন— আমি তো কোনও খারাপ বংশে জন্মাইনি, বউ হয়ে এসেছি মহাত্মা পাণ্ডুর ঘরে, আর এই মহাবীর পাণ্ডবদের ঘরণী আমি, তবু কেন আমি কোনও সুরক্ষা পাইনি, শত্রুরা আমার চুল ধরে টেনে আনল আর পাঁচ পাণ্ডব কিনা সেটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন— পঞ্চানাং পাণ্ডুপুত্রাণাং প্রেক্ষতাং মধুসূদন।

ঠিক এইখানেই দ্রৌপদীর দুঃখ-ক্ষোভ-অভিমান অশ্রুরাশির আকারে ঝরে পড়ছিল তাঁর পীনোন্নত স্তনমণ্ডলে। জানি না, অশ্রুপাতের আধার হিসেবে মহাকবি কেন এই রমণীয় প্রত্যঙ্গটুকুই বেছে নিলেন! তা হলে কি স্ত্রী-পুরুষের বন্ধুত্বের মধ্যেও অতি-পরোক্ষ অনুভূতিতে যৌনতার আভাস দিতে হয় এমনই প্রসঙ্গহীন রমণীয়তায়। ঠিক এখনই দু'হাতে মুখ ঢেকে দ্রৌপদী কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলবেন— বুঝেছি, আমার কেউ নেই, কৃষ্ণ! আমার স্বামীরা নেই, ছেলেরা নেই, বাপ-ভাই-আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, এমনকী তুমিও নেই, কৃষ্ণ— নৈব ত্বং মধুসূদন। এ-কথা যদি আজকের দিনেও কোনও রমণী তাঁর 'সতী' স্বামীর সামনে প্রকৃত বন্ধুর উদ্দেশে বলত, তা হলে তাঁদের সমস্ত দাম্পত্য কলহের বিষয় হয়ে উঠত এই বন্ধুত্বই— সতীদের মতে এই বন্ধুত্ব সম্পূর্ণটাই সন্দেহ-সংশয়ের তত্ত্ব

দিয়ে গড়া। দ্রৌপদীর পক্ষে আমাদের যুক্তি হল— এমন সম্পর্ক দ্রৌপদীর মতো বিদগ্ধা রমণীর পক্ষে সর্বথাই সম্ভব। যিনি পাঁচ-পাঁচটা স্বামীর সঙ্গে ঘর করেন এবং বিচিত্র সম্পর্ক-সেতুতে যাঁদের বেঁধে রেখেছেন, তিনি একজন পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে নির্বিকার অথচ সবিকারী সম্পর্ক রাখতে পারবেন না, এটা হতে পারে না। বিশেষত তিনি যা কিছু বলছেন, তাঁর পাঁচ স্বামীর সামনেই বলছেন। এই এই পাঁচ স্বামীও তাঁদের এই বন্ধুত্বের কথা সবিশেষ জানেন— কৃষ্ণা দ্রৌপদী এবং কৃষ্ণকে তাঁরা সেইভাবেই সমীহ করেন।

দ্রৌপদীর সাশ্রু বক্তব্য শেষ হওয়া-মাত্রই কৃষ্ণ তাঁর স্বামীদের সম্মান এতটুকু ব্যাহত না করে বলেছেন— দ্রৌপদী! যাদের ওপরে তোমার এত রাগ তৈরি হয়েছে, তারা অর্জুনের শরাঘাতে প্রত্যেকে রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দেবে। তোমার পাণ্ডব-স্বামীদের মাধ্যমেই যা করার আমি করব, তুমি কেঁদো না— যৎসমর্থং পাণ্ডবানাং তৎ করিষ্যামি মা শুচঃ। লক্ষণীয় নিশ্চয়, কৃষ্ণের এই অসম্ভব মাত্রাজ্ঞান। অন্য কোনও অপরিণতবুদ্ধি বন্ধু হলে তিনি দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামীর মুণ্ডপাত করে দ্রৌপদীর মতো আগুনপানা রূপসীর জন্য সমস্ত দায় নিজেই গ্রহণ করতেন। আর কৃষ্ণের মতো বিশালবুদ্ধি মানুষ তো তা করতেই পারতেন। কিন্তু কৃষ্ণ দ্রৌপদীর কাছে তাঁর স্বামীদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে শেষে তাঁর আপন প্রতিজ্ঞা-বাক্য উচ্চারণ করেছেন— আজ যদি আকাশ থেকে স্বর্গ পড়ে খসে, ভেঙে পড়ে হিমালয় অথবা খণ্ড খণ্ড হয় এই পৃথিবী, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, দ্রৌপদী! তুমি আবারও রাজরানি হবে— সত্যং তে প্রতিজানামি রাজ্ঞাং রাজ্ঞী ভবিষ্যসি।

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাশেষে দ্রৌপদীর প্রতিক্রিয়া ছিল এমনই, যেখানে রসশাস্ত্রের চরম অভিব্যক্তি ঘটে যায়। কৃষ্ণের কথা শেষ হলে দ্রৌপদী আর একটি কথাও বলেননি। তিনি শুধু একবার তাঁর বীরমানী গাণ্ডীবধন্বা মধ্যম স্বামীর দিকে বক্র তির্যক দৃষ্টিপাত করেছিলেন— সাচীকৃতমবৈক্ষৎ সা পাঞ্চালী মধ্যমং পতিম্। আর এই বক্র দৃষ্টিপাতের প্রতিক্রিয়া ছিল এই যে, অর্জুন দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং দ্রৌপদীকে প্রসন্ন করে বললেন— তোমার ক্রোধতাম্র নয়নে শুভ আসুক নেমে। তুমি আর কেঁদো না, কৃষ্ণ যা বলল, ঠিক তেমনটাই হবে, অন্যথা হবে না— মা রোদীঃ শুভতাম্রাক্ষি যথাহ মধুসূদনঃ। অর্জুনের পর দ্রৌপদীর ভাই ধৃষ্টদ্যুম্নও প্রতিজ্ঞা করলেন পাণ্ডবদের সামনে রেখেই। দ্রৌপদী বুঝলেন, এই বনবাস-কালের দীর্ঘসূত্রিতায় তিনি অন্তত রাজোচিত 'উত্থান-শক্তিকে' চেতিয়ে রাখতে পেরেছেন।

রাজনৈতিক দৃষ্টিতে 'উৎসাহ'-উদ্দীপনা এবং 'উত্থান'-শক্তি এমনই এক ভাববাচক পদার্থ, যা চর্চিত না হলে মরচে ধরে যায়। বারো বচ্ছরের বনবাস-কাল জুড়ে পূর্বের সঞ্চিত ক্রোধ ধরে রাখা এবং তদনুসারে উদ্দীপিত থাকা অত সোজা নয়। কৃষ্ণ-ধৃষ্টদ্যুম্নরা দ্বৈতবন ছেড়ে চলে যাবার সময় দ্রৌপদীর পরিচারিকা-দাসী-ধাত্রীরা কৃষ্ণের সঙ্গে দ্বারকায় চলে গেল। যত অলংকার, মহার্ঘ্য যত কিছু সে-সবও দ্রৌপদী দ্বারকায় পাঠিয়ে দিলেন ধাত্রী-পরিচারিকাদের হাতে। দ্রৌপদী এবার অনেকটাই বনবাসের যোগ্য করে নিলেন নিজেকে।

বনবাসের কাল চলছিলও ভালই। ব্রাহ্মণেরা যুধিষ্ঠিরকে নানা উপদেশ দিচ্ছেন, দ্রৌপদী সূর্যমার্কা থালার দৌলতে ঝালে-ঝোলে-অম্বলে সবাইকে খাওয়াচ্ছেন, চার ভাই বনে বনে ঘোরেন, আর যুধিষ্ঠির ধর্মকথা শোনেন। এই গড্ডলিকার জীবন দ্রৌপদীর যেন আর সহ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছিল না। বীর ক্ষত্রিয় পুরুষেরা নিষ্কর্মার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে আর যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ-সম্মেলন করে যাচ্ছেন। ওদিকে শত্রুর বৃদ্ধি ঘটছে। দুর্যোধন ভালই রাজ্য চালাচ্ছেন, সে খবরও দ্রৌপদীর কাছে আছে। এই অবস্থায়, যুধিষ্ঠির যদি দুঃখ দুঃখ মুখ করে দ্রৌপদীকে স্তোক দিতেন কিংবা কোমর বাঁধতেন পরবর্তী প্রতিশোধের জন্য— তাও বুঝি কিছু সান্ত্বনা থাকত। কিন্তু তিনি নির্বিকার, অনুৎসাহী— ব্রাহ্মণোচিত ধর্মচর্চায় আবদ্ধ। এক দিন ফেটে পড়লেন দ্রৌপদী।

যুধিষ্ঠিরের ওপর তাঁর রাগ জমা ছিল বহুদিনের। যে যাই বলুক, দ্রৌপদী জানতেন— তাঁর এ দুরবস্থা যুধিষ্ঠিরের জন্যই। সকলের সম্মানিত ধর্মরাজ স্বামীকে তিনি বারবার শ্রদ্ধা করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু একই সঙ্গে পাশা খেলায় যুধিষ্ঠিরের অত্যাসক্তি তাঁকে তাঁর জ্যেষ্ঠ-স্বামীর ওপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল হতে বাধা দিয়েছে। যে দ্যূতাসক্তি একদিন তাঁকে পণ্য করে তুলেছিল, যে দ্যূতাসক্তি একদিন তাঁকে রাজসভায় বিবস্ত্রা করার সুযোগ এনে দিয়েছিল শত্রুপক্ষের কাছে, তিনি যতই ধর্ম-উপদেশ করুন না কেন, ঘা-খাওয়া রমণীর কাছে তা ধর্মধ্বজিতা বলে মনে হয়। সত্যিই যে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে এই ধারাতেই ভাবতেন তার প্রমাণ পাব সেই বিরাট পর্বে, কীচক যেখানে দ্রৌপদীর পেছন পেছন ঘুর ঘুর করছেন। অপমানিতা দ্রৌপদী তাঁর চিরদিনের বিশ্বাসী ভীমের কাছে সেদিন বলেছিলেন— তোমার বড়ভাই যুধিষ্ঠিরকে তুমি নিন্দা করতে পার, যার পাশা খেলার শখ মেটানোর জন্য আমাকে এই অনন্ত দুঃখ সইতে হচ্ছে। পৃথিবীতে এক জুয়াড়ি ছাড়া এমন আর কে আছে যে রাজ্য হারিয়ে, নিজেকে হারিয়ে, শেষে বনবাসের জন্য আবার পাশা খেলে— প্রব্রজ্যায়ৈব দীব্যেত বিনা দুর্দ্যূত-দেবিনম্।

দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে ক্ষমা করতে পারেননি, কোনওদিনও পারেননি। বনবাসে কিছুদিন কাটার পরেই তিনি রাগে ফেটে পড়লেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। না, এ ঝগড়াটা নেহাত সাধারণ স্তরের ছিল না। বিবাহ এবং ছেলেপিলে হবার পর কর্তা-গিন্নির যে গার্হস্থ্য কলহ— এ তাও নয়। ঝগড়ার পূর্বাহ্ণেই ব্যাসকে দ্রৌপদীর সম্বন্ধে বলতে হয়েছে— প্রিয়া চ দর্শনীয়া চ পণ্ডিতা চ পতিব্রতা, অর্থাৎ কিনা বারবার এই 'চ' শব্দ দিয়ে ব্যাসকে দ্রৌপদীর প্রশংসায় 'ক্যাটিগোরিক্যাল' হতে হয়েছে। বিশেষ করে তৃতীয় বিশেষণে এক কুলবধূ রমণীকে 'পণ্ডিত' বলে সম্বোধন করায় বুঝতে পারি দ্রৌপদীর কথাগুলি যে ঠিক— তার পেছনে ব্যাসেরও সমর্থন আছে।

দ্রৌপদী বললেন— তোমাকে এমনকী আমাকে যে তোমার সঙ্গে গাছের ছালের কোপনী পরিয়ে বনে পার করেছে দুর্যোধন, তাতে তার মনে অনুতাপ তো হয়ইনি, বরঞ্চ সে রয়েছে আনন্দে— মোদতে পাপপুরুষঃ। তা ছাড়া তোমার অবস্থা দেখে আমার করুণা হচ্ছে মহারাজ...

পাঠক! দ্রৌপদীর এই করুণার নমুনাগুলি আমি মহাভারতকারের ভাষায় উপস্থাপন করতে চাই না। মহাভারতের ঠিক এই জায়গাটি অবলম্বন করে মহাকবি ভারবি তাঁর কিরাতার্জুনীয় মহাকাব্যে দ্রৌপদীর জবানি তৈরি করেছেন। এক মহাকবি আরেক মহাকবিকে যেমন বুঝেছেন তারই মূর্ছনা ভারবির দ্রৌপদীর রসনায়। দ্রৌপদী বললেন— তোমার অবস্থা

দেখে আমার করুণা হচ্ছে মহারাজ! সময় ছিল যখন বন্দিরা বিচিত্র রাগিণীতে বন্দনা গান গেয়ে তোমার ঘুম ভাঙাত, এখনও গানে গানেই তোমার ঘুম ভাঙে মহারাজ, তবে সে বন্য শেয়ালের অমঙ্গল গানে। সময় ছিল, যখন দ্বিজোচ্ছিষ্ট অন্নে প্রতিদিনের ভোজন আরম্ভ করতে তুমি, এখনও তাই কর তুমি, তবে এ দ্বিজ ব্রাহ্মণ নয়, এ দ্বিজ দু'বার জন্মানো অণ্ডজ পাখি, যাদের ঠুকরে খাওয়া ফলের প্রসাদ পাও তুমি। সময় ছিল, যখন প্রণতমস্তক রাজা-রাজড়াদের মুকুটমণিতে রক্তলাল হয়ে উঠত তোমার পা দু'খানি, হ্যাঁ, এখনও তোমার পা দু'খানি রক্তলাল, তবে তা একেবারেই রক্তেই— ব্রাহ্মণদের তুলে নেওয়া আধেক-ছাঁটা ধারালো কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হয় তোমার চরণ আর আক্ষরিক অর্থেই সেগুলি রক্তে রাঙা হয়ে ওঠে।

বস্তুত দ্বৈপায়ন ব্যাসের মহাভারতে দ্রৌপদীর অধিকারের সীমানা দেখে ভারবির দ্রৌপদী আরও বেশির মুখর হয়ে উঠেছেন প্রতিবাদে। তিনি বললেন— মহারাজ! এ জগতে তুমি ছাড়া আর কে আছে যে তার মনোরমা কুলবধূর মতো রাজলক্ষ্মীকে অন্যের দ্বারা অপহরণ করায়, কারণ আমাকেও যেমন তুমি পাশা খেলে অন্যের হাতে তুলে দিয়েছিলে, তেমনি রাজলক্ষ্মীকেও তুমি পাশা খেলেই অন্যের হাতে তুলে দিয়েছ,— পরৈস্ত্বদন্যঃ ক ইবাপহারেন্ মনোরমাম্ আত্মবধূমিব শ্রিয়ম্। তোমার পূর্বতন রাজপুরুষেরা ইন্দ্রের মতো যে-রাজ্য শাসন করে গেছেন, সেই রাজ্য তাঁরা তুলে দিয়েছিলেন তোমার হাতে। আর তুমি! হাতির শুঁড়ে মালা পরিয়ে দিলে সে যেমন যথেচ্ছভাবে সে মালা একদিকে ছুঁড়ে দেয়, তেমনি তুমিও রাজলক্ষ্মীর বরমাল্যখানি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ, যা লুফে নিয়েছে কৌরবেরা। তা ছাড়া তোমার জোয়ান জোয়ান ভাইগুলিকে দেখে তোমার মায়া হয় না মহারাজ? এই যে ভীম, যে এককালে রক্তচন্দন গায়ে মেখে সগর্বে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াত— পরিভ্রমল্-লোহিতচন্দনার্চিতঃ— সে এখনও চন্দনের মতো লাল রং গায়ে মেখেই ঘুরে বেড়ায় তবে তা গিরি-গুহার গৈরিক ধুলোর লাল— পদাতিরন্ত গিরিরেণুরুষিতঃ। তারপর, এই যে দেখছ অর্জুন, যে এককালে উত্তর দিক জয় করে থরে থরে ধনরত্ন এনে দিয়েছিল তোমার রাজসূয় যজ্ঞের ভাণ্ডার পূর্ণ করতে, সেই বীরপুত্র এখন গাছের বাকল খুঁজে বেড়ায় কোনটা পরিধানের উপযুক্ত, কোনটা নয়, এই বাছাই করার বীরকর্মে সে এখন নিযুক্ত।

রাজসভায় সুখলালিত পাণ্ডবদের বনবাসমলিন অবস্থাটি প্রতিতুলনায় বড় করুণ করে ধরবার চেষ্টা করেছেন ভারবি। দ্রৌপদীর জবানিতে তার বক্তব্য হয়ে উঠেছে বক্রোক্তির সংকেতে অলংকৃত। মহাভারতকার অলংকারের ধার ধারেন না, সহজ কথা তিনি এত সহজেই বলেন যে, দ্রৌপদীর বক্তব্য যেন আরও ক্ষুরধার হয়ে ওঠে। মহাভারতের দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের কাছে রাগে ফেটে পড়েন— তোমার শরীরে কি রাগ বলে কোনও জিনিস নেই মহারাজ! তোমার জোয়ান জোয়ান ভাইয়েরা সব ঘুরে-বুলে বেড়াচ্ছে। যাদের খাওয়াবার জন্য পাচকেরা শতেক ব্যঞ্জনে রান্না করে দিত, তাদের এখন বন্য খাবার ছাড়া গতি নেই। এই ভীমকে দেখে তোমার রাগ হয় না মহারাজ! যার পথ চলার সুখের জন্য দুয়ারে গোটা কতক রথ, হাতি, ঘোড়া প্রস্তুত থাকত, যে একাই সমস্ত কৌরবদের ধ্বংস সাধনে সমর্থ, তাকে দুঃখিত অন্তরে বনের বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে দেখে তোমার রাগ হয় না মহারাজ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে অর্জুনের তুলনা শুধু অর্জুনই, অস্ত্রসন্ধানে যে যমের মতো সমস্ত রাজার মস্তক নত করে ছেড়েছিল, সেই বাঘের মতো মানুষটাকে দেখে তোমার রাগ যে কেন বেড়ে যায় না— তাই ভেবে আমার মুচ্ছো যেতে ইচ্ছে করে— ন চ তে বর্ধতে মন্যুস্তেন মুহ্যামি ভারত। তারপর আছে নকুল, অমন সুন্দর চেহারা, অমন বীরত্ব— দর্শনীয়শ্চ শূরশ্চ, আছে সহদেব, কোনওদিন কোনও দুঃখ সইতে হয়নি বেচারাকে— আহা তাদের দেখেও কি তোমার রাগ বেড়ে যায় না মহারাজ! একেবারে শেষে আমার নিজের কথাও বলি, বড়মানুষের ঘরে আমার জন্ম, মহারাজ পাণ্ডুর পুত্রবধূ, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী আর পাঁচ-পাঁচটা বীর স্বামীর ঘরণী আমি— এমন আমাকে বনে বনে ঘুরতে দেখে তুমি সেই লোকগুলোকে ক্ষমা কর কী করে? বেশ বুঝি রাগ বলে কোনও জিনিসই তোমার শরীরে নেই, ভাইদের এবং বউকে দেখে মনে কোনও পীড়াও হয় না তোমার। জান তো লোকে বলে যাদের গায়ে ক্ষত্রিয়ের রক্ত আছে তারা কখনও ক্রোধহীন হয় না— ন নির্মন্যুঃ ক্ষত্রিয়োঽস্তি লোকে নির্বচনং স্মৃতম্। ভারবি কবি মহাভারতের এই কথাটাকে আরও একটু টেনে নিয়ে দ্রৌপদীর মুখে বলেছেন— ক্ষমার দ্বারা শান্তি চায় মুনিরা, রাজার নয়। আর তোমার যদি হৃদয়ে অত ক্ষমা থাকে, তবে মাথায় জটা ঝুলিয়ে হোমকুণ্ড সাজিয়ে মুনিদের মতো মন্ত্র পড় গিয়ে— জটাধরঃ সন্ জুহুধীহ পাবকম্।

পূর্ণ এক অধ্যায়ে দ্রৌপদীর মুখে যে ধ্রুবপদ বেঁধে দিয়েছেন মহাভারতকার তা হল— তবু তোমার মাথায় রাগ চড়ে না যুধিষ্ঠির— কস্মান্ মন্যুর্ন বর্ধতে। যুধিষ্ঠিরের কিছুই হয়নি, কোনও বিক্রিয়া নয়, প্রতিক্রিয়াও নয়। দ্রৌপদী সর্বসহ প্রহ্লাদের উক্তি পর্যন্ত উদ্ধার করে যুধিষ্ঠিরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, দৈত্যকুলের প্রহ্লাদের মতেও মাঝে মাঝে ক্রোধের প্রয়োজন আছে, অন্তত রাজনীতিতে, শত্রু-ব্যবহারে। কিন্তু যুধিষ্ঠির তবু সেই মিন-মিন করে সেই অক্রোধ, ক্ষমা, আর শান্তির বাণী পুনরুক্তি করতে থাকলেন। এবার রাগের বদলে দ্রৌপদীর ঘেন্না ধরে গেল যেন। যে ধর্ম মানুষকে এমন করে ডোবায়, সেই ধর্মের প্রবক্তার ওপরেই তাঁর ঘেন্না ধরে গেল যেন। লজ্জায় ঘৃণায় ক্ষুব্ধা হল তাঁর রসনা। বললেন— ঠাকুর তোমার পায়ে নমো নমঃ, যে ঠাকুর তোমায় এমন করে গড়েছে— নমো ধাত্রে বিধাত্রে চ যৌ মোহং চক্রতুস্তব। শুনেছি ধর্মের রক্ষাকারী রাজাকে ধর্মই রক্ষা করে, নিজেও সে রক্ষিত হয়, কিন্তু সেই ধর্ম তোমাকে রক্ষা করছে বলে তো মনে হচ্ছে না। আমি জানি— এই যে ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, এমনকী আমি— এদের সবাইকে তুমি ধর্মরক্ষার জন্য ত্যাগ করতে পার। ছায়ার মতো তোমার বুদ্ধি সবসময় ধর্মেরই অনুগামিনী। জানি, এই সসাগরা পৃথিবী লাভ করে ছোট বড় কাউকে তুমি অবমাননা করোনি, কিংবা বলদর্পে তোমার শিংও গজায়নি দুটো— ন তে শৃঙ্গম্ অবর্ধত। কিন্তু যে তুমি, রাজসূয়, পুণ্ডরীক যজ্ঞ করে এত দানধ্যান করলে, সেই তোমার ধর্মরাজের পাশা খেলার মতো বিপরীত বুদ্ধিটা কী করে হল শুনি? সব তো খুইয়েছিলে, রাজ্য, ধন, অস্ত্র, ভাই এমনকী পরিণীতা স্ত্রীকেও। তুমি তো সরলতা, মৃদুতা, বদান্যতা, লজ্জাশীলতা, সত্যবাদিতা— এত সব ধর্মগুণের পরাকাষ্ঠা, সেই তোমার মতো লোকের জুয়ো খেলার মতো উলটো বুদ্ধি হল কী করে— কথম্ অক্ষব্যসনজা বুদ্ধিরাপতিতা তব।

দ্রৌপদী আরও অনেক কথা বলেছেন, দর্শনশাস্ত্রও বাদ যায়নি। বেশ বোঝা যায় শান্তরসের নায়ক যুধিষ্ঠিরের ধর্মকথা তাঁর কাছে সময়কালে ধর্মধ্বজিতাই মনে হয়েছে। যুধিষ্ঠির 'পণ্ডিতা' দ্রৌপদীর যুক্তি-তর্ক মেনে তাঁর বচন বিন্যাসভঙ্গির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন— বল্গু চিত্রপদং শ্লক্ষ্ণং যাজ্ঞসেনি ত্বয়া বচঃ। কিন্তু এই প্রথম বাক্যটি বলেই যুধিষ্ঠির হৃদয়ে কোনও জটিলতা বোধ করলেন বোধহয়। দ্বিতীয় বাক্যেই তিনি বললেন, যত ভালই বলে থাক, কিন্তু যা বলেছ, নাস্তিকের মতো বলেছ। তর্কাহত ধর্মিষ্ঠ মানুষের শেষ অস্ত্র তর্কজয়ী মানুষকে নাস্তিক বলা। যুধিষ্ঠির কি পণ্ডিতা ঘরণীর সারকথা বুঝতে পেরেই তাঁকে নাস্তিক প্রতিপন্ন করলেন। অনেক কথা যুধিষ্ঠির বললেন, তাতে ব্রাহ্মণ-সজ্জন, মুনি-ঋষিদের ধর্ম প্রমাণসিদ্ধ হল, কিন্তু রাজধর্ম, যা নিয়ে মহাভারতেরই অন্যত্রও বিশদ আলোচনা আছে এবং যে আলোচনা দ্রৌপদীর সপক্ষে যাবে, কই যুধিষ্ঠির তো তার ধারও মাড়ালেন না! তিনি স্ত্রীকে নাস্তিক বললেন এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় দ্রৌপদীও ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু এই ক্ষমা চাওয়া তাঁর হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত নয়। বস্তুত দৈবাধীন হয়ে বসে থাকা এবং সময়ের অপেক্ষা করা— যুধিষ্ঠিরের এই অলস নীতিতে দ্রৌপদীর আস্থা ছিল না। তাই ক্ষমা চেয়েও দ্রৌপদী বললেন— হঠকারিতা করে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া যেমন বোকামি, তেমনি দৈবের দোহাই দিয়ে অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করাও এক ধরনের বোকামি। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে ইঙ্গিত করেই ব্যঙ্গ করলেন— যে নাকি দৈব মাথায় নিয়ে নিশ্চেষ্টভাবে সুখে নিদ্রা যায়, তার বুদ্ধি বলে কিছু নেই। জলের মধ্যে সদ্য নির্মিত কাদার ঘটখানি রাখলে সে যেমন আপনিই গলে গলে জলের মধ্যে মিশে যায়, দৈবাধীন পুরুষের অবস্থাও তেমনই— অবসীদেৎ স দুর্বুদ্ধিঃ আমো ঘট ইবাম্ভসি।

দ্রৌপদী, বীরস্বামিগর্বিতা দ্রৌপদী, পুরুষকারে বিশ্বাস করেন। যুধিষ্ঠিরকে তিনি বলতে চান— তুমি আমার জ্যেষ্ঠ স্বামী হলে কী হয়, তুমি যে হলে চাষারও অধম যুধিষ্ঠির। দেখ না, ক্ষেতের চাষিরাও লাঙল দিয়ে মাটি ফেড়ে বীজ বপন করে— পৃথিবীং লাঙ্গলেনেহ ভিত্ত্বা বীজং বপন্ত্যত— তারপর কৃষক চুপটি করে বসে থাকে দৈবাধীন বৃষ্টিপাতের অপেক্ষায়। কৃষক ভাবে, যতটুকু আমার পুরুষকারে কুলোয়— লাঙল দিয়ে মাটি ফাড়া— সেটুকু আমি করেছি, তারপরেও যদি বৃষ্টিপাতের দৈব সাহায্য না পাই তা হলে আমার দিক থেকে অন্তত ত্রুটি নেই কোনও— যদন্যঃ পুরুষঃ কুর্যাৎ কৃতং তৎ সকলং ময়া। তেমনি ধীর ব্যক্তিরা তাঁর পৌরুষের কর্তব্যটি আগে সম্পন্ন করেন, তারপরেও যদি দৈব তার সহায়তায় হাত বাড়িয়ে না দেয়, তখন তিনি আত্মতুষ্ট থাকেন এই ভেবে যে তাঁর তো কোনও দোষ নেই। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের এই উত্তাপহীন অলস-দশা সহ্য করতে পারেন না। যুধিষ্ঠিরকে তিনি মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়েছেন যে, শুয়ে পড়ে থাকা অলস ব্যক্তিকে অলক্ষ্মীতে ধরে— অলক্ষ্মীরাবিশত্যেনং শয়ানমলসং নরম্। কিছু তো কর, কিছু করলে তবে তো তুমি বলবে— আমি চেষ্টা করেছি, হয়নি— কৃতে কর্মণি রাজেন্দ্র তথানৃণ্যমবাপ্নুতে।

যুধিষ্ঠির কিছু করেননি, অন্তত সেই সময়ে কিছু করেননি। ঘরের বউ পণ্ডিতদের মতো বৃহস্পতির রাজনীতি উপদেশ দেবে, এ বোধহয় তাঁর সহ্য হল না। কিন্তু তিনি যে দ্রৌপদীকে আরেক দফা নাস্তিক-টাস্তিক বলে বসিয়ে দেবেন সে উপায়ও রইল না, কারণ মধ্যম-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাণ্ডব ভীমসেন ততক্ষণে বেশ একটু রাগত স্বরেই এগিয়ে এলেন দ্রৌপদীর পক্ষে— ক্রুদ্ধো রাজানম্ অব্রবীৎ। নরমে গরমে অনেক কিছুই বলে গেলেন ভীম, তাঁর সমস্ত বক্তব্য দ্রৌপদীর ভাষণের পাদটীকা মাত্র। সত্যি বলতে কি, ভীম দ্রৌপদীকে এতটাই ভালবাসেন যে, কখনও, কোনও সময়ে তাঁর কথার যৌক্তিকতা নিয়ে বিচার করেননি বেশি। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে যতখানি বুঝি ভালবাসেন তার থেকেও বুঝি ভয় পান; আর ভয় পান বলেই তাঁর ভালবাসার মধ্যে শুকনো কর্তব্যের দায় যেন বেশি করে ধরা পড়ে। পাঠক! খেয়াল করবেন, অজ্ঞাতবাসের আগে সব পাণ্ডবেরা যখন ভাবছেন কীভাবে, কোন কর্ম করে বিরাট রাজার রাজ্যে নিজেদের লুকিয়ে রাখবেন, তখন যুধিষ্ঠির বলছেন— এই আমাদের প্রাণের চেয়েও ভালবাসার পাত্রী দ্রৌপদী। মায়ের মতো এঁকে প্রতিপালন করা উচিত এবং বড়বোনের মতো ইনি আমাদের পূজনীয়াও বটে— মাতেব পরিপাল্যা চ পূজ্যা জ্যেষ্ঠেব চ স্বসা। অজ্ঞাতবাসের সময় অন্য মেয়েদের মতো দ্রৌপদী কি কিছু কাজকর্ম করতে পারবেন— ন হি কিঞ্চিৎ বিজানাতি কর্ম কর্তুং যথা স্ত্রিয়ঃ।

কিন্তু দ্রৌপদীর কাছে যুধিষ্ঠিরের এই কথাগুলি বাণী দেওয়ার মতো মনে হয়। মূলত, যুধিষ্ঠিরের কারণেই তাঁকে সমাজ বহির্ভূত ভাবে পঞ্চস্বামী বরণ করতে হয়েছে। একথা একভাবে তাঁর মুখ দিয়ে প্রকাশও হয়েছে এবং তা প্রকাশ হয়েছে মহাভারতের যুদ্ধ-মেটা শান্তিপর্বে যখন তাঁর জীবনেরও শেষ পর্ব উপস্থিত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ভাই, বন্ধু, জ্ঞাতিরা সব মারা যাওয়ায় যুধিষ্ঠিরের বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছে। যুধিষ্ঠিরের এই বৈরাগ্যই তো দ্রৌপদীর দু'চক্ষের বিষ। অথচ এই বৈরাগ্যই দ্রৌপদীকে সারা জীবন তাড়া করে বেড়াচ্ছে। ব্যাপারটা মহাভারতকার ব্যাসের নজর এড়ায়নি। দ্রৌপদী যে যুধিষ্ঠিরকে খুব ভাল চোখে দেখতে পারেন না, সে-কথা ব্যাসও রেখে ঢেকে পিতামহের মতো লঘু প্রশ্রয়ে প্রকাশ করেছেন। বলেছেন— দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের ব্যাপারে চিরকালই একটু অভিমানবতী— অভিমানবতী নিত্যং বিশেষণে যুধিষ্ঠিরে।

কিন্তু অভিমানের কথাগুলি কেমন? দ্রৌপদী বললেন, অনেক কথাই বললেন, 'ক্লীব'-টিব ইত্যাদি গালাগালিও বাদ গেল না। রাজনীতি, দণ্ডনীতির মধ্যে দ্রৌপদীর অভিমানও মিশে গেল। বললেন— আজকে আমার এতগুলো স্বামী কেন— কিং পুনঃ পুরুষব্যাঘ্র পতয়ো মে নরর্ষাভাঃ। আমার তো মনে হয় তোমাদের মধ্যে যে কেউ একজন আমার স্বামী হলেই আমার যথেষ্ট সুখ হত। একোপি হি সখায়ৈষাং মম স্যাদিতি মে মতিঃ। (দ্রৌপদী শুধু অর্জুনকে ব্যঞ্জনা করেননি তো?) কিন্তু কপালের ফের, শরীরে যেমন পাঁচটা ইন্দ্রিয় থাকে তেমনি তোমরা পাঁচজনই আমার স্বামী। দ্রৌপদী ভুলে যাননি যে মূলত যুধিষ্ঠিরের পাশা-পণ্যের চাপেই কৌরবসভায় তার চরম অপমান এবং পাশার দৌরাত্ম্যেই আবার অজ্ঞাতবাস। যুধিষ্ঠির নিজেও এ-কথা সবিনয়ে স্বীকার করেছেন। কিন্তু স্বীকার করলেই কী? এই ব্যবহারগুলির মধ্যে দ্রৌপদী 'মা' কিংবা 'বড়বোনে'র সম্মান পাননি। পরবর্তীকালে দেখেছি, এতকাল বনবাস-যুদ্ধ এবং সত্যি সত্যি যুদ্ধের পর যখন আবার যুধিষ্ঠিরের বৈরাগ্য এসেছে, তখন দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন— 'তুমি উন্মাদ' এবং তোমার পাগলামির জন্যেই তোমার চার ভাইও আজ পাগল হতে বসেছে— তবোন্মাদান্মহারাজ সোন্মাদাঃ

সর্বপাণ্ডবাঃ। দ্রৌপদী বললেন— জননী কুন্তী বলেছিলেন, সমস্ত শত্রুশাতন করে যুধিষ্ঠির তোমায় সুখে রাখবে। ছাই— তদ্ ব্যর্থং সংপ্রপশ্যামি। তুমি উন্মাদ, ডাক্তার ডাকিয়ে চিকিৎসা করাও। ধূপ, কাজল আর নস্যির ব্যবস্থা নিয়ে কবিরাজ আসুন— ভেষজৈঃ স চিকিৎস্যঃ স্যাৎ... ধূপৈরঞ্জনযোগৈশ্চ নস্যকর্মভিরেব চ।

সত্যিই যুধিষ্ঠিরের ব্যবহারে এই দ্বিমাত্রিকতা আছে। যিনি আজকে দ্রৌপদীকে মায়ের মতো, বড়বোনের মতো প্রতিপাল্যা মনে করেন, তিনিই পূর্বে তাঁকে পাশা খেলায় পণ রাখেন কী করে? ভীমের তো এইটেই খারাপ লেগেছে। তাঁর মতে পাশাখেলায় ধন-সম্পত্তি হেরে যাই, রাজ্য হারাই— দুঃখ নেই। কিন্তু এটাই যুধিষ্ঠিরের বাড়াবাড়ি যে, তিনি দ্রৌপদীকে পণ রেখেছেন— ইমং ত্বতিক্রমং মন্যে দ্রৌপদী যত্র পণ্যতে। বস্তুত যুধিষ্ঠির ছাড়া ভীম, অর্জুন কারও ব্যবহারেই দ্রৌপদী বৈষম্য খুঁজে পাননি। বিশেষত দ্রৌপদীর সম্বন্ধে ভীমের গৌরববোধ এতই বেশি যে, তিনি বিশ্বাসই করতে পারেন না যে— অজ্ঞাতবাসে দ্রৌপদীকে লুকিয়ে রাখা যাবে। যুধিষ্ঠির অজ্ঞাতবাসের সাজ নিয়ে চিন্তা করেছেন অজ্ঞাতবাসের আগে। কিন্তু ভীম তো সেই প্রথম বনবাসে দ্বৈতবনে বসেই ভাবছেন দীপ্তিমতী দ্রৌপদীকে লুকিয়ে রাখবেন কী করে? অজ্ঞাতবাসের আবরণে ফুলটি না হয় লুকোনোই রইল, কিন্তু পাণ্ডবঘরণীর উদীর্ণ গন্ধ লুকোবেন কী করে? সেই বনপর্বেই ভীম বলছেন— এই যে 'পুণ্যকীর্তি রাজপুত্রী দ্রৌপদী', ইনি এতই বিখ্যাত যে লোকের মধ্যে অপরিচিতার মতো থাকবেন কী করে— বিশ্রুতা কথম্ অজ্ঞাতা কৃষ্ণা পার্থ চরিষ্যতি।

গর্বে বুঝি কৃষ্ণার বুক ফুলে উঠেছিল সেদিন। বুঝেছিলেন এই মানুষটিই তাঁর একমাত্র নির্ভর। কৌরবসভায় প্রিয়া মহিষীর অপমানে বারংবার যে মানুষটি সভাস্তম্ভের দৈর্ঘ্য মেপে মেপে দেখছিলেন, সেই মানুষটিই তাঁর একান্ত নির্ভর। তাঁর এই আস্থার প্রমাণ দিয়েছেন ভীম, দ্রৌপদীর মুখের এককথায় হিমালয় থেকে পদ্মফুল কুড়িয়ে এনে। বস্তুত দ্রৌপদীর ব্যাপারে ভীমের এই যে গৌরববোধ তা একেবারে মিথ্যে ছিল না। ধরে নিতে পারি যজ্ঞবেদী থেকে উঠবার সময়েই যে কুমারী— তাম্রতুঙ্গনখী সুভ্রূশ্চারুপীনপয়োধরা,— তিনি বিবাহসময়ে নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ যৌবনবতী, পুষ্পবতী। বিবাহের পর বনবাসের সময় পর্যন্ত দ্রৌপদীর অনেক বছর কেটেছে। এতদিনে পঞ্চবীর স্বামীকে পাঁচ-পাঁচটি বীর সন্তানও উপহার দিয়েছেন তিনি— প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানীক এবং শ্রুতসেন— এই পঞ্চপুত্রের জননী দ্রৌপদী। বনবাসপর্বে কৃচ্ছ্রতায় মালিন্যে বারো বছর কেটেছে, তবুও দ্রৌপদীর দেহজ আকর্ষণ বোধহয় একটুও কমেনি। ভীমের ভালবাসার ভয় তাই মিথ্যে নয়— বিশ্রুতা কথম্ অজ্ঞাতা কৃষ্ণা পার্থ চরিষ্যতি। বিশেষত অন্য মানুষের কাছে দ্রৌপদীর আকর্ষণ এতই বেশি যে, ভীমের দায়িত্ব বারবার বেড়ে গেছে এবং বারবার তিনিই দ্রৌপদীর আস্থাভাজন হয়ে উঠেছেন, অর্জুন নন, যুধিষ্ঠির তো ননই।

স্মরণ করুন সেই দিনটির কথা। পাণ্ডবেরা সবাই দ্রৌপদীকে ঘরে একলা রেখে চারদিকে বেরিয়ে পড়েছেন মৃগয়ায়, নিজেদেরও খেতে হবে, ব্রাহ্মণদেরও খাওয়াতে হবে। কিন্তু এই সময়ে সিন্ধু-সৌবীর দেশের রাজা জয়দ্রথ মনে মনে বিয়ের ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হলেন শাল্বরাজার নগরীতে। জয়দ্রথের বিয়ে হয়ে গেছে, প্রতিথযশা ধৃতরাষ্ট্রের তিনি জামাই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুঃশলাকে বিয়ে করে স্বয়ং দুর্যোধনকে তিনি সম্বন্ধী বানিয়েছেন। কিন্তু জয়দ্রথের আবার বিয়ে করার ইচ্ছে হয়েছে, তাই আবার বরের সাজে বেরিয়ে পড়েছেন, তবে ছাতনাতলাটি ঠিক কোথায় এখনও ঠিক জানেন না। শাল্বনগরী থেকে আরও রাজা-রাজড়াদের বরযাত্রী নিয়ে তিনি কাম্যক বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। পাণ্ডবরাও তখন কাম্যক বনে এবং একলা ঘরে দ্রৌপদী। নির্জন বন। নতুন মেঘে বিদ্যুতের ছটা লাগলে যে শোভা হয়, দ্রৌপদীর আগুন-রূপের বিজলি লেগে বনস্থলীরও সেই দশা। তিনি কুটিরের দ্বারেই বসেছিলেন এবং চোখে পড়ে গেলেন জয়দ্রথের। শুধু জয়দ্রথ কেন, উপস্থিত সকলেই দ্রৌপদীকে না দেখে পারছিলেন না। ইনি অপ্সরা না দেবকন্যা— এইসব গতানুগতিক তর্কে অন্যেরা যখন ব্যস্ত, তখন কিন্তু জয়দ্রথের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে— দ্রষ্টা তাং দুষ্টমানসঃ। অব্রবীৎ কামমোহিতঃ। বন্ধুকে ডেকে জয়দ্রথ দ্রৌপদীর সমস্ত খবর নিতে বললেন। মহাভারতকারের মতে ব্যাপারটা ছিল— ঠিক শেয়াল যদি বাঘের সুন্দরী বউয়ের খবরাখবর জানার চেষ্টা করে— সেইরকম— ক্রোষ্টা ব্যাঘ্রবধূমিব।

আহা! জয়দ্রথের দিক থেকেও ব্যাপারটা একটু চিন্তা করুন পাঠক! নির্জন অরণ্যে একাকিনী সুন্দরী, যাঁর প্রতি অঙ্গসংস্থানে এখনও খুঁত নেই— 'অনবদ্যাঙ্গী'— তাঁর দিকে যুবক পুরুষেরা তাকাবে না, বিশেষত যে যুবক বিবাহার্থী! আমি বেশ জানি, জয়দ্রথ জ্ঞাতি-সম্বন্ধে পাণ্ডবদের পূর্বপরিচিত হলেও পাণ্ডব ঘরণীকে তিনি চিনতেন না। নির্জন অরণ্যে একচারিণী সুন্দরীকে দেখে বিবাহার্থী যুবকের মনে এই ইচ্ছে হতেই পারে যে, এই সুন্দরীকেই বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে যাই— এতামেব অহমাদায় গমিষ্যামি স্বমালয়ম্। তবে সন্দেহ এই— এমন চেহারা, ভুরু, দাঁত, চোখ কোনও কিছুতেই খুঁত নেই, উত্তমাঙ্গ অধমাঙ্গ অনালোচ্য, শুধু বলি তনুমধ্যমা— ইনি আমাকে পছন্দ করবেন তো? জয়দ্রথ বন্ধুকে খোঁজ করতে পাঠালেন।

আমি বলি, দ্রৌপদীরও দোষ ছিল। না হয় তিনি পঞ্চস্বামিগর্বিতা রাজপুত্রী। কিন্তু সুন্দরী অরণ্যভূমির মধ্যে বিশেষত যেখানে তাঁর পাঁচ স্বামীই বাইরে গেছেন— সেখানে এই খ্যাপা হাওয়ায়— ব্যাধূয়মানা পবনেন সুভ্রু— কুটির দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকার প্রয়োজন কী? দ্রৌপদীর আরও দোষ— এমন আগুনপানা রূপ যখন— দেদীপ্যমানাগ্নিশিখেব নক্তং— সেখানে দুয়ার থেকে নেমে এসে (দ্রৌপদী বিলক্ষণ জানতেন— রাজপুরুষেরা তাঁকে দেখছিলেন— সর্বে দদৃশুস্তাম্ অনিন্দিতাম্— জয়দ্রথ তাকে দেখে বন্ধুর কাছে গুনগুন করছিলেন এবং বন্ধু কোটিকাস্য তাঁর দিকে আসছে দেখেও)— দুয়ার থেকে নেমে এসে চিরকালের প্রেমের প্রতীক কদমগাছের একখানি অবাধ্য ডাল নুইয়ে ধরেছিলেন কেন— কদম্বস্য বিনাম্য শাখাম্ একাশ্রয়ে তিষ্ঠসি শোভমানা। দ্রৌপদী কি বুঝতে পারছিলেন না, এই শাখা নোয়ানোর আয়াসে, আন্দোলিত শরীরে, খ্যাপা হাওয়ায় তাঁকে আরও মোহিনী, আরও সুন্দরী লাগছিল!

দ্রৌপদী গাছের ডাল ছাড়লেন। যখন নাকি জয়দ্রথের বন্ধু তাঁর সহগামী সমস্ত রাজপুরুষের একে একে পরিচয় দিয়েছেন, তখন দ্রৌপদী কদম্বের ডাল মুক্ত করলেন। যখন জয়দ্রথের পরিচয় দিয়ে বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন— তুমি কার বউ, কার মেয়ে— তখন দ্রৌপদী গাছের

ডাল ছাড়লেন। সেই তখনই দ্রৌপদী মন্দ ভাবনায় উত্তমাঙ্গের ক্ষৌম বনবাসখানি আরও একটু টেনে নিলেন— অবেক্ষ্য মন্দং প্রবিমুচ্য শাখাং সংগৃহ্নতী কৌশিকম্ উত্তরীয়ম্। সংরক্ষণশীলেরা বলবেনই— দ্রৌপদীর দোষ ছিল। কিন্তু মহাশয়! দ্রৌপদীর ব্যবহারে লুকানো আছে চিরকালের বিবাহিতা রমণীর মনস্তত্ত্ব। বিবাহিতা বলে কি নিজের যৌবন অন্য পুরুষের চোখের আলোয় একটুও পরীক্ষা করবে না রমণী! একটুও পরখ করবে না, এই বেলাতেও তার আকর্ষণ আছে কিনা? দ্রৌপদী এতক্ষণ কদমগাছের শাখা টানাটানি করে এই পরীক্ষাই চালিয়েছেন। কিন্তু পরীক্ষায় সফল হওয়া মাত্রেই ঈষৎ-স্রস্ত উত্তরীয় টেনে নিয়েছেন। নিশ্চয় বিপদ বুঝে— অবেক্ষ্য মন্দম্।

আমরা কি দ্রৌপদীর মনস্তত্ত্ব-চিন্তায় প্রসঙ্গ হারিয়ে ফেলেছি? আমরা দ্রৌপদীর প্রতি ভীমের স্বামি-ব্যবহার নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু দ্রৌপদী যেমন স্বামী থাকতেও নিজের অস্তিত্ব, নিজের আকর্ষণ যাচাই করে নিলেন, আমরাও তেমনি একটু অন্য প্রসঙ্গ থেকে ঘুরে এলাম। বলা বাহুল্য, দ্রৌপদী বিদগ্ধা রমণী, ঠারে-ঠোরে আপন মাধুর্যের পরীক্ষা শেষ হতেই বিদগ্ধা বিবাহিতের পতিগৌরব ফিরে আসে। দ্রৌপদীরও তাই হয়েছে, অতএব আমরাও প্রসঙ্গে উপস্থিত। জয়দ্রথের বন্ধু দ্রৌপদীর মুখে পঞ্চপাণ্ডবের বৃত্তান্ত শুনে এসে জয়দ্রথকে জানাল। জানাল সে পাণ্ডবদের প্রিয়া পত্নী।

মধুলম্পট যে ভ্রমর একবার মল্লিকা ফুলে বসেছে, তার আর অন্য ফুল ভাল লাগে না, এ-কথা রসিক আলংকারিকেরা বলেছেন। জয়দ্রথের অবস্থাও এখন তাই। সে বললে— বিবাহিতা রমণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা এই মহিলাকে দেখে আর ফেরার পথ নেই— সিমন্তিনীনাং মুখ্যায়াং বিনিবৃত্তঃ কথং ভবান্। বস্তুত দুর্যোধনের বোন দুঃশলা, যে তার পূর্ব-পরিণীতা বধূও বটে, সেই দুঃশলাকেও বুঝি দ্রৌপদীর তুলনায় বানরী বলে মনে হচ্ছিল জয়দ্রথের কাছে— যথা শাখামৃগস্ত্রিয়ঃ। জয়দ্রথ মনের বেগ আর সহ্য করতে না পেরে সোজা উপস্থিত হল দ্রৌপদীর কাছে। বলল— সব ভাল তো, তুমি, তোমার স্বামীরা?

ঠাকুরজামাই বাড়ি এলেন। দ্রৌপদী বললেন— ভাল আছি গো ঠাকুরজামাই, সবাই ভাল আছি। যুধিষ্ঠির, তাঁর ভাইয়েরা এবং আমি— সবাই ভাল। এই নাও পা ধোবার জল, এইখানটায় বোস। আজকে তোমায় পাঁচশো হরিণের মাংস দিয়ে প্রাতরাশ খাওয়াব, ঠাকুরজামাই— মৃগান্ পঞ্চশতঞ্চৈব প্রাতরাশান্ দদানি তে। জয়দ্রথ বললে— তোমার প্রাতরাশ মাথায় থাকুক— কুশলং প্রাতরাশস্য— এখন আমার রথে ওঠ। রাজ্যহীন বনচারী পাণ্ডবদের উপাসনা করার যোগ্য নও তুমি। তুমি হবে আমার বউ— ভার্যা মে ভব সুশ্রোণি। দ্রৌপদীর বুক কেঁপে উঠল। ভ্রূকুটি-কুটিল কটাক্ষে একটু সরে গিয়ে দ্রৌপদী বললেন— লজ্জা করে না তোমার, কী সব বলছ? বিপদ বুঝে বিদগ্ধা রমণী অপেক্ষা করতে লাগলেন স্বামীদের, আর মুখে নানা মিষ্টি কথা বলে রীতিমতো ভুলিয়ে দিলেন জয়দ্রথকে— বিলোভয়ামাস পরং বাক্যৈর্বাক্যানি যুঞ্জতী। পাঁচ-পাঁচটা জোয়ান মরদকে যিনি হেলায় ভুলিয়ে রেখেছেন, তাঁর পক্ষে কিছু সময়ের জন্য জয়দ্রথকে ভোলানো অসম্ভব নয়। কিন্তু সে যে দুষ্ট মানুষ, কামার্ত। দ্রৌপদীকে আবার রেগে উঠতে হল। ইন্দ্রকল্প স্বামীদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুৎসা তিনি আর সইতে পারছিলেন না। স্বামীদের বল-বীর্য সম্বন্ধে তিনি কিছু বলাও প্রয়োজন বোধ করলেন।

স্বামীদের প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর ভাব-ভাবনার কথায় এই অংশটুকুই আমার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু দুষ্টজনের কাছে স্বামি-গৌরব করতে হলে সব স্বামীরই গৌরব করতে হয়। সেই সাধারণীকরণের সভ্যতার মধ্যে থেকে স্ত্রী-হৃদয়ের নির্ভরতা বের করে আনা কঠিন। এখানে যুধিষ্ঠিরকেও সংগ্রামী ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে দ্রৌপদী জয়দ্রথকে বললেন— তুমি ভাবছ যুধিষ্ঠিরকে জয় করে আমায় নিয়ে যাবে। এটা কেমন জান— কেউ যদি হাতে একটা ছড়ি নিয়ে ভাবে, 'আমি হিমালয়ের পাহাড়ি হাতি মেরে ফেলব', সেইরকম। তা ছাড়া রেগে যাওয়া ভীমকে কি তুমি দেখেছ? দেখনি। পালিয়ে যেতে যেতে যখন দেখবে, তখন মনে হবে 'ঘুমিয়ে থাকা মহাবল সিংহের দাড়ি ধরে টেনেছি, এখন উপায়— সিংহস্য পক্ষ্মানি মুখাল্লুনাসি'।

দ্রৌপদী অর্জুনের বেলাতেও সিংহের উপমা দিলেন। নকুল-সহদেবেরও কম প্রশংসা করলেন না। কিন্তু জয়দ্রথ ছাড়বেন কেন, তিনি পাণ্ডবদের নিন্দা করেই চললেন এবং প্রচুর ছুঁয়ো-না, ছুঁয়ো-না-র মধ্যেও দ্রৌপদীর আঁচল ধরে টান দিলেন। টানের চোটে দ্রৌপদী জয়দ্রথের কাছে এলেন বটে, কিন্তু তিনি তো সীতা-সাবিত্রী নন কিংবা অত 'স্পর্শকাতর'ও নন, কাজেই নিজের আঁচলের উলটো টানে জয়দ্রথকে তিনি ফেলে দিলেন মাটিতে— সমবাক্ষিপৎ সা। পাঞ্চালী-মেয়ের ঠেলা জয়দ্রথ সামলাতে পারল না, কিন্তু পড়ে গিয়েও সে দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে উঠে এল। আঁচল ধরে সে যখন টানতেই থাকল, তখন দ্রৌপদী ধৌম্য পুরোহিতকে জানিয়ে উঠে পড়লেন জয়দ্রথের রথে। আমি নিশ্চয় জানি, অনুরূপ পরিস্থিতিতে দণ্ডক-গতা সীতার সঙ্গে দ্রৌপদীর তফাত হল— নিজের অনিচ্ছায় পুরুষের স্পর্শমাত্রেই তিনি কাতর হন না— তার পরীক্ষা দুঃশাসনের টানাটানিতেই হয়ে গেছে। দ্রৌপদী যদি ব্যাসের না হয়ে বাল্মীকির হতেন, তা হলে হয় তাঁকে এখন 'সুইসাইড' করতে হত নয়তো মায়া-দ্রৌপদী হয়ে জয়দ্রথের সঙ্গে যেতে হত। দ্বিতীয়ত, দুঃশাসনের অভিজ্ঞতায় তিনি স্বেচ্ছায় রথে উঠেছেন— সাকৃষ্যমাণা রথম্ আরুরোহ। তৃতীয়ত, দ্রৌপদীর সুবিধে ছিল, তাঁর 'রাম' একটি নয়, পাঁচটি; তাঁর অবিচল ধারণা ছিল— পাঁচটি যখন পাঁচ দিকে মৃগয়া করতে গেছে, তখন তাঁর চিৎকারে একটা-না-একটা স্বামীকে বনপথেই পাওয়া যাবে। দ্রৌপদী স্বেচ্ছায় রথে উঠলেন।

সত্যিই পাণ্ডবেরা এসে গেলেন। ঘরে ফিরে ঘটনা শুনেই তাঁরা জয়দ্রথের পিছু নিলেন। একসময়ে জয়দ্রথ তাঁদের দেখতে পেলেন এবং ভয়ে তার প্রাণ উড়ে গেল। আমি আগেই বলেছি, জয়দ্রথ পাণ্ডব এবং দ্রৌপদী কাউকেই ভাল চিনতেন না। তিনি দ্রৌপদীকে স্বামী-পরিচয় দিতে বললেন এবং ঠিক এইখানটায় শত সাধারণীকরণের মধ্যেও দ্রৌপদী কোন স্বামীকে কেমনটি দেখেন তার একটা দ্বিধাহীন বর্ণনা আছে। প্রত্যেক স্বামী সম্বন্ধে দ্রৌপদীর গৌরবের মধ্যেও কোথাও যেন তাঁর পক্ষপাতের বিশেষ আছে। ঠিক এই বিশ্লেষণটায় পৌঁছনোর জন্যই আমাকে জয়দ্রথের পথটুকু অতিক্রম করতে হল।

ভীত ত্রস্ত জয়দ্রথ বললেন— ওই এলেন বুঝি তোমার স্বামীরা। একটু বুঝিয়ে বলবে

সুন্দরী, কার কেমন ক্ষমতা? দ্রৌপদী বললেন, তোমার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে— এখন আর ওসব বলেই বা কী হবে? তবে কিনা মৃত্যু পথের পথিক যে, তার শেষ ইচ্ছে পূরণ করা ধর্ম, তাই বলছি। ওই যে দেখছ— চোখ দুটো টানা টানা, ফরসা চেহারার মানুষটি— ইনি কুরুবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ যুধিষ্ঠির, লোকে যাঁকে ধর্মপুত্র বলে ডাকে। শত্রুও যদি শরণাগত হয়, তবে তাকেও ইনি প্রাণদান করেন।

লক্ষণীয়, যুধিষ্ঠিরের বল, বীর্য, যুদ্ধক্ষমতা— এইসব বীরসুলভ গুণের দিকে দ্রৌপদীর আর কোনও নজর নেই, তাঁর দৃষ্টিতে যুধিষ্ঠির শরণাগত শত্রুরও পালক অর্থাৎ নিজের কিংবা আপনজনের ক্ষতি স্বীকার করেও তিনি শত্রুকে বাঁচান। দ্রৌপদী এবার ভীমের প্রসঙ্গে এলেন, বললেন— ওই যে দেখছ শাল খুঁটির মতো লম্বা চেহারা, বড় বড় হাত; ভ্রুকুটি-কুটিল চোখ আর দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে যাচ্ছে ইনিই আমার স্বামী ভীম। লোকে ওকে ভীম বলে কেন জান— ওর কোনও কাজই সাধারণ মানুষের মতো নয়। তৃতীয় ব্যক্তির চোখ থেকে সরে এসে একান্ত আপন এবং নিবিড় দৃষ্টিতে ভীমকে যেমন লাগে, দ্রৌপদী এবার তাই বলছেন— অন্যায় করে এই মানুষটির কাছে বাঁচবার আশা কম। তা ছাড়া শত্রুতার একটি শব্দও ইনি ভোলেন না— নায়ং বৈরং বিস্মরতে কদাচিৎ— এবং শত্রুর প্রাণ না নেওয়া পর্যন্ত তাঁর মনে শান্তি থাকে না।

দ্রৌপদী যা বলেছেন, তার প্রমাণও তিনি পেয়েছেন। কৌরবদের পাশাখেলার আসরে একমাত্র ভীমই চুপ করে থাকতে পারেননি। বারংবার তাঁর ভীষণ প্রতিজ্ঞায় সভাগৃহ কেঁপে উঠেছিল, এবং ভবিষ্যতে দ্রৌপদীর এই ধারণা প্রমাণিত করেছে যে, ভীম কখনও শত্রুতা ভোলেন না। অথচ দেখুন, যে অর্জুনের সঙ্গে দ্রৌপদীর মালাবদল হয়েছিল এবং যাঁর মতো বীর সমকালে প্রায় কেউ ছিল না, তাঁর অনেক গুণের পরিচয় দিয়ে দ্রৌপদী বললেন— ইনি যুধিষ্ঠিরের শুধু ভাইই নয়, শিষ্যও বটে— ভ্রাতা চ শিষ্যশ্চ যুধিষ্ঠিরস্য। ছোটভাই বড়ভাইয়ের কথায় ওঠেন বসেন, অন্য মানুষের কাছে এর থেকে বেশি পারিবারিক গৌরব আর কী আছে। কিন্তু দ্রৌপদীর ব্যক্তিজীবনেও তাঁর এই বিশ্লেষণের গুরুত্ব আছে। সেই যেদিন কুন্তী-যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে ভিক্ষা ভেবে ভাগ করে নিলেন, সেদিনও এই মানুষটি কিছু বলেননি। তারপর দিন গেছে, রাত গেছে, কৌরবসভায় সেই চরম অপমানের দিন এসেছে, অর্জুন কিছুই বলেননি, কেননা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সত্যবদ্ধ এবং তিনি যদি কোনও উচ্চবাচ্য না করেন অর্জুনও করবেন না, কারণ ইনি 'ভ্রাতা চ শিষ্যশ্চ যুধিষ্ঠিরস্য'। এই ব্যবহার বোধহয় দ্রৌপদীর ভাল লাগেনি, এমনকী ভীম যখন যুধিষ্ঠিরের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে রুখে ওঠেন, তখন তাঁকেও শান্ত করে দেন এই অর্জুন। দ্রৌপদীর চোখে তিনি তাই যুধিষ্ঠিরের ভাই এবং ভাবশিষ্য।

জয়দ্রথের সেনাবাহিনী এবং পঞ্চপাণ্ডবের যুদ্ধ বাধল। প্রথমেই যাকে নির্ভীক ভাবে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা গেল— তিনি ভীম। অবশ্য স্ত্রীরক্ষার জন্য এখানে যুধিষ্ঠির থেকে সহদেব সবাই যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু যে মুহূর্তে জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে ছেড়ে বনের মধ্যে পালালেন এবং যে মুহূর্তে ভীম তা জানতে পারলেন, সেই মুহূর্তেই ধর্মরাজকে তিনি বললেন— সবাইকে নিয়ে আপনি কুটিরে ফিরে যান এবং দ্রৌপদীকে দেখা-শোনা করুন। জয়দ্রথকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি দেখছি, তার আজকে বেঁচে ফেরা কঠিন। যুধিষ্ঠির জানেন তাঁর অনুপস্থিতিতে জয়দ্রথ যদি ভীমের হাতে পড়ে, তা হলে দলাপাকানো মাংসপিণ্ড ছাড়া জয়দ্রথকে আর চেনা যাবে না। যুধিষ্ঠির অনুনয় করে বললেন— ভগিনী দুঃশলা বিধবা হবে, জননী গান্ধারীর একমাত্র কন্যা বিধবা হবে। এই দুঃশলা আর গান্ধারীর কথা মনে রেখে অন্তত তাকে প্রাণে মেরো না— দুঃশলামভিসংস্মৃত্য গান্ধারীঞ্চ যশস্বিনীম্।

দ্রৌপদী প্রথমেই ব্যাকুল হয়ে ডেকে উঠলেন ভীমকে— ভীমম্ উবাচ ব্যাকুলেন্দ্রিয়া। তারপর দেখলেন অর্জুনের মতো সম্মানিত পুরুষও সেখানে দাঁড়িয়ে। তখন দু'জনকেই যেন উদ্দেশ করে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথার প্রতিবাদ জানালেন দ্রৌপদী। তিনি বললেন— যদি আমার ভাল লাগার কথা বল, তা হলে মানুষের অধম সেই জয়দ্রথকে কিন্তু মারাই উচিত— কর্ত্তব্যং চেৎ প্রিয়ং মহ্যং বধ্যঃ স পুরুষাধমঃ। জনান্তিকে বলি— 'আমার ভাল লাগবে' এই কথাটা কিন্তু অবশ্যই ভীমের উদ্দেশে, কারণ তিনিই এ-ব্যাপারে একমাত্র উদ্যোগী ছিলেন এবং দ্রৌপদীর ভাল লাগার মূল্যও তিনিই সবচেয়ে বেশি দেন। সেইজন্যেই বুঝি ভীমকে তিনি প্রথমে বলতে আরম্ভ করেছিলেন। দ্রৌপদী বললেন— যে পরের বউ চুরি করে এবং যে রাজ্য চুরি করে সেই অপরাধী বারবার যাচনা করলেও তাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

আমার ধারণা, এই রাজ্য চুরির কথাটা যে হঠাৎ দ্রৌপদীর মুখে এল, তা এমনি এমনি নয়। ব্যাস এই মুহূর্তে দ্রৌপদীর বিশেষণ দিয়েছেন 'কুপিতা, হ্রীমতী, প্রাজ্ঞা'। প্রাজ্ঞা দ্রৌপদী এ-কথাটা অর্জুনের উদ্দেশে আকাশে উড়িয়ে দিয়েছেন। ভাবটা এই— যারা রাজ্য চুরি করেছে তাদের তো ছেড়েই দিয়েছ, এখন বউ-চুরির ব্যাপারে কী কর দেখি— পুরুষ মানুষেরা তো এই দুটি বস্তুকেই জমি বলে ভাবে। ভীম-অর্জুন ঝড়ের বেগে গিয়ে জয়দ্রথকে ধরে ফেললেন এক ক্রোশের মাথায়। তিনি তখন বনের পথে পালাচ্ছেন। অর্জুন নায়কের মতো বললেন— এই ক্ষমতায় পরের বউ চুরি করতে আস? পালিয়ে যেয়ো না, ফিরে এসো বলছি। কিন্তু জয়দ্রথ কি আর সেখানে থাকে! এবারে ভীম হঠাৎ করে ছুট লাগালেন জয়দ্রথের পেছনে— দাঁড়া ব্যাটা, যাচ্ছিস কোথায়— তিষ্ঠ তিষ্ঠ। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মরাজের শিষ্য বিবেকরূপী অর্জুন চেঁচিয়ে বললেন— প্রাণে মেরো না ভাই— মা ব্যধীরিতি।

ভীম প্রথমেই জয়দ্রথের চুলের মুঠি ধরে তার মুখটা একটু বনের মাটিতে ঘষে নিলেন। তারপর দু'-চার ঘা চড়ালেন মাথায়। তারপরের ব্যাপারটা অনেকটা হিন্দি সিনেমার মতো। খলনায়ক মাটিতে পড়ে গেছে, আর নায়ক বলছে 'উঠ্ উঠ্', তারপর আবার মার। তেমনি জয়দ্রথ যেই একটু সামাল দিয়ে মাটি থেকে উঠতে চায়— পুনঃ সঞ্জীবমানস্য তস্যোৎপতিতুমিচ্ছতঃ— অমনি ভীমের লাথি। এবার থামালেন অর্জুন। কিন্তু ভীম কি থামতে চান! তিনি অর্জুনের তূণ থেকে একখানি আধা-চাঁদের মতো বাণ দিয়ে জয়দ্রথের মাথাটা পাঁচ জায়গায় চেঁছে নিলেন, তারপর তাকে নিয়ে এলেন সেই বনের কুটিরে, যেখানে দ্রৌপদী আছেন, যুধিষ্ঠির আছেন। যুধিষ্ঠির জয়দ্রথের অবস্থা দেখে বললেন— এবার ছেড়ে দাও ভাই— মুচ্যতামিতি চাব্রবীৎ।

দ্রৌপদী জয়দ্রথকে অর্জুনের পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন— ভ্রাতা চ শিষ্যশ্চ যুধিষ্ঠিরস্য—

ইনি যুধিষ্ঠিরের শিষ্য অর্জুন। জয়দ্রথের ঝুঁটি-ধরা মানুষটি যদি সেই অর্জুন হতেন, তা হলে যুধিষ্ঠিরের কথা মুখ দিয়ে বেরনো মাত্রেই তিনি মুক্ত হতেন। কিন্তু ইনি তো অর্জুন নন, ভীম। কাজেই যুধিষ্ঠিরের কথায় কাজ হল না। কৌরবের রাজসভায় দ্যূতক্রীড়ায়, এবং দুঃশাসনের হাতে দ্রৌপদীর যে অপমান হয়েছিল, তার সমমর্মী যুধিষ্ঠিরও নন, অর্জুনও নন। তার ওপরেও জয়দ্রথকে ধরতে যাবার আগে দ্রৌপদী যে ভীমকেই প্রথম ডেকে উচ্চ স্বরে বলেছিলেন— যদি আমার ভাল লাগার কথা বল— কর্ত্তব্যং চেৎ প্রিয়ং মহ্যং বধ্যঃ স পুরুষাধমঃ— তা হলে জয়দ্রথকে শেষ করে দেবে। সবার মধ্যে দ্রৌপদীর এই আকুল আবেদন ভীম ভুলে যাবেন কী করে? হন না তিনি ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। ভীম সোজা বললেন— আপনার কথায় ছাড়ব না, আপনি দ্রৌপদীকে বলুন— রাজানং চাব্রবীদ্ ভীমো দ্রৌপদ্যাঃ কথ্যতামিতি। যুধিষ্ঠিরের কথা মিথ্যে হয়ে যায়। তাঁর কাতর অবস্থা দেখে দ্রৌপদীর বুঝি মায়া হল। জয়দ্রথের ওপরে যতখানি, তার চেয়েও বেশি বোধহয় যুধিষ্ঠিরের ওপর। হাজার হোক জ্যেষ্ঠ স্বামী বটে, যুধিষ্ঠিরের মুখ চেয়েই— অভিপ্রেক্ষ্য যুধিষ্ঠিরম্— দ্রৌপদী বললেন— যাক এর মাথাটা তো কামিয়ে নিয়েছ, এবার এটা পাণ্ডবদের দাস হয়ে গেছে, একে এবার ছেড়েই দাও। ছাড়া পেল দুর্যোধনের ভগ্নীপতি জয়দ্রথ। দ্রৌপদী আবার চিনলেন ভীম, অর্জুন এবং যুধিষ্ঠিরকেও।

৫

বারো বছর বনের পথে চলে-ফিরে পুরো এক বছর অজ্ঞাতবাসের সময় হয়ে গেল। ভীম তো সেই কবেই যুধিষ্ঠিরকে শাসিয়ে রেখেছেন— অজ্ঞাতবাসে দ্রৌপদীর এই আগুনপানা রূপ আপনি লুকিয়ে রাখবেন কী করে— বিশ্রুতা কথম্ অজ্ঞাতা কৃষ্ণা পার্থ চরিষ্যতি। কিন্তু বনের ফল আর মধু-খাওয়া গতানুগতিক মুখে অজ্ঞাতবাসের নতুনত্ব সব পাণ্ডবদের মুখেই বোধ হয় তেঁতুলের চাটনির কাজ করল, দ্রৌপদীর তো বিশেষত। যুধিষ্ঠির, ভীম— সবাই একে একে 'আমি এই সাজব', 'আমি সেই সাজব'— এমনি করে নতুন ঘরের কল্পলোক তৈরি করলেন। এখানে দ্রৌপদীও পেছিয়ে থাকবেন কেন! যুধিষ্ঠির অবশ্য বিরাট রাজার সঙ্গে আবার নতুন করে পাশার ছক পাতার গন্ধে দ্রৌপদীর বনবাসের কষ্টটা ভুলেই গেছিলেন। তিনি বেশ কর্তাঠাকুরের মতো বললেন— আমরা সবাই তো এটা-ওটা করব ঠিক করলাম, কিন্তু দ্রৌপদী তো অন্য বউদের মতো কাজকর্ম তেমন কিছু জানে না— ন হি কিঞ্চিদ্ বিজানাতি কর্ম কর্ত্তুং যথা স্ত্রিয়ঃ। ছোটবেলা থেকে যখন যেখানে গেছেন, দ্রৌপদী তো গয়না, কাপড়, এসেন্স আর বেণীতে ফুল গোঁজা ছাড়া আর কিছু জানেন না— মাল্যগন্ধান্ অলংকারাণ্ বস্ত্রাণি বিবিধানি চ। এতান্যেবাভিজানাতি যতো যাতা হি ভাবিনী ॥ বিরাট রাজার ঘরে ইনি কি কিছু করতে পারবেন?

কী-ই বা বলার আছে! জ্যেষ্ঠ স্বামী, বড় মুখ করে বলছেন। দ্রৌপদী আর কী-ই বা বলেন! হ্যাঁ বনবাসের কৃচ্ছ্রতার মধ্যেও প্রথম দিকটায় দ্রৌপদীর দাস-দাসী প্রচুর ছিল, পরে তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল দ্বারকায়, কিন্তু তাই বলে দিন রাত শাড়ি-গয়নার চিন্তা করার মতো অবিদগ্ধা নন দ্রৌপদী। হয়তো তাঁর মনে পড়ল— বিয়ের নববধূকে পাণ্ডবেরা কুমোরশালায় পরের বাড়িতে এনে তুলেছিলেন। হয়তো মনে পড়ল— সুখের মুখ দেখেছিলাম দু'দিন বই তো নয়— সেই খাণ্ডবপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞের পরে। তারপরেই তো আবার পাশার আসর বসল আর কপালে জুটল বারো বছরের বনবাস, এক বছরের অজ্ঞাতবাস। তবু দ্রৌপদী এসব কথায় কথা বাড়ালেন না। বরঞ্চ অজ্ঞাতবাসের নতুন সাজের কথায় যেন বেশ মজাই পেয়েছেন, এমনি মেজাজে বললেন— লোকে তো ঘরে শিল্পকর্মের জন্য দাসী রাখে, যদিও ভদ্রঘরের মেয়ে-বউরা সে কাজ করেন না— একথা সবাই জানে— ইতি লোকস্য নিশ্চয়ঃ। আমি বিরাটরাজার রানির বাড়িতে সৈরন্ধ্রীর কাজ করব, তাঁর চুল বাঁধব, তাঁকে সাজিয়ে দেব।

দ্রৌপদী 'সৈরন্ধ্রী' কথাটার একটা বিশ্লেষণ করেছিলেন তাঁর বক্তব্যের প্রথম লাইনে। সৈরন্ধ্রীকে লোকে দাসীকর্মের জন্য রাখে এবং যে রাখে সে তাকে পালন করে। টীকাকার নীলকণ্ঠ দেখিয়েছেন— সৈরন্ধ্রী পরের ঘরে থাকে, কিন্তু সে স্বাধীনও বটে। সে দাসী হলেও খানিকটা অরক্ষিতা অর্থাৎ কিনা স্ত্রী-পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে গৃহকর্তার যে দায়িত্ব থাকে, দাসীর ব্যাপারে তা থাকে না। আবার এই দাসীর চাকরিটা যেহেতু দাসীর নিজের হাতেই, তাই সে খানিকটা স্বাধীনও বটে অর্থাৎ তার অরক্ষণের ভাগ দিয়ে যদি কোনও বিপদ আসে, তা হলে সে চাকরি ছেড়েও দিতে পারে। কিন্তু মজা হল কাজের লোক যদি অতি সুন্দরী হয়, তবে তাকে নিয়ে গৃহকর্ত্রীর বিপদ আছে, বিশেষত সেকালের পুরুষ মানুষের কাছে মা আর বোন ছাড়া আর সবাই বুঝি গম্যা ছিলেন। যা হোক সবাই যখন নানা বেশে নানান ছাঁদে বিরাট রাজ্যে ঢুকে নিজের নিজের কাজ বাগিয়ে নিলেন তখন দ্রৌপদীও কাজের লোকের মতো একটি ময়লা কাপড় পরে নিলেন। কিন্তু ময়লা কাপড় পড়লে কি হয়, তিনি যেহেতু বড় ঘরে চুল বাঁধার কাজ করবেন, তাই নিজের চুলেই যত পারেন বেশ খানিকটা কায়দা করে নিলেন। শুধু এপাশের চুল ওপাশে নিয়ে ক্ষান্ত হলেন না, কালো চুলে চিক্কন-মৃদু, দীর্ঘ-হ্রস্ব গ্রন্থি তুলে বড় বাহারি সাজে সাজলেন দ্রৌপদী। 'অ্যাডভারটাইজমেন্ট'।

ময়লা কাপড়ের মধ্যে থেকে যে আগুনপানা রূপ চোখে পড়ছিল, আর কথাবার্তায় ধরা পড়ে যাচ্ছিল এমনি বিদগ্ধতা যে, বিরাট নগরের স্ত্রী-পুরুষ কেউই বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, পেটের দায়ে দ্রৌপদী খেটে খেতে এসেছেন— ন শ্রদ্দধত তাং দাসীম্ অন্নেহেতোরুপস্থিতাম্। বিরাটরাজার রানি সুদেষ্ণা পঞ্জাব-ঘেঁষা কাশ্মীর অঞ্চলের মেয়ে। ছাদের আলসে থেকে অমন আলো-ছড়ানো রূপ দেখে তিনি দ্রৌপদীকে ডেকে আনলেন। বললেন, "কে গো তুমি মেয়ে, কী চাও?" "কাজ চাই, যে কাজে লাগাবে, তার বাড়িতেই থাকব"— দ্রৌপদী বললেন। সুদেষ্ণা বললেন— এই কি কাজের লোকের চেহারা— নৈবংরূপা ভবন্ত্যেব যথা বদসি ভাবিনি? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি নিজেই মাল্‌কিন। নইলে এমন চেহারা, হাত, পা, নাভি, নাক, চোখ— সবই সুন্দর— সুকেশী সুস্তনী শ্যামা পীনশ্রোণিপয়োধরা। কথা বলার ঢঙও তো একেবারে হাঁসের মতো— হংসগদগদভাষিণী।

এক কথায় তুমি হলে দারুণ 'স্মার্ট', যেন কাশ্মীরি ঘোড়া— কাশ্মীরীব তুরঙ্গমী— আর লক্ষ্মীর মতো রূপ তোমার।

সুদেষ্ণা দ্রৌপদীর তুলনায় উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, সবাইকেই স্মরণ করলেন। দ্রৌপদী সলজ্জে বললেন— ওসব কিছুই নয়, নাস্মি দেবী ন গন্ধর্বী। আমি সৈরন্ধ্রী, খোঁপা বাঁধার কাজটি জানি ভাল, কুমকুম-চন্দনের অঙ্গরাগ তৈরি করি আর চাঁপা-মল্লিকার বিচিত্র মালা গাঁথতে পারি। ঘুরে ঘুরে বেড়াই, যেখানে যেখানে ভাল খাওয়া-পরা পাই— বাসাংসি যাবচ্চ লভে লভমানা সুভোজনম্— সেখানে সেখানেই আমি থাকি। সুদেষ্ণা বললেন— তোমাকে মাথায় করে রাখতে পারি— মূর্ধ্নি ত্বাং বাসয়েয়ং, কিন্তু ভয় হয়, স্বয়ং রাজা যদি তোমার রূপ দেখে তোমার প্রেমে পড়ে যান। দেখ না, রাজকুলের মেয়েরাই তোমাকে কেমন ড্যাব ড্যাব করে দেখছে, সেখানে পুরুষমানুষের বিশ্বাস আছে— পুমাংসং কং ন মোহয়ে— তারা তো মোহিত হবেই। এখন যদি বিরাট রাজা তোমার রূপ দেখে আমাকে ছেড়ে তোমাকে ধরেন— বিহায় মাং বরারোহে গচ্ছেৎ সর্বেণ চেতসা! না, না, বাপু, তুমি এস, যেই তোমাকে দেখবে, তারই মাথা পাগল হবে, প্রেমে নয়, কামেই। তোমার মতো মেয়েমানুষকে ঘরে ঠাঁই দেওয়া আর গাছের চুড়োয় উঠে আত্মহত্যা করা সমান।

দ্রৌপদী বললেন— কি বিরাট রাজা, কি আর কেউ, অন্য কোনও পুরুষ আমার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারবে না। আমার পাঁচটি গন্ধর্ব স্বামী আছে, তাঁরা আড়াল থেকে অদৃশ্যভাবেই আমাকে রক্ষা করেন। শুধু একটা শর্ত— আমাকে উচ্ছিষ্ট খেতে দেবেন না অথবা কাউকে পা ধুইয়ে দিতে বলবেন না। এতেই আমার স্বামীরা সন্তুষ্ট। আমার রূপ দেখে কোনও পুরুষ যদি আমার পেছনে ছোঁক ছোঁক করে— যো হি মাং পুরুষো গৃধ্যেৎ— তাকে পরপারে যেতে হবে সেই রাত্রেই। অতএব আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমাকে সতীধর্ম থেকে টলানো অত সস্তা নয়, আমার অদৃশ্য স্বামীরা আছেন না! দ্রৌপদীর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে বিরাটরানি সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে প্রধান পরিচারিকার স্থান দিলেন।

পঞ্চ গন্ধর্ব স্বামীর মধ্যে প্রধানত যাঁর ভরসায় দ্রৌপদী এত কথা বললেন, সেই মধ্যম পাণ্ডব ভীম কিন্তু বিরাটের পাকশালায় রাঁধার কাজে ব্যস্ত। ভাল খাইয়ে বলে ভীমের নাম ছিল, কাজেই রন্ধনশালায় ভীমের দিন খারাপ কাটছিল না। মাঝে মাঝে রাজার সামনে কুস্তির লড়াইতেও অংশ নিচ্ছিলেন তিনি। দ্রৌপদীরই একটু কষ্ট হচ্ছিল বুঝি, একমাত্র যুধিষ্ঠির ছাড়া আর সবারই পরিশ্রমের কাজ, সবাই রাজাকে কাজ দেখিয়ে তোষানোর চেষ্টা করছেন। দেওরপানা নরম স্বামী নকুল-সহদেবের গোরু-ঘোড়ার তদারকি দ্রৌপদীর স্ত্রীহৃদয়ে মমতা জাগাচ্ছিল। আবার ধরুন ভারতের 'চিফ অব দ্য আর্মি-স্টাফ'-কে যদি রবীন্দ্রভারতীর কলা বিভাগে কুচিপুরি শেখাতে হয়, তা হলে তার বউয়ের যে মর্মপীড়া হয়, বৃহন্নলাবেশী অর্জুনকে দেখে দ্রৌপদীর সেই পীড়াই হচ্ছিল— নাতিপ্রীতিমতী রাজন্।

যাই হোক সুখে দুঃখে দশ মাস কেটে গেল। দ্রৌপদী সুদেষ্ণার চুল বেঁধে, মালা গেঁথে ভালই দিন গুজরান করছিলেন। অজ্ঞাতবাসের পাট প্রায় চুকে এসেছে, এমনি এক দিনে সুদেষ্ণার ভাই কীচক এলেন বোনের খবর নিতে। তখনকার দিনে শালাবাবুদের খাতির ছিল এখনকার দিনের মতোই। বিশেষত সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে রাজার শালার একটি বিশেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুনাম আছে। আলংকারিকেরা দেখিয়েছেন, রাজার শালা মানেই সে অকালকুষ্মাণ্ড, কিন্তু শুধু রাজার শালা বলেই শাসন-বিভাগে তার ভাল কাজ জোটে এবং সেই জোরে সে নানা কুকর্ম করে বেড়ায়। এই নিয়মে বিরাটের শালাও কিছু ব্যতিক্রম নন। বোনের পাশে সুন্দরী দ্রৌপদীকে দেখেই তিনি বেশ তপ্ত হয়ে উঠলেন। সুদেষ্ণাকে বললেন— কে বটে এই মেয়েটা, আগে তো দেখিনি! এ যে একেবারে ফেনানো মদের মতো, আমাকে মাতাল করে তুলছে। কীচক বলল— তুমি একে দিয়ে দাসী-কর্ম করাচ্ছ, এই কি এর কাজ? এ হবে আমার ঘরের শোভা, আমার যা আছে তা সব দেব একে। কীচক আর অপেক্ষা করল না, অধৈর্য হয়ে সোজা দ্রৌপদীকেই সে কাম নিবেদন করল। কীচক প্রেম নিবেদন জানে না, তাই তার কথাই শুরু হল দ্রৌপদীর প্রত্যঙ্গ-প্রশংসায়। তার মধ্যেও আবার স্তন-জঘনের প্রশংসাই বেশি, এই জায়গাগুলোতে হার অলংকার না থাকায় রাজার শালা সেগুলো গড়িয়ে দেবার দায়িত্ব অনুভব করে। বারবার সে তার উন্মত্ত কামতপ্ত ভাব সোজাসুজি জানাতে থাকে। পাঁচ ছেলের মা এবং অন্তত আঠারো বছর বিবাহিত জীবন-কাটানো দ্রৌপদী কীচকের কাছে কাঁচা বয়েসের তিলোত্তমা— ইদঞ্চ রূপং প্রথমঞ্চ তে বয়ঃ। হয়তো শরীরের বাঁধন দ্রৌপদীর তেমনি ছিল এবং সেই কারণেই কীচক দ্রৌপদীর কাছে প্রতিজ্ঞা করে বসল— আমার পুরনো সব বউগুলোকে আমি ঘর থেকে বিদায় করে দেব, নয়তো তারা তোমরা দাসী হবে— ত্যজামি দারান্ মম যে পুরাতনাঃ/ ভবন্তু দাস্যস্তব চারুহাসিনি। এমনকী আমাকেও তুমি যা বলবে তাই করব, আমিও তোমার দাস।

জয়দ্রথের অভিজ্ঞতায় দ্রৌপদী আর কথা বাড়ালেন না। নিজের প্রতি ঘৃণা জাগানোর জন্য দ্রৌপদী কীচককে বললেন— খুব খারাপ ঘরে আমার জন্ম, তা ছাড়া আমি অন্যের বউ। তোমার এই দুর্বুদ্ধি ত্যাগ কর। এসব সাধুভাষায় কি আর কামুককে ভোলানো যায়! নানা অকথা-কুকথায় দ্রৌপদীর কান ভরিয়ে কীচক বললেন— আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে দারুণ বোকামি করবে তুমি, পরে তোমায় কাঁদতে হবে— পশ্চাত্তাপং গমিষ্যসি। তারপর, ক্ষমতা পেলে জামাইবাবুর করুণায় চাকরি-পাওয়া শালাবাবুদের যে অবস্থা হয় আর কি! কীচক বললেন— জান, আমি এ সমস্ত রাজ্যের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। বিরাটরাজার কথা একটুও না ভেবে কীচক জানালেন যে, সেই সবার আশ্রয়দাতা— প্রভুর্বাসয়িতা চাস্মি— তার সমান বীরও কেউ নেই। দ্রৌপদী এবার তাঁর অদৃশ্য পঞ্চস্বামীর কথা শুনিয়ে কীচককে একটু ভয় দেখাতে চাইলেন, নিজেও খানিকটা রেগে গিয়ে বললেন— তোমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। মায়ের কোলে শুয়ে বাচ্চা ছেলে যেমন চাঁদ ধরতে চায়, তোমার অবস্থাও সেইরকমই কীচক— কিং মাতুরঙ্কে শয়িতো যথা শিশুশ্চন্দ্রং জিঘৃক্ষুরিব মন্যসে হি মাম্।

কীচক গরবিনী বধূকে আর ঘাঁটালেন না, কিন্তু বোনটিকে সকাতরে বলে এলেন— যেমন করে পার তোমার পরিচারিকার মন আমার দিকে ভজিয়ে দাও— যেনোপায়েন সৈরন্ধ্রী ভজেন্মাং গজগামিনী। অতি প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে বোনেদের যে অবস্থা হয়, বিরাটরানি কীচককে বললেন— একটা ভাল পরব দেখে তুমি অনেক কিসিমের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কর, মদের ব্যবস্থাও রাখবে। সেই দিন, আমি তোমার ঘর থেকে সুরা নিয়ে আসবার ছলে সৈরন্ধ্রীকে পাঠিয়ে দেব। নির্জন ঘরে, বিনা বাধায়— বিজনে নিরবগ্রহে— তাকে

বোঝাবার চেষ্টা কোরো, তবে যদি তোমার দিকে মন ফেরে— স্বাস্থ্যমানা রমেৎ যদি। সুদেষ্ণার 'প্ল্যান' মতো একদিন মাংস-ব্যঞ্জন অনেক রান্না হল, ব্যবস্থা হল উত্তম সুরার। কীচক খবর পাঠালেন সুদেষ্ণাকে, আর অমনি তিনি দ্রৌপদীকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, বড় সুরার তিয়াস লেগেছে সৈরন্ধ্রী, তুমি একবার কীচকের ঘরে যাও, সেখান থেকে মদ নিয়ে এসো।

দ্রৌপদী সব বুঝলেন, সুদেষ্ণার উদ্দেশ্য এবং কীচকের উদ্দেশ্য— সব বুঝলেন। দ্রৌপদী বললেন— আমি যাব না রানি, তুমি বেশ ভালই জান তোমার ভাই লোকটা কীরকম বেহায়া— যথ স নিরপত্রপঃ। আমাকে দেখলেই সে উলটোপালটা বলবে, অশোভন ব্যবহার করবে। আমি যাব না রানি, তুমি অন্য কাউকে পাঠাও— অন্যাং প্রেষয় ভদ্রং তে স হি মাম্ অবমংস্যতে। সুদেষ্ণা বললেন— আমি পাঠাচ্ছি জানলে সে তোমায় অপমান করতে পারে না। উত্তরের অপেক্ষা না করে সুদেষ্ণা পানপাত্রখানি দ্রৌপদীর হাতে ধরিয়ে দিলেন। দ্রৌপদী চললেন। এই প্রথমবার বুঝি পঞ্চস্বামিগর্বিতা পাণ্ডববধূ ভয় পেলেন। প্রশস্ত রাজপথে যেতে যেতে তাঁর কান্না পেল। কী হবে কী হবে— সা শঙ্কমানা রুদতী। পাঁচ-পাঁচটা জোয়ান স্বামী থাকতেও এই মুহূর্তে দ্রৌপদীর অবস্থা— যা হয় হবে— দৈবং শরণমীয়ুষী। ভীতা ত্রস্তা হরিণী কীচকের ঘরে উপস্থিত হল। আর অগাধ কামসাগরের পারে দাঁড়িয়ে কীচকের মনে হল— এই বুঝি তার তাপ-তরঙ্গের নৌকা— নাবং লব্ধেব পারগঃ। কীচক লাফ দিয়ে উঠলেন।

প্রথমে তো বৈষ্ণব পদাবলীর ভঙ্গিতে— আজু রজনী হম ভাগে পোহায়নু— সুব্যুষ্টা রজনী মম— ইত্যাদি আবাহন চলল কীচকের দিক থেকে। দ্বিতীয় দফায় চলল মণি-রত্ন আর বেনারসির লোভ দেখানো। পরিশেষে বিছানাটা দেখিয়ে কীচক বললেন— এসব তোমার জন্য, এসো, বসে বসে একটু সুরাপান কর— পিবস্ব মধুমাধবীম্। দ্রৌপদী বললেন— রানি সুরা পিপাসায় কাতর, তিনি সুরা চেয়েছেন। বলেছেন— সুরা নিয়ে এসো। আমার তাড়া আছে। কীচক এবার দ্রৌপদীর ডানহাতটি ধরলেন চেপে, তারপরেই আঁচলখানি। পাঠক জানেন, আঁচলে টান পড়লেই দ্রৌপদীর কিঞ্চিৎ 'অ্যালার্জি' হয়, দুঃশাসন, জয়দ্রথের কথা মনে পড়ে। তা দ্রৌপদী প্রথমে জয়দ্রথকে দেওয়া প্রথম ওষুধটি প্রয়োগ করলেন— ধাক্কা, জোর একখানা ধাক্কা। কীচক মাটিতে পড়ে গেলেন এবং সেই অবসরে দ্রৌপদী বিরাটের রাজসভায় উপস্থিত। কিন্তু কীচকই বা ছাড়বেন কেন, তিনি রাজার শালা, প্রশ্রয় পেয়ে মাথায় উঠেছেন, রাজা কিংবা রাজসভাকেই বা তাঁর ভয় কীসের? তিনিও উপস্থিত হলেন বিরাটের রাজসভায় এবং সবার সামনে দ্রৌপদীকে উলটো লাথি কষালেন।

রাজসভা থেকে রান্নাঘর আর কতদূর। রাজাকেও পান-ভোজন মাঝে মাঝেই জোগাতে হয়। কাজেই সেই ছলে ভীমও ততক্ষণে রাজসভায় উপস্থিত। দ্রৌপদীর অপমান দেখে ভীমের দাঁত কড়মড়ি আরম্ভ হল, ঘাম ঝরতে থাকল আর বারবার উঠব কি উঠব না— এই ভঙ্গিতে বসে থাকলেন। যুধিষ্ঠির দেখলেন মহা বিপদ, ভীম একটা মারামারি বাধিয়ে দিলে লোক জানাজানি হয়ে যাবে, তখন আবার বারো বছর বনে কাটাও। কোনও মতে তিনি ভীমকে আঙুলের খোঁচা মেরে মেরে বাইরে পাঠালেন। দ্রৌপদী আগুন চোখে বিরাটরাজাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন দগ্ধ করে দিলেন। প্রথমে তো দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে উদ্দেশ করে তাঁর অলক্ষ্য স্বামীদের খানিকটা অবোধ্য গালাগালি দিয়ে বিরাটকে বললেন— তুমি রাজা না দস্যু। নইলে তোমার সামনে নিরপরাধিনীর অপমান দেখেও চুপ করে বসে আছ— দস্যূনামিব ধর্মস্তে ন হি সংসদি শোভতে। অথবা কী-ই বা বলব, যেমন এই কীচক, তেমনি এ-দেশের রাজা, আর তেমনি তোমার মোসাহেব সভাসদেরা (শেষ টিপ্পনীটির অন্তরে যুধিষ্ঠিরও আছেন)।

বিরাট কিছুই জানতেন না, কী ব্যাপার, কেন এই মারামারি, কিছুই জানতেন না। সভাসদেরা সব খবর নিলেন এবং তাঁরা কীচকের বিরুদ্ধে একটা নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করে দ্রৌপদীকে খুব প্রশংসা করলেন। যুধিষ্ঠিরের আর সহ্য হচ্ছিল না। সবার সামনে কুলবধূর হেনস্থা, সভাসদদের খবরাখবর নেওয়া, বিচার, প্রস্তাব— এত সব কসরত যুধিষ্ঠিরের আর সহ্য হচ্ছিল না। রাগে যুধিষ্ঠির ঘামতে থাকলেন। এতটা সময় সভায় থেকে দ্রৌপদীও বুঝলেন— তিনি কিঞ্চিৎ কাঁচা কাজ করেছেন। যুধিষ্ঠির বললেন— তুমি সুদেষ্ণার ঘরে যাও সৈরন্ধ্রী। যে স্বামীদের কথা তুমি বললে, বোঝা যাচ্ছে, তাদের রাগ দেখাবার সময় এখনও আসেনি। তুমি সময় বোঝ না, সৈরন্ধ্রী, শুধু এই রাজসভায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাটুকে মেয়েদের মতো কাঁদছ। রাজসভায় তরল জলে মাছের মতো সভাসদেরা যে খেলা করে, এ কান্না তাদের স্পর্শ করে না, শুধু খেলার বিঘ্ন ঘটায় মাত্র— অকালজ্ঞাসি সৈরন্ধ্রি শৈলূষীব বিরোদিষি। বিঘ্নং করোষি মৎস্যানাং দীব্যতাং রাজসংসদি। তুমি যাও, তোমার গন্ধর্ব স্বামীরা নিশ্চয়ই এই অপমানের বিহিত করবেন।

দ্রৌপদী সুদেষ্ণার কাছে ফিরে গেলেন। চুল খোলা, চোখ লাল, রাজরানি দ্রৌপদীর মুখে সব শুনে দ্রৌপদীকে কথা দিলেন যে, তিনি কীচকের বিষয়ে ব্যবস্থা নেবেন। দ্রৌপদী বললেন— তার আর দরকার হবে না, যাঁদের ব্যবস্থা নেবার কথা, তাঁরাই নেবেন। রাজসভায় দ্রৌপদীকে পদাঘাতে ভূলুণ্ঠিতা দেখেছেন ভীম, অন্য কেউ নন। এ-কথা দ্রৌপদীর মনে ছিল, অতএব সুদেষ্ণাকে উত্তর দিতে দেরি হয়নি দ্রৌপদীর।

অপমানে মানুষের যা হয়, মনে মনে শালা, রাজার শালাকে মেরেই ফেলতে চাইলেন দ্রৌপদী— বধং কৃষ্ণা পরীপ্সন্তী। মাথা ঠান্ডা করার জন্য শীতল জলে গা ধুলেন, উত্তমাঙ্গ এবং অধমাঙ্গের বসন দুটিতে কীচকের পায়ের ধুলো, মাটির ধুলো লেগেছে, সেগুলি ধুয়ে নিলেন। বাইরে রাত নেমে আসছে। সুদেষ্ণাকে এই একটু আগেই দ্রৌপদী বলেছেন— আজকের রাত্রিই তোমার ভাইয়ের কালরাত্রি না হয়— মন্যে চাদ্যৈব সুব্যক্তং পরলোকং গমিষ্যতি।

ধুর! গা ধুলে আর কাপড় ধুয়ে ফেললেই কি আর রাগ যায়? দ্রৌপদীর কিছুতেই আর স্বস্তি হচ্ছে না। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ওপর তাঁর কোনও বিশ্বাস নেই। তিনি বলেছেন এখনও তোমার গন্ধর্ব স্বামীদের ক্রোধ করার সময় আসেনি। দ্রৌপদীর মনের ভাব— তোমার কোনওদিনই সময় আসবে না। এখন কী করি, কোথায় যাই, আমার ভবিষ্যতের পথটাই বা কী হওয়া উচিত— কিং করোমি, ক্ব গচ্ছামি, কথং কার্যং ভবেন্মম। রাতের আঁধার গভীরতর হয়ে আসছে। দ্রৌপদীর মনের মধ্যে বিদ্যুৎশিখার মতো ঝলক দিয়ে উঠল একটি নাম— ভীমসেন— ভীমং বৈ মনসাগমৎ। দ্রৌপদী জানেন ভীমের ব্যাপারে তাঁর ভালবাসায় ফাঁকি

আছে। কিন্তু তিনি এও জানেন যে, ভীমের ভালবাসায় কোনও ফাঁকি নেই। অন্তত দ্রৌপদী যা চান এবং যেমন করে চান তা একমাত্র সাধন করতে পারেন ভীম। যুধিষ্ঠিরের মনোভাব তিনি পূর্বাহ্নেই জানেন, আর অর্জুনকে বললে তিনি ধর্মরাজের সঙ্গে কোনও কথা না বলে দ্রৌপদীর কথায় কাজ করবেন বলে মনে হয় না। কাজেই একমাত্র ভরসা ভীম। তিনি নির্বিচারে কারও কোনও অপেক্ষা না রেখেই দ্রৌপদীর যা ভাল লাগে তাই করবেন— নান্যং কশ্চিদ্ ঋতে ভীমান্মমাদ্য মনসঃ প্রিয়ম্— অতএব সেই সময়ে ভীমই তাঁর একমাত্র প্রিয় হয়ে উঠলেন (ব্যাসের এই পঙ্‌ক্তিটির মধ্যে দ্রৌপদীর ভালবাসার ফাঁকিটুকু ধরা পড়ে গেল)।

রাতের সুখশয়ন ছেড়ে স্তিমিতপ্রদীপ রজনীর আধছায়ায় অন্দর-মহলের বাইরে চলে এলেন দ্রৌপদী। সূপকার-কুলপতি ভীমের আবাস হবে রন্ধনশালার কাছেই, যেখানে বল্লব নামের ছদ্মবেশে নিজেকে মধ্যম-পাণ্ডবের গৌরব থেকে আড়াল করে রেখেছেন তিনি। দ্রৌপদী এক লহমায় ভীমের ঘরের সামনে পৌঁছলেন। ভেজানো দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতেই দ্রৌপদী বিড়বিড় করে বললেন— আমার মর্মশত্রু কীচক বেঁচে আছে, তবু তুমি ঘুমোচ্ছ কী করে— কথং নিদ্রাং নিষেবসে। দ্রৌপদী দেখলেন, তাঁর বিড়বিড়ানিতে ভীমের ঘুম ভাঙল না, বলবান সিংহ যেমন নির্ভয়ে নিদ্রা যায়, তেমনি ভীম ঘুমিয়েই আছেন। ব্যাস লিখেছেন দ্রৌপদীর অলোকসামান্য রূপে আর ভীমের প্রদীপ্ত তেজে সেই রন্ধনশালা যেন জ্বলে উঠল। আমি বলি, ভীমের আগুন-তেজে দ্রৌপদীর রূপের ঘি পড়ল। পাঁচ স্বামীর সহবাসিনী দ্রৌপদী দীর্ঘ দশ-এগারো মাস পরে মধ্যম-পাণ্ডবের সাহচর্য পেয়েছেন। মনে আছে অপমানের জ্বালা। ভীমকে কীভাবে কাবু করতে হবে তা তিনি জানেন।

দ্রৌপদী ভীমকে জাগালেন। কিন্তু যেভাবে জাগালেন তার মধ্যে মহাভারতকার দ্রৌপদীর প্রেমের ফাঁকিটুকু দেখিয়ে দিয়েছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহমশায় বিপদ ভেবে এই ফাঁকির শ্লোকের অনুবাদ করেননি, কিন্তু এই শ্লোক না হলে দ্রৌপদীর প্রেম-বিশ্লেষণ অসমাপ্ত থেকে যাবে। দ্রৌপদীর প্রেমের ফাঁকিটুকু আরও পরিষ্কার করে দেখিয়েছেন টীকাকার নীলকণ্ঠ। অতএব তাঁর সাহায্যও আমরা নেব। ব্যাস লিখেছেন— দ্রৌপদী প্রথমেই ভীমের কাছটিতে গা ঘেঁষে বসলেন, পাঞ্চালী দ্রৌপদী সর্বাংশে বরণীয় পতির কাছটিতে বসলেন— উপাতিষ্ঠত পাঞ্চালী। কেমন করে বসলেন? ব্যাস উপমা দিয়েছেন— পুষ্পবতী কামাতুরা রমণীর মতো। বাসিতেব— কামাতুরা রমণীর মতো। প্রকৃতপক্ষে তিনি কামাতুরা নন, নীলকণ্ঠ আরও ভেঙে বললেন— বস্তুতঃ ন কামাতুরা কিন্তু দ্বেষাতুরা এব। অর্থাৎ কিনা অন্তর্দাহ, প্রতিশোধ ইত্যাদি কারণেই ভীমকে পটাবার জন্য কামাতুরা রমণীর মতো দ্রৌপদী ভীমের গা ঘেঁষে বসলেন। ঠিক যেমনটি বন্য বকস্ত্রী প্রকৃতই কামাতুরা হয়ে বকের গা ঘেঁষে বসে থাকে, ঠিক যেমনটি তিন বছর বয়সের বকনা গোরু গরম হয়ে ষাঁড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে ঠিক তেমনই এক কামাতুরার ভাব নিয়ে দ্রৌপদী ভীমের কাছটি ঘেঁষে বসলেন— সর্বশ্বেতেব মাহেয়ী বনে জাতা ত্রিহায়ণী। উপাতিষ্ঠত পাঞ্চালী বাসিতেব বরর্ষভম্ ॥

শ্লোকটিতে 'বাসিতা' মানে পুষ্পিণী কামাতুরা নারী। 'ইব' শব্দটা উপমার্থক, যার মানে 'মতো'— কামাতুরা রমণীর মতো। এই 'মতো' শব্দটা 'সর্বশ্বেতা' অর্থাৎ বকীর সঙ্গেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগবে আবার গোরুর সঙ্গেও লাগবে। কাক যেমন দু'দিকে চোখ ঘুরাতে পারে, সেই রকম 'মতো' শব্দটা একবার বকীর সঙ্গে লাগবে, আবার গোরুর সঙ্গেও লাগবে। নীলকণ্ঠ লিখেছেন আভিধানিক অর্থে শ্বেতা মানে রাজহংসী। কিন্তু 'সর্ব' শব্দটা তো আর বোকার মতো ব্যবহার করেননি ব্যাস। কাজেই 'সর্বশ্বেতা' মানে বকী। আর সে যেহেতু বনে জাত, তাই কামাতুর হতে তার সময় লাগে না। আবার 'মাহেয়ী' মানেও গোরু, ত্রিহায়ণী মানেও গোরু। ব্যাস নিশ্চয়ই একই অর্থে দুটো শব্দ প্রয়োগ করেননি। ব্যাস বলতে চেয়েছেন— তিন বচ্ছর বয়সের গোরু— ত্রিহায়ণী। আমরা বলি— তাতে এমনকী হল? নীলকণ্ঠ উত্তর দিয়েছেন— ওই 'তিন বচ্ছরে'র বিশেষণটার মধ্যেই কামাতুরত্ব লুকিয়ে আছে, নইলে ওটি দ্রৌপদীর উপমা হবে কেন? নীলকণ্ঠ লিখেছেন— তিন বচ্ছর বয়েসের গোরু নাকি যৌবনবতী কামাতুরা হয়— ত্রিবর্ষা হি গৌঃ যৌবনারূঢ়া কামাতুরা চ ভবতি। তা আমাদের দ্রৌপদী যৌবনবতী গাভীর মতো, বন্য বকীর মতো কামাতুরা ভাব দেখিয়ে ভীমের কাছে বসলেন।

এই শ্লোকে দ্রৌপদীর প্রেমের ফাঁকিটুকু সাধ্যরণে যাতে সহজে না বোঝে, তাই ব্যাস পর পর কয়েকটি উপমা সাজিয়ে দিয়েছেন। গোমতী নদীর তীরে মহাপ্রাংশু শালগাছগুলিকে লতা যেমন জড়িয়ে ধরে তেমনি করে পাঞ্চালী ভীমকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলেন। মনের মধ্যে দ্বেষভাব নিয়ে আর বাইরে যেমন কামাতুর ভাবে তিনি ভীমের কাছে বসে ছিলেন, মনের মধ্যে সেই ভাব নিয়েই তিনি নিশ্চয়ই ভীমকে জড়িয়েও ধরলেন। প্রসুপ্ত মৃগরাজ সিংহকে সিংহবধূ যেমন জড়িয়ে ধরে, হাতিকে যেমন জড়িয়ে ধরে হাতির বউ, তেমনি দ্রৌপদী জড়িয়ে ধরলেন ভীমকে। দ্রৌপদীর প্রেমশীতল বক্ষে বাহুর ঘেরে জেগে উঠলেন ভীম— বাহুভ্যাং পরিরভ্যৈনং প্রাবোধয়দনিন্দিতা। গলার স্বরে বীণার গান্ধার তুলে দ্রৌপদী বললেন— ওঠো ওঠো, কেমন মরার মতো ঘুমোচ্ছ তুমি ভীম— উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কিং শেষে ভীমসেন যথা মৃতঃ। এমন মরার মতো না হলে কি আর জীবন্ত কোনও লোকের বউকে অপমান করে অন্যে বেঁচে থাকে?

গা-ঘেঁষা, আলিঙ্গন, বাহুর ঘের— এত সবের পর বীণার গান্ধারে যে সপ্তমের আমদানি হল তাতে ভীমের দিক থেকে আর প্রত্যালিঙ্গন সম্ভব ছিল না। ভীম উঠে বসলেন এবং সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন— তোমার গায়ের রং যে একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে! কী ব্যাপারটা হয়েছে, খোলসা করে বল তো? খারাপ, ভাল, যাই ঘটুক, পরিষ্কার বল। তুমি তো জান কৃষ্ণা, সমস্ত ব্যাপারেই আমি তোমার বিশ্বাস রেখেছি, অনেক বিপদে আমি তোমাকে কতবার বাঁচিয়েছি— অহমেব হি তে কৃষ্ণে বিশ্বাস্যঃ সর্বকর্মসু। অহম্ আপৎসু চাপি ত্বাং মোক্ষয়ামি পুনঃ পুনঃ ॥

ভীমের মতো মানুষও বুঝে গেছেন দ্রৌপদী তাঁকে বিশ্বাস করেন। বিশেষ করে বিপদে পড়লে অন্য সবার থেকে ভীমই যে দ্রৌপদীর কাছে বেশি আদরণীয় হয়ে ওঠেন, সে কথা ভীমও বুঝে গেছেন। ঠিক সেই কারণেই ভীম বললেন— তোমার যা বলার বল এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে তুমি যা চাও অর্থাৎ যা হলে তোমার ভাল লাগবে, সেটা তাড়াতাড়ি বল— শীঘ্রমুক্ত্বা যথাকামং যত্তে কার্যং ব্যবস্থিতম্। সবাই জেগে উঠলে তোমায় আমায় চিনে ফেলতে পারে, কাজেই তার আগেই যা বলার বলে শুতে যাও।

আমি আগেই বলেছি যুধিষ্ঠিরের স্বামী-ব্যবহারে দ্রৌপদী কোনওকালেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই বিরাটের রাজসভায় তিনি কথা দিলেও তাঁর ওপরে তিনি নির্ভর করেননি। তিনি ভীমের কাছে এসেছেন তড়িঘড়ি অপমানের শোধ নিতে। দ্রৌপদী ভীমের মনস্তত্ত্ব জানতেন অথবা কোন বুদ্ধিমতী স্ত্রীই বা স্বামীর মনস্তত্ত্ব না জানেন? দ্রৌপদী এও জানতেন যে, যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার নীতি ভীম পছন্দ করেন না অথবা অপমানের সময়েও যুধিষ্ঠিরের স্থিরভাব ভীম দু'চক্ষে দেখতে পারেন না।

দ্রৌপদী তাই ভীমের কাছে প্রথমেই যুধিষ্ঠিরের ওপর ঝাল ঝেড়ে নিলেন। দ্রৌপদী বললেন— যার স্বামী যুধিষ্ঠির, তার জীবনে আর সুখ কী— অশোচ্যত্বং কুতস্তস্যা যস্যা ভর্ত্তা যুধিষ্ঠিরঃ? আমার সব দুঃখ জেনেও, আবার তুমি ভালভালাই করে জিজ্ঞেস করছ— কী আমার হয়েছে? দ্রৌপদী পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে তুললেন, কারণ তিনি জানেন কোন কোন ঘটনায় ভীমের আক্রোশ জমা আছে। তিনি বললেন— একে তো সেই কৌরবসভার মধ্যে আমাকে টেনে আনা হয়েছিল, সে দুঃখ তো আমার রয়েইছে, এক দ্রৌপদী ছাড়া আর কোন রাজার ঝি এত অপমান সইবে? তার মধ্যে বনের মাঝে জয়দ্রথ এসে আমাকে আরেকবার নাকাল করে গেল, সেই অপমানও আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোন মেয়ে সইবে— বোঢুমুৎসহতে নু কা? এখন আবার... কেন, তুমি তো চোখের সামনেই দেখলে, এখন আবার ধূর্ত বিরাটরাজার শালা কীচক রাজার সামনেই আমায় লাথি কষাল— সে আঘাত সহ্য করার জন্যও তো আমিই বেঁচে আছি— কা নু জীবেত মাদৃশী। আমার আর বেঁচে থেকে লাভ কী? এই রাজার শালা রানির ঘরে আমার দাসীত্বের সুযোগ নিয়ে দিন-রাত— 'আমার বউ হও, আমার বউ হও'— বলে ঘ্যানর ঘ্যানর করছে— নিত্যমেবাহ দুষ্টাত্মা ভার্যা মম ভবেতি বৈ।

কীচকের সম্বন্ধে এইটুকু বলেই দ্রৌপদী কিন্তু আবার যুধিষ্ঠিরের ওপর আক্রোশে ফেটে পড়লেন। বললেন, তোমার দাদাভাইকে ঝাড়তে পারছ না, যার জুয়ো খেলার ফল ভোগ করছি আমি— ভ্রাতরং তে বিগর্হস্ব জ্যেষ্ঠং দুর্দ্যূতদেবিনম্। যস্যাস্মি কর্মণা প্রাপ্তা দুঃখমেতদনন্তকম্। সত্যি করে বল তো, এক জুয়াড়ি ছাড়া আর কে আছে, যে নাকি রাজ্য-সম্পত্তি সব ছেড়ে দিয়ে বনবাসের জন্য পাশা খেলে? দ্রৌপদী বললেন— খেলবি, খেল না, ধন-রত্ন কি হাজার খানেক মোহর নিয়ে সম্বচ্ছর ধরে— সকাল-সন্ধে পাশা খেললেও তো এত সম্পত্তি উজাড় হয়ে যেত না— সায়ং প্রাতরদেবিষ্যদ্ অপি সংবৎসরান্ বহূন্। কিন্তু বিবাদ আর উৎপাতের পাশা খেলে এখন মাথামোটার মতো চিৎপাত হয়ে পড়ে, চুপটি করে পুরনো কাজের হিসেব করছে— তূষ্ণীম্ আস্তে যথা মূঢ় স্বানি কর্মাণি চিন্তয়ন্। এই হল তোমার দাদা।

দ্রৌপদী দেখলেন, একটু বেশি হয়ে গেছে। ভীম যদি আবার 'জুয়াড়ি' মাথামোটা— এসব কথায় খেপে যান। তাই তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের পূর্ব সম্মানের এক লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে, "এখন তাঁর কী অবস্থা হয়েছে, এও কি আমি সইতে পারি!"— এইভাবে একটা প্রলেপ লাগিয়ে দিলেন পূর্ব গঞ্জনার ওপর। দ্রৌপদী দেখাতে চাইলেন— তিনি এই অনুক্রমেই কথা বলছিলেন, যার জন্য ভীমের সম্বন্ধেও তাঁকে বলতে হল— এই যে তুমি পাকঘরে রসুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার কাজ নিয়ে বিরাট রাজার খিদমতগারি করছ, এও কি আমি সইতে পারি— তদা সীদতি মে মনঃ। বিরাট রাজা বলল— তোমার গায়ে শক্তি আছে, এই মত্ত হাতিগুলোর সঙ্গে লড়, আর তুমি হাতির সঙ্গে লড়াই করছ। হাতির সঙ্গে তোমার লড়াই দেখে এদিকে বিরাটরানি সুদেষ্ণা আর তাঁর পরিজনেরা যে দাঁত বার করে হাসে, তাতে আমার কীরকম লাগে, তা তুমি জানি কি— হসন্ত্যন্তঃপুরে নার্যো মম তূদ্বিজতে মনঃ। জানো তো, তোমার ওই হাতির লড়াই দেখে একদিন আমার ভীষণ খারাপ লাগছিল, আমি চক্কর খেয়ে পড়েই গেছিলাম। তাই না দেখে বিরাটরানি অন্য মেয়েদের সামনে দাঁত বার করে কি হাসিই না হাসছিল! আর তারা কী বলল, জান? বলল— রাঁধুনে ছেলেটিকে হাতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখে এই সুন্দরীর এমন সোহাগ উথলে উঠেছে, যেন ও ব্যাটা ওর কতকালের সোয়ামী— স্নেহাৎ সংবাসজাদ্ ধর্মাদ্... ইয়ং সমনুশোচতি। তা আমাদের সৈরন্ধ্রীকেও দেখতে ভাল, রাঁধুনে ছোকরাটাও চমৎকার, মেয়েদের মনের কথাও কিছু বলা যায় না, তার ওপরে দুটিতেই এই রাজবাড়িতে কাজ নিয়েছে প্রায়ই একই সময়ে, সৈরন্ধ্রীও তো দেখি মাঝে মাঝেই স্বামীর সঙ্গে মিলতে পারছে না বলে দুঃখ করে, কে জানে কী ব্যাপার! দ্রৌপদী বললেন— জান ভীম। সুদেষ্ণারা বারবার আমাকে এই সব কথা বলে, আবার তাতে যদি আমি রেগে যাই, তা হলে আবার তোমায় নিয়ে আমাকে ঠাট্টা করে— ক্রুধ্যন্তীং মাং চ সংপ্রেক্ষ্য সমশঙ্কত মাং ত্বয়ি। আমার আর এসব ভাল লাগছে না। আবার আর-একজনকে দেখ, ওইরকম ধনুর্ধর পুরুষ! সে কিনা খুকি-বিনুনি বেঁধে— বেণীবিকৃতকেশান্তঃ— কানে দুল পরে, মেয়ে সেজে মেয়েদেরই মধ্যে নাচ শেখাচ্ছে, গান শেখাচ্ছে— কন্যানাং নর্ত্তকো যুবা। সোহদ্য কন্যাপরিবৃতো গায়ন্নাস্তে ধনঞ্জয়ঃ। আর দুটির কথা তো ছেড়েই দিলাম— একজন লাল খেটো পরে— সংরব্ধং রক্তনেপথ্যং— রাখালি করে বেড়াচ্ছে, আর একজন বিরাট রাজাকে ঘোড়ার কেরামতি দেখাচ্ছে— বিরাটম্ উপতিষ্ঠন্তং দর্শয়ন্তঞ্চ বাজিনঃ।

বস্তুত দ্রৌপদীর এই বক্তব্যের মধ্যে বীরভ্রাতা ভীম আর অর্জুনের জন্যই তাঁর মানসিক নিপীড়ন বেশি। আমি আগেই বলেছি নকুল এবং সহদেবের ব্যাপারে দ্রৌপদীর পত্নীপ্রেম যতটুকু ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল বাৎসল্য। এইখানে ভীমের কাছে যে তিনি দুঃখ করছেন, তাতেও সেই ভাবটি পরিষ্কার ফুটে উঠেছে।

ভীম আর অর্জুনের জন্যই দ্রৌপদীর মনে বীরপত্নীর মর্মপীড়া ছিল। স্ত্রীবেশী অর্জুনের ব্যবহার তাঁর আর সহ্য হচ্ছিল না। আর ভীমের মতো মানুষ রাজবাড়ির মাইনে-করা কুস্তিগির আর হাতিদের সঙ্গে লড়ে মেয়েদের তামাশার খোরাক জোগাচ্ছেন, দ্রৌপদীর কাছে এর থেকে কষ্টকর আর কী হতে পারে! আবার এই ঘটনা নিয়ে রাজবাড়ির মেয়েদের সামনে তাঁর মমতা দেখানোর উপায়টুকু পর্যন্ত নেই। একে তো জানাজানি হবার ভয়, তার ওপরে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক, যা নাকি দ্রৌপদী এবং ভীমের ক্ষেত্রে ঘটনাই, সেটাকেও অন্তত সবার সামনে উড়িয়ে দিতে হচ্ছে, সুদেষ্ণা আর অন্য মেয়েদের মশকরাও শুনতে হচ্ছে— আমাদের সৈরন্ধ্রীও রূপে-গুণে লক্ষ্মীমতী আর এই রাঁধুনে ছোকরাটাও চমৎকার দেখতে— কল্যাণরূপা সৈরন্ধ্রী বল্লবশ্চাপি সুন্দরঃ। অর্জুন আর ভীমের জন্য মর্মপীড়া বাদ দিলে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর কিন্তু সেই একই ভাব। বিশেষত কৌরবের রাজসভায় যে

পাশাখেলা হয়েছিল, তাতে হাজার নাকানি-চুবানি খেয়েও যুধিষ্ঠির যে বিরাটের রাজসভায় আবার পাশা খেলারই কাজ নিয়েছেন, এটা দ্রৌপদীর কাছে অন্য অর্থ বহন করে এনেছে। তাঁর কাছে নকুল সহদেব ছোট্ট 'নাজুক', নরম মানুষ— গোরু চরানো ঘোড়া-দাবড়ানো এসব পরিশ্রমবহুল কাজ তাদের যেন সয় না। উলটোদিক থেকে ভীম আর অর্জুন হলেন বীর। বিশাল গদা আর গাণ্ডীব নিয়ে যাঁদের কারবার, তাঁদের পক্ষে রান্না করা আর গান শেখানো যেন নিতান্ত বীরত্বহানির ব্যাপার, অন্তত দ্রৌপদীর কাছে তাই। কিন্তু সেদিক থেকে দেখতে গেলে যুধিষ্ঠিরকে কোনও পরিশ্রমের কাজও করতে হচ্ছিল না, আবার তাঁর সম্মান হানি হয়, এমন কিছুও তাঁকে করতে হচ্ছিল না। এতে তো দ্রৌপদীর বরং সুখী হবার কথা ছিল, কিন্তু তা তিনি হননি।

যুধিষ্ঠিরের হাত থেকে পাশার দান পড়ছে— এ তাঁর দু'চক্ষের বিষ। ভীমের কাছে তিনি কথা আরম্ভ করেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে ধিক্কার দিয়ে। বলেছিলেন— যুধিষ্ঠির যার স্বামী, তার আবার সুখ? এখন ভীমের কাছে সব স্বামীর প্রতি মমত্ব জানিয়ে কথা শেষ করলেন যুধিষ্ঠিরকে দিয়েই। বললেন— এই যে শতেক দুঃখ আমার দেখছ, সেও যুধিষ্ঠিরের জন্যেই— এবং দুঃখশতাবিষ্টা যুধিষ্ঠির-নিমিত্ততঃ। আজকে যে আমাকে চাকরানির মতো রাজবাড়িতে ফরমাস খাটতে হচ্ছে, রানি সুদেষ্ণার পায়খানা পেচ্ছাপের জল জোগান দিতে হচ্ছে, সেও ওই পাকা জুয়াড়িটার জন্য— শৌচদাস্মি সুদেষ্ণায়া অক্ষধূর্তস্য কারণাৎ। দ্রৌপদী এতক্ষণ অন্য স্বামীদের কষ্টভোগের কথা শুনিয়েছেন, এবারে নিজের দুর্ভোগের কাহিনি শোনাতে লাগলেন ভীমকে।

দ্রৌপদী বললেন— পঞ্চপাণ্ডবের মহিষী আর দ্রুপদ রাজার মেয়ে হয়েও এই অবস্থায় পড়ে আমি ছাড়া আর কে বেঁচে থাকতে পারে? এককালে ইন্দ্রের মতো স্বামীরা আমার মুখ চেয়ে বসে থাকত, এখন আমি এই অন্তঃপুরের ছোটলোক মেয়েগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। আমার সুখ কী ছিল— তা তুমি তো অন্তত বুঝবে ভীম! এককালে আমি হাঁটলে পরে আমার সামনে পেছনে শতখানেক বাঁদী যেত, এখন আমিই সেই কাজটা করি, আর হাঁটেন রানি সুদেষ্ণা— সাহমদ্য সুদেষ্ণায়াঃ পুরঃ পশ্চাচ্চ গামিনী। আর একটা দুঃখ আমার মনের মধ্যে কাঁটার মতো বিঁধছে, ভীম। আমি আগে কোনও দিন কারও জন্যে চন্দনও ঘষিনি, আমার শাশুড়িমাতা ছাড়া আর কারও গা-হাত-পাও টিপে দিইনি, এখন সেই চন্দন পিষতে পিষতে আমার হাতে কড়া পড়ে গেল। দেখ, ভীম! দেখ এই আঙুলগুলো, এ কি আর সেইরকম নরম তুলতুলে আছে, যেমনটি তুমি আগে দেখেছ— পশ্য কৌন্তেয় পাণী মে নৈবং যৌ ভবতঃ পুরা।

পাঠক! লক্ষ করবেন, সুদেষ্ণার বাড়িতে এই পরিচারিকার কাজ দ্রৌপদী নিজেই সেধে নিয়েছিলেন, নইলে যুধিষ্ঠির ঠিকই সন্দেহ করেছিলেন যে, সুকুমারী কৃষ্ণার পক্ষে কোনও নীচ কাজ করা সম্ভব নয় হয়তো। কিন্তু রাজার শালা কীচকের জ্বালায় আজ পরিস্থিতি পালটে গেছে। আজ তিনি যুধিষ্ঠিরকেই দুষছেন যে, কেন তাকে চন্দন পিষতে হচ্ছে? দ্রৌপদী বলেছেন যে, আমি কোনওদিন শাশুড়ি কি স্বামীদের ভয় করে চলিনি— বিভেমি কুন্ত্যা যা নাহং যুস্মাকং বা কদাচন— সেই আমাকে কিনা এখন বিরাটরাজার ভয়ে সিঁটিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকতে হয়। চন্দন পেষা ভাল হল, না মন্দ হল— বর্ণকঃ সুকৃতো ন বা— মহারাজ কী বলবেন— কিং নু বক্ষ্যতি সম্রাড় মাং— এ সব প্রশ্নে সব সময় এখন আমি বিচলিত। হায় হায়! কী পাপ করেছি, যার ফলে আমাকে এত দুঃখও সইতে হল।

দ্রৌপদীর চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকল, ভীমের দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে কান্নার নিঃশ্বাসে মিশিয়ে দিলেন অশ্রুবারি। ভীম দ্রৌপদীর হাত দু'খানি নিজের হাতে তুলে নিলেন, অসীম মমতায় সে দুটি হাত ক্ষণকাল রাখলেন নিজের মুখে, তারপর কেঁদে ফেললেন দ্রৌপদীর হাতের মধ্যেই— মুখমানীয় দ্রৌপদ্যা রুরোদ পরবীরহা। নিঝুম রাত্রে যখন বৃষ্টির মতো অন্ধকারের কাজল ঝরে পড়ছিল তখন বিরাটের রন্ধনশালার মধ্যে একটি সম্পূর্ণ প্রেমের ছবি দেখতে পেলাম আমরা। বর্তমান লেখক কিন্তু ভীম আর দ্রৌপদীর এই আভিসারিক প্রেম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বাস্তববাদী। ভীম যে দ্রৌপদীর হাত দু'খানি নিজের গালের ওপরে রাখলেন তার কারণ হয়তো এই— সুবিশাল গদা চালাতে চালাতে ভীমের নিজের হাতেই কড়া পড়ে গেছে; সেই গদা-ঘোরানো কড়ার মধ্যে চন্দন-পেষা মেয়েলি কড়া ঠিক ঠাহর করা যায় না বলেই ভীম নিজের মসৃণ গালে (পাঠক! ভীমের দাড়ি গোঁফও খুব বেশি ছিল না) দ্রৌপদীর হাত রেখে তাঁর দুর্ভোগ পরিমাপ করতে চেয়েছেন এবং যখন বুঝেছেন দ্রৌপদীর কথা সত্যি, সরলপ্রাণ ভীম তখন কেঁদে উঠেছেন সমব্যথায়। আমার কথা যে ঠিক, তার প্রমাণ— দ্রৌপদীর হাত দু'খানি মুখে মেজেই ভীম বলে উঠেছেন— ধিক আমার বাহুবল ধিক সেই গাণ্ডীবধন্বার গাণ্ডীবকে, যাঁরা থাকতেও তোমার হাতের রক্ত-লাল নরম তালুতে কড়া পড়েছে— যত্তে রক্তৌ পুরা ভূত্বা পাণী কৃতকিণাবিমৌ।

এতক্ষণ ভীমের সামনে দ্রৌপদী যে যুধিষ্ঠিরের নিন্দা করেছেন, তাতে অন্য সময়ে হলে ভীমের দিক থেকে যে প্রতিক্রিয়াটি হত, তা হয়তো দ্রৌপদীর অনুকূলেই যেত এবং অন্যত্র তা গেছেও। কিন্তু এই সময়ে অজ্ঞাতবাসের কারণেই হোক কিংবা যা হোক কোনও কারণে, ভীম কিন্তু দ্রৌপদীকে বুঝিয়ে বলতে চাইলেন যে বেচারা যুধিষ্ঠিরের ওপরে তিনি যেন রাগ না করেন। ভীম বললেন— যুধিষ্ঠির অজ্ঞাতবাসের শেষের দিন গুণছেন, নইলে তো একটি লাথিতে ওই বদমাস কীচকটার মাথা গুঁড়িয়ে ফেলতাম আমি— পোথয়ামি পদা শিরঃ। এই বিরাট রাজ্যেও লাগিয়ে দিতাম ধুন্ধুমার। নেহাৎ বড় ভাই যুধিষ্ঠির সব জানাজানি হবার ভয়ে চোখের ঠারে আমাকে সরে যেতে বললেন, তাই। কী জানি কেন, সরলপ্রাণ ভীমও বুঝেছেন যে যুধিষ্ঠির ঠিক কাজই করেছেন এবং এটা মাথায় ঢুকেছে বলেই তার মাথাও ঠান্ডা হয়েছে— স্থিত এবাস্মি ভামিনি। এই প্রথমবার বুঝি ভীম বললেন— মাথা ঠান্ডা কর, সুন্দরী! মাথা ঠান্ডা কর। তুমি যুধিষ্ঠিরের নামে যেভাবে বললে, এ যদি তিনি শোনেন, তিনি নির্ঘাত 'সুইসাইড' করবেন— শৃণুয়াদ্ যদি কল্যাণি নূনং জহ্যাৎ স জীবিতম্।

ভীমের কী সরল যুক্তি, হাজার হোক বড় ভাই, সুখে দুঃখে এতকাল একসঙ্গে আছেন। ভীম খুব চেষ্টা করলেন— যাতে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদী কিঞ্চিৎ সুদক্ষিণা হন। তিনি যুক্তি দিয়ে বললেন— তোমার এই নিন্দে-মন্দ শুনলে যুধিষ্ঠির নির্ঘাত 'সুইসাইড' করবেন। আর যুধিষ্ঠির 'সুইসাইড' করলে অর্জুন নকুল এবং সহদেবও 'সুইসাইড্' করবে। অপিচ এরা সবাই আত্মহত্যা করলে আমিই বা আর বেঁচে থেকে কী করব— নাহং শক্লোমি জীবিতুম্।

অকাট্য যুক্তি, অর্থাৎ কিনা যুধিষ্ঠিরের আত্মহত্যার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আত্মহত্যা করতে পারছেন না, কারণ বোধহয় দ্রৌপদীই, কিন্তু চার ভাই পর পর মারা গেলে তিনি একা দ্রৌপদীর একচ্ছত্র অধিকার নিতেও সাহসী নন— কারণ বোধহয় অনভ্যাস। দ্রৌপদীকে ভাগে পাওয়াই ভীমের অভ্যাস অথবা তাঁর ভ্রাতৃপ্রীতিও ছোট করে দেখা উচিত নয়। যুধিষ্ঠিরকে আংশিক অবমাননা তিনি বহুবারই করেছেন কিন্তু পুরোটা কখনও নয়।

ভীমের কাছে দ্রৌপদীর ভাষণ শুনে একথা পরিষ্কার বোঝা যায়, মাঝে মাঝে দ্রৌপদীর অন্যায় মাথা গরম করার অভ্যাস ছিল, নইলে ভীমের মতো হঠাৎ-ক্রোধী মানুষও এই মুহূর্তে চ্যবনপত্নী সুকন্যা, সীতাদেবী, লোপামুদ্রা এবং সাবিত্রীর উদাহরণ তুলে দ্রৌপদীকে পতিপরায়ণতার উপদেশ দিয়েছেন।

পাঠক মহাশয়! আমরা বোধহয় আবার প্রসঙ্গ থেকে সরে এসেছি। আমাদের দোষও নেই খুব একটা— দ্রৌপদী এতক্ষণ পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটছিলেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ঘাঁটছিলাম। এখন তিনি ভীমের মনোভাব বুঝে যুধিষ্ঠির ইত্যাদির প্রসঙ্গ বাদ দিয়েছেন, আমরাও তাই সুযোগ বুঝে সেই রাজার শালা কীচকের প্রসঙ্গে এসেছি। দ্রৌপদী বললেন— আমার দুঃখ সমস্ত সহ্য-সীমার বাইরে চলে গেছে, নইলে যুধিষ্ঠিরকে গালমন্দ করে আর কী হবে— ন রাজানমুপালভে? পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটেই বা কী হবে— কিমুক্তেন ব্যতীতেন? দ্রৌপদী এবার সোজাসুজি কীচকের প্রসঙ্গে এলেন। তার ভাব, ভাবনা, তার পেছনে রাজবাড়ির মদত— এ-সব কিছুই ভীমকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন। দ্রৌপদীর বক্তব্য অনুযায়ী— এক বাঘের মুখ থেকে বাঁচতে গিয়ে দ্রৌপদী আরেক বাঘের মুখে পড়েছেন। দ্রৌপদী সুদেষ্ণার পরিচারিকা। সুদেষ্ণার ধারণা— দ্রৌপদীকে দেখলে রাজা বিরাটকে ঠেকানো খুবই কঠিন হবে। দ্রৌপদীর রূপে তিনি এতই উদ্বিগ্ন যে, রাজা বিরাট অন্তঃপুরের দিকে এলেই সুদেষ্ণা এটা ওটা ফরমাস দিয়ে দ্রৌপদীকে এদিক-ওদিক পাঠিয়ে দেন। এই সুযোগটাই কীচক নিয়েছে। সুদেষ্ণার মনোভাব বুঝেই এবং ইতস্তত দ্রৌপদীকে চলাফেরা করতে দেখেই কীচক দ্রৌপদীকে প্রেম নিবেদন করা শুরু করে। তার পরের ঘটনা ভীমের জানা। গতদিন কীচক দ্রৌপদীকে সবার সামনে পদাঘাত করেছে। রাজা বিরাটের এতে কিছুই করবার নেই, কেননা সুদেষ্ণার কারণেই হোক কিংবা অন্য কোনও কারণে, রাজা তাকে প্রশ্রয় দিয়ে মাথায় তুলেছেন এবং দ্রৌপদীর পক্ষে তা কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে— কীচকো রাজবাল্লভ্যাচ্ছোককৃন্ মম ভারত।

শুধু এইটুকুই নয়, দ্রৌপদীর কাছে এইমাত্র যে সংবাদ পাওয়া গেল, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, কীচক শুধু সুন্দরী নারীর রতিলিপ্সু নন, তিনি নৃশংসও বটে। গরিব প্রজাদের টাকা-পয়সা আত্মসাৎ করা থেকে হত্যা— এসব কিছুতেই তাঁর হাত পাকা। দ্রৌপদীর আশঙ্কা হয় (পাঠক হিসেবে আমরাও বুঝি— এ আশঙ্কা অমূলক নয়) যে, বারবার রাস্তায় তিনি যেভাবে কামান্ধ কীচকের রতি-প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাতে এরপর তাঁর চোখের সামনে পড়লেই যথেষ্ট চড়-লাথি খেতে হবে দ্রৌপদীকে। পরে মহাভারতের গীতাপর্বে আমরা দেখেছি যে, কামীজনের কামনা প্রতিহত হলেই তা ক্রোধের আকার ধারণ করে। 'কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে' এই শ্লোকের ওপর টীকায় শংকরাচার্য তাই লিখেছেন— কাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এব প্রতিহতঃ ক্রোধরূপেণ পরিণমতে। দ্রৌপদী কীচকের ব্যাপারে এই সন্দেহই করছেন। তিনি এখন আপন সতীত্বের থেকেও বারবার মার খাবার কথা ভাবছেন এবং সেই মার খেতে খেতে তাঁর জীবন থাকবে কিনা— এই স্থূল শারীরিক চিন্তাই আপাতত তাঁর আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে— দর্শনে দর্শনে হন্যাদ্ যথা জহ্যাঞ্চ জীবিতম্। দ্রৌপদী বললেন— ভীম! এতে তোমাদের ধর্মও থাকবে না, শৌর্য-বীর্যও ব্যর্থ, কেননা যে স্বামী বউকেই রক্ষা করতে পারে না, তার আবার ধর্ম কীসের— মহান্ ধর্মো ন শিষ্যতি। আবার তোমরা যে লোক জানাজানি হবার ভয়ে অজ্ঞাতবাসের ব্রত নিয়েছ, সেই প্রতিজ্ঞা রাখতে গেলে তোমরা পাঁচভাই আর স্ত্রীর আশা কোরো না— সময়ং রক্ষমাণানাং ভার্যা বো ন ভবিষ্যতি।

কীচকের কামনার জ্বরে দগ্ধা দ্রৌপদী মহিলা হিসেবে আকুল প্রার্থনা জানালেন ভীমের কাছে, কারণ, অজ্ঞাতবাসের কড়াকড়ির মধ্যে এই কাজ ভীম ছাড়া আর কারও পক্ষেই উদ্ধার করা সম্ভব নয়। দ্রৌপদী বললেন— তুমি আমাকে একসময়ে জটাসুরের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলে, ভীম! (এ ঘটনা বনপর্বের। জটাসুর হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদীকে। ভীম তাকে মারেন।) তুমিই রক্ষা করেছিলে দুষ্ট জয়দ্রথের হাত থেকে, এখন এই লম্পট কীচকটাকেও উপযুক্ত শিক্ষা দাও। পাথরের ওপর মাটির কলসি ফাটালে যেমনটি হয়, তেমনি করে ওই কীচকের মাথাটাও ফাটাও দেখি— ভিন্ধি কুম্ভমিবাশ্মনি।

জনান্তিকে বলে রাখি দ্রৌপদীর সামনে 'মাসল্' ফুলিয়ে বাহুর কসরত দেখাতে একটু পছন্দ করতেন ভীম। স্ত্রীলোক সামনে থাকলে কোন বীরপুরুষই বা এটি না-পছন্দ করে। আমরা বনপর্বে কীর্মির রাক্ষস বধের সময়ে দেখেছি সুন্দরী কৃষ্ণা ভীমের যুদ্ধ-কসরত দেখছিলেন বলে, শুধুমাত্র দেখছিলেন বলেই, ভীমের শক্তি যেন আরও ক'গুণ বেড়ে গেল— কৃষ্ণানয়ন দৃষ্টশ্চ ব্যবর্ধত বৃকোদরঃ। রুক্ষ শুষ্ক বামুন নীলকণ্ঠ এই শ্লোকের টীকায় বলেছেন কৌরবনিবাসে দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণের কথা স্মরণ করেই, নাকি কৃষ্ণার চোখের চাহনিতে (নিশ্চয় করুণ চোখ বোঝাচ্ছেন নীলকণ্ঠ) অধিক কুপিত হয়েছেন ভীম। আরে এই শ্লোকের পূর্বার্ধে তো দুর্যোধনের অত্যাচারের কথাই আছে, কাজেই 'কৃষ্ণানয়নদৃষ্টশ্চ' এই সুন্দর শ্লোকাংশে আবার ওসব কথা কেন! নীলকণ্ঠ জানেন না, সুন্দরী স্ত্রীর তারিফ-করা চোখের চাহনিতে যে কোনও প্রতিযোগিতার শক্তি বেড়ে যায়, যুদ্ধশক্তি তো বটেই। আমি বাপু এখানে ভূয়োদর্শী ব্যাসের কথার সোজা অর্থ বুঝি— কৃষ্ণানয়নদৃষ্টশ্চ ব্যবর্ধত বৃকোদরঃ। তার ওপরে করুণ চোখে তাকানোটা কৃষ্ণার স্বভাববিরুদ্ধ। হয় তিনি বিদগ্ধা নারীর কটাক্ষে তাকান, নয়তো বাহবা দেওয়ার চোখে। ভীমের শক্তি তাতেই চেতিয়ে দেয়। দ্রৌপদী জানেন— কীচকের কথা যতটুকু বলেছেন, তাতেই ভীম তেতে গেছেন, এখন শুধু ঠোঁট ফুলিয়ে একবার বললেন— কীচক জীবিত আছে— এই অবস্থায় যদি কালকের রাত্রিও কাটে তবে আমি 'গ্লাসে'র মধ্যে বিষ গুলিয়ে খাব— বিষমালোড্য পাস্যামি— তবু কীচকের হাতে আমি ধরা দেব না। তার চেয়ে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে মরব, তাও ভাল।

আবার প্রেমের 'সিন'। ভীম দ্রৌপদীর কথার মর্ম বুঝলেন। বুঝলেন কীচকের বিরুদ্ধে আশু ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। সুন্দরী কৃষ্ণা তখনও ভীমের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে

কাঁদছেন। ভীম জড়িয়ে ধরলেন দুঃখের ঝড়ে আপতিতা অভিসারিকাকে। হাত দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে রাজনন্দিনী দ্রৌপদীকে আশ্বাস দিয়ে বললেন— তুমি যা চাও তাই হবে— তথা ভদ্রে করিষ্যামি যথা ত্বং ভীরু ভাষসে। তবে একটু নাটক করতে হবে তোমায়। বিরাটের নতুন নৃত্যশালাটি চেন তো? ওখানে দিনের বেলা মেয়েরা নাচে, কিন্তু রাত্রে কেউ সেখানে থাকে না। তুমি কীচককে জানাবে নৃত্যশালাতেই তোমার সঙ্গে মিলন হবে তার। দেখো কেউ যেন তোমাদের কথালাপ শুনতে না পায়। আজ সন্ধেবেলাতেই এই কাজ করতে হবে, তারপর সেখানেই আমি কীচককে তার মৃত বাপ-ঠাকুরদার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দেব— তত্রাস্য দর্শয়িষ্যামি পূর্বপ্রেতান্ পিতামহান্।

রাত্রি আর বাকি নেই। দুঁহু কোলে দুঁহু কাঁদে, যতক্ষণ থাকা যায় ততক্ষণ থেকে দ্রৌপদী ফিরলেন নিজের ঘরে। ভোর হতেই কীচককে আবার দেখা গেল দ্রৌপদীর কাছে কাছে ঘুর ঘুর করতে। তাঁর আর লজ্জা-ভয় নেই। তিনি বললেন— বিরাট রাজার সামনেই তো তোমাকে আমি লাথি মেরেছি। আরে! রাজা আমিই এবং সেনাপতি তো বটেই— অহমেব হি মৎস্যানাং রাজা বৈ বাহিনীপতিঃ। আমাকে তুমি একটু সুখ দাও সুন্দরী, আমি তোমার গোলাম হয়ে যাব— দাসো ভীরু ভবামি তে। প্রতিদিন তোমায় দেব হাজার মোহরের তোড়া আর দাস-দাসী যা চাও! পরিবর্তে আমি চাই তোমার সঙ্গে মিলতে— অস্তু নো ভীরু সঙ্গমঃ।

দ্রৌপদী বিদগ্ধা নারী। নাটক করা তাঁর ভালই আসে। দ্রৌপদী বললেন— আমি আজ মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি— তোমার বাঁধনে ধরা দেব। কিন্তু একটা কথা, তোমার বন্ধু-বান্ধব ভাইয়েরা সব কেউ যেন এ-কথাটা জানতে না পারে। তুমি জান তো, আমার সেই মুখপোড়া গন্ধর্ব স্বামীগুলো আছে, তারা জানতে পারলে আমায় আর আস্ত রাখবে না। কীচক বললেন— দূর বোকা, কেউ জানতে পারবে না, আমি একাই যাব— একো ভদ্রে গমিষ্যামি। 'মিট করার' জায়গা ঠিক হয়ে গেল— সেই নৃত্যশালা।

সেই সকালবেলার কথা। দুপুর বারোটা পর্যন্ত কীচকের মনে হল সে যেন ছ'মাস বসে আছে। দুপুর গড়িয়ে পড়তেই আরম্ভ হল তার সাজ। মনে কেবল দ্রৌপদীর রূপ-চিন্তা, আর সমাগমের প্রতীক্ষা। দ্রৌপদী আবার ভীমের কাছে জানিয়ে এসেছেন— সব ব্যবস্থা পাকা। রাত এসে গেল। সিংহ যেমন প্রচ্ছন্ন ভাবে শিকারের অপেক্ষা করে, ভীমও অন্ধকার নর্তনাগারে তেমনটি ঘাপটি মেরে রইলেন। রাত্রির আমেজে অনেক সাজগোজ করে কীচক উপস্থিত হলেন অন্ধকার নৃত্যশালায়। প্রথমে যেন কিছু ঠাহর করাই যায় না কোথায় সেই দ্রৌপদী। কীচকের মনে হল— সে যে বলেছিল, নৃত্যশালায় রীতিমতো শয্যা বিছানো আছে একটা। কোথায় শয্যা! আরে এই তো, এইখানেই শুয়ে আছে, কীচক অল্প একটু হাত ছোঁয়ালেন। দ্রৌপদী যে এতটা উন্মুখ হয়ে আছেন, তা যেন তাঁর কল্পনাতেও আসে না। কীচক বললেন— তোমায় কত টাকা পাঠিয়েছি, কত দাসী পাঠিয়েছি, তোমার সেবার জন্য। (এবার কাজের কথায়—) জান তো আমার অন্তঃপুরের মেয়েরা বলে— আমার মতো সুন্দর পুরুষ নাকি তারা কোনওদিন দেখেনি।

উত্তর এল, তবে সে কণ্ঠস্বরে বজ্র লজ্জাহত, বড় কঠিন, শুষ্ক স্বাধীন সে উত্তর। উত্তর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এল— বড় সৌভাগ্য আমার, তুমি এত সুন্দর। মেয়েদের ভাল লাগবার মতোই বটে। তবে এখন আমি তোমায় যে স্পর্শসুখ দেব, তুমি কামকলাকোবিদ হওয়া সত্ত্বেও এমন স্পর্শসুখ তুমি কোথাও পাওনি— ঈদৃশস্তু ত্বয়া স্পর্শঃ স্পৃষ্টপূর্বো ন কর্হিচিৎ। আর নিশ্চয়ই বলতে হবে না। কীচক আর ভীমের ধস্তাধস্তিতে নৃত্যশালা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। অবশেষে কীচককে মাংসপিণ্ডে পরিণত করে একটুখানি আগুন জ্বালিয়ে ভীম এবার ডাকলেন দ্রৌপদীকে। দ্রৌপদী এবং ভীম— দু'জনেরই ক্রোধ শান্ত হল। ভীম বললেন— তোমায় যারা অন্যায়ভাবে চাইবে, তাদের অবস্থা হবে ঠিক এই কীচকের মতো। দ্রৌপদীর প্রিয়কার্য করে ভীম রন্ধনশালায় ফিরে গেলেন। কিন্তু দ্রৌপদী গেলেন না। তাঁর সাহসটা দেখুন। এই নির্জন রাত্রে তিনি ঘুমন্ত সভাসদদের ডেকে ডেকে বললেন— দেখুন আমার গন্ধর্ব-স্বামীরা লম্পট কীচককে তার লাম্পট্যের শাস্তিটি কেমন দিয়েছেন, দেখুন। সভাপালেরা এলেন, মশাল জ্বালিয়ে এলেন অন্যেরাও। কীচকের বন্ধুবান্ধব এবং তার ভাইয়েরাও। কীচকের ভাইয়েরা হল সব উপকীচক। তারা ভাবল এই দ্রৌপদীটাই যত নষ্টের গোড়া। তারা দ্রৌপদীকে বেঁধে নিয়ে চলল মরা কীচকের সঙ্গে— তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে কীচকের আত্মার শান্তি ঘটাতে। দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীর ছদ্মনামগুলি ধরে চেঁচাতে লাগলেন এবং আবার তাঁর রক্ষায় এগিয়ে এলেন ভীম। গুপ্ত দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে শ্মশান চত্বরে ঢুকে দ্রৌপদীকে বন্ধন-মুক্ত করলেন ভীম এবং সেইসঙ্গে কীচকের একশো পাঁচটি ভাইকেও হত্যা করলেন।

খবরটা রটে গেল। প্রত্যক্ষদর্শীরা এসে রাজা বিরাটকে ভয় দেখাল। ভয়ের কারণ তিনটে— সৈরন্ধ্রী অত্যন্ত রূপবতী, গন্ধর্ব বলে যার কথা শোনা যাচ্ছে সে প্রবল পরাক্রান্ত; তৃতীয়, কোনও পুরুষ যদি আবার দ্রৌপদীর পেছনে ছোঁক ছোঁক করে— তা হলেই বিরাট রাজ্য উচ্ছন্নে যাবে। রাজাকে তারা বলল— মুক্ত হয়ে সৈরন্ধ্রী আবার আপনার ঘরে ফিরে আসছে— পুনরায়াতি তে গৃহম্। মানে এটাও যেন একটা ভয়ের কথা। দ্রৌপদীকে রাস্তায় ফিরে আসতে দেখে বিরাটরাজ্যের পুরুষমানুষেরা পর্যন্ত পালিয়ে গিয়ে ঘরের দরজা দিল। শ্মশান-ফেরা দ্রৌপদী স্নান করে নতুন কাপড় পরে জনহীন পথ বেয়ে বিরাটের রন্ধনশালার দ্বারে এলেন ভীমকে কৃতজ্ঞতা জানাতে। একটু ইশারা করে আস্তে ভীমকে বললেন— নমো গন্ধর্বরাজায়, তুমি আমার রক্ষাকর্তা। ভীম বললেন— আমরা যার হুকুমের গোলাম, তার এইটুকু কথাতেই আমি অঋণী হলাম।

আমরা বলেছিলাম— পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে ভীম একমাত্র মানুষ যিনি দ্রৌপদীকে ভালবাসতেন মনের গভীর থেকে। দ্রৌপদীর প্রত্যেকটি কথা যিনি বিনা দ্বিধায় নির্বিচারে পালন করতেন, তিনি ভীম। কৌরবসভায় দ্রৌপদীর অপমানে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন— দুঃশাসনের বুক চিরে রক্ত খাব। খেয়েছেন। দুর্যোধনকে বলেছিলেন— গদার বাড়িতে তোমার ঊরু দুটি ভাঙব। ভেঙেছেন। ক্ষত্রিয়ের নীতি উল্লঙ্ঘন করার কলঙ্ক মাথায় নিয়েও দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ করেছিলেন ভীম। কিন্তু যে দ্রৌপদীর জন্য ভীমের এত আত্মদান, সেই দ্রৌপদী! তাঁর মনে মনে মাতাল হওয়ার জায়গা তো ভীম নয়। ভীমকে তিনি বললেন— নমো গন্ধর্বরাজায়— আর এইটুকু চাটুতেই ভীম একেবারে বাধিত বোধ করেন দ্রৌপদীর কাছে। কিন্তু বিদগ্ধা রসবতীর এতে তৃপ্তি হবে কেন? তিনি কেবলই ধাওয়া করে বেড়ান

সেই ব্যক্তিত্বের পেছনে, যাকে কেবলই মনে হয় এই বুঝি আধেক ধরা পড়েছেন। কিন্তু আর বাকি অর্ধেকের নাগাল পেয়েছি পেয়েছি করেও পাওয়া যায় না যেন। তার জন্য খোঁজ চলে, কিন্তু উত্তর মেলে কি?

দ্রৌপদী কিন্তু ভীমের কাছ থেকে মধুর বিদায় নিয়ে সুদেষ্ণার ঘরে ফিরে গেলেন না। মহাভারতের লেখক লক্ষ করেছেন যে, তিনি বিনা কারণে বিরাট রাজার নর্তনালয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই যেখানে বিরাটের মেয়েরা নাচগান শেখে। আর নর্তনাগারের কাছে গেলে যে বৃহন্নলাবেশী অর্জুনকে দেখা যাবে, তাতে সন্দেহ কী? হ্যাঁ, তিনি স্বভাবতই রাজবাড়ির মেয়েদের কাছে নাচের বোল আউড়ে যাচ্ছিলেন। মেয়েরাও দেখল দ্রৌপদীকে। সেই মুহূর্তে দ্রৌপদী নিজেই যেহেতু জব্বর খবর, তাই নাচিয়ে মেয়েরা সব অর্জুনকে নিয়েই বেরিয়ে এসে দ্রৌপদীকে সম্ভাষণ জানাল— ভাগ্যিস আপনি কীচকদের হাত থেকে ছাড়া পেয়েছেন, ভাগ্যি মানি আপনি ফিরে এসেছেন আবার— দিষ্ট্যা সৈরন্ধ্রী মুক্তাসি, দিষ্ট্যাসি পুনরাগতা। মেয়েদের দেখাদেখি অর্জুনও জিজ্ঞাসা করলেন— তুমি কেমন করে ছাড়া পেলে সৈরন্ধ্রী! কেমন করেই বা সেই দুষ্টু লোকগুলো শাস্তি পেল— আমরা আদ্যন্ত সব কিছু শুনতে চাই তোমার মুখে— ইচ্ছামি বৈ তব শ্রোতুং সর্বমেতদ্ যথাযথম্।

দ্রৌপদীকে এমনিতেই ক্লিষ্টা দেখাচ্ছিল, কিন্তু যিনি সারারাত্রির ধকল সহ্য করে, সকালবেলায় গা ধুয়ে, কাপড় কেচে— গাত্রাণি বাসসী চৈব প্রক্ষাল্য সলিলেন সা— আবার ভীমের কাছে দরবার করতে যেতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই এত ক্লান্ত ছিলেন না যে, গল্প বলতে পারবেন না। কিন্তু কই, তিনি তো গল্পের ধারে কাছে গেলেন না, উলটে দ্রৌপদী বৃহন্নলাবেশী অর্জুনকে বললেন— তুমি অন্তঃপুরের মেয়েদের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছ, সুখেই থাক, আবার সৈরন্ধ্রীর কী হল না হল, তা দিয়ে তোমার আজ কী দরকার— কিন্নু তব সৈরন্ধ্র্যা কার্যমদ্য বৈ। রাজবাড়ির কিঙ্করী সৈরন্ধ্রী যে কষ্ট পাচ্ছে, সে কষ্ট তো আর তোমাকে পেতে হচ্ছে না এবং ঠিক সেইজন্যই মধুর হাসিটি হেসে দুখিনীকে এমনতর প্রশ্ন করতে পারছ— তেন মাং দুঃখিতামেবং পৃচ্ছসে প্রহসন্নিব— 'হাসিয়ে সোহাগ করা শুধু অপমান?'

অন্তরের ব্যথায় দ্রৌপদী ভুলেই গেছিলেন অর্জুন এখন স্ত্রীবেশে বৃহন্নলা, আপন পূর্ব-সংস্কারবশে তাই অর্জুনের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন পুংলিঙ্গবোধক ক্রিয়াপদ— প্রহসন্নিব। অর্জুন শুধরে দিয়ে বললেন— বৃহন্নলাও তোমার জন্যে যথোচিত দুঃখ পাচ্ছে, কল্যাণী! তাকে তুমি অন্তত পশু-পক্ষী ভেব না। এতকাল তুমি আমাদের মধ্যে আছ, আমিও তোমাদের মধ্যে একসঙ্গে আছি। সহবাসিনী একজনের কষ্ট মানে যে আমাদের সবারই কষ্ট। এবারে অর্জুন মোক্ষম কথাটি বললেন। বললেন— যে কেউ আরেকজনের মনের কথা ভাল করে বুঝতে পারে না— ন তু কেনচিদ্ অত্যন্তং কস্যচিদ্ হৃদয়ং ক্বচিৎ। বেদিতুং শক্যতে ভদ্রে যেন মাং নাববুধ্যসে ॥

দ্রৌপদীকে অর্জুন কতটা ভালবাসতেন সেটার পরিমাণ বিচারে অর্জুনের এই কথাটা অত্যন্ত জরুরি। যে বিদগ্ধা সুন্দরীকে তিনি নিজেই লক্ষ্যভেদ করে আপন বীর্যশুল্কে বিবাহ করে এনেছিলেন, বিবাহের এত বচ্ছর পরেও তাঁকে বলতে হচ্ছে— তুমি আমার মনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাটা বুঝতে পারছ না— যেন মাং নাববুধ্যসে। অন্যদিকে দ্রৌপদী তার মনের কথাটাই বুঝতে চান, অথচ পারেন না। এমনকী আজকেও তিনি এক লহমার তরে অর্জুনের কাছে না এসে পারেননি, অন্তত এই বিপন্ন মুহূর্তে অর্জুন তাঁর কথা কী ভাবছেন, কতটা ভাবছেন— এই জানা তাঁর নিতান্ত প্রয়োজন। এসেই খোঁটা দিয়েছেন, অথচ অর্জুন কতটা নিরুপায় তা তিনি বোঝবার চেষ্টা করেননি।

বস্তুত দ্রৌপদীর ব্যাপারে অর্জুন যে শুধু এখনই নিরুপায় তা নয়। স্ত্রীবেশী বৃহন্নলা অজ্ঞাতবাসের ব্যবহারে— এখনই নিরুপায়, তা মোটেই নয়। এই উপায়হীনতার বন্ধন তাঁর জীবনে সেইদিন থেকে তৈরি হয়েছে, যেদিন তাঁর মা কুমোরশালার মধ্যে থেকে দ্রৌপদীকে না দেখেই বলেছিলেন— পাঁচ ভাই ভাগ করে নাও। ব্যাপারটা আরও একটু বুঝিয়ে বলি। প্রথম কথা, অর্জুন হলেন মহাভারতের উদাত্ত নায়ক। যুদ্ধবীর হিসেবে তিনি যতখানি বড়, ঠিক ততখানি বড় সংযমী হিসেবে। সংযমী কথাটা আমি খুব প্রসারিত অর্থে ব্যবহার করছি। মহাভারতের কথায় অর্জুনের যতগুলি পদক্ষেপ আছে, প্রত্যেকটি সংযমের মাহাত্ম্যে ভরা। যুদ্ধ কিংবা অন্যান্য জায়গাগুলো আপাতত বাদই দিলাম, কারণ সেখানে সমস্ত বড় কাজগুলিই তাঁর নীরব এবং আস্ফোটহীন সহায়তায় ঘটেছে। শুধু দ্রৌপদীর ক্ষেত্রটাই ধরি, তা হলেও দেখব— প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে নিজেকে বাঁধবার জন্যই কতবার রাশ টেনে ধরতে হয়েছে এবং এইভাবেই তিনি অন্য ভাইদের ভুল বুঝবার যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পেতে চেয়েছেন। অন্যদিকে সুন্দরী কৃষ্ণাকে দেখুন। পাঁচ ভাইকে আপন একক প্রেম ভাগ করে দেওয়ার বৈবাহিকভাবে তিনি দায়বদ্ধ। কিন্তু বাস্তবে তা করতে গিয়ে কারও প্রতি বাৎসল্য, কাউকে রসমধুর স্তোকবাক্য, আবার কারও প্রতি শুধুই কর্তব্য করে গেছেন। কিন্তু অর্জুনের ব্যাপারটা বুঝি আলাদা। বিবাহ-লগ্নেই যে লক্ষ্যভেদী বীরপুরুষকে তিনি আশ্চর্য বিস্ময়ে হৃদয় নিবেদন করেছিলেন, সেই মানুষকে কি ভাগের প্রেম দিলে চলে? কারণে অকারণে, জ্ঞানে অজ্ঞানে দ্রৌপদীর দিক থেকে তাই কখনও বা সামান্য আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে, যে আকুলতা অতি স্বাভাবিক এবং তা এতই সূক্ষ্ম যে বোঝাই যায় না, এতই গভীর যে একমাত্র ভাগ-বসানো সতর্ক স্বামী ছাড়া অন্য কারও পক্ষে তা ধরাই মুশকিল।

বস্তুত আমাদের দেশের সামাজিক পরিস্থিতিতে একজনের পাঁচটা বউ থাকতে পারত, কিন্তু এক বউয়ের পাঁচটা স্বামী থাকতে পারত না। কিন্তু এক স্বামীর পাঁচটা কেন, যদি দুটি বউও থাকে তাদের একজন ঠিক বুঝতে পারে যে অন্যতরের প্রতি কতটা রস বিতরণ হচ্ছে, তেমনি এক বউয়ের যদি পাঁচটা স্বামী থাকে তা হলে অন্য স্বামীরাও ঠিক বুঝতে পারেন যে, নিকষে কার কতটা রসলাভ হল। এঁদের মধ্যে তাঁর পক্ষেই বরং খানিকটা নির্লিপ্ত থাকা সম্ভব, যাঁর ভাগ্যে সত্যিই সেই রস-বিনোদন ঘটছে এবং এই ঘটনাই ঘটেছে অর্জুনের ক্ষেত্রে। দ্রৌপদীর প্রেম নিশ্চিত জেনেই তিনি সে প্রেমে অধিকতর নির্লিপ্ত; কিন্তু সমস্ত বাস্তবতার ফাঁক-ফোকর দিয়ে, ঔচিত্যের গণ্ডী পেরিয়ে অর্জুনের জন্য দ্রৌপদীর যে আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে, সে আকুলতা সামান্য হলেও তা ঠিক ধরা পড়েছে অন্য স্বামীদের কাছে। হ্যাঁ, এ-কথা ঠিক, দ্রৌপদীর বিবাহ থেকে আরম্ভ করে মহাভারতের প্রায় শেষাংশ পর্যন্ত এ-তথ্য কেউ প্রকাশ করেননি, পঞ্চপাণ্ডবের কেউ না। মনের কথা বুঝি

মনেই ছিল, হয়তো দ্রৌপদীর সামনে এ-কথা প্রকাশ করার ভয়ও ছিল। কিন্তু মহাপ্রস্থানপর্বে যে মুহূর্তে দ্রৌপদীর দেহান্ত হয়েছে সেই মুহূর্তে— আমাদের ধারণামতো— বউ ভাল মরলে আর চাকর ভাল পালালে— এই সুযুক্তি সহানুভূতি যুধিষ্ঠিরের ছিল না, সেই মুহূর্তে তিনি যেন ভাইদের প্রতিনিধি হয়ে বললেন— আমাদের সবার মধ্যে দ্রৌপদী সবচেয়ে ভালবাসত অর্জুনকে, তার ওপরেই ছিল দ্রৌপদীর গহন প্রেমের পক্ষপাত— পক্ষপাতো মহানস্যা বিশেষণে ধনঞ্জয়ে। যুধিষ্ঠির একটুও ভণিতা না করে দ্বিধাহীনভাবে বললেন— এই পক্ষপাতেরই ফল আজ পাচ্ছে দ্রৌপদী তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে— তস্যেতৎ ফলমদ্যৈষা ভুঙ্‌ক্তে পুরুষসত্তম।

অর্জুনকে বেশি ভালবাসত এবং তার ফল পেয়েছে, মরেছে— মৃত্যুর মুহূর্তে হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা যুধিষ্ঠিরের এই সত্যবচন তাঁকে যতই সত্যবাক ঋষির মতো করে তুলুক, মানুষের হৃদয়লোকে এ যেন নৃশংসতা। তা ছাড়া এই পক্ষপাত কতটুকু? নববধূর কুসুম-কল্পনা বারবার দলিত করে ভাবে ভঙ্গিতে আর বক্রোক্তিতে এই পক্ষপাত কতটুকু দেখাতে পেরেছেন দ্রৌপদী? আবার তিনি, যদি বা নিজের অভিমান-মঞ্চ থেকে নেমে এসে যতটুকু পক্ষপাত দেখাতে পেরেছেন, অর্জুনের দিক থেকে তারও সাড়া মেলেনি। একেবারে বিরাটপর্বে এসে অর্জুনকে তাই বলতে হয়েছে— কেউ কারও মন বোঝে না, আমাকেও তুমি বোঝ না— যেন মাং স নাববুধ্যসে।

কিন্তু নিজেকে না বোঝার মতো কারণ অর্জুন যদি নিজেও তৈরি করে না থাকেন, তবে পরিস্থিতি তো সত্যিই এমন তৈরি হয়েছিল, যা তাঁকে না বোঝার মতো। কৌরব-সভায় সেই চরম অপমানের দিনে দ্রৌপদীর তো মনে হয়েই থাকতে পারে যে, অর্জুন তাঁর প্রতি নিতান্তই নির্বিকার। অর্জুন যেন তাঁর হয়ে একটুও কথা বলছেন না। যেখানে ভীম দ্রৌপদীর অপমানে একের পর এক প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছেন, তার প্রতিতুলনায় গাণ্ডীবধন্বাকে তাঁর নিতান্ত অপ্রতিভ মনে হল। ভীম রাগের চোটে জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের হাত পুড়িয়ে দিতে চাইছিলেন, অর্জুনই তাঁকে বারণ করেছেন। এ-সব ব্যবহার দ্রৌপদীর কাছে প্রীতিপ্রদ হয়নি। হয়তো সাধারণ সাংসারিকতায় অথবা নিতান্তই রমণীজনোচিত অভিমানে।

দ্রৌপদী বুঝতে পারেননি, যিনি মহাযুদ্ধের নায়ক হবেন, তাঁর মাথাটি ভীমের মতো হলে চলে না। অর্জুনের যুক্তি ছিল—যুধিষ্ঠির পাশা খেলতে আসেননি। ক্ষত্রিয় ধর্মের নিয়ম অনুসারে পাশা খেলায় আহূত হলে তাকে খেলতেই হবে। সেখানে যুধিষ্ঠিরের দোষ কী? অর্জুন ভীমকে বলেছেন—নিজেদের মধ্যে বাদ-বিসংবাদে শত্রুরই আখেরে লাভ হবে। সেই সুযোগ আপনি করে দেবেন না দাদা—ন সকামাঃ পরে কার্যাঃ। ভীম যুক্তি বুঝেছেন। তবু অর্জুনের এই স্থিরতা, ধৈর্য্যের চেয়ে ভীমের হঠাৎ-ক্রোধই দ্রৌপদীর কাছে বেশি ভাল লেগেছে। অর্জুনের ওপর অক্ষমা তাই বেড়েই যাচ্ছিল। কিন্তু মুখের এই ক্ষমাহীনতার সঙ্গে দ্রৌপদীর হৃদয়ের মিল নেই। সেখানে বারবার অর্জুনের প্রেমিকা হিসেবেই তিনি ধরা পড়ে যান। বনবাস-পর্বে পাণ্ডবেরা যখন দ্বৈতবন ছাড়ার মুখে, তখন ব্যাস এসে প্রতিস্মৃতি বিদ্যা দিয়ে গেলেন যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে সেই বিদ্যা শিখিয়ে তপস্যায় যেতে বললেন, যে তপস্যায় তুষ্ট হবেন ইন্দ্র এবং মহাদেব। অর্জুন জ্যেষ্ঠের আদেশ নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চললেন। ব্রাহ্মণেরা আশীর্বাদ করলেন—ধ্রুবোঽস্তু বিজয়স্তব। হতভাগিনী দ্রৌপদী আবার ধরা পড়ে গেলেন।

অর্জুনের আসন্ন প্রবাস বেদনায় দ্রৌপদীর মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। সব ভাইয়ের সামনেই তিনি অর্জুনের জন্য জমে থাকা ভালবাসা উজাড় করে দিলেন। বুঝি বিদগ্ধা রমণীর ভালবাসার এই রীতি। মুখে তাঁর প্রতি প্রসন্ন নন, অথচ বাড়ি থেকে তিনি যে চলে যাবেন, তারও উপায় নেই—চলে যেতে চাইলেই অভিমানে ভরা একরাশ দুঃখ হাঁড়ি-মুখ থেকে গলগল করে বেরিয়ে পড়ে। দ্রৌপদী বললেন—মহাবাহু! তুমি জন্মানোর পরে আর্যা কুন্তী তোমার কাছে যা চেয়েছিলেন এবং যেমনটি তুমিও চাও, ঠিক তেমনটিই যেন তোমার হয়, অর্জুন! ঠিক এই শুভাকাঙ্ক্ষার পরেই দ্রৌপদীর গলা থেকে বেরিয়ে এল আক্ষেপের সুর—প্রার্থনা করি, কারও যেন আর ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম না হয়—মাস্মাকং ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম কশ্চিবদবাপ্নুয়াৎ। ভিক্ষা করে যাঁরা জীবিকা নির্বাহ করেন, সেই ব্রাহ্মণেরা আমাদের চেয়ে অনেক ভাল আছেন, তাঁদের আমি নমস্কার করি—ব্রাহ্মণেভ্যো নমো নিত্যং যেষাং ভৈক্ষ্যেণ জীবিকা।

ক্ষত্রিয় রমণীর মুখে এ কী কথা? না, আমরা বুঝি, আমরা দ্রৌপদীর দুঃখ বুঝি। সেই যে নববধূর আবেশ না ঘুচতেই ব্রাহ্মণের গোরু উদ্ধার করতে অর্জুনকে ছুটে যেতে হল, আর বনবাস জুটল কপালে, সে ক্ষত্রিয় বলেই তো; রাজসভায় পাশাখেলার আসরে অপমান হতে হল দ্রৌপদীকে, তাও—তো ক্ষত্রিয়নীতির বালাই নিয়ে। আবার এখন যে অর্জুনকে প্রবাসে তপস্যায় যেতে হচ্ছে, তাও তো ক্ষাত্রযুদ্ধে চরম জয়লাভের জন্য। এর থেকে বামুন হয়ে জন্মালে, দু'বেলা দু'মুঠো ভিক্ষার অন্ন মুখে দিয়ে, বামুন ঠাকুরের ত্রিসন্ধ্যা-তপস্যার ব্যবস্থা করে দিলেই তো ল্যাঠা চুকত। অন্তত তিনি তো কাছেই থাকতেন, কোনওদিন কর্মহীন অবকাশে দীর্ঘশ্বাস ফেলে দিন কাটাতে হত না দ্রৌপদীকে। কিন্তু দ্রৌপদীর মুশকিল হল—কৌরবসভায় যে অপমান তাঁকে সইতে হয়েছিল তার চরম প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অর্জুনকে ছেড়ে দিতেই হবে, আবার অন্যদিকে তাঁকে ছেড়ে থাকতে তাঁর বনবাসের জীবন হয়ে উঠবে বিরহে বিধুর। চার স্বামী কাছে থাকতেও শুধু অর্জুন না থাকার মানে যে আলাদা। দ্রৌপদী বললেন—কুরুসভায় দুর্যোধন আমাকে বলেছিল 'গোরু'। আমি না হয় 'গোরু'ই হলাম, কিন্তু সেই বাচিক অপমান আর দুঃখ থেকে, তুমি অর্জুন—আমার কাছে থাকবে না—এ দুঃখ আমার কাছে আরও অনেক বড়—তস্মাদ্ দুঃখাদ্ ইদং দুখং গরীয় ইতি মে মতিঃ। তুমি চলে গেলে তোমার ভাইয়েরা হয়তো তোমার বীরত্বের কথা কয়েই দিন কাটাবে; কিন্তু আমার কী থাকল—তুমি প্রবাসে কষ্ট করবে, সেই অবস্থায় কোনও সুখ, কোনও ভোগ এমনকী জীবনও আমার কাছে অসহ্য লাগবে। আমাদের সুখ, দুঃখ, জীবন, মরণ, রাজ্য, ঐশ্বর্য—সব, সব তোমাতেই নির্ভর। কাজেই তোমাকে বিদায় দিতেই হবে, হে বন্ধু বিদায়। নমো ধাত্রে বিধাত্রে চ—প্রার্থনা করি তোমার প্রবাসের দিন সুখের হোক, তুমি নীরোগ থাক—স্বস্তি গচ্ছ হ্যনাময়ম্।

ব্যাস লিখেছেন—দ্রৌপদী অর্জুনকে এই 'আশীর্বাদ' করে থামলেন—এবমুক্ত্বাশিষঃ কৃষ্ণা বিররাম যশস্বিনী। দ্রৌপদী কি তখন যুধিষ্ঠির কিংবা ভীমের বউ হয়ে ছিলেন যে, এই শব্দটি—আশীর্বাদ? হয়তো তাই, নয়তো নয়—ব্যাস স্বকণ্ঠে কিছু বলেননি। কিন্তু

অভিজ্ঞতায় দেখেছি অর্জুনের বনবাস, প্রবাস—সবকিছুই ঘটে, যখন তিনি অন্য পাণ্ডবের ঘরণী—হয়তো এখানেও তাই হবে, হয়তো দুঃখ তাই বেশি। কৃষ্ণার এত কথা, এত শুভাশংসার উত্তরে অর্জুন কিন্তু একটি কথাও বলেননি। যদি বলতেন, তাহলে ভাইদের সতীন-হৃদয়ে তার ছায়া পড়ত এবং মৃত্যুর পরও তাঁকে শুনতে হত—অর্জুন কৃষ্ণার প্রতি বেশি অনুরক্ত ছিল। কিন্তু অর্জুন না হয় ধীরোদাত্ত নায়ক পুরুষ, কিছু বললেন না, কিন্তু দ্রৌপদীর স্ত্রীহৃদয় কি বশে আনা যায়! একবার, যেমন এখন, তিনি অর্জুনের ওপর তাঁর পক্ষপাত প্রকাশ করে ফেললেন, তেমনি অর্জুনের প্রবাস-পর্বে তিনি নিজেকে নিজেই একেবারেই ধরে রাখতে পারেননি।

অর্জুন যখন তপস্যার জন্য চলে গেলেন তখনও পাণ্ডবেরা কাম্যকবনে। তাঁরা কিছুদিন ব্রাহ্মণদের মুখে নল-দময়ন্তীর কাহিনি শুনে দিন কাটালেন, কিন্তু অর্জুন ছাড়া কারও ভাল লাগছিল না, এমনকী মহাভারতের শ্রোতা যে তরুণ ছেলেটি—জন্মেজয়, অর্জুন যার সাক্ষাৎ প্রপিতামহ, সে পর্যন্ত বৈশম্পায়নকে বলল— অর্জুনকে বাদ দিয়ে আমার আর আর পিতামহেরা কী করছিলেন? সুভদ্রার গর্ভ-পরম্পরায় যার জন্ম সেই জন্মেজয়ও কি দ্রৌপদীর ধরা পড়ার আন্দাজ পেয়েছিলেন কোনও? মহর্ষি বৈশম্পায়ন একটু বললেন অন্য পাণ্ডবদের কথা। তাঁরা সুতোছেঁড়া মণিমালার মতো ছন্নছাড়া আর ডানাকাটা পাখির মতো ছন্দোহীন হয়ে পড়েছেন। সবাই শোকার্ত, অহৃষ্টমনসঃ, কিন্তু পাঞ্চালী-দ্রৌপদীর অবস্থা যেন আরও খারাপ, অর্জুনকে স্মরণ করলেই জীবনের সবগুলো ফাগুন যেন একসঙ্গে তাঁর বুকের মধ্যে হা হা করে—অর্জুনকে যে তাঁর ভাল করে পাওয়াই হয়নি। ব্যাস তাই লিখলেন—বিশেষতস্তু পাঞ্চালী স্মরন্তী মধ্যমং পতিম্। পাঞ্চালী দুঃখ জানানোর লোক পেলেন না, বেছে বেছে যুধিষ্ঠিরকেই তিনি মনের ব্যথা বোঝাতে আরম্ভ করলেন। জ্যেষ্ঠ-স্বামীর মানসিক জটিলতা সম্পূর্ণ হল—দ্রৌপদী অর্জুনেরই।

দ্রৌপদী বললেন—মাত্র দুটি হাতেই অর্জুন আমার সহস্রবাহু কার্তবীর্যার্জুনের মতো শক্তিশালী। তাকে ছাড়া এই বনভূমি যে আমার কাছে শূন্য হয়ে গেছে, এই ফল-ফুল, নদী লতা সব শূন্য। সেই মেঘের মতো কালোপানা পেটা চেহারা, হাঁটলে মনে হবে হ্যাঁ হাঁটছে বটে, হাতি হাঁটছে। আর মনে পড়ছে তার নীল পদ্মের পাপড়ি হেন চোখ দুটি। সে ছাড়া এই কাম্যকবন আমার অন্ধকার। যার ধনুকের টঙ্কার শুনলে মনে হবে বাজ পড়ছে যেন—সেই পরবাসী অর্জুনের কথা ভেবে ভেবে একটু যে শান্তি পাচ্ছি না আমি—ন লভে শর্ম বৈ রাজন্ স্মরন্তী সব্যসাচিনম্।

অর্জুনের বীরত্ব, অর্জুনের চেহারা আর অর্জুন ছাড়া সুন্দরী অরণ্যভূমি—শূন্যামিব প্রপশ্যামি—দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের কাছে সম্পূর্ণ ধরা পড়ে গেলেন। কৃষ্ণার অর্জুন-বিলাপ শেষ হলে ভীম, নকুল এবং সহদেব তাঁরই সঙ্গে সুর মেলালেন বটে, কিন্তু সেই অধ্যায়ে ধর্মরাজের মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরল না। পরের অধ্যায়ে দেখতে পাচ্ছি কৃষ্ণা এবং ভাইদের সম্মিলিত হাহাকার শুনে যুধিষ্ঠিরও কিঞ্চিৎ বিমনা হলেন—শ্রুত্বা বাক্যানি বিমনা ধর্মরাজোঽপ্যজায়ত। যুধিষ্ঠিরও অর্জুনের জন্যে বিলাপ করেছেন, তবে সে পরে, ভাইদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে নয়। আমি বিশ্বাস করি প্রধানত দ্রৌপদীর উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা দেখেই পরবর্তী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়ে যুধিষ্ঠির এবং তাঁর ভাইয়েরা অর্জুনকে কৈলাস পর্বতের দুর্গম পথে খুঁজতে বেরলেন। যুধিষ্ঠির পথ-পরিশ্রমের কারণে কৃষ্ণাকে রেখেই যেতে চেয়েছিলেন, সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন শুধু নকুলকে। কিন্তু ভীম দ্রৌপদীর মন বুঝেই জবাব দিলেন—সে হয় না, দ্রৌপদী সত্যিই ক্লান্ত। কিন্তু অর্জুনকে দেখতে না পেয়ে তিনি তো দুঃখও পাচ্ছেন বটে এবং প্রিয়দর্শন লালসা যেহেতু শ্রমক্লান্ত শরীরকেও টেনে নিয়ে চলে, তাই দ্রৌপদী অর্জুনকে দেখার ইচ্ছে সামলাতে পারবেন না, তিনি যাবেনই—ব্রজত্যেব হি কল্যাণী শ্বেতবাহদিদৃক্ষয়া।

সার্থক প্রেমিক ছাড়া প্রিয়ার মনের কথা এমন করে কে বুঝবে? ভীম দ্রৌপদীকে ভালবাসেন বলেই তাঁর ভালবাসার পাত্রকে এমন করেই জুগিয়ে দিতে পারেন। ভীম বললেন—দুর্গম স্থানে আমি কাঁধে করে নিয়ে যাব দ্রৌপদীকে—অহং বহিস্যে পাঞ্চালীং যত্র যত্র ন শক্ষ্যতি। এইবার এতক্ষণে দ্রৌপদীর মুখে হাসি ফুটল—প্রহসন্তী মনোরমা। যুধিষ্ঠিরকে সলজ্জে বললেন—আমার জন্য আপনি ব্যাকুল হবেন না, মহারাজ! আমি ঠিক পারব—গমিষ্যামি ন সন্তাপঃ কার্যো মাং প্রতি ভারত। ঠিক এই অর্জুনকে খুঁজবার পথেই দ্রৌপদীর সেই সুর-সৌগন্ধিকের বায়না। বায়না ভীমের কাছে। পাঠক! এটি উৎকট কিছু ভাববেন না। অর্জুনের প্রতি এতক্ষণ যে অতিরিক্ত পক্ষপাত দেখিয়েছেন পাঞ্চালী, তাতে যদি একান্ত অনুরক্ত ভীমের প্রতি অবিচার হয়, তাই তিনি নতুন কোনও কর্ম দিয়ে ধন্য করলেন অনুরাগীকে। কিন্তু লক্ষ করুন অর্জুনকে। পাঁচ বচ্ছর পরে অর্জুনের সঙ্গে দেখা হল পাণ্ডবদের এবং পাঞ্চালীর। অর্জুন চারভাইকে অভিবাদন জানালেন, অগ্রজদের প্রণাম করলেন, অনুজদের আশীর্বাদ। কিন্তু এতদিনের পথ-চাওয়া কৃষ্ণার সঙ্গে মিলিত হলেন যখন, অবিচারী ব্যাস সেই মুহূর্তটিকে তপ্ত আলিঙ্গনে ধরে রাখতে পারেননি। রাখবেন কী করে? অর্জুনই যে সেরকম নন। দ্রৌপদী নিশ্চয়ই কাঁদছিলেন, হয়তো অনেক আশা ছিল। কিন্তু অর্জুন কী করেন, তিনি আপন প্রণয়িনীকে কোনওমতে সান্ত্বনা দিলেন—সমেত্য কৃষ্ণাং পরিসান্ত্ব্য চৈনাম্—এর বেশি কিছুই তাঁর পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। আর যদি করতেন তা হলে মৃত্যুর পরে যুধিষ্ঠিরের মুখে সেই বাণী শুনতে হত—দ্রৌপদীর প্রতি অর্জুনের বেশি পক্ষপাত ছিল।

আমরা বিরাট রাজার নৃত্যশালায় দ্রৌপদী আর অর্জুনের সংলাপ থেকেই অর্জুনের প্রসঙ্গে এসেছিলাম। অর্জুন বলেছিলেন—আমার মন তুমি বুঝলে না, ধনি। আমরা বলি, বুঝবার উপায় রাখলে কি? কৌরবসভায় দ্রৌপদীর অনুকূলে তুমি একটি কথাও বললে না। বনের মধ্যে জয়দ্রথ এলেন, তোমার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভীম, বিরাটের ঘরে কীচকেরা জ্বালাল, রক্ষা করলেন ভীম, তুমি তখনও উত্তরাকে নাচ শিখিয়ে চলেছ। অর্জুন! তুমি বলবে—দ্রৌপদীর বিপদে তুমি এগিয়ে আসার আগেই ভীম এত বেশি প্রাগ্রসর যে, তারপরেও তোমার এগিয়ে আসাটা বেমানান হত। আমরা বলি, হলেই কি, প্রেম দেখানোর রাস্তা তো ওইটাই। আসলে বল, তুমি যুধিষ্ঠিরের কাছে ধরা পড়ে যেতে—তুমি নির্লিপ্ত বীর সাজতে চেয়েছ এবং তা পেরেওছ। তোমার বিরুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের কোনও অভিযোগ নেই বটে, কিন্তু দ্রৌপদীর আছে, আমাদেরও আছে। দ্রৌপদীর মতো আমরাও তাই তোমাকে আশীর্বাদ করি—তুমি জন্মানোর সময় আর্যা কুন্তী যা চেয়েছিলেন এবং তুমিও যেমনটি

চাও, তুমি যেন তাই পাও, অর্জুন—তৎ তেহস্তু সর্বং কৌন্তেয় যথা চ স্বয়মিচ্ছসি। তোমাকে আর আমার মন বুঝতে হবে না অর্জুন। দ্রৌপদীর ভালবাসার উত্তরে, তুমি যদি কোথাও ধরা পড়ে যেতে, সেই হত তোমার সত্য পুরস্কার। তা তুমি পারনি, কিন্তু ধরা-পড়া তুমি জান না তা তো নয়। কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রার কাছে তুমি বেশ বাঁধা। দ্রৌপদীর আগেই তার গর্ভে তোমার পুত্র হয়েছে এবং সেই পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষা হয়েছে সযত্নে। দ্রৌপদীর গর্ভে তোমার পুত্র অবহেলিত, তার নামও শোনা যায় না। বিরাট রাজা যখন উত্তরার বিবাহ সম্বন্ধ করলেন তখন তাকে তোমার দ্রৌপদী-গর্ভজাত পুত্র শ্রুতকর্মার জন্য গ্রহণ করলেই পারতে, অভিমন্যুর জন্য কেন? পট্টমহিষী দ্রৌপদীর সমস্ত পুত্রগুলির মৃত্যুও হয়েছে এমনভাবে, যা একটু বীরোচিত নয়। সবই দ্রৌপদীর ভাগ্য। অথচ সুভদ্রার ধারায় অভিমন্যু মারা গেলেও তাঁরই বংশ পরীক্ষিৎ, জন্মেজয় পাণ্ডবকুলের রাজ্যশাসন করেছেন। স্বামী এবং পুত্র—কোনওটাতেই চরম সুখ হয়নি দ্রৌপদীর। প্রায় সারা জীবনই রাজ্যহীন অথচ—শুধু পট্টমহিষীর উপাধিটা বয়ে বেড়ানো ছাড়া দ্রৌপদী আর কিছুই পাননি।

আসলে বিদগ্ধা এক রমণীর অধিকার স্বামীর পক্ষে অতি গৌরবের কথা। কিন্তু সে যদি অতি বিদগ্ধা হয় তাহলে স্বামী তাঁকে যতখানি ভালবাসেন তার চেয়ে বেশি ভয় পান। দ্রৌপদীকে অনেকেই ভয় পেতেন, স্বামীরাও। ব্যাতিরেক একমাত্র অর্জুন, কারণ তিনি নির্লিপ্ত। স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র পর্যন্ত তাঁর পুত্রদের সাবধান করে দিয়েছেন দ্রৌপদীর তেজস্বিতা সম্পর্কে। ঘোষযাত্রা পর্বে তিনি বলেছেন—দ্রৌপদী শুধু তেজেরই প্রতিমূর্তি—যজ্ঞসেনস্য দুহিতা তেজ এব তু কেবলম্। রাজমাতা কুন্তী, যিনি নিজেও প্রায় কোনওদিন রাজ্যসুখ ভোগ করেননি, তিনি অসীম প্রশয়ে তাঁর এই পুত্রবধূটিকে তেজস্বিনী দেখতেই ভালবাসতেন। অন্তত একজন স্ত্রীলোক হিসেবে পুত্রবধূর মর্যাদা সর্বক্ষণ তাঁর অন্তরশায়িনী ছিল। বনবাসে যাবার সময় দ্রৌপদীকে তিনি বলেছেন—আমি নিশ্চিন্ত, কারণ পতিব্রতার ধর্ম তোমায় শেখাতে হবে না। সত্যি কুন্তী নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু বনবাসের চোদ্দো বছরের মাথায় কৃষ্ণ যখন দূতীয়ালি করার জন্য কৌরবসভায় এসেছেন, তখন কৃষ্ণের দেখা পাওয়ামাত্র তিনি যেমন তাঁর প্রিয় পুত্রদের জন্য বিলাপ করেছেন, তেমনি করেছেন পুত্রবধূ দ্রৌপদীর জন্য। কুন্তী বলেছেন—প্রিয় পুত্রদের থেকেও দ্রৌপদী আমার কাছে প্রিয়তরা—সর্বৈঃ পুত্রৈঃ প্রিয়তরা দ্রৌপদী মে জনার্দন। সে নিজের পুত্রস্নেহ জলাঞ্জলি দিয়ে স্বামীদের সঙ্গে কষ্ট করা বেশি ভাল মনে করেছে। কুন্তী তাঁর উপাধি দিয়েছেন—ঈশ্বরী সর্বকল্যাণী। স্ত্রীলোক হিসেবে কুন্তীর কাছে দ্রৌপদীর মর্যাদা যে কতখানি, সেটা বোঝা যায় কুন্তী যখন কৃষ্ণকে বলেন—যেদিন কৌরবসভায় আমি দ্রৌপদীর অপমান দেখেছি, সেদিন থেকে কি যুধিষ্ঠির, কি ভীম, কি অর্জুন, নকুল, সহদেব—কাউকে আমি আর প্রিয় বলে ভাবতে পারি না। কুন্তী দ্রৌপদীর অপমানে এতখানি অপমানিতা বোধ করেন যে, পাশাখেলায় যুধিষ্ঠিরের হার, রাজ্য হারানো এমনকী পুত্রদের নির্বাসন পর্যন্ত তাঁর সইতে পারে, কিন্তু রাজসভায় দ্রৌপদীকে খারাপ কথা বলা—এ তাঁর সয় না—ন দুঃখং রাজ্যহরণং ন চ দ্যূতে পরাজয়ঃ।...যত্তু সা বৃহতী শ্যামা একবস্ত্রা সভাং গতা। অশৃণোৎ পরুষা বাচঃ কিংনু দুঃখতরং ততঃ।

কুন্তীর এই অভিমানী মর্যাদাবোধ দ্রৌপদীর অন্তরে সর্বক্ষণ অনুস্যূত ছিল। তিনি মুখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যতই বলুন না কেন—ক্ষত্রিয়কুলে যেন আর কারও জন্ম না হয়, দ্রৌপদী ছিলেন সেই মানের ক্ষত্রিয়রমণী যিনি কোনও কিছুর মূল্যেই মান খোয়াতে রাজি নন। বাস্তব জীবনে তিনি যতখানি প্রেমিকা বা কুলবধূ, তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষাত্র তেজে তেজস্বিনী। সে তেজ এমনই যে তা প্রায় তাঁর পুরুষস্বামীদের সমান্তরাল। যেদিন থেকে তাঁর অপমান হয়েছে সেদিন থেকে প্রতিশোধ-স্পৃহাই তাঁর ধ্যান এবং জ্ঞান। মহাভারতের শল্যপর্বে এসে দেখেছি—যখন একে একে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের মতো প্রধান সেনাপতিরা মারা গেছেন, মারা গেছেন দুর্যোধনের ভাইয়েরা, কুলগুরু কৃপাচার্য তখন সন্ধি করবেন না। তাঁর অনেক যুক্তির মধ্যে একটি হল দ্রৌপদী। এতদিনে দুর্যোধনের বোধ হয়েছে যে, রাজসভায় দ্রৌপদীর যে অপমান তাঁরা করেছিলেন, সে অপমানের শোধ না হওয়া পর্যন্ত পাণ্ডবেরা কেন, স্বয়ং দ্রৌপদীই ছাড়বেন না। দুর্যোধনের কাছেই আমরা শুনেছি যে, অপমানের পরের দিন থেকেই দ্রৌপদী নাকি প্রতিশোধ-স্পৃহায় আপন স্বামীদের জয়লাভের জন্য তপশ্চরণ করছেন এবং সেই তপস্যার অঙ্গ হিসেবে সেদিন থেকেই তিনি নাকি মাটিতে শোন। দ্রৌপদী মাটিতে শোবেন ততদিনই, যতদিন না মূলশত্রু দুর্যোধনের অন্ত হচ্ছে—স্থণ্ডিলে নিত্যদা শেতে যাবদ্ বৈরস্য শাতনম্।

এই হচ্ছেন দ্রৌপদী। শুধু 'প্রাজ্ঞা' 'পাণ্ডিত্য' কিংবা 'মনস্বিনী' নন, আগুনের মতো তেজস্বিনী। অজ্ঞাতবাসের শেষে যেখানে কৌরবদের সঙ্গে কথাবার্তার 'স্ট্র্যাটিজি' ঠিক করা হচ্ছে, সেদিন পঞ্চপাণ্ডবদের মধ্যে একমাত্র সহদেব ছাড়া চারজনই, এমনকী ভীমও সন্ধির সুরে কথা বলেছিলেন। অন্তত ভীমের আচরণ দেখে দ্রৌপদী তো কিঞ্চিৎ হতাশই হয়ে পড়লেন—ভীমসেনঞ্চ সংশান্তং দৃষ্ট্বা পরমদুর্মনাঃ। সেদিন এই কনিষ্ঠ স্বামীকেই সহায় করে—সম্পূজ্য সহদেবঞ্চ—দ্রৌপদী কৃষ্ণের কাছে তাঁর প্রতিশোধের বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। দুঃশাসনের হাত-ছোঁয়ানো দ্রৌপদীর চুল—অসিতায়তমূর্ধজা—সর্বজনের অভিজ্ঞানের জন্য সেদিন খোলাই ছিল। দ্রৌপদী আজকে আবার রাজনীতির পাকা আলোচনায় সামিল। অনেক কথার মধ্যে দ্রৌপদী বললেন—যুধিষ্ঠির মাত্র পাঁচখানি গ্রাম চেয়ে দুর্যোধনের সঙ্গে সন্ধি চাচ্ছেন, তাও যেন লজ্জার সঙ্গে—হ্রীমতঃ সন্ধিমিচ্ছতঃ। মনে রেখ কৃষ্ণ! দুর্যোধন যদি ঈপ্সিত রাজ্য না দেন, তাহলে যেন খবরদার সন্ধি করতে যেয়ো না, দুর্যোধন করতে চাইলেও না—সন্ধিমিচ্ছেন্ন কর্ত্তব্যস্তত্র গত্বা কথঞ্চন। তাদের ওপরে তোমার দয়া দেখানোর দরকার নেই। যেখানে মিষ্টি কথায় কাজ হয় না, সেখানে দণ্ড দিতে হয় এবং এই পাপিষ্ঠদের দরকার মহাদণ্ড—তস্মাত্তেষু মহাদণ্ডঃ ক্ষেপ্তব্যঃ ক্ষিপ্রমচ্যুত।

পরপর খানিকটা ওজস্বিনী বক্তৃতা দিয়ে দ্রৌপদী এবার করুণরসের ছোঁয়া লাগালেন রমণীর অস্ত্র হিসেবে। বললেন, কৃষ্ণ! তোমাকে ভাল করেই বলছি, হয়তো বা পুনরুক্তিও হচ্ছে, কিন্তু সীমন্তিনী কুলবধূর দুর্দশা আমার মতো আর কার হয়েছে বলতে পার! যজ্ঞের আগুন থেকে আমার জন্ম, মহারাজ দ্রুপদের মেয়ে আমি। ধৃষ্টদ্যুম্নের বোন আর তোমার না আমি বন্ধু—তব কৃষ্ণ প্রিয়া সখী। আজকে মহারাজ পাণ্ডুর কুলবধূ হয়ে, পাঁচটা বীর স্বামী থাকতে এবং পাঁচটা ছেলে থাকতেও কৌরবসভায় আমাকে সেই অপমান সইতে হল? এই পাণ্ডবদের শরীরে যেন তখন রাগ বলে কিছু ছিল না, তাঁরা কোনও চেষ্টাও করেননি আমাকে

বাঁচাবার। তারা শুধু স্থাণু সাক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার অপমান দেখছিলেন—নিরমর্ষেষু অচেষ্টেষু প্রেক্ষমাণেষু পাণ্ডুষু। ধিক্ এই অর্জুন আর ভীমকে যদি এঁরা থাকতেও দুর্যোধন আর এক মুহূর্তও বেঁচে থাকে—যত্র দুর্যোধনঃ কৃষ্ণ মুহূর্তমপি জীবতি।

লক্ষণীয়, দ্রৌপদী যেখানে নিজেকে করুণার যোগ্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন, সেখানে তাঁর করুণ-রসাত্মক বাক্যগুলির মধ্যেও ওজস্বিতার ছোঁয়া লাগে। প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক শব্দে প্রতিহিংসার ফুলকি ছড়িয়ে দ্রৌপদী মাথা ঝাঁকিয়ে তাঁর বাম বাহুতে নিয়ে এলেন আপন কুঞ্চিত কেশদাম। বেণী করা থাকলেও সে চুলের কোঁকড়ানো ভাব, ঘনত্ব অথবা সুবাস—কোনওটাই চাপা দেওয়া যাচ্ছে না। সেই বিশাল বেণী-ভুজঙ্গিনীকে কৃষ্ণা তুলে নিলেন তাঁর বাম হাতে—মহাভুজগবর্চসম্। কেশপক্ষং বরারোহা গৃহ্য বামেন পাণিনা। সেই কুটিল কেশদামের মধ্যে বিষধর সর্পের অভিসন্ধি আরোপ করে দ্রৌপদী আকুল, জলভরা চোখে আস্তে আস্তে কৃষ্ণের কাছে এলেন। প্রস্ফুটিত পদ্মের পাপড়ির মতো আয়ত চোখে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে পাণ্ডব-ঘরণী কৃষ্ণা বললেন—এই সেই চুল, কৃষ্ণ! যে চুলে হাত লাগিয়েছিল দুঃশাসন। তোমার সন্ধি করার ইচ্ছে প্রবল হলে তুমি শুধু এই আমার চুলের কথা মনে রেখ—স্মর্তব্যঃ সর্বকার্যেষু পরেষাং সন্ধিমিচ্ছতা।

বক্তৃতায় এই অলংকার-পর্বের পর এবারে 'আলটিমেটাম্'। দ্রৌপদী বললেন ভীম আর অর্জুনকে তো দেখছি যুদ্ধের ব্যাপারে একেবারে যেন মিইয়ে গেছে, তারা যেন এখন সন্ধির জন্যই সজ্জিত। আমি বলছি—তাঁরা যদি যুদ্ধ করতে না চান, তাহলে জানবে—যুদ্ধ করবেন আমার বৃদ্ধ পিতা, যুদ্ধ করবেন আমার ভাইয়েরা—পিতা মে যোৎস্যতে বৃদ্ধঃ সহ পুত্রৈর্মহারথৈঃ। যুদ্ধ করার লোক আছে আরও। আমার পাঁচটি ছেলে তাদের মায়ের সম্মান রক্ষা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে, আর তাদের নেতৃত্ব দেবে কুমার অভিমন্যু—অভিমন্যুং পুরস্কৃত্য যোৎস্যন্তে কুরুভিঃ সহ।

দ্রৌপদী যাঁদের নাম করলেন, তাঁদের ওপর তাঁর অধিকার একান্ত। এমনকী অর্জুন যতই সুভদ্রা-সোহাগী হন না কেন, সুভদ্রার ছেলে অভিমন্যুর ক্ষমতা ছিল না তার বড়-মায়ের আদেশ অমান্য করার। কাজেই দ্রৌপদী স্বামীদের কাছে তাঁর প্রেমের যথাযথ মূল্য না পেলেও তাঁর ওজস্বিতার সম্মান, ব্যক্তিত্বের সম্মান সব সময় পেয়েছেন। নিজের ছেলেদের নেতৃত্বে কুমার অভিমন্যুকে স্থাপন করার মধ্যে ওই ওজস্বিতার সঙ্গে স্নেহধারা মিশেছে। হয়তো এই স্নেহধারা কৃষ্ণা পাঞ্চালীর অন্তরতম অর্জুনের প্রিয়তম পুত্র বলেই। তবু এই স্নেহ যে কতটা ছিল—তা স্বয়ং যুধিষ্ঠিরও ইয়ত্তা করতে পারেননি, যতখানি করেছেন সেই অর্জুন এবং তাও হয়তো বিদগ্ধা রমণীর অন্তর বিদগ্ধজনে বোঝে বলেই। প্রসঙ্গ থেকে সরে এসেও বলতে বাধ্য হচ্ছি—ওজস্বিতার মতো কঠিন গুণের প্রতিতুলনায় স্নেহ বড় বিরুদ্ধ বস্তু হলেও ব্যাঘ্রিনীর পুত্রের জন্য ব্যাঘ্রিনীর মমতা মোটেই অকল্পনীয় নয়। অভিমন্যু যখন সপ্তরথীর চক্রান্তে প্রাণ দিলেন, তখন যুধিষ্ঠির প্রচুর বিলাপ করেছিলেন। সেই সখেদ বিলাপোক্তির মধ্যে যুধিষ্ঠির বারবার এই কথা বলেছেন যে, তিনি অর্জুনের সামনে মুখ দেখাবেন কী করে! কী করেই বা তিনি অভিমন্যু-জননী সুভদ্রার মুখের দিকে চাইবেন—সুভদ্রাং বা মহাভাগাং প্রিয়ং পুত্রমপশ্যতীম্।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু অর্জুনকে বলতে হয়নি। প্রিয় পুত্রটি যখন সামনে এসে দাঁড়াল না, যুদ্ধ শিবির থমথম করছে, তখনই অর্জুন বুঝেছিলেন—অভিমন্যু যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। কেমন করে সেই পুত্রের মৃত্যু ঘনিয়ে এল—সেটা সবিশেষ জিজ্ঞাসা করার প্রথম মুহূর্তেই অভিমন্যুর প্রিয়ত্বের সম্বন্ধগুলি স্মরণ করলেন অর্জুন। বললেন—কেমন করে মারা গেল সেই বালকটি, যে শুধু সুভদ্রাই নয়, দ্রৌপদী এবং কৃষ্ণের প্রিয় পুত্র—সুভদ্রায়াঃ প্রিয়ং পুত্রং দ্রৌপদ্যাঃ কেশবস্য চ। এরপর আবার যখন অর্জুনের বিলাপোক্তির মধ্যে নিজের প্রতি ধিক্কার আসছে—প্রিয় পুত্রকে বাঁচাতে পারেননি বলে, তখনও সবার কথা বাদ দিয়ে শুধু দুটি শোকার্তা রমণীর মুখ তাঁকে পীড়ন করছে। কিন্তু শোক-ক্লিষ্ট অবস্থার মধ্যেও এই দুই রমণীর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য অর্জুনের নজর এড়ায় না। অভিমন্যুর প্রতি ভালবাসার ক্ষেত্রে অর্জুন এই দুই নারীর নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করেন, কিন্তু তবুও তার মধ্যে বলতে ভোলেন না—অভিমন্যুকে না দেখে সুভদ্রা আমায় কী বলবে? আর শোকার্তা দ্রৌপদীকে আমিই বা কী বলব?—সুভদ্রা বক্ষ্যতে কিং মাম্ অভিমন্যুম্ অপশ্যতা। দ্রৌপদী চৈব দুঃখার্তে তে চ বক্ষ্যামি কিং ন্বহম্।

'একজন আমায় কী বলবে, অন্যজনকে আমি কী বলব?' অর্থাৎ প্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে এই দুই নারী একইভাবে শোক সন্তপ্ত হবেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের মধ্যে প্রথমা সুভদ্রার শোকের আচ্ছাদন এতটাই যে, তিনি প্রিয় পুত্রের মৃত্যুর জন্য বারবার অর্জুনের কাছে নিরাশ্রয়তার আর শূন্যতার হাহাকার শোনাবেন। তাই অর্জুন বলছেন—সুভদ্রা আমায় কী বলবে? কিন্তু ওই পুত্রহীনার শত শূন্যতার মধ্যেও অন্যতরা রমণী তাঁকে প্রশ্ন করবে—তোমার এই শিব-স্পর্ধী ধনুষ্মত্তা নিয়ে বাসববিজয়ী বীরত্ব নিয়ে তুমি কী করছিলে, অর্জুন? তাই অর্জুনকে ভাবতে হয়—আমি দ্রৌপদীকে কী-ই বা বলব—তে চ বক্ষ্যামি কিং ন্বহম্। দ্রৌপদী এইখানেই দ্রৌপদী। বস্তুত অর্জুন এই অসম্ভব মৃত্যু-সংবাদ বহন করে এই দুই নারীর মুখোমুখি হতে পারেননি। আমার বক্তব্য ছিল—অসামান্য প্রেম, বা অকৃত্রিম স্নেহধারার মধ্যেও দ্রৌপদীর ব্যক্তিত্ব এমনই যে, অন্যায় এবং ক্ষত্রিয়ের শিথিলতায় তিনি প্রশ্ন না করে থাকবেন না। সুভদ্রা বিলাপ করবেন, গালাগালিও দেবেন, কিন্তু দ্রৌপদী প্রতিশোধ চাইবেন, জীবনের বদলে জীবন—আমি সুখে নেই, তুমিও সুখে থাকবে না।

আমি আমার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে যাই। দ্রৌপদী তাঁর স্বামীদের কাছে সার্থক প্রেমের মূল্য যতখানি পেয়েছেন, ব্যক্তিত্বের মূল্য পেয়েছেন তার চেয়ে বেশি। আর স্বামী ছাড়াও অন্য যাঁরা আছেন, তাঁরাও দ্রৌপদীর সাভিমান ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করতে পারেননি। ফলে কৃষ্ণের মতো অসাধারণ পুরুষকেও দ্রৌপদীর স্বাধিকার-বক্তৃতা সমস্ত গুরুত্ব দিয়ে শুনতে হয়েছে। সন্ধির আশ্রয় নিয়ে যে মহান দূত কৌরবসভায় যাচ্ছিলেন, তিনি পূর্বাহ্নেই দ্রৌপদীকে নিজের নামের মাহাত্ম্যটুকু ধার দিয়ে কবুল করে বসলেন—আজ তুমি যেমন করে কাঁদছ, কৃষ্ণা! ঠিক এমনই কাঁদবে কৌরবপক্ষের কুলবধূরা। স্বামী, পুত্র, ভাই, বন্ধু—সব হারিয়ে কাঁদবে এবং তা কাঁদবে শুধু তুমি তাদের ওপর রাগ করেছ বলে—যেষাং ক্রুদ্ধাসি ভামিনি। কত অসাধারণ বুদ্ধির অধিকারী এই কৃষ্ণ। তাঁর ধারণা—ভীম, অর্জুনের মতো মহাবীরদের সন্ধিকামুকতার পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যাই থাকুক, দ্রৌপদীর তাতে মন ভরবার কথা নয়, কারণ কুরুসভায় যে অপমান হয়েছিল তার বলি একমাত্র দ্রৌপদীই।

পাছে ভীম, অর্জুনের মতো স্বামীকে তিনি ভুল বোঝেন, তাই কৃষ্ণ বললেন—আমি যা বললাম, তা আমি এই ভীম অর্জুন কি নকুল-সহদেবকে সঙ্গে নিয়েই করব, স্বয়ং ধর্মরাজও সেই নির্দেশ দেবেন। কৃষ্ণ বললেন—আমার অনুরোধ যদি কৌরবেরা না শোনে, তাহলে শেয়াল-কুকুরের খাদ্য হয়ে রণভূমিতে মরে পড়ে থাকতে হবে তাদের। আজকে যদি হিমালয় পাহাড়ও চলতে আরম্ভ করে, পৃথিবীও যদি ফেটে যায় শতধা, আকাশও যদি তার নক্ষত্রবাহিনী নিয়ে ভেঙে পড়ে ভুঁয়ে, তবুও আমার কথা অন্যথা হবে না, কৃষ্ণা! তুমি আর কেঁদো না—কৃষ্ণে বাষ্পো নিগৃহ্যতাম্।

আবারও সেই সম্বোধন—কৃষ্ণা! নিজের নামের সমস্ত ব্যাপ্তি দ্রৌপদীর ডাক-নামে লিপ্ত করে কৃষ্ণের এই সম্বোধন—কৃষ্ণা। যুধিষ্ঠির যা পারেননি, অর্জুন-ভীম যা পারেননি, কৃষ্ণ তাই পারলেন। কেন পারলেন—সে কথায় পরে আসছি।

আমি আগেই বলেছি—দ্রৌপদী আগুনের মতো। কৌরবরা কৃষ্ণের প্রস্তাব মেনে নেননি। অতএব একদিন যে কুরুকুল ভীষ্ম, বিদুর এবং রাজমাতা সত্যবতীর বিচক্ষণতায় সংবর্ধিত হয়েছিল, সেই কুরুকুল দ্রৌপদীর ক্রোধের আগুনে আপনাকে আহুতি দিল। সংস্কৃতের নীতিশাস্ত্রে একটা লোকপ্রসিদ্ধ কথা চালু আছে। কথাটার মোদ্দা অর্থটা হল—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চতুর্যুগের এক একটিতে একেকজন অসামান্যা নারী জন্মেছেন, যাঁদের কারণে প্রচুর লোকক্ষয়, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং অশান্তি হয়েছে। নীতিশাস্ত্রকার এই নারীর নাম দিয়েছেন 'কৃত্যা'। 'কৃত্যা' শব্দটির অর্থের মধ্যে একটু হীনতা আছে, কারণ কৃত্যা মানে হল এক ধরণের অপদেবতা। কখনও বা যজ্ঞীয় অভিচার প্রক্রিয়ায় সেই অপদেবী নারীর উৎপত্তি হয় অপরের ধ্বংস সাধনের জন্য। এই শ্লোকটিতে অবশ্য কৃত্যা শব্দটি আরও একটু বিশদর্থে ব্যবহৃত। এখানে বলা হচ্ছে—সত্যযুগের কৃত্যা হলেন রেণুকা।

রেণুকা মহর্ষি জমদগ্নির স্ত্রী, পরশুরামের মা। ছেলে হয়েও পরশুরাম মাকে মেরেছিলেন, এইটাই তাঁর সম্বন্ধে বিখ্যাত কথা। বাবার কাছে বর লাভ করে পরশুরাম অবশ্য মাকে পরে বাঁচিয়ে ছিলেন।

এক সময় ক্ষত্রিয়কুলের বিশাল পুরুষ কার্তবীর্য-অর্জুন পাত্রমিত্র নিয়ে জমদগ্নির আশ্রমে আসেন। জমদগ্নি তাঁর কামধেনু সুশীলার সাহায্যে অতিথি-সংস্কার করেন বটে, কিন্তু ওই কামধেনুর ওপর কার্তবীর্যের লোভ হয়। মুনিও তাঁর হোমধেনু দেবেন না, রাজাও সেটা নেবেন। ফল হল এই যে, ব্রাহ্মণের সঙ্গে ক্ষত্রিয়কুলের যুদ্ধবিগ্রহ বেধে গেল। চলল আক্রমণ, পালটা আক্রমণ। জমদগ্নির দিক থেকে যুদ্ধ চালাতে লাগলেন পরশুরাম। তিনি কার্তবীর্যের হাজার হাত কেটে মেরে ফেললেন তাঁকে। ওদিকে পরশুরাম যখন বাড়ি নেই তখন কার্তবীর্যের ছেলে এসে জমদগ্নি মুনিকেই মেরে রেখে গেল। এই সময়ে জমদগ্নির স্ত্রী রেণুকা নাকি স্বামীর মৃত্যু যন্ত্রণায় একুশবার বুক চাপড়ে কেঁদেছিলেন। পুত্র পরশুরাম তখন বাধা দিয়ে মায়ের হাত ধরেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন একুশবার তিনি ক্ষত্রিয় নিধন করবেন। এই শুরু হল। পরশুরাম ক্ষত্রিয় মেরে রুধির হ্রদ তৈরি করে গেলেন। জমদগ্নির স্ত্রী রেণুকা এই একুশবার ক্ষত্রিয় নিধনের কারণ বলে সত্য যুগের কৃত্যা হলেন তিনি।

ত্রেতাযুগের কৃত্যা হলেন জনকনন্দিনী সীতা। সীতার কারণেই রামচন্দ্রের সাগর পার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে লঙ্কায় যাওয়া এবং রাবণ বধ। কবির মতে দ্বাপরের কৃত্যা হলেন দ্রৌপদী। কারণ তাঁকে অপমান করার ফলেই কুরুকুল উৎসাদিত হয়েছিল। সবার শেষে কবির মজাদার মন্তব্য—কলিকালে ঘরে ঘরে এই কৃত্যাদেবীরা আছেন, যাঁরা ঘর ভাঙেন—দ্বাপরে দ্রৌপদী কৃত্যা কলৌ কৃত্যা গৃহে গৃহে।

শ্লোকটা আমি উদ্ধার করলাম বটে, তবে এই শ্লোকের ভাবার্থের সঙ্গে আমার মতের মিল হয় না। প্রথমত দেখুন, কলিযুগের 'ঘর-পোড়ানি, পরভুলানি' সামান্যা নারীগুলির সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে দ্রৌপদীর নাম উচ্চারণ করায় আমার আপত্তি আছে। দ্বিতীয়ত জনকনন্দিনী সীতা রাবণ-বধের যত বড় নিমিত্তই হন না কেন, তাঁর সঙ্গেও দ্রৌপদীর কোনও তুলনা হয় না। আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের কুলক্ষয়ী যুদ্ধে রেণুকার একুশবার বুক চাপড়ানোটা এতই অকিঞ্চিৎকর যে, রেণুকাকে একটি গোটা যুগের ধ্বংস-প্রতীক বলে মেনে নিতে আমার যৌক্তিকতায় বাধে। আমার তো মনে হয় দ্বাপর-কলির সন্ধিলগ্নে এই যে বিরাট ভারত যুদ্ধ হয়েছিল, সেই যুদ্ধের নিমিত্ত হিসেবে দ্রৌপদী অত্যন্ত ব্যতিক্রমীভাবে উজ্জ্বল বলেই তাঁকে একটি যুগ-ধ্বংসের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করা অনেক বেশি সযৌক্তিক। অপিচ সেইটেই একমাত্র বেশি সযৌক্তিক বলে অন্যান্য যুগেও আরও এক একটি নারীকে শুধু খাড়া করে দেওয়া হল চতুর্যুগের শূন্যতা পূরণের জন্যই। নইলে দেখুন, সত্যযুগের রেণুকা বা কলিকালের ফাঁপা-চুলের রোম-দোলানো বিনোদিনীর কথা না হয় বাদই দিলাম, ত্রেতা যুগের সীতা লঙ্কার রাক্ষস ধ্বংসের যতখানি কারণ, রামচন্দ্র নিজেই তাঁর চেয়ে অনেক বেশি কারণ। রাবণ-বধের অন্তে সীতা উদ্ধারের পর রামচন্দ্র নিজেই প্রায় সে কথা স্বীকার করে বলেছেন—সমুদ্র লঙ্ঘন করে এসে অশেষ রণপরিশ্রমে রাক্ষস রাবণকে আমি যে শাস্তি দিয়েছি—তা তোমার জন্য নয় সীতা। তা সবটাই প্রখ্যাত রঘুবংশের কলঙ্ক-মোচনের জন্য, নিজের মান রক্ষার জন্য—ময়েদং মানকাঙ্ক্ষিণা। তবু অসামান্যা রূপবতী সীতাকে আমরা ত্রেতাযুগের কৃত্যা হিসেবে মেনে নিতে পারি, কারণ সীতাহরণ না হলে সেই বিরাট লঙ্কাকাণ্ড ঘটত না।

কিন্তু রাবণ সীতাকে হরণ করেছেন, তাতে সীতার দিক থেকে অক্ষম বিলাপোক্তি ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। তিনি অত্যন্ত পতিনির্ভর এবং সেই ভরসাই তাঁর কাজে লেগেছে। কিন্তু অনুরূপ পরিস্থিতিতে দ্রৌপদী পড়লে কী হত, তা সভাপর্বে বস্ত্র হরণের সময়েই টের পাওয়া গেছে। পাঁচটি স্বামীর একজনেরও সেখানে সঙ্গত কারণেই কথা বলার উপায় ছিল না। কিন্তু দ্রৌপদী নিজেও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। বস্ত্রাকর্ষণের হতচকিত মুহূর্তগুলির মধ্যেও তিনি কৌরবসভায় ধুন্ধুমার লাগিয়ে দিয়েছিলেন এবং সভা শেষ হয়েছে তাঁরই অনুকূলে। কাজেই সীতাহরণের বদলে দ্রৌপদী-হরণ হলে দ্রৌপদী যে নিষ্ক্রিয় থাকতেন না—তা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। অন্তত হনুমান পৌঁছনোর আগেই অশোকবনে যে ধুন্ধুমার লেগে যেত—তা বেশ অনুমান করা যায়।

তবু বলি, এই সব তাৎক্ষণিক প্রত্যাশা তো দ্রৌপদীর কাছে করাই যায়, কিন্তু এমনটাই দ্রৌপদী নয়। দ্রৌপদী আরও অনেক বড়। অন্তত সমস্ত, কুরুকুল-ধ্বংসের প্রতীক হিসেবে দ্রৌপদীকে চিহ্নিত করতে গেলে কুরুসভার মধ্যে তাঁর সর্বাঙ্গীণ অপমানই একমাত্র কারণ—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন একটা কথাও বড়ই অকিঞ্চিৎকর শোনাবে। মনে রাখা দরকার, মহাভারতের কবি যাঁকে 'মনস্বিনী' অথবা 'পণ্ডিতা' শব্দের উপাধিতে ভূষিত করেছেন, তিনি শুধু নারীর অপমানে ক্লিষ্ট হন না। পঞ্চস্বামীকেও তিনি শুধুমাত্র তাঁর একান্ত অপমানের দ্বারাই চালিত করেছেন—তাও আমি মনে করি না। মহাকাব্যের বিরাট পরিমণ্ডলে কুরুসভায় দ্রৌপদীর অপমান একটা খণ্ডচিত্র মাত্র। সেই অপমান থেকে উৎক্রমণ করার জন্য তাঁর বীরস্বামীদের সহায়তার প্রয়োজন হয়নি, তিনি একাই ছিলেন তার জন্য যথেষ্ট।

কুরুসভায় আসবার আগে যুধিষ্ঠির তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন 'একবস্ত্রা অধোনীবী' অবস্থায় শ্বশুর ধৃতরাষ্ট্রের সামনে এসে কেঁদে কেঁদে তিনি যেন তাঁর করুণা উদ্রেক করেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির তাঁকে চেনেননি। কুরুসভায় এসে তিনি যে নিজের জ্যেষ্ঠ-স্বামীকেই আইনের ফাঁদে ফেলে আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন অথবা আপন মনস্বিতায় শ্বশুরকে সন্তুষ্ট করে সেই ফাঁদে-পড়া জ্যেষ্ঠ-স্বামীকেই প্রথম মুক্ত করবেন কৌরবদের হাত থেকে—এসব কথা যুধিষ্ঠির ভাবতেই পারেন না। বিদগ্ধা রমণীর বিচিত্র হৃদয় বুঝতে পারেন না বলেই যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর কথায় কখনও থতমত খান, কখনও পুলকিত হন, কখনও সাতিশয় ক্রুদ্ধ হন, কখনও বা গালাগালিও দেন। কিন্তু এই যে 'কনফিউশন', এই দ্বিধাগ্রস্ততা—এর কারণও দ্রৌপদীর বৈদগ্ধ্যই। নারীত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্ব, পড়াশুনো এবং রাজনীতির জ্ঞান যদি একত্তর হয়ে যায়, তাহলে যে বিশালতা জন্মায়, সেই বিশালতা ধারণ করার ক্ষমতা যুধিষ্ঠিরের ছিল না। যাঁর ছিল, তিনি সে-পথে হাঁটেননি একান্ত ব্যক্তিগত কারণে—তিনি অর্জুন। আরও যাঁর ছিল—তিনি তাঁকে অবধারণ করেছেন বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি একটু ঘরের বাইরের লোক—তিনি কৃষ্ণ। তবু সে-কথা পরে।

দ্যূতক্রীড়ার উত্তর পর্বে যে দিন কৃষ্ণা পাঞ্চালী কুরুকুলের দাসপঙ্ক থেকে তাঁর পঞ্চ স্বামীকে উদ্ধার করে আনলেন—সেদিন দুর্যোধন-কর্ণরা বাঁকা হাসি হেসে বলেছিলেন—যারা জলে ডুবে মরছিল, আঁকড়ে ধরবার মতো কিছু ছিল না, সেই নিমজ্জমান পাণ্ডবদের দ্রৌপদী যেন নৌকার মতো এসে পার করে নিয়ে গেলেন—পাঞ্চালী পাণ্ডুপুত্রাণাং নৌরেষা পারগাভবৎ। কথাটা সেই মুহূর্তে যতই বাঁকা শোনাক, কথাটার মধ্যে গভীর সত্য আছে, এবং সে-সত্য স্বয়ং যুধিষ্ঠিরই পরে স্বীকার করেছেন। কর্ণের ওই কথা শুনে ভীম তো সেই মুহূর্তে রেগেমেগে অস্থির হয়েছিলেন, কিন্তু ওই একই কথা পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ স্বীকার করে নিয়েছিলেন পরে। যখন বনপর্বে স্বয়ং দ্রৌপদী এবং ভীমের কাছে তিনি তাঁর প্রশান্তি আর ক্ষমাগুণের জন্য গালাগালি খাচ্ছেন, তখন তিনি বলেছেন—তোমরা যে দু'জনে মিলে আমায় গালাগালি করছ, সেটা যত খারাপই শোনাক, তবু বেঠিক নয়। আমি যে অসম্ভব একটা অন্যায় করেছিলাম, তার কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে তোমাদের—মমানয়াদ্ধি ব্যসনং ব আগাৎ। আমার যথেষ্ট মনে পড়ে—যেদিন ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা কপট পাশায় জিতে আমাদের রাজ্য নিয়ে নিল, আমাদের মাথায় চাপিয়ে দিল দাস-দাসীর অপমান-পঙ্ক, সেদিন এই দ্রৌপদী—আমাদেরই এই দ্রৌপদীই, সবার প্রধান ভরসা হয়ে উঠেছিলেন—যত্রাভবচ্ছরণং দ্রৌপদী নঃ।

এত নির্ভরতার সুরে পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের এই যে স্তুতিবাদ—আপনারা কি মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন—এই স্তুতিবাদে দ্রৌপদী একটুও সম্মানিত বোধ করেছেন? আমি যতদূর এই মহাকাব্যের নায়িকাকে চিনেছি, তাতে আমার বোধ হয় না যে, কোনও অসাধারণ বিপৎকালে স্বামীদের তিনি রক্ষা করেছেন—এই গৌরববোধ তাঁকে মোটেই স্বস্তি দেয় না। বরঞ্চ বিপৎকালে স্বামীরা কেন তাঁকে রক্ষা করতে পারেননি, কেন স্বামীরা বেঁচে থাকতেও—জীবৎসু পাণ্ডুপুত্রেষু—তাঁকে অন্য পুরুষের হাতে চুলের মুঠি-ধরা সইতে হল—এই কৈফিয়ত তিনি বার বার চেয়েছেন। তিনি তো স্বামীদের শরণ বা আশ্রয় হতে চান না, কিন্তু স্বামীরা তাঁর অপমান চোখে দেখছেন—এই অবস্থাতেও—পঞ্চানাং পাণ্ডুপুত্রাণাং প্রেক্ষতাং—কেন তাঁর আশ্রয়স্থল হয়ে উঠতে পারেননি—এই অনাস্থা বিদগ্ধা রমণীর বুকে পীড়ার সঞ্চার করে। কর্ণের বাঁকা কথা শুনে ভীম যে রেগে গিয়েছিলেন, বরং তাও তাঁর ভাল লাগে। তিনি তবু তাতে সনাথ বোধ করেন; এই বোধ আছে বলেই কৌরবসভায় পঞ্চস্বামীর দাসত্ব-মুক্তির পর ধৃতরাষ্ট্র যখন আবারও বর দিতে চাইলেন, তখন তিনি বলেছিলেন—আমি আর কোনও বর চাই না। আমার স্বামীরা পাপকর্ম করে ফেলেছিলেন, কিন্তু এখন তাঁরা বিপদ থেকে উত্তীর্ণ—পাপীয়াংস ইমে ভূত্বা সন্তীর্ণাঃ পতয়ো মম। এঁদের মঙ্গল এখন এঁরা নিজেরাই বুঝবেন।

এক্ষুনি যে শ্লোকটা বললাম—আমার স্বামীরা নীচকর্ম পাপকর্ম করে ফেলেছিলেন, এখন তাঁরা বিপদ থেকে উত্তীর্ণ—এই শ্লোকে 'পাপীয়াংসঃ' শব্দের অর্থ টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন—কৌরবদের দাস্যে তাঁরা নীচভাবে অবনমিত হয়েছিলেন। কিন্তু পাপীয়াংসঃ মানে কি দ্রৌপদী শুধু তাঁদের দাসত্বে কষ্ট পেয়েছিলেন? আমার তো মনে হয়—পাণ্ডবদের দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকেও, তাঁর স্বামীরা যে উন্মুক্ত রাজসভার মধ্যে তাঁকে রক্ষা করতে পারলেন না, কুলবধূর লজ্জা নিবারণ করতে পারলেন না—এই অসহায়তার জন্যই তিনি বলেছেন—আমার স্বামীরা নীচকর্ম করে ফেলেছিলেন। যেভাবেই হোক এখন তাঁরা মুক্ত, কী করতে হবে—সেই মঙ্গল কর্ম তাঁদের আপন পুণ্যবলেই তাঁরা সাধিত করবেন—বেৎস্যন্তি চৈব ভদ্রাণি রাজন্ পুণ্যেন কর্মণা।

কী সেই পুণ্য কর্ম, যার দ্বারা নিজেদের মঙ্গল সাধন করবেন তাঁর স্বামীরা? এই পুণ্য নিশ্চয়ই যজ্ঞে আহুতি দেওয়া অথবা ব্রাহ্মণের যজ্ঞ-তপস্যা নয়, ক্ষত্রিয়ের কাছে এই পুণ্য হল তার শক্তি, যে শক্তির দ্বারা সে অন্যায়কে দমন করে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করে। দ্রৌপদী যে স্ত্রী-রক্ষায় অক্ষম স্বামীদের পাপী হয়ে পড়াটা দেখেছিলেন, তাতেও তিনি ততটা আহত হননি, যতটা হয়েছেন পরবর্তী সময়েও নিজের ক্ষমতায় তাঁরা প্রতিশোধ-বৃত্তি গ্রহণ না করায়। 'পাপ' বা 'পাপী' বলতে দ্রৌপদীর বোধে যে স্বামীদের অক্ষমতাই ছিল এবং 'পুণ্য' বলতে তাঁর মনে যে ক্ষত্রিয়বধূর প্রতিশোধ-স্পৃহাই ছিল তা আরও একভাবে বোঝা যায়।

দ্যূতক্রীড়ার দ্বিতীয় পর্বে যুধিষ্ঠির যখন পাশাখেলায় হেরে গেলেন, তখন অরণ্যবাসের শাস্তি নেমে এল সমস্ত পাণ্ডবভাই এবং দ্রৌপদীর ওপর। যুধিষ্ঠির এবং অন্য বীর ভাইয়েরাও জানতেন এই পাশাখেলার জন্ম হয়েছে কৌরবদের লোভ এবং অন্যায় থেকেই। কিন্তু পাণ্ডবভাইয়েরা কেউই দুর্যোধনের বাজি ধরার প্রতিবাদ করেননি, যুধিষ্ঠিরকেও অতিক্রম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেননি। পাঞ্চালী কৃষ্ণার পতির পুণ্যে সতীর প্রতিশোধ-স্পৃহা তৃপ্ত হয়নি কিছুই। এরই মধ্যে কৃষ্ণ এসে পৌঁছলেন কাম্যকবনে, পাণ্ডবদের কাছে। আগেও আমি একবার বলেছি—এই সময়ে কীভাবে দ্রৌপদী তাঁর অভিমান প্রকাশ করেছিলেন কৃষ্ণের ওপর। কিন্তু এই মুহূর্তে যে কথাটি ভীষণ জরুরি, তা হল—'পাপ' আর 'পুণ্য' বলতে দ্রৌপদী কী বুঝেছিলেন? দ্রৌপদী বলেছিলেন—ওঁদের দিক দেখে না হয় অন্যায়টা বুঝলাম। বুঝলাম যে, ভীষ্ম কিংবা ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের ধর্মানুসারে বিবাহিতা কুলবধূর অপমানে প্রশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু আমি আমার স্বামীদের দোষই বেশি দিই, কেননা তাঁরা ভারতবিখ্যাত বীর অথচ তাঁরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁদের 'ধর্মপত্নীর' ধর্ষণা দেখেছেন—যৎ ক্লিশ্যমানাং প্রেক্ষন্তে ধর্মপত্নীং যশস্বিনীম্।

আপনাদের কি মনে হয় না—এখানে 'ধর্মপত্নী' কথাটার ওপর একটা আলাদা জোর আছে। মনে রাখা দরকার—এর পরেই যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দ্রৌপদী এবং ভীমের ঝগড়া লাগবে; তখন ক্ষমা আর ধর্মের কথা কতবারই না বলেছেন যুধিষ্ঠির। দ্রৌপদী আগে ভাগেই তাই ধর্মের কথাই বলছেন। বললেন—চিরন্তন যে ধর্মপথ অথবা যে ধর্ম সজ্জন ব্যক্তিরা আচরণ করে এসেছেন এতকাল—সেই ধর্মে দৈহিক শক্তিহীন স্বামীরাও তাঁদের স্ত্রীদের সর্বতোভাবে রক্ষা করেন। সেখানে আমার কী হল? দ্রৌপদী এবার নিশ্চয়ই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দিকে ইঙ্গিত করেছেন অর্থাৎ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির থাকতেও আমার এই দশা হল কেন। দ্রৌপদী এবার ভীমের কথার জবাব দিচ্ছেন, যদিও সে-কথা ভোলেভালা ভীমও বোঝেননি। দ্রৌপদীর 'অনারে' পাণ্ডবদের দাসত্ব মুক্তির পর কর্ণ তির্যকভাবে পাণ্ডবদের যা বলেছিলেন তার অর্থ——অগতির গতি তোদের এই বউটি। আমি আগেই বলেছি কথাটা শুনে ভীম খুব ক্ষেপে গিয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষ্যাপার কথাগুলির ভাষা যা ছিল, তাতে কর্ণ যথেষ্ট বিদ্ধ হলেও দ্রৌপদীর গায়ে তার আঁচ লাগে। ভীম সে-কথা না বুঝলেও, দ্রৌপদীর সে কষ্ট আছে বলেই আমি মনে করি।

ভীম রেগে অর্জুনকে উদ্দেশ করে কর্ণের কথার জবাব দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—হায়! শেষে স্ত্রীই কিনা পাণ্ডবদের গতি হল—স্ত্রী গতিঃ পাণ্ডুপুত্রাণাম্! শাস্ত্রে বলে যে, পুরুষ মানুষ যদি মারা যায়, যদি অপবিত্র হয়, জ্ঞাতিবন্ধু যদি তাকে ত্যাগ করে, তাহলে পুত্র, মঙ্গল কর্ম এবং বিদ্যা—এই তিন জ্যোতি তাকে সাহায্য করে। কিন্তু আজ আমাদের ধর্মপত্নীকে দুঃশাসন যেভাবে সবলে লঙ্ঘন করল, তাতে তাঁর গর্ভের সন্তান কীভাবে আমাদের জ্যোতিঃস্বরূপ হয়ে উঠতে পারে।

কথাগুলি যতই ধর্মগন্ধী হোক না কেন, কথাগুলি ভাল নয়। এই কথায় যে স্বয়ং দ্রৌপদী জড়িয়ে পড়েন—সেটা সেই মুহূর্তে কর্ণ-দুঃশাসনের বিগর্হণার আতিশয্যে ভীম বুঝতে পারেননি। কিন্তু যাঁকে সম্বোধন করে ভীম কথাগুলি বলেছিলেন, সেই অর্জুন কিন্তু বুঝেছিলেন যে, এই ধর্ম-প্রবচন বেশি দূর এগোতে দেওয়া উচিত নয়। তিনি বলেছিলেন—ফালতু লোকে কী বলল, না বলল—তাই নিয়ে কি ভদ্রলোক মাথা ঘামায়? ভীমের নিন্দাবাদ কর্ণ-দুঃশাসনের অসভ্যতা প্রকট করার জন্য যতটা, দ্রৌপদীর অসহায়তার জন্যও যে ততটাই—সেটা দ্রৌপদী বোঝেন, কিন্তু কথাটা তো ভাল নয়। তাই এ-বিষয়ে তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বক্তব্য কী হতে পারে—সেটা ভীমের নাম না করেও তিনি কৃষ্ণকে একভাবে বলেছেন। তিনি বলেছেন—দুর্বল লোকেরাও নিজের বউকে সব সময় বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করে—যদ্ ভার্যাং পরিরক্ষন্তি ভর্ত্তারোঽল্পবলা অপি। স্ত্রীকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার অর্থ হল আত্মজ সন্তানকে রক্ষা করা। স্ত্রী এবং সন্তানের সুরক্ষার মধ্য দিয়ে পুরুষ নিজেও রক্ষিত হয়, কেননা পুরুষ স্ত্রীর গর্ভে নিজেই জন্মায় বলে স্ত্রীকে লোকে 'জায়া' বলে।

এতটা শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ কথা বলে এইবার ভীমকে এক হাত নিচ্ছেন দ্রৌপদী অর্থাৎ ভাবটা এই—তুমি না বলেছিলে—দুঃশাসন যেভাবে আমাদের ধর্মপত্নীকে লঙ্ঘন করল, তাতে তাঁর গর্ভের সন্তান পিতার কাছে জ্যোতিঃস্বরূপ হয়ে উঠতে পারে না। তাতে আমি বলি কি—স্ত্রীকেই যেখানে স্বামীর সুরক্ষায় উদ্যুক্ত হতে হয়, যে স্বামী স্ত্রী-রক্ষায় নিরুদ্যম হয়ে নিজেই যেখানে স্ত্রীর আশ্রয়ে মুক্ত হন, সে আমার পেটে ধর্মজ সন্তানের জন্ম দিয়ে নিজে জন্মাবে কীভাবে—ভর্ত্তা চ ভার্যয়া রক্ষ্যঃ কথং জায়ান্ মমোদরে? এতকাল শুনে এসেছি—শরণাগত জনকে পাণ্ডবরা কখনও ত্যাগ করেন না, আমি যে ধর্মপত্নীর অধিকারে তাঁদের শরণাগত হয়েই আছি, কই আমার প্রতি তো তাঁরা সেই শরণাগত-পরিত্রাণের অনুগ্রহ দেখাননি—তে মাং শরণমাপন্নাং নাম্বপদ্যন্ত পাণ্ডবাঃ। এত যে শুনি—ধনুর্যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয় করবেন, এমন শত্রু পৃথিবীতে নেই, কেন সেই পাণ্ডবরা দুর্বলতর কৌরবদের অপমান সহ্য করছেন—কিমর্থং ধার্তরাষ্ট্রাণাং সহন্তে দুর্বলীয়সাম্।

হয়তো শেষ বাক্যটি তাঁর অর্জুনের উদ্দেশে। কিন্তু অর্জুন-ভীমের উদ্দেশে যে কটুবাক্যই তিনি বলুন না কেন, দ্রৌপদীর মূল লক্ষ্য ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ-স্বামী—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, যাঁর ধর্ম এবং ক্ষমার অনুবৃত্তিতে ভীমার্জুনের মত শক্তিধরকেও দমিত হয়ে থাকতে হয়েছে। আসল কথা, কৌরব সভায় আত্মশক্তিতে স্বামীদের দাসত্ব-বন্ধন মোচন করেও দ্রৌপদী কোনও সাধুবাদে আগ্রহী নন, স্বামীরা কেন আপন যুক্তিতে স্ত্রীর সম্মান বাঁচাতে পারেননি বা এখনও কেন তাঁরা শত্রুর মাথায় পা দিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারছেন না—এই প্রতিশোধ-ভাবনাতেই তিনি আকুল। কারণ স্বামীরা যদি স্বরাজ্যে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হন, তা হলে আপনিই যে দ্রৌপদীর সম্মান ফিরে আসবে—সেটা দ্রৌপদী জানতেন। এই স্বরাজ্য এবং রাজ-সম্মানের মতো বিরাট একটা ব্যাপারের জন্য দ্রৌপদী নিজের অপমানকে শুধু নিমিত্তের মতো ব্যবহার করেছেন। বস্তুত পাণ্ডব-কৌরবদের জ্ঞাতিস্বার্থ এবং রাজনীতির মধ্যে তিনি এতটাই সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন যে, যখনই তিনি স্বামীদের, বিশেষত যুধিষ্ঠিরের দুর্বলতা লক্ষ করেছেন, তখনই সবার ওপরে যে যুক্তিটা তিনি অস্ত্রের মতো ব্যবহার করেছেন—সেটা সেই কৌরবসভায় অপমানের কথা।

তাই বলেছিলাম—দ্রৌপদী ঠিক সীতা বা রেণুকার মতো নন। তাঁর ধর্ষণ অপমান তিনি সব সময়ই মনে রেখেছেন বটে, কিন্তু সেইটাই সব নয়। তিনি চেয়েছেন, তাঁর স্বামীরা স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং এই প্রতিষ্ঠায় যত বিলম্ব ঘটছিল, ততই পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের ওপর তাঁর ক্রোধ ঘনীভূত হচ্ছিল। কারণ, দ্রৌপদী জানেন—যুধিষ্ঠিরের একান্ত ধর্মবোধ এবং সহিষ্ণুতা ক্ষত্রিয়ের ধর্মের সঙ্গে মেলে না, ক্ষত্রিয় বধূর আশা-আকাঙ্ক্ষাও তাতে তৃপ্তিলাভ করে না। তৃপ্তিলাভ করে না বলেই তিনি নিজের অপমান সমস্ত রাজনীতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। আমাদের এই সিদ্ধান্ত যে মিথ্যা নয় তারও একটা প্রমাণ আমরা হাজির করার চেষ্টা করছি।

কথাটা আমি আগেও একবার উল্লেখ করেছি, তবে তা অন্য প্রসঙ্গে, অন্যভাবে। উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণ যখন পাণ্ডবদের দূত হয়ে কৌরবসভায় যাচ্ছেন, তখন তো যুধিষ্ঠির—ভীম—দু'জনেই সন্ধিকামী হয়ে উঠলেন। অর্জুন সন্ধির কথা বলেওছেন, আবার বলেনওনি। সহদেব সন্ধির বিরুদ্ধে ছিলেন, এবং প্রধানত তাঁর কথাকে প্রাধান্য দিয়েই দ্রৌপদী প্রথমে রাজনীতির কথা তুললেন। দ্রৌপদী যে রাজনীতি ভাল বুঝতেন অথবা এ বিষয়ে যে তাঁর যথেষ্ট পড়াশুনো ছিল—সে কথা সেই কৌরবসভায় অপমানের পর থেকে একেবারে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ পর্যন্ত শত শতবার প্রকাশিত হয়েছে। পাণ্ডব-কৌরবদের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি যেভাবে, যেপথে চলছিল—সেখানে যৌধিষ্ঠিরী নীতি তাঁর পছন্দ হয়নি। এই স্থিরবুদ্ধি মনস্বীর 'ধীরে চল' নীতি, অথবা শত্রুর বিরুদ্ধে নিজের উত্থান-শক্তি বিলম্বিত করাটা দ্রৌপদীর রাজনীতি-বোধে আঘাত করেছে। এর প্রমাণ দ্রৌপদী আর যুধিষ্ঠিরের বহুতর কথোপকথনে বারংবার ফুটে উঠেছে। দুর্যোধনের বিরুদ্ধে সঠিক কী নীতি গ্রহণ করা উচিত ছিল বা এখনও উচিত—তা নিয়ে এই দুই জনের মধ্যে রাজনৈতিক মত-পার্থক্য উদ্যোগ-পর্বের এই মুহূর্ত পর্যন্তও দূর হয়নি।

হ্যাঁ, স্বামী বলে দ্রৌপদী এইটুকু মেনে নিতে রাজি আছেন যে, ঠিক আছে, যুধিষ্ঠির তো ইন্দ্রপ্রস্থের পরিবর্তে পাঁচখানি গ্রাম ফিরে পাবার প্রস্তাব দিয়েছেন দুর্যোধনকে; সে অন্তত তাই দিক। কিন্তু গোটা রাজ্যের বদলে এই যে যুধিষ্ঠির কঠিন কিছু করতে পারেন না বলে লজ্জা-লজ্জা মুখ করে সন্ধির কথা বলছেন—দ্রৌপদীর সাফ কথা—পঞ্চ গ্রামের শর্তে যদি দুর্যোধন রাজি না হন, তবে যেন কৃষ্ণ আগ বাড়িয়ে সন্ধির কথা না বলেন। অর্থাৎ দ্রৌপদীর মতে—তোমরাই অন্যায়ভাবে আমাদের রাজ্য কেড়ে নিয়েছ, অথচ এখন সন্ধির কথা তোমাদের দিক থেকেও উঠছে। কিন্তু সন্ধি যদি আদৌ করতে হয়, 'অ্যাজ আ টোকেন অব গুড জেসচার' তোমাকে নমনীয়তার প্রমাণ হিসেবে পাঁচটি গ্রাম আগে দিয়ে দিতে হবে, তারপর সন্ধির কথা। দ্রৌপদী কৃষ্ণকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন—যদি রাজ্য না দিয়ে দুর্যোধন সন্ধি করতে চায়, তবে তুমি যেন সেখানে গিয়ে সন্ধি করে এস না—অপ্রদানেন রাজ্যস্য যদি কৃষ্ণ সুযোধনঃ। সন্ধিমিচ্ছেন্ন কর্তব্যস্তত্র গত্বা কথঞ্চন।

এইবার দ্রৌপদী রাজনীতির তত্ত্ব এবং প্রয়োগের কথায় আসছেন, যে-কথায় এতকাল মহামতি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তাঁর বারবার মতবিরোধ ঘটেছে, এবং যে কথার মীমাংসা এখনও হয়নি। দ্রৌপদী বললেন—ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা যদি ক্রুদ্ধ হয়েও আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে—কারণ, ক্রুদ্ধ হলে শক্তির বৃদ্ধি ঘটে—তবুও সেই শক্তি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা পাণ্ডব এবং পাঞ্চালদের আছে। এতকালের অভিজ্ঞতায় কৃষ্ণকে সম্পূর্ণ সচেতন করে দিয়ে দ্রৌপদী বললেন—তুমি যেন এটা মনে কোরো না, কৃষ্ণ, যে, ভাল ভাল কথা আর নীতির উপদেশ দিয়ে তাদের কিছু করা যাবে; এমনকী তাদের কিছু ছেড়ে দিয়েও যে লাভ হবে, তাও আমার মনে হয় না— অর্থাৎ ওই ইন্দ্রপ্রস্থ বা রাজ্যের অর্ধাংশের দাবি না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু মাত্র পাঁচখানি গ্রাম নিয়ে সন্তুষ্ট থেকেও আর সব দাবি যদি আমরা ছেড়ে দিই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতেও যে কিছু করা যাবে— তা মনে হয় না— ন হি সাম্না ন দানেন শক্যোঽর্থ স্তেষু কশ্চন। দ্রৌপদীর বক্তব্য— তাদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করেও যদি কিছু না হয়, ত্যাগ স্বীকার বা অন্য কিছু করেও যদি কিছু না হয় তা হলে তাদের ওপর তোমার অত করুণা করার দরকার কী? সত্যি কথা বলতে কি, যদি নিজে বাঁচতে হয়, তা হলে তাদের শাস্তি দিয়েই বাঁচতে হবে— যোক্তব্য স্তেষু দণ্ডঃ স্যাজ্জীবিতং পরিরক্ষতা।

অতএব পাণ্ডবরা দ্রৌপদীর বাপের বাড়ির লোক পাঞ্চালদের সঙ্গে নিয়ে এই মুহূর্তে দুর্যোধনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ুক— এই ছিল দ্রৌপদীর সর্বশেষ সিদ্ধান্ত। এতে পাণ্ডবদের সামর্থ্যে তৃপ্ত হবে ক্ষত্রিয়ের ক্ষুধা। দ্রৌপদী বোধহয় এখন জ্যেষ্ঠ-পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরকে কিছু ইঙ্গিত করছেন। তিনি বললেন— ক্ষত্রিয় হোক অথবা অক্ষত্রিয়, সে যদি লোভী হয়, তা হলে উপযুক্ত অথবা নিজের ধর্মে স্থিত ক্ষত্রিয়ের কাজ হল সেই লোভীটিকে মেরে ঠান্ডা করা— ক্ষত্রিয়েণ হি হন্তব্যঃ ক্ষত্রিয়ো লোভমাস্থিতঃ। আসলে দ্রৌপদীর মতে— যাকে মারা উচিত নয়, তাকে মেরে ফেলাটা যেমন অন্যায়, তেমনই যে বধযোগ্য, তাকে বাঁচিয়ে রাখাটাও একইরকম অন্যায়।

রাজনীতির দিক দিয়ে নিজের সমস্ত নীতি-যুক্তি উপস্থিত করেও দ্রৌপদী এবার মোক্ষম সেই ঘটনায় এলেন, যেখানে অন্যের যুক্তি-তর্ক হার মানবে, যেখানে তিনি নিরঙ্কুশ— যেখানে শুধু এক যুক্তিতেই কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া যায়। সেই কুরুসভার অপমানের ঘটনা। দ্রৌপদী নিজেই তাঁর বাপের বাড়ির আভিজাত্য, শ্বশুর-কুলের সম্মান, স্বামীদের শক্তি এবং ধর্মজ পুত্রদের অভিমান— সব একত্রিত করে সেই সাংঘাতিক পুরাতন কথাটা তুললেন— শাঁখা-সিঁদুর-পরা আর কোনও অভাগিনী এই পৃথিবীতে আছে— কা নু সীমন্তিনী মাদৃক্— যে তার স্বামীরা বেঁচে থাকতে, ভাইয়েরা বেঁচে থাকতে, এমনকী তুমিও বেঁচে থাকতে, সবার সামনে অন্যের হাতে চুলের মুঠি ধরার অপমান সহ্য করল। ক্রোধলেশহীন, প্রতিকারের চেষ্টাহীন স্বামীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে অপমান দেখলেন, আর আমাকে কেঁদে কেঁদে ডাকতে হল তোমাকে— পাহি মামিতি গোবিন্দ মনসা চিন্তিতোঽসি মে। বাস, রাজনীতির প্রয়োগ-তত্ত্বের আগুনে এইমাত্র দ্রৌপদীর ঘৃতগন্ধী অভিমান যুক্ত হল।

দ্রৌপদী পুনরায় সেই কথাগুলি উচ্চারণ করলেন, যা তিনি কৃষ্ণের সামনে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন বনবাস-আরম্ভে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হবার পর। পাণ্ডব-মুখ্য মুখ্য স্বামীদের সন্ধিকামুকতায় উদ্বিগ্ন আজ আবারও সেই পরম শক্তিমান বন্ধুর আশ্রয় নিয়ে দ্রৌপদী বলেছেন— যে-অপমান দুর্যোধন-দুঃশাসন-কর্ণেরা আমাকে করেছে, তাতে আমার বীর স্বামীরা থাকতেও তারা যদি এক মুহূর্তও বেঁচে থাকে তো সেটাই আমার স্বামীদের পক্ষে চরম লাঞ্ছনার— যত্র দুর্যোধনঃ কৃষ্ণ মুহূর্তমপি জীবতি— কিন্তু তারা বেঁচে আছে, ভালভাবেই বেঁচে আছে। দ্রৌপদী দেখেছেন— অপমানের প্রতিশোধ নেবার কথা হাজার বার তাঁর স্বামীরা উচ্চারণ করা সত্ত্বেও শুধুমাত্র রাজনীতির কারণে আজকে তাঁদের মধ্যে যে সন্ধি-কার্যের দায়বদ্ধতা তৈরি হয়েছে, সেটা তাঁর কাছে ব্যক্তিগত-ভাবে এক কুলবধূ নারীর অপমান গৌণ করে দেয়। এখন কৃষ্ণও যদি তাঁর স্বামীদের কথায় প্রভাবিত হয়ে পড়েন, তা

হলে কার কাছে আর যাবেন তিনি। অতএব শেষ চেষ্টায় তাঁর বিনয়টুকুও প্রথাসিদ্ধ কথার কথা হয়ে ওঠে। দ্রৌপদী ব্যঙ্গ করে বললেন— আমার ওপর তোমার যদি এতটুকুও অনুগ্রহ থাকে কৃষ্ণ, যদি এতটুকুও কৃপার যোগ্য মনে হয় আমাকে, তা হলে ধৃতরাষ্ট্রের কুলাঙ্গার ছেলেগুলির ওপর সম্পূর্ণ ক্রোধটাই উগরে দিতে হবে— ধার্তরাষ্ট্রেষু বৈ কোপঃ সর্বঃ কৃষ্ণ বিধীয়তাম্।

এর পরের কাজটা কৃষ্ণের কাছে অভাবনীয় ছিল। যুদ্ধোদ্যোগের সভায় তখনও বসে আছেন অনেকেই। সেই সভায় একমাত্র কনিষ্ঠ স্বামী সহদেব— তিনি নিজেকে চিরকালই পণ্ডিত ভাবেন, এমনকী বীরও ভাবেন যথেষ্ট, কেননা সেই সভায় বৃহত্তর রাজনৈতিক সিদ্ধির জন্য প্রায় সকলেই সন্ধির কথা বললেও সহদেব কিন্তু একাই নিজের ক্ষমতায় ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণের মতো মহাবীরদের পর্যুদস্ত করে দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ নেবেন বলেছিলেন। পঞ্চস্বামীর একক স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও দ্রৌপদীর ওপর সহদেবের এই 'মম'-কারই হয়তো তাঁর অহংকার পুষ্ট করেছিল, কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-পূর্ব পরিস্থিতিতে জ্ঞাতিজনের রক্তপাত না ঘটানোর জন্য যে চেষ্টা অনেক দিন ধরেই চলছিল, সেখানে এটা ছিল শেষ জায়গা। কৃষ্ণ সর্বশেষ চেষ্টা করবেন শান্তির জন্য। ঠিক এই প্রমুখতার সামনে দাঁড়িয়ে দ্রৌপদী নিজের গভীরতম ক্ষোভোদ্গার করেও মনে করলেন— এও বুঝি যথেষ্ট নয়। ধিক্কার-বাচন শেষ করেই দ্রৌপদী এবার এগিয়ে এলেন কৃষ্ণের দিকে, তারপর বেণীর আকারে সমাহৃত কুটিল-সর্পিল কেশগুচ্ছ বাঁ হাতে নিয়ে— কেশপক্ষং বরারোহা গৃহ্য বামেন পাণিনা— কৃষ্ণকে বললেন কৃষ্ণা দ্রৌপদী। বললেন— এই সেই রাজসূয় যজ্ঞের পবিত্র জল-স্পৃষ্ট কেশরাশি যা দুঃশাসন আপন মুষ্টিতে ধরেছিল— তুমি যখন কৌরবদের সঙ্গে সন্ধির কথা ভাববে, তখনই যেন এই মুক্তবেণী কেশরাশির কথা মনে পড়ে— স্মর্তব্যঃ সততং কৃষ্ণ পরেষাং সন্ধিমিচ্ছতা।

খুব স্পষ্ট বোঝা যায়, বনবাস-অজ্ঞাতবাসের শেষ পর্যায়ে এসেও তাঁর বীর স্বামীরা যখন কৌরবদের সঙ্গে সন্ধির কথা ভাবছেন, তখন স্পষ্টতই তিনি তাঁর স্বামীদের ওপর আর ভরসা রাখতে পারছেন না, এবং এই বেভরসা তথা 'ফ্রাসট্রেশন'-এর জায়গা এমনই যে, এক মুহূর্তে তিনি স্বামীদের এক পৃথক অবস্থানে বসিয়ে রেখে কৃষ্ণের কাছে ঘোষণা করেন— যদি ভীম আর অর্জুনের মতো মানুষেরা এত সন্ধিকামী হয়ে ওঠেন, তা হলে দরকার নেই তাঁদের যুদ্ধ করার, আমার অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য আমার ভাইদের নিয়ে না হয় যুদ্ধ করবেন আমার বৃদ্ধ পিতা, আর আমার ছেলেদের নিয়ে যুদ্ধ করবে আমার অভিমন্যু— পিতা মে যোৎস্যতে বৃদ্ধঃ সহপুত্রৈর্মহারথৈঃ। অভিমন্যুং পুরস্কৃত্য যোৎস্যন্তে কুরুভিঃ সহ। এই মুহূর্তে দ্রৌপদী বোধহয় সবচেয়ে অবাক হয়েছেন তাঁর সুচিরভক্ত ভীমকে দেখে। কৃষ্ণ আগেই ভীমের কথা শুনে বলেছিলেন— এ তো কেমন সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন বিরাট পাহাড়ও যেন হালকা হয়ে গেল, আগুনের গরম যেন ঠান্ডা-শেতল বলে মনে হচ্ছে— গিরেরিব লঘুত্বং তৎ শীতত্বমিব পাবকে। দ্রৌপদী এই ব্যঙ্গোক্তিকে আরও তীক্ষ্ণ করে দিয়ে বলেছেন— আজ তেরোটা বচ্ছর পার হয়ে গেছে, আমি মনের মধ্যে আগুনের মতো এই ক্রোধ নিয়ে বসে আছি, কিন্তু আমার গা জ্বলে যাচ্ছে এই ভীমের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা শুনে— বিদীর্য্যতে মে হৃদয়ং ভীমবাক্শল্যপীড়িতম্— এই তেরো বছরে ক'বার ইনি বলেছেন— দুঃশাসনের রক্তপান করব, দুর্যোধনের উরু ভেঙে দেব— আর আজ যখন যুদ্ধের সময়ে এই প্রতিজ্ঞাপূরণের সময় এল, তখন তিনি ধর্ম দেখাচ্ছেন— ধর্ম— দ্রৌপদীর ভাবটা এই, ভীমও আজ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়েছেন— যোঽয়মদ্য মহাবাহুর্ধর্মমেবানুপশ্যতি।

দ্রৌপদীর ক্ষোভ অন্তর দিয়ে বুঝেছেন কৃষ্ণ। প্রগাঢ় রাজনৈতিকতায় সভা চালিত হলেও কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন— সন্ধির কথাটা একেবারেই কথার কথা, ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা এই সন্ধির প্রস্তাব মানবে না, তাদের সময় ঘনিয়ে এসেছে— ধার্তরাষ্ট্রাঃ কালপক্কা ন চেৎ শৃণ্বন্তি মে বচঃ। কৃষ্ণ আগের মতোই আজও আশ্বস্ত করেছেন কৃষ্ণা দ্রৌপদীকে। বলেছেন— আজকে তুমি যেমন কেঁদে ভাসাচ্ছ, দ্রৌপদী! এমনি করেই কাঁদবে একদিন কৌরবদের বউরাও। তবে জেনে রেখো, তোমার সম্মান আমি রাখব। যা যা করার আমি করব, এই ভীম-অর্জুন-সহদেবকে দিয়েই করাব, আর জ্যেষ্ঠ স্বামীটিও থাকবেন আমাদের মাথার ওপর— অহঞ্চ তৎ করিষ্যামি ভীমার্জুনযমৈঃ সহ। এই যে কৃষ্ণ বলেছেন— আমি করব— অহঞ্চ তৎ করিষ্যামি— এখন থেকেই বুঝতে পারি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধভার কৃষ্ণের হাতে চলে গেছে, যুধিষ্ঠির এখানে অলংকৃত একযান্ত্রিকতায় উচ্চাসনে বসে আছেন মাত্র। তাঁকে দ্রৌপদীও ভরসা করেন না কৃষ্ণও করেন না।

কৌরব-সভায় দ্রৌপদীর অসহায় ক্রন্দনের সময় সেই অলৌকিক বস্ত্ররাশি দুঃশাসনকে ক্লান্ত করেছিল কিনা, তা আমাদের প্রত্যয়ে আসে না হয়তো। কিন্তু কৃষ্ণের নামে যে কাজ হয়েছিল— তা আমি হলফ করে বলতে পারি। হরিনামের মাহাত্ম্য এই নামের মধ্যে নাও থাকতে পারে— কিন্তু সে যুগের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে কৃষ্ণের কূটনীতির মাহাত্ম্য তখন এতই বহুশ্রুত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত যে, কৃষ্ণনামের মাত্রা তখন রাজনৈতিক দিক দিয়ে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কৃষ্ণ পরে যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন— আমি যদি সেইসময় শুধু দ্বারকায় থাকতাম, তা হলে কৌরবরা না ডাকলেও আমি অনাহূত অবস্থাতেও পাশাখেলার আসরে পৌঁছতাম। প্রথমে ভীষ্ম-দ্রোণ এবং অন্যান্য বড় বড় মানুষদের সঙ্গে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাশাখেলার দোষগুলি বোঝাতাম— আর যদি তাতেও কেউ আমার ভাল কথা না শুনত, তা হলে মেরে বোঝাতাম— পথ্য জিনিসটা কী— পথ্যঞ্চ ভরতশ্রেষ্ঠ নিগৃহ্নীয়াং বলেন তম্। হয়তো তাতে অন্য পাশাড়েরা সব ক্ষেপে গিয়ে ওদের পক্ষে জুটত। তাতে কী? ওদেরও মেরে ফেলতাম নির্দ্বিধায়— তাংশ্চ হন্যাং দুরোদরান্।

আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি— কৃষ্ণের এই ক্ষমতা ছিল। তিনি যা বলেন, তা যে করতে পারেন— সেটা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে শিশুপাল বধের সময়েই দেখা গেছে। কোনও বিরুদ্ধতা তাঁকে কিছুই করতে পারেনি। কৌরব-সভায় পাশাখেলার সময় ভাল কথা অনেকেই বলেছেন, বিদুর তো বিশেষ করে, কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর কারওই ওই মারার ক্ষমতাটা ছিল না। সমগ্র দ্যূতসভায় একমাত্র দ্রৌপদী ছাড়া কৃষ্ণের নাম কেউ মুখে আনেননি— কৌরবরা তো নয়ই পাণ্ডবরাও নয়, ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরও নয়। আমার ধারণা যে মুহূর্তে এই শায়েস্তা করার লোকটির নাম দ্রৌপদীর মাধ্যমে সবারই স্মরণে এসেছে, সেই মুহূর্তে দুঃশাসন ক্লান্ত বোধ করেছেন, তাঁকে থামতেও হয়েছে। কিন্তু অপমান-মুক্তির

মধ্যে দ্রৌপদী তাঁর পঞ্চস্বামীকে ত্রাতার ভূমিকায় পাননি— সেই ধর্ষণ, অপমানের মুহূর্তেও পাননি, আজ এতকাল বনবাস পর্বের পর যুধিষ্ঠির, ভীম এবং আংশিকভাবে অর্জুনেরও সন্ধিকামুকতা দেখে তিনি এখনও আশ্বস্ত নন। তাই সেদিন সেই অকারণ লাঞ্ছনার মধ্যেও তিনি কৃষ্ণকে স্মরণ করেছিলেন, আজ এই যুদ্ধোদ্যোগের সময়েও তিনি কৃষ্ণেরই স্মরণ নিয়েছেন— বোধহয় একমাত্র তিনিই পারেন ক্ষত্রিয়বধূর কাম্য জয়াশা পূরণ করতে।

বস্তুত এই প্রত্যাশাপূরণের ক্ষেত্রে ভীম এবং অর্জুনও দ্রৌপদীর অবিশ্বাসের মানুষ ছিলেন না, কিন্তু তাঁর এই দুই স্বামীই যাঁর ইচ্ছা বা নীতি-যুক্তি অতিক্রম করতেন না— সেই জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের অমোঘ শাসন দ্রৌপদী কোনওদিনই পছন্দ করেননি, তাঁর নীতি-যুক্তিও সহ্য করতে পারেননি কোনওদিন। লেখক-সজ্জনের মধ্যে আছেন কেউ কেউ, যাঁরা যুধিষ্ঠিরের প্রতি সদয় পক্ষপাতে দ্রৌপদীকেও তাঁর প্রতি সরসা করে তুলেছেন। স্বয়ং বুদ্ধদেব বসু তাঁর অসাধারণ সংহত ভাষায় যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর প্রায় একক নিষ্ঠা এবং আশ্রয়ের কথাটা প্রকাশ করেছেন। তবে সে মত আমার মতো সাধারণ মহাভারত পাঠকের মনে বড় অনর্থক রকমের জটিল বলে মনে হয়েছে। মহাকাব্যের নায়িকা হিসেবে তথা পঞ্চস্বামীর একতমা বধূ হিসেবে দ্রৌপদীর মনের গতি-প্রকৃতি যে অতিশয় জটিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই জটিলতার সুযোগে পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর 'নিকটতম' সম্বন্ধ প্রমাণ করে দেওয়াটা আমাদের মতে কিছুটা সংহতিহীন মনে হয়।

আমি প্রথমে প্রয়াত বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্যগুলি উদ্ধার করে তাঁর সার্বিক মতটা দেখানোর চেষ্টা করব, তারপর, আমাদের যৌক্তিকতা আমরা দেখাব। বুদ্ধদেববাবু লিখেছেন— (১, ২, ৩ সংখ্যাগুলি আমার দেওয়া)

(১) "কিন্তু 'আসলে' যেন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গেই নিকটতম তাঁর সম্বন্ধ— ঘটনার পর ঘটনা অনুধাবন করতে করতে এমনি একটা ধারণা হয় আমাদের, যদিও অগ্নিসম্ভবা আগ্নেয়স্বভাব পাঞ্চালীর সঙ্গে মৃদু দ্যূতাসক্ত যুদ্ধবিমুখ যুধিষ্ঠিরের বৈশাদৃশ্য অতিশয় স্পষ্ট।"

(২) "বক-যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে তিনি তিনবার উল্লেখ করেছেন ভার্যার— তাঁর ভার্যার, তা বুঝে নিতে আমাদের দেরি হয় না। 'গৃহে মিত্র ভার্যা', 'দৈবকৃত সখা ভার্যা', আর উপরন্তু 'ধর্ম অর্থ কাম— এই এই তিন পরস্পর বিরোধীর সংযোগ ঘটে শুধু ধর্মচারিণী ভার্যার মধ্যে'— এ সব কথা যুধিষ্ঠিরের মুখে ঠিক শাস্ত্রবচনের মতো শোনাচ্ছে না, এদের পিছনে দ্রৌপদীর সঞ্চার আমরা অনুভব করি..."

(৩) "যুধিষ্ঠির সযত্নে লালন করেছিলেন এই সম্পর্কটিকে, এবং বহুভর্তৃকা দ্রৌপদী এর মূল্য বিষয়ে কতটা সচেতন ছিলেন তাও আমরা অনেকবার দেখেছি। স্মর্তব্য, তাঁর পায়ের কাছে যে স্বর্ণপদ্মটি উড়ে এসে পড়েছিল, দ্রৌপদী সেটি যুধিষ্ঠিরকেই উপহার দিয়েছিলেন, আজ্ঞাবহ ভীমসেনকে নয় (বনঃ ১৪৬)। তাঁর আছে 'ইন্দ্রের মত পঞ্চস্বামী'— এই বাঁধা বুলিটি দ্রৌপদীর মুখে শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু দ্যূতসভায় অপমানিত হয়ে তিনি তীব্র স্বরে বলে উঠলেন (সভা: ৬৭): আমি পাণ্ডবদের সহধর্মিণী, আমি ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের ভার্যা।'— যেন বহুবচনের মধ্যে যুধিষ্ঠিরকে ধরানো গেল না, স্বতন্ত্রভাবে তাঁর নাম বলতে হ'লো, যেন পাঁচের মধ্যে একের নাম করতে হ'লে যুধিষ্ঠিরকেই তাঁর মনে পড়ে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(৪) "আমরা লক্ষ করি যে সভাপর্বের পরে কাহিনি যত এগিয়ে চলে ততই সত্য হয়ে ওঠে দ্রৌপদীর সেই আর্ত মুহূর্তের ঘোষণা;— একান্ত ভাবে না হোক, উত্তরোত্তর আরও বেশি সংশ্লিষ্টভাবে, তিনি যুধিষ্ঠিরের ভার্যারূপে প্রতিভাত হতে থাকেন। দ্রৌপদীর অন্য দুই প্রধান স্বামীর উপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলছেন ব্যাসদেব— বলা বাহুল্য, নকুল-সহদেব এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য নন— দ্রৌপদীর বল্লভ রূপে কখনও অর্জুনকে আর কখনও বা ভীমকে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু তাঁর নিত্যসঙ্গীরূপে যুধিষ্ঠিরই ছিলেন একমাত্র— হয়তো ঘটনাচক্রে, যেহেতু অর্জুন ছিলেন অনবরত ভ্রাম্যমাণ আর ভীমসেন প্রধানত এক মল্লবীর হিসেবে উপস্থিত, বা হয়তো অন্তঃস্থিত কোনও নিগূঢ় আকর্ষণ ছিল দু'জনের মধ্যে— কেননা বিপরীতেরও আকর্ষণ থাকে, এবং তা প্রবল হবারও বাধা নেই। যে কারণে কান্তিমান দুর্মদ যুবা আলকিবিয়াদেস-এর পক্ষে কুদর্শন বৃদ্ধ জ্ঞানী সক্রেটিস ছিলেন প্রয়োজন, হয়তো সেই কারণেই দ্রৌপদীর যুধিষ্ঠিরকে না হলে চলত না।"

(৫) "যাকে বলা যায় সত্যিকার দাম্পত্য সম্বন্ধ, তার দৃষ্টান্ত রূপে যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদীকেই মনে পড়ে আমাদের— ঠিক মধুর রসে আশ্রিত নয় হয়তো, বলা যায় না রতিপরিমলে অনুলিপ্ত, কিন্তু গভীর ও স্থির ও সশ্রদ্ধ প্রীতিপরায়ণ সেই সম্বন্ধ, এবং যা আরও জরুরি— সমকক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত।"

বুদ্ধদেব বসু মহাশয়ের সমস্ত কথাগুলি এখানে উদ্ধার করতে পারলেই ভাল হত, কিন্তু তাতে গ্রন্থের কলেবর-বৃদ্ধির ভয় আছে; তা ছাড়া যতটুকু আমরা এখানে তুলেছি, তাতেই তাঁর সার্বিক মতটা বোঝা যায়। আমাদের নিবেদন— প্রথম মন্তব্যে 'আসলে' যেন যুধিষ্ঠিরই তাঁর স্বামী'— এখানে 'আসলে' আর 'যেন' কথাটি যতই কাব্যগন্ধী গদ্যের সূচনা করুক, এই কথাগুলির মধ্যে কেমন এক অপ্রত্যয় আছে, বোঝা যায়, মহাভারতের সামগ্রিক প্রমাণে এই কথা সম্পূর্ণ প্রমাণ করা যাবে না ভেবেই মন্তব্যের মধ্যে এক পিচ্ছিল অনিশ্চয়তা রেখে দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু "যুধিষ্ঠিরের সঙ্গেই নিকটতম তাঁর সম্বন্ধ' এই কথার সঙ্গেই 'যদিও' যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দ্রৌপদীর 'বৈশাদৃশ্য অতিশয় স্পষ্ট'— এই আপাত বিরোধিতারও অর্থ আমার কাছে স্পষ্ট নয়— এবং অস্পষ্টতা দিয়ে আর যাই হোক, পঞ্চস্বামীর একতমের সঙ্গে দ্রৌপদীর 'নিকটতম সম্বন্ধ' প্রমাণ করা কঠিন।

স্বামীদের সঙ্গে দ্রৌপদীর সম্বন্ধ পূর্বে আমি খানিকটা দেখানোর চেষ্টা করেছি এবং তা অবশ্যই মহাভারতের প্রমাণে। তাতে আমি কোথাও যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে 'নিকটতম সম্বন্ধ' খুঁজে পাইনি। তার ওপরে বুদ্ধদেবের ৪ সংখ্যক মন্তব্যে 'সভাপর্বের' পর থেকে দ্রৌপদীকে 'উত্তরোত্তর' যুধিষ্ঠিরের সংশ্লিষ্ট অথবা 'তিনি যুধিষ্ঠিরের ভার্যারূপে প্রতিভাত হতে থাকেন'— এই সিদ্ধান্তের মধ্যেও আমি কোনও বৈয়াসিক যুক্তি খুঁজে পাইনি। বরঞ্চ প্রায় উলটোটাই আমার কাছে সত্য বলে মনে হয়।

দ্রৌপদী যেদিন স্বয়ম্বরা বধূটির লজ্জারুণ চেলি পরে কুম্ভকার গৃহের ভাড়া-করা শ্বশুর-বাড়িতে এলেন, সেদিন গৃহের অন্তরালে থাকা কুন্তীর বচন ছিল— যা এনেছ পাঁচ ভাই ভাগ করে খাও। তারপর দ্রৌপদীকে দেখে তিনি ভীষণ ভয়ে আর্তস্বরে যুধিষ্ঠিরকেই বলেছিলেন— তুমি সেই ব্যবস্থা কর যাতে আমার কথা মিথ্যে না হয়, কৃষ্ণা পাঞ্চালীকে

যাতে কোনও অধর্ম না স্পর্শ করে অথবা তাতে তাঁর যেন কোনও বিভ্রান্তিও না হয় অর্থাৎ তিনি যেন কোনও ভুল না বোঝেন— ন বিভ্রমেচ্চ।

যুধিষ্ঠির মাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন হয়তো ধর্মের সূক্ষ্ম গতিপথ— যা তিনি নিজেও তখন তত বোঝেননি এবং যা তিনি কন্যার পিতা দ্রুপদকেও বোঝাতে পারেননি— সূক্ষ্মো ধর্মো মহারাজ নাস্য বিদ্মো বয়ং গতিম্— অথচ তিনি প্রায় আদেশের মতো বলেছিলেন— আমাদের সবারই মহিষী হবেন এই কল্যাণী দ্রৌপদী। মায়ের কথা মিথ্যে হয়নি, হয়তো বৃহত্তর স্বার্থে পঞ্চভ্রাতার সৌহার্দ্যকামনায় ধর্মও লঙ্ঘিত হয়নি, কিন্তু কৃষ্ণা পাঞ্চালীর কোনও বিভ্রান্তি হল কিনা, অর্থাৎ তিনি ভুল বুঝলেন কিনা— সে খোঁজ, যুধিষ্ঠির নেননি। দ্রুপদকেও তিনি ধর্মের গতি বোঝাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মায়েরই আশ্রয় নিয়েছেন, এবং নিজেকেও তিনি যথোপযুক্ত প্রয়োগ করেছেন সর্বাংশে জ্যেষ্ঠের মতো। বলেছেন— মা এইরকম বলেছেন, আমারও তাই মনে হয়— এবঞ্চৈব বদত্যম্বা মম চৈতন্মনোগতম্। দ্রৌপদী খুশি হয়েছিলেন কি না আমাদের জানা নেই। নিয়তির মতো পাঁচ স্বামী যখন তাঁর মাথায় চেপে গেল, তখন এই বিদগ্ধা নায়িকা অসাধারণ দক্ষতায় পঞ্চপ্রদীপের তলায় ধৃতিদণ্ডটির মতো পঞ্চস্বামীরই বশবর্তিনী হয়েছেন— বভূব কৃষ্ণা সর্বেষাং পার্থানাং বশবর্ত্তিনী। কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে তিনি ক্ষমা করেছেন তো?

তবু এমন পাঁচ স্বামীকে নিয়ে ভরা সুখের মধ্যে অর্জুন এক সামান্য গোরুচোর ধরতে গিয়ে বনে চলে যেতে বাধ্য হলেন কিন্তু ফিরে এলেন— যাদবনন্দিনী সুভদ্রাকে নিয়ে। ফিরে আসার পর দ্রৌপদীকে আমরা খণ্ডিতা হতে দেখেছি। অর্জুনের ওপর বড় অভিমান করতেও দেখেছি। উল্লেখ্য, মহামতি যুধিষ্ঠির কিন্তু রীতিমতো স্বয়ম্বরে গিয়ে গোবাসন শৈব্যের মেয়ে দেবিকাকে বিয়ে করেছিলেন। এই বিয়েটা দ্রৌপদীর বিয়ের আগে না পরে সুসম্পন্ন হয়েছিল— সে-খবর মহাভারতের কবি দেননি, অকিঞ্চিৎকর বলেই দেননি, আর দ্রৌপদীর কাছেও এ-ঘটনা ছিল বড়ই অকিঞ্চিৎকর। যুধিষ্ঠিরের প্রতি তাঁর নৈকট্যবোধ তীব্র হলে এই দেবিকার কথা একবারও অন্তত দ্রৌপদীর মুখে শুনতাম, অথবা দেখতাম সামান্যতম ভ্রুকুটি। এই ভ্রুকুটি যেমন যুধিষ্ঠিরের অন্যতরা স্ত্রীর জন্যও কুঞ্চিত হয়নি, তেমনই হয়নি নকুল বা সহদেবের অন্যান্য বধূদের জন্যও। স্বামীর প্রতি একান্ত অধিকারবোধই এই ভ্রূকুটি-কুটিলতার জন্ম দেয় বলে রসশাস্ত্রে শুনেছি। অথবা যুধিষ্ঠির সেই রসভাব-সমন্বিত বিদগ্ধ ভ্রুকুটি-ভঙ্গের যোগ্য ছিলেন না— অন্তত দ্রৌপদীর কাছে। দ্রৌপদীর মুখে ভীম-হিড়িম্বার সংবাদও সাড়ম্বরে শুনেছি, কিন্তু হিড়িম্বাকে নিয়ে দ্রৌপদীর ঈর্ষা তো ছিলই না, বরং একটু স্বাধিকার-বোধই ছিল যেন— একান্ত অনুগত ভীমের বউ বলেই হয়তো।

তবুও কেউ বলতে পারেন— অন্যান্য পাণ্ডব-বধূদের ব্যাপারে দ্রৌপদীর অন্তরঙ্গ ঔদাসীন্য এমন কিছু দরকারি কথা নয়, যাতে যুধিষ্ঠিরের প্রতি তাঁর নৈকট্য অপ্রমাণ হয়ে গেল। কথাটা যাই হোক, আমিও অত বড় করে কিছু বলছি না, কিন্তু অন্যের ক্ষেত্রে নিস্তরঙ্গতা আর অর্জুনের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া— এই বৈপরীত্যের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর সামান্য নৈকট্যের আভাস যতটা, অর্জুনের প্রতি দুর্বলতার ইঙ্গিত তার চেয়ে বেশি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু থাক সে-কথা। অর্জুন-সুভদ্রার বিয়ের পরে দ্রৌপদীকে আমরা একবার অর্জুনের সঙ্গে বেড়াতে যেতে দেখেছি। নিজের ইচ্ছায় নয়। কিন্তু বারো বছর বাইরে বাইরে থেকে এক যৌবনোদ্ধত যুবক এতকাল পরে বাড়ি ফিরেছে— হতে পারে, তার সঙ্গে সুভদ্রার মতো সুন্দরী সঙ্গিনী আছে— তবু জীবনের প্রথমা নারীটিকে স্ববীর্যে জয় করে আনার মধ্যে যে চিরন্তন অধিকার-বোধ থাকে, হয়তো সেই অধিকার-বোধেই, অথবা অর্জুন বাড়ি ফিরেও হয়তো দেখেছিলেন— দ্রৌপদী তখনও দাদা কিংবা ভাইদের পরকীয়া, হয়তো সেই যন্ত্রণায় অর্জুন যেন দ্রৌপদীর সমস্ত অন্যতর বন্ধন ছিন্ন করে দিয়ে ক্ষণেকের তরে নিজের অধিকারে স্থাপন করেছেন একান্ত এক বিহার-ভূমিতে।

বিবাহের পর দ্রৌপদীর সঙ্গে অর্জুনের সেই প্রথম মধুচন্দ্রিমা। জানি— মহাভারতের কবি কথাটা এমন স্পষ্ট করে বলেননি। কিন্তু ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিঃসংশয় অনুজ্ঞার জন্য অর্জুন বেশ একটু কৌশলই করেছিলেন কিনা— কে জানে! অর্জুন কৃষ্ণকে বলেছিলেন— চল যাই যমুনার দিকটায় ঘুরে আসি— বড্ড গরম এখানে— উষ্ণানি কৃষ্ণ বর্ত্তন্তে গচ্ছাবো যমুনাং প্রতি। কৃষ্ণ বললেন— আমিও মনে মনে এই কথাই ভাবছিলাম, অর্জুন! বেশ বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে নিয়ে যমুনার কাছে ফুর্তি করে আসলে দারুণ হত। কে না জানে— ধীর সমীরে যমুনাতীরে কৃষ্ণের উল্লাস বড় বেশি। কিন্তু অর্জুন! কৃষ্ণের ইচ্ছা থাকায় ধর্মরাজের অনুমতি মিলতে দেরি হয়নি। ফুর্তির জন্য বন্ধু-বান্ধব যত না গেছেন তাঁদের সঙ্গে, ফুর্তিবাজ অন্য মেয়েরা গেছে তার চেয়ে বেশি। তারা নাচবে, গাইবে, যা ইচ্ছে করবে— বনে কাশ্চিজ্জলে কাশ্চিৎ— স্ত্রিয়শ্চ বিপুল-শ্রোণ্য-শ্চারুপীনপয়োধরাঃ। কৃষ্ণ আর অর্জুনের সঙ্গে এসেছেন সুভদ্রা আর দ্রৌপদী। খাওয়া দাওয়া আর নাচে-গানে ভরে উঠল এই চারজনের অন্তরঙ্গ আসর। নাচনেওয়ালি মেয়েদের রঙ্গ-তামাশায় ভারী মজা পেলেন দ্রৌপদী এবং সুভদ্রা। খুশির মেজাজে তাঁরা সেই মেয়েদের দিকে নিজের গায়ের গয়না ছুড়ে দিলেন, ছুড়ে দিলেন রঙিন ওড়না— দ্রৌপদী চ সুভদ্রা চ বাসাংস্যাভরণানি চ।

বাড়ির বাইরে আপন ঈপ্সিততমের সঙ্গে দ্রৌপদীকে আমরা কি এত খুশির মেজাজে, এত উচ্ছ্বসিত— আর কখনও দেখেছি? হয়তো নৈকট্যের আরও সংজ্ঞা আছে কোনও, দিন দিন, প্রতিদিন দাম্পত্য অভ্যাস— সেই বুঝি নৈকট্য! হবেও বা। কৃষ্ণ-অর্জুনের এই যমুনা-বিহার থেকেই সূচিত হয়েছিল খাণ্ডব-দহনের প্রক্রিয়া। পাণ্ডবরা ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞায় খাণ্ডবপ্রস্থে রাজ্য করতে এসেছেন। শস্যহীন, রুক্ষ জমি এই খাণ্ডবপ্রস্থ। অগ্নিদেবের ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি কঠিন কথা থাক। কিন্তু সমস্ত খাণ্ডববন পুড়িয়ে যে বীর প্রায় একক ক্ষমতায় জায়গাটাকে সবার বাসযোগ্য করে তুললেন, যে শালীনতায় তিনি ময়দানবের মাধ্যমে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজপ্রসাদ বানানোর ব্যবস্থা করলেন— সেই অর্জুনের সব ক্ষমতা, ত্যাগ— দ্রৌপদীর মনে ছিল। খাণ্ডব-দহনের অসাধারণ প্রক্রিয়ায় দ্রৌপদী কতটা মুগ্ধ ছিলেন— তা টের পাওয়া যায় পরবর্তী সময়ে দ্রৌপদীর আক্ষেপে। সেই বিরাট-পর্বে দ্রৌপদী যখন কীচকের উদগ্র কামনায় বিব্রত হচ্ছেন, তখন ভীমের কাছে গিয়ে দ্রৌপদী অর্ধেক অনুশোচনা করেছেন শুধু অর্জুনকে নিয়ে। তাঁর কেবলই কষ্ট— অর্জুনের এই দশা হল কী করে? সেই মানুষ, যে নাকি খাণ্ডব-দহন করে অগ্নিকে তৃপ্ত করেছিলেন— যোঽতর্পয়দমেয়াত্মা খাণ্ডবে জাতবেদসম্— সে বিরাট রাজার

অন্তঃপুরে নাচনেওয়ালি সেজে থাকে কী করে? এই খাণ্ডব-দহনের প্রসঙ্গ দ্রৌপদীর মুখে আবার এসেছে, যখন তিনি কুমার উত্তরের কাছে বৃহন্নলার সারথি হবার যোগ্যতা-প্রমাণে ব্যস্ত হয়েছিলেন। কাজেই মহাভারতের আদিপর্বেও যুধিষ্ঠিরের স্বামিত্বে যত গৌরবান্বিত ছিলেন দ্রৌপদী, তার চেয়ে অনেক বেশি মুগ্ধ ছিলেন অর্জুনের বীরত্বে। কিন্তু দ্রৌপদীর কাছে অর্জুনের মাহাত্ম্য প্রমাণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার বক্তব্য— আদিপর্বে আমরা এমন কিছু দেখিনি যাতে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দ্রৌপদীর নৈকট্য প্রমাণ করা যায়।

তারপর বুদ্ধদেব যেমন লিখেছেন— 'দ্যূতসভায় অবমানিত হয়ে দ্রৌপদী তীব্র স্বরে বলে উঠলেন— আমি পাণ্ডবদের সহধর্মিণী, আমি ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের ভার্যা!— যেন বহুবচনের মধ্যে যুধিষ্ঠিরকে ধরানো গেল না, স্বতন্ত্রভাবে এবং বিশেষভাবে তাঁর নাম বলতে হ'লো...'— ঠিক এইভাবে কথাগুলি মহাভারতে নেই। দ্রৌপদী বলেছিলেন— আমি পাণ্ডবদের ভার্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, এবং কৃষ্ণের বান্ধবী হওয়া সত্ত্বেও কেমন করে যে আমায় এই সভায় সমস্ত রাজাদের সামনে নিয়ে আসা হল— ভাবতে পারি না।

এই হল একটি শ্লোক এবং এই শ্লোকে 'কথং হি ভার্যা পাণ্ডূনাম্' আমি পাণ্ডবদের ভার্যা— এখানে যুধিষ্ঠিরকেও ধরানো গেছে একভাবে। পরের শ্লোকে যুধিষ্ঠিরের নাম আলাদাভাবে উচ্চারণ করেছেন দ্রৌপদী, কিন্তু তার তাৎপর্য বুদ্ধদেব যেমনটি বলেছেন, তেমনটি আমার মনে হয় না। এখানে আবারও শ্লোকটা যেখানে আছে, যে প্রসঙ্গে আছে— সেটা বলি। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বাজি রেখে হেরেছেন যদিও, তবু তিনি নিজেকে বাজি রেখে হেরেছেন আগে। এ অবস্থায় আইনের মারপ্যাঁচে দ্রৌপদীকে কোনও ভাবেই কৌরবদের দাসী বলা যায় কিনা— এটাই ছিল দ্রৌপদীর প্রশ্ন। এই প্রশ্নকূট নিয়ে আগেও আলোচনা হয়ে গেছে। মহামতি ভীষ্ম এই প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছেন এবং উত্তরের জন্য দেখিয়ে দিয়েছেন যুধিষ্ঠিরকেই। দুঃশাসনের অসভ্যতাও তখন শেষ হয়ে গেছে, কাপড় টেনে টেনে তিনি তখন ক্লান্ত। এরই মধ্যে কর্ণ বললেন— দুঃশাসন! ঝিটাকে এবার ঘরে নিয়ে যাও— কৃষ্ণাং দাসীং গৃহান্ নয়।

ঠিক এই মুহূর্তে কৃষ্ণা পাঞ্চালী আবার কথা আরম্ভ করলেন সমবেত সুধীজনের সামনে। আবার সেই শাশ্বত লোকাচার সাধারণ ধর্মবোধের কথা তুললেন দ্রৌপদী। সেই স্বয়ম্বর সভায় রাজাদের সামনে একবার আমি এসেছিলাম, আর আজও আমাকে আসতে হল! আমার গায়ে হাওয়ার পরশ লাগলেও যেখানে আমার স্বামীরা সইতে পারেন না, ভাবেন বুঝি, পর-পুরুষের ছোঁয়া লাগল সেই পাণ্ডবরাও আমার এই অপমান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সহ্য করলেন।

ঠিক এইখানেই দ্রৌপদী দুঃখ করে বলেছেন— পাণ্ডবের ভার্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের বোন এবং কৃষ্ণের বান্ধবী হয়েও আমাকে এই সভায় আসতে হল? এর পরেই যুধিষ্ঠিরের গৌরবে সেই আলাদা শ্লোকটি। দ্রৌপদী বললেন— দেখ হে, কৌরবরা! আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ভার্যা, আমাদের বিবাহ হয়েছে সবর্ণে, ক্ষত্রিয়ে ক্ষত্রিয়ে— তামিমাং ধর্মরাজস্য ভার্যাং সদৃশ-বর্ণজাম্— এখন ভেবে দেখ তোমরা, আমাকে দাসী বলবে, না, অদাসী বলবে? যা বলবে— তাই করব— ব্রুত দাসীম্ অদাসীং বা তৎ করিষ্যামি কৌরবাঃ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ভার্যার গৌরবে যে কথাগুলি বলেছেন দ্রৌপদী, তার একটা পৃথক গুরুত্ব অবশ্যই আছে আমার বিবেচনায়, তবে তার প্রসঙ্গটা এখানে খেয়াল করার মতো। মনে রাখা দরকার— দ্রৌপদীকে কোনওভাবেই দাসী বলা যায় কিনা— এই ছিল প্রশ্ন। দ্রৌপদী ধৃতরাষ্ট্রকে মনে করিয়ে দিয়েছেন— তিনি কৌরবকুলের পুত্রবধূ, ধৃতরাষ্ট্রের কন্যার মতো— স্নুষাং দুহিতরঞ্চৈব। দ্রৌপদী মনে করিয়ে দিয়েছেন— কুরুকুলের চিরন্তন ধর্মবোধের কথা— যে ধর্মবোধ অতিক্রম করে তাঁরা কোনওদিন কুল-বধূদের অমর্যাদা করেননি, এবং যে ধর্মবোধ এখন বিলুপ্ত। এইবার তিনি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ভার্যার গৌরবের কথা বলছেন।

আবারও মনে রাখতে হবে— বিদগ্ধা দ্রৌপদী, পাণ্ডব-ভার্যা দ্রৌপদী, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী দ্রৌপদী— এই অভিজাত বংশ-সম্বন্ধগুলি কৌরব-কুলাঙ্গারদের মনে করিয়ে দিয়ে তবেই দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের প্রসঙ্গে আসছেন। আসছেন এইজন্য যে, এই কয়েক ঘণ্টা আগেও তিনি ছিলেন ইন্দ্রপ্রস্থের পাটরানি। রাজা যুধিষ্ঠিরের স্ত্রী। ক্ষত্রিয় যুধিষ্ঠির সমানবর্ণা ক্ষত্রিয়া-কুমারীকে বিবাহ করে, তবেই না কুরুকুলের পুত্রবধূর সম্মানে তাঁকে এই বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। আর যে কুরুকুল চিরকাল শুধু ধর্মানুসারে কাজ করেছে, সেই কুরুকুলের জাতকেরা আজ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্মানুসারে বিবাহিতা রানি দ্রৌপদীকে দাসী বানাতে চাইছে। দ্রৌপদীর শাণিত ইঙ্গিত— এতে আভিজাত্যও নেই, ধর্মও নেই।

ধর্ম শব্দটা এখানে ফুল, নৈবেদ্য কিংবা বেলপাতার পুজো বোঝাচ্ছে না, ধর্ম এখানে এক বিশাল নীতিবোধ, সামাজিক ঔচিত্য; এমনকী যা করা হয়ে গেছে, তা যদি ঠিক না হয়ে থাকে, তবে তার করণীয়তা সম্বন্ধে গভীর কোনও তর্কও হতে পারে। দ্রৌপদী সেই তর্কই করছিলেন, এবং এইসব ক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির এতকাল ছিলেন প্রমাণ স্বরূপ। পাশা-ক্রীড়ার এই তাৎক্ষণিক মত্ততা ছাড়া যুধিষ্ঠির নৈতিক এবং উচিত কার্যে সবসময় ব্যক্তি স্বার্থ অতিক্রম করে সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন। এমনকী এখনও তিনি পাশা খেলে নিজেকে এবং নিজের স্ত্রীকেও হেরেছেন— এই চরম মুহূর্তেও পাশা খেলার ন্যায়-নীতি অনুসারে তাঁর মাথার ওপর যে গভীর সংকট নেমে এসেছে— সে সংকট থেকে বাঁচবার জন্য অন্য কোনও সহজ পন্থা অবলম্বন করেননি, অথবা কোনও তর্ক করেননি। কারণ পাশাখেলার নির্ধারিত নিয়মনীতিও তাঁর কাছে ধর্ম। যার জন্য দ্রৌপদী যখন বারবার কৌরবদের ওপরে চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছেন— বল তোমরা, আমি দাসী, না অদাসী, আমি ধর্মানুসারে জিত হয়েছি! না জিত হইনি— তোমরা যা বলবে— আমি তাই করব।

লক্ষণীয় বিষয় হল, কৌরবরা এখানে আজ্ঞাকারীর ভূমিকায় থেকেও তাঁদের সিদ্ধান্ত তাঁরা ঘোষণা করেননি। এই অবস্থাতেও তাঁরা বলেছেন— ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের বুদ্ধি ধর্মেই স্থিত এবং পাশাখেলায় হেরে যাবার পর এখনও তোমার ওপর তাঁর স্বামীর অধিকার আছে, কি নেই— তা এই ইন্দ্রকল্প যুধিষ্ঠিরের কাছেই জেনে নাও— ধর্মে স্থিতো ধর্মসুতো মহাত্মা স্বয়ঞ্চেদং কথয়ত্বিন্দ্রকল্পঃ।

এই কথাটা দুর্যোধন বলেছেন। আপনারা কি মনে করেন না যে, এখানেও 'স্বতন্ত্রভাবে এবং বিশেষভাবেই' যুধিষ্ঠিরের নাম করতে হয়েছে। অন্যদিকে এই সংকট কালেও দ্রৌপদী

যে ধর্মকেই শেষ অবলম্বন হিসেবে বেছে নিয়েছেন, সেই বহুমাননা করেও ভীষ্ম কিন্তু আবারও সেই যুধিষ্ঠিরকেই ন্যায়-নীতি বিচারের শেষ প্রমাণ বলে মনে করেছেন— যুধিষ্ঠিরস্তু প্রশ্নেঽস্মিন্ প্রণামমিতি মে মতিঃ।

যে কারণে ভীষ্ম, এবং এমনকী দুর্যোধনও বার বার 'স্বতন্ত্রভাবে এবং বিশেষভাবে', আলাদা করে যুধিষ্ঠিরের নাম করেছেন— আমার বিবেচনায়— দ্রৌপদীও ওই একই কারণে যুধিষ্ঠিরের নাম আলাদা এবং স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেছেন। কারণটা ভীষ্ম একবার যুধিষ্ঠির সম্বন্ধে বলেছেন, আবার অন্যত্র দ্রৌপদী নিজেই যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধে সে-কথা বলেছেন। ভীষ্ম এই দ্রৌপদীকেই বলেছিলেন— দরকার হলে যুধিষ্ঠির সমস্ত পৃথিবীও ত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করবেন না— ত্যজেৎ সর্বাং পৃথিবীং সমৃদ্ধাং, যুধিষ্ঠিরো ধর্মমতো ন জহ্যাৎ। আর বনপর্বে এসে দ্রৌপদী নিজেই তার স্বামীর সম্বন্ধে বলেছেন আমি যা বুঝি তাতে তুমি ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, এমনকী নিজেকেও অথবা আমাকেও ত্যাগ করতে পার, কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করতে পার না— ত্যজেস্ত্বমিতি মে বুদ্ধি র্ন তু ধর্মং পরিত্যজেঃ।

ধর্মের জন্য যুধিষ্ঠির এতটাই নিরপেক্ষ। এই নিরপেক্ষতা এমন এক প্রাবাদিক পর্যায়ে উন্নীত যে, দ্রৌপদী প্রথম দুঃশাসনের কবলে পড়ে অতিসংকটে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধে যে-শব্দ উচ্চারণ করেন— ধর্মে স্থিতো ধর্মসুতো মহাত্মা— দুর্যোধন তাঁর শত্রুপক্ষ হয়েও তাঁর তর্ক-সংকটে সেই একই প্রবাদ-কল্প ব্যবহার করেন— ধর্মে স্থিতো ধর্মসুতো মহাত্মা। কাজেই দ্রৌপদীর পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে এবং বিশিষ্টভাবে যুধিষ্ঠিরের নাম উচ্চারণের মধ্যে যদি অন্য কোনও মাহাত্ম্য আরোপ করতে হয়, তবে দুর্যোধন বা ভীষ্মের দিক থেকে যুধিষ্ঠিরের নাম পৃথকভাবে উচ্চারণ করার জন্য আমরা তাঁর কোন মাহাত্ম্য স্মরণ করব? বস্তুত ধর্ম, এবং এক অতি পৃথক তথা স্বতন্ত্র ধর্মবোধই যুধিষ্ঠিরকে তাঁর ভাইদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে, যার ফলে দ্রৌপদী, দুর্যোধন একই কারণে যুধিষ্ঠিরের নাম উল্লেখ করেন। এর মধ্যে যদি বুদ্ধদেবের দৃষ্টি-মতো দ্রৌপদীর 'উত্তরোত্তর আরও বেশি সংশ্লিষ্টভাবে' যুধিষ্ঠিরের ভার্যায় উত্তরণ দেখতে পাই, তা হলে দুর্যোধন বা ভীষ্মের জন্যও আমাদের আরও সংশ্লিষ্ট কোনও সম্বন্ধ খুঁজে বার করতে হবে।

যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধে পৃথক এবং বৃহৎ আলোচনার অবসর যখন আসবে, তখন আরও সূক্ষ্মভাবে এসব কথা ধরবার চেষ্টা করব, তবে শুধু বুদ্ধদেব বসুর মতো মহোদয় ব্যক্তির প্রতিপক্ষতার গৌরবে অল্প হলেও এ-কথা বলতে হবে যে, দ্রৌপদী কোনওভাবেই উত্তরোত্তর আরও সংশ্লিষ্টভাবে যুধিষ্ঠিরের ভার্যারূপে প্রতিভাত হন না। যুধিষ্ঠির স্বক্ষেত্রে এতই বেশি বড়, এতই বেশি মহান এবং সেই কারণেই সুদূর আকাশে-আঁকা ইন্দ্রধনুটির মতো এতই তাঁর দূরত্ব যে, তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কে কারও পক্ষে সংশ্লিষ্টতায় উত্তরণ ঘটানো বড় কঠিন বলেই আমি মনে করি।

দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের স্ত্রী তো বটেই, কিন্তু এই জ্যেষ্ঠ-স্বামীর সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে একধরনের 'ডিকটমি' আছে। একদিকে যুধিষ্ঠির যেখানে তাঁর সুদূর ধর্মমঞ্চে বসে আছেন, সেখানে দুঃশাসন এসে তাঁর চুলের মুঠি ধরলেও, তিনি বলে ওঠেন— আমি ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের কথার মধ্যে গুণগুলি বাদ দিয়ে অণুমাত্র দোষও দেখতে চাই না, কারণ ধর্মের গতি সূক্ষ্ম এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিপুণভাবে তা লক্ষ করতে হয়; তিনি যা বুঝেছেন, আমি হয়তো তা বুঝতে পারছি না— বাচাপি ভর্তুঃ পরমাণুমাত্রম্ ইচ্ছামি দোষং ন গুণান্ বিসৃজ্য। অন্য দিকে এই সুদূর সম্মানিত ব্যবহারের লেশমাত্রও ছিল না, যখন দুঃশাসনেরও আগে প্রাতিকামী এসে দ্রৌপদীকে প্রথম রাজসভায় যেতে বলেছিল। দ্রৌপদী সারথি-জাতের প্রাতিকামীর সামনেই রাজা যুধিষ্ঠিরের সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে তাঁর দ্যূতাসক্তির ঘৃণ্যতা প্রমাণ করে বলেছিলেন— যাও সভায় গিয়ে সেই জুয়াড়িকে জিজ্ঞাসা করে এসো যে, সে নিজেকে আগে বাজি রেখে হেরেছে, না আমাকে— গচ্ছ ত্বং কিতবং গত্বা সভায়াং পৃচ্ছ সূতজ?

এই মুহূর্তে দ্রৌপদী আপন কুলবধূর সম্মান বাঁচানোর জন্য আইনের ফাঁকে যুধিষ্ঠিরের অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। অর্থাৎ যুধিষ্ঠির যদি আগে কোনওভাবে নিজেকে বাজি রেখে হেরে থাকেন, তবে এই মুহূর্তে তাঁর স্বামীত্বের অধিকার না থাকায় দ্রৌপদী খুশি হতে পারেন। কাহিনি যত এগিয়ে চলেছে, যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর অধৈর্য আরও বেড়ে চলেছে বলে আমাদের মনে হয়েছে। সামগ্রিকভাবে যুধিষ্ঠির তাতে খারাপ হলেন, না ভাল হলেন— সে তর্কে আমি আপাতত যাচ্ছি না। কারণ, যুধিষ্ঠির এক বিশাল এবং ব্যাপ্ত মহাক্রমের মতো। শুধুমাত্র দ্রৌপদীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কে তিনি খারাপ, না ভাল— সে প্রশ্নটির শুধু আলোচনা হতে পারে।

যুধিষ্ঠিরের সূক্ষ্ম ধর্মবোধের মতো বুদ্ধদেবের সাহিত্য বোধও বুঝি অতিশয় সূক্ষ্ম,— এতটাই সূক্ষ্ম যে, আমার মতো অনধিকারীর পক্ষে তা ধরাও বুঝি মুশকিল। তবে পূর্বাপর-বিচারে আমার যা মনে হয়েছে, তাতে সভাপর্বের পর কাহিনি যতই এগিয়ে চলেছে যুধিষ্ঠির সম্পর্কে দ্রৌপদীর অসহিষ্ণুতা ততই বেড়েছে। ইন্দ্রকল্প পাঁচস্বামীর পিছন পিছন তিনি বনে গিয়েছেন বটে, কিন্তু মনের রাগ তিনি মনে লুকিয়ে রাখেননি। দুঃশাসনের হাতে-ধরা চুল তিনি খুলে রেখে দিয়েছেন সমস্ত অপমানের প্রতীকের মতো। বনে যাবার কিছুদিনের মধ্যে যখন কৃষ্ণ পৌঁছালেন পাণ্ডবদের কাছে, তখন দ্রৌপদী কৃষ্ণের সামনে ধিক্কার দিয়েছেন স্বামীদের। হয়তো অত্যন্ত ক্ষোভে অথবা চরম উদাসীনতায় যুধিষ্ঠিরের নামও তিনি করেননি। ভাবটা এই— তিনি যা করে ফেলেছেন, ফেলেছেন; কিন্তু কী হল এই ভীম আর অর্জুনের, যাঁদের একজন নিজের বাহুবলে আস্থাবান আর অন্যজন ধনুষ্মত্তায়— ধিক্ বলং ভীমসেনস্য ধিক্ পার্থস্য গাণ্ডীবম্? বুদ্ধদেবের অনুকরণে কি এখানে বলব যে, পাঁচজনের মধ্যে যেন এঁদের ধরানো গেল না, স্বতন্ত্র এবং বিশেষভাবে এঁদের নাম করতে হল। যেন দ্রৌপদী নিজের রক্ষার জন্য এই দুই পাণ্ডবের ওপর বেশি নির্ভর করেন, যুধিষ্ঠির কিংবা নকুল-সহদেবের ওপর তাঁর যেন কোনও ভরসাই নেই।

কাহিনি আরও যখন এগিয়ে চলেছে, দ্রৌপদীকে আমরা তখন আরও উত্তপ্ত দেখেছি। দ্বৈতবনের এক অরুণিত সায়াহ্নে দ্রৌপদীকে দেখছি যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে বিব্রত, বিরক্ত। তিনি কথা আরম্ভ করেছিলেন দুর্যোধনের দোষ এবং শকুনির কপটতা নিয়েই, যাতে স্বামীদের ওপরে, বিশেষত যুধিষ্ঠিরের ওপরে তাঁর আক্ষেপ না আসে। ইন্দ্রপ্রস্থে পঞ্চ-স্বামীর সুখোচ্ছ্বাস এবং এই বনে তাঁদের কষ্টকর জীবনের প্রতিতুলনার উল্লেখেই কথা সমাপ্ত হতে পারত। কিন্তু রাজনীতির বিষয়ে দ্রৌপদীর ভাল রকম পড়াশুনো থাকায় তিনি সর্বংসহ প্রহ্লাদের

উক্তি শুনিয়েছেন যুধিষ্ঠিরকে। শুনিয়েছেন— প্রহ্লাদের মতো নরম মানুষও সময়কালে দণ্ডের প্রশংসা করেছেন, ক্ষমার নয়। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর কথা শোনেননি, কারণ তাঁর সেই চিরন্তন ধর্মবোধ, সেই চিরন্তনী ক্ষমার মহত্ত্ব। দ্রৌপদী হাল ছেড়ে দিয়েছেন তাঁর জ্যেষ্ঠ-স্বামী সম্পর্কে। বলেছেন তুমি ধর্মের জন্য নিজেকে, নিজের সমস্ত ভাইদের, এমনকী আমাকেও ত্যাগ করতে পার— ভীমসেনার্জুনৌ চেমৌ মাদ্রেয়ৌ চ ময়া সহ— কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করতে পার না।

দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের এই বিশাল ভারবত্তা এবং মহত্ত্বের দূরত্ব জানেন। কিন্তু সে তাঁর সহ্যের বাইরে—

যত বড় হোক ইন্দ্রধনু সে
সুদুর আকাশে আঁকা,
আমি ভালবাসি মোর ধরণীর
প্রজাপতিটির পাখা।

ধর্মে চিরস্থিত মহান যুধিষ্ঠিরের বিশালতা দূরে সরিয়ে দিয়ে দ্রৌপদী তাঁর স্বামীর কাছাকাছি আসতে চেষ্টা করেছেন। ঝগড়া করে বলেছেন— এত সরল, এত মৃদু, এত বদান্য অথবা এত সত্যবাদী তুমি— অথচ সেই তোমার মতো এক মানুষের একটা জুয়াড়ির মতো জুয়ো খেলার দোষটি ঘটল কেন— কথমক্ষ-ব্যসনজা বুদ্ধিরাপতিতা তব? সময় বুঝে পাঞ্চালী কৃষ্ণাও কত ধর্মের উপদেশ শুনিয়ে দিলেন যুধিষ্ঠিরকে। তবু যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর মনের কাছাকাছি আসেননি। স্ত্রীর সুমহান উপদেশের মধ্যে নাস্তিক্যের দোষারোপ করে তিনি শেষ আদেশ জারি করেছেন— বিধাতার বিধানকে 'চ্যালেঞ্জ' কোরো না, খোদার ওপর খোদকারি কোরো না— ঈশ্বরঞ্চাপি ভূতানাং ধাতারং মা চ বৈ ক্ষিপ। আরও শেখো আরও নত হওয়ার চেষ্টা করো, এমন বুদ্ধি ভাল নয় মোটেই— শিক্ষস্বৈনং নমস্বৈনং মা তে ভূদ্ বুদ্ধিরীদৃশী।

নিজের কথা একটুও শুনছেন না, এমন মানুষকে দ্রৌপদী গভীর চুম্বনে পবিত্র করে তোলেননি। তিনি অদৃষ্টবাদী নন, অতএব পুনরায় তিনি তাঁকে শত্রুর বিরুদ্ধে জেগে উঠতে বলেছেন। বলেছেন— রাজনীতির ফলের জন্য চেষ্টা প্রয়োজন, যত্ন প্রয়োজন। তোমার মতো যারা বিধাতা আর অদৃষ্ট নিয়ে শুয়ে থাকে, তাদের অলক্ষ্মীতে ধরে আর কিছু নয়— অলক্ষ্মীরাবিশত্যেনং শয়ানম্ অলসং নরম্।

দুঃখের বিষয়— দ্রৌপদী এখনও আমার কাছে যথার্থ যুধিষ্ঠিরের ভার্যারূপে প্রতিভাত হচ্ছেন না। অপিচ কোনও 'নিগূঢ় আকর্ষণ'ও তাঁকে যুধিষ্ঠিরের কাছাকাছি নিয়ে আসছে বলে আমার মনে হয়নি। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দ্রৌপদীর এই রাজনৈতিক তর্কযুদ্ধের পর-পরই অর্জুন চলে গেলেন তপস্যায় পাশুপত অস্ত্রের সন্ধানে। দ্রৌপদীর মনের অবস্থা তখন কী হয়েছিল— তা পূর্বেই দেখিয়েছি। বছরের পর বছর অর্জুন-হীন জীবন আর দিনের পর দিন যুধিষ্ঠির মুনি-ঋষিদের কাছে পুরাণ-কাহিনি, অধ্যাত্ম-কথা শুনে যাচ্ছেন। এরই অবধারিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফল— দ্রৌপদী অতিষ্ঠ হয়ে অর্জুনের জন্য একদিন কেঁদে উঠেছেন— আমার কিছু ভাল লাগছে না, অর্জুনকে ছাড়া একটুও ভাল লাগছে না, অর্জুন ছাড়া আমার কাছে সব শূন্য— শূন্যামিব প্রপশ্যামি তত্র তত্র মহীমিমাম্।

ঠিক এই ধরনের হাহাকার দ্রৌপদীর মুখে আর দ্বিতীয়বার শুনেছি কিনা সন্দেহ। এই বিলাপোক্তির সঙ্গে ভীম, নকুল এবং সহদেব— তিন ভাইই সুর মিলিয়েছেন, কিন্তু যুধিষ্ঠির নন। অবশ্য তিনি পরে একই কথা বলেছেন, কিন্তু ভাইদের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ সুর মেলাননি। আপন অধ্যাত্ম স্বাতন্ত্র্যে তখনও তিনি স্থিতধী। ভেবেছেন বুঝি— মেয়েরা ওরকম কাঁদেই বটে। কিন্তু কৃষ্ণা পাঞ্চালীর সঙ্গে ভাইয়েরা যোগ দেওয়ায় যুধিষ্ঠির কিছু চিন্তিত হলেন— ধনঞ্জয়োৎসুকানাস্তু ভ্রাতৃণাং কৃষ্ণয়া সহ। সবার মন ভোলানোর জন্য নারদের পরামর্শে যুধিষ্ঠির সবাইকে নিয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ালেন। ঘুরে ঘুরে দ্রৌপদী শ্রান্ত, ক্লান্ত। কিন্তু এরই মধ্যে খবর এসে গেছে— অর্জুনের অস্ত্রপ্রাপ্তি সম্পূর্ণ, তিনি আসছেন। দ্রৌপদীকে আর রাখা যায়নি, হিমালয়ের কঠিন বন্ধুর পথে তাঁর পা চলে না। তবু তাঁকে রাখা যায়নি। যুধিষ্ঠির বলেছেন— তুমি এখানেই দ্রৌপদীকে নিয়ে থাক ভীম। তোমার গায়ে জোর আছে, তুমি সহদেব, ধৌম্য— এঁদের নিয়ে এখানে থাক, নইলে এত কষ্ট করে কৃষ্ণা পাঞ্চালী যাবেন কী করে?

দিনের পর দিন নিত্যসঙ্গের ফলে দ্রৌপদীর মন যদি এইভাবে বুঝে থাকেন যুধিষ্ঠির, তা হলে কী করেই বা বলি— পাঁচের মধ্যে একের নাম করতে হলে 'যুধিষ্ঠিরকেই তাঁর মনে পড়ে।' আর ভীমসেন, যাকে বুদ্ধদেব ভেবেছেন বড়ই স্থূল, দ্রৌপদীর 'আজ্ঞাবহ' অথবা 'প্রধানত এক মল্লবীর'— তিনি কিন্তু দ্রৌপদীর মতো এক বিদগ্ধা রমণীর মন বোঝেন। এই স্থূল মল্লবীর জানেন— 'অনবরত ভ্রাম্যমাণ' যুবকটির ওপর এই রমণীর কী গভীর দুর্বলতা। যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাব শেষ হতে না হতেই তিনি জানিয়েছেন— হ্যাঁ, পথশ্রম, কিংবা শারীরিক কষ্ট অবশ্যই হচ্ছে, তবে দ্রৌপদী যে যাবেনই, তিনি যে অর্জুনকে দেখতে পাবেন— ব্রজত্যেব হি কল্যাণী শ্বেতবাহ-দিদৃক্ষয়া। দ্রৌপদী গেছেন, হিমালয়ের কনকনে হাওয়ায় আর পথশ্রমে দ্রৌপদী একবার অজ্ঞানও হয়ে গিয়েছেন, কিন্তু তবু গেছেন। ভীমের ছেলে ঘটোৎকচের কাঁধে বসে চলতে চলতে শেষে বুঝি তাঁর ভালই লাগছিল। অর্জুন আসবেন, কী ভাল যে লাগছে! এখন আর বন্ধুর পার্বত্য ভূমিতে হাঁটার কষ্ট নেই, শুধু সামান্য অপেক্ষার আনন্দ। হিমালয়ের পর্বত, বিজন অরণ্যানী— সে যেমন এখনও মধুর তেমনই সেদিনও ছিল অপূর্ব। বনভূমি ফল-ফুলের শোভায় উপচে পড়ছে, আর কৃষ্ণা পাঞ্চালীর মনে তখন শুধু অর্জুনের দিদৃক্ষা— কতদিন পর তার সঙ্গে দেখা হবে।

ঠিক এইরকম একটা মানসিক পরিমণ্ডলের মধ্যে— মন যখন আপনিই উদার হয়ে যায়— ঠিক তখনই কোথা থেকে উড়ে এসে একটি মাত্র সুর-সৌগন্ধিক, সোনার বরণ পদ্ম দ্রৌপদী পায়ের কাছে এসে পড়েছিল। আনন্দের আতিশয্যে দ্রৌপদীর সেটি উপহার দিয়েছিলেন যুধিষ্ঠিরকে। বুদ্ধদেবের মনে হয়েছে— যুধিষ্ঠির আর দ্রৌপদীর জীবন-বন্ধনে এই উপহার বুঝি এক বিরাট ঘটনা, বিরাট প্রতীকী ঘটনা— বহুভর্তৃকা দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকেই তাঁর স্বামী হিসেবে মনে মনে এতদিন লালন করতেন বলেই যেন দ্রৌপদীর দিক থেকে এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বর্ণপদ্মের উপহার। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের এরকম মনে হয় না। হ্যাঁ, এমন তো হতেই পারে— যে বিদগ্ধা রমণী পঞ্চস্বামী নিয়ে ঘর করেন এবং যাঁর অন্তরের কেন্দ্রভূমিতে অর্জুনের মতো এক বিরাট স্বপ্ন আছে— তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ-স্বামীটির সম্বন্ধে এমন তো ভাবতেই পারেন— আহা! এই মহান পুরুষটির হৃদয় তো আমি কোনও দিন ভাল করে লক্ষ করিনি, সারা জীবন ধর্ম ধর্ম করে গেল, শত্রুপক্ষের অন্যায় আচরণের জন্য কতই না গালাগালি দিয়েছি এঁকে! নিজের স্ত্রীর কাছেও কতই না লাঘব সহ্য করতে হয়েছে এই মহান ব্যক্তিটিকে! দ্রৌপদী ভাবতেই পারেন— উদগ্র নীতিবোধ, অতি-প্রকট সাধুতা— এ-সব আমার অপমানের নিরিখে আমার কাছে যতই কষ্টের হোক, যুধিষ্ঠির মানুষটা তো খারাপ নয়।

না, এ-সব কথা মহাভারতের কবি স্বকণ্ঠে উচ্চারণ করেননি। কিন্তু স্বর্ণপদ্মের উপহারে আর যাই হোক, যুধিষ্ঠিরের ভার্যাত্ব-প্রমাণের তাগিদ দ্রৌপদীর ছিল না। বরঞ্চ উদারতা ছিল। যে বীর স্বামীর সম্বন্ধে মনে মনে তাঁর একান্ত অপ্রাপ্তির বেদনা ছিল, তাঁর সঙ্গে দেখা হবে— এই আনন্দই তাঁকে সেদিন আকস্মিক-ভাবে যুধিষ্ঠিরের প্রতি উদার করে তুলেছিল। এই ঔদার্যের আরও একটা কারণ আছে। সেটা হচ্ছে অনায়ত্ততা। যুধিষ্ঠিরকে তিনি কোনওদিনই ভাল করে আয়ত্ত করতে পারেননি। হ্যাঁ, অর্জুনকেও পারেননি। এমনকী তথাকথিত ভাবনাটি যদি মেনেও নিই, অর্থাৎ একজন 'নিত্যসঙ্গী' অন্যজন 'অনবরত ভ্রাম্যমাণ'। এক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণের ওপর দ্রৌপদীর হৃদয়ের যে দুর্বলতা ছিল, নিত্যসঙ্গীর ওপর তা ছিল না। কিন্তু দুর্বলতা না থাকলেও একজন বলিষ্ঠ পুরুষমানুষ— হোক না তাঁর বলিষ্ঠতা নীতি অথবা ধর্মের দিক থেকেই শুধু প্রবল— তবু তিনি দ্রৌপদীর মতো একজন বিদগ্ধা রমণীর আয়ত্ত হবেন না— এটা কি দ্রৌপদীরই অভিপ্রেত ছিল?

স্বর্ণপদ্মের উপহার যুধিষ্ঠিরের ভাগ্যে জুটেছে দ্রৌপদীর ক্ষণিক-উচ্ছ্বাসের অঙ্গ হিসাবে, অথবা মাঝে মাঝে তিনি নিত্যসঙ্গী যুধিষ্ঠিরের মনের কাছে আসতে চেষ্টা করেছেন, তারই সুফল হিসেবে অথবা— আমাকে যদি আরও স্বাধীনতা দেওয়া যায়, তবে বলব— অনেকদিন পর অর্জুনের দেখা পাবেন বলে সব কিছুই যখন তাঁর কাছে উদার মাধুর্যে ধরা দিচ্ছে, সেই উদার-ক্ষণের উচ্ছ্বাসেই দ্রৌপদী স্বর্ণপদ্মের উপহার দিয়েছেন যুধিষ্ঠিরকে।

অন্যদিকে ব্যাপারটা যুধিষ্ঠিরের দিক থেকেও দেখুন। দ্রৌপদী বহু-ভর্তৃকা হলেও আসলে তিনি আমারই— এমন কোনও স্বাধিকার বোধ কি তাঁর দিক থেকে ছিল? স্বর্ণপদ্মের উপহারে তিনি একটুও বিগলিত হননি। মহাভারতের কবি একটি শব্দও ব্যয় করেননি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদীর উপহার দেওয়ার ছবিটি তুলে রাখতে। শুধু একটা সংবাদের মতো আমাদের তিনি জানিয়েছেন— দ্রৌপদী পদ্মফুল নিয়ে গেলেন ধর্মরাজের কাছে— জগাম পুষ্পমাদায় ধর্মরাজায় তত্তদা। ব্যাস, এরপর থেকেই কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন চলে গেছেন সেই ভীমসেনের বর্ণনায়— যিনি দ্রৌপদীর ইচ্ছামাত্রে আরও স্বর্ণপদ্ম জোগাড় করতে চললেন অথবা দ্রৌপদীর ওপর ভালবাসায় তিনি কী করলেন, কতটা করলেন— তার অনুপুঙ্খ বিবরণে। যুধিষ্ঠির এবং স্বর্ণপদ্মের কথা আর একবারও ওঠেনি। উপহার পাওয়ার পর যুধিষ্ঠিরের সামান্য প্রতিক্রিয়াও স্থান পায়নি ব্যাসের লেখনীতে। ভীমের জন্য ব্যাসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এত সহানুভূতি কেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল একটিমাত্র পঙ্‌ক্তিতে। ভীমকে অনেকক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, যুধিষ্ঠির উতলা হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন— ভীম কোথায়, পাঞ্চালী! কোথায় সে, কী কাজে গেছে? কৃষ্ণা পাঞ্চালী বললেন— সেই যে সেই সোনার বরণ পদ্মখানি, মহারাজ!— যৎ তৎ সৌগন্ধিকং রাজন্— সেটা হাওয়ায় উড়ে এসে পড়েছিল বটে কিন্তু সেটা ভীমই আমাকে এনে দিয়েছিল— আমি বলেছি— আরও যদি এমন ফুল দেখ তো নিয়ে এস আমার জন্য।

এইটুকুই। দ্রৌপদীর উপহার পেয়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কোনও ভাব-বিকার আমরা দেখিনি। কিন্তু দ্রৌপদীর ইচ্ছা, শুধু একটা ইচ্ছার জন্য ভীমসেনকে কত মারামারি, কত গিরি-দরি-গুহা আমরা লঙ্ঘন করতে দেখলাম। যুধিষ্ঠির ভাইদের আর দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে ভীমকে খুঁজতে খুঁজতে যখন সেই পদ্ম-সরোবরের কাছে এসে পৌঁছলেন, তখন দেখলাম সরোবরের তীরে রক্ষী-প্রতিম যক্ষ-রাক্ষসদের মেরে গদা উঁচিয়ে রেগে অন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ভীমসেন। যুধিষ্ঠির ভাইকে আলিঙ্গন করে মহাস্থবির ধর্মজ্ঞের মতো বললেন— এমন সাহস আর দ্বিতীয়বার কোরো না, যদি আমার মনের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে চাও তো দ্বিতীয়বার এমন ব্যবহার কোরো না— পুনরেবং ন কর্ত্তব্যং মম চেদ্ ইচ্ছসি প্রিয়ম্।

আর দ্রৌপদী ভীমকে কী বলেছিলেন? যদি আমি তোমার ভালবাসার মানুষ হই, ভীম— তা হলে এইরকম পদ্মফুল আরও আমাকে এনে দাও— যদি তেহং প্রিয়া পার্থ বহুনীমান্যুপাহর। মনে রাখবেন, ভীমের আনা পদ্মফুল দ্রৌপদী উপহার দিয়েছেন যুধিষ্ঠিরকে। তাতে বিন্দুমাত্র পুলকের প্রকাশ না ঘটিয়ে শুধুমাত্র দ্রৌপদীর প্রীতির জন্য সৌগন্ধিক পদ্মের অন্বেষায় ব্যস্ত ব্যক্তিটিকে যুধিষ্ঠির বলছেন— আমার পছন্দের কথা যদি ধর, তা হলে এমন কাজ যেন দ্বিতীয়বার কোরো না। এতে ভাইয়ের প্রতি যুধিষ্ঠিরের স্নেহ যতই প্রকট হয়ে উঠুক, দ্রৌপদীর উপহারের মর্যাদা এখানে কতটুকু প্রকাশ পেল? বিদগ্ধা প্রণয়িনীর ইচ্ছার মূল্যই বা কতটুকু থাকল?

আসলে এই উপহারের ব্যাপারটা বুদ্ধদেব অনর্থক বড় প্রতীকী করে তুলেছেন। কৃষ্ণা পাঞ্চালী আর যুধিষ্ঠিরের সম্পর্কে এত জটিলতা কিছু নেই। যুধিষ্ঠির তাঁর আজন্মলালিত ধর্মীয় তথা ন্যায়নীতির সংস্কারেই হোক, অথবা পিতৃবিয়োগের পর জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে আপন জননী এবং ভাইদের একান্ত-নির্ভর হিসেবেই হোক অথবা শত্রুপক্ষের জটিল ব্যবহারে বার বার অভিজ্ঞ হয়ে ওঠার ফলেই হোক, জগৎ সংসারে তিনি যেন কেমন বুড়ো মানুষটির মতো হয়ে গিয়েছিলেন। দ্রৌপদীর সঙ্গে তাঁর বয়সের যে বড় বেশি ফারাক ছিল, তা নয়; তবে স্ত্রীর ওপর তাঁর ব্যবহারটি ছিল বয়স্ক স্বামীর মতো। ভাইদের তিনি যে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন, দ্রৌপদীকেও তিনি সেই স্নেহেই দেখতেন। দ্রৌপদী তাঁর কাছে নিতান্তই এক সংস্কারের মতো, ধর্মপত্নীর সংস্কারে বাঁধা, তার বেশি কিছু না। আর ঠিক এই কারণেই বক-যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির যখন বলেন— গৃহে মিত্র ভার্যা, দৈবকৃত সখা ভার্যা, আর উপরন্তু 'ধর্ম অর্থ কাম— এই তিন পরস্পর বিরোধীর সংযোগ ঘটে শুধু ধর্মচারিণী ভার্যার মধ্যে'— এইসব কথার মধ্যে আমরা শুধু শাস্ত্রবচনের নীতিযুক্তিই অনুভব করি, দ্রৌপদীর

সঞ্চার আমরা অনুভব করি না। মহাভারতে এমন কোনও জায়গা নেই, যেখানে দ্রৌপদীর প্রণয়-সঞ্চারে তিনি কোনও ধর্ম-যুক্তি লঙ্ঘন করেছেন অথবা তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন। বক-যক্ষের অতগুলি প্রশ্ন এবং যে প্রশ্নগুলির একটারও বেঠিক উত্তর তাঁর স্নেহের ভাই এবং প্রিয়া পত্নীকে মৃত্যুর দিকেই ঠেলে দিতে পারত, সেইখানে সেই বিশাল নীতিশাস্ত্রীয় প্রহেলিকা সমাধানের সময় যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর ব্যক্তিগত সঞ্চার অনুভব করবেন— এমন মানুষই তিনি নন। যক্ষের প্রশ্ন এবং যুধিষ্ঠিরের উত্তরগুলি যদি সেভাবে দেখতে হয়, তা হলে বলতে হবে যুধিষ্ঠির যক্ষের শত প্রশ্নের উত্তরে শতবার শত-পরিচিত মানুষের ব্যক্তিগত সঞ্চার অনুভব করে থাকবেন। বস্তুত আমাদের চির-পরিচিত সংসারের সাধারণ তুলাদণ্ড দিয়ে দ্রৌপদীর প্রতি যুধিষ্ঠিরের ব্যবহার পরিমাপ করা বড়ই কঠিন। ভারতবর্ষের ধর্ম এবং দর্শন বাদ দিয়ে শুধুমাত্র শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে যুধিষ্ঠিরের চরিত্র বিশ্লেষণ করা একান্ত অসম্ভব। কারণ তিনি বড় বেশি স্বতন্ত্র, বড় স্বতন্ত্র-স্বভাব, নির্বিঘ্ন।

এত কথা বলেও আমি কিন্তু এটা বলছি না যে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে ভালবাসতেন না, অথবা দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে। বহুভর্তৃকা দ্রৌপদী তাঁর পঞ্চস্বামীর সঙ্গে কখন, কী ব্যবহার করেছেন আমি সংক্ষেপে তার একটা চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি— উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণের দুতিয়ালির আগে পর্যন্তও দ্রৌপদী তাঁর স্বামীদের কাছে নিজের অসহ্য অপমানের বিষয়ে সুবিচার পাবেন বলে মনে করেননি। কিন্তু যার কাছে সেই সুবিচার পাবেন বলে মনে করেছেন, অথবা যিনি এই বিদগ্ধা রমণীর স্বামী না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মন বুঝেছেন, সেই ব্যক্তিটির সঙ্গে দ্রৌপদীর সম্পর্কটাও অদ্ভুত— অদ্ভুত সুন্দর। আসছি সে কথায়, দ্রৌপদী তাঁর প্রিয়তম অর্জুনের একান্ত ভালবাসা পাননি, ভীমসেন আজ্ঞাবহ— দ্রৌপদীর প্রেমে তিনি বিকিয়েই আছেন, যুধিষ্ঠির বৈচিত্র্যহীন— নিত্য সাহচর্যের দৈনন্দিনতায় স্বামীত্বের অভ্যাসমাত্র, আর বলাই বাহুল্য, দ্রৌপদীর প্রেমের ক্ষেত্রে নকুল-সহদেব বড় বেশি বিবেচ্য নন। তাঁরা বৎসলা রমণীর স্নেহপাত্র-মাত্র।

তা হলে দ্রৌপদী কী পেলেন? তিনি প্রিয়তম অর্জুনের প্রত্যক্ষ ভালবাসা পাননি, পঞ্চস্বামীর অসম রসবোধ তাঁকে ভাগ করে নিতে হয়েছে, তাঁদের সারাজীবনের কষ্টের ভাগের সঙ্গে। বদলে তিনি পেয়েছেন শুধু সম্মান, ক্ষাত্র-রমণীর সম্মান, বীরপত্নীর সম্মান, শত্রুকুলের সর্বনাশের সম্মান। এমনকী যখন তাঁর প্রিয় পুত্রগুলিও মারা গেছে, তখনও তাঁর কোনও বৈরাগ্য কিংবা নির্বেদ আসেনি; তখনও তিনি পুত্রহন্তা অশ্বত্থামার প্রাণ চেয়েছেন। পুত্রহত্যার প্রতিশোধ-স্পৃহায় তিনি সটান উপস্থিত হয়েছেন পাণ্ডব-শিবিরে যুধিষ্ঠিরের কাছে। হস্তিনাপুরের ভাবী মহারাজের সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে দ্রৌপদী তাঁর বাক্যশূল প্রয়োগ করলেন সমস্ত স্বামীদের হৃদয়েই— প্রতিশোধ-স্পৃহায়।

তবে হ্যাঁ এখানেও, এই যুদ্ধপর্বের শেষ মুহূর্তেও একটা জিনিস লক্ষ করার মতো। ঝড়ে-পড়া কলাগাছের মতো দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের সামনে এসেই— ন্যপতৎ ভুবি— মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়লেন। তাঁর মুখটি শোকে কালিমাখা। অন্য কোনও কবি হলে দ্রৌপদীর মুখের উপমা দিতেন রাহুগ্রস্ত চাঁদের সঙ্গে। কিন্তু ব্যাস বললেন— তমোগ্রস্ত ইবাংশুমান্— অর্থাৎ তাঁর মুখখানি অন্ধকারে ঢাকা সূর্যের মতো। সূর্য ছাড়া এই ভাস্বর মুখের তুলনা হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। দ্রৌপদী পড়েই গিয়েছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই ভীম একলাফে তাঁকে ধরে নিলেন বাহুর বন্ধনে— বাহুভ্যাং পরিজগ্রাহ সমুৎপত্য বৃকোদরঃ। কথঞ্চিৎ শান্ত হবার পর দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বললেন— মহারাজ! সমস্ত ছেলেগুলোকে কালের গ্রাসে নিক্ষেপ করে বেশ তো রাজ্য-ভোগ করবেন মনে হচ্ছে। সমস্ত পৃথিবীর রাজা হয়ে আজকে সুভদ্রার ছেলেটাকে ভুলে গেলেন কী করে— অবাপ্য পৃথিবীং কৃৎস্নাং সৌভদ্রং ন স্মরিষ্যসি! আপনি আজই যদি ওই পাপিষ্ঠ অশ্বত্থামার জীবন না নিতে পারেন, তা হলে আমি উপোস করে মরব।

যুধিষ্ঠির স্বভাবতই মিন মিন করা আরম্ভ করলেন। দ্রৌপদী বললেন— ওকে প্রাণে মারা না গেলেও ওর মাথার সহজাত মণিটি আমায় এনে দিতে হবে। দ্রৌপদী বুঝলেন— এরা কেউ এগোবে না, তিনি সোজা তাঁর বশংবদ ভীমসেনকে ধরলেন এবং যথারীতি ভীম চললেনও। কাজটা সহজ ছিল না। কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনকে পাঠালেন, নিজেও গেলেন। অশ্বত্থামার সমস্ত সম্মানের প্রতীক, মণি আদায় হল এবং শুধুমাত্র নিজের জেদে সেই মণি যুধিষ্ঠিরের মাথায় ঝুলিয়ে শান্তি পেলেন কৃষ্ণা। তাঁর এই জেদের সাক্ষী মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন কিন্তু মণিটি দেবার সময় কতগুলি কথা বলেছিলেন এবং তাঁর বাক্যশেষের ব্যঞ্জনাটি ছিল— তাও কি তুমি খুশি হওনি? আর কী চাই? ভীম বলেছিলেন এই নাও তোমার মণি— অয়ং ভদ্রে তব মণিঃ— পুত্রহন্তা অশ্বত্থামা পরাজিত। তোমার কি মনে পড়ে দ্রৌপদী! সেই যখন শান্তির দূত হয়ে কৃষ্ণ যাচ্ছিলেন কৌরবসভায় আর তুমি বলেছিলে— যুধিষ্ঠির আজ যেভাবে শান্তির কথা বলছেন, তাতে বুঝি আমার স্বামীরা বেঁচে নেই, আমার ছেলে নেই, ভাই নেই, এমনকী তুমিও নেই। দ্রৌপদী! তুমি সেদিন বড় কঠিন কথা বলেছিলে কৃষ্ণকে। মনে রেখ কৃষ্ণকে আমরা পুরুষোত্তম বলে মানি। সেই তাঁকে তুমি কী ভাষাতেই না অপবাদ দিয়েছিলে— উক্তবত্যসি তীব্রাণি বাক্যানি পুরুষোত্তমে। হতে পারে— সেসব কথা ক্ষত্রিয় ধর্মের অনুরূপ। কিন্তু আজ দেখ— দুর্যোধন মৃত, আমি কথা রেখেছি। দুঃশাসনের রুধির পান করেছি। আমি কথা রেখেছি। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার সমস্ত যশের নিদান এই মণিও তোমাকে এনে দিলাম।

ভীম এইখানে কথা শেষ করেছেন এবং আমার বিশ্বাস— এই বাক্যের অবশেষ দ্রৌপদীকে বলা যায় না। বলা গেলে শেষ কথা ছিল— আর কী চাও? এবার অন্তত যুদ্ধ বন্ধ হোক। ভীম বলেছেন— দ্রৌপদীর কথা নাকি ক্ষত্রিয় ধর্মের অনুরূপ, আমি বলি— আজীবন দ্রৌপদীর ব্যবহার প্রায় পুরুষ-ক্ষত্রিয়ের মতো। তিনি যতখানি রমণী তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষত্রিয়া কিংবা ক্ষত্রিয়াণী। তিনি যতখানি প্রেমিকা, তার চেয়ে পাঁচ স্বামীর জীবনে অনেক বড় ঝটিকা। পাণ্ডবেরা তাঁদের রাজ্যহরণে কিংবা ধন-রত্নহরণে তত দুঃখ পাননি, যতখানি পেয়েছেন অপমানিতা কৃষ্ণার বিদ্যুৎসঞ্চারী কটাক্ষে— হৃতেন রাজ্যে তথা ধনেন রত্নৈশ্চ মুখ্যৈর্ন তথা বভূব। যথা ত্রপাকোপ-সমীরিতেন কৃষ্ণাকটাক্ষেণ বভূব দুঃখম ॥

দ্রৌপদীর কটাক্ষের কথা বারবার বলছি বটে, কিন্তু সারা জীবন ধরে স্ত্রীলোকের কটাক্ষ নিয়ে যত ভাল-মন্দ কথা-বার্তা শুনেছি, সে-কটাক্ষের তাৎপর্য সবটাই রসশাস্ত্রীয় ভাবনার মধ্যে নিহিত। সত্যি বলতে কী, সেই তাৎপর্যের একটা শাস্ত্রীয় সংকীর্ণতাও আছে। কবিরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন রমণীর কটাক্ষ নিয়ে বাড়াবাড়ি করবেনই, হয়তো বা বলবেন এমন কথাও যে, পুরুষ মানুষেরা ততদিনই সৎপথে থাকবে, ইন্দ্রিয়-সংযমের ব্যাপারে ততদিনই তাদের চেতনা থাকবে এবং শিক্ষা-দীক্ষার বোধও থাকবে ততদিনই, যতদিন তাদের ওপর লীলাবতী মেয়েদের কটাক্ষ-দৃষ্টি না এসে পড়ে। দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে তাঁর কটাক্ষ ব্যাপারটা কিন্তু এমন লাস্যময় মোহ-তাৎপর্যে ধরা পড়ে না, বরঞ্চ মুহূর্তে সেটা এক গভীর ব্যক্তিত্বের প্রতিরূপ হয়ে ওঠে। এই কটাক্ষের মধ্যে যে রসশাস্ত্রের কোনও মহিমা নেই তা নয়, কিন্তু তার চেয়েও বেশি আছে ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ। কৃষ্ণা দ্রৌপদীর পাঁচ-পাঁচজন স্বামী এই মনোহর কঠিন কটাক্ষপাতে মাঝে মাঝেই ন্যুব্জ হয়ে স্বকর্তব্যে নিযুক্ত হয়েছেন, সেটা বলাই বাহুল্য কিন্তু এই কটাক্ষের গতিপথ আরও দূরে প্রসারিত, অর্থাৎ স্বামী নামক প্রতিষ্ঠান খণ্ডিত করে তা অনুক্ত প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে অন্য স্থানেও।

পরবর্তীকালে এক মহা-সুচতুর কবি দ্রৌপদীর নাম উচ্চারণ না করেও এক ব্যক্তিত্বময়ী রমণীর ভ্রুবিলাস লক্ষ করে সংশ্লেষে বলেছিল— তোমার বাঁকা চোখের চাউনিতে এমন অদ্ভুত এক সৌন্দর্য্য আছে, যা নাকি মহাভারতের জটিল কাহিনির মতোই বহুবর্ণ এবং বহুবিচিত্রগতি। ঠিক এই জায়গায় শব্দশ্লেষ করে কবি লিখেছেন— এই অপাঙ্গ-দৃষ্টির মধ্যে কৃষ্ণ আর অর্জুনের গুণ আছে— কৃষ্ণ শব্দের একটা অর্থ কালো, অর্জুন মানে সাদা, অর্থাৎ কখনও সে চোখে কৃষ্ণবর্ণের আধিক্য কখনও বা তা স্বচ্ছ-সাদা, ভাবলেশহীন— ক্বচিৎ কৃষ্ণার্জুনগুণা। এখানে দ্বিতীয় অর্থ হল— গুণ মানে ধনুকের ছিলা। এ এমনই ভুরুর ধনুক যে ধনুকের ছিলার মধ্যে কখনও শার্ঙ্গধর কৃষ্ণের ক্ষমতা দেখা যাচ্ছে, কখনও বা অর্জুনের ক্ষমতা দেখা যাচ্ছে, অর্থাৎ দ্রৌপদী কখনও কৃষ্ণ-পক্ষপাতী কখনও অর্জুনের দিকে হেলে আছেন। আবার এই ধনুকের ছিলা টেনে বাণ মারার সময় ছিলাটা কান পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া যায়— অন্য অর্থে কর্ণ— দ্রৌপদীর মানস-হৃদয় নিয়ে টানাটানি করলে অন্তত তাঁর কটাক্ষ তো— কর্ণ পর্যন্তও পৌঁছে যেতে পারে— ক্বচিৎ কৃষ্ণার্জুনগুণা ক্বচিৎ কর্ণান্তগামিনী।

দ্রৌপদীর একটা কটাক্ষ নিয়ে দ্ব্যর্থক শ্লেষবাক্যে মহাভারতের তিনটি প্রধান নায়কের নাম উঠে এল, এমন শ্লেষালংকার ভাগ্যি জীবনে ছাত্রদের কাছে ব্যাখ্যা করতে হয়নি। কিন্তু এটা মানতে হবে যে, অর্জুনকে যদি দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর একক প্রতীক হিসেবেও গ্রহণ করি, তা হলে তিনিও যে এ-হেন কটাক্ষে মাঝে মাঝেই ভঙ্গুর হতেন, তা আমরা বারংবার দেখিয়েছি, কিন্তু এই কটাক্ষ-সূত্রে কৃষ্ণের নামও জড়িয়ে গেল, জড়িয়ে গেলেন এমনকী কর্ণও— ক্বচিৎ কর্ণান্তগামিনী— এটা বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার। কৃষ্ণের নামটা জড়িয়ে গেলেও ব্যাখ্যা করতে অসুবিধে হয় না, কিন্তু কর্ণ এই কটাক্ষ-ভঙ্গীর আওতায় আসেন কী করে? এই প্রশ্নের সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করার আগে, আমাদের একটু মৌখিকতার ঐতিহ্য ছুঁয়ে নিতে হবে। এই সেদিনও এক বিদ্বৎসভার আসরে ভাষণ-শেষে এক মহাভারত-কৌতূহলী মহিলা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন— আচ্ছা! আপনি তো মহাভারত নিয়ে অনেক ইয়ে-টিয়ে করেন, তো আপনি কি বলতে পারেন যে, কর্ণের ওপর দ্রৌপদীর কোনও দুর্বলতা-টতা ছিল কিনা? ভদ্রমহিলার শব্দক্ষেপেই বুঝতে পারা যায় যে, তাঁর নিজেরই খুব বিশ্বাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই এ-ব্যাপারে। আমি বললাম— দেখুন, মূল মহাভারত পড়ে কোনও ভাবেই কর্ণের প্রতি দ্রৌপদীর সামান্য দুর্বলতাও প্রমাণ করা যাবে না, বরঞ্চ উলটো দিকে দ্রৌপদীর নানান ব্যাপারে কর্ণের আক্রোশ, বারংবার অযথার্থভাবে তাঁকে ভুগিয়ে মারার ইচ্ছা এবং কোনও কোনও বক্রোক্তিতে কর্ণের মুখে দ্রৌপদীর প্রশংসাও— এগুলিকে এক ধরনের বিপ্রতীপ আকর্ষণের যুক্তি হিসেবে দেখা যেতেই পারে।

আসলে কর্ণের প্রতিও দ্রৌপদীর আকর্ষণ ছিল কিনা— এই জানার তাগিদ এবং তদনুসারে কিছু কাহিনি তৈরি করার প্রচেষ্টাটা এক ধরনের পৌরুষেয় তাগিদের মধ্যে পড়ে এবং এ-তাগিদ আরও বেশি হয় তাঁদেরই, যাঁরা শৈশবে মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত কর্ণের গৌরব নিয়ে বেশি সচেতন। আর এটা তো সব সময়েই অনুমান-প্রমাণে যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে যে, দ্রৌপদীর নিজের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব এবং জীবনযাত্রার প্রণালীর মধ্যেই এমন সব উত্তেজক উপাদান আছে যা সযৌক্তিক মানুষকেও ঈষৎ মুখর করে তুলতে পারে। কিন্তু গভীরভাবে ভেবে দেখবেন, দ্রৌপদী কিন্তু অসচেতন ভাবেও কোনওদিন তাঁর পঞ্চস্বামীর সীমানা অতিক্রম করেননি, যদিও স্বামীর সংখ্যা পাঁচটা বলেই তাঁর যৌনতার ক্ষেত্রটুকু যেহেতু প্রসারিত হয়ে পড়ে, অতএব তাঁর ওপরে এই দুরাক্ষেপ বারংবার এসেছে— এবং স্বয়ং কর্ণই এই মন্তব্য করেছেন যে, যার পাঁচ-পাঁচটা স্বামী আছে, তার আর একটা বেশি হয়ে ছ'টা হলে দোষ কী? কর্ণ হয়তো অসদভিপ্রায়ে দুরুক্তি করার জন্যই দুরুক্তি করে এ-কথা বলেছেন, কিন্তু দ্রৌপদীর জীবনে অন্য এক ষষ্ঠ স্বামীর সম্ভাবনার জায়গাটা যে একেবারে কোনও অবাস্তব আজগুবি কল্পনা নয়, সে-কথা তো দ্রৌপদীর পরম বন্ধু কৃষ্ণের মুখেও শোনা গেছে।

হতে পারে, সেটা কৃষ্ণের দিক থেকেই একটা 'সিডাকশন' তৈরি করার ব্যাপার ছিল কর্ণের জন্য— আর কে না জানে দ্রৌপদীর শরীর,ব্যক্তিত্ব এবং মনস্বিতার মধ্যেই এই 'সিডাকশন' ছিল এবং তাঁর পাঁচ-পাঁচটা স্বামীও ছিলেন এই 'সিডাকশন' প্রমাণ করার জন্য। কিন্তু দ্রৌপদীর দিক থেকে কোনওদিন এই 'সিডাকশন' ব্যবহার করার প্রশ্ন আসেনি, অনেক ক্ষোভ-আক্ষেপ থাকা সত্ত্বেও পাঁচ স্বামীর কনিষ্ঠটিরও স্বামিত্বের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ তিনি করেননি কখনও, সৌভাগ্যবশত তাঁর স্বামীর সংখ্যাই পাঁচ এবং 'সিডাকশন' যদি তাঁর শরীরে নিসর্গতই থাকে— তা হলে শীতকালের শীতল জলাশয়ে পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনার মতো— তা হলে জলাশয়ের দোষ দিয়ে লাভ কী! কৃষ্ণ কর্ণের কাছে দ্রৌপদীর নাম ব্যবহার করেছিলেন যুদ্ধকালীন সময়ে তাঁকে পাণ্ডবপক্ষে ফিরিয়ে আনার জন্য— তাঁকে দোষ দিই না— কেননা পাণ্ডবপক্ষে কর্ণ ফিরে আসলে 'ভীম ধরিবেন ছত্র, ধনঞ্জয় বীর সারথি হবেন রথে'— এসব কথা কৃষ্ণও তো কর্ণকে বলেছিলেন— এগুলোও তো 'সিডাকশন', নাকি পুরুষ বলেই শব্দটা প্রযোজ্য হবে না, এখানে কী মেয়েদেরই একক অধিকার? আর সত্যিই তো কৃষ্ণকে আমরা দোষ দিই কী করে, যুক্তি-তর্ক মানলে কর্ণ যদি সত্যিই ফিরে আসতেন, তা হলে পাঁচ-স্বামীর সঙ্গে দ্রৌপদীর স্বামিত্বের অধিকার তো তাঁকে দিতেই হত। ঠিক সেই কারণেই একেবারে নারদের নিয়ম অনুসারেই কৃষ্ণ তাঁকে স্বাভাবিক প্রাপ্তির আভাসটুকু দিয়ে বলেছিলেন— রাজারা এবং রাজকন্যারা তোমার অভিষেকের তোড়জোড় করুন,

দ্রৌপদীও তোমার কাছে নিয়মমতো আসবেন ষষ্ঠ পর্যায়ে, যেটাকে আসলে প্রথম পর্যায় ভাবাটাই ঠিক— ষষ্ঠে ত্বাঞ্চ তথা কালে দ্রৌপদ্যুপগমিষ্যতি।

হয়তো এই প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে কৃষ্ণের বুদ্ধি, চতুরতা এমনকী দুষ্টুমিও থাকতে পারে একটু একটু— কেননা দ্রৌপদীর ব্যাপারে কর্ণের অপরোক্ষ অনুভূতি না থাকলেও পরোক্ষ কোনও দুর্বলতা— পুষ্পে কীটসম যেথা তৃষ্ণা জেগে রয়— সে-কথা কৃষ্ণ জানতেনও হয়তো। সেই যেদিন স্বয়ংবর-সভায় কৃষ্ণা দ্রৌপদী— 'আমি সূতপুত্রকে বরণ করব না' বলে ঘোষণা করলেন, সেদিন থেকেই তাঁর প্রতি কর্ণের যে আক্রোশ-ক্রোধ জন্মেছিল, তার মধ্যে এক বিপ্রতীপ আকর্ষণও ছিল, তা নইলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ লাগার আগে পর্যন্ত কর্ণ দ্রৌপদীকে মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে দেননি। পাশাখেলার পর তাঁকে নগ্ন করার আদেশ কর্ণই দিয়েছেন দুঃশাসনকে, তাঁর পঞ্চস্বামীর সঙ্গে আর একজন কৌরবকে যোগ দিয়ে তাঁকে সম্পূর্ণ বেশ্যার চিহ্নে চিহ্নিত করাটাও কর্ণেরই কাজ ছিল। পাণ্ডবদের বনবাসের সময় দুর্যোধনকে বনে গিয়ে তাঁর ঠাঁট-বাট দেখানোর প্ররোচনাটা কর্ণই দিয়েছেন এবং সমস্ত মেয়েদের তথা দুর্যোধনের স্ত্রীদের সালংকারা হয়ে দ্রৌপদীর সামনে ঘুরে বেড়ানোর যুক্তিটাও কর্ণই দিয়েছিলেন এইজন্য, যাতে দ্রৌপদী তাঁর স্বামীদের নিয়ে হতাশ এবং বঞ্চিত বোধ করেন। দ্রৌপদীর ব্যাপারে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কর্ণের প্রতিশোধ-স্পৃহা-তাড়িত অযথা মন্তব্যগুলি নিয়ে বেশি কথা বলতে চাই না, কিন্তু এটা অবশ্যই ঠিক যে, এগুলি বিপ্রতীপভাবে দ্রৌপদীর প্রতি কর্ণের অকারণ আকর্ষণের তত্ত্বগত নিদান হয়ে ওঠে।

উলটো দিকে মূল মহাভারতের মধ্যে কর্ণের ব্যাপারে দ্রৌপদীকে কোথাও এতটুকুও বিগলিত দেখিনি এবং কর্ণের কারণে যখনই তিনি বিচলিত বোধ করেছেন, তখনই তাঁর মৃত্যু কামনা করেছেন দ্রৌপদী। কিন্তু ভাগ্য এমনই এক বিষম বস্তু— যে, পঞ্চ-স্বামীর সুবাদই কিন্তু মূলত পাণ্ডব কর্ণের সম্বন্ধে একটা অনুকূল লৌকিক তর্ক তৈরি করে রেখেছে। বিশেষত দ্রৌপদী যেমনটি সারা জীবন চেয়েছেন— সব বাঁধন-নিয়ম ভেঙে তাঁর অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া হোক, এটা কর্ণ হলে অবশ্যই তাঁর অনুকূলে ঘটত। বিশ্বস্ত জন হিসেবে কর্ণ দুর্যোধনের ওপর যত আস্থা রেখেছেন, তাতে দ্রৌপদী হলে কী হত, কতটা দ্রৌপদীর ব্যাপারে অনুকূলে প্রতিক্রিয় হতেন তিনি— এইসব 'হইলেও হইতে পারিত'— থেকেই কিন্তু এমন লৌকিক মুখরতা তৈরি হয়েছে যে, দ্রৌপদীরও হয়তো কিছু দুর্বলতা ছিল কর্ণের ওপর। আর আমরা তো বলব— কর্ণকে ফিরিয়ে আনার জন্য হলেও কর্ণের জন্য দ্রৌপদীর 'সিডাকশন' ব্যবহার করে কৃষ্ণ নিজেই এই অকারণ মুখরতা তৈরি করেছেন এবং যেহেতু দ্রৌপদীকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা না করে তিনি এই বস্তু-সম্বন্ধের 'নিদর্শনা' তৈরি করেছেন, তাতে পরবর্তীকালের লৌকিক কৃষ্টিতে দ্রৌপদীকেই খানিক দুর্বল করে তোলা হয়েছে কর্ণের প্রতি। এ-ব্যাপারে মধ্যযুগীয় মহাকবিদের মানসে কোনও প্রচ্ছন্ন পৌরুষেয়তা কাজ করেছে কিনা, খুব পরিষ্কার করে সে-কথা বলতে চাই না, কেননা প্রথমত কর্ণের মতো বঞ্চিত মহাবীরের জন্য দ্রৌপদীর এই হৃদয়-উপহার হয়তো প্রাপ্যই ছিল, আর দ্বিতীয়ত কাশীরাম দাস অসামান্য লৌকিক যুক্তিতে গল্পটা জমিয়ে দিয়েছেন চমৎকার। গল্পটা না বললে নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাশীরাম দাস এই কাহিনি সৃষ্টি করেছেন বনপর্বে। পাণ্ডবরা তখন কাম্যক বন ছেড়ে যাচ্ছেন অনেক কাল সেখানে থাকার পর। মনটা খারাপ, তবে কৃষ্ণ দ্বারকা থেকে আসায় সকলে খানিক উদ্দীপিত হলেন। কৃষ্ণ সহ পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে নিয়ে হাঁটছেন, যেতে যেতে এক সময় দ্রৌপদীর মনে হল— দীর্ঘ দিন বনবাসে পার হয়ে গেল, সুখে-দুঃখে কেটেছে অনেকদিন, কিন্তু এই বনবাসে যে কষ্ট করলাম স্বামীদের অনুগামী হয়ে, তাতে আমার এই তৃপ্তিবোধ করার যথেষ্ট কারণ আছে যে,

এ-তিন ভুবনে আমি সতী পতিব্রতা।
স্বামীর সহিত বনে দুঃখেতে দুঃখিতা ॥

দ্রৌপদী ভাবলেন— মুনি-ঋষিরাও আমার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন এবং হয়তো এই সতীত্বের জন্যই অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি কৃষ্ণও আমার কথা মেনে চলেন। অন্তর্যামী কৃষ্ণ জানতে পারলেন কৃষ্ণা দ্রৌপদীর মনোগত অহংকারের কথা। তিনিও মনে মনে ঠিক করলেন দ্রৌপদীর দর্পচূর্ণ করবেন। এর পরেই তারা এসে পৌঁছোলেন এক তপোবনের মধ্যে। ভারী মনোরম পরিবেশ, পথশ্রমে ক্লান্ত সকলেই সেই তপোবনে সেদিনকার মতো আশ্রয় নিলেন। সেই তপোবনে একটি আমগাছ ছিল এবং অতি-অসময়েও সেই গাছের একটি উঁচু ডালে একটি মাত্র আম ধরে আছে। এমন অদ্ভুত ব্যাপার দেখে দ্রৌপদী অর্জুনের কাছে বায়না ধরলেন আমটি পেড়ে দেবার জন্য। অর্জুনও দ্রৌপদীর কাছে নিজের ক্ষমতা দেখানোর জন্য আমটি পেড়ে দিলেন। পাকা সুদৃশ্য আমখানি দ্রৌপদী হাতে নিয়ে ঘুরছেন এবং সেটা কৃষ্ণের নজরে পড়ল। কৃষ্ণ একেবারে হায় হায় করে উঠলেন এবং অর্জুনকে বললেন—

কী কর্ম করিলে পার্থ কভু ভাল নয়।
দুরন্ত অনর্থ আজি ঘটিল নিশ্চয় ॥

কৃষ্ণের কথা শুনে অদ্ভুত আকস্মিকতায় কেউ কিছু বুঝতেই পারলেন না যে, কী অনর্থ ঘটল। একটি আম গাছ থেকে পেড়ে দেওয়ার ঘটনার সঙ্গে পূর্বকৃত কর্মদোষ থেকে আরম্ভ করে বুদ্ধিনাশ পর্যন্ত সবরকম অমঙ্গল-শঙ্কা কৃষ্ণের মুখে উচ্চারিত হল। যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ভীত-ব্যগ্র হয়ে কৃষ্ণকে বার বার জিজ্ঞাসা করতে থাকলেন— একটা আম পেড়ে দ্রৌপদীর হাতে দিয়ে কী অন্যায়টা ঘটল? কৃষ্ণ বললেন— দেখো, এই তপোবনে সন্দীপন নামে এক কঠিন তপস্বী ঋষি থাকেন, দেবতা-দানব-মানব সকলেই তাঁকে ভয় করে চলে। তিনি যে-কথা বলবেন, সেটাই শেষ কথা। কৃষ্ণ এবার ঋষির দিনচর্যার হিসেব জানিয়ে বললেন— সন্দীপন মুনি বহুকাল এই তপোবনে আছেন এবং তাঁর অভ্যাস হল— একেবারে ভোরবেলায় তিনি অন্যত্র বেরিয়ে যান নির্জনে তপস্যা করার জন্য। তাঁর এই তপোবনে এই যে আমগাছটা আছে, তারও একটা চরিত্র তৈরি হয়েছে মুনিরই তপস্যার ফলে। এই আমগাছে প্রতিদিন একটা করেই আম ধরে এবং মুনি তপস্যা করার

জন্য প্রত্যূষে বেরিয়ে যাবার সময় এই আমটি কাঁচা, কিন্তু 'সমস্ত দিবস গেলে' সেই আম 'সন্ধ্যাকালে পাকে'। সন্ধ্যাকালে মুনি আশ্রমে ফিরে আসেন এবং পাকা আমটি পেড়ে খান, সারাদিনের উপবাস-ক্লান্তি তাতেই দূর হয়ে যায়। উপাখ্যান শেষ করার পর কৃষ্ণের সভয় বার্তা—

হেন আম্র দ্রৌপদীকে পাড়ি দিল পার্থ।
দোহার কর্মের দোষে হইল অনর্থ ৷৷

কৃষ্ণ ভয় পাচ্ছে— সন্ধ্যাবেলায় এসে উপবাসক্লিষ্ট মুনি যদি আমটি না পান, তবে অভিশাপ দিয়ে ভস্ম করে দেবেন সবাইকে। যুধিষ্ঠির কাতর হয়ে কৃষ্ণকে বললেন— আমাদের সমস্ত বিপদে তুমিই আমাদের ত্রাণ করেছ চিরকাল, এই বিপদ থেকেও তুমিই বাঁচাবে আমাদের— তোমার আশ্রিত মোরা ভাই পঞ্চজন। কৃষ্ণ এবার চিন্তিতভাবে বললেন— একটাই উপায় আছে। এই আমটি গাছের ডালে যে জায়গায় যেমনটি ছিল, সেইভাবে প্রতিস্থাপন করলে সবাই বাঁচবে। কিন্তু সেটা হবে কীভাবে, এটা তো আর আঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়া নয়, আম যেমন ছিল, তেমনটাই থাকতে হবে। কৃষ্ণ বললেন— এর জন্য তোমাদের পাঁচ ভাই এবং দ্রৌপদীকে একেবারে সঠিক সত্য কথা বলতে হবে একটি ব্যাপারে। বলতে হবে— কোন কথাটা তোমাদের একেক জনের মনে সব সময় জাগ্রত রয়েছে, যেটা তোমরা কিছুতেই ভুলে যাচ্ছ না— কোন কথা কার মনে জাগে অনুক্ষণ! তবে একটাই শর্ত— তোমাদের প্রত্যেক সতত দীপ্যমান এই মনের কথা জানানোর সময় কোনও মিথ্যা কথা বলবে না, কোনও ছলনা-চাতুরি-কপটতা করবে না।

যুধিষ্ঠিরকে দিয়েই মনোমধ্যে এই অনুক্ষণ চিন্ত্যমান বিষয়ের বিবরণ দেওয়া আরম্ভ হল। তিনি সব সময়েই ভাবেন— টাকাপয়সা, ধনসম্পত্তি ফিরে পেলে আবার আগের মতো যাগ-যজ্ঞ, ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে দিন কাটাবেন। যুধিষ্ঠির তাঁর বিবরণ শেষ করা মাত্রই সেই আমটি মাটি থেকে গাছের ডালের দিকে খানিক উর্ধ্বে উঠে শূন্যে ভাসতে লাগল। সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল এই কাণ্ড দেখে। এরপর ভীম তাঁর মনের কথা জানিয়ে বললেন— আমি সবসময় ভাবি কবে আমি দুঃশাসনের বুক চিরে রক্তপান করব, কবে দুর্যোধনের উরু ভাঙব গদাঘাতে। ভীমের কথায় আমটি আর খানিক ওপরে উঠল। তারপর অর্জুনের সত্যবাক্যে আম আরও খানিক উঠে গেল, নকুল-সহদেবের অকপট স্বীকারোক্তিতে আমটি চলে গেল গাছের ডালের অনেকটাই কাছে। এবারে দ্রৌপদী বললেই আমটি জুড়ে যাবার কথা। 'অতঃপর ধীরে ধীরে বলে যাজ্ঞসেনী।'

বস্তুত পাশাখেলার আসরে পাণ্ডবরা যত অপমানিত হয়েছিলেন, তাতে অনুক্ষণ তাঁদের হৃদয়ে যে প্রতিশোধ-স্পৃহা ধিকিধিকি জ্বলছে, তারই সার্থক প্রকাশ ঘটেছে তাঁদের বক্তব্যে। দ্রৌপদী যখন বলতে উঠলেন— এবং এটাও তো ঠিক যে, প্রতিশোধ-স্পৃহা তাঁর মনেও যথেষ্ট ছিল, অতএব তখন তিনিও প্রায় একই সুরে বললেন— আমি সবসময়েই এই চিন্তা করি যে, দুষ্ট লোকেরা আমাকে যত কষ্ট দিয়েছে, তারা সবাই মারা পড়বে ভীম-অর্জুনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতে। আর আমার ইচ্ছা হয়— আগে যেমন যাগ-যজ্ঞ করে আত্মীয়বন্ধুকে পালন করতাম, ঠিক সেইভাবে আবারও দিন কাটাই।

দ্রৌপদীর এই মহৎ উদারোক্তি শেষ হওয়ামাত্রই যে আমটি নাকি গাছের ডাল থেকে সামান্য একটু দূরে হাওয়ায় ভাসছিল, সেই আম আবারও মাটিতে পড়ে গেল ধপ করে। যুধিষ্ঠির প্রমাদ গণলেন— এ কী হল, এ কী হল বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। কৃষ্ণ বললেন— সব ঠিক ছিল কিন্তু 'করিল সকল নষ্ট দ্রুপদদুহিতা'। সে কপট করে মনের কথাটি বাদ দিয়ে অন্য কথা বলেছে, যার ফলে এই দুর্গতি হল। কৃষ্ণ খুব ব্যগ্র হয়ে দ্রৌপদীকে বললেন— আরও একবার সুযোগ পাবে তুমি। মনের মধ্যে যা ঘটে অহরহ, সত্য করে বলো তুমি— নিশ্চয় বৃক্ষেতে আম্র লাগিবে সর্বথা। কৃষ্ণের অনুগামিতায় যুধিষ্ঠিরও অনুনয় করলেন দ্রৌপদীকে কিন্তু দ্রৌপদী মৌন হয়ে রইলেন, একটি কথাও বললেন না। ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে এল যে, দ্রৌপদীর প্রিয়তম স্বামী অর্জুন ভীষণভাবে রেগে গেলেন, এমনকী ধনুকে একটি বাণ জুড়ে বললেন—

শীঘ্র কহ সত্য কথা।
নচেৎ কাটিব তীক্ষ্ণ শরে তোর মাথা ॥

কাশীরাম দাসের মধ্যযুগীয় পৌরুষেয়তায় কাজ হল। দ্রৌপদী খানিক লজ্জা-লজ্জা মুখে বলতে আরম্ভ করলেন। বললেন— কী আর বলব, সখা। তুমি তো কৃষ্ণ অন্তর্যামী পুরুষ, সবার মনের কথা জানো। তবে মিথ্যে কথা বলব না, বললে পাপ হবে আমার। সেই যে রাজসূয় যজ্ঞের সময় মহাবীর কর্ণ এলেন কৌরবদের সঙ্গে। তাঁকে দেখা অবধি সবসময়েই আমার মনে হয়— আহা! ইনিও যদি কুন্তীর ছেলে হতেন, তা হলে পাঁচজনের সঙ্গে না হয় ছ'জন স্বামী হত আমার। এখনও এই কথাটাই আমার মনে হয়েছিল। দ্রৌপদী এই কথা বলামাত্র গাছের আম সটান গাছের ডালে গিয়ে লাগল।

কাশীরাম দাসে বৃন্তচ্যুত আম বৃন্তে গিয়ে লাগতেই যুধিষ্ঠির হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। কিন্তু দ্রৌপদীর এই সত্যবাক্যে ভীম অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে দ্রৌপদীকে যা-নয়-তাই বললেন। তাঁর রাগ হয়েছে এই কারণে যে, তিনি এত করেন দ্রৌপদীর জন্য, তবু এখনও এত আকাঙ্ক্ষা দ্রৌপদীর। রেগে গিয়ে বলেছেন—

এই কি তোমার রীতি কৃষ্ণা দুষ্টমতি।
এক পতি সেবা করে সতী কুলবতী ॥
বিশেষ তোমার এই পতি পঞ্চজন।
তথাপি বাঞ্ছিস মনে সূতের নন্দন ॥

ভীম নাকি গদা নিয়ে মারতেই চাইছিলেন দ্রৌপদীকে। কৃষ্ণ কোনওমতে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে বলেন— দ্রৌপদীর মতো গুণবতী সতী দ্বিতীয় নেই ভুবনে। তবে যে এমন একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনের বাসনা তিনি জানালেন, তার কারণ আছে, সে কারণ আমি তোমাদের বলব যখন দেশে ফিরে আবার রাজা হয়ে বসবেন যুধিষ্ঠির।

আমরা জানি— কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়ী হয়ে যুধিষ্ঠির সিংহাসনে বসার পরে এই ঘটনার কথা আর কারও মনেই নেই। আর এও জানি— কাশীরাম দাস এই কাহিনির সৃষ্টি করেছেন নিতান্ত লোকজ উপাদান থেকে, এবং তা বস্তু-সম্বন্ধের সম্ভাবিত অভিসন্ধি থেকে অর্থাৎ এমনটি 'হইলেও হইতে পারিত'। কর্ণ যেহেতু নিশ্চিতভাবেই কুন্তীর ছেলে ছিলেন এবং দ্রৌপদীর স্বামী-সংখ্যার আধিক্যটাও যেহেতু চোখে পড়ার মতো, তাই পাঁচের জায়গায় ছয় স্বামীর কল্পনাটা কখনওই খুব বাড়াবাড়ি হয় না এবং স্বয়ং কর্ণই নিজমুখে এই সম্ভাবনার কথা উচ্চারণ করেছিলেন বলেই গল্পের আম একবার গাছ থেকে পড়ে দ্রৌপদীর হৃদয় নিয়ে গাছের ডালে লেগেছে। মূল মহাভারতের মধ্যে দ্রৌপদীর প্রতি কর্ণের আক্রোশ উপলক্ষিত দুর্বলতা দেখেছি, কাশীরাম দাস সেই দুর্বলতার কাহিনির মধ্যে যেভাবে দ্রৌপদীর হৃদয়-মন্ত্রণা মিশিয়ে দিয়েছেন, তাতে মৌলিক সত্যতা ব্যাহত হলেও সমান-হৃদয় পাঠক কিন্তু কাশীরামের তারিফ করে এখনও বলেন— এমনটা হইলেও হইতে পারিত।

তবে কিনা দ্রৌপদীর সঙ্গে কর্ণের সম্বন্ধ খোঁজার মধ্যে যেটা বড় হয়ে ওঠে, সেটাও কিন্তু একভাবে তাঁর স্বামী-সম্পর্কেরই প্রসারিত ক্ষেত্রমাত্র। এই ক্ষেত্রের বাইরেও আরও এক বিলাস-ক্ষেত্র আছে দ্রৌপদীর যা তৎকালীন কোনও রমণীর জীবনে প্রায় অভাবিত ছিল, অথবা ভাবিত হলেও অপবাদের চূড়ান্ত ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হত। এটা হল এক প্রবাদ পুরুষের সঙ্গে দ্রৌপদীর বন্ধুত্বের জায়গা। সেই মহাভারতীয় বর্তমান কালে যৌনতার নাম-গন্ধহীন এক স্বর্গীয় সম্পর্ক গড়ে তোলার পিছনে কৃষ্ণের প্রায়োগিক বাস্তব বুদ্ধি যত কাজ করেছে, দ্রৌপদীরও ঠিক ততখানি। কৃষ্ণার সঙ্গে কৃষ্ণের সম্পর্ক কী ছিল আমি কোনও আলোচনায় বিশেষ যাইনি, সে আলোচনার পরিসরও এটা নয়। তবে কৃষ্ণ যে কৃষ্ণার চিরকালের 'অ্যাডমায়ারার' সে-কথা বোধ করি মহাভারতের উদার পাঠককে বলে দিতে হবে না। পাঁচ-পাঁচটি স্বামী-কূপের বাইরেও দ্রৌপদীর আরও একটি নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা ছিল এবং সেযুগে যা প্রায় অভাবনীয়, কৃষ্ণ ছিলেন দ্রৌপদীর তাই— 'বয়ফ্রেন্ড'। ইংরেজি কথাটা কৃষ্ণ-কৃষ্ণার সম্পর্ক-ব্যাখ্যায় বড্ড অগভীর, কিন্তু এর থেকে গভীর শব্দ প্রয়োগ করতে গেলে কৃষ্ণ কিংবা কৃষ্ণার ওপর যে ধরনের ভালবাসার দায় এসে পড়বে তাতেও স্বস্তি পাওয়া মুশকিল। তার থেকে বলি বন্ধু— কৃষ্ণস্য দয়িতা সখী। সংস্কৃতে 'সখা' শব্দটির মধ্যে সমপ্রাণতার মাহাত্ম্য মেশানো আছে, কিন্তু সে সমপ্রাণতা তো হয় পুরুষে পুরুষে, নয়তো মেয়েতে মেয়েতে। কিন্তু পুরুষ মানুষের মেয়ে বন্ধু— কৃষ্ণস্য দয়িতা সখী— তাও সেকালে— ভাবা যায়!

নইলে পঞ্চস্বামীর অতিরিক্তে দ্রৌপদী বারবার অভিমান করে বলেছেন— এমনকী তুমিও— এমন নিশ্বাস ফেলার জায়গা ক'জনের থাকে। কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে প্রথম দেখেছিলেন পাঞ্চালের স্বয়ম্বর-সভায়। না, না, আমি গজেন্দ্রকুমারের 'পাঞ্চজন্য' ফেঁদে বসছি না। সে ক্ষমতাও আমার নেই এবং মহাভারতের প্রমাণে আমার পক্ষে তা প্রমাণ করাও মুশকিল! তবে বলতে পারি— কৃষ্ণ কিংবা কৃষ্ণা কেউই তাঁদের পারস্পরিক ব্যবহারে সীমা অতিক্রম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেননি কোনওদিন। এমনকী আজকের দিনের স্বচ্ছ-দৃষ্টিতেও দুই যুবক যুবতীকে শুধুমাত্র বন্ধু ভাবা যায় না বলেই উপন্যাসের রাস্তা প্রশস্ত হয়। কিন্তু মহাভাতের প্রমাণে তাঁরা কিন্তু শুধুই বন্ধু, প্রাণের বন্ধু এবং এইমাত্র, এর বেশি নয়। পাণ্ডবেরা বনবাসে আসার পর কৃষ্ণ যেদিন সদলবলে বনেই এসে উপস্থিত হলেন সেদিন দ্রৌপদী কৃষ্ণের সামনে তাঁর কমলকলিকার মতো হাত-দুটি দিয়ে মুখ ঢেকে অনেক কেঁদেছিলেন। তাঁর সমস্ত অপমানের কথা সবিস্তারে শুনিয়ে সেই একই কথা বলেছিলেন— আমার যেন স্বামী-পুত্র, ভাই-বন্ধু কেউ নেই— এমনকী তুমিও নেই— নৈব ত্বং মধুসূদন। আমি একটুও ভুলতে পারছি না, যাকে আমি সুতপুত্র বলে রাজসভায় লক্ষ্যভেদের যোগ্যতা দিইনি, সেই কর্ণও আমাকে দেখে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসছিল— কর্ণো যৎ প্রাহসৎ তদা।

দ্রুপদের রাজসভায় যেদিন প্রথম কৃষ্ণা পাঞ্চালীকে দেখেছিলেন কৃষ্ণ, সেদিন তিনি ছিলেন পতিম্বরা বধূটি— আপ্লুতাঙ্গী সুবসনা সর্বাভরণভূষিতা। আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, কৃষ্ণ সেই স্বয়ম্বর-সভায় নতুন একটি বিয়ে করার উদ্দেশ্য নিয়ে যাননি। কেননা সেই বারণাবতে জতুগৃহদাহের খবর শুনে সাত্যকিকে নিয়ে কৃষ্ণের অল্প অল্প গোয়েন্দাগিরির কথা আমি আগেই জানিয়েছি। স্বয়ম্বর-সভায় অর্জুনের লক্ষ্যভেদ হল। সমবেত রাজাদের আক্রমণ প্রতিহত করে দ্রৌপদীকে নিয়ে ভীম-অর্জুন ফিরলেন কুমোরপাড়ার বাড়িতে। আর তার পিছন পিছন এলেন কৃষ্ণ এবং বলরাম। সেদিন নববধূ কৃষ্ণাকে একটি সম্বোধনও করেননি কৃষ্ণ। কারণ যুধিষ্ঠির, ভীম ইত্যাদি পিসতুতো ভাইদের সঙ্গেও সেই তাঁর প্রথম পরিচয়।

পরিচয়টা কিন্তু বাড়ল দ্রৌপদীর বিয়ের উপলক্ষেই। হস্তিনাপুরে পাণ্ডবরা ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত কৃষ্ণ পাঞ্চালেই ছিলেন। দ্রুপদ স্বয়ং এবং হস্তিনাপুর থেকে নিমন্ত্রণ করতে আসা বিদুর দু'জনেই কৃষ্ণের প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ। ফলত বিয়ের পর পর কৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবদের যোগাযোগ আরও বেড়ে গেল। পাণ্ডবরা রাজ্য পেলেন খাণ্ডবপ্রস্থে। ঘন ঘন যাতায়াত সমবয়সি অর্জুনের সঙ্গেও কৃষ্ণের যেমন বন্ধুত্ব গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়েছে, হয়তো দ্রৌপদীর সঙ্গেও সেইভাবে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। অর্জুন বনবাস থেকে ফিরে আসার পর কৃষ্ণ-অর্জুন তথা সুভদ্রা-দ্রৌপদীকে আমরা যমুনা বিহারে একান্তে দেখেছি। কিন্তু আগেই বলেছি— সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিয়েতে দ্রৌপদীর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল সাভিমান পরুষ-বাক্য। কৃষ্ণের ওপর দ্রৌপদী যে সেই মুহূর্তে খুশি হননি তা বোঝা যায় তাঁর বাচনভঙ্গিতে। তিনি অর্জুনকে বলেছিলেন— তুমি সেই চুলোতেই যাও, যেখানে আছে সেই সাত্বত-বৃষ্ণিকুলের পরমা মহিলাটি— সুভদ্রা।

কৃষ্ণ সাত্বত-কুলেরই গৌরবময় পুরুষ। অর্জুন তাঁর ভাই এবং বন্ধু। দ্রৌপদী অর্জুনের পরম-প্রণয়িনী জেনেও কৃষ্ণ তাঁর দাদা বলরাম এবং অন্যান্য বৃষ্ণি-বীরদের আপত্তি সত্ত্বেও সুভদ্রাকে প্রায় স্বমতেই অর্জুনের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। সামান্যতম হলেও দ্রৌপদীর প্রিয়তম স্বামী অর্জুনের সম্বন্ধে কৃষ্ণের একটু ঈর্ষা ছিল কি না কে জানে? অর্জুন দ্রৌপদীকে নিয়ে সম্পূর্ণ সুখী হন এটা অন্তরের অন্তরে চাননি বলেই কি কৃষ্ণ সুভদ্রার ব্যাপারে অর্জুনকে এত সাহায্য করেছিলেন? কে জানে চতুর চূড়ামণির অন্তরে কী ছিল? মহাভারতের কবিকে

ধন্যবাদ তিনি দ্বারকাবাসী সেই ধুরন্ধর পুরুষের নাম কৃষ্ণ, এবং দ্রৌপদীর নাম কৃষ্ণা রেখেই বুঝেছিলেন ব্যাকরণগতভাবে সম্পর্কটা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। তিনি আর বাড়তে দেননি। তবে অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিয়ে দেওয়ার মতো সামান্যতম ক্ষতি করেই বুঝি কৃষ্ণ অর্জুন এবং এমনকী দ্রৌপদীরও পরম বন্ধু হয়ে গেছেন। সুভদ্রাকে শ্বশুরবাড়িতে রেখে কৃষ্ণ যেদিন দ্বারকায় ফিরে যাবার দিন ঠিক করলেন, সেদিন দ্রৌপদীকে রীতিমতো সান্ত্বনা দিয়ে তাঁকে বাড়ি ফিরতে হয়েছিল। যেদিন থেকে কৃষ্ণের সান্ত্বনায় দ্রৌপদী সুখ পেতে আরম্ভ করলেন, সেদিন থেকে বোঝা যায়— তিনি মনে মনে অর্জুনকে একটু একটু করে হারিয়েছেন, আর নিজের অজান্তেই দ্বারকার ওই প্রবাদ-পুরুষটির কাছাকাছি চলে এসেছেন, বাঁধা পড়েছেন সম-প্রাণতার বন্ধনে— বন্ধুত্বের বন্ধনে।

এই বন্ধুত্ব এতটাই যে, যুধিষ্ঠির, ভীম এমনকী অর্জুনও কৃষ্ণকে যতটুকু সম্মান করে কথা বলতেন, দ্রৌপদী তা বলতেন না। শাল্বরাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়ার জন্য কৃষ্ণ কুরুসভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি, কিন্তু সেদিন সেই চরম অপমানের মধ্যে দ্রৌপদী স্বামীদের সুরক্ষায় বঞ্চিত হয়ে এই সমপ্রাণ বন্ধুর জন্যই ডাক ছেড়ে কেঁদেছিলেন— কৃষ্ণঞ্চ বিষ্ণুঞ্চ হরিং নরঞ্চ। ত্রাণায় বিক্রোশতি যাজ্ঞসেনী। তারপর যেদিন বনবাসে কৃষ্ণের সঙ্গে দ্রৌপদীর দেখা হল, যুধিষ্ঠির অর্জুনের কথা যেই থামল, অমনই দ্রৌপদী অভিমান-ভরে দেবল, নারদ আর পরশুরামের জবানিতে 'ভগবান' বলে গালাগালি দিলেন কৃষ্ণকে। বললেন— সবাই তোমাকে ঈশ্বর এবং সমস্ত প্রাণিজগতের একান্ত গতি বলে বর্ণনা করেন, কিন্তু এমন বিরাট, সনাতন পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সখী হয়ে, পাণ্ডবদের বউ হয়ে, ধৃষ্টদ্যুম্নের বোন হয়ে আমাকে একবস্ত্রা রজস্বলা অবস্থায় কৌরব-সভায় দাঁড়াতে হল কেন? কেন আমার চুলের মুঠি গেল দুঃশাসনের হাতের মুঠোয়?

কৃষ্ণ কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। দ্রৌপদী বলেছিলেন— জান কৃষ্ণ! ওরা আমাকে দাসীভাবে ভোগ করতে চেয়েছিল, অথচ তবু তোমরা সব বেঁচে ছিলে। অভিমানের শেষ কল্পে দ্রৌপদী নিজেকে এমন এক করুণ ভূমিকায় স্থাপন করেছেন, যেখানে তাঁর শেষ কথা— আসলে আমার কেউ নেই— স্বামীরা নেই, ছেলেরা নেই, আত্মীয়স্বজন নেই, বাপ নেই, এমনকী তুমিও আমার নও কৃষ্ণ— নৈব ত্বং মধুসূদন। এই যে এত নেই নেই, তার মধ্যে বিদগ্ধা রমণীর মুখে— এমনকী তুমিও নেই— নৈব ত্বং— এই 'তুমিও' শব্দটা যেমন সবার থেকে আলাদা। যেন, তেমন দিনে ওঁরা অর্থাৎ আত্মীয়স্বজন, স্বামী-পুত্তুর বাপ-ভাইও আমায় না দেখতে পারে, কিন্তু তুমি— চিরজনমের সখা হে! কৃষ্ণের মাত্রাটা সবার থেকে যেন আলাদা।

বনপর্বে, উদ্যোগপর্বে এমনকী যুদ্ধ শেষের দিন পর্যন্ত ওই একই কথাই বলেছেন দ্রৌপদী। কৃষ্ণ কেবলই সান্ত্বনা দিয়ে গেছেন, কেননা যুদ্ধের রাজনীতিতে পরপক্ষকে শাস্তি দিতে সময় লাগে। কিন্তু পাঞ্চালী কৃষ্ণার করুণ-কালো জল-ভরা চোখের কথা কৃষ্ণ ভোলেননি। দর্শনের দৃষ্টিতে যত নির্লিপ্ত পুরুষই তিনি হন অথবা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নাই করুন কোনও সশস্ত্র যুদ্ধ, ভারত-যুদ্ধের সুতোটা যদি তাঁর হাতেই ধরা থেকে থাকে— কেননা তিনি, মহাভারত-সূত্রধারঃ— তা হলে কুরু-পাণ্ডবের পুতুলনাচে পাঞ্চালী কৃষ্ণাই ছিলেন তাঁর প্রধান নটী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জননী গান্ধারী ভারত-যুদ্ধের সমস্ত দায় কৃষ্ণের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন, এবং সে দায় তিনি বহন করতেও দ্বিধা করেননি। বাহ্যত এই যুদ্ধের কারণের মধ্যে যত রাজনীতির কথা থাকুক, যতই থাক জ্ঞাতি-বঞ্চনা অথবা দুর্যোধনের অহংকার, কৃষ্ণ কিন্তু দ্রৌপদীর চুলের কথা ভোলেননি— সেই সর্পকুটিল, কুঞ্চিত কেশদাম— মহাভুজগবর্চসম্।

উদ্যোগপর্বে মহামতি সঞ্জয় যখন বিরাটরাজ্যে পাণ্ডবদের কাছে ধৃতরাষ্ট্রের বক্তব্য শোনাতে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন কৃষ্ণও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। সবার কথার শেষে কৃষ্ণ যে-ভাষায় উত্তর দিয়েছিলেন সঞ্জয়কে, সেই ভাষাটা ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের পক্ষে নাকি ছিল 'ত্রাসনী' অর্থাৎ 'লাস্ট ওয়ার্নিং'-এর মতো। ভাষার মধ্যে প্রাথমিক মৃদুতা ছিল বটে কিন্তু সেই মৃদুতার মধ্যে ছিল নিদারুণ পরিণতির সতর্কবাণী— ত্রাসনীং ধার্তরাষ্ট্রাণাং মৃদুপূর্বাং সুদারুনাম্।

কৃষ্ণের এই ভাষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কথা বলার পরিমণ্ডলটাও একটু বলতে হবে। মনে রাখা দরকার— এই পরিমণ্ডল বর্ণনায় আমার একটু ব্যক্তিগত প্রয়োজন আছে। যাঁরা কৃষ্ণের ভগবত্তায় বিশ্বাসী, তাঁরা যেন এই রাজোচিত পরিমণ্ডল-বর্ণনায় আহত না হন। সঞ্জয় এসেছেন অর্জুনের সঙ্গে কথা বলতে। অর্জুন তখন অন্তঃপুরের শিথিল পরিবেশে বসে আছেন এবং কৃষ্ণও রয়েছেন সেখানেই। আর আছেন দ্রৌপদী এবং সত্যভামা। কিঞ্চিৎ মদ্যপান করার ফলে এই দুই মহাত্মার মন এবং বুদ্ধি— দুইই একটু টান টান হয়ে আছে। প্রগাঢ় বন্ধুত্ব এবং অন্তঃপুরের শৈথিল্যে কৃষ্ণ তাঁর চেয়ার থেকেই দুই পা বাড়িয়ে দিয়েছেন অর্জুনের কোলে। আর অর্জুন তাঁর এক পা রেখেছেন নিজের স্ত্রী দ্রৌপদীর কোলে এবং অন্যটি রেখেছেন কৃষ্ণের প্রিয়া পত্নী সত্যভামার কোলে— অর্জুনস্য চ কৃষ্ণায়াং সত্যায়াঞ্চ মহাত্মনঃ।

একথা ভাবার কোনও কারণ নেই যে, কৃষ্ণ এবং অর্জুন মদের ঘোরে ব্যক্তিগত ব্যবহারের সীমা লঙ্ঘন করেছেন। বরঞ্চ এই মানুষগুলির মধ্যে বন্ধুত্ব এবং হৃদয়ের নৈকট্য এতই বেশি ছিল যে কৃষ্ণ-প্রিয়া সত্যভামার কোলে অর্জুনের পা রাখা দেখে যেমন আমরা আশ্চর্য হচ্ছি না, তেমনই আশ্চর্য হতাম না যদি দ্রৌপদীর কোলে কৃষ্ণের পা দুটি দেখতাম। তার ওপরে অন্তঃপুরের শিথিলতা তো আছেই। অর্জুন, কৃষ্ণ, দ্রৌপদী, সত্যভামার আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা এতটাই ছিল যে, দ্বৈপায়ন ব্যাস মন্তব্য করেছেন— এঁরা ঘনিষ্ঠভাবে বসে থাকলে অভিমন্যু বা নকুল-সহদেবও সেখানে যেতেন না। ঠিক এইরকম একটা অন্তঃপুরের পরিবেশে সঞ্জয় তাঁর দৌত্যকর্মের তাগিদে অর্জুনের কাছে আসতে বাধ্য হয়েছেন। সঞ্জয় তাঁর বক্তব্য নিবেদন করলে অর্জুন নিজে কথা না বলে, কৃষ্ণকেই বলবার জন্য ইঙ্গিত করলেন।

কৃষ্ণ বললেন। কোনও বড় বড় রাজনৈতিক কথা নয়, কোনও বিশাল দর্শনের কথা নয়, এমনকী কোনও মহৎ ধর্মের কথাও নয়। কৃষ্ণ বললেন— যুধিষ্ঠিরের একটু তাড়া আছে সঞ্জয়! ভীষ্ম দ্রোণকে সাক্ষী রেখে তুমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বোলো— ভাল করে যজ্ঞ-টজ্ঞ করে নিন, ছেলে-পিলে সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে যা আনন্দ করার, তাও করে নিন। সামনে বড় ভয় আসছে— মহদ্ বা ভয়মাগতম্। কেন জান, সঞ্জয়! কৃষ্ণ বলে চললেন— দ্রৌপদীর কাছে আমার ঋণ বেড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। আর সেই কথাটা আমার মন থেকে এক পলের

জন্যেও দূরে সরে যাচ্ছে না। আমি দূরে ছিলাম, আর সেই কুরুসভায় সমস্ত রাজন্যবর্গের চোখের সামনে অপমানিতা হতে হতে আমাকে কতই না কেঁদে কেঁদে ডেকেছিল দ্রৌপদী। এই কথাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। দিন চলে গেছে অনেক, তাই দ্রৌপদীর কাছে ঋণও আমার বেড়েই চলেছে— ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি।

কৃষ্ণ আরও অনেক কথা বলেছিলেন, যার অর্থ একটাই— সামনে বড় ভয় আসছে তোমাদের— মহদ্ বো ভয়মাগতম্। যুদ্ধের উদ্যোগপর্ব চলছে, সেই মুহূর্তে কৃষ্ণের মুখে দ্রৌপদীর জন্য এই পরম আর্তি কৃষ্ণা পাঞ্চালীর হৃদয়ে অন্য এক বিশিষ্ট অনুভূতি তৈরি করেছিল নিশ্চয়ই। পঞ্চস্বামীকে নস্যাৎ করে দিয়েও ষষ্ঠ যে পুরুষটিকে তিনি আলাদা করে চিহ্নিত করেছিলেন— এমনকী তুমিও নও, কৃষ্ণ!— সেই মানুষটি যখন তাঁর সামনেই শত্রুপক্ষকে বলেন— আর দেরি নয়, আমাকে পাঞ্চালী কৃষ্ণার ঋণ চুকোতে হবে, সেদিন নিশ্চয়ই দ্রৌপদীর মনে হয়— পঞ্চস্বামীর বাইরেও আরও এক অন্যতম সম্বন্ধ আছে তাঁর— তাঁর বন্ধু, চিরজনমের সখা হে।

এই সখার অধিকার এতটাই যে, যুধিষ্ঠির-ভীম অথবা অর্জুনও কৃষ্ণের সঙ্গে যে মর্যাদায় কথা বলেন, সেই মর্যাদা সমপ্রাণতার মাহাত্ম্যে স্তব্ধ করে দিয়ে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে সাভিমানে বলতে পারেন— আমি তোমাকে সাফ সাফ জানিয়ে দিচ্ছি কৃষ্ণ! অন্তত চারটে কারণ আছে যাতে তুমি নিয়ত আমাকে রক্ষা করতে বাধ্য— চতুর্ভিঃ কারণৈঃ কৃষ্ণ ত্বয়া রক্ষ্যাস্মি নিত্যশঃ। এক, 'সম্বন্ধাৎ' অর্থাৎ কিনা আমি তোমার আপন পিসির ছেলের বউ। দুই, 'গৌরবাৎ'— আমাকে কি তুমি খুব কম ভাব, যজ্ঞের আগুন থেকে আমার জন্ম অতএব ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের যেমন গার্হপত্য অগ্নি রক্ষা করেন, সেই গৌরবে আমারও রক্ষা হওয়া উচিত। তিন, 'সখ্যাৎ'— সব চাইতে বড়, পাণ্ডববধূর সম্বন্ধ গৌরব ছাড়াও তোমার সঙ্গে আমার একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে— তুমি আমার বন্ধু। দ্রৌপদী মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠকে চিনতেন না। চিনলে বলতেন— তুমি বোকার মতো 'সখ্যে'র অর্থ বানিয়েছ ভক্তিমতী। আমি কোনওদিনই কৃষ্ণের ভক্ত নই, আমি তাঁর বন্ধু। দ্রৌপদী বলেছেন— আমি পাণ্ডবদের বউ বটে— 'ভার্যা পার্থানাং', কিন্তু আরও আছে অর্ধেক আকাশ— আমি যে তোমার বন্ধু— তব কৃষ্ণ সখী বিভো। চতুর্থ কারণ হিসেবে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে বলেছেন— সবার ওপরে তোমার ক্ষমতা আছে, সামর্থ্য আছে। তাই আমি তোমার ওপর নির্ভর করি— সম্বন্ধাদ্ গৌরবাৎ সখ্যাৎ প্রভুত্বেন চ কেশব। কৃষ্ণ এই কথাগুলি ভোলেননি। সম্বন্ধ, গৌরব, সখ্য এবং প্রভুত্ব— এই সবগুলিই তাঁকে দ্রৌপদীর কাছে উত্তরোত্তর ঋণীই করেছে, যে-ঋণ চুকানোর জন্য দ্রৌপদীর সামনেই তিনি সে-কথা অঙ্গীকার করেছেন।

দ্রৌপদীর সঙ্গে কৃষ্ণের সম্পর্ক এই চার দেওয়ালের বাইরে যায়নি। যখনই মনে হয়েছে স্ত্রী হিসাবে তিনি সুবিচার পাচ্ছেন না, তখনই বন্ধুর কাছে তিনি সাভিমানে মুক্তশ্বাস হয়েছেন। আলগা করে দিয়েছেন তাঁর নিজের মনের গুরুভার। পরিবর্তে কৃষ্ণের কাছে পেয়েছেন সেই আশ্বাস যা তিনি চান। সেই সমপ্রাণতা, যা তাঁর স্বামীরাও তাঁকে দিতে পারেননি। দ্রৌপদীর মনের কথা দ্রৌপদীর মতো করেই যদি কেউ বুঝে থাকেন, তো সে কৃষ্ণ, তাঁর স্বামীরা নন। দ্রৌপদীর সঙ্গে কৃষ্ণের সম্পর্ক এইটুকুই— ভাই, 'মনের কথা', 'তব কৃষ্ণ প্রিয়া সখী'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই রোদ দিগন্ত ভাসানো

স্পর্শ করে এসেছে তোমাকে।

এই পাওয়া মায়েরই মতো যেন
ঘুমন্ত কপালে চুমু রাখে, চুপিসারে।
আর এই ব্যরান্দায় লাফানো চড়াই
বলে যে, আমি তো রোজ ভোরবেলা ওর কাছে যাই।
ভোর না হতেই শিউলি-কনে বউ হাসে
ওই তো আমার কাছে ফুল নিতে আসে।
রসিকা কাশের বুড়ি
চোখ টেপে, জানি,
সারা রাত তুমিও যে কেনো... কোন্ অভিমানে...
শিশির ঝিকোয় নিচু ঘাসের ওপরে
ও কিন্তু আমারই সাথে অশ্রু ভাগ করে।
জানি-তো, জানি-তো,
আমরা সকলে তো ওর
ভিনদেশি পাখিরা বলে
সুরের দোসর...
এত যে সম্পর্কসেতু
সুরে সুরে আজীবন পার
বলো তো,
এর পরও সত্যি কি উপায় আছে—
এই আর্যেতর বাসে
পরস্পর অস্পৃষ্ট থাকার!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উলূপী এবং চিত্রাঙ্গদা

আমার সবসময়ই কেমন মনে হয়— প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই, সে ধনী হোক, দরিদ্র হোক, বিদ্বান বা মূর্খ হোক— প্রত্যেকের মধ্যেই একটা জীবন-রচনার বৈচিত্র্য আছে। সেই জীবনের মধ্যে মুখ্য কতগুলি চরিত্রের সর্বক্ষণ আনাগোনা তো থাকেই— মা-বাবা, ভাই-বন্ধু অথবা স্ত্রী। কিন্তু এমন মুখ্য চরিত্র ছাড়াও আরও কতগুলি পার্শ্বচরিত্র থাকে— তারা যে জীবনটাকে খুব পালটে দেয়, তা নয়, তবে জীবনের মধ্যে যে সব ফাঁকফোঁকর থাকে, ছোট্ট ছোট্ট দুঃখ-সুখ থাকে, সেখানে তারা রং লাগিয়ে দেয়। এই চরিত্রগুলি যে সবসময় সামাজিক ব্যবহার এবং সৌজন্য মেনে জীবনের মধ্যে কোনও বিশিষ্ট জীবনধারা তৈরি করে, তাও নয়, কিন্তু আপন নিজস্বতায় তারা এমনই সম্পূর্ণ যে, তাদের বুঝতে হলে ব্যক্তিগত জীবনপটের বাইরে গিয়ে, তাদের দিক থেকেই জীবনটা বিচার করতে হয়।

এই যে মহাভারতের এত বড় চরিত্রটি— পাণ্ডব অর্জুন, গাণ্ডীবধন্বা— তিনি কেমন রিক্ত হয়ে গেলেন কৃষ্ণা দ্রৌপদীকে বিবাহ করে আনার পরেও। প্রথমত দ্রৌপদী-বিবাহের শর্তপূরণ করে মীনচক্ষু লক্ষ্যভেদ করার পরেও অর্জুন দ্রৌপদীর সম্পূর্ণ অধিকার পেলেন না। বৃহত্তর স্বার্থে দ্রৌপদীর এক-পঞ্চমাংশ লাভ করেই তাঁকে তৃপ্ত থাকতে হল। তাও বা বেশ চলছিল, প্রথম মধ্যম পাণ্ডবের পর তাঁরই ক্রম উপস্থিত হতে পারত নারদ ঋষির নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে। এক ব্রাহ্মণের গোরু হারিয়ে গেল— বলিহারি যাই ব্রাহ্মণের, ওই সময়েই তাঁকে গোরু হারাতে হয়, আবার তার চেয়েও বলিহারি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে— দ্রৌপদীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করার জন্য যুধিষ্ঠির সেই অস্ত্রাগারেই তখন বসে আছেন, যেখান থেকে অস্ত্র নিয়ে ব্রাহ্মণের গোধনহারী দস্যুকে শাস্তি দিতে হবে। অর্জুন অস্ত্রাগারে প্রবেশ করলেন, জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে দেখলেন দ্রৌপদীর সঙ্গে এবং নারদের বিধিনিয়ম মেনে শেষ পর্যন্ত বনবাসে চলে গেলেন ব্রহ্মচারী হয়ে, বারো বছর কাটানোর জন্য। সেটাই নিয়ম।

অর্জুন চললেন বনবাসে, তাঁর পিছন পিছন চললেন কত ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, কথক, পৌরাণিক সবাই— তাঁরা অর্জুনের বনবাসজীবন গল্পে-কথায়-সঙ্গ-সাযুজ্যে ভরিয়ে তুলবেন। অনেক তীর্থ, অনেক বন-পাহাড়-নদী পেরিয়ে অর্জুন এসে উপস্থিত হলেন গঙ্গাদ্বারে। গঙ্গাদ্বার জায়গাটা তাঁর বেশ পছন্দ হয়ে গেল— আর পছন্দ হবে নাই বা কেন— এই তো অন্য নামে আজকের হরিদ্বার। গঙ্গাদ্বারের অসামান্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, বিশেষত গঙ্গা-ভাগীরথীর শোভা দেখে অর্জুনের মন পুলকিত হল। তিনি সেখানে কিছুদিন বাস করার জন্য একটি আশ্রম বানিয়ে ফেললেন— স গঙ্গাদ্বারমাসাদ্য নিবেশমকরোৎ প্রভুঃ। ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রপাঠ করে যজ্ঞের আগুন জ্বাললেন, আরম্ভ হল অগ্নিহোত্র, পুষ্পাহুতি। পবিত্র যজ্ঞের আগুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গঙ্গার ওপার থেকেই দৃষ্টিগোচর হল অনেকের— তেষু প্রবোধ্যমানেষু... তীরান্তরগতেষু চ।

নতুন স্থানে নতুন আশ্রম-নিবেশ করার পর ব্রাহ্মণদের মাঙ্গলিক এবং নিত্যকর্ম আরম্ভ হতেই অর্জুন এবার নামলের গঙ্গায় স্নান করতে। গঙ্গাদ্বারের শীতল জলে স্নান করে স্নিগ্ধ হবার পর গঙ্গার জলেই পিতৃলোকের তর্পণ করে নিলেন অর্জুন। স্নান-তর্পণের পর এবার বেদবিহিত অগ্নিহোত্র সম্পন্ন করার ইচ্ছে হল তাঁর। ভাবলেন, এবার জল থেকে উঠে নব-নিবেশিত আশ্রমে বসে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করবেন তিনি। তাই জল থেকে ওঠা দরকার। গঙ্গার তীরে আশ্রম-নিবেশের পর এমনভাবেই অর্জুন স্নান-তর্পণ পরপর করে যাচ্ছিলেন যাতে তাঁর ধর্মপালনের ক্রমটুকু পরিষ্কার বোঝা যায়। বোঝা যাচ্ছিল যেন এবার তিনি অগ্নিহোত্র করার কথা ভাবছেন। ঠিক এই সময়েই সেই বিরাট বিভ্রাট ঘটে গেল। নাগকন্যা উলূপী এসে জলের ভিতরেই তাঁকে টেনে নিয়ে গেলেন আরও গভীরে, আরও গভীর জলের মধ্যে, অন্য কোনও স্থানে— অবকৃষ্টো মহাবাহুর্নাগরাজস্য কন্যয়া।

মহাভারতের এই কাহিনি বেশ রূপকথার মতো শোনাচ্ছে। যেন রূপকথার ছবির মতো নাগকন্যা উলূপীর পুচ্ছভাগ মৎস্যের মতো। মুখখানি এক সুন্দরী মেয়ের। সে জলপরীর মতো এসে অর্জুনের পা ধরে টেনে নিয়ে গেল কোনও নাগলোকে— অর্জুনকে তাঁর ভাল লেগেছে, অতএব তাকে চাই অগ্নিতৃষিত বক্ষে, বাহুর ঘেরে। আর মহাবীর অর্জুনও চললেন জলের মধ্যে, জলের গভীরে তাঁর নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হল না। দিবি্য অবশের মতো চলে গেলেন নাগ-সুন্দরীর টানে— অন্তর্জলে মহারাজ উলূপ্যা কামমানয়া।

প্রথমেই জানানো ভাল যে, মহাভারতের কবি কাহিনি বলার সময় রূপকথার ছাঁদ ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু কাহিনির অন্তরে তিনিই ইতিহাস, মানবতত্ত্ব সবই ব্যবহার করেন। মহাভারতের ইতিহাসনিষ্ণাত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, আমাদের দেশে নাগ-জনজাতির অধিষ্ঠান ছিল মহাভারতীয় জনগোষ্ঠীর অনেক আগে থেকে। নাগ অর্থ কখনও হস্তী কখনও বা সর্প। পণ্ডিতেরা বলেন— এই দুই অর্থেই মহাভারতপূর্ব সেই জনজাতিকে সপ্রমাণ করা যায়। এমনও বলা হয়ে থাকে যে, হস্তিনাম থেকে হস্তিনাপুর বা নাগসাহ্বয়— এই নামও মহাভারতপূর্ব নাগ-জনজাতির উপস্থিতি বা বসতি প্রমাণ করে। অন্যদিকে মহাভারতের আস্তীক-পর্বে যে বহুতর সর্পনাম বা নাগনাম উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলিই মহভারতীয় রাজা-মহারাজার নাম। স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্রের নামই আস্তীক-পর্বে উল্লিখিত এক সর্পনাম। এবং এই যে নাগকন্যা উলূপী, ইনি যাঁর কন্যা তিনি নামে যতই রূপকথার সর্প হোন, তাঁর নাম কিন্তু 'কৌরব্য' অর্থাৎ তিনি কুরুবংশের জাতক এবং তাঁর বংশ নেমে আসছে ঐরাবত নামের এক বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে। দেখা যাচ্ছে, ইন্দ্রের সুরহস্তী ঐরাবত এবং সর্পরাজ কৌরব্য একাকার হয়ে গেলেন আমাদের জনজাতির ভাবনায় সমস্ত বিভ্রান্তি ঘটিয়ে দিয়ে।

হয়তো হস্তী এবং সর্প— এই দুইয়ের একই পর্যায়-শব্দ 'নাগ' কথাটিই বিভ্রান্তির মূলে। আবার এমনও বলা যায় যে, হস্তীই হোন অথবা সর্পই হোন, এঁরা অবশ্যই মহাভারতীয় আর্যজনগোষ্ঠীর পূর্বতন জনজাতি, যাঁদের সঙ্গে মহাভারতীয় আর্যগোষ্ঠীর শত্রুতা হয়েছে

কখনও, আবার কখনও বা বন্ধুত্বও হয়েছে; সবচেয়ে বড় ঘটনা যেটা ঘটেছে সেটা হল, আর্যগোষ্ঠীর সঙ্গে পুরাতন এই গোষ্ঠীর 'অ্যাসিমিলেশন' বা তন্ময়ীভবন। যার ফলে অনন্ত, বাসুকি বা শেষনাগ আমাদের পূজনীয় ব্যক্তিত্ব এবং এই তন্ময়ীভবন এতটাই যে, এঁরা আর্য জনগোষ্ঠীর আচার-ব্যবহারও আত্মসাৎ করেছিলেন। এর শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ মিলবে সেই নাগকন্যা উলূপীর আচরণে— যিনি এই এক্ষুনি বিশাল সংহৃত বারিসঞ্চয়ের মধ্যে টেনে নিয়ে গেলেন অর্জুনকে। একটু আগে অর্জুনকে ধরে নিয়ে যাবার সময় উলূপীকে আমরা প্রথম দর্শনের প্রেমেই পাগলপারা দেখেছি, মহাভারতের ভাষায় তাঁকে কামার্তাই বলা চলে— উলূপ্যা কামমানয়া— অথচ অর্জুনকে জলের গভীরে টেনে নিয়ে যাবার পর এতটুকু কামাভাস তাঁর শরীরে নেই, নেই এতটুকু বিচলন, তিনি অর্জুনকে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন অগ্নিশরণ-গৃহে, যেখানে অগ্নিহোত্র-কর্ম সমাধা করা যায়। নাগরাজ-ভবনে স্থিত হতেই অর্জুন দেখেছেন যে, তিনি পবিত্র অগ্নির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন— দদর্শ পাণ্ডবস্তত্র পাবকং সুসমাহিতঃ।

অর্থাৎ এই অপ্রবেশ্য নাগরাজ্যেও আর্যজনোচিত অগ্নিসেবা চলে। জলের গভীরে একেবারে পাতালে এই নাগরাজ্যের অবস্থিতি কিনা, সেটা রূপকথার পরিসর বটে, কিন্তু মহাভারতে বর্ণিত নাগদের মনুষ্যরূপ এবং তাঁদের বেশবাস, বাড়িঘর এবং রাজপ্রাসাদ নিশ্চয়ই অন্তর্জলীয় কোনও সত্য হতে পারে না। বিভিন্ন প্রমাণ থেকে বরঞ্চ এটাই প্রতিষ্ঠা করা যায় যে, নাগ-জনজাতির মানুষেরা আর্য-অধ্যুষিত ভূখণ্ড থেকে একটু দূরেই থাকতেন। তাঁরা যে জায়গায় থাকতেন, সেখানে জলের প্রাচুর্য ছিল। নাগরাজ কৌরব্যের রাজগৃহে সমিদ্ধ অগ্নিদর্শন করে অর্জুন পূর্বের ইচ্ছামতো অগ্নিহোত্র সমাধা করলেন নিশ্চিন্ত মনে— তত্রাগ্নিকার্যং কৃতবান্ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ। এতক্ষণ পরে বুঝি নিশ্চিন্ত সময় এল ভাববার কেন এই সুন্দরী নাগরমণী তাঁকে এইখানে ধরে নিয়ে এসেছে— নিশ্চয়ই সেটা অগ্নিহোত্রের সুসমাধানের জন্য নয়।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন— হঠাৎ তুমি এমন একটা সাহসের কাজ করে ফেললে কেন— কিমিদং সাহসং ভীরু কৃতবত্যসি ভাবিনি। আর এই সুন্দর দেশটাই বা কার? এ দেশের রাজা কে? তুমিই বা কার মেয়ে। মেয়ে উত্তর দিল— প্রসিদ্ধ ঐরাবতবংশে জন্মেছেন আমার পিতা কৌরব্য। আমি তাঁরই মেয়ে, আমার নাম উলূপী, নাগকন্যা উলূপী— তস্যাস্মি দুহিতা বীর উলূপী নাম পন্নগী। এতক্ষণ রীতিমতো আর্যজনোচিত ব্যবহার করে উলূপী তাঁর নিজের মর্যাদা, ধৈর্য এবং সংযম পরিষ্কার করে দিয়েছেন। কিন্তু এখন যখন অর্জুন প্রশ্ন করছেন— আমাকে এখানে টেনে নিয়ে আসার এই আকস্মিকতার মধ্যে তোমার কী অভিপ্রায়, তখন উলূপী স্পষ্ট জানাতে দ্বিধা করলেন না। বললেন— তুমি যখন গঙ্গায় স্নান করতে নেমেছিলে, তখনই তোমাকে দেখে মোহিত হয়েছি আমি, ভালবেসে ফেলেছি তোমাকে। তোমাকে পাবার জন্য আমার শরীর-মন দুই-ই উৎসুক হয়ে আছে— দৃষ্ট্বৈব পুরুষব্যাঘ্র কন্দর্পেনাস্মি পীড়িতা।

সেকালে যাকে পাবার ইচ্ছে হত— সে পুরুষ হোক অথবা নারীই হোক— অকপটভাবে নিজের অভিলাষ স্বীকার করতে নারী অথবা পুরুষের লজ্জা হত না। উলূপী বলেছেন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে পাবার জন্যই আমার শরীর-মন জর্জরিত হয়ে আছে, অতএব তোমারও উচিত আমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করা। তা ছাড়া এমনও তো নয় যে, আমার একটি স্বামী আছে, যার কাছে আমি আত্মনিবেদন করতে পারি। অতএব আমাকে নিয়ে তোমার দ্বিধার কারণ নেই কোনও। এসো, আজই কোনও নির্জন স্থানে মিলন হোক আমাদের— অনন্যাং নন্দয়স্বাদ্য প্রদানেনাত্মনো রহঃ— এবং আমাকে তুমি নন্দিত করো নিজেকে আমার হাতে সমর্পণ করে।

অর্জুনের কাছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করার মধ্যে উলূপীর নিজস্ব আন্তরিকতার কোনও অভাব ছিল না এবং হয়তো এই গভীর এবং তীব্র আকাঙ্ক্ষার কারণেই তাঁর বক্তব্যে সত্যের সামান্য অপলাপ থেকে গেছে। সেই সত্য খুব প্রয়োজনীয় না প্রাসঙ্গিক, সেটা হৃদয় দিয়ে অনুভব করলে, সেই সত্যের অপলাপটুকুও যথেষ্ট প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে।

উলূপীর কথা শুনলে কী মনে হবে? এটাই তো বরং পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে, প্রথম দর্শনেই মহাবীর অর্জুনকে তাঁর ভাল লেগেছে এবং তিনি তাঁকে পাবার জন্য আকুল হয়ে উঠেছেন। অর্জুনকে যে তিনি এত তীব্রভাবে মনের কথা বলতে পেরেছেন, তার জন্য অর্জুনের নির্বিবাদ মৌনতাও খানিকটা দায়ী ছিল নিশ্চয়ই। সেই যে স্নানরত অবস্থায় অর্জুনের হাত ধরে তাঁকে টেনে নিয়ে এলেন— নিয়ে এলেন অন্য কোথাও, গভীর জলবৎ কোনও গহন স্থানে, একেবারে নিজের ক্রীড়াভূমিতে, অর্জুন তো কই বাধা দিলেন না একটুও। যে মহাবীর অর্জুন গুরুর আজ্ঞাপালনের জন্য দ্রুপদের মতো বীরকে জীবিত ধরে আনলেন, যিনি মৎস্যচক্ষু ভেদ করে যুধ্যমান সমস্ত নরপতিদের হারিয়ে দিলেন দ্রৌপদীকে লাভ করার জন্য, সেই মহাবীর অর্জুন নাগকন্যা উলূপীর কোমল বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেন না, এ-কথা কি বিশ্বাস্য? নাকি সে-বাহুপাশ ছাড়াতে চাননি বলেই উলূপীর টানে ধরা দিয়ে নির্বিবাদে এবং ভারী নিশ্চিন্তে চলে এসেছেন উলূপীর গহন বাসস্থানে— দূরে, বহুদূরে, আর্যনিবাস ছেড়ে অন্য এক আর্যায়িত জনস্থানে।

উলূপী অর্জুনকে বলেছিলেন— এমন তো নয় যে, আমার স্বামী আছেন অথবা আছেন আমার সত্তার কোনও অধিকারী, অতএব আমাকে তুমি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করো আজই— অনন্যাং নন্দয়স্বাদ্য। কিন্তু এই কথাটা নিয়েই গোল বেধে গেছে। উলূপীর কোনও অধিকারী, অর্থাৎ এমন কোনও পুরুষ, যিনি বলতে পারেন— উলূপী আমার, সে আমার স্ত্রী— না, এমন কোনও পুরুষ এখন কেউ নেই বটে, কিন্তু এক সময়ে ছিল—তার মানে উলূপী বিবাহিতা রমণী। এই বিবাহের সবিশেষ প্রমাণ আছে মহাভারতেই। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে উলূপীর গর্ভজাত অর্জুনের পুত্র ইরাবান যখন যুদ্ধ আরম্ভ করলেন, তখন কৌরবপিতা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে সোজাসুজি কোনও প্রশ্ন না করলেও 'ইরাবান' নামটা শুনেই প্রশ্নোৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। সঞ্জয় বলেছিলেন— ইরাবান অর্জুনের পুত্র। পিতাকে সাহায্য করার জন্য সে এই যুদ্ধে এসেছে— অর্জুনস্য সুতঃ শ্রীমান্ ইরাবান্নাম বীর্যবান্।

পরিচয় এইটুকুতেই শেষ হয়নি এবং সেই সবিশেষ পরিচয় থেকেই খবর পাওয়া যাচ্ছে যে, নাগকন্যার পূর্বে একবার বিবাহ হয়েছিল এবং তা হয়েছিল স্বজাতীয় এক নাগ-পুরুষের

সঙ্গেই। সেটাই স্বাভাবিক। সুন্দরী কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে ছিলেন উলূপীর পিতা ঐরাবত কৌরব্য। কিন্তু উলূপীর দুর্ভাগ্য এমনই যে তাঁর সর্প-স্বামীটি পক্ষিরাজ গরুড়ের হাতে মারা পড়লেন। এটা সবাই জানেন যে, সর্পের চিরশত্রু হলেন গরুড় বৈনতেয়। বংশগত কারণে সর্পরা গরুড়ের বৈমাত্রেয় ভাইও বটে আবার শত্রুও বটে। তাঁদের অনেক বিখ্যাত কলহ মহাভারত-পুরাণে বর্ণিত আছে। লৌকিক দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, একই পিতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও গরুড় এবং তজ্জাতীয়েরা তৎকালীন আর্যগোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসেন তাড়াতাড়ি এবং এতটাই তাঁদের প্রতিপত্তি বেড়ে যায় যে, গরুড় পুরুষোত্তম নারায়ণের বাহন নিযুক্ত হন। এমন হতে পারে— গরুড় যে গোষ্ঠীর প্রধান, তারা পক্ষীর 'টোটেম' ব্যবহার করতেন এবং তাঁর জ্ঞাতিগোষ্ঠীর নাগপুরুষেরা সর্পের 'টোটেম' ব্যবহার করতেন। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা ছিল চিরন্তন। ফলে কোনও এক সময় উলূপীর স্বামী গরুড়ের হাতে অথবা গরুড় গোষ্ঠীর কারও হাতে মৃত্যুবরণ করেন। উলূপীর স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিবাদের কোনও কারণ ছিল কি ছিল না, সেটা অমূলক; কারণ তাঁদের বিবাদ-বিরোধ কারণে-অকারণে সংঘটিত হত।

বিবাহের পরপরই নাগকন্যা উলূপীর সুখের দিন ফুরিয়ে গেল। তিনি কম সুন্দরী ছিলেন না, মহাভারতে তাঁকে বুড়ো বয়সেও সুন্দরী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সেই সুন্দরীর স্বামী মারা গেলেন অকালে। তিনি পিতৃগৃহেই লালিত হতে লাগলেন— মনটা শোকে কাতর, তাঁর জীবনটা অতি অল্প বয়সেই অন্ধকার হয়ে গেল। তাঁর কোনও একটা ছেলেও নেই যে, তিনি তাকে নিয়ে দুঃখের দিনগুলি অতিবাহিত করবেন— পত্যৌ হতে সুপর্ণেন কৃপণা দীনচেতনা। পিতা ঐরাবত কৌরব্য তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারেন না। এত অল্প বয়সে তাঁর সুন্দরী মেয়েটি বিধবা হয়ে গেল।

কিন্তু সময় এমন জিনিস যে, অতিক্রান্ত কালের সঙ্গে মানুষের মনের ব্যথা, দুঃখ, বেদনা, এমনকী ক্রোধও উপশম করে দেয়। তা ছাড়া এতই অল্পসময় উলূপী স্বামীর ঘর করেছিলেন, এতই স্বল্প ছিল তাঁর সঙ্গকাল যে, স্বামীর কথা ভুলতে তাঁর সময় লাগল না। কিন্তু জীবনে কাঁটা একটা রয়েই গেল— তাঁর এই নবীন বয়সে, যৌবনের শরীরী যন্ত্রণাগুলি এখনই তো সব শান্ত হয়ে যাবার কথা নয়। কিন্তু এখন কেই বা তাঁকে বিয়ে করবে, আর এই ক্ষুদ্র নাগগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর বিবাহের কথাটাও নিশ্চয়ই এতটাই প্রচারিত যে, সহজে কোনও নাগপুরুষ একজন বিধবাকে বিবাহ করবে না।

উলূপী এটা বুঝেছিলেন যে, তাঁর নিজের ব্যবস্থা তাঁকে নিজেই করতে হবে, কেননা পিতা কৌরব্য নাগও যে খুব তাড়াতাড়ি তাঁর কন্যাটির জন্য স্বামী সংগ্রহে মন দেবেন, এটা ভাবা উচিত নয়। উলূপী যেহেতু স্বল্পকালের জন্য হলেও সামান্য দাম্পত্যের আস্বাদ পেয়েছেন, অতএব শ্বশুরগৃহেই হোক, কিংবা পিতৃগৃহে, তিনি শান্ত হয়ে বসবাস করলেও তাঁর মনের বাসনালোকে অন্তত সেই আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিলই। তিনি তেমনই এক পুরুষ চাইছিলেন, যার সঙ্গলাভে তিনি নন্দিত হতে পারেন। নইলে কেনই বা তিনি এই অকালে নিজের বাসভবন ছেড়ে কোন বাতুলতায় সেই গঙ্গাদ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন! এসে অবশ্য ভালই হয়েছে। অর্জুনের মতো পুরুষসিংহকে তিনি দেখতে পেলেন এবং দেখামাত্রেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি আর দেরি করেননি, লজ্জা করেননি, সংকুচিত হননি স্ত্রীজনোচিত সীমাবদ্ধতায়। আমরা দেখেছি— অর্জুনকে গঙ্গায় স্নান করতে দেখে উলূপী মোহিত হয়েছেন এবং তিনি যে নিঃসঙ্কোচে তাঁকে টেনে এনেছেন— তার মধ্যে এতটাই তাঁর সত্যমধুর আত্মনিবেদন ছিল যাতে অর্জুন একটি কথা পর্যন্ত বলতে পারেননি।

উলূপীর মানুষ চিনতে ভুল হয়নি। এইরকম সিংহের মতো এক পুরুষ হঠাৎ গঙ্গাদ্বারে এসে আশ্রম-নিবেশ করে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ওঠা-বসা করছেন— এটা স্বাভাবিক লাগেনি উলূপীর কাছে। দ্রৌপদীর কারণে মনে মনে ভগ্ন হয়েই ছিলেন অর্জুন। কাজেই আজ যখন এই নাগকন্যা তাঁকে স্বেচ্ছায় আত্মনিবেদন করলেন, তখন সামান্য যে-কথাগুলি বলে তিনি কথা আরম্ভ করলেন, তার মধ্যে বীরোচিত ভদ্রতাই প্রাথমিক ছিল, ঠিক যেমন ছিল উলূপীর ভদ্রতা— তিনি অর্জুনকে প্রথমে তাঁর ব্রাহ্মসংস্কার সাঙ্গ করতে দিয়েছেন অগ্নিহোত্রের সমাধান করে— এখনও পর্যন্ত আপন অভিলাষের কথা কিছুই বলেননি উলূপী। কিন্তু অর্জুন তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই মনের সরল-সত্য অভিলাষ একেবারে নির্দ্বিধায় জানিয়েছেন তিনি এবং প্রয়োজনীয় সত্যটুকু গোপনও করেছেন সমান সরলতায়। কেননা, 'শুধু বিবাহ হয়েছিল'— এই সত্যটুকু তাঁর রমণী-জীবনের সর্বসার সত্য নয়। শুধু এই সত্য নিয়ে সুন্দরী যৌবনবতী এই রমণী জীবন কাটাতে চান না বলেই অর্জুনের কাছে দ্ব্যর্থহীন আত্মনিবেদন এবং পূর্ব ঘটিত সত্যের স্বেচ্ছাকৃত অপলাপ।

অর্জুন, মহাবীর অর্জুন এতটুকু জটিল প্রশ্ন করেননি আর, উলূপীর প্রস্তাব হৃদয়ঙ্গম করার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে তিনি নিজের অসহায়তার কথা জানিয়েও কীভাবে উলূপীর কথায় রাজি হওয়া যায়, তার উপায় খুঁজছিলেন তিনি। নাগকন্যার সঙ্গে মিলিত হবার প্রধান অন্তরায় হল পূর্ব প্রতিজ্ঞাত সেই ব্রহ্মচর্য। নারদের কাছে পাঁচ ভাইয়ের প্রতিজ্ঞা ছিল— দ্রৌপদীর সঙ্গে যাঁর নির্ধারিত সহবাস চলবে, তখন যদি অন্য কেউ সেই ভাইয়ের ঘরে প্রবেশ করে তবে বারো বছরের বনবাস এবং সঙ্গে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ বর্জিত অবস্থায় থাকতে হবে তাকে। অর্জুন স্বয়মাগতা এই রমণীকে প্রত্যাখ্যানও করতে পারছেন না, অন্যদিকে ব্রহ্মচর্যের স্খলন— এই দুইয়ের দ্বৈরথে উলূপীকেই বিচারক হিসেবে ভাবতে শুরু করেছেন, কারণ নাগকন্যার প্রগলভ উচ্ছ্বাস তাঁর ভাল লেগেছে। কঠিন লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে পেয়েও যিনি পেলেন না, উপরন্তু এই বনবাস, ব্রহ্মচর্য— অর্জুনের 'ফ্রাস্ট্রেশন' চরমে উঠেছে তখন।

অর্জুন বললেন— আমি কী করব, কল্যাণী! আমার যে এখন বারো বছর ব্রহ্মচর্য পালনের কথা— ব্রহ্মচর্যমিদং ভদ্রে মম দ্বাদশবার্ষিকম্— ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সকলের সামনে এই নিয়ম স্থির করে দিয়েছেন। কিন্তু কী জানো, আমি তোমার প্রিয় কর্ম করতে চাই। চাই, তোমার ইচ্ছাপূরণ করতে। অর্জুন এবার সমস্যাটা নাগকন্যা উলূপীর ওপরেই ছেড়ে দিয়ে বললেন— দেখ না, এমন কিছু কি করা যায়, যাতে আমাদের ওই নিয়মটাও মিথ্যে না হয়ে যায়, আবার তোমার প্রিয় আচরণও করা যায়— কথঞ্চন্নানৃতং তৎ স্যাৎ তব চাপি প্রিয়ং ভবেৎ— তেমন একটা উপায় বার করো তো দেখি।

এক্ষেত্রে নাগকন্যা উলূপী যা চাইছেন, সেটা ন্যায় কি অন্যায়, তার মধ্যে না গিয়েও

বলতে পারি— যিনি যে বিষয়ের প্রস্তাবক, তাঁকেই যদি নিজের অনুকূলে যুক্তি বার করতে দেওয়া যায়, তবে কি যুক্তির অভাব হয়? বিশেষত মহাভারতে এই ধরনের সংকট মাঝে মাঝে এসেছে— স্ত্রী-পুরুষের আকুল আকাঙ্ক্ষার মধ্যে মাঝে মাঝে এমন এক খণ্ড 'ধর্ম' অন্তরায়ের প্রাচীর তুলে দিয়েছে। মহাভারতের সংবেদনশীল কবি কখনও কিন্তু ধর্মের জিগির তুলে কোনও রমণীর উদ্গত হৃদয় স্তব্ধ করে দেননি। অর্জুন বলেছিলেন— তেমন কোনও যুক্তি খুঁজে বার করো যাতে আমার ধর্ম-নিয়ম নষ্ট না হয়— যথা ন পীড্যতে ধর্মস্তথা কুরু ভুজঙ্গমে।

উলূপী শান্ত উত্তর দিয়েছিলেন। বস্তুত তিনি অর্জুনের সব খবর রাখেন। তিনি বলেছিলেন— আমি জানি কেন তুমি এমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছ এখানে-সেখানে। আমি জানি কেন এই ব্রহ্মচর্য এবং বনবাস। দ্রৌপদীর জন্য তোমরা যে নিয়ম করেছিলে তারই প্রতিজ্ঞা মেনে আজকে তোমায় বনে আসতে হয়েছে ব্রহ্মচর্যের অঙ্গীকার করে। কিন্তু আমার যুক্তি একটাই— তোমাদের এই নিয়ম দ্রৌপদীর জন্য এবং সে-নিয়ম তোমাদের পাঁচ ভাইয়ের পারস্পরিক অবস্থান ঠিক রাখার জন্য— তদিদং দ্রৌপদীহেতোরন্যোন্যস্য প্রবাসনম্ —আমার ব্যাপারে সে নিয়মের তাৎপর্য কী? আমি তো অন্য এক রমণী যে শুধু তোমাকেই চাইছে, সেখানে দ্রৌপদীর কারণে ব্রহ্মচর্য আমার ব্যাপারে খাটবে কেন? দ্রৌপদী-ঘটিত নিয়ম আমার ব্যাপারে খাটে না— কৃতবাংস্তত্র ধর্মার্থম্, অত্র ধর্মো না দুষ্যতি।

এর পরে সেই অকাট্য যুক্তি। উলূপী বললেন— তুমি না ক্ষত্রিয়! আর্তজনের ত্রাণের জন্যই না তোমার ক্ষাত্রধর্ম। সেখানে আমার মতো পীড়িত মানুষের পরিত্রাণ করাটা কি ধর্ম নয়! উলূপী বুদ্ধিমতী রমণী। তিনি বুঝেছেন যে পূর্বে যে যুক্তি তিনি খাড়া করেছেন— অর্থাৎ ওটা দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে খাটে, আমার ক্ষেত্রে খাটে না— ইত্যাদি সব যুক্তি খুব জোরালো নয়। অতএব সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের যে পথে তিনি অর্জুনকে আর্দ্রসিক্ত করে দিতে পারবেন, সেই পথই তিনি বেছে নিলেন। বললেন— আমার সঙ্গে আমারই একান্ত অভীপ্সিত এই মিলনে আমার আগের যুক্তিতে যদি কোনও দুর্বলতা থেকেও থাকে, যদি বা তাতে তোমার প্রতিজ্ঞাত ধর্মের সূক্ষ্ম কোনও ব্যতিক্রম ঘটেও থাকে— যদি বাপ্যস্য ধর্মস্য সূক্ষ্মোঽপি স্যাদ্ ব্যতিক্রমঃ— তবু সেখানে সব অন্যায়, অধর্ম ধুয়ে মুছে যাবে, যদি তুমি আমার জীবনদান করো। এখানে দ্রৌপদীর কারণে তোমরা কথার কথা একটা নিয়ম করেছ, সেখানে সেই বাক্য রক্ষার ধর্ম থেকে কারও জীবনরক্ষার ধর্ম অনেক বড়। আমি আমার সব দিয়েছি তোমাকে, সেখানে তুমিও আমাকে একইভাবে চাইবে— এই তো ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার— ভক্তাঞ্চ ভজ মাং পার্থ সতামেতন্মতং প্রভো। তুমি আমাকে জীবন দাও— এটাই সবচেয়ে বড় ধর্ম।

সত্যিই তো উলূপীর কাছে এটা জীবনদানই বটে। তাঁর বিবাহ হয়েছিল অথচ কতকাল তিনি স্বামীহীনা। বাঁচার জন্য ক্ষণিকের জন্য হলেও এক উত্তরঙ্গ ভালবাসা চাই তাঁর। তাঁর বিবাহ হয়েছিল— শুধুমাত্র এই শাব্দিক পরিতৃপ্তি নিয়ে জীবন প্রাণিত করা কী এক যৌবনবতী রমণীর ঈপ্সিত হতে পারে? পিতা তাঁর যৌবন বয়সের কথা ভেবেও দ্বিতীয় কোনও বিবাহের চিন্তা করেননি, কখনও যে চিন্তা করবেন, তাও মনে হয় না। অতএব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের ব্যবস্থা তাঁকে নিজেই করতে হবে। উলূপী বলেছেন— তুমি ক্ষত্রিয়, কত দীনহীন অনাথকে তুমি রক্ষা করো। আমার বেলাতেই বা সেটা হবে না কেন, আমিও তো একইভাবে তোমার শরণ গ্রহণ করেছি। আমি স্ত্রীলোক হয়ে স্বয়ং তোমাকে কামনা করেছি, অতএব তুমিই বা কেন আমাকে চাইবে না— যাচে তঞ্চাভিকামাহং তস্মাৎ কুরু মম প্রিয়ম্।

অকাট্য যুক্তি। সজীব প্রাণের বদলে একটি সজীব প্রাণ কামনা করেন উলূপী। অল্প সময়ের জন্য সেই প্রাণের স্পর্শ পেলেও সেই সুখস্মৃতি এবং অর্জুনের স্ত্রী-স্বীকৃতির মর্যাদা নিয়েই জীবন কাটাতে পারেন তিনি। এর বেশি কিছু তিনি চান না। নাগকন্যার যুক্তি-তর্কের চেয়েও যেহেতু তাঁর আত্মনিবেদনই অনেক বেশি মহত্তর হয়ে উঠেছিল অর্জুনের কাছে এবং দ্রৌপদীর অভাববোধ যেহেতু এই মহাবীরের মনে এক স্পর্শকাতর শূন্যতাও তৈরি করেছিল, অতএব এক মুহূর্তের জন্য অর্জুনের ধর্মাধর্ম, নিয়মনীতি, ব্রহ্মচর্য— সমস্ত বাঁধ ভেঙে গেল। আর যদি ধর্মের কথা ধরাও হয় তবে সেকালে এ-ও একপ্রকার ধর্ম ছিল। সেকালে কোনও সকামা রমণী যদি পুত্রলাভের উদ্দেশে পুরুষের কাছে রতি প্রার্থনা করত, তা হলে তাকে ফিরিয়ে দেবার রীতি ছিল না। কোনও রমণীর বাৎসল্যের অধিকার, মা হবার অধিকার, তাঁর শ্রেণীগত অধিকারের মধ্যে পড়ত কিনা জানি না, কিন্তু এসব ক্ষেত্রে রমণীকে বঞ্চিত করার রেওয়াজ ছিল না এবং এই মা হবার অধিকারের সঙ্গে পিতৃপরিচয়টুকু যাতে যুক্ত হয়, সে-ব্যাপারেও সামাজিক পুরুষের বদান্যতার অভাব ছিল না।

আপনারা বলতেই পারেন— পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এ তো বেশ সুবিধের কথাই ছিল। পুরুষেরা মাঝে মধ্যেই বিনা আয়াসেই ভোগের সুযোগ পেতেন, অতএব একটি পুত্র বা কন্যা সৃষ্টির নির্মল আনন্দ তাঁরা পরিহার করতেন না। এ কথার প্রকট অর্থ আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু একই সঙ্গে এটাও বলতে চাই যে, পুরুষেরা পিতৃপরিচয়ের দায়টুকুও কিন্তু এড়িয়ে যেতেন না এবং এই সামাজিক স্বীকৃতিদানের মধ্যে কোনও সামাজিক লজ্জাও কাজ করত না বলেই ঘটনাগুলি সহজভাবেই মেনে নেওয়া হত। বিশেষত কামনা-প্রশমনের ইচ্ছাটা যদি পুরুষের দিক থেকে গৌণকর্ম না হয়ে মুখ্যকর্ম হত, তা হলে এই অর্জুনের পক্ষেও আরও বেশ কিছুদিন এই নাগ-ভবনে থাকার অসুবিধে ছিল না। কিন্তু তিনি তা থাকেননি। মাত্র একটি রাত তিনি উলূপীর সহবাসে নিযুক্ত ছিলেন— স নাগভবনে রাত্রিং তমুষিত্বা প্রতাপবান্— এবং তার পরেই তিনি প্রত্যুষে কৌরব্য-নাগের ভবন ছেড়ে ফিরে গেছেন গঙ্গাদ্বারের সেই অরণ্য-নিবাসে। মহাভারতের কবি অর্জুনের এই রাত্রিবাসের কারণ দেখিয়ে বলেছেন— অর্জুন ধর্মের উদ্দেশ্য সাধন করেই এক রাত্রি সহবাস করেছেন উলূপীর সঙ্গে— কৃতবাংস্তত্র তৎসর্বং ধর্মমুদ্দিশ্য কারণম্। এখানে ধর্ম কি? না, অর্জুন উলূপীকে বিবাহ করেছেন, তাঁর স্বামী-পরিচয় সুগম করেছেন এবং ভবিষ্যতে তাঁর যে পুত্র হবে, তার পিতৃপরিচয়ের জায়গাটাও সুস্থ রেখেছেন অর্জুন। এটাই এখানে ধর্ম, এই ধর্মের মধ্যে প্রাচীন আদিম সংস্কার থাকলেও আজকের দিনের অনেক বাঘা বাঘা আধুনিকও ভীত হয়ে পড়বেন। ব্যাপারটা অত সহজ নয়।

সহজ যে নয়, তার প্রমাণ মহাভারতের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে ইতস্তত। একটা প্রশ্ন তো অবশ্যই উঠবে যে, অর্জুন কি উলূপীর তীব্র আসঙ্গ-লিপ্সায় সাড়া দিয়ে এক রাত্রি তাঁর

সঙ্গে সহবাস করে গেলেন, নাকি অর্জুন তাঁকে বিবাহ করেছিলেন কোনও নিয়মে এবং সেই কারণেই এক বৈবাহিক রাত্রি অতিবাহিত করেছিলেন নাগবধূর সঙ্গে। বিয়ে যদি বা হয়েই থাকে, সেখানেও নানা প্রশ্ন উঠেছে। প্রগতিশীলেরা বলেছেন যে, এই তো এক বিধবা-বিবাহের উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে। সংরক্ষণশীলেরা তখন মহাভারতীয় শ্লোকের ভয়ংকর পাঠ-ব্যবচ্ছেদ এবং পাঠ-পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন— মোটেই না। উলূপী রীতিমতো কুমারী কন্যা। অন্যত্র তাঁর কোনও বিবাহও হয়নি এবং তাঁর ছেলে হওয়ারও কোনও প্রশ্ন ওঠে না। আর বিধবা-বিবাহ? সে-প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর।

বাপরে বাপ! উলূপীর সঙ্গে বৈবাহিক অথবা অবৈবাহিক সহবাস নিয়ে যে এত স্মৃতিশাস্ত্রীয় গোলযোগ তৈরি হবে, তা ভাবাই যায়নি। এসব জানলে স্বয়ং অর্জুনও যে কত বিপদে পড়তেন, তা ভাবতে ভয় হয়। গোল বেধেছে মহাভারতের ভীষ্মপর্বে উচ্চারিত অর্জুনের পুত্র ইরাবানকে নিয়ে। ভীষ্মপর্বে তখন পাণ্ডব কৌরবদের মহাযুদ্ধ চলছে, সেই সময়ে ইরাবান এসেছেন পিতা অর্জুনের সাহায্যার্থে, পিতা অর্জুনের পক্ষে যুদ্ধ করবার জন্য। যুদ্ধক্ষেত্রে হঠাৎই এক সুন্দর সুবেশ যোদ্ধা এসে পৌঁছলে, তাঁর পরিচয় জানবার প্রয়োজন হল। মহাভারতের শ্রোতার কাছেও তা দরকার এবং সেই উপলক্ষ করেই চক্ষুহীন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে তাঁর পরিচয় দিয়েছেন সর্বদ্রষ্টা সঞ্জয়।

সঞ্জয় বলেছেন— এ হল ইরাবান। নাগরাজের পুত্রবধূর গর্ভে ইরাবান হলেন অর্জুনের পুত্র— সুষায়াং নাগরাজস্য জাতঃ পার্থেন ধীমতা। এই সামান্য পরিচয়টুকুতেই আমাদের মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের মর্মে বড় আঘাত লেগেছে এবং তাঁর বিড়ম্বনাও বেড়েছে শতগুণ। আমার নিজের একটু অবাকই লাগে। সিদ্ধান্তবাগীশ যথেষ্ট পণ্ডিত মানুষ, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি বঙ্গভাষায় বহুতর সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ এবং সম্পাদনা করে শত শত পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য একাই শোষণ করে নিয়েছিলেন। ঠিক এই মানুষটি তাঁর নিজকৃত মহাভারতীয় টীকার এই অংশে ভীষণ রকমের সংরক্ষণশীল হয়ে উঠলেন। এই সংরক্ষণশীল পক্ষপাত আরও বিপ্রতীপভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এই কারণে যে, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কার-আন্দোলন অনেকটাই বঙ্গদেশের অন্তরে সুপ্রোথিত। এইখানে দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্তবাগীশ নানা প্রতিযুক্তিতে প্রমাণ করতে চাইছেন যে, এটা কোনও বিধবা-বিবাহের ঘটনাই নয়, অর্জুনও এমন বিবাহ করেননি আর নাগদের ঘরেও আর্য-সংস্কারেই বিবাহাদি হত, অতএব তাঁদের বাড়ির কোনও বিধবা-বধূর বিয়ে হচ্ছে অর্জুনের সঙ্গে এটা তাঁরাও মেনে নিতেন না। এ অবস্থায় অন্য প্রগতিবাদী মানুষেরা যে এটাকে বিধবা-বিবাহের ঘটনা বলে চালাতে চাইছেন, তাঁদের কথা এখানে প্রমাণ বলে মানা যাবে না— অতঃ খলু বিধবা-বিবাহ-পক্ষে নেদং প্রমাণং ভবিতুমর্হতি।

সংশয় হয়, এই অধিক্ষেপ— খবরদার! উলূপীকে নিয়ে বিধবা-বিবাহের পক্ষে উদাহরণ সাজাবেন না— এই অধিক্ষেপ, এই সিদ্ধান্তোক্তি সেই বিদীর্ণ-হৃদয় উদার ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরের উদ্দেশে নির্গত কিনা? অর্থাৎ সিদ্ধান্তবাগীশ কিছুতেই মানবেন না যে, অর্জুন কোনও বিধবা রমণীকে বিবাহ করেছিলেন। বরঞ্চ এটা তবু তিনি মেনে নিতে পারেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে, অর্জুন অন্য কোনও এক হৃতস্বামিকা নাগ-রমণীর অনুরোধে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকবেন এবং তাঁর গর্ভে অন্য কোনও পুরুষের আহিত সন্তানের পিতৃত্বও স্বীকার করে থাকতে পারেন, কিংবা তিনি নিজেও তার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করে থাকতে পারেন, কিন্তু কদাচ তাঁর সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ হয়নি। হয়তো উলূপীর সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ হয়েছে, কিন্তু তিনি অনাহতা কন্যা বলে তাঁকে নিয়ে কোনও গণ্ডগোল নেই, অন্তত বিধবা-বিবাহের প্রশ্ন সেখানে উঠছে না। সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর আপন সিদ্ধান্তে এতটাই অবস্থিত যে, তিনি উলূপীর ব্যবহৃত দু'-একটি কথা যেমন আপন সিদ্ধান্তের অনুকূলে ব্যবহার করেছেন, তেমনই মহাভারতের শ্লোকে যে পাঠভেদ আছে, সেখানে সেই পাঠটিকেই তিনি মূল্য দিয়েছেন যেটাতে তাঁর সিদ্ধান্ত বজায় থাকে যথাসম্ভব সযৌক্তিকভাবে। বস্তুত কিছু মানুষ তো উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই মহাভারতের অন্তরে তাঁদের স্থূলহস্তাবলেপ ঘটিয়ে পাঠ পরিবর্তন করেছেন এবং সিদ্ধান্তবাগীশ যে পক্ষ নিয়েছেন, তাতে বোঝা যায় যে এ-পাঠ হল সেই পাঠ যা সরংক্ষণশীল কোনও পণ্ডিতই ঘটিয়েছেন পূর্বকালে এবং অন্তহীন ভবিষ্যতে তাঁর যে সমর্থক-পরম্পরা জুটবে, তারও প্রমাণ হয়ে গেল সিদ্ধান্তবাগীশের মতো পণ্ডিত সেই স্থূল পাঠ সমর্থন করায়।

মহাভারতে যেহেতু এ কথা বলা আছে যে, পূর্বে অন্য পুরুষের পরিণীত ঐরাবতকুলের এক নাগরমণীর গর্ভে জাত অর্জুনের পুত্র ইরাবান— এবমেষ সমুৎপন্নঃ পরক্ষেত্রে- অর্জুনাত্মজঃ— অতএব মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত বিধান দিলেন— পাণ্ডুর স্ত্রী কুন্তীর গর্ভেও তো ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্রেরা পুত্র উৎপাদন করেছিলেন, তাতে তো আর এমন কথা বলা যায় না যে; ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্রেরা কুন্তীকে বিয়ে করেছিলেন। এখানেও তেমনই; অর্জুন অন্য কোনও এক নাগরমণীর তাড়নায় সাড়া দিয়ে তাঁর গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্র হিসেবে ইরাবানের জন্ম দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু নাগরমণীকে বিবাহ করেননি কোনওমতেই। আর হ্যাঁ, উলূপীকে তিনি বিবাহ করেছিলেন বটে, তবে তিনি বিধবা ছিলেন না। তাঁর গর্ভে অর্জুনের কোনও পুত্রও ছিল না— তস্মাৎ কন্যাম্ উলূপীম্ অর্জুনঃ পরিণীতবান্, অস্যাস্তু বিধবায়ামর্জুনঃ ক্ষেত্রজপুত্রভাবেন ইরাবন্তমুৎপাদিতবান্।

অর্থাৎ মূল মহাভারতে স্পষ্ট প্রমাণ থাকায় সিদ্ধান্তবাগীশের যুক্তি ঘেঁটে গেছে। একবার তিনি বলছেন— বিধবা-বিবাহের ব্যাপারে উলূপীর নাম জোড়া যাবে না, আবার বলছেন— উলূপী বিধবাই নন, পুনরায় বলছেন— উলূপী বিধবা যদি বা হন, ইরাবান তাঁর ছেলে নন। শুধুমাত্র বিধবা-বিবাহের পৌর্বাহ্নিক ধারণায় সিদ্ধান্তবাগীশ যে সব যুক্তি সাজিয়েছেন, তা আমরা ভাল করে মেনে নিতে পারিনি। প্রথমত নাগকন্যা উলূপী ছাড়া আরও অন্যতরা নাগকন্যা অর্জুনের কাছে রতি প্রার্থনা করেছিলেন, এমন কোনও সংবাদ আমরা অর্জুনের দ্বাদশবার্ষিক বনবাসকালে পাইনি। যেখানে উলূপী, চিত্রাঙ্গদা, সুভদ্রা, সবার খবর আছে, সেখান এই অনামিকা নাগকন্যার ওপর বিশালদর্শী কবির সর্বময়ী দৃষ্টি হারিয়ে গেছে, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তবাগীশের যুক্তি হল— ভীষ্মপর্বে এই নাগকন্যার পরিচয়ে বলা হয়েছে— নাগরাজ ঐরাবত মেয়েকে তুলে দিয়েছিলেন অর্জুনের হাতে— তাঁর মানে ইনি ঐরাবতের মেয়ে, আর উলূপী হলেন গিয়ে কৌরব্য নাগের মেয়ে— তার

মানে এই দুই মেয়ে দুটি পৃথক অস্তিত্ব। আমাদের মতে এ যুক্তি বলার জন্যই বলা এবং সেটা মহাভারতের কবির আশয়ের সঙ্গে মেলে না।

সিদ্ধান্তবাগীশ ইচ্ছাকৃতভাবে মনে রাখলেন না যে, অর্জুনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে উলূপী বলেছিলেন— আমার পিতা কৌরব্য নাগ, প্রসিদ্ধ ঐরাবতকুলে তাঁর জন্ম, আমি তাঁরই মেয়ে— ঐরাবতকুলে জাতঃ কৌরব্যো নাম পন্নগঃ। মহাভারতে এমন বহু বীর পরিচয় আছে, যেখানে পিতার নামে ছেলে বা মেয়েকে ডাকা হয়নি, বরঞ্চ ডাকা হয়েছে পূর্বপুরুষের নামে। ধৃতরাষ্ট্র, অর্জুন কিংবা যুধিষ্ঠিরকে একই পূর্বপুরুষের নামে 'ভরত', 'ভারত', 'অজমীঢ়', 'কুরুপুঙ্গব' বা এইরকম অন্য কোনও বিখ্যাত পূর্ব-পিতামহের নামে সোজাসুজি সম্বোধন করা হয়েছে। কৃষ্ণকে যখন সাত্বত, বৃষ্ণি, অন্ধক ইত্যাদি বংশনামে সম্বোধন করা হয়েছে, তখন কি আমরা ভাবব যে, কৃষ্ণ এক পৃথক মানুষ, তাঁর উদ্দেশে সম্বোধিত বংশনাম সেখানে আলাদা? অতএব ঐরাবত নাগ তাঁর মেয়েকে অর্জুনের হাতে তুলে দিলেন— এ কথা বললে অবশ্যই মহাভারতের আদিপর্বের প্রসঙ্গ ধরে বুঝতে হবে যে ঐরাবতবংশীয় কৌরব্য নাগই উলূপীকে তুলে দিয়েছিলেন অর্জুনের হাতে।

সিদ্ধান্তবাগীশ মনে করেন— উলূপীর সঙ্গে অর্জুনের বিবাহও হয়নি, অতএব বিধবাবিবাহও হয়নি। অর্থাৎ কিনা তিনি উলূপীর রতি প্রার্থনা মেনে নিয়ে তাঁর সঙ্গে সম্ভোগ করেছেন মাত্র এবং তাঁর কোনও পুত্রও ছিল না উলূপীর গর্ভে। আর ইরাবান? ইরাবান অন্য এক অনামিকা নাগ-নায়িকার পুত্র। মানা গেল না সিদ্ধান্তবাগীশের কথা। আমরা মনে করি— অন্য কোনও নাগকন্যার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ হয়নি; বিবাহ যদি হয়েই থাকে, তা উলূপীর সঙ্গেই হয়েছিল। বলতে পারেন— হ্যাঁ, মহাভারতের সেই ঐরাবতবংশীয় কৌরব্য নাগের ভবনে উলূপীর সঙ্গে অর্জুনের বৈবাহিক-পর্বে কোনও মঙ্গলশঙ্খ বাজেনি, উচ্চারিত হয়নি পর্বমুখরা রমণীকুলের মুখে কোনও উচ্চ জয়কার। কিন্তু মহাভারতের এমন বহুতর বিবাহ অতি সংক্ষেপে পাণিগ্রহণের মাত্রাতেই সুসম্পন্ন হয়েছে, অথবা শুধুমাত্র সপ্তপদ-গমনের সুসমাচারেই স্বীকৃত হয়েছে বিবাহ, এমন অনেক উদাহরণ আছে। তা ছাড়া উলূপী যদি কামার্ত-হৃদয় প্রশমন করার জন্য শুধু সম্ভোগমাত্রেই সন্তুষ্ট হতেন, যদি অর্জুনের মধ্যে তিনি স্বামীলাভের স্বপ্ন না দেখে থাকেন, তা হলে অর্জুনকে পিতার ভবনে এনে অপরিসীম মর্যাদায় অগ্নিশরণ-গৃহে অগ্নিহোত্র সম্পাদনের স্থানে উপস্থিত করতেন না। গঙ্গাদ্বারে, হরিদ্বারে অনেক নির্জন স্থান ছিল সেকালে, যেখানে এই সম্ভোগ-বিলাস চলতে পারত। তা কিন্তু হয়নি। যেহেতু নাগকন্যা উলূপীর ব্যবহারে আর্যজনোচিত মর্যাদাবোধ ছিল এবং যেহেতু তিনি অর্জুনকে পিতৃভবনে নিয়ে এসেছিলেন, তাতেও আরও বেশি করে বুঝি যে, ঐরাবতবংশীয় কৌরব্য নাগ স্বামীহীনা কন্যাটির অন্তর্যাতনা অনুভব করে তাঁকে অর্জুনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন অতিসংক্ষিপ্ত বৈবাহিক প্রথায়।

সিদ্ধান্তবাগীশ উলূপীর পরিচয়ে 'কন্যা' শব্দটির উপর খুব জোর দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, 'কন্যা' শব্দের অর্থ 'কুমারী', অতএব উলূপী বিবাহিত ছিলেন না এবং সেখানে বিধবাত্বের প্রশ্ন তো ওঠেই না। আমরা বলি— কোনও মেয়ে যখন বিবাহিত অবস্থাতে অথবা বিধবা অবস্থাতেও নিজের পিতৃপরিচয় দেয়, তখন সবসময়েই আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমুকের কন্যা, অমুকের বংশে জন্ম— এই চিরন্তন শব্দই প্রয়োগ করে। বাংলা ভাষা, সংস্কৃত ভাষা, সর্বত্রই তা একইরকম এবং মহাভারতেই তো এই উদাহরণ সহস্রবার আছে। দ্রৌপদীর মুখের তো শতবার— আমি মহারাজ দ্রুপদের কন্যা, পাণ্ডবদের কুলবধূ— এমন কথা বহুশ্রুত। তা ছাড়া মহাভারতের শব্দমন্ত্রের ওপরেই যদি এত জোর দিতে হয়, তা হলে বিবাহ-সিদ্ধির অন্যতম শব্দপ্রমাণ 'ভার্যা'-শব্দটি সিদ্ধান্তবাগীশ ভুলে গেলেন কী করে? মহাভারতের সেই অশ্বমেধ-পর্বে উলূপীকে অর্জুনের ভার্যা হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছে তাঁর অন্যতরা স্ত্রী চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে।

সবচেয়ে বড় কথা, উলূপীর যদি বিবাহিতা স্ত্রীর মর্যাদা না থাকত তা হলে অশ্বমেধের মতো প্রকট ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠানে তাঁকে নিমন্ত্রণ জানাতে পারতেন না অর্জুন। উলূপী অর্জুনভার্যা হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় আরও প্রমাণ হয় যে, ঐরাবত কৌরব্য তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন অর্জুনের সঙ্গে এবং তিনি তাঁর মেয়ের কষ্ট দেখেই তাঁর নামমাত্র পূর্ববিবাহের কথা নিজেও স্মরণ করেননি। অর্জুনকেও স্মরণ করাননি। বিশেষত মহাকাব্যের উদার-বিশাল পরিবেশে নামমাত্র বিবাহিতা কোনও বিধবার অর্জুনের সঙ্গে বিয়ে হল— এইসব স্মার্ত 'শুচিবাই' কোনও মানুষেরই ছিল না, অর্জুনের তো ছিলই না। থাকলে, সম্বন্ধে প্রায় ভগিনীপ্রতিম কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রার সঙ্গেও অর্জুনের বিয়ে হত না। এই বিয়ে নিয়েও ভট্ট কুমারিলের মতো খ্যাতকীর্তি মীমাংসক প্রশ্ন তুলেছেন এবং সমাধানও করেছেন একভাবে, কেননা বিবাহটা তো মিথ্যে নয়। সিদ্ধান্তবাগীশের মুশকিল হল— তর্কযুক্তি সাজাতে গিয়ে তিনি আর টাল রাখতে পারেননি। মহাভারতের অন্যত্র উলূপীর ভার্যাত্বের স্বীকৃতিতে অর্জুনের সঙ্গে তাঁর বিবাহও সিদ্ধ হয় এবং উলূপীর পূর্ববিবাহ মেনে নিলে বিধবা বিবাহের উদারতাও সিদ্ধ হয়। তা ছাড়া মহাভারতে তেমন ক্ষেত্রে বিধবা বিবাহের সমর্থন আছে। পতির অভাবে দেবর বিবাহ তো ছিলই। সিদ্ধান্তবাগীশ বাগর্থকৌতুকে মহাভারতীয় শ্লোকের অন্য পাঠ সমর্থন করলে কী হবে, ইরাবানের পরিচয় প্রসঙ্গে মহাভারতেই বলা হয়েছে— অর্জুন কোনও এক নাগরাজের বধূর গর্ভে এই পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, সেই নাগরাজ অবশ্যই গরুড় কর্তৃক হত উলূপীর স্বামী এবং সেই উলূপীর পুত্র ইরাবান। ইরাবান উলূপীর পুত্র হিসেবেই সর্বজনবিদিত। অতএব শুধুমাত্র স্মার্ত-কঠিন সংরক্ষণশীলতায় মহাভারতের উদার বৈবাহিক পরিবেশ কণ্টকিত করা ঠিক হবে না।

বড় খারাপ লাগে যখন দেখি— সিদ্ধান্তবাগীশ মহাভারতের স্বাভাবিক পাঠ ছেড়ে দিয়ে সেই পাঠভেদটি মেনে নিয়েছেন, যা কিনা মহাভারতের সার্বিক উদার পরিবেশের সঙ্গে মেলে না, দুটি-তিনটি শ্লোকের অর্থ একেবারে পুরোপুরি পালটে গেল শুদ্ধাচারী স্মার্তদের সমাজরক্ষার স্বাত্মারোপিত কুশলতায়। স্মার্তস্বার্থে পরিবর্তন করা হল দু'-দুটি ভীষণ প্রয়োজনীয় শব্দ। ভীষ্মপর্বে ইরাবানের পরিচয় বলা আছে— ইরাবান জন্মেছেন নাগরাজের পুত্রবধূর গর্ভে, তাঁর জন্ম দিয়েছেন অর্জুন— স্নুষায়াং নাগরাজস্য জাতঃ পার্থেন ধীমতা। এখানে 'স্নুষা' শব্দের অর্থ পুত্রবধূ এবং তাতে যেহেতু উলূপীর বিধবাত্ব প্রতিপন্ন হয়, অতএব সিদ্ধান্তবাগীশের বহুকাল পূর্বেই কোনও এক আচার-প্রবীণ পণ্ডিত আমাদের সমাজরক্ষায় কঠিন দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে পাঠ-পরিবর্তন করে বললেন— শব্দটা 'স্নুষা'

হবে না, ওটা হবে 'সুতা' অর্থাৎ নাগরাজের মেয়ে। তাতে আর বিধবাত্বের কথা আসে না, উলূপীরও না এবং ইনি অন্য কোনও নাগকন্যা হলেও আর অর্জুনের বিধবাবিবাহের কলঙ্ক লাগে না। সিদ্ধান্তবাগীশ স্মার্ত-কঠিন-শীতলতায় এই পাঠ মেনে নিলেন।

মহাভারতের দ্বিতীয় শ্লোকের টানা সরল অর্থ এইরকম— নাগরাজ ঐরাবত যখন দেখলেন যে, তাঁরই ঘরের মেয়ে, অথচ বিবাহিতা হওয়া সত্ত্বেও তার স্বামীকে গরুড় মেরে ফেলেছেন এবং মেয়েটির কোনও সন্তান নেই তখন তিনি মেয়েটিকে পরম স্নেহে অর্জুনের হাতেই তুলে দিয়েছেন— ঐরাবতেন সা দত্তা অনপত্যা মহাত্মনা। মহাভারতের কবি ঐরাবত নাগের মধ্যে পরম উদারতা দেখেছেন বলেই তাঁর বিশেষণে 'মহাত্মা' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন বলে মনে করি। এখানে দ্বিতীয় শ্লোকে ঐরাবত নাগের উল্লেখ থাকায় পূর্বশ্লোকের নাগরাজকে ঐরাবত বলেই মনে করেছেন প্রাচীন টীকাকার নীলকণ্ঠ এবং তাতে সিদ্ধান্তবাগীশের ভারী সুবিধে হয়েছে। তিনি বলেছেন— মহাভারতের আদিপর্বে অর্জুনের সঙ্গে সাক্ষাতে উলূপী নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন— আমি ঐরাবতকুলে জাত কৌরব্য নাগের মেয়ে। অতএব উলূপীর পক্ষে ঐরাবতকুলে জন্মে ঐরাবতেরই পুত্রবধূ হওয়া তো সম্ভব নয়, কারণ নাগদের বৈবাহিক সম্বন্ধেও আর্য-রীতিপদ্ধতি মানা হত।

আমাদের বক্তব্য— সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়! আপনি তো মহাভারতীয় টীকার বহু স্থানে নীলকণ্ঠের কথা না মেনে নিজের যুক্তি স্থাপন করেছেন। হঠাৎ এখানে নীলকণ্ঠের প্রতি এত শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছেন কেন? সে কি শুধুই পূর্বশ্লোকের নাগরাজকে ঐরাবতের একাত্মকতায় প্রতিষ্ঠা করে 'স্নুষার' বদলে 'সুতা' পাঠটিকে সমর্থন করার জন্য? মহাভারতের আদিপর্বে উলূপীর আত্মপরিচয় যদি সর্বথা মেনে নিই, তা হলে এটাই তো বলা ভাল যে, টীকাকার নীলকণ্ঠ এখানে পরিষ্কার ভুল করেছেন, যেমন অন্য জায়গাতেও এরকম দু'-একটি ভুল আছে যা সিদ্ধান্তবাগীশ সংশোধন করার চেষ্টা করেছেন। অতএব মহাভারতের শ্লোকার্থ সোজা সরলভাবে ধরলে তো কোনও স্মার্ত-যন্ত্রণাও থাকবে না। অর্থাৎ কিনা উলূপী কোনও এক নাগরাজের পুত্রবধূ তো বটেই, অল্পবয়সে স্বামী মারা যাবার পরে তাঁর মনোযন্ত্রণা বুঝেই তিনি (নাগরাজ) অর্জুনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়েছেন। এতেই তো মহাভারত শুদ্ধ থাকে, কিন্তু অশুদ্ধতার ভয় এমনই, নাকি মহাভারতে বিধবা-বিবাহ প্রতিষেধ করতে হবে বলে আরও একটি অকিঞ্চিৎকর স্মার্ত পাঠ মেনে নিলেন সিদ্ধান্তবাগীশ। মহাভারতে ছিল— সেই নাগকন্যা সকামভাবে অর্জুনের সঙ্গে মিলন প্রার্থনা করলে অর্জুন তাঁকে ভার্যা হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন— ভার্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ পার্থঃ কামবশানুগাম্। যেন কোনও রমণী সকামভাবে কোনও পুরুষের কাছে রতি-প্রার্থনা জানাতেই পারেন না— এটা ধরেই নিলেন সিদ্ধান্তবাগীশ। তার ওপরে সে যদি আবার কোনওভাবে অন্য এক মৃত-স্বামীর স্ত্রী হয়, তবে তাকে তো আর ভার্যা হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন না অর্জুন; তবে হ্যাঁ, তেমন হলে তার রতিলিপ্সুতায় সাড়া দিতে পারেন এবং ধর্মার্থে তার গর্ভে একটি পুত্রও দিতে পারেন— মানে, অন্যের ভার্যার গর্ভে কর্তব্য হিসেবে একটি পুত্রের জন্ম দিতে পারেন— কর্তব্যঃ সন্তানোৎপাদনার্থম্ ইত্যেবার্থঃ কর্তব্যঃ।

এখানে জানানো দরকার— প্রথমত 'ভার্যা' শব্দটিতেই সিদ্ধান্তবাগীশের আপত্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ 'ভার্যা' অর্থাৎ ভরণীয়তার দায়িত্ব নেবার মধ্যে একটা সামাজিক এবং স্মার্ত বৈধতা আছে, সেটা যেমন সামান্যা এক রতিযাচিনী রমণীর প্রার্থনায় পূরণ করাই যায় না, অতএব 'ভার্যা' শব্দটি বাদ দিতে হবে মহাভারতের উচিত পাঠ হিসেবে, ওটা করতে হবে—কার্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ পার্থঃ কামবশানুগাম্। মানে দাঁড়াবে যে রমণী কামবশতায় অর্জুনের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন অর্জুন 'কার্য' করার জন্য অর্থাৎ সম্ভোগ করার জন্য তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন, কেননা সিদ্ধান্তবাগীশ এমন অনুশাসন স্মরণ করতে পেরেছেন যাতে বলা হয়েছে— কোনও রমণী যদি তেমনভাবে রতিপ্রার্থনা করে তবে তার হাত ধরতে পারো অর্থাৎ সাড়া দিতে পারো— রামায়াং জাতকামায়াং প্রশস্তা হস্তাধারণা।

আমি খুব অবাক হয়ে যাই এ-সব কথায়। পাণ্ডব-তৃতীয় অর্জুনকে এক বিধবা রমণীর বৈবাহিকতা থেকে বাঁচানোর জন্য কী বিপরীত এই স্মার্ত অপচেষ্টা! সিদ্ধান্তবাগীশ মহাভারতের সেই বিশাল উদার সামাজিক বৈচিত্র্যের কথা একবার ভাবলেন না। ভাবলেন না— যিনি গাণ্ডীব ধারণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে শত শত্রুর জীবনসংশয় করতে পারেন, যিনি দ্রৌপদীর বরমাল্য লাভ করে বীরোচিত বৈরাগ্যে নিজের ভাইদের বৈবাহিক অধিকার দিতে পারেন, তিনি আরও অনেক কিছু করতে পারেন, যা বৃদ্ধ স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসন মেনে চলে না। সিদ্ধান্তবাগীশ বুঝলেন না— মহাভারতের অর্জুনের মতো এক বিরাট নায়কপুরুষ বাঁদিক ছেড়ে ডানদিকে গেলেই যেখানে সংবাদ হয়ে ওঠেন, তিনি উলূপী ভিন্ন অন্য এক নাগরমণীকে 'কার্য' করার জন্য গ্রহণ করলেও সেটা খবর হত মহাভারতে এবং তা হত সেই সময়েই যখন তিনি স্মার্ত-কার্যটি করেছেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মনে করেন— অর্জুনের সেই প্রথম বনবাসকালে উলূপীর সঙ্গে বিবাহের পরে পরেই আরও এক নাগ রমণীর সঙ্গে এই কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল, যার ফলে ইরাবানের জন্ম হয়— প্রথমবনবাসকালে নাগরাজকৌরব্যকন্যায়া উলূপ্যাঃ পরিণয়ানন্তরং তত্রাবস্থানাবসরে জ্ঞেয়ম্।

হায়! উলূপীর সঙ্গে বিবাহের পর পরই কোনও এক নির্জন অবসরে অর্জুনের জীবনে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, তিনি হতস্বামিকা এক রমণীর রতি-প্রার্থনা পূরণ করে তার গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করলেন, অথচ বিশাল-হৃদয় মহাভারতের কবির সর্বপ্রসারিণী দৃষ্টি থেকে সে-ঘটনা বাদ পড়ে রইল, এ অন্তত আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না, অন্তত এ জিনিস মহাভারতের বৃহত্ত্ব এবং ভারবত্তার নিরিখে ধোপে টেঁকে না। আসলে সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর পূর্বকল্পিত স্মৃতি চিন্তামণির ভাবনা মাথায় নিয়ে মহাভারতের বিচার করেছেন, ফলে একদিকে যেমন উলূপীর পাশে আরও এক অন্যতরা নাগরমণীর পরিকল্পনা তাঁকে প্রতিষ্ঠা করতে হচ্ছে স্মার্ত যুক্তিজাল বিস্তার করে, অন্যদিকে তাঁকে মহাভারতের উচিত পাঠ পরিত্যাগ করে এমন পাঠ গ্রহণ করতে হচ্ছে যেখানে ভারতের কৃষ্ণ-দ্বিতীয় নায়ক অর্জুন রীতিমতো এক অভব্যতায় প্রতিষ্ঠিত হন— যেন রতিলিপ্সু এক সকামা রমণীকে তিনি 'কার্য' করার জন্য গ্রহণ করেন, তাঁর দায়িত্ব নিয়ে 'ভার্যার্থ' তাঁকে গ্রহণ করেন না। আসলে সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর বিংশ-শতাব্দীর পৌরুষেয়তায় এটা ভাবতেই পারেন না যে, কোনও স্ত্রীলোক অল্পবয়সে বিধবা হবার পরেও তার শারীরিক আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে এবং সেই শতাব্দীর সংকোচেই তিনি এ-কথাও অনুমান করতে পারেন না যে, অর্জুনের মতো

বীর তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে তাঁকে মর্যাদাও দিতে পারেন। তা ছাড়া শুধু মর্যাদাটুকুই তো উলূপী চেয়েছেন, এর বেশি এক কণাও কিছু নয়। কেননা তাঁরও তো কিছু মর্যাদা আছে।

হ্যাঁ, একই সঙ্গে আমি এটাও বুঝি যে, উদারতা, মধ্যস্থতা এবং সংরক্ষণশীলতা সবই এক চলমান সমাজের অঙ্গ। সিদ্ধান্তবাগীশ পণ্ডিত মানুষ, তাঁর তর্কযুক্তি-বিতণ্ডার ছলও আগ্রহ ভরে দেখার মতো, কিন্তু শতাব্দীর সংকোচ তিনি হয়তো অতিক্রম করতে পারেননি। আমাদের বিশ্বাস— পূর্বে উলূপীর বিবাহ হয়েছিল সমানবর্ণ অন্য এক নাগ-পরিবারেই। তাঁর স্বামী শত্রুগোষ্ঠীর নেতার দ্বারা হত হওয়ায় তিনি যে পিতৃগৃহে বিধবার মনোযন্ত্রণা নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন, তাও হয়তো পরিবারের লোকজনের কাছে একেবারে অসহনীয় ছিল না; কিন্তু তিনি যে অন্য জাতি এবং ততোধিক ভিন্ন গোষ্ঠীর এক বীর নায়ককে বিবাহ করে ফেললেন এটা তাঁর পিতা-মাতা ছাড়া পরিবারের অন্য লোকজন মোটেই পছন্দ করেননি, বিশেষ উলূপীর শ্বশুরগৃহের লোকেরা। এ জিনিস আধুনিক সমাজেও আমরা দেখেছি। তথাকথিত নিম্নবর্ণের মেয়ে যদি উচ্চবর্ণের পুরুষকেও বিবাহ করে, তবে সেই মেয়ের বাপের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ি দু'পক্ষেই বাধা আসে। বাধা আসে আত্মীয়-পরিজনদের কাছ থেকে। ছেলের ঘরের উচ্চতা সেখানে জটিলতা এবং অকর্মণ্য দাম্ভিকের ঈর্ষা তৈরি করে। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরও জটিল। পূর্বে যে-বাড়িতে উলূপীর বিবাহ হয়েছিল তাঁরা যথেষ্ট কুলীন নাগগৌরবের অধিকারী এবং নিজেদের মর্যাদা সম্বন্ধে যথেষ্টই সচেতন।

উলূপীর স্বামী মারা যেতে তাঁর পুনর্বিবাহেও বুঝি তাঁর শ্বশুরঘরের আপত্তি ছিল না, কিন্তু উলূপী নাগবংশ ত্যাগ করে একেবারে পাণ্ডব অর্জুনকে কামনা করায় শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে তাঁর তিক্ততা বেড়েছে। হয়তো আরও বেড়েছে উলূপীর পিতা কৌরব্য নাগও এই বিবাহে সম্মতি দিয়েছেন বলে। অর্জুনের সঙ্গে বিবাহের ফলে উলূপীর পূর্ব-স্বামীর ঘরে যে বিদ্রোহ তৈরি হয়েছিল, তার খবরও আমরা পেয়েছি সেই ভীষ্মপর্বে— সেই যখন সঞ্জয় অর্জুন-পুত্র ইরাবানের পরিচয় দিচ্ছেন। সঞ্জয়ের বিজ্ঞপ্তি থেকে বোঝা যায় যে, উলূপীর পূর্বস্বামী হত হবার পরেও শ্বশুরবাড়িতে তাঁর স্থান অবিচল ছিল, কিন্তু অর্জুনের সঙ্গে বিবাহের পরেই তাঁর পূর্বস্বামীর ছোট ভাই অশ্বসেন উলূপীর ওপর অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হন। এই ক্ষিপ্ততা অবশ্যই অর্জুনের ওপর অশ্বসেনের রাগের পরিণতি এবং এই ক্ষিপ্ততা চরম আকার ধারণ করে উলূপীর গর্ভে ইরাবানের জন্মের পর— পিতৃব্যেণ পরিত্যক্তঃ পার্থদ্বেষাদ্‌ দুরাত্মনা। ইরাবানের পিতৃব্য অশ্বসেন উলূপী সহ তাঁর সন্তানের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন শুধুমাত্র অর্জুনের ওপর রাগ করে— পার্থদ্বেষাৎ— এবং হয়তো এই সময় থেকেই উলূপী তাঁর পিত্রালয়ে পাকাপাকিভাবে চলে আসেন। ইরাবান বড় হতে থাকেন মায়ের তত্ত্বাবধানে, মায়ের পিতার ভবনে— স নাগলোকে সংবৃদ্ধো মাত্রা চ পরিরক্ষিতঃ।

উলূপীর ক্ষেত্রে সব ধর্মযুক্তিও বুঝি সবিশেষ খাটে না। এই যে উলূপীর রতি-প্রার্থনা, অর্জুনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ, আবার সেই বিবাহে তাঁর শ্বশুরকুলের ক্রোধ— এই সব কিছু আমাদের অন্যতর এক বিশ্লেষণের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। বিশেষত শ্বশুরকুলে ইরাবানের পিতৃব্য অশ্বসেনের ক্রোধ। কেন, কেন এই অশান্তি, কেন এই ক্রোধ, মহাভারতে তো এরকম ঘটনা অনেক ঘটেছে, যেখানে স্বামী মারা যাবার পর সেই বিধবা রমণীর গর্ভে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুত্র জন্ম হয়েছে নিয়োগ-প্রথার মাধ্যমে, সেখানে কোনও জায়গায় তো কোনও রকম ক্রোধের আবেশ দেখিনি, তবে এখানে ইরাবানের পিতৃব্য অশ্বসেনের অথবা আরও স্পষ্ট করে বলি, উলূপীর দেবর অশ্বসেনের এই ক্রোধাবেশ কেন এবং কেনই বা তাঁকে সেই গৃহ ছেড়ে বাপের বাড়িতে চলে আসতে হল। এইখানে আমাদের কিছু ভাবনা থেকেই যায়।

আমাদের বিশেষ ধারণা— সুপর্ণ গরুড় কর্তৃক নিহত হবার পর উলূপী তাঁর শ্বশুরবাড়িতেই অবস্থান করছিলেন, অশ্বসেন তাঁকে সপুত্রক তাড়িয়ে দিয়েছেন বলেই উলটোদিকে উলূপীর শ্বশুরগৃহে অবস্থানের ঘটনাই সপ্রমাণ হয়। সেখানে নিঃসন্তান বিধবার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করার জন্য যে নিয়োগ প্রথা চলত, তার উদ্যোগ নেওয়া হত শ্বশুরবাড়ি থেকেই। তার প্রমাণ মহাভারতেই ভূরিভূরি আছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই এই পুত্র উৎপাদনে প্রথম কল্প ছিলেন ভাশুর, দেওর— এরাই, অভাবে বাইরের কোনও উপযুক্ত মানুষ। উলূপীর ক্ষেত্রেও এই কল্প সিদ্ধ ছিল, কারণ তাঁর স্বামী নাগরাজ— তিনি যেই হোন— তিনি নিহত হবার পর দেবর অশ্বসেনই ছিলেন নিয়োগের উপযুক্ততম পাত্র এবং তাঁর বাড়ির গুরুজনেরা এই নিয়োগে আপত্তি করতেন বলে মনে হয় না। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক— শ্বশুরবাড়ির নাগ পুরুষদের তেমন করে পছন্দ করতে পারেননি উলূপী। অথবা সে-বাড়িতে নিয়োগ প্রথার আয়োজনের আগেই উলূপী পছন্দ করে ফেলেছেন অর্জুনকে। গঙ্গাদ্বারে স্নানরত অর্জুনকে দেখে প্রায়-সম্ভাবিত নাগ-দেবর অশ্বসেনের নিয়োগ-সান্নিধ্য তিনি পছন্দ করতে পারেননি। কারণ অর্জুন, গাণ্ডীবধন্বা অর্জুন, তাঁর এমন বিরহবিধুর বনবাসক্লিষ্ট, শান্ত কঠিন চেহারা দেখে উলূপী মনে মনে ভরসা পেয়েছেন। তাঁকে সদ্য-বিধবার যৌবনোদ্ভেদী প্রেম নিবেদন করতে দেরি হয়নি উলূপীর। তিনি জানেন— অর্জুন তাঁর জীবনে ক্ষণিকের উৎসব, ক্ষণিকের অতিথি, তবুও পাণ্ডব-তৃতীয় অর্জুনের স্ত্রী হবার ইচ্ছা তাঁর সমস্ত অন্তঃকরণ জুড়ে ছিল। অতএব শুধুমাত্র অর্জুনের আসঙ্গ-লিপ্সায় তাঁর অন্তঃকরণ শান্ত হয়নি, তিনি তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছেন।

যে যৌবনবতী রমণীর সরল-দুর্বল তর্কযুক্তিতে অর্জুনের মতো নায়ক-পুরুষ দ্রৌপদীর মতো বিদগ্ধা রমণীর কথা মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পেরেছিলেন, সেই রমণীর ওপর নাগ-দেবর অশ্বসেনের নজর ছিল নিশ্চয়। নিশ্চয় তিনি ভেবেই রেখেছিলেন যে, নিয়োগ-প্রথায় বা অন্য কোনও উপায়ে তাঁরই সুযোগ আসবে একদিন, একদিন তিনিই অধিকারী হবেন উলূপীর। কিন্তু ভ্রাতৃবধূর স্বাধিকার-ভাবনাতে সেই সুযোগ যখন নষ্ট হয়ে গেল, তখন যে তিনি ক্রুদ্ধ হবেন, এটাই বোধ হয় স্বাভাবিক— কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে। অন্যদিকে মেয়েরা তাদের ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের অনুভূতিতে, তৃতীয় নয়ন দিয়েই বুঝতে পারেন যে, তাঁর উপর কার কেমন নজর। উলূপী কি বোঝেননি অশ্বসেনের তাড়না! বুঝেছেন বলেই অর্জুনকে নিয়ে তিনি সোজা চলে এসেছেন বাপের বাড়িতে কৌরব্য নাগের ভবনে, যেখানে পিতার কাছে তিনি নিজের বিধবাত্বের যন্ত্রণা বোঝাতে পারেন, বোঝাতে পারেন আপন স্বতন্ত্র ইচ্ছার পরিকল্পনাটুকুও।

ভীষ্মপর্বে পাচ্ছি— ঐরাবত তাঁকে নিশ্চিন্তে তুলে দিয়েছেন অর্জুনের হাতে। আবারও বলি— নীলকণ্ঠের টীকায় বিভ্রান্ত হবেন না। বিভ্রান্ত হবেন না সিদ্ধান্তবাগীশের যুক্তিতে।

ভাববেন না যে, ঐরাবত নাগ, কৌরব্য নাগের থেকে ভিন্ন কোনও ব্যক্তিত্ব, কেননা অর্জুনের কাছে উলূপীর মুখে প্রথম পরিচয়টুকুই এখানে সবচেয়ে বেশি গ্রাহ্য হওয়া উচিত। উলূপী বলেছিলেন— ঐরাবতকুলে কৌরব্য নাগের মেয়ে আমি। অন্তত এই সুস্পষ্ট পরিচয়পত্র থেকেই বোঝা যায় যে, ভীষ্মপর্বে উল্লিখিত 'ঐরাবত' বলতে তাঁর বংশজাত কৌরব্য নাগকেই বোঝানো হচ্ছে। মহাভারতের আস্তীক-পর্বে বিভিন্ন সর্পনাম-কথনের সময় যদিও ঐরাবতবংশীয় নাগ এবং কৌরব্যবংশীয় নাগদের পৃথক নাম কীর্তিত হয়েছে কিন্তু তবুও তাতে ঐরাবত এবং কৌরব্য পৃথকবংশীয়, এমন ভাবার কারণ নেই, বিশেষত ঐরাবতের পরেই কৌরব্য-নাগের বংশকথন করেছেন মহাভারতের কবি। আর বংশনাম কীর্তনের সময় একই বংশের দুই পৃথক ব্যক্তিত্বের নাম পৃথক উচ্চারণ করে তাঁদের পুত্র-পৌত্রের নাম পৃথকভাবে উল্লেখ করাটাও মহাভারতের একান্ত শৈলীর অন্তর্গত। অতএব এ-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই যে, ঐরাবত কৌরব্য, উলূপীকে অর্জুনের হাতেই তুলে দিয়েছিলেন বৈবাহিকতার বিধি অনুসারেই, আর তাতেই তার দেবর অশ্বসেন উলূপীকে আর শ্বশুরকুলে তিষ্ঠোতে দেননি। এই বিয়েতে অর্জুনের ওপর তার এমনই রাগ হল যে, উলূপীকে তিনি আর পূর্বস্বামীর ঘরে প্রবেশ করতে দেননি। তার পর ইরাবান উলূপীর গর্ভে জন্মানোর পর তাঁর পিতৃব্য অশ্বসেনের ক্রোধ আরও বেড়েছে। নিয়োগজাত যে সন্তানের শ্বশুরকুলেই মানুষ হবার কথা, পিতৃব্যের ক্রোধে তাঁকেই মানুষ হতে হয়েছে উলূপীর পিতৃগৃহে কৌরব্য-নাগের ভবনে।

উলূপী এবং তাঁর পুত্রের জীবনে যে এতরকম ঘটনা ঘটে গেল, অর্জুন বুঝি তার কোনও খবরই রাখতেন না, উলূপী অবশ্য তেমন কোনও দাবিও করেননি অর্জুনের কাছে। তিনি যথেষ্ট কঠিন প্রকৃতির রমণী। রমণী হয়েও অর্জুনের কাছে তিনি স্বয়ং রতি-প্রার্থনা করেছিলেন এবং প্রার্থনা পূরণ হতেই একরাত্রির সহবাসের পর তিনি নিজে তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিলেন স্বস্থানে। স্মার্তেরা বলেন— বিবাহের গৌণ ফল হল রতি, মুখ্য ফল সন্তান, পুত্র-কন্যা। মহাভারত-রামায়ণে রমণীর মুখে রতিপ্রার্থনায় বহুত্র এমন দেখেছি— রমণী পুত্রলাভের মুখ্যতাতেই প্রায় অপরিচিত পুরুষের কাছেও কাম-যাচনা করেছে এবং এমন অবস্থায় পুরুষের দিক থেকে রমণীর প্রার্থনা পূরণ করার শাস্ত্রবিধি ছিল, কেননা সেখানে রমণীর পুত্রলাভ ঘটছে। এই ধরনের শাস্ত্রীয় অনুমোদনের সঙ্গে হয়তো তখনকার সামাজিক প্রয়োজনও জড়িত ছিল। হয়তো আর্যায়ণের প্রথম কল্পে যুদ্ধের প্রয়োজনে বীর-পুত্রের প্রয়োজন জড়িয়ে গিয়েছিল পুত্র-প্রার্থনার সঙ্গে। কিন্তু উলূপীকে আমরা অন্যতরা এক অন্য ধাতুর মহিলা হিসেবে পেয়েছি। তিনি এতটাই সপ্রতিভভাবে প্রগলভা এবং 'স্মার্ট' যে, যৌবনের যৌবনোচিত ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে স্মার্ত বিধির তাড়নায় পুত্রলাভের সংকেতে পরিণত করেননি অথবা বলা উচিত— তাঁর হৃদয়ে উপস্থিত সেই মুহূর্তোচিত মুখ্যবস্তুকে গৌণভাবে উপস্থিত করেননি। এতটাই তাঁর ক্ষমতা যে, তিনিই প্রথম অর্জুনের দ্বাদশবার্ষিক ব্রহ্মচর্যের ব্রত বুভুক্ষু তাড়নার ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন; যুক্তি স্থাপন করেছেন নিজের পক্ষে, দ্রৌপদীকে ছোট না করেও। উপরন্তু একরাত্রের মধ্যে যে ক্ষণিক বিবাহ এবং ইচ্ছাপূরণ দুই-ই হল— তারপরে তিনি অর্জুনকে কোনও বন্ধনে আবদ্ধ রাখেননি। অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিজের গর্ভজাত সন্তানকে তিনি নিজে মানুষ করেছেন এবং পুত্র যৌবনপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উলূপী তাঁকে অর্জুনের কাছে পাঠিয়েছেন পিতার প্রয়োজনে সিদ্ধ করার জন্য।

পাণ্ডবরা তখন যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলার শাস্তিতে বনবাসে। অর্জুন দৈব অস্ত্র লাভ করার জন্য প্রতিস্মৃতি বিদ্যা শিখে তপস্যা করতে গেছেন। ভগবান শিবের কাছে পাশুপত অস্ত্র লাভের পর তিনি দেবলোকে ইন্দ্রের কাছে পৌঁছেছেন নতুন অস্ত্রসিদ্ধির জন্য। ঠিক এই সময়ে উলূপীর গর্ভজাত ইরাবান পাণ্ডবদের অরণ্য আবাসে পিতা অর্জুনের সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং দেখা না পেয়ে একসময় দেবলোকেই পৌঁছে যান পিতাকে দেখবার জন্য— ইন্দ্রলোকং জগামাশু শ্রুত্বা তত্রার্জুনং গতম্। অর্জুনকে দেখার পর ইরাবান ধীরভাবে নিজের পুত্র-পরিচয় দিয়ে মায়ের সঙ্গে কীভাবে অর্জুনের দেখা হয়েছিল, সেই ঘটনা জানান নিজের সত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য— মাতুঃ সমাগমো যশ্চ তৎ সর্বং প্রত্যবেদয়ৎ। উলূপীর সমস্ত দৃঢ়তা ইরাবানের মধ্যে এতটাই ছিল যে, তিনি একবারও নিজের জন্য অথবা তাঁর মায়ের জন্য কোনও দয়া অর্জুনের কাছে যাচনা করেননি অথবা একবারের জন্যও জানাননি যে, মায়ের পূর্বস্বামীর ভ্রাতা, তাঁর পিতৃব্য অশ্বসেন কীভাবে তাঁদের জীবন ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন। অর্জুনের সঙ্গে দেখা হতে ধীর গম্ভীর বিনয়ে তিনি বলেছেন— আমি ইরাবান। আমি আপনার পুত্র— ইরাবানস্মি ভদ্রং তে পুত্রশ্চাহং তব প্রভো— আমার মায়ের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল গঙ্গাদ্বারে।

ইরাবানকে বেশি কথা বলতে হয়নি। অর্জুনের সব মনে পড়ে গেছে— উলূপীর কথা, গঙ্গাদ্বার থেকে নাগলোকে গিয়ে সেই উচ্ছল রাত্রিযাপনের কথা এবং অবশ্যই উলূপীর মর্যাদাপূর্ণ আচরণ, তাঁকে গঙ্গাদ্বারের আশ্রমে ফিরিয়ে দেওয়া পর্যন্ত— তচ্চ সর্বং যথাবৃত্তম্ অনুসস্মার পাণ্ডবঃ। অর্জুন সানন্দপুলকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরেছেন পুত্র ইরাবানকে এবং পুত্র বলে তাঁকে স্বীকার করে নিতে এতটুকুও বিলম্ব করেননি। বীর পুত্রকে দেখে অর্জুনের অন্য কথাও মনে হল। অর্জুন দিব্যাস্ত্র লাভের আশায় ইন্দ্রলোকে গেছেন, তখন তাঁর মন জুড়ে আছে ভবিষ্যতের সেই বিরাট যুদ্ধ। সে-যুদ্ধ যে হবেই সে-কথা তিনি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন আর ক্ষত্রিয়ের কাছে এই ধর্মযুদ্ধের মূল্য অনুভব করেই তিনি বীর পুত্র ইরাবানকে সম্বোধন করে বললেন— বাছা! কৌরবদের সঙ্গে যখন আমাদের যুদ্ধ উপস্থিত হবে, তখন তুমি আমাদের সাহায্য করবে— যুদ্ধকালে ত্বয়াস্মাকং সাহ্যং দেয়মিতি প্রভো।

উলূপীর এই পুত্রটির ঘোড়ার শখ ছিল বোঝা যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে তিনি পিতা অর্জুনকে সাহায্য করতে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন, সেখানে তাঁর সমস্ত বীরশোভার মধ্যে অনেকটাই জুড়ে আছে ঘোড়া। কম্বোজ, আরট্ট, যেসব দেশে ভাল ঘোড়া পাওয়া যায়, সেইসব বিভিন্ন প্রকার ঘোড়া ইরাবানের চারদিকে জুড়ে রয়েছে— বাজিনাং বহুভিঃ সংখ্যে সমন্তাৎ পরিবারয়ন্। ইরাবান তাঁর সাধ্যমতো যুদ্ধ করে সাহায্য করেছেন অর্জুনকে, কুচক্রী শকুনির কতগুলি ভাইকে তিনি মেরেও ফেলেছেন বীরোচিতভাবে। কিন্তু এই শত্রু-নিধনের ফল তাঁকে পেতে হয়েছে নিজের মৃত্যু দিয়ে। দুর্যোধন আর্যশৃঙ্গি নামে এক রাক্ষসকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন ইরাবানকে ধ্বংস করার জন্যে। আর্যশৃঙ্গি বোধ হয় অলম্বুষ

নামে বিখ্যাত ছিলেন, তাঁর বাণে শেষ পর্যন্ত ইরাবানের মুকুটশোভী মস্তকটি লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। ইরাবান মারা গেলেন।

পুত্র ইরাবানের মৃত্যুতে নাগিনী-মায়ের কতটা কষ্ট হয়েছিল, মহাভারতের কবি তার কোনও সংবাদ দেননি, এমনকী যুদ্ধক্ষেত্রে এসে অর্জুনের এই প্রবাসী পুত্র এমনই এক অনাড়ম্বর মৃত্যুবরণ করলেন যে, কুরুক্ষেত্রের অন্যত্র যুদ্ধরত অর্জুনের কাছেও সে-খবর ভাল করে পৌঁছল না। মহাভারতের কবিকে দোষ দিই না। তিনি বড় ব্যস্ত মানুষ। মহাকাব্যের যত মহানায়িকা আছেন— দ্রৌপদী, কুন্তী, গান্ধারী— তাঁদের জীবনে এত সমস্যা, এত জটিলতা, তাঁদের ফেলে রেখে অর্জুনের প্রথম বনবাস-বিলাসের এক সামান্য নাগিনী নায়িকা উলূপীকে নিয়ে তার জীবনবিস্তার দেখানোর সময় নেই মহাভারতের কবির, হয়তো উপায়ও নেই, প্রাসঙ্গিকতাও নেই।

সত্যি, আমরা বহুকাল উলূপীর কোনও সংবাদ পাইনি। ভীষ্মপর্বে একবার মাত্র তাঁর পুত্রের দেখা পেলাম, তো সেখানে ইরাবানকে উলূপীর পুত্র হিসেবে প্রমাণ করার জন্যই আমাদের কত মেহনত করতে হল, তো উলূপীর মনের খবর পাব কোথায়! তবে মহাভারতের কবির ভাবভঙ্গি থেকে বুঝতে পারি যে উলূপী সেই সন্তুষ্ট এবং আত্মতৃপ্ত মহিলাদের একজন, যাঁরা অকারণে প্রেমাস্পদের আশঙ্কা তৈরি করেন না। অর্জুনের স্ত্রীর তকমা লাভ করেই উলূপী পরম তৃপ্তিতে জীবন অতিবাহিত করেছেন, তবে হ্যাঁ, এটা স্বীকার করতেই হবে যে, অর্জুনের জন্য, অথবা বলা উচিত, অর্জুনের জীবন এবং আয়ুর জন্য উলূপীর সবিশেষ ভাবনা ছিল। এ সম্বন্ধে রীতিমতো একটা গল্প আছে মহাভারতে, আর গল্পের এই জায়গায় উলূপী ভীষণভাবে জড়িয়ে গেছেন অর্জুনের আর-এক বনবাসকালীন সহচরী চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে। এটা অবশ্য ভেবে নিতে এমন কোনও কষ্ট নেই যে, প্রথম বনবাসে উলূপীর তর্ক-যুক্তি এবং সহবাসে অর্জুনের দুর্বল ব্রহ্মচর্যের যুক্তি ধুলোয় মিশে যাবার পরই তো চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে অর্জুনের দেখা হয়েছিল, অতএব উলূপীর সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার কিছু যোগাযোগ থাকাটা এমন কিছু আশ্চর্য নয়। বিশেষত পরবর্তী জীবনে এই দুই স্ত্রীর সঙ্গেই অর্জুনের কোনও পরিষ্কার যোগাযোগ ছিল না, অতএব যোগাযোগটা দুই সপত্নীর মধ্যে গড়ে ওঠাটা কিছু অসম্ভব ছিল না।

আসলে অর্জুনের স্ত্রী হিসেবে উলূপী এবং চিত্রাঙ্গদার মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত মিল আছে। দু'জনের সঙ্গেই অর্জুনের বিবাহ হয়েছে, কিন্তু দু'জনের কেউই অর্জুনের বধূবেশে হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে প্রবেশ করতে চাননি। অর্থাৎ কেউই অর্জুনকে আপন অঞ্চল ছায়ায় ধরে রাখতে চাননি, অবশ্য রাখতে চাইলেও অর্জুন থাকতেন না হয়তো। তবে সেটা অন্য কথা। উলূপী এতটাই বন্ধনমুক্ত যে, একবারমাত্র অর্জুনের মিলন-কামনা করেই ক্ষান্ত হয়েছেন তিনি, কেননা এই মিলনের ব্যাপারে তাঁরই আগ্রহ ছিল বেশি, অর্জুনের দিক থেকে এটা ইচ্ছাপূরণ করার চেয়ে বেশি কিছু না। অন্যদিকে চিত্রাঙ্গদাকে দেখে অর্জুনই মুগ্ধ হয়েছিলেন কিন্তু তিনি যে বাপের বাড়ি ছেড়ে যাবেন না, সেটা তাঁর মিলনের পূর্বশর্ত ছিল। কাজেই উলূপী বা চিত্রাঙ্গদা— এই দুই জায়গাতেই প্রেমের বাঁধন ছিল আলগা, এই দুই স্ত্রীই অর্জুনের স্ত্রী-র মর্যাদা লাভ করে এবং অর্জুনের মধ্যে আপন আপন পুত্রদের পিতৃত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দর্শন করেই খুশি ছিলেন। হয়তো এই মিলের সূত্রটাই উলূপী এবং চিত্রাঙ্গদার মধ্যে একটা যোগসূত্র বজায় রেখেছিল।

উলূপীর কথায় চিত্রাঙ্গদার প্রসঙ্গ এসে গেল এবং চিত্রাঙ্গদাকে অতিক্রম করে যাবার উপায় নেই বলেই, তাঁর বৈবাহিক ঘটনাটাও বলে নিতে চাই। চিত্রাঙ্গদা আমাদের কাছে বিখ্যাত হয়ে আছেন মহাকবি রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত অনুপানগুলির জন্য। চিত্রাঙ্গদা যে পুরুষের বিদ্যায় দীক্ষিত হয়ে প্রচুরতর পৌরুষেয় আচরণ করেছেন— এমন কোনও সংবাদ মহাভারতে নেই। তবে বাংলার কবি মহাভারত থেকে যে সংকেতটুকু পেয়েছেন, তা এইটুকুই যে চিত্রাঙ্গদার পিতা চিত্রবাহন মেয়েকে মানুষ করেছেন পুত্রের কল্পনায়; অর্থাৎ বিবাহের পরেও তিনি তাঁকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবেন না এবং কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মাবে, তাঁর মাধ্যমেই তিনি পিণ্ডলাভের আশা করেছেন। কিন্তু এছাড়া চিত্রাঙ্গদার মধ্যে আর কোনও পুরুষালি ব্যাপার ছিল না, কিংবা কোনওদিন তাঁকে আপন কটাক্ষে পঞ্চম শর যোজনার জন্য পঞ্চশরের তপস্যাতেও বসতে হয়নি।

বস্তুত সেই পঞ্চম শরের সিদ্ধিটুকু তাঁর মধ্যে এতটাই ঠিল যে, অর্জুন মণিপুর রাজকুমারীকে দেখা মাত্রই মোহিত হয়েছিলেন। ঘটনাটা এইরকম— অর্জুনের সঙ্গে উলূপীর যখন দেখা হয়, তখনও তিনি উত্তর ভারতেই ছিলেন। উলূপীর জীবন সার্থক করে অর্জুন পূর্বভারতে আসেন তীর্থভ্রমণ করতে। সেখানে গয়া-গঙ্গা-গঙ্গাধর, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ অতিক্রম করে অর্জুন অনেকটাই ঢুকে পড়েন দক্ষিণ ভারতে, তার পর আসেন দক্ষিণ-পশ্চিম। চিত্রাঙ্গদার আবাস যে মণিপুর তা এই দক্ষিণ-পশ্চিমের ভারতবর্ষে। মণিপুরের রাজধানীতে ঢোকার সময় অর্জুনের সঙ্গে সহায়ক মানুষজন বেশ কম ছিল। ফলে অর্জুন কিন্তু স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা ভোগ করছিলেন। মণিপুরে প্রবেশ করে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করতেই হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদাকে। পিতা তাঁকে পুত্রবৎ লালন করায় রমণীসুলভ কোনও সংকোচ বা জড়তা তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি নির্দ্বিধায় মণিপুরের রাস্তায় রাস্তায় বিচরণ করে বেড়াচ্ছিলেন যানে, বাহনে অথবা স্বতন্ত্র পদচারণায়— তাং দদর্শ পুরে তস্মিন্ বিচরন্তীং যদৃচ্ছয়া।

রমণীর এই দৃপ্ত উচ্ছল রূপ অর্জুন যেন পূর্বে দেখেননি। পথচারী মানুষজনকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন— ইনি মণিপুরেশ্বর চিত্রবাহনের মেয়ে— চিত্রাঙ্গদা চৈত্রবাহনী। মহাভারতের কবি যে সমাজচিত্র এঁকেছেন, তাতে অর্জুনের মতো এক পুরুষ যদি এমন এক রমণীকে দৃষ্টিমাত্রেই কামনা করে থাকেন, অর্জুন তাই করেছেন বস্তুত— দৃষ্ট্বা চ তাং বরারোহাং চকমে চৈত্রবাহনীম্— তা হলে সেই মুহূর্তেই সেই প্রণয়সংবাদ চিত্রাঙ্গদাকে সোজা জানানোর কথা অর্জুনের। কিন্তু তিনি বোধ হয় তা পারেননি, পারলে সে কথোপকথন মহাভারতে ধরা থাকত। পারেননি যে, তার কারণ বুঝি চিত্রাঙ্গদার ব্যক্তিত্ব এবং দৃপ্ততা— চিত্রাঙ্গদার চলন-বলন দেখে নিশ্চয়ই এমন মনে হয়ে থাকবে অর্জুনের যে, এই রমণী যদি কোনওভাবে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে।

চিত্রাঙ্গদাকে দেখে যে অর্জুনের ধৈর্য এবং বনবাসকালীন প্রতিজ্ঞাত ব্রহ্মচর্যের বাঁধ ভেঙে গেল, তার পিছনে অবশ্যই বাধাবন্ধহীন উলূপীর সেই অতীত-যুক্তি। তিনিই তো প্রথম

অর্জুনকে বুঝিয়েছিলেন— দেখো, তোমার যত ব্রহ্মচর্য সেটা দ্রৌপদীর ব্যাপারেই প্রযোজ্য, আমার ক্ষেত্রে নয়— তদিদং দ্রৌপদীহেতোরন্যোন্যস্য প্রবাসনম্। উলূপীর এই যুক্তি বুঝি চরম সার্থকতায় ধরা দিল ভেজা মহুয়াফুলের মতো মধুরবর্ণ চিত্রাঙ্গদাকে দেখে— যৈষা সবর্ণাদ্রমধুকপুষ্পৈঃ— অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে কিচ্ছু বললেন না, সোজা চলে গেলেন রাজা চিত্রবাহনের কাছে। সবিনয়ে তিনি তাঁর কন্যাটির পাণিগ্রহণের প্রার্থনা জানালেন। অর্জুন এটা বুঝেছিলেন যে, তাঁর পিতৃ-মাতৃ-কুলের প্রতিষ্ঠা এবং নিজের প্রতিষ্ঠা— দুটোই কাজ করবে রাজা চিত্রবাহনের কাছে, কিন্তু চৈত্রবাহনী চিত্রাঙ্গদা এসব নাও বুঝতে পারেন।

ঠিক তাই। চিত্রবাহন প্রত্যাশিতভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন— কী নাম তোমার, কার ছেলে তুমি— কস্য পুত্রোহসি নাম কিম্। অর্জুন উত্তর দিলেন— আমি পাণ্ডব অর্জুন, কুন্তীর গর্ভজাত। চিত্রবাহন দ্বিতীয় প্রশ্ন না করে তাঁর সমস্যার কথা জানিয়েছেন। বলেছেন— আমার পূর্বপুরুষ প্রভঞ্জন রাজা পুত্রকামনায় তপস্যা করেছিলেন, তপস্তুষ্ট মহাদেব তাঁকে বর দিয়েছিলেন— আমাদের বংশে প্রত্যেকেরই একটি করে সন্তান হবে— স তস্মৈ ভগবান্ প্রাদাদ্ একৈকং প্রসবং কুলে। সে সন্তান ছেলে হবে কী মেয়ে হবে, তার কোনও নির্দিষ্টতা নেই। তবে এমনই কপাল যে, আমার পূর্বপুরুষদের সবারই একটি করে ছেলেই হয়েছে, কিন্তু আমারই সন্তান একটি মেয়ে, অবশ্য মেয়ে বলে তাকে আমি এতটুকু অহবেলা করিনি, আমার সমস্ত ভাবনাতে সে আমার পুত্রের মতোই মানুষ হয়েছে, পেয়েছে পুত্রের সমান মর্যাদা— পুত্রো মমায়ম্ ইতি মে ভাবনা পুরুষর্ষভ।

চিত্রবাহনের এই একটি কথার সংকেতেই কবিগুরুর কবিচিত্ত নতুন সৃষ্টির রহস্য খুঁজে পেয়েছে, লিখিত হয়েছে 'চিত্রাঙ্গদা' গীতিনাট্য নতুন আলোক-সংগীতে। চিত্রবাহন মেয়ে চিত্রাঙ্গদাকে ছেলের মতো করে মানুষ করেছেন এবং অর্জুনের কাছে শর্ত রেখেছেন একটাই— মেয়েকে তিনি বাপের বাড়ি ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি যেতে দেবেন না। অবশ্য এ কথা তিনি স্পষ্ট করে সকণ্ঠে অর্জুনের মতো বীরের সামনে উচ্চারণ করেননি। কিন্তু তাঁর কথার মানে তাই দাঁড়ায়। চিত্রবাহন বলেছেন— আমার এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মাবে, বিধিমতে সেই আমার পিণ্ডদাতা পুত্রের কাজ করবে এবং সে-ই এই মণিপুর রাজ্যের রাজা হবে ভবিষ্যতে— এটাই আমার শর্ত— এতৎ শুল্কং ভবত্বস্যাঃ কুলকৃজ্জায়তামিহ। তুমি যদি এই শর্ত মেনে নাও অর্জুন, তবেই চিত্রাঙ্গদা তোমার।

চিত্রাঙ্গদার রূপমুগ্ধ অর্জুন উলূপীর পূর্ব-তর্কমাহাত্ম্যে স্বেচ্ছায় ব্রহ্মচর্যের ব্রত স্খলন করে মেনে নিয়েছেন চিত্রবাহনের শর্ত। বিবাহ করেছেন চিত্রাঙ্গদাকে এবং শুধু তাই নয়, বারো বছর বনবাসের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ সময়, তিন-তিনটে বছর অর্জুন মণিপুরের রাজভবনেই কাটিয়ে দিয়েছেন চিত্রাঙ্গদার সাহচর্যে— উবাস নগরে তস্মিন্ তিস্রঃ কুন্তীসুতঃ সমাঃ। তিন বছর শেষ হবার আগেই চিত্রাঙ্গদার গর্ভে পুত্র হল অর্জুনের। অর্জুন আর মণিপুরে অবস্থান করলেন না। তিনি বেশ বুঝলেন যে, উলূপীর যুক্তিটুকু তাঁর ক্ষেত্রে বেশি প্রয়োগ না করে অন্য ক্ষেত্রে বেশি প্রয়োগ করে ফেলেছেন। এবার পুনরায় কিছু ব্রত-আচরণ প্রয়োজন, নইলে গাণ্ডীবধন্বা অর্জুন তিন বছর বসে বসে শ্বশুরবাড়ির অন্ন ধ্বংস করে চিত্রাঙ্গদার মতো আর্দ্র মধুকপুষ্পের মধুকর হয়ে রইলেন, এটা তেমন মানায় না। অবশ্য তাঁর ওপরে শর্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল— পুত্রমুখ না দেখিয়ে মণিপুর ছেড়ে যেতে পারবেন না তিনি। অতএব চিত্রাঙ্গদার গর্ভে তাঁর ভবিষ্যতের কোল-আলো-করা ছেলের সম্ভাবনা হলে চিত্রাঙ্গদাকে আলিঙ্গন করে অর্জুন পুনরায় চলে গেলেন তীর্থযাত্রায়— তস্যা সুতে সমুৎপন্নে পরিষ্বজ্য বরাঙ্গনাম্।

অবশ্য বেশি তীর্থ এবার ভ্রমণ করা হল না। কেননা, অর্জুন জানেন যে, চিত্রাঙ্গদার গর্ভ-সম্ভাবনা হয়েছে এবং এতদিনে তাঁর কোলে পুত্রটিকে দেখতে পাবেন তিনি। অতএব তীর্থভ্রমণে দশ-বারো মাস কাটিয়ে দিয়ে আবারও অর্জুন ফিরে এলেন মণিপুরে চিত্রাঙ্গদার কাছে। দেখলেন তাঁর পুত্রের নাম হয়েছে বভ্রুবাহন। নাতির নামটা নিশ্চয়ই মণিপুররাজ চিত্রবাহনেরও দেওয়া— 'বাহন' শব্দটি তাঁরই বংশের স্মরণিকা হয়তো, আর অর্জুন যেহেতু কালো রঙের মানুষ ছিলেন, তাই তাঁর পুত্রের গায়ের রংও হয়তো খানিকটা চাপা ছিল। 'বভ্রু' শব্দের অর্থ পাঁশুটে-তামাটে রং। যাই হোক অর্জুন কথা রেখেছেন— শ্বশুর চিত্রবাহনের হাতে নিজের পুত্র বভ্রুবাহনকে তুলে দিয়ে অর্জুন বলেছেন— চিত্রাঙ্গদার অধিকারী হবার জন্য আপনি যে মূল্য চেয়েছিলেন, এই নিন সেই মূল্য। আমার পুত্র বভ্রুবাহন আপনার বংশের পুত্র হিসেবেই এখানে রইল— চিত্রাঙ্গদায়াঃ শুল্কং ত্বং গৃহাণ বভ্রুবাহনম্— এবারে আমাকে ঋণমুক্ত করুন মহারাজ!

অর্জুন এবার সত্যিই চলে যাবেন। তিন বছর মণিপুর রাজ বাড়িতে চিত্রাঙ্গদা তাঁর মধুকফুলের নেশা— মহাভারতের কবি চিত্রাঙ্গদার গায়ের রঙের বর্ণনা দিতে গিয়ে এমনই এত অমোঘ শব্দ উচ্চারণ করেছেন— আহা জলে-ভেজা মহুয়ার রং— মহুয়া তো স্বয়ং চিত্রাঙ্গদা। অর্জুন এবার নেশা কাটিয়ে ফিরে যাবেন আরও দূরে-দূরান্তে। যাবার আগে চিত্রাঙ্গদাকে শেষ বিদায় জানিয়ে বললেন— তুমি এখানেই থাক এবং ভাল থাক, লালন-পালন করে বড় করে তোলো আমার পুত্র বভ্রুবাহনকে— ইহৈব ভব ভদ্রং তে বর্ধেথা বভ্রুবাহনম্। অর্জুন চিত্রবাহনের মনোভাব থেকে এটা বুঝেছেন যে, জন্মমাত্রেই যে পুত্র বিনা কোনও কৃচ্ছ্রতায় রাজ্যলাভ করে, তার মায়ের মনও তখন এক অন্যতর তৃপ্তিতে ভরে থাকবে। বাপের বাড়ি ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি না যাওয়া চিত্রাঙ্গদাও অনেকটা অবস্থিত হয়ে থাকবেন এই মণিপুরে। সে কথা ভেবেই অর্জুন বললেন— একবার আমাদের ইন্দ্রপ্রস্থের আবাসে এসো, ভাল লাগবে তোমার— ইন্দ্রপ্রস্থনিবাসং মে ত্বং তত্রাগত্য রংস্যসি। সেখানে আমার জননী কুন্তী আছেন, দাদারা আছেন যুধিষ্ঠির, ভীম, আর আছে দুই ছোট ভাই নকুল, সহদেব। সেখানে সবার সঙ্গে তোমার দেখা হবে, তোমার ভাল লাগবে— বান্ধবৈঃ সহিতা সর্বৈর্নন্দসে ত্বমনিন্দিতে।

অর্জুন সবার কথা বললেন, কিন্তু দ্রৌপদীর কথা বললেন না। বলবার দরকারও ছিল না; চিত্রাঙ্গদা নিশ্চয়ই জানতেন সেই বিদগ্ধা সপত্নীর কথা। অর্জুনের ইন্দ্রপ্রস্থে যাবার কোনও বাসনাও তিনি দেখাননি। তবে অর্জুন ঘটা করে তাঁকে নেমন্তন্ন করেছিলেন, হয়তো ইন্দ্রপ্রস্থের ঐশ্বর্য দেখানোর জন্যই। একটা কথা অগ্রিম বলে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, এমনিতে চিত্রাঙ্গদার যাওয়া হবে না ইন্দ্রপ্রস্থে, কিন্তু যুধিষ্ঠির মহারাজ যেভাবে চলছেন, তাতে একদিন রাজসূয় যজ্ঞ তিনি করবেনই। অন্তত সেই রাজসূয় যজ্ঞের বিশাল মহৎ আয়োজনকে উপলক্ষ করে চিত্রাঙ্গদা একবার যেতেই পারেন ইন্দ্রপ্রস্থে। সেই যাবার কারণটা অর্জুন যেন একটু

সাহংকারেই জানিয়ে দিলেন চিত্রাঙ্গদাকে। বললেন— সেই রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান হবে সমস্ত ভারত জয় করার পর। তখন তোমার পিতা চিত্রবাহন অবশ্যই বহুমূল্য রত্নধন নিয়ে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করবেন তাঁর প্রতি বশ্যভাব নিয়ে— বহূনি রত্নান্যাদায় আগমিষ্যতি তে পিতা। তখন অন্তত তুমি পিতার সঙ্গেই ইন্দ্রপ্রস্থে যেও। একসঙ্গে এলে তোমার সঙ্গে অন্তত একবার দেখা হবে আমার। আর এখন তো তোমাকে এখানে থাকতেই হবে আমার পুত্র-পালনের সমস্ত ব্যস্ততা নিয়ে— দ্রক্ষ্যামি রাজসূয়ে ত্বাং পুত্রং পালয় মা শুচঃ।

'মা শুচঃ', অর্থাৎ দুঃখ কোরো না, কষ্ট পেয়ো না। তার মানে যতই বাপের বাড়ি থাকুন চিত্রাঙ্গদা, এই তিন বছরের আসঙ্গে, মিলনে, অর্জুনকে তিনি ততটাই ভালবেসে ফেলেছেন, যাতে পুরুষের দীক্ষায় দীক্ষিত এক রমণীও যথেষ্ট কষ্ট পান। অর্জুন সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন— আমি চলে যাচ্ছি বলে আমার বিরহে তুমি কষ্ট পেয়ো না যেন— বিপ্রয়োগেন সন্তাপং মা কৃথাস্ত্বমনিন্দিতে। আমার পুত্র বভ্রুবাহন যে এখানে রইল, জেনো সে আমার বহিশ্চর প্রাণ। সে মহারাজ চিত্রবাহনের বংশধর হিসেবে এখানে রাজা হলেও প্রসিদ্ধ কুরু-ভরতবংশের আনন্দ সংবাদ বহন করে এনেছে সে। একথা খুব ভাল করে মনে রেখো যে, সে আমার ঔরসজাত পুত্র হলেও সে আমাদের পাঁচ ভাই পাণ্ডবের একান্ত প্রিয় পুত্রের সমান। তুমি তাকে যথাশক্তি পালন কোরো— পাণ্ডবানাং প্রিয়ং পুত্রং তস্মাৎ পালয় সর্বদা।

অর্জুনের কথা শুনলে বোঝা যায় যে, দ্রৌপদীর এক-পঞ্চমাংশ পতিত্ব লাভ করেও সেখানে তাঁর গর্ভে এখনও কোনও পুত্রলাভ করেননি অর্জুন। উলূপীর গর্ভজাত পুত্রের পিতৃত্ব অস্বীকার না করলেও, তিনি অন্যপূর্বা বা অন্য লোকের পূর্ববিবাহিত স্ত্রী। চিত্রাঙ্গদাই হলেন সেই রমণী যাঁর গর্ভে প্রথম ঔরস-পুত্র লাভ করলেন তিনি। ঠিক সেই কারণেই এখানে তাঁর স্নেহের অভিব্যক্তি কিছু বেশি, আরও বেশি এই কারণে যে, স্ত্রী অথবা পুত্র কাউকেই তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে নিয়ে যেতে পারছেন না।

চিত্রাঙ্গদাকে আমরা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে তেমন করে দেখতে পাইনি। অথবা শত শত রাজা-মহারাজার ভিড়ে মহাভারতের কবি চিত্রাঙ্গদাকে তাঁর আড়াল থেকে আর স্পষ্ট করে দেখানোরই সুযোগ পাননি। সেখানে কৃষ্ণের মতো মানুষকে নিয়ে বিবাদ, শিশুপালকে নিয়ে বিরাট ঝামেলা, দুর্যোধনের হিংসে— এতরকম মহাকাব্যিক বৈচিত্র্যের মাঝখানে কোথায় উলূপী, কোথায় চিত্রাঙ্গদা? তা ছাড়া উলূপীকে তো অর্জুন নেমন্তন্নও করেননি রাজসূয় যজ্ঞে, চিত্রাঙ্গদাকে করেছিলেন। তিনি হয়তো এসেছিলেন, হয়তো আসেননি, আমরা খবর পাইনি সঠিক। এতটাই না-খবর যে, তার পর কত বড় বড় ঘটনা ঘটে গেল। সেই বিখ্যাত পাশাখেলা, পাণ্ডবদের বনবাস, অজ্ঞাতবাস, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, কৌরবদের পতন এবং শেষপর্যন্ত অনিচ্ছুক যুধিষ্ঠিরের রাজা হওয়া— এই সব বিশাল ঘটনা-চিত্রের ভিড়ে চিত্রাঙ্গদা-উলূপীর কোনও স্থান হয়নি।

অষ্টাদশাহ যুদ্ধের মধ্যে তবু একবার আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে উলূপীকে স্মরণ করতে পারি, কিন্তু চিত্রাঙ্গদাকে নয়। উলূপীর চেয়ে চিত্রাঙ্গদার প্রতি অর্জুনের সাময়িক আকর্ষণ বেশি ছিল, কিন্তু চিত্রাঙ্গদা এতটুকু ঝুঁকি নিয়েও পুত্রকে পিতার সাহায্যে পাঠাননি। কিন্তু উলূপী তাঁর গর্ভে অর্জুনের ক্ষেত্রজ পুত্র ধারণ করলেও সেই একরাত্রির ক্ষণিকের অতিথিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোলেননি কখনও। তিনি জানেন যুদ্ধ মানেই এক ধরনের সংশয় এবং বিপন্নতা, অর্জুনের মতো মহাবীর যুদ্ধ করলেও স্বামীর জন্য স্ত্রীর সংশয় সেখানে কাটে না। অতএব উলূপীর পুত্র ইরাবান নিজেই যুদ্ধে আসুন পিতার সাহায্যে অথবা উলূপীই তাঁকে পাঠিয়ে থাকুন, এটা বেশ বোঝা যায় যে, অর্জুনের জন্য উলূপীর ভাবনা অনেক বেশি। কুমার বভ্রুবাহনকে কিন্তু আমরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পিতার সাহায্যকল্পে উপস্থিত থাকতে দেখিনি। ভবিষ্যতে আমরা তাঁর অনেক বীরত্বের পরিচয় পেলেও যুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে বভ্রুবাহন উপস্থিত থাকলে অর্জুনের ভাল লাগত নিশ্চয়। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের কাছে উলূপীর চেয়ে প্রিয়তরা হওয়া সত্ত্বেও পুত্রকে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের সংশয়ের মধ্যে পাঠাননি। হয়তো পিতা চিত্রবাহনের বংশধরকে মণিপুর রাজ্যের রাজা হিসেবে বাঁচিয়ে রাখাটাই চিত্রাঙ্গদার কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এদিক থেকে নাগকন্যা উলূপী অর্জুনের জীবনে যতই অনুল্লেখ্য হোন, তিনি অনেক বেশি ভালবেসেছিলেন অর্জুনকে। তাঁর সেই উষ্ণতা বোধ হয় প্রমাণ করাও যায়, যদিও সে কাহিনি জড়িয়ে আছে চিত্রাঙ্গদার জীবনের সঙ্গে।

তখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে যুধিষ্ঠির রাজা হয়েছেন এবং তাঁর বহুতর জ্ঞাতিবধের পশ্চাত্তাপ প্রশমনের জন্য মুনিঋষিরা তাঁকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করার পরামর্শ দিয়েছেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রক্রিয়া মেনে মহাবীর অর্জুন বেরিয়েছেন অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে। কোথাও যুদ্ধ, কোথাও বা যুদ্ধ না করে নানান রাজ্যের বশ্যতা অধিকার করে অর্জুন পৌঁছলেন মণিপুর রাজ্যে। চিত্রাঙ্গদার পিতা চিত্রবাহন তখন বেঁচে ছিলেন না বোধ হয়, কিংবা বেঁচে থাকলেও রাজকার্য থেকে অবসরগ্রহণ করেছেন। কেননা মণিপুরের রাজা হিসেবে আমরা বভ্রুবাহনকেই দেখতে পাচ্ছি— মণিপুরপতের্দেশমুপাযাৎ সহ পাণ্ডবঃ।

অর্জুনের মতো মহাবীর যখন অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে আসছেন, তখন রাজ্যে রাজ্যে খবর হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। মণিপুরপতি রাজা বভ্রুবাহনের কাছেও সে-খবর পৌঁছল এবং তিনি জানেন যে, অর্জুন তাঁর পিতা— শ্রুত্বা তু নৃপতিঃ প্রাপ্তং পিতরং বভ্রুবাহনঃ। সেই কোনকালে শিশু বয়সে পিতা অর্জুন তাঁর মস্তক চুম্বন করে চলে গিয়েছিলেন— সে-কথা জননী চিত্রাঙ্গদার কাছে শুনে থাকবেন বভ্রুবাহন, কিন্তু জ্ঞান হওয়া ইস্তক সেই মহাবীর পিতাকে তিনি দেখেননি। আজ যখন তিনি এই রাজ্যে উপস্থিত এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রক্রিয়া যখন মণিপুর রাজ্যের বশ্যতা দাবি করে, তখন বভ্রুবাহনের পক্ষে এইটাই স্বাভাবিক যে, তিনি পিতার বশ্য হবেন। অতএব বশ্যতা স্বীকারের বিধি অনুসারেই বভ্রুবাহন ব্রাহ্মণ সজ্জনদের নিয়ে যথোপযুক্ত প্রণামী ধন সহকারে উপস্থিত হবেন পিতা অর্জুনের কাছে— সবিনয়ে পরম শ্রদ্ধায়।

এই বিনয়, এই শ্রদ্ধা দেখে এতটুকু বিগলিত হলেন না মহাবীর অর্জুন। পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষায় তাঁর সন্দেহ উপস্থিত হল। মহাবীর অর্জুনের পুত্রের এই কি সমুচিত ব্যবহার! বভ্রুবাহন ক্ষত্রিয়কুমার বটে, বাইরে থেকে যে কেউ তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করুক, তিনি পিতা হোন, ভাই বোন বা শ্বশুর হোন, তার সঙ্গেই যুদ্ধ করতে হবে। হারা-জেতা তো অন্য ব্যাপার। কিন্তু এই যে বশংবদজনের মতো অর্থ-ধনের প্রণামী নিয়ে এক ক্ষত্রিয় রাজা যুদ্ধার্থী ব্যক্তির কাছে উপনত হচ্ছে, এই কি ক্ষত্রিয়ের ব্যবহার! ক্ষত্রিয়পুত্রের এহেন বিনয় ব্যবহারে এতটুকুও খুশি

হলেন না অর্জুন— নাভ্যনন্দৎ স মেধাবী ক্ষত্রং ধর্মমনুস্মরন্। মনে মনে তিনি এতটাই ক্ষুব্ধ হলেন যে, অবনত পুত্রকে খানিকটা তিরস্কার না করে পারলেন না।

অর্জুন বললেন— তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যে, তুমি ক্ষাত্রধর্মের আওতার মধ্যে নেই। বাছা! এই যে ঘোড়াটি এসেছে, এটা যুধিষ্ঠির মহারাজের যজ্ঞীয় অশ্ব, আমি এসেছি এই অশ্বের রক্ষক হয়ে, এখন আমি তোমার পিতা নই। অশ্বরক্ষক যুদ্ধার্থী অর্জুনের সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করলে না কেন— নাযোৎসীঃ কিম্নু পুত্রক! ক্ষত্রিয়ের ছেলে হয়ে তোমার এই দুর্বুদ্ধি কেমন করে হল, আমি ধিক্কার দিচ্ছি তোমাকে। তুমি বেঁচে থেকে আমার কোন পুরুষার্থ সাধন করবে? আমি যুধিষ্ঠিরের অশ্ব রক্ষায় নিযুক্ত হয়ে যুদ্ধের দ্বারা তোমাকে বশ্যতা স্বীকার করাতে এসেছি, আর তুমি কিনা একজন স্ত্রীলোকের মতো কোমল মানসিকতায় আমাকে মধুর আলাপে বশীভূত করতে চাইছ— যস্ত্বং স্ত্রীবদ্ যুধা প্রাপ্তং মাং সাম্না প্রত্যগৃহ্ণথাঃ। হ্যাঁ, এমন যদি হত যে, আমি নিরস্ত্র অবস্থায় তোমার কাছে এসেছি, তা হলে এই এখন যেভাবে এসেছ— ব্রাহ্মণ-সঙ্গে, প্রণামী সহকারে, এগুলো তখন মানাত, নইলে এই কি ক্ষত্রিয়ের ব্যবহার, কুলাঙ্গার কোথাকার— প্রক্রিয়েয়ং ভবেদ্ যুক্তা তাবত্তব নরাধম।

মহাবীর অর্জুনের এই দুঃখ অস্বাভাবিক নয়। বিশেষত যাঁর পুত্র অভিমন্যু বীরদর্পে সম্মুখ যুদ্ধে সপ্তরথীর হাতে নিহত হয়েছেন। অর্জুন তাঁর এই পুত্রকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে দেখেননি। যেখানে ইরাবান তাঁর ক্ষেত্রজ পুত্র হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন, সেখানে এই পুত্রকে যিনি একসময় 'বহিশ্চর প্রাণ' বলে চিহ্নিত করেছিলেন, সে তো মহাযুদ্ধে যোগ দিলই না, আজ সে আবার মধুরালাপে যুদ্ধার্থী পিতার বশ্যতা স্বীকার করে নিতে এসেছে। অর্জুনের দিক থেকে পিতা হিসেবে ক্ষোভটুকু তাই স্বাভাবিক।

ঠিক এইখানেই মহাভারতের কবি নাগকন্যা উলূপীর প্রবেশ ঘটিয়েছেন পিতা-পুত্র সংবাদের অভ্যন্তরে। উলূপীর এই আবির্ভাব খানিকটা অলৌকিকতায় আচ্ছন্ন, কিন্তু তার লৌকিক প্রতিপত্তি কিছু অসম্ভব নয়। মহাভারতের কবি লিখেছেন— স্বামী অর্জুন তাঁর ছেলেকে এই অকথ্য তিরস্কার করছেন দেখে নাগকন্যা উলূপী নাকি সহ্য করতে না পেরে ভূমি ভেদ করে পাতাল থেকে উঠে এলেন— অমৃষ্যমাণা ভিত্ত্বোর্বীম্ উলূপী সমুপাগমৎ। এখানে উলূপী ভূমি ভেদ করে এলেন কিনা, অথবা পাতাল থেকেই এলেন কিনা সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, কেননা মহাকাব্যের বিরাট আড়ম্বরের মধ্যে অতল-পাতাল আর দ্যুলোক-ভূলোকের যোগাযোগ ঘটে মহাকবির বিশাল পরিব্যাপ্ত মনোভূমির সঙ্গে তাল রেখে। লৌকিকতার খাতিরে শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, অর্জুনের একক বনবাসকালে যে দুই রমণীর সঙ্গে পরপর দেখা হয়েছিল এবং যাঁদের সঙ্গে অর্জুন নিজে আর কোনও যোগাযোগ রাখেননি, সেই দুই রমণী কিন্তু নিজেদের মধ্যে হয়তো যোগাযোগ রেখেছিলেন আপন ভাগ্যের একাত্মতায়। মহাভারতের কোথাও এ কথা স্পষ্টভাবে লেখা নেই, কিন্তু যে দুই বহিশ্চরা রমণী দ্রৌপদী-সুভদ্রার মতো অর্জুনের অভ্যন্তরা হননি, তাঁদের নিজেদের মধ্যে অকালিক যোগাযোগটাও অস্বাভাবিক নয়।

এই যে উলূপী এখানে এসেছেন, তাও এখনও তিনি কত সুন্দরী, মহাভারতের কবি এই বিপন্ন মুহূর্তেও এক ঝলক সেই শরীর বর্ণনা দিতে ভোলেননি। বলেছেন— নাগকন্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উলূপী উপস্থিত হয়েছেন সপত্নীপুত্রের সামনে, এখনও তিনি কত সুন্দরী, তার শারীরিক সৌন্দর্যে এখনও কোনও খুঁত ধরার উপায় নেই। এই রূপ দেখেই না ব্রহ্মচারী অর্জুনের ব্রতভঙ্গের যুক্তি এসেছিল— উলূপী চারুসর্বাঙ্গী সমুপেত্য উরগাত্মজা। উলূপী দেখলেন— সপত্নীপুত্র বভ্রুবাহন অর্জুনের তিরস্কার শুনেও অধোমুখে দাঁড়িয়ে আছেন অর্জুনের সামনে, তখনও তিনি যুদ্ধের বিষয়ে সংশয়াপন্ন হয়ে চিন্তা করে যাচ্ছেন— সা দদর্শ ততঃ পুত্রং বিমৃশন্তমধোমুখম্। মহাভারতের কবি কিন্তু বভ্রুবাহনকে উলূপীর সপত্নীপুত্র বলেননি, বলেছেন 'পুত্র', অর্থাৎ স্পষ্ট চিনিয়ে দেবার জন্যেও তিনি আমাদের মতো স্পষ্ট অথচ কৃত্রিম শব্দ ব্যবহার করেন না, চিত্রাঙ্গদার পুত্র বলে পৃথক কোনও ভেদদৃষ্টি উলূপীর নেই।

উলূপী বভ্রুবাহনকে বললেন— বাছা! আমি নাগকন্যা বটে, তবে আমাকে তুমি তোমার মা বলে জেনো, আমার নাম উলূপী— উলূপীং মাং নিবোধ ত্বং মাতরং পন্নগাত্মজাম্। পরিচয় সাঙ্গ হতেই উলূপী কাজের কথায় এসে বললেন— তুমি যদি আমার কথা অনুসারে কাজ করো, তবেই সেটা ধর্ম হবে বাছা! এই হলেন তোমার পিতা যুদ্ধদুর্মদ অর্জুন, এই যুদ্ধার্থী পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করো নির্দ্বিধায়, তাতে একসময় তাঁর প্রীতি ঘটবে, তোমারও ভাল হবে, তুমি যুদ্ধ করো পিতার সঙ্গে—যুধ্যস্বৈনং কুরুশ্রেষ্ঠং পিতরং যুদ্ধদুর্মদম্।

উলূপী-মায়ের কথা শুনে চিত্রাঙ্গদার পুত্র বভ্রুবাহন যুদ্ধসাজে সেজে বীরদর্পে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন অর্জুনের সঙ্গে। পিতা-পুত্রে দারুণ যুদ্ধ হল এবং সে যুদ্ধের বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই। সবচেয়ে বড় কথা হল— এটা এমন একটা যুদ্ধ যার ফল যেমন অস্বাভাবিক তেমনই স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক এই কারণে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধনায়ক অর্জুন এই যুদ্ধে হেরে গেলেন শুধু নয়, বলা উচিত মারা গেলেন। আর স্বাভাবিক এই কারণে যে, যত বড় নায়কই হোন না কেন অর্জুন, পুত্রের কাছে হেরে যাবার আনন্দ পূর্বে তিনি পাননি। পুত্রের কাছে পিতা এবং শিষ্যের কাছে গুরু যখন হারেন, সেই হারার চেয়ে শিক্ষার গৌরব তখন বড় হয়ে ওঠে। অভিমন্যুর অবর্তমানে এই হারটুকু প্রয়োজন ছিল অর্জুনের। হয়তো বা সেইজন্যই বভ্রুবাহনের মতো বীর বেঁচে আছেন বিরাট কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরেও। মহাভারতের কবি লিখেছেন— পুত্রের বিক্রম দেখে গাণ্ডীবধন্বা অর্জুন মনে মনে বেশ সন্তুষ্ট হয়ে যুদ্ধে কিছু শিথিল হয়ে পুত্রকে আর তেমন পীড়ন করেননি— সংপ্রীয়মাণঃ পার্থানামৃষভঃ পুত্রবিক্রমাৎ— অন্যদিকে ছেলেমানুষ বলেই, বিশেষত পিতার মুখে যা-নয়-তাই ধিক্কার শুনেই, বাল-চাপল্যবশত বভ্রুবাহন বড় বেশি করে চেপে ধরলেন অর্জুনকে— ততঃ বাল্যাৎ পিতরং বিব্যাধ হৃদি পত্রিণা। অর্জুন মূর্ছিত হলেন আঘাতে এবং যদি পরবর্তীকালে উলূপীর ভালবাসার মাহাত্ম্য বেশি করে স্বীকার করতে হয়, তা হলে বলা ভাল— অর্জুন সাময়িকভাবে মারা গেলেন। বীর পিতাকে এইভাবে বাণাহত মৃতপ্রায় দেখে বভ্রুবাহনও মূর্ছিত হয়ে পড়লেন যুদ্ধস্থলেই।

এইভাবে সুচিরপ্রস্থিত স্বামীর মৃত্যু এবং পুত্রের পতন শুনে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করলেন চিত্রাঙ্গদা— মণিপুরের রাজমাতা, অর্জুনের মহিষী। ত্রস্ত, কম্পিত, বিমূঢ় চিত্রাঙ্গদা দেখলেন তাঁর স্বামী মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। হস্তিনাপুরের আবর্তে না-থাকা অর্জুনের দুই বহিশ্চরা স্ত্রীই যে দেখতে খুব সুন্দরী ছিলেন তা যেমন উলূপীর 'চারুসর্বাঙ্গী' বিশেষণে বোঝা গেছে,

তেমনই চিত্রাঙ্গদার বিশেষণ— তিনি অলোকসামান্যা সুন্দরী এখনও— দেবী দিব্যবপুর্ধরা। তিনি উলূপীকেই প্রথম দায়ী করলেন, কেননা তিনি জানেন যে, উলূপীই বভ্রুবাহনকে অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্ররোচিত করেছেন। চিত্রাঙ্গদা বললেন— দেখো উলূপী! তোমারই স্বামীর অবস্থাটা দেখো— পশ্য ভর্তারং শয়ানং নিহতং রণে— তোমার জন্যই আমার পুত্রের হাতে এই মহাবীরের মৃত্যু ঘটেছে।

চিত্রাঙ্গদা উলূপীকে দোষ দিয়ে দায়ী করছেন বটে, কিন্তু উলূপীর মর্যাদা সম্বন্ধে এবং অর্জুনের প্রতি উলূপীর অনন্ত ভালবাসা সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট অবহিত। চিত্রাঙ্গদা বললেন— আর্য পুরুষের রীতিনীতি, ধর্ম তুমি যথেষ্টই জানো এবং স্বামী অর্জুনের প্রতি নিষ্ঠাও তোমার যথেষ্টই আছে— ননু ত্বম্ আর্যধর্মজ্ঞা ননু চাসি পতিব্রতা— তো এহেন তোমার এ কী কুবুদ্ধি হল, যার জন্য তোমার স্বামী তোমারই প্ররোচনায় যুদ্ধে নিহত হলেন— পতিস্তে নিহতো রণে। এই মুহূর্তে নিজের স্বামীকে 'তোমার স্বামী' বলে চিহ্নিত করে অর্জুনের মৃত্যুর সমস্ত দায় উলূপীর ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছেন চিত্রাঙ্গদা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের মধ্যে এমন একটা প্রশ্নও উঁকি দিচ্ছে যে, কেন উলূপী এমন একটা কাণ্ড করে বসলেন, এমনকী এ বিশ্বাসও তাঁর আছে যে, উলূপী নাগ জনগোষ্ঠীর মানুষ; মণি-মন্ত্র-মহৌষধির নানা তুকতাক তাঁর জানা আছে যাতে তাঁর মৃত পতি আবার জীবিত হয়ে উঠতে পারেন। চিত্রাঙ্গদা বললেন— এমন যদি হয়ে থাকে যে তোমার স্বামী তোমার প্রতি কোনও অন্যায় অপরাধ করেছেন, তবু স্বামী বলেই এই অবস্থায় তাঁকে তোমার ক্ষমা করা উচিত। আমি চাইছি, যদি পারো এবার তোমার স্বামীকে তুমি বাঁচাও— ক্ষমস্ব যাচমানা বৈ জীবয়স্ব ধনঞ্জয়ম্।

একটা জায়গাতে চিত্রাঙ্গদা বেশ আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন। উলূপীকে তিনি যথেষ্ট চেনেন। অর্জুনের প্রতি যে তাঁর অনন্ত ভালবাসা আছে, এটা চিত্রাঙ্গদাও জানেন। কিন্তু এমন বিপন্ন অবস্থাতেও উলূপী কেমন ভাবলেশহীন। কোনও দোষারোপে তিনি কাতর হচ্ছেন না, কোনও প্রতিক্রিয়াও নেই তাঁর মধ্যে, এমনকী প্রিয়তম স্বামীর মৃত্যুতেও উলূপী এতটুকু বিকারগ্রস্ত নন। চিত্রাঙ্গদা বুঝতে পারছেন যে কোনও রহস্য আছে এই ঘটনার পিছনে। হয়তো বা রহস্য প্রকাশ এবং এই মৃত্যুর প্রতিকারের আশাতেই তিনি উলূপীকে চেতিয়ে দিয়ে বললেন— 'আর্যে'। সম্বোধনটা খেয়াল করুন, উলূপী এতটাই অধিগুণসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, যাঁকে 'আর্যে' সম্বোধনে চিহ্নিত করছেন চিত্রাঙ্গদা। অবশ্য এই সম্বোধনের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার তিরস্কারটুকুও বাদ গেল না। তিনি বললেন— আর্যে! দুনিয়ার সব কিছু জেনেও তুমি ধর্ম ব্যাপারটাই জানো না, নইলে পুত্রের মাধ্যমে পিতাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়েও তুমি নির্বিকার রয়েছে কেমন করে— যদ্ ঘাতয়িত্বা পুত্রেণ ভর্তারং নানুশোচসি। চিত্রাঙ্গদা উলূপীকে প্রায় দায়ী করেই বললেন— আমি আমার ছেলের জন্য ভাবি না, দিদি! কিন্তু যিনি এই দেশে অতিথি হয়ে এসেছিলেন সেই স্বামীর জন্য বড় কষ্ট পাচ্ছি আমি। এ আমরা কেমন আতিথ্য করলাম— পতিমেব তু শোচামি যস্যাতিথ্যম্ ইদং কৃতম্।

উলূপীর প্রতি অনুশোচনার তিরস্কারটুকু জানিয়ে বিমূঢ়া চিত্রাঙ্গদা রণস্থলে শায়িত অর্জুনের কাছে গেলেন। অধোমুখে বললেন— প্রিয় আমার! তুমি কুরুমুখ্য ধর্মরাজের প্রিয় ভাই। তুমি তাঁরই যজ্ঞের অশ্ব নিয়ে এসেছ এখানে। আমার পুত্র যে অশ্ববন্ধন করেছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই অশ্ব এই আমি মুক্ত করে দিলাম— অয়মশ্বো মহাবাহো ময়া তে পরিমোক্ষিতঃ। তোমাকে তো এখন এই অশ্বের সুরক্ষার ভার নিয়ে কত রাজ্যে যেতে হবে, সেই তুমি এমন করে মাটিতে শুয়ে থাকলে চলবে কী করে— স কিং শেষে মহীতলে? তুমি জানো— আমার প্রাণ এবং তোমার স্বজন কুরুদের প্রাণ তোমারই আয়ত্ত, সেই প্রাণদাতা মানুষটি এমন প্রাণহীন হয়ে পড়ে থাকলে সবাই কী করে?

চিত্রাঙ্গদা অনেক বিলাপ করলেন। উলূপীর প্রতি সেই পুরাতন তিরস্কার জাগ্রত রেখে এমনই সন্দেহ করলেন, যেন উলূপী ইচ্ছে করেই স্বামী হত্যা করে আবারও বিয়ে করতে চাইছেন। একথাগুলি অবশ্য একেবারেই বিলাপের তাড়নায় যা ইচ্ছে বলা। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের উত্তরাংশে উলূপীর প্রতি সেই আন্তরিকতা এবং সনির্বন্ধ অনুরোধ ছিল, যাতে তিনি যাচনা করেছিলেন যে, আমার ছেলে না বেঁচে থাকে, তাতেও আমি বিব্রত নই, কিন্তু অর্জুন বেঁচে উঠুন— কামং স্বপিতু বালোহয়ং... বিজয়ঃ সাধু জীবতু। চিত্রাঙ্গদা কেমন করে যেন বুঝতে পারছিলেন যে, এই দুর্ঘটনা, বা অর্জুনের এই মারণ-বাঁচনের মধ্যে উলূপীর হাতে কোনও গভীর উপায় আছে। চিত্রাঙ্গদা বললেন— ছেলেকে উত্তেজিত করে যে স্বামীকে তুমি মরণের মুখে ঠেলে দিয়েছ, তাঁকে যদি আজ তুমি জীবিত না দেখাতে পারো, তবে আমি আত্মহত্যা করব। আর যতক্ষণ আমি অর্জুনের এই জীবন না দেখছি, ততক্ষণ আমি প্রায়োপবেশনে বসে থাকব, তারপর মৃত্যুই হবে আমার আশ্রয়।

ইতোমধ্যে কুমার বভ্রুবাহনের সংজ্ঞা ফিরল। তিনিও পিতাকে মৃত্যুর মতো শীতল দেখে অনেক বিলাপ করলেন এবং অনেক অনুশোচনায় মায়ের সঙ্গে প্রায়োপবেশনের সিদ্ধান্ত নিলেন। ঠিক এইরকম একটা সংকটময় মুহূর্তেও নাগনন্দিনী উলূপীই ছিলেন স্থির এবং অবিচল। সপত্নী চিত্রাঙ্গদা এবং বভ্রুবাহনের মনের অবস্থা দেখে নাগকন্যা উলূপী নাগদের পরম বিশ্বাসের বস্তু সঞ্জীবন মণিটি স্মরণ করলেন। মণিটি সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হল। বিহ্বল বভ্রুবাহনের হাতে সেই মণিটি দিয়ে উলূপী বলছেন— ওঠো বাছা! ওঠো। তুমি ভাল করে এটা জেনে রেখো যে, তুমি অর্জুনকে মারোনি, মারতে পারোই না। দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে সমস্ত দেবতারা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেও তাঁরা অর্জুনকে মারতে পারবেন না, সেখানে তুমি তাঁকে মারবে কী করে। আসলে আমি 'মোহিনী' নামে এক মায়া তৈরি করেছিলাম এবং তা করেছিলাম তোমার পিতার খুশির জন্যই— প্রিয়ার্থং পুরুষেন্দ্রস্য পিতুস্তেঽদ্য যশস্বিনঃ। তোমার পিতা তোমার মধ্যে ক্ষত্রিয়ের শক্তি দেখতে চেয়েছিলেন, আর ঠিক সেইজন্যই আমি তোমাকে যুদ্ধে প্ররোচিত করেছি, তোমার কোনও অনিষ্ট করার জন্য নয়। তবে কোনও দুশ্চিন্তার কারণ নেই, আমি এই অলৌকিক সঞ্জীবন মণি এনেছি, এই মণি তুমি তোমার পিতার বক্ষস্থলে রাখো, তিনি অবশ্য বেঁচে উঠবেন।

বিমাতার প্রস্তাব অনুসারে বভ্রুবাহন সঞ্জীবন-মণিটি অর্জুনের বক্ষস্থলে স্থাপন করতেই অর্জুন সুপ্তোত্থিতের মতো উঠে বসলেন এবং নিদ্রাজড়িত রক্তচক্ষু দুটি মুছতে লাগলেন— চিরসুপ্ত ইবোত্তস্থৌ মৃষ্টলোহিতলোচনঃ। অর্জুন সুস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে আনন্দের ধুম পড়ে গেল। পুত্র বভ্রুবাহনকে আলিঙ্গন করে তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করলেন পিতা অর্জুন। তার পরেই তাঁর চোখ পড়ল দুই অসহায়া রমণীর দিকে— চিত্রাঙ্গদা এবং

উলূপী— কোনও কারণেই যাঁদের রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে থাকার কথা নয়। চিত্রাঙ্গদাকে খানিকটা শোকক্লিষ্ট দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু উলূপীকে তেমন নয়। অর্জুন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন পুত্র বভ্রুবাহনকে— কেমন যেন একটা কিছু ঘটে গেছে বাছা! সে-ঘটনার মধ্যে শোকের ব্যাপারও আছে, আশ্চর্যের ব্যাপারও আছে এবং আনন্দের ব্যাপারও আছে— কিমিদং লক্ষ্যতে সর্বং শোক-বিস্ময়-হর্ষবৎ।

ঘটনা যাই ঘটুক, অর্জুনের কাছে এটা কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না যে, এই দুই রমণী হঠাৎ এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত কেন। বিশেষ করে উলূপী, তিনি তাঁর নাগরাজ্যের আবাস ছেড়ে এই মণিপুর রাজ্যে কেন উপস্থিত। অর্জুন বভ্রুবাহনকেই জিজ্ঞাসা করে বললেন যে— আমি জানি তুমি আমার আদেশেই যুদ্ধ করেছ, কিন্তু তাতে এই দুই স্ত্রীলোক কেন এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত— স্ত্রীণাম্ আগমনে হেতুম্ অহমিচ্ছামি বেদিতুম্। বভ্রুবাহন পিতার কথার কোনও উত্তর দিলেন না। শুধু বললেন— আপনি উলূপী মাতাকে জিজ্ঞাসা করুন— উলূপী পৃচ্ছ্যতামিয়ম্।

এতে রহস্য আরও বেড়ে গেল। একদিকে অর্জুনের কাছে, অন্যদিকে পাঠকের কাছেও। অর্জুন পূর্বাপর কিছুই জানেন না, পাঠক তবু তা জানেন, তবু নানান অলৌকিক কাণ্ডকারখানায় পাঠক কিছু বিমূঢ়। আসলে মহাকাব্যের শৈলীমুখর অলৌকিকতার ছায়াটুকু সরিয়ে নিলে এইটুকু বেশ বোঝা যায় যে, উলূপীর সঙ্গে তাঁর কনিষ্ঠা সপত্নী চিত্রাঙ্গদার গভীর যোগোযোগ ছিল। সে যোগাযোগ এতটাই যে, সপত্নীর পুত্রকে নিজের পুত্রের মতো তিনি যুদ্ধে প্ররোচিত করতে পেরেছিলেন। কুমার অভিমন্যু মহাযুদ্ধে হত হবার পর বভ্রুবাহনের মধ্যে ক্ষাত্রতেজের যে প্রাধান্যটুকু অর্জুন দেখতে চেয়েছেন, তা পূরণ করেছেন উলূপী। তিনি অর্জুনের মর্ম এতটাই বোঝেন যে, অর্জুনের প্রীতির জন্য তাঁর পুত্রকে প্ররোচিত করার মধ্যে তিনি কোনও অপরাধ দেখতে পাননি। শেষমেশ সেই মণির কথা—আমাদের ধারণা— অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে একেবারে মরে যাননি, তবে হ্যাঁ, পুত্রের হাতে তিনি গুরুতর আহত হয়েছিলেন অবশ্যই। আর নাগ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদ চিকিৎসার প্রচলন না থাকলেও মণি-মন্ত্র-মহৌষধির স্বপ্রযুক্তির চিকিৎসা তাঁদের জানা ছিল, ফলে উলূপীর সঞ্জীবন মণির ব্যবহারে অর্জুন সংজ্ঞালাভ করেছেন, এতেও কিছু আশ্চর্য নেই।

বভ্রুবাহনের সংকেত থেকে অর্জুন এটা পরিষ্কার বুঝে গেলেন যে, সমস্ত ঘটনার মধ্যে উলূপীর একটা প্রাধান্য আছে এখানে। মণিপুর রাজ্যে তাঁর উপস্থিতি এই রহস্য আরও ঘনীভূত করে। অর্জুন এগিয়ে গেলেন উলূপীর দিকে এবং একটু চিন্তিতভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন— হ্যাঁগো! কৌরব্যকুলনন্দিনি! হঠাৎ করে তুমি মণিপুরেশ্বর বভ্রুবাহনের রাজ্যে এলে কেন— কিমাগমনকৃত্যং তে কৌরব্যকুলনন্দিনি! আর এলেই যদি তা হলে এই যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাকে দেখছি কেন?

অর্জুনের অন্যতর প্রশ্নগুলিতে যাবার আগে আবারও একবার মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশকে স্মরণ করে নিই। এই যে অর্জুন একটা সম্বোধন করলেন,— 'কৌরব্যকুলনন্দিনি'— এই একটা সম্বোধন থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, নিজের পিতাকেও সেকালে কুলের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হত, অর্থাৎ পিতার নামটিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোজাসুজি ব্যবহার না করে সেই নামের ওপরে এক কুলের বৃহত্ব স্থাপন করা। এই কারণেই হয়তো উলূপী ঐরাবত নাগের পৌত্রী হওয়া সত্ত্বেও সেই নামটিকে বৃহত্তর মর্যাদা দিয়ে বলেছিলেন— আমি ঐরাবত-কুলের জাতিকা, আমার পিতার নাম কৌরব্য। আর এখানে সেই পিতার নামটাকেও কুলনাম হিসেবে ব্যবহার করে অর্জুন উলূপীকে সম্বোধন করেছেন— 'কৌরব্যকুলনন্দিনি'। সিদ্ধান্তবাগীশ মহা ফাঁপরে পড়েছেন। যেহেতু একটি নামকে কুলনাম হিসেবে ব্যবহার করলে উলূপী ঐরাবতবংশীয়া হয়ে ওঠেন এবং তাতে যেহেতু উলূপী তাঁর প্রস্তাবিত অন্য কোনও দ্বিতীয়া নাগরমণী থেকে পৃথক থাকেন না, ইরাবানের জননীত্বও তাতে যেহেতু ব্যাহত, অতএব অর্জুনের সম্বোধনটিকে তিনি অপরিচিত অর্থে ব্যবহার করে অর্থ করেছেন— 'কুরুকুলানন্দকারিণি নাগনন্দিনি'! 'কৌরব্য' বলতে যে প্রসিদ্ধ কুরুকুল বোঝায় না, তা আমরা বলছি না, এমনকী 'নন্দিনী' বলতেও 'আনন্দিনী' অর্থে হতে পারে, কিন্তু কৌরব্য বলতে এখানে যেহেতু সোজাসুজি উলূপীর পিতার নাম আসে এবং নন্দিনী বলতেও যেহেতু তাঁর মেয়েকেই বোঝায়, সেখানে এমন বাঁকা অর্থ তখনই করতে হয়, যখন সেই বিধবা-বিবাহের সংস্কার ব্যক্তিমানুষকে পীড়ন করতে থাকে। অর্জুন এ-অর্থে তাঁর 'সম্বোধন' উচ্চারণ করেননি, সরলা নাগরমণীকে তাঁর পিতার পরিচয়েই তিনি সোজাসুজি বলেছেন— কৌরব্যনন্দিনী! হঠাৎ কৌরব্য-পিতার ভবন ছেড়ে মণিপুরে এসেছ কেন?

যুদ্ধক্ষেত্রে উলূপীকে দেখে তাঁর নানান সন্দেহ হচ্ছে। বিশেষত উলূপীর চোখেমুখে কোনও শোকের চিহ্ন নেই, যা চিত্রাঙ্গদার মুখে আছে, বভ্রুবাহনের মুখে আছে; তার ওপর বভ্রুবাহন আবার উলূপীকেই দেখিয়ে দিচ্ছেন উত্তর দেবার জন্য। অর্জুনের নানান সন্দেহ হচ্ছে। অর্জুন বললেন— তুমি হঠাৎ মণিপুর এসেছ তাই এই জিজ্ঞাসা। তুমি রাজা বভ্রুবাহনের মঙ্গলকামনা করো তো? সেই সঙ্গে তুমি আমারও মঙ্গল চাও তো? পুত্র বভ্রুবাহন অজ্ঞানবশত তোমার প্রতি কোনও অপ্রিয় আচরণ করেনি তো, অথবা আমিও এমন কিছু করিনি তো, যা তোমার ভাল লাগেনি— অকার্ষম্ অহমজ্ঞানাদয়ং বা বভ্রুবাহনঃ? এমন তো হয়নি যে, চৈত্রবাহনী চিত্রাঙ্গদা তোমার সপত্নী বলেই তোমার প্রতি কোনও অন্যায় অপরাধ করেছে।

নাগনন্দিনী উলূপীকে সেই কবে ছেড়ে এসেছেন অর্জুন, তবু এখনও তাঁর শরীরের আকুল ইশারা টের পান তিনি। এখনও অনেক সমর্যাদ প্রশ্নের মধ্যে অর্জুন তাঁকে সম্বোধন করেন, 'চপলাপাঙ্গি', 'পৃথুলশ্রোণি'। প্রশ্নের মধ্যে এখনও কত মর্যাদা— কোনও অপরাধ হয়নি তো। কিন্তু নাগনন্দিনী প্রথমত অর্জুনের প্রতি শারীরিক কামনায় প্ররোচিত হলেও, তিনি গভীরভাবে অর্জুনকে ভালবাসেন, অন্যদিকে অর্জুনের সঙ্গে যতই উলূপীর যোগাযোগ না থাকুক স্বামীকে তিনি সেই যে মন-প্রাণ-শরীর দিয়ে ভালবেসেছিলেন, সে ভালবাসা এক চিরকালীন শাশ্বত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে। অর্জুনের এতগুলি প্রশ্ন একবারে শুনেও উলূপী কিন্তু ক্রুদ্ধ হলেন না। অর্জুনের দিকে তাকিয়ে, স্মিতহাস্যে তাঁকে প্রসন্ন করে বললেন— না গো না! তুমিও কোনও অপরাধ করোনি আমার কাছে, পুত্র বভ্রুবাহনও কোনও অন্যায় করেনি। আর চিত্রাঙ্গদার কথা বলছ, সে তো সর্বদা আমার সঙ্গে দাসীর

মতো ব্যবহার করে, তার ওপরে আমি রাগ করব কী করে— ন জনিত্রী তথাস্যেয়ং মম বা প্রেষ্যবৎ স্থিতা।

উলূপী এবার সম্পূর্ণ ঘটনার আসল রহস্যটুকু ব্যক্ত করে বললেন— আমি যা করেছি, তার জন্য আমার ওপর রাগ কোরো না যেন, সত্যি কথা বলতে কি, আমি যা করেছি, তোমার ভালর জন্যই করেছি— ত্বৎপ্রিয়ার্থং হি কৌরব্য কৃতমেতন্ময়া প্রভো। ঘটনা হল— পূর্বে কৃত তোমারই এক অন্যায় অপরাধের জন্য পুত্র বভ্রুবাহনের হাতে তোমায় মরে প্রায়শ্চিত্ত করতে হল। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে তুমি পিতামহ ভীষ্মকে অন্যায় যুদ্ধে মেরেছিলে। তিনি যুদ্ধ করছিলেন না, সেই অবস্থায় শিখণ্ডীর সহযোগিতায় তুমি নিরস্ত্র অবস্থায় ভীষ্মকে মেরেছ। সেই পাপের যা ফল, তার শাস্তি ভোগ না করে তুমি যদি সময়কালে মৃত্যুবরণ করতে, তা হলে তোমায় নরকে যেতে হত। আর পুত্র বভ্রুবাহন তোমার যে অবস্থাটা করেছিল, সেটাই হল ওই পাপের শাস্তি— এষা তু বিহিতা শান্তিঃ পুত্রাদ্ যদ্ প্রাপ্তবানসি।

পুরো ঘটনা তবু রহস্যাবৃতই রয়ে গেল। এমনকী এ প্রশ্নও উঠতে পারে যে, ভীষ্মের প্রতি অর্জুন কী অন্যায় করেছেন, তার বিচারের ভার উলূপীর ওপর এসে বর্তাল কেন। উলূপী এবারে খুলে বললেন সমস্ত ঘটনা। বললেন— পূর্বে ভীষ্ম নিহত হলে বসুগণ গঙ্গাতীরে এসে গঙ্গায় স্নান করার পর তাঁকে বলেছিলেন— ভীষ্ম রণস্থলে অস্ত্রত্যাগ করেছিলেন, সেই অবস্থায় অর্জুন শিখণ্ডীকে সামনে রেখে ভীষ্মকে বধ করেছে। এই কাজের জন্য আমরা অর্জুনকে অভিশাপ দেব।

উলূপী গঙ্গাদ্বারের আবাসিক। তিনি বলেছেন— বসুগণের সঙ্গে গঙ্গার এই যে কথা হল এবং গঙ্গা যে অভিশাপের সমর্থনে আছেন, এ-কথা শুনে আমি খুব দুঃখ পেলাম এবং আমি সমস্ত ঘটনা আমার পিতার কাছে জানালাম। আমার দুঃখ দেখে আমার পিতা কৌরব্য নাগ বসুগণের কাছে গিয়ে তোমার মঙ্গলের জন্য অনেক যাচনা করলেন। তখন বসুগণ আমার পিতাকে বলেছিলেন— অর্জুনের পুত্র মণিপুরাধিপতি কুমার বভ্রুবাহন অর্জুনকে রণস্থলে ধরাশায়ী করবেন এবং তারপরেই অর্জুন আমাদের শাপ থেকে মুক্ত হবেন। পিতার কাছে এই বিবরণ শুনে আমি অভিশাপ থেকে তোমাকে মুক্ত করতে এসেছি এই মণিপুরে— তচ্ছ্রুত্বা ত্বং ময়া তস্মাচ্ছাপাদসি বিমোক্ষিতঃ।

এতক্ষণে বোঝা গেল— উলূপী কেন ছুটে এসেছিলেন এই মণিপুর রাজ্যে এবং কেনই বা বভ্রুবাহন পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে না চাইলেও তাঁকে জোর করে উলূপী যুদ্ধে প্ররোচিত করেছেন। পুত্রের হাতে যুদ্ধে পরাস্ত হবার মধ্যে যদি এতটুকু অবমাননার প্রশ্ন থাকে, সেখানে সান্ত্বনা দিয়ে উলূপী বলছেন— আমি এ-কথা বেশ জানি যে, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র আসলেও যুদ্ধে তিনি তোমাকে হারাতে পারবেন না, সেখানে যে তুমি পুত্রের হাতে পরাজিত হলে, এতে তোমার অপমানের কিছু নেই, কেননা পুত্র তো পিতার দ্বিতীয় আত্মা বলে শাস্ত্রে চিহ্নিত, তার হাতে পরাজিত হওয়ার মধ্যে কি কোনও দোষ আছে, তোমার কী মনে হয়— ন হি দোষো মম মতঃ কথং বা মন্যসে বিভো?

প্রত্যুত্তরে অর্জুন উলূপীকে 'দেবী' সম্বোধন করে বলেছেন— যা কিছু তুমি করেছ সব আমার প্রীতির জন্য, সব কিছুই আমার ভীষণ ভাল লেগেছে— সর্বং মে সুপ্রিয়ং দেবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদেতৎ কৃতবত্যসি। এর পরে উলূপী এবং চিত্রাঙ্গদার সামনে অর্জুন পুত্র বভ্রুবাহনকে বললেন— আগামী চৈত্র পূর্ণিমাতে যুধিষ্ঠির মহারাজের অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে, সেখানে তোমার দুই মা-কে নিয়ে, মন্ত্রী-অমাত্য সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত থাকতে হবে তোমাকে— তত্রাগচ্ছেঃ সহামাত্যো মাতৃভ্যাং সহিতো নৃপ। বভ্রুবাহন সবিনয়ে পিতা অর্জুনের নিমন্ত্রণ স্বীকার করলেন। কিন্তু তাঁর আরও কিছু বলার আছে, যেটা অর্জুনের ইচ্ছা সাপেক্ষ। আসলে বভ্রুবাহন তাঁর দুই মায়ের মনের কষ্টটুকু বোঝেন। সেই কবে মণিপুরে এসেছিলেন অর্জুন, তিন বছর এখানে ছিলেন এবং তাঁর জন্মের পরেই চলে যান। আর উলূপী তো আরও দুর্ভাগা। অর্জুনের সঙ্গ তিনি নিজেই যাচনা করেছিলেন একটিমাত্র দিন-রাতের অবসরে, তার পরে আর তাঁর দেখা পাননি উলূপী। বভ্রুবাহন এখন এতটাই বড় যে, দুই মায়ের এই স্বামী-বিরহের যন্ত্রণা তিনি বুঝতে পারেন, আর ঠিক সেই জন্যই পুত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি পিতা অর্জুনকে সানুরোধে বললেন— আমার প্রতি অনুগ্রহ করে আপনার এই দুই ভার্যার সঙ্গে অন্তঃপুরীতে প্রবেশ করুন এবং এ বিষয়ে আপনি কোনও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, তর্ক-বিতর্কের আশ্রয় নেবেন না— ভার্য্যাভ্যাং সহ ধর্মজ্ঞ মা ভূত্তেহত্র বিচারণা। আপনি আপনার নিজের ঘরে সুখে একরাত্রি বাস করে, আবার এই যজ্ঞীয় অশ্বের অনুবর্তন করবেন আগামীকাল— উষিত্বেহ নিশামেকাং সুখং স্বভবনে প্রভো।

পুত্র হলেও পিতার প্রতি বভ্রুবাহনের বক্তব্যে তাঁর চির-বিরহিত জননী এবং বিমাতার জন্য কিছু সংকেত ছিল, যে সংকেত বুঝতে দেরি হয়নি বিদগ্ধ নায়ক অর্জুনের। তিনি সব বুঝেই বলেছেন— পুত্র! তোমার ভাবনা এবং আগ্রহটুকু আমি বুঝি। কিন্তু আমি এই যজ্ঞীয় অশ্বকে অনুসরণ করার জন্য দীক্ষিত হয়েছি। আমার পক্ষে কোনও নগরের গৃহকোণে থাকা সম্ভব হবে না। যেখানে এই অশ্ব যাবে সেখানে আমায় যেতে হবে, যেখানে থাকবে সেখানেই আমায় থাকতে হবে— যথাকামং ব্রজত্যেব যজ্ঞীয়াশ্বো নরর্ষভ— অতএব কোনও উপায় নেই যাতে আমি রাত্রিবাস করতে পারি তোমার নগর-গৃহে।

অর্জুন চলে গেছেন অশ্ব নিয়ে। উলূপী আর চিত্রাঙ্গদার জন্য রইল আগামী চৈত্রী পূর্ণিমার অপেক্ষা। বেশি তো দেরি করতে হয়নি। পরের চৈত্রী পূর্ণিমাতে যাবার কথা, হয়তো আগের ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে দুই বহিশ্চরা স্ত্রীকে আহ্বান জানিয়ে গেছেন অর্জুন। বড় বড় যজ্ঞ সেকালে বসন্তকালেই আরম্ভ হত, কিন্তু সেই বসন্তের সঙ্গে অর্জুনের দুই বহিশ্চরা বাসন্তিকা এমন মিলে যাবে, সে-কথা ভাবা যায়নি আগে। আসলে দ্রৌপদী এবং সুভদ্রা, বিশেষত সুভদ্রা অর্জুনের জীবনে এমনভাবেই সামাজিকীকৃত হয়েছিলেন যাতে উলূপী এবং চিত্রাঙ্গদাকে সারাজীন বহিশ্চরা অবস্থাতেই থাকতে হয়েছে। এবারে এই অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে মহাভারতের কবি তাঁদের নিয়ে এসেছেন হস্তিনার অন্তঃপুরে, কেননা মহাভারতের কেন্দ্রীয় নায়কের সঙ্গে যাঁদের বিধিসম্মত বিবাহ হয়েছিল, তাঁদের বাইরে ফেলে রাখা যায় না। অশ্বমেধ যজ্ঞের মাহাত্ম্যে আজ এই দুই বহিশ্চরা রমণীর সামাজিক সিদ্ধতা সৃষ্টি করেছেন মহাভারতের কবি।

পৃথক একটা অধ্যায়ের আরম্ভটুকুই ব্যয়িত হয়েছে অর্জুনের এই দুই ভার্যার আগমন বর্ণনায় এবং তাঁদের হস্তিনাপুরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করাচ্ছেন পুত্র বভ্রুবাহন। বভ্রুবাহন তাঁর

জননী চিত্রাঙ্গদা এবং বিমাতা উলূপীকে নিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞে যোগ দিতে এলেন— মাতৃভ্যাং সহিতো ধীমান্ কুরূনভ্যাজগাম হ। সেখানে এসে সভাগৃহের মান্যজনদের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করেই বভ্রুবাহন তাঁর দুই মাকে নিয়ে প্রবেশ করলেন পিতামহী কুন্তীর ঘরে। বেঁচে থাকা নাতিদের মধ্যে তিনিই তো বোধ হয় একমাত্র। নাতি-পিতামহীতে অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা হল এবং এবার এই পুত্রের অন্তরাল সরিয়ে দুই রমণী একসঙ্গে এলেন শাশুড়ি কুন্তীর কাছে এবং জ্যেষ্ঠা সপত্নী কৃষ্ণা দ্রৌপদীর কাছে— পৃথাং কৃষ্ণাঞ্চ সহিতে বিনয়েনোপজগ্মতুঃ।

বেশ বোঝা যায়, সেকালে জ্যেষ্ঠা সপত্নীর সম্মান ছিল প্রায় শাশুড়ির মতোই। বিশেষত কৃষ্ণা দ্রৌপদী, তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর বিদগ্ধতা এবং তাঁর নিজস্বতা তাঁকে এমন একটা মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিল যে, তাঁকে অতিক্রম করা অর্জুনের সাধ্য ছিল না। যে-কালে অর্জুন কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রাকে বিয়ে করে হস্তিনায় নিয়ে এসেছিলেন, সেইকালেই তাঁকে দ্রৌপদীর অভিমান-উচ্চারণ শুনতে হয়েছিল এবং সেটা এই কারণে নয় যে, অর্জুন আরও একটা বিবাহ করেছেন, তাই। সেটা শুনতে হয়েছিল এই কারণে যে, দ্রৌপদী নিজেকে অতিক্রান্ত বোধ করেছিলেন। কিন্তু সুভদ্রা যে মুহূর্তে দীনবেশে দ্রৌপদীর সামনে এসে নিজেকে দাসী বলে পরিচয় দিয়েছিলেন, সেই মুহূর্ত থেকেই সুভদ্রা তাঁর সমস্ত স্নেহটুকু জয় করে নিয়েছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, মহাকাব্যের যুগে পট্টমহিষীর মর্যাদা ছিল রাজবাড়ির সঙ্গে অনেকটা সংপৃক্ত, তারপরেই প্রশ্ন আসত স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর বহুকালিক সম্পর্কের। ঠিক এই কারণে পট্টমহিষী হবার জন্য দ্রৌপদীর মর্যাদা ছিল রীতিমতো রাজকীয়, অন্যদিকে সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের সম্পর্ক যেহেতু বহুকালিক এবং ঐকান্তিক, তাই তিনি উলূপী এবং চিত্রাঙ্গদার সর্বকনিষ্ঠা সপত্নী হলেও, সুভদ্রার মর্যাদা তাঁদের চেয়ে বেশি হয়ে গিয়েছিল। এই জন্যই শাশুড়ির সঙ্গে এবং মর্যাদার অনুক্রমে দ্রৌপদীর সঙ্গে সবিনয়-সাক্ষাতের পরে সুভদ্রার সঙ্গেও দেখা করেছেন উলূপী এবং চিত্রাঙ্গদা— সুভদ্রাঞ্চ যথান্যায়ং যাশ্চান্যাঃ কুরুযোষিত।

বলতে গেলে এই প্রথম অর্জুনের বিধিসম্মত স্ত্রী-পরিচয়ে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করছেন উলূপী এবং চিত্রাঙ্গদা। তাঁদের প্রতি কুন্তী, দ্রৌপদী এবং সুভদ্রার সম্মান-সৎকারটুকুও রীতিমতো মহাকাব্যিক উদারতায় চিহ্নিত। তাঁরা অর্জুনের এই বহিশ্চরা দুই স্ত্রীকে বহুতর ধন-রত্ন-বসন উপহার দিয়ে প্রায় নতুন বউয়ের মতো বরণ করে নিয়েছেন হস্তিনার রাজবাড়িতে। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, এখানে কোনও ঈর্ষার ব্যাপারও ছিল না। দ্রৌপদী এবং সুভদ্রা অর্জুনের এই দুই স্ত্রীর পরিচয় জানতেন না, বা কোনওদিন তাঁদের কথা শোনেননি এমন মোটেই নয়, কিন্তু যেহেতু তাঁরা অর্জুনের অন্দরমহলে আসেননি, অতএব এই নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা হল সেই মহাকাব্যিক উদারতা।

এটা সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার, অথবা বলা উচিত— খেয়াল করার মতো ব্যাপার যে, দ্রৌপদী এবং সুভদ্রা— যাঁদের মধ্যে প্রথম জন অর্জুনের মতো স্বামীর অগ্রভাগটুকু পেয়েছিলেন এবং দ্বিতীয়জন অর্জুনের সমস্ত ঐকান্তিকতা লাভ করেছিলেন— এঁরা কেউই উলূপী এবং চিত্রাঙ্গদার ওপরে এতটুকু ঈর্ষা-অসূয়াগ্রস্ত ছিলেন না। বস্তুত যৌনতার ক্ষেত্রে পুরুষের এই আকস্মিক বিচলন নিয়ে মহাকাব্যিক রমণীরা প্রকটভাবে আহত হননি কখনও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়তো প্রাচীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পৌরুষের শক্তির প্রাধান্যেই পুরুষের এই বিচলন মেনে নিয়েছেন বিবাহিত রমণীরাও। কিন্তু পৌরুষেয়তাই বোধ হয় সর্বাংশে সত্যি নয়। কেননা উলূপীর মতো এক নাগ-রমণীও তো আপন স্বাধীনতায় বিচরণ করতে পেরেছেন। তিনি যেমন নিজের কারণে অর্জুনের প্রতিজ্ঞাত ব্রহ্মচর্যের স্খলন ঘটিয়ে দিয়েছিলেন এবং বিয়েও করেছিলেন অর্জুনকে, তেমনই অর্জুনও নিজের স্বাধীনতায় যদি অন্য কোথাও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আত্মলাভ করে থাকেন তাতেও আবার দ্রৌপদী-সুভদ্রা কিছু মনে করেন না। তবে এটাকে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কে— 'তুমি যখন এটা করতে পারো, আমিও তেমনি ওটা করতে পারি'— এইরকম একটা দ্বন্দ্বের বিষয় না ভেবে মহাকাব্যের রমণীদের স্বাভাবিক উদারতা ভেবে নেওয়াটাই ভাল বলে মনে হয়।

এতকাল পরে যে দুই প্রবাসী রমণী তাঁদের প্রৌঢ় বয়সে কুরুগৃহে প্রবেশ করলেন বধূর মতো, তাঁদের সানন্দ মনে বরণ করে নিলেন জননী কুন্তী, দ্রৌপদী এবং সুভদ্রাও। প্রচুর ধন-রত্ন দিয়ে তাঁদের প্রবেশ করানো হল কুরুবাড়ির অন্দরমহলে। তাঁদের জন্য মহার্ঘ শয়ন এবং আসনযুক্ত পৃথক মহলও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল বোধ হয়। তাঁরা সেখানে থাকতে আরম্ভ করলেন— উষতুস্তত্র তে দেবৌ মহার্হশয়নাসনে। স্বয়ং কুন্তী তাঁদের এই বাসস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা দিয়েছেন শুধু অর্জুনের ভাল লাগবে বলে। এতকাল অর্জুন তাঁর এই বিবাহিতা দুই পত্নীকে শ্বশুরবাড়ির ঘর দিতে পারেননি, আজকে কুন্তী সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন নিজে— সুপূজিতে স্বয়ং কুন্ত্যা পার্থস্য হিতকাম্যয়া। কুন্তী এটা বুঝেছেন যে, এই সুদূরপ্রোষিত রমণীদের ওপর কিছু অবিচার ঘটেছে; এঁরা নিজেরাও অবশ্য সাগ্রহে সে বিচার চানওনি, কেননা শ্বশুরবাড়িতে থাকার অধিকার নিয়ে এই স্বাধীনা ব্যক্তিত্বময়ী রমণীদের খুব একটা মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু স্বয়ং কুন্তী তাঁর পুত্রের বিবাহিতা পত্নীদের প্রতি অবিচার হয়েছে এবং তা অর্জুনের দিক থেকেই হয়েছে মনে করে অর্জুনের অপরাধ প্রশমিত করার জন্যই তাঁদের যথোচিত ব্যবস্থা করেছেন। হয়তো সেইজন্যই মহাভারতের কবির এই অপরাধবোধী শব্দ উচ্চারণ— পার্থস্য হিতকাম্যয়া।

অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষ হয়ে গেছে। সমাগত রাজা-রাজড়ারা সকলে আপন আপন রাজ্যে ফিরে গেছেন। তাঁদের সঙ্গে ফিরে গেছেন মণিপুরের রাজা বভ্রুবাহন। অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার পুত্র বভ্রুবাহন তাঁর জননী এবং বিমাতা উলূপীকে তাঁদের আযৌবন-হৃদয়-লালিত স্বামীর সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে নিজে ফিরে গেছেন রাজ্যে কিন্তু মায়েদের আর সঙ্গে নিয়ে যাননি। তাঁরা যে স্বেচ্ছায় অর্জুনের ঘরে রয়ে গিয়েছিলেন, আর ফিরে যাননি আপন স্বাধীনতার মধ্যে, তার প্রমাণ রয়ে গেছে মহাভারতের কবির বয়ানে। দেখতে পাচ্ছি— পুত্রশোকাহতা বৃদ্ধা গান্ধারীর সবরকম পরিচর্যার জন্য কুন্তী, দ্রৌপদী এবং সুভদ্রা যে যত্ন নিচ্ছেন, সেই যত্নের সমান দায় বহন করছেন অর্জুনের আর দুই স্ত্রীও, উলূপী এবং চিত্রাঙ্গদা— উলূপী নাগকন্যা চ দেবী চিত্রাঙ্গদা তথা।

একটা সময় তো এসেছে যখন ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী সংসারের সমস্ত সম্পর্ক মুক্ত হয়ে বনে চলে গেছেন এবং তাঁদের সঙ্গে গেছেন কুন্তী, পঞ্চপাণ্ডবের জননী। হস্তিনার রাজধানীতে যাঁরা রয়ে গেলেন, তাঁরা কিন্তু এই বানপ্রস্থ-ব্রতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ভুলতে পারেননি। একসময়

কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেবের অনুরোধে দ্রৌপদীর মতো ব্যক্তিত্বময়ী রমণীও যুধিষ্ঠিরের কাছে প্রার্থনা করেছেন যাতে সকলে মিলে একবার দূরপ্রস্থিনী কুন্তীর সঙ্গে দেখা করে আসা যায়, অনুষঙ্গে দেখা করা যায় গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গেও। যুধিষ্ঠির সকলের সঙ্গে পাণ্ডব-ঘরের সমস্ত বউদেরও নিয়ে গেছেন কুন্তীর নির্জন অরণ্যবাসে।

এইখানেই আরও এক গভীরতর পরিচয়ে দেখতে পেলাম উলূপী আর চিত্রাঙ্গদাকে। দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং পাণ্ডবগৃহের অন্যান্য বউদের সঙ্গে উলূপী আর চিত্রাঙ্গদাও এসেছেন কুন্তীর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁরা সকলে এসে দেখলেন— কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী অরণ্যবাসী তপস্বীদের সঙ্গে সহাবস্থান করছেন। তপস্বীরা পাণ্ডব-ভাইদের নাম শুনেছেন, তাঁদের স্ত্রীদের নামও শুনেছেন, কিন্তু চাক্ষুষ কাউকে চেনেন না। তাঁরা সকলের পরিচয় জানতে চাইলে সর্বাভিজ্ঞ সঞ্জয় একে একে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পাণ্ডব-ভাইদের পরে যখন তাঁদের স্ত্রীদের পালা এল, তখন দ্রৌপদীর পরিচয় দিতে গিয়ে চিরযৌবনবতী কৃষ্ণা দ্রৌপদীর সম্বন্ধেও সঞ্জয়কে একবার বলতে হচ্ছে— মাঝবয়স যাঁকে প্রায় ছুঁয়ে দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে— কিন্তু উলূপীর কথা বলার সময়— তাঁরও তখন নিশ্চয়ই মাঝবয়স ছুঁই ছুঁই— কিন্তু তবু তাঁর সম্বন্ধে বলতে হচ্ছে— জাম্বুনদের কাঁচা সোনার মতো যাঁর গায়ের রং, চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধে— শিশিরসিক্ত ভেজা মহুয়াফুলের মতো রং যাঁর— এ-সব কথা থেকে বোঝা যায়— পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইয়ের জীবনধারণের একান্ত কৃচ্ছ্রতাগুলি কৃষ্ণা দ্রৌপদীকে এতদিনে যত ক্লান্ত ক্লিষ্ট মাঝবয়সি করে তুলেছে, এঁদের তা করেনি। হয়তো চেহারার দিক দিয়ে উলূপী চিত্রাঙ্গদা তখনও দ্রৌপদীর চেয়ে সুন্দরী। কিন্তু সৌন্দর্য্যের থেকেও বড় কথা, তপস্বীদের সঙ্গে এই পরিচয়ে উলূপী এবং চিত্রাঙ্গদার মতো প্রায় অর্ধেক-চেনা অর্জুনের এই দুই স্ত্রীর 'আইডেনটিটি'-র প্রতিষ্ঠা হয়েছে পূর্ণ মর্যাদায়। চিত্রাঙ্গদার তত প্রয়োজন না হলেও উলূপীর বোধ হয় এই পরিচয়-মাহাত্ম্য প্রকৃত পরিচয়ই ছিল— ইয়ঞ্চ জাম্বুনদশুদ্ধগৌরী পার্থস্য ভার্যা ভুজগেন্দ্রকন্যা।

জাম্বুনদের সোনার তুলনাটা প্রায়ই আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাহীন প্রেমের তুলনায় ব্যবহৃত হয়। উলূপীর গাত্রবর্ণের কথা বলতে গিয়ে এই শব্দ স্মরণ, এটা তাঁর প্রেমেরও উপলক্ষণ বটে। হ্যাঁ, এটা মানি যে, প্রথমদিন অর্জুনকে আত্মগত করার জন্য তিনি নিতান্তই আপন শারীরিক আকাঙ্ক্ষার কথা স্বকণ্ঠে জানিয়েছিলেন। কিন্তু তার পর? তার পর একদিনের জন্যও কি অর্জুনের শরীরসঙ্গ পেয়েছিলেন তিনি? অথচ অর্জুনকে তিনি ভোলেননি কোনওদিন। কোলে যে ছেলেটি পেয়েছিলেন তাকেও পাঠিয়েছিলেন অর্জুনের কাছে; অর্জুন তাঁকে যুদ্ধের কাজে লাগিয়েছিলেন এবং সে মারা যায়। পুত্রের এই আকস্মিক মৃত্যুতেও তাঁকে শোকগ্রস্ত দেখিনি এবং তাঁর দিক থেকে কোনও দোষারোপও নেমে আসেনি অর্জুনের ওপর। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে, যখন চিত্রাঙ্গদার গৃহে তাঁকে ছুটে আসতে দেখি। ভীষ্মের মৃত্যুর কারণে অর্জুনের ওপরে বসুগণের অভিশাপ এবং তাতে অর্জুনের নরকদর্শনের সম্ভাব্যতা তর্কযুক্তির বিষয় হতে পারে, কিন্তু অর্জুনের জন্য উলূপীর দুর্ভাবনার অংশটুকুই এখানে জরুরি, কেননা এই ভাবনা এবং দুর্ভাবনার মধ্যেই অর্জুনের জন্য উলূপীর ভাবটুকু লুকোনো আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারাজীবন অর্জুনের জন্য এবং অর্জুনের জন্যই শুধু ভেবে গেছেন উলূপী। বস্তুত ক্ষত্রিয়ের ঘরে অর্জুনের ঔরসে যে পুত্র জন্মেছিল, সে ইরাবানই হোক অথবা বভ্রুবাহন— সে যদি যুদ্ধের ভয়ে অথবা পিতার সম্মান রাখার জন্য যুদ্ধ এড়িয়ে কৃতাঞ্জলি হত, এবং তা যদি অর্জুনকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হত, তা হলে সেটাই হত অর্জুনের মতো মহাবীরের পক্ষে নরক-দর্শন। উলূপী অর্জুনকে এই নরকদর্শন থেকে বাঁচিয়েছেন তাঁর আন্তরিক বোধ-সমতায়। হতে পারে, হ্যাঁ, উলূপী যেভাবে প্রথমে অর্জুনকে চেয়েছিলেন, তাতে এমন মতেই হতে পারে যে, সে যেন এক তামসী আকাঙ্ক্ষা। আর সে আকাঙ্ক্ষাও তো খুব অস্বাভাবিক নয়, কেননা সেই সদ্য যুবতীর স্বামী মারা গিয়েছিল জীবনের সমস্ত স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি ধ্বংস করে দিয়ে। সেই তিনি যদি একবার অর্জুনের মতো পুরুষকে দেখে কামবিদগ্ধ হয়ে তাঁর প্রাথমিক বৃত্তিতে অর্জুনের আসঙ্গলিপ্সায় মত্ত হয়ে ওঠেন, তবে তার মধ্যে রাজসী ভালবাসার লক্ষণ যদি থেকেও থাকে, সে ভালবাসাও একদিন সাত্ত্বিকতায় উত্তীর্ণ হয়েছিল অর্জুনের অপেক্ষায়, হিতকামনায় এবং অন্তরসাম্যের ভাবনায়। ঠিক এই কারণেই তাঁর প্রৌঢ় বয়সে এমন মর্ত্য থেকে স্বর্গে পরিণতি, ফুল থেকে ফলে পরিণতি। উলূপীর অবস্থিতি তখন হস্তিনার অন্তঃপুরে, তাঁর পরিচয় তখন— পার্থস্য ভার্য্যা ভুজগেন্দ্রকন্যা।

খেয়াল করে দেখবেন; কাব্যে, নাটকে এবং মহাকাব্যে সর্বত্রই পার্শ্বচরিত্র থাকে। অনেক সময়েই পার্শ্বচরিত্রের আরম্ভ এবং তার কিছু কাব্য-নাট্যোচিত সহায়তাও দেখতে পাই, কিন্তু সেই চরিত্রের শেষ দেখা যায় না, তাদের পরিণতি দেখতে পাই না। যদি মহাকবিদের ঈঙ্গিত অনুসন্ধান করলে বোঝা যায়— যে-সব চরিত্রের আরম্ভ আছে পরিণতি নেই, তাঁরা মূল চরিত্রগুলির সহায়ক-মাত্র, আপন সত্তায় তাঁরা সম্পূর্ণও নন, মূল চরিত্রগুলির জীবন-কাহিনিতেও তাঁরা অংশীদার নন। আমরা কিন্তু চিত্রাঙ্গদা বা উলূপীকে এই ছাঁচে ফেলতে পারি না। হয়তো অর্জুনের বিশাল-বিচিত্র জীবনের মধ্যে উলূপী বা চিত্রাঙ্গদার অংশ দ্রৌপদী বা সুভদ্রার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর, এমনকী উলূপীর জীবনও খানিকটা চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে জুড়ে গেছে, কিন্তু তবুও সেই উলূপীরও কিন্তু একটা আরম্ভ, সত্তা এবং পরিণতি আছে। তিনিই অর্জুনের স্বারোপিত ব্রহ্মচর্যের বাঁধন আলগা করে দিয়ে চিত্রাঙ্গদা এবং সুভদ্রার প্রেমের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছেন। অন্যদিকে প্রৌঢ় বয়সে হলেও তিনি পতিগৃহে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। অবশেষে তাঁর জীবনের শেষ পরিণতি দেখিয়ে দিয়ে উলূপীর সঙ্গে অর্জুনের স্বামী-স্ত্রী, চিরন্তন সম্পর্কটুকু প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন ব্যাস।

মহাকাব্যের শেষ অঙ্কে মহাপ্রস্থানের পথ। স্বভাবতই পট্টমহিষী দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে পঞ্চপাণ্ডব যাত্রা করেছেন দুর্গম যাত্রায়। কুরুবাড়ির অন্যান্য স্ত্রীরা পাণ্ডবদের বিদায় জানিয়ে হস্তিনাতেই রয়ে গেলেন কুমার পরীক্ষিতের কাছে। অর্জুনের স্ত্রীদের মধ্যে সুভদ্রা যেহেতু পরীক্ষিতের পিতামহী এবং তাঁকে যেহেতু কুমার পরীক্ষিতের অভিভাবিকা হিসেবে হস্তিনায় রেখে গিয়েছিলেন যুধিষ্ঠির, তাই তাঁর অন্য কোথায় যাবার প্রশ্ন উঠল না। কিন্তু অর্জুনের প্রস্থানে চিত্রাঙ্গদার আর মন টিকল না হস্তিনায়। তিনি চলে গেলেন পুত্র বভ্রুবাহনের কাছে মণিপুরে। উলূপী কিন্তু হস্তিনাতেও থাকলেন না, পিত্রালয়েও ফিরে গেলেন না, তিনি ঝাঁপ দিলেন গঙ্গায়— বিবেশ গঙ্গাং কৌরব্য উলূপী ভুজগাত্মজা।

উলূপীর গঙ্গাপ্রবেশের ঘটনা আসলে আত্মবিসর্জন, নাকি গঙ্গা শব্দের লক্ষণায় এটা সেই গঙ্গাদ্বারে অবস্থিত তাঁর পিত্রালয়ে গমন, সে-বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈধ থাকতে পারে, কিন্তু মহাকবির শব্দচয়নে চিত্রাঙ্গদার মণিপুর গমনে যেহেতু কোনও অস্পষ্টতা নেই, সেখানে উলূপী পিত্রালয়ে প্রস্থান করে থাকলে সেটাও স্পষ্টই বোঝা যেত তাঁর শব্দ-প্রয়োগের বিশেষত্ব থেকে। বস্তুত উলূপীর গঙ্গাপ্রবেশের ঘটনাকে আমরা আত্মবিসর্জন বা আত্মহত্যার ঘটনা বলেই মনে করি। চিত্রাঙ্গদার তবু একটি পুত্র ছিল— তাঁর মানসিক আশ্রয়। উলূপী শুধু অর্জুনকেই চেয়েছিলেন— প্রথমে শরীর দিয়ে, পরে মন দিয়ে। অর্জুনের মহাপ্রস্থানের অর্থ উলূপী বোঝেন, তিনি জানেন যে, মহাপ্রস্থান মানেই মনুষ্যজীবনের অন্তিম পথ। অতএব অর্জুন যে পৃথিবীতে থাকবেন না, উলূপীও সেই পৃথিবী পরিত্যাগ করে প্রবেশ করেছেন গঙ্গায়— যে গঙ্গায় তিনি প্রথম দেখেছিলেন স্নানরত অর্জুনকে, যে গঙ্গা তাঁর প্রিয় মিলনের প্রথম কুঞ্জকুটীর। অর্জুন চলে যেতেই জীবনের সমস্ত সরসতা নীরস ভেবেই উলূপী প্রবেশ করেছেন গঙ্গায়— বিবেশ গঙ্গাং কৌরব্য উলূপী ভুজগাত্মজা। মহাভারতের কবি গঙ্গার মধ্যে যাঁর শারীরবাসর রচনা করেছিলেন, তাঁর অন্তিম পরিণতি রচনা করলেন গঙ্গার গভীরেই, তবে সেটা আত্মবিসর্জনের মাহাত্ম্য, প্রিয়তমের বিরহে, আত্মপীড়নের ঐশ্বর্যে। ঠিক এই উলূপী আর চিত্রাঙ্গদার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রইলেন না, মরে গিয়ে তিনি বেঁচে রইলেন রমণীয় স্বতন্ত্রতায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুভদ্রা

ছোটবেলায় যেমনটি পড়েছি, যেমনটি ভেবেছি সবই এখন উলটো হয়ে গেছে। তখন কত হবে— এই বারো-তেরো বছর বয়স। কৈশোরগন্ধী সেই বয়সে যখন অর্জুনের সুভদ্রাহরণ পড়তাম কাশীরাম দাসের পয়ারে, তখন নিজেকে অন্য এক পৃথক জগতের অধিবাসী মনে হত। সে এক অদ্ভুত বীরের জগৎ। নিজের বোন সুভদ্রাকে নিয়ে পালাবার জন্য কৃষ্ণ নিজের রথখানি সারথি সহ ছেড়ে দিয়েছেন অর্জুনকে। কৃষ্ণের সারথি দারুক সবেগে রথ নিয়ে পালাচ্ছেন। পিছনে বলরামের প্ররোচনায় সমস্ত যদুবীরেরা অর্জুনের পিছনে ধাওয়া করেছেন তাঁকে ধরে আনবার জন্য। সুভদ্রাকে অর্জুনের সঙ্গে বিয়ে দিতে সম্মত নন বলরাম, তাঁর পছন্দের পাত্র হলেন ধার্তরাষ্ট্র দুর্যোধন। যাই হোক, বাঘা-বাঘা যদুবীরেরা যখন অর্জুনকে যুদ্ধাহ্বান জানাচ্ছেন এবং সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মহাবীর অর্জুন যখন রথ ঘোরাতে বলছেন, তখন সারথি দারুক রথ চালাতে অস্বীকার করে বসলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল— স্বর্গের ইন্দ্রভবনে তুমি পালাতে চাও, তো বল, আমি সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। কিন্তু কৃষ্ণের এই রথে চড়ে তুমি কৃষ্ণেরই ছেলেদের ওপর বাণ-নিক্ষেপ করবে, সে আমি পারব না— মম শক্তি নহিবে তুরগ চালাইতে।

মহাবীর পাণ্ডব-ধুরন্ধর অর্জুন এ যুক্তি মানতে পারেন না। তিনি বললেন— আমাকে পেছন থেকে যুদ্ধে ডাকছে, আর সেই যুদ্ধাহ্বান শুনেও আমি পালাব? এই যুদ্ধে কৃষ্ণের ছেলে কেন, স্বয়ং কৃষ্ণও যদি আসেন, যদি আসেন ভীম-যুধিষ্ঠির, তবুও আমাকে যুদ্ধ করতে হবে। এই আমার ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। আমি বুঝতে পারছি—এই ভীষণ যুদ্ধে কৃষ্ণপুত্রদের প্রতি মমতায় তুমি আমার যুদ্ধ পণ্ড করবে। তার চেয়ে ছাড়ো তোমার ঘোড়ার লাগাম— ফেলহ প্রবোধবাড়ি ছাড় কড়িয়ালি। শুধু কথা বলেই ক্ষান্ত হলেন না অর্জুন। তিনি দারুককে পাশ-অস্ত্রে বেঁধে রথস্তম্ভের সঙ্গে বেঁধে রাখলেন। তারপর 'এক পদে কড়িয়ালি আর পদে বাড়ি। ধনুর্গুণ টঙ্কারি রহিলেন বাহুড়ি।' অর্জুন যেভাবে পায়ে ঘোড়া চালিয়ে হাতে ধনুর্বাণ নিয়ে সম্মুখে ফিরলেন, তাতে আজকের হিন্দি ফিল্মের নায়করাও সংকুচিত বোধ করবেন।

কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। অর্জুনকে এইভাবে কষ্টকর অবস্থায় যুদ্ধ করতে দেখে রথস্থিতা সুভদ্রা, যিনি অর্জুনের প্রতি মুগ্ধতায় আপনিই তাঁর প্রেমে ধরা দিয়ে ভাইবন্ধু ছেড়ে অর্জুনের সঙ্গে পালিয়ে যাবার জন্য রথে উঠেছেন, সেই সুভদ্রা সদ্যপরিচিত অর্জুনকে বললেন—

মহাবীর এত কষ্ট কেনে?
আজ্ঞা কর আমারে চালাই অশ্বগণে ॥...

আজ্ঞা কর রথ চালাইব কোন পথে?
এত বলি কড়িয়ালি বাড়ি নিল হাতে ॥
চালাইয়া দিল রথ বায়ুবেগে চলে।
না দেখিতে গেল রথ আদিত্যমণ্ডলে ॥

লক্ষণীয়, এই যুদ্ধ অর্জুন জিতেছিলেন এবং কাশীরামের ছন্দোবন্ধে এই যুদ্ধ জয়ের কৃতিত্ব অর্জুনের যত ছিল, তার থেকে সুভদ্রার কম ছিল না। যুদ্ধে হারার পর যাদব-বৃষ্ণিদের দুত বলরামের কাছে এসেছিল এবং সে—

উর্ধ্বশ্বাসে কহে বার্তা কান্দিতে কান্দিতে।
আর রক্ষা নাহি প্রভু অর্জুনের হাতে ॥
সুভদ্রা চালায় রথ না পারি দেখিতে।
কখন আকাশে উঠে কখন ভূমিতে ॥

ছোটবেলায় সেই কৈশোরগন্ধী বয়সে অর্জুনের এই নবপ্রণয়িনী বধূটি যে বীররমণীর সংবাদ দিয়েছিল মনে, তার রেশ আমি এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। ব্যাসদেবের মূল মহাভারতে সুভদ্রার বিবরণ অনেক মন দিয়ে পড়েছি, কিন্তু বাঙালি কাশীরাম সেই বালকের মনে সুভদ্রার সম্বন্ধে যে বীরভাব সংক্রমিত করেছিলেন, তাতে এখনও মনে হয়— এই সুভদ্রা খণ্ডে কাশীরাম ব্যাসদেবকে একেবারে টেক্কা দিয়ে বেরিয়ে গেছেন। যে রমণী দু'দিন আগে যদুবৃষ্ণিদের স্নেহবশীভূতা ছিলেন, তিনি অর্জুনের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে তাঁদেরই বিরুদ্ধে ভাবী স্বামীকে সাহায্য করছেন— রমণীর এই বীরচরিত্র আমাকে এখনও অভিভূত করে।

সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাসের মহাকাব্যে সুভদ্রার চরিত্রগতি এত বিচিত্র নাটকীয়তায় ধরা পড়েনি, তবু বাঙালি কাশীরামের আলম্বন যেহেতু ব্যাসই, তাই ব্যাসের সুভদ্রার মধ্যে এই বীরস্বভাবের বীজ নিহিত ছিল নিশ্চয়ই এবং সে বীজ সেইভাবে পত্রে-পুষ্পে বিকশিত হয়নি বলেই তিনি বেশ খানিকটা উপেক্ষিতা বলে মনে হয়। মহাকাব্যের কবির দৃষ্টিতে এই উপেক্ষার কারণও হয়তো ছিল।

সুভদ্রার বংশ-পরিচয় একটা বিরাট কিছু নয়। কোনও মতে তিনি বসুদেবের অন্যতমা পত্নী রোহিণীর মেয়ে। এই সূত্রে তিনি বলরামের সাক্ষাৎ সহোদরা ভগিনী। অন্য একটি মতে তিনি কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভাই সারণের ভগিনী। অবশ্য সুভদ্রা বলরামেরই সহোদরা ভগিনী হোন অথবা সারণের ভগিনীই হোন, কৃষ্ণ তাঁকে সহোদরা ভগিনীর চেয়েও বেশি ভালবাসতেন এবং সেই ভালবাসার প্রমাণও তিনি দিয়েছেন অনেকভাবে।

সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের যোগাযোগ যেভাবে ঘটেছিল, তা আধুনিক অনেক প্রণয়কাহিনিকেও হার মানাবে। কিন্তু সে কথায় যাবার আগে অর্জুনের মানসিক অবস্থাটুকু আমাদের একটু জেনে নেওয়া দরকার। মনে রাখতে হবে, তখন দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চ পাণ্ডবের বিবাহ হয়ে গেছে। অর্জুনই যেহেতু লক্ষ্য ভেদ করে দ্রৌপদীকে জিতেছিলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতে দ্রৌপদীর ওপরে তাঁরই অধিকার সবচেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু ভাগ্যের অন্যথা-নিয়মেই হোক অথবা ঘটনার চক্রজালেই হোক দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীর পত্নীত্ব লাভ করলেন। অর্জুনের সঙ্গে একান্ত যোগাযোগ তাঁর হল না। কিংবা অর্জুনও এককভাবে পেলেন না দ্রৌপদীর অধিকার। এতে দুই পক্ষেরই কোনও মানসিক অবসাদ ঘটেছিল কিনা, মহাভারতের কবি তা স্বকণ্ঠে বলেননি। মহাকাব্যের অভিসন্ধিতে সে-কথা বলার প্রয়োজনও হয়তো বোধ করেননি তিনি। কিন্তু ঘটনা হল— দ্রৌপদী কিংবা অর্জুনের চরিত্র পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়— যা আমি অন্যত্র করেওছি— তাতে বোঝা যায় যে, অর্জুনকে একান্তভাবে পাবার জন্য দ্রৌপদীর অন্তর্দাহ কম ছিল না। অন্যদিকে অর্জুন যেহেতু উদারসত্ত্ব এক মহানায়ক, তাই পঞ্চস্বামীর অধিকারভুক্ত দ্রৌপদীর অধিকার থেকে নিজেকে সব সময় সরিয়ে রেখেছেন নায়কোচিত উদারতায়। কিন্তু তাই বলে দ্রৌপদীর জন্য তাঁর হৃদয় কখনও বিদীর্ণ হত না, একথা ভাবার কোনও কারণ নেই।

বিশেষত দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের বিবাহের পরপরই যে দুর্ঘটনা ঘটল, তাতে অর্জুনের দিক থেকে একটা মানসিক বিক্রিয়া হওয়ার কারণ অবশ্যই ছিল। ইংরেজিতে এই বিক্রিয়ার খুব ভাল একটা প্রতিশব্দ আছে— 'ফ্রাস্ট্রেশন'।

কিন্তু অমন যে ধীর-স্থির, উদাত্ত-গম্ভীর তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন, তাঁর জীবনের প্রথম ভাগেই এমন যে একটা 'ফ্রাস্ট্রেশন' আসবে, তা কে জানত। স্বয়ংবর-সভায় আপন বীর্যে দ্রৌপদীকে লাভ করার পরেও নায়কোচিত উদারতায় দ্রৌপদীর অংশ-স্বামিত্ব নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন তিনি। নারদ মুনির সামনে পাঁচ ভাই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যেন দ্রৌপদীর কারণে ভাইদের মধ্যে ভেদসৃষ্টি না হয়। তাঁরা সময় ঠিক করে নিয়েছিলেন— ভাইদের মধ্যে যিনি যখন দ্রৌপদীর অধিকার পাবেন, তখন যদি অন্যজন নির্জন অনুরক্তির মধ্যে অধিকারী ভাইকে একবার দেখেও ফেলেন, তবে বারো বছরের জন্য তাঁকে বনে যেতে হবে। আর ঘটল কি ঘটল, অর্জুনের ভাগ্যেই সেটা ঘটল। কী স্বল্পই না ছিল সেই কারণ— এক ব্রাহ্মণের গোরু খুঁজতে গিয়ে অস্ত্রাগারে বসা যুধিষ্ঠির এবং দ্রৌপদীকে দেখে ফেললেন অর্জুন এবং তাঁকে বনে যেতে হল। যুধিষ্ঠির তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, তবু বীর অর্জুন, ক্ষত্রিয় বীর অর্জুন শুধু দ্রৌপদীর ক্রমিক সঙ্গলাভের জন্য তাঁর বীরোচিত সত্যরক্ষার দায় থেকে মুক্ত হতে চাননি। তিনি বনবাসে গেছেন এবং ব্রহ্মচর্যের প্রতিজ্ঞা নিয়ে বনে গেছেন।

ঠিক এইজন্য 'ফ্রাস্ট্রেশন' কথাটা ব্যবহার করেছিলাম। অর্জুন বনবাসের প্রতিজ্ঞা থেকে চ্যুত হননি বটে, কিন্তু খুব সঙ্গত কারণেই ব্রহ্মচর্যের প্রতিজ্ঞাটুকু রাখতে পারেননি। স্বয়ংবর-সভায় আপন বীর্যলব্ধা যে বিদগ্ধা রমণীটিকে তিনি একান্ত আপনার করে পেয়েছিলেন, তাঁকে যেভাবে প্রতিজ্ঞার ফেরে হারিয়ে বসতে হল, তাতে বহিরঙ্গের ক্ষাত্র কাঠিন্যের সহচারী প্রতিজ্ঞাটুকু রইল বটে, তবে অন্তরের গভীরে সেই বৈমনস্য, সেই অন্তহীন নৈরাশ্য একটা কাজ করতেই থাকল। হয়তো বা এই নৈরাশ্য থেকেই অর্জুন পরপর কয়েকটি রমণীর প্রেমপাশে বদ্ধ হলেন। উলুপী এবং মণিপুর রাজনন্দিনী চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে একভাবে বিয়েও হল তাঁর, কিন্তু স্থায়ীভাবে এঁদের সঙ্গে থাকা হল না। মনে মনে সেই প্রতিজ্ঞাটাও কাজ

করছিল— তিনি বনবাসে এসেছেন, অতএব তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াবেন। তেমনি করে ঘুরতে ঘুরতেই এবার তিনি উপস্থিত হলেন প্রভাস তীর্থে।

প্রভাস বড় সুন্দর জায়গা, পুণ্যস্থানও বটে। সৌরাষ্ট্রের এই জায়গাটিতে পুণ্যতোয়া সরস্বতী সমুদ্রে এসে মিশেছে, অতএব পুণ্যস্থান তো বটেই— সুপুণ্যং রমণীয়ঞ্চ। তবে যতখানি এটা পুণ্যস্থান, তার থেকেও বুঝি রমণীয়। পরবর্তী সময়ে এইখানেই তৈরি হয়েছিল বিখ্যাত সোমনাথের মন্দির, যা বারবার লুণ্ঠন করেছিলেন গজনীর সুলতান মামুদ। প্রভাস দ্বারকা থেকে খুব দূরে নয় বলেই দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ খুব তাড়াতাড়ি খবর পেয়ে গেলেন যে, তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু এবং ভাই অর্জুন এসেছেন প্রভাসে। কৃষ্ণ জানতেন না যে, অর্জুন প্রতিজ্ঞার কারণে বনবাসে এসেছেন, তাই ভাবলেন— অর্জুনকে একেবারে তুলে নিয়ে আসবেন দ্বারকায়।

কৃষ্ণ প্রভাসে চলে এলেন অর্জুনের সঙ্গে দেখা করতে এবং হঠাৎ বিনা কারণে কোনও খবর না দিয়ে দ্বারকার এত কাছে এই প্রভাস তীর্থেই অর্জুন ঘোরাঘুরি করছেন কেন— এ-সব কথা জিজ্ঞাসা করতেই সব কথা খুলে বললেন অর্জুন, এমনকী হয়তো উলূপী-চিত্রাঙ্গদার কথাও— ততোঽর্জুনো যথাবৃত্তং সর্বমাখ্যাতবাংস্তদা। অর্জুনের মানসিক অবস্থা দেখে কৃষ্ণ তাঁকে বেশি ঘাঁটালেন না, বরঞ্চ তিনিও অর্জুনের ভাবেই অর্জুনের সঙ্গে প্রভাসেই ঘোরাঘুরি করলেন কিছুদিন। তারপর একদিন বললেন— তুমি এবার রৈবতক পর্বতে আস্তানা নাও কিছুদিন, দ্বারকা থেকে জায়গাটা একেবারেই কাছে, তোমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎটা আরও ঘন-ঘন হবে। অর্জুন স্বীকার করতেই রৈবতক পাহাড়ের অস্থায়ী আবাস ভাল করে সাজিয়ে দিল কৃষ্ণের লোকেরা। খাবার-দাবারও চলে এল কৃষ্ণের পছন্দমতো। প্রচুর গল্প করতে করতে, প্রচুর খেতে খেতে, এমনকী রৈবতক পর্বতের শৈলাবাসে সন্ধ্যার আমোদে প্রচুর নাচ-গান উপভোগ করতে করতে পুরো দিন-রাত কেটে গেল অর্জুনের।

প্রভাস থেকে রৈবতকে অর্জুনকে টেনে আনলেন কৃষ্ণ, এবার দ্বিতীয় টানে একেবারে দ্বারকায়। আসলে বড় অল্প কারণে বনবাস আর তীর্থযাত্রার পরিশ্রমে তখন হাঁপিয়ে উঠেছেন অর্জুন। পরম বন্ধু কৃষ্ণের আদর-অভ্যর্থনা অবহেলা করে বনবাসে দিন কাটানোর মানসিকতা প্রায় চলেই গেছে। কাজেই কৃষ্ণ যখন দ্বারকা যাবার প্রস্তুতি নিয়ে তাঁর সোনা বাঁধানো রথখানি নিয়ে এলেন, তখন অর্জুন আর না বলতে পারলেন না। দ্বারকায় এসে কত আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা হল, রাস্তায় লোক জমে উঠল— এক রথে কৃষ্ণ এবং অর্জুন আসছেন— এই দৃশ্য দেখার জন্য। কৃষ্ণের বন্ধু তিনি, দ্বারকার 'রয়্যাল গেস্ট'। তাঁর সম্মানে সুসজ্জিত করা হয়েছিল দ্বারকা নগরী। ভোজ-বৃষ্ণি-অন্ধক-কৃষ্ণের জ্ঞাতিগুষ্টি যে নামে চিহ্নিত তাঁরা সবাই অর্জুনকে রাজকীয় সম্মান প্রদর্শন করল।

অভিবাদন, আলিঙ্গন, অভ্যাগমনের পরে অর্জুনের জায়গা হল কৃষ্ণেরই ঘরে। দুই বন্ধুতে গল্পে-গল্পে, আমোদে-আহ্লাদে বেশ কিছুদিন দ্বারকায় থাকা হয়ে গেল অর্জুনের— উবাস সহ কৃষ্ণেন বহুলাস্তত্র শর্বরীঃ।

কৃষ্ণ এবং অর্জুন দ্বারকায় থাকলেও ভবিষ্যৎ-ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল রৈবতক পর্বতই। এখনকার দিনে গিরনারের উলটো দিকে জুনাগড়ে রৈবতক পর্বতের আধুনিক অবস্থান চিহ্নিত হলেও মহাভারত-পুরাণের মতে প্রভাস তীর্থের কাছেই উদবন্ত পর্বতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পশ্চিম দিকটায় রৈবতক পর্বতের অবস্থান এবং এই পর্বতের 'ল্যান্ডমার্ক' হল সোমনাথ। উত্তম শৈলাবাস, উত্তম পরিবেশ, দ্বারকাবাসীরা তাঁদের বাৎসরিক উৎসব পালন করেন এই পর্বতেই। অর্জুন দ্বারকায় থাকতে-থাকতেই সেই উৎসবের সময় এসে গেল এবং দ্বারকাবাসী বৃষ্ণি, অন্ধক, ভোজকুলের প্রধান-পুরুষেরা পাহাড়ে যাবার প্রস্তুতি নিলেন। দ্বারকায় এই সময়টা খুব ভাল সময়। উৎসব উপলক্ষে পাহাড়ে নতুন অস্থায়ী আবাস গড়ে উঠল; সেগুলি সাজানো হল চিত্রবিচিত্র উপকরণে। দেখলেই উৎসবের পরিবেশ মনে আসে। বাজনদারেরা বাদ্যি নিয়ে গেল, নাচিয়েরা নাচের মহড়া দিতে আরম্ভ করল, গাইয়েরা গানের গলা খুলে দিল উৎসবের আমেজে— ননৃতুর্নর্তকাশ্চৈব জগুর্গেয়ানি গায়নাঃ। উৎসব উপলক্ষে দ্বারকার সমস্ত লোকজন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে— কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ রথে, কেউ বা সুবর্ণমণ্ডিত যানে রৈবতকে চলে এসেছেন। যদু-বৃষ্ণিদের মেয়ে-বউরাও এসেছেন সালঙ্কারে, হাবে, ভাবে, লাস্যে।

নির্দিষ্ট দিনে ভোজ-বৃষ্ণি-অন্ধকদের কুমার-পুরুষেরা উৎসবের সাজে সেজে রৈবতকে প্রবেশ করলেন। এলেন বলরাম অনুগম্যমানা রেবতীকে সঙ্গে নিয়ে, উৎসবের আনন্দে তাঁর কাদম্বরী-সেবনের মাত্রা বেড়েছে।— ততো হলধরো ক্ষীবো রেবতীসহিতঃ প্রভুঃ। তাঁর পিছন পিছন গন্ধর্ব-গায়েনদের একটি পৃথক দল গান গাইতে-গাইতে চলেছে। এলেন মহারাজ উগ্রসেন। বহুতর স্ত্রীলোক এবং গন্ধর্বসহযোগে তাঁর যাত্রাপথ যথেষ্টই বর্ণাঢ্য। বৃষ্ণিকুমারদের মধ্যে রৌক্সিণেয় শাম্বের সঙ্গে প্রধানপুরুষ অক্রূর, সারণ, গদ, চারুদেষ্ণ, সাত্যকি, উদ্ধব— বলা উচিত কে না এলেন রৈবতকের উৎসবে। এইসব রাজপুরুষদের স্ত্রীরা তো এলেনই এবং সবার শেষে এলেন বাসুদেব কৃষ্ণ এবং অর্জুন। উৎসব আরম্ভ হয়ে গেছে, অর্জুন কৃষ্ণের সঙ্গে এখানে-ওখানে ঘুরে-ঘুরে দ্বারকাবাসীদের বিচিত্র উৎসব-কৌতুক দেখছেন। এরই মধ্যে হঠাৎই এক অসাধারণ সুন্দরী রমণীর ওপর চোখ পড়ে গেল অর্জুনের। সকলের মতো এই রমণীও উৎসবের সাজে সেজেছে, বিশেষত রৈবতকের উৎসবে সকলের চলাফেরা অত্যন্ত মুক্ত হওয়ায় এই রমণীও আপন বান্ধবীদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

অর্জুন তাঁকে দেখামাত্রই প্রেমে পড়লেন, শুধু প্রেম বললে মিথ্যে বলা হবে— এই রমণীর শারীরিক সৌন্দর্যের আকর্ষণ এতটাই ছিল যে, সুচিরকাল স্ত্রীসঙ্গবর্জিত অর্জুন একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

তাঁর ব্রহ্মচর্যের নিয়ম-নীতি মাথায় উঠল। যে বন্ধুর সঙ্গে এতক্ষণ তিনি ঘুরছিলেন সেই কৃষ্ণকে একবারও খেয়াল না করে তিনি তাকিয়ে থাকলেন সুভদ্রার দিকে— হাঁ করে। তাঁকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল— এ কোনও বিপন্ন ভালবাসা নয়, চর্চিত-উপলব্ধিজাত কোনও প্রেম নয়— সুভদ্রার আঙ্গিক সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়েই অর্জুন একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন সুভদ্রার দিকে। বৃষ্ণি-অন্ধকদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কুলজাতা, কন্যার প্রতি অভিন্নহৃদয় বন্ধুর এই সবিকার দৃষ্টিপাত অস্বস্তির কারণ হতে পারে ভেবেই অর্জুনের চটকা ভেঙে দিয়ে কৃষ্ণ বললেন— বনবাসীর মন যে একেবারে কামনায় আলোড়িত হচ্ছে— বনেচরস্য কিমিদং কামেনালোড্যতে মনঃ ?

ইনিই সুভদ্রা। আদর করে অনেকেই তাঁকে ভদ্রা বলে ডাকে। ইনি কৃষ্ণের আপন বোন নন বটে, কিন্তু অগ্রজ বলরামের আপন বোন। আসলে কৃষ্ণপিতা বসুদেবের আরও অনেকগুলি স্ত্রী ছিল। তার মধ্যে রোহিণী ছিলেন অন্যতমা। কংসের অত্যাচারের সময় রোহিণী বৃন্দাবনে নন্দগোপের আশ্রয়ে ছিলেন এবং বলরাম সেখানেই জন্মান। কিন্তু বৃন্দাবনের যত ঘটনাবলি বিখ্যাত পুরাণগুলিতে বলা আছে, তার কোনও অংশেই আমরা সুভদ্রার উল্লেখ পাইনি। তাঁর জন্মনক্ষত্র, বাল্যজীবন কিছুই আমাদের জানা নেই এবং আমাদের ধারণা— সুভদ্রার বাল্য-কৈশোর বৃন্দাবনে কেটে থাকলে কৃষ্ণের বিচিত্র লীলাময় জীবনের সঙ্গে তাঁরও কিছু আমরা পেতাম। তাতেই মনে হয়, কংস মারা যাবার পর বসুদেবের সম্পূর্ণ পরিবার বৃন্দাবন থেকে মথুরায় চলে আসার পর সুভদ্রার জন্ম হয়। বসুদেবের স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে যে-সব পুত্র জন্মেছিলেন, তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যেমন বলরাম, তেমনই অন্যান্য ভাইদের মধ্যে সরণ বা সারণও ছিলেন মোটামুটি বিখ্যাত। মহাভারতে সুভদ্রাকে 'সারণস্য সহোদরা' অর্থাৎ সারণের মায়ের পেটের বোন বলায় বুঝতে পারি তিনি বলরামেরও আপন বোন ছিলেন। হরিবংশে সুভদ্রার জন্ম-নাম ছিল চিত্রা, পরে তিনি সুভদ্রা নামে বিখ্যাত হন— চিত্রা সুভদ্রেতি পুনর্বিখ্যাতা কুরুনন্দন।

দাদা বলরাম যেমন গৌরবর্ণ ছিলেন, সুভদ্রার গায়ের রংও তেমনই— কাঁচা সোনার মতো। আর সুভদ্রা তেমনই সুন্দরী, তেমনই কোমল-মধুর তাঁর স্বভাব যার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে পারা যায় না। অর্জুন তাই অনিমিষে তাকিয়ে ছিলেন তাঁর দিকে। সুভদ্রার রূপ দ্রৌপদীর মতো আগুনপানা নয়, দ্রৌপদীর ব্যক্তিত্ব সম্ভ্রম এমনই যে, তাঁর দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। কিন্তু সুভদ্রার সৌন্দর্যের উজ্জ্বল দীপ্তি আছে, তাপ নেই। অর্জুন অনিমিষে তাকিয়ে ছিলেন, পাশে যে কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন, তাও তাঁর খেয়াল নেই। অর্জুনের অপলক চেয়ে দেখাটুকু পরম কৌতূহল নিয়ে লক্ষ করছিলেন কৃষ্ণ— তং তদেকাগ্রমনসং কৃষ্ণঃ পার্থমলক্ষয়ৎ। অস্ত্রশিক্ষার আসরে যিনি পাখির চোখ ছাড়া কিছু দেখতে পাননি, তাঁকে একইভাবে সুভদ্রার দিকে তাকাতে দেখে কৌতুকী কৃষ্ণের মুখে স্তিমিত হাসি ফুটে উঠল।

কৃষ্ণ বললেন— ব্যাপারটা কী বলো তো সখা? তুমি নাকি ব্রহ্মচর্যের পণ নিয়ে বনবাসী হয়েছ! কিন্তু বনবাসীর বিরাগী মন যে এমন কামনায় আলোড়িত হচ্ছে— সেটা কি ভাল কথা হল— বনেচরস্য কিমিদং কামেনালোড্যতে মনঃ। এই এতটুকু পরিহাস করার পরেই কৃষ্ণ বুঝলেন যে, তাঁর ভাবে আকুল বন্ধুটিকে এই বৃষ্ণি সুন্দরীর পরিচয় জানানো দরকার এবং যদি এই রমণীকে লাভের ব্যাপারে অর্জুনের কোনও দুর্ভাবনা থাকে, তবে তাঁকে আশ্বস্তও করা দরকার। কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন— যাকে দেখে তোমার এত ভাল লাগছে, সে আমারই বোন। পার্থ! আমার মায়ের পেটের বোন না হলেও আমার বৈমাত্রেয় ভাই সারণের বোন— মমৈষা ভগিনী পার্থ সারণস্য সহোদরা। বলতে পারো— আমার বড় মায়ের মেয়ে এই সুভদ্রা, আমার পিতা তাঁর এই মেয়েটিকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন। ওর নাম সুভদ্রা। আমার বোনটিকে যদি সত্যিই তোমার খুব ভাল লেগে থাকে— অন্তত আমার মনে হচ্ছে, তোমার ভাল লাগছে, তা হলে বলো— আমি নিজেই পিতাকে এ-ব্যাপারে বলব— যদি তে বর্ততে বুদ্ধির্বক্ষ্যামি পিতরং স্বয়ম্। আমি চাই তোমার ভাল হোক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্জুন বললেন— যে রমণী স্বয়ং বসুদেবের কন্যা এবং যিনি কৃষ্ণ বাসুদেবের ভগিনী, অপিচ যার এই রূপ, তাকে দেখেও ভুলবে না এমন লোক আছে নাকি এই দুনিয়ায়— রূপেণ চৈব সম্পন্না কমিবৈযা ন মোহয়েৎ! অর্জুনের এই কথাটা কৃষ্ণের সেই পরিহাসের উত্তর— অর্থাৎ বনবাসী কেন, সকলেই ভুলবে তোমার এই বোনটিকে দেখে। অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন— যাক ভালই হল। আমি এখন শুধু ভাবছি— তোমার এই ভগিনীটির সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে কীভাবে? যে কোনও একটা উপায়ের কথা বলো কৃষ্ণ— যদি মানুষ তা পারে, তবে জেনো— আমি তা করে দেখাব— আস্থাস্যামি তদা সর্বং যদি শক্যং নরেণ তৎ।

কৃষ্ণ অনেক চিন্তার ভাব দেখিয়ে বললেন— দেখ ভাই, ক্ষত্রিয় পুরুষেরা স্বয়ংবর-সভায় গিয়ে বিয়ে করেন, স্বয়ংবর সিদ্ধ না হলে জোরও খাটান অনেক সময়। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে এই স্বয়ংবর ব্যাপারটা আমাকে খুব নিশ্চয়তা দেয় না, নিশ্চিন্ততাও দেয় না। মেয়েদের মন তো জান; স্বয়ংবর-সভায় তোমার মতো আরও পাঁচ জন পুরুষ আসবেন সুভদ্রার পাণিপ্রার্থী হয়ে এবং সেখানে সবটাই নির্ভর করবে ওই সুভদ্রার ওপর। সুভদ্রা যদি হঠাৎ কোনও আকস্মিক মোহে অন্য কোনও পুরুষকে বরণ করে বসে, সেখানে তোমার-আমার কারওরই কিছু করার থাকবে না। তাই বলছিলাম— ব্যাপারটার মধ্যে সন্দেহ থেকে যায়, স্ত্রীলোকের মন তো— স চ সংশয়িতঃ পার্থ স্বভাবস্যানিমিত্ততঃ।

কৃষ্ণের এই কথা থেকে বোঝা যায়— অর্জুন সুভদ্রাকে দেখা মাত্র তাঁর প্রেমে পড়ে গেলেও সুভদ্রা এখনও অর্জুনকে ভাল করে দেখেননি, কিংবা দেখলেও তিনি তেমন আলোড়িত হননি, অন্তত তখনও পর্যন্ত। আরও জিজ্ঞাসা হয়— কৃষ্ণের মনে কি কোনও সন্দেহ ছিল? কী নিয়ে সন্দেহ? অর্জুনের গায়ের রং কালো, সেইজন্য! অর্জুন পূর্বেই বিবাহিত, সেইজন্য? বলতে পারি— এর কোনওটাই নয়। তা হলে কৃষ্ণের সন্দেহটা আসলে সন্দেহ যতখানি, তার থেকে অনেক বেশি হল— অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহের ব্যাপারে নিশ্ছিদ্রভাবে নিশ্চিন্ত হওয়ার প্রচেষ্টা। ঠিক সেই ধারণা মাথায় রেখেই কৃষ্ণ বললেন— বিয়ের জন্য বীর ক্ষত্রিয়েরা তো কন্যাহরণও করে থাকেন, অর্জুন! তা হলে সেই পথটাই তো সবচেয়ে নিশ্চিত। তুমি জোর করে আমার বোনটিকে হরণ করে নিয়ে যাও, অর্জুন। তারপর যা হয় দেখা যাবে।

বাঙালির কাশীরাম দাসে ঘটনাপ্রবাহ একেবারে উলটো আছে। সেখানে অর্জুন নয়, সুভদ্রাই অর্জুনের প্রেমে পড়েছেন এবং সেই প্রেম ঘটিয়ে দেবার জন্য কৃষ্ণপত্নী সত্যভামাকে একেবারে স্নেহময়ী বাঙালি বউদির ভূমিকায় নামতে হয়েছে। বলতে পারেন— কাশীরামের কথা এখানে আসছে কেন? ব্যাস যেভাবে সুভদ্রাকে দেখছেন, সেটাই তো যথেষ্ট। আমরা বলব— 'মিথ' মানেই তো এক নির্জ্ঞান সত্য, এখানে সাহিত্যসৃষ্টি বা জীবনবোধ কোনও একগুঁয়ে শাস্ত্র মেনে চলে না। অতএব কাশীরাম যেভাবে দেখছেন, তার মধ্যেও এক অন্যতর সত্য আছে, যা হলেও হতে পারত। আসলে বাঙালি কবির মনে কাজ করেছে মহাবীর অর্জুনের ছবি। এমনই তাঁর বীরত্বের মর্যাদা, এমনই তার সর্বময় ব্যক্তিত্ব যে, অর্জুনকে চাক্ষুষ দেখার পর থেকে তিনি আর অন্যদিকে মন দিতে পারছেন না। কৃষ্ণভামিনী সত্যভামা

এখানে রক্ষাকর্তা বউদির ভূমিকায়, কিন্তু তিনিও সুভদ্রার নির্লজ্জ আচরণ যেন মেনে নিতে পারছেন না। বেশ একটু তিরস্কার করেই তিনি সুভদ্রাকে বলছেন— ভদ্রা! খাইলি কি লাজ? রাখিলি কলঙ্ক নিষ্কলঙ্ক কুল মাঝ ॥ মনে রেখো, তোমার পিতা বসুদেব, আর ভাই বলরাম এবং কৃষ্ণ। এই বংশের মেয়ে হয়ে একটা পুরুষ দেখে তোমার মন ভুলেছে, এটা কেমন কথা? সত্যভামা মায়ের সমান বয়স্কা বউদিদির মতো করে সুভদ্রাকে বললেন— আমাদের ঘরে কি অবিবাহিতা আর কোনও মেয়ে নেই? কই তাদের কেউ তো পরপুরুষ দেখে এমন ব্যবহার করছে না। সত্যভামা ননদকে আরও ভাল উত্তম বংশজ বলিষ্ঠ পণ্ডিত জনের সঙ্গে বিয়ে দেবার আশ্বাস দিলেন। কিন্তু সুভদ্রার সেই এক কথা। অর্জুনকেই তিনি স্বামী হিসেবে চান এবং আজকের মধ্যেই একটা ব্যবস্থা তাঁকে করতে হবে।

যতই নিষ্ঠুর কথা বলুন সত্যভামা, ননদের ব্যাপারে তাঁর মনটা খুব নরম, এমনকী একটা প্রচ্ছন্ন সায়ও আছে। একান্নবর্তী পরিবারে এমন একটা ঘটনা ঘটলে স্বামীর সঙ্গে একটা শলা-পরামর্শ করতেই হয় এবং সেই সময়টা হল রাত। রাত্রে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হতেই সত্যভামা ঠিক বাঙালি বউদির মতোই বললেন— তোমার বোনটির অবস্থা তো খুব খারাপ। যখন থেকে সে অর্জুনের মুখ দেখেছে, সে আমার কাছ ছাড়ছে না। এখন সে বলছে— বিয়ে না দিলে আত্মহত্যা করবে। কৃষ্ণ সুযোগ বুঝে বললেন— এ তো বেশ ভাল কথা। বন্ধু অর্জুনকে আমি সত্যিই এই দানটুকু দিতে চাই। আজ রাতটা ধৈর্য ধরে থাকতে বলো। কাল সব কথা হবে। সত্যভামা বললেন— অত দেরি সইবে না। আজ রাতের মধ্যে তার সঙ্গে মিলন না ঘটালে তোমার বোন মরবে। কৃষ্ণ বেশ মধ্যযুগীয় পৌরুষেয়তায় জবাব দিলেন— এ ব্যাপারে তুমি যা করার করো। তবে দেখো, যাতে কোনও বিপদ না হয়। তখন রাত্রি আঁধার হয়ে গেছে। রাতের অন্ধকারে সুভদ্রাকে পিছনে নিয়ে সত্যভামা অর্জুনের ঘুম ভাঙালেন।

কাশীরামের পরিবেশনায় এই কাহিনি বাঙালি-হৃদয়ের মর্ম থেকে এমন আবেগমধুর হয়ে উঠেছে যে, ব্যাসের মহাকাব্যিক তথা ক্ষাত্রবীর্যের অভিসন্ধিগুলি আপাতত একটু যেন পরুষ-কঠিন লাগে। অর্জুনের কাছে সুভদ্রার হয়ে দূতিয়ালি করতে গিয়ে পঞ্চস্বামীর অধিকারভুক্তা দ্রৌপদীর কথাটাও সত্যভামা এমনভাবে বলেছেন, তাতে বুঝতে পারি— আমরা যে 'ফ্রাস্ট্রেশনে'র কথা বলেছিলাম, অর্জুনের সেই 'ফ্রাস্ট্রেশন'-টা কাশীরাম ঠিক বুঝেছিলেন— ব্যাস স্পষ্ট না বললেও। সুভদ্রার কথা অর্জুনের কাছে বলতে এসে সত্যভামা অর্জুনকে গালি দিয়ে বলেছিলেন—

পাঞ্চালের কন্যা জানে মহৌষধি গাছ।
এক তিল পঞ্চস্বামী নাহি ছাড়ে পাছ।
যে লোভে নারদবাক্য করিলা হেলন।
দ্বাদশ বৎসর ভ্রমিতে বনে বন।
ইহাতে তোমার লজ্জা কিছু নাহি হয়।
কিমতে করিবা বিভা দ্রৌপদীর ভয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্রৌপদীর প্রসঙ্গ ওঠায় এবং বিশেষত নিজের 'ফ্রাস্ট্রেশন'টা ফাঁস হয়ে অর্জুনও সত্যভামাকে স্বামী বশীকরণের প্রসঙ্গ টেনে রসিকতার জবাব দিলেন। সত্যভামা বললেন—

ঔষধ করিবে পার্থ স্ত্রীর এই বিধি।
পুরুষ হৈয়া তুমি কৈলে কি ওষধি ॥
ভণ্ডতা করিয়া হইয়াছ ব্রহ্মচারী।
মহৌষধি শিখিয়াছ ভুলাইতে নারী ॥

সত্যভামা এবার সুভদ্রাকে বিবাহ করার কথা বললেন, কিন্তু তিনি মহাবীর সুলভ ঔদাসীন্যে নিজের ব্রহ্মচারী-ব্রত, তীর্থযাত্রার কারণ দেখাতে সত্যভামা সুভদ্রাকে ফিরিয়ে এনে রতিকলার মন্ত্রপূত বশীকরণ সিঁদুর পরিয়ে দিলেন সুভদ্রার কপালে। এবারে অর্ধরাত্রের স্তিমিতপ্রদীপ অন্ধকারে অর্জুন সুভদ্রাকে দেখে এতই মোহিত হলেন যে, তখনি উঠিয়া তারে করিলেন কোলে। অর্জুন-সুভদ্রার গোপন গান্ধর্ব বিবাহ হয়ে গেল। ফলে এই অন্তরঙ্গতার সূত্রে সুভদ্রাহরণের পর তাঁর প্রিয়তম স্বামীর রথচালনাও আরও বেশি রোম্যান্টিক হয়ে ওঠে।

ব্যাসের মহাভারতে এ-সব রঙ্গ-রসিকতার প্রশ্রয় নেই আপাতত। তা ছাড়া এখানে প্রেমে পড়েছেন স্বয়ং অর্জুন। এবং স্বয়ং কৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে সুভদ্রা-হরণের প্রস্তাব দিয়েছেন। কৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুন তাঁর সঙ্গেই সুভদ্রা-হরণের উপায় ঠিক করতে বসলেন। কবে, কোথায়, কখন, কীভাবে সুভদ্রাকে হরণ করবেন অর্জুন এবং এই হরণের ভবিষ্যৎ ফল কী হতে পারে— সব ভেবে নেবার পর অর্জুন কয়েকটি লোক পাঠালেন ইন্দ্রপ্রস্থে— যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নেবার জন্য। কারণ তিনি যা করতে যাচ্ছেন, তার মধ্যে সামাজিক মাত্রা যতখানি, তার থেকে অনেক বেশি রাজনৈতিক মাত্রা যুক্ত ছিল। সামাজিক মাত্রাটা এইখানে যে, অর্জুনের মা কুন্তী কৃষ্ণপিতা বসুদেবের আপন বোন; বৈমাত্রেয় হলেও অর্জুন কিন্তু তাঁর মামার মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন। এই বিবাহ নিয়ে শাস্ত্রকারদের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে। তাঁরা একদিকে 'কনভেনশন' এবং দেশাচারের কথা তুলেছেন, অর্থাৎ কিনা মামাতো বোনের সঙ্গে এই ধরনের বিবাহ ভারতবর্ষের দক্ষিণ এবং পশ্চিম দেশে অনেক জায়গাতেই চালু ছিল। দ্বিতীয়ত কৃষ্ণ এবং অর্জুনের মধ্যে ঐশ্বরিক আবেশের কথা মাথায় রেখেও শাস্ত্রকারেরা অর্জুনের এই বৈবাহিক প্রচেষ্টা সমর্থন করেছেন। কাজেই এখানে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি যত প্রয়োজন ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কথা। পাণ্ডব-কৌরবদের জ্ঞাতি-বিরোধের নিরিখে মথুরা-দ্বারকার বৃষ্ণি-অন্ধক-ভোজ বংশের কুলপ্রধানেরা পাণ্ডবদের পক্ষেই ছিলেন। অর্জুনের এই বৈবাহিক সম্পর্ক হয় তাঁদের আরও অনুকূল করবে, নয়তো বিপক্ষতা তৈরি করবে। যদি বিপক্ষতা আসে, তবে যুধিষ্ঠিরের একটা মত এখানে প্রয়োজন ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা হিসেবে। যুধিষ্ঠির মত দিয়েছেন, কারণ যদুবীর কৃষ্ণ যেখানে নিজে এই বিয়ে চাইছেন, সেখানে সমস্ত রাজনৈতিক যোজনা অর্জুনের অনুকূলেই যাবার সম্ভাবনা।

খবরটা আগেই জানা ছিল। সুন্দরী সুভদ্রা রৈবতক পর্বতে পুজো করতে যাবেন এবং তারপর সেখান থেকে দ্বারকায় চলে যাবেন। অর্জুন আগেই কৃষ্ণের কাছ থেকে একটি রথ চেয়ে নিয়েছিলেন। তাতে জুতে দেওয়া হয়েছিল ভীষণ দ্রুতগামী দুটি অশ্ব। অর্জুন তাঁর ধনুক, তরবারি, বহুতর বাণ এবং অন্যান্য যুদ্ধসজ্জা ভর্তি করে রথটি নিজেই চালিয়ে নিয়ে এসে রৈবতক পর্বতের নীচে সমভূমিতে গোপন স্থানে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু যাঁর জন্য তলায় তলায় এত ব্যবস্থা চলছে, সেই সুভদ্রা কিন্তু কিছুই জানতেন না। তিনি না জানতেন অর্জুনের প্রেমে পড়ার কথা, না জানেন তাঁর সম্বন্ধে ভবিষ্যতের অন্যকৃত পরিকল্পনার কথা। স্বাভাবিক কারণেই যদুবংশীয়দের বার্ষিক উৎসবের সময় রাজকুমারীদের সাধারণ যে সব 'শিডিউল' থাকে, সেইভাবেই একদিন সুভদ্রা সকালবেলায় রৈবতক পর্বতের মাথায় দেবতার পূজা সেরে ফিরে আসছিলেন দ্বারকায়— প্রযযৌ দ্বারকাং প্রতি। সুভদ্রার পূজা সমাপন হল, ব্রাহ্মণদের দান দিলে তাঁরা স্বস্তিবাচন করলেন। সুভদ্রা এবার পর্বত থেকে নেমে দ্বারকার পথ ধরলেন। তাঁর পিছন পিছন দ্বারকা থেকে আসা রক্ষীবাহিনী আসছিল। একটি নির্দিষ্ট জায়গায় এসে সুভদ্রার রথে ওঠার কথা। কিন্তু রথে ওঠা আর হল না। সুভদ্রা কিছু না জানলেও অর্জুন তো সব জানেন। কখন তিনি পুজো করতে আসবেন, কতক্ষণ তাঁর সময় লাগবে এবং কখন তিনি ফিরবেন— সে সম্বন্ধে আগেই আন্দাজ করে নিয়েছেন অর্জুন এবং সেই আন্দাজেই তিনি সুভদ্রার ফিরবার রাস্তায় রথ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শুচি বসন পরা সুভদ্রার ভক্তিনম্র মুখখানি দেখে আরও একবার ভাল লাগল অর্জুনের। এখন পুলকিত হয়ে সময় নষ্ট করার সময় নেই তাঁর। সুভদ্রাকে দেখে ক্ষণিক বিচলিত হওয়ার পরেই অর্জুন তাঁর সামনে গিয়ে পাঁজাকোলা করে ধরে রথে তুললেন সুভদ্রাকে।

সুভদ্রা বাধা দেননি হয়তো। হয়তো বা সুভদ্রা নিশ্চয়ই অর্জুনকে চিনতে পেরেছিলেন। কৃষ্ণের সঙ্গে দিন-রাত ঘুরছেন অর্জুন, সমস্ত দ্বারকাবাসী তাঁকে মহাবীরের সম্মানে দেখে— সেই অর্জুনকে দেখে সুভদ্রা চিনবেন না, তা হতে পারে না। হয়তো চিনেছেন বলেই মহাবীর অর্জুনকে তিনি বাধা দেওয়ার চেষ্টাও করেননি, হয়তো বা মহাবীরের এই হঠাৎ বলাৎকৃত আচরণে খুশিও হয়েছিলেন সুভদ্রা। কেন না যে মুহূর্তে সুভদ্রাকে রথে চড়িয়ে অর্জুন ঘোড়া চালিয়ে দিলেন ইন্দ্রপ্রস্থের পথে, সেই মুহূর্তেও ব্যাস তাঁর মধুর স্মিতমুখের বিশেষণটি দিতে ভোলেননি— তাম্ আদায় শুচিস্মিতাম্। অন্তত সুভদ্রা অর্জুন কর্তৃক হৃত হওয়ায় যে অসন্তুষ্ট হননি তা এই বিশেষণ থেকে বেশ বোঝা যায়।

অতএব অর্জুন তাঁকে মহামহিম বীরের স্পর্শে ধারণ করতেই তিনিও ধরা দিয়েছেন বিনা বাধায়। পরবর্তী কালে বাংলার ব্যাস কাশীরাম অবশ্য সুভদ্রার মধ্যে আপন মমতা ঢেলে দিয়ে সুভদ্রাকে অর্জুনের সমগোত্রীয়া করে তুলেছেন। অর্জুনের রথের রশি সুভদ্রার হাতে চলে গেছে এবং তিনি যুদ্ধবীরের সহায়তা করেছেন রথের সারথ্য করে। কিন্তু মূল মহাভারতে এমনটি নেই। মহাভারতে সুভদ্রার অনুগামী সৈন্যদল যখন দেখল— অর্জুন তাঁদের রাজপুত্রীকে হরণ করেছেন এবং তিনি দ্বারকার পথে না গিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে রথ চালিয়ে দিয়েছেন, তখন তারা দ্বারকার রাজসভা সুধর্মায় গিয়ে ইতিবৃত্তান্ত সব জানাল।

রৈবতকে অবস্থিত যাদব-বৃষ্ণিদের রক্ষীবাহিনী অর্জুনের নাম মাহাত্ম্যেই তাঁকে আর বাধা দেবার মূর্খামি করেনি। তারা শোরগোল তুলে রাজসভায় এসে অর্জুনের সুভদ্রাহরণ বৃত্তান্ত জানাল। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের ভেরী বাজানো হল তুমুল শব্দে, যে শব্দ শুনলে দ্বারকাবাসীরা যেখানে যেমন থাকে, সেই অবস্থায় পান-ভোজন ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য ছুটে আসে। অতএব ভেরীর শব্দ শুনে ভোজ-বৃষ্ণি-অন্ধকেরা যে যেখানে ছিলেন, সেই অবস্থায় ছুটে এলেন সুধর্মায়— অন্নপানমপাস্যাথ সমাপেতুঃ সমন্ততঃ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোজ-বৃষ্ণিদের শাসনতন্ত্র সঙ্ঘরাষ্ট্রের ধারাণুসারী; এখানে যিনি রাজার উপাধি ধারণ করেন, তিনি সিদ্ধান্ত দেন না। বিভিন্ন কুলপ্রধানদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত তিনি কার্যকর করেন। অতএব সুভদ্রা হরণের পর ভোজ-বৃষ্ণিদের ইতিকর্তব্য নিয়ে 'মিটিং' বসল। 'সভাপাল' প্রথমে সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্ণি-ভোজদের অনেকেই প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। অত্যুৎসাহীরা দু-একজনে বললেন— আরে আমার রথটা নিয়ে আয় তো; কেউ বললেন— আমার অশ্বটি; অন্যজন ধনুক-বাণ এবং বর্মের খোঁজ করতে লাগলেন সমূহ প্রস্তুতির জন্য। অধস্তন আজ্ঞানুবর্তী পুরুষেরা ছোটাছুটিও আরম্ভ করল। অধিকাংশ জনের রায় যুদ্ধের পক্ষেই যাচ্ছে, অথচ কৃষ্ণ একটাও কথা বলছেন না— সমস্ত সভাস্থলে এটা একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া তৈরি করল। এমনকী অর্জুনের খবর শুনে যিনি ঘনঘন কাদম্বরীর পাত্র নিঃশেষ করছিলেন, সেই বলরাম পর্যন্ত মদপাটল চোখে অন্যদের অত্যুৎসাহ এবং কৃষ্ণের নিস্তব্ধতা দেখে চেঁচিয়ে বললেন— আরে মূর্খরা! তোমরা যে যুদ্ধের জন্য এত ক্রোধ দেখাচ্ছ, এত গর্জন করছ, সব তো বৃথা যাবে, কৃষ্ণ যে এখনও চুপ করেই রইল— কিমিদং কুরুথাপ্রাজ্ঞা তুষ্ণীম্ভূতে জনার্দনে। আগে কৃষ্ণ তার মত ব্যক্ত করুক, তারপর তো যা করার করবে।

উত্তেজিত বৃষ্ণি-অন্ধক-ভোজেরা সত্যিই এতক্ষণে লক্ষ করলেন যে, কৃষ্ণ একেবারে নিশ্চুপ। বলরাম তাঁর কথা শোনার জন্য সকলকে অবহিত করলেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণের নিস্তব্ধতার কারণ যদি বন্ধুবাৎসল্য হয়, তবে সেই মধুরতার মুখে আগুন দিয়ে বলরাম বললেন— এতদিন তোমার জন্যই আমরা অর্জুনকে যথেষ্ট সম্মান করেছি, কিন্তু সে বদমাশ সম্মানের যোগ্য নয়। আরে ব্যাটা! যেখানে বসে এতদিন তুই যে পাত্রে খাবার খেলি, সেই পাত্রটাই ভেঙে দিয়ে গেলি— কো হি তত্রৈব ভুক্তান্নং ভাজনং ভেত্তুমর্হতি। আমাদের সঙ্গে এতকালের সম্বন্ধ তুই একটুও খেয়াল করলি না। আমাকে তো কোনও 'কেয়ার'ই করলি না। তোর বন্ধু এই কৃষ্ণটার কথাও তো একটু মনে রাখবি— সোঽবমন্য তথা চাস্মান্ অনাদৃত্য চ কেশবম্।

বলরাম যে কৃষ্ণের সিদ্ধান্ত শোনার ঔৎসুক্য দেখিয়ে নিজেই বলতে আরম্ভ করলেন, সভার মত তৈরি করার গণতান্ত্রিক 'তরিকা' এটাই। বলরাম বললেন— ও সুভদ্রাকে হরণ করে নিজের মৃত্যু বয়ে নিয়ে গেছে সঙ্গে করে। এই যে আমাদের সবাইকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে যে অপমানটা করল অর্জুন, তাতে আমি মনে করছি— ও আমার মাথার মাঝখানে লাথি কষিয়ে দিয়েছে— কথং হি শিরসো মধ্যে কৃতং তেন পদং মম। আমি ছাড়ব না, কৃষ্ণ! আমি এই অপমানের শোধ নেব। এই পৃথিবীতে আর যাতে পাণ্ডব-কৌরব বলে কিছু না থাকে, সে ব্যবস্থা আমি একাই করতে পারব। বলরাম যে ভাবে বলতে আরম্ভ করলেন, তাতে সেই মেঘদুন্দুভির শব্দও হার মানল, এবং এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কথা শুনলে 'গণতান্ত্রিক' মূর্খেরা যে-ভাবে নেতার সুরে কথা বলে, ঠিক সেইভাবেই ভোজ-বৃষ্ণি-অন্ধকদের কুলজ্যেষ্ঠরা বলরামের দিকেই ঢলে পড়লেন— অম্বপদ্যন্ত তে সর্বে ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকাস্তদা। বলরাম অর্জুনকে মেরেই ফেলতে চাইলেন। কৃষ্ণ সেদিন সম্পূর্ণ মাথা ঠান্ডা রেখে অসাধারণ ঘটকালি করেছিলেন অর্জুনের পক্ষ হয়ে। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন— অর্জুন কোনও সাধারণ পুরুষ নন। তাঁকে মেরে ফেলাও অত সহজ নয়।

বলরাম অত্যন্ত আবেগে কথা বলেন, কৃষ্ণ বলেন যুক্তি দিয়ে। সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ এক সভাস্থলে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ এবার বললেন— আপনাদের সবচেয়ে বড় ভুল, আপনারা অর্জুনকে শত্রু বলে ভাবতে আরম্ভ করেছেন। অর্জুন এখানে অন্যায়টাই বা করল কী, আর এই ভোজ-বৃষ্ণিদের অপমানটাই বা কী করে করল? আসলে যে-সব পথে বিয়ে হলে ঠিক হত বলে আপনাদের মনে হচ্ছে, অর্জুনের তা মনে হয়নি, কিংবা সে তা মেনে নিতে পারেনি। এক নম্বর, কন্যাপণ দিয়ে বিয়ে হয়, অর্জুন যদি সেই পণ দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করতেন এবং আপনারাও তা মেনে নিতেন, তা হলে সেই পণ দেবার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের অর্থলোভীও ভাবতেন মনে মনে। অর্জুন আমাদের এতটা অর্থপিশাচ ভাবেননি— অর্থলুব্ধান্ ন বঃ পার্থো মন্যতে সাত্বতান্ সদা। দ্বিতীয় হল স্বয়ংবর বিবাহ। অর্জুন ভরসা পাননি নিশ্চয়। কেননা স্বয়ংবরা কন্যা কাকে বরণ করবে, কোনও ঠিক নেই। যদি বলেন, বামুনদের মতো গোরু-ছাগলের বিনিময়ে অনাড়ম্বর এক ব্রাহ্মবিবাহ করতে পারতেন অর্জুন, তা হলে বলব কোন ক্ষত্রিয় বীর এমন নিস্তরঙ্গভাবে বিয়ে করে? আর এইভাবে কন্যাদান করাটা গোরু-ছাগল দানের মতোই মনে করবেন অর্জুন— প্রদানমপি কন্যায়াঃ পশুবৎ কোঽনুমন্যতে।

সুধর্মা-সভা কৃষ্ণের যুক্তিতে নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছিল। অতএব এবারে তিনি মোক্ষম কথা বললেন। বললেন— সাধারণ বিবাহে যে-সব দোষের কথা বললাম, এগুলো অর্জুনকে যথেষ্ট ভাবিয়েছে বলেই অর্জুন সুভদ্রাকে হরণের পথ বেছে নিয়েছেন। আর সুন্দরী যশস্বিনী সুভদ্রাকে যিনি হরণ করেছেন, তাঁর গুণটা কম কীসে? যে বংশে তিনি জন্মেছেন এবং তিনি যেমন ভারত-বিখ্যাত বীর, তাতে যুদ্ধে তাঁকে কেউ হারিয়ে দেবে, এমন মানুষ আমি ইন্দ্রলোক কিংবা রুদ্রলোকেও দেখিনি— ন তং পশ্যামি যঃ পার্থং বিজয়েত রণে বলাৎ। কাজেই এমন বীরকে যদি সুভদ্রা স্বামী হিসেবে লাভ করে থাকে, তবে আমার মনে হয়— ভালই হয়েছে। অর্জুন ক্ষত্রিয়বীরের মতোই অসামান্যা সুন্দরী সুভদ্রাকে হরণ করেছে। এতে অন্যায়টা কী হল? সুভদ্রা সুন্দরী, অর্জুন বীর, বেশ তো যোটক হয়েছে— এষ চাপীদৃশঃ পার্থ... সুভদ্রা চ যশস্বিনী। তা ছাড়া অর্জুনের মতো মহাবীরকে পাত্র হিসেবে কে অপছন্দ করবে?

কৃষ্ণ এবার সিদ্ধান্ত দিয়ে বললেন— আমি বলি কি, আপনারা অর্জুনকে সসম্মানে ফিরিয়ে আনুন। ধরুন, আমরা যুদ্ধে গেলাম অর্জুনের সঙ্গে; তারপর অর্জুন আমাদের হারিয়ে দিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে চলে গেল, তখন আমাদের মান-সম্মানটা কোথায় যাবে? তার চেয়ে তাঁকে যদি মিষ্টি কথায় ফিরিয়ে আনা যায়, তা হলে এই বৈবাহিক সম্পর্কে পরাজয়ের অসম্মান থাকবে না কোনও। সবচেয়ে বড় কথা, অর্জুন আমাদের পিসতুতো ভাই, তাঁর সঙ্গে কি আমাদের এই শত্রুতার ব্যবহার মানায়— পিতৃস্বসুশ্চ পুত্রো মে সম্বন্ধং নার্হতি দ্বিষাম্?

আবারও সেই গণতান্ত্রিকতার জয় হল। বলরামের চেয়েও হাজার গুণ বেশি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কৃষ্ণের যুক্তি শুনে সমস্ত বৃষ্ণি-ভোজেরা কৃষ্ণের মত মেনে নিলেন এবং অবিলম্বে এবং সসম্মানে অর্জুনকে ফিরিয়ে আনলেন দ্বারকায়। এটা বেশ পরিষ্কার যে, অর্জুন নিজের সাভিলাষ প্রেম পূরণ করার জন্য সুভদ্রাকে হরণ করেছিলেন। কিন্তু সুভদ্রা অর্জুনকে কতখানি পছন্দ করেছিলেন— তার এতটুকু সাভিলাষ উক্তির এতটুকু বর্ণনাও মহাভারতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি দেননি। কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণের দূতীয়ালি থেকে বুঝি সুভদ্রাও অর্জুনকে যথেষ্ট ভালবেসে ফেলেছিলেন। কৃষ্ণের কথায় শান্ত হয়ে বলরাম যাদবদের বলেছিলেন অর্জুনকে সসম্মানে ফিরিয়ে আনতে। অর্জুন ফিরেছিলেন সুভদ্রাকে নিয়ে এবং দ্বারকায় বিধিসম্মতভাবে তাঁর বিবাহাদিও সম্পন্ন হল। কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার হল— অর্জুন তাঁর বারো বছর বনবাস এবং তীর্থযাত্রাকালের মধ্যে সম্পূর্ণ এক বছর সুভদ্রার সঙ্গে অতিবাহিত করলেন দ্বারকায়— উষিত্বা তত্র কৌন্তেয়ঃ সংবৎসরপরাঃ ক্ষপাঃ। এক বছর দ্বারকায় থাকলেও বারো বৎসর-কালের তখনও খানিকটা বাকি ছিল এবং সেই সময়টুকু অর্জুন পুষ্কর তীর্থে গিয়ে থাকলেন এবং তীর্থযাত্রায় নববধূ সুভদ্রাও সঙ্গী ছিলেন নিশ্চয়। কেন না এই তীর্থ থেকেই অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজধানীতে ফিরে আসেন সুভদ্রাকে নিয়ে।

সত্যি কথা বলতে কি, বাঙালি কাশীরামের মহাভারতে সুভদ্রাকে যেমন এক বীরাঙ্গনা তথা বীরপত্নীর মতো চিত্রিত দেখি, ব্যাসের মহাভারতে তা একেবারেই উলটো। সুভদ্রার হরণ থেকে আরম্ভ করে একেবারে ইন্দ্রপ্রস্থে তাঁকে নিয়ে ফেরা পর্যন্ত একটি শব্দও তাঁর মুখে উচ্চারিত হয়নি। যে সুভদ্রাকে অর্জুন জোর করে রথে তুলেছিলেন— তামভিদ্রুত্য কৌন্তেয়ঃ প্রসহ্যারোপয়দ্ রথম্ —অথবা যে সুভদ্রাকে নিয়ে যাদবদের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধই লেগে যাচ্ছিল, সেই সুভদ্রা যেন সর্বকর্মে নির্বিকার। অর্জুনের সমস্ত ক্রিয়াশীলতার মধ্যে তিনি বড়ই অনুপস্থ। অথচ মহাবীর অর্জুন যাঁর জন্য এত প্রগাঢ় প্রেম অনুভব করেছিলেন, তিনি একেবারে নিরেট বোকা হবেন, তা হতে পারে না। আসলে মহাবীর অর্জুনের দিক থেকে এই পছন্দটাও অস্বাভাবিক নয় এবং তার কারণ হয়তো দ্রৌপদী।

দ্রৌপদীর ব্যক্তিত্ব অসাধারণ। তিনি শুধু পঞ্চস্বামী গর্বিতাই নন, ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে তিনি শুধু পট্টমহিষীই নন, পাণ্ডবদের বিবাহোত্তর জীবনে পাণ্ডব-কৌরবদের সমস্ত রাজনীতির মধ্যে তাঁর ভূমিকা আছে এবং সমস্ত ব্যাপারে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্যও আছে। এমন একটি রমণীকে তাঁর সহজাত গুণাবলির জন্য সম্মান করা যায়, শ্রদ্ধা করা যায়, অথবা এমন একটি রমণীর স্বামিত্বের অধিকার পেলে তার জন্য গর্বিতও বোধ করা যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ আত্মসচেতন সেই রমণীর সমস্ত সত্তার সম্পূর্ণ অধিকারী নিজেকেই ভেবে পুলকিত হওয়াটা যে কোনও স্বামীর পক্ষেই খুব কঠিন। এমনকী মহাবীর অর্জুনের পক্ষেও তা কঠিন। সুভদ্রার সৌন্দর্যের সঙ্গে এমন এক নমনীয়তা ছিল, তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমনই এক আত্মনিবেদন ছিল, যা দ্রৌপদীর প্রতিতুলনায় ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছে অর্জুনকে। অর্জুন জানতেন যে, দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীর ঘরণী হলেও তাঁর প্রতি দ্রৌপদীর অশেষ দুর্বলতা ছিল, কিন্তু এই দুর্বলতা প্রকাশের কোনও উপায় দ্রৌপদীর ছিল না। যদি বা সে দুর্বলতা প্রকাশও পায় তো সাহংকার বক্রোক্তিতে এমনই সূচীভেদতুল্য জ্বলনশীল হয়ে উঠবে যে, সেই দুর্বলতা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হয়ে উঠবে। এখানে দ্রৌপদীর আংশিক অধিকার নিয়ে ভাইদের সঙ্গে কোনও মানসিক দ্বন্দ্ব নেই এবং নেই কৃষ্ণা পাঞ্চালীর সভ্রূভঙ্গ বিদগ্ধমণ্ডণ মুখখানি। আর পায় কে, এক বৎসরের বেশি সময় ধরে অর্জুন থেকে গেলেন দ্বারকায়— সুখে, সরসতায়, একান্তে। কিন্তু সময় এল, যখন যেতেই হবে ইন্দ্রপ্রস্থে এবং মুখোমুখি হতেই হবে সেই বিদগ্ধা রমণীর— যিনি অর্জুনের বীরত্ব মোহেই তাঁকে বরমাল্য

দিয়েছিলেন। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে যতই ভাগ হয়ে যান দ্রৌপদী, তাঁকে অতিক্রম করা সহজ ছিল না।

ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরবার পরেই যুধিষ্ঠির মহারাজ এবং ব্রাহ্মণদের সঙ্গে দেখা করেই অর্জুন মা-ভাই এবং অন্য কারও সঙ্গে কথা না বলে, প্রথমে গেছেন দ্রৌপদীর কাছে। সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিয়ের খবর আগেই দ্রৌপদীর কানে গেছে। অর্জুনকে দেখে দ্রৌপদী ক্রোধে আরক্ত হলেন না, আবার বারো বৎসর পর পুনরাগত আপন ঈপ্সিততম স্বামীটিকে দেখে তিনি কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে অভিভূতও হলেন না। অর্জুনকে উপস্থিত দেখে দ্রৌপদী বক্রোক্তিতে মুখর হয়ে বললেন, তুমি এখানে কেন, পার্থ? তুমি যাও সেইখানে যেখানে যাদব-বৃষ্ণিদের মেয়েটি বসে আছে তোমার অপেক্ষায়— তত্রৈব গচ্ছ কৌন্তেয় যত্র সা সাত্বতাত্মজা। দ্রৌপদী সুভদ্রার নামও উচ্চারণ করলেন না। শুধু মান করে বললেন— এক জিনিসকে দ্বিতীয়বার বাঁধলে আগের বাঁধনটুকু আলগা হয়ে যায়।

কথাটা অর্জুনের কাছে হয়তো তত সুখপ্রদ নয়, কিন্তু এই কথার বাস্তব মূল্য যে কতখানি, তা এই জীবনে বহুবার দেখেছি। বিবাহ-পূর্ব প্রেমের ক্ষেত্রে যাঁরা একাধিকবার প্রেমে পড়ে সফল হয়েছেন, তাঁদের প্রথম প্রেমের সুখস্মৃতি দ্বিতীয় বারের প্রেম-মধুরতায় অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়। উপমাটাও এখানে সত্যিই অসাধারণ। ছোটবেলায় বেডিং বা বোচকা বাঁধার সময় দেখেছি— একবার দড়ি দিয়ে বাঁধার পর যদি দ্বিতীয় বার তার ওপরে কষে বাঁধার চেষ্টা করেছি, তখনই আগের বাঁধনটা শিথিল, ঢলঢলে লাগত। বিবাহের ক্ষেত্রেও প্রেমের মতোই ব্যবহার। যিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করতেন বা এখনও করেন, সেক্ষেত্রে প্রায় সময়েই প্রথম বৈবাহিক প্রেম শিথিল এবং অনবধানে কোনও রকমে চলমান থাকে। দ্রৌপদীর কথায় যে সত্য উচ্চারিত হয়েছে, তা এক চিরকালীন সত্য বটে, কিন্তু সেখানেও স্থান, কাল এবং বিশেষত পাত্রীর বিবেচনা আছে। পাত্রী যে স্বয়ং দ্রৌপদী। তাঁর মতো বিদগ্ধা, মনস্বিনী এবং তেজস্বিনী মহিলার মুখে এমন কথা যে উচ্চারিত হয়েছে, তা হয়তো শুধু অর্জুন বলেই, কেননা অর্জুনের ওপরেই তাঁর অসম্ভব দুর্বলতা ছিল। ফলত এমন এক রমণীকে অতিক্রম করা খুব কঠিন। একথা ঠিক যে, দ্রৌপদীকে সম্পূর্ণ করে পাননি বলেই অর্জুনের জীবনে এতগুলি নারীর পদসঞ্চার ঘটেছে, এতগুলি বিবাহের পরেও এমন বিদগ্ধা রমণীকে অতিক্রম করা অর্জুনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। যদি বা প্রেম নাও হয়, তবু এটা হয়তো অপাদান কারকে বৈদগ্ধ্য হইতে ভয়।

অর্জুন বুঝলেন— দ্রৌপদীর এই অধিকার-বোধের মধ্যে প্রেম যত আছে, তার চেয়ে বেশি আছে অহংকার। দ্রৌপদীর মানে লাগছে, তিনি থাকতেও অন্যতরা কেউ নাকি তাঁরই সঙ্গে সমকক্ষায় প্রবেশ করছে অর্জুনের হৃদয়ে। অর্জুন সব বুঝলেন। কিন্তু দ্রৌপদী বুঝলেন না।

দ্রৌপদী খুব দুঃখ পেয়েছেন অর্জুনের আচরণে, কিন্তু অর্জুনের দিক থেকে তেমন করে তিনি ভাবেননি। দ্রুপদের স্বয়ংবরসভায় যে বরমাল্য তিনি অর্জুনের গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন, ঘটনাচক্রে সেই বরমাল্যের বন্ধন-পরিসরে আর চার স্বামী প্রবিষ্ট হয়েছেন। একটি হৃদয়ের জন্য এতগুলি হৃদয় যেখানে এক ফাঁসে ধরা পড়েছে, সেখানে আপন সত্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহির করার উপায় অর্জুনের কোথায়? ফলে অতৃপ্ত হৃদয়কে বিশ্রান্ত করার জন্য অর্জুনকে খুঁজে নিতে হয়েছে এমন একটি প্রাণ— যে প্রাণ অর্জুনের বিক্ষুব্ধ আলোড়িত হৃদয়ে মমতা যোগাবে, যোগাবে প্রেমের বিশ্বাস। অর্জুন দ্রৌপদীকে শান্ত করতে পারেননি কারণ তাঁর আত্মসচেতনতায় চিড় ধরানো যায়নি। কিন্তু রৈবতক পর্বতের বৃক্ষান্তরালে অর্জুনের বাহুলগ্না হবার পর থেকেই যিনি আত্মনিবেদন করে বসে আছেন, অর্জুন শেষে তাঁরই শরণাপন্ন হলেন দ্রৌপদীকে শান্ত করার জন্য।

অর্জুন বুঝলেন— দ্রৌপদীর সমকক্ষায় রাজবধূর আড়ম্বরে তাঁকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করানো যাবে না। না কি, এখানে কৃষ্ণেরই বুদ্ধি ছিল, তিনি তাঁর সখী কৃষ্ণা পাঞ্চালীকে চেনেন। অতএব বিবাহের লাল চেলি আর রাঙা কাপড় পরে যে সুভদ্রা নববধূর বেশে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশ করেছিলেন, অর্জুন সেই ঐশ্বর্যের অভিব্যক্ত পরিধানটুকু সুভদ্রার অঙ্গ থেকে খুলে নিয়ে, তাঁকে পরিয়ে দিলেন সাধারণ গোপবালিকার বেশবাস— যার মধ্যে রাজকীয় মর্যাদা এবং সচেতনতা নেই, আছে শুধুই বাধ্য এবং নমনীয় হবার অভিব্যক্তি— পার্থঃ প্রস্থাপয়ামাস কৃত্বা গোপালিকা বপুঃ।

অর্জুন এই সাধারণ পরিচয়ে সুভদ্রাকে পাঠিয়ে দিলেন অন্তঃপুরে। তিনি সুভদ্রার সঙ্গে এলেন না। অতিশয় সুন্দরী যদি বৃন্দাবনবাসিনী ব্রজরমণীর বেশে সাজে, তবে যেহেতু তাঁকে আরও সুন্দর দেখায়, বীরপত্নী সুভদ্রাকেও তেমনই আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল— সাধিকং তেন রূপেণ শোভমানা যশস্বিনী। বস্তুত দ্রৌপদীর ব্যক্তিত্ব যদি অতিক্রমের তাৎপর্যে নিহিত থেকে থাকে, তা হলে সুভদ্রার ব্যক্তিত্ব নিহিত ছিল মেনে নেওয়ার নমনীয়তার মধ্যে। অতিক্রম করা অনেক সহজ মেনে নেওয়া অনেক কঠিন। নববধূ সুভদ্রা, যদু-বৃষ্ণিদের কুলজাতিকা সুভদ্রা, কৃষ্ণ-বলরামের ভগিনী সুভদ্রা কী অদ্ভুত নমনীয়তায় নিজেকে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজবাড়িতে প্রতিষ্ঠা করলেন, তা ভাবা যায় না। অসাধারণ মানসিক শক্তি ছাড়া, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছাড়া নিজের জাতি-কুল-ঐশ্বর্যের অভিমান মঞ্চ থেকে নেমে এসে নতুন পরিবেশে এমন করে মানিয়ে নেওয়া যায় না, সুভদ্রা যেমন করে মানিয়ে নিয়েছেন।

সুভদ্রা এই এক বছর ধরে অর্জুনের কাছে দ্রৌপদীর কথা শুনে থাকবেন; শুনে থাকবেন পঞ্চস্বামী গর্বিতা এক পরম ব্যক্তিত্বময়ী রমণীর কথা। কিন্তু অর্জুনের প্রতি ভালবাসায় সুভদ্রা দ্রৌপদীর কাছে দীনভাবে আসতে বিমনা হলেন না একটুও।

গোপিনীর সাধারণ বেশে সুভদ্রা প্রথমে জননী কুন্তীকে প্রণাম করতে গেলেন। সর্বাঙ্গ সুন্দরী এমন এক নমনীয়া বধূমাতাকে বুকে জড়িয়ে ধরে স্নেহসূচক মস্তক আঘ্রাণ করা ছাড়া অন্য কোনও উপায়ই ছিল না কুন্তীর— তাং কুন্তী চারু সর্বাঙ্গীমুপাজিঘ্রত মূর্ধনি। কুন্তীর আশীর্বাদ গ্রহণ করে সুন্দরী সুভদ্রা দ্রৌপদীর ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরে ঢুকে দ্রৌপদীর পাদবন্দনা করে সুভদ্রা বললেন— আমি আপনার দাসীমাত্র— প্রেষ্যাহম্ ইতি চাব্রবীৎ। নববিবাহিতা রাজবধূর গায়ে রক্ত কৌষেয় বাসখানি নেই, মুখের মধ্যে অর্জুনের প্রথমা প্রিয়াকে জয় করার ঔদ্ধত্য নেই, বরঞ্চ দ্রৌপদীর সামনে জড়, ভয়াকুলিতা সেই রমণী এক অস্ফুট উচ্চারণে বলছে— দিদি! আমি আপনার দাসী, আপনার চরণ-সেবায়

উপস্থিত— এই একটা কথায় দ্রৌপদী একেবারে বিগলিত হয়ে গেলেন। পঞ্চস্বামী গর্বিতা দ্রৌপদী যে মর্যাদার আসনে বসেছিলেন, নবাগতা এই রমণীটি যে সেই মর্যাদার প্রতিযোগিনী হয়ে আসেনি— এই সান্ত্বনাবোধ দ্রৌপদীকে সুভদ্রার ওপর প্রীত করে তুলল। যথোচিত উদারতায় সেই দ্রৌপদীসুলভ বক্রোক্তি মিশিয়েই দ্রৌপদী সুভদ্রাকে বললেন— তোমার স্বামী শত্রুশূন্য হয়ে থাকুন— এই আমি চাই— নিঃসপত্নোঽস্তু তে পতিঃ।

আসলে সুভদ্রার নিরহংকার দীন 'দাসী' সম্বোধনটুকু দ্রৌপদীর অন্তরাত্মা তৃপ্ত করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন— এ আমাকে অতিক্রম করবে না। হায়! দ্রৌপদী বুঝলেন না যে, বিদগ্ধতা, ব্যক্তিত্ব এবং অন্যকে দমিয়ে রাখার ক্ষমতা, এমনকী স্বামীকেও আপনিই প্রহ্বীভূত করে রাখার ক্ষমতা একটি স্বামীকে এক ধরনের আহংকারিক তৃপ্তি দেয়, উচ্চতাও দেয় হয়তো, কিন্তু মুগ্ধতা দেয় না, নিশ্চিন্ততাও দেয় না। শুধু আনুগত্যের মহিমাতেই সুভদ্রা জিতে গেলেন। তাঁর ওপরে দ্রৌপদীর আশীর্বাদ ফলল কি না জানি না, কিন্তু দ্রৌপদী যে কোনও দিন এই কোমলা রমণীকে শত্রু ভাবেননি, তার কারণ যতখানি সুভদ্রার আনুগত্য, তার চেয়ে বেশি পঞ্চস্বামী গর্বিতার আত্মতৃপ্তি, যেটা কাশীরাম দাস ঠিক ধরেছিলেন, পাঞ্চালী কৃষ্ণার ব্যক্তিত্ব এমনই যে, 'এক তিল পঞ্চস্বামী নাহি ছাড়ে পাছ।'

সুভদ্রা দ্রৌপদীর ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ মেনে নিয়েছিলেন অনুকূল ভাবনায় এবং আনুগত্যে, হয়তো এই কারণেই সুভদ্রা দ্রৌপদীরও প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন সমধিক এবং হয়তো বা দ্রৌপদীও নিজের বৈদগ্ধ্য-বুদ্ধিতে সুভদ্রাকে আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন বলেই পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইয়েরও কোনও অশান্তি তৈরি হয়নি, অশান্তি হয়নি শাশুড়ি হিসেবে জননী কুন্তীরও। কেননা পাঁচ ভাই পাণ্ডবের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির এবং কুন্তী দু'জনেই মনে-মনে এই খবর জানতেন যে, পাঁচ স্বামীর সঙ্গে বিবাহে খণ্ডিতা হলেও খণ্ডিতা দ্রৌপদীরও মানসিক দুর্বলতা ছিল অর্জুনের জন্য। সেই অনন্ত দুর্বলতার জন্যই হয়তো দ্রৌপদী ভগিনীস্নেহে মেনে নিয়েছিলেন সুভদ্রার একান্ত অধিকার এবং দ্রৌপদীর 'ক্রেডিট'টা এই ব্যাপারে বেশি, কেননা তিনি সব মেনে নিয়েছিলেন বলেই সমস্ত পাণ্ডবরা এবং জননী কুন্তী শেষ পর্যন্ত শান্তিতে খুশি হয়ে উঠতে পেরেছিলেন— ততস্তে হৃষ্টমনসঃ পাণ্ডবেয়া মহারথাঃ।/কুন্তী চ পরমপ্রীতা বভূব...॥

সুভদ্রার এই বিবাহের পরপরই দ্বারকার যাদব-বৃষ্ণিদের ঘর থেকে বহুতর উপহার আসতে আরম্ভ করল খাণ্ডবপ্রস্থে; তখনও এটা ইন্দ্রপ্রস্থ হয়নি। কী নেই তার মধ্যে! রাজকীয় হস্তী-অশ্ব, সোনা-দানা, মণি-রত্ন, দাস-দাসী ছাড়াও যেটা বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, সেটা হল— স্বয়ং বলরাম কৃষ্ণের সঙ্গে উপস্থিত হলেন খাণ্ডবপ্রস্থে এবং এলেন বৃষ্ণি-অন্ধক- ভোজ-যাদবদের প্রধান পুরুষেরা। অর্জুন যেহেতু রাক্ষসবিধিতে সুভদ্রাকে হরণ করেছিলেন এবং সেই হরণ নিয়ে কিছু অসন্তোষও তৈরি হয়েছিল দ্বারকার যদুবৃষ্ণিসঙ্ঘে, তাই উপহার দেবার প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণের উদ্যোগে সুভদ্রাহরণের ঘটনা যখন সকলের অনুমোদন লাভ করল, তখন বলরাম-কৃষ্ণ সকলকে সঙ্গে নিয়ে খাণ্ডবপ্রস্থে এলেন এবং ধনরত্নের বহুল উপহার নিয়ে এলেন সুভদ্রার প্রাপ্য স্ত্রীধন হিসেবে— দদৌ শত সহস্রাখ্যং কন্যাধনমনুত্তমম্। বলরাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আনুষ্ঠানিক বৈবাহিকতায় অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার পাণিগ্রহণ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেন— রামঃ পাণিগ্রহণিকং দদৌ পার্থায় লাঙ্গলী।

বৃষ্ণি-অন্ধকদের সঙ্ঘরাষ্ট্র থেকে এত যে দান-মান-সম্মানের আয়োজন এবং যুধিষ্ঠিরের দিক থেকে সেই দান-প্রতিগ্রহণের মধ্যেও যে বাধিত, সম্মানিত বোধ দেখা গেছে— পূজয়ামাস তাংশ্চৈব বৃষ্ণ্যন্ধক-মহারথান্— তাতে এই বিবাহের একটা রাজনৈতিক তাৎপর্যও ধরা পড়ে। তৎকালীন দিনের অপ্রতিরোধ্য রাজা মাগধ জরাসন্ধের জামাই মথুরাধিপতি কংস কৃষ্ণের হাতে হত হয়েছেন এবং বৃষ্ণি- অন্ধক-ভোজদের সঙ্ঘশাসনপ্রথা আবারও ফিরে এসেছে কুলপ্রধানদের হাতে। কিন্তু সে শাসন এখনও অস্থির কেননা জরাসন্ধ বারবার আক্রমণ করছেন মথুরা-দ্বারকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। কৃষ্ণ-বলরামের বিরুদ্ধে জরাসন্ধের মিত্রবাহিনীতে যাঁরা যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন, সেই বাহিনীর পুচ্ছদেশে কিন্তু দুর্যোধনকেও আমরা দেখছি খিলহরিবংশের বিবরণে। মহাভারতে দেখা যাচ্ছে— সুভদ্রার বিবাহ উপলক্ষে যে পরিমাণ দান-মান এল দ্বারকা থেকে তার মধ্যে যুদ্ধের উপকরণ হিসেবে হস্তী-অশ্ব যথেষ্টই আছে এবং মহাভারত বলেছে এইসব গজবাজি, ধনরত্নের বিশাল উপকরণ যুধিষ্ঠিরের শত্রুকুলের কাছে যথেষ্ট কষ্টের কারণ হয়ে উঠল— দ্বিষচ্ছোকাবহোঽভবৎ। অন্যত্র একটি গ্রন্থে আমরা এই বিবাহের রাজনৈতিক তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে বলেছি যে, কংসবধের পর মগধরাজ জরাসন্ধের রাজনৈতিক এবং সাময়িক তাড়না সহ্য করাটা কৃষ্ণের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠছিল। এই অবস্থায় কৃষ্ণ যে-সব কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করেন, সেগুলির অন্যতম হল— কৌরব-পাণ্ডবদের জ্ঞাতিবিরোধে অংশ নিয়ে তাঁর আত্মীয় পাণ্ডবদের কাছাকাছি আসা বা তাঁদের সহায়তা করা। জরাসন্ধের রাজনৈতিক প্রতাপ এতটাই বেশি ছিল যে, কৃষ্ণের নিজের আত্মীয়গুষ্টির অনেকেই কৃষ্ণের বিরুদ্ধে জরাসন্ধের সহায়তা করেছেন। কৃষ্ণের পট্টমহিষী রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক এবং রুক্মিণীর ভাই রুক্মী কৃষ্ণের বিরুদ্ধে ছিলেন। বিরুদ্ধে ছিলেন চেদিরাজ শিশুপাল, যাঁর সঙ্গে কৃষ্ণের আত্মীয়-সম্পর্ক ঠিক পাণ্ডবদের মতোই— পাণ্ডবরা তাঁর এক পিসি কুন্তীর ছেলে, শিশুপাল তাঁর আর এক পিসি শ্রুতশ্রবার ছেলে। অথচ শিশুপাল ঘোর কৃষ্ণবিরোধী ছিলেন এবং তিনি জরাসন্ধের দক্ষিণহস্ত।

এঁরা ছাড়াও আরও অনেক জরাসন্ধ-পক্ষপাতী শত্রুদের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থিতি সুরক্ষিত করার তাগিদেই কৃষ্ণের দিক থেকে এইসব রাজনৈতিক পদক্ষেপ ভীষণ রকমের জরুরি ছিল। আমরা মনে করি— অর্জুনের প্রতি সখ্যবশত তো বটেই, কিন্তু এই সখ্যতা ছাড়াও সুভদ্রাহরণে অর্জুনকে মদত দেওয়া এবং তার জন্য জ্যেষ্ঠ বলরামের বিরুদ্ধে চলে গিয়েও এই বিবাহের উদ্যোগ সফল করে তোলার মধ্যে ন্যূনাধিক কিছু রাজনৈতিক তাৎপর্যও ছিল। সেটা মহাভারত-পুরাণ স্পষ্ট করে কোথাও বলেনি এবং বলবেও না বটে, কিন্তু দ্বারকার বৃষ্ণি-অন্ধকদের পুরো গুষ্টি যেভাবে খাণ্ডবপ্রস্থে নেচে-কুঁদে বাজনা বাজিয়ে বেশ কিছু সময় কাটিয়ে গেলেন— তত্র তত্র মহানাদৈরুৎকৃষ্টতলনাদিতৈঃ— তাতে বুঝি বৈবাহিক তাৎপর্য ছাড়াও আরও কিছু আছে যা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শত্রুপক্ষের কাছে

পীড়াদায়ক বটে। সবচেয়ে বড় কথা, যদুবৃষ্ণিরা বলরামের তত্ত্বাবধানে দ্বারকায় ফিরে গেছেন, কিন্তু তার পরেও কৃষ্ণ থেকে গেছেন খাণ্ডবপ্রস্থে— এবং কিছুদিনের মধ্যে খাণ্ডববন দহন করে খাণ্ডবপ্রস্থটাকে ইন্দ্রপ্রস্থে রূপান্তরিত করা হবে এবং জরাসন্ধ বধের পর যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ হবে।

তবে সুভদ্রার বিয়ের মধ্যে রাজনৈতিক তাৎপর্য যাই থাক, সুভদ্রা নিজে খুব রাজনীতি বুঝতেন না, বুঝতে চানওনি কোনও দিন। বিশেষত যেখানে দ্রৌপদীর মতো ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, সেখানে তিনি পাণ্ডবগৃহের কুলবধূর মর্যাদা এবং বধূত্বের মোহটুকুই পছন্দ করেছেন বেশি। হয়তো এই কারণেই মহাভারতের কবি সুভদ্রার পরবর্তী জীবন-বিবরণে তাঁর পুত্রজন্মের ঘটনাটাই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন এবং এখানে লক্ষণীয়, পঞ্চস্বামীর ঔরসে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র-জন্মের ঘোষণা করার আগেই মহাভারতের কবি সুভদ্রার পুত্রজন্মের কথা বলছেন। তার চেয়েও বড় কথা, অভিমন্যুর জন্ম, তাঁর আকৃতি, তাঁর অস্ত্রশিক্ষা নিয়ে যতগুলি শ্লোক মহাকবি ব্যয় করেছেন, সেখানে— সৌভদ্র অভিমন্যুকে নিয়ে এত কথা বললাম, অতএব দ্রৌপদীর পুত্রদের কথা না বললে কেমন দেখায়— ঠিক এই ভাবনাতেই যেন মহাকবি লিখলেন— পাঞ্চালী কৃষ্ণাও তাঁর পঞ্চস্বামীর কাছ থেকে পাঁচটি পুত্র লাভ করলেন— পাঞ্চাল্যপি তু পঞ্চভ্যঃ পতিভ্যঃ শুভলক্ষণা।

সুভদ্রার সম্পূর্ণ জীবন দ্রৌপদীর মতো ঘটনাবহুল নয়। স্বামীর রাজনৈতিক জীবনের নানান টানাপোড়েন অথবা জ্ঞাতিবিরোধের কূট প্রশ্নগুলি তাঁকে যেমন এতটুকুও আলোড়িত করে না, তেমনই অর্জুনের মতো বীর স্বামীর বিচক্ষণতা এবং উচ্চতাও যে সুভদ্রাকে কখনও আকণ্ঠ আপ্লুত পুলকিত করে রেখেছিল এমন কোনও স্বকণ্ঠ-নির্গত প্রমাণও আমরা সুভদ্রার মুখ থেকে পাই না। গবেষণার চিরাচরিত চর্চায় এই কথাই উঠে আসবে যে, 'পণ্ডিতা চ মনস্বিনী' দ্রৌপদীর অসামান্য ব্যক্তিত্বই সুভদ্রার কণ্ঠরোধের কারণ অথবা তাঁর ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পরিপন্থী। আপাতদৃষ্টিতে এই কথাই মহাভারত-পাঠকের মনে হবার কথা। কিন্তু মূল সংস্কৃত মহাভারতের প্রতিপদপাঠের তাৎপর্য বিচার করলে দেখা যাবে— সুভদ্রার ব্যক্তিত্ব এবং জীবনবোধই তেমন প্রখর নয় হয়তো।

বিপরীত দিক থেকে সমাজ-পটের যে চিত্র আমরা জানি, তাতে এমনও দেখেছি— অতি মূর্খ স্ত্রীও— হয়তো কিছু বোঝেন না বলেই উচ্চশিক্ষিত স্বামীর উচ্চতা প্রমাণ করার জন্য অনেক সময় হাস্যকর ভাবেও গলা ফাটিয়ে ফেলেন।

আবার আপাত বড় নিরীহ, দুর্গত, সাত চড়ে রা কাড়ে না এমন রমণীকেও আমি বহুল পারিবারিক কূটনীতি করতে দেখেছি এবং কোনও কোনও সময়ে তাঁদের তারগ্রামে ন্যস্ত কণ্ঠস্বর চকিত-চকিত করেছে আমাকে। তখন মনে হত— ব্যক্তিত্ব বস্তুটারও উত্তম-মধ্যম-অধম, এমনকী অধমাধম স্তরও আছে। অথচ সুভদ্রা বোধহয় এগুলির কোনও স্তরেই পড়েন না। বৈয়াসিকী মহাভারত-সংহিতায় বার বার সুভদ্রার পরিচয় উল্লিখিত হয়েছে— তিনি বসুদেবের মেয়ে, স্বয়ং কৃষ্ণের বোন বলে কথা— দুহিতা বসুদেবস্য বাসুদেবস্য চ স্বসা— কিন্তু বাস্তব জীবনে এই মহান পরিচয়ের এতটুকুও ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্ফুট হয়নি সুভদ্রার চরিত্রে। লক্ষণীয়, তিনি যদি কাশীরাম দাসের মানস-প্রসূতিও হতেন, তা হলেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর প্রকৃতি অন্যরকম হতে পারত। কিন্তু কাশীরাম বৈবাহিক ব্যাপারে সুভদ্রার জর-জর প্রেমবিকার দেখালেন, সুভদ্রাহরণ-পর্বে সুভদ্রার বীরাঙ্গনা-সুলভ রথচালনা দেখালেন বটে, কিন্তু তার পরে কাশীরামের মধ্যেও সেই বৈয়াসিকী স্তব্ধতা নেমে এসেছে— যে স্তব্ধতা মূল মহাভারতে প্রথম থেকেই ছিল।

মহাভারতে সুভদ্রাকে দেখার পর অর্জুনের মনোহরণ-পর্বে সুভদ্রার দিক থেকে একটি প্রেমের শব্দও ভেসে আসেনি, বাসুদেব কৃষ্ণ আপন জ্যেষ্ঠ বলরামের বিরুদ্ধে গিয়ে অর্জুনকে সুভদ্রা-হরণের প্রস্তাব দিচ্ছেন, সুভদ্রা তা জানেনও না এবং শেষ পর্যন্ত যখন রৈবতক পর্বতের মন্দির পরিক্রমা-শেষে দ্বারকার দিকে অভিমুখী সুভদ্রাকে দৌড়ে এসে জাপটে ধরে জোর করে রথে তুললেন অর্জুন— তামভিদ্রুত্য কৌন্তেয় প্রসহ্যারোপয়দ্ রথম্— তখনও আমরা সুভদ্রার মধ্যে এমন কোনও প্রতিক্রিয়া দেখিনি যাতে মনে হয়— তিনি মহাবীর অর্জুনের সঙ্গে বীরমহিমায় বীরপত্নীর মতো রথে যেতেই প্রস্তুত; অথবা এমন কোনও ভাবও তিনি করছেন না, যাতে তিনি বিপরীত সক্রিয়তায়— ওরে কে কোথায় আছিস রে, আমায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে রে— এমন কথাও একবারও উচ্চারণ করেছেন।

আমার ভাবতে অবাক লাগে কেমন উদাসীন এই রমণী, কেমন তাঁর জীবনবোধ, কেমনই বা তাঁর যুবতী-হৃদয়ের রোমাঞ্চ যাতে অর্জুনের জীবনে তাঁর নিঃশব্দ পদসঞ্চরণগুলি তেমন করে বুঝতেই পারি না, অথচ রবীন্দ্রনাথের মতো আপাদমস্তক রোম্যান্টিক কবি 'প্রেমের অভিষেক'-এর মতো একটি অন্তরঙ্গ কবিতায় চারটি-পাঁচটি প্রেমোজ্জ্বল পুরাকল্পের মধ্যে সুভদ্রার কথা জানিয়েছেন—

গিরিতটে শিলাতলে
কানে কানে প্রেমবার্তা কহিবার ছলে
সুভদ্রার লজ্জারুণ কুসুমকপোল
চুম্বিছে ফাল্গুনী।

আমি বিশ্বাস করি না এই মহাকবি কাশীরাম দাসের কাছ থেকে কোনও অনুপ্রাণ প্রেরণা লাভ করেছেন, কেননা কাশীরামের বীরাঙ্গনা সুভদ্রার কোনও তাৎপর্য তিনি গ্রহণ করেননি। বরঞ্চ বলব— ব্যাসের মহাকাব্য-কথনের মধ্যে সুভদ্রার যে শব্দহীন কথাহীন আত্মনিবেদন সংকেতিত হয়েছে, তাঁর হরণপর্ব থেকে শুরু করে পুত্রজন্ম পর্যন্ত যে মুগ্ধমধুর সম্ভোগ অকীর্তিত রয়েছে রবীন্দ্রনাথ সেখান থেকেই এই সদা-সতত লজ্জারুণা সুভদ্রাকে তুলে এনেছেন পুরাকল্পীয় মুক্তার মতো। কী বোঝাচ্ছেন মহাকবি? প্রেমের অভিষেকে এটাই তো মর্মবাণী ছিল যে, হেথা আমি কেহ নহি, সহস্রের মাঝে একজন— সত্যিই তো ইন্দ্রপ্রস্থের পঞ্চ দৃপ্ত পাণ্ডবদের মধ্যে অর্জুন তো মাত্র একজন, দ্রৌপদীর পঞ্চখণ্ড হৃদয়ের তৃতীয় সমাংশমাত্র। অথচ সুভদ্রাকে অর্জুন দেখামাত্র বরণ করেছিলেন সমস্ত হৃদয় দিয়ে। ফলত বৈবাহিক হরণের পূর্বেও তিনি নিশ্চুপ, হরণের কালেও তিনি নিরালাপ, নিরাভাষ নিবেদিতপ্রাণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেমের অমরাবতীতে যে ছয়টি পুরাকল্পের চরিত্র

উল্লেখ করেছেন, তাঁদের মধ্যে পাঁচ জন রমণী ছাড়াও একটি পুরুষও আছেন— উর্বশীর জন্য অশান্ত ভ্রান্ত পাগল পুরুরবা। কিন্তু দময়ন্তী, শকুন্তলা, পুরুরবা, সুভদ্রা, মহাশ্বেতা, পার্বতী— এঁদের প্রত্যেকের মধ্যে সেই সামান্য সাধারণ ধর্ম হল— এঁরা সাত্ত্বিক শারীর প্রেমকে তপস্যায় পরিণত করেছেন— অপেক্ষায় বসে বসে দিন গণনায়— সে আসিবে একদিন।

সুভদ্রা অর্জুনকে পেলেন কতটুকু? যেদিন কৃষ্ণের পরামর্শ মেনে যাদব-বৃষ্ণিরা অর্জুনকে দ্বারকায় ফিরিয়ে আনলেন সমস্ত মর্যাদা দিয়ে, সেই দিন থেকে এক বৎসরকাল অর্জুন সুভদ্রার সঙ্গলাভ করেছেন পূর্ণ অধিকারে। এখানে ব্রাহ্মণের গোরু হারায়নি, অকালে অস্ত্রগৃহে প্রবেশ করে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বসা দ্রৌপদীকে দেখে অধিকার-ভঙ্গের অঙ্গুলি-সংকেত সহ্য করতে হয়নি, অথবা যুধিষ্ঠিরের পর ভীমের পর্যায়-ভাগে অপেক্ষা করতে হয়নি পুনরায় অপেক্ষিত নকুল-সহদেবের রমণোচ্ছিষ্ট দ্রৌপদী-খণ্ডের জন্য। এখানে বর্ষকালভর 'প্রেমের অভিষেক' ঘটেছে এক সম্পূর্ণ নিবেদিতা রমণীর কাছে, তাঁর মন এখানে ঢাকা আছে 'অভিনব লাবণ্যবসনে', সুভদ্রার হৃদয়ে অর্জুন মহীয়ান সম্রাট।

এক বৎসর পর সুভদ্রাকে নিয়েই যেতে হয়েছে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজধানীতে। সেখানে দ্রৌপদীর বীর্য-সত্তা মেনে নিয়েই সুভদ্রা কিন্তু অন্তঃস্বত্তা হয়েছেন কুমার অভিমন্যুর জন্ম দেওয়ার জন্য।

পূর্বে দেখেছি, হৃদয়ের গভীর ক্ষত থেকে দ্রৌপদী সুভদ্রার সামনে যে হতাশা উচ্চারণ করেছিলেন— তোমার স্বামী শত্রুশূন্য হোক— সেই হতাশা সম্পূর্ণ সত্য ছিল কিনা জানি না। কিন্তু সুভদ্রা যে আপন গুণেই তাঁর প্রিয়তম স্বামীর হৃদয় হরণ করেছিলেন, তা অন্তত একটি সূত্রে বোঝা যায়। লক্ষণীয়, দ্রৌপদীর গর্ভে পঞ্চ পাণ্ডবের পাঁচটি পুত্র হয়েছিল এবং অর্জুনের ঔরসজাত পুত্রটির নাম ছিল শ্রুতকীর্তি। কিন্তু সেই শ্রুতকীর্তি কি কোনও দিন সুভদ্রার গর্ভজাত আর্জুনি অভিমন্যুর সমকক্ষ হতে পেরেছেন?

সুভদ্রা আসলে এতটাই মানিয়ে নিয়েছিলেন দ্রৌপদীকে যে, সুভদ্রার গর্ভজাত অভিমন্যুকে দ্রৌপদী নিজের ছেলের অধিক ভালবাসতেন। সুভদ্রার কী অসাধারণ গৃহমেধী বুদ্ধি যে, দ্রৌপদীর বুদ্ধিকেও তিনি নিজের অনুকূলে লালিত করেছিলেন শুধু আনুগত্যের মহিমায়। হয়তো বা আনুগত্যেরও এক অহংকার আছে, যা বাইরে থেকে একেবারেই বোঝা যায় না, কারণ এই অহংকারের কোনও অভিব্যক্তি নেই, অবশ্য অহংকার না বলে এটাকে অভিমানহীন অনুকূল আচরণ বলাই ভাল। দ্রৌপদীর অনন্ত বিদগ্ধতা, মনস্বিতা এবং দৃপ্তির আড়ালে অর্জুন এখানে নিশ্চিন্ত আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন।

ইন্দ্রপ্রস্থে কতদিনই বা আর থাকতে পরেছেন সুভদ্রা। ইন্দ্রপ্রস্থের অন্তঃপুরে থাকার সময় একদিন যমুনা-পুলিনে বনভোজনের সুযোগ এসেছিল এবং সেটা তাঁর বৈবাহিক পর্বের পরপরই মনে হয়। কেননা বিয়ের আসর সেরে সকলে চলে যাবার পর কৃষ্ণ তখনও খাণ্ডবপ্রস্থে রয়ে গেছেন। এই সময়েই দুই সখা কৃষ্ণ এবং অর্জুন যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে যমুনাতীরে ধীরসমীরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। রাজধানীতে তখন প্রবল গরম পড়েছে। অর্জুন কৃষ্ণকে বলেছিলেন— এত গরম আর সহ্য করা যাচ্ছে না, চলো যাই যমুনাতীরে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উষ্ণানি কৃষ্ণ বর্তন্তে গচ্ছাবো যমুনাং প্রতি। এই সফরে সুভদ্রা ছিলেন, দ্রৌপদীও ছিলেন। দুই বধূর সম্পর্ক এতটাই ভাল যে, যমুনাতীরের অস্থায়ী আবাসে যে সব অনুগতা রমণীরা নাচ দেখিয়েছিল, গান করেছিল, দ্রৌপদী এবং সুভদ্রা তাদের প্রচুর জামা-কাপড়, প্রচুর গয়নাগাটিও দিয়ে দিয়েছিলেন— দ্রৌপদী চ সুভদ্রা চ বাসাংস্যাভরণানি চ।

দ্রৌপদীর নাম আগে থাকায় বুঝতে পারি— তাঁর ভূমিকাই প্রধান, কিন্তু পাশেই সুভদ্রা থাকায় এটাও বুঝতে পারি যে, সুভদ্রা দ্রৌপদীর কাছে সতীন-কাঁটা হয়ে ওঠেননি। আপন আনুগত্যময়ী বুদ্ধিতে সুভদ্রা সাহংকারে নিজকক্ষে প্রতিষ্ঠিত। ঠিক এই যমুনাবিহারের পরেই খাণ্ডবপ্রস্থের বন দহন করে ইন্দ্রপ্রস্থ তৈরি হয়েছে। আর ইন্দ্রপ্রস্থ তৈরি হওয়া মানেই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ এবং জ্ঞাতিবিরোধের ঈর্ষা-দ্বেষ, রাজনীতি সব আরম্ভ হয়ে গেল। এইসব সময়ে সুভদ্রা একেবারেই পর্দার আড়ালে। তবে সুভদ্রার গর্ভজাত অভিমন্যুকে ইতোমধ্যেই অর্জুন অস্ত্রশিক্ষায় সুশিক্ষিত করে ফেলেছেন নিজের হাতে। দ্রৌপদীর গর্ভে জাত পুত্রদের ক্ষেত্রে কতখানি উৎসব-আড়ম্বর হল, সে খবর মহাভারতের কবি দেননি, কিন্তু অগ্রজাত অভিমন্যু জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্ঠির দু'হাতে অর্থ বিলিয়েছেন ব্রাহ্মণদের। পাঁচ পাণ্ডব ভাইদের কাছেই অভিমন্যু সৌভদ্র ভীষণ ভীষণ প্রিয়— পিতৃণাঞ্চৈব সর্বেষাং প্রজানামিব চন্দ্রমাঃ। বস্তুত অভিমন্যু যে সমস্ত পাণ্ডব-ভাইদের, এমনকী দ্রৌপদীরও নয়নের মণি হয়ে উঠলেন, এর জন্যও তো সুভদ্রাকেই ধন্যি মানতে হবে। বস্তুত এখানেও সেই আনুগত্য এবং অনুকূল ভাবনার দীপ্তি আছে, যেখানে সুভদ্রা আপন অঞ্চলছায়ায় অভিমন্যুকে ধরে রাখেননি। তাঁকে বাড়তে দিয়েছেন দ্রৌপদীর তত্ত্বাবধানে, পঞ্চপাণ্ডবের একত্রবদ্ধ ছত্রচ্ছায়ায়।

ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞের পরপরই সেই বিষময় পাশাখেলা আরম্ভ হয়েছে, পাণ্ডবদের এবং দ্রৌপদীর কপালে জুটেছে বনবাস। পুত্রদের বনবাসকালে জননী কুন্তী রাজবাড়িতে বিদুরের আশ্রয়ে থেকে গেলেন। কিন্তু অন্যেরা কে কোথায় গেলেন যে সেই মুহূর্তে জানাননি মহাভারতের কবি। সেই সময় উভয় পক্ষের ক্রোধোক্তি এবং দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের ঘটনা এতটাই বর্ণময় এবং বিপ্রতীপভাবে ভাস্বর যে, এইসব ক্ষুদ্র সংবাদ দেবার উপায় হয়নি মহাকবির। কিন্তু তেরো বছর পর বিরাট রাজার বাড়িতে কুমারী উত্তরার সঙ্গে যখন অভিমন্যুর বিবাহ আরম্ভ হল, তখন দেখলাম— মাতামহ দ্রুপদের বাড়ি থেকে দ্রৌপদীর ছেলেরা উপস্থিত হলেন বিবাহ-বাসরে, আর ওদিকে অভিমন্যু এবং তাঁর মা সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ-বলরাম এবং অন্যান্য যাদব-বৃষ্ণি-প্রধানেরা দ্বারকা থেকে এলেন বিরাটের বাড়িতে— অভিমন্যুমুপাদায় সহ মাত্রা পরন্তপ। আমরা বুঝতে পারি— পাণ্ডবদের তথা দ্রৌপদীর বনবাস-কালে সুভদ্রা বাপের বাড়িতেই অর্জুন-বিরহ সম্পন্ন করেছেন এবং অভিমন্যুও দিন কাটিয়েছেন মামাবাড়িতে কৃষ্ণের আদরে।

কিন্তু এতকাল বনবাসে দিন কাটিয়েও অর্জুন যে সুভদ্রা বা অভিমন্যুর কথা ভোলেননি, তা বোঝা যায়— উত্তরার বিবাহ-প্রস্তাব উঠতেই অর্জুন সুভদ্রার গর্ভজাত অভিমন্যুর কথা বলেছেন গর্বভরে। বলেছেন— আমার সেই ছেলে বাসুদেব কৃষ্ণের বোনের ছেলে— স্বস্রীয়ো বাসুদেবস্য সাক্ষাদ্দেবশিশুর্যথা। লক্ষণীয়, এখানে কিন্তু দ্রৌপদীর গর্ভজাত অর্জুনের

ছেলে শ্রুতকীর্তির কথা আসেনি, অথচ দ্রৌপদী তখনও বনবাসের তেরো বছরের সহবাস-পরিচয়ে বিরাটনগরে গভীরভাবে উপস্থিত এবং দ্রৌপদীও অর্জুনের মুখে অভিমন্যুর বিবাহ-প্রস্তাবে এতটুকুও বিসদৃশ অন্যায় কিছু দেখেননি। তিনি এতটাই স্নেহ করতেন অভিমন্যুকে অথবা সুভদ্রাকেও। সুভদ্রার নিরুচ্চার অথচ মোহময় ব্যক্তিত্বে দ্রৌপদী এতটাই মোহিত ছিলেন যে, সুভদ্রার এই অসামান্য বীর পুত্রটিকে দ্রৌপদী নিজের ছেলেদের চেয়েও বেশি ভালবাসতেন। আমরা বলব— এখানেও সুভদ্রাকেই বাহবা দিতে হবে, কেননা নিজের কুক্ষিজাত পুত্রকে জ্যেষ্ঠা সপত্নীর অনুশাসনে রাখাটা খুব সহজ কাজ নয়। সুভদ্রা সেটা করতে পেরেছেন নিরুচ্চারে, অন্যাভিলাষিতাহীন আনুগত্যের মহিমায়। সুভদ্রার এই ছেলেটিকে কতখানি স্নেহ করতেন অথবা ভরসা করতেন দ্রৌপদী, সেটা সবচেয়ে ভাল প্রমাণ হবে একটি উদাহরণ থেকেই।

বিরাটের রাজধানীতে তখন বনবাসোত্তর যুদ্ধোদ্যোগের মিটিং বসেছে। আসন্ন এই ভয়ংকর যুদ্ধে রক্তক্ষয় যাতে না হয় তার জন্য কৃষ্ণ, ভীম, অর্জুন— সকলেই আগে শান্তির চেষ্টা করতে বলছেন; দ্রৌপদী অসম্ভব ক্রুদ্ধ হলেন এবং নিজের অপমানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কৃষ্ণকে শান্তির পথে যেতে বারণ করেছেন। তবে এই মুহূর্তে বুঝি দুর্যোধন-কর্ণ- দুঃশাসনের চেয়েও তাঁর বেশি রাগ হচ্ছে ভীম-অর্জুনের ওপর— যাঁরা একের পর এক, এবং বারংবার দুঃশাসন-কর্ণ-দুর্যোধনকে মারার প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করে হঠাৎ এখন শান্তির কথা বলছেন অসীম ক্ষমায়। দ্রৌপদী ক্রুদ্ধ হয়ে শান্তির দৌত্যে উন্মুখ কৃষ্ণের দিকে অগ্নিচক্ষুতে তাকিয়ে তাঁর কেশপাশ ধারণ করেছেন ডান হাতে এবং বলেছেন— এই সেই কেশপাশ যা দুঃশাসন দুর্যোধনের লালসায় কলঙ্কিত। সন্ধি করার আগে আমার এই অপমান যদি ভীম-অর্জুনের স্মরণে না থাকে এবং তাঁরা যদি এখন যুদ্ধ করতে না চান, তবে যুদ্ধ করবেন আমার বাপ-ভাইরা, যুদ্ধ করবে আমার বীর পুত্রেরা এবং আমার পাঁচ ছেলেই অভিমন্যুকে সামনে রেখে তার অধিনায়কত্বে কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে— অভিমন্যুং পুরস্কৃত্য যোৎস্যন্তে কুরুভিঃ সহ।

অর্থাৎ অভিমন্যুর ওপর দ্রৌপদীর এতটাই অধিকার যে, এখানে সুভদ্রা কিংবা অর্জুনের কোনও সম্মতি-অনুমতি নেবার কোনও প্রয়োজন বোধ করছেন না তিনি। আমরা বলব— এই অধিকার অভিমন্যুর ওপর যতখানি, তার চেয়েও বেশি কি সুভদ্রার ওপর নয়? নিজের পাঁচ ছেলেকে অভিমন্যুর আনুগত্যে স্থাপন করাটাও কি সুভদ্রার প্রতি তাঁর স্নিগ্ধ সম্মাননার পরিচায়ক নয়? আসলে সুভদ্রার এই অসামান্য পুত্রটিকে নিজের পুত্রদের চেয়েও অধিক মনে করতেন দ্রৌপদী। এ-বিষয়ে সবচেয়ে বড় প্রমাণটা পাওয়া যাবে অভিমন্যুর মৃত্যুর কালে। অভিমন্যু যখন সপ্তরথীর হাতে মারা পড়লেন, তখন সুভদ্রা এবং অভিমন্যুপত্নী উত্তরাকে যতখানি সান্ত্বনা দেবার কথা ভেবেছেন পাণ্ডবরা ঠিক ততখানিই ভেবেছেন দ্রৌপদীর কথা— দ্রৌপদী চৈব দুঃখার্তা তে চ বক্ষ্যামি কিংন্বহম্।

হঠাৎ করেই সুভদ্রা-দ্রৌপদীর প্রসঙ্গে অভিমন্যুর মৃত্যুর কথা এসে গেল। বস্তুত এখনই এ প্রসঙ্গ আসবার কথা। পাণ্ডবদের বনবাস-আরম্ভের তেরো বছর পর অভিমন্যুর বিয়ের সময় বিরাট রাজধানীর অদূরে উপপ্লব্য উপনগরীতে পাণ্ডবদের যে অস্থায়ী আবাস তৈরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল, সেখানেই পাণ্ডবদের সৈন্যসংগ্রহ শুরু হয় এবং সেখান থেকেই কুরুক্ষেত্রে তাঁদের যুদ্ধযাত্রাও শুরু হয়। যুদ্ধকালে পাঞ্চালী কৃষ্ণা পিতা দ্রুপদরাজার স্ত্রীদের সঙ্গে উপপ্লব্যেই ছিলেন, কিন্তু সুভদ্রা এবং অভিমন্যুর পত্নী উত্তরা কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদের যুদ্ধশিবিরের নির্দিষ্ট কোনও অস্থায়ী কক্ষাবাসেই থাকতেন বলে মনে হয়। অভিমন্যুর তখন নতুন বিয়ে হয়েছে, অতএব যুদ্ধশিবিরের কাছাকাছি কোনও ব্যক্তিগত শিবিরে থাকাটাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। আর সুভদ্রা হয়তো অর্জুনের ন্যূনতম পরিচর্যার কারণেই যুদ্ধশিবিরের কাছাকাছি ছিলেন। এত কথা এইজন্য বলছি যে, বিয়ের পর এক বছর দ্বারকায় এবং আর কয়েক বছর মাত্র ইন্দ্রপ্রস্থে অর্জুনের সাহচর্য-লাভ করা ছাড়া সুভদ্রাও তো পাণ্ডবদের সম্পূর্ণ বনবাসকালে বাপের বাড়ি দ্বারকাতেই ছিলেন। আর তারপরেই তো এই যুদ্ধ লাগল। ফলত সেই সভাপর্বে খাণ্ডব-দহনের পর ইন্দ্রপ্রস্থ তৈরি হবার কাল থেকে উদ্যোগ পর্ব পর্যন্ত সুভদ্রার কোনও প্রসঙ্গই নেই, সম্পূর্ণ যুদ্ধকালেও প্রায় তিনি অনুপস্থিত।

এবং এটাই হবার কথা ছিল। কেননা তিনি রাজনীতি নিয়েও মাথা ঘামান না, কৌরব-পাণ্ডবের জ্ঞাতিবিরোধেও তিনি এতটুকু কৌতূহলী নন। একান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁর নিঃশব্দ পদসঞ্চার ঘটে বলেই অভিমন্যুর মৃত্যুর ঠিক পরেই আমরা প্রথম বুঝতে পারি, তিনি পাণ্ডব-শিবিরেই পুত্রবধূ উত্তরার সঙ্গে আছেন এবং তাও বুঝতে পারি অভিমন্যুর মতো এক মহাবীরের যুদ্ধ সমাধির পর! সুভদ্রা এতটাই আড়ালে থাকতে ভালবাসেন। কিন্তু অভিমন্যু মারা যাবার সময় এমন মানুষকেও আড়াল থেকে বেরোতে হল। আসলে সুভদ্রার মধ্যে এমনই এক স্বপ্রকাশের অবগুণ্ঠন আছে, যা প্রায় অভেদ্য এবং দুর্গম। অভিমন্যুর মৃত্যুসংবাদ প্রথম পেয়েছেন যুধিষ্ঠির। তাঁর অপরাধবোধ এবং বিষাদের অন্ত ছিল না, কারণ প্রধানত তিনিই অর্জুনের অনুপস্থিতিতে অভিমন্যুকে সপ্তরথীর চক্রব্যূহে প্রবেশ করার জন্য উৎসাহিত করেন। অভিমন্যুর মৃত্যুতে যুধিষ্ঠিরের বাঁধভাঙা বিলাপের মধ্যে সেই ভয়ংকর যন্ত্রণা ছিল যেখানে তিনি ভাবছেন— প্রিয় পুত্রকে যিনি আর দেখতে পাবেন না, সেই সুভদ্রার সামনে গিয়ে আমি দাঁড়াব কেমন করে— সুভদ্রাং বা মহাভাগাং প্রিয়ং পুত্রমপশ্যতীম্।

অর্জুনের চিন্তাও একই রকম ছিল, কী করে তিনি সুভদ্রার মুখোমুখি হবেন, অবশ্য অর্জুনের বক্তব্যে দ্রৌপদীর ভাবনাও ছিল, যা আমরা পাণ্ডবদের জবান হিসেবে চিহ্নিত করেছি। কিন্তু সুভদ্রার মতো আত্মগুণ্ঠিত ব্যক্তির মুখোমুখি হওয়া আর দ্রৌপদীর মতো বিকীর্ণ ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি হওয়ার মধ্যে তফাত আছে। এটা সোজাসুজি প্রমাণ দেওয়া যাবে না, তবে পরোক্ষ সূত্রে অনুমান করি— দ্রৌপদীর কাছে অভিমন্যুর মৃত্যুকাহিনি শোনালে তাঁর প্রথম উত্তর হত— অভিমন্যু না হয় চক্রব্যূহে প্রবেশ করল, কিন্তু তোমরা তখন কী করছিলে বসে বসে? না, মহাভারতে এটা বলা নেই, তবে অনুমান হয় তাঁর নিজের পঞ্চপুত্রের মৃত্যুঘটনা থেকে। পুত্রদের মৃত্যুতে তাঁর বিলাপ-মূর্চ্ছা যা কিছুই হোক, তার শেষ বক্তব্য ছিল যুধিষ্ঠিরের কাছে— বেশ তো আছ, মহারাজ! তোমার রাজ্যলাভের পথ তো এখন পরিষ্কার। কিন্তু জেনে রাখো— আজ, আজই যদি অশ্বত্থামা তাঁর সহায়-সঙ্গীদের নিয়ে নিহত না হন, তা হলে আমি শুধু দিন-দিন উপোস করেই আত্মহত্যা করব— তস্য পাপকৃতো দ্রৌণের্ন চেদদ্য ত্বয়া মৃধে।

ঠিক এর প্রতিতুলনায় সুভদ্রাকে দেখলে পরে কত কল্যাণী মনে হয়। এই কল্যাণী মূর্তিরও এমন একটা তেজ আছে, যেখানে মানুষ সহসা তার মুখোমুখি হতে পারে না, সে নিজেই অপরাধবোধে ভুগতে থাকে। ঠিক এই কারণেই অর্জুন নিজে তাঁর সামনে আসতে পারেননি। তিনি কৃষ্ণ-সখাকে বলেছেন— তুমি তোমার বোনের কাছে একবার যাও। পুত্রবধূ উত্তরার সঙ্গে বোনকে একটু সান্ত্বনা দাও। সুমধুর সান্ত্বনা-বাক্য তো তুমি বলবেই এবং সত্য ঘটনার বিবরণ দিয়ে সমস্ত যুক্তি দিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেবে। তুমি যাও একবার, বোনের কাছে যাও— আশ্বাসয় সুভদ্রাং ত্বং ভগিনীং স্নুষয়া সহ।

মহাভারত লিখেছে— কৃষ্ণ সুভদ্রার সঙ্গে কথা বলার জন্য অর্জুনের ঘরে গেলেন। আমরা এই কথাই বলেছিলাম। বলেছিলাম— এই যুদ্ধ সমারোহের মধ্যেও সেনানায়ক হিসেবে অর্জুনের নিজস্ব একটি শিবির ছিল এবং সুভদ্রা নিজের বাসকৃচ্ছ্রতা মেনে নিয়ে হয়তো অস্ত্র-যুদ্ধ ক্লান্ত অর্জুনের সেবা করার জন্যই তাঁর শিবিরে থাকতেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিরাটনন্দিনী পুত্রবধূ উত্তরাও— অভিমন্যুর সঙ্গে তাঁর সেদিন বিয়ে হয়েছে। কৃষ্ণ অর্জুনের ঘরে প্রবেশ করলেন এবং এটা বুঝলেন যে, সুভদ্রা তাঁর প্রিয় পুত্রের মৃত্যুসংবাদ আগেই পেয়েছেন। কৃষ্ণ আর তাই কোনও ভণিতা করলেন না। স্নিগ্ধ সান্ত্বনা-বাক্যে বরং তাঁর পুত্রগৌরব বাড়িয়ে তুলে বললেন— ছেলের জন্য দুঃখ কোরো না, বোন! তুমি না বৃষ্ণিবংশের মেয়ে। সমস্ত প্রাণীকেই একদিন মরতে হয়, এই সাধারণ বাক্য ছাড়াও যে কথাটা বড়, সেটা হল— তোমার ছেলে ক্ষত্রিয় ঘরের জাতক, যুদ্ধ করে সে মরতে ভয় পায় না। তোমার ছেলে ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত এক সাম্মানিক মরণ লাভ করেছে, তার জন্য তুমি দুঃখ পেয়ো না— সদৃশং মরণং হ্যেতত্তব পুত্রস্য মা শুচঃ।

ক্ষত্রিয়ের বীরগতির বিষয়টাকেই বড় করে দেখিয়ে কৃষ্ণ আবারও বললেন— তোমার ছেলে হল বাপকা বেটা, অর্জুনের মতোই তার অস্ত্রক্ষমতা এবং পরাক্রম। শত্রুপক্ষের একটার পর একটা কত শত্রুকে জয় করে সে মহাবীরের অভীষ্ট গতি লাভ করেছে। অন্য মানুষ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা, বেদবিদ্যার দ্বারা অথবা প্রজ্ঞার মাধ্যমে যে স্বর্গগতি লাভ করে, তোমার ছেলে বীরকর্ম করেই সেই ক্ষত্রিয়গতি, সেই স্বর্গলাভ করেছে। সেই দিক থেকে দেখলে— সুভদ্রা! তুমি যেমন এক মহাবীরের ঘরণী বটে, তেমনই এক মহাবীরের জননীও বটে, বীরত্বের এই একান্ত আত্মীয় পরিবেশের মধ্যে এতদিন তুমি আছ, অতএব অভিমন্যুর জন্য তোমার শোক করা চলে না— বীরসূ বীরপত্নী ত্বং বীরজা বীরবান্ধবা। শত্রুপক্ষে জয়দ্রথ যা করেছে, তার ফল সে কালকেই পাবে। কিন্তু তোমার ছেলে যা করেছে তাতে সে তার পিতৃপক্ষ, মাতৃপক্ষ সকলের মুখ উজ্জ্বল করেছে। হাজার হাজার শত্রু ক্ষয় করে সে নিজে মারা গেছে। তোমারই ছেলে স্বর্গে গেছে গো, যে স্বর্গ আমরা চাই, যে স্বর্গ সমস্ত ক্ষত্রিয় বীরেরা চায়— ক্ষত্রধর্মং পুরস্কৃত্য গতঃ শূরঃ পরাং গতিম্।

কৃষ্ণ সান্ত্বনা দিলেন বটে, তবে যে মায়ের যুবক ছেলে মারা গেছে এবং সে ছেলের বিয়ে হয়েছে মাত্র ছ'মাস, সেই মাকে সান্ত্বনা দিয়ে যে কোনও লাভ হবে না, সেটা তিনি যথেষ্ট বোঝেন। সুভদ্রাকেও শান্ত রাখা যায়নি। বরঞ্চ অন্যত্র সাধারণ জীবনে যা হয়, কৃষ্ণের কথা শুনে সুভদ্রার জননী-হৃদয় একেবারে উদ্বেল উন্মথিত হয়ে উঠল। দাম্পত্য জীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকটা সময় ধরেই স্বামী অর্জুনের অনুপস্থিতিতে এই বীর পুত্রটিকে নিয়েই সুভদ্রার দিন কেটেছে বাপের বাড়িতে। আজ সেই পুত্রের মৃত্যুতে তাঁর শোক এত তাড়াতাড়ি শান্ত হবে কী করে? কৃষ্ণের সান্ত্বনায় তিনি আরও ভেঙে পড়লেন একেবারে।

তবে হ্যাঁ, সুভদ্রা তো সুভদ্রাই। রুষ্ট হলেও তিনি উন্মত্ত হয়ে ওঠেন না, শোকে মথিত হলেও তাঁর বিষাদসিন্ধু বেলাভূমি অতিক্রম করে না। বরঞ্চ তাঁর শোকের মধ্যে সদ্য যৌবনে উপনীত তাঁর পুত্রের কৈশোরগন্ধী মুখখানিই বারবার ফিরে আসে। প্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া হল— কেমন মন্দ এক জননী আমি, কেমন এই জননীর মন্দভাগ্য যে, বাপের মতো পরাক্রমশালী হয়েও আমার ছেলে আজ যুদ্ধে মারা গেল। যারা যুদ্ধস্থলে রয়েছে, তারা আজ কেমন করে দেখছে বাছা! তোমার সেই সুন্দর মোহন মুখখানি, আজ যেটা যুদ্ধভূমির ধুলোয় ধূসর হয়ে পড়ে আছে— মুখং তে দৃশ্যতে বৎস গুণ্ঠিতং রণরেণুনা। তুই তো যুদ্ধ থেকে পালিয়ে ফিরে আসার ছেলে নোস বাছা! তাই তোর অত সুন্দর শরীরটাকে সম্মুখ সমরে অস্ত্রের ক্ষতে নবোদিত চাঁদের মতো রক্তলাল দেখবে সবাই— চারুপচিতসর্বাঙ্গং স্বক্ষং শস্ত্রক্ষতাচিতম্— আমি তো ভাবতেই পারি না— যে-শরীর তোর কত শত আস্তরণে নরম বিছানায় এলিয়ে থাকত, সেই শরীর অমন কঠিন মাটিতে পড়ে আছে কী করে! শেয়াল, শকুন আর মাংসাশী পশু-পাখির আনাগোনায় কেমন অবস্থায় পড়ে আছে তোর শরীরটা, আমি ভাবতে পারি না— কথমন্বাস্যতে সোঽদ্য শিবাভিঃ পতিতো মৃধে!

পুত্রশোকে অন্যদের প্রতি সুভদ্রার তিরস্কারের ভাষাতে তীক্ষ্ণতাও আসে বটে, কিন্তু সেখানেও তিরস্কারের চেয়ে তাঁর পুত্রস্নেহ এবং জননীর আর্তনাদ তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে, যা দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে একেবারেই উলটো। এখানে সুভদ্রা একবার বলেন— পাণ্ডব-পাঞ্চাল-বৃষ্ণিবীরেরা সবাই থাকতে কেমন করে অনাথের মতো তোকে মরতে হল, বাছা! পর মুহূর্তেই তাঁর মাতৃহৃদয় উছলে পড়ে; সুভদ্রা বলেন— তোকে দেখে-দেখেই আমার আশ মেটে না, বাছা! সেখানে তোকে না দেখতে পেয়ে আমি তো মরেই যাব একদিন। অমন সুন্দর তোর চুল, অমন সুন্দর চোখ, কত মিষ্টি কথা তোর মুখে শুনি, এই মুখটা অক্ষত অবস্থায় আমি আবার কবে দেখতে পাব, বাছা— তব পুত্র কদা ভূয়ো মুখং দ্রক্ষ্যামি নির্ব্রণম্।

সুভদ্রা প্রায় পাগলের মতো হয়ে গেছেন। অভিমন্যুর বয়স তো বেশি নয়। তাই পূর্বস্মৃতিতে অভিমন্যুর একান্ত শিশুস্মৃতি তার মনে আরও তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। সুভদ্রার বিলাপিনী ভাষা মর্মে এসে আঘাত করে তখন, যখন তিনি বলেন— আয় বাছা! আয় আমার দুধ খাবি আয়। কতক্ষণ তোকে দেখিনি, আমার বুক ফুলে আছে দুধে, আমার কোলে উঠে দুধ খাবি আয়— এহ্যেহি তৃষিতো বৎস স্তনৌ পূর্ণৌ পিবাশু মে। পর মুহূর্তেই ধিক্কার নেমে আসে সুভদ্রার বাস্তব যন্ত্রণা থেকে। তিনি বলেন— যে ভীমসেনের শক্তি আর বলের কথা শুনি এত, আমার ধিক্কার রইল তাঁর জন্য। ধিক্কার সেই মহাবীর অর্জুনের ধনুষ্মত্তায়, কেমন ধনুক ধারণ করেন তিনি, কেমনই বা সেই ধনুর্বিদ্যার শিক্ষা, যা প্রয়োজনের সময় তাঁর প্রিয় পুত্রকে বাঁচাতে পারে না— ধিগ্‌বলং ভীমসেনস্য ধিক্ পার্থস্য ধনুষ্মতাম্। আমার পিতৃকুলের বৃষ্ণিবীরদেরও আমি ধিক্কার দিই, আর ধিক্কার দিচ্ছি

পাঞ্চাল বীরদের— তারা থাকতেও কেন আমার ছেলে অনাথের মতো মারা গেল। সে নাকি বাসুদেব কৃষ্ণের ভাগনে, আর গাণ্ডীবধন্বা অর্জুনের ছেলে, সেই অতিরথ বীরকে আমি নিহত হতে দেখছি কেমন করে।

এই উষ্ণ-কোমল তিরস্কার-বিলাপের খানিক পরেই আমরা কিন্তু সুভদ্রাকে এক অসামান্য দার্শনিক নির্বিগ্নতায় দেখতে পাচ্ছি। সুভদ্রা মনুষ্য জীবনের জলবুদ্বুদোপম চঞ্চলতার কথা বলছেন এবং ভাবছেন— অভিমন্যুর তরুণী স্ত্রীটিকে কীভাবে সান্ত্বনা দেবেন! সুভদ্রা এটাও বেশ ভালই জানতেন যে, তাঁর পুত্রবধূ উত্তরা সন্তানসম্ভবা। সুভদ্রা দুঃখ পাচ্ছেন— যে সময়ে আমার নাতির জন্মে সংসার-বৃক্ষ ফলে-ফুলে ভরে ওঠার কথা, সেই সময়ে অকালে আমার ছেলে অভিমন্যু, যাকে দেখার জন্য আমি সদা সর্বদা উদগ্রীব হয়ে থাকি, সেই পুত্র আমাকে ছেড়ে চলে গেল— বিহায় ফলকালে মাং সুগৃদ্ধাং পুত্রদর্শনে। অথবা মৃত্যু বুঝি এক অদ্ভুত নিয়তি। যেখানে স্বয়ং কৃষ্ণ তার চিরকালের রক্ষাকর্তা হয়েও এই অন্তিম কালে তিনি তাঁকে বাঁচাতে পারলেন না।

মৃত্যুর অস্থির এই বিনিপাতের মধ্যে দার্শনিক বোধ খানিকটা জাগ্রত হতেই পরলোকগামী পুত্রের জন্য অনন্ত শুভৈষণা আর স্নেহব্যক্তি প্রকট হয়ে উঠছে সুভদ্রার মুখে। সংসার জীবনে ভাল কাজ করার জন্য যে শুভলোক নির্দিষ্ট আছে, ত্যাগীব্রতীর কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য শাস্ত্র যে-সব শুভফল উচ্চারণ করেছে, সে সব শুভ একত্রে অভিমন্যুর জন্য প্রার্থনা করেন সুভদ্রা। এই প্রার্থনার সামান্য একটু আভাস দিলে সুভদ্রার আবেগটুকু যেমন বোঝা যায়, তেমনই বোঝা যায়— ভয়ংকর বিপর্যয়ের মধ্যে দাঁড়িয়েও তিনি ক্রোধ এবং শোকে কাউকে দোষারোপ করেন না, যদি বা কোনও আবেগস্খলিত মুহূর্তে তা করেনও, তবুও তাঁর স্বস্থ দার্শনিক বোধে প্রতিষ্ঠিত হতে সময় লাগে না।

আমরা অভিমন্যুর জন্য সুভদ্রার আর্ত অনুভূতিগুলিও যে খানিক বিবৃত করার চেষ্টা করছি, তার কারণ এই যে, সারা মহাভারত জুড়ে তিনি কথা বলেছেন কতটুকু, নিজের স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব সকলের সামনে প্রকাশ করেছেন কতটুকু? অতএব তিনি যেটুকু কথা বলেন, সেটুকুই তাঁর জীবনবোধের নিরিখ হয়ে ওঠে। আরও একটা কথা এখানে বলতে হয়— আমাদের ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র এবং পুরাণ কর্মানুসারে ফললাভ ঘোষণা করে। শুভ কর্মের জন্য ইহলোকে যত সুখের কথা বলা আছে, পরলোকে তার শতগুণ সুখ-সমৃদ্ধির কথা বলা আছে— হয়তো বা সেই সুখের বিশ্বাসেও মানুষ যাতে শুভকর্ম করে, তার জন্যই এতসব পুণ্য কর্মের বিধান। এখানে আরও একটা লক্ষণীয় বিষয় হল— যজ্ঞ, দান, তপস্যা, শুচিতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ইত্যাদি পুণ্য কর্ম যাঁরা করেন, তাঁদের তুলনায় ক্ষত্রিয় পুরুষ, এবং রাজ্যরক্ষাকারী রাজা— এঁদের অনেকটাই ছাড় দেওয়া আছে। শাস্ত্র নির্দেশ দিয়েছে— ক্ষত্রিয় রাজপুরুষ এবং রাজারা যেহেতু প্রজারক্ষণ, প্রজাপালন এবং প্রজাকল্যাণের জন্য জন্মাবধি মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, বিশেষত রাষ্ট্ররক্ষার জন্য শত্রুর মুখোমুখি হয়ে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেন, তাই ধর্মবিহিত যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য— এসব তাঁদের ক্ষেত্রে মৌখিকভাবে প্রযোজ্য হলেও এগুলি তাঁদের বর্ণধর্ম নয়। শাস্ত্র এই কথা বলে, কিন্তু সত্যই প্রজাকল্যাণ এবং রাষ্ট্র-প্রজা-রক্ষণের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিলে সেই পুণ্যগতি হয় কিনা, সেই বিষয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের সামান্য হলেও সংশয় থাকে। সুভদ্রা পুত্রের জন্য সেই সংশয়িত প্রার্থনাই জানাচ্ছেন বিধাতার কাছে।

সুভদ্রা বলেছেন— যাঁরা যজ্ঞ করেন, যাঁরা দানশীল, যাঁরা জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ, যাঁরা অসীম কৃচ্ছ্রতায় তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ান, তাঁরা সবাই পরলোকে যে পুণ্যগতি লাভ করেন, সে গতি তুমি লাভ করো, বাছা— যা গতিস্তামবাপ্নুহি। কেউ সামান্য উপকার করলেও যাঁরা ভোলেন না সেইসব কৃতজ্ঞ পুরুষের যে গতি হয়, বদান্য মানুষের যে গতি হয়, গুরুশুশ্রূষাকারীদের যে গতি হয়, সহস্রমুদ্রা দক্ষিণা দিতে পারেন যাঁরা, তাঁদের যে গতি হয়, তুমি সেই গতি লাভ করো, বাছা। যাঁরা মহাবীর, যুদ্ধ করতে হলে যাঁরা পালিয়ে আসেন না কখনও, যারা বহু শত্রু নিধন করে নিজেও যুদ্ধে নিহত হন, তাঁদের যে গতি হয়, তুমি সেই গতি লাভ করো, বাছা— হত্বারীন্নিহতানাঞ্চ সংগ্রামে তাং গতিং ব্রজ।

হয়তো এই শেষের যে কল্পটি, সেটাই অভিমন্যুর ক্ষেত্র সম্বন্ধে সর্বাধিক প্রযোজ্য বটে এবং শাস্ত্রকারেরা শত শতবার সংগ্রামী ক্ষত্রিয়ের এই স্বর্গগতি লাভের কথা বলেছেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়-বীরের ঘরে জন্ম এবং ক্ষত্রিয়-বীরের ঘরণী হবার সুবাদে সুভদ্রা জানতেন যে, রাজনীতি বা দণ্ডনীতি শাস্ত্রের যুদ্ধনীতিতে 'সৈন্য-প্রোৎসাহন-নীতি' বলে একটা কল্প আছে। এটা আসলে যুদ্ধের আগে সেনা- সৈন্যদের ঐহিক এবং পারত্রিক লাভের লোভ দেখানো। এটা এখনও চলে, তবে পারত্রিক স্বর্গলাভের চেয়েও এখন জাতীয়তাবাদী ভূমিকা, দেশের জন্য, মাতৃভূমির জন্য শহিদ হওয়া অথবা 'মার্টারডম'-এর ওপর জোর দেওয়াটা সৈন্য-প্রোৎসাহনের অন্যতম রীতি। প্রাচীনকালে এই 'প্রোৎসাহন'-কর্ম বা 'বাক-আপ' করার কাজটা চলত স্বর্গ-নরকের সংস্কার এবং বিশ্বাসে। ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিতে যে সিদ্ধিলাভ করতে চায়, তাকে এইভাবেই উৎসাহিত করে বলা হত যে, সম্মুখসংগ্রামে মৃত্যু তার স্বর্গের পথ প্রশস্ত করবে, নইলে অনন্ত নরক। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখা যাবে— যুদ্ধের আগে সেনাছাউনিতে বক্তৃতা দেবার সময় রাজা মন্ত্রী এবং রাজপুরোহিতদের দিয়ে বলাতেন যে, দ্যাখো বাপু! বেদে আছে এসব কথা। বেদ বলেছে—'ব্রাহ্মণেরা স্বর্গকামনায় সারা জীবন অনেক যজ্ঞ-তপস্যা করে যে ফল পান, যুদ্ধবীরেরা যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে এক মুহূর্তে সেই সেই ফল অতিক্রম করেন। রাজার খেয়ে-পরে, রাজার বেতন ভোগ করে কোনও বীর যদি তার স্বামী রাজার জন্য যুদ্ধ না করে, তবে নরকভোগ আছে কপালে।'

সাধারণ সৈন্যদের ক্ষেত্রে এইসব ফললাভের ঘোষণার একটা যৌক্তিকতা এবং কার্যকারিতা অবশ্যই ছিল বা এখনও তা অন্যভাবে আছে, কিন্তু সেকালের মহাবীর ক্ষত্রিয়দের কাছে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করার ব্যাপারটা একটা সাংস্কারিক বিশ্বাসের মধ্যে পড়ত, এমনকী তাঁর মধ্যে এটা একটা চরম রোমাঞ্চ হিসেবেও কাজ করত। তা নইলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধমুখে দুই পক্ষের সৈন্যমধ্যে রথস্থিত অবসন্ন মহাবীর অর্জুনকেও তো কৃষ্ণ ওই একই কথা বলেছেন— কী অদ্ভুতভাবে তোমার সামনে এই স্বর্গের দুয়ার খুলে গেছে, অর্জুন— যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্— অথবা, এইরকম একটা ধর্মযুদ্ধের সুযোগ পেলে ক্ষত্রিয়রা ভীষণ খুশি হয়, অর্জুন— সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্। অতএব বুঝতে পারি যে, ক্ষত্রিয়ের এই সাংস্কারিক বিশ্বাসে সুভদ্রারও বিশ্বাস ছিল, এগুলি

সৈন্য-প্রোৎসাহনের সামান্য স্তোকবাক্য নয় তাঁর কাছে। বিশেষত তাঁর পুত্র অভিমন্যু এক অতিরথ মহাবীর বলে চিহ্নিত এবং কীর্তিত। তাঁকে বধ করতে কৌরবপক্ষে সাত জন মহারথীর প্রয়োজন হয়েছে, সেই বীরগর্ব সুভদ্রার মনেও কাজ করে। কিন্তু এইসব কিছু অতিক্রম করে পুত্রের মৃত্যুতে মায়ের মনে যে হাহাকার তৈরি হয়, তার জন্য উৎসারিত হয় এই বিলাপিনী ভাষা, পরলোকে তার জন্য অনন্ত মঙ্গলকামনা।

লক্ষণীয়, এই বিলাপিনী ভাষার মধ্যে ভারতবর্ষীয় সংস্কারে যা পুণ্যকর্ম, যত মাঙ্গলিক ক্রিয়া আছে, যা পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ বা নিরবচ্ছিন্ন সুখের সূচনা করে, তা প্রায় সবগুলিরই উল্লেখ করেছেন সুভদ্রা এবং তার সঙ্গে শ্লোকের প্রত্যেক চতুর্থ চরণে ধ্রুবপদের মতো ফিরে ফিরে এসেছে একটি বাক্য— তুমি সেই পুণ্যগতি লাভ করো, বাছা— তাং গতিং ব্রজ পুত্রক। যদি সংস্কৃত পংক্তিটির শেষ শব্দটি খেয়াল করেন— পুত্রক। ‘পুত্র’ নয় শুধু ‘পুত্রক’। সংস্কৃতের প্রকৃতি-প্রত্যয় সম্বন্ধে ধারণা থাকলে বা না থাকলেও জেনে রাখুন— ‘ক’ প্রত্যয়টা অনেক সময়েই একটি একটি শব্দের অভিধেয় মাত্রাটিকে ছোট করে দেয়। যেমন মানব মানে মানুষ কিন্তু মানব‘ক’ মানে শিশু; একই ভাবে বাল-বালক, বালা-বালিকা; কালিদাস তো দুষ্যন্তের ধনুর লক্ষ্যে স্থাপিত হরিণটিকে হরিণ‘ক’ বলে, তপোবনলালিত হরিণের প্রতি শিশুর মায়া তৈরি করে দিয়েছেন। এই নিরিখে সুভদ্রার প্রতি শ্লোকে আবৃত্ত— তাং গতিং ব্রজ পুত্রক— তুমি সেই পুণ্যগতি লাভ করো বাছা— এই ‘পুত্রক’ শব্দটি তার পূর্বকথিত মাতৃস্তন্যপানের আহ্বানটাকে আরও মাতৃময়ী মমতায় করুণভাবে সযৌক্তিক করে তোলে।

সুভদ্রার এই মর্মান্তিক বিলাপ শুনে স্বয়ং পাঞ্চালী দ্রৌপদী— যিনি জীবনের বহুতর কাঠিন্য দেখে দেখেই রোষাগ্নিতে প্রজ্বলিত হন— তিনি পর্যন্ত বৈরাটী উত্তরাকে নিয়ে সুভদ্রাকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে এসেছেন— অভ্যপদ্যত পাঞ্চালী বৈরাটীসহিতা তদা। আমরা বুঝতে পারি এবং জানি— দ্রৌপদী যুদ্ধের সময়ে কুরুক্ষেত্রে স্যমন্তপঞ্চকে উপস্থিত ছিলেন না সুভদ্রা বা উত্তরার মতো। কিন্তু বিরাট রাজ্যের উপনগরী উপপ্লব্য থেকে তাঁকে আনানো হয়েছে। অভিমন্যুর মৃত্যুসংবাদ পাঞ্চালী কৃষ্ণাকে না জানিয়ে পরবর্তী যুদ্ধকর্ম চালিয়ে যাওয়াটা পাণ্ডবদের পক্ষে অসম্ভব ছিল, কেননা সুভদ্রার গর্ভজাত এই পুত্রটির ওপর দ্রৌপদীর স্নেহ এবং বিশ্বাস ছিল অকৃত্রিম এবং দ্রৌপদীকেও সুভদ্রা কতখানি শ্রদ্ধা করতেন অথবা ভালবাসতেন যে, এতক্ষণ কৃষ্ণের সামনে যিনি পাগলিনীর মতো বিলাপ করছিলেন, তিনি দ্রৌপদীকে দেখামাত্রই সকরুণ বিলাপের অন্ত্যমাত্রায় নিশ্চেতন হয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে— অর্থাৎ অভিমন্যুর আর একটি সস্নেহা জননীকে দেখার পর সুভদ্রা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না, নিঃসংজ্ঞায় নিজেকে সঁপে দিলেন দ্রৌপদীর কাছে— উন্মত্তবত্তদা রাজন্ নিঃসংজ্ঞা ন্যপতদ্‌ভুমৌ। সুভদ্রাকে কৃষ্ণই চোখে-মুখে জল দিয়ে স্থির করলেন এবং আবারও পূর্বের মতো অভিমন্যুর শক্তি-ক্ষমতা-বীর্যবত্তার বহুমানন করে কৃষ্ণা পাঞ্চালীকে ভার দিয়ে গেলেন সুভদ্রা এবং উত্তরাকে শান্ত করার জন্য— সুভদ্রে মা শুচঃ পুত্রং পাঞ্চাল্যাশ্বাসয়োত্তরাম্।

মহাভারত যেহেতু বীরগাথা শোনায় এবং যেহেতু ঘটনার পর আরও বিচিত্রতর ঘটনা সেখানে জীবনধর্মেই সন্নিবিষ্ট হয়, তাই সুভদ্রার আর কোনও বিশেষ খবর আমরা পাই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর যেহেতু সুভদ্রাও নিজেকে কখনও প্রকট করে তোলেন না, অতএব তাঁর স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব প্রায় হারিয়েই যায় মহাভারতের ঘটনাপ্রবাহে। তবে তাঁর পুত্রস্থান সত্যিই যেন কোনও দুর্দৈব-নক্ষত্রের দৃষ্টিপাতে আচ্ছন্ন। নইলে এমন হবে কেন যে, যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত অবস্থায় মেরে ফেললেন, দ্রৌপদী অশ্বত্থামার মস্তকমণি চাইলেন, অশ্বত্থামা প্রাণভয়ে ব্রহ্মশির অস্ত্র ছেড়ে দিলেন, কিন্তু হাজার বারণ সত্ত্বেও তিনি শেষ পর্যন্ত বাণের লক্ষ্য হিসেবে সৌভদ্র অভিমন্যুর পুত্র পরিক্ষিৎকেই বেছে নিলেন। অশ্বত্থামার অস্ত্র সম্বরণ করার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু পিতৃহত্যার প্রতিশোধ-স্পৃহা তাঁর এতটাই নিদারুণ ছিল যে, তিনি সুপরিকল্পিতভাবে পাণ্ডবদের শেষ বংশবীজ সৌভদ্র অভিমন্যুর সন্তানকেও ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণ অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে অশ্বত্থামাকে জানিয়ে দিয়েছেন— তুমি যতই চেষ্টা করো, সুভদ্রা-অর্জুনের এই পৌত্র বাঁচবেই, আমি তাকে বাঁচাব।

দ্রৌপদী যখন অশ্বত্থামার মস্তকমণি লাভ করে পুত্রবধের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন, তখন একবারের তরেও নিশ্চয়ই ভাবতে পারেননি যে, প্রতিপক্ষের আঘাত এইভাবে নেমে আসবে সুভদ্রার পুত্রবধূর ওপর। সুভদ্রা কিন্তু অসূয়া-দ্বেষ পোষণ করেননি দ্রৌপদীর ওপর। তিনি নিশ্চয়ই দাদা কৃষ্ণের ওপর বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে ছিলেন। কৃষ্ণ বলেছিলেন— যদি সত্য এবং ধর্ম আমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে মৃত হয়ে জন্মালেও বাঁচবে এই অভিমন্যুর জাতক— তথা মৃতঃ শিশুরয়ং জীবতাদভিমন্যুজঃ।

যুধিষ্ঠির তখন হস্তিনায় রাজা হয়েছেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন এবং প্রস্তুতি চলছে রাজ্যে। কৃষ্ণ আত্মীয়-স্বজন নিয়ে হস্তিনায় এসে গেছেন। এই সময়ে একদিন অন্তঃপুরচারিণী রমণীদের গভীর আর্তনাদ শোনা গেল। উত্তরার গর্ভমোচনের সঙ্গে সঙ্গে যে শিশুর জন্ম হল, সে যে মৃত, তা প্রথমে বোঝাই যায়নি। ফলে পুরবাসীদের হর্ষকোলাহল একবার ধ্বনিত হয়েই মুহূর্তের মধ্যে স্তিমিত হয়ে কৌতূহলের অস্পষ্ট আলাপে পরিণত হল।

কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন সাত্যকির সঙ্গে। প্রবেশ-মুখেই কৃষ্ণ দেখলেন— স্বয়ং কুন্তী দৌড়তে দৌড়তে আসছেন তাঁর কাছেই, তাঁর পিছনে আসছেন দ্রৌপদী এবং সুভদ্রা। কুন্তী কৃষ্ণের কাছে অভিমন্যুর বংশ সুরক্ষিত করার যাচনা করলেন এবং সুভদ্রা কাঁদতে কাঁদতে দাদা কৃষ্ণকে জানালেন— দ্যাখো তুমি, দ্যাখো একবার পার্থ অর্জুনের পৌত্রের দিকে তাকাও, কুরুকুল ক্ষীণ হয়ে গেছে এই বিরাট যুদ্ধে, আজ কুরুকুলের শেষ বাতিটিও নিবে গেল। সুভদ্রা এবার পূর্ববিবরণ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন— তুমি তো জানো, কৃষ্ণ! অশ্বত্থামা তার অস্ত্রমোচন করেছিল ভীমকে মারার জন্য, কিন্তু সেই অস্ত্রের লক্ষ্য পরিবর্তন করে সেই অস্ত্রটাকে সে উত্তরার গর্ভে নিক্ষেপ করল এবং সত্যি বলতে কী, সেই অস্ত্রের আঘাত প্রকারান্তরে নেমে আসল আমার ওপরে এবং অর্জুনের ওপরে— সোত্তরায়াং নিপতিতা বিজয়ে ময়ি চৈব হ।

সুভদ্রার কথা শুনে একটিবার মাত্র মনে হতে পারে যেন তিনি বিরক্ত হচ্ছেন, কিংবা স্বার্থপরের মতো ভাবছেন যেন ভীমকে মারার জন্য চিহ্নিত অস্ত্র এসে আমার সংসার ধ্বংস করে দিল। সত্যি বলতে কী, সুভদ্রাকে এমন ভাবাটাই কঠিন। যেটা তিনি বলছেন, সেটা

তথ্য নিবেদন-মাত্র, এবং তার মধ্যে এই ভাবটুকু আছে যে, ভীমের মতো মহাবীর যে অস্ত্রাঘাত সইতে পারবেন না, সেই অস্ত্র এসে পড়ল এক অবলা নারীর ততোধিক অবল গর্ভের ওপর। উত্তরার স্বামী যেহেতু বেঁচে নেই, তাই শাশুড়ি হিসেবে সুভদ্রা এবং শ্বশুর হিসেবে অর্জুনই যেন এই অস্ত্রাঘাতে সবচেয়ে বেশি বিমূঢ়। সুভদ্রা যে স্বার্থপরের মতো ভীমসেনের মৃত্যুকামনা করেননি, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ লুকিয়ে আছে তাঁর পরবর্তী বক্তব্যে। তিনি কৃষ্ণকে বলছেন— আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না পাণ্ডবরা এই ঘটনা শুনে কী বলবেন? কী কথা এটা, অভিমন্যুর ছেলেটা জন্মাল এবং মরে গেল? একথা শুনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কী বলবেন? কী বলবেন ভীমসেন এবং অর্জুন, অথবা নকুল-সহদেবই বা কী বলবে? অশ্বত্থামা যেন জন্মমাত্রেই চুরি করে নিয়ে গেল পাণ্ডবদের সবাইকে ঠকিয়ে, এটা কেমন কথা— মুষিতা ইব বার্ষ্ণেয় দ্রোণপুত্রেণ পাণ্ডবাঃ।

এই কথাগুলি থেকেই বুঝতে পারি সুভদ্রার বক্তব্য অন্যরকম। বরঞ্চ তিনি ভাবছেন— এই ঘটনায় মহাবীর পাণ্ডবদের মনে কী প্রতিক্রিয়া হবে! কারণ তিনি জানেন এবং কৃষ্ণকেও সেটা জানিয়েছেন যে, অভিমন্যু, তাঁর ছেলে অভিমন্যু সমস্ত পাণ্ডব-ভাইদের কাছে সমান প্রিয়— অভিমন্যুঃ প্রিয়ঃ কৃষ্ণ ভ্রাতৃণাং নাত্র সংশয়ঃ— সেই অভিমন্যুর ছেলেটি জন্মমাত্রেই অশ্বত্থামার অস্ত্রাঘাতে মৃতপুত্রে পরিণত হবে, এটা পাণ্ডবভাইদের সইবে না। আমি তাই বলছি, কৃষ্ণ! তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে উত্তরা বৈরাটির কাছে, তুমি অশ্বত্থামাকে বলেছিলে— তোমার অস্ত্রাঘাতে অভিমন্যুর ছেলে মৃত হয়ে জন্মালেও আমি তাকে বাঁচাব। আজকে এই বিপন্ন মুহূর্তে আমি তোমাকে অনুনয় করছি, কৃষ্ণ! অভিমন্যুর ছেলেটাকে তুমি বাঁচাও, আজ যদি তুমি তোমার কথা না রাখো, তা হলে জেনে রাখো— আমিও আর বাঁচব না— মৃতাং মাম্ অবধারয়।

লক্ষ করার মতো বিষয় হল, সুভদ্রার হৃদয়টাই এমন বিশাল এবং কোমল, এবং এতটাই তা নমনীয় যে, তিনি কখনওই প্রায় নিজের কথা ভাবেননি। একে তো সারা মহাভারত জুড়ে তাঁর কথাই প্রায় শুনতে পাই না, কিন্তু যখন শুনতে পাই তখন তার মধ্যে এমনই এক সার্বিক শুভৈষণা থাকে, যা দিয়ে রীতিমতো তাঁকে চিহ্নিত করা যায় এবং সবচেয়ে বড় কথা, কোনও কথায়, কোনওভাবে তাঁকে দূষতে দেখিনি কাউকে— না অন্যান্য পাণ্ডব-ভাইদের, না দ্রৌপদীকে, না কুন্তীকে। দাদা কৃষ্ণের সম্বন্ধেও তাঁর এক অলৌকিকী ধারণা আছে, আমার দাদা সব পারে এই গোছের এক অতিশয়ী ধারণা, যা ভগবত্তার বোধ থেকে এক চুল কম হয়তো। কৃষ্ণকে তিনি বলেছেন— তুমি তো সব পারো, দাদা! ইচ্ছে করলে এই তিন ভুবনকে তুমি বাঁচিয়ে দিতে পারো, সেখানে তুমি তোমার প্রিয় ভাগনের ছেলেটাকে বাঁচাবে না তুমি— কিং পুনর্দয়িতং জাতং স্বস্রীয়স্যাত্মজং মৃতম্? সবশেষে সুভদ্রা পাণ্ডবকুলের বংশরক্ষার জন্য সম্পূর্ণ 'কনসার্নড'। পাণ্ডবদের একটি ছেলেও বেঁচে নেই। দ্রৌপদীর গর্ভজাতরা তো নেইই; নেই অভিমন্যু এবং ঘটোৎকচও। এই অবস্থায় সুভদ্রা যেমন একদিকে কৃষ্ণের কাছে পাণ্ডবদের সকলের জন্য অভিমন্যু-পুত্রের জীবন ভিক্ষা চাইছেন— কুরুষ্ব পাণ্ডুপুত্রাণামিমং পরমনুগ্রহম্— তেমনই অন্যদিকে তিনি দাদা কৃষ্ণের সার্বিক সাহায্য চাইছেন নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বলে। সুভদ্রা বলেছেন কৃষ্ণকে— আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার বোন বলেই এই দয়াটুকু তোমায় করতে হবে, আর এই দয়াটুকু আমার প্রাপ্য যেহেতু আমার শেষ সম্বল আমার ছেলেটাও আর বেঁচে নেই— স্বসেতি বা মহাবাহো হতপুত্রেতি বা পুনঃ।

আমরা জানি, কৃষ্ণ উত্তরার গর্ভজাত শিশুটিকে স্পর্শ করে তাঁর শরীরে প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়েছিলেন। এই ঘটনার মধ্যে অলৌকিক শক্তিই থাক অথবা লৌকিক ক্রিয়াকুশলতা, সে-কথা অন্যত্র বিচার্য হবে, আপাতত শুধু এইটে জানিয়ে সন্তুষ্ট থাকব যে, উত্তরার প্রিয় পুত্রের দেহে প্রাণের সঞ্চার হতেই সুভদ্রার ব্যক্তিত্ব মিশে গেছে পাণ্ডবকুলের অন্যান্য মহিলাদের বর্ষীয়সী ব্যক্তিত্বের মধ্যে। ব্যাস লিখেছেন— ভরতবংশের স্ত্রীজনেরা যেন কৃষ্ণকে ধরে বিপদের নদী পার হয়ে গেলেন এবং এই মহিলারা হলেন— কুন্তী দ্রুপদপুত্রী চ সুভদ্রা চোত্তরা তথা। কিন্তু এত আচ্ছন্নতার মধ্যেও সুভদ্রাকে পৃথকভাবে চেনা যায়। সময়কালে তাঁর নাম উল্লেখ না করে পারা যায় না এবং এর কারণ দুটো— প্রথমত, তাঁর অসামান্য সৌন্দর্য্য— এই মধ্য বয়সেও যৌবন অতিক্রম করেও অন্যতর এক গুরু যৌবন তাঁর শারীরিক সৌন্দর্য্য আরও মোহময় করে তুলেছে। দ্বিতীয়ত সেই স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব যা প্রকট হয়ে ওঠে না, কিন্তু ব্যঞ্জিত হয়।

হয়তো এই কারণেই পাণ্ডবরা যখন সপরিবারে বানপ্রস্থী ধৃতরাষ্ট্র এবং জননী কুন্তীর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, তখন সুভদ্রার সঙ্গে সমাগত তথা অরণ্যেই সহাগত ব্রাহ্মণদের পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বলেছেন— ওই যে দেখছেন— দ্রৌপদীর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, সোনার মতো গায়ের রং, আর চাঁদের জ্যোৎস্না যেন শরীরী হয়ে নেমে এসেছে ভুঁয়ে, ইনি কৃষ্ণের বোন সুভদ্রা— অস্যাস্তু পার্শ্বে কনকোত্তমাভা/ যৈষা প্রভা মূর্তিমতীব সৌমী— সত্যি বলতে কী, এখানে তাঁর গায়ের রং একবার সোনার মতো বলে আবার চাঁদের জ্যোৎস্নার উপমাটা পুনরাবৃত্ত-প্রায় হয়ে ওঠে, আসলে জ্যোৎস্নার মধ্যে যে আহ্লাদকত্ব, স্নিগ্ধত্ব এবং মাধুর্য আছে, সেটা সুভদ্রার ব্যক্তিত্বের প্রতিবিম্বে আসে বলেই মহাভারতের কবি এই দ্বিতীয় উপমাটি ব্যবহার করেছেন 'প্রভা' শব্দটি লাগিয়ে— যৈষা প্রভা মূর্তিমতীব সৌমী— সুভদ্রা হচ্ছেন সেই আলোক-প্রভা, যেখানে চাঁদের জ্যোৎস্না মূর্তিমতী হয়ে ধরা দিয়েছে।

আশ্রমিকপর্বে ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী-কুন্তীর সঙ্গে দেখা করার জন্য কুরুপাণ্ডবকুলের সমস্ত মহিলারা এসেছিলেন যুধিষ্ঠির এবং পাণ্ডবভাইদের সঙ্গে। মহামতি ব্যাস সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন পরম কৌতূহলে এই শান্ত মধুর আরণ্যক মিলন দেখার জন্য। গান্ধারী-কুন্তী প্রমুখ প্রবীণরা সেদিন ব্যাসের কাছে অনুনয় করেছিলেন যদি তিনি অলৌকিক যোগবলে তাঁদের মৃত পুত্র অথবা যাঁদের স্বামী মারা গেছে, তাঁদের একবার দেখাতে পারেন চোখের সামনে। ব্যাস তাঁদের সকলের মর্মব্যথা জানতেন, যোগবলে সকলের চোখের সামনে এনেও দিয়েছিলেন নিহত প্রিয়জনদের। সুভদ্রা সেদিন দেখতে পেয়েছিলেন প্রিয় পুত্র অভিমন্যুকে, সেই রাজকুমারের মহার্ঘ বেশ-বাসে, তাঁর মনে কোনও ক্রোধ নেই, জরা নেই, বিকার নেই। পাণ্ডবভাইরা সমক্ষ-স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য এগিয়ে গেছেন কর্ণের দিকে, দ্রৌপদীর পুত্রদের দিকে সৌভদ্র অভিমন্যুর দিকে, হৈড়িম্ব ঘটোৎকচের দিকে। ব্যাস অন্যদের সঙ্গে সুভদ্রার কথাও বলেছিলেন। বলেছিলেন— আমি জানি, এই কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রা তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একমাত্র ছেলেটিকে হারিয়ে কত দুঃখ পাচ্ছে— যচ্চ ধারয়তে দুঃখং... তচ্চাপি বিদিতং মম। আজ যখন কতকাল পরে সেই মৃত পুত্রকে দেখলেন পাণ্ডবদের দ্বারা অভিনন্দ্যমান, সুভদ্রার কত সুখ হল! একটা গোটা রাত্রি কেটে গেল 'চিত্রং পটগতং যথা,' শুধু দেখতে দেখতে— যেন মূর্ত একটা ছবির দিকে তাকিয়ে আছেন। সুভদ্রা দেখলেন— ছেলে ভালই আছে, যেমনটি তিনি প্রার্থনা করেছিলেন।

তারপর অনেক জল বয়ে গেছে গঙ্গা দিয়ে, যমুনা দিয়েও। হস্তিনায় পঁয়ত্রিশ বছর রাজত্ব করলেন যুধিষ্ঠির, মৌষল দুর্ঘটনায় কৃষ্ণ, বলরাম লীলা সম্বরণ করেছেন, কৃষ্ণের বংশ নির্মূল, শুধু কৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধের ছেলে বজ্র বেঁচে আছেন, ঠিক এদিকে যেমন পাণ্ডবকুলে পাণ্ডবদের নপ্তা পরিক্ষিৎ। পাণ্ডবরা এবং দ্রৌপদী মহাপ্রস্থানের জন্য তৈরি হলেন। যুধিষ্ঠির কুমার পরিক্ষিৎকে হস্তিনার সিংহাসনে অভিষিক্ত করে ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যাগর্ভজাত একমাত্র জীবিত পুত্র যুযুৎসুকে তাঁর অভিভাবক নিযুক্ত করলেন। ওদিকে কৃষ্ণের বংশ বজ্রকে যুধিষ্ঠির অভিষিক্ত করলেন ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যে। দুইজনকে অভিষেক করার পর মহাপ্রস্থানে প্রস্তুত ভাইদের সঙ্গে যুধিষ্ঠির এবার সুভদ্রাকে ডেকে বললেন— তোমার এখন অনেক দায়িত্ব। এই তোমার ছেলের ছেলে পরিক্ষিৎ হস্তিনাপুরে কুরুকুলের রাজা হিসেবে রইল— এষ পুত্রস্য পুত্রস্তে কুরুরাজ্যে ভবিষ্যতি— ওদিকে যদুকুলের শেষ বংশধর বজ্র রইল ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা হিসেবে। এই দুইজনেরই সুরক্ষা এবং দেখভালের দায়িত্ব রইল তোমার ওপর। তুমি এদের দেখো এবং আশীর্বাদ করি তোমার মন যেন কখনও অধর্মের দিকে না যায়। যুধিষ্ঠিরের মন ভারাক্রান্ত, তিনি আর বেশি কথা বলেননি— দুঃখার্তশ্চাব্রবীদ্ রাজা সুভদ্রাং পাণ্ডবাগ্রজঃ।

সব ঘটনা দেখে এক পণ্ডিতমানিনী মহিলা ঔপন্যাসিক এক অদ্ভুত মন্তব্য করেছেন— সবটাই নাকি এখানে কৃষ্ণের কারসাজি আছে— তিনি কুরু-পাণ্ডবদের জ্ঞাতিবিরোধের মধ্যে ঢুকে নিজের ঘরের ছেলেটাকে ইন্দ্রপ্রস্থে আর বোনের ছেলের বংশটাকে হস্তিনায় বসিয়ে দিয়ে যেতে পেরেছিলেন। এঁরা কী মহাভারত পড়েছেন, মহাকাব্যিক চরিত্রগুলিকে কোন্ গাধবুদ্ধিতে, কত ওপরচালাকিতে বুঝেছেন, আমি বুঝি না। আপনারা দেখলেন তো, চিনলেন তো সুভদ্রাকে। যিনি সৌমী স্নিগ্ধতায় জীবনের কোনও ক্ষেত্রে নিজেকে প্রকট করে তোলেননি, ঘটনার প্রবাহে কৃষ্ণ নিজেই যেখানে নিজের রাজ্যে নিজের বংশের কাউকে প্রতিষ্ঠা করার আগেই চলে গেলেন কোথায় কোন বৈকুণ্ঠলোকে, সেখানে মহাকাব্যিক দৃষ্টি কতখানি কটু এবং ক্ষীণ হলে এমন মন্তব্য করা যায়! পরিশিষ্টে সুতোর মতো কুরু-পাণ্ডবের পরিক্ষীণ বংশের পরিক্ষিৎকে সিংহাসনে বসানোটা দীপদানের মধ্যে সলতের মতো এগিয়ে দেওয়া। সুভদ্রা এখানে হস্তিনায় বসে রইলেন সেই চিরকালীন অনুগতা সৌমী জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতায়; মহাভারত শেষ হয়ে গেল। আমরা দ্রৌপদীরও মহাপ্রস্থানিক পতন দেখলাম, কিন্তু সুভদ্রার অন্তিম মুহূর্তটি দেখতে পেলাম না। তিনি বেঁচে রইলেন মহাভারতের শেষ পর্বের পরেও, পরিক্ষীণ বংশের পরিক্ষিৎ-নাতির হাত ধরে। তাঁর কোনও মহাপ্রস্থান নেই, তিনি থেকে গেলেন ভারতবর্ষের অগণিতা অনুগতা নারীর মধ্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুক্মিণী

বাস্তবের সঙ্গে যাঁদের সামান্য পরিচয় আছে অথবা এই জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে যাঁদের সার্বিক শ্রদ্ধা আছে, তাঁরা এই তথ্য খুব ভালভাবে জানেন যে, প্রত্যেক পুরুষ বা রমণীর হৃদয়ে প্রেম আসে এবং সে প্রেম পৃথিবীর তাবৎ পুরুষ-রমণীর প্রেমের তুলনায় একেবারেই পৃথক এবং বিলক্ষণ। আর সত্যিই তো, প্রত্যেক পুরুষ এবং প্রত্যেক রমণীর হৃদয়ই তো এত বিলক্ষণভাবে পৃথক যে, সেখানে এক প্রেমের সঙ্গে আর এক প্রেমের তুলনা হয় না। তার মানে, প্রেমের ব্যাপারে একটা সামান্য লক্ষণ ঠিক করা একেবারেই সঠিক কাজ নয়, অথচ আমরা অহরহই তা করি। না করে উপায়ই বা কী! পৃথিবীর এই লক্ষ-কোটি মানুষের লক্ষ-কোটি কমল-কলি হৃদয়, তাদের জটিল-কুটিল প্রেমাবর্ত নির্ধারণ করা কি চাট্টিখানি কথা! তবু সেখানে সাহায্য করেন কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার এবং অবশ্যই এই পৃথিবীর আশ্চর্য-রসিক কথক ঠাকুর যত। তাঁরা এক অথবা একাধিক তিন-চারটি পুরুষ-নারীর হৃদয় উদ্‌ঘাটন করেন, ঠিক যেমন সূর্য একে-একে উন্মোচন করেন কমল-কলির হৃদয়।

কবিরা যা পারেন, শাস্ত্রকারেরা তা পারেন না। যত প্রসিদ্ধ শাস্ত্রকার আছেন, রসশাস্ত্রকার, আলংকারিক, কাব্যতত্ত্ববেত্তা— তাঁরা তাবৎ নর-নারীকুলের হৃদয়-ভূমি বিচার করে নায়ক-নায়িকার শ্রেণি নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন ভাব-লক্ষণ মিলিয়ে। নায়কের মধ্যে কেউ বা উদাত্তগুণ, কেউ ললিত, কেউ বা উদ্ধত। আবার যুবতী নায়িকাদের মধ্যে কেউ ধীরা, কেউ বা প্রগলভা— এইরকম আরও কত কিছু। রমণী-হৃদয় হাজারো মধুরতায় জটিল বলে নায়িকা-ভেদে রসশাস্ত্রকারদের উপশ্রেণি তৈরি করতে হয়েছে এবং তার মর্যাদা মৌল শ্রেণির চাইতে কিছু কম নয়। তবু এত যে সংজ্ঞা তৈরি হল, তাতে লক্ষণীয় এইটাই যে, হৃদয় দেওয়া-নেওয়ার কায়দা-কৌশল-তরিকার চেয়েও অনেক বড় নির্ধারক হল হৃদয়ের ভাব, ভাবনা এবং সরসতা। তবু মানুষের মধ্যে এত সম্পর্ক-সেতু তার সব ক'টিই কি সংজ্ঞা আর লক্ষণের মধ্যে আসে? মানুষের মধ্যেই আসে না, সেখানে আবার সেই অখিল-রসামৃত-মূর্তি কৃষ্ণের জীবন-সঙ্গিনীদের হৃদয় ব্যাখ্যা করে কে?

আমার অদ্ভুত লাগে শব্দটা। ওঁরা ব্যবহার করেছেন অনেকেই, হয়তো অন্যভাবে করেছেন, কিন্তু নায়িকা-বিভাগের ক্ষেত্রে একেবারে সর্বোত্তমা নায়িকার লক্ষণ এবং সংজ্ঞা হিসেবে যে শব্দটাকে রীতিমতো কর্ষণ-বিশ্লেষণ করা যেত, সেটা হল— বিদগ্ধা। আলংকারিক এবং রসিক-সজ্জনেরা এই 'বিদগ্ধা' শব্দটির মধ্যে অনেক সম্ভাবনা দেখেছেন, কিন্তু শব্দটিকে নির্দিষ্ট ভাবে কোনও সংজ্ঞা বা লক্ষণের চেহারা দেননি। অথচ ওই যে এক মহাকবি লিখেছিলেন— তার খুব রাগ হলে সে চ্যাঁচায় না, হম্বিতম্বি করে না, শুধু

ভ্রূকুটি-কুটিল মুখখানি দেখলে বোঝা যায় যে, তার রাগ হয়েছে। অন্য সাধারণী যেমন চেঁচিয়ে ঝগড়া করে, এ তেমন নয়, ঝগড়া করার বদলে সে একেবারেই চুপ করে গিয়ে বিসংবাদ জানায়— কোপো যত্র ভ্রূকুটি-রচনা নিগ্রহো যত্র মৌনম্— এবং এটা যে কত বড় শাস্তি, তা একমাত্র ভুক্তভোগী প্রেমিকরাই সবচেয়ে ভাল জানেন। এই ধরনের রমণীয় যুবতীর খুশির জায়গাগুলিও খুব ব্যঞ্জনাময়। সামান্য স্মিতহাস্যের মধ্যেই তাঁদের অনুনয়ের উপাদান লুকোনো থাকে। আর যার দিকে একবার স্মিতহাসে দৃষ্টিপাত করেন সেই সহৃদয়ই বুঝতে পারে— যে, সেই দৃষ্টিতে কমল-কলির সমস্ত প্রসন্নতা একত্র ফুটে ওঠে— দৃষ্টিপাতঃ প্রসাদঃ।

বস্তুত এমন যে প্রেম, কিংবা প্রেমের মধ্যে এই রুচি এবং এই বিদগ্ধতা, তাও যে আমরা কোনও দিন শুনিনি, বা জানি না, এমন নয়। হয়তো বা বৈদগ্ধ্যের মধ্যে আরও কিছু আছে, যেখানে এমন সুরুচিসম্পন্ন অভিমান কাজ করে অথবা কাজ করে ব্যঞ্জনাময় এমন অপূর্ব কথন-ভঙ্গি যাতে করে 'হ্যাঁ' বললে মনে হয় বুঝি 'না' আর 'না' বললে 'হ্যাঁ' হতেও পারে বা— এ সবও এক উত্তমা বিদগ্ধা নায়িকার ভূষণ হয়ে উঠতে পারে। রসশাস্ত্রকারেরা পৃথক করে এমন বৈদগ্ধীর কথা বলেছেন বটে, কিন্তু একত্রে এক উত্তমা নায়িকার মধ্যে এত লক্ষণ তাঁরা সন্নিবেশ করেননি। বিশেষত যেটা তাঁরা বলেন না, সেটা হল— এই বৈদগ্ধী টিকিয়ে রাখার নিদান। বিবাহ-পূর্ব প্রেমে যে বিদগ্ধতা উত্তমা রমণীর একান্ত আকর্ষণ হয়ে ওঠে, বিবাহোত্তর জীবনে তা অনেক সময়েই পরিম্লান কৃপোদকে পর্যবসিত হয়, মালার ফুল শুকিয়ে যায়, পড়ে থাকে ডোর, শুধু বন্ধনের সুতোগাছি। বিদগ্ধ পুরুষের কাছে এই পরিম্লান বন্ধনও কখনও কখনও যন্ত্রণার হয়ে ওঠে।

যদি কৃষ্ণের কথা এই প্রসঙ্গে টেনে আনি, তা হলে বলতেই হবে যে, তাঁর মতো অসাধারণ নায়ক পুরুষ ক'জন আছেন? বিশেষত যে পুরুষের জন্য বিনোদিনী রাই কিশোরী বৃন্দাবনে উন্মাদিনী হয়েছিলেন, তাঁর বিবাহিত জীবনে প্রথমা হিসেবে যিনি এসেছিলেন, সেই রুক্মিণীর বিবাহ-পূর্ব আবেদনের মধ্যে বৈদগ্ধ্যের আকর্ষণ কম ছিল না। অথচ বিবাহোত্তর জীবনে তাঁর যে সতী-সাধ্বীর গড্ডলিকা-পরিণতি ঘটেছিল, তার জন্য রসিক-শেখর কৃষ্ণের জীবন কতটা স্মৃতি-মধুর ছিল, সেটা বলা খুব কঠিন। তবে কিনা রামচন্দ্রের মতো কৃষ্ণ তো কোনও ধীরোদাত্ত ধর্মগম্ভীর পুরুষ নন এবং একাধিক বিবাহও তাঁর সমাজে অচল ছিল না। বিশেষত শাস্ত্রকথিত যে সব নায়কভেদ আমাদের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে আছে, সে-সব দিয়ে আমাদের 'অখিল-রসামৃত-মূর্তি' কৃষ্ণকে নির্দিষ্ট একটা ছাঁদের মধ্যে ফেলা যায় না। তাঁর মধ্যে উদাত্ত গুণের সঙ্গে ললিতগুণ, লালিত্যের সঙ্গে ঔদ্ধত্য এমন সূক্ষ্মতায় মিশেছে যে, অন্য কোনও মহাকাব্যিক নায়কের মতো তাঁর গায়ে 'স্ট্যাম্প' লাগিয়ে দিয়ে বলা যায় না যে, তিনি এইরকম— তিনি রামচন্দ্রের মতো, কী তিনি ভীমের মতো অথবা তিনি যুধিষ্ঠিরের মতো ধীরপ্রশান্ত।

বলা যায় না; কৃষ্ণের সম্বন্ধে এমন নির্দিষ্টভাবে কিছুতেই বলা যায় না। যাবেই বা কী করে। কী ছিল এই মানুষটার মধ্যে, কোন সেই মায়া-গুণ, যাতে হাজার ঘৃণা করেও সেই মানুষটাকে আঁকড়ে না ধরে থাকা যায় না। রূপ গোস্বামীর লেখা বিদগ্ধমাধব নাটকে রাধার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সখীরা রাধার সামনেই তাঁর নষ্টচরিত্রের কথা সোচ্চারে বলে বোঝাচ্ছিল যে, এমন চঞ্চল, কঠিন এবং অসভ্য এই পুরুষটি রাধার ভালবাসার যোগ্য নয় এতটুকু। তার উত্তরে রাধা বলেছিলেন— অমন খারাপ করে বলিসনে ভাই। আমার শ্যামলসুন্দর সেই পুরুষ, যদি হাজার বছর ধরেও সে কঠিন ব্যবহার করে আমার সঙ্গে, তবু জন্ম-জন্মান্তর ধরেও আমি তার দাসী না হয়ে থাকতে পারব না। সেইজন্যই বলছিলাম— ঠিক কী আছে এই মানুষটার মধ্যে সেটা যুক্তি তর্কের গবেষণা দিয়ে প্রতিষ্ঠা করাটা খুব কঠিন। অতএব সেটা থেকে কৃষ্ণের বৈবাহিক জীবনে প্রধানা যে রমণীটি পট্টমহিষী হয়ে বসে ছিলেন, তিনিই তাঁর স্বামীর জটিল মনটুকুও সম্পূর্ণ অধিকার করতে পেরেছিলেন কিনা, সেটা বোঝাই আমাদের রসশাস্ত্রীয় কর্তব্য হওয়া উচিত।

মথুরায় কংস-ধ্বংসের পর পরই কৃষ্ণ জড়িয়ে পড়লেন রাজনীতিতে। তখনকার ভারতবর্ষের রাজনীতিতে কেন্দ্রীয় শক্তি ছিলেন মগধের রাজা জরাসন্ধ। সম্পর্কে তিনি কংসের শ্বশুর। জামাই কংস মারা যাওয়ার সঙ্গে জরাসন্ধ তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে কৃষ্ণের প্রতিপক্ষতা শুরু করলেন। আক্রমণের পর আক্রমণ চলল কৃষ্ণের মাতৃভূমি মথুরার ওপর। এই আক্রমণের জেরেই কৃষ্ণকে শেষ পর্যন্ত তাঁর ভদ্রাসন সরিয়ে নিয়ে যেতে হয় দ্বারকায়। এর পর অসীম চতুরতা এবং নিপুণতার মাধ্যমেই কৃষ্ণের রাজনৈতিক উন্নতি ঘটতে থাকে। কৃষ্ণকে সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক পুরুষ হিসেবে ধরে নিয়েই তাঁর এই রাজনৈতিক উত্তরণের কথা আমি অন্যত্র বলেছি। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর অন্তঃপুরের সরসতার মধ্যেও আমি যে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের 'স্কেচ'টুকু এঁকে দিলাম, তার কারণ— কৃষ্ণের অন্তঃপুরচারিণী মহিষীদের মধ্যে যে প্রধানা— তাঁদের বিবাহের সঙ্গে রাজনীতির যোগ আছে।

মনে রাখতে হবে— মথুরা-দ্বারকায় যদুবংশীয়রা যেভাবে রাজত্ব চালাতেন, তাকে ইংরেজিতে বলা যায় 'কর্পোরেশন'। অর্থশাস্ত্রের লেখক কৌটিল্য পরিষ্কার জানিয়েছেন কৃষ্ণের আগে থেকেই তাঁর বংশের লোকেরা কতগুলি সঙ্ঘের মাধ্যমে রাজত্ব চালাতেন। কৃষ্ণের পূর্বে যাঁরা যদুবংশে জন্মেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিখ্যাত পুরুষ। যেমন অন্ধক, কুকুর, বৃষ্ণি, ভোজ ইত্যাদি। এদের 'কর্পোরেশনে'র কোনওটির নাম অন্ধক-সঙ্ঘ, কোনওটি বৃষ্ণি-সঙ্ঘ আবার কোনওটি বা ভোজ-সঙ্ঘ। একবারে আধুনিক অর্থে না হলেও, এইসব সঙ্ঘগুলির কাজকর্ম ছিল যথেষ্ট গণতান্ত্রিক। কৃষ্ণের মামা ভোজবংশের কুলাঙ্গার হলেও 'মিটিং'-এর প্রয়োজন হলে তিনি অন্যান্য সঙ্ঘমুখ্যদের ডাকতেন। কখনও কথা শুনতেন কখনও বা শুনতেন না। এ সব কথাও আমি অন্যত্র বলেছি।

আপনারা সবাই জানেন যে, কৃষ্ণ রাজা ছিলেন না বটে, তবে তিনি ছিলেন 'কিংমেকার'। কংস মারা যাওয়ার পর জরাসন্ধকে মোকাবিলা করার সময় অন্ধক-বৃষ্ণি এবং অন্যান্য সব সঙ্ঘের কর্তারাই কৃষ্ণের কথা মেনে চলতেন। কৃষ্ণের সময়ে মথুরা-দ্বারকায় যাঁরা সঙ্ঘ-মুখ্য ছিলেন, তাঁদের অনেকেই ছিলেন কৃষ্ণের জ্ঞাতি-গুষ্টি। যুদ্ধ-বিদ্যায় এঁরা অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন এবং দরকারে মথুরা-দ্বারকার সঙ্ঘমুখ্যেরা বড় বড় যুদ্ধে সৈন্য ভাড়া দিতেন বলেও মনে করি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এই ধরনের 'মার্সেনারি' সৈন্য দুই পক্ষেই

গিয়েছিল। কৃষ্ণের সময়ে কৃতবর্মা, অক্রূর— ইত্যাদি সঙ্ঘমুখ্যেরা যত প্রতাপশালীই হোন না কেন কৃষ্ণের রাজনৈতিক বুদ্ধির কাছে তাঁরা ছিলেন শিশু। ফলত কৃষ্ণকে তাঁদের মেনে চলতেই হত এবং সেটা এতটাই যে, মথুরা-দ্বারকায় কোনও একটি বিশেষ মেয়ের ওপরেও যদি তাঁদের ভালবাসার নজর লেগে থাকে, তবে সে যে তাঁদেরই পছন্দ করছে— এমন কোনও 'গ্যারান্টি' ছিল না। কারণ কৃষ্ণ এতটাই বড়, এতটাই মানী যে, তিনি না চাইলেও অন্যের ঈপ্সিততমা রমণীটি হয়তো কৃষ্ণের জন্যই মনে মনে অপেক্ষা করছে, এমনকী মেয়ের বাবাও হয়তো কৃষ্ণের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখবার জন্য তাঁকেই মেয়ে দিতে চায়। এইসব কঠিন ত্রিভূজী, চতুর্ভুজী প্রেমকাহিনির আগেই আমরা অবশ্য কৃষ্ণের বিবাহ-ক্রমে প্রথমা রমণীটির কথা সেরে নেব।

আগেই আমরা বলেছি যে, কৃষ্ণের সমসাময়িক কালে মগধের রাজা জরাসন্ধের মতো প্রবল-প্রতাপ নরপতি আর দ্বিতীয় ছিলেন না। প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁর অঙ্গুলি-হেলনে উঠত বসত। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের আরম্ভে কৃষ্ণ তাঁকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন— মহারাজ! এই বিশাল যজ্ঞের আগে জরাসন্ধের কথা মনে রাখবেন। সমস্ত ভারতবর্ষের একছত্র রাজা এবং প্রভু বলতে যা বোঝায়, জরাসন্ধ কিন্তু তাই— প্রভুর্যস্তু পরো রাজা যস্মিন্নেকবশে জগৎ। যাঁদের ওপর নির্ভর করে এই বিশাল আধিপত্য জরাসন্ধ অর্জন করেছিলেন, তাঁদের একজন হলেন চেদি দেশের রাজা শিশুপাল। তিনি জরাসন্ধের পুত্রের মতো প্রিয়, শিষ্য তো বটেই। জরাসন্ধের ভাব এবং ব্যবহার শিশুপালের এতই প্রিয় ছিল যে কৃষ্ণ অবশ্য যুধিষ্ঠিরের কাছে তাঁকে জরাসন্ধের শিষ্য বলেই উল্লেখ করেছেন। সম্পর্কে শিশুপাল কিন্তু কৃষ্ণের আপন পিসতুতো ভাই। কিন্তু কৃষ্ণের প্রতিপক্ষ জরাসন্ধের সঙ্গে দিন-রাত ওঠাবসা করে তিনি কৃষ্ণের অন্যতম শত্রু হয়ে গিয়েছিলেন। সকলে সে কথা জানতও।

চেদি দেশটা হল বেনারস ছাড়িয়ে যদি আপনি ভারতবর্ষের মোটামুটি মাঝখানটায় পৌঁছন সেই জায়গাটায়। শিশুপালের বাবা দমঘোষ যখন চেদির রাজা, তখন তাঁর সঙ্গে নিজের বোনের বিয়ে দিয়ে কৃষ্ণপিতা বসুদেব কংস-জরাসন্ধের বিরুদ্ধে যে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চেয়েছিলেন মগধরাজ জরাসন্ধের পরাক্রম এবং চতুরতায় সে 'স্ট্রাটিজি' ব্যর্থ হয়। দমঘোষ জরাসন্ধের পক্ষেই চলে যান, আর তাঁর ছেলে শিশুপাল তো জরাসন্ধের পুত্রকল্প শিষ্য। সেই শিশুপাল বড় হয়েছে, জোয়ান হয়েছে, তার সঙ্গে একটা সুন্দরী মেয়ের বিয়ে না দিলে লোকে তো জরাসন্ধকেই দুয়ো দেবে। অতএব তার বিয়ে দেওয়াটা শিশুপালের বাবা নয়, জরাসন্ধেরই দায়িত্ব।

জরাসন্ধের যেমন ক্ষমতা এবং সমস্ত ভারবর্ষের রাজা-মহারাজাদের ওপর তাঁর যা 'কন্ট্রোল', তাতে জরাসন্ধ যদি কোনও রাজাকে ডেকে বলেন যে তোমার মেয়েটি আমার শিশুপালের জন্য চাই, তা হলে তার না বলার সাধ্য নেই। কিন্তু এতই যদি ক্ষমতা হয়, তবে তিনি নিজে এই চেষ্টা করবেনই বা কেন। মেয়ের বাপ-ভাই আপনিই এসে জরাসন্ধের পায়ে ধরে বলবে— এই নিন, আপনি আপনার কার জন্য একটি সুপাত্রী খুঁজছিলেন না? এই নিন, সেই পাত্রী নিয়ে এসেছি। ঠিক এইরকম ভাবেই ব্যাপারটা ঘটত। কিন্তু কৃষ্ণ, বাদ সাধলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষ্ণ। রাজনৈতিক বুদ্ধি, সাহস আর ক্ষমতায় তিনি ততদিনে এমন জায়গায় পৌঁছে গেছেন যে, সব হিসেব উলটোপালটা হয়ে গেল।

সেকালের দিনে বিদর্ভ দেশের বড় সুনাম ছিল। এই সুনাম শক্তি অথবা বলদর্পিতায় যতখানি, তার চেয়ে অনেক বেশি সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে। তখনকার দিনে যে বিস্তীর্ণ ভূমিকে আমরা দাক্ষিণাত্য বলি, সেই জায়গার আরম্ভই বিদর্ভকে দিয়ে। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে, নর্মদা নদী আর তাপ্তীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নদীঘেরা পাহাড়ি অঞ্চলটাই বোধহয় বিদর্ভ। চেদি রাজ্য থেকে এই বিদর্ভ যেমন খুব দূরে নয়, তেমনই মথুরা-দ্বারকা থেকেও এটা খুব দূরে নয়। সংস্কৃত ভাষা আর সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রীতিটাকেই যেহেতু বৈদর্ভী রীতি বলে, তাই এখানকার মানুষ-জনের ভাবভঙ্গি, আচার-ব্যবহার এবং মুখের ভাষা সারা ভারতবর্ষের মধ্যেই বিখ্যাত ছিল। বিশেষত এই দেশের রাজার ঘরের মেয়েদের কথা-বার্তা, বিদগ্ধতা এমন উচ্চপর্যায়ের ছিল যে, বৈদর্ভী রমণী বলতেই ভারতবর্ষীয় পুরুষদের মনে অন্য এক স্বপ্ন তৈরি হত।

জরাসন্ধ-কৃষ্ণ-শিশুপালের সময়ে এই বিদর্ভ দেশের রাজা ছিলেন ভীষ্মক। গবেষণার দৃষ্টি থেকে ভাল করে খুঁজলে প্রমাণ করা যায় যে, ভীষ্মকও মোটামুটি কৃষ্ণের জ্ঞাতি-গুষ্টির মধ্যেই পড়েন, কারণ তাঁরাও ভোজবংশীয়। এই ভীষ্মকের এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলের নাম রুক্মী, তিনি জরাসন্ধ-শিশুপালের গুণমুগ্ধ, আর মেয়ে হলেন রুক্মিণী। যেমন তাঁর রূপ, তেমনই গুণ। রুক্মিণীর সমসাময়িক কালে তাঁর মতো সুন্দরী আর দ্বিতীয় ছিল কি না সন্দেহ— অনন্যা প্রমদা লোকে রূপেণ যশসা শ্রিয়া। যেমন ফরসা তাঁর গায়ের রঙ, তেমনই তাঁর দেহের সৌষ্ঠব। চেহারাটা লম্বা এবং 'স্লিম'— বৃহতী চারুসর্বাঙ্গী তন্বী। স্থূলতা যদি কোথাও থেকে থাকে তবে সে শুধু স্তনে, জঘনে, নিতম্বে— পীনোরুজঘনস্তনী। চুল কালো এবং কোঁকড়ানো। নখ লাল। তীক্ষ্ণ, সাদা, সমান এবং ঝকঝকে দাঁতের স্মিত হাসিতে রুক্মিণীকে মনে হয় স্বর্গের মায়াময়তা নেমে এসেছে ভুঁয়ে— মায়াং ভূমিগতামিব। যেন চাঁদের কিরণ জমাট বেঁধেছে রুক্মিণীর নারী-শরীরের আনাচে কানাচে।

সেকালের রাজা-রাজড়ারা এই বৈদর্ভী সুন্দরীর খবর রাখবেন না, এমনটা হতেই পারে না। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত পুরাণ কিংবা অন্যান্য পুরাণগুলিতে রুক্মিণীর বিয়ের 'পলিটিকস'টা তেমনটি ঠিক ধরা নেই, যেমনটি আছে হরিবংশের বর্ণনায়। এখানে দেখছি— কৃষ্ণ তখন মথুরায়। জরাসন্ধের সঙ্গে তার আগেই বেশ কয়েকবার তাঁর ঝামেলা হয়ে গেছে। হঠাৎ মথুরায় কৃষ্ণের গুপ্তচরেরা— লোকপ্রাবৃত্তিকা নরাঃ— কৃষ্ণকে এসে খবর দিল— শুনে এলাম, বিদর্ভের কুণ্ডিনপুরে অনেক রাজা-রাজড়ার সমাগম হচ্ছে। ভীষ্মকের ছেলে রুক্মী নাকি দেশ-বিদেশের অনেক রাজাদের কাছে নেমন্তন্নের চিঠি দিয়েছে। লোকেরা বলাবলি করছে— রুক্মীর বোন রুক্মিণীর স্বয়ংবর-সভার অনুষ্ঠান হবে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই। রাজারা সব সেখানে যাচ্ছেন সৈন্যসামন্ত সঙ্গে নিয়ে।

চরেরা সংবাদের মধ্যে ব্যঞ্জনা মাখিয়ে কৃষ্ণকে বলল— যে সব রাজারা তাঁদের নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন এবং এই মুহূর্তে রুক্মিণীকে পাওয়ার জন্য যাঁরা একে অন্যকে শত্রু ভেবে নিচ্ছেন— তাঁরা সবাই এখন সাভিলাষে চলেছেন কুণ্ডিনপুরে। শুধু আমরা, শুধু এই আমরা, যারা মথুরার এক টেরে পড়ে আছি, তারাই কি শুধু সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে এইখানেই পড়ে

থাকব— নিরুৎসাহা ভবিষ্যামঃ কিমেকান্তচরা বয়ম্? কথাগুলি কৃষ্ণের উদ্দেশেই। মৌখিক সংকেতটা তাঁর দিকেই। কিন্তু এই কথাগুলি শোনার সঙ্গে সঙ্গে যে প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক, সেই প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে তাঁর মনেও একটা গূঢ় মনঃকষ্টের সঞ্চার হল, বার্তাবহ চরেরা যে প্রতিক্রিয়া দেখতে পেল না। এই স্বয়ংবরের আয়োজনের কথা শোনামাত্র তাঁর মনে হল— কে যেন তাঁর হৃদয়ে কাঁটা ফুটিয়ে দিল— হৃদি শল্যমিবার্পিতম্।

এই কাঁটা কীসের তা আমাদের বুঝতে দেরি হয় না। কৃষ্ণ রুক্মিণীর রূপের কথা শুনেছেন, গুণের কথাও বাদ যায়নি। হয়তো বা মনে ছিল— এই বৈদর্ভী রমণী আমারই, একান্তই আমার। আসলে মথুরা-দ্বারকার এই বিদগ্ধ পুরুষ আর বিদর্ভনন্দিনী সেই স্বয়ংবরা রমণীটির মধ্যে নিঃসাড়ে এক অন্তর প্রক্রিয়া চলছিলই। কেউ তার খবর জানত না। শুধু বিষ্ণুপুরাণ আর ভাগবতপুরাণের ব্যাস তাঁদের কাহিনির সূত্রপাতেই পাঠকদের আশ্বস্ত করে সংক্ষেপে বলেছিলেন, কৃষ্ণ চাইতেন— রুক্মিণী আমার হোক, আর রুক্মিণীও চাইতেন কৃষ্ণ আমার হোক— রুক্মিণীং চকমে কৃষ্ণঃ সা চ তং চারুহাসিনী।

পারস্পরিক এই চাওয়া-চায়ির মধ্যে যেটা আসল সত্যি, তা হল— শুনে শুনে ভালবাসা— আলংকারিকভাবে যাকে বলে শ্রবণানুরাগ। কংসকে মেরে, মগধের অধিরাজ জরাসন্ধের সঙ্গে টক্কর দিয়ে কৃষ্ণের মর্যাদা এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছিল, যাতে করে বিদর্ভনন্দিনী রুক্মিণী তাঁর মধ্যে আপন মনের মানুষ খুঁজে পেয়েছিলেন। অন্যদিকে রুক্মিণীর অসামান্য রূপ আর সৌন্দর্য্যের কথা শুনে শুনে কৃষ্ণও তাঁর মধ্যে লজ্জাবস্ত্র-পরা এক মহিষীর রূপ দেখতে পেলেন। ফলত এই না-বলা-বাণীর অন্তরাল থেকে হঠাৎই যেদিন শোনা গেল— রুক্মিণী স্বয়ংবরা হবেন, রাজারা সব ছুটে আসছেন কুণ্ডিনপুরে, সেদিন কৃষ্ণের মনে কে যেন কাঁটা ফুটিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যাদব-সৈন্যদের যুদ্ধসজ্জা করতে বললেন— তিনি বিদর্ভে যাবেন।

কৃষ্ণ বিদর্ভে এলেন এবং এসে দেখলেন— জরাসন্ধ ইত্যাদি বড় বড় রাজারা আগেই এসে গেছেন। অদ্ভুত ব্যাপার হল জরাসন্ধরা কিন্তু এই সময়ে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যাপারটা পছন্দ করছিলেন না। তার কারণ আছে। জরাসন্ধের সঙ্গে কৃষ্ণের অনেক যুদ্ধের মধ্যে একেবারে শেষেরটায় কৃষ্ণের জয় হয়েছিল। হয়তো এরই জেরে জরাসন্ধ আপাতত একটা লোকদেখানো স্তুতিবাদ করলেন কৃষ্ণের, কিন্তু অন্যদিকে তাঁকে সাজা দেওয়ার জন্য লাগালেন অন্য এক শক্তিশালী শক্তিকে। হরিবংশে যেমনটি দেখেছি তাতে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে একদিকে কৃষ্ণ এবং অন্যদিকে জরাসন্ধের মতো বিখ্যাত রাজার মাঝখানে পড়ে রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মকের অবস্থা হয়েছিল অনেকটা দুই সিংহের মাঝখানে দাঁড়ানো হরিণের মতো। হয়তো এই কারণেই রুক্মিণীর স্বয়ংবরসভা সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিতে হয়।

অবশ্য বেশিদিন এইভাবে স্বয়ংবরসভা চেপে রাখা গেল না। জরাসন্ধ কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অন্যান্য নরপতিদের লাগিয়ে দেওয়ায় কৃষ্ণ যেমন অন্যত্র যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত রইলেন, তেমনই আরেক দিকের খবর হল— জরাসন্ধ এবং বিদর্ভনন্দিনী রুক্মিণী দু'জনেই নিজের নিজের মতো করে একটু সময় পেয়ে গেলেন। এই সময়ের সদব্যবহার জরাসন্ধ করলেন একভাবে, রুক্মিণী করলেন আরেকভাবে। অবশ্য কৃষ্ণ যে কিছুই সদ্ব্যবহার করলেন না, তা নয়। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়ের মধ্যে তিনি দ্বারকায় নিজের বাড়ি-ঘর সব তৈরি করে ফেললেন। মথুরায় বারংবার জরাসন্ধের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ তিনি তাঁর সাময়িক স্তুতিতে ভুলে যাবেন, এমন মানুষ তিনি নন। তিনি নিজেকে এবং নিজের পরিজনকে সুরক্ষিত করে তারপরে আবারও মন দিলেন বিদর্ভনন্দিনীর দিকে। তিনি এখনও কৃষ্ণের ঘরে আসেননি বটে, কিন্তু মনে তাঁর নিত্য আসা-যাওয়া।

সময় পেয়ে জরাসন্ধ ঠিক করলেন তাঁর বশংবদ শিশুপালের বিয়ে দেবেন, সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা রুক্মিণীর সঙ্গে। আমি আগেই বলেছি— তিনি চাইবেন কেন, তিনি ইচ্ছে করবেন। তিনি ইচ্ছে করেছেন, এখন সেই ইচ্ছে যাতে কোনওভাবেই বানচাল না হয়ে যায়, এবং যাতে শিশুপালের মনে কোনও কষ্ট না থাকে, তাই সমস্ত রাজাদের এক জায়গায় জড়ো করার কথা ভাবলেন জরাসন্ধ— নৃপান্ উদ্‌যোজয়ামাস চেদিরাজপ্রিয়েপ্সয়া। যে সব রাজাদের সঙ্গে কৃষ্ণের শত্রুতা আছে তাঁদের সবাইকে বেছে বেছে এক জায়গায় নিয়ে জরাসন্ধ শিশুপালের বরযাত্রী নিয়ে গেলেন বিদর্ভনগরে। জরাসন্ধের সবচেয়ে বড় সুবিধে ভীষ্মকের শক্তিমান পুত্র, রুক্মিণীর দাদা— স্বয়ং জরাসন্ধের পক্ষে। কংস মারা যাওয়ার পর রুক্মীর কৃষ্ণ-দ্বেষ আরও বেড়েছে। তিনি জানেন যে, তাঁর বোন রুক্মিণী কৃষ্ণকে ভালবাসে, তিনি এও জানেন যে, কৃষ্ণও রুক্মিণীকে পেতে চান। কিন্তু মনে মনে তিনি ঠিকই করে রেখেছেন যে, কোনওভাবেই তিনি কৃষ্ণের হাতে নিজের বোনকে দেবেন না— তাং দদৌ ন চ কৃষ্ণায় দ্বেষাদ্ রুক্মী মহাবলঃ।

এরই মধ্যে জরাসন্ধ তাঁর রাজসমাজ নিয়ে এসে গেলেন বিদর্ভে এবং বরকর্তা হিসেবে শিশুপালের জন্য মেয়ে চাইলেন ভীষ্মকের কাছ থেকে। ভীষ্মক উপায়ান্তর না দেখে রুক্মিণীকে বাগ্‌দান পর্যন্ত করে দিলেন শিশুপালের কাছে। অন্যদিকে রুক্মিণীর ভাই রুক্মী জরাসন্ধের খাতির-যত্নে নিজেকে সঁপে দিলেন আগে থেকেই। সময় আর বেশি নেই। রুক্মিণী বুঝলেন, তাঁর ভালবাসা, তার প্রেম— কোনও কিছুরই মূল্য তিনি পাবেন না। পিতা ভয়ার্ত এবং ভাই জরাসন্ধের বশংবদ। কাজেই সময় আর নেই। পাকাপাকি এবং আনুষ্ঠানিক বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে। আগামী কাল বা পরশুই সেই বিয়ে।

এই অবস্থায় হরিবংশ এবং বিষ্ণুপুরাণ খুব সংক্ষিপ্তভাবে বলে দিয়েছেন— মহামতি কৃষ্ণ বিয়ের আগের দিনই রুক্মিণীকে হরণ করে নিলেন— শ্বোভাবিনি বিবাহে তু তাং কন্যাং হৃতবান হরিঃ। এই সংক্ষিপ্তসার এমনিতে ঠিকই আছে, কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা অত সহজ ছিল না। অন্য এক অচেনা দেশে গিয়ে— মেয়ে কখন কোথায় থাকবে জানা নেই— এই অবস্থায় কন্যাহরণ অত সহজ নয়। কিন্তু কৃষ্ণের পক্ষে ব্যাপারটা কেমন সহজ হয়ে গেল, সেটা অত্যন্ত রোমাঞ্চকরভাবে জানিয়েছে ভাগবতপুরাণ। শত সংক্ষিপ্ততার মধ্যেও এই পুরাণটি জানিয়েছেন কীভাবে রুক্মিণীকে রথে চাপিয়ে হরণ করে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেলেন কৃষ্ণ।

ভাগবতে দেখছি— যে মুহূর্তে রুক্মিণীর সহোদর রুক্মী ঠিক করলেন যে, বোনকে তিনি শিশুপালের হাতেই তুলে দেবেন, সেই দিনই রুক্মিণী বিদর্ভের এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর হাতে বিদর্ভের রাজনন্দিনীর মোহর আঁটা একটা চিঠি দিয়ে রুক্মিণী তাঁকে

কৃষ্ণের কাছে পাঠিয়ে দিলেন দ্বারকায়। ব্রাহ্মণ-দূত খুব তাড়াতাড়ি খবর নিয়ে আসবেন রুক্মিণীর কাছে, জানাবেন কৃষ্ণের প্রতিক্রিয়া।

দ্বারকায় সোনার আসনে বসে ছিলেন কৃষ্ণ। ব্রাহ্মণকে দেখে আসন থেকে নেমে তাঁর কুশল জিজ্ঞেস করতেই তিনি সমস্ত বিবরণ দিয়ে রুক্মিণীর পত্র দিলেন কৃষ্ণের হাতে। কৃষ্ণ একান্তে চিঠি খুললেন। রুক্মিণী লিখেছেন—

তিন ভুবনের সেরা সুন্দর আমার!

লোকের মুখে হৃদয়ের জ্বালা-জুড়োনো তোমার কথা অনেক, অনেকবার শুনেছি। তোমাকে একবার দেখলে পরে লোকের নাকি সব পাওয়ার অনুভূতি হয়। তোমার এত গুণ আর এত সৌন্দর্য্যের কথা বার বার শুনে আমার মনের সব লজ্জাই যেন ঘুচে গেল। নির্লজ্জ বেহায়ার মতো আমার মন কেমন যেন তোমারই স্বপ্ন দেখতে শুরু করল— ত্বয়ি অচ্যুতাবিশতি চিত্তম্ অপত্রপং মে।

বিয়ে হয়নি এমন একটা মেয়ে এইসব কথা বলছে দেখে তুমি যেন আবার আমাকে সত্যিই বেহায়া ভেবে বসো না। আমি বড় ঘরের মেয়ে; রূপ বল, বিদ্যা বল, ব্যক্তিত্ব বল, এমনকী টাকা-পয়সার কথাও বলতে পারো, কোনওটাই আমার কম নেই। এখন তুমিই বল, কোন মেয়ে তার রূপ, বয়স অথবা বিদ্যা এবং আভিজাত্যে সমান একটা স্বামী না চায়— বিদ্যাবয়োদ্রবিণধামভিরাত্মতুল্যম্? এই নিরিখে আমার বিয়ের সময় তোমাকেই আমি পেতে চাই।

আমি মনে মনে তোমাকে আমার স্বামীর আসন দিয়েছি। এখন যা করবার তুমি করবে। এমনটি যেন আবার না হয় যাতে সিংহের খাবার শেয়ালে খেয়ে যায়। যা নিতান্তই তোমারই প্রাপ্য তাকে কি শিশুপালের মতো শেয়ালে নিয়ে যাবে তুলে?

মনে রেখো, সামনেই আমার বিয়ে। সময় বেশি নেই। এ দেশের নিয়ম আছে, বিয়ে করতে হলে মেয়ের বাবাকেই পণ দেয় বিবাহার্থী পুরুষ। তুমি এখানে এসে শিশুপাল-জরাসন্ধের বাহিনীকে হারিয়ে দাও আর সেই শক্তিমত্তার পণ দিয়ে আমাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে যাও রাক্ষসের মতো। যদি বলো, আমার আত্মীয়-স্বজনকে না মেরে কেমন করে এই অন্তঃপুরচারিণীকে নিয়ে যাবে, তা হলে তার উপায় বলি শোনো। আমাদের রাজবাড়ির নিয়ম আছে— বিয়ের আগের দিন নগরের বাইরে যে ভবানী-মন্দির আছে, সেইখানে পুজো দিতে যায় বিয়ের কনে। সঙ্গে দু-চারজন বান্ধবী ছাড়া আর কেউ থাকে না। অতএব সেইখান থেকেই... কী বলো? আর তুমি যদি না আসো, তা হলে তোমাকে অন্তত শত-জন্মে পাওয়ার আশায় শুকিয়ে শুকিয়ে মরতে হবে আমায়। শতজন্মেও তো পাব— জহ্যাম্যসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাৎ।

চিঠির তলায় রুক্মিণীর নাম নেই। কে জানে, কেউ যদি রাস্তায় সরল ব্রাহ্মণকে প্রতারণা করে চিঠি কেড়ে নেয়। রুক্মিণীর চিঠি পড়া হয়ে গেলেই ব্রাহ্মণ তাই কৃষ্ণকে বললেন— এই হল সেই গোপন সংবাদ যা চিঠির মধ্যে লেখা আছে— ইত্যেতে গুহ্যসন্দেশঃ, এবং এটাই আমি বয়ে এনেছি এতদূর। সব বুঝে এখন আপনার যা করার করুন— বিমৃশ্য কর্তুং যচ্চাত্র ক্রিয়তাং তদনন্তরম্।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই কত হাজার বছর আগে দূরদেশিনী এক প্রেমিকার কাছ থেকে মন আধুনিক একটা প্রেমপত্র পেয়ে নায়ক-স্বভাব কৃষ্ণের মনে কী হয়েছিল, তা আমরা আন্দাজ করতে পারি। বার্তাবহ ব্রাহ্মণের হাত ধরে কৃষ্ণ বললেন— আমিও তাঁর কথাই ভাবছি নিশিদিন। তাঁর অবস্থা ভেবে রাত্রে আমার ঘুম হয় না। আমি জানি— আমার ওপর রাগে রুক্মী আমার সঙ্গে তাঁর মিলন রুদ্ধ করতে চায়। কিন্তু তা হবে না, বিবাহার্থী রাজাদের বিদলিত করে রুক্মিণীকে হরণ করে নিয়ে আসব আমি। খবর নিয়ে ব্রাহ্মণ চলল বিদর্ভে। আসলে কৃষ্ণই নিয়ে চললেন ব্রাহ্মণকে। দারুকের রথে চড়ে এক রাতের মধ্যে কৃষ্ণ চলে এলেন বিদর্ভে।

অন্তঃপুরে বসে কৃষ্ণপ্রিয়া রুক্মিণী তখন সময় গুণছেন। ব্রাহ্মণ তো এখনও এসে পৌঁছল না। বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে আগামীকাল। প্রণয়িনীর শত উৎকণ্ঠার মধ্যে বার্তাবহ ব্রাহ্মণ শেষ পর্যন্ত রুক্মিণীকে খবর দিলেন— কৃষ্ণ এসে গেছেন। তিনি কী বলেছেন, তাও জানালেন রুক্মিণীকে। রুক্মিণী এবার নিশ্চিন্ত হয়ে নগরের বাইরে ভবানী মন্দিরে যাওয়ার উদ্যোগ করলেন। ভাগবত পুরাণ বা বিষ্ণুপুরাণে ঘটনার যা বিবরণ পাই তার থেকে এই মুহূর্তে অবশ্য হরিবংশ ঠাকুরের জবানই আমার কাছে সত্য এবং বেশি প্রাচীন বলে মনে হয়। হরিবংশে রুক্মিণী ইন্দ্রাণীর পুজো দিতে যাচ্ছেন, অম্বিকার নয়। কৃষ্ণের আমলে বৈদিক দেবতাদের অবক্ষয় শুরু হলেও ইন্দ্রপূজার চল ছিল। গোবর্ধন ধারণের মতো রূপকের মাধ্যমে ইন্দ্রপুজা বন্ধ হলেও সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে নববধূর কাছে ইন্দ্রাণী তখনও পুজো পেতেন। বিদর্ভে নগরের বাইরে তখনও যে মন্দির ছিল সেটা তখনও ইন্দ্রেরই নামাঙ্কিত। অর্থাৎ কৃষ্ণের নিজের দেশে তাঁর ব্যক্তিত্বে ইন্দ্রপূজা বন্ধ হলেও বিদর্ভে সেই পূজা বন্ধ হয়নি। রুক্মিণী তাই সৌভাগ্যলক্ষ্মী ইন্দ্রাণীর পুজো দিতে যাবেন নগরের বাইরে— ইন্দ্রাণীমর্চয়িষ্যন্তী কৃতকৌতুকমালা।

কৃষ্ণ এই বিবাহবাসরে পৌঁছচ্ছেন পিসিমা শ্রুতশ্রবার মনোরঞ্জনের অজুহাতে। কারণ শ্রুতশ্রবার ছেলে শিশুপালই রুক্মিণীর বর হিসেবে জরাসন্ধের মনোনীত। কৃষ্ণ অবশ্য যুদ্ধের সমস্ত ভার দাদা বলরাম আর সাত্যকির ওপর ন্যস্ত করে নিজেকে মুক্ত রেখেছেন রুক্মিণী-হরণের জন্য। রাজনন্দিনী বাইরে ইন্দ্রাণী মন্দিরে চলেছেন সখীদের সঙ্গে নিয়ে। বিদর্ভের সেনাবাহিনী তাঁকে 'গার্ড' করে নিয়ে যাচ্ছিল। রুক্মিণীর কথামতো কৃষ্ণ একা সেখানে উপস্থিত। বলরাম আছেন কাছে কাছে। নগরপ্রান্তে অরণ্যের অন্তরালে যদুবংশের সৈন্যবাহিনী।

রুক্মিণী আসছেন। মাখন-রঙা বিয়ের বেনারসী পরে— রুক্মিণী রূপিণী দেবী পাণ্ডুরক্ষৌমবাসিনী— যাত্রাপথে আগুনপানা রূপ ছড়িয়ে রুক্মিণী আসছেন। কৃষ্ণ তাঁকে এই প্রথম দেখছেন। দেখামাত্র তাঁর কামনার অগ্নিশিখায় রূপের ঘি পড়ল— হবিষেবানলস্যার্চিমনস্তস্যাং সমাদধৎ। ইন্দ্রাণীর মন্দির থেকে বেরনো মাত্র কৃষ্ণ রুক্মিণীকে কোলে তুলে নিয়ে চড়ালেন নিজের রথে। বায়ুবেগে রথ ছুটল দ্বারকার পথে। ওদিকে লড়াই লাগল বলরাম-সাত্যকির বাছাই করা সৈন্যদলের সঙ্গে জরাসন্ধ আর শিশুপালের বাহিনীর। রুক্মিণীর ভাই রুক্মী একা রথ নিয়ে ছুটলেন কৃষ্ণকে রাস্তায় ধরবার জন্য।

দুঃখের বিষয় জরাসন্ধ-শিশুপাল যেমন একদিকে বলরাম-সাত্যকির হাতে নাস্তানাবুদ

হলেন, তেমনই অন্যদিকে রুক্মী কোনওরকমে তাও বুঝি নববধূ রুক্মিণীর করুণ যাচনায়— প্রাণ নিয়ে ফিরে এলেন কৃষ্ণের কাছ থেকে। ক্রোধে, অভিমানে তিনি কুণ্ডিনপুরে আর ঢুকলেন না। বিদর্ভের বাইরে নতুন এক রাজ্য তৈরি করে বাস করতে লাগলেন সেখানেই। দ্বারকায় যদুবংশীয়রা সবাই ফিরে এলে মহা সমারোহে কৃষ্ণের বিয়ে হল রুক্মিণীর সঙ্গে।

দেখুন, রুক্মিণী কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠা মহিষী। নববধূর প্রথম সঙ্গমে কৃষ্ণের মতো নায়ক পুরুষের যতখানি ভাল লাগার, তা নিশ্চয়ই লেগেছিল।

কারণ সব পুরাণ এবং হরিবংশের জবানে কৃষ্ণের অন্তঃপুরের এই প্রথমা রমণীটির সম্বন্ধে যথেষ্ট ভাল ভাল কথা শুনি। সীতার সঙ্গে রাম যে রকম, ইন্দ্রাণীর সঙ্গে ইন্দ্র যেরকম— এই সব রাজযোটকের উপমা কৃষ্ণ আর রুক্মিণীর সম্বন্ধেও এসেছে। কিন্তু এসব বড়ই ভাল ভাল কথা। রুক্মিণী বড় রূপবতী, বড় পতিব্রতা, বড় গুণোপেতা রূপশীলগুণান্বিতা। কৃষ্ণের ওপর তিনি এতই আস্থাশীল, এতই তিনি নম্র, কৃষ্ণের দাম্পত্যে তিনি এতই অভিভূত যে, কৃষ্ণকে তিনি দেবতার মতো মনে করেন। প্রত্যেকটি কথাই রুক্মিণীর কাছে বেদবাক্য।

কৃষ্ণের দিক থেকেও এটা বড় অবাক হওয়ার ছিল। তৎকালীন রাজনীতিতে যে রমণীটি হইহই ফেলে দিয়েছিল, যাঁর জন্য বড় রাজনৈতিক কক্ষ তৈরি হয়ে গেল সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে, সেই রুক্মিণী যে বশংবদ পত্নীটি হবেন— এটা কৃষ্ণ ভাবতেই পারেননি। ওইরকম একটি 'সেনসেশনাল' মহিলা, যাঁর কারণে শিশুপাল মরার দিন পর্যন্ত সক্রোধ অভিমানে বলেছে— রুক্মিণী আমার ছিল, এই কৃষ্ণ তাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বিয়ে করেছে— মৎপূর্বাং রুক্মিণীং কৃষ্ণঃ— সেই রুক্মিণী যে এমন অনুক্ষণ স্বামীর মুখাপেক্ষী নিস্তরঙ্গ গৃহবধূটি হবেন, এ বুঝি কৃষ্ণ কল্পনাও করতে পারেনি।

পৌরাণিকেরা যে রুক্মিণীকে জ্যেষ্ঠা মহিষীর মর্যাদা দিয়েই কৃষ্ণের অন্য মহিষীদের বর্ণনা করেছেন, সেই কী এই নিস্তরঙ্গতার কারণে? কৃষ্ণের নাকি আরও সাতজন মহিষী ছিল। আমার তো ধারণা, এই সাতজনের মধ্যেও মাত্র একজন ছাড়া আর যে ছয়জন মহিষী ছিলেন তাঁরাও ছিলেন একই রকম 'সাইফার' অর্থাৎ কৃষ্ণের হৃদয়ে তরঙ্গ তুলবার ক্ষমতা এই ছয়জনেরও ছিল না। যাঁর সে ক্ষমতা ছিল, তাঁর কথায় পরে আসছি।

পুরাণকারেরা কৃষ্ণের মহিষীদের যে লিস্টি দিয়েছেন, তাতে অবশ্য আটজন প্রধানা মহিষী ছাড়াও কৃষ্ণের অন্তঃপুরে আরও ষোলো হাজার রমণীর কথা শোনা যায়। এখনকার আসাম অর্থাৎ তখনকার প্রাগজ্যোতিষপুরের অনার্য রাজা নরকাসুরকে মেরে এই ষোলো হাজার রমণীকে নাকি কৃষ্ণ নিয়ে এসেছিলেন দ্বারকায়। পুরাণকারেরা কৃষ্ণের অলৌকিক যোগসিদ্ধির প্রসঙ্গ তুলে দেখাতে চেয়েছেন যে, একই কৃষ্ণ নিজেকে ষোলো হাজার কৃষ্ণে রূপান্তরিত করে এই রমণীদের সঙ্গ দিতেন। আমার অবশ্য ঠিক এতটা বিশ্বাস হতে চায় না। নরকাসুর নাকি দেবতা, গন্ধর্ব, এবং মানুষের ঘরের বহু সংখ্যক কুমারী মেয়েদের হরণ করে এনে আটকে রেখেছিলেন মণিপর্বতের গুহায়। পুরাণকারেরা এই রমণীদের যথেষ্ট শুদ্ধশীলা এবং চরিত্রবতীও করে রেখেছিলেন বটে, তবে এঁরা— ষোলো হাজার না হয়ে আমার বিশ্বাসমতো যদি এঁরা ষোলোজন মাত্রও হন, তবু চরিত্রের দিক থেকে এঁরা যে বড় শুদ্ধশীলা ছিলেন, তা আমি মনে করি না। এঁদের কথাতেও আমি পরে আসছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুক্মিণী ছাড়া কৃষ্ণের অন্তঃপুরে আর যে সাতজন প্রধানা মহিষী ছিলেন তাঁদের মধ্যেও দুইজনকে বাদ দিলে অন্যদের মর্যাদা ছিল নগণ্য। মুশকিল হল— বিভিন্ন পুরাণ এবং হরিবংশে কৃষ্ণের মহিষী সংখ্যা একেক জায়গায় একেক রকম। কোথাও আট, কোথাও বা দশ, কোথাও বা এগারোও বটে। এই পরস্পরবিরোধী সংখ্যা দেখে মহামতি বঙ্কিম মাথা গরম করে কৃষ্ণের অন্তঃপুর থেকে রুক্মিণী ছাড়া অন্য সমস্ত মহিষীদেরই বার করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার— পুরাণকারেরা বার বার বলেছেন— কৃষ্ণের প্রধানা মহিষী আটজন। কিন্তু এই আটজনের কথা বলা হয়েছে কখনও রুক্মিণীর বিয়ের পর, কখনও সত্যভামার বিয়ের পর, আবার কখনও বা জাম্ববতীর সঙ্গে কৃষ্ণের বিয়ের পর।

কথা হল— প্রধানা মহিষী আটজনই কিন্তু প্রধানতমাদের কথা এখানে বলা হয়নি। ফলত কখনও রুক্মিণীকে ধরে পুরাণের লিস্টিতে একবার নয়জন মহিষী, কখনও রুক্মিণী-সত্যভামাকে ধরে মহিষীর সংখ্যা দশ আবার কখনও বা রুক্মিণী-সত্যভামা এবং জাম্ববতীকে ধরে এই সংখ্যা এগারো। যাই হোক বিভিন্ন পুরাণের নামে একটু ইতর বিশেষ ধরে নিয়ে অন্যান্য কৃষ্ণ-মহিষীদের নামগুলিও বলা যেতে পারে। এঁরা হলেন কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, সত্যা, নাগ্নজিতী, রোহিণী বা ভদ্রা, লক্ষ্মণা এবং শৈব্যা গান্ধারী। পৌরাণিকেরা বলেন— কালিন্দী নাকি সূর্যের মেয়ে। কৃষ্ণ তখন কয়েক মাস ইন্দ্রপ্রস্থে ছিলেন। খাণ্ডব-দহন হয়ে গেছে। এই সময়ে কৃষ্ণের সঙ্গে বনে শিকার করতে করতে তৃষ্ণাতুর হয়ে অর্জুন যমুনায় জল খেতে নেমেছেন। হঠাৎ সামনে দেখলেন এক রূপসী মেয়ে। কৃষ্ণের ইঙ্গিতে অর্জুন তাঁর নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করলেন। জানা গেল— তিনি সূর্যদেবের মেয়ে; কৃষ্ণকে স্বামী পাওয়ার জন্য তিনি তপস্যার জোগাড় করছেন। তাঁর নাম কালিন্দী। কৃষ্ণের দর্শন না পেলে তিনি জলের মধ্যেই বসে থাকবেন চিরকাল।

কৃষ্ণ তাঁর কথা জানতেন অতএব তাঁকে রথে চড়িয়ে প্রথমে নিয়ে গেলেন যুধিষ্ঠিরের বাড়িতে। পরে দ্বারকায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে করলেন তাঁকে। কালিন্দীর ব্যাপারে আমার যেটা সন্দেহ সেটা হল— যমুনা নদীকে কালিন্দী বলেই আমরা জানি, এবং সেই যমুনাও সূর্যকন্যা বলেই পুরাণে চিহ্নিত। যমুনা নদীর সঙ্গে পুরুষোত্তম কৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধ যেহেতু অচ্ছেদ্য, অতএব পৌরাণিকের কথকতায় তিনি কৃষ্ণের স্ত্রী বলেই স্বীকৃত হয়েছেন।

মিত্রবিন্দা কৃষ্ণের আপন পিসি রাজাধিদেবীর মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই তিনি কৃষ্ণকে চেনেন এবং কৃষ্ণের ব্যাপারে তাঁর 'হিরো ওয়ারশিপ' ছিল। তাঁকে যদিও দুর্যোধনের বশংবদ অবন্তী দেশের দুই রাজা বিয়ে করতে চেয়েছিলেন কিন্তু কৃষ্ণ এই পিসতুতো বোনটির মনের কথা জানতেন নিশ্চয়। স্বয়ংবরে স্বভগিনীং কৃষ্ণে সক্তাম্। তিনি তাঁকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন। পিসতুতো-মাসতুতো অথবা মামাতো ভাই-বোনে বিয়ে হওয়ার ব্যাপারটা সেকালের সমাজে অস্বাভাবিক ছিল না। অর্জুনও তো মামাতো বোন সুভদ্রাকে বিয়ে করেছিলেন। অতএব কৃষ্ণের দিক থেকেও এটা অস্বাভাবিক নয়। কৃষ্ণের অন্তঃপুরে অবশ্য আরও একটি পিসতুতো বোন ছিলেন। তিনি তাঁর আরেক পিসি শ্রুতকীর্তির মেয়ে। নাম ভদ্রা বা রোহিণী। ভদ্রা-রোহিণী কেকয় রাজার মেয়ে বলে তাঁকে কৈকেয়ী বলেও ডাকা হত। কন্যার পিতা বোধহয় এক্ষেত্রে কন্যা সম্প্রদান করতে রাজি হননি, কিন্তু ভদ্রার দাদারা,

মানে, কৃষ্ণের পিসতুতো ভাইরা এই বিয়ের ব্যবস্থা করেন— কৈকেয়ীং ভ্রাতৃভির্দত্তাং কৃষ্ণঃ সন্তর্দনাদিভিঃ।

কোশলের রাজা নগ্নজিতের মেয়ে ছিলেন সত্যা। বাবার নামে তাঁকে লোকে নাগ্নজিতী বলে ডাকত। এঁকে বিয়ে করার সময় কৃষ্ণকে একটু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। সাতটা ষাঁড় অথবা— আমার ধারণা সাতটা ষণ্ডা মার্কা লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করে যিনি বিজয়ী হবেন তিনিই নাগ্নজিতী সত্যাকে পাবেন— এইরকম একটা শর্ত ছিল এই বিয়েতে। কৃষ্ণ এই অসামান্য কার্যটি করে পাণিপ্রার্থী অন্যান্য রাজাদের জয় করে সত্যাকে বিয়ে করেন। লক্ষ্মণা মদ্র রাজার মেয়ে। গরুড় যেমন অমৃতের ভাণ্ড নিয়ে উড়ে গিয়েছিলেন তীব্র বেগে কৃষ্ণ তেমনই হরণ করে নিয়ে এসেছিলেন লক্ষ্মণাকে।

ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণ মহিষীদের সম্পর্কে খানিকটা আঁচ পাওয়া গেলেও শৈব্যা গান্ধারীর সম্বন্ধে প্রায় কোনও কথাই পাওয়া যায় না। অন্যদিকে হরিবংশ ঠাকুর কালিন্দী, মিত্রবিন্দা— ইত্যাদি নাম অষ্টমহিষীর লিস্টিতে রাখলেও তাঁদের পরিচয় বা বিবাহের প্রক্রিয়ায় কোনও শ্লোক খরচ করেননি। লক্ষণীয় ব্যাপার হল— কৃষ্ণপ্রিয়া রুক্মিণী, সত্যভামা কিংবা জাম্ববতীর পরেই কৃষ্ণমহিষীদের মধ্যে অন্য যে নামটি হরিবংশে পৃথক এক বৈশিষ্ট্য নিয়ে উল্লিখিত হয়েছে, তিনি কিন্তু এই গান্ধারী। হরিবংশ যেহেতু ভাগবত পুরাণের থেকে অনেক প্রাচীন রচনা, তাই গান্ধারীকে আমরা আলাদা কিছু গুরুত্ব দেবই।

গান্ধারী শৈব্য রাজার মেয়ে এবং তিনি নাকি দেখতে ছিলেন স্বর্গের অপ্সরার মতো সুন্দরী— শৈব্যস্য চ সুতাং তন্বীং রূপেণাপ্সরসোপমাম্। কৃষ্ণের বউতে বউতে ঝগড়া বাধানোর জন্য নারদ অন্য কোনও মহিষীর নাম না করলেও জাম্ববতীর সঙ্গে এক নিশ্বাসে গান্ধারীর নাম করেছেন। নারদ রুক্মিণীকে বলেছিলেন— আজ তোমায় দেখে জাম্ববতী আর গান্ধারীরা জীবনে আর সৌভাগ্যের আশা করবেন না। ভাবে বুঝি, এই গান্ধারীও খুব কম কিছু ছিলেন না। স্ত্রীলোকের মঙ্গল-ব্রত পালনের উৎসবে আমরা রুক্মিণী, সত্যভামা আর জাম্ববতীর সঙ্গে চতুর্থী যে কৃষ্ণ মহিষীকে স্বনামধন্যা দেখতে পাই তিনি এই শৈব্যা গান্ধারী— গান্ধাররাজপুত্রী চ যোগযুক্তা নরাধিপ। পুরাণগুলি এবং হরিবংশ ছাড়াও মহাভারতে আমরা গান্ধারীর সম্বন্ধে একটা ধূসর উল্লেখ পাই। রুক্মিণীর বিবাহের সময় কৃষ্ণের পরাক্রমবার্তা প্রকাশের পরেই মহাভারতের একটি শ্লোকে বলা হচ্ছে কৃষ্ণ গান্ধার রাজ্যের সকলকে খুব তাড়াতাড়ি পর্যুদস্ত করে নগ্নজিতের ছেলেদের সবাইকে পরাস্ত করেছিলেন— যো গান্ধারাংস্তরসা সম্প্রমথ্য জিত্বা পুত্রান্ নগ্নজিতঃ সমগ্রান্। পুরাণে-ইতিহাসে গান্ধার রাজ্য এবং শিবিদের রাজ্য প্রায় পাশাপাশি এবং এমনও হতে পারে সেই শৈব্য রাজাই গান্ধার শাসন করছিলেন তখন এবং গান্ধারের অধিকার পাবার পরেই হয়তো স্মারক হিসেবে নবজাত কন্যার নাম রেখেছিলেন গান্ধারী। গান্ধার রাজ্য এবং নগ্নজিতের ছেলেদের জয় করে কৃষ্ণ গান্ধারী এবং নগ্নজিতের কন্যা নাগ্নজিতীকে লাভ করলেন কিনা, সেই খবর মহাভারত সোজাসুজি না দিলেও এই দুই রমণী এই বৃহদ্‌যুদ্ধের বৈবাহিক ফল বলেই আমরা মনে করি। পুরাণ বলেছে— গান্ধারীর বিয়ের সময় কৃষ্ণ নাকি অন্তত একশোটা রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। রাজাদের অনেককেই তিনি মেরে ফেলেছিলেন, অন্যদের দড়ি দিয়ে বেঁধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়েছিলেন রথে— গান্ধারকন্যাবহনে নৃপাণাং রথে তথা যোজনমূর্জিতানাম। কাজেই এত কষ্ট করে যে রমণীকে কৃষ্ণ অন্তঃপুরে নিয়ে এসেছিলেন, তিনিও খুব হেলাফেলার কেউ নন।

তবু কৃষ্ণের অন্তঃপুরের শোভাসার এই সমস্ত রমণীদের আমরা না হয় ছেঁটেই দিলাম। প্রমাণ-বাহুল্য অথবা ঐতিহাসিকতা— দুই দিক দিয়েই হয়তো এই রমণীদের আমরা প্রতিষ্ঠা করতে বিফল হব। কিন্তু কৃষ্ণের বুক খালি করে রুক্মিণী, সত্যভামা এবং জাম্ববতীকে অস্বীকার করার উপায় আমাদের নেই। উপায় নেই কারণ মহাভারতের মতো প্রাচীন গ্রন্থ আর কারও নাম না করে অন্তত এই তিনজনের নাম করেছে। উপায় নেই, কারণ এঁরা ইতিহাসের মতো সত্য এবং এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইতিহাস বোধহয় রুক্মিণী, কেননা এমন কোনও শাস্ত্রীয় এবং মহাকাব্যিক উপাদান নেই, যেখানে ভীষ্মকাত্মজা রুক্মিণীর বিষয়ে সেই রাক্ষস বিবাহের কথা উল্লিখিত হয়নি এবং এমন কোনও শাস্ত্রীয় উপাদান নেই, যেখানে রুক্মিণী দ্বারকার পট্টমহিষী বলে স্বীকৃত নন। বিশেষত মহাভারতে রুক্মিণীর বিবাহের কারণে কৃষ্ণের শৌর্য-বিক্রমের ঘটনাটা একটা উদাহরণ হয়ে আছে। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে অর্জুন যখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের প্রতি নিজের শৌর্য-সংকেত পাঠাচ্ছেন, তখন তিনি কৃষ্ণের অপ্রতিরোধ্যতার কথা বলেছেন রুক্মিণী-হরণের উদাহরণ দিয়ে। অর্জুন বলেছেন— তিনি একটিমাত্র রথ নিয়ে বিদর্ভে গিয়েছিলেন রুক্মিণীকে তুলে আনার জন্য, সেটা তো তিনি করেইছেন, কিন্তু সেটা সমস্ত ভোজদের যুদ্ধে পরাজিত করেই রূপে-গুণে বহুখ্যাত রুক্মিণীকে নিয়ে এসেছেন দ্বারকায় এবং তাঁর গর্ভে প্রদ্যুম্নের মতো যশস্বী পুত্রের জন্ম দিয়েছেন— যো রুক্মিণীমেকরথেন ভোজান্ / উৎসাদ্য রাজ্ঞঃ সমরে সম্প্রসহ্য।

আমরা কৃষ্ণের মহিষীকুলের মধ্যে রুক্মিণীর বৈবাহিক গরিমা নিয়েও আর বেশি কথা বলতে চাই না এবং কৃষ্ণের পট্টমহিষী হিসেবে তাঁর প্রকৃষ্ট সম্মান নিয়েও আর বিশদ কোনও আলোচনা করতে চাই না। কিন্তু একটা জিজ্ঞাসা তবু থেকেই যায়। সেটা হল— কতটা আত্মিক আকর্ষণ থাকলে অথবা কতটা সামাজিক বিকর্ষণ থাকলে একজন পুরুষ একটি রাক্ষস বিবাহ করার চেষ্টা করে। একটি মেয়েকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করার মধ্যে যে অপ্রমেয় পৌরুষ আছে, সেটা সচরাচর তার নিজের ঘরের লোকেরাও পছন্দ করেন না ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বেন বলে, আর কন্যার বাড়ির লোকেরা সেটাকে নিজেদের শক্তির প্রতি চরম অপমান এবং সম্মানের প্রতি চরম অবজ্ঞা বলে মনে করেন। রুক্মিণীর বিবাহের ক্ষেত্রে ঘটনাটা রাজনৈতিক দিক থেকেও একেবারে বিরুদ্ধ জায়গায় চলে গিয়েছিল। আমরা আগেই জানিয়েছিলাম— কংসবধের পর মগধরাজ জরাসন্ধ রাজনৈতিকভাবে অধিক সক্রিয় ওঠেন কৃষ্ণের বিরুদ্ধে। বিদর্ভরাজ ভীষ্মক এবং তাঁর পুত্র যেহেতু জরাসন্ধের অনুগামিতায় রুক্মিণীকে শিশুপালের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন, সেখানে কৃষ্ণ ভেবেছিলেন— ভীষ্মক তাঁর স্ববংশীয় ভোজ-বৃষ্ণি-অন্ধকদের কাছাকাছি ঘরের লোক এবং কৃষ্ণ যদি নিজে এই বিবাহ জোর করেও করেন, তা হলেও কন্যার পিতা হিসেবে কন্যাস্নেহেই একসময় তিনি কৃষ্ণের কাছাকাছি চলে আসবেন। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। মহাভারতের রাজসূয়-পর্বের আরম্ভেই কৃষ্ণ দুঃখ করে দাদা যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার শ্বশুরমশাই ভীষ্মক-ভোজ তো কম রাজা নন। ভৌগোলিক দৃষ্টিতে তাঁর রাজ্যও যেমন অনেকটা ভূমি জুড়ে আছে, তেমনই নিজের পরাক্রমে তিনি ক্রথ- কৈশিক এবং পাণ্ড্য রাজাকেও জয় করেছেন। আমার শ্বশুরের ভাইটিও এক বিরাট যুদ্ধবীর। কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে আমার শ্বশুর একেবারে আমার উলটো দিকে ছিলেন। তিনি মাগধ জরাসন্ধের চিহ্নিত ভক্তের একজন— স ভক্তো মাগধং রাজা ভীষ্মকঃ পরবীরহা।

কৃষ্ণ যে ওই রাজনৈতিক পরিস্থিতির সমাধানটা নিজের অনুকূলে করতে চেয়েছিলেন রুক্মিণী-হরণের মাধ্যমে এবং বিবাহের মাধ্যমে, সেটা তিনি যুধিষ্ঠিরকে জানিয়েছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও তিনি জানাতে ভোলেননি যে, তাঁর এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। তিনি বলেছেন— আমি ভোজরাজ ভীষ্মকের মেয়েকে বিয়ে করে তাঁর প্রিয় আচরণই করতে চেয়েছিলাম, তার জন্য অনেক বিনীত আচরণও করেছি— প্রিয়াণ্যাচরতঃ প্রৌঢ়ান্ সদা সম্বন্ধিনস্ততঃ— কিন্তু তাঁদের অনেক ভজনা করা সত্ত্বেও, অনেক আনুকূল্যময় প্রচেষ্টা দেখানোর পরেও, তাঁরা— মানে আমার শ্বশুরকুলের লোকেরা সকলেই মাগধ জরাসন্ধের মতে চলেন এবং আমাদের সবরকম অপ্রিয় কাজগুলিই করেন— ভজতো ন ভজত্যস্মান্ অপ্রিয়েষু ব্যবস্থিতঃ।

মহাভারতে কৃষ্ণের এই মন্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, রুক্মিণীকে বিবাহ করে দ্বারকায় তাঁকে পট্টমহিষীর সম্মান দিয়েও কৃষ্ণ তাঁর শ্বশুর এবং শ্যালকের মন জয় করতে পারেননি। কিন্তু আমাদের এই বাস্তব জগতে এই ধরনের বিবাহের একটা বিশেষ তাৎপর্য তৈরি হয়। অর্থাৎ মেয়ের বাড়ির সকল অভিভাবকতার বিরুদ্ধে গিয়ে একটি মেয়েকে যখন জোর করে কোনও পুরুষ বিয়ে করে, তো তখন তার পিছনে দুটি তিনটি কারণ কাজ করে এবং তা কৃষ্ণের ক্ষেত্রেও একইভাবে কাজ করেছে বলে আমরা মনে করি। প্রথমত এমন হতে পারে ছেলেটি এবং মেয়েটি দু'জনেই দু'জনকে পছন্দ করে এবং ভালবাসে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মেয়ের বাড়ি থেকে ছেলেটিকে অযোগ্য কিংবা যে কোনও কারণে অসহনীয় ভাবলে ছেলেটি জোর করে মেয়েটিকে তুলে এনে বিয়ে করে অথবা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। কৃষ্ণ তাই করেছেন, তবে পালানোর পরিবর্তে শ্বশুর-কুলের বিরুদ্ধে তিনি ভয়ংকর পরাক্রম প্রকাশ করেছেন এবং তা ভীষণভাবেই রুক্মিণীর স্বমতে করেছেন। দ্বিতীয় কী কারণ থাকতে পারে এতখানি বিরুদ্ধতার মুখেও এমন বিয়ে করার? কারণ হতে পারে, ভীষণ রকম পছন্দ এবং ভালবাসা, যা কৃষ্ণের ক্ষেত্রে একটা জরুরি মাৎসর্য তৈরি করেছে। পরবর্তীকালে জরাসন্ধের অনুগামী শিশুপালের মুখে যে মাৎসর্য প্রকাশ পেয়েছে, বারবার তিনি বলেছেন— রুক্মিণী আমার ছিল, আমার কাছে বাগ্‌দত্তা; তাকে কৃষ্ণ ছিনিয়ে নিয়েছে— এটা কৃষ্ণ মেনে নিতেই পারেননি, বিশেষত রুক্মিণী স্বয়ংই যেখানে কৃষ্ণের দিকে ঝুঁকে রয়েছেন, সেখানে তাঁকে অন্যে কেউ জীবনসঙ্গিনী করুক, এটা যেমন রুক্মিণী চাননি, তেমনই কৃষ্ণও চাননি। যে রুক্মিণী কৃষ্ণকে পত্র লিখে জানিয়েছিলেন যে, সিংহের ভাগ যেন শেয়ালে টেনে নিয়ে না যায়— গোমায়ুবন্-মৃগপতের্বলিমম্বুজাক্ষ— সেখানে এক সুন্দরী গুণবতী রমণীর কথায় কৃষ্ণ কতটা 'ইলেটেড' ছিলেন যে, কন্যাপক্ষের সকল যূথবদ্ধ বিরুদ্ধতার মুখেও কৃষ্ণ তাঁকে হরণ করার ব্যাপারে আমোদিত বোধ করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুক্মিণীকে বিয়ে করে নিয়ে আসার পর রুক্মিণী দ্বারকাধীশ কৃষ্ণের পট্টমহিষী হলেন। যেমন তাঁর রূপ, তেমনই তাঁর গুণ, কৃষ্ণের প্রতি যেমন তাঁর অনুকূল আচরণ, তেমনই আনুগত্যময়ী তাঁর সেবাবৃত্তি। তিনি মনে মনে সদা-সর্বদা জানেন যে, তাঁর স্বামী খুব বড় মানুষ, দুনিয়ার যত রাজনৈতিক তথা হাজারও সামাজিক সমস্যা আছে, সেগুলির সমাধানের ক্ষেত্রে দুনিয়ার লোক তাঁর স্বামীকেই মুরুব্বি মানে। এমন অবস্থায় স্ত্রী হিসেবে তার অনেক দায়িত্ব এবং সে দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হবে স্বামীর ইচ্ছার অবিরোধে। বস্তুত এই যে আনুগত্যময়ী সেবার ভাবনা ভারতবর্ষের অখিল নারীকুলের আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত, এই আদর্শের প্রতীক হলেন লক্ষ্মী। রুক্মিণীর মধ্যে এই আনুগত্য এবং অনুকূলতার মাহাত্ম্য পুরোপুরি ছিল বলেই তিনি শাস্ত্রীয় ভাবনায় নারায়ণরূপী কৃষ্ণের অথবা কৃষ্ণরূপী নারায়ণের বক্ষবিহারিণী লক্ষ্মী বলে কীর্তিত হয়েছেন।

লক্ষ্মীর পৌরাণিক চিত্রটাই এমন যে, একটা ছবি আঁকলে লক্ষ্মীকে নারায়ণের পাদসংবাহনে রত অবস্থাতেই দেখা যাবে। একইভাবে রুক্মিণীও কৃষ্ণের কাছে সদা নত। কৃষ্ণ যা বলবেন, তাই তিনি বিশ্বাস করবেন। তর্ক, প্রতিবাদ, দাম্পত্য কলহ— এ সবের ধারে কাছে তিনি যেতেন না। কৃষ্ণ তাঁর স্বামী, এবং সেই স্বামী মাঝমাঝেই তাঁর কাছে আসেন, তাঁকে পট্টমহিষীর মর্যাদা দেন— এতেই রুক্মিণী এত ডগমগ হয়ে থাকেন যে, স্বামীর কাছে প্রেমিকের ভালবাসা তিনি আশাই করেন না। স্বামী চাইলে রুক্মিণী সব করতে পারেন, অন্যের কাছে অভব্য অযৌক্তিক হলেও, পারেন।

এই ব্যাপারে একটা সঠিক উদাহরণ মহাভারত থেকেই দিতে চাই। না, সেটা এইরকম কোনও উদাহরণ নয় যেখানে অপমানে-অনাদরে কেউ কাঁদছেন, আর কৃষ্ণ সেই ভক্তহৃদয় শান্ত করার জন্য রুক্মিণীকেও অনাদর করে চলে এলেন তাঁর কাছে। এ-রকমটা দ্রৌপদীর অলৌকিক আহ্বান এবং কৃষ্ণের অলৌকিক আগমনেই সংঘটিত হয়েছিল পাণ্ডবদের বনবাসকালে, সেই যে সশিষ্য দুর্বাসা এসে অসময়ে খেতে চেয়েছিলেন দ্রৌপদীর কাছে। দ্রৌপদী সংকটমোচনের জন্য প্রপন্ন হয়ে স্মরণ করলেন বিপত্তারণ কৃষ্ণকে আর কৃষ্ণও অমনই পাশে-শুয়ে থাকা রুক্মিণীকেও কিচ্ছুটি না বলে একেবারে অলৌকিক গতিতে চলে এলেন দ্রৌপদীর সংকটমোচনের জন্য— পার্শ্বস্থাং শয়নে ত্যক্ত্বা রুক্মিণীং কেশবঃ প্রভুঃ। আমরা এমন উদাহরণ দেব যা কৃষ্ণের নিজের জীবনেই ঘটছে, কিন্তু সেটাও গল্পকথা হিসেবেই আসছে মহাভারতে। কিন্তু এই কল্পকাহিনিকে প্রমাণ হিসেবে এইজন্য উল্লেখ করছি যে, এই গল্পগুলি রুক্মিণীর সতীত্ব, পাতিব্রত্য কিংবা একনিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য নয়, বরঞ্চ আনুগত্য, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রশ্নহীন আনুগত্য প্রমাণ করার জন্যই এই গল্পগুলি।

কৃষ্ণ দ্রৌপদীর সংকটমোচন করতে আসছেন, এটা তো হতেই পারে, কিন্তু পাশে শুয়ে থাকা রুক্মিণীকে একবারের তরেও তিনি জানিয়ে আসছেন না, পৌরাণিক রুক্মিণীর প্রতি এই অনাদর-তুচ্ছতা কিন্তু অপ্রাসঙ্গিকভাবে টেনে আনছেন এইজন্যই যে, রুক্মিণীকে বুঝতেই হবে— তাঁর স্বামী বৃহত্তর কার্য সাধনের জন্যই প্রয়োজনে চলে গেছেন এবং সময় খুব অল্প ছিল বলেই তাঁকে জানিয়ে যেতে পারেননি কৃষ্ণ, সেটা বুঝতে হবে এবং এটা সত্যি রুক্মিণী পরেও এ-বাবদে প্রশ্ন করবেন না। মহাভারত থেকেই আরও একটি উদাহরণ দেব,

অবশ্য সেখানেও অদ্ভুতভাবে দুর্বাসা মুনিই আছেন, যাঁকে পৌরাণিকভাবে ব্যবহার করা হয় ধৈর্য-সহ্য পরীক্ষণের চরমতা বোঝানোর জন্য। প্রসঙ্গটা তৎকালীন সমাজের ব্রাহ্মণ্যশক্তির প্রতিষ্ঠার্থে কৃষ্ণের মানসিকতা বুঝে নেওয়া। অর্থাৎ কিনা, কৃষ্ণের কথা এবং জীবন দিয়ে প্রমাণ করা যে, ব্রাহ্মণের অবহেলা যেন কখনও না হয়। তারা বকুক, মারুক, অপমান করুক, তাদের কথা বিনা বাক্যে মেনে নিতে হবে। কৃষ্ণ নিজের মুখেই গল্প বলছেন রুক্মিণীর গর্ভজাত প্রদ্যুম্নের কাছে। আমরা আপাতত রুক্মিণীকে নিয়ে ব্যস্ত আছি বলেই ব্রাহ্মণ্যের মর্যাদা কতটা প্রতিষ্ঠা হল না হল, সেটা নিয়ে আমাদের এতটুকুও মাথাব্যথা নেই। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ রুক্মিণীর প্রতি কী ব্যবহার করেছেন এবং কৃষ্ণের খাতিরে শুধু স্বামীর সহধর্মচারিণী হবার জন্য রুক্মিণী কতটা সয়েছেন, সেইজন্যই কৃষ্ণের কৃতজ্ঞতা-মুখর বক্তব্যটা আমাদের শুনতে হবে।

কৃষ্ণ জানাচ্ছেন— এক সময় দুর্বাসা মুনি দ্বারকায় এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর গায়ের রং বানরের লোমের মতো ধূসর তামাটে, পরনে কৌপীন, গালে লম্বা দাড়ি, রোগাটে গড়ন, আর ভীষণ লম্বা চেহারা, হাতে আবার বেলকাঠের বড় লাঠি। তিনি দ্বারকায় এসে হাটে-মাঠে-সভায় বলে বেড়াতে লাগলেন— এমন কেউ আছে নাকি এই জায়গায় যে আমাকে একটু থাকতে দেবে ঘরে। আমি ঋষি দুর্বাসা, কে আমাকে আদর করে রাখবে— দুর্বাসসং বাসয়েৎ কো ব্রাহ্মণং সৎকৃতং গৃহে। দুর্বাসাকে ঘরে রাখলে যে সব সমস্যা হতে পারে, সে সব অবশ্য দুর্বাসা নিজে মুখেই বলে বেড়ালেন। বললেন— হ্যাঁ, আমাকে ঘরে রাখা খুব কঠিন কাজ অবশ্য। কেননা সামান্য একটু গোলমাল হলেই দুর্বাসা মুনির রাগ হয়ে যায় এবং যে আমাকে থাকতে দেবে, তাকে সব সময়ই খেয়াল রাখতে হবে আমার যাতে রাগ না হয়। তবে এ-সব শর্ত-নিয়মের কথা শুনে কেই বা আমাকে আশ্রয় দিতে রাজি হবে— পরিভাষাঞ্চ মে শ্রুত্বা কো নু দদ্যাৎ প্রতিশ্রয়ম্।

কৃষ্ণ বলেছেন— আমি সব জেনে বুঝেই দুর্বাসাকে আমার ঘরে থাকতে দিলাম। সত্যিই তাঁকে রাখার এবং তাঁর আতিথেয়তার অনেক সমস্যা ছিল। তিনি এক-একটা সময়ে ভীষণ বেশি পরিমাণ খেয়ে ফেলতেন আবার কখনও ভীষণ কম খেতেন। কখনও খাবার পর বাইরে গেলেন হাত ধুতে, কিন্তু তারপর আর ফিরেই আসলেন না— একদা সোহল্পকং ভুঙ্ক্তে ন চৈবেতি পুনর্গৃহান্। কৃষ্ণ দুর্বাসা মুনির খামখেয়ালি স্বভাবটার কথা জানাচ্ছেন বটে, কিন্তু তার জন্য তাঁর নিজের অসহনীয়তার কথা বলছেন না। এই খামখেয়ালিপনা কতটা যে, শোয়ার ঘরে ঢুকে তিনি বিছানার চাদর লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যাবেন, দেয়ালে টাঙানো ছবি ভেঙে দেবেন, কখনও কাঁদবেন, কখনও হাসবেন কিন্তু এইসব কিছুর পিছনে কোনও কারণ যে থাকবে তার কোনও মানে নেই— অকস্মাচ্চ প্রহসতি তথাকস্মাৎ প্ররোদিতি।

দুর্বাসার এইরকম ভয়ংকর সব আচরণের মধ্যে একটি বিশেষ দিনের ঘটনা জানাচ্ছেন কৃষ্ণ। সেদিন হঠাৎই তিনি বললেন— আমার খুব পায়েস খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। এখনই ব্যবস্থা করো। দুর্বাসার চরিত্র ভালরকম জানা ছিল বলে কৃষ্ণ সুপকারকে দিয়ে প্রায় সবরকম খাবারই রাঁধিয়ে রাখতেন। ফলে সুস্বাদু সুমধুর পরমান্ন তাঁর সামনে সাজিয়ে দিতে কৃষ্ণের কোনও অসুবিধে হল না। দুর্বাসা পায়েস খেতে বসলেন, খানিকটা খেলেনও কিন্তু তারপরেই উঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকে বললেন— বাকি পায়েসের খানিকটা খুব তাড়াতাড়ি আমার সারা গায়ে মাখিয়ে দাও তো— ক্ষিপ্রমঙ্গানি লিম্পস্ব পায়সেনেতি স স্ম হ। এই আদেশ পালন করাটা আপাতদৃষ্টিতে খুব সরল-সহজ মনে হতে পারে। কিন্তু অপরিচিত একটি লোক, তার ঢ্যাঙা লম্বা রোগা চেহারা, শুষ্ক-রুক্ষ শরীর এবং সর্বোপরি সেই পুরুষের গায়ে পায়েস মাখাতে কৃষ্ণের মতো শৌখিন মানুষের কেমন লেগেছিল, তা আজকের দিনের মানুষের কল্পনাতেও নেই। আমার মনে আছে, আমার খুব ছোটবেলায় গ্রামের বুড়োদের খুব সরষের তেল মাখা অভ্যেস ছিল এবং অনেক সময়েই তাঁরা দু-চারজনে খোশ গল্প করতে করতে বাড়ির বালকদের নিয়োগ করতেন তেল মাখানোর জন্য। আমার মনে আছে— বাড়িতে আসা ওইরকম এক খটখটে বুড়োর গায়ে তেল মাখাতে আমার খুব ঘেন্না করেছিল— সে বুড়োর আবার কথা বলার সময় দন্তহীন মুখ দিয়ে নাল পড়ত। কিন্তু কথা বলা তার চাই-ই, এই অবস্থায় ওই তেল-নালের মিশ্রিত সেই মর্দন যে আমার কেমন লেগেছিল, সেটা ভাবতে এখনও আমার ঘৃণা হয়। কৃষ্ণ বলেছেন— আমি কিন্তু কোনও বিচার করিনি, আমি বিনা বাক্যে তাঁরই উচ্ছিষ্ট পায়েস তাঁর সারা গা, চুল, দাড়ি সব জায়গায় মাখিয়ে দিলাম— তেনোচ্ছিষ্টেন গাত্রাণি শিরশ্চৈবাভ্যমৃক্ষয়ম্।

এ পর্যন্তও ঠিক আছে। কৃষ্ণকে দুর্বাসা আদেশ করেছেন, তিনি তাঁর গায়ে তাঁরই ইচ্ছেমতো পায়েস মাখাচ্ছেন, তবু ঠিক আছে এই ঘটনা। কিন্তু তার পরের বার্তা আরও ভয়ঙ্কর এবং এখানে কৃষ্ণ তাঁর আত্যন্তিক অসহায়তা জ্ঞাপন করছেন ছেলে প্রদ্যুম্নের কাছে। কৃষ্ণ বললেন— জানো প্রদ্যুম্ন! আমি তো তাঁর গায়ে পায়েস মাখালাম আদেশমতো। কিন্তু হঠাৎই তাঁর নজর পড়ল একান্তে দাঁড়িয়ে থাকা তোমার জননী শুভাননা সুন্দরী রুক্মিণীর দিকে— স দদর্শ তদাভ্যাসে মাতরং তে শুভাননাম্। মুনি এবার পায়েসের বাটি হাতে এগিয়ে গেলেন রুক্মিণীর দিকে এবং মুনির ইচ্ছামতো রুক্মিণীও তাঁর সর্বাঙ্গে পায়েস মাখিয়ে দিলেন বিনা দ্বিধায় এবং বিনা বাধায়। কৃষ্ণ অসহায় মুখে দাঁড়িয়ে আছেন, এবার মুনি নিজেও পায়েস মাখছেন এমনকী রুক্মিণীকেও মাখিয়ে দিচ্ছেন মহামজায়। দুর্বাসা মুনি পায়েস নিয়ে সর্বাঙ্গে পাগলামি করছেন, অবস্থার গতিকে হতচকিতা রুক্মিণী নিজের অসহায়তায় খানিক হেসে ঘটনাটাকে যথাসম্ভব লঘু করার চেষ্টা করছিলেন— তামপি স্ময়মানাং স পায়সেনাভ্যলেপয়ৎ।

এমন কাহিনিতে ফ্রয়েড সাহেব কোন অবচেতনের তত্ত্ব স্মরণ করতেন জানি না। জানি না, সাইমন দি বিভোয়া বা আঁদ্রে দোয়ারকিন-এর কী প্রতিক্রিয়া হত অনুরূপ ঘটনায়। কিন্তু আমরা যদি এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্যে না গিয়েও শুধু সাধারণ তথ্যটুকু বিচার করি, তা হলেও বলব— রুক্মিণী এই অদ্ভুত আচরণ সহ্য করছেন শুধু স্বামীর অসহায়তার দিকে তাকিয়েই। দুর্বাসার মানসিক বিকার শুধু পায়সের অভ্যঙ্গ-লেপনেই শেষ হয়ে যায়নি। ওইরকম পায়েস লিপ্ত অবস্থায় দুর্বাসা রুক্মিণীকে একটি রথের সঙ্গে যুতে দিয়ে বললেন— রথ টানো— মুনিঃ পায়সদিগ্ধাঙ্গীং রথে তূর্ণমযোজয়ৎ। রথে ঘোড়ার বদলে রুক্মিণী— তাঁর গজগামিতার অভ্যাসে ঘোড়ার গতি আসে না, কিন্তু মুনি তাঁকে ছাড়লেন না, মুনি রুক্মিণীতেই ঘোড়সওয়ারি করতে করতে তাঁকে প্রকাশ্য রাজপথে নিয়ে গেলেন, ঘোড়ার

প্রাপ্য চাবুকও তাঁকে খেতে হল মাঝে-মাঝে। যদু-বৃষ্ণি-সঙ্ঘের লোকেরা ব্রাহ্মণের উদ্দেশে যথেচ্ছ গালাগালি দিতে লাগল। কিন্তু কৃষ্ণ কিছু বললেন না, রুক্মিণীও কিছু বললেন না।

সব কিছু অম্লানবদনে সহ্য করার ফল অবশ্যই হল। দুর্বাসা ঋষি অনেক আশীর্বাদ করলেন কৃষ্ণ এবং রুক্মিণীর ধৈর্য-সহ্য দেখে, হয়তো এতে ব্রাহ্মণকুলের মর্যাদা এবং উচ্চতাও প্রতিষ্ঠা হল, কিন্তু সবকিছুর ওপরে এখানে রুক্মিণীর মানসিকতা আমাদের ভাবনালোকে তাঁর সম্বন্ধে অন্য এক মর্যাদা তৈরি করে। মহাভারতে এই কাহিনি উল্লিখিত হয়েছে ব্রাহ্মণদের পূজ্যত্ব স্থাপনের জন্য, কিন্তু এই কাহিনি আমাদের কাছে অন্য এক তাৎপর্য বহন করে এবং সেটা স্বামীর প্রতি রুক্মিণীর মানসিকতা। বিনা প্রতিবাদে, বিনা কোনও প্রতিরোধে স্বামীর ব্যাপারে এই যে আনুকূল্য-বোধ, এটাই একটা চরম আত্মত্যাগ বা চরম সতীত্ব বলে আমরা মহিমান্বিত করতে পারি, কিন্তু জিজ্ঞাসা হয়— এই সার্বিক আত্মনিবেদনে কৃষ্ণের মতো এক রসিক শেখর বিদগ্ধ-পুরুষ সম্পূর্ণ সুখী হতে পারেন কিনা। কিংবা অনুরূপ অবস্থায় পড়লে কৃষ্ণের অন্যতরা স্ত্রী সত্যভামা অথবা জাম্ববতী এতটা নিরীহ থাকতেন কিনা!

মহাভারতে উল্লিখিত ওই পায়েস মাখামাখি এবং মাখানোর ঘটনাটা সত্য নাও হতে পারে, হতে পারে এটা শুধুই এক কাহিনিমাত্র, এমনকী রুক্মিণীর এই অসম্ভব নমনীয় স্বানুকূল ব্যবহারে কৃষ্ণও পরম চমৎকৃত হয়ে বলতে পারেন যে, এমন বশংবদ সেবালক্ষ্মী আর দ্বিতীয় নেই দুনিয়ায়— এবং হয়তো সেটাই এই কাহিনির ব্যঞ্জনা। কিন্তু তবুও এই সার্বক্ষণিক বশংবদতা, প্রহ্বতা এবং অনুকূলতা কৃষ্ণের মতো বিদগ্ধ পুরুষের মনোহরণ করে কিনা, সেটা ভাবার আছে। হয়তো এখানে প্রেম-ভালবাসা এবং কামনার ব্যাপারে চিরন্তন পুরুষের যৌন-মানসও ভীষণভাবে চিন্তনীয়। কেননা স্বভাবতই বহুকামী পুরুষ যদি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে তার যৌনতার জায়গা সীমাবদ্ধ হয়ে যায় বলেই একটিমাত্র স্ত্রীর মধ্যেই সে যৌনতার বহুতর আস্বাদন লাভ করার চেষ্টা করে। কিন্তু খুব অনুভবযোগ্য প্রণিধানে একথা বুঝতে হবে যে, যৌনতা কিন্তু শুধুমাত্র স্ত্রী-পুরুষের মৈথুনের উপাদানেই একমাত্র গঠিত হয় না, বিষয়ত মৈথুনের ব্যাপারে পুরুষের কামনাই যেহেতু বহুশ্রুত এবং প্রথিত, অতএব তা প্রশমিত করার একমাত্র উপায় বারংবার ইচ্ছামাত্রিক যৌন মিলনও নয়। ঠিক এইখানেই পথ করে নেয় রমণীর কথা, রমণীর বামতা এবং মিলন-চেষ্টা-রহিত শারীরিক বিভঙ্গ। বস্তুত এগুলিও যৌনতারই অবচ্ছায়া বটে, কিন্তু পণ্ডিতরা এটাকে বলেছেন sizzle— এই 'সিজল'টা নাকি প্রেম-ভালবাসায় জীবনটা চালনার ক্ষেত্রে একান্ত জরুরি।

আমরা বলেছিলাম— রুক্মিণী এত পতিব্রতা, এত বশম্বদ, প্রিয়তম স্বামীর গর্বে তিনি এতটাই মুগ্ধ যে, বিবাহোত্তর জীবনে তাঁর মধ্যে এই মহতী তৃপ্তি যেন এক প্রকার স্থবিরতা সৃষ্টি করে। সসম্ভ্রমে জানাই, এই স্থবিরতা কোনও অন্যায় নয়, বরঞ্চ সেটা চরমতম এক সাধুতা, কিন্তু চরম সাধুতার মধ্যে তো এক চরম স্থবিরতা আছেই, যা বৈবাহিক জীবনে স্বামীর দিক থেকে স্বাধিকারের অথবা স্ত্রীর ওপর স্বাধিকারের তৃপ্তি দেয় বটে, কিন্তু সেটাকে প্রেম বলাটা রসশাস্ত্রীয় মতে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। প্রাচীনকালেই এক মহাকবি লিখেছিলেন— একেবারেই নিজের অধীন এক অতি-অনুকূলা নিজের ঘরণীকে আলিঙ্গন করে যে শুয়ে থাকা, এটাকে কি প্রেম বলে? এটা এক ধরনের গৃহস্থ আশ্রমের ব্রতপালন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলা চলে, যা আমরা সকলেই কষ্টে-সৃষ্টে পালন করি— তৎ কিং প্রেম গৃহাশ্রমব্রতমিদং কষ্টং সমাচর্য্যতে। এই কবি অবশ্য সেই বিবাহ-পূর্ব রোমাঞ্চক জীবনে ফিরে যেতে চেয়েছেন, যেখানে চাঁদের জ্যোৎস্না-ধোয়া অভিসার আছে, সংকেত-স্থানের নিশানা দেবার জন্য দূতী আছে, আছে উতল হাওয়া, আর যমুনার জল।

কিন্তু আমাদের কৃষ্ণ এই পূর্বোক্ত প্রেমিক পুরুষের মতো বাস্তববোধহীন মানুষ নন, বরঞ্চ বাস্তবকে তিনি রোম্যান্টিক করে নিতে জানেন। রুক্মিণী নিতান্ত স্বানুকূলা গৃহবধূ বলে তিনি আবার বৃন্দাবনে বিনোদিনী রাইকিশোরীর কাছে ফিরে যাবেন, এমন অধার্মিক তো তিনি নন। বরঞ্চ বিবাহিত জীবনের বাস্তবে রুক্মিণী কী ছিলেন এবং তিনি কী হইয়াছেন, সেটা স্বয়ং রুক্মিণীকেই বুঝিয়ে দিতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হননি। তিনি আরও যেন কী চান এই প্রিয়তমা পট্টমহিষীটির মধ্যে— যিনি এককালে অমন মধুর একটা প্রেমপত্র লিখে নিজেকে হরণ করতে বলেছিলেন, সেই রুক্মিণী আজ পাতিব্রত্যের বন্ধনে এমনই নম্র-কম্প্র এবং আবর্জিত হয়ে রইলেন যে, এককালের নারীহরণ-করা রোমাঞ্চকর কৃষ্ণের বুকে সেটা কাঁটার মতো বেঁধে। এই নম্রতা, বশংবদতার ওপরে কৃষ্ণ আরও কী চান এই প্রথমা বধূটির কাছে, কৃষ্ণ তা লুকোননি। তবে সে খবর মহাভারতে নেই, তা আছে ভাগবত পুরাণে এবং সেটা মহাভারতের রুক্মিণী-ভাবনা প্রতিপূরণ করে।

সেদিন রুক্মিণীর ঘরেই ধবধবে পরিষ্কার বিছানায় বসে ছিলেন কৃষ্ণ। আজ রুক্মিণীও দারুণ সেজে কৃষ্ণকে হাওয়া করছিলেন চামর দুলিয়ে। কৃষ্ণ মনে মনে একটু লজ্জিতও হচ্ছিলেন বোধহয়— সত্যি, তাঁকে কী ভালই না বাসে এই সরলা রুক্মিণী। কৃষ্ণ ছাড়া তাঁর যেন আর দ্বিতীয় কোনও গতি নেই। এমন সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণের কাছে তাঁর এত দীনতা নির্ভরতা কেন— তাং রূপিনীং শ্রিয়ম্ অনন্যগতিং নিরীক্ষ্য? কৃষ্ণের ইচ্ছার ওপর যাঁর এত নির্ভরতা, কৃষ্ণ ইচ্ছে করেই তাঁকে কাঁদাতে চাইলেন। কাঁদিতে কাঁদাতে কত সুখ!

কৃষ্ণ বললেন— হ্যাঁগো রুক্মিণী। রাজার ঘরের মেয়ে তুমি। কত শত গুণী, মানী এবং ধনী রাজারা তোমাকে পেতে চেয়েছিল আদর করে। তোমার বাপ-ভাইরাও চেয়েছিলেন তোমাকে ওইরকম বড় ঘরেই পাত্রস্থ করতে। কিন্তু তুমি কী করলে? ঘরের দুয়োরে-আসা তোমার প্রেম-ভিখারি শিশুপালের মতো একটা দুর্দম রাজাকে বাদ দিয়ে তুমি কিনা আমাকেই স্বামী হিসেবে বেছে নিলে? আর আমাকে তো এতদিন দেখছ! জরাসন্ধের মতো রাজাদের ভয়ে এই সমুদ্রগর্ভে দ্বারকায় লুকিয়ে আছি, সিংহাসনে বসে রাজা হওয়াও আর আমার হল না— প্রায়স্ত্যক্তনৃপাসনান্। কৃষ্ণ আরও দীনতা প্রকাশ করে রুক্মিণীকে বললেন— আমি জানতাম, সমানে সমানে বিয়ে হয়। রূপ বলো, ঐশ্বর্য বলো, বংশ বলো— বন্ধুত্ব আর বিয়ে প্রায় হয় সমানে সমানে। আর তুমি বৈদর্ভী— কথাটার মধ্যে বিদগ্ধা রমণীর ব্যঞ্জনা আছে— তুমি কিনা কিচ্ছুটি না ভেবে আমার মতো গুণ-মানহীন এমন একটা লোককে পছন্দ করে বসলে, যার নাম করে শুধু ভিখারিরা— বৃতা বয়ং গুণৈ হীনা ভিক্ষুভিঃ শ্লাঘিতা মুধা— এমনকী ভিখারিরাও যারা কৃষ্ণ নাম করে দিন-রাত গলা ফাটাচ্ছে, তাদেরও যে আমি কিছু দিতে পারি, তাও নয়।

কৃষ্ণ চেয়েছিলেন রুক্মিণীর বিকার হোক, প্রতিক্রিয়া হোক। ফুলে উঠুক মানিনীর

অধরোষ্ঠ, কঠিন হোক ভ্রূযুগল, রক্তলাল হয়ে উঠুক বৈদর্ভী রমণীর অপাঙ্গ দৃষ্টি। ভাগবতের অসামান্য টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পর্যন্ত বুঝেছিলেন কৃষ্ণ কী চাইছেন রুক্মিণীর কাছে। তিনি লিখেছেন— স্বামীর কর্তব্যে গম্ভীরা, সদা প্রিয়ভাষিণী রুক্মিণীর মুখে রোষ-ভাষের মধুটুকু কেমন লাগে, সেটার জন্য কৃষ্ণ অমনিধারা কথা কইতে আরম্ভ করেছিলেন— অসম্ভাবিতমানায়াঃ পরমগম্ভীরায়াঃ প্রিয়ংবদায়াঃ রোষোক্তিমাধ্বীকং কথমহং লভেয় ইতি।

কিন্তু হল না। রুক্মিণী মান করা জানেন না। বিকার একটা হল বটে, তবে সেটা মধ্যযুগীয় পতিব্রতা রমণীর গড্ডলিক-বিকার যা হয়ে থাকে, সেই বিকার হল মাথা নিচু করে পায়ের নখ দিয়ে প্রথমে তিনি মাটি খুঁড়তে লাগলেন, কাজল-মাখা চক্ষুর জলে স্তনভূষা কুমকুম-রাগ ধুয়ে গেল, গলা দিয়ে আর স্বর বেরোল না— তস্থাবধোমুখ্যতিদুঃখরুদ্ধবাক্। এই গেল প্রথম প্রতিক্রিয়া। রুক্মিণী ভাবলেন— স্বামীর বুঝি আর তাঁকে মনে ধরছে না। কৃষ্ণ বোধহয় ছেড়ে দেবেন তাঁকে। এ সব কথা ভাবামাত্র বালা সোনার চামর খুলে পড়ে গেল তাঁর হাত থেকে। বুদ্ধি কোনও কাজ করল না। চোখে আঁধার দেখে আলুলায়িতকেশে তিনি মাটিতে পড়ে মুচ্ছো গেলেন।

কী চেয়েছিলেন কৃষ্ণ, আর কী হল? কৃষ্ণ পরম স্নেহে মাটিতে শোয়া নতনম্রা বধূটিকে উঠিয়ে এলো চুল গুছিয়ে বেঁধে দিলেন, কোমল স্পর্শে চোখের জল দিলেন মুছিয়ে— কেশান্ সমুহ্য তদ্‌বক্ত্রং প্রামৃজৎ পদ্মপাণিনা। মনে মনে আহতা একব্রতা মহিষীকে জড়িয়ে ধরে কৃষ্ণ রুক্মিণীকে বললেন— বৈদর্ভী, বিদর্ভ রাজনন্দিনী।

বার বার আমি বলে যাচ্ছি— 'বৈদর্ভী' সম্বোধনটার মধ্যে নাকি ব্যঞ্জনা আছে। আগে তো বলেইছি— বিদর্ভ দেশের 'কালচার' সেকালে এমন ছিল যে, সেখানকার মেয়েদের বৈদগ্ধীর ঘরানা ছিল আলাদা। আর কীসের ব্যঞ্জনা? আছে একটা, সভয়ে বলি। মহাকাব্যের নল-দময়ন্তীর কথা নিয়ে মহাকবি শ্রীহর্ষ নৈষধচরিত লিখেছিলেন। দময়ন্তীর কথা তুললাম এই জন্যে যে, তিনিও রুক্মিণীর মতো বিদর্ভ দেশের মেয়ে। শুধু তাই নয়, যে কুণ্ডিনপুর রুক্মিণীর বাপের বাড়ি দময়ন্তীর বাপের বাড়িও সেইখানেই। কিন্তু দময়ন্তীর রূপের সঙ্গে বুদ্ধি এবং কথা বলার বৈদগ্ধী এত বেশি ছিল যে, নৈষধের লেখনিতে নল দময়ন্তীর সামনেই পঞ্চমুখ প্রশংসা করে বলেছিলেন— এ তুমি কেমন করে কথা বলছ? এ কী আমায় তুমি নিষেধ করছ, নাকি বিধান দিচ্ছ— আমি তো কিছু বুঝতেই পারছি না। অবশ্য কথার সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ, বক্রোক্তি, এ শুধু তোমাকেই মানায়। শুনেছি— আলংকারিকেরা যে ব্যঞ্জনার মাধুর্যের কথা অত করে বলেন, সেই ব্যঞ্জনার আকর হল গিয়ে তোমাদের মতো বিদগ্ধা রমণীদের বাক্যবিন্যাস— বিদগ্ধ-নারী-বচনং তদাকরঃ।

বৈদর্ভী রুক্মিণীর কাছেও কৃষ্ণ এই বাক্যবিন্যাস, এই বিদগ্ধতা আশা করেছিলেন। রুক্মিণীর কাণ্ড দেখে কৃষ্ণ তাই বিব্রত হয়ে সম্বোধন করে বললেন— বৈদর্ভী! অর্থাৎ— তুমি না বিদর্ভ দেশের মেয়ে! তুমি কি পরিহাসও বোঝো না? আমি শুধু আমার কথার পিঠে তোমার উলটো পরিহাস শুনতে চেয়েছিলাম, তাই অমন মজা করে কথাটা বলেছি— তদবচঃ শ্রোতুকামেন ক্ষ্বেল্যাচরিতম্ অঙ্গনে। আমি দময়ন্তীর উদাহরণে বলেছি— কৃষ্ণ রুক্মিণীর কাছে বিদর্ভের বৈদগ্ধী আশা করেছিলেন। কিন্তু রুক্মিণীর প্রতিক্রিয়া আনতা গৃহবধূটির মতো হওয়ায় তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষমা চেয়ে বলেছেন— আমি জানি, তুমি আমাকে ছাড়া আর কিছুই জানো না। কিন্তু নির্মম পরিহাসের উত্তরে আমি নির্মম কথাই শুনতে চেয়েছিলাম— তদবচঃ শ্রোতুকামেন। আমি দেখতে চেয়েছিলাম— কেমন করে এই প্রেমনত মুখে ফুটে ওঠে মানিনীর সর্বস্ব-ধন প্রণয়ের অভিমান, কেমন করে স্ফুরিত হয়ে ওঠে তোমার ঠোঁট, কেমনে নয়নপ্রান্ত হয় অরুণিত— কটাক্ষেপারুণাপাঙ্গং সুন্দর ভ্রুকুটীতটম্। কৃষ্ণ এবার সাধারণ গৃহস্থের দিন-যাপন আর প্রাণ ধারণের একঘেঁয়েমির কথা তুলে শেষ কথাটা বললেন পাকা নাগরিকের মতো। বললেন— বোকা মেয়ে কোথাকার! প্রণয়িণী প্রিয়ার সঙ্গে পরিহাস-নর্মে দিন কাটাবে বলেই না লোকে বিয়ে করে, ঘর বাঁধে। এটুকু নইলে তার আর কী থাকে বলো। যন্নর্মৈ নীর্য়তে যামঃ প্রিয়য়া ভীরু ভামিনি।

বৈদর্ভী রুক্মিণী হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন— কৃষ্ণ তা হলে তাঁকে ছাড়ার কথা ভাবছেন না, তিনি তা হলে এখনও তাঁকে ভালবাসেন। রুক্মিণী বুঝলেন না— নাগরিক পুরুষের কাছে এ কত বড় পীড়া যে, পরিহাস করে বলে দিতে হয়— এটা পরিহাস। কৃষ্ণ তাঁরই আছেন— এই অস্তিত্বের গরিমাটুকুই তাঁর কাছে এত বড় যে, কৃষ্ণ যেই বললেন— ভয় নেই ভীরু, তোমার সঙ্গে মজা করছিলাম— সঙ্গে সঙ্গে রুক্মিণী খুশি, যাক, তা হলে ভাবনার কিছু নেই— জ্ঞাত্বা তৎ পরিহাসোক্তিং পরিত্যাগভয়ং জহৌ। সঙ্গে সঙ্গে রুক্মিণীর মুখে হাসি ফুটল, সেই লজ্জা-লজ্জা ভাব, সেই স্নিগ্ধ দৃষ্টি ফুটে উঠল তাঁর চলনে-বলনে। শুধু তাই নয়, কৃষ্ণ পরিহাস করে যা যা বলেছিলেন, সেই সমস্ত কথার সগম্ভীর তাত্ত্বিক প্রত্যুত্তর দিয়ে রুক্মিণী বললেন— কোথায় তুমি আর কোথায় আমি! সৌন্দর্য্য বলো বুদ্ধি বলো, ঐশ্বর্য বলো সবতাতেই তুমি হলে আমার কাছে ভগবানের মতো। সেই তুমি কোথায়, আর বোকা লোকেরা পায়ে ধরে সেই সাধারণী রমণী আমি কোথায়— ক্বাহং গুণ-প্রকৃতিরজ্ঞগৃহীতপাদা।

বস্তুত বিবাহ-পরবর্তী জীবনে রুক্মিণীর মধ্যে এই যে সার্বিক স্বামী-নির্ভরতা এবং স্বামী-মনস্কতা দেখতে পাই— এটার একটা কারণ যেমন প্রাচীন ভারতবর্ষের শাস্ত্রভূমি থেকে উঠে আসতে পারে, তেমনই শাস্ত্রীয় আচার আচরণ পরম্পরাবাহিত হতে হতে সেটা সংস্কার এবং সাংস্কারিক বিশ্বাসও তৈরি করে ফেলতে পারে। রুক্মিণীর ক্ষেত্রে এটা তো আছেই, আবার এমনও হতে পারে যে, তাঁর স্বভাবের মধ্যেই এই পরম নির্ভরতার বীজ ছিল, ফলে একবার প্রাণপাতী উদ্যোগ নিয়ে তিনি কোনও মতে সেই স্বামীর রথে উঠে পড়েছিলেন মাত্র। কিন্তু তারপর থেকে তিনি নিজেকে একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন কৃষ্ণের কাছে তাঁকে প্রকৃষ্টরূপে বহন করার জন্য। এই বহনের মধ্যে স্ত্রীর আত্মনিবেদন তাঁর সমর্পণ, তাঁর বশংবদতা এবং স্বামীর জন্য তাঁর সার্বক্ষণিক তৎপরতা থাকতে পারে, কিন্তু এই ধরনের বহন এমনই এক সার্বিক বন্ধনের সৃষ্টি করে যে, তাতে স্বামীদেবতার মনের মধ্যে এক প্রকার হাঁস-ফাঁস অবস্থা তৈরি হয়। অনেক পুরুষ অবশ্য এই ব্যবহারে পরম পুলকিত থাকেন, কেননা এতে পুরুষের স্বাধিকার-বৃত্তি সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয়, অন্তত একটি রমণীর মধ্যে তার স্বেচ্ছাধীন যৌনতাও তৃপ্ত হয়, এবং প্রতিষ্ঠিত হয় পারিবারিক সুখ। কিন্তু ঠিক এই ধরনের সুখে বিদগ্ধ পুরুষের সুখ সম্পন্ন হয় কিনা, এমনকী কোনও বিদগ্ধা রমণীও শুধু এই

ধরনের সুখই বিতরণ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারেন কিনা, সেটা যেমন এতকালের কাব্য-সাহিত্যের প্রমাণে বিচার্য হয়ে ওঠে, তেমনই সেটা প্রমাণ-যোগ্য হয়ে ওঠে জীবনে, মানুষের জীবনে।

আমরা গড্ডলিক মানুষের জীবনপ্রবাহ নিয়ে তো এখানে মাথা ঘামাচ্ছি না, এমনকী বহুকামিতার সুযোগ না থাকায় অনেক বুদ্ধিমান পণ্ডিতও স্ত্রীর কাছে একদিকে যেমন দাসীভাব আশা করেন, তেমনই রতিক্রীড়ার সময় তাঁর মধ্যে বেশ্যাসুলভ আচরণও কামনা করেন, আর খাবার সময় হলে সেই নারী হয়ে উঠবেন জননীর মতো— কার্যে দাসী রতৌ বেশ্যা ভোজনে জননীসমা। কিন্তু কৃষ্ণ তো কোনও সাধারণ গড্ডলিক পুরুষ নন, তাঁর মতো বিদগ্ধ ললিত পুরুষ ক'জন আছেন এই দুনিয়ায়? বস্তুত তিনি রুক্মিণীর কাছে দাসীবৎ আচরণও আশা করেন না, প্রচুর রতিভোগও কামনা করেন না, তাঁকে অনুগত রাখার জন্য কোনও বলপ্রয়োগও করেন না। তা হলে কী অসুবিধে হল? অসুবিধেটা আসলে সেই বৈবাহিক শাশ্বতিকতার মধ্যেই যেখানে পথ চলতে-চলতে পুরুষ রমণী দুই পক্ষেরই কিছু সাংবিধানিক স্থবিরতা আসে, যেখানে প্রতিপদেই সহজলভ্যতা জীবনের সমস্ত নূতনত্বকেও প্রাত্যহিকতায় পরিণত করে। এরই মধ্যে যে রমণী অথবা যে পুরুষ নিজেকে তখনও 'ইনটারেস্টিং' তখনও মোহময় অথচ তখনও নাব্য করে রাখতে পারেন বাক্য এবং মনোময়তায়, তিনি থেকে যান। রুক্মিণী শুধু লক্ষ্মী হয়েই রইলেন কৃষ্ণের কাছে, নিবেদিতপ্রাণা চিরন্তনী।

হায় কৃষ্ণ! তোমার অন্তঃপুরের বৈদর্ভী-রীতিতে তোমার মন ভরল না। কিন্তু যে প্রণয়, মানিনীর যে অভিমান ঠোঁট ফোলা, অরুণ অপাঙ্গ— এত যা সব তুমি দেখতে চেয়েছিলে প্রিয়তমার মধ্যে, তা তুমি রুক্মিণীর মধ্যেও পাওনি, জাম্ববতীর মধ্যেও পাওনি, কিন্তু যার কাছে পেয়েছিলে, সে তো তোমার অতি পরিচিতা দ্বারকারই মেয়ে। সত্যভামা। তাঁকে দিয়ে তুমি পুণ্যক ব্রত করাতে পারোনি, দুর্বাসার পায়েস তাঁর গায়ে মাখাতে পারেনি, মাননীয় অতিথির চাবুক তাঁর পিঠে পড়েনি, উলটে তাঁর মানের জ্বালায় দিন-রাত্রি তোমার পাগল-পাগল লেগেছে, তবু এটা ঠিক যে, এমনতর এক বিষামৃত-মিলনের জন্যই বুঝি লোকে বিয়ে করে ঘর বাঁধে, এমনতর সুখের মতো ব্যথার জন্যই বুঝি ঘর-গেরস্তির আনন্দ, আর বেশি কীই বা আছে— অয়ং হি পরমো লাভো গৃহেষু গৃহমেধিনাম্।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যভামা

সেবারে দক্ষিণ-এশিয়ার সুবর্ণভূমিতে যেতে হয়েছিল একটি বিদ্বৎসভায় বক্তৃতা দেবার নেমন্তন্নে। বক্তাদের মধ্যে সেখানে দেশ-বিদেশের অনেক বিশিষ্ট নাম ছিল এবং তাঁদের মধ্যেও অনবদ্যা হওয়ার জন্য তখন তিনি বহুশ্রুত এবং 'ফেমিনিজম' ছাড়াও আরও বেশ কিছু ব্যাপারে তিনি জড়িয়ে আছেন বলেই সেই বিদ্বৎসভায় তিনি যেমন অন্যতম এক বক্তা হয়ে এসেছিলেন, তেমনি আরও একটা বড় কারণে তাঁকে সেই বিদ্বৎসভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং সেটা ছিল সভার অন্যতম আকর্ষণ-বিন্দু— বিদ্বৎসভার শেষে তাঁর নৃত্য-পরিবেশন করার কথা ছিল। আমি আগে মল্লিকাকে পিটার ব্রুকে দেখেছি, কিন্তু এমন প্রাত্যহিকতার মধ্যে কখনও দেখিনি। একই হোটেলে তিন-চারদিন আছি, এখানে-ওখানে, খাবার টেবিলে, 'চত্বরেষু সভাসু চ' তাঁর সঙ্গেই দেখা হচ্ছে এবং কেন জানি না, প্রথম দিনের একটা সন্ধ্যাকালীন আড্ডার পর তাঁর সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

খুব কাছ থেকে কখনও ভূষিত, কখনও অভূষিত একেবারে দৈনন্দিনভাবে তাঁকে দেখছিলাম, বিচিত্র বিষয়ে কথা বলছিলাম, রামায়ণের রাম থেকে মহাভারতের দ্রৌপদী নিয়েও কথা হচ্ছিল, কিন্তু সভার শেষে তাঁর নৃত্য-পরিবেশনের বিষয়টি তখনও আমাদের কাছে অঘোষিত ছিল। তখন সুবর্ণভূমিতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, বিদ্বৎসভার বক্তা-শ্রোতা ছাড়াও শহরের আরও বেশ কিছু গণ্যমান্য মানুষ উপস্থিত হয়েছেন মল্লিকার নাচ দেখার জন্য। আমি দর্শকাসনে বসেছিলাম। একজন মহিলা এসে আমাকে জানালেন, মল্লিকা ডাকছেন আপনাকে। তাঁর সঙ্গে যেতে মেক-আপ রুমের বাইরে এসে দাঁড়ালেন মল্লিকা, তাঁর নৃত্যসজ্জা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ চেহারায় মাদক-সুন্দর লাগছিল তাঁকে অথচ তিনি প্রথাগতভাবে সেই অর্থে ভয়ংকর সুন্দরী নন, কিন্তু চেহারার মধ্যে ওই চাঁছা-ছোলা ভাব, ভয়ংকর রকমের ব্যক্তিত্ব এবং only the nose and eyes— একজন বলেছিল সেইরকম— সব মিলিয়ে এটাই বোঝা যাচ্ছিল যে সৌন্দর্য্য মানে দৈহিক সৌন্দর্য্য ছাড়াও আরও বেশি কিছু। মল্লিকা আমাকে দেখে বললেন, I am Satyabhama!

সামান্য কথার পরেই আমি দর্শকাসনে ফিরে এসেছি। কিন্তু কী বলব, আমার সহৃদয় পাঠককুল! সেই ধ্বনি পবনে বহিল। কথাটা বারবার ধ্রুবপদের মতো ফিরে এসেছে মল্লিকার নৃত্যপরিবেশনের মধ্যে। তিনি পৌরাণিক পারিজাত-হরণের বিষয়টি বেছে নিয়েছিলেন নাচের জন্য— সেই যে সেই অদ্ভুত বিষয়টা— নারদমুনি সুরলোক থেকে নেমে এসে স্বর্গের নন্দনকাননে ফোটা একটি পারিজাত ফুল দিয়েছেন কৃষ্ণের হাতে, কৃষ্ণ সেটা সপ্রণয়ে পট্টমহিষী রুক্মিণীর হাতে দিয়েছেন এবং নারদ নিজেই গিয়ে সেই খবর দিয়েছেন

কৃষ্ণের অন্যতরা মহিষী সত্যভামাকে। সত্যভামার রাগ হয়েছে, কৃষ্ণ তাঁর মান ভাঙাচ্ছেন। এই মান ভাঙানোর পালার মধ্যে কৃষ্ণ-সত্যভামার সংলাপ আছে, গান আছে সংস্কৃতের শ্লোক ভাষায়। মল্লিকা সেগুলি ইংরেজি অনুবাদ করে দিয়েছেন এবং তা টেপ-রেকর্ডারে যথোপযুক্তভাবে বাজছিল, আর মল্লিকা 'লিপ্' মেলাচ্ছিলেন চিরাচরিত অভ্যস্ততায়। সংস্কৃত শ্লোক ছাড়াও ভোজপুরী-হিন্দিতে ক্ল্যাসিক্যাল গানের কথকতা ভেসে আসছিল সত্যভামার জবানিতে। কৃষ্ণ এটা-সেটা বলে নানা ওজর-অজুহাত দিয়ে সত্যভামার মান ভাঙানোর চেষ্টা করছেন এবং কৃষ্ণের কথারম্ভেই সত্যভামা চলে যাচ্ছেন স্টেজের পিছন দিকে এবং তাঁর কথা শেষ হতেই নৃত্যের তালে তালে সত্যভামা স্টেজের সামনের দিকে এগিয়ে আসছেন এবং কৃষ্ণের ওজর-অজুহাত যুক্তি দিয়ে কাটার আগেই দু' হাত কোমরে দিয়ে দৃঢ় ব্যক্তিত্বে, শাণিত অপাঙ্গ-সম্পাতে কৃষ্ণের দিকে তাকাচ্ছেন এবং বলছেন— আমি সত্যভামা— I am Satyabhama.

সেই পূর্ণালোকিত রঙ্গমঞ্চের মধ্যে বারংবার কৃষ্ণের নির্দিষ্ট বক্তব্য শোনার পরই পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত সেই রমণীয় ব্যক্তিত্বের ঝনৎকার—I am Satyabhama— মল্লিকা তাঁর পদন্যাস আর সাপাঙ্গ-মুখভঙ্গিতে সত্যভামাকে যেন স্বরূপে প্রকট করে তুলেছিলেন— সমস্ত কিছু ছাপিয়ে, আলো গান-সাজ সব ছাপিয়ে শুধু সেই অন্তহীন শব্দ— I am Satyabhama— এখনও আমার কানে বাজে। পরবর্তীকালে অনেক তাৎক্ষণিক কথা পারস্পরিক প্রতিজ্ঞা থাকলেও মল্লিকার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি, সুবর্ণদ্বীপের দৈনন্দিন কথালাপও অনেক ভুলে গেছি, কিন্তু সেই সন্ধ্যার পারিজাত-হরণ বৃত্তান্তে প্রথমাবধি শেষ শব্দের মধ্যে ওই একটি পঙ্ক্তি যেভাবে, যে ক্ষণে scripting করেছিলেন মল্লিকা, যে ঠাটে তিনি দাঁড়িয়ে স্থির বলছিলেন সে-কথাটা, সেটাই এতদিন ধরে বুঝেছি, সেটাই সত্যভামা-চরিত্রের ওপর আলোকপাতের রক্তবিন্দু— I am Satyabhama— যেন সবকিছু ছাপিয়ে খেয়াল করতে হবে তাঁকেই, কেননা তিনি রুক্মিণী নন যে, কৃষ্ণ যা বোঝাবেন তাই তিনি মেনে নেবেন, কেননা তিনি জাম্ববতীও নন যে, কৃষ্ণের অন্তঃপুরমহিষীদের মধ্যে গণ্যা হয়েছেন বলেই তিনি ধন্যা হবেন। তাঁর মতো রমণীর সঙ্গে কথা বলতে হলে কৃষ্ণের মতো নায়ক-পুরুষকেও সতর্ক হয়ে কথা বলতে হবে, কেননা তিনি সত্যভামা— I am Satyabhama— সত্যভামার অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে, কথায়, মনে রমণীর সেই সর্বাশ্লেষী অহংকার জড়িয়ে আছে— তিনি সত্যভামা।

সত্যভামার জীবন বহুবর্ণময় এবং ঘটনাবহুল, হয়তো বা এতসব ঘটনাই তাঁর ব্যক্তিত্ব তৈরি করেছে। যেখানে তিনি জন্মেছেন, সেখানকার রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশ, তাঁর নিজের পারিবারিক জীবন এবং যে সময়ে কমলকলির মতো তাঁর শরীর-মন একসঙ্গে ফুটে উঠছে, সেই সময়ে অতি অল্পবয়সি যুবা থেকে প্রৌঢ় পুরুষের সপ্রণয় তথা নিতান্ত বৈষয়িক দৃষ্টিপাত তাঁকে অন্যতর এক তির্যক রমণীয়তায় প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং হয়তো খুব বিপ্রতীপ ঘটনার মধ্য দিয়েই এই রমণীয়তা সম্পন্ন হয়েছে। প্রথমে বোধহয় রাজনৈতিক-প্রশাসনিক অবস্থানটাই বুঝে নেওয়া দরকার, কেননা তাতে সত্যভামার সামাজিক অবস্থানটুকুও পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমরা আগেও বলেছি যে, কৃষ্ণ যেখানে জন্মেছিলেন অথবা যেখানে তাঁর বাপ-পিতামহ, জ্ঞাতিগুষ্টি সকলে যে রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় হয়েছেন সেখানে রাজার শাসন চলত না। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে কাশী-কাঞ্চী-অবন্তীতে যখন রাজতান্ত্রিক শাসন চলছে, তখন মথুরা-শূরসেন অঞ্চলে এক ধরনের 'অলিগার্কিক্যাল' শাসন চলত, যেটাকে স্বয়ং কৌটিল্য বলেছেন 'সঙ্ঘ' শাসন, ইংরেজিতে সহজে বললে corporation. কৌটিল্য যাঁর নামের সঙ্গে 'সঙ্ঘ' শব্দটি জুড়ে আমাদের তৎকালীন ইতিহাসের সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন তিনি হলেন কৃষ্ণের বৃদ্ধ প্রপিতামহ বৃষ্ণি। বৃষ্ণির বংশধারাতেই কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল।

আমরা সেকথায় পরে আসছি, প্রথমে বোধহয় এটাই জানানো দরকার যে, মথুরা-শূরসেন অঞ্চলে এবং পরবর্তীকালে দ্বারকায় যদু-বৃষ্ণিদের শাখা-প্রশাখা, জ্ঞাতিগুষ্টির নামে অনেগুলি সঙ্ঘ ছিল এবং সেইসব সঙ্ঘমুখ্যরাই একত্রে মথুরা-দ্বারকার শাসন চালাতেন প্রায় গণতান্ত্রিকভাবেই। সত্যভামার প্রসঙ্গে যাবার আগেই আমাদের এই জ্ঞাতি-গুষ্টি সঙ্ঘমুখ্যদের পরিচয় খানিক দিয়ে নিতে হচ্ছে— কারণ, সত্যভামার মতো এক রমণীয় সত্যকে ঐতিহাসিকতায় প্রতিষ্ঠা করতে গেলে এই পারিবারিক পরিচয় নিতান্তই জরুরি। মহারাজ যযাতির প্রথম পুত্র যদুর ছেলে হল ক্রোষ্টু বা ক্রোষ্টা। ক্রোষ্টু দুটি বিবাহ করেছিলেন। তাঁদের নাম গান্ধারী এবং মাদ্রী; প্রথমা গান্ধার রাজ্যের মেয়ে, সেইজন্যই এই নাম, দ্বিতীয়া মদ্রভূমির, তাই মাদ্রী। গান্ধারীর একমাত্র পুত্রের নাম সুমিত্র, কেউ কেউ তাঁকে অনমিত্র বলেও ডেকেছেন, যদিও নামের অর্থ তাতে বদলায় না। আমাদের প্রস্তাবিত সত্যভামা এই বংশেই জন্মেছেন, তাঁর পিতার নাম সত্রাজিৎ এবং তাঁর জ্যাঠা সত্রাজিতের বড় ভাই প্রসেন। সত্যভামার বৈবাহিক প্রসঙ্গে তাঁর বাপ-জ্যাঠা দু'জনকেই আমাদের বিশেষ প্রয়োজন হবে— কেননা দু'জনেই সেই কালের দিনে আজকের দিনের মতো জঘন্য কারণে খুন হয়েছিলেন। প্রসেন এবং সত্রাজিৎ বৃষ্ণির প্রথমা স্ত্রীর গর্ভধারায় অধস্তন পুরুষ হলেও বিখ্যাত বৃষ্ণির নামেই তাঁরা পরিচিত ছিলেন।

আবার ক্রোষ্টুর দ্বিতীয়া স্ত্রী বহুপুত্রবতী ছিলেন। তাঁর প্রথম পুত্রের ধারায় এই বংশে জন্ম নিয়েছেন অক্রুর। তাঁর পিতামহ বৃষ্ণিও যথেষ্ট বিখ্যাত ছিলেন বলে অক্রুর বৃষ্ণি সঙ্ঘের প্রধান বলেও বহুল পরিচিত ছিলেন। কৃষ্ণ-বলরাম জন্মেছেন মাদ্রীর দ্বিতীয় পুত্রের ধারায়, তাদের পিতামহ বসুদেব-পিতা আর্যক শূর। শূর এতটাই বিখ্যাত ছিলেন যে তাঁর নামে মথুরা অঞ্চলটাই শূরসেন নামে চিহ্নিত ছিল, স্বয়ং মেগাস্থিনিস মথুরা-জায়গাটাকে 'শূরসেনাই' বলে ডেকেছেন বলে পিতামহ শূর এক মুহূর্তেই ঐতিহাসিকতায় উপস্থিত হন আমাদের কাছে। মাদ্রীর তৃতীয় পুত্রের বংশধারায় জন্মেছেন সাত্যকি। তাঁর পিতামহ শিনির নামে বিখ্যাত হয়েছে শিনি সঙ্ঘ অথবা শৈনেয়-গণ। পরবর্তী সময়ে বৃষ্ণি, শিনি, শূর— এইসব পিতামহের নাম যতই শোনা যাক না কেন, এঁদের সবার অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ হলেন যদুপুত্র ক্রোষ্টু। তার মানে সাত পুরুষ এর মধ্যে চলে গেল কিনা জানি না, কিন্তু জ্ঞাতি-গুষ্টির লতায়-পাতায় এক অর্থে সত্যভামা, অক্রুর, কৃষ্ণ-বলরাম, সাত্যকি— এরা সবাই ভাইবেরাদর। এই নামগুলির সঙ্গে আরও একটি-দুটি নাম আমাদের বলতে হবে, তাঁরা হলেন কৃতবর্মা এবং শতধন্বা। কৃতবর্মাকে আপনারা চেনেন, তিনি কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে কৃষ্ণ এবং পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন এবং পাণ্ডবদের ক্ষতিও

করেছিলেন যথেষ্ট। এই কৃতবর্মা এবং তাঁর ছোট ভাই শতধন্বা— এঁরা হলেন সেই অক্রূরের পিতামহ বৃষ্ণিরও বড় ভাই অন্ধক বংশের জাতক। এই দুই ভাইয়ের পিতা হলেন হৃদিক, ফলে শতধন্বা-কৃতবর্মা হলেন হার্দিক্য।

আমাদের মূল প্রসঙ্গ সত্যভামার সম্বন্ধে কোনও বিশ্লেষণ করার আগেই যে এতগুলি বংশ-নাম এবং এক-একটা পরিচিত নামের বাপ-পিতামহদের নাম নিয়ে যথাসম্ভব বিরক্তিকর একটা পরিচয় দিলাম, তার কারণ দুটি অথবা তিনটি। এক হল— এই এতগুলি নাম কিন্তু মোহময়ী সত্যভামার জীবনের সঙ্গে কোনও-না-কোনওভাবে জড়িত। দ্বিতীয়ত অক্রূর যদি বা এঁদের সকলের মধ্যে প্রৌঢ়-প্রৌঢ়তর হয়ে থাকেন, তবে এঁদের সকলের কনিষ্ঠ এবং এই কেবলই কৈশোর পেরিয়ে এসেছেন, তিনি হলেন শতধন্বা। এঁরা সকলেই কিন্তু এক অর্থে ভাই অথবা বেশ কাছের আত্মীয়। সোজা কথায় যদুপুত্র ক্রোষ্টু থেকে পঞ্চম পুরুষেই কিন্তু অক্রূর-সত্যভামা-কৃষ্ণ-সাত্যকি-কৃতবর্মারা সব সগোত্রীয় ভাই বোন। তার মানে অক্রূরের সঙ্গে সত্যভামার যা সম্পর্ক, কৃষ্ণের সঙ্গেও কিন্তু তাই। তা হলে সত্যভামার স্পৃহনীয়তা কোন জায়গায় পৌঁছেছিল যে, পূর্বোক্ত নামগুলির মধ্যে একটি-দুটি ছাড়া আর সকলেই তাঁর নাটকীয় জীবনে নামভূমিকায় আছেন। তৃতীয় কথাটা পুনরুক্তি, অর্থাৎ কিনা বৃষ্ণিবীর অক্রূর, শৈনেয় সাত্যকি, কৃষ্ণ-বলরাম অথবা সুমিত্রের ধারায় সৌমিত্র সত্রাজিৎ— এঁরা সকলেই এক-একজন সঙ্ঘমুখ্য। এক মথুরা-দ্বারকায় কোনও রাজনৈতিক-সামাজিক সিদ্ধান্ত করার সময়ে এঁদের সকলকে নিয়ে 'মিটিং' হত এবং সিদ্ধান্ত হত বহুলাংশের মতাধিক্যে অর্থাৎ এঁরা কেউ একে অপরের চেয়ে রাজনৈতিকভাবে ন্যূন নন।

সত্যভামার জীবনের কোনও কথা যদি মহাভারত থেকে উল্লেখ করে তাঁকে প্রমাণ করতে হয়, তবে আমার এবং সাধারণ পাঠকের মহা-সমস্যা তৈরি হবে। মহাভারতে সত্যভামার কথা উঠলেই অল্পশ্রুত ব্যক্তিরা বনপর্বে সত্যভামা-দ্রৌপদীর কথোপকথনের উল্লেখ করেন এবং সেখানে স্বামীর মন পাওয়ার ব্যাপারে দ্রৌপদীর বক্তব্য শুনেই তৎকালীন স্ত্রী-সমাজের অবস্থান নির্ণয় করতে বসেন। সদম্ভে জানিয়ে রাখি— এঁরা মহাভারত কিছু বোঝেন না। কেননা মহাভারত বুঝতে গেলে শুধু মহাভারত পড়লে চলে না, কেননা ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক পরম্পরা বুঝতে গেলে বেদ-পুরাণ সবকিছু মিলিয়ে না পড়লে হবে না এবং সেগুলি পড়ার পরেও মহাভারতীয় চরিত্রগুলির স্বকীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মাথায় রেখেই সেই চরিত্রের মুখের কথা বিচার করতে হবে। এর চেয়েও বড় কথা হল— মহাভারত যেহেতু মুখ্যত কুরু-পাণ্ডবদের জীবন-কাহিনি নিয়েই বেশি ব্যস্ত, তাই কৃষ্ণের জীবন, বিশেষত তাঁর অন্যতমা স্ত্রী সত্যভামার জীবন এখানে সবিস্তারে আসারই কথা নয়। কিন্তু সূত্রগুলি সব আছে এবং তা আছে বহু জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। পুরাণগুলিতে কথিত কাহিনির উপাদানে সেইসব মহাভারতীয় সূত্র আমাদের পূরণ করে নিতে হবে।

সত্যভামার জীবনে প্রায় কৃষ্ণের মতোই যে জিনিসটা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, সেটা একটা জড় জাগতিক বস্তুমাত্র এবং সেটায় তাঁর নিজের কোনও মাথাব্যথা নেই কিন্তু সেটা নিয়ে সত্যভামার সকল পার্শ্বচরিত্ররাই মাথা ঘামাতে বাধ্য হয়েছেন বলেই তাঁকেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়েছে। এই জড়-জাগতিক বস্তুটি হল একটি হিরে-পান্নাজাতীয় মণি; যার নাম স্যমন্তক। সত্যভামার জীবন নিয়ে কথা বলতে গেলে এই মণির কথা আসবেই, অতএব সে কাহিনি সংক্ষিপ্ত আকারে শুনে নিতে হবে।

বেশির ভাগ পুরাণ অনুযায়ী সত্যভামার পিতা সত্রাজিৎ ছিলেন সূর্যের উপাসক। কিন্তু ভারতবর্ষের মাটিতে উপাস্য এবং উপাসক অনেক সময়েই প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে ধরা পড়েছেন এবং হরিবংশ জানিয়েছে ভগবান সূর্য নাকি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় সখা ছিলেন— সখা প্রাণসমোঽভবৎ। একদিন পশ্চিম সমুদ্রতীরে সত্রাজিৎ তাঁর সূর্যোপাসনা শেষ করেছেন, হঠাৎই সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করে তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন সূর্যদেব এবং তিনি সত্রাজিৎকে বর দিতে চাইলেন। সত্রাজিৎ তাঁর কাছে কিছু চাইতে পারলেন না, শুধু সূর্যের প্রীতি-প্রতীক নিজের কাছে রাখার জন্য তিনি তাঁর গলার মালাখানি চেয়ে বসলেন। বন্ধু-উপাসকের জন্য এর চাইতে বড় সম্মান আর কীই বা হতে পারে। সূর্য তাঁর গলার মালাখানি খুলে পরিয়ে দিলেন সত্রাজিতের গলায়। অনেক মণি-রত্নখচিত এই মাল্যখানির মধ্যমণি ছিল স্যমন্তক এবং সেই মণির ক্ষমতা একেবারে অলৌকিক। এই মণি নাকি আটবার সুবর্ণ প্রসব করত প্রতিদিন এবং যে রাজ্যে এই মণিরত্ন থাকবে সেখানে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, রোগ-ব্যাধি কিছুই থাকবে না মণির প্রভাবে।

সত্রাজিৎ যখন এই মণিরত্ন গলায় নিয়ে দ্বারকায় প্রবেশ করলেন তখন এতটাই তিনি উদ্ভাসিত যে, তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সূর্যই বুঝি আকাশ থেকে নেমে এসেছেন ভুঁয়ে— সূর্যোঽয়ং গচ্ছতীতি হ। অসম্ভব দামি জিনিস সঙ্গে নিয়ে ঘুরলে ঈর্ষা-অসূয়াগ্রস্ত মানুষের হতাশাটুকু যতই উপভোগ্য হোক আক্রোশী লোভী মানুষের হাত থেকে রেহাই নেই কোনও। এই সত্যটা সত্রাজিৎ বুঝে গিয়েছিলেন পথ চলার কালেই হাজারও চক্ষুর প্রতিক্রিয়া দেখে। শুধু তাই নয়, মনে মনে আরও কতগুলি মুখ তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিকে আলোড়িত করল। দ্বারকার বিভিন্ন সঙ্ঘপ্রধানেরা তাঁর জ্ঞাতিগুষ্টির লোক হলেও তাঁরা কেউ কম প্রভাবশালী নন এবং তাঁরা বুদ্ধিও কেউ কিছু কম রাখেন না। অতএব ওই মহার্ঘ মণি-রত্নটিকে সত্রাজিৎ নিজের কাছে রাখা ঠিক মনে করলেন না। হরিবংশ ঠাকুর জানিয়েছেন যে, সত্রাজিৎ মণিটি নিয়ে ভালবেসে নিজের দাদা প্রসেনের হাতে দিলেন— দদৌ ভ্রাত্রে নরপতিঃ প্রেম্না সত্রাজিদ্ উত্তমম্। কিন্তু দাদাভাইয়ের ওপর যত ভালবাসাই থাকুক সত্রাজিতের, আসলে কিন্তু সেই বাস্তব ভয়, অতিমূল্যবান বস্তু নিজের ঘরে রেখে নিজের বিপদ ডেকে আনার ভয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় ভয় ছিল এই যে, মথুরা-দ্বারকার অন্যতম প্রভাবশালী নেতা কৃষ্ণ যদি এই মণিটি কোনওভাবে চেয়ে বসেন। বিষ্ণুপুরাণ জানিয়েছে— সত্রাজিতের আশঙ্কা সঠিক ছিল এবং এখানে বিষ্ণুপুরাণের বক্তব্য আমাদের বিশ্বাস করতে হবে এই কারণে যে, পৌরাণিক কথক ঠাকুর কৃষ্ণের প্রতি শত শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও এখানে তাঁর চরিত্রের ওপর অন্যদের কলঙ্ক-আরোপণ মেনে নিচ্ছেন। দ্বিতীয় হল বিষ্ণুপুরাণের ভাষা। পণ্ডিতেরা স্বীকার করেছেন যে এক-একটি বিশেষ পুরাণের কোনও কোনও জায়গায় প্রাচীন গদ্যভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। ঐতিহাসিকতার দিক থেকে এই গদ্যভাষার মূল্য অপরিসীম এবং বিষ্ণুপুরাণ

জানিয়েছে, পাছে কৃষ্ণ এই মণিটি তাঁর কাছে চেয়ে বসেন, সেই আশঙ্কাতেই সত্রাজিৎ দাদা প্রসেনজিতের কাছে সেটি রেখে দিলেন।

বিষ্ণুপুরাণ আগেই ইঙ্গিত দিয়েছে, হরিবংশও পরে জানিয়েছে যে, এই স্যমন্তক মণির ব্যাপারে কৃষ্ণ সস্পৃহ ছিলেন, সোজা কথায় মণিটির ওপরে তাঁর লোভ ছিল। তবে কিনা এটাও খুব মেনে নেওয়া মুশকিল, বিশেষত তাঁর সমগ্র জীবনের শতেক ঘটনা এবং তাঁর চরিত্রের নিরিখে এটা ভাবা খুব মুশকিল যে, তাঁর মতো উদার অবতারপ্রমাণ মানুষ একটি মণির জন্য লোভ প্রকাশ করবেন। প্রাচীন বিষ্ণুপুরাণ অবশ্য এ-বাবদে কৃষ্ণকে বাঁচিয়ে দেবার চেষ্টা করে বলেছে যে, মথুরা-দ্বারকার কুলসঙ্ঘগুলির প্রধানতম যিনি, সেই রাজা-উপাধিধারী উগ্রসেনের জন্যই কৃষ্ণ নাকি মণিটি উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিলেন সত্রাজিতের কাছ থেকে— অচ্যুতোঽপি তদ্‌রত্নমুগ্রসেনস্য ভূপতের্যোগ্যমিতি লিপ্সাঞ্চক্রে।

সত্রাজিতের কাছে কৃষ্ণের দিক থেকে এই মণি-যাচনার কথা মিথ্যে নাও হতে পারে। কেননা স্যমন্তক মণির মধ্যে সামগ্রিকভাবে একটা রাষ্ট্রীয় কল্যাণ-সাধনের গুণ ছিল। প্রবাদ ছিল, এই মণি যাঁর সংগ্রহে থাকত, সেই ঘরে এটি প্রতিদিন আট বার সুবর্ণ প্রসব করত এবং মণির প্রভাবে সেই রাষ্ট্রে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় কিছু ঘটত না। এমন সার্বিক কল্যাণগুণ যেটির মধ্যে আছে, সেটি অবশ্যই রাষ্ট্রকল্যাণের সাধক হিসেবে রাজার কাছেই থাকা উচিত। আর এখানে কৃষ্ণের দিক থেকে মণি-যাচনারও কারণ আছে। কংসের অত্যাচার এবং তাঁর একনায়ক অপশাসন থেকে মথুরাকে মুক্ত করার ব্যাপারে কৃষ্ণেরই অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। মগধরাজ জরাসন্ধের প্রত্যক্ষ মদতে তাঁর জামাই কংস মথুরায় যদু-বৃষ্ণিদের সঙ্ঘশাসনের মূলোচ্ছেদ করে দিয়ে ভোজসঙ্ঘের মুখ্য পুরুষ নিজের পিতা উগ্রসেনকে বন্দি করেছিলেন এবং মথুরায় নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঠিক এই অবস্থায় মথুরার অন্তত আঠেরোটা কুল সঙ্ঘের প্রধান পুরুষেরা মথুরার বাইরে অন্যত্র বৃন্দাবনে থাকা কৃষ্ণের হস্তক্ষেপ যাচনা করেন পূর্বের সঙ্ঘশাসন সুস্থিত করতে— একথা মহাভারতেই বলা আছে— জ্ঞাতিত্রাণমভীপ্সদ্ভিঃ অস্মৎসম্ভাবনা কৃতা। এই অবস্থায় কৃষ্ণ জ্ঞাতিদের ডাকে সাড়া দেন এবং কংসকে মেরে ফেলেন— এই সংবাদও মহাভারতে আছে। কংস মারা যাবার পর তাঁর পিতাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে মথুরার সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও এই সঙ্ঘশাসনে রাজা হিসেবে একজনকে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারটা অনেকটা গণতান্ত্রিক শাসনে একটি দলনেতা নির্বাচনের মতো ঘটনা। কৌটিল্য তাঁর স্বকৃত অর্থশাস্ত্রে সঙ্ঘশাসনের প্রধান পুরুষকে রাজা নামের উপাধিধারী ব্যক্তি হিসেবে অথবা রাজশব্দোপজীবী নামে নির্দেশ করেছেন। বস্তুত জ্ঞাতিগুষ্টির অনেকগুলি কুলের সঙ্ঘমুখ্যকে রাজনৈতিকভাবে পরিচালনা করার জন্যই কৃষ্ণ কংসপিতা উগ্রসেনকে মথুরার শাসনে নিযুক্ত করেছিলেন।

কংসের মৃত্যুর পর তাঁর শ্বশুর জরাসন্ধ বারবার মথুরা আক্রমণ করতে থাকলে অতিষ্ঠ হয়ে কৃষ্ণ দ্বারকায় যদু-বৃষ্ণিদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন এবং এখানে সঙ্ঘগুলির প্রধান হিসেবে রাজার উপাধিমাত্র নিয়ে শাসন পরিচালনা করতে থাকলেন সেই কংসপিতা উগ্রসেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষ্ণ যেহেতু কংসের অপসারণ থেকে আরম্ভ করে দ্বারকায় রাজধানী প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত সমস্ত রাজনৈতিক প্রক্রিয়াটার মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন, তাই নিজে রাজা হয়ে না বসলেও তাঁর প্রভাব ছিল সবচাইতে বেশি। হয়তো এই ভূমিকা থেকে রাষ্ট্রের উন্নতি এবং কল্যাণের চিন্তাতেই রাজা-উপাধিধারী উগ্রসেনের হাত শক্ত করার জন্য তিনি চেয়েছিলেন যাতে মণিটি উগ্রসেনের কাছেই থাকে, কেননা তাতেই মণির গুণে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মঙ্গল এবং প্রাকৃতিক মঙ্গল সাধিত হওয়ার কথা। হরিবংশ পরিষ্কার জানিয়েছে যে, কৃষ্ণ সব লজ্জা ত্যাগ করে প্রসেনজিতের কাছে রাখা সেই স্যমন্তক মণিটি চেয়েই বসেছিলেন, কিন্তু প্রসেন তাঁকে সত্রাজিতের গচ্ছিত-রাখা সেই মহার্ঘ রত্নটি দিতে অস্বীকার করেন— লিপ্সাং চক্রে প্রসেনাত্তু মণিরত্নে স্যমন্তকে গোবিন্দো ন চ তল্লোভাৎ...। কাজেই সত্রাজিতের অনুমান ঠিক ছিল— রাষ্ট্রের ভালর জন্যই হোক আর নিজের জন্যই হোক কৃষ্ণ মণিটি চাইতে পারেন এবং চাইলে পরে তাঁকে মণিটি না দিয়ে থাকা খুব কঠিন। সেই কারণেই সত্রাজিৎ আগেভাগে মণিটি হাতবদল করে প্রসেনের হাতে দিয়ে রেখেছিলেন, যাতে সত্রাজিতের কাছে চাইলে তিনি বলবেন, সেটা তো আমি দাদা প্রসেনকে দিয়েছি, আপনাকে আর দিই কী করে, আবার প্রসেনের কাছে চাইলে তিনি বলবেন— ওটি তো আমার নয়, ছোট ভাইয়ের গচ্ছিত রাখা ধন আপনাকে দিই কী করে!

আবার কৃষ্ণের দিক থেকেও দেখুন, মণিটি যাঁর কাছেই থাক, রাজপ্রয়োজনে, দেশের প্রয়োজনে এবং নিজের শক্তি-প্রভাবে মণিটি তিনি জোর করেই নিতে পারতেন প্রসেন কিংবা সত্রাজিতের কাছ থেকে, কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন— মণিটি নিলে যদু-বৃষ্ণি-সঙ্ঘের এক কুলীন সঙ্ঘমুখ্যের সঙ্গে তাঁর একটা অযথা বিরোধ তৈরি হবে, এই বিরোধে জ্ঞাতিগুষ্টি আত্মীয়-স্বজনদের বিভাগ-পক্ষপাত তৈরি হবে এবং সেটা সঙ্ঘাসনের পক্ষে মোটেই ভাল না। অতএব আবারও রাষ্ট্রীয় কল্যাণে কারণেই এবং অবশ্যই জ্ঞাতিবিরোধের আশঙ্কায় স্যমন্তক মণির অধিকার নিয়ে তিনি কোনও প্রভাব-প্রতিপত্তিও খাটালেন না, জোরও খাটালেন না। জোর খাটালে তিনি পেতেন, কিন্তু কৃষ্ণ সে জোর খাটালেন না— বিষ্ণুপুরাণ আর হরিবংশ ঠিক তাই লিখেছে— শক্তোঽপি ন জহার সঃ।

স্যমন্তক মণি নিয়ে যতটুকু সামান্য ঘটনা এ যাবৎ যা ঘটেছে, তাতে এটুকু পরিষ্কার যে, এই মণিরত্ন নিয়ে একটা ঐতিহাসিক গণ্ডগোল তৈরি হয়েছিল যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের আগে এবং অবশ্যই জরাসন্ধ-বধের আগে, কিন্তু রুক্মিণীর সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহের পরে। আর একই সঙ্গে সাত্রাজিতী সত্যভামার কথা জানিয়ে রাখা ভাল যে, এখনও তিনি আড়ালেই আছেন, তবে এটা তো বোঝা যাচ্ছে দ্বারকার এতগুলি কুলসঙ্ঘের অন্যতম মুখ্য পুরুষ সত্রাজিৎ এবং প্রসেনের বাড়িতে কৃষ্ণের যাতায়াত ছিল এবং এঁরা সব কাছাকাছি থাকেন বলেই কৃষ্ণকে বারবার দেখে থাকাটা সত্যভামার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। বাপ-জ্যাঠার সঙ্গে কৃষ্ণের আপাতত একটা মন-কষাকষি তৈরি হলেও কংসের মৃত্যুর পর এবং দ্বারকায় রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর কৃষ্ণ তখন এতটাই 'হিরো' যে, সত্যভামার মতো সুন্দরী যুবতীর পক্ষে তাঁকে উপেক্ষা করাটা খুব মুশকিল ছিল। সে যাই হোক, সত্যভামার সঙ্গে কৃষ্ণের মানসিক সংশ্লেষের কোনও খবর আমরা এখনও পাইনি বটে, কিন্তু আত্মীয়তা-

নিবন্ধন উভয়ে উভয়কে চিনতেন অথবা একের বাড়িতে অপরের যাতায়াত ছিল, এটা মানতে কোনও অসুবিধে নেই।

তবে আরও একটা ব্যাপার, সেটা বলে নেওয়া ভাল। যদিও কথাটা পরে আসবে, কিন্তু এই জ্ঞাতিগুষ্টির পলিটিক্স এত আরম্ভ হয়ে যাবে যে, এমন সংবেদনশীল ব্যাপারটা তখন যেন কেমন তথ্য নিবেদনের মতো শোনাবে। ঘটনা হল— এবং এমন ঘটনা আজও হয়, কিন্তু কিছু করার থাকে না, সেই ঘটনা হল যে, কৃষ্ণের সঙ্গে সত্যভামার বিয়ের পরে আমরা জানতে পারলাম— কৃষ্ণের সঙ্গে বিয়ের অনেক আগে থেকেই নাকি সত্যভামার হৃদয় চাইতেন আরও তিনটি লোক এবং তাঁদের মধ্যে অন্তত দু'জন দ্বারকার কুল সঙ্ঘের মান্যগণ্য পুরুষ। তাঁদের একজন হলেন অক্রূর এবং দ্বিতীয় জন কৃতবর্মা। এঁদের সঙ্গে তৃতীয়ও একজন আছেন— তাঁকে বলা উচিত— বালক কিশোর উত্তীর্ণ তার নাম— তিনি হলেন কৃতবর্মার ছোট ভাই শতধন্বা, লোকে সংক্ষেপে বলত শতধনু। বিষ্ণুপুরাণ জানিয়েছে, কৃষ্ণের বিয়ের আগে থেকেই অক্রূর, কৃতবর্মা এবং শতধন্বা— এই তিনজনেই সুন্দরী সত্যভামাকে কামনা করতেন মনে মনে— তাঞ্চাক্রূর-কৃতবর্ম-শতধন্ব-প্রমুখাঃ পূর্বং বরয়ামাসুঃ। বিষ্ণুপুরাণ তথ্যটুকু নিবেদন করেই সাংবাদিকতার দায় থেকে মুক্ত হলেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গে বিয়ে হবার আগে এই তিনজন কে কীভাবে সত্যভামার দিকে অভিমুখী হয়েছিলেন অথবা সত্যভামাই বা কীভাবে কতটা তাঁদের দিকে অভিমুখী, সে খবর পুরাণকার দিলেন না, শুধু জানালেন, কৃষ্ণের অনেক আগে থেকেই এঁরা চেয়েছিলেন সত্যভামাকে।

সত্যি বলতে কী, এই তিন পৃথক ব্যক্তিত্বের মধ্যে তুলনা করাও মুশকিল, তবে এটা তো ঠিকই যে, এঁদের মধ্যে খানিক বেশি বয়সের হলেন অক্রূর। কৃতবর্মা প্রায় কৃষ্ণের সমবয়সি হবেন এবং শতধন্বা কৃষ্ণের থেকে একটু ছোট হবেন বলেই মনে হয়। বিষ্ণুপুরাণে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদটি, এঁরা 'চাইতেন' বা 'চেয়েছিলেন' সত্যভামাকে, এই ক্রিয়া থেকেই অনুমানযোগ্য হয়ে পড়ে সত্রাজিতের বাড়িতে তাঁদের গতায়াত, সত্যভামার সঙ্গে তাঁদের কথালাপের চেষ্টা এবং সত্যভামার স্পৃহনীয়তা। এদের মধ্যে শতধন্বার জন্য আমার মায়া লাগে। দাদা কৃতবর্মা যে রমণীকে পছন্দ করেন ভাই শতধন্বারও তাঁকেই ভাল লাগে, এইরকম একটা অদ্ভুত পরিস্থিতিতে কৃতবর্মার ব্যক্তিত্বের কাছে শতধন্বা ম্লান ছিলেন নিশ্চয়। তবে কিনা কৃতবর্মা বীর মানুষ, তার মধ্যে যদু-বৃষ্ণি সঙ্ঘে তাঁর প্রশাসনিক দায়িত্বও অনেক বেশি ছিল, সর্বোপরি তাঁর চরিত্রটাও যেমনটি মহাভারতে টের পেয়েছি, তাতে খুব বেশি বিগলিত হয়ে সত্যভামার দিকে ঝুঁকে পড়াটা খুব স্বাভাবিক ছিল না। তবে ওই আর কী, তিনি মুগ্ধ ছিলেন বটে সত্যভামার ব্যাপারে, কিন্তু বহির্ভাবে তার যতটুকু ব্যক্ত হয়ে থাকবে, তাতে ছোট ভাই শতধন্বার পক্ষে সত্যভামার প্রতি নিজের ভাব প্রকট করে তোলাটা অসম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে অল্প বয়স বলেই হয়তো বেশ মুখচোরা স্বভাবের ছিলেন তিনি, নইলে একবারের তরেও তাঁর কোনও অভিব্যক্তি শোনা যায় না কেন? বাকি রইলেন অক্রূর। অক্রূরই বোধহয় একমাত্র মানুষ, যাঁকে প্রায় চিহ্নিত করে বলা যায় যে, সত্যভামার হৃদয় পেতে তিনি সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন, অবশ্য রাজকন্যার সঙ্গে রাজ্যটাও, কেননা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যভামার ওপরে তাঁর যত আকাঙ্ক্ষা ছিল, তার চেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষিত ছিল তাঁর কাছে স্যমন্তক মণি।

হরিবংশ পুরাণ সত্যভামার প্রতি দুর্বলতার প্রসঙ্গে কৃতবর্মা এবং শতধন্বার নাম সেভাবে করেনি, কিন্তু অক্রূরের ব্যাপারে বলেছে— অক্রূর সদা-সর্বদা সুন্দরী সত্যভামাকে চাইতেন, কামনা করতেন— সদা হি প্রার্থয়ামাস সত্যভামামনিন্দিতাম্। আমরা জানি— অক্রূরের বয়স কিছু বেশি এবং কৃষ্ণের চাইতেও তিনি বেশ খানিকটা বড়। তবে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় অক্রূর অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ। কূটনীতি এবং রাজ্যব্যবহারে তিনি এতটাই বুদ্ধিমান যে, মৃত অত্যাচারী কংস রাজার শাসনেও তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন কংসের প্রতি— কৃষ্ণকে বৃন্দাবন থেকে মথুরায় নিয়ে এসে মল্লযুদ্ধে তাঁকে মেরে ফেলার কল্পনাটা কংসের হলেও মথুরায় কৃষ্ণকে নিয়ে আসার জন্য অক্রূরকেই পাঠিয়েছিলেন কংস। সেই কংসের সময় থেকে অক্রূর রাজনীতিতে জড়িয়ে আছেন এবং কংস মারা যাবার পর মথুরা-দ্বারকায় নতুন নায়ক হিসেবে যদু-বৃষ্ণি-অন্ধকদের 'করপোরেশনে' কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা যখন তুঙ্গবিন্দুতে পৌঁছেছে, সেখানেও কিন্তু অক্রূরের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা কিছু লঘু নয়। নানা কারণে কৃষ্ণকে তিনি মেনে নিতে বাধ্য হন, কিন্তু অনেক সময়েই তিনি কৃষ্ণের বিরোধী ভূমিকায় অবস্থান করেন। হয়তো বা কংসের মৃত্যুর পর তাঁর কিছু প্রত্যাশা ছিল, কিন্তু তখন রাজার ভূমিকায় কংসপিতা আহুক উগ্রসেনকে ফিরিয়ে আনায় অক্রূর একযোগে কৃষ্ণ এবং আহুক-উগ্রসেনেরও বিরোধী স্থানে অবস্থিত। আর এই বিরোধের জায়গাতেই হার্দিক্য কৃতবর্মা তাঁর মদতদাতা— লক্ষ করে দেখবেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও কৃতবর্মা কৃষ্ণের বিরুদ্ধে দুর্যোধনের মদতদাতা হিসেবে কাজ করেছেন। সঙ্ঘশাসনের সামগ্রিকতায় এই বিরোধ যে সবসময় প্রকটভাবে ধরা পড়ে তা নয়, কিন্তু 'পাওয়ার রিলেশনশিপ' এমনই একটা ব্যাপার যে, ওপর ওপর সব বোঝা না গেলেও এই বিরোধিতা চোরাবালির মতো কাজ করে এবং করেছেও।

হরিবংশ যখন অনিন্দ্যসুন্দরী সত্যভামার ব্যাপারে অক্রূরের হৃদয়-দৌর্বল্য ব্যক্ত করল, ঠিক তখনই একই সঙ্গে স্যমন্তক মণির ব্যাপারেও অক্রূরের লোভের কথাটুকুও জানিয়ে দিয়েছে— অক্রূরোঽন্তরমন্বিচ্ছন্ মণিঞ্চৈব স্যমন্তকম্। অর্থাৎ অক্রূর সত্যভামাকেও চান, আবার স্যমন্তক মণিটিও চান। হয়তো এমনও হতে পারে সত্যভামাকে পেলে সত্রাজিতের ঘরের সম্পত্তি স্যমন্তকও তাঁর হাতে এসে যাবে এই পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ যেহেতু বলেছে— কৃষ্ণের সঙ্গে সত্যভামার বিয়ের অনেক আগে থেকেই অক্রূর-কৃতবর্মা-শতধন্বারা সত্যভামার হৃদয়াভিলাষী ছিলেন, অতএব এটাকেই আমরা প্রথম প্রমাণ হিসেবে নিলাম যে, সত্যভামাই অক্রূরের প্রথম লক্ষ্য ছিলেন, স্যমন্তক মণির অভিলাষ যুক্ত হয়েছে পরে। কিন্তু মূল কাহিনি আমরা যেভাবে আরম্ভ করেছিলাম, তাতে এখনও পর্যন্ত সত্যভামা সেভাবে অভিব্যক্ত নন, কিন্তু স্যমন্তক মণির সঙ্গে ভবিষ্যতে সত্যভামা এবং কৃষ্ণও যেহেতু জড়িয়ে যাবেন, তাই যদু-বৃষ্ণি-অন্ধকদের প্রায়-আত্মীয় জ্ঞাতিগুষ্ঠির মধ্যেই সত্যভামার বিষয়ে কাম্যতা কতটুকু, তাঁকে নিয়ে কত পুরুষের লোলভাব কতটুকু, সেটা জানিয়ে রাখলাম।

আমাদের মূল কাহিনিস্রোতে এসে জানাই— কৃষ্ণ চাইতে পারেন, এই ভেবে সত্রাজিৎ তো মণিটি রেখে দিলেন দাদা প্রসেনের কাছে— ঠিক যেমন বিষ্ণুপুরাণ জানিয়েছে— সত্রাজিতোঽপ্যচ্যুতো মামেতদ যাচিষ্যতি ইতি অবগতরত্নলোভঃ স্বভ্রাত্রে প্রসেনায় তদ্ রত্নং দত্তবান্— কৃষ্ণ এই মণি চেয়েছিলেন বলেই সত্রাজিৎ মণিটি প্রসেনের কাছ থেকে আরও সরালেন না। কিন্তু মণিটির বস্তুগুণ এবং মহার্ঘতা এমনই যে, তা না যায় ঘরে রাখা, না যায় সরিয়ে রাখা আবার কাছে থাকলে তা পরতেও ইচ্ছে করে। তা প্রসেন একদিন মণিটি গলায় পরে মৃগয়া করতে গেলেন বনে। পৌরাণিকেরা তাই লিখেছেন বটে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস— মহার্ঘ মণিরত্ন কোথাও কোনও গোপন স্থানে রেখে আসবার জন্যই তিনি মৃগয়ার ছলে সেই উদ্দিষ্ট স্থানে রওনা হলেন। কিন্তু তাঁর কপাল ভাল ছিল না, পথিমধ্যে একটি ভয়ংকর সিংহ তাঁকে মেরে ফেলল। তাঁর অশ্বটিও মারা পড়ল সিংহের হাতে। সিংহ যখন প্রসেন এবং তাঁর অশ্বটিকে মেরে সেই ভাস্বর স্যমন্তক মণি নিয়ে যাবার উপক্রম করেছে, তখন ভল্লুকরাজ জাম্ববান তাকে দেখতে পেলেন। জাম্ববান এবার সিংহটিকে মেরে সেই মণিরত্ন নিয়ে আপন গুহায় প্রবেশ করলেন। জাম্ববানের ছেলের নাম সুকুমার। মণি দেখে সে উচ্ছ্বসিত হলে জাম্ববান তার হাতেই স্যমন্তক মণি দিয়ে দিলেন।

এই কাহিনির মধ্যে প্রথমেই আমাদের পাঠককুলের অবিশ্বাস আসা দরকার। কেননা সিংহ তার প্রবৃত্তি এবং স্বভাববশত ঘোড়াও মারতে পারে প্রসেনকেও মারতে পারে, কিন্তু একটি সিংহ কোন আর্থিক প্রয়োজনবশত স্যমন্তক মণি নিয়ে যাচ্ছিল এবং কোন আর্থিক প্রয়োজনেই বা এক ভল্লুকরাজ সিংহকে মারছে এবং তাঁর ছেলের আবার একটি মনুষ্য-নাম— পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এখানে নৃতাত্ত্বিক কোনও সূত্র আছে এবং সে-কথায় আমরা পরে আসছি। আগে জানানো দরকার যে, প্রসেন মৃগয়া থেকে ফিরে আসছেন না দেখে দ্বারকায় যদু-বৃষ্ণি সঙ্ঘের সাধারণ্যে নানা জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ করল। লোকেরা কানাকানি করে বলতে লাগল যে, প্রসেন মরেননি, তাঁকে মারা হয়েছে। ওই মণিটার ওপরে তো কৃষ্ণের চোখ পড়েছিল, কিন্তু মণিটা তিনি পাননি, অতএব এই কাজটা কৃষ্ণেরই— নূন মেতদ্ অস্য কর্ম— আমরা এটা বিশ্বাস করতে পারছি না যে, প্রসেন মৃগয়া করতে গিয়ে অনর্থক প্রাণ হারাতে পারেন। অন্য কেউও তাঁকে মারেনি, এটা কৃষ্ণেরই কাজ— সমস্ত যদুকুলের মধ্যে এইসব কথা চলতে লাগল চুপিসাড়ে— নান্যেন প্রসেনো হন্যতে ইত্যখিল এব যদুলোকঃ পরস্পরং কর্ণাকর্ণি অকথয়ৎ।

কথাটা কৃষ্ণেরও কানে গেল একসময়। এমন একটা অপবাদ তিনি প্রায় সইতেই পারলেন না। কৃষ্ণের জীবৎকালেই অনেক অপবাদ তাঁর নামে উঠেছে, কিন্তু খুন করে চুরির অপবাদ তাঁর বিরুদ্ধে ওঠেনি। স্বভাবতই এই অপবাদ স্খালনের জন্য তিনি উচ্চকণ্ঠে সবার মধ্যে ঘোষণা করলেন যে, ঘটনাস্থল থেকে মণিটি তিনি উদ্ধার করে আনবেনই। যে অন্যায় তিনি করেননি— অনকারী তস্য কর্মণঃ— অথচ তার দায় এসে পড়ল তাঁর ওপর, অতএব তাঁরই দায় আসে মণিটি উদ্ধার করে নিয়ে আসার। তিনি সকলের সামনে প্রকাশ্যে জানালেন— খোয়া যাওয়া মণিরত্ন ঠিক উদ্ধার করে নিয়ে আসব আমি— আহরিষ্যে মণিমিতি প্রতিজ্ঞায় বনং যযৌ। কৃষ্ণ বেশ কয়েকজন বিশ্বস্ত লোককে সঙ্গে নিলেন, বিশেষত যারা বনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথ চেনে, যারা রাজপুরুষদের সঙ্গে মৃগয়ায় যায় এবং মৃগপদচিহ্ন চিনে সেই পথ ধরে এগোতে পারে। এইসব আপ্ত-পুরুষদের সঙ্গে নিয়ে প্রসেনের চলা পথ বেয়ে কৃষ্ণ এগোতে থাকলেন— প্রসেনস্য পদং গৃহ্য পুরষৈরাপ্তকারিভিঃ।

ঘোড়ার পিঠে চড়ে যে তীব্রবেগে অরণ্যের অন্তরে প্রবেশ করেছে তাঁকে খুঁজে বার করা অত সহজ নয়। পথ চলতে-চলতে কৃষ্ণ পরিশ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এবারে তাঁর সামনে ঋক্ষবান পর্বত এবং বিন্ধ্য পর্বত। এই দুই পর্বতের সম্ভাব্য স্থানগুলি দেখলেই আপাতত সমস্যা মেটে। নতুন উদ্যমে আবারও খুঁজতে খুঁজতে এবার হঠাৎই চোখে পড়ল সেই মৃত ঘোড়াটি, যাতে মৃগয়ার জন্য সওয়ার হয়েছিলেন প্রসেন। আর প্রসেনকেও বেশি খুঁজতে হল না। অদূরেই তাঁর নিথর মরদেহটি পাওয়া গেল— সাশ্বং হতং প্রসেনং বৈ... স দদর্শ মহামনাঃ। সবই পাওয়া গেল, কিন্তু যে প্রতিজ্ঞায় কলঙ্কমোচনের জন্য কৃষ্ণ প্রসেনকে খুঁজতে এলেন, কৃষ্ণ দেখলেন— সেই মণি নেই প্রসেনের কাছে— নাবিন্দচ্চৈচ্ছিতং মণিম্। হতাশ কৃষ্ণ খানিকটা বিমূঢ় অবস্থায় ইতস্তত পদচারণা করতে করতে একটি সিংহকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেলেন। সিংহের গায়ে নখদন্তের চিহ্ন, যুদ্ধকালে নখোৎপাটিত গাত্রলোমের নমুনা পরীক্ষা করে নিপুণ কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে, একটি ভল্লুকজাতীয় প্রাণী, অথবা একটি ভল্লুকই সিংহটিকে মেরেছে। কৃষ্ণ সেই ভল্লুকের পদচিহ্নও দেখতে পেলেন। আপ্তপুরুষদের দিয়ে সেই পদচিহ্নগুলি পরীক্ষা করে কৃষ্ণ আরও নিশ্চিত হলেন যে, ভল্লুকটিই ওই সিংহকে মেরে একটি নির্দিষ্ট দিকে চলে গেছে— ঋক্ষেণ নিহতো দৃষ্টঃ পাদৈ ঋক্ষশ্চ সূচিতঃ।

পাঠক! আবার সেই সিংহের কথা, সেই ভালুকের কথা। ভল্লুক পশুরাজ সিংহকে মারছে, ভালুক মণি নিয়ে পালাল কিনা সেই সন্দেহও হচ্ছে, অতএব নৃতাত্ত্বিক কায়দায় কথাটা পরিষ্কার করে নেওয়াই ভাল। লক্ষ করে দেখুন, সিংহ সশস্ত্র প্রসেনকে মেরে মণি নিয়ে পালাচ্ছে, সে তো গলায় পরে বনস্থলীতে ঘুরে বেড়াবার জন্য নয় নিশ্চয়ই, সেটাকে সে মূল্যবান রত্ন বলে বুঝেছে; আবার সিংহকে মারছে এক ভালুক এবং সেও মণি নিয়েই পালিয়েছে। আসলে যে অঞ্চলে প্রসেন মৃগয়ায় গিয়েছিলেন, সেটা ঋক্ষবান পর্বত, আরও একটু এগিয়ে বিন্ধ্য। আর্যায়নের প্রথম পর্যায় অথবা দ্বিতীয় পর্যায়ে এইসব অঞ্চলে যে-সব মানুষ থাকতেন, তাঁরা অনেকেই আর্যবৃত্তের বাইরে উপজাতীয় মানুষ। তাঁরা কেউ বা সিংহের 'টোটেম' ব্যবহার করতেন, কেউ বা ভল্লুকের অথবা কেউ সাপের। নইলে জাম্ববান নামটাই খেয়াল করে দেখুন। রামায়ণে রামচন্দ্রের সহায়ক জাম্ববানকে মনে আছে তো? যাঁরা এই অঞ্চলে ভল্লুকের টোটেম ব্যবহার করতেন তাঁদের মোড়ল ছিলেন জাম্ববান। তিনি রামায়ণে এতই বিখ্যাত হয়ে গেছেন যে, পরবর্তী সময়ে ভল্লুকের টোটেম ব্যবহার করা সমস্ত উপজাতীয় মানুষের মোড়লকেই জাম্ববান নামে ডাকা হয়েছে। তা নইলে রামচন্দ্রের আমলের জাম্ববান কৃষ্ণের কালে টিকে থাকতেন না। এখানে যে মানুষটি প্রসেনের গলায় ভাস্বর মণিটি দেখে লোভী হয়ে উঠেছিল, সে সিংহের 'টোটেম' ব্যবহারকারী কোনও মানুষ। কিন্তু ঋক্ষবান পর্বতে সিংহের টোটেমওয়ালা বেশি শক্তি দেখাতে পারেনি, কারণ 'ঋক্ষ' মানেই ভালুক, আর তাদের নামেই যেহেতু পর্বত, অতএব অনুমান করি— এখানে ভল্লুকের 'টোটেম' ব্যবহারকারী মানুষেরা বেশি থাকতেন। জাম্ববান নামটা এই উপজাতির

'লিডারে'র গৌরব সূচনা করে। কেননা, রামায়ণের আমল থেকেই জাম্ববান ভল্লুকাধিপতি বলে বিখ্যাত। এখানে এই উপজাতীয় মানুষের সংখ্যাও বেশি এবং তাদের নেতা জাম্ববানের শারীরিক শক্তিও বেশি। এই কারণেই এক ভল্লুকের পক্ষে সিংহকে মারা সম্ভব হয়েছে। জাম্ববান সিংহকে মেরে মণিটি নিয়ে তাঁর ছেলে সুকুমারকে দিলেন খেলা করার জন্য।

যাই হোক, কৃষ্ণ তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গকে নিয়ে ভল্লুকের পদচিহ্ন অনুসরণ করতে করতে কিছুদুর এসে দেখলেন— সেই পদচিহ্ন একটি গুহার মুখে এসেই মিলিয়ে গেছে। কৃষ্ণ বুঝলেন, গুহায় প্রবেশ করতে হবে। তিনি সহাগত যদু-বৃষ্ণি সঙ্ঘের লোকদের এবং আপ্ত পুরুষদের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে নিজে সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করলেন। গুহার প্রায়ান্ধকার পথ দিয়ে সাবধানে এগোতে এগোতে অর্ধেক পথেই কৃষ্ণের কানে একটি নারী-কণ্ঠস্বর ভেসে এল। রমণী সান্ত্বনা দেবার মতো করে একটি বাচ্চা ছেলেকে যেন বুঝিয়ে বলছেন— সিংহ প্রসেনকে মেরেছে, আবার জাম্ববান সেই সিংহকে মেরে এই মণি নিয়ে এসেছে। সুকুমার! তুমি কেঁদো না। এই মণি এখন তোমারই— সুকুমারক মা রোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তক।

এখানে গবেষণার দৃষ্টিতে যেটা খেয়াল করার মতো বিষয়, সেটা হল— হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ এবং বিষ্ণুপুরাণ— এই তিনটি পুরাণেই রমণীর মুখে ওই সান্ত্বনা-বাক্যটি অনুষ্টুপ ছন্দে লেখা, এমনকী বিষ্ণুপুরাণে স্যমন্তক মণির হরণাহরণের সমস্ত কাহিনিটাই যেখানে গদ্যে লেখা, সেখানেও কিন্তু অনুষ্টুপ ছন্দে লেখা এই শ্লোকটি প্রায় অবিকৃত। গবেষক পণ্ডিতেরা জানিয়েছেন— মহাভারত-পুরাণগুলির মধ্যে প্রাচীন গাথা হিসেবে চিহ্নিত কতগুলি শ্লোকের উল্লেখ থাকে, পৌরাণিকদের কৌশলী কথকতায় প্রাচীন কাহিনি, কথা মাঝে মাঝে অন্য রূপ ধারণ করলেও গাথা-শ্লোকগুলিকে তাঁরা প্রায় সময়েই অবিকৃত রেখেই কথকতা করেন। আসলে পুরাণের মধ্যে এই গাথা-অংশগুলি অপেক্ষাকৃতভাবে প্রাচীন এবং যেগুলি লোক-পরম্পরায় লোক-মুখে উচ্চারিত হতে-হতে বহুশ্রুত বিখ্যাত হয়ে ওঠে। তিন-তিনটি পুরাণে এই শ্লোকটি একই চেহারায় রয়েছে এবং বিষ্ণুপুরাণের গদ্যে লেখা অংশগুলিকে পণ্ডিতেরা যেহেতু এমনিতেই প্রাচীনতর লিখিত সংস্করণ মনে করেন, সেই গদ্যে-লেখা স্যমন্তক মণির বিবরণের মধ্যেও যেহেতু এই শ্লোক অবিকৃত রয়েছে, তাতে আমরা ধারণা করি শ্লোকটি পৌরাণিকদের কাছে মৌখিক পরম্পরায় বাহিত এবং মণির এই বিবরণের একটা ঐতিহাসিকতা আছে— অর্থাৎ এটা কল্পকাহিনি নয়, এমনটা ঘটেছিল কৃষ্ণের জীবনে।

যাই হোক, গুহাপথের অর্ধমাত্র অতিক্রান্ত হওয়ার পরেই নারীকণ্ঠে স্যমন্তক মণির বিষয়ে স্পষ্ট কথা শুনে কৃষ্ণ আর কালবিলম্ব করলেন না। তিনি গুহার ভিতরে প্রবেশ করলেন। কৃষ্ণ যত বড় প্রভাবশালী মানুষই হোন না কেন, উপজাতীয় গুহায় অপরিচিত লোক দেখে জাম্ববান তাঁকে ছেড়ে দিলেন না। দুইজনের যুদ্ধ আরম্ভ হল গুহার মধ্যেই। এই যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র কতটুকু ব্যবহার হয়েছে, সে কথা কোনও পুরাণ জানায়নি। কিন্তু গুহার মধ্যে কৃষ্ণের সঙ্গে কী হচ্ছে না হচ্ছে, সে খবর বাইরে অপেক্ষারত যদু-বৃষ্ণিদের আপ্ত পুরুষেরা নিলেন না। তাঁরা সাত-আট দিন অপেক্ষা করলেন কৃষ্ণের জন্য— সপ্তাষ্টদিনানি তস্থুঃ—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর সকলেই একযোগে ফিরে গেলেন দ্বারকায়। এই ফিরে যাওয়া দলের মধ্যে কৃষ্ণের দাদা বলরামও ছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। তাঁরা ফিরে যাবার পরেও যেহেতু কৃষ্ণ দু-চার দিনের মধ্যে ফিরলেন না, অতএব তাঁরা ভাবলেন এবং ঘোষণা করে দিলেন যে, কৃষ্ণ মারা গেছেন। তাঁরা মৃত কৃষ্ণের উদ্দেশে রীতিমতো একটা শ্রাদ্ধশান্তিও করে ফেললেন— তদ্‌বান্ধবাশ্চ তৎকালোচিতম্ অখিলমুপরত- ক্রিয়াকলাপং চক্রুঃ।

ওদিকে জাম্ববানের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ চলল পুরো একুশ দিন। শেষের দিকে জাম্ববান আর পেরে উঠছিলেন না কৃষ্ণের সঙ্গে। তাঁর বয়সটাও কৃষ্ণের চেয়ে অনেক বেশি এবং উপর্যুপরি খাওয়া-দাওয়ার অভাবে জাম্ববানের শক্তিক্ষয় হয়ে গিয়েছিল। অতএব যুদ্ধে তিনি হেরে গেলেন কৃষ্ণের কাছে। হেরে যাবার পর জাম্ববান কৃষ্ণের কাছে নতি স্বীকার করলেন নিজের কন্যা জাম্ববতীকে কৃষ্ণের কাছে দিয়ে। দুই পক্ষের শান্তিসন্ধির জন্য এই কন্যা-সম্প্রদানই যথেষ্ট ছিল, অতএব কোনও কোনও পুরাণ এই অংশে কৃষ্ণকে অলৌকিকতার কক্ষে নিয়ে গিয়ে তাঁকে যে বিষ্ণু-নারায়ণের অংশ বলে জাম্ববানের কাছে প্রতিপন্ন করেছেন, সেটা বিশ্বাসী ধার্মিক-জনের কাছে বড় হয়ে উঠুক, আমরা কিন্তু ইতিহাসের যৌক্তিকতাতেই বিশ্বাস করি যে, এখানে তথাকথিত অনার্য-ভাবনায় চিহ্নিত জাম্ববানের মেয়ে জাম্ববতীর সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহটাই যুদ্ধশান্তির পথ তৈরি করেছিল। বিশেষত তৎকালীন দিনে মহান আর্য পুরুষেরা অনেকেই অনার্যা রমণীকুলের পাণিগ্রহণ করে আমোদিত বোধ করেছেন, সেখানে কৃষ্ণের মতো ললিত পুরুষের কাছে জাম্ববতীর আবেদন কিছু কম হবার কথা নয়। কৃষ্ণ জাম্ববতীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন এবং ফিরে এলেন দ্বারকায়। সঙ্গে সেই স্যমন্তক মণি, সন্ধি হবার পরেই যে মণি জাম্ববান দিয়ে দিয়েছিলেন কৃষ্ণের হাতে।

অনেক গাম্ভীর্য নিয়ে যাঁর মৃত্যু-সংবাদ ঘোষিত হয়েছিল, যার শ্রাদ্ধ পর্যন্ত করে ফেলেছিলেন আত্মীয়-স্বজনেরা, সেই কৃষ্ণ এক অনার্যা সুন্দরীর হাত ধরে রাজধানীতে ফিরলেন মহাসমারোহে এবং তাঁর সঙ্গে সেই বহুপ্রতীক্ষিত স্যমন্তক মণি। কৃষ্ণ আর কাল বিলম্ব না করে সাত্বত-বৃষ্ণি-অন্ধকদের জরুরি সভা ডাকতে বললেন উগ্রসেনকে। সভায় সওয়মুখ্যেরা সকলে উপস্থিত হলে সবার সামনে কৃষ্ণ মণিটি দিলেন সত্রাজিতের হাতে, কেননা তিনিই স্যমন্তক মণির মূল অধিকারী, তিনিই মণি পেয়েছিলেন সূর্যদেবের হাত থেকে— দদৌ সত্রাজিতে তং বৈ সর্বসাত্বতসংসদি। কৃষ্ণ যেভাবে সবার সামনে সত্রাজিতের হাতে মণি তুলে দিয়ে নিজের কলঙ্ক মোচন করলেন, যেভাবে মণি ফিরিয়ে আনার সাক্ষী হিসেবে স্বয়ং জাম্ববতী অন্তঃপুরে বসে রইলেন মণির অন্তর্বর্তী অধিকারীর মতো, তাতে সত্রাজিৎ মণি পেয়েও স্বস্তিবোধ করলেন না। কেননা তিনি মনে মনে জানেন যে, ওই স্যমন্তক মণির জন্যই তিনি কৃষ্ণকে লোভী সাজিয়েছেন। দেশের রাজার জন্য অথবা বহুজনহিতের জন্য কৃষ্ণ মণিটি একবারমাত্র যাচনা করেছিলেন বলে মণিহরণের অপবাদ তিনিই দিয়েছিলেন প্রথম এবং তারপর দাদা প্রসেনের খুনি বলে তাঁকে প্রচার করার কৌশলও তিনিই গ্রহণ করেছিলেন। ফলে এখন সগর্বে এবং সাড়ম্বরে মণি ফিরিয়ে দেবার ফলে সত্রাজিৎ চরম লজ্জায় পড়লেন।

কৃষ্ণ কিন্তু একবারও সঙ্ঘমুখ্যদের সভায় হম্বিতম্বি করে নিজের নামে অন্যদের কলঙ্ক-রোপনের কথা বলেননি, তিনি নিশ্চুপে সবিনয়ে মণি ফিরিয়ে দিয়েছেন মৌন-মূক অহংকারে। ফলত সত্রাজিতের লজ্জা-সংকোচ যেমন বাড়ল, তেমনই মনে মনে একটু ভয়ও হল। কৃষ্ণের মতো প্রভাবশালী নেতার ওপর না বুঝে কলঙ্করোপন করাটা যে মোটেই বুদ্ধির কাজ হয়নি, সেটা ভেবেই কৃষ্ণকে খুশি করার জন্য এবং তাঁর সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করার জন্য সত্রাজিৎ তাঁর তিন মেয়ের সবচেয়ে সুন্দরীটিকে কৃষ্ণের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন, এই সুন্দরীই সত্যভামা— সত্যভামোত্তমা স্ত্রীণাং... ভার্যাং কৃষ্ণায় তাং দদৌ। এই বিবাহ এতটাই আকস্মিক এবং ঘটনা-পরম্পরা-বাহিত ছিল যে সত্যভামা নিজেও বুঝি এই বৈবাহিক ব্যাপারে প্রস্তুত ছিলেন না এবং হয়তো প্রস্তুত ছিলেন না স্বয়ং কৃষ্ণও। কিন্তু বিবাহ হয়ে গেল অনুকূল লগ্ন-সঞ্চারে।

বিবাহের অনুক্রম মানতে গেলে কৃষ্ণের প্রথমা স্ত্রী রুক্মিণীর পরেই কিন্তু দ্বিতীয় স্থানে আসেন জাম্ববতী এবং তাঁর অব্যবহিত কিছুদিনের মধ্যেই কৃষ্ণের জীবনে এলেন সত্যভামা। সত্যভামার জীবন নিয়ে যে বিচিত্র নাটক কৃষ্ণের জীবনে শুরু হল, তার কথায় পরে আসছি, আপাতত যেটা জানানো দরকার, সেটা হল, কৃষ্ণের জীবনে রুক্মিণী যেমন সত্য, জাম্ববতী তেমনই সত্য, এবং তেমনই সত্য আমাদের সত্যভামা। বারবার তাঁদের ঐতিহাসিকতার কথা বলতে হচ্ছে এই কারণে যে, পণ্ডিত-সজ্জনদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ আছেন যাঁরা কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতায় বিশ্বাস করলেও কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নীদের ঐতিহাসিকতায় বিশ্বাস করেন না। কেউ কেউ আবার পট্টমহিষী রুক্মিণীকে যদি বা কোনও মতে নেন, তো জাম্ববতী এবং সত্যভামাকে একেবারেই আমল দিতে চান না। স্বয়ং মহামতি বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের অতুলনীয় যৌক্তিকতার মধ্যেও সম্ভবত ঔপনিবেশিক যন্ত্রণায় ভুগেই এমন কথা লিখেছেন যে, রুক্মিণী ছাড়া কৃষ্ণের আর কোনও স্ত্রী ছিলেন না।

মহামতি বঙ্কিম জাম্ববানকে স্রেফ ভল্লুক বলে উড়িয়ে দিয়েছেন এবং কোনও ভল্লুকের মেয়ের সঙ্গে কৃষ্ণের বিয়ে হতে পারে এটা তাঁর মতে অসম্ভব। অন্যদিকে সত্যভামার সঙ্গে সম্পূর্ণ স্যমন্তক মণির বিবরণটাই তাঁর কাছে পৌরাণিকদের উপন্যাস। সাহেবদের প্রক্ষিপ্তবাদের ছোঁয়াচ তাঁর গায়েও এমনভাবে লেগেছিল যে, 'বিব্লিক্যাল মর‍্যালিটি'তে বাঁধা আদর্শ এক কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি তাঁর চিরাভীষ্ট জাতীয়তাবোধেও সম্পূর্ণতা আনতে পারেননি। খুব সংক্ষেপে হলেও একটা কথা বোঝা দরকার যে, কৃষ্ণের আমলে বহুবিবাহ কোনও সমাজ-অচল অন্যায় প্রথা বলে গণিত ছিল না। অতএব রুক্মিণী ছাড়া আর কোনও রমণী তাঁর প্রেমবৃত্তের মধ্যে অথবা নিতান্ত বৈবাহিক বৃত্তের মধ্যে এসে পড়বেন না, এমন ভাবাটা ধীরললিত কৃষ্ণের জন্য একটু বেশি বৈরাগ্যসূচক হয়ে পড়ে। জাম্ববতীর কথা মহাভারতে-পুরাণে খুব বেশি চর্চিত না হলেও এটা মানতে হবে যে, যেখানে যেখানেই স্যমন্তক মণির কাহিনি আলোচিত হয়েছে, সেখানে সেখানেই জাম্ববতী কৃষ্ণের কাছে প্রদত্ত তাঁর পিতার যুদ্ধোত্তর উপহার হিসেবেই চিহ্নিত। তা ছাড়া বহুতর রমণীর বল্লভ ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও এই অনার্যা উপজাতীয়া রমণীর আবেদন কৃষ্ণের কাছে কিছু কম ছিল না। লোকমুখে এতটাই তিনি চর্চিত যে কোন কালের সেই পঞ্চম শতাব্দীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুপ্তযুগীয় 'তুশম প্রস্তরলিপি'তে বলা হচ্ছে যে, কৃষ্ণ জাম্ববতীর মুখপদ্মে লীন এমন এক মধুকর, যিনি জাম্ববতীর সরসতায় রাধার মুখখানিও ভুলতে বসেছেন।

জাম্ববতীর প্রতি কৃষ্ণ এতটা আসক্ত ছিলেন, এটা যদি আমাদের অনুমানযোগ্য কোনও সত্যের খাতিরে নাও মেনে নিই এবং এমনটা যদি মেনেও নিই যে, কৃষ্ণের বৈবাহিক জীবনে জাম্ববতী মাঝে মাঝে আকস্মিক ভালবাসা যোগ করেছেন, তার বেশি কিছু নয়, তা হলে তার পরেও কিন্তু বলব যে, সত্যভামা এবং স্যমন্তক মণি কৃষ্ণের জীবনে ঐতিহাসিকভাবে সত্য— এতটাই সত্য যে, ব্যাপারটা এইভাবেও বলা যায়— স্যমন্তক মণির ঘটনা যদি সত্য হয়, তবে সত্যভামাও ঐতিহাসিকতায় প্রতিষ্ঠিত হন, আবার কৃষ্ণের সঙ্গে সত্যভামার বিবাহ যদি সত্য হয়, তবে স্যমন্তক মণিও সত্য। এ-কথা বলার পিছনে কতগুলি পুরাতাত্ত্বিক সূত্র আছে। প্রথমত বেশিরভাগ পুরাণে স্যমন্তক মণির কাহিনিটি আশ্চর্যজনকভাবে কৃষ্ণ কাহিনির মূলস্থান থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে, অর্থাৎ যেখানে কৃষ্ণজীবনের নানা কথা উল্লিখিত হচ্ছে, সেখানে সত্যভামার সঙ্গে তাঁর বিবাহ এবং স্যমন্তকের কাহিনি বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে অনেক আগে, বা পরে এমন জায়গায়, যেখানে যদু-বৃষ্ণি-অন্ধকদের বংশ-পরম্পরা বর্ণনা করা হচ্ছে। আর রাজ-রাজড়া, মুনি-ঋষিদের বংশ-পরম্পরা বর্ণনাতেই যেহেতু পৌরাণিকদের ইতিহাস-স্মৃতি প্রধানত কীর্তিত—সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ— তাই এই অংশে বর্ণিত স্যমন্তক, জাম্ববতী এবং সত্যভামার কথা ঐতিহাসিকভাবে বেশি প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই কাহিনি অংশের প্রাচীনতা এবং ঐতিহাসিকতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বিষ্ণুপুরাণ। এই পুরাণ সর্বৈব শ্লোক-ছন্দে লেখা হয়েছে, কিন্তু পুরাতন রাজাদের বংশাবলির বর্ণনায় যেখানে প্রাচীন গদ্যভাষা ব্যবহৃত, পণ্ডিতেরা মনে করেন বহুতর শ্লোকবদ্ধ ছন্দের মধ্যে যেখানে এই গদ্যের ব্যবহার, সেই অংশ অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি প্রাচীন। অতএব সেই গদ্যাংশে বর্ণিত বংশাবলি— বর্ণনার মধ্যে স্যমন্তক-জাম্ববতী-সত্যভামার কথা অবশ্যই বেশি প্রাচীন এবং সেটা এক্ষেত্রে ঐতিহাসিকতার একটা প্রমাণ বটেই।

সামান্য সাধারণ দু-তিনটি সাহেবি যুক্তি দিয়ে স্যমন্তক মণি এবং সত্যভামাকে পৌরাণিকদের উপন্যাস-গালগল্পের কোঠায় ফেলে দিলেও মহামতি বঙ্কিমের কৃষ্ণচারিত্রিক ভাবনাগুলি সবসময় ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের উপাদান এবং অন্তঃপ্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হয় না, বিশেষত স্যমন্তক মণির ব্যাপারে বঙ্কিমের ধারণা গবেষণার যুক্তিকে একেবারেই নিষ্প্রভ লাগে। মহামতি বঙ্কিম খেয়ালই করেননি যে, স্যমন্তক মণির জলঘোলা ঘটনাটা পুরাণকারদের কল্পনাপ্রসূত কোনও কল্পকাহিনি নয়, এই ঘটনা ঘটেছিল এবং তা জনসমাজে এতটাই প্রচলিত ছিল যে প্রাচীনতর অভিধানকার বা কোষকার-বৈয়াকরণের ধাতুরূপের উদাহরণ দেবার সময়ে পর্যন্ত 'সকলেই-জানে' ভেবে এই স্যমন্তক মণির ঐতিহাসিক উদাহরণ দিয়েছেন, কিন্তু সে-কথা জানানোর জন্য আগে আমাদের মূল কাহিনিতে ফিরে যেতে হবে।

মনে আছে নিশ্চয়ই যে, সত্রাজিৎ পূর্বে কৃষ্ণের অপবাদ দিয়ে এখন একটু ভয় পেয়েই যেন সত্যভামার সঙ্গে কৃষ্ণের বিয়ে দিলেন। হঠাৎ এই বিবাহের আগে পর্যন্ত কৃষ্ণও বোধহয়

তেমন করে তলিয়ে দেখেননি যে, তাঁর অন্তঃপুর-প্রবিষ্টা এই নববধূটি অন্য আরও কত রাজপুরুষের কামনার আধার ছিল। হ্যাঁ, একথা মানতে পারি যে, বিবাহের আগে জ্ঞাতিগত আত্মীয়তার সূত্রেই কৃষ্ণ সত্যভামাকে চিনতেন এবং সত্যভামাও হয়তো ভালই চিনতেই যদু-বৃষ্ণিকুলের শিরোমণির মতো উজ্জ্বল এই নেতাকে। হয়তো সামান্য বাক্যালাপও ছিল কৃষ্ণের সঙ্গে সত্যভামার। কিন্তু স্যমন্তক মণির মতো একটা sensitive ব্যাপার এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকায় কৃষ্ণ বা সত্যভামা কোনও পক্ষই তাঁদের অন্তর উন্মোচন করেননি। তাই বলে কৃষ্ণের মতো কূটনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সত্যভামার প্রতি প্রৌঢ়তম অক্রূরের সস্নেহ কামদৃষ্টিপাতের কথা জানতেন না অথবা সত্যভামাকে নিয়ে কৃতবর্মা-শতধন্বার মানসবিলাসের কথা জানতেন না, এটা হতে পারে না। অতএব সত্যভামার সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহটা যখন আকস্মিকভাবে হয়েই গেল, তখন কৃষ্ণ বেশ একটু আত্মতৃপ্ত হয়ে মৌনমূক অহংকারে কালাতিপাত করছিলেন।

কিন্তু একের প্রেম-সৌভাগ্য পূর্বতন লুব্ধকের মনে হিংসার জন্ম দেয়। কৃষ্ণের সঙ্গে সত্যভামার এই বিবাহবন্ধন ভাল মনে মেনে নিলেন না অক্রূর, কেননা সত্যভামাকে লাভ করার ব্যাপারে তাঁরই অভিলাষ ছিল সর্বাধিক। কীভাবে, কোন বিভঙ্গে, কেমন মধুরতায় সত্যভামার জন্য তাঁর প্রৌঢ় রোমাঞ্চ প্রকাশ করতেন অক্রূর, তার কোনও বিবরণ-প্রমাণ নেই বটে, কিন্তু তিনিই যে সত্যভামার হৃদয় কামনা করতেন, সেটা তথ্য হিসেবে বিষ্ণুপুরাণ জানিয়েছে এবং হরিবংশ আরও এক কাঠি এগিয়ে গিয়ে বলেছে— অক্রূর সদাসর্বদা চাইতেন, সুন্দরী সত্যভামা তাঁর হোন। অন্যদিকে সত্যভামার প্রতি কৃতবর্মা এবং শতধন্বার আকর্ষণের কথা অক্রূর জানতেন, কিন্তু তাঁদের তিনি কখনওই খুব বড় শত্রু হিসেবে ভাবেননি। কেননা কৃতবর্মা খানিক রুক্ষ-শুষ্ক মানুষ, তাঁকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়াটা প্রবীণ এই রাজনীতিকের পক্ষে অসম্ভব কিছু ছিল না। বরঞ্চ সামান্য একটু আশঙ্কা সর্বকনিষ্ঠ শতধন্বাকে নিয়েই ছিল, কেননা যৌবনসন্ধিতে অনুরাগ যত স্বপ্নমায়া তৈরি করে তাতে হৃদয়-ভঙ্গের বেদনা তীব্রতর হয়। এই তিনজন স্বাভিলাষ মানুষ সত্যভামা পর্যন্ত তাঁদের হৃদয়-শব্দ পৌঁছোতে পেরেছিলেন কিনা, আমরা তো জানি না। তবে মনে হয়, সত্রাজিতের কাছে অক্রূর বারবারই সত্যভামার বিষয়ে দরবার করেছেন এবং তাঁকে জানিয়েছেন তাঁর সাভিলাষ হৃদয়ের কথাও। হয়তো সেই কারণে সত্রাজিৎও এত তড়িঘড়ি করে সত্যভামার বিবাহ সম্পন্ন করেছেন কৃষ্ণের সঙ্গে। তাতে যদু-বৃষ্ণিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নায়কের সঙ্গেও সুসম্পর্ক তৈরি হল, অন্যদিকে তিনজন পাণিপ্রার্থীর অসমান যাচনাও সকারণ ব্যাখ্যায় উপেক্ষা করা গেল।

বিবাহের ব্যাপারে অক্রূরই যে সবচেয়ে বড় দাবিদার ছিলেন, সেটা বোঝা যায়, কৃষ্ণের সঙ্গে সত্যভামার বিবাহ-ঘটনার অব্যবহিত পরেই প্রথম প্রতিক্রিয় হলেন অক্রূর। কিন্তু কৃষ্ণের মতো প্রভাবশালী পুরুষের সঙ্গে তিনি নিজে কোনও সরাসরি বিবাদে জড়াতে চাইলেন না, কিন্তু মেয়ের বাবা হিসেবে সত্রাজিৎকে কীভাবে উচিত শিক্ষা দেওয়া যয়, সেটার ব্যবস্থা করার জন্য তিনি বেছে নিলেন সেই দুই ভাইকে যাঁরা সত্যভামার হৃদয় কামনা করেছিলেন যুগপৎ। তবে সত্যভামার সঙ্গে স্যমন্তক মণির অধিকারটাই অক্রূরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে বেশি কাম্য ছিল কিনা, সেটাও এই মুহূর্ত বিচার্য হয়ে উঠবে। কেননা, স্যমন্তক মণি প্রতিদিন আট বার সুবর্ণ প্রসব করত কিনা, অথবা তা অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি রোধ করত কিনা, সে তর্কে না গিয়েও বলতে পারি, মণিটি পরম ভাস্বর ছিল এবং এটির মহার্ঘতা এবং বিক্রয়মূল্যই এটিকে চরম যাচনীয় করে তুলেছে।

কৃতবর্মা এবং শতধন্বা— এই দুই আপন ভাই অন্ধক-বৃষ্ণিদের মতোই যদুবংশের আর এক ধারা ভজমানের বংশে জন্মেছেন। অক্রূরের সঙ্গে তাঁদের যেমন নিকট সম্পর্ক, কৃষ্ণের সঙ্গেও ঠিক তেমনই এক জ্ঞাতিসম্পর্ক, এমনকী সুন্দরী সত্যভামার সঙ্গেও তাই। এই সম্পর্কে সমতার মধ্যে কৃষ্ণ কেন হঠাৎ অসমভাবে বেশি সুবিধা পেয়ে যাবেন, সেই বিচারের জন্য অক্রূর প্রথমেই চলে এলেন কৃতবর্মা এবং শতধন্বার কাছে। দুই ভাইয়ের কাছে এসে কথাটা উপস্থাপন করলেও অক্রূর প্রধানভাবে ব্যবহার করতে চাইলেন সর্বকনিষ্ঠ শতধন্বাকে, কেননা শতধন্বা স্যমন্তক মণি নিয়ে এতটুকুও মাথা ঘামান না, তাঁর কৈশোরগন্ধী যুবহৃদয় আজ সত্যভামার জন্য খান খান হয়ে আছে। অক্রূর কৃতবর্মার বাড়িতে এসে কৃতবর্মাকে আগে সমস্ত পরিকল্পনাটা বোঝালেন, তারপর দু'জনে একযোগে শতধন্বাকে বললেন, এই সত্রাজিৎ লোকটাই হল আসল বদমাশ— অয়ম্ অতিদুরাত্মা সত্রাজিতঃ। শতধনু! তুমি জানো যে, আমরা, আমি এবং কৃতবর্মা তো বটেই, এমনকী কতবার তুমিও— আমরা তিনজনেই সত্যভামার জন্য কতবার যাচনা করেছি সত্রাজিতের কাছে। কিন্তু আমাদের দু'জনকে সত্রাজিৎ তো ধর্তব্যের মধ্যেই আনল না, এমনকী তুমি যে তুমি শতধন্বা, তুমি যুবক পুরুষ, তোমাকেও এতটুকু গণ্য করল না সে। আমাদের সবাইকে অবহেলা করে নিজের মেয়ে সত্যভামাকে দিয়ে দিল কৃষ্ণের হাতে— যোঽস্মাভির্ভবতা চাভ্যর্থিতোঽপি আত্মজাম্ অস্মান্ ভবন্তং চ অবিগণয্য কৃষ্ণায় দত্তবান্।

সত্রাজিতের বিরুদ্ধে শতধন্বার দুর্বলতা এবং যোগ্যতাটুকু ভালভাবে উসকে দিয়ে অক্রূর বললেন, এমনভাবে যে লোকটা আমাদের অপমান করল, সে পাপিষ্ঠের বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই, ওকে মরতে হবে— তদলম্ অনেন জীবতা। একটা মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করে অক্রূর আরও গূঢ়তর কৌশলে অন্যতর এক জাগতিক লাভের কথা শোনালেন শতধন্বাকে। বললেন, দেখো, মেয়েটাকে তো তোমাকে দিলই না সত্রাজিৎ, কিন্তু স্যমন্তক মণিটা এখনও ওর কাছে আছে। আমি বলব, অন্তত একটা লাভ তো হবে, তুমি ওই সত্রাজিৎ-ব্যাটাকে মেরে মণিটা অন্তত নিজের হাতে আনো। সেটায় অসুবিধে কী— ঘাতয়িত্বৈনং তন্মহারত্নং ত্বয়া কিং ন গৃহ্যতে— মণিটা অন্তত তুমিই সান্ত্বনা হিসেবে পাও, সেটা আমরা চাই। আর এই কাজ করতে গেলে কোনও বাধা যদি আসে তোমার, তো আমরা তোমার পিছনে আছি— বয়মপি অভ্যুপপত্স্যামঃ।

অক্রূর বিলক্ষণ জানতেন যে বাধা আসবেই, বিশেষত সত্রাজিতের ঘরের সঙ্গে কৃষ্ণের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হবার পর সত্রাজিতের মৃত্যু এবং স্যমন্তক মণির অপহরণ দেখার পর কৃষ্ণ নিশ্চুপে নিদ্রা যাবেন, এমনটা যে হবে না, এটা অক্রূর বিলক্ষণ জানতেন। কিন্তু অক্রূর এটাও বুঝেছিলেন যে, সদ্য-সদ্য সত্যভামাকে হারিয়ে এই বালক-কিশোর শতধন্বার হৃদয় এখন ক্ষোভে বিদীর্ণ হয়ে আছে। আর ক্ষত্রিয় বীরেরা প্রেমে ব্যর্থ হলে

বেশি রোম্যান্টিক হবার চেয়ে কন্যাপিতাকে শাস্তি দেবার পথ বেছে নেবেন, এটা অক্রূর বুঝেছিলেন বলেই শতধন্বাকে দিয়ে সত্রাজিৎকে খুন করার পরিকল্পনা তিনিই করলেন সুকৌশলে, কিন্তু সত্রাজিৎকে হত্যা করে শতধন্বা মণি নিয়ে আসলে তারপর কী হবে, সেখানে শুধু সাহায্য-বার্তার কথা জ্ঞাপন করেই ক্ষান্ত হলেন না অক্রূর। তিনি বললেন, যদি অচ্যুত কৃষ্ণ এ-ব্যাপারে তোমার প্রতি কোনও শত্রুতা আচরণ করে, তবে আমি এবং কৃতবর্মা তোমাকে সবরকম সাহায্য করব— যদি অচ্যুতস্তবাপি বৈরানুবন্ধং করিষ্যতি, বয়মপি অভ্যুপপৎস্যামঃ। শতধন্বা যেহেতু অক্রূর এবং কৃতবর্মার চেয়েও সত্যভামার প্রতি নান্দনিকভাবে বেশি অনুরক্ত ছিলেন এবং এঁদের চাইতে তাঁর বয়সটাও যেহেতু নান্দনিকতাতেই আক্রান্ত ছিল, অতএব তিনি সরলভাবে অক্রূরের চক্রান্ত মেনে নিলেন নিজের মতো বুদ্ধিতে। তিনি অক্রূরকে বললেন, আপনি যা বলছেন আমি তাই করব— এবমুক্তঃ তথেতি অসাবপ্যাহ।

একটা খুন করতে গেলে যেমন সুযোগের অপেক্ষা করতে হয়, তেমনই সময়েরও অপেক্ষা করতে হয়। সময় এবং সুযোগ দুটোই এসে গেল। কৃষ্ণ তখন সত্যভামার সঙ্গে কিছুকাল দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেছেন। ইতিমধ্যে বার্তাবহ দূতেরা এসে খবর দিল যে, দুর্যোধনের চক্রান্তে জতুগৃহের আগুনে পাণ্ডবরা মায়ের সঙ্গে সকলেই পুড়ে গেছেন। এই সংবাদ পেয়ে কৃষ্ণ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে সরেজমিনে সব দেখার জন্য সাত্যকিকে নিয়ে দ্রুতগামী অশ্বে বারণাবতে রওনা দিলেন। অক্রূর যেমনটা চাইছিলেন, তার অভিমত সুযোগ এসে গেল এবং এই সুযোগে আমাদের ধারণাটা বলি। আমাদের ধারণা— শতধন্বাকে দিয়ে অক্রূর যে সত্রাজিৎকে খুন করার পরিকল্পনাটুকু করলেন, সেটা কৃষ্ণ বারণাবতে প্রস্থান করার পরেই বোধহয় করেছেন। কারণ হরিবংশের বয়ানে দেখছি— সত্রাজিৎকে হত্যার পরিকল্পনা এবং তাঁকে হত্যা করার পরেই অক্রূর শতধন্বাকে একবার বললেন, কৃষ্ণ যদি শ্বশুরবধের জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে তোমাকে মারার জন্য তোমার পশ্চাদ্ধাবন করেন, তবে তোমার পাশে থেকে আমরাও তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করব। কেননা, সম্পূর্ণ দ্বারকাপুরী এখন আমার বশে, আমার অধীনে আছে— মমাদ্য দ্বারকা সর্বা বশে তিষ্ঠত্যসংশয়ম্। আসলে কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে এই প্রবীণ রাজনীতিকের ক্ষমতা এবং প্রভাব অনেক বেড়েছে দ্বারকায়। অক্রূর এখন অনেক আত্মবিশ্বাসী এবং যে কোনও প্রতিহিংসায় তিনি সফল হবেন বলে মনে করছেন এই সময়, কেননা এই সময়ে কৃষ্ণ নেই দ্বারকায়।

কৃষ্ণের কাছে যখন খবর এল যে, পাণ্ডবরা জতুগৃহে দগ্ধ হয়েছেন, তখনই অন্য সূত্রে তিনি খবর পেয়ে গেছেন যে, তাঁরা বেঁচেও গেছেন জতুগৃহের আগুন থেকে। তবুও পাণ্ডবরা মরেছেন ভেবেই দুর্যোধন যাতে এখন বেশ কিছুদিন পাণ্ডবদের জীবননাশের চেষ্টায় বিরত থাকেন, সেইজন্যই কতগুলো লোকদেখানো কাজ করার জন্য প্রথম খবরটায় গুরুত্ব দিয়েই বারণাবতের পথে ছুটলেন কৃষ্ণ, তাঁর সঙ্গে অতিবিশ্বস্ত সাত্যকি। এদিকে কৃষ্ণ নেই দেখেই অক্রূর আর কালবিলম্ব না করে শতধন্বাকে উত্তেজিত করলেন সত্রাজিৎকে বধ করার জন্য। রাতের অন্ধকারে সমস্ত দ্বারকা নগরী যখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে একদিন শতধন্বা সত্রাজিতের ভবনে প্রবেশ করে সুপ্ত অবস্থাতেই সত্রাজিৎকে হত্যা করলেন এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যমন্তক মণিটি নিয়ে ফিরে এলেন বিনা বাধায়। হরিবংশে দেখছি— শতধন্বা সত্রাজিৎকে মেরে তখন-তখনই মণিটি এনে অক্রূরের হাতে জমা করে দিলেন সেই রাত্রেই— রাত্রৌ তং মণিমাদায় ততোঽক্রূরায় দত্তবান্। অক্রূর মণিরত্ন হাতে নিয়ে শতধন্বাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে, তাঁর কাছে যে স্যমন্তক মণি আছে, এ-কথা তিনি কাউকে বলবেন না— সময়ং কারয়াঞ্চক্রে নাবেদ্যোঽহয়ং ত্বয়েত্যুত— এবং শর্তটা এইখানেই যে, কাউকে না জানালেই তবে তিনি কৃষ্ণের বিরুদ্ধে গিয়ে শতধন্বাকে সাহায্য করবেন।

এতে বোঝা যাচ্ছে— স্যমন্তক মণির ওপর অক্রূরের লোভটাই ছিল সবচেয়ে বেশি, এমনকী এটাও হতে পারে যে, ভবিষ্যতে মণিটি হস্তগত করার জন্যই তিনি সত্যভামার প্রতি মনে-মনে আসক্ত হয়েছিলেন, যাতে বিয়ের পরে উপহার হিসেবেই তিনি মণিটি লাভ করতে পারেন। বিষ্ণুপুরাণে অবশ্য ঘটনা একটু অন্যরকম। শতধন্বা সত্রাজিৎকে বধ করে স্যমন্তক মণি নিজের কাছেই রেখেছেন, কেননা অক্রূর সেই নির্দেশই দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, সত্যভামাকে না হয় তুমি পেলে না, কিন্তু তার বদলে সত্রাজিৎকে মেরে মণিটি তুমি নেবে না কেন? শতধন্বা সেইমতোই সত্রাজিৎকে হত্যা করে মণি রেখেছেন নিজের কাছে, আপাতত নিজের কাছে মণি রাখার মধ্যে তিনি কোনও ভয় দেখেননি।

সত্রাজিতের আকস্মিক মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিল। কৃষ্ণের পূর্বনিযুক্ত গুপ্তচরেরা এই খবরটুকু কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে সত্যভামাকেই জানিয়ে গেল যে, তাঁর পিতা সত্রাজিৎ খুন হয়েছেন শতধন্বার হাতে এবং তাঁর গৃহে রক্ষিত মণিরত্ন স্যমন্তকও তিনি নিয়ে গেছেন। এই খবর পাবার পর যা তৎকালীন দিনের কোনও যুবতী রমণী পারতেন না, সেই কাজটি সত্যভামা করে দেখালেন। পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর দুঃখ এবং ক্রোধ একসঙ্গে জাগ্রত হল। তিনি দ্রুতগামী অশ্ব যোজনা করলেন রথে এবং একা পৌঁছলেন বারণাবতে, যেখানে কৃষ্ণ আছেন— প্রযযৌ রথমারুহ্য নগরং বারণাবতম্। সত্রাজিতের মৃত্যুর খবর দেবার সময় সত্যভামা অবশ্য স্যমন্তক মণির চেয়েও তাঁর নিজের ব্যাপারে শতধন্বার অভিলাষের কথা বেশি প্রকট করে বললেন— পিতা আমাকে তোমার হাতে বিয়ের জন্য তুলে দিয়েছিলেন বলেই সেটা সহ্য করতে না পেরে ক্রুদ্ধ শতধন্বা আজ আমার পিতাকে হত্যা করেছে— ভগবতেঽহং প্রতিপাদিতেতি অক্ষান্তিমতা শতধন্বনা অস্মৎপিতা ব্যাপাদিতঃ— এমনকী পিতার ঘরে রক্ষিত সেই স্যমন্তক মণিরত্নও শতধন্বাই অপহরণ করেছে— তচ্চ স্যমন্তকমণিরত্নমপহৃতম্।

সমস্ত ঘটনা জানানোর পর সত্যভামা নিজের সমস্ত ক্ষোভ শতধন্বার প্রতি প্রকট করে কৃষ্ণকে বললেন, এই শতধন্বা আমাকে এইভাবে অপমান করল, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়ার জন্য আমার বাবাকে খুন করল এবং মহার্ঘ মণিটিও বাড়ি থেকে নিয়ে গেল, এই সমস্ত ঘটনা তুমি বিচার করো, তারপর যা উপযুক্ত মনে হয় করো— তদিয়মস্যাবহাসনা। তদালোচ্য যদত্র যুক্তং তৎ ক্রিয়তাম্। কৃষ্ণ সব শুনলেন, ক্রোধস্ফুরিতাধরা সত্যভামার সামনে ক্রোধে তাঁর চোখ ভ্রূকুটি কুটিল হয়ে উঠল বটে, কিন্তু কৃষ্ণ আপাদমস্তক প্রখর রাজনীতিবিদ। আপাতত সত্যভামার মতো বহুজনকাঙ্ক্ষিতা বিদগ্ধা রমণীর সামনে তিনি যতখানিই আবেগ প্রকট করে তুলুন, দ্বারকার সঙ্ঘ-রাজনীতির বিভিন্ন টানা-পোড়েনের

কথা তাঁকে মনে রাখতেই হয়। ফলত শ্বশুর সত্রাজিতের এই আক্রান্ত মৃত্যুতে তিনি মনে-মনে একটু খুশিই হলেন, কেননা এককালে এই স্যমন্তক মণির জন্য তাঁকেও কম অপমান সহ্য করতে হয়নি। দেশের-দশের জন্য মণি চেয়ে তিনি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন সত্রাজিতের কাছে এবং তাঁকে চোর অপবাদ দিয়ে রটনা করার মূলেও এই সত্রাজিৎই ছিলেন। ফলে মনে মনে একটু যেন অপমান-শান্তি ঘটল কৃষ্ণের। কিন্তু বাইরে সত্যভামার সামনে তিনি ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে জানালেন, তোমার এই অপমান আসলে আমারই অপমান। ওরা তোমাকে নয়, আমাকেই অপমান করতে চেয়েছে। আমি কথা দিচ্ছি, আমি সেই পাপিষ্ঠের করা এই অপমান কিছুতেই সহ্য করব না— সত্যে, মমৈষাবহাসনা। নাহমেতাং তস্য দুরাত্মনঃ সহিষ্যে— এটা মনে রেখো সত্যা যে, একটা গাছে পুরোপুরি না উঠে সেই গাছের মগডালে থাকা পাখিগুলোকে মারা যায় না। ওরা গাছে না উঠেই পাখির বাসায় হাত দিল। এর ফল ওরা বুঝবে, তুমি এই ব্যাপারটা নিয়ে আর কষ্ট পেয়ো না, সত্যা— ন হি অনুল্লঙ্ঘ্য বরপাদপং তৎকৃত-নীরাশ্রয়িণো বিহঙ্গা বধ্যন্তে। তদলম্ অত্যর্থমমুনা অস্মৎপুরতঃ শোকপ্রেরিত-বাক্য পরিকরেণ।

কৃষ্ণ আর দেরি করলেন না, বারণাবতে পাণ্ডবদের ভস্মীভূত হবার ঘটনা তিনি পূর্বেও বিশ্বাস করেননি, সব দেখে-শুনে এখন তো আরও বিশ্বাস করলেন না। কিন্তু দুর্যোধন যাতে পাণ্ডবদের ব্যাপারে এখনই আবার সক্রিয় না হন, অতএব তাঁকে ঠকাবার জন্যই পাণ্ডবদের একটা লোকদেখানো শ্রাদ্ধ করলেন। তারপর সাত্যকির ওপর জতুগৃহে দগ্ধ মানুষদের অস্থি-সংগ্রহ করার ভার দিয়ে তিনি সত্যভামার সঙ্গে ফিরে এলেন দ্বারকায়। সত্রাজিতের খুনের ব্যাপারে শতধন্বার নামটাই সরাসরি জড়িয়ে গেল বটে, হয়তো কৃষ্ণ জানতেনও যে, তাঁর স্ত্রী সত্যভামার জন্য এই সদ্যোযুবকের বিশেষ আপ্লুতি ছিল, কিন্তু খুনের পর স্যমন্তক মণি অপহৃত হওয়ায় তিনি বুঝতে পারছিলেন, এর পিছনে আরও গভীর রহস্য আছে। কিন্তু আপাতত তাঁকে শতধন্বাকে ধরেই এগোতে হবে এবং সত্যভামার প্রাথমিক ক্রোধ প্রশমনের জন্য তাঁর পিতৃহন্তাকে যে আগে শাস্তি দেওয়া দরকার সেটা তিনি বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে এইরকম একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবার জন্যও পিছনে কিছু সমর্থন দরকার। সেইজন্যে প্রথমেই তিনি দাদা বলরামকে নির্জনে ডেকে বললেন, দেখুন, মৃগয়ারত প্রসেনকে মেরেছিল সিংহ, সত্রাজিৎকে খুন করেছে শতধন্বা, অতএব উপযুক্ত অধিকারী না থাকাতে এই স্যমন্তক মণি এখন আমাদের দু'জনেরই প্রাপ্য হওয়া উচিত— তদুভয়-বিনাশাৎ তন্মণিরত্নমাবাভ্যাং সামান্যং ভবিষ্যতি।

এখানে মণির অধিকারী হিসেবে বলরামকেও জড়িয়ে নেওয়াটা কৃষ্ণেরই বুদ্ধি এবং সেটা প্রধানত বলরামের মতো নিরপেক্ষ জনকে পাশে রাখার জন্য। কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, অতএব আর দেরি না করে রথে উঠুন, শতধন্বাকে আগে ধরতে হবে। কৃষ্ণ-বলরামের এই তোড়জোড়ের খবর শতধন্বার কানে এসে পৌঁছল। তিনি প্রথমেই বড় ভাই কৃতবর্মার কাছে গেলেন সাহায্যের প্রত্যাশায়। কেননা পূর্বে অক্রূর যখন সত্রাজিৎকে খুন করার সাহস জুগিয়েছিলেন তাঁকে, তখন দাদা কৃতবর্মাও সাহায্যের কথা বলেছিলেন। কাজেই নিকটজনের কাছে আগে গেলেন শতধন্বা। কিন্তু এই মুহূর্তে কৃতবর্মা তাঁকে সাফ জানিয়ে দিলেন, কৃষ্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং বলরামের বিরুদ্ধে যাবার কোনও সামর্থ্য তার নেই। অর্থাৎ আগে যা বলেছি, বলেছি। এখন বলছি, পারব না। অগত্যা অক্রূরের কাছে গেলেন শতধন্বা। অক্রূর কৃষ্ণ-বলরামের ওপর আরও অনেক অলংকার চড়িয়ে বললেন, তিন ভুবনের সকল শক্তিমান পুরুষ যাঁদের ভয়ের চোখে দেখে, আমি তাঁদের সঙ্গে কী যুদ্ধ করব, তুমি অন্য কারও কাছে সাহায্য চাও— তদন্যতঃ শরণমভিলষ্যতাম্।

বিপদের প্রান্তভাগে দাঁড়িয়ে শতধন্বা সব বুঝে গেলেন এবং এটাও বুঝে গেলেন যে, সত্রাজিৎকে খুন করার জন্য যতখানি, তার চেয়ে অনেক বেশি ওই স্যমন্তক মণির কারণে তিনি আজ মরতে বসেছেন। তিনি ভাবলেন, অন্তত মণিটা যদি তাঁর সঙ্গে না থাকে, তবে হয়তো বেঁচেও যেতে পারেন তিনি। অক্রূরের ওপর তাঁর যা রাগ হচ্ছিল, এবং যে আশা নিয়ে তিনি অক্রূরের কাছে গিয়েছিলেন, তাতে সমস্ত জগৎটাকেই শতধন্বা তখন অক্রূরময় দেখছিলেন— শতধন্বা ততোহক্রূরম্ অবৈক্ষৎ সর্বতো দিশম্। বিশেষত অক্রূর আগে যেভাবে তাঁকে সত্রাজিৎ-হত্যা এবং মণিহরণে প্ররোচিত করেছিলেন, তাতে এখন এইভাবে অক্রূর পাল্টি খেয়ে যাওয়ায় শতধন্বা পরিষ্কার বুঝলেন, তাঁর নিজের মতো সত্যভামার জন্য নয়, মণির জন্যই আসলে ব্যগ্র ছিলেন অক্রূর। না হলে এখন কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা তিনি নাই করুন, কিন্তু তাঁর যা রাজনৈতিক ক্ষমতা, তাতে তিনি সামনে এগিয়ে এলে কৃষ্ণকে অন্যভাবে ভাবতে হত। হরিবংশ তো তাই পরিষ্কারই জানিয়েছে যে, অক্রূরের সেই শক্তিসামর্থ্য ছিল কৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ করার, কিন্তু শঠতাবশতই তিনি শতধন্বার পাশে এসে দাঁড়ালেন না— শক্তোঽপি শাঠ্যাদ্ হার্দিক্যম্ অক্রূরো নাভ্যপদ্যত।

শতধন্বার হাতেও আর সময় নেই এদিকে। ভবিষ্যদ্‌ভয়ের কারণ স্যমন্তক মণিটি তখন অক্রূরের কাছেই দিয়ে যাবার মানসে তিনি বললেন, আপনি যদি নিতান্তই আমাকে সাহায্য করতে অসমর্থ হন, তা হলে অন্তত এই মণিরত্ন স্যমন্তক রাখুন আপনার কাছে, এটা নিলে আমি বাঁচতেও বা পারি—তদয়মস্মন্মণিঃ সংগৃহ্য রক্ষ্যতাম্। অক্রূর বললেন, মণিটি আমি রাখতে পারি। কিন্তু তোমায় কথা দিতে হবে যে, তুমি মৃত্যুর মুখে এসে দাঁড়ালেও মণিটি কার কাছে আছে তুমি বলবে না। শতধন্বা স্বীকার করে নিলেন এই শর্ত। কারণ, তাঁর প্রধান আকর্ষণের কেন্দ্র ছিলেন সত্যভামা, স্যমন্তক মণি নয়। এই মণি তিনি অপহরণ করেছিলেন অক্রূরের কথাতেই এবং সমস্ত সহায়তার হাত তুলে নিয়ে অক্রূর কিন্তু মণিটি নিজের হেফাজতে এনে ফেললেন। শতধন্বার কাছ থেকে মণি গ্রহণ করলেন অক্রূর— অক্রূরস্তন্মণিরত্নং জগ্রাহ। পাঠকের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন বিষ্ণুপুরাণের এই ছোট্ট পঙ্‌ক্তিটি— অক্রূর সেই মণি গ্রহণ করলেন— অক্রূরস্তন্মণিরত্নং জগ্রাহ— এই পঙ্‌ক্তিটি যেন মনে রাখেন।

শতধন্বা অক্রূরের কাছে স্যমন্তক মণি রেখে একটি মাদী ঘোড়ায় চেপে বসলেন। এই ঘোটকীর সুনাম ছিল, এটি নাকি এক লপ্তে চারশো ক্রোশ বা একশো যোজন দৌড়তে পারে, অশ্বিনীর নাম হৃদয়া— বিখ্যাতা হৃদয়া নাম শতযোজন-গামিনী। শতধন্বা ঘোড়ায় চড়ে ছুটলেন, এদিকে কৃষ্ণ-বলরাম চারঘোড়ার রথে সওয়ার হয়ে ছুটলেন তাঁর পিছনে। দুর্ভাগ্যবশতই হোক অথবা ঘোটকী বলেই হোক অনেকটা পথ অতিক্রম করে হৃদয়া নামের

সেই অশ্বিনী ক্লান্ত হয়ে পড়ল এবং মিথিলার কাছাকাছি একটা জায়গায় এসে সে মারা গেল। শতধন্বা উপায়ান্তর না দেখে পায়ে হেঁটেই বনের পথ ধরে পালাতে লাগলেন— শতধনুরপি তাং পরিত্যজ্য পদাতিরেবাদ্রবৎ। কৃষ্ণ-বলরাম রথে যখন এসে পৌঁছলেন, তখন দেখলেন একটি ঘোটকী মরে পড়ে আছে। অশ্বার মৃত শরীর দেখে রথের ঘোড়াগুলি কেমন যেন একটা আচরণ করতে আরম্ভ করল। কৃষ্ণ বাস্তব পরিস্থিতি বুঝে দাদা বলরামকে বললেন, এই মৃত অশ্বের শরীর অতিক্রম করে এই চার ঘোড়ার রথ চালিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা কোরো না তুমি— নৈতে অশ্বা ভবতেমং ভূমিভাগম্ উল্লঙ্ঘ্য নেয়াঃ। তার চেয়ে তুমি এখানে অপেক্ষা করো যতক্ষণ আমি ফিরে না আসি। আমি পায়ে হেঁটেই শতধন্বাকে ধরতে পারব, কেননা সেও পায়ে হেঁটেই যাচ্ছে এবং বেশিক্ষণ সে এখান থেকে যায়নি। তুমি এখানেই থাকো আমি আসছি।

বলরাম দাঁড়িয়ে রইলেন কৃষ্ণের কথামতো। আর কৃষ্ণ খুব জোরে হেঁটে মাত্র দুই ক্রোশ পথ যেতেই দেখতে পেলেন শতধন্বাকে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, স্যমন্তক শতধন্বার কাছেই রয়েছে এবং সেইজন্যই সে এত পালাচ্ছে। এই বিশ্বাসের জন্যই কৃষ্ণ কোনও ঝুঁকি নিলেন না, সম্মুখীন দ্বন্দ্বে কোনও সময় নষ্ট করলেন না, এমনকী দূর থেকে একবারও একটু সাবধানবাণীও উচ্চারণ করলেন না যে, মণিটি তুমি দিয়ে দাও, আমি এখনও বলছি, তুমি এইভাবে বাঁচতে পারবে না। কৃষ্ণ দূর থেকেই তাঁর চিরাভ্যস্ত চক্র নিক্ষেপ করে শতধন্বার মাথা কেটে ফেললেন। সত্যভামা বলেছিলেন— পিতৃহত্যার শোধ নিতে হবে, তিনি বিনা বাক্যে শতধন্বাকে মেরে সেই প্রতিশোধ নিলেন বটে, কিন্তু এবারে তাঁর নিজের কৌতূহল এবং প্রয়োজনে কৃষ্ণ বেশ সময় নিয়েই আতিপাতি করে শতধন্বার জামাকাপড় হাটকে খুঁজলেন, এমনকী তাঁর শরীরের অন্তর্বর্তী স্থানগুলিও খুঁজে দেখলেন ভাল করে। কিন্তু স্যমন্তক মণি তিনি খুঁজে পেলেন না। কৃষ্ণ হতাশ হয়ে ফিরে এলেন বলরামের কাছে। বললেন, আমাদের ভুলই হয়ে গেল দাদা! আমরা বৃথাই শতধন্বাকে মেরে বসলাম। কিন্তু যেটার জন্য চেষ্টা, সেই স্যমন্তক মণি কিন্তু আমি শতধন্বার কাছে খুঁজে পেলাম না— বৃথৈবাস্মাভির্ঘাতিতঃ শতধনুঃ, ন প্রাপ্তম্ অখিলজগৎসারভূতং তন্মণিরত্নম্।

কৃষ্ণের কথায় এবং ঘটনার আকস্মিকতায় বলরাম যতখানি বিস্মিত হলেন, তার চেয়েও বেশি রেগে গেলেন। কৃষ্ণ যেভাবে তাঁকে বুঝিয়েছিলেন তাতে বলরাম সরলভাবেই বুঝেছিলেন যে, মণিটি শতধন্বার কাছেই আছে। কিন্তু সেই অনুমান যখন মিলল না, তখন বলরাম আর অন্য নতুন কোনওভাবে ভাবতে পারলেন না। বরঞ্চ কৃষ্ণকেই তিনি আর যেন বিশ্বাস করছিলেন না একেবারে। এতটাই অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন বলরাম যে, সেই মুহূর্তেই যেন কৃষ্ণের জামাকাপড় খুঁজে দেখার মতো মানসিকতা হচ্ছিল তাঁর। নেহাৎ সেটা পারছেন না বলেই বলরাম বললেন— ধিক্ তোমাকে কৃষ্ণ! শত ধিক্ তোমাকে। তুমি যে এইরকম অর্থলিপ্সু তা আমি জীবনেও ভাবিনি। আজকে শুধু ভাই বলে তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম— ধিক্ ত্বাং যস্ত্বম্ অর্থলিপ্সুঃ। এতচ্চ তে ভ্রাতৃত্বান্মর্ষয়ে। আমাদের ধারণা, সেই যে কৃষ্ণ এসে দাদা বলরামকে বলেছিলেন, সত্রাজিতের মৃত্যুর পর স্যমন্তক মণি এখন আমাদের দু'জনের হবে, সেই তখন থেকে বুঝি এই মণিরত্নের ওপর দাদা বলরামেরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা লালসা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তা নইলে মণি শতধন্বার কাছ থেকে না পেলেও এতটা তো তাঁর রেগে ওঠার কথা নয়। ভাবা যায় কী, কৃষ্ণকে তিনি বলছেন— তোমার সামনে এই খোলা রাস্তা রয়েছে, কৃষ্ণ! তুমি এবার যেখানে ইচ্ছে যেতে পারো— তদয়ং পন্থাঃ, স্বেচ্ছয়া গম্যতাম্— আমার দ্বারকাতেও প্রয়োজন নেই, তোমাকেও প্রয়োজন নেই, কোনও আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকেও দরকার নেই আমার— ন মে দ্বারকয়া, ন ত্বয়া, ন বন্ধুভিঃ কার্যম্— তুমি চলে যাও যেখানে ইচ্ছে।

প্রত্যাশিতভাবেই কৃষ্ণ অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলেন দাদা বলরামকে। অনেক শপথ করে বললেন, আমি কি এমন কাজ করতে পারি কখনও যে, মণিটি নিজের কাছে রেখে তোমাকে বলব আমার কাছে নেই। আমি সত্যি বলছি দাদা, শতধন্বাকে বৃথাই মারলাম, শতধন্বার কাছে মণি ছিল না, আমার কাছেও নেই। বলরাম এবার যেন আরও ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, কেন তুমি বারবার আমার কাছে এমন উলটো-পালটা শপথ করছ বলো তো— অলম্ এভির্মমাগ্রতোঽলীক শপথৈঃ। কৃষ্ণ শুধু বোঝানোরই চেষ্টা করছেন এবং সে আগ্রহে কমতি হচ্ছে না দেখে বলরাম নিজেই এবার সেই জায়গা থেকে হাঁটা দিলেন মিথিলাপুরীর দিকে। উপায়ান্তর না দেখে কৃষ্ণ একাই ফিরে গেলেন দ্বারকায়। সত্যভামাকে হয়তো বা তিনি বোঝাতেও পেরেছিলেন সবকিছু, হয়তো বা পিতৃহন্তা শতধন্বাকে বধ করে আসায় সত্যভামার প্রাথমিক ক্ষোভটুকু শান্ত হয়েছিল, কিন্তু স্যমন্তক মণিরত্ন কোথায় গেল, সেটা নিয়ে যথেষ্ট ধন্দে ছিলেন কৃষ্ণের মতো মানুষও। সত্যভামা অবশ্য এ-ব্যাপারে কৃষ্ণকে কোনও প্রশ্ন করেননি কোনওদিন। অথচ পিতা সত্রাজিতের মৃত্যুর পর নীতিগতভাবে মণিটি তাঁর কাছেই আসার কথা উত্তরাধিকারের নিয়মে। কিন্তু স্যমন্তক মণির অধিকার নিয়ে সত্যভামাকে আমরা কোনওদিন একটি কথাও বলতে শুনিনি এবং এইখানেই তাঁর বিদগ্ধতা।

দ্বারকায় স্যমন্তক মণির কথা আস্তে আস্তে চাপা পড়ে গেল, কৃষ্ণও তাঁর মহিষীদের নিয়ে সুখে কাল কাটাচ্ছেন। কিন্তু দুশ্চিন্তা রয়েই গেল। দাদা বলরাম সেই যে রেগে মিথিলাপুরীতে গিয়ে বসে রইলেন, তিন বছর হয়ে গেল, এখনও তিনি ফিরছেন না। ওদিকে কৃষ্ণ দেখতে পাচ্ছেন অক্রুরের বড় বাড়-বাড়ন্ত হয়েছে, কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণাভাবে তাঁকে সোজাসুজি কিছু বলাও যাচ্ছে না। তা ছাড়া বাড়বাড়ন্ত অনেক হলেও স্যমন্তক-প্রসূত সোনা-দানা-অর্থ দিয়ে অক্রুর কিন্তু বাইরে খুব একটা খরচাপাতি করতে পারছেন না। কিন্তু তবুও স্যমন্তক মণি যে তাঁর কাছেই আছে সে-কথা বুঝতে পারছেন না কৃষ্ণ এবং অক্রুরও খুব একটা মেলামেশা করছেন না কারও সঙ্গে। তিনি বুঝতে দিচ্ছেন না কিছু। শতধন্বার জন্যও কৃষ্ণের চিন্তা হয়, এতই আকস্মিকভাবে, কোনও বাক্যালাপ না করেই তাঁকে মেরেছেন যে, এখন সন্দেহ করতে ভয় হয়, যদিও কৃষ্ণ এটা বুঝে গেছেন— যাঁরাই এককালে তাঁর স্ত্রী সত্যভামার প্রণয়-অনুগ্রহ চেয়েছিলেন, তাঁরাই আসলে স্যমন্তক মণির ব্যাপারে সন্দেহভাজন। তাঁদের মধ্যে একজন মারা গেছেন। শতধন্বার দাদা কৃতবর্মার নামও সত্যভামার প্রণয়ীগোষ্ঠীতে জড়িয়ে গেলেও সত্যভামার প্রণয় এবং স্যমন্তক মণি দুই ব্যাপারেই তেমন কোনও তীব্রতা ছিল না তাঁর। তবে দ্বারকার সঙ্ঘ-রাজনীতিতে কৃষ্ণের প্রভাব প্রতিপত্তি তাঁকে অক্ষমের ঈর্ষায় ভোগাত মাঝে মাঝে।

আর অক্রূর এখন যেন হঠাৎ সাধু হয়েছেন। তিনি একটার পর একটা যজ্ঞ করে যাচ্ছেন। ব্রাহ্মণ-সন্তানদের দান করছেন এবং বাহ্য ভোগবিলাসে বিরত থাকছেন। আসলে তাঁর বুদ্ধিটা কেউ ধরতেই পারছেন না। তিনি যে সত্যভামাকে বিবাহ করতে না পেরে হঠাৎ সাধু হয়েছেন— একথা অন্য কেউ বিশ্বাস করলেও কৃষ্ণ তা করছেন না। কেননা কৃষ্ণ তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা জানেন। কিন্তু যজ্ঞকর্মে রত ব্যক্তিকে ধরা খুব কঠিন। আসলে যা হয়, সরকারি-বেসরকারি যে কোনও জায়গায় যাঁরা ঘুষ খেয়ে উপরিজীবিকা নির্বাহ করেন, তাঁরা কেউই প্রায় বাইরের ভোগ-বিলাসটুকু তেমন করে দেখাতে পারেন না। তাঁরা সাধু সেজে থাকেন না ঠিকই, কিন্তু মাইনে-কড়ি দিয়ে যতটুকু হয়, তার চেয়ে সামান্য একটু ওপরে নিজেদের ভোগ-বিলাসসামগ্রীর মান বেঁধে রাখেন, যাতে খুব একটা সন্দেহ তৈরি না হয়। অক্রূরও সেটা পারছেন না, স্যমন্তক মণির অলৌকিক প্রভাব-জাত অষ্টবার সুবর্ণ দৈনিক লাভ করেও বাইরে তিনি তাঁর ভোগবিলাসের মাত্রা প্রকট করে তুলতে পারছেন না। তিনি যজ্ঞ করছেন, একটার পর একটা যজ্ঞ করছেন। যজ্ঞ করতে গেলেও বিস্তর অর্থের প্রয়োজন হত সেকালের দিনে, কিন্তু সেই অর্থ অন্তত অক্রূর জোগাতে পারেন, এটা ভাবা অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু অক্রুর যজ্ঞ করে যাচ্ছেন সম্পূর্ণ অন্য কারণে এবং সেটা করছেন আপন দোষমনস্কতায়।

স্যমন্তক মণি ঘরে থাকায় সদাসর্বদা তাঁর মনে হয় যে, কৃষ্ণের চোখে ঠিক তিনি ধরা পড়তে পারেন এবং এই ভয়ও তাঁর আছে যে, ধরা যদি পড়েন তবে কৃষ্ণ যদি শতধন্বার মতোই আকস্মিকভাবে তাঁকে হত্যা করেন। বিষ্ণুপুরাণ জানিয়েছে, এই ভয়েই অক্রূর একটার পর একটা যজ্ঞ করছিলেন, কেননা তখনকার কালে এটা বিধিবদ্ধ মান্য নিয়ম ছিল যে, যজ্ঞে দীক্ষিত ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য পুরুষকে কেউ হত্যা করত না। করলে ব্রহ্মহত্যার মহাপাতক হত বলে সকলেই মনে করতেন। সেই কারণে একটার পর একটা যজ্ঞদীক্ষা নিয়ে অক্রূর প্রায় বাট-বাষট্টি বছর কাটিয়ে দিলেন— দীক্ষাকবচং প্রবিষ্ট এব দ্বিষষ্টিবর্ষাণি— অর্থাৎ নিরন্তর এই যজ্ঞদীক্ষা অক্রূরের ক্ষেত্রে একটা 'শিল্ড্' হিসেবে কাজ করছিল।

এতক্ষণ ধরে সত্যভামা এবং স্যমন্তক মণি নিয়ে যত কথা বলছিলাম, তা প্রাচীন কালের এক অপরিশীলিত গোয়েন্দা কাহিনির মতো শোনালেও আসল আসামী এখনও ধরা পড়েনি। তবু আমরা এত বড় কাহিনিটা আপনাদের শোনালাম এইজন্য যে, এই কাহিনির মধ্যে সত্যতা আছে। সত্যভামার সঙ্গে স্যমন্তককে জড়িয়ে এই ঘটনা যে ঘটেছিল তার একটা বড় প্রমাণ আগেই দিয়েছি এবং তা হল— সত্যভামা এবং স্যমন্তকের কথা বেশিরভাগ পুরাণ এবং হরিবংশে মূল কৃষ্ণজীবনের অন্যানা কাহিনির সঙ্গে অসংপৃক্ত লেখা হয়েছে এবং কখনও তা গদ্যে— যেটা প্রাচীনতার প্রমাণ। দ্বিতীয় প্রমাণটা আরও বড় এবং মহামতি বঙ্কিমচন্দ্র এবং তদনুসারী যুক্তিবাদীদের চোখে গবেষকজনের পরিশ্রম-প্রসূত এসব তথ্য ধরা পড়েনি বলেই কৃষ্ণ-জীবনের চরম-সংবেদনশীল সত্যভামা-স্যমন্তকের কাহিনিটি তাঁদের কাছে উপন্যাস হয়ে গেছে। অবশ্য জীবনের সত্য অনেক সময়েই গল্প-উপন্যাসের চেয়েও বেশি রোমাঞ্চকর হয়। সেই কারণেই সত্যভামার সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ-ঘটনাকে বঙ্কিমের মতো যুক্তিবাদী ঔপন্যাসিকও স্বভাব-ভাবনায় উপন্যাস না বলে পারেন না। যা হোক দ্বিতীয় প্রমাণটা দিই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গবেষণার এই সূত্রটি যিনি এখানে দিয়েছেন তাঁর নাম না করলে অন্যায় হবে। সেকালের দিনের বিখ্যাত গবেষণা-পত্রিকা Indian Culture-এ ১৯৩৯ সালের এপ্রিল সংখ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু একটি অমূল্য গবেষণা-প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর লেখাটির নাম 'Sources of the two Krisna Legends.' এই নিবন্ধে পূর্বোক্ত গবেষক দেখিয়েছেন যে, পুরাণগুলি লেখা হবার বহু আগে থেকেই স্যমন্তক-সত্যভামা অথবা স্যমন্তক-অক্রুরের কাহিনি ঐতিহাসিকতার কারণেই লোকমুখে প্রচলিত ছিল। তার প্রমাণ আছে খ্রিস্টপূর্বকালে যাস্কের লেখায়। যাস্ক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর বিখ্যাত বৈয়াকরণ পাণিনির চেয়েও অনেক আগের মানুষ। তিনি একাধারে কোষকার এবং বৈয়াকরণ দুইই বটে। প্রধানত বৈদিক শব্দগুলির অর্থ এবং ধাতুপ্রকৃতি নিয়েই তার গ্রন্থ নিরুক্ত রচিত হয়েছে এবং বেদ পড়তে হলে শিক্ষা-কল্প ইত্যাদি যে ছয়টি বেদাঙ্গ জানতে হয়, তার সবশেষ হল ধাতু-প্রত্যয় জাত শব্দের বুৎপত্তি জানা। এই ব্যাপারটাকে সেকালের ভাষায় নিরুক্ত বলে। কিন্তু যাস্কের লেখা আস্ত গ্রন্থ-নামটাই এখানে বেদাঙ্গের মধ্যে ঢুকে গেছে। তাতে বোঝা যায় যাস্কের মান্যতা কতটা।

যাই হোক, সেই যাস্ক যিনি পুরাণ এবং পাণিনিরও বহু পূর্বকালের মানুষ, তিনি 'দণ্ড্য' শব্দটির অর্থ বোঝানোর জন্য প্রথমে একটি বাক্য গঠন করে উদাহরণ দিলেন 'দণ্ড্যঃ পুরুষঃ'। আমাদের ব্যাকরণের বুদ্ধিতে এই বাক্যের মানে হওয়া উচিত—দণ্ডযোগ্য কোনও মানুষ যাকে অপরাধের জন্য দণ্ড দিতে হবে। যাস্ক মানেন যে, দণ্ড্ দেওয়া বা শাস্তি দেওয়া অর্থে 'দণ্ড' ধাতুর প্রয়োগ তাঁর আমলে চালু হলেও তাঁর নিজের কালের আগের কোষকার উপমন্যু এবং তাঁর সম্প্রদায়ের গুরুরা দণ্ড্ ধাতুর অর্থ করেছেন দমন করা। এবং হয়তো বা উপমন্যুদের মতো কোষকার-বৈয়াকরণদেরও আগে আরও একটা অর্থ ছিল এই দণ্ড্ ধাতুর। যাস্ক লিখেছেন— দণ্ড শব্দটা দণ্ড্ ধাতু থেকে আসার একটা ইতিহাস আছে, অর্থাৎ দণ্ড্ ধাতুটাই অন্য ধাতু থেকে নিষ্পন্ন একটা ধাতু। নিরুক্তের মধ্যে যাস্ক দণ্ড শব্দ নিষ্পন্ন করার সময় পূর্বের ধাতুরূপটুকু বলেছেন বটে কিন্তু সেই ধাতুর সঙ্গে কোন প্রত্যয় যুক্ত করে দণ্ড শব্দ বা ধাতু নিষ্পন্ন হল সেটা লেখেননি। যাস্ক বলেছেন, দণ্ড শব্দ ধারণার্থক দদ্ ধাতু থেকে এসেছে— দণ্ডো দদতে ধারয়তিকর্মণঃ। অর্থাৎ ধারণ করা অর্থে দদ্ ধাতুর ব্যবহার আগে প্রচলিত ছিল এবং সেই দদ্-এর শেষে 'অনি' প্রত্যয় করে দণ্ড নামে একটা শব্দ তৈরি হল এবং সেটা ক্রিয়াপদ হিসেবেও সেটা ব্যবহৃতও হতে থাকল।

স্পষ্টতই বোঝা উচিত, দণ্ড শব্দ বা দণ্ড্ ধাতু নিয়ে আমাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আমাদের প্রমাণের জায়গাটা হল দদ্ ধাতুর ব্যবহার— 'দদতে' মানে ধারণ করছে—ধারয়তি। যাস্ক এখানে বেদ থেকে উদাহরণ দিতে পারতেন, কেননা বেদে ধারণ করা অর্থে দদতে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু তাতে আমরা ভাবতাম, এটা বিশেষভাবে বেদের মন্ত্রেই ব্যবহার করা হয়, সংস্কৃতের কথ্য বা লেখ্য ভাষায় এটা চলে না। ঠিক সেইজন্যই যাস্ক এমন একটা ঘটনার উদাহরণ দিলেন যা মৌখিক পরম্পরায় লোকে তখনও বলছে। বলছে যে এই রকমটা ঘটেছিল। যাস্ক লিখলেন— অক্রূর নামে একজন মণি ধারণ করেছেন— এইরকমটা লোকে এখনও বলে— অক্রূরো দদতে মণিম্ ইতি অভিভাষন্তে।

যাস্কের সময় নির্ধারিতভাবে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দ। সেই সময়ে জনসাধারণের মুখে এই কথা চলছে যে, অক্রূর মণিটা ধারণ করেছেন অর্থাৎ অক্রূরই মণিটা নিয়েছেন এবং ধারণ করেছেন। যাস্ক লিখিত নিরুক্তের প্রাচীন টীকাকার দুর্গসিংহ মণি বলতে অবশ্যই স্যমন্তক মণির কথা লিখেছেন এবং অক্রূর যে সেই স্যমন্তক মণিই ধারণ করেছিলেন সেটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন। কিন্তু সে-কথা পরে। আমরা শুধু বলব, যাস্ক লিখিত 'দদতে' ক্রিয়াপদটি যে ধারণ করা অর্থে ব্যবহার হত লৌকিক ভাষায় সেটা পুরাণকারদের সময়ে উঠে গেছে এবং তাঁরা 'দদতে' পদটাকে 'আদান' বা গ্রহণ করা অর্থে ব্যবহার করে লিখেছেন 'জগ্রাহ'— অর্থাৎ গ্রহণ করলেন, ঠিক যেমনটি বিষ্ণুপুরাণে অক্রূরের সম্বন্ধে বলা হয়েছে— অক্রূর স্তন্মণিরত্নং জগ্রাহ— অক্রূর সেই মণিরত্ন গ্রহণ করলেন। এখানে ধারণের জায়গায় গ্রহণ করা ছাড়া অর্থের আর কোনও পার্থক্য নেই। ওদিকে হরিবংশ যখন এই একই প্রসঙ্গের বর্ণনা দিয়েছে, তখনও কিন্তু একবার লিখেছে 'আদায়'। মানে, গ্রহণ করে (করিয়া), যা কিনা দদ্ ধাতুর শব্দস্মৃতিই শুধু বহন করে। তা ছাড়া হরিবংশ সোজাসুজি ধারণ অর্থে 'ধারয়ামাস' শব্দটাও প্রয়োগ করেছে, অর্থাৎ হরিবংশ 'দদতে' ক্রিয়াটির ধারণার্থক ভাবনাটা মাথায় রেখেছে।

যাস্ক লিখেছেন, ধারণ করা অর্থে দদ্ ধাতুর উদাহরণ হিসেবে লোকে যে বাক্যটা উচ্চারণ করে, তা হল, অক্রূর মণি ধারণ করেছেন— অক্রূরো দদতে মণিম্ ইতি অভিভাষন্তে। 'অভিভাষন্তে' মানে লোকে বলে। আমাদের বক্তব্য এতেই বোঝা যায়। স্যমন্তক মণির সম্পূর্ণ কাহিনিটাই কৃষ্ণের জীবনে এতটাই এক ঐতিহাসিক সত্য ছিল যে, সেটা আমাদের প্রাচীন মৌখিক পরম্পরা বা oral tradition-এর মধ্যে এসে গেছে এবং আমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি পৌরাণিক কথক ঠাকুরেরা সেই লোক-পরম্পরার মৌখিকতা থেকে মণি-কাহিনির উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

গবেষক যোগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তে এসে বলেছেন যে, যাস্কের উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিটি— অক্রূরো দদতে মণিম্, এটি কোনও বহু পুরাতন কোনও প্রচলিত শ্লোকের একাংশ। এই পুরাতন শ্লোকগুলিকে বলা হয় গাথা। বস্তুত পুরাণগুলি তো বটেই এমনকী মহাভারতও এই ধরনের অতি পুরাতন গাথাগুলি নিজেদের লেখ্য অংশের মধ্যে প্রায় অবিকৃতভাবে ব্যবহার করে থাকে। যাস্ক ব্যবহৃত পঙ্‌ক্তিটি শুনলেও মনে হয় যে এটি ছন্দোবদ্ধ কোনও প্রাচীন গাথার একাংশ। গবেষক যোগেন্দ্রনাথ মনে করেন— স্যমন্তক মণির কাহিনি যেহেতু বৃষ্ণিবংশীয় সত্রাজিতের প্রসঙ্গেই সর্বদা উচ্চারিত, তাই এই গাথাংশটি might have formed a part of family ballad or the gatha of the Vrisnis which used to be sang on ceremonial occasions. গবেষকের এই প্রমাণে আমরাও বোঝাতে চাইছি, স্যমন্তক মণি নিয়ে অন্ধক-বৃষ্ণি-ভজমান ইত্যাদি গোষ্ঠীর যে গণ্ডগোল তৈরি হয়েছিল এবং তাতে শেষ পর্যন্ত সত্রাজিতের মণি কীভাবে শেষ পর্যন্ত অক্রূর ধারণ করলেন, সেই কাহিনিটাই একেবারে সংক্ষিপ্তসার হিসেবে যাস্কের কালেও পূর্বপ্রচলিত ওই গাথার মধ্যে ধরা পড়েছে। আর যাস্ক এখানে ভীষণই বিশ্বাসযোগ্য, কেননা তিনি পৌরাণিক নন, তিনি স্যমন্তক মণির কাহিনি বা সত্যভামার বিবাহ-সংবাদও লিখতে বসেননি। নিতান্ত অপ্রসঙ্গে, দণ্ড শব্দের নিরুক্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচার করার সময় অন্য এক ক্রিয়াপদের উদাহরণ দিতে গিয়ে এক ঐতিহাসিক সত্য তিনি উদ্‌ঘাটন করে ফেলেছেন।

কাহিনির প্রস্তাবে আমরা পূর্বে যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম— অর্থাৎ শতধন্বাকে মেরে কৃষ্ণ মণি পেলেন না, অথচ মণি স্বচক্ষে না দেখে নিজের দাদা বলরাম কৃষ্ণকেই সন্দেহ করতে আরম্ভ করলেন, এমনকী তিনি রাগ করে চলেও গেলেন মিথিলায়— এই অবস্থায় কৃষ্ণ ম্লান মুখে ফিরলেন দ্বারকায়, আর অক্রূর একটার পর একটা যজ্ঞ করে যেতে লাগলেন ষাট-বাষট্টি বছর ধরে। এই ঘটনাগুলি কৃষ্ণের জীবনে একটা বিরাট অশান্তি তৈরি করেছিল। ঘরে সত্যভামার কাছে তিনি নিশ্চয়ই অস্বস্তিতে ছিলেন, সত্রাজিতের মৃত্যুর পর সেই মণি উত্তরাধিকার সূত্রে সত্যভামারই পাবার কথা। অথচ ঢাকঢোল পিটিয়ে শতধন্বাকে বধ করেও কৃষ্ণ মণি এনে দিতে পারলেন না সত্যভামার কাছে। ওদিকে দাদা বলরাম, যিনি কোনও দাবিদারই ছিলেন না মণির, তিনিও কৃষ্ণের কথায় প্রভাবিত হয়ে শতধন্বার হত্যার সহায় হলেন অথচ মণিটি চোখে দেখলেন না। আর ওদিকে যিনি মণি নিয়ে বসে রইলেন, তিনিও মণির বৈভব প্রকট করতে না পেরে মৃত্যুভয়ে যজ্ঞ করতে লেগেছেন। কৃষ্ণের মতো ধুরন্ধর মানুষও মাথা খাটিয়ে বুঝতে পারছেন না যে, মণি কোথায় গেল?

এত অশান্তির মধ্যে বছর তিনেক পরে একটু সুবিধে হল কৃষ্ণের। সমগ্র যাদবকুল একসময় বুঝল যে, মণিহরণের সঙ্গে অন্তত কৃষ্ণের কোনও যোগ নেই আর তাতেই বৃষ্ণিদের প্রবর মন্ত্রী উদ্ধব, দ্বারকা-মথুরার রাজোপাধিধারী উগ্রসেন, এঁরা সবাই বিদেহ-মিথিলায় গিয়ে বলরামকে অনেক বোঝালেন, অনেক যুক্তি দিয়ে তাঁর বিশ্বাস উৎপাদন করলেন এবং অনেক শপথ করে তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন দ্বারকায়। এদিকে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। দ্বারকায় ভোজবংশীয় প্রধানেরা অক্রূরের সমর্থক ছিলেন। তাঁরা করলেন কী, কৃষ্ণের সমর্থক সাত্বতবংশীয়দের জ্ঞাতিগুষ্টির এক প্রধান এবং তিনি মহারাজ সাত্বতের প্রপৌত্র, তাঁর নাম শত্রুঘ্ন— এই শত্রুঘ্নকে মেরে ফেললেন অক্রূর-পক্ষের ভোজেরা। আগেই বলেছি, দ্বারকায় চলত সঙ্ঘপ্রধানদের শাসন, এখানে লতায়-পাতায় অনেক জ্ঞাতিগুষ্টির মধ্যেই চোরাগোপ্তা বিবাদ চলত। আর সাত্বতবংশীয়দের ওপর কৃষ্ণের প্রীতি একটু বেশিই ছিল— ভাগবতে তাঁকে বলা হয়েছে— সাত্বতকুলের প্রধান— ভগবান সাত্বতাং পতিঃ। সেই সাত্বতকুলের একজন যখন অক্রূর-পক্ষের ভোজদের হাতে খুন হলেন, তখন অক্রূর একটু ভয় পেলেন— চোরের মন বলে কথা। তিনি ভোজকুলের আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে পালিয়ে গেলেন অন্যত্র— দ্বারকামপহায় অপক্রান্তঃ।

এর আগে আমরা স্যমন্তক মণির প্রসঙ্গে জানিয়েছিলাম যে, এই মণি যেখানে থাকত, সেই রাজ্যে অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি-দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ হত না। কিন্তু অক্রূর যেই পালিয়ে চলে গেলেন, তার পরদিন থেকেই দ্বারকায় অনাবৃষ্টি, মড়ক, পশুভয়— এইসব নানান ঝামেলা আরম্ভ হয়ে গেল। দ্বারকায় কৃষ্ণ-বলরাম-উগ্রসেন এবং অন্যান্য কুল সঙ্ঘের প্রধানদের নিয়ে 'মিটিং' আরম্ভ হল। সঙ্ঘরাষ্ট্রে এমনটাই হয়। সেখানে অন্ধক বংশের এক বৃদ্ধ অক্রূরের পিতার অনেক সুখ্যাতি করে বললেন, অক্রূরের পিতা যেখানে থাকতেন, সেরাজ্যে কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ হত না। অক্রূর যেখানে থাকবেন সেখানেও

প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় না। অতএব অক্রূরকে রাজ্যে ডেকে আনা হোক, তার কোনও অন্যায় এবং অপরাধ উচ্চারণ করবার প্রয়োজন নেই। তিনি আসলে যদি দেশের এতটা উপকার হয়, তবে তাঁকে নিয়ে আসাটাই বেশি প্রয়োজন— অলমত্রাতিগুণবতি অপরাধান্বেষণেন ইতি।

এই কথোপকথন থেকেই স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, এই অন্ধক বৃদ্ধ অক্রূরের হয়ে কথা বলছেন, কিন্তু তাঁর কথায় হঠাৎই অক্রূরের পিতার মধ্যে স্যমন্তক মণির গুণগুলি আরোপিত হওয়ায় একদিকে যেমন সভায় অনুচ্চারিত অক্রূরের ঘরে-থাকা স্যমন্তক মণির ইঙ্গিতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তেমনই অক্রূরের কোনও দোষ না দেখে তাঁকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনার প্রস্তাবে অক্রূরের কাছে স্যমন্তক মণি থেকে যাওয়ার ইঙ্গিতটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যাই হোক, দেশের এবং দশের প্রয়োজনে উগ্রসেন, বলরাম, কৃষ্ণ এবং অন্যান্য যাদবরা অক্রূরের সমস্ত অন্যায়-অপরাধ সহ্য করে তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিলেন এবং অক্রূর ফিরেও আসলেন দ্বারকায়। তিনি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে দ্বারকায় সবরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অনাবৃষ্টি, মড়ক, দুর্ভিক্ষ সব বন্ধ হয়ে গেল। কৃষ্ণ বুঝে গেলেন, যদু-সভায় 'মিটিং'-এ অক্রূরের পিতার যে গুণগান করা হয়েছিল, সেটা একেবারেই ছেঁদো কথা— স্বল্পম্ এতৎ কারণং যদয়ং গান্দিন্যাং শফল্কেন অক্রূরো জনিতঃ— আসল কথা, এটা স্যমন্তক মণির প্রভাব। কারণ সকলেই জানে যে, স্যমন্তক মণি যে রাজ্যে থাকে সেখানে কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় না। এসব যখন হঠাৎই অক্রূর ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে গেল, তা হলে এটা নিশ্চিত যে, সেই মহার্ঘ মণি অক্রূরের কাছেই আছে— তন্নূনম্ অস্য সকাশে স মহামণিঃ স্যমন্তকাখ্যস্তিষ্ঠতি।

কৃষ্ণ একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেলেন। বস্তুত মণির সঙ্গে জড়িত অনাবৃষ্টি-দুর্ভিক্ষ-মড়কের কাহিনি যদি বিশ্বাস নাও করি এবং এগুলিকে যদি লৌকিক পরিশীলনে তেমন গুরুত্ব নাও দিই, তবুও যদুসভায় অন্ধক-বৃদ্ধের যে প্রস্তাব ছিল— অক্রূরের কোনও দোষ দেখার প্রয়োজন নেই, তাঁকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনা হোক— এই প্রস্তাবেই কৃষ্ণের কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। তিনি সুচতুর বুদ্ধিমান লোক, লোকোত্তর চতুরতা থাকার ফলেই অন্যের চতুরতা ধরে ফেলতে তাঁর সময় লাগে না। তবুও যে এতদিন সময় লেগে গেল, তার কারণ সঙ্ঘ-শাসনের রাজনৈতিক তাৎপর্য। অক্রূর অন্ধক-বৃষ্ণিদের সঙ্ঘশাসনে অন্যতম প্রভাবশালী প্রবীণ নেতা। তাঁকে যখন-তখন চোরের অপবাদ দিয়ে রাজ্যের মধ্যে রাজনৈতিক সমস্যা তৈরি করা যায় না। বিশেষত শতধন্বার মতো নগণ্য জনের সঙ্গেও যে অন্যায় হয়ে গেছে, তার জন্য অনুতপ্ত ছিলেন কৃষ্ণ। তিনি আর একটা হত্যা করে রাজনৈতিক সমস্যা বাড়াতে চাননি। কিন্তু এখন তিনি বুঝে গেছেন তাঁর নিজের স্ত্রী সত্যভামার প্রতি অক্রূরের যে এত আকর্ষণের কথা তিনি শুনেছেন, তা সত্যভামার জন্য মোটেই নয়, তা প্রধানত স্যমন্তক মণির জন্য। বরঞ্চ সত্যভামার প্রতি প্রেমে যে সত্যিই কাতর ছিল, সে বেচারা শতধন্বা তাঁর হাতে অহেতুক মারা পড়েছে। কৃষ্ণ এখন বুঝে গেছেন যে, অক্রূর কেন একটার পর একটা যজ্ঞ করছিলেন নিজের প্রতি আক্রমণ রোধ করার জন্য, কেন তাঁর পক্ষের একটি মানুষ অক্রূরের দলের হাতে মারা পড়তেই অক্রূর অন্য রাজ্যে পালিয়ে যান। কই তিনি তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শতধন্বাকে মারার পরেও পালাননি। কৃষ্ণ বুঝেছেন, সবকিছু অক্রূর করেছেন ওই স্যমন্তক মণি নিজের অধিকারে রাখার জন্য। নইলে তিনি বাইরে নিজের বৈভব-ঐশ্বর্য প্রকট করতে পারছেন না, অথচ যজ্ঞের পর যজ্ঞ করে সাধু সেজে বসেছিলেন সকলের চোখে, সব ওই স্যমন্তক মণির জন্য— অয়মপি যজ্ঞাদনন্তরম্ অন্যৎ ক্রত্বন্তরং, তস্মাদ্ যজ্ঞান্তরং যজতীতি। অল্পোপাদাঞ্চাস্য। অসংশয়ম্ অত্রাসৌ বরমণিস্তিষ্ঠতীতি।

অক্রূর ফিরে এলেন দ্বারকায়। এবার কৃষ্ণ ভাবলেন কীভাবে তাঁর নিজের অপবাদটুকু দূর করা যায়। শ্বশুরহন্তা শতধন্বাকে মেরে তিনি সত্যভামার উদ্যত ক্রোধ কিছু শান্ত করতে পেরেছেন বটে, কিন্তু পিতা সত্রাজিতের স্যমন্তক মণির উত্তরাধিকার তিনি সত্যভামাকে ফিরিয়ে দিতে পারেননি। অন্যদিকে দাদা বলরাম চোখের সামনে দেখলেন— শতধন্বা মরল কৃষ্ণের হাতে অথচ তার কাছ থেকে মণি ফিরে পেলেন না কৃষ্ণ। তিনি কৃষ্ণকে অবিশ্বাস করেছেন। কৃষ্ণ তাই ঠিক করলেন— অক্রূর লোকটাকে সবার সামনে 'এক্সপোজ' করতে হবে— মণি ফিরে পান আর না পান। এতসব ভেবেই একদিন তিনি দ্বারকার সমস্ত কুলপ্রধান যাদব-বৃষ্ণি-অন্ধকদের আমন্ত্রণ জানালেন নিজের বাড়িতে— সকল-যাদব-সমাজম্ আত্মগেহে এবাচীকরৎ। সভায় উপস্থিত সকলের সঙ্গে নানা কথা বলে কৃষ্ণ অক্রূরের সঙ্গে খানিক হাস্য-পরিহাস করে পরিবেশটাকে প্রথমে লঘু করে দিলেন। তারপর সময় বুঝে হঠাৎই কৃষ্ণ অক্রূরকে বললেন, দেখুন আমরা সকলেই জানি যে, ত্রিজগতের সার সেই স্যমন্তক মণিটি শতধন্বা আপনার কাছেই রেখে গেছে— শতধন্বনা অখিল-জগৎ-সারভূতং স্যমন্তকরত্নং ভবতঃ সকাশে সমর্পিতম্। না-না, আপনার কোনও দুশ্চিন্তা নেই। ওই মণিতে দেশের-দশের উপকার হয়, ওটা আপনার কাছে আছে এবং তা আপনার কাছেই থাকুক— তদেতদ্ রাষ্ট্রোপকারকং ভবতঃ সকাশে তিষ্ঠতীতি তিষ্ঠতু— আমাদের কোনও সমস্যা নেই, মণিরত্নের উপকারফল আমরা সবাই ভোগ করছি। আপনি শুধু একটা উপকার করুন আমার। আমার প্রিয় দাদা বলরাম এইরকম একটা সন্দেহ করেন যে, মণিটা আমার কাছে আছে। তাঁর ভাবটা এই যে, আমি শতধন্বাকে মেরে মণিটা আমার ঘরেই লুকিয়ে রেখেছি। আমার তাই একান্ত অনুরোধ যে, আপনি মণিটি একবার সবাইকে দেখান এবং তারপর না হয় আপনার কাছেই রেখে দিন— এষ বলভদ্রোঽস্মান্ আশঙ্কিতবান্ তদস্মৎপ্রীতয়ে দর্শয়।

অক্রূর মহা সমস্যায় পড়লেন। ভাবলেন, মণির ব্যাপারে যদি অন্যরকম বলি, তা হলে একবার যদি শরীর-অন্বেষণের দিকে যায়, তবে এক পরত দেহাবরণের তলাতেই তো মণি পেয়ে যাবে— তৎ কেবলাম্বর-তিরোধানম্ অন্বিষ্যন্তো রত্নমেতে দ্রক্ষ্যন্তীতি। কিন্তু সেই মিথ্যে তাঁর সম্মানের পক্ষে তখন বড় বেশি কঠিন হয়ে উঠবে। এতসব চিন্তা করেই শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের প্রত্যক্ষে সকলের সামনেই বললেন— আমার সেই স্যমন্তক মণি, শতধনু আমাকে দিয়ে গিয়েছিল— মমৈতৎ স্যমন্তকমণিরত্নং শতধনুষা সমর্পিতম্। এবারে কৃষ্ণকে উদ্দেশ করে অক্রূর বললেন, শতধন্বা মারা যাবার পর আপনি মণিটি 'আজ চাইবেন কাল চাইবেন' এইরকম ভেবে মণিটি আর দেওয়া হয়নি, সেটা আমি অনেক কষ্টেই এতকাল ধারণ করে বসেছিলাম— অতিকৃচ্ছ্রেণৈতাবন্তং কালমধারয়ম্। অনেক কষ্টেই এইজন্য যে,

এই মণির জন্য আমি কোনওরকম ভোগবিলাস এতদিন করতে পারিনি। এই মণি আমার কাছে থাকার জন্য যে ঐশ্বর্য-সুখ আমি ভোগ করতে পারতাম, তার একাংশও আমি ভোগ করতে পারিনি। অথচ মণিটি ধারণ করলে আপনি যদি কিছু ভাবেন, যদি ভাবেন এটা রাষ্ট্রের উপকারে লাগত, অথচ সেটা প্রকটভাবে বলাও যাচ্ছে না, বোঝানোও যাচ্ছে না— এত সব ভেবে আমি কিছু আর বলিনি। এখন এই স্যমন্তক মণি আপনি গ্রহণ করুন, এটা নিয়ে নিজের কাছেই রাখুন বা যাকে ইচ্ছে দিন, কিন্তু এটা এবার আপনি নিন— তদিদং স্যমন্তকরত্নং গৃহ্যতাম্, ইচ্ছয়া বা যস্যাভিমতং তস্য সমর্প্যতাম্।

এই কথোপকথন থেকে বোঝা যায় যে, শতধন্বার মৃত্যুর পরে অক্রূরের কাছেই যে স্যমন্তক মণি ছিল, সেটা কৃষ্ণ কোনও না কোনওভাবে আন্দাজ করেছিলেন, কিন্তু সঙ্ঘশাসনের রাজনৈতিক শিষ্টাচার মেনেই অক্রূরের মতো প্রবীন নেতাকে মানসিক আঘাত দেননি তিনি। কিন্তু এতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে অনেক যন্ত্রণা তৈরি হয়েছে। স্ত্রী সত্যভামার কাছে জবাবদিহির দায় ছাড়াও অতি নিকট বলরামের কাছে তিনি চোর বলে প্রতিপন্ন। ফলে আজ যখন সমস্ত মান-অপমানের ঊর্ধ্বে উঠে অক্রূর তাঁর অধর বস্ত্রের অন্তরাল থেকে মণিটি বার করে এনে সমগ্র যাদব-সমাজের চক্ষুর সামনে রাখলেন তখন সমস্ত সভা যেরকম মণিপ্রভায় কান্তিমতী হয়ে উঠল, তেমনই উজ্জ্বল হয়ে উঠল কতগুলি মুখ। অক্রূর মণিটি সবার সামনে রেখে বললেন, এই সেই স্যমন্তক মণি, যা শতধন্বা আমাকে দিয়েছিল। এবার তিনি গ্রহণ করুন এই মণি, যাঁর সঠিক অধিকার আছে এই মণির ওপর— যস্যায়ং স এনং গৃহ্নাতু ইতি।

মণির ওপর সত্যভামারই তো অধিকার আসে সবার আগে এবং সবার ওপরে। কিন্তু সমগ্র এই কাহিনি জুড়ে আমরা কোথাও এই স্যমন্তক মণির ওপর তাঁর উদগ্র আগ্রহ দেখিনি। মুখে কোনওদিন বলেননি যে, মণিটি আমার বাবার ছিল, অতএব মণি ধারণ করার কথা আমারই। অথচ অগ্রজ বলরামকে একবার গৌরবে দ্বিবচন প্রয়োগ করে কৃষ্ণ বলেছিলেন, আমার শ্বশুর মারা যাবার পর এ-মণি এখন আমাদের দু'জনের, তাতেই বলরাম মণির ওপর এতটাই অধিকার বোধ করেছিলেন যে, তিনি কৃষ্ণকেই সন্দেহ করে বসেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে কৃষ্ণ এই মণির ব্যাপারে এতটুকুও আগ্রহী ছিলেন বলে আমরা মনে করি না এবং তাঁর ক্রিয়াকর্মও বহুল সুদূরপ্রসারী ভাবনার সঙ্গে যুক্ত, ফলে মণি-সংগ্রহের জন্য তাঁর সমস্ত চেষ্টাই ব্যক্তিগত প্রয়োজনে চালিত ছিল না। কিন্তু আজ যখন মণিটি সবার সামনে রেখে অধিকারী-নির্ণয়ের প্রশ্ন উঠল, তখন প্রথম উজ্জ্বল হয়ে উঠল বলরামের মুখ। তিনি পূর্বকথা স্মরণ করে ভাবলেন, কৃষ্ণের সঙ্গে আমারও সহভোগ্য এই মণির সম্পদ। অতএব মণির ব্যাপারে তিনি আগ্রহী বোধ করতে লাগলেন। কিন্তু এখন এই প্রান্তভূমিতে এসে যখন মণির অধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, তখন কিন্তু সত্যভামাও ভাবলেন, এই স্যমন্তক আমার বাপের জিনিস, আমার পিতৃধন, অতএব এটা আমারই হওয়া উচিত। অতএব সত্যভামা চাইলেন মণিটি তাঁর হাতেই দেওয়া হোক--- মমৈবেদং পিতৃধনমিতি অতীব চ সত্যভামাপি স্পৃহয়াঞ্চকার।

বিষ্ণুপুরাণ প্রাচীন গদ্যে লিখেছে, দাদা বলরাম এবং স্ত্রী সত্যভামা— এই দুয়ের মণি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাসনার দ্বৈরথে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণের অবস্থাটা দাঁড়াল দুটি চাকার মধ্যে পিষে যাবার মতো— কৃষ্ণোঽপি আত্মানং চক্রান্তরাবস্থিতম্ ইব মেনে। কিন্তু সরল দাদা বলরামের সঙ্গে এবং প্রিয়তমা পত্নী সত্যভামার সঙ্গেও অন্তঃকলহ থেকে বাঁচার জন্য সুচতুর কৃষ্ণ সভার মাঝখানে দাঁড়িয়ে স্যমন্তক মণির অধিকারী নির্ণয় করে নিলেন প্রথমে এবং তাতেই বুঝিয়ে দিলেন যে, হ্যাঁ, তোমাদের মনের ইচ্ছা আমি বুঝেছি। তিনি অক্রূরকেই বললেন, দেখুন আমাদের এই যদুসমাজের সামনে এই মণিটি দেখানোর প্রয়োজন ছিল এই কারণেই যে, এতে আমার নামে অপবাদটুকু ঘুচে গেল এবং সকলে জানল যে, অন্তত আমি কোনও দিন এই মণি নিজের কাছে রাখিনি। এই মণির আসল অধিকারীর কথা বলতে গেলে বলা উচিত যে, আমাদের ঘরে এই মণি এলে আমার এবং বলরামের সমান অধিকার থাকবে মণির ওপর— এতচ্চ মম বলভদ্রস্য চ সামান্যম্। আর প্রকৃত উত্তরাধিকারীর কথা বললে মণি পাবার যোগ্য হলেন একমাত্র সত্যভামা। কেননা, এটা তাঁর পিতৃধন, এখানে আর কারও অধিকার আসে না— পিতৃধনঞ্চৈতৎ সত্যভামায়া নান্যস্য।

কথাগুলি বলেই কৃষ্ণ তাঁর এতদিনের অভিজ্ঞতার স্মৃতিতে ক্ষণিক অবগাহন করলেন। তিনি বুঝেছেন যে, এই মণির মহার্ঘতা এবং মণিজন্য ঐশ্বর্য যে মত্ততা তৈরি করতে পারে, তাতে নিজেদের ঘরের মধ্যেই অন্তঃকলহ সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে। সেই বিপদ এড়ানোর জন্যই কৃষ্ণ বললেন, দেখুন এই মণি ধারণের জন্য যে শুচিতা এবং ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজন হয়, তা আমার নেই। আমি এতগুলি বিবাহ করেছি, তাতে শুচিতা আর ব্রহ্মচর্যের কথা আর কী করে বড়াই করে বলি, আমার ষোলো হাজার বউ— অতোহমস্য ষোড়শ-স্ত্রী-সহস্র-পরিগ্রহাদ্ অসমর্থো ধারণে। একই কারণে আমার স্ত্রী সত্যভামাই বা এই মণি ধারণ করবেন কোন ব্রহ্মচারিতার মাহাত্ম্যে— কথঞ্চৈতৎ সত্যভামা স্বীকরোতু। আর আমি দাদা বলরামের কথাই বা কী বলব? তিনি কি আর এই বয়সে এসে এতকালের অভ্যস্ত মদ্যপানের অভ্যাস ত্যাগ করবেন— বলভদ্রেণাপি মদিরাপানাদ্যশেষোপভোগ-পরিত্যাগঃ কথং কার্য্যঃ? মণিধারণের ব্যাপারে উত্তরাধিকার বিকল্পের নিরসন করেই কৃষ্ণ অক্রূরকে বললেন, আমাদের তিনজনের তরফেই আমি আপনাকে জানাচ্ছি, আপনার কাছেই থাকুক এই স্যমন্তক মণি, তাতেই সমগ্র রাষ্ট্রের উপকার। এই মণিধারণে আপনিই সমর্থতম। কৃষ্ণের কথা শুনে অক্রূর আবারও গ্রহণ করলেন স্যমন্তক মণি, এতদিন লোকভয়ে বাইরে যা প্রকট করতে পারতেন না, এবার নির্দ্বিধায় সেই মণিরত্ন ধারণ করলেন অক্রূর— তথেত্যুক্ত্বা জগ্রাহ তন্মহামণিরত্নম্। বিষ্ণুপুরাণের ক্রিয়াপদ— জগ্রাহ— গ্রহণ করলেন— স্মৃতিতে থাকল যাস্কের লেখা লোকপ্রবাদ, অক্রূরই মণি ধারণ করলেন— অক্রূরো দদতে মণিম্।

অক্রূরকে মণি দিয়ে দেবার ফলে মণির প্রকৃত উত্তরাধিকারী সত্যভামা কোনও ক্ষোভ করেছিলেন কিনা, সেটা বিষ্ণুপুরাণ-হরিবংশ কেউই বলেনি। কিন্তু এতাবৎ কাহিনিটা প্রমাণ করে যে, নেতিবাচকভাবে হলেও এই স্যমন্তক মণির সঙ্গে সত্যভামার জীবন বহুলাংশে জড়িত এবং কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বিবাহ-সঙ্ঘটনার মূলেও এই স্যমন্তক মণি। কিন্তু বৈবাহিক জীবনে কৃষ্ণের মধুর সঙ্গ তাঁকে এতটাই মুগ্ধ রেখেছিল যে, পিতার সম্পত্তি নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো স্থূলতা তিনি কখনও দেখাননি। কিন্তু সেটা অন্য কথা। স্যমন্তক মণির

কাহিনি-চমৎকারে সত্যভামার মতো 'সেনসেশনাল' মহিলার জীবন-চমৎকারিতাই ঢাকা পড়ে গেছে। বিশেষত পুরাণগুলি মূলত তথা ঐতিহ্যগতভাবে সংরক্ষণশীল বলেই সেই যে একবার মাত্র সত্যভামার কথা বলতে গিয়ে বলেছিল, তাঁকে অক্রূর-কৃতবর্মা-শতধন্বার মতো গুরুত্বপূর্ণ যাদবজনেরাও ভীষণভাবে কামনা করতেন, কিন্তু তারপরে আর সত্যভামার 'সেনসেশন' নিয়ে আর কথা বলেনি। বলেনি তার কারণ, কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়ে গেছে এবং বিবাহোত্তর জীবনে কৃষ্ণের প্রিয়তমা স্ত্রীর ওপরে অন্যের আকর্ষণ ছিল— এ-কথায় বেশি কথা হয়ে গেলে লোকসমাজে কৃষ্ণের মর্যাদা নষ্ট হত। কিন্তু আমরা বলব, স্যমন্তক মণি তো বটেই, তার সঙ্গে সত্যভামাও যে বেশ খানিকটা সংকটের ঝড় তুলে দিয়েছিলেন কৃষ্ণের জীবনে, তার একটা বড় প্রমাণ আছে মহাভারতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মহাভারত কিন্তু কৃষ্ণের পূর্বজীবন বা বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে ব্যয়িত কোনও মহাকাব্য নয়। পাণ্ডব-কৌরবের মুখ্য ইতিহাসের মধ্যে এখানে কৃষ্ণের জীবন-কথা মাঝে মাঝে এসে যায়। ঠিক যেমন রুক্মিণীর স্বয়ংবর-পর্ব সেইভাবে কোনও প্রচলিত বিস্তারে আলোচিত না হলেও মাঝে মাঝে যেমন তার সূত্র পাই মহাভারতেও, তেমনই সত্যভামা এবং স্যমন্তক সম্বন্ধে বিস্তারিত কোনও বিবরণ মহাভারতে না থাকলেও এই দুটি নিয়ে যে গৃহবিবাদ শুরু হয়েছিল এবং দীর্ঘ ষাট বছর ধরে কৃষ্ণকে তার ফল পোয়াতে হয়েছিল, তারও একটা সূত্র পাই মহাভারতে। আমরা বিষ্ণুপুরাণ এবং হরিবংশে দেখেছি, শতধন্বার কাছ থেকে মণি পাবার সময় থেকে মণিটি শেষ পর্যন্ত অক্রূরের হাতে দেওয়া পর্যন্ত ষাট বছর সময় চলে গেছে। শেষে কৃষ্ণ অক্রূরকে বলেছিলেন, আজকে প্রায় ষাট বছর হয়ে গেল, আমি এই মণির জন্য ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম। আগেকার সেই রাগের তীব্রতা হয়তো এখন আর নেই, কিন্তু তবু সেই রাগ আমার মনের মধ্যে এখনও ধিকি ধিকি জ্বলছে— স সংরূঢোঽসকৃৎপ্রাপ্তস্ততঃ কালাত্যয়ো মহান্।

মহাভারতে প্রসঙ্গটা একেবারেই অন্য। শান্তিপর্বে শরশয়ান ভীষ্ম গণরাজ্য অথবা সঙ্ঘশাসনের শক্তি বোঝানোর জন্য কৃষ্ণ এবং নারদের একটি সংলাপ উদ্ধার করেছেন। সেখানে প্রসঙ্গটা এই যে, সঙ্ঘশাসনের একতা টিকিয়ে রাখার জন্য কৃষ্ণকে কতটা সইতে হয়েছে। কথার ভাবেই বোঝা যায় প্রায় বৃদ্ধ অবস্থায় কৃষ্ণ নারদের কাছে আপন জীবনের দুঃখ কষ্টের কথা বলছেন এবং সে-কথায় এই ভাবই ফুটে ওঠে যে, আত্মীয়-স্বজনের জন্য কতটা 'স্যাক্রিফাইস' তাঁকে করতে হয়েছে। ঠিক এই বক্তব্যের মধ্যেই সত্যভামা এবং স্যমন্তকের জন্য যে ভয়ংকর ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছিল, তার সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ছায়াটুকু পরিষ্কার ধরা পড়ে। কৃষ্ণ নারদকে বলেছেন, এই যে দেখছ আমার সব জ্ঞাতিগুষ্টি, এরা আমাকে খুব ক্ষমতাশালী বলে মনে করে, এমনকী মুখে এমন ভাব করে যেন আমি এদের ভগবান, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই জ্ঞাতিগুষ্টির চাকরের মতো থাকতে হয় আমাকে— দাস্যম্ ঐশ্বর্যবাদেন জ্ঞাতীনাং তু করোম্যহম্। ধন-সম্পত্তির যে উপায়-আদায় আমি নিজে করি, তার অর্ধেক ভোগ করি আমি, আর বাকি অর্ধেক যায় জ্ঞাতিগুষ্টির ভোগে, কিন্তু আমার লাভটা এই যে, তবুও তাঁদের বাঁকাচোরা কথা সব আমাকে সহ্য করতে হয়— অর্ধং ভোক্তাস্মি ভোগানাং বাক্‌দুরুক্তানি চ ক্ষমে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্ঞাতিগুষ্টির মধ্যে এই ধরনের সম্পর্ক খুব নতুন নয়, এখানে বৃহৎ মহৎ ব্যক্তি-মানুষের সহ্যশক্তির উদাহরণও আছে। কিন্তু কৃষ্ণ এবার একান্তভাবে নিজের নিকট জন, প্রায় পারিবারিক কথা শুনিয়ে বলছেন, এই যে আমার দাদা বলরাম, নিজের শক্তি এবং ক্ষমতায় নিজেই তিনি এত মত্ত যে, কাউকে তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেও আনেন না, আর আমার ছোট ভাই গদ, তাঁকে দেখতে সুন্দর সবাই জানে, কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যে সে নিজেই পাগল হয়ে আছে— বলং সংকর্ষণে নিত্যং সৌকুমার্যং পুনর্গদে। তবে ছোট ভাইয়ের দোষ দিই কেন শুধু, আমার নিজের ছেলের দোষও এখানে একইরকম, এই যে আমার প্রদ্যুম্ন, সেও আপন রূপে আপনি মত্ত। এসব দেখে আর ভাল লাগে না আমার, আমি বড় অসহায় বোধ করি— রূপেণ মত্তঃ প্রদ্যুম্নঃ সোহসহায়োহস্মি নারদ। আসলে দাদা বলরামের যে অসীম শক্তিমত্তা অথবা প্রদ্যুম্ন তিনিও বিশাল অস্ত্রবিদ পুরুষ, কিন্তু এঁদের শক্তি বা যুক্তিনিষ্ঠ মতামত কখনওই কৃষ্ণের কাজে আসে না। যদি আসত, তবে বলরাম শতধন্বার মৃত্যুর পরেও কৃষ্ণকে বিশ্বাস করতেন, অথবা সব কিছু জানার পরেও কৃষ্ণের স্ত্রী সত্যভামার একান্ত উত্তরাধিকারে প্রাপ্য স্যমন্তক মণির ওপর ওইরকম অদ্ভুত আকর্ষণ প্রকট করে তুলতেন না বলরাম।

কৃষ্ণ এবার তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যার কথা বলছেন নারদকে এবং এখানে প্রচ্ছন্নভাবে স্যমন্তক মণি এবং সত্যভামার অন্তরীণ ছায়াটুকু আছেই। কৃষ্ণ বলেছেন, বৃষ্ণি-অন্ধক গোষ্ঠীর মধ্যে অনেকেই অনেক বড় মানুষ। কিন্তু তাঁদের মধ্যে আবার আহুক এবং অক্রূরকে নিয়ে আমার সমস্যার অন্ত নেই। (এখানে আহুক বলতে আহুকের ছেলে উগ্রসেনকে বোঝাচ্ছে। মহাভারত-পুরাণে অনেক সময়েই পিতা-পিতামহের নাম ব্যবহার করা হয়েছে অধস্তন পুরুষকে বোঝানোর জন্য। কৃষ্ণ কংসহত্যা করে উগ্রসেনকে রাজার সিংহাসনে বসিয়েছিলেন বলে হয়তো প্রবীণ নেতা অক্রূরের মনে কিছু ক্ষোভ ছিল এবং তদবধি আহুক উগ্রসেন এবং অক্রূরের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলছে।) কৃষ্ণ বলেছেন— সঙ্ঘ-শাসনে যে জ্ঞাতিগুষ্টির মধ্যে আহুক উগ্রসেন আর অক্রূরের মতো দুটি আত্মীয়-বন্ধু থাকবেন, তার থেকে জ্বালা বোধহয় আর কিছুতে নেই— স্যাতাং যস্যাহুকাক্রূরৌ কিন্নু দুঃখতরং ততঃ। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে আমি যদি সমাধান-সূত্র দিই, তা হলে আহুক উগ্রসেন বলবে, কৃষ্ণ অক্রূরের পক্ষ নিয়েছে আর অক্রূর বলবে, আমি আহুকের পক্ষ নিয়েছি। আমার এমন সমস্যা যে, একই সমাধানে দু'জনেই আমাকে বারণ করতে থাকে, অথচ সঠিক হলেও আমি একজনের সঙ্গেও সহমত হতে পারি না— দ্বাভ্যাং নিবারিতো নিত্যং বৃণোম্যেকতরং ন চ। অথচ সমস্যা এমনই অর্থাৎ বৃষ্ণি-অন্ধকদের কাছে এদের দু'জনেরই গুরুত্ব এতটা যে, এরা না থাকলেও চলবে না— যস্য চাপি ন তো স্যাতাং কিন্নু দুঃখতরং ততঃ।

আসলে স্যমন্তক মণি নিয়েও কৃষ্ণ এদের দু'জনের ঝগড়াতে ভুগেছেন এবং মাঝখানে সত্যভামা এবং সত্যভামার বাবা থাকায় এই ঝগড়াটা তাঁর জীবনের ব্যক্তিগত স্তরে এসে পৌঁছেছিল। কৃষ্ণ দেশের রাজা আহুক উগ্রসেনের জন্যই রাষ্ট্রোপকারসাধক মণিটি চেয়েছিলেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে সে মণি এল না, মাঝখান দিয়ে সত্যভামার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গেল। তাতে সমস্যা দ্বিগুণতর হল। কৃষ্ণ শতধন্বাকে মারতে পেরেছেন, সে নেহাৎই সত্যভামার গুণগ্রাহী এবং সত্রাজিতের হন্তা বলেই। কিন্তু তিনি অক্রূরের কেশাগ্রও স্পর্শ

করতে পারেননি যেহেতু তাঁতে সঙ্ঘ-শাসনের রাজনীতি জড়িত ছিল। অবশেষে তিনি শুধু অপবাদমুক্ত হতে পেরেছেন এবং সেটা স্যমন্তক মণি অক্রূরের কাছে রেখে দিয়ে এবং সত্যভামাকে না দিয়ে।

আমরা শুধু বলব, এই বিশাল রাজনীতি, খুন, সন্দেহ এবং এক বিরাট অশান্তির মধ্য দিয়েই কিন্তু সত্যভামাকে লাভ করেছেন কৃষ্ণ এবং হয়তো বা এতসব জটিলতা এবং অনভিমত পুরুষের প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়েই সত্যভামার বৈদগ্ধ্যের উপাদান তৈরি হয়েছে বলেই কৃষ্ণের দিক থেকেও তাঁকে পাবার মধ্যে যেন এক অলভ্যতা এবং বামতা ছিল, যাতে সত্যভামা প্রিয়তরা হয়ে উঠেছেন কৃষ্ণের কাছে। যে রমণী পিতৃহন্তাকে শায়েস্তা করার জন্য একাকিনী রথে চড়ে দ্বারকা থেকে বারণাবতে চলে গিয়েছিলেন কৃষ্ণের কাছে, তিনি যে অবগুণ্ঠিতা সাধারণী রমণীটি নন, তা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না। আর কৃষ্ণ বুঝি সত্যভামাকে ছাড়া এক দণ্ড তিষ্ঠোতে পারেন না, নইলে কোথায় সেই প্রাগজ্যোতিষপুরে নরকাসুরকে যুদ্ধ করে মারতে যেতে হবে, কৃষ্ণ তাঁর গরুড়-বাহনের পক্ষপুটে সত্যভামাকেও নিয়ে গেছেন প্রাগজ্যোতিষপুরে, মানে, আমেদাবাদ থেকে অসমে। এ-খবর আমাদের দিয়েছে 'নরকাসুর-বিজয়-ব্যায়োগ' নামে একটা নাটক গ্রন্থ। ধর্মসূরি নামে এক জৈনধর্মীর লেখা এই নাটকে সত্যভামা অত্যন্ত আধুনিকভাবে প্রগল্‌ভা। যুদ্ধস্থানে স্ত্রীলোকের যাওয়াটা যেখানে পরম্পরাগত কারণেই নিষিদ্ধ, সেখানে সত্যভামা বায়না করে কৃষ্ণের সঙ্গে যাচ্ছেন। বায়না মেনে পরে অবশ্য কৃষ্ণকে আমরা বিরক্ত দেখছি না, বরঞ্চ আগে নিষেধ করে অপরাধ করেছেন, তার জন্য গরুড়-বাহনের পক্ষপুটে তাঁকে কোলে বসিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেছেন কৃষ্ণ— অঙ্কে নিধায় দয়িতামিহ সত্যভামাম্‌। জৈন ধর্মসূরি সত্যভামাকে এইভাবে চিত্রিত করেছেন পুরাণ-মহাভারতে সত্যভামার প্রতি কৃষ্ণের অনুরাগ-পদ্ধতি দেখেই। সত্যভামার আবদার, সে তো মানতেই হবে। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে বলেছিলেন, পরিহাস করব না? সেই যে গৃহস্থের একমাত্র রমণীয় সুখ! কিন্তু সত্যভামার সঙ্গে পরিহাসের আগেই তিনি মানিনী হন। অতিরিক্ত আত্ম-সচেতনতা থাকলেও যদি সত্যভামা কাউকে ভালবেসে থাকেন, তবে সে কৃষ্ণ। কিন্তু এমন একটা ভালবাসার জন্য কৃষ্ণকে সবসময় এত সচেতন থাকতে হয়েছে যে, সে সুখ একমাত্র কৃষ্ণের মতো ভগবানই বোধহয় সহ্য করতে পারেন। গৃহস্থেরা এমন কী করলে লোকে তাকে বউ-চাটা পুরুষ বলে, সত্যভামার জন্য কৃষ্ণকেও তাই শুনতে হয়েছে। স্বর্গের দেবরাজ তাঁকে বলেছেন— বউয়ের আঁচল ধরা কৃষ্ণকে আমি কেমন করে ক্ষমা করব— অহো তং মর্ষয়িষ্যামি কিমর্থং স্ত্রীজিতং হরিম্‌? তবু সত্যভামার জন্য এই অপবাদ কৃষ্ণের কাছে সুখের মতো এক ব্যথা।

সেদিন দ্বারকার কাছেই রৈবতক পর্বতে এক উৎসবের আয়োজন চলছিল। মহারানি রুক্মিণী দেবী ব্রত-উপবাস সাঙ্গ করেছেন, সেই উপলক্ষেই এই উৎসব। ব্রাহ্মণরা এসেছেন, দান-ধ্যান হবে, মণ্ডা-মিঠাই খাওয়া হবে— সবাই খুব খুশি। কৃষ্ণ নিজের হাতে ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা বিলোলেন, জ্ঞাতিগুষ্টির সবাইকে কিছু না কিছু দিয়ে তুষ্ট করলেন। স্বামীর মঙ্গলের জন্য উপবাস-ক্লিষ্টা রুক্মিণীর পাশে বসে কৃষ্ণ তাঁকে অনেক আদর জানালেন, অনেক প্রশংসা করলেন। ঠিক এই সময়ে নারদ মুনি এসে উপস্থিত হলেন কোথা থেকে। কৃষ্ণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছ থেকে পাদ্য-অর্ঘ্য পাওয়ার পরেই তিনি স্বর্গ থেকে আনা একগুচ্ছ মন্দারমঞ্জরী উপহার দিলেন কৃষ্ণকে। কৃষ্ণ পাশে-বসা রুক্মিণীর হাতে সেই পারিজাত ফুলের উপহার তুলে দিতেই তিনি কৃষ্ণেরই ইঙ্গিতে— দদৌ কৃষ্ণেঙ্গিতানুগা— সেই পারিজাত গুঁজে দিলেন চুলের খোঁপায়। এক মুহূর্তে রুক্মিণীকে দ্বিগুণতর সুন্দরী মনে হল— শুশুভে দেবপুষ্পেণ দ্বিগুণং ভৈষ্মকী তদা।

পারিজাত ফুল বড় মহার্ঘ্য। তার গন্ধেরও শেষ নেই, গুণেরও শেষ নেই। এমন একটা ফুল কৃষ্ণ রুক্মিণীর হাতে তুলে দিলেন বলে নারদ তাঁকে খুব মাথায় তুলে দিলেন। নারদ বললেন, আজ আমি বুঝলাম কৃষ্ণের এতগুলি মহিষীর মধ্যে তুমিই তাঁর সবচেয়ে ভালবাসার জন। আজ তুমি তোমার সতীনদের অভিমানের গোড়ায় জল ঢেলে দিয়েছ— অবমানাবসেকেন ত্বয়া সিক্তাদ্য ভামিনি। আজ তোমার সমস্ত সতীনেরা সব অপমানে মাথা নিচু করে থাকবে, কেননা কৃষ্ণ তোমাকেই এই বিরল পুষ্পের উপহার দিয়েছেন। আর ওই যে সুন্দরী, সত্রাজিতের মেয়ে, সত্যভামা, যিনি কৃষ্ণের ভালবাসার অধিকারে নিজেকে সবার চেয়ে বেশি সৌভাগ্যবতী বলে গুমোর করেন, আজকে তিনি বুঝবেন কার ভাগ্যি বেশি— অদ্য সাত্রাজিতী দেবী জ্ঞাস্যতে বরবর্ণিনী। জাম্ববতী, গান্ধারী— এইসব মহিষীরা জীবনে আর কোনওদিন মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবে না। আজকে আমি বুঝলাম, কৃষ্ণের দ্বিতীয় আত্মাই হলে তুমি— আত্মা দ্বিতীয়ঃ কৃষ্ণস্য ভোজে ত্বমিতি ভামিনি।

রুক্মিণী তো নারদের কথায় আহ্লাদে ডগমগ হলেন; তিনি খেয়াল করলেন না যে,সত্যভামার গুপ্তচরী দাসীরা হেথায় হোথায় দাঁড়িয়ে নারদের রুক্মিণী-স্তুতি শুনে ফেলল। তারা সব গিয়ে সত্যভামাকে অনুপুঙ্খ 'রিপোর্ট' দিল। কৃষ্ণের অন্য মহিষীরাও এসব শুনেছেন, তবে রুক্মিণী সবার বড়, মহারানি বলে কথা, তার ওপরে প্রদ্যুম্নের মতো একটি ছেলের মা বলেও তিনি একটু বাড়তি সম্মান পান— অর্হেতি পুত্রমাতেতি জ্যেষ্ঠেতি চ সমাগতাঃ— তাঁরা আর ব্যাপারটা গায়ে মাখেননি। কিন্তু সত্যভামা, তাঁর রূপ আছে, যৌবন আছে এবং এখনও পর্যন্ত কোনও ছেলে নেই বলে নিজের রূপ-যৌবনের ওপরে বোধহয় একটু বেশিই ভরসা করেন তিনি। সবচেয়ে বড় কথা, কৃষ্ণ তাঁকে সদা-সর্বদা মাথায় তুলে রাখেন— রূপযৌবন-সম্পন্না স্বসৌভাগ্যেন গর্বিতা— এমন উৎকর্ষ নিয়ে তিনি জ্যেষ্ঠা বলে রুক্মিণীকে বাড়তি সম্মান দেবেন কেন? বিশেষত রুক্মিণীর ওপর তাঁর রাগ কীসের, তাঁর চিন্তা কৃষ্ণকে নিয়ে, সে কেন রুক্মিণীকে পাত্তা দেবে? পারিজাতের সংবাদ শোনামাত্র কুমকুম-লাল শাড়িখানি খুলে ফেলে— সমুৎসৃজন্তী বসনাং সকুমকুমম্— সত্যভামা একটা সাদা কাপড় পরলেন। তারপর রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে রৈবতকের অন্তঃপুরের কোনায় এক নির্জন ঘরে গিয়ে বসে রইলেন। রাগ হলে সত্যভামা আবার মাথায় একটা সাদা ফেট্টি বাঁধেন এবং কপালের চারপাশে লাগিয়ে দেন রক্তচন্দনের ছোপ, এটাই তাঁর রাগ জানান দেবার চেহারা— বদ্ধা ললাটে হিমচন্দ্রশুক্লং/দুকূলপট্টং প্রিয়রোষচিহ্নম্। দাসীরা দু-একবার চেষ্টা করল তাঁকে বাইরে নিয়ে যেতে, কিন্তু তিনি কিচ্ছুটি না বলে চুপ করে রইলেন, দীর্ঘ-দীর্ঘতর নিঃশ্বাস তাঁকে আন্দোলিত করছিল, হাতের কমল-কলি তিনি চটকে চটকে গুঁড়ো করে ফেললেন— বিচূর্ণয়ামাস কুশেশয়ং সা/নিঃশ্বস্য নিঃশ্বস্য নখৈর্নতভ্রূঃ।

খবর চলে গেল। কৃষ্ণ নারদের সামনে রুক্মিণীর পাশে বসে আছেন, এই অবস্থাতেও দাসদাসীরা তাঁকে খবর দিল কানে কানে। তারা বুঝেছিল, সত্যভামার এই কঠিন-করুণ অবস্থা বেশিক্ষণ চললে কৃষ্ণের যন্ত্রণা যত বাড়বে, তাদের যন্ত্রণা হবে ততোধিক। নারদ রুক্মিণীর সঙ্গে কথা বলছেন, 'অ্যাটেন্ড' করছেন, এই সুযোগ নিয়ে কৃষ্ণ একটা অজুহাত দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন সেখান থেকে— জগাম ত্বরিতশ্চৈব... ব্যপদেশেন ভারত। এই ব্যবহারে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, এটাও ভাবার কোনও কারণ নেই যে, ভবিষ্যতে যিনি মহাভারত-সূত্রধার হবেন, তিনি কিনা অজুহাত-অছিলা খুঁজে স্ত্রীর মান ভাঙানোর জন্য দৌড়চ্ছেন— জগাম ত্বরিতশ্চৈব। আর কৃষ্ণ তো এমনটাই চেয়েছিলেন। নিতান্তই অনুগত এবং স্বানুকূল এক গৃহিণীকে আলিঙ্গন করে তিনি গার্হস্থ্য কাটাচ্ছেন এই গড্ডল জীবন তো তিনি চাননি এবং তা যদি চাইতেন, তা হলে প্রথমা রুক্মিণীই তো তাঁর কাছে সবচেয়ে কাম্য এবং মধুরা হতেন— খুব স্পষ্টভাবেই তিনি তা নন। এই পারিজাত-কাহিনি আরম্ভ হওয়ার মুখেই হরিবংশ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন, পত্নীলাভ করে বিবাহিত জীবন যাপন করার সময় কৃষ্ণের চরিত্র যে কী বিচিত্র হয়েছিল, শ্রবণ করুন, মহারাজ! এবং সত্যি বলতে কী, সে চরিত্র তাঁকেই খুব মানায়— নিবোধ চরিতং চিত্রং তস্যৈব সদৃশং বিভো। বস্তুত তখনকার বৈবাহিক জীবন এবং এখনকার বৈবাহিক জীবনে অনেক তফাত আছে। তখনকার পুরুষ বহু বিবাহ করত, এখন আইনগতভাবেই তা নিষিদ্ধ। আর মেয়েরা চিরকালই একটি পুরুষকে বিবাহ করে সুখী থাকবে এটাই সমাজসিদ্ধ এবং নীতিসিদ্ধ নিয়মে পরিণত। গবেষক পণ্ডিতেরা মানবমনের গহন নিয়ে গবেষণা করে এমনই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বিবাহপ্রথার মাধ্যমে একক স্বামী অথবা একক স্ত্রীর প্রেম-ভালবাসায় আবদ্ধ থাকাটা আমাদের মানবিক স্বভাব প্রসূত কোনও বৃত্তি নয়, ওটা সাংস্কৃতিক তথা সামাজিকভাবে আমাদের ওপর চাপানো আছে— long-term exclusivity with a sexual emotional companion is not an innate human need, but a culturally induced one.

গবেষকের এই মন্তব্য কিন্তু বৈবাহিক জীবনের পত্নীনিষ্ঠতা বা পতিনিষ্ঠতা ভেঙে দেবার জন্য নয়। তাঁর বক্তব্য, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের মনের মধ্যেই যেহেতু প্রেম-ভালবাসার বিষয়ে এক বৈচিত্র্যবাদী, এক varaietist বাসা বেঁধে আছে, তাই সেখানে আমাদের দ্বৈত জীবনের মধ্যেও অন্তত সেই বৈচিত্র্য নিবেশ করা প্রয়োজন, নইলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এক দুর্বহ ভারে পরিণত হয়, আর সম্পর্ক জিনিসটা একদিনেই ভেঙে পড়ে না, দৈনন্দিন অনাচরণে তা বিলয় প্রাপ্ত হয়— it does not break, it melts. যদি এই ভাবনার নিরিখে কৃষ্ণের আচার লক্ষ করি, তা হলে তো বলতে হবে, তাঁর জীবনে আর variety-র অভাব কী, এতগুলি স্ত্রীই তো তাঁর স্বাদ বদলের জন্য ছিলেন! আমরা শুধু বলব, একাধিক স্ত্রী থাকলেও তাঁরা যদি সেই মহান পাতিব্রত্যের চিরানুকূল বৃত্তের মধ্যেই ব্যাকরণগত বৈবাহিক প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ থাকেন, তা হলে যৌনতার বিষয় কিছু উপশান্ত হতে পারে বটে, কিন্তু ভাবজগতের চাহিদাটুকু সেখানে রয়েই যায়। বিশেষত কৃষ্ণের মতো রসিক পুরুষ তো আর শুধু স্ত্রীর ওপরে 'পজেশন' নিয়ে শান্ত থাকতে পারেন না। তাঁর কাছে ভাবজগৎটাই প্রধান এবং হয়তো এই কারণেই হরিবংশ ঠাকুরের মতো পুরাণ-গম্ভীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষও কৃষ্ণের বৈবাহিক জীবন নিয়ে এই মন্তব্য করেছেন— বিবাহিত জীবনে তাঁর বিচিত্র চরিতের কথা শুনুন।

আজ নারদের সামনে পারিজাত-পুষ্পের বিপর্যাস যে ঘটনা ঘটাল, তাতে সত্যভামাকে নিয়ে বিলক্ষণ চিন্তিত হলেন কৃষ্ণ। হরিবংশ মন্তব্য করেছে, সাত্রাজিতী সত্যভামাকে কৃষ্ণ প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসেন এবং হয়তো বা সত্যভামা এই ভালবাসাটা বোঝেন বলেই কৃষ্ণের এতটুকু অন্যাবেশেই তিনি বড় অভিমানিনী হন, আবার তিনি যে এতটুকুতেই অভিমানিনী হন, সেটাও কৃষ্ণ বোঝেন— অভিমানবতীম্ ইষ্টাং প্রাণৈরপি গরীয়সীম্। সত্যভামাকে কৃষ্ণ এত ভালবাসেনই বা কেন, তাঁর অভিমানিতায় কৃষ্ণ এত দুশ্চিন্তিতই বা কেন? আমরা জানি— এর প্রথম কারণ সেই দুর্লভ্যতা। অক্রূর, কৃতবর্মা, শতধন্বা— এতগুলি প্রসিদ্ধ পুরুষের ললামভূতা রমণীটি শেষ পর্যন্ত তাঁর কণ্ঠলগ্না হয়েছেন, এটা যেমন কৃষ্ণের কাছে সৌভাগ্যের প্রতীকে ধরা দিয়েছিল, তেমনই বিবাহিত হবার পরেও সত্যভামা বোধহয় নিজের চারদিকে সেই রহস্য চিরকাল ঘনিয়ে রাখতে পেরেছিলেন, যাতে কোনওদিনই তিনি কৃষ্ণের কাছে বড় সুলভ সহজ অভ্যাসে পরিণত হননি। এটা অবশ্যই একটা 'আর্ট' এবং এখন যদি কেউ বলেন যে, মান-অভিমান, কপট ক্রোধ এগুলিই যদি খুব বেশি আসে জীবনে, তা হলেই বৈবাহিক দাম্পত্যের একটা সফল রূপ দেখতে পাওয়া যাবে, তাঁদের বলি, এটা কোনও উপায়ই নয়। মান-অভিমানের বামতা কখনও হয়তো দাম্পত্য রস সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু মান-অভিমানের আতিশয্য একসময়ে বিরক্তি এবং অবসাদেরও জন্ম দিতে পারে।

আসলে শুধু এই মান-অভিমানই নয়, আরও কিছু আছে, যেখানে রমণীর স্বকীয় ব্যক্তিত্বের আবরণ-সংবরণ এবং অবশ্যই উন্মোচনেও sizzling হয়ে ওঠে দাম্পত্য— সেটাই আর্ট। মহাভারতের মধ্যে সত্যভামা দ্রৌপদীর কাছে এক সময় জানতে চেয়েছিলেন, কী করে তুমি তোমার অশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পাঁচ-পাঁচটা স্বামীকে সামলাও— কেন বৃত্তেন দ্রৌপদী পাণ্ডবান্ অধিতিষ্ঠসি? কোনও ব্রত-উপবাস, কোনও মন্ত্রতন্ত্র নাকি ওষুধ করেছ তুমি স্বামীদের, তারা তো দেখি সবসময় তোমার বশ হয়েই আছেন, সবসময় তাকিয়ে আছেন তোমার মুখের দিকেই, কখন কী বলো তুমি— মুখপ্রেক্ষাশ্চ তে সর্বে। সত্যভামা একটু অনুযোগ করেই বলেছিলেন, তুমি একটু রহস্যটা বলো দিদি! যাতে করে আমি আমার স্বামী কৃষ্ণকেও খানিক নিজের বশে রাখতে পারি— যেন কৃষ্ণে ভবেন্নিত্যং মম কৃষ্ণো বশানুগঃ।

এর উত্তরে দ্রৌপদী যা বলেছিলেন, সে কথায় আমি পরে আসব। কিন্তু এটা বলতে পারি— দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করার কোনও প্রয়োজন ছিল না সত্যভামার। কারণ প্রথমত দ্রৌপদীর স্বামীরা কেউ কৃষ্ণ নন; দ্বিতীয়ত পাঁচ পাঁচটা স্বামী থাকায় তাঁদের পর্যায়-সম্ভোগ দ্রৌপদীকে যতখানি স্বাভাবিক কারণে varietist করে তুলতে পারে, সত্যভামার সে সুযোগ নেই। কিন্তু বৈচিত্র্যের সুযোগ থাকলেও personality-র যে মন্ত্রে তিনি স্বামীদের অভিভূত করতে পেরেছিলেন, সত্যভামার মধ্যে সেটা আরও বেশি ছিল বলেই কৃষ্ণের মতো ললিত স্বামীকেও তিনি স্ববশে আনতে পেরেছিলেন নিজেকে বারবার recreate করে।

আপাতত অবশ্য এই পারিজাত-পুষ্পের ঘটনায় সত্যভামা যেভাবে ঈর্ষাতুর অভিমানে বসে আছেন ক্রোধগৃহে, সেটাকে কৃষ্ণ কীভাবে সামাল দেন, সেটা দেখে নেওয়া দরকার। একান্ত পার্শ্বচরদের কাছে সত্যভামার রাগের খবর পেয়ে বিচিত্র অছিলায় কৃষ্ণ সত্যভামার ঘরের দিকে ছুটলেন বটে কিন্তু ছুটে যাওয়াটা ওই ঘর পর্যন্তই, সত্যভামার গোঁসা-ঘরে ঢুকতে হল খুব সমঝে, ধীরে ধীরে, ভয়ে ভয়ে— ভীতভীতঃ স শনকৈর্বিবেশ মধুসূদন।

মাঝে মাঝে সত্যভামার এরকম হয়। তিনি খুব সুন্দরী, খুব অভিমানিনী। কৃষ্ণ জানেন— সত্যভামা এইরকমই। দূর থেকেই তিনি দেখতে পেলেন, সত্যভামা একবার উপুড় হয়ে বিছানায় শুচ্ছেন, কখনও পদ্মের পাপড়ি ছিঁড়ে উঁচু থেকে চোখের ওপর ফেলছেন, দাসীর হাতে চন্দন-বাটা ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন, কখনও মাথা দোলাচ্ছেন, কখনও হাসছেন, আর এখন ঠিক এই মুহূর্তে যখন তিনি বালিশে মুখ গুঁজে উশখুশ করে কাঁদতে আরম্ভ করলেন, তখনই সময় বুঝে ঘরে ঢুকলেন কৃষ্ণ— অবগুণ্ঠ্য যদা বক্তুম্ উপধানে ন্যবেশয়ৎ। কৃষ্ণ সম্পূর্ণ ব্যাপারটাকে লঘু করার জন্য হাসছিলেন। ভাবটা এই— ওরে পাগলি মেয়ে, এরকম করে নাকি? কথা বলবার সময় কৃষ্ণের গা দিয়ে পারিজাতের তীব্র গন্ধ বেরুচ্ছিল।

আর যায় কোথা! এতক্ষণ উলটে ফিরে বসেছিলেন সত্যভামা। এবার সামনে ফিরে মুখের ওপর কমল-কলির মতো হাত দুটি চাপা দিয়ে বললেন, ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে— শোভসীত্যব্রবীদ্ হরিম্। বলার সঙ্গে সঙ্গে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল মাটিতে, যেন কমলকলি থেকে গড়িয়ে পড়ল তুষার-জলের বিন্দু। কৃষ্ণ না এই চেয়েছিলেন, ভালবাসার বৈদভী রীতি! কৃষ্ণ সত্যভামার চোখের জল নিজের হাতে ধরে বললেন, এ কী, তুমি এমন করে কাঁদছ কেন? এ কী চেহারা হয়েছে তোমার? মুখখানা এত ফ্যাকাসে, যেন সকালবেলার চাঁদ, ভর দুপুরে পদ্মফুল! তার ওপরে আবার এই সাদা শাড়ি, কেন তোমার সেই কুঙ্কুম-লাল শাড়িটা কোথায় গেল, অথবা সেই সোনার বরণ শাড়িটা? কৃষ্ণ একটু ঠাট্টা-ইয়ারকিও করলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সুন্দরী সত্যভামা একটা কথাও বললেন না। হরিবংশ জানিয়েছে, সত্যভামা এমনিতেই খুব কম কথা বলেন, কিন্তু কম কথা বললেও অথবা না বললেও তাঁর মুখের স্মিতহাসিটি কিন্তু থেকেই যায়— স্মেরেণাবহুভাষিণা— এবং সেটা কিন্তু বিদগ্ধা ব্যক্তিত্বময়ী রমণীর লক্ষণ বটে। কিন্তু সমস্যা এই যে, বৈদগ্ধ্যের এই পরমেঙ্গিত লক্ষণ যখন স্বামী হিসেবে নিজের ওপরেই ঘুরে আসে, তখন তাকে সামাল দেবার জন্য বিদগ্ধ পুরুষকেও অন্য রাস্তা দেখতে হয়।

কৃষ্ণ এবার অন্য রাস্তা ধরলেন, যাতে আস্তে আস্তে সেই কথাটায় আসা যায়, যার জন্য সত্যভামা এত অভিমান করে বসে আছেন। কৃষ্ণ বললেন, কী এমন অন্যায়টা করলাম আমি,—কিমকার্যমহং দেবি— যাতে তুমি এত কষ্ট দিচ্ছ আমায়? আমি মনে এবং মুখে কোনওদিন কি তোমায় অতিক্রম করেছি— ন ত্বামতিচরাম্যহম্? কৃষ্ণ এবার আসল কথায় এলেন। বললেন, হতে পারে সমাজের নিয়মে আমার অনেকগুলি স্ত্রী। আমি কর্তব্যের খাতিরে সবার প্রতি সমান ব্যবহারও করি। কিন্তু তুমি! তোমার ব্যাপারে যে আমার বিশেষ পক্ষপাত আছে, আদর-ভালবাসাও যে অনেক বেশি, সেটা তো নিশ্চিত। আমার অন্য কোনও স্ত্রীই এই প্রশ্রয় ভোগ করে না— স্নেহশ্চ বহুমানশ্চ ত্বামৃতেঽন্যাসু নাস্তি মে। জেনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেখো, আমি মরে গেলেও তোমার ওপর এই বিশেষ ভালবাসা আমার যাবে না— নৈব ত্বাং মদনো জহ্যান্মৃতেঽপি ময়ি মামকঃ। এখানে এই সংস্কৃত শ্লোকাংশে 'মদন' কথাটার ব্যবহার বড় সাংঘাতিক। 'মদন' শব্দটা তো আজকাল খুব কুৎসার্থে ব্যবহৃত এবং প্রায়শই জুগুপ্সায় স্পষ্টভাবে উচ্চারিতই হয় না। বিশেষত বাংলা কথ্য ভাষায় 'মদন' শব্দটির এমন একটা 'সেম্যান্টিক' অপকর্ষ ঘটেছে যে, উচ্চারণ মাত্রেই এই শব্দের একটা বোকা-বোকা যৌন তাৎপর্য ফুটে ওঠে। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই মানতে হবে যে, মদন শব্দের ধাতু-প্রত্যয়গত অর্থের মধ্যেই একটা স্থূল শরীর আভাস আছে যেন, তার ওপরে কুমারসম্ভবকাব্যে পার্বতীর শরীরে মদনদেবের শারীরিক অধ্যাস 'মদন' শব্দটার মধ্যেই এমন একটা শরীর-শরীর গন্ধ নিবেশ করেছে যে, আধুনিক কালে শব্দটার মূল তাৎপর্যই নষ্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, যে ধাতু থেকে শব্দটা এসেছে, সেই মদ্ ধাতুর অর্থ অবশ্যই মত্ত করে তোলা এবং স্ত্রী-শরীরই তার প্রথাগত এবং পরম্পরাগত মাধ্যম, যাতে পুরুষ শারীরিকভাবে মত্ত হয়। কিন্তু সবার ওপরে এটাও তো ঠিক যে মত্ত অথবা প্রমত্ত হয়ে ওঠা— যেটা পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং প্রমত্ত করে তোলা যেটা অধিকাংশ স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেটা প্রধানত একটা মানসিক প্রক্রিয়া এবং প্রেম-ভালবাসা সেখানে এক অন্তরঙ্গ ফল। এখানে শারীরিক যৌনতার কোনও প্রসঙ্গ নেই, এমন ভাবাটা বাড়াবাড়ি কথা হয়ে যাবে, কিন্তু মানসিক আবেশের একটা গভীর অংশও যে এখানে আবিষ্ট আছে এবং তা যে প্রেম-ভালবাসাই বটে, তা প্রমাণ হয়ে যায় যখন রূপ গোস্বামীর মতো মহামতি রসশাস্ত্রকার 'মদন' শব্দ থেকেই 'মাদনাখ্য মহাভাবে'র সংজ্ঞা তৈরি করেন। সেই 'মাদন' নামের মহাভাবের বসতি আবার কৃষ্ণপ্রেষ্ঠা রাধারানির মধ্যেই, যাঁর কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ প্রেম নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলে না। ঠিক এই ভাবনায় বিচার করলে কৃষ্ণ যখন বলেন, আমি মরে গেলেও তোমার ওপরে আমার এই মদন-ভাব অথবা এই মত্ততা কোনওদিন নিরস্ত হবে না, তখনই বোঝা যায়, কৃষ্ণের মহিষীকুলে অন্য সমস্ত স্ত্রী তো বটেই, এমনকী পাটরানি রুক্মিণীর নিয়মমাফিক মর্যাদার চেয়েও সত্যভামার মর্যাদা আলাদা।

এখানে খানিক অপ্রাসঙ্গিক হলেও রূপ গোস্বামীর কথায় ফিরে আসতে হবে আমাকে, কেননা সত্যভামার প্রেম-ভালবাসার কথায় তাঁর সাক্ষীটাও খুব জরুরি। রূপ গোস্বামী একটা নাটক লিখবেন বলে ঠিক করছিলেন, যার মধ্যে কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা এবং দ্বারকার মহিষীদের নিয়ে সেখানকার পুরলীলা একাধারে বর্ণিত হবে। এমনিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলাই চরম সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, দ্বারকাস্থিত কৃষ্ণের মহিষীরা বৃন্দাবনের রাধা-চন্দ্রাবলীর কাছে একেবারেই গৌণ-মানে থাকেন। রূপ গোস্বামী এই ব্যাপারে খানিক রসশাস্ত্রীয় তথা দার্শনিক সমাধান করতে গিয়ে বৃন্দাবন-দ্বারকার পটভূমি মিশিয়ে একটি নাটক লেখার পরিকল্পনা করেন। বৃন্দাবনে থাকার সময়েই তিনি নাটকের আরম্ভ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু হঠাৎই ছোট ভাই অনুপমের শরীর-খারাপের খবর শুনেই বোধহয় রূপ-সনাতন দুই ভাই বাংলায় এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। ছোট ভাই অবশ্য তাঁরা আসার পরেই মারা গেলেন এবং আর কিছু করণীয় না থাকায় রূপ একাকী রওনা হলেন পুরীতে, চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করার জন্য। নাটক লেখার

পরিকল্পনা এবং ভাবনা কিন্তু মনের মধ্যে রয়েই গেছে রূপের এবং পথ চলতে চলতে বিশ্রামের স্থানগুলিতে কিছু কিছু 'নোট'ও করে রাখছিলেন তিনি। এর মধ্যে পুরী যাবার পথে যখন উড়িষ্যার সীমানায় ঢুকে পড়েছেন রূপ, তখন একদিন তাঁকে রাত্রিবাস করতে হল উড়িষ্যার সত্যভামাপুর নামে একটি গ্রামে। এমনিতেই নাটকের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে সত্যভামার বিভিন্ন ভূমিকা আছে। সেসব নিয়ে বিশেষ চিন্তিত ছিলেন রূপ। তার মধ্যে ব্রজপুরের রাধারানির পাশাপাশি দ্বারকার সত্যভামাকে নিয়ে আসাটা বৈষ্ণব জগতের তাত্ত্বিক দার্শনিকেরা কীভাবে গ্রহণ করবেন সে-বিষয়েও তাঁর দুশ্চিন্তা ছিল। রাত্রিতে যখন সত্যভামার নামাঙ্কিত ভূমিকাতেই তিনি নিদ্রাতুর হলেন, তখন স্থানমাহাত্ম্যের কারণেই তাঁকে যেন স্বপ্নে দেখা দিলেন সত্যভামা। তিনি বললেন, একটা নয়, দুটো নাটক লিখতে হবে তোমাকে। অন্তত যে নাটকে আমি থাকব, সেটা তুমি আলাদা করে দাও। আমাদের ধারণা, রূপ গোস্বামীর অন্তরস্থিত সত্যভামা বোধহয় ভয়ে ভয়েই ছিলেন যে, রাধাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব-ভাবনায় ভাবিত গৌড়ীয় রসশাস্ত্রের লেখায় সত্যভামা উপযুক্ত স্থান পাবেন কিনা।

সত্যভামার আজ্ঞায় রূপ গোস্বামী দুটি পৃথক নাটক রচনা করলেন এবং দ্বিতীয় নাটক ললিতমাধবে সত্যভামাকে রূপ নিয়ে এলেন অসাধারণ নাটকীয় প্রক্রিয়ায়। এই নাটকের প্রথমাংশে বৃন্দাবনের রাধা-চন্দ্রাবলীসহ ললিতা-বিশাখা ইত্যাদি অষ্ট সখীকে নানান প্রেম-ভূমিকায় দেখতে দেখতে হঠাৎই এঁদের ক্রীড়ার স্থান পরিবর্তন হয়ে যায় অলৌকিকভাবে এবং এঁরা সবাই 'রিসারেক্ট' বা 'রি-ইনকারনেট' করেন দ্বারকার অষ্টমহিষী হিসেবে। এখানে এই ভূমিকা পরিবর্তনে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হল, বৃন্দাবনে কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতমা রাধা যখন দ্বারকা-লীলায় প্রকাশিতা হলেন, তখন দ্বারকার সবচেয়ে মর্যাদাময়ী পট্টমহিষী রুক্মিণীর মধ্যেই তাঁর প্রকাশ সম্ভাব্য ছিল। কিন্তু রূপ এই শাস্ত্রীয় ব্যাকরণ পালটে দিয়ে বৃন্দাবনের দক্ষিণা নায়িকা চন্দ্রাবলীর প্রবেশ ঘটালেন রুক্মিণীর মধ্যে, আর রাধাকে প্রকাশ করলেন সত্যভামার ভূমিকায়। সমগ্র বৈষ্ণব রসতত্ত্বে রূপ গোস্বামী অন্যদের চেয়ে একেবারে বিলক্ষণ এবং অত্যন্ত নিষ্ণাত বলেই তিনি মর্যাদার ব্যাকরণ অতিক্রম করে রস-ভাবের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে সত্যভামাকে রাধার বামতা-বৈদগ্ধ্যের মহিমায় বুঝতে পেরেছিলেন। একদিকে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মতো রসশাস্ত্রীয় গ্রন্থে তিনি যে বিশ্বাসে কৃষ্ণমহিষী মধ্যে সত্যভামাকে শ্রেষ্ঠতমা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন— সত্যভামোত্তমা স্ত্রীণাং সৌভাগ্যে চাধিকাভবৎ— তেমনই অন্যদিকে সত্যভামাকে রাধার সমকক্ষায় বসিয়ে তাঁকে বৈবাহিক জীবনের চিহ্নিত জড়তাগুলি থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব।

আজকে কৃষ্ণের মতো বিশাল এক ব্যক্তিত্বকে কিন্তু সব কাজ ফেলে ছুটে আসতে হয়েছে সত্যভামার ক্রোধগৃহে এবং যিনি শত শত রাজরাজড়াদের কথার যুক্তিতে ধন্য করেন, তাঁর কথা, যুক্তি এমনকী অনুনয়ও কোনও কাজে আসছে না সত্যভামার কাছে। এটাকে নেহাতই এক সাধারণ দাম্পত্য জীবনের চিরন্তনী খুনশুটি বলে ধরে নিয়েও যদি এমন বলি যে, এরকম তো হয়েই থাকে, একটু পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে— দাম্পত্যকলহে চৈব ইত্যাদি— তাহলেও বলব এই ব্যাপারটার সঙ্গে সত্যভামার সেই বিশাল বৈদগ্ধ্যের মিশ্রণ আছে, ব্যাপারটা অত সোজা নয়। কৃষ্ণ বললেন, চাঁদের জ্যোৎস্না সূর্যের তাপ আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগুনের দীপ্তি যেমন স্বাভাবিক তেমনই তোমার ওপর আমার ভালবাসা। ভাবটা এই, কোথায় কাকে একটা পারিজাত ফুল দিলাম, তাতেই তুমি এতসব ভেবে বসে আছ— কান্তিশ্চ শাশ্বতী চন্দ্রে তথা ত্বয়ি স্নেহো মম।

সত্যভামা এবার চোখ মুছলেন। এবার বুঝি মানিনীর কথা বলার অবসর হল। সত্যভামা বললেন, আমারও এই ধারণা ছিল যে, তুমি শুধু আমারই— মদীয় স্বমিতি— কিন্তু আজ বুঝলাম, আমার ওপর তোমার ভালবাসার মধ্যে কোনও বিশেষ নেই, সবার সঙ্গে আমি সমান। যতদিন আমি বেঁচে থাকব, ততদিন তোমাকেই আমি দ্বিতীয় আত্মা বলেই ভেবে এসেছি। কিন্তু আজ তোমাকে আমি চিনে নিয়েছি— এ-ব্যাপারে বেশি কথা বলে কোনও লাভ নেই— কিমত্র বহুনোক্তেন হৃদয়ং বেদ্মি তেঽচ্যুত।

যে-কোনও অন্যায়জাত অভিমান-ঘটনার পর স্বামীরা চিরকালই চেষ্টা করেন নানা কথায় স্ত্রীদের ভোলাতে। আর কৃষ্ণ যতখানি নায়ক বটে, তার চেয়ে বাগ্মী অনেক বেশি। কথা এবং যুক্তি দিয়ে তিনি সমস্ত বিপক্ষতা ভুলিয়ে দিতে পারেন, এটা তাঁর প্রমাণিত ক্ষমতা। আর বাগ্মীপুরুষের ক্ষমতাটাকে স্ত্রীরা সব সময়ই ভয় পান। তাঁরা ভাবেন, সেই বাগ্মিতা তাদের ওপরে প্রয়োগ করা হচ্ছে। সত্যভামা বললেন, সব তোমার কথার ঢঙ্— বাঙ্মাত্রমেব পশ্যামি— আমার ওপর ভালবাসাটাও তোমার লোকদেখানো, কিন্তু অন্যত্র এটা বড় স্বাভাবিক— তবান্যত্র ন কৃত্রিমঃ। সত্যভামা রুক্মিণীর ইঙ্গিত দিলেন 'অন্যত্র' শব্দটা উচ্চারণ করে। তিনি বললেন, যা দেখলাম আজ, তা তো আর পালটাবে না, কিংবা যা শুনলাম, তাই কি পালটাবে কোনওদিন অথবা ভালবাসার প্রকাশ কীভাবে হয় তাও তো আজ প্রত্যক্ষ দেখলাম। ইঙ্গিত— রুক্মিণীকে কৃষ্ণের পারিজাত উপহার— শ্রুতং চাপ্যথ যচ্ছ্রাব্যং দৃষ্টস্নেহফলোদয়ঃ। সত্যভামা এবার কৃষ্ণের রঙিন উত্তরীয়ের লম্বিত অংশটুকু তুলে নিয়ে মুখ ঢাকলেন অশ্রু সংবরণ করার জন্য— গ্রহায় পীতং হরিবাসসঃ শুভা/ পটান্তমাধায় মুখে শুচিস্মিতা। সত্যভামা এবার একটু শিথিল হলেন বোধহয়। কারণ তিনি কথা বলছেন, প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন। কৃষ্ণ বুঝতে পারছিলেন যে, সত্যভামার রাগের মূল জায়গাটা ধরতে হবে। এমনিতে নিজের সম্বন্ধে তিনি ভীষণই নিশ্চিত। রুক্মিণী-জাম্ববতী এঁদের সঙ্গে তিনি তো অনেক কালই আছেন, কিন্তু তাঁদের তিনি অসম্মানও করেননি কখনও, আবার আপন প্রেমের প্রত্যয়ে এতটাই তিনি প্রতিষ্ঠিত যে, তাঁদের ধর্তব্যের মধ্যেও গণ্য করেন না। তা হলে রাগের কারণটা নিহিত আছে তাঁর অবমাননে, সেটা কেমন করে, কোথায়, কোন মুহূর্তে ঘটল, কৃষ্ণ জানতে চান সেটা।

কৃষ্ণ সুযোগ বুঝে বললেন, আমার প্রাণের শপথ— শাপিতাসি মম প্রাণৈঃ— যদি আমার মরা মুখ দেখতে না চাও, তা হলে তোমার লেগেছে কোথায়— সেটা তোমার এই চিরভক্তকে বলতে দোষ আছে কোনও? সত্যভামা বললেন, তোমার ভালবাসার সৌভাগ্যে আমি যে সবচেয়ে বেশি ভাগ্যবতী, এ গর্ব আমার তুমিই প্রতিষ্ঠা করেছিলে। আমি সকলের মধ্যে মাথা উঁচু করে চলতাম। ভাবতাম, তোমার স্ত্রীদের মধ্যে আমিই তোমার কাছে সবচেয়ে স্পৃহনীয়। কিন্তু এই সৌভাগ্য তো তুমিই প্রতিষ্ঠা করেছিলে— ত্বয়ৈব স্থাপিতং পূর্বং সৌভাগ্যং মম মানদ। কিন্তু আজ আমি সবার উপহাসের পাত্র। সবাই

আমাকে যা-তা বলছে। নারদ তোমাকে হাজার মণিরত্নের চেয়েও মূল্যবান স্বর্গের পারিজাত ফুল দিয়েছিলেন, আর তুমিও নাহয় সৌজন্যবোধে তোমার অতিপ্রিয় পট্টমহিষী রুক্মিণীকে সেটা দিয়ে নিজের প্রেম এবং প্রশংসা প্রকাশ করেছ। তাতে কিছু মনে করার নেই। কিন্তু তোমার সামনেই নারদ তোমার প্রিয়তমা মহারানির স্তুতি-প্রশংসা আরম্ভ করলেন এবং তুমি প্রেমানন্দে পরম পুলকে সেই ভূয়সী প্রশংসা শুনতে আরম্ভ করলে, এটাতেও আমার কিছু বলার নেই— তমশ্রৌষীশ্চ হৃষ্টস্ত্বং প্রিয়ায়াঃ সস্তবং কিল। কিন্তু আমার শুধু জিজ্ঞাসা হয়, নারদের সেই স্তুতি-নতি-প্রশংসার মধ্যে এই অভাগিনীর নাম উচ্চারিত হল কেন— দুর্ভগোঽয়ং জনস্তত্র কিমর্থম্ অনুশব্দিতঃ? সারা জীবনে বিচিত্র বহু রমণীর অভিজ্ঞতার নিরিখে কৃষ্ণ এটা জানেন যে, স্ত্রীলোক কখনও তুলনা পছন্দ করে না। অন্য বাড়ির অন্য ঘরের স্ত্রীলোকের সঙ্গে তুলনাই যেখানে স্বাভাবিক নিয়মে এত অপছন্দ, সেখানে সপত্নীর সঙ্গে তুলনায় কী হতে পারে?

সত্যভামা বললেন, হতেই পারে, হতেই পারে রুক্মিণীর ওপর নারদের অনেক শ্রদ্ধাভক্তি আছে, তিনি রুক্মিণীর প্রশংসা করছেন নিজের অভিলাষে— কামং কামোঽস্তু তস্যৈব— কিন্তু আমার রাগের বিষয় হল, তুমি তো সেই প্রশংসা বসে বসে শুনছিলে এবং তোমার সামনেই সে এই কথা বলে গেল যে, আজকে সাত্রাজিতী সত্যভামার থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গেল। তুমি রুক্মিণীর সামনেই বসে বসে শুনেছ এ-কথা— সান্নিধ্যং তব তত্র তৎ। রুক্মিণী ভাল, রুক্মিণী ভাল থাকুন, আমার দুর্ভাগা নামটা সেখানে আসে কেন— দুর্ভগোঽয়ং জনস্তত্র কিমর্থম্ অনুশব্দিতঃ। আর তুমি তো জানোই, লোকে বলে, সংসারে মানের জন্যই মান নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে। এমন মানহীন জীবন নিয়ে আমি আর বাঁচতে চাই না— তদেবং সতি নেচ্ছামি জীবিতুং মানবর্জিতা। সত্যভামার ক্রোধের জায়গাটা ভীষণ রকমের সূক্ষ্ম। মানের চাইতেও সেটা বোধহয় ঈর্ষা কিনা কে জানে? কিন্তু সত্যভামা রুক্মিণীকে ঈর্ষা করেন না, ঈর্ষার যোগ্যই মনে করেন না তাঁকে। কিন্তু আজ কোনওভাবে কৃষ্ণের সামনে তাঁর নাম প্রতিতুলনায় উচ্চারিত হওয়ায় এবং কৃষ্ণ সেখানে নিরুত্তর বসে থাকায় রাগটা তাঁর কৃষ্ণের ওপরই হচ্ছে। প্রেমের ক্ষেত্রে তিনি আর সুরক্ষিত বোধ করছেন না। কৃষ্ণকে বলেওছেন সে-কথা— যার কাছে আমি সবরকমের সুরক্ষা পেতাম, আজ তাকে দেখে আমার ভয় করছে, সে আর আমাকে রক্ষা করে না। কত অবহেলায় আমার নাম উচ্চারিত হয়, অথচ তার ভাবান্তর হয় না— সর্বতো রক্ষতে যো মাং স মাং নাদ্যাভিরক্ষতি। হায়! এমন অবহেলায় কোথায় যাব আমি! সত্যভামা বলেই চললেন, বলেই চললেন। একসময় স্ফুরিতাধরে চরম অভিমানের কথাটা জানিয়ে কৃষ্ণকে বললেন, তুমি, এই তুমিই না একসময় বলেছিলে— সাত্রাজিতী! প্রিয়া আমার! তোমার চেয়ে ভালবাসার জন আর কেউ নেই আমার পৃথিবীতে— সাত্রাজিতি প্রিয়া নান্যা ত্বত্তো মেঽস্তীতি বিদ্ধি মাম্— সেই প্রতিজ্ঞা আজ কোথায় গেল, কৃষ্ণ? সেই মানুষটাই আর তেমন নেই, কাজেই কে আর স্মরণ করে সে কথা— যদবোচঃ ক্ব তদ্‌যাতম্ অথবা কঃ স্মরিষ্যতি?

সত্যভামা ভীষণরকমের অপমান বোধ করছেন। নারদ রুক্মিণীর প্রশংসা করেছেন, এতে কোনও ক্ষতি ছিল না তাঁর মতে। এমনকী সেটা কৃষ্ণ শুনছেনও সম্মতিসূচক মৌনতায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতেও তাঁর কিছু মনে করার ছিল না। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁর নাম উল্লিখিত হল অবহেলায়, সাবমানে এবং কৃষ্ণ সেটা শুনলেনও, হয়তো নিছকই নৈর্ব্যক্তিক নিরুপায়তায়, কিন্তু সেটা সত্যভামার কাছে ভীষণই অপমানের হয়ে উঠেছে। সকলের কাছে আজ তিনি এমন ছোট হয়ে গেছেন বলেই সত্যভামা কৃষ্ণকে জানিয়েছেন— সবার চাইতে আমি তোমার কাছে বেশি, এসব তো অনেক দূরের কথা, যেখানে তুমি আমাকে অন্য লোকের সমান বলেই মনে করো না, সেখানে কোথায় আমি, আর কোথায় আমার প্রেম— যৎ সমানাং জনৈর্দেবো মাং ন পশ্যাতি নিত্যদা। সত্যভামা মনে করছেন যে রীতিমতো প্রবঞ্চনাই করা হয়েছে তাঁর সঙ্গে এবং সেটা কৃষ্ণই করেছেন! ফলে এখন কৃষ্ণ তাঁর বাক্যের মধুরতায় যতই পরিস্থিতি সামাল দেবার চেষ্টা করুন, সত্যভামার কাছে তিনি এখন 'বাঙ্‌মাত্রমধুরঃ শঠঃ।' এই শঠতা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে কী করে? বলা যাচ্ছে, কেননা সত্যভামা মনে করেন— বলা যায়— যেহেতু নারদ যখন রুক্মিণীর প্রশংসা করছিলেন এবং সত্যভামাকে হেয় করছিলেন, তখন কৃষ্ণের গলা দিয়ে স্বর বেরোয়নি, উচ্চারিত হয়নি কোনও প্রতিবাদের বর্ণ, কোনও অসন্তোষ প্রকাশিত হয়নি তাঁর চোখের ভাষায়, অথবা হাত-পায়ের নাড়াচাড়ায় অথবা কোনও ইশারায়— স্বর-বর্ণেঙ্গিতাকারৈর্নিগূঢ়া দেব যত্নতঃ।

আমরা জানি বোধহয় যে, প্রণয়িনীর এমনতর অভিমানের মুখে নিজেকে সযৌক্তিক প্রমাণ করার কোনও উপায় থাকে না পুরুষের। অতএব একেবারেই সব পৌরুষ বিসর্জন দিয়ে কৃষ্ণ বললেন, এমন করে আর বোলো না তুমি। আর তোমাকে বেশি কথা না বলেও জানাই, আমি তোমারই—কিমত্র বহুনোক্তেন ত্বদীয়মবগচ্ছ মাম্। এরপর নিজেকে প্রমাণিত করার শেষ চেষ্টা হিসেবে কৃষ্ণ এবার একটা মিথ্যে কথা বললেন সত্যভামাকে। বললেন, নারদমুনি আমাকে পারিজাত-পুষ্প উপহার দিলে রুক্মিণী সেটা আমার কাছে চেয়েছিলেন, আর আমিও স্বামী-সুলভ উদারতায় সেটা তাঁর হাতে দিয়েছি— দাক্ষিণ্যাদ্ অনুরোধাচ্চ দত্তবান্মাত্র সংশয়ঃ— আর সেটা যদি একটা মস্ত অপরাধ হয়ে থাকে, তবে সেই একটা অপরাধ তুমি ক্ষমা করো। তুমি খুশি হও এবার। আমরা জানি, কৃষ্ণ একটু মিথ্যে কথা বলেছেন এবং এই মিথ্যের মাহাত্ম্য আমরা বুঝি— দাম্পত্য-কলহে নিজেকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যে বলায় দোষ নেই— স্বয়ং মহাভারত এ ব্যাপারে বিধান দিয়েছে— ন স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহকালে। কিন্তু সেই 'জাস্টিফিকেশনে'ই সবকিছু শেষ হয়ে যায় না। সত্যভামার মান ভাঙানোর জন্য আরও অভিনব কিছু করতে হবে। কৃষ্ণ বললেন, পারিজাত ফুল যখন তোমার এতই পছন্দ, তা হলে পারিজাতের গোটা গাছটাই আমি স্বর্গের নন্দনকানন থেকে উপড়ে এনে তোমার ঘরের দুয়োরে পুঁতে দেব আমি— গৃহে তে স্থাপয়িষ্যামি যাবৎ কালং ত্বমিচ্ছসি? সত্যভামা বললেন, হ্যাঁ, তাই যদি তুমি করতে পারো, তবেই আমার জ্বালা কমে, আর তাতেই তোমার সমস্ত মহিষীদের মধ্যে আমি যে সবার ওপরে আছি, সেটা বুঝব— সীমন্তিনীনাং সর্বাসাম্ অধিকা স্যামধোক্ষজ।

অতঃপর স্বর্গ থেকে পারিজাত-পুষ্প উপড়ে আনার যে প্রক্রিয়া শুরু হল, সেটা আর এক অধ্যায় এবং এই প্রক্রিয়ার পূর্ব ঘটনায় হরিবংশ এবং বিষ্ণুপুরাণের বক্তব্যে কিছু তফাত আছে। বিষ্ণুপুরাণে দেখা যাচ্ছে, কৃষ্ণ প্রাগজ্যোতিষপুরে নরকাসুরকে বধ করতে গেছেন

এবং তাঁর সঙ্গে একই গরুড়াসনে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেছেন সত্যভামা। যুদ্ধ-শেষে নরকাসুর যে শত-সহস্র দেব-গন্ধর্ব-মানুষী কন্যাদের হরণ করে এনে মণি পর্বতে লুকিয়ে রেখেছিল, সেই মণিপর্বতটাকেই গরুড়ের পিঠে চাপিয়ে নিলেন কৃষ্ণ দ্বারকায় নিয়ে যাবার জন্য। আর নিলেন দেবমাতা অদিতির কুণ্ডল, যেটা নরকাসুর দেবতাদের যুদ্ধে হারিয়ে দেবমাতা অদিতির কান থেকে ছিঁড়ে নিয়ে এসেছিলেন। কৃষ্ণ ঠিক করলেন— দ্বারকা যাবার পথে দেবমাতা অদিতিকে ওই কুণ্ডল ফেরত দিয়ে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে দ্বারকায় ফিরবেন। সেই ভাবনায় স্বর্গে গিয়ে কুণ্ডল ফেরত দেবার পরেই বিপদটা ঘটল।

বিদায় নেবার জন্য কৃষ্ণের পরে সত্যভামাও অদিতিকে প্রণাম করে আশীর্বাদ চাইলেন দেবমাতার কাছে। অদিতি আশীর্বাদ করে বললেন, আমার অনুগ্রহে তোমার শরীরে বুড়ো বয়সের কোনও ছাপ পড়বে না কোনওদিন, চেহারায় আসবে না কোনও বিরূপতা— জরা বৈরূপ্যমেব চ— আর চিরটাকাল তোমার যৌবন থাকবে সুস্থির— ভবিষ্যত্যনবদ্যাঙ্গি সুস্থিরং নবযৌবনম্। এর থেকে বড় আশীর্বাদ এক বিবাহিত রমণীর কাছে আর কীই বা হতে পারে! এমনিতেই সত্যভামা কৃষ্ণের অন্য মহিষীদের তুলনায় কিছু অধিক যৌবনবতী ছিলেন বলে মনে করি, কিন্তু এই শারীরিক আশীর্বাদের চেয়েও সত্যভামার ব্যক্তিত্বই যে তাঁকে সবার চাইতে বিলক্ষণ করেছে, সেটা এক্ষুনি টের পাওয়া যাবে পারিজাত-হরণের বিষ্ণুপুরাণীয় বর্ণনায়।

দেবমাতা অদিতির পর দেবরাজ ইন্দ্র এবং ইন্দ্রাণী শচীর সঙ্গে দেখা করে যাওয়াটা সৌজন্য বলেই কৃষ্ণ এবং সত্যভামা তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন, এই সময় দেবরাজ স্বয়ং ইন্দ্রাণীর সঙ্গে নিজেরাই এসে উপস্থিত হলেন দেবমাতা অদিতির ঘরে। অদিতির অনুজ্ঞায় ইন্দ্র কৃষ্ণকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করলেন বটে, কিন্তু 'প্রোটোকল' অনুযায়ী ইন্দ্রাণী যখন কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামাকে যথোচিত সমাদর করতে যাবেন, তখন সত্যভামার রূপ দেখেই হোক অথবা তাঁর ব্যক্তিত্ব দেখেই হোক, তখন ইন্দ্রাণী শচী একটা কাণ্ড করে বসলেন। বস্তুত এক ব্যক্তিত্বময়ী রমণীর প্রতি অন্য ব্যক্তিত্বময়ীর ঈর্ষাই হয়তো এই কাণ্ডটা বাধাল, ইন্দ্রাণী শচী কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামাকে দেখিয়ে দেখিয়ে সদ্যছিন্ন পারিজাত-মঞ্জরী তাঁর নিজের খোঁপায় গুঁজে দিলেন, কিন্তু সমুচিত সদাচার প্রদর্শন করে সত্যভামাকে সেই ফুল এগিয়ে দিলেন না। ভাবলেন, মর্ত্যভূমির এই সাধারণ মেয়ে এই পুষ্পের মর্যাদা কতটুকু বুঝবে— ন দদৌ মানুষীং মত্বা স্বয়ং পুষ্পৈরলংকৃতা।

সত্যভামা সব দেখলেন, আপাতত সহ্যও করে নিলেন এই অসৌজন্য, তারপর অমরাবতী স্বর্গভূমি দেখতে বেরোলেন দু'জনে— কৃষ্ণ আর সত্যভামা। ঘুরতে ঘুরতে নন্দনকাননে এসে উপস্থিত হতেই সুগন্ধে তাঁদের শরীর-মন ভরে গেল। পারিজাতের গাছ এবং ফুল, দুটোই দেখতে যেমন ভাল, তেমনই গন্ধে একেবারে ভরপুর। পারিজাত পুষ্পের সম্ভার দেখে সত্যভামা এবার কৃষ্ণকে বললেন, এই গাছটা তুমি স্বর্গ থেকে নিয়ে গিয়ে দ্বারকার মাটিতে পুঁতে দাও না কেন— কস্মান্ন দ্বারকামেষ নীয়তে দেবপাদপঃ? সত্যভামার প্রথম কথায় খুব একটা আমল দিলেন না কৃষ্ণ। তা ছাড়া দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে এসে তাঁর সঙ্গে অনর্থক একটা ঝুট-ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চাইলেন না কৃষ্ণ। তবে শচী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইন্দ্রাণী সত্যভামার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন সেটা কৃষ্ণ দেখেছেন এবং মনেও রেখেছেন। কিন্তু কৃষ্ণ খুব একটা সাড়া দিচ্ছেন না দেখে সত্যভামা এবার তাঁর একান্ত আপন সেই অভিমান-পন্থা নিলেন। তিনি বললেন, তোমার সেই মুখের কথাটা যদি সত্যি হয়, তুমি না বারবার বলো এই কথা যে, 'সত্যা! তুমি আমার কাছে সবার চাইতে প্রিয়— যদি তে তদ্ বচঃ সত্যং সত্যাত্যর্থং প্রিয়েতি মে'— তা হলে আমার এই কথাটা তোমার শুনতে হবে। এই পারিজাত বৃক্ষ তুমি নিয়ে যাবে দ্বারকায়। সেখানে আমার গৃহ-সংলগ্ন উদ্যানটিতে এই গাছ আমি পুঁতে দেব— মদ্গেহ-নিষ্কুটার্থায় তদয়ং নীয়তাং তরুঃ।

হরিবংশের জবান থেকে এখানে একটু আলাদাই হল বটে। এই গ্রন্থে মহিষী-প্রথমা রুক্মিণীর প্রতি ঈর্ষায় সত্যভামা চরম অভিমানিনী হলে কৃষ্ণ নিজেই বলেছিলেন যে সত্যভামার প্রীতির জন্য তিনি পুরো পারিজাত বৃক্ষটাই উপড়ে নিয়ে আসবেন দ্বারকায়। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে সত্যভামা নিজেই বায়না ধরেছেন পারিজাত বৃক্ষ দ্বারকায় নিয়ে যাবার জন্য, যদিও এখানেও তাঁর ক্রোধ উদ্দীপিত করেছেন অন্যতরা এক রমণী, তিনি স্বর্গীয়া। পারিজাত পুষ্প নিয়ে ইন্দ্রাণী শচীর অহংকার চূর্ণ করার মানসের সঙ্গে সত্যভামা কিন্তু সপত্নীদের ওপর, বিশেষত প্রধানা রুক্মিণীর ওপর নিজের মর্যাদা-প্রতিষ্ঠার কাজটাও সেরে নিচ্ছেন একই সঙ্গে। তিনি কৃষ্ণের মুখের কথা উদ্ধার করে তাঁকে জানালেন, কৃষ্ণ! একথা একবার মাত্র তুমি বলোনি, যাতে আমি ভেবে নিতে পারি যে, কোনও মুহূর্তের আতিশয্যে তুমি আমাকে বেশি ভালবেসে ফেলেছ। বহুবার তুমি আমাকে বলেছ, রুক্মিণী, জাম্ববতী কেউ আমার তেমন ভালবাসার মানুষ নন, যতটা তুমি— ন মে জাম্ববতী তাদৃগ্ অভীষ্টা ন চ রুক্মিণী। জানি না, এসব কথা কথার ঝোঁকেই তুমি আমাকে বলেছিলে কিনা, নাকি এসব কথা আমাকে প্রলুব্ধ করার জন্য স্তোকবাক্য হিসেবে বলেছিলে, অথবা আমি যা ভাবছি তা নয়, তুমি সত্যিই যদি আমাকে ভালবেসে এইসব কথা বলে থাকো— সত্যং তদ্ যদি গোবিন্দ নোপচারকৃতং তব— তা হলে আমি যেমনটি চেয়েছি, এই পারিজাত বৃক্ষ আমারই ঘরের দাওয়ায় পুঁতে দিতে হবে। এবার ফুল ফুটবে দ্বারকায়, ফুল ফুটবে আমারই উঠোনে, আর সেই ফুল খোঁপায় গুঁজে আমি রুক্মিণী, জাম্ববতী সবার সামনে, সবার মধ্যে ঘুরে বেড়াব— সপত্নীনাম্ অহং মধ্যে শোভেয়মিতি কাময়ে।

কৃষ্ণ আর বেশি কথা বাড়াননি। সত্যভামাকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে তিনি গোটা পারিজাত-বৃক্ষটাকেই তুলে নিলেন গরুড়ের পিঠে— আরোপয়ামাস হরিঃ পারিজাতং গরুত্মতি— কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না, কারও অনুমতি নিলেন না— না ইন্দ্রের, না ইন্দ্রাণীর। কৃষ্ণের এই আকস্মিক সাহসী আচরণে বিহ্বল নন্দনকাননের বনরক্ষীরা কৃষ্ণকে বারবার এই বলে সাবধান করে দিল যে, এই গাছ ইন্দ্রপ্রিয়া শচীদেবীর গাছ, দেবতারা অমৃতমন্থন করার সময় শচীর কেশভূষণের জন্য এই দেববৃক্ষ তুলে এনেছিলেন— শচীবিভূষণার্থায় দেবৈরমৃতমন্থনে। এটাকে নিয়ে আপনি খুব সহজে যেতে পারবেন না এখান থেকে। কৃষ্ণ যদি ভাবেন, ইন্দ্র হলেও হত, একটি স্ত্রীলোকের ঈপ্সিত বৃক্ষ একটু জোর করে তুলে নিয়ে গেলে কী আর হবে, এমন একটা পূর্বপক্ষ ভেবে নিয়েই রক্ষীরা কৃষ্ণকে বলল, দেখুন! দেবরাজ ইন্দ্র সদাসর্বদা শচীর মুখ চেয়ে আছেন, তাঁর নিজের অধিকারের গাছটা

আপনি তুলে নিয়ে গিয়েও কুশলে থাকবেন, এটা হবে না, মহাশয়— দেবরাজ-মুখপ্রেক্ষী যস্যাস্তস্যাঃ পরিগ্রহম্।

বনরক্ষীরা কৃষ্ণকে উদ্দেশ করে কথা বললেন বটে, কিন্তু কথার উত্তর দিলেন সত্যভামা। এইরকম দাম্পত্য প্রেমে, দাম্পত্য জীবনে অনেক সময়েই হয়, বিশেষত যেসব ক্ষেত্রে স্ত্রীরা সূর্যতেজে তপ্ত বালুকারাশির সাধর্ম্যে স্বামীর মর্যাদা, ঐশ্বর্য এবং ব্যক্তিত্বের প্রতিফলিত গৌরব নিজের মধ্যে অনুভব করেন, তাঁরা কখনও কখনও স্বামীর চেয়েও অধিক প্রখর হন। প্রতিপক্ষের উষ্ণ মন্তব্য এঁরা স্বামী পর্যন্ত যাবার আগেই, স্বামী নরম হয়ে যেতে পারেন, তিনি ঝামেলা এড়িয়ে যেতে পারেন অথবা তিনি অধিক মর্যাদাবোধে উদাসীন নিরুত্তর থেকে যেতে পারেন— এসব আগাম ভেবে নিয়েই তাঁরা স্বামীর আগেই উত্তর দেন। সত্যভামা অবশ্য এই ধরনের প্রখরা না হলেও কৃষ্ণের প্রেম-প্রশ্রয় তিনি সমধিক ভোগ করেন। বিশেষত এখানে বনরক্ষীরা পারিজাত-পুষ্পকে ইন্দ্রাণী শচীর 'পরিগ্রহ' বা অধিকারী বলায় সত্যভামা ঈর্ষা এবং অসূয়ায় অধিক দগ্ধ হয়েছেন। তার ওপরে শচীর পছন্দ এই পারিজাত রক্ষার জন্য ইন্দ্র তাঁর স্ত্রীর মুখের দিকেই তাকিয়ে আছেন— একথা শুনে তাঁর নিজের স্বামী এ-বিষয়ে কতটা উদ্যোগী হতে পারেন সত্যভামার জন্য, সেটাও বুঝিয়ে দিলেন সত্যভামা। সত্যভামা রেগে গেছেন— সত্যভামাতিকোপিনী।

তবে সত্যভামার কথায় মনস্বিতার যুক্তি দেখা গেল আগে। তিনি বনরক্ষীদের বললেন, পারিজাত পুষ্পের অধিকার নিয়ে যদি কথা বলিস, তা হলে এই শচীই বা কে আর এই ইন্দ্রই বা কে— কা শচী পারিজাতস্য কো বা শক্রঃ সুরাধিপঃ? সমুদ্র মন্থন করে অনেক কিছুই উঠেছিল যা পৃথিবীর সর্বজনাভোগ্য সম্পদ। যেমন সুরা উঠেছে সমুদ্র থেকে, উঠেছে চাঁদ, উঠেছেন লক্ষ্মী— এগুলি তো সর্বসাধারণের সম্পত্তি, পারিজাত পুষ্পও তাই সকলের প্রাপ্য হওয়া উচিত— সামান্যঃ সর্বলোকস্য পারিজাতস্তথা দ্রুমঃ। এই যুক্তির পর যদি শক্তিপ্রদর্শনের প্রশ্ন আসে সেখানে সত্যভামার উত্তর আরও কঠিন, আরও গর্বোদ্ধত। তিনি বললেন, দেখো রক্ষীরা! তোমরা তোমাদের মালকিনকে খবর দাও। ইন্দ্রাণী শচী যদি তাঁর স্বামীর বাহুবলে স্ফীত হয়ে এই বৃক্ষহরণ রোধ করতে চান, তবে তোমরা সেইভাবেই তাঁকে বলো। বলো যে, আমি, আমি কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা, আমি আমার স্বামীর শক্তিতে এই বৃক্ষ নিয়ে যাচ্ছি, তোমার ক্ষমার প্রয়োজন নেই এখানে— সত্যভামা বদত্যেতদ্ অতিগর্বোদ্ধতাক্ষরম্। তুমি যদি তোমার স্বামীর প্রিয় হও এবং তোমার স্বামী যদি তোমার কথা মেনেই চলেন, তা হলে জানাও শচীকে যে, আমার স্বামী এই দেববৃক্ষ হরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন, তোমাদের ক্ষমতা থাকে তো আটকাও— মদ্‌ভর্তৃর্হরতো বৃক্ষং তৎ কারয় নিবারণম্। তোমাদের দেবতাদের সামনে আমি মানুষী হয়ে এই বৃক্ষকে হরণ করাচ্ছি, এটাই আমার ক্ষমতা— মানুষী হারয়ামি তে।

পারিজাত-হরণের এই প্রসঙ্গে সত্যভামার এই গর্বোক্তির মধ্যে একটা পৌরাণিক অভিসন্ধিও আছে, সেটা জানি। মানে, কৃষ্ণাবতারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য বৈদিক পরম্পরায় আগত ইন্দ্র-অগ্নি-বায়ু ইত্যাদি দেবতার ওপর কৃষ্ণের মর্যাদাধিক্য দেখানোটা একান্ত জরুরি হয়ে পড়ে। বিশেষত কৃষ্ণের মনুষ্য-স্বরূপটা যে সমস্ত দেবস্বরূপের চেয়েও অধিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মর্যাদাসম্পন্ন, সেটা বোঝানোর জন্য সত্যভামার এই গর্বোক্তিগুলিকেই মাধ্যম হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে বটে, তবে সত্যভামার চরিত্র এবং তাঁর স্বামীগৌরবের মধ্যেও যে এই মাধ্যম হয়ে ওঠার বীজ নিহিত ছিল, সেটা বোঝানোও পুরাণকারদের একটা অভিসন্ধি বটে। সত্যভামা বনরক্ষীদের যেভাবে বলেছিলেন, তারা সেইভাবেই শচীর কাছে সত্যভামার গর্বভাবনা জানাল। ইন্দ্রাণী শচীর প্রোৎসাহনে ইন্দ্রও পারিজাত-বৃক্ষ রক্ষার জন্য বিশাল দেবসৈন্য সঙ্গে বজ্রহস্তে তৈরি হলেন।

ঈর্ষাঅসূয়ায় প্রসূত এই যুদ্ধ লাগল। বেদের বৃত্র-শম্বর-ঘাতক দেবরাজ মানুষ কৃষ্ণের সঙ্গে ভয়ংকর যুদ্ধ করলেন বটে, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে না পেরে বজ্র নিক্ষেপ করবেন বলেই মন্ত্র পড়ে কৃষ্ণের উদ্দেশে ছেড়ে দিলেন বজ্র। কৃষ্ণ নির্দ্বিধায় সেই বজ্র হাত দিয়েই ধরে ফেললেন, কিন্তু নিজের চক্রায়ুধ ব্যবহার করলেন না তাই বলে। ইন্দ্র সভয়ে পালাতে লাগলেন, কিন্তু এইবার শুরু হল সত্যভামার বাক্যবাণ। সত্যভামা বললেন, আপনি না শচীর স্বামী, আপনাকে কি মানায় এইভাবে পলায়ন করা? বরঞ্চ দাঁড়ান, এই তো আপনার ইন্দ্রাণী শচী আপনার কাছে চলে আসবেন এক্ষুনি। তার মাথায় গোঁজা থাকবে পারিজাত ফুলের গুচ্ছ— পারিজাত-স্রগাভোগা ত্বামুপস্থাপস্যতে শচী। আর এটাও তো খুব ঠিক কথা যে, এক সময় যিনি পারিজাতের মালায় শোভাশালিনী হয়ে সপ্রণয়ে এসে দাঁড়াতেন আপনার সামনে, এখন যদি তাঁকে সেই আগের মতো না দেখে অন্যরকম দেখেন, তা হলে এই স্বর্গভূমি আর কোন সুখ বয়ে আনবে আপনার কাছে— অপশ্যাতো যথাপূর্বং প্রণয়াদাগতাং শচীম্?

অস্ত্রহীন দেবরাজের প্রতি এতক্ষণ যে তির্যক প্রকারে তিরস্কার বর্ষণ করলেন সত্যভামা, তার মধ্যে বারবার ভেসে এসেছে ইন্দ্রাণীর সেই গর্বিত মুখচ্ছবি, যেখানে তিনি সত্যভামাকে দেখিয়ে দেখিয়ে পারিজাত পুষ্প নিজের মাথায় গুঁজেছিলেন এবং সত্যভামাকে সেটা দেননি। সত্যভামা শুধু সেই ঘটনাটা মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি পারিজাতের বৃক্ষ নিয়ে যান দেবরাজ, এতে কোনও প্রয়োজন নেই আমাদের। কিন্তু ঘটনাটা কী জানেন তো? শচী তাঁর স্বামীর গর্বে স্ফীত হয়ে বড় অপমান করেছিল আমাকে, আমি আপনার ঘরে অতিথি হয়ে এসেছিলাম, সেখানে এই সামান্য সৌজন্যটুকু অপেক্ষিত ছিল। সেটা তিনি দেখাননি— ন দদর্শ গৃহে যাতামুপচারেণ মাং শচী। আর ঠিক সেই কারণেই আমি স্ত্রীলোক বলেই হোক, অথবা রাজনীতির গভীরতা আমি অত বুঝি না বলেই হোক, আমি শুধু আমার স্বামীর গৌরব এবং ক্ষমতাটুকু সমঝে দিলাম মাত্র— স্ত্রীত্বাদ্ অগুরুচিত্তাহং স্বভর্তৃশ্লাঘনাপরা— নইলে পরের ঘরের এই পারিজাত ফুল নিয়ে গিয়ে আমি কী করব? এই সম্পূর্ণ ঘটনায় ইন্দ্রাণী শচীর শুধু বোঝা উচিত ছিল যে, নিজের রূপ আর স্বামীর গর্বে গর্বিত হওয়ার স্বভাবটা শুধু তাঁর বিলক্ষণ কোনও প্রাপ্তি নয়, সেটা সমস্ত রমণীরই স্বভাব এবং ভাবনা— রূপেণ গর্বিতা সা তু ভর্ত্রা স্ত্রী কা ন গর্বিতা। সত্যভামা পারিজাত-বৃক্ষ ফিরিয়ে দিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে চলে এলেন দ্বারকায়।

বিষ্ণুপুরাণে সত্যভামা শেষ দিকে রীতিমতো ভাল, শচীর অহংকার চূর্ণ করা-মাত্রেই তাঁর শান্তি হয়েছে। কিন্তু হরিবংশ পুরাণে মানিনী সত্যভামার শুধু একটা কথা রাখার জন্য

স্বর্গরাজ্যে দেবরাজের সঙ্গে কৃষ্ণের বিশাল যুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্বামী-সোহাগী সত্যভামা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণ তাঁকে ফেলে রেখে যেতে পারেননি। যুদ্ধের সময় কৃষ্ণের গর্বে ইন্দ্র এবং ইন্দ্রাণীকেও দু-চার কথা শোনাতে ছাড়েননি সত্যভামা। পারিজাতের অধিকার নিয়ে দীর্ঘকাল ভয়ংকর যুদ্ধ হয়েছিল। ইন্দ্রাণী আর সত্যভামার উতোর-চাপানে যুদ্ধটা ব্যক্তিগত ক্রোধে পর্যবসিত হয়েছিল। যুদ্ধ অবশ্যই কৃষ্ণের অনুকূলে শেষ হয় এবং স্বর্গের দেবরাজ হয়েও ইন্দ্র যখন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন, তখন কিন্তু কৃষ্ণ স্বীকার করেছেন যে, আমি শুধু বউয়ের কথা শুনেই তোমার নন্দন-বন থেকে উপড়ে নিয়ে গিয়েছি এই পারিজাতের গাছ— গৃহীতোঽয়ং ময়া শক্র সত্যাবচনকারণাৎ।

তা যাক, বউয়ের কথা সবাই শোনে, কৃষ্ণও শুনেছেন। মুশকিল হল, কৃষ্ণ কতটা শোনেন, সেটা ভাষ্য দিয়ে বোঝাবার মতো জায়গা এটা নয়। তবু এই সামান্য পরিসরে যতটুকু আমি বোঝাতে চেয়েছি, তা হল, কৃষ্ণের অন্তঃপুরে যত রমণীই থাক, তার সংখ্যাতত্ত্ব আমার কাছে গৌণ। আমি শুধু বুঝি কৃষ্ণ প্রেমের রহস্য জানতেন। দাম্পত্য জীবনে যে খাড়া-বড়ি-থোড়ের একঘেঁয়েমি আসে, অন্তত সেই কালেও সেটা তিনি বুঝেছিলেন বলেই একটি গৃহবধূ স্ত্রীর মধ্যেও তিনি প্রেমিকার সন্ধান চেয়েছিলেন। দিন-রাত স্বামীসেবার ব্রত নিয়ে থাকা দাম্পত্যের ছ্যাকড়া-গাড়ি টানার কথা সেদিনেও তিনি ভাবতে পারতেন না। কুব্জ ন্যুব্জ ঘর্মাক্ত গৃহস্থ-জীবনের মধ্যে অন্তত একটু নতুনত্ব আসুক— এই সমান অনুভূতিটুকু ছিল বলেই বোধহয় তিনি চাইতেন যে, প্রেমিকার মতো তাঁর প্রিয়তমা পত্নীটিরও ঠোঁট ফুলে উঠুক অভিমানে, অপাঙ্গ অরুণিত হোক বক্রতায়, বাক্য শাণিত হোক বিদগ্ধতায়। কারণ, সত্যিই তো গৃহস্থ-জীবনের গড্ডলিকায় প্রণয়িণী বধূর এই অন্যতর আচরণটুকুই তো একমাত্র নতুনত্ব, একমাত্র লাভ— অয়ং হি পরমো লাভো গৃহেষু গৃহমেধিনাম্। আর ঠিক এইজন্যই, এই ঘামে ভেজা প্যাচপ্যাচে জীবনটার মধ্যে এই সামান্য দখিনা বাতাসটুকু আমদানি করার জন্যই সত্যভামার গালি-শোনা গৃহস্থ কৃষ্ণকে আমরা পছন্দ করি।

খুব সহজ সরলভাবে সত্যভামাকে যেটুকু চেনা গেল, তাতে মনে হবে যেন কৃষ্ণ তাঁর তিরস্কার-বক্রোক্তি শোনার ভয়েই তাঁকে ভালবাসতেন, যেন ভয়েই তাঁকে মাথায় তুলে রাখতেন। কিন্তু বাস্তবে যদি গভীরভাবে সত্যভামার চরিত্র অনুধাবন করেন, তা হলে দেখবেন কৃষ্ণের মতো বিশালবুদ্ধি তথা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের স্ত্রী হতে গেলে যে সমধর্মিতার প্রয়োজন হয়, সেটাই সত্যভামার ছিল এবং অন্যদের তা ছিল না।

মহাভারতে দ্রৌপদীর কাছে স্বামী বশ করার মন্ত্র শিখতে চেয়েছিলেন সত্যভামা। দ্রৌপদী উত্তর দিয়েছেন এই প্রশ্নের, তবে এই উত্তরের মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক এবং বাস্তবসম্মত যেটা, সেটা হল— মন্ত্র-তন্ত্র, ব্রত-হোম কিংবা বশীকরণের ওষুধ খাইয়ে কখনও স্বামীদের বশ করা যায় না— ন জাতু বশগো ভর্ত্তা স্ত্রিয়াঃ স্যান্মন্ত্রকর্মণা। বরঞ্চ বশীকরণের ওষুধ বলে মেয়েরা যেসব ওষুধ স্বামীদের ওপর প্রয়োগ করে, তাতে স্বামীদের সত্যি-সত্যিই শারীরিক রোগ তৈরি হয় ওষুধের পার্শ্বক্রিয়া থেকে। দ্রৌপদী বলেছেন— এগুলো কোনও ভদ্রঘরের মেয়েদের কাজ নয়, আমি কখনওই এসব কাজ করি না— অসদাচরিতে মার্গে কথং স্যাদনুকীর্ত্তনম্। দ্রৌপদী এসব কাজ করেন না— এটা ঠিক আছে, কিন্তু যেসব কাজ করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলে স্বামীরা তাঁর বশে আছেন বলে তিনি বলেছেন, সেগুলিও তিনি এতটুকু করেন বলে আমাদের মনে হয় না। প্রথমত দ্রৌপদীর এই উপদেশাবলি মহাভারতের পাঠ-শুদ্ধিবাদীরা গ্রন্থ থেকেই বর্জন করে দিয়েছেন, কিন্তু সেটা আমাদের কাছে কোনও বড় ব্যাপার নয়। কেননা এমন উপদেশ-পরামর্শ তিনি দিতেই পারেন। বিশেষত এইরকম একটা বিষয়ে যদি উপদেশ-পরামর্শই দিতে হয়, তা হলে সেটা সাধারণের পালনীয় হওয়া উচিত বলেই তার মধ্যে সর্বগ্রাহ্য একটা 'ডাইডাক্‌টিভ্‌নেস' থাকে। নইলে স্বামীকে হাতে রাখার উপদেশ হিসেবে তিনি যেসব কথা বলেছেন, সেগুলি যদি তাঁর জীবনে এতটুকু পালিত হয়ে থাকে, সেগুলি তাঁর চরিত্র অনুযায়ী একেবারেই গৌণ ব্যাপার এবং সেটা সত্যভামার সম্বন্ধেও একান্তভাবে সত্য। নইলে দেখুন, স্বামীরা স্নান না করলে দ্রৌপদী স্নান করেন না, স্বামীরা না খেলে দ্রৌপদী খান না অথবা স্বামীরা বাইরে থেকে এলে তিনি তাদের পা ধোয়ার জল এগিয়ে দেন অথবা তিনি বাসন মাজেন, রান্না করেন, শাশুড়ির মতে চলেন,, গৃহকর্ম করেন, সকলের আগে সকালে ঘুম থেকে ওঠেন এবং সবার পরে তিনি শুতে যান— এই যে এতসব গৃহকর্মনিপুণা এক গৃহিণীর কর্ম— এগুলিই শুধু দ্রৌপদীর মতো এক মনস্বিনী রমণীর স্বামী বশ করার কৌশল— এটা আমরা মানতে পারলাম না।

আসল সত্যটা আপনাদের জানিয়ে বলি, উপরিউক্ত উপদেশাবলি একেবারে স্মৃতিশাস্ত্রোচিত পতিব্রতার ধর্ম কোনও কোনও সময়ে দ্রৌপদী পালন করে থাকতেও পারেন, কিন্তু সম্পূর্ণ মহাভারতের মধ্যে দ্রৌপদীর এই কর্মগুলির প্রতিফলন দরকার ছিল। অর্থাৎ আমরা বলতে চাই, সমগ্র মহাভারতের মধ্যে দ্রৌপদীর চরিত্রটা যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তাতে কোনও জায়গায় আমরা দ্রৌপদীকে বাসন মাজতেও দেখিনি, অথবা স্বামী বাড়ি ফিরলে পা-ধোয়ার জল দিতেও দেখিনি। তাঁকে মহাভারতের অসংখ্য বিচিত্রতার মধ্যে আপ্রবন্ধ স্থির যেভাবে দেখেছি, সেটি হল তাঁর অসম্ভব ব্যক্তিত্ব— যে ব্যক্তিত্বে দ্যূতসভায় বস্ত্রহরণের সময় তাঁর চোখে চোখ পড়লেই পাণ্ডবরা ভয় পেতে থাকেন— স পাণ্ডবান্ কোপপরীতদেহান্/ সন্দীপয়ামাস কটাক্ষপাতৈঃ— যে ব্যক্তিত্বে তর্কধ্বস্ত যুধিষ্ঠিরকে সারা বনবাস এবং অজ্ঞাতবাসের সময় জুড়ে দ্রৌপদীর জন্য দোষী বোধ করতে হয়, যে ব্যক্তিত্বে সমস্ত স্বামীদের সামনে কৃষ্ণের মতো পুরুষকে সখা সম্বোধন করে দোষারোপ করা যায়, অথবা যে ব্যক্তিত্বে লম্পট কীচকের সম্বন্ধে রাজসভায় একাকিনী গিয়ে অভিযোগ করা যায়, এই ব্যক্তিত্ব কিন্তু কোনওভাবেই ভোরে স্বামীদের আগে ওঠা, বাসন মাজা বা দরজার বাইরে গিয়ে না দাঁড়ানোর স্মার্ত সতীপনার ব্যক্তিত্ব নয়। বরঞ্চ আমি ব্যক্তিত্ব বলতে যে মানসিক দৃঢ়তা এবং মনস্বিতার কথা বলছি যাতে স্ত্রীলোকের মুখের ওপর, শরীরের ওপর ঝুলে-থাকা যে প্রতীয়মান গম্ভীরতা তৈরি হয়, তাতে পুরুষের উৎকণ্ঠা আরও বাড়ে, যেমনটি দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে হয়েছে এবং একইভাবে তা সত্যভামার ক্ষেত্রেও হয়েছে— পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে লাভ করে যেমন সুস্থির থাকেননি, তেমনই কৃষ্ণও সত্যভামাকে লাভ করে সুস্থির থাকেননি।

প্রসঙ্গত বলি, সত্যভামা বা দ্রৌপদীর মধ্যে যে মনস্বিতা এবং যে ব্যক্তিত্ব আমরা দেখেছি, সেটা কৃষ্ণ অথবা পাণ্ডবদের মতো বিরাট এবং মনস্বী স্বামীদের সঙ্গে দাম্পত্যের

মর্মভাগিতা তৈরি করেছিল। হয়তো এইভাবে একটা 'শেয়ারড কনজ্যুগালিটি' তৈরি হয় যেখানে একের অনুপস্থিতিতে অন্যে নিজেকে একইভাবে প্রয়োগ করতে পারেন, অথবা বিপক্ষতার মাধ্যমেও নিজের যুক্তি অন্যতরকে দিয়ে গ্রহণ করাতে পারেন। সত্যভামা কৃষ্ণকে বলেছিলেন, আমার সম্মান নষ্ট হয়ে গেলে আমার আর বেঁচে থেকে লাভ নেই— তদেবং সতি নেচ্ছামি জীবিতুং মানবর্জিতা। অর্থাৎ সমস্ত অবস্থায় নিজেদের মর্যাদা নিয়ে ভাবিত থাকাটা এই ব্যক্তিত্বের অঙ্গ হিসেবে কাজ করে। ফলত এই ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশের জায়গাগুলো খুব সঙ্গত কারণেই ভীষণ রকমের সপ্রতিভ, এমনকী কখনও কখনও তা খানিক প্রগল্‌ভও বটে। একান্ত আনুগত্যে স্বামী সেবার চেয়েও আপাতদৃষ্টিতে স্বামীর কর্মপদ্ধতির মধ্যে স্ত্রীর অংশভাগিতা এখানে বেশি। সত্যভামাকে দেখুন, পিতার মৃত্যুর পর তিনি একা একটি রথে চড়ে দ্বারকা থেকে বারণাবতে পাণ্ডবদের জতুগৃহ পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন পিতৃহত্যার শোধ তোলার জন্য। এটা কি তৎকালীন দিনের আর কোনও মহিলার পক্ষে সম্ভব ছিল— সম্ভাব্য তালিকায় একমাত্র দ্রৌপদী ছাড়া। সত্যভামার স্বামী-সোহাগের ব্যাপারটাও ছিল অন্যান্য পতিব্রতা গৃহবধূজনের পক্ষে বিপজ্জনক। পারিজাত-পুষ্পের সেই ঘটনায় সত্যভামা নিজমুখে কৃষ্ণকে জানিয়েছিলেন, মহাসাগরে জলক্রীড়া করার সময় আমি তোমার কোলে উঠে স্নান করি— জলক্রীড়াং তবাঙ্কস্থা দেব কৃত্বা মহোদধৌ— কিন্তু এখন যা হল, তাতে আর ওই সমুদ্রের দিকে আর তাকাতে পারব না আমি।

আমি এটা বলছি না যে, কৃষ্ণের নিবিড় হস্তাবলম্বনে কৃষ্ণের সঙ্গে সমুদ্রস্নান করা, একা একরথে বারণাবতে চলে যাওয়া, অথবা যুদ্ধভূমিতেও স্বামীর সঙ্গে থাকাটাই একমাত্র 'স্মার্টনেস' যাতে বেশ চমক লাগে; কিন্তু এই 'স্মার্টনেস'-এর চেয়েও জরুরি বোধহয় সেই মনস্বিতা এবং ব্যক্তিত্ব, যাতে স্বামী হিসেবে কৃষ্ণ সত্যভামাকে তাঁর জটিল জীবনের অংশভাগী ভাবতে পেরেছেন, মনস্বী পুরুষের ভাবনার সংগ্রাহিতা যৌবনবতী স্ত্রীর যৌনতার চেয়েও অধিক কোনও আস্বাদন দেয় যা অনির্বচনীয় কোনও যৌনতার প্রতীক হয়ে ওঠে।

এই প্রসঙ্গে মহাভারতের একটি ঘটনা না বললেই নয়। মহাভারতে তখন যুদ্ধের উদ্যোগপর্ব চলছে। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে পাণ্ডবদের কাছে পাঠিয়েছেন যুদ্ধের বিষয়ে তাঁদের প্রস্তুতি এবং মানসিকতা বুঝে আসার জন্য। সঞ্জয় ফিরে এসেছেন, ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর দফায় দফায় আলোচনা চলছে, ধৃতরাষ্ট্র ভয় পাচ্ছেন, বারবার মহাবীর অর্জুনের বক্তব্য শুনতে চাইছেন, সুচতুর কৃষ্ণের কথা শুনতে চাইছেন। এই অবস্থায় সঞ্জয় অনেকবার অর্জুনের বক্তব্য এবং কৃষ্ণের বক্তব্য শুনিয়েওছেন ধৃতরাষ্ট্রকে। কিন্তু ভয়বিহ্বল ব্যক্তি, বিশেষত নিজেই যে নিজের দোষ জানে, সে আবারও অবস্থার বিপাক পরিমাপ করতে চায়। ধৃতরাষ্ট্র আবারও জিজ্ঞাসা করলেন সঞ্জয়কে, কী বললেন কৃষ্ণ, কী বললেন অর্জুন, আর-একবার বলো তো? সঞ্জয় আগে যা বলেছিলেন, তা সভামধ্যে উপস্থিত সকলের সামনে উচ্চারিত অর্জুন অথবা কৃষ্ণের কথা। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের হিতাকাঙ্ক্ষী, তিনি উভয়পক্ষেরই রক্তক্ষয় চান না। সঞ্জয় ঠিক করলেন, এবার তিনি কৃষ্ণ এবং অর্জুনের একান্তে উচ্চারিত ব্যক্তিগত কথা শোনাবেন ধৃতরাষ্ট্রকে।

সঞ্জয় বললেন, আমি যেমনটা কৃষ্ণকে এবং অর্জুনকে দেখেছি এবং তাঁরা যা স্বমুখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছেন, সেটা শুনুন আপনি। আমি সেদিন নিজের সমস্ত দুরন্ত ভাবনাগুলি সংযত রেখে, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে হাতজোড় করে ওঁদের অন্তঃপুরে ঢুকছিলাম। একান্তে ব্যক্তিগত সেই প্রকোষ্ঠ, যেখানে অন্তঃপুরের মেয়েরা থাকেন সেখানে কৃষ্ণার্জুন দু'জনেই ছিলেন। সেটা একান্ত ব্যক্তিগত স্থান বলেই আমি খুব সংকোচের সঙ্গে মাথা নিচু করে, নিজের পায়ের আঙুল দেখতে দেখতে প্রবেশ করছিলাম। আরও সংকোচ হচ্ছিল এই কারণে যে, এই অন্তঃপুরে শুধু কৃষ্ণ এবং অর্জুনই থাকবেন না, থাকবেন কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামাও এবং থাকবেন দ্রৌপদী— আমি জানতাম সে-কথা— যত্র কৃষ্ণৌ চ কৃষ্ণা চ সত্যভামা চ ভাবিনী। আমার সংকোচ হচ্ছিল, কারণ এই অন্তঃপুরে নকুল-সহদেবও আসেন না, এমনকী অভিমন্যুও ছেলের আবদার দেখিয়ে আসেন না এখানে— নৈবাভিমন্যুর্ন যমৌ তং দেশমভিযান্তি বৈ। কিন্তু আমার প্রয়োজন এতটাই যে আমি প্রবেশ করলাম সেই অন্তঃপুরে।

সঞ্জয় সাধারণত খুব মূল প্রসঙ্গে কথা বলেন, কিন্তু বলার আগেই অন্তঃপুরের যে ভণিতা করছেন, তাতে দুটো জিনিস বেরিয়ে আসে। প্রথমত অজ্ঞাতবাসের পর পাণ্ডবরা যেখান থেকে হস্তিনাপুরের সঙ্গে রাজনৈতিক কথালাপ চালাচ্ছিলেন, সেটা বিরাট রাজার তৈরি করে দেওয়া একটি উপনগরী। এখানে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য কৃষ্ণ, বলরাম, সাত্যকি এঁরা সবাই এসেছেন দ্বারকা থেকে। আমাদের বক্তব্য এখানে সত্যভামাই বোধহয় একমাত্র স্ত্রীলোক, যিনি কৃষ্ণের সঙ্গে এসেছেন দ্বারকা থেকে। তার মানে, তিনি কৃষ্ণের মহিষীকুলের সেই মানুষটি, যিনি কূট এবং কুটিল একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যেও কৃষ্ণের মানসিক সঙ্গী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সারাদিন কৃষ্ণ তথা পাণ্ডবদের সঙ্গে হস্তিনাপুর থেকে ধৃতরাষ্ট্রের দূত হিসেবে আসা সঞ্জয়ের কথাবার্তা চলেছে দফায় দফায়। এখন সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসছে। দ্রৌপদী আজকের এই আলোচনায় নিজে অংশগ্রহণ করেননি বলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েই বসেছিলেন সত্যভামার সঙ্গে। সভাশেষে কৃষ্ণ এবং অর্জুন দু'জনেই দ্রৌপদীর অন্তঃপুরে ফিরে এসেছেন এবং সেখানেই সত্যভামাও আছেন।

সঞ্জয় দেখেছেন অনেক এবং জানেনও অনেক। তিনি বুঝেছেন যে, এইসময় সারাদিনের রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞের পর কৃষ্ণ প্রবেশ করেছেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু অর্জুনের অন্তঃপুরে, যেখানে দ্রৌপদীর সঙ্গে সত্যভামাও আছেন। সঞ্জয় দেখেছেন অর্জুন এবং কৃষ্ণ সারাদিনের রাজনৈতিক অবসাদ মোচনের জন্য স্নান-টান করে 'ফ্রেশ' হয়ে বসেছেন, পরিষ্কার জামাকাপড় পরেছেন এবং খানিক প্রসাধনও করেছেন স্ত্রীদের সামনে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য। শ্রান্তি অপনোদনের জন্য মদ্যপানের ব্যবস্থা হয়েছে এবং কৃষ্ণ-অর্জুন দু'জনেই মদ্যপান করছেন এখন— উভৌ মধ্বাসবক্ষীবৌ উভৌ চন্দনরূষিতৌ। এটা ভাবার কোনও কারণ নেই যে, সত্যভামা এবং দ্রৌপদী এই 'মধ্বাসবে'র রস থেকে বঞ্চিত ছিলেন। কেননা সঞ্জয় যখন অনেক সংকোচ শেষ করে এই অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছেন, তখন এতটাই কাল অতিবাহিত যে, কৃষ্ণ-অর্জুন এবং দ্রৌপদী-সত্যভামা যথেষ্ট 'রিলাকস্‌ড' মেজাজে বসে আছেন এবং এই 'রিলাকসেশনে'র নমুনা এমনই যে, তা এখনকার দিনের অনেক আধুনিকতাকেও হার মানাবে। সঞ্জয় বলেছেন, আমি দেখলাম, অর্ধশায়িত অবস্থায় মদ্যপান করতে করতে কৃষ্ণ তাঁর দুটি পা-ই তুলে দিয়েছেন অর্জুনের

কোলে, আর অর্জুনের একটা পা দ্রৌপদীর কোলে এবং অন্য পা'টি সত্যভামার কোলে— অর্জুনস্য চ কৃষ্ণায়াং সত্যায়াঞ্চ মহাত্মনঃ।

আমরা আর বর্ণনা বাড়াতে চাই না, কেননা সঞ্জয় যেমন রাজনীতির কথা বলতে গিয়ে এই অপ্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, আমরাও তেমনই সত্যভামার প্রস্তাবে-প্রসঙ্গে অবস্থান করছি বলেই এই অপ্রসঙ্গটাকেই সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক মনে করি। আমরা বলতে চাই, সেইকালের দিনে, যখন সতীত্ব, সাধ্বীত্বের সম্পূর্ণ মাত্রাটিই পর-পুরুষ-স্পর্শ-বিরহের মধ্যে নিহিত এবং প্রোথিত ছিল, এমনকী নিজের স্বামীর ক্ষেত্রেও গৃহমেধিনী বধূরা অবগুণ্ঠন মোচন করে স্বামীর সঙ্গে সদাসর্বদা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এমনটা যেখানে সমাজের চোখে ভীষণই নিন্দিত ছিল, সেখানে কৃষ্ণ যেখানে যাচ্ছেন, সেখানেই প্রায় সময় সত্যভামা তাঁর সফরসঙ্গিনী— এটা অনভ্যস্ত চোখে বেশ কটু-কষায় লাগে। কিন্তু আমরা বলব, সত্যভামার ভালবাসা এতটাই আধুনিকভাবে প্রত্যয়ী ছিল যে, স্বামী হিসেবে কৃষ্ণ অনেকটাই তাঁর আপন সখার মতো। বিশেষত এই যে, অর্জুন সত্যভামার কোলের ওপরে পা তুলে বসে আছেন, এটাকে এখনকার জঘন্যতায় 'ওয়াইফ-সোয়াপিং' বলে ভুল না করেও বলতে পারি সত্যভামার ওপর কৃষ্ণের ভালবাসা এবং বিশ্বাসও এতটাই যে, অতিঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে যখন তিনি মদ্যপানে বিনোদিত বোধ করছেন, তখন প্রিয়া পত্নীর উরুর ওপরে স্থাপিত বন্ধুর চরণ দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হচ্ছেন না এবং সত্যভামাও এখানে পরপুরুষের চরণস্পর্শে ছুঁৎকার কিংবা শীৎকার কোনওটাতেই মুহ্যমান হচ্ছেন না। কৃষ্ণের বন্ধু বলেই অর্জুনও তাঁর সঙ্গে সমবন্ধুত্বে একটা পা তাঁর কোলে তুলে দিতেই পারেন— এই সহজ ব্যাপারটা সহজে গ্রহণ করতে পারেন বলেই তিনি কৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠা প্রণয়িনী সত্যভামা।

অনেকে বলতে পারেন, তুমি একটা উদাহরণ দিয়ে সত্যভামাকে এমন মাথায় তুলে ছাড়লে— এটা নেহাৎ বাড়াবাড়ি বটে। আমি শুধু বলব, একটি রমণী-চরিত্রের 'ফোক্যাল পয়েন্ট' বুঝতে গেলে অনন্ত উদাহরণের দরকার হয় না। আর মহাভারত-পুরাণ তো এমন নয় যে, আমার প্রমাণিতব্য ভাবনা বুঝে অনেকানেক প্রমাণ রেখে যাবে যাতে করে সত্যভামাকে আমি ঈপ্সিতভাবে প্রমাণ করতে পারি। আসলে সত্যভামাকে বুঝতে গেলে তাঁর সপত্নী-রোষ-রুষিত অভিমানগুলি দিয়ে বোঝা যাবে না, তাঁকে বোঝার উপায় তাঁর আপন কালাতিক্রমী সেই ব্যবহারগুলি দিয়ে, যেখানে তাঁর সপ্রতিভতা এবং বিদগ্ধতা অন্য রমণীকুলের সমস্ত অভ্যস্ত মাত্রাকে অতিক্রম করে। এখানে দেখার বিষয় এইটাই যে, সারাজীবন ধরে কৃষ্ণের মতো এক বিশালবুদ্ধি মানুষ যে কর্মশীলতায় জীবন বাহিত করছেন, সত্যভামা কৃষ্ণের সেই জীবনের সহধর্মচারিণী— যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাজনীতি— কৃষ্ণ যেখানেই গেছেন, সেইখানেই সত্যভামা আছেন তাঁর হৃদয়-বোদ্ধা সখীর মতো। দাম্পত্য জীবনে যে রমণী এমন বন্ধু হয়ে উঠতে পারেন, তাঁকে প্রমাণের জন্য একটা-দুটো 'ট্রেইট'ই যথেষ্ট এবং ওই একটা-দুটো উদাহরণের প্ররোচনাতেই রূপ গোস্বামীর নাটকে বৃন্দাবনের রাধা সত্যভামা হয়ে ওঠেন বিবর্তনে, এই প্ররোচনাতেই রসশাস্ত্রে লিখিত হয়— অন্য সমস্ত মহিষীদের থেকে সত্যভামা আলাদা— সত্যভামোত্তমা স্ত্রীণাং সৌভাগ্যে চাধিকাভবৎ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুদেষ্ণা

দেখুন, বড়লোকের ঘরে যেসব মেয়েরা থাকেন, তাঁদের আমি দূর থেকে খুবই শ্রদ্ধা করি। একে তো সুখের ঘরে রূপের বাস— এমন মাখন-মাখন সব চেহারা, স্বল্পালম্বিত কেশগুচ্ছেও এমন এলোমেলো চুল, এমন উতলা আঁচল— অথবা রূপের কথা থাক, যদি স্বভাবের কথাও বলি, তা হলে বলব— তাদের আপাত-বিনীত সম্ভ্রান্ত ভঙ্গির সঙ্গে মধুর হাসে বিধুর ভাষাও যেমন ভাল লাগে, তেমনই ভাল লাগে উদ্দাম উচ্ছল ভেঙে-পড়া প্রগলভতাও কখনও। কিন্তু এত যে আমার ভাল লাগা, তার মুখে ছাই দিয়ে আমার এক বন্ধু বলেছিল— দেখ, ওরা দেখতে-শুনতে যতই ভাল হোক, বড়লোকের মেয়ে আর পয়সাওলা লোকের বউ, দেখবি, বুদ্ধিহীন হয়। যে কোনও উচ্ছলতায় ওরা তাড়াতাড়ি নাচে। অপরের কথায় তাড়াতাড়ি বাহিত হয়, আর নিজস্ব বিচারবুদ্ধি নেই বললেই চলে।

কথাটা শুনে আমার ভাল লাগেনি। প্রতিবাদ করে বলেছিলাম— এটা তোর ভারী একপেশে কথা। অন্তত, এটা কখনও সার্বিক লক্ষণ হতে পারে না। বরঞ্চ বড় ঘরের অর্থ, ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধি সেসব বাড়ির বউঝিদের আরও বেশি সুরুচিসম্পন্না, আরও বেশি মর্যাদাময়ী করে তোলে। তা ছাড়া এইরকম একটা সাধারণীকরণ তো মধ্যবিত্ত মানুষের ঈর্ষা-অসূয়াই বেশি প্রকট করে তোলে। আমার বন্ধু সাময়িকভাবে চুপ করে গেলেও আমার কথা খুব মেনে নিল বলে মনে হল না। আর আমিও আমার তর্কে যুক্তিনিষ্ঠ ছিলাম বলেই মনে করি, কেননা দু'-চারটি রমণীর দৃষ্টান্ত দেখে এমন সাধারণীকরণ কখনও যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে না। আরও দু'-চারটি বুদ্ধিহীন সজ্জাসর্বস্ব আত্মারাম মহিলা যা বড় ঘরে আছে, তা তো অন্যান্য ঘরে শয়ে-শয়ে আছে। তবে হ্যাঁ, একটাই যুক্তি মানতে পারি এবং সেটা হল— বড়লোকের ঘর হলেই একটা প্রত্যাশা জন্মায়— অমন মাখন-মাখন চেহারায় কুন্দকলি-হাসির মধ্যে বুদ্ধি থাকবে না, বিদ্যা থাকবে না, এটা যেন ঠিক মানায় না। এটা যেন কেমন মেনে নিতে পারি না।

এই যে 'মানায় না' এবং 'মেনে নিতে পারি না'— এইখানেই মহাভারতের সুদেষ্ণা ভীষণ সদর্থক হয়ে ওঠেন। সত্যিই তো, মহাভারতের অন্য যত স্ত্রী-চরিত্র— সত্যবতী, কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী— এঁরাও তো বড় ঘরের মেয়ে, বড় ঘরের বউ— তাঁদের ভাবনা এবং বুদ্ধিতে হীরকখণ্ডের দ্যুতি ঠিকরে পড়ে যেন। এমনকী মহাভারতের যেসব গৌণ রমণীরা আছেন— সুভদ্রা, উলূপী, চিত্রাঙ্গদা— তাঁদের তুলনাতেও সুদেষ্ণা কেমন সাধারণ। কিন্তু সাধারণ, অতি-সাধারণ বলেই মহাকাব্যিক নিরিখে তাঁকে 'মানায় না' বা 'মেনে নিতে পারি না' বললেও সাধারণ গৃহস্থ-বধূর মধ্যে যেসব সাধারণী বৃত্তি থাকে— স্বামীকে সন্দেহ

করা, বাপের বাড়ির লোক হলে সাত খুন মাপ, ন্যায়-অন্যায়ের কঠিন বিবেচনার ক্ষেত্রে উদাসীন বিভ্রান্তি— এগুলি আমাকে টানে। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে— মহাকাব্যের কবির সেই ক্রান্ত দৃষ্টিটুকুর কথা ভেবে। বুদ্ধি এবং যৌবনের মহাকাব্যিক মাত্রাগুলি মুখ্য মহিলা-চরিত্রগুলির মধ্যে চিহ্নিত করেই তাঁর কাজ ফুরিয়ে যায় না। একটা রাজবাড়ির মধ্যেই তিনি এমন চরিত্রের সন্ধান পান, যাঁর মধ্যে বড়মানুষের 'ইগো' আছে ষোলো আনা, অথচ ভাবনায়, বুদ্ধিতে এবং আচারে তিনি বড় বেশি গ্রাম্য এবং সাধারণ।

অথচ সুদেষ্ণা খুব সাধারণ বাড়ির মেয়ে নন। তিনি কেকয় দেশের রাজার মেয়ে এবং দেশটা সেকালে আর্যসভ্যতা এবং সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। পণ্ডিতদের মতে পঞ্চনদীর দুই নদী শতদ্রু-বিপাশা অথবা বিপাশা রাভীর মধ্যগত পাহাড়ি এলাকাটাই সেকালের কেকয় দেশ। এই কেকয় থেকে বিবাহ-পরিণয়ের সূত্রে তাঁর মৎস্যদেশে বিরাট রাজার বধূ হিসেবে আগমন। যদি দেশজ সংস্কৃতির কথা বলি, তবে মৎস্যদেশ, মানে এখানকার জয়পুর-ভরতপুর-আলোয়ার অঞ্চল সেকালে আর্য-ভাবনায় অধ্যুষিত ছিল। সরস্বতী-দৃষদ্বতীর মধ্যগত যে দেশটাকে ব্রহ্মর্ষিদেশ বলা হয়, তার অবস্থান প্রায় এইখানেই। তা ছাড়া আর্যদের পরিক্রমণ যে পথে ঘটেছিল, সেও তো পঞ্চনদীর দেশ থেকে সরস্বতী-দৃষদ্বতীর মাঝখানে আর্যাবর্তে আসা। কাজেই কৈকেয়ী সুদেষ্ণার জন্ম এবং বিবাহ— দুই-ই আর্য-সংস্কৃতির প্রথম-প্রবাহিনী ধারায় সিক্ত। অথচ কৈকেয়ী সুদেষ্ণার চরিত্র মহাভারতীয় গান্ধারী, কুন্তী কিংবা সত্যবতীর মতো নৈতিকতা মেনে চলে না। অবশ্য এর কারণ শুধুমাত্র সুদেষ্ণাই নন। রাজা এবং বিশেষত পুরুষ হিসেবে সুদেষ্ণার স্বামী এতটাই উদাসীন প্রকৃতির যে, মৎস্য-রাজ্যের প্রশাসন এবং তিনি নিজেও অনেকটা স্ত্রী সুদেষ্ণার ইচ্ছার অধীন হয়ে গিয়েছিলেন। অধীন যদি বা নাও বলি, অন্তত তাঁর অন্যায়গুলির প্রতিবাদও করেননি তিনি, আর রাজা হিসেবে তাঁর সামনে সুদেষ্ণার সম্বন্ধে তো নয়ই, তাঁর সম্পর্কিত কারও সম্বন্ধে নালিশ করেও কোনও লাভ ছিল না।

চরিত্রের মূলস্থানে না গিয়ে আগেই একটা কথা বলে রাখা ভাল যে, মহাভারতের অন্যান্য বৃহৎ চরিত্রের মতো সুদেষ্ণা সারা মহাভারত জুড়ে অবস্থান করেন না। শুধুমাত্র বিরাট-পর্বের মধ্যে সুদেষ্ণাকে আমরা ছোট্ট একটি ফ্রেমের মধ্যে দেখতে পাব, সে চরিত্রের মধ্যে বিরাট বিস্তার নেই কোনও, মহাকাব্যের কোনও প্রশ্রয়ও তাঁকে মহত্তর কোনও স্তরে উন্নীত করে না। কিন্তু মানুষের অনন্ত জীবন-বৈচিত্র্যের মধ্যে সুদেষ্ণাও একতর জীবন, যেখানে রাজার ঘরের বড়লোক বউ কোনও প্রতিবিশিষ্ট চেহারায় ধরা পড়েন না। সুদেষ্ণা বুঝিয়ে দেন যে, অনেক সময়ে রাজার ঘরেও সাধারণ মনুষ্যবৃত্তি কাজ করে, কোনও বৃহৎ পরিশীলিত আভিজাত্য সেখানে অমূলক হয়ে ওঠে।

মহাভারতে খুব নাটকীয়ভাবে সুদেষ্ণার প্রবেশ ঘটেছে এবং এমন চেনা সুরে তিনি কথা বলেন, যাতে মনে হয় তাঁর অন্যান্য সমস্ত পরিচয় যেন আমাদের আগে থেকে জানা। পাণ্ডবরা তখন বনবাস-পর্ব শেষ করে বিরাট রাজ্যে প্রবেশ করবেন বলে স্থির করেছেন। কে, কীভাবে, কোন ভূমিকায়, কোন বেশে বিরাট রাজ্যে অজ্ঞাতভাবে থাকবেন, তাও ঠিক হয়ে গেছে। হয়তো বিরাট রাজার ভোলেভালা চরিত্র সম্বন্ধে পাণ্ডবদের পূর্বজ্ঞান ছিল, কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্রৌপদী কৃষ্ণা প্রথমে যে-উচ্ছ্বাসে সুদেষ্ণার ঘরে সৈরিন্ধ্রীর বেশে কাজ করতে এসেছিলেন, তাতে সুদেষ্ণাকে প্রথমে যতখানি চেনা গেছে, পরে তিনি তাঁকে অন্যভাবে চিনেছেন বলেই মনে হয়। দ্রৌপদীকে নিয়ে বড় চিন্তায় ছিলেন যুধিষ্ঠির। রাজবাড়ির সুখে অভ্যস্ত বিলাসিনী দ্রৌপদী কীভাবে বিরাটগৃহে থাকবেন— এই দুশ্চিন্তায় জল ঢেলে দিয়ে দ্রৌপদী বলেছিলেন— সৈরিন্ধ্রীর কাজটা আমার বেশ পছন্দ হয়। লোকসমাজে এই ধারণা আছে যে, এই কাজে কিছু স্বাধীনতাও আছে আবার পরাধীনতাও আছে। পরাধীনতা এইখানে যে, লোকের ব্যড়ি তাকে খাটতে হবে, তার খাওয়া-পরার ভারও সেই বাড়ির কর্তার। কিন্তু স্বাধীনতা এইখানে যে, তাঁর সুরক্ষার ব্যাপারে নিয়োগকর্তার কোনও দায় নেই। অর্থাৎ সৈরিন্ধ্রী নিজের ইচ্ছেয় যেখানে-সেখানে, যখন-তখন চলাফেরা করতে পারে। প্রসাধন প্রস্তুত করা এবং সাজানো ব্যাপারটা যেহেতু তার স্বাধীন শিল্পরচনার প্রক্রিয়ার, অতএব এখনকার 'বিউটিশিয়ান'দের মতোই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনটা স্বাধীন, কিন্তু কাজের জায়গাটা তেমন স্বাধীন নয়, কেননা পরগৃহে কাজ করতে হয় বলেই এবং সে বাড়ির ভাত খেতে হয় বলেই সে বাড়ির নিয়ম-কানুন, মালিক-মালকিনির পরোয়ানা খানিকটা মেনে নিতে হয়। দ্রৌপদী তাতে খুব অস্বস্তি বোধ করেননি। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন— তুমি চিন্তা কোরো না। আমি রাজভার্যা সুদেষ্ণার প্রসাধনী পরিচর্যা করেই এই এক বছর কাটিয়ে দেব এবং আমার মনে হয়, রাজবাড়ির মহিষী বলেই তিনি আমাকে সুরক্ষিত রাখার ভাবনাটাও যথাযথভাবে ভাববেন— যা রক্ষিষ্যতি মাং প্রাপ্তাং মা ভূত্তে দুঃখমীদৃশম্।

বিরাট রাজ্যে যুধিষ্ঠির-ভীমের প্রবেশ সম্পন্ন হবার পর দ্রৌপদীর প্রবেশ। তিনি যখন তাঁর কুঞ্চিতাগ্র কেশগুলিকে মাথার ডান দিকে তুলে বেঁধে, একখানি কালো কাপড় পরে রাজবাড়ির কাছাকাছি রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, তখন আশেপাশের মেয়ে-পুরুষেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল— তুমি কে গো মেয়ে? কী করতে চাইছ? দ্রৌপদী উত্তর দিলেন— আমি সৈরিন্ধ্রী। অন্য জায়গা থেকে এখানে এসেছি। কেউ যদি শুধুমাত্র আমার ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করে দেয়, তা হলে তার বাড়িতে থেকেই তার কাজ করব আমি। হয়তো একজনকে নয়, আরও দু'-চারজন জিজ্ঞাসুকে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে নিজের কথা বলতেই রাজবাড়ির অলিন্দে-বসা সুদেষ্ণার কানে সেটা গেল। রাস্তার লোকেরা একেবারেই তাঁর কথা বিশ্বাস করেনি। কেননা কালো হলেও দ্রৌপদীর উচ্ছ্বসিত যৌবন, তাঁর বিদগ্ধ রমণীয় ভঙ্গি এবং তাঁর দৃপ্ত পদক্ষেপ এবং কথাবার্তা সব কিছুই এমন এক মর্যাদা বহন করছিল, যাতে তিনি শুধু অন্নপানের পরিবর্তে বাড়িতে দাসীর কাজ করবেন, এটা বিশ্বাস করা কঠিন হচ্ছিল।

ঠিক এইরকম একটা পরিস্থিতিতে আমরা প্রথম বিরাট-গৃহিণী সুদেষ্ণার সাক্ষাৎ পাই। রাজবাড়ির অলিন্দ থেকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে দ্রৌপদীর ওপর। এক কাপড়ে এসেছেন, সঙ্গে পোঁটলা-পুটলি কিছু নেই, এমনকী পুরুষ মানুষও একজন নেই সঙ্গে, সুদেষ্ণা লোক দিয়ে তাঁকে ডেকে পাঠালেন নিজের কাছে। পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে দ্রৌপদী সেই একই কথা বললেন— তিনি সৈরিন্ধ্রী, ভাত-কাপড় দিলে তিনি সুদেষ্ণার দাসী হয়ে থাকবেন। সুদেষ্ণার যে পরিচয়-ই ভবিষ্যতে আমাদের কাছে প্রকট হয়ে উঠুক, তাঁর লোক চিনতে ভুল হয়নি।

তিনি বললেন, দেখো হে মেয়ে! দাস-দাসী আমি অনেক দেখেছি, তারা কেউ-ই তোমার মতো নয়। এমন আগুনপানা চেহারা নিয়ে কেউ দাসীবৃত্তি করে? অতএব যেমনটি তুমি বলছ, তা হতেই পারে না— নৈবংবিধা ভবত্যেবং যথা বদসি ভামিনি।

আসলে সুদেষ্ণার সমস্ত নজর তখন দ্রৌপদীর শরীরের দিকে। একেতেই সাধারণ রমণীকুলের মধ্যে এই স্বভাব থাকেই। সুন্দরী রমণী দেখলে নিজের সঙ্গে তুলনা করে দেখার একটা প্রবণতা থাকেই। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তুলনার পর অন্য সুন্দরীর প্রতি এক ধরনের ঈর্ষা-অসূয়া এমনকী অনীহাও কাজ করে। কিন্তু সুদেষ্ণা এদিকে খুব সরল। প্রথম দেখাতেই তিনি দ্রৌপদীর দাসীত্ব-বিলাস উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন— তোমার চেহারাটা তো অসম্ভব সুন্দর। রমণী-দেহের উচ্চাবচ সংস্থানের মধ্যে যে যে অঙ্গ গভীর-নিম্ন হওয়া দরকার, দ্রৌপদীর ঠিক তাই, আবার যে যে-স্থান উচ্চ-পীন হলে পরে রমণীর সৌন্দর্য্য বর্ধিত হয়, দ্রৌপদীর শরীর সংস্থানের উচ্চতা সেখানেই। সাধারণ সৌন্দর্য্য উচ্চারণে— 'সুকেশী সুস্তনী শ্যামা পীনশ্রোণী-পয়োধরা'— দ্রৌপদীকে এইটুকু প্রশংসা করেই সুদেষ্ণা থামলেন না, দ্রৌপদীর শারীরিক সৌন্দর্য্য ছাড়াও তাঁর মধ্যে যে 'একস্ট্রা অর্ডিনারি গ্ল্যামার' এবং অসম্ভব একটা 'এনার্জি' কাজ করছে, এটা বোধহয় সুদেষ্ণা ছাড়া মহাভারতের আর কেউ এমনভাবে বলেননি। সুদেষ্ণা বলেছেন— তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি কাশ্মীরি ঘোটকীর মতো টগবগ করছ যেন— তেন তেনৈব সম্পন্না কাশ্মিরীব তুরঙ্গমী। যেমন তোমার রূপ, তেমনই তোমার সদা-প্রস্তুত মানসিক তেজ। এমন চেহারা কি দাসীদের জন্য তৈরি করেছেন ভগবান! তার চেয়ে তুমি সত্যি করে বল যে, তুমি দেবী না গন্ধর্বী, অপ্সরা না কিন্নরী, নাকি দেবকন্যা না দেবপত্নী— তাসাং ত্বং কতমা শুভে?

সবিনয়ে দ্রৌপদী বললেন— আমি কোনও দেবী বা গান্ধর্বী নই। আমি সত্যিই সৈরিন্ধ্রী এবং অন্ন-পানের পরিবর্তে আমি সেবা করতে চাই। আমি দারুণ খোঁপা বাঁধতে জানি, জানি কত মিহি করে চন্দন বাটা যায়। তা ছাড়া মল্লিকা, চাঁপা এবং পদ্মের মালাগাছি তৈরি করি ভাল। আমার অভিজ্ঞতাও কম নয়। আমি একসময় কৃষ্ণভামিনী সত্যভামার সাজ-সজ্জা করেছি, আর কুরুকুলের একতমা সুন্দরী পঞ্চ-পাণ্ডবের পত্নী দ্রৌপদীরও কাজ করেছি আমি। আমার বেশি চাহিদা নেই। ঠিক-ঠিক ভাত-কাপড় পেলেই আমি আনন্দে থাকি। আর জানেন তো, আমার কাজে খুশি হয়ে স্বয়ং দেবী দ্রৌপদী আমার নাম রেখেছিলেন মালিনী। আমি সেই মালিনী এসেছি আপনার কাছে, আপনার কাছে রেখে দিন আমাকে— সাহমদ্যাগতা দেবি সুদেষ্ণ ত্বন্নিবেশনম্।

দ্রৌপদীর মতো অসাধারণ দৃপ্ত সুন্দরী তাঁর কাছে কাজ চাইছেন, তাঁকে রাখতেও কোনও আপত্তি নেই তাঁর। কিন্তু দ্রৌপদীর আগুনপানা রূপ তাঁকে স্বস্তি দিচ্ছে না। তবু সুদেষ্ণা বড় সরল, তিনি নিজের ঘরের কথা লুকিয়ে রাখতে পারেন না, চাপতে পারেন নিজের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব। সুদেষ্ণা বললেন— তোমাকে দেখে আমার মনে যদি কোনও সন্দেহ দানা না বাঁধত, তা হলে তোমায় আমি মাথায় করে রাখতাম। তোমাকে যদি ঘরে স্থান দিই, তা হলে আমার একটাই ভয়— রাজা বিরাট তোমাকে দেখে পাগল হয়ে যাবেন না তো? তোমাকে মন দিয়ে বসবেন না তো— ন চেদিচ্ছতি রাজা ত্বাং গচ্ছেৎ সর্বেণ চেতসা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুদেষ্ণার কথারম্ভ থেকেই এ-কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, স্বামীর ব্যাপারে তিনি বেশ সন্দেহপ্রবণ। তাঁর স্বামী বিরাট রাজার স্ত্রী-বিষয়ক দুর্বলতা ছিল— এমন ছিটেফোঁটা প্রমাণও আমরা মহাভারতের বিশাল সাম্রাজ্য জুড়ে পাইনি। মহাভারতের কবি কিছু লুকোন না, যদি বিরাট রাজার চরিত্র খারাপ হত, তা হলে মহাভারতের কোথাও না কোথাও তার ইঙ্গিত পেতাম। তা পাইনি বলেই বলছি— সুদেষ্ণা বোধহয় একটু সন্দেহপ্রবণ মহিলা। স্বামীকে সন্দেহ করার ব্যাপারে তাঁর যুক্তি-তর্কও খুব শক্তপোক্ত নয়। তিনি দ্রৌপদীকে বললেন— রাজা তো পুরুষ মানুষ, তার তো হবেই এরকম। দেখো না, তোমাকে দেখা ইস্তক এই রাজবংশের মেয়েরা সব, যত আমার পরিচারিকা আছে, সব তোমার দিকেই চেয়ে আছে। সেখানে রাজা তো পুরুষ মানুষ, তোমাকে দেখলে কোন পুরুষ মানুষের মাথার ঠিক থাকবে— প্রসক্তাস্ত্বাং নিরীক্ষন্তে পুমাংসং কং ন মোহয়েঃ। তোমার এই চেহারা চোখে পড়লে রাজা বিরাট আমার মতো বিবাহিতা স্ত্রীকে ছেড়ে তোমাকে নিয়েই থাকবেন। সবচেয়ে বড় কথা, তুমি যদি সানুরাগে কোনও পুরুষ মানুষের দিকে তাকাও তা হলে সেই পুরুষ অবশ্যই কামনার বশবর্তী হবে— প্রসক্তমভিবীক্ষেথাঃ স কামবশগো ভবেৎ।

সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে তেমন করে চেনেন না এমনকী তিনি যে দ্রৌপদী, তাও তিনি জানেন না। কিন্তু একজন সুন্দরী পরিচারিকাকে বাড়িতে স্থান দেওয়ার ব্যাপারে তিনি যেভাবে কথা বলছেন, সেটা সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের কোনও গৃহিণীর চেয়েও বেশি। তিনি ধরেই নিচ্ছেন— এমন সুন্দরীকে ঘরে রাখলে কোনও পুরুষের চরিত্র ঠিক থাকবে না। তার শেষ কথাটা ছিল একেবারে প্রাণীবিজ্ঞানের জৈব উপমায় জড়িত। সুদেষ্ণা বলেছেন— তোমাকে ঘরে রাখা মানে কর্কটীর গর্ভ ধারণ করা। কর্কটী যেমন গর্ভধারণ করে নিজেরই মৃত্যু ডেকে আনে, তেমনই কাজটা হবে তোমাকে ঘরে রাখা— যথা কর্কটকী গর্ভমাধত্তে মৃত্যুমাত্মনঃ। সাধারণ ভারতীয় ঐতিহ্যে এইরকম একটা ধারণা আছে যে, কর্কট-জাতীয় প্রাণী বা পতঙ্গ— কর্কট কথাটির সোজা মানে কাঁকড়া কিন্তু এখানে কর্কট বলতে কাঁকড়াই বোঝাচ্ছে কিনা তা বলা যাচ্ছে না— তবে কিনা ধারণাটা এইরকম যে, কর্কটী অর্থাৎ স্ত্রী-কর্কট নাকি গর্ভধারণ করলে সন্তান প্রসব করার সময় সাধারণত মারা যায়, অর্থাৎ এদের গর্ভস্থ প্রাণীটি অতিরিক্ত বড় হয়ে যায় বলে স্ত্রী-কর্কট মারা পড়ে।

প্রাণীবিদ্যাবিদ পণ্ডিতেরা এই ধারণা কতটা মানবেন সন্দেহ, এমনকী মহাভারতের টীকাকার মহামতি নীলকণ্ঠও 'কর্কট' শব্দটির অর্থে কোনও বিশেষ প্রাণীর কথা বলেননি, ভাষাগত অর্থে কাঁকড়ার উচ্চারণ তো এড়িয়েই গেছেন তিনি। কর্কট শব্দের অর্থ তিনি করেছেন— ষটপাদবান্ জন্তুঃ— অর্থাৎ ছয়-পা-ওয়ালা প্রাণী। আমাদের ধারণা— এটা ছয়-পা-ওয়ালা প্রাণী বা আট-পা-ওয়ালা এ-ব্যাপারটায় একটা বিভ্রান্তি নীলকণ্ঠের হতে পারে। যদি পরেরটা ধরি, তা হলে মহাভারতের শ্লোকার্থ পরিষ্কার হতে পারে। বিশিষ্ট প্রাণীবিদ্যাবিদ অধ্যাপক রাজীব ভক্ত আমাকে জানিয়েছিলেন যে, স্ত্রী মাকড়সা বা মৌমাছি, যারা অষ্টপদ পতঙ্গ, বিশেষত স্ত্রী-মাকড়সা, তারা 'মেটিং'-এর পর পুরুষ মাকড়সাকে মেরে ফেলে এবং তারপর 'সাক্' করে পুরুষ-মাকড়ের দেহের রসটা খেয়ে ফেলে। স্ত্রী-মাকড়সা এমনিতেই পুরুষ মাকড়সার থেকে আকারে বড় হয় এবং 'মেটিং'-এর পর স্ত্রী-মাকড়ের

শক্তিও বেড়ে যায় বহুগুণ। কাজেই বিরাটপত্নী সুদেষ্ণার আশঙ্কা আমরা এইভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি যে, অন্তঃপুরের গর্ভগৃহে যদি এই মালিনী দ্রৌপদীকে লুকিয়ে রাখা যায় তবু তাঁর সৌন্দর্য্যের লোলুপতায় আকৃষ্ট হতে পারেন রাজ্যের রাজা, তাঁর স্বামী বিরাট। পুরুষ হিসেবে তিনি বাঁধা পড়বেন দ্রৌপদীর প্রেমে এবং সুদেষ্ণার স্বামীর মৃত্যু তো সেখানেই। অতএব দ্রৌপদীকে রাখা মানে সুদেষ্ণার পক্ষে নিজের স্বামী হারানো এবং অন্য অর্থে নিজেরই মৃত্যু ডেকে আনা— যথা কর্কটকী-গর্ভমাধত্তে মৃত্যুমাত্মনঃ।

দ্রৌপদী সুদেষ্ণার আশঙ্কায় প্রলেপ লাগিয়ে বললেন— আপনার স্বামী বিরাট কেন, কোনও পুরুষ মানুষই আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। আমার পাঁচ-পাঁচ জন গন্ধর্ব-স্বামী আছেন। তাঁরা সদা-সর্বদা রক্ষা করবেন। আর আমিও যে আপনার বাড়িতে কাজ করতে এসেছি, সে-একটা ব্রত পালনের নিয়ম ঠিক করার জন্য। আমি পরিচারিকা হয়ে থাকব বলেই আমাকে আপনারা উচ্ছিষ্ট দেবেন না, আর আমাকে দিয়ে পা ধোয়াবেন না আপনারা। আমার স্বামীরাও তাতে সন্তুষ্ট থাকবেন এবং আমিও। আর হঠাৎ যদি কোনও পুরুষ আমাকে পাবার জন্য লোলুপ হয়ে ওঠে, তবে সেই রাত্তিরেই তাকে নিজের দেহ ছেড়ে জন্মান্তরের দেহে প্রবেশ করতে হবে। দ্রৌপদী সুদেষ্ণাকে আরও আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে, তাঁকে অন্য দিকে প্রলোভিত করা কোনও পুরুষ মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়, সে চেষ্টা করলে তাঁর প্রচ্ছন্নচারী গন্ধর্ব-স্বামীরা সেই পুরুষকে ছেড়ে দেবেন না।

সুদেষ্ণা সত্যিই বড় সরল এই দিকটায়। তিনি তাঁর স্বামীর ব্যাপারেই শুধু নিশ্চিন্ত হতে চাইছিলেন, কিন্তু এটা সন্দেহ হল না যে, এই সুন্দরী মহিলার স্বামী সংখ্যা পাঁচটা কেন, তাঁরা কেনই বা প্রচ্ছন্নচারী। দ্রৌপদীর যুক্তিতে সন্তুষ্ট হতেও তাঁর সময় লাগেনি এবং সন্তুষ্ট হওয়া মাত্রেই তিনি তাঁকে তাঁর শর্ত মেনেই কাজে বহাল করেছেন। বলেছেন— যেমনভাবে তুমি এখানে থাকতে চাও তেমনভাবেই তুমি এখানে থাকবে— এবং ত্বাং বাসয়িষ্যামি যথা ত্বং নন্দিনীচ্ছসি— কারও চরণও তোমাকে স্পর্শ করতে হবে না, কারও উচ্ছিষ্টও তোমাকে খেতে হবে না।

দ্রৌপদী কাজে বহাল হলেন এবং নিত্যদিন সুদেষ্ণার পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ করলেন। এই পরিচর্যার কাজের মধ্যে সুদেষ্ণাকে সাজানো বা তাঁর চুল বেঁধে নানান ধরনের কেশবিন্যাস করা অথবা কুমকুম-চন্দন-পঙ্কে তাঁর দেহে অলকা-তিলকা রচনা করাই তাঁর একমাত্র কাজ ছিল বলে মনে হয় না। আমাদের ধারণা, বাড়িতে সর্বসময়ের পরিচারিকা থাকলে যা হয়, সুদেষ্ণা ফাই-ফরমাস করতেন অবশ্যই, এমনকী তাঁর স্নানের ব্যবস্থা থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য হীন কাজও কিছু কিছু করতে হত বলে মনে হয়। হয়তো বা দ্রৌপদীর পক্ষে সবচেয়ে কষ্টকর ছিল মধ্য মেধাবিণী রাজপত্নীর বিলাস-কুতূহলের কালে ততোধিক মধ্যম রসিকতাগুলি সহ্য করা। মহাভারতের কবি সবিস্তারে এইসব পরিচর্যা-কর্ম উল্লেখ করেননি, কিংবা সুদেষ্ণার ফাই-ফরমাসের নানান নমুনাও তিনি দেখাননি। কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে যে-সব ঘটনা এখানে ইঙ্গিতাকারে এসেছে তার মধ্যে থেকেই সূত্র সংগ্রহ করে বলা যায় যে, সুদেষ্ণা নৈতিক দিক থেকে খুব দৃঢ় মনের মানুষ ছিলেন না। নইলে নিজের স্বামীর ব্যাপারে দ্রৌপদীর রূপ নিয়ে তিনি যত আশঙ্কিত ছিলেন, সেই আশঙ্কা সময়মতো এতটুকুও মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এল না, অথচ তখন সত্যিই তাঁর কর্তৃত্ব এবং ব্যক্তিত্ব বড় বেশি প্রয়োজন ছিল স্বয়ং দ্রৌপদীর সুরক্ষার জন্যই।

আসলে সুদেষ্ণা যতই আদর করে রাখুন দ্রৌপদীকে, অন্তত সেই আদরে মৌখিকতার আবেশই বেশি ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু সুদেষ্ণার অন্তর-গভীরে কৃষ্ণা দ্রৌপদীর আলোকসামান্য রূপ অসহনীয় ছিল ছিল বলেই আমাদের নিশ্চিত ধারণা। কেননা অসহনীয়তার মনস্তত্ত্ব কোনও কোনও রমণীর মনে এই বিপরীত প্রতিক্রিয়াই তৈরি করে যে, ওই রূপ কোনওভাবে দলিত, ধর্ষিত, কলুষিত হোক। সুদেষ্ণা নিজে যাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন, তাঁকে প্রত্যক্ষত নিজে কিছু করা যায় না বলেই এই অবদমিত আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে কাজ করে যাতে অপরূপা দ্রৌপদী তাঁর দীপ্র সৌন্দর্য্য-সাম্রাজ্যের মধ্যে লাঞ্ছিতা হন কোনওভাবে। সে সুযোগ সুদেষ্ণার এসে গেল।

সুদেষ্ণার বাড়িতে দ্রৌপদীর খুব সুখে থাকবার কথা নয়। সৈরিন্ধ্রীর কাজটার মধ্যে কেশচর্চা বা চন্দন-কুমকুমের প্রলেপ বানানোর কাজ যতটুকুই থাক, এই কাজটা রাজবধূর করার কথা ছিল না, বরঞ্চ রাজবধূ হিসেবে এই সেবা তাঁর পাবার কথা। ফলত মনে মনে দ্রৌপদী সুখে ছিলেন না এতটুকুও। স্বামীরা বিরাটগৃহে হীন কার্য করছেন, নিজেও তাই করছেন, অতএব সুখ নেই তাঁর মনে— অবসৎ পরিচারার্হা সুদুঃখং জনমেজয়। এই অবস্থায় দুঃখের ওপর মহাদুঃখ হিসেবে তাঁর ভবিতব্যের মতো নেমে এলেন সুদেষ্ণার ভাই কীচক। সুদেষ্ণার চরিত্র-কথা বলতে গিয়ে কীচকের কথা এই জন্য বলতে হচ্ছে যে, সুদেষ্ণার সম্বন্ধেই তাঁর সম্বন্ধ, সুদেষ্ণা না থাকলে কীচকের অস্তিত্ব নেই কোনও। একই সঙ্গে এটাও মানতে হবে যে, সুদেষ্ণার ভাই বলেই তিনি কোনও সাধারণ লোক নন, সুদেষ্ণার সম্বন্ধ-বলেই তিনি বিরাট রাজ্যের প্রবল প্রতাপান্বিত সেনাপতি। সেই সেনাপতি কীচক তাঁর ভগিনী সুদেষ্ণার ঘরে আসতে গিয়ে দ্রৌপদীকে দেখে ফেললেন। তিনি পরিচারিকার কর্মে রত ছিলেন, সেই অবস্থায় কীচকের আবির্ভাব ঘটল সুদেষ্ণার ঘরে— তথা চরন্তীং পাঞ্চালীং সুদেষ্ণায়াঃ নিবেশনে। যিনি বিশ্বস্তচিত্তে ঘরের পরিচারিকার কাজ করছেন, তাঁর বেশ-বাস কিঞ্চিৎ অবিন্যস্ত থাকবে, অথবা কাজের সুবিধের জন্যই গ্রন্থিহীন বস্ত্রখানি অতিমাত্রায় সুগ্রন্থিত থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। তাতে দ্রৌপদীর দৈহিক রূপ-যৌবন, অঙ্গ-সংস্থান আরও প্রকট হয়ে উঠেছিল হয়তো। আর কীচকও তেমন কোনও সংযমী পুরুষ নন এবং বিরাট রাজ্যের সেনাপতি বলেই আরও বুঝি অসংযত পৌরুষেতায় ভোগেন, ফলে দ্রৌপদীকে দেখামাত্রেই তিনি কামনায় তপ্ত হয়ে উঠলেন— কীচকঃ কাময়ামাস কাম-বাণ-প্রপীড়িতঃ। মহাভারতের কবি, মহাকাব্যের কবি দ্বৈপায়ন ব্যাস তখনকার রাজতন্ত্রের অন্যতর এক অন্ধকার রূপ দেখাচ্ছেন। দেখাচ্ছেন— নিজের অস্ত্রক্ষমতায় যিনি সেনাপতি হননি, বৈবাহিক সম্বন্ধ লাঞ্ছিত করে যিনি স্ত্রৈণ জামাইবাবুর দুর্বলতায় রাজ্যের শাসনযন্ত্রে অধিষ্ঠিত হন, তিনি কোনও বিধি-নিয়ম, সামাজিক লজ্জার ধার ধারেন না। একজন মানুষ রাজ্যের সেনাপতি হওয়া সত্ত্বেও নিজের মর্যাদা ভুলে গিয়ে, এমনকী দিদি সুদেষ্ণার কাছে তিনি কী কাজে এসেছিলেন সে-কথাও ভুলে গিয়ে নির্লজ্জভাবে দিদি সুদেষ্ণাকেই প্রশ্ন করে বলছেন— বিরাট রাজার বাড়িতে এই সুলক্ষণা রমণীটি আগে তো কোনওদিন দেখিনি। বহুকালের

পুরাতন সুপক্কা সুরা যেমন গন্ধেই সুরারসিককে উন্মত্ত করে তোলে, এই সুন্দর ভঙ্গিশালিনী রমণীটিও কিন্তু নিজের রূপে আমাকে পাগল করে তুলেছে। এমন পাগল-করা রূপ, এমন মনোহরণ আবেশ— মেয়েটা কে? কোত্থেকে এসেছে, কারও স্ত্রী নাকি? এর সঙ্গে মিলন-সঙ্গম ছাড়া আমাকে শান্ত করার আর কোনও ওষুধ নেই— চিত্তং বিনির্মথ্য করোতি মাং বশে/ ন চান্যদত্রৌষধমস্তি মে মতম্।

কীচক সুদেষ্ণাইকেই দ্রৌপদীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করছিলেন, কিন্তু তাঁর উত্তর শোনবার কোনও ধৈর্য ছিল না। অন্যদিকে এটাও আশ্চর্য যে, পরমাত্মীয়া দিদির সামনে নিজের কামবিকারের কথা উচ্চকণ্ঠে জানাতে তাঁর লজ্জা করছে না এবং সুদেষ্ণাও ভাইয়ের এই কামতপ্ত শারীরিক ভাষ্য শুনে কানে আঙুল দিচ্ছেন না, অর্থাৎ কিনা এমনটা তাঁর শোনা অভ্যাস আছে অথবা অভ্যাস না থাকলেও ভাইয়ের এই কথাগুলি শুনতে তিনি লজ্জিত বোধ করছেন না। কীচকের বুদ্ধি কম নয়। তাঁর এটা বুঝতে দেরি হয়নি যে, এই রমণী পরিচারিকার কর্মে নিযুক্ত হয়েছে। অতএব সেই বোধেই তিনি সুদেষ্ণাকে বললেন— তোমার এই সুন্দরী পরিচারিকাটি নতুন কাজে লেগেছে বলে মনে হচ্ছে। তবে তোমাকে আমি স্পষ্ট জানাচ্ছি দিদি, এ-কাজটা ওকে মানাচ্ছে না। বরঞ্চ আমি বলি, আমার ঘরে তো জিনিস-পত্র, ঐশ্বর্য-বিভবের অভাব নেই। ও বরঞ্চ আমার বাড়িতে গিয়ে সে-সব ভোগ করুক। আমার বাড়িটা তো আর কম বড় নয়, সেখানে দাস-দাসী, হাতি-ঘোড়া, খাদ্য-পানীয়, বসন-ভূষণ, কিছুরই অভাব নেই। ও আমার বাড়িতে গিয়ে বাড়িটার শোভা ফিরিয়ে আনুক— মনোহরং কাঞ্চন-চিত্র-ভূষণং/ গৃহং মহচ্ছোভয়তামিয়ং মম।

এসব কথা সুদেষ্ণাকেই বললেন কীচক এবং সেটা দ্রৌপদীকে শুনিয়ে শুনিয়ে, যাতে সাধারণী স্ত্রীর মতো দ্রৌপদীও তাঁর ঐশ্বর্য-সম্পত্তি এবং স্বর্ণালংকারের প্রতি আকৃষ্ট হন। লক্ষণীয়, এখনও পর্যন্ত সুদেষ্ণা কোনও উত্তর দেননি। হয়তো উত্তর দেবার মতো সুযোগও তিনি পাননি, কিন্তু কীচক-ভাইয়ের এই উন্মাদ-প্রলাপের মুখে তিনি তাঁকে থামিয়ে দেবারও চেষ্টা করেননি কোনও। এই অসম্ভব প্রশ্রয়টুকু কীচকের না বোঝার কথা নয়, ফলত সুদেষ্ণার সঙ্গে আর একটিও কথা না বলে তিনি সোজাসুজি দ্রৌপদীর কাছে উপস্থিত হলেন। সত্যি বলতে কী, সুদেষ্ণা এতটাই তৈরি মহিলা যে, কীচক-ভাই তাঁকে তাঁর মনোভাব বুঝিয়ে দিয়েছেন, কথা বলার আর কোনও প্রয়োজনই নেই সুদেষ্ণার সঙ্গে। কীচক এবার সোজা দ্রৌপদীর কাছে গেছেন।

দ্রৌপদীর সঙ্গে কীচকের যে-সব কথা হয়েছে, আমি তার বিস্তারে যাব না, কেননা বিরাট-গৃহিণী সুদেষ্ণা সেখানে অনুপস্থিত। কিন্তু সামান্য আকারে সেই কথোপকথন একটু না বললেও নয়, কেননা সেখান থেকেই সুদেষ্ণার ভূমিকাটুকু উঠে আসবে। সংক্ষিপ্ত হলেও বলা দরকার যে, কীচক দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ ভাষায় নিজের কাম-বিকার নিবেদন করল। প্রেম-ভালবাসার এতটুকুও গন্ধ নেই সেখানে, কীচক দ্রৌপদীর সামনে দ্রৌপদীরই স্তন-জঘনের উচ্চানুচ্চ বর্ণনা করে নিজের শারীরিক মোহ একেবারে উচ্চগ্রামে প্রকট করে তুলল। দ্রৌপদী প্রত্যাখ্যান করলেন কীচককে— সেনাপতির মর্যাদাসম্পন্ন একজন মানুষের গৃহ-পরিচারিকার প্রতি এই আকর্ষণ যে উপযুক্ত নয়— এই কথার সঙ্গে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি যে একজন বিবাহিতা রমণী এবং তাঁর বৈবাহিক গন্ধর্বও স্বামীরা এই খবর পেলে কীচকের মৃত্যু যে অবধারিত— এইসব বীরোচিত প্রত্যাখ্যান করার পর কীচক এবার ফিরে এলেন সুদেষ্ণার কাছে— প্রত্যাখ্যাতো রাজপুত্র্যা সুদেষ্ণা কীচকোঽব্রবীৎ। তিনি মনে মনে এটাই সার বুঝেছেন যে, এই রমণী যাঁর পরিচারিকা, সেই মালকিনকেই ধরতে হবে স্বকার্য সাধনের জন্য এবং সেই মালকিন তাঁর নিজের দিদি, তিনি ভাইয়ের মন বুঝবেন নিঃসন্দেহে।

কীচক যে সুদেষ্ণার কাছে নিজের প্রয়োজনের কথা বলছেন, তার মধ্যে কোনও অনুনয়-বিনয় নেই। কোনও লজ্জাও নেই; শেষ মুহূর্তে একটা চরম কথা আছে বটে, কিন্তু সেটাও প্রশ্রয়শীলা রমণীকে ভয় দেখানোর কাজটাই বেশি করে। কীচক সুদেষ্ণাকে এসে বললেন— দ্যাখো দিদি, এই সৈরিন্ধ্রী যাতে আমার কাছে যায়, তুমি তার ব্যবস্থা কর। আমি তাকে চেয়েছি, এখন যে উপায়ে যে কৌশলে সে আমাকেই চায়, তুমি তার উপায় বার কর— যথা কৈকেয়ি সৈরিন্ধ্রী মামিয়াত্ তদ্‌বিধীয়তাম্। নইলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে, এই বলে দিয়ে গেলাম। তুমি কৌশল বার কর, ওকে আমার চাই— তং সুদেষ্ণে পরীপ্সস্ব মাহং প্রাণান্ প্রহাসিষম্।

সুদেষ্ণার প্রতি ভাই কীচকের এই যে আদেশোপম আবদার, এই আবদার থেকে সুদেষ্ণার জীবনের পূর্ব-ভাবনাগুলি পরিষ্কার হয়ে যায়। আমি অনেক পরিবারেই এমন বধূমাতাদের দেখেছি— আগেও দেখেছি এখনও দেখছি— যাঁরা শ্বশুরবাড়িতে আসার পর স্বামীর ক্ষমতা, ঐশ্বর্য এবং বিভবকে নিজের বাপের বাড়ির খাতে প্রবাহিনী করে তোলেন। আমি এতটা প্রগতি-ভাবনাহীন নই যে, জীবনের বাস্তব সত্যগুলি বুঝব না। এতটা হৃদয়হীনও নই যে, এই বাস্তব আমার বোঝার ক্ষমতা নেই— আমাদের নবাগতা বধূমাতারাও আমাদের ছেলেদের মতোই এক-একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। এমনকী আপন পিতা-মাতার প্রতি তাঁদের পুত্রতুল্য দায়িত্ব আছে, এটাও আমি সর্বৈব মানি। ফলত বধূমাতা নিজে রোজগার না করলেও স্বামীর উপার্জিত অর্থে আপন পিতা-মাতা এমনকী ভাই-বোনেদেরও ভরণ-পোষণ যথাসাধ্য করতে পারেন— এর মধ্যেও কোনও অন্যায় নেই, বরঞ্চ সেটাই স্বাভাবিক প্রয়োজন।

কিন্তু মুশকিল হয় অন্য জায়গায়। বধূ যখন শ্বশুর-শাশুড়ি অথবা স্বামীর ভাইবোনদের ভাবনাটা একেবারেই না ভেবে যদি বাপের বাড়ির স্বার্থের কথাই শুধু ভাবেন। এ-সব ক্ষেত্রে স্বামী-নামক মানুষটির দুর্বলতা, স্ত্রৈণতা এমনকী সরলতাও বেশ ভয়ংকরী হয়ে উঠতে পারে এবং স্ত্রী যদি অধিক ব্যক্তিত্বসম্পন্না সুন্দরী হন, তা হলে পুরুষের ওই দুর্বলতা, স্ত্রৈণতা এবং সরলতাই স্ত্রীর পিতৃগৃহ-প্রবাহিনী হয়ে ওঠে। আমরা সুদেষ্ণার চরিত্রটা এই নিরিখে খুব ভালভাবে বুঝতে পারি। সুদেষ্ণা কেকয়দেশের রাজনন্দিনী বটে, কিন্তু তাঁর পিতা রাজা ছিলেন বলে মনে হয় না, হয়তো বা রাজন্যবর্গের অন্যতম ছিলেন তাঁর পিতা। হয়তো সে কারণেই সুদেষ্ণার ভাই কীচক রাজ্য পেয়ে রাজা হননি, তিনি চলে এসেছেন দিদির সঙ্গে জামাইবাবুর রাজ্যে। সেকালের দিনে এইরকম শ্যালক অনেক মিলবে এবং এই রাজশ্যালকেরা একটা 'ক্লাস' হিসেবে পরিচিত, যাঁরা ভগিনী কিংবা দিদির সুবাদে

জামাইবাবুর রাজ্যে শাসনযন্ত্রের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হতেন। জামাই-রাজা দুর্বলচিত্ত এবং স্ত্রৈণ, ফলত নির্গুণ রাজশ্যালকেরা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যথেচ্ছাচার করতেন অনেকেই। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকে রাজশ্যালককে দেখুন, সে আইন-কানুন মানে না, যথেচ্ছভাবে সে সাধারণ মানুষকে বধ-বন্ধন-নিগ্রহ করতে পারে। আর মৃচ্ছকটিকের নাট্যকার যেভাবে রাজশ্যালক শকারের চরিত্র এঁকেছেন, তার মধ্যে আমি বিরাটগৃহিণী সুদেষ্ণার ভাইয়ের প্রতিচ্ছায়া দেখতে পাই। রাজা জামাইবাবুর অনুগ্রহে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়ে যথেচ্ছ নারীসম্ভোগ ক'রে এবং নিজের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন শাসন-পদ অপব্যবহার ক'রে সে নিজের স্বার্থ সাধন করে। সুদেষ্ণার ভাই বলেই কীচক এতটাই ক্ষমতাসম্পন্ন যে রাজা তাঁকে ঘাঁটাতে সাহস পান না এবং রাজক্ষমতার সঙ্গে পৌরুষের ভার যোগ হওয়ায় এখন তিনি অবলীলায় সুদেষ্ণাকে আদেশ করেন— তোমার পরিচারিকা ঝি-টি যাতে আমার সঙ্গে শয়ন করে, সে ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে— যেনোপায়েন সৈরিন্ধ্রী ভজেন্মাং গজগামিনী।

কীচককে প্রত্যাখ্যান করার জন্য দ্রৌপদী যে যুক্তিগুলি দিয়েছিলেন, তা সুদেষ্ণাও জানতেন এবং সে যুক্তিগুলি এতটাই ব্যক্তিত্ব-নিষ্পন্ন ছিল যে, যথেচ্ছ-নারীগামী কীচকও অকামা দ্রৌপদীকে জোর করার সাহস পাননি। সেখানে রাজমহিষী হলেও সুদেষ্ণাই বা এত সাহসিনী হবেন কী করে? তিনি বিপদের গন্ধ পাচ্ছিলেন কিন্তু কীচককেও ফেলতে পারছিলেন না। দ্রৌপদী বলেছিলেন— আমার গায়ের রং কালো, জাতিতেও নিকৃষ্ট, কাজ করি পরিচারিকার, যে কাজ লোকে নিন্দা করে— বিহীনবর্ণাং সৈরিন্ধ্রীং বীভৎসাং কেশকারিণীম্। দ্রৌপদীর সঙ্গে সুদেষ্ণাও এটা বোঝেন যে, রাজ্যের সেনাপতি হয়ে তাঁর ভাই তাঁরই দাসীর দেহজ আকর্ষণে লালায়িত। এই মর্যাদাহীন আচরণে তিনি সম্মানিত বোধ করছেন না নিশ্চয়ই। বিশেষত যে মেয়ে বিবাহিত বলে গৌরব বোধ করছে এবং একাধিক স্বামীর আক্রমণের ভয় দেখাচ্ছে, সেখানে ইচ্ছে থাকলেও সুদেষ্ণা কিন্তু চিন্তিত বোধ করছেন; অথচ ভাই কীচকের উপরোধ তথা অন্যায়-আবদার তিনি উড়িয়েও দিতে পারছেন না। মহাকাব্যের কবি সুদেষ্ণার এই দোলাচল-চিত্তবৃত্তির কথা ঠিক ধরেছেন। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সুদেষ্ণা নিজের দিকটাও যথেষ্ট ভেবে দেখছেন।

কীচকের আদেশ-প্রতিম আবদার শুনে আপাতত সুদেষ্ণা দেখালেন, যেন তিনি বিগলিত হয়েই কৃপা করছেন কীচককে। কিন্তু পিছনে যেটা দেখতে পাচ্ছি, সেটা হল— সেই মুহূর্তেও তাঁর মাথা ঠিক কাজ করছে— তিনি নিজের দিকটা যথেষ্ট খেয়াল রাখছেন, অর্থাৎ কিনা রাজমহিষী হিসেবে তিনি যাতে নিজের মর্যাদা খুইয়ে না বসেন এবং নিজের বিপদও যাতে না আসে। অন্যদিকে ভাই কীচক, যিনি কিনা শাসনযন্ত্রের জোরে প্রতাপশালী এবং তিনি স্নেহের ভাইটিও বটে, তাঁর দিকটাও তিনি ভাবলেন। আর শেষে ভাবলেন দ্রৌপদীর উদ্বেগের কথাও। কীচককে যে সাহসে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন, সেই সাহসের উৎসভূমি এখনও তাঁর প্রত্যক্ষ নয়, সেখান থেকে কী অনর্থ ঘটবে, তার জানা নেই। এই তিনটি ভাবনা সেই সংকট মুহূর্তেও সুদেষ্ণার মাথায় কাজ করছে— স্বমর্থমনুসন্ধায় তথ্যার্থমনুচিন্ত্য চ। উদ্বেগঞ্চৈব কৃষ্ণায়াঃ...।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহূর্তের মধ্যেও এই অনুচিন্তনের ফল হল অবশ্যই। সুদেষ্ণা এমন সিদ্ধান্ত নিলেন না যাতে দ্রৌপদী ভাবেন— আশ্রিতা তথা নিযুক্তা দাসী বলেই তাঁকে জোর করে ভাইয়ের কামতৃপ্তি ঘটনোর জন্য তাঁর ঘরে পাঠাচ্ছেন সুদেষ্ণা। অর্থাৎ সুদেষ্ণা এমন একটা উপায় বা কৌশল বার করলেন যেখানে তাঁর কোনও দায় থাকছে না। যা থাকছে, সেটা দ্রৌপদীর পরিচারিকা-বৃত্তির পরিসর, সেখানে তাঁর কিছু বলার থকছে না। সুদেষ্ণা কীচককে বললেন— ভাই! তুমি তোমার বাড়িতে একটা বড় উৎসবের আয়োজন কর আমাকেই খাওয়ানোর জন্য। এই উপলক্ষে বাড়িতেই প্রস্তুত কর উৎকৃষ্ট অন্ন-পানীয় এবং সুরা। আমি সেইদিন সুরা আনার জন্য আমার এই পরিচারিকা সৈরিন্ধ্রীকে তোমার কাছে পাঠাব— তত্রৈনাং প্রেষয়িষ্যামি সুরাহারীং তবান্তিকম্। এবারে তোমার জন্য ভাবনা, তাকে তুমি বাধাবন্ধবহীন নির্জন স্থানে নিয়ে যাও, তাকে কথায়-ব্যবহারে খুশি কর, অর্থাৎ এমনটা কর যাতে সে তোমার ব্যাপারে আগ্রহী এবং আকৃষ্ট বোধ করে— সান্ত্বয়েথা যথাকামং সান্ত্ব্যমানা রমেদ্ যথা। সুদেষ্ণার বুদ্ধি ধরা পড়ে এখানে— তিনি এটা বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন যে, অনিচ্ছুক দ্রৌপদীকে কখনও শয়নাসনে নিগৃহীত করা যাবে না। অথচ কীচকের ভাবনাটা সেইরকমই। সেনাপতির পদ এবং নিজের শক্তি-পৌরুষেয়তায় মত্ত এমনই যে তিনি সেইরকমই ভাবছেন, সেটা বুঝেই সুদেষ্ণা বলেছিলেন— এমন কথা-ব্যবহার চালাও যাতে সে তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়— সান্ত্ব্যমানা রমেদ্ যথা।

সুদেষ্ণার পরামর্শ-কৌশলে উদ্দীপিত কীচক আর কাল বিলম্ব করলেন না। বাড়িতে গিয়েই তিনি প্রকৃষ্ট সুরা এবং অন্যান্য চর্ব্য-চোষ্যের ব্যবস্থা করে সুদেষ্ণাকে খবর দিলেন লোক দিয়ে। সুদেষ্ণা যে যাবেন না, সে তো আগে থেকেই ঠিক ছিল। অতএব পূর্বের পরিকল্পনা-মতোই তিনি দ্রৌপদীকে বললেন— সৈরিন্ধ্রী! তুমি বরং একবারটি কীচকের বাড়িতে যাও। ওর ওখানে সুরা তৈরি করেছে অসম্ভব সুন্দর করে। ওই সুরা তুমি নিয়ে এস এখানে। আমার কিন্তু তেষ্টা পাচ্ছে ওই সুরাপানের জন্য। তুমি যাও, শিগগির কীচকের ঘরে যাও— পানমানয় কল্যাণি পিপাসা মাং প্রবাধতে।

দ্রৌপদী এতকাল ধরে পাণ্ডব-কৌরবের জ্ঞাতি-বিরোধ দেখছেন, রাজনীতির চাল দেখছেন নানা কিসিমের, তিনি সুদেষ্ণার মনোভাব কিছু বুঝতে পারছেন না, এটা কোনও কথা নয়। সবচেয়ে বড় কথা, সুদেষ্ণার এখানেও তাঁর দশ মাস থাকা হয়ে গেল। এতদিনে তিনি রানিকে যতটুকু চিনেছেন, তাতে মানুষটাকে খুব দয়াময়ী নিরীহ প্রকৃতির বলে মনে হয়নি তাঁর। মনের মধ্যে হিংসা-ক্রূরতাও কিছু কম নেই। সুদেষ্ণার নৃশংসতাও খুব কম নয়। মহারাজ বিরাটের শখ ছিল, মাঝে-মাঝে তিনি মল্লদের সঙ্গে পশুর লড়াই করাতেন, কখনও-কখনও মল্লদের সঙ্গে শক্তিমত্তর মল্লের লড়াই, যেখানে দুর্বলতরের মৃত্যু দেখেও মজা লাগত তাঁর। আশ্চর্য হল, এই লড়াই শুধু রাজসভার প্রাঙ্গণে আবদ্ধ ছিল না, রাজবাড়ির অন্তঃপুরেও তিনি মল্লযুদ্ধের আয়োজন করতেন, যেখানে অন্যতম মহিলা-দর্শক হতেন সুদেষ্ণা। বিরাটনগরে মধ্যম পাণ্ডব ভীমের আগমনের পর এই মল্লযুদ্ধের প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠেছিলেন তিনিই। কিন্তু ভীম মানেই তো অন্যপক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যু, যে প্রতিদ্বন্দ্বী যদি কোনও মানুষ নাও হয়, তবে ষাঁড়, হাতি এইসব পশু। কিন্তু অন্তঃপুরের মধ্যে

এই নৃশংস লড়াই সুদেষ্ণা অবশ্যই দেখে খুশি হতেন— পুনরন্তঃপুরগতঃ স্ত্রীণাং মধ্যে বৃকোদরঃ।

এই যে নৃশংসতা দেখে খুশি হওয়া, এই নৃশংসতাই কাজ করেছে দ্রৌপদীর প্রতি আচরণে। সুদেষ্ণা জানতেন— তিনি দ্রৌপদীর কী সর্বনাশ করতে যাচ্ছেন। কিন্তু পরিচারিকা সৈরিন্ধ্রীর রূপ, ব্যক্তিত্ব, অদৃশ্য স্বামী নিয়ে গর্ব এবং সর্বোপরি তাঁর দীপ্র স্বভাব— সুদেষ্ণা এগুলো ভেঙে দিতে চেয়েছেন তাঁর সতীত্ব লঙ্ঘিত করে। দ্রৌপদী কিন্তু সুদেষ্ণার কথা শুনেই বুঝেছেন, তিনি কী চাইছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন— আমি যাব না, কীচকের ঘরে আমি কিছুতেই যাব না— ন গচ্ছেয়ম্ অহং তস্য কীচকস্য নিবেশনম্— এবং আপনি জানেন যে, ও কতটা নির্লজ্জ। আমি আপনার মতো বড় মানুষের বাড়িতে থেকেও আমার স্বামীদের প্রতি ব্যভিচারিণী হব, এটা কি কোনও কথা হল। তা ছাড়া আপনার বাড়িতে কাজে লাগার সময়েই আপনার সঙ্গে আমার কথা হয়ে গিয়েছিল। কথা ছিল— আমি এ-সব কাজ করতে পারব না, বিশেষত অন্য কোনও পুরুষ আমাকে পেতে চাইলে কী হতে পারে, সে ব্যাপারেও আপনাকে আমি বলেছিলাম। দ্রৌপদী এবার প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন— আমি নিশ্চিত জানি যে, কীচকের ঘরে গেলে এই কামার্ত লোকটা আমার স্ত্রীভাবটুকু লঙ্ঘন করবেই। আমি কিছুতেই যাব না ওই লোকটার ঘরে— সোঽবমংস্যতি মাং দৃষ্ট্বা ন যাস্যে তত্র শোভনে।

এসব কথা শুনে সুদেষ্ণার যে খুব ভাবান্তর হচ্ছিল, তা নয়। নিজে যেতে না চেয়ে দ্রৌপদী এবার বিকল্প প্রস্তাব দিয়ে বললেন— আমার মতো আরও তো শতেক দাসী আছে আপনার, আপনি তাঁদের কাউকে পাঠান না ওই লোকটার কাছে, আমি গেলে ঠিক সে অপমান করবে আমাকে— স হি মাম্ অবমংস্যতি। ভাবটা এই— অপমান সে করবেই, কেননা আমি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করব। সুদেষ্ণা অনেক শুনেও রাজবাড়ির ঘরানায় খুব সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন। বললেন— তুমি আমার কাছ থেকে যাচ্ছ; আমার এখান থেকে সে বাড়িতে গেলে কীচক কখনও তোমাকে অপমান করবে না— নৈব ত্বাং জাতু হিংস্যাৎ স ইতঃ সম্প্রেষিতাং ময়া।

আমরা জানি— এই কথাটার মধ্যে চরম মিথ্যাচার ছিল। সুদেষ্ণা নিজের ঘর বা তাঁর রাজমহিষীর প্রতিষ্ঠানের কথা যতই স্মরণ করিয়ে দিন, তাঁর দুঃশাসিত ভাইয়ের কাছে রমণীর শরীর ছাড়া অন্য কোনও মর্যাদা নেই— সুদেষ্ণা সম্পূর্ণ জেনে এবং বুঝেই পূর্বপরিকল্পিতভাবে দ্রৌপদীকে এক চরম অসভ্যতা এবং অন্যায়ের মুখে ঠেলে দিয়েছেন, দ্রৌপদীকে, আশ্রিতা দ্রৌপদীকে। ঠিক এই মুহূর্তে এটাই ভাবতে ইচ্ছে করে যে, রাজমহিষীর উচ্চ মর্যাদা নয়, উদার-স্বভাব বিরাট রাজার স্ত্রীর মর্যাদাতেও নয়, আশ্রিতার প্রতি সুরক্ষা-কল্পনা থেকেও নয়, তা হলে সমাজ-সাধনার কোনও প্রবৃত্তি থেকে সুদেষ্ণা নিজে মেয়ে হয়েও আরেকটি মেয়েকে এমন ধর্ষণার মুখে ছেড়ে দিলেন।

কারণ বোধহয় সেই ঈর্ষা, অসূয়া— যা আগেই বলেছি। আশ্রিতা হওয়া সত্ত্বেও একজন সৈরিন্ধ্রীর এত দীপ্র ভাব সুদেষ্ণা সইতে পারেন না। সেই যে প্রথম দিনে চাকরিতে বহাল হবার সময় দ্রৌপদী বলেছিলেন— আমি একাকী নিজের অধীনতায় চলতে ভালবাসি—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তত্র তত্র চরাম্যেকা লভমানা সুভোজনম্— অথবা, তিনি যে বলেছিলেন— এমন কোনও পুরুষ নেই এ জগতে, যে নাকি আমাকে প্রলোভন দেখিয়ে বিচলিত করতে পারে— ন চাপ্যহং চালয়িতুং শক্যা কেনচিদঙ্গনে। সত্যিই তো কীচক অনেক প্রলোভন দেখিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে বিচলিত না হয়ে সুদেষ্ণা এমন দীপ্র স্বভাবের মহিলাকে বলাৎকারেই বশীভূতা দেখতে চান। অতএব নিশ্চিত ধর্ষণ জেনেও সুদেষ্ণা স্বর্ণময় সুরাপাত্র দ্রৌপদীর হাতে দিলেন কীচকের বাড়ি থেকে সুরা নিয়ে আসার জন্য— ইত্যস্যাঃ প্রদদৌ কাংস্যং সপিধানং হিরন্ময়ম্।

দ্রৌপদী কীচকের ঘরে প্রবেশ করলেন ত্রস্তা হরিণীর মতো আর তাঁকে দেখামাত্রই কামুকের যত প্রলাপ সব বেরিয়ে এল কীচকের মুখ থেকে। দ্রৌপদী সুদেষ্ণার কথামতোই জানালেন— আমাকে রানি সুদেষ্ণা পাঠিয়েছেন আপনার ঘর থেকে সুরা আহরণ করে নিয়ে যাবার জন্য— যা প্রৈষীদ্রাজপুত্রী মাং সুরাহারীং তবান্তিকম্। সুরার জন্য তিনি পিপাসার্তও বোধ করছেন যথেষ্ট, অতএব আমাকে যেতে হবে তাড়াতাড়ি। কীচক আর অপেক্ষা করেননি, তিনি দ্রৌপদীর হাত ধরে যেইমাত্র বস্ত্রাকর্ষণ করেছেন, সেই তো গণ্ডগোল লেগে গেল এবং যে গণ্ডগোল রাজসভা পর্যন্ত গড়াল, যেখানে বসেছিলেন রাজা বিরাট, কঙ্করূপী যুধিষ্ঠির এবং আশেপাশে বল্লব-রূপী ভীম। দ্রৌপদীর চরম অপমান হল রাজসভায়, কীচক দ্রৌপদীকে রাজসভায় বিরাটের সামনেই পদাঘাত করেছেন। অপমানিতা দ্রৌপদী বিরাট রাজার কাছে বিচার চেয়েছেন, রাজসভার সভ্যদের মতামত চেয়েছেন এবং ধিক্কার-তিরস্কারও করেছেন বিরাটকে। কিন্তু কোনও ফল হয়নি। রানি সুদেষ্ণার পরিপুষ্ট ভাইকে তিনি কিছুই করতে পারেননি এবং সে ভাইয়ের সেনাপতিত্বও অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে।

অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, অজ্ঞাতবাসের কালে কথার মাত্রা অন্যদিকে গেলে বিপদ বাড়বে বুঝে যুধিষ্ঠির সামান্য ক্রোধ করেই বলেছেন— তুমি এখানে থেকো না সৈরিন্ধ্রী, তুমি সুদেষ্ণার ঘরে চলে যাও। দ্রৌপদী আরও খানিকক্ষণ ধিক্কার দিয়ে ফিরে এসেছেন সুদেষ্ণার ঘরে— ইত্যুক্তা প্রাদ্রবৎ কৃষ্ণা সুদেষ্ণায়া নিবেশনম্। তাঁর চুল খুলে গেছে, ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ। অনেকক্ষণ কাঁদার পর এখন তাঁর মুখমণ্ডল অনেকটা সদ্য মেঘভারমুক্ত সূর্যমণ্ডলের মতো বিবর্ণ ধূসর। সুদেষ্ণা তাঁকে দেখেই বুঝতে পারলেন— একটা বড় ঝড় বয়ে গেছে; অথচ খুব স্পষ্টভাবে কীচকের কথা না উল্লেখ করে সুদেষ্ণা বললেন— কে তোমাকে মারল এইভাবে, এই কাঁদছ কেন তুমি। কে সেই লোকটা যে তোমার অপ্রিয় আচরণ করে নিজের দুঃখ ডেকে আনল— কস্যাদ্য ন সুখং ভদ্রে কেন তে বিপ্রিয়ং কৃতম্?

দ্রৌপদী কোনও ভণিতা করলেন না। খুব সোজাসুজি বললেন— কেন আপনিই তো আমাকে সুরা আনতে পাঠালেন তার কাছ থেকে। সেই কীচকই আমাকে রাজসভায় মহারাজ বিরাটের সামনেই প্রহার করেছে— সভায়াং পশ্যতো রাজ্ঞো যথৈব বিজনে বনে। এখানে ব্যাকরণ-শাস্ত্র-সম্মত বিভক্তি প্রয়োগের একটা সামান্য নৈপুণ্যে দ্রৌপদী সুদেষ্ণাকে যেন বুঝিয়ে দিলেন— তোমার এই জিজ্ঞাসাবাদের কোনও মূল্য নেই। তোমার স্বামীই এখানে কিছু করতে পারেননি, আর তুমি তো গৃহিণী স্ত্রীলোক। সংস্কৃতে অনাদর বোঝাতে,

'কেয়ার' না করা বোঝাতে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। এই যে দ্রৌপদী বললেন— একটা মানুষকে যদি অন্যের অলক্ষ্যে নির্জন স্থানে মারধোর করা যায়, তাতে অন্য কারও সোজাসুজি অপমান হয় না। কিন্তু একজন অধস্তন রাজপুরুষ যিনি রাজারই নিযুক্ত সেনাপতি, তিনি যদি রাজার সামনে, রাজসভার সভ্যদের সামনে, রাজসভার মধ্যে দাঁড়িয়েই একজন মহিলাকে প্রহার করেন, তা হলে রাজার সম্মান কী থাকে? এই বিভক্তি-প্রয়োগের মাধ্যমেই বোঝানো যায় যে, নিযুক্ত সেনাপতি অধস্তনের ওপর রাজার নিজেরই কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। দ্রৌপদী সুদেষ্ণাকে সেটাই বুঝিয়ে দিয়েছেন, অর্থাৎ তোমার স্বামীরই কোনও ক্ষমতা নেই তাকে শাসন করার, সেখানে তোমার এই কথার মানে কী!

সুদেষ্ণা দ্রৌপদীর কাছে বিবরণ শুনে বেশ বড় মুখ করে বললেন— কী, এত বড় ঘটনা! তুমি আমারই আদেশে, আমারই বাড়ি থেকে তার ঘরে সুরা আনতে গিয়েছিলে, এই পরিস্থিতিতেও কীচক যদি তোমায় অপমান করে থাকে, তা হলে তুমি বল, তুমি বললে আজই তার প্রাণদণ্ড করিয়ে দেব আমি— ঘাতয়ামি সুকেশান্তে কীচকং যদি মন্যসে।

আমরা জানি— সুদেষ্ণার এই কথা একেবারেই ফাঁকা আওয়াজ। তিনি নিজের অভিজ্ঞতাতেই জানেন— তাঁর ভাই কতটা দুর্বিনীত এবং তাঁরই প্রশ্রয়ে বেড়ে উঠে তাঁরই স্বামীর রাজ্যে সেনাপতিত্ব করছেন এবং এখন তাঁকেও তিনি মানে না তাঁর স্বামীকেও মানেন না। অথচ সুদেষ্ণা মুখে বলছেন— তিনি কীচকের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করবেন। এটা ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া কী? এমনকী দ্রৌপদীও সেটা সহজেই বোঝেন এবং বোঝেন বলেই সুদেষ্ণার বিচার এবং তাঁর মৌখিক প্রাণদণ্ড-বিধানের ওপর তাঁর বড় কিছু আস্থা নেই। তিনি জানেন— সুদেষ্ণার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হবে না। অতএব বেশ মেজাজেই বললেন— না, আপনাকে আর কিছুই করতে হবে না। যাদের কাছে সে অপরাধ করেছে, আমাকে অপমান করে আমার গন্ধর্ব স্বামীদের যে চটিয়েছে, তাঁরাই এই অসভ্যতার মূল্য চোকাবেন এবং এখন দেখার বিষয় যে, আজকের রাতটা তাঁর কাটে কিনা?

আশ্চর্যের বিষয়, সুদেষ্ণা এ-সব কথার কোনও প্রতিবাদ করেননি এবং এর পরে তাঁর কোনও উচ্চবাচ্যও নেই। তিনি যেন বেশ নির্বিকার, যা হয় হবে গোছের ভাব। এই সম্পূর্ণ ঘটনা থেকে মনে হয়, তিনি যে খুব খারাপ লোক, তাও নয়। দ্রৌপদীকে ভাই কীচকের কামনার আগুনে নিক্ষেপ করার মধ্যে তাঁর ইচ্ছা ছিল কি ছিল না, এটা বিচার করা কঠিন, হয়তো বা তিনি নাচার ছিলেন, কীচককে নিয়ন্ত্রণ করার কোনও সাধ্যই ছিল না তাঁর। কিন্তু এও তো ঠিক যে, তিনি দ্রৌপদীর অনুরোধ-উপরোধ প্রত্যাখ্যান করে সব জেনে-শুনেও দ্রৌপদীকে নারীত্বের চরম অবমাননার দিকে ঠেলে দিয়েছেন। আবার এখন তিনি বলছেন— কীচককে প্রাণদণ্ড দেবার ব্যবস্থা করবেন। এই দুটি আচরণ বিপরীত ভাবনা সমন্বিত। তাতে আরও মনে হয়, মানুষ হিসেবে হয়তো সুদেষ্ণা ঠিক এতটা খারাপ নন অথবা এতটা হিংস্রও নন। তবে হ্যাঁ, তাঁর মধ্যে কতিপয়-স্ত্রীজনোচিত ব্যবহার আছে। ঈর্ষা, অসূয়া, অসহনীয়তা এগুলি হয়তো দ্রৌপদীর প্রতি তাঁকে খানিক তীক্ষ্ণ-তীব্র করে তুলেছে মাঝে মাঝে।

আমরা জানি, এর পরে দ্রৌপদীর প্ররোচনায় ভীম কীচককে বীভৎসভাবে হত্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছেন, কিন্তু কীচক-বধের চেয়েও যে খবরটা এখানে বেশি জরুরি, সেটা হল সুদেষ্ণার সঙ্গে দ্রৌপদীর প্রাত্যহিক সম্পর্ক, যা খুব সুন্দরভাবে বেরিয়ে এসেছে দ্রৌপদীর সঙ্গে ভীমের বাক্যালাপে। দ্রৌপদী কীচকের কাছে অপমানিত হয়ে রাতের আঁধারে ভীমের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে যুধিষ্ঠিরের প্রতি রীতিমতো ক্রোধ প্রকাশ করার পর অজ্ঞাতবাসের কারণে হীনকর্মে রত অন্যান্য পাণ্ডব-স্বামীদের জন্য তাঁর দুঃখও প্রকটিত হল অনেক। এরপরেই ভীমের প্রসঙ্গে সুদেষ্ণার আচরণগুলি বলতে আরম্ভ করলেন দ্রৌপদী। তিনি বললেন— তোমার মতো বীর মানুষ যখন পাচক-কর্ম করে বিরাট রাজার মনোরঞ্জন কর, তখন আমার মনে দুঃখ হয় একরকম। কিন্তু বিরাট রাজা যখন অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে তোমাকে দিয়ে হাতির সঙ্গে যুদ্ধ করায়, তখন অন্তঃপুরের মেয়েগুলো সব হি হি করে হাসতে থাকে, কিন্তু আমার মন তোমার বিপদের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে— হসন্ত্যন্তঃপুরে নার্য্যো মম তূদ্বিজতে মনঃ।

বলা বাহুল্য, দ্রৌপদী-কথিত এই মেয়েগুলোর মধ্যে সুদেষ্ণাও আছেন, বলা উচিত, সুদেষ্ণাই প্রধান। দ্রৌপদী ভীমকে বলেন— শুধুই কি হাতি! বাঘ-সিংহ-মহিষের মতো ভীষণ জন্তুর সঙ্গে তুমি যখন যুদ্ধ কর, তখন সুদেষ্ণা নিজের মজায় দেখে, আর আমার প্রাণ কাঁপতে থাকত আশঙ্কায়— কৈকেয্যাং প্রেক্ষমাণায়াং তদা মে কশ্মলো ভবেৎ। ঠিক এই কথা বলতে বলতেই সুদেষ্ণার মনোজগতের কথা স্পষ্টভাবে তুলে আনেন দ্রৌপদী। রূপ-যৌবনবতী রমণীদের সম্বন্ধে সুদেষ্ণার ধারণা খুব ভাল নয়। তাঁদের সবসময়েই তিনি সন্দেহের চোখে দেখেন এবং ভাবেন— পুরুষ মানুষ তাঁদের এতটুকু স্তাবকতা করলেই তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়বেন উষ্ণ বক্ষে বাহুর ঘেরে। দ্রৌপদী সুদেষ্ণার বাড়িতে সৈরিন্ধ্রীর কাজে যোগ দেবার সময় তাঁর প্রথম সন্দেহ ছিল— রাজা বিরাট এই মেয়েটিকে দেখলে ধৈর্য রাখতে পারবেন না এবং দ্রৌপদীকে কথা দিতে হয়েছে যে, তিনি কোনওভাবেই বিরাট কর্তৃক প্রলোভিত হবেন না। কীচকের ক্ষেত্রেও তাঁর মনে হয়েছে— দ্রৌপদী যতই হম্বিতম্বি করুন, কীচকের তেজ এবং ব্যক্তিত্বের কাছে মাথা নোয়াবেন দ্রৌপদী এবং তাঁর স্তুতি-নতিতে বিগলিতও হবেন। কীচককে তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন— সান্ত্বয়িত্বা যথাকামং সান্ত্ব্যমানা রমেদ্ যথা— ভাল করে তোষামোদ করো নির্জনে যাতে করে সে অনুরক্ত এবং প্রবৃত্ত হয় তোমার দিকে। অর্থাৎ সুদেষ্ণার ধারণা— তোষামোদ করলেই মেয়েরা ভুলবে। হয়তো তিনি নিজেও সেইরকম।

দ্রৌপদী ভীমকে বলেছেন— বাঘ-সিংহের সঙ্গে তোমার লড়াই দেখে আমি যখন তোমার বিপদের আশঙ্কায় মুচ্ছো যাবার জোগাড়, সুদেষ্ণা তখন প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট অন্য মেয়েদের দেখিয়ে দেখিয়ে আমায় বলেন— একই জায়গায় থাকে তো, ওই ওখানে রান্নাঘরে রান্নায় ব্যস্ত বল্লব নামে এই ছেলেটি, আর এই এখানে সৈরিন্ধ্রী। সব সময়েই একে অপরকে দেখছে। এইরকম কাছে কাছে থাকতে থাকতে একটা মায়াও তো জন্মায়। সৈরিন্ধ্রীর তাই হয়েছে, যার জন্য বল্লব-ঠাকুরকে যুদ্ধ করতে দেখলেই আমাদের সৈরিন্ধ্রীর মনে একটা কষ্ট হয়। একসঙ্গে কাছাকাছি থাকলে বুঝি এই মায়াটা হয়-ই— স্নেহাৎ সংবাসজান্মন্যে... ইমং সমনুশোচতি।

যুক্তির কথা হলে এটাও মানতে হবে যে, বল্লব ভীমের কাছাকাছি তো আরও অনেকে আছেন, সেই সব রমণীরা, যাঁরা সুদেষ্ণার পাশে বসে যুধ্যমান বল্লবকে দেখেন, কই তাঁদের সঙ্গে তো সুদেষ্ণা এই রসিকতা করেন না। সত্যি বলতে কী, তাঁরা তো কেউ স্বামীর জীবনাশঙ্কায় চিন্তিত হয়ে মূর্ছিতপ্রায়ও হল না। কাজেই স্বামী-সম্বন্ধ না জেনে কোনও রমণী যদি অন্যতরার সঙ্গে কোনও সুন্দর পুরুষের কিঞ্চিৎ বা কথঞ্চিৎ প্রিয়সম্বন্ধ রচনা-যোজনা করে, তাতে দোষের কিছু আছে বলে মনে হয় না। তা হলে দ্রৌপদীর লাগছে কেন? দ্রৌপদীর লাগছে এইজন্য যে, বল্লব ভীম তাঁর সত্যিই স্বামী বটে, অথচ সে-সম্বন্ধ তিনি প্রচ্ছন্ন রেখেছেন সবার কাছে। বিশেষত তিনি নিজেকে বিবাহিত বলে প্রচার করেন, অদৃশ্য স্বামীদের সম্বন্ধে তিনি নিজের সতীত্ব-প্রখ্যাপনও কম করেন না। এই অবস্থায় বল্লবকে দেখে তিনি যদি আচ্ছন্ন এবং করুণ হয়ে ওঠেন, তবে মুখরা সুদেষ্ণার কী এমন অপরাধ হল! তিনি বলতেই পারেন— সৈরিন্ধ্রীও বড় লক্ষ্মী মেয়ে আর এই যুধ্যমান বল্লবও বেশ সুন্দর পুরুষ— কল্যাণরূপা সৈরিন্ধ্রী বল্লবশ্চাপি সুন্দরঃ।

অন্যদিকে অদৃশ্যভাবে তাঁর স্বামী আছেন বলা সত্ত্বেও একটি অন্য সুপুরুষ সম্বন্ধে প্রকাশ্যত দুর্বল দ্রৌপদীকে পরপুরুষের মোহাচ্ছন্ন বলে প্রমাণ করার মধ্যে একটা মর্যাদাহানির কলঙ্ক থাকে। এই কলঙ্কলেপনের চেষ্টাতেই দ্রৌপদীর আপত্তি। কিন্তু আপত্তি হলেও সুদেষ্ণার সেটা বোঝবার কথা নয়, কেননা বল্লবরূপী ভীমের জন্য তিনি তো উৎকণ্ঠা দেখাচ্ছেন প্রকাশ্যেই। অতএব একটি অপরিচিত পুরুষের জীবন-ভাবনায় আকুল হয়ে ওঠা অন্য এক অপরিচিতা রমণীকে সুদেষ্ণাও যেমন সঙ্গতভাবেই খোঁচা দিতে পারেন, তেমনই বাইরে যিনি সতীত্বের আবরণ খ্যাপন করছেন, অথচ তাঁকেই যদি এক তথাকথিত পরপুরুষের ভাবনায় আকুল বলে প্রমাণিত করা হয়, তবে তাঁরও এক বিপন্নতা তৈরি হয়। তবে সেটা অনেকটাই এইরকম যে, নিজের হাতের খোঁচায় নিজের চোখে জল আসলে কেউ যদি কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করে তবে তার ওপরে রাগ করার মতো।

সুদেষ্ণার সমস্যা হল, এই রসিকতার সঙ্গে— এক্ষেত্রে তাঁর রসিকতাও খুব অপ্রাসঙ্গিক বা অন্যায়ও নয়, কিন্তু রসিকতার সঙ্গে তিনি স্ত্রী-জাতির সাধারণ সত্তা এবং চরিত্রকেই কলঙ্কিত করে ফেলেন। দ্রৌপদীর সঙ্গে বল্লবের প্রণয় প্রমাণ করার জন্য তিনি বলে ওঠেন— মেয়েদের গোপনচারিণী ইচ্ছের কথা কিন্তু একেবারেই স্পষ্ট করে বলা যায় না। তার মধ্যে এই সৈরিন্ধ্রী আর বল্লব— দু'জনকেই দু'জনের সঙ্গে বেশ মানায়— স্ত্রীণাং চিত্তং তু দুর্জ্ঞেয়ং যুক্তরূপৌ চ মে মতৌ। এইসব রসিকতার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু পার্শ্ববর্তী রমণীকুলের মধ্যে গল্পটা তৈরি করে দেন। তিনি বলেন— একটা ঘটনা কিন্তু খেয়াল কর। এই বল্লব আর এই সৈরিন্ধ্রী— এরা দু'জনেই কিন্তু রাজবাড়িতে প্রায় একই সঙ্গে কাজে লেগেছে। তারা এতকাল ধরে একসঙ্গে পাশাপাশি আছে, এতদিন ধরে নিজেদের মধ্যে আড়েঠাড়ে কথাবার্তা হচ্ছে, হয়তো এর মধ্যে কিছু আছে, যার জন্য বাঘ-সিংহের সঙ্গে যুধ্যমান বল্লবের কিছু একটা হয়ে যাবে বলে কষ্ট পায় আমাদের সৈরিন্ধ্রী— সৈরিন্ধ্রী প্রিয়সংবাসান্নিত্যং করুণবাদিনী।

দ্রৌপদী যতই দোষ ধরুন, যতই তাঁর সম্বন্ধে নালিশ করুন ভীমের কাছে, অন্তত এই রসিকতায় আমরা তাঁর বড় দোষ দেখি না কোনও। হ্যাঁ, সুদেষ্ণা কিছু সন্দেহপ্রবণা রমণী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বটে, তাঁর নিজের মধ্যেও সেই অন্তশ্চিন্তিত অথবা অবদমিত পুরুষপ্রবৃত্তি ছিল কিনা কে জানে, হয়তো তিনি এমনই ভাবতেন যে, পৌরুষেয় শক্তিতে যে কোনও রমণী বশীভূত হতে পারে, কিন্তু দ্রৌপদী যে-কারণে নালিশ জানাচ্ছেন, সেটা খুব যুক্তিসহ নয়। এটা অবশ্যই ঠিক যে, সুদেষ্ণা দুর্বল প্রকৃতির মানুষ, কীচকের ক্ষেত্রে সেই দুর্বলতা চরমভাবে প্রকটিত। তিনি যেমন একভাবে কীচকের অসদুদ্দেশ্য জেনেও দ্রৌপদীকে প্ররোচিত করেছেন, তেমনই কীচক মারা গেলেও তাঁকে আমরা আহা-উহু কান্নাকাটি করতে দেখি না। বরঞ্চ তিনি এখন সৈরিন্ধ্রীকে ভয় পাচ্ছেন।

দ্রৌপদী যে সুদেষ্ণার সম্বন্ধে নালিশ জানাচ্ছেন ভীমের কাছে, সেটা অনেকটাই তাঁর ব্যক্তিগত জ্বালা। যিনি পূর্বে রাজবধূ ছিলেন, ইন্দ্রপ্রস্থের পট্টমহিষী, তিনি আজ সুদেষ্ণার মতো দুর্বল রমণীর স্নান আচমনের জল বহন করছেন— শৌচদাস্মি সুদেষ্ণায়াঃ— এটা দ্রৌপদীর ব্যক্তিগত কষ্ট। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজবাড়িতে তিনি একবার আসন থেকে উঠে হাঁটতে আরম্ভ করলে তাঁর সামনে পিছনে দাসীরা ছুটত তাঁরই সুখযাত্রার জন্য, আর আজ বিরাট গৃহিণী সুদেষ্ণা রাজবাড়িতে হাঁটতে থাকলে দ্রৌপদীকেই তাঁর সামনে অথবা পিছনে দৌড়তে হয়— সাহমদ্য সুদেষ্ণায়াঃ পুরঃ পশ্চাচ্চ গামিনী— দ্রৌপদীর এ দুঃখও তাঁর নিতান্ত ব্যক্তিগত কাজের শর্ত, এর জন্য তিনি সুদেষ্ণাকে দোষী করতে পারেন না কোনওভাবেই। সুদেষ্ণার একমাত্র বড় দোষ, তিনি কামুক কীচকের অভিসন্ধি জেনেও নিজের পরিচারিকা দাসীকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁরই কাছে সমর্পণ করা। কিন্তু এর পিছনেও সুদেষ্ণার কিছু মনস্তাত্ত্বিক কারণ আছে এবং সেটা দ্রৌপদী একেবারে সঠিক ধরতে পেরেছেন।

দ্রৌপদী বলেছেন— কেকয়-রাজনন্দিনী সুদেষ্ণা সবসময় আমার রূপ নিয়ে আশঙ্কা করে, সবসময় সে ভাবে যে, এই বুঝি তাঁর স্বামী বিরাট রাজা আমার রূপ দেখে-না মজে যায় এবং সুদেষ্ণাকে ছেড়ে আমার প্রতি না আকৃষ্ট হয়— নিত্যমুদ্‌বিজতে রাজা কথং নেয়া দিমিমা মিতি। এই উদ্বিগ্নতা এতটাই প্রকট ছিল যে, সে-কথা সুদেষ্ণা তাঁর ভাই কীচককেও কোনও-না-কোনওভাবে জানিয়েছেন। দ্রৌপদী বলেছেন এটা জানার পর থেকেই আমার ওপর কীচকের আকর্ষণ আরও বেড়ে যায়, কীচক তারপর থেকেই আমাকে ভীষণভাবে চাইতে থাকে— তস্যা বিদিত্বা তদ্‌ভাবং... কীচকোহয়ং সুদুষ্টাত্মা সদা প্রার্থয়তে হি মাম্। আমরা দ্রৌপদীর কথা থেকেই বুঝতে পারি— কেন সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে কীচকের কাম-মুখের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিলেন ইচ্ছে করে। যেহেতু প্রথম থেকেই তাঁর মনের মধ্যে কাজ করছে যে, রাজা এই রূপবতী রমণীর বশীভূত হবেন, অতএব সেই সন্দেহ-বাতিকেই তিনি তাঁর বিশ্বস্তা দাসী সৈরিন্ধ্রীকে কীচকের ঘরে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। এই ভাবনায় যে, তাঁর স্বামীটি অন্তত ঠিক থাকবেন।

আমরা জানি— এটা নিছক সন্দেহ। বিরাট রাজার কাছে সৈরিন্ধ্রী প্রতিদিনই যেতেন চন্দনপঙ্ক পৌঁছে দেবার জন্য। এমনকী দ্রৌপদীর পিষ্টপেষিত চন্দন-কুমকুম ছাড়া বিরাটের পছন্দও হত না, কিন্তু বিরাট কোনওদিন কোনও অভদ্র অশ্লীল ব্যবহার করেননি দ্রৌপদীর সঙ্গে। অথচ সুদেষ্ণা বোঝেননি যে, দ্রৌপদীকে আপন সন্দেহবশে বিপদের মুখে ঠেলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কীচককেও মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছেন। কীচক এবং উপকীচকরা

দ্রৌপদীর অদৃশ্য স্বামীদের হাতে নিহত হয়েছেন— এই প্রচার কানে যাবার পর বিরাট এসে সুদেষ্ণাকে বলেছেন— তুমি সৈরিন্ধ্রীকে এই নগর থেকে চলে যেতে বলবে। বলবে— মহারাজ বিরাট তোমার গন্ধর্ব স্বামীদের ব্যাপারে ভয় পাচ্ছেন, তুমি এই নগর ছেড়ে যেখানে ইচ্ছে চলে যাও। কীচকের মৃত্যুর পর সৈরিন্ধ্রী-দ্রৌপদী নগর ভ্রমণ সেরে বাড়ি ফিরলে সুদেষ্ণা স্বামীর কথামতো সৈরিন্ধ্রীকে বললেন— তুমি এই নগর ছেড়ে যেখানে মনে হয় চলে যাও— সৈরিন্ধ্রী গম্যতাং শীঘ্রং যত্র কাময়সে গতিম্— আমার স্বামী তোমার গন্ধর্ব স্বামীদের কাছ থেকে পরাজয়ের ভয় পাচ্ছেন। তুমি চলে যাও।

শুধু এটুকু বললে বুঝতাম যে, সুদেষ্ণা স্বামীর কথা শুনছেন নির্বিচারে, কিন্তু এই কথার সঙ্গে তাঁর নিজের একটা যোজনা আছে। স্বামীর কথাটি শেষ করেই সুদেষ্ণা বললেন— দেখ, বয়সে তুমি তরুণী, এমন রূপ-যৌবন নিয়ে এখানে তোমার বাস না করাই ভাল— তঞ্চাপি তরুণী সুভ্রূ রূপেণাপ্রতিমা ভুবি। এই কথার মধ্যে অবশ্যই সেই সন্দেহ আছে এবং এখন সন্দেহের সঙ্গে ভয়ও আছে। ভাই কীচক এই রূপের জন্য নিজেকে যেমন আত্মাহুতি দিল, শেষে তাঁর স্বামীটিও না এই রূপে মত্ত হয়ে গন্ধর্ব-স্বামীদের হাতে মারা পড়েন।

দ্রৌপদী অবশ্য যাননি এবং সুদেষ্ণার কাছে মাত্র তেরো দিন সময় চেয়ে নিয়েছেন এবং অভয়ও দিয়েছেন তাঁর স্বামীদের ব্যাপারে। বলেছেন— তেরো দিন পরেই তাঁর স্বামীরা এসে তাঁকে নিয়ে যাবেন এবং তাঁর স্বামীরা বিরাট রাজার ভাল ছাড়া মন্দ করবেন না— তত মামুপনেষ্যন্তি করিষ্যন্তি চ তে প্রিয়ম্। সুদেষ্ণা কিন্তু সৈরিন্ধ্রীর কথা শুনেছেন। এটাও তাঁর চরিত্রের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, কোনও ঘটনা নিয়েই তিনি বেশি দূর ভাবেন না। তেমন হলে তো তিনি এখন দ্রৌপদীকে চাপাচাপি করতেন, ভ্রাতৃহন্ত্রী দাসীকে ঘরছাড়া করতে পারতেন সেই মুহূর্তেই। কিন্তু সৈরিন্ধ্রীর কথায় বিশ্বাস করেই হোক, অথবা তাঁকে কিংবা তাঁর গন্ধর্ব স্বামীদের ভয় পেয়েই হোক সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে আর কোনও কথা বলেননি, রাজার প্রত্যাদেশও শোনাননি নিজের অস্বস্তি ঢাকার জন্য।

মহাভারতের কবি সুদেষ্ণার জন্য বেশি জায়গা রাখতে পারেননি। পাণ্ডবদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে অজ্ঞাতবাসের জীবন এবং সেখানেও যে বাধা-বিঘ্ন সতত তাঁদের উদ্বিগ্ন করেছে, তারই পরিসরে সুদেষ্ণা এসে পড়েছেন খানিক জায়গা জুড়ে। কিন্তু এইটুকুর মধ্যেই এক আপাত সরলা রাজবধূর অন্তর্হৃদয়ের জটিলতা, সন্দেহ কতদূর যেতে পারে, সেইটুকু বলেই মহাভারতের কবি সুদেষ্ণা-পর্ব শেষ করে দিয়েছেন। সুদেষ্ণাকে এর পরে দেখতে পাব সেই বিবাহোৎসবের মঞ্চভূমিতে, যেখানে অর্জুন-পুত্র অভিমন্যুর জন্য সুদেষ্ণা তাঁর মেয়ে উত্তরাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে বিবাহ-পীঠিকায় বসাচ্ছেন— সুদেষ্ণাঞ্চ পুরস্কৃত্য মৎস্যানাঞ্চত বরস্ত্রিয়ঃ। উত্তরা-অভিমন্যুর বিয়ে হয়ে গেলে মহাভারতে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। এই বিশাল-তুমুল যুদ্ধ-শব্দের মধ্যে সুদেষ্ণা হারিয়ে গেছেন কখন। মহাভারতের কবি আর তাঁকে স্মরণে আনেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোপামুদ্রা

বেশ পুরনো কালে, আমি যখন খুবই ছোট, তখন গাঁয়ে-গঞ্জে, এমনকী শহরেও বহুতর গোঁড়া বামুনবাড়ি ছিল। তাঁদের অনেকের ঘরেই আমি অনেক প্রৌঢ়া-বৃদ্ধা, সধবা এবং বিধবা বামুন-গিন্নিদের দেখেছি, যাঁরা ওই বয়সেও অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন। বাড়িতে পুরুষদের মধ্যে খানিক বিদ্যাচর্চা থাকায় কেউ কেউ একটু চালিয়ে নেবার মতো শিক্ষিতাও ছিলেন। খুব ছোট বয়সে সেটা না বুঝলেও একটু বড় হতে সেটা বুঝেছি। আর যখন বুঝতে আরম্ভ করেছি, তখন তাঁদের অনেকেই পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছেন তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনৈতিক যন্ত্রণায়। দেশ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ এবং আর্থ-সামাজিক কারণে আমি কিছু পরিবর্তন লক্ষ করতাম উপরি-উক্ত সুন্দরী প্রৌঢ়া-বৃদ্ধা এবং বিধবা-সধবাদের। গাঁয়ে থাকার সময় এঁদের দেখেছি— তাঁদের শরীর এবং মনের চারদিকে ঘনিয়ে থাকত ব্রাহ্মণ্য দারিদ্র্যের অহংকার। অতিসস্তা শাড়ির সঙ্গে নিরলংকার শরীর, স্বামীর পুজো-আচ্চার জোগাড় দিচ্ছেন, অথবা বিধবা পিসি হলে সেটা ছিল তাঁর আপন প্রয়োজন। উপভোগের প্রশ্ন উঠলে বলতেন— বামুন-ঘরের বউ, আমাদের কি আর সেজেগুজে লোকদেখানি চলে? আমাদের ওসব চলে না।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ছেলে শহরে চাকরি পেয়েছে, গাঁ থেকে চলে এসেছেন উপরি-উক্তারা। এবারে তাঁদের সাবান মাখতে দেখেছি, স্নো-পাউডার মাখতে দেখেছি, সাজতে দেখেছি, এমনকী ছেলের রোজগার থেকে হার-বাউটি বানাতেও দেখেছি। জিজ্ঞেস করলে ডগমগ হয়ে বলতেন— স্বামীর উপার্জনী ক্ষমতায় তো পারিনি। ছেলের কালে করে গেলাম। যদি এমন প্রশ্ন হত যে, ইচ্ছেটা তো তা হলে মনের মধ্যে ছিল? বলতেন— একটু সাজতে-গুজতে, একটু গয়না পরতে কোন মেয়ের না ভাল লাগে, বাছা! কিন্তু ওঁর যা চাপ ছিল, শুধু টাকার ক্ষমতা নয়, উনি পছন্দই করতেন না। বলতেন— বামুন-ঘরের বউ, তাদের আবার অত সাজগোজ কী, লজ্জা হওয়া উচিত। আমার গাঁয়ের পিসি-মাসি-মামিরা তাই তেমনিই রয়ে গিয়েছিলেন। সকালে উঠোনে গোবর-ছড়া দিয়ে জীবন আরম্ভ হত, অবশেষে ছেঁড়া কাঁথায় ঘুমন্ত স্বামীর পাশে এসে শুয়ে পড়া। এই তো ব্রাহ্মণীর জীবন।

এটা অবশ্যই সত্যি যে, সত্তর-আশি বছর আগে এই জীবন এমনিই তৈরি হয়নি। এর একটা পরম্পরা আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় পরম্পরা হল— পুরুষরা কিন্তু দশ ঘর বেছে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটাকেই ঘরে এনে তুলতেন, কিন্তু তারপর ব্রাহ্মণ্য এবং দারিদ্র্যের দার্শনিক প্রচার এমনভাবেই চলত, যাতে নীতিগত দৃষ্টিতে পুরুষরাও অনেক দারিদ্র্যের সহিষ্ণু জীবন কাটিয়েছেন, সঙ্গে তাঁদের স্ত্রীরাও। পণ্ডিত গবেষকদের

একাংশ ব্রাহ্মণদের শোষণ-শাসন এবং তাঁদের বড়লোকি নিয়ে অনেক বড় বড় প্রবন্ধ লিখেছেন, কিন্তু সেটা সমাজের সামগ্রিক চিত্র নয়। উলটো দিকের চিত্রটা গবেষণার বিস্তারে দেখানোর জায়গা নেই এখানে। কিন্তু নৈতিক দৃষ্টিতে উপভোগের জীবন কাটানো ব্রাহ্মণের উপজীব্য ছিল না, ব্রাহ্মণীদের তো কথাই নেই। মহাভারত এক জায়গায় বলেছে— ব্রাহ্মণস্য দেহোঽয়ং ন কামার্থায় জায়তে— অর্থাৎ ব্রাহ্মণের শরীর কখনওই জৈবিক কামনা উপভোগের জন্য নয়— সেটা পরিশ্রম করার জন্য, তপস্যার জন্য, তাতেই পরলোকের সুখ।

এই দার্শনিক ভিত্তি থাকার ফলে সমাজের বৃহত্তর অংশে, বিশেষত যাঁরা রাজা বা ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, সেইসব ব্রাহ্মণদের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না, কিন্তু সেই আর্থিক অসাচ্ছল্যই তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য এবং দারিদ্র্যের আড়ম্বর তৈরি করত, যা বেশির ভাগ সময়েই বরণ করে নিতেন বামুন ঘরের বউরা এবং পরম্পরাগত অশিক্ষিত-পটুত্বে তাঁদের বাণী ছিল— বামুনঘরের বউদের কী আর অমন সেজেগুজে ঢঙ করলে চলে? অন্যেরা কী শিখবে! ভাবতেই পারি, ব্রাহ্মণ্যের এই মহিমা আত্মস্থ করে আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা বড়ই মহতী অনুভব করতেন নিজেদের। কিন্তু কালান্তরের যে রমণীয় বাসনালোক, অনাদ্যনন্ত সংসারের অনন্ত পরম্পরাবাহী রমণী-হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষার যে সংকেত নেমে আসে জন্মান্তর থেকে, সেখানে অভীষ্ট পুরুষের সঙ্গে মিলন যখন ঘটতেই চায়, তখন তার জন্য সামগ্রীর প্রয়োজন হয়, প্রয়োজন হয় সম্ভার এবং শৃঙ্গার-উপকরণের, অন্তত একটি রমণীর ক্ষেত্রে তা চির-আকাঙ্ক্ষিত বস্তু।

আমার কাছে যদি উদাহরণ চান তা হলে মহাভারত-পুরাণ থেকে আমি এখনই অন্তত পঞ্চাশটা উদাহরণ দিতে পারি, যেখানে শুষ্ক-রুক্ষ ঋষি-মুনি রাজবাড়িতে রাজার মেয়ে বিয়ে করতে গিয়েছেন। অপিচ মহাভারতে এটা যেন একটা 'প্যাটার্ন' হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, এইসব সময়ে, রাজকন্যার পিতা-মাতাদের ভীষণ মন খারাপ হবে, কিন্তু তাঁদের অতি-অনিচ্ছায় আবার অভিশাপেরও ভয় থাকবে এবং পরিশেষে সব সমস্যার সমাধান করে দিয়ে রাজকন্যা নিজেই বরণ করে নেবেন ব্রাহ্মণ ঋষিকে। আর সুখৈশ্বর্য সব জলাঞ্জলি দিয়ে একই সঙ্গে বরণ করে নেবেন তপস্বিনীর জীবন। এ-রকম জীবন কত কেটে গেছে, তার ইয়ত্তাও নেই, কত ঋষিবধূ সতীত্বের মহা-উপাধি নিয়ে সন্তুষ্ট থেকেছেন এইভাবে, তারও ইয়ত্তা নেই কোনও। মনে রাখা দরকার, সতীত্বের প্রতি আমার বিরাগ নেই কোনও, সতীত্ব অতি শ্রদ্ধেয় বস্তু, কিন্তু মহাকাব্যের কবি যাঁরা সমাজ-মানসের প্রতিফলন ঘটান লেখনীতে, তাঁরা অনন্যসাধারণ কৌশলে বুঝিয়ে দেন— যাঁরা নৈতিকতায় প্রতিষ্ঠিত থাকলেন, থাকুন তাঁরা। খুব ভাল কথা। কিন্তু এই ধরনের তপস্বী-জীবনে যাঁরা অসামান্যা রূপবতী হওয়া সত্ত্বেও তপস্বিনী হয়ে রইলেন, তাঁদের ভিতরে 'সাপ্রেশন'-এর একটা প্রক্রিয়া তো চলেই এবং তারও একটা অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া থাকে।

এই প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে সঠিকভাবে ফুটে উঠেছে আদিকাব্য রামায়ণে। এখানে মহর্ষি গৌতমের স্ত্রী অহল্যা— যাঁর রূপের মধ্যে সামান্য দোষ বা 'হল্য' ছিল না বলেই তাঁর নাম অহল্যা। কিন্তু এত সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও ঋষিপত্নীর জীবনে যৌন সার্থকতা কম ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেই স্বর্গের দেবতা ইন্দ্র যেদিন গুরু গৌতমের রূপ ধারণ করে এসে গুরুপত্নীর সঙ্গম প্রার্থনা করলেন, সেদিন কিন্তু ইন্দ্রকে স্বরূপে চেনা সত্ত্বেও শুধু দেবেন্দ্রের রতি-পূরণ কেমন লাগে, সেটা বোঝার জন্যই তিনি সঙ্গত হলেন ইন্দ্রের সঙ্গে— মুনিবেশং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় রঘুনন্দন... দেবরাজ কুতূহলাৎ। একেবারে অনুরূপ ঘটনা হয়তো রামায়ণ মহাভারতে বেশি নেই, কিন্তু এই ধরনের যৌন অতিক্রম, ধর্ষণ— হয়তো অনেক সময়ে না জেনেই, না চিনেই, তবু যখন সেটা ঘটেছে— তখন রমণীর দিক থেকে এগুলি যে সর্ব সময়েই অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল, তা আমাদের মনে হয়নি।

বিশেষত এইরকম একটা শব্দ মহাভারত-পুরাণ এবং ধর্মশাস্ত্রগুলিতে পাওয়া যায়, যা পুরুষের সম্বন্ধেই প্রধানত প্রযুক্ত— সেই শব্দটাও কিন্তু ভীষণই ইঙ্গিতবহ। কথাটা হল— 'গুরুতল্পগামী', 'গুরুতল্পগ'। 'তল্প' মানে বিছানা অর্থাৎ যে মানুষ গুরুর বিছানায় ওঠে, গুরুর স্ত্রীকে লঙ্ঘন করে। এসব লোকের অনেক পাপ হবে, অনন্ত নরক ভোগ, এসব ধর্মশাস্ত্রীয় ভয় তো আছেই, কিন্তু আমাদের বক্তব্য হল—এই ধরনের ঘটনা তা হলে ঘটত, কিন্তু কেন ঘটত— এখানেই কিন্তু একটা সামাজিক-মানসিক প্রশ্ন উঠে যায়। গুরুতল্পগামীর পাপ কিংবা নরকভোগের ক্ষেত্রে পুরুষ-মানুষগুলিই সর্বত্র দায়ী হয়েছে সর্বাংশে, কখনও কখনও গুরুপত্নীরাও তপস্বী ঋষি-স্বামীর অভিশাপ লাভ করেছেন কিন্তু এইসব প্রসঙ্গে সর্বক্ষেত্রে গুরুরমণীকুলের অনভিনন্দন ছিল কিনা, সে-কথা মহাভারত-পুরাণ স্পষ্ট করে বলে না। কিন্তু আমাদের সর্বাঙ্গীণ সমাজ-মানসের বিচার করলে এটা আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে, তৎকালীন ঋষি-মুনির তপস্বীভাব, ইন্দ্রিয়-সংযমের শাস্ত্রীয় শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থার বিপ্রতীপে এক সুন্দরী রমণীর পত্নী-জীবন, ওপর থেকে নেমে-আসা সহধর্মচারিত্বের ব্রত, সংযম-নিয়মের পালনীয়তা এক ধরনের আশা-আকাঙ্ক্ষার অবদমন তো বটেই। তাতে সকলেই অরুন্ধতী-অনসূয়ার মতো অবিচল সতীত্বের আড়ম্বরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন না। হয়তো তাতে স্বাভাবিক বিচলন কিছু ঘটত।

যেখানে যেখানে এই বিচলন ঘটেছে, তার বিস্তারিত দৃষ্টান্ত সাজিয়ে আমরা পাঠককুলকে বিচলিত করতে চাই না। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা যে থাকে, পরিপূর্ণ জীবনে কামনার আস্বাদন লাভ করতে গেলেও যে একটা উপকরণ-সামগ্রী লাগে— সেই আকাঙ্ক্ষার সোচ্চার শব্দ মহাভারত-পুরাণে বড় বেশি উচ্চারিত হয় না। হয়তো তা এই কারণেই যে, তাতে স্বামীর তপস্বী-স্বভাব এবং বৈরাগ্যের মাহাত্ম্যে কলঙ্ক তৈরি হয়, আর নিজের ক্ষেত্রে ঘটে সেই কলঙ্কিত অতিক্রম, যেখানে স্ত্রী চিহ্নিত হন স্বামীর ধর্মে শ্রদ্ধাহীনা এক 'স্বতন্তরী' রমণী হিসেবে। প্রমাণিত হয়, যেন এমন স্ত্রীর ধর্মজ্ঞান নেই, নীতবোধ নেই এবং তিনি নারীজনোচিত সংসার ধর্মের চেয়েও নিজের রূপ-যৌবন নিয়ে বেশি ব্যস্ত। এমন মহিলা কখনও সম্মানের যোগ্য হতে পারেন না। কিন্তু সমাজের এই উপদেশ্য বিধি-ব্যবহারের বিপ্রতীপে প্রবহমান এক বাস্তব আছে, যেখানে সুন্দরী রমণী তার প্রাপ্য বুঝে নিতে চায় এবং তার জন্য মাঝে মাঝে যে বিধি-প্রতিকূল ব্যবহার করে, অথবা করে ফেলে। তাতে চিরকালীন ভারতবর্ষের স্ত্রীজনোচিত যে সহনীয়তা এবং নৈঃশব্দ্য, সেখানেও বড় প্রকটভাবে আঘাত লাগে। সে নিজে বেশি কথা না বললেও তার ব্যবহার কথা বলে ফেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক বেশি। মেয়েদের দিক থেকে এই ঘটনা অবশ্যই এক নৈঃশব্দ্য-ভঙ্গ এবং তা একান্ত বৈপ্লবিক হলেও এই ভারতবর্ষেই ঘটেছে।

এই কাহিনি বোধহয় কাহিনি হিসেবে সকলেরই জানা যে, দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী ছিলেন তারা। তিনি অসম্ভব সুন্দরী ছিলেন এবং সেই সৌন্দর্যের মধ্যে এমন একটা ঢলো-ঢলো ভাব ছিল যাতে খানিক মদালসা মনে হত তাঁকে দেখলেই— রূপ-যৌবন-যুক্তা সা চার্বঙ্গী মদবিহ্বলা। এহেন তিনি ব্রাহ্মণগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী। ওদিকে অত্রিমুনির পুত্র সোম বা চন্দ্র ছিলেন গ্রহ-নক্ষত্র ওষধিকুলের রাজা। তিনি একদা রাজসূয় যজ্ঞ করছিলেন এবং স্বয়ং দেবগুরু বৃহস্পতি ছিলেন তাঁর যাজ্ঞিক পুরোহিত, আচার্য। রাজসূয় যজ্ঞের বিরাট পরিসরে বৃহস্পতি একদিন তারাকে নিয়ে যজমান শিষ্যের বাড়িতে গেলেন। গুরুর স্ত্রী তারাকে দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন চন্দ্র এবং তারা বোধহয় চন্দ্রকে দেখে ততোধিক প্রেমাসক্ত হলেন—পরস্পর-স্পৃহান্বিতৌ। ঘটনা দাঁড়াল এই যে, কিছুদিনের মধ্যেই চন্দ্র গুরুপত্নীকে হরণ করে নিয়ে এলেন আপন গৃহে। বিষ্ণুপুরাণের মতো প্রাচীন পুরাণ তথ্য দিয়ে জানিয়েছে যে, রাজসূয় যজ্ঞ করছিলেন বলে চন্দ্রের মনে নাকি একটু অহংকারই তৈরি হয়েছিল, সেই অহংকারেই গুরুপত্নীহরণ এবং তাঁকে নিজের বাড়িতে এনে তোলা— মদাবলেপাচ্চ অসৌ সকলদেবগুরোর্বৃহস্পতে-স্তারাং নাম পত্নীং জহার।

ব্রাহ্মণ-গুরু বৃহস্পতি প্রথমে এত ভাবেননি; ভেবেছিলেন— এই গেছে, এই চলে আসবে। কিন্তু সেটা আর হল না। চন্দ্র গুরুপত্নীর সঙ্গরঙ্গে বেশ কিছুদিন উদ্দাম রতিক্রিয়ায় কাটিয়ে দেবার পর গুরু বৃহস্পতির টনক নড়ল। তিনি অন্য এক শিষ্যকে চন্দ্রদেবের বাড়িতে পাঠালেন পত্নীকে ফিরিয়ে আনার জন্য। কিন্তু তারা তখন চন্দ্রের প্রেমে এতই মত্ত হয়ে আছেন যে, তিনি নিজেই ফিরে এলেন না— নায়াতা সা বশীকৃতা। স্ত্রী কিছুতেই ফিরে আসছেন না দেখে বৃহস্পতি নিজেই যজমান শিষ্যের বাড়ি গিয়ে প্রচুর তিরস্কার-সহ কটূক্তি করে বললেন— তুই আমার শিষ্য হয়ে গুরুপত্নীকে এমন নির্লজ্জভাবে ভোগ করে যাচ্ছিস, তাঁকে বাড়িতে আটকে রেখেছিস, তুই কি জানিস এর ফল কী— গুরুভার্যা কথং মূঢ় ভুক্তা কিং রক্ষিতাথবা। তুই এখনই আমার স্ত্রীকে ছেড়ে দিবি, আমি তাঁকে না নিয়ে বাড়ি যাব না— ন যামি সদনং মম। আমরা খেয়াল রাখছি— এসব ক্ষেত্রে যেমন হয়। অপহরণকারী ব্যক্তির ওপরেই প্রকৃত স্বামীর রাগ হচ্ছে এবং তিনি ভাবছেন— তাঁর স্ত্রী নির্দোষ, তাঁকে পৌরুষেয় শক্তিতে আটকে রাখা হয়েছে।

চন্দ্র অবশ্য দেবগুরুর ভুল ভাঙালেন না। বরঞ্চ একটা সত্য কথা জানিয়ে একটু 'ভিলেইনাস্' সুরে বললেন— যাবে, যাবে, নিশ্চয়ই ফিরে যাবে। কিন্তু কিছুদিন যদি এখানে থেকে একটু সুখ করে যায়, তাতে আপনার কী এত ক্ষতি হচ্ছে বলুন তো— কা তে হানি রিহানঘ। আর সবচেয়ে বড় কথা, আমি তো আপনার স্ত্রীকে জোর করে আটকে রাখিনি। আমার কাছে থাকতে তাঁর ভাল লাগছে এবং তিনি নিজের ইচ্ছেতেই আমার সঙ্গে আছেন— ইচ্ছয়া সংস্থিতা চাত্র সুখকামার্থিনী হি সা। চন্দ্র এবারে জব্বর একটা শাস্ত্রবাক্যও শুনিয়ে দিলেন, যে-শাস্ত্র নাকি বৃহস্পতিরই লেখা। চন্দ্র বললেন— আর কিছুদিন আমার সঙ্গে থেকে রতিসুখ অনুভব করার পর যদি তিনি আপনার বাড়িতে ফেরেন, তাতেও তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনও অসুবিধে নেই। আপনিই তো ধর্মশাস্ত্রের বিধান দেবার সময় বলেছেন যে, ব্রাহ্মণ অন্যায় করলে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে শুদ্ধ হন আর স্ত্রীলোক যদি ব্যভিচারিণী হয়, তা হলে পরবর্তী রজঃসঞ্চারেই তিনি শুদ্ধ হয়ে যান। কাজেই উপপতির সঙ্গে কিছুদিন থাকলে আপনার স্ত্রীকে গ্রহণ করার কোনও অসুবিধে থাকতে পারে না— ন স্ত্রী দুষ্যতি জারেণ ন বিপ্রো বেদকর্মণা।

আমরা অবশ্য এইরকম একটা উদার বিধান বৃহস্পতি-স্মৃতি বা বার্হস্পত্য কোনও ধর্মশাস্ত্রে পাইনি, কিন্তু এইরকম একটা বিধান ধর্মশাস্ত্রে অবশ্যই আছে এবং চন্দ্র সেটাই বৃহস্পতির ওপরে চাপিয়ে দিয়ে নিজে তার সুযোগ করে নিয়েছেন। বৃহস্পতির কোনও উপায় ছিল না এবং তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, তাঁর স্ত্রীই পছন্দ করছেন না তাঁর কাছে ফিরে আসতে। আর কী আশ্চর্য এই মনোজগতের তত্ত্ব! যতদিন ঘরে তাঁর সুন্দরী স্ত্রী ছিল, ততদিন তিনি তাঁর রূপযৌবন অবহেলা করেছেন। কিন্তু এখন যখন সেই রমণীই অন্যের দ্বারা উপভুক্তা হচ্ছেন, এখন তাঁর জন্য তিনি চরম কামনা অনুভব করছেন। তিনি বিতাড়িত হয়ে ঘরে ফিরছেন যতখানি যজমান শিষ্যের ওপরে রাগে, ঠিক ততখানি কামাতুর হয়ে— জগাম স্বগৃহং তূর্ণং চিন্তাবিষ্টঃ স্মরাতুরঃ। কিছুদিন আবার ঘরে কাটালেন বৃহস্পতি। কিন্তু আর থাকতে পারলেন না, উপস্থিত হলেন শিষ্যবাড়িতে চরম ক্রোধ নিয়ে। আজ একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বেন। চন্দ্রের গৃহে পৌঁছে দ্বারদেশ থেকেই তিনি চ্যাঁচাতে আরম্ভ করলেন— ওরে বদমাস! কোথায় শুয়ে আছিস তুই! বেরিয়ে আয়, আজ যদি তুই আমার স্ত্রীকে ফেরত না দিস, তা হলে অভিশাপ দিয়ে ভস্ম করব তোকে— করোমি ভস্মসান্নূনং ন দদাসি প্রিয়াং মম।

অসীম ব্যক্তিত্বশালী ভগবান চন্দ্র, যাঁর এই সাভিমান গুরুপত্নী-রমণ থেকেই প্রসিদ্ধ চন্দ্রবংশের সৃষ্টি হয়েছে, তিনি এই অভিশাপের ভয় তত পেলেন না। বস্তুত তাঁর সবচেয়ে বড় জোর তাঁর গুরুপত্নী নিজেই। তিনি নিজেই আর রুক্ষ-শুষ্ক বেদাধ্যয়ন-তৎপর গুরুর কাছে ফিরতে চাইছেন না। বৃহস্পতির নিন্দামন্দ শুনে নিজের প্রাসাদ-ভবনের দ্বারদেশে এসে মাথা ঠান্ডা করে সহাস্যে গুরুকে বললেন— কেন এত গালমন্দ করছেন শুধুমুধু। আপনার যে অসামান্যা রূপযৌবনবতী স্ত্রীটি আছেন, আপনি তাঁর যোগ্য নন— ন তে যোগ্যাসিতাপাঙ্গী সর্বলক্ষণসংযুতা। আপনি তো নিজের অনুরূপ— মানে, দেখতে-শুনতে তত ভাল নয়, একটু নিম গোছের একটি মেয়েকে বিয়ে করে ফেলতে পারেন। সেটাই ঠিক হবে। কিন্তু আপনার মতো ভিখারি গুরুর ঘরে, যিনি যজন-যাজন-দক্ষিণায় জীবিকা নির্বাহ করছেন, তাঁর ঘরে এত সুন্দরী একটি রমণীর কী তৃপ্তি হতে পারে— ভিক্ষুকস্য গৃহে যোগ্যা নেদৃশী বরবর্ণিনী?

চন্দ্রের এই প্রত্যাখ্যান-তিরস্কারের মধ্যে অহংকার, অভিমান, কিংবা বলদর্পিতার ভাগ যতটুকুই থাকুক, আধুনিক দৃষ্টিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথাটা এখানে অর্থনৈতিক। এ-কথাটা এ-দেশের মেয়েরা পৌরুষেয় এবং শাস্ত্রীয় 'সহধর্মচারিত্বে'-র চাপে কখনওই বলতে পারেননি। কিন্তু আজকের দিনের গবেষণা থেকে এটা বোঝা কিছু অসম্ভব নয় যে, পুরুষের অর্থনৈতিক অসাচ্ছল্য প্রেম বা ভালবাসার নান্দনিক ক্ষেত্রে যদি বা খুব স্বর্গীয়ভাবেও আঘাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে, বাস্তব জীবনে কিন্তু এই অসাচ্ছল্য কিংবা অর্থনৈতিক দুর্বলতা একটি স্বয়মাগতা রমণীকেও আস্তে আস্তে উদাসীন করে তোলে। আধুনিক গবেষক এবং মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা পুরুষের আর্থিক অক্ষমতাকে অনেক সময়েই বিবাহিতা রমণীর 'সেক্সুয়াল ডিসফাংকশন'-এর কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন। আমাদের দেশে দার্শনিক এবং ধর্মীয় প্রতিপত্তিতে পুরুষের আর্থিক পূর্ণতা মেয়েদের যৌবন-সাফল্যে খুব যে বাদ সেধেছে, তা নয়। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা এবং আশার জায়গাটা তবু রয়েই যেত— তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাব মহাকাব্য এবং পুরাণগুলিতেই।

কিন্তু পুরুষের এই অর্থনৈতিক সাফল্যের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বোধহয় যৌনতার সমঞ্জস আচরণ। মুনি-ঋষিরা অথবা পরবর্তীকালের তথাকথিত বৈরাগ্যবাদী ব্রাহ্মণেরা— যাঁরাই বড় ঘরের সুন্দরী মেয়েদের বিবাহ করেছেন কামনাবশে, তাঁদের নিজেদের যাজ্ঞিক কর্মজীবন, জীবিকা-জনিত ব্যস্ততা এবং অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সংযমের শিক্ষা বিবাহিতা যৌবনবতীকে খানিক অবদমনের পথে তো চালিত করতই, তার মধ্যে সংসারে শ্বশুর-শাশুড়ি, ভাসুর-ননদের সাংস্কারিক বিনয়-শিক্ষা 'এলিট' মহিলাদের চার দিকে এমনভাবেই এক সামাজিক আচ্ছন্নতা তৈরি করত, যার আবরণ ভঙ্গ করে সোচ্ছ্বাস যৌনতার পরিসরে প্রবেশ করাটা তাঁদের পক্ষে কঠিন ছিল, এমনকী সাংস্কারিক ভাবনায় সেটা অন্যায়ও ছিল। এটাও সঙ্গে সঙ্গে বলা ভাল যে, যৌনতার সাংস্কারিক সংযম কিন্তু ব্রাহ্মণ্যের একটা অঙ্গ, যা মহিলারা নিজের অজ্ঞাতেই অত্যন্ত গৌরব-বোধে আত্মসাৎ করতেন অথবা করানো হত এবং এই গৌরববোধ এতটাই প্রবল যে নিম্নবর্গীয় জাতি-বর্ণের মধ্যেও সেটা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নিম্নবর্গীয়া রমণীদের মধ্যে যেহেতু ব্রাহ্মণ্য আচার-আচরণ-শুদ্ধতা তেমন সাংস্কারিক কাঠিন্যে প্রতিষ্ঠিত হত না এবং যেহেতু সেটা ব্রাহ্মণের চোখেও ঘৃণার বস্তু ছিল, তাই বৈবাহিক জীবনে ওপর-ওপর একটা পাতিব্রত্যের পরিসর তৈরি হলেও যৌনতার ক্ষেত্রে তাঁরা অনেক বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এক ইতালীয় পণ্ডিত ফ্রান্‌সেস্‌কা অর্‌সিনি উপরি-উক্ত ভাবনা প্রমাণ করার জন্য একটি মৌখিক গল্পকথার আশ্রয় নিয়েছেন।

অর্‌সিনি প্রথমত ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর রচিত শুকসপ্ততি এবং তার অনুবাদ তুতিনামার প্রমাণ দেখিয়ে সাধারণ গৃহস্থ রমণীর যৌন অভিযানগুলিকে একটা গবেষণার উপাদান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে বীরবলের একটি উর্দু গল্প শুনিয়ে বলেছেন— নিম্নবর্গীয়া রমণীদের ব্যবহার এখানে অনেকটাই 'এসেনশিয়ালি ডুপ্লিসিটাস'। তাঁর উদ্ধৃত গল্পটা এইরকম— একদিন আকবর শাহ বীরবলকে বললেন— আমার কাছে চার জন মানুষ নিয়ে এসো— যাদের একজন হবেন অত্যন্ত বিনয়ী, দ্বিতীয় এক নির্লজ্জ মানুষ, তৃতীয় জন এক কাপুরুষ, এবং চতুর্থত এক মহাবীর। পরের দিন বীরবল রাজাদেশ অনুসারে একটি যৌবনবতী মহিলা এনে হাজির করলেন আকবরের সামনে। আকবর সামান্য ক্রুদ্ধ হয়েই বললেন— আমি তোমাকে চারজন মানুষ ধরে আনতে বলেছিলাম। তুমি তো একজনকে নিয়ে এলে, আর তিন জন কোথায়? বীরবল বললেন— জাঁহাপনা! এই একজন রমণীর মধ্যেই আপনার চার-চারটি মানুষের গুণ আছে। আকবর বললেন— সে আবার কেমন? বীরবল বললেন— এই মহিলা যখন শ্বশুরবাড়িতে থাকেন, তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর বিনয়-বোধ এমনই যে, একটি কথা পর্যন্ত তিনি মুখ ফুটে বলেন না। কিন্তু বিভিন্ন বিয়ে বাড়ির আসরে এই মহিলাই যখন প্রচণ্ড অশ্লীল সব গান করেন, তখন সে গান কিন্তু শুনছেন তার সামনে-পিছনে বসা তার বাবা, তার ভাইরা, তার স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকজন তথা স্বজাতের পরিজন, অথচ তখন কিন্তু এই রমণীর লজ্জা বলে কিছু থাকে না। তখন ইনি বেহায়া নির্লজ্জ। আবার এই রমণীই যখন রাত্রে তাঁর স্বামীর সঙ্গে থাকেন, তখন কিন্তু একা-একা ভাঁড়ার ঘরেও যাবেন না, তাঁর এত ভয়। কিন্তু কোনও দিন— যেদিন সুযোগ আসে, কোনও পরপুরুষকে মনে ধরেছে তাঁর, সেদিন কিন্তু তিনি নির্ভয়ে মধ্যরাত্রির অন্ধকারেও তাঁর পিছনে দৌড়োবেন— একান্ত একাকী, হাতে কোনও অস্ত্র নেই, চোর-ডাকাত-লুঠেরার ভয় নেই, ভুত-পেত্নীর ভয় নেই। এমন নির্ভীক বীর আপনি পাবেন নাকি কোথাও? আকবর আর দেরি করেননি বীরবলকে মোহর দেবার ব্যবস্থা করেছেন পুরস্কার হিসেবে।

বীরবলের এই উদাহরণ নিতান্ত মৌখিকতায় প্রকটিত হলেও এর মধ্যে গভীর সামাজিক সত্য নিহিত আছে এবং সে সত্য শুধু সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়, সেটা বড় ঘরের সম্বন্ধেও বেশ খাটে। কিন্তু ওই যে বললাম— সামাজিক পরিশীলন। উচ্চবর্গের মহিলারা জন্ম ইস্তক অভিভাবক এবং শাস্ত্রের তত্ত্বাবধানে এমনভাবেই তৈরি হয়ে উঠতেন, এমনই সংযম-নিয়মের গৌরব-স্ফীতিতে তাঁদের মানসিক সংস্কার তৈরি করা হত, যাতে যৌনতার কোনও পরিসরে নিজেকে একবারের তরেও প্রকট করে তোলাটা চারিত্রিক দূষণের মধ্যে গণ্য হয়ে উঠত। কিন্তু আমরা জানি— ভদ্রলোকের বাস্তব জগৎও শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে চালিত হয় না। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর ব্রাহ্মণ্য পরিশীলনে কালিদাস তাঁর নায়িকা শকুন্তলাকে 'মূর্তিমতী সৎক্রিয়া' হিসেবে চিহ্নিত করলেও মহর্ষি কণ্বের অনুপস্থিতিতে শকুন্তলা কিন্তু রাজসম্ভোগ স্বীকার করে নিয়েছিলেন নির্জনে এবং তাতে গর্ভবতী হয়ে পড়াটাকেও শেষ পর্যন্ত গান্ধর্ব-বৈধ উপায়ে সিদ্ধ করতে হয়েছে। আর বিকীর্ণ কবিতায় অনুলক্ষ্মীর মতো সম্ভ্রান্ত মহিলা কবিও কিন্তু সোচ্ছ্বাসে নিজের কবিতায় এক নবীন যুবককে রতিসুখের প্রশ্রয় দিয়ে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বলেছেন— দেখো হে নবীন! কুশলী বিদগ্ধ পুরুষের পুনঃপুনঃ আচরিত পূর্ণ রমণের মধ্যে যতই অনুরাগ থাকুক, সে কেমন ব্যবহারে ব্যবহারে জীর্ণ পুনরুক্তির মতো মনে হয়। তার চেয়ে এই যে যেখানে-সেখানে, যেমন-তেমনভাবে আকস্মিক মিলনের সুযোগ নাও তুমি, তার মধ্যে যে তীব্রতা আর অভিলাষ থাকে, সেটাই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে— যথা যত্র বা তত্র বা যথা বা তথা বা সদ্ভাব-স্নেহ-রমিতানি।

আমরা পূর্ব-প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে বলব— একজন হলেও এইরকম একটি অনুলক্ষ্মী-রমণীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, যাঁর কাছে বিদগ্ধ পুরুষের নাগরক-জনোচিত কুশলী রমণও পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হওয়ায় বার-বার এক কথা বলা পুনরুক্তির মতো লাগছে, সেখানে বৃহস্পতির মতো দেবগুরু যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনার সমাধান-শেষে কতখানি তৃপ্ত করতে পেরেছেন তারাকে, সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ এক সন্দেহের কথা তাঁর উপপতি চন্দ্রের কথায় ফুটে উঠেছে। চন্দ্র বলেছেন— মেয়েরা নিজের অনুরূপ কাম্য পুরুষের রতি-রমণই

প্রার্থনা করে— রতিঃ স্বসদৃশে কান্তে নার্য্যাঃ কিল নিগদ্যতে— সেখানে তুই ব্যাটা গুরুগিরি করে দিন কাটাস, তুই কামশাস্ত্রের কী বুঝিস? তুই বাড়ি যা, তোর বউকে আমি ফেরত দেব না। তোর যা মনে হয় করতে পারিস, তুমি অভিশাপ দে, ভস্ম করে দে, তোর মতো কামুক লোকের অভিশাপে আমার কিছুই হবে না। তোর যা মনে হয় কর, কিন্তু তোর বউকে ফেরত দেব না আমি— নাহং দদে গুরো কান্তাং যথেচ্ছসি তথা কুরু।

পুরাণের কাহিনি অনুযায়ী এই 'ইসু' অনেক দূর গড়িয়েছিল। বৃহস্পতি তাঁর শিষ্য দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন। তিনি সসৈন্যে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন চন্দ্রের সঙ্গে। সুযোগ বুঝে অসুরগুরু চন্দ্রের পক্ষে অসুর-সৈন্য নিয়ে যোগ দিলেন। তারাকে উপলক্ষ করে স্বর্গরাজ্যে প্রায় দেবাসুরের পৌরাণিক যুদ্ধ লেগে যায় আর কী। ভগবান দেবদেব শংকর পর্যন্ত 'ইনভলবড' হয়ে গেলেন। কিন্তু এত বড় বড় সব দেবতারা চন্দ্রকে দোষী সাব্যস্ত করছেন শাস্ত্রীয়ভাবে, কিন্তু এই সত্য কেউ অবধারণ করছেন না যে, তারা নিজেই ফিরে আসতে চাইছিলেন না বৃহস্পতির ঘরে। অবশেষে যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ভগবান ব্রহ্মা অসুরগুরু শুক্রাচার্যের সহায়তায় চন্দ্রকে রাজি করাতে সমর্থ হলেন। পৌরাণিক মন্তব্য করেছেন— নিরুপায় হয়ে চন্দ্র গুরুর স্ত্রীকে ফেরত দিলেন যদিও তিনি মনে মনে খুব ভালই জানতেন যে, তারা তাঁর স্বামীকে ভালবাসেন না। সবচেয়ে বড় কথা— যখন তারাকে ফেরত দিলেন চন্দ্র, তখন তিনি গর্ভবতী— দদৌ চ তৎপ্রিয়াং ভার্যাং গুরোর্গর্ভবতীং শুভাম্।

চন্দ্র তারাকে ফেরত দিলেন বটে, কিন্তু গণ্ডগোলটা শেষ হল না। বৃহস্পতি স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি গেলেন বটে, কিন্তু এই ঘটনার মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে নিজের ঘরে ঢোকানোর আত্মতৃপ্তি ছাড়া আর কিছু যে ছিল না, সেটা ভারতবর্ষীয় বহুল পুরুষের মতো তিনি নিজেও বোঝেননি। আর সত্যি বলতে কী, এটাই বোধহয় প্রাচীন ভারতী-কথার অন্যতম বিরল উপাখ্যান, যেখানে এক বিবাহিতা রমণীর ইচ্ছে-অনিচ্ছের ব্যাপারটা তাঁর মুখ দিয়েই শোনা যাচ্ছে। এত যে ঘটনা ঘটে গেল— একটার পর একটা, বিবাহিত বৈধ স্বামী উপপতির দরজায় এসে দিনের পর দিন নরমে-গরমে দাঁড়িয়ে থাকছেন, উপপতির মুখে কামধর্মের উপদেশ শুনছেন, স্বামীর সঙ্গে অভীষ্ট প্রেমিক উপপতির যুদ্ধ লেগে যাচ্ছে, কিন্তু তিনি একবারের তরেও বলছেন না— আমি স্বামীর কাছে ফিরে যাই।

স্বামী বৃহস্পতির গৃহে ফিরে আসার কিছু দিন পর তারার একটি পুত্র হল। আত্মতৃপ্ত স্বামী হিসেবে পরম পুলকিত হয়ে বৃহস্পতি বিধি অনুসারে পুত্রের জাতকর্মাদি পুণ্য কর্ম সমাপ্ত করলেন। সব খবর পেলেন চন্দ্র, তারার প্রতি ভালবাসার অধিকার এবং ঔপপত্যের অসূয়া এই পুত্রজন্মের ঘটনাকে আবারও জটিল করে তুলল। চন্দ্র দূত পাঠালেন গুরু বৃহস্পতির কাছে। দূতের মুখে চন্দ্র বলে পাঠালেন— আপনি কার জাতকর্মাদি পুণ্য ক্রিয়া সম্পন্ন করছেন, এ-ছেলে আপনার ছেলেই নয়, এটা তো আমার ছেলে— ন চায়ং তব পুত্রোঽস্তি মম বীর্য-সমুদ্ভবঃ। চন্দ্রের কথা শুনে বৃহস্পতি ভাবলেন— শিষ্য আবারও ফন্দি আঁটছে। তিনি এতটুকুও ঘাবড়ে না গিয়ে চন্দ্রদূতকে জানালেন— বললেই হল, এটা ওর ছেলে। ছেলেটাকে দেখতে পুরো আমার মতো, আর বলছে কিনা ওর ছেলে। এটা আমারই ছেলে— উবাচ মম পুত্রো মে সদৃশো নাত্র সংশয়ঃ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুত্রের অধিকার নিয়ে আবারও গণ্ডগোল পেকে উঠল। আবারও দেবাসুর-যুদ্ধ লেগে যায় আর কী। প্রজাপতি ব্রহ্মাকে পুনরায় নেমে আসতে হল যুদ্ধ-দুর্মদ অসুর-দেবতাদের সামনে। তিনি কোনও মতে দু'পক্ষকে শান্ত করে তারার কাছে এসে বললেন— কল্যাণী! তুমি সত্যি করে বলো তো এই শিশুটি কার? প্রশ্ন শুনে তারা অনেকক্ষণ অধোমুখে থাকলেন। ব্রহ্মার পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন— এ পুত্র চন্দ্রেরই— বলেই তিনি লজ্জায় লাল হয়ে ঢুকে গেলেন ঘরে— চন্দ্রস্যেতি শনৈরন্তর্জগাম বরবর্ণিনী। ঘটনা শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়াল— বৃহস্পতির পৌরুষের কাঠিন্যে তারা তাঁর ললাট-লিখিত স্বামীর কাছেই থেকে গেলেন বটে, কিন্তু তাঁর ছেলেটিকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন চন্দ্র— অর্থাৎ সেইকালে এটাই সবচেয়ে বড় ঘটনা যে, বৃহস্পতির আইনসঙ্গত স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তারা তাঁর ঔপপত্যের ফল ঘোষণা করতে দ্বিধা করেননি শেষ পর্যন্ত, এবং চন্দ্রের পিতৃত্ব স্বীকার করে এটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সেখানে তাঁর উপপতির ঘরেই তিনি ভাল ছিলেন।

চন্দ্র-তারার পৌরাণিক কাহিনি শুনিয়ে আমরা এতক্ষণ যেটা বোঝাতে চেয়েছি, সেটা হল— জীবনকে 'যাপন' করতে হলে মেয়েদেরও কিছু কাম্য থাকে। বিশেষত যেহেতু তাঁরা উপযুক্ত বিদ্যালাভে প্রায়শ বঞ্চিত ছিলেন, এবং যেহেতু অর্থ রোজগার করার মতো ব্যস্ত বৃত্তিতেও তাঁরা অনধিকারী ছিলেন, তাই স্বামীর ঘরে ভাল থাকার ইচ্ছের মধ্যে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাও যেমন প্রাচীন রমণীদের কাছে একটা মাত্রা ছিল, তেমনই যৌনতার ক্ষেত্রেও তাঁদের পরম ঈপ্সিত ছিল রমণীয়ভাবে ব্যবহৃত হওয়ার সুখ। ঠিক এইরকম একটা 'কাম্যতা' যদি প্রাচীনাদের চাওয়া-পাওয়ার মাত্রা হয়, অথবা সেটাই যদি হয় 'ফ্রেম অফ রেফারেন্স', তা হলে মহাভারত থেকে আমরা এক ঋষিপত্নীর কাহিনি শোনাব, আর এই ঋষি-পত্নীর কথার মধ্যে সেই প্রখ্যাত ঋষির কথা আগে আসবে যাঁর নাম অগস্ত্য। মহাভারতের এই কাহিনির মধ্যে অবশ্য মহাকবির ঈপ্সিত অন্যতর কাহিনির সংযোজন আছে, যাতে করে ঋষিপত্নীর ইচ্ছা এবং কাম্যতার ক্ষেত্রগুলি অনেক ধূসর হয়ে ওঠে। তার কারণটাও অবশ্য খুব ধ্যানগম্য নয়, কেননা মহাভারতের মধ্যে এই কাহিনি প্রবেশ করেছে ঋগ্‌বেদের পরম্পরায়। বৈদিক এবং উপনিষদোত্তর সাহিত্য হিসেবে মহাভারতের কবি তাঁর পূর্বকালের এক রমণীর অন্তর্যন্ত্রণাকে চিরন্তনী এক মানবিক প্রবৃত্তি হিসেবে বুঝেছিলেন বলেই ঋগ্‌বেদের সেই মন্ত্র-মথিত সত্যকে মহাভারতের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন ব্যাস। কিন্তু বৈদিক মূলের মধ্যে যে সরলতায় রমণী-মনের যে তীব্রতা ধরা পড়েছে, পরবর্তীতে মহাভারতের কবির মহাকাব্যিক আড়ম্বরে সেই দহন কিছু কাব্যায়িত হয়েছে হয়তো, কিন্তু তাতেও ঋষিপত্নীকে ঠিক চেনা যায় নারীর আপন দার্শনিকতায়।

আমরা বেদের মন্ত্রগুলিকে আগে বুঝে নিতে চাই। কিন্তু তারও আগে এটা বোঝা দরকার যে, বৈদিকের জীবন বুঝতে গেলে শুধু বৈদিক মন্ত্রের অর্থটুকু বুঝে নিলে চলে না। তার অগ্রপশ্চাৎ কিছু বুঝতে হয়। বুঝতে হয় এইসব মন্ত্রের প্রায়োগিক ক্ষেত্র যাঁকে তাঁরা বলেন 'বিনিয়োগ'। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ এই মন্ত্রগুলির প্রয়োগ হয় কোথায়, এই মন্ত্রগুলির দেবতা কে— এই তথ্যগুলিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেকগুলি মন্ত্রের সমষ্টি এই সূক্তটির প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল— চিরপরিচিত কোনও ঐতিহ্যময় বৈদিক দেবতা— ইন্দ্র,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অগ্নি, বায়ু, সূর্য এই মন্ত্রগুলির দেবতা নন, কোনও দেবতার কাছে অভীষ্ট-প্রার্থনার একটি পঙ্‌ক্তিও এখানে নেই। মন্ত্রগুলির 'ফরম্যাট' একটা বিশেষ মুহূর্তে এক ঋষি এবং ঋষিপত্নীর বাক্যালাপ এবং অনুভূতির দ্বন্দ্ব। পরিশেষে একটি মন্ত্রে এই গুরুকুলে থাকা একজন শিষ্য সম্পূর্ণ এই কথোপকথনের যবনিকাপাত ঘটাচ্ছে নিজের মত ব্যক্ত করে। বৈদিক নিয়মমতো মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি থাকবেন না, এটা যেমন হয় না, তেমনই তার দেবতা থাকবে না, তাও হয় না, অতএব মন্ত্রগুলির প্রাচীন টীকাকার সায়নাচার্য মন্তব্য করেছেন— এই মন্ত্রগুলি লোপামুদ্রা, অগস্ত্য এবং তাঁর শিষ্য দর্শন করেছেন বলে তাঁরাই এই মন্ত্রসূক্তের ঋষি। এই সূক্তের প্রতিপাদ্য অর্থ যেহেতু রতি, তাই রতিই এই মন্ত্রগুলির দেবতা। আর লোপামুদ্রা এবং গুরু অগস্ত্যের রতিবিষয়ক কথোপকথন শুনে অন্তেবাসী শিষ্য যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে অন্যতর এক ছন্দে সেখানেই এই মন্ত্রগুলির তাৎপর্য অর্থাৎ বিনিয়োগ।

আমরা শুধু বলব— বৈদিক এই মন্ত্রগুলির টীকা করতে গিয়ে প্রাথমিক এই যে মন্তব্য, এটাই বৈপ্লবিক এবং ততোধিক বৈপ্লবিক হল— মন্ত্রারম্ভেই ঋষিপত্নী লোপামুদ্রার তীব্র জীবন-যন্ত্রণা। এও মনে হয়— সেদিন বুঝি কোনও আকালিক চৈত্রী সন্ধ্যা ছিল, হয়তো উতলা হাওয়াও কানে কানে কথা কয়েছিল কিছু, ঋষিপত্নী লোপামুদ্রা আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। সামনে-বসা তপস্বী ঋষি অগস্ত্যকে দেখে তিনি সক্ষোভে বলে উঠলেন— আমার জীবনের কতগুলি শরৎকাল চলে গেল। প্রতিটা দিন, প্রতিটা রাত্রি আমি তোমার সেবা করতে করতে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে গেছি। প্রতিটি সকাল আমার চৈতন্য সম্পাদন করেছে, প্রতিটি সকালে আমার বয়স বাড়তে বাড়তে আমার শরীরে জরা আসছে— পূর্বীরহং শারদঃ শশ্রমাণাঃ/ দোষা-বস্তোরুষসো জরয়ন্তী। জরা তো শরীরের সৌন্দর্য্য নষ্ট করে দেয়। তবু এমন তো হতে পারে যে, পুরুষ আসুক এবার তার বিবাহিতা রমণীর কাছে— অপ্যূ নু পত্নীর্বৃষণো জগম্যুঃ।

শেষের এই পঙ্‌ক্তিটি ধ্রুবপদের মতো এসেছে লোপামুদ্রার সাবেগ উচ্চারণে। বস্তুত এই পঙ্‌ক্তিটির মধ্যে একটা অসাধারণ নৈর্ব্যক্তিকতাও আছে। একজন তপস্বী ব্রাহ্মণের সহধর্মপরায়ণা স্ত্রী হিসেবে তিনি বোধহয় চান না যে, অন্যান্য হাজারো কুলবতী রমণীকুলের এমনই দশা হোক— যাঁরা দিনের পর দিন স্বামীদের আচার-ব্রতের সহধর্মিণী হয়ে শুধু সেবা করে যাবে, অথচ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা- যৌনতার দিকে ফিরেও তাকাবে না পুরুষ। অতএব সমস্ত নারীকুলের জন্য লোপামুদ্রার এই প্রার্থনা— পুরুষই যেন বুঝে নেয় তার স্ত্রীর ইচ্ছে, সে যেন নিজেই সব বুঝে নিয়ে রমণীর অভীষ্ট পূরণ করে এবং প্রতিটি পুরুষই যেন তার আচার-বৃত্তি, ব্রহ্মচর্য-সংযম মাথায় তুলে রেখে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সঙ্গত হয় যৌনমিলনে— অপি উ নু পত্নীর্বৃষণো জগম্যুঃ। লোপামুদ্রার উচ্চারণে শব্দ খণ্ডেই এক অদ্ভুত ইচ্ছাময়ী সম্ভাবনা আছে, নিশ্চয়তার প্রার্থনা আছে এবং সংশয়ও আছে— অপি উ নু— অর্থাৎ এমনটা কি হবে কখনও— হওয়াটাই তো উচিত, এখনই কি সেটা হয় না! সায়নাচার্যের ভাষায়— 'অপি'-শব্দটা সম্ভাবনায় উচ্চারিত। 'উ'-শব্দটা নিশ্চয়াত্মক অবধারণ অর্থে। আর 'নু'— শব্দটা সংশয়িত বিতর্কে— এখনই সেটা হতে পারে— ইদানীমপি কিং সম্ভাবনীয়ম্। বৈদিকী লোপামুদ্রার ভাষায় এখানে 'পুরুষ' শব্দটাও ব্যবহার করা হয়নি। বলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে 'বৃষণঃ'। বৃষ-শব্দের সঙ্গে তাল রেখে যে পুরুষ যৌনাকাঙ্ক্ষায় আপন তেজোবীর্য সংযত করে রাখতে পারে না, সেইরকম এক 'বৃষণ' পুরুষের কথা বলছেন লোপামুদ্রা। তিনি নিজের কথা উহ্য রেখে সামগ্রিক সংসারের মধ্যে যেন এমনটা হয়, এই প্রার্থনা করে বলছেন— আমার যা হবার হয়েছে— কিন্তু সংসারে বৃষণ পুরুষ এগিয়ে আসবে না এখনও তার স্ত্রীর কাছে— অপ্যূ নু পত্নীর্বৃষণো জগম্যুঃ?

লক্ষণীয়, লোপামুদ্রার প্রত্যেকটা সকাল এসেছে জরার সংকেত নিয়ে— তাঁর ঈপ্সিত মিলন ঘটেনি যেহেতু— উষসো জরয়ন্তীঃ। বৎসরের পর বৎসর— এমন একটা হীন সাংসারিক শব্দ ব্যবহার না করে কবির অভীষ্টতম— পূর্বজীবনের কতগুলি শরৎকাল আমি শুধু তোমার সেবা করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে গেছি— এই কথার মধ্যে সেই সংশয়— শরৎকালের প্রাপ্যতা কী ছিল, আর কী হয়েছে? এই হাহাকারের সঙ্গে এক রমণীর চিরন্তনী আশঙ্কাটুকুও জড়িয়ে গেছে— জরা আমার সৌন্দর্য্য নাশ করে দিয়েছে— মিনাতি শ্রিয়ং জরিমা তনূনাম্— এমনটা যেন আর কারও শারদীয় জীবনে না ঘটে, বৃষণ পুরুষ যেন সময়ে স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়— এমন একটা প্রার্থনা এক রমণীর মুখে এবং তাও খ্রিস্টপূর্ব আড়াই থেকে তিন হাজার বছর আগে— ভাবা যায়?

প্রাচীনেরা, মীমাংসা-দার্শনিকেরা বলেন— বেদ অপৌরুষেয়, অর্থাৎ বেদের মন্ত্র কেউ লেখেনি। ঋষিরা মন্ত্র দর্শন করেছেন, মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন, তাই শ্রুতিপরম্পরায় নেমে এসেছে আমাদের কাছে। অবিশ্বাসী লোকেরা তর্ক করুন এই বিষয়ে। আমার শুধু বক্তব্য— এই দেখতে পাওয়ার মধ্যেই দার্শনিকের গভীরতা, মন্ত্র হাতে লিখলেন, না, সার্থক লিপির অভাবে মনের মাঝে স্মৃতির পাতায় লিখে রাখলেন, এটা আমার কাছে বড় কথা নয়। বড় কথা হল দেখাটা। লোপামুদ্রা জীবনকে দেখতে পেয়েছেন, তাই মন্ত্রটাকেও তিনি দেখতে পাচ্ছেন আপন অনুভূতিতে— ঠিক যেমন এক অসামান্য ক্ল্যাসিক্যাল গায়ক বলেছিলেন— সুরকে যতক্ষণ দেখতে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ এক ধ্রুপদী গায়কের সিদ্ধি নেই। লোপামুদ্রার এই দার্শনিক অভিব্যক্তিটা এমন এমন শব্দে নিজেই বেঁধেছেন তিনি, যাতে এটা সম্পূর্ণভাবে এক রমণীর অভিজ্ঞতা উপলব্ধিকে প্রকট করে তুলেছে। লোপামুদ্রার উপলব্ধির গভীরতা এইখানে এই যে, তাঁর জরাও ঠিক বয়স বেড়ে যাওয়ার জরা নয়। এ জরা অন্যরকম।

অনেক পরবর্তী কালে কতগুলি নীতিশাস্ত্রীয় শ্লোকের মধ্যে দেখেছি— দু'জন অভিজ্ঞ কবি দুটো গভীর কথা বলেছেন স্ত্রীলোকের যৌন জীবন সম্বন্ধে। একজন বলেছেন— যৌবনবতী রমণীর সঙ্গে স্বামী যদি এক বিছানায় না শুয়ে যদি তাঁকে পৃথক শয্যায় শোয়ার ব্যবস্থা করেন, তবে সে একরকম বিনা অস্ত্রাঘাতে তাঁকে মেরে ফেলার শামিল— পৃথক্‌শয্যা চ নারীনাম্ অশস্ত্রো বধ উচ্যতে। তার মানে জীবনের অভিজ্ঞতায় এটাই সবচেয়ে বড় উপলব্ধি যে, রমণীর শরীর উপভোগ করার জন্য পুরুষ যেভাবে লালায়িত হয়, সেই উপভোগে বিরত হয়ে রমণীকে যদি পৃথক শয্যায় শোয়ানোর ব্যবস্থা করো, তা হলে উপভোগ্য হওয়ার জন্য রমণীর যে আত্মাভিমান, সেও যেমন ব্যাহত হয়, তেমনই আহত, শুষ্ক, জরাগ্রস্ত হয়ে ওঠে তার শরীর। আর এক নীতি-কবি লিখেছেন— ঘোড়া যদি পথে না

দৌড়োয়, সেটাই যেমন তার জরা, তেমনই উপযুক্ত সম্ভোগ লাভ না করাটাই স্ত্রীলোকের জরা সৃষ্টি করে— অসম্ভোগো জরা স্ত্রীণাম্... অনধ্বা বাজিনাং জরা।

বলতেই পারেন— এ সব বাজে শ্লোক পুরুষের লেখা। আমরা বলব— যদি এটা পুরুষের লেখা হয়ও, তবু কথাটা বেঠিক নয়। আর সেটা যে কোনও রমণীও জানে। কুমারী অবস্থা থেকে প্রৌঢ়াকাল পর্যন্ত যে রমণী অনন্ত পুরুষের দৃষ্টি-রমণ উপভোগ করেছে স্বেচ্ছায়, অনিচ্ছায়, জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে, সে তার আপন উপভোগ্যতা সম্বন্ধে সাংস্কারিক ভাবে সচেতন বলেই যে কোনও অপ্রার্থ্যমানতা তাকে যন্ত্রণা দিতে বাধ্য, সংযমসিদ্ধ পুরুষের অসম্ভোগ সেখানে জরা সৃষ্টি করবেই। লোপামুদ্রা এই জরার কথা বলছেন, তা নইলে এমন হাহাকার চূড়ান্ত হত না যে, প্রত্যেকটি শারদ সকালে আমার জরা তৈরি হয়েছে, তোমার সেবায় আমি ক্লান্ত, এমনটা যেন অন্যত্র না হয়, বৃষণ পুরুষ যেন সঙ্গত হয় তার স্ত্রীর সঙ্গে।

আজ অনেক দিন, অনেক কাল পরে লোপামুদ্রা কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। একজন মহান ব্রহ্মর্ষি পুরুষের সংযম-নিয়মের প্রয়োজন তিনি জানেন। আবার তিনি এও জানেন যে, তাঁর বিবাহিত স্বামী-পুরুষটি শুধু সংযম আর তপস্যাই করে যাবেন, আর তাঁর স্ত্রী শুধু সেবা করে যাবেন স্বামীর— এটা শুধু তাঁর আপন গৃহচিত্র নয়, ভারতবর্ষের হাজারও গার্হস্থ্যে অনেক ব্রাহ্মণ ঋষি আছেন এবং আছেন তাঁদের যৌবনবতী স্ত্রীরাও, সেখানেও কোথাও শরৎ সফল হয়ে ওঠে ঈপ্সিত সম্ভোগে আবার কোথাও তা অতিবাহিত হয় তাঁরই মতো নিরুচ্চারে, অসম্ভোগে। লোপামুদ্রা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, তিনি মন্ত্র দর্শন করছেন। জীবনকে দর্শন করেছেন বলেই বুঝি এমন মন্ত্রদর্শন। লোপামুদ্রা বলছেন স্বামীকে— তুমিই তো সেই প্রথমতম ঋষি নও, যিনি সংযম-নিয়ম পালন করে সত্যদর্শন করছেন। তোমার আগেও ছিলেন অনন্ত ঋষিরা, যাঁরা সত্যকে লাভ করেছেন, দেবতাদের সঙ্গে তাঁরা কথা বলেছেন। তাঁরা কিন্তু এই সংযম-নিয়ম-ব্রহ্মচর্যের কূল পাননি কোনও এবং সেই কারণেই প্রণয়সুখে আপন স্ত্রীদের রেতঃসিক্ত করতে তাঁদের বাধেনি কোথাও— তে চিদবাসু-র্ন হ্যন্তমাপুঃ। আর তাঁরা যদি এমন আচরণ করে থাকেন, তা হলে এটাই আমার প্রার্থনা যে, ঋষিপত্নীরা যাঁরা স্বামীর সঙ্গে সংযমের তপস্যায় দিন কাটাচ্ছেন, তাঁরা এবার সম্ভোগে মিলিত হোন কামুক স্বামীদের সঙ্গে— সমূ নু পত্নীর্বৃষভির্জগম্যুঃ।

পূর্বমন্ত্রের ধ্রুবপদে বার্তা ছিল পুরুষদের কাছে, তারা উদ্যোগী হোক সম্ভোগে। এবারে দ্বিতীয় মন্ত্রে বার্তা যাচ্ছে স্ত্রীদের কাছে, যাতে তাঁরাই উদ্যোগী হন 'বস্তুত' কামকাতর পুরুষের সম্ভোগে। পূর্ব মন্ত্রে যেন কর্তা হলেন পুরুষ, দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্তৃস্থানে যেন স্ত্রীরা। লোপামুদ্রার কথা শুনে অগস্ত্যের মতো তেজস্বী মহর্ষিও যেন থতমত খেয়ে গেছেন। অনেক সংযম-তপস্যায় তাঁর দিন কেটেছে, ঋগবেদে অনেকগুলি মন্ত্রবর্ণের তিনি দ্রষ্টা পুরুষ। কিন্তু আজ তাঁকে এক অদ্ভুত গার্হস্থ্য সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছে। তিনি বিবাহ করেছেন, কিন্তু তাঁর ধর্মপত্নী বঞ্চিত বোধ করছেন, সম্ভোগ-বঞ্চনার মতো এক গুরুতর অভিযোগ উঠছে তাঁর বিরুদ্ধে। থতমত খেয়েই সম্পর্ক-সংশোধনে ব্যস্ত হচ্ছেন ঋষি অগস্ত্য। তিনি 'অ্যাপোলোজেটিক' এবং স্ত্রীকে প্রসন্ন করতে চাইছেন। অগস্ত্য বললেন— আমরা তো বৃথা শ্রান্ত হইনি। আমরা যে এত কৃচ্ছ্রতায় তপস্যা করেছি, দেবতারা তার ফল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছেন, তাঁরা রক্ষা করছেন আমাদের— ন মৃষা শ্রান্তং যদবন্তি দেবাঃ। আর তুমি এত শত ভাবছ কেন, লোপামুদ্রা? এই পৃথিবীতে যত উপভোগ্য বস্তু আছে, তা সবই আমরা ভোগ করতে পারি, যদি দু'জনেই আমরা একটু চেষ্টা করি। আমাদের সাংসারিক পৃথিবীতে ভোগ্য বস্তু আছে শত শত, আমরা পরস্পরেই জয় করে নিতে পারি সেগুলি— জয়াবেদত্র শতনীথমাজিম্। এমনকী আমরা খুব সম্যকভাবেই পরস্পর মৈথুনে পরস্পরকে জয় করতে পারি— যৎসম্যঞ্চা মিথুনাবভ্যজাব।

অগস্ত্য বোধহয় অনুভব করতে পেরেছেন যে, তাঁর এই সংযম-নিরুদ্ধ স্বভাব তাঁর বিবাহিতা বধূর জীবনে অনীপ্সিত এক বঞ্চনার আবরণ তৈরি করেছে সম্পর্কের মধ্যে। আর যেহেতু তিনি বিবাহিত এবং লোপামুদ্রা তাঁর ধর্মপত্নী, সেখানে তপোনিষ্ঠার সংযমটাকে কারণ হিসেবে খাড়া করাটা একটা ব্যর্থ অজুহাত হিসেবেই গণ্য হবে। হয়তো এই কারণেই অগস্ত্য পশ্চাৎপদে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে বললেন— হয়তো আমি জপ-ধ্যানে নিরত হয়ে ব্রহ্মচারীর সংযম নিয়ে বসে ছিলাম, তবে কিনা তোমার সঙ্গে সংসর্গের কারণেই হোক, অথবা আজ বসন্তের উতলা বাতাসে কোনও কিছু হল কিনা কে জানে, আজ কিন্তু আমার মনের মধ্যে জেগে উঠেছে সেই আদিম কামনা— নদস্য মা রুধতঃ কাম আগান্/ ইতঃ আজাতো অমুতঃ কুতশ্চিৎ। আজ তুমি লোপামুদ্রা, আমার এই কামনার প্রবর্তক হয়ে উঠেছ তুমি— এক অধীরা রমণী নিয়ম-নিরুদ্ধ ধীর স্বামীর সম্ভোগ স্বীকার করুক, আমার নিঃশ্বাস উষ্ণ হয়ে উঠেছে— লোপামুদ্রা বৃষণং নীরিণাতি/ ধীরম্ অধীরা ধয়তি শ্বসন্তম্— তুমি এসো, আমি প্রস্তুত।

বেদে একটা কথোপকথনের মধ্যে অগস্ত্য এবং তাঁর স্ত্রীর এই যে মানসিক সংশ্লেষ ঘটেছে, অপিচ সেই সংশ্লেষের মধ্যে গুরু এবং গুরুপত্নীর মুখে যে কাম-শব্দ উচ্চারিত হয়েছে, সেটা শুনে গুরুকুলবাসী একজন শিষ্যের একটা পাপবোধ তৈরি হচ্ছে। তাঁর মনে হচ্ছে গুরুর এইসব গোপন কথা তাঁর শোনা উচিত হয়নি। প্রথমত যজ্ঞশেষে পীত সোমের কাছে সে প্রার্থনা করছে— সে যেন সুখে থাকে। পরমুহূর্তেই সে গুরুপত্নী এবং গুরুক্ত কামনার বর্ণগুলিকে সহজ স্বাভাবিকভাবে বর্ণনা করে বলছে— এই মর্ত্য পৃথিবীর মানুষগুলির বহুতর কামনাই তো থাকার কথা— পুরুকামো হি মর্ত্যঃ। পরিশেষে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে শিষ্য জানাচ্ছে— আমার গুরু অগস্ত্য সংযমসিদ্ধ উগ্রতপা মহর্ষি। তিনি পুত্রলাভের জন্য আপন ধর্মপত্নীর সঙ্গে সঙ্গত হয়ে আপন বংশের গতি সুস্থির করেছেন। এইভাবে আমার গুরু পুত্রকামনার মাধ্যমে যেমন রতিসম্ভোগ সাধন করেছেন, তেমনই জপ-ধ্যান-তপস্যার সংযমও সাধন করেছেন— উভৌ বর্ণাবৃষিরুগ্রঃ পুপোষ/ সত্যা দেবেষ্বাশিষো জগাম।

বেদে উল্লিখিত লোপামুদ্রার কাহিনিটিই বোধহয় পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্যিক উপাদান, যা সামাজিক তথা ঐতিহাসিক দিক থেকে এক বিবাহিতা রমণীর অন্তরঙ্গ সম্ভোগেচ্ছার কথা স্পষ্টভাবে সেই রমণীর মুখ দিয়েই বলিয়েছে। মহাভারতে লোপামুদ্রার বক্তব্যের তীব্রতা অনেক পরিশীলিত, যৌনতার শব্দ সেখানে স্তব্ধ হয়ে এসেছে মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় এবং ব্যঞ্জনার আড়ম্বরে। পুত্রার্থে বিবাহের প্রয়োজন এবং পুত্রের প্রয়োজন বংশরক্ষার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য— এই স্থূল আর্য অধ্যবসায় বৈদিক সূক্তের শেষ ছত্রে অন্তেবাসী এক ছাত্রের মুখে ধ্বনিত হয় এবং তাতে এক রমণীর প্রজননী ভূমিকাটাই যেন মুখ্য করে তোলে এবং সেটা যেন গুরুস্থানীয় এক পুরুষেরও প্রধান প্রয়োজন বলে নির্ধারিত হয়। কিন্তু বেদের এই বিশেষ সূক্তের মন্ত্রভাগে শিষ্যের এই অবেক্ষণটুকুকে যদি বৈদিক সমাজমুখ্য এক মোড়লের স্থূল টিপ্পনী হিসেবেও ধরে নিই এবং সেটাকে যদি লোপামুদ্রা এবং অগস্ত্যের দাম্পত্য কথোপকথনের অংশ থেকে বাদও দিয়ে দিই, তাহলেও দেখব— লোপামুদ্রা বোধহয় পৃথিবীর প্রাচীনতম নারী, যিনি পুরুষের তীব্র ধর্মনিষ্ঠাকেও দাম্পত্যের বাইরে এক তীব্র আবেশ বলে চিহ্নিত করেছেন। পরবর্তী কালে যে স্বামীসেবা স্ত্রীলোকের কাছে অখিল ধর্মমূল তথা 'ধর্ম-কামার্থ-মোক্ষদা' হয়ে উঠবে, সেই স্বামীসেবার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠাটাই প্রথমত এক চরম বিদ্রোহ। তার ওপরে লোপামুদ্রা সংযম-নিয়ম-নিষ্ঠ স্বামীর ঔদাসীন্য নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এখন। বলেছেন— অসম্ভোগে দিন কেটেছে আমার, আমি বুড়িয়ে গিয়েছি স্বামীর যৌনতাহীন অন্তহীন তপস্যায়, পুরুষ এবার আসুক তার স্ত্রীর কাছে— সমূ ন পত্নীর্বৃষভির্জগম্যুঃ।

মহাভারত এইভাবে কথা বলে না। মহাভারত কাহিনি বলে, উপাখ্যানের মাধ্যমে সে বৈদিক-পরম্পরাকে ধরে রেখেছে মহাকাব্যের পরিমার্জন লেপন করে। সমাজের মধ্যে পৌরুষের প্রাধান্য বেড়ে ওঠায় সে বংশকর পুত্রজন্মের প্রয়োজনটাকেই যৌনতার প্রথম সূত্র হিসেবে দেখবে, কিন্তু প্রত্যেক দিনোদয়ে লোপামুদ্রার বৈদিক হতাশাকে মহাভারত কিন্তু কবির চেতনায় পরিশীলিত করেছে। ঋষি অগস্ত্যের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী লোপামুদ্রার পার্থক্যটা প্রথমে সূচিত হয় একটা আর্থসামাজিক তথা সাংস্কৃতিক পার্থক্যের নমুনা দিয়ে, কিন্তু কাহিনির বাঁধনটা শুরু হয় এক পৌরুষেয় পরাক্রমে এবং তা ঋষি অগস্ত্যকে দিয়েই। কীভাবে অগস্ত্য ইল্বল এবং বাতাপি দৈত্যকে বধ করেছিলেন, সেই প্রসঙ্গে অগস্ত্যের কাহিনি শুরু হয়, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে ঘটনা আবর্তিত হয় অগস্ত্যের জীবন-কাহিনির মধ্যে।

অগস্ত্য হঠাৎই একদিন তাঁর প্রাচীন পূর্বপুরুষদের একটি গর্তের মধ্যে অধোমুখে ঝুলতে দেখেন। বস্তুত এ ধরনের প্রতীকী নরক, যা আমরা মহাভারতে একাধিক কাহিনিতে দেখেছি। আকাশের দিকে পা রেখে পিতৃপুরুষেরা অধোমুখে ঝুলছেন মানেই তাঁদের অধস্তন পুত্র এখনও বিবাহ করেননি এবং তাঁর বংশধারা প্রবর্তিত হয়নি। জরায়ু-মধ্যস্থ সন্তান যেমন মাতৃগর্ভে বিপরীত দিকে মাথা রেখে জন্মানোর জন্য অপেক্ষা করে, পিতা-পিতামহরাও তেমনই উলটো হয়ে ঝুলছেন পুত্র-কন্যা হয়ে জন্মানোর জন্য, প্রতীকীভাবে। অগস্ত্য জিজ্ঞাসা করতেই তাঁর পরলোকগত পিতা-পিতামহেরা একযোগে বললেন— তোমার মাধ্যমে আমাদের বংশ প্রতিষ্ঠিত না হলে আমাদের এই নরকেই পচে মরতে হবে। অগস্ত্য পিতৃপুরুষদের আর্তি শুনেই বললেন— আমি নিশ্চয়ই আপনাদের অভিলাষ পূরণ করব। আপনারা দুঃখ পাবেন না। তার মানে অগস্ত্যের বিবাহেচ্ছার মূলে আছে বংশকর পুত্রলাভের ভাবনা— যা চিরাচরিত ধর্মশাস্ত্রীয় নিয়মে ধর্মসঙ্গত বিবাহের মূল উদ্দেশ্য বলে মহাভারতও স্বীকার করে নেয়। কিন্তু কী অদ্ভুত দেখুন, পুত্রলাভের জন্য তো যে কোনও একটি সাধারণ রমণীই যথেষ্ট ছিল, অথচ অগস্ত্য সাধারণ কোনও রমণীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোঁজ করেননি; কেননা, স্ত্রীলোকের খোঁজ করে নিজের যোগ্য কোনও রমণীই তিনি খুঁজে পেলেন না; যাঁর গর্ভে তিনি নিজেই পুত্র হয়ে জন্মাবেন— আত্মনঃ প্রসবস্যার্থে নাপশ্যৎ সদৃশীং স্ত্রিয়ম্।

মহা-মহর্ষির এই বাস্তব অনুসন্ধানের মধ্যে আমাদের মতো কলির জীবের কিছু ধর্মশাস্ত্রীয় সংশয় তৈরি হয় মনে— মনে হয়, বিবাহের মুখ্য ফল যদি পুত্রলাভই হয়, তা হলে ধর্মশাস্ত্রীয় নিয়ম-মতে গৌণ ফল রতিক্রিয়ার জন্য অতিসুন্দরী রমণীর তো কোনও প্রয়োজন থাকে না। অথচ অগস্ত্য মুনির মতো এক মহর্ষিকে দেখছি— সাধারণ কোনও সুন্দরীকে দেখে তাঁর মনেই হচ্ছে না যে, সে-রমণী তাঁর সন্তান-ধারণের উপযুক্ত। এইখানটায় আমরা বুঝতে পারি যে, শুষ্ক-রুক্ষ মুনি-ঋষি হলেও তাঁর সামনে যখন কামনার রাজ্য উপস্থিত হয়, সেখানে তিনি অন্য সাধারণ মানুষের মতোই নিতান্ত মানবিক। আর এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে, স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য, আকর্ষণ এবং যৌবন বহির্দৃষ্টিতে যতই পৌরুষেয় আকাঙ্ক্ষার বস্তু হোক, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সেটাও কিন্তু শেষ জায়গায় 'ফার্টিলিটি' এবং উপযুক্ত সন্তান-লাভের সঙ্গেই জড়িত। যে পুরুষ এক রমণীর পীন-পয়োধর দেখে মোহিত হচ্ছে এবং যেখানে সেই রমণীও তাঁর পয়োধর-মাহাত্ম্যে গর্বিত, সেখানে বস্তু-বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবু নির্বিকারভাবে বলবেন— উইমেন উইত্ লার্জার ব্রেস্টস্ টেন্ড টু হ্যাভ হায়ার লেভেলস্ অব হরমোনস্ ওস্ট্রেডিয়াল এ্যান্ড প্রোজেস্টেরোন হুইচ বোথ প্রোমোট ফার্টিলিটি। তার মানে যে পুরুষ ভদ্রলোক মিলন-কামনায় অতিসুন্দরী খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তাঁর রতি-ভাবনার অন্তস্তলে কিন্তু সন্তানলাভের শাস্ত্রীয় কামনাটাই সিদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ আমরা বলতে চাই— অগস্ত্য মুনি একজন ঋষি হওয়া সত্ত্বেও একটি সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করতে চাইছেন— এই ভাবনার মধ্যে ঋষিজনোচিত কোনও অশোভন ব্যবহার নেই।

যাই হোক, উপযুক্ত কন্যার অভাবে অগস্ত্য আপন আর্ষ প্রভাবে নিজেই নিজের জন্য এক কন্যারত্ন সৃষ্টি করলেন এবং তা করলেন মনে-মনে সমস্ত প্রাণীর সর্বোৎকৃষ্ট অঙ্গটি একত্র সংযোজিত করে— স তস্য তস্য সত্ত্বস্য তত্তদঙ্গমনুত্তমম্। ঠিক এই সময়ে বিদর্ভদেশের রাজা সন্তানের জন্য তপস্যা করছিলেন। অগস্ত্য তার সংকল্পিত মনোময়ী রমণীটিকে স্থাপন করলেন বিদর্ভরাজার স্ত্রীর গর্ভে। বিদর্ভ-রাজমহিষীর গর্ভে কন্যা জন্মাল যেন সন্ধ্যাবেলায় বিদ্যুতের চমকানি লাগল সবার চোখে, কন্যা বড় হতে থাকল জলে বাড়তে থাকা পদ্মিনীর মতো, কাঠে জ্বলতে-থাকা অগ্নিশিখার মতো— অপ্স্বিবোৎপলিনী শীঘ্রমগ্নেরিব শিখা শুভা। কন্যার নাম হল লোপামুদ্রা। 'মুদ্রা' বা 'আমুদ্রা' মানে চিহ্ন, পণ্ডিতেরা বলেছেন— লোপামুদ্রা বড় হতে থাকলে সৌন্দর্য্য-মাধুর্যের অন্যত্র-স্থিত সমস্ত চিহ্ন যেন লুপ্ত হয়ে গেল, সেইজন্যই তাঁর নাম হল লোপামুদ্রা। রাজার ঘরে মেয়ে বলে ঐশ্বর্য এবং প্রাচুর্যের মধ্যে বড় হতে লাগলেন তিনি। দাস-দাসী-সখীরা সব সময় তাঁকে ঘিরে রাখে। লোপামুদ্রা পূর্ণ যৌবনবতী হলেও বিদর্ভরাজের ব্যক্তিত্ব এবং লোপামুদ্রার সৌন্দর্য্যের তীক্ষ্ণতায় কোনও রাজপুত্র অথবা রাজপুরুষই তাঁর ধারেকাছে আসার সাহস পেল না। তাঁর পিতা বিদর্ভরাজও অত্যন্ত চিন্তিত হলেন— কার হাতে এই আগুনপানা সুন্দরী মেয়েটিকে তুলে দেবেন— মনসা চিন্তয়ামাস কস্মৈ দদ্যামিমাং সুতাম্।

হয়তো এটাই মহাকাব্যিক অভিসন্ধি ছিল অগস্ত্যের বধূ হিসেবে লোপামুদ্রার তৈরি হয়ে ওঠার মধ্যে। লোপামুদ্রার রূপ স্বর্গসুন্দরী অপ্সরাদের চাইতেও বেশি অথচ তিনি অত্যন্ত সদাচারসম্পন্না— সা তু সত্যবতী কন্যা রূপেণাপ্সরসোঽপ্যতি— কোনও রাজপুরুষও তাঁর কাছে ঘেঁষছেন না তাঁর পিতার ভয়ে— এটা মহাভারতীয় তথ্য। যদিও মহাভারতে এমন খবর আর পেয়েছি বলে মনে হয় না। কেননা, রাজপুরুষেরা কন্যাপিতার ভয়ে যৌবনবতী রমণীকে এড়িয়ে যাচ্ছেন— ন বব্রে পুরুষঃ কশ্চিদ্ ভয়াত্তস্য মহাত্মনঃ— এমন হীনবীর্য পুরুষের কথা মহাভারতের কবি অন্য কোথাও বর্ণনা করেননি। আসলে অগস্ত্য ঋষির ভবিষ্যৎ-পরিগ্রহের কারণেই লোপামুদ্রার এই বিপ্রতীপ সংস্থান— তিনি আচারবতী, যৌবনবতী, পিতার ঘরে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী— কিন্তু বৈদিক গ্রন্থে যেহেতু কোনও কাহিনি নেই এবং যেহেতু লোপামুদ্রা সেখানে যৌবন ব্যর্থ হবার প্রতিবাদ-শব্দ উচ্চারণ করছেন, অতএব তাঁর কাহিনি সাজাতে হচ্ছে লোপামুদ্রার রূপ-গুণ এবং সামাজিক সচ্ছলতার পূর্বসিদ্ধি প্রতিষ্ঠা করে।

মহাভারতে ঋষি অগস্ত্য নিজেই তাঁর ভবিষ্যৎ-পত্নীর স্রষ্টা। অতএব যৌবনস্থা এবং বিবাহযোগ্যা হয়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি বিদর্ভ রাজ্যে এসে কন্যাপিতার কাছে লোপামুদ্রার পাণি-প্রার্থনা করলেন। এক মহাশক্তিধর মুনি তাঁর মেয়েকে চাইছেন— বিদর্ভরাজ এতে গৌরবও বোধ করলেন যেমন, তেমনই তাঁর মনে দুঃখ হল মেয়ের জন্য। ভোগ-ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিতা কন্যাটি ঋষির ঘরের ত্যাগ-বৈরাগ্য সহ্য করতে পারবে তো? অগস্ত্যের প্রার্থনা শুনে তিনি তাই কিছুই বলতে পারলেন না, তিনি না পারছেন এই প্রার্থনা স্বীকার করতে না পারছেন ঋষিকে প্রত্যাখ্যান করতে— প্রত্যাখ্যানায় চাশক্তঃ প্রদাতুমপি নৈচ্ছত। রাজমহিষীর সঙ্গেও অনেক আলোচনা করলেন বিদর্ভরাজ, রানী মেয়ের ভবিষ্যৎ-পরিণতির কথা ভেবে কোনও কথাই বলতে পারলেন না। এমন সংকটাপন্ন অবস্থায় লোপামুদ্রা নিজেই পিতার কাছে এসে অগস্ত্যের প্রার্থনা পূরণ করতে বললেন এবং অভিশাপ-ভয় থেকে মুক্ত হতে বললেন তাঁকে। মেয়ের কথার মধ্যে যুক্তি আছে বুঝেই বিদর্ভরাজ বৈদিক বিধিতেই মেয়ের বিবাহ দিলেন অগস্ত্যের সঙ্গে।

স্বাভাবিক ভাবেই লোপামুদ্রার বধূবেশে রাজার ঐশ্বর্য আহিত ছিল— মহামূল্য অলংকার, রক্ত-কৌষেয় বাস উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল সকলের চোখে। মহামুনি অগস্ত্য অবশ্যই অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তিনি নিজের সঙ্গে লোপামুদ্রাকে নিয়ে যাবার আগেই বললেন— তুমি এইসব মহামূল্য বস্ত্র-অলংকার ত্যাগ করে আমার সঙ্গে চলো— মহার্হাণ্যুৎসৃজৈতানি বাসাংস্যাভরণানি চ। লোপামুদ্রা স্বামীর কথা সম্পূর্ণ মেনে নিয়ে চীরবাস, বল্কল এবং মৃগচর্ম— ততশ্চীরাণি জগ্রাহ বল্কলান্যজিনানি চ— মুনি-ঋষির উপযুক্ত বৈরাগ্যের সাধন। এই পতিধর্মানুবর্তিতা অথবা সহধর্মচারিতার আচরণ নববধূ হিসেবে লোপামুদ্রার পক্ষে খুবই প্রশংসনীয় হলেও ব্যাপারটা যৌবনবতী এক রাজনন্দিনীর পক্ষে যে বিপরীত কর্ম ছিল, তা এই মুহূর্তে মহাভারতের কবি বুঝিয়ে দিলেন লোপামুদ্রার ওপর 'রম্ভোরু' এবং 'আয়তেক্ষণা' শব্দ-দুটি প্রয়োগ করে। কবি বললেন— কদলী-স্তম্ভের মতো যাঁর ঊরুদেশ এবং যিনি আয়তলোচনা, তিনি স্বামীর অনুশাসন মেনে মূল্যবান বসন ত্যাগ করলেন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমুৎসসর্জ রম্ভোরূ-র্ব্যসনান্যায়তেক্ষণা। অর্থাৎ এ-হেন সুন্দরীও চীর-বঙ্কল ধারণ করলেন, সেটা খানিক বেমানানই লাগছিল।

অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে নিয়ে গঙ্গাদ্বারে চলে গেলেন শ্বশুরের রাজবাড়ি ছেড়ে। সেখানে অনুবর্তিনী লোপামুদ্রার সঙ্গে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। তপস্যার কৃচ্ছ্রসাধনে ব্যাপৃত অগস্ত্য মুনির সেবা-পরিচর্যা করাটা ছিল লোপামুদ্রার তপস্যা। পরম আদরে এই পরিচর্যা করছিলেন বলেই তাঁর শরীরের মধ্যে এক অলৌকিক উজ্জ্বলতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল— সা প্রীতা বহুমানাচ্চ পতিং পর্য্যচরত্তথা। এমন বশবর্তিনী স্ত্রীর ওপরে অগস্ত্য মুনিরও প্রীতি কম ছিল না। তিনিও যথেষ্ট ভালবাসতেন তাঁর স্ত্রীকে। কিন্তু শম-দমাদি-সাধনের নিরিখে তাঁর ভালবাসাটা শরীরের পর্যায়ে যাবার আগেই কুণ্ঠিত হত। কিন্তু একদিন লোপামুদ্রাকে দেখে অগস্ত্যের বাসনালোক উন্মথিত হয়ে উঠল। এত দিন তপস্যার কারণে অগস্ত্য যেন খেয়ালও করেননি পরিচর্যায় অভ্যস্তা স্ত্রীকে— ততো বহুতিথে কালে লোপামুদ্রাং বিশাম্পতে। কিন্তু সেদিন লোপামুদ্রাকে অন্যরকম দেখাচ্ছিল যেন। ঋতুকাল উত্তীর্ণ হবার পর তিনি স্নান করেছেন। স্ত্রীজনোচিত উর্বরতা এই মুহূর্তে যে ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করেছে তাঁর শরীরে অগস্ত্য যেন সেটা নতুন করে আবিষ্কার করলেন।— তপসা দ্যোতিতাং স্নাতাং দদর্শ ভগবানৃষিঃ। অগস্ত্যের মন বুঝে মহাভারতের কবি লোপামুদ্রার এই ঔজ্জ্বল্যের কারণ নির্ণয় করে বলেছেন— অগস্ত্য বড় আনন্দিত হয়েছেন তাঁর পরিচর্যায়, পবিত্রতায়, ইন্দ্রিয়দমনের ক্ষমতায় এবং তাঁর সৌন্দর্য্য-মাধুর্যে। প্রথম তিনটি— পরিচর্যা, পবিত্রতা এবং ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ যদি অগস্ত্যের মনে নিতান্ত এক পৌরুষেয় সন্তোষ তৈরি করে থাকে, তবে তাঁর এই মুহূর্তের আকর্ষণ লোপামুদ্রার সৌন্দর্য্য— অগস্ত্য সোজাসুজি মৈথুনের আগ্রহ প্রকাশ করলেন— শ্রিয়া রূপেণ প্রীতো মৈথুনায়াজুহাব তাম্।

এত পরিষ্কার স্পষ্ট এবং সাগ্রহ এই পৌরুষেয় আহ্বান যা শুধু পৌরুষেয়তার কারণেই অপ্রতিরোধ্য এবং অনিবার্য ছিল চিরকাল, বিশেষত তপস্যা-নিষ্ঠ এক মুনির দিক থেকে এতটাই কৃপার মতো শোনায় যে, তাতে ব্রত-নিয়ম-পরিচর্যায় এতকাল অপেক্ষমাণ এক যৌবনবতী রমণী সমান আগ্রহে সাড়া দেবে— এটা তো সাংস্কারিকভাবে নির্ধারিত ছিল। কিন্তু এই প্রথমে ভেসে এল সেই শান্ত-মধুর প্রতিবাদ— যা বেদের মন্ত্রে লোপামুদ্রার মুখে একই রকম 'ব্লেটান্ট'— এতদিন তোমার পরিচর্যা করতে করতে আমি ক্লান্ত। আমার জীবনের কতগুলি শরৎকাল কেটে গেল, প্রতিটি সকালে আমি কেমন বুড়িয়ে গেছি এতকাল ধরে— পূর্বীরহং শরদঃ শশ্রমাণাঃ/ দোষাবস্তোরুষসো জরয়ন্তী। মহাভারত লোপামুদ্রাকে এই স্পর্শ-মুখরতা থেকে সরিয়ে এনে তাঁকে তাঁর সমকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছে। লোপামুদ্রা এতকালের তপোদৃষ্টিতে এটা বুঝে গেছেন নিশ্চয় যে, তাঁর স্বামী তাঁর পিতৃলোকের সন্তান-বৃদ্ধির কামনা পূরণ করতে গিয়ে শুধু সন্তান-লাভের জন্যই প্রথমত লোপামুদ্রার পাণিগ্রহণ করেছেন। কিন্তু অগস্ত্যের মনেও রমণীর উপভোগ্যতার বিষয়টি নিশ্চয়ই আহিত ছিল, তা নইলে নিজের জন্য কোনও উপযুক্ত রমণী তিনি খুঁজেই পেলেন না এবং সেই অন্বেষণার হৃদয় নিয়েই তিনি সৃষ্টি করেছিলেন লোপামুদ্রাকে।

লোপামুদ্রা ঋষি-স্বামীর হৃদয়টুকু জানেন বলেই এতকালের শারীরিক অনভিনন্দন

তাঁর সহ্য হল না। কিন্তু এখন সেই বৈরাগ্যবান স্বামীর মুখে মৈথুনের আহ্বান শুনে তিনি একেবারে উপবাসী বুভুক্ষুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন না। লোপামুদ্রা খানিক লজ্জা পেলেন— লজ্জমানেব ভাবিনী— এবং সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান-বাক্য উচ্চারণ করলেন মহাকাব্যিক উদারতায়। লোপামুদ্রা বললেন— ঋষি! তুমি আমাকে পুত্রলাভের জন্যই ভার্যা হিসেবে গ্রহণ করেছিলে, সে কথা আমি জানি— অসংশয়ং প্রজাহেতোর্ভার্য্যাং পতিরবিন্দত। লোপামুদ্রা সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়ে দিলেন যে, পুত্রলাভের ওই যান্ত্রিকতার চেয়েও আরও বেশি কিছু কাম্য আছে তাঁর এবং তিনি বলেও ফেললেন সে কথা। বললেন— তুমি শুধুই সন্তান চাইলেও এখানে আমারও কিছু ইচ্ছে-অনিচ্ছে অথবা ভাল লাগার প্রশ্ন আছে এবং সেটা তোমায় আগে মেটাতে হবে— যা তু ত্বয়ি মম প্রীতিস্তামৃষে কর্তুমর্হসি।

লোপামুদ্রা বোঝাতে চাইলেন যে, বিবাহ মানেই শুধু চিরাচরিত সঙ্গমের এক যান্ত্রিক অনুষঙ্গ নয়, পুত্রলাভের হেতুটা সেখানে স্মার্ত নিয়মে মুখ্য হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু তার মাধ্যম রতি, রমণ শৃঙ্গার কোনও গৌণ যান্ত্রিকতা নয়, বস্তুত তারও একটা প্রস্তুতি আছে। লোপামুদ্রা বললেন— আমার পিতার ভবনে অট্টালিকার ভিতর আমার মহার্ঘ শয্যা ছিল, আমি চাই সেইরকম এক শয্যায় তোমার সঙ্গে মিলন হোক আমার— তথাবিধে ত্বং শয়নে মামুপৈতুমিহার্হসি। স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গমে অন্যতর উপাদান হল শৃঙ্গারোচিত বেশ। আমি চাই তুমি অলংকার পরে মালা-চন্দনে বিভূষিত হয়ে আমার কাছে এসো। এবং আমিও চাই বিভূষিতা হতে, মাল্য-চন্দনের গন্ধে আমোদিতা হয়ে তোমাকে লাভ করতে চাই আমি— উপসর্তুং যথাকামং দিব্যাভরণ-ভূষিতা। এবারে লোপামুদ্রার কণ্ঠে ভেসে এল সেই বৈদিক হাহাকার, যেটাকে মহাভারতীয় ভাষায় প্রকাশ করলে প্রত্যাখ্যানের ব্যঞ্জনাটুকু ঠিক ধরা পড়ে। লোপামুদ্রা বললেন— যদি এমন অলংকার-বিভূষণে উৎকৃষ্ট শয্যায় তুমি আমার কাছে আসো, তবেই সেই মিলন হবে আমাদের, তা নইলে এই গৈরিক কৌপীন ধারণ করে তোমার সঙ্গে আমি মিলিত হতে চাই না— অন্যথা নোপতিষ্ঠেয়ং চীর-কাষায়বাসিনী।

লোপামুদ্রার কথাবার্তা শুনে বরঞ্চ আমাদের নিন্দামুখর মুখে এটা বলে দেওয়াই সহজ যে— এই তো স্ত্রী-হৃদয়ের গোপন কথাটা ইনিয়ে-বিনিয়ে ঠিক বেরিয়ে এসেছে। মনের মধ্যে ভোগ-লালসা, টাকা-পয়সাওয়ালা স্বামী, খাট-বিছানা-ড্রেসিং টেবল সব রয়েছে, আর বাইরে এতদিন ছেঁড়া কাপড় আর গলায় সুতো পরার গৌরব দেখাচ্ছিলি। সময়কালে এখন গয়না-বেনারসি কিনে নিয়ে আয়, তবে তোর মতো স্বামীর সঙ্গে শোব— এই তো দাঁড়াল, চিরকালীন স্বল্প-মধ্যবিত্ত ঘরের মশারি-খাটানোর শব্দ। এর উত্তরে মহাকাব্যের উদার বোধ থেকে জানাই— লোপামুদ্রার মুখে এই শাড়ি-গয়নার কথাটা এত আক্ষরিক অভিধায় গ্রহণ করলে চলবে না। কেননা বৈরাগ্য-সাধক স্বামীকে যদি তাঁর ভাল না লাগত কিংবা তিনি যদি তাঁকে ভাল না বাসতেন, তা হলে স্বেচ্ছায় অগস্ত্য মুনিকে বিয়ে করতেন না, কিংবা বিয়ের পরের দিন থেকে তিনি স্বামীর হাত ধরে যোগিনী হয়ে আসতেন না গঙ্গাদ্বারে।

বরঞ্চ এইখানেই তাঁর প্রতিবাদ— তুমি বিয়ে করে সংসারী হলে, অথচ গার্হস্থ্য ধর্মে স্ত্রীকে পাশে শুইয়ে তুমি ঊর্ধরেতা পুরুষ হয়ে জীবন কাটাবে— এমন বঞ্চনা কেন নেমে আসবে এক বিবাহিতা রমণীর ওপর। এখানে লোপামুদ্রার মুখে শাড়ি-গয়নার উচ্চারণটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথমত এক প্রতীকী প্রতিবাদ এবং তিনি যেহেতু অগস্ত্য ঋষিকেও বিভূষণ-মণ্ডিত হয়ে শয্যায় আসতে বলেছেন, তাতে বোঝা যায় যে, এটা সেই শৃঙ্গার-মৈথুনের বঞ্চনা যা বৈদিকী লোপামুদ্রার শব্দমন্ত্রে স্পষ্টভাবে ধ্বনিত হয়েছিল। আমাদের ভরতের নাট্যশাস্ত্রে শৃঙ্গার রসের আলোচনায় একটা ভীষণ গভীর কথা আছে। শাস্ত্রকার বলছেন— শৃঙ্গার রসের স্থায়ীভাব হল রতি। শৃঙ্গারের চেহারাটা উজ্জ্বল। উজ্জ্বল তার বেশবাস। এই পৃথিবীতে যা কিছুই শুভ্র-শুচি এবং পবিত্র, যা কিছুই খুব উজ্জ্বল এবং দর্শনীয়, তার সঙ্গেই শৃঙ্গারের তুলনা হতে পারে অথবা সেখানেই শৃঙ্গার শব্দটা খাটে— যৎ-কিঞ্চিল্লোকে শুচি মেধ্যম্ উজ্জ্বলং দর্শনীয় তচ্ছৃঙ্গারেণোপমীয়তে। লক্ষণীয়, শৃঙ্গারের মধ্যে এই উজ্জ্বলতার ভাবনাটা এতটাই প্রখর এবং গভীর হওয়ার ফলেই বৈষ্ণব রসশাস্ত্রকারেরা— যাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই পূর্বৈতিহ্যবাহী চর্চিত শব্দ পরিহার করেন, তাঁরাও কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের চরম রস-পরিণতিতে শৃঙ্গার শব্দটা পরিহার করে ভরত-মুনি-কথিত 'উজ্জ্বল' শব্দটিকে বহু সমাদরে গ্রহণ করেছেন— যার সুফল রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বল-নীলমণি।

আমরা এবার লোপামুদ্রার বক্তব্যে সেই মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনাটা পরিষ্কার করে দিয়ে বলি— তিনি প্রিয়মিলনের জন্য নিজের এবং তাঁর স্বামীর সালংকার উজ্জ্বল উপস্থিতিটুকু যেভাবে চাইছেন— ইচ্ছামি ত্বাং স্রগ্বিণঞ্চ ভূষণৈশ্চ বিভূষিতম্— তার অর্থ এই অভিধেয় বেশ-বাস অলংকার নয়, সেটা আসলে শৃঙ্গার এবং তার স্থায়ী ভাব হল রতি— সেটা থেকে এতকাল তিনি বঞ্চিত। লোপামুদ্রা বলেছেন— এত দিন তোমার সহধর্মচারিত্বের এই বেশ চীর-বল্কল যেমন পবিত্র, তেমনই আমাদের মিলনের জন্য আমার প্রার্থিত উজ্জ্বল বেশ-বাস-ভূষণও কোনও ভাবেই অপবিত্র নয়— নৈবাপবিত্রো বিপ্রর্ষে ভূষণোঽয়ং কথঞ্চন।

মিলনের জন্য উদ্যত পুরুষ অগস্ত্য এতকালের সেবাবৃত্তি-অভ্যস্ত স্ত্রীর কাছে এমন একটা উত্তর শুনবেন এমন আশঙ্কা করেননি। অগস্ত্য অবশ্য এতটুকুও রাগ করলেন না, অন্যান্য মুনি-ঋষিদের মতো এতখানি পৌরুষেয় নন তিনি। তিনি ধর্মপত্নীকে বুঝেছেন সমবেদনাতে, কিন্তু এমন প্রত্যুত্তরে, সাংস্কারিকভাবে অনভ্যস্ত বলেই এক নিঃশ্বাসে তিনটি সম্বোধন করে বললেন— কল্যাণী, সুমধ্যমে, আমার লোপামুদ্রা! তুমি তোমার পিতার ঘরের আসন-বসন-আভূষণের কথা বলছ, তেমন ধন তো আমার নেই, আর তোমারও নেই— ন তে ধনানি বিদ্যন্তে লোপামুদ্রে তথা মম। লোপামুদ্রা আর এতটুকুও আঘাত করেননি। বলেছেন— তোমার অসাধ্য কিছু আছে নাকি, তপস্বী আমার! এই জীবলোকে যা ধনৈশ্বর্য লাভ করা সম্ভব, সে সব কিছুই তুমি তপস্যার বলে এনে দিতে পারো আমাকে। অগস্ত্য বললেন— হয়তো তা পারি, এটা সত্য। কিন্তু তাতে তপস্যার শক্তি নষ্ট হয়ে যায়— এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বং তপোব্যয়করন্তু তৎ। বরঞ্চ তুমি সেইরকম কিছু বলো যাতে আমার তপস্যার তেজ নষ্ট না হয়ে যায়।

শাস্ত্র এবং বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ে এইরকম একটা কথা চালু আছে বটে যে, ঈশ্বর-সন্নিধানের জন্য ধ্যান-জপ-তপস্যার সিদ্ধি যদি জাগতিক লাভের জন্য ব্যয়িত হয়— এমনও হতে পারে, তাতে শিষ্য, আত্মীয়, পরিজনের উপকার হচ্ছে, নিজের কিংবা অন্যের রোগ-ব্যাধি পর্যন্ত নিরাময় হচ্ছে— কিন্তু সিদ্ধি বা সিদ্ধাই-কে এইভাবে ব্যবহার করার জন্য নিজের

যোগসিদ্ধি ব্যাহত হয়। তপঃক্ষয় হয় নিজের বা অন্যের কর্মবিপাক রোধ করার কারণে। ঈশ্বর-প্রণিধান অথবা মহৎকৃপায় যে কৃপাসিদ্ধি অথবা সাধনসিদ্ধি ঘটে, সেটাকে কর্মবিপাক রোধ করার জন্য ব্যবহার করলে ঐহিক-লৌকিক কিছু লাভ হয় বটে কিন্তু তাতে তপস্যার শক্তি নষ্ট হয়— অগস্ত্য সেই কথাই বলছেন। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর স্ত্রী লোপামুদ্রা যা চাইছেন, সেই প্রার্থনার মধ্যে শত ভাগ যৌক্তিকতা আছে বলেই তিনি সানুনয়ে বলছেন— তুমিই বলো না কী করা যায়? যাতে আমার তপঃশক্তি নষ্ট না হয়, অথচ তোমার প্রার্থনাও পূরণ করতে পারি, সে রকম একটা উপায় তুমিই বলো না।

লোপামুদ্রা এতটুকুও বিগলিত হলেন না এই প্রস্তাবে। তিনি জানেন যে, সহধর্মচারিণী পত্নীরা স্বামীদের এই সানুনয় প্রার্থনা অবশেষে মেনে নেন, স্বামীদের আত্মলাভের প্রক্রিয়ায় তাঁরা শেষ পর্যন্ত বাধা হয়ে দাঁড়ান না। কিন্তু লোপামুদ্রাকে বেশ কঠিন দেখাল। তিনি বললেন— আমার ঋতুকালের আর অল্পই অবশিষ্ট আছে এবং আমি যেমনটা চেয়েছি তেমনটা না হলে কোনওভাবেই তোমার সঙ্গে একশয্যায় সঙ্গত হবো না আমি, এখানে অন্যরকম হবে না— ন চান্যথাহমিচ্ছামি ত্বামুপৈতুং কথঞ্চন। আমি নিশ্চয়ই চাইব না যে, আমার ইচ্ছাপূরণ করার জন্য তোমার তপঃক্ষয় হোক, কিন্তু প্রিয়মিলনের জন্য যে উপকরণটুকু আমি চেয়েছি, সেটা তোমাকে মেটাতেই হবে— এবন্তু মে যথাকামং সম্পাদয়িতুমর্হসি। অগস্ত্য লোপামুদ্রার কথা মানতে বাধ্য হলেন। কারণ এটা তো তেমন কোনও দৈনন্দিন উদাহরণ নয়, যেখানে সাধের বস্তুটা না পেলে বিবাহিতা স্ত্রী মিলনোন্মুখ স্বামীকে বাধা দিচ্ছে, বিছানা ছেড়ে অন্য খাটে শুচ্ছে। তাঁদের সেই মিলনই তো হয়নি, বিবাহের পর থেকেই স্বামী তাঁর আত্মোন্নতিতে ব্যস্ত আছেন— এখানে সেটা না হয় ঈশ্বর-প্রণিধানের মতো মহা-মহৎ কাজই হল; কিন্তু তবুও বিবাহিতা স্ত্রীকে দিনের পর দিন অবহেলা করে নিজে বড় হয়ে ওঠার চেষ্টা করলে আদর্শ ভারতীয় রমণীদের একজন অন্তত স্বযুক্তিতে অবিচল থাকেন— লোপামুদ্রা সেই উদাহরণ। তিনি স্বামীকে তপস্যার অধ্যাত্মভূমি থেকে অবতরণ করে সেই লৌকিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেছেন— যে প্রস্তুতি একান্তভাবে তাঁরই জন্য আয়োজিত, অথবা এক সার্থক যুগ্ম-মিলনের জন্য আকাঙ্ক্ষিত।

লোপামুদ্রার ইচ্ছে মেনে অগস্ত্য বেরোলেন অর্থলাভের জন্য। অগস্ত্যের এই অর্থৈষণায় মহাভারত অন্য এক কাহিনির অবতারণা করেছে, সে-কাহিনি অর্থলাভের মুখ্য চেষ্টার মধ্যেও মহাকাব্যের গৌণ প্রয়োজন সিদ্ধ করে দেয় এবং লোপামুদ্রা সেখানে অপ্রত্যক্ষে যুক্ত থাকেন। অর্থলাভের চেষ্টায় অগস্ত্য প্রথম গেলেন শ্রুতর্বা নামে এক রাজার কাছে। শ্রুতর্বা সানুবন্ধে অগস্ত্যকে মহাসমাদরে ঘরে বসালেন। অগস্ত্য বললেন— আমার কিছু অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ দিলে অন্য কারও যদি ক্ষতি না হয়, তবে সেই উদ্বৃত্ত অর্থ আমাকে আপনি দান করুন— যথাশক্তি-অবিহিংস্যান্যান্ সংবিভাগং প্রযচ্ছ মে। বোঝা যাচ্ছে, অগস্ত্য রাজার ওপরে অন্যায় চাপ তৈরি করছেন না। রাজা শ্রুতর্বা সবিনয়ে জানালেন— আমার রাজ্যে আয় যতটুকু হয় ব্যয়ও ততখানিই। অতএব উদ্বৃত্ত যদি কিছু থাকে বলে আপনি মনে করেন, তবে সেটা আপনি অবশ্যই নিতে পারেন। অগস্ত্য রাজার আয়-ব্যয় পরীক্ষা করে দেখলেন এবং বুঝলেন যে, শ্রুতর্বা রাজার কাছ থেকে অর্থ নিলে, সেটা প্রজাদের পীড়ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৈরি করবে। তিনি অর্থ নিলেন না, কিন্তু শ্রুতর্বা রাজাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি গেলেন ব্রধ্নশ্ব রাজার কাছে— তিনিও একই কথা বললেন শ্রুতর্বার মতো। মহাভারতের কবি এইভাবে পরপর তিন জন রাজার নাম করলেন, যার শেষে ছিলেন পুরুকুৎস-বংশীয় ত্রসদস্যু। তিন জন রাজাই নিজেদের আয়-ব্যয়ের সমতার কথা জানিয়ে অগস্ত্যের প্রার্থনা-পূরণে নিজেদের অক্ষমতা জানালেন এবং অবশেষে তিনজনে মিলে ঠিক করলেন যে, রাজাদের মধ্যে দানব ইল্বল-ই একমাত্র ধনী যে কিনা এই রাজাদেরও ধন দিতে পারে এবং অগস্ত্যকেও প্রার্থিত সম্পদ দিয়ে সুখী করতে পারবে। অগস্ত্য এবার সেই রাজাদের নিয়ে ইল্বল-দানবের কাছে গেলেন।

মহাভারত এরপর সেই বিখ্যাত ইল্বল-বাতাপির গল্প বলেছে এবং আমরা জানি বাতাপি অগস্ত্যের বিভূতিতে মারা পড়েছিল। ভয়ভীত ইল্বল তখন সেই রাজাদেরও যেমন অশ্ব, রথ, গোধন এবং অর্থ দান করেছিল, তেমনই তার দ্বিগুণ অর্থ-ধন, রথ-অশ্ব-গোধন দিয়ে অগস্ত্যকে সম্মানিত করেছিল। পৌরাণিক কবি বিশিষ্ট বিভূতিময় পুরুষকে দিয়ে এক কাজে দুই কাজ সম্পন্ন করলেন। কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হল এই যে, অগস্ত্য ন্যায়োপার্জিত অর্থ নিয়ে লোপামুদ্রার কাছে ফিরে এলেন এবং ফিরে এলেন সেইভাবে, যেমনটা লোপামুদ্রা অগস্ত্যকে দেখতে চেয়েছিলেন— কৃতবাংশ্চ মুনিঃ সর্বং লোপামুদ্রা-চিকীর্ষিতম্। সেই মহার্ঘ শয্যার ব্যবস্থা হল, অগস্ত্য বিভূষিত শৃঙ্গারোচিত বেশ-বাসে, আভরণে এবং তাঁকে দেখে লোপামুদ্রা বললেন— আমি যেমন যেমন চেয়েছিলাম, স্বামী! তুমি সব আকাঙ্ক্ষাই পূরণ করেছ— কৃতবানসি তৎ সর্বং ভগবন্ মম কাঙ্ক্ষিতম্— এবার এসো আমার গর্ভে এক শক্তিশালী পুত্র উৎপাদন করো।

লোপামুদ্রা এবার আবেগ-মুখর শৃঙ্গার সরসতার শব্দগুলি অখিল প্রাচীন পুরুষকুলের সাংস্কারিকতায় আবদ্ধ করলেন— যেন পুত্রলাভের জন্যই এসব কথা বলেছিলেন তিনি। কথাটা বৈদিকী লোপামুদ্রার সার্বিক হতাশার সঙ্গেও মিলে যায়। সেই ঋষিপত্নীরা— যাঁরা এতকাল স্বামীর সঙ্গে সংযম, নিয়ম আর তপস্যায় স্বামীর সহধর্মিণী হয়ে বঞ্চিত জীবন কাটাচ্ছেন, এবার সময় এসেছে তাঁদের, এবার তাঁরা সম্ভোগে মিলিত হোন কামুক স্বামীদের সঙ্গে— সমূ নু পত্নীর্বৃষভির্জগম্যুঃ।

সত্যি বলতে কী, অগস্ত্য ঋষিও বোধহয় প্রথম সেই বৈদিক এবং মহাকাব্যিক পুরুষ যিনি স্ত্রীহৃদয়ের শৃঙ্গারোৎসিক্ত মর্মকথাটুকু বুঝেছেন। লোপামুদ্রার আকাঙ্ক্ষা-পূরণের পর এবার যখন তাঁর মুখেই সন্তান-লাভের যৌন বার্তা ভেসে আসছে— এবার আমার গর্ভে অপত্য উৎপাদন করো— উৎপাদয় সকৃন্মহ্যম্ অপত্যং বীর্যবত্তরম্— তখন অগস্ত্য বুঝিয়ে দিয়েছেন— পৌরুষেয়তায় স্ফীত অন্য পুরুষের মতো ব্যবহার করেননি তিনি। তিনি স্ত্রীর মন বুঝেছেন, তাঁকে মর্যাদা দিয়েছেন, তাঁকে সমর্থন করে বলেছেন— তোমার চরিত্র, তোমার আচার-ব্যবহারে আমি সম্পূর্ণ সুখী হয়ে আছি— তুষ্টোঽহমস্মি কল্যাণি তব বৃত্তেন শোভনে। এমনকী পুত্রলাভের ক্ষেত্রেও অগস্ত্য মত নিচ্ছেন লোপামুদ্রার। তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন— তুমি দশটি উৎকৃষ্ট পুত্রের মতো একটি পুত্র চাও, নাকি শতপুত্রের সংখ্যামোহে দশটি পুত্র চাও। লোপামুদ্রা বিদ্যাশিক্ষিতা এক রমণীর মতো ততোধিক শক্তিতে উত্তর

দিয়ে বললেন— সহস্র পুত্রের তুল্য একটিই মাত্র বিদ্বান পুত্র চাই আমি। কেননা বহুতর মূর্খ পুত্রের চাইতে একটি বিদ্বান পুত্র অনেক বেশি আকাঙ্ক্ষিত— একো হি বহুভিঃ শ্রেয়ান্ বিদ্বান্ সাধুরসাধুভিঃ।

মুনি বললেন— তবে তাই হোক। মহাভারতের নিরপেক্ষ কবি মন্তব্য করলেন— সেই মহান মুহূর্ত ঘনিয়ে এল— যখন এক সমস্বভাব সমশীল পুরুষ সমানশীলা রমণীর সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হলেন। সেই মহান মুহূর্ত ঘনিয়ে এল— যখন স্ত্রীর প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল এক পুরুষ সমান-শ্রদ্ধাশীলা এক রমণীর সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হলেন— সময়ে সমশীলিন্যা শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্দধানয়া।

লোপামুদ্রার আকাঙ্ক্ষিত মিলন সম্পূর্ণ হল। অগস্ত্যের ঔরসে তাঁর প্রিয় পুত্রের নাম দৃঢ়স্যু ইধ্মবাহ। মহাভারতের কথক ঠাকুর এই পুত্রের আখ্যা দিয়ে বলেছেন— লোপামুদ্রার গর্ভচ্যুত হয়ে জন্মালেন এক মহাকবি— প্রাচ্যবৎ স মহাকবিঃ— এমন সমশীল সমবোধী জনক-জননীই তো ভূয়োদর্শী কবির জন্ম দিতে পারেন, যেমনটা লোপামুদ্রা এবং অগস্ত্য দিয়েছেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাধবী

আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া ছিলেন। আমি তাঁর বিশেষ পরিচয় দেব না, পরিচয় দিলে অনেকে চিনেও ফেলবেন। তিনি এখন একা থাকেন, পয়সাপাতি স্বোপার্জিত এবং প্রচুর। দুনিয়া তাঁকে প্রচুর যন্ত্রণা দিলেও, তিনি খুব আক্ষেপ করেন না। মাঝে মাঝে তির্যক মন্তব্য করেন পুরুষদের ব্যাপারে, কিন্তু তাই বলে নিজেকেও একেবারে অকলঙ্ক চন্দ্রের মতো সাধ্বী-শিরোমণি ভাবেন না এবং নিজের সম্বন্ধে তাঁর এতটাই অহংবোধ ছিল এবং এখনও আছে যে, শুধুমাত্র পুরুষদের গালাগাল দিয়ে নিজেকে 'বলি' বা 'শিকার' ভেবে স্তব্ধ হয়েও বসে থাকেন না। এমন মহিলা আমি খুব বেশি দেখিনি, আমার যৌবন-সন্ধিতে আমার চাইতে বেশ খানিকটা বড়, এত সুন্দরী, এত সুরুচিসম্পন্না, এত শিক্ষিতা মহিলা আমি খুব কম দেখেছি। একটি বিদেশি কনসুলেট অফিসে ভাল পদেই তিনি কাজ করতেন এবং আমার সেই বয়সে তাঁর 'অ্যাডমায়ারার'দের দেখে আমি স্বস্তি পেতাম না। আমার বয়স তাঁর থেকে অনেক কম হলেও আমার সঙ্গে তাঁর কিছু আত্মীয়নিবন্ধন অহৈতুকী সখ্য ছিল। তবে এটাও ঠিক, তাঁর অনেক খবর পেলেও আরও অনেক খবরই আমি পেতাম না, কিন্তু অন্যান্য ঈর্ষাকাতর আত্মীয়রা তাঁর সম্বন্ধে সত্য, মিথ্যা, কল্পিত অনেক খবর আমাকেই দেওয়ার চেষ্টা করত।

এই আত্মীয়ার প্রধান দোষ ছিল— তিনি অসম্ভব সুন্দরী, অসম্ভব স্মার্ট এবং স্বপ্রয়োজনে তথা পছন্দের মানুষের প্রয়োজনে সীমিত পরিমাণে ফেমিনিটি এক্সপ্লয়েট করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। কলেজ-জীবনের পর পরই অতিরিক্ত 'ফ্লার্টেশন' ধারণ করতে না পেরে ঝোঁকের মাথায় বিয়ে করে ফেলেছিলেন। সে-বিয়ে বেশি দিন টিকল না, ছেলেটি বড়লোকের ঘরের ছেলে হলেও বেশ ব্যক্তিত্বহীন এবং অতি সুন্দর দেখতে। কেন যে এই বিয়েটা ভেঙে গেল, সেটা বিচার করা খুব মুশকিল কিন্তু তার চেয়েও বেশি কঠিন ছিল এই বিচার— কেন এই বিয়েটা হল? চিন্তনীয় বিষয় ছিল এটাই যে, এই ছেলেকে বিয়ে করার জন্য আমার আত্মীয়া দিদিটি ঘরে থেকে পালিয়েছিলেন। অবশ্য পালানোর দিন রাত্রিবেলা তিনি মা-বাবাকে এস টি ডি করে জানিয়েও দিয়েছিলেন। তাঁর মা-বাবার কথা কী বলব— তাঁরা অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ছিলেন। ছোটবেলা থেকে সমধিক প্রশ্রয়ে তাঁরা মেয়েকে মানুষ করেছিলেন এবং মেয়ের সৌন্দর্য্য, ব্যক্তিত্ব এবং প্রগলভতা যেহেতু তার সার্বত্রিক আকর্ষণ তৈরি করত, এজন্য তাঁরা বেশ গর্বিতও বোধ করতেন। তবে এমন প্রশ্রয়-পোষক মা-বাবাকে পুরো ঘটনা না বলে কেন যে মেয়ে হঠাৎ পালিয়ে বিয়ে করতে গেল, এটা তাঁরাও কোনওদিন বোঝেননি। মেয়ে পালিয়ে যাবার পর বারবার শুধু তাঁরা

এটাই বলতেন— আমরা কি কোনওদিন ওর চলাফেরায় বাধা দিয়েছি, না স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছি? আমাদের বললেই তো হত, বিয়ে দিয়ে দিতাম।

কিন্তু সাড়ে চার-পাঁচ মাস পরে পলায়নী প্রেমে ইতি দিয়ে মেয়ে যখন বাবা-মার কাছে ফিরে এল, তখন বাবা-মা এই ভেবে পরম শান্তি পেলেন যে, আরও বড় দুর্যোগ ঘটার আগে মেয়ে ফিরে এসেছে।

পাড়ার লোকজন এবার দিদিকে একটু বেশিই দেখতে লাগল, চায়ের দোকান থেকে আরম্ভ করে নানান জায়গায় নানান মুখরোচক আলোচনাও করতে লাগল, কিন্তু পাড়ার ছেলেদের মধ্যে যেহেতু এই ধারণাটা দৃঢ়প্রোথিত ছিল যে, এ মহিলা আমাদের নাগালের মধ্যে কেউ নয় এবং টিটকিরিও জোরে করলে কীসের থেকে কী হবে জানি না, অতএব তারা পথিমধ্যে অনায়াস এবং সায়াস দেহদর্শন-সুখ থেকে বঞ্চিত না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। তবে আমাকে তাঁর আত্মীয় জানা সত্ত্বেও আমার সামনেও পাড়ার ছেলেরা তাঁকে নিয়ে এমন সব মন্তব্য করে ফেলত, যেটা তৎকালীন দিনে অবাঞ্ছিত দেহতত্ত্বের পরিসর। আমার চুপ করে থাকা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না।

যাই হোক, তিনি পলায়নের তথাকথিত কলঙ্ক পদ্মপত্রের ওপর জলবিন্দুর মতো টুসকি দিয়ে সরিয়ে দিলেন এবং এম এ ক্লাসে ভর্তি হলেন। এর বছর দশেক পরে যখন আরও অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে তখন একদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম— তুমি সেই পালিয়েই বা গেলে কেন, আবার ফিরেই বা এলে কেন? এর উত্তর ছিল অদ্ভুত। বললেন— দুটো কারণ আছে। এক নম্বর, পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার মধ্যে দারুণ একটা রোমাঞ্চ অথবা রোম্যান্টিক ব্যাপার আছে। আমি সেই রোমাঞ্চটা চেয়েছিলাম। দুই, ছেলেটাকে প্রথমে আমার দারুণ লেগেছিল, এত সুন্দর কথা বলে! আমি বললাম— বোঝা গেল, এবার ফিরে আসার কারণটা? বললেন— রোমাঞ্চটা তো পনেরো দিনেই ফুস, তারপরেই দিনগুলো কেমন আলু-বেগুন-ঝিঙে হয়ে গেল। তাও চলত, কিন্তু ছেলেটাকে দেখলাম— কেমন যেন! এক্কেবারে 'কোল্ড'। অত কথাবার্তা, সব কেমন উলটো হয়ে গেল। আমি বললাম— তুমি কী বলছ, শব্দগুলো ভেবে বলছ তো? এ কথার উত্তর মেলেনি, হয়তো আমি তাঁর চেয়ে খানিক ছোট ছিলাম বলেই, হয়তো বা সেটা কথার কথাই ছিল।

তবে এই ঘটনার পরেও বেশ সাফল্যের সঙ্গে এম এ পাশ করলেন তিনি। তারপর শুনলাম— তিনি দিল্লি চলে গেছেন কনসুলেটের অফিসে চাকরি নিয়ে। তার বছর খানেক পরে কলকাতায় দেখা হল। কপালে বড় টিপ, মাঙ্ ভরি সিন্দুর, সঙ্গে একটি টুকটুকে রাজস্থানী ছেলে। বছর চারেক তার সঙ্গে কেটেছিল বলে জানি। আমার নিজেরও চাকরি জীবন শুরু হওয়ায় অনেক দিন তাঁর সঙ্গে দেখাও হয়নি। ওঁর মা-বাবা বলেছিলেন— বিয়ে ভেঙে গেছে, ও এখন একাই আছে। আমার সঙ্গে দিল্লিতেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয় আরও দু'বছর পর। দেখা হয়, মানে, আমি দেখা করি। আমি একটা সেমিনারে বক্তৃতা দিতে গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় ফোন করি এবং দেখা করি। দেখলাম— তিনি বেশ খোশ মেজাজেই আছেন, প্রচুর বন্ধুবান্ধব, বাঙালি-অবাঙালি— ছেলে বন্ধু, মেয়ে বন্ধু সবই। চেহারাটি এখনও বেশ খাশা রেখেছেন, শরীরে কিঞ্চিৎ মেদ যুক্ত হয়েছে, তাতে তাঁর সৌন্দর্য্য বেড়েছে বই কমেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধু-বান্ধবের দৌরাত্ম্য শেষ হলে একান্তে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার রাজস্থান-গৌরবের কী হল? বললেন— কী হল আবার, নেশা কেটে গেল। আরে, বিয়ের এক বছর পর থেকেই বলে— ছেলে চাই, মেয়ে চাই। পরম্পরাকে বারেমে কুছ শোচনা হায়। ওর মা-বাবার সাতটা ছেলেমেয়ে। তা হলে বুঝতে পারছিস— পরম্পরা রাখতে গেলে এত দিনে আমার চারটে ছেলেমেয়ে হয়ে যেত।

আমি বললাম— এটা আবার কেমন কথা। একটা সময়ে ছেলেমেয়ে তো চাইবেই। দিদি বললেন— হ্যাঁ, তা তো চাইবেই। আমি তবু চার বছর টিকে ছিলাম কোনও রকমে; আর বলেছিলাম— একটা 'অ্যাডপট' করব। ও রাজি হল না। বলে— আমার নিজের ছেলে চাই— তেরি কোঁকমে মেরা অপনা। আমি সরে এসেছি। তবে জানিস তো— রাজস্থান-গৌরব ছেলেটা ভাল ছিল। আমার সঙ্গে কখনও সখনও টেলিফোনে কথাও হয়। আবার একটা বিয়ে করেছে এবং এর মধ্যেই একটা ছেলে হয়ে গেছে, দু নম্বর আসছে। আমি বললাম— তার না হয় দু-নম্বর আসছে। তা তুমি এখন কী করবে, তোমারও তো বয়স বাড়ছে, একটা 'সিকিওরিটি'ও তো চাই। তিনি বললেন— আমার সিকিওরিটি আমি নিজে, আমার তেত্রিশ বছর বয়েস, এখনও শরীরটা ভালই আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা কী জানিস— আমি এত 'সিকিওরড্' থাকতে চাই না। তা ছাড়া সিকিওরিটি বলতে তুই বুঝিসটা কী? টাকার 'সিকিওরিটি' মেয়ে মানুষের শরীরের সিকিওরিটি— তাই তো? তুই আজকে রাত্রে এখানে থেকে যা, সব বলব। আমি বললাম— তুমি বেশ রেগে গেছ বলে মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, এসব কথা থাক। দিল্লিতে তোমার কেমন কাটছে বলো?

সেদিন রাত সাড়ে বারোটা-একটা পর্যন্ত ছিলাম দিদির বাড়িতে। কথাবার্তাও হয়েছিল অনেকক্ষণ এবং তা যথেষ্টই খোলামেলা। মেয়েদের নিরাপত্তা-বিষয়ক কথায় আমি বলেছিলাম— দেখো, টাকা-পয়সার সিকিওরিটির কথা তোমার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই খাটে না, কারণ তুমি নিজেই রোজগার করছ, কিন্তু হাজার হলেও তুমি তো একটা মেয়ে, এবং অন্য মেয়েদের ক্ষেত্রেও শারীরিক শক্তি কম বলেই নিরাপত্তার প্রশ্নটা আসেই। হয়তো এই কারণেই আমাদের প্রাচীন মনু মহারাজ বলেছিলেন...। দিদি থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন— তোদের এই এক দোষ, যেখানে-সেখানে একটা দুটো সংস্কৃত শ্লোক না বললে তোদের ভাত হজম হয় না। আরে কী বলবি, আমি তো জানি— ওই তো সেই ক্লিশে-হওয়া কথাটা— মেয়েদের কোনও স্বাতন্ত্র্য নেই। অল্প বয়সে সে বাপের অধীন, যৌবনে স্বামীর আর বয়স হলে ছেলের তাঁবেদারিতে থাকবে। আমি বললাম— হ্যাঁ ঠিক তাই।

আমার এই দিদিটি যেহেতু বহুল পড়াশুনো-করা বিদগ্ধা রমণী, অতএব 'সোসিওলজি'র বেজ্টা ওকে অনেক ভাবতে শিখিয়েছে। দিদি বললেন— দেখ, ভারতবর্ষের আপামর-জনের ক্ষেত্রে— যেখানে মেয়েদের 'ইকোনোমিক সাফিসিয়েন্সি' একেবারে নেই, সেখানে শারীরিক নিরাপত্তার জন্য তোদের মনুর কথাটা ধর্মের মতো যেভাবে বলা হয়েছে, সেটা কিন্তু মন্দ নয়। এমনকী অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বা সাচ্ছল্য থাকলেও মেয়েদের শারীরিক দুর্বলতা সবলতায় পরিণত হয় না। সেখানে বাপ-ভাই, স্বামী অথবা ছেলে তাদের সুরক্ষা দিচ্ছে— এ ব্যাপারটা আমার খুব খারাপ লাগে না, বরং মানবিকই লাগে। কিন্তু ঝামেলা

লাগে ওই জায়গায়, যেখানে মনু বলবে— অতএব স্ত্রীলোকের কোনও স্বাধীনতা নেই— ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি। এটা কেমন কথা? মেয়েদের কোনও স্বতন্ত্রতা থাকবে না? আমি বললাম— মনুর এই শব্দটা সকলেই খারাপভাবে ধরে এবং না বুঝে 'কোট' করে। আমি মনু মহারাজের আহা-মরি কোনও 'সাপোর্টার' নই, কিন্তু এটা জেনো, মেয়েদের সুরক্ষা দেবার ব্যাপারে অথবা ঘরে আটকে রাখার ব্যাপারে ওঁর বৃহত্তর চিন্তা ছিল— বর্ণধর্ম অথবা রক্তের বিশুদ্ধতা, বিশেষ করে উচ্চতর বর্ণের কোনও মেয়েদের গর্ভে যাতে কোনওভাবে তথাকথিত অনুৎকৃষ্ট বীজ বাহিত না হয়, সেটার জন্য মনুর মাথাব্যথা ছিল অনেক বেশি। সেইজন্যই তিনি স্বতন্ত্রতার এত বিরোধী। আমি এবার সামান্য প্রলেপ দিয়ে বললাম— আমি ওভাবে কথাটা বলতে চাইনি। তোমার সঙ্গে ঠাট্টাও করছিলাম খানিক। তবে এটা আমার একটু দুশ্চিন্তাই লাগে— তোমার তেত্রিশ বছর বয়েস, তুমি একা থাকো, তার মধ্যে কোনও একটা খবরের কাগজে নাকি কী একটা গবেষণার ফল বেরিয়েছে। সেটা বলছে— একত্রিশ বছর বয়সে নাকি মেয়েদের সবচেয়ে সুন্দর দেখায়! প্রাস দু-বছরে সেটা নিশ্চয়ই ভয়ংকর নীচে নেমে যাবার কথা নয়। আমি সেইজন্য 'সিকিওরিটি'র কথাটা বলেছি।

এই ব্যাজস্তুতিতে দিদির পিত্তোপশম হল খানিক। খুব খোলাখুলি মেজাজে বললেন— দেখ, আমার জীবনে পুরুষদের আনাগোনা অনেক দিনই এবং তা এখনও আছে, আর সেটা যে সব সময়েই খুব 'এসথেটিক' পর্যায়ে থাকে এমন দাবিও আমি করি না। আর ঠিক সেইজন্যেই বলেছিলাম এত 'সিকিউরিটি' আমি চাই না। আমার অল্প বয়সে আমি যখন পথ চলেছি, ছেলেগুলো যখন সব হাঁ করে তাকিয়ে দেখত, গিলত, আমি সেটা 'এনজয়' করেছি। সামান্য সামান্য বিপদেও যে পড়িনি তাও নয়। তবে অধিকতর পরস্ত্রীকাতর পুরুষদের জন্য আমি বেঁচেও গেছি। অর্থাৎ কিনা, এই ধর, একজন হাত ধরে টানল, এখানে-ওখানে হাত লাগানোর চেষ্টা করল, তখন অন্য ভাল লোক অথবা অধিকতর খারাপ লোক তার হাত থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্য আমার অন্য হাত ধরে টেনেছে, সেটাকেও দু-ঘা কষিয়েছে, কিন্তু রক্ষা করার হিরো-ভাব তখনও থেকে যাওয়ায় সেই মুহূর্তে সে আমার গায়ে হাত ছোঁয়াতে পারেনি তেমন করে, কিন্তু তার চোখ-মুখ দেখে আমি বেশ বুঝতাম— তার ইচ্ছেটাও কোনও নিষ্কাম সাধু পুরুষের নয়।

আমি এবার নিরুপায় হয়ে বললাম— আমি আর নিতে পারছি না, দিদি। আমি গোবেচারা সংস্কৃতের লোক, আপাদমস্তক সংরক্ষণশীলতার চর্চা করি, তার মধ্যে তুমি যে কী সব জীবনকাহিনি বলছ, আমি আর নিতে পারছি না। দিদি বললেন— সংরক্ষণশীল বলিস না, বল ভণ্ড। ব্যাটা! আমি জানি না ভেবেছিস? তোদের সংস্কৃত সাহিত্যের পুরুষগুলো কতটা জৈব হয়, আমি জানি না ভেবেছিস। আমি অনুবাদ পড়েছি অনেক। তোদের অত বড় নাটক 'শকুন্তলা' সেখানে তোদের দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে দেখামাত্রই যে সব দেহজ বর্ণনা দিয়েছে, সেগুলো কী? তবে জানিস তো, ওটাই সঠিক 'রি-অ্যাকশন', আমার সঙ্গে দেখা হওয়া পুরুষদের মধ্যে আমি সেই 'রি-অ্যাকশন'ই দেখেছি, তবে সেটা চোখে, মুখে, হাবে, ভাবে। মুখে না বলার ব্যাপারটা আধুনিক ভদ্রতা অথবা ভণ্ডামি। তবে আমার কথা যদি বলিস, আমি এটা 'এনজয়' করি, এই তেত্রিশ বছর বয়সেও 'এনজয়' করি। এটা বলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারি— আমার সঙ্গে যারা মিশেছে, যাদের অনেককে আমি একটু বেশি প্রশ্রয়ও দিয়েছি কখনও, তারা কিন্তু সবাই খুব ভাল নয়। অনেকেই আছে যারা 'সেক্সুয়ালিটি'র বাইরে কিছু বোঝে না, কিন্তু কী করা যাবে তাদের চরিত্রটাই ওরকম। কিন্তু আমি যাদের নিজে প্রশ্রয় দিয়েছি, তারা কি সবাই 'সেক্সুয়ালিটি'র ঊর্ধ্বে নাকি? তাদের হয়তো বাড়তি কিছু গুণ আছে, কিন্তু যেখানে সেক্সুয়ালিটির প্রশ্ন আসে, সেখানে তো আমিও তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছি; আমার ফেমিনিটি যে তারা এনজয় করেছে এবং এখনও করে, সেখানে আমিও তো একটা পার্টি। আর ঠিক সেইজন্যই পুরুষদের সব সময় আমি শুধু দুষি না,আমি ওদের ভালওবাসি মাঝে মাঝে।

রাত হয়ে আসছিল, এবার ফেরার প্রয়োজন। দিদি বললেন— থেকে যা, আমার এই একার ফ্ল্যাটে অন্য কেউ এসে রাত্রে থাকে না, এটা ভাবিস না। আমি বললাম— থাকতেই পারতাম, তবে কিনা তাতে অন্য লোকে আমাকেও না আবার 'অন্য কেউ' ভেবে বসে। দিদি বললেন— তা ভাবলেই বা কী? তোর ভাবনা তোর কাছে, আমার ভাবনা আমার, অন্য কে কী ভাবল, তাতে কিসসু আসে যায় না আমার। আমি বললাম— তোমার সাহস দেখে আমি অবাক হই, দিদি! আমার থাকা না-থাকাটা বড় কথা নয়, তবে শেষ প্রশ্নটা আমার মনের মধ্যে থেকেই যায়— তোমার এমনকী বয়স, এখনও তো একটা বিয়ে করতে পারো, 'লাইফে' তো একটা 'সেটল্ড্' ভাব আসে। তোমার অসুবিধেটা কোথায়? দিদি বললেন— আমাকে দেখে কি তোর 'আনসেটল্ড্' মনে হচ্ছে? এতক্ষণ এখানে থাকলি, খাওয়া-দাওয়া করলি, ঘর-দোরের অবস্থা দেখলি— কোথাও কী আমাকে 'আনসেটল্ড্' লাগল? নাকি একবারও তোর মনে হল যে, আমার কোনও মানসিক স্থিরতা নেই, আমি খুব হাহুতাশ করে কষ্টে আছি? মনে হল তোর?

খানিকটা উষ্মা প্রকাশ করার পর দিদি এবার স্থির হয়ে বললেন— দেখ, যেভাবে আমি জীবন কাটিয়েছি, তাতে আর আমাকে কেউ বিয়ে করতে চাইবে না। তবে সবচেয়ে বড় কথা, আমি নিজেই আর বিয়ে করতে চাই না। দু-দুটো বিয়ে তো আমি করেই দেখলাম। আমার কাছে এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে, বিয়ের আগে পুরুষ-মানুষের মধ্যে যত 'রোম্যান্স' যত উষ্ণতা থাকে— সেটাকে তুই প্রেম বলবি কিনা, সেটা তুই-ই বসে বসে ভাব— কিন্তু ওই উষ্ণতা, রোম্যান্স বিয়ের কিছুদিন পর থেকে আর থাকে না। একটা প্রেম-দ্যাখানো ভাব যেটা দেখিস, ওটাকে আমি প্রেমের কর্তব্য বলি। আর যে-পুরুষ মানুষগুলোকে দেখিস— বিয়ের সাত বছর পরেও— 'ওগো শুনছো' বলে বাথরুমে যাবারও অনুমতি নেয়, ওগুলোকে আমি তোদের মতো স্ত্রৈণও মনে করি না, ওরা অসহায় সমাজ-জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু ওদের একটু সুযোগ দিয়ে দ্যাখ, স্ত্রৈণর জায়গায় 'স্বৈন' হতে ওদের একটুও সময় লাগবে না। আর আমার কথা যদি বলিস, আমি এখনও বেশ 'মাগীতব্যা' অবস্থায় আছি। এক বছর আগেও আমি একটা 'লিভ টুগেদার'-এ ছিলাম, দেখলাম— সেখানেও কিছু দিনের মধ্যেই আমার পার্টনার ছেলেটি দায় সারা ভাব দেখাচ্ছে, অথচ এই সামান্য 'সেটলমেন্টের' আগেই তার মতো উষ্ণ, রোম্যান্টিক আর কেউ ছিল না। আমার এটাই খারাপ লাগে। প্রেম, ভালবাসা অথবা শরীর নিয়ে যদি পুরুষেরা দায় সারতে আরম্ভ করে, তখন সেই

পুরুষদের আর আমার ভাল লাগে না। আমি ওদের দোষও দিই না, কেননা এটাই পুরুষের প্রকৃতি। অথচ দ্যাখ, এই যে আমি চলছি, এখন কিন্তু আমার 'অ্যাডমায়ারার'-এর সংখ্যা কম নেই— সেটা আমার বন্ধুত্ব পাবার জন্যই হোক, অথবা সেক্স-এর জন্যই হোক। তুই কি জানিস— যে লোকটা আমার সঙ্গে 'লিভ টুগেদারে' ছ'মাসে দায় সারতে আরম্ভ করছিল, সে পূর্বতর উষ্ণতায় আবারও দু-একদিন থেকে যায় আমার সঙ্গে। তাতেই বুঝি— এত সব বিয়ে করা পুরুষ মানুষের চেয়ে একা থাকা অনেক ভাল, আমি একা থাকতে ভালবাসি, নতুন করে পাবার জন্য ক্ষণে-ক্ষণে হারানোটাই অনেক ভাল। আমি বেশ আছি। এবার চল, তোকে পৌঁছে দিয়ে আসি কোন চুলোয় যাবি সেখানে। আমি যাবার আগে বললাম— আমি এবার তোমার কথা লিখব, আমি মহাভারতের মাধবীকে নিয়ে তোমার কথা লিখব। সবটা হয়তো মিলবে না, কিন্তু জেনো সেই মহাভারতীয় মিথের 'আনকনশাসে' তুমি আছ, তুমি পুরুষদের অপছন্দ করোনি কোনওদিন, অথচ রাগ না করেও পুরুষের প্রতি এমন উদাসীন আর ক'জন আছে, আমি জানি না।

২

মহাভারতে এই কাহিনির সূত্রপাত এক বিপরীত পরিস্থিতিতে। দুর্যোধন পাণ্ডবদের রাজ্যলাভে অতিরিক্ত আগ্রহী হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু কোনও বিষয়ে অতিরিক্ত আগ্রহ যে মানুষের বিপদ ডেকে আনে, সেটা দুর্যোধনকে বোঝাবার জন্য নারদ ব্রহ্মচারী গালবের কাহিনি বলেছিলেন। আমরা যে মাধবীর জীবন নিয়ে কথা বলতে চাইছি, সেখানে গালবও তেমন সংপৃক্ত নন, মাধবীর জীবনটাই সেখান অনেক বড় হয়ে উঠেছে, কিন্তু গালব এখানে সবচেয়ে বড় দর্শকের ভূমিকায় আছেন, মাধবীর জীবন-ঘটনায় তিনি 'ইনস্ট্রুমেনটাল', অতএব গালবের কথা এখানে ভূমিকায় আসবে। গালব বিশ্বামিত্রের শিষ্য ছিলেন। কোনও এক সময় বিশ্বামিত্র ভগবান ধর্মকে তুষ্ট করার জন্য কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন করছিলেন। সেই সময়ে গালব বিশ্বামিত্রের সেবা-পরিচর্যা করে তাঁকে যথাসম্ভব সুস্থ রেখেছিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁর নিজের সাধনে সিদ্ধিলাভ করার পর এটা অনুভব করলেন যে, তাঁর তপঃক্লিষ্টতার দিনগুলিতে গালবের অবদান কিছু কম নয়। ফলে উপযুক্ত শিষ্যের জন্য তাঁর যেমন গর্বও হল, তেমনই হল সন্তোষ। তিনি প্রীত হয়ে শিষ্যকে বললেন— যা তুমি লাভ করতে এসেছিলে, তা লাভ হয়ে গেছে তোমার। এবার তুমি এই গুরুকুল থেকে বিদায় নিয়ে তোমার অভীষ্ট স্থানে যেতে পারো, আমি অনুমতি দিলাম— অনুজ্ঞাতো ময়া বৎস যথেষ্টং গচ্ছ গালব।

এটা অনেকেরই জানা নেই যে, সেকালে গুরুকুলে বিদ্যালাভ করতে গেলে কোনও 'টুইশন ফি' লাগত না, কিন্তু বিদ্যালাভ হয়ে গেলে শিষ্যরা কখনও কখনও যেমন গুরুকার্য করার জন্য সম্মান-দক্ষিণা কিছু দিতেন বা দিতে চাইতেন, তেমনই গুরুরাও কখনও কখনও সম্মান-দক্ষিণা চাইতেন। গুরুদের সেকালে অর্থলাভের অন্য উপায় না থাকায় শিষ্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপরে অন্যায় চাপও তৈরি করে ফেলতেন কখনও কখনও। শিষ্যরা সাধারণত দেশের রাজা বা অন্য কোনও ধনী ব্যক্তির কাছে গিয়ে গুরুদক্ষিণার আনুকূল্য চাইতেন এবং ব্রহ্মচারী শিষ্যকে দান করাটা যেহেতু মহাপুণ্য বলে গণ্য হত, অতএব ধনীরা এই অর্থ দিতে উন্মুখ থাকতেন। তবু এটা ঠিক যে, শিষ্যদের মাঝে মাঝে অসুবিধে হতই।

গালবের ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। বিশ্বামিত্র ঋষি তাঁর কাছে কিছু চানওনি, তিনি নিজেই— হয়তো বা অতিরিক্ত কৃতজ্ঞতাবশত, নয়তো দক্ষিণা দানের বহুশ্রুতিতে মুগ্ধ হয়ে— তিনি নিজেই বিশ্বামিত্রকে বললেন— আপনি যে গুরুকার্য করেছেন, তার জন্য আপনাকে কী দক্ষিণা দেব— দক্ষিণাঃ কাঃ প্রযচ্ছামি ভবতে গুরুকর্মণি। আমি দক্ষিণাদানের পুণ্য-কথা শুনেছি— স্বর্গ, শান্তি, নির্বাণ, আরও কত কী; তো আপনি বলুন— কী নিয়ে আসব আপনার জন্য— কিমাহরামি গুর্বর্থং ব্রবীতু ভগবানিতি? শিষ্য হিসেবে গালবের এই আগ্রহের মধ্যে যেন কৃতজ্ঞতার চেয়েও গুরুকার্যের মূল্য চুকিয়ে দেবার একটা তাড়না ছিল এবং বিশ্বামিত্র সেটা পছন্দ করেননি। তিনি গালবের অবস্থা জানতেন। এতদিন তাঁর কঠিন পরিচর্যা করে গালব কতটা ক্লান্ত, তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন সেটা এবং এখন এই শ্রান্ত-বিধ্বস্ত অবস্থায় আবার দক্ষিণার আনুকূল্য যোগাড় করতে যাওয়াটা যে কতটা কষ্টসাধ্য সেটা বুঝেই বিশ্বামিত্র সকরুণ ভাবে গালবকে বললেন— তুমি যাও তো, স্বচ্ছন্দে যাও এখান থেকে— অসকৃদ্ গচ্ছ গচ্ছেতি বিশ্বামিত্রেণ ভাষিতঃ।

বিশ্বামিত্র বারবার গালবকে চলে যেতে বললেও গালব বারবারই গুরুদক্ষিণার আগ্রহ দেখাতে থাকেন তাঁর কাছে, বলতে থাকেন— কী দেব আপনাকে বলুন— কিং দদানীতি বহুশো গালবঃ প্রত্যভাষত। শিষ্যের এই অত্যাগ্রহে ঋষি বিশ্বামিত্রের এবার রাগ হল। তিনি গালবকে বললেন— ঠিক আছে, তোমার যখন এত ইচ্ছে, তা হলে আটশো ঘোড়া দেবে আমাকে। তবে সে ঘোড়া যেমন তেমন নয়। প্রত্যেকটি ঘোড়ার এক দিকের কানটি হবে কালো, ডান দিকেরটা সাদা আর ঘোড়ার গাগুলো হবে চাঁদের মতো জ্যোৎস্না-ধোয়া। এইরকম ঘোড়া আটশো আমার চাই এবং তুমি বেশি দেরি করবে না এগুলো আনতে— অষ্টৌ শতানি মে দেহি গচ্ছ গালব মা চিরম্।

এক মুহূর্তে বিশ্বামিত্র-শিষ্য গালবের মুখ শুকিয়ে গেল। তার ধারণা ছিল না যে, দক্ষিণাদানের এই বায়নার ফল কী হতে পারে! তিনি দক্ষিণা দিতে চেয়েছেন বটে কিন্তু তার পরিমাণ এবং অপ্রাপ্যতা যে এইরকম হবে, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। সেই থেকে দুশ্চিন্তায় রাত্রে তাঁর ঘুম আসে না, তিনি উঠলে বসতে পারেন না, বসলে উঠতে পারেন না, আহারে রুচি নেই— নাস্তে ন শেতে নাহারং কুরুতে গালবস্তদা। চিন্তায় দুঃখে তাঁর শরীর শুকিয়ে গেল, গায়ের রং হয়ে গেল ফ্যাকাশে। কোনও যে উপায় হবে একটা, তাও নয়। এমন কোনও বন্ধুও নেই তাঁর, যাঁর কাছে প্রচুর অর্থ আছে এবং যে সাহায্য করবে এই বিপন্ন সময়ে। তাঁর সঞ্চিত ধন নেই, আর অল্প সময়ের মধ্যে এত অর্থও তিনি উপার্জন করতে পারবেন না যা দিয়ে ওই নির্দিষ্ট প্রকারের অশ্ব কিনে গুরুকে দিতে পারেন। গালব মনে-মনে ঋণী বোধ করতে থাকলেন এবং প্রতিজ্ঞাত অশ্ব না দিতে পারার অক্ষমতায় মিথ্যাবাদিতার দায়ও অনুভব করতে লাগলেন।

নিতান্ত ভগ্নমনোরথ হয়ে গালব শেষ পর্যন্ত ভগবান বিষ্ণুরূপী কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। গালবের স্মরণ-মাত্রেই কৃষ্ণ-বিষ্ণুর বাহন গরুড় দর্শন দিলেন গালবের সামনে এবং পরম বন্ধুর মতো সমস্ত সহায়তার অঙ্গীকার করলেন গালবের জন্য! গরুড়ের কাছে গালব খুব স্পষ্ট করে নিজের প্রয়োজনের কথা না বলায় গরুড় খানিকক্ষণ গালবকে নিজের পিঠে চড়িয়ে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণে ইতস্তত ঘোরালেন, গুরুর কাছে প্রতিজ্ঞাত সেই অশ্বের কোনও সন্ধান গালব পেলেন না। আবার এর মধ্যেই পড়বি পড় বাঘের মুখে— গালবের সঙ্গে বিশ্বামিত্র-গুরুর দেখা হয়ে গেল। বিশ্বামিত্র কোনও ভণিতা না করেই গালবকে শুনিয়ে বললেন— কী হে ব্রাহ্মণ! আমি তো চাইনি, তুমি নিজে থেকেই যে দক্ষিণা দেবার জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছিলে, সেটা এবার দাও, সময় তো অনেক গড়িয়ে গেল— যস্ত্বয়া স্বয়মেবার্থঃ প্রতিজ্ঞাতো মম দ্বিজ। বিশ্বামিত্র চলে গেলেন এবং গরুড় তখন আর গালবের ওপর ভরসা না রেখে নিজেই গালবকে বললেন— দেখো, সোনা-দানা, অর্থ-ধন এই বসুন্ধরাতেই আছে, কিন্তু এমন উদ্দেশ্যহীন চেষ্টায় তা পাওয়া যাবে না। আবার টাকা-পয়সা না হলে তুমি সেই অদ্ভুত ঘোড়াগুলোও যোগাড় করতে পারবে না। অতএব চলো, আগে কোনও বড় বংশের, বড় মনের রাজার কাছে যাই।

গরুড় এই প্রস্তাব দেবার পর নিজে থেকেই তাঁর এক বন্ধু রাজার কথা জানালেন এবং আমরা তাঁর নাম জানি— তিনি চন্দ্রবংশীয় নহুষের পুত্র যযাতি। তাঁকে কে না চেনে? দেবযানী-শর্মিষ্ঠার কারণে তিনি যেমন বিখ্যাত, তেমনই বিখ্যাত তিনি তাঁর যদু-পুরু প্রভৃতি পুত্রদের জন্য। গরুড় গালবকে বললেন— যযাতির এককালে অনেক অর্থ-সম্পত্তি ছিল। অতএব অর্থের ব্যাপারে আমিও তাঁকে বলব, আর তুমিও যাচনা-প্রার্থনা করবে এবং আমার মনে হয়— তিনি দেবেন— স দাস্যতি ময়া চোক্তো ভবতা চার্থিতঃ স্বয়ম্। গরুড় এবং গালব দু'জনেই যযাতির কাছে উপস্থিত হলেন। যযাতির দিক থেকে গৃহস্থের আদর-প্রদর্শন যত ছিল, গরুড় ও গালবের দিক থেকে ততই ছিল বহুমানন আর প্রশংসা। গরুড় নিজেই যযাতির কাছে গালবের দক্ষিণা দেবার ইচ্ছা এবং গুরু বিশ্বামিত্রের এই খামখেয়ালি যাচনার কথা জানালেন সবিস্তারে। সব শুনে যযাতি একটু দুঃখিত হয়েই গরুড়কে বললেন— সখা! আগে আমার যেমন ধনসম্পত্তি ছিল, এখন আর তা নেই। কিন্তু ব্রহ্মচারী প্রার্থী দাতার কাছে এসে ফিরে যাবে— এমন পাপ আমি করতে পারব না। অতএব তোমাদের অভীষ্ট অর্থ অথবা তার বিনিময়ে অশ্বগুলি যাতে লাভ করতে পারো, তার একটা উপায় আমি করে দিচ্ছি— তত্তু দাস্যামি যৎকার্যম্ ইদং সম্পাদয়িষ্যতি।

যযাতি এবার বললেন— দেখো, আমার ঘরে রূপ-গুণ-সম্পন্না এক অতি সুলক্ষণা কন্যা আছে। এমনই তার রূপ যে, দানব-মানব-দেবতা যেই তাকে দেখুক, দেখামাত্রই তাকে কামনা করে— সদা দেব-মনুষ্যানাম্ অসুরাণাঞ্চ গালব। আর শুধু রূপই নয়, যাঁরা বংশলাভের জন্য ধর্মত পুত্রকামনা করেন, তাঁরাও আমার এই দেবকন্যার মতো মেয়েটিকে পেলে বংশকর পুত্রলাভের ধর্মও লাভ করবেন— ইয়ং সুরসুতপ্রখ্যা সর্বধর্মোপচায়িনী। স্বর্গসুন্দরীর মতো রূপ আমার এই মেয়েটিকে পাবার জন্য এক একজন রাজা তাঁদের রাজ্য পর্যন্ত দিয়ে দেবেন— অস্যাঃ শুল্কং প্রদাস্যন্তি নৃপা রাজ্যমপি স্বয়ম্— সেখানে কালো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কানওয়ালা আটশো ঘোড়ার কথা আর কী বলব? অতএব গালব! তুমি নিশ্চিন্ত মনে আমার এই মেয়েটিকে নিয়ে যাও। আমার মেয়ের নাম মাধবী। মাধবীকে দিয়ে তোমারও অভীষ্ট পূরণ হবে আবার আমিও হয়তো আমার মেয়ের ঘরে একটা-দুটো নাতি পাব— স ভবান্ প্রতিগৃহ্নাতু মমৈতাং মাধবীং সুতাম্।

বিশ্বামিত্রের শিষ্য গালব এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেননি একবারও। পিতা হিসেবে যযাতি তাঁর নিজের মেয়েকে অন্যের যৌন ব্যবহারে নিযুক্ত করছেন সামাজিক বিধি-নিয়মের বাইরে গিয়ে এবং তাঁর মেয়েরও কোনও অনুমতি গ্রহণ করছেন না— এইসব নৈতিক প্রশ্ন গালবের মনে উঠল না এবং তিনি নিজেও যে এই সামাজিক বিধি-ভঙ্গের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে কাজ করছেন, সেটাও একেবারের তরেও ভেবে দেখলেন না। গুরুদক্ষিণা দানের জন্য অশ্বলাভের একটা উপায় বেরোনো মাত্রেই গালব যযাতিকে বলেছেন— আপনার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে। কথাটা বলেই মাধবীকে নিয়ে প্রস্থান করলেন গালব— পুনর্দ্রক্ষ্যাব ইত্যুক্ত্বা প্রতস্থে সহ কন্যয়া। আর গরুড়, যিনি এতক্ষণ গালবের সঙ্গে ঘুরছিলেন এবং বন্ধু হিসেবে যযাতির বাড়িতে গালবকে নিয়ে এসেছিলেন, তিনিও বিনা দ্বিধায়— তা হলে এবার তোমার কালো-কানের ঘোড়া পাবার একটা উপায় পাওয়া গেছে— উপলব্ধমিদং দ্বারম্ অশ্বানামিতি চাণ্ডজঃ— এই কথা বলেই গরুড়ও গালবের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। মাধবী রইলেন গালবের সঙ্গে এবং গালব আর এতটুকু সময়ও নষ্ট করলেন না। তিনি তক্ষুনি ভাবতে বসে গেলেন— বিখ্যাত রাজাদের মধ্যে কার কাছে গেলে এই কন্যাটির পরিবর্তে ভাল শুল্ক পাওয়া যাবে, অর্থাৎ টাকা পাওয়া যাবে— চিন্তয়ানঃ ক্ষমং দানে রাজানং শুল্কতোঽগমৎ।

এখানে প্রাথমিকভাবে তিনটি চরিত্র নেমে এল— যযাতি, মাধবী এবং গালব। পিতা হিসেবে যযাতির পৌরুষেয় অধিকার এখানে খুব স্পষ্ট। ঔরসজাতা কন্যার ওপর পিতা যযাতির অধিকার-বোধ এতটাই প্রবল যে, একবারের তরেও তিনি মাধবীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেননি যে, এই কাজটা তিনি করতে যাচ্ছেন। অথবা এমন একটা যৌনতার প্রকল্প যেখানে মাধবী ব্যবহৃত এবং ব্যবহৃত হবেন বার বার, সেখানে একবারও মেয়েকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন না যে, এমন একটা অসামান্য যৌনতার মধ্যে সে যাবে কিনা! চিন্তা করলেন না গালবও। তিনি সদ্য বিদ্যাচর্চা শেষ করেছেন, অথচ একবারও তাঁর মনে প্রশ্ন উঠল না যে, এক যৌবনান্বিতা রমণীকে স্বকার্য-সাধনের জন্য এইভাবে ব্যবহার করা ঠিক হবে কিনা। পশ্চিমি সমাজতত্ত্ববিদদের মধ্যে প্রখ্যাত জরজেস দুমজেইল মাধবীর জন্য কিছু সময় দিয়েছেন তাঁর Destiny of a King বইটিতে। তিনি পিতা যযাতির মধ্যে গর্বের ঔদ্ধত্য বা 'ভ্যানিটি' দেখতে পেয়েছেন। যযাতি পুরাতন প্রখ্যাত রাজা, তাঁর ঐশ্বর্য-সম্পদ শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু পূর্বৈশ্বর্যের অভিমান-মত্ততা যায়নি। অতএব মানীর মহত্ত্ব দেখাতে গিয়ে নিজের মেয়েকে তিনি ব্যবহার করছেন নিজের বনেদিয়ানা দেখানোর জন্য। এর অন্য পাশে রয়েছেন 'অ্যারোগান্ট' বিশ্বামিত্র, যিনি বিচিত্র এক গুরুদক্ষিণা চাইছেন শিষ্যের ক্ষমতা-অক্ষমতা বিচার না করে। আর শিষ্য গালবের চিন্তাজগতে গুরুভক্তি প্রদর্শনের বাড়াবাড়ি দেখানো ছাড়া অন্য কোনও নৈতিকতা কাজ করছে না। তিনি একটি

সুন্দরী রমণীকে নিজের কাজ মেটানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছেন বিনা জিজ্ঞাসায়, বিনা সেই রমণীর অনুমতিতে।

মাধবীকে হাতে পেয়ে গালব ইক্ষ্বাকু বংশের প্রসিদ্ধ রাজা হর্যশ্বের কথা ভাবলেন। তিনি যেমন বীরপুরুষ তেমনই ঐশ্বর্যশালী রাজা। হয়তো তাঁর কাছে গেলে একবারেই কাজ হয়ে যাবে। গালব হর্যশ্ব রাজার কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন— আমার হাতে এই অসামান্যা সুন্দরী রমণীটি আছে। আপনি এই কন্যাটির মাধ্যমে আপনার বংশবৃদ্ধি করতে পারেন। কিন্তু এঁকে ভার্যা হিসেবে গ্রহণ করতে হলে আপনাকে শুল্ক দান করতে হবে— ইয়ং শুল্কেন ভার্যার্থং হর্যশ্ব প্রতিগৃহ্যতাম্। তবে হ্যাঁ, শুল্কের বিষয়টা আমি বলব এবং সেটা আগে শুনে তারপর আপনার কর্তব্য স্থির করুন।

মহাভারতের কবি বড় বুদ্ধি করে এবং বেশ লৌকিক-নির্মাণ-নিপুণতায় এই জায়গাটা সাজিয়েছেন। আমরা প্রথমে দেখছি— মহারাজ হর্যশ্ব— ইক্ষ্বাকু-কুলধুরন্ধর— এই সময়ে তার যথেষ্টই বয়স হয়ে যাবার কথা, অথচ এখনও তাঁর কোনও পুত্রসন্তান নেই— এইজন্য তাঁর যথেষ্ট হতাশা আছে এবং সেই হতাশায় এখনও তাঁর নিশ্বাস দীর্ঘতর হয়— দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিশ্বস্য প্রজাহেতোর্নৃপোত্তম। অর্থাৎ একটি সুন্দরী রমণীর সঙ্গে মিলন-প্রার্থনার যুক্তি হিসেবে প্রথমত এক ধরনের শাস্ত্রীয় কল্পের ভাবনা আসছে হর্যশ্বের মনে এবং তাতে পুত্রলাভের যুক্তিটা ভীষণভাবে একটা শাস্ত্রীয় প্রয়োজন হয়ে ওঠে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মহাভারতের কবি বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, এটা এক ধরনের চক্ষু ধৌত করার যুক্তিমাত্র, আসল প্রয়োজনটা বিখ্যাত রাজার বুক ঠেলে মুখে বেরিয়ে আসছে। হর্যশ্ব এই রমণী-শরীরের প্রত্যঙ্গ-সংস্থানে দৃষ্টি দিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন— এই কন্যার শরীরে ছয়টি অঙ্গ উন্নত, পাঁচটি অঙ্গ সূক্ষ্ম— উন্নতেষূন্নতা ষট্‌সু সূক্ষ্মা সূক্ষ্মেষু পঞ্চসু— তিনটি স্থান গভীর আর পাঁচটি স্থান রক্তবর্ণ। এই সাধারণ বাচনিকতায় যদি বোঝা না যায়, তাই মাধবীর সামনেই হর্যশ্ব বললেন— দুই নিতম্ব, দুই উরু, কপাল এবং নাসিকা— এই ছয়টি অঙ্গ উন্নত। এঁর অঙ্গুলীর পর্বগুলি, কেশ, লোম, নখ এবং চর্ম— এই পাঁচটি সূক্ষ্ম। কণ্ঠস্বর, স্বভাব এবং নাভি গভীর, আর পাণিতল, পদতল, বাম-দক্ষিণ নয়নের প্রান্ত এবং নখ— এই পাঁচটি রক্তবর্ণ।

হর্যশ্ব রমণী-শরীরে আরও বেশ কিছু শাস্ত্রীয় সুলক্ষণের কথা বললেন, কিন্তু সেগুলির শাস্ত্রীয় তাৎপর্য যাই হোক, হর্যশ্ব এটা বুঝেছেন যে, মাধবী খুব সাধারণ সুন্দরী রমণী নন, ইনি যেখানেই থাকবেন— দেবতা, অসুর, দানব, মানব, গন্ধর্ব সবারই তিনি চোখে পড়বেন— বহুদেবাসুরালোকা বহুগন্ধর্বদর্শনা। হর্যশ্ব অনুভব করলেন— এই অতিসুলক্ষণা রমণী রাজচক্রবর্তী পুত্র উপহার দিতে পারে তাঁকে— অর্থাৎ লালসামুখর মিলনকামিতাকে আবারও পুত্রলাভের শাস্ত্রীয়তায় আগুণ্ঠিত করা। হর্যশ্ব গালবকে বললেন— আপনি আমার ধন-সম্পদের ভাবনাটা মাথায় রেখে শুল্কের কথা বলুন। গালব আর দেরি করলেন না, তাঁর আসল কাজ হয়ে গেছে। অতএব নির্দ্বিধায় বলেন— এক দিকের কানগুলি হবে শ্যামবর্ণ, গায়ের রং চাঁদের মতো শুভ্রবর্ণ হবে, সেগুলি দেশজ হবে, অথচ সুন্দর— হয়ানাং চন্দ্রশুভ্রাণাং দেশজানাং বপুষ্মতাম্। এইরকম অশ্ব আটাশোটি দিতে হবে আমাকে এবং তখনই এই রমণী আপনার পুত্রদের জননী হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশেষে গালবও কিন্তু সব বুঝেও প্রকট রতিলিপ্সার মধ্যে পুত্রলাভের মতো শাস্ত্রীয়তার নির্মোক চাপিয়ে দিয়েই নিজের প্রয়োজনের কথাটা জানিয়েছেন। আসলে মহাভারতের যে সমাজ এবং সেই সমাজে যাঁরা ধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্যের কথা বলেছেন, তাঁরা অন্তত এই মিথ্যা প্রবঞ্চনাটা করতেন না— যেমনটা মনু মহারাজের কালে যথেষ্টই করা হয়েছে— যেন পুরুষ-মানুষেরা যে নারী-সঙ্গ করছেন, তা তাঁরা দয়া করে বংশরক্ষার কারণেই করছেন। মহাভারতের যে সব জায়গায় নীতি উপদেশের মাধ্যমে জীবনের সত্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা চলেছে, সেখানেও স্ত্রীলোক বলতে পুরুষের কাছে উত্তম রতিলাভ এবং পুত্রলাভ দুটোই বলা হয়েছে অর্থাৎ 'সেক্স অ্যান্ড প্রোক্রিয়েশন'— রতি-পুত্রফলা নারী। যদিও মনু মহারাজের সামাজিক কাল পরিণত হওয়ার জন্য রতিলিপ্সার মধ্যে পুত্রলাভের ধর্মাবরণ সৃষ্টি করার কাজটা মহাভারতের সময় থেকেই তৈরি হয়েছে, কিন্তু তবু স্ত্রীলোকের কাছে রতিলিপ্সার সত্যটা মহাভারতের পুরুষ লুকিয়ে রাখে না। এই কারণেই মহাভারতে গালবের বলা নির্দিষ্ট গোত্রের আটশো ঘোড়ার হাঁক শুনেই হর্যশ্ব রাজার অন্তরে একই সঙ্গে কামনা এবং কামনা বিফল হওয়ার কাতরতা সৃষ্টি হচ্ছে— উবাচ গালবং দীনো... হর্যশ্বঃ কামমোহিতঃ। তিনি বলে উঠলেন— মহর্ষি! আপনি যে-ধরনের ঘোড়াগুলি চাইছেন, তেমন ঘোড়া আমার অশ্বশালায় দু'শোটা-মাত্র আছে। অন্য রকমের শত শত ঘোড়া আমার অশ্বশালায় আছে, কিন্তু সেগুলো তো আপনার চলবে না— দ্বে মে শতে সন্নিহিতে হয়ানাং যদ্বিধাস্তব।

হর্যশ্ব খুব কাতরভাবে নিজের অসহায়তার কথা জানালেন। গালবের আটশো ঘোড়া চাই, আর তাঁর আছে দু'শো, অথচ অসামান্যা সুন্দরী মাধবীকে দেখে নিজের লালসাকেও তিনি দমিত করতে পারছেন না। এই অবস্থায় আরও দীনতর আবেদন জানিয়ে হর্যশ্ব গালবকে বললেন— বেশি দরকার নেই, আপনি যেমন বলছিলেন— আমার বহুতর পুত্রের জননী হতে পারে এই মেয়ে— ততস্তব ভবিত্রীয়ং পুত্রাণাং জননী শুভা— তা অত বেশি দরকার নেই আমার। এই রমণীর গর্ভে আমি যাতে একটি মাত্র পুত্রের জন্ম দিতে পারি, আমার এই ইচ্ছেটা অন্তত পূরণ করুন দয়া করে— অস্যামেতং ভবান্ কামং সম্পাদয়তু মে বরম্। অর্থাৎ হর্যশ্বরাজার নিবেদনের তাৎপর্য এই— তিনি একবার অন্তত এই সুন্দরী রমণীর সঙ্গে মিলিত হতে চান।

আমরা এতক্ষণ যে-সব সংলাপ শুনেছি, সেগুলি তো এই একবিংশ শতাব্দীর পরিশীলিত হৃদয়কে আক্রান্ত করবে, অন্তত প্রতিবাদী করে তুলবে আমাদের লোক-দেখানো মৌখিকতাকে। তার ওপরে এইসব বড় বড় প্রশ্ন তো উঠবেই— পিতা যযাতির কী অধিকার আছে তাঁর মেয়েকে ব্যবহার করে অন্যের কাজ উদ্ধার করার! কই, একবারও তো মাধবীকে জিজ্ঞাসা করা হল না যে, তোমাকে এইভাবে স্বকার্যসাধনের জন্য গালব ঋষি ব্যবহার করবেন এবং রাজাদের কাছ থেকে গুরু-দক্ষিণার অর্থ-বস্তু সংগ্রহ করবেন, তা তুমি এতে রাজি আছ কিনা? বেশ তো এসব না-হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু এটা কী চলছিল এতক্ষণ— গালব বলছেন— আমার হাতে এই মেয়ে আছে, শুল্কের পরিবর্তে এঁকে দিতে পারি। হর্যশ্ব রাজা বলছেন— মেয়েটিকে চাই আমি, কিন্তু শুল্ক দেবার মতো অত পরিমাণ বস্তু আমার কাছে নেই। যতটুকু আছে, তাই দিয়ে যতটুকু হয়, সেই ব্যবস্থা

করতে পারো। মেয়েটার যা চেহারা, উচ্চাবচ প্রত্যঙ্গ-সংস্থান ইত্যাদি ইত্যাদি— এগুলি কী চলছিল এতক্ষণ?

জায়গাটা আজকের দিনের প্রগতিবাদিনী তর্কপ্রিয় রমণীদের পক্ষে লুফে নেবার মতোও বটে। একজন তো রাগে, দুঃখে একটি বড় প্রকাশকের সংকলন গ্রন্থে 'ইউজেবল্ উইমেন' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে মাধবীর করুণ অবস্থার জন্য তৎকালীন পুরুষ-সমাজকে একেবারে তুলোধোনা করে ছেড়েছেন। তাঁর মতে পিতা যযাতি মেয়ে বলেই মাধবীর স্ত্রৈণ মর্যাদা নিয়ে এতটুকু ভাবেননি, আর গালব মাধবীর শরীর নিয়ে প্রায় একজন 'প্রস্টিটিউশন এজেন্ট'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ। আর সেই বয়স্ক সব রাজারা, যারা অর্থ বা বস্তুর বিনিময়ে মাধবীকে ভোগ করেত চাইছেন, নারী শরীর ছাড়া তাঁদের কাছে আর কিছুই ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না। অতএব একজন পুরুষ নয়, বিভিন্ন স্থানে থাকা বিভিন্ন পুরুষ বিভিন্ন কারণে মাধবীর সঙ্গে যে ব্যবহারটা করছেন, সেখানে সত্যিই এমনই এক দুঃসহ চিত্র ফুটে ওঠে, যেখানে 'কমোডিটাইজেশন' যাকে বলে তার চরম রূপটাই ধরা পড়ে।

তবু কথা কিছু থেকে যায় এবং মহাকাব্য মহাভারত যখন এই রকম একটা কাহিনি লেখে, তখন তার বিচার করার জন্যও একটা মানসিক ব্যাপ্তির প্রয়োজন হয়। সেই ব্যাপ্তি না থাকলে মহাভারতীয় সমাজের সম্পূর্ণ বোধ হয় না। বিশেষত যাঁরা মহাভারতের একটা-দুটো জায়গা খামচা দিয়ে তুলে এনে একটা গভীর সিদ্ধান্ত প্রচার করে দেন, তাঁদের বিদ্যা এবং বোধ নিয়েও কিছু কথা বলার থাকে। মনে রাখবেন— এতদ্দ্বারা আমি এমন কিছু বলতে চাইছি না যে স্ত্রীলোককে 'কমোডিটাইজ' করাটা মহাভারতীয় পৌরুষেয়তার আদত নয়। 'কমোডিটাইজেশন'-এর ধারণাটা বিংশ-একবিংশ শতাব্দীর পরিশীলিত চিন্তার ফসল এবং সেটা পুরুষশাসিত সমাজে স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষের ব্যবহারের নিরিখে নির্ণীত এবং সেই ব্যবহার প্রায়শই হয় বলেই 'কমোডিটাইজেশন'-এর ধারণাটাকে আমরা 'কনসেপ্ট' হিসেবে গ্রহণ করেছি। কিন্তু মহাভারতীয় মাধবীর ক্ষেত্রে এটাই হয়েছে, এটা বলাটাও যেমন অতিসরলীকরণ, তেমনই আরও অতিসরলীকরণের নমুনা হবে এই কাহিনির নিরিখে মহাভারতের সমাজটাকে ধরে ফেলা। কেননা সমাজকে বুঝতে হলে সেই সমাজের সাধারণ রীতি-নীতি-প্রবৃত্তি দিয়েই বুঝতে হবে এবং বুঝতে হবে 'কনটেক্সচুয়ালি'

মহাভারতের মধ্যে যে-সব জায়গায় বিধি-নিষেধাত্মক 'ডাইডাক্টিক' কথাবার্তা আছে, সে-সব জায়গায় শুল্কের পরিবর্তে বা টাকা-পয়সার পরিবর্তে মেয়েদের বিয়ে করাটাই ভয়ঙ্কর অপরাধের মধ্যে পড়ে, সেখানে মাধবীর ঘটনাটা তো রীতিমতো বেশ্যাগৃহের আচরিত ভাবনার মধ্যে পড়ার কথা। মহাভারতের শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠিরের একটি সদর্থক প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম বলেছিলেন— দেখো বাছা যুধিষ্ঠির! বিয়ের সময় এই টাকা-পয়সার লেনদেন ব্যাপারটাই ভীষণ খারাপ — নৈব নিষ্ঠাকরং শুল্কম্। কন্যার পিতারা বরপক্ষের কাছে পণের টাকা চান তখনই, যখন দেখেন বরের বুদ্ধি কম, বয়স বেশি অথবা বর অর্থহীন। এইরকম গুণহীন বরের ক্ষেত্রেই কন্যাপণের প্রশ্ন ওঠে। পণের বিষয়ে ভীষ্ম যেটা বলেছেন, সেই বরপক্ষের দুর্বলতাটাই পণপ্রথা চালু করে দিয়েছিল সেকালে। ব্যাপারটা উলটো হয়ে ফিরে এসেছে পরবতী কালে, যখন পুরুষ-সমাজ নিজেদের স্বার্থবুদ্ধিতে এটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝেছে যে, মেয়েরা শারীরিক ক্ষেত্রে এবং অর্থাগমের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত দুর্বল, অতএব সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই বরপণ চালু হয়ে উঠল। তবে এই চালুমির পিছনে পুরুষের দুষ্টতার ইতিহাস আরও আছে, সেটা আমাদের আলোচনায় এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। বরঞ্চ বলার দরকার এটাই যে, ভারতবর্ষীয় সমাজের বিস্তারে প্রথম দিকে কন্যাপণই চালু ছিল এবং তা এতটাই যে, সেটাকে সমাজ-বিহিত করার জন্য একটু ধর্মভাবও নিহিত করা হয়েছে কন্যাপণের মধ্যে। কন্যার পিতা কন্যার ওপর স্বস্বত্ব নাশ করে বরের কাছে সম্প্রদান করছেন এবং দানধর্মের নিয়মে ভীষ্ম বলেছেন— দান যখন করা হচ্ছে, তখন তার বদলে কিছু নেওয়াটা অধর্ম নয় অর্থাৎ মেয়ের বাপ কন্যাদানের মতো একটা আন্তরিক দান করছে, তার বদলে সে কিছু নিতেই পারে— প্রতিগৃহ্য ভবেদ্ দেয়ম্ এষ ধর্মঃ সনাতনঃ।

সমাজের চাপেই হোক বা পৌরুষেয়তার চাপেই হোক, দানধর্মের নিরিখে কন্যাপণের নীতি ভীষ্ম সাধারণভাবে পরম অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিয়েছেন বটে, কিন্তু একই সঙ্গে বিবাহের ক্ষেত্রে টাকা-পয়সার লেন-দেন ব্যাপারটা মহাভারতীয় সমাজের প্রতিভূ প্রধান ভীষ্ম একেবারেই পছন্দ করেননি। কন্যাপক্ষ অথবা বরপক্ষ যে কেউ পণ নিচ্ছে— এই ব্যাপারটাকে ভীষ্ম দ্রব্যবিক্রয়ের শামিল বলে মনে করেছেন। অর্থাৎ পণ নেওয়াটাই ভীষ্ম 'কমোডিটাইজেশন'-এর তন্ত্র বলে মনে করেছেন। তিনি বলেছেন— শুল্কগ্রহণের প্রথাটাই অন্যায়— কন্যা ক্রয়ও কোরো না, কন্যা বিক্রয়ও কোরো না— ন হ্যেব ভার্যা ক্রেতব্যা ন বিক্রেতব্যা কথঞ্চন। ক্রয় এবং বিক্রয় কথাটা 'কমোডিটি'র ধারণা থেকেই উচ্চারিত শুধু নয়, এই দুটি শব্দে বরপক্ষ এবং কন্যাপক্ষ দু'পক্ষই জড়িয়ে গেল। এই ক্রয়-বিক্রয় পণের মাধ্যমে হয় বলেই মহাভারত রীতিমতো ঘেন্না দেখিয়ে বলেছে— ঘরের দাসীটিকেও যে ক্রয়-বিক্রয় করে, সেই লোভী পাপিষ্ঠ ব্যক্তির ভাবনা-চিন্তাও আসলে দাস-দাসীর মতো হয়ে যায়— ভবেত্তেষাং তথা নিষ্ঠা লুব্ধানাং পাপচেতসাম্।

এই রকমটা করা উচিত এবং এই-রকমটা নয়— ঠিক এই ধরনের বিধি-নিষেধমূলক শাস্ত্রীয় উপদেশের মধ্যে কন্যাপণের ক্ষেত্রে কন্যার পিতা বা অভিভাবকের হাতে অর্থ গুঁজে দেওয়াটা শাস্ত্রীয়ভাবে অন্যায় এবং ব্যবহারিকভাবে ঘৃণ্য বলে মনে করেছে মহাভারত; কিন্তু মহাভারতের সমাজে কন্যাপণের একটা দেশাচার, কুলাচার কোথাও কোথাও ছিল— একথা পাণ্ডুর সঙ্গে মাদ্রীর বিবাহের সময়ে প্রমাণিত হয়েছে। মাদ্রীর বিয়ের সময় মাদ্রীর ভাই শল্য খুব সঙ্কোচের সঙ্গে ভীষ্মকে নিজেদের কুলাচার জানিয়ে বলেছিলেন— আমাদের এইরকম বংশনিয়ম আছে বটে এবং সেইজন্যই এই কন্যা বরণ করে নিয়ে যাবার জন্য একটু কিছু আপনি দিন, একথা আপনাকে বলতে আমার সংকোচ হচ্ছে— ন চ যুক্তং তথা বক্তুং ভবান্ দেহীতি সত্তম। তা ভীষ্ম মদ্রদেশের কুলাচার মেনে হস্তিনাপুরের রাজগৌরব দেখিয়ে মাদ্রীর দাদা শল্যর হাতে অনেক সোনাদানা ধনরত্ন দিয়েছিলেন এবং অতটা শল্য চানওনি। কিন্তু মহাভারতে এই ঘটনাটাকে কি কোনও উপায়ে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে যে, অর্থের বিনিময়ে স্ত্রীলোককে ভোগ করার জন্য এই পৌরুষেয় ব্যবস্থা চালু হয়েছিল? নাকি পরবর্তী কালে যখন বরপণ চালু হয়, তখন উলটো দিকে এইরকম বলা যাবে যে, অর্থের বিনিময়ে পুরুষকে ভোগ করার জন্য বরপণ চালু হয়েছিল? আসলে পণপ্রথা একটা

সামাজিক অভিশাপ, কিন্তু সেখানে অর্থলোভের সঙ্গে জড়িত আছে বৈবাহিক সমস্যা এবং সে সমস্যার পিছনেও আছে অন্যতর পৌরুষেয় শক্তি, তার সঙ্গে মাধবীর ঘটনা মেলানো যায় না।

বিশেষত গালব-মাধবীর ঘটনা-কাহিনি মহাভারতে এমন একটা 'কনটেকস্চুয়াল' উদ্দেশ্য নিয়ে লিখিত হয়েছে, যেখানে বোঝা যায়— এটা মহাভারতীয় সমাজের রীতি নয় এবং এই কাহিনির তাৎপর্য অন্যত্র। বিশেষত এইরকম ঘটনার দ্বিতীয় উদাহরণও মহাভারতে পাওয়া যাবে না এবং ঠিক সেইজন্যই এই প্রায়াদ্ভুত ঘটনাটা— প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা না করে মহাভারতের সমুদ্রকল্প বিস্তার থেকে হঠাৎ এক অঞ্জলি জল তুলে নিয়ে বললাম— এটাই অমুক নদীর জল, এটা 'কমোডিটাইজেশন'-এর উদাহরণ, মাধবী আসলে 'ইউজেবল উওম্যান'— আমার কাছে এ-কথা খানিক অল্পজ্ঞ ব্যক্তির অতি উত্তেজনা বলে মনে হয়। যদি তা না হয়, তা হলে যে-মুহূর্তে হর্যশ্ব রাজা গালব ঋষিকে প্রস্তাব দিলেন— দেখুন, আপনার বলা ওইরকম নির্দিষ্ট অশ্ব আমার কাছে দু'শোর বেশি নেই, এই অবস্থায় আমার ইচ্ছেটার কথা একবার ভাববেন, তখন সেই মুহূর্তে মাধবীর উত্তরটা কিন্তু 'উইমেনস ডিজায়ার' হিসেবে ব্যাখ্যা করতে হয়।

লক্ষণীয়, হর্যশ্ব মাধবীকে দেখে 'কামমোহিত' ছিলেন। ফলে পর্যাপ্ত অশ্ব না থাকলেও মাত্র দু'শো ঘোড়ার পরিবর্তে তিনি যখন মাধবীর সঙ্গ-কামনা করে মাত্র একটি সন্তানের জন্য গালব ঋষির অনুমোদন ভিক্ষা করছেন, তখন কিন্তু গালব কোনও উত্তর দিতে পারেননি, তিনি সেই মুহূর্তে বিভ্রান্ত, কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। যযাতি-কন্যা মাধবীকে তিনি আর তো ব্যবহার করতে পারবেন না, অতএব তাঁর গুরুদক্ষিণার কী হবে? গালব ঋষির এই বিভ্রান্ত হতভম্ব অবস্থায় প্রথম কথা বলছেন মাধবী। এতক্ষণ তাঁর মুখ দিয়ে কোনও কথা আমরা শুনতে পাইনি। পিতা যযাতি যখন তাঁকে গালব-ঋষির হাতে দিয়েছেন, তখন ঋষির গুরুকার্যে সাহায্য করার জন্য তিনি নিজের স্বার্থের একটি কথাও বলেননি— এবং মহাভারতের মহাকাব্যিক পরিমণ্ডলে এখানে তাঁকে জিজ্ঞাসা করাও হল না, পিতৃকার্যে ঋষিকার্যে তাঁর কোনও সম্মতি আছে কিনা; বস্তুত— এই আক্ষেপ একেবারেই অবান্তর। মহাকাব্যিক সমাজে পৌরুষেয়তার সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে চলাটা মহাকাব্যিক রমণীর অভ্যাসের মধ্যে পড়ে।

মহাকাব্যিক মহাভারতের রমণী এতটা পারেন বলেই হর্যশ্বরাজার কামোন্মুখ প্রস্তাবনায় গালব ঋষি যখন বিভ্রান্ত, তখন মাধবী নিজেই গালবকে বললেন— আপনি বিব্রত হবেন না, ঋষি! আমাকে এক ব্রহ্মবাদী মুনি বর দিয়েছেন যে, 'তুমি যদি জৈব রতির মাধ্যমে সন্তান-লাভও করো, তা হলে প্রত্যেক প্রসবের পরেই তুমি কন্যাভাব লাভ করবে— প্রসূত্যন্তে প্রসূত্যন্তে কন্যৈব ত্বং ভবিষ্যসি। অতএব গালব! আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনি নিশ্চিন্তে হর্যশ্ব রাজার হাতে আমাকে সমর্পণ করুন এবং পরিবর্তে আপনার নির্দিষ্ট দু'শো ঘোড়া আপনি নিয়ে নিন। এইভাবে আমি চার জন রাজার কাছে নিজেকে সমর্পণ করলেই তো আপনার আটশো ঘোড়াও হয়ে যাবে আর আমারও চার-চারটে ছেলে হবে। আপনি আর চিন্তা করবেন না, আপনি এইভাবেই গুরুদক্ষিণা দেবার সংকল্পটা শেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করুন— ক্রিয়তাম্‌ উপসংহারো গুর্বর্থং দ্বিজসত্তম— আর এ ছাড়া আর কোনও উপায়ও নেই, আপনি কী বলেন!

মাধবীকে নিয়ে যাঁরা পুরুষশাসনের গল্প লেখেন, তাঁরা মাধবীর এই উক্তিগুলি উদ্ধার করেন না। করলে, 'কমোডিটাইজেশন'-এর গল্পও জমে না, 'ইউজেবল্‌ উইমেন' নিয়ে প্রবন্ধ ফাঁদাটাও বেকার হয়ে যায়। আমরা বলব— মহাভারতের চরিত্র নিয়ে ব্যক্তিসিদ্ধির প্রবন্ধ লিখতে হলে, সেই চরিত্রকে সম্পূর্ণভাবে উপস্থিত করতে হবে, খামচা মেরে নয়। এখানে দেখার বিষয় যেটা, সেটা হল— মাধবীর নিজের ইচ্ছা। যযাতি যে মুহূর্তে তাঁকে গালবের হাতে দিয়েছেন, সেই মুহূর্তেই তিনি জানেন যে, তিনি কোনও রাজা-মহারাজার কণ্ঠলগ্না হতে যাচ্ছেন এবং নিজের শরীর সম্বন্ধেও তিনি এতটাই সচেতন যে, তিনি জানেন— তাঁকে দেখলেই অতিবড় রাজারও ভোগস্পৃহা জন্মাবে। কিন্তু ভোগেচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতেও তাঁর খুব একটা ছুঁৎমার্গ নেই। এবং একটা নয়— গালবকে তিনি যখন প্রত্যেক প্রসবান্তে কন্যাভাবের খবর শোনাচ্ছেন, সেই মুহূর্তেই মাধবী বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি খুব 'ডিটাচড' ভাবেই অন্যান্য রাজাদের যৌন আচরণে সাড়া দিতে পারেন, তাঁর দিক থেকে কোনও সমস্যা নেই।

এখানে খেয়াল করতে হবে— মহাভারতের মহাকাব্যিক রমণীরা 'সেক্সুয়ালিটি'-ব্যাপারটাকে মধ্যযুগীয় স্পর্শকাতরতায় গ্রহণ করেননি। বিশেষত সমাজের দিকে তাকালেই যেহেতু বহুপুরুষগামিতার প্রশ্ন দেখা দেয়, তার জন্য সঙ্গম বা প্রসূতির পরেও দেবতা-ঋষি-মুনির বরাভয়ে কন্যাভাব প্রাপ্ত হওয়ার একটা অলৌকিক প্রলেপ থাকে। এই জিনিস আমরা মহাভারতের অন্যতমা নায়িকা সত্যবতীর ক্ষেত্রে দেখেছি, কুন্তীর ক্ষেত্রে দেখেছি এবং স্বয়ং দ্রৌপদীর ক্ষেত্রেও দেখেছি। এঁরা প্রত্যেকেই এমন একটা সময়ে মুনি-ঋষি-দেবতার কাছে আপন কন্যাভাবের স্থিতির জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছেন, যখন পুরুষের যৌন আচরণে তাঁদের কন্যাভাব লঙ্ঘিত হচ্ছে, অথচ এই যৌন আচরণে তাঁদের সায় আছে। কিন্তু যৌনক্রিয়ায় অনুকূলভাবে প্রতিক্রিয় হলেও সামাজিক দৃষ্টিতে বিবাহপূর্ব যৌনতায় আসক্ত হলে— যেমনটি সত্যবতীর ক্ষেত্রে এবং কুন্তীর ক্ষেত্রে হচ্ছিল— তেমনটি হলে বৈবাহিক জীবনে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেইজন্যই পুনরায় কন্যাভাবের জন্য আবেদন এসেছে সত্যবতীর মুখে ঋষি পরাশরের কাছে এবং কুন্তীর মুখে দেবতা সূর্যের কাছে। আর দ্রৌপদী নাকি পূর্বজন্মেই পঞ্চস্বামী লাভ করার জন্য দেবতার বরে প্রত্যেক পর্যায়ক্রান্ত স্বামীর কাছেই কন্যাভাব বজায় রাখতে পারতেন— মহানুভাবা কিল সা সুমধ্যমা/ বভূব কন্যৈব গতে গতেঽহনি।

আপনারা কী মনে করেন? লৌকিক সামাজিকতায় কন্যাভাব দূষিত হলে যে কলঙ্ক-লেপন ঘটে, দৈবশক্তি বা আর্যশক্তির অলৌকিকত্বে সেই তথাকথিত সামাজিক দূষণ ধুয়ে-মুছে যায়? মহাকাব্যের সান্দৃষ্টিকী দৃষ্টিতে আমাদের তা মনে হয় না। আমাদের ধারণা, সত্যবতী, কুন্তী বা দ্রৌপদীর মতো মহাকাব্যের বৃহতী-মহতী নায়িকারা যেহেতু অন্যতর মহাকাব্যিক অভ্যুদয়ের সূচনা করেছেন, অতএব তাঁদের বিবাহপূর্বকালীন যৌন লঙ্ঘন অথবা বিবাহোত্তর বহু-পুরুষগামিতার ঘটনাকে সামাজিকের চোখে ব্যতিক্রমীভাবে সম্মত

করে নেবার জন্যই আর্যশক্তি অথবা দৈবশক্তির অবতারনা ঘটেছে এখানে। তা ছাড়া সাধারণ লৌকিক সমাজে যুবক-যুবতীর পারস্পরিক কুতুহলে, অথবা পুরুষের অন্যায় আগ্রহ বা অত্যাগ্রহে রমণীকুলেও স্খলন তো ঘটেই, কন্যাভাবও দূষিত হয় কখনও কখনও। তো আমাদের শাস্ত্রকারেরা এই সামাজিক ব্যবহারকে একেবারে অস্বাভাবিক অন্যায় বলে ধরে নেননি। বশিষ্ঠস্মৃতি, অত্রিস্মৃতি অথবা পরাশর-স্মৃতির মতো সামাজিক আইনের গ্রন্থে এমনটা বলা হয়েছে যে, বিপদে পড়ে মেয়েদের এই যৌন লঙ্ঘন ঘটতে পারে, বলাৎকারের ঘটনাও ঘটতে পারে, বিবাহিতা রমণীর ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে এই সব ব্যত্যয়, কিন্তু তাই বলে সেই মেয়েকে ত্যাগ করতে হবে, তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে ঘর থেকে— এমন কাজ করতে না করেছেন বশিষ্ঠ মুনি। তিনি বলেছেন— এইসব দুর্ঘটনা ঘটলে কন্যা বা স্ত্রীর পুষ্পকালের অপেক্ষা করো। সে পুষ্পবতী হলে ঋতুর মাধ্যমেই শুদ্ধা গ্রহণযোগ্যা হয়ে উঠবে আবার— পুষ্পকালমুপাসীত ঋতুকালেন শুধ্যতি। হয়তো এতখানি গ্রহণযোগ্যতা ছিল বলেই ঋতুশুদ্ধি না ঘটলেও কানীন পুত্র সেকালের সমাজের চোখে ঘৃণা বা অবহেলার পাত্র ছিল না।

যদি এই দিক থেকে মাধবীর বক্তব্য বিচার করি, তা হলে বুঝব— তিনি নিজের কন্যাত্ব এবং সতীত্ব নিয়ে খুব আতঙ্কিত ছিলেন না এবং যৌনতার ক্ষেত্রে তাঁর মানসিক প্রস্তুতি এমনই যে, গালবের কাছে তিনি নিজেই প্রস্তাব দিচ্ছেন যে, হর্যশ্ব রাজার পুত্র-কামনা এবং কামনার প্রয়োজনে তিনি নিজেই তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে রাজি। শুধু তাই নয়, তিনি নিজের কুমারীত্ব নিয়েও তত চিন্তিত নন, কেননা ব্রহ্মবাদী ঋষির বরেই হোক, অথবা বৃহত্তর প্রয়োজনে তিনি নিজের শরীরকে সতীচ্ছন্নতায় আবৃত করতে চান না বলেই হোক, তিনি হর্যশ্ব রাজার একটি সন্তান ধারণ করতে স্বেচ্ছায় স্বীকৃত হচ্ছেন। এর মধ্যে হর্যশ্ব-কৃত তাঁর উচ্চাবচ শরীর সংস্থানের বর্ণনাটা মাধবীর আত্মতুষ্টিও যেমন ঘটিয়েছে, তেমনই যুবতী রমণী হিসেবে তাঁর শারীরিক শংসা শারীর মিলনের উদ্দীপন হিসেবেও কাজ করছে বলে আমরা মনে করি। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এ কথাটাও বলতে হবে যে, এই সম্পূর্ণ ঘটনার মধ্যে মাধবীর দিক থেকে একটা 'ডিটাচমেন্ট'-ও আছে; হয়তো বা সেটা এক ধরনের অনাসক্ত কর্তব্য পালনের মতো, কিন্তু সামনাসামনি তাঁর আন্তরিকতারও অভাব নেই— তিনি অসহায় কামমোহিত হর্যশ্ব রাজাকেও তাঁর অভীষ্ট এবং একান্তকাম্য শরীর দিয়ে তৃপ্ত করতে চান কেননা তাতে গালব ঋষির গুরুদক্ষিণার দায় সিদ্ধ হবে; অন্যদিকে তিনি তাঁর বহুস্তুত রমণী-শরীর নিয়েও মানসিকভাবে আকণ্ঠ ব্যাপৃত নন, অথবা এতটাই নিজের সম্বন্ধে তাঁর আস্থাবোধ, যাতে বলতে পারেন— একটা সন্তান দেওয়া নিয়ে তো কথা। তো প্রত্যেক প্রসবের পরেই আমি আবারও কুমারীই তো বটে— প্রসূত্যন্তে প্রসূত্যন্তে কন্যেব ত্বং ভবিষ্যসি— অতএব গালবকে তিনি বলছেন— গালব! চিন্তা কোরো না, চারজন রাজার কাছে আমাকে দান করো তুমি। তোমার আটশো ঘোড়ার প্রতিশ্রুতি ঠিক থাকবে তাতে— নৃপেভ্যো হি চতুর্ভ্যস্তে পূর্ণান্যষ্টৌ শতানি চ।

এখানে আর একটা অন্তরাল ঘটনা বোধহয় এরই মধ্যে অন্তহীনভাবে চলছে। পিতা যযাতি গালব ঋষির হাতে মাধবীকে দিয়েছেন তাঁর প্রতিশ্রুত গুরুদক্ষিণা-সিদ্ধির জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গালব ব্রহ্মচারী যুবক। সদ্য বিদ্যালাভ সম্পূর্ণ করেছেন, মাধবী তাঁর সঙ্গে যাচ্ছেন অসহায় ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা-পূরণে সাহায্য করতে। গালব যখন হর্যশ্ব রাজার কাছে আসেন, তখন ভেবেছিলেন যে, রাজার সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হবে, মাধবী ইক্ষ্বাকুবংশের রাজবধূ হবেন, অতএব মাধবীকে একবারের তরে ব্যবহার করলেও তিনি তাঁকে জলে ফেলে দিচ্ছেন না। কিন্তু যে-মুহূর্তে হর্যশ্ব বলেছিলেন— আমার কাছে মাত্র দু'শো ঘোড়াই আছে। অথচ মাধবীকে আমি চাই, সেই মুহূর্তে অসীম অসহায় এক লজ্জা তাঁকে গ্রাস করেছিল। একজন বিখ্যাতবংশীয় রাজা, যিনি পরম নির্লজ্জভাবে মাধবীর সামনেই তাঁর উচ্চাবচ শরীর-সংস্থান বর্ণনা করে তাঁকে কামনা করছেন, অথচ প্রস্তাবিত আটশো অশ্ব তাঁর দেবার ক্ষমতা নেই— এই অবস্থায় বিব্রত গালবকে আশ্বস্ত করছেন মাধবী। কেন করছেন, তাঁর কি অসহায় ছন্নছাড়া ব্রাহ্মণ যুবককে ভাল লেগেছিল? মহাভারতের কবি স্বকণ্ঠে এ কথা উচ্চারণ করেননি, সম্পর্কের স্পষ্টতা না থাকলে তিনি তা করবেনও না। কিন্তু কোথাও কখনও যেন মনে হয়— গুরুদক্ষিণার চক্রে পড়ে যাওয়া ইতস্তত ভ্রাম্যমাণ এই যুবকটির প্রতি মাধবীর কিছু করুণামিশ্রিত দুর্বলতাও হয়তো আছে।

মাধবীর স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কথা শুনে গালব মুক্তি পেলেন যেন। গালব হর্যশ্ব রাজাকে বললেন— আপনি গ্রহণ করুন এই কন্যাকে, কিন্তু মনে রাখবেন মহারাজ! আপনি এক-চতুর্থাংশ ঘোড়া দেবেন যেহেতু, অতএব এই রমণীর গর্ভে একটিই মাত্র পুত্র উৎপাদন করবেন— চতুর্ভাগেন শুল্কস্য জনয়স্বৈকমাত্মজম্। মহারাজ হর্যশ্ব গালবকে অভিনন্দন জানিয়ে মাধবীকে গ্রহণ করলেন সুতোৎপত্তির জন্য। অন্তত এই কারণটাই ধর্মশাস্ত্রের নিয়মে দেখাতে হয় এবং বিবাহের অন্যতম ফল যে রতিশান্তি, সেটা ধর্মশাস্ত্রের মতে গৌণফল বলেই মহাভারতের কবি সব বুঝিয়ে দিয়েও সামাজিকদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছেন। এটাও এখানে লক্ষ করার মতো যে, হর্যশ্ব রাজা মাধবীকে এমনিই গ্রহণ করলেন, নাকি বিবাহ করলেন বিধিসম্মতভাবে। আমরা মনে করি— ঠিক এই মুহূর্তে স্পষ্টোচ্চারিত শব্দে প্রকাশ না করলেও 'প্রতিগ্রহ' শব্দের অর্থ যেহেতু 'বিবাহ'-ই এবং বিবাহের জন্য নির্ধারিতা কন্যাই যেহেতু 'প্রতিগ্রহ' শব্দের অভিধেয় অর্থ, অতএব সেই শব্দটিকে ক্রিয়াপদে প্রয়োগ করে মহাভারতের কবি বুঝিয়ে দিলেন যে, হর্যশ্ব মাধবীকে বিবাহ করেছেন বিধি-নিয়ম ক্ষেত্রেই— প্রতিগৃহ্য স তাং কন্যাং গালবং প্রতিনন্দ্য চ। এবং এটা যদি না হত তা হলে মাধবীর গর্ভে যে বিরাট অভ্যুদয়শালী ইক্ষ্বাকুবংশের ধুরন্ধর পুত্র বসুমনা জন্মালেন, তাঁর এত মর্যাদা উচ্চারিত হত না স্বয়ং সামাজিক মহাকবির মুখে।

রাজার পুত্রলাভের খবর পেয়েই গালব ঋষি এলেন রাজার কাছে। বললেন— আপনার সূর্যবংশে সূর্যের মতোই তো এক পুত্র লাভ করেছেন আপনি। কিন্তু আমার তো কপাল, আমাকে শুল্কসংগ্রহের জন্য অন্য রাজাদের কাছেও যেতে হবে। অতএব সময় তো হয়ে গেল, মহারাজ— কালো গন্তুং নরশ্রেষ্ঠ শুল্কার্থম্ অপরং নৃপম্। হর্যশ্ব রাজা তাঁর সত্য রক্ষা করে মাধবীকে এনে দিলেন গালবের কাছে এবং মাধবীও দীপ্ত রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করে কুমারী কন্যার মতো গালবের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলেন— কুমারী কামতো ভূত্বা গালবং পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ। অর্থাৎ মহাকাব্যের কবি এই মুহূর্তে মাধবীর নির্বিকার ভাবের সঙ্গে তাঁর

অনায়াস অনাসক্ত আচরণটাকে প্রায় পুরুষসুলভ ব্যক্তিত্বের আভাসে দেখছেন। দৈবভাব বা আর্ষতায় তিনি কতটা কুমারীত্ব লাভ করেছেন জানি না, কিন্তু একটি সন্তান প্রসব করার পর নিজেকে আবার কুমারী ভেবে নিয়ে অন্যতর এক পুরুষের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে প্রবেশ করতে যে ব্যক্তিত্ব লাগে, তাকে 'কামাবশায়িতা' বলব কিনা, সেটা চলন্তিকার আভিধানিক যুক্তিতেও যেমন মেনে নিতে পারি, তেমনই পারি রমণীর পুরুষায়ণী শক্তির যুক্তিতেও। 'কামাবশায়িতা' কথাটা আমার বন্ধু অপরাজিতার কাছ থেকে ধার করা।

যাই হোক, মাধবীকে সঙ্গে নিয়ে গালব এবার কাশীপতি বিখ্যাত দিবোদাস রাজ্যর কাছে পৌঁছোলেন। দিবোদাসের কাছে যাবার আগে গালব মাধবীর কাছে যেমন তাঁর খ্যাতির বর্ণনা করেছেন, তেমনই এই অপরিচিত পুরুষের সম্বন্ধে মাধবীর মনের মধ্যে একটা আনুকূল্য ঘনিয়ে আনবারও চেষ্টা করছেন। একজন অভিজাত-বংশীয়া রমণীর মনের মধ্যে এক পুরুষ থেকে পুরুষান্তর-গমনের কল্পনায় আশঙ্কা থাকাটাই খুব স্বাভাবিক। বিশেষ করে পুরুষের যৌন ব্যবহারের মধ্যে পৌরুষেয় বিকারগুলিও অপরিচিতা রমণীর কাছে আশঙ্কনীয়ভাবেই চিন্তার বস্তু হয়ে ওঠে। হয়তো এই কারণেই দিবোদাসের কাছে যাবার আগে গালব মাধবীকে বলছেন— তুমি চিন্তা কোরো না, ভদ্রে! তুমি ধীরে ধীরে চল আমার সঙ্গে— তত্র গচ্ছাবহে ভদ্রে শনৈরাগচ্ছ মা শুচঃ। দেখো, আমি যতটুকু জানি— দিবোদাস খুব ধার্মিক রাজা, খুব সংযমী মানুষও বটে। সর্বদা তিনি সত্যে স্থিত আছেন, অতএব চিন্তা কোরো না তুমি, আমরা তাঁর কাছে যাব— ধার্মিকঃ সংযমে যুক্তঃ সত্যে চৈব জনেশ্বর। হয়তো পূর্ব রাজা হর্যশ্ব যেভাবে মাধবীর সামনেই তাঁর শরীর নিয়ে কথা বলেছিলেন, তার মধ্যে যে ইঙ্গিত ছিল, গালব বুঝি এখন তার ওপর প্রলেপ রচনা করছেন।

গালবের কথাগুলি খুব মিথ্যাও ছিল না। গালব যখন দিবোদাসের কাছে গিয়ে তাঁর প্রস্তাব দিলেন, তখন দিবোদাস খুব সংযতভাবে জানিয়েছেন— আমি পূর্বে শুনেছি মাধবীর কথা। কাজেই এঁর সম্বন্ধে আর বেশি কথা বলার প্রয়োজনই নেই— শ্রুতমেতন্ময়া পূর্বং কিমুক্ত্বা বিস্তরং দ্বিজ। আমি এঁর কথা শোনামাত্রই মনে মনে তাঁকে চেয়েছি। আর আমার সত্যিই ভাল লাগছে দেখে যে, আপনি অন্যান্য রাজাদের ছেড়ে দিয়ে আমার কাছেই এসেছেন— মামেবমুপযাতোঽসি... যদুৎসৃজ্য নরাধিপান্। তবে সত্য কথা আগেই জানিয়ে রাখি— আমারও অশ্বধন কিন্তু মহারাজ হর্যশ্বের মতোই— ওই বিশেষ প্রকারের ঘোড়া আমার কাছেও ওই দু'শোই আছে এবং আমিও এই রমণীর গর্ভে একটিই মাত্র পুত্র উৎপাদন করতে চাই— অহমপ্যেকমেবাস্যাং জনয়িষ্যামি পার্থিবম্।

এটা বোঝা যাচ্ছে যে, মাধবীর রূপ-গুণ এবং তাঁর নিরাসক্ত রতি-সম্পর্কের কথা অযোধ্যার ভূমিমণ্ডল থেকে কাশীখণ্ডে এসে পৌঁছেছে এবং হয়তো বা নির্দিষ্ট অশ্বধন আছে বলেই দিবোদাস আশা করতে আরম্ভ করেছিলেন যে, মাধবী একদিন তাঁর কাছেও উপস্থিত হবেন। এ কথা জানাতেও তিনি লজ্জাবোধ করেননি যে, মাধবীর অসামান্য রূপের কথা তিনি শুনেছেন এবং তাঁর কথা শ্রবণমাত্রেই তিনি তাঁকে লাভ করার আশা করতে আরম্ভ করেছেন— কাঙ্ক্ষিতো ময়ৈষোঽর্থঃ শ্রুত্বৈব দ্বিজসত্তম। তবে দিবোদাসের ক্ষেত্রে কামনার ভাগটা আমরা একটু অন্যরকম দেখছি, তাঁর মুখের ভাষাও একজন বিদগ্ধা রমণীর কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুখশ্রাব্য। আরও লক্ষণীয়, গালব কন্যাভাবিতা মাধবীকে দিবোদাসের হাতে দিতেই তিনি বেদবিধি অনুসারে তাঁকে বিবাহ করলেন— বিধিপূর্বঞ্চ তাং রাজা কন্যাং প্রতিগৃহীতবান্।

এই সংবাদটাকেও আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। তার মানে, মাধবী বহুপুরুষগামী হওয়া সত্ত্বেও তিনি গণিকা-বেশ্যার সমতা লাভ করছেন না কিন্তু পুরুষের রতিতৃপ্তির প্রসঙ্গটা এখানে অবশ্যই খুব জোরদার, কিন্তু অন্যের দ্বারা উপভুক্তা হওয়া সত্ত্বেও মাধবীর স্বাত্মারোপিত কন্যাভাবের জন্যই হোক অথবা বংশের ধারা বিধিসম্মতভাবে বজায় রাখার জন্যই হোক, মাধবীকে কিন্তু বিধিসম্মতভাবেই বিবাহ করতে হচ্ছে। এটাকে মাধবীর প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের পরিসর বলেই ধরতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, কাশীশ্বর দিবোদাসের সঙ্গে মাধবীর বৈবাহিক প্রসঙ্গে পৌরাণিক যত বিখ্যাত স্বামী-স্ত্রীর উদাহরণ আছে, স্বামিত্ব এবং সতীত্বের ক্ষেত্রে পুরাণগুলি যাঁদের দৃষ্টান্ত বলে মনে করে, সেই সব উদাহরণ একের পর এক এখানে উচ্চারণ করে শেষে বলা হল— রাম যেমন সীতার সঙ্গে, কৃষ্ণ যেমন রুক্মিণীর সঙ্গে রমণ করেছেন, ঠিক সেইভাবেই রাজর্ষি দিবোদাস মাধবীর সঙ্গে রমণ করতে লাগলেন এবং সেই বিধিসম্মত রতির ফল হল মাধবীর গর্ভজাত পুত্র পুরাণ-বিখ্যাত প্রতর্দন— মাধবী জনয়ামাস পুত্রমেকং প্রতর্দনম্। দিবোদাস পুত্রলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে গালব ঋষি আবারও উপস্থিত হলেন তাঁর কাছে। দিবোদাস কাল বিলম্ব না করে মাধবীকে গালবের কাছে প্রত্যর্পণ করলেন।

আবারও পথ চলা শুরু হল। মহাভারতের কবি মিতভাষায় মন্তব্য করলেন— হর্যশ্বের গৃহে পূর্বোপভুক্তা রাজলক্ষ্মীর মতো দিবোদাসের ঐশ্বর্যলক্ষ্মীকেও ত্যাগ করে মাধবী আবারও গালবের সঙ্গে চলতে লাগলেন নিজের সত্যে স্থিত থেকে এবং সেই কন্যা-ভাব আবারও সংক্রমিত হল তাঁর মধ্যে— তথৈব তাং শ্রিয়ং ত্যক্ত্বা কন্যা ভূত্বা যশস্বিনী। কথাটা প্রত্যেক বারই উচ্চারণ করছেন মহাভারতের কবি— আবারও তিনি কন্যা হয়ে গালবের সঙ্গে পথ চলতে লাগলেন। আমাদের দেশের বিশাল যে সাংস্কারিক জগৎ, সেখানে সতীত্বের অহংকারে পুত্রোপম পুরুষের স্পর্শও দূষণযোগ্য মনে করেছেন সীতা এবং তিনি হনুমানের পিঠে চড়ে স্বামীর কাছে আসতেও সযত্নে অস্বীকার করেছেন। ঠিক এই সামাজিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে মহাভারতের কবি কিন্তু এমন একটা বৈপ্লবিক চরিত্র চিত্রণ করছেন, যেখানে যৌনতার বিষয়ে প্রথাগত সংস্কারের বাইরেও আরও একটা তর্ক-যুক্তি যেন কাজ করছে। একথা ঠিক যে, ভারতবর্ষের ধর্মশাস্ত্র এবং উপদেশের জায়গায় মহাভারতও একই কথা বলবে। বলবে— যৌনতা মানেই অন্যায় এবং সেটা পাপ। বিধিসম্মত বিবাহের মাধ্যমে এই পাপমুক্তি ঘটতে পারে এবং সেখানে সন্তান লাভ করে বংশরক্ষা করাটাই প্রধান প্রয়োজন।

আমরা বলব— এই ভাবনার মধ্যে নতুন কিছু নেই, ভারতবর্ষে এই সিদ্ধান্তের জন্য মনুর মতো ধর্মশাস্ত্রকারেরা যেরকম, সেইরকম ওই দেশেও সেইন্ট টমাস আকুনাস আছেন, আছেন অগাস্টাইন। এবং আশ্চর্য যে, মাধবীর ক্ষেত্রেও প্রত্যেক বার একটি রাজার সঙ্গে তাঁর বিধিসিদ্ধ বিবাহ হচ্ছে এবং তিনি নিঃসন্তান পুরুষের বংশরক্ষায় সাহায্য করছেন। অতএব এটা 'মরাল সেক্স', যেটাকে প্রাচীন মত দেখানোর জন্য বলা হয়েছে marriage prevents

us from using others merely as instruments for fulfilling our sexual appetites. অথচ আপাত-দৃষ্টিতে স্বয়ং মাধবীকেই অনেকের ইউজেবল মনে হচ্ছে। হয়তো এর কারণ একটাই, তিনি বহু পুরুষের সঙ্গ করছেন। আমরা তো বলব— মহাভারতে মাধবীর এই উদাহরণটাকে মহাভারতীয় কালে স্ত্রীলোকের ইচ্ছার মূল্য হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত। কেননা পরার্থ-সাধনের মতো এক মহৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখেও গালবকে তিনি প্রথমেই হতাশ করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে নিজের কন্যাভাবের যুক্তিটাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তিনি স্বেচ্ছায় এই বহুগামিতায় অনুমোদন দিয়েছেন। মহাভারতের কবি এবং মহাভারতের সমাজ মাধবীকে সহায়তা দিয়েছে ধর্মশাস্ত্রীয় যুক্তিতে। প্রত্যেক পুরুষ-গমনে একবার করে বিবাহ এবং পুনরায় কন্যাভাবের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে 'সেক্স'-ব্যাপারটাও 'রিডিমেব্‌ল' হয়ে ওঠে। আমার এক পুরাতনী পরিচিতা সিনেমার নায়িকা, যিনি সেকালে যথেষ্ট সুন্দরী ছিলেন এবং খানিক পুরুষ-গমনে অভ্যস্ত ছিলেন, তিনি একদিন বলেছিলেন— সমস্যাটা বহুপুরুষগামিতা বা বহুনারীগমনের মধ্যে নয়, সমস্যাটা আসলে 'পাপবোধ' নিয়ে। কথাটা প্রায় পণ্ডিত-গবেষক প্রাইমোরাট্জ্‌-এর কাছাকাছি নিয়ে যায়— যিনি বলেছিলেন— স্ত্রী-পুরুষের যৌনাচারের মধ্যে বিশেষ নৈতিকতার তাৎপর্য নেই, কেননা যৌনাচার নীতিগতভাবে আপন স্বতন্ত্রতাতেই নিরপেক্ষ— সেক্স ইজ মর‍্যালি নিউট্রাল।

বাংলা অনুবাদটা তেমন ভাল হল না এবং ততোধিক ভালভাবেও আমরা মাধবীর যৌন-ব্যবহার বোঝাতে পারছি না। তবে এটা বলতেই পারি যে, তাঁর কন্যাভাবের আর্ষ যুক্তিটা আসলে তাঁর পাপবোধহীনতার প্রতিরূপ এবং এটা আপনাকে খানিকটা মানতেই হবে যে, মহাভারতে সত্যবতী, কুন্তী এবং দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে বারংবার সেই কন্যাভাবের উপযোগ দেখিয়ে 'প্রিমেরিটাল' বা 'পোলিয়েনড্রাস' যৌনতার মধ্যে সেই পাপবোধ নিরসনেরই চেষ্টা করা হয়েছে দেবতার বর বা ঋষির আশীর্বাদের মাধ্যমে। মাধবীর ক্ষেত্রটা আরও একটু আলাদা— তিনি বিবাহ করছেন, বিবাহিত স্বামীর জন্য পুত্রোৎপাদন করছেন, কিন্তু তার পরেই পূর্বস্বামী এবং তাঁর দীপ্ত রাজলক্ষ্মীকে ত্যাগ করে অন্য পুরুষের অঙ্কশায়িনী হয়েছেন স্বেচ্ছায়, কিন্তু পরার্থতায়— শুধু গালবের জন্য, যদিও এই কাহিনির মধ্যে অন্যতর এক তাৎপর্যও ফুটে উঠবে, যেখানে সমাজের অনন্ত পৌরুষেয়তার মধ্যে বংশধারা রক্ষার ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের উপযোগের জায়গাটাও তাৎক্ষণিকভাবে প্রধান হয়ে উঠবে। কিন্তু সে-কথা পরে।

মাধবী গালবের পিছন-পিছন এবার ভোজরাজ্যে এসে পৌঁছোলেন। এই রাজ্যের রাজার নাম উশীনর। গালব তাঁকে বললেন— মহারাজ! এই কন্যার গর্ভে আপনি চন্দ্র-সূর্যের মতো দুটি পুত্র লাভ করতে পারেন, তাতে ইহলোক-পরলোক দুইই চরিতার্থ হবে আপনার। তবে আমার একটা প্রয়োজন আছে এখানে। দুটি পুত্র-রত্ন-লাভের পরিবর্তে আমাকে কালো কানওয়ালা চারশোটি সাদা ঘোড়া দিতে হবে। আমি নিজের জন্য এসব চাইছি না, কিন্তু গুরুদক্ষিণার দায় মেটাতে আমার এই চেষ্টা— গুর্বর্থোহয়ং সমারম্ভো ন হয়ৈঃ কৃতমস্তি মে। উশীনর বললেন— আপনার কথা সব শুনলাম বটে, কিন্তু দুর্দৈব আমার! আমার কাছেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'শোর বেশি ঘোড়া নেই। সুতরাং গালব! আমিও এই কন্যার গর্ভে একটিই মাত্র পুত্র লাভ করতে চাই, আপনি দেবকন্যাসদৃশী এই কুমারী রমণীকে দান করুন আমার হাতে— কুমারীং দেবগর্ভাভাম্ একপুত্রভবায় মে।

'প্রতিগ্রহ' অর্থাৎ বিবাহার্থক শব্দটা এখানেও এল, যদিও সেটা প্রযোজক ক্রিয়ায় এইভাবে বলা হল যে, গালব ঋষি উশীনর রাজার সঙ্গে মাধবীর বিধিবৎ পাণিগ্রহণ-কর্ম করিয়ে তখনকার মতো বনে চলে গেলেন— উশীনরং প্রতিগ্রাহ্য গালবঃ প্রযযৌ বনম্। উশীনরের সঙ্গে মাধবী থাকতে আরম্ভ করলে এই প্রথম আমরা দেখলাম— উশীনর রাজা মাধবীকে পেয়ে পর্বতগুহায়, প্রবাহিণী নদীর পাশে, পাহাড়ি ঝরনায়, নানান উপবনে, বনে এবং গৃহের ভিতরেও তাঁর সঙ্গে পরমানন্দে দিন কাটাতে লাগলেন।

তারপর মাধবীর গর্ভে উশীনর ভবিষ্যতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা শিবিকে লাভ করলেন। গালব ফিরে এলেন বন থেকে এবং মাধবীকে নিয়ে আবারও দেখা করলেন বিষ্ণুবাহন গরুড়ের সঙ্গে— কীভাবে তাঁর গুরু-দক্ষিণার চতুর্থ ভাগ আরও দু'শো ঘোড়া পাওয়া যায় এই আলোচনা করতে। গরুড় বললেন— তুমি এসে ভালই করেছ এবং শোনো— আমি যতটুকু জানি, সেই শ্যামকর্ণ চন্দ্রবর্ণ অশ্ব ওই ছ'শোর বেশি আর কোথাও অবশিষ্ট নেই। তুমি বরঞ্চ তোমার গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করে ওই দু'শো অশ্বের পরিবর্তে মাধবীকেই গুরুর কাছে নিবেদন করো— ইমামশ্বশতাভ্যাং বৈ দ্বাভ্যাং তস্মৈ নিবেদয়। আর ছ'শো অশ্ব তো তোমার আছেই।

শেষ পর্যন্ত সেই অসহ্য অপছন্দের জায়গাটা এসেই গেল, যেখানে মাত্র দু'শো অশ্বের পরিবর্ত হিসেবে মাধবী ব্যবহৃত হচ্ছেন। তবে আমরা বলব— এটা নতুন কিছু নয়, এর আগের তিনটি জায়গাতেও তিনি দু'শো করে অশ্বশুল্কের পরিবর্তেই ব্যবহৃত হয়েছেন, কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁর নিজের ইচ্ছা, বিবাহ এবং পুত্রোৎপাদনের ভূমিকা থাকায় আজকের পরিশীলিত দৃষ্টিতে তাঁর অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। যাই হোক, ছয় শত শ্যামকর্ণ শুভ্রবর্ণ অশ্ব আর মাধবীকে নিয়ে গালব এবার গুরু বিশ্বামিত্রের কাছে উপস্থিত হলেন এবং গরুড় ঠিক যেভাবে বলেছিলেন, সেইভাবেই তিনি বললেন— গুরুদেব! আপনার অভীষ্ট এই ঘোড়া ছ'শো আমি পেয়েছি, কিন্তু আর দু'শো পাইনি। তার পরিবর্তে আপনি এই কন্যাটিকে গ্রহণ করুন। বিখ্যাত রাজাদের মধ্যে ইক্ষ্বাকু-কুল-ধুরন্ধর হর্যশ্ব, কাশীশ্বর দিবোদাস এবং ভোজরাজ উশীনর পর্যায়ক্রমে এই কন্যার গর্ভে তিন জন ধার্মিক পুত্র লাভ করেছেন এবং আপনিও যদি এই কন্যার গর্ভে একটি মহোত্তম পুত্র লাভ করেন, তবে গুরুর কাছে আমি অঋণী হই— চতুর্থং জনয়ত্বেকং ভবানপি নরোত্তমম্।

ঠিক এই মুহূর্তে মনুষ্যদৃষ্টিতে সবচেয়ে স্বাভাবিক, অথচ বিশ্বামিত্র মুনি বলেই সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটল। বিশ্বামিত্র মাধবীর শান্ত সমাহিত এবং অশেষ যৌবনান্বিত রূপ দেখে মোহিত হয়েছিলেন নিশ্চয়ই এবং সেইজন্যই গালবকে ঈষৎ তিরস্কারের সুরেই যেন বললেন— গালব! ঘটনা যখন এইরকমই যে, তুমি অশ্বের পরিবর্তে অন্য মহান রাজাদের কাছে এঁকে দিয়েছ। তা হলে আগেই কেন এই কন্যাকে আমার কাছে নিয়ে আসোনি— কিমিয়ং পূর্বমেবেহ ন দত্তা মম গালব— তা হলে তো এই রমণীর গর্ভে আমি চার-চারটি

পুত্রলাভ করতে পারতাম। কিন্তু এখন যে পরিস্থিতিতে এবং যে শুদ্ধভাবনার মধ্যে তুমি আমার কাছে এঁকে নিয়ে এসেছ, তাতে এই রমণীর গর্ভে আমি একটি পুত্র লাভ করেই সন্তুষ্ট থাকব— প্রতিগৃহ্ণামি তে কন্যাম্ একপুত্রফলায় বৈ। অর্থাৎ যে 'প্রতিগ্রহণ' প্রতিগ্রহ বা বৈবাহিক ঘটনা ঘটল এবং বিশ্বামিত্রও মাধবীর গর্ভে অষ্টক নামে এক মহান পুত্র লাভ করলেন— আত্মজং জনয়ামাস মাধবীপুত্রমষ্টকম্। পুত্রজন্মের পরেই বিশ্বামিত্র তাঁর পুত্রকে সেই ছ'শোটি ঘোড়া এবং ধনৈশ্বর্য দান করে তাঁকে ক্ষত্রিয় ধর্মে স্থাপন করলেন এবং মাধবীকে ফিরিয়ে দিলেন শিষ্য গালবের হাতে। বিশ্বামিত্র বনে চলে গেলেন— নির্যাত্য কন্যাং শিষ্যায় কৌশিকোঽপি বনং যযৌ।

গালব ঠিক করলেন— যাঁর কাছ থেকে মাধবীকে নিয়ে এসেছিলেন সেই যযাতি পিতার কাছেই পিরিয়ে দেবেন তাঁকে। ফিরিয়ে দেবার আগে অসীম কৃতজ্ঞতায় গালব মাধবীকে বললেন— তোমার প্রথম পুত্র বসুমনা অসাধারণ দাতা। তোমার দ্বিতীয় পুত্র প্রতর্দন এক মহাবীর যোদ্ধা, তৃতীয় পুত্র শিবি সত্যধর্মে স্থিত আছেন নিরবধি, আর তোমার চতুর্থ পুত্র অষ্টক বিশ্বামিত্রের ভূতপূর্ব রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ক্ষত্রিয়োচিত যজ্ঞকর্ম করছেন। গালব এবার মাধবীকে রমণীর সৌন্দর্য্য-স্বরূপেই সম্বোধন করে বললেন— বরারোহে! সুমধ্যমে! তুমি এবার চল আমার সঙ্গে। তুমি একই সঙ্গে তোমার পুত্রগণের মাধ্যমে পিতা যযাতির মেয়ের ঘরের পিণ্ড-প্রয়োজন সম্পন্ন করেছ, চার জন রাজা-রাজর্ষিকে তুমি পুত্র দান করেছ এবং আমাকেও তুমি গুরুদক্ষিণার দায় থেকে মুক্ত করেছ। চলো, এবার তোমায় ফিরিয়ে দেব তোমার পিতার কাছে।

গালব যযাতির কাছে মাধবীকে ফিরিয়ে দিয়ে বনে গেলেন তপস্যা করতে। ঠিক এই সময়ে মাধবী মানসিক দিক থেকে কেমন ছিলেন, এই ঔপন্যাসিক অভিমুখ মহাভারত বর্ণনা করে না। মহাভারত ঘটনা বলে যায় এবং তা থেকে যদি আপনি মনের কথা বোঝেন! যেমন এখন দেখছি— তাঁর পিতা যযাতি একটা স্বয়ংবরের ব্যবস্থা করতে চাইছেন মাধবীর জন্য। অন্তত চার জায়গায় চারজন পুরুষের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছে এবং সব জায়গায় তিনি একটি করে পুত্র লাভও করেছেন, তবে অলৌকিকভাবে মণ্ডিত মাধবীর সেই কন্যাত্ব এখনও আছে এবং যযাতি নিশ্চয়ই ভেবেছেন তাঁর কন্যাটি পরার্থ-নিষ্পাদনপরতায় চার বার বিবাহিত হলেও বিবাহিত জীবন বলে তিনি কিছু পাননি, অতএব সেইজন্যই তিনি মাধবীর জন্য এক স্বয়ংবর সভার আয়োজন করলেন প্রয়াগের এক আশ্রমভূমিতে। যযাতির জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ দুই পুত্র যদু এবং পুরু স্বয়ংবরমাল্যধারিণী ভগিনী মাধবীকে রথে চড়িয়ে নিয়ে চললেন আশ্রমের দিকে। লক্ষণীয়, এই স্বয়ংবর সভায় শুধু রাজা, ঋষি এবং সাধারণ মানুষেরাই উপস্থিত ছিলেন না, ছিল বনের পশু, আকাশচারী পক্ষীরা এবং বন-পর্বতের প্রাণীরা— শৈল-দ্রুম-বনৌকানাম্ আসীত্তত্র সমাগমঃ। স্বয়ংবর সভায় মাধবীর বন্ধুজনেরা সমাগত পাণিপ্রার্থীদের চিনিয়ে দিয়ে তাদের পরিচয় জানাতে থাকলে— নির্দিশ্যমানেষু তু সা বরেষু বরবর্ণিনী— মাধবী কাউকেই পছন্দ করতে পারলেন না। সমাগত সকলকে অতিক্রম করে মাধবী তপোবনকেই বর হিসেবে বরণ করে নিলেন— বরানুৎক্রম্য সর্বাংস্তান্ বরং বৃতবতী বনম্।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ অবধি মাধবীর মতো এক অসামান্যা সুন্দরী রমণী যুবতীজনোচিত সমস্ত উপভোগ ছেড়ে আরণ্যক তপস্যার পথ নির্বাচন করলেন— এই ঘটনায় আধুনিক বিদ্বান-বিদুষীদের জিহ্বা তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠেছে। পুরাতন সমাজের পৌরুষেয় অত্যাচারে নারীর বঞ্চনা মাধবীর আচরণে যেন নিরুচ্চার প্রতিবাদের রূপ ধারণ করেছে— এই তথ্য মাথায় রেখে বিদুষীরা মাধবীকে পৌরুষেয় অত্যাচারের বলি 'ইউজেবল উইমেন'দের একতমা বলে কঠিন আলোচনা করে ফেললেন, আর ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের মতো ঐতিহাসিক তাঁর সোশ্যাল হিসট্রি অব ইন্ডিয়াতে মাত্র দু-লাইনে মাধবীর জীবনী বর্ণনা করে মন্তব্য করলেন— পিতা যযাতি তাঁর মেয়ে মাধবীকে গালবের হাতে ছেড়ে দিলেন আর গালব তাঁকে যৌন-ব্যবহার করলেন গুরুদক্ষিণা দেবার জন্য। তিনি পর্যায়ক্রমে তিনজন অপুত্রক রাজার কাছে মাধবীকে ব্যবসায়িক কৌশলে সমর্পণ করলেন। প্রত্যেক রাজাই তাঁদের পুত্রসন্তান জন্মানোর পর মাধবীকে পরিত্যাগ করলেন। এমনকী যখন গুরুদক্ষিণার সম্পূর্ণ দায় মিটল না, তখন গালবও তাঁকে পরিত্যাগ করলেন, তিনি মাধবীকেই দিয়ে দিলেন গুরুর কাছে। মহাভারত মহাকাব্য এই সমস্ত লোকগুলোকেই আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে বিরাট বিরাট মানুষ মনে করে। মাধবীর বাবা যযাতি এখানে তাঁর করুণা-গুণের জন্য প্রশংসিত হচ্ছেন, গালব প্রশংসিত হচ্ছেন তাঁর গুরুভক্তির জন্য আর বিশ্বামিত্র তাঁর বিদ্যার জন্য প্রশংসা লাভ করছেন, অবশেষে মাধবীর মুক্তি ঘটল অনন্ত স্তব্ধতার মধ্যে।

ব্রজদুলাল 'সোশ্যাল হিসট্রি' লিখছেন, কিন্তু প্রথমত 'কনটেক্শ্ট্'-টাই তিনি বোঝেননি। মহাকাব্যে যখন কাহিনি বর্ণনা করা হয়, তখন মহাকাব্যিক বর্ণনীয় রীতিতেই যযাতি মহান রাজা, বিশ্বামিত্রও ব্রহ্মর্ষি বলে সম্বোধিত এবং গালবও খুব গুরুভক্ত। কিন্তু মহাভারতে 'কনটেক্শ্ট্'-টা এই রকম নয়। সেখানে যুদ্ধের উদ্যোগপর্বে যুদ্ধোৎসাহী দুর্যোধনকে যুদ্ধ থেকে বিরত করার জন্য রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ নারদ উপদেশ দিয়ে বলেছেন— তুমি আত্মীয়-পরিজন-বন্ধুদের ভাল কথাটা শোনো। আর এটাও জেনো কোনও একটা বিশেষ বিষয়ে অতিরিক্ত আগ্রহ দেখিয়ে একরোখা লোকের মতো একগুঁয়েমি কোরো না। একগুঁয়েমি করে একটা বিশেষ ব্যাপারেই অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করাটা ভয়ংকর বিপত্তি ডেকে আনতে পারে— ন কর্তব্যশ্চ নির্বন্ধো নির্বন্ধো হি সুদারুণঃ। নারদ বললেন— এই একগুঁয়েমি আর একটি বিষয়েই অতিরিক্ত আগ্রহ যে কী বিপত্তি ঘটনা করতে পারে, সে-বিষয়ে একটা ইতিহাসের কথা আছে শোনো— একগুঁয়েমি করে প্রাচীন কালে গালব বিপর্যস্ত হয়ে হার মেনে গিয়েছিলেন— যথা নির্বন্ধতঃ প্রাপ্তো গালবেন পরাভবঃ।

এটা কি গালবের প্রশংসা হল? আসলে আমি দেখেছি— মহোদয় পুরুষেরাও গৌণসূত্রে মহাভারত পড়েন এবং খামচা খামচা ঘটনা বর্ণনা করে পূর্বভাবিত আপন সিদ্ধান্তকে সপ্রমাণ করতে চান। আবার তার মধ্যে বিংশ-একবিংশ শতাব্দীর অভিজাত পরিশীলন দিয়ে খ্রিষ্টপূর্ব শতাব্দীর বিচারটা এমনভাবেই করেন যাতে প্রগতিকামিনী মহিলাদের মধ্যেও যথেষ্ট বাহবা পাওয়া যায়। সশ্রদ্ধে জানাই, প্রাচীন কালে পৌরুষেয় অত্যাচারের হাজারো নমুনা আছে এবং সেই নমুনার ইতিহাস আপনাদের থেকে আমি আরও বেশি জানি বলে, আরও বেশি লজ্জা পাই। কিন্তু মহাভারত মহাকাব্যটাকে আমি নারীপ্রগতি-ভাবনার ক্ষেত্রে একটা বড়

দলিল বলে মনে করি। কিন্তু মহাভারতের যেখান সেখান থেকে এক একটা কাহিনি টেনে এনেই আপনি স্বমত-সাধন করবেন— মহাভারত এতটা ছোটও নয়, এতটা জটিলও নয় এবং সেটাকে বুঝতেও হবে মহাকাব্যিক মনন-শৈলীতে।

আমরা কী 'সোশ্যাল হিসট্রি' লিখব? তার আগে গালবের প্রসঙ্গ টেনে এনে নারদই সোশ্যাল হিসট্রি বলছেন। বলছেন— একটা বিশেষ ক্ষেত্রে একগুঁয়েমি আর বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে গালবের পরাভব লাভ করার কাহিনিটা আমি ইতিহাসের কথা হিসেবে বলছি—অত্রাপ্যুদাহরন্তীমম্ ইতিহাসং পুরাতনম্। মনে রাখবেন— এই কাহিনিকে ইতিহাস বলামাত্রই বুঝতে হবে যে, গালবের কথা বহুকাল ধরে লোকমুখে চলছে এবং এইরকম একটা ঘটনা কোনও কালে ঘটেও ছিল। নারদ সেই সামাজিক ইতিহাস দুর্যোধনকে শোনাচ্ছেন তাঁকে যুদ্ধের আগ্রহ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য। অতএব গালবের ইতিহাস নিন্দার্থে প্রযুক্ত, প্রশংসার জন্য নয়। আরও বিচিত্র কথা হল এই যে, মহাভারত কীভাবে পড়তে হয় যদি বোঝেন, তা হলে দেখবেন— একগুঁয়েমির বাড়াবাড়িটা শুধু গালবের ক্ষেত্রে নয়, গালব-কাহিনির প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যেই এই বাড়াবাড়িটা আছে— এক জনের উপলক্ষে মহাভারতের কবি আর একজনের কথাও বলে দেন।

প্রথমে তো আমাদের বিশ্বামিত্র গুরু আর শিষ্য গালবের কথাই ধরতে হবে। সেকালের দিনে গুরুগৃহে পড়তে গেলে 'টিউশন ফি' নেবার চল ছিল না। গুরুকুলে খাটাখাটনি ছিল— সেটা অন্য কথা। গালবও অনেক খাটাখাটনি করেছেন এবং গুরু বিশ্বামিত্র তাঁর প্রতি এতটাই সন্তুষ্ট হয়েছেন যে, প্রথমে তিনি কোনও গুরুদক্ষিণা নিতেই চাননি। গালবই তাঁর বাড়াবাড়িটা আরম্ভ করেছেন। বিশ্বামিত্র প্রথম থেকেই না-না করে যাচ্ছেন, কিন্তু গালব তা সত্ত্বেও 'কিং দদানি, কিং দদানি'— কী দেবো আপনাকে, কী দেবো— এই একগুঁয়েমিটা করতেই থাকলেন। মহাভারত এটাকেই বলেছে অত্যাগ্রহ অর্থাৎ 'নির্বন্ধ'। আবার বিশ্বামিত্রের দিক থেকেও দেখুন, তিনি রেগে গেছেন, রেগে যাবার কারণও এখানে যথেষ্ট আছে। কিন্তু তাই বলে সম্পদহীন শিষ্যের কাছে এমন নির্দিষ্ট কতগুলি ঘোড়া চাইবেন যা কারও কাছে নেই। অথবা এমন ঘোড়া যে গুণতিতে আটশোটা পাওয়া যাবে না— এ কথা বোধহয় তিনি বুঝেই বলেছিলেন গালবকে এবং প্রথম দিকে এসে অশ্বের মহার্ঘতা জানালেও বিশ্বামিত্র নিজের জেদ থেকে সরলেন না।

যা হোক অনেক শলামর্শ সেরে গরুড়কে নিয়ে গালব যখন দক্ষিণার অশ্ব যোগাড় করার জন্য যযাতির কাছে গেলেন, তখন সামর্থ্যহীন যযাতি নিজের দান- শৌণ্ডতা দেখানোর জন্যই অতিথিকে নিরাশ করলেন না, তিনি নিজের মেয়ে মাধবীকেই গালবের হাতে দিয়ে বসলেন— অভীষ্টলাভের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। এটাও বাড়াবাড়ি অথবা দানের বিষয়ে অতিনির্বন্ধ। মহাভারতে এ রকম দৃষ্টান্ত আর একটাও দেখা যাবে না। অন্যদিকে মাধবীকে দেখুন, তিনিও গালবের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি রকমের করুণা এবং দয়া দেখাচ্ছেন। গালব হর্যশ্ব রাজার কাছে আটশো ঘোড়া না পেয়ে যখন বিভ্রান্ত, তখন মাধবী নিজেই নিজেকে বিনিময়যোগ্য করে তুললেন অন্তত চার জন পুরুষের কাছে। মাধবী যদি নিজে অন্তত চার জন পুরুষের উপভোগ-সহনীয়তার কথা না জানাতেন গালবকে অথবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না জানাতেন প্রত্যেকটি পুরুষ-সংক্রমণের পর তাঁর নির্বিকার কন্যাভাবের কথা, তা হলে গালব ঋষির এমন ক্ষমতা হত না যে, তিনি তাঁকে ব্যবহার করেন। আর এখানেও একটা বাড়াবাড়ি আছে, যেন তেন প্রকারে গালবের সংকট মোচন করাটা মাধবীর দায়িত্বের মধ্যে এসে পড়েছে, সেই অত্যাগ্রহে চার চার জন পুরুষের কাছে তাঁকে ব্যবহার করলেও তাঁর কিছু হবে না— এই 'নির্বন্ধ' বা 'বিষয়ে'র প্রতি অত্যাগ্রহটা কি মাধবীর নীরবতা নাকি যযাতি বা গালবের পৌরুষেয় অভিসন্ধি, যেখানে এক অসহায়া রমণী 'ইউজেবল' হয়ে উঠছেন।

তা হলে দেখুন, এক অত্যাগ্রহ থেকে কতগুলি অত্যাগ্রহের সৃষ্টি হচ্ছে এবং এই অত্যাগ্রহ থেকে ওই তিনজন অপুত্রক রাজাও মুক্ত নন। তাঁদের সামর্থ্য নেই, অথচ মাধবীকে দেখে তাঁদের ভোগেচ্ছাও চরমে উঠছে, পুত্রলাভের ইচ্ছাটাও হয়তো পূর্বোক্ত কারণেই প্রবল হচ্ছে। কিন্তু বাড়াবাড়িটা এইখানে যে, একমাত্র হর্যশ্ব ছাড়া অন্য দুই রাজা মাধবীকে পূর্বোপভুক্তা এবং বিবাহিতা জানা সত্ত্বেও মাধবীর ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। গালবের সেই দক্ষিণাদানের অত্যাগ্রহ থেকে মাধবীর আত্ম-সম্প্রদানের ঘটনা পর্যন্ত প্রত্যেকটি ঘটনায় এখানে বাড়াবাড়ি আছে এবং মহাভারত দেখাতে চায়— সংসারে মহৎ, দয়ালু বা পরার্থপর হয়ে ওঠার মধ্যেও কখনও কখনও এমন ধরনের অত্যাগ্রহ মনের মধ্যে কাজ করতে থাকে, সেখানে যুদ্ধের বিষয়ে দুর্যোধন কারও কথা শুনছেন না, সে বিষয়ে 'নির্বন্ধ' বা অত্যাগ্রহ প্রকাশ করছেন— এই প্রসঙ্গেই কিন্তু গালবের কাহিনিটা আসছে, পুরুষ কীভাবে নারীদের নিয়ে ব্যাবসা করে এটা দেখানোর জন্য মাধবীর উদাহরণ প্রচার করাটাও একটু বাড়াবাড়ি বা অত্যাগ্রহের কাজ হবে বলে আমার মনে হয়।

দেখুন মাধবী যে তপোবনকেই বর হিসেবে বেছে নিলেন, অথবা তপোবনে তপস্যার ইচ্ছেটাই যে তার মধ্যে বেশি প্রকট হয়ে উঠল— এই ঘটনাটাকে যে আমরা তাঁর দিক থেকে খুব বড় একটা প্রতিবাদ বা পিতার প্রতি তাঁর অভিমান-প্রতিক্রিয়া হিসেবে গণ্য করব, সেটাও খুব মহাভারত-বোধের পরিচয় হবে না। আমি জানি, এখানে অনেক লেখক-লেখিকাই আধুনিক যুগের লেখ্যধারার করুণায় মাধবীর তপোবন আশ্রয়ের ইচ্ছাটাকে এক অসহায় বহুপুরুষোভুক্তা নারীর বিকল্পহীন আশ্রয় হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন; তাঁদের জানাই মহাভারতের নারীরা রামায়ণের নারীর মতো এত অসহায়বৃত্তি নন। তাঁদের অনেকের মনের মধ্যেই অনেক দুরন্তপনা আছে। বিশেষত যে-রমণী স্বেচ্ছায় চার-চারজন পুরুষের অঙ্কশায়িনী হয়েছেন বিনা কোনও মানসিক তাড়নায় এবং বিনা কোনও মানসিক যন্ত্রণায় তাঁর তপোবন আশ্রয়ের ঘটনাকে মহাভারতোচিত-ভাবেই একটা বৈরাগ্যের উদাহরণ হিসেবে, এমনকী খুব উদার এক বৈরাগ্য-বিলাস হিসেবেও দেখা যেতে পারে।

মহাভারতে এই বৈরাগ্যটা অনেক ক্ষেত্রেই একটা 'ট্রেইট' হিসেবে কাজ করে। পূর্বোক্ত ঐতিহ্যাসিক মাধবীর ব্যাপারে 'অ্যাবান্‌ডান্‌' কথাটা খুব করুণাঘনভাবে ব্যবহার করেছেন। আমরা বলব— ওই 'অ্যাবান্‌ডান্‌'-টাই খুব গভীরভাবে মহাভারতের 'ট্রেইট', ওটাই মহাভারতের শেষ রস। একটা ভয়ংকরী সর্বগ্রাসী আসক্তি থেকে হঠাৎই একটা নিরাসক্তিতে চলে যাওয়া, আসক্ত হয়েও অনাসক্ত থাকা— এই অসম্ভব 'অ্যাবান্‌ডান্‌' মহাভারতের

মুনি-ঋষি থেকে আরম্ভ করে অনেক মনুষ্যচরিত্রের মধ্যেও কাজ করে এবং তা নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে। পরাশর সত্যবতীকে উপভোগ করে মহাভারতের কবির পরম অভ্যুদয় ঘটিয়ে চলে গেলেন ছেলেকে নিয়েই। তারপরেই অনাসক্তি। তিনি আর ফিরে আসেননি। আবার সত্যবতীর দিক থেকেও কোনও অনুশোচনা নেই, কোনও ভাবনাই নেই। এটাও একটা 'অ্যাবান্‌ডান্‌'। একই কথা কুন্তীর সূর্যসম্ভোগের ক্ষেত্রেও খাটে, খাটে দ্রৌপদীর ক্ষেত্রেও। এখানে মাধবীর প্রতি অত্যাগ্রহী রাজাদের দেখুন। তাঁরা মাধবীর শরীর-সংস্থান বর্ণনা করে ভোগ করছেন, কিন্তু কাল পূর্ণ হলেই মাধবীকে ছেড়ে দিচ্ছেন— এটাও ব্রজদুলালবাবুর 'আব্যান্‌ডান্‌' নয়, ঔচিত্যবোধে নীতিগত 'অ্যাবান্‌ডান্‌'। মহাভারতের কবি বারবার মাধবীর ক্ষেত্রেও এই পরিত্যাগ-মর্ম প্রকাশ করে বলেছেন— মাধবী পূর্বোপভুক্তা ঐশ্বর্যময়ী রাজলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করে পুনরায় অন্য এক রাজার কাছে গেছেন। বিবাহিত স্বামী, তাঁর ঔরসজাত পুত্র এবং অভ্যস্ত রাজৈশ্বর্য পরিত্যাগ করে বারবার যিনি চলে আসছেন, তাঁর পক্ষে স্বয়ংবর-সৌভাগ্য পরিত্যাগ করে বনবাসী হওয়াটাও খুব আশ্চর্য কিছু নয়। বিশেষত সংসারের সুখ, শারীর মিলন এবং রাজসমাদর সবটাই তাঁর যথেষ্ট দেখা হয়ে গেছে— দেখে দেখে তিনি খানিক ক্লান্তও বটে, হয়তো বা এরই মধ্যে পৌরুষেয়তার অবিচারও একদেশিকভাবে অন্তর্গত, কিন্তু সেটাই সব নয় এবং সবার ওপরে তাঁর 'অ্যাবান্‌ডান্‌'-এর ভাবনাটাই মহাকাব্যিক বিচারে বেশি বিচারসহ হয়ে ওঠে। তিন জন বিশিষ্ট রাজা এবং এক রাজর্ষির সঙ্গে পর্যায়ক্রমে সংসার করে পুনরায় আবার এক নতুন সংসার পাতার অনীহাটাই হয়তো এখানে তপোবন-বাসের অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে।

অতএব অভিমান নয়, ঘৃণা নয়, অন্তর্জাত কোনও ক্রোধও নয়— পরার্থসাধনের মহত্ত্ব প্রকট করার একটা বিপ্রতীপ অত্যাগ্রহ যেমন যযাতি এবং গালবের মধ্যে দেখা গেছে, মাধবীর মধ্যেও সেটাই আছে। আর সেটা করতে গিয়েই একসময় তাঁর মধ্যে মহাভারতের অন্য অনেক চরিত্রের মতোই একটা 'হিরোইক অ্যাবান্‌ডান্‌' চলে এসেছে। হয়তো বা এর চেয়েও বড় কথা হল— যযাতি, গালব এবং মাধবীর সম্পূর্ণ সমন্বয়ী কাহিনি-চিত্রে মহাভারতের 'হিরোইক' ঔদার্য এবং মহত্ত্বটাই প্রধান, যেটা সবচেয়ে ভাল ধরেছেন প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ জরজেস দ্যুমেজিল। দ্যুমেজিল লিখেছেন— শুধু যে গালবের মতো এক ব্রহ্মচারী পুরুষ এক রমণীকে ব্যবসায়িকভাবে কাজে লাগিয়ে গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাল— এটাই এই মহাভারতীয় কাহিনির তাৎপর্য নয়। মাধবীর বাবা যে যযাতি গালবের অভীষ্ট পূরণ করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মেয়েটিকে তুলে দিলেন তাঁর হাতে এর মধ্যেও সেই মহাকাব্যিক বদান্যতার ইঙ্গিত আছে। এবং মাধবীর ব্যাপারে দ্যুমেজিলের বক্তব্য হল— Does not the young girl herself, seeing her guardian in a quandary, propose, heroically also, perhaps—that he divide her worth in moon-colored horses by four and thus multiply by four the number of her partners.

দ্যুমেজিল সঠিকভাবেই মহাভারতের মহাকাব্যিক ঐশ্বর্য মাথায় রেখেই জানিয়েছেন— আটশো ঘোড়ার বদলে চার জন রাজার সঙ্গ ব্যাপারটাকে যদি 'প্রভিশনাল' ধরা যায়, তবুও বিভিন্ন পর্যায়ে ওই চার-চারটি বিবাহেরও সম্পূর্ণ বৈধতা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবাহগুলির সত্যতা এবং সম্মান দুইই সম্পূর্ণ স্বীকার করতে হবে। দেবতারাও এই বিবাহে কোনও দোষ দেখেননি। এখন যদি শুধু মাধবীর দিক থেকেই ঘটনা বিচার করতে হয়, তা হলেও সেটাকে মহাকাব্য মহাভারতের ভাবনাতেই করতে হবে।

এই যে মাধবী স্বয়ংবর বিবাহের ভবিষ্যৎ সুখ অতিক্রম করে অরণ্য আশ্রয় করলেন, এটাকে যাঁরা মাধবীর বিরাট অভিমান ভেবে পৌরুষের অত্যাচারের কাহিনি ফেঁদে বসেছেন, তাঁরা স্বাভীষ্ট প্রতিপাদন করছেন মাত্র। কেননা মাধবীর ঘটনার মহাকাব্যের উদ্দেশ্য আরও অনেক দূর প্রসারিত এবং সেটা মহাকাব্যিক দৃষ্টিতেই বুঝতে হবে। আরও লক্ষণীয়, তপোবনে মাধবী খুব কষ্টে এবং অবসাদে জীবন কাটাচ্ছিলেন, এমনটাও নয় কিন্তু। তপোবন-বাসের বিধিতে উপবাস, ব্রতদীক্ষা এবং নিয়মের কড়াকড়ি কিছু ছিলই। কিন্তু এর মধ্যেও তাঁর জীবন-ধারণের ভাবনাটার মধ্যে যেন একটা গভীর বন্ধন-মুক্তির আনন্দ দেখতে পাচ্ছি। বনের মধ্যে কখনও তিনি নরম সবুজ তৃণরাজির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কখনও পান করছেন নদীর শীতল-নির্মল জল, আবার কখনও গভীর বনে— যেখানে বাঘ-সিংহের উপদ্রব নেই— তেমন জায়গায় হরিণদের সঙ্গে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। তখন তাঁকে দেখেও মৃগযূথের মধ্যে এক হরিণীর মতো মনে হয়— চরন্তী হরিণৈঃ সার্ধং মৃগীব বনচারিণী।

দ্যুমেজিল মহাভারতের বিস্তারে মাধবীকে মহাকাব্যিক দৃষ্টিতে বিচার করে লিখেছেন— মাধবী কোনও পাপ করেননি, কোনও পাপবোধেও তিনি ভুগছেন না। যে আরণ্যক জীবন তিনি বেছে নিয়েছেন, তার মধ্যে পশুত্বহীন এক আরণ্যকতা আছে এবং সেটা তিনি উপভোগ করছেন নিজের মধ্যেও— which she undertakes when she again finds herself free, is not an act of repentence, a sinner's expiation, but the belated realization of a vocation long thwarted—for approximately four years—by the execution of an urgent duty. এর মধ্যে ধর্ম তো আছেই আর আছে ভবিষ্যতের ধর্মার্থসিদ্ধির প্রয়োজন, যেটা মাধবীর মাধ্যমেই সম্পূর্ণ হবে, যদিও সেখানে আরও এক পরার্থসাধন লুকিয়ে আছে— intended for another person's advantage এবং এইখানেই মহাভারতের তাৎকালীন মহাকাব্যিক অভিসন্ধিটুকু স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মহাভারতকে যাঁরা সংরক্ষণশীল ভাবনায় দেখেন, তাঁরাও এখন বলবেন যে, মাধবীর কাহিনিতে চার জন অপুত্রক রাজার পুত্রেরা— বলা উচিত, মাধবীর মতো মেয়ের ঘরে যযাতি যে সব নাতিদের পেলেন— সেই পুত্রেরা এবার যযাতির পরকালের কাজে লাগছেন এবং এটাই মাধবীর কাহিনির প্রধান উপযোগ। সবচেয়ে বড় কথা— মাধবীর কাহিনিতে এটাই তৎকালীন সমাজের বিশ্বাসের বিস্তার। ঘটনাটা সংক্ষেপে বলি। মহারাজ যযাতির জীবন আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়। শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর সঙ্গে বিবাহের পরেও শর্মিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর পার্শ্বিক মিলন, শুক্রাচার্যের অভিশাপ— হাজার বছরের জরা। শর্মিষ্ঠার গর্ভজাত পুত্র পুরু তাঁর জরা গ্রহণ করে যৌবন ফিরিয়ে দিলেন এবং অনন্ত ভোগের পর যযাতি স্বীকার করলেন— কাম উপভোগ করে কামনার শান্তি হয় না— তিনি পুনরায় জরা গ্রহণ করে পুরুকে সিংহাসনে বসালেন, অনেক তপস্যার পর মারা গেলেন। পুরু আর

যদু— শর্মিষ্ঠা এবং দেবযানীর গর্ভে দুই জ্যেষ্ঠ পুত্রের পিণ্ডলাভ করে যযাতি স্বর্গে গেলেন এবং সুখময় স্বর্গসুখ ভোগ করতে লাগলেন বহু বছর ধরে।

তারপর অন্য লোকের ক্ষেত্রে যা হয় না, যযাতির তাই হল। তিনি বহুকাল স্বর্গবাস করে খানিক উদ্ধত হয়ে উঠলেন এবং স্বর্গ থেকে তাঁর পতন হল। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে যখন মাধবীর কাহিনি বিস্তারিত হচ্ছে, সেখানে দেখা যাবে— যযাতির এই স্বর্গপতন আপন তপস্যাবলে রোধ করছেন তাঁর মেয়ের ঘরে জন্মানো সেই নাতিরা অর্থাৎ মাধবীর সেই বৎসরান্তিক মিলনজাত বীর তপস্বী পুত্রেরা। যযাতির ঔরসজাত যদু-পুরু ইত্যাদি পুত্রদের পিতৃপিণ্ড তাঁদের পিতাকে স্বর্গে ধারণ করতে পারল না, আর তাঁর মেয়ের ঘরের ছেলেদের যাজ্ঞিক ক্রিয়া তাঁর স্বর্গপতন রোধ করে তাঁকে পুনরায় স্বর্গে স্থিত করছে, এমনকী মেয়ে হলেও মাধবীরও সেখানে অবদান আছে— এই সম্পূর্ণ কাহিনি মহাভারত এখন বলবে এবং তৎকালীন সমাজের পৌরুষেয়তার মধ্যে এই কাহিনি-বিস্তার যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা শুধু মহাভারতের উদ্যোগপর্বে মাধবীর শেষ জীবনের কাহিনির মধ্যেই আসেনি, সেটা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে মহাভারতের আদিপর্বে, যেখানে যযাতির উপাখ্যানটাই প্রধান, মাধবী সেখানে প্রায় উল্লিখিতই নন, কিন্তু তাঁরই গর্ভজাত চার পুত্রের কথা সেখানে সবিস্তারে আছে।

মহাভারতের আদিপর্বে যযাতি যখন স্বর্গলোকে পুণ্যভোগ করছেন, এবং সেই পুণ্যবলে স্বর্গস্থানেও যখন তিনি এক বিরাট মান্য-গণ্য মানুষ হয়ে উঠেছেন, এই সময় দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। ইন্দ্র তাঁর কাছে জীবনের নানান কর্তব্য সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি বিস্তর উপদেশ দিলেন এবং সে উপদেশগুলি এমন যেন তিনি স্বয়ং সেইসব উপদেশের মূর্ত প্রতিফলন। এবার ইন্দ্র তাঁকে খুব ঠাণ্ডা মাথায় বললেন— আপনি তো সাংসারিক জীবন শেষ করে বহুদিন মুনিবৃত্তি অবলম্বন করে বনে বাস করেছিলেন। এবার বলুন তো— আপনি তপস্যায় কার সমান হয়েছেন। যযাতি সাহংকারে বললেন— আমি দেবতা-মনুষ্য-মহর্ষিদের মধ্যে কাউকেই আমার সমান তপস্বী বলে মনে করি না। ইন্দ্র দুঃখিত হয়ে বললেন— আপনি যখন আপনার সমান এবং আপনার চেয়ে উৎকৃষ্ট তপস্বীদের এইভাবে খাটো করলেন তবে এখনই স্বর্গ থেকে আপনার পতন ঘটবে। পতন অবধারিত জেনেই যযাতি আর কথা বাড়ালেন না। দেবরাজকে তিনি অনুরোধ করলেন— স্বর্গ থেকে যদি আমার পতনই হয়, তবে আমি যেন সাধু-সজ্জনের ভিতরে গিয়ে পড়ি। এমনিতে যযাতি পুণ্যবান কীর্তিশালী মানুষ; দেবরাজ তাঁর প্রার্থনা মেনে নিলেন।

স্বর্গ থেকে পতনের কালে যযাতি এক সময় দেখলেন— নৈমিষারণ্যে চার জন রাজা যজ্ঞ করছেন। যজ্ঞে আহুতি দেওয়া ঘৃত-ভস্মের গন্ধ স্বর্গের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছোচ্ছে— তেষাম্ অধ্বরজং ধূমং স্বর্গদ্বারমুপস্থিতম্। যযাতি সেই ঘৃতধূম আঘ্রাণ করতে করতে সেই ধূমধারার ভূমিদিশা অনুসরণ করে স্বর্গ থেকে পতিত হলেন সেই পুণ্য যজ্ঞস্থলে। সেখানে চারজন রাজা যজ্ঞস্নান করে যজ্ঞ করছিলেন। যযাতি তাঁদের মাঝে এসে দাঁড়ালেন। তিনি এই চার জন রাজাকে চিনতে পারলেন না, রাজারাও চিনতে পারলেন না তাঁকে। এই চারজন আসলে যযাতি-কন্যা মাধবীর পুত্র— হর্যশ্বের ঔরসজাত বসুমান বা বসুমনা, কাশীশ্বর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন, উশীনরের ঔরসজাত শিবি এবং বিশ্বামিত্রের আত্মজ অষ্টক। মহাভারতের আদিপর্বের কাহিনি-বিস্তারে মাধবীর কথা এবং নাম কোনওটাই উচ্চারিত হয়নি এবং মাধবীর চার ছেলের নাম কোথাও কোথাও বলা হলেও প্রধানত বৈশ্বামিত্র অষ্টকই সেখানে কথা বলেছেন মাতামহ যযাতির সঙ্গে। আদিপর্বের কাহিনিতে আরও একটা বিশিষ্টতা হল— যযাতি স্বর্গ থেকে পুরোপুরি পতিত হচ্ছেন না, তিনি আকাশ-মার্গ থেকেই অষ্টকের সঙ্গে কথা চালিয়ে যাচ্ছেন আর অষ্টক ছাড়া মাধবীর আর তিন পুত্র একেবারে শেষে তাঁদের সঞ্চিত পুণ্য দান করছেন যযাতিকে পুনরায় স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। আর বসুমনা উদ্যোগপর্বে মাধবীর কাহিনিতে হর্যশ্বের পুত্র হলেও আদিপর্বে ঈষৎ অন্য নাম উষদশ্বের পুত্র।

আমরা আদিপর্বের কাহিনিতে প্রবেশ করব না, কেননা এখানে যযাতি অষ্টকের সঙ্গে জীবন-যাপনের দার্শনিক সংলাপে রত আছেন। কথাগুলি যথেষ্টই মূল্যবান, কিন্তু আমাদের কৌতূহলের জায়গা হল যযাতি এবং তাঁর মেয়ের ঘরের ছেলেরা কেউই তাঁদের নিজস্ব পরিচয় দিচ্ছেন না, কিন্তু মহাভারতের কথক-ঠাকুর বৈশম্পায়ন জানাচ্ছেন— অষ্টক তাঁর মাতামহের সঙ্গে কথা বলছেন— মাতামহং সর্বগুণোপপন্নং/ অথাষ্টকঃ পুনরেবান্বপৃচ্ছৎ।

আর বৃহৎ-বিরাট এক দার্শনিক সংলাপের শেষে যযাতির চার দুহিতৃপুত্ররা তাঁদের সঞ্চিত পুণ্যভাগ যযাতিকে দিলেন প্রায় বিনা পরিচয়েই, যদিও যযাতি রাজা এর আগে চার দৌহিত্রের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্র এড়িয়ে গেলেও তাঁদের বদান্যতায় মুগ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত বলেছেন— তোমরা আমার অত্যন্ত নিজের জন, আমি তোমাদের মাতামহ— এই গোপন কথাটা এবার জেনেই নাও— গুহ্যঞ্চার্থং মামকেভ্যো ব্রবীমি/ মাতামহোঽহং ভবতাং প্রকাশম্। লক্ষণীয়, এখানেও কিন্তু মাতা মাধবীর নাম উচ্চারিত হল না একবারও, কিন্তু পরিশেষে মহাভারতের কথক-ঠাকুর এই সত্যটা যযাতি-কাহিনির তাৎপর্য হিসেবে জানাচ্ছেন— গার্হস্থ-পরম্পরায় পুত্র-সন্তানই সব নয়, তাঁরা যযাতির স্বর্গপতন রোধ করতে পারেননি, কিন্তু মেয়ের ঘরের ছেলেরা তাঁর সেই উপকার করলেন যাতে তাঁদের মাতামহ চিরস্থায়ী আবাস লাভ করলেন স্বর্গলোকে— এবং রাজা স মহাত্মা হ্যতীব/ স্বৈর্দৌহিত্রৈ-স্তারিতোঽমিত্রসাহ।

হয়তো মাতামহ এবং দৌহিত্রদের এই কাহিনিতে তত্ত্ব হিসেবে দুহিতা মাধবীর আত্মদানের মাহাত্ম্যকাহিনি নেই বলেই যুদ্ধের উদ্যোগপর্বে এসে মাধবীর কাহিনি বিশদভাবে লিখতে হয়েছে মহাভারতের কবিকে। এখানে বিশেষত্ব এই যে, যজ্ঞস্থলে পতিত হওয়া-মাত্রই চার দৌহিত্র যখন যযাতির পরিচয়-প্রশ্ন করছেন, তখন যযাতি বলছেন— আমি যযাতি। আমার পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেছে, তাই স্বর্গ থেকে পতন ঘটেছে আমার। এখানে বিরাট দার্শনিক সংলাপ চলল না বহুক্ষণ ধরে। বসুমনা, প্রতর্দন, শিবি এবং অষ্টক এখানে সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের যজ্ঞকর্মের পুণ্যফল গ্রহণ করতে বললেন যযাতিকে। যযাতি অস্বীকার করলেন অপরের পুণ্যভাগ নিয়ে নিজের স্বার্থ পূরণ করতে। বিশেষত যযাতি বললেন— আমি তো ব্রাহ্মণ নই যে, অন্যের দান প্রতিগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করব। আমি ক্ষত্রিয়। এই অবস্থায় আদিপর্বে মাধবীর চার পুত্র মাতৃপরিচয় না দিয়েই নিজেদের ক্ষত্রিয়ত্বের কথা বলেছিলেন, কিন্তু এখানে প্রশ্ন ওঠা-মাত্রই বনচারিণী মাধবীকে আমরা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হতে দেখছি।

মাধবীকে দেখে চারজন রাজাই তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন— তপস্বিনী মা আমাদের! কষ্ট করে তোমার আবার এখানে আসার প্রয়োজন হল কেন? কী আদেশ তোমার বলো। আমরা তোমার ছেলে, আমরা সকলেই তোমার আজ্ঞার অধীন, তুমি যা আদেশ করবে তাই করব— আজ্ঞাপ্যা হি বয়ং সর্বে তব পুত্রাস্তপোধনে।

আমরা মনে করি— মহাভারতে মাধবী-কাহিনির তাৎপর্য এইখানে। তৎকালীন সমাজের দৃষ্টিতে মহাভারতের কবি এখানে পৌরুষেয়তার বিপরীত মেরুতে গিয়ে মেয়েদের শক্তির জায়গাটা দেখাচ্ছেন। পারলৌকিক জগৎটা মহাভারত পুরাণে এক ভয়ংকর গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, যেখানে পুত্র-সন্তানের ভূমিকাটা মেয়েদের চেয়ে বড় হয়ে উঠে পুরুষতান্ত্রিকতাকে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু যযাতির পারলৌকিক জীবনের কাহিনিতে তাঁর আপন ঔরসজাত পুত্র সন্তানদের ভূমিকা কার্যকরী হচ্ছে না। এখানে মেয়ের ঘরের অপেক্ষা রয়েছে। হয়তো মেয়ের ঘরের পুত্র সন্তানের কথায় পৌরুষেয়তা একভাবে জয়ী হয়, কিন্তু তবু মেয়েদের একটা ক্ষমতার পরিসর তৈরি হচ্ছে। যযাতির পারলৌকিক স্থিতির জন্য মেয়ের ঘর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে বড় কথা— পিতৃপুরুষের পুণ্য-পাপের ক্ষেত্রে মেয়েদের যে intervention— এটা যে সমাজের পুরুষাবসায়িতার প্রেক্ষিতে কতটা বিপ্রতীপভাবে গুরুত্বপূর্ণ, সেটা তাঁরাই বুঝবেন, যাঁরা পৌরাণিক সমাজটাকে চেনেন। লক্ষ করে দেখুন, পুত্রদের বিনয়-বচন শুনে মাধবী যযাতির সামনে গিয়ে তাঁর প্রত্যেক পুত্রের মস্তক স্পর্শ করে বলেছেন— রাজশ্রেষ্ঠ পিতা আমার! এরা সব আমার ছেলে, আপনার নাতি, আপনার মেয়ের ঘরের ছেলে সব, এরা কেউ আপনার পর নয়— দৌহিত্রাস্তব রাজেন্দ্র মম পুত্রা ন তে পরাঃ। এরাই আপনাকে সমূহ স্বর্গপতন থেকে উদ্ধার করবে।

মাধবীর কোনও অভিমান নেই পিতার ওপর, কোনও রাগও নেই। বরঞ্চ পিতার পারলৌকিক বিপন্নতায় আজ তিনি পুত্র-সন্তানদের মতোই তাঁর শাস্ত্রীয় সহায় হয়ে উঠছেন। যে ত্যাগ এবং অনাসক্তিতে পিতার দান-ধর্মকে তিনি মর্যাদা দিয়েছিলেন, যে অনাসক্ত চেতনায় তিনি চার-চার জন পুরুষের বিবাহিতা স্ত্রী হয়েও বন্য জীবন বরণ করে নিয়েছেন, ঠিক সেই গৌরবেই আজ তিনি পিতাকে বলছেন— আমি আপনার সেই মেয়ে মাধবী, আমিও তো বন্য হরিণীদের মধ্যে বাস করে ত্যাগ-বৈরাগ্যে অনেক পুণ্য সঞ্চয় করেছি— অহং তে দুহিতা রাজন্ মাধবী মৃগচারিণী। আমার সেই সঞ্চিত পুণ্য থেকে অর্ধেক আপনি গ্রহণ করুন। মাধবী মেয়ে হিসেবে শুধুমাত্র মমতাময় এক বক্তব্য নিবেদন করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, পিতার পারলৌকিক কৃত্যে এত দিন শুধু পুত্রসন্তানের ভূমিকাই মুখ্য হয়ে উঠত, কিন্তু তাদের সঞ্চিত পুণ্যভার পিতা যযাতিকে সম্পূর্ণ ধারণ করতে পারল না। আজকে পুনরায় তাঁর স্বর্গস্থিতির জন্য মেয়ের ঘরের পুরুষ সন্তানদের ভূমিকায় যেমন কন্যার আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়ন ঘটছে, তেমনই মাধবী নিজেও কন্যা হিসেবে পিতার পারলৌকিক স্থিতির মধ্যে অংশ গ্রহণ করছেন। তিনি বলছেন— আমিও তো তপস্যার দ্বারা পুণ্যসঞ্চয় করেছি, সেই পুণ্যের অর্ধেক ভাগ তোমার জন্য রইল— ময়াপ্যুপচিতো ধর্মস্ততোঽর্ধং প্রতিগৃহ্যতাম্। তা ছাড়া এই তো তোমার সময়, যখন মানুষ সন্তানদের পিতৃকৃত্যের ফল ভোগ করে, পুত্র-সন্তানের পিতৃকৃত্যের ফল ভোগ করে, পুত্র-সন্তানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিতৃকৃত্যের পরেও মানুষ মেয়ের ঘরের ছেলে, দৌহিত্রদের কাছ থেকে পুণ্যভাগ আশা করে— তুমি তো তাই চেয়েছিল, যার জন্য গালবের সঙ্গে গিয়ে আমি তোমার নাতিদের গর্ভে ধারণ করেছি— তস্মাদিচ্ছন্তি দৌহিত্রান্ যথা ত্বং বসুধাধিপ।

মহাভারতে মাধবীর কাহিনির তাৎপর্য কিন্তু এইখানে। তৎকালীন পুরুষপ্রধান সমাজে একটা স্মার্ত বা ধর্মশাস্ত্রীয় দ্বন্দ্ব এইভাবেই তৈরি হয়েছিল। দ্বন্দ্ব ছিল যে, শুধু পুরুষ সন্তানই পিতৃকৃত্যের অধিকারী। পরবর্তী কালে মেয়ের ঘরের ছেলেরা প্রেতজনের পুত্রাভাবে শ্রাদ্ধাদিকর্মের অধিকারী হয়েছে, অধিকারী হয়েছে মেয়েরাও, কিন্তু তার মধ্যেও কিছু পৌরুষেয়তা আছে, সেই স্মৃতি শাস্ত্রীয় ভাবনায় এখন আমরা প্রবেশ করব না। শুধু এইটুকু জানিয়ে ক্ষান্ত হব যে, মাধবী পুরুষায়িত সমাজে মেয়েদের একটা ভূমিকা এবং গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করছেন। এর মধ্যে চার জন রাজার সঙ্গ এবং তাঁদের ঔরসে সন্তান ধারণের ঘটনাটা আজকের পরিশীলিত চিন্তনে স্ত্রীলোককে একটা ব্যবহারিক বস্তুপিণ্ডে পরিণত করলেও মহাভারতের কাল এই বিষয়টাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। তার মানে এই নয় যে, স্ত্রীলোকের যৌনতার ক্ষেত্রটা বেশ উদার ছিল, কিন্তু সেটা না হলেও এই ক্ষেত্র অনেক প্রসারিত এবং মুক্ত ছিল নিশ্চয়, বিশেষত মাধবীর চার-চার-জন পুরুষসঙ্গের মধ্যে যাঁরা পৌরুষেয় ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ করছেন, তাঁরা কিন্তু বিপ্রতীপভাবে চিরকালীন সতীত্বের ভাবনাতেই বেশি আবদ্ধ হয়ে আছেন। পুরুষসঙ্গের ক্ষেত্রে মাধবীর স্পষ্ট, ত্বরিত এবং নিজস্ব অনুমোদনটা তাঁদের মাথাতেই আসে না। তার মধ্যে মাধবীর বিধিসম্মত চার-চারটি বিবাহ— আমরা মনে করি, এটা সতীত্বের পরিভ্রষ্ট ব্যবহারিক বঞ্চনার চেয়ে অনেক বেশি আধুনিক।

পরিশেষে আরও দু-একটি কথা জানাতে হবে। মাধবীর চার পুত্র এবং স্বয়ং মাধবী স্বর্গভ্রষ্ট যযাতিকে মর্ত্যভূমিতে পা রাখবার আগেই নিজেদের সঞ্চিত পুণ্যবলে তাঁকে স্বর্গে প্রতিষ্ঠা করলেন। ঠিক এই সময়ে আমরা গালব ঋষিকেও একবার দেখতে পাই। তিনিও তাঁর সঞ্চিত পুণ্যের অষ্টম ভাগ যযাতিকে দিতে এসেছেন। এখানে একটা রোম্যান্টিক কল্পনা চলতেই থাকে। যযাতি তাঁর হাতেই কন্যা মাধবীকে সঁপে দিয়েছিলেন, তিনি তাঁকে নিয়ে গেছেন বিভিন্ন রাজার কাছে এবং গালবের জন্যই মাধবী একের বদলে চারজন রাজার সঙ্গ করতে রাজি হয়েছিলেন— সেই গালব আজ উপস্থিত হয়েছেন। সে কি মাধবীর জন্য? আমরা বলব— মহাভারত এখানে অনেকটাই নির্বিকার, বরঞ্চ গালব যযাতির প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতই আজ এখানে উপস্থিত, যযাতি যদি তাঁকে অনুগ্রহ না করতেন, তা হলে গুরুর কাছে প্রতিজ্ঞা পালন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অতএব গালবের এই সময়ে উপস্থিত হওয়াটা মাধবীর প্রতি কোনও সহমর্মিতায় নয়, এটা আমরা হলফ করে বলতে পারি।

মাধবী এবং মাধবীর চার পুত্র নিয়ে স্মৃতিশাস্ত্রীয় বিধানের যেটুকু প্রসার ঘটেছে স্ত্রীলোকের ক্ষমতায়নে, মহামতি দ্যুমেজিল এখানে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন— যযাতি বোধহয় সেই মূল রাজপুরুষ যার পুত্র পরম্পরায় ভারতবর্ষে অনেকগুলি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। মূল ভূখণ্ডে তাঁর কনিষ্ঠপুত্র পুরুর অবস্থিতি ছাড়াও যদু, দ্রুহ্যু, তুর্বসুর মাধ্যমে আর্য-অনার্য বিভিন্ন নিবাসে বিভিন্ন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। দ্যুমেজিল

বলছেন— কন্যা মাধবীর মাধ্যমে চার জন রাজার ঔরসে যে পুত্রগুলি জন্মাল, তাতে যযাতি আরও প্রসারিত হলেন এবং এঁরা হচ্ছেন সেই 'সেকেন্ড সেট অব কিংস' যাঁদের প্রভাব বুদ্ধের সময় পর্যন্ত প্রসারিত। কাজেই দ্যুমেজিলের মতে মাধবী আসলে তৎকালীন সময়ে ক্ষত্রিয়-রাজবংশ প্রসারণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করছেন। এমনকী যে বিশ্বামিত্র মুনি, যিনি পূর্বে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং পরে ব্রাহ্মণ্য লাভ করেন, তিনিও যে বংশধারা তৈরি করেছেন মাধবীর গর্ভে, তিনিও ক্ষত্রিয় হিসেবেই পরিচিত হয়েছেন এবং তিনিও রাজা।

সত্যি কথা বলতে কী, আমরা দ্যুমেজিলের মতও মেনে নিতে খানিক রাজি আছি, কেননা সেখানেও মাধবীর বংশকারিতার ভাবনাই আছে, যেমনটা আছে যযাতির দুহিতৃ-পুত্রের স্মৃতিশাস্ত্রীয় বংশকারিতার মাধ্যমে যযাতির স্বর্গচ্যুতি রোধ করার মধ্যে। যদি বলি, মহাভারতে মাধবী-কাহিনির এটাই 'প্রাইমারি মোটিফ', তা হলে ভুল হয় না, কিন্তু এই কাহিনির একটা 'আলটেরিয়র মোটিফ'ও আছে এবং সেটা কিন্তু সেই 'অত্যাগ্রহ' অর্থাৎ একটা বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি— এর মধ্যে যযাতির অতিরিক্ত বদান্যতা যেমন আছে, তেমনই আছে গালবের দক্ষিণা-দানের অত্যাগ্রহ। এখানে বিশ্বামিত্র মুনির অত্যাগ্রহ যেমন দক্ষিণার পরিমাণ যথা বস্তুটা নিয়ে অনর্থক বাড়াবাড়ি— ভাবুন একবার, আটশো ঘোড়া চাই, তার প্রত্যেকটার কানগুলো হবে কালো অথচ শরীরটা যেন জ্যোৎস্না-ধোয়া শুভ্রবর্ণ— এটা একটা ভয়ংকর বাড়াবাড়ি। আর মাধবীর কথা তো বলেইছি— সমস্ত স্ত্রীলোকের একপতিক পাতিব্রত্য অতিক্রম করে তিনি স্বেচ্ছায় চার চার জন স্বামীর যৌন সম্বন্ধ এবং বলা উচিত, যৌন অত্যাচারও মেনে নিয়েছেন পুত্রলাভের জন্য। তবে এখানে স্ত্রীলোককে পণ্য হিসেবে পৌরুষেয় ব্যবহার করার প্রবণতার চেয়েও অনেক বেশি 'ইনট্রিগিং' হল পুরুষের যৌন আচরণ। বেশি বয়সের ইক্ষ্বাকু-কুল-ধুরন্ধর যেভাবে মাধবীকে দেখেই তাঁর শরীর বর্ণনা করে যৌনতা উপভোগ করেছেন, তার চেয়েও বেশি 'ইনট্রিগিং' ছিল বিশ্বামিত্র গুরুর আসঙ্গ-লিপ্সার প্রসঙ্গ, যেটা একজন বৈরাগ্যবান মুনির পক্ষে নিতান্তই বাড়াবাড়ি ছিল। গালবকে তিনি বলেছিলেন— ঘোড়াই যখন যোগাড় করতে পারোনি, তখন আমার কাছে মাধবীকে নিয়ে আগে এলেই পারতে— আমি চার-চারটি পুত্র সন্তানের পিতা হতে পারতাম। এটা কি 'শুধু' 'প্রোক্রিয়েশন' বা 'প্রোজেনি'-র তাড়না! নাকি তার চেয়েও মহাশক্তিশালিনী সেই যৌনতা, যা একজন তপস্বী গুরুকেও শিষ্যের সামনে লজ্জিত করে না।

মহাভারত কিন্তু নির্লজ্জভাবেই এই সব কথা বলেছে, কাজেই মাধবীর জীবনে যদি পুরুষের অত্যাচারের প্রসঙ্গটাই প্রধান হত, সেটা বলতেও তিনি নির্লজ্জই হতেন। এটা ভীষণ রকমের ঠিক যে, মহাভারতে মাধবীর চরিত্র-ভাবনা অত্যন্ত জটিল এবং ঘটনা-পরম্পরায় দৃষ্টি রাখলে একটা আপাত সিদ্ধান্ত নেবার বিভ্রান্তিটাও খুব স্বাভাবিক। কিন্তু কেউ যদি মাধবীর কাহিনিতে একটা ঘটনা লক্ষ করেন, তা হলে বুঝবেন— কোনও বিকৃত কামনায় স্ত্রীলোককে আক্রান্ত করাটা মাধবী-কাহিনির উদ্দেশ্য নয়। গুরুঠাকুরের ঘোড়া যোগাড় করার জন্য গালব যখন বিষ্ণুবাহন গরুড়ের পিঠে চড়ে পৃথিবীর চার দিক চষে ফেলেছেন, তখন তিনি ঋষভ পর্বতে বিশ্রাম করার সময় শাণ্ডিলী নামে এক তপস্বিনী ব্রাহ্মণীকে দেখতে পান। বস্তুত তিনিই খাবার-দাবার দিয়ে দুই নতুন অতিথিকে তৃপ্ত করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাবার খেয়ে দু'জনের চোখেই ঘুম নেমেছে, এমন সময় গরুড়ের ঘুম ভেঙে গেল এবং তিনি হঠাৎই চোখের সামনে সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী তপস্বিনীকে দেখতে পেলেন— তাং দৃষ্টা চারুসর্বাঙ্গীং তাপসীং ব্রহ্মচারিণীম্। তাঁকে দেখে গরুড়ের মনে হল— এই তপস্বিনী রমণীকে তিনি নিয়ে যাবেন— গ্রহীতুং হি মনশ্চক্রে। কিন্তু এই ভাবনা মনের মধ্যে আসামাত্রেই গরুড়ের সমস্ত পাখা-পালকগুলি গা থেকে খসে গেল। গরুড়ের এই অবস্থা দেখে পথের বন্ধু গালব খুব বিষণ্ণ হলেন। তিনি বললেন— তুমি কি ধর্মদূষক কোনও চিন্তা করেছ ভায়া! খুব অল্পদূষিত কুচিন্তার ফল তো এটা নয়— ন হ্যয়ং ভবতঃ স্বল্পো ব্যভিচারো ভবিষ্যতি!

গরুড় বললেন— দ্যাখো ভায়া! আমি কখনও খারাপ কিছু ভাবিনি। শুধু ভেবেছিলাম— এই সিদ্ধা রমণীর স্থান এই ঋষভ পর্বত নয়। যেখানে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মতো ভগবৎপুরুষ আছেন, সেইখানে এঁকে নিয়ে যাব বলে ভেবেছিলাম এবং এই সত্য এই তপস্বিনী শাণ্ডিলীর কাছেও জানাব। গরুড় শাণ্ডিলীকে বললেন— আপনার প্রতি মর্যাদার গৌরবেই আমি এইরকম ভেবেছিলাম, কিন্তু সেটা আপনার ভাল লাগেনি। কিন্তু আপনি দয়া করে ভুল বুঝবেন না আমাকে। গরুড়ের আকুতি শুনে শাণ্ডিলী তাঁকে নতুন পাখা গজানোর আশীর্বাদ দিলেন, কিন্তু সাবধান করে দিয়ে বললেন— আমাকে নীচ-চক্ষুতে দেখলে তার ফল ভাল হবে না। তুমি যদি নিজের জন্য আমাকে নিয়ে যাবার কথা ভাবতে— যদি ত্বমাত্মনো হ্যর্থে মাঙ্ক্ষ্বাদাতুমিচ্ছসি, তা হলে তোমার মোটেই ভাল হত না। আমি শুধু বলব— আমাকে যেন খারাপ চোখে দেখার চেষ্টা কোরো না, আর শুধু আমি কেন, কোনও মেয়েকেই যেন গর্হিত চোখে দেখার চেষ্টা কোরো না— ন চ তে গর্হনীয়াহং গর্হিতব্যাঃ স্ত্রিয়ঃ ক্বচিৎ। তুমি নিজের জন্য আমাকে নিয়ে যাওয়ার কথা না ভেবে দেবদেব মহাদেব বা বিষ্ণুর জন্য আমার কথা ভেবেছিলে, তাতে সেই পরম দেবতাদের আশীর্বাদেই আবার তোমার পাখা গজাবে— তস্যৈব হি প্রসাদেন দেবদেবস্য চিন্তনাৎ।

আমরা বলব— মাধবী-কাহিনির সুর বাঁধা হয়ে গেছে এইখানে। এখানে সবটাই পরের জন্য ঘটছে— যযাতি পরের জন্য ভাবছেন, গালব পরের জন্য ভাবছেন, মাধবীও পরের জন্য ভাবছেন— কিন্তু সমস্ত ভাবনাগুলির মধ্যেই অত্যাগ্রহ বা বাড়াবাড়ি আছে বলেই— এই অত্যাগ্রহ ত্যাগ করার জন্য যুদ্ধপ্রিয় দুর্যোধনকে উদ্যোগপর্বে গালব এবং মাধবীর কাহিনি শোনানো হচ্ছে। মহাভারতে মাধবী কাহিনির এটাই 'আলটেরিয়র মোটিভ'।

উত্তরা

আমাদের দেশের সামাজিক পরিস্থিতিই ব্যাপারটাকে একেবারে জলভাত করে দিয়েছে। এটা এই সেদিন পর্যন্তও খুব অস্বাভাবিক লাগত না, অসামাজিক তো নয়ই। হাটে-মাঠে, বাসে-ট্রেনে এখনও দেখতে পাই রীতিমতো জীর্ণ বয়সের বর কচি বউ বিয়ে করে নিয়ে সদর্পে পথ বেয়ে চলেছে। জানি, এ-সবের মধ্যে কন্যাপক্ষের সামাজিক বিপন্নতা আছে, আছে অর্থনৈতিক অসহায়তা। আরও জানি— এ-সব প্রেম-ভালবাসার ক্ষেত্র নয়, এ হল বলবত্তর পৌরুষেয়তার কাছে আর্থিক অস্বাতন্ত্র্যের পরাজয়। কিন্তু তেমন কোনও ঘটনা আমি লিখতে বসিনি এখানে, প্রায় বৃদ্ধ দশরথের সঙ্গে তরুণী কৈকেয়ীর বিবাহ-সংবাদের মতো ঘটনাও এটা নয়, পাছে আপনারা এইরকমই কিছু একটা ভেবে বসেন, সেইজন্যই বরঞ্চ আগে থেকে কিছু সাফাই গেয়ে রাখছি।

এটা তো নিশ্চয়ই খুব অস্বাভাবিক ভাববেন— আমার এক বন্ধু তখন আমরা উনিশ-কুড়ি হব— সে আমার অপর এক বন্ধুর বড় দিদিকে বেশ পছন্দ করত। দিদি তখন পঁচিশ-ছাব্বিশ হবেন— আবেগের আতিশয্যে বন্ধু তাঁকে প্রেম নিবেদন করবে বলেই ঠিক করল। যে বন্ধুর দিদি, সেই বন্ধু বাড়িতে আসন্ন বিপদ এবং স্বয়ং দিদির চড়-চাপড়ের ভয়ে চরম অস্বস্তিতে দিন কাটাতে আরম্ভ করল। চা-চক্রীরা প্রচুর উত্তপ্ত আলোচনার পর পুঁথিগত নানান বিদ্যার ওপর নির্ভর করে ঘটনাটাকে নেহাত ইনফ্যাচুয়েশন আখ্যা দিয়ে প্রেম-প্রবৃত্ত বন্ধুকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করল। ঘটনার শেষটা অবশ্য অজা-যুদ্ধের পরিণতি লাভ করেছিল। বলা বাহুল্য, দিদি তাঁর প্রতি এই বালক-কিশোর উত্তীয়-বন্ধুর প্রেমমত্ততা জানতে পেরে অন্তরে পুলকিত, কিন্তু বাহ্যে সমাজ রক্ষার তাগিদে ছেলেটিকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং প্রচুর বাৎসল্য বিকিরণ করে সামাজিক সার্থকতার পথ নির্দেশ করেছিলেন।

বলতে পারেন, প্রথমে অস্বাভাবিক হলেও শেষ পর্যন্ত এখানে স্বাভাবিকতার জয় হয়েছে। কিন্তু যদি ঘটনাটা উলটো হয়, অর্থাৎ যদি কোনও কৈশোরগন্ধী রমণী তার চেয়ে অনেক বেশি বয়সি পুরুষের প্রেমে পড়েন তবে সেখানে প্রথমে একটু উত্তেজনা এবং চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু এমন একটা বিয়ে হলে পুরুষটিকে বড় জোর বুড়ো বর বলে কিছু নিন্দা সইতে হয়, এমনকী বুড়ো বয়সে সে তরুণী বিয়ে করেছে বলে খানিকটা তর্জনও তাকে লাভ করতে হয় মাঝে মাঝে, অপিচ মেয়েটির ওপরে বেশ মায়াও হয় এ-সব ঘটনায়। কিন্তু কোনওভাবেই সমাজ এটাকে অস্বাভাবিকও বলে না, অসামাজিকও বলে না।

আমি মহাভারতের এই ঘটনাটা লিখতে গিয়ে বারবারই থমকে গেছি, কতবার যে বসেছি, আর কতবার যে থেমেছি তার ঠিক নেই। শেষ পর্যন্ত লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা ভেবে যে, মহাভারতের কবির সৃষ্টির তপস্যার মধ্যে কী অসীম বৈচিত্র্য ছিল। সমস্ত জগৎটা তো বটেই, কিন্তু জীবনের মধ্যে কোথায়, কখন যে কার হৃদয়তন্ত্রী বেজে উঠছে, তার সূক্ষ্ম সুরটুকু ঠিক তাঁর কানে এসে বেজেছে। হাজারো ব্যস্ত ঘটনার মধ্যে সে সুর তিনি পাঠককে শুনিয়েও দেন সময়মতো। নইলে দেখুন, মহাকাব্যের কবির ব্যস্ততা তখন কম নয়। পাণ্ডবদের বনবাস-পর্ব শেষ হয়ে গেছে। তাঁরা এবার বিচার-বিবেচনা করছেন— কে কেমন ছদ্মবেশে বিরাট-গৃহে প্রবেশ করবেন, কে কোন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন এবং তাঁদের কর্ম, বেশ এবং ব্যবহার কতটাই বা প্রত্যয় জাগাতে পারে বিরাট রাজার মনে। পাঁচ ভাই পাণ্ডবদের মধ্যে অর্জুনের বেশ-ভাব-আচারই সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠার কথা, কেনা তিনি নিজের স্বরূপটাকেই পরিবর্তন করে ফেলেছিলেন। নিজের পৌরুষ এবং ব্যক্তিত্বকে তিনি ক্লীবত্বের আবরণে প্রায় লুকিয়ে ফেলেছিলেন।

এটা অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, মৎস্যদেশের রাজা বিরাট অতি সদাশয় এবং উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর যদি তেমন সন্দেহ কুটিলতা থাকত, তা হলে যুধিষ্ঠির-ভীম বা নকুল-সহদেবকে ধরে ফেলতে তাঁর অসুবিধে হত না, কিন্তু অর্জুন সেই যে একবার নিজের পরিচয় দিয়ে বিরাট রাজার কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলেন, তারপর বেরিয়েছিলেন একেবারে অজ্ঞাতবাসের কাল ফুরোনোর পরে। যাঁরা ভাবেন— অর্জুন ইন্দ্রপুরীতে উর্বশীর অভিশাপ লাভ করে একেবারে সম্পূর্ণ একটি নপুংসকে পরিণত হয়েছিলেন, তাঁদের অগাধ বিশ্বাস এবং আস্থার জন্য তাঁদের আমি মহাভারতের কবির আশীর্বাদ জানাই। কিন্তু বাস্তবে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হয় না।

আসলে উর্বশীর অভিশাপকে আমরা লৌকিকভাবেই বেশ বুঝতে পারি। এটা তো মানবেন যে, অর্জুনের মতো মহাবীর, যিনি প্রসিদ্ধ পাশুপত অস্ত্রের অধিকারী, যিনি গাণ্ডীবধন্বা, তিনি যদি পট্টশাটিকায় আবৃত হয়ে, হার-অলংকার ধারণ করে নর্তকের বৃত্তি অবলম্বন করেন, তবে সেটাই তাঁর চরম নপুংসকত্ব। এই নপুংসকত্বের আবরণ তাঁর পক্ষে সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ছিল, কেননা এই স্বরূপ-পরিবর্তন ছাড়া তাঁর মতো দীপ্ত ব্যক্তিত্বকে চিনে ফেলাটা খুব সহজসাধ্য ছিল। তবে হ্যাঁ, এটা তখনই বিরাট রাজার পক্ষে সহজসাধ্য হত, যদি সেই গূঢ়পুরুষের বেশ, ব্যবহার, আকার, ইঙ্গিত এবং শারীরিক প্রয়াসগুলি ততটা আবৃত না হত এবং তা তেমন বিশ্বাসযোগ্য না হত। বিরাট রাজার বিশ্বাস করার বৃত্তিটাই যথেষ্ট বেশি ছিল, নইলে দেখুন— যুধিষ্ঠির, ভীম একে-একে আসছেন, নিজেদের মিথ্যা পরিচয় দিচ্ছেন এবং রাজার কাজে লেগে যাচ্ছেন, বিরাট তাতে এতটুকু সন্দেহ করছেন না।

বিরাট-গৃহে অজ্ঞাতবাসের জন্য প্রবেশ করার সময় পাণ্ডব-ভাইরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন এবং অপর মানুষ বলে প্রমাণ করার জন্য নিজেদের ভ্রাতৃক্রম পরিবর্তন করেছিলেন। বিরাট রাজ্যে প্রথমে প্রবেশ করলেন যুধিষ্ঠির, অনুক্রমে ঢুকলেন ভীম এবং দ্রৌপদী, তারপর সহদেব, তারপরে অর্জুন এবং একেবারে শেষে নকুল। কিন্তু এই ক্রম-পরিবর্তনই কি শুধু যথেষ্ট ছিল? একই দিনে খানিকক্ষণ বাদে বাদে এক-এক ভাই এসে নিজের নিজের বিশেষজ্ঞতা খ্যাপন করার পরেই বলছেন— আমি পূর্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে অমুক কাজ করতাম, তমুক কাজ করতাম— এই কথাগুলি আজকের এই সন্দেহ-বাতিক যুগে

কতটা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে? এমনকী দ্রৌপদী পর্যন্ত পূর্বে দ্রৌপদীরই পরিচারিকা সৈরিন্ধ্রী ছিলেন এবং বৃহন্নলা অর্জুনও দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলেন— এই কথাগুলি বিরাট রাজা বিনা কোনও ভ্রুকুটি-কুটিলতাতেই বিশ্বাস করলেন— এটা বিরাট রাজার অসাধারণ সরল মানসিকতা প্রকাশ করে। অথবা বিরাট রাজাকে এমন চারিত্রিকতায় স্থাপন করাটাই মহাকাব্যের কবির কাব্যসিদ্ধি তৈরি করে।

তবু বলি এতগুলি ছদ্মবেশের মধ্যে বুঝি অর্জুনের ছদ্মবেশই সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ছিল। প্রথমত তিনি নকুল-সহদেবের মতো অশ্বরক্ষক-গোরক্ষকের পরিচিত ভূমিকা গ্রহণ করেননি অথবা রাজার সঙ্গে নিরন্তর রসে-বশে পাশা খেলার অলস ব্যসনও তাঁর পছন্দ হয়নি যুধিষ্ঠিরের মতো। অন্যদিকে ভীমের মতোও তিনি পারেন না। প্রচুর রান্না করা এবং হাতির সঙ্গে লড়াই করার মতো স্থূল ব্যবহারও তাঁর রুচি-রোচন হয় না। অর্জুন সূক্ষ্ম প্রকৃতির মানুষ, দেবরাজ ইন্দ্রের স্ত্রী-প্রিয়তার পরম্পরায় অর্জুনও বড় স্ত্রীপ্রিয় মানুষ অর্থাৎ মেয়েরা তাঁকে যথেষ্টই ভালবাসে; অথচ এমনও নয় যে, অর্জুন সব সময় মেয়েদের সঙ্গে মেশার জন্য ছোঁক ছোঁক করছেন। আসলে তাঁর স্বভাব, বীরত্ব এবং সম্পূর্ণ অভিব্যক্তির মধ্যেই এমন একটা ব্যাপার আছে, যেখানে প্রিয়ত্ব এবং দূরত্ব দুইই আছে। পণ্ডিতেরা পাশ্চাত্যের 'মিথলজিক্যাল প্যাটার্ন' মেনে অর্জুনের কথা উঠলেই ইন্দ্রের কথা তোলেন। বলেন— পুরাযুগের ইন্দ্রের গুণগুলি অর্জুনের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ইন্দ্র বীর এবং স্ত্রীপ্রিয় দেবতা। তিনিই যেহেতু অর্জুনের জন্মদাতা পিতা হিসেবে চিহ্নিত অতএব অর্জুন পুরাকালিক ইন্দ্রের মহাভারতীয় সংস্করণ।

এ-সব বাঁধা গতের ওপর আমাদের আধুনিক শ্রদ্ধার অভিনন্দন রইল, কিন্তু এও বলি যে, ইন্দ্রের গুণগুলি অর্জুনের মধ্যে তেমন কিছু সংক্রান্ত হয়নি। বীরত্বের দিকে ইন্দ্র তো বারবার অসুরদের কাছে হারেন, কিন্তু যুদ্ধে অর্জুনের সমকক্ষ বীর তাঁর কালে দ্বিতীয় নেই কেউ। আর স্ত্রীপ্রিয়তা। দেবরাজ ইন্দ্র প্রধানত কামুক এবং ধর্ষক হিসেবেই চিহ্নিত, সুন্দরী রমণীর সন্ধান পেলেই তাঁকে আমরা চঞ্চল দেখি আর এও জানি স্ত্রীলোকের জন্য যে পুরুষ বেশি ছোঁক ছোঁক করে, কোনও বিদগ্ধা রমণী তাঁকে প্রশ্রয় দেন না। প্রতিতুলনায় অর্জুনকে দেখুন। একমাত্র কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রা ছাড়া অন্য সকল স্ত্রী-বিষয়েই তাঁর একটা 'হিরোয়িক আইসোলেশন' আছে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও রমণীর সঙ্গে তিনি সঙ্গত হননি, বরঞ্চ দেবসভায় উর্বশীকে তিনি যে-ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তা তাঁর জন্মদাতা পিতা ইন্দ্রেরও কল্পনার বাইরে ছিল, নৃত্যরতা উর্বশীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন বলেই ইন্দ্র আপন স্বভাবে বুঝে নিয়েছিলেন যে উর্বশীর সঙ্গে অর্জুনের মিলনের ব্যবস্থা করা দরকার। তাঁর পরিকল্পনা খাটেনি এবং উর্বশী অভিশাপ দিয়েছিলেন।

লৌকিক দৃষ্টিতে সেই অভিশাপের ফল এত জোরদার নাও হতে পারে যাতে এক বছরের জন্য অর্জুন পুরুষত্ব হারিয়ে একেবারে নপুংসক হয়ে গেলেন। বরঞ্চ আমরা মনে করি— অর্জুনের মতো বীরের পক্ষে নপুংসকের আবরণটাই তো একটা চরম নপুংসকত্ব। তিনি অস্ত্র হাতে নেবেন না, বিরাট রাজার রাজধানীতে কোনও দিকে নজর দেবেন না, শুধু নাচ-গান নিয়ে থাকবেন— মহাভারতের কবি মহাবীরের এমন বঞ্চনা সহ্য করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারেননি বলেই সুরসুন্দরী উর্বশীর অভিশাপ সৃষ্টি করে রেখেছেন, যেন সাধারণ যুক্তিতে এটা কল্পনাও করা যায় না যে, মহাবীর অর্জুন হাতে চুড়ি পরে বেণী দুলিয়ে বিরাট রাজার ঘরে ঢুকছেন। বিরাটের কন্যান্তঃপুরে শুধু মেয়েদের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন— এ-কথা ভাবতেও মহাভারতীয় ভাবুকের কষ্ট হয়। আর ওই বিরাট রাজার কথাই একবার ভাবুন— পাণ্ডব-ভাইদের চেহারা দেখে তাঁরও বিশ্বাস হয়নি যে, তাঁরা কেউ ভৃত্যবর্গের মানুষ, কিন্তু তাঁদের মধ্যেও অর্জুনকে দেখে বিরাট রাজা শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন তাঁর দিকে।

বিরাট রাজা আর তাঁর সভাসদ-সদস্যেরা প্রাচীরের পাশ বরাবর যাঁকে ঘুরে ফিরে বেড়াতে দেখলেন, তাঁকে তাঁরা পুরুষ বলেই শনাক্ত করেছিলেন— সে পুরুষ শুধু স্ত্রীলোকের অলঙ্কার পরে থাকে— স্ত্রীণামলঙ্কারধরো বৃহৎ পুমান্— তিনি যথেষ্ট দীর্ঘাকৃতি পুরুষ অর্থাৎ লম্বা মানুষের সুন্দর চেহারায় কানে দুটো বড় বড় দুল, হাতে শাঁখা, এবং দুই বাহুতে দুটি সোনার কেয়ূর। কিন্তু অলঙ্কার যতই পরে থাকুন, তাঁকে দেখে মহাবিক্রমশালী বলে মনে হচ্ছিল। বিশেষত তাঁর লম্বা চেহারা এবং দৃপ্ত পদক্ষেপ, অথচ তারই সঙ্গে মাথার ওপর আলুলায়িত কেশরাশি— বহুংশ্চ দীর্ঘাংশ্চ বিমুচ্য মূর্ধজান্। গতেন ভূমিমভিকম্পয়ংস্তদা— বিরাট রাজা অর্জুনকে দেখে যেমন বিভ্রান্ত হয়েছেন, তেমনই আকৃষ্ট বোধ করেছেন। লোক-জন ডেকে জিজ্ঞাসা করেছেন— লোকটা কে? আগে তো কখনও দেখিনি একে? লোকেরা বলল— আমরাও একে চিনি না, আগে দেখিওনি কখনও। বিরাট আরও বিভ্রান্ত হয়ে অর্জুনকেই ডেকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন— তোমার গায়ের রংটি কালো বটে, তবে হস্তিযূথের যূথপতির শক্তি তোমার গায়ে, অথচ দুটি শাঁখা আর কেয়ূর পরে চুল এলিয়ে দিয়েছ এমন! বড় অদ্ভুত লাগছে আমার— বিমুচ্য কম্বু পরিহাটকে শুভে/ বিমুচ্য বেণীমপিনহ্য কুণ্ডলে। এর চাইতে তুমি যদি ভাল করে চুল বেঁধে— কারণ, সেটাই যোদ্ধার লক্ষণ, সে চুল খুলে রাখে না— তাই চুল বেঁধে, ধনুক-বাণ-ঢাল হাতে নিয়ে রথে করে ঘুরে বেড়াতে, তা হলে তোমাকে যেমন মানাত, এখন তেমন মানাচ্ছে না। আর দেখছই তো, আমি বুড়ো হয়ে গেছি, রাজ্য-টাজ্য আর আমার ভাল লাগে না। আমি মনে করি, তোমার সেই শক্তি আছে, যাতে এই মৎস্যদেশ তুমি শাসন করতে পারো। আর আমার দৃঢ় ধারণা, তোমার মতো মানুষ কখনও নপুংসক-ক্লীব হতে পারে না— নৈবংবিধাঃ ক্লীবরূপা ভবন্তি/কথঞ্চনেতি প্রতিভাতি মে মতিঃ।

অর্জুনের চেহারা এবং ভাব-সাব দেখে বিরাট যে কিছুতেই তাঁকে ক্লীব বলে মেনে নিতে পারছেন না, সেটা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু এই অবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে অর্জুনও কিন্তু নিজেকে আর ক্লীব বলে পরিচয় দিচ্ছেন না। তিনি বললেন— মহারাজ! আমি গান গাই, নেচে বেড়াই, বাজনা বাজাই— গায়ামি নৃত্যাম্যথ বাদয়ামি— আমি নাচ-গানই ভালবাসি। আপনি আপনার মেয়ে উত্তরাকে আমার হাতে দিন, আমি তার নৃত্যগুরু হতে চাই— ত্বমুত্তরায়ৈ প্রদিশস্ব মাং স্বয়ম্/ ভবামি দেব্যা নরদেব নর্তকঃ। বিরাটের কাছে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ছিল সেই ক্লীবত্ব এবং অর্জুনও সে-সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে কিছু বললেন না। শুধু জানালেন— যে কারণে আমার এই ক্লীবত্ব, সেই কষ্টের কথা আপনাকে অবসর সময়ে বলব আমি। এখন

শুধু এইটুকু জানুন— আমার নাম বৃহন্নলা এবং আমার পিতা-মাতা কেউ নেই। আমি আপনারই পুত্র বা কন্যা হতে পারি— সুতং সুতাং বা পিতৃমাতৃবর্জিতাম্‌।

পুত্র বা কন্যা— অর্থাৎ সেই ধোঁয়াশাটা রয়েই গেল। বিরাট রাজাও উদার-হৃদয় মানুষ। অর্জুনকে দেখে তিনি এতই মুগ্ধ যে, বেশি কথা না বলে অর্জুনকে তিনি আশীর্বাদের সুরে বললেন— তোমাকে আমি বর দিলাম, বৃহন্নলা। আমার মেয়েকে তুমি নৃত্যশিক্ষা দাও ইচ্ছেমতো। কিন্তু ব্যাপারটা আমি পছন্দ করতে পারলাম না। এটা তোমার কাজ নয় বাপু, অস্ত্র হাতে নিলে তুমি এই পৃথিবী জিতে আনতে পারো। তবু তুমি যখন ইচ্ছে করছ— আমার মেয়ের নৃত্যগুরু হবে তুমি তখন তাই হোক; তুমি আমার মেয়ে এবং তার অন্য সমবয়সি বন্ধুদের ন্যাচই শেখাও— সুতাঞ্চ মে নর্তয় যাশ্চ তাদৃশীঃ। কথ্য ভাবার মতো এই মহাভারতীয় শব্দটা একেবারে মর্মে এসে লাগে— নাচাও তুমি, আমার মেয়েকে নাচাতে থাকো— সুতাঞ্চ মে নর্তয়।

অর্জুনের ক্লীবত্বের একটা পরীক্ষা হল বটে, তবে সে পরীক্ষা খুব কঠোর সত্য যাচাই করবার জন্য নয়। বিরাট বোধহয় অর্জুনের নপুংসকোচিত ভাব-সাবগুলি পরীক্ষা করলেন এবং খুব ভাল করে শুনলেন অর্জুনের নপুংসকত্ব-লাভের কাহিনিটি— অপুংস্ত্বমপ্যস্য নিশম্য চ স্থিরং— আর দেবলোকের সেই কাহিনি শুনেই অর্জুনের কথা বিশ্বাস করে নিলেন সরলহৃদয় বিরাট। অর্জুনের স্থিতি হয়ে গেল বিরাট রাজার কন্যান্তঃপুরে যেখানে কুমারী উত্তরা তাঁর সমবয়সি সখীদের নিয়ে অবস্থান করেন।

সেকালের এই কন্যান্তঃপুর বড় বিচিত্র জায়গা। এখানে পুরুষ মানুষেরা সচরাচর আসে না, এমনকী বয়স্কা মহিলারা— মেয়েদের মা বা অন্যান্য কেউও কৈশোরগন্ধী অথবা যৌবনগন্ধী বালিকাদের স্বাতন্ত্র্যে ব্যাঘাত ঘটায় না। নিরাপত্তার কারণে মন্ত্রী-অমাত্যদের মধ্যে যাঁরা কিঞ্চিৎ ভীরু প্রকৃতির অর্থাৎ যে-সমস্ত মন্ত্রী-অমাত্যরা তেমন ডাকাবুকো বা দাপুটে নন এবং যাঁদের মানসিকতায় রাজপুত্রী বা তাঁর সখী-সহচরীদের শ্লীলতাহানির সম্ভাবনা থাকত না, সেইসব পুরুষই কন্যান্তঃপুরে মাঝে মাঝে প্রবেশ পেতেন এবং তাঁরাই অনীপ্সিত পুরুষের দুরভিলাষ থেকে রক্ষা করতেন মেয়েদের। বিরাট রাজার গৃহে কন্যান্তঃপুরের সুরক্ষা-প্রযুক্তি কেমন, মহাভারতে তার তেমন কোনও স্পষ্ট বর্ণনা নেই। তবে এটা অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে যে, অর্জুন এই অন্তঃপুরে কোনও অনভীষ্ট ব্যক্তিত্ব নন, কারণ প্রথমত অর্জুন এক অসাধারণ নৃত্যগুরু হিসেবে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। দ্বিতীয়ত তাঁর হাব-ভাব, ক্রিয়া-কলাপ সব নপুংসকের মতো, তৃতীয় মহারাজ বিরাট তাঁকে নিয়োগ করেছেন আপন কন্যার নৃত্যশিক্ষার আচার্য হিসেবে।

অর্জুন যেদিন বিরাট রাজার কন্যান্তঃপুরে প্রথম প্রবেশ করলেন, সেদিন তাঁকে দেখে কৈশোরগন্ধী বয়সের সেই মেয়ের কেমন লেগেছিল, কতটা শ্রদ্ধায়, কতটা দূরত্ব থেকে তাঁকে দেখেছিলেন উত্তরা, মহাভারতের কবি সেই বর্ণনার মধ্যে যাননি। মহাভারতের বিশাল কর্মকাণ্ড, উত্তরোত্তর ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে উত্তরাকে নিয়ে তাঁর নিভৃতে বসার উপায় ছিল না। আমরা শুধু এইটুকু জানতে পারলাম যে, অর্জুন বিরাট রাজার কন্যান্তঃপুরে বিরাট-সুতা উত্তরাকে নৃত্য-গীত শিক্ষা দিতে লাগলেন, উত্তরার সঙ্গে তার সখীরাও অর্জুনের কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৃত্য-গীত বাদ্যের পাঠ নিতে লাগল এবং কিছুদিনের মধ্যেই পাণ্ডব অর্জুন তাদের কাছে বেশ প্রিয় হয়ে উঠলেন— প্রিয়শ্চ তাসাং স বভূব পাণ্ডবঃ। পরবর্তী শ্লোকে এই কথাটাই বড় হয়ে উঠেছে যে, মেয়েদের শিক্ষা দেবার এই আচ্ছাদন নিজের ওপরে ঘনিয়ে নিলেন অর্জুন, তাতে অজ্ঞাতবাসের এই ছলনাটুকু বিরাট-রাজধানীর ঘরে বাইরে কেউ বুঝতে পারল না। অর্থাৎ অজ্ঞাতবাসের ভাবনায় অর্জুন এখন বেশ সুরক্ষিত, তাঁকে নিয়ে কোনও চিন্তা রইল না। এই একই শ্লোকের মধ্যে আরও একটি অর্ধপঙ্ক্তির সংযোজন আছে। সেটা হল— মেয়েদের নৃত্যগুরু অর্জুন কিন্তু তাঁর ছাত্রীদের মন জয় করে নিয়েছিলেন তাঁদের প্রিয়কার্য সম্পাদন করে এবং এই স্ত্রী-ব্যাপারে তাঁর ধীরতার হানি ঘটেনি কখনও— তথা চ সত্ত্রেণ ধনঞ্জয়য়োঽবসৎ/প্রিয়াণি কুর্বন্ সহ তাভিরাত্মবান্।

যে অবস্থায় ধনঞ্জয় অর্জুন বিরাট রাজার কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করলেন, সেদিন সেই অন্তঃপুরের মেয়েগুলি তাঁকে কেমন চোখে দেখল, বিরাট-নন্দিনী উত্তরাই বা তাঁর নপুংসক গুরুকে কীভাবে, কোন দৃষ্টিতে গ্রহণ করলেন, সেটা দেখানো মহাকাব্যের কবির দায় নয় বলেই আমরা এই সব জায়গায় কেমন যেন মর্মান্তিক শূন্যতা বোধ করি। তবে কিনা আমরা তো বড় ক্ষুদ্রমনা মানুষ, 'ভিকটোরিয়ান রোমান্টিসিজম' এ-দেশে পয়দা হবার পর থেকেই আমাদের নিপুণ বুদ্ধিজীবিতা মহাকাব্যের কবির বৃহদাশয় বুঝতে পারে না। মনুষ্য-হৃদয়ের গহনে ক্ষণিক বা তাৎক্ষণিক যে-সব পদসঞ্চার ঘটে, তাই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মহাকাব্যের কবি মুখ্য বস্তুর বহতা স্বভাব আহত করেন না। তাঁর কাজ ছিল অজ্ঞাতবাসী অর্জুনকে সযৌক্তিকভাবে বিরাটের কন্যান্তঃপুরে পৌঁছে দেওয়া। তিনি সেটা করার পরে সাধারণ মন্তব্যে অর্জুনের কর্মকাণ্ড এক লাইনে শেষ করে দিয়েছেন— তিনি বিরাটনন্দিনী উত্তরাকে গান শেখাচ্ছেন, বাজনা শেখাচ্ছেন, নাচ শেখাচ্ছেন, উত্তরার সঙ্গে তাঁর সখীরাও অর্জুনের কাছ থেকে পাঠ নিচ্ছে— স শিক্ষয়ামাস চ গীত-বাদিতং/ সুতাং বিরাটস্য ধনঞ্জয়ঃ প্রভুঃ। অর্থাৎ নাচের গুরুমশাই নাচ-গান শেখানোর কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করছেন, আর অর্জুন সেটা এতই ভাল করছিলেন— মহাকাব্যের কবির গৌণ বস্তুর প্রতি মেদবর্জিত মন্তব্য— অর্জুন কিছু দিনের মধ্যেই অন্তঃপুরচারিনী কন্যাদের বড় প্রিয় হয়ে উঠলেন।

ঠিক এইখানেই একবিংশ শতাব্দীর দ্বন্দ্বজড়িত মনের মধ্যে জল্পনা শুরু হয়— কেমন এই প্রিয়ত্ব। কেমন দেখতে ছিলেন কুমারী উত্তরা? কত বয়স তার? অর্জুন যে নিজেই বিরাট রাজার কাছে এই মেয়েটিকে প্রিয়শিষ্যা হিসেবে চেয়ে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন— আমাকে আপনার মেয়ের কাছে নৃত্যগুরুর মর্যাদায় স্থাপন করুন— ত্বম্ উত্তরায়ৈ প্রদিশস্ব মাং স্বয়ম্। স্বয়ংবৃত আচার্যত্বের এই ভূমিকায় থেকে কোন মন্ত্রগুণে অর্জুন এতগুলি মেয়ের প্রিয় হয়ে উঠলেন— এই সব গৌণ সংবাদ মহাকাব্যের কবির প্রবাহিনী লেখনীতে এতটুকুও ধরা পড়ে না। কিন্তু তিনি শব্দের ইঙ্গিত রেখে যান এখানে-ওখানে, তাও এমন শব্দ যা স্পষ্ট করে কিছুতেই বোঝাবে না যে, মহাকবি তাই বলছেন, যা আমি ভাবছি। বরঞ্চ তিনি বলবেন— অন্যের, অন্য চরিত্রের শব্দগ্রন্থির আবরণে, ব্যঞ্জনায়।

ভবিষ্যতে বিরাটনন্দিনী উত্তরাকে আমরা যেমনটি দেখতে পাব, তাতে অনুমান করতে পারি— এখন তিনি নেহাত কিশোরীটি নন। রাজবাড়ির মেয়ে বলে কথা, আদরে আহ্লাদে

এখনও তাঁর পুতুলের সংসার সাজানোর অভ্যাস যায়নি। কিন্তু এই অর্জুন যখন প্রবেশ করেছেন অন্তঃপুরে, তখন তিনি কিশোরীর অবভাস কাটিয়ে যৌবন-সন্ধিতে উপস্থিত হয়েছেন অবশ্যই। জয়পুর-ভরতপুর-আলোয়ার অঞ্চলের মেয়ে, তাঁর শারীরিক সৌন্দর্য্য শব্দ তাৎপর্যে বর্ণনা করা মুশকিল। তবে এই মুহূর্তে তার কোনও বর্ণনাও কবি দেননি। যাতে আমরা অযথা কোনও সম্পর্ক তৈরি না করি, সেই কারণেই বিরাট নগরে অর্জুনের প্রবেশ ঘটার পর থেকে আমরা একটি ক্ষুদ্র নৃত্যগীতের আসরও দেখিনি, যেখানে অর্জুন উত্তরাকে নৃত্য-গীত-বাদিত্রের একটাও পাঠ দিচ্ছেন। অথবা একদিনও দেখলাম না বিরাট-নন্দিনী উত্তরাকেও, যেদিন তিনি নিবিষ্ট প্রিয়শিষ্যার মতো ললিত-কলার পাঠ শিখছেন অর্জুনের কাছে। পতাক, ত্রিপতাক, অর্দ্ধচন্দ্রকের একটি শব্দও উচ্চারিত হতে দেখলাম না অর্জুনের ভঙ্গিমায়, উত্তরাকেও কোনওদিন জিজ্ঞাসা করতে দেখলাম না মুষ্টিক-শিখর অথবা কপিত্থ-তাম্রচূড়কের রহস্য।

অথচ এইসব জিজ্ঞাসা, পরিপ্রশ্ন, উত্তর এবং এক-একটি প্রত্যঙ্গ-মুদ্রা প্রদর্শন, 'ডিমনস্ট্রেশন'-এর জন্য অর্জুনকে কিছু-না-কিছু করতেই হয়েছে। বার বার স্পর্শ করতে হয়েছে উত্তরার শরীর, বারবার ঠিক করে দিতে হয়েছে করাঙ্গুলির সংস্থান, হস্ত-মণিবন্ধ থেকে জানু-জঘন-পদন্যাসের বিপরিবর্তন। মনে আছে সেই কবির কথা, যিনি নৃত্যারম্ভে হর-পশুপতির প্রশিক্ষণ-অভ্যাস শুনিয়েছিলেন আমাদের। পার্বতীকে নাচের পাঠ দেবার সময় শিব বলছেন— আরে না, না, অমন নয়, তুমি হাতটা বাড়াও এইভাবে, হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে পড় এবার এই 'পজিশনে'। ওঃ হোঃ হাতটা অত উঁচু করছ কেন, আরও একটু নীচ, আরে পায়ের গোড়ালি তুলে শুধু অগ্রচরণের আঙুলগুলোর ওপর দাঁড়াও— হচ্ছে না, হচ্ছে না আমার দিকে তাকাও, দেখ আমি করছি— নাত্যুচ্চৈ-নর্ম কুঞ্চিতাগ্রচরণং মাং পশ্য তাবৎ ক্ষণম্।

আমরা বলি— হ্যাঁ, এমন অসংশ্লিষ্টভাবেও একটু দূর থেকে নাচ শেখানো যায়। কিন্তু এখানে নৃত্যের পাঠ দিচ্ছেন নৃত্যশিক্ষার জনক তাণ্ডবী শিব, আর যাঁকে শেখাচ্ছেন, তিনি নৃত্যশিক্ষার জননী লাস্যময়ী পার্বতী। এঁরা বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী, ফলে এতদিনে নাচ শেখানোর জন্য আর হাতে ধরে অঙ্গুলি-মুদ্রা ঠিক করে দিতে হয় না, ঠিক করে দিতে হয় না কটিভঙ্গের কৌশল। কিন্তু এখনও যাঁরা ভারতীয় নৃত্য শেখান— ভরতনাট্যম, কুচিপুরি অথবা মোহিনী আট্টম— তাঁদের অনেককেই দেখেছি— গুরুরা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে কাছে এসে শিষ্য-শিষ্যাদের জানু-জঘন-কটি-পৃষ্ঠের বিভঙ্গ পরিশোধন করেন নিজের হাতে। হয়তো নিতান্ত অনাসক্তভাবেই করেন, কিন্তু এই ধরনের অঙ্গস্পর্শে আচার্য এবং যুবতী শিষ্যার সামান্যতম বিকারও কখনও হয় না— একথা নীতিগতভাবে স্বীকার্য না হলেও মন বড় জটিল স্থান, সেখানে কখন কার নিঃশব্দ পদসঞ্চার ঘটে, তা শুধু মনই জানে। জানে গুরুর মন, শিষ্যার মন, মনে যদি বা কিছু হয়, বুদ্ধি সেটা শোধন করে, তবু সেই ক্ষণটুকু মিথ্যে হয় যায় না।

অন্তঃপুরে থাকার কালে অর্জুনকে আমরা বিশেষ বাইরে বেরোতে দেখিনি খুব একটা। এ-বিষয়ে তাঁর স্বাধীনতা ছিল না, তা নয়। ভীম যুধিষ্ঠির, নকুল-সহদেব সব ভাইদেরই আমরা প্রকাশ্যে বিচরণ করতে দেখেছি। এমনকী দ্রৌপদীকেও প্রতিদিন বিরাট রাজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চন্দন-বিলেপন নিয়ে অন্তঃপুর থেকে রাজসভার প্রসাধন-কক্ষে যেতে দেখেছি আমরা। কিন্তু অর্জুন! তিনি সেই যে উত্তরার নৃত্যশিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে বিরাট রাজার কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করলেন, আর তাঁকে একবারও বাইরে বেরোতে দেখলাম না। নপুংসক অথবা নপুংসকবেশি অর্জুনের বহিশ্চারিতায় তো বাধা ছিল না কোনও। হ্যাঁ একটা খবর অবশ্যই আছে যে, পাণ্ডব-ভাইরা যে-যেখানে যেমন গোপনেই থাকুন, তাঁরা নিজেদের লব্ধ অর্থ একে অপরকে দিতেন গোপনে। এমনকী বিক্রয়ের ছলে ভীম বিরাট রাজার রন্ধনশালার ভক্ষ্য-ভোজ্য যুধিষ্ঠিরকে দিতেন, অথবা অর্জুন নাচঘরের পুরনো বর্জিত কাপড়-জামা ভাইদের দিতেন, অথবা গোপালক সহদেব ভাইদের দুধ-দই খাওয়াতেন— এ-সব খবর আমরা পাই বটে, কিন্তু অর্জুনের সম্বন্ধে এইরকমই প্রচার শুনতে পাই যে, তিনি কন্যান্তঃপুরের বাইরে খুব একটা যাতায়াত করতেন না।

এটা মানতেই হবে যে, যথেষ্ট কর্তব্যবুদ্ধিতে নিজের কাজটা খুব ভালভাবেই করছিলেন অর্জুন। কর্মের দায় এবং কর্তব্যগুলি ভাল না লাগলেও যে মানুষ সানন্দে সেগুলি সম্পাদন করে, সেই বুদ্ধিমান মানুষ দায় এবং কর্তব্যের মধ্যেই নিজের পরিবেশ তৈরি করে নেয়। এই ব্যাপারটা নিতান্ত নিরাসক্তভাবেই এমন সুষ্ঠুভাবে করেছিলেন অর্জুন যে অন্তঃপুরের মেয়েরা অতি অল্পকালের মধ্যেই তাঁকে বড় প্রিয় ভাবতে আরম্ভ করেছে। স্ত্রীপ্রিয়তা অথবা নায়কত্বের সমস্ত গুণই অর্জুনের মধ্যে থাকায় বিরাট রাজার অন্তঃপুরে প্রিয় হয়ে উঠতে তাঁর সময় লাগেনি বটে, কিন্তু যৌবনসন্ধিস্থিতা রমণীদের প্রিয়ত্বের অবগুণ্ঠনে থেকেও অর্জুন নিজেকে হারিয়ে ফেলেননি। আবার দায় পূর্ণ করে কন্যা রমণীদের নৃত্যগীত শেখাতে শেখাতে বাইরে বেশি না বেরোনোটাও তিনি রপ্ত করে ফেলেছিলেন।

কন্যান্তঃপুরের অবগুণ্ঠনের মধ্যে তাঁর এই লুকিয়ে থাকার অভ্যাসটা কিন্তু তাঁর পরিণীতা স্ত্রী দ্রৌপদীও খুব একটা পছন্দ করেননি। ভীম-যুধিষ্ঠির, নকুল-সহদেব কারও সম্বন্ধে দ্রৌপদীর কোনও ঈর্ষা-অসূয়া ছিল না, কিন্তু অর্জুন, মহাবীর অর্জুন অন্তঃপুরের মধ্যে নৃত্যশিক্ষা দিচ্ছেন— এই ক্লীবতা তাঁকে যত না দুঃখ দিয়েছে, তার চেয়ে বেশি তিনি ঈর্ষান্বিতা হয়েছেন এই ভাবনায় যে, অর্জুন বিরাট রাজার অন্তঃপুরে কন্যাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আছেন— কন্যাপরিবৃতং দৃষ্ট্বা ভীম সীদতি মে মনঃ। গাণ্ডীবধন্বার হাতে বলয়— কেয়ূর, স্ত্রীলোকের ধার্য্য অলংকারে তাঁর শারীরিক শোভা দ্রৌপদীকে অবসন্ন করে, কিন্তু অন্তঃপুরের মধ্যেই সহবাসের পরিচয়বশে অল্পবেশি মেয়েরা যখন বয়োজ্যেষ্ঠ অর্জুনের কাছে বায়না করে, অকল্পনীয় প্রার্থনা করে, তখন দ্রৌপদীর মনে হয়— তিনি অন্তঃপুরের মেয়েদের পরিচারক হয়ে গেছেন— আস্তে বেশ-প্রতিচ্ছন্নঃ কন্যানাং পরিচারকঃ।

দ্রৌপদী এসব দুঃখের কথা জানাচ্ছিলেন তাঁর মধ্যম স্বামী ভীমকে। বিরাট রাজার সেনাপতি কীচকের কামৈষণায় দ্রৌপদী যখন বিপন্ন বোধ করছেন, তখন তিনি রাত্রির অন্ধকারে ভীমের কাছে এসে নিজের অনন্ত দুর্গতির কথা জানাচ্ছিলেন। অথচ এই সময়ে অর্জুনের কাছে তাঁর আসাটা অনেক সমীচীন ছিল সম্মান বাঁচানোর জন্য অথবা প্রাণ বাঁচানোর জন্য একজন স্ত্রীলোক বিরাটের কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করছে এবং একজন স্ত্রী-প্রতিম নপুংসকের সঙ্গে কথা বলছে— দ্রৌপদীর পক্ষে তাই অর্জুনের কাছে আসাটাই

অনেক সহজ হত এবং অজ্ঞাতবাসে ছদ্মবেশের সমস্ত অজ্ঞাতচর্যা তা হলে অনেক সদর্থকও হয়ে উঠত। দ্রৌপদী নিজেই অর্জুনের সম্বন্ধে বলেছেন— স্ত্রীবেশে বিকৃত অর্জুনকে দেখে আমর মন কেমন করে— স্ত্রীবেশ-বিকৃতং পার্থং দৃষ্টা সীদতি মে মনঃ। অথচ আসন্ন বিপদের সময় সেই স্ত্রীবেশী অর্জুনের কাছে তিনি যাননি। মন অবসন্ন, দুঃখিত বলে যাননি—এটা যতখানি তার চেয়ে অনেক বেশি ঈর্ষা কাজ করেছে তাঁর মনে। তার প্রমাণ আছে উপরি উক্ত শ্লোকের পরবর্তী ভাষার মধ্যে। তিনি ভীমকে বলেছেন— আমি যখন হস্তিনী-পরিবৃত মদস্রাবী হস্তীর মতো দেবরূপী অর্জুনকে কন্যাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখি— যদা হ্যেনং পরিবৃতং কন্যাভির্দেবরূপিণম্— তখন যেন আর সইতে পারি না, আমার চোখটা যেন নষ্ট হয়ে যায়— দৃশো নশ্যন্তি মে তদা।

ভীমের কাছে উদ্গার করবার সময় অর্জুনের জন্য যত শ্লোক দ্রৌপদী খরচ করেছেন, তার মধ্যে বারবার এই শব্দটা বড় হয়ে উঠেছে যে, অর্জুন কন্যা-পরিবৃত হয়ে বেশ মজায় আছেন— সোঽদ্য কন্যাপরিবৃতা গায়ন্নাস্তে ধনঞ্জয়ঃ। অর্জুন কতখানি মজায় ছিলেন আমাদের জানা নেই, অথবা মজায় ছিলেনও হয়তো— কেননা থাকতেই হবে যেখানে সেখানে রসেবশে থেকে কার্যোদ্ধার করাই ভাল— এই নীতিতে বীর ধানুষ্কের সমস্ত স্বপ্ন পরিহার করে নাচে-গানে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন তিনি। কিন্তু বিরাটের মেয়েকে অথবা আরও অন্যান্য মেয়েদের তিনি নৃত্য প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন নৃত্যগুরুর সাধারণ প্রশিক্ষণ-নৈকট্য বজায় রেখে, এই নৈকট্য দ্রৌপদীর ভাল লাগেনি। দ্রৌপদী তো কোনওভাবেই অর্জুনকে নপুংসক ভাবতে পারেন না। তাঁর অন্তত মনে আছে যে, একবার তাঁর চোখের আড়াল হতেই উলূপী, চিত্রাঙ্গদা এবং সুভদ্রার প্রণয়-পঙ্‌ক্তি কতটা গ্রাস করেছিল অর্জুনকে। তাঁকে তো এখনও তিনি যুবক-বয়সি অর্জুনই ভাবেন— মেয়েদের সর্ব অর্থেই নাচাতে পারেন এমন যুবক— কন্যানাং নর্তকো যুবা— কিন্তু এতকালে অর্জুন কতটা নাচছেন, এ বিষয়ে দ্রৌপদীর নিতান্ত একপেশে এবং পূর্বাবস্থিত ধারণা থাকলেও এটা অবশ্যই ঠিক যে, মেয়েরা তাঁকে খুব একটা ছাড়তে চাইত না, বিশেষত উত্তরা, কুমারী উত্তরা দ্রৌপদীর মনে এক ধরনের সন্দেহ-দ্বন্দ্ব তৈরি করে।

সেই কীচকের যখন প্রাণান্ত ঘটল ভীমের হাতে, কীচকের ভাইরাও মারা গেল, তখন দ্রৌপদী নগরে ফিরে এসে কীচক এবং উপকীচকদের হস্তস্পর্শ প্রক্ষালণ করেছিলেন অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে। তারপর একবার বেরিয়ে সর্বরক্ষক ভীমকে অন্তরের ধন্যবাদ জানিয়ে সাভিমানে ঢুঁ মেরেছিলেন ধনঞ্জয়ের নর্তনাগারে। তিনি দেখলেন— অর্জুন নির্বিকার, এত বড় যে একটা ঘটনা ঘটে গেল। এত বড় যে একটা স্রোত বয়ে গেল তাঁর ওপর দিয়ে— অথচ অর্জুন সব জানেনও এমনকী তাঁর নটী শিষ্যারাও সব জানে— অর্জুনের মনের মধ্যে কোনও আতঙ্কিত শিহরণ তৈরি হয়নি দ্রৌপদীর জন্য। অন্তত দ্রৌপদীর তাই মনে হয়, তিনি দুঃখিত, আহত বোধ করেন। অর্জুন অবশ্য খুব ভালভাবে জানেন যে, ভীম দ্রৌপদীর পিছনে আছেন এবং উদ্ধারকর্তা হিসেবে তাঁর কোনও জুড়ি নেই। বরঞ্চ এই স্ত্রীবেশে যদি কীচক, উপকীচকদের বধ করতে হত, তাতে অজ্ঞাতবাসের শর্তহানি হলে বিপদ আরও বাড়ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাই হোক, এগুলো অন্তত আর্তা, বিপন্না দ্রৌপদীর যুক্তি নয়। তিনি ভীমের রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে বিরাট রাজার নর্তনাগারে প্রবেশ করলেন এবং দেখলেন ধনঞ্জয় অর্জুনকে। ভাল লাগল না দ্রৌপদীর, নিশ্চয়ই ভাল লাগল না। তিনি দেখলেন— নিরুদ্বেগ-চিত্তে বিরাট রাজার মেয়েদের নৃত্যশিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন— রাজ্ঞঃ কন্যা বিরাটস্য নর্তয়ানং মহাভুজম্। চতুর-মধুর মহাকাব্যের কবি একবারও বিরাট-নন্দিনী উত্তরার নামও করলেন না। কিন্তু ভাবে বুঝি— উত্তরাকে নৃত্যশিক্ষা দেওয়াই তো অর্জুনের প্রধান লক্ষ্য ছিল, তাঁকেই তো তিনি শিষ্যা হিসেবে চেয়ে নিয়েছিলেন বিরাটের কাছ থেকে। আজ দ্রৌপদীর সামনে তাঁকে কন্যামণ্ডলীর মেলায় মিশিয়ে রেখে মহাকাব্যের কবি নৈতিকতার সমস্ত মানগুলি বজায় রেখে দিলেন। দ্রৌপদীকে দেখেই কন্যান্তঃপুরের কন্যারা সদলে বেরিয়ে এল নর্তনাগার থেকে, সঙ্গে অর্জুন— কন্যা দদৃশুরায়ান্তীং... বিনিষ্ক্রম্য সহার্জুনাঃ। এখানে অর্জুনকে সহ-স্থানে রেখে কন্যারা বেরিয়ে এলেন, এই কর্তৃকারকের মধ্যে অর্জুনের গৌণতা স্থাপন করার মধ্যেও মহাকাব্যের কবির ইঙ্গিত আছে। অর্জুনের নিঃস্পৃহতা দেখানোই অবশ্য এখানে প্রধান ইঙ্গিত নয়, বরঞ্চ ইঙ্গিত হল— অর্জুনের নাচের মেয়েরা যা করছে, অর্জুন তাদের সঙ্গে গৌণ ভূমিকায় তাই করছেন। বিরাট-ঘরের মেয়েরা অর্জুনকে নিয়ে বেরোল দ্রৌপদীকে স্বাগত জানাতে এবং তারাই প্রথমে বলল— ভাগ্যিস তুমি দুষ্ট লোকেদের হাত থেকে বেঁচেছ, সেই কারণেই আবার তোমায় দেখতে পেলাম। তোমার কোনও অন্যায় না থাকা সত্ত্বেও যারা তোমার প্রতি হিংসার আচরণ করেছে, তারা মারা গেছে ভাগ্যিস!

দ্রৌপদী মেয়েদের কথার কোনও উত্তর দেননি, তার আগেই প্রশ্ন করেছেন ক্লীববেশী অর্জুন। অর্জুন বলেছেন— কেমন করে তুমি এই বিপদ থেকে বাঁচলে, কেমন করেই বা ওই বদমাশ লোকগুলো মারা পড়ল, বল তো গুছিয়ে, আমাদের সব শুনতে ইচ্ছে করছে। দ্রৌপদী এই প্রশ্নেরও যথাযথ কোনও উত্তর দেননি। বরঞ্চ উত্তরে ভেসে উঠেছে সেই চরম অভিমান— সৈরিন্ধ্রীর কি বিপদ হল না হল, সেসব দিয়ে তোমার কাজ কি বৃহন্নলা? বেশ তো আছ, মেয়েদের মধ্যে বেশ সুখেই তো দিন কাটছে তোমার— যা ত্বং বসসি কল্যাণি সদা কন্যাপুরে সুখম্।

'মেয়েদের মধ্যে'— এই কথাটা বোধহয় গৌরবে বহুবচন। তাঁর তুলনায় উত্তরা এতই ছোট এবং সকলের মাঝে তাঁকে আলাদা করে সন্দেহ করলে দ্রৌপদীর মান কিছুমাত্র বাড়ে না বলেই বিদগ্ধা দ্রৌপদীর মুখে এমন সাভিমান সংকেত। তবু আমরা উত্তরার কথা একেবারেই স্পষ্ট করে জানি না, কিন্তু দ্রৌপদীর মুখে অর্জুন সম্বন্ধে বারংবার এই অভিমানী ভাষণ আমাদের মধ্যে নিরুচ্চার এক সংকেত পৌঁছে দেয় এবং সে-সংকেত আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে পর্বশেষে— যখন কুমার উত্তর যুদ্ধে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

কৌরবযোদ্ধারা যখন বিরাট রাজার গোধন হরণ করে নিয়ে গেছেন, তখন মহারাজ বিরাট অন্যত্র যুদ্ধকার্যে ব্যাপৃত। তিনি রাজধানীতে নেই। নগর রক্ষক লোকজন কুমার উত্তরকে জানাল— কৌরবরা আমাদের হাজার হাজার গোরু নিয়ে গেছে, আপনি যুদ্ধে যাবার উদ্যোগ করুন কুমার! রাজার অনুপস্থিতিতে আপনিই এখানকার রক্ষক রাজা। মহারাজ বিরাটও আপনার যুদ্ধনৈপুণ্যের কথা বারবার বলেন। অতএব কুমার! এই সেই

সময়, যখন আপনি আপনার যুদ্ধনৈপুণ্য দেখিয়ে সমস্ত দেশবাসীর আশ্রয় হয়ে উঠতে পারেন।

মুশকিল হল, নগরপাল যখন এসে উত্তরকে এই পশুহরণের সংবাদ দিয়েছিল, কুমার উত্তর তখন অন্তঃপুরে মেয়েদের মধ্যে বসেছিলেন। মেয়েদের সামনে কোনও ভীরুতা প্রকট না হয়ে যায়, এই ভাব প্রকাশ করেই উত্তর বলেছিলেন— আমি অবশ্যই যুদ্ধে যেতে পারি, কিন্তু একটা ভাল সারথি না থাকায় আমি মুশকিলে পড়েছি— যদি মে সারথিঃ কশ্চিদ্ ভবেদশ্বেষু কোবিদঃ। সেই যে মাসখানেক ধরে যে বড় যুদ্ধটা হয়েছিল, তাতে আমার সারথিটি মারা গেছে। কিন্তু আমার ঘোড়াগুলো চালাতে পারে এমন একজন লোকও আমি দেখছি না। রথের ঘোড়া বোঝে এমন একটা লোক পেলে আমি আমার ধ্বজা উঁচিয়ে যুদ্ধে যাব। কৌরবদের মনে আসবে যে, তারা কার সঙ্গে যুদ্ধ করছে, মার খাওয়ার পর মনে হবে— এটা অর্জুন এল নাকি?

মেয়েদের সামনে উত্তর অনেক নরম-গরমকথা বলছেন। নিজের সঙ্গে অর্জুনের তুলনা শুনেই দ্রৌপদীর গা পুড়ে গেল, তবু মুখের মধ্যে একটা লজ্জা লজ্জা ভাব ঘনিয়ে এনে উত্তরকে বললেন— রাজপুত্র! বৃহন্নলা নামে এখানে সবাই যাকে চেনে, সেই মহাহস্তিতুল্য অত্যন্ত প্রিয়দর্শন ওই যে যুবক— যোঽসৌ বৃহদ্‌বারণাভো যুবা সুপ্রিয়দর্শনঃ— ও কিন্তু আগে অর্জুনের সারথি ছিল। ও যুদ্ধও ভাল জানে, অর্জুনের কাছেই যুদ্ধবিদ্যা শিখেছে। ওর মতো সারথি তুমি এই তল্লাটে খুঁজে পাবে না— ন যন্তাস্তি তাদৃশঃ।

অন্তত দুইবার দ্রৌপদীর মুখে এই স্পষ্ট উচ্চারণ— অর্জুন এক নর্তক যুবা— কন্যানং নর্তকো যুবা, আবারও এখন— যুবা সুপ্রিয়দর্শনঃ— তা হলে কি স্ত্রীবেশী অর্জুনকে যুবক পুরুষের মতোই দেখাত। অন্তত সেই বেশের মধ্যেও অর্জুন যে তাঁর যুবক চেহারাটা লুকোতে পারতেন না— সেটা কী অন্তত মেনে নেব। দ্রৌপদীর মুখে এর পরের প্রস্তাবটা আরও সাংঘাতিক। কুমার উত্তর দ্রৌপদীর মুখে বৃহন্নলার কথা শুনে যদি তাঁকেই বলেন, কিংবা অন্য কাউকেও বলেন যে ডেকে দাও তবে বৃহন্নলাকে, তাকেই আমি সারথি করে নিয়ে যাব— তা হলে দ্রৌপদী এতটুকুও ভরসা পাচ্ছেন না। কিন্তু অন্তঃপুরগত অর্জুনকে উত্তরার নৃত্যগুরু হিসেবে তিনি যতটুকু চিনেছেন, সেই দৃষ্টি মাথায় রেখে দ্রৌপদী বললেন— এই যে তোমার ছোট বোনটি আছে, কুমারী উত্তরা— যেয়ং কুমারী সুশ্রোণী ভগিনী তে যবীয়সী— সেই সুনিতম্বা উত্তরাকে তুমি বল— অর্জুনকে যাতে সে তোমার সারথি হতে অনুরোধ করে।

কুমার উত্তর অন্তঃপুরে বসে কথা বলছিলেন, সেখানে যেমন দ্রৌপদী ছিলেন, তেমনই ছিলেন উত্তরাও। দ্রৌপদী উত্তরাকে দেখিয়েই অর্জুনকে ডেকে আনার প্রস্তাব দিয়েছেন এবং সর্বশেষে জানিয়েছেন আপন প্রত্যয়ের কথা। দ্রৌপদী বলেছেন— উত্তরা যদি বৃহন্নলাকে একবার অনুরোধ করে, তবে সেই মহাবীর তার কথাটা একেবারেই ফেলবে না বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস— অস্যাঃ স বীরো বচনং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ।

এই প্রথম অন্যান্য কন্যাকুলের মধ্য থেকে উত্তরার পৃথকীকরণ ঘটল দ্রৌপদীর বাক্যে, তাও এমন একটা প্রত্যয়ের মাধ্যমে যা আমাদের আগে জানা ছিল না। অর্জুন উত্তরার কথা ঠিক শুনবেন, তার কথা তিনি ফেলতে পারবেন না— এই কথা দ্রৌপদীর মুখে যখন শুনতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাই, তখন হঠাৎই এই প্রিয় শিষ্যার কোমল অন্তর-তন্তুগুলি আমাদের কাছে নতুন বিধানে ধরা দেয়। এই প্রথম উত্তরার এক প্রত্যঙ্গ-বৈশিষ্ট্য— সুশ্রোণী, দ্রৌপদীর মুখে উচ্চারিত হয় এবং এই প্রথম আমরা বুঝতে পারি— এতদিন নৃত্যশিক্ষার আসরে অর্জুনের সহবাস নিতান্ত উদাসীন হলেও এই নৈকট্য, শিক্ষা চালনার সৌকর্যের জন্য দৈনন্দিন কর-চরণ-স্পর্শ এবং স্ত্রীবেশ-বিকৃত বৃহন্নলার মধ্যেও মহাবীর অর্জুনের আঙ্গিক প্রতিভাস— কুমারী উত্তরাকে কোনও-না-কোনওভাবে আন্দোলিত করে রেখেছিল। মহাকাব্যের কবি আমাদের সেই খবর দিতে চাননি মহাকাব্যিক নৈতিকতার প্রশ্রয়ে। কিন্তু এতদিন কুমারী-মনের যে সংবাদ শুধুমাত্র দ্রৌপদীর বিদগ্ধমধুর উৎকণ্ঠিত বচনের মধ্যে সংগোপনে রেখে দিয়েছিলেন, সেই সংবাদ হঠাৎ তাঁর মুখেই বিস্ফোরণের মতো বেরিয়ে আসে— সুনিতম্বা উত্তরা যদি বলে, তবে সে-কথা সে রাখবেই— অস্যাঃ স বীরো বচনং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ। এর পর আরও স্পষ্টতর বোধনের জন্য যা পড়ে থাকে, তা শুধুই তাঁর প্রতিক্রিয়াটুকু— সুশ্রোণী উত্তরার মানসিক, শারীরিক এবং বাচিক প্রতিক্রিয়া।

দ্রৌপদীর প্রস্তাব শুনে কুমার উত্তর নিকটে থাকা বোনকে শুধু বলেছিলেন— এই যে সুন্দরী! যাও তবে, ডেকে আন সেই বৃহন্নলাকে— আর অমনই কুমারী উত্তরা দৌড়তে আরম্ভ করলেন নর্তনাগারের দিকে— সা প্রাদ্রবৎ কাঞ্চনমালা-ধারিণী। এই এতকালে সময় হল মহাভারতের কবির— তিনি উত্তরার রূপ বর্ণনা করছেন, তিনি উত্তরার আভূষণ-অলংকার, বেশ-বাস বর্ণনা করছেন, বর্ণনা করছেন সুশ্রোণী যুবতীর রমণীয় গতিভঙ্গি এবং কোনও প্রসঙ্গে এই বর্ণনা— উত্তরা বৃহন্নলা-রূপী অর্জুনের কাছে যাচ্ছেন। শুধুই নপুংসক বৃহন্নলার কাছে যাবার জন্য কি যুবতী উত্তরার এই প্রস্তুতি প্রয়োজন ছিল, নাকি মহাকাব্যের কবির প্রয়োজন ছিল নপুংসক-প্রত্যয়ে এমন রমণীয় বর্ণনার। বড় ভাই একবার মাত্র তাঁকে বলেছেন আর উত্তরা ছুটছেন তাঁর নৃত্যগুরুর কাছে যাবার জন্য, তাঁর গলায় সোনার মালা দুলছে— যা প্রাদ্রবৎ কাঞ্চনমাল্যধারিণী।

উত্তরা চললেন অর্জুনের কাছে— তাঁর গায়ের রং পদ্মের পাতার মতো রক্তাভ, কৃশ কটি তার স্তন-জঘনের উচ্চতা জানান দেয়, মাথার উপর চুল এমন ছাঁদে বাঁধা যাতে ময়ূরপুচ্ছ গোঁজা আছে একটি-দুটি— বেদিবিলগ্নমধ্যা/ সা পদ্মপত্রাভনিভা শিখণ্ডিনী। তন্বঙ্গী উত্তরা মণিচিত্রের মেখলা ধারণ করেছেন নিতম্বের শোভা হিসেবে, তাঁর চোখের পাতায় বক্রতার কাঁপন, কৃষ্ণবর্ণ অর্জুনের কাছে তিনি পৌঁছচ্ছেন যেন বিদ্যুৎ এসে পৌঁছল মেঘের কাছে— তন্নর্তনাগারমরালপক্ষ্মা/ শতহ্রদা মেঘমিবান্বপদ্যত। হাতির শুঁড়ের মতো তার দুই উরু সুসংহত, তার প্রত্যঙ্গ-ভঙ্গে কোনও ত্রুটি নেই, হাসলে দাঁতগুলিকে মুখের শোভা মনে হয়— সেই উত্তরা পার্থ অর্জুনের কাছে উপস্থিত হলেন— যেন নাগবধূ এসে পৌঁছলেন যূথপতি হস্তি-নায়কের কাছে— পার্থং শুভা নাগবধূরিব দ্বিপম্।

মহাকাব্যের এই সব চিরপ্রথিত উপমা-খণ্ডগুলি— বিদ্যুৎ-মেঘের উপমা, নাগবধূ আর হস্তির উপমা নায়ক-নায়িকার মিলন-সূত্রে ব্যবহৃত হয়। মহাভারতের কবি কিছুতেই স্বকণ্ঠে বলবেন না স্পষ্ট উচ্চারণে যে, উত্তরা প্রিয়া নায়িকার মতো প্রিয়মিলনের ভঙ্গিমায় উপস্থিত হয়েছেন অর্জুনের কাছে। অথচ এইসব বিশ্রুত উপমা প্রয়োগ করে উত্তরার একটা সংজ্ঞাও

তিনি নির্ধারণ করছেন। পার্থ অর্জুনও উত্তরাকে এতদবস্থায় প্রিয়শিষ্যার মতো সম্বোধন করছেন না। বলছেন— মৃগাক্ষি তরুণী। এমন তাড়াহুড়ো করে আসছ কেন তুমি— মৃগাক্ষি কিং ত্বং ত্বরিতেব ভামিনি। হঠাৎ করে কেন এখন এলে এখানে? তোমার মুখখানা দেখে ভাল লাগছে না হে সুন্দরী! বল শিগগির, কী হয়েছে তোমার— কিং তে মুখং সুন্দরি ন প্রসন্নম্/ আচক্ষ্ব তত্ত্বং মম শীঘ্রমঙ্গনে।

কিছু কিছু মহাভারতীয় পুঁথি অর্জুনের কাছে উত্তরার এই আসার অংশটুকু বাদ দিয়েছে; ফলে মহাভারতের শুদ্ধিবাদী পণ্ডিতেরা এই শ্লোকগুলিকে প্রক্ষেপ-পঙ্কে নিক্ষেপ করে উত্তরার নায়িকা-প্রতিমতা ছেঁটে দিয়েছেন, অর্জুনকেও করে তুলেছেন অজ্ঞাতবাসের মর্যাদারক্ষী শ্রদ্ধেয় এক নপুংসক। এঁরা মনে রাখেননি, এমনকী ভাণ্ডারকরের শুদ্ধিবাদী পণ্ডিতেরাও মহাকাব্যের কবির হৃদয় বোঝেন বলে মনে হয় না, নইলে এঁরা বুঝতেন কাহিনির শুদ্ধতা এবং পরম্পরা রাখাই মহাকাব্যের কবির একমাত্র কাজ নয়, এই জগৎসংসারের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়ের নীতিবোধের মধ্যেও আরও এক ধূসর মনের জগৎ আছে, যেখানে শুধুই অন্তর্গত অভিলাষ কাজ করে, কাজ করে কতগুলো মানবিক প্রবণতা যার মীমাংসা করা যায় না। এখানে যে অংশে উত্তরার এই সবিশেষ আলংকারিক প্রত্যভিগমন বর্ণিত হল, এর মধ্যেও সেই নিরুচ্চার অভিলাষ আছে, যা স্পষ্ট করে বোঝা যায় না। আর এমনটা দেখলে উদাসীন নপুংসকও নিজের নৃত্যগুরুর মর্যাদা খানিকটা বিগলিত করে দিয়ে 'সুন্দরী' আর 'মৃগাক্ষী' সম্বোধনে অপ্রতিভ নায়িকার প্রসন্ন মুখ দেখতে চায়। অন্য কেউ না বুঝুন, টীকাকার নীলকণ্ঠ শুদ্ধিবাদী সংশয়ী পণ্ডিতদের চেয়ে অনেক প্রাচীন, তিনিও এই অংশের টীকা করেছেন দেখেই বুঝতে পারি— মহাভারতের কবির কাছে উত্তরার এই প্রত্যভিগমন বর্জ্য নয় মোটেই। তিনি কিশোরী-যুবতীর বীরপূজার তত্ত্ব বোঝেন, বোঝেন— হিরো-ওয়ারশিপ'-এর মধ্যে অনির্বচনীয় নারী-হৃদয়ের দুর্বলতা থাকে। সে দুর্বলতা প্রেম নয় বটে, এমনকী অনেক সময় তার পরিণতিও ঘটে না, কিন্তু পরিণামে একটা বীজ তার মধ্যে থেকে যায়। ব্যাস সেই অপরিণত রমণীর মোহটুকু জানেন বলেই উত্তরাকে বর্ণনা করছেন অকারণের আনন্দে। এবং টীকাকার নীলকণ্ঠও এই অংশ বর্জন না করে বুঝিয়ে দিয়েছেন— তিনি মহাকবির সমান-হৃদয়।

উত্তরা যখন অর্জুনের কাছে এসে উপস্থিত হলেন, তখন পিছন পিছন তাঁর অন্য সখীরাও ছুটতে ছুটতে এসেছিল। রাজবাড়িতে রাজপুত্রীর সখীরা কখনওই সম-মর্যাদার হয় না বলে রাজার মেয়ের সঙ্গে যতই সমভাব দেখাক, সখীদের মনে কিছু হীনমন্যতা থাকে, ফলে রাজার মেয়ের সম্মান-অসম্মান নিয়ে কিছু কৌতূহলও থাকে। দ্রৌপদী বলেছেন— উত্তরা বললেই অর্জুন শুনবেন— সেই উত্তরা বড় ভাইয়ের নির্দেশে অর্জুনের কাছে ছুটতে ছুটতে যাচ্ছেন, এখন অর্জুন-বৃহন্নলা তার কথা শোনেন কিনা, সেটা অন্তর্গত ঈর্ষায় বুঝে নেবার জন্য উত্তরার সখীরাও কৌতূহলী হয়ে তার সঙ্গেই ছুটতে ছুটতে গেল। অর্জুনের প্রশ্নের মধ্যে মমতা, স্নেহ এবং প্রণয়োচিত কৌতুক ছিল— কী সুন্দরী! মুখখানা এমন শুকনো কেন? কী হয়েছে বল তাড়াতাড়ি— কিং তে মুখং সুন্দরি ন প্রসন্নম্/ আচক্ষ্ব তত্ত্বং মম শীঘ্রমঙ্গনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তরা যেহেতু সখীদের মধ্যে রয়েছেন, অতএব ক্ষুদ্র শিষ্যার অনুরোধ যাতে ফিরিয়ে না দেন, তাই অর্জুনের প্রতি ষোড়শীর প্রণয় মাখিয়ে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন— প্রণয়ং ভাবয়ন্তী সা সখীমধ্যে ইদং বচঃ। উত্তরা বললেন— কৌরবরা সব আমাদের গোধন হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। আমার ভাই উত্তর যুদ্ধে যেতে চায়, কিন্তু তার সারথিটি গত যুদ্ধে মারা গেছে, তার মতো সারথিও আর নেই যে আমার ভাইয়ের সহায় হতে পারে। তবে সারথির প্রসঙ্গ উঠতে সৈরিন্ধ্রী তোমার অশ্ববিষয়ে অগাধ জ্ঞান এবং সারথি হিসেবে তোমার নৈপুণ্যের কথা বার বার বলল। আমি তাই তোমার কাছে এসেছি। আমি শুনলাম— তুমি অর্জুনের সারথি ছিলে, তোমার সহায়তায় অর্জুন পৃথিবী জয় করেছিলেন— অনেক কথা শুনলাম তোমার সম্বন্ধে। আমি চাই— তুমি আজ আমার ভাই উত্তরের সারথির কাজ করো— সা সারথ্যং মম ভ্রাতুঃ কুরু সাধু বৃহন্নলে— নইলে কৌরবরা আমাদের গোরুগুলোকে আরও অনেক দূরে নিয়ে চলে যাবে।

রাজবাড়িতে রাজার মেয়ে আশ্রিত নৃত্যগুরুকে এইটুকু অনুনয় করলেই তো যথেষ্ট ছিল। কিন্তু উত্তরার কুমারী-মনে বৃহন্নলা-অর্জুনের বিষয়ে আরও কিছু 'আমি-আমার'-বোধ আছে যাতে অর্জুন কোনও উত্তর দেবার আগেই তিনি বললেন— আমি! আমি তোমাকে অনুরোধ করেছি, আমি বলেছি— তোমাকে এই সারথির কাজটুকু করে দিতে হবে, এখন তুমি যদি আমার কথা না শোনো— অথৈতদ্ বচনং মেঽদ্য নিযুক্তা ন করিষ্যসি— কেন শুনবেই বা না তুমি— আমি যথেষ্ট ভালবাসা নিয়েই তোমাকে অনুনয় করেছি— প্রণয়াদুচ্যমানা ত্বং— তবুও যদি না শোনো, তবে জেনো আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে নিশ্চয়— প্রণয়াদুচ্যমানা ত্বং পরিত্যক্ষ্যামি জীবিতম্।

রমণীর মন! এ কেমন কমলকলির পাঁপড়ি, একটা একটা করে একটু একটু করে মেলে ধরতে হয়! কেমন চিত্রকর এই মহাকাব্যের কবি, যিনি তুলি দিয়ে একটু একটু করে উন্মীলিত করছেন রমণীর হৃদয়-কমল-কলিকা! এ কেমন সম্পর্ক, যেখানে একবার কথা না রাখলে প্রিয় শিষ্যা প্রাণ দিতে চায়! ব্যাস দ্বৈপায়ন বলেননি স্পষ্ট করে। বলবেনও না। তবু শব্দমন্ত্রে জানিয়ে দিচ্ছেন শুধু— পরিণতি নেই; কিন্তু এমনও হয়, এমনও হয়। শব্দ আছে আরও। ব্যাস বললেন— সুনিতম্বা সখী এমনটা বলার পর— এবমুক্তস্তু সুশ্রোণ্যা তয়া সখ্যা পরন্তপঃ— অর্জুন দ্বিতীয় কোনও প্রশ্ন না করে সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্র উত্তরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

ওপরের শ্লোকটার মধ্যে ব্যাস উত্তরার নামের বদলে সর্বনাম ব্যবহার করেছেন, আর তার বিশেষণ দিয়েছেন দুটো— সুশ্রোণী এবং সখী। 'সুশ্রোণী' শব্দটা বোঝা গেল পরিষ্কার— ওটা একটা শারীরিক অভিজ্ঞান, আর মহাকাব্যের কবিরা তাঁদের যুবতী নায়িকাদের সুশ্রোণী, সুস্তনী ইত্যাদি সম্বোধন করেন অকারণেও। কিন্তু 'সখী' শব্দটা তো কোনও প্রত্যঙ্গ বিশ্লেষণ নয়, এটা মানবিক-বৃত্তি-সম্পন্ন মানুষের সম্পর্কের কথা। নৃত্যগুরু অর্জুনের সঙ্গে তাঁর প্রিয়শিষ্যা উত্তরার প্রভু-সম্মিত সম্পর্কের মধ্যে এতটাই তা হলে দ্রবীভবন ঘটেছিল, যাতে শিষ্যা একসময় সখী হয়ে গেছেন। সখ্যের মধ্যে যে সমপ্রাণতা প্রয়োজন হয়, উত্তরা সেই সমপ্রাণতা থেকেই অর্জুনের কাছে উত্তর-সারথ্যের অনুনয় জানিয়েছিলেন এবং অর্জুনও

সেই সমপ্রাণতা অস্বীকার করতে পারেননি বলেই বিনা বাক্যে তাঁর অনুনয় স্বীকার করে নিয়েছেন। সংস্কৃতের নীতিশাস্ত্র সখ্যের সংজ্ঞা করতে গিয়ে 'সমপ্রাণতা'র বৈশিষ্ট্যটুকুই সখ্যের অন্তঃসার হিসেবে উল্লেখ করেছে— সমপ্রাণঃ সখা মতঃ। সেই সূত্রে অর্জুনের এই প্রিয় শিষ্যাটিকে সখিত্বের সংজ্ঞায় চিহ্নিত করাটা দ্বৈপায়ন ব্যাসের এক মহাকাব্যিক অভিসন্ধি বটে।

অর্জুন উত্তরার কথা সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেওয়ায় উত্তরার মনে বেশ গর্ব হয়েছিল। আপন অনুনয়-সিদ্ধিতে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারেননি, কিংবা নিজের ঘরে গিয়েও পুলকিত হতে পারেননি। বরঞ্চ অর্জুন-বৃহন্নলা তাঁর কথা শুনেছেন, এটা সগর্বে উপভোগ করার জন্য উত্তরা অর্জুনের পিছন-পিছন ছুটেছেন এবং আবার ব্যাসের সেই চিরাচরিত উপমা— ঠিক যেমন গজবধূ তার দয়িত মদস্রাবী হস্তী-স্বামীর পিছন পিছন যায়— অন্বগচ্ছদ্ বিশালাক্ষী গজং গজবধূমিব। আপনাদের ভাল করে বোঝাতে পারব না— এই উপমার গভীরার্থ কোথায় পৌঁছায়। মহাকাব্য এই বিশাল পশুটিকে প্রেমিক হিসেবে এক চিরাচরিত মর্যাদা দিয়েছে। গজবধূ তার প্রেমিক হস্তীটির পদানুসরণ করে সবসময়। সেই গজবধূর উপমায় উত্তরাকে অর্জুনের পিছনে নিয়ে যাবার যে মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা, সেটা অন্তর দিয়ে বোঝাই ভাল, বুদ্ধি দিয়ে নয়, নীতিবুদ্ধিতে তো নয়ই।

কুমার উত্তরের সঙ্গে অর্জুনের দেখা হতেই তিনি পূর্ববৎ সৈরিন্ধ্রীর প্রশংসা-শব্দ উচ্চারণ করে রথের সারথি হতে অনুরোধ করলেন অর্জুনকে। উত্তরের প্রস্তাব শুনে বেশ খানিকটা বৃহন্নলোচিতভাবেই কৌতুক বজায় রেখে অর্জুন বললেন— এত বড় একটা যুদ্ধের মধ্যে আমি কেমন করে সারথির কাজ করি বল। আমাকে গান গাইতে বল, গাইছি। বাদ্যি বাজাতে বল তাল-লয় ধরে, বাজিয়ে দেব। নাচতে বল, নাচতেও পারি, কিন্তু সারথির কাজটা করি কী করে— গীতং বা যদি বা নৃত্যং বাদিত্রং বা পৃথগ্‌বিধম্। উত্তর বৃহন্নলার ভণিতা শুনে বললেন— তুমি গাইয়ে হও, বাজিয়ে হও, আর নাচিয়েই হও, কিছু যায় আসে না। তুমি তাড়াতাড়ি আমার রথে ওঠো দেখি। অর্জুন যুদ্ধ-জানা মানুষ, রাজনীতিও কম জানেন না। বিশেষত অজ্ঞাতবাসের কাল তাঁর হিসেব করা হয়ে গেছে। তার ওপরে এও জানেন যে, কৌরবরা গোরু নিয়ে পালিয়ে যাবে না, তারা যুদ্ধ করতেই এসেছে। অতএব এই অবস্থায় যুদ্ধবীরের কৌতুকটুকু তিনি হারিয়ে ফেলেন না। তাঁর বরং মনে হল— হঠাৎ এই যুদ্ধ সংকেতের মধ্যে আতঙ্কিতা কুমারী উত্তরাকে একটু হাসিয়ে তোলা যায় কিনা। অর্জুন ভঙ্গি করে দেখাতে লাগলেন— একজন নপুংসক যদি যুদ্ধে যায় তা হলে কতখানি হাস্যাস্পদ কাজ সে করতে পারে। যুদ্ধভূমির সমস্ত পরিচিত প্রয়োজনগুলি জেনেও অর্জুন তবু উত্তরার কৌতুক-প্রসাধনের জন্য— উত্তরায়াঃ প্রমুখতঃ— নানারকম মজা আরম্ভ করলেন— স তত্র নর্মসংযুক্তমকরোৎ পাণ্ডবো বহু।

এত সব কৌতুকের একটা-মাত্র উদাহরণ দিয়েছেন মহাভারতের কবি। যুদ্ধে যেতে হলে রথের সারথিকেও বুকে বর্ম এঁটে যেতে হয় নিজের প্রাণের জন্য এবং রথস্থ যোদ্ধার বিঘ্ন-প্রশমনের জন্য। তো সেইরকমই একটা লোহার বর্ম এনে দেওয়া হল অর্জুনকে তাঁরই বুকের মাপে। অর্জুন সেটাকে এদিকে-ওদিকে ঘুরিয়ে উলটো করে বাঁধার চেষ্টা করলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের বুকে— উত্তরাকে দেখিয়ে দেখিয়ে। রাজবাড়ির মেয়েরা সব— জন্ম থেকে যুদ্ধ দেখছে— কীভাবে বর্ম পরতে হয়, নিজেরাও তা জানে— নপুংসক-প্রতিম বৃহন্নলার কাণ্ড দেখে উত্তরা এবং তাঁর সখীরা সব হেসে কুটিকুটি হল— কুমার্য্যস্তত্র তং দৃষ্ট্বা প্রাহসন্ পৃথুলোচনাঃ। তবু কিছুতেই অর্জুন লৌহকবচটি ঠিক করে পরলেন না। সরলপ্রাণ কুমার উত্তর ভাবলেন— অর্জুনের ভ্রান্তি ঘটছে অথবা বিভ্রান্তি; উত্তর নিজেই তখন একটি মহামূল্য বর্ম এনে এঁটে দিলেন অর্জুনের বুকে— স তু দৃষ্ট্বা বিমুহ্যন্তং স্বয়মেবোত্তরস্ততঃ।

আর দেরি নয় বৃহন্নলা-অর্জুন এবার সারথি হয়ে ধরলেন ঘোড়ার লাগাম। উত্তর যুদ্ধযাত্রায় অভিমুখ হলে উত্তরা এবং তাঁর সখীরা ঘিরে ধরলেন রথের সারথিকে। তাঁরা বললেন— বৃহন্নলা! তুমি যুদ্ধে আসা ভীষ্ম-দ্রোণ— এতসব মহারথীদের উত্তরীয় বস্ত্রগুলি নিয়ে এস। সেগুলো যেমন রং-বেরং হয়, তেমনই পাতলা আর নরম। আমাদের পুতুল-খেলার জন্য সেইসব বস্ত্রগুলি নিয়ে আসবে তুমি— পঞ্চালিকার্থং চিত্রাণি সূক্ষ্মাণি চ মৃদুনি চ।

দ্বৈপায়ন ব্যাসের এই তথ্যের ওপর দুটো কথা না বলে চলে যাই কী করে? অর্জুনকে দেখছেন! লক্ষ করছেন তাঁর অদ্ভুত মনঃশৈলী, অদ্ভুত পৌরুষেয়তা। যৌবন সন্ধি-স্থিতা এক কুমারীর অন্তর্গত দুর্বলতাকে তিনি কী সযত্নে লালন করছেন। অর্জুন তাঁর কথা শুনছেন, তাঁর অভিমান উপভোগ করছেন, কিন্তু একই সঙ্গে প্রৌঢ়তার কৌতুকগুলি মনে-প্রাণে-ভাষায় এমনভাবেই তিনি মাখিয়ে রেখে দিয়েছেন যাতে করে কোনওভাবেই বলা যাবে না যে, তাঁর দিক থেকে উত্তরার প্রতি অর্জুনের দুর্বলতা আছে। উত্তরা যখন প্রৌঢ় বয়সী অর্জুনের সখী হয়ে ওঠেন, তখন বুঝি দূরত্বের জায়গাটা এখানে অনেকটাই কম, কিন্তু প্রণয়ের প্রশ্ন যদি আসে, তখন প্রৌঢ়-পক্ষটিকে এমন যান্ত্রিকতায় আবদ্ধ দেখি যে, কৈশোরগন্ধী যুবতী উত্তরার জন্য কেমন মায়া হয়। অথচ এমন ঘটনা ঘটে পৃথিবীতে, ঘটেই। মহাভারতের কবি তথ্য-সংকলনে এমন বিপ্রতীপ প্রণয়ের ইঙ্গিত দেন মাত্র, কিন্তু পরিণাম দেন না।

কুমার উত্তরের সঙ্গে কৌরবপক্ষের কেমন যুদ্ধ হল, সে আমরা বেশ জানি। কিন্তু এই যুদ্ধকাণ্ডের প্রস্তুতিতেই এটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল যে, অর্জুন মোটেই নপুংসক হয়ে যাননি, তিনি নপুংসক সেজে থাকতেন। কুমার উত্তর অর্জুনকে বলেছেন— আমার কিছুতেই বিশ্বাস আসে না যে, আপনি নপুংসক। আপনার চেহারা, দেহের গঠন এবং রূপ— সবটার মধ্যেই একজন শক্তিমান পুরুষের লক্ষণ বড় প্রকট— এবং যুক্তাঙ্গরূপস্য লক্ষণৈরুচিতস্য চ— আপনাকে আমি ক্লীবের বেশে শূলপাণি শিব অথবা দেবরাজ ইন্দ্র বলেও বরং ভাবতে পারি, কিন্তু ক্লীব কিছুতেই নয়। অর্জুন এই কথার উত্তর দিয়েছিলেন— আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম— অজ্ঞাতবাসের এই একটা বছর আমি ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করব, বাস্তবে মোটেই ক্লীব নই আমি— নাস্মি ক্লীবো মহাবাহো পরবান্ ধর্মসংযতঃ। এখন আমার ব্রহ্মচর্যের ব্রত সমাপ্ত হয়ে গেছে, আমার প্রতিজ্ঞায় আমি উত্তীর্ণ। কুমার উত্তর বলেছিলেন— এইরকম যার চেহারা সে কখনও নপুংসক হয়! কৌরবরাও বেণীকৃতবেশ অর্জুনকে এক নজরেই চিনে গিয়েছিলেন।

আমাদের বক্তব্য— তা হলে উর্বশীর শাপ নয়, অন্য কিছু নয় অর্জুন মেয়েদের সঙ্গে

দিন কাটাবেন, তাদের প্রত্যঙ্গ-স্পর্শে নৃত্যশিক্ষা দেবেন, অতএব ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে তাঁকে সত্যপ্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল— এই এক বছর তিনি নপুংসকের বেশে ইন্দ্রিয়-সংযম করে ব্রহ্মচারী ব্রত গ্রহণ করবেন। আমরা বেশ বুঝতে পারি— অর্জুনের ক্লীবত্ব নিয়ে একটা সন্দেহ সকলের মনেই ছিল, বিরাট রাজা, কুমার উত্তর কেউই তাঁকে ক্লীব ভাবেননি, সেখানে এই উদ্দাম পুরুষকে যুবতী উত্তরা নপুংসকের অভয় মাহাত্ম্যে মন থেকে বিসর্জন দিয়ে রেখেছিলেন— এ-কথা ভাবতে অসহজ লাগে।

বিরাট যুদ্ধ হল। সেই যুদ্ধের বর্ণনা এখানে ঈপ্সিত নয়। যুদ্ধের মতো যুদ্ধ হয়ে গেল। কৌরব পক্ষের মহা-মহাবীরেরা রণে ভঙ্গ দিলেন বারবার। অবশেষে অর্জুনের সম্মোহন বাণে সকলে সংজ্ঞাশূন্য নিশ্চেষ্টভাবে শায়িত হলেন ভূমিতে। অন্য কোনও বীর হলে, এমনকী কুমার উত্তরও যদি যুদ্ধ জিতে নিতেন, তা হলে এই সময়ে যুদ্ধজয়ের গৌরবই তাঁর মন অধিকার করে থাকত। কিন্তু পরম এবং চরম মুহূর্তেও প্রিয়শিষ্যা উত্তরার অনুনয় অর্জুনের মনে আছে। কুরুবীরেরা সংজ্ঞাহীন হতেই তাঁর মনে পড়ল— উত্তরা বায়না করে বলেছিল— কৌরবরা হেরে গেলে তুমি ভীষ্ম-দ্রোণদের মৃদু-সূক্ষ্ম উত্তরীয় বস্ত্রগুলি নিয়ে আসবে আমাদের পুতুল-সাজানোর জন্য। উত্তরা কী জানতেন না— ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ কত বড় যুদ্ধবীর। তিনি জানতেন না— তাঁর ভাই কতটা পারেন? নাকি সৈরিন্ধ্রী দ্রৌপদীর মতো তিনিও বুঝেছিলেন— বৃহন্নলা যদি যুদ্ধে যায়, তবে কৌরবরা সকলেই পরাজিত হবেন। কিন্তু অর্জুনকেও দেখুন— এত বড় যুদ্ধ জেতার পরেও কৈশোর-গন্ধী উত্তরার পুতুলখেলার বায়নাক্কা তিনি ভোলেননি। রথ ঘোরাবার আগেই মনে পড়েছে— উত্তরার বালিকা-মুখের আবেদন— তথা বিসংজ্ঞেষু পরেষু পার্থঃ/ স্মৃত্বা চ বাক্যানি তথোত্তরায়াঃ। কুমার উত্তরকে তিনি আদেশ দিলেন— যাও বৎস! কুরুবীরেরা যতক্ষণে সংজ্ঞালুপ্ত হয়ে আছে, ততক্ষণে তুমি ওদের মাঝখান দিয়ে নির্ভয়ে চলে যাও। দেখো, দ্রোণ আর কৃপের বস্ত্রগুলি হল সাদা, কর্ণেরটা হলুদ আর অশ্বত্থামা আর দুর্যোধনের উত্তরীয় দুটো নীল। যাও তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো এগুলো— বস্ত্রে সমাদৎস্ব নরপ্রবীর।

খুব বেশি সময় তো ছিল না, তা ছাড়া ভীষ্ম-পিতামহ জ্ঞান হারাননি, তিনি মটকা মেরে পড়ে আছেন, মহাবীর নাতির অস্ত্র-কৌশল তিনি বোঝেন আবার প্রশ্রয়বশত অজ্ঞানের ভাণ করেও পড়ে থাকেন। কাজেই খুব অল্প সময়ের মধ্যে সাদা, হলুদ আর নীল বসন যা জুটল, তাতেই বালিকা-হৃদয়ের মনস্তুষ্টি ঘটবে বলেই অর্জুন সার্থক প্রেমিকের মতো বাড়াবাড়িটাও করেননি, আবার উত্তরার প্রতি স্নেহ-প্রণয়ে তাঁর কথাটাও রেখেছেন।

আমরা জানি— অর্জুনও আবার বৃহন্নলার ক্লীবত্ব স্বীকার করে রথে উঠলেন সারথির ভূমিকায় এবং উত্তরকে বীরের সম্মানে ফিরিয়ে আনলেন রাজধানীতে। বিরাট রাজার সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের তর্কাতর্কি রীতিমতো ক্ষোভজনক অবস্থায় পৌঁছেছিল, যুধিষ্ঠিরের মুখে বৃহন্নলার কোনও প্রশংসা তাঁর সহ্য হচ্ছিল না, যদিও অর্জুন সেইদিনই নিজেদের পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক থাকায় কুমার উত্তরের সঙ্গে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছিল পরের দিন তাঁদের আত্মপ্রকাশের সিদ্ধান্ত আলোচনায়। কিন্তু অনন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও অর্জুন যখন আপন নর্তনাগারে ফিরে এলেন, তখন কিন্তু নিজের হাতে সেই চিত্রবর্ণ বস্ত্রগুলি বিরাট-নন্দিনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তরার হাতে তুলে দিলেন— প্রদশৌ তানি বাসাংসি বিরাটদুহিতুঃ স্বয়ম্। মহাকাব্যের কবি তখন তাঁর প্রধান কাহিনি নিয়ে ব্যস্ত। পরের দিনই অজ্ঞাতবাসের আবরণ মোচন করে আত্মপ্রকাশ করবেন পঞ্চ পাণ্ডব এবং দ্রৌপদী। অতএব উত্তরাকে নিয়ে আর সময় কাটানোর উপায় নেই তাঁর। শুধু এইটুকু জানলাম— অর্জুনের হাত থেকে অতগুলি সুন্দর সুন্দর দামি কাপড় পেয়ে উত্তরা বড় আনন্দিত মনে সেগুলি গ্রহণ করলেন— প্রত্যগৃহ্নাৎ ততঃ প্রীতা তানি বাসাংসি ভামিনী।

কিছু কিছু সম্পর্ক এইরকম আছে— মানুষের জীবনেও আছে; আছে মহাকাব্যেও তার ধূসর প্রতিফলন— কিছু কিছু এমন সম্পর্ক, যা উন্মুখ হয়েও কেমন স্তব্ধ হয়ে যায়। স্তব্ধ হতেই হয়, একজন ব্যবহারে যা করছে, তা হয়তো তত ভেবে করছে না হয়তো বা সে নিজেও বুঝে উঠতে পারে না, সে কী করছে। বিপরীতে আর একজন হয়তো তেমন করে ভাবছেই না, অন্যতরের ব্যবহারগুলি সে স্বাভাবিক ছন্দে গ্রহণ করছে— মনের জটিল আবর্তগুলি পরিহার করে। এর সঙ্গে আছে পরিবেশ, সমাজ, ভব্যতা— যা উন্মুখীন অমুখর সম্পর্ক স্তব্ধ করে দেয়। এমনিতেও যা ঘটত না হয়তো, তা যদি ঘটানোর চেষ্টা করে কেউ, সামাজিকতা সেখানে নিজস্ব গাম্ভীর্যে সম্পর্কের পরিত্রাণ ঘটায় তথাকথিত নৈতিকতায়।

পরের দিন পাণ্ডবরা বিরাট রাজার সভা আলো করে রাজাসনে বসে রইলেন পর্দার পিছনে পূর্বাবস্থিত কুশীলবের মতো। বিরাট রাজা তাঁদের দেখে বিস্মিত, ভ্রূকুটি-কুটিল এবং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেই অর্জুনই সকলের পরিচয় দিলেন বিরাট রাজার কাছে। এবার বিরাটের মুগ্ধ, স্নিগ্ধ এবং আবারও বিস্মিত হবার পালা। পাঁচ পাণ্ডব ভাইকে তিনি ভালও বাসেন শ্রদ্ধাও করেন যথেষ্ট। তাঁরা এতদিন তাঁরই বাড়িতে থেকেছেন, ভৃত্যের মতো কাজ করেছেন এবং অবশেষে শত্রুর হাত থেকে তাঁর রাজ্যও রক্ষা করেছেন— বিরাট রাজা কৃতজ্ঞতায়, বিনয়ে, ভালবাসায় একেবারে আপ্লুত হয়ে গেলেন। এই বিশাল, বিশদ আপ্লুতির শেষেই কিন্তু তাঁর মুখে সেই বিখ্যাত প্রস্তাবনা ভেসে এল। বিরাট বললেন যুধিষ্ঠিরকে— এখন আমি যেটা বলব, সেই কথাটা কিন্তু অর্জুনকে নিঃসংশয়ে মেনে নিতে হবে— যচ্চ বক্ষ্যামি তৎ কার্যম্ অর্জুনেন অবিশঙ্কয়া। আমার মেয়ে উত্তরাকে আমি অর্জুনের হাতে দিতে চাই। অর্জুন তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করুন। অর্জুনের মতো পুরুষ আমার উত্তরার সবচেয়ে উপযুক্ত বর বলে আমি মনে করি। যুধিষ্ঠির আপনি অনুমতি করুন।

বিরাটের এই প্রস্তাব যুধিষ্ঠিরের কাছে খুব মনঃপূত হয়নি। বয়সের একটা পার্থক্য তো আছেই, তার মধ্যে জড়িয়ে আছে গুরু-শিষ্যার পবিত্র সম্পর্ক— সব কিছু মিলিয়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এই বৈবাহিক প্রস্তাব খুব খুশি মনে গ্রহণ করতে পারেননি। আর খুশি মনে না নিলে যা হয়— এমন একটা আনন্দের প্রস্তাব শুনেও তাঁর চোখ-মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠল না, হৃদয় হল না বিকশিত। বরঞ্চ বিরাট অর্জুনের ব্যাপারে চরম আপ্লুতি দেখানো-মাত্রেই যুধিষ্ঠির একবার সচকিত বিস্ময়ে তাকালেন অর্জুনের দিকে। ভাবটা এই— তা হলে ব্যাপারটা এতদূর! তা হলে দ্রৌপদী এত দিন যে ঈষদীষৎ সন্দেহ পোষণ করতেন, সেটাই কি ঠিক। যুধিষ্ঠির অর্জুনের দিকে চকিত দৃষ্টিতে একবার তাকালেন— এবমুক্তো ধর্মরাজঃ পার্থমৈক্ষদ্ ধনঞ্জয়ম্।

অর্জুন যে বিরাটের প্রস্তাবে খুব পুলকিত হয়েছিলেন, তা নয়। তবে এখনও এই বয়সে এমন সপ্রশংস বৈবাহিক প্রস্তাব দিলে কোন পুরুষের হৃদয় স্ফীত না হয়! কিন্তু অর্জুন বাস্তব অবস্থা বোঝেন, বিশেষত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মরাজের ওই চকিত দৃষ্টি তাঁকে সুস্থিত হতে সাহায্য করেছে আরও। অর্জুন বিরাট রাজার সম্মান রেখে বললেন— আপনার কন্যা আমি গ্রহণ করব, তবে আমার জন্য নয়। আপনার কন্যাকে আমি পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করব আমার পুত্র অভিমন্যুর জন্য— প্রতিগৃহ্ণাম্যহং রাজন্ স্নুষাং দুহিতরং তব। ভরতবংশীয় এই জাতকের সঙ্গে মৎস্যদেশীয়া এই কন্যার বিবাহ-কর্মটা সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত হবে।

সেই মৌলিক প্রশ্নটা এবার উঠল বিরাট রাজার দিক থেকেই। জানি না, তিনি তাঁর কন্যার মানসিক প্রবণতা কিছু বুঝেছিলেন কিনা! বিরাট বললেন— এটা তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার। আমার মেয়ে, আমিই স্বেচ্ছায় তাকে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি, তাতে তোমার দিক থেকে কীসের এত আপত্তি যে, তুমি নিজে তাকে বিয়ে করতে চাইছ না— প্রতিগৃহীতুং নেমাং ত্বং ময়া দত্তামিহেচ্ছসি? এবার অর্জুন যে যুক্তিগুলি দিলেন, তাতে বোঝা যায়, এতকালের সাংবৎসরিক অভ্যস্ততায় উত্তরার যদি বা কোনও মানসিক দুর্বলতা থেকেও থাকে তাঁর প্রতি, তবু সেখানে প্রশ্রয় দেওয়াটাকে ঠিক মনে করেননি অর্জুন। অর্জুন বললেন— আপনার মেয়ের সঙ্গে এই এক বছর অন্তঃপুরের মধ্যে আমি থেকেছি, সব সময়ে তাকে দেখেছি বড় কাছ থেকে, তার ওঠা-বসা, চলা-ফেরা প্রত্যেকটি অঙ্গ-বিক্ষেপ আমি চিনি— অন্তঃপুরেঽহমুষিতঃ সদাপশ্যং সুতাং তব। আপনার মেয়ের সমস্ত গোপনীয়তা এবং তার প্রকাশ্য যে-সব আচরণ— তাও আমার সব জানা। আমার ওপরে সে বিশ্বাসও রেখেছে পিতার মতো— রহস্যঞ্চ প্রকাশঞ্চ বিশ্বস্তা পিতৃবন্ময়ি।

সংস্কৃতে উপরি উক্ত পঙ্‌ক্তিটির অর্থ সিদ্ধান্তবাগীশ যা করেছেন, তা আমার কাছে তেমন মনঃপূত নয়। তাঁর অনুবাদে অর্জুনের জবানিটা দাঁড়ায়— আপনার কন্যাও গোপনে এবং প্রকাশ্যে পিতার মতোই আমার উপরে বিশ্বাস করিয়াছেন। আমার মনে হয় এই 'রহস্যঞ্চ প্রকাশঞ্চ'— এটাকে ক্রিয়া-বিশেষণ না ভেবে সোজাসুজি দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচন ভাবা ভাল। যে মানুষটি দিনের পর দিন অন্তঃপুরে উত্তরার সঙ্গে দিন কাটিয়েছেন, তিনি তাঁর গোপনীয়তাও জানেন এবং প্রকাশও সবটুকু জানেন। সত্যি কথা বলতে কি, বহুকাল একসঙ্গে থাকতে থাকতে— তাও যদি থাকাটা এমন উদ্দেশ্যমূলক হয় যে, এই কোনও মতে একটা বছর সংযত হয়ে কাটিয়ে দিলেই তো আবার ইন্দ্রপ্রস্থের রাজবাড়িতে ফিরে যাব— সেইরকম একটা মানুষ কিন্তু উদ্দেশ্যমূলকভাবেই কোনও আন্তর বিচ্যুতির দিকে যায় না। অর্জুনও সেই দৃষ্টিতেই দেখছেন উত্তরাকে এবং বলছেন— সে আমাকে সব সময় পিতার মতো, গুরুর মতো দেখেছে।

আমাদের মনে শুধু জিজ্ঞাসা হয়— সত্যিই কি তাই! অর্জুন না হয় তাঁর বয়স এবং নিজস্ব প্রয়োজনে একটা পিতৃবৎ সস্নেহ ভাব রাখার চেষ্টা করেছেন উত্তরার প্রতি, কিন্তু এই নৃত্যগুরুর সঙ্গে তাঁর যে ভাব-সংলাপ আমরা লক্ষ্য করেছি, তা খুব অল্পই বটে, হয়তো তা দীর্ঘতর হবার প্রয়োজনও নেই, কেননা এই সম্পর্কের কোনও পরিণতি কোনও পক্ষ থেকেই খুব ঈঙ্গিত ছিল না— কিন্তু সেই অত্যল্প সংলাপ এবং অর্জুনের কাছে তাঁর যাবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভঙ্গি, অনুগমনের ভঙ্গি এবং তাঁর প্রার্থনার আন্তরিকতা এমন একটা মোহ সৃষ্টি করে আমাদের মধ্যে, যাতে বিশ্বাস হতে চায়— ওই মোহটুকু উত্তরার মধ্যেও ছিল। নৃত্যশিক্ষার কালে অলৌকিক পৌরুষেয়তার অধিকারী অর্জুনের প্রতিনিয়ত দর্শন-স্পর্শ-সংলাপ এই কৈশোরগন্ধী যুবতীর মনে এমন কোনও আকুলতা নিশ্চয়ই তৈরি করেছিল— যা একদিকে যেমন দ্রৌপদীর মনে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে— সে সন্দেহ অবশ্য অনেকটাই স্ত্রীজনোচিত মৌখিকতায় বহুলীকৃত— কিন্তু অন্যদিকে সেই আকুলতা প্রত্যাখ্যাত হলে বালিকা উত্তরা আত্মহত্যার মন্ত্রণা করেন স্বকণ্ঠে সর্বসমক্ষে। প্রণয়, মান মিথ্যা হোক, এই আবেগটুকু মিথ্যা নয়। হয়তো অর্জুনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটুকুও ওই স্ফুরিত আবেগেই শেষ হয়ে গেছে।

অর্জুন বিরাট রাজাকে বলেছিলেন— আমি আপনার মেয়েকে দিনের পর দিন নাচ, গান শিখিয়েছি। একজন নর্তক এবং ভাল গায়ক হিসেবে দিনে দিনে আমি যেন তার প্রিয় হয়ে উঠেছি, তেমনই তার প্রশংসাও পেয়েছি অনেক— প্রিয়ো বহুমতশ্চাসং নর্তকো গীতকোবিদঃ— তবু আপনার মেয়ে কিন্তু আমাকে আচার্য, গুরুর মতোই দেখে। এই পরস্পর বিরোধী এক দ্বৈরথ— আমি তার প্রিয় হয়ে উঠেছি, তার প্রশংসা এবং আদরের পাত্র হয়ে উঠেছি, অথচ সে আমাকে আচার্যের মতো— মনে রাখবেন, 'আচার্যের মতো' দেখে— আচার্যবচ্চ মাং নিত্যং মন্যতে দুহিতা তব— এই দুই স্বতো-বিভিন্ন আবেগ এবং আরোপিত সম্পর্কের মধ্যেও যে ফাঁকটুকু থেকে যায়, সেখানে কিন্তু প্রথম-যৌবনবতী উত্তরার শিথিল বিভ্রান্ত হৃদয়টুকু অদ্ভুত এক অনির্বচনীয়তায় ধরা পড়ে। অর্জুন সেখানে সুচতুরভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখেন এবং তিনি সাফাই গেয়ে কন্যাপিতাকে বলেন— মহারাজ! আমি একটি বয়স্থা মেয়ের সঙ্গে পুরোটা বছর একসঙ্গে কাটিয়েছি— বয়স্থয়া তয়া রাজন্ সহ সংবৎসরোষিতঃ— এখন যদি সেই মেয়েটিকেই আমি বিয়ে করে বসি, তা হলে লোকে যেভাবে সন্দেহ করবে, আপনারও সেই সন্দেহই হবার কথা, এবং সেই সন্দেহ হওয়াটা খুব অযৌক্তিকও নয়— অভিশঙ্কা ভবেৎ স্থানে তব লোকস্য চোভয়োঃ। অর্জুন ভাবছেন— এক বৎসর কাল কন্যান্তঃপুরে ক্লীবের ছদ্মবেশে থাকার পর হঠাৎ যদি এখন তিনি উত্তরাকে বিবাহ করেন, তা হলে মানুষের এই সন্দেহ তো হবেই যে, এ-লোকটা রাজনন্দিনী উত্তরার সঙ্গে কীভাবে সময় কাটিয়েছে, নৃত্যগুরুর শিক্ষার ছলে, ক্লীবত্বের আবরণে এ-মানুষটা কী-না-কী করেছে, যাতে এখন এই বয়সে কন্যা-সমান একটি মেয়েকে বিবাহ করতে বাধ্য হচ্ছে।

অর্জুনের দিক থেকে এইসব যুক্তি-তর্কের সারবত্তা আছে, এবং অর্জুন নিজের পৌর্বাহ্নিক ভাবনা অনুসারে উত্তরাকে বিবাহ করবেন না বলেই তাঁর যুক্তি-তর্কও যথেষ্ট শাণিত। কিন্তু এই মুহূর্তে এই আলাপ-আলোচনার কালে উত্তরা কী ভাবছিলেন, সে-খবর মহাভারতের কবি দেননি। অর্জুনের প্রতি তাঁর যদি বা কোনও বীরভোগ্য আকর্ষণ-দুর্বলতা থেকেও থাকে, রমণীর হৃদয় লজ্জাপুটে সে-হৃদয় বেঁধে রেখে পুরুষের বিধি-বিধান মেনে নিয়েছে। অবশ্য এটাও ঠিক উত্তরার এই আকর্ষণ তখনও কোনও কোমলতম মাত্রায় পৌঁছয়নি, যাকে প্রণয় বলতে পারি, যার জন্য সঙ্গিনী যুবতী প্রকট অভিমান ব্যক্ত করতে পারে। ফলত অর্জুন যখন নিজের বদলে তাঁর মহাবীর পুত্র অভিমন্যুর জন্য উত্তরাকে যাচনা করলেন,

তখন এই বিবাহ-সম্বন্ধের মধ্যে নতুন মাত্রা এল যেন। নিজেকে সম্পূর্ণ দিলেন না বটে, কিন্তু— আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ— নিজেই তো সে পুত্র হয়ে জন্মায়— এই পরম্পরাগত চিরন্তন নিয়মে অর্জুন পুত্রের প্রতিরূপে ধরা দিলেন উত্তরার কাছে— দিব্য বালকের মতো তাঁর চেহারা, মহামহিম কৃষ্ণের ভাগনে, বালককাল থেকেই তাঁর অস্ত্রনৈপুণ্য প্রবাদে পরিণত হয়েছে। তবু সমস্ত বিশেষণের মধ্যে আপন প্রৌঢ়ত্বের বিপ্রতীপ ভূমিতে দাঁড়িয়ে অর্জুনের এই ঘোষণা— তাকে দেখতে সাক্ষাৎ দেবশিশুর মতো— সাক্ষাদ্ দেবশিশু-র্যথা— নবযৌবনবতী উত্তরার প্রতি এটাই যেন অর্জুনের সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মদান। তিনি এই মায়াময়ী বালিকাকে ঠকাতে চাননি।

একজন বয়স্ক মানুষ হিসেবে অর্জুন কন্যাপ্রতিমা এই বালিকার ইনফাচুয়েশন-টুকু বুঝেছিলেন, অথচ সমাজের ভয়-ত্রাস-সন্দেহ যাতে না হয়, কলঙ্ক যাতে তাঁকে এবং এই বীরমোহগ্রস্তা বালিকাকেও গ্রাস না করে, সেই প্রৌঢ়বুদ্ধিতেই তিনি বিরাটকে বলেছিলেন— আমার ছেলের সঙ্গে যদি আপনার মেয়ের বিয়ে দিই, তবে একদিকে যেমন আমিও নির্দোষ প্রমাণিত হব, তেমনই আপনার মেয়ের শুদ্ধি প্রমাণ করাটাও আমারই দায়িত্বের অগ্রভাগে পড়ে। আমি তাই করছি— তস্যাঃ শুদ্ধিঃ কৃতা ময়া। ছেলে বা ভাইয়ের সঙ্গে যদি একত্রে বাস করা যায়, তবে আমার মেয়ে বা পুত্রবধূর সঙ্গে একত্রে এক বৎসর থেকেছি, এটাও কোনও দোষের ব্যাপার নয়। এতে আমাকে এবং অন্য কাউকেই মিথ্যা অপবাদ দেবে না এই সমাজ। আমার কাছে মিথ্যা অপবাদের মতো অভিশাপ আর কিছু হতে পারে না— অভিশাপাদহং ভীতো মিথ্যাবাদাৎ পরন্তপ। প্রৌঢ়ের শাণিত যুক্তির কাছে উত্তরাকে সর্বথা কলঙ্কমুক্ত রাখার সামাজিক দায়টাই তখন এমন বড় হয়ে উঠল যে, বালিকার বর্ষভোগ্য কৌতুক, অভিমান, নৃত্যশিক্ষার কালে প্রত্যঙ্গ-স্পর্শের মৌহূর্তিক শিহরণ— সব কিছু এক দিনের মধ্যেই অন্যতর এক অপেক্ষা তৈরি করল বালিকার মনে— অন্যতর এক অর্জুন যাকে সাক্ষাৎ দেবশিশুর মতো দেখতে— তার জন্য অপেক্ষা।

বিরাট রাজার কী বা আসে যায়— অর্জুনকে জামাই হিসেবে লাভ করলে তিনি যত খুশি হতেন, তাঁকে বৈবাহিক লাভ করেও তিনি ততটাই খুশি হলেন। কিন্তু এমন সময়েই উত্তরার বিবাহ স্থির হল, যখন পাণ্ডব-কৌরবের যুদ্ধকাল ঘনিয়ে আসছে। আর কিছু দিনের মধ্যেই যুদ্ধের উদ্যোগপর্ব আরম্ভ হবে। অজ্ঞাতবাসের ঠিক অব্যবহিত কাল পরে এবং যুদ্ধের উদ্যোগপর্বের অব্যবহিত কাল পূর্বে উত্তরার বিবাহ স্থির হল। এই বিবাহ শেষ হওয়ামাত্রেই বিরাট রাজ্যে বসেই অজ্ঞাতবাসের পরবর্তী রাজনৈতিক কর্তব্য স্থির হবে বিবাহ-উপলক্ষে সমাগত রাজন্যবর্গের সামনে। বলরাম এবং কৃষ্ণ এলেন দ্বারকা থেকে। ভাগিনেয় অভিমন্যু এখন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে অনুগতিতে এলেন যদু-বৃষ্ণি-বীরেরা সব, সবাই এলেন বিবাহোত্তর যুদ্ধালোচনায় অংশ নিতে। মহারাজ দ্রুপদ, পঞ্চ পাণ্ডবের শ্বশুর— তিনি নাতি-প্রতিম অভিমন্যুর বিবাহ-উৎসবে যোগ দিতে এলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীকে সঙ্গে নিয়ে। আর এলেন দ্রৌপদীর ছেলেরা— ভাই-দাদার বিয়ে দেখতে। কাশী থেকে এলেন কাশীর রাজা, এলেন শৈব্য। সবাই এলেন এক-এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে— পাণ্ডবদের মিত্রগোষ্ঠী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেমন দাঁড়াল এই বিবাহের আসর! বিরাট রাজা নিজের রাজধানীর অদূরে অন্য এক নতুন শহর উপপ্লব্যে পাণ্ডবদের পৃথক নিবাস ব্যবস্থা করলেন। বিবাহ উৎসব এবং সেনা-ছাউনি একসঙ্গে চালনার জন্যই হয়তো এই পৃথক ব্যবস্থাপনা। রাজা-রাজড়ারা বেশির ভাগ আগেই এসে গিয়েছিলেন, সবার শেষে কৃষ্ণ অভিমন্যুকে নিয়ে উপপ্লব্যে প্রবেশ করলেন। সাময়িকভাবে উদ্যত যুদ্ধের আলোচনা থেমে গিয়ে বেজে উঠল শঙ্খ, বেজে উঠল তুরী-ভেরী-গোমুখ। বিরাট রাজার লোকেরা বিবাহ উপলক্ষে বহু রকমের হরিণ আর মনুষ্য-খাদ্য পশু মেরে মাংস রান্না করল, ব্যবস্থা হল বহুতর সুরা, মৈরেয় এবং মদ্যপানের। গায়েনরা গাইতে লাগল, কথক ঠাকুরেরা কথকতা করতে লাগল, সূত-মাগধেরা স্তুতিপাঠ করতে লাগল। মৎস্যদেশের সঙ্গে পাণ্ডবদের বৈবাহিক সম্বন্ধ হচ্ছে, রাজরানি সুদেষ্ণা এবং রাজবাড়ির মেয়েরা— যেমন সুন্দর তাঁদের দেখতে, তেমনই গয়নাগাটি পরে তাঁরা সেজে বেরোলেন— আজগ্মুশ্চারুসর্বাঙ্গ্যঃ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ।

এই বিশাল বিয়ে বাড়ির আসরে, যেখানে সুচারু সুন্দরীদের বেশ-অলংকারের হট্টমেলা বসেছে, সেখানেও এক রমণীকে কী অসাধারণ শব্দসজ্জায় পৃথক করে দিলেন ব্যাস। মৎস্যদেশের মেয়ে মানে এখনকার জয়পুর-ভরতপুরের মেয়ে, তখনকার আর্যদের আদি নিবাস। ব্যাস বলেছেন— সেখানে সকল মেয়েদেরই গায়ের রং ভীষণ সুন্দর, অর্থাৎ ফরসা ফরসা মেয়েরা সব, তার ওপরে বেশ-বাস অলঙ্কার— বর্ণোপপন্নাস্তা নার্য্যো রূপবত্যঃ স্বলঙ্কৃতঃ। কিন্তু এদের সবাইকে ছাপিয়ে যাঁর ব্যক্তিত্ব, সৌন্দর্য্য এবং রূপ প্রকট প্রতিষ্ঠানের মতো হয়ে উঠল— তিনি হলেন কৃষ্ণা দ্রৌপদী— সর্বাভ্যশ্চাভবৎ কৃষ্ণা রূপেণ যশসা শ্রিয়া। নিজের পেটের ছেলে না হলেও অভিমন্যুকে তিনি কম ভালবাসতেন না। সেই অভিমন্যুর আজ বিয়ে, পাণ্ডবগৃহের পরবর্তী প্রজন্মের প্রথম বিয়ে। তার মধ্যে অর্জুনের প্রতি নিজের অত্যধিক আকর্ষণ থাকার ফলে উত্তরাকে নিয়ে তাঁর যত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল, সেই ভ্রান্তিবিলাস একেবারেই কেটে গেল অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিবাহ-পরিণামে। অতএব এই বচ্ছর-ভর ক্লিষ্ট অজ্ঞাতবাসের পর আজ দ্রৌপদীকে সবচেয়ে ব্যক্তিত্ব-সম্পন্না সুন্দরী শোভনা লাগছিল।

বিরাট-পত্নী সুদেষ্ণা অন্যান্য রমণীদের নিয়ে সালংকারা উত্তরাকে চার দিক থেকে ঘিরে রইলেন। বিবাহ-মঙ্গলে সজ্জিতা উত্তরাকে ঠিক দেবনন্দিনীর মতো লাগছিল— সুতামিব মহেন্দ্রস্য পুরস্কৃত্যোপতস্থিরে। বিবাহ-বাসরে বর এসে পৌঁছলেন— অভিমন্যু। বরকর্তা হিসেবে বসলেন অর্জুন, তিনি পুত্রের জন্য সর্বাঙ্গসুন্দরী উত্তরাকে গ্রহণ করলেন পুত্রবধূ হিসেবে— তাং প্রত্যগৃহ্ণাৎ কৌন্তেয়ঃ সুতস্যার্থে ধনঞ্জয়। মহামতি যুধিষ্ঠির এবং বিশালবুদ্ধি কৃষ্ণের সামনে অর্জুন তাঁর আত্মজ অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিবাহ সুসম্পন্ন করালেন। আমি কিছুতেই ধারণা করতে পারি না এই মুহূর্তটি! কেমন লাগছিল কন্যাসনে-বসা উত্তরার, মনে কি পড়ছিল সেই নৃত্যময় দিনগুলি! মনে কি পড়ছিল অর্জুনের কাছে সেই ছুটে যাওয়া, সেই অনুযোগ— আমার কথা না শুনলে আমি আত্মহত্যা করব! মহাকবির হৃদয় চুপ করে থাকে এইখানে। সত্যবতীর হৃদয়নন্দন ব্যাস এইখানে শুধু ঘটনা বলে যান, নিরুপায় নিরুত্তাপ অনাসক্ত কবির হৃদয় অর্জুনের আত্মপ্রতিম নবযৌবনোদ্ধত অভিমন্যুকে উত্তরার সামনে

বসিয়ে দিয়েই সমস্ত আত্মগ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে যান। আর এই কালে বসে আমার নারীর কবিতা মনে পড়ে—

নিজের ভিতরে তুমি একা কাঁদো
বড় অশ্রুহীন
বন্ধ রাখো ত্রিকালদর্শী ত্রিনয়ন
সত্যকার সঙ্গমে রমণ
কে দেবে তোমায় নারী?
কোথায় সে পুরুষোত্তম?
তাই অভিনবা।
শমীবৃক্ষে শস্ত্র তুলে রাখো
খুলে রাখো রমণীধরম
কিম্পুরুষের সঙ্গে ঘটে যায় পৃথিবীর
সমস্ত অফলা সঙ্গমে।

উত্তরার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল অভিমন্যুর। যুধিষ্ঠির অনেক দানধ্যান করলেন বিবাহমঙ্গলের কৌতুকে। কিন্তু যে সুরে এই বিবাহ-রাগিণী বাঁধা হল তার মধ্যে ইমন-বেহাগের সুর যত মেশানো ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল আসন্ন রণসঙ্গীতের সুর। বিরাট-রাজধানীতে তখন পাণ্ডব-পক্ষে যোগ দিতে-আসা রাজা-রাজড়াদের সৈন্যবাহিনীর কুচকাওয়াজ চলছে। মুহুর্মুহু কথা চলছে উত্তেজনার— এই অজ্ঞাতবাসের পর কৌরব দুর্যোধনকে কোন কৌশলে মোকাবিলা করতে হবে; কোন ভাবনায় বৃদ্ধপক্ষ ভীষ্ম, দ্রোণ, এমনকী ধৃতরাষ্ট্রেরও সম্মান বজায় রেখে দুর্যোধন-কর্ণ, শকুনি-দুঃশাসনের মতো দুষ্ট-চতুষ্টয়কে শেষ করে দেওয়া যায়— এইরকম সব দুরন্ত ভাবনার মধ্যেই উত্তরার বিবাহ সম্পন্ন হল। বিবাহে খাদ্য-পানীয় থাকবে, সাধারণের হৃষ্টি-পুষ্টি হবে, এটা কোনও নতুন কথা নয়, বিশেষত রাজবাড়িতে— ভোজনানি চ হৃদ্যানি পানানি বিবিধানি চ— কিন্তু এই বিবাহের মধ্যে মহোৎসবের নির্ভার আনন্দময়তা যত না ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল আসন্ন যুদ্ধের দুশ্চিন্তা। লক্ষ করে দেখুন, আগের দিন রাত্রে উত্তরার সঙ্গে অভিমন্যুর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে, রাত্রির পূর্বভাগ যদি বা উৎসব-মুখরতাতেই কেটে গিয়ে থাকে, কিন্তু উত্তর-রাত্রির সামান্য বিশ্রামের পরেই পাণ্ডবরা সকলে তাঁদের স্বপক্ষীয়দের নিয়ে বিরাট রাজার সভায় গিয়ে উপস্থিত হলেন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেবার জন্য— কৃত্বা বিবাহং তু কুরুপ্রবীরাঃ/... সভাং বিরাটস্য ততোঽভিজগ্মু। এমনকী ঠিক আগের রাত্রেই যে অভিমন্যুর বিয়ে হয়েছে, সেই বিবাহোত্তীর্ণ সদ্য-স্বামীও নবযৌবনবতী উত্তরার সরসতা ছেড়ে উপস্থিত হয়েছেন বিরাটের রাজসভায় বিরাট-পুত্রদের সঙ্গে— বিরাটপুত্রৈশ্চ সহাভিমন্যুঃ।

মহাকবি দ্বৈপায়ন ব্যাস এখন বড় ব্যস্ত আছেন। বিশাল কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ভূমিকা রচনা হচ্ছে মহাভারতের উদ্যোগপর্বে। এই বিরাট রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে বালিকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনও সংবাদ দেবার সময় নেই তাঁর। অর্জুনের পরিবর্তে অন্য এক ছোট্ট অর্জুনকে পেয়ে তিনি যে বাতাহত কদলীর মতো শুয়ে পড়েছিলেন, এমন আভাস পাইনি আমরা। কিন্তু যে কৈশোরগন্ধী যুবতী খেলার পুতুল সাজানোর জন্য অর্জুনের মতো মহাবীরের কাছে বস্ত্রসজ্জা চেয়েছিল, বিবাহের রজনীতে তার অনেক স্বপ্ন দেখার কথা ছিল। কিন্তু এ-কেমন বীর-স্বামী সে লাভ করেছে যে, বিবাহের রাত্রি প্রভাত হতে-না-হতেই বিরাট রাজার রাজসভায় পৌঁছেছে যুদ্ধের অভিসন্ধিতে— বিশ্রম্য রাত্রাবুষসি প্রতীতাঃ/ সভাং বিরাটস্য ততোঽভিজগ্মুঃ। এমন বীর-স্বামীর জন্য বৈরাটী উত্তরার গর্ব হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু নববধূর সেই সতত উৎসারিত রোমাঞ্চ! মহাকবির সময় নেই, উপায়ও সেই রোমাঞ্চকর সংবাদ দেবার।

বিরাটের রাজসভায় অনেক উত্তপ্ত আলোচনা হল। পাণ্ডবের দূত গেল ধৃতরাষ্ট্রের সভায়, ধৃতরাষ্ট্রের প্রতিদূত সঞ্জয় এলেন পাণ্ডবদের কাছে। যুদ্ধ এড়িয়ে যাবার কোনও সমাধান-সূত্র মিলল না, অবশেষে শেষ শান্তির প্রস্তাব নিয়ে স্বয়ং কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় যাবেন, এই তো ঠিক হল। এই শান্তির প্রস্তাবের মধ্যে অবশ্য যুদ্ধের উন্মাদনা কম ছিল না এবং এই উন্মাদ পরিস্থিতিতে উত্তরার স্বামীর স্থিতি ঠিক কোথায়, তা বীরপত্নী দ্রৌপদীর একটিমাত্র বাক্য থেকেই প্রমাণ হয়ে যাবে। শান্তি-সন্ধিতে দ্রৌপদীর আপত্তি ছিল। তিনি কৃষ্ণের সামনে দুঃশাসনের ধর্ষিত কেশদাম মুক্ত করে ওজস্বিনী ভাষায় বলেছিলেন— তোমরা যদি যুদ্ধ না কর, তা হলে কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে আমার ছেলেরা এবং সে যুদ্ধ হবে অভিমন্যুর নেতৃত্বে— অভিমন্যুং পুরস্কৃত্য যোৎস্যন্তে কুরুভিঃ সহ।

আমরা জানি, ভবিষ্যতে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হবে, সেখানে অর্জুন-ভীমের মতো মানুষেরাই যুদ্ধনায়কের ভূমিকা পালন করবেন, কিন্তু অভিমানে আহতা দ্রৌপদীর মুখে অভিমন্যুর জন্য যে আশা ব্যক্ত হয়েছে, তাতে অভিমন্যুর যুদ্ধশৌর্য যেমন একদিকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তেমনই কৌরবপক্ষের মহাপ্রভাবশালী বীরদের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধজীবনের অস্থিরতাও প্রকট হয়ে ওঠে। বিশেষত সদ্যকৈশোরোত্তীর্ণ যৌবন-সন্ধানী অভিমন্যু তো যুদ্ধ-বস্তুটাকে হৃদয়ের তাড়নায় পরম অভীষ্ট বলে মনে করেন, সেখানে নববধূ উত্তরার নতুন দাম্পত্যের অর্গল কতটুকু শক্তিশালী!

উত্তরা যে অর্জুনের পরিবর্তে অভিমন্যুকে লাভ করে খুব অসুখী হয়ে পড়েছিলেন, তা আমরা মনে করি না। অর্জুনের মতো প্রৌঢ় মহাবীরের জন্য তাঁর 'ইনফ্যাচুয়েশন' ছিল, 'হিরো-ওয়রশিপ' ছিল, এবং অবশ্য অনেক বিভ্রান্তিও ছিল এবং তা ছিল অর্জুনের অজ্ঞাতবাসের 'আইডেনটিটি'র কারণেই। ফলত বিভ্রান্তি দূর হয়ে যেতেই উত্তরারও মানসিক স্থিতি তৈরি হতেও খুব একটা সময় লাগেনি বলেই মনে হয়। বিশেষত, অর্জুনের কৃত্রিম ক্লীবত্ব এবং ব্যক্তিত্ব প্রকাশ হয়ে যাবার ব্যাপারটা এতটাই আকস্মিক ছিল এবং সেই আকস্মিকতায় কুমার অভিমন্যুর রঙ্গপ্রবেশ এত তাড়াতাড়ি ঘটেছে যে, উত্তরার কিশোরী-হৃদয়ের শূন্যতা পূরণ হতেও দেরি হয়নি। হয়তো দেরি হয়নি!

কিন্তু যে কিশোর-বীরকে তিনি স্বামী হিসেবে লাভ করলেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর দাম্পত্যের কাল কাটল কতদিন! এটা মনে রাখতে হবে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু হবার আগে যুদ্ধের

উদ্যোগ-পর্বে যত সময় কেটেছে, ওই সময়টুকুই উত্তরার সঙ্গে তাঁর স্বামীর দাম্পত্য জীবন। অথচ এই যুদ্ধোদ্যোগের মধ্যে, চারিদিকে সাজ-সাজ রবের মধ্যে, উপপ্লব্য আর হস্তিনাপুরের সীমানায় বারংবার দূত-বিনিময় এবং তাদের সান্ধি-বিগ্রহিক শব্দ-বিনিময়ের উত্তেজনার মধ্যে অভিমন্যুর মতো বীরের মানসিক 'ইনভলবমেন্ট' যতটা হতে পারে, তাতেই কিন্তু উত্তরার দাম্পত্য জীবনের সরসতা এবং সময় অনুমেয় হয়ে ওঠে সহজেই। এটা অবশ্যই মানতে রাজি আছি যে, তখনকার দিনের ক্ষত্রিয়-চরিত্রের কঠিন আদর্শ যেভাবে পুরুষ-রমণী সকলের মধ্যে সঞ্চারিত এবং প্রচারিত হত, তাতে বিরাট-নন্দিনী উত্তরার কাছে তাঁর স্বামীর যুদ্ধ বিষয়িনী উন্মাদনা অতিশয় স্বাভাবিক ছিল, বরঞ্চ তাঁর পক্ষে 'প্রেমের সময় পাচ্ছি না' বলে অভিমানে মানিনী হওয়াটাই অস্বাভাবিক ছিল। বিশেষত বিরাট রাজ্য মানে এখনকার জয়পুর-ভরতপুর-আলোয়ার অঞ্চল, এই মরুভূমির মেয়ের চরিত্রে বাষ্পসংমিশ্র কোমলতার চেয়ে মঞ্জরীহীন মরুভূমির লতার আচরণটাই অনেক বেশি সদর্থক।

তবুও তো দাম্পত্য-জীবনের একটা অভীপ্সিত কাল থাকে সকল নর-নারীর— অন্তত সর্বনিম্ন যে সময়টুকু পেলে একজন রমণী বলতে পারে— আমার স্বামীকে আমি আমার মতো করে যতটুকু পেয়েছি। উত্তরা কিছুই বলতে পারেন না, বিবাহ থেকে স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর দাম্পত্য জীবন মাত্র ছ'মাস, আর এই ছয় মাসই তাঁকে ঘরে বসে যুদ্ধের উত্তেজনার আগুন পোয়াতে হয়েছে। অথচ এর মধ্যেও উত্তরার অযান্ত্রিক মনে বালক-বীরের ছায়া পড়েছে, ছায়া পড়েছে তার শরীরেও। এরই মধ্যে উত্তরা অভিমন্যুর তেজ ধারণ করে গর্ভবতী হয়েছেন। কিন্তু ঠিক ছ'মাস। বিয়ের পর ছয় মাস মাত্র গেছে, কুরুক্ষেত্রের সর্বক্ষয়ী যুদ্ধে সপ্তরথীর হাতে নৃশংসভাবে মারা গেলেন উত্তরার স্বামী অভিমন্যু। যুদ্ধের সময় অর্জুন কাছাকাছি ছিলেন না। এদিকে যুদ্ধতাড়িত যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যকৃত চক্রব্যূহের দুরভিসন্ধি তেমন বুঝতে না পেরে পুত্রপ্রতিম অভিমন্যুকে অনুরোধ করলেন চক্রব্যূহ ভেদ করে ব্যূহের ভিতরে প্রবেশ করার জন্য।

দুর্ভাগ্য এমনই, অভিমন্যু ব্যূহে প্রবেশের উপায় জানতেন, কিন্তু ব্যূহ থেকে নির্গমনের উপায় জানতেন না। যুধিষ্ঠির-ভীমরা আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তাঁরা অভিমন্যুর পিছন পিছন ব্যূহে প্রবেশ করবেন, কিন্তু কৌরবপক্ষে জয়দ্রথ সেদিন অদম্য ছিলেন, তাঁর শক্তিমত্তার কারণে পাণ্ডবপক্ষের অন্য কেউই অভিমন্যুর সহায় হতে পারলেন না। বালক-বীর অভিমন্যু সপ্তরথীর সম্মিলিত আক্রমণে একসময় বীরের মতো মৃত্যুবরণ করলেন।

অভিমন্যুর এই মৃত্যু কোনও সাধারণ মৃত্যু নয়, এক সদ্যোযুবকের মৃত্যু। এই নৃশংস মৃত্যুর প্রভাব যাঁদের ওপরে সবচেয়ে বেশি হবার কথা, তাঁদের নাম আছে মহাভারতে। প্রথমত অর্জুন, পিতা হিসেবে মৃত পুত্রের জন্য তাঁর করুণ অভিব্যক্তি মহাকাব্যিক মর্যাদায় উপস্থাপন করেছেন দ্বৈপায়ন ব্যাস। দ্বিতীয় যুধিষ্ঠির, যিনি অভিমন্যুকে চক্রব্যূহে প্রবেশ করার প্রথম প্ররোচনা দিয়েছিলেন, তিনি অনুতাপে মুখ দেখাতে চাইছিলেন না কাউকে। তৃতীয়ত, যুধিষ্ঠির আর অর্জুনের মুখেই শোনা গেল তিনজন রমণীর কথা এবং সেই নামগুলি শুনেই তাঁদের মানসিক অবস্থার তর-তম বিচার করা যায় না কিন্তু। অভিমন্যুর মৃতুর পর যুধিষ্ঠির সানুতাপে বলেছিলেন— সুভদ্রা, কৃষ্ণ এবং অর্জুনের সবচেয়ে অপ্রিয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটনাটা আমিই ঘটিয়েছি— অহমেব সুভদ্রায়া কেশবার্জুনয়োরপি। সুভদ্রার কথা এই প্রথম এল, কিন্তু এখনও উত্তরার নাম উচ্চারিত হয়নি যুধিষ্ঠিরের মুখে। এরপরে অর্জুন যখন অভিমন্যুর জন্য করুণ বিলাপ করছেন, তখন প্রথমে তিনি দুটি রমণীর নাম উচ্চারণ করে বলেছেন— সুভদ্রার জন্য আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, প্রিয়তম পুত্রকে না দেখে সুভদ্রা আমাকে কী বলবে, আর দ্রৌপদীই বা আমাকে কী বলবে, আর তাঁদেরই বা আমি কী বলব— সুভদ্রা বক্ষ্যতে কিং মাম্ অভিমন্যুমপশ্যতী। একেবারে শেষ কল্পে এসে অর্জুন উত্তরা বধূর কথা বলছেন। বলছেন— আমার হৃদয়টা নিশ্চয়ই বজ্রের কঠিন সারটুকু দিয়ে তৈরি, নইলে এই ভয়ংকর খবর শুনে বধূ উত্তরা যখন ভীষণভাবে রোদন-ক্রন্দন করবে, তবু এই কঠিন হৃদয় হাজারটা টুকরো হয়ে ফেটে যাবে না— সহস্রধা বধূং দৃষ্ট্বা রুদতীং শোক কর্ষিতাম্।

একে একে বিচার করি এবার। আগে বলা দরকার— মহাকাব্যের কবি এখন-এখনই উত্তরার বিলাপে নিখিল বিশ্ব ধ্বনিত করে তোলেননি। তিনি আঠেরো দিনের যুদ্ধপর্বে বীররসে ভাসছেন এখন, একটু পরেই অর্জুনের মুখে জয়দ্রথের বধ-প্রতিজ্ঞা শুনতে পাব। তবুও যে ক্রমান্বয়ে সুভদ্রা, দ্রৌপদী এবং উত্তরার কথা এল তারও একটা হেতু আছে, এমনকী ইঙ্গিতও আছে বধূ-জীবনের অসহায়তার প্রতিও— মহাকবি যা স্বকণ্ঠে বলেন না, শুধু ইঙ্গিত দেন।

প্রথমে সুভদ্রার প্রসঙ্গটা খুব স্বাভাবিক, কেননা তিনি অভিমন্যুর জননী। সন্তানের মৃত্যু হলে জননীর হৃদয় যত বিদারিত হয়, এমনটি বোধহয় অন্য কারও নয়। তা ছাড়া অর্জুনের দৃষ্টিতে তাঁর সন্তানের জন্ম এবং এতদিনের লালন ঘটেছে যাঁর মাধ্যমে, সেই সুভদ্রা তো তাঁর স্ত্রী। অতএব স্ত্রী সুভদ্রা অভিমন্যুর মাতৃত্ব হারিয়ে কতটা কষ্ট পাবেন, এই আশঙ্কা বার বার এসেছে তাঁর মনে। অন্যদিকে বিমাতা হওয়া সত্ত্বেও দ্রৌপদীর কথাও যে আসছে আশঙ্কার রূপ ধরে, তার কারণ দ্রৌপদীর ব্যক্তিত্ব এবং অভিমন্যুর ওপরে তাঁর পুত্রাধিক মমতা। ভীম-অর্জুনের মতো মহাবীর এবং কৃষ্ণের মতো বুদ্ধিমান সহায় থাকতেও অভিমন্যুর কেন এই মৃত্যুগতি হল তার জবাবদিহি যিনি চাইতে পারেন, তিনি কিন্তু একমাত্র দ্রৌপদী। তৃতীয়ত এসেছে উত্তরার কথা— আজকের দিনে হলে এখনকার আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে পরিবারগুলির দাম্পত্যের কেন্দ্রায়ন যেহেতু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এমনকী পরিবারের সরকারি সংজ্ঞার মধ্যেও যেহেতু স্বামী-স্ত্রী এবং তাঁদেরই সন্তান ভিন্ন অন্যতরের কোনও অস্তিত্ব নেই, তাই উত্তরার কথাটাই সবচেয়ে সংবেদনশীল হয়ে উঠত। বিশেষত তিনি গর্ভবতী এবং মাত্র ছয় মাসের মধ্যে তাঁর দাম্পত্যের সমস্ত অনুষঙ্গ ব্যর্থ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় বর্তমান যুগের সমস্ত অনুকম্পা, সহৃদয়তা এবং সামাজিকভাবে সযৌক্তিক করুণা উত্তরার প্রতিই বাহিত হয়, ধাবিত হয়।

অথচ দেখুন, মহাকাব্যের বিশাল পটভূমির মধ্যে উত্তরার কথা আসছে সবার শেষে। আজকের দিনের নারী-মর্যাদার নতুন নিরিখে দাম্পত্য জীবনের সার্থকতা এবং সদর্থকতাই যেহেতু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, সেখানে মহাকাব্যের কবির এই ক্রমান্বয়ী অনুকম্পা-বোধ আমাদের তখনকার দিনের আর্থ-সামাজিক বোধ সম্বন্ধে সচেতন করে

তোলে, যদিও তাঁদের বোধ-ভাবনাটুকুই তাঁদের মতো করে বুঝলে এখনকার কালেও অসহনীয় হবে না।

এটা মানতেই হবে যে, মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে যত চিন্তা, তার চেয়ে অনেক বেশি চিন্তা কিন্তু যাঁরা বেঁচে রইলেন তাঁদের নিয়ে এবং বেঁচে-থাকা শোকাতুর মানুষগুলির বিচার কিন্তু সব সময়েই ক্রমান্বয়ী গুরুত্ব লাভ করে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে শোকার্তের সম্বন্ধ এবং সেই সম্বন্ধের সময়কালের নিরিখে। আজকের দিনে হলে আমরা উত্তরার কথাই বেশি চিন্তা করতাম, কেননা তিনি অভিমন্যুর স্ত্রী এবং তিনি গর্ভবতী— অভিমন্যুর সন্তান বীজ তিনি বহন করছেন। হোক না, মাত্র ছয় মাস তাঁর সঙ্গে বিবাহ হয়েছে, কিন্তু এখনকার দিনের পরিবারতন্ত্রের গুরুত্বের ভাবনায় স্ত্রী-সম্বন্ধই বেশি, অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিশেষত স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর পরিবারের মধ্যে তাঁর সন্তানের ভরণ-পোষণের ব্যাপারটা অনেক সময়েই অর্থনৈতিক অবহেলা এবং সামাজিক অবহেলার বিষয় হয়ে উঠত বলেই বিধবা স্ত্রী, বিশেষত গর্ভবতী অবস্থায় বিধবা রমণীর ওপর এখনকার সামাজিকদের অনুকম্পা বেড়ে ওঠাটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু মহাকাব্যের কালে এই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক নিষ্ঠুরতা কল্পনাই করা যায় না। একটি রমণী একটি বিখ্যাত বংশের বধূ হয়ে বাড়িতে প্রবেশ করল মানেই বধূ হিসেবে তাঁর মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। কুরুকুলে মহারাজ শান্তনুর বিধবা স্ত্রী সত্যবতীর মর্যাদা ভীষ্মের চেয়েও বেশি ছিল এবং অকালমৃত বিচিত্রবীর্যের দুই বিধবা স্ত্রী অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভলাভের জন্য পরিবারের বাইরে থেকে পুরুষের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এই উদারতার মধ্যে সামাজিক অবহেলার তো প্রশ্নই ওঠে না, আর অর্থনৈতিক চাপটাও রাজবাড়িতে তেমন করে অনুভূত হয়নি। ফলত উত্তরার গর্ভস্থ অভিমন্যুর সন্তান কীভাবে মানুষ হবে, অথবা অকালমৃত স্বামীর কারণে বধূর সামাজিক সুরক্ষা কতটা সুস্থির হবে, তা নিয়ে কোনও ভাবনা বা দুর্ভাবনা ছিল না।

বরঞ্চ এখানে যেটা বড় হয়ে উঠেছে, তা হল মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ এবং সেই সম্বন্ধের সময়কাল এবং অবশ্য সম্বন্ধের নিবিড়তাও। অভিমন্যু হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে মানুষ হননি। তিনি জননী সুভদ্রার মাতৃস্নেহচ্ছায়ায় মানুষ হয়েছেন মামাবাড়িতে। বারো বছর বনবাস আর এক বছরের অজ্ঞাতবাসের কারণে অভিমন্যুর জীবনে পিতার নৈকট্য অধরা রয়ে গেছে অনেক কাল। স্বামীর অনুপস্থিতিতে অভিমন্যুর অনেকটাই জুড়ে ছিলেন সুভদ্রা এবং অনেকটাই তাঁর মামা মহামতি কৃষ্ণ। অভিমন্যু বিবাহও করতে এসেছিলেন দ্বারকা থেকে। এত বছর যিনি জননীর তত্ত্বাবধানে এবং স্নেহমায়ায় বড় হয়ে উঠেছেন, সেই অভিমন্যু বিবাহ করতে এলেন বিরাটরাজ্যে এবং তার পরের ছয় মাসের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হল— এখানে মহাকাব্যের কবির সমস্ত অনুকম্পা পুঞ্জীভূত হয়েছে অভিমন্যুর জননীর ওপরে।

জননীর বাৎসল্য, সে তো সব জননীর ক্ষেত্রেই সাধারণ, কিন্তু বীর স্বামীর অনুপস্থিতিতে পুত্রকে স্বামীর মতোই বীর করে তুলবার মধ্যে অভিমন্যুর মামা কৃষ্ণের যত নিষ্ঠা ছিল, তেমনই সুভদ্রারও বড় দায় ছিল। তিনি এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছিলেন এতটাই সময় ধরে যে, এই সময়-জোড়া বাৎসল্যই মহাকাব্যের কবির কাছে উত্তরার বৈরথে বড় হয়ে উঠেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই কারণেই যুধিষ্ঠিরের আশঙ্কিত চিত্তে সুভদ্রার হৃদয়-ভাবনা প্রথমে আঘাত করে, উত্তরার নাম সেখানে আসেই না। আর অর্জুনের ব্যক্তিগত ভয়ংকর শোকার্তির মধ্যেও একই ভাবে সুভদ্রার ভাবনা এসেছে প্রথমে এবং তার কারণ সেই একই, দায়িত্বশীলা জননীর কাছে দায়িত্ব পালন-না-করা পিতার দায়। তারপরেই এসেছে দ্রৌপদীর কথা, কেননা দ্রৌপদী অভিমন্যুকে শুধুমাত্র পুত্রাধিক মর্যাদা দিতেন, তাই শুধু নয়, এই মৃত্যু-ঘটনার জন্য তিনি কুঞ্চিত নাসিকায় ধিক্কার দেবেন অর্জুনের ধনুষ্মত্তার প্রতি, ভীমের বাহুবলের প্রতি। এতসব বীর-নাম থাকতে কেন মরতে হল এই কৈশোরগন্ধী যুবককে— এই জবাবদিহি চাইবেন দ্রৌপদী স্বভাবতই। কিন্তু অর্জুন পরিশেষে তাঁর প্রিয়শিষ্যা উত্তরার কথাও ভোলেননি। যে আশা নিয়ে তিনি কিশোরী-যুবতীর বর না হয়ে বরকর্তা হয়েছিলেন, সেই উত্তরা যে এইভাবে বিয়ের ছয় মাসের মধ্যে এমনভাবে স্বামী হারিয়ে বিধবা হবেন, এ কষ্ট তাঁর মতো করে কে বুঝবে! অতএব সুভদ্রা, দ্রৌপদী ছাড়াও উত্তরার জন্য বড় কষ্ট হল অর্জুনের এবং উত্তরার কথা মনে আসতে শুধু একটাই কথা তাঁর মনে হল— বউটা আছাড়ি-পিছাড়ি করে কত কাঁদবে— আমার বুকটা তবু ফেটে যাবে না সেই কান্না দেখে, কতটা কঠিন মানুষ আমি— সহস্রধা বধূংদৃষ্ট্বা রুদতীং শোককর্ষিতাম্।

অর্জুন জয়দ্রথ-বধের ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, কেননা এই জয়দ্রথই হলেন সেই দুষ্টতম লোক, যিনি অভিমন্যুর পশ্চাদ্‌ভাগে-আসা ভীম এবং অন্যান্য যোদ্ধাদের আটকে দিয়েছিলেন, যাতে তাঁরা অভিমন্যুকে সুরক্ষা দিতে না পারেন। অর্জুন এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা করার পরেই কিন্তু কৃষ্ণকে বললেন— তুমি তোমার বোন সুভদ্রার কাছে যাও, একই সঙ্গে যাও বধূ উত্তরার কাছেও— আশ্বাসয় সুভদ্রাং ত্বং ভগিনীং স্নুষয়া সহ। আসলে অর্জুন নিজেও প্রিয় পুত্রের অকাল মৃত্যুতে এত শোকগ্রস্ত ছিলেন যে, তাঁর পক্ষে সুভদ্রা এবং উত্তরার মুখোমুখি হওয়া সম্ভবই ছিল না। বিশেষত পরিচিত অতিনিকট নিজের জন হবার কারণে সুভদ্রা এবং উত্তরার শোকার্তি এমন মাত্রায় পৌঁছবে— অর্জুন জানেন— তাতে পরের দিন ভোরেবেলাতেই জয়দ্রথকে বধ করার শক্তিটুকু খানিকটা আর্দ্র হয়ে উঠতে পারে। তবে অর্জুন যে উত্তরার মানসিক অবস্থাটা সুভদ্রার চেয়ে কম করে দেখছেন না, বরঞ্চ এই গর্ভবতী বালিকা-বধূর অসহায়তা তিনি এতটাই বোঝেন যে, কৃষ্ণকে তিনি বলেছিলেন— শুধু আমার বধূ উত্তরাই নয়, তুমি তার সখী এবং দাসীদেরও সান্ত্বনা দিয়ে শোকমুক্ত করবে— স্নুষা-প্রেষ্যা-বয়স্যাশ্চ বিশোকাঃ কুরু মাধব।

অর্জুনের কথায় কৃষ্ণ ভগিনীর কাছে গেছেন, তাঁর উদ্বেল শোক যথাসম্ভব মুক্ত করার পরে একবার তিনি ভগিনী সুভদ্রাকেই বলেছিলেন— তুমি বধূ উত্তরাকে একটু শান্ত করার চেষ্টা করো। ক্ষত্রিয়-যোদ্ধার জীবনটাই এমন অনিশ্চিত, তার জন্য শোক কোরো না— আশ্বাসয় স্নুষাং রাজ্ঞি মা শুচঃ ক্ষত্রিয়ে ভৃশম্। কিন্তু স্বজন-বিয়োগের শোক, বাৎসল্যময়ী জননীর শোক এমনই উত্তাল হয়ে উঠল যে, সুভদ্রার রোদন-শব্দ শুনে উত্তরা বোধহয় নিজেই সুভদ্রার কাছে চলে এসেছিলেন। কেননা একটু পরে যখন পাঞ্চালী দ্রৌপদীকে সুভদ্রার কাছে উপস্থিত হতে দেখছি, তখনই বোঝা যাচ্ছে— বৈরাটী উত্তরা সেখানেই আছেন শোককর্ষিতা শ্বশ্রূমাতার কাছে— অভ্যপদ্যত পাঞ্চালী বৈরাটী-সহিতাং তদা। সদ্য

পুত্রহারা, স্বামীহারা এই শোকাকুলা রমণীদের শান্ত করা যে কত কঠিন, সেটা কৃষ্ণ খুব তাড়াতাড়িই বুঝে গেছেন এবং বুঝেছেন— ভগিনী সুভদ্রাকে তিনি যদি বা কিছু সান্ত্বনা দিতে পেরে থাকেন, উত্তরার প্রতি তিনি তেমন নজরই দিতে পারেননি। এই সময়ে দ্রৌপদী সেখানে এসে যাওয়ায় তাঁর বড় সুবিধা হল। সুভদ্রাকে যথাসম্ভব সান্ত্বনা দেবার পরেই কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বললেন— তুমি উত্তরাকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করো— সুভদ্রে মা শুচঃ পুত্রং পাঞ্চালী আশ্বাসয়োত্তরাম্। কৃষ্ণ পুনরায় চলে এলেন অর্জুনের কাছে।

সত্যি কথা বলতে কি, উত্তরাকে আমরা এই সময়ে খুব পরিণত, 'ম্যাচিয়র' দেখছি। হয়তো মহাকাব্যের কবি পুনরুক্ত-বর্ণনার ভয়ে সুভদ্রার পাশাপাশি আর উত্তরার সন্তাপ-দুঃখ সবিস্তারে বর্ণনা করেননি, কিন্তু এটাও তো ঠিক যে, সুভদ্রার উদ্বেল রোদন-মুহূর্তে যখনই উত্তরাকে তাঁর পাশে দেখছি, তখনই বোঝা যায়— নিজের উদ্গত অশ্রু যথাসম্ভব সম্বরণ করে শোকার্তা শাশুড়িকেই তিনি শান্ত করবার চেষ্টা করছেন হয়তো। কেননা অভিমন্যুর জন্য যত বিলাপ, তা সবই নিবদ্ধ হয়েছে জননী সুভদ্রার মুখে, উত্তরার অসহায় আর্ত কণ্ঠস্বর সেখানে শুনতে পাই না বলেই মনে হয় সুভদ্রার উদ্দেশে কৃষ্ণের সান্ত্বনা-বাক্যগুলি উত্তরা নিজের মতো করে আত্মস্থ করে নিয়েছেন। বৈরাটী উত্তরাকে আমরা অনেক পরিণত দেখতে পাই এখানে। অথবা স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে একদিনের মধ্যেই তাঁর অকাল-গম্ভীর সেই পরিণতি এসেছে, যা বর্ণনা করার অবকাশ পাননি মহাভারতের কবি।

কুরুক্ষেত্রের তেরো দিনের দিন অভিমন্যু মারা গেলেন। সেই দিন সন্ধ্যা থেকে রাত্রির তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত শোক এবং ক্রোধের উদ্বেল পরিবেশের মধ্যে আমরা বারবার তবু উত্তরার নাম শুনি। আরও পাঁচ দিন যুদ্ধের পর আঠেরো দিনের দিন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়। এর মধ্যে এত ক্ষয়, এত ধ্বংস এবং এত প্রতিশোধ আমরা দেখেছি যে, তার মধ্যে বৈরাটী বালিকা-বধূর নাম উচ্চারিতই হতে পারেনি। অবশেষে যেদিন যুদ্ধ থেমে যাবার দিন এল, সেদিনও কিন্তু এক চরম বিপদ নেমে এল এই উত্তরার ওপরেই। যুদ্ধের শেষ দিনে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার হাতে দ্রৌপদীর পাঁচটি ছেলে মারা পড়লেন। অর্থাৎ সুভদ্রার গর্ভজাত অভিমন্যুর সঙ্গে দ্রৌপদীর পুত্রেরাও কালগ্রাসে গ্রস্ত হবার ফলে পাণ্ডবদের বংশে পরবর্তী প্রজন্ম একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল।

পাণ্ডবরা নিজেরা বেঁচে রইলেন প্রত্যেকে অথচ কোনও যুদ্ধ ছাড়াই অশ্বত্থামা পাণ্ডবদের বংশ ধ্বংস করার পর নিজের ব্রহ্মশির অস্ত্রখানি সম্বরণ করতে না পেরে লক্ষ্য স্থির করলেন উত্তরার গর্ভস্থ অভিমন্যুর সন্তানটি নষ্ট করার জন্য এবং সেটা অভিমন্যুর মৃত্যুর ঠিক পাঁচ দিন পরে, অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হবার দিন। এই বিড়ম্বনা আমার অদ্ভুত লাগে। বিয়ের ছয় মাসের মাথায় উত্তরার স্বামী মারা গেলেন, এখন তাঁর গর্ভস্থ সন্তানটিও মৃত্যুর জন্য নির্ধারিত হলেন। যে রমণী সংসার জীবনের ওঠা-নামা, পোড় খাওয়া কিছুই টের পেল না, সে আকস্মিকভাবে তার স্বামী হারাচ্ছে এবং পুত্রকেও হারাতে বসেছে। এ কেমন যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা যুবতী বধূর বুকে। এই তো সেদিনও, ভীষ্ম বহু চেষ্টা করেও পাণ্ডবদের কোনও ক্ষতি করতে পারছিলেন না বলে দুর্যোধন তাঁকে দুঃখ দিয়ে বলেছিলেন— আপনি মনে হচ্ছে পাণ্ডবদের খানিকটা বাঁচিয়ে রাখছেন ইচ্ছে করে, বরঞ্চ এই যুদ্ধের ভার আপনি আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপরে বা কর্ণের ওপরে ছাড়ুন, আমরাই যুদ্ধ করব। ভীষ্ম সেদিন খুব রেগে গিয়ে অর্জুনের যুদ্ধশক্তির প্রশংসা করার সময় বালিকামতি উত্তরার প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেছিলেন— যেদিন বিরাট নগরে কর্ণকে বেহুঁশ করে দিয়ে শুধু বালিকা উত্তরার খেলার পুতুলের জন্য তার মাথার পাগড়ি নিয়ে গিয়েছিল বিনা বাধায়, সেদিনই ওই অর্জুনের ক্ষমতা, আর তোমাদের মুরোদ বুঝেছি, বাছা— উত্তরায়ৈ দদৌ বস্ত্রং পর্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্।

তার মানে, এই বিরাট যুদ্ধভূমিতে বিচিত্র কথাপ্রসঙ্গে এখনও উত্তরার যে বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়, সে হল তাঁর ছেলেমানুষি, তাঁর আদর-কাড়া স্বভাব। অথচ সেই ছেলেমানুষটির ওপর দিয়ে যেন আকালিক দৈবের ঝড় বয়ে গেল। স্বামীর মৃত্যু হয়েছে পাঁচ দিন আগে, আর এখন পেটের ছেলেটিও যেতে বসেছে। উত্তরার ক্ষুদ্র-পরিসর দাম্পত্য জীবনে স্বামীর ঘরের জ্ঞাতি-কলহ যত দুর্দশা ডেকে আনল তাঁর, তাতে আজকের দিনে হলে এই বাড়িটার ওপরেই তাঁর একটা ঔদাসীন্য আসত। কিন্তু সেকালের দিনে একজন রাজবধূ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত হতাশায় চালিত হতেন না, পরিবারের ঐতিহ্য-গর্ব এবং রাজকীয় মর্যাদা তার মধ্যে জীবন-ধারণের অন্যতর আসক্তি দান করত। লক্ষ্য করে দেখুন, অশ্বত্থামা তাঁর পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য দুর্দম্য পাণ্ডবদের কাউকে লক্ষ্য বেছে নেননি, ক্ষত্রিয়ের রক্ত তাঁর ধমনীর মধ্যে কোনও বীরোচিত উষ্ণতা জাগায় না বলেই তিনি এমন একটা 'টারগেট' নিয়েছেন যাতে পাণ্ডবদের পরবর্তী প্রজন্মটাই নষ্ট হয়ে যায়। তিনি আগে দ্রৌপদীর পাঁচটি ছেলেকে নিদ্রাগত অবস্থায় ঘুম থেকে তুলে মেরে ফেলেছেন, এখন তিনি লক্ষ্য স্থির করেছেন পাণ্ডবদের শেষ সন্তানবীজটির ওপর।

অথচ ঠিক এই জায়গা থেকেই স্বামীহারা উত্তরার পারিবারিক মর্যাদা বিপ্রতীপভাবে বাড়তে থাকে। কুরুক্ষেত্রের এই বিরাট যুদ্ধের মধ্যে একজন সামান্য কুলবধূ— কেননা তিনি দ্রৌপদীও নন, এমনকী সুভদ্রাও নন— মাত্র ছয় মাসের বিবাহিতা বধূটি হঠাৎই যেন বিপ্রতীপভাবে ভাস্বর হয়ে ওঠেন। হয়তো এখানেও সকলের অলক্ষ্যে সেই পুরুষতান্ত্রিকতা আছে, কেননা উত্তরার গর্ভে রাজবংশের শেষ সন্তানটি জীবিত আছে যার মধ্যে পাণ্ডববংশের সুস্থিতির আশ্বাস পাওয়া যায়। কিন্তু ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে মহাকাব্যের বিচার না করলেও চলে, কেননা উত্তরা অভিমন্যুর স্ত্রী ছয় মাস মাত্র বিয়ে হলেও তাঁর জন্য পাণ্ডবরা যথেষ্টই অবহিত। দ্রৌণি অশ্বত্থামা সত্যিই তাঁর ব্রহ্মশির অস্ত্রসম্বরণের উপায় জানতেন না— এই সরল মহাকাব্যিক বিশ্বাসের চেয়েও যেটা বড় হয়ে ওঠে, সেটা হল— অশ্বত্থামা ঠিক করেই রেখেছিলেন যে, উত্তরার গর্ভস্থ সন্তানটিকে নষ্ট করে তিনি পাণ্ডবদের অস্তিত্ব নষ্ট করে যাবেন। তিনি বলেছিলেন— আপনারা আমার মাথার মণি চেয়েছেন, সেটা নিন, কিন্তু আমার ছোড়া বাণটা কিন্তু লাগবেই— ঈষিকা তু পতিষ্যতি। পাণ্ডবরা সকলে সন্তান-বীজের যে আধার-গর্ভটির ওপর নির্ভর করে আছেন, সেখানে এই অস্ত্রপাত নিশ্চিত ঘটবে— গর্ভেষু পাণ্ডবেয়ানাম্ অমোঘঞ্চৈতদ্ উদ্যতম্।

বৃহত্তর স্বার্থে, বৃহত্তর ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে মধ্যস্থ ভগবান ব্যাস মেনে নিয়েছিলেন অশ্বত্থামার কথা। বলেছিলেন— তবে তাই হোক। কিন্তু কৃষ্ণ, যিনি ভাগিনেয় অভিমন্যুর মৃত্যুতে ভগিনী সুভদ্রা এবং পাণ্ডব কুলবধূ উত্তরার জন্য মর্মে মরে আছেন, তিনি অশ্বত্থামার

এই বেয়াদপি সহ্য করলেন না। তিনি বললেন— দেখ অশ্বত্থামা! বিরাট রাজার মেয়ে গাণ্ডীবধন্বা অর্জুনের পুত্রবধূ। উপপ্লব্যে যখন ওঁরা ছিলেন, তখন এক ব্রাহ্মণ এসে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, উত্তরাকে— কৌরব-পাণ্ডবের বংশ যখন ক্ষীণ, পরিক্ষীণ হয়ে আসবে, তখন তোমার গর্ভে পুত্র আসবে— পরিক্ষীণেষু কুরুষু পুত্রস্তব ভবিষ্যতি। ব্রাহ্মণের সেই বচন মিথ্যা হবে বলে মনে করি না। পরিক্ষীণ বংশে উত্তরার পুত্র পাণ্ডবদের বংশ রক্ষা করবে বলেই তার নামও হবে পরিক্ষিৎ— পরিক্ষিদ্‌ভবিতা হ্যেষাং পুনর্বংশকরঃ সুতঃ। অতএব তুমি যা ভাবছ, তা হবে না অশ্বত্থামা। 'পরিক্ষিৎ' নামটা ব্যাকরণের যন্ত্রণা, যাতে 'পরীক্ষিৎ' পরিক্ষিৎ হয়েছেন।

অশ্বত্থামা যে পূর্বপরিকল্পতভাবে পাণ্ডবদের নিরীহ বংশধর সন্তানদেরই ধ্বংস করার জন্য ফন্দি এঁটেছিলেন, তা এই জায়গায় আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। অশ্বত্থামা কৃষ্ণকে বললেন— জানি এবং বুঝি তোমার ব্যাপার। ভাগনে-বউ বলে কথা, তোমার সখার পুত্রবধূ। তার ওপরে একটা স্নেহ-পক্ষপাত তো তোমার থাকবেই। তবু জেনো, যেমনটি তুমি বলছ, তেমনটা হবে না— নৈতদেবং যথাত্থ ত্বং পক্ষপাতেন কেশব। আমি যা বলেছি, তা হবেই। বিরাটনন্দিনী উত্তরার যে গর্ভ তুমি রক্ষা করতে চাইছ, আমার এই ব্রহ্মশির অস্ত্র তাঁর গর্ভ নষ্ট করবেই। কৃষ্ণ অশ্বত্থামার বাক্য মেনে নিয়েও প্রবেশ করলেন আপন স্বকীয়তার মধ্যে। পাণ্ডবদের বংশকর সন্তানবীজটিকে তিনি ধ্বংস হতে দেবেন না। তিনি বললেন— হ্যাঁ, ব্রহ্মশির অস্ত্রের মতো অমোঘ অস্ত্রের নিক্ষেপ ব্যর্থ হবে না, জানি। কিন্তু এও তুমি জেনে রেখো— উত্তরার গর্ভস্থ সন্তান যদি মৃত হয়েও জন্মায়, তবু সে দীর্ঘ আয়ু লাভ করবে— স তু গর্ভো মৃতো জাতো দীর্ঘমায়ুরবাপ্স্যতি। কিন্তু মাঝখান দিয়ে তোমার দশাটা কী হবে? গর্ভশয্যায়-থাকা শিশুহত্যার জন্য তুমি শাস্তি পাবে সারাজীবন। লোকে তোমাকে কাপুরুষ বলবে, পাপী বলবে— অসকৃৎ পাপকর্মাণং বাল-জীবিতঘাতকম্। তুমি আমার ক্ষমতা দেখো, অশ্বত্থামা! তোমার শস্ত্রাগ্নিদগ্ধ শিশুকে আমি বাঁচিয়ে তুলব। উত্তরার সেই ছেলের নাম হবে পরিক্ষিৎ এবং সেই পাণ্ডব-কুরুবংশের রাজাও হবে। আমার যদি কোনও সত্য প্রতিষ্ঠা থাকে, তপস্যার শক্তি থাকে, তবে এই সন্তানকে আমি বাঁচিয়ে তুলব, সেটা তুমি দেখে নিয়ো— অহং তং জীবয়িষ্যামি দগ্ধং শস্ত্রাগ্নিতেজসা।

এই মুহূর্তে উত্তরার গর্ভস্থ পুত্রকে বাঁচানোর কথাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। স্বামীহারা উত্তরার কাছেও হয়তো তাঁর পুত্রের জীবনের আশ্বাসটাই সবচেয়ে বড় কথা, তবু বারবার অশ্বত্থামার প্রতি কৃষ্ণের যে ক্রোধ-আক্ষেপ বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে কুরু-পাণ্ডবদের বংশকর সন্তানের জন্য দুর্ভাবনাই যেন বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। উত্তরার হৃদয়ে, মনে মৃতপতিকা রমণীর অন্তর-যাতনার চেয়েও অতি পৃথক ভাবে তাঁর স্ফীত-স্ফুট গর্ভটুকুই যেন এই মুহূর্তে বড় বেশি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। সঙ্গে-সঙ্গে বড় বেশি অনুভূত হয় পৌরুষেয়তার সেই চিরাচরিত অভিসন্ধি— উত্তরার গর্ভ যদি সুরক্ষিত থাকে, তবে পাণ্ডবরাও বংশলাভ করবেন। স্বামীহারা জননীর সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, এই সন্তানজন্মের সাফল্যের সঙ্গে মিশে থাকায় পৌরুষেয়তায় অভিসন্ধি কেমন অদ্ভুত ছলে মিশে যায় তার সঙ্গে, আর সেইজন্যই মাত্র ছয়-সাত মাসের এই নায়িকাকে বড় অসহায় লাগে। কিন্তু স্বামীর জন্য উত্তরা-বৈরাটীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হৃদয় কত পোড়ে, তা বোঝা যায় যুদ্ধশেষে, হাজারো স্ত্রীকুলের মধ্যে উত্তরাকে যখন দেখতে পাই মহাভারতের স্ত্রীপর্বে।

মহাভারতের স্ত্রীপর্ব এমন একটা জায়গা, যেখান থেকে মহাভারতের রমণী-নায়িকাদের অনেককেই খুব ব্যক্তিগতভাবে চেনা যায়। সেই বিরাটপর্বে যখন থেকে উত্তরার সঙ্গে অভিমন্যুর বিয়ে হয়েছে, তখন থেকে এতাবৎ পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গে উত্তরার দাম্পত্য জীবনের কোনও সংবাদ পাইনি। মহাকবিদের এই এক স্বভাব— তাঁরা সব চরিত্রের সব কথা পরপর লিপিবদ্ধ করেন না, মূল ঘটনা চালিয়ে যেতে যেতে প্রসঙ্গান্তর হয় বটে, তবু গভীর অপ্রসঙ্গে না গিয়ে কোনও এক জায়গায় বিপরীত বর্ণনায় তিনি পূর্বের কথা, পূর্বের ব্যবহার জানিয়ে দেন। যেমন, আমরা তো জানতামই না যে, অভিমন্যুর দাম্পত্য-জীবনের মধ্যেও একটা দারুণ 'রোম্যান্টিক অ্যাপ্রোচ' ছিল। আমরা জানতাম— অভিমন্যু তাঁর বীরোচিত ক্রিয়াকর্মে এতটাই ব্যাপৃত এবং ব্যস্ত ছিলেন যে, স্ত্রীকে বুঝি তিনি সময়ই দিতে পারতেন না কোনও। এই ভাবাটা খুব অস্বাভাবিকও নয়। এত সংক্ষিপ্ত অভিমন্যুর জীবন এবং ততোধিক সংক্ষিপ্ত যেহেতু তাঁদের দাম্পত্যের কাল এবং তদুপরি বিবাহোত্তর জীবনে এতই তাড়াতাড়ি এমন বিরাট যুদ্ধ এসে গেল, সেখানে মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই অভিমন্যু এমন মধুর অভিসার সৃষ্টি করেছিলেন নববধূ উত্তরার জীবনে— এ-কথা আমরা জানতেই পারতাম না— যদি না এই অন্তিম স্ত্রীপর্বে এসে জননী গান্ধারীর জবানিতে উত্তরা-অভিমন্যুর পূর্বজীবনের হদিশ পেতাম।

কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠিরদের সঙ্গে নিয়ে গান্ধারী যখন রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন সেই বীরভূমিতে করুণ-রসের রাজত্ব চলছে। শত শত রমণীর ক্রন্দনে রণাজির কর্দমাক্ত, মৃতদেহগুলি বেশির ভাগ অঙ্গহীন, বিকৃত, তার মধ্যে শেয়াল-শকুনের অতি-সতর্কতায় এবং ক্রন্দনরতা রমণীদের অসতর্কতায় অদ্ভুত এক বীভৎসতা সৃষ্টি হয়েছে। এরই মধ্যে গান্ধারীর দিব্য-দৃষ্টি পড়ল বৈরাটী উত্তরার ওপর। সপ্তরথীর আক্রমণে বিধ্বস্ত হলেও অভিমন্যুর বীর-শরীর এখনও অবিকৃত। অনিন্দ্যসুন্দরী বালিকা উত্তরা শোকে মুহ্যমান। তবুও প্রিয় স্বামীর রণশায়িত মূর্তি দেখে আপন জীবন-বোধে তাঁর শব-শরীর থেকে সমস্ত ধূলি সরিয়ে দিচ্ছিলেন কোমল অঙ্গুলি-চালনায়— বিরাটদুহিতা কৃষ্ণ পাণিনা পরিমার্জিতে।

মহাভারতের 'অপূর্ব-নির্মাণ-নিপুণ' কবি এই মুহূর্তে তিনটি বিশেষণ দিয়েছেন উত্তরার। বলেছেন— উত্তরা মনস্বিনী রমণী, উত্তরা 'কামরূপবতী' অর্থাৎ রাজনন্দিনীর যেমন রূপ আমরা কল্পনা করি, উত্তরা তেমনই সুন্দরী, আর তিনি হলেন 'ভাবিনী' অনুরাগবতী, অর্থাৎ অভিমন্যুর ভাবের ভাবিনী, তদ্গতা, তদাত্মিকা। মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই যিনি স্বামী হারিয়েছেন তাঁর তো শোকে-দুঃখে তদ্গতা হবারই কথা, কিন্তু শোকের কারণ এই আকস্মিক মৃত্যুই তদাত্মতার একমাত্র কারণ নয়। এর পিছনে নব-বিবাহিত উত্তরা অভিমন্যুর পূর্বনির্মিত অনুরাগ-পদ্ধতি থাকায় দুটি বিশেষণ আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ মনস্বিনী, অনুরাগবতী এবং তদ্ভাব-ভাবিনী উত্তরার শোক-সংকুল করুণ অবস্থার মধ্যেও কোথা থেকে শৃঙ্গার-রসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এ-সব রসশাস্ত্রের কথায় পরে আসছি।

উত্তরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না যে, অভিমন্যু মারা গেছেন। মৃত অবস্থাতেও

অভিমন্যুর প্রতি এই জীবিতবৎ আচরণ তাঁর স্বল্পকালীন বৈবাহিক জীবনের ক্রমিকতা ফুটিয়ে তুলছে, জাগিয়ে তুলছে সেই হাহাকার— এখনও সব কিছু বোধহয় শেষ হয়ে যায়নি। নিপুণ অঙ্গুলিচালনায় অভিমন্যুর শরীর থেকে সব ধূলিকণা সরিয়ে দিয়ে উত্তরা তাঁর প্রিয় স্বামীর বুক থেকে রুধিরলিপ্ত স্বর্ণখচিত বর্মখানি খুলে দিলেন, তারপর তাকিয়ে রইলেন সেই উন্মুক্ত শরীরের দিকে— বিমুচ্য কবচং বীরশরীরমভিবীক্ষতে। অদূরবর্তী গান্ধারী দিব্য দৃষ্টিতে দেখছেন— কী করছেন উত্তরা। মৃত স্বামীর বর্মমুক্ত বীর-শরীরের প্রতি নববধূ উত্তরার এই অভীক্ষণের অর্থ জননী গান্ধারী যত বোঝেন, তার চেয়েও বেশি বোঝেন রমণী গান্ধারী। গান্ধারীর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন কৃষ্ণ। উত্তরা অভিমন্যুর দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতেই কৃষ্ণকে বললেন— তোমার চোখের মতোই এর চোখ দুটো ছিল, কৃষ্ণ! শক্তি, তেজ, রূপ সবই তো তোমার মতো, সেই তোমার অভিমন্যু আজ মাটিতে পড়ে আছে— অয়ং তে পুণ্ডরীকাক্ষ শেতে ভুবি নিপাতিতঃ। আসলে এ যেন কৃষ্ণের প্রতি এক অধিক্ষেপ। ভাবটা এই— আপন সদৃশ মানুষকে সদৃশ জন আপন মায়ায় বাঁচাতে চেষ্টা করে। তুমি এই অভিমন্যুকে বাঁচাতে পারোনি, কৃষ্ণ!

অভিমন্যুর এই ধূলিশায়িত মলিন অবস্থা দেখে কেঁদে উঠেছেন উত্তরা। কিন্তু সেখানেও তাঁর শৃঙ্গার-শোভন প্রত্যঙ্গ-অনুভূতি কাজ করছে। উত্তরা বলছেন— বীরত্বে যতই কঠিন হও তুমি, তোমার সমস্ত শরীর বড় নরম ছিল, তুমি শয়ন করতে রঙ্কু-মৃগের চর্মশয্যায়। সেই তোমার শরীর এমন করে মাটিতে লুণ্ঠিত হচ্ছে, তোমার কঠিন দুই বাহু, যা নাকি এখনও ধনুর্গুণ সঞ্চালনের জন্য কঠিন চর্মাবৃত, সেই বাহু-দুটিকে কেমন প্রসারিত করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে তুমি শুয়ে আছ— তোমার কষ্ট হচ্ছে না— কাঞ্চনাঙ্গদিনৌ শেষে নিক্ষিপ্য বিপুলৌ ভুজৌ। ক্ষণিকের মধ্যেই উত্তরার মনে হচ্ছে— বড় ঘুম পেলে বুঝি মানুষের এইরকম হয়। বিস্রস্ত বাসের মধ্যে এমন এলোমেলো চুল উতলা শয়নের ভঙ্গি বুঝি একমাত্র ঘুমোলেই হয়— এমন বোধে উত্তরা বললেন— বুঝেছি, সারা দিন এতটাই যুদ্ধব্যায়াম গেছে তোমার, তাতেই ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে আর কথাই বলছ না আমার সঙ্গে। আমি তো অন্যায় কাজও করিনি, তবু তুমি কথা বলছ না কেন আমার সঙ্গে, কেন? কেন? ক্ষণিকের মধ্যেই আবার সেই বাস্তব চেতনা ফিরে আসে উত্তরার। উত্তরা বলেন— আগে কত দূর থেকে তুমি যদি আমায় দেখতে পেতে, তো তখনই তুমি আমায় অভিভাষণ করে কাছে ডাকতে— ননু মাং ত্বং পুরা দূরাদভিবীক্ষ্যাভিবাষসে— আজ তা হলে কী হল।

আমরা পূর্বে উত্তরার বিবাহ-মুহূর্ত থেকে অভিমন্যুর যে ব্যস্ত জীবনধারা দেখেছি, তাতে আমাদের ধারণাও ছিল না যে, এই কয় মাসের যুদ্ধোদ্যোগের মধ্যে উত্তরার সঙ্গে এই বালক-বীরের কতটা প্রণয় জন্মেছে যে, দূর থেকে দেখতে পেলেও তাঁকে অভিভাষণ না করে থাকতে পারতেন না অভিমন্যু। এই প্রণয়ের গভীরতা আজকে এসে জানতে পাচ্ছি, এই স্ত্রীপর্বে উত্তরার বিলাপ-ধ্বনির মধ্যে। এ এক অদ্ভুত কৃতিত্ব মহাভারতের কবির। মহাকাব্যের বিশাল কাহিনি-তন্তুর জমাট বাঁধুনির মধ্যে ভীষ্ম-দুর্যোধন অথবা ভীমার্জুনের তুলনায় উত্তরার চরিত্র নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর এবং তার চেয়েও বুঝি অকিঞ্চিৎকর উত্তরা-অভিমন্যুর প্রেমালেখ্য-তত্ত্ব। পাঠকের মন বুঝেই মহাকবি তাই উত্তরা-অভিমন্যুর দাম্পত্য-জীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্তার নিয়ে এতটুকু মাথা ঘামাননি। তাঁদের বিবাহের পরেই কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধোদ্যোগ এবং অবশেষে যুদ্ধ। সেই অষ্টাদশ দিবসের যুদ্ধও তিনি শেষ হতে দিয়েছেন, কিন্তু আজ এই স্ত্রী-বিলাপ-পর্বে এসে মহাকবির শব্দমন্ত্রে এমন দু'-একটি পঙ্‌ক্তি তিনি লিখে ফেলছেন, যাতে এক-একজন উপেক্ষিত যুদ্ধ-বীরের অথবা বহু-উপেক্ষিতা রমণীর অস্ফুট রোমাঞ্চ জীবন্ত হয়ে উঠছে। সেই সব সরস পঙ্‌ক্তির কাব্য-ব্যঞ্জনা-মহাভারতের স্ত্রী-বিলাপের এক-একটি খণ্ডাংশে বিধৃত আছে এবং সেগুলি প্রাচীন আলংকারিকদের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অলংকার-গ্রন্থে উল্লিখিত সেইরকম একটা মহাকাব্যিক উদাহরণ দিলে উত্তরার সামগ্রিক জীবনটাও আমাদের কাছে যেমন পরিষ্কার হয়ে উঠবে, তেমনই বিপ্রতীপভাবে অভিমন্যুর মৃত্যুতে তাঁর কষ্টটাও আমাদের কাছে মর্মন্তুদ হয়ে উঠবে।

মহাভারতের যুদ্ধকালে দুর্যোধনের পক্ষে ভূরিশ্রবা নামে এক বীর ভয়ংকর যুদ্ধ করেছিলেন অর্জুনের সঙ্গে। ভূরিশ্রবাকে ঠিকমতো পর্যুদস্ত করতে না পেরে অর্জুন একসময় তাঁর হাত দুটি কেটে ফেলেন একেবারে কাঁধ থেকে। পরে অর্জুন-শিষ্য সাত্যকি তাঁকে মেরে ফেলেন। মহাভারতে ভূরিশ্রবার এই মৃত্যু নিয়ে কিছু তর্ক-বিতর্ক আছে, কিন্তু সে-সব বাদ দিয়ে বলা যায়— ভূরিশ্রবার সঙ্গে আমাদের সঠিক এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় হয় এই আঠেরো দিন যুদ্ধের কালেই শুধু। সেই অনুল্লেখ্য ভূরিশ্রবারও যে একটা রোমাঞ্চকর রমণীমোহন শক্তি ছিল, তা শুধু প্রকট হয়ে ওঠে এই স্ত্রীপর্বে গান্ধারীর মুখে। গান্ধারী দেখছেন— ভূরিশ্রবার অনেকগুলি স্ত্রী, প্রত্যেকেই তারা ভূরিশ্রবার অঙ্গস্পর্শে পাগল ছিল। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে ভূরিশ্রবার মৃতদেহটি দেখতে পেল এবং একটু দূরেই পেল তাঁর কর্তিত হস্তদুটি। ভূরিশ্রবার প্রিয়া পত্নীরা ভূরিশ্রবাকে ঘিরে শোক করছিলেন, এরই মধ্যে ক্ষীণকটি এক প্রিয় (পাঠক! শুধুমাত্র ক্ষীণকটি— ব্যাসের ভাষায়— মুষ্টিতে ধরা যায় এমন মাজা— কর-সম্মিত-মধ্যমা— শুধুমাত্র এই একটা শব্দে এই রমণীর স্তন-জঘনের রূপ বোঝা যায়), সেই প্রিয়া রমণী ভূরিশ্রবার ছিন্ন বাহুটি কোলের ওপরে তুলে নিয়ে বলল— এই সেই হাত! যে হাত একদিন আমার নাভি-উরু-জঘন-স্পর্শী রশনার বাঁধ ভেঙে দিত, যে হাত আমার পীন-স্তনের মর্দন-সুখ অনুভব করত— এই সেই হাত, যে হাত একদিন সমস্ত শত্রুর বিনাশ ডেকে এনেছিল, বন্ধুদের দিয়েছিল বরাভয়, এই সেই হাত— অয়ং স রশনোৎকর্ষী পীন-স্তন-বিমর্দনঃ।

যুদ্ধক্ষেত্রে বিলাপরতা সুন্দরীর স্বমুখ-কীর্তিত এই শৃঙ্গার ঘোষণা আমাদের সংবেদনশীল আলংকারিকদের চোখ খুলে দিয়েছে। তাঁরা বলেছেন— আপাতদৃষ্টিতে খুব বিপরীতধর্মী মনে হতে পারে এই সরসতা; মনে হতে পারে যে, কাব্যের মধ্যে যেখানে করুণ রসই প্রধান, সেখানে প্রিয়জনের জন্য আলুথালু মরণ-বিলাপের মধ্যে এমন শৃঙ্গার-রসের আমদানি কাব্যান্তরবাহী প্রধান করুণ-রসটাকে একেবারে লঘু করে তোলে এবং সেটাকে রস না বলে রসাভাস বলাটাই ঠিক হয়। তাঁরা এই প্রশ্ন তুলে সিদ্ধান্ত শুনিয়ে বলেছেন— মোটেই নয়। শৃঙ্গার অথবা বীররস আপাতদৃষ্টিতে করুণ-রসের পরিপন্থী বলে মনে হতেই পারে, কিন্তু এমনও ক্ষেত্র আছে— যেমন এই ভূরিশ্রবার ছিন্ন বাহু দেখে তাঁর অন্যতম প্রিয়ার যেমন অনুভূতি হয়েছিল, তাতে এটাই প্রমাণ হয় যে, ক্ষেত্র-বিশেষে শৃঙ্গার-রস এবং বীর-

রস গৌণ ভূমিকায় থেকে কাব্যবাহী প্রধান করুণ-রসকে আরও পরিপুষ্ট করতে পারে, বিশেষত মৃত্যুর কারুণিক বিলাপ-বাক্যের মধ্যে পূর্বকালীন অবস্থার স্মরণ-মনন যেহেতু ঘটতেই পারে, তাই এই আর্তা সুন্দরীর মুখে ভূরিশ্রবার শৃঙ্গার-মোহন পূর্বকথা করুণ-রসের পরিপোষণ ঘটাচ্ছে—আলংকরিক মম্মটাচার্যের ভাষায়—অত্র পূর্বাবস্থা-স্মরণং শৃঙ্গারাঙ্গম্ অপি করুণং পরিপোষয়তি। এমনকী সেই বিলাপের মধ্যে যখন ভূরিশ্রবার শত্রু-বিজয়ের ক্ষমতা এবং বীরদর্প প্রকট হয়ে ওঠে, তখন বীররসও অপ্রধান ভূমিকায় থেকে মৌল করুণ-রসকে পুষ্ট করে।

আরও পরিপুষ্ট করতে পারে, বিশেষত মৃত্যুর কারুণিক বিলাপ-বাক্যের মধ্যে পূর্বকালীন অবস্থার স্মরণ-মনন যেহেতু ঘটতেই পারে, তাই এই আর্তা সুন্দরীর মুখে ভূরিশ্রবার শৃঙ্গার-মোহন পূর্বকথা করুণ-রসের পরিপোষণ ঘটাচ্ছে—আলংকরিক মম্মটাচার্যের ভাষায়—অত্র পূর্বাবস্থা-স্মরণং শৃঙ্গারাঙ্গম্ অপি করুণং পরিপোষয়তি। এমনকী সেই বিলাপের মধ্যে যখন ভূরিশ্রবার শত্রু-বিজয়ের ক্ষমতা এবং বীরদর্প প্রকট হয়ে ওঠে, তখন বীররসও অপ্রধান ভূমিকায় থেকে মৌল করুণ-রসকে পুষ্ট করে।

আমরা মহাভারতের ভূরিশ্রবা-সংক্রান্ত আলংকারিক উদাহরণটি এই কারণেই পর্যালোচনা করলাম, যাতে উত্তরার পূর্বকালীন মধুর দাম্পত্যটুকুও আমরা বুঝতে পারি। যে বালিকা একদিন মহাবীর অর্জুনের বীরত্বে মুগ্ধা ছিলেন, সেই বালিকাকে যুবতীর পরিপূর্ণতা দিতে তরুণ অভিমন্যুর সময় লাগেনি এতটুকু। এই তারুণ্যের বিকাশ কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা প্রকট হয়ে ওঠে জননী গান্ধারীর জবানিতে। আশ্চর্য লাগে—তাঁর কানেও উত্তরা-অভিমন্যুর প্রেমজল্প ঠিক পৌঁছে গেছে। মহাভারতের কবির শব্দমন্ত্রে যুবতী উত্তরার বিশ্লেষণ সেই তিন শব্দ—সকলে স্পৃহা করে এমন তাঁর রূপ, তিনি মনস্বিনী এবং তদ্‌ভাব-ভাবিনী। গান্ধারী বলছেন— উত্তরা মৃত অভিমন্যুর প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো মুখখানির ঘ্রাণ নিতে গিয়েই একটু লজ্জা পেলেন সকলের সামনে—তস্য বক্ত্রমুপাঘ্রায় সৌভদ্রস্য মনস্বিনী—তবু তিনি নির্লজ্জের মতোই আলিঙ্গন করলেন দয়িত অভিমন্যুকে—কাম্যরূপবতী চৈষা পরিস্বজতি ভাবিনী।

এই যে গান্ধারী, কৃষ্ণ-বাসুদেব, যুধিষ্ঠির ইত্যাদি মহাব্যক্তিত্বের সামনে প্রথমত খানিক লজ্জিত হয়েও পূর্ণ আলিঙ্গনে মৃত অভিমন্যুর মস্তকাঘ্রাণ করলেন উত্তরা—এ থেকে একদিকে যেমন তাঁর মমত্বময়ী প্রেম-চেতনা বেপরোয়াভাবে মহিমান্বিত হয়ে ওঠে, তেমনই অন্যদিকে তাঁর পূর্বকালীন অভ্যাসগুলিও প্রকট হয়ে ওঠে। গান্ধারী অনুমান করছেন—পূর্বেও নিশ্চয়ই এই রাজনন্দিনী উত্তরা প্রিয়মিলনের আনন্দে এইভাবেই মদ্যপানে মত্ত হত এবং সম্ভবত এইভাবেই অভিমন্যুকে আলিঙ্গন করত—লজ্জমানা পুরা চৈনং মাধবীকমদমূর্ছিতা। গান্ধারীর একটি বাক্য থেকেই বিলাপ-করুণ উত্তরার পূর্ব-দাম্পত্যের শৃঙ্গার-মধুর গভীরতা এক মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে যায়। আমরা সেই বৈবাহিক কাল থেকে উত্তরা-অভিমন্যুর যে দাম্পত্য জীবন কল্পনা করেছি, যা অনেকটাই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আমাদের অগম্য ছিল, তা এক মুহূর্তে অভিমন্যুর শৃঙ্গার-সুবাসে প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। গান্ধারী বলছেন—উত্তরার কোনও বোধ কাজ করছে না। সে কেমন অদ্ভুত আচরণ করছে প্রিয়তম স্বামীর সঙ্গে, ভাবছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন বেঁচে আছে তার স্বামী। নানা প্রশ্নে জর্জরিত করে তুলছে মৃত-মূক অভিমন্যুকে। অথচ সে একটা কথারও জবাব পাচ্ছে না— উৎসঙ্গে বক্তমাধায় জীবন্তমিব পৃচ্ছতি।

উত্তরা অভিমন্যুর মাথার কাছে এসে বসেছেন। তাঁর শোণিতদিগ্ধ ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত কেশগুলি সরিয়ে দিয়ে তাঁর মুখখানি নিজের কোলের ওপর ন্যস্ত করলেন উত্তরা। তারপরে প্রশ্ন করলেন জীবিতমানিতায়—আচ্ছা! তুমি না বাসুদেব-কৃষ্ণের ভাগনে, তুমি না গাণ্ডীবধন্বা অর্জুনের পুত্র! তবু তোমাকে এইসব মহারথ যোদ্ধারা যুদ্ধভূমিতে মেরে ফেলল কী করে—কথং ত্বাং রণমধ্যস্থং জঘ্নুরেতে মহারথাঃ। মনস্বিনী উত্তরা দুই ধারে কথা বলছেন। অভিমন্যুর বীরত্ব এবং শৌর্য-বীর্যের প্রতি কোনও দিন তাঁর অশ্রদ্ধা ছিল না, এখন এই দীর্ণ মরণের পরেও তাঁর সেই অশ্রদ্ধা নেই। কিন্তু এতক্ষণে তিনি জেনে গেছেন—পাণ্ডবরাই তাঁকে চক্রব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করতে বলেছিলেন। তা নয় প্রবেশ করলেনও, কিন্তু একই সঙ্গে কৃষ্ণ-বাসুদেবের ভাগনে, অর্জুনের পুত্র এবং বিপক্ষ-কুলকে যেন বেশি সম্মান দিয়ে 'মহারথ' বলে সম্বোধন করায় উত্তরার মুখে এই মুহূর্তে কৃষ্ণ এবং অর্জুন যেন ছোট হয়ে গেছেন। তিনি বোঝাতে চাইছেন—এই বহুকীর্তিত সম্বন্ধের কী মূল্য হল, যখন কৃষ্ণ এবং অর্জুন রণক্ষেত্রে থাকলেও দ্রোণ-কৃপ-কর্ণ-অশ্বথামা—এঁরা কত বড় মহারথ যোদ্ধা, যাতে তরুণ অভিমন্যুকে মরতে হল এইভাবে।

অভিমন্যুর স্ত্রী বলেই সেই বীরমানিতা তাঁর মধ্যেও আছে, আছে সেই মহাকাব্যিক যুদ্ধনীতির বোধ, যাতে কিছুতেই উত্তরা ক্ষমা করতে পারছেন না প্রতিপক্ষের সপ্তরথীকে, যাঁরা সকলে মিলে একক অভিমন্যুকে বধ করেছেন। ধিক্কারে-ধিক্কারে উত্তরা তুচ্ছ করে দিয়েছেন মহারথ যোদ্ধাদের সমস্ত বীরদর্প। অদ্ভুত মনস্তত্ত্ববিচারণায় উত্তরা বলেছেন—তাঁদের তুলনায় তুমি নিতান্তই বালক এবং তাও একাকী। কেমন হয়েছিল এই সময়ে তাঁদের মন যারা আমাকে বিধবা করে দুঃখ দেবার জন্য এতগুলো লোক একসঙ্গে এমন প্রহার করেছিলেন তোমাকে—বালং ত্বাং পরিবার্যৈবং কথমাসীত্তদা মনঃ। সুন্দরী উত্তরা জানেন না—একত্রে যারা তাঁর স্বামীকে আঘাত হেনেছিল, তারা কেউ সেই মুহূর্তে উত্তরার কথা ভাবেনি। যুদ্ধবীর অভিমন্যুকে হত্যা করাই তাদের সেদিন প্রথম এবং শেষ কাজ ছিল। প্রিয় স্বামীর এই মৃত্যুতে উত্তরা যেমন বিপক্ষীয় যোদ্ধাদের ক্ষমা করতে পারছেন না, তেমনই পারছেন না স্বপক্ষীয় বীরদেরও সহ্য করতে। বারবার তিনি বলছেন—মহাবীর পাণ্ডব-ভাইদের এবং পাঞ্চালদের কেমন সেই সুরক্ষা-ব্যবস্থা যাতে এমন অনাথের মতো প্রাণ হারাতে হল তোমাকে—কথং নু পাণ্ডবানাঞ্চ পাঞ্চালানাঞ্চ পশ্যতাম্। উত্তরার শেষ ক্ষোভ সেই অর্জুনের ওপর যাঁকে দেখে এককালে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন বালিকার বীরপূজা-ভাবনায়। আজ অর্জুনকে দেখে তাঁর অদ্ভুত লাগছে। উত্তরা বলছেন—এতগুলো লোক একসঙ্গে তোমাকে মারল দেখেও তোমার পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর পিতা বেঁচে রয়েছেন কী করে—বীরঃ পুরুষ-শার্দূলঃ কথং জীবতি পাণ্ডবঃ। তুমি মারা যাওয়ায় আজকের এই সর্বশত্রু-পরাজয় অথবা রাজ্যলাভ—কোনওটাই পাণ্ডবদের কাছে মধুর হবে না।

এই ধিক্কার-বিলাপের পরে আবারও উত্তরার মুখে ভেসে আসে সেই দাম্পত্য-জীবনের পূর্ব-রোমাঞ্চ। তিনি বলেন—কোথায় যাবে তুমি আমাকে ফেলে? তুমি যে শত্রুবিজয়ীর

স্বর্গে গেছ, আমিও শীগগিরই যাব। সেখানে কিন্তু তুমি আমাকে আগের মতোই দেখে রাখবে—ক্ষিপ্রমন্বাগমিষ্যামি তত্র মাং পরিপালয়। উত্তরার কেমন এক ঈর্ষাও হচ্ছে মনে-মনে। পুরাণ-প্রসিদ্ধিতে তিনি শুনেছেন—পিতৃলোকে, স্বর্গলোকে কত সব সুন্দরী অপ্সরাদের আবাস, যখন-তখন তাঁরা পুণ্যবান জনের সমাশ্লেষে ধরা দেন। উত্তরা বলেছেন—তোমাকে স্বর্গসুখে ছেড়ে দিয়েও সুখ পাই না আমি। সেখানে হয়তো ধীর-মধুরভাবে আমার সঙ্গে যেমন কথা বলতে, তেমনই অন্য কোনও রমণীর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেবে তুমি, আর আমারই মতো সেই সব স্বর্গসুন্দরীর মন হয়ে উঠবে উথাল-পাথাল—নূনমপ্সরসাং স্বর্গে মনাংসি প্রমথিষ্যসি। তোমার এই রূপ, এমন চতুর-মধুর কথা, এমন মিঠে হাসি—তবু বলি তাঁদের সঙ্গে কথা বলার সময় আমি যত ভালবেসেছি তোমায়—সে-সব সুভগ-ভাবনা একবার স্মরণ কোরো তুমি—সৌভদ্র বিহরন্ কালে স্মরেথাঃ সুকৃতানি মে।

উত্তরার এই মর্মস্পর্শী বিলাপের সঙ্গে শুধু কালিদাসের রতিবিলাপ-সঙ্গীতের তুলনা হয়। আমি এই বিলাপের বিস্তারে যেতাম না এতটুকু যদি-না এর মধ্যে উত্তরাকে বোঝার অথবা উত্তরার পূর্বজীবন-বোধের কোনও উপাদান থাকত। মহাকবির লেখন-শৈলীই এমনতর সংক্ষিপ্ত হয় কখনও, তিনি গৌণ-চরিত্রের বিবরণে সবিস্তারে পূর্বজীবন উল্লেখ না করে ধ্বংসের বর্ণনায় পূর্বের গরিমা বুঝিয়ে দেন। ঠিক সেখানেই কাব্যবাহী মুখ্য করুণ-রসের মধ্যেও গুণীভূত শৃঙ্গার-জীবন, ভালবাসার জীবন কেমন মূর্ত হয়ে ওঠে। উত্তরার বিলাপ-সঙ্গীত এমন বিরহ-মধুর মূর্চ্ছনা তৈরি করেছে এখানে যে, বিরাট রাজ্যের কুলবতী রমণীরা আর বেশিক্ষণ তাঁকে অভিমন্যুর পাশে বসে থাকতে দিতে চাইলেন না, তাঁরা জোর করে টেনে অন্যত্র নিয়ে গেলেন উত্তরাকে—উত্তরামপকৃষ্যৈনাং...মৎস্যরাজকুলস্ত্রিয়ঃ। উত্তরার পিঠে সান্ত্বনার হস্তস্পর্শ ঘটার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর চেতনা ফিরেছে, তাঁর শেষ কথাটা তাই ভীষণ রকমের অপ্রিয় সত্য হয়ে উঠেছে। উত্তরা বলেছেন—ছয় মাস! মাত্র ছয় মাস তুমি আমার সঙ্গে ছিলে, সাত মাসে পড়তে-না-পড়তেই আমার বৈবাহিক জীবন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল—ষণ্মাসান্ সপ্তমে মাসি ত্বং বীর নিধনং গতঃ। কারও কি এমন হয়? তোমার সঙ্গে আমার সহবাসের সময় কি এইটুকুই মেপে রাখা হয়েছিল? হায় বিধাতা! এতাবানিহ সংবাসো বিহিতস্তে ময়া সহ।

মৎস্যরাজের অন্যান্য কুলবধূরা আর উত্তরাকে অভিমন্যুর কাছে থাকতে দেননি। বিশেষত উত্তরা তখন গর্ভবতী, ছয় মাসের স্বামী ইহলোকে নেই, অন্তত তাঁর পেটের ছেলেটার যাতে কোনও ক্ষতি না হয়, হয়তো সেই বোধেই উত্তরাকে প্রকৃতিস্থ করার চেষ্টা করেছেন বিরাট রাজ্যের বয়স্কারা। আমরা খুব ভালভাবে জানি—বাল-বিধবা উত্তরার জীবনে এত তাড়াতাড়ি শোকশান্তি হবার কোনও কারণ নেই, তবুও এই ভয়ংকর শোকের মধ্যেও প্রদীপের শেষ শিখার মতো যে আশা ছিল, সে হল উত্তরার গর্ভে অভিমন্যুর তেজোনিহিত গর্ভ। তবে সেখানেও কাঁটা দিয়ে রেখেছেন অশ্বত্থামা। তিনি ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন উত্তরার গর্ভে নিহিত পাণ্ডবদের বংশকর পুত্রটিকে ধ্বংস করার জন্য। এখানে শুধু আশা এই যে, কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, উত্তরার গর্ভস্থ সন্তানকে তিনি বাঁচিয়ে তুলবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের ধারণা, অভিমন্যু যখন মারা যান, তখন উত্তরার গর্ভ দুই কি তিন মাসের পরিপক্কতা লাভ করেছে। কারণ যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবারও প্রায় ছয় মাস পরে ভীষ্ম ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেছেন, এবং তখনও উত্তরার প্রসব ঘটেনি। এর পরে যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেছেন এবং যজ্ঞের প্রারম্ভিক কাজ সুষ্ঠু সম্পাদন করার পরামর্শ নিয়েই কৃষ্ণ তাঁর আত্মীয় স্বজন নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন হস্তিনাপুরে। কৃষ্ণ সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে হস্তিনায় আছেন—বসৎসু বৃষ্ণিবীরেষু—পূর্ণোদ্যমে অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রস্তুতি চলছে, এমন সময় একদিন উত্তরার গর্ভ থেকে অভিমন্যুর পুত্র জন্মাল। মহাভারতের কবি অন্যত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ দিয়ে উত্তরার পুত্রজন্মের সমস্যাটা জটিল করে দিয়েছেন আমাদের জন্য। সেই আদিপর্বে বলা হয়েছে যে, গর্ভধারণের ছয় মাস অতিবাহিত হবার পরেই উত্তরার এই আকালিক সন্তান মৃত অবস্থায় জন্মেছে। কৃষ্ণ সেই ছয়মাসের বাচ্চার 'দায়িত্ব' নিয়ে বলেছিলেন—একে আমি বাঁচাব—ষাণ্মাসিকং গর্ভমেনং জীবয়িষ্যামি। আমাদের লৌকিক দৃষ্টিতে মহাকাব্যের অতিশায়নী বর্ণনাকে আক্ষরিক মূল্য না দিয়ে যদি ছয়/সাত মাসের 'প্রিম্যাচিওর বেবি'র জন্মে বিশ্বাস করি, তাহলে এই আকালিক পুত্রজন্মের সমস্যাই তো অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হিসেবে গণ্য হতে পারে এবং তার বেঁচে যাওয়াটাও কৃষ্ণের অসামান্য চেষ্টার ফল বলা যেতে পারে। যাই হোক, মহাকাব্যের অতিশায়িনী বর্ণনায় উত্তরার সদ্যোজাত পুত্রটি মৃত, তার কোনও আঙ্গিক চেষ্টা নেই, সে নড়া-চড়াও করছে না। হস্তিনা রাজবাড়িতে বংশকর পুত্র জন্মেছে এই সংবাদ পুরবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে না পড়তেই মৃত পুত্রের খবর তাদের বিষাদ ডেকে আনল—শবো বভূব নিশ্চেষ্টো হর্ষ-শোক-বিবর্ধনঃ। পুরবাসীরা সিংহনাদ করে ডাক ছাড়তেই মুহূর্তের মধ্যে সে কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেল। একটা ভয়ানক কিছু ঘটেছে, এমন আন্দাজ পেতেই কৃষ্ণ সাত্যকির সঙ্গে হস্তিনার অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করেই তিনি দেখলেন—তাঁর নাম করে ডাকতে ডাকতেই কুন্তী ধেয়ে আসছেন তাঁর দিকে। কুন্তীর পিছন-পিছন আসছেন পঞ্চপুত্রহারা দ্রৌপদী এবং আর এক পুত্রহারা সুভদ্রা। কুন্তী শুধু বলে যাচ্ছেন—শীগ্‌গির এসো কৃষ্ণ! শীগ্‌গির এসো হেথায়—ক্রোশন্তীমভিধাবেতি বাসুদেবং পুনঃ পুনঃ।

উত্তরার এই বিষণ্ণ পুত্রজন্মের জন্য এতগুলি রমণী—বৃদ্ধা-মধ্যমা-কনিষ্ঠা—কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা সকলেই ছুটে এসেছেন সর্বার্তিহর কৃষ্ণের কাছে। কেননা, এই পুত্র শুধু উত্তরার মাতৃক্রোড় শান্তির বাহক নয়, এই পুত্র পাণ্ডবদের সকলের কাছে অনেক কিছু। সবচেয়ে অভিজ্ঞা বলে কুন্তী সেই কথাই জানালেন কৃষ্ণকে। বললেন—এই সন্তানটিই আমার শ্বশুর-স্বামীর মুখে জল-পিণ্ড দেবে—পাণ্ডোশ্চ পিণ্ডদানার্হ তথৈব শ্বশুরস্য মে। আমাদের সকলের প্রাণ এই বালকের ওপর নির্ভর করছে। তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তুমি বলেছিলে এই পুত্রকে বাঁচাবে—ত্বয়া হ্যেতৎ প্রতিজ্ঞাতম্ ঐষিকে যদুনন্দন। আজ সেই সময় এসেছে, তোমার প্রিয় এবং সদৃশ অভিমন্যুর প্রিয়কার্য করো তুমি। আপন বংশের সার্বিক শুভোদয় এই গতাসু পুত্রের ওপরেই নির্ভর করছে—এই কথা বলবার সময় কুন্তী অদ্ভুত একটা কথা বললেন কৃষ্ণকে। কুন্তী বললেন—আমার বধূ উত্তরা বার-বার এ-কথা বলে আমায়। বলে—অভিমন্যু তাকে নাকি এ-সব কথা বলত। তাতেই বুঝি—বেচারা

মিথ্যে কথা বলছে না, মৃত স্বামীর নাম নিয়ে এমন মিথ্যে সে বলতেই পারে না—উত্তরা হি পুরোক্তং বৈ কথয়ত্যরিসূদন! অভিমন্যোর্বচঃ কৃষ্ণ...। কথাটা তোমার প্রিয়ই হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই বাছা। অভিমন্যু নাকি উত্তরার কাছে বলেছে যে, তোমার যে ছেলে হবে, বউ! সে ছেলে আমার মামার বাড়িতে মানুষ হবে। আমার মামা কৃষ্ণের বংশ বৃষ্ণি-অন্ধকদের কাছে সে সমস্ত অস্ত্রবিদ্যা শিখবে, শিখবে রাজনীতির গূঢ় তত্ত্ব—মাতুলস্য কুলং ভদ্রে তব পুত্রো গমিষ্যতি। উত্তরার কাছে এ-সব কথা অভিমন্যু বলেছে বলেই আরও আমার মনে হয়—তোমার এখানে একটা দায়িত্ব আছে, কৃষ্ণ!

কুন্তীর মুখে এই কথাও কিন্তু উত্তরার পূর্ব দাম্পত্যের অনুশ্রুতি। আসন্ন যুদ্ধের প্রাক-কালে অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিয়ে হয়েছিল। অভিমন্যু কি বুঝেছিলেন—এগিয়ে আসছে সেই ধ্বংস, হয়তো সেই ধ্বংসের হাত থেকে তাঁর বাপ-জ্যাঠা এবং তিনি নিজেও বুঝি বাঁচবেন না। এমনটা না হলে সদ্য-গর্ভধারিণী প্রিয়া পত্নীর কাছে এমন কথা তিনি বলবেন কেন? উত্তরা হয়তো এত-শত বোঝেননি, এখন অভিমন্যু মারা যাবার পর প্রিয় স্বামীর বলা কথা তাঁর মনে পড়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধভেরী যখন গভীর-শব্দে বেজে উঠেছে, তখন আসন্নসত্ত্বা উত্তরার লজ্জারুণ কানের কাছে অভিমন্যুর এই স্বপ্ন-জল্পনা নিশ্চয় ছিল যে, তাঁর ছেলে তাঁর মামা কৃষ্ণের বাড়িতেই মানুষ হবে, যেমনটি তিনি হয়েছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর অশ্বত্থামার হাতে যখন গর্ভস্থ পুত্রের জীবনও সংশয়িত, তখন অভিমন্যুর এই কথাগুলি হয়তো বালিকা-বিধবার মনে আশার সঞ্চার করত।

কুন্তীর পরে সুভদ্রাও অনেক আর্তি জানালেন উত্তরার জন্য। তিনি বললেন—এত বড় কুরুবংশ ধ্বংস হয়ে গেল, আজ অর্জুনের নাতিও জন্মাল মৃত অবস্থায়। অশ্বত্থামার বাণ আজ শুধু উত্তরা নয়, আমার ওপরেও এবং অর্জুনের ওপরেও এসে পড়েছে। আজকে আমার ছেলেও মরে গেছে, নাতিও মরেছে, অর্জুন সহ সমস্ত পাণ্ডব ভাইদের কী প্রতিক্রিয়া হবে এতে। তারা তো এটাই ভাববে যে, যুদ্ধ জেতার পরেও অশ্বত্থামা সবাইকে হারিয়ে দিল। সুভদ্রা যতখানি উত্তরার দিক থেকে ঘটনাটা বিচার করছেন, মৃতপুত্রা জননী হিসেবে এই ঘটনাটাকে তিনি অনেকটাই দেখছেন অভিমন্যুর দৃষ্টি থেকে। কৃষ্ণকে তিনি বলেছেন—তুমি বেঁচে থাকতে যদি অভিমন্যুর ছেলেটাই না বাঁচে, তবে তোমাকে দিয়ে আমার কী হবে—জীবতি ত্বয়ি দুর্দ্ধর্ষ কিং করিষ্যাম্যহং ত্বয়া।

ভগিনীর আর্তনাদ, পিতৃস্বসার অবরুদ্ধ ক্ষোভ দেখে কৃষ্ণ বিগলিত হলেন এবং প্রায় কথাই দিয়ে দিলেন যে, তিনি বাঁচাবেন উত্তরার মৃত পুত্রকে। কৃষ্ণ রাজবাড়ির সূতিকা-গৃহের দিকে যাবার আগেই দ্রৌপদী উপস্থিত হলেন সেখানে। সদ্যপ্রসবা রমণীর সুচারুতার চেতনা থাকে না, বেশ-বাস থাকে অবিন্যস্ত। দ্রৌপদী তাই পূর্বাহ্নেই এসে খবর দিলেন উত্তরাকে। বললেন—তোমার মামা-শ্বশুর আসছেন এই ঘরে। তাঁর অনেক প্রভাব, নিশ্চয়ই তোমার ভাল হবে—অয়মায়াতি তে ভদ্রে শ্বশুরো মধুসূদনঃ। উত্তরার সত্যিই মনে হল—বরদ দেবতা আসছেন ঘরে, এক মুহূর্তের মধ্যে রাজনন্দিনী নিজের বসন-পরিধান সুসংবৃত করে আবৃত দেহে কৃষ্ণের সামনে দাঁড়ালেন আর্তনাদ, অশ্রুমোচন বন্ধ করে—সুসংবৃতাভবদ্দেবী দেববৎ কৃষ্ণমীয়ুষী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের গ্রাম্যকালে যেমন দেখেছি, তাতে আতুর-ঘরের অবস্থাটা খুব অস্বাস্থ্যকর ছিল। যেভাবে তা বানানো হত এবং যে ধরনের ব্যবস্থা সেখানে থাকত, যেভাবে মশা-তাড়ানোর জন্য ধোঁয়া দেওয়া হত, তার সবটাই প্রসূতি এবং সদ্য-প্রসূতের পক্ষে খুব উপযুক্ত নয়। তবে উত্তরা যে সূতিকা-গৃহে রয়েছেন, সেটা রাজার বাড়ি বলে কথা। মহাভারতের বিরাট কাহিনি-কাণ্ডের মধ্যে সে-কালের দিনের রাজবাড়ির একটা আতুর-ঘরের ছবি পেয়ে এত কষ্ট, এত আর্তনাদের মধ্যেও একটা সমাজ আবিষ্কারের কৌতুক বোধ হচ্ছে। কৃষ্ণ এসে দেখলেন—সূতিকা-গৃহের চার পাশে সাদা-সুন্দর মালা ঝুলছে—সিতৈর্মাল্যৈ যথাবিধি। ঘরের চারদিকে পূর্ণকুম্ভের জল—মঙ্গলের প্রতীক। ঘৃতপাত্র ছিল সদ্য-প্রসূতির প্রয়োজনে। পুরাতন বিশ্বাসবশত গাব-গাছের দগ্ধশাখা এবং সর্ষেধরা সর্ষে গাছ। আছে নির্মল (স্টেরিলাইজড) অস্ত্র, হয়তো নাড়ী কাটার জন্য, আর এই সেদিনও সেঁক দেবার জন্য যে আগুন লাগত, তাও মজুত ছিল সেখানে। বৃদ্ধা অভিজ্ঞা মহিলারা ছিলেন প্রসূতি এবং প্রসূতের পরিচারণ তথা শুশ্রূষার জন্য। এমনকী চরম বিপন্নতায় রোগ-নির্ণয়-নিপুণ দক্ষ চিকিৎসকেরাও চারদিকে ঘিরে রয়েছেন।

এমন একটা পরিচ্ছন্ন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা-সম্পন্ন আতুর-ঘর দেখে কৃষ্ণ পর্যন্ত বলে উঠলেন—দারুণ সুন্দর, দারুণ ব্যবস্থা হয়েছে তো— হৃষ্টোঽভবদ্ধৃষীকেশঃ সাধু সাধ্বিতি চাব্রবীৎ। কৃষ্ণকে দেখামাত্রই উত্তরা আবারও ডুকরে কেঁদে উঠলেন। মিনতি করে বললেন—দেখুন, অভিমন্যু এবং আমি দু'জনেই কিন্তু পুত্রহীন হলাম। অশ্বত্থামার অস্ত্রপ্রহারকালে আপনি, ভীম অথবা ধর্মরাজ যদি বলতেন—ওই অস্ত্র জননীকে বধ করুক, তাহলেও ভাল ছিল, আমি মরতাম বটে, কিন্তু আমার বাচ্চাটা বেঁচে যেত—অহমেব বিনষ্টা স্যাং নায়মেবংগতো ভবেৎ। এই বিলাপ-প্রার্থনার কালেও উত্তরা কিন্তু অশ্বত্থামার কথা ভোলেননি এবং পাণ্ডবরা যতই দ্রোণকে গুরু-আচার্যের মাহাত্ম্যমণ্ডিত করুন, মনস্বিনী উত্তরা কিন্তু সেই অপ্রিয় সত্যটুকু উচ্চারণ করেছেন, যা পাণ্ডবরা কখনও করেননি। উত্তরা বলেছেন—এই অশ্বত্থামা যেমন কৃতঘ্ন, তেমনই তার বাপটাও, পাণ্ডবরা তাঁর কম উপকার করেনি এবং দুর্যোধনের আশ্রয় ছেড়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে থাকলে তাদের সম্পদ কম হত না। কিন্তু সেটা না করে একটা তো যমের বাড়ি গেছে, আর যেটা বেঁচে রইল, সেটাও এমন নৃশংস যে, আমার ছেলেটাকেই খেয়ে বসে রইল, যেমন বাপ তেমনই ছেলে—কৃতঘ্নোঽয়ং নৃশংসোঽয়ং যথাস্য জনকস্তথা।

পুত্রহীনা জননী ছাড়া দ্রোণাচার্যের সম্বন্ধে এমন কঠিন সত্য বোধহয় কেউ উচ্চারণ করতে পারত না। উত্তরা এবার সমস্ত ভাবনা ত্যাগ করে কৃষ্ণের শরণাগত হয়ে বললেন—এই ছেলের জন্য আমার অনেক স্বপ্ন ছিল—বহব আসন্ মনোরথাঃ। ইচ্ছে ছিল, আজ ছেলে কোলে নিয়ে তোমাকে এই পাণ্ডবগৃহে অভিবাদন করব—অভিবাদয়িষ্যে হৃষ্টেতি...পুত্রোৎসঙ্গা জনার্দন। কিন্তু আমার দুর্দৈব তা হতে দিল না। আমি তোমার কাছে আর কিছুই চাই না, অভিমন্যু মারা গেলেও আমি যে মরিনি, তা এই ছেলের জন্য। আমার একান্ত প্রার্থনা—অশ্বত্থামার অস্ত্র-নির্দগ্ধ এই ছেলেটিকে তুমি বাঁচিয়ে দাও—দ্রোণপুত্রাস্ত্র-নির্দগ্ধং জীবয়েনং মমাত্মজম্। একই সঙ্গে মৃতপুত্র কোলে নিয়ে মর্মান্তিক সুরে উত্তরা তাঁর

মৃত পুত্রকেই বললেন—বৎস তোমার হল কি? তুমি বৃষ্ণিবংশের প্রবীর পুরুষ কৃষ্ণকে অভিবাদন করছ না, তুমি ধর্মজ্ঞ অভিমন্যুর ছেলে হয়ে ধর্ম বুঝতে পারছ না, এ তোমার হল কি, বাছা—যত্ত্বং বৃষ্ণিপ্রবীরস্য কুরুষে নাভিবাদনম্।

কৃষ্ণ আর উত্তরাকে বিলাপ করতে দেননি এবং এও তিনি বুঝতে পারছিলেন—সময় বড় তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে। একটা কিছু করা দরকার। আমরা জানি—কৃষ্ণের ভাবনা-শক্তিতে উত্তরার মৃতজাত পুত্র বেঁচে উঠেছিল এবং রহস্যের সমাধান দিতে হলে আমার অধীত বিদ্যার বঞ্চনা ঘটবে। যদি বিশ্বাসের কথা বলেন, তাহলে বলব—মহামতি কৃষ্ণ পূর্ণভগবৎস্বরূপ, তিনি ইচ্ছে করলে হ্যাঁ-কে না করতে পারেন, না-কে হ্যাঁ করতে পারেন এবং ইচ্ছে হলে যেটা যেমন ঘটছে, সেটাকে অন্যভাবেও ঘটাতে পারেন—কর্তুম্, অকর্তুম্, অন্যথা কর্তুং সমর্থঃ। তবে কিনা তিনি নরলীলায় মানুষের ব্যবহার করছেন, তিনি তাঁর ভ্রুকুটিমাত্রেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বন্ধ করে পাণ্ডবপক্ষের গৌরব-বর্ধন করেননি। বরঞ্চ যত অঘটন-অন্যায় ঘটেছে, তার দায় নিজে গ্রহণ করে সখ্যরসের গৌরব বাড়িয়েছেন। এক্ষেত্রেও যদি আপনি ঈশ্বর-সম্মিত অলৌকিকতায় বিশ্বাস না করেন, তবে বলব—কী অদ্ভুত ইঙ্গিত দিয়েছেন দ্বৈপায়ন ব্যাস।

আমরা ধারণা করি—উত্তরার পুত্রটি একেবারে মৃত হয়েই জন্মায়নি, তবে কিনা অশ্বত্থামা-প্রেরিত ব্রহ্মশির অস্ত্রই হোক, অথবা অন্য কিছু, সেটার কোনও সর্বধ্বংসী ক্ষমতা থাকুক অথবা আঘাত কিংবা বিষদিগ্ধ করার শক্তি, যা কিছুই হোক সেটা কিছু ক্ষতি করে দিয়েছিল উত্তরার গর্ভস্থ সন্তানের। সে ক্ষতির প্রতিক্রিয়া সদ্যোজাত শিশুর ওপর এতটাই যে, সে শিশু জন্মে মৃতবৎ পড়ে ছিল, তার শ্বাস-প্রশ্বাস ঠিকভাবে চলছিল না, স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন—মহাভারত যাকে বলেছে 'নিশ্চেষ্ট'। এই সদ্যোজাত নিশ্চেষ্ট শিশুকে কীভাবে জীবনের ধর্মে ফিরিয়ে আনা যায়, তার উপায় হস্তিনার অন্তঃপুরের বৃদ্ধা মহিলারা জানতেন না, বিভ্রান্ত ছিলেন তত্রস্থ চিকিৎসকেরাও। এই অবস্থায় কৃষ্ণ ত্বরিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন এবং তিনি এমন কিছু লৌকিক উপায় জানতেন যাতে আঘাত-জনিত এই নিশ্চেষ্ট স্তব্ধ ভাব তিনি দূর করে দিতে পেরেছিলেন।

আমাদের ধারণায়—অনেক শিশুরই জন্মকালীন প্রথম ক্রন্দন শব্দের পূর্বে অনেক সময়ই একটা নিশ্চেষ্টভাব থাকে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও তখন ঠিক মতো চলে না বলেই ধাত্রী-চিকিৎসকেরা নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুকে কাঁদাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কৃষ্ণ বোধহয় এই শারীরিক ব্যায়াম বা ফিজিওথেরাপির কাজটি ভালই জানতেন, কেননা পূর্বে মথুরা প্রবেশ কালে কুব্জা-সুন্দরীর ওপর তাঁর এই প্রয়োগ নিপুণতা আমরা দেখেছি। হয়তো সেই প্রক্রিয়াতেই তিনি উত্তরার পুত্রকে জীবন দিতে সমর্থ হন, যদিও শিশুটিকে প্রকৃতিস্থ করার কালে তিনি সেই সত্য এবং ধর্মের স্তুতিবাচনকেই রোগহরণের নিদান হিসেবে উপস্থিত করেছেন। বারবার বলেছেন—আমি যদি সত্যে এবং ধর্মে সদা-সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকি, তবে এই শিশু এখনই বেঁচে উঠুক—তেন সত্যেন বালোঽয়ং পুনঃ সঞ্জীবতামিহ। লক্ষণীয়, কৃষ্ণের মুখে এই সত্য-ধর্মের বহুমানন সম্পূর্ণ হতেই শিশুটি হঠাৎই একবারে চনমন করে উঠল না, যেমনটি অলৌকিকভাবে হওয়া উচিত ছিল। ব্যাস কিন্তু রীতিমতো চিকিৎসা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিধির প্রক্রিয়াতে প্রথমেই বলেছিলেন—কৃষ্ণ প্রথমেই আচমন করে অর্থাৎ এখনকার চিকিৎসাবিধিতে দুই হস্ত বীজাণু-মুক্ত করে প্রথমেই অশ্বত্থামা-নিহিত ব্রহ্মাস্ত্রটি বার করে নিলেন নিপুণ শল্য-চিকিৎসকের মতো—উপস্পৃশ্য ততঃ কৃষ্ণো ব্রহ্মাস্ত্রং প্রত্যসংহরৎ।

হয়তো এই শিশুর গায়ে অস্ত্রের কোনও প্রতিক্রিয়া ছিল, যেভাবেই হোক কৃষ্ণ সেই প্রতিক্রিয়ার অবসান ঘটিয়েছেন এবং সেটাই হয়তো ব্রহ্মাস্ত্রের প্রতিসংহার। এর পরে সেই সত্য-ধর্মের গৌরব উচ্চারণ এবং তারপরেই দেখছি—উত্তরার গর্ভজ পুত্র আস্তে-আস্তে অঙ্গ-সঞ্চালন করছে এবং আস্তে আস্তে তার মধ্যে চৈতন্যের লক্ষণও প্রকট হয়ে উঠছে—শনৈঃ শনৈর্মহারাজ প্রাস্পন্দত সচেতনঃ। দ্বৈপায়ন ব্যাস কিন্তু শেষ কথাটা লিখেছেন এইভাবে—কৃষ্ণ যেইমাত্র শিশুর শরীর থেকে ব্রহ্মাস্ত্রের অপসরণ করলেন, তখনই শিশুর নিজস্ব চেতনায় সেই সুতিকাগৃহ আলোকময় হয়ে উঠল—ব্রহ্মাস্ত্রং তু যদা রাজন্ কৃষ্ণেন প্রতিসংহৃতম্। তার মানে, জন্মকালেই এই শিশুর দেহে হয়তো কোনও অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, যে কাজটা অন্যান্য চিকিৎসকের দ্বারা সম্ভব হয়নি, কৃষ্ণকেই সেটা করতে হয়েছে। আর এটা মনে রাখতেই হবে, যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়রা আহত হবার পর শরীর থেকে অস্ত্রাংশ বার করে তার চিকিৎসা-নিরাময় নিজেরাই করতেন। সে-সব মহাভারতের যুদ্ধকাণ্ডে অনেক দেখেছি। এ-ক্ষেত্রে ঠিক কী হয়েছে জানি না, কিন্তু এটা লৌকিকভাবে মনে হয় যে, নরলীল কৃষ্ণ সত্য-ধর্মের স্তুতি গৌরব করার সঙ্গে-সঙ্গে শল্য-চিকিৎসার প্রক্রিয়াও কিছু প্রয়োগ করেছিলেন, যাতে শিশুর শরীরে থাকা এমন কোনও কিছু তাকে বার করতে হয়েছিল, যাকে অশ্বত্থামা-প্রণিহিত ব্রহ্মাস্ত্র বলে চিহ্নিত করতে হয়েছে রূপকের মাধ্যমে। এই উপসংহরণের পরেই ক্রমে উত্তরার শিশুপুত্র তার নিজের জীবনী-শক্তি অনুসারে হাত-পা নাড়তে আরম্ভ করল—ব্যচেষ্টত চ বালোহসৌ যথোৎসাহং যথাবলম্। আর যদি 'স্টিল-বর্ন'-এর তত্ত্ব না মেনে উত্তরার ছেলে যদি ছয়ের বদলে সাত-আট মাসের 'প্রিম্যাচিওর বেবি' হয়ে থাকে, তাহলে বলব—তার অবস্থা মহাভারতের অন্যত্র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী—সে অকালজাত ছিল বলেই সে অন্যান্য স্বাভাবিক বাচ্চাদের তুলনায় বলহীন, শক্তিহীন, শিশুসুলভ পরাক্রমী অঙ্গ-সঞ্চালনও তার ছিল না। সেই অবস্থায় কৃষ্ণের অসামান্য শুশ্রূষায় সেই শিশু বেঁচে উঠেছে, ধীরে ধীরে তার আঙ্গিক প্রক্রিয়াগুলিও শুরু হয়েছে—স ভগবতা বাসুদেবেন অসঞ্জাত-বল-বীর্য-পরাক্রমো-অকালজাত-অস্ত্রাগ্নিনা দগ্ধঃ তেজসা স্বেন সঞ্জীবিতঃ। এবং আমাদের ধারণা—এত ক্ষীণ, দুর্বল, হীনতেজ আকালিক শিশু বলেই কৃষ্ণ তার নাম রেখেছিলেন 'পরিক্ষিৎ'—পরিক্ষীণ বংশের তুলনায় পরিক্ষীণ অপরিণত শিশুর যুক্তিটাই বেশি বাস্তব। যাই হোক বেঁচে গেলেন কৃষ্ণের চেষ্টায় এবং ক্ষমতায়। ব্রাহ্মণেরা স্বস্তিবাচন করতে আরম্ভ করলেন। উত্তরা, জননী উত্তরা সজীব, সচেষ্ট পুত্রকে কোলে নিয়ে সানন্দে কৃষ্ণকে অভিবাদন করলেন—অভ্যবাদয়ত প্রীতা সহ পুত্রেণ ভারত। কৃষ্ণ নিজেই শিশুর নামকরণ করলেন পরীক্ষিৎ। বললেন—যেহেতু এই কুরুবংশ পরিক্ষীণ হয়ে যাবার পর অভিমন্যুর এই পুত্রটি জন্মাল তাই এর নাম হোক পরীক্ষিৎ—পরিক্ষীণে কুলে যস্মাজ্জাতোহয়স্ অভিমন্যুজঃ। পরীক্ষিদিতি নামাস্য ভবত্বিত্যব্রবীত্তদা।

উত্তরা জননী হলেন। বালিকা থেকে পরম অভিজ্ঞতায় যুবতী হওয়া, বিবাহিতা হওয়া,

বিধবা হওয়া এবং জননী হওয়া—মাত্র একবছরের মধ্যে উত্তরা এতগুলি জীবন-প্রকোষ্ঠ পার হয়ে এলেন। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, পাণ্ডবকুলের পর-প্রজন্ম সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় উত্তরার এই পুত্রজন্ম তাঁকে অধিকতর উজ্জ্বল করেছে। বিশাল এবং বিখ্যাত ভরত বংশের উত্তরাধিকার পৃথিবীতে রয়ে গেল—এই পুরুষতান্ত্রিকতাই উত্তরাকে মহীয়সী করে তুলল কিনা, সেই তর্কের মধ্যে সাধারণ পুরুষতান্ত্রিকতার সেই আংশিক সত্যটুকু থাকবেই। তবে কিনা যে বংশে পরবর্তী প্রজন্ম বলতে একটি প্রাণীও বেঁচে রইল না, সেখানে বংশের এই কনিষ্ঠা বধূটির জন্য পুরুষ এবং স্ত্রীলোক কারওরই উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না। উত্তরার স্বামী নেই, তাঁর বাপ-ভাই সকলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মারা গেছে, কিন্তু ভরত বংশের সমস্ত কুলবধূরা অভিমন্যুর প্রতি সম্পূর্ণ ভালবাসাটুকু উত্তরাকে দিয়েছিলেন, তাঁর সুখ-প্রসবের জন্য প্রত্যেকের আন্তরিক প্রার্থনা ছিল। মহাভারতের কবি উপমা দিয়ে বলেছেন—স্ত্রিয়ো ভরতসিংহানাং নাবং লব্ধেব পারগাঃ—অর্থাৎ নদীর তীরে এসে নদী পার হবার জন্য বসে থেকে-থেকে যদি নদী পার হবার নৌকো পাওয়া না যায়, সেইরকম ভাবেই কিন্তু ভরতবংশের স্ত্রীরা এই দশ মাস ধরে অপেক্ষা করেছেন—কবে উত্তরার ছেলে হবে। সেই ছেলের জন্য কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং উত্তরা তো বটেই— সকলের সদিচ্ছা একত্র হয়ে গিয়েছিল। অতএব উত্তরার ছেলে যখন আপন জীবনী শক্তিতে সচেতন হয়ে উঠল, তখন অপেক্ষমাণ পথিকের নৌকোয় উঠে নদী পার হবার সার্থকতা তৈরি হল ভরতবংশের সকল কুলবধূর অন্তরে—কুন্তী দ্রুপদপুত্রী চ সুভদ্রা চোত্তরা তথা। স্ত্রিয়ো ভরতসিংহানাং নাবং লব্ধেব পারগাঃ। ভরতবংশের সকল কুলবধূ এই মুহূর্তে একাকার হয়ে গেছেন উত্তরার মধ্যে।

আশা করি, কোল-আলো-করা ভরতবংশের আদরণীয় পুত্র লাভ করে উত্তরা তাঁর উত্তর জীবন অপেক্ষাকৃত ভাল কাটিয়েছেন। পরবর্তী কালে যুধিষ্ঠির যখন হস্তিনার রাজরমণীদের নিয়ে আশ্রমে-থাকা বানপ্রস্থী ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তীকে দেখতে গেলেন, তখন সকলের সঙ্গে উত্তরাও সেখানে গিয়েছিলেন। সেখানে দ্বৈপায়ন ব্যাসের অলৌকিক শক্তিতে সকলে যখন প্রয়াত স্বামী-পুত্র, পিতা-ভ্রাতাকে দেখতে পেল, সেখানে উত্তরা তাঁর পিতা বিরাট এবং প্রয়াত ভাইদের সঙ্গে পরম অভীষ্ট অভিমন্যুকে দেখতে পেয়েছিলেন।

মহাভারতের বিশালবুদ্ধি নায়িকা যাঁরা আছেন—সত্যবতী কুন্তী অথবা দ্রৌপদী—উত্তরা এঁদের মতো সপ্রতিভ নন। মূল কাহিনির প্রবহমান পথে উত্তরা কোনও মৌল চরিত্রও নয়। কিন্তু অন্য চরিত্র থেকে তিনি পৃথক এবং জীবনের গতি এবং সন্ধিতে একান্তভাবে তিনি স্বতন্ত্র এবং তাঁর জীবনের সমস্যাগুলি খুব আধুনিক দৃষ্টিতে দেখা যায়, চেনা যায়। তাঁর শৈশব আমরা জানি না, কিন্তু যৌবনসন্ধিরও পূর্বে অধিকবয়স্ক মহাবীর অর্জুনের প্রতি আপন বীরমানিতায় মুগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বৈবাহিক জীবনে তাঁরই পুত্রকে তিনি গভীর রোমাঞ্চের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই রোমাঞ্চও তাঁর জীবন থেকে এত তাড়াতাড়ি চলে গেল যে, তিনি ভারতীয় গৃহের প্রতিপদ-বিপন্না ভাগ্যহীনা বালবিধবার জীবন লাভ করলেন। পুত্র তাঁর কোল ভরে দিয়েছিল বটে, কিন্তু হৃদয়ান্তের প্রাণ ভরে দিয়েছিল কিনা জানি না। একটা সন্দেহ হয়ই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বৈপায়ন ব্যাস যখন যুদ্ধাবশিষ্ট পাণ্ডব-কৌরব এবং কুলবধূদের সবাইকে তাঁদের প্রয়াত স্বজন-বান্ধবদের দেখিয়ে দিলেন অলৌকিক বিভূতিতে, তখন তার পরেই তিনি একটা অদ্ভুত প্রস্তাব করলেন। স্বামী-পুত্রহীনা রমণীদের উদ্দেশে তিনি বললেন—তোমরা যারা তোমাদের স্বামীদের এতক্ষণ দেখলে, একটা গোটা রাত্রি তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আলাপ করলে, তারা এই গঙ্গার জল থেকেই উঠে এসেছিল, তোমরা যারা পতিলোক লাভ করতে চাও, তারা নেমে এসো এই গঙ্গার জলে—তা জাহ্নবী-জলং ক্ষিপ্রম্ অবগাহন্ত্বতন্দ্রিতাঃ। এই কথা শুনে কুরু-পাণ্ডব-পাঞ্চালদের স্ত্রীরা অনেকেই গঙ্গার জলে নামলেন, ডুব দিলেন, আর উঠলেন না। মহাভারতের কবি লিখলেন—তাঁরা সবাই মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে পতিলোকে স্বামীদের সঙ্গে মিলিত হলেন—বিমুক্তা মানুষৈর্দেহৈ স্ততস্তা ভর্তৃভিঃ সহ।

অলৌকিকতার এই মহাকাব্যিক অতিশায়ন আমাদের পরিচিত। মহাভারতের কবি স্বয়ং যেহেতু এই মহাকাব্যের চরিত্রদের অন্যতম বৃদ্ধ চরিত্র এবং এই বৃহৎ পরিবারের সবচেয়ে হিতকামী পুরুষ, তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা এবং কবিজনোচিত বেদনাবোধেই জানেন যে, দুর্যোধন, দুঃশাসন, অভিমন্যু—এঁদের স্ত্রীরা কেউ আর মনে-মনে ভাল নেই। আমাদের উত্তরাও হয়তো এই পতিলোক-পিয়াসীদের অন্যতমা। আমরা পরীক্ষিতের রাজা হবার খবর পেয়েছি এক সময়, মহাকাব্যে উপেক্ষিতা উলূপী-চিত্রাঙ্গদাদেরও শেষ সংবাদ এবং গতি আমরা জানি। কিন্তু এই ঘটনার সময় ছাড়া পরে আর আমরা উত্তরার খবর পাইনি। আমাদের ধারণা—ব্যস-কথিত পতিলোকের এই স্পৃহনীয়তা আসলে আত্মহত্যারই অন্য কোনও রূপ। ব্যাস বুঝেছিলেন জীবন নিয়ে তাঁরা যত ভাল আছেন, তার থেকে জীবনের অপর পারে তাঁরা অনেক ভাল থাকবেন। সেই কারণেই স্রোতোবহা জীবন-জাহ্নবীর অতলান্তে নিমগ্ন হয়ে উত্তরা বোধহয় সেই রোমাঞ্চ কামনা করেছিলেন আত্মহত্যা করে। সেই রোমাঞ্চ তাঁর বিশ্বাসের মধ্যে ছিল। মৃত স্বামীকে জড়িয়ে ধরে তিনি একসময় বলেছিলেন সেই কথা, বলেছিলেন—ওগো! তুমি যুদ্ধবীরের প্রাপ্য স্বর্গে গেছ, আমিও খুব শিগ্‌গিরই আসব সেখানে, সেখানেও আমাকে তুমি দেখে রেখো—ক্ষিপ্রম্ অন্বাগমিষ্যামি তত্র মাং পরিপালয়।

নির্দেশিকা

অকৃতব্রণ ১৫১-১৫৩

অক্রূর ৬০৫, ৬৩৫, ৬৫৭, ৬৫৮, ৬৬২, ৬৬৩, ৬৭০-৬৭৫, ৬৭৭, ৬৭৮, ৬৮০-৬৮৮, ৬৯১

অক্ষমালা ৮২

অগস্ত্য ২০, ৮২, ১৭৮, ৭৩৩-৭৪৬

অগাস্টাইন ৭৬৫

অগ্নি/ অগ্নিদেব ৫৪১, ৭০০, ৭৩৪

অঙ্গ ২৯৪, ৩১৬, ৫৮৩

অঙ্গিরা ৪৯, ৫৪, ৬১

অচলা ২৪৮, ২৪৯

অচ্যুত ৬৭২

'অজমীঢ়' ৫৭৪

অত্রি ১০৩, ৭২৮

অদিতি ৬৯৩

অদৃশ্যন্তী ১০১, ১০২

অদ্রিকা ১০৪

অধিরথ ১১

অনন্ত দেখুন বাসুকি

অনন্তলাল ঠাকুর ৪০৮

অনমিত্র ৬৫৭

অনসূয়া ৭২৭

অনিরুদ্ধ ৬৩২

অনু ৯৪

অনুপম ৬৯৩

অনুলক্ষ্মী ৭৩১

অবন্তী ১৭২, ৬৪৩, ৬৫৭

অভিমন্যু ২৩৫, ২৩৮, ৩২৪, ৩২৬, ৩৪০, ৪০২, ৪৪৬, ৪৪৭, ৫২৪, ৫২৬, ৫২৭, ৫৩৬, ৫৬১, ৫৮৮, ৫৯২, ৬১৮, ৬২০-৬২৬, ৬২৮-৬৩১, ৭০৫, ৭২৪, ৭৯৯-৮০৭, ৮০৯, ৮১১-৮২৩

অমর সিংহ ২, ৩, ৫

অম্বা ১১৯, ১৪২, ১৪৫-১৫৩, ১৫৫-১৬৩, ১৬৯

অম্বালিকা ১১৯, ১২৯, ১৩০, ১৩৪, ১৩৫, ১৬৯, ১৮৭, ১৮৮, ২৭৮, ২৭৯, ২৯১, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৭০, ৪০৭, ৮০৬

অম্বিকা (দেবী) ৬৪১

অম্বিকা ১১৯, ১২৮-১৩১, ১৩৩-১৩৫, ১৬৯, ১৮৭, ১৮৮, ২৭৮, ৩৩৫, ৩৩৬, ৪০৭, ৮০৬

অযোধ্যা ৭৬৪

অরুন্ধতী ৪৩৬, ৭২৭

অর্জুন ২১-২৫, ১৫৮, ১৬৩, ১৯৫, ২০৩, ২০৫, ২০৭-২০৯, ২১৮, ২১৯, ২৩৩, ২৮০, ২৮৫, ২৯৩, ২৯৫, ২৯৯-৩০১, ৩০৬-৩০৯, ৩১১, ৩১৫, ৩১৭, ৩২০-৩২২, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৮, ৩৩২, ৩৪৭, ৩৫৭, ৩৮৫, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯৩, ৪০১, ৪০৮, ৪১৪-৪১৭, ৪১৯-৪২৫, ৪২৯, ৪৩২, ৪৩৬, ৪৩৯, ৪৪১-৪৪৮, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬৯-৪৭১, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৯-৪৮১, ৪৮৪-৪৮৬, ৪৮৮, ৪৯০, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৯-৫০২, ৫০৪, ৫০৮, ৫১১, ৫১৩, ৫১৮-৫২৪, ৫২৬-৫২৮, ৫৩০, ৫৩২-৫৩৪, ৫৩৬-৫৪২, ৫৪৪-৫৪৮, ৫৫০, ৫৫২, ৫৫৩, ৫৫৫-৫৫৭, ৫৫৯-৫৬২, ৫৬৪-৫৬৭, ৫৬৯, ৫৭০, ৫৭২-৫৭৯, ৫৮১-৫৮৩, ৫৮৫-৫৯০, ৫৯২, ৫৯৩, ৫৯৫-৬০৫, ৬০৭-৬১৫, ৬১৭,

AMARBOI.COM

৬১৯, ৬২০, ৬২২-৬২৭, ৬২৯, ৬৩০, ৬৪৩, ৬৪৫, ৭০৪, ৭০৫, ৭৮১-৮১০, ৮১৩-৮১৮, ৮২২
অলকাপুরী ১৬
অলম্বুষ ৫৮১
অশ্বত্থামা ২২৭, ২৩৮, ৩৪৩, ৪১৩, ৫৫০, ৫৫১, ৬২৩, ৬২৯, ৬৩০, ৭৯৬, ৮০৮-৮১০, ৮১৫-৮২১
অশ্বসেন ৫৭৮-৫৮১
অশ্বিনীকুমারদ্বয় ৯, ২৮৭, ৩৬১, ৪২৫
অষ্টক ৭৬৮, ৭৭৫
অসম/ আসাম ৬৪২, ৬৮৮
অসিত ১১৪
অস্ত্র
    পাশুপত অস্ত্র ৫৪৬, ৫৮১
    বায়ব্যাস্ত্র ১৫
    ব্রহ্মশির অস্ত্র ৬২৯, ৮০৮, ৮১০, ৮১৬, ৮২০
    সম্মোহন বাণ ৭৯৬
অহল্যা ২৫০, ৩২৭, ৩৩৯, ৭২৬

আঁদ্রে দোয়ারকিন ৬৪৯
আকবর শাহ ৭৩০, ৭৩১
আফগানিস্তান ১৬৭
আমেদাবাদ ৬৮৮
আয়ু ২০, ২১
আরষ্ট ৫৮১
আর্যক শূর ২৫৫-২৫৭, ২৬০, ২৭৪-২৭৬, ৩০৯, ৩৫৬, ৬৫৭
আর্যশৃঙ্গি ৫৮১
আলকিবিয়াদেস ৫৩৯
আলোয়ার ১৪১
আহুক ৬৮৭

ইন্দ্র ৪, ৭, ৮, ১৪, ১৭, ২১-২৩, ২৮, ৩১, ৫৭, ৬৭, ৬৮, ৭২,২৭৬, ২৮৫, ২৮৬, ২৯২, ৩০২, ৩৩২, ৩৫৫, ৩৫৯, ৩৬০, ৪২৫, ৪৭০, ৪৯২, ৫১২, ৫২০, ৫৩৮, ৫৬৫, ৫৭৩, ৫৮১, ৫৯১, ৫৯৪, ৬৪১, ৬৪২, ৬৯৮-৭০২, ৭২৭, ৭৩২, ৭৩৩, ৭৭৪, ৭৮২, ৭৯৫
ইন্দ্রপ্রস্থ ১৩৭, ১৯৬, ২০৬, ৩০৩, ৩০৬, ৩০৮, ৩৩২, ৩৪৯, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯৩-৩৯৫, ৪৪০, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৭৫, ৪৭৮, ৪৮৩, ৫১০, ৫৩৪, ৫৪১, ৫৪৩, ৫৪৫, ৫৮৫, ৫৮৬, ৬০৯, ৬১০, ৬১২, ৬১৩-৬১৬, ৬১৯-৬২১, ৬২৩, ৬৩২, ৬৪৩, ৭২৩, ৭৯৮
ইন্দ্রলোক ৬১২
ইন্দ্রাণী ৬৪১, ৬৪২
ইরান ৩৫৪
ইরাবান ৫৬৭, ৫৭২-৫৭৫, ৫৭৮-৫৮২, ৫৮৭, ৫৮৮, ৫৯৩, ৫৯৯
ইলা ১৩
ইলাহাবাদ ৯, ১৩
ইল্বল ৭৩৮, ৭৪৫

উইলিয়ম থ্যাকারে ৬৫
উগ্রসেন ২১২, ৬০৫, ৬৬০, ৬৬১, ৬৬৩, ৬৬৭, ৬৮১, ৬৮২, ৬৮৭
উজ্জয়িনী ২৭
উড়িষ্যা ৬৯৪
উত্তর ৫৪২, ৭৮৯-৭৯২, ৭৯৪-৭৯৬
উত্তরা ২৩৮, ২৪৬, ৫২৩, ৬২১-৬২৪, ৬২৬, ৬২৮-৬৩১, ৭২৪, ৭৮৩-৮২৩
উত্তীয় ৬৬২
উদকসেন ১৩৮
উদ্ধব ৬০৫, ৬৮১
উপকীচক ৫১৭, ৭৮৮
উপপ্লব্য ২২০, ২৩৯, ৬২২, ৬২৩, ৬২৮, ৮০১, ৮০৪, ৮১০
উপমন্যু ৬৭৯
উপরিচর বসু ১১, ১০৪-১০৭, ১১৪
উপসুন্দ ৪৪০
উর্বশী ২, ৩, ৬-৯, ১৪-১৮, ২০-২৫, ৫০৪, ৬২০, ৭৮১-৭৮৩, ৭৯৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উলূপী ২১, ৩৯০, ৪৪৪, ৫৬৫-৫৮৪, ৫৮৬-৬০০, ৬০৩, ৬০৪, ৭০৭, ৭৮৮, ৮২৩
উশীনর ৭৬৬, ৭৬৭, ৭৭৫
উষদশ্ব ৭৭৫

এইচ. জি. ওয়েলস ১৭৮
একচক্রা ২৯৭-২৯৯
এড্‌গারটন ৪৬৪, ৪৬৫
এলাহাবাদ *দেখুন* ইলাহাবাদ
এলোকেশী ১

ঐরাবত *দেখুন* কৌরব্য নাগ

ওনটারিও ৩৭৭

কংস ২১২, ২৫৬, ২৭৪, ২৭৫, ৪১৭, ৬০৬, ৬১৭, ৬৩৫, ৬৩৬, ৬৩৮, ৬৩৯, ৬৬০, ৬৬১, ৬৬৩
কচ ৪৮-৬৭, ৭৪, ৭৫, ৮১, ৮২, ৮৬, ৮৭
কঙ্ক ৭১৯
কণিক ১৮৯
কণ্ব ২৮-৩০, ৩২-৩৮, ৭৩১
'কবি' ৪৮
কম্বোজ ৫৮১
কর্ণ ১১, ১৬৭, ১৯১, ১৯২, ১৯৪, ২০৬, ২০৭, ২১২, ২১৮, ২১৯, ২২২, ২২৩, ২২৬, ২৩৫, ২৩৮, ২৭২, ২৭৩, ২৭৭, ২৮২, ২৯২, ২৯৪, ৩০৯, ৩১৬-৩২৫, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩৭-৩৪১, ৩৪৯, ৩৫৪, ৩৮৯, ৩৯৪, ৪১৩-৪১৫, ৪২১, ৪২৩, ৪২৯, ৪৩৪, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৪০, ৪৫১, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৬১-৪৬৩, ৪৬৬, ৪৬৮-৪৭১, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৮৪, ৫২৫, ৫৩০-৫৩২, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৪২, ৫৫২-৫৫৪, ৫৫৭-৫৫৯, ৬২২, ৬৩১, ৭৯৬, ৮০২, ৮০৯, ৮১৫
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২৪৯
কলি ১৬৬
কলিঙ্গ ৪১৩, ৫৮৩
কল্মাষপাদ ১০১
কশ্যপ ৬
কাঞ্চনমালিনী ৭
কাঞ্চী ১৭২, ৬৫৭
কান্দাহার ১৬৭, ১৭০, ১৮৮
কাবুল ১৬৭
কাব্য ৪৮
কার্তবীর্য-অর্জুন ৫২৮
কার্তিক ৪০৪
কালিদাস ৩, ১৪, ১৯, ২৬-৩৬, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৭৮, ১৬৪, ২৪৭, ২৬১, ২৬৩, ২৬৪, ২৭৯, ২৮৩, ৩৩৫, ৪১২, ৪১৩, ৪২১, ৭১৬, ৭৩১, ৮১৬
কালিন্দী ৬৪৩, ৬৪৪
কালী ৯৯, ১০৫
কালীপ্রসন্ন সিংহ ৪৪৫, ৫০৮
কাশী ১১৯, ১৩৪, ১৩৭, ১৩৮, ১৪২, ১৬৩, ১৬৯, ১৭২, ৩৩০, ৬৫৭, ৬৬০, ৭৬৪, ৮০০
কাশীরাম *দেখুন* কাশীরাম দাস
কাশীরাম দাস ৩৯০, ৩৯১, ৩৯৩, ৩৯৪, ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৭, ৫৫৮, ৬০১, ৬০২, ৬০৭, ৬১০, ৬১৩, ৬১৬, ৬১৮, ৬১৯
কাশ্মীর ১৬৭, ৩৫১, ৩৫৭, ৫০৩
কিন্‌সে ৪৩৮
কিন্দম ২৭৮-২৮০, ২৮৮, ৩৫৫, ৩৬৩-৩৬৫
কিমিন্দম *দেখুন* কিন্দম
কির্মীর রাক্ষস ৪৮৪, ৫১৫
কীচক ৩০৬, ৪৭৯, ৪৯১, ৫০৪-৫০৮, ৫১০, ৫১২-৫১৫, ৫১৭, ৫১৮, ৫২৩, ৫৪১, ৭০৩, ৭১৩-৭২১, ৭২৩, ৭৮৭, ৭৮৮
কীর্তি ১৪
কুইনজ্ ইউনিভার্সিটি ৩৭৭
কুণ্ডিনপুর ৬৩৭, ৬৩৮, ৬৪২
কুন্তিভোজ ১৬৬, ২৫২-২৬৩, ২৬৮, ২৭০, ২৭১, ২৭৩-২৭৬, ২৮৪, ৩১৮, ৩২০, ৩৫০, ৩৫৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুন্তী ২৪, ২৫, ১২৯, ১৩২, ১৬৬, ১৭৪-১৭৭, ১৮১, ১৮২, ১৮৬, ১৮৭-১৮৯, ১৯৪, ২০০-২০২, ২০৪, ২১০, ২১১, ২২৭, ২২৯, ২৩৩, ২৩৪, ২৪৩, ২৪৫-২৪৭, ২৫০-৩০০, ৩০২-৩৩৩, ৩৩৫-৩৩৭,৩৩৯-৩৪৯, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫৫-৩৬২, ৩৬৪-৩৭০, ৩৭৫, ৩৮৪-৩৮৬, ৩৮৯, ৩৯১, ৩৯৪, ৪০৫, ৪০৭, ৪১০, ৪১১, ৪১৮, ৪১৯, ৪২৫-৪২৭, ৪৩০-৪৩৩, ৪৩৬, ৪৪৬, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮৩, ৪৮৯, ৪৯৬, ৫০০, ৫২১, ৫২৪, ৫৩৯, ৫৫৭, ৫৫৮, ৫৭২, ৫৮২, ৫৮৪, ৫৮৫, ৫৯৬-৫৯৮, ৬০৯, ৬১৫-৬১৭, ৬২১, ৬২৯-৬৩১, ৭০৭, ৭০৮, ৭৬১, ৭৬৬, ৭৭২, ৮১৭, ৮১৮, ৮২২

কুবের ৩১২

কুমারিল ভট্ট ৪৩৩, ৪৩৪, ৫৭৫

কুম্ভকর্ণ ৩৭৫

কুরু ১৩, ৯৮, ২৮০

কুরুজাঙ্গল ২৪৪, ৪০২, ৪০৩, ৪৩৬

'কুরুপুঙ্গব' ৫৭৪

কুলুমানালি ৩৭৪, ৩৮৭

কুল্লুকভট্ট ৭৪

কৃতবর্মা ২২৭, ২৩৮, ৬৩৬, ৬৫৭, ৬৫৮, ৬৬২, ৬৬৩, ৬৭০, ৬৭১, ৬৭৪, ৬৮৬, ৬৯১

'কৃত্যা' ৫২৮

কৃপ/কৃপাচার্য ১১, ২০, ১৯৩, ১৯৬, ২১৩, ২১৬, ২১৯, ২২০, ২২৭, ২২৮, ২৩৮, ২৯৪, ৩০৪, ৪৪০, ৪৫১, ৪৫৪, ৪৬১, ৪৬৮, ৪৬৯, ৫২৫, ৭৯৬, ৮১৫

কৃষ্ণ ১৪, ১৮৫, ২০৬, ২০৯-২১৪, ২১৮-২২০, ২২৪, ২২৬-২২৯, ২৩৩, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৮-২৪২, ২৫২, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৬, ২৭০, ২৭৪, ২৭৫, ৩০৫-৩১৩, ৩১৫-৩২০, ৩৩০, ৪০৪, ৪০৭, ৪০৮, ৪১৩, ৪১৭, ৪১৮, ৪২৬, ৪২৯, ৪৩৪, ৪৩৬-৪৩৮, ৪৪০, ৪৪৪, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৬৪-৪৬৮, ৪৮০, ৪৮৫-৪৮৮, ৪৯০, ৫২৪-৫২৮, ৫৩০, ৫৩২-৫৩৮, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৫, ৫৫০-৫৬২, ৫৭৪, ৫৮৬, ৬০১, ৬০২, ৬০৪-৬০৭, ৬০৯-৬১৩, ৬১৬-৬২২, ৬২৪-৬৭৮, ৬৮১-৭০৬, ৭৪৩, ৭৫৪, ৭৬৫, ৮০০-৮০২, ৮০৫-৮২১

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস *দেখুন* ব্যাসদেব

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ৩৩৬

কৃষ্ণদাস শাস্ত্রী ১২

কৃষ্ণা ৩০৬, ৩৩৭, ৪০৯, ৪২২, ৪৩২, ৪৩৭, ৭০৯

কেকয় ১৩৮, ১৬৭, ৭১৫

কেকয় রাজা ৬৪৩

কেশী ১৪

কৈকেয়ী *দেখুন* রোহিণী-২

কোটিকাসা ৪৯৭

কোশল ৬৪৪

কৌটিল্য ২১৭, ২৫৬, ৬২৭, ৬৩৫, ৬৫৭, ৬৬০

কৌরব্য নাগ ৫৬৫, ৫৬৬, ৫৬৮, ৫৭৩-৫৭৬, ৫৭৮-৫৮০, ৫৯৩, ৫৯৪

কৌশল্যা ৪৭৮

ক্রথ- কৈশিক ৬৪৬

ক্রোষ্টু ৬৫৭

ক্রোষ্টা *দেখুন* ক্রোষ্টু

খাণ্ডবপ্রস্থ ২১৪, ৪৪২, ৪৪৪, ৪৪৭, ৪৪৮, ৫০৩, ৫৪১, ৫৫৯, ৬১৬-৬১৮, ৬২০, ৬২১

গঙ্গাদ্বার ৫৬৪, ৫৬৫, ৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭১, ৫৭৪, ৫৭৯, ৫৮১, ৫৯৪, ৬০০, ৭৪১, ৭৪২

গঙ্গাধর ৫৮৩

গজনী ৬০৪

গজেন্দ্রকুমার ৫৫৮

গদ ৬০৫, ৬৮৭

গন্ধবতী ১০৯-১১১

গয়া ৫৮৩

গরুড় ৫৬৮, ৫৭৫, ৫৭৬, ৫৭৯, ৬৪৪, ৭৫৪, ৭৫৫, ৭৬৭, ৭৭০, ৭৭৮, ৭৭৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাণ্ডীব ৪৮৬, ৪৮৮, ৫১২, ৫১৩, ৫৭৭
গান্ধার ১০৬, ১৬৬-১৬৮, ১৭০, ১৭১, ১৮৮, ৬৪৪
গান্ধারী-১ ৯১, ১০৬, ১২৯, ১৩১, ১৬৪-২৪৭, ২৭৭, ২৮৭, ২৯১, ৩২৪-৩৩০, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৪০, ৩৪২, ৩৪৪-৩৪৮, ৩৫৫, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬৭, ৪৫৫, ৪৭৩, ৪৭৪, ৫০১, ৫৬১, ৫৮২, ৫৯৭, ৫৯৮, ৬৩১, ৭০৭, ৭০৮, ৮১১-৮১৪, ৮২২
গান্ধারী-২ ৬৮৯
গান্ধারী-৩ ৬৫৭
গালব ৭৫২-৭৫৮, ৭৬০-৭৭২, ৭৭৭, ৭৭৮
গিরনার ৬০৪
গিরিকা ১০৪, ১০৬
গুজরাট ১৪২
গোবাসন শৈব্য ৫৪০
গোবিন্দ দেখুন কৃষ্ণ
গোলাপ ১
গৌতম ৭২৬, ৭২৭
গৌতমী, আর্যা ৩৬
গৌরী ধর্মপাল ৪০৮
গ্রন্থ
অত্রিস্মৃতি ৭৬২
'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' ২৬, ৪১-৪৩, ৭১৬
'অমরকোষ' ২, ৫
অর্থশাস্ত্র ২১৭, ২৫৬, ৬২৭, ৬৬০
উজ্জ্বল-নীলমণি ৭৪৩
উত্তর-রামচরিত ১৮৪
উপনিষদ ২৭৩
ঋগ্‌বেদ /ঋগ্বেদ ৩, ১৮, ২৯, ১৬৭, ২৬৫, ৪৫১, ৭৩৩, ৭৩৬
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩৫১, ৪০০
কট্‌হহরি জাতক ৪৩
'কবিরত্নপ্রকরণ' ২৫১
কর্ণ-কুন্তী সংবাদ ১৮৬, ৩১২, ৩২৩
কিরাতার্জুনীয় মহাকাব্য ৪৯১
কুমারসম্ভব কাব্য ৩২, ৪২১, ৬৯৩
গান্ধারীর আবেদন ১৮৬
গৃহদাহ ২৪৮
তন্ত্রবার্তিক ৪৩৩
তুতিনামা ৭৩০
'তুশম প্রস্তরলিপি' ৬৬৯
'নরকাসুর-বিজয়-ব্যায়োগ' ৬৮৮
নাট্যশাস্ত্র ১, ৩৩৬, ৭৪৩
নৈষধচরিত ২৬১, ৬৫২
'পঞ্চেন্দ্রোপাখ্যান' ৪২৪
পরাশর-স্মৃতি ৭৬২
'প্রেমের অভিষেক' ৬১৯
বশিষ্ঠস্মৃতি ৭৬২
'বিক্রমোর্বশীয়' ১৪, ১৯
বৃহদ্‌-দেবতা ৯
বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৩৫১
বৃহস্পতি-স্মৃতি ৭২৯
বৃহস্পতিসংহিতা ৪৭৭
বেণীসংহার ৪০৮
'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ৬৯৪
ভগবদ্‌গীতা ৫৭৫
ভট্টি কাব্য ২৯
মনুসংহিতা ২১৭
মৃচ্ছকটিক ৭১৬
রঘুবংশ ২৬, ৭৮, ৪১২, ৫২৯
ললিতমাধব ৬৯৪
শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩৭
'শর্মিষ্ঠা' ১
শুকসপ্ততি ৭৩০
শুক্রসংহিতা ৪৭৭
'শ্যামা' ২৬
সোশ্যাল হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া ৭৬৯
ঘটোৎকচ ৩৪০, ৩৮৮, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯৪-৪০৫, ৪৮১, ৫৪৭, ৬৩০, ৬৩১
ঘূর্ণিকা ৭১, ৮৬
ঘৃতাচী ২, ৬, ৭, ২০, ২১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চন্দ্র ১৩, ৭২৮, ৭২৯, ৭৩১-৭৩৩, ৭৬৬
চন্দ্রাবলী ৬৯৩, ৬৯৪
চাণক্য ১১
চারুদেষ্ণ ৬০৫
চিত্রবাহন ৫৮৩-৫৮৭
চিত্রলেখা ১৪, ১৫
চিত্রসেন ২২-২৪, ২৩৮
চিত্রা *দেখুন* সুভদ্রা
চিত্রাঙ্গদ ১১৮, ১২০, ১৩৬, ২৭৬
চিত্রাঙ্গদা ২১, ৩৯০, ৪৪৪, ৫৭৩, ৫৭৫, ৫৮২-৫৮৭, ৫৮৯-৫৯৩, ৫৯৫-৬০০, ৬০৩, ৬০৪, ৭৮৮, ৮২৩
চেদি দেশ ১০৪, ৬৩৬
চৈতন্য মহাপ্রভু ৬৯৩
চ্যবন ৫১৪

জগত্তারিণী ১
জটাসুর ৫১৫
জড়-ভরত ৩৬৭
জন্মেজয় ১৭৩, ১৮৫, ৫২২, ৫২৪
জমদগ্নি ৫২৮
জয়দ্রথ ২০৩, ২২৩, ২৩৮, ৩১৭, ৪৯৬-৫০২, ৫০৫, ৫০৬, ৫১০, ৬২৪, ৮০৪, ৮০৫, ৮০৭
জয়পুর-ভরতপুর-আলোয়ার ১০৬, ৭০৮, ৭৮৬, ৮০১, ৮০৪
জরজেস দ্যুমেজিল ৭৫৫, ৭৭২, ৭৭৩, ৭৭৭, ৭৭৮
জরাসন্ধ ৯৯, ২৭৫, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৭, ৪১৮, ৬১৭, ৬১৮, ৬৩৫-৬৪১, ৬৪৫, ৬৪৬, ৬৫১, ৬৬০, ৬৬১
জলক্লিন্ন ৩৯৭
জাম্ববতী ৬৪৩-৬৪৫, ৬৫০, ৬৫৪, ৬৫৬, ৬৬৭-৬৬৯, ৬৮৯, ৬৯৯
জাম্ববান ৬৬৪-৬৬৮
জাম্বুনদ ৫৯৮
জীবনানন্দ ৪৬৮
জুনাগড় ৬০৪

ঝুসি ১৩

টমাস আকুলাস, সেইন্ট ৭৬৫
টরোন্টো ইউনিভার্সিটি ৩৭৭

ডানিয়েল বার্গনার ৩৭৭
ডারউইন ৪৭
ডি. এইচ. লরেন্স ৬, ২০

তাপ্তী ৬৩৭
তারা ১২, ১৩, ২৫০, ৩২৭, ৩৩৯, ৭২৮, ৭৩১-৭৩৩
তিলোত্তমা ২, ৫, ৭, ৮, ৪৪০, ৫০৫
তুর্বসু ৩৩, ৩৯, ৪০, ৯৪, ৭৭৮
ত্বষ্টা ৪২৫
ত্রসদস্যু ৭৪৫

দক্ষকন্যা মুনি ৬
দমঘোষ ৬৩৬
দময়ন্তী ৪৩৬, ৫২২, ৬২০, ৬৫২
দশরথ ২১, ১৮৫
দশার্ণ দেশ ১৬০
দশার্ণ রাজা ১৬০, ১৬১
দারায়ুস ৩৫৪
দারুক ৬০১, ৬৪১
দাশ ১০৪, ১০৭, ১১০-১১৭, ১২০, ১২৩
দিবাকর *দেখুন* সূর্য
দিবোদাস ৭৬৪, ৭৬৫, ৭৬৭, ৭৭৫
দিলীপ ২১
দিল্লি ৩৭৪, ৪০৭
দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ৪০৬
দুঃশলা ১৮৫, ২০৩, ২২৩, ৪৯৭, ৪৯৮, ৫০১
দুঃশাসন ১৮৫, ১৯১-১৯৭, ২০০, ২০১, ২১২, ২১৮, ২১৯, ২২৩, ২৩১, ২৩৭, ২৩৮,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩০৩, ৩০৯, ৩১৬, ৩১৭, ৩৩২, ৩৪০, ৪৩৭, ৪৫১, ৪৫৫-৪৫৭, ৪৫৯, ৪৬১, ৪৬৩-৪৬৯, ৪৭২, ৪৭৫-৪৭৭, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৯৯, ৫০২, ৫০৬, ৫১৭, ৫২৫, ৫২৬, ৫৩২-৫৩৪, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৪২, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৫১, ৫৫৪, ৫৫৬, ৫৬০, ৬২২, ৮০২, ৮০৩, ৮২৩

দুঃসহ ২৩৮

দুর্গসিংহ, টীকাকার ৬৮০

দুর্বাসা ৩৪, ৪২, ৪৩, ২০৩, ২৫৮, ২৫৯, ২৬১-২৬৫, ২৬৮, ২৭৭, ২৮৫, ২৮৮, ২৯২, ৩১৮, ৩২০, ৩৩৯, ৩৫৬, ৩৫৯, ৬৪৭-৬৫০, ৬৫৪

দুর্মুখ ২৩৮

দুর্যোধন ১১, ১৩০, ১৩১, ১৩৩, ১৬৬, ১৭৫, ১৭৮-১৮১, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৮, ১৮৯, ১৯১-২০১, ২০৩, ২০৪, ২০৬-২২৭, ২২৯-২৩২, ২৩৬-২৪০, ২৪২-২৪৪, ২৪৭, ২৫২, ২৫৩, ২৯২-২৯৫, ২৯৮, ৩০৩, ৩০৯-৩১৮, ৩২১, ৩২৩, ৩২৫, ৩৩২, ৩৪০, ৩৭৫, ৪০৭, ৪০৮, ৪১৩, ৪১৭, ৪১৮, ৪৩১, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৪০, ৪৪৭-৪৫০, ৪৫২-৪৫৫, ৪৫৭-৪৫৯, ৪৬১-৪৬৩, ৪৬৮-৪৭৫, ৪৭৫-৪৭৭, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৮৮, ৪৯১, ৪৯৭, ৪৯৮, ৫০২, ৫১৫, ৫১৭, ৫২৫, ৫২৬, ৫৩০, ৫৩৪, ৪৩৫, ৫৩৭, ৫৪৩-৫৪৫, ৫৫১, ৫৫৪, ৫৫৬, ৫৬১, ৫৮১, ৫৮৬, ৬০১, ৬১৭, ৬২২, ৬৪৩, ৬৫৭, ৬৬৩, ৬৭২, ৬৭৪, ৭৫২, ৭৬৯-৭৭১, ৭৭৯, ৭৯৬, ৮০৮, ৮১২, ৮১৩, ৮১৯, ৮২৩

দুষ্মন্ত/ দুষ্যন্ত ১৩, ২০, ২৬-৪২, ৯৮, ২৬৪, ২৮০, ৬২৮, ৭৫০

দৃঢ়স্যু ইধ্মবাহ ৭৪৬

দেবব্রত ১১০, ১১২-১১৮

দেবযানী ১, ৩৯, ৪৬-৫৭, ৫৯-৮৩, ৮৫-৯৮, ৭৫৪, ৭৭৪

দেবল ১১৫, ৫৬০

দেবিকা-১ ৫৪০

দেবিকা-২ ১

দ্বারকা ৪১৭, ৪৪৪, ৪৮৪, ৪৯০, ৫৩৭, ৫৫৫, ৫৬০, ৬০৪, ৬০৫, ৬০৯, ৬১০, ৬১২, ৬১৩, ৬১৬-৬২১, ৬২৩, ৬৩৫-৬৪৩, ৬৪৫, ৬৪৬, ৬৪৮, ৬৫৪, ৬৫৭-৬৬৪, ৬৬৭, ৬৭২-৬৭৪, ৬৭৭, ৬৮১-৬৮৩, ৬৮৮, ৬৯৪, ৬৯৮, ৬৯৯, ৭০১, ৭০৪, ৭০৫, ৮০০, ৮০২, ৮০৬

দ্বৈপায়ন *দেখুন* ব্যাসদেব

দ্বৈপায়ন ঋষি *দেখুন* ব্যাসদেব

দ্য ভিন্সি ১৭৮

দ্রুপদ ৪৯, ১৫৮-১৬২, ২০৬, ২২৭, ২৩৮, ২৯৮, ৩০২, ৩০৩, ৩৩২, ৩৯৩, ৪০৯-৪১৮, ৪২৫, ৪২৮-৪৩২, ৪৩৫-৪৩৮, ৪৪০, ৪৪৩, ৪৪৮, ৪৬৭, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৭, ৪৮১, ৪৮৪, ৫১২, ৫২৫, ৫৪০, ৫৫৯, ৫৬৭, ৫৭৫, ৬১৪, ৬২১, ৬২৩, ৮০০

দ্রুহ্য ৯৪, ৭৭৭

দ্রোণ/দ্রোণাচার্য ১১, ২০, ৪৯, ১৫৮, ১৬০, ১৬২, ১৭৮, ১৯৩, ১৯৬, ২০২, ২১১-২১৩, ২১৬, ২১৮-২২০, ২৩৫, ২৩৮, ২৯৩, ৩০৪, ৩১৫, ৩১৭, ৩২৩, ৩৯৩, ৪১৬, ৪১৭, ৪৪০, ৪৫১, ৪৫৪, ৪৫৬, ৪৬১, ৪৬৮-৪৭০, ৫২৫, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৬১, ৭৯৫, ৭৯৬, ৮০২, ৮১৫, ৮১৯

দ্রৌপদী ১০৬, ১৮৫, ১৯১-১৯৭, ২০০-২০৫, ২০৮-২১০, ২১৪, ২২৭, ২২৮, ২৩১, ২৩৩, ২৩৮, ২৪৩, ২৪৬, ২৫০, ২৫১, ২৯৬, ২৯৮-৩০৪, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৯, ৩১৫, ৩১৬, ৩২৩-৩২৮, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৭-৩৪০, ৩৪৩, ৩৪৭, ৩৮২, ৩৯১-৩৯৫, ৪০৫, ৪০৭-৪১৪, ৪১৬-৪৪৩, ৪৪৫-৪৬৫, ৪৬৭-৫৩০, ৫৩২-৫৬২, ৫৬৪, ৫৬৭, ৫৬৯-৫৭১, ৫৭৫, ৫৭৯, ৫৮০, ৫৮২, ৫৮৪, ৫৮৫, ৫৮৮, ৫৯৫-৫৯৯, ৬০২, ৬০৩, ৬০৬, ৬০৯, ৬১৩-৬১৬, ৬১৮-৬২৩, ৬২৫, ৬২৮-৬৩২, ৬৪৭, ৬৫৫, ৬৫৮, ৬৯১, ৭০২-৭০৬, ৭০৯-৭১৪, ৭১৬-৭৬১, ৭৬৬, ৭৭২, ৭৮২, ৭৮৬, ৭৮৮-৭৯২, ৭৯৬,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭৯৭, ৭৯৯, ৮০১, ৮০৩, ৮০৫, ৮০৭-৮০৯, ৮১৭, ৮১৮, ৮২২

ধনঞ্জয় ৭৮৮, ৭৮৯
ধর্ম ১৬৬, ২৮৪-২৮৬, ২৯২, ৩৬০, ৪২৫, ৫৭৩
ধর্মরাজ দেখুন ধর্ম
ধর্মরাজ দেখুন যুধিষ্ঠির
ধর্মসূরি ৬৮৮
ধৃতরাষ্ট্র ১১, ৯১, ১৩০-১৩৪, ১৩৭, ১৬৮-১৮১, ১৮৫-২০৪, ২০৬-২১৩, ২১৫, ২১৬, ২২০-২২৩, ২২৬-২২৮, ২৩০, ২৩৪-২৩৬, ২৪১, ২৪৩-২৪৭, ২৫২, ২৫৪, ২৫৫, ২৭৭, ২৭৯, ২৮০, ২৮৭, ২৯২, ২৯৩, ২৯৫, ৩০৩, ৩১৭, ৩২০, ৩২৫-৩২৯, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৫-৩৩৮, ৩৪০, ৩৪২-৩৪৯, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬৯, ৩৭০, ৪০৭, ৪১০, ৪৩৭, ৪৪০, ৪৪৮-৪৫১, ৪৫৩-৪৫৬, ৪৫৮, ৪৬৬, ৪৭৩-৪৭৫, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৮, ৪৯৬, ৫২৪, ৫৩০-৫৩২, ৫৩৪, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৪১, ৫৪৩, ৫৬১, ৫৬৫, ৫৬৭, ৫৭২, ৫৭৪, ৫৯৭, ৫৯৮, ৬৩১, ৬৩২, ৬৪৫, ৭০৪, ৭০৫, ৮০২, ৮০৩, ৮২২
ধৃষ্টদ্যুম্ন ৪৯, ১৫৯, ১৬২, ২১৯, ২২৭, ২৯৮, ৩০২, ৪০৯, ৪১২-৪১৫, ৪১৭, ৪১৮, ৪২৮-৪৩০, ৪৩২, ৪৭৭, ৪৮৫, ৪৯০, ৪৯৩, ৫২৫, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৬০, ৮০০
ধৌম্য ৩৯৮, ৪১৭, ৪৯৯, ৫৪৭

নকুল ২৯৬, ২৯৯-৩০১, ৩০৬, ৩৩২, ৩৫০, ৩৬১, ৩৬৪, ৪২৫, ৪৩৯-৪৪১, ৪৪৪, ৪৪৬, ৪৬৯, ৪৭১, ৪৭৪, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৯-৪৮১, ৪৯৩, ৪৯৯, ৫০৪, ৫১১-৫১৩, ৫১৫, ৫২২-৫২৪, ৫২৮, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৪৭, ৫৫০, ৫৫৬, ৫৬১, ৫৮৫, ৬২০, ৬৩০, ৭০৫, ৭৮১, ৭৮২, ৭৮৬, ৭৮৭
নগ্নজিত ৬৪৪
নদী / নদ
অশ্ব ২৭১, ৩৪১
গঙ্গা ৯৯, ১১০, ১১২, ১৪২, ১৫৫, ২২৮, ২৯২, ৩১৮, ৩২৫, ৩৩৬, ৩৪৮, ৩৭০, ৩৭৪, ৪৮৮, ৫৬৪-৫৬৬, ৫৮৩, ৫৯৪, ৫৯৯, ৬০০, ৮২৩
গোমতী ৫০৯
জাহ্নবী ১৫৫
দৃষদ্বতী ১৬৭, ৭০৮
নর্মদা ৬৩৭
বিপাশা ৭০৮
ভাগীরথী ৩৪১, ৫৬৪
যমুনা ৯৯-১০১, ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১১০, ১১২, ১৪২, ১৫৭, ৩৩৮, ৪৪৭, ৪৪৮, ৫৪১, ৫৫৯, ৬২০, ৬২১, ৬৪৩
রাভী ৭০৮
শতদ্রু নদ ৭০৮
সরস্বতী ১৬৭, ৬০৪, ৭০৮
সিন্ধু ১৬৭
নন্দ ২৫৩, ৬০৬
নন্দনকানন ৬৫৫, ৬৯৭-৬৯৯
নর ৮
নর-নারায়ণ ৭
নরকাসুর ৬৪২, ৬৮৮, ৬৯৭-৬৯৯
নল ৫২২, ৬৫২
নহুষ ১৩, ৩০৬-৩০৮, ৭৫৪
নাগলোক ২৯২
নাগসাহ্বয় ৫৬৫
নাগ্নজিতী ৬৪৩, ৬৪৪ দেখুন সত্যা
নারদ ১৫, ২১, ১৫৭, ১৬০, ২৪৭, ২৭৭, ২৭৮, ৩২৫, ৩৪৪-৩৪৬, ৩৪৮, ৪৩৫, ৪৪০, ৪৪৮, ৫৪৭, ৫৫৩, ৫৬০, ৫৬৪, ৬০৩, ৬৪৪, ৬৫৫, ৬৮৬-৬৯১, ৬৯৬, ৬৯৭, ৭৫২, ৭৬৯, ৭৭০
নারায়ণ ২৬৫, ৫৬৮, ৬৪৭
নারায়ণ ঋষি ৮
নারায়ণ-বিষ্ণু দেখুন বিষ্ণু-নারায়ণ
নিউ ইয়র্ক ৪০৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিউইয়র্ক টাইমস ৩৭৭
নিমি ৮২
নীলকণ্ঠ, টীকাকার ৯২, ১৭২, ২৫৩, ৩৪০, ৪২৭, ৪২৮, ৪৪১, ৩৫২, ৫০৩, ৫০৮, ৫০৯, ৫১৫, ৫৩১, ৫৬২, ৫৭৬, ৫৭৯, ৭১১, ৭৯২
নৈষধ *দেখুন* নৈষধচরিত

পঞ্চানন তর্করত্ন ১২
পঞ্চাল/পাঞ্চাল ১০৬, ১৬০, ২৯৮, ২৯৯, ৩৪৭, ৩৭৪, ৩৮৯, ৪১১, ৪১৬, ৪১৮, ৪৩২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৫৫৮, ৫৫৯
পঞ্চাল নগর ১৬০, ৪১৯
পঞ্জাব ৩৫১, ৩৫৪, ৩৫৭
পদ্মগন্ধা ১২৩
পরশুরাম-১ ১৩৯, ১৫০-১৫৫, ১৫৯, ৫২৮, ৫৬০
পরশুরাম-২ ৩৯৫
পরাশর ১০১-১০৫, ১০৭-১১০, ১১৬, ১২৩, ১২৬, ১৩১, ১৩৪, ১৩৫, ৪০৭, ৪৩৩, ৭৬১, ৭৭২
পরীক্ষিৎ/ পরিক্ষিৎ ৫২৪, ৫৯৯, ৬২৯, ৬৩২, ৮১০, ৮২১, ৮২৩
পর্বত/ পাহাড়
আরাবল্লী পাহাড় ১৪২
উদবন্ত পর্বত ৬০৪
ঋক্ষবান পর্বত ৬৬৫
ঋষভ পর্বত ৭৭৮, ৭৭৯
কৈলাস পর্বত ৫২৩
গন্ধমাদন পর্বত ৭, ৪৮১, ৪৮২
বিন্ধ্য পর্বত ৬৩৭, ৬৬৫
মণি পর্বত ৬৪২, ৬৯৮
মহেন্দ্র পর্বত ১৫১
রৈবতক পর্বত ৪৪৪, ৬০৪, ৬০৫, ৬০৯, ৬১০, ৬১৫, ৬১৯, ৬৮৮, ৬৮৯
শতশৃঙ্গ পর্বত ২৮৫, ৩০৪, ৩৩১, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৫৬, ৩৬২, ৪৩৬
হিমালয় পর্বত ১৭৮, ১৮৬, ৪৮১, ৪৯০, ৫২৮, ৫৪৭
পল শিহান ৪, ৫
পশুপতি ৭৮৬
পাকিস্তান ১৬৭
'পাঞ্চজন্য' ৫৫৮
পাঞ্চালী *দেখুন* দ্রৌপদী
পাণিনি ৬৭৯
পাণ্ডু ১১, ১২৯-১৩৪, ১৭৪, ১৭৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৯৮, ২০৪, ২২১, ২৫২, ২৫৫, ২৭৫, ২৭৬-২৯২, ২৯৯, ৩০৩-৩০৫, ৩২৩, ৩২৭, ৩৩২, ৩৩৫, ৩৪৭, ৩৪৯-৩৫২, ৩৫৪-৩৭০, ৪০৭, ৪৩০, ৪৯৩, ৫২৫, ৫৭৩, ৭৫৯
পাণ্ড্য ৬৪৬
পারস্য ১৬৭
পার্বতী ৪১২, ৬২০, ৬৯৩, ৭৮৬
পিটার ব্রুক ৬৫৫
পুণে ৪৬৪
পুণ্যক ব্রত ৬৫৪
পুণ্ড্র ৪১৩
পুরন্দর ২৮
পুরাণ
খিলহরিবংশ ৬১৭
গরুড় পুরাণ ১২
দেবীভাগবত পুরাণ ১৪, ১৫
পদ্মপুরাণ ৪২, ৪৩
বায়ু পুরাণ ১০৬, ১৩৮
বিষ্ণুপুরাণ ১৩, ১৬, ২৭, ৬৩৭-৬৩৯, ৬৪১, ৬৫৯-৬৬২, ৬৬৪, ৬৬৬, ৬৬৯, ৬৭০, ৬৭৩, ৬৭৫, ৬৭৮, ৬৮০, ৬৮৪-৬৮৬, ৬৯৭, ৬৯৯, ৭০১, ৭২৮
ব্রহ্মপুরাণ ৬৬৬
ভাগবত পুরাণ ৩৬৭, ৬৩৭-৬৩৯, ৬৪১, ৬৪৪, ৬৫১, ৬৮১
মৎস্যপুরাণ ১৪, ১৫, ২৭, ১৩৮
শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ ১৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরিবংশ পুরাণ ২৭, ৪০, ২৭৫, ৪১৭, ৬০৬, ৬৩৭-৬৩৯, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৪, ৬৫৯-৬৬১, ৬৬৩, ৬৬৬, ৬৭০, ৬৭২, ৬৭৩, ৬৭৫, ৬৭৮, ৬৮০, ৬৮৫, ৬৮৬, ৬৯১, ৬৯২, ৬৯৭, ৬৯৯
পুরী ৬৯৩, ৬৯৪
পুরু ১৩, ৩৯, ৪০, ৯৪, ৯৭, ৯৮, ৭৫৪, ৭৬৮, ৭৭৩, ৭৭৪, ৭৭৭
পুরুরবা ৯, ১৩-২০, ২৩, ৬২০
পুলস্ত্য ১০৩
পুলহ ১০৩
পুষ্কর তীর্থ ৬১৩
পূর্বচিত্তি ৭
পৃথা ২৫৭, ২৬১, ২৬২, ৩৫৬
পেশাওয়ার ১৬৭
প্রতর্দন ১৩৭, ৭৬৮, ৭৭৫
প্রাতিকামী ১৯১, ৪৫২-৪৫৪, ৪৭৭, ৫৪৫
প্রতিবিন্ধ্য ৪৪৬, ৪৭৪, ৪৯৬
'প্রতিষ্ঠান' ৯
প্রতিষ্ঠান ১৩
প্রতিষ্ঠানপুর ১৩, ১৭, ৯৮
প্রদীপ ভট্টাচার্য ৪৬৫
প্রদ্যুম্ন ৩০৯, ৬৪৫, ৬৪৮, ৬৪৯, ৬৮৭, ৬৮৯
প্রভঞ্জন ৫৮৪
প্রভাস তীর্থ ৬০৪
প্রমদ্বরা ২০
প্রয়াগ ৭৬৮
প্রসেন ৬৫৭, ৬৫৮, ৬৬০, ৬৬১, ৬৬৪, ৬৬৫, ৬৬৭, ৬৭৪
প্রসেনজিৎ *দেখুন* প্রসেন
প্রহ্লাদ ৪৯৩, ৫৪৫, ৫৪৬
প্রাইমোরাট্জ্ ৭৬৬
প্রাগজ্যোতিষপুর ৬৪২, ৬৮৮, ৬৯৭

ফ্রয়েড ২৫০, ৬৪৯
ফ্রান্সেস্কা অর্সিনি ৭৩০

বংশ
অন্ধকবংশ ৬৩৫, ৬৫৮, ৬৮১
ইক্ষ্বাকুবংশ ৭৫৬, ৭৬৩
কুকুরবংশ ৬৩৫
কুরুবংশ ১১৯, ১২১, ১২২, ১২৯, ১৩০, ১৩৩, ১৩৭, ১৬৫, ১৭১, ১৭৫, ১৮০, ২৭৮, ২৭৯, ২৮৫, ২৯৭, ২৯৯, ৩২২, ৩৩৫, ৩৮৯,৪৬৯, ৫০০, ৫৬৫, ৫৮৬, ৮১৮, ৮২১
কুরুভরতবংশ ১৩৬, ১৬৮
কুরু-পাণ্ডববংশ ৩৪১
কৌরববংশ *দেখুন* কৌরব-পাণ্ডব বংশ
কৌরব-পাণ্ডব বংশ ৯, ১১, ৯৯
চন্দ্রবংশ ১২, ১৩, ৭২৯
তুর্বসুবংশ ৩৩, ৪০
নাগবংশ ৫৭৮
পাণ্ডব বংশ ২২৭, ৮০৯
পাণ্ডব-কুরুবংশ ৮১০
পাণ্ডব-কৌরববংশ *দেখুন* কৌরব-পাণ্ডব বংশ
পুরুবংশ *দেখুন* ভরতবংশ
পুরু-ভরতবংশ *দেখুন* ভরতবংশ
পুরু-ভরত-কুরুবংশ *দেখুন* ভরতবংশ
পৌরববংশ *দেখুন* ভরতবংশ
বসুবংশ ১০৭
বৃষ্ণিবংশ ৩১৫, ৬২৪, ৬৩৫, ৮২০
ভজমান বংশ ৬৭১
ভরতকুরু বংশ *দেখুন* কুরু-ভরতবংশ
ভরতবংশ ৩, ১১, ১২, ২১, ২৩-২৫, ৩৯-৪১, ৪৩, ৭০, ১১০, ১১৭-১১৯, ১২২, ১২৪, ১২৫, ১২৮, ১২৯, ১৩৩, ১৩৯, ১৬৬, ১৬৮, ১৬৯, ২৭৫-২৭৭, ২৮০, ৩০২, ৩৫২, ৪৬৬, ৫৮৬, ৬৩১, ৮২২
ভোজবংশ ২৫৬, ২৭৪, ৬৩৫
যদুবংশ ২৫৬, ৬৩৫, ৬৪১, ৬৭১
যাদব-বৃষ্ণিবংশ ২৪২
শূর বংশ ২৬১

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূর্যবংশ ১০১, ৭৬৩
সৃঞ্জয় বংশ ১৫৯
বক-যক্ষ ৫৪৯, ৫৫০
বক রাক্ষস ২৯৭, ৩০৬, ৩৭৫, ৪১০, ৪৮৮
বঙ্কিম/ বঙ্কিমচন্দ্র ২৫১, ৬৪৩, ৬৬৮, ৬৬৯
বঙ্গ ৪১৩, ৫৭২, ৫৮৩
বজ্র ৬৩২
বদরিকাশ্রম ১২৫, ১৩৫
বদায়ুন ৩৭৫
বন
কাম্যক বন ৪৮২, ৪৮৪, ৪৯৭, ৫২২, ৫৩২, ৫৫৫
খাণ্ডববন ৪৪৮, ৫৪১
চৈত্ররথের বন ১৬
দণ্ডকবন ৪৭৭
দ্বৈতবন ৪৭৯, ৪৮৪, ৪৯০, ৪৯৬, ৫২০, ৫৪৫
নৈমিষারণ্য ৭৭৪
হিড়িম্বক বন ৩৯০
বভ্রুবাহন ৫৮৫-৫৮৭, ৫৮৯-৫৯২, ৫৯৪-৫৯৭, ৫৯৯
বরুণ ২৭২
বলরাম ৩০৯, ৩২০, ৪১৮, ৪২৬, ৪২৯, ৪৪৪, ৫৫৯, ৬০১, ৬০২, ৬০৪, ৬০৬, ৬০৮, ৬১১-৬১৩, ৬১৬-৬১৯, ৬২১, ৬৩২, ৬৪১, ৬৫৭, ৬৬৭, ৬৭৪-৬৭৭, ৬৮১-৬৮৫, ৬৮৭, ৭০৫, ৮০০
বল্লব ৫০৮, ৭১৯, ৭২১, ৭২২
বশিষ্ঠ ২০, ২১, ৮২, ১০১, ১০২, ১৭৮, ১৮৪, ৭৬২
বসু ৫৯৪, ৫৯৮
বসুদেব ২৫৩, ২৫৫-২৫৭, ২৬০, ২৭৪, ২৭৬, ৬০২, ৬০৬-৬০৯, ৬১৮, ৬৩৬
বসুমনা ৭৬৩, ৭৬৮, ৭৭৪, ৭৭৫
বসুমান দেখুন বসুমনা
বাতাপি ৭৩৮, ৭৪৫
বায়ু ২৮৫, ২৮৬, ২৯২, ৩৬০, ৪০২, ৪২৫, ৫৭৩, ৭০০, ৭৩৪
বারণাবত ১৮৯, ১৯০, ২০৪, ২৯৫, ৩০৩, ৩১৩, ৩৩১, ৩৩২, ৩৭৪, ৪১০, ৪১৪, ৪১৬, ৪১৭, ৪৩১, ৪৩৬, ৪৮৮, ৫৫৯, ৬৭২-৬৭৪, ৬৮৮, ৭০৪
বারাণসী ৪৩, ১৩৭, ৬৩৬
বাল্মীকি ২৬১, ৪৯৯
বাসবী ১০৩-১০৫, ১০৭
বাসুকি ৫৬৬
বাসুদেব দেখুন কৃষ্ণ
বাহাদুর সিং ৩৭৪
বিকর্ণ ১৯১, ২৩৮, ৪৬১-৪৬৩, ৪৬৬, ৪৬৮
বিক্রমাদিত্য ৩
বিচিত্রবীর্য ৯১, ১১৮-১২০, ১২১, ১২৩, ১২৪, ১২৬-১২৯, ১৩৪, ১৩৬-১৩৮, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৭, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৬, ১৬৮, ১৬৯, ২৫২, ২৭৬, ২৭৮, ২৮০, ২৮১, ২৮৯, ৩৫১, ৪০৭, ৮০৬
বিডন স্ট্রীট ১
বিদর্ভ ৪১৩, ৬৩৭-৬৩৯, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৫, ৭৩৯
বিদুর ৯১, ১২৯, ১৬৬, ১৬৮, ১৭৪, ১৭৮-১৮০, ১৮৬, ১৮৮, ১৮৯, ১৯২-১৯৪, ১৯৭, ১৯৮, ২০০, ২০২, ২০৪, ২০৭, ২০৯-২১৩, ২১৫, ২১৬, ২১৮, ২২০-২২২, ২২৭, ২৩৯, ২৪৫, ২৫২, ২৭৪, ২৭৬, ২৭৭, ২৯২-২৯৬, ৩০৩, ৩০৫-৩০৭, ৩১৭, ৩৩০, ৩৩২, ৩৪৭, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭৪, ৪১৮, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৪০, ৪৪৯-৪৫৪, ৪৫৬, ৪৬১, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৮-৪৭০, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৮৩, ৫২৮, ৫৩৭, ৫৫৯, ৬২১
বিদুলা ৩১২-৩১৫, ৩২৩, ৩২৬, ৩৩৩, ৩৩৭
বিদ্যাসাগর ১, ২৫১, ২৮৬, ৫৭২
বিদ্যুন্মালা ৭
বিবিংশতি ২৩৮
বিভাবসু ১৭

বিভীষণ ৩৭৫
বিরাট ২৩৮, ৪১৩, ৪৭৯, ৪৯৫, ৫০২-৫০৭, ৫১০-৫১৪, ৫১৬-৫১৮, ৫২৩, ৫২৪, ৫৪১, ৫৬১, ৬২১, ৬২২, ৬২৮, ৭০৫, ৭০৮-৭১০, ৭১৭, ৭১৯, ৭২১, ৭২৩, ৭২৪, ৭৮১-৭৮৬, ৭৮৮, ৭৮৯, ৭৯৭-৮০১, ৮০৩, ৮১০, ৮২২
বিরাট নগর ৩১৫, ৭১৭, ৮০৯
বিরাট রাজ্য ২০৬, ৭০৮, ৭০৯, ৭১৩, ৭৮৬, ৮০৪, ৮০৬, ৮১৬
বিষ্ণু ১৪, ৩৬০, ৪০১, ৪০৪, ৭৫৪, ৭৭৯
বিষ্ণু-নারায়ণ ২৬৫, ৬৬৭
বিশাখা ৬৯৪
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (টীকাকার) ৬৫২
বিশ্বাচী ৭, ২০
বিশ্বামিত্র ৩১, ৩২, ৩৫, ৩৮, ১০১, ৭৫২-৭৫৫, ৭৬৭-৭৭০, ৭৭৫, ৭৭৮
বিষ্বকসেন ১৩৮
বীতহব্য (বীতিহোত্র) ১৩৭
বীরবল ৭৩০, ৭৩১
বুদ্ধ ৭৭৮
বুদ্ধদেব বসু ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪২, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৪৭, ৫৪৯
বুধ ১৩
বৃত্র ৭০১
বৃন্দাবন ২৫৩, ৬০৬, ৬৩৪, ৬৫১, ৬৬০, ৬৬৩, ৬৯৪, ৭০৬
বৃষপর্বা ৪৭, ৪৮, ৬৭, ৬৮, ৭১, ৭২, ৭৪-৭৯, ৮৩, ৮৬, ৮৮, ৮৯
বৃষ্ণি ৬৫৭
বৃহন্নলা ৫১৮, ৫১৯, ৫৪২, ৭৮২, ৭৮৪, ৭৮৯-৭৯৫
বৃহস্পতি ১২, ১৩, ৪৭-৪৯, ৫১, ৫৪, ৫৭, ৬০, ৬১, ৬৬, ৬৭, ৭১, ১২১, ৪৯৪, ৭২৮, ৭২৯, ৭৩১-৭৩৩
বেদব্যাস *দেখুন* ব্যাসদেব
বেনারস *দেখুন* বারাণসী
বেরিলি ৩৭৫
বৈজয়ন্ত প্রসাদ ১৭, ২১
বৈশম্পায়ন ১৭৩, ১৮৫, ৪৬৭, ৫২২, ৭৭৫
বৈশালী ১৩৮
বোধিসত্ত্ব ৪৩
ব্যাকট্রিয়া ৩৫৪
ব্যাস *দেখুন* ব্যাসদেব
ব্যাসদেব ৬, ১১, ২৮, ৩০-৩৭, ১০৫, ১০৮, ১০৯, ১২৩-১২৭, ১৩১-১৩৩, ১৩৫, ১৫৭, ১৬৫, ১৬৮, ১৭০, ১৭১, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬-১৭৮, ১৮১-১৮৫, ১৮৮, ১৮৯, ১৯১, ১৯২, ২০২, ২০৩, ২০৯, ২১০, ২২৬-২২৯, ২৩৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৫২, ২৬৩, ২৭০, ২৭৬, ২৭৭-২৭৯, ২৮১, ২৯৯, ৩০১, ৩০২, ৩২২, ৩২৪, ৩৩৫-৩৩৮, ৩৪০-৩৪২, ৪০৭, ৪০৮, ৪১০, ৪১১, ৪১৪, ৪১৭-৪১৯, ৪২৩-৪২৫, ৪৩২-৪৩৪, ৪৪১, ৪৪৩, ৪৭২, ৪৮২, ৪৮৪, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৫, ৪৯৯, ৫০১, ৫০৮, ৫০৯, ৫১৫, ৫২০, ৫২১, ৫২৩, ৫৩৯, ৫৪৮, ৫৫০, ৫৬১, ৫৯৯, ৬০২, ৬০৭, ৬০৯, ৬১০, ৬১৯, ৬৩১, ৬৩৮, ৭১৩, ৭৩৩, ৭৯২-৭৯৫, ৮০১, ৮০২, ৮০৪, ৮০৯, ৮২০, ৮২২, ৮২৩
ব্যুষিতাশ্ব ২৮৩, ৩৫৪
ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় ৭৬৯, ৭৭২
ব্রজপুর ৬৯৪
ব্রধ্নশ্ব ৭৪৫
ব্রহ্মদত্ত ৪৩, ১৩৮
ব্রহ্মর্ষি দেশ ৭০৮
ব্রহ্মা ১, ২, ৬, ১২-১৪, ৩২০, ৩৫৩, ৩৬০, ৪০৪, ৭৩২, ৭৩৩, ৭৭৯

ভজমান ৬৭১
ভট্টনারায়ণ ৪০৮
ভট্টি ২৯
ভদ্রা-১ ২৮৩
ভদ্রা-২ *দেখুন* রোহিণী-২
ভবভূতি ১৮৪, ২৪৯
ভবানী মন্দির ৬৪১

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভরত' ৫৭৪
ভরত ২০, ২৭, ৪১-৪৩, ৯৮, ২৮০
ভরত মুনি ১, ২, ১৫, ১৯, ৩৩৬, ৭৪৩
ভল্লাট ১৩৮
ভানুমতী ৪০৭, ৪০৮
'ভারত' ৫৭৪
ভারবি ৪৯১-৪৯৩
ভার্গব ৪৩০
ভাস ৩৯৫-৩৯৭, ৩৯৯-৪০১, ৪০৩-৪০৫
ভীম ১১, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৭, ২০৩-২০৫, ২০৭-২০৯, ২২২-২২৪, ২২৮-২৩২, ২৩৮, ২৪২, ২৪৩, ২৮৫, ২৯২, ২৯৪-৩০১, ৩০৬-৩০৯, ৩১১, ৩১৩-৩১৭, ৩২৮, ৩৩১-৩৩৩, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৫৭, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৮, ৩৮০-৩৮৮, ৩৯০-৩৯৩, ৩৯৫, ৩৯৭, ৩৯৮, ৪০০-৪০৫, ৪১৯, ৪২০, ৪২৬, ৪৩৪, ৪৩৯, ৪৪৪-৪৪৬, ৪৪৮, ৪৫০, ৪৫৯-৪৬২, ৪৬৬, ৪৬৯-৪৮৪, ৪৮৬, ৪৮৮, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৮, ৫০০-৫০২, ৫০৪, ৫০৬-৫১১, ৫১৩-৫১৮, ৫২০, ৫২২-৫২৮, ৫৩০-৫৩৪, ৫৩৬-৫৪১, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৪৭-৫৫১, ৫৫৩, ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৫৯, ৫৬০, ৫৬২, ৫৮৫, ৬০১, ৬২০, ৬২২, ৬২৫, ৬২৯, ৬৩০, ৬৩৪, ৭০৯, ৭১৯-৭২৩, ৭৮১, ৭৮২, ৭৮৬-৭৮৯, ৭৯৬, ৮০৪, ৮০৫, ৮০৭, ৮১৯
ভীমসেন দেখুন ভীম
ভীষ্ম ৬, ১০৫, ১১৬, ১১৮-১২২, ১২৪, ১২৫, ১২৮, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬-১৪১, ১৪৩-১৪৯, ১৫১-১৫৮, ১৬০-১৬৩, ১৬৮, ১৬৯, ১৭১-১৭৩, ১৭৮, ১৭৯, ১৮৬, ১৯৩, ২০২, ২০৬, ২০৭, ২১১, ২১২, ২১৬, ২১৮-২২২, ২৩৫, ২৩৮, ২৩৯, ২৫২, ২৭৪-২৮০, ২৯৩, ৩০৪, ৩১৫, ৩১৭, ৩২২, ৩২৩, ৩৫০-৩৫৪, ৩৬৯, ৩৭০, ৪০৯, ৪১৬, ৪১৭, ৪৪০, ৪৫১, ৪৫৪, ৪৫৬-৪৫৮, ৪৬১, ৪৬৮-৪৭০, ৪৮৫, ৫২৫, ৫২৮, ৫৩২, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৪২, ৫৪৪, ৫৬১, ৫৯৪, ৫৯৮, ৬৮৬, ৭৫৮, ৭৫৯, ৭৯৫, ৮০২, ৮০৬, ৮০৮, ৮১২, ৮১৭
ভীষ্মক ৪১৪, ৪৮৮, ৬১৭, ৬৩৭-৬৩৯, ৬৪৫, ৬৪৬
ভূরিশ্রবা ২৩৮, ৮১৩, ৮১৪
ভৃগু ৪৮
ভোজরাজ্য ৭৬৬

মগধ ৯৯, ৬৩৫, ৬৩৬, ৬৩৮
মঞ্জুঘোষা ২, ৩
মণিপুর ৫৮৩, ৫৮৫, ৫৮৭, ৫৮৯, ৫৯২, ৫৯৯, ৬০০
'মৎস্য' ১০৫, ১০৬
মৎস্য দেশ ১০০, ১০৬, ১৪২, ৭০৮, ৭৮১, ৭৮৩, ৮০১
মৎস্যগন্ধা ১০৪-১০৯
মথুরা ১৬৭, ২১২, ২৫৬, ২৭৫, ৬০৬, ৬০৯, ৬১৭, ৬৩৪, ৬৩৬-৬৩৯, ৬৫৭-৬৬০, ৬৬৩, ৮২০
মথুরা-শূরসেন ১০০
মদনদেব ৬৯৩
মদ্র দেশ ১০৬, ২৭৬, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৪, ৭৫৯
মদ্র নগরী ২৭৯
মনু ১৩, ৪৬, ৭৩, ৭৪, ৯৩, ২৫৮, ৩৭৩, ৭৪৯, ৭৫০, ৭৫৭, ৭৬৫
মন্মটাচার্য ৮১৪
মন্ত্র/ বিদ্যা
দেবসঙ্গম মন্ত্র ৩৫৯, ৩৬০
দেব-সঙ্গমনী মন্ত্র দেখুন দেবসঙ্গম মন্ত্র
প্রতিস্মৃতি বিদ্যা ৫২০, ৫৮১
বশীকরণ মন্ত্র ২৮৪
সঞ্জীবন/ সঞ্জীবনী মন্ত্র ৪৭-৪৯, ৫২-৫৫, ৫৭-৫৯, ৬৩, ৭০-৭২, ৮৯
মন্দোদরী ২৫০, ৩২৭, ৩৩৯
ময়দানব ৫৪১
মরুত্ত ৩৩, ৪০

'মর্নিং হেরাল্ড' ৪
মল্লিকা ৬৫৫, ৬৫৬
মহাদেব ২১, ১৫৭-১৬২, ৭৭৯
মহাশ্বেতা ৬২০
মহেশ্বর ৩৬০, ৭৭৯
মাইকেল মধুসূদন ১
মাণ্ডব্য ১৮৯, ১৯০
মাদ্রী-১ ২৪, ১০৬, ১৩০, ১৩১, ১৮২, ১৮৬, ১৮৭, ২৫৭, ২৭৬, ২৭৯-২৮২, ২৮৭-২৯২, ২৯৬, ৩০৪, ৩৪৩, ৩৫০, ৩৫৪-৩৭০, ৪২৫, ৪৭৮, ৭৫৯
মাদ্রী-২ ৬৫৭
মাধবী ৭৫২,৭৫৫-৭৫৮, ৭৬০-৭৭৯
মানসসরোবর ১৬
মানালি ৩৭৪, ৩৮৯
মান্ধাতা ৪০, ৩০৬
'মাবেল্ল' ১০৬
মামুদ ৬০৪
মালিনী ২৯, ৩১, ৩২, ৭০৯, ৭১২
মিত্রবিন্দা ৬৪৩, ৬৪৪
মিত্রাবরুণ ৯, ১৩-১৫, ৩৬১
মিথিলা ১৩৭, ৬৭৬, ৬৭৭, ৬৮১
মিরাট ৯৯
মুচুকুন্দ ৩১২
মেগাস্থিনিস ৬৫৭
মেঘদূত ২৬
মেনকা ২-৭, ১৫, ২০-২৩, ৩১, ৩২, ৩৫, ৩৮, ৩৯, ৫০৪
মেরিডিথ শিভার্‌স্‌ ৩৭৭, ৩৭৮
মেহেন্‌ড্‌লে ৪৬৪
মৈত্রাবরুণ দেখুন মিত্রাবরুণ
ম্যাক্স হ্বেবার ৮৫

যজ্ঞ
অগ্নিহোত্র যজ্ঞ ১২
অশ্বমেধ যজ্ঞ ১৩৭, ৫৭৫, ৫৮৭, ৫৯৫-৫৯৭, ৬২৯, ৮১৭
পুণ্ডরীক যজ্ঞ ৪৯৩
রাক্ষসমেধ যজ্ঞ ১০৩
রাজসূয় যজ্ঞ ১২, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯৪,৪৪৮, ৪৯২, ৪৯৩, ৫০৩, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৫৭, ৫৮৫, ৫৮৬, ৬১৮, ৬২১, ৬৩৬, ৬৬১, ৭২৮
শতকুম্ভ যজ্ঞ ৩৯৮
যতীন্দ্রনাথ বাগচী ৪৩৯
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৯
যদু ৩৯, ৯৪, ৬৫৭, ৭৫৪, ৭৬৮, ৭৭৪, ৭৭৭
যম ৪০২, ৪৯৩
যযাতি ১৩, ৩২, ৩৩, ৩৯, ৪০, ৭০-৭২, ৭৮-৮৬, ৮৮, ৯০-৯৭, ১৮৫, ৩০৬, ৬৫৭, ৭৫৪-৭৫৮, ৭৬১, ৭৬২, ৭৬৮-৭৭৯
যাজ্ঞবল্ক্য ৪৬
যাজ্ঞসেনী ৪৫৫
যাস্ক ৬৭৯, ৬৮০, ৬৮৫
যুধিষ্ঠির ৬, ১৩০, ১৩২, ১৩৭, ১৬৬, ১৭৫, ১৭৮, ১৭৯, ১৮৫, ১৯১, ১৯৪, ১৯৭, ১৯৮, ২০৪, ২০৬, ২০৮-২১০, ২১২, ২১৯-২২১, ২২৩-২২৬, ২২৮-২৩০, ২৩২, ২৩৩, ২৩৭, ২৪২-২৪৫, ২৪৭, ২৭৫, ২৮০, ২৮৫, ২৯২, ২৯৫-৩০৩, ৩০৬-৩০৮, ৩১১-৩১৫, ৩১৭, ৩২১-৩৩০, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৪১-৩৪৯, ৩৫৭, ৩৭৪, ৩৮৫, ৩৮৭, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯৪, ৩৯৫, ৪০২, ৪০৩, ৪১১, ৪২০-৪২৬, ৪৩০-৪৩৪, ৪৩৬, ৪৩৯-৪৫৬, ৪৫৮-৪৬২, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৯-৪৭১, ৪৭৩-৪৭৬, ৪৭৮-৪৮৩, ৪৮৫, ৪৯০-৪৯৬, ৪৯৮-৫০২, ৫০৪, ৫০৬-৫০৮, ৫১০, ৫১২-৫১৫, ৫২০, ৫২২-৫২৪, ৫২৬, ৫২৮, ৫৩০-৫৩৫, ৫৩৭-৫৫১, ৫৫৫-৫৬২, ৫৬৪, ৫৬৯, ৫৭৪, ৫৮১, ৫৮৫-৫৮৮, ৫৯০, ৫৯৫, ৫৯৮, ৬০১, ৬০৩, ৬০৯, ৬১৩, ৬১৪, ৬১৬-৬১৮, ৬২০, ৬২১, ৬২৩, ৬২৯-৬৩২, ৬৩৪, ৬৩৬, ৬৪৩, ৬৪৫, ৬৪৬, ৬৬১, ৭০৩, ৭০৯, ৭২১, ৭৫৮,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭৮১, ৭৮২, ৭৮৬, ৭৮৭, ৭৯৫- ৭৯৮, ৮০১, ৮০২, ৮০৪, ৮০৫, ৮০৭, ৮১১, ৮১৭, ৮১৯, ৮২২
যুযুৎসু ৯১, ১৮১, ৬৩২
যূপগ্রাম ৪০২
যোগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রী ৬৭৯, ৬৮০
যোগেন্দ্রনাথ বাগচী, মহামহোপাধ্যায় ৩২৭, ৩২৯
যোজনগন্ধা ১০৯, ১১০

রবীন্দ্রনাথ ২৬, ৬০, ৬৩, ৬৫, ২০৪, ২০৫, ৩২৩, ৫৮৩, ৬১৯
রম্ভা ২-৮, ১৫, ২০, ২১, ২৩, ৫০৪
রাইকিশোরী *দেখুন* রাধা-২
রাওয়ালপিণ্ডি ১৬৭
রাজপুতানা ১০৬
রাজলক্ষ্মী ২৪৮, ২৪৯
রাজশেখর বসু ৩৯৫
রাজস্থান ১৪১
রাজাধিদেবী ৬৪৩
রাজীব ভক্ত, অধ্যাপক ৭১১
রাঠোর ১০৬
রাধা-১ ১১, ২৭৭
রাধা-২ ৬৩৪, ৬৩৫, ৬৫১, ৬৬৯, ৬৯৩, ৬৯৪, ৭০৬, ৭৪৩
রাধারানি *দেখুন* রাধা-২
রাফায়েল ৪৬
রাবণ ৩৭৫, ৪৭৭, ৫২৯
রাম *দেখুন* রামচন্দ্র
রামকৃষ্ণ ১৮৪
রামচন্দ্র ১৮৪, ২৬১, ৪০৬, ৪৫১, ৪৭৭, ৪৭৮, ৫২৮, ৫২৯, ৬৩৪, ৬৪২, ৬৫৫, ৬৬৫, ৭৬৫
রামায়ণ ৩৭৫, ৩৭৯, ৩৯০, ৪৫১, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৮৪, ৫৮০, ৬৫৫, ৬৬৫, ৬৬৬, ৭২৬, ৭২৭, ৭৭১
রুক্মিণী ৪১৩, ৪১৪, ৬১৭, ৬৩৪, ৬৩৭-৬৫৬, ৬৬১, ৬৬৮, ৬৮৬, ৬৮৮-৬৯০, ৬৯৩-৬৯৭, ৬৯৯, ৭৬৫
রুক্মী ৪১৪, ৬১৭, ৬৩৭, ৬৩৯, ৬৪১, ৬৪২
রুদ্রলোক ৬১২
রুরু ২০
রূপ গোস্বামী ২৭৭, ৬৩৪, ৬৯৩, ৬৯৪, ৭০৬, ৭৪৩
রেণুকা ৫২৮, ৫২৯, ৫৩৩
রেনোয়া ৪৬
রেবতী ৬০৫
রোহিণী-১ ৬০২, ৬০৬
রোহিণী-২ ৬৪৩

লক্ষ্মণ-১ ২৩৭
লক্ষ্মণ–২ ২৬১, ৪৭৭
লক্ষ্মণা ৬৪৩, ৬৪৪
লক্ষ্মী ৪৩৩, ৪৩৬, ৪৫০, ৬৪৭, ৬৫৪, ৭০৫
লঙ্কা ৫২৯
ললিথ ১০৬
ল্যাঠোর *দেখুন* রাঠোর
লাহোর ১৬৭
লোপামুদ্রা ৮২, ৫১৪, ৭৩৪-৭৪৬
লোমশ মুনি ৪৮১

শংকর ৭৩২
শংকরাচার্য ৫১৪
শকার ৭১৬
শকুনি ১৬৬, ১৬৭, ১৭১, ১৮৮, ১৮৯, ১৯২, ১৯৪, ১৯৯, ২০৪, ২১২, ২১৪, ২১৯, ২৩৮, ৩০৩, ৩৪০, ৩৯৫, ৪৩৭, ৪৪৮-৪৫১, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৬২, ৪৬৮, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৮৪, ৫৪৫, ৫৮১, ৮০২
শকুন্তলা ২০, ২৬-৪১, ৪৩, ২৬৪, ৬২০, ৭৩১, ৭৫০
শক্তি ১০১, ১০২
শচী ২৪, ২৫, ২৭৬, ৬৯৮, ৬৯৯-৭০১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শতধন্বা ৬৫৭, ৬৫৮, ৬৬২, ৬৬৩, ৬৭০-৭৬৮, ৬৮১-৬৮৪, ৬৮৬, ৬৮৭, ৬৯১

শতধনু দেখুন শতধন্বা

শতযূপ ২৪৫, ৩৩৭, ৩৩৮

শতানীক ১৩৭, ৪৪৬, ৪৯৬

শত্রুঘ্ন ৬৮১

শম্বর ৭০১

শরৎচন্দ্র ২৪৮

শর্মিষ্ঠা ৩৩, ৩৯, ৬৭-৮০, ৮৮-৯০, ৯৩-৯৫, ৯৭, ৯৮, ৭৫৪, ৭৭৩, ৭৭৪

শল্য ২৩৮, ২৭৬, ৩২৩, ৩৫২-৩৫৪, ৪১৩, ৪১৫, ৭৫৯

শশবিন্দু ৪০

শাণ্ডিলী ৭৭৮, ৭৭৯

শান্তনু ১০৫, ১১০-১১৮, ১২১, ১২২, ১২৫, ১২৮-১৩০, ১৩৩, ১৩৬, ১৬৮, ২৭৬, ২৮০, ৩২২, ৩৩৫, ৪০৭, ৪০৯, ৮০৬

শাম্ব ৬০৫

শারদ্বত ৩৬

শার্ঙ্গরব ৩৬

শাল্ব ১৪২-১৫৪, ১৬৩, ৪৯৬, ৫৬০

শাল্বদেশ ১৪২

শাল্বনগরী ৪৯৭

শাল্বপুর ১৩৮, ১৪১, ১৪৪, ১৪৬, ১৫৩

শিখণ্ডিনী দেখুন শিখণ্ডী

শিখণ্ডী ১৫৭, ১৫৮, ১৬০-১৬৩, ২২৭, ৪১৭, ৫৯৪, ৮০০

শিনি ৬৫৭

শিব ২১, ১৬৮, ১৭৩, ৪১২, ৪২৪, ৪৩২, ৪৩৪, ৫২০, ৫৮১, ৫৮৪, ৭৮৭, ৭৯৫

শিবি ৭৬৭, ৭৬৮, ৭৭৫

শিয়ালকোট ৩৫১

শিশুপাল ৩৪৩, ৪১৩, ৪১৪, ৪৪৮, ৫৮৬, ৬১৭, ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৯-৬৪২, ৬৪৫, ৬৪৬, ৬৫১

শুক্রাচার্য ৩৯, ৪৭-৪৯, ৫১-৬০, ৬২, ৬৩, ৬৫, ৬৭-৭২, ৭৪-৭৭, ৭৯-৮১, ৮৩, ৮৫-৯৩, ৯৬, ৯৭, ১২১, ৭৩২, ৭৭৩

শুনঃশেপ ৩৯৯, ৪০০

শূর দেখুন আর্যক শূর

শূরসেন ৬৫৭

'শূরসেনাই' ৬৫৭

শেক্সপীয়র ১৯

শেষনাগ ৫৬৬

শৈখাবত্য ১৪৯-১৫২, ১৫৯

শৈব্য ৮০০

শৌনক ৯

শ্যামা ১

শ্রুতর্বা ৭৪৪

শ্রাবস্তী ১৩৮

শ্রীকান্ত ২৪৮

শ্রীহরি ৭

শ্রীহর্ষ ২৬১, ৬৫২

শ্রুতকর্মা ৪৪৬, ৪৯৬, ৫২৪

শ্রুতকীর্তি-১ ৬২০, ৬২১

শ্রুতকীর্তি-২ ৬৪৩

শ্রুতশ্রবা ৬১৭, ৬৪১

শ্রুতসেন ৪৪৬, ৪৯৬

সংবর্ত ৪০

সক্রেটিস ৫৩৯

সঞ্জয়-১ ১৯৬, ২০৬-২১০, ২২২, ২২৭, ২৪৫, ৩৪৪-৩৪৬, ৩৪৮, ৫৬১, ৫৬৭, ৫৭২, ৫৯৮, ৭০৪-৭০৬, ৮০৩

সঞ্জয়-২ ৩১২, ৩১৩

সঞ্জীবন মণি ৫৯১, ৫৯২

সত্যবতী ১১, ১০৫-১১০, ১১৩-১২০, ১২১-১৩১, ১৩৩-১৩৭, ১৪৪, ১৪৬, ১৫৬, ১৬৮, ১৮৭, ১৮৮, ২৭৬-২৮০, ২৯১, ৩২২, ৩৩৫, ৩৪০, ৪০৭-৪০৯, ৪৩৩, ৫২৮, ৭০৭, ৭০৮, ৭৬১, ৭৬৬, ৭৭২, ৮০১, ৮০৬

সত্যভামা ৪০৭, ৫৬১, ৬০৭-৬০৯, ৬৪৩-

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬৪৫, ৬৫০, ৬৫৪, ৬৫৬-৬৫৯, ৬৬১-৬৬৩, ৬৬৮-৬৭৮, ৬৮১-৭০৬, ৭১০
সত্যভামাপুর ৬৯৪
সত্যা ৬৪৩, ৬৪৪
সত্রাজিৎ ৬৫৭-৬৬৪, ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৭০-৬৭৫, ৬৮০, ৬৮১, ৬৮৭, ৬৮৯
সনাতন ৬৯৩
সন্দীপন ৫৫৫
সম্বরণ ২৮০
সম্মতা ৪০
সর্বদমন ৩৬
সহজন্যা ৭
সহদেব ১৯২, ২৪৫, ২৯৬, ২৯৯-৩০১, ৩০৪, ৩০৬-৩০৮, ৩২৮, ৩৩২, ৩৩৮, ৩৪১, ৩৪৩, ৩৪৮, ৩৫০, ৩৬১, ৩৬৪, ৩৯১, ৪১৯, ৪২৫, ৪২৬, ৪৩৯-৪৪১, ৪৪৪, ৪৪৬, ৪৫০, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬৯, ৪৭১, ৪৭৪, ৪৭৬-৪৮১, ৪৯৩, ৪৯৯, ৫০০, ৫০৪, ৫১১-৫১৩, ৫১৫, ৫২২, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৮, ৫৩৪, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৪৭, ৫৫০, ৫৫৬, ৫৬১, ৫৮৫, ৫৯৮, ৬২০, ৬৩০, ৭০৫, ৭৮১, ৭৮২, ৭৮৬, ৭৮৭
সহমরণ ৩৬৬, ৩৬৭
সাইমন দি বিভোয়া ৬৪৯
সাতবাহন হাল ৪৪৫
সাত্যকি ৪১৭, ৪১৮, ৫৫৯, ৬০৫, ৬২৯, ৬৪১, ৬৫৭-৬৬৪, ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৭০-৬৭৫, ৬৮০, ৬৮১, ৬৮৭, ৬৮৯, ৭০৫, ৮১৩, ৮১৭
সাত্বত ৬৮১
সাবিত্রী ৪০৭, ৪৫৩, ৪৯৯, ৫১৪
সায়নাচার্য, টীকাকার ৭৩৪
সারণ ৬০২, ৬০৫, ৬০৬
সিডনি ৪
সিদ্ধান্তবাগীশ দেখুন হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ
সিদ্ধি দেবী ১৬৬
সিন্ধু-সৌবীর ৪৯৬
সিন্ধুদেশ ৩১২
সীতা ২৬১, ৩৭৯, ৩৮০, ৪০৬, ৪০৭, ৪৫১, ৪৫৩, ৪৭৭, ৪৮৪, ৪৯৯, ৫১৪, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩৩, ৬৪২, ৭৬৫
সীতারাম শাস্ত্রী ২৬৫
সুকন্যা ৫১৪
সুকুমার ৬৬৪, ৬৬৬
সুকেশী ২, ৩
সুতসোম ৪৪৬, ৪৯৬
সুদ্যুম্ন ১৩
সুদেষ্ণা ৫০৩-৫০৭, ৫১১, ৫১২, ৫১৪, ৫১৮, ৭০৭-৭২৪, ৮০১
সুধর্মা ৬১০
সুন্দ ৪৪০
সুপর্ণ ৫৭৯
সুবল ১৬৭-১৬৯, ১৭৬
সুভদ্রা ২৪৩, ২৪৬, ৩২৪, ৩৩১, ৩৩৮, ৩৪০, ৩৯১, ৩৯২, ৪০৮, ৪৪৪-৪৪৮, ৫২২, ৫২৪, ৫২৬, ৫২৭, ৫৪০, ৫৪১, ৫৫১, ৫৫৯, ৫৬০, ৫৭৩, ৫৭৫, ৫৮৮, ৫৯৫-৫৯৯, ৬০১, ৬০২, ৬০৫-৬১১, ৬১৩, ৬১৫-৬১৯, ৬২১-৬৩২, ৬৪৩, ৭০৭, ৭৮২, ৭৮৮, ৮০৫-৮০৯, ৮১৭, ৮১৮, ৮২২
সুমিত্র ৬৫৭, ৬৫৮
সুলোচনা ২, ৩
সুশীলা ৫২৮
সূর্য ২৬৫-২৭১, ২৮৬, ৩১৮-৩২০, ৩২৫, ৩২৬, ৩৩৯, ৩৫৬, ৩৬৬, ৩৬৭, ৪০৭, ৪১৩, ৬৫৯, ৬৬৭, ৭৩৪, ৬৭১, ৭৬৬
সৃঞ্জয় ১৫৯
সোম ৭২৮
সোমতীর্থ ৩০
সোমদত্ত ১৯৬
সোমনাথের মন্দির ৬০৪, ৬০৫
সোমেশ্বর ভট্ট ৪৩৩
সৌভ ১৪২
সৌরাষ্ট্র ৬০৪

স্থূণাকর্ণ ১৫৭, ১৬১
স্যমন্তক মণি ৬৫৯-৬৬১, ৬৬৩, ৬৬৪, ৬৬৬-৬৭১, ৬৭৩-৬৭৮, ৬৮০-৬৮৮
স্যমন্তপঞ্চক ৬২৮

হনুমান ৪৮২, ৭৬৫
হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ৬৪, ১০২, ২৭০, ২১৩, ২৯৯, ৩০০, ৪২৭, ৪২৮, ৫৭২-৫৭৯, ৫৯২, ৫৯৩, ৭৯৮
হরিদ্বার *দেখুন* গঙ্গাদ্বার
হরিবংশ ঠাকুর ৬৯০
হর্যশ্ব ৭৫৬, ৭৫৭, ৭৬০, ৭৬২-৭৬৫, ৭৬৭, ৭৭১, ৭৭৪, ৭৭৫
হস্তিনা *দেখুন* হস্তিনাপুর
হস্তিনাপুর ১৩, ৯৭, ৯৯, ১১০-১১২, ১১৬-১২০, ১২৬-১২৯, ১৩৪-১৩৮, ১৪১, ১৪৪-১৪৬, ১৪৯, ১৫৩, ১৫৬, ১৬৩, ১৬৮-১৭০, ১৭৯, ১৮০, ১৮৬, ১৮৮, ১৮৯, ১৯২, ২০২-২০৪,২০৬, ২১০,২১৪, ২১৬, ২২০, ২২১, ২২৬, ২২৭, ২৫৫, ২৭৮, ২৮২, ২৯১, ২৯৫, ৩০৩, ৩০৪, ৩১০, ৩২৮, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৪, ৩৪৭, ৩৪৯-৩৫২, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৬৯, ৩৯০, ৪১৬, ৪১৭, ৪৩৫-৪৩৭, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪৯, ৪৮৩, ৫৫০, ৫৫৯, ৫৬৫, ৫৮২, ৫৮৯, ৫৯৫-৫৯৭, ৫৯৯, ৬২৯, ৬৩২, ৭০৫, ৭৫৯, ৮০৪, ৮০৬, ৮১৭, ৮২০, ৮২২
হস্তিনাপুরী *দেখুন* হস্তিনাপুর
হিড়িম্ব ২৯৬, ৩০৬, ৩৭৫, ৩৭৮, ৩৮১, ৩৮৩-৩৮৫, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৫, ৩৯৬
হিড়িম্বা ২৯৬, ২৯৭, ৩০১, ৩৭৪-৩৯৭, ৩৯৯, ৪০৩-৪০৫, ৪৮৮, ৫৪০
হিরণ্যবর্মা ১৬০
হিমাচল প্রদেশ ৩৭৪, ৩৮৭
হিল্‌টেবাইটেল ৪৬৪, ৪৬৫
হৃদয়া ৬৭৫
হৃদিক ৬৫৯
হোত্রবাহন ১৫০-১৫২, ১৫৯, ১৬১, ১৬২

David Howe ২৫৪
Destiny of a King ৭৫৫
Indian Culture ৬৭৯
Patterns of Adoption: nature, nurture and psychosocial development ২৫৪
'Sources of the two Krisna Legends.' ৬৭৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~